দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

NOT TO BE LENT OUT

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিকপত্র

পঞ্চম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ—জ্যৈষ্ঠ

১৩২৪-১৩২৫

সম্পাদক—শ্রীজলধর সেন

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌—২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার — শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

ভারতবর্ষ

সূচীপত্র

পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড পৌষ—জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪-১৩২৫

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

অঘটন (গল্প)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ... ৬৩৭

অদল-বদল (আলোচনা)—শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ৮৫২

অরণ্যের অপচয় (ধন-বিজ্ঞান)—
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত এম-আর-এ-এস ... ১৯১

আমার বৈঠকখানা (আলোচনা)—
শ্রীযতিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ... ৫১৬, ৫৮৮

আমেরিকায় হিন্দুস্থান-সমিতির কার্য্য (সাহিত্য)—
শ্রীসুধীন্দ্র বসু এম-এ, পি-এইচ-ডি ... ১৯৬

আরাবল্লীর কথকতা বা আর্য্যাবর্ত্তের জন্ম (পুরাতত্ত্ব)—
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ৪৪৭

উকিলের ভাগ্য (গল্প)—শ্রীকিরণবালা দেবী ... ৬৬৬

উৎকল-সাহিত্য (মাসিক সাহিত্যালোচনা)—
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস ১৩৯, ২৪১, ৩৯৯, ৫৬২, ৬৮০, ৭৮৮

এলকোহল বা সুরাসার (শিল্প-বিজ্ঞান)—
অধ্যাপক শ্রীনলিনীনাথ রায় এম এ ... ২০১

কন্নাড় ভাষা (সাহিত্য)—শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ... ৬২৫

কয়লার খনি (বাণিজ্য)—শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত ... ৭৬৭

করুণা (সমালোচনা)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার ... ৮১৮

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর (শিক্ষা)—
অধ্যাপক শ্রীসত্যশরণ সিংহ
বি-এস্‌সি (ইলিনয়), এম-ও-জি-এ ... ৬৪১

কবি রঙ্গলাল (জীবনী)—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১২, ১২৯, ২৯৫

কবি (স্বরলিপি) শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ২৬৯

কালা-আজর (চিকিৎসা-বিজ্ঞান)—
শ্রীচন্দ্রশেখর কালী এল-এম-এস ... ৩৩

কালোয়াত (কবিতা)—শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম বি ২৩১

কাব্যে ইঙ্গিত (সাহিত্য)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্-এ ৮৩৮

কি চাহি না ? (স্বাস্থ্য-তত্ত্ব)—শ্রীরামরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বি-এল্ ৭৭৩

কৃতান্তের অনুচর (আলোচনা)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ৫২৭

কোনারক (ভ্রমণ)—শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ ... ৬৯, ২৫২

ক্ষুদ্র বিন্দু (কবিতা)—শ্রীসরলা দত্ত ... ১২০

খাঁচার পাখী (জীবতত্ত্ব)—শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল ১৫২

গদাই পণ্ডিত (নক্সা)—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় ... ৮৫২

গান (স্বরলিপি)—লালা মুক্তিপ্রকাশ নন্দে (বিদ্যারত্ন) ২৭১

গুরুচরণ (গল্প)—শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এম-এ ... ৩৫৫

গুরুদক্ষিণা (নক্সা)—শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ ... ১৩২

গৃহদাহ (উপন্যাস)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৪১, ২৭৩, ৪২৩

গৃহ-প্রাঙ্গণ (সাহিত্য)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৭৪

গোবিন্দদাস পদাবলীতে বৃত্ত্যনুপ্রাস (সাহিত্য)—
শ্রীগণেশচন্দ্র শীল ... ১৯৮

চিকিৎসক (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ লাহিড়ী ... ৫২২

চিঠির মূল্য (গল্প)—শ্রীশচীন্দ্রভূষণ দাসগুপ্ত এম-এ ... ৪৯৬

চিত্রে বসরা নগরী (ভ্রমণ)—
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৭৬, ৪৭৭

চুম্বক-তত্ত্ব (বিজ্ঞান)—
অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য বি-এসসি ... ৭৮, ৩৭৬

ছদ্মবেশ (সাহিত্যিক নক্সা)—অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যারত্ন, এম-এ. ৭২, ২০৬, ৩৩২, ৫০৮, ৬৪১, ৭৩২

জড়-পরিচয় (বিজ্ঞান)—
অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় এম-এস্‌সি ... ৩৭

জলধি-তলে (বিজ্ঞান)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ৬৮৮

টাকার লীলাতত্ত্ব (নক্সা)—
অধ্যাপক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ ... ৩৫৩

ঢেলে সাজা (ব্যঙ্গ)—শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি ৩৯

তড়িৎ বিজ্ঞান (বিজ্ঞান)—অধ্যাপক শ্রীনরেশচন্দ্র রায় বি-এসসি ৬৩২

তীর্থযাত্রী (চিত্র)— ... ৬২৪

দত্তা (উপন্যাস)—
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫০, ২১০, ৩৮১, ৫৬৪, ৭০৭, ৮১০

দাদা (গল্প)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ ... ৭৮৩

দিদারগঞ্জে যক্ষিণী-মূর্ত্তি (প্রত্নতত্ত্ব)— ... ৪০১

দীনের দাবী (অর্থশাস্ত্র)—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ এম-এ ৫০৮

দীর্ঘতম টেলিস্কোপ (বিজ্ঞান)—শ্রীচুনীলাল মিত্র ... ১৮০

দুইখানি পুস্তক (সমালোচনা)—
(ক) দ্বিজেন্দ্রলাল—শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী ... ৬৫১
(খ) ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়নভাষ্যের বঙ্গানুবাদ—
শ্রীহরিহর শাস্ত্রী ... ৬৫৩
ধীরা (গল্প)—শ্রীপাঁচুগোপাল ঘোষ ... ৭৭০
নদীয়ার উটজ-শিল্প (শিল্প-বিজ্ঞান)—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সরকার বি-এ ও
শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এ ... ১৭২
নদীয়ার কথিত ভাষার বিশুদ্ধত্ব (সাহিত্য)—
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার বি-এ ... ৭৬৬
নদীপুরের স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহ (শোক সংবাদ) ৮৪১
নন্দলাল (স্বরলিপি)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ১১৩
নিরক্ষর কবি (জীবনী)—শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ ৩৪৪
নেত্য পাগলী (গল্প)—শ্রীবরদাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ... ৬৮২
পঞ্জাবে কয়েকদিন (ভ্রমণ)—
শ্রীকুমারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এসসি ... ৮২২
পরমাণুর প্রকৃতি (বিজ্ঞান)—
অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় এম-এসসি ... ৩৪৮
পাখীর খাঁচা (জীবতত্ত্ব)—শ্রীসত্যচরণ লাহা এম এ, বি-এল ৩৬১
পাণ্ডু-নগরাধিপ শ্রীশ্রীমহেন্দ্র দেব ও দনুজমর্দ্দন দেবের সম্বন্ধ-নির্ণয়
(ইতিহাস)—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি-এল ... ৭৬৪
পুনর্দর্শন (গল্প)—শ্রীকালিপদ মিত্র এম-এ, বি এল ... ৪১৬
পুরাণে প্রাকৃতিক ইতিহাসের মূল নিদর্শন (গবেষণা)—
অধ্যাপক শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ ... ৫৭৭
পুস্তক-পরিচয়—সম্পাদক ... ২৮৭, ৪২১
পৃথিবীর গ্রহত্ব (জ্যোতিষ)—
অধ্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায় এম্-এ ... ৭৫৯
প্রণাম, নমস্কার ও অভ্যর্থনাদির বিভিন্ন ধরণ (সমাজতত্ত্ব)—
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ... ৪৯২
প্রসাদ-প্রসঙ্গ (আলোচনা)—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৬১
প্রস্তর-মূর্ত্তি (শিল্প)—ভাস্কর শ্রীকারমোকার ... ২২৮
প্রাকৃত-দর্শনের ইতিহাস (দর্শন)—
অধ্যাপক শ্রীসীতানাথ প্রধান, এম্-এসসি ... ১৪৫
প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (বিজ্ঞান)—
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল্-এম্-এস্ ... ৬৮৬
প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে জনশিক্ষা (ইতিহাস)—
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, বি-এ ... ৪৯৩
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় গ্রীক সংস্পর্শ (ইতিহাস)—
শ্রীসুধাংশুমোহন দাসগুপ্ত ... ৪৮৭
প্রাচীন যুগের জ্যোতিষ্ শাস্ত্র (জ্যোতিষ)—
শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাসগুপ্ত বি-এ ... ৭২১
প্রায়শ্চিত্ত (গল্প)—শ্রীজলধর সেন ... ৫৪৩
ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে বাঙ্গালী সৈনিকগণ (সাময়িক) ... ৬২১
ভাবের অভিব্যক্তি (চিত্র)—
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২৭, ২৫৭, ৪০২, ৫৫৩
মকরপোত বা সবম্যারিণ (বিজ্ঞান)—শ্রীচুনীলাল মিত্র ৬০২
মনোবিজ্ঞান (দর্শন)—
অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ, এম্-এ ১, ২৮৯, ৪৩৯
মহাকবি ভাস-প্রণীত—প্রতিমা (সাহিত্য)—
শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, সরস্বতী, এম্-এ, বি-এল ... ৫৮২
মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী (জীবনী)—
শ্রীসারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৬০০
মহাবৎ খাঁ কি রাজপুত ? (ইতিহাস)—
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১২০
মাতৃভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রদান (শিক্ষা)—
অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম্-এ, পি-এইচ ডি,
এফ-সি-এস্, পি আর-এস ৬৭৩
মাতৃ স্নেহ (সমাজ-চিত্র)—
শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম্-বি ... ৬৯১
মানুষের সাধনা (আলোচনা)—শ্রীনলিনী রায় ... ২৯৯
মিকটিলা-ভ্রমণ (ভ্রমণ-কাহিনী)—
লেপ্টেন্যাণ্ট শ্রীকিরণ সেন, এম-বি, আই এম্-এস্ ৬১৩
মোগল-সম্রাট্ আকবর (ইতিহাস)—
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২১, ৩১৫, ৬৬৩
মোড়ল (ছোটো গল্প)—শ্রী——— ... ২৫৬
যুদ্ধ-যাত্রা (গল্প)—শ্রীবিহঙ্গবালা দাসী ... ৭৫৫
রঙ্গ-চিত্র (ব্যঙ্গ)—
শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম্ বি, ২৩১, ৩১৩, ৫৩৬
রস-সাহিত্য (সাহিত্য)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু ... ৬১০
রাঢ়ে বৌদ্ধধর্ম্ম (ইতিকথা)—
শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় জ্যোতিভূষণ, বি-এ ... ৩৫১
বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর একটী অজ্ঞাতপূর্ব্ব কীর্ত্তি (ইতিহাস)—
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সান্ন্যাল ... ৬৩০
বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ... ৮৪২
বন্ধু (গল্প)—শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় ... ২৮৪
বসুর বিজ্ঞান-মন্দির (চিত্র) ... ৯২২
বাঙ্গালা ধাতুর রূপ (সাহিত্য)—
শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল ... ২৭, ৮৩০
বাঙ্গালার জন্ম-মৃত্যু (স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান)—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ ... ৯৯৭
বাঙ্গালার ধাতুরূপ (সাহিত্য)—
শ্রীরাখালরাজ রায়, বি-এ ... ২১৯

বিজ্ঞানের ব্যর্থ্য (বিজ্ঞান)—
শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ... ১৩৩
বিজ্ঞানের রূপরেখা (বিজ্ঞান)—
শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্‌সি ... ৫৪৮
বিধিলিপি (উপন্যাস)—
শ্রীনিরুপমা দেবী, ২০, ২৩৩, ৩২৪, ৪৫৫, ৫৯৬, ৭৪৪
বিবাহে বিভ্রাট্ (গল্প)—শ্রীকল্পনা দেবী ... ৯৭
বিষের আংটি (সমাজতত্ত্ব)—শ্রীসুধাংশু চট্টোপাধ্যায় ... ৪৯০
বীণার তান (সাহিত্য)—শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়, বি-এ ... ১২৯
ব্যর্থ প্রয়াস (গল্প)—শ্রীশান্তিকুমার রায়চৌধুরী ... ১৮৫
ব্যায়াম-বীর মহেন্দ্রনাথ (চিত্র)— ... ২৩০
ব্রাহ্মণ-ভোজন (পল্লী-চিত্র) শ্রীজলধর সেন ১৯০
শঙ্কর মিশ্র (জীবনী)—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী ... ৪৮২
শোক-সংবাদ—সম্পাদক ৮৩, ৪০৬, ৬৯৬
শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী (উপন্যাস)—
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০৭, ২৪৩, ৩৩৮, ৫৩৭, ৬৫৩, ৮৪৭
শ্রীবৃন্দাবনে হোলি (ভ্রমণ)—
মহারাজ-কুমার শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ... ৩৬৯
সঙ্গীত ও স্বরলিপি—শ্রীঅরুণা বেজবড়ুয়া ... ৫৫১
" —শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১১১, ২৭১
সঙ্গীতাস্ত—শ্রীদিব্যোনাথ শাস্ত্রী ... ৩৬
সন্ধি (গল্প)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ... ৫৫৭
সন্ধ্যা-রাণী (গল্প)—শ্রীসত্যপ্রিয়া দেবী ... ৮৩
সমাজ-চিত্র—শ্রী——— ... ৫৫৫
সরবায়া (প্রত্নতত্ত্ব)—
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ ... ৮৭
সবিতা-দেব (দর্শন)—
অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ ... ৪৩৩
সাজাহান (প্রতিবাদ) - শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ... ৪১২
সাজাহান (সমালোচনা)—
শ্রীএব্রাহিম খাঁ, বি-এ ... ৪০
সাধনা ও সিদ্ধি (কবিতা)—
শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম্-বি ... ২৩২
সাময়িকী (আলোচনা)—সম্পাদক ১০৫, ২৬২, ৩৯৫, ৫৭২, ৬৯৯, ৭৯৬
সাহিত্য-প্রসঙ্গ (আলোচনা)—
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় ১১৮, ২৮১, ৪২৬, ৫৪১, ৭৫৩
সাহিত্য সংবাদ ১৪৪, ২৮৮, ৪৩২, ৫৭৬, ৭১৮, ৮৫২
সুমতি (গল্প) - শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু ... ১৬২
সৌভাগ্য (গল্প)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি এ ... ১১৫
স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ... ৮৩৪
হারাধন বাবু (সমাজ-চিত্র)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ ৭০২
হাসি ও অশ্রু (গল্প)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ ... ৪০৯
হিমালয়ে (ভ্রমণ)—অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম-এস্‌সি ৪৭০

চিত্র-সূচি

পৌষ

চিত্র—১ ... ৮
চিত্র—২ ... ৯
কোনারকের প্রস্তর-শিল্প ... ৬৪
কোনারক মন্দিরের ভাস্কর্য্য-শিল্প ... ৬৫
নাটমন্দির—কোনারক ... ৬৬
কোনারক মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে স্বতন্ত্র একটী মন্দির ... ৬৬
গঙ্গামূর্ত্তি—কোনারক (পার্শ্বের দৃশ্য) ... ৬৭
গঙ্গামূর্ত্তি—কোনারক (সম্মুখের দৃশ্য) ... ৬৭
কোনারকের খোদাই শিল্প ... ৬৭
দক্ষিণ দিক হইতে কোনারকের মন্দিরের পার্শ্ব দৃশ্য ... ৬৮
কোনারকের অপর একটী দৃশ্য ... ৬৮
পিতৃভক্ত ব্রজেশ্বর ... ৬৯
ব্রজেশ্বরের প্রতি পিতার আদেশ ... ৬৯
ব্রজেশ্বরের প্রতি মাতার আদেশ ... ৭০
ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্লর প্রথম সাক্ষাৎ ... ৭০
ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্লর মিলন ... ৭১
ব্রজেশ্বরের মোহ নাশ ... ৭১
ব্রজেশ্বর ও দেবী চৌধুরাণী ... ৭২
চিত্র—১৭ ... ৭৮
দিক্-শলাকা ... ৭৯
চিত্র—১৮ ... ৭৯
টপ-ওয়াচ্ ... ৭৯
পাকদণ্ড ... ৮০
চিত্র—২১ ... ৮১
সংস্কারের পূর্ব্বে মঠের দৃশ্য ... ৮৯
সংস্কারের পর মঠের দৃশ্য ... ৮৯
সংস্কারের পর মঠের সাধারণ দৃশ্য ... ৯০
মঠের পূর্ব্বপার্শ্বের দক্ষিণ ভাগ ... ৯০
মঠের পূর্ব্ব পার্শ্বের বামভাগ ... ৯১

হ্রদের দক্ষিণের দৃশ্য ... ৬১৭
রেলওয়ে সেতু ... ৬১৮
সিগতাল প্যাগোডা ... ৬১৮
সৈন্যদের লাইব্রেরী ও গার্ডরুম ... ৬১৯
ভারতীয় সেনানিবাস ... ৬১৯
হ্রদের দৃশ্য—ব্রহ্মনারীর জল তুলিবার ঘাট ... ৬২০
রেলষ্টেসন ও ওভারব্রিজ ... ৬২০
হাসপাতাল ... ৬২১
ফরাসীদের বিখ্যাত ৭৫ c. m. কামান লইয়া শ্রীজিতেন্দ্রিয় ... ৬২১
মধ্যাহ্ন ভোজন ... ৬২২
দুপুরবেলা আহারের পর খবরের কাগজ পড়া ... ৬২২
শ্রীঅমিতাভ ঘোষ ... ৬২৩
ফরাসীদের বিখ্যাত ৭৫ c. m. কামান লইয়া বাঙ্গালী সৈনিকগণ ৬২৩
শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় ... ৬২৩
শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ ও শ্রীব্রজমোহন দত্ত ... ৬২৩
তীর্থযাত্রী .. ৬২৪
চিত্র ১ .. ৬৩৩
চিত্র ২ ... ৬৩৪
চিত্র ৩ ... ৬৩৫
চিত্র ৪ ... ৬৩৫
চিত্র ৫ ... ৬৩৫
চিত্র ৬ ... ৬৩৬
চিত্র ৭ ... ৬৩৬
সমুদ্রতলের সর্ব্বপ্রথম ফটোগ্রাফ ... ৬৮৯
সমুদ্রগর্ভের ফটো-গ্রহণ প্রণালী ... ৬৮৯
হাঙ্গরের সহিত যুদ্ধ ... ৬৯০
ডুবুরির সমুদ্রতলে নিক্ষিপ্ত মুদ্রা কুড়ান ... ৬৯০
ডুবুরি নঙ্গর তুলিতেছে ... ৬৯০
সমুদ্রগর্ভে মৎস্যকুলের সঙ্করণ ... ৬৯০
ছাইয়ের ডাক্তার! ... ৬৯১
কি নিষ্ঠুর তুমি ... ৬৯২
কি লক্ষ্মীছাড়া ছেলে বাবু ছোট বৌয়ের! ... ৬৯২
দাঁড়িয়ে দেখলো কি ঝি! ... ৬৯৩
বল্ মা বেশ করিচি গাল দিয়েছি। ... ৬৯৩
তা তুমি ভেবো না ... ৬৯৪
মার! এত বড় ছেলেকে ধরে মার! ... ৬৯৪
তাও বলি, বৌ-মা, তোমারও দোষ আছে ...
তোমার খুব দরকার বলচো, তাই হাতের বালা খুলে দিলুম
হাবিলদার ৺দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ...

জ্যৈষ্ঠ

রাশিচক্র ...
এমোফিলিস্ ...
কালেন্দ্র ...
৬ ইঞ্চি-মাপের হাউইজার কামান ...
ভাসমান সবম্যারিণ ...
মাইন-বিভীষিকা ...
গোলাবর্ষণোদ্যত কামান ...
"আয়রন ডিউক" রণতরীর সম্মুখের কামান ...
সবম্যারিণে বিনাতারের সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্র ...
দ্রুত গোলাবর্ষী কামানে শেল ভরা হইতেছে ...
কামানের কারখানা ...
নৌসেনাগণের কামান-চালনা শিক্ষা ...
সবম্যারিণের খোল ...
৬০ পাউণ্ড ওজনের গোলাবর্ষী কামান ...
ডেষ্ট্রয়ার রণতরীতে কামান স্থাপন ...
একটী ম্যাক্সিম কামান ...
সবম্যারিণ হইতে নিক্ষিপ্ত টর্পেডো ...
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সভাপতি) ...
" চিত্তরঞ্জন দাস (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি) ...
" সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত (অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক) ...
" শশাঙ্কমোহন সেন (সভাপতি, সাহিত্য শাখা) ...
" দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক (সভাপতি, বিজ্ঞান শাখা) ...
" দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (সভাপতি, দর্শন শাখা)
" রামপ্রাণ গুপ্ত (সভাপতি, ইতিহাস শাখা) ...
সচ্ছলতায় ...
অনাটনে ...
ফটোতোলা ...
নদীপুরের স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহ ...
মেয়োকলেজ—আজমীর ...
আজমীরের সাধারণ দৃশ্য ...

বহুবর্ণ চিত্র

"চল চল মাধব মধু পরণাম।
চাতুরি ন রহ চতুরক ঠাম॥"
বেয়ান ঠাকরুণ
"পিদড়ি" মুনিয়া (Indian Silverbil)
ষ্ট্রিয়েটেড মুনিয়া (Striated Finch)
"বেঙ্গলী" বা জপান মুনিয়া
"রামগোরা" (Java Sparrow)
পল্লীপথে
প্রণয়-লিপি
পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ
সাপুড়ে
দানেশ খাঁ
জলকেলে জল আন্তে যাওয়া হলো বিষম দায়
মুক্ত বেণী
পাঠ-নিরতা
স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (পৃষ্ঠাব্যাপী একবর্ণ)

"চল চল মাধব মঝু পরণাম।
চাতুরি ন রহ চতুরক ঠাম॥"

—বিদ্যাপতি।

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা

THE Emerald Printing Works CALCUTTA

সচিত্র মাসিক পত্র
ভারতবর্ষ

পৌষ, ১৩২৪

দ্বিতীয় খণ্ড] পঞ্চম বর্ষ [প্রথম সংখ্যা

মনোবিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম-এ]

সংবিত্তি

কেমন করিয়া মানুষের মনে ভাবের সমাবেশ হয়? সংসারে মানুষ নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় প্রবেশ করে। এখানে সমস্ত বিষয়ই তাহার অজ্ঞাত ও অপরিচিত। এই অজানিত দেশে তাহাকে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইবে। ইহার তথ্যসমূহ আবিষ্কার ও আয়ত্ত করিতে হইবে। যে জ্ঞানের বলে এই সকল কার্য্য সম্পাদিত হইবে, যে জ্ঞান জীবনে শৃঙ্খলা আনয়ন করিবে, যে জ্ঞান জীবনকে কর্ত্তব্যের দিকে, ধর্ম্মের দিকে পরিচালিত করিবে,—কেমন করিয়া সেই জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হয়? বাহ্যশক্তিই মনের সুপ্ত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে।

"নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত্ত বিরাম নাই,
নিদ্রাহীন সারা দিন-রাত।"

সন্ধ্যার সময় গঙ্গার উপকূলে পদচারণা করিতেছি। মন চিন্তানিবিষ্ট। এমন সময় একটি সুঘ্রাণ পাইলাম। এ সুঘ্রাণ কিসের এবং কোথা হইতে আসিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না, বা বুঝিবার চেষ্টাও করিলাম না। একটি সুঘ্রাণ পাইতেছি—মাত্র এই জ্ঞানটুকু আছে। কেমন করিয়া এই জ্ঞানের উদয় হইল? সুগন্ধি বস্তু হইতে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রেণুকণা আসিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সংলগ্ন স্নায়ুসমূহের প্রান্তভাগে আঘাত করিতেছে। সেই আঘাতে স্নায়ু-সকল স্পন্দিত হইতেছে। অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্ত্তৃক উক্ত স্পন্দন মস্তিষ্কে নীত হইতেছে। এইবার শারীর-ক্রিয়া শেষ ও মানস-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য হেতু মনও চঞ্চল হইয়া উঠিল। মস্তিষ্ক-স্পন্দনের উপর মনের প্রতিক্রিয়া হইল। তখন বুঝিলাম যে, এই স্পন্দন অপরাপর ইন্দ্রিয়-সংলগ্ন স্নায়ু-স্পন্দন হইতে পৃথক, এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সংলগ্ন স্নায়ু-স্পন্দন-সদৃশ। এইরূপ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য-জ্ঞান হইতে অনুভূতির সৃষ্টি হইল। এইরূপ অনুভূতিকে সংবিত্তি বলে।

"কুসুম আপনি খুয়েছে গন্ধ,
গন্ধ কুসুমে র'য়ে,
স্পর্শ শরীরে জাগায় চেতনা,
দুয়ে মিলি এক হ'য়ে।"

স্নায়বীয় স্পন্দনের উপর মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম সংবিত্তি। এখানে আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংবিত্তি হইল। কিন্তু যখনই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, এই সুঘ্রাণটি অদূরস্থিত বকুল পুষ্পের—তখনই আমি সংবিত্তির সীমা অতিক্রম করিলাম। এখানে আমার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইল।

আমি নিদ্রামগ্ন। দরজায় কেহ ধাক্কা দিতেছে। আমি কিন্তু কোন শব্দ শুনিতে পাইতেছি না। বায়ুর স্পন্দন হইতেছে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্পন্দন হইতেছে, অন্তর্বাহী স্নায়ুর স্পন্দন হইতেছে, মস্তিষ্কের স্পন্দন হইতেছে; - শরীর সম্বন্ধীয় সমস্ত কাজই হইতেছে, তথাপি কোন শব্দ শুনিতেছি না। কারণ, মন আমার সুপ্ত। এখন তাহার উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। বাহ্য শক্তি আমার ইন্দ্রিয় স্পর্শ করিতেছে; কিন্তু সে শক্তি মনকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিতেছে না,— সে শক্তির উপর মনের প্রতিক্রিয়া হইতেছে না। সুতরাং আমার সংবিত্তিও হইতেছে না। আমার পার্শ্বে যদি কেহ জাগ্রত অবস্থায় থাকে, তাহার কাছে শব্দ থাকিতে পারে; কিন্তু আমার কাছে কোন শব্দ নাই। বারংবার ধাক্কা দেওয়ায় আমার নিদ্রার ঘোর কমিতে লাগিল; সুপ্ত চৈতন্য কথঞ্চিৎ জাগ্রত হইল; উপলব্ধি করিবার শক্তি ফিরিয়া আসিল। বাহ্যশক্তি-প্রসূত মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার উপর মানসিক প্রতিক্রিয়া হইল। বুঝিতে পারিলাম যে, বর্ত্তমান স্পন্দন—দর্শন, আস্বাদন প্রভৃতি-জনিত স্পন্দন হইতে পৃথক এবং পূর্ব্ব-পরিচিত শ্রবণ-জনিত স্পন্দন-সদৃশ। এতক্ষণে আমার শ্রোত্র-সংবিত্তি হইল। এইরূপে সংবিত্তির জ্ঞান হইয়া থাকে।

"বার বার তুমি আপনার হাতে
স্বাদে গন্ধে ও গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ
অন্তর-মাঝখানে।"

পরে ক্রমশঃ যখন বুঝিলাম যে, কেহ দরজায় ধাক্কা দিতেছে বলিয়া শব্দ হইতেছে, তখন আমার "প্রত্যক্ষ-জ্ঞান" হইল। অতএব সংবিত্তির ক্রম—

১। বাহ্য কারণ

(ক) যান্ত্রিক—বায়বীয় স্পন্দন।

(খ) শারীর।

(অ) ইন্দ্রিয়ের প্রান্তভাগে বায়বীয় স্পন্দনের ক্রিয়া।

(আ) অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়-স্পন্দন মস্তিষ্কে আনয়ন।

(ই) মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন।

২। মানস কারণ—

(ক) অবধান
(খ) সাদৃশ্যানয়ন
(গ) বৈসাদৃশ্যানয়ন
} মস্তিষ্ক-স্পন্দনের উপর মনের প্রতিক্রিয়া।

সংবিত্তি সাধারণতঃ দুই প্রকার—প্রাদেশিক এবং ব্যাপক। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি শরীরের এক-একটি অংশ। এই অংশগুলির সহিত বাহ্যজগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। ইহারা এরূপ ভাবে গঠিত যে, ইহাদের উপর বাহ্যজগতের ক্রিয়া অতি সহজেই সম্পন্ন হয়। বাহ্যজগতের যাবতীয় পরিবর্ত্তন উক্ত অংশগুলি দ্বারা সহজেই গৃহীত এবং অন্তর্জগতে নীত হয়। উল্লিখিত এক-একটি অংশ এক-একটি গুণ গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া গঠিত হইয়াছে। চক্ষু বর্ণবাহক, শ্রোত্র শব্দবাহক, ত্বক স্পর্শ-বাহক, নাসিকা গন্ধবাহক এবং জিহ্বা রসবাহক।

"কেড়ে লহ নয়নের আলো, পাষাণ নয়ন কর অন্ধ;
চির যবনিকা প'ড়ে যাক হে, নিবে যাক রবি, তারা, চন্দ্র।
হ'রে লহ শ্রবণের শক্তি, থেমে যাক জলদের মন্দ্র;
সৌরভ চাহি না, বিধাতা, রুদ্ধ কর হে নাসা-রন্ধ্র।
স্বাদ হর হে, কৃপাসিন্ধু, চাহি না ধরার মকরন্দ;
স্পর্শ কর, হে হরি, লুপ্ত ক'রে দাও অসাড় নিষ্পন্দ।
তুমি মূর্ত্তিমান হ'য়ে এস প্রাণে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ;
এনে দাও অভিনব চিত্ত, ভুঞ্জিতে সে মিলনানন্দ।"

শরীরের এই পাঁচটি অংশকে পাঁচটি ইন্দ্রিয় বলে। বাহ্যবস্তুর উত্তেজনা-গ্রহণ-পটু শরীর-অংশের নাম ইন্দ্রিয়। কতকগুলি সংবিত্তি পঞ্চেন্দ্রিয়-সমুদ্ভূত, আর কতকগুলি কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়-সমুদ্ভূত নহে। যাহারা ইন্দ্রিয়-সমুদ্ভূত, তাহারা প্রাদেশিক এবং অপরগুলি ব্যাপক। যাহা সমস্ত

শরীর-সর্ব্বব্যাপী, তাহাকে ব্যাপক সংবিত্তি বলা যায়। ব্যাপক-সংবিত্তি শরীরের কোন্ অংশ-সংলগ্ন, তাহা স্থির করা কঠিন। ইহার উৎপত্তির প্রাক্‌কালে উৎপত্তিস্থান নির্ণীত হইলেও পরক্ষণেই ইহা সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হইয়া পড়ে; শরীরের কোন বিশেষ প্রদেশে আবদ্ধ থাকে না। পরিপাক যন্ত্র হইতে ক্ষুধার উৎপত্তি হইলেও, এই ক্ষুধাজনিত অশান্তি সর্ব্বস্থানব্যাপী হয়।

ক্ষুন্নিবৃত্তি কর,—তোমার মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হইবে, মনের স্ফূর্ত্তি হইবে, সমস্ত শরীরেই সুখ অনুভব করিবে। ব্যাপক সংবিত্তি শরীরের কোন বিশেষ প্রদেশান্তর্গত নহে। এরূপ সংবিত্তি হইতে বহির্জগতের কোন সমাচার প্রাপ্ত হই না। শরীরাভ্যন্তরের যদিও কিছু পাই,—তাহা অতি সামান্য। প্রাদেশিক সংবিত্তি শরীরাবয়বের কোন বিশেষ প্রদেশান্তর্গত।

ব্যাপক সংবিত্তি।

১। অনিন্দ্রিয় সমুদ্ভূত।
২। দেশ নির্ণয় অসম্ভব।
৩। অন্তর্দৈহিক।
৪। শারীরিক সুখ-দুঃখ-সংবাদ-বাহী।
৫। জীবন ধারণের সহায়ক।

প্রাদেশিক সংবিত্তি।

১। ইন্দ্রিয়-সমুদ্ভূত।
২। দেশ নির্ণয় সম্ভব।
৩। বহির্দৈহিক।
৪। বাহ্যজগৎ-সমাচার-বাহী।
৫। জ্ঞানবিস্তারের সহায়ক।

চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক, নাসিকা এবং জিহ্বা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়। ইহাদের গঠন-প্রণালী বিভিন্ন; উদ্বোধক শক্তিও ভিন্ন প্রকারের; সুতরাং স্পর্শকে ঘ্রাণ বলিয়া বা ঘ্রাণকে বর্ণ বলিয়া আমাদের ভ্রম হয় না। প্রাদেশিক সংবিত্তির উদ্বোধক-বাহ্য এবং বাহ্য-উদ্বোধকের মধ্যে নানাপ্রকার পার্থক্য দৃষ্ট হয়; এবং এই পার্থক্য অনুসারে সংবিত্তিরও পার্থক্য লক্ষিত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ানুভূতি পৃথক; কারণ, একটি উদ্বোধকের প্রকৃতি আর একটি উদ্বোধকের প্রকৃতি হইতে পৃথক। দীপশিখার আলোক এবং বৈদ্যুতিক আলোক পরস্পর পৃথক; কারণ, একটির উদ্বোধক ক্ষীণ এবং আর একটির উদ্বোধক তীক্ষ্ণ। তোমার বাম হস্তে একটি পয়সা রাখিলাম এবং দক্ষিণ হস্তে দুইটি পয়সা পাশাপাশি রাখিলাম; দক্ষিণ হস্তের সংবিত্তি বাম হস্তের সংবিত্তি অপেক্ষা ব্যাপক—কারণ একটি উদ্বোধকের ক্রিয়াস্থল আর একটির ক্রিয়াস্থল অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। এক হস্তে তোমার কপাল আর এক হস্তে তোমার কপোল স্পর্শ করিলাম। তুমি এই দুই স্পর্শের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করিলে—কারণ উহাদের উৎপত্তিস্থান পৃথক। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, উদ্বোধক যখন প্রবল, সংবিত্তি তখন প্রবল। উদ্বোধক যখন বিস্তৃত, সংবিত্তি তখন ব্যাপক। উদ্বোধক যখন স্থায়ী, সংবিত্তিও তদ্রূপ। উদ্বোধক ভিন্ন প্রকারের, সংবিত্তিও ভিন্ন প্রকারের। আবার উদ্বোধকের ক্রিয়ার স্থান অনুসারে সংবিত্তিরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অতএব উদ্বোধক এবং সংবিত্তির সম্বন্ধ এই প্রকার—

সংবিত্তি

১। পরিমাণগত—
 (ক) প্রাবল্য
 (খ) ব্যাপকতা
 (গ) স্থায়িত্ব
২। প্রকৃতিগত—
 (ক) প্রকারগত—
  (দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন ইত্যাদি)
 (খ) স্থানগত।

উদ্বোধক

১। পরিমাণগত—
 (ক) প্রাবল্য
 (খ) বিস্তৃতি
 (গ) স্থায়িত্ব
২। প্রকৃতিগত—
 (ক) প্রকারগত—
  (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ)
 (খ) স্থানগত
  (অগ্র পশ্চাৎ, হস্ত, পদ ইত্যাদি)

বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে প্রকৃত সংবিত্তি অসম্ভব আমরা যাহাকে সংবিত্তি বলিতেছি, উহা প্রকৃতপক্ষে অবিমিশ্র

দেখিবে, লোকটি কতকগুলির যথার্থ নাম দিতে পারিবে না; কারণ, অনেক গন্ধই পরস্পর সদৃশ। একই বস্তু হইতে আমরা সকল সময়ে একরকম গন্ধ পাই না; আবার একই বস্তু একই সময়ে দুইজন লোককে একই গন্ধ বিতরণ করে না। এই সকলে কারণে, গন্ধ নানা প্রকারের হইলেও, এ পর্য্যন্ত গন্ধের নাম নির্দ্দেশ করা হয় নাই; এবং অদূর-ভবিষ্যতে করা হইবে বলিয়াও মনে হয় না। স্বাদের নাম আছে, বর্ণের নাম আছে, কিন্তু গন্ধের নাম নাই। সুন্দর গন্ধ, সুখকর গন্ধ প্রভৃতি নাম আমরা উল্লেখ করি সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা গন্ধের নাম নয়। বিশেষ-বিশেষ গন্ধ হইতে আমাদের মনে বিশেষ-বিশেষ ভাবের উদয় হয় এবং আমরা ঐ ভাব অনুসারেই নামকরণ করিয়া থাকি। অতএব এই সকল নাম গন্ধের নাম নয়; গন্ধের ফলের, গন্ধ-উদ্দীপ্ত মানসিক ভাবের নাম।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় সকল সময়েই ঘ্রাণ গ্রহণে সমর্থ হয় না—ইহারও ক্লান্তি আছে। যে পাচক প্রত্যহই পলাণ্ডু রন্ধন করে, সে পলাণ্ডুর গন্ধ পায় না—তাহার ইন্দ্রিয় উক্ত ঘ্রাণ গ্রহণে অক্ষম হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সময়ে অন্য ঘ্রাণ উপস্থিত হইলে, সে তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ক্লান্তি ঘটিলেও, যে গন্ধ হইতে ক্লান্তি জন্মে, সেই গন্ধ ব্যতীত অপর গন্ধে ক্লান্তি জন্মে না। নাসিকার একটি রন্ধ্র বন্ধ কর; পরে অপর রন্ধ্রের সাহায্যে কোন একটি গন্ধ-দ্রব্য আঘ্রাণ কর; কিছুক্ষণ পরে দেখিবে তুমি আর গন্ধ পাইতেছ না—কারণ, তোমার ইন্দ্রিয়ের ক্লান্তি জন্মিয়াছে। এক্ষণে অন্য একটি গন্ধ-দ্রব্য আঘ্রাণ কর,—ইহার গন্ধ পাইবে।

রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, যে দ্রব্য ঐ ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আইসে, তাহারই জ্ঞান হইয়া থাকে; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নাসিকা-সংস্পৃষ্ট দ্রব্য বা ইহার নিকটবর্ত্তী দ্রব্যের জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অধিকতর দূরবর্ত্তী দ্রব্যের জ্ঞান হইয়া থাকে। কর্ণপটহে বায়ুতরঙ্গের আঘাত হেতু শব্দানুভূতি হইয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়-শক্তি এত প্রবল যে, ইহার সাহায্যে ধমনীতে রক্তপ্রবাহের শব্দ পর্য্যন্ত শ্রুত হইয়া থাকে। দুই হস্তের দুইটি অঙ্গুলির সাহায্যে তোমার কর্ণবিবরদ্বয় বন্ধ কর; দেখিবে যে, একটি শব্দ-প্রবাহ শুনিতে পাইতেছ। আবার, একটি অঙ্গুলির দ্বারা একটি কর্ণবিবর রুদ্ধ করিয়া অপর হস্তটি তোমার বক্ষে স্থাপন কর; দেখিবে যে, এই শব্দ-প্রবাহের ক্রমের সহিত তোমার হৃদয়-স্পন্দন ক্রমের সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। মাত্র চাপ হইতেও শব্দানুভূতি হইয়া থাকে। কর্ণবিবরে অঙ্গুলি রাখিয়া ক্ষণে-ক্ষণে চাপ দিলে শব্দানুভূতি হয়।

শব্দ প্রধানতঃ দুই প্রকার—তান ও বিতান। কতকগুলি শব্দ কোমল; আবার কতকগুলি কর্কশ। যে শব্দ শ্রুতি-মধুর, যে শব্দে সুখের উদ্রেক হয়, তাহাই সঙ্গীত; আর যাহা শ্রুতি-কঠোর, যাহা হইতে বিরক্তি জন্মে, তাহাই গোলমাল। তান ও বিতানের জ্ঞান অনেক পরিমাণে শিক্ষালব্ধ। যে শব্দ আমার নিকট শ্রুতি-মধুর, তোমার নিকট তাহা কর্কশ বলিয়া মনে হইতে পারে। চীনবাসীদের নিকট যাহা সঙ্গীত, জর্ম্মণদের নিকট তাহা বড়ই কর্কশ। গায়ক গীত গাইতেছে। তুমি সঙ্গীতজ্ঞ, তাই উহার সুর-লয়ের ভ্রম-প্রমাদ লক্ষ্য করিতে পারিতেছ; কিন্তু আমি ঐ রসে বঞ্চিত বলিয়া সঙ্গীতের কোন ত্রুটিই আমার লক্ষ্যপথে আসিতেছে না। আবার একই কারণ-সম্ভূত শব্দ অবস্থা-বিশেষে পৃথক বলিয়া মনে হয়। বাদ্য-যন্ত্র এক হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি তাহা হইতে যে ধ্বনি বাহির করিতে সমর্থ হইবে, অশিক্ষিত ব্যক্তি তাহা পারিবে না।

শব্দের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য আছে—শব্দের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, উচ্চ-নিম্ন ক্রম আছে। কোন শব্দ উচ্চ, আবার কোনটি বা মৃদু। যে শব্দ যত নিকট হইতে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা তত মৃদু; আর যেটি যত দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা তত উচ্চ। শব্দের আবার প্রকারগত পার্থক্যও আছে—শব্দোৎপাদক বস্তুর পার্থক্যই এ পার্থক্যের হেতু। একটি স্ত্রীলোক গীত গাহিতেছে, আর একটি পুরুষও সেই সুরে সেই মানে সেই গীত গাহিতেছে। দুই জনের শব্দের পার্থক্য আছে—এ পার্থক্য পরিমাণগত পার্থক্য নহে;—এখানে শব্দের উচ্চতা এক;—এ পার্থক্য প্রকারগত পার্থক্য। বায়ু-কম্পন শব্দানুভূতির হেতু—কম্পনের বিস্তৃতি এবং কম্পন-সংখ্যার তারতম্য অনুসারে শব্দের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কম্পন-তরঙ্গের বিস্তৃতি বা পরিধি যত বেশী হয়, শব্দেরও উচ্চতা তত অধিক হইবে। সেতারের কোন একটি তারের মধ্যভাগ ধরিয়া তোমার শরীরের দিকে টানিয়া ছাড়িয়া দাও; দেখিবে,

তারটি অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া কাঁপিতে থাকিবে; প্রথম কম্পন অধিক স্থান ব্যাপী হইবে, দ্বিতীয় কম্পন তদপেক্ষা কম স্থান অধিকার করিবে, তৃতীয় কম্পন আরও কম স্থান অধিকার করিবে;—এইরূপে দেখিবে যে, যেমন পরিধি কমিয়া আসিতেছে, শব্দের উচ্চতারও তেমনি হ্রাস হইতেছে। বায়ু-তরঙ্গের পরিধি যত বেশী হইবে, শব্দের উচ্চতাও তত বেশী হইবে। আবার দেখ, বাদক যখন সেতার বাজাইতেছে, তখন তাহার বাম হস্তের অঙ্গুলি একবার উপরে উঠিতেছে আবার নীচে নামিতেছে। এই বাম হস্তের গতি অনুসারে সুরের তারতম্য হইতেছে। শব্দের উচ্চতা এক হইলেও সুর সরু-মোটা হইতেছে। বাদক তাহার বাম হস্তের সাহায্যে তারের দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি করিতেছে। কারণ, তারের দৈর্ঘ্য যত বেশী হইবে, কম্পন-সংখ্যাও তত কম হইবে; আবার তারের দৈর্ঘ্য যত কম হইবে, কম্পন সংখ্যাও তত বেশী হইবে। কম্পন-সংখ্যা যত বেশী হয়, সুরও তত মিহি হয়। অতএব কম্পনের পরিধি অনুসারে শব্দ উচ্চ বা নিম্ন, এবং উহার সংখ্যা অনুসারে শব্দ মিহি বা মোটা হইয়া থাকে। প্রতি সেকেণ্ডে অন্ততঃ দ্বাদশটি কম্পন না হইলে, শব্দ শ্রুতি-গোচর হয় না; আবার কম্পন-সংখ্যা যদি প্রতি সেকেণ্ডে ষষ্টিসহস্রের অধিক হয়, তাহা হইলেও শব্দ শ্রুতির অগোচর থাকিয়া যায়। সুতরাং শব্দেরও দুইটি সীমা আছে—একটি নিম্নতম, অপরটি ঊর্দ্ধতম সীমা। কিন্তু এই সীমাদ্বয় সকলেরই পক্ষে সমান নয়। আমার পক্ষে যাহা নিম্নতম সীমা, অপরের পক্ষে তাহা নাও হইতে পারে। অনেকেই প্রতি সেকেণ্ডে ৩২টি কম্পন হইলেও শব্দ শুনিতে পায় না। মানুষের পক্ষে যে শব্দ ঊর্দ্ধতম সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া অশ্রুত থাকিয়া যায়, অনেক পশু সে শব্দ শুনিতে পায়। অর্থাৎ শব্দের উচ্চতা হেতু মানুষ যে শব্দ শুনিতে পায় না, অনেক পশু সে শব্দ শুনিতে পায়; আবার মানুষ যে শব্দ শুনিতে পায়, অনেক পশু তাহা শুনিতে পায় না।

মানুষের বয়োবৃদ্ধির সহিত শ্রবণ-শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। বধির ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ-কেহ উচ্চ শব্দে, আবার কেহ-কেহ নিম্ন শব্দে বধির হয়। যাহারা উচ্চ শব্দে বধির, তাহাদের নিকট উচ্চ শব্দে কথা কহিলে তাহারা শুনিতে পাইবে না; কিন্তু স্পষ্ট অথচ নিম্নস্বরে কথা কহিলে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে। আবার যাহারা নিম্নস্বরে বধির, তাহাদের নিকট চীৎকার না করিলে শুনিতে পাইবে না। আবার আরও আশ্চর্য্যের বিষয়,—এমন অনেক বধির আছে, যাহারা একেবারে নিস্তব্ধতার মধ্যে থাকিয়াও উচ্চ শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু বহু গোলমালের ভিতর হইতেও অতি মৃদু শব্দ শুনিতে পায়। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, এক স্বাদের সহবাসে অন্য স্বাদের মাত্রা বৃদ্ধি পায়; তেমনি এক শব্দের সহবাসে অন্য শব্দেরও মাত্রা বৃদ্ধি পায়। জাঁতার ঘড়ঘড় শব্দ হইতেছে;—এই শব্দে বধির ব্যক্তির কর্ণপটহ স্পন্দিত হইতেছে। পরে তুমি একটি মৃদু শব্দ করিলে। এই শব্দে পূর্ব্ব স্পন্দন অধিকতর দ্রুত হইয়া তাহার শ্রুতি-গোচর হইল। এই অতিরিক্ত স্পন্দনে তাহার শ্রুতি আকৃষ্ট হইল বলিয়া শব্দটি তাহার নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। অনেকেই আবার শব্দের সুরে বধির—ইহাদের সুর-বোধ নাই; পৃথক-পৃথক সুরের তারতম্য লক্ষ্য করিতে পারে না। সুরবোধহীন লোকে গীত গাহিবার সময় স্বরের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া থাকে মাত্র; কিন্তু তাহাদের কি ত্রুটি হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না।

দর্শনেন্দ্রিয়ের আমরা বড়ই সমাদর করিয়া থাকি; কারণ, অপরাপর ইন্দ্রিয়-সমুৎপন্ন জ্ঞানগুলিকেও দর্শনেন্দ্রিয়ে আরোপ করিয়া থাকি। রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জিহ্বা-সংস্পৃষ্ট দ্রব্যেরই জ্ঞান হইয়া থাকে; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী বস্তুরও জ্ঞান হইয়া থাকে; শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অধিক দূরতর বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে; আর দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তদধিক দূরতর বস্তুরও জ্ঞান হইয়া থাকে। মাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা প্রভৃতি দূরবর্ত্তী বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়ের অভাব হইলে শ্বেত, নীল, লোহিত প্রভৃতি সকল প্রকার বর্ণ-জ্ঞানেরই অভাব হয়। এই ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়েরই সদ্ভাব আছে। যখন ঐ গোলাকার বস্তুটি স্পর্শ করিতেছ, তখন উহার বর্ণটিও দেখিতেছ। পরে উহার বর্ণমাত্র দেখিয়াই উহার আকার বুঝিতে সমর্থ হও। লোভনীয় বস্তু দেখিলে অনেক সময় অনেকেরই জিহ্বায় জল আইসে। অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সাহচর্য্যেই দর্শনেন্দ্রিয় হইতে আমরা অনেক প্রকার জ্ঞানের অধিকারী হইয়া

থাকি ; কিন্তু মাত্র চক্ষু-সাহায্যে কেবল বর্ণ ও আলোকের জ্ঞান হইয়া থাকে।

যদি আমাদের দুইটি চক্ষু না থাকিয়া মাত্র একটি চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে আমরা আংশিকরূপে অন্ধ হইতাম ; কারণ, আমাদের অক্ষিপটের কিয়দংশ আলোক গ্রহণে একেবারে অক্ষম। একটি পেনশিলের উপর একটি পয়সা রাখিয়া নিশ্চল ভাবে ধরিয়া রাখ ; পরে আর একজনকে এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ দূর হইতে আসিয়া ক্ষণমাত্র অবসর না লইয়া, মাত্র একটি অঙ্গুলির সাহায্যে পয়সাটি ফেলিয়া দিতে বল ; দেখিবে সে অপারগ হইবে—পয়সাটির সঠিক স্থান নির্ণয়ে অসমর্থ হইবে।

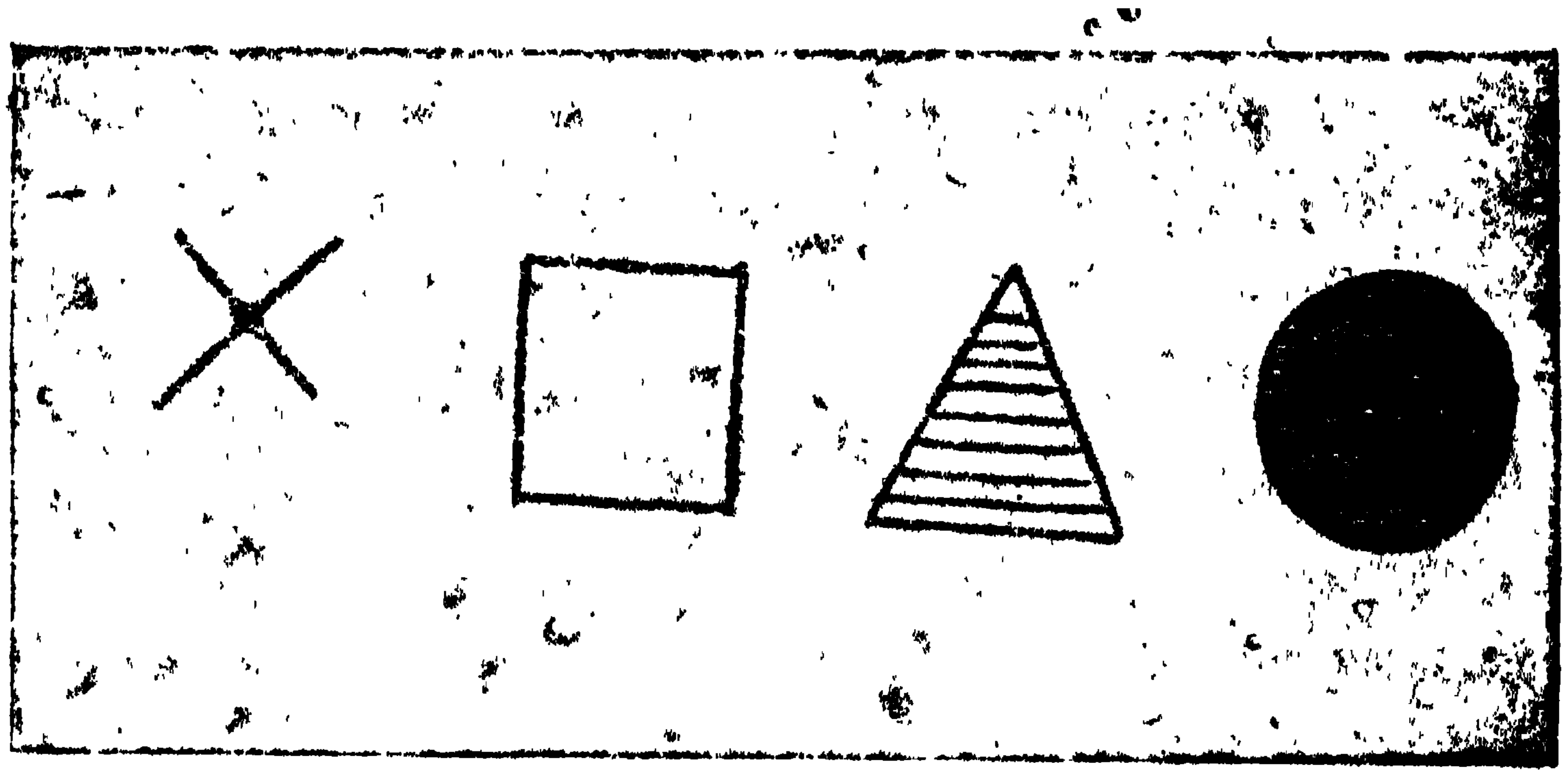

চিত্র—১

বাম চক্ষুটি বন্ধ করিয়া এই চিত্রখানি তোমার চক্ষুর সম্মুখে ধর। এক্ষণে দক্ষিণ চক্ষুর সাহায্যে একদৃষ্টে, নির্নিমেষ লোচনে × চিহ্নটির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এখন তুমি তোমার চক্ষুকে সর্ব্বতোভাবে নিশ্চল রাখিয়াও অপর তিনটি চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ। এখন চিত্রখানি তোমার চক্ষুর ঠিক সম্মুখে রাখিয়া আস্তে-আস্তে চক্ষুর নিকট হইতে ক্রমে-ক্রমে দূরে সরাইয়া লও। যখন তোমার চক্ষু এবং চিত্রের মধ্যে আন্দাজ ৭ ইঞ্চি ব্যবধান হইবে, তখন দেখিবে যে, চতুষ্কোণ চিহ্নটি অন্তর্হিত হইয়াছে,—যদিও ত্রিকোণ এবং গোলাকার চিহ্নটি বর্ত্তমান রহিয়াছে। চিত্রখানি তোমার চক্ষুর নিকট হইতে আরও দূরে লইয়া যাও। যখন উহাদের মধ্যে ব্যবধান আন্দাজ ১১ ইঞ্চি হইবে তখন দেখিবে যে, ত্রিকোণ চিহ্নটি অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু অপর দুইটি বর্ত্তমান। চিত্রখানি আরও আন্দাজ ১৬ ইঞ্চি তফাতে লইয়া যাও ; দেখিবে যে ; গোলাকার চিহ্নটি অন্তর্হিত হইয়াছে,—যদিও অপর দুইটি বর্ত্তমান। যদি তুমি তোমার চক্ষু নিশ্চল রাখিতে না পার, যদি তোমার দৃষ্টি × চিহ্নতে একেবারে আবদ্ধ না থাকে, এবং চিত্রখানি যদি একেবারে সোজা ভাবে না ধরা হয়, তাহা হইলে তোমার পরীক্ষা-কার্য্য সফল হইবে না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অক্ষিপটের সকল অংশেরই দৃষ্টি-শক্তি নাই—ইহার কিয়দংশ অন্ধ। এই অংশকে অন্ধবিন্দু বলা হয়।

এই পুস্তকের যে কোন অক্ষরে তোমার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর ; দেখিবে, সেই অক্ষরটি তোমার নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ; কিন্তু কিয়দ্দূর ব্যাপিয়া উহার চতুষ্পার্শ্বের অক্ষরগুলিও তোমার দৃষ্টির অন্তর্গত এবং তদতিরিক্ত অক্ষরগুলি তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত। অতএব দৃষ্টির সীমা আছে—কিয়দংশ দৃষ্টির অন্তর্গত ; আবার কিয়দংশ দৃষ্টির বহির্ভূত। যাহা এককালে দৃষ্টির অন্তর্গত, তাহাকেই দৃষ্টিক্ষেত্র বলা হয়।

সচরাচর আমরা দুইটি চক্ষুর সাহায্যেই দেখিয়া থাকি। এক-চক্ষু-লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা দুই-চক্ষু-লব্ধ জ্ঞান জটিল। ঠিক তোমার নাসিকার সম্মুখে একখানি কার্ড সোজা

ভাবে ধর; ইহার কিনারা তোমার নাসিকার দিকে থাকিবে। নাসিকা এবং কার্ডের ব্যবধান আন্দাজ ১ ফুট মাত্র রাখিতে হইবে। এক্ষণে, প্রথমতঃ একচক্ষু দ্বারা, পরে দুই চক্ষুর দ্বারা এই কার্ডের প্রতি লক্ষ্য কর। এক-চক্ষু-দৃষ্ট কার্ডের প্রতিবিম্ব, দুইচক্ষু-দৃষ্ট প্রতিবিম্ব হইতে পৃথক প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুরই জ্ঞান তদ্বস্তুর দুইটি প্রতিবিম্বের সমন্বয়। দুই চক্ষুর সাহায্যে আমরা যাহা দেখি, তাহা দুই-চক্ষু-লব্ধ দুইটি প্রতিকৃতির সমন্বয় মাত্র। তোমার চক্ষুর তারাদ্বয়ের ব্যবধান মাপিয়া লইয়া, একখণ্ড কাগজের উপর ঐ ব্যবধানানুযায়ী দুইটি বিন্দুপাত কর। পরে চক্ষুর্দ্বয় বিন্দুদ্বয়ের উপর ন্যস্ত করিয়া অনিমেষ লোচনে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ ব্যাপিয়া দৃষ্টি করিতে থাকিলে দেখিতে পাইবে, কি প্রকারে বিন্দুদ্বয়ের উপর চক্ষুর্দ্বয়ের ক্রিয়া হইতেছে। আরও, একই সরল রেখার উপর দুইটি পেনসিল সোজাসুজি ভাবে রাখ। পেনসিলদ্বয়ের ব্যবধান ৫ ইঞ্চি হইবে। প্রথমতঃ দুরবর্ত্তী পেনসিলটির উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর; দেখিবে, নিকটবর্ত্তী পেনসিলটি দুইটি পেনসিল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তৎপরে নিকটবর্ত্তী পেনসিলটির উপর দৃষ্টিপাত কর; তখন দুরবর্ত্তী পেনসিলটি দুইটি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এই প্রতিকৃতিদ্বয়ের কোন্‌টি বাম চক্ষুর এবং কোন্‌টি অপর চক্ষুর, তাহা সহজেই স্থির করা যায়। প্রথমে একচক্ষু পরে আর একচক্ষু বন্ধ করিয়া লক্ষ্য করিলে সহজেই ইহা নির্ণয় করা যায়।

তোমার নাসিকা সংলগ্ন করিয়া একখানি কার্ড (চিত্রে প্রদর্শিত) পক্ষী এবং পিঞ্জরের মধ্যস্থলে রেখাটির উপর ধরিয়া বাম চক্ষুর সাহায্যে পক্ষীটি এবং দক্ষিণ চক্ষুর সাহায্যে পিঞ্জরটি স্থির ভাবে নিরীক্ষণ কর। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিবে যে, পক্ষীটি আস্তে-আস্তে অগ্রসর হইয়া পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিবে। এক্ষণে তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা দুইটি প্রতিকৃতির সমন্বয় মাত্র।

সূর্য্য-কিরণে একটুকরা শ্বেতবর্ণের কাগজের বর্ণ পর্য্যবেক্ষণ কর। পরে ঐ কাগজের উপর একখানি স্বচ্ছ স্ফটিক ধর; দেখিবে যে, কাগজের উপর আকাশধনুর রং প্রতিফলিত হইয়াছে। কাগজটির উপর আলোকের যাবতীয় রশ্মি প্রতিফলিত হইতেছে বলিয়া কাগজটির বর্ণ সাদা দেখাইতেছে; পরে যখন উহার উপর স্বচ্ছ স্ফটিক ধরা হইতেছে, তখন আলোকরশ্মিগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে বলিয়া কাগজের উপর বহুবর্ণের সমাবেশ দেখা যাইতেছে। ইথার-তরঙ্গের কম্পন হইতে বর্ণ-বৈচিত্রের সৃষ্টি; যথা—

লোহিত— ৪৫০,০০০০০০, বার প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন
পাটল— ৮০০,০০০০০০ বার " " "

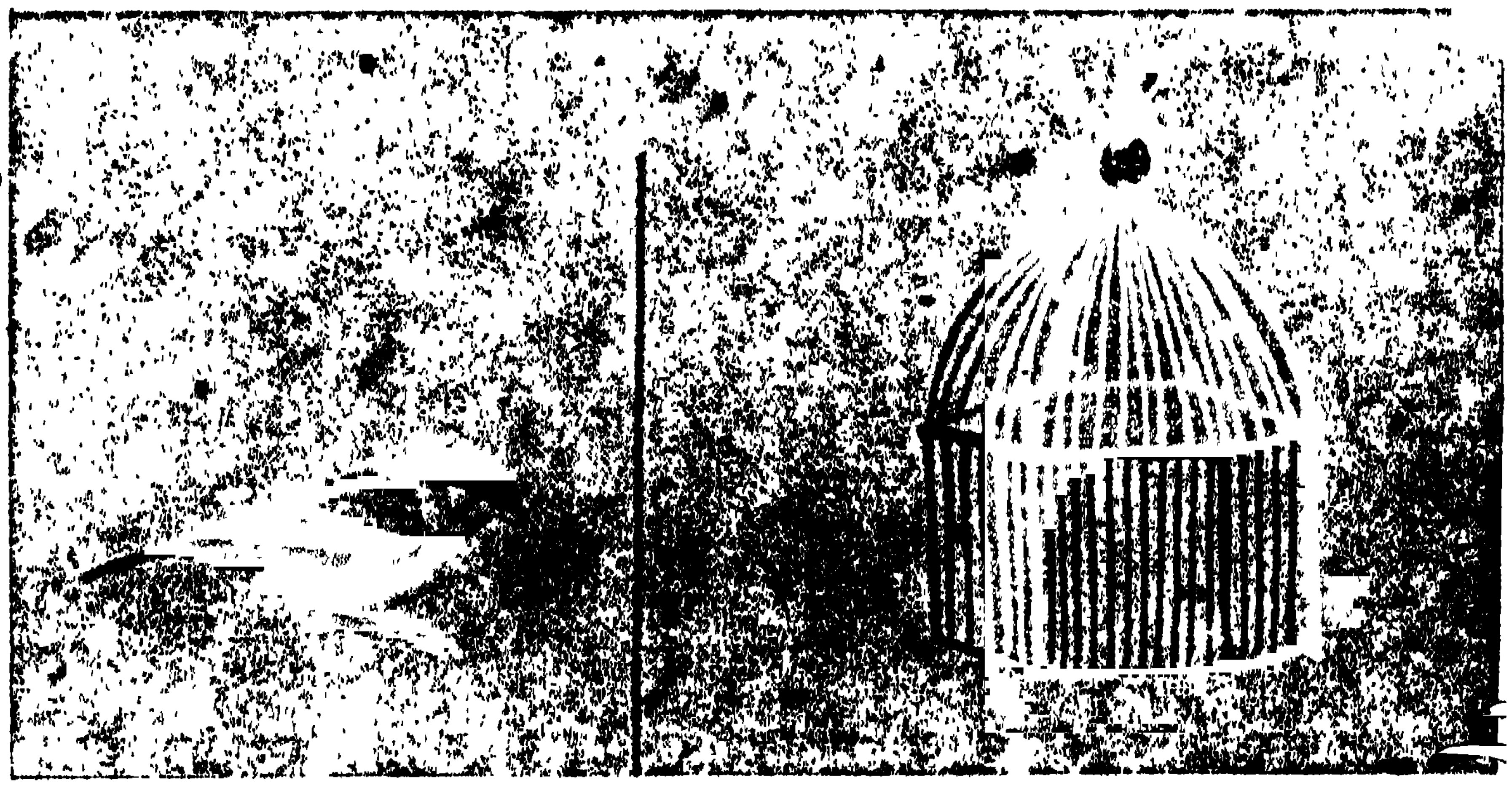

চিত্র—২

পীত— ৫২৬,০০০০০০ বার " "
সবুজ— ৫৮৯,০০০০০০ " " " "
নীল— ৬৪১,০০০০০০ " " " "

লোহিত, পাটল এবং নীল এই তিনটি বর্ণের সংমিশ্রণে শ্বেত বর্ণের সৃষ্টি হয়। এই তিনটি বর্ণকে সাধারণতঃ মুখ্য বর্ণ বলা হয়। এই বর্ণত্রয়ের সংমিশ্রণে নানাবর্ণের উৎপত্তি হয়।

কৃত্রিম উপায়েও আলোক-সংবিত্তি সম্ভব। চক্ষুর ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে, কিংবা মুদ্রিত চক্ষুর উপর অঙ্গুলির চাপ দিলে অথবা মস্তকে সজোরে আঘাত করিলে আলোক দেখিতে পাওয়া যায়।

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা বিবিধ বর্ণের পার্থক্য লক্ষ্য করিতে পারে না। এরূপ লোককে বর্ণান্ধ বলিতে পারা যায়। মনুষ্যের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪ জন লোক

বিশেষ। অনেকেই লাল রং দেখিতে পায় না; তাহাদের নিকট লাল রং সবুজ বলিয়া মনে হয়। ইহারা লাল এবং সবুজের পার্থক্য লক্ষ্য করিতে পারে না। আবার এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সবুজবর্ণ দেখিতে পায় না। ইহারা সবুজকে লাল বলিয়া ভুল করিয়া থাকে।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী। ইহা আমাদের শরীরাবয়বের কোন বিশেষ অংশে অধিষ্ঠিত নহে। ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের স্পর্শ-সংবিত্তি হইয়া থাকে। স্পর্শ-সংবিত্তি সকলেরই সমানভাবে থাকে না। কাহার-কাহারও এই শক্তির এত অধিক ঔৎকর্ষ্য হইয়া থাকে যে, ত্বকের সহিত কোন বস্তুর সংস্পর্শ হইবার পূর্ব্বেই উহারা তাহার স্পর্শজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ত্বগিন্দ্রিয় সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হইলেও সকল অঙ্গেই সমানভাবে স্পর্শানুভূতি হয় না। কোন অঙ্গের স্পর্শশক্তি অধিক এবং কোন অঙ্গের স্পর্শশক্তি কম। কোন্ অঙ্গের কি প্রকার স্পর্শ-শক্তি, তাহা সহজেই প্রমাণ করিতে পারা যায়। একটি "কম্পাস" লও। উহার বাহুদ্বয় অধিক পরিমাণে পৃথক করিয়া কাহারও পৃষ্ঠদেশের কোন অংশে স্থাপন কর। দেখিবে, সে দুইটি বিন্দুর স্পর্শ অনুভব করিতেছে। পরে বাহুদ্বয়ের ব্যবধান কমাইয়া সেইস্থানে স্থাপন কর। এইরূপে ক্রমশঃ ব্যবধান কমাইতে থাক; পরে দেখিবে যে বাহুদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও লোকটির মাত্র একটি বিন্দুরই স্পর্শজ্ঞান হইতেছে—দুইটি বিন্দুর স্পর্শজ্ঞান হইতেছে না। শরীরাবয়বের স্থানভেদে এই ব্যবধানের কম-বেশী পরিলক্ষিত হয়। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অপেক্ষা চক্ষুহীন ব্যক্তির স্পর্শ-শক্তি অধিক। অন্ধ ব্যক্তির চক্ষুর কায অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ত্বগিন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ই অন্ধ ব্যক্তির বিশেষ সহায়। অন্ধ ব্যক্তির স্পর্শ-শক্তি স্বভাবতঃই অধিক নহে; কিন্তু উহারা অধিক পরিমাণে ঐ শক্তির উপর নির্ভর করে বলিয়া ঐ শক্তি বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে।

আমার শরীরের যে-কোন স্থান স্পর্শ কর; আমি চক্ষুর সাহায্য না লইয়াই সে স্থান নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইব। এই স্থান-নির্দ্দেশ-শক্তি অভ্যাস-প্রসূত; এবং এই অভ্যাস এত প্রবল হইতে পারে যে, কোন অঙ্গের অভাব হইলেও সেই অঙ্গের সংবিত্তির অভাব হয় না। যাহাদের হাত বা পা কোন কারণবশতঃ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, তাঁহারাও সময়ে-সময়ে হস্তে বা পদে যন্ত্রণা বা অন্য কোন পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া থাকে। হস্ত না থাকিলেও হস্তের স্থল-বিশেষে যন্ত্রণার অনুভূতি হয় কেন? পূর্ব্বে কতকগুলি স্নায়ুসূত্র হস্তাবলম্বিত ছিল। হস্তের যে কোন স্থানে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে সে সংবাদ অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে আনীত হইত এবং সেই স্নায়ুবার্ত্তার উপর নির্ভর করিয়া মন বুঝিতে পারিত হস্তের কোন স্থানে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখন ঐ হস্তাবলম্বি স্নায়ুসূত্রগুলির প্রান্ত ভাগে কোন প্রকার চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইলেই মন স্বভাবতঃ হস্তেই সেই চাঞ্চল্যের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমার শরীরের কোন্ স্থান স্পর্শ করিতেছ, তাহা নির্ণয় করিতে পারি সত্য; কিন্তু একেবারে ঠিক স্থানটি নির্দ্দেশ করা দুরূহ। চক্ষু মুদ্রিত কর। পরে একটি পেনসিল লইয়া শরীরের যে কোন স্থানে একটি বিন্দু পাত কর। পেনসিলটি উঠাইয়া লও। পুনরায় পেনসিলটি সেই বিন্দুর ধারে রাখিতে চেষ্টা কর—দেখিবে তোমার চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

মাত্র ত্বগিন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিলে, আমাদের স্পর্শানুভূতি নির্ভুল হয় না; কিন্তু ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত গতীন্দ্রিয় সংমিলিত হইলে স্পর্শ সংবিত্তি অধিকতর স্পষ্ট হয়। পুস্তকের মলাটের উপর অঙ্গুলি স্থাপন কর, মলাটটি মসৃণ বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু যদি মলাটের উপর অঙ্গুলি ঘর্ষণ কর, দেখিবে ইহা তত মসৃণ নহে। কিংবা একখণ্ড কাচের উপর একগাছি চুল রাখিয়া, ২।৩ খানি কাগজ দিয়া চুলটি আচ্ছাদন কর। পরে ইহার উপর অঙ্গুলি স্থাপন কর, চুলের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু কাগজটির উপর অঙ্গুলি ঘর্ষণ কর, উহার অস্তিত্ব বোধ হইবে।

স্পর্শ-সংবিত্তির একটি সীমা আছে—স্পর্শমাত্রেরই অনুভূতি হয় না। যে স্পর্শের শক্তি-প্রাচুর্য্য নিতান্ত কম, যে স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসিলেও ত্বগিন্দ্রিয়ের কোন প্রকার চাঞ্চল্য উৎপন্ন হয় না সে স্পর্শে সংবিত্তিও হয় না। তোমার বাম হস্তের তালুর উপর দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি অতি আস্তে-আস্তে বুলাইতে থাক। অঙ্গুলিটি অনবরত তালুর সংস্পর্শে থাকিবে, কিন্তু অঙ্গুলির উপর বিন্দুমাত্র চাপ দিবে না। দেখিবে, অঙ্গুলি তালু-সংস্পর্শে থাকিলেও সকল সময়েই স্পর্শানুভূতি হইতেছে না—মনে হইবে, যেন

হাতের উপর দিয়া একটি মক্ষিকা বা পিপীলিকা চলিয়া যাইতেছে। এখানে অঙ্গুলির গতি অবিরাম ; কিন্তু স্পর্শানুভূতি সবিরাম। তোমার অঙ্গুলিসকল এবং তালু পরস্পর সংস্পৃষ্ট। তোমার অঙ্গুলির কম্পন অনিবার্য্য। এই কম্পন হেতু অঙ্গুলির উপর কোথাও চাপ পড়িতেছে, আবার কোথাও বা পড়িতেছে না,—কিন্তু অঙ্গুলি সর্ব্বদাই তালু-সংস্পৃষ্ট। সুতরাং যেখানে চাপ পড়িতেছে, সেইখানেই স্পর্শজ্ঞান হইতেছে। অতএব চাপের মাত্রার উপর স্পর্শানুভূতি নির্ভর করিতেছে ; —যেখানে মাত্রা একেবারে কম হইতেছে, সেখানে স্পর্শ-সংবিত্তি হইতেছে না। তোমার হস্ত টেবিলের উপর রাখিয়া তালুর উপর ৩ সের ওজনের একটি দ্রব্য রাখিয়া দাও। পরে চক্ষু মুদ্রিত কর। আমি তোমার অজ্ঞাতসারে, অতি সতর্কতার সহিত, কোন প্রকারে তোমার হস্তের চাঞ্চল্য উৎপাদন না করিয়া, উক্ত দ্রব্যের উপর আরও এক পোয়া ওজনের আর একটি দ্রব্য রাখিলাম ; তুমি কিন্তু তাহা টের পাইলে না। আরও একপোয়া রাখিলাম, এখনও বুঝিতে পারিলে না। এইরূপে যতক্ষণ না পূর্ব্ববর্ত্তী ৩ সেরের উপর আরও একসের ওজন না চাপিবে, ততক্ষণ তুমি চাপের তারতম্য বুঝিতে পারিবে না।

বস্তুর উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে উহার চাপেরও তারতম্য হইয়া থাকে। আমি সমান ওজনের এবং আকারের তিনখানি লৌহ-শলাকা লইলাম। ইহাদের মধ্যে একটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা, আর একটির উত্তাপ তোমার শরীরের উত্তাপের সমান, এবং তৃতীয়টির উত্তাপ কিছু বেশী—অর্থাৎ যতটুকু তুমি হস্ত দ্বারা সহ্য করিতে পার। হস্ত দ্বারা এই তিনটি লৌহদণ্ডের ওজন অনুমান করিতে বলিলাম। তোমার নিকট এই তিনটির ওজন এক বলিয়া অনুমিত হইবে না ; এবং যতক্ষণ তুলাদণ্ডের দ্বারা ওজন না করা হইবে, ততক্ষণ তোমার বিশ্বাস হইবে না যে, বাস্তবিক উহাদের ওজন সমান। যাহার উত্তাপ তোমার শরীরের উত্তাপ অপেক্ষা কম বা বেশী, তাহারই ওজন বেশী বলিয়া বোধ হইবে, কারণ ঐ বস্তু হইতে ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিক উত্তেজনা হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তাপের সহিত ত্বকের সম্বন্ধ নিতান্ত কম নহে। তিনটি পাত্র লও। প্রথম পাত্রে গরম জল—যতটুকু গরম হাতে সহ্য হইতে পারে ; দ্বিতীয় পাত্রে অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল এবং তৃতীয় পাত্রে নাতি-শীতোষ্ণ জল রাখ। এক হস্ত গরম জলে এবং আর এক হস্ত ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া রাখ। পরে উভয় হস্তই এক সঙ্গে তৃতীয় পাত্রের জলে ডুবাইয়া দাও ; দেখিবে যে, একই জল এককালীন ঠাণ্ডা ও গরম বোধ হইতেছে। শরীরের সকল অংশেই শীতাতপ সমান ভাবে অনুভূত হয় না ;—কোন অংশে শীত অনুভূত হয়, আবার কোন অংশে তাপ অনুভূত হয়। যে অংশে শীত অনুভূত হয় তাহাকে শীতবিন্দু, এবং যে অংশে উত্তাপ অনুভূত হয় তাহাকে উষ্ণবিন্দু বলা হয়। সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া এই বিন্দুগুলি অবস্থান করিতেছে। শীতবিন্দু এবং উষ্ণবিন্দু পাশাপাশি এবং মেশামিশি হইয়া রহিয়াছে। একটি পেনসিলের অগ্রভাগটি বরফ-জলে ডুবাইয়া লইয়া অতি আস্তে-আস্তে বাহুর নিম্নদেশে বুলাইতে থাক ; দেখিবে যে সেই দেশের সকল বিন্দুতেই সমান শৈত্য অনুভূত হইতেছে না। আবার ঐ পেনসিলের অগ্রভাগটি উষ্ণ করিয়া সেই প্রকারে বুলাইতে থাক, দেখিবে যে এবারেও সকল বিন্দুতে তাপ অনুভূত হইতেছে না। কোন-কোন বিন্দুতে শৈত্য-সংবিত্তি স্পষ্ট হইতেছে, আবার কোন-কোন বিন্দুতে তাপ-সংবিত্তি স্পষ্ট হইতেছে। তোমার বাহুর নিম্নদেশে এক ইঞ্চি একটি চতুষ্কোণ অঙ্কিত কর। এই চতুষ্কোণটি ৬৪ সমান অংশে বিভক্ত কর। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চতুষ্কোণের উপর একবার পেনসিলের শীতল অগ্রভাগটি স্থাপন করিয়া যাও, এবং আর একবার উষ্ণ অগ্রভাগটি স্থাপন করিয়া যাও। দেখিবে যে, কোন-কোন ক্ষুদ্র চতুষ্কোণটিতে শৈত্য অনুভূত হইতেছে, আবার কোন-কোনটিতে উষ্ণতা অনুভূত হইতেছে। শীতবিন্দুতে উষ্ণতার অনুভূতি হইতেছে না, আবার উষ্ণবিন্দুতে শৈত্যানুভূতি হইতেছে না। এইরূপে ত্বকের শীতবিন্দু এবং উষ্ণবিন্দুর স্থান নির্ণয় করা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তুমি যখন উষ্ণ জলে তোমার হাত ডুবাইয়াছিলে, তখন সেই হস্তের উষ্ণবিন্দুগুলি উত্তেজিত হইয়াছিল এবং অপর হস্তের শীতবিন্দুগুলি উত্তেজিত হইয়াছিল ; কারণ এই হস্তটি ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়াছিলে। পরে যখন উভয় হস্তই নাতি-শীতোষ্ণ জলে ডুবাইলে, তখন এই জল শীতবিন্দু বা উষ্ণবিন্দু-গুলিকে বিশেষ ভাবে উত্তেজিত করিতে পারিল না ; কিন্তু পূর্ব্ব উত্তেজনা এখনও বর্ত্তমান বলিয়া একই জল একসময়ে উষ্ণ ও শীতল বলিয়া বোধ হইল।

কবি রঙ্গলাল

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

বঙ্গের কবি-কানন কখনও নীরব নহে—সেখানে বীণার ঝঙ্কার চিরদিনই উঠিতেছে। যে দিন সুদূর বায়ুরের মাঠে—

"কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

বীণার সঙ্গে বাজিয়া উঠে, সেই দিন হইতে আজ বিশ্বের মাল্য-চন্দন-প্রসাধিত মহাকবির সময় পর্য্যন্ত কত-শত কবি আপন সঙ্গীতে বঙ্গভূমি মুখরিত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা-গণনা কে করিতে পারে? আজ আমরা যে কবির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনিও একদিন বঙ্গবাসীর আনন্দোৎপাদনে কৃতকার্য্য হইয়া আপনার কবি-জন্ম সার্থক করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের যে প্রদেশ মুকুন্দরাম, ঘনরাম ও কাশীরামের জন্মভূমি, যে প্রদেশ গোবিন্দদাস, বৃন্দাবনদাস লোচনদাস ও কৃষ্ণদাসের জন্মভূমি, যে প্রদেশ ভারতচন্দ্র ও দাশরথির জন্মভূমি, যে প্রদেশ দেওয়ান রঘুনাথ ও কমলাকান্তের জন্মভূমি, যে প্রদেশ রাজকৃষ্ণ ও চিরঞ্জীব শর্ম্মার জন্মভূমি,—বঙ্গের সেই পুণ্যধাম, কবিপ্রসূ বর্দ্ধমান প্রদেশই কবি রঙ্গলালের জন্মক্ষেত্র।

১২৩৪ বঙ্গাব্দের (খ্রীষ্টাব্দ ১২৮৭ ও শক ১৭৪৯) পৌষ মাসে বর্দ্ধমান জেলায় প্রসিদ্ধ কালনা নগরীর সমীপবর্ত্তী বাকুলিয়া গ্রামে রঙ্গলাল জন্ম-পরিগ্রহ করেন। কবির জন্ম-বৎসর লইয়া কিঞ্চিৎ মতদ্বৈধ আছে। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তদীয় 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ১৭৪৮ শক কবির জন্ম-বৎসর। অথচ কবি স্বয়ং ১৭৯৯ শকে তৎপ্রণীত 'কাঞ্চী কাবেরীর' ভূমিকায় লিখিতেছেন—"প্রায় ৩৫ বৎসর গত হইল মেজর কলনেট আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল মহাশয়কে কতকগুলি পুস্তক প্রদান করেন। * * * আমার তখন ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম" এই উক্তি অনুসারে এবং অঙ্ক-শাস্ত্রের সাহায্যে ১৭৪৯ শক কবির জন্ম-বৎসর নির্দ্ধারিত হয়। আমরা কবির প্রদত্ত বৎসরই গ্রহণ করিলাম; রামগতির অভিমত এ স্থলে ভ্রান্ত হইয়াছে। বাকুলিয়া কবির মাতুলালয়। রঙ্গলালের পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়; তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের ছোট-দেওয়ান ছিলেন। রামেশ্বরপুর কবির পৈতৃক বাসভূমি; কিন্তু বঙ্গের অমর কবি দাশরথির ন্যায় রঙ্গলালেরও পিতৃবাসের সহিত কোনও সম্বন্ধ ছিল না। রামনারায়ণ কুলীনসন্তান ছিলেন; তন্নিমিত্ত কৌলিন্য-মর্য্যাদার সংরক্ষণ-হেতু তিনি বহু বিবাহ করেন, এবং রঙ্গলালের আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই দুই কারণবশতঃ পিতৃভূমির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় এবং তিনি মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হন। আজ প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে ইদানীন্তন কালের ন্যায় বহু-পত্নীকতা ধিক্কারের চক্ষে পরিদৃষ্ট হইত না; তখন কুলীন এবং অকুলীন প্রায় সকলের ভিতরই বহু-বিবাহ অল্প বিস্তর আধিপত্য প্রসারিত করিয়াছিল। মহাকবি মধুসূদনের পিতৃদেব রাজনারায়ণ দত্ত কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব হইয়াও এক স্ত্রী বর্ত্তমানেই দারান্তর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

পাঁচ-ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে বাকুলিয়ার পাঠশালায় রঙ্গলালের বিদ্যারম্ভ হয়। রঙ্গলাল তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন থাকায়, অল্পকালের মধ্যেই 'সর্দ্দার পড়ুয়া' বলিয়া পরিগণিত হন। রঙ্গলাল যখন পাঠশালার ছাত্র, সেই সময়ে বাকুলিয়া গ্রামে পাদ্রীদিগের যত্নে একটি বাঙ্গালা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রঙ্গলালের ধী-শক্তির প্রাখর্য্য দেখিয়া তাঁহার অভিভাবক তাঁহাকে উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী করিয়া দেন। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে রঙ্গলাল ইংরাজী শিক্ষার জন্য হুগলী কলেজে প্রেরিত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজ (প্রাচীন হিন্দুকলেজ) যেরূপ মধুসূদন, হেমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বহু রত্নের শিক্ষাগার বলিয়া গৌরবমণ্ডিত, সেইরূপ হুগলী কলেজও বঙ্গের তিনটি রত্নের [illegible] বলিয়া গর্ব্বে স্ফীত-বক্ষ। এই তিন রত্ন—নাট্যকার দীনবন্ধু, কবি রঙ্গলাল এবং ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র। দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই রঙ্গলাল অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। ইঁহারা আবার প্রেসিডেন্সি

কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু রঙ্গলাল তথায় শিক্ষালাভ করেন নাই; তিনি উত্তরকালে উক্ত কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। হুগলী কলেজের এই রত্নত্রয় একই সময়ে এবং একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় নাই; কিন্তু তাহা না হইলেও, পরস্পরের ভিতর বেশ সম্প্রীতি ছিল। কলেজে অধ্যয়ন কালেই বঙ্গের বাল্মীকি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি কুলীন-নিধান ফুলিয়া গ্রামের অধিবাসী দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যার সহিত রঙ্গলাল পরিণীত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। বিবাহের দুই বৎসর পরেই কবির মাতৃবিয়োগ হয় এবং সেই সঙ্গে কায়িক অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। অষ্টম বর্ষ বয়সে কবি পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হন, এবং সেই ঘটনার আট বৎসর পরেই জননী-ক্রোড় হইতেও বঞ্চিত হইলেন। আহা, কবির কি দুর্ভাগ্য! যিনি বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছেন, তিনিই এই অবস্থার মর্ম্মভেদী স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবেন, এবং তাঁহাকেই রঙ্গলালের জন্য অশ্রুবিন্দু ফেলিতে হইবে—অন্তঃকরণের সমবেদনাই শ্রেষ্ঠ সহানুভূতি। কবির জীবন দুঃখময়—রঙ্গলালের কবি-জীবনেও যে বিষাদের কালিমা পড়িবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? রঙ্গলালকে ব্যথিত হৃদয়ে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হইল বটে, কিন্তু তিনি বিদ্যানুশীলন পরিহার করিলেন না। সুবিধা হইলেই তিনি জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন এবং তাঁহার এই উপার্জ্জন বিদ্যা-সাধনার বলে রঙ্গলাল উত্তরকালে 'কবি' নামের সঙ্গে একজন ভাষাবিৎ পণ্ডিত বলিয়াও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

হুগলী কলেজ পরিত্যাগ করিবার পর, রঙ্গলাল কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত খিদিরপুরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুল মকমল মুখোপাধ্যায়ের নিকট বাস করিতে লাগিলেন। মকমল বাবু ফোর্ট উইলিয়মে কোনও দেওয়ানের কাযে নিযুক্ত ছিলেন। রঙ্গলাল মাতুলালয়ে নিষ্কর্ম্মার ন্যায় কালহরণ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা না করিয়া, অর্থোপার্জ্জনের মানসে, ষোল বৎসর বয়সেই খিদিরপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। রঙ্গলালের ছাত্রদিগের মধ্যে ভবানীপুর-বাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কবির এই বিদ্যালয় অল্পকালের মধ্যেই উঠিয়া যায়। এই সময়ে মহাকবি মধুসূদনও খিদিরপুরে থাকিতেন। রঙ্গলালের সঙ্গে মধুসূদনের প্রগাঢ় প্রণয় জন্মে; অধিক কি, রঙ্গলাল মধুসূদনের জননীকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। মধুসূদন মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে) অন্যতম বাল্যসুহৃৎ মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুকে পত্রে এই কথাই লিখিয়াছিলেন—"I did not read that part of your letter to Rangalal, who is often with me, for we were boys to-gether at Kiddirpore, and he used to call my mother (god rest her soul!) 'mother'."

উভয়েই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই মধুর বাল্যপ্রণয় সুন্দর ভাবে রক্ষা করেন। খিদিরপুরের বিদ্যালয় উঠিয়া যাইবার পর, কবি বিশ বৎসর বয়সের সময়ে ভ্রমণোদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধ তীর্থ বারাণসী যাত্রা করেন; এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া 'কাশীযাত্রা' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কবির অপরাপর বহু রচনার ন্যায় এই গ্রন্থখানিও আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অপিচ পুস্তকখানি পদ্যে কিংবা গদ্যে রচিত এবং উহা মুদ্রিত হইয়াছিল কি না, তাহাও সংশয়-তিমিরাবৃত। 'কাশীযাত্রাই' রঙ্গলালের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মধুসূদন, রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্র উদীয়মান কবি; এবং দাশরথি, ঈশ্বরচন্দ্র ও মদনমোহন প্রবীণ কবি। এই প্রাচীনদিগের ভিতর দাশরথি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ এবং মদনমোহন বয়ঃ-কনীয়ান্। খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও কবিত্বশক্তির দিক হইতে দেখিলেও, দাশরথি সর্ব্বপ্রথম এবং তাঁহার নীচেই ঈশ্বরচন্দ্র। এই দুই কবির ভিতর প্রভেদ এই যে, ঈশ্বরচন্দ্রের কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার সীমাবদ্ধ- তিনি কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন; সুদূর পল্লীসমূহে তাঁহার বীণার সুর প্রবেশ লাভ করে নাই। আর দাশরথি সমগ্র বঙ্গভূমি তাঁহার সঙ্গীত-তানে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন—আজ তাহারই পুরস্কার স্বরূপ বঙ্গের প্রান্তর-প্রান্তান্তর হইতে দাশরথির সুযশঃ গীত হইতেছে। 'শিশুশিক্ষা'র "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"ই কেবল মদনমোহনের স্মৃতি রক্ষা

করিতেছে। অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই মদনমোহন বঙ্গবাসীর নিকট বিস্মৃত হইবেন, কিন্তু দাশুরায়ের নাম যে কখনও বঙ্গবাসীর স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হইবে, তাহা কল্পনা-রাজ্যের বহির্ভূত বিষয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা লইয়াই থাকিতেন। 'কাশীযাত্রা' রচনার পর যুবক রঙ্গলালের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় হয়। এই সময়ে তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকরের' খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি। যে সকল যুবকের রচনা-শক্তির পরিচয় পাইতেন, তাহাদিগকে গুপ্ত-কবি যথাসাধ্য উৎসাহিত করিতেন, এবং তাহাদিগের রচনা সংশোধন করিয়া আপনার পত্রে প্রকাশিত করিতেন। রঙ্গলাল আজন্ম-কবি; সুতরাং অতি সত্বর তিনি ঈশ্বর-চন্দ্রের প্রিয় শিষ্য হইয়া পড়িলেন; 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে তিনি এই বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে একজন সুকবি বলিয়া পরিচিত হইলেন। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র রঙ্গলালের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের লেখক বন্ধু, ইঁহার সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব।" (সংবাদ প্রভাকর, ২রা বৈশাখ, ১২৫৪।) এত অল্প বয়সে এরূপ সৌভাগ্য সকলের ঘটিয়া উঠে না। হুগলী কলেজ যেরূপ রঙ্গলাল, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রকে ছাত্ররূপে পাইয়াছিলেন, সেই প্রকার ঈশ্বরচন্দ্রও এই রত্নত্রয়কে তাঁহার শিষ্য স্বরূপ লাভ করেন। সংবাদ প্রভাকরের সহিত সম্পৃক্ত হইবার কিছুদিন পরেই ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রঙ্গলাল 'রস-সাগর' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন। কাগজখানি ছয় বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার বহু উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হয়। এতদিন পর্য্যন্ত রঙ্গলাল অর্থোপার্জ্জনের বিশেষ কোনও সুবিধা করিতে পারেন নাই। যদিও তাঁহাকে বাল্যকালে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি নির্জ্জন বিদ্যানুশীলনের ফলে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যে কৃতবিদ্য হন; এতদ্ব্যতীত 'প্রভাকর' ও 'রসসাগর'-কর্তৃক তাঁহার যশঃ-সৌরভ সাধারণ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। এই সকল গুণপনার পুরস্কার স্বরূপ তদানীন্তন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্যোগে কবি রঙ্গলাল তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। স্ব কালের মধ্যেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যাচার্য্যের পদে উন্নীত হন; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নপদ জনৈক অধ্যাপককে তাঁহার উপরিতন পদে উন্নীত করা রঙ্গলাল পদত্যাগ করেন। এই সামান্য ব্যাপারে যুব রঙ্গলাল আপন মনুষ্যত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে তেজস্বিত প্রদর্শন করেন, উত্তরকালে উহাই 'পদ্মিনী' 'কর্ম্মদেবী' 'শূরসুন্দরী'তে নলিনীর মত শতদল বিস্তার করিয়া ফুটি উঠে। এই অধ্যাপকতার সময়ে তিনি 'শরীর সাধিনী বিদ্যার গুণকীর্ত্তন' এবং 'বাঙ্গালা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ' নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। রামগতি ন্যায়রত্ন তদীয় পূর্ব্বোক্ত পুস্তকে ইহাদিগকে "পদ্যগ্রন্থ" বলিয়াছেন কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ঐ দুইটীর ভাষা গদ্যময় হওয়া বিশেষ সম্ভব। এই গ্রন্থদ্বয়ের এখন আর অস্তিত্ব নাই।

অধ্যাপকের কার্য্য পরিত্যাগ করিবার পর রঙ্গলালকে প্রতিভাশালী যুবাপুরুষ দেখিয়া শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি কতি পয় মহাত্মা তাঁহার ভবিষ্য উন্নতির আশায় তাঁহাকে ওকালতি পরীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু কবি উহাতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এই সময়ে (১৮৫৫ খৃঃ অঃ) প্রসিদ্ধ 'এডুকেশন গেজেট' প্রকাশিত হয়। Rev. W. Obriane Smith ইহার সম্পাদক, আর কবি রঙ্গলাল সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন। রঙ্গলালের সঙ্গে এই সময়ের মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজেন্দ্রলাল; রঙ্গপুরের সাহিত্যানুরাগী ভূম্যধিকারী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল প্রভৃতি মহোদয়গণের পরিচয় হয়। ইঁহারা সকলে এবং বিখ্যাত Vernacular Literature Societyর সভ্যগণ কবিকে একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফলে রঙ্গলাল ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশ করেন। এই বৎসরই মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের বীণার ঝঙ্কার চিরদিনের মত থামিয়া যায় *। তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই রঙ্গলালের বীণা জলদ-মন্দ্রে বাজিয়া উঠিল। পদ্মিনীর প্রচারে কবির যশঃ আরও ছড়াইয়া পড়িল।

---

* ইহার পূর্ব্ব-বৎসর দাশরথির কবিকণ্ঠও চির-নীরবতা লাভ করে।

৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গলাল ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং তিনি ক্রমোন্নতি সহকারে অবসর-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও তিনি বাগ্দেবীর আরাধনা হইতে নিবৃত্ত হন নাই। এই সময় তিনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কর্ম্মদেবী' এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'শূরসুন্দরী' নামক কাব্যদ্বয় প্রকাশিত করেন। এতদ্ব্যতিরেকে তিনি পুরাতত্ত্ববেত্তা রাজেন্দ্রলালের 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামক সংবাদপত্রে মনসাদেবীর গুণকীর্ত্তন বিষয়ক কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত করেন; কিন্তু এগুলি রঙ্গলালের লেখনীর উপযুক্ত হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রঙ্গলালের ভিতর মনুষ্যত্ব ও তেজস্বিতা ছিল। এই ভাব তদীয় ব্যক্তিগত চরিত্র এবং স্বরচিত কাব্যকলাপে অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কবি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে বদলি হন। এই সময়ে উক্ত জেলার কোনও গ্রামের কতিপয় খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক এক ভদ্রলোকের দুই কন্যাকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য বাহির করিয়া লইয়া যান। এই সময়ে খ্রীষ্টীয় পাদ্রীগণ নবজাত ব্রাহ্মসমাজের বাধা উপেক্ষা করিয়া এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে বদ্ধপরিকর হন। কন্যাদ্বয়ের পিতা রঙ্গলালের নিকট পাদ্রীদিগের বিরুদ্ধে মকদ্দমা উপস্থাপন করেন। এই পুলিশের বিচারে পাদ্রীরা দোষী সাব্যস্ত হইলে রঙ্গলাল তাহাদিগের বিরুদ্ধে যে 'রায়' দেন তাহা অতিশয় তেজস্বিতা ব্যঞ্জক। ইহার স্থল বিশেষে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"They took refuge in Christianity, that asylum for all black sheep of the Hindu community." এই কঠোর নিন্দাবাদে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর অতীব কোপান্বিত হইয়া তাঁহাকে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কবির বৈবাহিক হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে তিনি পদচ্যুত হইলেন না। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কটকে বদলি করিলেন। উৎকল দেশে তাঁহাকে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে হয়। এই সম্বন্ধে কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন—"রাজকার্য্যের অনুরোধে বহুবৎসর আমি উৎকল দেশে প্রবাস করিলাম। আমি প্রথমে আসিয়া এ দেশের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, ক্রমশঃ তদবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে।" ... বহুদিন উড়িষ্যাদেশে বাস ... ছিলেন।

নিবন্ধন তদ্দেশবাসীদিগের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। এই সময়ে তিনি উৎকল-বন্ধুদিগের অনুরোধ-ক্রমে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'কাঞ্চী-কাবেরী' নামক জগন্নাথের মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এতদ্ব্যতীত উড়িষ্যা-বাসকালে কবি 'উৎকল দর্পণ' নামক ওড্র ভাষায় লিখিত একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন। রঙ্গলালের হৃদয় অতি সুন্দর ছিল। তিনি যখন যে দেশে থাকিতেন, তাহাকেই আপনার জন্মভূমির ন্যায় হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ভালবাসিতেন, এবং তাহার মঙ্গল-সাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। 'কাঞ্চী-কাবেরী' প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে রঙ্গলাল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' 'নীতিকুসুমাঞ্জলি'-নামক কবিতাগুলি প্রকাশ করিতে থাকেন। এই কবিতাসমূহ তাঁহার নিজস্ব চিন্তা-প্রসূত না হইলেও, ধর্ম্ম ও কাব্যগ্রন্থের উপদেশাবলির মনোজ্ঞ মর্ম্মানুবাদ।

আমরা প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছি যে, কবি রঙ্গলাল একজন সুপণ্ডিত বহু-ভাষাবিৎ ছিলেন। বঙ্গের অন্যান্য বিখ্যাত বহু ভাষাবিৎ রাজর্ষি রামমোহন, মহাকবি মধুসূদন এবং অধ্যাপক হরিনাথ। রঙ্গলালও এই তিন বহুভাষীর ন্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আট-দশটি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। রঙ্গলাল কাব্য লইয়াই থাকিতেন বলিয়া আপনার ভাষাজ্ঞান প্রদর্শনের সুবিধা পান নাই। এইবার তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের এক মহাসুযোগ উপস্থিত হইল। কবি যখন উড়িষ্যায় ছিলেন, সেই সময়ে দুই-তিনখানি প্রাচীন তাম্র-ফলক আবিষ্কৃত হয়। রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি তদানীন্তন প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ উহাদিগের পাঠোদ্ধার করিতে অক্ষম হওয়ায় ঐগুলি কবি রঙ্গলালের নিকট প্রেরিত হয়। তিনি উহাদিগের পাঠ উদ্ধার করিয়া দেন। এই প্রগাঢ় ভাষাজ্ঞান ও কৃতিত্বের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহার একশত টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং বিদ্বন্মণ্ডলীতে তাঁহার যশের সুপ্রতিষ্ঠা হয়। তাম্রফলকের পাঠোদ্ধার ব্যতীত কবি কমিশনার বিম্‌স্ সাহেবকে তাঁহার Grammar of all the Indian Languages for all Civil Servants নামক বৃহৎ গ্রন্থের প্রণয়নকালে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। অধিক কি, কবির সাহায্য ব্যতীত ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত হইত কি না সন্দেহ। রঙ্গলাল যে শুধু বহু ভাষাবিৎ ছিলেন তাহা নহে; তিনি একজন প্রত্নতত্ত্বানুরাগীও ছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল তদীয়

'Antiquities of Orissa' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ তাঁহার বন্ধু রঙ্গলালের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই প্রণয়ন করিতে সমর্থ হন। এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম ছাত্র এবং রঙ্গলালের বাল্যসুহৃৎ হাস্যসিন্ধু দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র রচনাকালে কবি তাঁহাকেও যথেষ্ট সাহায্য করেন। উড়িষ্যায় থাকিবার সময়ে কবি নীতি-কুসুমাঞ্জলি ব্যতীত 'কুমার সম্ভব' কাব্য বাঙ্গালা পদ্যে অনূদিত করেন; ঐ অনুবাদ অতি মনোরম এবং কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত। এতদ্ব্যতীত যখন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড যুবরাজ বেশে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তৎকালে রঙ্গলাল তাঁহার আগমনোপলক্ষে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করেন; কিন্তু উহা সাধারণ্যে সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই। এক্ষণে উক্ত কাব্যখানি আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গলাল রাজকার্য্য উপলক্ষে হাবড়ায় স্থানান্তরিত হন। এই সময়ে কবি কালিদাসের 'ঋতুসংহার' পদ্যে অনুবাদ করেন এবং 'লক্ষ্মণ বিজয়' ও 'চন্দ্রহংস' নাটক নামক পুস্তক রচনা করেন, কিন্তু ইহার কোনটিই তিনি মুদ্রিত করেন নাই। অতঃপর দুই বৎসর পরে তিনি পক্ষাঘাত ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হইলে, ত্রিশবৎসর দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য করিবার পর কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি এই উৎকট রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে ছয় বৎসর রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে নবরাত্রি ভাগীরথী-তটে বাস করেন। অবশেষে ১২৯৪ বঙ্গাব্দের (১৮৮৭ খ্রীঃ অঃ) ১লা বৈশাখ, নববর্ষের দিন, কবির বীণার ঝঙ্কার চিরদিনের মত থামিয়া গেল—রঙ্গলাল বসুধার কোল হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। জন্ম-বৎসরের ন্যায় কবির মৃত্যু-দিন লইয়াও কিছু মতদ্বৈধ আছে। রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন "১৮৮৭ খ্রীঃ অঃ ১৩ই মে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।" বঙ্গাব্দের গণনায় এই তারিখ ১২৯৪ সালের ২১শে বৈশাখ; অপর দিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিশেষ অনুসন্ধানে (উক্ত সালের) ১লা বৈশাখ কবির মৃত্যুদিন স্থির করিয়াছেন। আমরা সাহিত্য পরিষদের প্রদত্ত দিন সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলাম। মৃত্যুকালে কবি রঙ্গলালের বয়ঃক্রম ৫৯ বৎসর প্রায় হইয়াছিল।

রঙ্গলালের চরিত্রে অনেকগুলি গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়; সেগুলি—তেজস্বিতা, কবিত্বশক্তি, জ্ঞানানুশীলন, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার কাব্যগুলিও তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ। কবির জ্ঞানানুশীলনের কথা পাঠক ইতঃপূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন; যদিও তিনি কবিত্ব-শক্তিতে মধুসূদনের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, তথাপি জ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহার তুল্য সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। কবির স্বদেশ-প্রেমের কথা আর কি বলিব! 'পদ্মিনী', 'কর্ম্মদেবী', 'শূরসুন্দরী', প্রভৃতির প্রায় ছত্রে-ছত্রে স্বদেশ প্রেমিকতার অমিয়-ধারা প্রবাহিত। কবির হৃদয় উনবিংশ শতাব্দীর নবীন জ্ঞানালোকে প্রোজ্জ্বল হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত তিনি রমণীজাতির প্রকৃত আদর করিতে শিখিয়াছিলেন—

"সেই দেশ ধন্য হয়, যেই দেশে নারীচয়,
সদা কাল আদরে অর্চ্চিত॥"

(কাঞ্চী-কাবেরী)

শুধু ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; "সভ্যতার খনি" সুদূর ফরাসীভূমির কামিনীকুল রাজনীতিক অধিকারে বঞ্চিতা হওয়ায় কবি পুরুষজাতির প্রতি তীব্র ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিয়াছেন—

"যুগ যুগান্তরে তোর এ দারুণ রীতি।
কিসের বড়াই নব্য সভ্যতার নীতি?
সভ্য শিরোমণি ফ্রান্স বিখ্যাত ভূতল।
প্রজাতন্ত্রে তিরস্কৃত প্রমদামণ্ডল। (কাঞ্চী-কাবেরী)

সত্য বটে, মধুসূদনের অন্তঃকরণও উনবিংশ শতাব্দীর নব্য জ্ঞান-কিরণে আলোকিত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাঁহার মুখ হইতে এহেন কথা বহির্গত হয় নাই। মধুসূদন যদি রমণীর দুঃখে সমবেদনা অনুভব করিতেন, তবে রেবেকার প্রসূন-পেলব নারীহৃদয় অশ্রুধারায় প্লাবিত করাইয়া তিনি হেনরিয়েটার প্রেম-সরোবরে ভাসমান হইতেন না। বঙ্গকবির ভিতর কবিবর হেমচন্দ্র রঙ্গলালের এই সুরে আপনার বীণার স্বর সাধিয়াছিলেন। পাঠক বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই যে, রঙ্গলাল ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্য। তাঁহার কাব্যের অনেকস্থলেই গুপ্ত-কবির প্রভাবের ছায়া পতিত হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র নারীজাতিকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই; অধিক কি সহধর্ম্মিণীর সহিত প্রায় মেথরানের কবির ন্যায় দুর্ব্ব্যবহার করেন। তিনি স্ত্রীজাতির প্রতি মুখভঙ্গি করিয়া

ছেন, তাহাদিগকে ব্যঙ্গের পাত্রী করিয়াছেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের প্রচলনের সময়ে পরিহাসচ্ছলে উহার প্রতিবাদ করেন। এইজন্য তিনি বিদ্যাসাগর মতের পক্ষপাতী দাশরথির নিকট হইতে নিন্দাবাদ পাইয়াছেন—

"তোদের ঈশ্বর গুপ্ত অলপ্পেয়ে।
রোগীর রোগ বোঝে না বৈদ্য হ'য়ে॥"

ঈশ্বরচন্দ্র রঙ্গলালের চরিত্রের উপর এই স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। প্রমদামণ্ডলের আর্ত্তনাদে ঈশ্বরচন্দ্রের উপল-হৃদয় দ্রব হয় নাই, কিন্তু কামিনীকুলের কাতরতার সুরে রঙ্গলালের হৃদয়-বীণার প্রতি তন্ত্রী করুণ ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠে—এইখানেই গুরুশিষ্যে স্বর্ণ লৌহ পার্থক্য। রঙ্গলাল প্রথম জীবনে পৌত্তলিক ছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি মনসার গান গাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ নবীন আলোকে যতই উদ্‌ভাসিত হইতে থাকে, ততই তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, এবং পরিশেষে তিনি একেশ্বর ও নিরাকারবাদী, এমন কি পশুবলির বিরুদ্ধবাদী হন, এই সময়ে তিনি গাহিলেন—

(ক) "যিনি হরি, তিনি হর, তিনি প্রজাপতি।
তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী তিনিই পার্ব্বতী॥"
(কাঞ্চীকাবেরী)

(খ) "যিনি নিরাকার কি আচার তাঁর"

(গ) "এ দেশের অজা যত ধর্ম্মধ্বজা
বলিতে নিয়োগ করে।" (কর্ম্মদেবী)

ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক মধুসূদন, রাজনারায়ণ প্রভৃতি রঙ্গলালের সমসাময়িকদিগের ন্যায় তাঁহার হৃদয়েও আর এক বিষয়ে কার্য্যকরী হয়। কবি বুঝিয়াছিলেন, জাত্যাভিমান দূরীভূত না হইলে ভারতভূমির মঙ্গল নাই—

"কি কাণ্ড কুলের কাণ্ড জাতি অভিমান।
ধরা পরিহরি কবে হবে অন্তর্দ্ধান॥
কবে সবে একজাতি করিবে স্বীকার।
একভাবে জাতীশ্বরে দিবে নমস্কার॥
এই জাতি বহুতর অনর্থের মূল।
ইতিহাসে আছে তার প্রমাণ বহুল॥"
(শূরসুন্দরী)

রঙ্গলাল এই সকল গুণের আকর হইলেও একটি দোষ তাঁহার ভিতর অস্থির লাভ করিয়াছিল। তিনি অতি কোপনস্বভাব ছিলেন। তাঁহার এই দোষের কথাটি তদীয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং সেইজন্য তাঁহারাও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। কবিবর মধুসূদন, তাঁহার এবং রঙ্গলালের সুহৃৎ মহাপ্রাণ রাজনারায়ণ বসুর নিকট লিখিত পত্রেও কবির এই দোষটির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন—

"He is a very touchy fellow, more so, than a sensible poet should be." (1st July, 1860.)

কবিকুলীন কালিদাস তদীয় কুমারসম্ভবে হিমাচলের শৈত্যের বিষয়ে বলিয়াছেন—

"একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে।
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

আমরা কবি রঙ্গলাল সম্বন্ধে এই কথাই প্রয়োগ করিয়া বলি, কবির এই একটি মাত্র দোষ তাঁহার গুণরাশিতে বিলীন হইয়াছে।

আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, দাশরথি, ঈশ্বরচন্দ্র ও মদনমোহন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবীণ কবি, এবং রঙ্গলাল, মধুসূদন্ ও হেমচন্দ্র ঐ যুগের নবীন কবি। দাশরথির মৃত্যু পূর্ব্বে হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত বঙ্গকাব্য-সাহিত্যের তদানীন্তন যুগ শেষ হয়, এবং নব্যদলের ভিতর রঙ্গলাল সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থরচনা করেন বলিয়া তিনি বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যের বর্ত্তমান যুগের আংশিক প্রবর্ত্তক।

রঙ্গলাল যুগ-প্রবর্ত্তক কবি হইলেও, তাঁহার ভিতর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভাবের একটি সুন্দর সমন্বয় হইয়াছিল। তাঁহার কাব্যের ভিতর যেরূপ গুপ্ত-কবির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ পক্ষান্তরে স্কট, মূর, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিকুলের কাব্য-প্রতিভার নিদর্শনও পাওয়া যায়। বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্য-ভাণ্ডারে পাশ্চাত্য ভাব-সম্পদ আনয়নের সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার করিলে রঙ্গলাল অপেক্ষা মধুসূদনকেই প্রকৃত যুগ প্রবর্ত্তক কবি বলিতে হইবে। রঙ্গলাল এই যুগ-প্রবর্ত্তন-রবির অরুণাভাস দিয়াছিলেন মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্রে এক যুগের পরিসমাপ্তি, মধুসূদনে অপর যুগের সূত্রপাত, আর রঙ্গলালে উভয় যুগের সম্মিলন;—রঙ্গলাল দিঙ্‌মণ্ডলের ন্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে অতীত এবং বর্ত্তমান যুগের সংযোগ-রেখা। রঙ্গলাল বিচার এবং বিবেচনায়

সহিত তাঁহার কাব্যগুরুর অনুসরণ করিয়াছিলেন; এই জন্যই তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের দোষগুলির পরিহার পূর্ব্বক গুণসমূহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন;—ইহাই জগতে বরেণ্য হইবার লক্ষণ। ঈশ্বরচন্দ্রের ভিতর হাস্য-রস, কবিত্ব ও প্রাঞ্জলতা থাকিলেও যথেষ্ট অশ্লীলতা আছে। দাশরথি আমাদিগের প্রিয় কবি হইলেও, আমরা সত্যের অনুরোধে ইহা বলিতে বাধ্য যে, তিনি বহু কবিগুণের আধার হইলেও, তাঁহার ভিতরও যথেষ্ট অশ্লীলতা আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' অশ্লীলতার নিমিত্ত দাশরথির জন্য "অর্দ্ধচন্দ্রের" ব্যবস্থা করিয়াছেন; দীনেশবাবু যে শুধু দাশরথির প্রতি কেন এ হেন করিয়া ব্যবস্থা করিলেন, তাহা বুঝিলাম না। তিনি যাহাকে শ্লীলতা বলেন তাহার অভাবের জন্য যদি 'অর্দ্ধচন্দ্রই' পুরস্কার দেওয়া হয়, তবে উহা চণ্ডীদাস, গোবর্দ্ধন দাস, জ্ঞানদাস, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের সকল কবিই তাঁহার নিকট হইতে উক্তরূপ সমাদর লাভ করিবার যোগ্য; কারণ তিনি যাহাকে অশ্লীলতা বলেন, তাহা অল্প বিস্তর উপরিউক্ত কবিদিগের লেখায় দৃষ্ট হয়। শ্লীলতা ও অশ্লীলতার বিচার দেশ, কাল ও পাত্রের উপর নির্ভর করে। রঙ্গলাল যখন গ্রন্থকাররূপে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন যদিও দাশরথি এবং ঈশ্বরচন্দ্র জীবিত ছিলেন না, তত্রাচ সমগ্র বঙ্গভূমি তাঁহাদিগের কাব্যরসে মুগ্ধ ছিল। এই সময়ে রঙ্গলাল পাশ্চাত্য ভাব পরিপূর্ণ সুরুচি-সম্পন্ন অভিনব কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গবাসীর কাব্য-প্রিয়তার স্রোত ফিরাইয়া দেন—ইহাই রঙ্গলালের অমর-কীর্ত্তি। ইংলণ্ডের সাহিত্য-জগতে নবযুগ (renaissance) আনয়নের জন্য আজ ইংরেজ ইতিহাসে পার্কার, সিড্‌নী, স্পেন্সার, সেক্‌সপিয়ার, মার্লো, ম্যাসিঙ্গার প্রভৃতির নাম সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে এবং ইহাঁদিগের নামোচ্চারণে ইংরেজজাতি আজ গর্ব্বে স্ফীতবক্ষ। বাঙ্গালী বড় আত্ম-বিস্মৃত—তাই একদিন যে কবি বঙ্গের কাব্যজগতে নবযুগের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছে।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' রঙ্গলালের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই কাব্য যখন (১৮৫৮ খ্রীঃঅ) প্রকাশিত হয়, তখন মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব' এবং হেমচন্দ্রের 'চিন্তা-তরঙ্গিনী' আবির্ভূত হয় নাই। এই কাব্যের বর্ণিত বিষয় যে কি, তাহা আর বোধ হয় পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না। তবে শুদ্ধ ইহা বলিয়া রাখি যে, চিতোর-রাজ ভীমসিংহ, তৎ-পত্নী পদ্মিনী এবং দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন এই এই কাব্যের বিবরীভূত ব্যক্তি। রঙ্গলালের পূর্ব্বে কোনও বঙ্গীয় কবি রাজস্থানের বীর চরিত্র লইয়া কাব্য রচনা করেন নাই; সকলেই পুরাণের অলৌকিক বর্ণনার সহিত আপনাদিগের কবিত্ব বিজড়িত করিতেন। কাব্যের ভূমিকাতে কবি নিজেই বলিয়াছেন—"এই নূতন প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য রচনার প্রথমোদ্যোগ পদবীতে আমি পদার্পণ করিলাম।" পদ্মিনী উপাখ্যানের রচনায় তাঁহার কবি-যশঃ যথেষ্ট বিস্তৃত হয়। এই কাব্যের পর ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে কবি "কর্ম্মদেবী" প্রকাশিত করেন। ইহাও রাজস্থানের ইতিহাস-রত্ন লইয়া রচিত। 'কর্ম্মদেবী' প্রণয়মূলক কাব্য, পদ্মিনী উপাখ্যানের ন্যায় বীর, করুণ ও শৃঙ্গার রসপ্রধান; কিন্তু ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত কাব্যের ন্যায় কুত্রাপি ভারতচন্দ্রের আদিরসের অবতারণা নাই। এই কাব্যের উপাখ্যান ভাগ এইরূপ:—ওরিণ্টপতি স্বীয় কন্যা কর্ম্মদেবীর সহিত রাঠোর রাজতনয় অরণ্যকমলের বিবাহ স্থির করেন। কিন্তু কর্ম্মদেবী তাঁহাকে বিবাহ না করিয়া যশল্মীর রাজপুত্র সাধুকে বরমাল্য দেন। এই লইয়া সাধু ও অরণ্যকমলের ভিতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় এবং সাধু নিহত হন। অনন্তর কর্ম্মদেবী স্বহস্তে আপনার এক বাহু ছেদন পূর্ব্বক পিতৃকুলকবির নিকট পাঠাইয়া, অপর হস্ত শ্বশুরের নিকট পাঠাইবার জন্য স্বীয় ভ্রাতাকে ছেদন করিতে অনুরোধ করেন। 'কর্ম্মদেবী' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে 'চিন্তা-তরঙ্গিনী' এবং 'তিলোত্তমা-সম্ভব' মুদ্রিত হইয়াছিল। তিলোত্তমা-সম্ভবের সহিত বঙ্গীয় কাব্যজগতে অনেকগুলি অভূতপূর্ব্ব বস্তুর আবির্ভাব হয়; তন্মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দই সর্ব্বপ্রধান। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরিজের ন্যায় মধুসূদন ও রঙ্গলালের মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল, এবং তাঁহারা বহুদিন একস্থানেই বাস করিয়াছিলেন। 'তিলোত্তমা সম্ভব' লিখিবার পর মধুসূদনের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রঙ্গলালের ভিতর তাঁহার প্রভাব প্রবিষ্ট হইবে; এবং উহা কবির দ্বিতীয় কাব্য 'কর্ম্মদেবী'তে

ফুটিয়া উঠিবে। তাঁহার বাল্যবন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি পত্রে এই কথা জানাইয়াছিলেন—'Tillottama seems to have created some impression on him, as you will find in his very next poem." (15th July, 1860.)। মধুসূদনের এই আশা ফলবতী হয় নাই—'কর্ম্মদেবী'র ভিতর 'তিলোত্তমা'র কোন ছায়াই প্রতিফলিত হয় নাই; কিন্তু 'তিলোত্তমা'র প্রভাব থাকিলে 'কর্ম্মদেবী' 'পদ্মিনী উপাখ্যান' অপেক্ষা অতি উচ্চঅঙ্গের কাব্য হইতে পারিত। কর্ম্মদেবীর পর ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে রঙ্গলাল 'শূরসুন্দরী' প্রকাশ করেন। শূরসুন্দরীর স্থূল মর্ম্ম এই —দিল্লীশ্বর আকবর শাহ, নিজ শ্যালক মানসিংহের অপমানকারী উদয়পুরের রাণার উপর কুপিত হইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন, এবং তাঁহার কুলে কলঙ্ক দিবার মানসে দিল্লীর অন্তঃপুরে রমণীদিগের নৌরোজা নামক এক সখের বাজার স্থাপন পূর্ব্বক তথায় উক্ত রাণার ভ্রাতুষ্কন্যা পৃথ্বীরায়-পত্নীকে কৌশলে আনয়ন করিয়া তাঁহার সতীধর্ম্ম-নাশের চেষ্টা করেন। শূরসুন্দরী আক্রমণ সময়ে তরবারি দ্বারা বাদশাহকে বিনাশ করিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া 'আর' কখনও কোন রাজপুত মহিলাকে অন্তঃপুরে আনিবেন না, এতদ্বিষয়ে এক স্বীকৃতি-পত্র লিখিয়া দেন। এই কাব্যও যথেষ্ট কবিত্ব, মাধুর্য্য ও ওজোগুণ-সম্পন্ন; কিন্তু ইহাও 'কর্ম্মদেবী'র ন্যায় পদ্মিনী উপাখ্যানের কবির লেখনীর উপযুক্ত হয় নাই—কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী পদ্মিনী উপাখ্যানের ন্যায় পাঠকের চিত্তাকর্ষক না হইলেও উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক কাব্য। শূরসুন্দরীর পর ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে কবি 'কাঞ্চীকাবেরী' নামক আর একখানি ঐতিহাসিক কাব্য প্রকাশ করেন; কিন্তু এবার তিনি রাজস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক উড়িষ্যার ইতিবৃত্ত গ্রহণ করেন। ওড্ররাজ পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চীনগরাধিপতির কন্যা পদ্মিনী অথবা পদ্মাবতীর রূপ-মাধুর্য্যের কথায় মুগ্ধ হইয়া বিবাহমানসে কাঞ্চীরাজ্যে দূত প্রেরণ করেন। কাঞ্চীপতি বিবাহে সম্মত হইয়া জামাতা দর্শন করিবার জন্য জগন্নাথ ক্ষেত্রে আগমন করেন; কিন্তু তিনি রথযাত্রার সময়ে উৎকল-নৃপতিকে পুরীর মন্দিরে সম্মার্জ্জনধারীর কর্ম্ম করিতে দেখিয়া তাঁহাকে জামাতা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। উৎকলরাজ এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া কাঞ্চীভূপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন। 'কাঞ্চী-কাবেরী'কেও আমরা কর্ম্মদেবীর ন্যায় একখানি প্রণয়মূলক কাব্য বলিতে পারি। এই গ্রন্থ-প্রণয়ন-সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন—"এই কাব্য রচনায় প্রবর্ত্ত হইয়া কতিপয় দিবসে সমাপ্ত করিলাম।" সত্বরতা নিবন্ধন এই কাব্যখানি তেমন উচ্চাঙ্গের না হইলেও কবিত্বের হিসাবে ইহা যে বেশ সুখপাঠ্য, একথা অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে। ফলতঃ রঙ্গলালের এই চারিখানি কাব্যের ভিতর পদ্মিনী উপাখ্যানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মধুসূদনের 'মায়াকানন' ও 'হেক্টর বধ' কাব্যের ন্যায় রঙ্গলালের সহিত তাঁহার অপরাপর কাব্যের নাম সুদূর ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, পদ্মিনী উপাখ্যানের সহিত কবি রঙ্গলালের নাম চিরদিন গ্রথিত থাকিবে। রঙ্গলালের এই কাব্য চতুষ্টয় মেঘনাদ, বৃত্রসংহার, পলাশীর যুদ্ধ কিংবা কুরুক্ষেত্রের ন্যায় সুদীর্ঘ এবং প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, বঙ্গসাহিত্যে মূল্যবান্ রত্ন। রমেশচন্দ্র তাঁহার Literature of Bengal নামক গ্রন্থে এইগুলির (কাঞ্চীকাবেরী ব্যতীত) মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন—

"Our poet has served his country well by embalming passages from the annals of Rajasthan in admirable verse." এই কয়খানি কাব্য ব্যতীত কবির আর দুইটি রচনা প্রকাশিত আছে; ইহাদিগের ভিতর একটি কুমার সম্ভবের অনুবাদ এবং অপরটি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ হিতকথার মর্ম্মানুবাদ,—এই উভয় অনুবাদই বেশ প্রাঞ্জল এবং মনোজ্ঞ। (ক্রমশঃ)

বিধিলিপি

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সেই অবধি কাত্যায়নী তাঁহার মাতার সহিত প্রায়ই বৈকালে ঠাকুর-মন্দিরে যাইত। মাতা, রমা বা তাহার সহিত যে আত্মীয়া আসিত, তাহার সহিত গল্প করিতেন; কখনও বা জপ করিতেন। রমা ঠাকুরের কাজেই বেশীর ভাগ ব্যস্ত থাকিত। কেবল কাত্যায়নী তাহাদের নিকট হইতে পলাইয়া গঙ্গার নিভৃত সোপানে জলের একেবারে ধারে গিয়া জলে পা ডুবাইয়া তাহার অভ্যাস মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। রমা মাঝে-মাঝে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াও, তাহার তন্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া ডাকিতে সাহস করিত না, ফিরিয়া যাইত। সে বুঝিয়াছিল, সেই আকাশের তলে দিগন্তের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধ ক্ষীর-নীর প্রবাহিনীকে স্পর্শ করিয়া বসিয়া থাকাই কাত্যায়নীর জীবনের পরম সুখ ও চরম তৃপ্তি! এর বেশী জগতে সে আর কিছু পায় নাই এবং পাইতে চাহেও না। তাই রমা আর তাহার সে ধ্যান হইতে তাহাকে বিক্ষিপ্ত করিতে চাহিত না; তাহার আশৈশব-গ্রথিত জীবন-স্মৃতির মধ্যে তাহাকে মগ্ন হইয়াই বসিয়া থাকিতে দিত। যখন মন্দিরের বাদ্যধ্বনি থামিয়া যাইত, তখন যেন কাত্যায়নী সংজ্ঞা পাইয়া মন্দিরে তাহাদের নিকটে উঠিয়া যাইত এবং সকলের প্রণত দেহের নিকটে নিজের অবশ শরীরটীও নত করিয়া ফেলিয়া দিত মাত্র।

সে দিন ঝুলন-পূর্ণিমা। ঠাকুর-বাড়ীতে উৎসবের সীমা নাই। বিচিত্র শোভায় সজ্জিত হইয়া বিগ্রহ ঝুলনে বসিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে মানুষের ভোগের উপযোগী বিবিধ সজ্জা। কত না কারুকার্য্য-খচিত আতরদান, গোলাপ-পাশ! তাহা হইতে কত না সুগন্ধ উদগীরিত হইয়া সেই সর্ব্বপুষ্পসারের সমন্বয়ে স্থানটী সুগন্ধে আমোদিত করিতেছিল! কত স্বর্ণ-রৌপ্যময় বিচিত্র পুত্তলিকা—তাহাদের কাহারো হস্তে দীপাধার, কেহ বা পুষ্প-পাত্র বহন করিতেছে। স্ফটিক-পাত্র বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ আলোকে মন্দির ও বিগ্রহ উজ্জ্বল শোভায় হাসিতেছে। মন্দিরের সম্মুখের চাঁদনিতে ঘটা আরও বেশী। সেখানে রাত্রিতে গান হইবে। তাহার স্তম্ভে-স্তম্ভে কৃত্রিম পুষ্প-পত্র-মাল্য জড়িত। মধ্য-স্থলে অগণ্য নানা বর্ণের নানা শাখাপ্রশাখা-শোভী ঝাড় ও নানাপ্রকারের দীপাধার ঝুলিতেছে। দেওয়ালের গাত্রে অসংখ্য উজ্জ্বল চিত্র। গ্রামের বালকেরা নিষ্কর্ম্মা হইয়া সে দিন চাঁদনির তলায়ই মারামারি, হুড়াহুড়ি, দাপাদাপি করিয়া ঠাকুরের মন্দিরকে এক নূতন সুরে ভরিয়া তুলিতেছে। ঠাকুরের ভোগ-বাড়ীর দিকের কলরব তখনো মেটে নাই। গ্রামের ব্রাহ্মণদল ও নিমন্ত্রিত সকলে ভোজন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ভোজনাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট পত্র লইয়া প্রাঙ্গণে কুকুরের দল মহা কাড়াকাড়ি বাধাইয়াছে। বহু অনাহুত এবং রবাহুতের দল তখনো উমেদার ভাবে রসুইকার ব্রাহ্মণদের তত্ত্বে ফিরিতেছে। ভিখারীর দল চাউল-মিষ্টান্নাদি যাহা পাইয়াছে, তাহা ট্যাঁকে বা পোঁটলারূপে বগলে পুরিয়া রাখিয়া, তাহারা যে কিছুই পায় নাই তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য স্থানে-স্থানে জটলা পাকাইয়া বসিয়া আছে। যে গায়নেরা গানিতে আসিয়াছে, তাহারা ভোজন-স্ফীত উদরে, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে-করিতে নাট-মন্দিরের একপার্শ্বে সতরঞ্চি বিছাইয়া একটু নিদ্রা দিবার বৃথা চেষ্টায় গড়াইতেছে; এবং ধৃষ্ট বালকেরা তাহাদের টিকি কাটিয়া লওয়ার কোন উপায় হইতে পারে কি না, তাহার জল্পনায় এক-এক জায়গায় জটলা পাকাইয়া রীতিমত কলরবের সহিত গুপ্ত পরামর্শ চালাইতেছে। ঠাকুরবাড়ীর পরিচারকেরা ব্যস্ত ভাবে এদিক-ওদিক চলা-ফেরার মাঝে-মাঝে তাহাদের ধমক দিয়া তাহাদের উৎসাহ দমাইয়া দিতেছে। সমস্ত দিন-ব্যাপী কাযের মধ্যে রমা তাহার সেই পাশ-কুঠারীটির মধ্যে বসিয়া স্বহস্ত-চয়িত ফুলগুলিতে মালা গাঁথিয়াছিল। এখন সেগুলিতে জল ছিটাইয়া নেকড়া-চাপা খুলিয়া রেকাবিতে সাজাইয়া রাখিতেছিল এবং কেয়া-পুষ্পপুট-

গুলির পাতা ছাড়াইয়া রূপার ডাণ্ডায় থরে-থরে বাঁধিয়া একটা চামর তৈয়ারীর উদ্যোগে ব্যাপৃত ছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। সজ্জিত ঠাকুরবাড়ীর সমস্ত আলোকই প্রায় জলিয়া উঠিয়াছে; কোনটা বা জলিব-জলিব করিতেছে। আকাশের নক্ষত্রদলেরও সেইরূপ অবস্থা। কিন্তু তাহাদের আলোকের অঙ্কুরেই বিনাশসাধন করিয়া পূর্ব্বাকাশে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় হইতেছিল। কেহ বা পূর্ব্বের সেই স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ীকের পানে চাহিতেছে, কেহ-বা পশ্চিমে অপ্রত্যাশিতরূপে মেঘ-সঞ্চারের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ভাবিতেছে, আজিকার গানটাই বা মাটী হয়। তা হইলে তো সবই মাটী।

কাত্যায়নীর মাতাকে কন্যা সহ আসিতে দেখিয়া রমা আস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া আসন পাতিয়া দিল। মাতা বসিলেন, কাত্যায়নী দাঁড়াইয়া রহিল। রমা তাহার ভাব বুঝিয়া বলিল, "আজ আর ঘাটে যেও না, মেলা লোক।"

"লোক তো তোমার এইখানেই,—ঘাটে এ সময়ে কে যাবে?"

"তা বটে; কিন্তু বস না কেন এইখানেই।"

"শীগ্‌গিরই আস্‌ছি। দেখেছ আকাশে কেমন মেঘ উঠেছে?"

"দেখেছি, আজ্‌কের রাতের শোভাটাই মাটী হবে।"

"মাটী কেন, বরং আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। কালো মেঘের মাথায় সাদা ফেনার মত চাঁদের আলো পড়ে আকাশের যেন এক নূতন শোভা হ'য়েছে। দেখ্‌তে যাবে একবার?"

"আমার যে এখনি ডাক্ পড়্‌বে। বাবাও আস্‌বেন এখনি।"

মাতা বলিলেন, "ঘাটে বেশীক্ষণ থেকো না—যদি বৃষ্টি হয়।"

রমা উত্তর দিল, "বৃষ্টি হলে তো সকলে বেঁচে যেত। তাতো হবে না, মাঝে থেকে হয়ত খানিক ঝড়্-ঝাপটা এনে দেবে। বর্ষাকাল,—অথচ এক ফোঁটা জল নেই; চাষারা সবাই হাহাকার করছে। এতদিন না ততদিন—আজ রাত্রেই কেবল একটা দুর্য্যোগ তুলবে হয় ত।"

"কীর্ত্তনটাও হতে দেবে না হয় ত। মেঘের আর মরবার দিন ছিল না।"

"কেন ভাবছ মা,—কিছু হবে না; এ মেঘ উড়ে যাবে।" বলিয়া কাত্যায়নী চলিয়া গেল।

কামাখ্যানাথ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং পরে ব্রাহ্মণীকে নমস্কার করিয়া গৃহের চারি দিকে দেখিয়া বলিলেন, "আপনার কন্যা আসেনি?"

রমা উত্তর দিল, "এসেছে।"

"আমি আপনার কাছেই আবার একবার যাব ভাব্‌ছিলাম; এখানেই দেখা হ'ল, ভাল হ'ল। শুনুন মা, আমি একটী পাত্রের সন্ধান পেয়েছি, তার কোষ্ঠী খুব জোরালো।"

"বাবা, আমায় ও-কথা আর কেন শোনাচ্ছ! কাত্যায়নীর বিয়ের আশা আমি একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। তাকে আমি কিছু বল্‌তেও পারব না—বোঝাতেও পারব না।"

"আমি তাকে আর একবার ভাল কোরে বোঝাব। কোথায় সে?"

"ঘাটে। তাকে এখানে ডাকব কি বাবা?"

ব্রাহ্মণী বাধা দিয়া বলিলেন, "না রমা, চারিদিকে সব লোক। সে বড় জেদী মেয়ে, নিজের জেদের কাছে, নিজের বুঝের কাছে, কার কথার মান রাখে না। ওঁর কথা সে রাখ্‌বে না, সমান-সমান তর্ক করবে;—কে কোথায় শুনবে, আমি লজ্জায় মরে যাব। তাকে ডেকো না।" "থাক্ আমি নিজেই ঘাটে যাচ্ছি! আপনি যাবেন কি আমার সঙ্গে?"

"না বাবা, যা ফল হবে, তা শুন্‌তে আমি যাব না। আমি জানি সে বুঝ্‌বে না।"

কামাখ্যানাথ সে কথা কাণে না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সামান্যা একটা বালিকা, তাঁহার কথা মানিবে না? তাহার কিসের এত দার্ঢ্য, কিসের এ অটল পণ, যে তাঁহার যুক্তিতেও সে তার ভ্রান্ত সংস্কারকে ত্যাগ করিবে'না। তাহাকে যদি সহজে রাজী করিতে না পারেন—যদি সে মেয়ে এতই জেদী হয়—তাহাকে জোর করিয়া এ বিবাহে বাধ্য করিতে হইবে। একটা তুচ্ছ বালিকার জেদ ভাঙ্গা কি এমন কঠিন কায? কিন্তু প্রথমে জোরের প্রয়োজন নাই, প্রথমে বুঝাইয়া বলিতে হইবে। মেয়েটিকে বুদ্ধিমতী বলিয়াই বোধ হইয়াছিল,—বুঝাইলে যে সে বুঝিবে না, ইহা কামাখ্যানাথ মানিতে পারিলেন না।

কামাখ্যানাথ জনৈক কর্ম্মচারীকে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার্থ নিয়োজিত করিলেন, এবং গায়েনদের কীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রিকা ধরিবার আদেশ পাঠাইয়া নিজে ঘাটের দিকে গেলেন। অবাধ্য বালিকাকে সেই রাত্রেই স্বমতে না আনিয়া তিনি যেন স্বস্তি পাইতেছিলেন না। আর সেই রাত্রেই তাঁহাকে জ্যোতির্ষার্ণব মহাশয়ের নিকটে কাত্যায়নীর কোষ্ঠীখানিও পাঠাইয়া দিতে হইবে—তাঁহার সঙ্গে এইরূপ কথা আছে। সে কোষ্ঠী কাত্যায়নীর নিকটে,—ব্রাহ্মণীরও তাহা দিবার সাধ্য নাই। তাই আজ রাত্রিতেই কামাখ্যানাথের এ বিষয়ে একটা "হেস্ত-নেস্ত" না করিলে নয়।

ঘাটের প্রথম সিঁড়িতে পা দিতেই সহসা তাঁহার অন্তঃস্থল এবং চারিদিক কাঁপাইয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল - গড়াম্ গুম্। কামাখ্যানাথ চমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন সেই ম্লান জ্যোৎস্না সহসা যেন নিবিয়া গিয়াছে। আকাশে করি-করভের মত স্তূপে-স্তূপে যে মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল, দলে-দলে এদিকে-ওদিকে বেড়াইতেছিল—তাহারই একখানা আসিয়া পূর্ব্বদিকের চাঁদকেও ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, এবং আপনাদেরই বপ্র-ক্রীড়ায় তাহাদের কৃষ্ণগাত্র মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তখনি-তখনি আবার পূর্ব্বাকাশের সেই কৃষ্ণ করি-করভেরা চাঁদের নিকট হইতে সরিয়া জ্যোৎস্না-ফেন গায়ে মাখিয়া সারা আকাশে আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছে। এই চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল; তাহাদের কৃষ্ণ গাত্র ভেদ করিয়া পূর্ণ চাঁদের উজ্জ্বল রশ্মি আকাশের গায়ে ছড়ুরিত হইয়া পড়িতেছিল; আবার তখনি তাহারা চাঁদকে ছাড়িয়া অন্যদিকের খেলায় মত্ত হইয়া ছুটিয়া চলিল। কামাখ্যানাথ স্থানকাল ভুলিয়া, নিজে কি কার্য্যে কোথায় যাইতেছেন তাহাও ভুলিয়া, বিমুগ্ধের ন্যায় কিছুক্ষণ সেই শোভা দেখিতে লাগিলেন। যদিও এ মেঘাড়ম্বর পূর্ণিমার রাত্রিতে, তথাপি দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর চরাচর যেন আজ তাহার দগ্ধ চক্ষুকে সেই স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি জলদ পটলের গায়ে বুলাইয়া জুড়াইয়া লইতে চায়। জগৎ যেন আজ রামগিরির সেই যক্ষের মত। আষাঢ়ের নব মেঘের অভ্যুদয়-দিনে সে যেমন কুটজ কুসুমের অর্ঘ্য সাজাইয়াছিল, তেমনি এই বর্ষণহীন শ্রাবণের শুক্লপক্ষে সেও এই মেঘ অতিথিকে সাদরে আহ্বান করিল।

মেঘখানা সরিয়া গিয়া তাহার ষোড়শ কলার আলোয় আবার ধরণীকে হাসাইয়া তুলিল। কামাখ্যানাথও প্রবুদ্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, জলের অত্যন্ত নিকটে কে একব্যক্তি বসিয়া একমনে পশ্চিমের মেঘপানে চাহিয়া আছে। বুঝিলেন, এই বালিকাই কাত্যায়নী।

নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিতে নিকটে গিয়া ডাকিলেন, "কাত্যায়নী কি ?" সচকিতে কাত্যায়নী ফিরিয়া চাহিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। তোমার মা নিজে আর সে কথা নিয়ে তোমার-আমার বাদানুবাদ শুন্‌তে ইচ্ছুক হলেন না, অগত্যা আমার একাই আস্‌তে হ'ল।" কাত্যায়নী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া যেন কিংকর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিল। কামাখ্যানাথ সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া বলিয়া গেলেন, "ব্যস্তর কায নয়; তুমি যেখানে বসেছিলে আবার সেখানে ব'স, আমি এই উপরের সিঁড়িতে বস্‌ছি। কথাটায় খানিকক্ষণ সময় লাগবে।"

কাত্যায়নী এইবার মৃদুস্বরে কোনমতে বলিল "অনেকক্ষণ আমি এসেছি, মা হয় ত ব্যস্ত হবেন।"

"না, তিনি জানেন"– কামাখ্যানাথ গঙ্গা হইতে একটু জল তুলিয়া লইয়া মস্তকের উপরে ছিটাইয়া দিলেন। উভয় হস্তে প্রণাম করিয়া দুই তিন সিঁড়ি উপরে উঠিয়া বসিয়া পড়িলেন। অগত্যা কাত্যায়নীও নিজস্থানে বসিল।

"তার পরে রমার কাছেও তোমার সেই একই কথা শুন্‌লাম্।" কাত্যায়নী নীরবই রহিল। কামাখ্যানাথ বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু এ তোমার মস্ত একটা ভ্রম ছাড়া অন্য কিছুই নয়। সেখানে আমি বরাবর উপস্থিত ছিলাম, তা কি তোমার স্মরণ নেই ? তোমার তখন শোকের সময়; সব কথা মনে না থাকতে পারে; তা ছাড়া তাঁর কথার অর্থও তখন ঠিক ভাবে নেবার ক্ষমতা তোমার ছিল না। তাই কি শুন্‌তে কি শুনে, কি বুঝতে কি বুঝে, তুমি অনর্থক একটা গোল পাকিয়ে বসেছ, বুঝতে পারছি। এরকম স্থলে তোমার আমাদের উপরই নির্ভর রাখা উচিত। তিনি যে তোমায় চিরকুমারী রাখ্‌বার কথা বলেছিলেন, উপযুক্ত পাত্রাভাবই তার একমাত্র কারণ। এ বিবাহ দেওয়ার ঐ একমাত্র নিষেধ; আরও যেটুকু ছিল, সেটুকুও আমরা মানতে রাজী আছি। উপযুক্ত পাত্র খুঁজে তোমায় সমর্পণ করতে পারলে

তাঁর আপত্তি ছিল না ;—আমি যতটুকু বুঝি তাতে তো এই-ই আমি বুঝেছিলাম।" কাত্যায়নী নিস্পন্দ, নিশ্চল হইয়া একভাবেই বসিয়া রহিল। কামাখ্যানাথ আশান্বিত হইয়া বলিলেন, "তোমার পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করতে আমরা কেন বলব ? আর আমাদেরও তা লঙ্ঘন করবার সাধ্য কোথায়! এ কেবল তোমার বুঝবার ভুল মাত্র। বিবাহের যে উপায় আছে, তাও তিনি একবার উল্লেখ করেছিলেন, তা' তোমার মনে আছে কি ?"

"আছে ; কিন্তু সে নিরুপায়েরই কথা, কোন উপায়ের নয়। সে কথা তখনি বুঝিয়েও দিয়েছিলেন।" কাত্যায়নী অতি মৃদুস্বরে কোন রকমে কথা কয়টা বলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল।

"তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তোমার উপযুক্ত পাত্রই মিল্‌বে না। কিন্তু এ তো কখনো জগতে সম্ভব হ'তে পারে না। আমি তাঁর মতের সঙ্গেই যথাসাধ্য মিলিয়ে এ কায করব। তাঁর আরও এক ভয় ছিল, পাছে অলক্ষণা বলে কেউ তোমায় প্রত্যাখ্যান করে,—তা জান ?"

"জানি।"

"এই সব নানা কারণেই তিনি ও-কথা বলেন। আরও আমায় পাছে এজন্য বেশী বেগ পেতে হয়, সে ভয়ও তাঁর ছিল ; তাই আমায় তিনি দায়মুক্ত করে দিয়ে যাবার জন্যও তোমার কুমারীত্বের ব্যবস্থা করেন।"

"যে দায় থেকে তিনি আপনাকে মুক্তিই দিয়ে গেছেন, কেন আপনি তা—" "কেন তার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিচ্ছি, —এই তো তোমার কথা ? এর উত্তর তোমাদের আর আমি কি দেব। তিনি জীবিত থাক্‌তে তাঁকেও এ কথা বোঝাতে পারিনি বটে ; কিন্তু আশা রাখি, এখন তিনি সে সর্ব্বজ্ঞতা নিশ্চয়ই লাভ করেছেন। অতএব তোমাদের এ কথা আমি না বুঝিয়ে তাঁকেই এর ভার দিলাম। তোমায় মাত্র এই কথা বলি, তুমি বালিকাসুলভ জেদের বশে এই একটা ঝোঁক ধরছ বটে, কিন্তু এর ফল যে কতদূর পর্য্যন্ত দাঁড়াতে পারে, সে অভিজ্ঞতার বয়স এখনো তোমার হয়নি। তাই বলছি, আমরা তোমার অভিভাবক, শুভানুধ্যায়ী ; আমরা যা করব, তাতে তোমার এতখানি চপলতা প্রকাশ করা উচিত নয়। তোমার এ দার্ঢ্যতা ছাড়। অনর্থক কেন সকলকে মনঃক্ষুণ্ণ ও উত্যক্ত ক'রে তুলচ ? আমরা যখন বল্‌ছি—তোমার বাপের ও-কথার অর্থ তুমি যা বুঝেছ তা নয়, তখন তোমার সেই কথাই বোঝা উচিত।"

কাত্যায়নী উঠিয়া দাঁড়াইল। কামাখ্যানাথ বলিলেন, "আশা করি আমার কথাগুলো বুঝেছ! আর ও-রকম ক'র না। তোমার কোষ্ঠীখানা আমার চাই।"

"কোষ্ঠী পাবেন না, যা নিয়ে কোনরকম চেষ্টা করাও চলবে না, জানবেন।"

"সে কি! এতক্ষণ ধরে তবে তোমায় আমি কি বুঝালেম!"

"যা আমি তখনো বুঝেছি, এখনো তাই বুঝেছি,—নতুন কিছু বোঝাতে পারেন নি!"

"নতুন কিছু বুঝলে না ? তোমার জেদ তুমি ছাড়বে না।"

"আমার এ জেদ বলতে চান বলুন ; কিন্তু এ আমার পিতৃ-আজ্ঞা।" "পিতৃ-আজ্ঞা ? তিনি উপযুক্ত পাত্রেও তোমায় সমর্পণ করতে বলেন নি ?"

"আর না।"

"এ আর না'র অর্থ কি ? এইটুকু মেয়ে তুমি, তুমি কি বল্‌তে চাও, তোমার চেয়েও এই প্রৌঢ়-বুদ্ধি—এই এতখানি বয়সেও এ একেবারেই নির্ব্বোধ!" কাত্যায়নী এইবারে মুখ তুলিল। সেই বিজ্ঞ, মান্যগণ্য জমীদার, যাঁহার ভ্রূকুটির সম্মুখে অতি বড় জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিরও কথা কহিতে সাহস হয় না, তাঁহার বিরক্তি ও বিস্ময়পূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া এইবার তাহারও অন্তরটা বিচলিত হইয়া উঠিল। কি বলিবার জন্য যেন তাহার মুখের কতকগুলা শিরা উপশিরা সহসা চঞ্চল হইয়া পড়িল। তখন সে সবলে তাহাদের দমন করিয়া, নতমস্তকে মৃদুকণ্ঠে কেবল বলিল, "আমি তাঁর মেয়ে—তাঁর মনের কথা আপনাদের চেয়ে আমি যদি বেশী বুঝি, সে কি এত অসম্ভব কথা ?"

"তাঁর যদি তাই মনের ভাব ছিল, তা'হলে তিনি তোমার বিয়ের জন্য চেষ্টামাত্রই করতেন না। আমি শুনেছি, সে চেষ্টা তিনি আজীবনই করেছেন। এজন্য একখানা কল্পিত কোষ্ঠী পর্য্যন্ত করে রেখেছিলেন, তা কি তুমি জান্‌তে না ?"

"জান্‌তাম।"

"তবে! তোমার কথাগুলা একটা জেদ ছাড়া আর

কিছুই নয়। এ জেদ তোমায় ছাড়তে হবে। দাঁড়াও; আমার কথাগুলো সব শেষ ক'রে শুন্‌তে হবে তোমার। আমায় তিনি তোমাদের সকল বিষয়েরই ভার দিয়ে গেছেন। আমার এ ক্ষমতা আছে যে, আমি তোমার জোর করে বিয়ে দিতে পারি, তা জানো ?"

"আপনার মত লোকের এ ক্ষমতা কেন থাকবে না। কিন্তু তাই বলে যে একজনের দত্তা কন্যারও জোর করে আবার বিয়ে দিতে পারেন, এ জান্‌তাম না।"

"দত্তা কন্যার বিবাহ। সে কি! এ কি কথা ?"

"আপনি না আপনার প্রৌঢ় বয়সের অভিমান কর্‌ছিলেন! তাই ত অবাক্ হচ্চি, একটা ছোট মেয়ে যার সহজ অর্থ দেখ্‌তে পায়, বড়-বড় জ্ঞানী-গণ্যমান্যেরা তার সন্ধান পান না; তাই নিয়ে আবার জোরের কথা বলেন ?"

"কি বল্‌ছ কাত্যায়নি, তোমার এ সকল কথার অর্থ কি? যদি না বুঝতে পেরে থাকি, সরল ভাবে বুঝিয়ে দেওয়াই তোমার উচিত। আমি জোর করে তোমার বিয়ে দিলে, তোমার বা আমার কারও কোন অধর্ম্ম হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।"

"বিশ্বাসের কথা নিয়ে জোর চলে কি! আপনি কি ঠিক জানেন, কোন অধর্ম্ম হবে না ?"

"এই রকমই আমি মনে কর্‌ছি। তোমার এ রাগ ও অসংলগ্ন কথা;—এ কেবল অল্প বয়সের জেদ্ ভাঙার ক্ষোভে তুমি নানারকম মনগড়া বাধার সৃষ্টি করছ বলেই, এ কথা এখনো আমি মনে করছি। এ সব মিথ্যা জল্পনা ছেড়ে সাধারণ মেয়েদের মত চল।"

"মিথ্যা জল্পনা ও মনগড়া বাধা ?"

"হাঁ। কোষ্ঠী না দাও, আমি বড় জ্যোতিষী আনিয়ে তোমার মার কাছ থেকে তোমার জন্মের দিন-ক্ষণ জেনে কোষ্ঠী তৈরি করাব; আর সেই কোষ্ঠীর মিলে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়েও দেব—এ তুমি শুনে রাখ। এইবার তুমি যেতে পার; এবং এর জন্য প্রস্তুত হয়েও থেক!"

কাত্যায়নী স্তব্ধভাবে কামাখ্যানাথের পানে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল; তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া নীল আকাশে জ্যোতিষ্মান শুক্রের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। তাহার মুখের ভাব ও সেই দৃষ্টি দেখিয়া কামাখ্যানাথও সহসা যেন একটু ভীত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, এই বালিকার সহিত তর্কে বিচলিত হইয়া তাঁহার এতখানি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠা উচিত হয় নাই। কিন্তু না বলিয়াই বা উপায় কি! এ ভার তো তাঁহাকে মস্তক হইতে নামাইতেই হইবে। তিনি একটু শান্তস্বরে তখন বলিলেন, "রাত্রি হয়েছে, বাড়ী যাও; আমিও উঠি।"

কাত্যায়নী সহসা অত্যন্ত কঠিন ও গর্ব্বিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "যান্—গিয়ে, আপনার জ্যোতিষীকে—উপযুক্ত পাত্রকে—সকলকে ডেকে আনুনগে। আমার যা বল্‌বার আছে, আমি তাদের সামনেই বলব।"

"আবার সেই কথা! আশ্চর্য্য মেয়ে তুমি! তাদের কি বল্‌বে শুনি ?" "বল্‌ব যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমার বাবা অন্তিম সময়ে আমাকে যাঁর হাতে সমর্পণ করে গেছেন, তিনি অধর্ম্ম করে আবার আমার বিবাহ দিতে চান্।" স্তম্ভিত কামাখ্যানাথের চক্ষে সহসা সমস্ত বিশ্ব যেন আবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। বিরাট বিশ্ব যেন ভূমিকম্পে নাড়া পাইয়া সজোরে দুলিতে লাগিল। জল-স্থলকে একটা ঘনঘোর অন্ধকারে একাকার করিয়া পূর্ণিমার চন্দ্র একটা প্রকাণ্ড মেঘে ঢাকা পড়িয়া গেল। কামাখ্যানাথ স্তম্ভিত, নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলেন; কাত্যায়নীও তেমনি জলের উপরেই দাঁড়াইয়া রহিল। উভয়েই এমনি স্তব্ধ—যেন সেখানে একটা বজ্রপাতই হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতিও একেবারে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ! তাহার বক্ষের অবিশ্রান্ত শব্দিত ভাবা সহসা যেন তখন মূক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ণতোয়া জাহ্নবীর অবিরাম ছল্-ছল্, কল্-কল্ ধ্বনি তখন কি এক মায়ামন্ত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়া সাড়ামাত্র দিতেছে না। চরাচর যেন একটা সাড়া পাইবার জন্যই উৎকর্ণ হইয়া কাণ পাতিয়া রহিয়াছে; কিন্তু শূন্যে, জলে, স্থলে তাহার সঞ্চরণমাত্র নাই। সদা-চাঞ্চল্যময়ী প্রকৃতি সহসা এমনি বিকলা হইয়া গিয়াছে।

কাত্যায়নী সেই মৃত নীরবতাকে শব্দময়ী করিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, "আপনার সব কথা বলা হয়েছে? আমি এখন যেতে পারি ?"

কামাখ্যানাথ সংসজ্ঞ হইলেন; তাঁহার কণ্ঠ হইতে ক্রমে স্বর বাহির হইল, "কে এ কথা তোমায় বোঝালে? ভুল, ভুল—তোমার এ একেবারেই মিথ্যা ধারণা!"

...তার আমি যে অনুমান ... আপনার কোষ্ঠী দেখে তাঁর মনে এমনি কি একটা ধারণা জন্মেছিল, যাতে তিনি—"

"ভুল—এ ব্যাপারের আগাগোড়াই ভুল; কোষ্ঠী দেখে এমন ধারণা এক বিধাতাপুরুষ ছাড়া আর কারও দ্বারা সম্ভব নয়। এমন পাগলামী তিনি—"

"পাগল বলবেন না। হতে পারে তাঁর এ ভুল বিশ্বাস; কিন্তু তিনি আমার বিধাতা; তিনি আমার জন্য যে বিধান করে গেছেন, তাহাই আমার মাথায় তুলে নিতে হবে।"

"কই, এমন কথা তো তিনি একবারও বলেন নি, আভাসও দেননি—"

"দিয়েছেন, কিন্তু সে কথা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে নি। যে উপায়ের কথা তিনি বলেছিলেন, সেই উপায়।"

"এ তো উপায় নয়—এ যে নিরুপায়, এ তিনি কখনই বলেন্ নি। তাঁর মত ধার্ম্মিক লোকের দ্বারা এমন কাজ কখনই সম্ভব হতে পারে না। মিথ্যা তুমি—" "তিনি স্বেচ্ছায় তা বলেননি। যতক্ষণ পেরেছিলেন প্রচ্ছন্নই রেখেছিলেন; নানা পাঁচ রকমে আপনাকে বুঝিয়ে, এ চেষ্টা থেকে যাতে আপনাকে থামাতে পারেন; তারই উপায় দেখেছিলেন। শেষে অজ্ঞানের মধ্যে, মৃত্যুর মুহূর্ত্ত কয় আগে তাঁর সেই গোপন ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছিল। আমি বুঝেছিলাম, আপনারা কেউই তাঁর সে সমর্পণের অর্থ বুঝতে পারেন নি,—আমিও তা আপনাদের আর বোঝাতে ইচ্ছা করিনি; কিন্তু আপনি আজ আমার পরিত্রাণের আর অন্য পথ দিলেন না।"

"সেই সমর্পণের এই অর্থ? অসম্ভব,—এ একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এ কি হতে পারে?" "আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? বাবা তো আপনাকে অধর্ম্ম করতে কখনোই বলেন নি। তাই তিনি তাঁর ভাব আপনার কাছে লুকিয়ে রেখেই চলে গেছেন। যা বোঝাবার, তা আমাকেই বুঝিয়ে গেছেন, তার সঙ্গে আপনার তো কোন সম্বন্ধ নেই বা কোন দায়িত্বও নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ... আর কেউ জানবে না। আপনাকে আমি কেবল এইটুকু জানিয়ে দিলাম যে, তাঁর বিবাহিতা মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করে আপনি অধর্ম্ম করবেন না। আমার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র মনে রাখবেন,—আমি বিবাহিতা, কিন্তু পিতৃ-আজ্ঞায় চিরকুমারী; আমার ও-সব কথা আর বলাও পাপ। আমার সম্বন্ধে আমার বাবা আপনাকে কোন দায়িত্বই দিয়ে যান্ নি; আমিও জীবনে তা' আপনাকে দেব না। আপনার ধর্ম্মে একটুও আঘাত পড়বে না, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আর আমাকেও এইটুকু নিশ্চিন্ততা দেন, যাতে আমি আপনার দ্বারা এ-রকম বিব্রত আর কখনো না হই। আমার জন্য আপনি আর কোন চেষ্টাই করবেন না, এইমাত্র আমি আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।"

কামাখ্যানাথ আবার কি একটু যেন বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্বরে ভাষা ফুটিল না, কেবল অস্পষ্ট ভাবে সেটা কণ্ঠের মধ্যেই বদ্ধ রহিল। কাত্যায়নী সোপান বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। চারি-পাঁচটা সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া দেখিল, সেখানে প্রস্তর-প্রতিমার মত কে একজন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কাত্যায়নী সচকিতে চাহিয়া দেখিয়া বুঝিল, সে রমা। কামাখ্যানাথ বা কাত্যায়নী—এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার অস্তিত্ব জানিতে পারে নাই।

অত বড় মানী ও প্রবীণ ব্যক্তির নিকটেও কাত্যায়নী এতক্ষণ যাহা অনুভব করে নাই, এই বালিকার উপস্থিতিতে অন্তরে লজ্জার সেই আঘাত অনুভব করিল। একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সহসা বস্ত্রে মস্তক ও মুখ যথাসাধ্য ঢাকিয়া সিঁড়ির একধার ধরিয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া চলিল। রমাও তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিল। সিঁড়ির চাতালের উপর উঠিয়া রমা একবার মৃদুস্বরে বলিল "একটু দাঁড়াও।"—কাত্যায়নী সে কথা যেন শুনিতেও পায় নাই, এমনি ভাবে একটু দ্রুতপদে মন্দিরের দিকে চলিল। মাতার নিকটে গিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। মাতা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে কাত্যায়নি? অসুখ বোধ করছ কি?"

"হাঁ মা, বাড়ী চল।"

"বাড়ী যাব! কীর্ত্তন আরম্ভ হচ্ছে যে।"

"আমি যে বসতে পারব না—বড় অসুখ করছে।"

"তাই তো! কপালও যে গরম! জ্বর এল বোধ হয়।"

এই যে রমা,—কাত্যায়নীর বোধ হচ্চে জ্বর এসেছে। আমরা আর তো বস্‌তে পারছি না।”

“জ্বর? কই দেখি?” রমা কাত্যায়নীর ললাট স্পর্শ করিতে গেলে কাত্যায়নী ত্বরিত পদে মাতার অপর পার্শ্বে সরিয়া গিয়া বলিল—“জ্বর নয়, কেবল খুব শীত করছে; বস্‌তে পারছি না। বাড়ী চল মা—”

রমা তাহার পানে ক্ষণেক চাহিয়া শেষে বলিল “যাও তবে। যে রকম গতিক দেখছি, ঝড় এল বলে। আজ হয় ত গান বসবেই না—সকলকেই বাড়ী যেতে হবে।”

কাত্যায়নী মাতার স্কন্ধে প্রায় ভর রাখিয়াই চলিয়া গেল। রমা চিন্তিত মুখে একবার গোবিন্দদেবের মুখের পানে চাহিয়া আবার তাহার গতি-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। সেও যেন ‘খেই’ হারাইয়া চারিদিকে পথ খুঁজিতেছিল!

বাহির হইতে কে বলিল “উঃ। কি মেঘ করে এলো! বিদ্যুৎ হাস্‌ছে দ্যাখ, এ যে ভয়ানক ঝড় এলো!” রমা ত্রস্তে জানালার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—কে বলিবে আজ পূর্ণিমার রাত্রি। ঘন তিমিরে পৃথিবী একেবারে নিজেকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কোথা হইতে পুঞ্জে-পুঞ্জে প্রচুর মেঘ আসিয়া আকাশকে গাঢ় প্রলেপের ন্যায় ছাইয়া ফেলিতেছে,—যেন তাহারা এখনি পৃথিবীকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া রসাতলে পাঠাইবে। সেই বিশ্ব-ধ্বংসক্ষম মেঘযূথকে কোন্ এক অদৃশ্য হস্ত যেন এক-একবার এক গাছা জ্বলন্ত কশার দ্বারা আঘাত করিতেছে; আর সেই উন্মত্ত ঝড়-সমষ্টি অসহ্য ব্যথার তীব্র গর্জ্জনে গুমরাইয়া উঠিতেছে। হুহু শব্দে একটা প্রচণ্ড বায়ু প্রমত্তভাবে আসিয়া পৃথিবীর গায়ে লাগিল এবং তাহাকে যেন দু’চার ধাক্কাতেই উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দিবার জন্য এলো-মেলো ভাবে চারিদিক হইতে ঠেলাঠেলি বাধাইল। রমা মন্দির হইতে ছুটিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেই কেহ-কেহ বাধা দিল, “ও কি! এই দুর্য্যোগের মুখে ঘাটের দিকে কেন যাও।” রমা শুনিল না,—ছুটিয়া চাতালে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল “বাবা, বাবা, বাবা।”

“এ কি! রমা, তুমি এমন সময়ে বাইরে এসেছ,—চল, মন্দিরে চল; আমার জন্য ভয় কি? তুমি কেন এ সময়ে বেরিয়েছ মা!” বলিতে-বলিতে কন্যাকে প্রায় ক্রোড়ের কাছে টানিয়া লইয়া কামাখ্যানাথ মন্দিরের পানে চলিলেন। ইতি মধ্যে ছাতা ও আলোক লইয়া কয়েকজন পরিচারকও তাহাদের পশ্চাতে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন হইল না, তখনি তাঁহারা মন্দিরে পৌঁছিলেন। ভীতা বালিকা পিতার ক্রোড়ের নিকট দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। উপস্থিত আত্মীয়ারা কেহ তাহাকে নিকটে টানিয়া লইতে গেলে, সে পিতার আরও গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ভয়ার্ত্তভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল, “এ কি ঝড় বাবা! কেন এমন হল?” পিতা বলিলেন, “ভয় কি!” রমা দেখিল, তাঁহার মুখ অসাধারণ গম্ভীর।

এদিকে এই ঝড়ে নাটমন্দিরে হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। ঝড়ের বেগে ‘কাচের আলোক সকল আন্দোলিত হইয়া ঠোকাঠুকি লাগিতেছে এবং ঝন্‌ঝন্ শব্দে তাহার অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। “গেল রে, গেল রে” শব্দে চাকরেরা মৈ লইয়া, আলোক লইয়া দৌড়াদৌড়ি বাধাইতেছে। গায়েনেরা “ভোর কীর্ত্তনে মৃদঙ্গ ভাঙার” ন্যায় “গৌরচন্দ্রিকা” ভাঙিয়া নিজেদের বাদ্য-ভাণ্ড সাম্‌লাইতে ব্যস্ত; শ্রোতৃবর্গ খালি পায়ে যে যাহার জুতা সম্মুখে পাইতেছে, যদৃচ্ছামত পাটি না দেখিয়াই হস্তে তুলিয়া লইয়া নিজ-নিজ আবাসাভিমুখে দৌড় দিতেছে। বালকদের ততটা ভয় নাই; তাহারা পলাইতে-পলাইতেও গাহিতেছে, “আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে; কচুর পাতে করমচা, এই মেঘখানা নেমে যা,” ইত্যাদি। পরদিন গান হইবে এইরূপ আশ্বাস দিয়া, গায়েনদের সেই মন্দিরেরই এক দিকে রাত্রির মত থাকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। সমাগত স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাঁহারা দৌড়ধাপে পলাইতে পারেন নাই, তাঁহাদের বাটী যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া কামাখ্যানাথ আত্মীয়া রমণীগণ ও রমাকে লইয়া বাটী চলিলেন। রমার অন্ধ পুত্রটিও সে সময়ে মন্দিরের বাহিরের অঙ্গনে উপস্থিত ছিল। সেও রমার নিকটে কিছু প্রসাদ আদায় করিয়া লইয়া ঠাকুরবাড়ীর নাট-মন্দিরে সতরঞ্চি মুড়ি দিয়া রাত্রির মত নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িল। অবশ্য তাহার শরীরও একান্ত অভাব ছিল না।

চাকরেরা আলোক লইয়া অগ্র-পশ্চাতে চলিয়াছে; রমা পিতাকে ধরিয়া ভীত ভাবে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। ঝড় তখনো প্রচণ্ড বেগে বহিতেছিল। সর্ব্বেই পার্শ্বেই

চালাঘরখানা তাহার দাপটে যেন এক-একবার হেলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। রমা সভয়ে বলিল, "ও কি! এ ঘরে কি কাত্যায়নীরা থাকে বাবা? যদি এ ঘর ভেঙ্গে যায়?" কামাখ্যানাথ উত্তর দিলেন না। উন্মত্ত জড়ের সেই তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে কন্যাকে লইয়া অতিকষ্টে অগ্রসর হইতে-হইতে বোধ হয় অন্ধকারময়ী প্রকৃতির পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন, ইহার কাণেও বোধ হয় এমন কোন অসঙ্গত কিছু প্রবেশ করিয়াছে, যাহা প্রকৃতির বিরুদ্ধ। তাই সে রুদ্র রোষে ফুলিয়া উঠিয়া পৃথিবীকে "নয়-ছয়" করিয়া ভাঙ্গিয়া উড়াইয়া গুঁড়া করিবার মতলবে আছে। পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া রমা আপনিই বলিল, "না, এটা তাদের শোবার ঘর নয়। এই ঝড়ে তাদের মত কত লোকের কত বিপদই হয় ত ঘট্‌তে পারে। কে তাদের দেখ্‌ছে?"

কামাখ্যানাথ উত্তর দিলেন, "যিনি এই ঝড় তুলেছেন তিনিই।"

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বাঙ্গালা ধাতুর রূপ

[শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল]

বর্ত্তমান-কাল

১। ইংরাজীতে বর্ত্তমান কালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়:—১) প্রেজেণ্ট ইন্‌ডেফিনিট, (২) প্রেজেণ্ট কণ্টিনিউয়স্ (৩) প্রেজেণ্ট পারফেক্ট। বাঙ্গালাতেও ক্রিয়ার এই তিন কাল বিভাগ করা হয় ও তদনুযায়ী ধাতুর রূপও ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রেজেণ্ট ইণ্ডেফিনিট সাধারণ ভাবে বিশেষ কোনও সময় নির্দ্দেশ না করিয়া বর্ত্তমানে কৃত বা অভ্যস্ত কার্য্য সম্পাদন করা বুঝায়; যথা, আমি করি—বর্ত্তমান সময়ে করি, অথবা সদা-সর্ব্বদা করা আমার অভ্যাস—এই বুঝায়। (২) প্রেজেণ্ট কণ্টিনিউয়স্—যে ক্রিয়া বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেও সম্পাদিত হইতেছে—শেষ হয় নাই। আমি করিতেছি—আমার "করা" পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু সেই আরব্ধ ক্রিয়া এখনও করা চলিতেছে। (৩) প্রেজেণ্ট পারফেক্ট—আমি করিয়াছি—আমার প্রাক্ আরব্ধ ক্রিয়া বর্ত্তমানে" শেষ হইয়া চুকিয়া গিয়াছে।

২। বাঙ্গালায় প্রেজেণ্ট ইণ্ডেফিনিট (অনির্দ্দিষ্ট) বর্ত্তমান বুঝাইতে ধাতুর উত্তর নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলি হয়:—

প্রথম পুরুষে—এ, এন (তিনি ও আপনি, তাঁরা ও আপনারা'র সহিত)

মধ্যম „ —ও, অ, স (তুই ও তোরা'র সহিত)

উত্তম „ —ই

যথা—সে করে, তাহারা করে, তিনি তাঁহারা আপনি আপনারা করেন, তুমি তোমরা কর, তুই তোরা করিস, আমি আমরা করি।

৩। স্বরাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে, ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয়ের পূর্ব্বে "ইর" আগম হয় না (১)

৪। আকারান্ত ধাতু:—

ধরা + এন্ = ধর্ + এন্ = ধরেন (২)

করা + ই = কর + ই = করি।

এইরূপে মারে, ধরে, বকে, ছোঁড়ে, মারেন, ধরেন, বকেন, মারি, ধরি, বকি, মার, ধর, বক।

চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে প'চে মরে।
যদি সে নিবাইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে। রামপ্রসাদ
বল হাট বাজার কে করে। ভারত
ধনিকে বিয়োগ ভরমি সংসার। বিদ্যা

৫। ওয়া-অন্ত ধাতু:—

গাওয়া + এ = গা + এ = গায়	গাওয়া + ই = গা + ই = গাই
যাওয়া + এ = যা + এ = যায়	যাওয়া + ই = যা + ই = যাই
খাওয়া + এ = খা + এ = খায়	খাওয়া + ই = খা + ই = খাই
পাওয়া + এ = পা + এ = পায়	পাওয়া + ই = পা + ই = পাই
নাওয়া + এ = না + এ = নায়	নাওয়া + ই = না + ই = নাই
লওয়া + এ = ল + এ = লয়	লওয়া + ই = ল + ই = লই (নেই), নি, নিই।
দেওয়া + এ = দে + এ = দেয়	দেওয়া + ই = দে + ই = দেই (দিই), দি, দিই।

(১) প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর উত্তর ও পূর্ব্বে বিকল্পে "ই"র আগম হয় (ভারতবর্ষ, ৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫.৭)

(২) প্রত্যয় পরে থাকিলে "আ"কারান্ত ধাতুর আকারের লোপ হয়।
" " " "আন" অন্ত " "ন"এর " "।
" " "ওয়া" " " "উয়া" " "।
" " "হা" " " "হা" " "।
ঐ ৫২২ পৃঃ

খোওয়া + এ = খো + এ = খোয় খোওয়া + ই = খো + ই = খুই
হওয়া + এ = হ + এ = হয় হওয়া + ই = হ + ই = হই
চাওয়া + এ = চা + এ = চায় চাওয়া + ই = চা + ই = চাই
ধোওয়া + এ = ধো + এ = ধোয় ধোওয়া + ই = ধো + ই = ধোই।

তুমি যদি বল সমাধান দেই ঘন্দে। চণ্ডী। আগুনে দিই ঝাঁপ আগুন নিভাই; পাষাণেতে দিই কোল পাষাণ মিলায়। চণ্ডী। আজুক জাল তোহে কি কহব মাই। জল দেই (দিয়া) ধোই (ধুই) যদি তবহু ন যাই (যায়)। বিদ্যাপতি।

৬। কিন্তু এন্ এর 'এ'র লোপ হয়। ও-এই "এন্" এর "ন" ও তুই এর পর "স" উত্তর "ই" আইসে না।

যান, খান, পান নান, নেন, দেন, (দিন-অনুজ্ঞায়), খোন (খুন অনুজ্ঞায়), হন (হউন, বর্ত্তমানে হয় না), চান (চাউন, বর্ত্তমান কালে প্রযুক্ত হয় না), ধোন (পা ধোন-ধুন ও ধোন অনুজ্ঞায়), যাস্ (যাইস্ বর্ত্তমান কালে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না), খাস্-পাস্-নাস্, লস্ (হয় না), নিস্ দিস্, খুস্ হ'স্, চাস্, গাস্, ধুস্।

তুই লোক দেখিয়ে হেঁসে বেড়াস্, সোয়ামীর কথা পাড়লে আর পাঁচ কথা পেড়ে উড়িয়ে দিস্, মনে করিস কি সবাই তাতে ভুলে যায়? তুই ভাল করে চুল বাঁধিসনে, একখানা ভাল কাপড় পরিসনে।—অমৃত বসু।

৭। যা এ হইতে যায় ইত্যাদি যে হইয়াছে,—অনুমান হয়, উচ্চারণ অনুযায়ী "এ"—"য়" তে পরিণত হইয়া হইয়াছে।

৮। স্বরাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে "হা" অন্ত ধাতুর "হা"র বিকল্পে লোপ হয়।

কহা + এ = কহ্ + এ = কহে। কহা + এ = ক + এ = কয়।
রহা + এ = রহ্ + এ = রহে। রহা + এ = র + এ = রয়।
বহা + এ = বহ্ + এ = বহে। বহা + এ = ব + এ = বয়।
চাহা + এ = চাহ্ + এ = চাহে। চাহ্ + এ = চা + এ = চায়।
বাহা + এ = বাহ্ + এ = বাহে। বাহা + এ = বায়।

এইরূপে কহি কই, রহি রই, বহি বই, চাহি চাই, বাহি (বাই দেখি নাই)

যুবতী সকলে কয়। চণ্ডী। পরাণ রহে কি না রয়। চণ্ডী

৯। আন অন্ত ধাতু যথা :—

করায়, কর্ম্মায়, চালায়, খাওয়ায়, শোওয়ায়, দেখায়, আনায়, মানায় ইত্যাদি।

করাই, কর্ম্মাই, চালাই, খাওয়াই, শোওয়াই, দেখাই, আনাই, মানাই ইত্যাদি।

হের এস তুয়া পায়ে যাবক পরাই। চণ্ডী

১০। পূর্ব্ববঙ্গে

যাওয়া + এন = যা + এন = যায়েন।

হওয়া + এন = হয়েন

করান + এন = করা + এন = করায়েন, দেখায়েন ইত্যাদি রূপ প্রচলিত আছে।

১১। তুমির সহিত প্রযুক্ত ধাতুর Present Indefinite রূপ অবিকল অনুজ্ঞার মত।

তুমি কর, তুমি করাও, দেখাও, শুনাও, যাও, খাও, আও, দেও, কহ, বহ, রহ, কও, বও, রও দ্রষ্টব্য।

(ক) ৬ সূত্রের Exception গুলি।

(খ) আন—অন্ত ধাতুর মাড়াইও, কামড়াইও, ফুড়াইও রূপগুলি বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হয় না।

(গ) হা-অন্ত „ বহিও, কহিও, রহিও, চাহিও „ „ „ „
(ঘ) আকারান্ত করিও, মারিও, ধরিও, বকিও, „ „ „ „
(ঙ) ওয়া-অন্ত খাইও, খেও, যাইও, যেও „ „ „ „

অর্থাৎ "ই" আগম করিয়া সিদ্ধ অনুজ্ঞার রূপ ও বর্ত্তমান কালের রূপ এক নহে।

১২। বিদ্যাপতিতে প্রথম পুরুষের কয়টী রূপ দেখা যায়

ক ১। তনু তনুঁ ঝাঁসিতে ঝাঁসন যাই (যায়)

২। জল দেই ধোই যদি তবহুঁ ন যাই (যায়)

৩। শুনই (ন + ই = নে) বিদ্যাপতি গোচর গো এ (ব্যক্ত কথা গুপ্ত করিয়া)

৪। সুপুরুষ সিনেহ অন্ত নাহি হোএ (৫ম সূত্র দেখ)

৫। পিশুনে হসব পুনু মাথ ডোলাএ
বড়াক কহিনী বড়ি দূর জাএ (ঐ)

খল ব্যক্তিগণ মাথা নাড়িয়া হাসিবে, বড়লোকের কথা অনেকদূর যায় - অস্যার্থঃ।

৬। সুপহু জানি হমে সেবল পাওঁ
আরে মোর প্রাণ রহত (রহিবে) কি জাও (যাইবে)।

পরিষদের গ্রন্থে ইহার মানে দেওয়া হইয়াছে:—'সুপ্রভু জানিয়া আমি পদ সেবা করিলাম—এখন আমার প্রাণ থাকে কি যায়'—এখন আমার প্রাণ থাকিবে কি যাইবে, এই অর্থ ই সঙ্গত।

৭। কতহুঁ ন শুনলে অইসন (এরূপ) বাত (কথা)
সীকর (সর্করা) খাইতে তাজয়ে দাঁত।

৮। দিনে দিনে বাঢ়এ সুপুরুষ নেহ (স্নেহ)।
অনুদিনে জৈসন (যেমন) চান্দক (চন্দ্রের) রেহা (রেখা)।

(খ) হাসি মুখ মোড়ই (মোড়ে) দীঠ নুকাই।
মাগয় (মাগে) তব পরিরম্ভ।
আবহন নিকসয় (নির্গত হয়) কঠিন পরাণ।
রোগী করয় জনি ঔখধ পান।
সে পুনু সহচরি হোয় মতিমান।
কহয় পীতুন বচন অবধান।—বিদ্যা।

তথা আধুনিক কালেও—
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন। ভারত।
শুনিয়া লাগয়ে ভয়। ঐ

(গ) যদি হে সে সব কহিতে আর

যে কয়ের রসিক রায়।

(ঘ) 'এ'কে ভাঙ্গিয়া 'অই' লিখিতে দেখা যায়।

রঙ্গিনীগণ সব রঙ্গহি নটই [নট্ + অ + ই (= এ)] নটে = নৃত্য করে।

রণ রণ কিঙ্কিনী কঙ্কণ রটই [রট্ + অ + ই (= এ)] রটে = শব্দ করে।

তথা চণ্ডীদাসে :—চড়িয়া উপরে ঝুলিয়া পড়য়ে (খ দেখ)

আধ নয়ানে ছহুঁ রূপ নেহারই (নেহারে) চুম্বই যুবতী মুখে।

আনন্দে গায়ই (গায়) কৃষ্ণ রসে হ'য়ে ভোলা।

বৃন্দাবন দাস।

ঝম্পই সঘন = ঝম্পে। ভারত। দংশই দশন = দংশে। ভারত।

বিরলে চিন্তই = চিন্তে। চণ্ডী।

১৩। আমরা যেখানে তুই, দিস্, নিস্, ইত্যাদি প্রয়োগ করি, বিদ্যাপতি সে সকল স্থানে কি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা দেখুন :—

ক। পরমুখে ন শুনসি (শুনিস্ না) নিথ (নিজ) মনে ন (না) গুণসি (গুণিস্) ন (না) বুঝসি (বুঝিস) ছইলরি (রসিকের) বাণী।

(খ) কিছুন উত্তর (উত্তর) দেসি (দিস্)।

(গ) নিকি সম গুরুথ (গুরু) মান নহি (না) মুকসি (ত্যাগ করিস্)

(ঘ) দোসর দিনা (দিন) পুর (পূর্ব্ব) ন রহসি (রহিস্ না)

(ঙ) সুমুখি পুছএ (জিজ্ঞাসা করি) তোহি সরূপ (স্বরূপ) কহসি (কহিস্) মোহি (আমাকে) সিনেহ (স্নেহের) কতদূর ওল (সীমা)।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, এই সংস্কৃত "সি"র + "স্ + ই"র বর্ণদ্বয় স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালায় 'ইস্' হয় নাই ত?

১৪। সংস্কৃত তিপ্, সিপ্, মিপ্ করিয়া সিদ্ধ পদ আধুনিক বাঙ্গালায়ও দেখা যায়।

নমামি তারিণীং (বঙ্কিম)। বলা যাইতে পারে যে, বন্দে মাতরম্ গানটীর সবই সংস্কৃত।

অগতির গতি নমামি মানস অতি

শীঘ্রগতি গতির সঙ্গতি। দাশরথি।

প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবিশতি সুধা। রামপ্রসাদ।

জয়িত নীলাদ্রিনাথ নীলপদ্মধারী। কাশী।

কমলে কমলা বন্দে কোমল শরীর। রাম।

চুম্বতি বদন চিবুক ধরি। চণ্ডী।

কাহে (কেন) ডরসি (ডরিস্) সখী চলু (চল) হম সঙ্গ (আমার সাথে)। বিদ্যা। মান নহি মুকসি। ঐ

১৫। বাঙ্গালা প্রত্যয় "ই" ও "এ" অন্নে সংস্কৃত ধাতুর মূলের উত্তর প্রযুক্ত হয়।

নীচ যদি উচ্চ ভাষে। ভারত।

নমি আমি কবিগুরু বাল্মীকির পদে। মধু।

অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে। ভারত।

নগর বিবরণ করি কেশরী বিশেষ। রাজনাথ।

এমন দুর্ব্বাক্য বলে কার প্রাণে সহে। কাশী।

দংশয়ে পতির অধর দলে। ভারত।

ভুজ যুগে নিন্দে নাগে। কাশী।

কাল সর্পে দংশে ক্রোধে। কাশী।

না দেবী মানুষী আমি জাহ্নবী নিবসি তুমি। ঐ

ধরাধর গুণ্ড গর্জ্জে সে বুঝি মদন তর্জ্জে।

আটনী রামনী বাহু নাড়া। রামপ্রসাদ।

নিবেদি তোমার পায়। মুকুন্দ ও চণ্ডী।

ধনি কে বিয়োগে ভরমি সংসার। বিদ্যাপতি।

সুখে ভুঞ্জে রতি মন আবেশে।

১৬। উত্তম পুরুষের সহিত প্রযুক্ত ধাতুর চারি প্রকার ভিন্ন রূপ আমরা বিদ্যাপতিতে দেখিতে পাই। যথা—

(ক) দিবস রহও (রহি) হেরি।

ই (এই) ধন মাগঞো (মাঙ্গি) বিহি (বিধাতঃ)

এক চাএ (মাত্র) তোহি (তোকে) বিদ্যা।

জানঞো প্রকৃত বুঝঞো গুণশীলা

সুমুখি পুছঞো (জিজ্ঞাসা করি) তোহি (তোরে) ঐ

কাহক গান কহ দিথ (দিই) সাম (সঙ্কেত পূর্ব্বক আহ্বান)

(খ) তৈসনন দেখিঅ (দেখি) কোই (কাহাকেও)।

আন পুছিঅ (জিজ্ঞাসা করি) বহ আন।

(গ) ইঙ্গিত ন বুঝিয় (বুঝি) না জানিয় (জানি) মান।

বাধএ (বাধিতে) ন জানিয় (জানি) আপন বেশ।

কভু নাহি শুনিয় (শুনি) মরত ক বাত।

(ঘ) বচন চাতুরি হম কিছু নাহি জান (জানি)।

১৭। "এ" অর স্থানে "উ" দেখা যায়।

আর কত জন কে করু (করে) লেখা। চণ্ডী।

ধরণী পশি যে যাদি পাউ (পায়) পরকাস। বিদ্যাপতি।

১৭। (খ) বিদ্যাপতিতে উত্তম পুরুষের "ইয়" স্থানে "উ" দেখা যায়।

না জানু (জানি) কোন পথে গেলি কান্হাইয়া।

১৭। (গ) বিদ্যাপতিতে প্রথম পুরুষের "এর" সম্পূর্ণ লোপও দেখা যায়।

নব জল বিন্দু সহই (সহিতে) কৈ পার (পারে)?

১৮। ১২র উল্লিখিত (খ) চিহ্নিত রূপের মধ্যে চণ্ডীদাস "অ"কারান্ত ধাতুর উত্তর "যে"ও "অ" আগম করিয়া পদ সিদ্ধ করিবার অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। যথা :—

আছয়ে, করয়ে, কহয়ে, ঘুচয়ে, চলয়ে, চাঁহয়ে, জানয়ে, ডাকয়ে, পড়য়ে, পুরয়ে, ফিরয়ে, দরবয়ে (দ্রবে) বলয়ে, মুরয়ে, রচয়ে, লেপয়ে, হাসয়ে ইত্যাদি।

ক্রমে উক্ত রূপগুলির অন্তস্থিত 'এ' অনাবশ্যক বোধে বোধ হয় পরিত্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়।

আমরা চণ্ডীদাসে এ রূপগুলিও পাই :—

এমতে ধন যে করেছ কত।
সে কহে ভুবনয়ে 'আছয়ে' যত।
চণ্ডীদাস কয় হিয়ায় সহয়
সকল গরল হৈল ॥

পরে এখনও :—পঞ্চ ক্রোশ উর্দ্ধে মৎস্য শূন্যেতে আছয়। কাশী।

তবে পার্থ প্রণময় ধর্ম্মের চরণে : কাশী।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যদি করয়ে কলহ। ঐ।
কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা। ভারত।
শুনিয়া * * * নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস। ঐ।
কাঁপয়ে আবেশ-রসে। ঐ।

আর ঠিক এই ক্ষেত্রেই বিদ্যাপতি 'অএ' লেখার পক্ষপাতী। সম্ভবতঃ এই 'অএ' ক্রমে "অয়ে" পরে অয় হইয়াছে।

কতন জীবন সঙ্কট পরএ
কত-নু মীলএ নিধি।
উত্তিম তৈথও সতা না ছাড়য়ে
ভাল মন্দ কর বিধি। বিদ্যা।

১৯। আমি যাই, আমি করি ইত্যাদি প্রশ্নে সম্বোধিত ব্যক্তির মত বা অনুমতি জানিতে বা পাইতে ইচ্ছা প্রকাশ পায়; বা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির আপত্তি আছে কি না, জানাই মুখ্য উদ্দেশ্য; বা পরামর্শ লইবার ইচ্ছা সূচিত হয়। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মতে কার্য্য করণে বা গমনে কোনও দোষ আছে কি না, জিজ্ঞাসা করা হয়।

আপনি বলিলে তিনি করেন বা আমি করি = করিতে রাজী আছি বা প্রস্তুত আছে (তবে অনুমতিসাপেক্ষ)। ইত্যর্থ :—তোমার কথাটা শুনি—এরকম স্থলে বক্তা সম্বোধিতের কথা শুনিতে, প্রস্তুত ইহা বলিতে চান ও তদনন্তর আপনার রায় ঐ কথা সম্বন্ধে প্রকাশ করিবেন। আপাততঃ নিজের বক্তব্য অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন। (২) আপনার কথা অনুসারে চলি পরে যাহা ঘটিবার তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি; দেখি ভাল হয় কি না।

২০। সংস্কৃত অনেক ধাতুমূলের সহিত বাঙ্গালা প্রত্যয় যোগে ধাতুমূল আশ্চর্য্য ভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

ধাব্ ধাতু—ধায় উত্তরড়ে। কৃত্তি। (ধাব্ + এ = ধা + এ = ধায়)

অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাবয়ে। চণ্ডী (ধাব্ + অয়ে ১২ খণ্ড ১৮ দেখ।
চতুর্দ্দিকে নরনারী দেখিবারে ধায়।
অলিবৃন্দ ধায় মধুলোভে।

ধ্যৈ ধাতু—মানসে ধিয়ায় সবে রণক্ষেত্রে মরি। রঙ্গলাল।

[ধ্যায় প্রকৃত উচ্চারণ ধিয়া তৎপরে এ ধিয়া এ = ধিয়ায়]
যে ভজে তোমার পায়
সে জন তোমারে ধ্যায়। চণ্ডী

জীব্ ধাতু—+ এ = জীবে।

বিরাট হউক কিংবা অন্য কোনও জন।
পাপ চক্ষে চাহিলে না জীবে কদাচন। কাশী
তব অঙ্গ দরশনে মোহ গেল নারীগণে
পুরুষ না জীয়ে কদাচন। ঐ
জীব্ + এ = জী + এ = জীয়ে,
না হিন্দী জীনা (জী ?) + এ = জীএ জীয়ে ?
তা দেখি রমণী জিয়ে। চণ্ডী। = জীবিত হয় [৺রমণীমোহন]
তবে সে জীয়ই অধির রমণী। ঐ
ধিক্ রহু জীবনে যে পরাধীন জীয়ে। ঐ
তোহ বিনা যদি অমিয় পীউতি, তইঁথও ন জীউতি রাহি।
—বিদ্যাপতি।

জন্ ধাতু—উপজে তখন। চণ্ডী

মন্থ ধাতু—অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধুজল। কাশী

কুরুবল মথে পার্থ হ'য়ে একেশ্বর। ঐ

পা ধাতু—পিবয়ে অধর সুধা, উগারে গরল। চণ্ডী। এখানে পা ধাতুর যে "পিব্" আদেশ হয়, তাহার পরে অয়ে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নব মধু যেন পীয়ে [পান করে]। চণ্ডী।
তোহ বিনা যদি অমিয় পীউতি ॥ বিদ্যাপতি।
অধর 'পিবএ' মুখ হেরি— ঐ
বদন চাঁদ তোর নয়ন চকোর মোর
রূপ অমিয় রস পাবে। ঐ [পা + এ = পিব্ + এ = পীব্ + এ = পীবে]
বিনু মধু দরশে পরশে নহি জীব।
সো বিনু পিয়াসে পানি নহি পীব।

জি—কথায় যে জিনে সুধা মুখে সুধাধর। হাসিতে তড়িত জিনি...।
—ভারত।

হিন্দি "জিত্‌না"র ত বাদ দিয়া জিনা ?

২১। বিদ্যাপতিতে ১২(ক)তে যে রূপ দেখা যায় অন্যত্রও সে রূপ দেখা যায়।—ই = য়।

কেহো দেই (দেয়) মেওয়া ক্ষীর কর্কটিকা ...
কেহো দেই (দেয়) ইক্ষু, কেহো দেই গঙ্গাজল। বৃন্দাবন দাস।
ঘন ঘন রব মুরলীর শব্দ তাহাই শুনিতে পাই (পায়) চণ্ডী।
জিনিবেন যে জন সে জন বুঝি এই
বিধি নিধি নাহি দিবে আর কেবা দেই ? ভারত।
আপনার পরিচয় রাজপুত্র কেবা কোথা দেই ? ভারত।

২২। বর্ত্তমান কাল সনাতন সত্য (Universal truth) ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

১। দম্পতি কলহে যে হারি মানে সেই জিতে। ভূদেব।

২। একবার চক্ষের বাহির হইলে, যা ছিল তা আর হয় না, যা যায়

তা বঁধুর জ্বালে যাঁ যা ভাজে তা আর গড়ে না, মুক্তবেণীর পুর মুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ? বঙ্কিম।

৩। যেমন উপায় বৃক্ষের কোটরে যে বসে সেই মরে, এই বিবাহের ছায়া যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে সেই মরিয়াছে। বঙ্কিম।

২৩। কতকগুলি রূপ কবিপ্রয়োগ বলিয়া বোধ হয়।

বিদ্যুতের প্রায় পৈশে মেঘের ভিতর। কাশী (প্র+বিশ্+এ)

ওপারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি। (বস্+এ) চণ্ডী।

ব্যাকুল হইয়া বৈসে বকুলের তলে। ভারত।

গোকুল নগরে বৈসি (বস্+ই) চণ্ডী।

হেন মতে ভক্তগণ নদীয়ায় বৈসে। বৃন্দাবন।

হিন্দী বস্না ও পশ্না (ঢোকা) হইতে এই দুই পদ সিদ্ধ কি? হিন্দীতে বৈঠনা আছে, বৈসনা বা পৈশ্না বলিয়া ত কিছু নাই।

২৪। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রথম পুরুষের "এ"র স্থানেও 'ত' ব্যবহার করিয়াছেন।

দ্বিজ চণ্ডীদাস   আবীর যোগাও ত
সকল সখীগত সাত।

২৫। প্রথম পুরুষের "এ"র স্থলে কোথাও কোথাও "অত" দেখা যায়।

ভারত যাচত (যা চে না যাচিতেছে?) ভকতি লেশ।

২৬। উত্তম পুরুষের "ই"র পর আবার "য়ে" যুক্ত থাকিতে দেখা যায়।

ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ। বিদ্যা

২৭। কহে রামা আর   আর জন কয় এই মহাশয়,
গলে পরিহার   চাঁপা ফুল খোঁপায় রাখি।
এ হার কি ছার   হলদী জিনিয়া তনু চিকণিয়া।
ফেলি গো টেনে   স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥

এখানে "ই"=ইতে ইচ্ছা করি=ইচ্ছা হইতেছে।

বিদ্যার রূপের কথা বল শুনি আগে।=শুনা যাউক বা শুনিতে ইচ্ছা করি।

আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি। বক্তার কতটা ভালবাসা চাপা আছে তাহা অনুধাবন যোগ্য।

মারি মিলয়ের আগে এক দিন—বক্তার যাহা ইচ্ছা তৎসহ কতটা রাগ আছে—তাহা বিবেচ্য।

২৮। প্রচলৎ ক্রিয়া (Present Continuous) বুঝাইতে ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয়গুলি হয়:—

প্রথম পুরুষে—তেছে, তেছেন, তিছে, তিছেন, ছে, ছেন, চে, চেন (উচ্চারণ অনুসারে) ছ=স (পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ)

মধ্যম "—তেছ, তেছিস, ছ, ছিস, চ, চিস, চো (শেষের তিনটী উচ্চারণ অনুসারে) তিছ, সে ঐ।

উত্তম "—তেছি, তিছি, ছি, চি, সি, (পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ)

ক। 'আ'কারান্ত ধাতু—করা+তেছে ইত্যাদি=কর্+ই+তেছে=করিতেছে, করিতেছে, করিতেছেন, করিতিছেন (?) করিছে, করিছেন, করিচেন, করিচে ইত্যাদি।

করা+তেছ ইত্যাদি=কর্+তেছ=কর্‌তেছ, কর্‌তেছে, কর্‌তেছেন, কর্‌তিছে, কর্‌তিছেন, কর্‌ছেন, কর্‌ছে, কর্‌চে, কর্‌চেন ইত্যাদি।

খসা—খসিতেছে, খস্‌তেছে, খস্‌তিছে—ইত্যাদি।

বলা—বলিতেছে, বল্‌তেছে, বলতিছে—"

ওয়া অন্ত:—খাওয়া+তেছে=খাইতেছে, খেতেছে, খাচ্চে, খাচ্ছে, খাতিছে, ইত্যাদি।

লওয়া+তেছে=লইতেছে, লতেছে, লচ্চে, (?) নিচ্চে, লতিছে (?)

গাওয়া+তেছে=গাইতেছে, গাতিছে (?) গেতেছে, গাচ্চে, গাচ্ছে।

নাওয়া+তেছে=নাইতেছে, নাতিছে, নাচ্চে, নেতেছে, নেতেচে, নাচ্ছে।

"আন" অন্ত—খাওয়ান+তেছে=খাওয়াইতেছে, খাওয়াতেছে, খাওয়াচ্চে, খাওয়াচ্ছে, খাওয়াতিছ (?)

দেখান+তেছে=দেখাইতেছে, দেখাতেছে, দেখাচ্চে, দেখাচ্ছে, দেখাতিছি (?)

'হা' অন্ত—দোহা+তেছে=দুহিতেছে, দুতেছে, দুতেচে, দুচ্চে, দুতিছে

(?) রহা+তেছে=রহিতেছে, রইতেছে, রতেছে, রচ্চে, রচ্ছে, রতিছে (?)

কহা+তেছে=কহিতেছে, কইতেছে, কতিছে, (?) কচ্চে, কচ্ছে।

রোপা+তেছে=রোপিতেছে, রুপিতেছে, রূপতেছে, রূপচে, রূপছে, রূপতিছে, রোপতেছে।

নাচা+তেছে=নাচিতেছে, নাচতেছে, নাচ্চে, নাচ্ছে (নাওয়া দেখ) নাচতিছে (?)

আসছে, যাচ্ছে, বস্‌ছে, হাস্‌ছে, কথা কচ্ছে, হাস্‌ছে, অথচ তুই যেন কিছুর মধ্যে নই [অমৃত বসু]

কুটিল ভোহ করি (ভ্রূ করিয়া) হেরইছি (হেরিতেছিস) কাহি (কাহাকে) বিদ্যাপতি।

দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে—(ভারত)

নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমায়—(ভারত)

সে কানু ধরিছে কোলে চুম্ব দিছে বদন কমলে—(চণ্ডী)

এখনি আসিছি মথুরা হইতে—(ঐ)

দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার।

ভ্রমেতেছে ভাসিয়া সব কি দেখিছ আর।—(নবীন)

আমি তোমায় বারংবার বলছি তোমার পায় ধ'রে মিনতি করচি—(দীনবন্ধু)

তোমার পায়ে ঠেলেছেন ব'লে তোমার অন্তর্দাহ হতেছে—(বঙ্কিম)

এখন বিধাতা বুঝি সূর্য্যমুখীর মাথা খায়। তাকে বোধ হয় জোর ক'রে বিবাহ করতেছে।—বঙ্কিম (*)

সুবোর সঙ্গে একটা তিন বছরের ছেলে—সেটাও তেমনই একটা আধ-ফুটন্ত ফুল। উঠিতেছে, পড়িতেছে, বসিতেছে, খেলিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে, দৌড়াইতেছে, হাসিতেছে বকিতেছে, মারিতেছে, সকলকে আদর করিতেছে।—বঙ্কিম

নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন—নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে, বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে আবর্ত্তে ডাকিতেছে।—বঙ্কিম

২৯। তেছের পরিবর্ত্তে "অত"-অন্ত পদ ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয়ের অৎ থাকে তার উপর "অ" (†) ক। লোচন নোর তটিনী নিরমান (চক্ষু জলে নির্ম্মিত যে নদী) ততহি (তাহাতে) কমলমুখী করত (করিতেছে) সিনান (স্নান) (বিস্তা) (কুর্ব্বৎ)

চকিতে হেরিয়া অলকে এ হিয়া।—চণ্ডী

সখী সকল মিলত (মিলিতেছে) মধু মঙ্গল গাবত (গাইতেছে)

ততকায় তরঙ্গত (তরঙ্গ হইতেছে) সঙ্গত নাচত (নাচিতেছে)

ঘন বিবিধ মধুররব যন্ত্র বাজাবত (বাজাইতেছে)

তাল মৃদঙ্গধ্বনি বনিয়া—(ভারত)

৩০। 'তেছ'র পরিবর্ত্তে অনুজ্ঞা সূচক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়।

কেন দাও (দিতেছ ?) কিরা।—ভারত।

আপনি কেন অপমানিত হন (হইতেছেন)— বঙ্কিম।

৩১। প্রচলৎ ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে অনির্দ্দিষ্ট বর্ত্তমান (Present Indefinite) রূপ ব্যবহৃত হয়।

ফুকরি ফুকরি পড়ই (পড়িতেছে) ভূমির তলে—চণ্ডী।

আরও আশীর্ব্বাদ করি (করিতেছি) যে, যেদিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিনই যেন তোমার আয়ুঃ শেষ হয়।—বঙ্কিম।

অন্ধ হেতু নহে এই দুর্য্যোধনে খুঁজে (খুঁজিতেছে)—কাশী।

চিকুর গরএ জলধারা

চিকুর গলয় জলধার—বিস্তা, চিকুর বহিয়া জলধারা গলিতেছে।

চলিতে না পারে (পারিতেছে)।

দেখাইয়া ঠারে এ বলে উহারে (বলিতেছে)

দেখলো সই।—ভারত।

৩২। কেমন করিয়া হয় ?

একণে কামিনী কাটিছে যামিনী।—মুকুন্দরাম

—কাটাইতেছে। পদটী অশুদ্ধ।

পথশ্রমে যদপি জন্মায় (জন্মে) বড় ক্ষুধা। জন্মায় অশুদ্ধ।

৩৩। বর্ত্তমানে পরিসমাপ্ত ক্রিয়া (present perfect) বুঝাইতে হইলে ধাতুর এই প্রত্যয়গুলি হয়—

প্রথম পুরুষ—য়াছে, এছে, এচে, য়েছে, য়াছেন, এছেন, এচেন, য়েছেন।—ছ = স (পূর্ববঙ্গে)।

মধ্যম „ —য়াছ, এছ, এচ, য়েছ, য়াছিস্, এছিস্, এচিস্ য়েছিস্, অছি।

উত্তম „ —য়াছি, এছি, এচি, য়েছি, চি, ছি, চি।

সবারে উত্তম দিয়া আছ (দিয়াছ) দাত্ত ভাব।—বৃন্দাবন দাস।

বোধ হয় পত্তের অক্ষর পূর্ণ করিবার জন্ত।

আকারান্ত:—করা—করিয়াছে, ক'রেছে, ক'রেচে, করিয়াছেন, ক'রেছেন, ক'রেচেন।—কর্য়াছে, কর্য়াছেন।

মারা—মারিয়াছে, মেরেছে, মেরেচে, মারিয়াছেন, মেরেছেন, মেরেচেন।

আন অন্ত—দেখান—দেখাইয়াছে, দেখিয়েছে, দেখায়েছে দেখিয়েচে।

দেখান + য়াছে = দেখা + ই + য়াছে = দেখাইয়াছে।

বহা—বহিয়াছে, ব'য়েছে, বয়েচে।

স্বামী উহাকে ইংরাজের সহিত কথা কহাইয়াছে, তাহাদের সামে গান করাইয়াছে—আপনার সঙ্গে মদ পর্য্যন্ত খাওয়াইয়াছে—আর কি ওর লজ্জা রাখিয়াছে? তাই অত গলা হইয়াছে, ধরণ ধারণ সব বদল হইয়া গিয়াছে।—ভূদেব।

অন্যায় করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে ?— ভারত।

ঠান্‌দি ঠান্‌দি আমায় ডেকেছ—কোথায় গেলো—ঠাকুরদা ঘায়গাটী কেমন সুন্দর করেছেন।—অমৃত বসু।

ভগবান সইতে দিয়েছেন কি করবে? যেমন অবস্থায় পড়েছ তারই সব দিক বজায় রেখেছ। দূর হোক্‌গে ছাই—যা হয়েছে তাত আর ফির্‌বে না তবে কেন ভগবান অদৃষ্টে যে সুখটুকুও দিয়েছেন—তাতেও বঞ্চিত হই? সে কি আমার পর না উড়ুনে থেকে উড়ে এসেছে।—দীনবন্ধু।

ও কুবুজার বন্ধু! পাশরেছ রাই-সুখ-ইত্যাদি—চণ্ডী।

আমি কি নিজের কাজ করিচি? তোমায় আমি বলিচি, যা বলেচেন, মাসী বলেচেন মর্কটচাঁদের সুমুখে ঘোমটা দিও না।—দীন।

ওঁকে এত ভালবাসি কত গহনা দিইচি। সংস্কৃত বলচো, দাপরখি হয়েচ—চুপ করচি—ছড়া কাটাও ওগো অধিকারী মশায়। যা করেচ—সেকালে করেচ।—দীন।

৩৪। কোনও কোনও স্থলে উপরিউক্ত প্রত্যয় যোগে সিদ্ধ পদ অতীত কালের সূচনা করে। কতবার ব'লেছি (বলিয়াছিলাম) এমন কুচরিত্র মানুষ তোমরা দেখ না।—বঙ্কিম।

৩৫। আবার এই আকৃতিযুক্ত ক্রিয়ার অতিরিক্ত কার্য্য বুঝায়।

---

* এই দুইটী বাক্য বসুমতীর সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। সূর্য্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগরে। কমলমণির মুখে কয়তেছে, হতেছে, মুদ্রাকর প্রমাদ নহে ত? যদি তা না হয়, গোবিন্দপুর কোন্ জিলায় তাহা গবেষণা করিয়া বাহির করা উচিত।

† এরূপগুলি অদ্যাপি হিন্দিতে প্রচলিত আছে

রেছি (ধরা কার্য্য যেমন সম্পূর্ণ হইয়াছে) কি খেয়েছি (খাইব? রিবামাত্র খাইব, যা ধরা কার্য্যের সঙ্গে খাওয়া কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে? তা হইতে পারে কি।) মেরেছি কি গিয়েছে (মারা কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া অর্থাৎ মৃত্যুও সম্পূর্ণ হইয়াছে অথবা মারা কার্য্য সম্পূর্ণ হইবামাত্র মৃত্যু ঘটিবে)। দেখেছি কি মেরেছি [প্রথম ক্রিয়ার কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারি, ত, অপর ক্রিয়ার কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারিব—এরূপ অর্থও স্থলে স্থলে করিতে পারা যায়] 'ধরেছি কি খেয়েছি'র অর্থ যদি ধরিতে পারি ত নিশ্চয় খাইয়া ফেলিব, এ অর্থ অসঙ্গত হয় না। যথা, নড়েছ কি মরেছ।

৩৬। আছি বা য়াছি স্থানে "ই" দেখা যায়।

নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে। (দেখিয়াছি, শুনিয়াছি)।

আর কোথা পাইব সে সাধু পুত্রগণে॥—কাশী।

৩৭। ৩৩এ করার সর্ব্বশেষ রূপ "ই" আগম না হইলে করয়্যাছ দেখান হইয়াছে। মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র আবার—

রন্ধন কর্যাছ ভাল আর কিছু আছে? (কর্+ই...আছ) মুকুন্দ।

বিদেশে আসিয়া সাধুর লাগ্যাছে তরাস (লাগ্...ই...আছে) ঐ

"আছে"র "আ" কি পরে উচ্চারণ অনুযায়ী "য়া" হইয়াছে?—

কর্...ই...আছে...করি...আছে...করিয়াছে।

কর্...ই...আছে...কর্...য়্...আছে...কর্যাছে।

৩৮। চণ্ডীদাস মাঝে মাঝে "য়াছে" "য়াছ" "য়া"র স্থলে "ঞা" লিখিয়াছেন। এটা বীরভূমের অনুনাসিক উচ্চারণ জন্য বানান বিপর্য্যয়।

কোন ভাগ্যবানে সাঞাছে কি দানে

ভজিয়া সে উমাপতি।

কর জোড় করি বলে রমাক্রি পণ্ডিত।

সকল জানিঞাছহ, চলহ ত্বরিত।—বৃন্দাবন দাস।

৩৯। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

অঙ্গের বসন কৈরাছে (করিয়াছে) আসন

আলাঞা দিয়াছে বেণী।

৪০। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

মুই সত্য করিয়াছি (ছি) আপনার মুহে।—চৈতন্য ভাগবতে।

মুই নি শিখাইছি এ সব লোকেরে। ঐ

৪১। য়াছ এবং য়েছ

য়াছি এবং য়েছি

য়াছে এবং য়েছে তে প্রভেদ এই-১ স্তম্ভে লিখিত প্রত্যয়গুলি সাধারণ ক্রিয়ার উত্তর হয়। আর দ্বিতীয় স্তম্ভের প্রত্যয়গুলি নিজন্ত ধাতুর ও "আন"অন্ত ধাতুর উত্তর হয়।

করিয়াছ —	করিয়াছে	করিয়াছি
করিয়েছ	করিয়েছে	করিয়েছি
করেছ	করেছে	করেছি
ঘুমড়েছ	ঘুমড়েছি	ঘুমড়েছে
ঘুমড়াইয়াছ	ঘুমড়াইয়াছি	ঘুমড়াইয়াছে
ঘুমড়ায়েছ	ঘুমড়ায়েছি	ঘুমড়ায়েছে
ঘুমড়িয়েছ	ঘুমড়িয়েছি	ঘুমড়িয়েছে
মাড়িয়াছ	মাড়িয়েছে	মাড়িয়াছি
মাড়িয়েছ	মাড়িয়েছে	মাড়িয়েছি

৪২। এসেছি, এনেছি, থেকেছি ইত্যাদি কিরূপে সিদ্ধ হয়?

ভারতবর্ষ ৫১৮ পৃঃ (১৪) দেখ।

৪৩। প্রচলৎ বর্ত্তমান (Present Continuous) পরিসমাপ্ত বর্ত্তমান (Perfect Present) প্রত্যয় পরে মূল ধাতুর আন্ত দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়।

কালা-আজর (KALA AZAR)

ও কুইনাইনের অপব্যবহার

[শ্রীচন্দ্রশেখর কালী এল্-এম্-এস্]

আসামী ভাষায় এই রোগের নাম "কালা আজর"। "আজর" অর্থ পীড়া; অর্থাৎ যে পীড়ায় শরীর কালবর্ণ হইয়া যায়, তাহাই কালা-আজর নামে আসামীরা বলিয়া থাকে। **জ্বরই এই পীড়ার প্রধান (chief) লক্ষণ এবং জ্বরে দেহস্থ অনেক যন্ত্র কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে;** ইহা শব-দেহ-পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে। আমাদের বঙ্গদেশে ইহাকে "কালাজ্বর" বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন।

সম-সংজ্ঞা Synonyms :—Tropical Splenomegaly; Black Sickness ব্ল্যাক্ সিক্‌নেস্ (কৃষ্ণব্যাধি); সরকারী পীড়া; সাহেবী পীড়া; বর্দ্ধমানের জ্বর; কালাদুঃখ; দম্ দম্ জ্বর ইত্যাদি নানাবিধ নাম ইহার জন্য য়ুরোপের অনেক গ্রন্থকার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সংক্ষিপ্ত রোগ-পরিচয় Descriptions in brief:—ইহা এক প্রকার সংক্রামক জ্বর বিশেষ। এই জ্বর তরুণ ভাবের নহে, কিন্তু প্রাচীন (Not acute but of chronic nature); অনিয়মিত (irregular) স্বভাবাপন্ন ও ইহাতে **প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়;** উহাদের অভ্যন্তরে এবং অন্যান্য যন্ত্র মধ্যে (Leishman Body) লিসম্যান্ বডী নামক এক প্রকার জীবাণু পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত যতদূর জানা হইয়াছে, তাহাতে এই জীবাণু পাওয়া গেলেই "কালা আজর" সম্বন্ধে কোন সন্দেহ (doubt) থাকে না। উপস্থিত কালের জন্য এই মাত্র মীমাংসা; পরে আবার কি স্থিরী দাঁড়াইবে বলা যায় না!!! **এই রোগে রক্তহীনতা ও শরীর-শীর্ণতা সহ প্রায়ই শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়।** এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে প্রায় স্থলেই অনেকে বাঁচে না।

আমরা একবার আসাম ভ্রমণ করিতে যাইয়া দেখিয়াছি, হাজ ইত্যাদি কতকগুলি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম প্রায়ই ইহাতে মনুষ্যশূন্য হইয়া গিয়াছে।

গারো ইত্যাদি অনেক নিম্নজাতির মধ্যে এই রোগ অনেককেই নির্ব্বংশ করিয়াছে। ভদ্রলোকের মধ্যেও অনেক মরিয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের তুলনায় তেমন অধিক সংখ্যায় নহে। এই রোগের নামে সকলেই মহা ভীত ও সন্ত্রস্ত ; বন্য জাতিদিগের মধ্যে এই পীড়া কোন গ্রামে দেখা দিলে, সে গ্রামে অন্য-গ্রামের লোকেরা কদাচ পদার্পণ করে না। কোন-কোন গ্রামের মধ্যে এই পীড়া কাহারও হইলে, তাহাকে নেশা খাওয়াইয়া গভীর অরণ্য মধ্যে সকলে ফেলিয়া রাখিয়া আইসে। কোন-কোন গ্রামে এই পীড়া দেখা দিবামাত্র সেই গ্রাম, এমন কি সেই দেশ ছাড়িয়া লোক দেশান্তরে চলিয়া যায়।

অন্যান্য বিশেষ লক্ষণচয় ; Other Special Symptoms :—কালাজ্বরের এপিডেমিক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, প্রথমাবস্থায় জ্বরের উত্তাপ অতি প্রখর হয় ; প্রায়ই উৎকট (Severe) কম্প দিয়া এবং বমন সহ জ্বর আইসে ; এই জ্বর কখন ইণ্টারমিটেণ্ট অবস্থায় চলে ; কিন্তু প্রায়ই রেমিটেণ্ট আকার ধারণ করে এবং তাহাতে অবস্থা অতি কঠিন হইতে পারে। ২ হইতে ৬ সপ্তাহ কিম্বা ইহার অধিক সময় প্রথম ভোগকাল। **ইহাতে প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি হইয়া পড়ে। এই বিবৃদ্ধি জ্বরের প্রাবল্যানুসারে অধিক বা কম হয়।** কতক দিন এইভাবে জ্বর ভোগ হইয়া, পরে কতকদিনের জন্য বিরাম পায়। পরে আবার জ্বর দেখা দেয় এবং ঐ সঙ্গে প্লীহা ও যকৃৎ আবার বিবৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপ কয়েক মাস পর্য্যন্ত মাঝে-মাঝে জ্বরের বৃদ্ধি ও সমভাব চলিতে থাকে। **কুইনাইনাদি প্রয়োগে কোন উপকার** হয় না। পরে ঐ জ্বর ক্রমে নিস্তেজ (low) মন্দীভূত অবস্থা ধারণ করিয়া চলিতে থাকে। জ্বর ১০২ ডিগ্রীর উপরে প্রায় যায় না, কিন্তু সর্ব্বদাই উহা লাগা থাকে। প্রবল কম্প আর দেখা যায় না, মাঝে মাঝে (Profuse) বহুল ঘর্ম্ম হইতে থাকে। হাত পায়ে বেদনা হয়।

পীড়া এইরূপে শরীরে মূলবদ্ধ হইয়া বসিলে পর, **শরীর শীর্ণ হইতে আরম্ভ হয় এবং এনিমিয়া বা রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।** প্লীহা ও যকৃত ক্রমে বাড়িতে থাকে ; হাতে-পায়ে শোথ এবং কখন-কখন (ascites) জলোদরী দেখা যায়। শরীরের বর্ণ এক প্রকার মেটে রং ধারণ করে। মাথার চুলের উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং শুষ্ক হইতে থাকে ; পরে উহা ভাঙ্গিয়া যায় ও খসিয়া পড়ে। কক্ষদেশে কাল শিরা পড়ে, অর্থাৎ চর্ম্মের নীচে রক্ত জমিয়া যায়। নাসিকা এবং দাঁতের মাড়ী হইতে প্রায়ই রক্তস্রাব হইতে থাকে। এইরূপ ভাবে রোগী মাসের পর মাস ভুগিতে-ভুগিতে এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসর অতীত হয়। পরে ভাগ্যাধীনে দু-একটী রোগী ভাল (cure) হইয়া যায়। অধিকাংশ রোগীতেই আমাশয়, থাইসিস্, নিউমোনিয়া ইত্যাদি দেখা যায় ; রক্তক্ষীণতা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, **রোগীর জিহ্বা বরাবরই পরিষ্কার থাকে।** ক্ষুধা, আহারে রুচি ও পরিপাক-শক্তি ভালই চলে।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis) :—রক্তের লিউকোসাইটস্ (Leucocytes) নিতান্ত কমিয়া যায়। কুইনাইনের দ্বারা এই জ্বরে কোন সুফল পাওয়া যায় না ; সুতরাং ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর নয় বলিয়া **অনেক পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।** ইহা পর যদি পূর্ব্বলিখিত লিস্‌ম্যানের জীবাণু রোগীর রক্তে পাওয়া যা তখন ইহা যে "কালাজ্বর" তাহাতে আর সংশয় থাকে না।

চিকিৎসা (Treatment) :—কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অন্যতম অধ্যাপক ডাক্তার রোজার্স **এণ্টিমোনিয়াম টার্টারিক** ঔষধের ইন্‌জেক্‌সনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কোন-কোন এলোপ্যাথি ডাক্তার বলেন, উহা ব্যবহার করিয়া সন্তোষজনক ফল পান নাই বরং কাহার-কাহারও ঐ উপায়ের চিকিৎসায় ভয়ঙ্কর বমনাদি হই প্রাণ নষ্ট হইয়াছে, এমনও জানা গিয়াছে। **এলোপ্যাথিতে ইহা চিকিৎসা নাই বলিলেই হয়।** তবে মহাত্মা হ্যানিম্যানে প্রসাদে আমাদের হোমিওপ্যাথিতে ভাল প্রুভিংযুক্ত যে সমস্ত ঔ আছে, তাহাদের সদৃশ লক্ষণ মিলাইয়া যদি ঔষধ-নির্ব্বাচন করি পার, তবে এই দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করিয়া যশোলাভ করি সন্দেহ নাই। মূল কথা ঔষধ-নির্ব্বাচনে পরিশ্রম করা চাই।

ইহাতে এলোপ্যাথিক ঔষধ তেমন কার্য্যকরী হয় না বটে, কি আমাদের **আর্সেনিক এবং উচ্চশক্তিযুক্ত কুইনাই** ক্রোটেলাস (কালচে রক্তস্রাবে), ল্যাকেসিস, হেমামেলিস, ইপিকা সোরিনাম, রাস-টক্স, এণ্টিম-টার্ট, ব্যাপ্‌টিসিয়া, পাইরোজিন জেলসিমিয়াম, বেলেডোনা, মার্কুরিয়াস, চায়না, ফেরাম, পাল্‌সেটি ব্রাইওনিয়া, লাইকোপোডিয়াম, ক্যাল্ক-কার্ব সাল্‌ফার, একোনা (নাসিকা এবং দন্তের গোড়া হইতে রক্তপাতে), চেলিডোনিয় হিপার সালফ্‌, ট্যারেনটুলা, ইত্যাদি ঔষধের উচ্চ এবং নিম্ন উ শক্তিতেই কাজ পাইবে—অবশ্য লক্ষণ অনুযায়ী।

আমাদের হস্তে **হোমিওপ্যাথিক অমৃত-ভাণ্ডার** হই **যে কোন পীড়ারই ঔষধ বাহির হইতে পারে।** এ কি, যে **পীড়া** (disease) **এখনও পৃথিবীতে আসে না** **তাহারও ঔষধ নির্ব্বাচিত হইতে পারে !!**

বর্ত্তমানে Dr. Patric Manson আদি কয়েকজন অভিজ্ঞ লোক লেখায় দেখা গেল যে, যাহাদের **ওরিয়েণ্টাল সোর** (Orien Sore) নামক গ্রীষ্মপ্রধান দেশজাত **বিস্ফোটক-ক্ষত** শরী **থাকে, তাহাদিগকে কালা আজরে আক্রা হইতে দেখা যায় না।** আবার ঐ ক্ষত আরোগ্য হই কালা-আজর আক্রমণ করে ; কিন্তু পুনরায় যদি ক্ষত দেখা যায়, ত কালাজ্বর আরোগ্য লাভ করে। ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। এই ঘটনা হইতে মনে হইতেছে যে, পূর্ব্ববঙ্গের গু **চিকিৎসা** এই কালাজ্বরে কার্য্যকরী হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হ এই স্থানে সেই জন্য লেখক "**গুল**" চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু লিপি করিলেন।

আমাদের বাল্যাবস্থায় অনেক (obstinate) দুরারোগ্য জ্বর, প্লী

ত-যুক্ত রোগ, আজের পীড়া ইত্যাদি অনেক রোগ **শুল প্রক্রিয়া** রা আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। এই শুল-চিকিৎসাকে "শুল-ওয়া" বলে। বাঙ্গালা দেশে এখনও অনেক স্থানে শুল দেওয়া। সে সকল স্থান হইতে শিক্ষিত ডাক্তার মহাশয়গণ শুল দেওয়া ত-কলমে শিক্ষা করিতে পারেন; এবং যে স্থানে ভাল চিকিৎসক নাই, স্থানের অনেক ভদ্রলোকও হাতে-কলমে ভাল শুল দিতে শিক্ষা রিতে পারেন। নিম্নলিখিত ভাবে শুল-প্রয়োগকার্য্য করা হয়:—

শুল-বসান প্রক্রিয়া (Process):—বাহুর মধ্যভাগে কিম্বা বার উর্দ্ধ-তৃতীয় ভাগে **মাংসল স্থানের** বহির্দ্দেশে **ক্ষত** রিয়া ঐ স্থানে প্রথমতঃ বড় মটরের (size) আকৃতিবৎ মোমের টী গুটিকা বসান হয়; পরে একটী নিমকাষ্ঠের ছোট গুটিকা প্রস্তুত রিয়া তাহার অগ্রভাগ ক্ষতের উপর বসাইয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বাঁধিয়া খিতে হয়। **এ গুটিকার চাপে ক্ষত ক্রমে বৃদ্ধি হইতে** কে এবং তাহা হইতে ক্রমে (pus) পুঁয় নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। রূপে পুঁয় নির্গত হইলে পর অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করে।

কথিত নিমের গুটিকা তর্জ্জনির অগ্রভাগের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট রিতে হয়। পক্ষান্তরে কেহ-কেহ পাশা খেলার গুটিকার য় করিয়াও উহা প্রস্তুত করে। তাহাতে গোড়াটী প্রশস্ত হয় এবং তের উপর মাথাটী রাখিয়া বাণ্ডেজ বাঁধিবার পক্ষে বিশেষ বিধা হয়।

শুল জন্য ক্ষত:-(১) কদলী ফলের বল্কল পোড়াইয়া, াহার অঙ্গারে জল দিয়া ছোট মার্ব্বলের ন্যায় একটী বটিকা প্রস্তুত রিয়া লয় এবং পরে ঐ বটিকা যে স্থানে ক্ষত করিতে হইবে, সে স্থানে ধিয়া রাখে। তাহাতে চর্ম্মে ঘা হইয়া ক্ষত হয়। (২) আবার কেহ লৌহ চর্ম্মের উপর স্পর্শ করাইয়া একটী সিকির আকার ক্ষত পাদন করে। উভয় প্রক্রিয়াই কষ্টদায়ক। সাবধান! **এই ক্ষত** ন **কোন ভেইন** (Vein) **বা আর্টারীর** (artery) **পরে বা নিকটে না হয়। তাহাতে বহুল রক্তস্রাবের সম্ভাবনা।**

রোগী নিতান্ত (weak) ক্ষীণ হইলে তাহাকে শুল দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। রণ তাহাতে এই ঘা, ক্ষত হইতে বহুল রক্তস্রাব হইতে পারে এবং ীহ্‌মোরিসবৎ হইয়া ক্ষত বর্দ্ধিত হওতঃ প্রাণনাশ হইতেও পারে। ক্রণিক পীড়ায় (Chronic diseases) কোন প্রকার ঔষধেই ফল হয় বরং ঔষধ দিলেই বৃদ্ধি ও ক্রমে রোগীর দশা খারাপ হয়, সেই-সেই লেই শুল দিবার প্রথা অন্যায় নহে। লেখক হোমিওপ্যাথ হইয়াও ার অনুরোধে এই শুল সম্বন্ধে যাহা জানেন লিখিলেন। শুল ত হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারাই দেওয়া কর্ত্তব্য।

পথ্যাদি (Diet):—দেখিয়াছি, রোগীকে শুল দিয়া, আস্তে-আস্তে কে তাহার ইচ্ছামত খাদ্য প্রদান করা হয়। দধি, মাষ ারেরডাইল, দুগ্ধ, মোহনভোগ, লুচি, নানাবিধ-ফল অর্থাৎ কমলা-বু, আম ইত্যাদি ইত্যাদি। এই শুল দেওয়া হইতে পুঁয় অধিক নির্গত হইতে থাকে, এবং পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা রোগীর শরীরও স্ফূর্ত্তিযুক্ত এবং সবল হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে রোগও ভাল হইতে থাকে; তবে এই শুল দিতে হইলে সুধীর চিকিৎসকের ন্যায় সকল বিষয় অনু-ধাবন করিয়া ব্যবস্থা করিবে; সাধারণ হাতুড়িয়া চিকিৎসকের খাম-খেয়ালী চিকিৎসার ন্যায় কার্য্য করিও না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ও মন্তব্য (Remarks):—বঙ্গদেশের বহু স্থানে, বিশেষ কলিকাতায়, কুইনাইনের নিতান্ত অপব্যবহার দ্বারা রোগীর অবস্থা এত **শোচনীয় হইয়া পড়ে যে, আর কোন ঔষধেই এলোপ্যাথ মহাশয়েরা কাজ উদ্ধার করিতে পারেন** না। তখন কাশি দেখা দিলে বলিয়া বসেন, "**ইহার যক্ষ্মা-রোগ আরম্ভ হইয়াছে**"; আবার **কাহাকেও বলেন "কালাজ্বর হইয়াছে—" উভয়ই** দুরারোগ্য; অতএব "জলবায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত স্থানান্তরে যাও।" কুইনাইনের অপব্যবহার দ্বারা লোকের আয়ু থাকিতেও তাহাকে মৃত্যু-মুখে প্রেরণ করা হয়।

কুইনাইনের অপব্যবহার:—ইহার দরুণ দেখিয়াছি যে, অনেক রোগীর আর কোন ঔষধেই ফল হয় না। তাহাদের মধ্যে কতকগুলির চিরজন্মের জন্য **শিরোরোগ** জন্মে, নিউর্যাল্‌জিয়া-জনিত **সায়েটিকাদি স্নায়বীয় বেদনাতেও** সময়-সময় অনেকে বহুকাল কষ্ট পায়। অনেকের উৎকট **চক্ষুরোগ** (গ্লকোমা) জন্মিয়া ক্রমে-ক্রমে তাহারা দৃষ্টি-হারা হয়। **ভগবানের কৃপায় বঙ্গদেশে কদাচ কালাজ্বর ছিল না এবং এখনও নাই।** তবে কুইনাইনের অপব্যবহারে (drug pathogenesis) ড্রাগ্ প্যাথোজেনেসিস্ জন্মিয়া অর্থাৎ ঔষধ-জনিত-পীড়া উৎপন্ন হইয়া কালাজ্বরের (shape) আকার ধারণ হইতে পারা সম্ভব। কালাজ্বর সহজ জিনিষ নয়; যখন কোন লোকালয়ে দুই-একটি রোগী দেখা দেয়, সেই লোকালয়ে তখন অনেকেই সংক্রামিত হইয়া এই রোগের কবলে পতিত হয়। সুতরাং আমাদের মীমাংসা "**বাঙ্গালা দেশে এখনও কালাজ্বর স্থান পায় নাই।**" তবে কুইনাইনের প্রতি অতি ভক্তি (faith) হেতু অপব্যবহার দ্বারাই নামজাদা চিকিৎসক মহাশয়েরা চিকিৎসায় হতাশ হইয়া দুই একটি রোগীকে **কালাজ্বর** বলিয়া আপনাদের মান রক্ষা করেন—কারণ লোকে জানে "কালাজ্বর চিকিৎসার অসাধ্য।" তাহাতেই তাহাদের দোষক্ষালন হইয়া যায়!! ইহা নিতান্ত কষ্টের কথা!!!

কুইনাইনের অপব্যবহারের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ:—এই কুইনাইনের অপব্যবহারে বঙ্গদেশের অনেকে যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহা স্বচক্ষে অনেকেই দেখিতেছেন। আমরা এস্থলে একটি অতি উচ্চ বংশের রোগীর কথা উল্লেখ করিতেছি। ইহার নিবাস কলিকাতার নিকট উত্তর-পাড়া। কয়েক বৎসর হইতে তিনি কলিকাতায় কুমারটোলার উৎকৃষ্ট বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন; নিজে কলিকাতা মেডিকেল কলেজেরই একজন গ্রাজুয়েট ও

সু-চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার মধ্যে-মধ্যে (Slight) অল্প-অল্প জ্বর হইত। কোন দিন ১০০, কোন দিন ৯৯ ডিগ্রী এইরূপ ভাব ছিল। অনেক বড়-বড় ইংরাজ এবং ইংরেজ-ডাক্তারদিগের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কোন ইংরেজ ডাক্তার একদিন একটি বাঙ্গালী ডাক্তারের সঙ্গে বন্ধুভাবে তাঁহার আলয়ে আগমন করেন এবং বলেন—"তোমার এই জ্বর কয়েক ডোজ কুইনাইন খাইলেই সারিয়া যাইবে। কেন মিছামিছি জ্বর পুষিয়া রাখিয়াছ। এ জ্বর তোমার কষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ইহাকে তাড়ান উচিত। ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর; কুইনাইন ব্যতীত ইহার অন্য কোন ঔষধ নাই। গতবার মান্দ্রাজে গবর্ণমেণ্ট হইতে ভারতবর্ষের বড়-বড় ডাক্তারদের কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল; তাহাতে তখন সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, ম্যালেরিয়া জ্বরে (big dose) অধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবন ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ নাই, সুতরাং তোমাকে কুইনাইন খাইতেই হইবে।"

ডাক্তার সাহেবের এই প্রস্তাবে বাড়ীর কর্ত্তাদের মধ্যে কেহ-কেহ তাঁহাকে কুইনাইন খাইতে অনুরোধ করিলেন; প্রতি মাত্রায় ২০ কুড়ি গ্রেণ করিয়া কুইনাইন ব্যবস্থা হইল। ঐ কুইনাইন খাওয়ার পর জ্বর প্রায় ১০২ ডিগ্রী উঠিল এবং তৎসহ কম্প হইতে লাগিল। উক্ত ডাক্তার সাহেব পর দিন আসিয়া রোগীর অবস্থা শুনিলেন এবং প্রতি মাত্রায় ৪০ গ্রেণ করিয়া কুইনাইনের ব্যবস্থা করিলেন। সেদিন জ্বর প্রায় পূর্ব্ব দিনের মত হইলেও কিন্তু অতি ঘর্ম্ম এবং অতি দুর্ব্বলতা ও শরীরের গ্লানি বৃদ্ধি পাইল। তৎপর দিন আবার ঐ প্রতি মাত্রায় ৪০ গ্রেণ কুইনাইনের ব্যবস্থা হইল। ঐ ৪০ গ্রেণের একমাত্রা খাইবার পরই অত্যন্ত ঘর্ম্ম দেখা দিল এবং নাড়ী প্রায় বিলুপ্ত হইবার মত হইল। সঙ্গে-সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসেরও কষ্ট হইল। তখন ডাক্তার সাহেব আসিয়া নানাবিধ প্রক্রিয়ায় ষ্ট্রীক্‌নিয়া ইত্যাদি হাইপোডার্ম্মিক ইন্‌জেক্‌শন দিয়া কোনমতে তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন।

সঙ্গীতাস্ত

[শ্রীদিবোনাথ শাস্ত্রী]

এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি দুই জিনিসে। এক পুরুষ, অপর প্রকৃতি। এই দুইয়ের মিলনে বিচিত্র রূপ ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। সঙ্গীতও এইরূপ দুই জিনিস হইতে উৎপন্ন; এক নাদরূপ "ব্রহ্ম," অপর তাল বা কালরূপ "প্রকৃতি"। এই দুইয়ে মিলিয়া সঙ্গীতকে অপরূপ সৌন্দর্য্যময় করিয়াছে; এই বিচিত্র জগৎ যেরূপ ক্ষণস্থায়ী ও সদা-পরিবর্ত্তনশীল, এবং একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য ব্রহ্মই সর্ব্বত্র; সেইরূপ সঙ্গীত-জগতেও আদি ও অন্তে একমাত্র সুর—ষড়জ। ইহা হইতে সঙ্গীতের উৎপত্তি, ইহাতেই সঙ্গীতের লয়। এই ষড়জ সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার, নির্গুণ; কিন্তু ইহা যখন প্রকৃতি বা কালের সহিত যুক্ত হয়, তখনই বিচিত্র রূপ সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়। এই ষড়জ আদি-অন্ত-বিহীন, সর্ব্বব্যাপী; —"বিহঙ্গকণ্ঠে, তটিনীতরঙ্গে, পয়াগসংসক্ত বিতত বাতে" সর্ব্বত্রই ধ্বনিত হইতেছে। ইহাই সঙ্গীত-জগতের "একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

এক ব্রহ্ম যেরূপ মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া বহু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন, এক ষড়জও সেইরূপ কাল দ্বারা বিচিত্র ও বিভক্ত হইয়া বহু স্বর, শ্রুতি, ও তাহাদের বিবিধ বিন্যাসজনিত অসংখ্য রাগরাগিণী উৎপাদন করিতেছে। ভগবানের অসীম বৈচিত্র্য সসীম মানবের পক্ষে শিক্ষার দ্বারা সম্পূর্ণ বোধগম্য বা আয়ত্ত হওয়া সম্ভব নহে। কত-শত যুগ পূর্ব্বে এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে; সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই মানব বিশ্বের রহস্য অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতেছেন; কিন্তু কত অল্প পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। এমন কি, ক্রমশঃই তাঁহার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত রহস্য আয়ত্তাধীন হওয়া অসম্ভব; এই জন্যই বলে শিক্ষার শেষ নাই।

ইহা অতি ভয়ানক কথা। মানব কি তবে কখনই আপনার শিক্ষার পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না? তবে কেন মানবের মনে এত আকাঙ্ক্ষা, এত উচ্চ আশা পোষণ? এখনকার কথা বলিতে পারি না, কিন্তু জানি—একদিন এরূপ লোক ছিলেন যিনি "কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি"—কাহাকে জানিলে হে ভগবন্ এই জগতের সকলই জানা যায়—এই মহাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে ব্রহ্মবাদীরা যাহা বলিয়াছেন তাহার সার কথা এই:—"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, যাঁহাতে জীবন ধারণ করে এবং প্রলয় কালে যাঁহাতে গমন করে, তাঁহাকে জান। তাঁহাকে পাইলেই মানব সেই একের মধ্যে সমস্তকে পায়। তাঁহাতেই জ্ঞান পিপাসার পূর্ণ শান্তি; সেই শান্তিই পূর্ণ আনন্দ।

সঙ্গীতকেও যদি কেবল মাত্র সুর-লয়-বিন্যাসের দিক হইতে দেখিয়া শিক্ষা করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলেই তাহার আর সীমা পাওয়া যায় না। তখন "নাদাব্ধেস্তু পরপারং ন জানাতি সরস্বতী। অদ্যাপি মজ্জ ভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি॥" সত্য-সত্যই তখন আর ইহার শেষ নাই। বিভিন্ন স্বর-বিন্যাসের দ্বারা অশেষ রাগের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতে থাকিবে। প্রত্যেক রাগকে অসংখ্য তানের যোগে অসীম বৈচিত্র্য দান করা যাইতে পারে। এরূপ চেষ্টার শেষ নাই, পরিণাম নাই। কিন্তু যদি সঙ্গীত-সাধক সেই আদি ও সর্ব্বব্যাপী সুরের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাকে ধারণা ও আয়ত্ত করিতে পারেন, তবে যেমন কোন-কোন সাধক ওঁকার স্বরূপ ব্রহ্মকে বিন্দুর মধ্যে পাইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থের রহস্য অবগত হইয়াছেন, তিনিও সেইরূপ আপনার সঙ্গীত-সাধনা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন; কারণ জগতের সকল স্বর, সুর, রাগ, তাল, লয়, মান সেই এক ষড়জকে আশ্রয় করিয়া তাহা হইতে উৎপন্ন হয় ও অন্তে তাহাতেই লয় পায়। সেই অনাদি অনন্ত সুরকে প্রাপ্ত হইলে সাধক এককালে সকল প্রকার সুর-বিন্যাস

লয়-সংযোগের অর্থ ও রাগরাগিণীর রসের অধিকারী হইবেন। তাঁহাকে আর বলিতে হইবে না :—"নাদাব্ধেস্তু পরপারং ন জানাতি সরস্বতী।"

সেই আদি ও একমাত্র সুর সঙ্গীতের সমস্ত গুণের আধার ও কারণ হইলেও স্বয়ং নিগুণ। ইহা হইতেই সঙ্গীতের শ্রুতি-মাধুর্য্য উৎপন্ন হয়; কিন্তু ইহা স্বয়ং শ্রুতি-মধুর নহে। ইহা হইতেই সঙ্গীতের মনোমোহিনী শক্তি, কিন্তু ইহাতে মোহ নাই। তবে ইহাতে আছে কি? আছে মুক্তি,—পাণ্ডিত্যের প্রগল্‌ভতা হইতে মুক্তি, মতদ্বৈধ ও রীতি-পদ্ধতির বিভিন্নতা হইতে মুক্তি, অঙ্গচালনা ও কণ্ঠ-ব্যায়াম হইতে মুক্তি। যে সাধক সেই পরম সঙ্গীত-রসকে জানিয়া মুক্ত হইয়াছেন, তিনি মহাশান্তি ও শান্তিজনিত আনন্দ পাইয়াছেন। তিনিই দেশ-কাল রীতি নির্ব্বিচারে সকল প্রকার সঙ্গীতের আনন্দের অধিকারী।

তবে কি স্বর ও লয়, রাগ ও তাল—এই সকলের প্রয়োগ ও বিন্যাসের নিয়মাবলীকে অপরাবিদ্যা রূপে উপেক্ষা করিয়া আমরা প্রথমাবধি সেই পরাবিদ্যার প্রতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক একমাত্র তাহারই সাধনা করিব, 'তদক্ষরমাধিগম্যতে'—যাহার দ্বারা সেই অক্ষরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহা নহে, তাহা হয় না। আমাদের শাস্ত্র বার-বার সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, অপরা বিদ্যা অর্জ্জন রূপ প্রাথমিক সোপান অবহেলা করিয়া যিনি একেবারে পরাবিদ্যা রূপ অতি উচ্চ স্তরের দিকে পদক্ষেপ করেন, তিনি তমোময় নরকে পতিত হয়েন।

বিজ্ঞানকে সারথি করিয়া কর্ম্ম-মার্গ অবলম্বন ব্যতীত নিবৃত্তি মার্গে পৌঁছান যায় না; কিন্তু সেই কর্ম্মতেই মুক্তি নাই, কারণ তাহার অন্ত বা চরম সমাপ্তি নাই। এবং ইহা উপলব্ধি করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য হইয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছিলাম। কিন্তু খুব কম মানবই মায়ামুক্ত হইয়া নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিতে সমর্থ; এবং সকলেই মায়াশূন্য হইলে ভগবানের সৃষ্টি অতি সত্বরই লোপ হইয়া যাইত। তাই ভগবানের মোহিনী মূর্ত্তি মানব-মনকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে; তাই সঙ্গীতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য মানব-চেষ্টাকে সজাগ রাখিয়াছে;—নতুবা একটি মহাবিদ্যা লোপ পাইত।

জড়-পরিচয়

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় এম-এস্‌সি]

বাল্যকালে বৃদ্ধ পিতামহী হইতে আরম্ভ করিয়া আজকালকার পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় পর্য্যন্ত আকাশকে স্বচ্ছ, নীল, অসীম, অনন্ত, দিগন্তব্যাপী প্রভৃতি আখ্যা দিয়া আমাদের মনের মধ্যে এক কিম্ভূত-কিমাকার পদার্থের ধারণা করাইয়া দিয়াছেন। সেই জন্যই আমরা বাল্যকাল হইতে পদে-পদে যেখানে-সেখানে আকাশকে এক বিরাট শূন্যের মধ্যে বিস্তৃত দেখিতে পাই। আকাশ কি এবং তাহার ব্যাপ্তিই বা কতটুকু, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। সত্যই কি আকাশ সীমাহীন? আমরা—সাধারণ জীব, সীমাহীন বস্তুর কল্পনা এক আজগুবি ব্যাপার বলিয়া মনে করি, কিছুতেই যেন তাহার ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। ছেলেবেলা হইতে যখন আকাশ সম্বন্ধে ধারণা করিতে শিখি, তখন আকাশ যে কি বস্তু—কিরূপ তাহার আকার, তাহা সমস্ত মন তোলপাড় করিয়াও কিছু খুঁজিয়া পাই না; কেবল মনে হয়, এক বিরাট শূন্যতা সমস্ত প্রদেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সেই কারণে, সাধারণের নিকট 'আকাশ' অর্থে শূন্য বা ফাঁকা ব্যতীত আর কিছুরই বোধ হয় না।

এই আকাশ জিনিষটা কি, তাহা তলাইয়া না বুঝিলে, আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে না। যাহা হইতে দেশ-বুদ্ধি জন্মে তাহাই আকাশ। আমরা এদিক-ওদিক চারিদিক বিচরণ করিয়া বেড়াই,—এই বিচরণের সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের প্রয়াসের জ্ঞান মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। দক্ষিণ হইতে পশ্চিম বা পশ্চিম হইতে দক্ষিণে বিচরণকালে যে জাতীয় প্রয়াসের জ্ঞান জন্মিবে, ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে বা নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে গমনকালে ঠিক সেই জাতীয় প্রয়াস অনুভূত হইবে না। আবার পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে বা সম্মুখ হইতে পশ্চাতে বিচরণকালে অন্য আর এক জাতীয় প্রয়াসের জ্ঞান জন্মিবে। এই তিন দিকের প্রয়াস বিভিন্ন প্রকার বলিয়াই সমতলক্ষেত্র হইতে পর্ব্বতারোহণকালে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে ছুটিয়া যাইবার সময়, দক্ষিণ হইতে বামে চলিবার সময় আমরা ভিন্ন জাতীয় কষ্ট বা বাধা অনুভব করি। তাহা হইলে এই দেশ-বুদ্ধি বা যাহাকে আমরা আকাশ বলি, তাহা এই তিন জাতীয় প্রয়াসের সমষ্টি-মাত্র। সেই কারণেই বিজ্ঞান-বিদ্যা এই আকাশ বা Spaceকে তিন জাতীয় প্রয়াসের সমষ্টি বা তিন dimension বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এখন দেখা যাউক, এই যে আকাশ, তাহা বাস্তবিক কি সীমাহীন? না, সামান্য গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ? আমরা চেতন জীব। ইন্দ্রিয়-পরিপুষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে দেশ-বুদ্ধি বাড়িয়া যায়। আমার দেশ-বুদ্ধির সহিত তোমার দেশ-বুদ্ধির সর্ব্বতোভাবে মিল থাকিতেই পারে না। আমি যতটুকু দেখি, তুমি ততটুকু পার না। আমি যতটুকু ভাবিতে পারি, তুমি ঠিক তাহা পার না। কাজে কাজেই আমার দেশ-বুদ্ধির সহিত তোমার দেশ-বুদ্ধির সম্পূর্ণভাবে যে মিল থাকিবে, তাহা বলা যায় না; তবে আংশিক মিল থাকিতে পারে। যখন দেশ-বুদ্ধি হইতে আকাশের উৎপত্তি, তখন প্রত্যেকে তাহার দেশ-বুদ্ধি অনুসারে স্ব-স্ব আকাশ গড়িয়া লইয়াছে এবং বেশ সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহাই আমাদের প্রত্যক্ষ আকাশ। এই প্রত্যক্ষ আকাশ সীমাবদ্ধ। যখন এই আকাশ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, তখন জ্ঞানের পরিমাণ অনুসারেই ইহার পরিমাণ বা ব্যাপ্তি।

মানুষ যে দিন জন্মগ্রহণ করে, যে দিন সবে মাত্র তাহার চক্ষু, কর্ণ, ইন্দ্রিয়াদি ফুটিয়া উঠিতেছে, সেই দিন সেই [illegible] ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সে তাহার চতুষ্পার্শ্বের আকাশকে একটী ক্ষুদ্র সীমাব[illegible] ব্যতীত আর

কিছুই মনে করিতে পারে না। তাহার পরিমাণ, ব্যাপ্তিই বা কতটুকু? সে তখন মায়ের কোল ব্যতীত আর কিছুই জানে না। তাহার আকাশ তাহার মায়ের অঙ্কে নিবদ্ধ। যতই দিন যায়, ততই তাহার আকাশ অল্পে-অল্পে বাড়িয়া যায়, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য যেন বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে, হাতের খেলনা পড়িয়া গেলে তখন কাঁদিয়া আর অধীর হইয়া উঠে না, হামাগুড়ি দিয়া ধরিবার চেষ্টা করে; কেন না তাহার আকাশ তখন কয়েক হস্ত পরিমিত স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রিয়-পরিচালনের দ্বারা তাহার দেশ-বুদ্ধি ঐ প্রদেশটুকুর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; সেই হেতু ঐ প্রদেশটুকুই তাহার আকাশ এবং ঐ আকাশের ঐ টুকুই ব্যাপ্তি বা সীমা। সূতিকাগারের বাহিরের সহিত শিশুর কোন সংস্পর্শ নাই। সে জানে না তাহার বাহিরে কি আছে। ক্রমে যখন সে বড় হইয়া উঠে, তখন তাহার জ্ঞান বাড়িয়া যায়, এবং সেই জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার আকাশ বাড়িয়া যায়। এইরূপ ভাবে আমরা প্রত্যেকে নিজ-নিজ আকাশ গড়িয়া লইয়াছি। সেই আকাশ আমার নিকট এখন সীমাবদ্ধ। দু'দিন পরে দেখি, আমার আকাশ আরও খানিকটা বাড়িয়া গিয়াছে; তখন আবার নূতন করিয়া তাহার সীমা-নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হই। সীমা টানা হইয়া গেলে, বেশ করিয়া নিজের মত গুছাইয়া কাজ করিয়া যাইতেছি। কিছুদিন পরে চাহিয়া দেখি—কই, সে আকাশ ত আর নাই। তাহার সীমা-রেখা মুছিয়া গিয়াছে, তাহার প্রসার বাড়িয়া গিয়াছে। তাই তাড়াতাড়ি আবার সীমা টানিতে বসিয়া যাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আকাশও বাড়িয়া চলিয়াছে, সীমারেখাও সরিয়া যাইতেছে। কত আর সীমা নির্দ্দেশ করিব,—মন বিরক্ত হইয়া উঠে, ক্লান্তির অবসাদে ভরিয়া যায়। তখন বাধ্য হইয়া, হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিয়া বসি, আর সীমা টানিব না। সীমা-রেখা যদি দিন দিন সরিয়া যায়, তবে তাহা টানার প্রয়োজন কি? সেই কারণেই আমরা আমাদের আকাশকে অসীম অনন্ত প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া এক প্রকার নিষ্কৃতি পাইয়াছি।

আমি এখানে বসিয়া লোক-মুখে বা পুস্তকাদিতে ভিন্ন-ভিন্ন দেশের ভিন্ন-ভিন্ন দ্রব্যের বিবরণ শুনিয়া বা পাঠ করিয়া সেই-সেই দেশের একটা অস্পষ্ট জ্ঞান সংগ্রহ করিতেছি, সেই দেশের জ্ঞান হইতে একটা কল্পিত আকাশও খাড়া করিয়া মনের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছি। এই কল্পিত আকাশের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ আকাশের মিল নাই। কাজে-কাজেই যাহাকে আমরা আকাশ বলিয়া মনে করি, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ এবং কাল্পনিক আকাশের সমষ্টিমাত্র। এই আকাশ প্রত্যেকের নিকট ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। অবশ্য ইহার মধ্যে কিয়দংশ মিল থাকিলেও অবশিষ্ট অংশ প্রত্যেকের আকাশ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা চেতন জীব—প্রত্যক্ষ আকাশ লইয়াই আমাদের কারবার। সেই কারণেই প্রত্যক্ষ আকাশ আমাদের নিকট একটা জীবন্ত সত্য পদার্থ এবং সীমাবদ্ধ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আকাশের অসীমত্ব আমাদের [illegible] ক্লান্তির পরিচায়ক। আমার আকাশ আপনার আকাশ হইতে ভিন্ন, [illegible] আকাশ শ্যামের আকাশ হইতে ভিন্ন। এই ভিন্ন-ভিন্ন আকাশের সমষ্টি করিয়া আমরা এক নূতন আকাশ তৈয়ারী করিতে প্রবৃত্ত হই। তাহা কাহারও নিজের নহে, এ আকাশকে কেহ কখনও দেখে নাই। এইরূপ কল্পনা করিয়া সমগ্র আকাশকে এক বিরাট অন্ধকারের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই। তখনই বাধ্য হইয়া এই অস্পষ্ট, অন্ধকার আকাশকে অসীম, অনন্ত, দিগন্তব্যাপী প্রভৃতি কষ্ট-কল্পিত আখ্যা দিয়া কবিত্বের উৎস ছুটাইয়া দিই।

এই যে কাল্পনিক আকাশ,—ইহা সাধারণের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। এই আকাশে তাহার কোন কাজ নাই। তাহারা এই আকাশ চেনে না, জানে না এমন কি তাহাদের বুঝিবার ক্ষমতাও নাই। এই বিশাল, বিরাট আকাশের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের মত আমাদের প্রত্যক্ষ আকাশ মাঝে-মাঝে উঁকি মারে। আমরা সামান্য প্রাণী; জ্ঞানও আমাদের সামান্য। কাজে কাজেই সামান্য সীমাবদ্ধ আকাশ লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট। এই অনন্তব্যাপী কাল্পনিক আকাশ—ইহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। তাই আমরা স্বেচ্ছায় বৈজ্ঞানিক-দিগকে ইহা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি। তাহাদের অনন্ত জ্ঞানের নিকট এই অনন্ত আকাশই যোগ্য।

এতক্ষণ যে আকাশের কথা বলিতেছিলাম, তাহার অন্ত নাই, সীমা নাই, জগৎ জুড়িয়া সেই আকাশ বর্ত্তমান আছে। ইহার এক অংশ হইতে অন্য অংশ চিনিয়া লইবার উপায় নাই,—সব দিকেই সমান। এই সমাকার আকাশ লইয়া আমরা কি করিব? গভীর অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবীর ঘর-বাড়ী কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না; মনে হয়, সব অন্ধকারে ডুবিয়া আছে, অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই নাই। পথ ঘাট চিনিয়া লইবার উপায় থাকে না। কাজে-কাজেই এই অন্ধকারময় পৃথিবী থাকা না থাকা আমাদের পক্ষে সবই সমান। সেইরূপ, এই সমাকার আকাশ—যাহাতে কোন চিহ্ন নাই, তাহা লইয়া আমরা কি করিব? সেইজন্য, তাহাকে প্রয়োজনোপযোগী করিবার জন্য, নানা প্রকার দ্রব্য ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; এখানে ইট, ওখানে পাথর, গগনবক্ষে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী, মর্ত্তে বৃক্ষ-লতা, ঘর-বাড়ী, পাতালে সোণা, লোহা, ধাতব পদার্থ। এই সব পদার্থকে আমরা সাধারণতঃ জড় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। পাঠশালার কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে সে জড়ের অর্থ করিবে,—যাহা নির্জীব, চৈতন্যহীন এবং যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে পারে না, তাহাই জড়। ইহাই কি প্রকৃত অর্থ? বাল্যকাল হইতে এইরূপ ধারণা আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। জড় বলিলে, আমরা আর কিছু বুঝি আর নাই বুঝি, এইটুকু বুঝি যে, যাহার চলৎ-শক্তি নাই, তাহাই জড়; এবং সেই কারণেই বোধ হয় একটা নেকা-বোকা, অলস লোক দেখিলেই, নির্ব্বিবাদে বলিয়া থাকি—ও একটা 'জড়ভরত'। কত দিন হইতে যে এই জড় পদার্থ লইয়া নাড়াচাড়া হইতেছে, তাহা বলা যায় না; তবে অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে এই ভারতবর্ষে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রীসে ইহার আলোচনা হইয়াছিল, এ কথা বেশ জোর করিয়া বলা যায়। কপিলের সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি-পুরুষ হইতে

ভূতাদির সৃষ্টি পর্য্যন্ত নানা প্রকারে, নানা ভাবে জড়ের তথ্য নিরূপণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সমগ্র বৈশেষিক দর্শনখানি জড়তত্ত্ব লইয়া রচিত। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র যে ভাবে জড়তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন, তাহার সহিত পূর্ব্বের আলোচনার বড় একটা মিল দেখা যায় না। সাংখ্য, বৈশেষিকের মতে—যাহা নিজে প্রকাশিত হইতে পারে না, বা অন্যকে প্রকাশিত করিতে পারে না, তাহাই জড়। তাঁহারা এই ভাবে জড়ের ব্যাখ্যা করিয়া, যাবতীয় স্থূল ভূতাদির পরিচয় দিয়া, জগতে বিবিধ প্রকারের জ্ঞান বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জড় অনিত্য। এই যে স্থাবর-জঙ্গম, জল-স্থল, ঘর-বাড়ী—যাহা কিছু আমরা জড় বলিয়া ধরি, তাহা কিছুই নহে,—শক্তির সমষ্টিমাত্র। জড় বস্তুকে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিলে, কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত জড় বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়; পরে নানা অবস্থার মধ্য দিয়া একটি বিশ্বব্যাপী শক্তিতে পরিণত হয় বা তাহার মধ্যে ডুবিয়া যায়। এইখানেই জড়ের জড়ত্ব থাকে না; এইখানেই তাহার রূপান্তর এবং এইখানেই তাহার মৃত্যু।

এই ত গেল সাংখ্য-বৈশেষিকের জড়বাদ। এখন দেখা যাক্, আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রে জড় বস্তু বলিতে কি বুঝায়, এবং কিরূপ ভাবে তাহার প্রকৃতি নিরূপিত হইয়াছে? পূর্ব্বে আমরা যে সকল জড় দ্রব্যের নাম করিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকে চলিয়া, ফিরিয়া, ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কেহ চুপ করিয়া বসিয়া নাই; প্রত্যেকে প্রত্যেককে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সুবিধা পাইলে দূরে চলিয়া যাইবার চেষ্টাও করিতেছে। এইরূপ টানাটানি, ছুটাছুটির ব্যাপার জগতের প্রত্যেক জড়দ্রব্যের মধ্যে অবিরত চলিতেছে।

ইহাও দেখা যায় যে, জড় দ্রব্য মাত্রেরই বেগ-বৃদ্ধির দিকে, বেগ-অর্জ্জনের দিকে একটা প্রবৃত্তি আছে। সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া চক্ষুর অগোচর ধূলিকণা পর্য্যন্ত প্রত্যেকের বেগ অর্জ্জনের প্রবৃত্তি আছে। জানি না কেন, এই প্রবৃত্তির নাম দেওয়া হয় নাই। বেগ অর্জ্জনের অপ্রবৃত্তির নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাই জড় দ্রব্যের জড়ত্ব বা Inertia। যে দ্রব্যের দ্রুত চলিবার প্রবৃত্তি অধিক, তাহার জড়ত্ব বা Inertia অল্প; এবং যে দ্রব্য কিছুতেই নড়িতে চাহে না, তাহার জড়ত্ব অধিক। যে দিন আপেল ফল গাছ হইতে ছিঁড়িয়া পড়িল, আর যে দিন Newton তাহা লক্ষ্য করিলেন, সেই দিন বিজ্ঞান-বিস্তার যে একটি শুভ দিন, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না।

কত দিন কত ফল ত গাছ হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। কত লোক ত তাহা দেখিয়াছে। কিন্তু কেহই ত Newtonএর মত করিয়া দেখে নাই। Newton দেখিলেন, ভাবিলেন, এবং বিস্ময়ে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কেন এমন হইল? ফল পড়িল ত মাটিতে না পড়িয়া শূন্যে রহিল না কেন? নানা পরীক্ষা এবং গভীর গবেষণার পর Newton ঠিক করিলেন যে, জগতের প্রত্যেক দ্রব্য প্রত্যেককে আকর্ষণ করিতেছে। আমি তোমাকে টানিতেছি, তুমি আমাকে টানিতেছ। সূর্য্য পৃথিবীকে টানিতেছে। আবার পৃথিবীও নিজ সামর্থ্যানুসারে সূর্য্যকে টানিতেছে। প্রকাণ্ড পাহাড়-পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত সকলে পরস্পরকে টানিতেছে। এই টানাটানির ব্যাপার জগৎ জুড়িয়া বর্ত্তমান আছে। যতদিন জগৎ থাকিবে, ততদিন এই টানাটানি থাকিবে। এই টানাটানি লুপ্ত হইলে জগতে প্রলয় উপস্থিত হইবে। সেই দিনের পরিণাম ভাবিতে গেলে প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তবে সুখের বিষয় যে, এই টানাটানির বিরাম নাই, কখনও যে হইবে, সে ভরসাও অল্প। কে বেশী জোরে টানে, কে কম জোরে টানে,—সেই টানের জোরে কে বেশী দূরে সরিয়া আসে, আবার কাহাকে নড়াইতে বা অধিক টানের প্রয়োজন হয়, এই সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে জড় বস্তুর জড়ত্ব বা Inertia বুঝা কঠিন হইবে না।

পৃথিবী আপেলকে টানিতেছে এবং আপেলও পৃথিবীকে টানিতেছে। কাহার টান বেশী? কে বেশী দূর নড়িতেছে? এখানে পৃথিবী স্থির হইয়া আছে, আর আপেল তাহার বক্ষে লুটাইয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর জড়ত্ব আপেলের চেয়ে বেশী। সূর্য্যের টানে পৃথিবী তাহার দিকে সরিয়া আসিতেছে, আর পৃথিবীর টানে সূর্য্য প্রায় নড়িতেছে না। তাহা হইলে সূর্য্যের জড়ত্ব পৃথিবী হইতে ঢের বেশী, এবং সেই কারণেই চন্দ্রের জড়ত্ব পৃথিবী হইতে অল্প। এই ভাবে জাগতিক দ্রব্যের জড়ত্ব নিরূপিত হইতে পারে। আমরা জগতের অধিবাসী। সূর্য্যকে স্থির ধরিয়া পৃথিবীস্থ অন্যান্য দ্রব্যের এবং শূন্যস্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদির বেগ-অর্জ্জনের প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া, প্রত্যেক বস্তুর এক-একটী জড়ত্ব নির্দ্ধারিত করি। Newton আসিয়া জড়ত্বের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যাহার যে জড়ত্ব বা Inertia তাহা অপরিবর্ত্তনীয়; চিরকাল একই থাকিবে, কোন নড়চড় হইবার উপায় নাই। আজ যে বস্তুকে যে মার্কা দিয়া চিহ্নিত করা হইল, তাহা দু'দশ বৎসরে মুছিয়া যাইবে না, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ঠিক থাকিবে। এই মার্কা দেখিয়াই আকাশের মধ্যে নিক্ষিপ্ত বিভিন্ন জড় বস্তুকে চিনিয়া লইতেছি। তাহা হইলে পার্থিব বস্তুর মুখ্য লক্ষণ Inertia বা জড়ত্ব। ইহা অপরিবর্ত্তনীয়। এই হিসাবে জড় বস্তু নিত্য ধ্বংসহীন এবং indestructible। কেহ-কেহ Inertia বা জড়ত্বকে mass of a body বলিয়া থাকেন। Mass কথাটিকে quantity of matter বলিলে অর্থ কিছু পরিষ্কার হইবে। যে বস্তুর mass যত বেশী, তাহাতে Inertia তত বেশী হইবে; এবং যাহার mass যত কম, তাহার Inertia তত কম হইবে। এই ভাব হইতে Inertiaকে mass বলিলে বিশেষ দোষের হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আর এক কথা। যখন সমাকার আকাশকে বিষমাকার করিবার প্রয়োজন হইল, তখন জড় বস্তুর আবির্ভাব হইল। এক একটা জড় দ্রব্য আকাশের এক-এক জায়গা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সকলে এদিক-ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কেহ কাহারও সহিত মিশিয়া যাইতেছে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আকাশকে চিহ্নিত করাই হইতেছে জড় দ্রব্যের উদ্দেশ্য। যদি একটা বস্তু আর একটা বস্তুর সহিত সম্পূর্ণ ভাবে মিশিয়া যায় তাহা হইলে এই উদ্দেশ্যের সার্থকতা থাকে

না। সমাকার আকাশ সমাকারই থাকিয়া যায়। বহু বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করিবার প্রয়োজন হয় না। তাহা হইলে যেখানে জড় বস্তু সেই খানে তাহার extension বা দেশ ব্যাপ্তি। অনেক জায়গায় মনে হয় যেন দুইটা বিভিন্ন পদার্থ পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে। জলে কিছু লবণ ফেলিয়া দিলে তাহার বাহ্যিক আকারের কোন প্রভেদ হয় না, তবে স্বাদের তারতম্য ঘটে। এক্ষেত্রে মনে হয় লবণ জলের সহিত একবারে মিশিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে লবণ এবং জল স্ব-স্ব অস্তিত্ব হারাইয়া মিশিয়া যায় নাই। লবণাক্ত জলের অভ্যন্তরে লবণের এবং জলের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণিকাগুলি পাশাপাশি রহিয়াছে। তাহারা অতি ক্ষুদ্র বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না। তাহারাও গায়ে-গায়ে লাগিয়া নাই। পরস্পরের মাঝে কিছু ফাঁক আছে। যেখানেই দুই পদার্থের সম্মিলন, সেখানেই বুঝিতে হইবে যে ভিন্ন-ভিন্ন পদার্থের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণিকাগুলি পাশাপাশি রহিয়াছে; একটি কণিকা আর একটির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই। এই কণিকাগুলিকে স্থানবিশেষে atoms, molecules, Corpuscles বলিয়া থাকে। এতক্ষণ জড় বস্তুর পরিচয় খুঁজিতেছিলাম। তাহার খবর মিলিয়াছে। জড়তাই লক্ষণ তাহার Inertia এবং extension বা দেশ-ব্যাপ্তি। যেখানে জড় বস্তু আছে, সেখানে সে একটু-একটুকু স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং সেইখানে তাহার Inertiaও আছে।

সাজাহান *

(শ্রীএব্‌রাহিম খাঁ বি-এ

বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যে নির্ম্মল হাস্যস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা এখনও মিলে নাই। তাঁহার স্বদেশ হিতৈষণা-প্রবুদ্ধ প্রচ্ছন্ন-বেদনাময়ী সঙ্গীতাবলি, ততোঽধিক তাঁহার নূতন আলোক-সম্পাতে ভারতেতিহাসের অপূর্ব্ব চরিত্র-চিত্রন নব্যবঙ্গের যুবকমণ্ডলীর কল্পনা-প্রবণ হৃদয়ে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শাহ্‌জাহান কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক।

ভারতসম্রাট বৃদ্ধ শাহ্‌জাহান দুরন্ত রোগভারে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরে শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন। আমির-ওমরাহ্‌গণ চিন্তাকুল; প্রজাপুঞ্জের মধ্যে প্রথমতঃ কাণাকাণি, পরে রটনা হইয়া গিয়াছে,—শাহ্‌জাহান আর ইহজগতে নাই। এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতের চারিদিক হইতে চারি শাহ্‌জাদা সিংহাসন অধিকার করিতে ধাবিত হইয়াছেন। সম্রাট রোগমুক্ত হইয়া এ সংবাদ শ্রবণে দারার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তাই ত, এ বড় দুঃসংবাদ, দারা!" (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য); এইরূপে নাটকের আরম্ভ।

এ নাটকে কবি, আওরঙ্গজেবের শাসনকালের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা নিখুঁত না হইলেও মুসলমান চরিত্র অবলম্বনে লিখিত অন্যান্য নাটক-উপন্যাসে অঙ্কিত চিত্রসমূহ অপেক্ষা উপাদেয় হইয়াছে। ভারতেতিহাসের যে অধ্যায় লইয়া শাহ্‌জাহান লিখিত, সে অধ্যায় ভ্রাতৃরক্তে, হিন্দু-মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত। শাহ্‌জাহানেও যোদ্ধার যুদ্ধংদেহী, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, অশ্বের হ্রেষারব, সমরাঙ্গনের তূর্য্যধ্বনি এবং ঘাতকের অস্ত্রাঘাতের অভাব নাই। কিন্তু এগুলি শাহ্‌জাহানের বিশেষত্ব নয়; তাহার বিশেষত্ব এক নির্ম্মল, পবিত্র, প্রচ্ছন্ন, বেদনাময়ী, গভীর প্রেমধারা; আর সেই প্রেমের বিয়োগান্ত নাটক এই শাহ্‌জাহান। এই অলক্ষিত, বেদনাময়ী, শুভ্র প্রেম-প্রবাহ শাহ্‌জাহানের স্তরে-স্তরে সঞ্চরমান থাকিয়া তাহাকে এক অপূর্ব্ব, করুণ সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে এবং মাঝে-মাঝে বিপুল উচ্ছ্বাসে আবরণ ভেদ করিয়া উৎস আকারে তাহার গৈরিকধারার নিঃসরণ করিয়াছে।

"শাহ্‌জাহান" শাহ্‌জাহানের দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্য-স্নেহের বিয়োগান্ত নাটক। ভুবনমোহিনী, প্রেমময়ী মমতাজ-মহল আর ইহজগতে নাই। বিরহ-বিদগ্ধ শাহ্‌জাহানের দীর্ঘশ্বাস মর্ম্মরময়ী হইয়া তাজমহলরূপে প্রেমের অপূর্ব্ব সৌধ-সমাধি রচনা করিয়াছে; অশ্রুরাশি যমুনা-কলেবর বৃদ্ধি করিয়া লক্ষ বীচি রূপে সমাধি-পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে। আজ মমতাজের প্রতি সেই গভীর প্রেম অপত্যস্নেহরূপে শাহ্‌জাহানের সমস্ত হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু হায়! পুত্রগণের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে বৃদ্ধ শাহ্‌জাহানের শেষ সম্বল অপত্যস্নেহটুকুরও সমাধি রচনা

* এ শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ শাহ্‌জাহান।

রক্ত হইয়াছে! কি গভীর, করুণ সুর শাহ্‌জাহানের এই দ্বার শব্দে শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে—"দারা, এ যুদ্ধে পক্ষেরই জয় হো'ক্, আমার সমান ক্ষতি। এ যুদ্ধে তুমি পরাজিত হলে তোমারি ম্লান মুখখানি দেখতে হবে; আর যাঁ'রা পরাজিত হ'য়ে ফিরে গেলে তা'দের ম্লান মুখ কল্পনা ক'র্ত্তে হবে।" (১ম দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)। বিদ্রোহী পুত্র বিজয়ী হইয়া রাজধানী অধিকার করিতে আসিতেছে, শাহ্‌জাহান বলিতেছেন—"আওরঙ্গজেব—আমারি পুত্র—আমার উদ্ধত বিজয়ী পুত্র,—আমার লজ্জা—আমার গৌরব" (৭ম দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)। পুত্র বিজয়ী—এ সংবাদ পিতার কি গৌরবের বিষয়! কিন্তু হায়! এ পুত্র যে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী! কি গভীর লজ্জার বিষয়! আবার বন্দী শাহ্‌জাহানের সম্মুখে একে-একে দুইটী পুত্রের প্রাণনাশ, একটী সুদূর আরাকানে নির্ব্বাসিত, আর একটী পিতৃদ্রোহী,—অপত্য-স্নেহের কি করুণ সমাধি! ভারতের প্রতাপান্বিত সম্রাট শত-যুদ্ধ-জয়ী শাহ্‌জাহান আজ বৃদ্ধ,স্থবির, জীর্ণ, দুর্ব্বল, প্রেমময়ী পত্নীহীন, সন্তান-বিয়োগ-শোকদগ্ধ, কারাগারে পুত্র-হস্তে বন্দী। এক-একবার পূর্ব্ব-শৌর্য্য-স্মৃতিতে উন্মত্ত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠেন, কিন্তু সে নিষ্ফল আস্ফালন। শেষ দৃশ্যে যখন আওরাঙ্গজেব ক্ষমার জন্য আসিলেন, পিতা তাঁহাকে দস্যু ভাবে বর্জ্জন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যেই পুত্র পিতৃপদতলে জানু পাতিয়া বসিলেন, অমনই সকল অভিমান, সকল বেদনা দূর হইল,—অম্লানবদনে বিদ্রোহী পুত্রকে ক্ষমা করিলেন। যে অমৃত-নিস্যন্দিনী দাম্পত্য-প্রণয় শাহ্‌জাহানের সমস্ত হৃদয়-মন অধিকার করিয়া তাঁহাকে পুত্র-শাসনে বিরত রাখিয়াছে, আজ আবার সেই প্রেমেরই জয় হইল। প্রতিবাদকারিণীকে বলিলেন, "কথা ক'সনে জাহানারা, পুত্র আমার পা জড়িয়ে আমার ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে, আমি কি তা না দিয়ে থাক্‌তে পারি?" জাহানারা কিন্তু আওরঙ্গজেবকে ক্ষমা করিবেন না। শাহ্‌জাহান তাঁহাকে বলিতেছেন—"তোরই মত মাতৃহারা, জাহানারা, তোরই মত বেচারী, ক্ষমা কর; ওর মা যদি এখন বেঁচে থাক্‌ত, সে কি কর্ত্ত, জাহানারা?—তা'র সেই মায়ের স্নেহ যে আমার কাছে জমা রেখে গেছে! কি জাহানারা, তবু নিস্তব্ধ? চেয়ে দেখ্ এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে—দেখ্ সে কি স্বচ্ছ! চেয়ে দেখ্ ঐ আকাশের দিকে, দেখ্ সে কি গাঢ়! চেয়ে দেখ্ ঐ কুঞ্জবনের দিকে, দেখ্ সে কি সুন্দর! আর চেয়ে দেখ্ ঐ প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু-ঐ অনন্ত আক্ষেপের আপ্লুত বিয়োগের অমর কাহিনী, ঐ স্থির মৌন, নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মন্দির, ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্—সে কি করুণ! তা'দের দিকে চেয়ে ঔরঙ্গজীবকে ক্ষমা কর।" (৫ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)।

দ্বিজেন্দ্রলাল শাহ্‌জাহানের এই স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-মণ্ডিত, মহিমময়, করুণ চরিত্র-চিত্রনে একটু পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। আওরাঙ্গজেব বিদ্রোহী, ভ্রাতৃহন্তা,—এ সংবাদ শ্রবণে যখন শাহ্‌জাহান নিষ্ফল আস্ফালন করিয়াছেন, তখন হয় ত তাঁহার একবার মনে করা উচিত ছিল যে, পিতৃদ্রোহ-কলুষ হইতে তিনি নিজে নিষ্কলঙ্ক নহেন এবং ভ্রাতৃ-রক্ত-রঞ্জিত হস্তে ভারতের রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া তিনিই আওরাঙ্গজেবকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কবি এ কথার উল্লেখ করিলে শাহ্‌জাহানের চরিত্র-মহিমা কিঞ্চিৎ পরিম্লান হইত সত্য, কিন্তু আওরঙ্গজেবের প্রতি একটু ঐতিহাসিক সুবিচার হইত। কেন তিনি এ সুবিচারটুকু করেন নাই,—দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ মীমাংসা হইবে। তিনি নাটকে সাধারণতঃ এমন একটি বিরাট চরিত্র রচনা করেন যে, তাহার উজ্জ্বল প্রভায় অন্যান্য চরিত্র ম্লান হইয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁহাকে ইংরেজ কবি মারলোর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি এইরূপ বিরাট চরিত্র-চিত্রনে সিদ্ধহস্ত। "তৈমুর লঙ্গের" (Tamerlane) তৈমুরের সঙ্গে "চন্দ্রগুপ্তের" চাণক্য এবং দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের (Edward II) সঙ্গে শাহ্‌জাহানের তুলনা করা যাইতে পারে। এডওয়ার্ড গ্যাভেষ্টনের ভালবাসার জন্য রাজ্য হারাইলেন, আর চিরজীবন শুধু নিষ্ফল আস্ফালন করিয়াই কাটাইয়া দিলেন। তবে শাহ্‌জাহানের চরিত্র এডওয়ার্ডের চরিত্র অপেক্ষা মহত্তর হইয়াছে। এই নায়কগণ একটিমাত্র প্রবল ভাবে বিভোর হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়াছেন। শাহ্‌জাহানের এই সাধনা—প্রেম। কবি তাঁহার অনুতাপের উল্লেখ করিলে, এই একনিষ্ঠ সাধনায় বাধা পড়িত।

এ পর্য্যন্ত আমরা শাহ্‌জাহানকে প্রেমময় স্বামী ও পুত্র-বৎসল পিতা রূপে দেখিয়াছি। সম্রাট রূপে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখি যে, শাহ্‌জাহান আর সে শাহ্‌জাহান নাই।

তিনি জরাজীর্ণ; পুত্রগণের আত্ম-কলহে যে পক্ষেরই জয় হউক, কিন্তু শাহ্‌জাহানের আর ভারতের ভাগ্য-চালনার ক্ষমতা অবশিষ্ট নাই। তিনি স্নেহ-দুর্ব্বল; ভাব-প্রবাহ-সংঘাতে স্রোত-কম্পিত বেতসী-লতার ন্যায় এদিকে-ওদিকে হেলিয়া পড়িতেছেন; তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব একেবারে লোপ পাইয়াছে। সিংহাসন-লাভোদ্দেশ্যে তিন পুত্র তিন দিক হইতে সমরানলে তিনদিক ভস্মীভূত করিয়া রাজধানীর দিকে আসিতেছেন; আর তিনি শুধু বলিতেছেন, "আমি তা'দের বুঝিয়ে বল্‌বো, তাদের নির্ব্বিরোধে রাজধানীতে আস্‌তে দাও।" জাহানারা এরূপ দুর্ব্বলতার প্রতিবাদ করিলেন,—শাহ্‌জাহান একটু হেলিয়া পড়িলেন। যেই দারা তাঁহার অহঙ্কার স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তা'রা আসুক, সম্রাট সাজাহান স্নেহশীল, কিন্তু দুর্ব্বল নহেন," অমনি তাঁহার সকল সংকল্প ভাসিয়া গেল; সম্রাট পদের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং দারাকে যুদ্ধের আজ্ঞা দিলেন—"তা'রা জানুক যে সাজাহান শুধু পিতা নয়, সাজাহান সম্রাট" (১ম দৃশ্য ১ম অঙ্ক) নাটকের প্রথম হইতে শেষ অবধি শাহ্‌জাহানের এইরূপ চিত্তের দুর্ব্বলতা, "শরতের মেঘের ন্যায় নিষ্ফল গর্জ্জন" প্রকটিত হইয়াছে। বৃদ্ধজনোচিত ধীর, স্থির ভাবে একটি ধর্ম্মকথাও তাঁহার মুখে আমরা শুনিতে পাই না। এক পা সমাধিগর্ভে রাখিয়াও, তিনি যে "সম্রাট শাহ্‌জাহান"—এ কথা ভুলিতে পারেন নাই। তবে অধিকাংশ স্থলে তাঁহার উন্মত্ততার উপর স্নেহ-প্রেম-প্রীতির ছায়াপাত করা হইয়াছে।

"সাজাহান" প্রেমের বিয়োগান্ত নাটক, কিন্তু কেবল শাহ্‌জাহানের নহে। মোগল-সেনাপতি রাজপুত-বীর যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে গিয়াছেন, সমর-বিজয়ী স্বামী ফিরিয়া আসিবেন—এই গৌরব-কল্পনায় বীরজায়া মহামায়া চারণগণকে লইয়া সমর-সঙ্গীত গাহিতেছেন—

"সেথা গিয়াছেন তিনি, সমরে আনিতে জয়গৌরব জিনি"

এমন সময়ে সংবাদ আসিল, যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হইয়া দুর্গদ্বারে প্রবেশ-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। প্রেমের গৌরবে, বীরত্বের অহঙ্কারে, রাজপুত-শৌর্য্যে, নিদারুণ আঘাত লাগিল; অপমানবিদ্ধা মহামায়া দলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন—'ক্ষত্রবীর যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফেরে না।... যে এসেছে, সে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নয়। সে তাঁর আকারধারী কোন ছদ্মবেশী; তা'কে প্রবেশ কর্ত্তে দিও না। দুর্গদ্বার রুদ্ধ কর'' (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য), প্রেম স্বর্গীয়, মহামায়া প্রেমিকা,—তাই যাহা কিছু নীচ, ঘৃণ্য, তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যশোবন্ত যোদ্ধামাত্র, প্রেমিক নহেন; তাই তিনি অনায়াসে প্রভু মোগলদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন; মহামায়া স্বামীর এই অযোগ্য কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া যশোবন্তের নিকট শুনিলেন, স্ত্রী কেবল ভোগের জন্য, উপদেশ বা পরামর্শের জন্য নহে (৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)। প্রেমের উপর ইহা অপেক্ষা নিদারুণ কষাঘাত আর কি হইতে পারে? মহামায়ার প্রতি নিশ্বাসে জীবন্ত স্বদেশ-প্রেম, ততোধিক তীক্ষ্ণ আত্মসম্মান-জ্ঞানের বাতাস বহিয়া যায়; আর তাঁহারই সম্মুখে তাঁহারই বিশ্বাসঘাতক স্বামী কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া "রাজপুত জাতির" "গৌরবের মহিমা সমারোহ" ধীরে-ধীরে চলিয়া যাইতেছে!

আর বালসূর্য্যের স্নিগ্ধ-রশ্মিরঞ্জিত সদ্য-প্রস্ফুটিত প্রভাত-কমলের ন্যায় একখানি পবিত্র নির্ম্মল চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন কবি আওরঙ্গজেব-পুত্র মহম্মদের। মহম্মদ প্রেমিক, নীরব, নির্ভীক, বীর। তিনি পিতৃ-আজ্ঞা-পালনে হেলায় দিল্লীর সিংহাসন ঠেলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃ-ভক্তি অন্ধ নহে; পিতার দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাঁহার এই গভীর পিতৃভক্তিও টলিল; তিনি সুজার সঙ্গে মিলিত হইলেন; তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবেন, কিন্তু পিতৃচক্রান্তে তাহাও হইল না। মহম্মদেরও প্রেমের সমাধি হইল।

জাহানারার চরিত্র যেমনটি হওয়া উচিত ছিল, তেমনটী হয় নাই। কবি কেবল তাঁহাকে স্নেহ-দুর্ব্বল পিতৃ-হৃদয়কে পুত্রের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেই নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু জাহানারা-চরিত্রের যেটুকু সার, শাহাজাদীর যে অপ্রমেয় পিতৃভক্তি, যে অতুল্য জীবনব্যাপিনী পিতৃসেবা, যে স্বর্গীয় পরার্থে আত্মবলিদান তাঁহাকে জগতের "দ্বিতীয় স্বর্গ" দিল্লী-আগ্রার ঐশ্বর্য্যপুঞ্জকে তুচ্ছ ধূলিমুষ্টির ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া আজীবন কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করতঃ বিলাস-বিভ্রমশূন্য সন্ন্যাসিনীর ন্যায় কারাগারে নিষ্কাম ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, জাহানারা-চরিত্রের সে মহিমময় অংশের প্রতি কবি সুবিচার করেন

নাই। তাঁহার চরিত্রে একটা বিভীষিকার ছায়াপাত হইয়াছে। আওরঙ্গজেবের প্রতি তাঁহার যে ক্ষমাহীন, নিদারুণ ঘৃণা, তাঁহার দৃষ্টি বা নামমাত্র শ্রবণে তীব্র গরল-রাশির স্থায় উদ্গীর্ণ হইয়াছে,—যে নীচতা, হৃদয়হীনতা এবং স্বার্থপরতার আলোকে তিনি জগতকে শাহ্‌জাহানের নিকট চিত্রিত করিয়াছেন,—বন্দী, বৃদ্ধ পিতাকে কোন যুক্তি, বা ধর্ম্মমূলক প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা দানের পরিবর্ত্তে তিনি যেরূপ তাঁহাকে উত্তরোত্তর উত্তেজিত করিয়া তাঁহার মানসিক অশান্তি চতুর্গুণ বর্দ্ধন করতঃ তাঁহার কারাগারকে নরক করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তাঁহার মানব-প্রীতিমূলক সান্ত্বনাময় সেবাব্রতের সামঞ্জস্য ঘটে না। দুঃখ, দৈন্য, দুর্নীতি, পাপ,—এগুলির সঙ্গে সেবকের চিরসংগ্রাম; সেবক তাহাদের কবল হইতে দীন, দুঃখী, পাপীকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন; কারণ তাহাদের অধঃপতনে তাঁহার সহানুভূতি জাগিয়া উঠে, পতিতকে তিনি আপন করিয়া লয়েন। এই সহানুভূতিই মানব-প্রীতিমূলক সেবাব্রতের মূল উৎস। জাহানারাও সেবিকা; কিন্তু তাঁহার ঘৃণা পাপ ছাড়াইয়া পাপীর উপর গিয়া পড়িয়াছে; ঘৃণা তীব্র আক্রোশে পরিণত হইয়াছে; এবং আক্রোশ প্রতিবিধিৎসার্থে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করতঃ আহতা ফণিনীর স্থায় শত্রুর অঙ্গে প্রথম সুযোগেই সমস্ত গরল ঢালিয়া দিতে অধৈর্য্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহা অস্বাভাবিক ও অনৈতিহাসিক। সেবা, জনহিতৈষণা ও ক্ষমা—এই তিনটিই ইতিহাসের জাহানারার চরিত্রের বিশেষত্ব। তাঁহার স্নেহ ও হৃদয়ের কোমলতা পরিজনের মধ্যে একটি স্নিগ্ধ-মধুর ছায়াপাত করিত; তাঁহার দয়ায় অনেক অনাথ ও বিধবার অন্নবস্ত্র-কষ্ট দূর হইত; এবং তিনিই অনুরোধ করিয়া শাহ্‌জাহানের নিকট হইতে আওরঙ্গজেবের জন্য ক্ষমা গ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। নাটকে কিন্তু আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই; সেখানে শাহ্‌জাহানই জাহানারার নিকট হইতে আওরঙ্গজেবের জন্য ক্ষমা গ্রহণ করিতেছেন (৫ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)। শাহ্‌জাহান তাঁহাকে মনে করাইয়া দিতেছেন, "ভাবতে চেষ্টা কর, এ সংসারকে যত খারাপ ভাবিস, তত খারাপ নয়।" কবি আরও এক স্থলে পিতার কাজ পুত্রীতে আরোপ করিয়া পিতার চরিত্র-মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছেন। আওরঙ্গজেবের পিতৃদর্শনে আসিবার কথা জাহানারা পিতাকে বলিতেছেন "আসুক সে একবার এই দুর্গে; আমি কৌশলে তাকে বন্দী কর্ব্ব; ঐ কক্ষে একশত সৈনিক গুপ্তভাবে রেখেছি।" শাহ্‌জাহান উত্তর দিতেছেন, "সে কি জাহানারা? সে আমার পুত্র, তোমার ভাই; না জাহানারা, কাজ নাই।" (১ম অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য।) প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কিন্তু এই:—দারার পরাজয়ের পর আওরঙ্গজেব পিতৃদর্শনাকাঙ্ক্ষা করেন; কিন্তু তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে এই বলিয়া নিষেধ করেন যে, সম্রাট দারাকে অধিক ভালবাসেন এবং সেজন্য তাঁহাকে কৌশলে বন্দী করিতে পারেন; আওরঙ্গজেব পিতৃদর্শন স্থগিত রাখেন (২)। ইহার কিছু দিন পরে আবার তিনি পিতৃদর্শনে গমন করেন, কিন্তু শুনিতে পান যে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার আর যাওয়া হইল না (৩)। তাই আমরা নাটকে আওরঙ্গজেবের পরিবর্ত্তে তৎপুত্র মহম্মদকে শাহ্‌জাহানের বন্দিত্ব-সংবাদ লইয়া উপস্থিত দেখিতে পাই। শাহ্‌জাহান দারার পক্ষ হইয়া তাঁহার জন্য চেষ্টা করিবেন,—এই মর্ম্মে শাহ্‌জাহান লিখিত দারার নামীয় এক পত্রও তাঁহার হস্তগত হয় (৪)।

কিন্তু পিয়ারার প্রতি কবির সমস্ত সহানুভূতি যেন ঢলিয়া পড়িয়াছে। পিয়ারার চরিত্র অপূর্ব্ব, অতুলনীয়। পিয়ারা নিখুঁত প্রেমের নিরেট প্রতিমা। পিয়ারা প্রেমময়ী বেদনাময়ী, কৌতুকময়ী, হাস্যময়ী, সঙ্গীতময়ী। পিয়ারা জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ, কোমল, শুভ্র, পবিত্র; সুজা মধ্যাহ্ন-রবি-রশ্মির স্থায় প্রদীপ্ত, দৃপ্ত, নির্ভীক, বীর। পিয়ারার সৃষ্টি ভালবাসার জন্য, স্নেহের জন্য, সান্ত্বনাদানের জন্য; আর সুজার জন্ম শত্রু-শোণিতে অসিরঞ্জিত করিতে; তৈমুরের বংশধর সুজা, যুদ্ধের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যুদ্ধ করিতে-করিতেই মরিবেন, তবু অন্যের অধীনতা স্বীকার করিবেন না,—সে অন্য ভাইই হউক, আর যেই হউক। বাংলা হইতে আগ্রা অভিমুখে ধাবিত হইবার পর সুজা পুনঃ-পুনঃ পরাজিত হইয়াছেন, কিন্তু পিয়ারার হাসির

(১) আওরঙ্গজেবের ইতিহাস—বাবু যদুনাথ সরকার এম,এ

(২) যদু বাবুর ইতিহাস—২য় খণ্ড ৭৫ পৃ।

(৩) ঐ ঐ ৮৪ পৃ।

(৪) জাফরনামা—৬১ ৬২, মাসুম—৭৯ ৮২ পৃ।

ফোয়ারা, সঙ্গীতের ফোয়ারা শুকায় নাই। যাহাতে পরাজয়-স্মৃতি সুজার মনে দুঃখ না দিতে পারে, এই জন্য পিয়ারা সর্ব্বদা হাসিতেন, গান গাহিতেন। কিন্তু পিয়ারার হৃদয়ে কি স্বামীর পরাজয়-বার্ত্তা শেলবিদ্ধ করিত না? করিত, কিন্তু পিয়ারা কাঁদিতেন না; তিনি যে প্রেমময়ী, তাঁহার অশ্রুদর্শনে সুজার মনে যদি বিন্দুমাত্র দুঃখেরও উদয় হয়! পিয়ারার হাসি অশ্রুময়ী; তিনি হাসিতেন, আর চোখে জল পড়িত; তাঁহার সঙ্গীত বেদনাময়ী "সুখে-দুঃখে গান আপনি আসে"; অতি দুঃখে পিয়ারার সঙ্গীত-প্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত। পিয়ারা প্রেমের রাজ্যে বাস করিতেন, পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য তাঁহার মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তবে যে তিনি সুজাকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করেন নাই, তাহার কারণ এই, তিনি জানিতেন, সুজার ধমনীতে মোগল-রক্ত প্রবাহিত, যুদ্ধের নামে সে রক্ত নাচিয়া উঠে, রোধ করিবার উপায় থাকে না :—"তোমার উদ্ধারের উপায় থাকিলে আমি তোমায় উদ্ধার করিতাম। তাই আমি সে চেষ্টা ত করিনে, আপন মনে গান গাই।" (১য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)। দুইবার মাত্র পিয়ারার প্রচ্ছন্ন প্রেমধারা ভাবপ্রাবল্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে;—একবার যখন সুজা যুদ্ধের পরামর্শ চাহিয়াছেন—"যুদ্ধে কাজ নাই। কি হবে সাম্রাজ্যে, নাথ; আমাদের কিসের অভাব? চেয়ে দেখ, এই শস্যশ্যামা, পুষ্পবিভূষিতা, সহস্র-নির্ঝর-ঝঙ্কৃতা অমরাবতী —এই বঙ্গভূমি। কিসের সাম্রাজ্য! আর আমার এই হৃদয়-সিংহাসনে তোমায় বসিয়ে রেখেছি, তা'র কাছে কিসের সেই ময়ূর-সিংহাসন! যখন আমরা এই প্রাসাদ-শিখরে দাঁড়িয়ে বিহঙ্গমের ঝঙ্কার শুনি, ঐ গঙ্গার দিগন্ত-প্রসারিত ধূসর বক্ষ দেখি, অই অনন্ত-নীল আকাশের উপর দিয়ে আমাদের মিলিত মুগ্ধনেত্রের নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে চ'লে যাই—সেই নীলিমার এক নিভৃত প্রান্তে কল্পনা দিয়ে একটী মোহময় শান্তিময় দ্বীপের সৃষ্টি করি, আর তা'র মধ্যে এক স্বপ্নময় কুঞ্জে ব'সে পরস্পরের প্রাণ পান করি—তখন মনে হয় না-নাথ, কিসের ঐ সাম্রাজ্য? নাথ, এ যুদ্ধে কাজ নাই; হয়ত যা আমাদের নাই, তা পাবো না, যা আছে, তা হারাবো।" (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)। আর একবার যখন দুরন্ত আরাকানরাজ নীচ প্রস্তাব করিয়াছে, "কাল প্রভাতে আমাদের নির্ব্বাসন নয়! কাল যুদ্ধ হবে। এই চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়েই, এই রাজ্য আক্রমণ কর; ক'রে বীরের মত মর। আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মর্ব্ব।" প্রথমবারে পার্থিব রাজ্য তুচ্ছ করিয়া প্রেমের রাজ্য বরণ করিয়া লইয়াছেন; দ্বিতীয়বার যখন প্রেমের রাজ্য আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তখন সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছেন। স্বামীর জন্য "সারাটী সকাল বেলা বসিয়া-বসিয়া সাধের মালাটী" গাঁথা যাঁহার অভ্যাস, আজি সেই কুসুমকোমলা নারী অসি হস্তে দুরন্ত শত্রুর শাস্তি-বিধান করিতে সমুদ্যত। পিয়ারা গাহিয়াছিলেন, "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল," তাহাই ঠিক হইল, তিনি সমরাঙ্গনে ইজ্জতের চরণে আত্মবলিদান করিলেন; একটী মূর্ত্তিমতী স্বর্গীয় সঙ্গীত-ঝঙ্কার আরাকানের পার্ব্বত্য-বিহঙ্গ-কাকলীর সঙ্গে মিশিয়া গেল।

আওরঙ্গজেবের চরিত্র মনোজ্ঞ হয় নাই। সাধারণ ইতিহাসে তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক নহে। কবি এই ইতিহাসই অনুসরণ করিয়াছেন। কবির চিত্রে আওরঙ্গজেব বীর, ধীর, নির্ভীক, কিন্তু শাঠ্য-কপটতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। তিনি অদম্য রাজ্যলিপ্সাকে ধর্ম্মের আবরণে ঢাকা দিতে নিষ্ফল প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্প অবিচলিত। সে সংকল্প-সাধনে, প্রয়োজন হইলে পিতাকে বন্দী করিতে, ভ্রাতৃহত্যা করিতে বা যুদ্ধে শাঠ্য-কপটতা-বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। রাজপুত-সেনাপতি-দ্বয়ের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি অনুদার, হিন্দুদ্বেষী। কিন্তু তিনি পাষাণ নহেন; তাঁহার মধ্যেও একটী বিবেক আছে। দারার মৃত্যু-দণ্ডাদেশ-কালে এই বিবেক মাথা তুলিয়াছে; আওরঙ্গজেব ধর্ম্মের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়া বিবেককে নীরব করিয়া দিয়াছেন। বিবেক কিন্তু চিরতরে নীরব হইবার পাত্র নহে; শেষ দিকে আবার সে মাথা জাগাইয়া আওরঙ্গজেবের হৃদয়ে অনুতাপের সঞ্চার করিয়াছে।

আমাদের মনে হয়, আওরঙ্গজেবের চিত্র ঠিক হয় নাই। বীরত্ব ও শাঠ্য এক ঘরে বাস করে না। ইতিহাসের দিক হইতে, এবং কবির নিজ চিত্রে, আওরঙ্গজেবের উপর সুবিচার হয় নাই। আওরঙ্গজেবের চরিত্র যে সম্পূর্ণ অনিন্দনীয় নহে, ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিস্তর

বেয়ান ঠাকরুণ

শিল্পী—শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম-বি

The Emerald Printing Works
CALCUTTA.

মতভেদই তাহার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ; তবে কবির চিত্র কতদূর ইতিহাসসঙ্গত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে বিচার্য্য।

কৈশোরেই আওরঙ্গজেবের তীক্ষ্ণ মেধা, দৃঢ় সংকল্প এবং নির্ভীকতা শাহজাহান ও দরবারের আমীর ওমরাহ-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যৌবনোদ্গমের সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি ভ্রাতৃগণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী হইয়া উঠেন। যৌবন কল্পনার লীলাভূমি। বাদশাজাদার আশা মায়াবিনী। যৌবনে সে আশা কল্পনার রঙ্গীন পক্ষপুটে ভর করিয়া অনন্ত অন্তরীক্ষে বিহার করে; কত কুহকজালের, কত স্বপ্নের সৃষ্টি করে; আওরঙ্গজেবেরও করিয়াছিল। এই কল্পনাময়, আশাময় প্রথম যৌবনে আওরঙ্গজেব অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হন। ময়ূর-সিংহাসনের স্বপ্ন, আশার কুহক, সুবাদারীর ক্ষমতা-লালসা তাঁহাকে তৃপ্তিদান করিল না; তিনি ফকিরবেশ হইয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ধর্ম্মালোচনায় রাজকার্য্যের ক্ষতি হইতে লাগিল। পুত্র যৌবনে যোগী সাজিয়াছেন, এ সংবাদে শাহজাহান মর্ম্মাহত হইলেন; এমন কি, রাগ করিয়া ফেলিলেন; এবং তাঁহাকে সুবেদারী হইতে পদচ্যুত করিলেন (১)। পুত্রকে এইরূপ ভয়, ভর্ৎসনা এবং স্নেহের আহ্বানে আবার সংসারে টানিয়া আনিলেন। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি এক মত্ত হস্তীর সঙ্গে অসমসাহসে যুদ্ধ করিয়া পিতার নিকট হইতে নানা উপহার পান (২)। ১৫ বৎসর বয়সে দশ-হাজারী পদ প্রাপ্ত হন এবং ১৬ বৎসর বয়সে বুন্দেলা অভিযানে গমন করেন। এদিকে অল্প বয়সেই তিনি নানা সাহিত্যে ও শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। সাদী ও হাফেজের গ্রন্থাবলী, কোরাণ, হাদিস ও তাহাদের-ভাষ্য অধ্যয়ন করিতে তিনি ভাল বাসিতেন (৩)। অপরাহ্নে অবসরকাল তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা, দর্শনের গবেষণা এবং জ্ঞানী ও দরবেশগণের লিখিত গ্রন্থ অধ্যয়নে যাপন করিতেন। তিনি কোরাণে হাফেজ ছিলেন, দরবেশদের সঙ্গ অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে তত্রত্য সমস্ত ধার্ম্মিক ও দরবেশগণের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদের পদতলে উপবেশন করতঃ ভক্তির সহিত জ্ঞান লাভ করেন (১)।

সংসারে ফিরিয়া আওরঙ্গজেব ভাবিলেন, যদি সংসারই করিতে হয়, তবে তাহা ভালরূপেই করিতে হইবে। অক্লান্ত-কর্ম্মী, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন আওরঙ্গজেবের কোন কাজ অর্দ্ধাংশ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত থাকার অভ্যাস ছিল না। জীবনের কর্ত্তব্য স্থির করিতে যাইয়া দেখিলেন, পিতৃ-অভাবে ভারতের সিংহাসন তাঁহাকে লইতে হইবে। আওরঙ্গজেব আগে মুসলমান, পরে শাহজাদা। দারা সিয়া ও হিন্দুধর্ম্মানুরাগী—"আমি এ সাম্রাজ্য চাই না; আমি দর্শনে, উপনিষদে এর চেয়ে বড় সাম্রাজ্য পেয়েছি" (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)। ইতিহাসেও দেখা যায়, দারা হিন্দুধর্ম্মানুরাগী; তিনি উপনিষদ ও বেদান্ত আগ্রহ ও ভক্তির সঙ্গে পাঠ করিতেন, বেদ-বাণীকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; এবং আকবর যেমন "দিনে এলাহী" নামক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তিনিও সেই সেইরূপ ইসলাম ও হিন্দুধর্ম্ম মিলাইয়া একটা নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন (২)। আরও শোনা যায়, তিনি অনেক সময় ব্রাহ্মণ, যোগী ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কাটাইতেন; তাঁহাদিগকে পূর্ণজ্ঞান ধর্ম্মগুরু বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; নামাজ পড়িতেন না, এবং রমজানের মাসে উপবাসও করিতেন না (৩)। তিনি কেবল দরবারে থাকিতেন; যুদ্ধ, লোক-চরিত্র-বিচার এবং শাসনকার্য্যে তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন; এদিকে দুর্ব্বলচিত্ত, অদূর-দর্শী, উচ্ছৃঙ্খল, অহঙ্কারী, একগুঁয়ে এবং দাম্ভিক হইয়া উঠেন। দেশের এমন অশান্তির সময় তাঁহার শাসন-কৃত-কার্য্যতার কোনই সম্ভাবনা ছিল না (৪)।

মুরাদ "সম্ভোগে নিমজ্জিত। মনোরাজ্য ওর কাছে একটা অনাবিষ্কৃত দেশ" (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)। নির্ব্বোধ, বিলাসী, উগ্র-প্রকৃতি, সুরাসক্ত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তোষামোদ-প্রিয়, বদান্য ও অসমসাহসিক,—সৈন্য-চালনা বা উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত লোক নিয়োগের ক্ষমতা তাঁহার একবারেই ছিল না। বল্‌খ, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট প্রভৃতি যে-যে স্থানে

(১) আবদুল হামিদ—২য় খণ্ড ৩৭৩-৩৭৬ পৃ।
(২) যদু বাবুর ইতিহাস—১ম খণ্ড ১১ পৃ।
(৩) মাছির-ই-আলমগিরী—৫৩১ পৃ।

(১) আলমগীরনামা—১১০৩ পৃ।
(২) যদু বাবুর ইতিহাস—১ম খণ্ড ২৯৭০পৃ।
(৩) আলমগীরনামা ৩৪-৩৫ পৃ।
(৪) যদু বাবুর ইতিহাস ১ম খণ্ড ২৯৯ ৩০১ পৃ।

তিনি মোগল-বাহিনী পরিচালন করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক স্থলেই তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়াছেন (১)। আওরঙ্গজেব এবং মুরাদের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহার এই সর্ত্ত ছিল যে, তাঁহারা উভয়ে ভারত-সাম্রাজ্য সমান ভাগ করিয়া ভোগ করিবেন (২); মুরাদকে সমগ্র সাম্রাজ্যের সিংহাসন দিয়া আওরঙ্গজেব মক্কায় চলিয়া যাইবেন (২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য) এরূপ কোন কথাই ছিল না। মুরাদ কিন্তু চাটুকারদের প্ররোচনায় বুঝিলেন, যুদ্ধজয় কেবল তাঁহার বাহুবলেই হইতেছে; সুতরাং সমগ্র সাম্রাজ্যের সিংহাসন একমাত্র তাঁহাকে দিতে হইবে,—পরে এই দাবী করিয়া বসিলেন (৩)। মুরাদ যুদ্ধে আহত হইয়া আওরঙ্গজেবকে হিংসা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে প্রতিযোগতা মানসে সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন (৪)।

সুজা অকর্ম্মণ্য। তিনি একদিকে বুদ্ধিমান, মার্জ্জিত-রুচি ও অমায়িক-প্রকৃতি,—অন্যদিকে দুর্ব্বল-হৃদয়, অলস-প্রকৃতি, অসাবধান এবং কঠোর পরিশ্রমের অযোগ্য ছিলেন। তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য ও অকালবৃদ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহার প্রতিভা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ক্ষণিক জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া যাইত (৫)। সুতরাং আওরঙ্গজেব দেখিলেন, যদি আগরার সিংহাসন মুসলমানের সিংহাসন হয়, এবং সে সিংহাসনে যদি কোন স্বধর্ম্মানুরাগী, কর্ম্মদক্ষ শাহজাদার বসিয়া ভার তর অগণিত প্রজাপুঞ্জের সুশাসন করার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে সে সিংহাসন আওরঙ্গজেবেরই প্রাপ্য। পিতার মৃত্যু-সংবাদে রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইবার পর যখন শুনিলেন, পিতা জীবিত,—তখন আর ফিরিবার উপায় নাই; রক্তপাত আগেই হইয়া গিয়াছে; এখন ফিরিয়া গেলে ভবিষ্যতে আবার এই রক্ত-গঙ্গা বহিবে; হয় ত ইতিমধ্যে অবস্থার স্রোতে তিনি কোথায় ভাসিয়া যাইবেন; তখন অযোগ্য হস্তে শাসনদণ্ড পড়িবে; সুতরাং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, ধর্ম্মের মর্য্যাদার জন্য যদি সিংহাসন লইতে হয়, তবে এই তাহার সময়; রাজ-কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি তাহা করিয়াছিলেন। আর শাহ্‌জাহান যে [illegible] সময় রাজকা পরিচালনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা আমরা উপ দেখিয়াছি। রাজ্যের শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য পিতাকে রা কার্য্য হইতে দূরে নজরবন্দী করিয়া রাখিতে হইত,—ইহার নাম পিতৃ-বন্দী। আর এক কাঠা জমি লইয়া ঝগড় করিয়া দুইটি ভাইকে হত্যা করার অপরাধের গুরুত্ব অপেক্ষা একটি বিপুল সাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলসাধনোদ্দেশ্যে কৃত তদ্রূপ হত্যাপরাধের গুরুত্ব অনেক লঘু হইবে সন্দেহ নাই। আওরঙ্গজেব সম্রাট, রাজনীতিজ্ঞ;—সেইভাবে তাঁহাকে বিচার করাই উচিত। তাঁহার পারিবারিক জীবন শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক। তিনি খাঁটি মুসলমান; বিলাস-ঐশ্বর্য্য পরিবৃত থাকিয়াও জীবনে মদ্য স্পর্শ করেন নাই; ভারতেশ্বর হইয়াও স্বহস্ত-নির্ম্মিত টুপির বিক্রয়লব্ধ সামান্য অর্থ-সাহায্যে ক্ষুন্নিবারণ করিতেন; এদিকে কঠোর পরিশ্রমে নিজ হস্তে সমস্ত রাজকার্য্য সমাধা করিতেন; বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে কত অনিদ্র রজনী পোহাইয়াছেন। এই জ্ঞানগরীয়ান, অধ্যয়ন-শীল, ধর্ম্মানুরক্ত, শ্রদ্ধাবান, চিরসন্ন্যাসী, বীর, ধীর, নির্ভীক আওরঙ্গজেব যে শুধু নীচ রাজ্যলিপ্সা চরিতার্থ করিতে নিঃসঙ্কোচে শাঠ্য কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ পিতাকে বন্দী করিয়া ভ্রাতৃহনন করিয়াছিলেন, ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়।

আওরঙ্গজেবের আর এক কলঙ্ক—তাঁহার হিন্দু-বিদ্বেষ। সত্যই তিনি কোন-কোন হিন্দুকে, বিদ্বেষের চোখে না হউক, বিষের চোখে দেখিতেন, এরূপ অনুমিত হয়। তিনি গোঁড়া মুসলমান, সুতরাং তিনি প্রতিমা-পূজক হিন্দুকে বোধ হয় অন্তরের সঙ্গে ভক্তি করিতে পারিতেন না। কিন্তু আওরঙ্গজেব সম্রাট,—সম্রাটরূপে তিনি কোন-কোন হিন্দুকেও বিষের চোখে দেখিতে পারিতেন কি না তাহাই বিচার্য্য। ইহা স্বীকার্য্য যে, সম্রাটরূপে তিনি তাহা করিতে পারিতেন,—যেমন তিনি কোন-কোন মুসলমানকেও বিষের চোখে দেখিতে পারিতেন এবং প্রকৃতপক্ষে যেমন তিনি সিয়া সম্প্রদায়কে ও কোন-কোন মুসলমান আমির-ওমরাহকে দেখিতেন। আওরঙ্গজেব যে সিংহাসনে বসিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিতে তিনি দায়ী। তিনি সিংহাসনে বসিয়া দেখিলেন, তাহা টলমলায়মান। রাজ্যের বড়-বড় কর্ম্মচারীর অধিকাংশই হিন্দু, অথচ তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য-অবহেলার জন্য কথাটী

(১) যদু বাবুর ইতিহাস—১ম খণ্ড ৩১৮-৩২০ পৃ।
(২) আদব-আলমগিরী—৭৮-৯৯ পৃ।
(৩) যদু বাবুর ইতিহাস—২য় খণ্ড ৮৯ পৃ।
(৪) ঐ ঐ ৮৭-৮৯ পৃ।
(৫) ঐ ঐ ১২৯ ১৬৯ পৃ।

লবার যো নাই; বলিলেই অসন্তোষ, বিদ্রোহ। দ্বিজেন্দ্র-
লদেখাইয়াছেন, আওরঙ্গজেবের দুইজন প্রধান সেনাপতির
ধ্য, জয়সিংহ স্বার্থপর, যশোবন্তসিংহ উদ্ধত, এবং উভয়েই
বাসঘাতক। আকবর যখন বড়-বড় রাজপদে হিন্দু নিযুক্ত
রন, তখন তাঁহারা সে নিয়োগকে অনুগ্রহ জ্ঞান করতঃ
কে ধারণ করিয়া আজীবন অবিচলিত প্রভুভক্তির
তে কর্ত্তব্য-পালন করিতেন। কিন্তু এই হিন্দু কর্ম্মচারী-
ার পরবর্ত্তী পুরুষেরা এই উচ্চপদগুলিকে বংশাবলীক্রমে
স্বত্ব মনে করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্যে প্রত্যেক
যুক্ত প্রজারই ন্যায়তঃ দাবী আছে এবং থাকা উচিত;
ন্তু সে দাবীরও সীমা আছে। আওরঙ্গজেবের সময়
র পরিণতি ঘটে; কোন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে কিছু
লেই অমনি চোখরাঙানি, অসন্তোষ, হয় ত বা বিদ্রোহ।
সিংহ আকবরের দিকে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে দ্বিধা
তেন, আর তাঁহার চেয়ে ক্ষুদ্রতর যশোবিন্তসিংহ আকবর
াক্ষা প্রতাপান্বিত আওরঙ্গজেবের সম্মুখে প্রকাশ্য
ারে অসি ঘূর্ণন করিয়া শাসন করিতে চাহেন;
তেই রাজপুত অহঙ্কার-গরিমা কিরূপ ধৃষ্টতায় পরিণত
ছিল, এবং রাজপুত-শৌর্য্যের শুভ্র যশোমহিমা কিরূপ
সঘাতকায় কলঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার আভাস পাওয়া
। আওরঙ্গজেব আকবরের রাজ্যশাসন-নীতি সম্পূর্ণ
রণ না করায় এ অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।
পুত সৈন্যেরাও উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা
দের মৎলব মত নিজেদের কায়দাকানুন অনুযায়ী যুদ্ধ
ত এবং নিজেদের রাজপুত সেনাপতি ভিন্ন মুসলমান
পতি বা বিদেশীয় সেনাপতির অধীনে লড়াই করিতে
কার করিত (১)।

সুতরাং রাজ্যের মঙ্গলার্থে কোন কোন হিন্দুর এ ঔদ্ধত্য
নের প্রয়োজন হইয়াছিল। আকবরের মত তিনি
াজগণের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে সখ্যতাপাশ দৃঢ় করিবার
পছন্দ করিতেন না। তিনি অনেক হিন্দু কর্ম্মচারীকে
ইতে অব্যাহতি দিয়া ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহাদের উপর
া বসাইয়াছিলেন। এদিকে মারহাট্টাপতি শিবাজী
াত্যে এক নূতন অশান্তি-বহ্নি প্রজ্জালিত করেন,

তাহা দমন করার প্রয়োজন হয়। এইরূপ নানা রাজ-
নৈতিক কারণে তাঁহাকে কোন কোন হিন্দুর সখ্যতা-পাশ
ছিন্ন করিতে হয়; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার চরিত্রে
সার্ব্বজনীন হিন্দু-দ্বেষ আরোপ করিতে পারি না। আর
আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে আরও ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধারের বাকী
আছে। আওরঙ্গজেবের চরিত্রের কলঙ্কভিত্তি অনেকাংশে
খাফি খাঁর (১) ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; কারণ, খাফি
খাঁ আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক বলিয়া দাবী করতঃ দেখিয়া-
শুনিয়া নিজের অভিজ্ঞতা হইতে ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া-
ছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এখন প্রমাণিত
হইতে চলিয়াছে যে, খাফি খাঁ আওরঙ্গজেবের পরবর্ত্তী যুগের
লোক; সুতরাং তাঁহার ইতিহাসের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে গভীর
সন্দেহ (২)। আর আওরঙ্গজেবের সময় হিন্দুগণের যে সব
অধিকার ছিল (৩) আজ বিংশ শতাব্দীর উন্নততর সভ্যতা-
সঙ্গত শাসনকালের অধিকারের সঙ্গে তুলনা করিলে হিন্দু-
গণের আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও তজ্জাত বিদ্বেষ-
ভাব অনেকাংশে বিদূরীত হইবে।

আমরা উপরে দেখিলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার
"সাজাহানে" শাহ্‌জাহান, আওরঙ্গজেব, জাহানারা, দারা,
মুরাদ ও সুজার চরিত্র-চিত্রণে সকল স্থলে ইতিহাসের
অনুসরণ করেন নাই, অনেক যোগ-বিয়োগ করিয়াছেন।
জাহানারা-চরিত্রে সুকুমার-বৃত্তি বিকাশের সুযোগ পায় নাই;
আওরঙ্গজেব ভিন্ন আর সকল চরিত্রই উন্নত হইয়াছে,
এবং সেই অনুপাতে আওরঙ্গজেবের চরিত্র নিতান্ত জঘন্য
হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার উপর ঐতিহাসিক সুবিচার
হয় নাই; তাঁহার আত্ম-সমর্থনযোগ্য সমস্ত বিষয়ই ঢাকা
পড়িয়াছে। পিয়ারা অনৈতিহাসিক; নাদিরা, সুলেমান,

(১) আওরঙ্গজেবের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ৪৩ পৃঃ।

(১) এই গ্রন্থকার বলেন, আওরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বের ইতি-
হাস লিখিতে দিতেন না; সুতরাং তিনি গোপনে তাঁহার ইতিহাস
লেখেন, এই জন্য তাঁহার নাম খাফি (লুক্কায়িত) হইয়াছে।

(২) ১৯১৫ সালের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ
সরকার এম-এ, মহাশয় এ বিষয়ে নূতন আবিষ্কৃত পার্শী পাণ্ডুলিপির
সাহায্যে প্রামাণিক আলোচনা করিয়াছেন।

(৩) ১৩২৩ সালের "আল- এসলাম" পত্রের কয়েক সংখ্যায়
মৌলানা ইসলামাবাদী সাহেব "মুসলমান আমলের হিন্দুর অধিকার"
শীর্ষক প্রবন্ধে আওরঙ্গজেবের সময়ে শাসন-কার্য্যের নানা বিভাগের
হিন্দুগণের বিবিধ উচ্চ অধিকার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

মহম্মদ ও সিপার সুন্দর হইয়াছে। শাহ্‌নেওয়াজের চরিত্র ঐতিহাসিক ও মনোজ্ঞ। মুসলমান সেনাপতিদ্বয় ভীরু ও তোষামোদকারী।

ইতিহাসের এরূপ যোগ-বিয়োগ কি দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গত হইয়াছে? "পলাসীর যুদ্ধে" সিরাজদ্দৌলার চরিত্র এরূপ অনৈতিহাসিক ও জঘন্যরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন, "পলাসীর যুদ্ধ কাব্য, ইতিহাস নহে।" আমরাও জানি, 'সাজাহান' নাটক, ইতিহাস নহে। কিন্তু আমরা ইহাও বিশ্বাস করি, কল্পনার বিহার-ভূমি নীতি, সত্য এবং সদুদ্দেশ্য দ্বারা সীমাবদ্ধ; তাই আমরা এই সুযোগে এ প্রশ্নটীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে চাই; ইহাতে আমাদিগকে বক্ষ্যমান আলোচ্য বিষয়ের একটু বাহিরে যাইতে হইবে।

সাহিত্যে যেমন জাতীয় চিন্তা-ধারা প্রকটিত হয়, তেমনি আবার সাহিত্য জাতীয় চিন্তা ধারার গতিও নির্ণয় করে। কোন জাতীয় যুগবিশেষের সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আমরা যে জাতীয় চিন্তা-ধারার রেখা আবিষ্কার করি, তাহা অধিকাংশ স্থলে আমাদের প্রত্নতত্ত্ব-চিকীর্ষার চরিতার্থতা সাধন করে মাত্র। কিন্তু সাহিত্য কিরূপে আমাদের জাতীয় চিন্তাধারা গঠন করিয়া কোন্ দিকে তাহা প্রবাহিত করিয়াছে, তাহার খোঁজ রাখা আমাদের জাতীয় জীবনের মঙ্গলের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। জাতীয় চিন্তার বাহ্যবিকাশ জাতীয় চরিত্র। সুতরাং সাহিত্যের এই জাতীয় চরিত্র-গঠন-শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া সত্য ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে কি-না, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক স্বদেশ-হিতৈষীর একান্ত কর্ত্তব্য। সাহিত্যের প্রত্যক্ষ ফল আনন্দ-দান; সত্য এবং সুন্দরের জ্ঞানসম্ভূত নির্ম্মল পবিত্র আনন্দ দান; সাহিত্যের পরোক্ষ কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য এই সত্য এবং সুন্দরের জ্ঞানের মধ্য দিয়া জাতীয় চিন্তাধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রবাহিত করা। কল্পনা বিশ্ব খুঁজিয়া এই সত্য এবং সুন্দরের রাজ্যের নব-নব জ্ঞান, নব-নব আনন্দ দান করিবে, দিন-দিন আমাদের ব্যক্তিগত, জাতীয় ও বিশ্বমানব-চরিত্রকে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে লইয়া যাইবে; বীভৎস আনন্দের পঙ্কিল প্রবাহে জাতীয় চরিত্র-মহিমা পরিম্লান করিয়া দেওয়া কল্পনার কার্য্য নহে।

ভারতের জাতীয় জীবন প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান লইয়া গঠিত হইবে। সুতরাং ভারতের যে সাহিত্যিক ভারতেতিহাসের কোন অধ্যায় লইয়া বা ইতিহাস-সম্পর্ক-শূন্য হইয়াও এমন সাহিত্য রচনা করিবেন, যাহাতে এই ভারতের এই হিন্দু-মুসলমানের পথে "অচলায়তন" জাগিয়া উঠিয়া ভারতের জাতীয় জীবন-সংগঠনের প্রতিকূলতা করিবে, তিনি নিজহস্তে তাঁহার সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিবেন। এই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহানে"র প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। সিপার, সোলেমান, মহম্মদ, নাজিরা, পিয়ারা, ইহাঁদের কাহার-কাহারও নাম ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে মাত্র; তাঁহাদের চরিত্র উন্নত করায় বিশেষ লাভ হয় নাই; দারা, সুজা, মুরাদ, ইহাঁরা সিংহাসনের অযোগ্য ছিলেন; তাঁহাদিগকে যোগ্য সাজাইয়া ভারতেতিহাসের একটী প্রধান চরিত্র আওরঙ্গ-জেবকে হীন বর্ণে অঙ্কিত করা ঠিক হয় নাই। কারণ, মুসলমানগণ ভারতীয় মুসলমান সম্রাটগণের মধ্যে আওরঙ্গ-জেবকে তাঁহার জ্ঞান, বিদ্যা, ধর্ম্মপ্রাণতা ও ধর্ম্মগ্রন্থের বিবিধ টীকাভাষ্য প্রণয়নের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করেন। তদ্ভিন্ন, তাঁহাকে যেরূপ হিন্দু-বিদ্বেষীরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুগণের আওরঙ্গজেবের উপর ব্যক্তিগত ঘৃণা সঞ্চার ভিন্ন মুসলমানের উপর সাধারণ ভাবেও একটা জাতক্রোধের ভাব জাগাইয়া তুলিবে। "সাজাহানে" কল্পনার বিলাসিতা আছে, শাহ্‌জাহানের উন্মত্ত প্রলাপ ও নিষ্ফল আস্ফালন, দারা ও সুজার শোচনীয় পরিণাম, পিয়ারার হাস্য-সঙ্গীত, রসিকতা ও প্রণয়, যশোবন্ত সিংহের পরিণাম-চিন্তা-শূন্য অসমসাহস এবং দিলদারের জ্ঞান-গর্ভ মন্তব্য, দর্শককে ক্ষণিক আনন্দ দান করিবে; কিন্তু "সাজাহান" হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয়-জীবনের উদ্বোধনের অনুকূল হইবে না। আমাদের আলোচ্য মাপকাঠির হিসাবে একমাত্র মহামায়ার চরিত্র সম্পূর্ণ মনোজ্ঞ ও সার্থক হইয়াছে। তাঁহার পবিত্র স্বদেশ-প্রীতি, প্রেমের অত্যুন্নত ধারণা, ততোধিক তাঁহার তীক্ষ্ণ-আত্ম-সম্মান অনুভূতির সম্মুখে আমাদের হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মস্তক ভক্তিতে অবনত হইয়া পড়ে।

ভারতে হিন্দু-মুসলমানে অনেক রক্তারক্তি হইয়াছে; সে রক্তে, উভয়ের পূর্ব্বপুরুষের গৌরব-কাহিনী লিপিবদ্ধ

াছে, অনেক স্থলে তাঁহাদের শুভ্র যশোমহিমাও কলঙ্কিত ইয়াছে। হিন্দু হিন্দুর বা মুসলমান মুসলমানের কলঙ্ক-াহিনী অতীত হইতে টানিয়া আনিয়া বর্ত্তমানে উপস্থিত রায় কোন লাভ নাই, বরং যথেষ্ট লোকসান আছে। ম্প্রদায়িক অহঙ্কার চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যদি সলমান হিন্দুর, কিম্বা হিন্দু মুসলমানের কলঙ্ক-াহিনী বাছিয়া-বাছিয়া লিপিবদ্ধ করেন, তবে তাহা নসাধারণের হৃদয়ে বিজাতীয় ক্রোধের সঞ্চার করিয়া াতীয় জীবন সংগঠনের অধিকতর ক্ষতি করে; কিন্তু তিহাসের ব্যভিচার করিয়া যদি এক সম্প্রদায় অন্য প্রদায়ের অতীতের কল্পিত কলঙ্ক-কাহিনী প্রচার করেন, বে তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে যোক্ত রূপে হিন্দু দ্বারা মুসলমানের কল্পিত কলঙ্ক-কাহিনী পিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের লনের পক্ষে বহু অন্তরায়ও ঘটিয়াছে। 'রাজসিংহে' শনারা ও জেবন্নিসার "পুষ্পে-পুষ্পে বিহারিণী স্বাধীনা রীর ন্যায়" অবাধ ব্যভিচার, 'দুর্গাদাসে' আলমগীর-গমের উদ্দাম লালসাবৃত্তি, 'রিজিয়া'য় রিজিয়ার পৈশাচিক ায়পিপাসা (১) সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক, কলঙ্কপূর্ণ ও নীতি-ি-ন্যায়ের বিরুদ্ধ। এরূপ লেখা আরও অনেক আছে। ঙ্কমচন্দ্র যে যুগের লেখক, তখন ভারতের হিন্দু-মুসলমানের লিত জাতীয় জীবনের স্বপ্ন আরম্ভ হয় নাই; সুতরাং নি মনস্বী ও স্বদেশপ্রেমিক হইলেও তাঁহার লেখায় মরা তত আশ্চর্য্য ও মর্ম্মাহত হই না, যত হই আমরা লিত জাতীয়-জীবনের সাধনা-কালের স্বদেশী আন্দোলনের জন প্রধান নায়ক, আধুনিক লেখক, মনস্বী ও স্বদেশ-মিক দ্বিজেন্দ্রলালের এইরূপ নাটক দেখিয়া। ততোধিক শ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমানেও এরূপ ধরণের ক লিখিত হইতেছে, চলিতেছে, অধিকাংশস্থলে আমাদের ক্ষিত, উন্নত, মার্জ্জিতরুচি, জাতীয়তার সাধক হিন্দু-ুগণ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইতেছে, অবশিষ্ট স্থলেও বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ হইতেছে না। কোন-কোন "স্বদেশী" সভায় দেখা গিয়াছে, হিন্দু-মুসলমান যে এক মায়ের পেটের দুই ভাই, তাহাদের মিলন যে স্বাভাবিক ও একান্ত বাঞ্ছনীয়—উন্নত হিন্দু-ভ্রাতৃগণ এরূপ বক্তৃতা করিয়া অনুন্নত মুসলমানদিগকে আহ্বান করিতেন; আর এ দিকে স্বদেশ-ভক্তিমূলক জাতীয় সঙ্গীত গীত হইত – "বিশ কোটি ভারত সন্তান!!" আমরা এ বিষয়ে এত কথা বলিতাম না, যদি না দেখিতাম যে, এই শ্রেণীর সাহিত্য-প্রচারের কু-ফল ইতি-মধ্যেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সোনাভান, সূর্য্য-উজাল, বিধবাগঞ্জনা, হিন্দুধর্ম্মরহস্য, কাফের-ধ্বংস, অগ্নি-কুক্কুট, রায়-নন্দিনী ও ঈশা খাঁ প্রভৃতি এরূপ লেখার প্রতিধ্বনি। অবশ্য এ বইগুলির বিস্তৃত প্রচার না হওয়ায় তেমন ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু এগুলি যে হিন্দু-ভ্রাতা পড়িয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, যদি দ্বিজেন্দ্রলাল বা বঙ্কিমের মত কোন প্রতিভাবান ভবিষ্যৎ মুসলমান-লেখক এরূপ লেখায় হস্তক্ষেপ করেন, তবে তাহাতে কত ক্ষতি হইবে! আমরা সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ লেখার পক্ষপাতী নহি,—সে লেখা হিন্দু গ্রন্থকারেরই হউক, আর মুসলমান গ্রন্থকারেরই হউক। আমরা জানি, অনেক হিন্দু এরূপ লেখা অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন; কিন্তু কেবল তাহাই যথেষ্ট নহে। এরূপ লেখার বিরুদ্ধে লোকমত গঠন করিবার প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং সে দায়িত্ব ভারতের মঙ্গলকামী প্রত্যেক দূরদর্শী সমালোচক ও সম্পাদকের গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা আরও জানি, মুসলমানের গ্লানিপূর্ণ এরূপ জাতীয়তা-বিরোধী লেখার প্রতিবাদ পত্র সাহিত্য-পরিষদ সভায় পঠিত হইবার আদেশ পায় নাই, মাসিকপত্রেও সাধারণতঃ ছাপা হয় না। ইহা উদার ও সুবিচার-সঙ্গত নহে। এরূপ প্রতিবাদের সুযোগ দিয়া দরকার হইলে তাহার সমালোচনা করা উচিত। এরূপ প্রতিবাদকে অতীতের প্রতি ব্যর্থ আক্রোশ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না; কারণ ইহার সঙ্গে ভবিষ্যতের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান। ইহাতে ভবিষ্যতের লেখকগণের লেখার গতি সুনিয়ন্ত্রিত হইবে; মিলনের পথ প্রশস্ত হইবে। আর এরূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধ-সৃষ্টিকারী লেখার প্রতিবাদ হিন্দুগণ করিলে যেরূপ সুফলের সম্ভাবনা, মুসলমানগণ লিখিলে তেমন সুফলের সম্ভাবনা নাই। হিন্দুগণ সর্ব্ব-বিষয়েই উন্নতির অগ্রদূত। আশা করি, এ বিষয়টী তাঁহারা ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। *

(১) রিজিয়া এক নীচ কুলোদ্ভব "ওমরাহকে" ভাল বাসিয়া-ন—ইতিহাসে এরূপ পাওয়া যায়। ছোটকে হঠাৎ বড় হইতে লে যে অ-কারণ হিংসার উদয় হয়, সেই হিংসার আগুনে জ্বলিয়া র-ওমরাহগণ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। ছোটর সঙ্গেও পবিত্রতম বাসা হইতে পারে; রিজিয়ার ভালবাসা যে পবিত্রতম ছিল না, ন কোন প্রমাণ নাই।

* এ প্রবন্ধের ঐতিহাসিক অংশ প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের "আওরঙ্গজেবের ইতিহাস" (History of Aurangzib) অবলম্বনে লেখা হইয়াছে। প্রবন্ধে উল্লিখিত ফারসী গ্রন্থগুলি তাঁহার ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে।

দত্তা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেকালে হুগলি ব্রাহ্ম স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু বিদ্যালয়ের রত্ন বলিয়া যে তিনটি ছেলেকে নির্দ্দেশ করিতেন, তাহারা তিনখানি বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রত্যহ এক ক্রোশ, দেড় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পড়িতে আসিত। তিন জনের কি ভালবাসাই ছিল! এমন দিন ছিল না, যে দিন এই তিনটি বন্ধুতে স্কুলের পথে নদডাঙার ন্যাড়া বটতলায় একত্র না হইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিত। তিন জনেরই বাড়ী হুগলির পশ্চিমে। জগদীশ আসিত সরস্বতীর পুল পার হইয়া দিঘড়া গ্রাম হইতে, এবং বনমালী ও রাসবিহারী আসিত দুইখানি পাশা-পাশি গ্রাম কৃষ্ণপুর ও রাধাপুর হইতে। জগদীশ যেমন ছিল সব-চেয়ে মেধাবী, তাহার অবস্থাও ছিল সব-চেয়ে মন্দ। পিতা একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। যজমানী করিয়া, বিয়া-পৈতা দিয়াই সংসার চালাইতেন। বনমালীরা সঙ্গতিপন্ন। তাহার পিতাকে লোকে কৃষ্ণপুরের জমিদার বলিত। রাসবিহারীদের অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল। জমি-জমা, চাষ-বাস, পুকুর-বাগান; পাড়াগ্রামে যাহা থাকিলে সংসার দিব্য চলিয়া যায়—সবই ছিল। এ সকল থাকা সত্ত্বেও যে ছেলেরা কোন সহরে বাসা-ভাড়া না করিয়া, —ঝড় নাই, জল নাই, শীত-গ্রীষ্ম মাথায় পাতিয়া এতটা পথ হাঁটিয়া প্রত্যহ বাটী হইতে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিত, তাহার কারণ, তখনকার দিনে কোন পিতামাতাই ছেলেদের এই ক্লেশ-স্বীকার-করাটাকে ক্লেশ বলিয়াই ভাবিতে পারিতেন না; বরঞ্চ মনে করিতেন, 'এতটুকু দুঃখ না করিলে সরস্বতী ধরা দিবেন না! তা' কারণ যাই হোক, এম্‌নি করিয়াই ছেলে তিনটি এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছিল। বটতলায় বসিয়া ন্যাড়া-বটকে সাক্ষী করিয়া তিন বন্ধুতে প্রতিদিন এই প্রতিজ্ঞা করিত, জীবনে কখনও তাহারা পৃথক হইবে না, কখনও বিবাহ করিবে না, এবং উকিল হইয়া তিন জনেই একটা বাড়ীতে থাকিবে; টাকা রোজগার করিয়া সমস্ত টাকা একটা সিন্দুকে জমা করিবে, এবং তাই দিয়া দেশের কাজ করিবে।

এই ত গেল ছেলেবেলার কল্পনা। কিন্তু যেটা কল্পনা নয়, সেটা অবশেষে কিরূপ দাঁড়াইল, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি। বন্ধুত্বের প্রথম পাক্‌টা এলাইয়া গেল বি-এ ক্লাসে। কলিকাতায় কেশব সেনের তখন প্রচণ্ড প্রতাপ। বক্তৃতার বড় জোর। সে জোর পাড়াগাঁয়ের ছেলে তিনটি হঠাৎ সামলাইতে পারিল না—ভাসিয়া গেল। গেল বটে, কিন্তু, বনমালী এবং রাসবিহারী যেরূপ প্রকাশ্যে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ-ভুক্ত হইল, জগদীশ সেরূপ পারিল না —ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সে সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী বটে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল-চিত্ত। তাহাতে, তাহার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পিতা তখনও জীবিত ছিলেন। কিন্তু ও-দুটির সে বালাই ছিল না। কিছুকাল পূর্ব্বে পিতার পরলোক-প্রাপ্তিতে বনমালী তখন কৃষ্ণপুরের জমিদার, এবং রাসবিহারী তাহাদের রাধাপুরের সমস্ত বিষয়-আশয়ের একচ্ছত্র সম্রাট। অতএব অনতিকাল পরেই এই দুটি বন্ধু ব্রাহ্ম-পরিবারে বিবাহ করিয়া বিদুষী ভার্য্যা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু দরিদ্র জগদীশের সে সুবিধা হইল না। তাহাকে যথাসময়ে আইন পাশ করিতে হইল এবং এক গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের এগারো বছরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত এলাহাবাদে চলিয়া যাইতে হইল। কিন্তু যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের যে কাজ কলিকাতায় নিতান্ত সহজ মনে হইয়াছিল, গ্রামে ফিরিয়া তাহাই একান্ত কঠিন ঠেকিল। বউমানুষ শ্বশুরবাড়ী আসিয়া ঘোম্‌টা দেয় না, জুতা-মোজা পরিয়া রাস্তায় বাহির হয়,—তামাসা দেখিতে পাঁচখানা গ্রামের লোক ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল। এবং গ্রাম জুড়িয়া এম্‌নি একটা কদর্য্য হৈ হৈ সুরু হইয়া গেল যে, একান্ত নিরুপায় না হইলে আর কেহ স্ত্রী লইয়া সেখানে বাস

রিতে পারে না। বনমালীর উপায় ছিল; সুতরাং সে াম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিল; এবং, কমাত্র জমিদারীর উপর নির্ভর না করিয়া ব্যবসা সুরু রিয়া দিল। কিন্তু রাসবিহারীর অল্প আয়। কাজেই, ; নিজের পিঠের উপর একটা, এবং বিদুষী ভার্য্যার পিঠের পর আর একটা কুলা চাপা দিয়া কোনমতে তাহার দেশের টীতেই 'একঘরে' হইয়া বসিয়া রহিল। অতএব এই ন বন্ধুর একজন এলাহাবাদে, একজন রাধাপুরে এবং ার একজন কলিকাতায় বাস করায় আজীবন অবিবাহিত কিয়া, এক বাড়ীতে বাস করিয়া, এক সিন্ধুকে টাকা য়া করিয়া দেশ উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞাটা আপাততঃ স্থগিত হল। এবং যে ন্যাড়া বটবৃক্ষ ইহার সাক্ষী ছিলেন, তিনি হারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন না করিয়া, নীরবে, ন-মনে বোধ করি হাসিতে লাগিলেন। এইভাবে অনেক ন গেল। ইতিমধ্যে তিন বন্ধুর কদাচিৎ কখনও দেখা ত বটে, কিন্তু, ছেলেবেলার প্রণয়টা একেবারে তিরোহিত লে না। জগদীশের ছেলে হইলে সে বনমালীকে সুসংবাদ য়া এলাহাবাদ হইতে লিখিল, 'তোমার মেয়ে হইলে, হাকে পুত্রবধূ করিয়া, ছেলেবেলায় যে পাপ করিয়াছি, হার কতক প্রায়শ্চিত্ত করিব। তোমার দয়াতেই আমি কল হইয়া সুখে আছি, এ-কথা কোন দিন ভুলি নাই।'

বনমালী তাহার উত্তরে লিখিলেন, 'বেশ। তোমার লের দীর্ঘজীবন কামনা করি। কিন্তু আমার মেয়ে য়ার কোন আশাই নাই। তবে, যদি কোন দিন মঙ্গল-য়র আশীর্ব্বাদে সন্তান হয়, তোমাকে দিব।' চিঠি লিখিয়া মালী মনে-মনে হাসিল। কারণ, বছর-দুই পূর্ব্বে হার অপর বন্ধু, রাসবিহারীর যখন ছেলে হয়, সেও ঠিক প্রার্থনাই করিয়াছিল। বাণিজ্যের কৃপায় এখন সে ধনী। সবাই তাহার মেয়েকে ঘরে আনিতে চায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছ'মাস-ছ'মাসের কথা নয়, বিশ বৎসর পরের কাহিনী তেছি। বনমালী প্রাচীন হইয়াছেন। কয়েক বৎসর ত রোগে ভুগিয়া-ভুগিয়া এইবার শয্যা আশ্রয় করিয়া পাইয়াছিলেন, আর বোধ হয় উঠিতে হইবে না। তিনি দিনই ভগবৎপরায়ণ এবং ধর্ম্মভীরু। মরণে তাঁহার ভয় ছিল না। শুধু, একমাত্র সন্তান বিজয়ার বিবাহ দিয়া যাইবার অবকাশ ঘটিল না মনে করিয়াই কিছু ক্ষুণ্ণ ছিলেন। সেদিন অপরাহ্ণকালে হঠাৎ বিজয়ার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিয়াছিলেন "মা, আমার ছেলে নেই বলে আমি এতটুকু দুঃখ করিনে। তুই আমার সব। এখনো তোর আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ হয়নি বটে, কিন্তু তোর এইটুকু মাথার উপর আমার এত বড় বিষয় রেখে যেতেও আমার এক বিন্দু ভয় হয় না। তোর মা নেই, ভাই নেই, একটা খুড়ো-জ্যাঠা পর্য্যন্ত নেই। তবু আমি নিশ্চয় জানি, আমার সমস্ত বজায় থাক্‌বে। শুধু একটা অনুরোধ করে যাই মা, জগদীশ যাই করুক আর যাই হোক্, সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। দেনার দায়ে তার বাড়ীঘর কখনো বিক্রী করে নিস্‌নে। তার একটি ছেলে আছে—তাকে চোখে দেখিনি, কিন্তু শুনেচি সে বড় সৎ ছেলে। বাপের দোষে তাকে নিরাশ্রয় করিস্‌নে মা, এই আমার শেষ অনুরোধ।" বিজয়া অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়াছিল, "বাবা, তোমার আদেশ আমি কোনদিন অমান্য করব না। জগদীশ বাবু যতদিন বাঁচবেন, তাঁকে তোমার মতই মান্য করব; কিন্তু তাঁর অবর্ত্তমানে, সমস্ত বিষয় মিছামিছি তাঁর ছেলেকে কেন ছেড়ে দেব? তাঁকে তুমিও কখনো চোখে দেখনি, আমিও দেখিনি। আর যদি সত্যিই তিনি লেখা-পড়া শিখে থাকেন, অনায়াসেই ত পিতৃঋণ শোধ কর্‌তে পারবেন।" বনমালী মেয়ের মুখের পানে চোখ তুলিয়া কহিয়াছিলেন, "ঋণ ত কম নয় মা। ছেলেমানুষ, এ যদি না শুধ্‌তে পারে?" মেয়ে জবাব দিয়াছিল, "যে না পারে, সে কুসন্তান, বাবা! তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।" বনমালী তাঁহার এই সুশিক্ষিতা তেজস্বিনী কন্যাকে চিনিতেন। তাই আর পীড়াপীড়ি করেন নাই; শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, "সমস্ত কাজ-কর্ম্মে ভগবানকে মাথার উপর রেখে যা কর্ত্তব্য তাই কোরো মা। তোমাকে বিশেষ কোন অনুরোধ করে আমি আবদ্ধ করে যেতে চাইনে।" বলিয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, পুনরায় একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিয়াছিলেন, "জানিস্ মা বিজয়া, এই জগদীশ যখন একটা মানুষের মত মানুষ ছিল, তখন তুই না জন্মাতেই সে তোকে তার এই ছেলেটির নাম কোরেই চেয়ে নিয়েছিল। আমিও মা, কথা দিয়েছিলাম" বলিয়া তিনি

যেন উৎসুক দৃষ্টিতেই চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার এই কন্যাটি শিশু কালেই মাতৃহীন হইয়াছিল বলিয়া তিনিই তাহার পিতামাতা উভয়ের স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাই বিজয়া তাঁহার কাছে মায়ের আব্দার করিতেও কোন দিন সঙ্কোচ বোধ করে নাই; কহিয়াছিল, "বাবা, তুমি তাঁকে শুধু মুখের কথাই দিয়েছিলে, তোমার মনের কথা দাও নাই।" "কেন মা?" "তা দিলে কি একবার তাঁকে চোখের দেখা দেখ্‌তেও চাইতে না?" বনমালী বলিয়াছিলেন, "রাসবিহারীর কাছে যখন শুনেছিলাম, ছেলেটি না কি তোর মায়ের মতই দুর্ব্বল—এমন কি ডাক্তারেরা তার দীর্ঘজীবনের কোন আশাই করেন না, তখন তাকে কাছে পেয়েও একবার আনিয়ে দেখ্‌তে চাইনি। এই কলকাতা সহরেই কোন্ একটা বাসায় থেকে সে তখন বি-এ পড়্‌ত। তার পরে নিজের নানান্ অসুখে-বিসুখে এখন দেখ্‌চি সেইটাই আমার মস্ত ক্ষতি হয়ে গেছে মা। কিন্তু, তোকে সত্যি বল্‌চি বিজয়া, সে সময়ে জগদীশকে তোর সম্বন্ধে আমার মনের কথাই দিয়াছিলাম।" কিছুক্ষণ থামিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ জগদীশকে সবাই জানে একটা অকর্ম্মণ্য জুয়ারি, অপদার্থ মাতাল। কিন্তু এই জগদীশই একদিন আমাদের সকলের চেয়েই ভাল ছেলে ছিল। বিদ্যা বুদ্ধির জন্য বল্‌ছি না, মা, সে অনেকেরই থাকে, কিন্তু এমন প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তে আমি কাউকে দেখিনি। এই ভালবাসাই তার কাল হয়েছে। তার অনেক দোষ আমি জানি, কিন্তু যখনি মনে পড়ে, স্ত্রীর মৃত্যুতে সে শোকে পাগল হয়ে গেছে, তখন, তোর মায়ের কথা স্মরণ করে আমি ত মা তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না করে পারিনে। তার স্ত্রী ছিল সতী লক্ষ্মী। তিনি মৃত্যুকালে নরেনকে কাছে ডেকে শুধু বলেছিলেন, বাবা, শুধু এই আশীর্ব্বাদ করে যাই যেন ভগবানের ওপর তোমার অচল বিশ্বাস থাকে। শুনেছি না কি মায়ের এই শেষ আশীর্ব্বাদটুকু নিষ্ফল হয়নি। নরেন এইটুকু বয়সেই ভগবানকে তার মায়ের মতই ভালবাসতে শিখেছে। যে এ পেরেছে, সংসারে আর তার বাকি কি আছে মা?" বিজয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, "এইটাই কি সংসারে সব চেয়ে বড় পারা বাবা?"

মরণোন্মুখ বৃদ্ধের শুষ্ক চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা দুই হাত বাড়াইয়া মেয়েকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন, "এইটিই সব চেয়ে বড় পারা মা। সংসারের মধ্যে, সংসারের বাইরে,—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এত বড় পারা আর কিছু নেই বিজয়া। তুমি নিজে কোনদিন পারো আর না পারো, মা, যে পারে তার পায়ে যেন মাথা পাত্‌তে পারো—আমিও মরণকালে তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করে যাই।" পিতৃ-বক্ষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সে-দিন বিজয়ার মনে হইয়াছিল, কে যেন বড় মধুর, বড় উজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়া তাহার পিতার বুকের ভিতর হইতে তাহার নিজের বুকের গভীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিতেছে। এই অভূতপূর্ব্ব পরমাশ্চর্য্য অনুভূতি সে-দিন ক্ষণকালের জন্য তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। বনমালী কহিয়াছিলেন, "ছেলেটির নাম নরেন; তার বাপের মুখে শুনেচি, সে ডাক্তার হয়েচে—কিন্তু ডাক্তারি করে না। এখন যদি এ দেশে সে থাকৃতো, এই সময়ে একবার তাকে আনিয়ে চোখের দেখা দেখে নিতাম।" বিজয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "এখন তিনি কোথায় আছেন?" বনমালী বলিয়াছিলেন, "তার মামার কাছে—বর্ম্মায়। জগদীশের এখন ত আর সব কথা গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা নেই—তবু তার মুখের দুই-একটা ভাসা-ভাসা কথায় মনে হয়, যেন সে ছেলে তার মায়ের সমস্ত সদ্‌গুণই পেয়েছে। ভগবান করুন, যেখানে যেমন করেই থাক্, যেন বেঁচে থাকে।"

সন্ধ্যা হইয়াছিল। ভৃত্য আলো দিতে আসিয়া, বিলাসবাবুর আগমন-সংবাদ জানাইয়া গেলে, বনমালী বলিয়াছিলেন, "তবে তুমি এখন নীচে যাও মা, আমি একটু বিশ্রাম করি।" বিজয়া পিতার শিয়রের বালিশগুলি গুছাইয়া দিয়া, পায়ের উপরে শালখানি যথাস্থানে টানিয়া দিয়া, আলোটা চোখের উপর হইতে আড়াল করিয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেলে, পিতার জীর্ণ বক্ষ ভেদিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছিল। সে-দিন বিলাসের আগমন-সংবাদে কন্যার মুখের উপর যে আরক্ত আভাটুকু দেখা দিয়াছিল, বৃদ্ধকে তাহা ব্যথাই দিয়াছিল।

বিলাসবিহারী রাসবিহারীর পুত্র। অনেকদিন যাবৎ সে এই কলিকাতা সহরে থাকিয়া প্রথমে এফ-এ এবং পরে বি-এ পড়িতেছে। বনমালী সমাজ ত্যাগ করিয়া অবধি বড় একটা দেশে যাইতেন না। যদিচ, ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দেশেও জমিদারী অনেক বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু

সে সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার বাল্যবন্ধু রাসবিহারীর উপরেই ছিল। সেই সূত্রেই বিলাসের এ বাটীতে আসা-যাওয়া আরম্ভ হইয়া কিছুদিন হইতে অন্ত যে কারণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাস-দুই হইল বনমালীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কলিকাতার এত বড় বাড়ীতে বিজয়া এখন একা। তাহার দেশের বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শুনা রাসবিহারীই করিতে লাগিলেন, এবং সেই সূত্রে তাহার একপ্রকার অভিভাবক হইয়াও বসিলেন। কিন্তু নিজে থাকেন গ্রামে, সেইজন্য পুত্র বিলাসবিহারীর উপরেই বিজয়ার সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল। সে-ই তাহার প্রকৃত অভিভাবক হইয়া উঠিল। তখন এই সময়টায় প্রতি ব্রাহ্ম-পরিবারে 'সত্য' 'সুনীতি', 'সুরুচি' এই শব্দগুলা বেশ বড় করিয়াই শিখানো হইত। কারণ, বিদেশে পড়িতে আসিয়া হিন্দু যুবকেরা যখন পিতামাতার বিরুদ্ধে, দেবদেবীর বিরুদ্ধে, প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এই সমাজের বাঁধানো খাতায় নাম লিখাইয়া বসিত, তখন এই শব্দগুলাই চাড়া দিয়া তাহাদের কাঁচা মাথা ঘাড়ের উপর সোজা করিয়া ধরিত—ঝুঁকিয়া ভাঙিয়া পড়িতে দিত না। তাহারা কহিত, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, তাহাই করিবে। মায়ের অশ্রু-জলই বল, আর বাপের দীর্ঘশ্বাসই বল, কিছুই দেখিবার শুনিবার প্রয়োজন নাই। ও-সব দুর্ব্বলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিবে, নচেৎ আলোকের সন্ধান মিলিবে না। কথাগুলা বিজয়াও শিখিয়াছিল।

আজ গ্রাম হইতে বিলাস বাবু বৃদ্ধ মাতাল জগদীশের মৃত্যু-সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল। বিজয়ার সে পিতৃবন্ধু বটে, কিন্তু, বিলাসবাবু যখন বলিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া জগদীশ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া ছাতের উপর হইতে পড়িয়া মরিয়াছে, তখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সুনীতি স্মরণ করিয়া বিজয়া এই দুর্ভাগ্য পিতৃ-সখার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ওষ্ঠ বিকৃত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না। বিলাস বলিতে লাগিল—"জগদীশ মুখুয্যে আমার বাবারও ছেলে-বেলার বন্ধু ছিলেন; কিন্তু তিনি তার মুখ পর্য্যন্ত দেখ্‌তেন না। টাকা ধার করতে দুবার এসেছিল, বাবা চাকর দিয়ে তাকে ফটকের বার করে দিয়েছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বলেন, এই সব দুর্নীতি-পরায়ণ লোকগুলোকে প্রশ্রয় দিলে, মঙ্গলময় ভগবানের শ্রীচরণে অপরাধ করা হয়।" বিজয়া সায় দিয়া কহিল, "অতি সত্য কথা।" বিলাস উৎসাহিত হইয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল, "বন্ধুই হোক, আর স্নেহই হোক, দুর্ব্বলতা-বশে কোন মতেই ব্রাহ্ম-সমাজের চরম আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। জগদীশের সমস্ত সম্পত্তি এখন ন্যায়তঃ আমাদের। তার ছেলে পিতৃঋণ শোধ করতে পারে ভাল, না পারে ডিক্রিজারি করে আমাদের এই দণ্ডেই সমস্ত হাতে নেওয়া উচিত। বস্তুতঃ, ছেড়ে দেবার আমাদের কোন অধিকারই নেই। কারণ, এই টাকায় আমরা অনেক সৎকার্য্য করতে পারি। সমাজের কোন ছেলেকে বিলাত পর্য্যন্ত পাঠাতে পারি; ধর্ম্ম-প্রচারে ব্যয় করতে পারি; কত কি করতে পারি—কেন তা' না করব বলুন? তা'ছাড়া, জগদীশবাবু কিম্বা তার ছেলে আমাদের সমাজভুক্ত নয়, যে, তার উপর কোন প্রকার দয়া করা আবশ্যক। আপনার সম্মতি পেলেই বাবা সমস্ত ঠিক করে ফেলবেন বলে আজ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।" বিজয়া মুমূর্ষু পিতার শেষ কথাগুলা স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিল—সহসা জবাব দিতে পারিল না। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বিলাস সজোরে, দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"না, না, আপনাকে ইতস্ততঃ করতে আমি কোন মতেই দেব না। দ্বিধা, দুর্ব্বলতা—পাপ! শুধু পাপ কেন, মহাপাপ! আমি মনে-মনে সঙ্কল্প করেচি তার বাড়ীটায় আপনার নাম করে,—যা' কোথাও নেই কোথাও হয়নি—আমি তাই করব। পাড়াগাঁয়ের মধ্যে ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেশের হতভাগ্য, মূর্খ লোকগুলোকে ধর্ম্মশিক্ষা দেব। আপনি একবার ভেবে দেখুন দেখি, এদের মূর্খতার জ্বালাতেই বিরক্ত হয়ে আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেব দেশ ছেড়েছিলেন কি না! তাঁর কন্যা হয়ে কি আপনার উচিত নয়—এই নোব্‌ল প্রতিশোধ নিয়ে তাদেরই এই চরম উপকার করা! বলুন—আপনিই এ কথার উত্তর দিন!" বিজয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। বিলাস দৃপ্তস্বরে বলিতে লাগিল, "সমস্ত দেশের মধ্যে একটা কত-বড় নাম, কত-বড় সাড়া পড়ে যাবে, ভেবে দেখুন দেখি! হিন্দুদের স্বীকার করতেই হবে—সে ভার আমার উপর—যে, ব্রাহ্ম-সমাজে মানুষ আছে! হৃদয় আছে

—স্বার্থত্যাগ আছে! যাঁকে তারা নির্য্যাতন করে দেশ থেকে বিদায় করে দিয়েছিল, সেই মহাত্মারই মহীয়সী কন্যা তাদেরই মঙ্গলের জন্যে এই বিপুল স্বার্থত্যাগ করেচেন। সমস্ত ভারতবর্ষময় একটা কি, বিরাট মর‍্যাল এফেক্ট হবে, বলুন দেখি।" বলিয়া বিলাসবিহারী সম্মুখের টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিল। শুনিতে-শুনিতে বিজয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক এত-বড় নামের লোভ সংবরণ করা আঠারো বছরের মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। সে পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিয়া কহিল, "তাঁর ছেলের নাম শুনেচি নরেন্দ্র। এখন সে কোথায় আছে জানেন?" "জানি। হতভাগা-পিতার মৃত্যুর পরে সে বাড়ী এসে তার শ্রাদ্ধ করে এখন দেশেই আছে।"

"আপনার সঙ্গে বোধ হয় আলাপ আছে?" "আলাপ? ছিঃ! আপনি আমাকে কি মনে করেন, বলুন দেখি!" বলিয়া বিজয়াকে একেবারে অপ্রতিভ করিয়া দিয়া বিলাসবাবু একটুখানি হাসিয়া কহিল, "আমি ত ভাব্‌তেই পারিনে, যে, জগদীশ মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে আমি আলাপ করচি। তবে, সে-দিন রাস্তায় হঠাৎ একটা পাগলের মত নূতন লোক দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। শুন্‌লাম, সেই নরেন মুখুয্যে।" বিজয়া কৌতূহলী হইয়া কহিল, "পাগলের মত? শুনেচি না কি ডাক্তার?" বিলাসবাবু ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ঠিক পাগলের মত। ডাক্তার? আমি বিশ্বাস করিনে। মাথায় বড়-বড় চুল—যেমন লম্বা, তেম্‌নি রোগা। বুকের প্রত্যেক পাঁজরটি বোধ করি দূর থেকে গোণা যায়—এই ত চেহারা। তালপাতার সেপাই! ছোঃ—" বস্তুতঃ চেহারা লইয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার বিলাসের ছিল। কারণ সে বেঁটে, মোটা এবং ভারি যোয়ান। তাহার বুকের পাঁজর বোমা মারিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত না। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বিজয়া বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বিলাসবাবু, জগদীশবাবুর বাড়ীটা যদি আমরা সত্যিই বিক্রী করে নিই, গ্রামের মধ্যে কি একটা বিশ্রী গোলমাল উঠ্‌বে না?" বিলাস জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, "একেবারে না। আপনি পাঁচসাতখানা গ্রামের মধ্যে এমন একজনও পাবেন না, যার ঐ মাতালটার ওপর বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি ছিল। আহা বলে, এমন লোক ও-অঞ্চলে নেই।" একটু হাসিয়া কহিল, "কিন্তু তাও যদি না হ'ত, আমি বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত সে চিন্তা আপনার মনে আনাও উচিত নয়।" কিন্তু আমি বলি, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও আপনার একবার দেশে যাওয়া কর্ত্তব্য।" বিজয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? আমরা কখনই ত সেখানে যাইনে।" বিলাস উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সেই জন্যই ত বলি, আপনার যাওয়া চাই-ই! প্রজাদের একবার তাদের মহারাণীকে দেখ্‌তে দিন। আমার ত নিশ্চয়ই মনে হয়, এ সৌভাগ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করা মহাপাপ।" লজ্জায় বিজয়ার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে আনত মুখে কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই, বিলাস বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "ইতস্ততঃ করবার এতে কিছু নেই। একবার ভেবে দেখুন দিকি, কত কাজ সেখানে আপনার করবার আছে! এ-কথা আজ আপনার মুখের ওপরেই আমি বল্‌তে পারি, যে, আপনার বাবা সমস্ত দেশের মালিক হয়েও যে কতকগুলো ক্ষ্যাপা কুকুরের ভয়ে আর কখনো গ্রামে ফিরে গেলেন না, সে কি ভাল কাজ করেছিলেন? এই কি আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ? এ যে কোন সমাজেরই আদর্শ নহে, তাহাতে আর ভুল কি!" বিজয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু, বাবার মুখে শুনেচি, আমাদের দেশের বাড়ী ত বাস করবার উপযুক্ত নয়?" বিলাস বলিল, "আপনি হুকুম দিন, একবার বলুন সেখানে যাবেন,—আমি দশদিনের মধ্যে তাকে বাসের উপযুক্ত করে দেব। আমার উপর নির্ভর করুন; যাতে সে বাড়ী আপনার মর্য্যাদা সম্পূর্ণ বহন করতে পারে, আমি প্রাণপণে তার বন্দোবস্ত করে দেব। দেখুন, একটা কথা আমার বহুদিন থেকে বারবার মনে হয়—আপনাকে শুধু সামনে রেখে আমি কি যে করে তুল্‌তে পারি, তার বোধ করি সীমা-পরিসীমা নেই।"

বিজয়াকে সম্মত করাইয়া বিলাস প্রস্থান করিলে, সে সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যাহা তাহার দেশ, সেখানে সে জন্মাবধি কখনও যায় নাই বটে, কিন্তু মাঝে-মাঝে পিতার মুখে তাহার কত বর্ণনাই না শুনিয়াছে। দেশের গল্প করিতে তাঁহার উৎসাহ ও আনন্দ ধরিত না। কিন্তু, তখন সে সকল কাহিনী তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত না; যেমন শুনিত তেমনি ভুলিত। কিন্তু

আজ কোথা হইতে অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিয়া সেই সব বিস্মৃত বিবরণ একেবারে আকার ধরিয়া তাহার চোখের উপর দেখা দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহাদের গ্রামের বাড়ী কলিকাতার এই অট্টালিকার মত বৃহৎ ও জমকালো নয় বটে, কিন্তু সেই ত তাহার সাত-পুরুষের বাস্তু-ভিটা! সেখানে পিতামহ-পিতামহী, প্রপিতামহ-প্রপিতামহী, তাঁদেরও বাপ-মা - এমন কত পুরুষের সুখে-দুঃখে, উৎসবে-ব্যসনে যদি দিন কাটিয়া থাকে, তবে তাহারই বা কাটিবে না কেন?

গলির সুমুখে হাজ্‌রাদের তেতালা বাড়ীর আড়ালে সূর্য্য অদৃশ্য হইল। এই লইয়া পিতার সঙ্গে তাহার কতদিন কত কথা হইয়া গেছে। তাহার মনে পড়িল, কত সন্ধ্যায় তিনি ওই ইজি-চেয়ারটার উপর বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছেন, "বিজয়া, আমার দেশের বাড়ীতে কখনও এ-দুঃখ পাইনি। সেখানে কোন হাজ্‌রার তেতালা ছাদই আমার শেষ সূর্য্যাস্তটুকুকে এমন কোরে কোনদিন আড়াল কোরে দাঁড়ায়নি। তুই ত জানিস্‌নে মা, কিন্তু আমার যে চোখ-দুটি এই বুকের ভেতর থেকে উঁকি মেরে চেয়ে আছে, তারা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চে, আমাদের ফুল-বাগানের ধারের ছোট্ট নদীটি এতক্ষণ সোণার জলে টল্‌টল্‌ করে উঠেচে; আর তার পারে যতদূর দৃষ্টি যায়, মাঠের পর মাঠের শেষে এখনো সূয্যি ঠাকুর যাই-যাই করেও গ্রামের মায়া কাটিয়ে যেতে পারেন নি। ঐ ত মা, গলির মোড়ে দেখ্‌তে পাচ্চিস্‌, দিনের কাজ শেষ কোরে ঘরপানে মানুষের স্রোত বয়ে যাচ্চে; কিন্তু ওই দশবারো হাত জমিটুকু ছাড়া তাদের সঙ্গে যাবার ত আর একটুও পথ নেই। এম্‌নি কোরে এই সন্ধ্যাবেলায় সেখানেও উল্টো স্রোত ঘরপানে বয়ে যেতে দেখেচি; কিন্তু, তার প্রত্যেক গরু-বাছুরটির গোয়াল-ঘরের পরিচয় পর্য্যন্ত জানতুম, মা।" বলিয়া অকস্মাৎ একটা অতি গভীর শ্বাস হৃদয়ের ভিতর হইতে মোচন করিয়া নীরব হইয়া থাকিতেন। যে গ্রাম একদিন তিনি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এত সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যেও যে তাহারই জন্য তাঁহার ভিতরটা কাঁদিতে থাকিত, ইহা যখন-তখন বিজয়া টের পাইত। তথাপি, একটা দিনের জন্যও সে ইহার কারণ চিন্তা করিয়া দেখে নাই; কিন্তু আজ বিলাসবাবু সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চলিয়া গেলে, পরলোকগত পিতৃদেবের কথাগুলা স্মরণ করিতে-করিতে তাঁহার সমস্ত প্রচ্ছন্ন বেদনার হেতু অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তেই তাহার মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কলিকাতার এই বিপুল জনারণ্যের মধ্যেও তিনি যে কিরূপ একাকী জীবন যাপন করিয়া গেছেন, আজ তাহা সে চোখের উপর দেখিতে পাইয়া একেবারে ভয় পাইয়া গেল। এবং আশ্চর্য্য এই যে, যে গ্রাম—যে ভিটার সহিত তাহার জন্মাবধি পরিচয় নাই, তাহাই আজ তাহাকে দুর্নিবার শক্তিতে টানিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বহুকাল-পরিত্যক্ত জমিদার-বাটী বিলাসের তত্ত্বাবধানে মেরামত হইতে লাগিল; কলিকাতা হইতে অদৃষ্টপূর্ব্ব বিচিত্র আসবাব সকল গরুর-গাড়ী বোঝাই হইয়া নিত্য আসিতে লাগিল। জমিদারের একমাত্র কন্যা দেশে বাস করিতে আসিবেন, এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, শুধু কেবল কৃষ্ণপুরে নয়, রাধাপুর, ব্রজপুর, কোড়োলা, দিঘ্‌ড়া প্রভৃতি আশপাশের পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে হৈচৈ পড়িয়া গেল। এমনিই ত ঘরের পাশে জমিদারের বাস চিরদিনই লোকের অপ্রিয়, তাহাতে জমিদারের না-থাকাটাই প্রজাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং নূতন করিয়া তাঁহার বাস করার বাসনাটা সকলের কাছেই একটা অন্যায় উৎপাতের মত প্রতিভাত হইল। ম্যানেজার রাসবিহারীর প্রবল শাসনে তাহাদের দুঃখের অভাব ছিল না, আবার জমিদার-কন্যার প্রত্যাবর্ত্তনের শুভ উপলক্ষে সে যে কোন্‌ নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি করিবে, তাহা হাটে-মাঠে-ঘাটে—সর্ব্বত্রই এক অশুভ আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। পরলোকগত বৃদ্ধ জমিদার বনমালী যতদিন জীবিত ছিলেন, তখন দুঃখের মধ্যেও এই সুখটুকু ছিল, যে, কোন গতিকে কলিকাতায় গিয়া একবার তাঁহার কাছে পড়িতে পারিলে কাহাকেও নিষ্ফল হস্তে ফিরিতে হইত না। কিন্তু জমিদার-কন্যার বয়স অল্প; মাথা গরম; রাসবিহারীর পুত্রের সঙ্গে বিবাহের জনশ্রুতিও গ্রামে অপ্রচারিত ছিল না,—তিনি মেম সাহেব, ম্লেচ্ছ; সুতরাং অদূর-ভবিষ্যতে রাসবিহারীর দৌরাত্ম্য কল্পনা করিয়া কাহারও মনে কিছুমাত্র সুখ রহিল না,—পৈতাধারী ব্রাহ্মণেরও না, পৈতাহীন শূদ্রেরও না। এম্‌নি, ভয়ে-ভাব্‌নায় বর্ষাটা গেল। শরতের প্রারম্ভেই এক মধুর প্রভাতে

মস্ত দুই ওয়েলারবাহিত খোলা ফিটনে চড়িয়া, তরুণী জমিদার-কন্যা শত নরনারীর সভয় কৌতূহল দৃষ্টির মাঝখান দিয়া হুগলি ষ্টেসন হইতে পিতৃ-পিতামহের পুরাতন আবাস-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাঙালীর মেয়ে,—আঠারো-উনিশ বৎসর পার হইয়া গেছে, তথাপি বিবাহ হয় নাই,—সে প্রকাশ্যে জুতা-মোজা পরে,—খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না--ইত্যাদি কুৎসা গ্রামের লোকেরা সঙ্গোপনে করিতেও লাগিল, আবার জমিদারের নজর লইয়া একে-একে, দুইয়ে-দুইয়ে আসিয়া নানা প্রকারে আনন্দ ও মঙ্গল-কামনা জানাইয়া যাইতেও লাগিল। এমন করিয়া পাঁচ-ছয় দিন কাটিবার পরে, সে-দিন সকালবেলা বিজয়া চা পানের পরে নীচের বসিবার ঘরে বিলাসবাবুর সহিত বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, বেয়ারা আসিয়া জানাইল,—একজন ভদ্রলোক দেখা করিতে চান্। বিজয়া কহিল, "এইখানে নিয়ে এসো।" এই কয়দিন ক্রমাগতই তাহার ইতর-ভদ্র প্রজারা নজর লইয়া যখন-তখন সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিল; সুতরাং প্রথমে সে বিশেষ কিছু মনে করে নাই। কিন্তু ক্ষণকাল পরে যে ভদ্রলোকটি বেহারার পিছনে ঘরে প্রবেশ করিল, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রই বিজয়া বিস্মিত হইল। তাহার বয়স বোধ করি সাতাশ-আটাশ হইবে। লোকটি দীর্ঘাঙ্গ, কিন্তু তদনুপাতে হৃষ্টপুষ্ট নয়, বরঞ্চ, ক্ষীণকায়। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, গোঁফ-দাড়ি কামানো, পায়ে চটিজুতা, গায়ে জামা নাই, শুধু একখানি মোটা চাদরের ফাঁক দিয়া শুভ্র পৈতার গোছা দেখা যাইতেছিল। সে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। ইতিপূর্ব্বে যে-কোন ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে,—শুধু যে নজরের টাকা হাতে লইয়াই প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নয়, তাহারা কুণ্ঠিত হইয়াই প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এ লোকটির আচরণে সঙ্কোচের লেশমাত্র নাই। তাহার আগমনে শুধু যে বিজয়াই বিস্মিত হইয়াছিল, তাহা নয়; বিলাসও কম আশ্চর্য্য হয় নাই। বিলাসের গ্রামান্তরে বাস হইলেও এ-দিকের সকল ভদ্রলোককেই সে চিনিত; কিন্তু এই লোকটি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আগন্তুক ভদ্রলোকটিই প্রথমে কথা কহিল; বলিল, "আমার মামা পূর্ণ গাঙ্গুলি মশাই আপনার প্রতিবেশী, পাশের বাড়ীটিই তাঁর। আমি শুনে অবাক্ হয়ে গেছি যে, তাঁর পিতৃ-পিতামহের কালের দুর্গা-পূজা না কি আপনি এবার বন্ধ করে দিতে চান্? এর মানে কি?" বলিয়া সে বিজয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। প্রশ্ন এবং তাহা জিজ্ঞাসা করার ধরণে বিজয়া আশ্চর্য্য এবং মনে-মনে বিরক্ত হইল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। তাহার উত্তর দিল বিলাস। সে রুক্ষ স্বরে কহিল, "আপনি কি তাই মামার হয়ে ঝগড়া করতে এসেছেন না কি? কিন্তু কার সঙ্গে কথা কচ্চেন, সেটা ভুলে যাবেন না।" আগন্তুক হাসিয়া একটুখানি জিভ্ কাটিয়া কহিল, "সে আমি ভুলিনি, এবং ঝগড়া করতেও আসিনি। বরঞ্চ, কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি বলেই ভাল কোরে জেনে যেতে এসেচি।" বিলাস বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিল, "বিশ্বাস হয়নি কেন?" আগন্তুক কহিল, "কেমন করে হবে বলুন দেখি? নিরর্থক নিজের প্রতিবেশীর ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত করবেন—এ বিশ্বাস না করাই ত স্বাভাবিক।" ধর্ম্মমত লইয়া তর্ক-বিতর্ক বিলাসের কাছে ছেলেবেলা হইতেই অতিশয় উপাদেয়। সে উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের কণ্ঠে কহিল, "আপনার কাছে নিরর্থক বোধ হলেই যে কারও কাছে তার অর্থ থাকবে না, কিম্বা আপনি ধর্ম্ম বল্লেই সকলে তাকে শিরোধার্য্য করে মেনে নেবে, তার কোন অর্থ নেই। পুতুল-পূজো আমাদের কাছে ধর্ম্ম নয়, এবং তার নিষেধ করাটাও আমরা অন্যায় বলে মনে করিনে।" আগন্তুক গভীর বিস্ময়ে বিজয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "আপনিও কি তাই বলেন না কি?" তাহার বিস্ময় বিজয়াকে যেন আঘাত করিল; কিন্তু সে-ভাব গোপন করিয়া সে সহজ সুরেই জবাব দিল, "আমার কাছে কি আপনি এর বিরুদ্ধ মন্তব্য শোনবার আশা করে এসেছিলেন?" বিলাস সগর্ব্বে হাস্য করিয়া কহিল, "বোধ হয়। কিন্তু উনি ত বিদেশী লোক—খুব সম্ভব আপনাদের কিছুই জানেন না।" আগন্তুক ক্ষণকাল নীরবে বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া তাহাকেই কহিল, "আমি বিদেশী না হলেও, এ গ্রামের লোক নয়—সে কথা ঠিক। তবুও এ আমি সত্যিই আপনার কাছে আশা করিনি। পুতুল-পূজো কথাটা আপনার মুখ থেকে বার না হলেও, সাকার-নিরাকার উপাসনার পুরানো ঝগড়া আমি

এখানে তুলবেন না। আপনারা যে ব্রাহ্ম-সমাজের, তা-ও আমি জানি। কিন্তু, এ তো সে নয়। গ্রামের মধ্যে এই একটি পূজা। সমস্ত লোক সারা বৎসর এই তিনটি দিনের আশায় পথ চেয়ে বসে আছে", বলিয়া আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "গ্রাম আপনার,—প্রজারা আপনার ছেলে-মেয়ের মত; আপনার আসার সঙ্গে-সঙ্গে গ্রামের আনন্দ-উৎসব শতগুণ বেড়ে যাবে, এই আশাই ত সকলে করে। কিন্তু তা' না হয়ে, এত-বড় দুঃখ, এত-বড় নিরানন্দ বিনা অপরাধে আপনার দুঃখী প্রজাদের মাথায় নিজে তুলে দেবেন, এ বিশ্বাস করা কি সহজ? আমি ত বিশ্বাস করতে পারিনি।" বিজয়া সহসা উত্তর দিতে পারিল না। দুঃখী প্রজাদের নামে তাহার কোমল চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না, শুধু বিলাসবাবু বিজয়ার সেই নিঃশব্দ স্নেহার্দ্র মুখের প্রতি চাহিয়া ভিতরে-ভিতরে উষ্ণ এবং উদ্বিগ্ন হইয়া তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল, "আপনি অনেক কথা কইচেন। সাকার-নিরাকারের তর্ক আপনার সঙ্গে করব, এত অবচ্ছল সময় আমাদের নেই। তা সে চুলোয় যাক্, আপনার মামা একটা কেন একশ'টা পুতুল গড়িয়ে ঘরে বসে পূজো করতে পারেন, তাতে কোন আপত্তি নেই; শুধু কতকগুলো ঢাক-ঢোল-কাঁসি অহোরাত্র ওঁর কাণের কাছে পিটে ওঁকে অসুস্থ করে তোলাতেই আমাদের আপত্তি।"

আগন্তুক একটুখানি হাসিয়া কহিল, "অহোরাত্র ত বাজে না। তা সকল উৎসবেই একটু হৈ চৈ গণ্ডগোল হয়," বলিয়া বিজয়াকে বিশেষ করিয়া উদ্দেশ করিয়া বলিল, "অসুবিধে যদি কিছু হয়, না হয় হলই। আপনারা মায়ের জাত, এদের আনন্দের অত্যাচার-উপদ্রব আপনি সইবেন না, ত, কে সইবে?" বিজয়া তেমনি নিরুত্তরেই বসিয়া রহিল। বিলাস শ্লেষের শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "আপনি ত কাজ আদায়ের ফন্দিতে ছেলে-মেয়ের উপমা দিলেন; শুনতেও মন্দ লাগল না। কিন্তু জিজ্ঞেসা করি, আপনি নিজেই যদি মুসলমান হয়ে মামার কাণের কাছে মহরম সুরু করে দিতেন, তাঁর সেটা ভাল বোধ হত কি? তা সে যাই হোক্, বকাবকি করবার সময় নেই আমাদের, বাবা যে হুকুম দিয়েছেন তাই হবে। কলকাতা থেকে ওঁকে দেশে এনে, মিছামিছি একরাশ ঢাক-ঢোল-কাঁসর বাজিয়ে ওঁর কাণের মাথা খেয়ে ফেলতে আমরা দেব না—কিছুতেই না।" তাহার অভদ্র ব্যঙ্গ ও উষ্মার আতিশয্যে আগন্তুকের চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। সে বিলাসের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কহিল, "আপনার বাবা কে, এবং তাঁর নিষেধ করিবার কি অধিকার, আমার জানা নেই; কিন্তু আপনি যে মহরমের অদ্ভুত উপমা দিলেন, এটা হিন্দুর রোসুনচৌকী না হয়ে সেই মুসলমানদের মহরমের কাড়া-না-কাড়ার বাদ্য হলে তিনি কি করতেন শুনি? এ শুধু নিরীহ স্বজাতির প্রতি অত্যাচার বৈ ত নয়!" বিলাস অকস্মাৎ চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। চোক রাঙাইয়া ভীষণ কণ্ঠে চেঁচাইয়া কহিল, "বাবার সম্বন্ধে তুমি সাবধান হয়ে কথা কও বলে দিচ্চি, নইলে এখনি অন্য উপায়ে শিখিয়ে দেব তিনি কে, এবং তাঁর কি অধিকার!"

আগন্তুক আশ্চর্য্য হইয়া বিলাসের মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু ভয়ের চিহ্নমাত্র তাহার মুখে দেখা দিল না। দেখা দিল বিজয়ার মুখে। তাহার বাটীতে বসিয়া তাহারই এক অপরিচিত অতিথির প্রতি এই একান্ত অশিষ্ট আচরণে ক্রোধে, লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। আগন্তুক মুহূর্ত্তকালমাত্র বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল; পরক্ষণেই তাহাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া বিজয়ার প্রতি চোখ ফিরাইয়া কহিল, "আমার মামা বড়-লোক ন'ন, তাঁর পূজার আয়োজন সামান্যই। তবুও এইটিই একমাত্র আপনার দরিদ্র প্রজাদের সমস্ত বছরের আনন্দ-উৎসব। হয় ত আপনার কিছু অসুবিধে হবে, কিন্তু তাদের মুখ চেয়ে কি এটুকু আপনি সহ্য করে নিতে পারবেন না?" বিলাস ক্রোধে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া সম্মুখের টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "না, পারবেন না, একশবার পারবেন না। কতকগুলো মূর্খ চাষার পাগলামি সহ্য করবার জন্যে কেউ জমিদারী করে না। তোমার আর কিছু বলবার না থাকে ত তুমি যাও,—মিথ্যে আমাদের সময় নষ্ট করো না।" বলিয়া সে হাত দিয়া দরজা দেখাইয়া দিল।" তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য আগন্তুক ভদ্রলোকটি যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সহসা তাহার মুখে প্রত্যুত্তর যোগাইল না। কিন্তু পিতার কাছে

বিজয়া নিষ্ফল শিক্ষা পায় নাই,—সে শান্ত, ধীর ভাবে বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, "আপনার বাবা আমাকে মেয়ের মত ভালবাসেন বলেই এঁদের পূজো নিষেধ করেছেন ; কিন্তু, আমি বলি হলই বা তিন-চার দিন একটু গোলমাল—" কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বিলাস তেমনি উচ্চ কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—"সে অসহ্য গণ্ড-গোল! আপনি জানেন না বলেই—" বিজয়া হাসিমুখে বলিল, "তা হোক্ গণ্ডগোল,—তিন দিন বৈ ত নয়! আর আপনি আমার অসুবিধের ভাবনা ভাবচেন—কিন্তু কলকাতা হলে কি করতেন বলুন ত? সেখানে অষ্ট-প্রহর কেউ কাণের পাশে তোপ দাগ্‌তে থাক্‌লেও ত চুপ কোরে সহ্য করতে হোতো?" বলিয়া আগন্তুক যুবকটির পানে চাহিয়া চাহিয়া কহিল, "আপনার মামাকে জানাবেন, তিনি প্রতিবার যেমন করেন, এবারেও তেম্‌নি পূজো করুন, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।" আগন্তুক এবং বিলাসবাবু উভয়েই বিস্ময়ে অবাক হইয়া বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। "আপনি তবে এখন আসুন" বলিয়া বিজয়া হাত তুলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিল। অপরিচিত ভদ্রলোকটিও আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ধন্যবাদ ও প্রতি-নমস্কার করিয়া এবং বিলাসকেও একটি নমস্কার করিয়া ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল। অবশ্য ক্রুদ্ধ বিলাস আর একদিকে চক্ষু ফিরাইয়া তাহা অগ্রাহ্য করিল ; কিন্তু দু'জনের কেহই জানিতে পারিল না যে, এই অপরিচিত যুবকটিই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান আসামী জগদীশের পুত্র নরেন্দ্রনাথ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সে চলিয়া গেলে, মিনিট-খানেক বিজয়া অন্যমনস্ক ও নীরব থাকিয়া সহসা সচকিত হইয়া মুখ তুলিতেই, নিতান্ত অকারণেই তাহার কপোলের উপর একটা ক্ষীণ আরক্ত আভা দেখা দিল। বিলাসের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ না থাকিলে, তাহার বিস্ময় ও অভিমানের হয় ত পরিসীমা থাকিত না। বিজয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমাদের কথাটা যে শেষ হতেই পেলে না। তা'হলে তালুকটা নেওয়াই আপনার বাবার ত?" বিলাস জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল,—সেই ভাবেই কহিল, "হুঁ।" বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু এর মধ্যে কোন রকম গোলমাল নেই ত?" বিলাস বলিল, "না।" বিজয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, "আজ কি তিনি ও-বেলায় এদিকে আস্‌বেন?" বিলাস কহিল, "বল্‌তে পারিনে।" বিজয়া হাসিয়া কহিল, "আপনি রাগ করলেন না কি?" এবার বিলাস মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে জবাব দিল, "রাগ না করলেও, পিতার অপমানে পুত্রের ক্ষুণ্ণ হওয়া বোধ করি অস্বাভাবিক নয়।" কথাটা বিজয়াকে আঘাত করিল ; তবুও সে হাসিমুখেই কহিল, "কিন্তু এতে তাঁর মানহানি হয়েছে—এ ভুল ধারণা আপনার কি করে জন্মালো? তিনি স্নেহ-বশে মনে করেছেন, আমার কষ্ট হবে, কিন্তু কষ্ট হবে না এইটেই শুধু ভদ্রলোককে জানিয়ে দিলুম। এতে মান-অপমানের কথা ত কিছুই নেই বিলাসবাবু।" বিলাসের গাম্ভীর্য্যের মাত্রা তাহাতে বিন্দুমাত্র কমিল না ; সে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "ওটা কথাই নয়। বেশ, আপনার এষ্টেটের দায়িত্ব নিজে নিতে চান্, নিন ; কিন্তু, এর পরে বাবাকে আমার সাবধান করে দিতেই হবে, নইলে পুত্রের কর্ত্তব্যে আমার ত্রুটি হবে।" এই অচিন্তনীয় রূঢ় প্রত্যুত্তরে বিজয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া অত্যন্ত ব্যথার সহিত কহিল, "বিলাসবাবু, এই সামান্য বিষয়টাকে যে আপনি এমন কোরে মনে নিয়ে এত গুরুতর কোরে তুল্‌বেন, এ আমি মনেও করিনি। ভাল, আমার বোঝবার ভুলে যদি অন্যায়ই কোরে থাকি, আমি অপরাধ স্বীকার করচি, ভবিষ্যতে আর হবে না।" বলিয়া বিজয়া বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। সে ভাবিয়াছিল, ইহার পরে কাহারও কোন কথাই আর থাকিতে পারে না—দোষ-স্বীকারের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার সমাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না যে, দুষ্ট-ব্রণের মত এমন মানুষও আছে, যাহার বিষাক্ত ক্ষুধা একবার কাহারও ত্রুটির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর কোন মতেই নিবৃত্ত হইতে চাহে না। তাই, বিলাস যখন প্রত্যুত্তরে কহিল, "তাহলে পূর্ণ গাঙুলিকে জানিয়ে পাঠান যে, রাসবিহারীবাবু যে হুকুম দিয়েছেন, তার অন্যথা করা আপনার সাধ্য নয়" তখন বিজয়ার দৃষ্টির সম্মুখে তাহার হিংস্র প্রবৃত্তিটা একমুহূর্ত্তেই একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দিল। সে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে-ধীরে কহিল, "সেটা কি ঢের বেশী অন্যায় কাজ হবে না? আচ্ছা,

আমি নিজেই না হয় চিঠি লিখে তাঁর অনুমতি নিচ্চি।" বিলাস বলিল, "এখন অনুমতি নেওয়া-না-নেওয়া দুই-ই সমান। আপনি যদি তাঁকে সমস্ত গ্রামের মধ্যে অশ্রদ্ধার পাত্র করে তুল্‌তে চান, আমাকেও তা'হলে অত্যন্ত অপ্রিয় কর্ত্তব্য পালন করতে হবে।" বিজয়ার অন্তরটা অকস্মাৎ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আত্মসংযম করিয়া ধীরভাবে প্রশ্ন করিল, "এই কর্ত্তব্যটা কি শুনি?" বিলাস বলিল, "আপনার জমিদারী-শাসনের মধ্যে তিনি যেন আর হাত না দেন।" "আপনার নিষেধ তিনি শুন্‌বেন, আপনি মনে করেন?" "অন্ততঃ, সেই চেষ্টাই আমাকে করতে হবে।" বিজয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অন্য দিকে চাহিয়া তেমনি শান্ত কণ্ঠেই জবাব দিল, "বেশ, আপনি যা পারেন করবেন; কিন্তু, অপরের ধর্ম্ম-কর্ম্মে আমি বাধা দিতে পারব না।" তাহার কণ্ঠস্বরের মৃদুতা সত্ত্বেও তাহার ভিতরের ক্রোধ গোপন রহিল না। বিলাস তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনার বাবা কিন্তু এ কথা বল্‌তে সাহস করতেন না।" বিজয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিল; কহিল, "আমার বাবার কথা আপনার চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি, বিলাস বাবু! কিন্তু, সে নিয়ে তর্ক করে কি হবে? – আমার স্নানের বেলা হ'ল, আমি উঠ্‌লুম।" বলিয়া সে সমস্ত বাক্‌-বিতণ্ডা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্রই ক্রোধোন্মত্ত বিলাসের মুখের উপর হইতে তাহার ধার-করা ভদ্রতার মুখোস একমুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িয়া গেল। সে নিজের স্বভাবটাকে একেবারে অনাবৃত উলঙ্গ করিয়া দিয়া, নিরতিশয় কটু কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, "মেয়েমানুষ জাতটাই এম্‌নি নেমকহারাম।" বিজয়া পা বাড়াইয়াছিল, বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পলকমাত্র এই বর্ব্বরটার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া, নিঃশব্দে ধীরে-ধীরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বিলাস শুষ্ক হইয়া উঠিল। সে যে পিতৃভক্তির আতিশয্য-বশতঃই বিবাদ করিতেছিল, এ ভ্রম যেন কেহ না করেন। এ সকল লোকের স্বভাবই এই যে, ছিদ্র পাইলেই তাহাকে নিরর্থক বড় করিয়া দুর্ব্বলকে পীড়া দিতে, ভীতকে আরও ভয় দেখাইয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিতেই আনন্দ অনুভব করে,—তা সে যাই হোক, এবং হেতু যত অসংলগ্নই হোক্‌। কিন্তু, বিজয়া যখন তিলার্দ্ধ অবনত না হইয়া তাহাকেই তুচ্ছ করিয়া দিয়া ঘৃণাভরে চলিয়া গেল, তখন এই গায়ে-পড়া কলহের সমস্ত ক্ষুদ্রতা তাহাকে তাহার নিজের কাছেও অত্যন্ত ছোট করিয়া ফেলিল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, মুখখানা কালী করিয়া আস্তে-আস্তে বাড়ী চলিয়া গেল। অপরাহ্ণকালে রাসবিহারী ছেলে সঙ্গে করিয়া দেখা করিতে আসিলেন। বলিলেন, "কাজটা ভাল হয়নি মা। আমার হুকুমের বিরুদ্ধে হুকুম দেওয়ায় আমাকে ঢের বেশি অপ্রতিভ করা হয়েচে। তা' যাক, বিষয় যখন তোমার, তখন এ-কথা নিয়ে আর অধিক ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইনে। কিন্তু বারংবার এ রকম ঘটলে আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে আমাকে তফাৎ হতেই হবে, তা' জানিয়ে রাখ্‌চি।" বিজয়া কোন উত্তর দিল না; বরঞ্চ, মৌনমুখে সে অপরাধটা এক রকম স্বীকার করিয়াই লইল। রাসবিহারী তখন কোমল হইয়া বিষয় সংক্রান্ত অন্যান্য কথাবার্ত্তা তুলিলেন। নূতন তালুকটা খরিদ করিবার আলোচনা শেষ করিয়া বলিলেন, "জগদীশের দরুণ বাড়ীটা যখন তুমি সমাজকেই দান করলে মা, তখন আর বিলম্ব না করে এই পূজার ছুটিটা শেষ হলেই তার দখল নিতে হবে—কি বল?" বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আপনি যা' ভাল বুঝবেন, তাই হবে। টাকা পরিশোধ করবার মিয়াদ ত তাঁদের শেষ হয়ে গেছে!" রাসবিহারী কহিলেন, "অনেকদিন। জগদীশ তার সমস্ত খুচ্‌রা ঋণ একত্র করবার জন্যে তোমার বাবার কাছে আট বছরের কড়ারে দশ হাজার টাকা কর্জ্জ নিয়ে কবালা লিখে দেয়। সর্ত্ত ছিল, এর মধ্যে শোধ দিতে পারে ভালই; না পারে, তার বাড়ী-বাগান-পুকুর—তার সমস্ত সম্পত্তিই আমাদের। তা' আট বৎসর পার হয়ে এটা ত নয় বৎসর চল্‌ছে মা।" বিজয়া কিছুক্ষণ অধোমুখে নীরবে বসিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "শুনতে পাই, তাঁর ছেলে এখানে আছেন; তাঁকে ডেকে আরো কিছুদিন সময় দিয়ে দেখ্‌লে হয় না, যদি কোন উপায় করতে পারেন?" রাসবিহারী মাথা নাড়িতে-নাড়িতে কহিলেন, "তা' পারবে না—পারবে না। পার্‌লে—" পিতার কথাটা শেষ না হইতেই বিলাস হঠাৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে কোনরূপে ধৈর্য্য ধরিয়া ছিল; আর পারিল না। কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল, "পারলেই বা আমরা দেব কেন? Business is business! টাকা নেবার সময় সে মাতালটার হুঁস ছিল না—কি সর্ত্ত

করচি? এ শোধ দেব কি কোরে?" বিজয়া বিলাসের প্রতি একবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই রাসবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন; তাঁর সম্বন্ধে সসম্মানে কথা কইতে বাবা আমাকে আদেশ করে গেছেন—" বিলাস পুনরায় তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "হাজার করে গেলেও সে যে একটা—"

রাসবিহারী বাধা দিয়া উঠিলেন—"তুমি চুপ কর না বিলাস।" বিলাস জবাব দিল, "এ সব বাজে Sentiment আমি কিছুতে সইতে পারিনে—তা' সে কেউ রাগই করুক, আর যাই করুক। আমি সত্য কথা বল্‌তে ভয় পাইনে, সত্য কাজ করতে পেছিয়ে দাঁড়াইনে!" রাসবিহারী উভয় পক্ষকেই শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে হাসিবার মত মুখ করিয়া বারবার মাথা নাড়িতে-নাড়িতে বলিতে লাগিলেন, "তা' বটে, তা বটে। আমাদের বংশের এই স্বভাবটা আমারও গেল না কি না! বুঝ্‌লে না, মা, বিজয়া,—আমি আর তোমার বাবা এই জন্যেই সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করতে ভয় পাইনি।" বিজয়া কহিল, "বাবা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে আদেশ করে গিয়েছিলেন, ঋণের দায়ে তাঁর বাল্যবন্ধুর বাড়ীঘর যেন বিক্রী করে না নিই।" বলিতে-বলিতেই তাহার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। স্নেহময় পিতার যে অনুরোধ তাঁহার জীবিতকালে অসঙ্গত খেয়াল বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, আজ তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহাই দুরতিক্রম্য আদেশের মত তাহাকে বাধা দিতেছে। বিলাস কহিল, "তবে তিনিই কেন সমস্ত দেনাটা নিজে ছেড়ে দিয়ে গেলেন না শুনি?" বিজয়া তাহার কোন উত্তর না দিয়া, রাসবিহারীর মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরায় কহিল, "জগদীশ-বাবুর পুত্রকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে সমস্ত কথা জানানো হয়, এই আমার ইচ্ছে।" তিনি জবাব দিবার পূর্ব্বেই বিলাস নির্লজ্জের মত আবার বলিয়া উঠিল, "আর সে যদি আরো দশ বৎসর সময় চায়? তাই দিতে হবে না কি? তা'হলে দেশে সমাজ-প্রতিষ্ঠার আশা সাগরের অতল গর্ভে বিসর্জ্জন দিতে হবে দেখ্‌চি!" বিজয়া ইহারও কোন উত্তর না দিয়া রাসবিহারীকেই লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনি একবার তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে, এ বিষয়ে তাঁর কি ইচ্ছা, জানতে পারবেন না কি?" রাসবিহারী অতিশয় ধূর্ত্ত লোক; সে ছেলের ঔদ্ধত্যের জন্য মনে-মনে বিরক্ত হইলেও, বাহিরে তাহারই মতটাকে সমীচীন প্রমাণ করিবার জন্য একটুখানি ভূমিকাচ্ছলে শান্ত ধীরভাবে কহিল, "দেখ মা, তোমাদের মতান্তরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির কথা কওয়া উচিত নয়—কারণ, কিসে তোমাদের ভালো, সে আজ না হয় কাল, তোমরাই স্থির করে নিতে পারবে, এ বুড়োর মতামতের আবশ্যক হ'বে না। কিন্তু কথা যদি বল্‌তে হয়, মা, বল্‌তেই হবে—এ-ক্ষেত্রে তোমারই ভুল হচ্ছে। জমিদারী চালাবার কাজে আমাকেও বিলাসের কাছে হার মান্‌তে হয়—সে আমি অনেকবার দেখেচি। আচ্ছা, তুমিই বল দেখি, কার গরজ বেশী, তোমার, না জগদীশের ছেলের? তার ঋণ পরিশোধের সাধ্যই যদি থাকৃত, সে কি নিজে এসে একবার চেষ্টা করে দেখ্‌ত না? সে তো জানে, তুমি এসেচ? এখন আমিই যদি উপযাচক হয়ে তাকে ডাকিয়ে পাঠাই, সে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের সময় নেবে, কিন্তু, তাতে ফল শুধু এই হবে, যে, সে টাকাও দিতে পারবে না, তোমাদের সমাজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পও চিরদিনের জন্যে ডুবে যাবে। বেশ কোরে ভেবে দেখ দেখি মা, এই কি ঠিক নয়?" বিজয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী ক্ষণকাল পরে কহিল, "বেশ ত, তার অগোচরে ত কিছুই হতে পারবে না। তখন নিজে যদি সে সময় চায়, তখন না হয় বিবেচনা কোরেই দেখা যাবে। কি বল মা?" বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আচ্ছা।" কিন্তু তথাপি তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, সে মনে-মনে এই প্রস্তাব অনুমোদন করে নাই। রাসবিহারী আজ বিজয়াকে চিনিলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন, এ মেয়েটির বয়স কম,—কিন্তু, সে যে তাহার পিতার বিষয়ের মালিক, ইহা সে জানে, এবং তাহাকে মুঠার ভিতরে আনিতেও সময় লাগিবে। সুতরাং, একটা কথা লইয়াই বেশি টানা-হেঁচড়া সঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া সান্ধ্য উপাসনার নাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বিজয়া প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বিজয়া মুহূর্ত্তকাল মাত্র চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "আমার অনেকগুলো চিঠিপত্র লিখতে আছে,—আপনার কি আমাকে কোন আবশ্যক আছে?" বিলাস রূঢ়ভাবে জবাব দিল, "কিছু না। আপনি যেতে পারেন।" "আপনাকে চা পাঠিয়ে দিতে বোল্‌ব কি?" "না, দরকার নেই" "আচ্ছা, নমস্কার" বলিয়া বিজয়া দুই করতল একবার একত্র করিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

কোনারক

[শ্রীগুরুদাস সরকার, এম্‌-এ]

(৩)

রথ সপ্তমীর দিন প্রাতঃস্নালে লোকে স্নানের পর রথারূঢ় সূর্য্যদেবকে দেখিতে পায় বলিয়া একটি প্রবাদ আছে। এই সময়ে নিকটস্থ চন্দ্রভাগা তীর্থে মেলা বসিয়া থাকে। লোকে প্রাতঃকালে নবোদিত সূর্য্যকে দর্শন করিয়া আসিয়া কোনারকের নবগ্রহ প্রস্তরের পূজা করিয়া থাকে। পূর্ব্ব-কথিত য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মতে, এ প্রথাটি কোনও প্রাচীনতম অনুষ্ঠানের অবশেষমাত্র। রথ-সপ্তমীর সময় সূর্য্যদেব অগ্নিকোণে মকর ও মেষরাশির মধ্যস্থলে অবস্থিতি করেন। পর্ব্বকালে সূর্য্যদেব এই জ্যোতিষিক "কোণে" অবস্থিত থাকেন বলিয়াই "কোনারক" নাম হইয়াছে— সাহেব বাহাদুরের ইহাই অনুমান। বর্ত্তমান কালে অনুষ্ঠানের মোটামুটি আনুমানিক সময়—মাঘের সপ্তম দিবসে— সূর্য্যদেবের স্থিতি অগ্নিকোণ হইতে প্রায় ১৭॥০ ডিগ্রি দূরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে বিষুব বা Equinox এর বিপরীত গতি বৎসরে এক "মিনিট" করিয়া। মেলার প্রথম অনুষ্ঠান ও মন্দির-নির্ম্মাণকাল সমসাময়িক বলিয়া লইয়া, সূর্য্যদেবের মকর ও মেষ-রাশির ঠিক মধ্যস্থলের অবস্থিতির সময় গণনা করিলে, এবং উহাতে আর দুই-চারি বৎসর যোগ দিলে, প্রায় খৃঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে আসিয়া পড়ে এবং আবুল ফজল-কথিত মন্দির-নির্ম্মাণের সময়ের সহিত প্রায় মিলিয়া যায়। আবুল ফজলের মত এখন সর্ব্ববাদীক্রমে অগ্রাহ্য বলিয়াই স্বীকৃত এবং অবিসংবাদী তাম্রলিপিও তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিতেছে; * নতুবা এই সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচায়ক মতটি চলিয়া যাইত কি না বলা যায় না।

* (Mr. N. N. Vasu's paper in the J. A. S. B., 1896, p. 251; on Copperplate Narsingh Deva II)

কোনারকে সাল ও তারিখ-সম্বলিত কোনও খোদিত লিপি পাওয়া যায় না। ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একখানি লিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন; তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বেহার ও উড়িষ্যা অনুসন্ধান-সমিতির পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। (J. B. O. R. S., Vol III. Pt. II.)। এ লিপিতে কোনও তারিখ নাই; মাত্র তিনজন কর্ম্মচারীর নাম ও পদবী অবগত হওয়া যায়। "শ্রীদশ ভাণ্ডার অধিকারী বলীকি নাএকা। ভাণ্ডার নাএক। উং অণান্ন´ নাএকা. কোঠকরণ অঙ্গাই নাএক।" 'বলীকি' বোধ হয় "বাল্মীকি" শব্দের অপভ্রংশ। উং সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র। বলীকি নাএকা বা নায়ক "দশ" ভাণ্ডারের কর্ত্তা ছিলেন। অণান্ন´ নায়ক সাধারণ ভাণ্ডারের কর্ত্তা ছিলেন। অঙ্গাই নায়ক কোঠকরণ বা হিসাব-রক্ষক (accountant) ছিলেন। ইঁহারা যে মন্দির-সংক্রান্ত কার্য্যেই নিয়োজিত ছিলেন

"কোণকোণ কুটীর কমটীকর দুষ্করশ্মেঃ অষ্টাশাং চক্রবাল ভ্রমণরণ মহায়স সম্ভবিত ক্ষুৎক্ষারেক্ষুদগ্ধ দস্তোপগমিতমপি লংঘয়িত্বা স্বরাব্ধিং সর্পিঃ সব্দর্প দাথুর্দধি মধুরমথাস্বাদ্য দুগ্ধেনতৃপ্তাষৎকীর্ত্তিঃ কান্তমূর্ত্তিঃ সন্নিনিধিমথা কামসারাসতীব।"

তিনি (রাজা প্রথম নৃসিংহদেব) কোনাকোনো নামক সুবিখ্যাত স্থানে অন্যান্য দেবতাগণের সহিত একত্র বাসের জন্য সূর্য্যদেবের নিমিত্ত একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রিয়-দর্শন যশ পৃথিবীর অষ্টদিক পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া লবণ ও ইক্ষু-সমুদ্রে জল পান করিত; কিন্তু ইহা যথেষ্ট না হওয়ায় সুধাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া স্বাস্থ্যপ্রদ সর্পি গ্রহণ করিত; পরে দধি ও দুগ্ধ-সমুদ্রে দধি আস্বাদন ও দুগ্ধ পানে পরিতৃপ্ত হইয়া অন্য সাগরাদিতে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিত। (রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের তাম্রলিপি।)

তাহাতে সন্দেহ নাই। লিপিটি প্রাচীন উড়িয়া অক্ষরে লিখিত। ১৬২৭—২৮ খৃঃ অব্দে সূর্য্যমন্দির পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। এই সময়ে রাজা মুকুন্দ-দেবের আদেশ অনুসারে মন্দিরের পরিমাপ প্রভৃতি লওয়া হইয়াছিল (J. A. S. B. 1908, pp. 302, 3?2)। সুতরাং এই কর্ম্মচারিত্রয় ইহার পূর্ব্বেই নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া অনুমিত। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর অনুমান করেন যে, মন্দির-নির্ম্মাতা রাজা নরসিংহ দেবের রাজত্বকাল হইতে (১২৩৮-১২৬৪ খৃঃ অব্দ) ১৬২৭-২৮ খৃ অব্দের মধ্যে কোনও সময়ে লিপিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পাদে, মন্দির নির্ম্মাণ সময়েও, এরূপ লিপি খোদিত হওয়া অসম্ভব নহে।

প্রবাদ আছে, মন্দিরের শিখর-দেশ সংলগ্ন একটি সুবৃহৎ চুম্বক পাথর জাহাজের লৌহময় অংশ টানিয়া লইয়া নাবিকগণকে বড়ই বিপন্ন করিত। মুসলমানেরা এজন্য চুম্বকটি স্থানচ্যুত করায় মন্দিরটি ক্রমশঃ ধ্বংস মুখে পতিত হয়। কালাপাহাড় এই প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এরূপ প্রবাদও শুনিতে পাওয়া যায়। আরব্য উপন্যাসে সিন্ধবাদ বণিকের উপাখ্যানে এইরূপ চুম্বক-প্রস্তর-বিশিষ্ট মন্দিরের উল্লেখ আছে, এবং প্রবাদটিও বেশ মুখরোচক বটে; কিন্তু ইহার ভিত্তি একটি দ্ব্যর্থ-বোধক কথার ভ্রমাত্মক অর্থ মাত্র। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ তাঁহার "কোনার্ক" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে উড়িষ্যায় চলিত কথায় চুম্বককে "কুম্ভ" পাথর বলিয়া থাকে। মুসলমানেরা মন্দিরের চূড়াস্থিত "কুম্ভ" বা প্রস্তর-কলসটিকে বিনষ্ট করায় এইরূপ কাহিনীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। মন্দিরটি ধ্বংস হওয়ার কারণ সম্বন্ধেও নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ভিন্সেন্টস্মিথ তাঁহার শিল্পকলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, মন্দিরটি অসমাপ্ত অবস্থাতেই রহিয়া যায়। কাহারও মতে নির্ম্মাণ দোষে ভিত্তি বসিয়া যাওয়ায় এবং কাহারও-কাহারও মতে অশনি-নিপাত বা ভূমিকম্প-নিবন্ধন মন্দিরের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দু ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মন্দির-নির্ম্মাতা প্রাচীন স্থপতিগণের শিল্প-শাস্ত্রে অজ্ঞতা বা কেবল বহিঃসৌষ্ঠবের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টির কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহার মতে, আমলা বা অমৃতশিলা নামক প্রস্তরখণ্ডে ভারে খিলানের প্রস্তরগুলি স্ব-স্ব স্থানে দৃঢ় সন্নিবিষ্ট ছিল। এই অমৃত-শিলাখানি বিনষ্ট হওয়া অপর প্রস্তরগুলিও ক্রমশঃ স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে ১২৮০ (১২৬৪ ?) খৃঃ অব্দে রাজা প্রথম নরসিংহ বা লাঙ্গুল নরসিংহ দেবের মৃত্যু নিবন্ধন কোনারক মন্দিরের বিমান অসমাপ্তই থাকিয়া যায়; মন্দির-ধ্বংসের ইহাই এখন প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত।

সে যাহা হউক, মন্দির-ধ্বংসে মানবের সহায়তাও যে নিতান্ত কম ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য। Major Kittoe (মেজর কিটো) ১৮৩৮ অব্দের J. A. S. B. পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন কোনারকে গমন করেন, সে সময় খুরদার রাজার আদেশ ক্রমে প্রবেশ দ্বারের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছিল।

মন্দিরে মাল-মসলাই যে কত লাগিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। দেখিলাম, মন্দিরের সন্নিকটে বড়-বড় লোহার কড়ি পড়িয়া আছে। সে কালের কর্ম্মকারগণ যে কি করিয়া এরূপ বৃহদায়তন দ্রব্য ঢালাই করিত, তাহা ভাবিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। রাজা রাজেন্দ্র-লাল একটি কড়ির মাপ লইয়াছিলেন। উহা দৈর্ঘ্যে ২১ ফিট এবং স্থূলতায় ৮×১০। যাঁহারা দিল্লী নগরীর প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি সেই সুবিশাল লৌহময় স্তম্ভ দর্শন করিয়াছেন, এরূপ দুই-চারিটি কড়ি আর তাঁহাদের নিকট বড় বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইবে না। মিঃ আর্ণট নামক কোনও উচ্চপদস্থ ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই লৌহ-বীমগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশের সুকৌশল সংযোজনে নির্ম্মিত। পরে তাহার উপর গলিত লৌহ ঢালিয়া দিয়া ঢালাই-করা জয়েন্টের ন্যায় আকৃতি দেওয়া হইয়াছে। বাহির হইতে যেরূপ ভারসহ বলিয়া বোধ হয়, ভিতরে সেরূপ দৃঢ় নহে বলিয়া, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এগুলিকে whitened sepulchre বা চুণকাম-করা গোরস্থানের সহিত তুলনা

করিয়াছেন। পণ্ডিত বিষণস্বরূপ মহাশয়কে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশ সংযোজন করার কথাটা মানিয়া লইতে হইয়াছে; কিন্তু তিনি উপরে গলিত লৌহ ঢালিয়া জোড়গুলি ঢাকিয়া দেওয়ার কথা স্বীকার করেন না। পুরী মন্দিরের জগমোহনেও লোহার কড়ির ব্যবহার আছে। ইঞ্জিনিয়ার সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের মতে, এগুলি একপ্রকার ইস্পাতের নির্ম্মিত (rolled mild steel).

মন্দির ত তৈয়ারী হইয়াছে কোন কালে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা বাদানুবাদের নিবৃত্তি হয় নাই। অনেকের মতে পাথরগুলি খোদাই করিয়া লাগান হয় নাই; স্বস্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়ার পর in situ খোদাই করা হইয়াছে।

তাহাই না হয় হইল; কিন্তু ৩৭৪টন ভারি পাথর উপরে উঠাইল কি করিয়া? একটি গজসিংহের মাপ লইয়া দেখা গিয়াছিল যে, সেটি উচ্চে ২০ ফিট, তলদেশের পরিমাণ ১৫ ফিট এবং চওড়া ৪ ফিট ৭ ইঞ্চি। মূর্ত্তিটি দুই খণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত।

কেহ-কেহ বলেন, চারি দিকে ঢালু বাঁধ বাঁধিয়া, উহার উপর দিয়া পাথরগুলি টানিয়া বা গড়াইয়া তোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ বলেন, সেকালের লোকে pully বা কপিকলের ব্যবহার জানিত; সুতরাং কপিকলের সাহায্যে উত্তোলন করাই সম্ভব।

যাউক সে কথা; দৃশ্য-সমুচ্চয়ের একটি স্মৃতিচিত্র রাখিবার জন্য বেষ্টনীর নিকটে দাঁড়াইয়া দৃষ্টিপাত করিতেই, মনুষ্য বা দানবদেহ-পদদলনকারী অশ্বমূর্ত্তি ও কয়েকটি গজ ও গজসিংহ মূর্ত্তি দৃষ্টি-পথে পড়িল। অশ্বগুলি সুগঠিত; কিন্তু কাহারও কাহারও মতে নাসিকায় না কি কিঞ্চিৎ রোমক-ভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এগুলি রথ-সন্নদ্ধ অশ্ব-রূপে পূর্ব্বদ্বারের সোপানাবলীর পার্শ্বদেশে অবস্থিত ছিল। সূর্য্যের সপ্তাশ্ব যে সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণ-সম্ভূত সাতটি বর্ণেরই নিদর্শন-স্বরূপ, এরূপ ব্যাখ্যাও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আনুষ্ঠানিক হিন্দুগণ ইহা স্বীকার করিবেন কি না জানি না। মীমাংসার ভার শাস্ত্রদর্শী ও বৈজ্ঞানিক-গণের উপর অর্পণ করিয়া আপাততঃ নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে।

মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অশ্বটির বর্ণনা-প্রসঙ্গে হেভেল (Havell) সাহেব বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ইহা একটি সুমহান্ দৃষ্টান্ত। কোনারকের এই সকল মূর্ত্তির তুলনায় তিনি সুবিখ্যাত এলগিন্ মার্বল (Elgin marbles) নামধেয় গ্রীকশিল্পের মর্ম্মর-নিদর্শনগুলিকেও উড়িয়া শিল্প-কলার নিম্নে স্থান দিতে সঙ্কুচিত নহেন। শ্রীযুক্ত হেভেলের মতে গৌরবদীপ্ত জয়শ্রীমণ্ডিত এইরূপ সুবৃহৎ অশ্বমূর্ত্তি।

ভেনিস নগরীর বর্দ্ধকী (Sculptor) প্রথিতযশা ভেরো-চিও'র (Verrochio) শিল্প-নিদর্শনের সহিত অনায়াসেই তুলনা করা যাইতে পারে; ভেরোচিও খৃঃ ১৪৮৮ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি বার্ত্তলমেও কলেওনির (Bartolomeo Colloeni) যে অশ্বারোহী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত।

হেভেল সাহেব এই মূর্ত্তির অশ্বটীকে কোনারকের পূর্ব্বোক্ত অশ্বমূর্ত্তির সহিত তুলনায় যে প্রশংসা করিয়াছেন ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাহা অত্যুক্তি-দুষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার মতে হস্তীগুলির ভঙ্গীই অধিক সতেজ ও সজীবতা-পূর্ণ। বাস্তবিকই হস্তীগুলির বেশ স্বাভাবিক ভাব; জীবিত মাতঙ্গের তুলনায় দেখিতে বড় মন্দ নহে। কিন্তু সিংহ-মূর্ত্তিগুলি একবারেই কাল্পনিক অনেকটা বিদেশী উপকথার গ্রিফিন্ (griffin) বা (dragon) ড্রাগনের ন্যায়।

মধ্যভারতে খাজরাহোর বিশ্বনাথ-মন্দিরে এ শ্রেণীর একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত হস্তীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার পদচতুষ্টয়ের সামঞ্জস্যহীন হ্রস্বতায় মূর্ত্তিটি কেমন যেন কদাকার বলিয়া মনে হয়। মাহুতটি স্কন্ধদেশে শায়িত। সম্মুখে একটি নরমূর্ত্তি পতিত; তাহার পদদ্বয় হস্তীর সম্মুখ-ভাগে বিস্তৃত।

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, কোনারক মন্দির ধ্বংস হইলে, এই সকল শার্দ্দুল ও অশ্ব প্রভৃতি মন্দিরের তিনটি প্রবেশ-দ্বারের নিকটে ভগ্নাবস্থায় পতিত

ছিল। পূর্ত্ত-বিভাগের মিঃ ডেভিড নামক জনৈক সাহেব যেন তেন প্রকারে এগুলি "খাড়া" করিয়া সংস্থাপিত করেন। কিন্তু অজ্ঞতাক্রমে মন্দিরের দিকে পশ্চাৎদেশ না করিয়া মূর্ত্তিগুলির মুখ মন্দিরের দিকেই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

কোন-কোনও পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, এই গজারূঢ় সিংহগুলি উড়িষ্যা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়নকারী কেশরী-রাজগণের কীর্ত্তি জ্ঞাপন করিতেছে। হস্তী না কি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠ-পোষক রাজা অশোকের শিলালিপির সন্নিকটে বা তৎপ্রতিষ্ঠিত স্তম্ভগুলিতে হস্তীমূর্ত্তি বা হস্তী আলম্বন (elephant frize) প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে। জাতক-কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার মাতা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, একটি শ্বেতহস্তী যেন তাঁহার দক্ষিণপার্শ্ব ভেদ করিয়া গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কথিত আছে, বুদ্ধদেব না কি কোনও পূর্ব্বজন্মে শ্বেত-হস্তী রূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানকালে শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেক বিষয়ই রূপক বা Symbol ভাবে গ্রহণ করা একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জগন্নাথ মন্দিরের ত্রিমূর্ত্তি, বৌদ্ধচিহ্ন চক্র ও ত্রিশূলের anthropomorphic development বা জড়বস্তুতে মানবীয় রূপাদি আরোপের ক্রমবিকাশ বলিয়া উক্ত হইয়াছিল। এখন এই মত সরকারী Gazetterএও স্বীকৃত নহে।

প্রবাদ আছে যে, মুসলমানেরাও এক সময়ে কোনারক মন্দিরটী দাবী করিতে ছাড়েন নাই। আবুল ফজল আইন-ই-আক্‌বরী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইহাদিগের মধ্যে কেহ-কেহ ইহা কবীর মুয়াহিদ নামক সাধুপুরুষের সমাধি বলিয়া প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। কথিত আছে, মুয়াহিদ হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ভক্তির পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শব কিরূপে সংকার করা হইবে, তাহাই লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে শবের বস্ত্রাবরণ তুলিয়া সকলে দেখিতে পায় যে, শব অন্তর্হিত হইয়াছে।—*Ain-i-Akbari—Col. H. E. Jarret p. 129.*

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে বোধ হয় Gladwi[n] অবলম্বনে কোনারক কবীর Mowelhidএর (মৌয়েলহিদ সমাধিস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। Mowelhid শব্দ বোধ হয় লিখিবার ভুল। কবীর মুয়াহ্‌হিদ্ (mua'h-hid বা একেশ্বরবাদ-প্রচারক নামে বিখ্যাত। গ্লাড্‌উই[ন] লিখিয়াছেন যে, শবাবরণ-বস্ত্রটি উত্তোলন করিলে কবীরে[র] মৃতদেহ আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মূল পুস্তকে এ কথা লিখিত নাই (Trans. Col. HS. Jarrett p. 129); তবে এ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে।

মৃত্যুর পর শবের সংকার লইয়া হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ উপস্থিত হইলে, কবীর নাকি হঠাৎ সেখানে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়েন। তাহার পর শবাধার বস্ত্র উত্তোলন করিয়া সুন্দর কুসুমদাম ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। এই কুসুম-গুলির কতকাংশ হিন্দুমতে দাহ এবং কতকাংশ মুসলমান মতে প্রোথিত করা হইয়াছিল।

পুরীতে একটি 'কবীরমঠ' আছে। "পশ্চিমা"-যাত্রিগণ অনেকেই এক চামচ ricewater বা ফেনক-প্রসাদের প্রত্যাশায় সেখানে গমন করিয়া থাকেন।

Tavernier (টাভার্ণিয়ে) স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, পুরীর শ্বেত দেউল (Pagoda) সান্নিধ্যে কবীর নামক একজন ধর্ম্মোপদেশকের সমাধি আছে। সে স্থানে মৃত মহাপুরুষের সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

উত্তর-পশ্চিম (বর্ত্তমান United Provinces) বা মধ্যপ্রদেশস্থ রতনপুরও কবীরের সমাধি-স্থান বলিয়া বিখ্যাত। কবীর—১৩৮০ হইতে ১৪২০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নিজ মত প্রচার করিয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পুরীর শ্বেতদেউল সান্নিধ্যে সমাধি থাকার প্রবাদ কোনারকের কৃষ্ণদেউলেও আরোপিত হইয়া থাকিবে। জনপ্রবাদ কোন কালেই স্থান বা অর্থ সামঞ্জস্যের অপেক্ষা রাখে না।

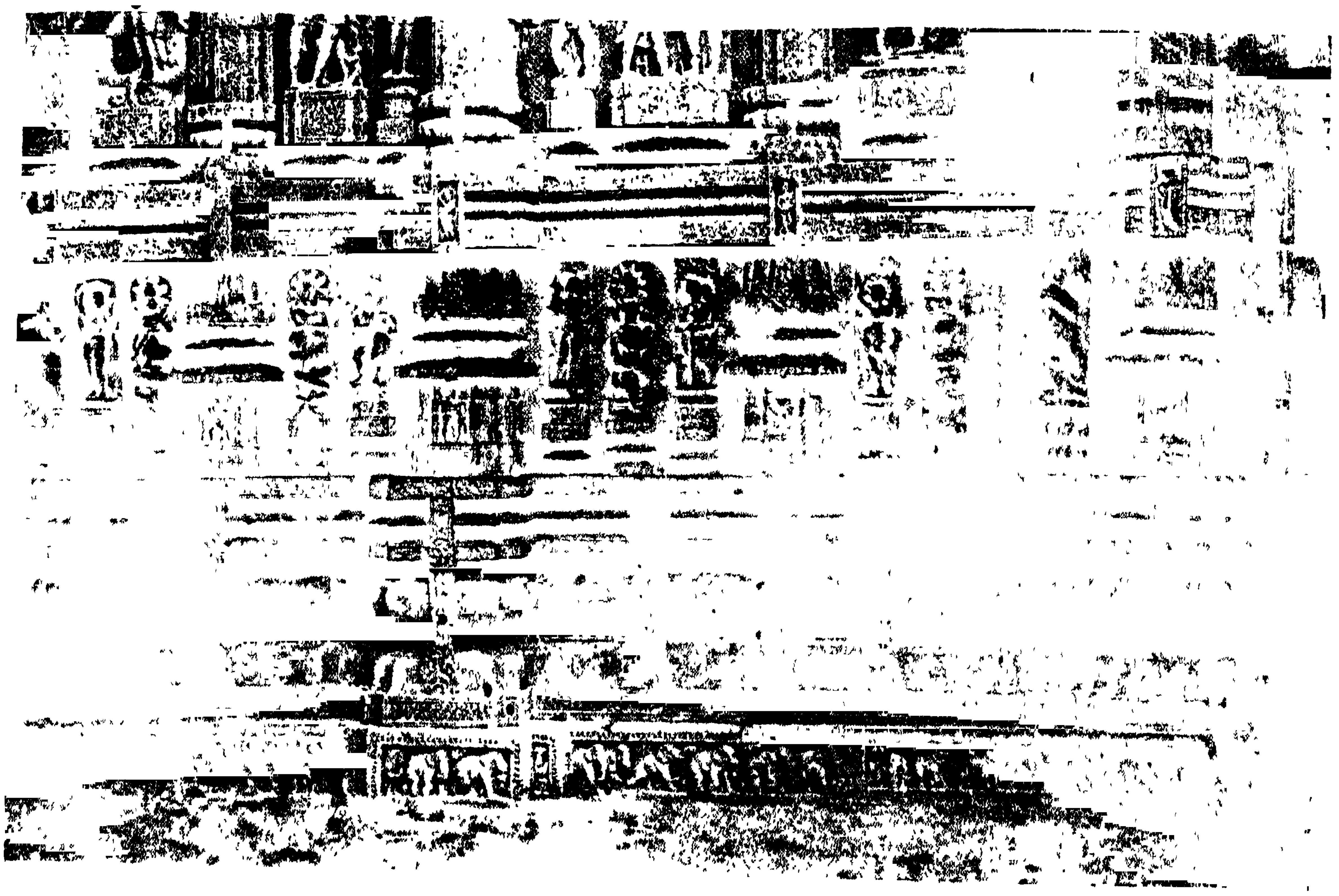

[illegible] প্রস্তর-শিল্প

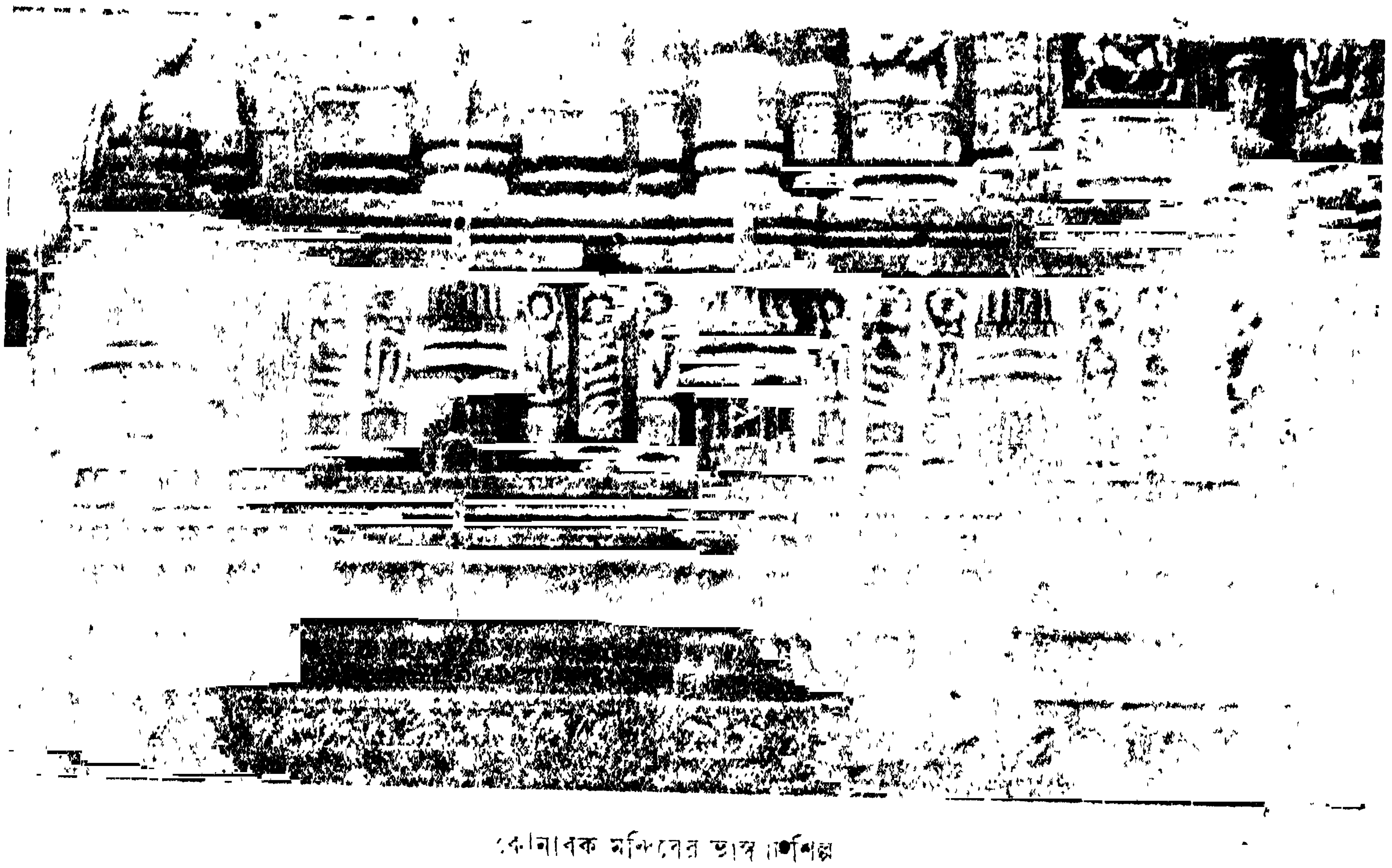

কোনারক মন্দিরের ভাস্কর্যশিল্প

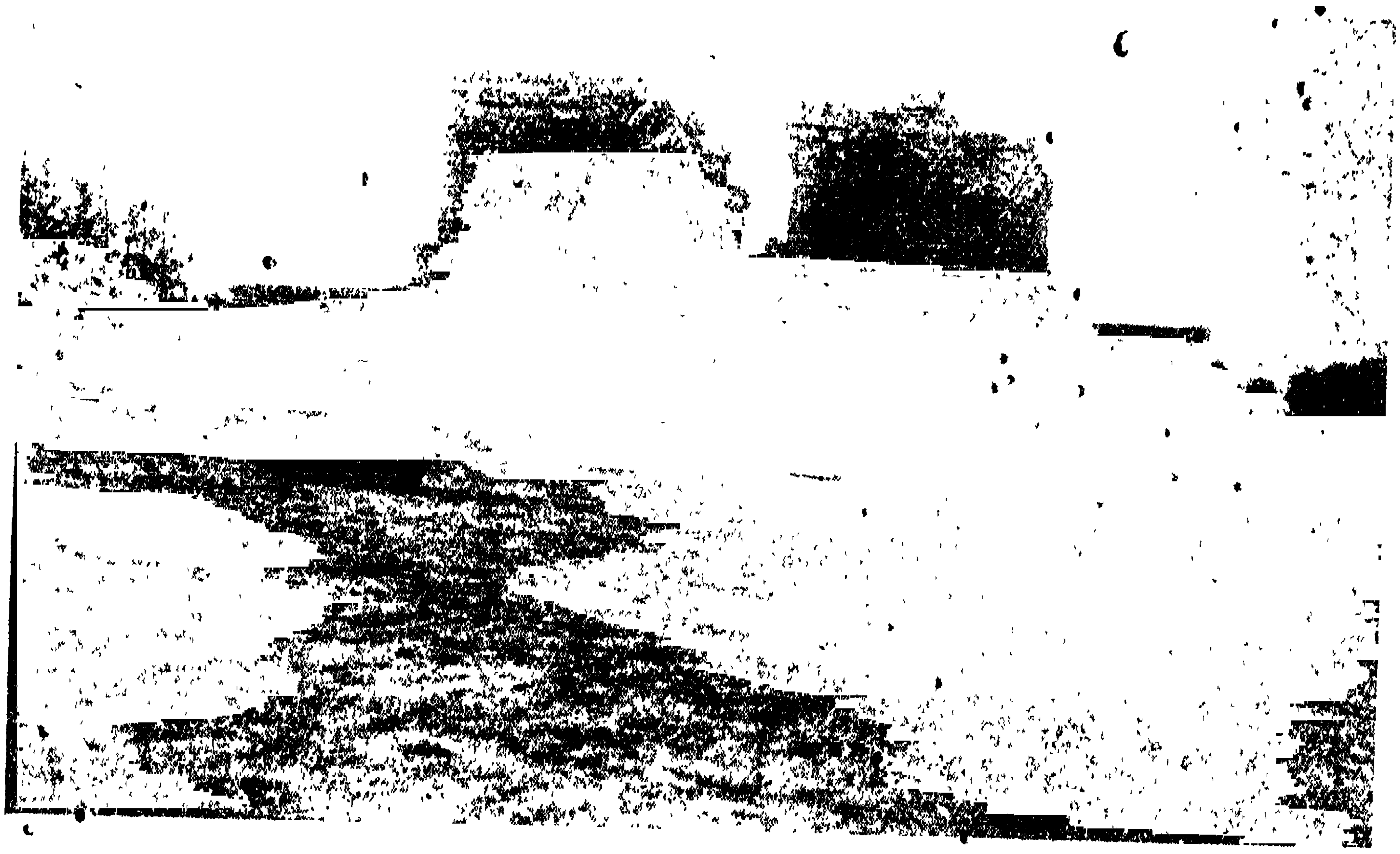

নাটমন্দির - কোনারক

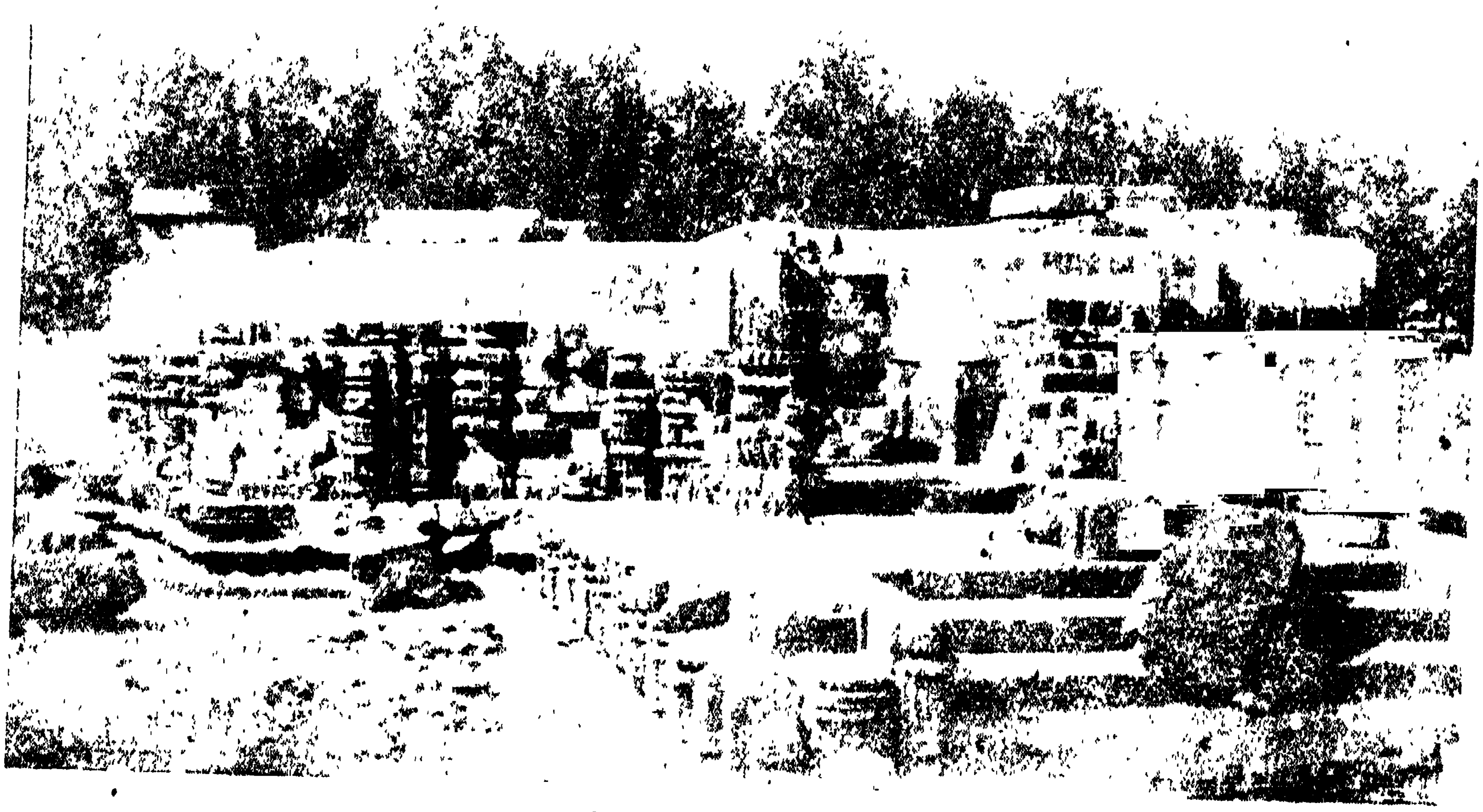

কোনারক মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে স্বতন্ত্র একটী মন্দির

গঙ্গা-মূর্ত্তি কোনারক (পাশের দৃশ্য)

গঙ্গা মূর্ত্তি কোনারক (সম্মুখের দৃশ্য)

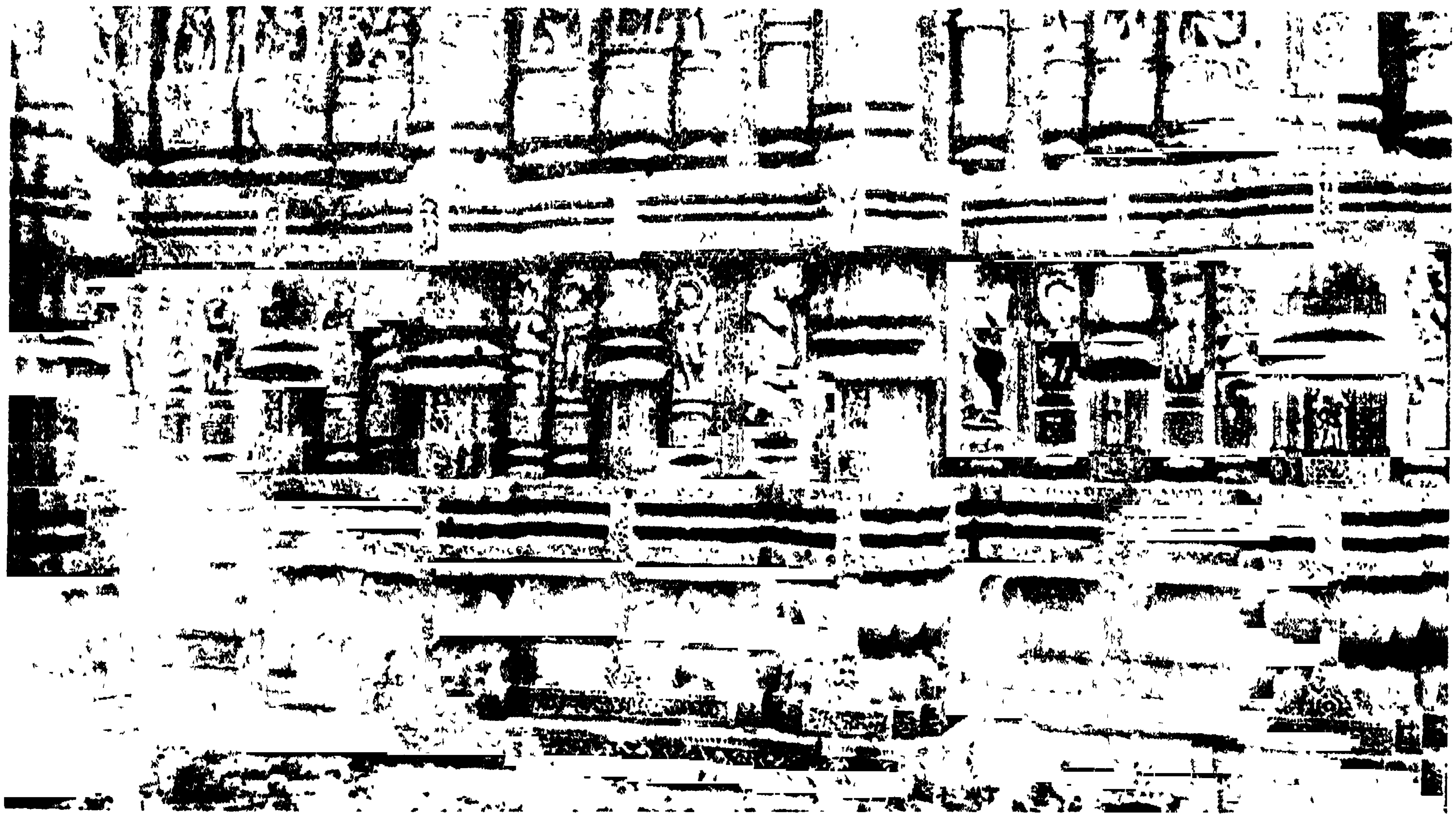

কোনারকের খোদাই শিল্প

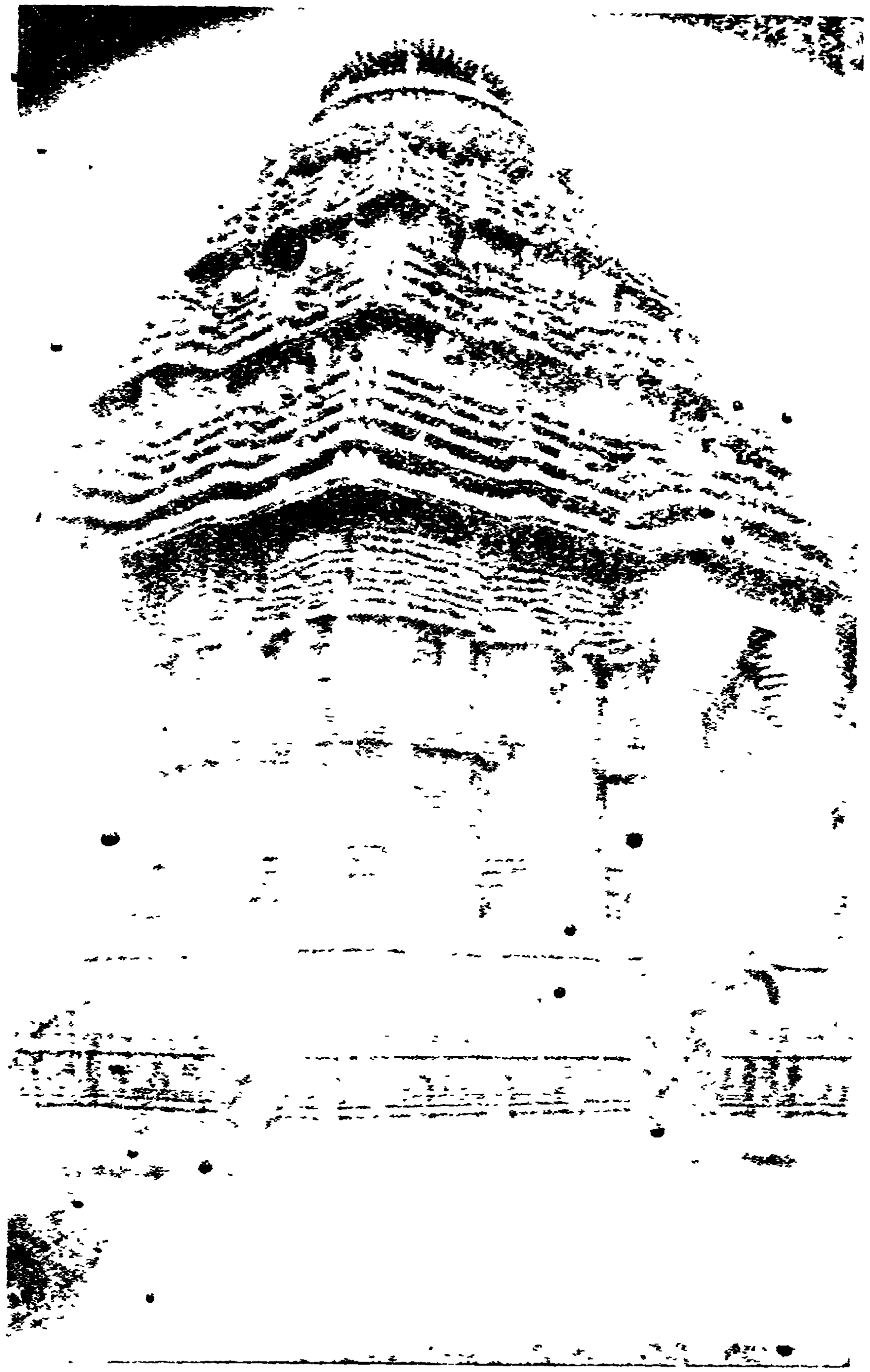

দক্ষিণ দিক হইতে কোনারকের মন্দিরের পার্শ্ব দৃশ্য

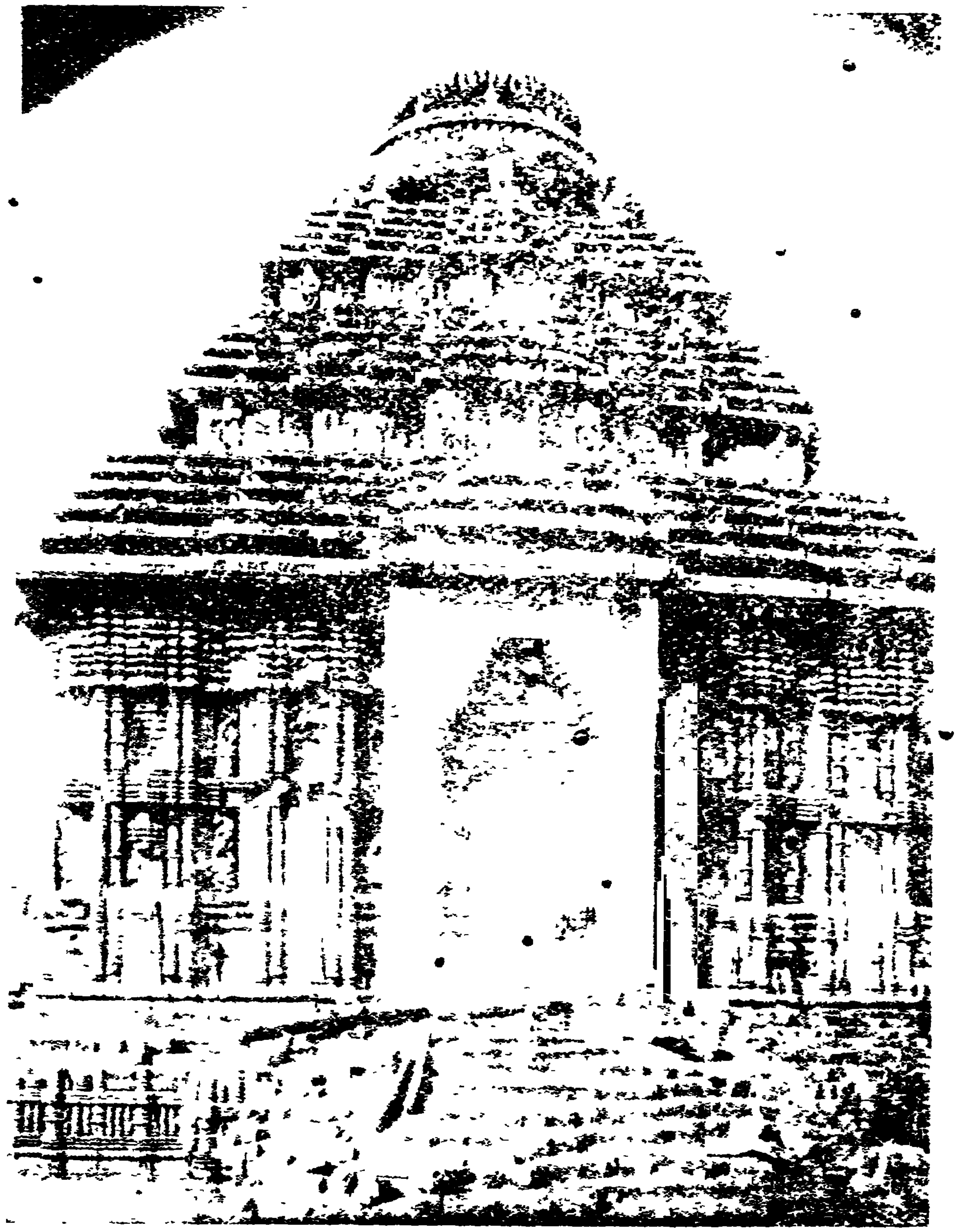

কোনারকের অপর একটি দৃশ্য

ঢেলে সাজা

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি]

(বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী সচিত্র ও বিচিত্র)

পিতা বলিলেন, "প্রফুল্লকে ঝাঁটাইয়া বিদায় কর এই মুহূর্ত্তে।"
ব্রজেশ্বর বলিলেন, "যে আজ্ঞে।"

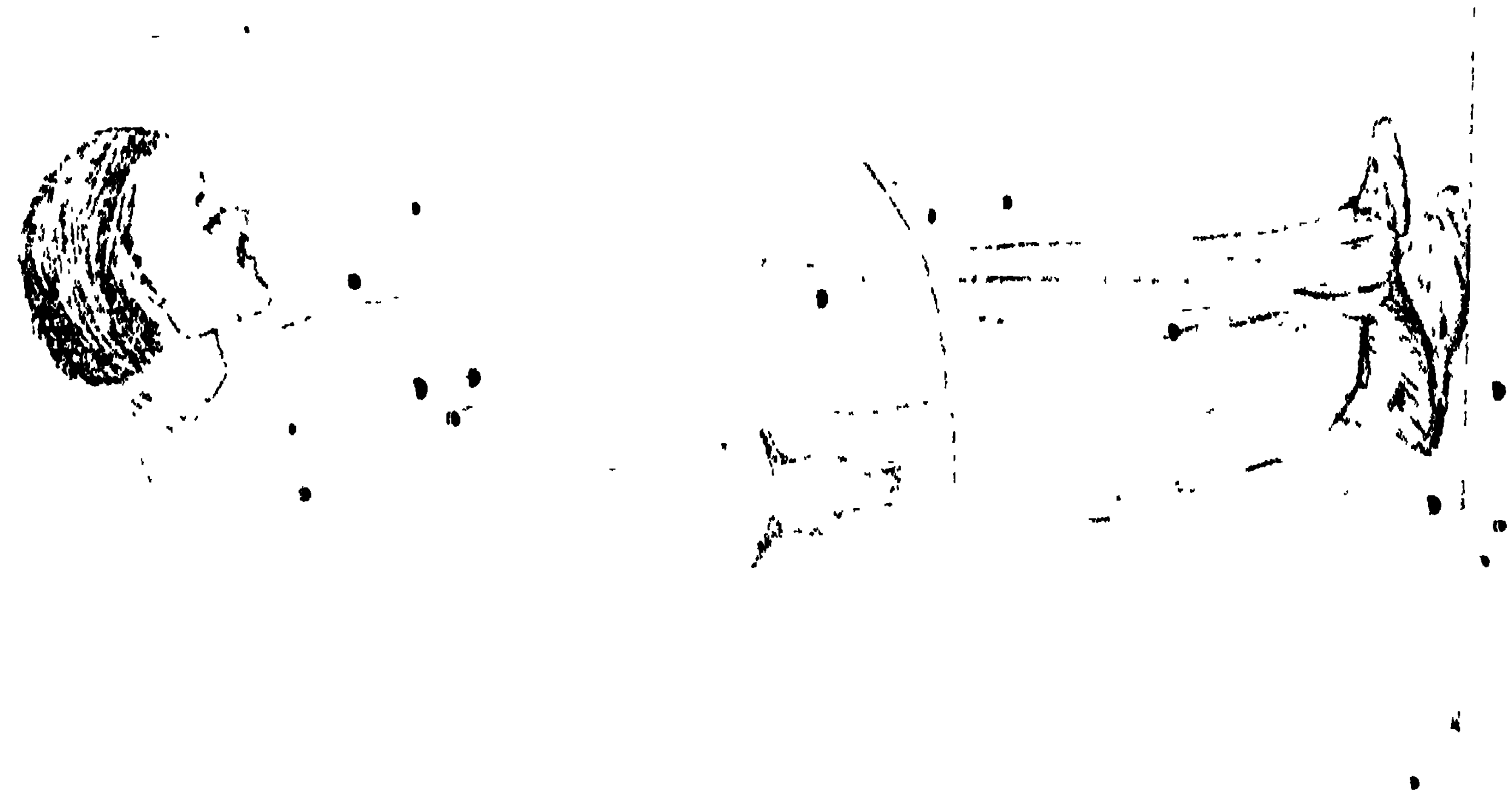

ব্রজেশ্বর সেকালের ছেলে, সুতরাং গুরুজন দেখিলেই প্রায়ই নতমস্তক বলীবর্দ্দের ন্যায় মাথা নীচু করিলেন, কখনও লম্বা Speech দিতেন না।

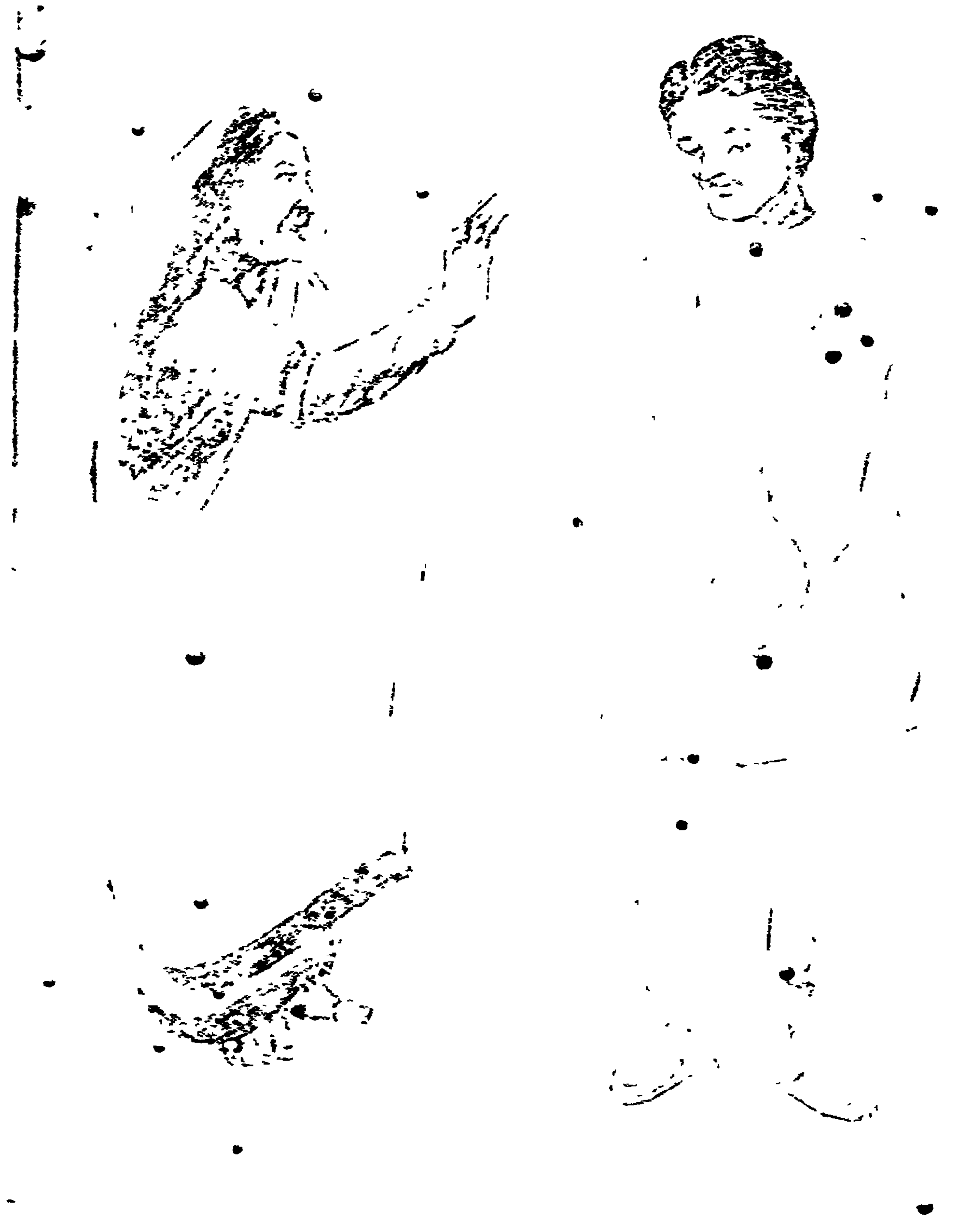

মাতা বলিলেন, "বিদায় করিও। কিন্তু খবরদার স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিও না।"

ব্রজেশ্বর বলিলেন, "যে আজ্ঞে।"

ব্রজেশ্বর ভাবিলেন, পায়ে ঝাঁটা বাঁধিয়া প্রফুল্লকে প্রহার করিবেন। কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই বড় গোলে পড়িয়া গেলেন।

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মোহ কাটিয়া গেল। তাই প্রফুল্ল যখন বলিল, "তুমি না স্থান দিলে আমি কোথায় যাই ?" তখন ব্রজেশ্বর বলিলেন, "সে আমি জানি না। যাই হোক, এখানে তোমার থাকা হইবে না। কারণ এখন সকাল হইয়াছে। এখন পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।"

পিতার আজ্ঞা পালন করা হইল না। মাতার আজ্ঞাও না; কারণ, ব্রজেশ্বর লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, প্রফুল্লর leather বড় good qualityর।

ব্রজেশ্বর দেবীচৌধুরাণীকে চিনিলেন বলিলেন "ও তুমি প্রফুল্ল! তবে এস, এস,— আমার ঘরে এস, আমার গৃহলক্ষ্মী এস, আমার জীবন সর্ব্বস্ব এস। তুমি না থাকিলে গৃহ অন্ধকার। যে দিন তোমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম, সে দিন তুমি যে একেবারেই নিরন্ন ছিলে; আজ তোমার কত ঐশ্বর্য্য! কত অলঙ্কার, কেমন নেকলেশ! কেমন—! না, ও পিতা স্বর্গ চুলায় যাক। তুমি এস।"

ছদ্মবেশ

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম্‌-এ]

অবতরণিকা

রল-প্রকৃতি ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিগণ, অথবা কড়া কথায় লিতে গেলে, উৎকট নীতিবাগীশগণ (strait laced noralists) ছদ্মবেশকে মিথ্যাচার, কপটাচার, ধূর্ত্ততা, বঞ্চনার সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলিবেন, চাই কি False ersonation) ছদ্মবেশে বঞ্চনা বলিয়া পীনালকোডের রাভুক্ত করিয়া বসিবেন! কিন্তু যেমন অসৎ উদ্দেশ্যে গর-জুয়াচোর প্রভৃতি অসাধু লোকে ছদ্মবেশ ধারণ করে, তেমনি আবার সদুদ্দেশ্যে সাধুলোকেও ছদ্মবেশ ধারণ করিতে বাধ্য হয়। পুলিশ, আবকারী ও নিমক মহলের লোককে অনেক সময়ে এই উপায়ে চুরি, ডাকাতি, জুয়াচুরি, খুন প্রভৃতির আস্কারা করিতে হয়। তখন ইহা 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' বা 'The end justifies the means' এই নীতিতে সমর্থনীয়। ফরাসী, ইংরেজী ও বাঙ্গালা ডিটেক্‌টীভ্‌ গল্পের কল্যাণে পাঠকগণ সাধু ও অসাধু উভয়

উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ-ধারণের অনেক চমকপ্রদ (Sensational) বিবরণের সহিত সুপরিচিত।

আবার রাষ্ট্রনীতি ও যুদ্ধনীতিকে অনেক সময়ে প্রজার মনোভাব বুঝিবার জন্য, শত্রুর বলাবল এবং অভিসন্ধি অবগত হইবার জন্য, ছদ্মবেশী গুপ্তচরের প্রয়োজন হয়। শুনিয়াছি, কৌটিল্যসূত্র প্রভৃতিতে কূটরাজনীতি-প্রসঙ্গে নানারূপ ছদ্মবেশ-ধারণের উপদেশ আছে। 'মুদ্রা-রাক্ষসে' রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে চাণক্য-নিয়োজিত ছদ্মবেশী গুপ্তচরের গতিবিধি পরিদৃষ্ট হয়। রামায়ণ ও উত্তর-রামচরিতে রামের এবং কিরাতার্জ্জুনীয়ে যুধিষ্ঠিরের যে প্রণিধির কথা আছে, সম্ভবতঃ সেই প্রণিধিও ছদ্মবেশে রাজ্যের ভিতরকার ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিত। শত্রু-শিবিরে ছদ্মবেশে গুপ্তচরের প্রবেশ ও পর্য্যবেক্ষণের কথা প্রাচীন ইউরোপের ইতিহাসেও পাঠ করা যায়। ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার প্রয়োজন দেখি না। আধুনিক রাজনীতিতেও বোধ হয় ইহার চলন আছে, কেন না ইউরোপের বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র ব্যাপারে শত্রুরাজ্যে ও শত্রুসৈন্যমধ্যে জর্ম্মান গুপ্তচরের গতিবিধির কথা সংবাদপত্রে মধ্যে-মধ্যে পাঠ করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে, কুমার জগৎসিংহের রণরীতির প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে (১ম খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ), "তাঁহার বহুসংখ্যক চর ছিল; তাহারা ফলমূলমৎস্যাদি বিক্রেতা বা ভিক্ষুক, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, বৈদ্যাদির বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, পাঠান সেনার গতিবিধির সন্ধান আনিয়া দিত।" ইহা প্রাচীন কৌটিল্যসূত্রেরই অনুবৃত্তি। আবার এই আখ্যায়িকাতেই (২য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ), অভিরাম স্বামীর ভিখারী ব্রাহ্মণের বেশে বন্দী বীরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উল্লেখ আছে। এইরূপ 'মৃণালিনী'তে গৌরোদ্ধরণিক শান্তশীলের কাঠুরিয়া ও তুরকীর বেশ (৩য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ), 'আনন্দমঠে' ভবানন্দের মোগল-সৈনিকের বেশ (১ম খণ্ড, ১৭শ পরিচ্ছেদ), শান্তির বৈষ্ণবীসজ্জা (৪র্থ খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ), 'রাজসিংহে' মাণিকলালের মোগল সৈনিকের বেশ (৩য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ), ও পরে প্রস্তর-বিক্রেতার ভূমিকা (ষষ্ঠ খণ্ড, পরিচ্ছেদ) এ সমস্তই রাষ্ট্রনীতি বা যুদ্ধনীতির অন্তর্ভুক্ত। 'দেবী চৌধুরাণী'তে 'আমি দেবী, আমি দেবী,' বলিয়া দিবা, নিশি ও স্বয়ং দেবীর সমকালে পরিচয়-প্রদান (৩য় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) এই কূটনীতিরই প্রকারভেদ।

ইতিহাসে পান্না দাইএর রাজ-বংশধরের সহিত নিজের সন্তানের পরিবর্ত্তন, (১) পুরাণে দেবকীসুত শ্রীকৃষ্ণের সহিত যশোদানন্দিনী যোগমায়ার পরিবর্ত্তন—এতদুভয়ও এক হিসাবে কূটরাজনীতির অঙ্গ বলিতে হইবে। পাণ্ডবদিগের দ্রৌপদী-স্বয়ংবরকালে ও অজ্ঞাতবাসকালে ছদ্মবেশ আত্মরক্ষার্থ পরিগৃহীত হইলেও, ইহা কূটরাজনীতির অন্তর্ভুক্ত বলিতে পারা যায়। আরব্যোপন্যাসে খলিফা হারুন আলরাসিদের ছদ্মবেশে ভ্রমণ, জীবনের বৈচিত্র্য-আস্বাদনের জন্যও বটে, আবার রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা, অবিচার-অত্যাচারের ব্যাপার পরিজ্ঞাত হইবার জন্যও বটে। অতএব ইহাকেও কূট-রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত বলাই সমীচীন। স্কটের 'ট্যালিস্‌ম্যানে' সুলতান স্যালাডিন (Saladin) সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। ইংলণ্ডের ও স্কটলণ্ডের কোন্-কোন রাজার ছদ্মবেশে ভ্রমণ সম্বন্ধেও সুন্দর-সুন্দর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

যাহা হউক, রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি প্রভৃতি বড় বড় কথা অধম বাঙ্গালীর না তোলাই ভাল। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি? আর পুলিশের, তথা পুলিশের আসামী-শ্রেণীভুক্ত চোর জুয়াচোর প্রভৃতির কথা তোলাও বড় নিরাপদ নহে। অতএব এ-সব কথা ছাড়িয়া অন্যান্য শ্রেণীর লোকের ছদ্মবেশের প্রসঙ্গ তুলি। এ পর্য্যন্ত বুঝা গেল, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, লোকহিতের জন্য, সময়ে-সময়ে রাজা, রাজপুরুষ বা রাজপুরুষদিগের নিয়োজিত ব্যক্তিগণ ছদ্মবেশ গ্রহণ করেন। ইহার উদ্দেশ্য, রাজপুরুষ-দিগের ব্যক্তিগত স্বার্থ নহে, উচ্চতর জাতিগত বা রাষ্ট্রগত স্বার্থ। আবার যে সকল দেশে বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ, সে সকল দেশে দেশী লোকের ছদ্মবেশে জ্ঞানপিপাসু বিদেশীর

(১) পান্না দাইএর অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের সত্যঘটনা (রাজপুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য অপত্য বাৎসল্য ত্যাগ) এবং টেনিসনের Lady Clare কবিতায় বা ফ্যানি বার্ণির Evelina আখ্যায়িকায় নিজ কন্যার মঙ্গলের জন্য অভিজাত-তনয়ার সহিত নিজ-তনয়ার পরিবর্ত্তনে ধাত্রীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার কাল্পনিক বৃত্তান্ত—এই উভয় শ্রেণীর দৃষ্টান্তে কি বিষম (Contrast) বিরোধিতা!

প্রবেশ এবং এই উপায়ে আচার, ধর্ম্ম, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-প্রণোদিত নহে।

রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে ছদ্মবেশ-গ্রহণ সুপ্রচলিত। ভিক্ষাজীবী বহুরূপীর লীলাও সুপরিচিত। এ-সব ছদ্মবেশ দর্শক ও শ্রোতৃবর্গকে আনন্দ-প্রদানের জন্য। অতএব ইহারও উদ্দেশ্য সৎ। লেখকগণ কখন-কখন আত্মগোপনের জন্য অথবা খেয়ালের বশে ছদ্মনাম গ্রহণ করেন (সেকালের নাইট অর্থাৎ বীরগণও করিতেন)! যথা, আমাদের সাহিত্যে টেকচাঁদ ঠাকুর, ভানুসিংহ ঠাকুর, পঞ্চানন্দ, বীরবল ইত্যাদি ছদ্মনাম। বিলাতি সাহিত্যে জুনিয়াস ও মার্কিন মুল্লুকের মার্ক টোয়েন বিখ্যাত ছদ্মনাম। ইহাকেও ছদ্মবেশের প্রকার-ভেদ বলা যাইতে পারে।

(১) এক্ষণে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ছদ্মবেশ-ধারণের কথা বলিব। স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছদ্মবেশের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত—বাইবেলে জেকব কর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ছদ্মবেশ-ধারণ। এক শ্রেণীর স্বার্থ কাব্যের মনোরম উপাদান, সেটি প্রেম। এই প্রেমের দায়ে ছদ্মবেশ-ধারণের অনেক মনোমদ বৃত্তান্ত কাব্যে পাঠ করা যায়। সকল সময়ে ইহা বিশুদ্ধ প্রেম নহে, একটা কলুষিত প্রবৃত্তি; বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "রূপজ মোহ, রূপভোগলালসা, ভালবাসা নহে।" কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে তাহা অনেক কবি ভুলিয়া যান। আমরাও সেই মহাজনদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বক্তব্যের সুবিধার জন্য উভয়কেই একপর্য্যায়ভুক্ত করিলাম।

আমাদের পুরাণে ইন্দ্রের গৌতম-মূর্ত্তিতে অহল্যা-হরণ ইহার সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত দৃষ্টান্ত। অন্যান্য দেশের পৌরাণিক আখ্যানেও এইরূপ উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশের দৃষ্টান্ত আছে। তবে সেগুলি এতটা কুৎসিত নহে, কেন না আর কোথাও ধর্ষিতা নারী গুরুপত্নী নহেন। গ্রীক পৌরাণিক আখ্যানে (Zeus) দেবরাজ Amphitryon এর মূর্ত্তিগ্রহ করিয়া তৎপত্নী Alcmenaর সঙ্গলাভ করেন (বিখ্যাত গ্রীকবীর হেরাক্লিসের জন্মবৃত্তান্ত), ইংরেজের পৌরাণিক আখ্যানে Uther Pendragon মার্লিনের ইন্দ্রজাল-প্রভাবে Gorlois এর মূর্ত্তিতে তৎপত্নী Ygraineএর সঙ্গলাভ করেন (বিখ্যাত আদর্শ বীর ও রাজা আর্থারের জন্মবৃত্তান্ত),—এই দুইটি বিদেশী দৃষ্টান্ত প্রথমটির অনুরূপ। আবার গ্রীক দেবগণ এইরূপ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য মেঘ, বৃষ, রাজহংস, মহাসর্প প্রভৃতির আকার ধারণ করিয়াছিলেন এরূপ বৃত্তান্তও আছে। আমাদের দেব ও ঋষিগণ সম্বন্ধেও এরূপ আখ্যান আছে। মায়াবী রাবণের দশমুণ্ড গোপন করিয়া যোগিবেশে সীতাহরণ এগুলি অপেক্ষা সুরুচিসঙ্গত দৃষ্টান্ত। ইন্দ্রাদি দেবগণ দময়ন্তী-লাভের জন্য স্বয়ংবর-সভায় সকলেই নলরাজার মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন, ইহাও এই শ্রেণীতে পড়ে। নব অনুরাগের অবস্থায় শ্রীরাধার সঙ্গলাভের জন্য এবং পরে মানভিক্ষার জন্য, শ্রীকৃষ্ণের বৈদ্য, বেদিয়া, বণিক, বাজীকর, গণক, ভেকধারী নটরাজ যোগী, অভিমন্যু, আয়ান ঘোষ প্রভৃতির বেশধারণ বহু কৃষ্ণলীলাত্মক গ্রন্থে অতি সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কোন-কোন পাঠক এ-সব দেবলীলার কথা শুনিয়া বলিয়া বসিবেন, "দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।" কিন্তু প্রকৃত আস্তিক শুকবাক্য স্মরণ করিবেন,—

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥"

ভারতচন্দ্র দেবলীলা ছাড়িয়া প্রেমিক সুন্দরকে শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে সন্ন্যাসিবেশে সাজাইয়া—

"কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী
* * *
কখন লুঠেরা কখন পসারী
কভু চোর কভু চর হে।"

বলিয়া বেশ একটু টিটকারী দিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত দেখা গেল, 'অন্যে পরে কা কথা', দেবতারাও প্রেমের দায়ে ভোল বদলাইয়াছেন। তবে মানুষের বেলায় শুধু বেশ-পরিবর্ত্তন নেপথ্যবিধান, দেবতাদের বেলায় অতিমানুষী শক্তিতে ভিন্ন-মূর্ত্তিগ্রহ। অলৌকিক পৌরাণিক ব্যাপার অবিশ্বাস্য বলিয়া অনেক আধুনিক লোকে উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু এগুলিও সাহিত্যে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এই প্রবন্ধে স্থান পাইবার যোগ্য।

স্বামীর ছদ্মবেশে প্রণয়পাত্রীর সহিত পরপুরুষের মিলন কতকগুলি কুৎসিত ইতালীয় ও ফরাসী গল্পে দেখা যায়। ইহার রকমফের, প্রেমিকের দেবতা বা দেবদূত সাজিয়া প্রণয়পাত্রীর বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহার সহিত মিলন। ডনলপ্ History of Fiction নামক গ্রন্থে ইতালীয় সাহিত্যে

বর্ণিত দেবদূত গ্যাব্রিয়েল সাজার একটি গল্প দিয়া তৎপ্রসঙ্গে অন্যান্য সাহিত্যে উহার মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া মহাবীর এলেক্‌জ্যাণ্ডারের মাতার জুপিটার-আমন-ঘটিত ব্যাপারও যে প্রকৃত পক্ষে এই শ্রেণীর তাহা দেখাইয়াছেন। বোধ হয় এই শ্রেণীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দৃষ্টান্ত, পঞ্চতন্ত্রে রাজকন্যার প্রণয়ী কৌলিকের নারায়ণ-বেশে রাজকন্যাকে এবং পরে তাঁহার মাতাপিতাকে ছলনা (২)। ডন্‌লপ্‌ বোধ হয় 'পঞ্চতন্ত্রের' সংবাদ রাখিতেন না।

শেক্‌স্‌পীয়ারের Taming of the Shrewতে উগ্রচণ্ডার ভগিনী Biancaর প্রেমিকের শিক্ষক সাজা ও উক্ত প্রেমিকের চাকরের মনিব সাজা প্রেমের জন্য ছদ্মবেশের সুন্দর দৃষ্টান্ত। ইহা ইতালীয় গল্পেরই অনুকরণ। পক্ষান্তরে ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'তে অটলের মোগল সাজা অতি কুৎসিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে প্রেমের জন্য ছদ্মবেশ-ধারণের দুই-চারিটি উদাহরণ আছে। যথা, 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে বারিবাহক দাস সাজিয়া বীরেন্দ্রসিংহের, বিমলার সহিত মিলনের জন্য, মানসিংহের অন্তঃপুরে প্রবেশ, (৩) (২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ), এবং 'মৃণালিনী'তে প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎকারের সুবিধার জন্য হেমচন্দ্রের বৎসরে একবার করিয়া মথুরায় রত্নদাস বণিক্ (৪) সাজিয়া বাণিজ্য করিতে আগমন (৪র্থ খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ)। 'রাধারাণী'তে 'রাজা' দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের রুক্মিণীকুমার ছদ্মনামগ্রহণ গোড়ায় খেয়াল মাত্র (খলিফা হারুন আলরাসিদের জের); কিন্তু পরিণামে প্রেমের ব্যাপার। 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' হিরণ্ময়ীর স্বামী বলিয়া রাজার পরিচয়-প্রদান হিরণ্ময়ীর প্রেমের পরীক্ষার জন্য। আবার নারীরও প্রেমাস্পদের পার্শ্বচারিণী হইবার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ-ধারণ দুর্লভ নহে। এই উদ্দেশ্যসাধনের সোপান-স্বরূপ দরিয়ার (মেহেরজান) নর্ত্তকীবেশে ('রাজসিংহ', ৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ) মোগল সেনাপতি হাসান আলির সন্তোষ-সাধন। ইন্দিরার নিজেকে বিদ্যাধরী বলিয়া চালান (১৯শ পরিচ্ছেদ) কতকটা মজামারার জন্য, কতকটা স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত, বশীভূত করিবার জন্য। পক্ষান্তরে সুন্দরীর নাপিতানী-বেশ মামুলী প্রেমের দায়ে নহে,—গৃহত্যাগিনী শৈবলিনীর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহবশতঃ, তাহার উদ্ধারের চেষ্টায় ('চন্দ্রশেখর' ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

(১) আবার প্রেমিকের খপ্পর হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য গ্রীক পৌরাণিক আখ্যানে ডাফ্‌নি ফিলোমেলা প্রভৃতি সুন্দরীগণ দেবতাদিগের নিকট আকুল প্রার্থনা করিয়া গাছ পাথর পশু পক্ষীতে পরিবর্ত্তিত হইলেন, এরূপ ব্যাপার দেখা যায়। ইহাও এক হিসাবে প্রেমের জের, পরন্তু আত্ম-রক্ষার্থ। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে (Merry Wives) পত্নী-চরিত্রে সন্দিগ্ধ ফোর্ডের ব্রূক ছদ্মনামে নিজপত্নীর গুপ্ত-প্রণয়ী ফল্‌ষ্টাফের নিকট যাতায়াত—উদ্দাম প্রেমের পথে বাধা দিবার জন্য স্বামীর অনুষ্ঠিত কৌশল। (All's Wellএ) ডায়েনার বদলী হেলেন, (Measure for Measureএ) ইজাবেলার বদলী মেরিয়ানা (এ সকলের মূল ইতালীয় গল্পে) 'নবীন তপস্বিনী'তে মালতীর বদলী জগদম্বা—ইত্যাদি কৌশল উদ্দাম প্রেমের পথে বাধা দিবার জন্য, ধর্ম্ম-পথাবলম্বিনীর স্বার্থরক্ষার্থ, তথা লম্পটের শাস্তিবিধানের জন্য। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ-সব প্রকৃত পক্ষে প্রেম নহে, একটা কলুষিত প্রবৃত্তি।

(২) শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকাবলিতে অন্যান্য উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশধারণের নানা বিচিত্র দৃষ্টান্ত আছে। King Learএ কেণ্ট ও এড্‌গারের ছদ্মবেশ-ধারণ আত্মরক্ষার জন্যও বটে, আবার প্রভু বা পিতার রক্ষার জন্যও বটে। Measure for Measureএ ডিউক মহাশয় সন্ন্যাসিবেশে আরব্যোপন্যাসের খলিফা হারুন আলরাসিদের মত রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও পরোপকার-সাধন করিয়াছেন। Much Adoতে মার্গারেটকে হীরো বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেওয়া প্রণয় ও পরিণয়ের পথে

(২) পঞ্চতন্ত্রের এই গল্পে গোপকুলপ্রসূতা রাধার নামোল্লেখ আছে এবং রাজকন্যা পূর্ব্বজন্মে রাধা ছিলেন, কৌলিক তাহাকে এইরূপ বুঝাইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রে এই রাধার উল্লেখের প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কি?

(৩) প্রেমের জন্য পুরুষের পরের অন্তঃপুরে প্রবেশ ইংরেজিনবিশ বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ভাবিত নহে, ভাসের অবি-মারক একার্য্য করিয়াছেন। 'পুরুষের নারীবেশ' প্রসঙ্গে মালতী-মাধব, দশকুমারচরিত প্রভৃতিতেও এরূপ দৃষ্টান্তের অস্তিত্ব প্রদর্শিত হইবে।

(৪) 'ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ', ইহাই বুঝি স্ত্রীরত্ন লাভার্থী নায়কের ছদ্মনামরহস্য!—ইতি ব্যাকরণ-বিভীষিকা-কারের টীকা।

বাধা দেওয়ার জন্য কুচক্রীর কারসাজি। ৺মনোমোহন বসুর 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকে ইহার সুদক্ষ অনুকরণ আছে। আর Winter's Taleএ অটোলাইকাসের আহত হৃত-সর্ব্বস্ব সাজিয়া পরের পকেটমারা জুয়াচুরি ফন্দী হইলেও মনোহর। বেন্ জন্সনের Every Man in His Humour নাটকে ব্রেন্ওয়ার্মের দণ্ডে-দণ্ডে ভোল বদলান ইহা অপেক্ষাও উপভোগ্য।

স্কটের বিখ্যাত আখ্যায়িকা 'আইভ্যানহো' নানা-প্রকারের ছদ্মবেশের যাদুঘর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নায়ক আইভ্যানহো পিতার বিরাগভাজন হওয়াতে পিতৃগৃহে তীর্থপ্রত্যাগত ব্যক্তির (palmer) ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়াছিলেন এবং পরে দ্বৈরথ যুদ্ধে ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা রিচার্ড কতকটা খলিফা হারুন আলরাসিদের ধরণে এবং কতকটা ষড়যন্ত্রকারীদিগের গুপ্ত অভিসন্ধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ছদ্মনামে দ্বৈরথ যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। দস্যুপতি রবিন হুড আত্মরক্ষার জন্য লক্স্লে নামে তীরন্দাজের ছদ্মবেশে জনসমাজে দেখা দিয়াছিলেন। ডি ব্রেসী নামক নর্ম্মান বীর কন্যাহরণের উদ্দেশ্যে স্যাক্সন দস্যুর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল। ওয়াম্বা শত্রুপুরীর সংবাদ গোপনে সংগ্রহ করার জন্য পুরোহিতের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল। আবার ওয়াম্বার অনুরোধে সেড্রিক্ উক্ত পুরোহিতের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্মপ্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। ফলতঃ, ছদ্মবেশের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অনেকগুলি শ্রেণীর দৃষ্টান্তই এই পুস্তকে মজুত আছে। উক্ত লেখকের 'ট্যালিস্ম্যানে' স্যালাডিনের ছদ্মবেশের উল্লেখ কূটরাজনীতি-প্রসঙ্গে করিয়াছি। ঐ পুস্তকে স্কট্লণ্ডের রাজপুত্র কেনেথ্ রিচার্ডের বিরাগভাজন হওয়াতে ক্রীতদাসের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া রিচার্ডের অনুচর হইয়াছিলেন। ইহা শেক্স্পীয়ারের 'কিং লীয়ারে' কেণ্টের ছদ্মবেশের সহিত তুলনীয়।

(৪) অনেক স্থলে ছদ্মবেশের উদ্দেশ্য কোনরূপ নীচ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ নহে, শুধু মজামারা, রগড়, নির্দ্দোষ আমোদ, কোথাও বা হাসিতে-হাসিতে ভণ্ড, পাষণ্ড 'ত্রিপণ্ডে'র শাস্তিবিধান। শেক্স্পীয়ারের নাটকাবলিতে ইহার দুই-তিনটি দৃষ্টান্ত আছে। যথা Twelfth Nightএ ম্যাল-ভোলিয়োকে দশচক্রে পাগল বনাইয়া তাহাকে লইয়া মজামারার জন্য বিদূষক কর্ত্তৃক পুরোহিতের ছদ্মবেশধারণ ও পুরোহিতের স্বরের অনুকরণ; All's Wellএ এ মুখসাপটে দড় ভাঁড় দত্ত-জাতীয় Parollesকে শিক্ষা দিবার জন্য, তাহার নীচতা, ভীরুতা প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য, তাহার চোখ বাঁধিয়া, অদ্ভুত ভাষাপ্রয়োগে—শত্রুপক্ষীয় লোকের হাতে সে নিগৃহীত হইতেছে তাহার মনে এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন; এবং Merry Wivesএ ফলষ্টাফকে লাম্পট্যের জন্য শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে মেয়েমর্দ্দে মিলিয়া ভূত ও পরী সাজিয়া রামচিম্‌টি প্রয়োগ! ইহার দ্বিতীয়টি আমাদের সাহিত্যে ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'কমলে কামিনী'তে (৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক) বকেশ্বরের ব্যাপারে সুন্দররূপে অনুকৃত হইয়াছে। তৃতীয়টির বেলায় 'নবীন তপস্বিনী'তে জলধরকে হোঁদোলকুৎকুতে সাজান শেক্স্পীয়ারের চিত্রের অপরূপ পরিবর্ত্তন।

অঙ্গদ-রায়বারে ইন্দ্রজিৎ ব্যতীত সভাস্থ সকলের রাক্ষসী মায়ায় রাবণবেশ-ধারণে অঙ্গদকে ভ্যাবাচাকা লাগাইয়া তাহার দৌত্যকার্য্য পণ্ড করার চেষ্টা আছে বলিয়া ইহা রাজনীতির অঙ্গীভূত বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কৃত্তিবাস ওঝার উদ্দেশ্য যে মজামারা এবং ফাউ-স্বরূপ রাবণকে গালি খাওয়ান, অত্র সন্দেহো নাস্তি।

(৫) ইহা ছাড়া দেবতারা আত্মরক্ষার্থ অথবা ছলিবার জন্য, ভক্তের ভক্তি, ধার্ম্মিকের ধর্ম্মনিষ্ঠতা পরীক্ষা করিবার জন্য, ভক্তের বিপদুদ্ধারার্থ, কখন-কখন পাষণ্ড-দলনের জন্য, নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, পুরাণাদিতে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রীক জলদেবতা প্রোটিয়াসের এ বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। আমাদের পুরাণাদিতে নানা দেব-দেবীর শ্যেন, কপোত, বক, শঙ্খচিল, শ্বেতমাছি, শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি পশুপক্ষীর আকার-গ্রহণ সুবিদিত। মহা-ভারতে অগ্নি খাণ্ডব-দাহনের প্রার্থনা কৃষ্ণার্জ্জুনকে জানাইতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাজিয়াছিলেন; কাশীখণ্ডে দিবোদাসকে ছলিবার জন্য ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, গণেশ গণৎকার সাজিয়াছিলেন; (অনুপ্রাস-মাহাত্ম্য বটে!) 'কুমারসম্ভবে' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে মহাদেবের গৌরীকে ছলনা, 'কিরাতার্জ্জুনীয়ে' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে ইন্দ্রের ও কিরাতবেশে মহাদেবের অর্জ্জুনকে ছলনা, 'রঘুবংশে' হোমধেনুর মায়াসিংহ সৃষ্টি করিয়া দিলীপকে

ছলনা ইত্যাদি উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য মাত্র। শিবকে ছলিবার জন্য ভগবতীর দশমহাবিদ্যা-মূর্ত্তি ধারণ প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বৃত্তান্ত। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভগবতী মৃগী ও স্বর্ণগোধিকার আকার গ্রহণ করিয়া কালকেতুকে ছলিলেন এবং ষোড়শী সুন্দরী সাজিয়া ফুল্লরাকে লইয়া একটু রঙ্গ করিলেন। 'অন্নদামঙ্গলে' ব্যাসকে ছলিবার জন্য 'মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।' অন্নপূর্ণা হরিহোড়কে দয়া করিবার জন্য ঘুঁটেকুড়ুনী বুড়ী সাজিলেন। আবার তিনি যখন হরিহোড়ের গৃহ হইতে ভবানন্দ মজুমদারের ভবনে যাইতে অভিলাষিণী হইলেন, তখন ছল করিয়া কন্যার মূর্ত্তি ধরিয়া হরিহোড়ের নিকট বিদায় লইলেন, ইহাও তাঁহার এক লীলা। শ্রীরামচন্দ্রকে ছলিবার জন্য ভগবতী সীতামূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন, এরূপ কথাও আছে। রামেশ্বরের 'শিবায়নে' বা 'শিব-সঙ্কীর্ত্তনে' ভগবতীর বাগ্দিনী-বেশে শিবকে ছলনা এবং শিবের ব্যাঘ্র, বৃদ্ধ ও শাঁখারীবেশে ভগবতীকে ছলনা প্রণয় কলহের জের বলিয়া ধরিতে হইবে। (শিবের শাঁখারী সাজিয়া পার্ব্বতীকে শাঁখা পরান কৃষ্ণলীলায় শ্যামসুন্দরের পসারী নাপিতানী প্রভৃতি বেশে রাধার শ্রীঅঙ্গের সেবার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।) 'ভক্তমালে' নারায়ণের জয়দেব-মূর্ত্তিগ্রহণ ও শ্রীরামচন্দ্রের কবীরমূর্ত্তি-গ্রহণ ভক্তের প্রতি কৃপাবশতঃ। শ্যামাভক্ত রামপ্রসাদের কন্যা সাজিয়া শ্যামা-মা তাঁহার বেড়া বাঁধার সাহায্য করিয়াছিলেন, শ্যাম-ভক্ত বিল্বমঙ্গলের নিকট শ্যামসুন্দর রাখাল বালক সাজিয়া ধরা দিয়াছিলেন, ইত্যাদি ভক্তের জন্য ভগবল্লীলা বর্ণনার অতীত।

পক্ষান্তরে, রাক্ষসগণ রাক্ষসী মায়ায় বিভ্রম ও বিভ্রাট্ ঘটাইয়াছে, ইহাও পুরাণ-পাঠকের অবিদিত নহে। রামায়ণে মারীচের মায়ামৃগ-রূপধারণ, মায়াসীতা, মায়াসৃষ্ট রাম-লক্ষ্মণের মুণ্ডচ্ছেদ, ইহার দৃষ্টান্ত। আবার কৃষ্ণলীলায় পূতনা রাক্ষসী, বকাসুর, বৎসাসুর প্রভৃতির মায়াজাল-বিস্তারও ইহার দৃষ্টান্ত। আরব্যোপন্যাসে জিনদিগের নানামূর্ত্তি-গ্রহণও এই শ্রেণীভুক্ত। দেবতা ও ঋষিদিগের শাপে এবং ইন্দ্রজাল-প্রভাবে অপরে দেহান্তর-ধারণে এমন কি গাছপাথরে পর্য্যন্ত পরিণত হইতে বাধ্য হইয়াছে, ইহারও উদাহরণের অভাব নাই। তবে এগুলি স্বেচ্ছাকৃত নহে। শাপবশে জন্মান্তর-গ্রহণ এবং ভূভারহরণার্থ নারায়ণের এবং অন্যান্য দেবতার অবতারত্ব-স্বীকার, এতদুভয়ের অবশ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্ক অত্যন্ত দূর।

এইরূপ নানাপ্রকারের ছদ্মবেশের মধ্যে পুরুষের নারীবেশ ও নারীর পুরুষবেশ একেবারে তাজ্জব ব্যাপার, পুকুর-চুরি, দিনে ডাকাতি। অথচ এতদুভয়ের উদাহরণ সাহিত্যে অজস্র মিলে। অবশ্য প্রকৃত জীবনেও (অধিকাংশ স্থলে অসদুদ্দেশ্যে) এরূপ ছদ্মবেশের কথা মধ্যে মধ্যে শুনা যায়, তবে সে সকল আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। যাত্রার দলে ও সখের থিয়েটারে (যথা কলেজের ছাত্রগণের অভিনয়ে) পুরুষে নারীর ভূমিকা গ্রহণ করে; শেক্সপীয়ারের আমলে বিলাতী পেশাদারী থিয়েটারেও এই ব্যবস্থা ছিল। পক্ষান্তরে, আধুনিক পেশাদারী থিয়েটারে স্থানে স্থানে স্রোত উল্টা বহিতেছে। নারী কোন কোন স্থলে পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। (ইহাও কি স্ত্রী-স্বাধীনতার একটা বিচিত্র বিকাশ?) আমাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীর ধ্রুব-প্রহ্লাদ, গৌর-নিতাই সাজা, 'বিল্বমঙ্গলে' রাখাল-বালক সাজা, 'সরলা'য় সরলার পুত্র গোপাল সাজা দেখিয়াছি। শুনিয়াছি, বিলাতী থিয়েটারে অভিনেত্রীরা রোমিওর ভূমিকা গ্রহণ করেন। কলিকাতার একটি সাহেবী থিয়েটারে হেমলেটের ভূমিকায় একজন খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী খুব প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এ সব রঙ্গমঞ্চ-ঘটিত ব্যাপার আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আত্মগোপনের জন্য বা খেয়ালের বশে লেখক-লেখিকাগণ কখন-কখন ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রেও পুরুষ কর্ত্তৃক নারীর ছদ্মনাম ও নারী কর্ত্তৃক পুরুষের ছদ্মনাম-গ্রহণ ছদ্মবেশেরই প্রকারভেদ। আমাদের সাহিত্যে একসময়ে পুরুষ 'ভুবনমোহিনী' সাজিয়া খুবই 'প্রতিভা'র পরিচয় দিয়াছিল; পক্ষান্তরে ইংরেজী সাহিত্যে নারী (Marian Evans) পুরুষ (জর্জ্জ এলিয়ট) সাজিয়া অনেক পুরুষ-লেখকের কাণ কাটিয়াছেন। যাহা হউক, এরূপ ছদ্মনাম গ্রহণও আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। সাহিত্যে পুরুষের নারী-বেশধারণ ও নারীর পুরুষ-বেশ-ধারণের উদাহরণ-সংগ্রহ প্রবন্ধের অবশিষ্ট ভাগের উদ্দেশ্য।

অবশ্য পুরুষের নারীবেশ ও নারীর পুরুষবেশ—উভয় শ্রেণীর ছদ্মবেশ সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে যে, কৈশোর

অতিক্রান্ত হইলে, শরীর-সংস্থানের নানা প্রকার প্রভেদের জন্য (৫) কৃত্রিম উপায়ে উভয় শ্রেণীর ছদ্মবেশ-বিধানই কঠিন ব্যাপার। থিয়েটারে এই ব্যাপার নিপুণতার সহিত সংসাধিত হইলেও চক্ষুষ্মান্ দর্শক সহজেই এই কৌশল ধরিয়া ফেলেন। সুতরাং এইরূপ কৃত্রিমতা দ্বারা সাধারণ জীবনে লোকের চোখে ধূলি দেওয়া খুবই কঠিন। তবে কখন-কখন ইহা বেমালুম চলিয়া গিয়াছে, জাল ধরা পড়ে নাই, প্রকৃত জীবনে এরূপ ঘটনা সময়ে-সময়ে শুনা যায়। যাহা হউক, ইহা সুসাধ্যই হউক, আর দুঃসাধ্যই হউক, সাহিত্যে ইহার খুব চল আছে। আমরা পরসংখ্যায় সেইগুলির আলোচনা করিব।

(৫) যাঁহারা বৈষ্ণব-ধরণে বা ব্যারিষ্টারি ঢংএ দাড়ীগোফ উত্তমরূপে ক্ষৌর করেন, তাঁহারা নারী ও পুরুষের চেহারার একটা বাহ্য প্রভেদের মূলোচ্ছেদে যত্নবান্, ইহা বলা যাইতে পারে। যদি কেহ দাশুরায়ী ধরণে ইহাদিগকে লইয়া একটু রসিকতাপ্রয়াসী হয়েন, তিনি বলিতে পারেন যে, এই ক্ষৌরকর্ম্মে গোপীভাবের একটু সহায়তা করে! প্রকৃত 'মধুর' ভাবের বৈষ্ণব সাধকও এই সুরের উপর সুর চড়াইয়া জবাব দিতে পারেন যে, 'মধুর'ভাবের সাধনায় স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ নাই, সকলেই নারী, একমাত্র পুরুষ সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। মীরাবাই জীবগোস্বামীকে এই উত্তর দিয়াই নিরুত্তর করিয়াছিলেন।

চুম্বক-তত্ত্ব

[অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য বি-এস্‌সি]

(৪)

একটি ছোট গোল ইস্পাত চুম্বকে পরিণত করিবার পর একগাছি রেশম অংশু দ্বারা একটি কাচের চিমনির মধ্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। (চিত্র ১৭) বাতাস হইতে রক্ষা করাই চিমনির উদ্দেশ্য। চিমনির তলাটা এক টুকরা গোল কাষ্ঠফলকে আঁটা। তাহার উপরিভাগ একটি কর্কে আবদ্ধ। এই কর্কের মধ্য দিয়া একটি পিতলের তার গিয়াছে। এই পিতলের তারের নিম্নভাগটি একটি ছোট হুকের আকারে পরিণত ও তাহার মাথাটা একটি বৃত্তের আকারে প্রস্তুত। এই হুকে বাঁধিয়া রেশম অংশুটি ঝুলাইয়া দেওয়া হয় ও তাহার অপর প্রান্তে চুম্বকখণ্ডকে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। আন্দোলনের হার অভ্রান্তরূপে স্থির করিবার জন্য একখানি খুব পাতলা দর্পণ চুম্বকে আঁটিয়া দেওয়া হয়। দর্পণ-প্রতিফলিত আলোকগুচ্ছ একখানি সাদা পটে (Screen) ফেলা হয়। এই পটে পতিত ক্ষুদ্র আলোকখণ্ডের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রলম্বিত চুম্বকের আন্দোলনের হার (rate of oscillations) নির্ভুলে স্থির করা যায়। এই যন্ত্রের নাম চুম্বক-জ্ঞাপক যন্ত্র। চুম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব নিরূপণে ও তাহাদের তুলনার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চুম্বক-জ্ঞাপক যন্ত্র

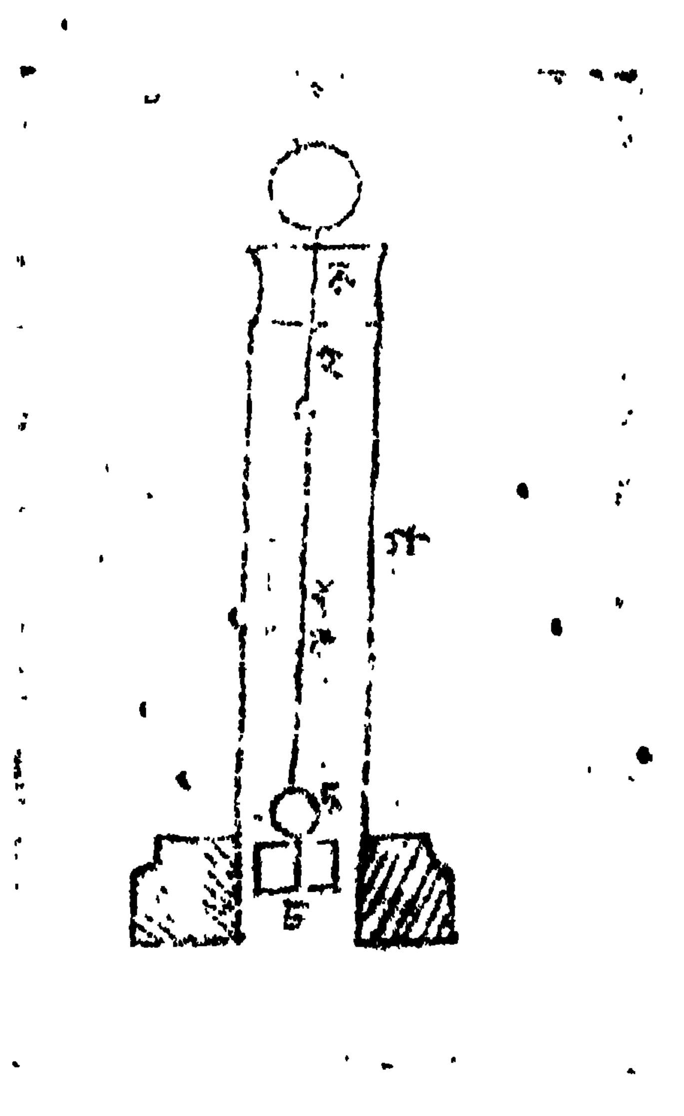

(চিত্র ১৭)

ক = কর্ক, গ = চিমনি হু = হুক, র রেশম অংশু, দ = দর্পন, চ = চুম্বক

বিপরীত বর্গ-বিধি।

Law of inverse square.

১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চুম্বকের উত্তোলন ক্ষমতা দ্বারাই চৌম্বক শক্তি মাপা হইত। উক্ত সালে মহামতি কুলম্ব সাহেব (Coulomb) চুম্বক শক্তি মাপের দুটি অতি উত্তম উপায় বাহির করেন। রেশম অংশু দ্বারা দিক্‌জ্যামার্গে প্রলম্বিত চুম্বক-শলাকার বা দিক-শলাকার আন্দোলনের (Swing) হারের উপর প্রথম উপায়টি নির্ভর করে।

অতি সরু রৌপ্য তারের পাকের (torsion) উপর দ্বিতীয় উপায়টি নির্ভর করে। কুলম্ব উভয় উপায় দ্বারাই চুম্বক-শক্তি মাপিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে আকর্ষণ বা

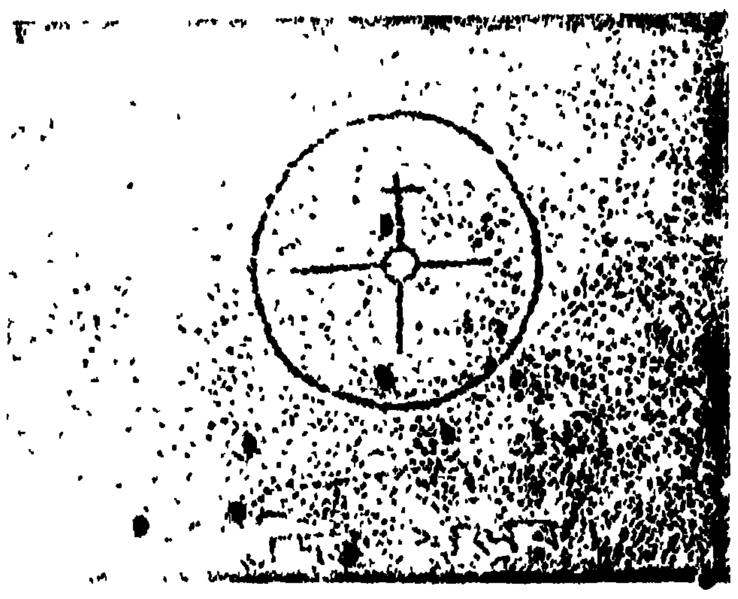

দিক্-শলাকা

বিকর্ষণ বিপরীত ক্রমে উভয়ের দূরত্বের বর্গের উপর নির্ভর করে। হিবার্টের (Hibbert) চৌম্বক নিক্তি দ্বারাও বিপরীত-বর্গবিধি প্রমাণিত হইয়া থাকে।

১। একটি দিক্‌শলাকা (Compass needle) বা চুম্বক-জ্ঞাপকযন্ত্র (magnetoscope) কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখ। একখানি ছুরির ফলা বা ছোট চুম্বক-খণ্ড দিক-শলাকার মধ্যস্থিত চুম্বক শলাকার সুমেরুর নিকট লইয়া গিয়া হঠাৎ ক্ষিপ্রহস্তে পূর্ব্ব বা পশ্চিমদিকে সরাইয়া লইয়া যাও; দেখিবে দিক-শলাকার চুম্বক-শলাকাটি

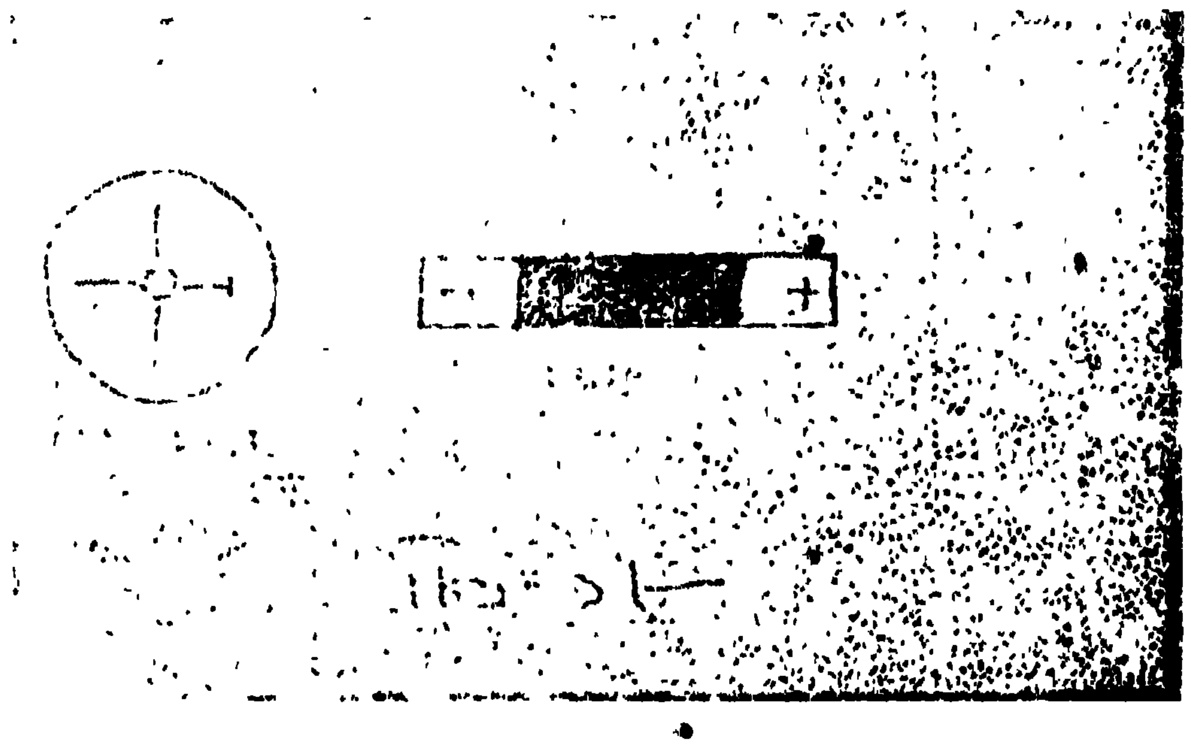

(চিত্র ১৮)

ইতঃস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছে। দশ বার পূর্ণ আন্দোলনের সময় একটি "ষ্টপ ওয়াচ" (Stop watch) সাহায্যে স্থির কর। তাহা হইতে ত্রৈরাশিক সাহায্যে এক মিনিটের আন্দোলন-সংখ্যা নির্ণয় কর। মনে কর, দিক্-শলাকা পৃথিবীর চুম্বকশক্তির অধীনে 'ব' বার আন্দোলন করে। তাহা হইলে পৃথিবী সেই দেশের ক্ষেত্রবল 'ব২' এর আনুপাতিক (proportional)। তার পর একটি চুম্বকখণ্ড দিক্-শলাকার উত্তর দিকে ইহার সহিত সম-অক্ষদণ্ডে এরূপ ভাবে স্থাপন কর যে, তাহার কুমেরু দিক্-শলাকার সুমেরুর নিকটে থাকে। এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্তরূপে এক মিনিটে চুম্বক-শলাকার আন্দোলন গণনা কর। মনে কর, এখন আন্দোলন-সংখ্যা প্রতি মিনিটে 'ব১' বার। পৃথিবী ও চুম্বক উভয়ের মিলিত ক্ষেত্রবল'ব'১' এর আনুপাতিক। এবং মনে কর, এখনকার চুম্বক ও দিক শলাকার দূরত্ব 'দ১' সেঃ মিঃ। তাহা হইলে কেবলমাত্র চুম্বক-শক্তি মাত্রা ব১'-ব১ এর আনুপাতিক। তার পর চুম্বকদণ্ডকে দিকশলাকার সহিত

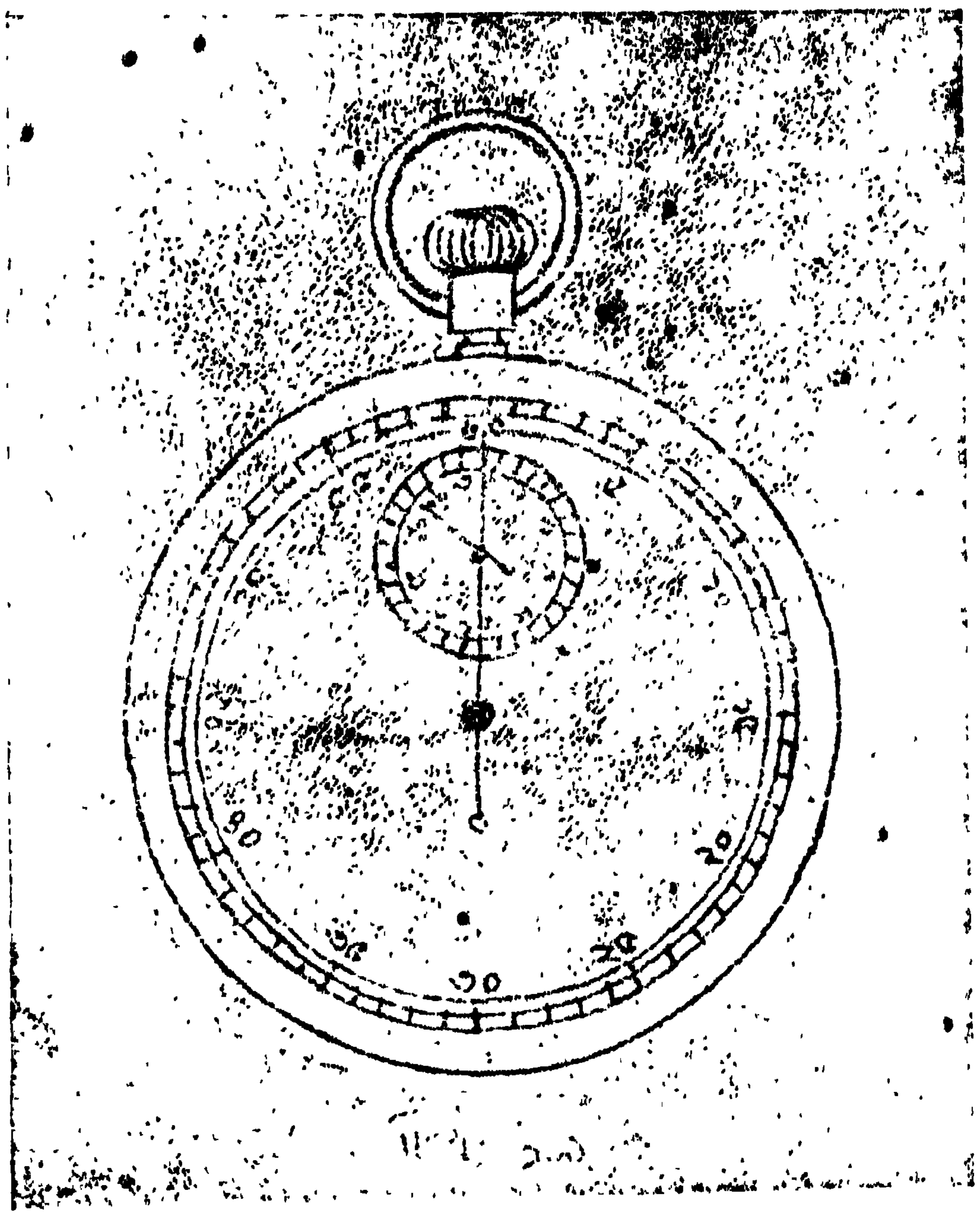

(চিত্র ১৯)

ষ্টপ-ওয়াচ

সম-অক্ষদণ্ডে রাখিয়া সরাইয়া লইয়া যাও এবং পুনরায় পূর্ব্ব কথিত মতে প্রতি মিনিটে দিক্-শলাকার আন্দোলন-সংখ্যা স্থির কর। মনে কর, আন্দোলন সংখ্যা 'ব২' বার; এবং চুম্বক ও দিকশলাকার দূরত্ব এখন 'দ২' সেঃ মিঃ (cm) তাহা হইলে এখন কেবলমাত্র চুম্বকদণ্ডের দরুণ দিক্‌শলাকা অধিকৃত দেশের ক্ষেত্রবল (ব২-ব২) এর আনুপাতিক এরূপে দেখা যায় যে নিম্নলিখিত আনুপাতটি সত্য।

$$(ব_১^২ - ব^২) \times দ_১^২ = (ব_২^২ - ব'^২) \times দ_২^২ = ধ$$

[ধ = ধ্রুবাঙ্ক বিশেষ] অর্থাৎ $\dfrac{ব_১^২ - ব^২}{ব'^২_২ - ব^২} = \dfrac{দ_২^২}{দ_১^২}$

পাকদণ্ড।

Torsion Balance

২। একটী কাচের চোঙা কছ (দৈর্ঘ্য ৬ ইঞ্চ ব্যাস প্রায় ৯ ইঞ্চ) তিনটী সমতল কর্ক স্ক্রুযুক্ত যয একখানি মোটা কাঠের তক্তায় (২" মোটা, ব্যাস এক ফুট) খাঁজের মধ্যে বসান থাকে। (চিত্র ২০) চোঙ্গাটীর দৈর্ঘ্যের মাঝখানে কাচের গায়ে একটি স্কেল শশ খোদিত থাকে। এই

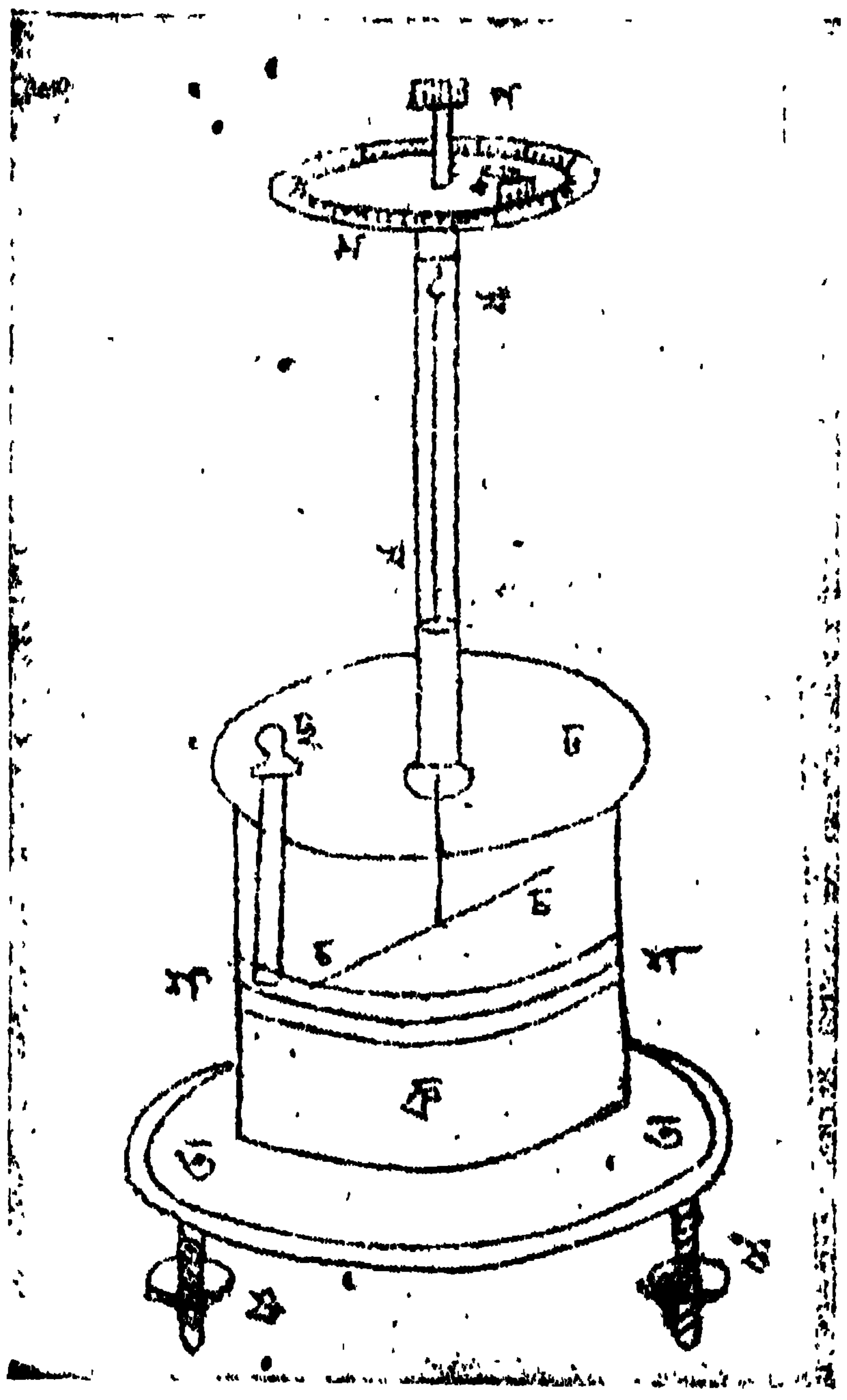

(চিত্র ২০)
পাকদণ্ড
প—পাক-মাপক, ভ—ভারনিয়ার, স—অংশ মাপক স্কেল, ঢ—ঢাকনি, চ—প্রলম্বিত চুম্বক, ছ— ছিদ্রান্তর্গত চুম্বক, শশ—স্কেল, যয—সমতল-কর্ক স্ক্রু

স্কেলটী অংশ-(degree) জ্ঞাপক। চোঙ্গার উপরকার ধারটী বেশ ঘষা ও সমতল। বৃত্তাকারে ঘষা-ধারবিশিষ্ট একখানি কাচের ঢাকনি (ঢ) চোঙ্গার উপর এমন ভাবে বসান থাকে যে, ঢাকনির ঘষা-দেশটী ঠিক চোঙ্গার ঘষা ধারটীর উপর পড়ে। ঢাক্নিটীর এক পাশের দিকে চুম্বক (অথবা ইবনাইটের রড বা ছড়ি) প্রবেশ করাইবার জন্ম একটী ছিদ্র ছ থাকে। ঢাকনির মধ্যস্থলের ছিদ্রের উপর (১" ব্যাস) সরু আর একটী কাচের চোঙ্গা, খথ, সুদৃঢ়রূপে লাগান থাকে। এই সরু চোঙ্গাটীর মাথায় পিতলের পাক-মাপক (torsion-head) লাগান থাকে। এই পাক-মাপকে একটী ছোট ভারনিয়ার, ভ, (vernier) খোদিত থাকে। পাকমাপকটী যে পিতল চোঙ্গার উপর বসান থাকে, সেই পিতল চোঙ্গার ঠিক উপর দিকের ধারে অংশ-জ্ঞাপক একটী স্কেল, স, থাকে। পাকমাপক হইতে প্রলম্বিত রৌপ্য বা তাম্র তার দ্বারা একটী চুম্বকদণ্ড, চচ, বড় চোঙ্গাটীর মধ্যে ঝোলান থাকে। চুম্বকের আন্দোলন-তলটী (plane of oscillation) বড় চোঙ্গার স্কেলের সহিত সমতলে অবস্থিত। (দুই ধারে পিতলের মণ্ডলযুক্ত ইবনাইট বা কাচের রড rod ছড়ি চুম্বকের বদলে আবশ্যক হইলে ঝুলান যাইতে পারে।) পাকমাপকটী ঘুরাইতে পারা যায়। স্কেল ও ভারনিয়ার সাহায্যে পাক-মাপকের ঘূর্ণণের পরিমাণ স্থির করা হয়। বলা বাহুল্য, পাক-মাপকটী যতখানি ঘুরান হইবে, রৌপ্য-তারে ততখানি পাক লাগিবে (যদি রৌপ্য তারকে পাক-মাপকের সহিত ঘুরিতে না দেওয়া হয়)। ঢাক্নির ছিদ্রান্তর্গত চুম্বকের নিম্নমেরু ও প্রলম্বিত চুম্বকের মেরুদ্বয় এক সমতলে অবস্থিত। কুলুম্ব (Coulomb) এই যন্ত্রের আবিষ্কারক। আমরা ইহাকে **"পাক তুলাদণ্ড"** বা সংক্ষেপে **"পাকদণ্ড"** বলিতে পারি। কুলুম্ব এই যন্ত্রের সাহায্যে "বিপরীত বর্গবিধি" (law of inverse square) প্রমাণ করিয়াছিলেন।

মনে কর, পাক-মাপকটী (torsion-head) এমন করিয়া রাখা হইয়াছে যে, প্রলম্বিত চুম্বকের অক্ষদণ্ড (axis) "চৌম্বক দিকে" (magnetic meridian) অবস্থিত। (চিত্র, উদ)। পাক-মাপকটী তার পর ৯০° অংশ ঘুরান হইল। কাজেই ঘোরান দরুণ রৌপ্য তারে পাক লাগিবে। তারে এই পাক লাগার দরুণ প্রলম্বিত চুম্বক-দণ্ডটী "চৌম্বক দিকের" সহিত ৯০° অংশে অবস্থিত, তলের দিকে ঘুরিয়া

যাইতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু পৃথিবীর চুম্বক-শক্তির দরুণ প্রলম্বিত চুম্বকটী "চৌম্বক দিকে" থাকিবার চেষ্টা করিবে। কাজেই চুম্বক-দণ্ডটী দুই টানের মধ্যে পড়িয়া হরিশ্চন্দ্র রাজার স্বর্গবাসের ন্যায় মাঝামাঝি অবস্থায় আসিয়া স্থির হইবে। এই মাঝামাঝি অবস্থাটী দুই টানের পরস্পর গুরুত্বের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ এই শক্তিদ্বয়ের মোমেণ্টের (moment) পরিমাণের উপর নির্ভর করে। মনে কর, চুম্বকটী এই দুই টানের মধ্যে পড়াতে $\theta°$ (θ গ্রীস-বাসীদিগের একটী অক্ষর, উচ্চারণ থীটা) অংশ ঘুরিয়া তাহা হইলে তারের পাকের পরিমাণ $= (৯০ - \theta°)$।

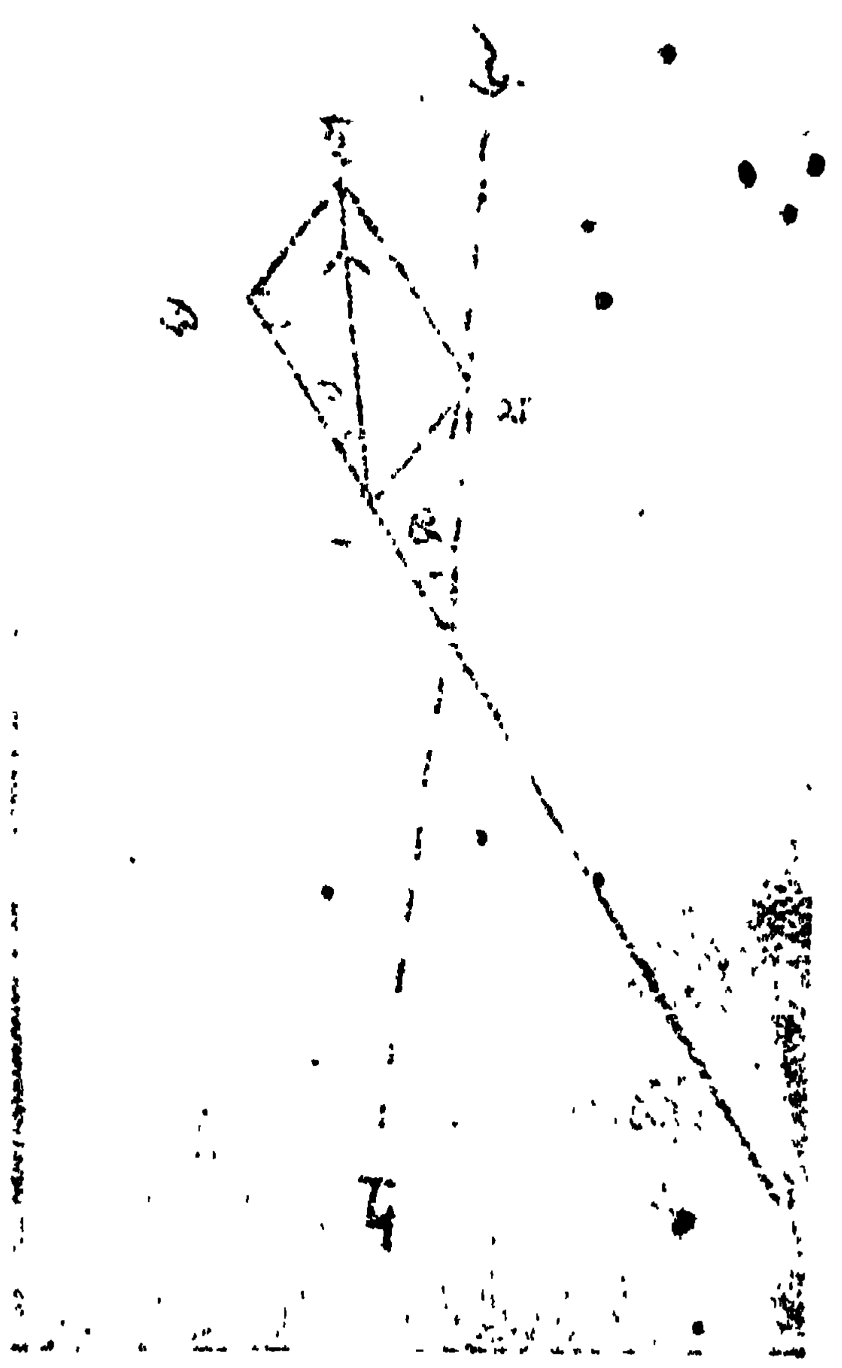

(চিত্র ২১)

যদি প্রলম্বিত চুম্বকের মেরুবল 'চ' হয়, এবং একক চুম্বক মেরুর উপর পৃথিবীর চুম্বক শক্তির টানের মাপ যদি 'হ' হয়, তবে প্রলম্বিত চুম্বকের প্রত্যেক মেরুর উপর পৃথিবীর চুম্বক-শক্তির পরিমাণ হইবে 'চ × হ'। 'চ × হ' শক্তিকে সমকোণে অবস্থিত দুইদিকে বিশ্লেষ কর। চুম্বকের দৈর্ঘ্য একটী দিক ও তাহার সমকোণে অবস্থিত রেখা অপর দিক। মনে করা যাক্, 'চ × হ' র দৈর্ঘ্যের দিকে বিশ্লিষ্ট অংশের (component) মাপ 'চক'। ইহার চুম্বককে ঘুরাইবার বা ফিরাইবার কোন ক্ষমতা নাই। কেবল তাহাকে দৈর্ঘ্যের দিকে টানিবে মাত্র। আর দৈর্ঘ্যের সমকোণী দিকে বিশ্লিষ্ট অংশ = 'চখ' (মনে কর)

এখন চখ = চ × হ × সাইন $\theta°$ *

এখন দেখা যাইতেছে যে পাকের দরুণ মোমেণ্ট চ × হ × সাইন $\theta°$ শক্তির মোমেণ্টের সহিত সমান। θ অতি সামান্য বলিয়া সাইন $\theta° = \theta°$ মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চুম্বক-টিকে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রে $\theta°$ অংশ ঘুরাইতে (৯০ $- \theta$) অংশ পাক (torsion) তারে লাগাইতে হয়। সুতরাং ১° অংশ ঘুরাইতে $\frac{৯০ - \theta}{\theta}$ অংশ পাক লাগিবে।

এখন আবার পাক-মাপককে বিপরীত দিকে ৯০° অংশ ঘুরাইয়া দাও; তাহা হইলে চুম্বকটী আবার "চৌম্বক দিকে" আসিবে। মনে কর, ভারনিয়ারের শূন্য দাগটি স্কেলের শূন্য দাগের সহিত মিলিত। তার পর একটী চুম্বকদণ্ড ঢাক্নির ছিদ্র পথে এরূপ ভাবে প্রবেশ করাইয়া দাও যে, তাহার সুমেরু প্রলম্বিত চুম্বকের সুমেরু দেশে পৌছায়। যদি প্রলম্বিত চুম্বকটী অচৌম্বক দ্রব্য (non-magnetic) হইত, তাহা হইলে প্রবিষ্ট চুম্বক প্রলম্বিত অচৌম্বক দ্রব্যটীকে চুম্বন বা স্পর্শ করিত। কিন্তু তাহা না হইয়া উভয় মেরু সমধর্ম্মী হওয়ায়, তাহাদের মধ্যে বিকর্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। মনে কর, তাহাদের মধ্যে বিকর্ষণ 'ব°' অংশ হইল। এই বিকর্ষণ দুইটী শক্তির সমষ্টির সহিত সমান।

(১) পৃথিবীর চুম্বক-ক্ষেত্রের শক্তি-মাত্রা বা ক্ষেত্রবল ; (২) তারের 'ব' অংশ পাক। পৃথিবীর চুম্বক-ক্ষেত্রের শক্তি-মাত্রা $\frac{৯০ - \theta}{\theta}$ পাক। তবেই

মেরুদ্বয়ের মধ্যে বিকর্ষণ $= \frac{৯০° - \theta}{\theta} \times ব + ব$ অংশ পাক। এখন এই 'ব' অংশ বিকর্ষণকে পাকমাপকটিকে ঘুরাইয়া অর্দ্ধেক, $\left(\frac{ব}{২}\right)$ করিতে কত পাক লাগে দেখিতে হইবে। পরীক্ষায় জানা যায় যে, 'ব°' বিকর্ষণকে ($\frac{১}{২}$ব°) করিতে

$$৪\left\{\frac{৯০° - \theta}{\theta} \times ব + ব\right\}$$ অংশ পাক লাগে।

মনে কর, যখন 'ব' অংশ বিকর্ষণ হইয়াছিল, তখন যদি

* সাইন $\theta°$ = Sin $\theta°$। বা ভূজ্যা $\theta°$ = Sin $\theta°$। ত্রিকোণমিতি দ্রষ্টব্য।

মেরুদ্বয়ের দূরত্ব 'দ' হয় এবং যখন $\frac{ব}{২}$ অংশ বিকর্ষণ, তখন মেরুদ্বয়ের দূরত্ব '½দ' হইবে। তবেই দেখা যায়,

$$\frac{\frac{১}{২}ব \text{ দরুণ বিকর্ষণ}}{ব \text{ দরুণ বিকর্ষণ}} = \frac{৪\left\{\frac{৯০^\circ-\theta}{\theta} \times ব + ব\right\}}{\left\{\frac{৯০^\circ-\theta}{\theta} \times ব + ব\right\}}$$

$$= \frac{৪}{১} \quad \ldots \quad \ldots \quad (১)$$

পরীক্ষায় জানা যায় যে, চুম্বক দূরে লইয়া গেলে চুম্বক-শলাকায় অপসরণ (deflection) কমিয়া যায়, নিকটে আনিলে বাড়ে। সুতরাং আমরা ইহা হইতে বলিতে পারি যে, চুম্বক-শক্তি বিপরীত-ক্রমে দূরত্বের কোন শক্তির (power of the distance) উপর নির্ভর করে। এই শক্তিটী যে কত, তাহা আমাদের বাহির করিতে হইবে। মনে কর, 'ন' হইতেছে এই শক্তি। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই—

$$\frac{\frac{১}{২}ব \text{ দরুণ বিকর্ষণ}}{ব \text{ দরুণ বিকর্ষণ}} = \frac{\frac{১ \times ধ}{\left(\frac{দ}{২}\right)^{ন}}}{\frac{১ \times ধ}{(দ)^{ন}}} = \frac{দ^{ন} \times ধ}{\ldots} = \frac{২^{ন}}{১}$$

ধ – ধ্রুবাঙ্ক বিশেষ। 'ন' যে কত তাহা আমাদের জানা নাই বাহির করিতে হইবে।

$$\therefore \frac{২^{ন}}{১} = \frac{৪}{১} = \frac{২^{২}}{১} \qquad [\text{(১) দ্বারা}]$$

$$\therefore ন = ২$$

সুতরাং ইহা দ্বারা বিপরীত বর্গবিধি প্রমাণ হইল। অর্থাৎ চুম্বক-শক্তি বিপরীত ক্রমে দূরত্বে বর্গের উপর নির্ভর করে।

এই যন্ত্র-সাহায্যে কুলুম্ব সাহেব পরীক্ষায় কার্য্যতঃ যে ফল পাইয়াছিলেন, বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। চুম্বককে পৃথিবীর চুম্বক-শক্তির অধীনে ১° অংশ ঘুরাইতে ৩৫° অংশ পাক আবশ্যক হইয়াছিল। অর্থাৎ $\frac{৯০^\circ-\theta}{\theta} = ৩৫$। লম্বমান (vertical) চুম্বক প্রবেশ করাইবার পর প্রলম্বিত চুম্বকের অপসরণ (deflection), ব = ২৪° অংশ। তাহা হইলে

পৃথিবীর চুম্বক-শক্তি = (২৪ × ৩৫) = ৮৪০° অংশ পাক (torison); সুতরাং ২৪ দরুণ বিকর্ষণ = (৮৪০ + ২৪) = ৮৬৪ পাক। এখন এই অপসরণকে (deflection) অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১২ করিতে, পাকমাপককে পূর্ণ আটবার ঘুরাইতে হইয়াছিল; অর্থাৎ (৩৬০ × ৮°) = ২৮৮০ ঘুরাইতে হইল। ∴ এখন তারের পাক-সমষ্টি = (২৮৮০ + ১২) = ২৮৯২°। চুম্বককে চৌম্বকদিক হইতে ১২° অংশ ঘুরাইতে যে পাক লাগে [অর্থাৎ, ১২ × ৩৫ (= ৪২০)] সেইটা নিশ্চয়ই ২৮৯২° তে যোগ করিতে হইবে। সুতরাং ১২° অংশ দরুণ বিকর্ষণ = (২৮৯২ + ৪২০) = ৩৩১২°

সেইজন্য

$$\frac{১২ \text{ দরুণ বিকর্ষণ}}{২৪ \text{ দরুণ বিকর্ষণ}} = \frac{৩৩১২}{৮৬৪} = \frac{৪}{১} \text{ (মোটামুটি)}$$

এখানে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, মেরুদ্বয়ের রৈখিক দূরত্ব কৌণিক দূরত্বের আনুপাতিক। যখন θ অতি সামান্য অর্থাৎ যখন সাইন θ = θ, তখনই এই ধরিয়া লওয়াটা খাটে; নচেৎ যখন θ'র মাপ বেশী, তখন এই ধরিয়া লওয়াটা ভুল। তখনকার গণনা-পদ্ধতি "অচল তড়িৎ তত্ত্বে" বিস্তারিত ভাবে দিবার ইচ্ছা রহিল।

সন্ধ্যা-রাণী

[শ্রীসত্যপ্রিয়া দেবী]

প্রথম সরকারি চাকরি লইয়া বক্সার যাত্রা করিয়াছি। অণ্ডাল ষ্টেসনে এক্সপ্রেস ট্রেণের আশায় অপেক্ষা করিতেছি; ট্রেণ রাত্রি ৯টার সময় ছাড়িবে। সঙ্গে কেবল একটা পোর্টমেণ্ট। কুলির সহিত চুক্তি হইয়াছে, আমাকে ট্রেণে উঠাইয়া দিলে পুরস্কার পাইবে। ট্রেণখানা মাত্র ৩ মিনিট কাল ঐ ষ্টেসনে থামিবে।

ট্রেণ আসিল -অনেক ছুটাছুটি করিয়াও কোনও গাড়ী খালি পাইলাম না। কুলি পুরস্কারের লোভে অগত্যা একটা স্ত্রীলোকের গাড়ীতে বাক্সটা উঠাইয়া দিল। সেখানকার প্লাটফর্ম একটু নীচু হওয়াতে আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না—গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। উঠিয়া দেখি, সর্ব্বনাশ! স্ত্রীলোকের গাড়ী। আর সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রীলোক যাত্রীরা প্রায় সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জেনানা গাড়ী, জেনানা গাড়ী"। আমি তখন স্তম্ভিত হইয়া একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম। নামিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে সুমিষ্ট অথচ ভীত চীৎকারে আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। হায়, হায়! এমন বিপদও মানুষের হয়! একে ত বিষম অপ্রস্তুত হইয়া দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছি, তাহার উপর প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ভয় হইতেছিল, যদি কোন রূপসী দয়া করিয়া একবার সতর্ক করিবার শৃঙ্খল টানিয়া দেন, তাহা হইলে অপরংবা কিং ভবিষ্যতি। কোন সুন্দরী বলিল, "মিন্সের আকেলটা দেখ দেখি।" কেহ বা বলিল, "নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে, দেখ্‌ছো না?" কেহ বা হাসিয়া অপরার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল। বাসর-ঘরে বরের অবস্থাও বুঝি এমন শোচনীয় হয় না!

লজ্জায় ও ভয়ে যখন নিতান্ত অস্থির হইয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশনের দিকে এক-একবার উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিতেছিলাম, তখন দেখি, একটি অতি সুন্দরী কিশোরী একটি বৃদ্ধার কাণে-কাণে কি বলিয়া দিল। পরিচ্ছদে অনুমান হইল, উঁহারা হিন্দুস্থানী। বৃদ্ধা উচ্চ কণ্ঠে সকলকে বলিল, "আপনারা এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? উনি কি আর ইচ্ছা করিয়া এ গাড়ীতে উঠিয়াছেন? পরের ষ্টেশনে নামিয়া যাইবেন।" তাহার পর আমার নিকটে আসিয়া সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে বলিল, "বাবু, তুমি আসানসোলে নামিও; আমরাও নামিব—আমাদের একটু দরকার আছে; পরের ট্রেণে আমরা যাইব।"

আসানসোলে ট্রেণ থামিবামাত্রই আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। মাথা হইতে যেন একটা বিষম বোঝা নামিয়া গেল। সে ট্রেণে আর স্থান পাইলাম না। রাত্রি তিনটার সময় একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ যাইবে—তাহার অপেক্ষায় আসানসোলে একটা বেঞ্চের উপর হতাশ ভাবে শয়ন করিয়া রহিলাম। সেই বৃদ্ধা আর বালিকা আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। বালিকা একটু করুণ অথচ বোধ হয় একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া আমার দিকে চাহিল। বৃদ্ধা বলিল, "বাবুর বড় কষ্ট হ'লো।" আমি লজ্জায় চুপ করিয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকার পর সবে-মাত্র একটু তন্দ্রার আবির্ভাব হইয়াছে, এমন সময় শুনিলাম, অতি কোমল কণ্ঠে কে বলিল, "বাবুকে ডাক না, ট্রেণের সময় হইয়াছে।" চাহিয়া দেখি সেই কিশোরী ও সেই বৃদ্ধা। আমি উঠিয়া বসিলাম।

বৃদ্ধা বলিল, "বাবু, আপনি কত দূর যাবেন?"

"বক্‌সার।"

"আমরাও বক্‌সার যাবো; ভাল হ'লো, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

এক গাড়ীতেই তিনজনে উঠিলাম। বৃদ্ধা আমার পার্শ্বে বসিল—তরুণী সম্মুখের বেঞ্চে স্থান লইল। ট্রেণের দীপ্ত আলোকে বালিকার অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এমন সুগোল গোলাপি রংএর মুখ! স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য যেন সেই কোমল দেহের সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমি মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলাম - তরুণী চক্ষু অবনত করিল। বৃদ্ধা নিজেই তাহাদের পরিচয় দিল।

বালিকা পিতৃমাতৃহীনা; নিবাস ভোজপুর। বাড়ীতে

এক বৃদ্ধ পিতামহ আছেন। বালিকা প্রায়ই কলিকাতায় মাতুলালয়ে বাস করে। তাহার মামা একজন ধনী ব্যবসায়ী। অপর এক মাতুল বক্‌সারে ওকালতি করেন; তাঁহার নাম শিউশরন মিশ্র। বালিকা সেইখানেই যাইতেছে। বৃদ্ধা তাহার দাসী। আসানসোলেও এক কুটুম্ব আছে—বালিকা একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নামিয়াছিল। বৃদ্ধাকে আমার নিজের পরিচয়ও কতকটা দিতে হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?" বালিকা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধা বলিল, 'সান্ঝারাণী"—আমি কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। বালিকা তাহা বুঝিতে পারিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "সন্ধ্যারাণী"। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি বাবু?"

"দীনদয়াল ঘোষ।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিয়া আমি বলিলাম, "তোমরা এমন সুন্দর বাঙ্গলা বল্‌ছো, যে আমি পোষাক না দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্ত্তাম না যে তোমরা বেহারী।"

বৃদ্ধা বলিল, "আমরা বরাবর কল্‌কাতায় আছি। সন্ধ্যা ত বাঙ্গালা লেখাপড়া ভালরকম শিখেছে। আর তা'র খেলার সাথি ছিল যত বাঙ্গালীর মেয়ে। সে বাঙ্গালা গান পর্য্যন্ত শিখেছে।" আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম, "এ ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।" বালিকা লজ্জিতা হইয়া বসিয়া রহিল।

সারারাত্রি জাগরণের অবসাদে বৃদ্ধার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যা কিন্তু প্রফুল্লভাবেই বসিয়া ছিল। আমি বলিলাম, "সন্ধ্যা, তুমি ত এখন বক্‌সারে থাকবে—আমিও বক্‌সারে যাচ্ছি। বোধ হয় মাঝে-মাঝে দেখা হ'তে পারে।" সন্ধ্যা বলিল, "বাবু, আপনি আমার মামার সহিত আলাপ কর্ব্বেন—সেখানে আবার দেখা হ'তে পারে।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা"।

(২)

একদিন বৈশাখের অপরাহ্ণে বক্‌সার দুর্গের একপ্রান্তে যেখানে Anemograph Shed আছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া দুই বন্ধু—আমি ও সুরযমল। সুরযমল আমার বাল্যবন্ধু। এখন সে এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার; আর আমিও গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত-বিভাগে কার্য্য করি। দুর্গতলে যেখানে বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবন ছিল, সেই "চরিত্র বনে" একটা বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর ঐখানে একবার করিয়া যজ্ঞ হইয়া থাকে। তাহার নিকটেই রামরেখা ঘাট; সেখানে একটা বৃহৎ মেলা বসিয়াছে। রামচন্দ্র তাড়কাবধের সময় ঐ স্থানে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যজ্ঞক্ষেত্র হইতে পঞ্চশত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উচ্চারিত প্রণবধ্বনি সেই ক্ষুদ্র প্রান্তরে কি একটা গাম্ভীর্য্য আনয়ন করিতেছিল—কি একটা অতীতের পুরাতনী স্মৃতি সেই বেদধ্বনির সহিত ভাসিয়া আসিয়া আমার মনের মধ্যে দারুণ নৈরাশ্যের সঞ্চার করিতেছিল—তাহা ভাষায় প্রকাশ হয় না। আমি উদাস দৃষ্টিতে যজ্ঞভূমির দিকে চাহিয়া ছিলাম, সুরযমল মেলার দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার পর দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেলা দেখিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। একে-একে জনস্রোত বিরল হইল। দুইজনে রামরেখার বাঁধা ঘাটে বসিয়া ভাগীরথী-শীকরসিক্ত বায়ুতে কতকটা শ্রান্তি দূর করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরের আরতিধ্বনি শেষ হইলে, দুইজনে উঠিয়া রামচন্দ্র দেবকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহমধ্যে অতি কোমল কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছিল—

"সহজ কৃপালা
দীনদয়ালা
রঘুকুলতিলক
শরণাগত পালক—"

মুগ্ধ হইয়া দুইজনে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম; যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিচলিত হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, সেই পূর্ব্বপরিচিতা বালিকা মধুর কণ্ঠে তন্ময়তার সহিত তুলসীদাসের গাথা আবৃত্তি করিতেছিল—নিকটেই যোড়-হাতে সেই বৃদ্ধা। বালিকা যতক্ষণ আবৃত্তি করিতেছিল, ততক্ষণ তাহার দৃষ্টি স্থিরভাবে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি-প্রতি সন্নিবদ্ধ ছিল। আমরাও মন্ত্র-মুগ্ধবৎ শুনিতেছিলাম। আবৃত্তি শেষ হইলে বালিকা আমাদিগের প্রতি চাহিল,—পরে মধুর হাস্যে আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "কৈ, আপনি ত আমার সহিত দেখা করেন নাই!" একটা চৌম্বক আঘাত, কি বৈদ্যুতিক প্রবাহ আমার শরীরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইল, জানি না। আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "অবকাশ পাই

নাই—আচ্ছা, কা'ল তোমাদের ওখানে যাব।" নিদ্রাবসানে অভাগার সুখস্বপ্নবৎ বালিকা অন্তর্হিতা হইল। সুরযমলের বিস্ময় কতকটা অপনীত হইলে, সে উল্লাসের সহিত চীৎকার করিয়া বলিল, "Romance"। আমি হাসিতে-হাসিতে বলিলাম, "Romance কি হে?"

সুরযমল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "তাই ত হে, ব্যাপারটা কি বল দেখি।" আমি তখন তাহাকে মোটামুটি ঘটনা বলিলাম। সে বলিল, "তা মন্দ নয়। যেরূপ ব্যাপার দেখছি, তাতে তুমি একটা নভেলের প্লট জুটিয়ে দেবে দেখ্‌ছি।"

আমি—"তামাসা রাখ। প্রেম জিনিসটা আমার মধ্যে সহজে প্রবেশ কর্ত্তে পারে না।"

সুরয—"হাঁ, কিন্তু, প্রবেশ কল্লেও সহজে বেরোতে পার্ব্বে না, এটাও ঠিক।" আমি কৌশলক্রমে কথাটা চাপা দিয়া সে দিনের মত রক্ষা পাইলাম।

পরদিন অপরাহ্নে শিউশরণ বাবুর সহিত আলাপ করিলাম ও তাঁহার ভাগিনেয়ীর সহিত যে পরিচয় আছে তাহাও বলিলাম। তিনি অতি ভদ্রলোক। আমার অত্যন্ত আদর করিলেন ও মাঝে-মাঝে তাঁহার ওখানে যাইবার জন্য সানুরোধ নিমন্ত্রণ করিলেন।

সে দিন আর দুই-চারিটী কথার পর বিদায় লইলাম। বাহিরে আসিয়া একবার, কেন জানি না, কৌতূহলী হইয়া দ্বিতলের জানালার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম, উদাস, লজ্জা ও চঞ্চলতা-মাখা দুইটী উৎসুক নেত্র আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমিও চাহিলাম। তাহার পর উদাস প্রাণে বাসায় ফিরিলাম। এইরূপ প্রায়ই হইত। মাঝে মাঝে শিউশরণ বাবুর বাসায় চা-পান ও জলযোগ করিতে হইত। সন্ধ্যাও প্রয়োজনবশতঃ আসিয়া সরল ভাবে দু'একটী কথা কহিত। প্রায়ই আমি চিন্তা করিতাম—এ আকর্ষণের পরিণাম কি? আমার কঠোর হৃদয় তখন দুর্ব্বলতায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়া-ভাবিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতাম না। শেষটা মনকে প্রবোধ দিতাম, ভবিতব্যতা নিজের পথ দেখিয়া লইবে। সুরযমলকে ঐ সম্বন্ধে আর কোনও কথা বলি নাই।

(৩)

একদিন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। ধীরপদে শিউশরণ বাবুর বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম। যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছিলাম, ততই এক স্বর্গীয় সঙ্গীত-তরঙ্গ কাণে আসিয়া আমার চতুর্দ্দিকে যেন এক অপ্সরা-রাজ্যের সৃষ্টি করিতে লাগিল। এ যে সন্ধ্যার স্বর! হার্ম্মোনিয়াম-সহযোগে মধুর কণ্ঠে গীত হইতেছিল—

"তুমি আমারি, তুমি আমারি
মম বিজন-স্বপন-বিহারী—"

কেবল এই দুই ছত্রই মনে হইতেছে। আর যে কি গাহিতেছিল, তাহা বলিতে পারি না, কারণ তখন আমি কোন্ স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া গিয়াছিলাম। গান থামিলে শিউশরণ বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। ঝি বলিল, "বাবু আজ মফঃস্বলে গিয়াছেন—আমি খবর দিতেছি, আপনি বসুন।" কিয়ৎকাল পরে সহাস্য মুখে সন্ধ্যা চা-পাত্র লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

আমি ধীরে-ধীরে চা পান করিতেছি, আর সন্ধ্যা মূর্ত্তিমতী শোভা রূপে সম্মুখে দণ্ডায়মানা—যেন আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির সাম্‌নে,—নিষ্ঠা সফলতার সাম্‌নে। আমি বলিলাম, "সন্ধ্যা, আজ তোমার গান শুনিয়াছি; এমন মধুর গান আমি কখনও শুনি নাই।" আনন্দে বালিকার মুখ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সে তাহার একটা হাত চেয়ারের উপর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন আমার হৃদয়ে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু আমি মনোমধ্যে একটা সংকল্প স্থির করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। সন্ধ্যা কিয়ৎকাল স্থিরভাবে আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "বাবুজি, আজ আপনাকে বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?" আমি বলিলাম, "সন্ধ্যা"—স্বর বুঝি কাঁপিতেছিল; সন্ধ্যা উৎকণ্ঠিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি বলিলাম, "সন্ধ্যা, আজ তোমাকে একটা কথা বল্‌বো মনে করেছি।"

"আমিও বুঝেছি, আজ কোন নূতন কথা আপনার মনে হয়েছে।"

"সন্ধ্যা, আর আমার এখানে আসা উচিত নয়।"

"কেন?"

"দেখ সন্ধ্যা, দিন-দিন তোমার উপর আমার ভালবাসা বেড়ে যাচ্ছে।"

বালিকা কতকটা প্রফুল্লতার সহিত বলিল; "ও—এই

কথা!" বলিতে বলিতে বালিকা দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ নীরবে তাহার প্রতীক্ষা করিলাম—কিন্তু সে আসিল না। তখন ভগ্ন-হৃদয়ে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

পরদিনও যন্ত্রচালিতবৎ পুনরায় শিউশরণ বাবুর বাসায় গিয়াছি—আদর পাইয়াছি; কিন্তু আমার ব্যাকুল চক্ষু যাহা খুঁজিয়াছে, তাহা পায় নাই। সন্ধ্যাকে আর দেখিতে পাইতাম না। একদিন সাহস করিয়া শিউশরণ বাবুকে সন্ধ্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "সে তাহার জন্মভূমি ভোজপুরে গিয়াছে।" "এখানে আসিবে না?" "না; তাহার বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানেই থাকিবে।" সেইদিন হইতে আমার মন যেন কেমন হইয়া গেল। আমি ত সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিব না; লুব্ধ পথিক—আর এ আশাহীন মরীচিকার দিকে ছুটিব না। তবে সে চলিয়া যাওয়াতে কেন মন এত খারাপ হইল? বুঝি প্রবল হৃদয় স্রোতে কর্ত্তব্যজ্ঞান ভাসিয়া গেল।

(৪)

দিন দিন আমার মানসিক অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে একবার ৪ দিনের জন্য ছুটি পাইলাম। চিত্তের অপ্রসন্নতা কতকটা গোপন করিয়া সুরযমলকে বলিলাম, "ভাই, চল, একবার শোন-নদীর খাল দিয়া নৌকা-যোগে দু'এক দিনের জন্য বেড়াইয়া আসি।" সে স্বীকৃত হইল। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল। ভোজপুর হইতে এক মাইল দূরে বজরা বাঁধা হইল। ভোজপুরেই যে তখন আমার হৃদয়ের সমস্ত বাসনাই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, তাহা সুরযমল জানিত না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নৌকার উপর আহারাদির উদ্যোগ হইতেছে। সম্মুখে কিয়দ্দূরে ভোজপুর গ্রাম—ইহাই ভোজরাজ-প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন নগর। সেখান হইতে সন্ধ্যাকালীন মৃদু কলরব ভোজপুর Distributary দিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল। আমি বলিলাম, "ভাই সুরযমল, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার জ্যোৎস্না-মাখা ময়দানের উপর দিয়া ঘুরিয়া আসি।" জিজ্ঞাসা করিতে-করিতে বৃদ্ধ রঘুনন্দনের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। তাহাকে বলিলাম "এখানে সরকারী কার্য্যে এসেছি—তোমার পৌত্রীর সহিত আলাপ আছে—তাই একবার দেখা করতে এলাম।" বৃদ্ধ আমার ন্যায় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে অতিথি পাইয়া কৃতার্থ হইল,—হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। বৃদ্ধ ও সন্ধ্যার অনুরোধে সে-দিন আমাকে সেখানেই আহার করিতে হইবে। আহার-গৃহে একাকী বসিয়া আছি—সন্ধ্যা কতকগুলি মোটা রুটি, ডাউল ও তরকারী লইয়া হাজির হইল। সে হাসিতে-হাসিতে বলিল, "বাবুজি, আজ আপনাকে এই সামান্য খাবার খেতে হবে। এ সব জিনিস আপনার ভাল লাগ্‌বে কি? আচ্ছা বাবুজি, আপনি এখানে কোন্ সরকারী কাযে এসেছেন?" আজ বালিকাকে একটু অধিক কৌতুকময়ী দেখিলাম। আমি বলিলাম, "কি কায তা তুমি কি বোঝ না সন্ধ্যা? তোমাকে অনেকদিন দেখি নাই, তাই দেখ্‌তে এসেছি।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আমি বলিলাম, "শিউশরণ বাবুর মুখে শুনিলাম, তোমায় বিবাহের জন্য এখানে পাঠান হইয়াছে। সন্ধ্যা, তোমার বিবাহের সময় আমাকে সংবাদ দিবে না?"

"বিবাহ যদি করি, ত সংবাদ পাবেন।"

"কেন, বিবাহ কর্‌বে না?"

"না, আমার বর পছন্দ হয় না।"

"জগতে কি কাহাকেও পছন্দ হয় না?"

"তা বল্‌বো না"—কৌতুকের সহিত এই কথা বলিয়া সন্ধ্যা চুপ করিল।

"আচ্ছা সন্ধ্যা, তোমার এ-সব আব্‌দার তোমার ঠাকুর-দাদা সহ্য করেন?"

"তিনি আমার সব আব্‌দারই সহ্য করেন।"

"আচ্ছা, একটা কথা তিনি রাখেন না?" সন্ধ্যা আমার মনের কথা বোধ হয় বুঝিল—উচ্চহাস্যে বলিল, "না;—সেই কথাটাই কেবল তিনি রাখবেন না।" এবার আর তাহাকে আট্‌কাইতে পারিলাম না—সে ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমার আহারের সংবাদ লইতে বৃদ্ধ আসিল। সন্ধ্যা তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। অনেক কথার পর বৃদ্ধ বলিল, "বাবুজি, আমি দশবৎসর বাঙ্গালা দেশে কায করিয়াছি—আপনার বাড়ী কোন্ জিলা?"

"বর্দ্ধমান"

"কোন্ গ্রাম?"

"খাস বর্দ্ধমানেই আমার বাড়ী।"

বৃদ্ধ চমকিত হইয়া বলিল, "আপনার পিতার নাম?"

"রাজকুমার দোবে।"

বৃদ্ধ আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি ব্যাপার কি বুঝিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ হাসি-কান্নার পর বৃদ্ধ বলিল, "বাবুজি, আমি আপনার গোলাম।" আমি অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। সে বলিল, "আমি দশবৎসর বাঙ্গালায় ছিলাম—ঐ দশবৎসরই আপনাদের বাড়ীতে বরকন্দাজ ছিলাম। আপনার তখন জন্ম হয় নাই। আপনার পিতা তখন যুবক। ঈশ্বর ইচ্ছায় আজ আমার যে দশা দেখ্ছেন, তেমন দশা পূর্ব্বে ছিল না। আমি পূর্ব্বে বিষম দরিদ্র ছিলাম। আপনাদের অন্নে এই বৃদ্ধ প্রতি-পালিত হইয়াছে।" বলিতে-বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। সন্ধ্যা উৎকণ্ঠিত ভাবে এসব শুনিতেছিল—আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। মনে হইল, পিতৃদেব অনেকবার বলিয়াছেন, রঘুনন্দন উপাধ্যায় নামে একজন অতি সাহসী ও বিশ্বস্ত পালোয়ান আমাদের বাড়ীতে ছিল। কতকটা স্থির হইয়া বৃদ্ধ বলিল, "বাবু, তুমি প্রভু—আমি দাস—তোমার উপযুক্ত আদর করিতে পারি নাই।"

"ও কথা তুমি বলো না—তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার পূজ্য।" বৃদ্ধ তাহার পর আমার পারিবারিক অন্যান্য সংবাদ লইল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আমার হৃদয়ের সমস্ত সাহস সংগ্রহ করিয়া বৃদ্ধকে বলিলাম "বৃদ্ধ, তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখিবে?" "এখনও প্রভু-পুত্রের জন্য এ দরিদ্র প্রাণ দিতে পারে।" আমি দ্বিধা-মিশ্রিত স্বরে বলিলাম, "তোমার বাড়ীর একটা জিনিসে আমার বড় লোভ হয়েছে।" বৃদ্ধ বলিল, "এ দরিদ্রের ঘরে যা কিছু তোমার পছন্দ হয়, তুমি নিজের হাতে তুলে নাও বাবু—এ বৃদ্ধ কৃতার্থ হইবে।" আমি তখন উঠিয়া লজ্জাবনতমুখী সন্ধ্যার হাত ধরিলাম—আকস্মিক আনন্দে ও উৎকণ্ঠায় বিহ্বল হইয়া সন্ধ্যা তখন কাঁপিতেছিল। বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া-চাহিয়া ব্যাপারটা বুঝিল। বুঝিয়া সাশ্রুনয়নে বলিল, "তুমি বিবাহ কর্‌বে?"

"তুমি যদি সন্তুষ্ট চিত্তে রাজি হও।"

"তোমার পিতামাতার মত হবে?"

"তাঁরা স্বর্গে গিয়েছেন।"

আমার পিতামাতার পরলোক-গমনের সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল "বাবুজি, এমন মনিব আর পাইব না।" বৃদ্ধ তখন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বাবুজি, সন্ধ্যার কি এমন অদৃষ্ট হবে?"

তাহার পর—তাহার পর আর কি? তাহার পর শ্রীমতী সন্ধ্যাকে লইয়া আমি এখনও সুখে ঘরকন্না করিতেছি।

সরবায়া

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

সিপ্রি গোয়ালিয়র রাজ্যের গ্রীষ্মকালের রাজধানী। মহারাজ সিন্ধিয়া বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত সিপ্রিতে বাস করেন, সেই জন্য এই ছয় মাস তাঁহার প্রধান-প্রধান কর্ম্মচারীরাও এখানে আসেন। গোয়ালিয়র হইতে সিপ্রি পর্য্যন্ত মহারাজা একটি ছোট রেল-লাইন তৈয়ার করিয়াছেন। তাহাতে দিনে একখানি গাড়ী যায় ও আসে; কেবল মহারাজা যখন সিপ্রিতে থাকেন, তখন আর একখানি গাড়ী চলে। এই গাড়ীখানির নাম সিপ্রির ডাক। সিপ্রির ডাক অনেকটা কলিকাতার ট্রাম গাড়ীর মত; ইহার একখানিতে ইঞ্জিন, ফার্ষ্ট ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাস এবং আর একখানিতে থার্ডক্লাস ও ব্রেক ভ্যান। দুঃখের বিষয়, গাড়ীর বেঞ্চগুলি কলিকাতার ট্রামগাড়ীর বেঞ্চ অপেক্ষা কম চওড়া। মহারাজা সিন্ধিয়া ও তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গ গোয়ালিয়র হইতে সিপ্রি পর্য্যন্ত ৭৪ মাইল পথ মোটরেই যাতায়াত করিয়া থাকেন।

সিপ্রির দক্ষিণে কালিসিন্ধুর উভয় তীরের পর্ব্বতময় ভূমি দীর্ঘকাল স্বাধীন ছিল; এই সকল দেশের রাজপুত রাজারা কখনও ভাল করিয়া মুসলমানের অধিকার স্বীকার করেন নাই। সেই জন্য এই দেশে হিন্দুর প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ ততটা লুপ্ত হয় নাই। গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব-

বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মোরেশ্বর গার্দ্দের নিকট এই দেশের কথা শুনিয়া, তাঁহার সহিত সিপ্রির ডাকগাড়ীতে গোয়ালিয়র হইতে সরবায়ার প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিতে যাত্রা করা গেল।

বেলা ৪টার সময় গোয়ালিয়র হইতে রওনা হইয়া রাত্রি ৯টার সময় সিপ্রিতে উপস্থিত হওয়া গেল। সিপ্রি ছোট সহর বটে, কিন্তু তথায় অনুষ্ঠানের ক্রটী নাই। সরাই, হোটেল, হাসপাতাল, স্কুল, ক্লব সমস্তই আছে। রাস্তা ঘাট অতি সুন্দর, বৈদ্যুতিক আলো ও পাথার ব্যবস্থা হইতেছে। দুই দিন মহারাজ সিন্ধিয়ার দ্বিতীয় রাজধানী সিপ্রি সহরে বাস করিয়া, তৃতীয় দিনে সরবায়া যাত্রা করা গেল। সিপ্রি হইতে সরবায়া ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে পাকা রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ধরিয়া সরবায়া যাইতে হয়।

ছবির মত, সিপ্রি সহর ছাড়িয়া, মহারাজার পার্ক ও ব্যাণ্ড-ষ্টাণ্ড পার হইয়া আমাদের টাঙ্গা এক উপত্যকায় নামিল। উপত্যকাটি বড় সুন্দর, চারিদিকে ছোট-ছোট পাহাড়, সবুজ গাছপালা; আর মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট পাহাড়িয়া নদী। পথ ক্রমশঃ উপত্যকা ও বন ছাড়িয়া একটু খোলা জায়গায় গিয়া পড়িল। এই স্থানটি পূর্ব্বে অতি রমণীয় ছিল, কারণ, মহারাজ উপত্যকার একদিক বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া একটি সরোবর তৈয়ার করিয়াছিলেন। সরোবরের বাধটি গত বর্ষার সময় ভাঙ্গিয়া সমস্ত জল বাহির হইয়া গিয়াছে। অতীতের স্মৃতির মত দুই-একখানি ষ্টীমার ও কয়েকখানি নৌকামাত্র পড়িয়া আছে। এ বৎসর দুই-তিনটি নদের বাধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মহারাজার অনেক টাকা ক্ষতি হইয়াছে, এবং গোয়ালিয়র রাজ্যের বহু প্রজা ধনে-প্রাণে মারা গিয়াছে। যে সরোবরটির ধার দিয়া সরবায়ায় যাইবার পথ গিয়াছে, তাহার নাম চাঁদপাঠা। হ্রদ তৈয়ারি হইবার পূর্ব্বে এই উপত্যাকায় প্রচুর পরিমাণে ফসল হইত, টাঙ্গাওয়ালা বলিল যে এই জায়গার খরমুজা এককালে বিখ্যাত ছিল।

চাঁদপাঠার সরোবর ত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য উপত্যকা দিয়া টাঙ্গা চলিতে লাগিল। চারিদিকেই ধ্বংসের চিহ্ন; সরোবরের জল গ্রাম, নগর, বন, উপবন, শস্যক্ষেত্র সমস্তই ধ্বংস করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিছুদূর গিয়া দক্ষিণ-পার্শ্বে আর একটি হ্রদ দেখা গেল; অতিরিক্ত বর্ষা হওয়ায় তাহার জল অত্যন্ত বাড়িয়াছে এবং বাঁধ ছাপাইয়া পড়িয়াছে। সিপ্রি হইতে চারিক্রোশ দূরে আসিয়া চড়াই আরম্ভ হইল; এবং তিন ঘণ্টায় ছয় ক্রোশ পথ চলিয়া টাঙ্গা সন্ধ্যাবেলায় সরবায়ার ডাকবাঙ্গালায় পৌছিল। সরবায়া গ্রামে যাইবার পথ সিপ্রি হইতে ১২ মাইল দূরে বাম দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই রাস্তাটা কাচা ছিল; কিন্তু সম্প্রতি মহারাজা উহা পাকা করিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন। সরবায়ার ডাকবাঙ্গালা এই পথের মোড় হইতে এক পোয়া পথ দূরে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যবর্ত্তী পুরাণ ডাকবাঙ্গালাটি ভাঙ্গিয়া মহারাজা দূর পাহাড়ের উপর এই নূতন ডাকবাঙ্গালা তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। চারিদিকে ছোট-ছোট সবুজ পাহাড়; চারিদিক হইতে অসংখ্য ময়ূর ডাকিতেছে; মাঝে-মাঝে হরিণের দল ছুটিয়া পথ পার হইয়া যাইতেছে। পাহাড়ের গা বাহিয়া শত-শত ঝরণার জল পড়িতেছে। শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠিয়াছে। এমন সুন্দর দেশ বোধ হয় কখন দেখি নাই।

সরবায়া গ্রাম কত দিনের, তাহা বলা যায় না। তবে খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে ইহা এই দেশের একটি প্রধান তীর্থস্থান ছিল। তখন একটি শিবমন্দির, একটি বিষ্ণুমন্দির ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের জন্য একটি বড় মঠ তৈয়ার হইয়াছিল। মুসলমানেরা যখন এদেশে আসে, তখন এই মন্দির দুইটি ও মঠটির অর্দ্ধেকের বেশী মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য তাহারা উপরের অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহা দিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। আগ্রা হইতে বোম্বাই যাইবার পথ ছাড়িয়া এক পোয়া চলিয়া গেলে, সরবায়া গ্রামে উপস্থিত হওয়া যায়। গ্রামটি অত্যন্ত ছোট; ইহাতে বাজার বা দোকান নাই। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে সরবায়ার দুর্গ অবস্থিত। দুর্গের চারিদিকে পাথরের প্রাচীর। প্রাচীর বেড়িয়া পরিখা আছে; তাহাতে বার মাস জল থাকে। এই দুর্গের ভিতরে আর একটি ছোট দুর্গ আছে, তাহার নাম বালে-কিল্লা। সরবায়ার কিল্লাদারের ঘরবাড়ী এই বালে-কিল্লার মধ্যে ছিল। এই বালে-কিল্লার মধ্যেই, সরবায়ার প্রাচীন কালের নিদর্শন যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা অবস্থিত। বালে-কিল্লার বাহিরে অথচ দুর্গের মধ্যে এখন বন-জঙ্গল যথেষ্ট আছে। দুর্গের চারিদিকে চারিটি ফটক ছিল; তাহার মধ্যে প্রধান ফটক

সংস্কারের পূর্ব্বে মঠের দৃশ্য (উত্তর পশ্চিম দিক হইতে)

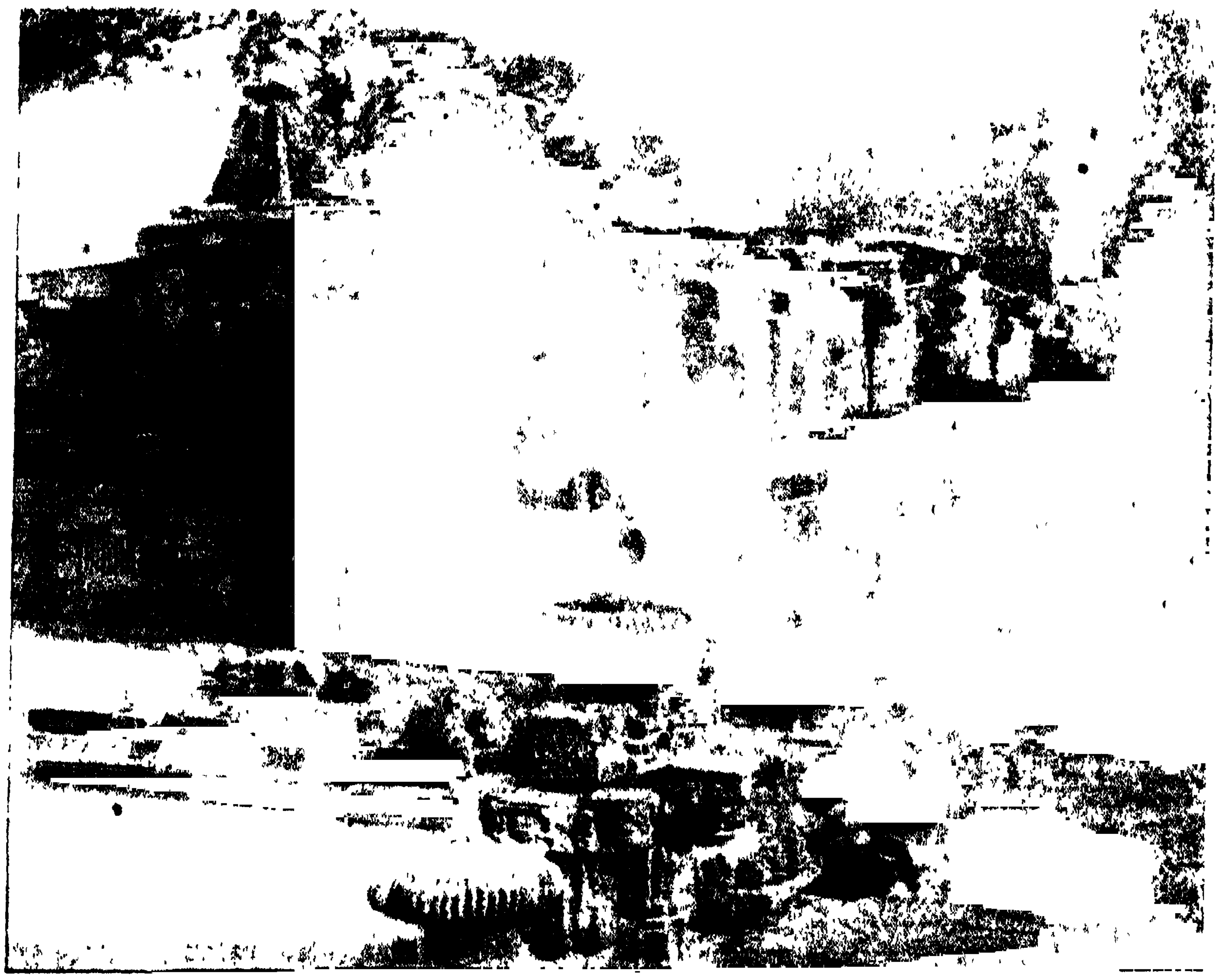

সংস্কারের পর মঠের দৃশ্য (উত্তর পশ্চিম দিক হইতে)

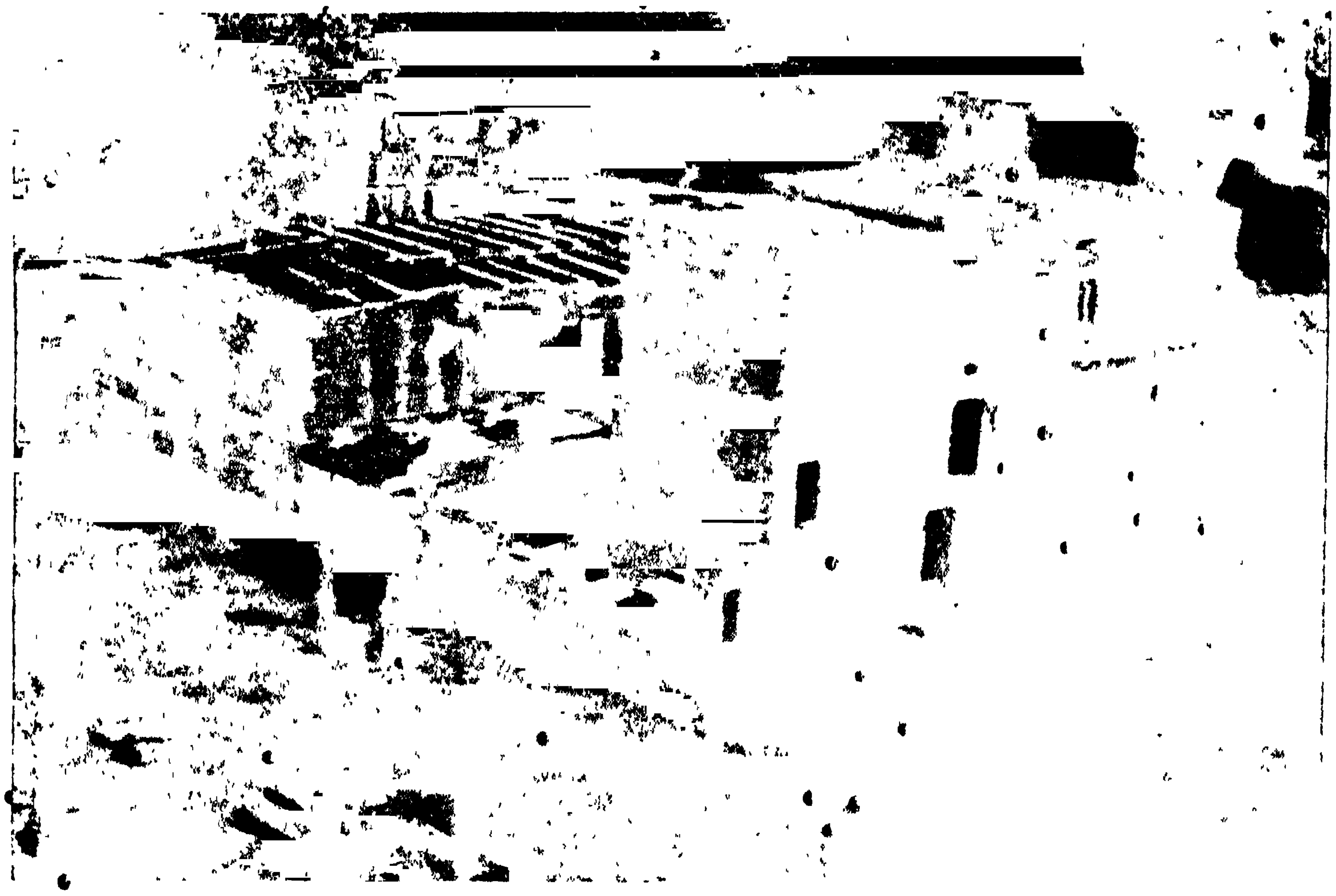

সংস্কারের পর মঠের সাধারণ দৃশ্য

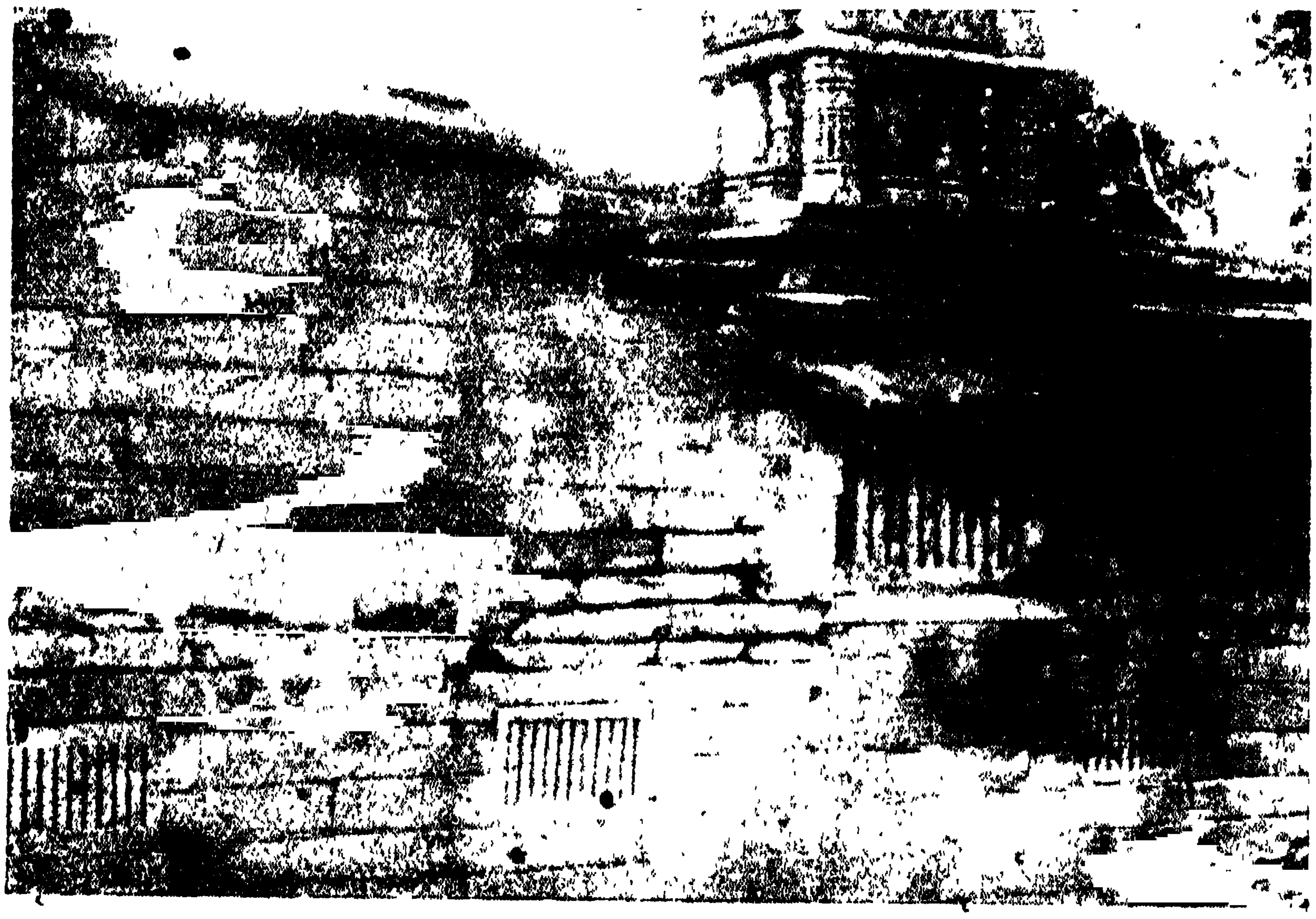

মঠের পূর্ব্ব পার্শ্বের দক্ষিণ ভাগ

পশ্চিমদিকে, ইহাতে দুইটি দরজা আছে। দক্ষিণদিকের ফটকটি খুব ছোট,—সেইজন্য ইহার নাম খিড়কী দরওয়াজা। উত্তর দরওয়াজাটি এখন একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দুর্গের প্রাচীরে অনেকগুলি মুর্চা আছে এবং তাহার দুই একটিতে এখনও গোলার দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কবে, কোন্ সময়ে সরবা...র দুর্গ অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না।

বালে-কিল্লার একটিমাত্র দরওয়াজা আছে ও তাহার চারি কোণে চারিটি মুর্চা আছে। তাহার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম কোণের মুর্চাটি এখনও ভাঙ্গে নাই। এই মুর্চার উপর হইতে

সরবায়ার চারিদিকের পাহাড়-গুলি বড় সুন্দর দেখায়। বালে-কিল্লা যে সময়ে তৈয়ারী হইয়াছিল, সে সময় সরবায়ার পুরাতন মন্দিরগুলি ভাঙ্গা হইয়াছিল। বালে-কিল্লার ভিতরে, ফটকের প্রায় বিশ হাত নীচে সরবায়ার হিন্দু কীর্ত্তির নিদর্শনগুলি পাওয়া গিয়াছে। মহারাজা সিন্ধিয়া দশবারো হাজার টাকা খরচ করিয়া বালে-কিল্লার প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি উদ্ধার করিয়াছেন। বালে-কিল্লার ভিতরে মাটি খুঁড়িয়া দুইটি বড় পাথরের মন্দির, একটি ইঁদারা ও একটি মঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

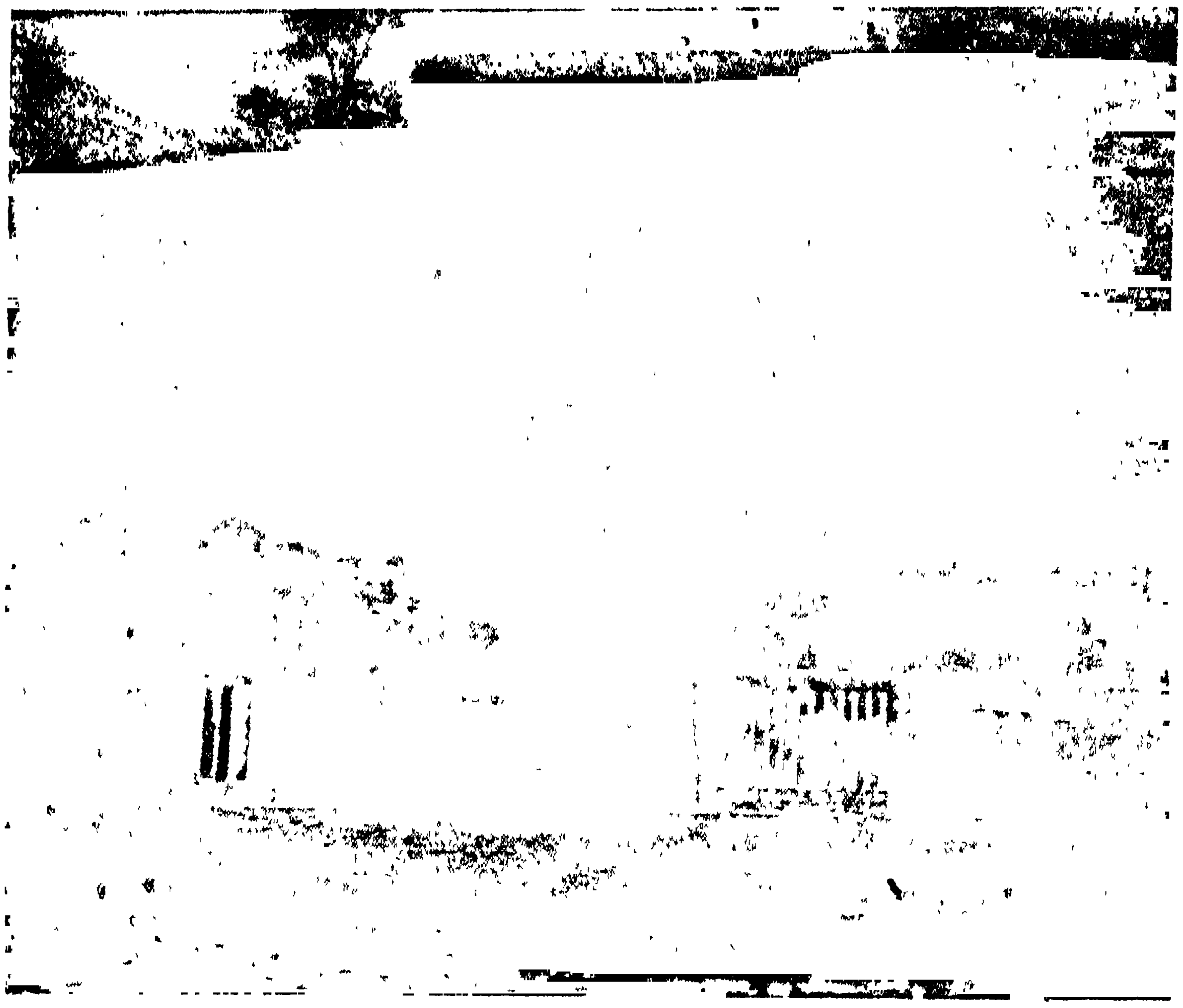

মঠের পূর্ব্ব পার্শ্বের বাম ভাগ

মঠের দক্ষিণদিকের হলের অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভাবলী

মঠটি বালে-কিল্লার দক্ষিণপশ্চিম অংশ অধিকার করিয়া আছে। ইহা এককালে তিনতলা ছিল; কিন্তু তাহার মধ্যে অধিকাংশই মাটি চাপা পড়িয়াছিল। ত্রিতলের ঘর গুলির পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া সরবায়ার কিল্লাদারেরা বাস-স্থানে পরিণত করিয়াছিলেন। মঠটির দরওয়াজা উত্তর দিকে; দরওয়াজার এক-এক দিকে দুইটি করিয়া থাম ছিল। দরওয়াজার দক্ষিণদিকে উপরে উঠিবার সিঁড়ি ছিল; তাহার পাঁচ-ছয়টি ধাপ এখনও আছে। দরওয়াজার সম্মুখে উঠান; তাহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি ইঁদারা। এই উঠানের তিন দিকে মঠের বাড়ী আছে। পরবর্ত্তী কালে উঠানের পশ্চিম-দিকের ঘরগুলি কিল্লাদারের বাসগৃহে পরিণত করা হইয়াছিল। পূর্ব্বদিকের ঘরগুলিতে কতকগুলি জানালা আছে; তাহা দিয়া ঘরের ভিতর হাওয়া

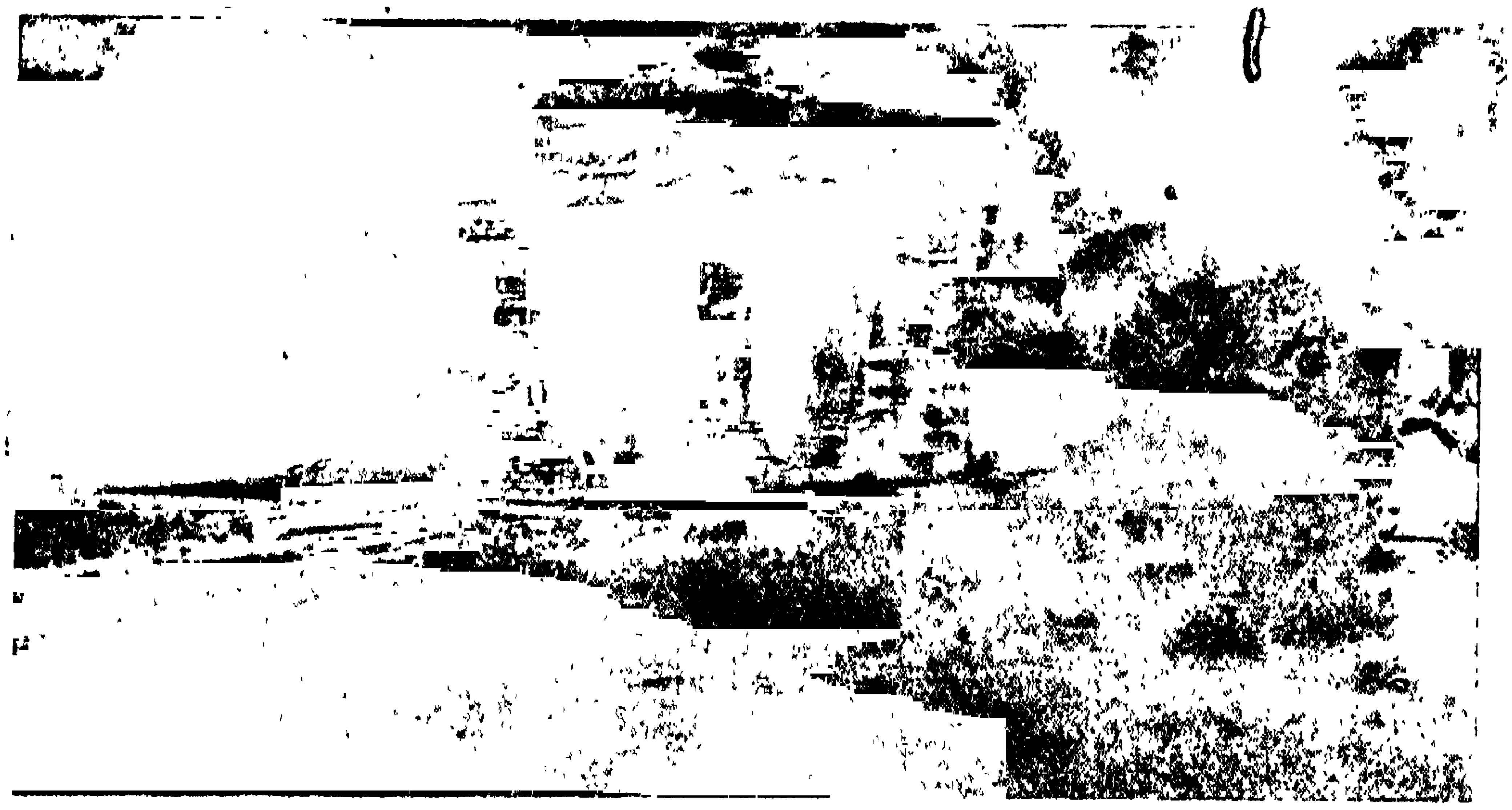

সংস্কারের পূর্ব্বে ১ নং মন্দির ও তাহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য

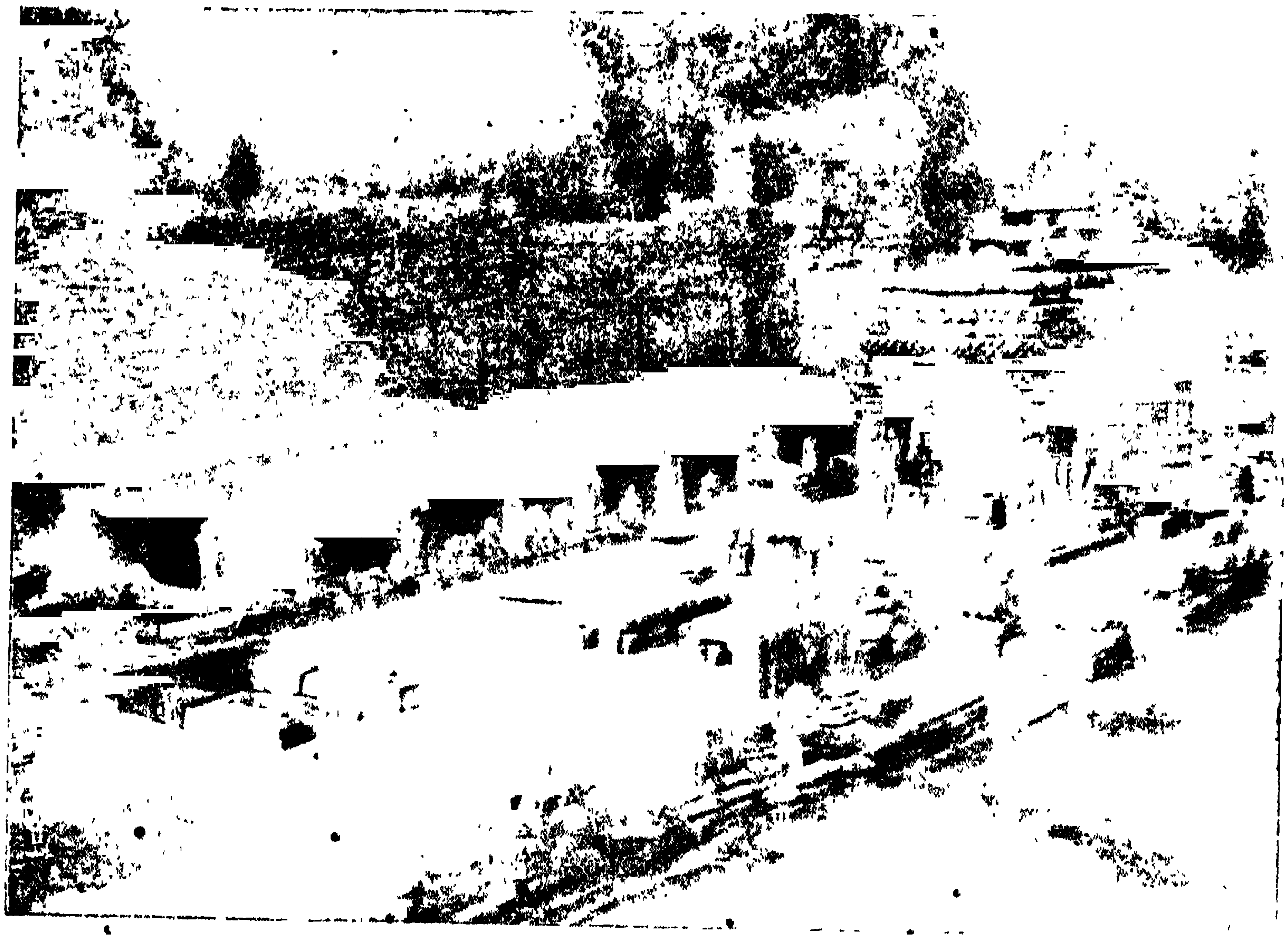

১ নং মন্দির (সংস্কৃত হইবার পর) ও তৎসংলগ্ন সংগ্রহশালা

আসিতে পারে বটে, কিন্তু আলো আসা এক প্রকার অসম্ভব। উঠানের তিন দিকে ছোট একতালা বারান্দা ছিল। দক্ষিণদিকের ঘরগুলি একেবারে অন্ধকার; ইহাতে আলো বা হাওয়া আসিবার কোনও উপায় নাই।

দোতালায় উঠিবার পুরাতন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া উঠানের মাঝখানে একটি লোহার মই আনিয়া রাখা হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের ও পশ্চিমদিকের দোতালার ঘরগুলি এখনও আছে; কিন্তু দক্ষিণদিকের ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বড়-বড় পাথর, খাপরার ঘরের চাল যেমন করিয়া ছাওয়া হয়, তেমন করিয়া সাজাইয়া, মঠের ছাদ তৈয়ার করা হইয়া-

ছিল। পূর্ব্বদিকে ছাদের উপরে একটি ছোট মন্দির আছে; তাহার মাঝখানে একটি বড় ও চারিপাশে চারিটি ছোট চূড়া আছে। মন্দিরটি শূন্য।

মঠের উত্তরদিকে দেওয়াল-দিয়া-ঘেরা অনেকটা জায়গা আছে। এটি এখন একটি ছাদশূন্য চিত্রশালায় (Open-air museum) পরিণত করা হইয়াছে। বালে-কিল্লার উত্তরদিকের প্রাচীরের নীচেও এই দেওয়াল পাওয়া গিয়াছে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মোরেশ্বর গাদ্রে যতটা খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন, তাহা দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এককালে এই প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গন অনেক দূর বিস্তৃত ছিল, তাহার দক্ষিণদিকের খানিকটার উপরে পরেবালে কিল্লা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রাচীন অঙ্গনের যতটুকু খোঁড়া হইয়াছে, তাহাতে একটি বড় ও দুইটি ছোট মন্দির, একটি মস্‌জিদ ও একটি ইদারা পাওয়া গিয়াছে। বড় মন্দিরটি পশ্চিমদ্বারী; ইহা শিবের মন্দির, এবং ইহার গর্ভগৃহ অপেক্ষা অন্তরালে কারুকার্য্যের ঘটা বেশী। চারিটি থামের উপরে ছাদ বসাইয়া অন্তরাল তৈয়ার করা হইয়াছে। থামগুলির গোড়া ঘটের মত এবং তাহাদের গায়ে এক-এক মুখে শিকল হইতে এক একটি ঘণ্টা ঝুলিতেছে। প্রত্যেক থামের এক-এক দিকে এক-একটি ঋষির মূর্ত্তি আছে, এবং থামের আগাগুলিও ঘটের মত। প্রত্যেক থামের মাথায় ক্রুশের মত এক-একটি মাথাল আছে; তাহার এক-একটি পা খুদিয়া হাতী অথবা বামনের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। অন্তরালের ছাদ চারিকোণা; ইহার একদিক হইতে খানিকটা কাটিয়া লইয়া বাকীটাকে সমচতুষ্কোণ করা হইয়াছে। এই অংশে কতকগুলি গায়িকা ও বাদকের মূর্ত্তি খোদা আছে। ছাদের সমচতুষ্কোণ অংশ পাঁচটি বৃত্তে বিভক্ত। এই অংশটির খোদাই আবু পর্ব্বতের বিমলশার মন্দিরের ছাদের মত। সরবায়ার মন্দিরের ছাদটি বিমলশার মন্দিরের ছাদ অপেক্ষা ছোট বটে, কিন্তু খোদাইয়ের কাজ সরবায়ার মন্দিরেই অপেক্ষাকৃত উত্তম। গর্ভগৃহের

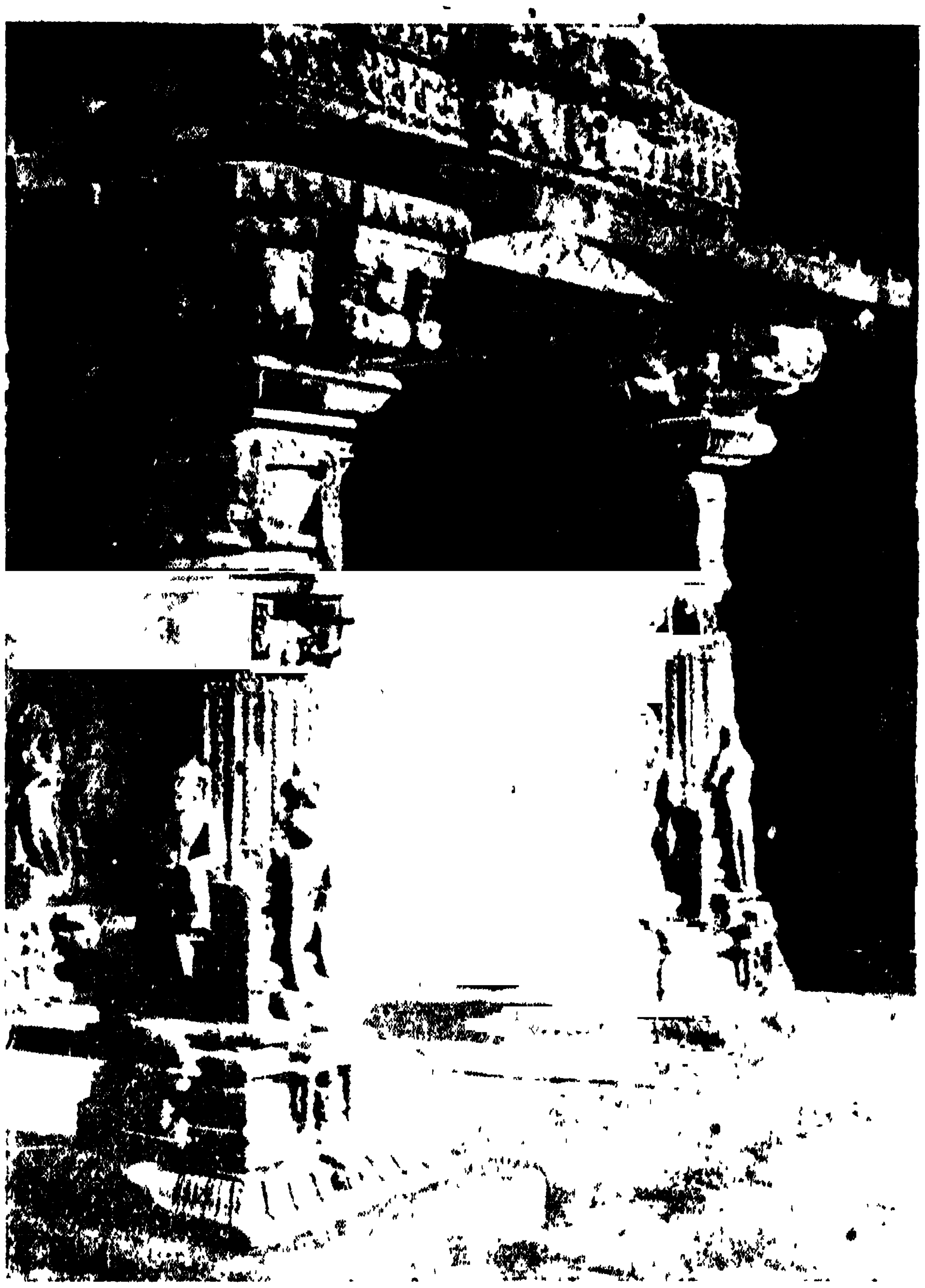

১ নং মন্দিরে প্রবেশের পথ

দরওয়াজার সম্মুখে দুই থাকে অনেকগুলি দেবদেবীর মন্দির আছে। গর্ভগৃহের চৌকাট পাথরের; তাহার নীচের দিকে একপাশে মকরবাহিনী গঙ্গা ও অপর দিকে কচ্ছপবাহিনী যমুনার মূর্ত্তি আছে। চৌকাটের উপরে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণী, গরুড়-বাহন বিষ্ণু, শিবদুর্গা ও নবগ্রহের মূর্ত্তি আছে। ইহাদের উপরে একদল মালাবাহী গন্ধর্ব্বের মূর্ত্তি আছে। গর্ভগৃহের মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ এখনও আছে। মন্দিরের বাহিরের দিকে খোদাই একেবারে নাই বলিলেই হয়; যাহা কিছু ছিল, তাহা মুসলমানেরা ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে।

বালে-কিল্লার নীচে যে পুরাতন অঙ্গনটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বদিকে এই শিব-মন্দিরটি আছে এবং ইহা মঠের দরওয়াজার সম্মুখে অবস্থিত। শিবমন্দিরের সম্মুখে অঙ্গনের পশ্চিমদিকে আর একটি ছোট মন্দির আছে। এই মন্দিরটি দেখিতে শিবমন্দিরের মত, কিন্তু ইহাতে তত বেশী খোদাইয়ের কাজ নাই; ইহারও চূড়া ভাঙ্গিয়া

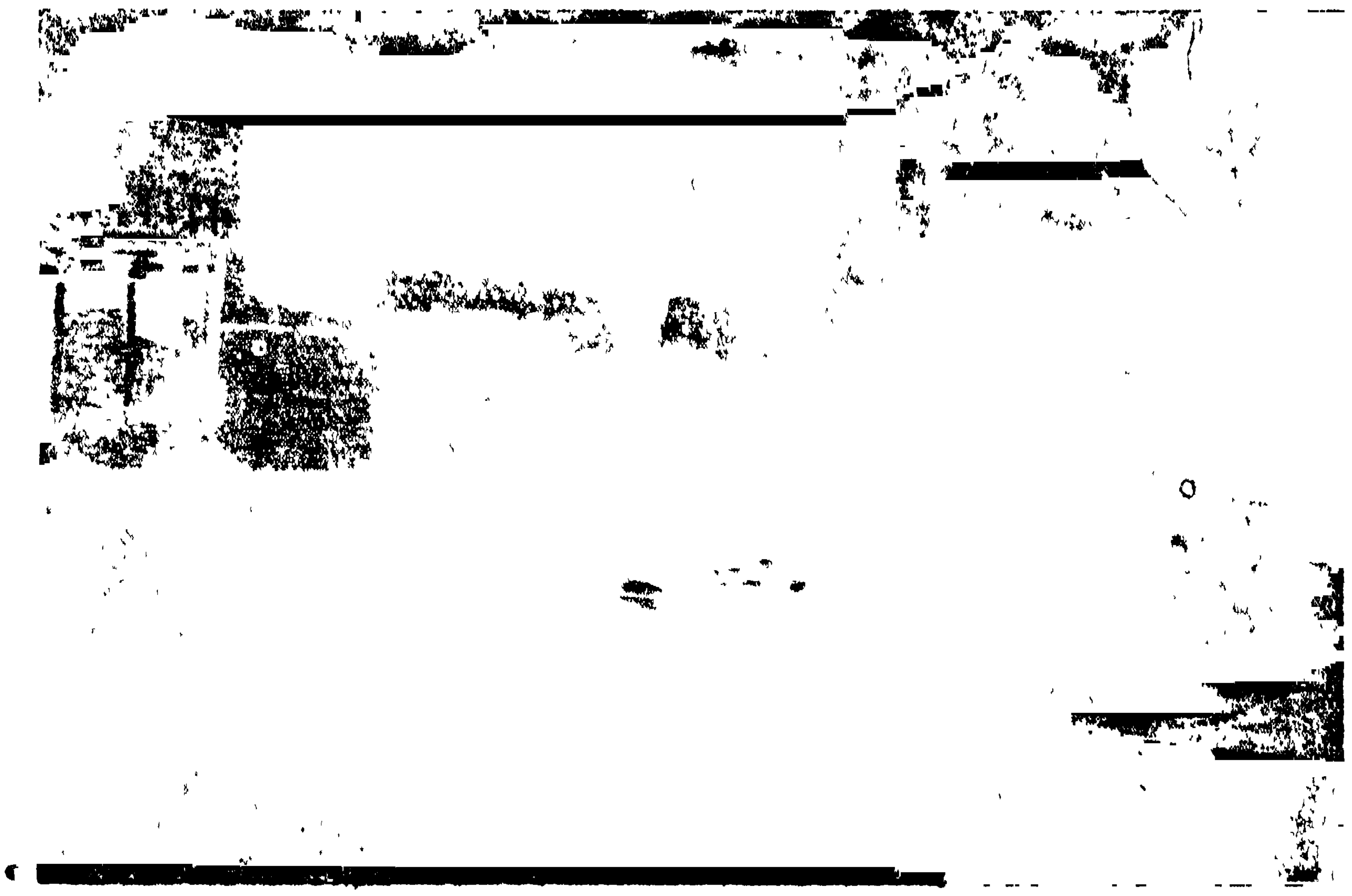

. নং মন্দির, মস্‌জিদ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের দৃশ্য (সংস্কৃত হইবার পূর্ব্বে)

সংস্কারের পর ২ নং মন্দির ও মসজিদ

গিয়াছে বটে, কিন্তু বাহিরের দিকে গর্ভগৃহের নীচের খোদাই কাজ এখন পর্য্যন্তও ভালই আছে। এই স্থানে এক-একটি কোণের উপর অগ্নি, যম, বায়ু, নৈঋত, বরুণ, কুবের প্রভৃতি দশ-দিক্‌পালের মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরের ভিতরে এখন আর কোন মূর্ত্তি নাই; গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে একটি চতুষ্কোণ কুণ্ডমাত্র আছে।

এই মন্দিরের উত্তর দিকে একটি ছোট মস্‌জিদ আছে, এবং মস্‌জিদের পিছনে একটি পূর্ব্বদ্বারী মন্দির আছে।

পুরাতন অঙ্গনের পশ্চিম-সীমায় কুলুঙ্গীর মত দুইটি ছোট-ছোট মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহার মধ্যে একটিতে একটি পুরাতন পাদপীঠ আছে। শিবমন্দির ও অন্য দুইটি মন্দিরের মাঝামাঝি একটি পুরাতন কূপ আছে। কূপটি এখনও জলে পরিপূর্ণ। ইহা হইতে জল উঠাইয়া আনিবার জন্য একটি সিঁড়ি আছে এবং সিঁড়ির দুইধারে দুইটি কুলুঙ্গী আছে। একটি কুলুঙ্গী খালি ও আর একটিতে অনন্তশায়ী নারায়ণের মূর্ত্তি আছে।

সরবায়ার দুর্গ সম্বন্ধে ইতিহাসে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। দুর্গটির বর্ত্তমান নাম সমসানিগড়। দুর্গের বাহিরে তিনটি বড় পুষ্করিণী ও অনেকগুলি ইঁদারা আছে। সরবায়া এককালে সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল; তাহার চিহ্নস্বরূপ বনজঙ্গলের মধ্যে এখনও অনেক ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের উত্তর অঞ্চলে মুসলমানের আমলের পূর্ব্বের ঘরদুয়ার, মঠ বা মন্দির নাই বলিলেই চলে। যাহা ছিল, মুসলমানেরা তাহা ভাঙ্গিয়া

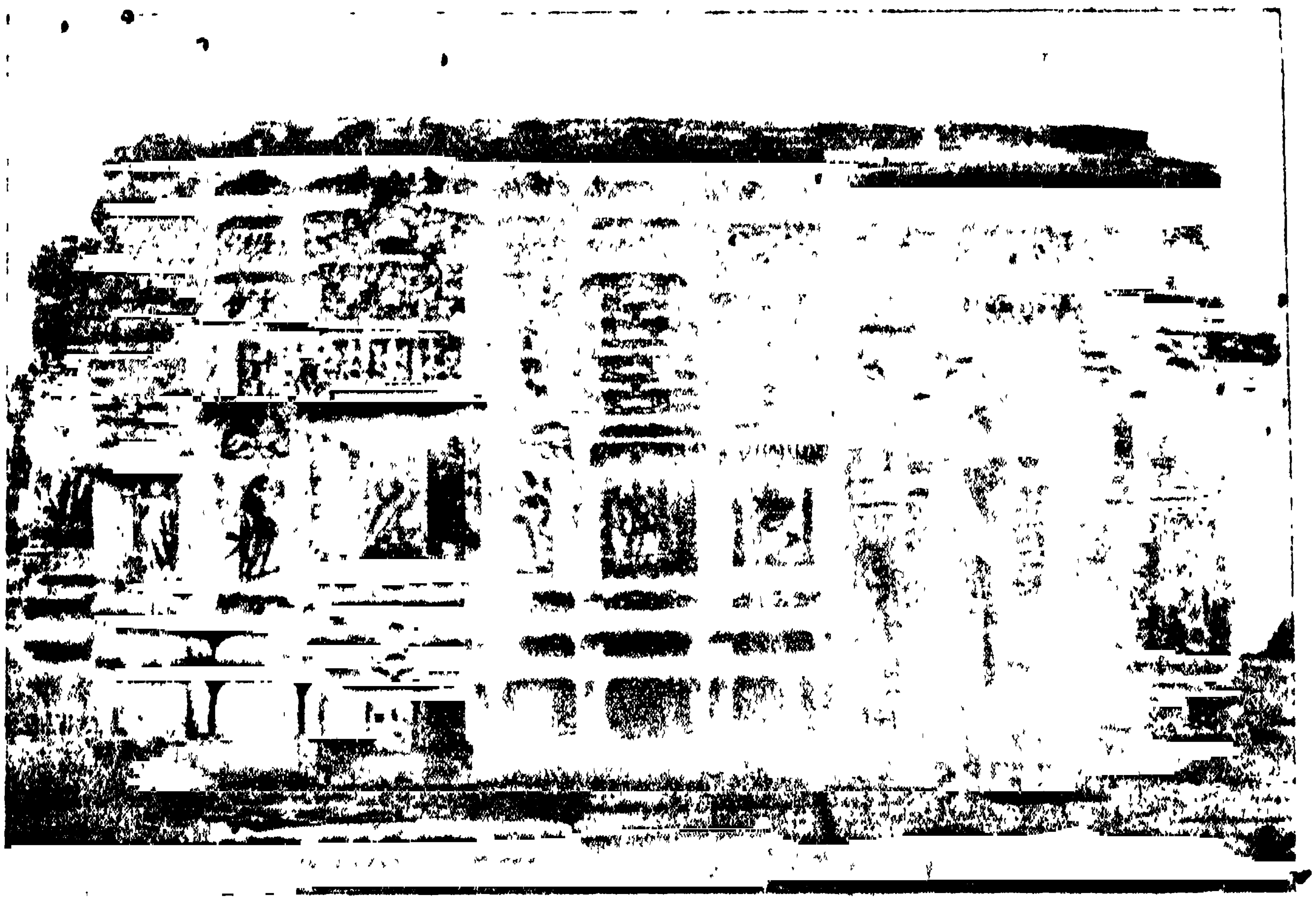

২ নং মন্দিরের পার্শ্ব দৃশ্য

সরবায়ার প্রাচীন নাম সরস্বতী পত্তন। সরবায়ার দুর্গ হইতে দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত দেবী-কা-বাউলী নামক একটি কূপের উপরে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১৩৪১ বিক্রম সংবৎসরে ঈশ্বর নামক সরস্বতী পত্তননিবাসী একজন সারস্বত ব্রাহ্মণ একটি কূপ খনন করাইয়াছিলেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম (Sir Alexander Cunningham) ১৮৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সরবায়া দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে ১৩৪৮ বিক্রম সম্বৎসরে (১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

লইয়া গিয়া মস্‌জিদ অথবা কবর তৈয়ার করিয়াছে। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বের অনেকগুলি হিন্দুমঠ মধ্যভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বন্ধুবর মোরেশ্বর গার্দ্দে সরবায়া ছাড়া গোয়ালিয়র রাজ্যে আর তিনটি হিন্দুমঠ আবিষ্কার করিয়াছেন। কোলারস্ পরগণায় রাণোড গ্রামে একটি, পিছোর পরগণায় জেরাহী গ্রামে একটি ও ইসাগড় পরগণায় কদ্‌ওয়াহা গ্রামে একটি হিন্দুমঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বার-তের বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মেবার রাজ্যে মেণাল গ্রামে এইরূপ একটি হিন্দুমঠ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গোয়ালিয়র, সিপ্রি ও সরবায়া কচ্ছপঘাতবংশীয় রাজপুত রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল।

সরবায়া দুর্গের মন্দিরগুলি সেই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কচ্ছপঘাতবংশীয় রাজগণের অধঃপতনের পরে প্রতীহারগণ এই দেশে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জজপেল্লবংশীয় রাজগণ এই পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করিয়া দীর্ঘকাল মুসলমানদিগকে দক্ষিণ-দিকে অগ্রসর হইতে দেন নাই। এই বংশের চাহড়দেব, নৃবর্ম্মা অমলদেব, গোপাল ও গণপতির বহু শিলালিপি এই দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কানিংহাম সারবায়ায় ১৩৪৮ বিক্রম সম্বৎসরে উৎকীর্ণ যে শিলালিপি দেখিয়াছিলেন, তাহাতে চাহড়দেবের প্রপৌত্র গণপতির নাম ছিল। সরবায়া দুর্গের পূর্ব্বদ্বারে ১৩৫০ বিক্রম সম্বৎসরে (১২৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে। ইহাতে সাহসমল্ল নামক এক রাজকুমার ও সল্লক্ষণদেবী নাম্নী এক রাজ্ঞীর উল্লেখ আছে। চাহড়দেব, অমলদেব ও গণপতি দেবের বহু তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহার মধ্যে অনেক মুদ্রায় তাহাদিগের তারিখ আছে; কিন্তু ইহাদিগের প্রকৃত পরিচয় এখনও পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উত্তর চক্রের অধ্যক্ষ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহানী রতোল গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসন প্রকাশ করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনখানি টুকরা-টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ইহার একটি টুকরা মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই টুকরাটিতে মহাকুমার চাহড়দেবের নাম ও চাহমানবংশীয় দুইজন রাজার নাম আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মহাকুমার চাহড়দেব—চাহমান-বংশের যে শাখায় বীসলদেব অর্ণোরাজ ও পৃথ্বীরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই শাখায় উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সম্প্রতি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মোরেশ্বর গার্দ্দে গোয়ালিয়র রাজ্যে কতকগুলি নূতন শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহা হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, চাহড়দেব 'নৃবর্ম্মা, অমলদেব ও গণপতিদেব যজ্বপেল্ল বংশসম্ভূত। এই যজ্বপেল্ল বংশ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা কিছুই জানিতাম না। বন্ধুবর মোরেশ্বর গার্দ্দে অনুমান করেন যে, যজ্বপেল্ল-বংশের চাহড়দেব ও রতোল গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের চাহড়দেব ভিন্ন ব্যক্তি। রতোল-গ্রামের তাম্রশাসন, ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজের উক্তি, ও গোয়ালিয়রে আবিষ্কৃত শিলালিপি-সমূহ দেখিয়া অনুমান হয় যে, যজ্বপেল্ল বংশীয় চাহড়দেব চাহমন বংশের দৌহিত্র অথবা দৌহিত্র-বংশজাত। তিনি দীর্ঘকাল দিল্লীর মুসলমান সুলতানগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মালবের মুসলমান সুলতানগণ সরবায়া ও সিপ্রি অধিকার করিয়াছিলেন। সিপ্রিতে জমাম মস্‌জিদে যে শিলালিপি আছে, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৮৪৫ হিজরায় (১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে) মালবরাজ মহম্মদ্ খিল্‌জির রাজত্বকালে উক্ত মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিছুদিন পরে গোয়ালিয়রের তোমরবংশীয় রাজগণ সরবায়া ও সিপ্রি অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী নারওয়ার প্রদেশ অধিকার করিয়া সমস্ত হিন্দু ও জৈন মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন; এবং উক্ত প্রদেশ কচ্ছপঘাত বা কছওয়াহা রাজপুতগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের নিকট হইতেই মরাঠাগণ নারওয়ার প্রদেশ অধিকার করিয়াছেন। এই প্রদেশে প্রতি পর্ব্বতশীর্ষে একটি পুরাতন দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়, মরাঠা-বিজয়ের পূর্ব্বে এই সমস্ত দুর্গের রাজপুত কিল্লাদারগণ এই দেশের রাজা ছিলেন। এখন দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়া জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ইহাতে বাস করিয়া থাকে।

বিবাহে বিভ্রাট

[শ্রীকল্পনা দেবী]

জোরে রমেনের নিকট হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া, হস্তচ্যুত 'হকি' ব্যাট কুড়াইয়া লইতে-লইতে হাসিয়া অহিভূষণ বলিল, "বৌ-বাজারে তোর বৌ আছে তুই যা, আমি সেখানে গিয়ে কি করব? তার চেয়ে একটু খেল্‌তে গেলে কাজ দেখ্‌বে।" সকৌতুকে হাসিয়া রমেন বলিল, "তাই ত বলি রে ভাই, বৌ-বাজারে গিয়ে একটা বৌ করে আয়, তখন রোজ যাবি সেখানে, দেখ্‌বি কিসে বেশী কাজ দেয়।" "বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়।" "এমন শক্তটাই বা কি শুনি?" "ভারি শক্ত। বল কি! বলে, 'লাখ কথা নৈলে একটা বে' হয় না।" "যাক্; আমি ত আর এক্ষণিই বিয়ে করতে বলছি না। একবার দেখ্‌তেই চল্ না। তার পর তখন দেখা যাবে। অমন পেঁচার মত মুখ করে রইলি যে, যাবিনে?"

অহি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, না হয় গেলুম। তার পর তুই ত বলেছিস্ যে তাকে দেখ্‌লে পছন্দ না করে থাক্‌তে পারবো না। তা যদি একেবারে মুগ্ধই হয়ে যাই, তার পর আর কি বিলম্ব সইবে?" সোৎসাহে রমেন বলিয়া উঠিল, "তক্ষণি বিয়ে করে ফেলবি। তারা ত তোর সঙ্গেই বিয়ে দিতে চায়। তারা"—বাধা দিয়া অহি বলিল, "তার পর?" অহির কথার সুরে রমেন বুঝিল যে অহি উপহাস করিতেছে; বিরক্ত হইয়া বলিল, "তার পর আবার কি?" এবার গম্ভীর হইয়া অহি বলিল, "তার পর আর কিছুই নেই? বিয়েতেই সব শেষ হয়ে গেল? একটা চালচুলো পর্য্যন্ত যার নেই, পরের দয়ায় যে জীবন ধারণ করে,—তার আবার বিয়ে কেন রমু? তারও কি বিয়ে না করলে চলে না? আর মেয়ে দেবার জন্য লোকে তার পানেও তাকায়? হা' রে অভাগী বাঙ্গালীর মেয়ে।" রমেন আহতভাবে হাসিয়া বলিল,—"অহি, অহি, তোর ভাই সকল সময় ঠিক মনে থাকে, আমি কিন্তু সম্পূর্ণই ভুলে গেছলাম; তুই যে আমার কেউ নস্—সে কথা আমি একেবারেই ভুলে গেছ্‌লাম।"

এ কথার পর কথা চালান কঠিন। অহি রমেনের হাত ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ক্ষমা করিস্। আমি বড্ডই অকৃতজ্ঞ, না রমেন?" রমেন আজ অভিমান করিল না; সামান্য এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তার পর বলিল,—"একটা কাজ করিস্ ত ক্ষমা করি।" কোন কথা এক মিনিটের বেশী দু'মিনিট মনে রাখা অহির স্বভাব নয়। সে ইহার মধ্যেই বিবাহের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। বলিল, "কি কাজ?" মুখ টিপিয়া হাসিয়া রমেন বলিল, "বিয়ে করিস্ যদি ত ক্ষমা করি, তা নৈলে ঠিক বল্‌চি এবার আর ক্ষমা করছিনে।" অহি উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, "কত ছলই জানিস্! যা, চাইনে তোর ক্ষমা। ওঃ, মস্ত লোক কি না! ওঁর আবার ক্ষমা!"—ব্যাট ঘুরাইতে-ঘুরাইতে অহিভূষণ ক্রীড়াভূমির উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

রমেন আয়নার কাছে গিয়া গন্ধামোদিত কেশকলাপ একটু ফিরাইয়া লইয়া, সাদা সিল্কের চাদরখানি ফ্যাসানেবল্ করিয়া গায়ে দিয়া, রুমালখানিতে একটু এসেন্স মাখাইয়া, আলনা হইতে রূপার-মুখ-দেওয়া ছড়ি লইয়া, কি করিয়া এই বিবাহদ্বেষী অহিভূষণকে স্বমতে আনা যাইতে পারে, তাহাই ভাবিতে-ভাবিতে বৌ-বাজার অভিমুখে যাত্রা করিল।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়া যায়—অহির পিতা একমাত্র পুত্রের স্কন্ধে ঋণরাশি চাপাইয়া দিয়া সম্ভবত নিরয়ের পথেই প্রস্থান করিয়াছেন। অহি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ে। পিতৃশোকাতুর যুবক অহিভূষণ দেনার দায়ে অস্থির হইয়া উঠিল। বসতবাটী ও যা কিছু যৎসামান্য আসবাবপত্র ছিল, সবই পাওনাদারদের হাতে তুলিয়া দিয়াও সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্যবৎ কিছুই ফললাভ হইল না। দেনা অনেক। মহাজনগণ নিরুপায় খাতককে শেষে জুয়াচুরির দায়ে ফেলিয়া রাজদ্বারে দাঁড় করাইলেন।

শেষে অহির বাল্যবন্ধু রমেন্দ্র সে সকল কথা শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তে বিনা দ্বিধায় সেই সকল দেনা নিজের পয়সায় শোধ করিয়া দিল। সেই পর্য্যন্ত অহি রমেনের অনুগ্রহে

জীবন-ধারণ করিতেছে। পিতৃহীন নাবালক জমিদার রমেন তাহার প্রাণের বন্ধু অহিকে খুব সুখ-স্বচ্ছন্দেই রাখিয়াছিল; তাহার প্রতি তাহার স্নেহ-যত্নেরও কোন ত্রুটী ছিল না। কিন্তু অহি তবু সর্ব্বদা এই অনুগ্রহ গ্রহণে কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। সে যে দয়ার পাত্র। অহি এখন M. A. ক্লাসে পড়িতেছে। রমেনও তাহার সহপাঠী। প্রায় ছয় মাস হইতে চলিল রমেনের বিবাহ হইয়াছে। বধূর নাম অনিলা। রমেন নিজে 'বুড়ো' হইয়া পড়িয়া বন্ধুটির আইবুড়ো নাম খণ্ডাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। কনে'টি শ্রীমতী অনিলা দেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মলিনা দেবী। আজ তাই শ্রীমতীর সহিত পরামর্শ করিতে রমেন বৌ-বাজার গমন করিয়াছে।

(২)

অহি যখন ফিরিয়া আসিল, তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। শীষ দিয়া গান গাহিতে-গাহিতে সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের কাছে গিয়া দেওয়ালে একটা সুইচ টানিয়া দিতেই, আলোকিত কক্ষে টেবিলের উপরিস্থিত ফ্রেমে-আঁটা একটি বালিকার ফটো তাহার চোখে পড়িল। ফটোখানা আলোর দিকে ফিরাইয়া সে দেখিতে লাগিল। প্রথমে ভাবিয়াছিল অনিলার ছবি; কিন্তু তখনই বুঝিতে পারিল, এ অনিলা নয়, অনিলার চেয়েও বুঝি এ বালিকা অধিক সুন্দরী। ছবির চোখে-মুখে-ঠোঁটে যেন হাসি উছলিয়া উঠিতেছিল। এ ছবি কি মলিনার? এরই নাম মলিনা? বাপ-মা নামকরণের সময় অহিভূষণকে ডাকেন নাই কেন? বালিকা যেই হোক্, সে যেন অহির দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। একটু যেন জয়ের হাসি। হাসি যেন বলিতেছিল;—"এই না আমায় দেখিবে না?" ঠিক সেই সময়ে রমেন সশব্দে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

তাহাকে দেখিয়া অহি একটু থতমত খাইয়া হাসিয়া ফেলিল।—ছবিখানা নামাইয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল; এখন তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিল। হাসিয়া রমেন বলিয়া উঠিল, "তা দেখ্, দেখ্; বাধা দেবো না, ভাল করেই দেখ্; বলেছিলাম না, যে, দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবি? তবু এ তার প্রতিমূর্ত্তি—আসল নয়! আসল দেখ্‌লে যে কি করতিস্, তা তুই-ই জানিস্!—যাক্, এখন বল্ দেখি, কেমন লাগল?"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া অহি বলিল, "কি হে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কি? পাগলের মত বকছিস্ কি? দেখব? কার প্রতিমূর্ত্তি?"

"তবে রে রাস্কেল! ভণ্ডামি আমার সঙ্গে? হাঁ; কি দেখা হচ্ছিল?" "বাঃ কোথায় কি দেখ্‌ছিলুম! দেখ্‌ছিস্ নাকি?" কি ভাবিয়া রমেন বলিল, "না তোমায় একটু ঠাট্টা কচ্ছিলুম; ছবি আবার কার পাবি দেখ্‌বি।" অহি বলিল, "মোহিনীর কাছে একটু দরক আছে, আসছি।" বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বা হইয়া পড়িল;—এখনি আবার কি কথা উঠিতে কি উ পড়িবে, সেই ভয়েই সে সরিয়া পড়িল।

অহি চলিয়া যাইতেই রমেন মলিনার ছবিখানা টেবি ক্লথের নীচে হইতে বাহির করিয়া বাক্সের মধ্যে পূর ফেলিয়া একখানা বই খুলিয়া বসিয়া পড়িল—যেন পড় দিকেই তাহার খুব মন লাগিয়াছে!

কিছুক্ষণ পরে অহি ঘরে ঢুকিয়াই একবার সেই ছ খানির আশায় উস্‌খুস করিয়া উপর-নীচে চাহিয়া লইল কোথায় সে ছবি? পাঠ-রত রমেনের মুখের দিকে চাহি দেখিল। রমেন বহু কষ্টে হাসি চাপিয়া ছিল, আর পারিল না সহসা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অহি জিজ্ঞাসা করিল "কি?" রমেন হাসিতে-হাসিতেই বলিল, "ভাবছিস্ কি?" "কি আবার ভাবব? তোমার অনিলা দেবীর খবর কি?" "অনিলা দেবীর না মলিনা দেবীর?" "উক্ত নামধেয় দেবীটির সহিত আমার কি সম্বন্ধ?" "আমার তো শ্যালিকা সম্বন্ধ, তোমার ইহা অপেক্ষা মধুরতর সম্বন্ধ ঘটাই সম্ভব।"

(৩)

তাহার পর পাঁচ-সাত দিন চলিয়া গিয়াছে,—অহি আর একটিবারও সেই ছবিখানি দেখিতে পায় নাই। এই কয়দিনে সে hockey-stick ছাড়িয়া কাগজ-কলম লইয়া ছাদের উপর বসিয়া থাকিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তা যার হয়, এই রকম না কি হইয়া থাকে। প্রেম-সুন্দর ও কবিতা-সুন্দরী এক সঙ্গে সবার স্কন্ধেই ভর করেন। দু'জনের দায় সামলাইতে যুবক অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তার উপর ষ্টুপিড্ রমেনের অত্যাচার! এ কি সহ্য হয়! হতভাগাটা যদি আর একবারও ছবিখানা দেখ্‌তে দিত। সেই দিন হইতে রমেন আর একবারও মলিনার বা বিবাহের কথা

পাড়ে নাই। যখন সেটা জ্বালাতন মনে হইত, তখন দিন-রাতই ঐ কথা শুনাইত; এখন অহি শুনিবার জন্য কাণ খাড়া করিয়া থাকে কি না, তাই বাবু আর একটিবারও সে কথা বলিতে পারেন না।

আজ ঘরে ঢুকিয়াই অহি দেখিল, টেবিলের উপর সেই ছবিখানি। পেটুক যেমন করিয়া সন্দেশ তুলিয়া লয়, তেমনি করিয়া সে ছবিখানা তুলিয়া লইল। আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল। আঃ, কি মুস্কিল! অহি তাড়াতাড়ি খোলা ট্রাঙ্কের মধ্যে ছবিখানি পুরিয়া ফেলিয়া একখানা বই লইয়া বসিয়া পড়িল এবং সঙ্গে-সঙ্গে রমেন ঘরে ঢুকিয়া বলিয়া উঠিল, "কি হে, হচ্ছে কি?"

"পড়্‌ছি" বলিয়া বইয়ের পাতার দিকে চাহিয়া দেখিল। ও হরি, এ কি! গোড়ায় গলদ যে! বই ধরা হইয়াছে উল্টা! তাড়াতাড়ি বইখানা সোজা করিয়া ধরিল।—রমেন দেখিয়াও যেন দেখে নাই, এম্‌নি ভাব দেখাইয়া, তাহার হাত হইতে পুস্তক কাড়িয়া লইয়া বলিল, "কোনখানটা পড়্‌ছিলি?" কি মুস্কিল! সে যে কিছুই পড়ে নাই! তাড়াতাড়ি বলিল, "এই এমনি দেখছিলাম; চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্‌।" "চল" বলিয়া দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল। রমেন বলিল, "চল, গোলদীঘি যাই।" কেন রে বাপু, বৌ-বাজার কি হল? মনে-মনে চটিয়া অহি বলিল, "চলো।" কিছুদূর গিয়া রমেন বলিল, "অভয় আমায় একবার যেতে বলেছিল, আমি যাই; তুই আমার সঙ্গে যাবি?" অহির সহিত অভয়ের পরিচয় ছিল না। বলিল, "না।" "আমি তবে যাই" বলিয়া রমেন ফিরিল। অভয়ের জন্য ত রমেন ফেরে নাই। সে বাসায় ফিরিয়া আসিল। নিজেদের ঘরে গিয়া অহির খোলা ট্রাঙ্ক হইতে ছবিখানি বাহির করিয়া নিজের বাক্সে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়া বৌ-বাজার অভিমুখে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতে রমেন অহিকে বলিল, "আজ আমায় একবার বৌ-বাজারে যেতে হবে। মলিনাকে এক জায়গা থেকে দেখতে আসবে। ঘণ্টা দুয়েক পরেই ফিরে আসবো।" বলিয়া সে সহাস্য মুখে অহির ম্লান, বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিল। কথাটা শুনিয়া অহির মনের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। সে নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। রমেন নীরবে সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অহি উঠিয়া খোলা ট্রাঙ্ক হইতে ছবিখানা বাহির করিতে গেল; কিন্তু হায় রে, কোথায় সে ছবি? অহি তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। ধুতি, সার্ট, কোট টান-মারিয়া ট্রাঙ্কের চারিপাশে ছড়াইয়া ফেলিয়া সে গম্ভীর মুখে এটা-ওটা ঝাড়িতেছিল—যদিই ছবিখানা কোন রকমে কাহারও ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়ে!

রমেন ও মোহিনী কথা কহিতে-কহিতে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। অহির অবস্থা দেখিয়া রমেন হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।—মোহিনী তাহাদের গুপ্ত কথা কিছুই জানিত না; কাছে গিয়া ভীত ভাবে তাহার হাত ধরিল "কি হয়েছে, অহি বাবু?" অহি শূন্য-দৃষ্টি মোহিনীর মুখের উপর স্থাপন করিল। তাহার সেই ফ্যালফ্যালে চাহনি দেখিয়া রমেন আরও উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিল। হঠাৎ বিরক্ত ভাবে মোহিনী বলিল, "কি রমেন বাবু, তোমার সব সময় হাসি ঠাট্টা!"

রমেন উপস্থিত সার্টের বোতাম-খোলা কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়া, নিজের ট্রাঙ্ক খুলিয়া, ছবিখানি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "কি রে অহি, তোর হ'ল কি?" "কিছু না" বলিয়া অহি কাপড়-চোপড়গুলা ট্রাঙ্কে পুরিয়া ডালা বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "একটা জিনিস খুঁজে পাচ্ছিলাম না; একটা ইয়ে—এই কি বলে ইয়ে—" মোহিনী বলিল, "তবু ভাল। রকম দেখে আমার মনে হয়েছিল, তোমার সেই কে আত্মীয় আছেন, সেখান থেকে বুঝি বা কোন জরুরী তার এসেছে—সেখানে যেতে হবে।" রমেন হাসিয়া বলিল, "ও ওই রকম করে ইয়ারকি করছিল, আমি তা প্রথমেই বুঝতে পেরেছি।" মোহিনী বলিল, "আমি অহি বাবুর রকম দেখে সত্যই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তা যা হোক, তোমার সেই শালীটিকে যাঁরা দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা পছন্দ করে গেলেন?" গর্ব্বের হাসি হাসিয়া রমেন বলিল, "তা আর করবেন না। দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেছে। ২৭শে দিন-স্থির হয়েছে। আজ ১০ই, আর এই কটাদিন মাত্র।" বলিয়া সে চোরা কটাক্ষে অহির দিকে চাহিয়া দেখিল।

পিছন হইতে কে যেন অহিকে বেত্রাঘাত করিল। তাহার মলিনা! হাঁ, তাহারি ত! সে তাহার হইবে না;—

আর কয়টা মাত্র দিন পরে সে অন্যের হইয়া যাইবে! এ অপমানের চেয়েও লজ্জা বড় হইল! তখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও মলিনা তাহার হইবে না।

মোহিনী চলিয়া যাইতেই রমেনের হাত ধরিয়া অহি ডাকিল, "রমু!" "কি অহি!" "সত্যি এ কি? সত্যি রমু?" "কি—সত্যি?" "মলিনার বিয়ে?" এই বিয়ে কথাটা সে কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারিতেছিল না; জোর করিয়া বলিল, "বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে?" "সত্যি নয় ত মিথ্যে হতে যাবে কেন? হিন্দু-ঘরের কোন মেয়েকে আইবুড়ো থেকে যেতে দেখেছ কি?" "আমায় কষ্ট দেবার জন্যেও ত বলতে পার।" "তোমার কষ্ট দেবার জন্যে? তোমার এতে কষ্ট কি? তুমি ত তাকে বিয়ে করতে চাওনি। তবে তোমার কিসের কষ্ট?" "তুমি যে বুঝেও বুঝলে না রমু।" হাসি চাপিয়া রমেন গম্ভীর ভাবে বলিল, "আহা, একটু আগেও যদি বলতে অহি। এখন ত আর কোন উপায় নেই—সবই যে ঠিক হয়ে গেছে।" অহি ম্লান, বিবর্ণ মুখে পার্শ্বস্থিত চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল। তাহার অবস্থা দেখিয়া রমেনের দুঃখ হইল; মুখের পানে চাহিয়া পিঠের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল, "অহি!" উদাস দৃষ্টি রমেনের মুখে স্থাপন করিয়া অহি উত্তর দিল, "রমু।" "সত্যি তার বিয়ের ঠিক হয়নি।" চমকিয়া অহি মুখ তুলিল, "সত্যি!" "হাঁ, কিন্তু পেটে ক্ষিদে মুখে লজ্জায় কি আবশ্যক ছিল মশাই? ও বাবা, এত!" অহি লজ্জিত ভাবে নতমুখে বলিল, "যাও, আর জ্বালিও না।" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। মাথা নাড়িয়া রমেন বলিল, "হুঁ, তা ত বটেই; নেমকহারামি আর কাকে বলে। এক্ষুণি কেঁদে লুটুচ্ছিলি, আবার এক্ষুণি ফোঁস করছিস্? এখনও দাদা আমার হাতে,—এখনও দিন কিনে নাওনি।"

বন্ধুর হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া অহি পলাইয়া বাঁচিল। রমেনও ঘরে-ঘরে ২৭শে বিয়ের ভোজের সংবাদ দিতে ছুটিল।

(৪)

আজ ২৭শে, আজ অহিভূষণের শুভ-বিবাহ। বরসাজে সাজিয়া সহাস্য মুখে অহি সকলের মাঝে বসিয়া। আশেপাশে বন্ধুবর্গ উপহাসে তাহাকে মস্তক নত করিতে বাধ্য করিতেছিল। কেমন একটা লজ্জা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিতেছিল। রমেন বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি। কখন সে বরযাত্রদের বরফ, পান যোগাইতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে; কখন বরযাত্রদের পাশে বসিয়া অন্য সকলকে ফরমাস করিতেছে এবং কেমন করিয়া কন্যা-পক্ষকে জ্বালাতন করা যায়, আরও কয়েক জনের সহিত তাহারই পরামর্শ করিতেছে। তাহারই আজ সমধিক আনন্দ। তাহার বাড়ী শ্রীরামপুর হইতেই বর আসিয়াছে। অহিভূষণের ত নিজের কিছুই নাই। রমেনের বাড়ী হইতেই বিবাহ হইতেছে। সেও একটা বড় কষ্ট।—এমন লোকেরও কি বিবাহ না করিলে চলে না?

শুভ-দৃষ্টির সময় অহি চোখ তুলিতে যাইতেছে, এমন সময় কয়েকজন সহপাঠী বন্ধু এমন বিকট স্বরে হাসিয়া উঠিল যে, সে তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া লইল। কয়েকটা স্ত্রীলোক তাহাকে পুনঃপুনঃ চাহিতে অনুরোধ করিলেও অহি আর চোখ তুলিতে পারিল না। সে কতক্ষণ হইতে এই শুভ-দৃষ্টির জন্য লালায়িত হইয়া রহিয়াছিল; কারণ সে চাক্ষুস একবারও তো মলিনাকে দেখিতে পায় নাই। রমেন একবার বলিয়াছিল, "চল হে কনে দেখ্‌তে-।" সে বলিয়া দিয়াছিল "নূতন করে আর দেখব কি? সে আমার দেখাই।" রমেন কতকগুলা ঠাট্টা করিল বটে, কিন্তু আর যাইতেও বলিল না। অহি ত আর নিজে যাইতে পারে না; তাই এ পর্য্যন্ত মলিনাকে চাক্ষুস্ দর্শন-সৌভাগ্য তাহার ঘটে নাই। শুভদৃষ্টির শুভ মুহূর্ত্তও এইরূপে চলিয়া গেল, দেখা হইল না।

বাসরেও আর অত লোকের মাঝখানে অহি মলিনার মুখ দেখিতে পারে না। আর দেখিবেই বা কি? কনে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়া ঘামিয়া ভিজিতেছিল। মলিনার লজ্জাটা যেন একটু বেশি-বেশি! সে আজ-কালকার ফ্যাসানে দশটা ব্রোচ আঁটিয়া কাপড় পরিয়া থাকিলে কি হয়, কোথা হইতে খানিকটা কাপড় টানিয়া এমন ভাবে গায়ে জড়াইয়াছিল যে, তাহার শুভ্র কোমল হস্তের একটী অঙ্গুলীও দেখা যাইতেছিল না।

কুশণ্ডিকা হইয়া গেল। দায়ে পড়িয়া সে সময় মলিনাকে হস্ত বাহির করিতে হইয়াছিল। অহি মলিনার হাত দুইখানি দেখিয়া, অত লোকের মাঝখানেও লজ্জা ভুলিয়া, মুখ দেখিবার আশায় চোখ তুলিল; কিন্তু লাল

টুকটুকে বেনারসি সাড়ীর ভিতর হইতে কিছুই দেখা গেল না। নিরাশ হইয়া অহি আবার হাতের দিকে চাহিল। এই কি সেই মলিনা? ছবির মলিনা? কখনই নয়, নিশ্চয়ই ইহারা তাহার সহিত জুয়াচুরি করিয়াছে! যার রং এত ময়লা, ফটোতে সত্যই কি তাহাকে তেমন ফরসা দেখায়? অহি একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। রমেন অদূরে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। তাহার দিকে চোখ পড়িতেই অহি ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। ইহার জন্যই ত তাহাকে এই কাল মেয়ে বিবাহ করিতে হইতেছে! মনের ক্রোধ মনে চাপিয়া অহি পুরোহিতের অনুজ্ঞামত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। এখন গোলমাল করিলেও আর বিবাহ ফিরিবে না। অনর্থক সকলে জানিতে পারিবে, কলেজে মুখ দেখান ভার হইবে। ছিঃ, ছিঃ!

পুনঃপুনঃ মন্ত্রোচ্চারণে ভুল করিয়া, কোনমতে কর্ম্ম শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িয়াই, গাঁটছড়া-বাঁধা চাদরখানা ছাড়িয়া দিয়া খালি পায়ে অহি রমেনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। রমেন তাহার শ্যালক দেবীপ্রসাদের সহিত কথা কহিতেছিল। অহিকে কাছে আসিতে দেখিয়া, "ওহে, বড় ভুল হয়েছে; দাঁড়াও, এখনি আসছি—" বলিয়াই প্রস্থান করিল। "শোন, শোন,—রমেন!" রমেন ফিরিল না। দেবী বলিল, "কি দরকার, আমায় বলো না।" "না" বলিয়া অহি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনিলা দেবী 'ঠাকুরপো' সম্পর্কে অহিভূষণকে এতদিন ঠাট্টা-তামাসা করিয়া আসিতেছেন। এখন ত সোণায় সোহাগা,—ভগিনী-পতি! তাঁহার উপহাস, ভারাক্রান্ত-মন অহিকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল। ফুলশয্যার দিন রাত্রি প্রায় একটা-দেড়টার সময় হাতে-পায়ে ধরিয়া সাধিয়া রমেন অহিকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া আসিল। ঘরে প্রায় দশ-এগারোটী রমণী বসিয়াছিলেন। সজ্জিত কক্ষে ফুলসাজে সাজিয়া নববধূ উত্তমাসনে উপবিষ্টা। তাহার-মুখ আবরণবিহীন। অহি ইচ্ছা করিলেই সে মুখ দেখিয়া লইতে পারিত। কিন্তু তাহার আর তাহাতে প্রবৃত্তি ছিল না। অনিলা অহিকে বলিল, "বসো ঐখানে।" অহি বসিল। তখন তাহার মন হইতে ক্রোধ একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল। কেবল একটা বিষাদ তাহার মনকে শ্রাবণের মেঘের মতই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। এই বিষাদই তাহার চিরজন্মের সাথী। গত দিবসগুলাও তাহার এইরূপ দুঃখম্লান! মাঝে একবারমাত্র যে কয়টা দিনের জন্য সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিল; সে স্বপ্ন,—স্বপ্ন মাত্র, সত্য নয়। আবার চিরজন্মই তাহাকে এই ভাবেই কাটাইতে হইবে। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিতে গেলে কে সে? দরিদ্র, বান্ধববিহীন, পরানুগ্রহ-জীবী, তাহার আবার অত উচ্চ আশা কেন?

যথাবিধি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, সকলেই বাহির হইয়া গেলেন। অনিলা যাইবার সময় সকৌতুকে হাসিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গে নববধূ নিজে উঠিয়া, ভিতর হইতে দ্বারে খিল দিয়া, আবার সেই স্থানে ফিরিয়া আসিয়া, একখানা ভেল্‌ভেটের চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "উঠে বসো।" অহি এতক্ষণ অবাক হইয়া নববধূর কার্য্য-কলাপ দেখিতেছিল। এবার চোখ নামাইয়া লইয়া মনে-মনে বলিল, 'আচ্ছা, কষ্টিপাথর কি এর চেয়ে কালো?' নববধূ উঠিয়া আসিয়া অহির হাত ধরিয়া বলিল, "শুনছ?" চমকিয়া অহি হাত সরাইয়া লইয়া বলিল, "তুমি শোওগে, আমি এখন এইখানেই একটু বসে থাকব।"

অপ্রতিভ না হইয়া অল্প হাসিয়া নববধূ বলিল, "কেন, রাগ হয়েছে বুঝি? আমায় তোমার পছন্দ হয়নি, না?" অহি কোন উত্তর দিল না। উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া বধূর দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইল। সত্যই সে একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। এই কি তাহার নববধূ! দুই দিন পূর্ব্বে সে এই অপরিচিত ব্যক্তিকে প্রথম দেখিয়াছে, আর আজ নিজে যাচিয়া..তাহার সহিত এই মাথামাখি করিতে আসা!—ছিঃ, ছিঃ! এই কি নববধূর ব্যবহার? হায় নির্গুণা কিংশুক! রূপ ছিল না, নাই ছিল! গুণও কি ভগবান এক তিল দিতে পারে নাই! তা বেশ হইয়াছে; এই উচিত হইয়াছে; যেমন গরীবের ঘোড়া রোগে ধরিয়াছিল, এই তার উচিত শাস্তি।

নববধূ স্বামীর মনোরঞ্জনে অসমর্থা হইয়া পালঙ্কের উপরে শয়ন করিল। এবং অচিরে নিদ্রিতা হইয়া পড়িল। তাহার মন বেশ সুস্থই ছিল; সে তো আর অহির মত ভাবনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে নাই। কেনই বা হইবে?

রূপে-গুণে মহাদেবতুল্য স্বামী পাইয়াছে,—তাহার কাছে কি বিষাদ আসিতে সাহস করিতে পারে ?

বেচারি অহি অনেক রাত্রে জানালা ছাড়িয়া আসিয়া আসনখানার উপর হাতে মাথা রাখিয়া শুইয়া সেই ফটোখানার কথাই ভাবিতেছিল। কি ভয়ানক প্রতারণা! অন্নদাতা, মানরক্ষক বন্ধু সে!—হুকুম করিলেই ত হইত! এমন করিবার কি আবশ্যক ছিল ?

ভোরবেলা অহি বাহিরে আসিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। তখন সবেমাত্র পূর্ব্বদিক একটু লাল হইয়া উঠিয়াছে। আকাশে একটু মেঘও ছিল, সেই মেঘের উপর লাল আলো পড়িয়া বড় সুন্দরই দেখাইতেছিল। হঠাৎ তাহার কাঁধে কে হাত দিল। অহি ফিরিয়া দেখিল, তাহারই নববধূ। বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "এখানেও তুমি ?" সহসা তাহার চোখ ভরিয়া জলের ধারা উছলিয়া পড়ে-পড়ে হইল বলিয়া সে যেই ফিরিতে যাইবে,—দেখিল, রমেন দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। ক্ষোভে, দুঃখে অধীর হইয়া অহি কাঁদো-কাঁদো মুখে বলিয়া উঠিল, "ছি, ছি! কি বেহায়া এই বউটা, এতটুকু কি লজ্জা-সরম নেই ? মেয়েমানুষ এতবড় নির্লজ্জা হতে পারে রমেন ? এ কি বউদির বোন ?" রমেন আসিয়া নববধূর হাত ধরিল; তার পর তাহার মাথার কাপড় খুলিয়া দিয়া খোঁপা ধরিয়া একটা টান দিতেই পরচুলা খসিয়া আসিল। নববধূ তখন খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রমেন বলিল, "কি রে গাধা, এমনি পাগল হয়েছিলি যে গোষ্ঠকে মোটে চিন্‌তেই পারলিনে ?"

সবিস্ময়ে অহি বলিয়া উঠিল, "আমি কি তবে গোষ্ঠকেই বিয়ে করেছি নাকি।" গোষ্ঠ বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়! যদি অস্বীকার করো, ত, খোর-পোষের জন্য নালিস করবো—কিন্তু বলে রাখছি।" এমন সময় অহি দেখিল, অনিলা মলিনার—সত্যকার মলিনার,—সেই ছবির সুন্দরী মলিনার—হাত ধরিয়া আসিতেছেন।—অহি লজ্জায় মুখ নত করিল। রমেন বলিল "অনিলা, তুমি ত গল্প-টল্প একটু-আধটু লিখ্‌তে জানো,—এইটা, এই বিয়ের গল্পটা লিখে মাসিকে কেন ছাপিয়ে দাও না।" মলিনা মুখ ঢাকিবার জন্য দিদির হাত ছাড়াইয়া আঁচল খুঁজিতেছিল।

অহি বলিল, "আচ্ছা, কুশণ্ডিকার সময়ঃত আমি দেখেছিলাম যে, কনের হাত দু'খানি কাকচক্ষের ন্যায় কালো!" —অনিলা ও রমেন একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। অনিলা কহিল, "ওগো বিদ্যাসাগর! সে আমি একরকম কালি-রং মাখিয়ে দিয়েছিলেম, বিদ্যের দৌড়টা বোঝবার জন্যে; তা বোঝা বেশ ভাল রকমই গেছে।" অহি প্রীতিপূর্ণ হাস্যের সহিত নীরবে মলিনার লজ্জানম্র আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; বলিল, "তোমাদের সঙ্গে পারবো কেন বৌদি। তোমরা হলে স্বয়ং বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।" রমেন কহিল, "অর্থাৎ বিদ্যার আধার হ'লে তোমরাই—কেমন, না? যথা—বিদ্যাধরী!" "যাও, খুব ব্যাখ্যাটাই কল্লেন"—বলিয়া অনিলা হাসি মুখে কোপদৃষ্টি হানিলেন।

"মনে থাকে যেন, ঠাকুরপো, বিদ্যালাভ যদি ঈপ্সিত হয়, তবে যেন কায়মনোবাক্যে এই দেবীর আরাধনায় কোন ত্রুটি না ঘটে।" অহি ভালমানুষের মত নত-মস্তকে প্রণাম করিয়া কহিল, "যে আজ্ঞে।" রমেন প্রাণ ভরিয়া হাসিল। আর তার দেখাদেখি সূর্য্যদেব তাঁহার উজ্জ্বল আলোকরাশি নবদম্পতির মুখে ফেলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সাময়িকী

এবার সাময়িক প্রধান ঘটনা আমাদের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট বা ভারত-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত ই, এস্ মন্টেগু মহোদয়ের এদেশে আগমন। ভারত-সচিব মহাশয়ের ভারতে আগমনের একটু বিশেষত্ব আছে; সেই জন্যই এটাকে আমরা সর্ব্বপ্রধান ঘটনা বলিয়া মনে করিতেছি। তিনি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেন নাই; ভারতবর্ষের ভবিষ্যত-ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই তিনি এ দেশ আগমন করিয়াছেন। আমরা ভারতবাসী তাই আজ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি, তাঁহার শুভ কামনা করিতেছি; এবং আমাদের মহামহিম বড়লাট বাহাদুর যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এদেশে আনিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকটও আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত মন্টেগু মহোদয় যে উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই কথায় আমরা পাঠকপাঠিকা-গণের গোচর করিতেছি। তিনি বিলাতে বিগত ২০শে আগষ্ট তারিখে বলিয়াছিলেন—

"The policy of His Majesty's Government, with which the Government of India are in complete accord, is *that of increasing the association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realization of responsible Government in India, as an integral part of the British Empire.* They have decided that substantial steps in this direction should be taken as soon as possible, and that it is of the highest importance, as a preliminary to considering what these steps should be, that there should be a free and informal exchange of opinion between those in authority at Home and in India. His Majesty's Government have accordingly decided, with His Majesty's approval, that I should accept the Viceroy's invitation to proceed to India to discuss these matters with the Viceroy and the Government of India, to cnsider with the Viceroy the views of Local Governments, and to receive the suggestions of representative bodies and others. I would add that progress in this policy can only he achieved by successive stages." উপরিউদ্ধৃত কথার সার-সংগ্রহ এই যে মহামহিম শ্রীযুক্ত ভারত সম্রাট মহোদয়ের এই অভিপ্রায় যে, তাঁহার ভারতবাসী প্রজাবর্গ ধীরে-ধীরে দেশ-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন (Responsible Government); এবং যাহাতে এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল ব্যবস্থা শীঘ্রই প্রচলিত হয়, তাহাই মহামহিম শ্রীযুক্ত ভারত-সম্রাট মহোদয়ের ইচ্ছা। মাননীয় শ্রীযুক্ত বড় লাট বাহাদুরও এই সদুদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। মহামহিম শ্রীযুক্ত ভারতসম্রাট মহোদয়ের আদেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত ভারত সচিব মহোদয় শ্রীযুক্ত বড় লাট বাহাদুরের সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া এ দেশে আগমন করিয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি সভাসমূহ ও মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করেন, কি প্রণালীর সম্বন্ধে অভিমত দেন, তাহাই জানিবার জন্য শ্রীযুক্ত ভারত সচিব মহোদয়ের এ দেশে শুভাগমন। শ্রীযুক্ত ভারত সচিব মহোদয় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, 'এই শাসনাধিকার ক্রমে ক্রমে প্রদত্ত হইবে' (progress in this policy can only be achieved by successive stages)।

এই সম্বন্ধে আরও একটী কথার উল্লেখ করা আমরা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি। বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহিমবর শ্রীযুক্ত

রাজ-প্রতিনিধি মহোদয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষের বঙ্গানুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলে উদ্দেশ্যটী আরও বিশদ হইবে। শ্রীযুক্ত রাজ-প্রতিনিধি মহোদয় বলিয়াছেন—

"আমি রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর-জেনরলস্বরূপ প্রথম যে কার্য্যকরী সমিতি (এক্‌জিকিউটিব কাউন্সিলের) আহ্বান করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি মন্ত্রিসভার নিকট দুইটী প্রশ্নের অবতারণা করি :—

(১) ভারতবর্ষে বৃটিষ শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ?

(২) ঐ মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ?

ভারতবর্ষ বৃটিষ সাম্রাজ্যের একটী অখণ্ড অংশ বলিয়া ভারতকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করাই বৃটিষ শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সিদ্ধান্ত ভিন্ন যে আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় অধিকাংশ মাননীয় সভ্য আমার সহিত একমত হইবেন। শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের নীতি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমি বলিতে পারি, ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তৃপক্ষরূপে আমাদের প্রস্তাবিত নীতির সহিত উহার প্রকৃত পক্ষে কোন পার্থক্য নাই। সাবধানে ও বিস্তারিতভাবে কারণসমূহের বিচার করিয়া আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নসম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ঐ মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইবার তিনটী পথ আছে। প্রথম পথ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কার্য্যক্ষেত্র পল্লীগ্রাম, গ্রাম্য বোর্ড এবং নগর কিম্বা মুনিসিপল কাউন্সিলে নিহিত। নাগরিক ও গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র রাজনৈতিক জ্ঞান-লাভের শিক্ষাভূমি। উহা হইতেই রাজনীতিক উন্নতি ও দায়িত্ব-জ্ঞানের আরম্ভ হইয়াছে। এবং আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে দ্রুতপদে অগ্রসর হইবার, অগ্রগতির পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবার এবং এইরূপে সাধারণ নাগরিকের দায়িত্বজ্ঞান পরিপুষ্ট করিবার ও অভিজ্ঞতা সংবর্দ্ধিত করিবার সময় আসিয়াছে। আমাদিগের মতে গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতবাসীকে অধিকতর দায়িত্ব-বিশিষ্ট পদে নিয়োগই দ্বিতীয় পথ। আমরা বেশ অনুভব করিয়াছি যে ঐ মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে গেলে ভারতবাসীকে নিয়ত-বর্দ্ধমান অনুপাতে বিভিন্ন রাজকার্য্য ও কর্ম্মবিভাগের উচ্চতর শ্রেণীসমূহে এবং সাধারণতঃ শাসন-কার্য্যের অধিকতর দায়িত্ব-বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইহা যে উন্নতির একটি প্রকৃষ্ট পন্থা, তাহা সকলেরই সহজে বোধগম্য। আমাদিগকে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে দিন-দিন অধিক সংখ্যক ভারত-বাসীর দৈনন্দিন শাসনকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত সমগ্র রাজ্যশাসন-বিদ্যায় দক্ষ হওয়া আবশ্যক। অগ্রসর হইবার এই দুই পথ সম্বন্ধে আমরা যে সকল সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় কেহই অসার আপত্তি উত্থাপন করিবেন না। কিন্তু ঐকমত্য থাকিলেও আমরা প্রশ্নের গুরুত্বাবধারণে অন্ধ হইব না। ভ্রম করিবার অধিকার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিক্ষার উপায় আর নাই। লোকদিগকে আপন আপন স্থানীয় ব্যাপার পরিচালন করিতে শিক্ষা দেওয়াই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য, এবং কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় রাজ-কার্য্যে দক্ষতা অপেক্ষা এই প্রকারের রাজনীতিক শিক্ষার প্রাধান্য দিতে হইবে।—এই প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান নীতি লর্ড রিপণ তাঁহার ১৮৮৩ সালের মে মাসের স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত মন্তব্যে বিবৃত করেন এবং পরে লর্ড মর্লে এবং লর্ড ক্রু যথাক্রমে ১৯০৯ সালের ৭ই নবেম্বর তারিখে ও ১৯১৩ সালের ১১ই জুলাই তারিখে তাঁহাদিগের শাসনপত্রে (ডেস্‌প্যাচে) উহা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছেন। আমরা ঐ নীতির সম্পূর্ণ অনুমোদন করি, আর সেই জন্যই আমরা প্রথম পথ অবলম্বনে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী। দ্বিতীয় পথ অবলম্বনে অগ্রসর হইলে শাসন-কার্য্যে যে শিক্ষালাভ হয়, তাহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমরা তুল্যরূপে উপলব্ধি করি। শাসনকার্য্যের অভিজ্ঞতা হইতে যেরূপ বিচার-শক্তি সংযত হয়, এবং শাসন ব্যাপারে কার্য্যতঃ যে সকল বাধাবিঘ্ন বিদ্যমান থাকে তাহার যেরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। এবং ইহা হইতেই আমরা ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপক সভার নিমিত্ত অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত সভ্য পাইবার আশা করিতে পারি। এক্ষণে আমরা আমাদিগের তৃতীয় পথের বিচারে উপনীত হইলাম। এই পথ ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যক্ষেত্রে নিহিত। মাননীয় সভ্যগণ সহজেই উপলব্ধি করিবেন যে এই বিষয়ে যত মতভেদ আছে এবং এই বিষয়ে যত সমীচীন

অনুসন্ধান ও সংবত সিদ্ধান্ত আবশ্যক, এরূপ আর কিছুতেই নাই। আমি অকপট চিত্তে বলিতে পারি যে, অপর দুই পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে—ইহা ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষরূপে আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি। এবং শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের ঘোষণায় যে মুখ্য উদ্দেশ্যের আভাষ দিয়াছেন, তৎসম্পর্কে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ উদ্দেশ্য-সাধনার্থ যত শীঘ্র সম্ভব বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদিগের ডেস্‌প্যাচে নীতির আভাষ মাত্র দেওয়া হইয়াছে, স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই, বলিয়া কেহ কেহ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। আমি মাননীয় সভ্যগণকে সেজন্য স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এরূপ কোন প্রশ্নের মীমাংসা ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষদিগের উপরই নিভর করে। অধিকন্তু অনেক প্রতিকূল সমালোচনা সত্ত্বেও আমি নীতি ব্যক্তকরণের অসাধারণ দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াই তৎসম্বন্ধে আমার নিজের কোন উক্তি দ্বারা শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের কোন পূর্ব্বাভাষ দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃত হইয়াছি; কারণ তাঁহারাই কেবল চরম ও প্রামাণিক মত প্রকাশ করিতে সমর্থ। এবং ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা পূর্ব্ব হইতে গুরুতর ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকা নিবন্ধন বিলম্বের সম্ভাবনা—একথাও আমি গত ফেব্রুয়ারি মাসে মাননীয় সভ্যগণের সমক্ষে বক্তৃতায় জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আশা করি এক্ষণে উহার আর কোন সার্থকতা নাই। কারণ, এখন শ্রীশ্রীমানের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের নীতি প্রচার করিয়াছেন এবং ষ্টেট্ সেক্রেটরীকে শ্রীশ্রীমানের অনুমত্যনুসারে বিচার্য্য বিষয়গুলি এদেশে আসিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে আমি চেম্বারলেন সাহেবকে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করি। তিনি ঐ আমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিবেন এমন সময়ে পদত্যাগ করেন। মণ্টেগুসাহেব ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই, আমি ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট্ সেক্রেটরী মহোদয়কে যে আমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলাম, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখি। এবং তিনি উহা গ্রহণ করিবেন—মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তে আমি আনন্দিত হইয়াছি। কাহারও কাহারও মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, হয় ত কিয়ৎকালের জন্য ষ্টেট্ সেক্রেটরী ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে নিজ হস্তে শাসনকার্য্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সেজন্য উদ্বেগের কোন কারণ নাই। আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি মণ্টেগুসাহেব বেসরকারীভাবে ভারত গবর্ণমেণ্ট, অপরাপর ব্যক্তিগণ ও আমার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আমার আমন্ত্রণে ভারতে আসিতেছেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে নীতি সম্বন্ধীয় কোন কথা ব্যক্ত করিবেন না; এবং ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সহিত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি নিয়মিত প্রণালীতে ও ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের মধ্যবর্ত্তিতায় সম্পন্ন হইবে। ইহাতে ভারত গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতালোপের কোন কথাই নাই। কিন্তু মণ্টেগু সাহেবের ভারতাগমনের বিশেষ সুবিধা এই যে, এক্ষণে তিনি বিচার্য্য বিষয়ঘটিত প্রশ্নগুলির মূল উৎপত্তিস্থানে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইবেন এবং যাহাতে তিনি প্রতিনিধি সম্প্রদায়সমূহ ও ইচ্ছা করিলে অপরাপর ব্যক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এরূপ অবস্থায়, বিশেষতঃ যখন মণ্টেগু সাহেব আশ্বাস দিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত প্রস্তাব যথানিয়মে পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করা হইবে ও তৎসম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে সমলোচনার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে, তখন মাননীয় সভ্যগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, মণ্টেগু সাহেবের ভারতাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল, তাঁহার সমক্ষে যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইবে, সেই সকল প্রশ্নের ধীরভাবে পরীক্ষায় অতিবাহিত করা হউক। মণ্টেগু সাহেব এখানে আসিলে যে সমস্ত উপাদান হইতে একটী যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, সেই সমস্ত উপাদান যাহাতে তাঁহার সমক্ষে স্থাপিত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত আছি। এখানে "আমাদিগের" বলিতে ঘোষণাপত্রে যে সমস্ত প্রতিনিধি সম্প্রদায় ও অপরাপর ব্যক্তির উল্লেখ আছে, তাঁহাদিগকেও বুঝিতে হইবে। আমি আশা করি, মাননীয় সভ্যগণ আমার পরামর্শ সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন না। আমি উহার প্রতি আপনাদিগের মনোযোগ বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিতেছি। মণ্টেগু সাহেব ভারতে আগমন করিয়া যাহাতে দেখিতে

পান যে, দেশে বিরোধ-বিক্ষোভ নাই, প্রস্তাবিত নীতিগুলি সাবধানে বিবেচিত ও যথাযথ যুক্তি ও বাস্তব ঘটনার উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকের মনে আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বোপযোগী সংযমের ভাব বিরাজ করিতেছে—তদ্বিষয়ে সকলকে অনুরোধ করা আমার পক্ষে আর অধিক কথা কি ?”

———

শ্রীযুক্ত ভারত সচিব মহোদয় এ দেশে আগমন করিবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক সভা-সমিতি, অনেক প্রতিনিধি এই শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক রকমের কার্য্য-প্রণালীর প্রস্তাব করিয়াছেন, সেগুলির আলোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সকলেই দেশের কল্যাণ-কল্পে নানা প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহাতে মত-বৈষম্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মাননীয় ভারত সচিব ও বড়লাট মহোদয়দ্বয় সকল পক্ষের কথাই শুনিতেছেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের অভিমতও সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহারা এখন কোন বিষয়েই স্বাভিমত প্রকাশ করিবেন না। ভারত-সচিব মহোদয় বিলাতে ফিরিয়া যাইয়া সমস্ত অভিমত আলোচনা করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় তাঁহার মন্তব্য উপস্থাপিত করিবেন। তাহার পর ভারতের ভবিষ্যত ভাগ্য নির্ণীত হইবে। তবে একথা নিশ্চিত যে, ভারত-শাসন সম্বন্ধে ভারতবাসীর দায়িত্বলাভের পথে আর কোন বিঘ্ন নাই ;—তবে সে অধিকার অল্পই হউক, আর অধিকই হউক।

———

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কার্য্য-প্রণালীর অনুসন্ধান ও ভবিষ্যত প্রণালীর বিধান সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই কমিশনের সদস্যগণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। বিলাত হইতে কয়েকজন খ্যাতনামা সদস্য এখানে আগমন করিয়াছেন ; তাঁহারা সকলেই শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ; মাননীয় শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই কমিশনের একজন সদস্য। তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের সমস্ত কলেজের কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন করিতেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহারা কয়েকটি প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করিয়া এদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট সেগুলি প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের অভিমত চাহিয়াছেন। প্রশ্নের সংখ্যা বেশী নহে, মোটে তেইশটি। এই তেইশটি প্রশ্নেই তাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যত সংস্কার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথারই উত্থাপন করিয়াছেন। এই অনুসন্ধান ও মতামত সংগ্রহ করিতেই তাঁহাদের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত সময় লাগিবে। তাহার পর তাঁহারা সিমলায় মিলিত হইয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, এই কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যে প্রস্তাব করিবেন, তাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষা-বিস্তারের পথ প্রশস্ত হইবে, প্রকৃত শিক্ষারই ব্যবস্থা হইবে।

———

এইবার ‘বসুর বিজ্ঞান-মন্দিরে’র কথা বলিব। বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন, আমাদের সার জগদীশ-চন্দ্র বসু মহাশয়ের বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিজ্ঞান-মন্দির বাঙ্গালীর গৌরবের জিনিস, আমাদের দেবায়তন। মন্দিরের কোন বর্ণনা আমরা দিব না ; পুরোহিত শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়ার কোন পরিচয় আমরা দিব না ; আমরা সমস্ত বাঙ্গালী নরনারীকে—সমস্ত ভারতবাসীকে বলিব, একবার তোমরা আমাদের এই মন্দির, এই দেবায়তন দর্শন করিয়া যাও ;—একবার দেখিয়া যাও, জগদীশচন্দ্র তোমাদের জন্য কি স্বর্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন ;—দেখিয়া যাও, সেই মন্দিরে কি আছে। মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র শিক্ষার্থীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন “হে সৌম্য, ব্রহ্মের চরণে তোমাদিগকে দান করিতেছি। কর্ম্ম কর, কর্ম্মই বীর্য্য ; বীর্য্যবান্ হও।' তেজের সহিত ব্রহ্মবর্চ্চসের সহিত আপনা-দিগকে যুক্ত কর। এই ব্রতাচরণে নিদ্রিত হইও না, মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইও না, মৃত্যুর বশীভূত হইও না। সেবার কর্ম্মে তোমরা মিত্র হও।” এই সার উপদেশ গ্রহণ করিয়া শিষ্যগণ অগ্রসর হউন, আমাদের বিজ্ঞান-মন্দির জয়যুক্ত হইবে। পাশ্চাত্য-বিদ্যা আমাদিগকে শুধুই কেরাণী করিতেছে না, শুধুই disappointed graduates সৃষ্টি করিতেছে না ; পাশ্চাত্যবিদ্যার প্রসাদে আমরা পাইয়াছি সার জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ;—আমরা পাইয়াছি ব্রজেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, যদুনাথ ;—আমরা পাইয়াছি সার আশুতোষ,

আমরা পাইয়াছি সার রবীন্দ্রনাথ। আর সেদিন যে বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহার কল্যাণে আমরা শত শত জগদীশ প্রফুল্লচন্দ্র পাইব। এই আশাতেই আমরা উৎফুল্ল হইয়াছি। সেদিন মন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় সার জগদীশচন্দ্রের বিগত দুই-যুগব্যাপী সাধনার কথা,—নানা প্রতিকুল অবস্থার সহিত সেই একনিষ্ঠ সাধকের সংগ্রামের কথা শুনিয়া কি কাহারও মনে নিরাশার সঞ্চার হইতে পারে? সার জগদীশ-চন্দ্রের মত অনন্যনিষ্ঠ সাধক নিশ্চয়ই আমাদের দেশে জন্ম-গ্রহণ করিবে; তাঁহাদেরই আবাহনের জন্য বসুর বিজ্ঞান-মন্দিরের দ্বার সেদিন উদ্ঘাটিত হইল। ভগবানের শুভাশীস্ এই মন্দিরের উপর বর্ষিত হউক; আমরা সার জগদীশ-চন্দ্রের সহিত সমস্বরে বলি—

"যস্তা শালে নিনিমায়।
দৃঢ়া নদ্ধা পরিষ্কৃতা।
নমস্তস্মৈ নমো দাত্রে শালাপতয়ে চ কৃন্মঃ॥"

হে মন্দির, যিনি তোমাদের দৃঢ়, শ্লিষ্ট ও শোভন করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি; যিনি তোমাকে দান করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি; এবং যিনি এই মন্দিরের অধীশ্বর হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

অভয়া ও রোহিনীদাদাকে তাহাদের নূতন বাসার নূতন ঘর-কন্নার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেদিন সকালে নিজের জন্য আশ্রয় খুঁজিতে রেঙ্গুনের রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম, সেদিন ওই দুটি লোকের সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে একেবারেই কোন গ্লানি স্পর্শ করে নাই, এমন কথা আমি বলিতে চাহি না। কিন্তু এই অপবিত্র চিন্তাটাকে বিদায় করিতেও আমার বেশি সময় লাগে নাই। কারণ, কোন দুটি বিশেষ বয়সের নর-নারীকে কোন একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে দেখিতে পাওয়ামাত্রই একটা বিশেষ সম্বন্ধ কল্পনা করা যে কত বড় ভ্রান্তি—এ শিক্ষা আমার হইয়া গিয়াছিল। এবং ভবিষ্যতের জটিল সমস্যাও ভবিষ্যতের হাতে ছাড়িয়া দিতে আমার বাধে না। সুতরাং, শুদ্ধমাত্র নিজের ভারটাই নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়া সেদিন প্রভাত-কালে তাহাদের নূতন বাসা হইতে বাহির হইয়াছিলাম। এখনকার মত তখনকার দিনে নূতন বাঙালী বর্ম্মা মুল্লুকে পদার্পণ করামাত্রই পুলিশের প্রকাশ্য এবং গুপ্ত কর্ম্মচারীর দল তাহাকে প্রশ্ন করিয়া, বিদ্রূপ করিয়া, লাঞ্ছিত করিয়া, বিনা অপরাধে থানায় টানিয়া লইয়া গিয়া ভয় দেখাইয়া যন্ত্রণার একশেষ করিত না। মনের মধ্যে পাপ না থাকিলে তখনকার দিনে পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেকেরই নির্ভয়ে বিচরণ করিবার অধিকার ছিল; এবং, এখনকার মত নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার নিরতিশয় অপমানকর গুরুভারও তখনও নবাগত বঙ্গবাসীর ঘাড়ের উপর চাপানো হয় নাই। অতএব স্বচ্ছন্দচিত্তে কোন একটা আশ্রয়ের অনুসন্ধানে সমস্ত সকালটাই সেদিন পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে পড়ে। একজন বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে মুটের মাথায় এক ঝাঁকা তরি-তরকারি চাপাইয়া ঘাম মুছিতে-মুছিতে দ্রুতপদে চলিয়াছিল;—জিজ্ঞাসা করিলাম, "মশাই, নন্দমিস্ত্রীর বাসাটা কোথায় ব'লে দিতে পারেন?" লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কোন্ নন্দ? রিবিট ঘরের নন্দ পাগ্‌ড়িকে খুঁজচেন?" বলিলাম, "সে তো জানিনে মশাই—কোন্ ঘরের তিনি। শুধু পরিচয় দিয়েছিলেন, রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী বলে।" লোকটা অসম্মানসূচক একপ্রকার মুখ-ভঙ্গী করিয়া কহিল, "ওঃ—মিস্তিরি! অমন সবাই নিজেকে মিস্তিরি ব'লায় মশায়! মিস্তিরি হওয়া সহজ নয়! মর্কট সাহেব যখন আমারে বলেছিল,—হরিপদ, তুমি ছাড়া মিস্তিরী হবার লোক ত আমি দেখ্‌তে পাইনে! তখন বড় সাহেবের কাছে কত উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন? একশখানি। আরে, কাস্তের জোর থাক্‌লে কি উড়ো চিঠির কর্ম্ম?

কেটে যে জোড়া দিতে পারি। তবে, কি জানেন মশাই—” দেখিলাম, অজ্ঞাতে লোকটার এমন যায়গায় আঘাত করিয়া ফেলিয়াছি যে, মীমাংসা হওয়া কঠিন। তাই, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলাম, “তা’হলে নন্দ বলে কোন লোককে আপনি জানেন না?” “শোন কথা! চল্লিশ বছর রঙ্গিনে বাস, আমি জানিনে আবার কাকে? নন্দ কি একটা? তিনটে নন্দ আছে যে! নন্দ মিস্তিরি বল্‌লেন? আস্‌চেন কোত্থেকে? বাঙলা থেকে বুঝি? ওঃ—তাই বলুন—টগরের মানুষকে খুঁজ্‌চেন।” ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, “হাঁ—হাঁ, তিনিই বটে!” “আসুন আমার সঙ্গে। বরাতে কোরে খাচ্চে মশাই, নইলে নন্দ পাগ্‌ড়ি না কি আবার মিস্তিরি! মশাই আপনারা?” ব্রাহ্মণ শুনিয়া লোকটা পথের উপরেই প্রণাম করিল; কহিল, “সে দেবে আপনার চাকুরি করে? তা’ সাহেবকে বলে’ দিতেও পারে একটা জোগাড় কোরে; কিন্তু দুটি মাসের মাইনে আগাম ঘুষ দিতে হবে। পারবেন? তা’হলে আঠারো আনা পাঁচ সিকে রোজ ধরতেও পারে। এর বেশি নয়!” জানাইলাম যে আপাততঃ চাকরির উমেদারীতে যাইতেছি না, একটু আশ্রয় জোগাড় করিয়া দিবে, এই আশা আমাকে নন্দ মিস্ত্রী জাহাজের উপরেই দিয়াছিল। শুনিয়া হরিপদ মিস্ত্রী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মশাই ভদ্রলোক, কেন ভদ্রলোকদের মেসে যান না?” কহিলাম, “মেস কোথায় সে ত চিনি না।” সেও চিনে না—তাহা সেও স্বীকার করিল। কিন্তু ওবেলা সন্ধান করিয়া জানাইবে আশা দিয়া বলিল, “কিন্তু এত বেলায় নন্দর সঙ্গে দেখা হবে না—সে কাজে গেছে—টগর খিল দিয়ে ঘুমোচ্চে। ডাকাডাকি কোরে তার ঘুম ভাঙালে আর রক্ষে থাকবে না মশাই!” সেটা খুব জানি। সুতরাং পথের মধ্যে আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে সাহস দিয়া কহিল, “নাই গেলেন সেখানে! অমন তোফা দা’ঠাকুরের হোটেল রয়েচে—চান করে সেবা করে এক ঘুম দিয়ে, বেলা পড়লে তখন দেখা যাবে। চলুন।” হরিপদর সহিত গল্প করিতে-করিতে দা’ঠাকুরের হোটেলে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন হোটেলের ডাইনিঙ্‌-রুমে জনপোনর লোক খাইতে বসিয়াছে।

ইংরাজীতে দুটা কথা আছে ‘instinct’ এবং ‘prejudice’ কিন্তু আমাদের আছে শুধু ‘সংস্কার’। একটা যে আর একটা নয়, তাহা বুঝা কঠিন নয়; কিন্তু আমাদের এই জাতি-ভেদ, খাওয়া-ছোঁয়া বস্তুটা যে ‘instinct’ হিসাবে সংস্কার নয়, তাহা দা’ঠাকুরের এই হোটেলের সংস্রবে আজ প্রথম টের পাইলাম। এবং সংস্কার হইলেও যে ইহা কত তুচ্ছ সংস্কার, ইহার বাঁধন হইতে মুক্ত হওয়া যে কত সহজ, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। আমাদের দেশের এই যে অসংখ্য জাতি-ভেদের শৃঙ্খল—তাহা দু’পায়ে পরিয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া বিচরণ করার মধ্যে গৌরব এবং মঙ্গল কতখানি বিদ্যমান, সে আলোচনা এখন থাক্; কিন্তু এ কথা আমি অসংশয়ে বলিতে পারি যে, যাহারা নিজেদের গ্রামটুকুর মধ্যে অত্যন্ত নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সংস্কার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এবং ইহার শাসন-পাশ ছিন্ন করার দুরূহতা সম্বন্ধে যাঁহাদের লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই, তাঁহারা একটা ভুল জিনিস জানিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ, যে কোন দেশে খাওয়া-ছোঁয়ার বাচ-বিচার প্রচলিত নাই, তেমন দেশে পা দেওয়া মাত্রই বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, এই ছাপান্ন পুরুষের খাওয়া-ছোঁয়ার শেকল কি করিয়া না জানি রাতারাতিই খসিয়া গেছে। বিলাত গেলে জাতি যায়; একটা মুখ্য কারণ, নিষিদ্ধ মাংস আহার করিতে হয়। যে নিজের দেশেও কোন কালে মাংস খায় না, তাহারও যায়। কারণ, জাতি মারিবার মালিকেরা বলেন, সে ওই একই কথা,—না খেলেও সে ওই খাওয়াই ধরে নিতে হবে। নেহাৎ মিথ্যা বলেন না। বর্ম্মা ত তিন চার দিনের পথ; অথচ দেখি, পনর আনা বাঙালী ভদ্রলোকই—বোধ করি ব্রাহ্মণই বেশি হইবেন, কারণ এ যুগে তাঁদের লোভটাই সকলকে হার মানাইয়াছে—জাহাজের হোটেলে শস্তায় পেট ভরিয়া আহার করিয়া ডাঙায় পদার্পণ করেন। সেখানে মুসলমান ও গোয়ানিজ্ পাচক-ঠাকুরেরা কি রাঁধিয়া সার্ভ করিতেন, প্রশ্ন করা রূঢ় হইতে পারে; কিন্তু তাহারা যে হবিষ্যান্ন পাক করিয়া কলাপাতায় তাহাদিগকে পরিবেশন করে নাই, তাহা ভাটপাড়ার ভট্টচায্যিদের পক্ষেও অনুমান করা বোধ করি কঠিন নয়। আমি ত সহযাত্রী! যাঁহারা নিতান্তই এই সকল খাইতে চাহেন না, তাঁহারা অন্ততঃ চা-রুটি, ফলটা-পাকড়টাও ছাড়েন না। অথচ, সেই

একদম্ নিষিদ্ধ মাংস হইতে বর্ত্তমান রম্ভা পর্য্যন্ত সমস্তই একত্রে গাদা-গাদি করিয়া জাহাজের কোল্ড-রুমে রাখা হইয়া থাকে, এবং তাহা কাহারও অগোচর রাখার পদ্ধতিও জাহাজের নিয়ম-কানুনের মধ্যে দেখি নাই। তবে আরাম এইটুকু যে বর্ম্মা-প্রবাসীর জাতি যাইবার আইনটা বোধ করি কোন গতিকে শাস্ত্রকারের কোডিসিলটা এড়াইয়া গেছে। না হইলে হয় ত আবার একটা ছোট-খাটো ব্রাহ্মণ-সভার আবশ্যক হইত। থাক্ ভদ্রলোকের কথা আজ এই পর্য্যন্তই থাক্। হোটেলে যাহারা সারিসারি পংক্তি-ভোজনে বসিয়া গেছে, তাহারা ভদ্রলোক নয়। অন্ততঃ আমরা বলি না। সকলেই কারিকর, ওয়ার্ক-শপে কাজ করে। সাড়ে দশটার ছুটিতে ভাত খাইতে আসিয়াছে। সহরের প্রান্তে মস্ত একটা মাঠের তিন-দিকে নানা রকমের এবং নানা আকারের কারখানা এবং একধারে এই পল্লীর মধ্যে দা'ঠাকুরের হোটেল। এ এক বিচিত্র পল্লী। লাইন করিয়া গায়ে-গায়ে মিশাইয়া জীর্ণ কাঠের ছোট-ছোট কুটীর। ইহাতে চিনা আছে, বর্ম্মা আছে, মাদ্রাজী, উড়িয়া, তৈলঙ্গী আছে, চট্টগ্রামী মুসলমান ও হিন্দু আছে, আর আছে আমাদের স্বজাতি বাঙালী। ইহাদেরই কাছে আমি প্রথম শিখিয়াছি যে, ছোট জাতি বলিয়া ঘৃণা করিয়া দূরে রাখার বদ্ অভ্যাসটা পরিত্যাগ করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। যাহারা করে না, তাহারা যে পারে না বলিয়া করে না, তাহা নয়; যে জন্য করে না, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে বিবাদ বাধিবে।

দা'ঠাকুর আসিয়া আমাকে সযত্নে গ্রহণ করিলেন; একটি ছোট ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, "আপনি যতদিন ইচ্ছা এই ঘরে থাকিয়া আমার কাছে আহার করুন, চাকুরি-বাকুরি হইলে পরে দাম চুকাইয়া দিবেন।" কহিলাম, "আমাকে ত তুমি চেনো না, একমাস থাকিয়া এবং খাইয়া, দাম না দিয়াও ত চলিয়া যাইতে পারি?" দা'ঠাকুর নিজের কপালটা দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, "এটা ত সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না মশাই?" বলিলাম "না।" দা'ঠাকুর মাথা নাড়িতে-নাড়িতে এবার পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "তবেই দেখুন। বরাত মশাই, বরাত! এ ছাড়া আর পথ নেই, এই আমি সকলকে বলি।" বস্তুতঃ, এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। এ সত্য তিনি যে নিজে কিরূপ অকপটে বিশ্বাস করিতেন, তাহা হাতে-নাতে প্রমাণ করিবার জন্য মাস-চার-পাঁচ পরে একদিন প্রাতঃকালে অনেকের গচ্ছিত টাকা-কড়ি, আংটি-ঘড়ি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া শুধু তাহাদের নিরেট কপালগুলি শূন্য হোটেলের মেঝের উপর সজোরে ঠুকিবার জন্য বর্ম্মায় ফেলিয়া রাখিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। যাই হোক্, কথাটা শুনিতে মন্দ লাগিল না, এবং আমিও একজন তাঁর নূতন মক্কেল হইয়া একটা ভাঙ্গা ঘর দখল করিয়া বসিলাম। রাত্রে একজন কাঁচা বয়সের বাঙালী ঝি আমার ঘরের মধ্যে আসন পাতিয়া খাবার যায়গা করিয়া দিতে আসিল। অদূরে ডাইনিং-রুমে বহুলোকের আহারের কলরব শুনা যাইতেছিল। প্রশ্ন করিলাম, "আমাকেও সেখানে না দিয়া এখানে দিতেছ কেন?" সে কহিল "তারা যে 'নোয়া-কাটা', বাবু, তাদের সঙ্গে কি আপনাকে দিতে পারি?" অর্থাৎ তাহারা ওয়ার্ক-মেন, আমি ভদ্রলোক। হাসিয়া বলিলাম, "আমাকেও যে কি কাটতে হবে, সে তো এখনো ঠিক হয় নাই। যাই হোক্ আজ দিচ্চ দাও, কিন্তু কাল থেকে আমাকেও ও-ঘরেই দিয়ো।" ঝি কহিল, "আপনি বামুন মানুষ, আপনার সেখানে খেয়ে কাজ নেই।" "কেন?" ঝি গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, "সবাই বাঙালী বটে, কিন্তু একজন 'ডোম', আর দু'জন 'পোদ' আছে।" ডোম এবং পোদ! দেশে এই দুটা জাতিই অস্পৃশ্য। ছুঁইয়া ফেলিলে স্নান করা compulsory কি না জানি না; কিন্তু কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিতে হয়, তাহা জানি। অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর সবাই?" ঝি কহিল, "আর সবাই ভাল জাত। কায়েত আছে, কৈবর্ত্ত আছে, সদ্গোপ আছে, গয়লা আছে, কামার—" "এরা কেউ আপত্তি করে না?" ঝি আবার একটু হাসিয়া বলিল, "এই বিদেশে, সাত সমুদ্দুর পারে এসে কি অত বাম্‌নাই করা চলে বাবু? তারা বলে, দেশে ফিরে গঙ্গাস্নান কোরে একটা অঙ্গ-প্রাচিত্তির করলেই হবে।" হয় ত হয়; কিন্তু আমি জানি যে, দুই চারিজন মাঝে-মাঝে দেশে আসে। তাহারা চল্‌তি-মুখে কলিকাতার গঙ্গায় একবার গঙ্গাস্নানটা হয় ত করিয়া লয়, কিন্তু অঙ্গ-প্রাচিত্তির কোনকালেই করে না। বিদেশের আব-হাওয়ার গুণে ইহা তাহারা বিশ্বাসই করে না।

দেখিলাম হোটেলে মাত্র দুটি হুঁকা আছে; একটি

ব্রাহ্মণের, অপরটি যাহারা ব্রাহ্মণেতর তাহাদের। আহারাদির পরে কৈবর্ত্তর হাত হইতে ডোম এবং ডোমের হাত হইতে কর্ম্মকার মশায় স্বচ্ছন্দে হাত বাড়াইয়া হুঁকা লইয়া তামাক ইচ্ছা করিলেন। দ্বিধার লেশমাত্র নাই। দিন দুই পরে এই কর্ম্মকারটির সহিত আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, এতে তোমাদের জাত যায় না?" কর্ম্মকার কহিল, "যায় না আর মশাই, যায় বই কি।" "তবে?" "ও কি আর প্রথমে ডোম বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল; বলেছিল, কৈবর্ত্ত। তার পরে সব জানা-জানি হয়ে গেল।" "তখন তোমরা কিছু বল্‌লে না?" "কি আর বোল্‌ব মশাই, কাজ্‌টা ত খুবই অন্যায় করেচে, সে তো বল্‌তেই হবে। তবে, লজ্জা পাবে, এই জন্য সবাই জেনেও চেপে গেল।" "কিন্তু দেশে হলে কি হোতো?" লোকটা যেন শিহরিয়া উঠিল। কহিল, "তা হলে কি আর কারও রক্ষে ছিল?" তার পরে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেই বলিতে লাগিল, "তবে কি জানেন বাবু, বামুনের কথা ধরিলে, তাঁরা হলেন বর্ণের গুরু, তাঁদের কথা আলাদা। নইলে, আর সবাই সমান; নব-শাখই বলুন, আর হাড়ি-ডোমই বলুন, কিছুই কারও গায়ে লেখা থাকে না; সবাই ভগবানের সৃষ্টি, সবাই এক, সবাই পেটের জ্বালায় বিদেশে এসে লোহা পিট্‌চে। আর যদি ধরেন বাবু, হরি মোড়ল ডোম হলে কি হয়, মদ খায় না, গাঁজা খায় না—আচার ব্যবহারে কার সাধ্যি বলে ও ভাল জাত নয়, ডোমের ছেলে! আর ঐ লক্ষ্মণ, ও ত ভাল কায়েতের ছেলে, ওর দেখুন দিকি একবার ব্যবহারটা? ব্যাটা দু' দুবার জেলে যেতে-যেতে বেঁচে গেছে। আমরা সবাই না থাক্‌লে এত দিন ওকে জেলে মেথরের ভাত খেতে হোতো যে!" লক্ষ্মণের সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল ছিল না, কিম্বা হরি মোড়ল তাহার ডোমত্ব গোপন করিয়া কত বড় অন্যায় করিয়াছে, সে মীমাংসা করিবারও প্রবৃত্তি হইল না; আমি শুধু ভাবিতে লাগিলাম, যে দেশে ভদ্রলোকেরা পর্য্যন্ত চর লাগাইয়া তাহার আজন্ম প্রতিবেশীর ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া, তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করিয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সেই দেশের অশিক্ষিত ছোটলোক হইয়াও ইহারা একজন অপরিচিত বাঙালীর এতবড় মারাত্মক অপরাধও মাপ করিয়াছে; এবং, শুধু তাই নয়, পাছে এই প্রবাসে তাহাকে লজ্জিত ও হীন হইয়া থাকিতে হয়, এই আশঙ্কায় সে কথা উত্থাপন পর্য্যন্ত করে নাই, এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল! বিদেশী বুঝিবে না বটে, কিন্তু আমরা ত বুঝিতে পারি হৃদয়ের কতখানি প্রশস্ততা, মনের কত বড় ঔদার্য্য ইহার জন্য আবশ্যক। এ যে শুধু তাহাদের দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসার ফল, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। মনে হইল এই শিক্ষাই এখন আমাদের দেশের জন্য সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন। ঐ যে নিজের পল্লীটুকুর মধ্যে সারাজীবন বসিয়া কাটানো, মানুষকে সর্ব্ব বিষয়ে ছোট করিয়া দিতে এত বড় শত্রু বোধ করি কোন একটা জাতির আর নাই। যাক্‌। বহু দিন পর্য্যন্ত আমি ইহাদের মধ্যে বাস করিয়াছি। কিন্তু আমার যে অক্ষর-পরিচয় আছে, এ সম্বাদ যতদিন না তাহারা জানিবার সুযোগ পাইয়াছে, শুধু ততদিনই আমি ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাদের সকল সুখ-দুঃখের অংশ পাইয়াছি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জানিয়াছে আমি ভদ্রলোক, আমি ইংরাজি জানি, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা আমাকে পর করিয়া দিয়াছে। ইংরাজি-জানা শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে ইহারা আপদ-বিপদের দিনে আসেও বটে, পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে তাহাও সত্য; কিন্তু, বিশ্বাসও করে না, আপনার লোক বলিয়াও ভাবে না। আমি যে তাহাদিগকে ছোট বলিয়া মনে-মনে ঘৃণা করি না, আড়ালে উপহাস করি না, দেশের এই কুসংস্কারটা তাহারা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। শুদ্ধ এই জন্যই আমার কত সৎ-সঙ্কল্পই যে ইহাদের মধ্যে বিফল হইয়া গিয়াছে, বোধ করি তাহার অবধি নাই। কিন্তু সে কথাও আজ থাক্‌। দেখিলাম, বাঙালী মেয়েদের সংখ্যাও এ অঞ্চলে বড় কম নাই। তাহাদের কুলের পরিচয় প্রকাশ না করাই ভাল; কিন্তু আজ তাহারা আর একভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া একেবারে খাঁটি গৃহস্থ-পরিবার হইয়া গেছে! পুরুষদের হয় ত আজও একটা সাবেক 'জাতের' স্মৃতি বজায় আছে, কিন্তু দেশেও আসে না, দেশের সহিত কোন সংস্রবও রাখে না। তাহাদের ছেলে-মেয়েদের প্রশ্ন করিলে বলে, আমরা বাঙালী; অর্থাৎ, মুসলমান, খৃষ্টান, বর্ম্মা নই, বাঙালী হিন্দু। আপোষের মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রদান স্বচ্ছন্দে চলে;—শুধু বাঙালী

হইলেই যথেষ্ট, এবং চট্টগ্রামী বাঙালী ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্ত্র পড়াইয়া দুই হাত এক করিয়া দিলেই বাস্। বিধবা হইলে বিধবা-বিবাহের রেওয়াজ নাই, বোধ করি পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে রাজী হন না বলিয়াই; কিন্তু বৈধব্যও ইহারা ভালবাসে না; আবার একটা ঘর-সংসার পাতাইয়া লয়—আবার ছেলে-মেয়ে হয়; -তাহারাও বলে, আমরা বাঙালী। আবার তাহাদের বিবাহে সেই পুরোহিত আসিয়াই বৈদিক মন্ত্র পড়াইয়া বিবাহ দিয়া যান,—আর কিন্তু এক তিল আপত্তি করেন না। স্বামী অত্যধিক দুঃখ-যন্ত্রণা দিলে ইহারা অন্য আশ্রয় গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা বলিয়া দুঃখ-যন্ত্রণার পরিমাণটাও অত্যন্ত হওয়া প্রয়োজন। অথচ ইহারা যথার্থই হিন্দু, এবং দুর্গা-পূজা হইতে সুরু করিয়া ষষ্টি-মাকাল কোন পূজাই বাদ দেয় না। (ক্রমশঃ)

সঙ্গীত ও স্বরলিপি

* দীপক—চৌতাল

রবি যো রম্যো জগত জগমগাত জগত জোত
ওতপ্রোত ভূতল নভ লোগ তেজ তমকে ছায়ো-রি।
দ্বাদশ-রবি অনল অনিল ঊনঞ্চাশ রূপ ধরে,
ঊনঞ্চাশ কোট তান মধ দরশায়ো-রি।
ভূমি জল থল আকাশ চঁহুদিশ ছায়ো,
ক্রোধ প্রগট কর শঙ্কর ত্রিশূলকুঁ উঠায়ো-রি।
তানসেন কালকো করাল মুখ খুলন লগো,
তাণ্ডব কর শঙ্করনে দীপক সুখ গায়ো-রি ॥—তানসেন।

* "দীপক" এক্ষণে "পঞ্চম" নামে খ্যাত। হিন্দুস্থানী "সঙ্গীত-শিক্ষক" নামক গ্রন্থে দীপক অথবা পঞ্চম বলিয়া লিখিত আছে।
"তোপ্‌ তেল্‌ হিন্দ্‌" নামক প্রসিদ্ধ পারসিক গ্রন্থকার মিজা খাঁও বলেন, "দীপক এক্ষণে পঞ্চম বলিয়া প্রচলিত।
(সঙ্গীত-সার—২য় পৃষ্ঠা।)

বর্দ্ধমানাধিপতির গায়ক—সঙ্গীতসঙ্ঘের কণ্ঠ-সঙ্গীতের প্রফেসর,

সঙ্গীতবিদ্যার্ণব ও সঙ্গীতনায়ক—

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক স্বরলিপি

সম্পূর্ণ-জাতি। ম—বাদী। ধ—সংবাদী। ঋ—কোমল।

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

II সা র্সা | না ধমা | ধা-না I না-ধা | -া মা | -া মা | মা মা | মা মা | পা গা

র বি যো র০ ম্যো০ জ০ ০গ ০ত জ গ ম গা ০ত

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২

I গা গা | ঋা সনা | -সা সা | সা -া | সা ঋা | না ধা I মা -ধা | না সা | -া সা |

জ গ ত জো০ ০ত ও০ ত প্রো ০তি ভূ০ ০ত ০ল

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

সা সা | মা মা | -া গা | মা ধা | না ধা | মা গা | মা র্সা | -া নধা | না ধা

ন ভ ০লো ০গ তে০ ০০ ০জ ত০ ০ম০ ০কে

১´ ০ ২

I মাঃ-পঃ | গা গা | ঋা সা II

ছা ০ ০য়ো ০রি।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০

II{মা -ধা | না র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সনা র্ঋা | র্সা র্সা I র্সা র্সা | -র্মা র্গা |

ছা০ দ শ র বি অ ন ল০ অ নি ল ০ঔ ন ০ ক্ষা

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০

র্ঋা র্সা | র্সনা -র্সা | র্ঋা না | ধা -া }I না না | -া ধা | -া ধা | মা -া |

০শ রু০ ০ প ধ রে০ ঔ ন ০ক্ষা ০শ কো০

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

মা মা | পগা গা I মা -ধা | -না -ধা | র্সা র্সা | র্ঋা -না | -ধা না | -ধা মা

ট তা ০০ন ম০ ০০ ০ধ দ০ ০০ ০র

১´ ০ ২

I মাঃ -পঃ | গা গা | ঋা সা II

শা ০ ০য়ো ০রি।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২

II না না | ধা ধা | মা মা | মা -া | -া মা | -পা গা I মা -ধা | -না ধা | -মা মা |

ভূ অ জ ল থ ল আ০ ০কা ০শ চঁ হু ০দি ০শ

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

মাঃ পঃ | -গা গা | -ঋা সা I সা -া | সা ঋা | না ধা | মা ধা | না -ধা | সা সা

ছা ০ ০য়ো ০রি ক্রো০ ধ প্র গ ট ক র শ০ ঙ্ক র

২ ০

I সা ণা | -মা মা | -া মা | মা মগা | পমা মা | -পগা গা II

ত্রি শূ ০ ল ০ কুঁ উ ঠা০ ০০ য়ো ০০ রি

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০

II{ মা -ধা | মা ধা | -র্সা র্সা | সা -া | র্সা র্সা | নর্সা -া I র্সা র্সা | র্মা র্মা |

তা ০ ন সে ০ ন কা ০ ল কো ০০ ০ ক রা ০ ল

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০

র্গা ঋা | র্সা র্সা | ঋা না | ধা -া }I মা -া | মা মা | মপা গা | মা -ধা |

মু থ খু ল ন ল গো ০ তা ০ ও ব ক০ র শ ০

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

মা র্সা | -া র্সা | ঋা -না | -ধা না | -ধা মা | ধা -না | র্সা না | ধা মা

ঙ্ক র ০ নে দী ০ ০ প ০ ক সু ০ ০ ০ ০ থ

১´ ০ ২

I মাঃ-পঃ | গা গ | -ঋা সা II II

গা ০ ০ য়ো ০ রি।

নন্দলাল

তাল্—দাদ্‌রা

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা' ক'রেই হোক্, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল 'আ-হা-হা কর কি, কর কি, নন্দলাল ?'
নন্দ বলিল 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে, কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?'
তখন সকলে বলিল—'বাহবা বাহবা বাহবা বেশ !'

নন্দোর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা !
সকলে বলিল 'যাওনা নন্দ, করনা ভা'য়ের সেবা' !
নন্দ বলিল 'ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক' ;
তখন সকলে বলিল—'হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে, তা বটে, ঠিক !'

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ;
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির ;
পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন ;
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ !—
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল ;
তখন সকলে বলিল—'বাহবা বাহবা নন্দলাল !'

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি ;
সাহেব আসিয়া গলাটী তাহার টিপিয়া ধরিল খালি ;
নন্দ বলিল, 'আ-হা-হা ! কর কি, কর কি, ছাড়না ছাই,
কি হবে দেশের, গলাটিপুনিতে আমি যদি মারা যাই ?
বল ক'বিঘৎ দিব নাকে খৎ, যা বল করিব তাহা' ;
তখন সকলে বলিল—'বাহবা বাহবা বাহবা বাহা !'

নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির, কোথা কি ঘটে কি জানি ;
চড়িত না গাড়ী, কি জানি কখন উল্‌টায় গাড়ীখানি ;
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে 'কলিশন' হয় ;
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ী-চাপা-পড়া ভয় ;
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল—'ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাল !'

\+ ২
॥ ধা -া ধা ধা -া -া ॥
ন ন্ দ লা ল্

কথা ও সুর—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়] [স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

\+ ২ + ২ + ২ + ২
ধা -া ধা ধা -া নধা পা ধা পা মা গা গা গা পা পা মা গা গা রা সা -া -া -া -া
ন ন্ দ লা ল্ ত এ ক দা এ ক্ টা ক রি ল ভী ষ ণ্ প - - - - ণ্
ন ন্ দ র্ ভা ই ক লে রা য়্ ম রে দে খি বে তা হা রে কে বা - - - -
ন ন্ দ এ ক দা হ ঠা ৎ এ ক টা কা গ জ্ ক রি ল বা হি - - - র্
ন ন্ দ এ ক দা কা গ জে তে এ ক সা হে ব কে দে য় গা লি - - - -
ন ন্ দ বা ড়ী র্ হ ত না বা হি র্ কো থা কি ঘ টে কি জা নি - - - -

\+ ২ + ২ + ২ + ২
রা রা রা -া রা সা রা মা পা ধা ধা -া ধা ধা র্সা না ধা ধা না ধা পা মা -া -া
স্ব দে শে র্ ত রে যা ক' রে ই হো ক্ রা খি বে ই সে জী ব - - - - ন্ ॥
স ক লে ব লি ল যা ও না ন ন্ দ ক র না ভা য়ে র সে বা - - - -
গা লি দি য়া স বে গ - চ্ছে প - চ্ছে বি - দ্যা ক রি ল জা হি - - - র্
সা হে ব্ আ সি য়া গ লা টি তা হা র্ টি পি য়া ধ রি ল খা লি - - - -
চ ড়ি ত না গা ড়ী কি জা নি ক খ ন্ উ ল্ টা য়্ গা ড়ী খা নি - - - -
ত খ ন্ স ক লে ব লি ল বা হ বা বা হ বা বা হ বা বে - - - - -
ত খ ন্ স ক লে ব লি ল হাঁ হাঁ হাঁ তা ব টে ত্বা ব টে ঠি - - - - -
ত খ ন্ স ক লে ব লি ল বা হ বা বা হ বা ন ন্ দ লা - - - - ল্
ত খ ন্ স ক লে ব লি ল বা হ বা বা হ বা বা হ বা বা হা - - - -
স ক লে ব লি ল ভ্যা লা রে ন ন্ দ বেঁ চে থা ক্ চি র কা - - - - ল্ ॥

\+ ২ + ২ + ২ + ২
মা মা মা মা মা মপা পা ধা ধা ধা ধা ধা ধা ধা ধা ধা ধা ধা না ধা পা মা -া -া
স ক লে ব লি ল আ হা হা ক র কি ক র কি ন ন্ দ লা - - - - ল্
ন ন্ দ ব লি ল ভা য়ে র্ জ - ন্য জী ব ন্ টা য দি দি ই - - - -
প ড়ি ল ধ - ন্য দে শে র্ জ - ন্য ন ন্ দ খা টি য়া খু - - - - ন্
ন ন্ দ ব লি ল আ হা হা ক র কি ক র কি ছা ড় না ছা - - - - ই
নৌ - কা ফি স ন্ ডু বি ছে ভী ষ ণ্ রে লে ক লি শ ন্ হ - - - - য়্

\+ ২ + ২ + ২ + ২

মা -া মা মা মা মা পা না না র্সা র্রা র্রা র্রা র্মা র্গা র্রা র্রা র্রা র্গা র্রা র্সা না -া -া

ন ন্ দ ব লি ল ব সি য়া ব সি য়া র ছি ব কি চি র কা - - - - ল্

না হ য়্ দি লা ম্ কি - ন্তু অ ভা গা দে শে র্ হ ই বে কি - - - - -

লে খে য ত তা র্ দ্বি গু ণ ঘু মা য়্ খা য়্ তা র্ দ শ্ গু - - - - ণ

কি হ বে দে শে র্ গ লা টি পু নি তে আ মি য দি মা রা যা - - ই - -

হাঁ টি তে স - র্প কু - ক্কু র্ কিম্ বা গা ড়ী চা পা প ড়া ভ - - - - য়্

র্রা র্রা র্রা র্রা র্রা র্রর্গা র্সা র্রা·র্সা না ধা -া ধা -া র্সা না ধা -া মা মা -া -া -া -া

আ মি না ক রি লে কে ক রি বে আ র্ উ - দ্ধা র এ ই দে - - - - -

বাঁ চা টা আ মা র্ অ তি দ র্ কা র্ ভে বে দে খি চা রি দি - - - - ক্

খা ই তে ধ রি ল লুঁ চি ও ছো কা - স ন্ দে শ থা ল্ থা - - - - ল্

ব ল ক বি ঘ ৎ না কে দি ব খ ৎ যা ব ল ক রি ব তা হা - - - -

তা ই শু য়ে শু য়ে ক - ষ্টে বাঁ চি য়ে র হি ল ন ন্ দ লা - - - - -

সৌভাগ্য

[শ্রীমাণিক্ ভট্টাচার্য্য বি-এ]

প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া পড়িবার ঘরে একখানি বই হাতে করিয়া বসিবামাত্র, আমার স্ত্রী সাম্‌নের টেবিলে চা রাখিয়া গলে বস্ত্র দিয়া আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। "সর্ব্বনাশ! আজ আবার এ কি!" বলিতেই রাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরণে কৌষেয় বাস, মুখে ভক্তির ভাব, চক্ষু দুটী অশ্রুসিক্ত। তাহার মুখের পানে চাহিতেই আমার পরিহাস মুখেই মিলাইয়া গেল; মনে পড়িয়া গেল—আজ আমাদের বিবাহের তিথি। আমার মুখে আর কথা ফুটিল না; শুধু গাঢ় স্নেহভরে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। রাণী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। আজ তাহার অনেক কাজ। প্রতি বৎসর এই দিনে সে আমাকে দেবোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে সঙ্কুচিত করিয়া তুলে।

কত বৎসর হইয়া গেল,—তবু যেন মনে হয়, সে দিন! —সকাল বেলাতে ফুলগাছের গোড়াগুলি পরিষ্কার করিয়া দিতেছি, এমন সময় নির্ম্মলের ছোট ভাই টুনু আসিয়া ডাকিল —"ভানু দাদা, শীগ্‌গির এস,—বাবা ডাক্‌ছেন।" নির্ম্মলদের বাড়ী আসিতেই. নির্ম্মলের পিতা বলিলেন—"ভানু, বনগাঁয়ের সম্বন্ধটী আমার পছন্দসই হয়েছে। তুমি ও নির্ম্মল আজই গিয়ে একবার দেখে এস। অগ্রাণের মধ্যেই বিবাহ হয় আমার ইচ্ছা। কুটুম্ব, বংশ, মেয়ের স্বভাব সে সব আমি বেশ জেনেছি; এখন মেয়ে দেখার ভার তোমাদের।"

কাকা একজন পুরাতন-তন্ত্র ও নূতন-তন্ত্র মিশান লোক। আমরা যাইব না বলিলে তিনি ছাড়িবেন না। বাবার মত লইয়া তাঁহার কথামত নির্ম্মল ও আমি সেই

দিনই ভাবী বধূ দেখিতে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া আমি বলিলাম—"পাত্রী সুন্দরী, আমাদের খুব পছন্দসই।" অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি বিবাহ স্থির হইল। বিবাহের দিন অপরাহ্ণে আমরা দিগ্বিজয়ে যাত্রার মতই সগর্ব্বে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেই আমরা বিবাহ-বাটী পৌঁছিলাম। আহারের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় পাশের বাড়ী হইতে একটা গোলমাল উঠিল। শুনিলাম, সেখানেও একটী মেয়ের বিবাহ। সেটী একটু দূর-সম্পর্কে নির্ম্মলের খুড়-শ্বশুরের বাড়ী। সেখানে গিয়া দেখি, সে এক বৃহৎ ব্যাপার। বিবাহ ভ্রষ্টপ্রায়। বর ও বরপক্ষীয় লোকেরা গমনোন্মুখ। সে মেয়েটীর শ্রাবণ মাসের ২৫শে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। ৪ দিন পূর্ব্বে হঠাৎ পাত্র জ্বরাক্রান্ত হওয়ায়, সে সময়ে বিবাহ বন্ধ হয়। অগত্যা অগ্রহায়ণের প্রথমেই বিবাহ হইবে, ইহাই স্থির হয়। এদিকে আশ্বিনের মাঝামাঝি মেয়েটীর বসন্ত হয়। দিন ২০র মধ্যে রোগ চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহারই মধ্যে সে বালিকাটীর মুখে যে স্মৃতি-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা সামান্য হইলেও আজীবন থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। তাহার পিতা পাত্রপক্ষকে একবার সংবাদ দিবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু বিষয়বুদ্ধি তাঁহাকে পরামর্শ দিল—এ সংবাদ গোপন করাই সমীচীন, কারণ, ইহাতে গোলযোগের আশঙ্কা আছে। পাছে আবার বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে এ সংবাদ গোপন করা হইয়াছিল। বর-পক্ষ কিছুই জানিত না। সম্প্রদানের সময় প্রথমে কন্যাকে অবগুণ্ঠিতা দেখিয়া বর-পক্ষীয় একজন আপত্তি করিলেন। অবগুণ্ঠন মোচিত হইলেই সত্য প্রকাশ পাইল। মৃত্তিকা-নিবদ্ধ-দৃষ্টি, সঙ্কুচিতা বালিকার মুখে যে কাতরতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বরকর্ত্তার করুণা আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন—"মশায়, আমি ত এ মেয়ে দেখে যাইনি—তার মুখে কোন দাগ ছিল না।" কন্যাপক্ষীয় সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য দিলেন—"আপনি ইহাকেই দেখেছিলেন। আশ্বিন মাসে মা শীতলার কৃপা হয়েছিল, তাই এ অবস্থা হয়েছে।" "তা আমাদের জানান হয়নি কেন?" "জানালে কি আর বেশী ফল হত? কেবল আপনাদের ব্যস্ত করা।" "মশাইরা কি আর প্রবঞ্চনার জায়গা পান নি? এ মেয়ের সঙ্গে আমি ছেলের বিবাহ দিতে রাজী নই। ওঠ তো রমেশ।" বর এই আকস্মিক দুর্ব্বিপাকে কিছু হতভম্ব হইয়াছিল। সব শুনিয়া সে যে তাহার আসন্না প্রিয়াকে প্রীতিচক্ষে দেখিতেছিল, তাহা বোধ হইতেছিল না। পিতার আহ্বানে সে আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল। বালিকাটী এতক্ষণ সেখানে বসিয়া মুখ নীচু করিয়া কেবল ঘামিতেছিল। বরকে উঠিতে দেখিয়া সকলে কলরব করিয়া উঠিল। বালিকা সেখানে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। আমি যখন সে ঘরে প্রবেশ করি, তখন বাবার কণ্ঠস্বর শুনিলাম। তিনিও আমাদের সঙ্গে বরযাত্র আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন —"এতে তো কন্যাপক্ষের কোন দোষ নেই মশাই। শ্রাবণ মাসে যে আপনার ছেলের জ্বর হয়েছিল, তাতে কি আপনার দোষ ছিল? সে সময়ে যদি আপনার ছেলের জ্বর না হ'ত, তা'হলে তো সেই সময়েই বিয়ে হয়ে যেত। যদি বিবাহ হবার পর এ অসুখ হ'ত, তাহলে কি করতেন?" বাবাকে কথা কহিতে শুনিয়াই বুঝিলাম, তিনি একটা কিছু উপায় করিবেন। তিনি যেরূপ স্বাধীন-চিত্ত, ন্যায়পরায়ণ ও কর্ম্মকুশল, তাহাতে একটা কিছু উপায় না করিয়া স্থির থাকিবেন না।

বরের পিতা বলিলেন,—"যদি বিবাহ হবার পর এ ঘটনা হ'ত, তা'হলে কোন কথা হ'ত না। কিন্তু জেনে-শুনে এ-রকম কুৎসিত মেয়েকে আমার পুত্রবধূ করতে পারি না। তা'ছাড়া উনি আমাকে এ কথা জানান নি কেন?" বাবা বলিলেন—"সে দোষ আপনি ক্ষমা করে নিন্। আর জানালে তো বাস্তবিক তাতে কোন লাভ হ'ত না; মাঝে থেকে আপনি হয় ত একখানা পোষ্ট কার্ড লিখে দিতেন—কন্যার বিবাহ অন্যত্র দিবেন। এতগুলি ভদ্রলোকের অনুরোধে আর এই বালিকার মুখ চেয়ে আপনি বিবাহে অনুমতি দিন।" "তা যদি উনি এর জন্য বিশেষ বিবেচনা করেন, আমি আপনাদের অনুরোধে রাজী হতে পারি।" "আপনার 'বিশেষ বিবেচনা' মানে কি?" "মশাই, পরিষ্কার বলি শুনুন্—বিবাহ দিতে আমার মোটেই ইচ্ছা নাই। শুধু আপনাদের অনুরোধে আর ব্রাহ্মণের জাত যায় ভেবে অগত্যা এই কথা বল্‌ছি। যা দেওয়ার কথা আছে, তা ছাড়া যদি এখনি ১০০০৲ টাকা নগদ দিতে পারেন—তা'হলে রাজী হ'তে পারি, নতুবা নয়।" "তা'হলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আপনার উদ্দেশ্য কিছু মোড় দিয়ে নেওয়া।

যদি আমার মেয়ের বিবাহ হ'ত, আমি আপনাদের এক পয়সা বেশী দিতাম না, খাইয়ে দিয়ে এখনি বিদায় করতাম; জাত যাবে বলে ভয় করতাম না।"

কন্যার পিতা হাত যোড় করিয়া বলিলেন—"আমার আর কিছুরই সঙ্গতি নেই। বাড়ীখানি বন্ধক দিয়ে তবে বিবাহের যোগাড় করেছি। দয়া করে আমায় উদ্ধার করুন।" বরকর্ত্তা বলিলেন—"যান মশাই, আর ন্যাকামো করবেন না। টাকা দিতে পারেন—আসুন; না হলে আপনি অপর ব্যবস্থা দেখুন।" ভিতর হইতে চাপা কান্নার স্বর আসিতে লাগিল। বালিকাটীর মুখে মাথায় জল দিয়া সেই আসনেই বসান হইয়াছিল। তাহার আবার মূর্চ্ছার উপক্রম হইতেছিল। বাবা কন্যার পিতাকে বলিলেন—"মশায়, মেয়েটীকে দেখুন,—ও যে মারা যায়! ও-রকম অভদ্র লোকদের আর খোসামোদ করবেন না! এর আর এক রাস্তা—একে চাবুক মেরে বিয়ে দিতে বাধ্য করান। সে ব্যবস্থা শক্ত নয়। কিন্তু তাতে মেয়ের শেষে কষ্ট হ'বে বলে করা উচিত নয়। আপনি এমন একটী ছেলে কি এখানে পাবেন না, যে মেয়েটির এই অবস্থা দেখে তাকে গ্রহণ করে। আপনি তারি চেষ্টা দেখুন। ভগবানকে প্রণাম করুন যে, এ-রকম লোকের ঘরে আপনাকে মেয়ে দিতে হবে না।" বরপক্ষীয় দুই-একজন লোক বলিল—"মশায়, আর গোলমালে কাজ নেই, শুভ কাজে আর বিঘ্ন দেবেন না।" কিন্তু বরকর্ত্তা অতিরিক্ত অর্থাগমের আর কোন আশা নাই দেখিয়া পূর্ব্ব সঙ্কল্পে অটল রহিলেন; বলিলেন,—"বলেন কি মশায়, আমি এই মেয়ে নেব। তার ওপর, ওই মোটা লোকটা বলে কি না চাবুক মেরে বিয়ে দেওয়াও!" "হাঁ, চাবুক মেরে বিবাহ দেওয়াব ত নিশ্চয়ই" —বলিয়া পাড়ার অনেকগুলি যুবক বরযাত্রদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। দুই পক্ষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। বাবা তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া কন্যাপক্ষীয়গণকে নিবৃত্ত করিলেন; বলিলেন,—"ওদের অনায়াসে আজ বিবাহ দিতে বাধ্য করা যায়; কিন্তু তা'হলে কাল ওরা মেয়েটীকে নিয়ে গিয়ে পরশুই মেরে ফেল্‌বে,—নয় মরণাধিক যন্ত্রণা দেবে। এখন ওরা স্বীকার হলেও আপনারা মেয়ে দেবেন কেন? তা'ছাড়া আজ এরা আপনাদের অতিথি; শত দোষ করিলেও মাননীয়।" গোলযোগ মিটিয়া গেল। কাকা ও নির্ম্মলের শ্বশুর তুজনেই বাবার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কন্যার পিতা তাঁদের কাছে গিয়া বলিলেন— "এঁরা ত চলে যাচ্চেন। কি উপায় হবে এখন; কোথায় পাত্র পাব?" তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বাবা একবার বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দ্বারের কাছে আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম; তাঁহার দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। বোধ হইল তিনি আমাকেই খুঁজিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি ইঙ্গিতে নিকটে ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকটে গেলাম। বাবা বলিলেন—"ভানু, তুমি এই লাঞ্ছিতা বালিকাকে গ্রহণ করলে আমি সুখী হ'ব। তোমার আপত্তি আছে?" আমি বলিলাম— "আপনার আদেশ হলে আমার কোন আপত্তি নেই।" বাবা তখন কন্যার পিতাকে বলিলেন—"দেখুন, আপনি যখন বল্‌ছেন পাত্র পাবেন না, আমি আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজী আছি। আপনি যেমন নির্ম্মলের শ্বশুরের খুড়তত ভাই, নির্ম্মল ও ভানুর মধ্যেও সেই সম্বন্ধ। কাজেই বিবাহে কিছুই বাধবে না। কয়েক মাস হ'ল এ এম-এ পাশ করেছে—এখনও কোন কাজ আরম্ভ করেনি। আশা করি আপনার কোন আপত্তি হ'বে না।"

কন্যার পিতা কৃতজ্ঞতার আবেগে বাবার হাত দুখানি জড়াইয়া ধরিলেন; মুখ দিয়া কোন কথা ফুটিল না। আমি সেই বেশেই বরের আসনে বসিয়া পড়িলাম। প্রথম বর ও তাঁহার অনুগামিগণ কিছু পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিলেন। বাবা বলিলেন—"আপনি যে নগদ টাকাটা রেখেছেন তা তুলে নিন্, আর বৌমাকে যে গহনা দিয়েছেন, তাও খুলে রাখুন। গহনা বিক্রয় করে আর ঐ টাকা দিয়ে কালই আপনি আপনার বাড়ী খালাস করুন। তার পরে আপনার ইচ্ছা ও সময়মত যা দিতে ইচ্ছা হয় দিবেন;—কিন্তু এখন কিছুতেই নয়।—রাখ ত মা লক্ষ্মী, গহনা-কখানি খুলে। হাঁ দাও, তোমার বাবার হাতে দাও; ওঁর অবস্থা ভাল হলে আবার তোমাকে দেবেন—এখন নিতে নেই।"

* * * *

"হ্যাঁ গো, এত অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলে, চা যে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! এ চা খেও না; আমি এখনি আবার চা এনে দিচ্ছি।" রাণীর বাক্যে চমক ভাঙ্গিল। তাহার হাতখানি হাতের মধ্যে রাখিয়া বলিলাম,—"আমার সেদিনকার সৌভাগ্যের কথা ভাব্‌ছিলাম।"

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

শিশুপাঠ্য গ্রন্থ—

মানব মনের উপর গল্পের যেমন প্রভাব, এমন আর অন্য কোনও লেখায় দেখা যায় না। ইহার আকর্ষণী শক্তিও অসামান্য। এইজন্য বোধ করি স্মরণাতীত কাল হইতে এ জিনিষটা শিক্ষা-প্রচারের উপায় স্বরূপ হইয়া চলিয়া আসিতেছে।—এইজন্য মনে হয়, খ্রীষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থেও দেখিতে পাই—And He spake many things to them in Parables.

বাস্তবিক, ছোট ও বড়, স্ত্রী ও পুরুষ—সকলের মনকেই ইহা যেমন টানিয়া রাখিতে পারে, তেমনি সকলের চিত্তে ভাবান্তরও ঘটায়। গিরিশচন্দ্রের জীবন কথায় আছে,—"শৈশবকালে গিরিশচন্দ্র তাঁহার খুল-পিতামহীর নিকট রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পৌরাণিক গল্প শুনিতেন। সেই সব গল্প শুনিতে-শুনিতে শিশু-হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় রসে আপ্লুত হইত। একদিন পিতামহী কহিলেন,—'কৃষ্ণ ব্রজপুরী ছাড়িয়া মথুরায় গেলেন।' বালক গিরিশচন্দ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আবার আসিলেন?" পিতামহী কহিলেন,—'না।' বালক গিরিশচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আর আসিলেন না?' আবার উত্তর 'না'। তিনবার এইরূপ নির্দ্দয় উত্তর শুনিয়া গিরিশচন্দ্রের কোমল প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। বালক কাঁদিয়া পলাইল, তিনদিন আর গল্প শুনিতে আসিল না। খুল-পিতামহীর নিকট এইরূপ গল্প শ্রবণে, বাল্যহৃদয়ে ধর্ম্মগ্রন্থের মর্ম্ম জানিবার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পল্লীর নিকটস্থ কোন স্থানে কথকতা বা রামায়ণ ইত্যাদি গান হইলে, গিরিশচন্দ্র সে স্থানে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।"—শুধু গিরিশ বাবু বলিয়া নহে;—এ আগ্রহ, এ ভাবান্তরের উদাহরণ খুঁজিয়া দেখিলে তোমার আমার জীবনেও যে একেবারে না পাওয়া যায়, তাহা নহে। 'মিথ্যা কথা বলিও না',—এই মাধুর্য্যবিহীন বাক্য কখনও মর্ম্মকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু ঐ উপদেশই যখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতির চরিত্রে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া সত্যনিষ্ঠার বড়-বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় দেখি, তখন সত্যের সৌন্দর্য্যে বাস্তবিকই মন মোহিত হয়। তখন মনের মধ্যে বাস্তবিকই একটা মহান্ ভাব জাগিয়া উঠে।

তবে কথা এই যে, গল্প বলিলেই গল্প বলা হয় না; তাহা সরস ও সুন্দর করিয়া বলিতে পারা চাই। রচনা রচয়িতার নিজের জন্য নহে,—তাহার প্রধান লক্ষ্য পাঠক-সমাজ। অতএব, যিনি বড়দের জন্য যে ভাবে গল্প লিখিবেন, তাঁহাকে ছোটদের জন্য ঠিক সে ভাবে গল্প লিখিলে চলিবে না। ছেলেদের জন্য বহি লিখিতে হইলে তাহাদের প্রকৃতির সঙ্গে নিজের লেখাটি মিলাইয়া লইতে হইবে। যিনি তাহা পারিবেন, তাঁহার রচনায় অন্যান্য দোষ থাকিলেও তাহা ছেলেদের মনোহরণ করিতে নিশ্চয় পারিবে।

কিন্তু মনোহরণ করিতে পারাটাই গল্পের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য নহে। বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশের প্রস্তাবনায় বলিয়া গিয়াছেন, "কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।" এইটাই সকল শিশুপাঠ্য পুস্তকের কাজ হওয়া উচিত। গল্পের আপাত উদ্দেশ্য অবশ্য নানা রূপ হইতে পারে, যথা—শিশুর কল্পনা-শক্তির বিকাশ ও পুষ্টিসাধন, তাহার হৃদয়ে রসানুভূতির সৃষ্টি, পরোক্ষভাবে ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের শিক্ষা প্রভৃতি। কিন্তু সকল গল্পেরই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া চাই—চরিত্র-গঠন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ মুখ্য উদ্দেশ্যটাই বাঙ্গালার অধিকাংশ শিশুপাঠ্য পুস্তকে পদে-পদে উপেক্ষিত হইতে দেখা যায়। এই দুঃখে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন,—"যে-সে শিশুপাঠ্য পুস্তক একখানি লইয়া দেখিবেন, প্রথমেই মলাটে একখানি চিত্র আছে। একটি বালক হাসিতেছে। এমন বিকট হাসি শিশুর মুখে স্বভাবে প্রায়ই দেখা যায় না। তাহার উপর মুখগহ্বর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নাসিকা স্ফীত, চক্ষু কোটরগত। যেন বীভৎস-রসের শিশু-সংস্করণ! এই ত গেল শিল্পের পরিচয় তার পর ভিতরে সাহিত্যে শিক্ষার পরিচয় লউন:

কে ধরেছে, কে মেরেছে
কে দিয়েছে গাল?
যাদুর গুণের বালাই নিয়ে
মরে যেন সে কাল!

অতি শৈশব হইতেই বালকের গালি দিবার শিক্ষা আরম্ভ হইল।

তার পর গল্প শুনিবেন—শতকিয়া বা জমাখরচ ছন্দেবন্দে শেখান হইতেছে হারাধনের দশটি ছেলে, নয়টি শ্লোকে—জলে, স্থলে, বিষে, বাঘে, নয়টি মারা পড়িল, তার পর যোগ্য উপসংহার—

হারাধনের একটী ছেলে
কাঁদে ভেউ ভেউ,
মনের দুঃখে বনে গেল
রইল না আর কেউ!"

এইরূপ শুধু ভাব বা আদর্শের দোষ নহে,—ভাষার দোষও ছেলেদের গল্পের বহিগুলিতে বড় বেশী রকম দেখিতে পাওয়া যায়। লেখকেরা এই শ্রেণীর পুস্তকে প্রায়ই কলিকাতার চলিত বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু ছেলে মেয়েদের পক্ষে যে সেটা কি বিপদ হয়,

তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। তাঁহারা লেখেন—'ক্যান।' বালকেরা কিন্তু বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয়ভাগ ও শিশুশিক্ষা প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য পুস্তকে দেখিয়া থাকে—'কেন।' কাজেই 'ক্যান' কথাটা কেবল তাহাদের কাণে নহে-মনেও প্রথমটা বিপ্লব ঘটাইয়া দেয়। এইরূপ চলিত বাঙ্গালার উপদ্রবে ছেলেরা দেখিয়াছি ছেলেদের বহিতে প্রতি পদে বাধা পাইয়া থাকে। তাহারা স্কুলে এক ভাষা শিখে, অথচ এ বহিগুলিতে অন্য ভাষা দেখে। ফলে, ভাষা-শিক্ষা ও বানান-শিক্ষা এ দুইটাতেই তাহাদের মহাবিভ্রাট উপস্থিত হয়।

আমাদের দেশে 'ছেলেদের বহি'র অভাব নাই বটে, কিন্তু ছেলেদের উপযোগী ভাব ও ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তক রচিত হইয়াছে, এমন পুস্তকের অত্যন্তই দুর্ভিক্ষ। পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় লেখকেরা এ জিনিসটাকে অবজ্ঞার যোগ্য মনে করেন না;—তাঁহাদের অনেকেই শিশুপাঠ্য গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন। কিন্তু এ অভাব বৃদ্ধ জাতির নামজাদা লেখকদের মধ্যে দুই-একজন ছাড়া বড় একটা কাহাকেও এ কাজে হাত দিতে দেখি নাই। ছেলেদের জন্য বহি লেখাকে বোধ করি তাঁহারা ছেলেমানুষী বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। যাহা হোক, এজন্য ক্ষতিগ্রস্ত যে আমরাই হইতেছি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের সাহিত্য-রথীরা এ দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

সাহিত্যের শালীনতা—

অগ্রহায়ণের 'প্রতিভা' পত্রিকায় সম্পাদক-লিখিত "সাহিত্যের শালীনতা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের এক স্থানে আছে—

"আমরা একটু বেশী পরিমাণে শ্লীলতা-বাদী হইয়া পড়ি নাই ত? অর্থাৎ শালীনতা রক্ষা আমাদের একটা 'নেশা' হইয়া যায় নাই ত? সুরুচি যেমন চোখে চশমা দিয়া বাহির হইত, পাছে ল্যাংট কুকুর চোখে পড়ে, আমাদেরও সে রোগ জন্মে নাই ত? আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'কেও অশ্লীল বলি; কেন না, উহাতে পর পুরুষের সহিত প্রণয়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে। আর কিছুই নাই; কেবল ঐ টুকুই উহাকে কাহারও কাহারও চক্ষে অশ্লীল প্রতিপন্ন করিয়াছে। অথচ বৈষ্ণব ধর্ম্মসাহিত্য, যেমন চৈতন্যচরিতামৃত বলে, 'পরকীয়া না হইলে নয় রসের সঞ্চার'। একটা হজম করিতে পারি, আর একটা এমন হলাহল কেন?"

উপরি-উদ্ধৃত কথা কয়টি পড়িয়া আমরা একটু বিস্মিত হইয়াছি। কারণ, এই লেখক মহাশয়েরই নাম দিয়া ইতিপূর্ব্বে "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" কাগজে "সাহিত্যে নবীন পন্থা" শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহারই মাথার উপর স্যর আশুতোষের এই কথা কয়টি লেখা ছিল,—

"যাহা তোমার সমাজের বা জাতীয়তার পরিপন্থী, তাহাকে আড়ম্বর-পূর্ণ সাজসজ্জায় সাজাইয়া সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে তোমার স্বজাতির আপামর সাধারণকে মজাইও না।"

তারপর প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক নিজেও বলিয়াছেন,—"যাহাদের সংহিতা বলিয়াছিল, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'—তাহারা নারীর সম্মান করিতে জানিত; কিন্তু সে বিলাসিনী বরবর্ণিনী রূপে নয়, আদ্যাজননীর অংশরূপে; এ সম্মান তার স্ত্রীত্বের নয়, মাতৃত্বের। কবে আমরা ভাবিতে শিখিব যে নারীত্বের পরিসমাপ্তি পত্নীত্বে নয়, মাতৃত্বে; কবে আমাদের সাহিত্য অস্বাভাবিক ভোগতৃষ্ণা সংযমিত করিয়া পবিত্রভাব ধারণ করিবে?"

এখন, আমাদের প্রশ্ন এই যে, লেখক মহাশয় কোন্ মতাবলম্বী? 'প্রতিভা'য় তিনি যে ব্যঙ্গবাণ ছাড়িয়াছেন, তাহা কাহার অঙ্গে লাগিতেছে? 'ঘরে বাইরে' পুস্তকে যাহা আছে, তাহা 'সমাজের ও জাতীয়তার পরিপন্থী' কি না?

আমরা আরও বিস্মিত হইয়াছি, লেখককে 'ঘরে বাইরে'র সহিত 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নাম করিতে দেখিয়া! লেখক বলিতেছেন,—"বৈষ্ণব ধর্ম্ম-সাহিত্য, যেমন চৈতন্যচরিতামৃত বলে, 'পরকীয়া না হইলে নয় রসের সঞ্চার'।" একটা হজম করিতে পারি, আর একটা এমন হলাহল কেন?—কথাটা শুনিতে হাসির বটে, কিন্তু লেখক মহাশয় খুব গম্ভীর ভাবেই উহা বলিয়াছেন! চৈতন্যচরিতামৃতের পরকীয়ার সঙ্গে 'ঘরে বাইরে'র পরকীয়ার তিনি নিঃসঙ্কোচেই তুলনা করিয়াছেন! যাহা অতুলনীয়, তাহার সহিত তুলনা! পরকীয়ার প্রকৃতি কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

'পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ-বিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রী রাধিকার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥'

এখন বোধ করি, লেখক বুঝিতে পারিতেছেন যে, 'একটা আমরা কেন হজম করিতে পারি, এবং অন্যটা এমন হলাহল কেন?'

সেদিন একখানা বটতলার বহিতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সহিত রেণল্ডের তুলনা দেখিয়া হাসিয়া বাঁচিয়াছিলাম! কিন্তু সম্পাদক মহাশয় একজন সুপণ্ডিত, সুলেখক। তাঁহার কলম হইতে এমন বেতালা কথা বাহির হইতে দেখিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়।

মহাবৎ খাঁ কি রাজপুত ?

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বিগত ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, বি-এ মহাশয়ের 'প্রতাপ সিংহ' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। সতীশবাবু মহাবৎ খাঁ সম্বন্ধে পুস্তকে একটু আলোচনা করিয়াছেন (পৃঃ ৭০ পাদটীকা); কিন্তু মহাবৎ জাতিতে রাজপুত কি না, এ সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ থাকায়, 'প্রতাপ সিংহ' সমালোচনা-কালে এই প্রসঙ্গে আমি কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করি নাই।

টড্ সাহেব (Tod) তাঁহার Rajasthan গ্রন্থে লিখিয়াছেন, উদয়সিংহ-পুত্র সাগরসিংহের (সাগরজী) পুত্রই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহাবৎ খাঁ নাম গ্রহণ করেন। এই উক্তি অবলম্বন করিয়া, অনেক ঐতিহাসিক ও নাট্যকার মহাবৎকে 'রাজপুত' সাব্যস্ত করিয়াছেন; কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহার যে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

জহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী 'তুজুক্-ই-জহাঙ্গীর' পাঠ করিলে বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। মহাবৎ সম্বন্ধে জহাঙ্গীর লিখিতেছেন :—

"I raised Zamana Beg, son of Ghayur Beg of Kabul, who has served me personally from his childhood, and who, when I was prince, rose from the grade of an *ahadi* to that of 500, giving him the title of MAHABAT KHAN and the rank of 1,500. He was confirmed as *bakshi* of my private establishment (*shagird-pisha*)"—*Tuzuk-i-Jahangiri*—Rogers & Beveridge, i, 24.

মহাবৎ সম্বন্ধে জহাঙ্গীর যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমার মনে হয়, নিসংশয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহার সম্বন্ধে জহাঙ্গীর যে ভুল করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নয়, কারণ মহাবৎকে জহাঙ্গীর শৈশব হইতেই জানিতেন, এবং তাঁহার জীবদ্দশায় মহাবৎ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের অভিনয় করিয়াছিলেন।

ক্ষুদ্র বিন্দু

[শ্রীসরলা দত্ত]

শুভ্র শিলাখণ্ড ছিল নিশ্চল পাষাণ,
নাহি ছিল অনুভূতি নাহি ছিল প্রাণ।
বিন্দু বিন্দু বারি-পাতে পাষাণের পর,
বরষ বরষ ব্যাপি রচিয়াছে স্তর।
এ জগতে কিছু নাহি উপেক্ষার আর
মহা-সিংহাসন টলে স্পর্শে করুণার;

ভিখারী দুয়ারে ডাকে, সুখ শয্যা তার
কণ্টকিত করি তুলে, তিষ্ঠিতে না দেয়।
এ নিয়তি তুচ্ছ কাজে যেই দিন ধরে
আমার উন্নত শিরে ধূলি'রেণু পরে
হে মহান, বুঝি নাক ইঙ্গিত তোমার,
একি শাস্তি! অথবা কি করুণা অপার!

ভারত-সচিব শ্রীযুক্ত মণ্টেগু মহোদয়ের অভ্যর্থনা

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভবনে

[আলোকচিত্র-গৃহীতা—শ্রীশচী রায় ও শ্রীবিমল পাল

প্রতা ও বনলতার [illegible]

ক্লান্তি-বিনোদন

শিল্পী - শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

ভাবের অভিব্যক্তি

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

বিষয়ী ও উদাসী

ধনী ও ভিক্ষার্থী

গায়কের আনন্দ

বিষাদ

সন্ন্যাসী

তৃপ্তি

বীণার তান

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় বি-এ]

হিন্দী

১। সরস্বতী—অক্টোবর, ১৯১৭।

"প্রাথমিক শিক্ষা কী সমস্যা" লেখক শ্রীরঘুবীর সিংহ।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্নটি এদেশে বেশ একটু আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। সভ্যজগতের মধ্যে ভারতবর্ষই যে সর্ব্বাপেক্ষা অশিক্ষিত দেশ, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। এখানে যে কয়টি বেসরকারী বিদ্যালয় আছে, লোকসংখ্যার অনুপাতে সেগুলি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। আজকাল যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা উণ্টা গঙ্গার মত। শিক্ষার ইমারত এদেশে উপর হইতে বাঁধ আরম্ভ করা হইয়াছে। ভিত্তি যে আগে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহা দেশের নায়কগণ বিস্মৃত হন। প্রথমে বহু যুগে যখন শিক্ষার কথা উঠে, তখন সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া ঠিক হয়। পরে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষার প্রথা প্রচলিত হইল। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরে যে এক শ্রেণী রহিয়াছে, যাহারা ইংরাজী জানে না এবং ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া জ্ঞানলাভ করা যে তাহাদের পক্ষে আর্থিক হিসাবে অসম্ভব, একথা কেহ মনেও করে না। ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া আমরা যে শিক্ষা পাই, তাহা অর্থ ও সময় সাপেক্ষ। দরিদ্র যাহা ও নিম্নশ্রেণীর লোক যাহারা উপার্জ্জনক্ষম না হওয়া পর্য্যন্তই বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে, তাহারা ইংরেজীর সহায়তায় জ্ঞানলাভ করিবার অসমসাহস করিতে পারে না। তাহাদের জন্য ভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

এই নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার জন্য দেশে সংস্কার ও দেশের সামাজিক উন্নতি হইতেছে না,—যাহা হইতেছে তাহাও অতি ধীরে এবং অনেক বিপদ ও বাধার মধ্য দিয়া। আধুনিকতার সঙ্গে এক কদমে চলিবার মত অবস্থা দেশের হয় নাই। এই আধুনিকতাকে বুঝিতে হইলে শিক্ষার দরকার; আধুনিকতার সঙ্গে পরিচয় আবশ্যক; কিন্তু দেশের লোক অন্ধ জনতা (mob) ছাড়া কিছুই নয়। আবার এই mobএর অধিকাংশ নিরক্ষর!—যাঁহারা অধিকতর অশিক্ষিত অথচ জবরদস্ত সংস্কারাচ্ছন্ন!

বেসরকারী উদ্যমেই দেশের জনতার শিক্ষার চেষ্টা দেখিতে হইবে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বেসরকারী উদ্যোগগুলিও উণ্টা পথ ধরিয়া বসিয়াছে। ইহারা যদি প্রারম্ভিক শিক্ষায় একটাকা খরচ করে, তবে উচ্চশিক্ষায় দশটাকা ব্যয় করে। কিন্তু ইহাদের উচিত প্রাথমিক শিক্ষার দিকে অধিক নজর দেওয়া; কারণ, গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, আপাততঃ যতদিন না প্রাথমিক শিক্ষার আরও বিস্তার হয়—ততদিন তাহাই যথেষ্ট হইবে।

মিউনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ড হইতেই প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রচার আমরা আশা করিতে পারি।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা লইয়া এখন আর বড় একটা মত-ভেদ নাই। এখন সমস্যা হইতেছে, কোন্ পথে ইহাকে চালিত করা যায়। কেহ কেহ চান যে, পাকা রাস্তায় ঘুরিয়া, ফিরিয়া যাওয়া অপেক্ষা সোজাপথে (Short cut) যাওয়াই ভাল। কিন্তু শিক্ষার সূত্র-সঞ্চালক-গণ দীর্ঘ, অলস পথে যাওয়াই পছন্দ করেন। আমাদের দেশের শিক্ষার প্রধান বাধা হইতেছে দারিদ্র্য। দেশ এত দরিদ্র যে ছয় বৎসরের শিশুকেও তাহার পিতার ব্যবসায়ে সাহায্য করিতে হয়। চাষী কর্ম্মকার, মিস্ত্রী প্রভৃতি শ্রেণীতে শিশুকালেই ছেলেরা নিজ নিজ ব্যবসায় শিক্ষা করে -করিতে বাধ্য হয়, নহিলে পেট চলে না।

তাহার পর আমাদের দেশে যথেষ্ট যোগ্য শিক্ষকের অভাব। ধরুন একটি দেশে পঞ্চাশ হাজার গ্রাম আছে। এখন প্রত্যেক গ্রামের জন্য একটি করিয়া শিক্ষক দরকার হইলে ৫০০০০ শিক্ষকের দরকার। কিন্তু সরকার ওদিকে সরকারী নিয়মে শিক্ষিত না হইলে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে রাজী নহেন।

তৃতীয়তঃ, দেশে পাঠশালা খুলিবার জন্য যথেষ্ট পাকা বাড়ী নাই। গবর্ণমেণ্ট আবার ইমারত না হইলে পাঠশালা খুলিতে দিবেন না।

অধিক দিনের কথা নয়, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের প্রত্যেক গ্রামে "টেশালা" ছিল। এই সকল স্থানে গ্রামের মোড়লদিগের বৈঠক বসিত; আবার পাঠশালার কাজও চলিত। চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল প্রভৃতির কোনও প্রয়োজন হইত না, অথচ গ্রামের শিশুরা লেখাপড়া শিখিত। আমাদের মনে হয়, যে-শ্রেণীর বালক ও শিশুর জন্য আমরা প্রাথমিক শিক্ষার আন্দোলন করিতেছি, সে-শ্রেণীর বালকদের চেয়ার বেঞ্চি না দিলেও চলে। তাহারা যেটুকু শিখিবে, তাহা দ্বারা চেয়ার-টেবিলে বসিবার ক্ষমতা জীবনে পাইবে কি না সন্দেহ। কারণ, নিম্ন-তম শ্রেণী ও দরিদ্রতম লোকের জন্যই প্রাথমিক শিক্ষার দরকার; তাহা-দিগকে পাকা ইমারতে মূল্যবান চেয়ার-বেঞ্চিতে বসাইয়া শিক্ষা না দিলেও চলে। বরং গাছতলায় শিক্ষা দিলে বেশী উপকার হয়।

অবশ্য পাকা ইমারত, চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল প্রভৃতি যদি জোগাড় করার উপযুক্ত অর্থ থাকে, তাহা হইলে তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু এই সব জোগাড় হইতেছে না বলিয়াই যে শিক্ষা বন্ধ থাকিবে, আমরা এ যুক্তির মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলাম না; এবং ইহার সমর্থনও করি না।

সার রবীন্দ্রনাথের বোলপুরের বিদ্যালয়ের আদর্শে দেশে পাঠশালা

স্থাপন করা উচিত। লেখাপড়া শিখিলেই যে চাকরী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে, শিক্ষিত ব্যক্তির দৈহিক পরিশ্রম করা যে অপমানজনক—এই ধারণা লোকের মন হইতে বিদূরিত করিতে হইবে। বোলপুরে গাছতলায়, মাঠে বিদ্যার্থী শিক্ষা পায়; শিক্ষকগণ—কি ভারতীয়, কি বিদেশী—সকলেই বিদ্বান, এবং সামান্য পারিশ্রমিকে কাজ করেন। শিক্ষার নিয়ম শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই খুব কড়া হওয়া উচিত নয়।

"চাঁপা কা কুষ্ঠাশ্রম"- লেখক শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মা।

অধর্ম্ম, অত্যাচার, উৎপীড়ন ও পরস্বাপহরণের প্রতিকারের জন্য ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিবর্ষণের সম্মুখীন হওয়া যদি বীরত্ব হয়, তাহা হইলে দীন, মলিন, হীন, রোগজীর্ণ আতুর জনের সাহায্যের জন্য কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হওয়াও কম বীরত্বের কার্য্য নহে। যে জাতি লোকসেবা ও পীড়িত জনের সেবায় যত তৎপর, সে জাতি তত উদার এবং মহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। আমাদের দেশে যারা দীন, যারা অথর্ব্ব, যারা ভীষণ ব্যাধি দ্বারা পীড়িত, তাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া শাস্ত্র তাহাদের দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। অথচ আমরা সভ্যতার বড়াই করি! ক্রিশ্চিয়ানগণ আর কিছু না করুক, ইহারা যে লোকসেবা—জাতি, ব্যাধি-নির্ব্বিশেষে মানুষের সেবা করিতে পারে, ইহা শতমুখে স্বীকার্য্য। চাঁপাতে মিশনারীগণ আপনাদের মহোদয়তার আর একটি পরিচয় দিতেছেন।

মধ্য-প্রদেশের বিলাসপুর জিলায় আমেরিকার Mennonite Mission হইতে কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। আশ্রমটির নাম Bethesda Leper Home। ইহার প্রবর্ত্তক ও সঞ্চালক রেভারেণ্ড পেনার (Rev. Penner)। অশিক্ষিত, ভীরু গ্রামবাসিগণ ইঁহাকে তাহাদের বিপদে সহায় মনে করেন। এরূপ দয়ালু, মহানুভব ব্যক্তি খুব কমই আছেন। ইনি সস্ত্রীক চব্বিশ ঘণ্টাই লোকের উপকারের জন্য প্রস্তুত থাকেন। যখন পেনার সাহেব উপস্থিত থাকেন না, তখন পেনারপত্নী গ্রামের সাহায্যপ্রার্থী লোকদের অভাব পূর্ণ করেন।

পেনার সাহেবের একখানি পত্রের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"We have 225 lepers just now in the Home and there are continual admissions. We are just now putting up new Wards for females, 10 in number. Each house will cost in the neighbourhood of Rs. 1500. Here is a chance for Indian charity. But till now I have not received a single pie from an Indian. I have to pay rent even for the land which the Champa Zemindar has given to the Mission."

পত্রখানি গত জানুয়ারী মাসে লিখিত। শেষ কথাগুলির দিকে পাঠক নজর দিবেন। আমরা মুখে যত কথাই বলি, কাজে কিছুই নই। আমরা হোমরুল প্রার্থনা করি বটে, কিন্তু আমরা চাই যে, সুখটুকু সব ভোগ করিব আমরা, আর কাজগুলি—দেশের কর্ত্তব্যগুলি করিয়া দিবে ইংরেজ। এই সামান্য কুষ্ঠাশ্রমটিতে সামান্য অর্থ সাহায্য যদি সকলে করেন, তাহ হইলে ইহার কাজ আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

'বিবিধ বিষয়"—সম্পাদক।

(১) "ভারতমে একসে পহনাবে কী আবশ্যকতা"

ভারতবর্ষের ভিন্ন-ভিন্ন প্রান্তের পোষাক ভিন্ন রকম। ফলে, যখন কোনও ভারতবাসী বিদেশে যায়, তখন দেশের লোকের ধাঁধাঁ লাগে—তাহারা কাহাকে ঠিক নিখুঁত ভারতবাসী বলিবে। এই ভিন্ন পোষাক আমাদের জাতীয় অনৈক্যের একটি প্রধান লক্ষণ। আমাদের কি উচিত নয়—সকলে মিলিয়া একটি জাতীয় পোষাকের সৃষ্টি করা?

বিভিন্ন-ভাষাভাষী ভারতবর্ষে ইহা সম্ভব কি না, তাহা আলোচ্য বটে; এবং এক ভাষার প্রচার না হইলে এক বেশ সম্ভব হইবে কি না, ইহা একটি সমস্যা বটে। এদেশ বিভিন্নতা ও পার্থক্যের জন্মভূমি; কিন্তু বোধ হয় এখানেও একতা সম্ভব শুধু চেষ্টাসাপেক্ষ। এই এক বেশ দ্বারা আমরা এ কথা বলি না যে, বিভিন্ন প্রদেশবাসিগণ সকলে নিজেদের পোষাক পরিত্যাগ করুন। দৈনন্দিন ব্যবহারে তাঁহারা প্রান্তীয় পোষাক ব্যবহার করুন ক্ষতি নাই; কিন্তু এমন একটি পোষাক হওয়া দরকার যাহা কোনও একটি বিশেষ কার্য্যের সময়, জাতীয় সম্মিলনীতে সকলে—সকল প্রান্তের লোকই পরিধান করিবেন।

(২) "এক নয়া আবিষ্কার"

১৯১১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এস্‌সি পরীক্ষা পাশ করিয়া শ্রীমন্মথনাথ দাস ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৯১৫ সালে ইনি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। ইঁহার যোগ্যতা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ সেখানেই ইঁহাকে রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদ প্রদান করেন। আমরা জানিতে পারিলাম, সেখানে ইনি একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা দ্বারা ফলমূল প্রভৃতি সব্‌জী দু'মাস অবধি বেশ ভাল রাখা যাইতে পারে। পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে ইংলণ্ডে যে সব ফলের চালান আসিত, তাহাতে অনেক ফল নষ্ট হইয়া যাইত। মিঃ দাসের উপায় দ্বারা এই সব ফল টাট্‌কা থাকিবে। ইহার পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে এবং এই আবিষ্কার রেজেষ্ট্রী হইয়াছে। ব্যবসায়ীদের খুবই সুবিধা হইবে; এবং আশা করা যায় যে, এখন এ দেশের আম বিলাতে পাঠান সহজ হইবে।

২। মর্য্যাদা—ভাদ্র সংখ্যা

"কৃষি অওর কৃষি শিক্ষা'—লেখক "আর্য্য"

ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অন্য দেশের প্রত্যেক লোকের বার্ষিক আয়ের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যায়, এ দেশের লোকের অবস্থা কত হীন। অবশ্য এক শ্রেণীর লোক আছে—যেমন জমীদার, ব্যারিষ্টার, উকীল, মহাজন ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী -

যাহারা খুব ধনী; কিন্তু যাহারা মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া দেশের লোকের ভাত-কাপড় যোগায়, তাহাদের অবস্থা চিন্তা করিবার অবসর কাহারও নাই।

যতদিন কৃষক বেচারাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া ইহাদের ব্যবসায়ের উন্নতির ব্যবস্থা না করা হয়, যতদিন ইহাদের বালকগণকে শিল্পশিক্ষার সুবিধা করিয়া না দেওয়া হয়, যতদিন প্রাথমিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত না হয়, আমরা হোমরুলের চেষ্টা যতই করি না কেন ততদিন দেশের উন্নতি সম্ভবে না।

এ কথা ঠিক যে, ব্যবসায় ও শিল্পোন্নতি ব্যতীত কোনও দেশের আর্থিক অবস্থার শীঘ্র উন্নতি হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে এখন শিল্পোন্নতি ও ব্যবসায়ের সুবিধা তত নাই। ইহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কৃষির উন্নতির প্রতি অমনোযোগী হইলেও চলিবে না। এদেশ কৃষিপ্রধান এবং কৃষি দ্বারাই শ্রমশিল্পের উপাদান সরবরাহ করা হয়। এদেশে শিল্প ও কৃষি পাশাপাশি অগ্রসর হইলে এক দিকে যেমন দেশের দৈন্য ঘুচিয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। য়ুরোপ ও অন্যান্য স্থানের বড়-বড় ফ্যাক্টরীর মাল-মসলা এই ভারতবর্ষের কৃষি হইতেই যোগান হয়। যদি এই মালমসলাগুলি ভারতবর্ষ নিজ কাজে লাগাইতে পারিত।

আমেরিকার যুক্তপ্রান্তে এমন কতকগুলি প্রদেশ আছে যাহা কৃষিপ্রধান। অথচ সেখানকার কৃষকগণ আমাদের কৃষকগণ অপেক্ষা অনেক বেশী ধনী, অনেকগুণ শিক্ষিত। তাহার কারণ তাহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিতে শিক্ষা করে এবং তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়ার সুবন্দোবস্তও আছে। আমাদের দেশে ঐরূপ বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের দেশে সরকার Agricultural school এবং model farms প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে কাজ হয় কম। যাহাদের বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীর জ্ঞান দরকার, তাহারা উহা পায় না, কারণ, গবর্ণমেন্টের স্কুলে পড়া নিঃস্ব চাষীদের পক্ষে অসম্ভব। তার পর একটু ইংরেজী জ্ঞান না হইলে এই সব স্কুলে শিক্ষালাভ করা যায় না; নিরক্ষর কৃষকগণের পক্ষে ইহাও এক অন্তরায়। যদি প্রাথমিক শিক্ষা থাকিত এবং কৃষিকলেজে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা হইলে ভাল হইত। তাহার পর, যে সব শিক্ষা এখানে দেওয়া হয়, তাহার কিছু-কিছু আমাদের চাষীরাই বেশী জানে। কখন কোন্ শস্য বুনিতে হয়, কখন জল সেচন করিতে হয়, কোন্ জমিতে কি বোনা উচিত—এসব না শিখাইলেও চলে; কারণ এগুলি চাষীরা বাল্যকাল হইতেই শিখিয়া আসিতেছে।

আমরা দেখিয়াছি এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, কৃষিকলেজে যাহারা যায়, তাহারা প্রায়ই সরকারী চাকরীর লোভেই যায়। আত্মোন্নতির উদ্দেশ্য খুব কম লোকেরই থাকে—অবশ্য ইহারা সুবিধাও পায় না।

৩। জৈন হিতৈষী।—সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর সংখ্যা, ১৯১৭। "সমাজসুধারমেঁ সবসে অধিক ডর কিন লোগোঁসে হায়?" লেখক শ্রীনিহালকরণজী শেঠী।

জৈন সমাজে সামাজিক সংস্কারের জন্য একটা হৈ-চৈ অনেক দিন হইতেই পরিলক্ষিত হইতেছে; কিন্তু এপর্য্যন্ত আমরা এমন কোনও নিদর্শন পাইলাম না, যাহাতে আমাদের মনে একটু আশার সঞ্চার হয়। বিবাহে দেখিতেছি, বাল্যবিবাহ অর্থাৎ শিশু-বিবাহ—পূর্ব্বের মতই চলিতেছে, বৃদ্ধবিবাহ তথৈবচ। বিধবাদের অবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও বৈবাহিক আদান-প্রদানের কোনও সূচনাই দেখা যাইতেছে না।

নূতন কিছু একটা সহসা করিতে সমাজ স্বভাবতঃই ভয় পায়। কিন্তু সমাজ ভয় পাইয়া বসিয়া রহিল বলিয়া সমাজের বিবেচক, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যে সৎকার্য্য হইতে বিমুখ থাকিবেন, এ কোনও কাজের কথা নহে।

প্রত্যেক সমাজে দেখা যায়, একদল আছে যাহারা একেবারে চরমপন্থী—জোরজার করিয়া সংস্কার সাধন করিতে হইবে। আর এক দল ভিন্নদিকে চরমপন্থী, তাহারা পূজার ঘরের সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে - পাছে কোনখান দিয়া কোনও ফাঁকে হঠাৎ একটু আলো প্রবেশ করিয়া জড়িমা ভাঙ্গিয়া তাহাদের দীনতা জগতের সামনে ঘোষণা করিয়া দেয়। কেবল এই দুই দল থাকিলে দোষ ছিল না, একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাইতে দেরী লাগিত না। কিন্তু এক মধ্যপন্থী আছে, যাহারা বলে সংস্কার দরকার, কিন্তু ধীরে-ধীরে। ইহারা দুইদলের কথায় সায় দেয়, অথচ কোনও দলে ধরা দেয় না; যে দল জয়ী হয় সেইদলের সঙ্গে শেষে খুব চীৎকার করে। যদি সংস্কারের চরমপন্থীগণ কোনও কাজ করিল, অমনি ইহারা বিপক্ষদের সঙ্গে যোগ দিয়া বলিতে থাকে, সহসা এরূপ হঠকারিতা ভাল নয় ইত্যাদি। ফলে, সংস্কারের বিরুদ্ধবাদীরা সুযোগ পায়, তাহারা বলে, দেখ; যাহারা সংস্কার চায়, তাহারাও এ কাজে অগ্রসর নয়, অথবা এ কাজ এ ভাবে হইতে দিতে চাহে না। ফলে, সৎকার্য্যে, সমাজ-সংস্কারে বাধা পড়ে এবং সমাজের শৈবাল আগেকার মতই থাকিয়া যায়। এই মধ্যপন্থীরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধা দেয়।

গুরু-দক্ষিণা

[শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ]

(স্থান ভদ্রলোকের মজলিস)

জনৈক-বৃদ্ধ। কি, হ্যাড়া যে,—ভাল তো।

উদ্দিষ্ট যুবক। আজ্ঞে, আমার নাম—অমল।

বৃ। অমল? আমরা তো তোমায় ছোট্টটি থেকে হ্যাড়া বলেই ডেকে আস্‌চি।

যু। আজ্ঞে—ছোটবেলায় তো আমরা এখানে থাকৃতুম না—এই মোটে ছ'মাস হ'ল প্রথম দেশে এসেচি।

বৃ। বিলক্ষণ! তোমায় কোলে করে' তোমার বাবা বৃন্দাবন সকাল-বিকাল আমার ওখানে চা খেতে যেত!

যু। আজ্ঞে আমার বাবার নাম তো বৃন্দাবন নয়—শ্রীশকুমার।

বৃ। হাঁ—হাঁ—শিরীষ-কুমার, তা জানি! বৃন্দাবনও তার আর একটা নাম,—জিজ্ঞেস কোরো না গিয়ে তোমার বাবাকে!

যু। তিনি তো মারা গিয়েচেন!

বৃ। হাঁ—হাঁ—তা জানি!—বেচারা বাড়ীখানা বিক্রী হয়ে যেতেই শোকে-তাপে ভেঙে পড়ল!

যু। আমাদের তো কোন বাড়ী বিক্রী হয়নি—বরং তিনি মারা যাবার আগে আর একখানা বাড়ী তৈরী করে গেছেন!

বৃ। তা কর্ত্তে পারে,—আজকাল ওকালতী করে' দু'পয়সা হচ্ছিল।

যু। আজ্ঞে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

বৃ। হাঁ—তাও জানি—হঠাৎ পসার কমে-যাওয়াতে যোগাড়-সোগাড় করে ডেপুটী হয়েছিল!

যু। আজ্ঞে—তাঁর সময় তো নমিনেশন ছিল না। ডেপুটী হবার জন্যে তাঁকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল!

বৃ। হাঁ—পরীক্ষা একটা হ'ত বটে; তবে তলে-তলে সুপারিশ যোগাড় কর্ত্তেই হ'ত।—আর সেই সুপারিশ যোগাড় কর্ত্তে আমায় কম বেগ্‌টা পেতে হয়েছিল!

যু। আপনাকে বেগ পেতে হ'ল কেন? আমার মাতামহ তো সে সময় শিমলায় খুব বড় কাজ কর্ত্তেন।

বৃ। সেখানে এগুবার সাধ্যি ছিল কি? তিনি তোমার বাপের মুখ-দর্শন কর্ত্তেন না—মোদো-মাতালের ওপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন!

যু। কি-সব বাজে কথা বলচেন মশাই—আমার বাপের পানদোষ মোটেই ছিল না।

বৃ। ইদানীং আমার কথায় ছেড়ে দেছ্‌ল!—তাই গোড়ার খবর জান না!—তোমার কাছে বাপু বল্‌তে কি—আমরা এক গেলাসের ইয়ার ছিলুম...আমি অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিলুম. তার পর তাকেও ছাড়িয়েছিলুম!

যু। (মনে মনে) নাঃ! লোকটা বড় বাড়াবাড়ি করচে... একটু জব্দ কর্ত্তে হবে! (প্রকাশ্যে) তা হতে পারে। তখন তো আমার জ্ঞান হয়নি। সে সব কথা জানবই বা কেমন করে'? তবে বাবা বল্‌তেন বটে, বিষ্ণু বলে তাঁর এক বন্ধু হতেই বাবার উন্নতি! আপনার নামটি কি?

বৃ। (সহাস্যে) বল্‌তো না কি? আমারই ছোটবেলার ডাক-নাম—বিষ্ণু, ঐ তোমার বাপের যেমন বিন্দাবন নাম। তোমার বাপ এ-ধারে যাই হোক্—আমার সঙ্গে বড় ভাব ছিল!

যু। ও! আপনি সেই বিষ্ণু বাবু?—নমস্কার—প্রণাম!

বৃ। বেশ বাবা! থাক্-থাক্...এখন কি কাজকর্ম্ম কচ্ছ?

যু। আজ্ঞে হাঁ—চাকরী করছি...

বৃ। কোথায়—ছাপাখানায়?

যু। আজ্ঞে না—সেখানে আর হোল কৈ?

বৃ। আহা! আমায় যদি একটু জানাতে! তা হলে একটা পনেরো টাকার চাকরী অনায়াসেই করে' দিতে পার্ত্তুম!

যু। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আপনার পরিচয় ত আর তখন পাই নি···তাই হোম্ ডিপার্টমেণ্টে ঢুকে পড়তে হ'ল!

বৃ। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) হোম্ ডিপার্টমেণ্ট? তা মন্দ নয়—তবে লাট-বেলাটের পেছন-পেছন বড় ঘুরে বেড়াতে হয়; আর সাহেব-সুবোর মন যুগিয়ে চলা বড় শক্ত!

যু। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আর কি করি বলুন—লেখাপড়া তো বেশী দূর কর্ত্তে পেলুম না—এম্-এ পাশ করেই লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হ'ল—

বৃ। ঠিক বলেচ বাবা!—এম্-এটুকু অবধি পাশ কল্লে কি আর লেখাপড়া হ'ল! ওর চেয়ে আমি বলি ম্যাট্রীক্যুলেশন পাশ করে ছেলেরা শেখে বেশী··· unseen passageএর উত্তর লিখে পাশ কর্ত্তে হয়—চারটিখানি কথা নয়!

যু। তা আর বল্‌তে! আপনার ছেলেটি এখন কি করচে?—

বৃ। তাকে পুলিশ লাইনে ঢুকিয়ে দিইচি—

যু। অই—যেটীর সঙ্গে ক্ষুদীরামের খুব আলাপ ছিল...?

বৃ। (সভয়ে) এঁ্যা—এঁ্যা—ও কি কথা!

যু। এখন আর ভয় কিসের? বরং পুলিসের চাকরীতে না ঢুক্‌লে অ্যাদ্দিনে একটা ফাঁসাদে পড়তে পারত...এখন খাকীর পোষাকে সব ঢাকা পড়ে গেছে—!

বৃ। এঁ্যা—এঁ্যা—কে বল্লে, কে বল্লে—সে ক্ষুদিরামের সঙ্গে—

যু। তা থাক্—বাবার মুখে শুনেছিলুম, চারদিকে আপনার ঢের দেনা ছিল; সে সব শোধ হয়েচে তো—বাস্ত বাড়ীখানা খালাস করেচেন তো। বাপ্!—যে সাংঘাতিক লোকের কাছে বাঁধা পড়েছিল, ও যে আর ফিরে পাবেন এ আর কেউ আশা করেনি।

বৃ। (সরোষে) তুমি তো দেখচি বড় সাংঘাতিক ছোকরা —জ্যান্ত মাছে এমন পোকা পড়াতে শিখ্‌লে—কোত্থেকে?

যু। (অভিবাদন পূর্ব্বক) আজ্ঞে - শিখলুম এইমাত্র আপনার কাছ থেকে!

বৃ। যাও—আমি তোমায় চিনি না—তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না!

যু। এতক্ষণে আপনি একটা সত্যি কথা বলেচেন··আর আমিও বলচি—আমার সাতপুরুষে আপনাকে চেনে না বা আপনার ঘরের খবর রাখে না...কেবল গুরু-দক্ষিণে দিতেই এই মিথ্যে কথাগুলোর সৃষ্টি কর্ত্তে হয়েচে—এখন আসি, নমস্কার।

বিজ্ঞানের কার্য্য

[শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বি-এ]

"Science is the study of nature. By means of science, we are enabled to understand the everythings of life—the flowers, the hills, the stars—and the place which they occupy in nature."—Hector Macpherson.

"Science is full of beautiful pictures, of real poetry and of wonder-working faeries."

—Mrs. Fisher.

এক দেশের এক রাজপুত্র, সাতসমুদ্র-তেরনদী পার হইয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে এক সাতমহল রাজপুরীতে আসিয়া দেখেন—হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, নিরালা উপবনে ভোরপুর সুবাস, নানারঙের পশুপক্ষী, সরোবরে রঙবেরঙের পদ্ম,—সবই আছে, কিন্তু যেন কোথাও প্রাণ নাই। মহল 'তন্ন তন্ন' করিয়া রাজপুত্র দেখেন—সাতমহলের ভিতর এক ফিনিক-ফোটা আলোর ঘরে, মুক্তামতির ঝালর-দেওয়া সোণার পালঙ্কে এক রাজকুমারী ঘুমাইতেছে,—সাড়া নাই, শব্দ নাই, পাশে একটি সোণার ও একটি রূপার কাটি পড়িয়া আছে। রাজপুত্র নিরুপায় হইয়া কাটি দুইটি নাড়াচাড়া করেন—আর যেমনি সোণার কাটি অঙ্গে লাগিয়াছে, অমনি রাজকন্যা জাগিয়া উঠিয়া অবাক্।

তখন 'বাঁচন-কাটি'র সন্ধান মিলিল—পুরীর সকলে কলরব করিয়া উঠিল।

রূপ-রস-শব্দ-গন্ধপূর্ণা বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির অনন্ত-মহল পুরীর কোন্ নিভৃত গুপ্ত কক্ষে সেই সোণার 'বাঁচন-কাটি'টি আছে, কে বলিয়া দিবে? প্রকৃতির এই 'বাঁচন-কাটি'টি ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। আমাদের বৈজ্ঞানিক রাজপুত্রগণ সেই টুকরাগুলি কুড়াইতেছেন। তাই প্রকৃতি এখন আমাদের কাছে তাহার পুরাকালের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন আমরা দেখিতে পাই—

"Tongues in trees, books in the running brook,
Sermons in stones and good in everything."

বিজ্ঞান অসাড়, নির্জীব প্রকৃতিকে কথা কহাইতেছে। যে-দিন আমাদের প্রথম জ্ঞান হয়, যে-দিন আমরা বিবিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ উপভোগ করিতে শিখি, যে-দিন এত আলো, এত সৌন্দর্য্য, এত বৈচিত্র্য আমাদের চক্ষুর সম্মুখে এক অনির্ব্বচনীয় মায়ারাজ্যের সৃষ্টি করে, সে-দিন হইতে আমাদের হৃদয় অনন্ত প্রশ্ন-তরঙ্গে উদ্বেল হইতে থাকে। চারিদিক হইতে অনন্ত "কেন" শিকারী জন্তুর মত আমাদের উপরে আসিয়া পড়িতে থাকে;—আমরা উত্তরের জন্য ব্যাকুল হই;—সেই উত্তর দেয় বিজ্ঞান। বিজ্ঞান ক্রমে-ক্রমে, অল্পে-অল্পে আমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিয়াছে। হয় ত এমন দিন আসিবে, যখন কবির—

"ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে;
দেখি সে উপাধি নিলে, ক'টা "কেন"র জবাব শিখে।"

এই উক্তি বিজ্ঞান একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিবে। মানব-সমাজ অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া সর্ব্বজ্ঞানময়ের পদপ্রান্তে সে-দিন আপনার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া ধন্য হইবে।

বর্ণ

শিশু যে-দিন প্রথম নয়ন মেলিয়া দেখিবার ও অনুভব করিবার শক্তি পায়, সে-দিন তাহার কি অবস্থা! সে দেখে, চারিদিকে বিবিধ বর্ণের ভোজবাজি। সে বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না, সব জগৎটা এক রকম নয় কেন? কোনটা লাল, কোনটা নীল, কোনটা সবুজ হয় কেমন করিয়া? গোলাপই বা কেন ঘোর লাল, ফিকে লাল, সবুজ, ফিকে সবুজ হয়? লাল রঙ ত অনেকেরই; সব লাল রঙই কি এক? তাই যদি হয়, তবে কচি ছেলের লাল ঠোঁট-দু'খানি দেখিলে হৃদয় তাদের হাজার চুমায় ভরাইয়া দিতে চায় কেন?—আর রাগে-ভরা লাল চক্ষু দেখিলেই বা অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে কেন? রঙটা তবে কি? কেমন করিয়া আমরা রঙের উপলব্ধি করি? আকাশকে নীল, বৃক্ষলতাকে শ্যামল, হলুদকে পীত,—এই যে পৃথক্ ভাবে দেখা হয়, ইহার মূলে কিছু সত্য আছে কি? আকাশ নীল, গভীর স্বচ্ছ জল নীল, নীলকান্তমণি নীল, এই সব নীলই কি এক? বহুরূপী ত নিমেষের মধ্যে বিবিধ বর্ণ ধারণ করে, তবে কি একটা জিনিস নানারকম রঙ বদলাইতে পারে? রঙ কি একই ভাবের উপলব্ধি; না, নানা ভাবে রঙের উৎপত্তি হয়? কালো কি লাল-নীলের মত একটা রঙ? এই সব রঙের মধ্যে কি সাম্য আছে? ফেনা কি? দোয়াতের কালি কালো, সমুদ্রের জল কালো, হলুদগোলা জল পীত, নীলবড়িগোলা জল নীল, রক্ত লাল; কিন্তু দেখা যায়, সকলের ফেনাই হয় সাদা! তাই বা কেমন করিয়া হয়? এই যে অনন্ত প্রশ্ন নিরন্তর আমাদের মনের মধ্যে উদিত হইতেছে,—বিজ্ঞান এই "কি, কেন ও কেমন করিয়া" র উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছে।

আমরা আবার দেখি লোহা, কাঠ, ইস্পাত, সোণা, রূপা এক রকমের জিনিস—হাতে শক্ত ঠেকে, ছুঁড়িয়া মারিলে কপাল ভাঙ্গিয়া যায়—ইহারা কি সবই তবে এক? ইস্পাত কেমন করিয়া লোহার চেয়ে শক্ত হয়? আর আমরা কেনই বা লোহা বা কাঠের টুকরা ফেলিয়া সোণা বা রূপার জন্য ব্যাকুল হই? ইহাদের মধ্যে তফাৎ কোন্‌খানে? আবার দেখি জল, রক্ত, খেজুর রস আর এক রকমের জিনিস, হাতে ত শক্ত ঠেকে না;—এ আবার কি দ্রব্য? আবার এই যে হাওয়া খাইতেছি—মুখ দিয়া, নাক দিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে—ইহারাই বা কি পদার্থ? এই তিন রকমের জিনিসের মধ্যে কি কিছু ঐক্য আছে? একজন মানুষ রাগিলে কঠিন হয়, আহ্লাদে হাল্কা হয়, আর দুঃখে একটু তরল হয়; কিন্তু মানুষটা সেই একই মানুষ থাকে। তবে কি জিনিষের কঠিন, তরল ও অনিল—এই

তিন অবস্থা? কঠিনকে কি কোনও উপায়ে তরল বা অনিল করা যায়? তরলকে কঠিন বা অনিল করার সম্ভাবনা আছে কি? যদি তাই হয়, তবে এত বিভিন্ন পদার্থের এমন বিচিত্র অবস্থা কেমন করিয়া হইল? আবার দেখি লোহা ও জলের ভার আছে; তবে কি হাওয়ারও ভার আছে? দশমণ লোহা আমার মাথায় চাপাইয়া দিলে মাথাটা আর কাঁধের সঙ্গে এক হইয়া থাকিতে চায় না, তাহাদের বন্ধুতা টুটিয়া যায়; দশমণ জলেরও ত ওই শক্তি। তবে আমরা যে হাওয়ার সমুদ্রে ডুবিয়া আছি, তাহাও ত ভার দিতে পারে! উত্তরে দক্ষিণে, উর্দ্ধে, নিম্নে, সম্মুখে, পিছনে চারিদিকেই ত এই হাওয়ার খেলা? আমাদের মাথার উপর ত একটা অনন্তদূরগামী হাওয়ার স্তম্ভ বহিয়া আমরা চলিয়াছি; তবু ভার ত কই লাগে না? কেহই ত এ পর্য্যন্ত সে কথা বলে নাই? তবে এ কি হইল? তবে কি হাওয়ার ভার নাই? - ইহার উত্তর দেয় বিজ্ঞান।

উত্তাপ ও আলোক

দুইটা এমন জিনিস লইয়া আমাদের কারবার করিতে হয় যে, তাহাদের ত্যাগ করিলে আমাদের এক দণ্ড চলে না; —সে দুইটি উত্তাপ ও আলোক। দুইখানি কাঠে ঘষাঘষি করিলে দেখা যায়, তাহারা একটু রাগিয়া উঠে,—কারণ, গরম হয়। মানুষকে একটু নাড়াচাড়া করিলে তাহার মেজাজ গরম হয়; এমন কি দেহটাও একটু গরম হইয়া উঠে। কিন্তু কাঠে-কাঠে ঘষাঘষি করিয়া আদিম মানব আগুন জ্বালাইয়াছে, এমন কি গাছের ডালে-ডালে ঘষাঘষি হইয়া বিরাট দাবানলের সৃষ্টি হইয়াছে,—প্রকাণ্ড বনও ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তবে মানুষও কি অধিক গরম হইয়া জ্বলিয়া উঠিতে পারে? শুনিয়াছি, মহাদেবের দৃষ্টিতে মদন ঠাকুর ছাই হইয়াছিলেন। তবে কি উত্তাপে ও আলোকে কিছু সম্পর্ক আছে? আগুন জ্বলিয়া উঠিলে তাহার নিকট হইতে আমরা আলোকও পাই, উত্তাপও পাই; নতুবা শীতের দিনে হাজার-হাজার নিরাশ্রয়, অসহায় লোক বাঁচিতে পারিত না। উত্তাপে ও আলোকে তবে কি সম্বন্ধ? ঘষাঘষি করিলে দেখা যায়, বস্তু দুইটি আগে গরম হয়; তাহার পর আরও ঘষাঘষি করিলে আগুন জ্বলিয়া উঠে,—তখন আলোক দেখা দেয়। তবে কি আলোক উত্তাপের পরিমাণ? তাই যদি হয়, তবে সেই পরিমাণের মাত্রা কি? কেমন করিয়াই বা সেইটিকে সহজে লাভ করা যায়? বিজ্ঞান ইহার উত্তর দেয়। কতক জিনিস এমন দেখা যায় যে, কোনও উপায়ে তাহাদিগকে গরম করিলে তাহারা দেহ বদলাইয়া ফেলে। খানিকটা বরফ গরম করিলে দেখা যায়, সবটা জল হইয়া গিয়াছে। সেই জলকে আবার গরম করিলে দেখা যায়, যে পাত্রে উহা ছিল সে পাত্র শূন্য হইয়া গিয়াছে। জল তবে গেল কোথায়? কি হইল? একখানি ভিজা কাপড় রৌদ্রে রাখিলে খানিক পরে দেখা যায়, কাপড়খানি শুষ্ক হইয়াছে, অর্থাৎ কাপড়ের জলটুকু পলাইয়াছে। কিন্তু পলাইল কোথায়? "কোথায় নে' যায়, কে জানে?" মানুষ মরিলে তাহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়; কোথায় যায় কেহ বলিতে পারে না। কাপড় হইতে জলও কি সেই ভাবে বন্ধন-মুক্ত হয়? সে কোথায় যায়, তাহার কি কিছু স্থিরতা আছে? তাহাকে কি আবার জল করা যায়? একদিন চা'য়ের "কেট্‌লি"র ঢাকনিটি নাচিতেছিল। যে-দিন হইতে চায়ের কেট্‌লি হইয়াছে, সেইদিন হইতেই নাচিয়া আসিতেছে, কেহই দেখিয়াও দেখে নাই। একজন মানুষের মত মানুষ এই দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, তবে ত এই জল গরম করিলে কিছু কাজ পাওয়া যাইতে পারে। তাহার পরই ইঞ্জিনের সৃষ্টি। কেমন করিয়া জল গরম করিলে বাষ্প হয়, তাই বা কেমন করিয়া ইঞ্জিনখানা চালায়, আর কেমন করিয়াই বা এত শক্তি আসে যে হাজার-হাজার মণ জিনিস সে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে? —বিজ্ঞান ইহারই উত্তর দেয়।

কবি বলিয়াছেন—

"—To the solid ground
Of nature trust the mind which builds
for aye.
—Wordsworth.

বৈজ্ঞানিকেরা কবির এই কথাই মানিয়া আসিতেছেন। কবির মত বৈজ্ঞানিকেরও তীক্ষ্ণ কল্পনার প্রয়োজন। একটি সূক্ষ্ম সত্য কবির মনের কল্পনার সম্মুখে উদিত হইলে, কবি তাহারই উপর রঙ চড়াইয়া তাহাকে সুন্দর করেন; কিন্তু তাহাতে প্রাণ থাকে না। বৈজ্ঞানিক সেই সূক্ষ্ম সত্যটিকে কল্পনার সাহায্যে নামাইয়া আনিয়া তাহার মধ্যে

প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন,—কবি ও বৈজ্ঞানিকে ইহাই তফাৎ। 'ফ্যারাডে'র মত, 'নিউটনে'র মত, 'কেলভিনে'র মত কবি-বৈজ্ঞানিক কয়জন? যাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গ্রহে-গ্রহে, উপগ্রহে-উপগ্রহে উধাও হইয়া উড়িয়া যায়, যাঁহাদের কল্পনা অণু-পরমাণু হইতে বিরাট চন্দ্র-সূর্য্যকে পর্য্যন্ত একই সূত্রে গাঁথিতে সমর্থ, তাঁহারাই ধন্য।

কবি একদিন তাঁহার ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"—With a gentle hand touch
For there is a spirit in the woods."

আর আমাদের 'জগদীশচন্দ্র' দেখাইয়া দিয়াছেন, গাছেরাও মানুষের মত আনন্দে নৃত্য করে, দুঃখে মুহ্যমান হয়। আঘাতে বেদনা অনুভব করে। কবি হয় ত নিজের হৃদয়ে এই সত্য অনুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু বৈজ্ঞানিক জগতের সমক্ষে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, একই ঐশী শক্তি সমগ্র সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ইহাই বিজ্ঞানের কার্য্য। বিজ্ঞান শুধু বুঝিয়াই সন্তুষ্ট হয় না। যে সত্যটিকে একবার বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে জগতের চক্ষুর সম্মুখে দেখাইয়া না দিলে বিজ্ঞানের আনন্দ হয় না। বিজ্ঞান ততক্ষণ সার্থকতা লাভ করে না।

শান্ত ভাবে প্রকৃতির লীলা নিরীক্ষণ কর দেখি। যখন বায়ু বহে, যখন উপরে জলদ বজ্র হানিয়া প্রলয় সলিল বৃষ্টি করে, যখন তোমার পায়ের কাছে তরঙ্গিণীর তরঙ্গলীলা হয়,—এই সমস্ত দেখিয়াছ, শুনিয়াছ কি? যখন নির্ঝরিণী ঝরঝরে, মরমরে বহিতে-বহিতে রামধনু লইয়া লোফালুফি করে, যখন কুসুমকলি প্রভাতে নয়ন মেলিয়া আবার সন্ধ্যায় নয়ন মুদিয়া ফেলে, তখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি—"এ সব কি? এ সব কেমন করিয়া হইতেছে?" সন্ধ্যার পর শিশিরবিন্দু অল্পে-অল্পে জমিয়া গাছের পাতা হইতে টস্‌টস্ করিয়া পড়িতে থাকে, আর প্রভাতে শ্যামল তৃণের উপর জমিয়া বালার্ক-কিরণে জল্‌জল্ করিতে থাকে—দেখিয়াছ কি? সুনীল আকাশের বুক চিরিয়া চপলা চমকিয়া যায়, আর ঘোরারাবী, বজ্রবর্ষী জলদের ভীষণ ভ্রূকুটি ও গভীর গর্জ্জন কর্ণ বধির করিয়া দেয়—দেখিয়াছ, শুনিয়াছ কি? ইহারা কি, ইহারা কেমন করিয়া আমাদের দেখা দেয়?—বিজ্ঞান ইহারই উত্তর দিয়া থাকে।

সন্ধ্যায় গোধূলি-লগ্নে যখন দিনমণি অস্তাচলের কোলে ঢলিয়া পড়েন, তখন পশ্চিমাকাশের বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়াছ কি? সেই লালে-নীলে মেশামেশি-জড়াজড়ি, গোলাপী-পীতের অপূর্ব্ব কোলাকুলি, সেই লালের পর মেটে লাল, তার মাঝে একটু ফিকে গোলাপী, তার চারিদিকে সোণার পাড়ের অপূর্ব্ব বাহার; সেই গোলাপীর নীলের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন দেখিয়াছ কি? কখনও মনে হয়, যেন কোন্ বিরাট চিত্রকর বিশাল এক তুলিকার সাহায্যে রঙের এক মনোমোহন ছটা আঁকিয়াছে। সেই অপূর্ব্ব বর্ণের ছটা চক্রবাল হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া-উঠিয়া আপনার দেহ বিস্তার করিতেছে; আর চারিদিকের নীল-সুনীল-গাঢ়নীল আকাশকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া শেষে নিজেও বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। লাল গোলাপীতে মিশিয়াছে, গোলাপী ফিকে-মাঠো গোলাপীর সহিত মিলাইয়া গিয়াছে; আর দুইদিকের পাড়ের কাছে হাজার-হাজার হীরা-চুনি-পান্না-মোড়া সোণার জরি ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছে;-যাহাকে রাস্কিন বলিয়াছেন "Harmony of Colours," যাহাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সন্ধ্যায় রঙের পাগলামি", আর যাহাকে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন "বর্ণের ঐক্যতান" ও "বর্ণসৈন্য"—সেই বিচিত্র বর্ণের অনবদ্য চারু সমাবেশ দেখিয়াছ কি? এই বৈচিত্র্য কি? ইহা কেমন করিয়া হয়? তার পর "তমিস্রা-গর্ভে সুন্দরী সন্ধ্যার আত্মহত্যা" দেখিয়া পাগল হইয়াছ কি? এই সব কি? এই সব কেন হয়? আবার এই পাগল আকাশকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছ কি? এ ত দুই মিনিট একসঙ্গে একরকমে থাকিতে চাহে না। রাস্কিনের ভাষায় "Sometimes gentle, sometimes capricious, sometimes awful, never the same for two minutes together; almost human in its passion, almost spiritual in its tenderness, almost divine in its infinity, its appeal to what is immortal in us, is as distinct as it is ministry of Chastisment or blessing to what is mortal is essential." আর "Who saw the narrow sun-beams that came out of the south

and smote upon their summits until they melted and mouldered away in a dust of blue rain? .Who saw the dance of the dead clouds when the sunlight left them last night and the west wind blew them before it, like withered leaves?"—এই বিচিত্রতার কর্ত্তা কে? কেমন করিয়াই বা এমনিভাবে রঙের উপর রঙ, তা'র উপর রঙ জমিয়া উঠিতেছে? বিজ্ঞান ইহারই উত্তর দেয়।

আবার এই সুনীল আকাশের বক্ষে লঘু, শুভ্র মেঘ-খণ্ডগুলি কোথাও ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও আবার কালো ঘন জলদ-জাল স্তরে স্তরে, থাকে-থাকে, স্তবকে-স্তবকে একের উপর আর, তার উপর আর—এমনিভাবে জমিয়া উঠিতেছে,—ইহারাই বা কি? একটি উপরে-ছিদ্রযুক্ত পাত্রে জল গরম করিলে, সেই ছিদ্র দিয়া এমনি সাদা একরকম কি বাহির হয়; মেঘও কি এমনই কিছু? তাই যদি হয়, তবে এমন বিভিন্নতা কেমন করিয়া হইল? মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়; তবে সব মেঘই এমনি বৃষ্টি দিতে পারে? ওই যে হাল্কা-হাল্কা মেঘগুলি হাল্কা হাওয়ায় নাচিয়া-নাচিয়া, ভাসিয়া-ভাসিয়া বেড়াইতেছে, উহারা কি জল দিতে পারে? কই, তাহা ত দেখি না; তবে কি কালো ঘন বজ্রবর্ষী মেঘই জলদ? বজ্র কি? ওই যে লক্‌লক্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া, আকাশকে দুই ফাল করিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া খেলিয়া-খেলিয়া বেড়ায়—ওই ত বজ্র? যদি না হয়, তবে ওটা কি?—বিদ্যুৎ? বিদ্যুৎ কি? কেমন করিয়া তাহার জন্ম? এইরূপ অনন্ত প্রশ্ন আমাদের মনের মাঝে ভিড় বাঁধিয়া দাঁড়ায়। তখন বিজ্ঞান আমাদের রক্ষা করে।

যখন সন্ধ্যার পর অন্ধকার সমস্ত পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলে, তখন দেখি, অসংখ্য মণিমুক্তার মত কাহারা আকাশে জ্বলিয়া উঠে। নীল মখমলের উপর হীরা মণি, বসাইয়া রাখিলে যেমন দেখায়, ইহাও ত তেমনি। তবে কি এই তারার মালা কেহ আকাশের গায়ে বসাইয়া দিয়াছে? আকাশ কি তবে মখমলের মত কিছু? মনে হয়, ঐ বড় বটগাছের উপর উঠিলেই আকাশ ধরিতে পারিব; কিন্তু কৈ, তাহা ত হয় না। যাহারা বিমানে চড়িয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহারাও বলে, আকাশকে ধরিতে পারিল না; তবে আকাশের কি কিছু পদার্থগত অস্তিত্ব নাই? এ সবটাই কি তবে শূন্য? স্বচ্ছ জলের রঙ নাই; কিন্তু একটু গভীর হইলেই রঙ দেখা দেয়। বায়ুরও ত রঙ নাই, তবে গভীর জলের মত কি আকাশ এমনি গভীর বায়ুস্তর? তবে এই যে অসংখ্য কাহারা জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে, মিট্‌মিট্ করিয়া নিবিতেছে, ফুটিতেছে, আবার নিবিতেছে,—এই চন্দ্র-সূর্য্য-আলো-আঁধারের আলিপনা আঁকিতেছে—ইহারা তবে কি? ইহারা কোথায় দাঁড়াইয়া আছে? আমরা ত দেখি শূন্যে কিছুই থাকিতে পারে না; একটা ঢিল আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিলে সে ত ঘুরিয়া আবার এই পৃথিবীর উপরই আসিয়া পড়ে। তবে কি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ—ইহারাও এমনিভাবে পৃথিবীর দিকে অদৃষ্ট আকর্ষণে ছুটিতেছে? তাই যদি হয়, তবে কেন তাহারা আমাদের ঢিলটির মত মাটীর উপর পড়ে না? তবে কি একটা গ্রহ অপরটাকে টানিয়া রাখিয়াছে? যদিই বা টানিয়া রাখে, তবে সে টানের মাত্রা কি? সূর্য্য আমাদের আলোক ও উত্তাপ দেয়। সূর্য্য কি? একটা লোহার ভাঁটা আগুনে পোড়াইলে যে টক্‌টক্ করে—সূর্য্যও কি তেমনি? আবার এই সূর্য্যের দিকে উদয় ও অস্তের সময় বেশ তাকাইয়া দেখা যায়, দুপুরবেলাই বা কেন যায় না?—চক্ষু ঝলসিয়া যায় কেন? লোহার ভাঁটা ত জুড়াইয়া আবার কালো হয়, সূর্য্য কি অনন্তকাল এই ভাবে আছে?—তবে এই অনন্ত উত্তাপ তাহাকে কে দিল? সূর্য্য কত বড়? সূর্য্য কি এক যায়গায় দাঁড়াইয়া আছে? শূন্যে কি কিছু দাঁড়াইতে পারে? বিজ্ঞান বলিতেছে,—হাঁ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা সকলেই শূন্যে আছে, কিন্তু দাঁড়াইয়া নাই; তাহারা সকলেই ঘুরিতেছে। কেমন করিয়া ঘুরিতেছে? কলুর ঘানির গরু যেমন ঘানিকাঠের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, ইহারাও কি তেমনিভাবে কাহারও চারিদিকে ঘুরিতেছে? ঘানির সঙ্গে গরুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, তবে কি ইহারাও পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ রহিয়াছে? সূর্য্য কত বড়? আমাদের পৃথিবীর মত কি? আমাদের পৃথিবী ত কম নয়! যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরই দেখি সমতল,—বর্ত্তুলের মত ঘোরালো নয়! তবে এই পৃথিবী কত বড়? বিজ্ঞান বলিতেছে, আমাদের পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল। এই ব্যাস লইয়া একটা বর্ত্তুল গড়িলে আমাদের পৃথিবী হয়।

আবার সূর্য্য এই পৃথিবীর চেয়ে ৩৩৩০০০ গুণ বড়। তবে সূর্য্য কত বড়? আমরা এত ছোট দেখি কেন? তবে কি সূর্য্য আমাদের নিকট হইতে অতি দূরে আছে? কত দূরে? এই এত বড় সূর্য্য আমাদের? সূর্য্য কি সত্যই এত বড়? হনুমান এত বড় সূর্য্যকে বগলে পুরিয়াছিলেন? মহাবীর হনুমান তবে কত বড়?—এই এত বড় সূর্য্যের চারিদিকে নানা গ্রহ-উপগ্রহ মিলিয়া একটা সৌরজগৎ; এই সৌরজগতের মত অন্য সৌরজগৎ আছে কি? বিজ্ঞান বলিতেছে,—আমরা যে অসংখ্য নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহারা এক-একটি সূর্য্য—আর এক-একটি সূর্য্যের চারিদিকে এমনি এক-একটি সৌরজগৎ আছে। ঐ যে তবে অসংখ্য সৌরজগৎ! তবে এই সৃষ্টি কতদূর? কোথায় ইহার আরম্ভ, আর কোথায়ই ইহার শেষ? ইহার কি আরম্ভও নাই, শেষও নাই? এত ত ধারণা হয় না; মস্তিষ্ক যে পঙ্গু হইয়া পড়ে। ইহার ধারণা কেমন করিয়া হইবে? ঐ যে অনন্তের সঙ্গে সাম্‌নাসাম্‌নি—মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি! অর্জ্জুন একদিন ভগবানের বিরাট অনন্ত রূপ দেখিয়া ভয়-বিহ্বল হইয়া বলিয়াছিলেন—

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

* * * *

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব! রূপং
প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস!

আমরাও এই অনন্ত রূপ দেখিয়া এমনই বিহ্বল হইয়া পড়ি। বিজ্ঞান এখানে আসিয়া অনন্তকে সান্ত ভাবে দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই অনন্ত প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে আমরা কত হীন, আমরা কত ছোট,—আমরা কি!

এই ভাবে বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখে এক বিরাট চিত্র উপস্থাপিত করিয়া দেখাইয়া দিতেছে। মানবের মনে ও প্রকৃতিতে এই ভাবে আলাপ চলিতেছে। বিজ্ঞান প্রকৃতির চারু রূপ দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া শিশুর মত বলিতেছে—"কিছু বুঝি না, জননীর মত প্রকৃতি! আমাদের সব বুঝাইয়া দাও!—

"কথা কও তরুলতা! নিশীথের ফুলদল!
কথা কও তটিনী সুন্দরি!
কথা কও, কথা কও, মৌন আকাশ নীল!
আসিয়াছি খেলা শেষ করি।
তোমাদের কাণাকাণি, বাতাসে বাতাসে দোলা
মন্ত্র যেন টানিছে আমায়;
বল কি রচিছ নিত্য গোপনে সকলে মিলে
অর্থগূঢ় রহস্য ভাষায়?
হের রাত্রি সুগম্ভীর; ছায়াম্লান জ্যো'স্না-তলে
মর্ম্ম আজি মুক্ত করে' দাও,
একা আমি, কেহ নাই, এই বেলা কাণে-কাণে
তোমাদের জীবনী শুনাও—
(ওগো) মুখ তুলে চাও!"

যখন এই প্রাণ ও প্রকৃতির মর্ম্মে-মর্ম্মে কথা হয়, যখন এই mind and nature এর মধ্যে জানা-শোনা হয়, তখনই বিজ্ঞান সার্থক! প্রাণ ও প্রকৃতির—ভিতর ও বাহিরের যখন আদান-প্রদান চলে, উভয়ের মধ্যে যখন আর কোন আবরণ না থাকে, যখন একে অন্যের মধ্যে আপন-আপন বিশিষ্টতা ডুবাইয়া দেয়, তখনই বিজ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি। এই উভয়ের মিলন-রঙ্গেই সমগ্র জ্ঞানের উদয়। তখনই—

"এই প্রাণ, এ প্রকৃতি, এদেরি মিলন-রঙ্গে
জন্মিয়াছে দর্শন, বিজ্ঞান;
এদেরি সঙ্গম-তটে ভক্ত ফিরিয়াছে নাচি',
যোগী বসে' করিয়াছে ধ্যান;
কবি গাহিয়াছে হেথা, এ'রি খণ্ড ছবিগুলি
আঁকিয়াছে পটে চিত্রকর;
এখানে লভেছে জন্ম জীব রাজ্যে যাহা কিছু
সনাতন, সত্য, মনোহর—
আদর্শ সুন্দর;—
সকল জ্ঞানের পথ এই কেন্দ্রে মিশিয়াছে, উৎস এ সবার,—
এই তীর্থে দাঁড়া একবার!"

উৎকল-সাহিত্য

[শ্রীরমেশচন্দ্র দাস]

"উৎকল সাহিত্য—ভাদ্র, ১৩২৪

"কবি ভূপতি পণ্ডিত"—লেখক শ্রীতারিণীচরণ রথ বি-এ।

পুরাতন ওড়িয়া ভাষায় বিদেশীয় লেখকগণের মধ্যে কবি ভূপতি পণ্ডিত অগ্রগণ্য। তিনি "প্রেমপঞ্চামৃত" নামক ভক্তি-গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উৎকলে সুপরিচিত। লোকে অতি সমাদরে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকে। পুস্তকখানি জগন্নাথ দাস প্রবর্ত্তিত 'নবাক্ষরী' ছন্দে রচিত। ইহা শ্রীকৃষ্ণের রাধিকা প্রভৃতি গোপাঙ্গনার সহিত রাসলীলার অতি সুন্দর বর্ণনা। কবি স্বভাব ও লক্ষণক্রমে গোপাঙ্গনাদের চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা:—বেদকন্যা, দেবকন্যা, মুনিকন্যা ও ব্রজকন্যা। প্রকৃত নিষ্কাম ভক্তি ও প্রেমামৃত কি, কবি তাহা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন। "ভক্তিবিনোদ ভাগবত" গ্রন্থখানির নামান্তর। পুস্তকখানি দীর্ঘ দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। দশম অধ্যায়ের শেষে কবি সুন্দররূপে নিজের ও পুস্তকের পরিচয় দিয়াছেন।

ভূপতি পণ্ডিত রাজা দিব্যসিংহ দেবের সমসাময়িক। কোন্ সময়ে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়, গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকিলেও, বিভিন্ন পুঁথিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিখিত; সুতরাং গ্রন্থ রচনার ঠিক সময় নিরূপণ সহজ নয়। তথাপি বহু প্রমাণাদি দ্বারা জানা যায়, ভূপতি কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন।

"প্রেমপঞ্চামৃত" পুস্তকের ভাষা সরল ও সুন্দর। ওড়িয়া ভাষা অল্পদিন পূর্ব্বে শিক্ষা করা সত্ত্বেও কবি রচনায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার উপমা ও উক্তিগুলি স্বাভাবিক ও আড়ম্বরশূন্য।

ভূপতি কবির অব্যবহিত পরে সদানন্দ কবি-সূর্য্যও 'প্রেমপঞ্চামৃত' নামে একখানি ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি নামক স্থানে ভূপতি কবির তালপত্র-লিখিত অতি পুরাতন একখানি 'প্রেমপঞ্চামৃত' পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে কতিপয় উৎকল লিপির পুরাতন আকারও দেখা যায়।

"বিবিধ প্রসঙ্গ"—সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ কর।

"সনাতন ধর্ম্ম"—যথার্থ ধর্ম্ম যাহা তাহা সনাতন ও মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত। এই সনাতন অংশটা প্রধানতঃ ঈশ্বর-বিশ্বাস, পূজা, প্রেম, ও ভক্তি; অপরাংশে দয়া, ক্ষমা, পবিত্রতা, অহিংসা প্রভৃতি সুনীতি বা সদাচার। ভক্তপ্রবর শ্রীচৈতন্য সংক্ষেপে "নামে রুচি, জীবে দয়া"—ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাত্মা যিশু বলেন—"Love thy God with all thy heart and love thy neighbour as thyself."। বর্ত্তমান যুগের ভারতের ঋষি বলেন—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনং চ তদুপাসনমেব"। ফল কথা এই যে, ধর্ম্মবস্তু সনাতন এবং তাহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে এক। কিন্তু এই সনাতন ভাবকে বেষ্টন করিয়া নানা প্রকার লোকাচার, দেশাচার, অনুষ্ঠান, সাধন-প্রক্রিয়া রহিয়াছে; এবং ধর্ম্মকে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছে। যে ধর্ম্মে আচার প্রভৃতির প্রাধান্য যত অল্প, তাহা সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট, উদার ও উন্নত।

"এ কি অনুদারতা"—বেদে স্ত্রী-শূদ্রাদির অনধিকারের যুগ ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। এ যুগে কোন প্রকার জ্ঞান বা বিদ্যা কাহারও নিকট প্রচ্ছন্ন রাখা অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের জন্য অবারিত। দুঃখের বিষয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপক জনৈক সংস্কৃতশিক্ষার্থী এম-এ শ্রেণীর মুসলমান ছাত্রকে বেদ শিক্ষা দিতে অসম্মত হইয়া শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। সেদিন নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় সভায় এ সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক উপস্থিত হয়। সুখের কথা অনেক সভ্য এ অনুদারতা সমর্থন করেন নাই।

আর কি বেদ ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবদ্ধ আছে? বহুদিন হইতে বেদ বেদান্ত পাশ্চাত্য 'ম্লেচ্ছ'দের করায়ত্ত হইয়া গিয়াছে। মোক্ষমূলার বেদের অনুবাদক ও অনেক আর্য্যসন্তানের গুরু। অপর জাতি ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর গৌরবের সামগ্রী ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিবে, হিন্দুর ধর্ম্ম ও জাতি সম্বন্ধে নানা ভ্রান্তমত বর্জ্জন করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইবে—ইহাতে হিন্দুর গৌরবের কথা। সত্য কাহারও নিজস্ব কিম্বা জ্ঞান কাহারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। জগতের কল্যাণের জন্য বিধাতা তাহা দান করিয়াছেন; আপামর সাধারণ তাহাতে সমান অধিকারী। যে দান করিতে কুণ্ঠা বোধ করে, সে কৃপার পাত্র।

"আত্মমানস্ক প্রতিনিধি"—বা "সাহিত্যের" আত্মকথা। এ যুগে মাসিক পত্রিকা সাহিত্য-সাধনা ও সাহিত্য-বিকাশের একটি প্রশস্ত উপায়। এই জন্য সমস্ত সভ্য ও উন্নত জাতির মধ্যে মাসিক পত্রিকার বহুল প্রচার।

বিস্তৃত উৎকল দেশে মাসিক পত্রিকার একান্ত অভাব দেখিয়া ২০ বর্ষ পূর্ব্বে আমরা এই "উৎকল সাহিত্য" প্রচার করিতে আরম্ভ করি। কঠোর সংগ্রাম ও বহু বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য দিয়া পত্রিকাখানি জীবিত থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কথঞ্চিৎ সাধন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার বাঞ্ছনীয় উন্নতি সাধনে অক্ষম হইয়া আমরা নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছি।

প্রকৃতপক্ষে অপরাপর প্রদেশের পত্রিকার কলেবর ও সৌষ্ঠব দেখিয়া আমরা লজ্জায় অধোবদন হই। পত্রিকার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। গভীর দুঃখের

বিষয়, বিস্তীর্ণ উৎকল খণ্ডে এই সুদীর্ঘ সময়েও গ্রাহকসংখ্যা এক সহস্র হয় নাই। অথচ পত্রিকার উৎকর্ষ্য ও উপাদেয়তা বিজ্ঞ ও বিবেচক ব্যক্তিগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন।

"পরিচারিকা"—শ্রাবণ, ১৩২৪

"ওড়না" বা ঘোমটা—লেখিকা শ্রীমতী হেমবালা দেবী। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রকারের পরিচ্ছদ। এক দেশে বহু জাতি বাস করিয়াও এক রকমের পোষাক পরিধান করিয়া থাকে; কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার অন্যথা দেখা যায়। এদেশে আর্য্য ও অনার্য্যের বাস। উভয়ের ভাষা, রীতি, নীতি, খাদ্য ও পরিচ্ছদ বিভিন্ন। আর্য্য মহিলাগণ সর্ব্ব সময়ে মস্তকে ঘোমটা দিয়া থাকেন; কিন্তু অনার্য্যদের মধ্যে সে প্রথা ততদূর পালিত হয় না। তেলেগু এবং অন্যান্য দ্রাবিড় জাতীয় মহিলারা কি কারণে ইহার অন্যথা করেন, তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। বহু সভ্যদেশে নানা রূপে ইহা প্রচলিত থাকিয়া বিশেষ সুফল প্রদান করিতেছে।

বহুকাল হইতে ওড়িয়া স্ত্রীগণ ঘোমটা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজকাল কোন-কোন স্থলে ইহা ঘৃণার্হ ও অগ্রাহ্য হইয়া যাইতেছে। এমন কি অনেকে ঘোমটা দেওয়া ভার বোধ করিতেছেন। দক্ষিণ উড়িষ্যার কতিপয় স্ত্রীলোক এ প্রথার প্রবর্ত্তক। সম্ভবতঃ ইহা তেলেগু-সংসর্গের ফল; কোনরূপ সংস্কারে ঘটে নাই। সত্য বটে ওড়িয়া জাতির বহু সংস্কার আবশ্যক; জাতিটা অনেকাংশে বিকলাঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু কিরূপ সংস্কারে ওড়িয়া স্ত্রীলোক উন্নতি লাভ করে এবং উৎকল জননীর মুখ উজ্জ্বল হয়, তাহা গভীর চিন্তার বিষয়। নিন্দনীয় ও বীভৎস প্রথার বর্জ্জন একান্ত আবশ্যক।

ঘোমটা ওড়িয়া স্ত্রীগণের একটি জাতীয় লক্ষণ বলিলেও চলে। জাতীয় সুলক্ষণগুলিকে অবজ্ঞা করা সম্পূর্ণ ভ্রম। কুপ্রথা বর্জ্জনীয় হইলেও সুলক্ষণগুলি পালন সর্ব্বথা বিধেয়। সংস্কার আবশ্যক বটে, কিন্তু তাই, বলিয়া সংস্কারের নামে জাতীয়ত্ব রক্ষাকরী প্রথা বিসর্জ্জন দিলে চলিবে না।

"উৎকলে বালিকা শিক্ষা"—লেখিকা শ্রীমতী শ্রীমন্তী দেবী—

আমাদের দেশে বালিকা শিক্ষার প্রতি কেহই যত্নবান নন। মাতা-পিতা সমভাবে পুত্রকন্যা লালনপালন করিলেও কন্যার শিক্ষার বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে অধিকাংশ জননী অশিক্ষিতা। তাঁহাদের সন্তানেরা ৭।৮ বর্ষ বয়সে "ক" "খ" শিখিতে আরম্ভ করে। তৎপূর্ব্বে তাহাদের কোন শিক্ষা হয় না। আমাদের জননীদের "টুয়া টিয়ে টুই টিয়ে বিরি চাউল আনিলে" বা "বেঙ্গমা বেঙ্গমী" প্রভৃতি অমূলক গল্প সুপরিচিত। তাঁহারা ভালরূপে শিক্ষিতা হইলে নিজ নিজ সন্তানগণকে কত উচ্চ বিষয়ে শিক্ষা দিতে বা আলোচনা করিতে পারিতেন। জগন্নাথ দাশ, উপইন্দ্র ভঞ্জ, দীনকৃষ্ণ দাশ, কবিসূর্য্য রাধানাথ রায়ের কথা—লীলাবতী খনা প্রভৃতি বিদুষী মহিলার কথা—পুরুষোত্তম দেব প্রভৃতির বীরত্ব-কাহিনী—মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম-কথা—এবং ভগীরথ মহীন্দ্রের দানশীলতার কথা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া বালকবালিকাদিকে শিক্ষা ও সন্তোষ দান করিতে পারিতেন।

"মুকুর"—শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩২৪

"প্রাচীন উৎকল"—(সংস্কৃত সাহিত্য ও জয়দেব) লেখক শ্রীজগবন্ধু সিংহ।

কবিকুঞ্জ ভারতবর্ষ বীণাপাণির বরপুত্রগণের ক্রীড়াক্ষেত্র। ভারতের বেদ, বেদান্ত, পুরাণাদি প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। উৎকলও সংস্কৃত-চর্চ্চায় নীরব, নিশ্চল নয়। উৎকলীয় কবিগণ সংস্কৃত ভাষায় অনেক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সনন্দ-দান-পত্র, অনুশাসন প্রভৃতি সংস্কৃতে লিখিত। পুরীর মুক্তিমণ্ডপ—পণ্ডিতসভা এ বিষয়ের অন্যতম নিদর্শন। উৎকলীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া গর্ব্বানুভব করিয়া থাকেন; কারণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর পণ্ডিতেরাও সংস্কৃত ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন।

গঞ্জাম খলিকোট নিবাসী কবি চক্রপাণি পট্টনায়ক সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া মুক্তি-মণ্ডপ পণ্ডিতবর্গকে মুগ্ধ করিতেন। পুরীর নর-সিংহপুর শাসনের রায়গুরু ও তদীয় ভ্রাতা বিশিপট্টজোশী সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। "উষাহরণ" রায়গুরুর প্রধান রচনা। ইঁহারা "কৃপাসিন্ধু জনান" রচয়িতা রাজা বীরকিশোর দেবের সমসাময়িক।

চৈতন্য দেবের প্রিয়পাত্র রায় রামানন্দ, যাজপুরের রমাই আনন্দ কোন গ্রামে করণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। "জগন্নাথ বল্লভ" তাঁহারই রচিত। তিনি সংস্কৃত, ওড়িয়া বাংলা, তৈলঙ্গী, পার্সি ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। উপেন্দ্র ভঞ্জ, অভিমন্যু প্রভৃতি কবিশিরোমণিগণ সংস্কৃত ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটীর আনুকূল্যে এবং ওড়িয়ার কৃতী পুত্র, স্বদেশসেবক, মহামহোপাধ্যায় সদাশিব কাব্যকণ্ঠ মহোদয়ের অদম্য উৎসাহ, সাহস, ও যত্নে উৎকলের প্রাচীন গৌরব ও প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক কতকগুলি সংস্কৃত সাহিত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

"গীতগোবিন্দ"-রচয়িতা জয়দেবের জন্মস্থান বলিয়া বীরভূম জেলার কেন্দুলী বা কেন্দুবিল্ব গ্রাম সাধারণ্যে খ্যাত; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। তাঁহার জন্মস্থান পুরী ও তিনি ওড়িয়া। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সদাশিব কাব্যকণ্ঠও তাঁহার "জগন্নাথ মন্দির" পুস্তকে এই মত পোষণ করিয়াছেন। অতি প্রাচীন "ভক্তমাল" গ্রন্থে জয়দেবের জন্মস্থান পুরী লিখিত আছে; এবং রাজর্ষি গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় স্বরচিত "নীলাচলে জগন্নাথ ও গৌরাঙ্গ" নামক পুস্তকে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন।

পুরীর কেন্দুলীগ্রাম বহু প্রাচীন। এখানে একপ্রকার রঙ্গিন বস্ত্র প্রস্তুত হয়; তাহা এখনও কেন্দুলীকস্তা বলিয়া খ্যাত। পিপলী থানার ৪৪৫ নম্বর গ্রাম একটী পল্লী-গ্রাম—পাশা-পাশি ৪টী গ্রামের সমাবেশ; যথা কেন্দুলী শাসন, কেন্দলী দেউলী, কেন্দলী সুধানগর ও কেন্দলী পটনা। প্রথমটী শাসন বা ব্রাহ্মণ-বসতি। এই কেন্দলী শাসন পুণ্য-তোয়া প্রাচীন নদীতীরে অবস্থিত। এখানে কেন্দলী মঠ নামে একটী মঠ আছে। অপর পার্শ্বে কুলভদ্রা নদী। দুই মাইল দূরে প্রাচীন ত্রিবেণী তীর্থ। এখানে মাঘী অমাবস্যায় মেলা বসে ও বহু লোকের সমাগম হয়।

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

যাহারা নূতন জুতার সুতীক্ষ্ণ কামড় গোপনে সহ্য করিয়া বাহিরে স্বচ্ছন্দতার ভান করে, ঠিক তাহাদের মতই সুরেশ সমস্ত দিনটা হাসিখুসিতে কাটাইয়া দিল; কিন্তু, আর একজন, যাহাকে আরও গোপনে এই দংশনের অংশ গ্রহণ করিতে হইল, সে পারিল না!

স্বামীর অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের কাছে এই কদাকার ভাঁড়ামিতে, এই বেহায়াপনায় তাহার ক্ষোভে, অপমানে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাঁহাকে সে আজিও হৃদয়ের দিক হইতে চিনিতে না পারিলেও বুদ্ধির দিক হইতে চিনিয়াছিল; সে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল এই তীক্ষ্ণ ধীমান, অল্পভাষী লোকটির কাছে এ অভিনয় একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, অথচ লজ্জার কালিমা প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন তাঁহারি মুখের উপর গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। আজ সকাল-বেলার পরে মহিম আর বাটীর বাহির হয় নাই; সুতরাং, দিনের বেলার ভাত খাওয়া হইতে সুরু করিয়া রাত্রির লুচি খাওয়া পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত সময়টাই এই ভাবে কাটিয়া গেল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিছানার উপর ছট্‌ফট্ করিয়া অচলা ধীরে-ধীরে কহিল, "সারারাত্রি আলো জ্বেলে পড়লে আর একজন ঘুমোতে পারে না। তোমার কাছে এটুকু দয়াও কি আর আমি প্রত্যাশা করতে পারিনে?"

তাহার কণ্ঠস্বরে মহিম চমকিয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি বাতিটা নামাইয়া দিয়া কহিল, "অন্যায় হয়ে গেছে, আমাকে মাপ কোরো।" বলিয়া বই বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। এই অপ্রার্থিত অনুগ্রহ লাভের জন্য অচলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল না, কিন্তু ইহা তাহার নিদ্রার পক্ষেও লেশমাত্র সাহায্য করিল না। বরঞ্চ যত সময় কাটিতে লাগিল, এই নিঃশব্দ অন্ধকার যেন ব্যথায় ভারী হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার কাছে দুঃসহ হইয়া উঠিতে লাগিল। আর সহিতে না পারিয়া এক সময়ে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক্, সংসারে ভুল করিলেই তার শাস্তি পেতে হয়, এ কথা কি সত্যি?" মহিম অত্যন্ত সহজভাবে জবাব দিল, "অভিজ্ঞ লোকেরা তাই ত বলেন।"

অচলা পুনরায় কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, "তবে যে ভুল আমরা দুজনে করেচি, যার কুফল গোড়া থেকেই সুরু হয়েচে, তার শেষকালটা কি রকম দাঁড়াবে, তুমি আন্দাজ করতে পারো?" মহিম কহিল, "না।" অচলা কহিল, "আমি পারিনে। কিন্তু ভেবে ভেবে আমি এটুকু বুঝেছি যে, আর সমস্ত ছেড়ে দিলেও শুধু পুরুষমানুষ বলেই এ শাস্তির বশি ভার পুরুষের বহা উচিত।"

মহিম বলিল, "আরও একটু ভাব্‌লে দেখ্‌তে পাবে, মেয়েমানুষের বোঝা তাতে এক তিল কম পড়ে না। কিন্তু এই পুরুষটি কে? আমি না সুরেশ?"

অচলা যে শিহরিয়া উঠিল, অন্ধকারের মধ্যেও মহিম তাহা অনুভব করিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অচলা ধীরে-ধীরে কহিল, "তুমি যে একদিন আমাকে মুখের ওপরেই অপমান করতে সুরু করবে, এ আমি ভেবেছিলুম। আর, এ-ও জানি, এ জিনিষ একবার আরম্ভ হ'লে কোথায় যে শেষ হয়, তা' কেউ বলতে পারে না। কিন্তু আমি ঝগড়া করতেও পারব না. কিম্বা, বিয়ে হয়েচে বলেই ঝগড়া কোরে তোমার ঘর করতেও পারব না। কাল হোক্, পরশু হোক্, আমি বাবার ওখানে ফিরে যাব।" মহিম কহিল, "তোমার বাবা কিছু আশ্চর্য্য হবেন।" অচলা বলিল, "না। তিনি জানতেন বলেই আমাকে বারংবার সাবধান করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, এর ফল কোন দিন ভাল হবে না। কলকাতায় চলে, কিন্তু পল্লীগ্রামে সমাজ, আত্মীয়, বন্ধু সকলকে ত্যাগ কোরে শুধু স্ত্রী নিয়ে কারও বেশি দিন চলে না। সুতরাং তিনি আর যাই হোন্ আশ্চর্য্য হবেন না!"

মহিম কহিল, "তবে, তাঁর নিষেধ শোনোনি কেন? অচলা প্রাণপণ বলে একটা উচ্ছ্বসিত শ্বাস দমন করিয়া লইয়া কহিল, "আমি ভাবতুম তুমি কিছুই না বুঝে কর না।"

"সে ধারণা ভেঙ্গে গেছে?" "হাঁ" "তাই ভাগের কারবারে সুবিধে হোলোনা টের পেয়ে দোকান তুলে দিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে চাচ্চো?" "হাঁ?"

মহিম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তাহলে যেয়ো। কিন্তু, একে ব্যবসা বলেই যদি বুঝতে শিখে থাকো, আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল হবে না, কিন্তু এ কথাটাও ভুলো না, যে ব্যবসা জিনিষটাকেও বুঝতে সময় লাগে। সেই ভুল যদি কখনো ধরা পড়ে, আমাকে জানিয়ো, আমি তখনি গিয়ে নিয়ে আস্‌ব।" অচলার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল; হাত দিয়া তাহা সে মুছিয়া ফেলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কণ্ঠস্বরকে প্রবল চেষ্টায় সংযত করিয়া বলিল, "ভুল মানুষের বারবার হয় না। তোমার সে কষ্ট স্বীকার করার দরকার হবে, মনে করিনে।"

মহিম কহিল, "মনে করা যায় না বলেই তাকে ভবিষ্যৎ বলা হয়। সেই ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের জন্যে রেখে আজ আমাকে মাপ কর, আমি আর বক্‌তে পারচিনে।"

অচলা মনে-মনে অতিশয় আহত হইয়া বলিল, "আমাকে কি তুমি তামাসা করচ? তা' যদি হয়, তোমার ভুল হচ্চে। আমি সত্যিই কাল-পরশু চলে যেতে চাই।"

মহিম কহিল, "আমি সত্যিই তোমাকে যেতে দিতে চাইনে।"

অচলা হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে রাখ্‌বে? সে তুমি কিছুতেই পারো না, জানো?"

মহিম শান্ত সহজ ভাবে জবাব দিল, "বেশ ত, সেও ত আজই রাত্রে নয়। কাল-পরশু যখন যাবে, তখন বিবেচনা করে দেখ্‌লেই হবে। ঢের সময় আছে, আজ এই পর্য্যন্তই থাক্‌।" বলিয়া সে মাথার বালিশটা উল্টাইয়া লইয়া সমস্ত প্রসঙ্গ জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত ভাবে শয়ন করিল; এবং বোধ করি বা পরক্ষণেই ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে চা খাইতে বসিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "মহিম তার মাঠের চাষ-বাস দেখ্‌তে আজও ভোরে বেরিয়ে গেছে বোধ হয়?" অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল "পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে গেলেও তার অন্যথা হবার যো নেই।"

সুরেশ চায়ের বাটিটা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "এক হিসেবে সে আমাদের চেয়ে ঢের ভাল। তার কাজের একটা শৃঙ্খলা আছে, যা' কলের চাকার মত যতক্ষণ দম আছে ততক্ষণ চলবেই।"

অচলা কহিল, "কলের মত হওয়াটাই কি আপনি ভাল বলেন?"

সুরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি বলি, কেন না, এ ক্ষমতা আমার সাধ্যাতীত। দুর্ব্বল হওয়ার যে কত দোষ, সে ত আমি জানি; তাই, যে স্থিরচিত্ত, তাকে আমি প্রশংসা না কোরে পারিনে। কিন্তু আজ আমাকে ছুটি দাও, আমি বাড়ী যাই।"

অচলা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, "যান। আমিও কাল যাচ্চি।"

সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "তুমি কোথায় যাবে কাল?" "কলকাতায়" "হঠাৎ কলকাতায় কেন? কই, কাল এ মৎলব ত শুনিনি।"

"বাবার অসুখ, তাই তাঁকে একবার দেখ্‌তে যাবো।"

সুরেশের মুখের উপর উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কহিল, "অসুস্থ বাপকে হঠাৎ দেখবার ইচ্ছে হওয়া কিছু সংসারে আশ্চর্য্য ঘটনা নয়; কিন্তু, ভয় হয় পাছে বা আমার জন্যেই একটা রাগারাগি কোরে—" অচলা তাহার কোন জবাব দিল না। যদু সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, সুরেশ ডাকিয়া কহিল, "তোর বাবু মাঠ থেকে ফিরেচেন রে?"

যদু কহিল, "তিনি ত আজ সকালে বার হননি। তাঁর পড়বার ঘরে ঘুমোচ্চেন।"

অচলা তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বারের বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, মহিম একটা চেয়ারের উপর হেলান দিয়া বসিয়া দুই পা টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া ঘুমাইতেছে। একটা লোক রাত্রের অতৃপ্ত নিদ্রা এই ভাবে পোষাইয়া লইতেছে, সংসারে ইহা একান্ত অদ্ভুত নহে; কিন্তু অচলার বাস্তবিকই বিস্ময়ের অবধি রহিল না,

যখন সে স্বচক্ষে দেখিল তাহার স্বামী দিনের কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া এই অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সে পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া চুপ করিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া প্রভাতের অপর্য্যাপ্ত আলোক সেই নিদ্রামগ্ন মুখের উপর পড়িয়াছিল। আজ অকস্মাৎ এতদিন পরে তাহার চোখের উপর এমন একটা নতুন জিনিস পড়িল, যাহা ইতিপূর্ব্বে কোনদিন সে দেখে নাই। আজ দেখিল, শান্ত মুখের উপর যেন একখানা অশান্তির সূক্ষ্ম জাল পড়িয়া আছে; কপালের উপর যে কয়েকটা রেখা পড়িয়াছে, এক বৎসর পূর্ব্বেও সেখানে সে সকল দাগ ছিল না। সমস্ত মুখের চেহারাটাই আজ যেন তাহার মনে হইল, কিসের গোপন ব্যথায় শ্রান্ত, পীড়িত। সে নিঃশব্দে আসিয়াছিল, নিঃশব্দেই চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু পিক্‌দানীটা পায়ে ঠেকিয়া যেটুকু শব্দ হইল, তাহাতেই মহিম চোখ মেলিয়া চাহিল। অচলা অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "এখন ঘুমোচ্চো যে? অসুখ করেনি ত?"

মহিম চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল "কি জানি, অসুখ না হওয়াই ত আশ্চর্য্য।" অচলা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পরেই সুরেশ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হইতেছিল, মহিম অদূরে একখানা চৌকির উপর বসিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল; অচলা দ্বারের নিকটে আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিয়া উঠিল, "কাল আমিও যাচ্ছি। সুবিধে হলে বাবার সঙ্গে একবার দেখা করবেন।"

সুরেশ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "তাই নাকি!" বলিয়াই মহিমের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৌঠানকে তুমি কালই কলকাতা পাঠাচ্চ নাকি মহিম?"

স্ত্রীর এই গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতায় মহিমের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু সে মুখের ভাব প্রসন্ন রাখিয়াই মৃদু হাসিয়া বলিল, "আর কোন বাধা ছিল না, কিন্তু, আমাদের এই পল্লীগ্রামের গৃহস্থ-ঘরে নাটক তৈরি করার রীতি নেই। কালই বা কেন, আজই ত তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারতুম।"

সুরেশের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল; অচলা চক্ষের পলকে তাহা লক্ষ্য করিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "সুরেশ বাবু, আমাদের সহরে বাড়ী বলে লজ্জিত হবার কারণ নেই। অসুস্থ বাপ-মাকে দেখ্‌তে যাওয়া যদি পাড়াগাঁয়ের রীতি না হয়, আমি ত বলি আমাদের সহরের নাটকই ঢের ভাল। আপনি না হয় আজকের দিনটেও থেকে যান না, কাল একসঙ্গেই যাবো।"

তাহার অপরিসীম ঔদ্ধত্যে সুরেশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে মাথা হেঁট করিয়া বলিতে লাগিল, "না না, আমার আর থাকবার যো নেই বৌ'ঠান। তোমার ইচ্ছে হলে কাল যেয়ো, কিন্তু, আমি আজই চল্লুম—" বলিতে—বলিতেই সে তীব্র উত্তেজনায় হঠাৎ ব্যাগটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার উত্তেজনার আবেগ অচলার সর্ব্বাঙ্গ যেন মূল হইতে একবার নাড়িয়া দিল। সে অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "এখনও ট্রেণের অনেক দেরি, সুরেশবাবু, এরি মধ্যে যাবেন না—একটু, দাঁড়ান।—আমার দুটো কথা দয়া করে শুনে যান।" তাহার আর্ত্ত কণ্ঠস্বরের আকুল অনুরোধে উভয় শ্রোতাই যুগপৎ চমকিয়া উঠিল।

অচলা কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনার আমি কোন কাজেই লাগ্‌লুম না সুরেশ বাবু; কিন্তু, তুমি ছাড়া আর আমাদের অসময়ের বন্ধু কেউ নেই। তুমি বাবাকে গিয়ে বোলো, এরা আমাকে বন্ধ করে রেখেচে, কোথাও যেতে দেবে না—আমি এখানে মরে যাবো। সুরেশ বাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভাল বাসিনে, তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।"

মহিম হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল; সুরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সহসা দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি জানো, মহিম, উনি ব্রাহ্ম-মহিলা! নামে স্ত্রী হলেও ওঁর ওপর পাশবিক বল প্রয়োগের তোমার অধিকার নেই?"

মহিম মুহূর্ত্ত কালের জন্যই অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। সে আত্ম-সম্বরণ করিয়া শান্ত স্বরে স্ত্রীকে কহিল, "তুমি কিসের জন্যে কি কোরচ, একবার ভেবে দেখ দিকি অচলা।" সুরেশকে হাসি মুখে কহিল, "পশু বল, মানুষ বল, কোন জোরই আমি কারও উপর কোন দিন খাটাই নে। বেশ ত, সুরেশ, তুমি যদি থাকতে পার, আজকের দিনটা থেকে ওঁকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাও না। আমি

নিজে গিয়ে ট্রেণে তুলে দিয়ে আস্‌বো, — তাতে গ্রামের মধ্যে বিশেষ দৃষ্টিকটুও হবে না।” একটুখানি থামিয়া বলিল, “একটু কাজ আছে, এখন চল্‌লুম। সুরেশ, যাওয়া যখন হলই না, তখন কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেল। আমি ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ফিরে আস্‌চি।” বলিয়া ধীরে-ধীরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অচলা মূর্ত্তির মত চৌকাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তেম্‌নি দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেশ মিনিট-খানেক হেঁটমুখে থাকিয়া হঠাৎ অট্ট হাসি হাসিয়া বলিল, “বাঃ রে, বা! বেশ একটি অঙ্ক অভিনয় করা গেল! তুমিও মন্দ কর নি, আমি ত চমৎকার! ওর বাড়ীতে, ওর স্ত্রী নিয়ে ওকেই চোক-রাঙিয়ে দিলুম! আর চাই কি? আর বন্ধু আমার মিষ্টি মুখে একটু হেসে ঠিক যেন বাহবা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি, অচলা, ও আড়ালে শুধু গলা ছেড়ে হো-হো করে হাস্‌বার জন্যেই কাজের ছুতো করে বেরিয়ে গেল! যাক্‌, আরসিখানা একবার আন তো বৌ’ঠান, দেখি, নিজের মুখের চেহারাখানা কি রকম দেখাচ্চে!” বলিয়া চাহিয়া দেখিল অচলার মুখখানা একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। সে কোন জবাব দিল না, শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে-ধীরে সরিয়া গেল।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত “অভিমানিনী” মূল্য ১৷৷০

শ্রীঅমরচন্দ্র ঘোষ প্রণীত (নাটক) “বাবর শা” মূল্য ১

শ্রীমুণীন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী (নাটক) “সবিতারাধনা” মূল্য ১

শ্রীপরেশনাথ ঘোষ প্রণীত “মানময়ী” মূল্য ১।০

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রণীত “সমসাময়িক ভারত” একবিংশ খণ্ড বাহির হইয়াছে, মূল্য ৪

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—দ্বিতীয় বৎসরের “সাহিত্য পঞ্জিকা”র প্রেসকাপি প্রস্তুত হইতেছে। প্রথম বৎসরে যে সকল অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে তাহা সংশোধন করিবার জন্য আমরা সমগ্র বঙ্গবাসীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি। (১) গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ প্রকাশে নিজ নিজ জন্মের তারিখ, জন্মস্থান, বর্ত্তমান ঠিকানা, গ্রন্থের নাম, কি বিষয়ক গ্রন্থ, প্রথম সংস্করণের তারিখ, বর্ত্তমান সংস্করণ ও মূল্য জানাইবেন। পরলোকগত কোন গ্রন্থকারের নাম ইত্যাদি প্রথম বৎসরের পঞ্জিকার না থাকিলে তাহাও অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ পুস্তক প্রকাশিত হইবামাত্র আমাকে পাঠাইলে পঞ্জিকা সঙ্কলনের সুবিধা হয়। (২) দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা-সম্পাদকগণ পত্রিকা প্রকাশের প্রথম তারিখ, স্বত্বাধিকারীদিগের নাম, যাঁহারা পত্রিকা প্রকাশের তারিখ হইতে সম্পাদকতা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদের নাম, বাৎসরিক ও প্রতি সংখ্যার মূল্য এবং ঠিকানা জানাইয়া বাধিত করিবেন। (৩) মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা-সম্পাদকগণ দ্বিতীয় দফার লিখিত বিবরণ ব্যতীত নিজ নিজ পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ামাত্র আমাকে পাঠাইলে সহজে সারসঙ্কলন করিয়া “সাহিত্য পঞ্জিকা”য় দিতে পারি। যে সকল পত্রিকা-সম্পাদকগণ পঞ্জিকা পান নাই, তাঁহারা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

"ইণ্ডিয়ান সিলভার-বিল"

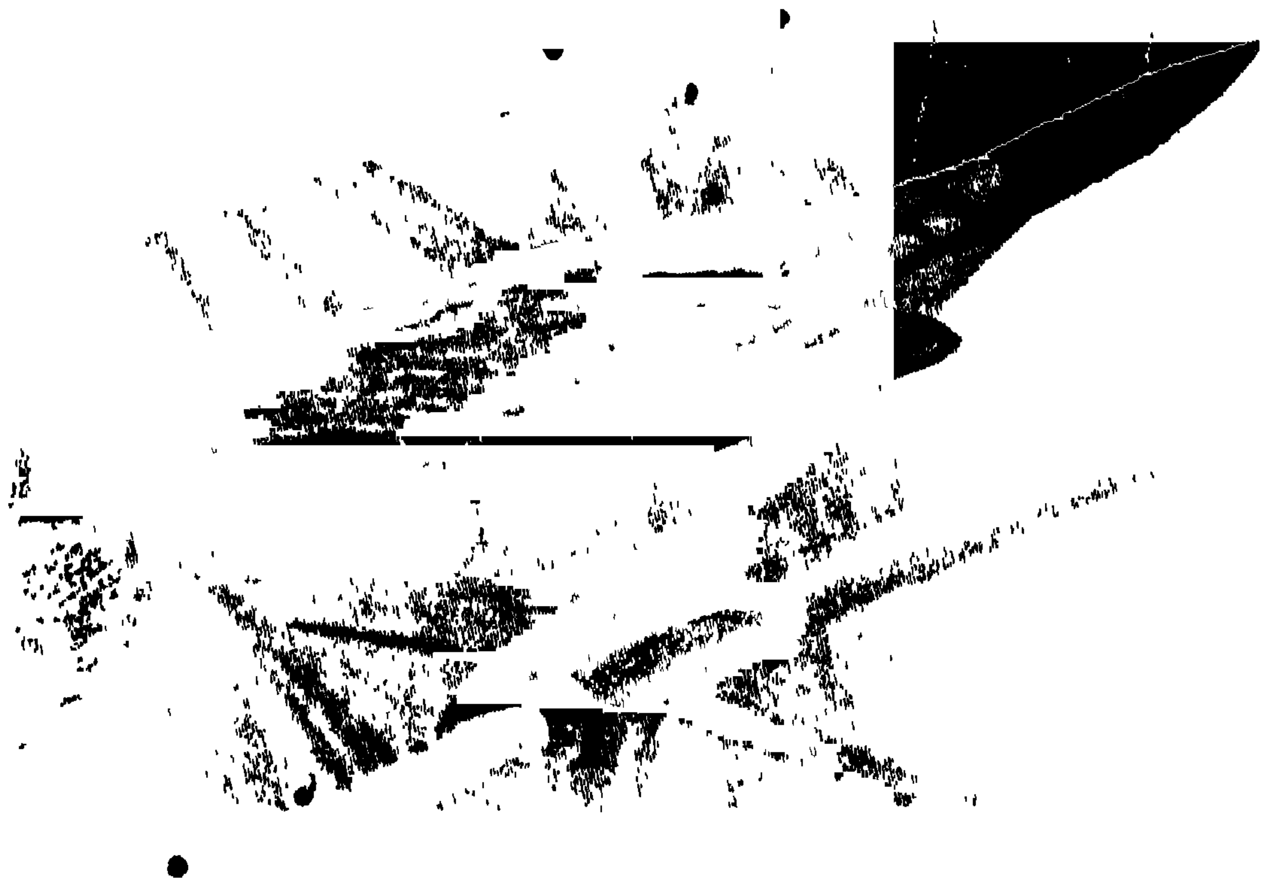

"ষ্ট্রিয়েটেড ফিঞ্চ"

"দি বেঙ্গলী"

এই চিত্রের বিবরণ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল-লিখিত "খাঁচার পাখী" প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, ৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড ১২৮ পৃষ্ঠা) দেখুন

The Emerald Ptg. Works.

সচিত্র মাসিক পত্র
ভারতবর্ষ

মাঘ, ১৩২৪

দ্বিতীয় খণ্ড] পঞ্চম বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রাকৃত-দর্শনের ইতিহাস

[অধ্যাপক শ্রীসীতানাথ প্রধান এম্‌-এস্‌সি]

বাদরায়ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে একই ব্যক্তি, তাহার কয়েকটি প্রমাণ আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে দিয়াছি। এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে; তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। দেবীপুরাণে নিশুম্ভ-শুম্ভ-মথন পাদে লিখিত আছে যে, ন্যায়দর্শনকার অক্ষপাদ গৌতম নাস্তিকমত-খণ্ডনে যে তর্কপ্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মসূত্রোপদেশক বাদরায়ণ উঁহার নিন্দা করিয়াছিলেন। দেবীপুরাণের বচনটি এই ;—

"স তর্কং নিন্দয়ামাস ব্রহ্মসূত্রোপদেশকঃ।

তচ্ছ্রুত্বা গৌতমঃ ক্রুদ্ধো বেদব্যাসং প্রতিস্থিতঃ॥"

বেদব্যাস যে ব্রহ্মসূত্রের উপদেষ্টা, তাহা উপর্য্যুক্ত ব্যাপারে সূচিত হয়। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, যে বেদব্যাস বেদ সঙ্কলন ও বিভাগ করিয়া স্বীয় শিষ্য সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল ও বৈশম্পায়নকে উঁহা শিক্ষা দিলেন। পরে তাঁহাদিগকে বেদচতুষ্টয় প্রচার করিতে নিযুক্ত করিলেন। প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত হইলে, জৈমিনিকে পূর্ব্বমীমাংসা লিখিতে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মসূত্র বা উত্তর-মীমাংসা লিখিতে আরম্ভ করেন। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে ;—

"তৈর্বিজ্ঞাপিত কার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।

অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ॥

* * *

চকার ব্রহ্মসূত্রাণি যেষাং সূত্রত্বমঞ্জসা॥"

সুতরাং পারাশর্য্য ব্যাসই যে ব্রহ্মসূত্র করিয়াছিলেন, ইহা স্কন্দপুরাণের মত।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে পারাশর্য্য ব্যাসই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। যথা—

"পারাশর্য্য মহাযোগী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো হরিঃ।"

মহাভারতে আদিপর্ব্বে ষষ্টিতম অধ্যায়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে ;—

"যিনি যমুনাদ্বীপে শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে অবিবাহিতা কালীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন,........., যিনি এক বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করেন, যিনি শান্তনু রাজার বংশ-রক্ষার্থে···পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে উৎপাদন করেন, যিনি নিখিল বেদ, বেদাঙ্গ ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, পাণ্ডবগণের পিতামহ ত্রিলোকবিশ্রুত মহাকবি বেদব্যাস শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয়ের

সর্পযজ্ঞ দর্শনার্থ সভামণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজগণ ও সদস্যগণে পরিবৃত সুখাসীন রাজা জনমেজয়ের সাক্ষাৎ করিলেন। ......তৎপরে ভগবান্ বাদরায়ণি সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন।"

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে একোনষষ্টিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে ;—

"উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পসত্রে দৈনন্দিন কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যাবকাশে দ্বিজগণ বেদগান করিতেন, তৎপরে মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারতীয় উপাখ্যান শ্রবণ করাইতেন। শৌনক কহিলেন, ভগবান্ বাদরায়ণি রাজা জনমেজয় কর্ত্তৃক পার্থিত হইয়া পাণ্ডবদিগের গুণগান স্বরূপ মহাভারত নামে ইতিহাস কীর্ত্তন করেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।"

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে একষষ্টিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে ;—

"বৈশম্পায়ন মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অপূর্ব্ব উপাখ্যান কীর্ত্তন বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া রাজা জনমেজয়কে কহিলেন, মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণির মুখনিঃসৃত এই অমৃতকল্প মহাভারতীয় কথা যেমন রমণীয়, আপনাকে তদনুরূপ উপযুক্ত পাত্র লাভ করিয়াছি।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মহাভারতের অনেক স্থলে বেদব্যাস বা পারাশর্য্য ব্যাস ও বাদরায়ণি একই ব্যক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ অভিধানকার হেমচন্দ্র বলিতেছেন যে, বেদব্যাসের ছয়টি নাম ছিল ; যথা, (১) মাঠর, (২) দ্বৈপায়ন, (৩) পারাশর্য্য, (৪) কানীন, (৫) বাদরায়ণ, (৬) ব্যাস।

শব্দরত্নাবলীকার নিম্নোক্ত চারিটি নাম সংগ্রহ করিয়াছেন ;—বাদরায়ণি, সত্যবতীসুত, সত্যরত, পারশর।

দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীভাষ্যকার রামানুজ বলিতেছেন যে, এই ব্রহ্মসূত্র উপনিষদরূপ দুগ্ধ-সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত পারাশর্য্য ব্যাসের বচন সুধা স্বরূপ ; যথা—

"পারাশর্য্য বচঃ সুধামুপনিষদ্ দুগ্ধাব্ধিমধ্যোদ্ধৃতাম্।"

ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ;—

"বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্"

মহাপণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী 'বেদান্তকৃৎ' এই শব্দে অর্থ 'বেদান্তার্থ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকো, বেদব্যাসাদিরূপেণ' এইরূপ করিতেছেন।

বেদব্যাস যে বেদান্ত-প্রবর্ত্তকগণের অন্যতম, ইহা মধুসূদন বলিতেছেন। এস্থলে বক্তব্য এই যে, বেদান্ত বলিতে উপনিষৎসমূহকেও বুঝায়; এবং এই অর্থে যাজ্ঞবল্ক্য, উদ্দালক আরুণি, শ্বেতকেতু, নচিকেতা প্রভৃতিও বেদান্ত-প্রবর্ত্তক।

অতএব দেখিতেছি যে, (১) পাণিনি, (২) বাচস্পতি মিশ্র (৩) দেবীপুরাণ, (৪) স্কন্দপুরাণ, (৫) কূর্ম্মপুরাণ, (৬) হেমচন্দ্র, (৭) শব্দরত্নাবলী, (৮) মহাভারত, (৯) রামানুজ, (১০) মধুসূদন সরস্বতী, (১১) তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি সকলেই বলিতেছেন যে, বাদরায়ণ ও বেদব্যাস একই ব্যক্তি।

বাদরায়ণ যে সময়ে বেদ সঙ্কলন ও বিভাগ করেন, সে সময়ে এদেশে বৈদিক ভাষা প্রচলিত ছিল না। উহা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া পৌরাণিক সংস্কৃতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা কোলব্রুক স্বীকার করিতেছেন ;—

"The language, metre, and style of a particular hymn in one of the Vedas furnish internal evidence that the compilation of those poems in the present arrangement took place after the Sanskrit tongue had advanced from the rustic and irregular dialect in which the multitude of hymns and prayers of the Veda was composed, to the polished and sonorous language in which mythological poems sacred and profane have been written."

অধ্যাপক মুলার কোলব্রুকের কথা মানিয়া লইয়া লিখন-পদ্ধতি হইতে ব্রহ্মসূত্রের কাল-নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মুলার বলিতেছেন ;—

"Bhagabatgita might well be placed contemporary with the Vedanta Sutras or somewhat later."

Max Muller's Six Systems of Indian Philosophy, Page 118.

অর্থাৎ ভগবদ্গীতা বেদান্তসূত্রের সমকালীন বলিয়া ধরা যাইতে পারে ; অথবা কিছু পরবর্ত্তী। কিন্তু অন্যান্য স্থলে

তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন যে, ব্রহ্মসূত্র মহাভারত বা ভগবদ্গীতার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার প্রমাণ - ঐ উভয়ের লিখন-পদ্ধতির পার্থক্য। তিনি বলিতেছেন ;—

"No two styles can well be more different than that of Vyasa of the Mahavarat and that of Vyasa the supposed author of Vyasa Sutras." Ibid. Page 117.

অর্থাৎ 'মহাভারতের ব্যাস ও বেদান্তসূত্রের ব্যাসের লিখন-পদ্ধতি এতই বিভিন্ন যে, একই ব্যক্তির ঐরূপ বিভিন্ন লিখন-পদ্ধতি দেখা যায় না।' অধ্যাপক ম্যুলার অপরস্থানে বলিতেছেন ;—

"All that we can say is that whatever the date of Bhagabatgita is, and it is a part of the Mahabharat, the age of the Vedanta Sutras must have been earlier.'—Six Systems of Indian Philosophy, Page 113.

অর্থাৎ 'ভগবদ্গীতা বা মহাভারতের কাল যাহাই হৌক না কেন, বেদান্তসূত্রের কাল তাহার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।' অতএব সুধী পাঠক দেখিতেছেন যে, অধ্যাপক ম্যুলার একস্থানে বলিতেছেন যে, ভগবদ্গীতা ও বেদান্তসূত্র প্রায় সমকালীন বলিয়া ধরা যাইতে পারে, ও অপরত্র বলিতেছেন যে, ভগবদ্গীতা বেদান্ত-সূত্রের অনেক পরবর্ত্তী।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, লিখন-পদ্ধতি হইতে কাল-নিরূপণ করিতে যাওয়া যৌক্তিক নহে। বিষয় ও উদ্দেশ্য পৃথক্ হইলে লেখকেরা পৃথগ্বিধ লিখন-পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, উপনিষৎ হইতে সংগৃহীত ও সূত্রাকারে লিখিত বেদান্তসূত্র যে ইতিহাসাকারে লিখিত মহাভারত হইতে বিভিন্ন হইবে, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি-যুক্ত। একটি নির্দ্দিষ্ট উদাহরণে সম্ভবতঃ বিষয়টি বিশদ হইবে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ একস্থলে বলিতেছেন :—

"হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কি বেশে!
দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব-গগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে!
ললাট তোমার নীল নভস্তল
বিমল আলোকে চির উজ্জ্বল,
নীরব আশীষ সম হিমাচল
তব বরাভয় কর,—
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ;
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ পর!
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে
দেখিনু আজিকে নিমেষে
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে!"

আবার অপর স্থানে বলিতেছেন,—

"তোদের ছেড়ে সারাটি দিন,
আছি অমনি এক রকম
খোপের ভিতর পায়রা যেমন,
করছি শুধু বক্ বকম্॥"

অথবা—

"মা আমার লথ্খি
মনিয্বি না পক্খি,
কাল ছিলাম খুলনায়
তাতে আর ভুল নাই।
কলিকাতায় এসেছি সদ্য,
বসে বসে লিখ্ছি পদ্য॥"

সহস্র বৎসর পরে লিখন-পদ্ধতি হইতে কাল-নিরূপণ করিতে উৎসুক লোকে বলিতে পারেন,—

"পূর্ব্বকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামধারী দুইজন কবি বিদ্যমান ছিলেন। এক জন অপর জনের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী; যেহেতু 'কড়ি-কোমলের' রবীন্দ্রনাথ ও 'স্বদেশে'র রবীন্দ্রনাথের লিখন-পদ্ধতি এতই বিভিন্ন যে, একই লোকের ঐরূপ বিভিন্ন লিখন-পদ্ধতি দেখা যায় না। অতএব কড়ি-কোমলের কাল যাহাই হৌক না কেন, 'স্বদেশ' উহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী কালে রচিত।"

ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে অনেকগুলি সূত্রে বাদরায়ণ নামের উল্লেখ আছে; যথা—

'দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ।'

উক্ত সূত্রের অর্থ এই.—'বাদরায়ণ—সত্যসঙ্কল্পত্বনিবন্ধন

মুক্ত পুরুষের সশরীরত্ব ও অশরীরত্ব—এই উভয়বিধ ভাব স্বীকার করেন।'

সূত্রকারের নাম ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অধ্যাপক ম্যুলার বলিতেছেন, "বাদরায়ণ যদি নিজে সূত্রগুলি লিখিতেন, তবে 'আমি' বা 'আমরা' অর্থাৎ উত্তমপুরুষযুক্ত সর্ব্বনাম ব্যবহার করিতেন; যেহেতু ঐ সকল সূত্রে সেরূপ করা হয় নাই, অতএব উক্ত সূত্রগুলি তাঁহার প্রত্যনন্তরগণ কর্তৃক লিখিত; এবং এই বিষয়ে তিনি কোলব্রুক কর্তৃক উদ্ধৃত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকারের উক্তি প্রামাণিক ধরিয়াছেন। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, কোনও গ্রন্থে লেখকের নাম ব্যবহৃত হইলে, উত্তমপুরুষ যুক্ত সর্ব্বনাম না থাকিলে, ঐ গ্রন্থ লেখকের নহে, এরূপ প্রমাণ হয় না। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহই ইহার সাক্ষী। গ্রন্থকারগণ 'আমি' বা 'আমরা' ব্যবহার না করিয়া নিজেদের নামগুলি গ্রন্থের মধ্যে শ্লোকে অথবা সূত্রে গ্রথিত করিয়া শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের কথা এখন বাদ দিলেও, বাঙ্গলা ভাষায় লেখা মহাভারতের দৃষ্টান্ত পাঠককে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

"ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস।"

উপর্যুক্ত পদ্যটি দেখিলে স্বতঃই মনে হইবে, অপর কেহ মহাভারত লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি কাশীরাম দাসের পরবর্ত্তী।

'কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ।'

এইটি দেখিলেও বোধ হয় যে, কৃত্তিবাসের লেখার পর অপর কেহ পুনরায় লিখিয়াছিলেন। সন্দিগ্ধ ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন যে, কৃত্তিবাস যদি নিজে লিখিতেন, তাহা হইলে লিখিতেন—

'কৃত্তিবাস—আমার কবিত্ব বিচক্ষণ
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলাম গীত রামায়ণ।'

অথবা কাশীরাম দাস যদি নিজে লিখিতেন, তবে লিখিতেন—

'ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস
পাঁচালীতে রচিলাম আমি কাশীদাস।'

এইরূপ ভূরি-ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আর এক কথা। যদি তর্কের অনুরোধে এই মত ত্যাগও করা যায়, তাহা হইলেও ক্ষতি নাই। জিজ্ঞাসা করি, 'বাদরায়ণ এই প্রকার উভয়বিধ ভাবের কথা বলেন'—এই কথার অর্থ কি? সকলেই বলিবেন যে, বাদরায়ণই আত্মার উভয়বিধ অবস্থার কথা বলেন, অপর কেহ নহে। সুতরাং ঐ মতের উদ্ভাবক (author) বাদরায়ণ। উহা তাঁহার শিষ্য বা প্রশিষ্য কর্তৃক লিখিত হইলেও তাঁহার কর্তৃত্ব (authorship) অপহৃত হইল না। মুখে বলিয়া শিষ্যদিগের নিকট প্রকাশ করা, আর নিজে স্বহস্তে লিখিয়া প্রকাশ করা একই কথা। উভয় প্রকারেই কর্তৃত্বের (authorship) দাবী থাকে। বাদরায়ণ ও জৈমিনি সমকালীন। শেষোক্ত প্রথমোক্তের শিষ্য, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত পুরাণই একবাক্যে ইহাই বলিতেছে। এতদ্ভিন্ন গুরু বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে প্রাচী-মীমাংসাকার শিষ্য জৈমিনির নামোল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

* সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥১।২।২৯

শিষ্য জৈমিনিও তাঁহার দর্শনে গুরু বাদরায়ণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কোনও স্থানে জৈমিনি ব্রহ্মসূত্রকে আক্রমণ করেন নাই। বাদরায়ণও কোনও স্থলে জৈমিনিকে আক্রমণ করেন নাই।

অতএব উভয়কৃত দর্শনের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতেও ইহা পরিস্ফুট হইতেছে যে, খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পূর্ব্ব ও উত্তর-মীমাংসার উদ্ভব হইয়াছিল।

কয়েকটি সন্দেহের কথা আছে। ব্রহ্মসূত্রের সমুদায়াধিকরণে বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়াছে। উহার দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের সপ্তদশ সূত্র হইতে সমুদায়াধিকরণ আরব্ধ হইয়াছে। অনেকে বলেন, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বৌদ্ধ মতের অস্তিত্ব, রামের জন্মের পূর্ব্বে রামায়ণের অস্তিত্বের ন্যায়। কিন্তু কেহ-কেহ বলেন, বীজাকারে বৌদ্ধ দর্শন (শূন্যবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, নিরীশ্বরবাদ, ইত্যাদি)

* বাদরায়ণ বলিতেছেন যে অগ্নি শব্দ সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরমাত্মার বোধক হইবে—ইহাতে তাঁহার শিষ্য জৈমিনি কোনও প্রকার বিরোধ মনে করেন না।

বুদ্ধের পূর্ব্বেও এদেশে ছিল। এই সম্বন্ধে অধ্যাপক মুলার নিজে বলিয়াছেন ;—

"Buddhistic Suttas breathe the spirit of Sankhya Philosophy." অর্থাৎ "বৌদ্ধ সুত্ত (সূত্র)—গুলি সাংখ্যদর্শনের গন্ধে ভরপুর।"

অধ্যাপক ওয়েবার বলিয়াছেন ;—

"Buddha's teaching contains in itself absolutely nothing new; on the contrary, it is essentially identical with the corresponding Brahminical doctrine. Only the fashion in which Buddha proclaimed and disseminated it was novel aud unwonted."

অর্থাৎ "বুদ্ধদেবের শিক্ষায় নূতনত্ব কিছুই নাই। পক্ষান্তরে, ঐ শিক্ষার দার্শনিক মতগুলি মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য বা ঔপনিষদিক। কেবল যে ধরণে ইহা শিক্ষা দেওয়া হইত, সেই ধরণটাই নূতন।" *

এইবার ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের কাল-নিরূপণ করিতে হইবে। ন্যায়দর্শনের কর্ত্তা অক্ষপাদ গৌতম। যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণ করাই ন্যায়ের চরম উদ্দেশ্য। বৃহস্পতি কর্ত্তৃক নাস্তিক-মতমূলক চার্ব্বাক-দর্শন প্রচারিত হইলে, ভারতীয় সমাজের নৈতিকতা ও সাম্যভাব (stability) নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। এই নিমিত্ত ন্যায়ের উৎপত্তির প্রয়োজন হয়। অক্ষপাদের হৃদয়ে এই প্রকার নাস্তিক্য সহ্য হয় নাই। তাঁহার মহাপ্রযত্ন-প্রকল্পিত হেতুবিদ্যা সম্পাদিত হইলে, একজন নাস্তিক-চূড়ামণি তাঁহার সহিত বিচার আরম্ভ করেন। তর্কে এই নাস্তিক পণ্ডিত পরাস্ত হইলে, ন্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইল। কণাদ-কৃত বৈশেষিক-দর্শন ন্যায়দর্শনেরই শাখা। ইহা সমস্ত দার্শনিকই স্বীকার করেন। এই নিমিত্ত বৈশেষিকী ও হেতুবিদ্যা (ন্যায়) ভগিনীদ্বয় (sister philosophies) বলিয়া কথিত হয়। বৈশেষিক-দর্শনকেও ন্যায়-দর্শন বলা হয়।

ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক ও হেতুবিদ্যার উল্লেখ আছে। ললিত-বিস্তর খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর নিকটবর্ত্তীকালে রচিত। উহার চীনভাষায় অনুবাদ তৃতীয় শতাব্দীর। সুতরাং এই কালে ন্যায় ও বৈশেষিক বিদ্যমান ছিল, ইহা নিশ্চিত। বৌদ্ধ ত্রিপিটকে কপিল, গৌতম, কণাদ, বাদরায়ণ, জৈমিনি, পতঞ্জলি এই নামগুলির উল্লেখ আছে। ইঁহারা যে দর্শন-কার তাহাও লিখিত আছে। বুদ্ধের মৃত্যুর অত্যল্পকাল পরেই ত্রিপিটক সংগৃহীত হয়। ৪৮৩ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দ বুদ্ধের মৃত্যু-অব্দ ধরিলে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে ত্রিপিটক-সংগ্রহ হয়, ইহা বলা যায়। লঙ্কাবতার নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থে কণাদ, বৃহস্পতি, অক্ষপাদ, কপিল নামের উল্লেখ আছে। ইঁহারা দর্শনকার পণ্ডিত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইহাদের প্রণীত দর্শন হইতে কোনও সূত্র উদ্ধৃত হয় নাই বলিয়া, সূত্রগুলি লঙ্কাবতার প্রণয়নকালে বিদ্যমান ছিল না, ইহা প্রমাণ হয় না।

মোটের উপর কথা এই যে, বৌদ্ধযুগে এদেশে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্যদর্শন বিদ্যমান ছিল, এবং অক্ষপাদ, কণাদ, কপিল উহাদের কর্ত্তা (authors) বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

'তর্ক' বা 'যুক্তি' (Syllogism) এই অর্থে 'ন্যায়' পাণিনির জানা ছিল। গোল্ডষ্টুকারের মতে পাণিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব পাণিনির আবির্ভাবের পূর্ব্বে তর্কবিদ্যার (ন্যায়) উদ্ভব হইয়াছিল, বলিতে পারা যায়। গোল্ডষ্টুকার কিন্তু ইহাতে কিছু সন্দেহ করিয়াছেন! তিনি বলিতেছেন যে, যেহেতু গৌতম (ন্যায়দর্শনকার) পদার্থ সকলকে জাতি (genus), আকৃতি (species) ও ব্যক্তি (Individual)—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; এবং পাণিনি ঐ পদার্থসমূহকে জাতি (species) ও ব্যক্তি (Individual) কেবল এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং যেহেতু পাণিনি জাতি বলিতে যাহা (species) বুঝিতেন, গৌতম আকৃতি বলিয়া তাহাই (species) বুঝাইয়াছেন; অতএব পাণিনির ন্যায়-দর্শন জানা ছিল না। পূর্ব্ববর্ত্তী একটি লোক 'জাতি'-শব্দের এক প্রকার অর্থ করিলে, পরবর্ত্তী লোককেও যে সেই প্রকার অর্থ করিতে হইবে, তাহার হেতু কি? পূর্ব্ববর্ত্তী একটি লোক পদার্থসকলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে, যদি পরবর্ত্তী লোক একই প্রসঙ্গে তাহা অপেক্ষা

* ভিন্নমতাবলম্বীর মতে সমুদায়াধিকরণ বৌদ্ধযুগে ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অল্প সংখ্যক শ্রেণীতে বিভক্ত করেন," তবে পূর্ব্ববর্ত্তী লোকটি বাস্তবিকই পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন, ইহা বিবেচনা করা যায় কি না, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। সুদূর সলাতুরবাসী পাণিনি গঙ্গাতীরবাসী অক্ষপাদ গৌতমের তর্ক না দেখিয়া থাকিতে পারেন, অথবা উভয়ের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বে একোনবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহ-রাজ জনকের নিকট বলিতেছেন, "মহারাজ পূর্ব্বে আমি ভগবান্ ভাস্করকে প্রসন্ন করিবার জন্য ঘোরতর তপোঽনুষ্ঠান করিয়াছিলাম।.........ভগবান্ ভাস্কর প্রসন্ন হইয়া ....আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্!, পর-শাখা ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ তোমার আয়ত্ত হইবে। উহা আয়ত্ত হইলে তোমার বুদ্ধি মুক্তিমার্গে প্রবেশ করিবে এবং তুমি সাংখ্যমতাবলম্বী ও যোগীদিগের অভিলষিত পদ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে।............তখন আমি সমগ্র উপনিষদ্ ও আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। ঐ আন্বীক্ষিকী বিদ্যা মানবগণের মোক্ষোপযোগী। উহাকে চতুর্থী বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।"

উদ্ধৃত অংশটি যদি মূল মহাভারতের অংশ বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলেও যে সময়ে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে সেই ব্যক্তি জানিতেন যে, বেদবিদ্যা প্রথমা, সাংখ্যবিদ্যা দ্বিতীয়া, যোগবিদ্যা তৃতীয়া, এবং আন্বীক্ষিকী চতুর্থী মোক্ষোপযোগিনী বিদ্যা। চতুর্থী শব্দটি স্পষ্টতঃ কালক্রম-বাচক; কারণ মোক্ষ আবার বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে না।

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বাদশ সূত্রে বাদরায়ণ গৌতমকর্ত্তৃক অবলম্বিত তর্কপ্রণালীকে শিষ্টের অপরিগ্রহের* মধ্যে ফেলিয়াছেন; অর্থাৎ ইতর দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন; এবং ঐ তর্ককে আক্রমণ করিয়াছেন। ইহা শঙ্করাচার্য্যের মত। তাঁহার গুরু গোবিন্দাচার্য্যেরও এই মত ছিল। গোবিন্দের গুরু গৌড়পাদেরও এই মত ছিল। বস্তুতঃ ইহা শিষ্যপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। বেদব্যাস গৌতমের তর্ককে এইরূপ নিন্দা করিলে, গৌতম ব্যাসের মুখ দর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। গুরু ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া শিষ্য বেদব্যাস তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, "আমি আপনার তর্কের নিন্দা করি নাই, কুতর্কেরই নিন্দা করিয়াছি।" ইহাতে গৌতম প্রসন্ন হইলেন, কিন্তু স্বীয় প্রতিজ্ঞার বিষয় স্মরণ করিয়া নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ* করিয়া রহিলেন, তথাপি বাদরায়ণের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না। দেবী-পুরাণের শ্লোকগুলি এই:—

স তর্কং নিন্দয়ামাস ব্রহ্মসূত্রোপদেশকঃ।
তচ্ছ্রুত্বা গৌতমঃ ক্রুদ্ধো বেদব্যাসং প্রতি স্থিতঃ॥
প্রতিজজ্ঞে চ নৈতাভ্যাং দৃগ্‌ভ্যাং পশ্যামি তন্মুখম্।
যঃ শিষ্যো দ্বেষ্টি মে তর্কং চিরায় গুরু সম্মতম্॥
ব্যাসোঽপি ভগবাংস্তস্য গুরোঃ কোপং বিমৃশ্য চ।
আযযৌ ত্বরিতং তত্র যত্রাভূদ্ গৌতমো মুনিঃ॥
অসকৃদ্দণ্ডবদ্ভূত্বা পাদয়োঃ প্রণিপত্য চ।
গুরুং প্রসাদয়ামাস কুতর্কো নিন্দিতো ময়া॥
প্রসন্নো গৌতমো ব্যাসে প্রতিজ্ঞাংস্ত্বেব সংস্মরন্।
পাদেঽক্ষ কারয়ামাস সোঽক্ষপাদস্ততোঽভবৎ॥

দেবীপুরাণের এই অংশ যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল, সেই সময়ে গৌতম ও বাদরায়ণের সমসাময়িকতাই পুরাণকারের জানা ছিল।

গৌতম-সংহিতায় 'আন্বীক্ষিকী' শব্দের উল্লেখ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় গৌতম ব্যবস্থাপক (legislator) বলিয়া কথিত হইয়াছেন। গৌতম-সংহিতাই উহার প্রমাণ।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে ও শ্রৌতসূত্রে ও লাত্যায়ন সূত্রে গৌতম ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্যবস্থাদির প্রণেতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে সুমন্তু, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন, পৈল, সূত্রানি, ভাষ্যানি, ভারত, মহাভারত, ধর্ম্মাচার্য্য, জানন্তি, গার্গ্য, গৌতম, শাকল্য, মাণ্ডব্য, মাণ্ডুকেয়, গার্গী বাচক্নবী, সুলাভা, মৈত্রেয়ী, কহোল কৌষিতকি, শৌনক, আশ্বলায়ন ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ আছে। এই গৃহ্যসূত্রগুলি যে বুদ্ধ-পূর্ব্বকালে সঙ্কলিত, ইহা অধ্যাপক মুলারও স্বীকার করিয়া-

* এতে শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতা। ২।১।১২॥

* Had his eyes fixed in abstraction on his feet—Monier Williams.

ছেন। আশ্বলায়ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান-বিষয়ক সূত্রের নামই আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র। এই আশ্বলায়ন মহাভারত-প্রসিদ্ধ শৌনকের শিষ্য। শৌনক ঋষি রাজা জনমেজয়ের সমসাময়িক। বিদেহরাজ জনকের বহুদক্ষিণ নামক যজ্ঞে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 'অশ্বল হোতা ছিলেন।' এই অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন। এই অশ্বলের পুত্র আশ্বলায়ন। অতএব আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাবে সঙ্কলিত, ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, এইকালে সূত্র ও ভাষ্যাদির অস্তিত্ব ছিল। ইহাতে বাদরায়ণের চারিজন শিষ্যের নাম (সুমন্ত, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন, পৈল) পাওয়া যাইতেছে। এই কালে মহাভারত নামক গ্রন্থ ছিল, তাহাও বুঝা যাইতেছে। বিদেহরাজের বহুদক্ষিণ যজ্ঞে বৈশম্পায়নের শিষ্য ও ভাগিনেয় যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বচক্নু মুনির কন্যা গার্গীর যে বাকলহ হইয়াছিল, সেই গার্গীর নাম গৃহ্যসূত্রে আছে। *মীমাংসা বা আন্বীক্ষিকী-কার গৌতমের নাম পাওয়া যাইতেছে। প্রাচী-মীমাংসাকারের নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে কণাদ বা উলূক ও পতঞ্জলির নাম নাই। গৃহ্যসূত্রে কণাদের নাম থাকিবার হেতুও নাই; কারণ উহাতে সঙ্কলিত হইবার উপযুক্ত কিছু না লিখিলে কাহারও নাম উল্লিখিত হইবার উপলক্ষ্য হয় না। পতঞ্জলি পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার নাম উঠিতে পারে না। গৃহ্যসূত্রোল্লিখিত শাকল্য ঋষি বহুদক্ষিণ-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইনি ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক একখানি গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) প্রণয়ন করেন। পাঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণ সুপ্রসিদ্ধ উদ্দালক আরুণির জামাতা কহোল ও যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ীর নামও উহাতে আছে।

রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মার সময়ে শ্রীমৎকৃষ্ণ মিশ্র যতি-সম্পাদিত প্রবোধচন্দ্রোদয়ে কণাদ কাশ্যপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ও দেবর্ষি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। দেবর্ষি উপাধি অতি প্রাচীনতারই পরিচায়ক।

* ন্যায়ের প্রাচীন নাম অন্বীক্ষিকী অনেক স্থলে মীমাংসা বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বায়ুপুরাণে কণাদ বা উলূক একজন মুনি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বায়ুপুরাণ যে অতি প্রাচীন পুরাণ, ইহা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথও স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য উহা পরবর্ত্তী কালের ঘটনাসমূহ দ্বারা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, অক্ষপাদ ও উলূক একই গুরুর শিষ্য ছিলেন। উভয়-কৃত দর্শন হইতেও ইহাই পরিস্ফুট হয়। লিঙ্গপুরাণ অতি প্রাচীন। উহাতে কিছুই প্রক্ষিপ্ত হয় নাই।

বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে যেমন গৌতমের তর্ককে শিষ্টের অপরিগ্রহের মধ্যে ফেলিয়াছেন, তেমনি আবার কণাদকে আক্রমণ করিয়াছেন। যথা—

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ২।২।১০।

এই সূত্রে বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, হ্রস্ব (দ্ব্যণুক) ও পরিমণ্ডল (পরমাণু) হইতে মহৎ (ত্র্যণুক) ও দীর্ঘের (দ্ব্যণুকের) উৎপত্তি অসমঞ্জস। এতদ্ভিন্ন আক্রমণ আরও আছে। এই প্রসঙ্গে ম্যাক্‌ডোনেল্ (Macdonell) বলিতেছেন:—

"Vaisheshika is assailed in the Brahma-Sutras. It is there described as undeserving of attention, because it had no adherents."

বার্হস্পত্য দর্শন ও বৈখানস সূত্র আন্বীক্ষিকী ও মীমাংসা অপেক্ষাও প্রাচীন; ইহা অধ্যাপক মুলারেরও মত। অতি প্রাচীন বলিয়া বৃহস্পতি-সূত্র ও বৈখানস-সূত্রগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর যদি বা থাকিত, তাহা সুলতান মামুদ ইত্যাদির অনুগ্রহে থাকিতেই পারে না। বৌদ্ধ যুগেও এই সকল ব্যাপারের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ঐ দর্শনের স্থূল মতগুলির অতি সামান্য অংশ বেদান্তসার, শীলাঙ্ক, রাজতরঙ্গিনী, মধুসূদন সরস্বতীর প্রস্থানভেদ,প্রবোধ-চন্দ্রোদয় ও মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে আছে। শঙ্কর-দিগ্বিজয়েও উহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহস্পতির পরে তাঁহার দর্শন চার্ব্বাক নামক ঋষি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় বলিয়া উহা চার্ব্বাক-দর্শন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। চার্ব্বাক যে বুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের, ইহা স্বীকার্য্য। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় পাদে ত্রিপঞ্চাশত্তম সূত্রের ভাষ্যে লোকায়তিক বা

চার্ব্বাক-মতাবলম্বীদিগের উল্লেখ আছে। এই চার্ব্বাক আন্বীক্ষিকী-কার গৌতমকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন :—

"মুক্তয়ে য শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ।
গৌতমং তমবেত্যৈব যথাবিত্থ তথৈব স॥"

অর্থাৎ, 'যে মহামুনি শিলাত্বপ্রাপ্তিতুল্য মুক্তির নিমিত্ত শাস্ত্র বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে একটি গরু বলিয়া জানিবে। তিনি যেমন জানেন, তিনি নিজেও তেমনি।'

গৌতম চার্ব্বাকের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা উল্লিখিত ব্যাপারে সূচিত হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ললিতবিস্তর, বৌদ্ধ ত্রিপিটক, লঙ্কাবতার, পাণিনি, মহাভারত, ব্রহ্মসূত্র, গৌতম-সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্র, প্রবোধচন্দ্রোদয়, বায়ুপুরাণ, চার্ব্বাকের বিদ্রূপ প্রভৃতিতে গৌতম ও কণাদের অতি প্রাচীনতা পরিস্ফুট হইতেছে; এবং দেবীপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, প্রভৃতিতে উহাঁদের সহিত বাদরায়ণ ও জৈমিনির সমসাময়িকতা প্রমাণিত হইতেছে।

খাঁচার পাখী

[শ্রীসত্যচরণ লাহা এম-এ বি-এল্]
মেম্বর, ন্যাচারেল হিষ্ট্রি সোসায়টি (বোম্বাই)

পাখী পোষার ঝোঁক মানুষের বহুকাল হইতেই আছে। জগতের প্রায় সকল স্থানে ইহার স্বল্পাধিক নিদর্শন লক্ষিত হয়। মানব-সমাজের সকল স্তরে ইহার প্রভাব বিদ্যমান। অবস্থা-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোককে অল্প-বিস্তর এই ঝোঁকের বশবর্ত্তী হইতে দেখা যায়।

এই বিপুল বিশ্বের কোন-না-কোন ক্ষুদ্র জীবের প্রতি মানব-হৃদয়ের কেমন একটা সূক্ষ্ম আকর্ষণ আছে যে, মানুষ নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও, সে এই আকর্ষণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হয় না। এই আকর্ষণের বলেই মানুষ, কুক্কুর, বিড়াল, পারাবত প্রভৃতি প্রাণীকে যত্ন ও প্রীতির সহিত গৃহে পালন করিতে উদ্যত হয়। মানবের শৈশবাবস্থা হইতে ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের মধ্যে প্রায় দেখা যায় যে, ছোট-ছোট বালকেরা ঝড়, জল ও রৌদ্রের প্রখরতা উপেক্ষা করিয়া গাছে-গাছে পাখীর নীড় অন্বেষণ করে, এবং শাবক দেখিতে পাইলে আহ্লাদে আটখানা হইয়া উহাকে সাবধানে গৃহে লইয়া যায়। অসহায় পক্ষি-শিশুকে বাঁচাইবার জন্য বালকদিগের চেষ্টা বড়ই আশ্চর্য্যজনক; এবং এরূপ অনেক সময়ে ঘটে যে, ভালবাসা ও যত্নের আধিক্য হেতু শাবকটি মরিয়া যায়। এই পালন ও ভালবাসিবার ইচ্ছা বালকের বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়।

সৃষ্ট প্রাণিসমূহের মধ্যে পক্ষি-পালনের দিকে মানুষের পক্ষপাতিত্বের কারণ এই যে, পাখীরা অতি সহজে নেত্র-পথবর্ত্তী হইয়া উহাদের উজ্জ্বল বর্ণ এবং মধুর কণ্ঠস্বরের দ্বারা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। পক্ষপুটের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা স্বেচ্ছায় যথা-তথা উড়িয়া বেড়াইতে সমর্থ। ইহাদের স্বভাবসুলভ চঞ্চল-গতি অনায়াসেই ইহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। অপর জন্তুদিগকে ভয়ে-ভয়ে বিচরণ করিতে হয় বলিয়া উহারা সহজে আমাদের নয়নগোচর হয় না। উহাদের মধ্যে কেহ রাত্রিকালে আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া গহ্বর হইতে বহির্গত হয়; কেহ-বা নিবিড় অরণ্যমধ্যে সন্তর্পণে বিচরণ করে; কিছুমাত্র শব্দ হইলেই চকিত নয়নে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে থাকে। পক্ষিজাতির চাকচিক্যময় ক্ষুদ্র সুকোমল অবয়ব, শ্রবণ-মনোহর মধুরাস্ফুট ধ্বনি, উহাদের অবাধ-ললিত-গতি ও অসহায় জীবন অতর্কিত ভাবে আমাদের হৃদয়ে এক অনুরাগ-মাখা ভাবের গঠন করে। এই নিমিত্ত পাখীরা চিরযুগ ধরিয়া মানুষের মনে বিশ্বস্ততা-পাশে আবদ্ধ। মানবের ক্রিয়াকলাপে, আচারব্যবহারে, গল্পে, কবিতায়, প্রবাদে, ছড়ায় এই ভাবের অভিব্যক্তি যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পক্ষিপালন প্রথা পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। এই প্রথা এত প্রাচীন যে, কেহ সম্যকরূপে ইহার উৎপত্তি,

কাল নিরূপণ করিতে পারেন না। বিহঙ্গ-তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার বাটলার (Dr. A. G. Butler) সাহেব বলেন যে, সম্ভবতঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই পালন-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল (১)। হেন্‌রি ওল্‌ডিস্ (Henry Oldys) সাহেব তাঁহার "Cage bird traffic of the United States" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "জীবিত পক্ষীকে পিঞ্জরে রাখিয়া পালন-প্রথা জগদ্ব্যাপী ; এবং ইহা ঐতিহাসিক যুগের এত পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত যে, কবে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ দেশবাসীদিগের মধ্যে ইহার প্রচলন দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জের নবাবিষ্কারের সময়েও তথায় পক্ষি-পালন-প্রথা দেখা গিয়াছিল ; ইঙ্কা রাজত্বকালে পেরুদেশ-বাসীদিগের ইহা একটি অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল * * (২)।" তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, "প্রাচীন গ্রীস ও রোমবাসী-দিগের নিকট পিঞ্জর-পালিত পক্ষী বড়ই আদরের জিনিষ ছিল। কথিত আছে যে, ভারতবর্ষীয় কণ্ঠরেখাসমন্বিত শুক পক্ষী মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের কোন এক সেনাপতি কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপে নীত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেও পশ্চিম-এসিয়ার বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক জীবিত পক্ষী পালিত হইত ; এবং বুলবুল প্রভৃতি মনোমুগ্ধকর গায়ক পক্ষী বেবিলনের দোদুল্যমান উদ্যানসমূহের যে সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন করিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই (৩)।" জেনেসিস্ (Genesis), লেভিটিকস্ (Leviticus) এবং ইসায়া (Isaiah) নামক গ্রন্থসমূহে গৃহপালিত পারাবতের ভূরি-ভূরি উল্লেখ আছে। এই পারাবত-পালন-প্রথার প্রাচীনত্ব নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ডারউইন সাহেব তাঁহার 'Variation of Animals and Plants under Domestication' নামক গ্রন্থে বলেন, 'প্রফেসার লেপ্‌সিয়স (Professor Lepsius) এরূপ সূচনা করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব তিনসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে পঞ্চম মিশর-বংশের রাজত্বকালে গৃহপালিত পারাবতের সর্ব্বপ্রথম নিদর্শন লিপিবদ্ধ আছে (৪)। বাট্‌লার সাহেব (Dr. A. G. Butler) তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের (৫) মুখবন্ধে প্রাচীন হিব্রুজাতির পক্ষিপালন সম্বন্ধে হেন্‌রি ওলডিস্ (Henry Oldys) সাহেবের অভিমত এরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন—'ইহা একরূপ অবধারিত হইয়াছে যে, প্রাচীন হিব্রুরা পক্ষিপালক ছিলেন ; যেহেতু তাঁহাদের লিখিত পুস্তকাদির মধ্যে অপরিষ্কার পিঞ্জর-পক্ষীর উল্লেখ দেখা যায়।' ভারতবর্ষে যে বহুকাল পূর্ব্বে পারাবত, শুক, সারিকা প্রভৃতি পক্ষী গৃহে পালিত হইত, তাহা আর্য্যদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। প্রাসঙ্গিক দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।

"গৃহে পারাবতা ধন্যা শুকাশ্চ সহসারিকাঃ
গৃহেষ্বেতে ন পাপায়——"। মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, অধ্যায় ১০৪, শ্লোক ১১৪।

"তাং (৬) সারিকাকন্দুক দর্পণাম্বুজৈঃ
শ্বেতাতপত্র ব্যজন স্রগাদিভিঃ
* * * * *
বৃষেন্দ্রমারোপ্য বিটঙ্কিতা যযুঃ।"
শ্রীমদ্ভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ৫ শ্লোক।

১। Foreign Birds for Cage and Aviary, Part I, Preface.

২। "The practice of keeping live birds in confinement is world-wide, and extends so far back in history that the time of its origin is unknown. It exists among the natives of tropical as well as temperate countries, was found in vogue on the islands of the Pacific when they were first discovered, and was habitual with the Peruvians under the Incas * * *"— Henry Oldys.

৩। Caged birds were popular in classic Greece and Rome. The Alexandrian Parrakeet, a ring necked Parrakeet of India—which is much fancied at the present day, is said to have been first brought to Europe by one of the generals of Alexander the Great. Before this, living birds had been kept by the natives of Western Asia, and the voices of Bulbuls and other attractive singers added to the charms of the hanging gardens of Babylon."—Henry Oldys.

৪। Darwin's Variation of Animals and Plants under Domestication, Vol. I, p 204.

৫। Foreign Birds for Cage and Aviary, Part I, Preface.

৬। সারিকা—পান নিরূপিত পক্ষিণী, ইতি শ্রীধরস্বামী।

এই শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, তাৎকালিক স্ত্রীলোকদিগের দর্পণ ব্যজনাদির ন্যায় সারিকা পক্ষিণীও অত্যাবশ্যক বিলাসের সামগ্রী ছিল। এমন কি, আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদিক যুগে সারিকা ও শুক পক্ষী পালিত ও শিক্ষিত হইয়া মনুষ্যের ন্যায় কথা বলিত।

"সরস্বত্যৈ শারিঃশ্যেতা পুরুষবাক্(৭) সরস্বতে শুকঃ শ্যেতঃ পুরুষবাক্। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৫।৫।১২

মনুষ্যের ন্যায় কথা বলিতে পারে এমন রক্তবর্ণবিহীন স্ত্রী শুক সরস্বতী দেবীর প্রতি এবং ঐ প্রকার শ্বেতবর্ণ শুক পক্ষী সমুদ্রের প্রতি উৎসর্গ করিতে হইবে।

বাজসনেয় সংহিতায় (২৪।৩৩) ঠিক এইরূপ মনুষ্যবাক্য ভাষী শুকশারি পক্ষীর উল্লেখ আছে।

কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এতদ্দেশে পক্ষিপালন-প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এমন কি কতিপয় পক্ষী রাজকীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হইত (৮)। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মৌর্য্যরাজের অশ্বশালায় ময়ূর, চকোর, শুক, সারিকা প্রভৃতি পক্ষীর নিমিত্ত আসন ফলক নির্দ্দিষ্ট ছিল (৯)।

শূদ্রক প্রণীত মৃচ্ছকটিক নাটকে একটি অনতিবৃহৎ পক্ষিশালার সুচারু বর্ণনা পাওয়া যায়।

"ইহাপিসপ্তমে প্রকোষ্ঠে সুশ্লিষ্ট বিহঙ্গ বাটী সুখনিষণ্ণানি অন্যোহন্য চুম্বনপরাণি সুখমনুভবন্তি পারাবতমিথুনানি, দধিভক্তপূরিতোদর ব্রাহ্মণইব সূক্তম্পঠতি পঞ্জরশুকঃ। ইয়মপরা স্বামিসম্মাননা লব্ধপ্রসরা ইব গৃহদাসী অধিকং কুরকুরায়তে মদনসারিকা। অনেক ফলরসাস্বাদ প্রহৃষ্টকণ্ঠা-কুম্ভদাসীব কূজতি পরপুষ্টা, আলম্বিতা নাগদন্তেষু পঞ্জর-পরম্পরাঃ যোধ্যন্তে লাবকাঃ, আলপ্যন্তে পঞ্জরকপিঞ্জলাঃ, প্রেষ্যন্তে পঞ্জরকপোতা ইতস্ততো বিবিধমণিচিত্রিত ইবায়ং সহর্ষং নৃত্যন্ রবিকিরণ সন্তপ্তং পক্ষোৎক্ষেপৈর্বিধুবতীব প্রাসাদং গৃহময়ূরঃ। ইতঃ পিণ্ডীকৃতাইব চন্দ্রপাদাঃ পদগতিং শিক্ষয়ন্তীব কামিনীনাং পশ্চাৎ পরিভ্রমন্তি রাজ-হংসমিথুনানি। এতে অপরে বৃদ্ধমহোত্তরা ইব ইতস্ততঃ সঞ্চরন্তি গৃহসারসাঃ" (১০)।

'এখানে এই সপ্তম প্রকোষ্ঠে সুসংযুক্ত একটি পক্ষিশালা রহিয়াছে, যথায় অনেক পারাবত-মিথুন পরস্পরকে চুম্বন করিয়া সুখে অবস্থান করিতেছে। পিঞ্জরস্থ শুক দধি-ভোজন দ্বারা পূর্ণোদর ব্রাহ্মণের সূক্তপাঠের ন্যায় পড়িতেছে, এই মদনসারিকাটি (ময়না) গৃহস্বামীর আদরে লব্ধপ্রভাবা গৃহদাসীর ন্যায় অধিক শব্দ করিতেছে। কুম্ভদাসীর ন্যায় কোকিল পাখী বহুফলের রস আকণ্ঠ পান করিয়া কূজন করিতেছে। হস্তিদন্তকিলকে পিঞ্জরসমূহ লম্বিত রহিয়াছে, লাবক পক্ষীরা যুদ্ধ করিতেছে। কপিঞ্জল পক্ষীসকল পিঞ্জরের ভিতর আলাপ করিতেছে। কপোতসমূহ ইতস্ততঃ প্রেরিত হইতেছে। গৃহময়ূর সানন্দে নৃত্য করিতে-করিতে উহার বিবিধ মণি চিত্রিত পুচ্ছ বিস্তার করিয়া যেন রবিকরোত্তপ্ত প্রাসাদকে বীজন করিতেছে। রাশীকৃত চন্দ্রখণ্ডের ন্যায় অসংখ্য রাজহংসমিথুন যেন স্ত্রীলোকদিগকে পদগতি শিক্ষা দিতে-দিতে উহাদের পশ্চাৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। গৃহ-সারসসমূহ অতিবৃদ্ধের ন্যায় মৃদু পদে বিচরণ করিতেছে।'

এই পক্ষিবাটিকার বিবরণ কবি-কল্পিত হইলেও, প্রায় দেড়সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে প্রচলিত পক্ষিপালন-প্রথার কতকটা আভাস দেয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "শ্যৈনিকশাস্ত্র" (১১) গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, অনূন পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক শ্যেন পক্ষী সমাদৃত হইত। তাঁহারা ঐ পক্ষীর সাহায্যে মৃগয়া করিয়া বড়ই আনন্দানুভব করিতেন। উক্ত গ্রন্থে শ্যেনপক্ষী সম্বন্ধে উপযুক্ত বাসস্থান, পথ্যাপথ্য-নির্ণয় প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় বিশদভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ দেখিয়া আমাদের মনে হয়, তাৎকালিক ভারতীয়

৭। শারিঃ শুকস্ত্রী কীদৃশী? 'শ্যেতা' অরক্তবর্ণা। পুনশ্চ বিশেষ্যতে 'পুরুষবাক্' পুরুষবৎ বদিতুং সমর্থা।—ইতি সায়ন।

৮। অর্থশাস্ত্র, নিশান্তপ্রণিধিঃ, পৃঃ ৪০। Vide also 'Studies in ancient Hindu Polity' by Narendra Nath Law, p, 93.

৯। অর্থশাস্ত্র, অশ্বাধ্যক্ষঃ, পৃঃ, ১৩২।

১০। মৃচ্ছকটিক নাটক (জীবানন্দ সংস্করণ), ৪র্থ অঙ্ক, পৃঃ ১৪৫।

১১। শ্যৈনিক শাস্ত্র নামক গ্রন্থখানি, শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, কূর্ম্মাচল (কুমাউন) রাজ রুদ্রচন্দ্রদেব কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর অভ্যন্তরে বিরচিত হইয়াছিল। রুদ্রচন্দ্রদেবের নাম কেহ রুদ্রদেব কেহ বা চন্দ্রদেব বলিতেন।

নৃপতিবৃন্দ যে পক্ষীপালন ব্যাপারে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্যেনপক্ষীর আবাস স্থান সম্বন্ধে উক্তগ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে—

"উপত্যকা হিমগিরের্যেষাং পরিচয়ং গতাঃ
তেষাং দাবাগ্নিসঙ্কাশো গ্রীষ্মোভবতি দুঃসহঃ।
অতস্তাপোপশমনান্ উপচারান্ প্রযোজয়েৎ
তেষাং প্রাসাদশিখরে সুধাধবলিতোদরে।
যন্ত্র নির্ম্মুক্ত পর্য্যন্ত পানীয়া সারণীতলে

* * * *

বিবিক্তে বন্ধনং কার্য্যং জালসংরুদ্ধমক্ষিকে
অথবোদ্যানসদ্বেদ্যাং রক্ষিতায়াং সুরক্ষিভিঃ॥
সরৎকুল্যাম্বুশীতায়াং নিবিড়োচ্ছ্রিতভূরুহৈঃ
চণ্ডাংশুকর সঞ্চার-রহিতায়ামনারতম্।

* * * *

নির্দংশমশকেরম্যেভূগৃহে বন্ধ ইষ্যতে
স্থানং বিলোচনানন্দজননং ঘ্রাণতর্পণম্।
সমাকৃতপ্রচারন্তু সাবকাশং প্রকল্পয়েৎ
নৈকত্র বহবঃ স্থাপ্যাঃ দ্বিত্রাঃ স্থাপ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্।"
৫ম পরিচ্ছেদ, ১৬,১৭,১৮,১৯,২০,২২,২৩ শ্লোক।

'যে শ্যেন পক্ষিসমূহ হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকাভূমির আস্বাদ পাইয়াছে, তাহারা কিরূপে দাবাগ্নিসদৃশ গ্রীষ্ম সহ্য করিবে? এইজন্য তাহাদিগের তাপনাশক উপচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যন্ত্রনির্ম্মুক্ত পরিমিত বারিবৃষ্টির দ্বারা সুশীতল সুধাধবলিত প্রাসাদশিখরে উহাদিগকে জালবেষ্টিত মক্ষিকার অগম্য নির্জ্জন স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। অথবা উহাদিগকে উদ্যানস্থ একটি উচ্চ বেদীর মধ্যে রাখিতে হইবে। বেদীটি প্রহরিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়া চাই এবং উহা স্বচ্ছকুল্যাম্বুদ্বারা শীতল এবং ঘন উন্নত পাদপসমূহের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিবে। সূর্য্যের তীব্র কিরণ যেন তাহার মধ্যে কখনও প্রবিষ্ট হইতে না পারে। * * * * * অথবা যদি উহাদিগকে ভূগৃহে রাখিতে হয়, তাহা হইলে ভূগৃহটি রম্য, প্রশস্ত, সুগন্ধযুক্ত ও পবিত্র বায়ু সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক। এরূপ স্থানে অনেকগুলি পক্ষী একত্র রাখিবে না; দুইটি কিম্বা তিনটিকে পৃথক্-পৃথক্ রাখিবে।'

পক্ষীদিগের খাদ্যাদি সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"বাত্যাদিকলবিঙ্কাদের্মাংসং নাত্যচিরস্থিতম্॥
লঘুরুচ্যং প্রদাতব্যং যথা পরিণমেত্তথা
পুষ্ট্যৈ প্রবর্দ্ধয়েদেষাং মাত্রামথ শনৈঃ শনৈঃ॥
স্নানার্থং বারিপূর্ণাশ্চ স্থাপয়েৎ কুণ্ডিকাঃপুরঃ।
৫ম পরিচ্ছেদ, ২৪,২৫,২৬ শ্লোক।

'কলবিঙ্কাদি পক্ষীর সদ্য অচিরস্থিত মাংস এবং লঘু রুচিকর ও সহজে হজম হয় এরূপ খাদ্য উহাদিগকে প্রদান করিবে। উহাদিগের পুষ্টির জন্য আহারের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে। স্নানার্থ উহাদের অগ্রে জলপাত্র রক্ষা করিবে।'

এমন কি, উক্ত গ্রন্থে শ্যেন পক্ষীর শারীরিক পীড়ানাশক বিবিধ ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পক্ষিপালনাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিদিত আছেন যে, বর্ষা ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন পক্ষিগণের পুরাতন পক্ষসমূহ পতিত হইয়া ক্রমশঃ নূতন পালক উদ্গত হয়, তখন তাহারা অসুস্থতা নিবন্ধন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এজন্য যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে সুশৃঙ্খলায় পতত্রিগণের নূতন পক্ষের উদ্গম হয়, এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। গ্রন্থকার কুমাউনরাজও যে তৎকালে এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, তাহা আমরা এই শ্লোক হইতে জানিতে পারি।

* * * * *

ঝিল্লী ঝঙ্কার বাচালে কালে প্রাবৃষি চাগতে॥
তথৈবোপচরেত্তাং স্ত যথা পুষ্টাঃ স্বপক্ষকান্
ত্যক্ত্বা নবান্ প্রপদ্যেরন্ সর্পাস্তচমিব দ্রুতম্॥
৫ম পরিচ্ছেদ, ৩৪,৩৫ শ্লোক।

ভারতীয় মুসলমান নৃপতিগণও পক্ষিপালন-বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। 'আইন-ই-আক্‌বরী' (Ain-i-Akbari) গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানা প্রকার পক্ষী পালিত হইত। সম্রাট আক্‌বরের পক্ষিশালা তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি পার্সিয়া, তুর্কিস্থান ও কাশ্মীর প্রভৃতি সুদূর প্রদেশ হইতে বহুবিধ পক্ষী সঞ্চয় করিয়া পক্ষিশালার শোভা বৃদ্ধি করিতেন (১২)। বিংশতি

(১২) Ain-i-Akbari by Blochmann and Jarrett Vol. I. p. 298; Vol. III, p. 121.

সহস্রাধিক পারাবত (১৩) তাঁহার পক্ষিশালায় বিরাজ করিত। এই নিমিত্ত ভিন্ন শ্রেণীর পারাবতগণের বাসোপযোগী স্বতন্ত্র গৃহাদি (১৪) নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্রাট তাঁহার পালিত শ্যেন পক্ষীগুলির স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন, এবং এই নিমিত্ত উহাদের খাদ্যাদির নূতন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 'আইন ই-আক্‌বরি' গ্রন্থে লিখিত আছে—'কাশ্মীর প্রদেশে এবং সৌখীন ভারতবাসীর পক্ষিশালায় শ্যেনপক্ষিসমূহ সাধারণতঃ প্রতিদিবস একবারমাত্র আহার পাইত; কিন্তু রাজপ্রাসাদে পক্ষীগুলির দুইবার আহারের ব্যবস্থা ছিল (১৫)।

মানবজাতির এই পক্ষিপালনের মূলে যে কেবল হিংসা-লেশবিহীন স্নেহ ও ভালবাসা বিদ্যমান আছে, তাহা নহে; পুরাকাল হইতে দেখা যায় যে, দেশ, কাল এবং পাত্র ভেদে পক্ষিজাতি মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই খাদ্য অন্বেষণ ও আহরণ করা বহু ক্লেশ ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। এই পরিশ্রমের লাঘব করিবার নিমিত্ত উপায়কুশল মানবজাতি কুক্কুট, পারাবত প্রভৃতি কতিপয় জাতীয় বিহঙ্গ গৃহে পালন করিতে আরম্ভ করে; এবং উহাদের অণ্ড ও শাবক খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। পক্ষী আহরণ ও শিকার কতিপয় মানব জাতির উপজীবিকা হইয়াছে; এবং কোন-কোন জাতি বা সম্প্রদায় পালিত পক্ষীদিগকে কৌতুক প্রদর্শন (১৬) করিতে শিখাইয়া আপনাদিগের উপার্জ্জনের সংস্থান করিয়া লয়। বুলবুল, তিতির এবং কুক্কুটের (১৭) লড়াই ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। লড়াইয়ে জয় হইলে পালকের যে কেবল অর্থোপার্জ্জন হয় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্ভ্রম (১৮) বাড়িয়া যায়। কোন কোন লড়াইয়ে পক্ষীদিগের দৈহিক বলের পরীক্ষা না হইয়া উহাদের স্বরের উচ্চতা এবং মাধুর্য্য পরীক্ষিত হইয়া থাকে। পরীক্ষায় জয় লাভ হইলে পালক যথেষ্ট পুরস্কৃত হয় এবং তাহার পক্ষীর দরও দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। স্বীয় পাখীগুলিকে যুদ্ধোপযোগী করিবার নিমিত্ত পালকদিগকে যে বহু যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোন-কোন পক্ষী পালকদিগের নির্দ্দিষ্ট কোন নৈমিত্তিক কার্য্যের সাহায্যার্থ পালিত ও শিক্ষিত হয়। চীন-প্রদেশে আমরা দেখিতে পাই যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে তদ্দেশীয় ধীবর সম্প্রদায় পালিত সমুদ্রকাক বা Cormorant পাখীকে (১৯) মৎস্য ধরিতে সহায়তা করিবার নিমিত্ত শিক্ষা প্রদান করিত। পেচকের সাহায্যে পক্ষী শিকারের সুবিধা বোধে ইতালীদেশবাসী ব্যাধবৃন্দ উহাকে পালন করিয়া থাকে (২০)। বাজ বা শিক্‌রা পাখীকে পোষ মানাইয়া উহার দ্বারা অপর পক্ষীশিকার করা ভারতবর্ষের ন্যায় য়ুরোপেও প্রচলিত দেখা যায়; এমন কি তথায় ইহা mediæval যুগের রাজবৃন্দের মধ্যে একটি fashionএ পরিণত হইয়াছিল। মানুষের এইরূপ আহার্য্য বা স্বার্থ-সম্বন্ধে ব্যবহারের নিমিত্তই

১৩ ১৪। Ibid, Vol I. pp. 300, 301

১৫। Ibid, Vol I. p. 304

১৬। শিক্ষিত পক্ষী লইয়া এরূপ কৌতুক-ক্রীড়ার প্রচলন ভারতবর্ষেও দেখা যায়; কারণ তথায় স্থানবিশেষে কৌতুকপ্রিয় যুবকগণ আপনাদের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বুলবুল পক্ষীকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দেয় যে, উহাকে আপনাদের প্রণয়-ভাজন রমণীর নিকট সঙ্কেত পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলেই পক্ষীটি রমণীর ললাটমধ্যস্থ টিপ চঞ্চুপুটের দ্বারা নিপুণ ভাবে আকর্ষণ করিয়া তাহার প্রভুকে অর্পণ করে। ডাক্তার বার্লার সাহেব তাঁহার 'Foreign Birds' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭। দণ্ডাচার্য্য প্রণীত 'দশকুমার চরিত' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে গ্রন্থকার প্রাচ্য দেশীয় নারিকেল জাতী কুক্কুটের সহিত পশ্চিম দেশবাসী বলাক জাতীয় কুক্কুটের একটি তুমুল যুদ্ধ প্রসঙ্গ বর্ণনায় ক্ষুদ্রকায় বলাক-জাতীয় কুক্কুটের বিজয়-ঘোষণা করিয়াছেন (পঞ্চমোচ্ছ্বাস, প্রমতি চরিত, পৃঃ ২৪৮-৪৯, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর Ed.)।

১৮। প্রাচীন রোম-প্রদেশে দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধকুশল পক্ষীর প্রতি যথোপযুক্ত গৌরব প্রদর্শন না করিতেন, তিনি সাধারণের চক্ষে নিকৃষ্টরূপে পরিগণিত হইয়া এমন কি সময়ে-সময়ে দণ্ডার্হ হইতেন। যুদ্ধে লব্ধপ্রতিষ্ঠ একটি তিতির পক্ষী মিশরের কোন এক নগরপাল কর্ত্তৃক খাদ্যরূপে ক্রীত হওয়ায় সম্রাট আগষ্টাস তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। Vide 'Birds of Shakespeare' by E. J. Harting, p. 218. যুদ্ধনিপুণ পক্ষী যখন এরূপ ভাবে সমাদৃত হয় তখন তাহার পালক যে অধিকতর সম্মানার্হ হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

১৯। E Stanley's 'A Familiar History of Birds', p 370.

২০। Ibid, p. 154.

জাভা স্প্যারো

[এই চিত্রের বিবরণের জন্য শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, এম এ, বি এল লিখিত "খাঁচার পাখী" (ভারতবর্ষ, ৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৫২ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।]

Emerald Printing Works
CALCUTTA

বর্ণসঙ্কর পক্ষী জাপানবাসিগণ কর্ত্তৃক উদ্ভূত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বহুশত বৎসর ধরিয়া সাবধানে নিকট-শ্রেণীর পক্ষি-মিথুনগুলির নির্ব্বাচনের ও পরস্পর সংস্থাপনের এবং তদবস্থায় সন্তানজননের ফলে বর্ণসঙ্কর পক্ষীগুলি তিনটি সুপরিচিত বর্ণের আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রথম আকার শ্বেতবর্ণের সহিত লোহিত পিঙ্গলের মিশ্রণ; প্রায়ই মস্তকের দিকে বর্ণসমূহের স্ফুরণ লক্ষিত হয়। * * * দ্বিতীয় আকার ঐরূপ সাদার সহিত মৃগচর্ম্মবর্ণের সমাবেশ। তৃতীয় প্রকার বিহঙ্গগুলি একেবারেই সাদা (২৭)। এব্রাহেমস্ (Mr. J. Abrahams) সাহেবের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন (২৮) যে যথার্থই Striated Finch (২৯) এবং ভারতবর্ষীয় (Indian) Silver-bill (৩০) এই দ্বিপ্রকার পক্ষীর পরস্পর সম্মিলনে বেঙ্গলী (Bangalee) উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ, ইহার পৃষ্ঠদেশ ভালরূপে নিরীক্ষণ করিলে Striated Finch এর পৃষ্ঠদেশস্থ রেখাগুলির সমতা লক্ষিত হয়; উহাদের কণ্ঠস্বরেরও কতকটা সাদৃশ্য উপলব্ধি হইয়া থাকে।

বন্যজাভা চড়াই (munia oryzivora) স্বভাবতঃ দেখিতে ভস্মবর্ণ। পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় উহাদের যে সকল সন্তান হয়, তাহাদিগের সহজ ভস্মবর্ণের সহিত প্রায়ই শুভ্র বর্ণের সংমিশ্রণ দেখা যায়। চীন ও জাপানবাসীরা এই মিশ্রিতবর্ণের সন্তানদিগের মধ্যে যাহাদিগের শুভ্রবর্ণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এরূপ পক্ষিমিথুন বাছিয়া লইয়া উহাদিগকে অপর পিঞ্জরে যত্নে রক্ষিত করে। কালে এই পক্ষিমিথুন হইতে যে সকল সন্তান হয় উহাদিগের বর্ণ অধিকতর শুভ্রাকার ধারণ করে। ক্রমশঃ এই প্রণালীতে তুষারশুভ্র বর্ণের জাভা চড়াই উৎপন্ন হইয়াছে। জাপানে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, শ্বেতবর্ণ পিঞ্জরে পালিত ও সংরক্ষিত হইত বলিয়া ঐরূপ তুষার শুভ্রবর্ণের আবির্ভাব হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কফিন্ (Frank Finn) সাহেব লিখিয়াছেন—"যদিও জাভা চড়াই জাতি-নির্ব্বিশেষে দেখিতে একরূপই, তথাপি চীন ও জাপান প্রদেশে পিঞ্জর-পালিতাবস্থায়, এতদ্দেশে কেনেরি (Canary) পক্ষীর ন্যায়, আনুক্রমিক সন্তানজননের ফলে উহারা একটি সুপরিচিত বর্ণবৈপরীত্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই শুভ্রবর্ণের জাভা চড়াই।" (৩১)

ভারতবর্ষেও পক্ষীর আবদ্ধ জীবন লইয়া এরূপ কিছু-কিছু experiment বা আন্দোলন দেখা যায়। আবল্-ফজল্ প্রণীত আইন-ই-আকবরী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্রাট্ আক্‌বর অতিশয় পারাবতপ্রিয় ছিলেন। তিনি ভিন্ন জাতীয় পারাবতের সংমিশ্রণে বহু নূতন প্রকার পারাবতের উদ্ভাবন করিয়াছেন। পারাবত-মিথুন নির্ব্বাচন কালে তিনি উহাদিগের সৌষ্ঠব ও গতিবিধির সামঞ্জস্যের প্রতি একান্ত লক্ষ্য রাখিতেন (৩২)।

গ্রন্থকার আবল্ ফজল্ লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কেহ কখনও এইরূপ সুপ্রণালী অবলম্বন করেন নাই। আক্‌বর বাদ্‌শাই পারাবত জাতির উন্নতিকল্পে সর্ব্বপ্রথম

২৭। সম্পূর্ণ শুভ্রবর্ণের বেঙ্গলী পক্ষীকে albino বলিয়া ভ্রম হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে উইনার (August F. Wiener) সাহেব এরূপ বলেন—"শুভ্রবর্ণের জাপানী Manakin কখনই সাদা Blackbird এর ন্যায় albino বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহার প্রথম কারণ, Manakin পক্ষীর চক্ষুর্দ্বয় লোহিত বর্ণের সংস্রববর্জ্জিত। দ্বিতীয় কারণ, যেমন হরিদ্রাবর্ণের কেনেরী (Canary) পক্ষীর শাবক হরিদ্রবর্ণের হইয়া থাকে তদ্রূপ শুভ্রবর্ণ জাপানী Manakin এর শাবক শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট হইবে ইহা স্থির নিশ্চিত। Canaries and Cage Birds, British and Foreign," p. 385

২৮। Foreign Finches in Captivity by A. G. Butler, p. 213.

২৯। বাঙ্গালায় ইহা 'শকরি' মুনিয়া নামে পরিচিত; ইহার ল্যাটিন নাম Munia Striata.

৩০। এ দেশে ইহা 'পিদড়ি' বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার ল্যাটিন নাম Uroloncha Malabarica.

৩১। "Although Java Sparrows look particularly uniform in appearance, they have produced a well-marked variety, which is cultivated in a tame state in China and Japan as Canaries are with us. This is the white Java Sparrows"—Frank Finn, Garden and Aviary Birds of India, p. 85.

৩২। 'His Majesty thinks equality in gracefulness and performance a necessary condition in coupling and has thus bred choice pigeons'—Ain-i-Akbari. Blochmann. Vol I. p 299.

এই নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন (৩৩)। ইহার ফলে সম্ভবতঃ আধুনিক লক্কা, লোটন, পরপাঁ প্রভৃতি কতিপয় পারাবতের অভ্যুত্থান। ডারউইন সাহেব তাঁহার Variation of animals and plants under domestication নামক গ্রন্থে (৩৪) বলেন "খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর বাদশার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে লক্কা পারাবতের অস্তিত্বের সর্ব্বপ্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা আইন-ই-আকবরী নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। য়ুরোপে তখনও এই পারাবতের আবির্ভাব হয় নাই।" লক্কা পারাবতের বর্ণনা আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এইরূপ দৃষ্ট হয় (৩৫) —"উহার কণ্ঠস্বর শ্রুতি মধুর এবং যেরূপ স্পর্দ্ধা ও গৌরব-ভরে মাথা তুলিয়া চলে, তাহা বাস্তবিক বিস্ময়জনক।"

৩৩। 'His Majesty, by crossing the breeds, which method was never practised before, has improved them astonishingly'—Ayeen Akbery, Gladwin, vol I. part II, p 211.

৩৪। Ibid Vol. I. p. 208.

৩৫। The Annals and Magazine of Natural History, vol XIX (1847), p 104.

লোটন পারাবত সম্বন্ধে ডারউইন্ সাহেব ৩৬) লিখিয়াছেন যে, এই সময়েও আধুনিক যুগের ন্যায় দ্বিবিধ লোটন পারাবাত ভূতল ও নভস্তলে আপনাদের অসামান্য উৎপতন ও উল্লম্ফন, অঙ্গবৈপরীত্যে পতন প্রভৃতি গতিবৈচিত্র্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিত।" আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে যে "লোটন পারাবতকে নাড়া দিয়া ভূতলে ছাড়িয়া দিলে উহা আশ্চর্য্যরূপ উল্টাবাজীর সহিত লাফাইতে থাকে (৩৭)।'

প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্য জগতের এই সকল experiment যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের নিমিত্ত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না; কিন্তু তাহা না হইলেও বিজ্ঞানশাস্ত্র যে ইহার দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক তথ্য নিরূপণের নিমিত্ত পক্ষিপালন ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আমরা উঁহাদিগের কার্য্যকলাপের কিঞ্চিৎ বিবৃতি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

৩৬। Darwin's Variation, pages 207 & 209.

৩৭। The Annals and Magazine of Natural History, vol. XIX. p 104.

কবি রঙ্গলাল

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

(২)

রঙ্গলালের কাব্যগুলির সম্যক্ আলোচনা করিলে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রকৃত উপলব্ধি করা যায়। তাঁহার কাব্যের ভিতর বীর ও করুণ-রসেরই প্রাধান্য; তবে মধ্যে-মধ্যে শৃঙ্গার-রসেরও সন্ধান পাওয়া যায়,—কিন্তু তাহা চণ্ডীদাস ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় নিরবগুণ্ঠন নহে। বঙ্গভূমি যখন দাশরথি এবং ঈশ্বরচন্দ্রের আদিরসে প্লাবিত, তখন তিনি বঙ্গভাষার বহুপূর্ব্বলুপ্ত বীররসের পুনরুদ্ধার করেন। বঙ্গকবির বীণায় যে প্রেমের করুণ ঝঙ্কার ব্যতীত রণাঙ্গনের অম্বরভেদী ভেরীনিনাদও বাজিতে পারে, রঙ্গলালই তাহার প্রমাণকর্ত্তা ইহা রঙ্গলালের অক্ষয় কীর্ত্তি। 'মেঘনাদে'র জন্ম না হইলে 'বৃত্রসংহার' উদ্ভূত হইত কি না, তাহা যেমন সংশয়-তিমিরাবৃত,—সেইরূপ রঙ্গলালের আবির্ভাব না হইলে আজ আমরা "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" পাইতাম কি না, তাহাও বড় সন্দিগ্ধ জটীল প্রশ্ন। রঙ্গলাল যখন—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়;
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।" (পদ্মিনী)

গাহিয়াছিলেন, তাহাতে হেমচন্দ্রের শিঙা "আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি" বলিয়া বাজিয়া উঠে নাই, তখনও মেঘনাদের গম্ভীর মেঘাম্বরা শ্রুত হয় নাই। কবিতার ভিতর স্বদেশ-প্রেমপ্রবণতা বিকশিত করিবার জন্য মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই রঙ্গলালের নিকট ঋণী; এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের নবীন বেদমন্ত্র "বন্দে মাতরম্" রচিত হইবার বহুপূর্ব্বে রঙ্গলাল প্রাণের আবেগে গাহিয়াছিলেন—

"সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার, ইত্যাদি।
(পদ্মিনী)

কাব্য কবির অন্তঃকরণের প্রতিচ্ছায়া মাত্র—মুকুরে যেরূপ নরনারীর মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়া থাকে, কাব্যেও সেইরূপ কবি-হৃদয়ের প্রতিবিম্ব পড়িয়া যায়। কবি কখনও আপনার চিত্তবৃত্তি লুক্কায়িত রাখিয়া কাব্য প্রণয়ন করিতে পারেন না। মিল্টন, বায়রণ, পোপ, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকল কবির রচনাতেই কবি-হৃদয় আপন আপন মানসক্ষেত্রের সুন্দর ছায়াপাত করিয়া গিয়াছে; রঙ্গলাল সম্বন্ধেও ইহার বৈপরীত্য ঘটে নাই। কবির চরিত্রালোচনা কালে আমরা তাঁহার মনোবৃত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছি; এস্থলে আর কয়েকটি কথা বলিব। বর্ত্তমান হিন্দুজাতির ঐক্যের অভাব, দৌর্ব্বল্য, হিংসাবৃত্তি প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—

(গ) "কোথা হায় সেই দিন, ভেবে হয় তনুক্ষীণ,
এযে কাল পড়েছে বিষম।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সর্ব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম॥
সব পুরুষার্থ শূন্য, কিবা পাপ কিবা পুণ্য
ভেদজ্ঞান হইয়াছে গত।
বীর কার্য্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীরুতায় রত॥
নাহি সরলতা-লেশ, দ্বেষেতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি।
ক্ষীণ দেহ ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী॥
হায় কবে এরা যাবে, এ দশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন-প্রসূন!
কবে পুনঃ বীররসে, জগৎ ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুনঃ?
আর কি সেদিন হবে, একতার সূত্রে সবে,
বদ্ধ রবে মননে বচনে?
পূজিবে সত্যের মূর্ত্তি, প্রণয় পাইবে স্ফূর্ত্তি,
সুখদ সরল আচরণে? (পদ্মিনী)

কবি শুধু হিন্দুজাতির অধঃপতনের জন্য অশ্রু বিগলিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আবার তাঁহার স্বজাতির জন্যও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন—

"যে দেশে যেরূপ বৃত্তি, সেইরূপ মতি।
সেইরূপ ক্রীরারস, সেইরূপ রতি॥
শৈশব হইতে সেই দিকে চিত্ত ধায়।
অন্যরস, অন্যরূপ ক্রীড়া নাহি চায়॥
যথা, বাঙ্গালার লোক নহেক সাহসী।
নারীপ্রিয় কেলীকলা কৌতুক-বিলাসী॥
শিশুর পুতুলে দেখ আভাস তাহার।
কামকলা ছলা তাহে প্রত্যক্ষ প্রচার॥
পুতুলে পুতুলে বিয়া, বহু-বহু-কেলী।
নিতান্ত কৈশোরে যথা বাল বালা মেলি॥
কিরূপে পৌরুষ পথে যাইবে বালক।
তামাক-খাকুয়া বুড়া প্রিয় খেলনক॥"
(কর্ম্মদেবী)

শত্রুর নিশিত কৃপাণাপেক্ষা কবির-কাব্য-শেল লক্ষ্যগুণ শাণিত; রঙ্গলাল মর্ম্মভেদী দুঃখের সহিত স্বজাতির প্রতি যে তীক্ষ্ণ শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর অন্তস্তল স্পর্শ করিয়াছে, কবির ক্রন্দন সফল হইয়াছে—বঙ্গবাসী সাহসী হইয়াছে, বঙ্গ সমাজ হইতে বাল্যবিবাহ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু বঙ্গবাসী যে কখনও তাম্রকূটের সেবায় বিরত হইবে, সে আশা বড় বিরল।

রঙ্গলাল আজন্ম-কবি—রঙ্গলাল স্বভাব-কবি। তিনি অতি সামান্য এবং অকিঞ্চিৎকর বস্তুকেও সুন্দর কবিত্বের সহিত বর্ণনা করিতে পারিতেন। 'কর্ম্মদেবী'র

ভিতর বেদানা, দাড়িম্ আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের এবং উটের বর্ণনা, 'শূরসুন্দরী'র ভিতর ময়ূরের বর্ণনা, 'কাঞ্চীকাবেরী'র ভিতর নিদাঘ প্রভৃতির বর্ণনা যেরূপ মধুর, কবিত্বপূর্ণ, প্রাঞ্জল, এবং মনোজ্ঞ, তাহা আর ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে—সেগুলি কবি-হৃদয় লইয়া অনুভব করিবার; তাহাদিগের ভিতর অনেকস্থানে মহাকবির রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্থলে উহাদিগের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত হইল—

"কিবা মধুরিম বেদানা দাড়িম,
দেবের দুর্লভ ফল।
নয়ন-রঞ্জন, বীজের বরণ,
পদ্মরাগ অবিকল॥
তনু বিদারিত, ঈষৎ স্ফারিত,
বীজের বিমল রেখা।
যেন কামিনীর, দশন রুচির,
মৃদু হাসে দেয় দেখা॥" (কর্ম্মদেবী)

"আর সেই বিহঙ্গ চতুর চূড়ামণি।
ইঙ্গিতে হরিয়া আনে নায়িকার মণি॥
নিকটে দাঁড়ায়ে মেঘপ্রিয় মেঘনাদ।
পুচ্ছে যার শোভিত হাজার স্বর্ণচাঁদ॥
(শূরসুন্দরী)

"অনলের শিখারাজি শোভে শিরোপর।
দ্রব স্বর্ণময় কিবা মুকুট সুন্দর॥
কভু লুপ্ত কভু দীপ্ত হয় প্রতিক্ষণে।
অভিনব আশা যথা প্রেমিকির মনে॥
(কাঞ্চীকাবেরী)

"তরল তরঙ্গমালা ধায় উভরড়ে।
বেলাকূলে আসি তূর্ণ চূর্ণ হয়ে পড়ে॥
নিরমল ফেনালীলা নাচে শূন্যোপরে।
নানা রঙ্গ [illegible] তাহে দিনকর-করে॥"
(কাঞ্চীকাবেরী)

ওজোগুণ যেরূপ রঙ্গলালের রচনার অলঙ্কার, সেইরূপ স্বাভাবিকতা এবং কৃত্রিমতার অভাবও তাঁহার কবিতার অঙ্গভূষণ; এই জিনিসটি তাঁহার নিজস্ব,—ইহার জন্য তিনি বাঙ্গালার কোনও কবির নিকট ঋণী নহেন, এবং ইহাই তাঁহার প্রধান গুণ। পরবর্ত্তীকালে 'সদ্ভাবশতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারই কেবল রঙ্গলালের এই স্বাভাবিকতা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই স্বাভাবিকতার জন্য রঙ্গলালের যুদ্ধবর্ণনা স্থলবিশেষে অতি সুন্দর,—এমন কি মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর মনোহর হইয়াছে। স্বাভাবিকতা তাঁহার কাব্যসমূহে আর এক বিষয়ে কার্য্যকরী হইয়াছে। কষ্ট-কল্পনার অভাব স্বাভাবিকতার অন্তর্গত, অধিক কি সূক্ষ্মবিচারে দুই-ই এক বস্তু এবং ইহাও উচ্চশ্রেণীর কবিত্বের লক্ষণ। রঙ্গলালের কাব্যে যে শুধু বীররসের অবতারণা আছে, তাহা নহে;—তিনি প্রেমের কথাও বলিয়াছেন, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমালাপও দিয়াছেন; আবার সুন্দরীর রূপবর্ণনাও করিয়াছেন। এগুলির ভিতর কষ্ট-কল্পনা ও কৃত্রিমতা না থাকায় এবং এগুলি স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি হইতে উদ্ভূত হওয়ায়, সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনামালার ভিতর স্থান পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে। পদ্মিনী উপাখ্যানের ভিতর কবি যে 'রাজদম্পতির' কথোপকথন দিয়াছেন, বঙ্গভাষায় তাহার কবিত্বের তুলনা বড়ই বিরল। সত্য বটে, ইহার ভিতর প্রেম-নৈরাশ্য নাই, হতাশের দীর্ঘশ্বাস নাই, ব্যর্থ-প্রণয়ের মর্ম্মভেদী খেদোক্তি নাই, "ভাল বেসে-বেসে হয়েছি আলা" নাই; তথাপি ইহা নীরব কক্ষের পবিত্র প্রেম-আলাপন, তথাপি ইহা হৃদয়গ্রাহী ও আসক্তি-ব্যঞ্জক—তথাপি ইহা মহাকবির উপযুক্ত। রঙ্গলালের রূপবর্ণনা অপূর্ব্ব সামগ্রী। কবি নিজেই বলিয়াছেন—

"মৃগপতি যূথপতি দ্বিজপতি গজমতি,
তিলফুল কোকিল খঞ্জন॥
এই সব উপমার, প্রয়োজন নাহি আর
নব কবিজনের বাঞ্ছিত।"

অথচ তিনি রমণীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে সেই প্রাচীন প্রথার চর্ব্বিত-চর্ব্বণ হইবে না এবং ইহার ভিতর কবির যে কিছু নিজস্ব কবিত্বশক্তির নিদর্শন থাকিবে, তাহা সুনিশ্চিত। আমরা এস্থলে কবির মোগল-রমণী এবং পদ্মাবতীর রূপ-বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম—

"বসিয়াছে তার কাছে মোগল-মোহিনী।
কামের কামিনী কিবা চাঁদের রোহিণী॥
প্রফুল্ল দাড়িম সম লোহিত অধর॥
মাদকে ঘূর্ণিত-প্রায় আঁখি ইন্দীবর।

সুবর্ণ ঘুঙ্গুর পদে বাজে পদে-পদে।
বিষদ মেহেদী-রাগ কর-কোকনদে॥
ঝলমল পেশোয়াজ টলমল কায়।
আতরেতে তর করে যেখানেতে যায়॥
জরিতে জড়িত বেণী বিনোদ-বন্ধন।
মেঘে যেন সৌদামিনী দেয় দরশন॥"

(শূর-সুন্দরী)

"কিবা অপরূপ, পদ্মাবতী রূপ
অলপ-বয়সী বালা।
কেতকী কুসুম, কেশের কুসুম
লাবণ্য ফুলের ডালা॥
নয়ন সুন্দর, নীলনিভাধর,
কাজলে উজল ভাতি।
যেন ইন্দীবরে, অলি শোভাধরে,
রবহীন মদে মাতি॥
অধরোষ্ঠ কিবা, প্রবালের ডিবা,
দশন মুকুতাধার।
মৃদু-মৃদু হাসে দর পরকাশে,
কি শোভা করে সঞ্চার॥
নাসিকার কোলে, গজমতি দোলে,
তিল ফুলে হিমকণা।
প্রলম্বিত বেণী নাগিনীর শ্রেণী,
উভে কি বিস্তার ফণা॥
পাটলী কি রসে কপোলে বিকশে
কপাল কি আধ ইন্দু?
মৃগাঙ্কের প্রায়, শোভিছে কি তায়
মৃগমদ লেখা বিন্দু?

(কাঞ্চী-কাবেরী)

এই সকল শ্রেষ্ঠ কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা করিয়াও কবির প্রাণ তৃপ্ত হয় নাই; তখন তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন —

"কোন্ মূঢ় চিত্রকরে পদ্ম-দেহ চিত্র করে,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা?
কিংবা সেই কোকনদে মাখাইলে মৃগমদে
অতি সুখ লভে মধুলোভা?"

প্রকৃতই কবির কথা ধ্রুব সত্য—বর্ণনীয়ের বর্ণনা কখনও সসীম হইতে পারে না। সত্য বটে ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের অনুকরণে 'বিস্তার' রূপ-বর্ণনায় যথেষ্ট কবিত্ব-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তথাপি রঙ্গলালের সহিত বঙ্গীয় রাজকবির তুলনা করিলে পাঠক দেখিবেন যে, রূপবর্ণনায় রঙ্গলালের আসন ভারতচন্দ্রের উপরে; ইহার কারণ, রঙ্গলালের বর্ণনার ভিতর কষ্ট-কল্পনা নাই, শাব্দিকতা নাই; এবং ইহা নিরবগুণ্ঠন নহে।

সুমতি

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

১

সদ্য-বিধবা সুমতি যখন সিঁথির সিঁদুরের সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ীর সম্পর্ক মুছিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া আসিয়াছিল, তখন তাহার বয়স দশ বৎসর। সে অনেক দিনের কথা। এখন সে পূর্ণযৌবনা রমণী,—দেখিলে মনে হয়, বিশ্বশিল্পী যখন এই নিষ্ফল সুষমা-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হাতে আর কোন কাজ ছিল না,—তাই এমন নিখুঁৎ নৈপুণ্যের উদ্ভব হইয়াছে।

স্বামীর সহিত দুই-তিন দিনের আলাপ সুমতির আর বড় স্মরণ নাই। দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত কেবল মনে পড়ে,—কোথায় যেন সে বিচিত্র বেশে উৎসব দেখিতে গিয়াছিল; সেথায় চারিদিকে আলো জ্বালা, ফুলের মালা, সাহানা সুরে সানাই বাজিতেছে। তার পর কোথা থেকে হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস এল, আলো নিবিল, ফুলের মালা ছিঁড়িয়া গেল, সুমতির বেশভূষা কে কাড়িয়া লইল, সে কাঁদিয়া পলাইয়া আসিল।

তার পর দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। সম্প্রতি সুমতির পিতা পরলোকে গমন করিয়াছেন। পিতৃকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া শ্রীপতি এখন কর্ম্মস্থানে যাইবে। জন্মদাতা

পিতা এবং অন্নদাতা সাহেব ব্যতীত শ্রীপতি সংসারে আর কিছুই জানিত না। পিতার অবর্ত্তমানে পুত্র কর্ত্তা এবং কর্ত্রীপদ তাহার গৃহিনীর,—সাধারণতঃ সংসারে এইরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীপতি এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম করিল। বিপত্নীক পিতার জীবিতাবস্থায় সুমতি যেমন সংসারের কর্ত্রী ছিল, তেমনই রহিল। শ্রীপতি কিছুতেই বুঝিল না যে, তাহার স্ত্রীকে সে তাহার প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে। স্বামীর এই বিসদৃশ আচরণে যামিনী মনে-মনে রুষ্ট হইলেও, বাহ্যিক লক্ষণে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিল না। একবারমাত্র জিজ্ঞাসা করিল,—"সংসারের কি ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছ ?" শ্রীপতি উত্তর দিল, "যেমন চল্‌ছিল, তেমনি চল্‌বে।" "কি চল্‌ছিল, কি চল্‌বে ?" "বাবার সময়ে যেমন ছিল,—" বলিতে-বলিতে শ্রীপতি একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল; তাহার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। বুড় মিন্‌সে! বুড় বাপের জন্য রস দেখ! দু'চোখ দিয়ে ঝরঝরিয়ে জল পড়ছে! যামিনীর চক্ষুও সজল হইয়াছে, কিন্তু তাহা বৃদ্ধ শ্বশুর বা স্বামীর জন্য সমবেদনায় নহে, ক্ষুণ্ণ অভিমানে। সে অশ্রু লুকাইয়া যামিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুরঝি একলা মেয়েমানুষ, সব সাম্‌লাতে পার্‌বে ?" তিনি যেন কর্ত্রী হইলে একক দশটা হইতে পারিতেন! কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানান্ধ শ্রীপতি কোন ইঙ্গিতই বুঝিল না। বলিল,—"বাবা ওকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন,—ও যেমন পার্‌বে, আমিও তেমন পার্‌ব না।"

তুমি আবার কোন্‌কালে কি পেরেছ! পার কেবল সাহেবদের মন যোগাতে! ঘর-জ্বালানে, পর-ভোলানে! এইরূপ আরও অনেক কথা যামিনীর মনে উদয় হইল, কিন্তু মুখ দিয়া বাহির হইল না। অন্তরের অন্তস্তলে যে গরলকুণ্ড টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল, কথাগুলি তাহারই অতল তলে তলাইয়া গেল। যামিনী মনে-মনে স্থির করিয়া রাখিল যে, তাহার সংসারের কণ্টক তাহাকেই উচ্ছেদ করিতে হইবে। এ নির্ব্বোধ, অকর্ম্মা স্বামীর দ্বারা কোন কাজই হইবে না। সুমতির সম্বন্ধে এই সাধু সঙ্কল্প স্থির করিয়া যামিনী আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইল।

শ্রীপতি ভাবিতে লাগিল, বাটীতে দুটী স্ত্রীলোক, আপদ-বিপদ আছে, একজন অভিভাবক থাকা উচিত। যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার মামাতো ভাই সিদ্ধেশ্বরকে এখানে রাখ্‌লে হয় না ?"

"কেন, তা'কে আবার কি দরকার ?" "তোমরা দুটী স্ত্রীলোক রইলে, একজন অভিভাবক থাক্‌লে ভাল হয় না ? তা'র ত স্ত্রী-পুত্র কেউ নেই। নিজেকে রেঁধে খেতে হয়। এখানে থাক্‌লে তা'রও সুবিধে, আমাদেরও সুবিধে।" যামিনী এ প্রস্তাবে যেমন আহ্লাদিত তেমনি আশ্বস্ত হইল। একজন আপনার লোক থাকিলে দলভারি হইবে। কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া বলিল,—"আমি ত তাই একটা ব্যবস্থা কর্‌বার কথা বল্‌ছিলুম। তা সুবিধে ত হয়, কিন্তু ঠাকুরঝির মত হবে ?" "তা হবে।" "তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন ?" এই ছোট্ট দাঁতটুকু বসাইয়া যামিনী শয়ন করিল। শ্রীপতি সিদ্ধেশ্বরের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া কর্ম্মস্থানে যাত্রা করিল।

(২)

সিধু আসিয়াই পাড়ায় একটা সখের দল বসাইয়া দিল। মানুষটা খুব সৌখীন। হাসি-গান-পান্ তাহার চিরসহচর। চেহারা চলনসই। বাঁকা সিঁতে, ফিতেপাড় কাপড়ে, আর চুড়িদার পিরাণে তাহার লজ্জৎ বাড়ে বই কমে না। মনটা সাদাসিদে, তাহার নিদর্শন দুইটী সরল, উজ্জ্বল, সুবৃহৎ চক্ষু। সে চক্ষু যাহাকে দেখে, বা যে সে চক্ষু দেখে, সে সিধুকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। পল্লীগ্রামে রাত্রিতে প্রায় অন্নাহারের ব্যবস্থা। সিধুর আখ্‌ড়া হইতে ফিরিতে বিলম্ব হয়, ভাত ঠাণ্ডা হইয়া যায়,—যামিনী আর্ত্তি করিয়া বলিল, "দাদা, অত রাত্তিরে ঠাণ্ডা ভাতগুল খাও কেমন ক'রে ? আমি বলি, ঠাকুরঝি না-হয় তোমার জন্যে খান্‌কতক ক'রে রুটি গ'ড়ে রেখে দেবে।" "তা হ'লে ত ভালই হয়, দিদি!"—বলিয়াই সিধু গুন্‌গুন্ করিয়া গাইল,—

'রোট্টি আর ধারে বেচ্‌ব না।
নগদ্ পয়সা নইলে দিব না॥'

রোটি আর—হা—'

কেহ মনে করিবেন না যে, সিধু রোটির জন্য তখনি 'হা' করিতেছে। তাহা নহে। ওটা সমের হা। সিধু সদরবাটীতে গিয়া ভাবিতে লাগিল, ঠাকুরঝি ? ঠাকুরঝি কে ? ক'দিন হ'ল এ বাড়ীতে রয়েছি, কিন্তু ঠাকুরঝি ব'লে কোন পদার্থ আছে, তা ত

জানতেই পারলুম না! সেই না কি? শ্রীপতির বোন্? হাঁ—হাঁ, মনে পড়ছে! শুনেছিলুম যেন বে'র পরই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ীতে এসে আছে। হাঁ—হাঁ, মনে পড়ছে—একে একবার দেখেছিলুম! দেখতে বেশ! বহুকাল পূর্ব্বে, যামিনীর বিবাহের পরে, সিধু একবার এ বাটীতে নিমন্ত্রণে আসিয়াছিল। সেই সময় যামিনী সুসজ্জিতা ননদিনীকে সিধুর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বলিয়াছিল,—'দাদা, আমার কেমন ননদ দেখ! বে করবে?' সিধু ভাবিতে লাগিল, দেখ, সেই রেঁধে খাওয়াছে, অথচ বে হ'ল না! তা হ'লে ও-ও বিধবা হ'ত না, আমারও বৌ মরত না। এখন কেমনটী হয়েছে কে জানে! সুমতিকে দেখিবার জন্য সিধু সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

অধ্যবসায় কখন ব্যর্থ হয় না। সিধু একদিন সুমতিকে দেখিল। কিন্তু যাহা দেখিল, তাহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। সিধুর চক্ষু, চরণ উভয়ই নিশ্চল হইল।

দুই হস্তে দ্রব্যভার লইয়া সুমতি রন্ধনশালার দিকে যাইতেছিল। স্নানস্নিগ্ধ মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনমুক্ত, ঈষৎ আর্দ্র, কুঞ্চিত কুন্তলজাল-বেষ্টিত,—কি সুন্দর! লজ্জারাগে আরও মনোহর! রূপে মোহ থাকে—সুমতির সৌন্দর্য্য সুরার মত মদির। সে সুরা সিধু আকণ্ঠ পান করিল। সুমতি অগ্রসর হইতেও পারিল না, পিছাইতেও পারিল না। লজ্জায় নিমীলিত নেত্রে মধ্য-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বাতাহতা লতার ন্যায় অন্তরে-অন্তরে কাঁপিতে লাগিল। বিস্মিত, স্তম্ভিত সিদ্ধেশ্বর সে মানসী মূর্ত্তি ধ্যান করিতে-করিতে চলিয়া গেল। সেদিন আখড়ায় আর তাহার হাসি তেমন জমাট হইল না। তাহার সুর বেসুর, গানের তাল কাটিতে লাগিল।

সিধুর সেই ভাব-তরল, মুগ্ধ, লুব্ধ দৃষ্টির আঘাতে সুমতি চঞ্চল হইয়া উঠিল। যেন সহসা কোথা হইতে বসন্তের বাতাস আসিয়া শত-শত ফুলের কলি ফুটাইয়া দিল। বিংশতিবর্ষ বয়সে সুমতি প্রথম জানিল যে, সে যুবতী। বিংশতি বৎসর যে সমাচার তাহার কাছে অগোচর ছিল, হঠাৎ আজ কে-যেন বৈদ্যুতিক তারযোগে তাহাকে তাহা প্রেরণ করিল। দর্পণে প্রতিবিম্বিত নয়ন আজ কি নূতন ভাষা কহিতেছে! অধরের অন্তরালে কোথায় এ হাসি লুকাইয়া ছিল! তরুণ কিরণপাতে, তুষারস্তব্ধ নির্ঝরের মত সুমতি বিচলিত হইয়া উঠিল। এ কি দুর্ম্মদ আকাঙ্ক্ষা ক্ষুব্ধ সাগরের মত তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে! মনে আজ এ কি বিপরীত তরঙ্গ! এ কি চপল পুলক, কোমল বেদনা! আজ তাহার অন্তরে এ কি কোলাহল—! যেন দুর্ভিক্ষপীড়িত শত শত ভিক্ষুক তাহার হৃদয়দ্বারে আসিয়া হাহাকার করিতেছে!

সুমতি অধীর হইয়া উঠিল। কুটনো কুটিতে আঙুল কাটে! বাটনা বাঁটিতে মনে হয় সিধু আসিতেছে! অমনি মনে মনে সঙ্কুচিত হয়, চ্যুত অঞ্চল মাথায় তুলিয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। চলিতে-চলিতে চকিত হইয়া দাঁড়ায়,—মনে হয়, সহস্রলোচন ইন্দ্রের মত সিধুর চক্ষু সর্ব্বস্থানে রহিয়াছে! জাগরণে, শয়নে, স্বপনে সে চক্ষু নিমীলিত হয় না, সুমতির অন্তরে জাগিয়া থাকে। তাহার অত্যাচার-উৎপাতে সুমতির নানা বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। কোনদিন ঝোলে ঝাল হয় না; ব্যঞ্জনে নুন পড়ে না; পানে চূণাধিক্যে বাড়ীসুদ্ধ সকলের গাল পুড়িয়া যায়। যামিনী বলে,—"এমন ক'রে জব্দ করার চেয়ে পষ্ট বললেই হয়, আমি কিছু করব না—ছোঁব না।" সুমতি ভীত, অনুতপ্ত হয়,—কিন্তু ত্রুটীর সংশোধন হয় না। যে আপনার নিকট আপনি অপরাধিনী, সংসারে সকলের কাছে তার পদে-পদে অপরাধ।

যামিনী সুমতিকে তিরস্কার করিলে সিধু নিরতিশয় ব্যথিত হইত, কিন্তু নিরুপায়। সর্ব্বদা অপরাধ-ভয়ে, আপনার আন্তরিক বিদ্রোহে, দিন-দিন দুঃসহ যন্ত্রণায় সুমতির শরীর ক্রমে ভাঙিয়া পড়িল—একদিন আর উঠিল না। সে দিন একাদশী। যামিনী আসিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, আজ তোমার একাদশী ব'লে কি সবাই হরিমটর করবে? বাড়ীতে একজন কুটুম্বুর ছেলে থাকে, তা'র হুঁস আছে?" যামিনীর চীৎকারে সিধু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে দিদি?" সিধুর কণ্ঠস্বরে সুমতি চকিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

৩

গভীর রাত্রিতে রোগশয্যাশায়িনী সুমতির শিয়রে বসিয়া সিধু ভাবিতেছিল,—ভগবান্ কেন এ সোণার প্রতিমা গ'ড়ে

অকূলে ভাসিয়ে দিয়েছেন! হায়, এ যদি আমার হ'ত! সিধু উদাস নেত্রে সম্মুখের মুক্ত গবাক্ষপথে চাহিয়া আছে। রাত্রি অতি গভীর, নিবিড়, নিস্তব্ধ, অন্ধকারময়ী। সব স্থির। বৃক্ষের পাতাটী পর্য্যন্ত নিস্পন্দ। চরাচর নিদ্রামগ্ন। কেবল বিধাতা জাগ্রত, আর দুর্দ্দমনীয় লালসা-পিপাসা প্রপীড়িত এই মানব-সন্তান সজাগ; ভাবিতেছে—বোধ করি এ অতুল ফুল কারুর ভোগের জন্য সৃষ্টি হয় নি। তাই আমার পাপ-দৃষ্টিতে শুকিয়ে যাচ্ছে। এ দুরন্ত মন কেমন ক'রে বশ করি। ভগবান্, তুমি রক্ষা কর, যেন আমার মনে লোভ না জাগে! গাছেই ফুলের শোভা। তুলে বুকে রাখ্‌লেও শুকিয়ে যায়! আমি শুধু দেখে চক্ষু সার্থক কর্‌ব, মনে মনে ভালবাস্‌ব। ভগবান্, তুমি এর প্রাণরক্ষা কর।

কিছুক্ষণ পরে সুমতি সংজ্ঞা লাভ করিল। তাহার মনে হইল, শিয়রে বসিয়া কে যেন বীজন করিতেছে। মৃদুস্বরে ডাকিল "বৌ!" সুমতিকে সচেতন দেখিয়া অতিরিক্ত আনন্দে সিধুর কণ্ঠ হইতে একটা আরামের স্বর নির্গত হইল—'আঃ।' সুমতি আবার ডাকিল,—"বৌ!" সিধু বলিল,— "সে ঘুমুচ্ছে! কি চাই, বল না! এখন কেমন আছ?" সিধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সলজ্জ পুলকে সুমতির সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা সরিল না। সিধু আবার প্রশ্ন করিল,—"এখন কেমন আছ?" সুমতি একটু দায়ে ঠেকিল। যে অযাচিতভাবে এত করিতেছে, তাহার কথার উত্তর না দেওয়া কৃতঘ্নতা। মৃদুস্বরে বলিল,—"ভাল আছি। আর বাতাস করবার দরকার নেই। আপনি শুন্‌গে যান! মিছে কেন এত কষ্ট কর্‌ছেন!" কষ্ট! সিধু মনে-মনে বলিতে লাগিল, তোমার জন্য কষ্ট! তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব! আমার শোণিত, প্রাণের প্রাণবায়ু, কণ্ঠের ভাষা, নাসার নিশ্বাস, মুখের হাসি,—তুমি যে আমার সব! আমার অসীম সুখ, অপরিমেয় দুঃখ; আমার অশেষ যন্ত্রণা, অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি; আমার দেহে জীবন, জীবনে অমৃত, অমৃতে গরল; আমার অনন্ত পিপাসা, পিপাসার জল, জলে বহ্নি; আমার শ্রান্তিতে সুনিদ্রা, নিদ্রায় স্বপ্ন, স্বপ্নের শূন্যতা; আমার হৃদয়ে আশা, আশায় কণ্টক, কণ্টকে কুসুম, কুসুমে কীট;—তুমি যে আমার সব! আমার ঐকান্তিক বাসনা, বাসনার মরুভূমি, মরুভূমির মরীচিকা, মরীচিকার ভ্রান্তি,—তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব! তোমার সেবা কষ্ট!—এমনি কত কথা সিধুর মনে হইতে লাগিল। কিন্তু তীব্র তাড়নায় রসনাকে সংযত করিয়া বলিল,—"কষ্ট কি, সুমতি! এতে আমার কোন কষ্ট নেই। তুমি ঘুমোও!" "আপনি শুতে যান, নইলে আমার ঘুম হবে না।" "কেন হবে না? আমি বাতাস করি, তুমি ঘুমোও।" "আমার ঘুম হবে না।" "তবে ঘুমের ওষুধ খাও।" "আমি আর ওষুধ খাব না।" "সে কি! কেন?" "কি হবে ওষুধ খেয়ে?" "এইবার তুমি হাসালে। ওষুধ খেলে কি হবে! ওষুধ খেলে রোগ ভাল হবে।" "ভাল হয়ে কি হবে?" "তুমি ভাল হ'লে আমাদের লাভ। যামিনীর রান্না খেয়ে-খেয়ে যে অরুচি ধ'রে গেল!" সুমতি হাসিল, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাহার একটী দীর্ঘশ্বাস পড়িল। সিধুর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। ভাবিল, যামিনীর নির্য্যাতনে সুমতির জীবনে ধিক্কার জন্মিয়াছে। সিধু বিষণ্ণ স্বরে বলিল,—"সুমতি, শ্রীপতি এলে তোমায় কেউ কিছু বল্‌তে সাহস কর্‌বে না।" "ছিঃ, বৌ'র নামে আমি দাদার কাছে নালিশ কর্‌ব!" "তোমায় কিছু বল্‌তে হবে না।" "আপনার পায় পড়ি, আপনি কিছু বল্‌বেন না। আর বাতাস কর্‌বেন না। শুন্‌গে। কেন আপনি এত ক্লেশ ভোগ কর্‌ছেন?" কেন?- সিধু কোন উত্তর করিতে পারিল না। কেবল তাহার অন্তস্তল মথিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস শূন্যে মিলাইয়া গেল! সুমতি তাহা বুঝিতে পারিল কি না, বলিতে পারি না। অনেক সময় মনে-মনে নীরব ভাষায় কথা হয়; শূন্যে শূন্যে ঘাত-প্রতিঘাত হয়; বিনা মন্থনে গরল উঠে। নিরতিশয় বিষণ্ণ স্বরে সুমতি বলিল,—"আপনি ঘুমুতে যান। আমার জন্যে মিছে কষ্ট ভোগ। বিধবাদের বাঁচা-মরায় কিছুই এসে যায় না।" "কে বল্‌লে?" "আমি বল্‌ছি। আমি বড় পোড়াকপালী।" "কেন সুমতি?" "আমার অনেক দুঃখ, অনেক দুঃখ!" সুমতি আর কিছু বলিল না। সিধু ধীরে-ধীরে উঠিয়া গেল। সুমতি নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

৪

স্বাস্থ্যের সঙ্গে-সঙ্গে সুমতির অঙ্গে-অঙ্গে রূপ যেন উছলিয়া উঠিল। পূর্ণ-জোয়ার আসিলে নদীর জল যেমন কানায়-কানায় ভরিয়া উঠে, আপনার উচ্ছ্বাসে আপনি থল্‌থল করিতে থাকে, অভিনব লাবণ্যের প্লাবনে সরস

সৌন্দর্য্যভরে সুমতি তেমনি টলটল্ করিতে লাগিল। কিন্তু হায়, মৃতদেহে এত আভরণের ঘটা কেন? সুমতি যে মৃত। বিধবার রূপের প্রয়োজন কি?

মুকুরে প্রতিবিম্বিত মুখচ্ছবি দেখিয়া সুমতি ভাবিতে থাকে,—হায়, মন পুড়ে, এ মুখ পুড়ে না কেন? বিধাতা এ চক্ষু দিয়াছিলেন কি কেবল কাঁদিবার জন্য? হায়, কেন এমন হয়! ক্ষুধা আছে, ভোজ্য নাই; তৃষ্ণা আছে, জল নাই; কামনা আছে, কাম্য নাই; প্রণয় আছে, প্রীতি-ভাজন নাই। এ কি রহস্য!

দীর্ঘকাল পরে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া সুমতির মনে হইল, কেবল পরের জঞ্জাল, পরের বোঝা বহিতে-বহিতে তাহার দিন গেল! এই সোণার সংসার, পরিপূর্ণ ভোগ-ভাণ্ডার,—কিন্তু প্রাচুর্য্যের মাঝখানে বসিয়া সে উপবাসী। তাহার ক্ষুধিত হৃদয়, পিপাসাতুর প্রাণের পরিতৃপ্তির জন্য একটী তণ্ডুল-কণা, একবিন্দু জল নাই! কি কঠোর বঞ্চনা! তাহার জীবন, যৌবন, রূপ, সকলই বিফল! বিধাতা তাহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়াও ভিখারিণী করিয়াছেন। কি নিষ্ঠুর পরিহাস! সংসারের হাটে কারবার খুলিবার পূর্ব্বেই সে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে! হায়, জীবনে কখন্ ভোর হইল, দিনের আলো আসিল, সে জানিতেই পারিল না; চক্ষু চাহিয়াই দেখিল—সন্ধ্যা! মৃত্যু না হইতে তাহার জন্মান্তর হইয়া গেল! নিয়তির এ কি নির্ম্মম কৌতুক! দীর্ঘপথ অটনান্তে মন্দিরদ্বারে আসিয়া সে দেবতার দেখা পাইল না। তাহার পূজার অর্ঘ্য, অর্চ্চনার উপহার, সকলই ব্যর্থ! আহুতির নিমিত্ত প্রজ্বলিত হোমানল চিতায় পরিণত হইল। কেন এমন হইল? কে এমন করিল? কি পাপে তাহার প্রতি এ নিষ্ঠুর দণ্ডের বিধান? হায়, কোন্ নির্দ্দয় দস্যু তাহাকে রাজগৃহ হইতে লুটিয়া আনিয়া বাঁদীর হাটে বেচিয়া গিয়াছে! কঠিন বিধাতা! কঠিন সংসার! হায়, তরুণ জীবনে মুকুলিত হৃদয়, উদ্বেলিত আশা, উচ্ছ্বসিত আকাঙ্ক্ষা ভাসাইয়া দেওয়া অতি কঠিন,—আর সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রেমের পূর্ণভাণ্ডার, বুকভরা প্রীতি, মুখভরা সোহাগ থাকিতে—বুভুক্ষু অতিথিকে বিমুখ করা।

সিধু যে ভালবাসে সুমতি তাহা বুঝিয়াছিল। বুঝিয়াছিল, সে ভালবাসা অসীম, অতলস্পর্শী, অপার্থিব, মধুরিমাময়। যে ভালবাসা স্বার্থশূন্য; তাহা বুঝিতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রমাণ-প্রয়োগ, কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তাহা স্বতঃসিদ্ধ; তাহার নীরব ভাষা পশু-পক্ষীও বুঝে। সুমতিও বুঝিয়াছিল। আরও বুঝিয়াছিল যে, সিধু সুমতির অকল্যাণ-ভয়ে সে ভালবাসা অন্তরের অন্তরে লুকাইয়া আপনার সহিত আপনি কঠোর যুদ্ধ করিতেছে।

ভাবিতে-ভাবিতে সুমতির চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। সেই সময় যামিনী রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে আসিয়া বলিল,—"বলি, পোড়া-গন্ধে যে বাড়ীতে টেঁকা যাচ্ছে না!"

সুমতির তখন হুঁস্ হইল। তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ছুটিয়া গিয়া ভাতের হাঁড়ি নামাইল। সে কেবল দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য। অন্ন তখন অখাদ্য হইয়া গিয়াছে।

যামিনী পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরে বলিতে লাগিল,—"যেমন লক্ষ্মীছাড়া সংসার, তেমনি ব্যবস্থা! ব'সে ব'সে ভাতগুল পোড়ালে! ও মা, এ কি বাদ-সাধা! কে মাথার দিব্যি দিয়ে রাঁধ্‌তে আস্‌তে সেধেছিল? এদ্দিন কি বাড়ীতে রান্না হয় নি, কেউ খায় নি! এখনি দাদা খেতে আস্‌বে, তার আবার ক্ষিধে সয় না।"

সুমতি যে কেমন করিয়া এত অন্যমনা হইয়াছিল, নিজেই তাহা বুঝিতে পারিল। এখন কি বলিয়া আত্মদোষ স্খালন করিবে! সে কেবল কাতরনেত্রে যামিনীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—"আমার হুঁস্ ছিল না, বউ! নইলে কি এমন হয়!" সে সশঙ্ক, সলজ্জ, করুণ কণ্ঠস্বর শুনিলে পাষাণও বিগলিত হয়। যামিনী আরও শক্ত হইয়া উঠিল। বলিল,—"হুঁস্ ছিল না! কেউ ত মরেনি যে, হুঁস্ ছিল না! ঐ ত দাদা খেতে এল, এখন উনুনের পাঁশ বেড়ে দিক।" সিধু যে বাস্তবিক আহারের চেষ্টায় আসিয়াছিল, তাহা নহে। সে সুমতির নিমিত্ত ইদানীং সর্ব্বদাই শঙ্কিত হইয়া থাকিত,—কখন্ তাহার উপর সুধাবৃষ্টি হয়। যামিনীর ভৈরবকণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়াই সে আসিয়াছিল। তাহার পক্ষে এরূপ আকর্ষণেরও অভাব ছিল না। কিন্তু নিরুপায় সিধু সুমতিকে রক্ষা করিতে পারিত না এবং পারিত না বলিয়া নিষ্ফল রোষে আপনি দগ্ধ হইত। সিধু আসিয়া যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে, দিদি?"

এই দুই ভাই-ভগিনী প্রায় সমবয়স্ক ছিল। পরস্পরকে

দিদি দাদা বলিয়া সম্বোধন করিত। যামিনী কোন উত্তর দিল না। দুঃখে, অভিমানে, আত্মগ্লানিতে সুমতির দুই গণ্ড বহিয়া অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরিতেছিল; দেখিয়া ক্রোধে সিধু ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। কিন্তু অমানুষী উদ্যমে আত্মসংযম করিয়া শান্তস্বরে যামিনীকে পুনঃ প্রশ্ন করিল,—"কি হয়েছে দিদি?" "হবে আর কি, দাদা? তোমার কি কোথাও থল্ নেই, না অন্ন জোটে না, তাই এত হেনস্তা সয়ে এখানে প'ড়ে রয়েছ? যেমন তোমার পোড়া কপাল, তেমনি পোড়া ভাত গেলো!" সুমতি চক্ষুর জল মুছিয়া কাতর-স্বরে বলিল,—"আমায় মাপ কর, বৌ! আর লজ্জা দিয়ো না। আমি কাউকে হেনস্তা করি নি। আমি বড় দুঃখিনী। তোমাদের আশ্রিত। তোমরা মাপ না করলে আমি কোথায় দাঁড়াব? আমি এখনই আবার ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি।" কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়! যামিনী শ্লেষ করিয়া বলিল,—"তুমি ঢের ঢঙের কথা জান, তা জানি!" কিন্তু সুমতি তখন পুনরায় অন্ন প্রস্তুত করিবার জন্য সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। দুর্ব্বল দেহে সুমতির উপর এই নির্য্যাতন! সিধু ভাবিল, আজিকার পাপ অন্ন মুখে দিলে মহাপাতক হইবে। বলিল,—"তুমি ঠাকুরঝিকে ভাত চড়াতে বারণ কর দিদি, আমি আজ আর খাব না—" বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। যামিনী সিধুর অগ্নিময় চক্ষু দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে, ক্ষুধায়, উষ্মায় সিধুর পিত্ত, চিত্ত দুই-ই জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ এসব কথা শ্রীপতির কর্ণগোচর হইবে। সে অন্তরে-অন্তরে পুলকিত হইয়া প্রস্থান করিল। যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া গেল,—"আর কার জন্যে ভাত চড়ান, দাদা ত রাগ ক'রে চ'লে গিয়েছে।"

অন্ন প্রস্তুত হইলে সিধুকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। মনঃকষ্টে সুমতি সেদিন নিরাহার রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, হায়, সেই বৌ!—পিতা জীবিত থাকিতে সুমতির সন্তোষসাধন করা যার একমাত্র কার্য্য ছিল! কতদিন বধূকে সে পিতার তিরস্কার হইতে রক্ষা করিয়াছে! এখন সে তার চক্ষুঃশূল! আর ত সয় না! হা ভগবান্! কেন তুমি আমার এমন দশা করলে? কোথায় যাব? কার কাছে দাঁড়াব? আর ত সয় না! নিত্য-নিত্য কেটে-কেটে নূনের ছিটে আর ত সয় না! কিন্তু না সয়ে করি কি! কোথায় যাই? কোথায় আমার আশ্রয়? বাবা গো, কোথায় তুমি? একবার দেখে যাও, কি ক'রে রেখে গিয়েছিলে, কি হয়ে রয়েছি! আমার এই নবীন বয়স, এই কি আমার কাঁদবার সময়! মেয়ে জন্ম হয়ে কত গয়না কাপড় পরে, সাজগোজ করে। মেয়েমানুষের তুষ্টির জন্য কত সামগ্রীর সৃষ্টি হয়েছে; বলে,—প্রকৃতির ভোগের জন্যই সংসার। কিন্তু আমার জন্য কেবল এই থানকাপড়। ভগবান্! যে হাতে সধবা গড়েছ, সে হাতে কি বিধবাকে গড় নি? তা যদি না গড়ে থাক, তবে তা'কে ক্ষুধা দিয়েছ কেন? তৃষ্ণা দিয়েছ কেন? আশা-আকাঙ্ক্ষা, লজ্জা-ভয় দিয়েছ কেন? তা'র হৃদয়ে ভালবাসার লালসা দিয়েছ কেন? বিধবার বুকে আগুন দিয়েছ কেবল তা'র নিজে-নিজে পোড়্বার জন্য? হায়, সংসারে এত আনন্দ, এত ভোগের সৃষ্টি করেছ, কিন্তু বিধবার জন্য কিছু কর নি? সংসারে কত ভাগ্যবতী খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, খাচ্ছে, পরছে,—আমি কেবল তাই দেখ্বার জন্য এসেছি। আনন্দে সবার হৃদয় ভরপুর, কেবল আমার প্রাণ শূন্য! সংসারে একা ভাসছি, আমার মুখ চাইবার কেউ নেই, মনের দুঃখ বল্বার স্থান নেই, শোন্বার লোক নেই! যদি কেউ দরদ্ ক'রে আমার মুখ চায়, তা হ'লে পাপ। আমি যদি কাউকে ভালবাসি, তা হ'লে ইহলোকে কলঙ্ক, পরলোকে নরক! সংসারে আমার ওপর সবাই বিমুখ, কেবল সিধু নয়। একে কি না ভালবেসে থাকা যায়। আহা, আজ আমারই জন্য খাওয়া হ'ল না।

সুমতির নয়নধারায় ক্রমে দিন বহিয়া গেল। রাত্রি হইল। রাত্রিও ক্রমে বাড়িতেছে। ক্রমে পল্লীভবন নিস্তব্ধ। কিন্তু সিধুর এখনও দেখা নাই। সুমতি ক্রমে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কিন্তু এ কি! দূরে কে গাহিতেছে! কণ্ঠস্বর জড়িত,—যেন সিধুর মত, যেন নয়! স্বর আরও নিকটবর্ত্তী হইল। সুমতি চিনিল, স্বর সিধুরই বটে। সিধু গাহিতেছে—

দিবানিশি মনপিপাসী।
ভুলি আপন ছলে, তুলি গরল ফলে,
নয়নজলে জলে অনলরাশি॥
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, সকলি মিছে;
চাহে না ফিরে—ফিরি তারই পিছে,

ফিরি কুহক ঘোরে, বাঁধা স্বপন ডোরে,
নিরাশা ধ'রে সাধে বিষাদে ভাসি ॥

'দিবানিশি মন পিপাসী'—হায়, এ জীবনে কেবল তৃষ্ণাই সার—ভাবিতে-ভাবিতে সুমতি উঠিল; সিধুর জন্য খাদ্য প্রস্তুত ছিল, লইয়া ধীরে-ধীরে তাহার কক্ষে গেল।

সিধু তখন সুরাপানে ঈষৎ অপ্রকৃতিস্থ। সুমতিকে দেখিয়াই উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"তুমি এখানে কেন? পালাও, পালাও! আমার চেয়ে শত্তুর তোমার কেউ নেই।" সুমতি বলিল,—"আমি যাচ্ছি। আপনি সারাদিন উপস ক'রে আছেন, খান। এই খাবার রইল।" "যাঁর আশ্রয়ে রয়েছি, তিনি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন—তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?' কিন্তু তুমি হাতে ক'রে দিচ্ছ, খেতেই হবে। নইলে যে সংসারে অনাথা বিধবার ওপর পীড়ন হয়, সেখানে জলস্পর্শ করতে নেই।" অপ্রত্যাশিত সহানুভূতিতে সুমতির হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। সহসা অশ্রু-প্রস্রবণ ছুটিল। কিন্তু পাছে সিধুর কাছে কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তজ্জন্য দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল,—সিধু জিজ্ঞাসা করিল,—"যাচ্ছ? একটা কথা ব'লে যাও!—তুমি কি আমাকে ঘেন্না কর?" সুমতি তখন আপনাকে সাম্‌লাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল,—"আপনি আমার একটা কথা রাখবেন, বলুন?"

"রাখব। কিন্তু আমি মাতাল, আমার কথায় বিশ্বাস কি?" সুমতি চুপ্ করিয়া রহিল। সিধু জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?" "আপনি এ বিষ ত্যাগ করুন!" "বিষ খায় কেন জান?" সুমতি ঘাড় নাড়িল- না। "বিষ খায় মর্‌বার জন্যে। আমার দু-ই ভাল। মরি সেও ভাল। বিষে বিষক্ষয় হয় তাও বেশ।" "তা হ'ক্! আপনি এ বিষ খাবেন না।" "তোমার হুকুম্- আর খাব না। কিন্তু আমি কি সাধ করে' খাই? মদ কখন ছুঁই নি। যে খেত, তাকে ঘেন্না করতুম্। ভাবতুম, পয়সা খরচ করে বিষ কিনে খায় কেন? এখন বুঝ্‌ছি, বিষ খাবার দরকার হয়। শোন সুমতি! লেখাপড়া শিখিনি, কিন্তু কুচরিত্র ছিলুম না। রীত-চরিত্র ভাল দেখে এক ভদ্রলোক আদর ক'রে জামাই করলেন। কিন্তু ঠক্‌লেন—তাঁর মেয়ের গুণে। শুনেছি লোকে স্ত্রীকে ভালবাসে। আমি শুনে হাস্‌তুম। মনে কর্‌তুম, সে আবার কি? এতদিন পরিবার নিয়ে ঘর কর্‌লুম, ভালবাসা পেলুমও না, দিলুমও না। স্ত্রীকে দেখ্‌তুম যম, আর ঘর-সংসার নরক। কিন্তু তা'তেও দমিনি। খুব ফুর্ত্তিবাজ ছিলুম। গান-বাজ্‌না, যাত্রা, থিয়েটার নিয়ে আমোদ ক'রে বেড়াতুম। স্ত্রী কাছে এলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যেত। ম'রে গেল, গা জুড়ুল। তার পর কুক্ষণে এ বাড়ীতে এলুম! আমার সব উল্‌টে-পাল্‌টে গেল! এখন বুঝেছি, ভালবাসা হাসির কথা নয়। সত্যি ভালবাসা আছে। আকাশের ফুল নয়, এই মাটীর পৃথিবীর জিনিস! পেলে না ত পেলে না, এল না ত এল না। কিন্তু আসে যদি, বানের মত ছুটে আসে। যে তার টানে পড়ে, তা'কে ওলট্-পালট্, হাবু-ডুবু খাইয়ে দেয়! কোথায় টেনে নিয়ে যায়! কেউ কূল পায়, কেউ পায় না। সত্যিকার ভালবাসা আছে, ভালবাস্‌বার মত লোক আছে, যাকে দেখ্‌লে সুখ, যে কাছে এলে স্বর্গ; কথা কইলে মন উল্‌সে ওঠে, ছুঁলে গায় কাঁটা দেয়।" সুমতি দ্বার-সংলগ্ন হইয়া প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া ছিল, আর তাহার নত-নয়ন দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বহিতেছিল। সিধু বলিল,—"তুমি যাও। আর আমি মদ ছোঁব না। কিন্তু একটা কথা ব'লে যাও, তুমি কি আমাকে ঘেন্না কর?" সুমতি কথা কহিতে পারিল না। এবারও ঘাড় নাড়িল—না। তার পর দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

(৫)

যে বিষ নারীকণ্ঠ উদ্গীরণ করিতে সক্ষম, সে গরল নীলকণ্ঠের কণ্ঠেও বিরল। যামিনীর কথার জ্বালায় সুমতি ক্রমে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

সংসারে একজন নূতন ঝি আসিয়াছে, নিত্য চাল চুরি করে। চোরাই মাল বিক্রয় করিতে গিয়া সে ধরা পড়িল। যামিনী বলিল,—"বাড়ীর গিন্নীর হাতে চাবি, কেমন ক'রে চুরি হ'ল? ষড়্ না-হ'লে হয়! আমরা ত আর ঘাস খাই নি!"

সুমতি এ ঘৃণ্য অপবাদের কোন প্রতিবাদ করিল না। মনে-মনে স্থির করিল—মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে, এই চন্দ্রসূর্য্যালোকিত, পত্রপুষ্পশোভিত, কল-কূজিত মেদিনী হইতে চিরবিদায় লইবার পূর্ব্বে সিধুকে একবার দেখিবে। জীবনের কোন সাধ কখন পূর্ণ হয়

নাই, যে ভালবাসে,—এই দুঃখ-তাপ-যন্ত্রণাপূর্ণ সংসারে যে একমাত্র সুহৃদ্,—তাহাকে একবার চোখের দেখা দেখিবে। ইহাতে যদি কোন পাপ, কিছু প্রত্যবায় থাকে, তবে সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বহৃদয়দর্শী, সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ কি তাহা ক্ষমা করিবেন না? যিনি হৃদয় গড়িয়াছেন, হৃদয়ে তৃষ্ণা দিয়াছেন, কাম্যপদার্থ সৃজন করিয়া হৃদয়ে কামনা দিয়াছেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্—এ ক্ষুদ্র ধূলিকণার বিদ্রোহ কি তিনি মার্জ্জনা করিবেন না? সুমতি ছাদের উপর আসিয়া বিহ্বলপ্রাণে নিভৃতে কাঁদিতে বসিল। আদরে চন্দ্রকর তাহার বদন চুম্বন করিল। সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত পবন কাণে-কাণে কত কথা কহিল। কিন্তু সুমতি শান্ত হইল না। অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আকাশে নক্ষত্র হাসিতেছে, ধরাতলে ফুল। জলে-স্থলে, গগনে পবনে হাসির ছড়াছড়ি! ভগবান্, তোমার এই সৌন্দর্য্যের রাজ্যে, হাসির উৎসবে, সৌন্দর্য্যের সারভূতা এই সুন্দরীর চক্ষে জল কেন? হায়, কেন এ সোণার প্রতিমা গড়িয়াছিলে? সোহাগমন্ত্রে কেহ ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিল না; প্রেম-প্রীতির পুষ্প-চন্দনে পূজা হইল না; কেহ আদরের অঞ্জলি দিল না; আঁখি-দীপে অনুরাগ-শিখা জ্বালিয়া আরতি করিল না; হইল শুধু সর্জ্জন আর বিসর্জ্জন!

নিষ্ঠুর সংসার চোর বলিয়া বিদায় দিতেছে,—সুমতির চক্ষু দিয়া দরদর-ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। হায়, কেন আমি জন্মিয়াছিলাম! এ ব্যর্থ-জীবনভার বহন ক'রে কি ফল! কেবল তাপ আর তৃষ্ণা—তবে এ মরুভূমিতে বাস করি কোন্ সুখের আশায়? শান্তি? সিধুকে যেদিন দেখেছি, সে দিন তাও গিয়েছে! তবে আর কেন প্রাণ রাখি? আমি মর্‌ব। কিন্তু আর একবার সিধুকে দেখে, মুখে নয়, চোখে-চোখে তার কাছে বিদায় নিয়ে যাব। হায়, এত দুঃখ, তবু এ প্রাণের মমতা যায় না। এই চাঁদের আলো, শীতল বাতাস, ফুলের গন্ধ, ঐ আকাশভরা তারা,—এ সব ছেড়ে যেতে প্রাণ কেমন ক'রে ওঠে! শুনেছি, যমপুরী অন্ধকার—উঃ, মনে হ'লে ভয় করে! যারা আমার মতন দুঃখে মরেছে, সংসার যাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে মাথায় কলঙ্কের ডালি দিয়ে বিদায় দিয়েছে,—তা'রা সব কোথায় আছে, কে জানে! যদি কারুর দেখা পেতুম—

সহসা অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে মনুষ্যের ছায়াপাত হইল। সুমতি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

সিধু বলিল,—"ভয় নেই, আমি। শোন সুমতি! এত অত্যাচার তুমি কেমন ক'রে সহ্য কর্‌ছ, জানিনি! কিন্তু আমি ত আর পারিনি!" "কি কর্‌ব? উপায় কি?" "উপায় কি? এখান থেকে চ'লে যাও।" "কোথায় যাব? কে আমায় আশ্রয় দেবে?" সিধু কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল,—"সুমতি, আমার একটা কথা শুন্‌বে?"

সুমতি সিধুর মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। সিধু বলিতে লাগিল,—"শোন। চল, আমরা কাশী চ'লে যাই।" "ছি ছি; লোকে কি বল্‌বে!" "সে কথাও আমি ভেবেছি। সুমতি, আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার মন তা জানে। তুমি যদি রাজি হও, আমি শাস্ত্রমতে ধর্ম্মতঃ তোমায় বিবাহ করি। তুমি মনে ক'র না, তোমাকে নিরুপায় দেখে, বাগে পেয়ে আমি এসব কথা বল্‌ছি। আমি বিবাহ কর্‌ব, কিন্তু তোমার কাছে আস্‌ব না, তোমায় ছোঁব না। শুধু তোমায় রক্ষা কর্‌বার অধিকারটুকু আমায় দাও। আমি আর কিছু চাইনি। কেবল তোমার অভিভাবক হব। যাতে তুমি সুখে থাক, তাই কর্‌ব। তোমাকে এই অত্যাচারের হাত থেকে, লোক-নিন্দে থেকে বাঁচাবার জন্যে কেবল এই অধিকারটুকু আমায় দাও।"

সিধু সুমতির সম্মুখে জানু পাতিয়া বলিতে লাগিল,—"আমার কথা রাখ। আমাকে বিশ্বাস কর! আমায় দয়া কর!" "ছি ছি, কি কর, ওঠ!" "না, তুমি যতক্ষণ না উত্তর দেবে, আমি উঠ্‌ব না। কিন্তু ভয় নেই, তুমি যা বল্‌বে, আমি মাথা পেতে নেব।" সুমতি মৃদুস্বরে বলিল,—"আমি কি বল্‌ব!" "বেশ! শোন! আমি কাল দেশে যাব। আমার যা জমি-জমা আছে, একটা বিলি-বন্দোবস্ত ক'রে কিছু টাকা নিয়ে আস্‌ব। যদি তুমি রাজি হও, পরশু এমনি সময় খিড়কীর বাগানে থেক। আমি গাড়ী ঠিক ক'রে রাখ্‌ব। তোমায় নিয়ে কাশী যাব। সেইখানে বিবাহ হবে। কেমন, এই কথা রইল?" সুমতি মাথা নাড়িল—হাঁ। সিধু ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল। সুমতি ভাবিতে লাগিল, হয় যম, নয় সিধুকে বরণ করা ভিন্ন তাহার অন্য গতি নাই।

(৬)

আজিও আবার তেমনি রাত্রির উদয় হইয়াছে—তেমনি অস্পষ্ট ছায়ালোকময়ী। পৃথ্বী তেমনি ঝিল্লীরবামোদিনী। মন্দপবনে বৃক্ষপত্র তেমনি দুলিতেছে। তেমনি কম্পিত পত্রের মত ভয়-উদ্বেগ-আন্দোলিত হৃদয়ে সুমতি অতি সন্তর্পণে খিড়্‌কীর বাগানে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই পরিত্যক্ত, পতিত ভূখণ্ডকে উদ্যান বলিলে ইহার গৌরববৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য সযত্নরক্ষিত উদ্যানের মানহানি ঘটে। শ্রীহীন, প্রাচীন বংশের মত ইহার আছে কেবল নাম, আর পূর্ব্বসম্পদের চিহ্নস্বরূপ গোটাকতক সন্ধ্যামণি, একটা করবী, আধখানা কৃষ্ণচূড়া এবং তিন-চারিটি খুব বড়-বড় যুঁইফুলের ঝাড়—তাহাতে দরিদ্রের বংশবৃদ্ধির মত অজস্র ফুল ফুটে।

সুমতি রিক্তহস্তে, একবস্ত্রে আসিয়া এই যুঁইঝাড়ের আড়ালে বসিল। তাহার হাত-পা কাঁপিতেছে, বুকের ভিতর গুর্‌গুর্ করিতেছে,—স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস পড়িতেছে না, পাছে সুপ্ত সংসার জাগিয়া উঠে।

সুমতি ভীতিবিহ্বল নেত্রে একবার নিদ্রিত পিতৃ-ভবনের পানে চাহিল। এই গৃহে সে জীবনের প্রথম আলোক দেখিয়াছে, প্রাণবায়ু গ্রহণ করিয়াছে। এই গৃহ তাহার চির-আশ্রয়,—আজ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। ইহার প্রত্যেক ধূলিকণার সহিত তাহার আজন্মের পরিচয়। সুমতির মনে পড়িল, এই কয়টী যুঁইয়ের গাছ তাহার পিতৃহস্তরোপিত। ঐ কৃষ্ণচূড়ার তলে সে কত খেলিয়াছে, ঐ করবীর ফুলে ছেলেবেলা কত মালা গাঁথিয়াছে। সুমতির বাপকে মনে পড়িল, মাকে মনে পড়িল; আর আজিকার এই জ্যোৎস্নার মত আর একখানি কচি মুখের হাসি তাহার মনে পড়িল। এই মুখখানি সুমতির একটী ছোট ভাই ছিল—তাহার। সুমতির চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আশৈশব সুখে-দুঃখে পুণ্যস্মৃতিমণ্ডিত এই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আজি সে কোন্ রহস্যময় অভিসারে, অজ্ঞাত পথে যাত্রা করিতে চলিয়াছে! লোকের সংশয়-দৃষ্টি এড়াইতে আজিও সে তাহার ক্ষুদ্র কক্ষে ক্ষুদ্র শয্যা পাতিয়াছে, কিন্তু আজিকার এই বিনিদ্র রজনীর কোন্‌খানে অবসান হইবে?

সিন্ধুলহরীবৎ সুমতির হৃদ্‌সাগরে চিন্তাতরঙ্গ উঠিতেছে, ডুবিতেছে, চিত্ত মথিত করিতেছে। একবার ভাবিল, সিধু আসিলে বলিবে—তুমি ফিরিয়া যাও, আমি শমনকেই বরণ করিব। সর্ব্বদুঃখহর, সর্ব্বশান্তির আকর, অব্যর্থ-নির্ভর, তাপিতের বন্ধু, অমৃতের সিন্ধু, সর্ব্বভয়ত্রাতা, সর্ব্বভয়দাতা, অনন্যশরণ শমন সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিব,—তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, কর্ম্মফলদাতা বিধাতা, আমায় বলিয়া দাও, কি পাপে আমার ভাগ্যে এ দণ্ড লিখিয়াছ? আমাকে অতুল রূপরাশি দিয়া, সোণার প্রতিমা সাজাইয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলে—কেবল কি বহ্নির ক্ষুধা-পরিতৃপ্তির জন্য? কি অপরাধে আমার এ শাস্তি? আমার নিত্য নির্য্যাতন, চোরের কলঙ্ক কি তোমার ন্যায়-বিচার? আমাকে নারী গড়িয়াছ; কিন্তু যাহাতে নারীর পুণ্য, জীবন ধন্য হয়, সেই আত্ম-নিবেদনের চরিতার্থতা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছ কেন? আমাকে ভোগের বাসনা দিয়াছ, তৃপ্তির সুযোগ দাও নাই; সুখের লালসা দিয়াছ, চরিতার্থতার অবসর দাও নাই; রাজ্ঞীর আসনে বসাইয়াছ, রাজ্য দাও নাই; গৃহী করিয়াছ, গৃহ দাও নাই; পূজার উপকরণ দিয়াছ, দেবতা দাও নাই! এ কি বিড়ম্বনা? আবার বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা—আমার লুব্ধ দৃষ্টির সমক্ষে এ প্রলোভন কেন? খণ্ডিতা, লুণ্ঠিতা লতায় আবার ফুল ফুটাইতেছ কেন? কেন আশাশূন্য হৃদয়ে আবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইতেছ? তৃষ্ণার্ত্তের সম্মুখে অমৃত-কলস ধরিতেছ? আমি ত বেশ ছিলুম, কেন সিধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাইলে? এ কি তোমার পরীক্ষা? ঠাকুর, আমার এই নবীন বয়স, প্রবৃত্তি প্রবল, লালসা চঞ্চল, জ্ঞান দুর্ব্বল, মতি অস্থির। আমাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য কেহ কখন শিখায় নি। ঠাকুর, আমাকে বলিয়া দাও,—আমার এ ব্যর্থ বিধবা-জীবনের সার্থকতা কি, কর্ত্তব্য কি? এ সংসারে কোথায় আমার আশ্রয়, কি আমার অবলম্বন? হে ঠাকুর, আমায় দয়া কর।—বলিয়া সুমতি সজল নয়নে আকাশের পানে চাহিল। মনে হইল, গগন সহস্রলোচন উন্মীলন করিয়া অপার্থিব করুণাভরে তাহাকে দেখিতেছে! তখন সেই বিমূঢ়া, বিহ্বলা, ব্যথিতা মর্ম্মপীড়িতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য শশধর যেন শীতলতর করবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুঃখিনীর দুঃখে উচ্ছ্বসিত পবন যুথিবন মন্থন করিয়া স্নিগ্ধ সৌরভ আনিয়া উপহার দিল। সে নিবিড় মদির গন্ধ সুমতির উত্তপ্ত মস্তিষ্কে হিমশীতল চন্দনের ন্যায়

প্রলিপ্ত হইল। সুমতি সংসার ভুলিয়া, সিধুকে ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া সেই সৌরভে যেন বিভোর হইয়া রহিল। থাকিতে-থাকিতে তাহার মনে হইল, যেন কোথায়, কবে সে এমনি সৌরভে একদিন বিভোর হইয়াছিল! একাকিনী নয়, সঙ্গে যেন আর একজন কে ছিল। তা'কে যেন মনে পড়ে, পড়ে না! যেন বিস্মৃত সঙ্গীতের মত, স্বপ্নে দেব-দর্শনের মত আধ-আধ, আবছা-আবছা কি মনে হয়! সেও এমনি উজ্জ্বল রাত্রি। উৎসব-কোলাহল সব নিস্তব্ধ। কেবল ঝিল্লীর সনে একতানে মিলিয়া দূরে কি সুরে সানাই বাজিতেছে। বাহিরে চাঁদের আলো। ঘরে দীপের আলো, আর সে আলোর চেয়ে উজ্জ্বল, দুটী প্রেমপূর্ণ চোখের আলো। ঘরে যূথিকার এমনি নিবিড় সৌরভ। সে দিন সে ঘরে যে ছিল, আজ সে কোথায়? সুমতির মনে হইল, যেন চারিদিকে বৃক্ষপত্র সকল তরতর-সরসর করিয়া হায়-হায় করিয়া উঠিল—সে কোথায়, সে কোথায়! হায়, আজি সে কোথায়?

যামিনীর অন্ধকারে ঊষার অরুণরাগ বিকশিত হইয়া যেমন বিশ্বচিত্র প্রকাশিত করে, একে-একে সুমতির স্মৃতি তেমনি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে দিন সে উজ্জ্বল আলোক-শোভিত, যূথিগন্ধ-আমোদিত ঘরে যে ছিল, সেই কুসুম-চন্দন-চর্চ্চিত সুকুমার পুরুষ সুমতির ছোট হাত দুখানি ধ'রে, কোলের কাছে টেনে এনে, চোখে-চোখে চেয়ে বলেছিল,—'তুমি যেমন সুন্দর, আমি তেমনি কালো, আমায় কি তুমি ভালবাস্‌তে পার্‌বে?' ভালবাসা কি—সুমতি তখন ভাল জানে না। এক রকম খেলা মনে ক'রে, কৌতুকে হেসে বলেছিল—'পারব!' 'আমায় চিরদিন এমনি ভালবাস্‌বে?' —'বাস্‌ব।' 'আর যদি ম'রে যাই?' বালিকা এ কথার উত্তর জানে না। তার পর সে পুরুষ—সে মানুষ কি দেবতা, সুমতি ঠিক তাহা বুঝিতে পারিতেছে না—সে পুরুষ সুমতিকে বুকে টানিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিল। সে চুম্বন স্মরণ করিয়া আজিও সুমতির সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠে! সুমতিকে বুকে লইয়া সে পুরুষ বলিয়াছিল—বলিয়াছিল কি না ঠিক মনে নাই,—তাহার বুকে মুখ রাখিয়া তাহার বক্ষঃস্পন্দনে সুমতি যেন শুনিয়াছিল—সে হৃদয় বলিতেছে—আমি তোমার, আমি তোমার, জীবনে-মরণে আমি তোমার! নক্ষত্রখচিত, নির্ম্মল গগন পানে চাহিয়া সুমতির শূন্য হৃদয় যেন হাহাকার করিয়া উঠিল,—হায়, আজি সে কোথায়? অমনি শূন্য গগন যেন প্রতিধ্বনি করিল—সে কোথায়, সে কোথায়, সে কোথায়!

তখন সেই স্মৃতি-বিহ্বলা, বিষাদিনী ব্যাকুলা হইয়া বলিয়া উঠিল,—"ও গো, কোথায় তুমি? কোথায় তুমি? বলেছিলে, জীবনে-মরণে তুমি আমার! হায়, কোথায় তুমি? কোথায় তুমি?"

এ কি! এ কি! যূথিবন মর্ম্মরিত করিয়া কার সুরভি দীর্ঘশ্বাস সমীরণে মিশাইয়া গেল? সুমতি চকিত হইয়া বলিল,—"কই গো, কই? কোথায় তুমি? এখনও কি তুমি আমায় ভালবাস? জীবনে-মরণে কি তুমি আমার? সত্যই আমার? আমার কাছে-কাছে আছ? কৈ? কোথায় তুমি?" আবার সেই যূথিবন মর্ম্মরিত করিয়া পবনোচ্ছ্বাস! সুমতি উন্মাদিনীর ন্যায় বলিতে লাগিল,—"কোথায়? কোথায়? দেখা দাও, আমি বড় কাতর, আমায় দেখা দাও। আমি তোমায় ভুলে আছি ব'লে কি অভিমান করে লুকিয়ে আছ? কৈ, একদিনও ত আমায় মনে পড়িয়ে দাও নি। তোমার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে এসেছি ব'লে কি রাগ করেছ? আজ আমার বড় বিপদ, আর অভিমান ক'রে থেক না। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেইখানে যাব। তুমি আমার চিরদিনের দেবতা, ক্ষণিক দেখা দিয়ে লুকিয়েছ, আমি চিন্‌তে পারিনি। আর আমার উপর রাগ ক'রে অকূল সাগরে আমায় ভাসিয়ে দিয়ো না। আমি বড় দুঃখিনী। আমি বুঝ্‌তে পারি নি, তাই অমৃতসিন্ধু থাক্‌তে অন্ধকূপে ডুব্‌ছিলুম!"

সুমতি অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে-কাঁদিতে তাহার মনে পড়িল, কুসুম-শয্যায় সেই দিব্য-পুরুষের অন্তিম শয়ন। সেই বিসূচিকা-রোগক্লিষ্ট মুখমণ্ডল; সেই শয্যা-কণ্টক, সেই বিশ্বশোষী পিপাসা, আর তা হ'তেও অধিকতর—সেই মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন চক্ষুতে অনন্ত প্রেমপিপাসা। মনে পড়িল, চরম সময় ক'নে-বধূর কচি হাত দু'খানি ধরিয়া সেই কাতর প্রার্থনা: ভুল না; আমায় ভুল না, আমি তোমার, জীবনে-মরণে আমি তোমার! আরে রাক্ষসী, এতদিন কেমন করিয়া ভুলিয়া ছিলি?

তার পর মনে পড়িল, সুমতির মুখ দেখিতে-দেখিতে

চক্ষুর সেই চিরনিমীলন। সুমতির হৃদয় আবার হাহাকার করিয়া উঠিল! যূথিবনে আবার সেই মর্ম্মরিত দীর্ঘশ্বাস!

সুমতি ধূলায় লুটাইয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিল, আর ভুলব না, আর তোমায় ভুলে থাক্‌ব না। আমি নিত্য তোমার ধ্যান করব। নিত্য নয়নজলে তোমার পূজা করব। যে গৃহে তোমার পদধূলি পড়েছে, সে আমার পরম তীর্থ। আমি সেখানে যাব। নিত্য সেই তীর্থের রজ গায় মাখ্‌ব। তুমিই আমার আশ্রয়! জীবনে-মরণে তুমিই আমার পরম অবলম্বন! এস প্রভু! আর আমার হৃদয়-মন্দির শূন্য ক'রে থেক না।

নদীয়ার উটজ শিল্প *

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সরকার বি-এ

ও

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এ]

নদীয়ার শিল্প-বিদ্যার বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, আমরা পাঠকগণকে পূর্ব্বেকার শিল্প বিদ্যা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলিব। শিল্প বিদ্যা অপেক্ষা সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থান বলিয়া নদীয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। তাহা হইলেও নদীয়ার কতকগুলি শিল্প উল্লেখযোগ্য। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনায় স্থির হইয়াছে যে, নদীয়া-জেলার অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা ৫৬ জন কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, নদীয়া জেলায় কৃষকের সংখ্যাই বেশী। শতকরা ১৫.৮ জন বিভিন্ন শিল্প-কার্য্যের সাহায্যে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। ধীবর ও মৎস্য-ব্যবসায়ী, গোপ ও দুগ্ধ বিক্রেতা, তন্তুবায়, তৈলক ও ধান্যাদি শস্য-ব্যবসায়ীরা উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২৩ জন চাকরীজীবী, এবং শতকরা একজন বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত থাকে।

নদীয়ার শিল্প-সমূহের মধ্যে বস্ত্রবয়ন সমধিক প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে শান্তিপুরের নাম উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শান্তিপুর উৎকৃষ্ট বস্ত্রবয়নের কেন্দ্রস্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কয়েক বৎসর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখান হইতে বাৎসরিক ১৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের কাপড় খরিদ করিতেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে প্রচুর পরিমাণে সুলভ মূল্যের বস্ত্র আমদানী হওয়ায়, লোকে উহাই সমধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে লাগিল; সেই জন্য শান্তিপুরের বস্ত্রবয়ন-কার্য্যের বিশেষ অবনতি ঘটিল। অনন্তর ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতী সূতার প্রচলন হওয়ায়, শান্তিপুরের বস্ত্রব্যবসায়ীদের সমূহ ক্ষতি হয়। বিলাতী সূতার আমদানীতে দেশীয় সূতার ব্যবহার একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট লেখেন, "প্রায় সমগ্র জেলার গ্রামগুলিতে সামান্য কয়েক ঘর জোলা অতি সাধারণ ধরণের কাপড় প্রস্তুত করে। উহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে; এবং বিলাত বস্ত্র-ব্যবসায় প্রচলিত হওয়ায়, লোকে ঐ বিলাতী কাপড় সুলভ মূল্যে ক্রয় করিতেছে। সুতরাং ইহাদের ব্যবসায় আর পূর্ব্বেকার মত চলিতেছে না।" শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালি, হরি-নারায়ণপুর, মেহেরপুর, নবদ্বীপ, বালিয়াডাঙ্গা ও কৃষ্ণনগর বস্ত্র-ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল বলিয়া বিখ্যাত। কেবল শান্তি-পুরই উৎকৃষ্ট ধুতি ও সাড়ির জন্য প্রসিদ্ধ,— শান্তিপুরের ধুতিই এই স্থানের বিশেষত্বের পরিচায়ক। শান্তিপুরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য প্রায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জনৈক লেখক তাঁহার 'বঙ্গদেশে বয়ন-শিল্প' নামক প্রবন্ধে বলেন, "শান্তিপুরে বাৎসরিক সওয়া তিনলক্ষ টাকার কাপড় প্রস্তুত হয়।" এই কথাটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, গত দশ বৎসরের ভিতর শান্তিপুরে বস্ত্রবয়ন-কার্য্যের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। *

---

* অনুসন্ধান-কার্য্যে শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র ঘটক বিশেষ সাহায্য করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত আর, এন, গিলক্রাইষ্ট, ও মিণ্টো প্রফেসর শ্রীযুক্ত সি, জে, হ্যামিলটন্ প্রবন্ধ লিখিতে উৎসাহ দিয়াছেন।

* নদীয়া গেজেটিয়ার দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে আমরা এখানকার পিত্তল-শিল্পের বিষয়ে আলোচনা করিব। এই শিল্প সাধারণতঃ পূর্ব্বস্থলী, নবদ্বীপ, মেটিরী, মুড়াগাছা, দাঁইহাট এবং মেহেরপুরে সমধিক পরিমাণে চলিয়া থাকে। পিত্তলের সামগ্রী গঠন করিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির প্রয়োজন,—পিত্তল, তাম্র, দস্তা, সীসা এবং কাংস। পিত্তলের পুরাতন দ্রব্যগুলি নূতন সামগ্রী প্রস্তুত করিবার উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে ৫০০৲ হইতে ১৫০০০৲ পর্য্যন্ত মূলধন আবশ্যক হয়। শ্রমজীবীরা "ফুরণ" হিসাবে কার্য্যের পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে।

অতঃপর এই জেলার চিনি-প্রস্তুত-প্রণালী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাশ্চাত্য প্রথায় চিনি প্রস্তুতের চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। শান্তিপুর ও আলমডাঙ্গায় কয়েকটি চিনির কারখানা আছে। সেখানে দেশীয় প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হয়। চিনি প্রস্তুত করিতে জলীয় শৈবাল ব্যবহৃত হয়। উৎপন্ন সকল চিনিই প্রায় খর্জ্জুর বৃক্ষের রস হইতে প্রস্তুত হয়।* কেহ-কেহ বলেন যে, দেশীয় প্রণালীতে অপচয়ের ভাগ খুব বেশী। এই প্রণালীর উন্নতি সাধন করিতে হইলে, যাহাতে গুড় ও রস অধিক পরিমাণে নষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মিঃ গ্যারেট তাঁহার গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন, "নদীয়াতে গাছের আঁশ (fibre) কিম্বা বেত হইতে মাদুর এবং ধামা নির্ম্মাণ-কার্য্য নাই বলিলেও হয়।" কিন্তু ইহা সত্য নয়। এই জেলার রাণাঘাট সাব্‌ডিভিসানে বেত হইতে প্রচুর পরিমাণে ধামা, পালি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এই বেত "গঙ্গার পারে" জন্মিয়া থাকে। এই বেতের দ্বারা যে ধামা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তাহা বিক্রয় করিয়া বিক্রেতার অধিক লাভ থাকে না, এবং এইরূপ ধামা প্রভৃতি বাজারে অধিক বিক্রীত হয় না। আসামে যে বেত জন্মে, তাহা এই বেতের তুলনায় উৎকৃষ্ট-তর। "পালি" নদীয়া জেলায় উৎপন্ন বেত হইতে প্রস্তুত হয়; কারণ, ইহা নিকৃষ্ট বেতে প্রস্তুত করিলেও চলিতে পারে। এই ব্যবসায়ে তিনশত হইতে পাঁচহাজার, এমন কি, কুড়িহাজার টাকা পর্য্যন্ত মূলধন আবশ্যক হয়। মাড়োয়ারী মহাজনেরা ধামা প্রস্তুতকারীদের নিকট সুদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বেত সরবরাহ করে এবং এই শিল্পীরা তাহাদের ধামা প্রভৃতি বিক্রয়ের টাকা হইতে মহাজনের ঋণ পরিশোধ করে। ইহারা কখনও ধারে বিক্রয় করে না। প্রত্যেক শ্রমজীবীর দৈনিক মজুরী চারি আনা। প্রত্যেক শ্রমজীবী প্রত্যহ চারিটি কিম্বা পাঁচটি করিয়া ধামা প্রস্তুত করে। এই সকল শ্রমজীবী বলে যে, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া পরিশ্রম করিয়াও সংসার চালাইতে পারে না। মূলধন এবং সুলভ মূল্যে ধামা প্রস্তুত করিবার উপাদান পাইলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল হইত।

কৃষ্ণনগরের মাটীর কাজও বিশেষ প্রসিদ্ধ।* কৃষ্ণনগরের সন্নিকটে ঘূর্ণি নামক স্থানে অত্যুৎকৃষ্ট মাটীর দ্রব্য সকল প্রস্তুত হয়। এই সম্পর্কে প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত যদুনাথ পালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃৎশিল্পিগণের নির্ম্মিত প্রতিকৃতি, মূর্ত্তি ও পুতুল য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে। এই স্থানে এই প্রসিদ্ধ শিল্পের অভ্যুদয় কিরূপে হয়, তাহা আমরা সবিশেষ অবগত নহি। (গত চৈত্র, ১৩২৩, সংখ্যা "ভারতবর্ষে" যদুনাথ পাল ও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।) কিন্তু আমরা যদি অনুমান করিয়া লই যে, নদীয়ার মহারাজগণ এখানে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের বিশেষ অন্যায় হইবে না।†

অতঃপর কৃষ্ণনগরের "ডাকের সাজ" শিল্পের বিষয়ে দু' একটী কথা বলিব। ইহা স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যনির্ম্মিত তারের কারুকার্য্যের ন্যায়, এবং হিন্দুদিগের প্রতিমার অঙ্গাভরণ রূপে ব্যবহৃত হয়। কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী উলা নামক স্থানে এই শিল্প সর্ব্বপ্রথমে প্রচলিত ছিল, এইরূপ শুনা যায়; কিন্তু আজকাল দেশের সর্ব্বত্রই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ডাকের সাজ ও মেটে সাজ নির্ম্মাণে ভারতবর্ষের কোন শিল্পী কৃষ্ণনগরের কারিকরদের সমকক্ষ

* দক্ষিণ বাংলায় তালগাছের রস হইতে চিনি তৈয়ারী করা হয়।

* পুতুল ও প্রতিমা নির্ম্মাণে শিল্পীরা বাস্তব প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। দু'একখানি প্রতিমা পুরাতন ভারতীয় শিল্পের আদর্শে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব এখানেও দেখা যায়।

† এ বিষয়ে "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্" দ্রষ্টব্য।

নয়। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, উপরিউক্ত শিল্প-দুটিতে স্ত্রীলোকেরাও সাহায্য করিয়া থাকে। য়ুরোপীয় মহা-সমরের পূর্ব্বে সাজের উপকরণ জার্ম্মাণী ও বেলজিয়াম হইতে আমদানী হইত; এক্ষণে ঐ উপকরণ উচ্চদরে ফ্রান্স হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। যাহারা "মেটে সাজ" এবং "ডাকের সাজে"র কাজে লিপ্ত, তাহাদের এক্ষণে বড়ই দুঃসময় পড়িয়াছে।

এই মুখবন্ধেই আমরা আমাদের প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করি। অতঃপর আমরা নদীয়ার উটজ শিল্পের বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অন্যান্য অনেক শিল্প বিষয়ে আলোচনা করা হয় নাই। তাহাদের বিষয় পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সবিশেষ উল্লেখ করিতে পারিব, আশা করি। *

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে নদীয়া সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

গৃহ-প্রাঙ্গণ

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

পল্লীগ্রাম; ইহারই মধ্যবর্ত্তী বিরল-পথিক একটি ক্ষুদ্র পথ। এই পথের পাশে আম্রচ্ছায়াতলে আমার নিভৃত, নির্জ্জন গৃহ; তাহারই সম্মুখে আমার আঙ্গিনা। কিন্তু এই ক্ষুদ্র আঙ্গিনার নীরব সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ। এই প্রাঙ্গণে বসিয়া কতদিন আমি শোকে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি, দুঃখকে স্বাগত-সম্ভাষণে বুকে টানিয়া লইয়াছি, দারিদ্র্যের পীড়নে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছি;—আনন্দে অধীর হইলে কতদিন এই আঙ্গিনায় বসিয়া সংযমের কঠিন নিগড়ে হৃদয়ের উদ্দাম গতির অবরোধ করিয়াছি।

পরিস্কার, ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে, অল্পপরিসর প্রাঙ্গণ। একপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ যূথিকা-ফুলের গাছগুলি শোভা পাইতেছে। আঙ্গিনার মধ্যস্থলে ছায়াঘন, শাখাপ্রসারী, নিবিড়-পল্লব ছোট একটি কাঁটাল-গাছ অবস্থিত। অপর পার্শ্বে দুইটি পুরাতন আম্র ও একটি নারিকেল-বৃক্ষ। এ কয়টিতে কিন্তু আমার আঙ্গিনার বড় সুন্দর শ্রী, অপূর্ব্ব শোভা। একটি নারিকেল ও একটি আম্রবৃক্ষ এমনি সুষ্ঠু-রূপে অবস্থিত যে, তাহাদিগকে দেখিলেই মন হর্ষে পুলকিত ও বিস্ময়ে চমকিত হইয়া উঠে। দুইটী বৃক্ষ-হৃদয়ে যেন কত সদ্ভাব, সহৃদয়তা ও সহানুভূতি বর্ত্তমান। দুইজনের মধ্যে যেন কত নিকট সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। দুইজনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া ভূমি হইতে উদ্গত হইয়াছে; পরে যত আকাশের পানে উর্দ্ধমুখে উঠিয়াছে, ততই তাহাদের সেই প্রগাঢ় পরিরম্ভ শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশ ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যেন মানব-হৃদয়ের সহানুভূতি বিদ্যমান, তাই যেন তাহারা সলজ্জ, সরম-সঙ্কুচিত। দেখিলেই মনে হয়, যেন ইহাদের মধ্যে কত দিনের আকর্ষণ, কত যুগের পরিচয়।

ইহাদের এই প্রেম-বন্ধনটিকে আরও দৃঢ় করিবার জন্য স্বহস্তে ইহাদের শরীরে একটি মালতীলতার বন্ধন-মালিকা জড়াইয়া দিয়াছি। সে কত সোহাগে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাতাসের মৃদুস্পর্শে শিহরিয়া উঠিয়া সে সহকার-শাখাকে আলিঙ্গন করে; তরুশাখা সস্নেহে তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার ভীতি অপনোদিত করে। দুরন্ত সমীরের দুর্দ্দান্ত ঘাত-প্রতিঘাতে মূর্চ্ছিতা হইয়া সে নারিকেলের দেহে আছড়াইয়া পড়ে; নারিকেল তরুর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; সে স্থির হইয়া ঝটিকার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকে এবং কিসে মালতীলতার মূর্চ্ছা ভাঙ্গে, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করে।

এই ত গেল আমার ক্ষুদ্র আঙ্গিনার নীরস বর্ণনা। পাঠকের নিকট ইহা সৌন্দর্য্যহীন, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে বাস্তবিকই আমি এক ব্যাপক সৌন্দর্য্যের বিপুল বিকাশ দেখিতে পাই। সে সৌন্দর্য্যে যুগপৎ উপভোগ ও অনুভূতির উপাদান আছে। এই আঙ্গিনা ও আমার মধ্যে বেশ একটি আকর্ষণ-রজ্জুর বাঁধন পড়িয়াছে। শত চেষ্টাতেও সে মোহের, সে স্নেহের, সে প্রেমের বাঁধন আমি ছিঁড়িতে পারি না। যখনি আমি তাহার বুকের নিভৃত

প্রদেশটি ছাড়িয়া পলাইতে যাই, তখনি সে যেন জীবন্ত, প্রাণময় হইয়া বর্দ্ধিত বলে আমাকে আকর্ষণ করিতে থাকে; আর দুর্ব্বল, অনুগত ভৃত্যের মত আমি ধীরে-ধীরে তাহার বুকের কাছটিতে ফিরিয়া আসি। প্রত্যাগত আমাকে অমনি সে যেন কত আদরে, সোহাগে, স্নেহে, যত্নে, প্রেমে, ভালবাসায়, মায়া-মমতায়, ঘিরিয়া, ঢাকিয়া মন্ত্র-মুগ্ধ করিয়া ফেলে। তাহার সহিত আমার যেন জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ, যুগ-যুগান্তের পরিচয় ও ভালবাসা।

ঋতু-বিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে আমার আঙ্গিনার সৌন্দর্য্যেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। সকল ঋতুই তাহাদের বিবিধ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির একটু ছায়া, খানিকটা আভাষ আমার এই ক্ষুদ্র গৃহ-প্রাঙ্গণটির উপর রাখিয়া যায়; এবং তাহাই আমার সৌন্দর্য্যোপভোগতৃষ্ণা মিটাইয়া দেয়।

আমার এই নির্জ্জন প্রাঙ্গণে বসিয়া চারিদিকে শরতের শ্যামল শোভা দেখিতে পাই। নির্ম্মল শারদ-গগনে শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি ভাসিয়া বেড়ায়; নিম্নে ছায়াতলে বৃন্ত-রঙ্গীন শেফালির রাশি ঝরিয়া পড়ে। ফুল ছুঁড়িয়া বাতাসে উড়াইয়া দিই,—মেঘ সরিয়া যায়, অবসন্ন ফুল ধীরে-ধীরে ধরিত্রীর গায়ে লুটাইয়া পড়ে।

বসন্তে আমার আঙ্গিনায় কত ফুল ফুটে, দিকে-দিকে কত সৌরভ ছুটে। বসন্তের উন্মাদ পবন সে সৌরভে স্নাত হইয়া আত্মহারা হইয়া যায়। মধুপানলুব্ধ অলির মৃদুগুঞ্জনে প্রাঙ্গণখানি মুখর হইয়া উঠে। তাহাদের মসীকৃষ্ণ অঙ্গরাগে পুষ্প-পরাগ লাগিয়া যায়,—আনন্দে অধীর হইয়া ছুটাছুটি করে। মন্দানিলস্পর্শে সোহাগভরে কত ফুল ঝরিয়া পড়ে। আমার আঙ্গিনার সেই অপূর্ব্ব বাসন্তী-শ্রীমণ্ডিত মূর্ত্তিখানি বধূর বেশে আমার ক্ষুদ্র মন হরণ করিয়া লয়।

উচ্ছল যৌবনলাবণ্য লইয়া বর্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়। চারিদিকের জলাশয় ও জলপথগুলি পরিপূর্ণ হইয়া ঢলঢল করিতে থাকে। কত মল্লিকা ও যূথিকা ফুল প্রস্ফুটিত হয়। আর আমার সাধের মালতীলতা প্রস্ফুট, শুভ্র কুসুম-রাজিতে ভরিয়া উঠে। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সারা প্রাঙ্গণটিতে ঝরা-ফুল বিছাইয়া থাকে। মনে হয়, কে যেন তাহার কোমল হস্তে কুসুমশয়ন রচনা করিয়া কোন বাঞ্ছিতের অপেক্ষায় দীর্ঘ বিনিদ্র রজনী বসিয়া-বসিয়া যাপন করিয়াছে। মালতীকুঞ্জের মধ্য হইতে অমনি আর্দ্রপক্ষ বিহঙ্গম প্রভাতী গাহিয়া উঠে, আর অতীতের কত মধুময় স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রাঙ্গণ শ্রীবৃন্দাবনের কথা মনে পড়ে; মনে পড়ে সেই মাধবীকুঞ্জ, তমালতল, যমুনাতট; মনে পড়ে তাঁহার সেই সব লীলা-কাহিনী। আর মনে পড়ে, যামিনী-যাপনের পর ভয়চকিতা হরিণীর মত শ্রীরাধিকার সেই সঙ্কুচিত, সলজ্জ, করুণ মূর্ত্তিখানি। সন্ধ্যায় প্রাঙ্গণতলে বসিয়া যখন দেখি যে, সেই যুগল তরু-তনু বেষ্টন করিয়া হিম-শুভ্র মালতী-কুসুম গ্রথিত মাল্যাকারে ফুটিয়া আছে, তখন মনে পড়ে বৈষ্ণব-কবির সেই মধুময় গান—

"মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
(আর) উঠিয়া পড়িয়া মাতাল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বোলে।

অমনি শ্রীরাধিকার সেই প্রেম-বিধুরা, কাতর অভি-সারিকা মূর্ত্তিখানি মনে পড়ে,—কেলীকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সেই ছলা, কলা, শঠতা, চতুরতার কথা মনে পড়ে। ক্রমে অতীত যুগের মোহন স্মৃতিতে বিভোর হইয়া যাই;—নয়নের সম্মুখে যেন সেই পুণ্য-যুগ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এমনিভাবে আমার সকল সাধ পূর্ণ করিয়া আমার আঙ্গিনা তাহার অন্তরের মধ্যে আমাকে টানিয়া লয়; এমনি করিয়া আমি তাহার মোহন মায়াডোর আপনার কণ্ঠে আপনিই জড়াইয়া দিই।

এই আঙ্গিনা ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারি না। যাইলেও থাকিতে পারি না। মনঃপ্রাণ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; অমনি ছুটিয়া আসিতে হয়, না আসিলে যেন সকল শান্তি হারাইয়া ফেলি। হৃদয়ে মুর্ম্মুর দহন উপস্থিত হয়, মস্তকে বাড়ববহ্নি জ্বলিয়া উঠে।

মোহের ঘোরে, হৃদয়ের টানে, দিবানিশি, সময়ে-অসময়ে, উদাসনয়নে শূন্যে চাহিয়া আমার এই প্রাঙ্গণটিতে বসিয়া থাকি। প্রাণে বিপুল শান্তি, বিমল আনন্দ ও বিশুদ্ধ স্ফূর্ত্তি লাভ করি। কোন দুর্ভাবনা আমাকে পীড়া দেয় না। বসিয়া-বসিয়া বায়ুর স্পর্শ-সুখ অনুভব করি,—ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে দেখি; তরুশাখায় শ্রান্ত পাখী আসিয়া বসিতেছে দেখিতে পাই। দেখি, আমার এই আঙ্গিনা দিয়া কত লোকে আসে-যায়, কত বালিকা আসিয়া কুসুম চয়ন করে, কত প্রৌঢ়া আসিয়া পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া

লইয়া যায়। আর একজন তরুণী,—সেও প্রত্যহ সকলের সহিত আমার আঙ্গিনা দিয়া যায়; নূপুর-নিক্কনে আঙ্গিনাটি মুখরিত করিয়া গর্ব্বিত-চরণে চলিয়া যায়,—বিচ্ছুরিত অঙ্গ-লাবণ্যচ্ছটায় মনঃপ্রাণ মুগ্ধ ও দগ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আমি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া থাকি, আর হৃদয়ের মধ্যে, কে জানে কেন, সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠে—

"আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া।"

কল্পতরু

চিত্রে বসরা-নগরী

[শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

এঙ্গলো-পার্সিয়ান কোম্পানির হেড-আপিস মহামেরাতে অবস্থিত। ঐ সুন্দর অট্টালিকার নীচের তলায় কোম্পানির আপিস; উপরে কর্ত্তৃপক্ষীয় সাহেবদিগের বাসস্থান। ঐ সুদৃশ্য বাড়ীখানি ব্যতীত আর কয়েকখানি বাড়ীও নদীর উভয় পার্শ্বে আছে। তন্মধ্যে বৃটিশ কন্সুলেট এবং ২১৪টি সওদাগরি আপিস প্রধান। নদীর অপর পারেও কোয়ারেণ্টাইন-গৃহ এবং মিলিটারী ডক্-ইয়ার্ড ইত্যাদি আছে। পার হইবার জন্য উভয় পারেই বালাম নামক ক্ষুদ্র নৌকা আছে। ছবিতে দেখা যাইতেছে, একখানি বালাম রৌদ্র নিবারণের নিমিত্ত ছত্রি ও পাল তুলিয়া যাইতেছে।

ফাও বসরা যাইবার পথে সমুদ্রগামী জাহাজসমূহের সিগনাল-ষ্টেসন। চিত্রে প্রদর্শিত গ্রামখানি ফাও হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের নাম সিরাজী। এখানে একজন সম্ভ্রান্ত আরব ধনীর বাটীই চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। নদীর উপরে মাল বোঝাই করিয়া একখানি নাখোদা বা মহেলা পাল তুলিয়া চলিয়াছে।

ভারতবর্ষের পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন, বসরা নগরী অসংখ্য খাল-বিলে পূর্ণ। খোরাও সেইরূপ একটি খাল। প্রায় ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রতি রবিবারে এই খোরার খালে বসরার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বালামে করিয়া নৃত্য-গীত শুনিতে ও দেখিতে আসিতেন। সহরের যাবতীয় বারবণিতা মনমুগ্ধকর বেশ-ভূষা করিয়া বালামে চড়িয়া এখানে আসিত এবং বালামের উপরেই গীত, বাদ্য ও নৃত্য করিত। এখানে খোরার উভয় পার্শ্বেই সরকারী "লেবার কোরের" (শ্রমজীবিগণের) বাসস্থান; এবং খাল হইতে কিছু দূরে ২৭ নম্বর ইণ্ডিয়ান জেনারেল হাসপাতাল হইয়াছে। আজকাল আর সেই জন্য ঐরূপ নর্ত্তকী ও গায়িকার দল আসে না; তবে এখনও ২।৪ দল ইহুদি পরিবার পর্ব্বদিন উপলক্ষে খোরায় আসিয়া থাকে।

খোরার চিত্রে দেখা যাইতেছে, খালের দুই পাশেই খেজুর গাছের ঘন জঙ্গল। দুই ধারে ঐরূপ জঙ্গল থাকায় খালটি বড় মনোরম বলিয়া মনে হয়।

চিত্রে সাট এল-আরব নদী হইতে বসরা নগরীতে প্রবেশের খাল দেখা যাইতেছে; খালের ভিতর প্রবেশের পথে ম্যারিণ্ ওয়ার্কসপ ও দক্ষিণে কাষ্টম হাউস। কাষ্টম হাউস এখনও ঐ স্থানেই আছে; কিন্তু ওয়ার্কসপ আর এখন ঐ স্থানে নাই। অপর একটি স্থানে একটি ডক-ইয়ার্ড ও ওয়ার্কসপ হইয়াছে; এবং এই ওয়ার্কসপটি বর্ত্তমানে মোটর ডক-ইয়ার্ড নামে কেবল মোটর বোটের জন্যই ব্যবহৃত হইতেছে।

আশার বসরার ক্যাণ্টনমেণ্ট বলিলেও চলে। নদীর উপরেই আশার খালের ভিতর দিয়া এক মাইলের মধ্যেই বসরা নগরী।

আশারে খালের এপার-ওপারে যাইবার জন্য উপস্থিত দুইটি সাঁকো আছে,—হুইটলি সাঁকো ও ব্যারাট সাঁকো। আরও একটি সাঁকো এখানে তৈয়ারী হইতেছে। সাঁকোটি ভাসা-পুল। বড়-বড় নৌকা আসিলে লোক ও গাড়ীর যাতায়াত বন্ধ করিয়া পুল কয়েক মিনিটের জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়। পুল হইতে নামিয়াই আশার বাজার ও ব্রিজ রোডের উপর বিপণি-শ্রেণী। আরব, পার্শিয়ান, বম্বে ও করাচী-বাসী মুসলমানগণ নানা বর্ণের ও নানা রঙ্গের দোকান করিয়া এক পয়সার জিনিস চার পয়সায় বিক্রয় করিতেছে। পুল দিয়া নদী পার হইয়া ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপর দিয়া বসরা নগরীতে যাইবার রাস্তা আছে। সাধারণতঃ গাড়ী-ঘোড়া, মোটর ও পথিকগণ ঐ পথ দিয়াই বসরায় যাতায়াত করে। এ পারে পুলের নীচেই ডাক-ঘর ও টেলিগ্রাফ আপিস।

বসরা ও আশারের মধ্যে ইহাই প্রধান রাস্তা। ঐ রাস্তার উপর

মহামেরায় সাট-এল-আরব নদীর বামতীরস্থ এঙ্গলো-পার্সিয়ান কোম্পানীর আপিস ও অন্যান্য অট্টালিকা।

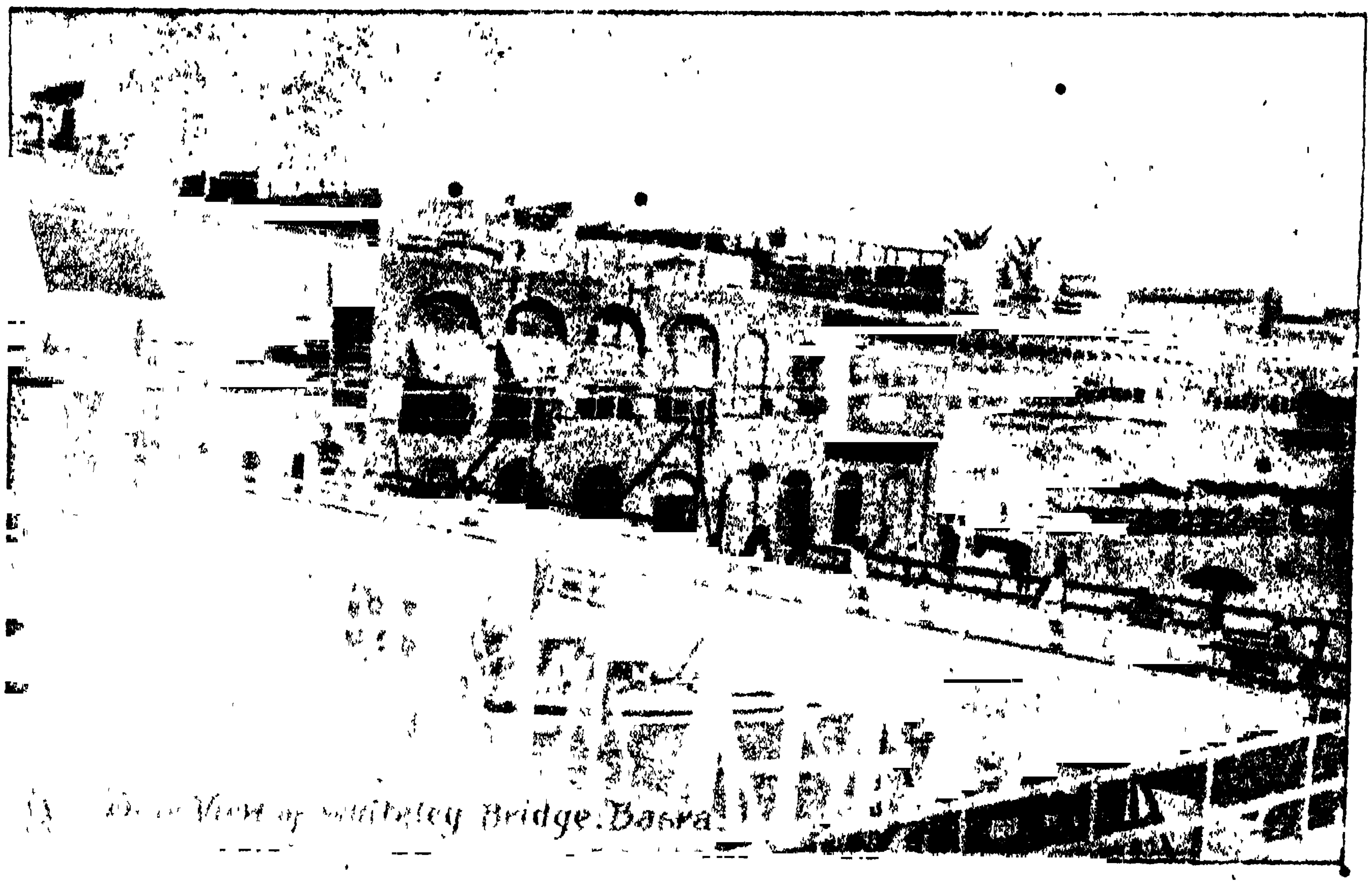

হুইটলি সাঁকোর এক পাশের দৃশ্য।

খোরা খাল—বসরা।

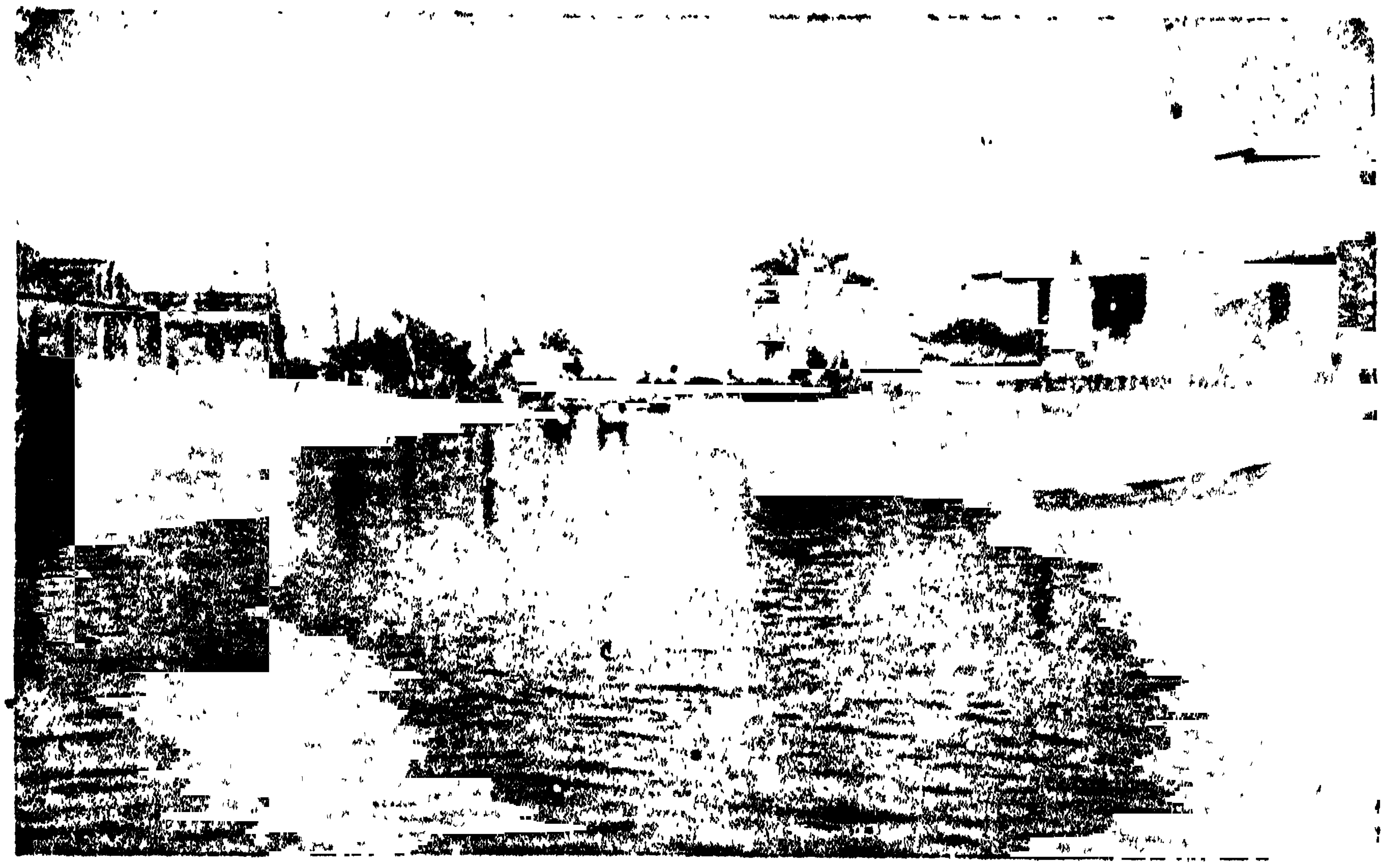

মেরিন রিপেয়ার সপ এবং কাষ্টম-হাউস—বসরা।

বড়-বড় বাড়ীগুলি—যাহাদের অধিকাংশই এখন সরকার দখল করিয়াছেন—উহাতে তুরস্কের সরকারী প্রধান-প্রধান কর্ম্মচারী বাস করিতেন। এই রাস্তার উপর একটি বাড়ীতেই Lady Cox থাকিতেন। এখন বড়-বড় অট্টালিকাতে সরকারী আফিস নীচে, এবং উপরে অফিসারদের থাকিবার স্থান হইয়াছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পোষ্টাফিসের সন্নিকটে ঠিকা গাড়ীর দাঁড়াইবার স্থান আছে। সেয়ারে গেলে আশ্নার হইতে বসরা যাইবার জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৵০ আনা করিয়া গাড়ী ভাড়া দিতে হয়। একখানি গাড়ীর

সাট-এল-আরব নদীর উপর গ্রাম

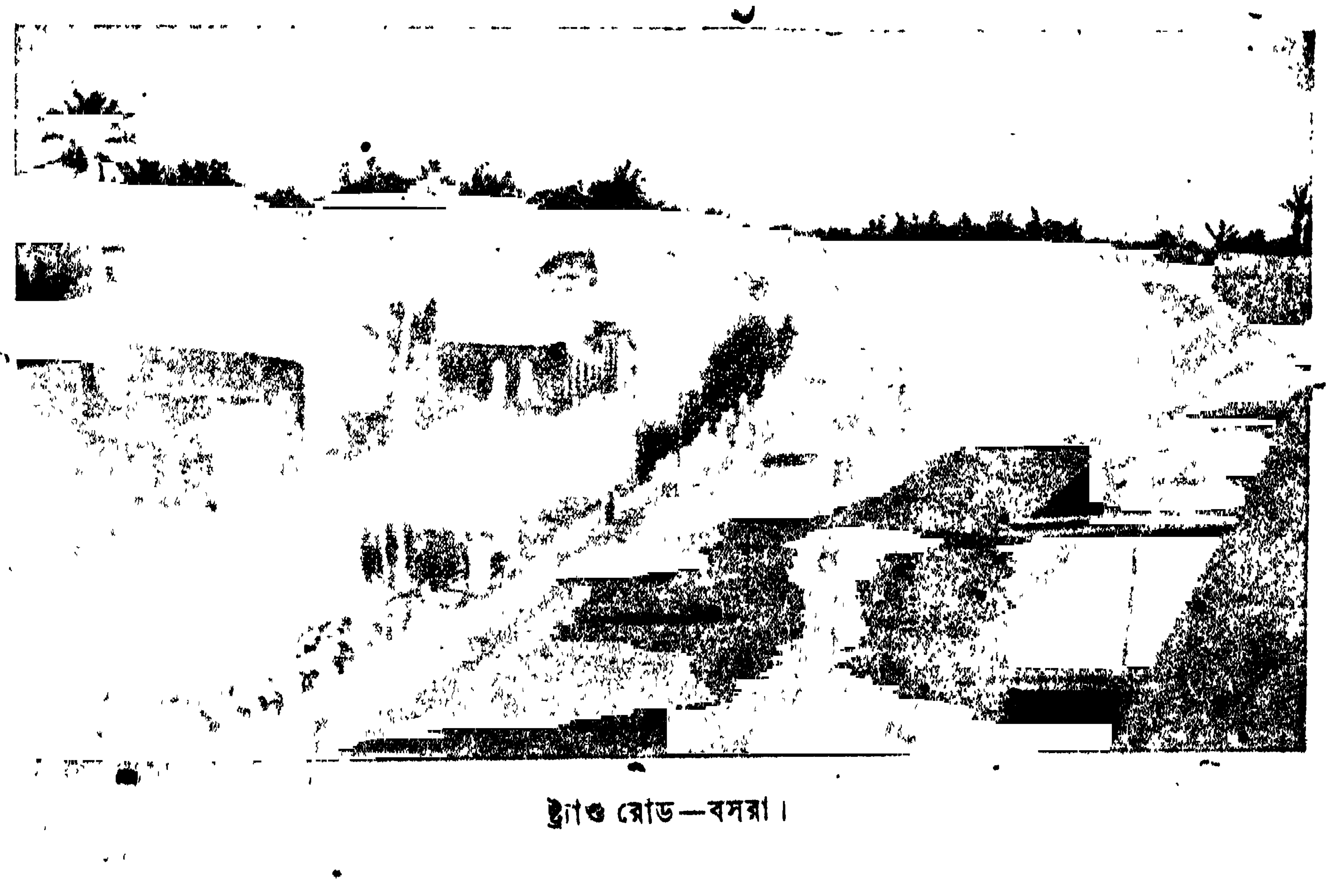

ষ্ট্রাণ্ড রোড—বসরা।

ভাড়া ॥• আনা। বালামের ভাড়াও একই; তবে সময়ে সময়ে বেশীও লাগে।

যে খাল দিয়া বসরা যাওয়া যায়, উহার নাম আশার ক্রীক। ক্রীকে কয়েকখানি বালাম রহিয়াছে ও ক্রীকের উপরে ২।৩খানি অট্টালিকা আছে। অট্টালিকাগুলি এখন সরকারী ও বেসরকারী আপিস ও আবাসস্থল রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

দীর্ঘতম টেলিফোঁ

[শ্রীচুণীলাল মিত্র]

প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, টেলিফোঁ যন্ত্রের দুই জন প্রধান আবিষ্কর্ত্তা আমেরিকার টেলিফোঁ লাইনের দুই প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন। প্রথম যখন টেলিফোঁ আবিষ্কৃত হয়, তখন যেমন পরস্পর অদূরবর্ত্তী দুইটি স্থানে থাকিয়া দুইজনে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন, এবার সেরূপ নহে,—এবারকার টেলিফোঁর প্রান্ত দুইটি ৩৩৯০ মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। এই নূতন তারের সহিত বোষ্টন নগরীতে প্রথম পরীক্ষাকালে ব্যবহৃত একখণ্ড তার সংযুক্ত ছিল। ইহার একটি ইতিহাস আছে; যখন বেল সাহেবের টেলিফোঁ যন্ত্রের পরীক্ষা শেষ হইয়া যায়, তখন তাঁহার পরীক্ষাগারটী ধ্বংস করা হয়। এই সময়ে ওয়াটসন সাহেব এই পুরাতন তার সংগ্রহ করিয়া আমেরিকান টেলিফোঁ কোম্পানীকে রক্ষণীয় দ্রব্য বলিয়া উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।

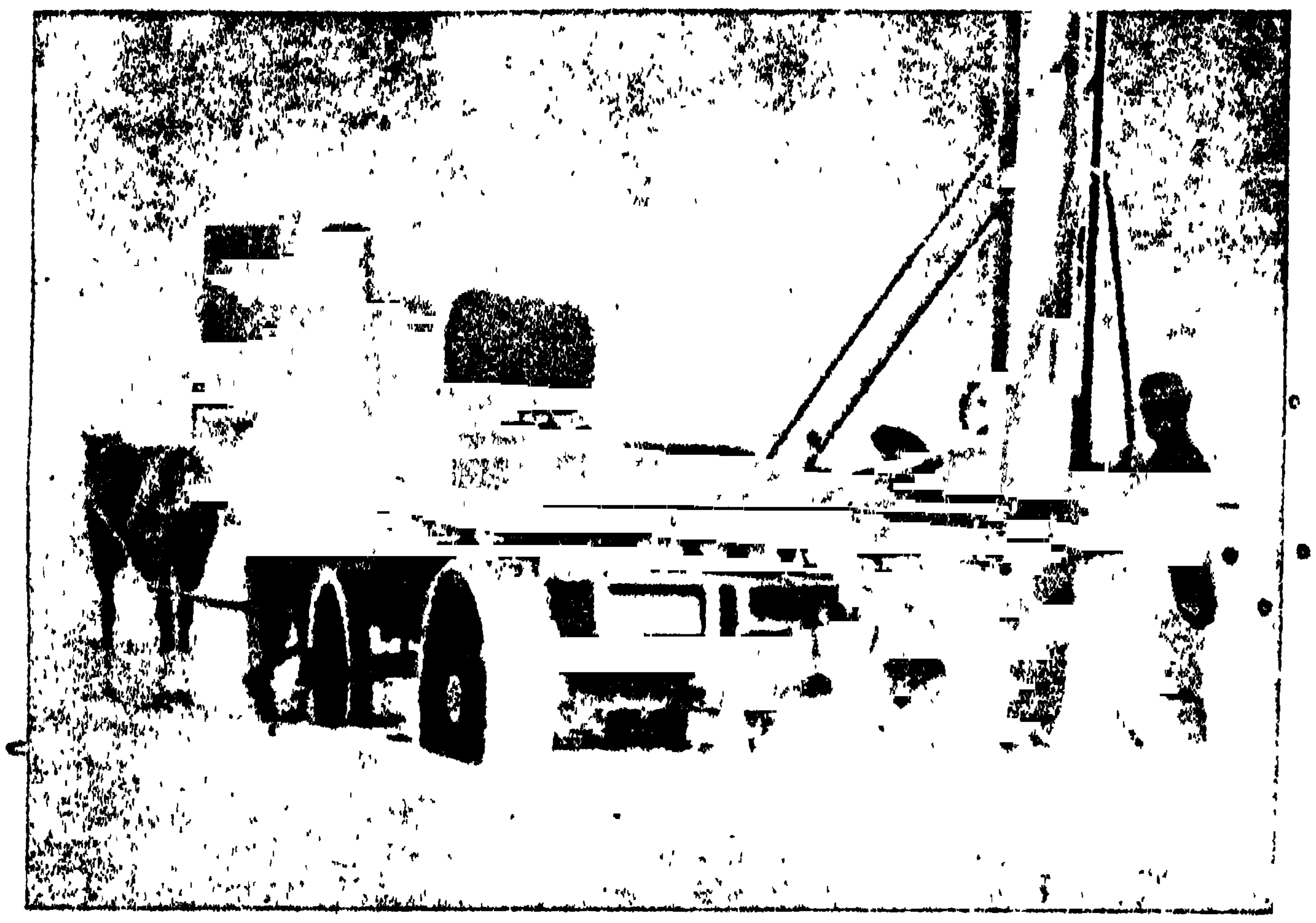

হ্রদগর্ভে যন্ত্রের সাহায্যে গর্ত্ত খনন

সার্ভেয়ারগণ জরিপ কার্য্যে নিযুক্ত

লবণ হ্রদে খোঁটা পোঁতা হইতেছে

টেলিফোঁ আমেরিকা মহাদেশে বিস্তৃতিলাভ করিতে প্রায় ৩৫ বৎসর লাগিয়াছে। এই টেলিফোঁর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বেল সাহেব প্রথমে দেখিলেন যে, যেরূপভাবে ইহার কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে ইহা কোন দিন আর্থিক সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। তিনি বুঝিলেন যে, কেবল নগরে-নগরে কার্য্য করিয়া টেলিফোঁ কোন দিন লাভকর ব্যবসায় হইবে না। তিনি বিবেচনা করিলেন, নগর হইতে পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর অবধি টেলিফোঁ সংযুক্ত করিলে, তবে উহা আর্থিক সফলতা লাভ করিবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেক পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত হইল যে, আটলান্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত টেলিফোঁ চালানো যায়। প্রকৃত পক্ষে বেলসাহেবই এই সুদীর্ঘ আমেরিকান টেলিফোঁ লাইনের জন্মদাতা।

তাহারই চেষ্টায় এই মহান ব্যাপার সাধিত হইয়াছে। তিনি যখন টেলিফোঁর কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন টেলিফোঁ লাইনের দুই প্রান্তের ব্যবধান তিন মাইল মাত্র ছিল। বোষ্টন নগর হইতে টেলিফোঁ লাইন আরম্ভ হয়। ভেল সাহেব বোষ্টন হইতে নিউইয়র্ক নগর টেলিফোঁ দ্বারা যোগ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু এই কার্য্য করিতে তিনি নানা প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৮৪ অব্দে টেলিফোঁ ৪৫ মাইল অগ্রসর হইল; শেষে ২৩৪ মাইল বিস্তৃত হইয়া দুইটি নগরীর মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

ভেলসাহেব কিঞ্চিৎ ফল লাভ করিয়া আমেরিকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত টেলিফোঁ লাইন বসাইবার

হাম্বো ট হ্রদে খোঁটা পোঁতা

থিয়োডোর নিউটন ভেল

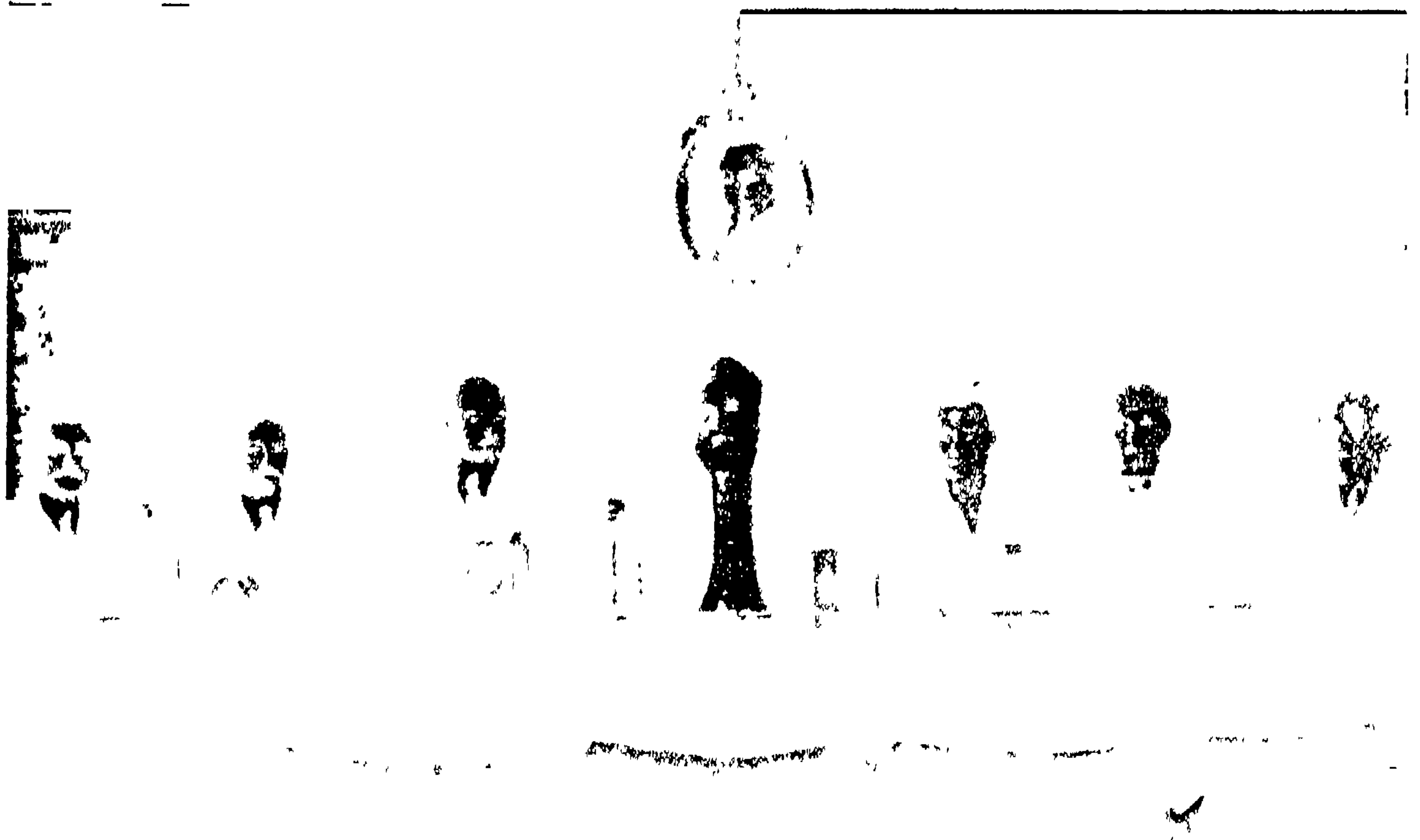

ডাঃ এলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল

বাসনা করিলেন। ১৮৯২ খৃঃ ভেলসাহেব নিউইয়র্ক হইতে সিকাগো নগরী পর্য্যন্ত লাইন বসাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত-কারণে এই কার্য্য নিষ্ফল হইল; অর্থাৎ লাভবান না হইয়া বিশেষ ক্ষতিকর হইল। টেলিফোঁর উপকারিতা স্বীকার করিলেও, ইহার উপর লোকে আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না; অথবা এত দূরবর্ত্তী স্থানের লোকদের মধ্যে হয় ত কথাবার্ত্তার প্রয়োজন হইল না; কিম্বা এত দূরে থাকিয়া কথা-বার্ত্তা চালাইতে পারা যায় বলিয়া লোকে সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিল না। অবশেষে সকলেই ভেলসাহেবের কল্পনাটী বাতুলতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভেলসাহেব কিন্তু কোন মতেই নিরুৎসাহ হইলেন না; তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে নিউইযর্ক হইতে সিকাগো পয্যন্ত সকল লোককে তাঁহার কল্পনার সারবত্তা, অর্থাৎ লোকের সুবিধা-অসুবিধা বুঝাইয়া দিলেন। এই লাইনে প্রথম প্রথম লোকসান হইয়াছিল, কি ন্ত পরে ইহার আয়-ব্যয় সমান দাঁড়াইতে বিশেষ দেরি হয় নাই। ভেলসাহেবের সবিশেষ চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে কোম্পানীর ক্ষতিপূরণ হইয়া এই লাইনটী আজ জগতে একটি অর্থকরী ব্যবসায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই লাইনের উন্নতির সহিত আরও নূতন-নূতন শাখা-লাইন খোলা হইয়াছে।

নিউইয়র্ক হইতে ধীরে-ধীরে এই লাইন বিস্তৃতি লাভ করিয়া সানফ্রানসিস্কোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহা প্রথমে বন বসতির মধ্য দিয়া মিসিসিপি নদীর পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত দেশ সমূহ অতিক্রম করিয়া সিকাগো হইতে ওহামা, তথা হইতে ডেনভার, তৎপরে সল্টলেক সিটীর মধ্য দিয়া সানফ্রানসিস্কো নগরে পৌছিল। লাইন খোলা হইল বটে, কিন্তু কার্য্যটা বড় সহজে হয় নাই। পথে অনেক অসমতল ও জনবিরল দেশ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এই সকল স্থানে লাভের আশা বেশী ছিল না। কারণ, দুইটি পর্ব্বতমালা, একটি মরুভূমি ও একটি লবণময় জলাভূমি পার হওয়া যে কত ব্যয়সাপেক্ষ তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

ভেল সাহেব ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ার কার্টি সাহেব একমত হইয়া এই কার্য্য আরম্ভ করেন। কার্টি সাহেব ওহামা হইতে ডেনভার পর্য্যন্ত টেলিফোঁর তার দ্বারা যুক্ত করিবার সময়ে তাঁহার সমস্ত লোকজনসহ পর্ব্বতমালা ও মরুভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল উপায় সকল বুঝিয়া লইতেন। তাঁহার লোকজনও এই বিষয়ে উদাসীন ছিল না; তাহারাও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পাহাড়-পর্ব্বত, বনজঙ্গল ও উত্তপ্ত বালুরাশির মধ্যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া এই সকল স্থানের বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এই কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল। এই সকল স্থান জরিপ করিবার সময় বুঝা গিয়াছিল যে, টেলিফোঁ লাইন বসান হইলেও তাহাকে রক্ষা ক.া কঠিন ব্যাপার। রাজপথ রক্ষা করিতে হইলে যেরূপ সর্ব্বদা তাহার প্রতি নজর রাখা আবশ্যক, সেইরূপ টেলিফোঁ-সংযোগ রক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বদা তাহার বিরুদ্ধাচারিণী প্রকৃতি ও তাহার আনুসঙ্গিক শত্রুগণকে জয় করিতে হয়।

ওয়ালটার এফ, রীড

ডেনভারের সহিত নিউইয়র্ক সংযুক্ত হইলে একদিন প্রেসিডেণ্ট ভেল কার্টি সাহেবের সহিত এই সুদীর্ঘ লাইন সম্পূর্ণ করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। প্রধান ইঞ্জিনিয়ার কার্টি এই কার্য্যের ভার প্রাপ্ত

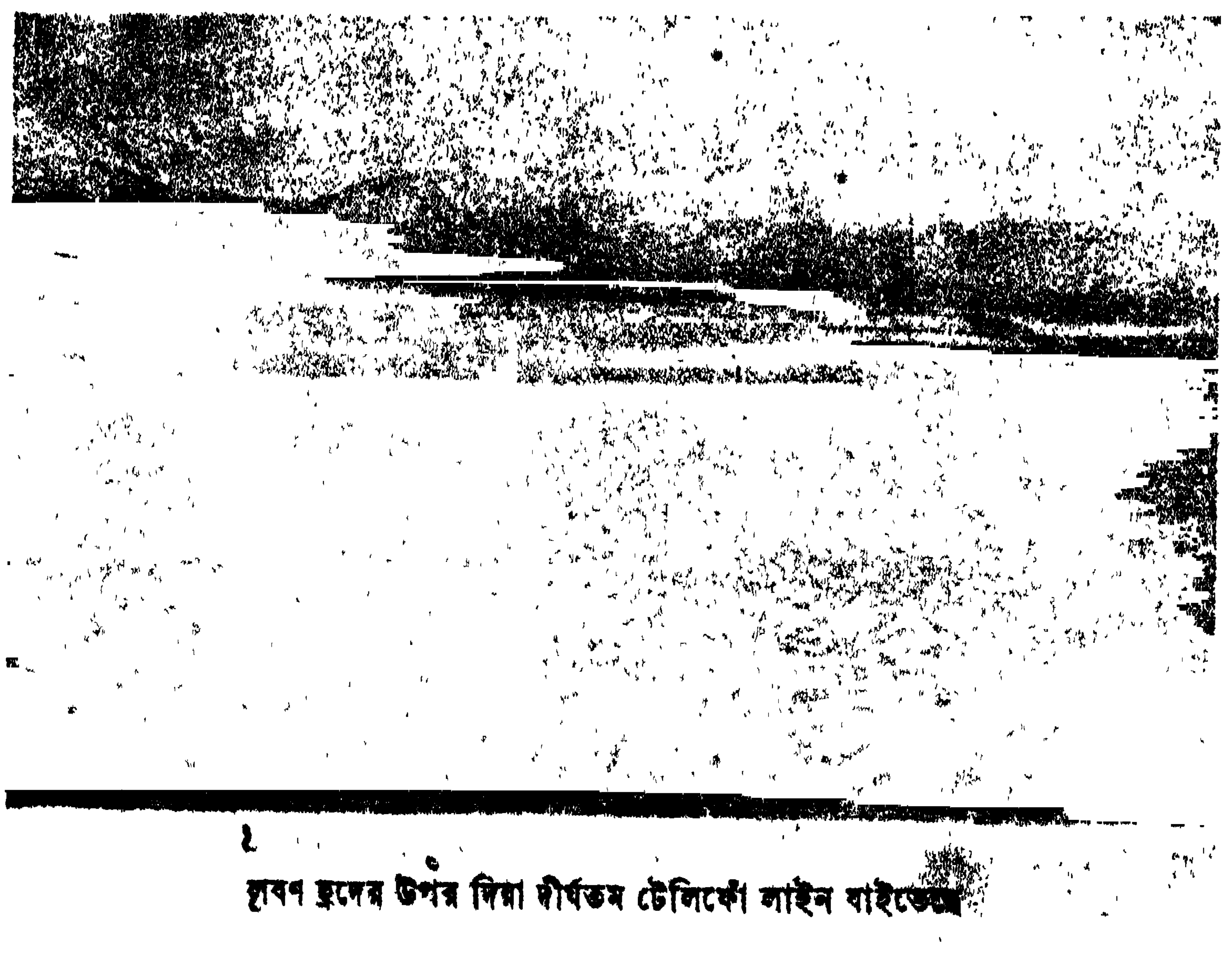

লবণ হ্রদের উপর দিয়া দীর্ঘতম টেলিফোঁ লাইন যাইতেছে

লাইনের শেষ অংশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত শক্তি করেন। কাষ্ঠবিক্রেতাগণের হস্তে শত-শত পরিষ্কৃত ও চৌকা নির্ম্মাণের ভার প্রদান করিলেন; ছয় হাজার মাইল ব্যাপী তার নির্ম্মাণ করিবার হুকুম দিলেন; বালুকাপূর্ণ রাস্তার উপর দিয়া বৃহৎ-বৃহৎ গাড়ী টানিবার জন্য শত-শত ঘোড়া ভাড়া করা হইল; তাহাদের চালক নিযুক্ত হইল। এই সকল অত্যাবশ্যক সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে তাঁবু (mobile camps), weather-tight huts) ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কুটীর প্রভৃতি লওয়া হইয়াছিল; কারণ, এই নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত লোকগুলির থাকিবার অন্য উপায় ছিল না।

তার বসাইবার রাস্তার জরীপ হইলে নির্ম্মাণকারিগণ দ্রুতগতিতে কাজ চালাইতে লাগিল। সুবিস্তৃত মরুভূমির মধ্য দিয়া সোজা পথে টেলিফোঁ লাইন স্থাপিত হওয়ায়, এই লাইন ধূলি-ধূমসমাচ্ছন্ন রেল-ষ্টেসন হইতে অনেক দূরে পড়িল। যখন ইহা কোন লবণ হ্রদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ইঞ্জিনিয়ারগণ তাহাকে এড়াইয়া না গিয়া তাহার উপর দিয়া সমান ভাবে তার চালাইল। যে সকল স্থানে বালুকারাশির স্তূপ আছে, সেইখানেই সমূহ বিপদ; কারণ, এই সকল স্থানে কোন ভারী দ্রব্য লইয়া যাওয়া অতি কঠিন। এই সকল কার্য্যের বিশেষত্ব দেখিয়া টেলিফেঁর দণ্ডগুলি বহিবার জন্য বড়-বড় ভারবাহী গাড়ী সকল নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বাস্তবিক, এ কার্য্যে যে সকল লোক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিলে চলে। তাহারা দেখিতে ক্ষীণ, কিন্তু কষ্টসহিষ্ণু; এদেশের প্রচণ্ড উত্তাপ তাহাদের শরীরের উপর কোন কার্য্য করিতে পারে না। তবে এই সকল মনুষ্য ও জীব-জন্তুকে পালন করিতে তাহাদের উপযুক্ত আহার্য্য সামগ্রী আহরণ করিতে হয়। এই সকল স্থানে পানীয় জলাভাব বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া উঠে। অতি দূর স্থান হইতে বোতলে করিয়া পানীয় জল সরবরাহ করা হইয়া থাকে এবং তাহা হিসাব করিয়া খরচ করা হয়। টেলিফোঁ লাইন মরুপথে যাইতে-যাইতে কখন-কখন কোন ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়া উপস্থিত হয়। এই সকল ক্ষুদ্র পল্লী পাঁচ-সাতখানি কুটীরের সমাবেশ মাত্র। এখানে যে সকল ছোট-ছোট পান্থনিবাস আছে, সেগুলি মরুজাত পণ্য আহরণকারিগণের আশ্রয়স্থল। ইহারা টেলিফোঁ-লাইন-নির্ম্মাতৃগণের পক্ষেও বড় আরামের স্থান হইয়াছিল। ইহাতে তাহাদের জীবনের একঘেয়ে ভাব নষ্ট করিয়া হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিত।

বালুকাময় মরুভূমি কষ্টকর হইলেও এক রকমে সহ্য করা যায়; কিন্তু এখানকার লবণময় জলাভূমি লোকজনদের অধৈর্য্য করিয়া তুলিত।

ক্রস-আর্ম্ম স্থাপন

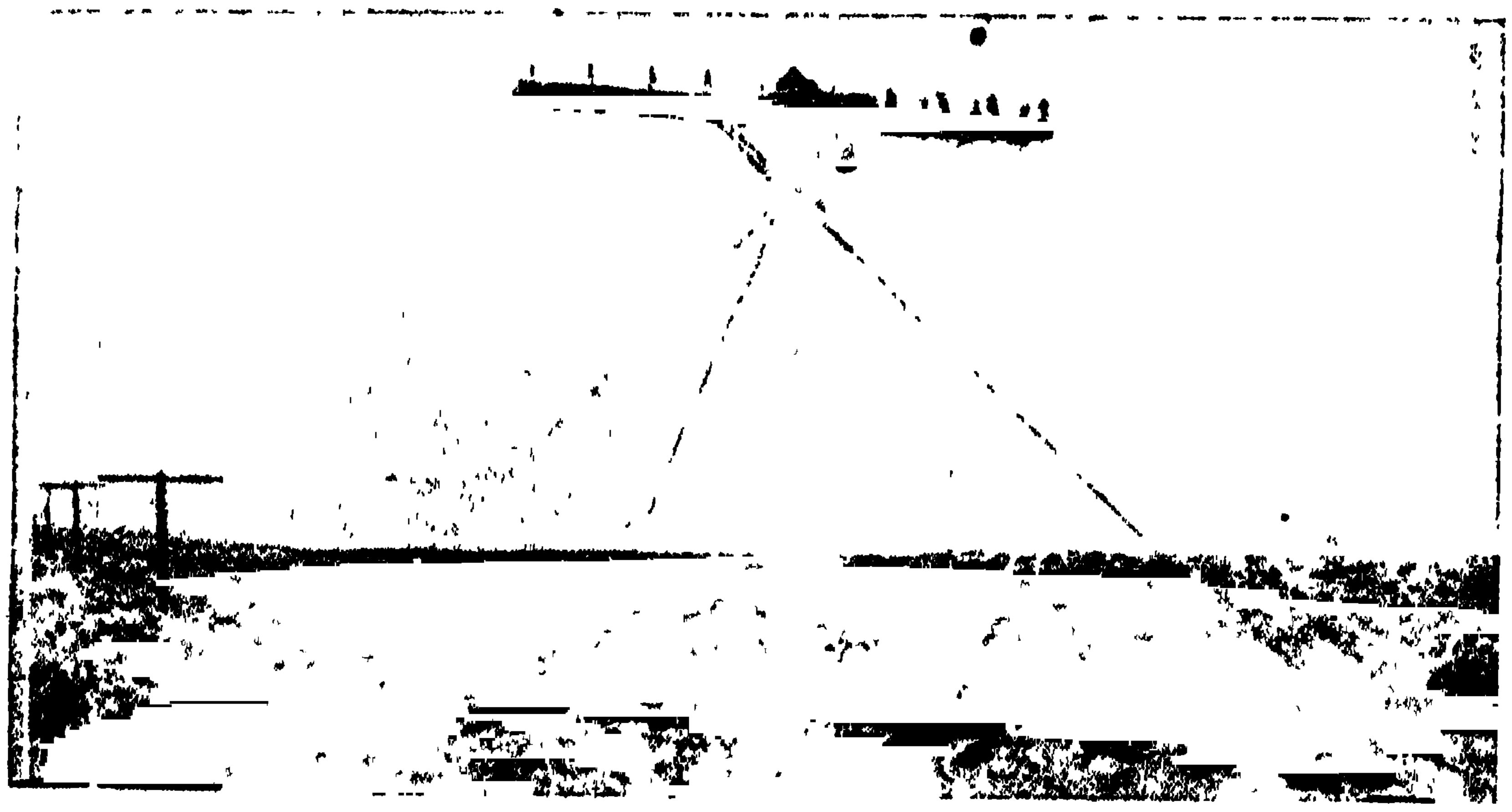

টেলিফোঁ পোষ্ট

খোঁটা পুঁতিবার কর্ম্মচারিগণ

নিউইয়র্ক হইতে ধীরে ধীরে এই লাইন বিস্তৃতি লাভ করিয়া সানফ্রানসিস্কোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহা প্রথমে ঘন বসতির মধ্য দিয়া মিসিসিপি নদীর পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত দেশ সমূহ অতিক্রম করিয়া সিকাগো হইতে ওহামা, তথা হইতে ডেনভার, তৎপরে সল্টলেক সিটির মধ্য দিয়া সানফ্রানসিস্কো নগরে পৌছিল। লাইন খোলা হইল বটে, কিন্তু কার্য্যটা বড় সহজে হয় নাই। পথে অনেক অসমতল ও জনবিরল দেশ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এই সকল স্থানে লাভের আশা বেশী ছিল না। কারণ, দুইটি পর্ব্বতমালা, একটি মরুভূমি ও একটি লবণময় জলাভূমি পার হওয়া যে কত ব্যয়সাপেক্ষ তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

ভেল সাহেব ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ার কার্টি সাহেব একমত হইয়া এই কার্য্য আরম্ভ করেন। কার্টি সাহেব ওহামা হইতে ডেনভার পর্য্যন্ত টেলিফোঁর তার দ্বারা যুক্ত করিবার সময়ে তাঁহার সমস্ত লোকজনসহ পর্ব্বতমালা ও মরুভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল উপায় সকল বুঝিয়া লইতেন। তাঁহার লোকজনও এই বিষয়ে উদাসীন ছিল না; তাহারাও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পাহাড়-পর্ব্বত, বনজঙ্গল ও উত্তপ্ত বালুরাশির মধ্যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া এই সকল স্থানের বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এই কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল। এই সকল স্থান জরিপ করিবার সময় বুঝা গিয়াছিল যে, টেলিফোঁ লাইন বসান হইলেও তাহাকে রক্ষা ক.া কঠিন ব্যাপার। রাজপথ রক্ষা করিতে হইলে যেরূপ সর্ব্বদা তাহার প্রতি নজর রাখা আবশ্যক, সেইরূপ টেলিফোঁ-সংযোগ রক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বদা তাহার বিরুদ্ধাচারিণী প্রকৃতি ও তাহার আনুসঙ্গিক শত্রুগণকে জয় করিতে হয়।

ডেনভারের সহিত নিউইয়র্ক সংযুক্ত হইলে একদিন প্রেসিডেণ্ট

ওয়ালটার এফ, রীড

ভেল কার্টি সাহেবের সহিত এই সুদীর্ঘ লাইন সম্পূর্ণ করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। প্রধান ইঞ্জিনিয়ার কার্টি এই কার্য্যের ভার প্রাপ্ত

লবণ হ্রদের উপর দিয়া দীর্ঘতম টেলিফোঁ লাইন যাইতেছে

দিয়া এই লাইনের শেষ অংশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। কাঠবিক্রেতাগণের হস্তে শত-শত পরিষ্কৃত ও চৌকা কাষ্ঠ নির্মাণের ভার প্রদান করিলেন; ছয় হাজার মাইল ব্যাপী তাহার তার নির্মাণ করিবার হুকুম দিলেন; বালুকাপূর্ণ রাস্তার

ক্রস-আর্ম্ম স্থাপন

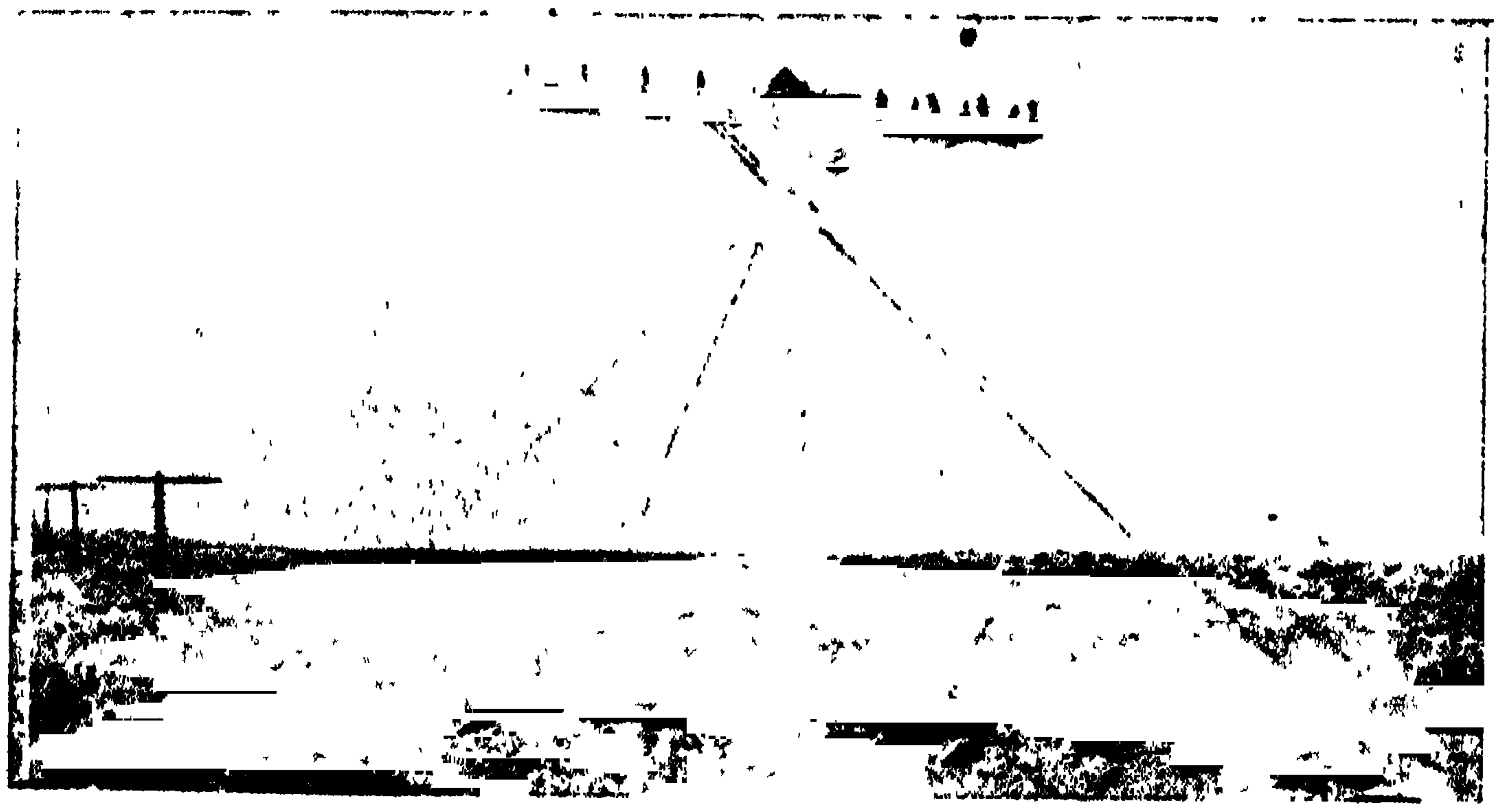

টেলিফোঁ পোষ্ট

খোঁটা পুঁতিবার কর্ম্মচারিগণ

উপর দিয়া বৃহৎ-বৃহৎ গাড়ী টানিবার জন্য শত-শত ঘোড়া ভাড়া করা হইল; তাহাদের চালক নিযুক্ত হইল। এই সকল অত্যাবশ্যক সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে তাঁবু (mobile camps), weather-tight huts) ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কুটীর প্রভৃতি লওয়া হইয়াছিল; কারণ, এই নির্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত লোকগুলির থাকিবার অন্য উপায় ছিল না।

তার বসাইবার রাস্তার জরীপ হইলে, নির্মাণকারিগণ দ্রুতগতিতে কাজ চালাইতে লাগিল। সুবিস্তৃত মরুভূমির মধ্য দিয়া সোজা পথে টেলিফোঁ লাইন স্থাপিত হওয়ায়, এই লাইন ধূলি-ধূমসমাচ্ছন্ন রেল-ষ্টেসন হইতে অনেক দূরে পড়িল। যখন ইহা কোন লবণ হ্রদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ইঞ্জিনিয়ারগণ তাহাকে এড়াইয়া না গিয়া তাহার উপর দিয়া সমান ভাবে তার চালাইল। যে সকল স্থানে বালুকারাশির স্তূপ আছে, সেইখানেই সমূহ বিপদ; কারণ, এই সকল স্থানে কোন ভারী দ্রব্য লইয়া যাওয়া অতি কঠিন। এই সকল কার্য্যের বিশেষত্ব দেখিয়া টেলিফোঁর দণ্ডগুলি বহিবার জন্য বড়-বড় ভারবাহী গাড়ী সকল নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বাস্তবিক, এ কার্য্যে যে সকল লোক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিলে চলে। তাহারা দেখিতে ক্ষীণ, কিন্তু কষ্টসহিষ্ণু; এদেশের প্রচণ্ড উত্তাপ তাহাদের শরীরের উপর কোন কার্য্য করিতে পারে না। তবে এই সকল মনুষ্য ও জীব-জন্তুকে পালন করিতে তাহাদের উপযুক্ত আহার্য্য সামগ্রী আহরণ করিতে হয়। এই সকল স্থানে পানীয় জলাভাব বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া উঠে। অতি দূর স্থান হইতে বোতলে করিয়া পানীয় জল সরবরাহ করা হইয়া থাকে এবং তাহা হিসাব করিয়া খরচ করা হয়। টেলিফোঁ লাইন মরুপথে যাইতে-যাইতে কখন-কখন কোন ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়া উপস্থিত হয়। এই সকল ক্ষুদ্র পল্লী পাঁচ-সাতখানি কুটীরের সমাবেশ মাত্র। এখানে যে সকল ছোট-ছোট পান্থনিবাস আছে, সেগুলি স্বচ্ছন্দমরুজাত পণ্য আহরণকারিগণের আশ্রয়স্থল। ইহারা টেলিফোঁ-লাইন-নির্ম্মাতৃগণের পক্ষেও বড় আরামের স্থান হইয়াছিল। ইহাতে তাহাদের জীবনের একঘেয়ে ভাব নষ্ট করিয়া হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিত।

বালুকাময় মরুভূমি কষ্টকর হইলেও এক রকমে সহ্য করা যায়; কিন্তু এখানকার লবণময় জলাভূমি লোকজনদের অধৈর্য্য করিয়া তুলিত।

এই সকল জলাভূমি প্রায় ১৮ হইতে ৩৬ ইঞ্চি গভীর; কিন্তু এই জল মনুষ্যের পক্ষে অব্যবহার্য্য। এইসকল হ্রদের জল ভয়ানক লবণাক্ত ও ঘোলা। যে সকল স্থানের জল পরিশুষ্ক হইয়াছে, সেইখানে লবণ জমিয়া সাদা বস্ত্রের ন্যায় দৃষ্ট হয়।

আজকাল টেলিফোঁ নির্ম্মাণ কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কত রকম নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কারের দ্বারা পরিশ্রমের কত লাঘব করিয়াছে। এই সকল যন্ত্রের মধ্যে power driven hole-borer অর্থাৎ শক্তি-চালিত গর্ত্ত খুঁড়িবার যন্ত্রের দ্বারা যতটা মাটি কাটা আবশ্যক তাহা পরিষ্কারভাবে কাটিতে পারে। এবং তাহাতে টেলিফোঁ লাইনের খোঁটাগুলিকে বসান যায়। ইহা দ্বারা লবণাক্ত স্থানের মাটি খুঁড়িবার বড় সুবিধা। কখন কখন এই ক্ষমতাশালী যন্ত্র দুস্তর মরুভূমিতে নিরর্থক হইয়াছে। তাহার কারণ, মরুভূমিতে মাটী কাটিতে কাটিতে অনেক সময় তাহার মধ্যে লুক্কায়িত পর্ব্বতের কঠিন শিলাখণ্ড এই যন্ত্রের কাটিবার শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে; কাজেই সে সকল স্থানে এই যন্ত্রের প্রভাব নিষ্ফল হইয়াছে এবং সেকেলে সেই পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এ সকল স্থানে ভয়ানক উত্তাপ। ১২০ ডিগ্রি উত্তাপে মাটী কাটা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। এই খনন কার্য্য শেষ ও স্তম্ভগুলি বসান হইলে, একদল লোক আসিয়া cross-arms অর্থাৎ হাত পরাইয়া ও তাহাতে insulators অর্থাৎ চিনামাটির মুখ পরাইয়া দেয়। তার পর স্তম্ভের গোড়ার চারিদিকের খাদগুলি মাটী দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়, আবশ্যক হইলে তাহার গোড়ায় প্রস্তর-খণ্ড দিয়া তাহাকে আরও অধিক মজবুত করিয়া দেওয়া হয়। লবণ-হ্রদ সকলে টেলিফোঁ-স্তম্ভ বসান বড় কষ্টকর ব্যাপার বটে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ ব্যয়সংক্ষেপ হয়; কারণ একবার এই সকল স্থানে বসাইলে স্তম্ভগুলি লবণ-সংসর্গে প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠে; অধিক কি ইহাকে বহুকালের জন্য কঠিন করিয়া দেয়,—কোন প্রকারে জীর্ণ হইতে দেয় না।

স্তম্ভগুলি বসান হইলে তারগুলি তাহার উপর দিয়া বসান হয়। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, পর্ব্বতের উপর দিয়া লাইন লইয়া যাওয়া বড় দুরূহ; কিন্তু তাহা ঠিক নয়। পার্ব্বত্য প্রদেশে বেশ গাড়ীর রাস্তা আছে; তাহাতে যাতায়াতের কোন অসুবিধা হয় না। মোট কথা, এই লাইন নির্ম্মাতৃগণকে পার্ব্বত্য পথে যত অধিক কার্য্য করিতে হয়, তাহার অপেক্ষা মরু পথে অনেক অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। নিউইয়র্ক হইতে সানফ্রানসিস্কোর দূরত্বের কথা

মালবহনের গাড়ী

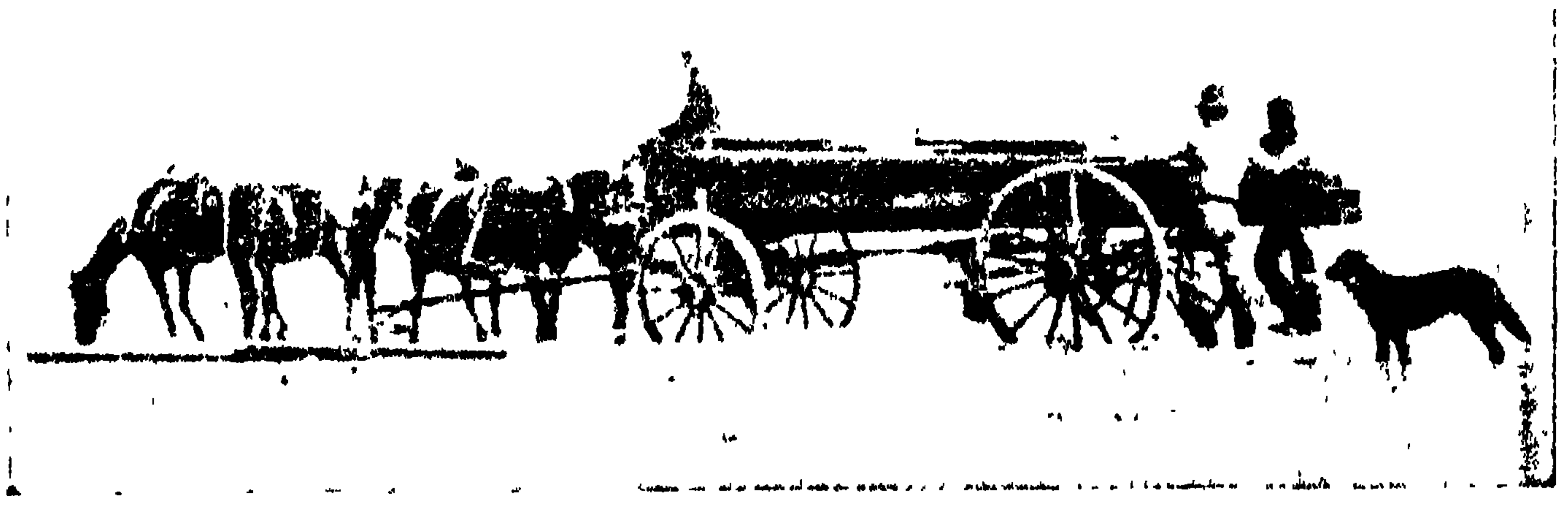

লবণ হ্রদে খোঁটা পুঁতিবার আয়োজন

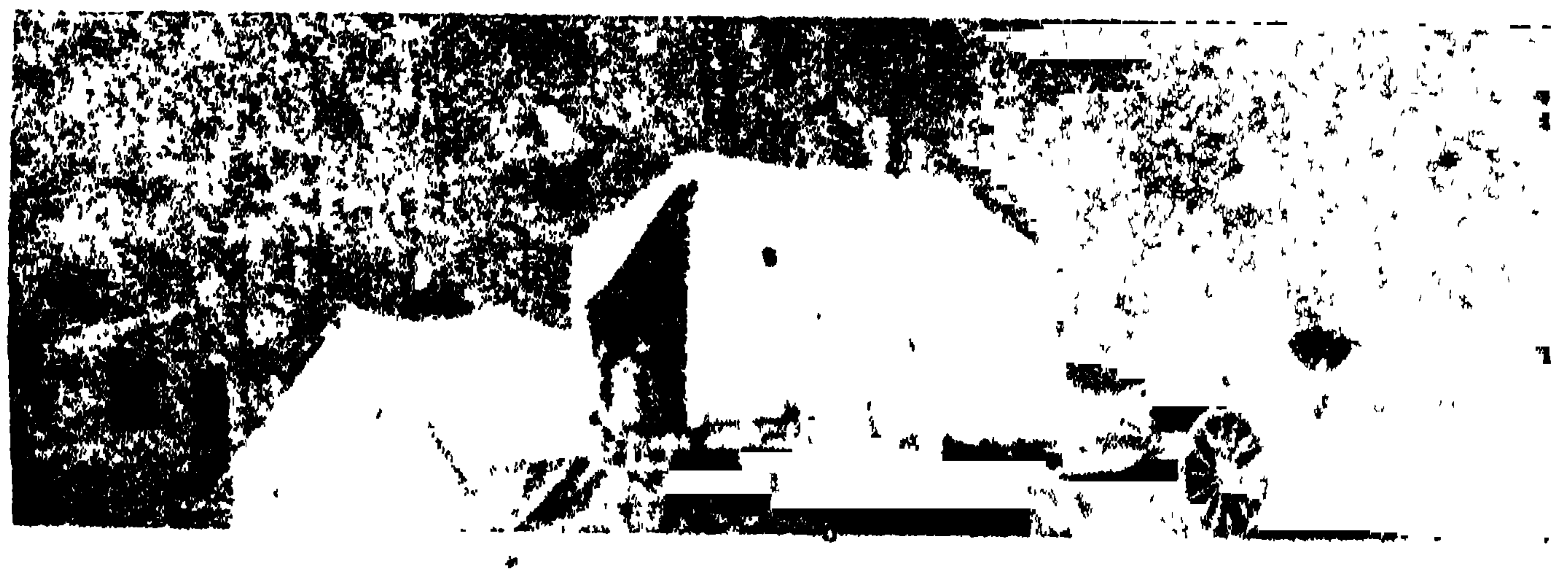

চলনশীল তাঁবু

বিবেচনা করিয়া দেখিলে পাঠকেরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন, জগতে এত বড় টেলিফোঁ আর কোথাও নাই। নিউইয়র্ক হইতে ওহামার দূরত্ব ১৫৪০ মাইল; আর টেলিফোঁ লাইনের দৈর্ঘ্য ইহার দ্বিগুণ। লণ্ডন হইতে প্যারী লাইন মোট ৩৫০ মাইল। সকলে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, কেহ যদি নিউইয়র্কে তাঁহার টেলিফোঁর receiver অর্থাৎ শ্রবণ-যন্ত্র উত্তোলন করেন, তাহা হইলে সান-

ফ্রান্সিস্কোতে তাঁহার বন্ধুর বাড়ীর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে। এই দুইটী সহরের দূরত্বের কথা শুনিলে আমরা চমৎকৃত হইব; কারণ, এই দুইটী সহরের ঘড়ির সময়ে (standard time) প্রায় তিন ঘণ্টার প্রভেদ। এক স্থানের মানুষের স্বরকে বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিণত করিতে এবং তাহাকে ৩৩৯০ মাইল তারের মধ্য দিয়া অন্য মুখে আনিয়া পুনরায় বৈদ্যুতিক প্রবাহ হইতে বায়ু-প্রবাহে পরিণত করিয়া আমাদের কর্ণ-পটহের শ্রবণোপযোগী করিতে এক সেকেণ্ডের পনরো ভাগের একভাগ সময় লাগে। বৈদ্যুতিক প্রবাহের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৫৬০০০ মাইল। American Telephone ও Telegraph কোংর এই লাইন বসাইবার পর একটা গুরু সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এখন তারহীন টেলিফোঁর পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। ফলে, নিউ-ইয়র্ক হইতে হাউই দ্বীপের অন্তর্গত পার্ল হারবার পর্য্যন্ত ৪৯০০ মাইল দূরবর্ত্তী দুইটা স্থানের মধ্যে তারহীন টেলিফোঁর সাহায্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল পিউপিন ও মিঃ কার্টি এই তারহীন টেলিফোঁর প্রধান উদ্‌যোগী। এই তার-হীন টেলিফোঁর সৃষ্টি হওয়ায় অল্পকাল পূর্ব্বে কোটী-কোটী টাকা ব্যয় করিয়া যে সকল টেলিফোঁ লাইন বসান হইয়াছে, আজ তাহা অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। কিছুদিনমাত্র পূর্ব্বে যে আমেরিকান-মহাদেশ বিস্তৃত (transcontimental) লাইন জগতের অন্যতম আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইতেছিল, আজ তাহা নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।*

* এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে The World's Work নামক ইংরাজী মাসিক পত্রের একটী প্রবন্ধ হইতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। চিত্রগুলিও ঐ মাসিকপত্র হইতে গৃহীত। সেই জন্য ঐ সাময়িক পত্রের নিকট আমি বিশেষ ঋণী।

ব্যর্থ প্রয়াস

[শ্রীশান্তিকুমার রায়-চৌধুরী]

সতীশকে আমরা খুব সচ্চরিত্র বলিয়া জানিতাম। আমরা বরাবর একসঙ্গে পড়িয়াছি। ম্যাট্রিকুলেসন পাশ করিয়া সকলেই কলেজে ঢুকিলাম; কিন্তু পিতার অকালমৃত্যুতে সংসারের ভার স্কন্ধে পড়ায় বেচারা সতীশকে চাকরীর সন্ধানে ছুটিতে হইল। চাকরিও জুটিল। নরেশের দাদা কুমার বাবু কারবারী লোক; নরেশের সুপারিসে তাঁহার চালের আড়তে সতীশ পঁচিশ টাকা মাহিনায় বিল-সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। ইহা ছাড়া টিউসানি করিয়াও সতীশ কিছু রোজগার করিত। পৌত্র-মুখ দর্শন করিয়া সশরীরে স্বর্গে যাইবার কামনায় সতীশের মাতা অতি বাল্যকালেই তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন,—তাঁহার সে আশা সফলও হইয়াছিল। সুতরাং সতীশের সংসারে এখন মাতা, স্ত্রী, ছোট ভাই ও একটী মাস-ছয়েকের পুত্ররত্ন। মাসিক গুটি ত্রিশেক টাকায় এই কয়টী প্রাণীর ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ কলিকাতা সহরে বড়ই কষ্টকর। সতীশের পিতারও অবস্থা ভাল ছিল না। শেষবয়সে কিছু ঋণগ্রস্ত হওয়ায়, মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি গ্রামের বসতবাটী বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করেন। কাজেই সতীশের আর দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। শুনা যায়, ২।৩ পুরুষ পূর্ব্বে সতীশদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল, বাটীতে বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত; কিন্তু সতীশের নিকট কোনদিন আমরা এসব কথা শুনি নাই, অতীত সুখ-সৌভাগ্যের কথা তুলিয়া নিজেকে বনিয়াদী-বংশ-সম্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সে আদৌ ভালবাসিত না। দারিদ্র্যের সহিত সে প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় যুদ্ধ করিত। সর্ব্বদাই তাহার মুখে তৃপ্তির ছায়া দেখিতে পাইতাম। কষ্টের ভাগ সতীশ কখনও আমাদের দিত না, আমরাও জানিতে পারিতাম না,—কিন্তু সুখের অংশ দিতে সর্ব্বদা সে লালায়িত ছিল। এখন 'আমরা' কথাটির একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। পাঁচটী বন্ধু লইয়া এই 'আমরা'—সুবোধ, সুধীর, নরেশ, সতীশ ও আমি। আমাদের একটী ক্লাব ছিল; সে ক্লাবের অধিবেশনে হাস্যের উৎস সদাই প্রবাহিত হইত বলিয়া, ক্লাবটীর নাম দেওয়া হইয়াছিল—'লাফিং ক্লাব'। কিন্তু আমাদের ক্লাবে শুধু যে হাসির গল্প হইত, তা নয়; সিগারেটের মূল্যবৃদ্ধির কারণ, পুরাতন ইজিপ্টের আর্ট, পার্লামেণ্টের বক্তৃতা, চীনাদের টিকি কাটিবার প্রয়োজনীয়তা, জাপানের ব্যবসা, হিন্দু-দর্শনে ঈশ্বরবাদ, পূর্ব্বভারতের কলাবিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েরই আলোচনা চলিত। ক্লাবের অধিবেশন হইত আমার বৈঠকখানায়।

তার কোন সময়-অসময় ছিল না—সময় পাইলেই হইল। কিন্তু জমিত ভাল সান্ধ্য চা-পানের সঙ্গে। আর ছুটীর দিন সকালে ঈষদুষ্ণ চায়ের সঙ্গে নরেশের চুট্‌কি, গম্ভীর কবি সুবোধের বুক্‌নি, সুধীরের হাস্য, সকলেই বেশ উপভোগ করিতাম। সতীশ সব দিন আসিতে পারিত না,—কিন্তু যেদিন আসিত, সেদিন অত্যন্ত আনন্দেই কাটিত; কারণ, সতীশ মজ্‌লিসি লোক, নিজে একজন সাহিত্যিক ও বেশ গাহিতে পারিত,—কত বর্ষার সন্ধ্যায় বা চাঁদিনী রাতে যে আমরা সতীশের সুমিষ্ট কণ্ঠের সঙ্গীতে বিভোর হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বেশী দিন অনুপস্থিত হইলে আমরা সতীশের বাড়ী দৌড়াইতাম; কারণ তাহাকে না পাইলে আমাদের ক্লাব ভাল জমে না। অনুপস্থিতির জন্য অনুযোগ করিলে, সে হাসিয়া বলিত,—"ওহে, কবি তোমরা, তোমাদের আড্ডা, ইয়ারকি, দক্ষিণ হাওয়া, চাঁদের আলোতে পেট ভরে; কিন্তু আমাদের ঐ পোড়া পেট ভরাবার জন্যে অন্নের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতে হয়।" বলিয়া সে হাসিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সে হাসি বিষাদ-মাখা। সতীশের একটা গুণ ছিল,—আমরা গেলে সে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িত না। হাতে পয়সা না থাকিলেও ধার করিয়া আনিয়া কিছু খাওয়াইয়া দিত। তজ্জন্য তাকে অবশ্য খুবই প্রশংসাই করিতাম; বলিতাম, 'গরীব হলে কি হবে, বনেদি ঘরের ছেলে কি না, দিল খুব উঁচু' কিন্তু আমাদের সামান্য একটু তৃপ্তির জন্য যে তাহাকে কতখানি সহ্য করিতে হইত, হয় ত বা তাহার পরিবারবর্গকে একসন্ধ্যা উপবাস করিয়া কাটাইতে হইত, আমরা তা কখনও ভাবিয়া দেখিতাম না, বা দেখিবার ক্ষমতা ছিল না—কারণ, আমরা অন্য সকলেই ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত। আমাদের কোন বিপদে-আপদে সতীশ প্রাণ দিয়া সাহায্য করিত; কিন্তু তাহার নিজের জন্য কখনও কাহাকেও কিছু বলিত না। এই হৃদয়ের প্রসারতা সে কোথা হইতে পাইয়াছিল, তা তাহার জননীকে দেখিলেই বুঝা যাইত। সেই সৌম্য, শান্ত, সদাহাস্যময়ী বিধবা পরের দুঃখ-মোচনের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত,—মা ও ছেলে এক ছাঁচে ঢালা। সতীশের পত্নীও শ্বশ্রূর আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার সংসারটী বাস্তবিকই সুখের সংসার ছিল। সতীশ পত্নীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তজ্জন্য বিদ্রূপের বাণ তাহাকে কম সহ্য করিতে হইত না; কিন্তু সে নীরবে সহ্য করিত, কোন উত্তর দিত না।

(২)

এইরূপে চার-পাঁচ বৎসর অতীত হইল। সতীশের মা পরলোকে, এবং সতীশের একটী কন্যা হইয়াছে। আমাদের পরিবর্ত্তনের মধ্যে সকলেই বি-এ পাশ করিয়াছি, এবং সুধীর নূতন বিবাহ করিয়া সবজজ শ্বশুরের নিকট যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্তির আশায়, ডেপুটিত্বের নমিনেশনের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। যদি সুবিধা না হয় ত মুনসেফি গ্রহণ করিবে,- তজ্জন্য তাহাকে কষ্ট করিতে হইবে না; কারণ তাহার খোঁটায় জোর আছে। নরেশ শিক্ষা-বিভাগে যাইবে বলিয়া এম-এ পড়িতেছে। আমি কি করিব ঠিক করিতে পারিতেছি না; কারণ, ব্যারিষ্টারি পড়িতে যাইব এইরূপ বরাবর ঠিক ছিল; কিন্তু এখন যুদ্ধের জন্য সমুদ্র-যাত্রা নিরাপদ নহে। জীবনের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইলেও আমাদের ক্লাবের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে সতীশের আসা-যাওয়া খুব কমিয়া গিয়াছে। আমরা বলিতাম, "সতীশটা গিন্নীকে ছেড়ে এক মিনিট থাকতে পারে না।" পূর্ব্বে সুধীর ইহাতে খুব হাসিত; কিন্তু বিবাহের পর হইতেই সে সতীশের পক্ষ লইয়া আমাদের উত্তর দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাতে কোন ক্ষতি নাই; কারণ আমরা দলে ভারী—তিনজন অবিবাহিত। প্রায় দিন-পনের অনুপস্থিতির পর একদিন সতীশ আসিলে আমি বলিলাম, "কি হে সতীশ, তোমার যে আজ চুলের টিকিটী দেখবার জো নাই, অবসর সময়ের সবটাই কি 'অন হার ম্যাজেষ্টিস্ সার্ভিসে' কাটাও না কি?'

ঈষদ্ধাস্যে সতীশ বলিল, "ওসব কথা এখন তোমাদের মুখেই শোভা পায়। তোমাদের কাছে দুনিয়াটা এখন গোলাপী, বড় মিঠে; কিন্তু আমাদের কাছে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এককালে আমাদেরও পৃথিবীটা বেশ সুখেরই বোধ হত।"

আমাদের কাছে দুনিয়াটা বাস্তবিক তখন গোলাপী। সমস্ত সংসারের ভার লইয়া পিতা বর্ত্তমান। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, ভবিষ্যতে বেশ রোজগারের আশা, বিবাহ না করায় বন্ধনমুক্ত জীবন। মোটের উপর পৃথিবীর দুঃখটা বাদ শুধু সুখটুকুই কল্পনার তুলি দিয়া একটু গাঢ় রংয়েই

রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিলাম। ইহার পর আর দিনকতক সতীশের দেখা পাই নাই। একদিন সে আসিলে শুনিলাম, স্ত্রীর অসুখ লইয়া সে বড়ই বিব্রত। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কেমন?" "বড় দুর্ব্বল, ডাক্তারে বলেছে চেঞ্জের দরকার।" আমি বলিলাম, "এ উত্তম পরামর্শ, স্বাস্থ্যকর স্থানের জল-হাওয়ায় শরীরটা বেশ সেরে যাবে।"

সতীশ আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু চুপ করিয়া রহিল। নরেশ বলিল, "রেখে দাও ওসব সংসারিক কথা; এস, একটু গল্প করা যাক্,—এমন সুন্দর রবিবারের সকালটা বাজে নষ্ট করা যায় না।" চা, চুরুট সহযোগে গল্প চলিল বটে, কিন্তু ভাল জমিল না। সতীশ বরাবরই নীরব ছিল; সে চলিয়া গেলে নরেশ বলিল, "সতীশটা বড়ই স্ত্রৈণ!"

বহুদিন সতীশের আসিবার আশায় বসিয়া থাকিয়া একদিন তাহার ওখানে গিয়া হাজির হইলাম; দেখিলাম, সতীশের চেহারা বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, "কি হে, ভেবে-ভেবে শরীরটা তুমি একেবারে মাটী করে' ফেল্‌বে না কি? কেন, আর কারও কি কখনও স্ত্রীর অসুখ করে না, না কি!"

ব্যগ্রভাবে সতীশ বলিল "না, না, তার জন্যে কিছু নয়। আজকাল রাত জেগে একটু খাটতে হচ্ছে, একখানা নভেল লিখ্‌ছি কি না?"

আমি সোৎসাহে তাহার পিঠ চাপড়াইলাম; কিন্তু কৈ তাহার মুখে ত হাসির রেখাটীও ফুটিয়া উঠিল না!

শনিবার সকালে উদাস ভাবে ইজি চেয়ারের উপর পড়িয়া চায়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, এমন সময় সতীশ ঘরে ঢুকিল। আমি বলিলাম, "আরে এস এস, আজ সকালে যে কার মুখ দেখে উঠেছি ঠিক মনে পড়ছে না—ওরে এক-কাপ চা বেশী আনিস্।" সে বলিল "না, থাক, আমার চায়ের দরকার নেই।" "কেন?" "নাঃ, চা-সিগারেট-টিগারেটগুলো ছেড়ে দেবার মতলব করছি।" "অপরাধ?" "জোটাব কোত্থেকে?" "দেখ সতীশ, অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।" সতীশ আর কিছু না বলিয়া চার কাপে মনোনিবেশ করিল। ভাবে বোধ হইল সে কিছু বলিতে আসিয়াছে, কিন্তু বলিতে পারিতেছে না। আমিও তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না।

ঝি আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, মা বল্লেন, ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে কি?"

ব্যস্ত হইয়া সতীশ বলিল "ডাক্তারকে কেন?" "লীলার অসুখ।" লীলা আমার ভগিনী। "কি হয়েছে?" "টাইফয়েড।" "ওঃ, টাইফয়েড! তা'হলে সকলে খুব ব্যস্ত বল!" "কিছু বইকি" বলিয়া আমি টেলিফোঁর নিকটে গেলাম।

সতীশ বিষণ্ণ মুখে প্রস্থান করিল। ভাবিলাম, ব্যাপারখানা কি? কিছুদিন পরে শুনিলাম, সে স্ত্রী-পুত্র লইয়া মধুপুরে গিয়াছে।

(৩)

১৫ই পৌষ আমার জন্মতিথি উপলক্ষে বন্ধুদের আমাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ ছিল। সমস্ত দ্বিপ্রহরটী পাশা খেলিয়া, বিকালবেলা গরম চায়ে ক্লান্ত দেহটী একটু তাতাইয়া লইয়া, র‍্যাপার মুড়ি দিয়া, সিগারেট ধরাইয়া, সবে মাত্র বসিয়াছি, —এমন সময় চাকর ডাকের চিঠিপত্র দিয়া গেল। একটা বুকপোষ্ট ছিল; সেটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখি, একখানি বাংলা নভেল, নাম "কিরণবালা;" গ্রন্থকার আমাদের শ্রীমান সতীশ। নরেশ টপ্ করিয়া বইখানি কাড়িয়া লইয়া বলিল, "যাক্, শীতের সন্ধ্যায় খোরাক মন্দ পাওয়া গেল না।"

সুবোধ বলিল, "প্রমোদ, তুই বইখানা চেঁচিয়ে পড়, আমরা শুনি।" আমি সম্মত হইলাম। পড়া চলিতে লাগিল। সতীশের নভেলের ভাষা সুন্দর, ঘটনাবলী চমৎকার সাজান, চরিত্রগুলি অতি মনোহর ভাবে চিত্রিত। বিশেষতঃ নভেলের শেষদিকে সামান্য ভুলের জন্য যখন কিরণবালাকে অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে, সে স্থান অতি করুণ, অতি মর্ম্মস্পর্শী,—আমাদের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। এমন সময় হাঁপাইতে-হাঁপাইতে কালিদাস বাবু ঘরে ঢুকিলেন। কালিদাস বাবু কুমার বাবুর আড়তের ক্যাসিয়ার।

আমরা বলিলাম "আসুন, আসুন, কালিদাস বাবু, এত ব্যস্ত ভাবে যে।" "আরে ভাই, কি আর বলব। বড়ই খারাপ খবর। তোমাদের সতীশ আজ দু-মাস হল দোকানের ক্যাস থেকে দু'শটাকা ভেঙ্গেছে,—আজ ধরা পড়ে গেছে। তোমাদের খবরটা দেওয়াও ত দরকার,—তোমরা হলে কি না তার বন্ধু, অন্তরঙ্গ।"

"কে—কে, সতীশ ?" আমরা আশ্চর্য্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম। "হাঁা গো, হাঁা ;—তোমাদের বন্ধু" বলিয়া তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন।

আমরা পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলাম ; ভাবটা—এও কি সম্ভব ? তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোমরা বরাবরই বল্‌তে, সতীশ বড় ভাল ছোকরা ; কিন্তু আমি জানতাম, ওর মত অত বড় পাজী আর ভুভারতে নেই। এবার জেলে পচতে হবে।"

কালিদাস বাবুর জানিবার কারণ ছিল ; কারণ, এক-গ্রামেই উভয়ের বাড়ী ছিল। আরও শুনা যায় যে, সতীশের পিতাই দরিদ্র কালিদাসকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিয়া, নিজে অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহার একটী চাকরী জুটাইয়া দিয়া, নিরন্ন পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। কালিদাস বাবু উঠিলেন। আমি বলিলাম, "ও কি, উঠলেন যে এরই মধ্যে, অন্ততঃ তামাক-টামাক খান।"

"নাঃ ভাই, আর সময় নেই—একটু কাজ আছে" বলিয়া র‍্যাপারটী দিয়া মাথা বেশ করিয়া ঢাকিয়া লইয়া তিনি বাহির হইলেন। স্পষ্টই দেখিলাম, একটা পৈশাচিক আনন্দে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আহারান্তে সকলে বাটী গেল। সত্য বলিতে কি, আমার মনে সতীশের প্রতি একটী ঘৃণার ভাব উদয় হইয়াছিল। হতে পারে তার অর্থের অভাব ; কিন্তু তাই বলে চুরি ! নাঃ, এ অপরাধের ক্ষমা নেই।

মাসতিনেক আর সতীশ আমাদের সঙ্গে দেখা করে নাই। আমরা ভাবিতাম, লজ্জায়।

সে-দিন সকালে বসিয়া, সামনের ঈষ্টারের ছুটীটা কি ভাবে কাটান যাইবে তাহারই আলোচনা চলিতেছিল, এমন সময় রমেন ঘরে ঢুকিল। রমেন আমাদের ক্লাবের স্থায়ী সভ্য না হইলেও মাঝে-মাঝে আসিত। সুবোধ বলিল, "রমেন যে হঠাৎ ?" সে-কথার উত্তর না দিয়া রমেন বলিল, "প্রমোদ, চট্ করে একখানা আপীল লিখে ফেল ত। এক ব্রাহ্মণ-পরিবার বড়ই কষ্টে পড়েছে ; দেখি—বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কিছু চাঁদা ওঠাতে পারি কি না ?"

নরেশ বলিল, "রমেন যে আজকাল বড় বিশ্বপ্রেমিক হয়ে পড়েছ। বলি, কে সে ব্রাহ্মণ-পরিবার—যার জন্য মশায়ের সুনিদ্রার ব্যতিক্রম ঘটছে ?"

"তোমরা সকলেই তাকে চেন। আর বোধ হয় তোমরা একটু চেষ্টা করলে তাদের এত দুরবস্থায় পড়তে হত না। আজ দুদিন তাদের হাঁড়ি চড়ছে না।"

"বল কি ? কে সে ?" "সে আর কেউ নয়—তোমাদের বন্ধু সতীশ।" "অ্যাঁ, আজ দু'দিন তাদের খাওয়া হয়নি !"

"আর, তা'ছাড়া, সতীশের স্ত্রীর খুব অসুখ, একেবারে মৃত্যুশয্যায় !" "বল কি ?" "আরও শোন, কুমার বাবু তার নামে নালিশ করেছেন ;—কাল কোর্টে টাকা জমা দিতে না পারলে তাকে জেলে যেতে হবে।"

আমার মুখ হইতে একটী অস্ফুট শব্দ বাহির হইল মাত্র। তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ছুটিলাম ; মাকে গিয়া সমস্ত বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "আহা, সতীশের এতদূর অবস্থা খারাপ হয়েছে,—কৈ, সে ত একদিনও আমাদের কোন কথা জানায় নি ?"

"তার কষ্টের কথা সে কবে আমাদের জানিয়েছে মা ?" মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সে বড় অভিমানী।" "যাক্ সে কথা, এখন কিছু টাকা দাও।"

"তাই ত ! উনি মফস্বলে যাবার সময় সংসার-খরচ ছাড়া বেশী কিছু দিয়ে যান নি।" পরক্ষণেই বলিলেন, "আচ্ছা, দাঁড়া দেখ্‌ছি" বলিয়া নিজের ক্যাসবাক্স খুলিয়া পাঁচখানি গিনি বাহির করিয়া আমাকে দিলেন। এই গিনিগুলি তাঁর নিজের সম্পত্তি। মার বরাবরই গিনি জমাইবার সখ ছিল। একখানি গিনি কোনমতে তাঁর হাতে আসিলে আর বাহিরে যাইত না ; এমন কি, দেখিয়াছি, তাঁর ক্রোধের সময় বাবা যেই একখানি চকচকে গিনি বাহির করিয়াছেন, অমনি সমস্ত ক্রোধ কি এক মায়ামন্ত্রে দ্রবীভূত হইয়া যাইত।

তাড়াতাড়ি রমেনের হাতে গিনি কয়খানি দিয়া বলিলাম "তুমি এ খবর কোথা থেকে পেলে ?" "এই দেখ না কেন" বলিয়া সে একখানি চিঠি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "সতীশের ভাই যতীশ বাইরে অপেক্ষা করছে। সে বেচারারও কাল থেকে খাওয়া হয় নি।"

সুবোধ, সুধীর ও নরেশও বাড়ী হইতে যা পারিল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রমেনের হাতে দিল। সে বলিল, "চল না সকলেই যাওয়া যাক্। আর নরেশ, তুমি যদি দাদাকে বলে নালিশের টাকাটার কিছু কর্‌তে পার—" "আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।" "তাহলে চল প্রমোদ।" আমি বলিলাম, "দেখ

রমেন, এখন কোন্ লজ্জায় আমরা তার কাছে দাঁড়াব! হয় ত সে সমস্তই প্রত্যাখ্যান করবে। চিঠিতেই দেখ না কেন,—লেখা রয়েছে, 'শেষ পর্য্যন্ত অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে না পেরে, তোমায় লিখছি; কেন না তুমি আত্মীয়। তবু অন্য কোন বন্ধুকে লিখতে পারছি না।' তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর। যতীশের কাছে সব টাকা দিয়ে বলে দাও, যেন সে, টাকাটা কোথা থেকে পেলে, না বলে। আর মাঝে-মাঝে তার খবর আমাদের জানিয়ে টাকাকড়ি নিয়ে যায়। পরে সতীশ একটু সাম্‌লে উঠ্‌লে আমরা দেখা করব।"

যতীশকে ডাকিয়া আনিয়া সব বুঝাইয়া বলিলাম সে সহজেই স্বীকৃত হইল। অতগুলি টাকা হাতে পাইয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে তাহার চক্ষু ভরিয়া গেল।

(৫)

শ্যামবাজারের একটা দরিদ্র পল্লীতে গোলপাতার ঘরের ভিতর অচেতন পত্নীর পার্শ্বে মাথায় হাত দিয়া সতীশ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। চিন্তার তরঙ্গ আসিয়া তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতেছিল। সেও আজ সাতদিন জ্বরে ভুগিতেছে। বড়ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছোটটা তখনও ফুঁপিয়া-ফুঁপিয়া কাঁদিতেছিল। সতীশের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল—তাহা অনলের ন্যায় জ্বালাময়।

যতীশ ঘরে ঢুকিবামাত্র সতীশ বলিল, "রমেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল রে?" "না দাদা, দেখা করবার দরকার হয়নি" এই বলিয়া তাহাকে একখানি মনিঅর্ডারের কুপন দিল। তাহাতে লেখা ছিল, "ভাই সতীশ, তোমার অবস্থা বিপর্য্যয়ের কথা শুনে বড়ই দুঃখিত হইলাম। এখন এই দেড়শত টাকা পাঠাইলাম, পরে আরও পাঠাইব। তুমি এই টাকা লইতে দ্বিধা বোধ করিও না। জানিবে, এককালে আমি তোমার পিতার দ্বারা অশেষ প্রকারে উপকৃত হইয়াছিলাম। সে ঋণ অপরিশোধ্য।" নিম্নে কোন স্বাক্ষর নাই। বলা বাহুল্য ইহা যতীশের কারসাজি। সতীশের চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পড়িল; শুধু একটী কথা বাহির হইল, "এতদিনে সদয় হলে ভগবান্।"

যতীশ নিকটেই একটী পাকা ছোট বাড়ী ঠিক করিয়া আসিয়া সকলকে তথায় লইয়া গেল। ডাক্তার ডাকিয়া দাদার ও বৌঠানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। সতীশ শীঘ্রই সারিয়া উঠিল; কিন্তু তার স্ত্রীর রোগ কিছুতেই প্রশমিত হইল না। পরদিন সতীশ যতীশকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই, যা হ'ক এখন ত ভগবানের কৃপায় দু'সাঁঝ খাওয়া চল্‌ছে। কিন্তু কুমার বাবুর টাকাটা—" "সে তুমি জান না বুঝি দাদা, তিনি ত তিনমাস সময় দিয়েছেন।"

নরেশ দাদাকে সতীশের টাকাটা মাপ করিবার জন্য ধরিয়া বসিলে, তিনি বলেন, "কারবারি লোক আমরা, আমাদের কি টাকাকড়ি ছাড়লে চলে? তবে তুমি যখন বলছ, তাকে আরও তিনমাস সময় দেওয়া গেল।" নরেশ আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

একমাস কাটিয়া গিয়াছে,—সতীশ এখন সুস্থ হইয়া চাকরীর অন্বেষণ করিতেছে; কিন্তু তাহার স্ত্রীর অবস্থা একেবারেই খারাপ হইতে লাগিল। যতীশ প্রায়ই আসিয়া আমাদের কাছে সব বলিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ চাহিয়া লইয়া যাইত। একদিন আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "বৌঠা'নকে আর বাঁচান গেল না,—ডাক্তারেরা জবাব দিয়েছে।"

আমরা সকলেই সতীশের বাড়ী গেলাম। আমাদের কিছু না জানাইবার জন্য তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলাম; সে শুধু নীরবে শুনিল। ভাল-ভাল ডাক্তার ডাকাইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সতীশের স্ত্রীকে বাঁচান গেল না। এক গোধূলিতে সেই সাধ্বী স্বামীর পদে মাথা রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইল। সতীশকে রোজই আসিয়া সান্ত্বনা দিতাম; কিন্তু সে সদাই বিমর্ষ থাকিত।

একদিন সে বলিল, "কেন আমাকে মিছে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিস্; যার জন্য আমি জেলে যেতে প্রস্তুত হয়েছিলুম, সেই যখন বাঁচল না—"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে, "যখন ডাক্তারে বললে যে, স্ত্রীকে যদি বাঁচাতে চাও ত শীঘ্র চেঞ্জে যাবার বন্দোবস্ত কর, তখন ভাবলুম, টাকা কোথায় পাই। দূর-সম্পর্কের এক খুড়োকে চিঠি লিখে অবস্থার কথা জানালুম,—কোন উত্তর পেলুম না; পাবার আশাও করি নি, কারণ, তিনি অর্থবান। বড়লোকে কি গরীবের কষ্ট বোঝে? কিছুদিন থেকে একখানা নভেল লিখ্‌ছিলুম; রাত জেগে, দারুণ পরিশ্রম করে সেটা সেরে

ফেললুম, যদি কিছু টাকা পাওয়া যায়। পাবলিশারদের দোরে-দোরে ঘুরলুম; কিন্তু নূতন লেখকের বই কেউ পড়েও দেখলে না। শেষকালে একজন পাবলিশ করতে রাজী হল; কিন্তু বিক্রি করে' টাকা দেবে। বললে, বইখানি খুবই ভাল হয়েছে;—অন্ততঃ আপনি তিন-চারশ' টাকা পাবেন। তাঁরই কথার উপর নিভর করে কুমার বাবুর ক্যাস থেকে দু'শ' টাকা নিয়ে সকলকে সঙ্গে করে মধুপুরে গেলুম। ফিরে এসে পাবলিশারের কাছে টাকা চাইলুম। শুনেছিলুম, বইখানা খুব কাটছে। সে বল্লে, "টাকা এখন কি,—অ্যানুয়াল একাউণ্ট ক্লোজ্ না-হলে কোন হিসেব হবে না; আর বই বা কোথায় বিক্রি হচ্ছে?" সর্ব্বনাশ! এদিকে কালিদাস বাবু আবার—একাউণ্ট' চেক্ করে, ক্যাসে টাকা কম ধরে, কুমার বাবুর কাছে নালিশ করলেন। আমি ধরা পড়লুম। হাতে তখন আমার মাত্র টাকা কুড়ি-পচিশ আছে। দুশো টাকা কোথা থেকে দেব কিছুতেই ঠিক করতে পারলুম না। তিন মাসের মধ্যে কুমার বাবুর টাকা না দিলে জেলে যেতে হবে। সে টাকাই বা কোথাই পাই।"

সতীশ জানিত না যে, সে টাকাটা আমরাই চাঁদা করিয়া তুলিয়া সতীশের নামে কোর্টে জমা দিয়াছি।

(৬)

'কিরণবালা' বাহির হইবার পর হইতেই সাহিত্য-জগতে সতীশের বেশ একটা নাম হইয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য চাকরিরও কিছু সুবিধা হইল। হরিপুরের জমিদার বাবু একখানি বাঙ্গালা মাসিক বাহির করিবেন। সুধীরের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। তাহারই সুপারিশে সতীশ আশী টাকা বেতনে উক্ত কাগজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইল।

এক রবিবার সকালে আবার আমাদের চায়ের টেবিল বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় সতীশ দ্রুতপদে আমাদের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। তাহার হাতে এক-খানি নীলরঙের খামে মোড়া চিঠি। দেখিয়া বুঝিলাম, সমস্ত রহস্য ভেদ হইয়া গিয়াছে; কারণ, এই চিঠি আমারই লিখিত; তাহাতে লেখা লেখা ছিল—'প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে,—সতীশ যেন আসিয়া লইয়া যায়। কুমার বাবুর নিকট তিন মাস সময় লওয়া হইয়াছে। সাবধান, সতীশ যেন এই টাকার কথা জানিতে না পারে।"

সতীশ চিঠিখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল, "ভাই, তোদের কি বলে যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাব তা জানি না। সেদিন টাকার জোগাড় করে' কোর্টে জমা দিতে গিয়ে শুনলুম, কে আগেই জমা দিয়ে গেছে। তখন কিছুই বুঝতে পারি নি। এখন সবই বুঝতে পারছি যে, কে আমার পরিবারবর্গকে অনশন-মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছে; কে আমাদের ঔষধ-পথ্যের জোগাড় করে দিয়েছে।"

আমরা তাহাকে বাধা দিয়া বসাইলাম। কিছুক্ষণ পরে সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—"ভাই, আমার জন্যে তোরা যথেষ্ট করেছিস্। ভাই, আজকাল ভাইয়ের জন্য কেউ এতটা করে না। কিন্তু তোদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেছে। যদি একটু আগে এই উপকারটা কর্‌তিস্ তা'হলে আমার স্ত্রী আজ হয় ত মরত না; পৃথিবী আমার কাছে অন্ধকার হয়ে যেত না। আমি আজ সব পেয়েও কিছুই পাই নি। যদি একটু আগে কর্‌তিস!"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল—"তোরা জানবিই বা কোত্থেকে। তোদের আমি ত কিছুই বলি নি। কেন বলি নি জানিস্। তোদের হাসিমুখগুলো দেখলে বড় শান্তি পেতুম। সেই সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে পৃথিবীর কঠোর দুঃখের কথা তোদের জানাতে প্রাণে বড় বাজ্‌ত। আর—আর, আমি ছেলেবেলা থেকে বড় অভিমানী—প্রাণ ফেটে গেলেও কাকেও দুঃখের কথা জানাতে পারতুম না। যদি এত অভিমানী করেছিলে, তবে অর্থ দাও নি কেন হে ভগবান্।" তাহার চক্ষের জল টপ্‌টপ্ করিয়া পড়িতেছিল।

অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে বিদায় লইল; কিন্তু তাহার করুণ সুরের প্রতিধ্বনি কক্ষময় ছুটিয়া বেড়াইতেছিল—'যদি একটু আগে কর্‌তিস্—একটু আগে!'

বিবিধ-প্রসঙ্গ

অরণ্যের অপচয়

[শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত এম্-আর্-এ-এস্]

যে সময় মানুষের জ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয় নাই, যে সময়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের মর্ম্ম মানব ভাল করিয়া বুঝিতে শিখে নাই, সে সময়ে অরণ্য কেবল অনিষ্টের আকর বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ বুঝা যাইতেছে যে, মনুষ্য সমাজের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য কর্ষিত ভূমির ন্যায় অরণ্যও অতীব প্রয়োজনীয়। অরণ্যজাত নানাবিধ ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য হিসাবে অরণ্য অত্যাবশ্যক। দেশমধ্যে বারিপাত, মৃত্তিকায় জল-সংস্থান, প্রবল বন্যা নিবারণ—এ সমুদয়ের সহিত অরণ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঐতিহাসিক যুগের মধ্যেই কত দেশ অরণ্যশূন্য হইয়া অনুর্ব্বর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আমাদিগের দেশে পঞ্চনদের কতিপয় স্থান ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল।

পূর্ব্বাপেক্ষা ভারতে অরণ্যের পরিমাণ যে অনেক কমিয়া গিয়াছে, তাহা পুরাকালের পুস্তকাদি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এখনও ভারতে বনভূমি নিতান্ত সামান্য নয়। বৃটিশ-শাসিত সমস্ত ভারত ও ব্রহ্মদেশের আয়তন ১০,৭৯,৬৩৮ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে শুধু সরকারী বনভূমিরই আয়তন ২,৪৫,৬১২ বর্গ মাইল। এতদ্ভিন্ন বেসরকারী জঙ্গলও আছে; কিন্তু তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। মোটের উপর, ভারতের সমস্ত বনভূমির পরিমাণ দেশের আয়তনের এক-চতুর্থাংশের কম হইবে না।

ভারতে অরণ্যের পরিমাণ কম না হইলেও, উহার সংস্থান সর্ব্ব-প্রদেশে সমান নহে। অরণ্যের প্রকৃতিও, অর্থাৎ নানাজাতীয় বৃক্ষ-লতাদির সমাবেশও দেশভেদে বিভিন্ন প্রকারের। প্রধানতঃ সাত প্রকারের জঙ্গল এতদ্দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য জঙ্গলের ঠিক শ্রেণীবিভাগ করা যায় না, কিন্তু তবু বিবিধ উদ্ভিদ্জাতির প্রাধান্যে ও জল, বায়ু, মৃত্তিকা এবং ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার পার্থক্যে নিম্নলিখিত স্থানসমূহের অরণ্য বিশেষ-বিশেষ লক্ষণযুক্ত।

১। উত্তর ভারতীয় অরণ্য :—ইহা হিমালয়ের গাত্র ও পাদদেশ দিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চনদ, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল, দার্জ্জিলিং, আসাম ও সমুদ্র-উপকূলে চট্টগ্রাম—এই সমস্ত দেশ দিয়াই এই বিশাল অরণ্যমালা চলিয়া গিয়াছে। এত দূরব্যাপী জঙ্গলের বৃক্ষলতাদি যে সর্ব্বস্থলে সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে না, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব হিমালয়ের বনানীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে কি উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে, কি উপত্যকায়, সর্ব্বস্থানেই কনিফার (conifer) শ্রেণীর গাছ- দেবদারু, চিল, রেওয়ার ও মোরু, ভুজ, সফেদার, বেদ প্রভৃতিরই প্রাধান্য। উত্তর-পূর্ব্বে উচ্চদেশে কনিফার শ্রেণীর বৃক্ষ থাকিলেও, নিম্নদেশে উহার সংখ্যা নিতান্ত কম এবং তৎপরিবর্ত্তে অধিক উত্তাপসহ উদ্ভিদ সমূহের- যথা ম্যাগ্নোলিয়া, শিশু, খয়ের প্রভৃতিরই প্রাদুর্ভাব বেশী। বেতের জঙ্গল, আসামে নাগকেশর ও টুণ এবং সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী স্থানে গর্জ্জন ও জারুলের সমাবেশ উত্তর পূর্ব্ব অরণ্যানীর বিশিষ্ট লক্ষণ। এই হিমালয়ের অরণ্যের নিম্নভাগে গড়ওয়াল, কুমায়ুণ, গেড়ী, নেপাল তরাই ও গারো পর্ব্বত-অঞ্চলে বহুবিস্তৃত শালের জঙ্গল। পঞ্চনদের দিকে শুষ্ক মৃত্তিকার উপযোগী ক্ষুদ্র বৃক্ষাদির জঙ্গলও স্থানে স্থানে রহিয়াছে।

পূর্ব্ব-ভারতের অরণ্য :—গঞ্জাম ও বিজয়পত্তনের জঙ্গলে ইহা প্রারব্ধ হইয়াছে। দেশাভ্যন্তরে কর্ণূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া দক্ষিণে সালেম ও নেলোর জেলায় গিয়া ইহা পশ্চিম ভারতের জঙ্গলের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

৩। পশ্চিম-ভারতের জঙ্গল :—বোম্বাই প্রদেশের থানা জেলা-হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত বোম্বাই, কোলাবা, কানাড়া, মালাবার ও নীলগিরি পর্ব্বত দিয়া ইহা ত্রিবাঙ্কুরের জঙ্গলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। এই বন-বিভাগের উত্তরাংশে যথেষ্ট আবলুষ ও সেগুন গাছ দেখিতে পাওয়া যায়; মধ্যাংশে হরিতকী, জারুল ও চালতা জাতীয় বৃক্ষাবলী এবং দক্ষিণাংশে পুন্নাগ, চাঁপা, ঠেঙ্গস, আম, কুচিলা, দারুচিনি, গর্জ্জন, নাগকেশর প্রভৃতি বহুবিধ জাতীয় উদ্ভিদের নিবিড় জঙ্গল।

৪। মধ্য-ভারতের জঙ্গল :—পূর্ব্বপ্রান্তে সৌরাষ্ট্র ও পশ্চিম-প্রান্তে বঙ্গদেশ এতদুভয় সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানে মধ্য প্রদেশ, খান্দেশ, সাতপুরা ও দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ ব্যাপিয়া মধ্যভারতীয় অরণ্য বিরাজ করিতেছে। এই সমুদয় স্থানে বারিপাত কম এবং উদ্ভিদও তদনুরূপ। পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণে সেগুন, মধ্য ও পূর্ব্বে শাল এবং দক্ষিণসীমায় চন্দন—এই তিনটি বৃক্ষজাতিই এই বন-বিভাগের বিশিষ্ট লক্ষণ। তদ্ভিন্ন সাঁই, অঞ্জন, কুসুম, রক্তচন্দন, শিমুল প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে এতদঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। ব্রহ্মদেশের জঙ্গল :—দেশের আয়তনের অনুপাতে ব্রহ্মদেশেই অরণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ জমিই জঙ্গল দ্বারা অধিকৃত। আবার সমস্ত ভারতের অরণ্যের মধ্যে কি প্রসারতায়,

কি বৃক্ষজাতির বাহুল্যে, উভয় হিসাবেই ব্রহ্মদেশ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এতদ্দেশে অনেক শ্রেণীর জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চ পর্ব্বতগাত্রের বনশ্রেণী পূর্ব্ব হিমালয়ের বনের ন্যায়। টেনাসেরিম, পেগু, মার্টাবান ও পূর্ব্ব আরাকানে সেগুনই অধিক। গাম্ভার, জাম, সিরিস প্রভৃতিও এইস্থানে পাওয়া যায়। এক-এক স্থানে শুধু গর্জ্জনেরই জঙ্গল। আবার শুষ্ক স্থানে খদিরেরই প্রাধান্য।

৬। উপকূল অরণ্য :—ভারতের বড়-বড় নদী—গঙ্গা, সিন্ধু, গোদাবরী, ইরাবতী, প্রভৃতির মোহানায় ব-দ্বীপ সমূহের উপর এক প্রকার স্বতন্ত্র শ্রেণীর উদ্ভিদাবলী জন্মিতে দেখা যায়। সুন্দরবনের জঙ্গল ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত। এইরূপ জঙ্গল টেনাসেরিম, আরাকান, চট্টগ্রাম, মালাবার ও ভারতের অন্যান্য উপকূলে দৃষ্ট হয়। সুন্দরী, গোরা, গরাণ প্রভৃতি গাছ এই সমুদয় কর্দ্দমময় স্থানের প্রধান উদ্ভিদ।

৭। বিচ্ছিন্ন বনশ্রেণী :—ভারতের নানাস্থানে, পশ্চিমে সিন্ধু নদের উভয় পার্শ্বে এবং পূর্ব্বে খাসিয়া, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পাহাড় ও আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কতকগুলি জঙ্গল আছে। সাধারণ হিসাবে পূর্ব্বোক্ত ছয়টি শ্রেণীর মধ্যে কোনটিতেই উহাদিগকে স্থান দিতে পারা যায় না। উহাদিগের উদ্ভিদাবলীও স্থান হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের।

মোটামুটি হিসাবে ভারতীয় বনশ্রেণীকে উক্তরূপ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়। প্রদেশ হিসাবে বিভাগ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অরণ্য-সংস্থানের যথেষ্ট তারতম্য রহিয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :—

প্রদেশের নাম		মোট ভূমির সহিত বনভূমির অনুপাত।
১। বেলুচিস্থান—	...	১·৪
২। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—	...	১·৮
৩। বিহার ও উড়িষ্যা—	...	৩·৪
৪। যুক্তপ্রদেশ—	...	৩·৯
৫। আজমীর মাড়ওয়ার—	...	৫·১
৬। পঞ্চনদ—	...	৮·৬
৭। বোম্বাই—	...	৯·৯
৮। বঙ্গদেশ—	...	১৩·৫
৯। মান্দ্রাজ—	...	১৩·৮
১০। মধ্য-প্রদেশ ও বেরার—	...	১৯·৭
১১। কুর্গ—	...	৩০·৯
১২। আসাম—	...	৪৬·৬
১৩। ব্রহ্মদেশ—	...	৬২·৯
১৪। আণ্ডামান—	...	৭০·৩

উপরিউক্ত তালিকায় প্রদেশগুলি অরণ্যের আধিক্যের হিসাবে পর-পর সজ্জিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, এক-এক প্রদেশ প্রায় জঙ্গলবিহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পক্ষান্তরে, আণ্ডামানের ন্যায় স্থানে প্রায় সমস্ত জমিই জঙ্গল দ্বারা অধিকৃত। সেইজন্য স্থান-বিশেষে অরণ্য-বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হয়। কোন স্থানে জঙ্গল কাটিয়া চাষের ও বসবাসের জমি বৃদ্ধি করিতে হয় এবং কোথাও বা অরণ্য স্থাপন ও সংরক্ষণ করিতে হয়।

অরণ্য সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্যই অরণ্য-বিভাগের সৃষ্টি। সাধারণ লোকের নিকট অরণ্য রাখা কি কাটিয়া ফেলা একটা অতি সামান্য কাজ, তাহাতে কোন বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু আধুনিক জগতে বনবিদ্যা কৃষিবিদ্যার সমশ্রেণী অধিকার করে। প্রত্যেক সুসভ্য দেশেই বনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বড়-বড় কলেজ, যন্ত্রাগার, পরীক্ষা ও প্রদর্শনক্ষেত্র আছে, এবং উক্ত স্থানে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিলে তবে কোন ব্যক্তির বন-বিভাগে কর্ম্ম-প্রাপ্তি ঘটে। আমাদিগের দেশে দেরাদুনে অবস্থিত বন-বিদ্যার কলেজ ও মৌলিক গবেষণাগারই বনবিদ্যা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র-স্থল। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব অধিক দিনের নহে। তার ও ডাক বিভাগের ন্যায় বনবিভাগও লর্ড ড্যালহৌসির সৃষ্টি। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইহা প্রথমে স্থাপিত হয় এবং কয়েক স্থানের জঙ্গল গবর্ণমেণ্ট নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া উন্নতির চেষ্টা করেন। আপাততঃ জার্ম্মাণি আমাদিগের শত্রু হইলেও সত্যের খাতিরে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতের বনবিভাগের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা একজন জার্ম্মাণ—স্যর ডের্টিক ব্র্যাণ্ডিস্। সে সময়ে বনবিভাগের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ প্রধানতঃ জার্ম্মাণি অথবা ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেন। তৎপরে ইংলণ্ডের কুপার্স হিল কলেজে ও অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, এডিনবর্গ ও ডব্লিনের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বর্ত্তমান দেরাদুনে অবস্থিত কলেজ ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে প্রথমতঃ স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজেই বনবিভাগে নিযুক্ত অধিকাংশ দেশীয় কর্ম্মচারি শিক্ষিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বনবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এখনও বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসেন।

ভারতে জঙ্গলের আধিক্য হিসাবে ভারতবাসী যে অরণ্য-বিদ্যায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, জাপান আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ন্যায় উচ্চস্তরের বনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার সুবন্দোবস্ত এখনও এতদ্দেশে হয় নাই। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে সবেমাত্র রাজসরকার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিতে পারা যায়। ফলাফল বিবেচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে শাল, সেগুন, শিশু, দেবদারু, চিল, প্রভৃতি আয়কর বড়-বড় বৃক্ষের সংরক্ষণ ও বাছাই কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে বটে, কিন্তু আরও যে নানা প্রকার অরণ্যজাত দ্রব্য দ্বারা ধনাগমের উপায় হইতে পারে, সে বিষয়ে রাজ-সরকারের কিম্বা অন্য সাধারণের বিশেষ চেষ্টা নাই। ১৯১৩।১৪ সালের বনবিভাগের হিসাবে দৃষ্ট হয় যে, উক্ত বিভাগের মোট আয় ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং প্রকৃত আয় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। মোট বনভূমির অনুপাতে এই হিসাবে

প্রতি বর্গ-মাইলে ৬৪ টাকা লাভ হয়। অপরাপর দেশের হিসাবে ইহা অতি সামান্য। অরণ্য-বিদ্যায় অবহেলাই ইহার অন্যতম কারণ। অরণ্যসকল অধিকতর দক্ষতার সহিত পরিদর্শিত হইলে এবং নানাবিধ অরণ্যজাত দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় অভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইলে, আয় যে চতুর্গুণ হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সরকারী হিসাবে অরণ্যজাত ফসলকে সাধারণতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—মুখ্য ও গৌণ ফসল। মুখ্য ফসলের মধ্যে অবশ্য কাষ্ঠই সর্ব্বপ্রধান, এবং ইহা হইতেই সরকারের সর্ব্বাধিক আয় হয়। ভারতের অরণ্যে বৃক্ষের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; এবং জাতি-বাহুল্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতীয় অরণ্যে অন্ততঃ ২৫০০ জাতীয় বৃক্ষ আছে। তবে প্রধান কাষ্ঠ-উৎপাদক বৃক্ষাদির মধ্যে শাল, সেগুন, শিশু, দেবদারু, আবলুষ, চন্দন, রক্তচন্দন, পাদক, পিংকাড়ো, গর্জ্জন, বাকুল, খয়ের প্রভৃতিই অন্যতম। বাঁশ, জ্বালানি কাঠ ও ঘাস এই বিভাগের অন্তর্গত। এই তিন প্রকারের দ্রব্য হইতে গবর্ণমেণ্টের আয় সামান্য নহে। বনবিভাগের কর্ম্মচারিবর্গ এই শ্রেণীর ফসলের উৎপাদন মাত্রা যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য সকল সময়ে সচেষ্ট থাকেন। সেইজন্য বৎসরের পর বৎসর মুখ্য ফসল উৎপাদনের অধিক পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইতেছে।

কিন্তু ভারতীয় অরণ্যসমূহের গৌণ আরণ্য ফসলও নিতান্ত নগণ্য নহে। দুই-একটি স্থল ব্যতীত এই শ্রেণীর ফসলের ক্রমোন্নতি-সাধন অথবা উৎপাদনমাত্রা বৃদ্ধি করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। এমন কি, অনেক স্বভাবজ উদ্ভিদাদি যাহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং যাহা অন্য দেশে ব্যবসায় ও বাণিজ্যে নিয়োগ করিতে আদৌ কাল বিলম্ব হইত না,—সেরূপ দ্রব্যাদিও অবহেলায় বনমধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আপাততঃ যে সকল গৌণ ফসল হইতে বনবিভাগের আয় হয়, সেগুলি শুধুই যে অনায়াসলব্ধ, তাহা নহে, অধিকন্তু সেই সমুদয় ফসল অবৈজ্ঞানিকভাবে আরণ্য জাতি প্রভৃতির দ্বারাই সংগৃহীত হয়। এইরূপ শৈথিল্য ও অবজ্ঞার সহিত সংগৃহীত হইয়াও ইহা হইতে সরকারের প্রায় ১০৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গৌণ আরণ্য ফসল হইতে কিরূপ আয় হয়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

প্রদেশের নাম	গৌণ অরণ্য ফসল হইতে আয়।	বনভূমির বর্গ-মাইল প্রতি আয়ের অনুপাত।
১। পঞ্চনদ	২৩,৪৭,১২০	২৮২
২। যুক্ত প্রদেশ	৮,৮৮,৯৪৯	২১৩
৩। আজমীর মাড়বার	২৩,৮৩৭	১৮৬
৪। সীমান্ত প্রদেশ	৩৬,৮৮১	১৫৬
৫। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২২,৩৪,৮১১	১১৪
৬। বোম্বাই	১১,৮৩,৫৮৯	৯৭
৭। মান্দ্রাজ	১৮,৬৮,৪৩২	৯৫
৮। বিহার ও উড়িষ্যা	২,৩৩,৪২১	৮৪
৯। বেলুচিস্থান	৪৩,৬১৭	৫৬
১০। কুর্গ	২৪,৩৮৪	৪৯
১১। বঙ্গ	৩,৫৩,৯৭৪	৩৩
১২। আসাম	৬,৯৯,৮২৮	৩১
১৩। ব্রহ্ম	৮,৫৩,৯০৫	৬
১৪। আণ্ডামান	৫,১৫৭	২

উপরি-উক্ত তালিকার সহিত ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত তালিকার তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অরণ্যের প্রাচুর্য্য থাকিলেই গৌণ আরণ্য ফসল অধিক হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রহ্মদেশ ও আণ্ডামানের উল্লেখ করিতে পারা যায়। অরণ্যের অনুপাতে এই দুই দেশে শতকরা ৬২.৯ ও ৭০.৩ অংশ জমিতে অরণ্য আছে। কিন্তু এই দুই দেশে গৌণ আরণ্য ফসল হইতে আয় বর্গমাইল প্রতি যথাক্রমে ৬ ও ২ টাকা। পক্ষান্তরে প্রদেশসমূহের মধ্যে অরণ্যের বাহুল্যতায় পঞ্চনদ নবম স্থান অধিকার করিলেও গৌণ আরণ্য ফসল হইতে আয়ের হিসাবে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, জঙ্গলের বিস্তৃতিতে নহে, বরং তত্ত্বাবধারণের গুণে গৌণ আরণ্য ফসলের আয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পঞ্চনদ ও যুক্তপ্রদেশে বন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ গৌণ আরণ্য ফসল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যতটা চেষ্টা করেন, ততটা অন্য কোথাও হয় না। বর্ত্তমান সময়ে অরণ্য বিভাগের উদ্যমে যে সমুদয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তন্মধ্যে তার্পিণ ও রজন উৎপাদন অন্যতম এবং পঞ্চনদের জাল্লো এবং যুক্তপ্রদেশের ভাওয়ালী এই দুই স্থানেই দুইটি প্রধান তার্পিণের কারখানা অবস্থিত। আরণ্য ঘাস ও বাঁশ হইতে কাগজের উপাদান, কাষ্ঠ হইতে নানাবিধ কার্য্যে প্রয়োগের জন্য কাষ্ঠ-পিণ্ড—এই সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রস্তাবনা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই, হইলেও তাহা উক্ত দুই দেশে কিম্বা বঙ্গদেশে হইবে।

গৌণ আরণ্য ফসল হইতে যে কত প্রকারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা মোটামুটি কয়েক শ্রেণীর ফসলের উল্লেখ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সংক্ষেপতঃ শ্রেণীগুলি নিম্নরূপ :—

(১) তন্তু; রজ্জু প্রস্তুতের উপযোগী মুঁজঘাস, মুর্গা, কেয়া, আঁতমোড়া, আকন্দ, বনঢেঁড়স প্রভৃতি; কাগজের জন্য সাবাই ও অন্যান্য জাতীয় ঘাস ও বাঁশ; ঝরুমের জন্য হেঁতাল, গোলপাতা ইত্যাদি।

(২) ঔষধার্থ ব্যবহৃত উদ্ভিদাদি, মসলা ও গন্ধদ্রব্য; গন্ধতৃণ, রোজা-তৃণ ও চন্দন-কাষ্ঠ আপাততঃ বড় বড় ব্যবসায়ের দ্রব্য। দারুচিনি, ছোট এলাচ, গোলমরিচ, জায়ফলও জঙ্গল হইতে কতক পরিমাণে সংগৃহীত হয়। ঔষধে সুপরিচিত বহু সংখ্যক উদ্ভিদ্ জঙ্গলে জন্মাইয়া থাকে; মিঠা তেলিয়া, বচ, থোয়াথালী সাজোঁয়ান, কুচিলা, কুট প্রভৃতি কতক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু এগুলির এখনও রীতিমত ব্যবসায় স্থাপিত হয় নাই।

(৩) খাদ্য দ্রব্য:—আম, কাঁঠাল, জাম, মহুয়া, খোবানি,

আখরোট, নানা জাতীয় ঘাস প্রভৃতি অনেক দ্রব্য ভারতের নানা স্থানে দরিদ্র আরণ্য জাতিসমূহের সময়ে-সময়ে আহার যোগাইয়া থাকে। সাগু ও আরারুটও অনেক পরিমাণে বন্য উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত হয়।

(৪) রঞ্জক পদার্থ :—বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য উদ্ভিজ্জ পদার্থের ব্যবহার আজ-কাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু চামড়া রং করিবার জন্য এখনও বাবলা, তারওয়ার, খোলাব ও গরাণ ছাল এবং হরিতকী ও বাবলা ফল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সমস্তই আরণ্য দ্রব্য।

(৫) আঠা ও বৃক্ষাদির নির্য্যাস বাবলা আঠা, পলাশ, সিমুল ও বিজাশাল গাঁদা, ধুনা, লবান প্রভৃতি ব্যবসায়ের দ্রব্য। চির বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে তার্পিণ ও রজন প্রস্তুত হইতেছে। গর্জ্জন ও ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ ইন ও পিটমি তৈল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রবার চাষের চেষ্টা আসাম ও ব্রহ্মদেশে চলিতেছে।

(৬) *গৃহসজ্জাদি এবং ইমারৎ ও নৌগঠনের কাষ্ঠাদি :—এই সমুদয় শ্রেণীর দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য নানাবিধ কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। বাঁশ, বেত, উইলো, খুঁজ, খর, প্রভৃতির সাহায্যে সেরূপ টেবিল, চেয়ার, ঝুড়ি, মাদুর, বাক্স, পেটরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে, এতদ্দেশে এখনও সেরূপ হয় নাই।* চীন ও বিশেষতঃ জাপানে এই সমুদয় উপাদান হইতে মনোহর কারু কার্য্যসম্পন্ন আসবাবাদি নির্ম্মিত হয়।

(৭) বিশেষ কার্য্যাদি :—পেন্সিল, খেলানা, প্যাকিং-বাক্স, ঝুড়ি, ক্রিকেট, টেনিস, প্রভৃতি ক্রীড়ার সরঞ্জাম, স্লীপার ও কাষ্ঠপিণ্ড প্রস্তুতের উপযোগী কাঠ ভারতীয় অরণ্যসমূহে যথেষ্ট পরিমাণ আছে, কিন্তু এ সকলের সামান্য অংশ মাত্রই ব্যবহারে আসিয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে গৌণ আরণ্য ফসলের কেবলমাত্র শ্রেণীরই উল্লেখ করা চলে। আমরা প্রত্যেক শ্রেণীতে যে দুই চারিটি দ্রব্যের নাম করিয়াছি, সেগুলি শুধু শ্রেণীর প্রতিভূ। প্রত্যেক শ্রেণীতে ঐ প্রকারের বহুসংখ্যক দ্রব্য আছে এবং সে গুলির নামোল্লেখ করিতে গেলে একটি ছোট-খাট পুস্তিকা হয়। তবে এই স্বল্প তালিকা হইতেই বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, গৌণ আরণ্য ফসলের প্রাচুর্য্যতার অনুপাতে কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা নগণ্য। যে সমুদয় ফসল আজকাল অবহেলায় অপচয় হইতেছে, তৎসমুদয়ের ভবিষ্যৎ যে কিরূপ সুমহান, তাহা আমরা জঙ্গলের অনেক কর্ত্তৃপক্ষের উক্তির দ্বারাই দেখাইব।

বিগত বৎসর শ্রম-সমিতির (Indian Indiustrial Commission) অধিবেশনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় মধ্য-প্রদেশের Chief Consurvator of Forests, মিঃ হিল্ বলিয়াছেন : It was in the utilisation of the minor forest products that the greatest possibilities of Commercial development existed. There was a great amount of work still to be done and the prospects were such as to justify fully a large staff of experts. The existing staff could only undertake enquiries into a few of the numerous products available What was essentially wanted was a body of highly trained practical experts who would make full investigations into single products or groups of products on a large scale to demonstrate their commercial value."

ভাবার্থ :—গৌণ আরণ্য ফসলের সদ্ব্যবহারেই ব্যবসায়ের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি বিধানের সম্ভাবনা। এখনও বিপুল পরিমাণ কার্য্য অসাধিত রহিয়াছে। ঐ সমুদয় কার্য্যের ভবিষ্যৎ এরূপ আশাপ্রদ যে বহু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা আদৌ অসঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমান কর্ম্মচারিবর্গ অপরিমিত ফসলসমূহের মধ্যে কেবল দুই-একটির তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারেন। কিন্তু এখন একদল উচ্চশিক্ষিত, ব্যবহারজ্ঞান সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ বিস্তৃতভাবে বিশেষ-বিশেষ ফসল অথবা ফসলশ্রেণী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধান করেন ও উহাদের ব্যবসায় হিসাবে আবশ্যকতা প্রতিপাদন করেন, ইহাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

মূল হিসাবে ধরিতে গেলে, এখন রাজসরকার বন-বিভাগ রাখিয়া প্রধানতঃ কাঠেরই কারবার করিয়া থাকেন। কিন্তু শুধু তাহা করিলেই চলিবে না। গৌণ আরণ্য ফসলসমূহ যাহাতে অপচিত না হইয়া, ব্যবহারে আসিয়া দেশের ধনাগমের পন্থা সুগম করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতৎ সম্বন্ধে শুধু পরামুখাপেক্ষী হইয়া থাকা বাতুলের কার্য্য। সরকারের কর্ত্তব্যের ন্যায় জনসাধারণেরও কর্ত্তব্য আছে। সরকারী বিশেষজ্ঞ অথবা কর্ম্মচারিগণ বিশেষ-বিশেষ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তৎসমুদায় যে ব্যবসায়ে লাভজনক হইতে পারে, তাহা প্রতিপাদন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু কার্য্যতঃ এই সমুদয় দ্রব্য লইয়া সরকার যে এক-একটা ব্যবসা খুলিয়া বসিবেন, সেরূপ আশা করাই অসঙ্গত। দেশের জনসাধারণও এতদ্বিষয়ে সচেষ্ট হউন, তাঁহারাও যেন প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে পশ্চাৎপদ না হন।

বস্তুতঃ কাঁচামাল লইয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় গবর্ণমেণ্টের কতদূর অগ্রসর হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞই বিগত শ্রম-সমিতিতে নানারূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। বন-বিভাগের ব্যবহারতত্ত্ববিৎ মিঃ পিয়ারসন্ বলেন যে, একেবারে নূতন ধরণের কায হইলে স্বয়ং, এবং তাহা না হইলে অংশীদাররূপে গবর্ণমেণ্ট কার্য্য করিতে পারেন। পক্ষান্তরে Chief Conservator মিঃ হিলের মত এই যে, সরকারের আর্থিক সাহায্য দান অনাবশ্যক। ইহাতে বর্ত্তমান কারবারসমূহের অনিষ্ট হইতে পারে এবং স্বাধীন চেষ্টাও পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তি না পাইতে পারে। উভয় পক্ষের উক্তির মধ্যে যে কতক পরিমাণে সত্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের কতক পরিমাণে পথ প্রদর্শন করা আবশ্যক; কারণ দেশীয় ব্যক্তিবর্গ এখনও গৌণ আরণ্য ফসল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এই বিষয়ে প্রথমতঃ তাহাদের দৃষ্টি

আকর্ষণ ও পরে বিশেষ-বিশেষ কার্য্যে যোগদানের প্রবৃত্তি সঞ্চারণ, এই দুইটিই আপাততঃ মুখ্য কার্য্য। এই দুইটি কার্য্যে শিক্ষিত জনগণ সাহায্য না করিলে শুধু গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় কোন ফল ফলিতে পারে না। সুতরাং সরকারের কার্য্য আংশিক রূপে শিক্ষাপ্রদ এবং অবশিষ্ট ব্যবসায়োপযোগী হওয়া আবশ্যক।

আমরা এতক্ষণ নানাবিধ আরণ্য ফসলের প্রাচুর্য্য ও ব্যবহারাভাবে অপচয়ের বিষয় আলোচনা করিলাম। এক্ষণে উক্ত অপচয় কি প্রকারে নিবারিত হইয়া অরণ্যসমূহ অধিকতর ধনোৎপাদনের উপায় হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা যাউক। বন-বিদ্যা বিষয়ক উচ্চ-শিক্ষা, বনবিভাগের পুনর্গঠন ও অধিক সংখ্যক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী-নিয়োগ এবং বর্ত্তমান বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থনীতির প্রশ্নাদির উল্লেখের এস্থলে স্থানাভাব। শুধু সাধারণের পক্ষ হইতে কোন্-কোন্ কার্য্যের অচিরে অনুষ্ঠান হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহাই আমরা বলিব।

(১) ভারতীয় বনসমূহে ব্যবসায়োপযুক্ত কি কি দ্রব্য পাওয়া যায়, স্থানবিশেষ তাহাদের প্রাচুর্য্য কিরূপ, যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ে কিরূপে তৎসমুদয় সংগৃহীত হইতে পারে, এই সমুদয় বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। আমরা স্বকীয় অভিজ্ঞতার বলে অবগত আছি যে, বন-বিভাগের কর্ম্মচারিবর্গ কাঠ ভিন্ন অন্য কোন আরণ্য পদার্থের সঠিক খবর কদাচিৎ দিতে পারেন। ফলতঃ ইচ্ছা থাকিলেও কোন ব্যবসায়ী কোন বিশেষ আরণ্য ফসল কাজে লাগাইতে পারে না। সুতরাং যত শীঘ্র উপযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা এই কার্য্য নির্ব্বাহ হয় ততই ভাল।

(২) ব্যবহারিক আরণ্য ফসল বিষয়ক প্রদর্শনাগার প্রতিষ্ঠা।—ব্যবসায়ীর সম্মুখে ব্যবসায়োপযুক্ত দ্রব্যের নমুনা থাকিলে তবে উহার সন্ধান লইতে প্রবৃত্তি হয় এবং এইরূপ অনুসন্ধানই বা ক্রমে ব্যবহারে পর্য্যবসিত হয়। প্রত্যেক বড় ব্যবসায়ের কেন্দ্রে এইরূপ এক-একটি প্রদর্শনাগার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। উহাতে শুধুই যে কাঁচামাল থাকিবে তাহা নহে, কাঁচা মালের পার্শ্বে উহা হইতে কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে অথবা হইতে পারে, তাহারও নমুনা থাকা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

(৩) সাক্ষাৎ ভাবে আরণ্য ফসল হইতে আপাততঃ অতি অল্প সংখ্যক শিল্পাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা কোন বিশেষ শিল্প অথবা ব্যবসায়ের জন্য আরণ্য পদার্থ ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে সরকারের যথাসম্ভব সাহায্য করা উচিত। অবশ্য এস্থলে আরণ্য পদার্থ এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, উহা ইতঃপূর্ব্বে বিশেষ কোন কাজে আসে নাই। কার্য্যতঃ আমরা দেখিয়াছি যে, কোন বিশেষ ফসল অধিক পরিমাণে ব্যবহারের পথ সুগম না করিয়া দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সময়ে-সময়ে বরং বাধাই দিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধুয়া এই যে ফসল অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিলে উহা একবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। সংগ্রহের সহিত সমমাত্রায় সংরক্ষণ ও উৎপাদনও যে সম্ভব, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। কোন নূতন জিনিষ বাজারে চালাইতে হইলেই, ব্যবসায়ীকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য কিছু অধিক মাত্রায় লাভ দিতে হইবে। ব্যবসায়ের এ মূলমন্ত্রটা বনবিভাগের কর্ম্মচারিবর্গের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অধিক-কালব্যাপী কিম্বা স্বল্প হারে জমা, সম্ভবমত সামান্য রয়েল্‌টি অথবা অন্য কোন প্রকার বিশেষ সাহায্য প্রদান না করিলে আরণ্য ফসল লইয়া নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব।

(৪) আরণ্য ফসল-সম্ভূত অনেক ছোটখাট ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়—উপযুক্ত কলকব্জাদির অভাব। আমাদিগের দেশের জল-হাওয়া ও আর্থিক অবস্থার উপযুক্ত স্বল্প মূল্যের কল সব সময়ে পাওয়া যায় না। সেই জন্য যাহাতে বিশেষ-বিশেষ প্রকারের ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ের উপযোগী কলকব্জাদি প্রস্তুত হইতে পারে, তৎ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজনীয়। শ্রমসমিতির সভাপতি স্যর টমাস্ হল্যাণ্ড বোম্বাই সহরে ভারতীয় মহাজন সমিতির নিমন্ত্রণে গিয়া এই কথারই উল্লেখ করিয়াছিলেন। এক্ষণে এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে আরণ্য দ্রব্যাদি হইতে তৈল, গন্ধদ্রব্য, ঔষধ ও অন্যান্য প্রকারের দ্রব্যাদি প্রস্তুতের পথ অনেকটা প্রশস্ত হইবে।

(৫) বন-বিভাগ হইতে নানা বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা-বহুল ইংরেজিতে লিখিত। ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠক-গণের পক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ যে অবোধ্য, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণও উক্ত গ্রন্থাদির অস্তিত্ব প্রায়ই অবগত নহেন; এবং অবগত থাকিলেও নিতান্ত জটিল বোধে পাঠে বিরত থাকেন। অবশ্য বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর অবগতির নিমিত্ত রচিত গ্রন্থাদি বৈজ্ঞানিক ভাষায়ই রচিত হওয়া উচিত। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যাহাদিগের দেশের স্বভাবজ দ্রব্যকে ভিত্তি করিয়া এই সমুদয় গ্রন্থ লিখিত এবং যাহাদিগকে উক্ত সমুদয় দ্রব্যের ব্যবহার অবগত করান বনবিভাগের চরম উদ্দেশ্য, তাহাদিগের জাতীয় ভাষা ইংরেজি নহে। কৃষিবিভাগ আজকাল অনেকটা ঠেকিয়া শিখিয়া দেশীয় ভাষায় তথ্যাদি প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বন-বিভাগেরও উক্ত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবার সময় আসিয়াছে। বন-বিভাগের অনেক বিবরণী ও পুস্তিকার মধ্যে ব্যবসায়ীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বহুবিধ বিষয় আছে। সাধারণের অবগতির জন্য এইরূপ পুস্তিকাদির সার-সঙ্কলন করিয়া সহজ ইংরেজী ও প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে দেশে যে ফসলের ব্যবসায় চলিতে পারে, অথবা যেস্থলে যাহার প্রাচুর্য্য অধিক, সেই দেশে স্থানীয় ভাষায় সেই ফসল সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যাদি সংক্ষিপ্তাকারে প্রচারিত হইলে লোকের অনুসন্ধিৎসা যে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্রিক্ত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই অনুসন্ধিৎসা বৃত্তিই সকল শিল্প বাণিজ্যের মূল ভিত্তি। আমরা অবশ্য ইহা বলি না যে, বনবিভাগের সমস্ত গ্রন্থাদিরই অনুবাদ প্রকাশিত হউক। সামান্য বিবেচনা করিলে কর্ত্তৃপক্ষ নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন যে, বিষয়-

বিশেষ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। এইরূপ স্থলেই জনসাধারণের অবগতির জন্ম প্রাদেশিক ভাষায় সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে আমরা এই মাত্র বলিতে চাহি যে, কাঁচা মাল উৎপাদন ও সংগ্রহ—আজকাল সভ্যজগতের একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহার দেশে যাহা কিছু কর্ষিত অথবা বন্য ফসল আছে, সকলেই তৎসমুদায়ের পূর্ণ মাত্রায় সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। আমাদিগকে উৎপাদন করিতে হইবে না; প্রকৃতি আমাদিগের জন্ম যাহা উৎপাদন করিয়া দিতেছেন, তাহাই কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিলেও আমাদিগের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

দ্রষ্টব্য গ্রন্থাদি :—

১। Pearson, R. S.—Commercial Guide to Forest Economic Products.
২। Troup, R. S.—Indian Wo d and their Uses.
৩। Dutt, N. B.—Commercial Medicinal Plants of India, Rep. Ind. Assosc. for Cult Sc. 1914.
৪। Statistical Abstract for British India, Vol. II, Financial Statistics, 1913-14.
৫। Report of Evidence Given before the Indian Industrial Commission, 1916-17.

আমেরিকায় হিন্দুস্থান-সমিতির কার্য্য

[শ্রীসুধীন্দ্র বসু, এম্-এ, পিএইচ-ডি]

ভারতীয় ছাত্রগণ আমেরিকার কোন কলেজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহাদের মনে প্রথমে সাধারণতঃ এই কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হয়;—কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি প্রবেশ করিব? আমার ডিগ্রি পাইতে কয় বৎসর লাগিবে? কোথায় থাকিবার বিশেষ সুবিধা হইবে? আমেরিকার হিন্দুস্থান সমিতি সানন্দে এই সকল প্রশ্ন ও ইহার অনুরূপ প্রশ্নের উত্তর দেন। এই সমিতি ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা স্থাপিত; এবং ইহার শাখা আমেরিকার প্রায় সকল শিক্ষা-কেন্দ্রেই প্রতিষ্ঠিত আছে। সমিতির সভাপতি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের খবর রাখেন এবং সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তিনি অপরাপর কর্ম্মচারীদের সাহায্যে ভিন্ন-ভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সুতরাং কোন ছাত্র কোন পরামর্শ কিংবা খবর জানিতে চাহিলে সমিতির সভাপতি তাঁহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন।

ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্য করিবার জন্য সমিতি একটি "কর্জ্জ ভাণ্ডার" (Loan Fund) স্থাপন করিয়াছেন। বৎসরের শেষে কিংবা বাড়ী হইতে টাকা পাইতে দেরী হওয়ায়, যখন কোন ছাত্র কষ্টে পড়ে, তখন এই ভাণ্ডার হইতে তাহাকে কিছু টাকা ধার দেওয়া হয়। এই ভাণ্ডার হইতে কখনও টাকা দান করা হয় না; কিন্তু সময়-সময় ধার দেওয়া হয়। এখন আমেরিকায় থাকিবার খরচ এত বেশী যে, কোন ছাত্র মাসে অন্ততঃ ১০০ টাকা বাড়ী হইতে না পাইলে, এখানে কিছুতেই চালাইতে পারে না। টাকা উপায় করিয়া কলেজে পড়িবার দিন এখন আর নাই : নূতন "ইমিগেশন আইন" অনুসারে, যে ভারতবাসী বাড়ী হইতে রীতিমত টাকা পাইবার প্রমাণ না দিতে পারে, তাহাকে এদেশে নামিতে দেওয়া হয় না।

এইখানে আমি বলিতে চাই যে, এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্য করা। ইহা রাজনীতির সহিত কোন সংস্রব রাখে না। ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বলিয়া আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি যে, এই সমিতির নেতাদের মূল এবং মুখ্য উদ্দেশ্য—ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্য করা।

সমিতি যে কেবল ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্য করিতেছে তাহা নয়; ইহা আমেরিকানদের সহিত ভারতবাসীর ভ্রাতৃভাব স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। এজন্য স্থানীয় শাখা-সমিতিসকল সময়ে-সময়ে সভা আহ্বান করেন, এবং ভারতবর্ষের কোন বিষয় আলোচনা করেন। আবার সময়ে-সময়ে সমিতির নির্দ্ধারিত সভ্যগণ, অন্যান্য সভা ও সমাজে গমন করেন এবং সেখানে ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতার বিষয় আলোচনা করেন। ইহা ছাড়া কেন্দ্র-সমিতির একটি ছাপাখানা আছে এবং ঐ ছাপাখানা হইতে "হিন্দুস্থানী ষ্টুডেণ্ট" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ইহার উৎসাহী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় "এডুকেশন ইন্ আমেরিকা" (আমেরিকায় শিক্ষা) নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আমেরিকার শিক্ষার রীতি-নীতি, আসিবার সোজা পথ, থাকিবার খরচ, প্রধান-প্রধান কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর ও অন্যান্য বিষয় বর্ণিত আছে। এই পুস্তিকার মূল্য মাত্র ৵১০ দশ পয়সা এবং ইহা সম্পাদক মহাশয়ের ঠিকানায়, (আরবানা, ইলিনয়), পাওয়া যায়। এইরূপ পুস্তিকা আমেরিকা ও ভারতের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে।

এ পর্য্যন্ত সমিতি যত কাজ করিয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় কাজ, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের পানামা-প্যাসিফিক প্রদর্শনীতে (Panama-Pacific Exposition, San Francisco), সমগ্র ভারতীয় ছাত্রের সভা (International Hindusthanee Students' Convention)। এই সভা তিন দিন ধরিয়া প্রদর্শনীর অন্তর্গত বিখ্যাত "কেষ্টিভাল হলে" হয়; এবং ইহা আমাদের গর্ব্বের বিষয় যে, এই প্রদর্শনীতে আমাদের সমিতি ভারতবর্ষের পণ্য-প্রদর্শনের জন্য একটি কুটীর স্থাপন করেন। এখানে ভারতীয় উচ্চদরের কারু-কার্য্য এবং পণ্যদ্রব্য সমুদয় প্রদর্শিত হয়। ইহার পূর্ব্বে, পৃথিবীর

জাতিসমূহের প্রদর্শনীতে ভারত এরূপ স্বাধীনভাবে অংশ গ্রহণ করে নাই। সত্য বটে, প্যারিস্ এবং সেণ্ট লুইর প্রদর্শনীতে ভারতের কিছু অংশ ছিল; কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই ভারতের দ্রব্য ভারতবাসীদের দ্বারা প্রদর্শিত হয় নাই, কাহারও না কাহারও অংশরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্যানামা-প্যাসিফিক প্রদর্শনীতে ভারত তাহার নিজের লোক দ্বারা নিজের অংশ গ্রহণ করে। এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য, হিন্দুস্থান-সমিতি প্যানামা-পাসিফিক প্রদর্শনীর কর্ত্তাদের নিকট হইতে সম্মানের চিহ্নস্বরূপ একটা ব্রঞ্জ পদক (Bronze Medal) প্রাপ্ত হন। ইহা ভারতবাসীদের পক্ষে নিতান্তই গৌরবের কথা।

সংক্ষেপে হিন্দুস্থান-সমিতির কয়েকটী কার্য্যের বিষয় বর্ণিত হইল। সুখের বিষয়, ডাক্তার রফিউদ্দিন আহামদ এখন ইহার সভাপতি। ডাক্তার আহামদ এখন বষ্টনের "ফরসাইত ডেণ্টাল ইনফারমারী"তে (Forsyth Dental Infirmary, Boston) দন্ত-চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত। তিনি আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্যের জন্য সর্ব্বদা যত্নবান। যাহারা সমিতির সাহায্য প্রাপ্তির অভিলাষ করে, তাহাদের সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত। কয়েকদিন হইল, সভাপতি আহমদ আমাকে বলিয়াছিলেন, "হিন্দুস্থান সমিতি যে স্থাপিত হইয়াছে, ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, ভারতীয় ছাত্রগণ সমস্ত পৃথিবীকেই জ্ঞান-ভাণ্ডার রূপে গণনা করে। এই জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ ভারত তৈয়ারী করিতে হইবে। ইহা সম্পাদন করিতে আমাদের দেশের লোকদের সাহায্য আবশ্যক। সে সাহায্য আর কিছুই নয়, কেবল, যত পারেন ছাত্র বিদেশে পাঠান। সকলের জন্যই আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান হইবে।"

বাঙ্গালার জন্ম-মৃত্যু।*

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ]

জন্ম।

সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, গত বৎসর অর্থাৎ ইংরাজী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গদেশে মোট ১৪৪৫৫৯২টি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে বৰ্দ্ধমান বিভাগে ২৬৫৪৮১; প্রেসিডেন্সি বিভাগে ২৭১৯৭৭; রাজসাহি বিভাগে ৩২৬১৬৭; ঢাকা বিভাগে ৩৮৩৯৭৪ এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮৯৯৯৩।

পুত্র কন্যার সংখ্যা হিসাব করিলে দেখা যায়, বৰ্দ্ধমান বিভাগে ১৩৭০২৮টি পুত্র জন্মিয়াছে; কন্যার সংখ্যা ১২৮৪৫৩ মাত্র। প্রেসিডেন্সি বিভাগে পুত্র কন্যার সংখ্যা যথাক্রমে ১৪৫৫৭৩ এবং ১৩৪৪০৪। রাজসাহি বিভাগে পুত্রের সংখ্যা ১৬৮৮৪৭, কন্যা ১৫৭৩২০ ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে পুত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ১৯৮৮২৭ এবং ৯৮৯৭২; কন্যা ১৮৫১৪৭ এবং ৯১০২১। ইহার পূর্ব্ববৎসর (ইংরাজী ১৯১৫) সারা বঙ্গে জন্মের সংখ্যা ছিল ১৪৪৯৬২৮; সুতরাং এ বৎসর বাঙ্গালার প্রতি ষষ্ঠীর কৃপা কিছু অধিক দেখা যাইতেছে।

* "Report on Sanitation in Bengal for the year 1916" অবলম্বনে লিখিত।

মৃত্যু।

বাঙ্গালার লোকসংখ্যা এখন ৪৫৩২৯২৪৭। আলোচ্য বর্ষে সারা বঙ্গদেশ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২৪১০২১ জন যমপুরে প্রেরিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে প্রেরিত আসামীর সংখ্যা ছিল ১৪৮৮৫৬৭; সুতরাং মহাযাত্রীর সংখ্যা অনেক কম।

কোন্ বিভাগ হইতে কত লোক মহাপ্রয়াণ করিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাই বা কত, তাহাও দেখাইতেছি।

	পুরুষ	স্ত্রী	একুন
বৰ্দ্ধমান বিভাগ	১৩৩৫৬৯	১২১৮১২	২৫৫৩৮১
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৪৭৬৫৭	১২৯৮৭৯	২৭৭৫৩৬
রাজসাহি বিভাগ	১৬৯৪৪৮	১৪৯৩৫৪	৩১৮৮০২
ঢাকা বিভাগ	১৪৬৩৩২	১২৯০০২	২৭৫৩৩৪
চট্টগ্রাম বিভাগ	৫৯১৭১	৫৪৭৯৭	১১৩৯৬৮
	৬৫৬১৭৭	৫৮৪৮৪৪	১২৪১০২১

জ্বরই এখন এদেশের প্রধান শত্রু। ইহা ম্যালেরিয়া রূপ ধারণ করিয়া একাকী সহস্র বদন হইয়া লোক গ্রাস না করিলে যমপুরে আসামীর সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়া পড়িত। আলোচ্য বর্ষে বৰ্দ্ধমান বিভাগ হইতে ১৭৪৬৮০; প্রেসিডেন্সি বিভাগ হইতে ১৮১৫৮৩; রাজসাহি বিভাগ হইতে ২৮২১৮৭; ঢাকা বিভাগ হইতে ১৮৫৩৭৬ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে ৮৬০৫৪—একুনে ৯০৯৮৮০ জন একমাত্র জ্বর রোগেই যমালয়ে গমন করিয়াছে।

প্লেগের অনুগ্রহ-দৃষ্টি এবার খুবই কম। এই ব্যাধি সমস্ত বাঙ্গালা হইতে ১১০ জন মাত্র আমদানি করিয়াছে। ইহার মধ্যে জনবহুল কলিকাতা সহরের লোকই ৭৮ জন। অবশিষ্ট ৩২ জনের মধ্যে বীরভূম হইতে ২২; হাওড়া হইতে ৪; ২৪ পরগণা হইতে ৩; বৰ্দ্ধমান হইতে ১; মুরসিদাবাদ হইতে ১ এবং রংপুর হইতে ১ জন মাত্র কালের অতিথি হইয়াছে।

মুষিকের সহিত প্লেগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে জানিয়া অনেকেই মূষিক-বংশ ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। মূষিক মারিতে পারিলে এখন সরকার হইতে পারিতোষিক প্রদত্ত হয়। তাই আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা সহরে ১৩৮৫৯৬টি ইন্দুর ধরিয়া লোক ২১৪০্ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

এ বৎসর ওলাউঠার প্রেরিত বঙ্গবাসী আসামীর সংখ্যা ৭০৮৩৬। ইহার পূর্ব্ব চারি বৎসরে আসামীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩০৬৭৯; ৮৯২২৪; ৭৮৮৯৮ এবং ৯২৪৬৭। সুতরাং এই বর্ষে এই রোগে মৃত্যু-সংখ্যা অনেক কম। দারজিলিংএ ইহার পূর্ব্ববৎসর ২২০ জন

ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করে। এ বৎসর তথায় মৃতের সংখ্যা ৫ জন মাত্র। এবার ২৪ পরগণাই এই রোগের প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল। ঐ জেলা হইতে ৯৩৯৪ জন এই রোগে মহাপ্রয়াণ করিয়াছে।

উদরাময় ও আমাশয় ২৬২৮১ জন বাঙ্গালা হইতে প্রেরণ করিয়াছে। ঐ আসামী সংখ্যার মধ্যে হাওড়া জেলার লোকই অধিক। দারজিলিং, কলিকাতা, হুগলি, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, ২৪ পরগণা ও ত্রিপুরা জেলা সমূহেও এই দুই যম-দূতের কার্য্য মন্দ হয় নাই।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় এবার ১১৬৭৫ জন বঙ্গবাসী ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়াছে। উক্ত সংখ্যার মধ্যে কৃতান্তের শ্রেষ্ঠ দূত "যক্ষ্মা"র প্রেরিত আসামী কত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। মহাভারতীয় যুগে ঐ ব্যাধি একমাত্র ভূপতি বিচিত্রবীর্য্যকে বাঁধিয়া আনিয়াছিল; কিন্তু এই ঘোর কলিকালে সে ভারতের কোন-কোন সহর হইতে এক বৎসরে আট-নয়শত পর্য্যন্ত আসামী আমদানি করিতেছে। ফল কথা, যখন ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জিত হইয়াছে—যখন দুর্ভোজন, দুরালাপ ও ইন্দ্রিয়-ভোগ-বাসনাই এখনকার মানুষের নিত্য কর্ম্ম হইয়াছে, যখন দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখেও বিড়ির আগুন জ্বলিয়াছে, তখন এই রোগের প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়িবে বলিয়াই মনে হইতেছে।

সারা বাঙ্গালা হইতে গত সালে বসন্ত কর্তৃক ১৩৮৯০ জন আসামী শমন সদনে প্রেরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের লোকই অধিক। এক সময়ে এই রোগের আক্রমণে মর্ত্ত্যের কত জনপদ জনশূন্য হইত, কত সুন্দর মুখ শোভাশূন্য হইত; কিন্তু এখন জেনারের আবিষ্কৃত টিকা গ্রহণ করিয়া লোক এই ভীষণ মানব শত্রুকে দেশ হইতে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইতেছে।

কৃতান্তের অন্যান্য অনুচরেরা এ বৎসর বাঙ্গালা হইতে মোট ১৮৯২৯৭ জন আসামী প্রেরণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আহত যাত্রীর সংখ্যা ১১০১৫; সর্প ও অন্যান্য জন্তু-দষ্ট যাত্রী ৪৭৫৩; ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুক্কুর-দষ্ট ৪৪ এবং আত্মঘাতী ৩৩১০ জন মাত্র।

গোবিন্দদাস-পদাবলীতে বৃত্ত্যনুপ্রাস।*

[শ্রীগণেশচন্দ্র শীল]

বৈষ্ণবপদাবলী সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে, আমরা গোবিন্দদাস নামে অন্যূন পাঁচজন পদকর্ত্তার পরিচয় পাই। ইঁহাদের অন্যতম গোবিন্দদাস কবিরাজই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ইঁহাকে অতিশয় সমাদর করিতেন এবং ইঁহার কবিত্ব-শক্তির পরীক্ষা লইয়া ইঁহাকে "কবিরাজ" উপাধি-ভূষিত করেন। ইঁহার পদাবলী অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার স্বরূপ।

বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদিগের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যে সুকণ্ঠ সুগায়ক বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাচূড়ামণি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের "সুমধুর গীতি-ঝঙ্কারে আজি পর্য্যন্ত বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যাবাসী জনমণ্ডলীর প্রাণমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছে, সেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস অপেক্ষা গোবিন্দদাস কবিরাজ কোন অংশে ন্যূন নহেন। আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-কবিদিগের যত পদাবলীর পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তন্মধ্যে একমাত্র গোবিন্দদাস কবিরাজের পদাবলীতে বৃত্ত্যনুপ্রাসের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই। অন্যান্য পদকর্ত্তাদিগের পদাবলীতেও আমরা এই প্রকার অনুপ্রাস দেখিতে পাই বটে, কিন্তু সেই-সেই পদাবলীর প্রতি-পংক্তিতে এই শব্দালঙ্কার দৃষ্ট হয় না; ইহা একমাত্র গোবিন্দদাসের কতিপয় পদাবলীরই বিশেষত্ব।

এই প্রকার অনুপ্রাস বিশুদ্ধভাবে ব্যবহৃত হইলে বড়ই শ্রুতিমধুর হয়। ইহা প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের লেখনী হইতেই উদ্ভূত হয়। গোবিন্দদাস কবিরাজ ধীশক্তিসম্পন্ন লেখক ছিলেন; সুতরাং তিনি যে এই প্রকার রচনায় সিদ্ধহস্ত হইবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা একে-একে গোবিন্দদাস রচিত এই শব্দালঙ্কারের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

এখন গোষ্ঠবিহারী, রাখালসঙ্গী, যশোদানন্দন শ্রীগোপালের বাল্য-লীলার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা যাউক। নন্দরাণী 'যদুমণি' শ্রীহরিকে 'নানা আভরণ পীতবাসে' সজ্জিত করিয়া দিলেন। তখন আমাদের 'নন্দের দুলাল' রাখালবালকদিগের সহিত গোষ্ঠে গমন করিয়া বালস্বভাবসুলভ নানাবিধ আমোদপ্রমোদ করিতে লাগিলেন; এদিকে গোবিন্দদাস কবিরাজ মহাশয় তান ধরিতেছেন,—

গোষ্ঠে গোচর গূঢ় গোপাল।
গাওত গ্রামকে, গীত কীরি গুর্জ্জরী,
গৌরী গোল গোপী গান্ধার॥
গোপ গরিম, গুণ গোপক,
গোকুল গান বিহারী।

---

* অনুপ্রাস প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে,—বর্ণানুপ্রাস ও শব্দানুপ্রাস। বর্ণানুপ্রাস আবার দুইভাগে বিভক্ত,—ছেকানুপ্রাস ও বৃত্ত্যনুপ্রাস; শব্দানুপ্রাসও এইরূপে দুইভাগে বিভক্ত,—এক-পদগত ও বহুপদগত। বৃত্ত্যনুপ্রাস ও বহুপদগত অনুপ্রাসও আবার তিন-তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে গোবিন্দদাস-রচিত কয়েকটী পদাবলীতে বৃত্ত্যনুপ্রাসই প্রদর্শিত হইবে।

বৃত্ত্যনুপ্রাসের লক্ষণ—

"অনেকস্যৈকধা সাম্যমসকৃদ্বাপ্যনেকধা।
একস্য সকৃদপ্যেষ বৃত্ত্যনুপ্রাস উচ্যতে॥"

(সাহিত্যদর্পণ, ১০।৬৩৫)

এক বা একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণের স্বরূপতঃ ও ক্রমশঃ এই উভয়বিধ-ভাবে একবার বা বহুবার বিন্যাস হইলে বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার হয়।

গুঞ্জা-গৈরিক, গোরস গরভিত,
গোরোচনা রুচির ধারী ॥
গহন গুহাগত, গোচারণ রত,
গোদোহন রতিকারী।
গোগোরিধারী, গূঢ় গরবায়িত,
গুরু গৌরব পরিচারি ॥
গজমতি গামী, গান গুণ গুম্ফিত,
গগনে চলয়ে সুরবৃন্দ।
গোরস গাহি, গিরীশ্বর নন্দন,
গাওত দাস গোবিন্দ ॥

আমরা গোবিন্দদাস-বর্ণিত রাখালবালকদিগের সহিত ক্রীড়ারত শ্রীগোপালের বাল্যলীলার কিঞ্চিৎ আভাষ দিলাম। এইবার কবিরাজ মহাশয় শ্রীশ্যামসুন্দর রাসবিহারী শ্রীহরির যৌবনস্বভাবসুলভ রাস-লীলার অবতারণা করিতেছেন। 'বঙ্কিম 'নীরদ-নীল নয়ন, নীরজ-নিন্দিত' কটাক্ষপাত করত: নটবর বেশধারী রসিকশেখর 'নন্দ-নন্দন' ত্রিভঙ্গ-মূর্ত্তিতে নৃত্য করিতেছেন; সঙ্গে-সঙ্গে বংশীধ্বনিও করিতেছেন,—এরূপ সুমধুর প্রাণমনোমোহকর ধ্বনি হইতেছে যে, তাহা শ্রবণ করিতে-করিতে ব্রজবধূবৃন্দ অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে মগ্ন হইয়া 'বিরহিত বৃন্দাবনে বনমালী'কে বেষ্টনপূর্ব্বক আত্মহারা হইতেছেন,—

নীরদ নীল নয়ন নীরজ নিন্দিত,
বঙ্ক নেহারনি ছন্দ।
নিরখিতে নিয়ড়ে, নিতম্বিনী নিচোল,
নিকশত নীবি নীবি-বন্ধ ॥
নাচত নন্দ-নন্দন নটরাজ।
নাগরী নারী, নাগরী নবনাগরী,
নিরুপম নাটিনী সমাজ ॥
নাগরী নাহনন্দিনী নদী নিকট,
নীপ নিকুঞ্জ নিবাসী।
নিতি নবযৌবনী, নিধুবনালঙ্কৃত,
নিভৃত নিনাদন বাঁশী ॥
নামহি নারী নিকেতনে, নারহু নৌতুন
নেহ বিলাস।
নিন্দহি নিজজন, নহি নহ হেরয়ে,
নিরমিত গোবিন্দদাস ॥

* * * *

বিরহিত বৃন্দাবনে বনমালী।
বেড়ল ব্রজবধূবৃন্দ, বিমোহিত বোলত,
বলি বলিহারি ॥
বকুল রঞ্জিত, বল্লী বলয়িত,
বিলোল বর্হাবতংস।
বিমল ভূষণ বেশ, বাসিত বেকত,
বাওত বংশ ॥
বিশদ বারণ, বাহু বৈভব,
বলয় বন্ধ নিবন্ধ।
বিবিধ বৈদগধি, বচন বিরচন,
বিবশ দাস গোবিন্দ ॥

অসংখ্য ব্রজনারী এই যে সর্ব্বরসজ্ঞ রসিক প্রবর 'নাগর' রাস-বিহারীর 'প্রাণমাতোয়ারা' বেণুধ্বনি শ্রবণমাত্র পতি-পুত্র-কন্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাসলীলারসে মগ্না হইয়াছেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে আপন-আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিস্মৃতা হইয়া, কাননবাসিনী হইয়াছেন, সেই মদনমোহন গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অনন্যসাধারণ রূপগুণে বিমুগ্ধ হইয়া গোবিন্দ-দাস গাহিতেছেন :—

মুদির মরকত, মধুর মুরতি,
মুগধ মোহন ছাঁদে।
মল্লিকা মালতী মালে মধুকর,
মত্ত মনমথ ফাঁদে ॥
শ্যামসুন্দর, সুঘড় শেখর,
শরদ শশধর হাস।
সঙ্গে সবরস, সুবেশ সময়,
সতত সুখময় ভাস ॥
চিকণ চাঁচর, চিকুর চুম্বিত,
চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপলা চমকিত, চকিত চাহনী,
চিত চোরক ভাঁতি ॥
গৌর গৈরিক, গোরজ গোরোচন,
গোরস গরবিত বাস।
গোপ গোপন, গরিম গুণগণ
গাওত গোবিন্দদাস ॥

* * * *

কুবলয় কন্দর, কুসুম কলেবর,
কালিম কান্তি কলোল।
কোমল কেলি, কঙ্কণ করম্বিত,
কুণ্ডল কান্তি কপোল ॥
জয় জয় কৃষ্ণ কমলেশ।
কালিয়া কেলী, কংস করী কর্ষণ,
কেশর কুঞ্চিত কেশ ॥
কুল বনিত, কুচ কুকুমাঙ্কিত,
কুসুমিত কুন্তল বন্ধ।
কালিন্দী কমল, কলিত কর কিশলয়,
কৌতুক কন্দন কন্দ ॥

কমলা কেলি, কল্পতরু কামদ,
কমনীয় কটি করীন্দ্র।
কৃপণ কৃপাকর, কলিকলুষাকুশ,
কহ কবি দাস গোবিন্দ ॥

* * * *

কুটিল কুন্তল, কুসুম কাছনি,
কান্তি কুবলয় ভাস রে।
কুঞ্চিতাধর, কুমুদ কৌমুদী,
কুণ্ড কোরক হাস রে ॥
কালিন্দী কূল, কদম্ব কাননে,
কুঞ্জে কুঞ্জে রাজ রে।
কামিনী কুচ, কুঙ্কুমাঙ্কিত,
কাম কোটি বিরাজ রে ॥
কনক কিঙ্কিনী, কঙ্কণাঙ্গদ,
কুণ্ডলাকৃতি অংস রে।
কেকী কোকিল, কণ্ঠ কণ্ঠক,
কাকলী কৃত বংশ রে ॥
কেশরী কোটি, কম্বু কণ্ঠক,
কুন্দ কেশর দান রে।
কলিকাল কালিয়, কবল কম্পিত,
দাস গোবিন্দ নাম রে ॥

মুখরিত মুরলী মিলিত মুখ মোদনে,
মরকত মুকুর মৈলান।
মানিনী মান, মথন মুচুকায়লি,
মুনি মানস মুরছান ॥
মায়ি মোহন মুরতি মুরারি।
মনইতে মরমে, মনোরথ মাধুরী,
মনমথ মনমন মায়ি ॥
মুকুলিত মল্লী, মধুর মধু মাধুরী,
মালতী মঞ্জুল মাল।
মন্দ মকরন্দ, মুদিত মত্ত মধুকর,
মণ্ডিত মৌকলি মন্দার ॥
মাথহি মৌড়, মুকুট মদ মন্থর,
মণিমণ্ডল মন মান।
মঞ্জু মঞ্জীর, মহিমাময়,
দাস গোবিন্দ গুণগান ॥

* * * *

ঝুনঝুন কনক, কলিত কর কঙ্কণ,
কালিন্দী-কূল-বিহারী ;

কুঞ্চিত কেশ, কনচ কুসুমাকুল,
কুলকামিনী-করধারী ॥
জয় জয় জগজীবন যদুবীর।
জলধর জ্যোতিঃ, জিতি যদু যৌবন,
যুবতী-যূথ অথির ॥
পদ্মিনী পাণি, পরশে পুলকায়িত,
পরিজন প্রেম পসারি।
পহিরণ পীত, পতনি পতিতাঞ্চল,
পদ পঙ্কজ পরচারি ॥
রমণীরমণ, রতন রুচিরানন,
রতি রঞ্জিত রস বাস।
রসনা রোচন, রসিক রসায়ন,
রচয়তি গোবিন্দদাস ॥

ব্রজবাসিনী গোপিকাদিগের সহিত রাসলীলা সমাপন করিয়া, বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনধাম পরিত্যাগ করিয়া, মথুরাপুরী গমন করিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধিকা বিরহানলে জর্জ্জরিতা হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিলেন। সখীবৃন্দ নানাপ্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। তখন তাঁহারা এক উপায় অবলম্বন করিলেন—"কানু কানু করি চেতায়ল তাই," এবং বিধিমত উপায়ে সান্ত্বনাবারি সেচন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দদাস আবেগভরে গাহিতেছেন,—

শুনহ শ্যাম, সকল-গুণবন্ত।
শুধই সম্বাদে কি, সুমুখি সম্বোধব
সুখময় সময় বসন্ত ॥
শীতল সুরভিত, সরস সমীরণে,
সতত সন্তাপই গাত।
স্বপন সমাগম, সাধে সুধামুখী,
সুতই সরসিজ পাত ॥
সখিনী সমাজ, সাঁজ সঙ্গে সো ধনী,
সগরিহুঁ শরবরী জাগ।
সোঙরি সুনেহ, সোহাগিনী সংশয়,
গোবিন্দদাস দিঠি আগ ॥

ক্রমে-ক্রমে হেমন্ত ও শিশির-ঋতুর অবসান হইল, ঋতুরাজ বসন্ত আগমন করিল। নবজাত কিশলয়ে ও মুকুলিত মল্লিকায় মাধবীকুঞ্জ 'মঞ্জু' শোভা ধারণ করিল। মত্ত মধুকর মধু সংগ্রহার্থ গুনগুন্ রবে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। বসন্তকালীন স্নিগ্ধ সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রকৃতিদেবীর ঈদৃশী মনোমোহিনী শোভা নিরীক্ষণ করিতে-করিতে 'মানিনী' শ্রীমতী রাধিকা বিরহতাপে দগ্ধীভূতা হইয়া, ভূমিতলে মূর্চ্ছিতা হইলেন ; তাঁহার পরম

রমণীর মুখপদ্ম মলিন হইল। গোবিন্দদাস মোহিত হইয়া তান ধরিতেছেন,—

* * * *

মিলল মধু ঋতু, মল্লী মুকুলিত,
মঞ্জু মাধবী-কুঞ্জ।
মেলি মধুকরী, মুখর মধুকর,
মাতি মধু পিবি গুঞ্জ॥
মিহিরজা মৃদু, মন্দ মারুত,
মনই মনসিজ সাতি।
মসৃণ মলয়জে, মুংছি মানিনী,
মহী মাহা গড়ি যাতি॥
মহা মণিময়, মহী মণ্ডল,
মলিন মুখ অরবিন্দ।
মরমে মৃগমতি, মৃদির মনোহর,
মোহিত দাস গোবিন্দ॥

দেখিতে দেখিতে চৈত্রমাস গত হইল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না। তখন শ্রীমতী রাধিকা বিরহদুঃখে যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহতা হইলেন। গোবিন্দদাস শ্রীমতীর খেদোক্তি এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন,—

পরখি পেখনু, পুরুখ পুরুষোত্তম,
তুহুঁ সে পাভন জাতি।
প্যারী পামরী, পিরীতি পাবকে,
পৈঠে পতগকি ভাঁতি॥
পৌর পুণ্যবতী, পহিলে পরিচয়,
প্রাণ পহু তুহুঁ ভোরি।
প্রেম-পরবশ, পুরুষ প্রেয়সী,
পন্থ পেখই তোরি॥
প্রচুর পরিমল, পঙ্ক পঙ্কজ,
পরশে পীড়িত গাত।
পড়য়ে প্রিয় সখী, পায়ে পুন পুন,
প্রখর পাঁচ শর ঘাত॥
পাপ পাউখ, পবন পিয়াসিত,
পাপিয়া পিউপিউ ভাষ।
পুন কি পাওব, পরম প্রিয়তম,
পুছত গোবিন্দদাস।

তাপিনী তীর, তীর তরুতল,
তরল তরল তরুছায়।
তরুণ তমাল তরু, কিও হেতু রাখিত,
তরুণী তোহারি পথ চায়॥
ত্রিভুবন তিলক, তুহিন কর তোহে বিমু,
তপত তপন সম তেল।
তোহারি বিমু তিলকে, তলপে তরাসই,
তোহারি অবধি কত গেল॥
তিমিত তিমিত দিঠে তোই।
তিতল তাল বীজনে, তনু তাপই,
তিরপিত জনিক না হোই॥
তোড়ল তাড়, তাড়ক তিয়াজল,
তোড়ি তড়িত রুচি হার।
তিলে তিলে তরুণী, তুয়া পথ হেরই,
গোবিন্দদাস কহ সার॥

পরিশেষে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের বিরহে শ্রীমতী রাধিকার ও ব্রজবধূ-বৃন্দের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইল। নবপল্লব-সুশোভিত মালতী-মল্লিকা-সুবাসিত নিকুঞ্জবনের মনোহারিণী শোভা এখন আর তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারিল না। কমলমুখীদিগের পরম সুন্দর মুখ-মণ্ডল ক্রন্দনহেতু মলিন ভাব ধারণ করিল। গোবিন্দদাস করুণস্বরে তান ধরিতেছেন,—

কাঁচা কাঞ্চন, কাঁতি কমলমুখী,
কুসুমিত কাননে রোই।
কুঞ্জ-কুটীরে, কলাবতী কাতর,
কানু কানু করি রোই॥
কি কহব কিতব, কত যে কুলকামিনী,
কঠিন কুসুম শর সহই।
করহি কপোলে, কত করি কুঞ্চিত,
কালিন্দী কূলমে রহই॥
কর কেয়ূর কটি, কিঙ্কিনী কঙ্কণ,
কাঢ়ল কণ্ঠকি মালা।
কো জানে কুচ তটে, কোন কামাওল,
কাজরে কালিম হারা॥
কেবল কান্ত, কথা কহি কাঁদয়ে,
কামকলঙ্কিনী গোরী।
কিঞ্চিত কাল, কলপ করি মানয়ে,
গোবিন্দদাস পহুঁ ছোড়ি॥

এখন আমরাও শ্রীকৃষ্ণপরায়ণা শ্রীমতী রাধিকা ও গোপীদিগের প্রতি সহানুভূতি-প্রদর্শন করতঃ এই শোচনীয় দৃশ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করি।

এলকোহল বা সুরাসার

[অধ্যাপক শ্রীনলিনীনাথ রায় এম-এ]

অতি পুরাকাল হইতে প্রাচীন আর্য্যগণ সুরার গুণাগুণ অবগত ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদে ৮৪ প্রকার সুরা বা আসবের উল্লেখ আছে এবং উহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদে মদ্যের গুণ বর্ণনায় লিখিত

আছে যে, ইহা রোচক, অগ্নিদীপক, হৃদ্য, স্বর-পরিষ্কারক, বর্ণপ্রসাধক, প্রীতিজনক, বৃংহণ, বলকারক, ভয়-শোক-শ্রান্তি নিবারক, নিদ্রাদায়ক, বাক্য-প্রবর্ত্তক ইত্যাদি; এবং ইহার বাহ্য প্রয়োগে মুখ, কর্ণ, নেত্র ও স্তনরোগের, এবং ব্রণের ও ভগ্নস্থানের বেদনার উপশম হয়। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে মদ্যের তিন অবস্থার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম অবস্থায় উপরিউক্ত গুণের ক্রিয়া লক্ষিত হয়; কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় স্নায়ুর এবং তৃতীয়ে পেশী সমুদয়ের অবসাদ হয়। মদ্য বা সুরার মূল পদার্থকে সুরাসার বলে। মদ্যে সুরাসার ব্যতীত অন্যান্য অনেক পদার্থ থাকে; তাহাদের মধ্যে কোনটি স্বাদের জন্য ও কোনটি ঔষধের জন্য ইহার সহিত মিলিত থাকে, এবং সুরাসারই ইহার উত্তেজক শক্তির মূল।

রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা গিয়াছে যে সুরাসারে অঙ্গার, অম্লজান ও উদ্‌জান ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহাদের পরিমাণ শতকরা

অঙ্গার	৫২·১৭ ভাগ
অম্লজান	৩৪·৭৯ "
উদ্‌জান	১৩·০৮ "
	১০০.০০

রাসায়নিকগণের মতে সুরাসার বলিলে এক জাতীয় পদার্থকে বুঝায়। অর্গ্যানিক কেমিষ্ট্রিতে প্রায় কুড়ি প্রকার সুরাসারের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মিথিল্ ও ইথিল্ সুরাসার আমাদের পরিচিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইথিল্ সুরাসার সম্বন্ধে কিছু বলিব। মিথিল সুরাসার বিষয়ে বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

ইথিল্ সুরাসার দেখিতে জলের ন্যায় তরল ও স্বচ্ছ; কিন্তু উহা জল অপেক্ষা লঘু। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮·৯৫। ইহার স্ফুটন-তাপ-পরিমাণ ৭৮·৪° শতাংশিক; সেইজন্য অল্প তাপেই ইহা বাষ্পে পরিণত হয়। যদি হাতে অল্প পরিমাণে সুরাসার রাখা যায়, তাহা হইলে হাতের তাপে ইহা বাষ্পে পরিণত হইয়া শৈত্য উৎপাদন করে। ইহা দাহ্য পদার্থ,—অগ্নি-সংযোগে উহা নিঃশেষে জ্বলিয়া নীলাভ-পীত বর্ণের আলোক প্রদান করে; এবং পরিশেষে সমস্তই কার্ব্বন-ডাইঅকসাইডে পরিণত হয়। ইহার স্বাদ মিষ্ট, পরিশেষে কটু ও তীব্র। ইহার গন্ধও মিষ্ট ও তীব্র। জলের সহিত ইহার ঘনিষ্টতা অত্যধিক,—বায়ু হইতে ইহা জল শোষণ করে এবং ক্রমশঃ হীনতেজ হইয়া যায়; সেইজন্য ইহাকে সতেজ রাখিবার জন্য কাচের ছিপিবিশিষ্ট শিশির মধ্যে রাখা উচিত। জলের সহিত ইহা যেমন মিলিত হইতে থাকে, ইহার স্ফুটন-তাপ-পরিমাণও তেমনি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার এই জল-শোষণ ক্ষমতার জন্য, যখন ইহা কোন জান্তব তন্তুর সংস্পর্শে আইসে, তখন তাহা হইতে জল শোষণ করে ও বিষের ন্যায় কার্য্য করে। সমভাগে সুরাসার ও জল মিশ্রিত করিলে, তাহাদের সমষ্টি দুইভাগ অপেক্ষা কম হয় ও তাপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু জলের পরিবর্ত্তে বরফ কিম্বা তুষার ব্যবহার করিলে মিশ্রণ অত্যন্ত শীতল হয়। যে সকল পদার্থ জলে কিম্বা এসিডে দ্রব হয় না, সুরাসারে তাহাদের মধ্যে অনেক পদার্থ দ্রব হয়; যেমন ফস্ফরস্, গন্ধক, আইওডিন্, রজন, চর্ব্বি, সুগন্ধি তৈলসার, রং ইত্যাদি। শ্বেতসার, জিলাটিন্, Starch, গঁদ প্রভৃতি দ্রব অবস্থায় থাকিলে, সুরাসার তাহাদিগকে অধঃক্ষেপিত (precipitate) করে। এই সকল কারণে সুরাসার রাসায়নিকের নিকট অতি মূল্যবান পদার্থ।

মদ্যে সুরাসার আছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু ইহার পরিমাণ অতি অল্প এবং ইহা স্বতন্ত্র ভাবে প্রস্তুত করিয়া মিশান হয় না। ইহার সমস্ত উপাদান একত্র করিয়া চুয়াইয়া প্রস্তুত করা হয়। মদ্য অপেক্ষা শিল্প বাণিজ্যে (art and commerce) ইহার ব্যবহার আরও অধিক। ঔষধ, টিংকচারে, হোমিওপ্যাথিক ডাইলিউসনে, পালিশ ও বার্ণিস প্রস্তুত করিতে, এবং তৈল ও রজন জাতীয় পদার্থ সকলকে দ্রব করিতে ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। যদি ইহার শুল্ক কমাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহা যে কেরোসিন, পেট্রোল ও গ্যাসোলিনের পরিবর্ত্তে আলোকে ও এঞ্জিনে ব্যবহৃত হইতে পারে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সুরাসার স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না, ইহা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। যে সকল পদার্থে শর্করা অথবা Starch আছে, তাহা হইতে সুরাসার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। শর্করা গ্লুকোস্ (glucose) সুমিষ্ট ফল ও মূলে অধিক পরিমাণে থাকে। সুমিষ্ট ফলের মধ্যে দ্রাক্ষা, আম্র, কাঁঠাল, জাম, কলা, কুল, আড়ু প্রভৃতি, এবং Starch-বিশিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, গম, যব, রাই প্রভৃতি শস্য ও আলু সুরাসারের উপাদান (raw material) বলিতে পারা যায়। এমন কি কাষ্ঠ, কাগজ এবং নূতন ফরাসী প্রণালী দ্বারা প্রস্তুত এসিটিলিন্ হইতেও সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু প্রধানতঃ চিনি, গুড়, বিট ও আলু হইতে সুরাসার প্রস্তুত হইয়া থাকে। জর্ম্মানি ও আমেরিকায় বিট হইতে সুরাসার অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয়। উপরিউক্ত বিবিধ পদার্থ হইতে যে-যে পরিমাণে সুরাসার পাওয়া যায়, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

২২০	পাউণ্ড	ধান্য	হইতে	৭·৭	গ্যালন	বিশুদ্ধ	সুরাসার	পাওয়া যায়।
"	"	গম	"	৭·০	"	"	"	"
"	"	গুড়	"	৬·৬	"	"	"	"
"	"	রাই	"	৬·১৬	"	"	"	"
"	"	যব	"	৫·৫	"	"	"	"
"	"	ভুট্টা	"	৫·৫	"	"	"	"

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের জন্য য়ুরোপ হইতে সুরাসারজাত-দ্রব্য ভারতে আসা একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে; সেজন্য আমাদিগকে এই সমস্ত দ্রব্যের অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতে হইতেছে। এখানে সুরাসার প্রস্তুত করিবার কারখানা অধিক নাই; যাহা আছে, তাহা আমাদের অভাব সম্পূর্ণভাবে মোচন করিতে পারে না। আজকাল যবদ্বীপ হইতে কিছু পরিমাণে সুরাসার আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। যদি আমাদের দেশের কোন ধনী কিছু টাকা খরচ করিয়া একটি বড় রকমের সুরা-

সারের কারণ না চালানি, তাহা হইলে আমাদের অভাব কতকটা মোচন হয় ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হয়।

সুরাসার প্রস্তুত-প্রণালী প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারা যায়; (১) শর্করা বা শর্করাবিশিষ্ট কোন পদার্থ হইতে, (২) Starchবিশিষ্ট পদার্থ হইতে। দ্বিতীয় প্রণালীর আবার দুইটি পর্য্যায় আছে—প্রথম Starchকে শর্করায় পরিণত করা ও পরে তাহাকে সুরাসারে পরিণত করা। শর্করা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া yeast ঈষ্ট জীবাণু সাহায্যে গাঁজাইয়া (ferment) লওয়া হয়। ইহাতে শর্করা বিশেষিত হইয়া কার্ব্বনিক ডাইঅক্সাইডে ও সুরাসারে পরিণত হয়। প্রথমোক্ত পদার্থটি গ্যাস, সেজন্য বায়ুতে চলিয়া যায় এবং সুরাসার জলের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। পরে এই মিশ্রণকে fractional distillation দ্বারা চুয়াইয়া ও শোধন করিয়া লওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রণালীর বিষয় প্রথমেই বলিব, কারণ Starch শর্করায় পরিণত হইলে দুই প্রণালীর প্রক্রিয়া একই হইয়া পড়ে।

মণ্ড বা ম্যাস। Starch হইতে শর্করা-প্রস্তুত-প্রণালীর দুইটি অস্তর্পর্য্যায় আছে; প্রথম মণ্ড বা ম্যাস প্রস্তুতকরণ, দ্বিতীয় শর্করীকরণ। Starchবিশিষ্ট পদার্থগুলিকে প্রথমে উত্তমরূপে কুটিয়া বা গুঁড়া করিয়া জলের সহিত কোন পাত্রে ফুটাইতে হয়। ম্যাস প্রস্তুত করিবার জন্য স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে; তাহাকে vaccum mash cooker বলে। ইহা দেখিতে বড় বয়লারের মত। ইহার মধ্যে জল-মিশ্রিত মাল রাখিয়া অধিক চাপে জলীয়বাষ্প চালান হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্র দ্বারা আলোড়িত করা হয়। ইহার দ্বারা মধ্যস্থিত পদার্থের সমস্ত অংশ স্বতন্ত্র হইয়া যাইয়া মণ্ডের আকার ধারণ করে। ইহার Starch কতক অংশ দ্রব হয় এবং অপর অংশ gelatinএ পরিণত হয়। জলীয়বাষ্পের চাপ প্রায় ৬৫ পাউণ্ড এবং তাহার তাপ-পরিমাণ ৩০০° ফারেনহিট হয়।

শর্করীকরণ। মণ্ড প্রস্তুত হইলে তাহাকে শীতল করিয়া ১৪২° ফাঃ তাপ পরিমাণে লইয়া আসা হয়। শীতল করিবার জন্য হয় পাখা দ্বারা বাতাস করিয়া আলোড়িত করা হয়, কিম্বা কোন পাত্রে রাখিয়া তাহার মধ্যে শীতল জলপূর্ণ নলের কুণ্ডলী রাখা হয়। তাপ-পরিমাণ কমিলে তাহাতে মল্ট মিশ্রিত করা হয়। এই মল্ট Starchকে প্রথমে (dextrin) "মধুশর্করা", পরে শর্করায় পরিণত করে। মল্টে diastase নামক একপ্রকার পদার্থ আছে, তাহার প্রভাবে Starch শর্করায় পরিণত হয়। এই শর্করাকে maltose বলে। মল্টের পরিমাণ Starchএর পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ম্যাল্টোজ শর্করা যাহা প্রস্তুত হয়, তাহা আবার মণ্ডে জলের পরিমাণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মণ্ডকে মল্টের সহিত রাখা যায় তাহার সময়, এবং তাপ-পরিমাণের উপর নির্ভর করে। শর্করীকরণের অনুকূল তাপ-পরিমাণ ১২২° হইতে ১৪৫° ফাঃ। তাপ-পরিমাণ অধিক কিম্বা অল্প হইলে অন্য প্রকারের জীবাণু আসিয়া এই প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়। সেজন্য তাপ-পরিমাণের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

ঈষ্ট yeast। Starch শর্করায় পরিণত হইলে পর শর্করিত মণ্ড ও শর্করার fermentation একই উপায়ে হইয়া থাকে। জলমিশ্রিত শর্করা অথবা শর্করিত মণ্ডকে ঈষ্ট দ্বারা গাঁজাইয়া শর্করাকে সুরাসারে পরিণত করা হয়। ঈষ্ট একপ্রকার একটিমাত্র-কোষবিশিষ্ট নিম্নজাতীয় উদ্ভিদণু। ইহার জীবদ্দশায় ইহা হইতে একপ্রকার পদার্থ বাহির হয়, তাহাকে জাইমস বলে। এই জাইমস্ই শর্করাকে সুরাসার ও কার্ব্বন্-ডাই-অক্সাইডে পরিণত করে। ঈষ্ট দুইপ্রকার—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। স্বাভাবিক ঈষ্ট বায়ুতে থাকে এবং নিজের অনুকূল উপাদান পাইলেই তাহাতে বাস করে, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়। ঈষ্ট অনেক জাতীয় আছে এবং তাহারা প্রত্যেকে বিভিন্ন প্রকারের fermentation করিয়া থাকে। কোন জাতি এলকোহলিক fermentation, অপর জাতির মধ্যে কেহ বা এসিটস্ fermentation, কেহ বা ল্যাকটিক্ এসিড্ fermentation প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের fermentation উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাদিগকে স্বতন্ত্র করিবার একমাত্র উপায় ইহাদিগের mediumএর তাপ-পরিমাণ বিভিন্ন রাখা। যে ঈষ্ট এলকোহলিক fermentation উৎপন্ন করে, তাহার অনুকূল তাপ-পরিমাণ ৫০—৮৬°ফাঃ। কাজেই, যদি medium (উপাদান)কে ঐ তাপ-পরিমাণের মধ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে অন্য কোনপ্রকার ferment আসিয়া তাহাতে জন্মিতে পারে না। কৃত্রিম ঈষ্ট প্রস্তুত করা কষ্টসাধ্য বটে, কিন্তু ইহা ব্যতীত উত্তম সুরাসার প্রস্তুত হয় না; কারণ স্বাভাবিক ঈষ্টের সহিত অন্য জাতীয় ঈষ্ট আসিয়া বিভিন্ন প্রকারের এলকোহলে পরিণত করিবার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য সুরাসারের জন্য যখন ঈষ্ট প্রস্তুত করিতে হয়, তখন অন্য কোন জাতীয় ঈষ্ট যাহাতে না আইসে, তাহার উপায় করিতে হয়। প্রত্যেক প্রকার ঈষ্টের বৃদ্ধির জন্য ও তাহার কার্য্য করিবার এক একটি নির্দ্দিষ্ট তাপ-পরিমাণ আছে, যদি তাপ-পরিমাণ ঠিক রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে একটাকে অন্য হইতে পৃথক করিতে পারা যায়।

কৃত্রিম ঈষ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে, কিছু পরিমাণে ব্রুয়ার্স ঈষ্ট (Brewer's yeast)* স্বতন্ত্র মণ্ড, ও পরিষ্কার পাত্রের প্রয়োজন। এই মণ্ড প্রস্তুত করিতে হইলে সমভাগে যব-মল্ট ও রাইচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া একটি পরিষ্কার পাত্রে ১২৬°ফাঃ তাপ-পরিমাণে গরম জলের সহিত অল্প অল্প করিয়া মিশাইতে ও নাড়িতে হয়। জলে সমস্ত চূর্ণ মিশাইবার ২০ মিনিট পর পর্য্যন্ত নাড়িতে হয়। এই সময়ের মধ্যে সমস্ত মণ্ড শর্করিত হইয়া যায়। ইহার পর প্রায় ২০ ঘণ্টা কাল মণ্ডকে স্থিরভাবে থাকিতে দেওয়া হয়। প্রথমে ইহাতে Lactic acid fermentation আরম্ভ হয়; এজন্য স্বাভাবিক ঈষ্ট কিম্বা অন্য কোন-প্রকার জীবাণু আসিয়া ইহাতে আশ্রয় লইতে পারে না। এই সময়ে মণ্ডের তাপ-পরিমাণ ৯৫° ফাঃ-এর নিম্নে যাহাতে না আইসে, সে বিষয়ে

* ইহা একপ্রকার শুষ্ক চূর্ণ, দেখিতে কাঠের গুঁড়ার মত। কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হয়। বদ্ধ শিশির মধ্যে রাখিলে অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকে।

লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই অবস্থায় মণ্ডের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে; প্রথমে lactic হইতে পরে butyric এবং পরিশেষে acetous fermentationএ পরিণত হয়। ইহার পর পাত্রে শীতল জলপূর্ণ নলের কুণ্ডলী রাখিয়া এবং আলোড়ন করিয়া তাপ-পরিমাণ ৫৯° হইতে ৬৮ ফাঃ মধ্যে কমাইয়া আনিতে হয়। যখন তাপ-পরিমাণ ৮৬° ফারেনহিটে আইসে, সেই সময়ে মণ্ডে ব্রুয়ার্স ঈষ্ট ঢালিয়া দিয়া আস্তে-আস্তে নাড়িতে হয়। ইহার পর ১২ ঘণ্টা ইহাকে ferment হইতে দেওয়া হয় ও যখন ৮৪° ফাঃ হয় তখন ৬৫ ফাঃ তাপে কমাইয়া আনিতে হইবে। এই তাপ-পরিমাণে এই ঈষ্ট বীজকে সুরাসার fermentationএর জন্য ব্যবহার করিতে হইবে।

Fermentation প্রধানতঃ চারি প্রকার:—এলকোহলিক্, এসিটস্, ল্যাক্টিক্ ও ভিসকস্। এলকোহলিক্ ফার্মেণ্টেশনে মণ্ড গামলাতে রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট তাপ পরিমাণে আনিয়া তাহাতে ঈষ্ট-বীজ নিক্ষেপ করিয়া আলোড়িত করিয়া দিতে হয়, যেন বীজ মণ্ডের সহিত বেশ মিশিয়া যায়। এই তাপ-পরিমাণ fermentation পদ্ধতি, তাহার সময় ও মণ্ডের গাঢ়ত্বের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। fermentationএর সময় মণ্ডের তাপ পরিমাণ বৃদ্ধি হয়; কিন্তু ৮৬° ফাঃ উপর কোন ক্রমে যাইতে দেওয়া উচিত নহে। এজন্য বীজ-ঈষ্ট নিক্ষেপের পূর্ব্বেই মণ্ডের তাপ-পরিমাণ পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়; এবং যাহাতে ইহা চরম সীমা অতিক্রম করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বীজ মিশ্রণের প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যে মণ্ড ঘোলা হয় ও তাহা হইতে বুদ্‌বুদ উঠিতে আরম্ভ হয়। ইহা fermentation আরম্ভ হওয়ার লক্ষণ। বুদ্‌বুদ উপরে উঠিয়া গামলার চারিপাশে একত্রিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ বুদ্‌বুদ যত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, মণ্ড তত আলোড়িত হয়, এবং পরিশেষে মনে হয় যেন মণ্ড ফুটিতেছে। তাপ-পরিমাণের বৃদ্ধি এই সময় আরম্ভ হয়। Acetus fermentation যাহাতে না হয়, এজন্য গামলার মুখ উত্তমরূপে কাষ্ঠের আবরণ দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; কেবল আবরণের মধ্যস্থানে বুদ্‌বুদের বাষ্প বাহির হইবার জন্য একটি ছিদ্র থাকে। তাপ-পরিমাণের বৃদ্ধির সহিত বুদ্‌বুদের পরিমাণ অধিক হওয়ায়, কখন-কখন মণ্ড গামলা হইতে ছাপাইয়া পড়ে; এজন্য তাপ-পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে শীতল করা আবশ্যক। ২৪ ঘণ্টা পরে বুদ্‌বুদ কমিতে আরম্ভ হয় ও তাপ পরিমাণ কমিয়া আইসে। দুই এক ঘণ্টা পরেই বুদ্‌বুদ অদৃশ্য হয় ও মণ্ডের জল স্বচ্ছ হইয়া যায়। এই সময় মণ্ডের গন্ধ ও আস্বাদন সুরাসারের ন্যায় হয়। এই সমস্ত ব্যাপার ৪৮ হইতে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সমাপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইহা মণ্ডের পরিমাণ, শর্করার পরিমাণ, fermentএর প্রকারভেদ ও তাপ-পরিমাণের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

Acetus fermentation। এই বিরক্তিকর অম্লজ fermentation প্রায়ই ঘটিয়া থাকে; অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা সত্ত্বেও ইহা নিবারণ করিতে পারা যায় না। fermentationএর সময় মণ্ডে বায়ুর অবাধগতি থাকিলে এই fermentation ঘটিয়া থাকে; সেজন্যই গামলার মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিবার ব্যবস্থা। বায়ু হইতে অম্লজান শোষণ করিয়া সুরাসার অম্লে পরিণত হয় ও এসিটিক্ এসিড উৎপন্ন হয়। এসিটিক্ এসিড্ ভিনিগার ও সির্কায় আছে। যখন acetus fermentation আরম্ভ হয়, তখন মণ্ড ঘোলা হয় ও তাহার উপরে সুতার ন্যায় লম্বা-লম্বা একপ্রকার পদার্থ জন্মায় এবং কিছুক্ষণ পরে পাত্রের নীচে পড়িয়া যায়। ইহার পর দেখা যায় যে, সমস্ত সুরাসার অম্লে পরিণত হইয়াছে। এই fermentationএর অনুকূল তাপ-পরিমাণ ৬৮° হইতে ৯৫° ফাঃ। ইহার নিবারণের একমাত্র উপায় মণ্ডে বায়ুর প্রবেশের পথ বন্ধ করা, তাপ-পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে না দেওয়া, পরিষ্কার জল ব্যবহার করা, এবং প্রত্যেক fermentationএর পর গামলা চূণ দ্বারা উত্তমরূপে পরিষ্কার করা।

Lactic fermentation। এই fermentation প্রভাবে শর্করা ও starch ল্যাকটিক্ এসিডে পরিণত হয় এবং একবার আরম্ভ হইলে সমস্ত মণ্ডকে ল্যাক্টিক্ এসিডে পরিণত করে। এই ল্যাকটিক ferment প্রভাবে দুধ দধিতে পরিণত হয়। জিলিপি ও তন্দুরের রুটিতে যে "খামি" ব্যবহৃত হয়, তাহা ল্যাকটিক্ ফার্ম্মেণ্ট ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি পূর্ব্ব হইতে মণ্ডকে সামান্য অম্লাক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই ফার্ম্মেণ্টেশন রোধ করিতে পারা যায় বটে; কিন্তু butyric এসিডে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং শর্করার অপচয় হয়। fermentation পাত্র চূণ দ্বারা পরিষ্কার করিয়া পরে শতকরা ৫ ভাগ গন্ধক দ্রাবক মিশ্রিত জল দিয়া ধৌত করা ও ঈষ্টবীজ বদলান ভিন্ন ইহার নিবারণের অন্য উপায় নাই।

Viscous fermentation। Fermentationএ ব্যবহৃত গামলা যদি কিছু দিন পড়িয়া থাকে এবং তাহা পুনরায় ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে এই ফার্ম্মেণ্টেশন হইয়া থাকে। ইহার প্রভাবে মণ্ড গাঢ় হয় ও কাশের মত ঘন ও গাঢ় হইয়া যায়। এই fermentationএ মণ্ড হইতে কার্ব্বনিক এসিড ও উদ্‌জান বুদ্‌বুদ্ বাহির হয় ও এবং পরিশেষে (ম্যানাইট) manniteএ পরিণত হয়। ইহা নিবারণের উপায় উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

Fermentationএর কাল ও তাহার লক্ষণ। Fermentationএর কালকে তিন সমভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেক কালে কি কি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নীচে দেওয়া গেল।

প্রথমকাল। ঈষ্ট-বীজ মিশ্রিত করিবার সময় মণ্ডের তাপ-পরিমাণ ৬০° হইতে ৬৮° ফাঃ মধ্যে রাখা হয়। এইভাবে ঈষ্ট-বীজ বাড়িতে থাকে, কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প অল্প পরিমাণে উঠিতে থাকে ও মণ্ড অল্প নড়িতে থাকে। মণ্ড শতকরা ৫ ভাগ সুরাসারে পরিণত হইলে ঈষ্টের বৃদ্ধি বন্ধ হয়।

দ্বিতীয়কাল প্রায়ই ১২ ঘণ্টা স্থায়ী হয় ও এই সময় হইতে ঈষ্ট-বীজের কার্য্য আরম্ভ হয়। কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প অধিক পরিমাণে নির্গত হয় ও তাপ-পরিমাণের বৃদ্ধি হয়; কিন্তু ৮১ ফাঃ অধিক হওয়া

উচিত নহে। এই কালের শেষভাগে অল্প-অল্প জল মিশাইতে হয়। তাহাতে মণ্ড তরল হয় এবং ঈষ্ট সম্পূর্ণভাবে কার্য্য করিতে পারে।

তৃতীয়কাল। কার্ব্বনিক-এসিড বুদ্‌-বুদ্‌ কমিয়া আইসে ও তাপ পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহা ৭৭° হইতে ৮১° মধ্যে থাকা উচিত।

ফার্ম্মেণ্টেশনের সময় কখন কখনও মণ্ডের বিবিধ-প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। যদি মণ্ডে এমন কোন পদার্থ থাকে, যাহা সম্পূর্ণভাবে দ্রব হয় নাই, তাহা হইলে উপরে উঠিয়া একত্রিত হইয়া একটি স্তর গঠন করে। এই স্তর যদি কার্ব্বনিক এসিড্ বুদ্‌বুদ্‌ ভাঙ্গিতে না পারে, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে Fermentation অতি ধীরে ও অসম্পূর্ণভাবে হইতেছে। কিন্তু যদি স্তর উঠে-নামে ও ঘুরিতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে স্তর কাটিয়া কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্প বাহির হইতে থাকে, তাহা হইলে Fermentation সম্পূর্ণ ভাবে চলিতেছে, মনে করিতে হইবে। ফেনা অধিক হইলে কখন-কখন গামলা হইতে মণ্ড ছাপাইয়া পড়ে ও তাহাতে ক্ষতি হয়; কিছু পরিমাণ গরম তেল কিম্বা পেট্রোলিয়ম্ ঢালিয়া দিলে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে সুরাসারে দুর্গন্ধ হয় বটে, কিন্তু গুণের কোন তারতম্য হয় না। Fermentation শেষ হইলে মণ্ড কখন গাঢ় কিম্বা পাতলা অবস্থায় থাকে ও বলা বাহুল্য যে সুরাসার ইহাতেই থাকে এবং পরে চুয়াইয়া লইতে হয়। Theory হিসাবে সুরাসার প্রতি পাউণ্ডে যতটা পাওয়া উচিত, হাতে-কলমে করিতে গেলে ততটা পাওয়া যায় না। এক পাউণ্ড Starch হইতে ১১৪ আউন্স সুরাসার পাওয়া উচিত কিন্তু শতকরা ইহার ৮০ ভাগ ও অতি যত্নে শতকরা ৮৮ ভাগ পর্য্যন্তও পাওয়া গিয়াছে।

Fermentation এর পাত্র। সচরাচর ওক কিম্বা সাইপ্রেস্ কাঠের গামলা ব্যবহৃত হয়। চতুষ্কোণ অপেক্ষা গোলাকার গামলা উত্তম। ইহার ব্যাস অপেক্ষা উচ্চতা অধিক হয় এবং তলদেশ অপেক্ষা মুখের পরিসর অল্প হইয়া থাকে। আবরণ দ্বারা গামলার মুখ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা থাকে। আবরণের মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র ও এক-স্থলে একটি ছোট দ্বার রাখিতে হয় এই দ্বার যাহাতে ইচ্ছামত খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আবরণের মধ্য-স্থলের ছিদ্র কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্প নির্গমনের জন্য ও তাপমান যন্ত্র দ্বারা মণ্ডের তাপ পরিমাণ মাপিবার জন্য রাখা হয়। তাপপরিমাণ ইচ্ছামত কমাইবার ও বাড়াইবার জন্য সচরাচর তাঁবার নলের কুণ্ডলি গামলার ভিতর রাখা হয়, আবশ্যক অনুযায়ী জল-বাষ্প কিম্বা শীতলজল এই কুণ্ডলির মধ্য দিয়া চালনা করিয়া মণ্ডকে উষ্ণ বা শীতল করা হয়। এই নলকুণ্ডলি প্রায়ই গামলার তলদেশে আবদ্ধ থাকে ও তাহার দুই মুখ গামলার বাহিরে থাকে। কোন কোন স্থলে ইহা স্বতন্ত্র থাকে ও আবশ্যক মত গামলার ভিতর রাখিতে ও বাহির করিয়া লইতে পারা যায়। কখন কখনও লোহার গামলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহা কাঠের গামলা অপেক্ষা ভাল। কাষ্ঠ সচ্ছিদ্র বলিয়া তাহার ছিদ্রের ভিতর অনেক প্রকার Ferment থাকিতে পারে এবং একবার ব্যবহার করিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিলে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য হয় না। তবে যদি গামলার ভিতর দিকে পালিস, বার্ণিশ কিম্বা মসিনার তেল দিয়া ছিদ্র সকল বন্ধ করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ভাল হয়।

Fermentation-গৃহ। যে গৃহে বায়ু-চলাচল অধিক না হয় ও যাহাতে দ্বার ও জানালা অতি অল্প থাকে তাহা Fermentation এর জন্য মনোনীত হয়। তাপ-পরিমাণ সমভাবে রাখিবার জন্য গৃহের উচ্চতা অল্প, ও দেওয়াল প্রশস্ত হওয়া উচিত। একটি তাপমান গৃহে ঝুলাইয়া রাখা হয়; ইহা দ্বারা গৃহের তাপ পরিমাণ সর্ব্বদা জানিতে পারা যায়। গৃহের ভিতর চারিপাশে চুল্লি থাকা উচিত; কারণ শীতকালে যখন শীত অধিক হয়, তখন চুল্লির সাহায্যে গৃহকে গরম করিতে হয়। তাপপরিমাণ ৬৪° হইতে ৬৮° ফাঃ মধ্যে রাখিতে হইবে।

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রতিদিন ঘরের মেজে জল দিয়া ধুইতে হইবে ও Fermentation হইয়া গেলেই গামলাগুলিকে উপরে বর্ণিত প্রণালীতে পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। Fermentation এর সময় যে কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প বাহির হয়, তাহা নষ্ট কিম্বা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য চারিদিকে চূণের ছোট ছোট গামলা রাখিতে হয়, অথবা মেজের সমতলে দেওয়ালে চারি ইঞ্চ প্রশস্ত ও তিন ইঞ্চ উচ্চে বড় বড় ছিদ্র রাখিতে হয়। কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্প বায়ু অপেক্ষা গুরু; সেজন্য ইহা মেজের উপর একত্রিত হয় ও এই সকল ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়, কিম্বা চূণ ইহাকে শোষণ করিয়া লয়। কার্ব্বনিক এসিড্ অতি বিষাক্ত বাষ্প; ইহার আঘ্রাণে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য বন্ধ হয়, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এজন্য এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

ছদ্মবেশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পুরুষের নারীবেশ

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম্-এ]

প্রথমে দেবলীলার কথাই বলি। পুরাণে শুনা যায়, অসুরগণের প্রতিকূলতা হইতে দেবগণের স্বার্থরক্ষার্থ, নারায়ণ মোহিনী মূর্ত্তিতে অমৃতবণ্টনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; স্বয়ং শিব সেই মোহিনী মূর্ত্তি দ্বারা মোহিত হইয়াছিলেন। আবার মহাদেবও পার্ব্বতীর মনোরঞ্জনের জন্য নারীবেশ ধরিতেন—এরূপ পৌরাণিক বৃত্তান্ত আছে। ইলার ব্যাপার বড়ই গোলমেলে। তিনি 'পুরুষ কি নারী' স্থির করা কঠিন। এক মতে, তিনি বৈবস্বত মনুর কন্যা, পরে বিষ্ণুর বরে পুরুষ (সুদ্যুম্ন); পরে কুমার-বনে প্রবেশ করাতে পুনরায় স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মতান্তরে, তিনি কর্দ্দম ঋষির পুত্র ইল, কুমার-বনে প্রবেশ করাতে নারী হইয়া যান; পরে পার্ব্বতীর বরে একমাস পুরুষ ও একমাস নারী হইতেন। (নারী অবস্থায় তিনি বুধপুত্র পুরূরবার জননী।) অবশেষে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলে তিনি সম্পূর্ণ পুরুষ হইয়াছিলেন।(১)

কৃষ্ণলীলাত্মক সাহিত্যে দেখা যায়, শ্রীরাধাকে শাশুড়ী, ননদ ও স্বামীর সন্দেহ হইতে মুক্তি দিবার জন্য শ্যাম শ্যামার মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন। আবার শ্রীমতীর সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় বা মানভিক্ষার্থ শ্যামসুন্দরের গণকী, বিদেশিনী, বণিকিনী, নাপিতানী, মালিনী, গায়িকা, দেব-দেয়াশিনী প্রভৃতি বেশের সরস বর্ণনা উক্ত সাহিত্যে আছে। ইহার মধ্যে 'চমৎকার-চন্দ্রিকা'য় শ্যামসুন্দরের ব্রাহ্মণী বিদ্যাবলী সাজিয়া কপট সর্পাঘাতে শ্রীরাধার চিকিৎসা ইত্যাদির বর্ণনা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার। রাধাকৃষ্ণের মিলন-ঘটনের সুযোগ দিবার জন্য সুবলের রাধিকাবেশ-ধারণও এই শ্রেণীভুক্ত। কৃষ্ণলীলার এ সমস্ত ব্যাপারই 'রসতত্ত্ব লাগি' অর্থাৎ প্রেমের দায়ে।

এইবার দেবলীলা ছাড়িয়া মানব-মানবীর কথা বলিব। জাম্ববতীসুত শাম্বের গর্ভিণী সাজা ছেলেমানুষী খেয়াল, মজামারার জন্য। বৈদ্য বা দৈবজ্ঞের বিদ্যা-পরীক্ষার জন্য, একটু মজামারার জন্য, পুরুষকে নারী সাজানর কথা শুনিয়াছি। এক্ষেত্রে হয় ত মূল উদ্দেশ্য তাহাই ছিল—যদিও ব্রহ্মশাপে তাহার ফল (মুষলং কুলনাশনম্) বিষম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহাভারতে নারীবেশে ভীমের কীচক-বধ—কামুকের দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে। রামপ্রসাদের বিদ্যা-সুন্দরে পড়িয়াছি, "সূর্য্যবংশে জন্মে দশরথ নামে ভূপ। বিপদসময়ে রাজা ধরে নারীরূপ॥" এ কোন্ 'বিপদ-সময়ে'র কথা বুঝিতে পারিলাম না। এ তিনটিই পৌরাণিক দৃষ্টান্ত।

কবি কালিদাস সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত, তাহার দুইটিতে তাঁহার স্ত্রীবেশধারণের কথা আছে। একটিতে তিনি স্ত্রীবেশে পুরুষের মত ডাহিন পা আগে বাড়াইয়া ধরা পড়িয়াছিলেন। অপরটিতে তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে কৌশলে তাড়াইবার জন্য, নিজের দাসীবেশে পণ্ডিতের বাসাবাড়ীতে ঝাঁট-পাট দিতে-দিতে এমন পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, 'কবির দাসীর এত বিদ্যা, না জানি কবির বিদ্যা আরও কত বেশী!' এই কৈমুতিক ন্যায়ের আশ্রয় লইয়া পণ্ডিত সদ্যঃ সদ্যঃ প্রস্থান করিলেন! ইহার একটি দৃষ্টান্তে আত্মরক্ষার জন্য, অপরটিতে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য ছদ্মবেশ।

'মালতীমাধবে' মালতীর প্রণয়ের পথ নিরাপদ্ রাখিবার জন্য কামন্দকীর পরামর্শে মাধবমিত্র মকরন্দ নারীবেশে নন্দনের বধূ হইলেন। আবার এই বধূবেশে নন্দনের

---

(১) গ্রীক্ পৌরাণিক আখ্যানে টাইরিসিয়াস্ Tiresias অদ্ভুত কারণে পুরুষ হইতে নারীতে পরিণত হইয়াছিলেন এবং পরে আবার ঐরূপ অদ্ভুত কারণে পুনরায় পুরুষ হইয়াছিলেন।

অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করাতে, মকরন্দের নিজ-প্রণয়িনী নন্দন-ভগিনী মদয়ন্তিকার সহিত মিলনের অপূর্ব্ব সুযোগ ঘটিল। এক ছদ্মবেশে দুই যোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; অতএব ইহা কৃষ্ণলীলার উপরও টেক্কা দেয়।

'নাগানন্দে' বিদূষক মধুমক্ষিকা-নিবারণের জন্য নারী সাজিয়া ঘোমটা টানিয়া বসিল। বিট তাহাকে নিজ-প্রণয়িনী নবমালিকা মনে করিয়া 'দেহি পদপল্লবম্' মন্ত্রে মানভঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এমন সময়ে আসল আসিল। একটু প্রেমের ফোড়ন থাকিলেও ইহা শুধু ভাঁড়ামির জন্যই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে, ইহার কোন (serious) গম্ভীর উদ্দেশ্য নাই।

'দশকুমারচরিতে' পূর্ব্বপীঠিকার চতুর্থ উচ্ছ্বাসে পুষ্পোদ্ভবের বৃত্তান্তে নায়ক পুষ্পোদ্ভব প্রণয়িনী বণিক্-কন্যা বালচন্দ্রিকার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ-প্রতিনিধির ভ্রাতা দারুবর্ম্মার কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য, নায়িকার সহচরী-বেশে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিল। আবার পঞ্চম উচ্ছ্বাসে প্রমতি শ্রাবস্তী-রাজ-কন্যা নবমালিকার সহিত পূর্ব্বরাগবশতঃ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কুমারী কন্যা সাজিয়া রাজান্তঃপুরে স্থানলাভ করিল এবং কৌশলে কার্য্য উদ্ধার করিল।

দশকুমারচরিতের শেষোক্ত উপাখ্যানটির সহিত 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র ত্রয়োদশ উপাখ্যানের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়। এই উপাখ্যানে মনস্বামি-নামক ভট্টপুত্র রাজকন্যা শশিপ্রভার প্রেমে পড়িয়া মন্ত্রবলে ষোড়শবর্ষীয়া সুন্দরী সাজিল এবং এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভাবি-পুত্রবধূ-পরিচয়ে রাজান্তঃপুরে স্থান লাভ করিল। মনস্বামী মন্ত্রবলে অন্তঃপুরে পুরুষের দেহও গ্রহণ করিত। (এ ক্ষেত্রে বেশ-পরিবর্ত্তন নহে, মন্ত্রবলে দেহ-পরিবর্ত্তন।) মন্ত্রিপুত্র নারী-ভ্রমে উহার প্রেমে পড়িলেন, এই ব্যাপারে আখ্যান-বস্তু আরও জটিল ও সরস হইয়াছে।

এই তিনটি স্থলেই উদ্দাম প্রেমের কাণ্ড। এসব উপাখ্যানের সহিত কৃষ্ণলীলার কোন সম্পর্ক আছে কি না, এবং এই সকল (Loves of the Harem) অন্তঃপুরের গুপ্ত-প্রণয়-লীলা তৎকালীন সমাজের বাস্তব অবস্থার কতটা পরিচায়ক, সে সব গভীর তত্ত্ব লইয়া প্রত্নতত্ত্ববাগীশগণ গবেষণা করুন।

সুখের বিষয়, 'দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা'য় অর্থাৎ 'বত্রিশ-সিংহাসনে' 'ভানুমত্যাস্তিলম্' ব্যাপারে রাজরোষ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে রাজগুরু সারদানন্দের নারীবেশ-ধারণ ও পরে রাজপুত্রের 'সসেমিরা' ব্যাপারে মন্ত্রিগৃহবাসিনী কুমারীর ভূমিকায় তথ্যনিরূপণ-বৃত্তান্ত পূর্ব্বপ্রদত্ত উদাহরণ-গুলির ন্যায় গুপ্ত-প্রণয়লীলাত্মক নহে।

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দরে' দশকুমারচরিত বেতাল পঞ্চ-বিংশতির বর্ণিত প্রেমের জের; তবে পুরুষের নারী-বেশ প্রেমের সুযোগের জন্য নহে, প্রাণের দায়ে। সুন্দর বিদ্যার পরামর্শে ('জাতি প্রাণ হেতু লোক তঞ্চ করে নানা' এই যুক্তিতে) নারীবেশ ধারণ করিলেন; কিন্তু কোটালের কিরার ভয়ে খন্দক-লঙ্ঘনে ধরা দিয়া ধর্ম্মভীরুতার পরিচয় দিলেন!

পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে' 'চোর ধরা'র জন্য কোটালগণের নারীবেশ,—আত্মরক্ষার জন্য প্রেমিকের নারীবেশ নহে। অতএব এই কৌশল প্রেমের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নহে, প্রেমিককে শাস্তি দিবার জন্য। শক্তিভক্ত কবি এই 'চোরধরা'-ব্যাপারে অজস্র কৃষ্ণলীলার ধূয়া তুলিয়া বেশ একটু টিটকারী দিয়াছেন। সে যাহাই হউক, অপ-রাধী ধরিবার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের কৌশল আধুনিক (police method) পুলিশের প্রণালী অপেক্ষা ন্যূন নহে। তবে ভারতচন্দ্রের কোটালের অপেক্ষা রাম-প্রসাদের কোতোয়াল ও তস্য ভ্রাতার সূক্ষ্ম ডিটেক্‌টিভ-বুদ্ধির আরও তারিফ করিতে হয়।

এক্ষণে ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে কয়েকটি উদাহরণ আহরণ করিব। তাহা হইলে বুঝিব যে, পুরুষের নারী-বেশে আত্মগোপন কৌশলী ভীরু প্রাচ্যজাতিরই একচেটিয়া নহে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে বোধ হয় গ্রীক্ পৌরাণিক আখ্যানে ইহার সর্ব্বপ্রথম উদাহরণ দৃষ্ট হয়। গ্রীক্-বীর একিলিস্ অল্প-বয়সে ট্রয়ের যুদ্ধে প্রাণ হারাইবেন এই কথা জানিয়া ভবিতব্য-লঙ্ঘনের চেষ্টায় তাঁহার মাতা থেটিস্ (Thetis) তাঁহাকে নারীবেশে এক রাজার গৃহে লুকাইয়া রাখিয়া-ছিলেন। (শেষে কূশাগ্রীয়ধী ইউলিসিসের কৌশলে একিলিস্ ধরা পড়েন।) এখানে প্রাণরক্ষার জন্য এই বেশ-পরিবর্ত্তন, বীরপুরুষের নিজের চেষ্টায় নহে, পুত্রগত-প্রাণা জননীর চেষ্টায়। এক্ষেত্রেও এই ছদ্মবেশের ফলে

'বিদ্যাসুন্দরী' ব্যাপার ঘটিয়াছিল। যাক্, সে কুৎসিত কথায় আর কায নাই।

ইংরেজী সাহিত্যে, শেক্‌স্‌পীয়ারের সমসাময়িক স্যর ফিলিপ্ সিড্‌নির গদ্যপদ্যময় কাব্যে এক দেশের রাজপুত্র (Pyrocles) বীরনারীর (Amazon) ছদ্মবেশে অপর দেশের রাজকন্যার (Philoclea) গৃহে প্রবেশের সুযোগ পাইলেন ও তাঁহাকে গোপনে আত্ম-পরিচয় দিয়া প্রেম-জ্ঞাপন করিলেন। এদিকে আবার নায়িকার পিতা নারী-ভ্রমে, ও নায়িকার মাতা পুরুষ বলিয়া চিনিয়া, তাঁহার প্রেমযাচ্ঞা করিলেন! এইরূপ সত্য ও ভুলের জড়াজড়ি এবং প্রেমের ছড়াছড়িতে ব্যাপার খুব ঘোরালো হইয়াছে। তাহার পর শ্রাদ্ধ আরও গড়াইয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক ডন্‌লপ বলেন, এইরূপ ছদ্মবেশের প্রকৃত মূল একিলিসের আখ্যানে; তবে সিড্‌নি ইহা একখানি ফরাশী রোম্যান্স হইতে লইয়াছেন; অন্যান্য ফরাশী, ইতালীয় ও স্প্যানিশ রোম্যান্সেও প্রেমের জন্য এরূপ ছদ্মবেশের ব্যাপার আছে: (Dunlop: History of Fiction, Ch. XI)। বাস্তবিক, রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের ইংরেজী সাহিত্য এরূপ নানা বিষয়ের জন্য উক্ত তিনটি সাহিত্যের নিকট ঋণী। তবে উক্ত তিনটি সাহিত্যের সহিত বর্ত্তমান লেখকের ও অধিকাংশ পাঠকের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয় নাই; অতএব উক্ত তিনটি সাহিত্য হইতে উদাহরণ-সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া, ইংরেজী সাহিত্য হইতে বাছা বাছা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব।

এইবার শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকাবলি হইতে উদাহরণ দিব। Taming of the Shrew 'উগ্রচণ্ডা-দমন' নাটকের Induction বা প্রস্তাবনার বৃত্তান্ত এইরূপ:—ক্রিষ্টোফার স্লাই নামক একজন নিম্নশ্রেণীর লোক মদ খাইয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়া ছিল; একজন বড়লোকের খেয়াল হইল যে, উহাকে বহুমূল্য আসবাবে সজ্জিত গৃহে উত্তম শয্যায় শোয়াইয়া দেওয়া হউক এবং নেশা ছুটিলে উহাকে বুঝান হউক যে, সে একজন বড়লোক, উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল, এক্ষণে জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছে। এই আবুহোসেনী ব্যাপারে বারথোলোমিউ নামক একজন বালক-ভৃত্যকে স্লাইএর স্ত্রী সাজান হইয়াছিল। এক্ষেত্রে পুরুষের নারী-বেশ শুধু মজামারার জন্য।

Merry Wivesএ ফলষ্টাফ গুপ্ত প্রণয় করিতে গিয়া বিপন্ন হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য অপরের পরামর্শে বৃদ্ধার বেশ ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যমও পাইলেন। (এই প্রকরণটুকু ৺দীনবন্ধু মিত্রের জলধরের ব্যাপারে নাই।) (২)

ঐ নাটকেই Anne Page নাম্নী কুমারী মাতা ও পিতার নির্ব্বাচিত উভয় বরকেই ফাঁকী দিয়া স্বীয় অভিলষিত বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য দুইটি বালককে নিজের নারী-বেশ পরাইয়াছিল, প্রেমিকদ্বয় অন্ধকার-রাত্রিতে কুমারী-ভ্রমে উহাদিগকে লইয়া পলাইয়াছিল, কিন্তু পরে ফাঁকি ধরা পড়িয়াছিল। (৩) এক্ষেত্রে প্রেমের জন্য উক্ত কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

শেক্‌স্‌পীয়ারের সমসাময়িক বেন্ জন্‌সনের Epicoene or the Silent Woman ('মুখচোরা মেয়েমানুষ') নাটকে ব্যাপারটা বেশ রগড়দার। প্রৌঢ় আইবুড় কৃপণ ও কোপন-স্বভাব মামাকে আক্কেল দিবার জন্য কানাইয়ে ভাগ্নে মামার এক বিবাহ ঘটাইয়া দিল; মামা অল্পভাষিণী পত্নী পছন্দ করিতেন, প্রথম পরিচয়ে ইহাকে আদর্শের অনুরূপই বুঝিয়াছিলেন; বিবাহের পরেই কিন্তু মামীর বাক্যের চোটে অস্থির হইয়া মামা মামীকে তালাক দিতে প্রস্তুত; শেষে মামা অনেক লাঞ্ছনার পর ভাগ্নের নামে সমস্ত বিষয় উইল করিয়া দিলে ভাগ্নে প্রকাশ করিল যে মামী নারী নহে, ছদ্মবেশী বালক! (এই আমলে রঙ্গমঞ্চে বালকে নারীর ভূমিকা গ্রহণ করিত, এ কথাটা এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য।) ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়েপাগলা বুড়ো'র সঙ্গে এই নাটকের

---

(২) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্কে' বৌদ্ধমঠের আচার্য্য বুড়া বাঁদর দেশানন্দ প্রেম করিতে গিয়া প্রেমপাত্রী তরলার কৌশলে নারীবেশ ধারণ করিতে বাধ্য হইল। তবে ইহা ঠিক Falstaffএর ব্যাপারের অনুকরণ নহে; কেননা দেশানন্দকে প্রেমচর্চ্চার জন্য শাস্তি দেওয়া এখানে গৌণ কল্প; যূথিকার সখী তরলার মুখ্য উদ্দেশ্য, এই কৌশলে যূথিকার প্রণয়ী বসুমিত্রের উদ্ধার।

(৩) একজন ইংরেজ সমালোচক (W. H. Hudson.) বেন্ জন্‌সন্ প্রভৃতি সমসাময়িকদিগের সহিত তুলনা করিয়া বলেন যে শেক্‌স্‌পীয়ার সর্ব্বত্র এই ছদ্মবেশের কথা আগেভাগেই নাটকের পাঠক ও দর্শককে জানাইয়া দেন। কিন্তু এই মন্তব্য Anne Pageএর ব্যাপারে খাটে না।

কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। বেন্ জন্‌সনের কায়দা এই যে তিনি বরাবর রহস্য গোপন করিয়া একেবারে শেষ দৃশ্যে রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ৺দীনবন্ধু মিত্র গোড়া হইতেই নাটকের পাঠক ও দর্শকের কাছে কথাটা ফাঁশ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে দেখা গেল, ভাণের উদ্দেশ্য শুধু রগড় বা বুড়োকে জব্দ করা নহে, স্বার্থসিদ্ধি। ৺দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের বালক-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য মহত্তর।

শেক্‌স্‌পীয়ারের সমসাময়িক আর একখানি নাটকে Nathaniel Field's Amends for Ladies) প্রেমিক প্রেমপাত্রীর সহিত মিলনের সুযোগ লাভ করিবার জন্য দাসী সাজিয়াছিল। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহা নাটককারের জঘন্য রুচির পরিচায়ক।

ঐ সময়কার একখানি আখ্যায়িকায় (Emanuel Forld's Orxatas and Artesia) প্রেমিক নারীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন এবং একজন পুরুষ নারীভ্রমে তাহার প্রেমে পড়িয়াছিল, এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। (পুস্তকখানি নিজে পড়ি নাই; তথ্যটুকু Saintsbury's The English Novel নামক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।)

উনবিংশ শতাব্দীতে বায়রনের 'ডন জুয়ানে' নারীর ছদ্মবেশে নায়কের সুলতানের অন্তঃপুরে প্রবেশ সংস্কৃত সাহিত্যে অবিমারক-দশকুমারচরিতাদির ন্যায় অন্তঃপুরে গুপ্তপ্রণয়লীলার (Loves of the Harem) কাণ্ড। তবে এখানে নায়ক অনিচ্ছায় এ কার্য্যে লিপ্ত; সুলতানের পেয়ারের বেগম স্বয়ং উপযাচিকা, তাঁহার লালসা-পরিতৃপ্তির জন্য বিশ্বস্ত ভৃত্য এ কার্য্যে উদ্‌যোগী। এই ব্যাপারের লেজুড়ে বাঁদীমহলে নারীর ছদ্মবেশে নায়কের রাত্রিযাপন ব্যাপার—কবির জঘন্য রুচির পরিচয় দেয়।

পক্ষান্তরে, টেনিসনের 'প্রিন্‌সেসে' প্রেমিক রাজপুত্র (রূপকথার রাজপুত্রের ন্যায়) প্রণয়পাত্রী বাগ্‌দত্তা রাজকন্যার দর্শনলাভের অন্য উপায় না পাইয়া দুইজন বন্ধুর সহিত মিলিয়া যুক্তি আঁটিলেন। তিন বন্ধুতে নারী সাজিয়া রাজকন্যার স্থাপিত মেয়ে-কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। তাহার পর, নানা হাস্যকর ও ভয়ঙ্কর ঘটনার সঙ্ঘাতে শেষে শুভ হইল, তিন বন্ধুরই তিনটি স্ত্রী-রত্ন মিলিল (এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হইল না।)—বড় চমৎকার কাব্য, রুচিও বিশুদ্ধ, রসও বিচিত্র। প্রেমের দায়ে পুরুষের নারীবেশধারণের এমন রোম্যান্টিক অথচ এমন সুরুচিসঙ্গত দৃষ্টান্ত আর বোধ হয় কুত্রাপি মিলে না।

এইবার আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসঙ্গ তুলিব। ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়েপাগলা বুড়ো'য় বুড়ার 'বয়োগতে বনিতাবিলাস'-লালসায় বেশ একটু আদিরস থাকিলেও নাটকের উদ্দেশ্য সাধু। রতা নাপ্তের কনে সাজা ও তাহার সহপাঠীদিগের বাসরঘরের মহিলামণ্ডলী সাজার আসল প্রয়োজন—দুষ্টের দমন, দুইটি বিধবা কন্যার পিতা বিয়ে-পাগলা বুড়োর বিবাহোন্মাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদান। সঙ্গে সঙ্গে বিলক্ষণ রগড়ও আছে।

৺তারকনাথ গাঙ্গুলির 'স্বর্ণলতা'য় পুলিশের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভার্থ অপরের পরামর্শে গদাধরচন্দ্রের নারীবেশধারণ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অনুসৃত কৌশল। তাহার মাতার নির্বুদ্ধিতার দোষে কৌশল ব্যর্থ হইল। এই উভয় উদাহরণেই দুষ্টের শাস্তিতে poetic justice হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট হাস্যরসও উদ্ভূত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে পুরুষের নারীবেশের কেবল একটিমাত্র উদাহরণ মিলে,—'বিষবৃক্ষে' (৯ম ও ১৫শ পরিচ্ছেদে) দেবেন্দ্র দত্তের হরিদাসী বৈষ্ণবী সাজা। এখানেও সেই মামুলি প্রেমের দায়ে ছদ্মবেশ—কৃষ্ণলীলার জের। নারীবেশে পুরুষের পরের অন্তঃপুরে প্রবেশ সংস্কৃত কাব্যের অনুবৃত্তিও বটে। তবে কার্য্যটির অনুষ্ঠাতা নায়ক নহেন, প্রতিনায়ক (the villain of the story); সত্য বটে, ছদ্মবেশী সরাসরিভাবে প্রণয়ের কথা কুন্দকে মুখ ফুটিয়া বলে নাই, কুন্দকে খাশুড়ীর সহিত দেখা করিতে লইয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু কুন্দ সম্মত হইলে ইহাতেই গুপ্তপ্রণয়ীর কুৎসিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত, এই অভিপ্রায়েই সে এই কৌশলটুকু করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহা প্রকৃত প্রেম নহে, একটা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। যাহা হউক, ব্যাপারটা নিন্দনীয় হইলেও বায়রন-ভারতচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় জঘন্য রুচির পরিচায়ক নহে। বঙ্কিমচন্দ্র রহস্যভেদে অধিক বিলম্ব করেন নাই, পর-পরিচ্ছেদেই 'বৈষ্ণবীর স্ত্রীবেশ ঘুচিয়া অপূর্ব্ব সুন্দর যুবা পুরুষ দাঁড়াইল।' (১০ম পরিচ্ছেদ।) পরন্তু প্রথম দিনের ঘটনায় তিনি সমালোচিকা নারীদিগের মুখ হইতে 'গড়নটা বড় কাঠকাঠ' ইত্যাদি মন্তব্য বাহির

করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় দিনের ঘটনায় সূর্য্যমুখীর মনে সন্দেহের ছায়াপাত করিয়াছেন। রহস্যের এই ক্রমিক উদ্ঘাটন বেশ একটু (artistic) কলাকৌশলময়।

রমেশচন্দ্র দুইখানি আখ্যায়িকায় নায়ককে নারীবেশ পরাইয়াছেন। 'বঙ্গবিজেতা'য় (২৮শ পরিচ্ছেদে) বিমলার পরামর্শে ইন্দ্রনাথ (সুরেন্দ্রনাথ) নিতান্ত অনিচ্ছায় নারীবেশ ধরিয়াছেন—উদ্দেশ্য শত্রুহস্ত হইতে আত্মরক্ষা। আর 'মাধবীকঙ্কণে' (২৭শ পরিচ্ছেদে) জেলেখার পরামর্শে নরেন্দ্রনাথ নওরোজার দিনে শিশমহলে প্রবেশের জন্য নারী-বেশে সজ্জিত হইয়াছেন; জেলেখার গূঢ় উদ্দেশ্য, নরেন্দ্র-নাথকে একবার তাহার প্রণয়িনী পরস্ত্রী হেমলতাকে দেখান। এখানে প্রেমের ব্যাপার। তবে নরেন্দ্রনাথ নিজের অজ্ঞাতসারে জেলেখার কৌশলজালে পড়িয়াছিলেন, নারীবেশও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরেন নাই, জেলেখা জোর করিয়া পরাইয়াছিল। অতএব নরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের দেবেন্দ্র দত্তের তুলনায়। তবে দেবেন্দ্র দত্ত 'বিষবৃক্ষে'র প্রতিনায়ক, আর নরেন্দ্রনাথ 'মাধবীকঙ্কণে'র নায়ক; সুতরাং উভয়ের চরিত্রে এই প্রভেদ থাকাই প্রয়োজনীয়।

হালের বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে সংগৃহীত বহু উদাহরণ দ্বারা প্রবন্ধ আরও স্ফীত না করিয়া এইবার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'নীলাম্বরী' গল্পের আলোচনায় 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' নীতির অনুসরণ করি। এক্ষেত্রে নায়ক মহাজন-পদাবলী পড়িয়া নীলাম্বরীপরা 'গোরোচনা-গোরী'র পক্ষপাতী হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে চৈতন্য দিবার জন্য নিতান্ত খেয়ালের বশে একটি সুশ্রী বালককে নীলাম্বরী পরাইয়া নারী সাজান হইয়াছিল, ফল কিন্তু সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল। এই 'পুংস্যেব যোষিদ্‌ভ্রমঃ' রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় অবিদ্যার আশ্রয় হইল, প্রথমদর্শনেই নায়কের চিত্তচুরি গেল (love at first sight), দ্বিতীয় দর্শনে প্রেমজ্ঞাপন (declaration of love), কিন্তু পরক্ষণেই যখন কলহাস্যের তরঙ্গে ভ্রান্তি দূর হইল, নায়কের তখনকার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক, দার্শনিক অধ্যাপক অভয় দিয়াছেন যে, পরে তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্যাধি হইয়াছিলেন।

বারান্তরে নারীর পুরুষ বেশের আলোচনা করিব।

দত্তা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দিঘড়ার স্বর্গীয় জগদীশ বাবুর বাড়ীটা সরস্বতীর পরপারে; এবং সরস্বতী হইলেও গ্রাম-প্রান্তে কতকগুলি বাঁশঝাড়ের জন্যেই বনমালী বাবুর বাটীর ছাদ হইতে তাহা দেখা যাইত না। তখন শরৎকালের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষুদ্র সর-স্বতীর বর্ষা-বর্দ্ধিত জলটুকুও নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল, এবং তীরের উপর দিয়া কৃষকদিগের গমনাগমনের পথটিও পায়ে-পায়ে শুকাইয়া কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। এই পথের উপর দিয়া আজ অপরাহ্ণ-বেলায় বিজয়া বৃদ্ধ দরওয়ান কানহাইয়া তেওয়ারীকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ও-পারের বাবুলা, বাঁশ, খেজুর প্রভৃতি গাছপালার পাতার ফাঁক দিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের আরক্ত আভা মাঝে-মাঝে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। সে অন্যমনস্ক-দৃষ্টিতে উভয় তীরের এটা-ওটা-সেটা দেখিতে-দেখিতে বরাবর উত্তরমুখে চলিতে-চলিতে হঠাৎ একস্থানে তাহার চোখে পড়িল, নদীর মধ্যে গোটাকয়েক বাঁশ একত্র করিয়া পারাপারের জন্য সেতু প্রস্তুত করা হইয়াছে। এইটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য বিজয়া জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল, অনতিদূরে বসিয়া একজন অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে মাছ ধরিতেছে। সাড়া পাইয়া লোকটি মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং তৎক্ষণাৎ ছিপ রাখিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। ঠিক সেই সময়ে বিজয়ার মুখের উপর সূর্য্যরশ্মি আসিয়া পড়িল কি না জানি না; কিন্তু

[চ]োখোচোখি হইবামাত্রই তাঁহার গৌরবর্ণ মুখখানি [এ]কেবারে যেন রাঙা হইয়া গেল। যে মাছ ধরিতেছিল, [সে] পূর্ণবাবুর সেই ভাগিনেয়টি, যে সেদিন মামার হইয়া [ত]াহার কাছে দরবার করিতে আসিয়াছিল। বিজয়া প্রতি-[ন]মস্কার করিতেই সে কাছে আসিয়া হাসিমুখে কহিল, [বি]কেলবেলায় একটুখানি বেড়াবার পক্ষে নদীর ধারটা [ম]ন্দ যায়গা নয় বটে, কিন্তু, এই সময়টায় ম্যালেরিয়ার ভয়ও [ব]ড় কম নেই। এ বুঝি আপনাকে কেউ সাবধান করে [দে]য়নি?"

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না"; এবং পরক্ষণেই [আ]ত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু [ম্য]ালেরিয়া ত লোক চিনে ধরে না। আমি ত বরং না জেনে [এ]সেচি, আপনি যে জেনে-শুনে জলের ধারে বসে আছেন? [দে]ক দেখি, কি মাছ ধরলেন?"

লোকটি হাসিয়া কহিল, "পুঁটি মাছ। কিন্তু দু' ঘণ্টায় [ম]াত্র দুটি পেয়েচি। মজুরী পোষায়নি। কিন্তু, কি করি [ব]লুন; আপনার মত আমিও প্রায় বিদেশী বল্‌লেই হয়। বাইরে-বাইরে দিন কেটেছে, প্রায় কারুর সঙ্গেই তেমন আলাপ-পরিচয় নেই;—কিন্তু বিকেলটা ত যা' করে হোক্ কাটাতে হবে?"

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া সহাস্যে কহিল, "আমারও প্রায় সেই দশা। আপনাদের বাড়ী বুঝি পূর্ণবাবুর বাড়ীর কাছেই?"

লোকটি কহিল, "না।" হাত দিয়া নদীর ও-পারে দেখাইয়া বলিল, "আমাদের বাড়ী ঐ দিঘড়ায়। এই বাঁশের পুল দিয়ে যেতে হয়।"

গ্রামের নাম শুনিয়া বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা'হলে বোধ হয় জগদীশবাবুর ছেলে নরেনবাবুকে আপনি চেনেন?" লোকটি মাথা নাড়িবামাত্রই বিজয়া একান্ত কৌতূহল-বশে সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, "তিনি কি রকম লোক আপনি বল্‌তে পারেন?"

কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজের অভদ্র প্রশ্নে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। এই লজ্জা লোকটির দৃষ্টি এড়াইল না। সে হাসিয়া বলিল, "তার বাড়ী ত আপনি দেনার দায়ে কিনে নিয়েছেন; এখন তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান কোরে আর ফল কি? আর যে সদুদ্দেশ্যে নিলেন, সে কথাও এ অঞ্চলের সবাই শুনেচে।" বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একেবারে নেওয়া হয়ে গেছে—এই বুঝি এ দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে?" লোকটি বলিল, "হবারই ত কথা। জগদীশ বাবুর সর্ব্বস্ব আপনার বাবার কাছে বিক্রী-কবালায় বাঁধা ছিল। তাঁর ছেলের সাধ্য নেই তত টাকা শোধ করেন—মিয়াদও শেষ হয়েছে—খবর সবাই জানে কি না।" "বাড়ীটি কেমন?" "মন্দ নয়, বেশ বড় বাড়ী। যে জন্যে নিচ্চেন, তার পক্ষে ভালই হবে। চলুন না, আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।"

চলিতে চলিতে বিজয়া কহিল, "আপনি যখন গ্রামের লোক, তখন নিশ্চয়ই সমস্ত জানেন। আচ্ছা, শুনেচি নরেনবাবু বিলেত থেকে ভাল করেই ডাক্তারি পাশ করে এসেছেন। কোন ভাল যায়গায় প্র্যাকটিস্ আরম্ভ কোরে আরও কিছুদিন সময় নিয়েও কি বাপের ঋণটা শোধ করতে পারেন না?" লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "সম্ভব নয়। শুনেচি চিকিৎসা করাই না কি তার সঙ্কল্প নয়।" বিজয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, "তবে তাঁর সঙ্কল্পটাই বা কি শুনি? এত খরচ-পত্র করে বিলেত গিয়ে কষ্ট করে ডাক্তারি শেখ্‌বার ফলটাই বা কি হতে পারে? লোকটি বোধ হয় একেবারেই অপদার্থ।" ভদ্রলোক একটুখানি হাসিয়া বলিল, "অসম্ভব নয়। তবে শুনেচি না কি নরেনবাবু বেশ একটু খেয়ালী গোছের লোক; নিজে চিকিৎসা করে রোগ সারানোর চেয়ে, এমন কিছু একটা না কি বার করে যেতে চান, যাতে ঢের—ঢের বেশি লোকের উপকার হবে। শুন্‌তে পাই নানাপ্রকার কল-কব্জা নিয়ে দিনরাত পরিশ্রমও খুব করেন।"

বিজয়া চকিত হইয়া কহিল, "সে ত ঢের বড় কথা। কিন্তু তাঁর বাড়ী-ঘর-দোর গেলে কি কোরে এ সব করবেন? তখন ত রোজগার করা চাই। আচ্ছা, আপনি ত নিশ্চয় বল্‌তে পারবেন, বিলেত যাওয়ার জন্যে এখনকার লোকে তাঁকে 'একঘরে' করে রেখেচে কি না?" ভদ্রলোক কহিল, "সে ত নিশ্চয়ই। আমার মামা পূর্ণবাবু তাঁরও ত একপ্রকার আত্মীয়, তবুও পূজোর ক'দিন বাড়ীতে ডাক্‌তে সাহস করেন নি। কিন্তু তাতে তাঁর কিছুই আসে-যায় না। নিজের কাজকর্ম্ম নিয়ে আছেন, সময় পেলে ছবি আঁকেন—বাড়ী থেকে বারই হন না। ঐ যে তাঁর বাড়ী—"

বলিয়া আঙুল দিয়া গাছ-পালায় ঘেরা একটা বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

এই সময়ে বুড়া দরওয়ান পিছন হইয়া ভাঙা বাঙ্‌লায় জানাইল যে, অনেকদূর আসিয়া পড়া হইয়াছে, বাটী ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। লোকটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হাঁ, কথায়-কথায় অনেক পথ এসে পড়েচেন।" তাহাকেও সেই বাঁশের সেতু দিয়াই গ্রামে ঢুকিতে হইবে, সুতরাং ফিরিবার মুখেও সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। বিজয়া মনে-মনে ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিয়া কহিল, "তা হলে তাঁর কোন আত্মীয়কুটুম্বের ঘরেও আশ্রয় পাবার ভরসা নেই বলুন?" লোকটি কহিল, "একেবারেই না।" বিজয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চলিয়া কহিল, "তিনি যে কোথাও যেতে চান না, সে কথা ঠিক। নইলে, এই মাসের শেষেই ত তাঁকে ছেড়ে দেবার নোটিশ দেওয়া হয়েচে,—আর কেউ হলে অন্ততঃ আমাদের সঙ্গেও একবার দেখা করবার চেষ্টা করতেন।" লোকটি বলিল, "হয় ত তার দরকার নেই,—নয় ভাবেন, লাভ কি! আপনি ত আর সত্যই তাঁকে বাড়ীতে থাক্‌তে দিতে পারবেন না।"

বিজয়া কহিল, "না পারলেও আর কিছুকাল থাক্‌তে দিতেও ত পারা যায়! দেনার দায় হাজার হলেও ত একজনকে তার বাড়ীছাড়া করতে সকলেরই কষ্ট হয়! কিন্তু আপনার কথাবার্ত্তার ভাবে বোধ হয় যেন তাঁর সঙ্গে আপনার বিশেষ পরিচয় আছে। কি বলেন, সত্যি নয়?" লোকটা শুধু হাসিল, কোন কথা কহিল না। পুলটির কাছেই তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। সে ছোট ছিপটি কুড়াইয়া লইয়া কহিল, "এই আমাদের গ্রামে ঢোকবার পথ। নমস্কার।" বলিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া সেই বংশ-নির্ম্মিত পুলটির উপর দিয়া টলিতে-টলিতে কোনমতে পার হইয়া সঙ্কীর্ণ বন্য-পথের ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বহুদিনের বৃদ্ধ ভৃত্য কানাই সিং বিজয়াকে শিশুকালে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে সে দরওয়ানীর ন্যায্য অধিকারকেও বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল; সে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাবুটি কে মাইজী?" বিজয়া কিন্তু এতটাই বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল যে, বুড়ার প্রশ্ন তাহার কাণেই পৌঁছিল না। সেই প্রায়ান্ধকার নদীতটের সমস্ত নীরব মাধুর্য্যকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু এই কথা ভাবিতে-ভাবিতেই পথ চলিতে লাগিল,—লোকটি কে, এবং আবার কবে দেখা হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাসবিহারী বলিলেন, "আমরাই নোটিশ দিয়েছি, আবার আমরাই যদি তাকে রদ্ করতে যাই, আর পাঁচজন প্রজার কাছে সেটা কি রকম দেখাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি মা।" বিজয়া কহিল, "সেই মর্ম্মে একখানা চিঠি লিখে কেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন না। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে, তিনি শুধু অপমানের ভয়েই এখানে আস্‌তে সাহস করেন না।" রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপমান কিসের?" বিজয়া বলিল, "তিনি নিশ্চয় ভেবেছেন, তাঁর প্রার্থনা আমরা মঞ্জুর করব না।" রাসবিহারী বিদ্রূপের ভাবে কহিলেন, "মহা মানী লোক দেখ্‌চি। তাই অপমানটা ঘাড়ে নিয়ে আমাদের যেচে তাঁকে থাক্‌তে দিতে হবে?" বিজয়া কাতর হইয়া কহিল, "তাতেও দোষ নেই কাকাবাবু। অযাচিত দয়া করার মধ্যে কোন লজ্জা নেই।" রাসবিহারী কহিলেন, "ভাল, লজ্জা না হয় নেই; কিন্তু, আমরা যে সমাজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেচি, তার কি হবে বল দেখি?" বিজয়া বলিল, "তার অন্য কোন ব্যবস্থাও আমরা করতে পারব।"

রাসবিহারী মনে-মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বাবা যথেষ্ট টাকা রেখে গেছেন, তুমি অন্য ব্যবস্থাও করতে পার, সে আমি বুঝলুম; কিন্তু, এই কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি মা, যাকে আজ পর্য্যন্ত কখনো চোখেও দেখনি, আমাদের সকলের অনুরোধ এড়িয়ে তার জন্যেই বা তোমার এত ব্যথা কেন? ভগবানের করুণায় তোমার আরও পাঁচজন প্রজা আছে, আরও দশজন খাতক আছে; তাদের সকলের জন্যেই কি এ ব্যবস্থা করতে পারবে, না, পারলেই তাতে মঙ্গল হবে,—সে জবাব আমাকে দাও দেখি বিজয়া?" বিজয়া কহিল,—"আপনাকে ত বলেচি, এটা বাবার শেষ অনুরোধ। তা'ছাড়া আমি শুনেচি—" "কি শুনেচ?" বিদ্রূপের ভয়ে তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানের কথাটা বিজয়া কহিল না; বলিল, "আমি শুনেচি, তিনি 'একঘরে'। গৃহহীন করলে আত্মীয়-কুটুম্ব কারও বাড়ীতেই তাঁর আশ্রয় পাবার পথ নেই। তা'ছাড়া,

'গৃহহীন' কথাটা মনে করলেই আমার ভারি কষ্ট হয় কাকাবাবু।"

রাসবিহারী কণ্ঠস্বর করুণায় গদগদ করিয়া বলিলেন, "তোমার এইটুকু বয়সে যদি এই কষ্ট হয়, আমার এতখানি বয়সে সে কষ্ট কত বড় হতে পারে, একটু ভেবে দেখ দেখি? আর আমার দীর্ঘ জীবনে এই কি প্রথম অপ্রিয় কর্ত্তব্যের সুমুখে দাঁড়িয়েছি বিজয়া? না, তা' নয়! কর্ত্তব্য চিরদিনই আমার কাছে কর্ত্তব্য! তার কাছে হৃদয়-বৃত্তির কোন দাবী-দাওয়া নেই। বনমালী যে কঠোর দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত করে গেছেন, সে ভার আমাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বহন করতেই হবে—তাতে যত দুঃখ-কষ্টই না আমাকে ভোগ করতে হোক্। হয়, আমাকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দাও, নইলে কিছুতেই তোমার এ অসঙ্গত অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।"

বিজয়া অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। পিতার অপরাধে তাহার নিরপরাধ পুত্রকে গৃহছাড়া করার সঙ্কল্প তাহার অন্তরের মধ্যে যে বেদনা দিতে লাগিল, বয়সের অনুপাত করিয়া এই বৃদ্ধ যে তাহার অষ্টগুণ অধিক ব্যথা সহ্য করিয়াও কর্ত্তব্য-পালনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে, তাহা সে মনের মধ্যে ঠিক মত গ্রহণ করিতে পারিল না,—বরঞ্চ এ যেন শুধু একজন নিরুপায় হতভাগ্যের প্রতি প্রবলের একান্ত হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার মতই তাহাকে বাজিতে লাগিল। কিন্তু জোর করিয়া নিজের ইচ্ছা পরিচালন করিবার সাহসও তাহার নাই। অথচ, ইহাও তাহার অগোচর ছিল না যে, পল্লীগ্রামে সমারোহপূর্ব্বক ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার খ্যাতিলাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষাতেই বৃদ্ধ পিতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বিলাসবিহারী এই জিদ এবং জবরদস্তি করিতেছে। রাসবিহারী আর কিছু বলিলেন না। বিজয়াও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া নীরবে সম্মতি দিল বটে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তাহার পরদুঃখকাতর স্নেহ-কোমল নারীচিত্ত এই বৃদ্ধের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাহার পুত্রের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

রাসবিহারী বিষয়ী লোক; এ কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না যে, যে মালিক, তাহাকে তর্কের বেলায় ষোলো-আনা পরাজয় করিয়া আদায়ের বেলায় আটআনার বেশি লোভ করিতে নাই। কারণ, সে পাওনা শেষ পর্য্যন্ত পাকা হয় না। সুতরাং দাক্ষিণ্য প্রকাশের দ্বারা লাভবান হইবার যদি কোন সময় থাকে ত সে এই! বিজয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "মা, তোমার জিনিস, তুমি দান করবে, আমি বাদ সাধব কেন! আমি শুধু এই দেখাতে চেয়েছিলুম যে, বিলাস যা করতে চেয়েছিল, তা' স্বার্থের জন্যেও নয়, রাগের জন্যেও নয়, শুধু কর্ত্তব্য বলেই চেয়েছিল। একদিন আমার বিষয়, তোমার বাবার বিষয়—সব এক হয়েই তোমাদের দু'জনের হাতে পড়বে; সেদিন বুদ্ধি দেবার জন্যে এ বুড়োকেও খুঁজে পাবে না। সেদিন তোমাদের উভয়ের মতের অমিল না হয়, সেদিন তোমার স্বামীর প্রত্যেক কাজটিকে যাতে অভ্রান্ত বলে শ্রদ্ধা করতে পারো, বিশ্বাস করতে পারো—কেবল এই আমি চেয়েছি। নইলে, দান করতে, দয়া করতে সেও জানে, আমিও জানি। কিন্তু সে দান অপাত্রে হলে যে কিছুতে চলবে না, এই শুধু তোমার কাছে আমার প্রমাণ করা। এখন বুঝলে মা, কেন আমরা জগদীশের ছেলেকে একবিন্দু দয়া করতে চাইনি, এবং কেন সে দয়া একেবারে অসম্ভব?" বলিয়া বৃদ্ধ সস্নেহ হাস্যে বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এই পরম সারগর্ভ ও অকাট্য যুক্তি-যুক্ত উপদেশাবলীর বিরুদ্ধে তর্ক করা চলে না,—বিজয়া নীরবেই বসিয়া রহিল। রাসবিহারী পুনশ্চ কহিলেন, "এখন বুঝলে মা, বিজয়া, বিলাস ছেলে-মানুষ হলেও কতদূর পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করে? ঐ যে তোমাকে বললুম, আমি ত এই কাজেই চুল পাকালুম, কিছু জমিদারীর কাজে ওর চাল্ বুঝতে আমাকেও মাঝে-মাঝে স্তম্ভিত হয়ে চিন্তা করতে হয়।" বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

"সাড়ে-চারটে বাজে", বলিয়া রাসবিহারী লাঠিটি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এই সমাজ-প্রতিষ্ঠার চিন্তায় বিলাস যে কি রকম উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে, তা' প্রকাশ করে বলা যায় না। তার ধ্যান-জ্ঞান-ধারণা সমস্তই হয়েছে এখন ওই। এখন ঈশ্বরের চরণে শুধু প্রার্থনা আমার এই, যেন সে শুভদিনটি আমি চোখে দেখে যেতে পারি।" বলিয়া তিনি দুই হাত যুক্ত করিয়া ব্রহ্মের উদ্দেশে বারংবার নমস্কার করিলেন। দ্বারের কাছে আসিয়া তিনি সহসা স্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছোক্‌রা একবার আমার কাছে এলেও না হয় যা'হোক্ কিছু একটা বিবেচনা করবার চেষ্টা করতুম;

কিন্তু তাও ত কখনো—অতি হতভাগা, অতি হতভাগা! বাপের স্বভাব একেবারে ষোলকলায় পেয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি—" বলিতে-বলিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সেইখানে এক ভাবে বসিয়া বিজয়া কি যে ভাবিতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই। অকস্মাৎ বাহিরের দিকে নজর পড়ায় যাই দেখিল বেলা পড়িয়া আসিতেছে, অমনি নদী-তীরের অস্বাস্থ্যকর বাতাস তাহাকে সজোরে টান দিয়া যেন আসন ছাড়িয়া তুলিয়া দিল। এবং আজিও সে বৃদ্ধ দরওয়ানজীকে ডাকিয়া লইয়া বায়ুসেবনের ছলে বাহির হইয়া পড়িল। ঠিক সেইখানে বসিয়া আজিও সেই লোকটি মাছ ধরিতেছিল, এবং অনেকটা দূর হইতেই বিজয়ার চোখে পড়িয়াছিল; কিন্তু কাছা-কাছি আসিয়া যেন দেখিতেই পায় নাই এমনি ভাবে চলিয়া যাইতেছিল,—সহসা কানাই সিং পিছন হইতে ডাক্ দিয়া উঠিল—"সেলাম বাবুজী, শিকার মিলা?"

কথাটা কানে যাইবামাত্রই তাহার মূল পর্য্যন্ত বিজয়ার আরক্ত হইয়া উঠিল। যাঁহারা মনে করেন যথার্থ বন্ধুত্বের জন্য অনেকদিন এবং অনেক কথাবার্ত্তা হওয়া চাই-ই, তাঁহাদের এইখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, না, তাহা অত্যাবশ্যক নহে। বিজয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই লোকটি ছিপ রাখিয়া দিয়া নমস্কার করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সহাস্যে কহিল, "হাঁ, দেশের প্রতি আপনার সত্যিকার টান্ আছে বটে। এমন কি, তার ম্যালেরিয়াটা পর্য্যন্ত না নিলে আপনার চল্‌ছে না দেখ্‌চি।" বিজয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নেওয়া হয়ে গেছে বোধ হয়? কিন্তু দেখে ত তা মনে হয় না।"

লোকটি বলিল, "ডাক্তারদের একটু সবুর করে নিতে হয়। অমন কাড়াকাড়ি—" কথাটা শেষ না হইতেই বিজয়া প্রশ্ন করিল, "আপনি ডাক্তার না কি?" লোকটি অপ্রতিভ হইয়া সহসা উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া পরিহাসের ভঙ্গীতে কহিল, "তা' বই কি। একজন কত-বড় ডাক্তারের প্রতিবেশী আমরা! সবাইকে দিয়ে-থুয়ে তবে ত আমাদের—কি বলেন?"

বিজয়া তৎক্ষণাৎ কোন কথাই বলিল না; ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে কহিল, "শুধু প্রতিবেশী নয়, তিনি যে আপনার একজন বন্ধু, সে আমি অনুমান করেছিলুম। আমার কথা তাঁকে গল্প করেছেন নাকি?" লোকটি হাসিয়া কহিল, "আপনি তাকে একটা অপদার্থ হতভাগা মনে করেন, এ তো পুরোনো গল্প—সবাই করে। এ আর নূতন করে বল্‌বার দরকার কি? তবে, একদিন হয় ত সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।" বিজয়া মনে-মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া কহিল, "আমার সঙ্গে দেখা করায় তাঁর লাভ কি? কিন্তু, তাঁর সম্বন্ধে ত আমি এ রকম কথা আপনাকে বলিনি।" "না বলে থাকলেও বলাই ত উচিত ছিল।" "উচিত ছিল কেন?" "যার বাড়ী-ঘর-দোর বিকিয়ে যায়, তাকে সবাই হতভাগ্য বলে। আমরাও বলি। সুমুখে না পারি আড়ালে ত বল্‌তে পারি।" বিজয়া হাসিতে লাগিল, কহিল, "আপনি ত তা'হলে তাঁর খুব ভাল বন্ধু!" লোকটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সে ঠিক। এমন কি, তার হয়ে আমি নিজেই আপনাকে ধরতুম, যদি না জানতুম আপনি সদুদ্দেশ্যেই তার বাড়ীখানি গ্রহণ করচেন।" বিজয়া একটিবারমাত্র মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না।

কথায়-কথায় আজ তাহারা আরও একটু অধিকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। দেখা গেল, ওপারে একদল লোক সার বাঁধিয়া নরেন্দ্রবাবুর বাটীর দিকে চলিয়াছে। তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হইতে পোনর পর্য্যন্ত সকল বয়সের লোকই ছিল। লোকটি দেখাইয়া কহিল, "ওরা কোথায় যাচ্চে জানেন? নরেনবাবুর ইস্কুলে পড়তে" বিজয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি এ ব্যবসাও করেন না কি? কিন্তু যতদূর বুঝ্‌তে পারচি, বিনা পয়সায়—ঠিক না?"

লোকটি হাসিমুখে কহিল, "তা'কে ঠিক চিনেচেন। অপদার্থ লোকের কোথাও আত্মগোপন করা চলে না।" পরে, অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়া কহিল, "নরেন বলে, আমাদের দেশে সত্যিকার চাষী নেই। চাষ-করা পৈত্রিক পেশা; তাই, সময়ে-অসময়ে জমিতে দুবার লাঙ্গল দিয়ে, বীজ ছড়িয়ে, আকাশের পানে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকে। একে চাষ-করা বলে না, লটারি-খেলা বলে। কোন্ জমিতে কখন্ 'সার' দিতে হয়, কারে 'সার' বলে, কাকে সত্যিকার চাষ-করা বলে—এ সব জানেই না। বিলাতে থাক্‌তে, ডাক্তারি

পড়ার সঙ্গে এ বিদ্যেটাও সে শিখে এসেছিল। ভাল কথা, একদিন যাবেন তার ইস্কুল দেখ্‌তে? মাঠের মাঝখানে গাছের তলায় বাপ ব্যাটা-ঠাকুদ্দায় মিলে যেখানে পাঠশালা বসে, সেখানে?" যাইবার জন্য বিজয়া তৎক্ষণাৎ উদ্যত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই কৌতূহল দমন করিয়া শুধু কহিল, "না, থাক্।" জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তাঁর অতবড় বাড়ী থাক্‌তে গাছতলায় পাঠশালা বসান্ কেন?" লোকটি বলিল, "এ সব শিক্ষা ত শুধু কেবল মুখের কথায় বই মুখস্থ করিয়ে দেওয়া যায় না। তাদের হাতে-হাতে চাষ করিয়ে দেখাতে হয় যে, এ জিনিসটা রীতিমত শিখে করলে দুগুণো এমন কি চারপাঁচ গুণো ফসলও পাওয়া যায়। তার জন্যে মাঠ দরকার, চাষ করা দরকার। কপাল ঠুকে মেঘের পানে চেয়ে হাত পেতে বসে থাকা দরকার নয়। এখন বুঝ্‌লেন, কেন তার পাঠশালা গাছতলায় বসে? একবার যদি তার ইস্কুলের মাঠের ফসল দেখেন, আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে, তা নিশ্চয় বল্‌তে পারি। এখনো ত বেলা আছে,—আজই চলুন না,—ঐ ত দেখা যাচ্চে।" বিজয়ার মুখের ভাব ক্রমশঃ গম্ভীর এবং কঠিন হইয়া আসিতেছিল; কহিল, "না, আজ নয়।" লোকটি সহজেই বলিল, "তবে থাক্। চলুন, খানিকটে আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি—" বলিয়া সঙ্গে-সঙ্গে চলিতে লাগিল। মিনিট পাঁচ-ছয় বিজয়া একটা কথাও কহিল না, ভিতরে-ভিতরে কেমন যেন তাহার লজ্জা করিতে লাগিল—অথচ, লজ্জার হেতুও সে ভাবিয়া পাইল না। লোকটি পুনরায় কথা কহিল; বলিল, "আপনি ধর্ম্মের জন্যই যখন তার বাড়ীটা নিচ্চেন,—এই ক'বিঘে জমি যখন ভাল কাজেই লাগ্‌চে,—তখন এটা ত আপনি অনায়াসেই ছেড়ে দিতে পারেন?" বলিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে বিজয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, "এই অনুরোধ করবার জন্যে তাঁর তরফ থেকে আপনার কোন অধিকার আছে?" বলিয়া আড়-চোখে চাহিয়া দেখিল, লোকটির হাসি-মুখের কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না। সে বলিল, "এ অধিকার দেবার ওপর নির্ভর করে না, নেবার উপর নির্ভর করে। যা' ভাল কাজ, তার অধিকার মানুষ সঙ্গে-সঙ্গেই ভগবানের কাছে পায়,—মানুষের কাছে হাত পেতে নিতে হয় না। যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করার জন্যে আপনি মনে-মনে বিরক্ত হলেন, পেলে কারা পেতো জানেন? দেশের নিরন্ন কৃষকেরা। আমাদের শাস্ত্রে আছে, দরিদ্র হচ্চে ভগবানের একটা বিশেষ মূর্ত্তি। তাঁর সেবার অধিকার ত সকলেরই আছে। সে অধিকার নরেনের কাছে চাইতে যাবো কেন বলুন?" বলিয়া সে টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

বিজয়া চলিতে চলিতে বলিল, "কিন্তু, আপনার বন্ধু ত শুধু এই জন্যেই এখানে বসে থাক্‌তে পারবেন না!" লোকটি কহিল, "না। কিন্তু, তিনি হয় ত আমার ওপরে এ ভার দিয়ে যেতে পারেন।" বিজয়ার ওষ্ঠাধরে একটা চাপা হাসি খেলা করিয়া গেল; কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিল, "সে আমি অনুমান করেছিলুম।" লোকটি বলিল, "করবারই কথা কি না। এ সকল কাজ আগে ছিল দেশের ভূস্বামীর। তাঁদের ব্রহ্মোত্তর দিতে হ'ত। এখন সে দায় নেই বটে, কিন্তু তার জের মেটেনি। তাই দু'চার বিঘে কেউ ঠকিয়ে নেবার চেষ্টা করলেই তাঁরা পূর্ব্ব-সংস্কার বশে টের পান।" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। বিজয়া নিজেও এই হাসিতে যোগ দিতে গেল, কিন্তু পারিল না। এই সরল পরিহাস তাহার অন্তরের কোথায় গিয়া যেন বিঁধিয়া রহিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলিয়া প্রশ্ন করিল, "আপনি কি ব্রাহ্মণ?" লোকটি কহিল, "হাঁ।" বিজয়া পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নিজেও ত আপনার বন্ধুকে আশ্রয় দিতে পারেন?" "কিন্তু, আমি ত এখানে থাকিনে। বোধ হয় এক সপ্তাহ পরেই চলে যাবো।" বিজয়া অন্তরের মধ্যে যেন চম্‌কাইয়া উঠিল; কহিল, "কিন্তু, বাড়ী যখন এখানে তখন নিশ্চয়ই ঘন-ঘন যাতায়াত করতে হয়?"

লোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আর বোধ হয় আসতে হবে না।"

বিজয়ার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। সে মনে-মনে বুঝিল, এ সম্বন্ধে অযথা প্রশ্ন করা আর কোন মতেই উচিত হইবে না; কিন্তু কিছুতেই কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। ধীরে-ধীরে কহিল, "এখানে বাড়ীর লোকের ভার নেবার লোক আপনার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু—"

লোকটি হাসিয়া বলিল, "না, সে রকম লোক কেউ

নেই।" "তা হলে আপনার বাপ-মা—" "আমার বাপ-মা, ভাই-বোন কেউ নেই;—এই যে, আপনার বাড়ীর সুমুখে এসে পড়া গেছে। নমস্কার, আমি চল্লুম—"বলিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। বিজয়া আর তাহার মুখের পানে চাহিতে পারিল না; কিন্তু, মৃদু কণ্ঠে কহিল, "ভেতরে আস্‌বেন না?" "না, ফিরে যেতে আমার অন্ধকার হয়ে যাবে। নমস্কার।" বিজয়া হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত ধীরে-ধীরে বলিল, "আপনার বন্ধুকে একবার রাসবিহারী বাবুর কাছে যেতে বল্‌তে পারেন না?" লোকটি বিস্মিত হইয়া বলিল, "তাঁর কাছে কেন?" "তিনিই বাবার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দেখেন কি না।" "সে আমি জানি। কিন্তু তাঁর কাছে যেতে কেন বল্‌চেন।" বিজয়া এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। সেও ক্ষণকাল স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "আমার ফিরতে রাত হয়ে যাবে,—আমি আসি।" বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিজয়াদের বাটী-সংলগ্ন উদ্যানের এই দিকের অংশটা খুব বড়। সুদীর্ঘ আম কাঁঠাল গাছের তলায় তখন অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছিল। বুড়া দরওয়ান কহিল, "মাইজী, একটু ঘুরে সদর রাস্তা দিয়ে গেলে ভাল হোতো না?"

এ সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিবার মত মনের অবস্থা বিজয়ার ছিল না,—সে শুধু একটা 'না', বলিয়াই, তাড়াতাড়ি অন্ধকার বাগানের ভিতর দিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। যে দুইটা কথা তাহার মনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার একটা এই যে, এত কথাবার্ত্তার মধ্যেও শুধু নারীর পক্ষে ভদ্ররীতি বিগর্হিত বলিয়াই ইঁহার নামটা পর্য্যন্ত জানা হইল না। দ্বিতীয়টি এই যে, দু'দিন পরে ইনি কোথায় চলিয়া যাইবেন—প্রশ্নটা শতবার মুখে আসিয়া পড়িলেও, শতবারই কেবল লজ্জাতেই মুখে বাধিয়া গেল। ইঁহার সম্বন্ধে একটা বিষয় প্রথম হইতেই বিজয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল যে, ইনি যেই হোন্, যথেষ্ট সুশিক্ষিত। এবং, পল্লীগ্রাম জন্মস্থান হইলেও অনাত্মীয় ভদ্রমহিলার সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করিবার শিক্ষা এবং অভ্যাস ইঁহার আছে। ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত না হইয়াও এ শিক্ষা যে তিনি কি করিয়া কোথায় পাইলেন, ভাবিতে-ভাবিতে বাড়ীতে পা দিতেই, পরেশের-মা আসিয়া জানাইল যে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিলাসবাবু বাহিরের বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন। শুনিবামাত্রই তাহার মন শ্রান্তি ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। এই লোকটি সেই যে সেদিন রাগ করিয়া গিয়াছিল, আর আসে নাই; কিন্তু, আজ যে কারণেই আসুক, যে লোকটির চিন্তায় তাহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহার কিছুই না জানিয়াও, উভয়ের মধ্যে অকস্মাৎ মনে-মনে আকাশ-পাতাল ব্যবধান না করিয়া থাকিতে পারিল না! শ্রান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি বাড়ী এসেছি—তাঁকে জানানো হয়েছে পরেশের-মা?" পরেশের মা কহিল, "না, দিদিমণি, আমি এক্ষুণি পরেশকে খবর দিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" "তিনি চা খাবেন কি না, জিজ্ঞেসা করা হয়েছিল?" "ও মা, তা' আর হয়নি? তিনি যে বলেছিলেন, তুমি ফিরে এলেই একসঙ্গে হবে।"

বিলাসবাবুই যে এ বাটীর ভবিষ্যৎ কর্ত্তৃপক্ষ, এ সংবাদ আত্মীয়-পরিজন কাহারও অবিদিত ছিল না, এবং সেই হিসাবে আদর-যত্নেরও ত্রুটি হইত না। বিজয়া আর কোন কথা না বলিয়া উপরে তাহার ঘরে চলিয়া গেল। প্রায় মিনিট-কুড়ি পরে বিজয়া নীচে আসিয়া, খোলা দরজার বাহির হইতে দেখিতে পাইল, বিলাস বাতির সম্মুখে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি কতকগুলা কাগজপত্র দেখিতেছে। তাহার পদশব্দে সে মুখ তুলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া, একেবারেই গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, "তুমি নিশ্চয় ভেবেচ, আমি রাগ করে এতদিন আসিনি। যদিও রাগ আমি করিনি, কিন্তু, করলেও যে সেটা আমার পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় হোতো না, সে আজ আমি তোমার কাছে প্রমাণ কোরব।"

বিলাস এতদিন পর্য্যন্ত বিজয়াকে 'আপনি' বলিয়া ডাকিত। আজিকার এই আকস্মিক 'তুমি' সম্বোধনের কারণ সে কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, আনন্দে যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু, সে কোন কথা না কহিয়া ধীরে-ধীরে ঘরে ঢুকিয়া অনতিদূরে একটা চৌকী টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। বিলাস সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া কহিল, "আমি সমস্ত ঠিক-ঠাক্ করে এইমাত্র

কলকাতা থেকে আস্‌চি, এখনো পর্য্যন্ত বাবার সঙ্গেও দেখা করতে পারিনি। তুমি স্বচ্ছন্দে চুপ করে থাক্‌তে পারো, কিন্তু আমি ত পারিনে! আমার দায়িত্ব-বোধ আছে;—একটা বিরাট কার্য্য মাথায় নিয়ে আমি কিছুতে স্থির থাক্‌তে পারিনে। আমাদের ব্রাহ্ম-মন্দির-প্রতিষ্ঠা এই বড়দিনের ছুটিতেই হবে- সমস্ত স্থির করে এলুম; এমন কি, নিমন্ত্রণ করা পর্য্যন্ত বাকি রেখে আসিনি। উঃ—কাল সকাল থেকে কি ঘোরাটাই না আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। যাক্—ওদিকের সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কারা কারা আস্‌বেন তাও এই কাগজখানায় আমি টুকে এনেচি—একবার পড়ে দেখো—" বলিয়া বিলাস আত্মপ্রসাদের একটা প্রচণ্ড নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুমুখের কাগজখানা বিজয়ার দিকে ঠেলিয়া দিয়া চৌকিতে হেলান দিয়া বসিল।

তথাপি বিজয়া কথা কহিল না,—নিমন্ত্রিতদিগের সম্বন্ধেও লেশমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করিল না; যেমন বসিয়া ছিল, ঠিক তেমনি বসিয়া রহিল। এতক্ষণ পরে বিলাসবিহারী বিজয়ার নীরবতা সম্বন্ধে ঈষৎ সচেতন হইয়া কহিল, "ব্যাপার কি! এমন চুপচাপ যে?" বিজয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আমি ভাব্‌চি, আপনি যে নিমন্ত্রণ করে এলেন, এখন তাঁদের কি বলা যায়?" "তার মানে?" "মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি এখনো কিছু স্থির করে উঠ্‌তে পারিনি।" বিলাস সটান্ সোজা হইয়া বসিয়া কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তার মানে কি? তুমি কি ভেবেচ, এই ছুটির মধ্যে না করতে পারলে আর শীঘ্র করা যাবে? তাঁরা ত কেউ তোমার—ইয়ে ন'ন যে, তোমার যখন সুবিধে হবে, তখনই তাঁরা এসে হাজির হবেন? মনস্থির হয়নি তার অর্থ কি শুনি?" রাগে তাহার চোখ-দুটা যেন জ্বলিতে লাগিল। বিজয়া অধোমুখে বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া আস্তে-আস্তে বলিল, "আমি ভেবে দেখ্‌লুম, এখানে এই নিয়ে সমারোহ করবার দরকার নেই।"

বিলাস দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "সমারোহ! সমারোহ করতে হবে এমন কথা ত আমি বলিনি! বরঞ্চ, যা' স্বভাবতঃই শান্ত, গম্ভীর,—তার কায নিঃশব্দে সমাধা করবার মত জ্ঞান আমার আছে। তোমাকে সে জন্যে চিন্তিত হতে হবে না।" বিজয়া তেমনি মৃদু কণ্ঠে কহিল, "এখানে ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করার কোন সার্থকতা নেই। সে হবে না।" বিলাস প্রথমটা এম্‌নি স্তম্ভিত হইয়া গেল, যে, তাহার মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। পরে কহিল, "আমি জান্‌তে চাই, তুমি যথার্থ ব্রাহ্ম মহিলা না কি?" বিজয়া তীব্র আঘাতে যেন চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু চক্ষের পলকে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া শুধু বলিল, "আপনি বাড়ী থেকে শান্ত হয়ে ফিরে এলে তার পরে কথা হবে—এখন থাক্।" বলিয়াই উঠিবার উপক্রম করিল। কিন্তু ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া সে পুনরায় বসিয়া পড়িল। বিলাস সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র করিল না। ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইয়াও সে নিজের ব্যবহার সুসংযত বা ভদ্র করিতে শিখে নাই,—সে চাকরটার সম্মুখেই উদ্ধত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমরা তোমার সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করতে পারি জানো?"

বিজয়া নীরবে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না। ভৃত্য প্রস্থান করিলে ধীরে-ধীরে কহিল, "সে আলোচনা আমি কাকাবাবুর সঙ্গে কোরব,—আপনার সঙ্গে নয়।" বলিয়া একবাটি চা তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিল। বিলাস তাহা স্পর্শ না করিয়া সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়া বলিল, "আমরা তোমার সংস্পর্শ ত্যাগ করলে কি হয় জানো?" বিজয়া বলিল, "না। কিন্তু, সে যাই হোক না, আপনার দায়িত্ব-বোধ যখন এত বেশি, তখন, আমার অনিচ্ছায় যাঁদের নিমন্ত্রণ করে অপদস্থ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তখন সে ভার নিজেই বহন করুন, আমাকে অংশ নিতে অনুরোধ করবেন না।" বিলাস দুই চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া হাঁকিয়া কহিল, "আমি কাজের লোক—কাজই ভালবাসি, খেলা ভালবাসিনে—তা মনে রেখো বিজয়া।" বিজয়া স্বাভাবিক শান্ত স্বরে জবাব দিল, "আচ্ছা, সে আমি ভুল্‌ব না।" ইহার মধ্যে যেটুকু শ্লেষ ছিল, তাহা বিলাসবিহারীকে একেবারে বারুদের মত প্রজ্বলিত করিয়া দিল। সে প্রায় চীৎকার করিয়াই উঠিল, "যাতে না ভোলো সে আমি দেখ্‌ব।" বিজয়া ইহার জবাব দিল না, মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে চায়ের বাটির মধ্যে চামচটা ডুবাইয়া নাড়িতে লাগিল। তাহাকে মৌন দেখিয়া, বিলাস নিজেও ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, আপনাকে কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, এত বড় বাড়ী তবে কি কাজে লাগ্‌বে শুনি? এ তো আর শুধু-শুধু ফেলে রাখা যেতে পারবে না।" এবার

বিজয়া মুখ তুলিয়া চাহিল; এবং অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত কহিল, "না। কিন্তু এ বাড়ী যে নিতেই হবে, সে তো এখনো স্থির হয়নি।" জবাব শুনিয়া বিলাস ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। মাটীতে সজোরে পা ঠুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "হয়েছে, একশবার স্থির হয়েচে। আমি সমাজের মান্য ব্যক্তিদের আহ্বান করে এনে অপমান করতে পারব না—এ বাড়ী আমাদের চাই-ই। এ আমি করে তবে ছাড়ব—এই তোমাকে আজ আমি জানিয়ে গেলুম।" বলিয়া প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সেই দিন হইতে বিজয়ার মনের মধ্যে এই আশাটা অনুক্ষণ যেন তৃষ্ণার মত জাগিতেছিল, যে, সেই অপরিচিত লোকটি যাইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ একটিবারও তাঁহার বন্ধুকে লইয়া অনুরোধ করিতে আসিবেন। যত কথা তাহাদের মধ্যে হইয়াছিল, সমস্তগুলিই তাহার অন্তরের মধ্যে গাঁথা হইয়াছিল, তাহার একটি শব্দ পর্য্যন্তও সে বিস্মৃত হয় নাই। সেইগুলি সে মনে মনে অহর্নিশি আন্দোলন করিয়া দেখিয়াছিল যে, বস্তুতঃ সে এমন একটা কথাও বলে নাই, যাহাতে এ ধারণা তাঁহার জন্মিতে পারে যে, তাহার কাছে আশা করিবার তাঁহার বন্ধুর একেবারেই কিছু নাই। বরঞ্চ, তাহার বেশ মনে পড়ে, তিনি যে তাহারও পিতৃ-বন্ধুর পুত্র, এ উল্লেখ সে করিয়াছে; সময় পাইলে ঋণ-পরিশোধ করিবার মত শক্তি সামর্থ্য আছে কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছে; তবে যাহার সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে, তাহার ইহাতেও কি চেষ্টা করিবার মত কিছুই ছিল না! যেখানে কোন ভরসাই থাকে না, সেখানেও ত আত্মীয়বন্ধুরা একবার যত্ন করিয়া দেখিতে বলে। এ বন্ধুটি কি তাঁহার তবে একেবারেই সৃষ্টিছাড়া!

নদীতীরের পথে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু সে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রত্যহই এই আশা করিত যে, একবার-না-একবার তিনি আসিবেনই। কিন্তু দিন বহিয়া যাইতে লাগিল,—না আসিলেন তিনি, না আসিল তাঁহার অদ্ভুত ডাক্তার বন্ধুটি। বৃদ্ধ রাসবিহারীর সহিত দেখা হইলে তিনি, ছেলের সঙ্গে যে ইতিমধ্যে কোন কথা হইয়াছে, তাহার আভাসমাত্র দিলেন্ না। বরঞ্চ ইঙ্গিতে এই ভাবটাই প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেন সঙ্কল্প এক-প্রকার সিদ্ধ হইয়াই গিয়াছে। এই লইয়া যে আর কোন প্রকার আন্দোলন উঠিতে পারে, তাহা যেন তাঁহার মনেই আসিতে পারে না। বিজয়া নিজেও সঙ্কোচে কথাটা উত্থাপন করিতে পারিল না। অগ্রহায়ণ শেষ হইয়া গেল, পৌষের ঠিক প্রথম দিনটিতেই পিতা-পুত্র একত্র দর্শন দিলেন। রাসবিহারী কহিলেন, "মা, আর ত বেশি দিন নেই, এর মধ্যেই ত সমস্ত গুছিয়ে গুছিয়ে তুলতে হবে।" বিজয়া সত্য-সত্যই একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "তিনি নিজে ইচ্ছে করে চলে না গেলে ত কিছুই হতে পারে না।" বিলাসবিহারী মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন;—তাঁহার পিতা কহিলেন, "কার কথা বল্‌চ মা, জগদীশের ছেলে ত? সে ত কালই বাড়ী ছেড়ে দিয়েচে।" সংবাদটা যথার্থই বিজয়ার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়া আঘাত করিল। সে তৎক্ষণাৎ বিলাসের দিক হইতে এমন করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, যাহাতে সে কোন মতে না তাহার মুখ দেখিতে পায়। এই ভাবে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া, আঘাতটা সামলাইয়া লইয়া, আস্তে-আস্তে রাসবিহারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর জিনিসপত্র কি হ'ল? সমস্ত নিয়ে গেছেন?" বিলাস পিছন হইতে হাসির ভঙ্গিতে বলিল, "থাক্‌বার মধ্যে একটা তে-পেয়ে খাট ছিল—তার উপরেই বোধ করি তাঁর শয়ন চল্‌ত, আমি সেটা বাইরে গাছতলায় টেনে ফেলে দিয়েচি, তাঁর ইচ্ছে হলে নিয়ে যেতে পারেন—কোন আপত্তি নেই।" বিজয়া চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখের উপর সুস্পষ্ট বেদনার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া রাস-বিহারী ভর্ৎসনার কণ্ঠে ছেলেকে বলিলেন, "ওটা তোমার দোষ বিলাস। মানুষ যেমন অপরাধীই হোক্, ভগবান্ তাকে যত দণ্ডই দিন, তার দুঃখে আমাদের দুঃখিত হওয়া, সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত। আমি বল্‌চিনে যে, তুমি অন্তরে তার জন্যে কষ্ট পাচ্চ না, কিন্তু বাইরেও সেটা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। জগদীশের ছেলের সঙ্গে তোমার কি দেখা হয়েছিল? তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বল্‌লে না কেন? দেখ্‌তুম যদি কিছু—" পিতার কথাটা শেষ হইতেও পাইল না,—পুত্র তাঁহার ইঙ্গিতটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিয়া মুখে একটা শব্দ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিমন্ত্রণ করা ছাড়া আমার ত

[ত]র কাজ ছিল না বাবা। তুমি কি যে বল, তার ঠিকানাই [না]ই। তা'ছাড়া আমার পৌঁছাবার পূর্ব্বেই ত ডাক্তার [সা]হেব তাঁর তোরঙ্গ, প্যাঁটরা, যন্ত্র-পাতি গুটিয়ে নিয়ে সরে [প]ড়ছিলেন। বিলাতের ডাক্তার! একটা অপদার্থ হাম্‌বাগ্‌ [কো]থাকার!" বলিয়া সে আরও কি-সব বলিতে যাইতেছিল, [কি]ন্তু রাসবিহারী বিজয়ার মুখের প্রতি আড়-চোখে চাহিয়া [রু]ক্ষ কণ্ঠে কহিলেন, "না বিলাস, তোমার এ রকম কথাবার্ত্তা [আ]মি মার্জ্জনা করতে পারি নে। নিজের ব্যবহারে তোমার [ল]জ্জিত হওয়া উচিত—অনুতাপ করা উচিত।"

বিলাস লেশমাত্র লজ্জিত বা অনুতপ্ত না হইয়া জবাব [দিল], "কি জন্যে শুনি? পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, [প]রের ক্লেশ নিবারণ করার শিক্ষা আমার আছে; কিন্তু [যে] দাম্ভিক লোক বাড়ী বয়ে অপমান করে যায়, তাকে [আ]মি মাপ করিনে। অত ভণ্ডামি আমার নেই।"

তাহার জবাব শুনিয়া উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল। [রাস]বিহারী কহিলেন, "কে আবার তোমাকে বাড়ী বয়ে অপমান করে গেল? কার কথা তুমি বল্‌চ?' বিলাস ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, "জগদীশবাবুর সু-পুত্র নরেন-বাবুর কথাই বল্‌চি বাবা! তিনিই একদিন ঠিক এই ঘরে বসেই আমাকে অপমান করে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে চিনতুম না তাই—" বলিয়া ইঙ্গিতে বিজয়াকে দেখাইয়া কহিল, "নইলে ওঁকেও অপমান করে যেতে সে কসুর করেনি—তোমরা জানো সে কথা?"

বিজয়া চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই, বিলাস তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল, "পূর্ণবাবুর ভাগ্নে বলে পরিচয় দিয়ে যে আমাকে পর্য্যন্ত অপমান করে গিয়েছিল, সে কে? তখন যে তাকে ভারি প্রশ্রয় দিলে! সে-ই নরেনবাবু! তখন নিজের যথার্থ পরিচয় দিতে যদি সে সাহস কোরত, তবেই বলতে পারতুম সে পুরুষ মানুষ! ভণ্ড কোথাকার!" বলিয়াই উভয়েই সবিস্ময়ে দেখিল, বিজয়ার সমস্ত মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে বেদনায় একেবারে বিবর্ণ, শ্রীহীন হইয়া গেছে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গলার ধাতুরূপ

(আলোচনা)

[শ্রীরাখালরাজ রায় বি-এ]

[পৌ]ষ মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্ [মহা]শয়ের "বাঙ্গলার ধাতুরূপ" পড়িয়া মনে হইল, তিনি [সর্ব্ব]ত্র ঠিক কথা বলেন নাই।

তিনি ইংরাজীর অনুকরণে প্রেজেন্ট পার্ফেক্ট 'আমি [ক]রিয়াছি'কে বর্ত্তমান কাল বলিয়াছেন। ইহার অর্থ [লি]খিয়াছেন "আমার প্রাক্-আরব্ধ ক্রিয়া 'বর্ত্তমানে' শেষ [হ]ইয়া চুকিয়া গিয়াছে।" যাহা পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়া পূর্ব্বেই [শে]ষ হইয়াছে তাহাই ত "অতীত"। তবে তাহাকে ["]বর্ত্তমানের" মধ্যে টানিয়া আনা হয় কেন? "আমি [ক]রিলাম ও আমি করিয়াছিলাম" এই দুই অতীত কালের [উ]দাহরণেও আমরা দেখিতেছি আমার প্রাক্-আরব্ধ [ক্রি]য়া বর্ত্তমানে শেষ হইয়া চুকিয়া গিয়াছে। তবে কি [এ]ই দুটিকেও বর্ত্তমান কাল বলিতে হইবে? অনাদিবাবু [ত]াহার প্রবন্ধের ৩৩সূত্রে প্রেজেন্ট্ পার্ফেক্টের বাঙ্গালা অর্থ দিয়াছেন "বর্ত্তমানে পরিসমাপ্ত"। ইহাতেও উপরের দুই উদাহরণের সহিত পার্থক্য বুঝা গেল না। "আমি একার্য্য ৫বৎসর পূর্ব্বে করিয়াছি" বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না, অথচ কার্য্যটি বর্ত্তমানে পরিসমাপ্ত নহে, বহু পূর্ব্বে পরিসমাপ্ত। '৫ বৎসর পূর্ব্বে করিয়াছি' বলিলে ইংরাজীতে অতীত হইয়া ক্রিয়া ভিন্নরূপ ধরে, অথচ বাঙ্গলায় একই রূপ থাকে।

"আমি করিয়াছি, আমি করিলাম ও আমি করিয়াছিলাম" এই তিনই অতীত কাল। প্রথম ও তৃতীয়ে পার্থক্য এই, প্রথমটির ফল এখনও বর্ত্তমান আছে, তৃতীয়টির নাই। দ্বিতীয় উদাহরণে কার্য্য অল্পক্ষণ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। বাঙ্গলার ধাতুগুলির তিনি যে নামকরণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে তিনি শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের "বাঙ্গলা ব্যাকরণ" একেবারেই পড়েন

নাই। তিনি "ধরা, করা" প্রভৃতিকে আকারান্ত ধাতু বলিয়াছেন; কিন্তু "ধরা" ধাতু নহে, ইহা "ধর" ধাতুর বিশেষ্যের রূপ। যথা ধরা পড়িল না। সংস্কৃতে "গম্" ধাতু না বলিয়া "গমন" ধাতু বলিলেও ঠিক এই প্রকারই ভুল হয়। তাঁহার "ওয়া"-অন্ত ধাতুর নামগুলিও ঐ কারণেই ঠিক নহে।

গাওয়া ধাতু নহে,		গা বা গাহ্ ধাতু
যাওয়া "	"	যা ধাতু
খাওয়া "	"	খা "
পাওয়া "	"	পা "
লওয়া "	"	লহ্ "
দেওয়া "	"	দি "
থোওয়া "	"	থ্ "
চাওয়া "	"	চাহ বা চা ধাতু
ধোওয়া "	"	ধু ধাতু

অনাদিবাবুর মতে "কহা, রহা, বহা" প্রভৃতি "হা অন্ত" ধাতুর "হা"র বিকল্পে লোপ হয়। ধাতুগুলি প্রদেশ-ভেদে বা কালভেদে "কহ, রহ ইত্যাদি" কিম্বা 'ক, র' প্রভৃতি হইবে। মুর্শিদাবাদে এখনও এই সকল ধাতুর 'হ' উচ্চারিত হয়। দক্ষিণাঞ্চলে 'হ' এর লোপ হয়। ভারতচন্দ্রের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে কবিরা 'হ' এর লোপ করিতেন না। তাই দেখি ভারতচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে; আগুনের কপালে আগুণ।"

বাঙ্গলার দক্ষিণাঞ্চলের লোকে কেবল এই "হ"কে লোপ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তাঁহারা মহাপ্রাণ বর্ণগুলির মহাপ্রাণত্ব লোপ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা "দেখা"কে উচ্চারণ করেন "দেকা" আর "লিখিতে"কে বলেন "লিক্‌তে"।

অনাদিবাবু "করায়, চালায়" প্রভৃতিকে "আন অন্ত" ধাতু বলিয়াছেন। এগুলি সংস্কৃতের নিজন্ত ধাতুর ন্যায় "আ অন্ত" ধাতু বা যোগেশবাবুর মতে প্রয়োজক ধাতু। ধাতুরূপের সময়—যা+আ+ই, উচ্চারণে যা-আই না হইয়া "যাওয়াই" হয়। এখানে "আন" অন্তে কোথাও পাই।

অনাদিবাবু ১৭ ও ১৮ সূত্রে লিখিয়াছেন—"এ"র স্থানে "উ" দেখা যায় এবং বিদ্যাপতিতে উত্তম পুরুষের "ই"র স্থানে "উ" দেখা যায়। বর্ত্তমান হিন্দীতে এখনও উত্তমপুরুষে "উ" হয়। পূর্ব্বে মৈথিল ভাষায় উত্তম ও প্রথম পুরুষে উ হইত। সুতরাং বাঙ্গলার "এ" বা "ই" স্থানে বিদ্যাপতিতে বা ব্রিজ ভাষায় উ দেখা যায় না বলিয়া, বলা উচিত ছিল, বাঙ্গলায় যেখানে 'এ' বা 'ই' হয় ব্রিজ ভাষায় সেখানে কখনও 'উ' হইত।

তৎপরে অনাদিবাবু ২৪, ২৫ ও ২৯ সূত্রে ব্রিজভাষার "যাওত, করত"র "ত" কে, কোথাও "ত" বলিয়াছেন, কোথাও "অত" বলিয়াছেন। আবার কোথাও বা বলিয়াছেন "তেছে" র পরিবর্ত্তে "অত অন্ত" পদ ব্যবহৃত হয়। ব্রিজভাষার এই "ত" "অত" সংস্কৃতের "তিপ্" বা "তি" বিভক্তির অপভ্রংশ। সংস্কৃতে যেখানে "করোতি" হইত, ব্রিজভাষায় সেখানে "করত" হইত। বিহারের চলিত ভাষায় এখনও ইহার ব্যবহার হয়। বাঙ্গলার "করিতেছি" (করিতে+আছি) বিহারের চলিত ভাষায় "করত হায়" এবং হিন্দীতে "করতা হায়"। সুতরাং "ত বা অত" বিভক্তি ব্রিজভাষায় বর্ত্তমানে প্রযুক্ত হয়, এইরূপ বলাই উচিত ছিল। তা সেই বর্ত্তমান "করে" বা "করিতেছি" যে আকারের হউক না কেন, দুই স্থলেই সমানভাবে ব্যবহৃত হয়।

অনাদিবাবু "করিতেছে" ও "করিয়াছে" র "তেছে" ও "য়াছে" কে প্রত্যয় বলিয়াছেন; ইহাও ঠিক নহে। "কর" ধাতুতে "ইয়া" ও "ইতে" এই দুই বিভক্তি যোগ করিয়া তৎপরে "আছ" ধাতুর বিভিন্ন রূপ যোগ করা হইয়াছে। যথা কর্+ইয়া+আছে=করিয়াছে এবং কর্+ইতে+আছে=করিতেছে।

লেখক ৩৬ সূত্রে "য়াছি বা আছি" স্থানে "ই" দেখা যায় বলিয়া উদাহরণ দিয়াছেন "নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে।" এখানে তিনি বলেন "দেখি" মানে "দেখিয়াছি"। একথা ঠিক বটে, কিন্তু সূত্রটা ওরূপ আকারে না লিখিয়া এইরূপ লিখিলে ভাল হইত।—"দেখি নাই" এইরূপ অতীত কালের স্থানে পদ্যে কখনও কখনও "নাহি দেখি" এইরূপ বর্ত্তমান কালের রূপের প্রয়োগ হয়।

লেখক ৩৭ সূত্রে বলিয়াছেন "৩৩এ করার সর্ব্বশেষরূপ "ই" আগম না হইলে কর্‌য়াছ দেখান হইয়াছে। মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র আবার—

রন্ধন করাছি ভাল আর কিছু আছে? (মুকুন্দ)।

কর্+ই+আছে=করি+আছে=করিয়াছে

কর্+ই+আছে=কর্+য্+আছে=কর্যাছে।"

কথাটা আর একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি। বঙ্গ-শব্দের "এ" স্থানে "এ"র বক্র উচ্চারণ বর্ত্তমান সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশে প্রচলিত আছে এবং পূর্ব্বকালে বীরভূম, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল। মুর্শিদাবাদের উত্তরাংশে "বেল"এর চলিত উচ্চারণ "ব্যাল" এবং "ফেলেছি" এই ক্রিয়ার "এছি"র উচ্চারণ "য়াছি"। "করিয়া+আছি"র সংক্ষিপ্ত বা চলিতরূপ দক্ষিণাঞ্চলে "ক'রেছি" কিন্তু মুর্শিদাবাদের উত্তরাঞ্চলে সংক্ষিপ্ত বা চলিতরূপ ক'র্যাছি। উভয় স্থলেই "করিয়া"র "ইয়া"র জন্যই এই বক্র উচ্চারণ ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে বীরভূম, বর্দ্ধমানের সকল কবিই মুর্শিদাবাদের উচ্চারণের ন্যায় উচ্চারণ করিতেন এবং লিখিতেন। কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রের "কর্যাছি ফেল্যাছি" অধিকাংশ স্থলে "করেছি ফেলেছি" রূপ পাইয়াছে। কিন্তু যেখানে পাণ্ডুলিপির বানান ঠিক রাখা হইয়াছে, সেখানে এই য ফলা আকার নিজ রূপ বজায় রাখিয়াছে। ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রাম রসায়ন' গ্রন্থেও এইরূপ বানান দেখা যায়। এই রঘুনন্দন গোস্বামী বর্দ্ধমান জেলার লোক।

মোগল-সম্রাট্ আক্‌বর

রমণী-পরিচালিত রাজ্য; আক্‌বরের মুক্তি

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

আক্‌বর এখন আর বালক নহেন; কিন্তু এখনও তাঁহার বালচপলতা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই—মন ক্রীড়াসক্ত। এখনও তিনি পূর্ব্বের মত হাতীর লড়াই, শিকার প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে অত্যধিক রত—রাজকার্য্যে এক প্রকার উদাসীন। বয়রামের আধিপত্য অন্তরিত, সম্রাট্ শিথিল-প্রযত্ন,—এই সুযোগে মাহম্ অনগ অল্পে অল্পে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে আমীর-ওম্‌রাহ্‌গণের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তিনিই এখন সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—সম্রাট্ তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলী। রাজ্যের প্রায় সকল প্রধান পদে মাহমের আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়পাত্রগণ অধিষ্ঠিত হইতে লাগিল; সুতরাং রাজ্যশাসনকার্য্যে সর্ব্বত্র যে মাহমের সর্ব্বময় প্রভুত্ব, তাহা ক্রমে প্রজা সাধারণেরও অগোচর রহিল না।

বয়রাম্ খাঁর শাসনের মূলমন্ত্র ছিল—প্রভুর মঙ্গলসাধন এবং সাম্রাজ্যের উন্নতি। মাহমের একমাত্র লক্ষ্য—তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আধম্ খাঁর প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তির প্রসার। কেবল স্বার্থপরায়ণতাই মাহমের সকল চেষ্টার প্রেরণা,—রাজ্যের মঙ্গল বা সুশাসনের উপর তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। প্রভুর কল্যাণকল্পে, বয়রাম্ পাত্র-নির্ব্বিশেষে নিরপেক্ষ-ভাবে শত্রুর উচ্ছেদ-সাধনে কখন পরাঙ্মুখ হ'ন নাই। মাহম এরূপ অপক্ষপাতী নীতির সেবিকা ছিলেন না। যে তাঁহার প্রিয়কারী, সে বিশ্বাসহন্তা পামর হইলেও, তাঁহার প্রীতি-ভাজন হইত; পীর মুহম্মদ্ তাহার দৃষ্টান্ত। মাহমের আধিপত্য-সময়ে সে তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজশক্তির বিরোধী উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি অপরাধীর নিমিত্ত বয়রামের সুশাসনদণ্ড নিয়ত উদ্যত থাকিত। মাহম্ তাঁহার স্বেচ্ছাচারী পুত্রের উদ্দাম অবাধ্যতায় সর্ব্বথা পোষকতা করিতেন। মাতৃবলে বলীয়ান্ আধম্ নির্ভয়ে নানা অত্যাচার ও দুষ্কার্য্য করিয়া বেড়াইতেন; তাঁহার অসংশয় ধারণা ছিল যে, জননী তাঁহার রক্ষা-কবচ। যতদিন সম্রাটের উপর মাহমের অমোঘ প্রভাব থাকিবে, ততদিন আধমের 'সাতখুন মাপ।' সে বিশ্বাস মাহমেরও ছিল, এবং এই বিশ্বাস-দুর্গের নিরাপদ প্রকোষ্ঠে বসিয়া নিষ্ঠুর-প্রকৃতি মাহম্ ভীষণ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হ'ন নাই। এক সময় অপরাধী আধম্‌কে সম্রাটের রোষ হইতে রক্ষাকল্পে তিনি দুইজন নিরপরাধা রমণীকে হত্যা করাইয়াছিলেন। পাছে রমণীদ্বয় জীবিত থাকিলে, তাঁহার পুত্রের কু-কীর্ত্তির কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হয়, তাই এই সতর্কতা!

'কাটামুণ্ড কথা কহে না'—আবুল-ফজলের উক্তি। (*A.N.* ii, 221)' আকবর এই নির্দ্দয় ব্যাপার অবগত হইয়াও কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে সাহস করেন নাই।

বয়রাম খাঁর প্রাধান্যলোপকালে আকবর প্রকৃতপক্ষে সমগ্র হিন্দুস্থানের অধিকারী ছিলেন না; বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার উত্তরে অবস্থিত মালব প্রদেশ তখন বাজ্ বহাদুর সুরের করগত। বাজ্ বহাদুর শাসনকার্য্যে মনোযোগ প্রদান না করিয়া সর্ব্বদা বিলাস-সাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। মালবের ন্যায় উর্ব্বর প্রদেশ শাসনাধীনে আসিলে, যথেষ্ট সুবিধা হইবে ভাবিয়া, মোগল-সরকার বাজ্ বহাদুরের বিরুদ্ধে সৈন্যপ্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন।

১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে আধম্ খাঁ মালব-অভিযানের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের পদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে (৯৬৮ হিজরা) বাজ্ বহাদুর সারংপুরের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হ'ন। পলায়নকালে তিনি ভৃত্যবর্গকে আদেশ দিয়াছিলেন, যেন তাঁহার হারেমের স্ত্রীলোকগণ বিজেতার হস্তে পতিত হইয়া কামানলের ইন্ধনস্বরূপ মোগল-সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রেরিত না হয়;—যেন তৎপূর্ব্বে তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিয়া ভৃত্যগণ বাজ্ বহাদুরের যশোমান অক্ষুণ্ণ রাখে। এ আদেশ পালিত হইল।

বিজয়ী আধম্ খাঁ যখন অনুচরবর্গসহ সংহারস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া বধক্রিয়ায় বাধা প্রদান করিলেন, তখন কার্য্য এক-প্রকার সমাধা হইয়া গিয়াছে; কেবল যাহারা হত হয় নাই, তাহারা সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। আধম্ দেখিলেন, এই হতাহত রমণীগণের মধ্যে ললনাকুল-ললামভূতা এক অনিন্দ্যসুন্দরী রূপজ্যোতিতে সেই ভীষণ শ্মশানভূমি আলোকিত করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় নিপতিত। ইনি রূপমতী; গায়িকা, নর্ত্তকী এবং অনন্য-সাধারণ কবিত্বসম্পন্না বলিয়া সমগ্র ভারতে তৎকালে তাঁহার খ্যাতি ছিল। আধম্ রূপমতীর নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন;—তিনি ত তাঁহারই সন্ধান করিতেছেন! তিনি সেই অতুলনা ললনার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার জীবনরক্ষায় তৎপর হইলেন। মৃত্যুকল্পা রূপমতী আধমের অযাচিত সেবা প্রত্যাখ্যান করিলে, পাপিষ্ঠ প্রতিশ্রুত হইল যে, রূপমতী নীরোগ এবং গমনক্ষম হইলে তাঁহাকে তাঁহার প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিবে। রূপমতী এই আশ্বাসবাক্যে আশান্বিত হইয়া আত্মজীবনরক্ষায় স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু অচিরেই তাঁহার সমস্ত আশাভরসা সমূলে নির্ম্মূল হইল। রূপমতী আরোগ্য লাভ করিয়া প্রতিশ্রুতিপালনের জন্য অনুরোধ করিলে আধম্ উত্তর দিল,—'তুমি আমার বন্দী, আমার ক্রীতদাসী'। প্রতারকের দুরভিসন্ধি তখন সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। রূপমতী বুঝিলেন যে, যে অবশ্যম্ভাবী দুর্গতির আশঙ্কায় তিনি মরণকে বরণ করিতেছিলেন, দুর্ব্বৃত্ত তাহারই নিমিত্ত তাঁহাকে ছলে ভুলাইয়াছে। পাপাত্মার পাপপ্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির জন্য অচিরাৎ তাঁহাকে তাহার অবরোধে যাইতে হইবে। এখন বিষপান ব্যতীত এ বিষময় পরিণাম হইতে নিষ্কৃতি নাই। সঙ্কল্প স্থির হইবামাত্রই কার্য্যে পরিণত হইল। কিয়ৎকাল পরে, নিজ চাতুর্য্যের সাফল্যে হর্ষোৎফুল্লচিত্তে নীচাশয় আধম্ রূপমতীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে তাহা মসিলিপ্ত, তাঁহার রূপলাবণ্যময় দেহ নিস্পন্দ! প্রভু বাজ্ বহাদুরের প্রতি রূপবিক্রেত্রী রূপমতীর প্রগাঢ় প্রণয়ের পরিচয় পাইয়া আধম্ বিস্মিত হইল।

বাজ্ বহাদুরের প্রাসাদ-লুণ্ঠিত ধনরাজি, বহুমূল্য দ্রব্য-সম্ভার ও হতাবশেষ রমণীবৃন্দ আধম্ আত্মসাৎ করিল;—তাহার মনে হইল না যে ইহাদের মধ্যে সুন্দর মূল্যবান্ শ্রেষ্ঠ দ্রব্যগুলি সম্রাটেরই প্রাপ্য। ক্ষমতাগর্ব্বে গর্ব্বিত আধম্ আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ভাবিতে লাগিল,—সে যে সম্রাটের একজন কর্ম্মচারীমাত্র ক্ষণিকের ক্ষমতামোহে তাহা একেবারে বিস্মৃত হইল।

আধমের এই অন্যায় আচরণে সম্রাট্ আকবর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহার শাস্তি-বিধানের জন্য দ্রুতগতি সারংপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন (২৭এ এপ্রেল ১৫৬১ খ্রীঃ)। মাহম্ অনগ সম্রাটের অভিপ্রায় বুঝিয়া পুত্রকে পূর্ব্বাহ্ণে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আকবর মাহম্-প্রেরিত দূতের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সারংপুরের অনতিদূরে আধমের নিকট সহসা উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিলেন; কারণ সে ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার আগমনের কোন সংবাদই পায় নাই। সম্রাটের ক্রোধ-প্রশমনের বহু চেষ্টা করিয়াও আধম্ কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরদিন মাহম্ অনগ তথায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সম্রাট্‌কে উপহার দিতে পুত্রকে পরামর্শ

দিলেন। উপহৃত দ্রব্যাদি পাইয়া ও অন্যান্য রাজকার্য্য-পরিচালনের বন্দোবস্ত করিয়া সম্রাট্ আক্‌বর আগ্রা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন (৪ঠা জুন, ১৫৬১ খ্রীঃ)।

মাহম্ অনগ ও তাঁহার পুত্র আধম্ খাঁর আধিপত্য অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। মাহমের চেষ্টায় কিছুদিনের জন্য খান্-যমান্ আলী কুলী খাঁর অযোগ্য ভ্রাতা, ক্রূরপ্রকৃতি বহাদুর খাঁ প্রধান মন্ত্রীর (উকীল্) পদলাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু আবুল-ফজ্‌ল্ বলেন, মাহম্ অনগই প্রকৃত মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনিই সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন ও তৎসম্বন্ধে আবশ্যক আদেশ প্রচার করিতেন (*A.N.*ii, 151)।

মাহম্ অনগ ও তৎপুত্রের ব্যবহারে উভয়ের নীচ মনের পরিচয় পাইতে পাইতে আক্‌বর ক্রমে উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহাদের কবল হইতে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়া লইলেন; পূর্ব্বোল্লিখিত নিরপরাধা রমণীদ্বয়ের নিষ্ঠুর হত্যাব্যাপারের জন্য তাঁহাদিগের দণ্ড হয় নাই সত্য, কিন্তু সম্রাট্ অচিরাৎ তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সকল দুষ্কার্য্যের মূলোচ্ছেদ করিলেন।

১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আক্‌বরের পালক-পিতা শামস্-উদ্দীন্ মুহম্মদ্ খাঁ আট্‌কা পঞ্জাব হইতে রাজ-দরবারে আগমন করিলে, আক্‌বর তাঁহাকেই অমাত্যপদে বরণ করিয়া, রাজনৈতিক, রাজস্ব ও সমর-বিভাগের সমস্ত ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। (*A.N.* ii, 230) শামস্-উদ্দীন্, বয়রামের ন্যায় কার্য্যকুশল বা শিক্ষিত না হইলেও, ন্যায়পরায়ণ, সরল-প্রকৃতি ও সুদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন; বয়রাম্ খাঁ বিদ্রোহী হইলে তিনিই তাঁহাকে পরাস্ত করেন। 'আক্‌বরনামার' দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত, সম্রাট্‌কে লিখিত, একখানি আবেদনপত্রে শামস্-উদ্দীন্ আপনার কর্ম্মপটুতার কথা নিবেদন করিয়া মাহম্ অনগের চক্রান্তের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই আবেদনের ফলেই তিনি মন্ত্রীত্ব পদ লাভ করিতে সমর্থ হ'ন।

আক্‌বর অতঃপর মালব হইতে আধম্‌কে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ পাঠাইলেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে পীর মুহম্মদ্‌কে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, কার্য্যতঃ প্রচার করিলেন যে, এখন হইতে স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করা তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প।

শামস্-উদ্দীনের এই উচ্চপদ-নিয়োগে রাজদরবারে তাঁহার বহু শত্রুর উদ্ভব হইয়াছিল। সম্রাট্ নবমন্ত্রীর সহায়তায় তাঁহার ধাত্রীর সর্ব্বগ্রাসী কবল হইতে অল্পে অল্পে আপনাকে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, এই কল্পনায় মাহম্ অনগ শামস্-উদ্দীনের ঘোরতর বৈরী হইয়া দাঁড়াইলেন; খান্ খানান্ মুনিম্ খাঁ মাহমের একজন প্রধান সহায়ক; সুতরাং তিনিও, আধম্ খাঁ এবং মহাম্‌পক্ষীয় অন্যান্য লোকের দৃষ্টান্তে শাম্‌স্-উদ্দীনের শত্রুতা সাধনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

শামস্-উদ্দীনের প্রাধান্য অধিক দিন স্থায়িত্বলাভ করিল না। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে যখন তিনি, মুনিম্ খাঁ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারি পরিবৃত হইয়া রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত কক্ষে রাজকার্য্যে ব্যস্ত, সেই সময়ে আধম্ খাঁ অনুচরগণসহ অতর্কিতভাবে তথায় প্রবেশ করিয়া, ইঙ্গিতে তাহার দুইজন অনুগত অনুচর দ্বারা শামস্-উদ্দীন্‌কে হত্যা করে।

সম্রাট্ আক্‌বর তখন অন্তঃপুরে নিদ্রামগ্ন; এই নৃশংস হত্যাব্যাপারের গোলমালে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দুর্ব্বৃত্ত আধম্, শামস্-উদ্দীন্‌কে হত্যা করাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; নৃপহত্যা—চরম অপরাধের সঙ্কল্প করিয়া দুরাত্মা দুরভিসন্ধিবশে রাজকক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু সতর্ক দ্বাররক্ষক খোজা তৎক্ষণাৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। প্রহরীর নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া, আক্‌বর সশস্ত্র নিষ্ক্রান্ত ও আধমের সম্মুখীন হইলেন। সম্মুখে উদ্যতফণ সর্প দেখিয়া লোকে যেরূপ শিহরিয়া উঠে, ভীতচকিত আধমেরও সেইরূপ অবস্থা হইল। সম্রাট্ কর্কশস্বরে আধম্‌কে আট্‌কা খাঁর হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আধম্ দোষক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছিল; অধিকন্তু ঔদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য সম্রাটের হস্তদ্বয় চাপিয়া ধরিয়াছিল। আক্‌বর তাহাকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করিলে দুর্ব্বৃত্ত সম্রাটের তরবারিতে হস্তক্ষেপ করে। ক্রুদ্ধ সম্রাট্ সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। যে বাহুতে হিন্দুস্থানের রাজদণ্ড, শাসন-রশ্মি ন্যস্ত, তাহার একটীমাত্র আঘাতে আধম্ ধরাশায়ী হইল। আক্‌বর অবিলম্বে তাহাকে প্রাসাদ-ছাদ হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করিবার জন্য প্রহরীগণকে আদেশ দিলেন।

মাহম্ অনগ ইতঃপূর্ব্বে অসুস্থ হইয়াছিলেন। প্রিয়পুত্র

আধমের শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনিয়া, তিনি পুনরায় যে শয্যাগ্রহণ করিলেন, তাহা হইতে আর উঠিলেন না; হতভাগ্য তনয়ের মৃত্যুর ৪০ দিন পরে মাতাও তাহার অনুগামিনী হইলেন। হতভাগিনীর সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া, কেবল তাঁহার পূর্ব্ব ব্যবহার ও বিশ্বস্ততার কথা স্মরণ করিয়া, মহামনা আক্‌বর তাঁহার ধাত্রীমাতার পদোচিত সমারোহে সমাধির ব্যবস্থা করিলেন। অদ্যাপি এই সমাধি-ভবন কুতব মীনারের নিকট বিদ্যমান।

এই ঘটনার প্রায় সমসময়ে (১৫৬২ খ্রীঃ) পারোঙ্কের ভীষণ দ্বন্দ্ব সঙ্ঘটিত হয়। বর্ত্তমান এটোয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত, আগ্রার দক্ষিণ-পূর্ব্বে সকীট্ পরগণার ছয়খানি গ্রামের লোকেরা ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতি ভীষণ অত্যাচার করিত। এই অত্যাচার-দমনার্থ আক্‌বর স্বয়ং তথায় গমন করিয়াছিলেন। এই দুরাচার-দমনে সম্রাট্ যে বীরত্ব ও অসনসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বহু গুপ্ত শত্রুর মনে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিল। (*A.N.*, ii, 251-5).

আক্‌বরের বয়ঃক্রম এক্ষণে বিংশতি বৎসর; কিন্তু এখনও তিনি একেশ্বর শাসনকার্য্য-পরিচালনে সমর্থ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; কারণ তাহা হইলে তিনি মুনিম্ খাঁ ও শিহাব্-উদ্দীনের সহায়তালাভে উৎসুক হইতেন না। শাম্‌স্-উদ্দীনের হত্যাব্যাপারে মুনিম্ খাঁ ও শিহাব্-উদ্দীন্ যে একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন, তাহা মনে হয় না; কারণ তাঁহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও শাম্‌স্-উদ্দীনের প্রাণরক্ষার জন্য কোনরূপ চেষ্টাই করেন নাই। বরং আধমের গুরুদণ্ডের পরিচয় পাইয়া, উভয়েই সভয়ে আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করেন; কিন্তু পরে দুইজনেই ধৃত হইয়া বন্দীভাবে রাজধানীতে নীত হ'ন। আক্‌বর উদার হৃদয়ে উভয়েরই অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া মুনিম্ খাঁকে অমাত্যপদে বরণ করিলেন; কিন্তু আক্‌বরের এই উদারতার মূলে কোন গভীর উদ্দেশ্য নিহিত ছিল বলিয়াই মনে হয়।

আবুল-ফজল্ লিখিয়াছেন,—'আধম্ খাঁর হত্যার পর হইতে শাহান্‌শাহ্ সাময়িক যুগভাব (spirit) ও লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করেন।' মাহম্ অনগের শাসনকালে রাজস্ববিভাগের অবস্থা অতীব বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল; রাজকর্ম্মচারীরা সুবিধা পাইলেই সরকারী রাজস্ব আত্মসাৎ করিত, এবং প্রায়ই রাজকোষ শূন্য থাকিত। বায়াজীদ্ বীয়াৎ লিখিয়াছেন (*J.A.S.B.* 1898, p. 311) মাহমের আধিপত্যকালে একবার আক্‌বর ১৮টী মাত্র টাকা চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কোষাধ্যক্ষ তাহা প্রদান করিতে পারেন নাই। এক্ষণে আক্‌বর ফুল মালিক্ নামক একজন খোজাকে 'ইতিমাদ্ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করিয়া রাজস্ব-বিভাগের তত্ত্বাবধানভার অর্পণ করেন; এই ব্যক্তির চেষ্টায় রাজস্বের অবস্থা অনেকটা সুশৃঙ্খলায় আনীত ও রাজস্ব আত্মসাতের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থার সঙ্গে ক্রমে সম্রাটের মনোরাজ্যেও অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল। অবস্থার সঙ্ঘর্ষে আক্‌বর শিখিয়াছেন যে, মানুষের উপর প্রত্যয় স্থাপন করা মূঢ়তা। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, যাহাকেই তিনি প্রত্যয় করিয়াছেন, সেই বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে; এমন কি সুযোগ পাইলে কেহ তাঁহার প্রাণনাশে পশ্চাৎপদ নহে। এই মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা আত্মনির্ভরপরায়ণতায় পরিণত হইল। সম্রাট্ আপনার বিশাল দায়িত্ব উপলব্ধি করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে রাজমুকুট, রাজদণ্ড-ধারণ, কেবল রাজ-অঙ্গের শোভা-সম্পাদনার্থ নহে। দণ্ডধারণ সুশাসনের নিমিত্ত, এবং মুকুটের সঙ্গে রাজ্যের গুরুভার মস্তকে বহন করিতে হয়। সম্রাট্ স্থিরসঙ্কল্প হইলেন যে, সে গুরুভার যতই দুর্ব্বহ হউক, ঈশ্বরকৃপায় তিনি একাই তাহা বহন করিবেন,—কখন অপর কাহারও উপদেশপ্রার্থী বা মুখাপেক্ষী হইবেন না; যতই বিঘ্নবিপদসঙ্কুল হউক, এখন হইতে তাঁহার গন্তব্য পথে একক অগ্রসর হইবেন।

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে আক্‌বর দিল্লীতে শেখ্ নিজাম্-উদ্দীন্ অউলিয়ার সমাধিস্থল দর্শন করিতে গমন করেন। অধুনাবিলুপ্ত মাহম্ অনগের মাদ্রাসার নিকট দিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় উক্ত প্রাসাদের বারান্দা হইতে ফুলাদ্ নামে জনৈক ক্রীতদাস তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী তীর নিক্ষেপ করে। তীর সম্রাটের স্কন্ধদেশ বিদ্ধ করিল। দশদিনের পর আরোগ্যলাভ করিয়া আক্‌বর দিল্লী হইতে আগ্রা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হ'ন। ফুলাদের অপরাধমূলে গুপ্তভাবে অন্য কোন ব্যক্তি আছে কি না, রাজসভাসদ্‌গণ তাহা অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আক্‌বর তাহাতে বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন:—

অপরাধীকে অবিলম্বে হত্যা কর; নতুবা তাহার কথায় আমার মনে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীর উপর সন্দেহ জন্মিতে পারে।' সম্রাট্ আক্‌বর এই সময়ে দিল্লীর অভিজাত-সম্প্রদায়ের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবার চেষ্টায় নিরত। বাটীতে বাটীতে পাত্রীর সন্ধানে ঘটক ও খোজা ফিরিতেছিল। এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে, বদায়ূনী লিখিয়াছেন,—'সমগ্র দিল্লী শহরে এক ভীষণ আতঙ্কের ছায়া পড়িয়াছিল; তাহার কারণ এই যে, আক্‌বরের উদ্দেশ্য কেবল অভিজাত

রাজা মানসিংহ

বাজ্ বহাদুরের প্রাসাদ

ধই-কা-মহল

কুমারীদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না; আব্দুল-ওয়াসী নামক এক ব্যক্তির পত্নীর অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে আপনার অঙ্কলক্ষ্মী করিয়াছিলেন। কিন্তু আততায়ী ফুলাদের শরনিক্ষেপ সম্রাট্‌কে ভবিষ্যতে সতর্ক ও সংযত করিয়াছিল। বদায়ূনী বলেন, ফুলাদ, আক্‌বরের জীবন-নাশের চেষ্টা করিলে, সম্রাট্ তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিরত হ'ন (*Bad.* ii, 60)। আমাদের মনে হয়, পরিবারবর্গের সম্মানের উপর আক্রমণহেতু প্রজাগণের অসন্তোষ ও ক্রোধের মূলেই আক্‌বরকে হত্যা করিবার চেষ্টা নিহিত। উত্তরকালে আক্‌বরও বলিয়াছিলেন:—'অগ্রে ইহা ভালরূপ বুঝিতে পারিলে, আমারই সাম্রাজ্য হইতে গৃহীত কোন স্ত্রীলোককে আমার অন্তঃপুরে স্থান দিতাম না; কারণ প্রজারা সকলেই আমার সন্তান-সন্ততির তুল্য।' (Jarrett. ii, 398)

১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে, জানুয়ারী মাসের শেষভাগে, রাজ্‌পুতানার সাম্বর নামক স্থানে আক্‌বর অম্বর বা জয়পুর-অধিপতি, রাজা বিহারী মলের কন্যাকে * বিবাহ করিয়া

* ইনিই জহাঙ্গীর-জননী 'মরিয়ম্-উজ্-যমানী'। অনেকে ইঁহার নামের সহিত আক্‌বর-জননী 'মরিয়ম্-মকানীর' নাম মিশাইয়া গোল করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, মরিয়ম্ যমানী—পর্ত্তুগীজ খ্রীষ্টান; এই উক্তির কোনই সার্থকতা নাই; কারণ আক্‌বরের বহুসংখ্যক পত্নীর মধ্যে কেহ যে পর্ত্তুগীজ বা খ্রীষ্টান ছিলেন, ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ নাই। মুসলমানেরা কুমারী মেরীকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের নামের সহিত 'মেরী' নাম সংযোজন করিয়া দেন।

রাজপুত-পরিবারের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হ'ন। এই বিবাহের শুভপরিণাম ফলে তিনি রাজা ভগবান্ দাস ও মানসিংহের ন্যায় বীরদ্বয়ের চিরসৌহৃদ্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং রাজত্বের অবশিষ্টকাল পর্য্যন্ত তিনি এই রাজপুত পরিবারের সহায়তালাভে বঞ্চিত হ'ন নাই। যে উদ্দেশ্যে আক্‌বর রাজপুতের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন

আধম্ খাঁর মৃত্যু

এবং যে উদ্দেশ্যে ইতঃপূর্ব্বে (১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি হিন্দু তীর্থে সমাগত যাত্রিগণের নিকট তীর্থ-কর-গ্রহণ প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন - সেই একই উদ্দেশ্য-পরিচালিত হইয়া, ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে, বহু পরিমাণ রাজস্বের ক্ষতি সত্ত্বেও তিনি হিন্দুদিগকে 'জিজিয়া' কর প্রদান হইতে মুক্তিদান করেন। অনতিপূর্ব্বে একমাত্র আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়াকলাপ যাহার জীবনের অনন্যাশ্রয় ছিল, সেই আক্‌বর ২০।২১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, সমধর্ম্মীদিগের মনোভাবের বিরুদ্ধে,—পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট্‌গণের পদ্ধতি উল্লঙ্ঘন করিয়া—'জিজিয়া' ও 'তীর্থযাত্রীর করের' উচ্ছেদ করিয়াছিলেন;—ইহা তাঁহার ন্যায় অপরিণতবয়স্ক সম্রাটের পক্ষে অসাধারণ মানসিক বলের প্রকৃষ্ট পরিচয় সন্দেহ নাই। রাজত্বের প্রথম হইতেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে

আক্‌বর চিতাব্যাঘ্র ধরিতেছেন

ব্যবহার-বৈষম্য দূর করাই আক্‌বরের রাষ্ট্রনৈতিক মূলমন্ত্র ছিল।

দিল্লীর দুর্ঘটনার অনতিকাল পরেই, আক্‌বর পুনরায় একবার বিপদ্‌গ্রস্ত হ'ন। তাঁহার মাতুল খাজা মুয়জ্জম্ একজন উচ্ছৃঙ্খল ও জঘন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন; নানা গুরুতর অপরাধ, এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত দোষে দুষ্ট হইলেও, একমাত্র রাজপরিবারভুক্ত ছিলেন বলিয়া, তিনি কোন দণ্ডের ভয় করিতেন না। মুয়জ্জম্, স্বীয়-পত্নী জহ্‌রার সহিত প্রায়ই

বাদ-বিসম্বাদ, এমন কি তাঁহার উপর নানা অত্যাচার-উৎপীড়ন পর্য্যন্ত করিতেন। জহ্‌রার মাতা বিবি ফতীমা হুমায়ূনের রাজ্যকালে 'উর্দ্দূ বেগী' (হারেমের কর্ত্রী) পদাভিষিক্ত ছিলেন; সম্রাট্ আক্‌বর তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন (১৫৬৪ খ্রীঃ মার্চ্চ) ফতীমা আসিয়া আক্‌বরকে জানাইলেন যে, সম্রাট্ সান্নিধ্য নিরাপদ নহে ভাবিয়া তাঁহার জামাতা জহ্‌রাকে অবিলম্বে নিজ জাগীরে লইয়া গিয়া হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। শীঘ্রই ইহার প্রতিবিধান করিবেন বলিয়া সম্রাট্ ফতীমাকে আশ্বস্ত করিলেন।

প্রতিশ্রুতি-পালনার্থ আক্‌বর কয়েকজন অনুচরসহ শিকারের ছলে যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া খাজা মুয়জ্জমের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; এবং খাজাকে তাঁহার আগমন

মাহম্ অনকগর মাদ্রাসা

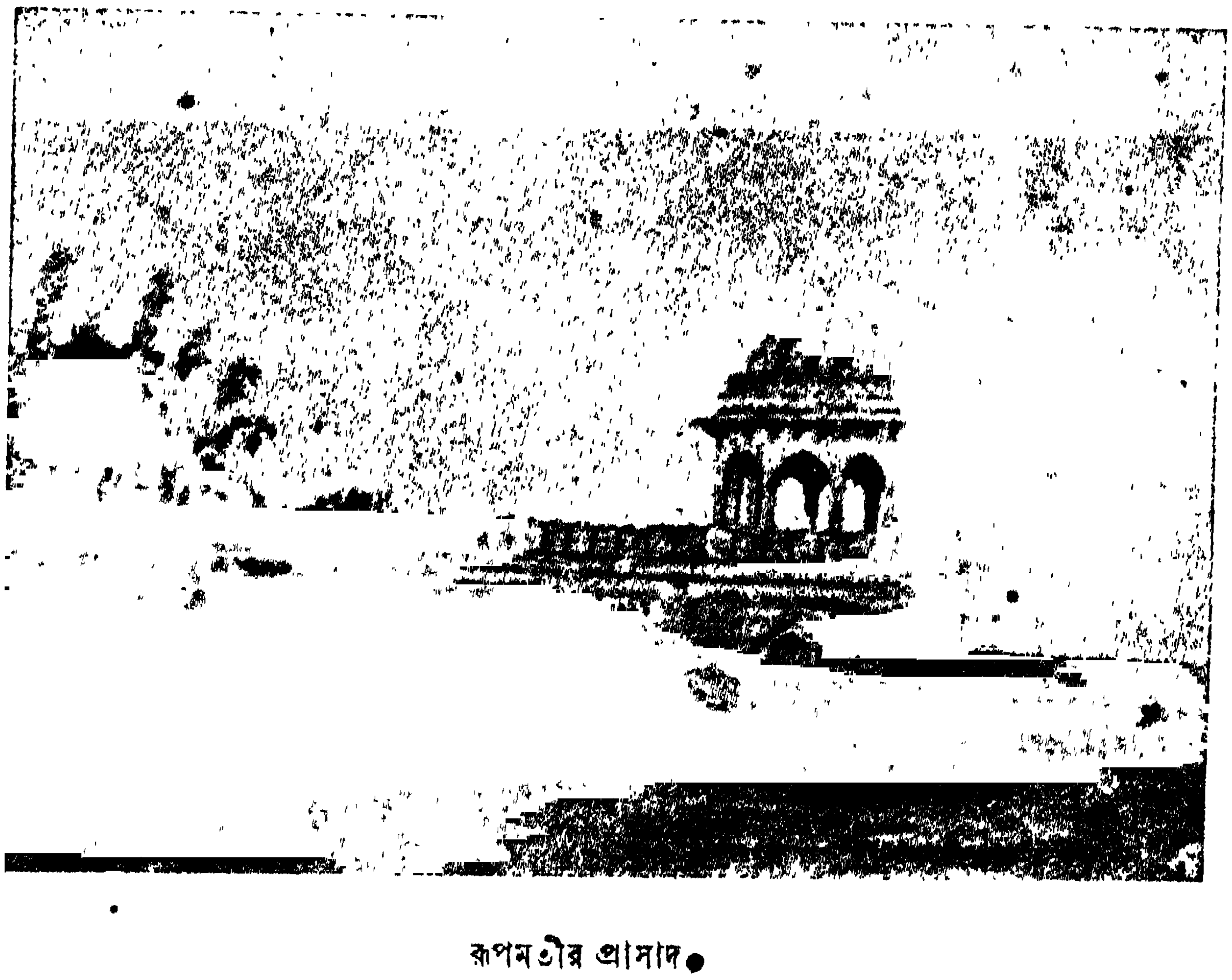

রূপমতীর প্রাসাদ

বার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ দুইজন অগ্রগামী দূত প্রেরণ করিলেন। দূতদ্বয়কে দেখিয়া খাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া জানাইলেন যে,'তিনি সম্রাট্‌কে অভ্যর্থনা করিতে যাইবেন না। ইহা বলিয়াই তিনি অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী জহ্‌রা তখন স্নানান্তে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে মুয়জ্জম্ সহসা আসিয়া স্বহস্তে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদন করেন। পরে পত্নীর ছিন্নমুণ্ড ও রক্তাক্ত ছুরিকা বাতায়নপথ হইতে সজোরে আক্‌বর-প্রেরিত দূতদ্বয়ের সম্মুখে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক খাজা চীৎকার করিয়া বলিলেন; —'আমি জহ্‌রাকে হত্যা করিয়াছি – যাও, তোমার প্রভুকে জানাইতে পার।' দূতমুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আক্‌বর তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। খাজা তখন সম্রাট্‌কে অস্ত্রাঘাত করিবার জন্য তরবারিতে হস্তার্পণ করিলে, আক্‌বর তীব্রস্বরে বলিলেন —'সাবধান! এখনই তোমার মস্তকে এমন আঘাত করিব যে, মুহূর্ত্তমধ্যে তোমার ভবলীলা সাঙ্গ হইবে।' মুয়জ্জম্ এ কথায় নিবৃত্ত হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার একজন গুজরাটী

ভৃত্য আকবরের উপর অস্ত্র-নিক্ষেপের চেষ্টা করিল। আকবরের ইঙ্গিতে মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্ব্বৃত্তের মস্তক ভূলুণ্ঠিত হইল। অতঃপর মুয়জ্জম্ ধৃত ও প্রহারে জর্জ্জরিত হইলে আকবর তাঁহাকে যমুনায় নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করেন; কিন্তু খাজা নিমজ্জিত হ'ন নাই। অবশেষে তিনি গোয়ালিয়রের রাজ-কারাগারে প্রেরিত হ'ন। তথায় অল্পদিন পরেই, মস্তিষ্কবিকৃত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, মুয়জ্জম্ ভীষণ দুর্ব্বৃত্ত হইলেও একজন কবি ছিলেন; বদায়ূনী তাঁহার পুস্তকে কবিদের তালিকায় তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

মুয়জ্জমের প্রতি কঠোর শাস্তিবিধান করিয়া আকবর সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া দিলেন যে, দুরাচারের দণ্ডবিধান করিতে তাঁহার কাছে আত্মপর বিচার নাই—অপরাধীর সমুচিত শাস্তিবিধানের জন্য তিনি বজ্রকঠিন করে শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাস্কর শ্রীকারমোকার নির্ম্মিত

প্রস্তর-মূর্ত্তি

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই

রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু

ব্যায়াম-বীর মহেন্দ্রনাথ

চিত্রে প্রদর্শিত ১৫, মণ ওজনের রোলার ইঁহার বুকের উপর দিয়া অনায়াসে চালাইয়া লওয়া হইয়াছিল

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম্-বি]

কালোয়াৎ

কণ্ঠে আমার নেমেছে ভারতী,
নেমেছে মরাল সারথি তাঁর ;
হাঁসের পালক লেগেছে গলায়
খাঁখারিয়া মরি বারংবার।
সরস-রসনা-ফরাস-আসনে
নাচিয়া ফিরিছে সপ্ত স্বর,
ব্যায়ত বদন, রাগিনী সদন
রদনতোরণ প্রমোদপুর।
আলো ঠিকারিছে তালু tonsilএ
আল্‌জিব গান-তুফানে দুলে ;
জোঁকের মতন কাল-কাল শিরা
গলায়, কপালে উঠিছে ফুলে।
Ellipse, বৃত্ত, ত্রিকোণক্ষেত্র,
আরও কত Geometrical
তড়িৎ গতিতে করিছে সৃষ্টি—
ওষ্ঠ-অধর-অন্তরাল।
ছন্দে ছন্দে নাচিছে অঙ্গ,
হেলিছে, দুলিছে মুণ্ড জোরে,
মুখ-পঙ্কজ খসে বা ছিঁড়িয়া
কণ্ঠ মৃণাল দণ্ড ডোরে!
হাতের নাড়ায় কাঁধের গোড়ায়
নামিয়া আসিছে জামার হাতা,
আছি গদ্‌গদ, অৰ্দ্ধমুদিত
আঁখি দুটী যেন তেঁতুল-পাতা।

কালোয়াত

সাধনা ও সিদ্ধি

বিধিলিপি

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হেন্দ্র জমীদার কামাখ্যানাথের ষ্টেটে বেতনভোগী কর্ম্মচারীর পদ স্বেচ্ছায় লইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত কোথায় কি কার্য্য করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে র নাই; কেবল নায়েবের সহকারীর পদ লইয়া জমীদারের প্রত্যেক তালুক দেখিয়া বেড়াইতেছিল। দেওয়ান ন, ইহাতে তাহার অভিজ্ঞতা এত বাড়িয়াছে যে, সে রে তাঁহার সহকারীরূপে থাকিলেই সব দিকে ভাল হয়। প মেধাবী এবং সুদক্ষ সহকারী পাইলে, ষ্টেটের কাযও ন আরও ভালরূপে চালাইবার আশা করেন; এবং ইহাতে হেন্দ্রেরও পদটি যথোচিত উচ্চ স্থানে থাকে। কামাখ্যানাথ র ইহাতে আপত্তির কিছুই ছিল না। মহেন্দ্রকে অর্থকরী কার দিকে মন দিতে দেখিয়া, সে বিষয়েও যাহাতে তাহার তি হয়, সেজন্য তিনি একান্ত ইচ্ছুক। কিন্তু মহেন্দ্র সদরে কতে একেবারেই রাজী নয়। পদের দিকে বা অর্থের ক তাহার যে বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল, তাহা তত বুঝা ত না; কেবল কর্ম্মের দিকেই তাহার একান্ত আগ্রহ দৃষ্ট ত। তাই সে সহকারী দেওয়ান অথবা যে কোন স্থানেরই য়েব গোমস্তা প্রভৃতির পদের জন্য কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না খয়া কেবল যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া মাত্র খাটিয়াই রত। অবশ্য ইহাতে জমীদারের বিষয়-কার্য্যের অত্যন্ত বিধা হইত বলিয়া দেওয়ানের সন্তোষের সীমা ছিল না; ন কি তাঁহার অবর্ত্তমানে এই অপূর্ব্ব প্রতিভাবান্ যুবকই এ ষ্টেটের ম্যানেজারের উপযুক্ত হইয়া রহিল,—তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীও সর্ব্বদা সর্ব্বসমক্ষে তিনি বিঘোষিত করিতে া করিতেন না; কিন্তু মহেন্দ্রের এইরূপে অস্থায়ীভাবে ত্যক স্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়ানতে তালুকের স্থানীয় র্চারিগণের অসন্তোষ ও বিরক্তির সীমা ছিল না। ইনি জমীদারের একজন চিহ্নিত শক্তিশালী লোক, তাহা লেই বুঝিত; এবং কার্য্যের অনুপযুক্ততার দোষে ইঁহার া কাহার কখন অন্ন মারা যায়, এই ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত থাকিত। প্রজাপীড়ন অথবা অন্য কোন অপরাধ পাছে জমীদারীর এই পরিদর্শকের চক্ষে পড়ে, কোন-কোন অপরাধীকে সে ভয়েও ব্যস্ত হইতে হইত; কেন না জমীদার যে অত্যন্ত প্রজাবৎসল, তাহা তাহাদের তো অজ্ঞাত ছিল না। বাহ্যতঃ তাহারা মহেন্দ্রকে যথেষ্ট সম্ভ্রমের সহিত সম্মান দেখাইত, কিন্তু তাহাদের ভাব মহেন্দ্রের প্রতি অনুকূল থাকিত না। মহেন্দ্রের কিন্তু সে বিষয়ে কোন লক্ষ্য ছিল না। সে আপনার মনে কেবল কর্ম্ম হইতে কর্ম্মে ঝাঁপাইয়া পড়িত। যেখানে কায বেশী দেখিত, সেখানে কিছুদিন থাকিয়া যাইত; যেখানে তাহা পাইত না, সেখান হইতে পলাইতেও তাহার বিলম্ব হইত না। প্রায় ছয়মাস ধরিয়া সে এইভাবে দিন কাটাইতেছিল; সহসা আজ দুই-তিন দিন হইল নিরঞ্জন তাহার নিকটে আসিয়া বড়ই গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিয়াছে। মহেন্দ্রকে তাহার এই জীবন হইতে টানিয়া উদ্ধার করিয়া লইয়া যাওয়াই যে নিরঞ্জনের মহেন্দ্রের নিকটে হঠাৎ এইরূপে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা মহেন্দ্রও বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই সে নিজের ভবিষ্যতের উন্নতি, অর্থ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির সম্ভাবনার কথা নিরঞ্জনকে বুঝাইতেছিল। নিরঞ্জন কিন্তু তাহা কিছুতেই মানিয়া লইতেছিল না। সে বলিতেছিল, "লেখাপড়া করলে কি সে উন্নতি আপনার হ'তে পার্‌ত না? আপনি এদিকে কেন এলেন? এ ছাড়া উপার্জ্জনের কি অন্য পথ ছিল না?" মহেন্দ্র ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "এ পথই বা মন্দ কি নিরঞ্জন? কায আর উপার্জ্জন নিয়ে ত কথা? তা যখন এতেও আছে, বিশেষ ভবিষ্যতে যাতে এতটা উন্নতির সম্ভাবনা, তখন এর চেয়ে আর কোন্ পথ ভাল হ'তে পারে?" নিরঞ্জন যেন একটু অধীরতার সহিত বলিল, "আপনি উপার্জ্জনের কথা রেখে দেন তো মহেন্দ্র বাবু। সংসারের আপনার এমন কোন ভার নেই, যার জন্য এখনি প্রচুর উপার্জ্জনের বিশেষ দরকার। আর অর্থের জন্যই যে আপনার প্রাণ-মন পড়ে আছে; সে বোধ হয় কেউই

বিশ্বাস করবে না। উন্নতির কথা যা বল্‌ছেন—তা আপনি যে দিকে যেতেন, সেইদিকেই হয় ত এমনি সুবিধা করে নিতে পার্‌তেন। এখন এ পথ ভাল কি মন্দ, সেই নিয়ে বিচার। আপনিই বলুন দেখি, জ্ঞানার্জ্জনের বিশুদ্ধ আনন্দ থেকে এই তহশীল আর চালান, বাকী-বকেয়ার জের আর আদায়, লাটকিস্তি আর সদরকিস্তি দাখিল করা, প্রজা-ঠেঙানো আর খাতাপত্রের হিসাব, এই সব দেখে-শুনে এবং হাতে-কলম করে' কি এমন আনন্দটা লাভ করছেন?" মহেন্দ্র তেমনি অনুত্তেজিত স্বরে বলিল, "আনন্দ, নিরঞ্জন? কাজের সঙ্গে আনন্দের কি সম্বন্ধ? কায হচ্ছে জীবনের সব ভোলাবার পথ, এতে আনন্দকে কেন খুঁজ্‌ছ?" "আপনি বলেন কি মহেন্দ্র বাবু! কাযে আনন্দ আছে বলেই, কায জগতে এখনো টিকে আছে। আনন্দের সঙ্গে কাযের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ।" "আমার তো তা মনে হয় না। কাযের উদ্দেশ্যেই কাজ করা। হ'তে পারে, কারও অদৃষ্ট-ক্রমে তার ভেতরেই তার আনন্দের সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ হয়; কিন্তু কাযের সঙ্গে তার নির্দ্দিষ্ট কোন সম্বন্ধ নেই। কায হচ্ছে সংসারের পথ। এই পথ দিয়েই মানুষকে তার জীবন গাড়ীখানা চালিয়ে নিয়ে চল্‌তে হবে। এতে দুঃখ বা আনন্দ লাভ সে সবই মানুষের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে, কাযের ওপর নয়।" "না—না, মহেন্দ্র বাবু, আজ আপনি ভুল কর্‌ছেন। মানুষের কাযের ওপর তার শুধু সমস্ত জীবনযাত্রাটা নয়, তার ইহ ও পরকাল সবই নির্ভর করে। আমাদের দেশের মনস্বীরা মানুষের এই কাযের জের্ জন্ম-জন্মান্তর পর্য্যন্ত যে টেনে দিয়েছেন। 'নমস্তৎ কর্ম্মেভ্যোঃ' কথাটা কি ভুলে গেলেন?" "ভুলিনি, কিন্তু বল দেখি নিরঞ্জন, যে জন্ম-জন্মান্তরের জের্ আমি এ জন্মের শত চেষ্টায়ও মিটাতে পার্‌ব না, যিনি অব্যক্ত কারণ বা 'অদৃষ্ট' নাম নিয়ে আমার জীবনের সমস্তটাই গ্রাস করে থাক্‌বেন, তাঁরই আদি-অন্তহীন কর্ম্মজালের কাছে আমার এই ব্যক্ত জীবনটা লুটিয়ে দিয়ে,—সে আমায় যা দিচ্ছে, তাই যে মাত্র এ জগতে আমার প্রাপ্য—এ ছাড়া আমার চাইবার, বলবার বা ভাববার আরও কিছু যে জগতে থাক্‌তে পারে না, এই কথা ভেবে সেই অদৃষ্ট বা অব্যক্ত শক্তির ওপর পরম ভক্তিশ্রদ্ধা নিয়ে যোড়-হাত করে বসে থাক্‌ব—তার সম্বন্ধে এতখানি বিশ্বাস বা আস্থা আমি যে রাখিনে নিরঞ্জন।"

"কিন্তু দেখুন মহেন্দ্রবাবু, মানুষের চাওয়ার কি কোন অন্ত আছে? এই যে অভাব-বোধ, এ মানুষের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে জাগ্‌তে আরম্ভ করে, আবার মানুষ ম'লে তবে তার নিবৃত্তি হয়। তবেই দেখুন, জীবনে যার হাত হ'তে নিস্তার নেই, তাকে জীবনে যতটা কম করে ব্যবহার করা যায় ততটাই ভাল। অভাবের বোধটা ঠিক রবারের থলির মত। মানুষের মনের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে তার ভেতরে কুক্‌ড়ে-সুঁক্‌ড়ে একটা জায়গায় ছোট্ট একটু বীজের আকারে বসে আছে; তাতে ইচ্ছার বাতাস যতই দেবেন, ততই সেই থলির ভেতরটা ফুল্‌তে থাকবে, আর বড় হবে। ক্রমে ক্রমে তার অজগর জঠরের মধ্যে মানুষের মনের অন্য সব বৃত্তিগুলোই যে লোপ পেয়ে বসে, জানেন ত? তাই মানুষের এই অভাব-জ্ঞানকে যে যত ছোট করতে পারে, ততই তার মঙ্গল।" "মানি নিরঞ্জন; কিন্তু এমন একটা কোন বোধ, যা মানুষের জীবনে জেগে তার ভেতরের অন্য সব জিনিসকেই একেবারে নগণ্য করে ফেলে থাকে, যে বোধের ওপরে মানুষের আর কোন হাতই নেই, তারও ওপর কি কোন জোর চলে? তা' সে বোধটার তুমি বৃত্তি, স্বভাব, প্রকৃতি—যে নামই দাও।" "সহজে চলে না; কিন্তু তবু চালাতে হবে। একান্ত চেষ্টাবান মানুষকে ভগবান এমন একটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র শক্তি দিয়াছেন, যার বলে সে এই অদম্যকেও দমন করতে পারে।" মহেন্দ্র উচ্চ হাস্যের সঙ্গে বলিল, "থামো নিরঞ্জন, থামো, তর্কে-তর্কে আমরা যে এইবার পাগল হবার উপক্রম করলাম। যার ওপরে চেষ্টার জোর খাটে, তাকে তো অদম্য বলা যায় না। প্রাণবায়ুর মতই মানুষের ওপরে যে কায চালায়, তারই নাম কেবল অদম্য। দোহাই তোমার, তুমি আবারও যে কিছু বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছ! আর আমি শুন্‌ব না, দৌড় দেব তা'হলে। তার চেয়ে বরং চল একটু বেড়িয়ে আসি।" নিরঞ্জন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া নীরব হইলেও, মহেন্দ্র যে তাহাদের প্রথম পরিচয়ের পর উভয়ের মধ্যে যে বন্ধুত্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল,—সেই স্থানটাকেই স্পর্শ করিয়া এখন কথা কহিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া সে যেন খানিকটা আনন্দিতও হইল। মহেন্দ্র তাহার অপেক্ষা বয়সে একটু বড় হইলেও, তাহার সহিত অল্পকালের সেই পরিচয়, এবং ততোধিক অল্পদিনস্থায়ী বন্ধুত্বের আকর্ষণ নিরঞ্জনের মনে এখনো জাগিয়া ছিল। তাই আজিকার এই কথোপ-

থনের মধ্যে সেই বিস্মৃত সম্বন্ধটুকু মহেন্দ্রের স্মরণে আসি-ছে বুঝিয়া, সে একটু খুসী না হইয়াও থাকিতে পারিল । মহেন্দ্র তাহার অপেক্ষা বয়সে তিন-চারি বৎসরের ড়, এবং উভয়ের শিক্ষাও এক ভাবের নয়; আধুনিক ত শিক্ষায় মহেন্দ্র তাহার নিম্নে দাঁড়াইয়া আছে বটে, থাপি এই সুদর্শনকান্তি স্বল্পভাষী যুবকের চরিত্রে সে মন কিছু হয় ত পাইয়াছিল, যাহা নিরঞ্জন অন্য কোথাও য় নাই।

উভয়ে বেড়াইতে-বেড়াইতে গ্রামের পথ অতিবাহিত রিয়া চলিল। প্রভাত-অরুণালোকে শারদশ্রী তখন মের পথে-ঘাটে, বনে-মাঠে ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল। রঞ্জনের মুগ্ধ চক্ষু জলে, স্থলে, আকাশে কেবলই ঘুরিয়া রিতেছিল; কিন্তু মহেন্দ্রের পানে যখন তাহার সে দৃষ্টি ড়িতেছিল, তখনই সে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিতে ল না। মহেন্দ্রের দৃষ্টি কেমন একরকম ভাবে গন্তব্য থের উপরই নিবদ্ধ,—যেন সে দৃষ্টি কেবল চলিবার থটুকুই দেখিয়া লইতে চায়; জগতের আর কিছুরই হিত তার যেন কোন সম্বন্ধ নাই, বা কোন দিকে াকর্ষণের কোন বস্তু নাই। নিরঞ্জন প্রফুল্ল ভাবে নানা থা কহিতে-কহিতে চলিয়াছে; সেই শরৎ-প্রফুল্ল প্রভাত-বন তাহার মনের গায়ে লাগিয়া তাহাকে মাঝে-মাঝে কটা সুর বা একটা সঙ্গীতের মধ্যে টানিয়া লইয়া ইতেছিল; কেবল মহেন্দ্রের নিস্তরঙ্গ, নির্ঝুম অন্তর-াহই নিরঞ্জনকে একটা গূঢ় আঘাত দিয়া প্রবুদ্ধ রিতেছিল। নিরঞ্জনের অসংখ্য কথায় মহেন্দ্র কেবল ঁ, হাঁ, না, এই রকম ভাবেই প্রায় উত্তর দিয়া সারিতেছে। ই বন্ধুত্বের পুনর্জাগরণের আশায় নিরঞ্জন ক্ষণকাল র্ব্বে যেটুকু আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল,—ক্রমে বুঝিল াহার আর কোন সম্ভাবনাই নাই। কিছুকাল হইতে হেন্দ্র তাহার সহিত প্রভু-ভৃত্যের যে গণ্ডি মাঝে াখিয়া চলিতেছিল, আজিকার এই শরৎ-প্রভাতে যদিও স গণ্ডিটা কিছু অস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু ব্যবধান মানই থাকিল। নিরঞ্জনের অন্তর ধীরে-ধীরে প্রকৃতির াকর্ষণ হইতে ফিরিয়া মানবের আভ্যন্তরিক রহস্যজালের ধ্যে নিমগ্ন হইতে লাগিল। তাহার প্রফুল্ল মুখ ধীরে-ীরে বিষণ্ণ হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাহাও ক্ষণিক! প্রকৃতির সঙ্গে যাহাদের প্রকৃত প্রাণের সম্বন্ধ, তাহারা অন্তরের সহস্র বিপ্লবেও সে সম্বন্ধ ছিঁড়িতে পারে না। গ্রামের একদিকে যেখানে বিস্তৃত পদ্মদহ বিল নদীর মত বিশাল হৃদয় মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার তীরে পৌছিয়াই নিরঞ্জন সানন্দে প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল, "দেখুন, দেখুন, মহেন্দ্রবাবু, ঋতু-সংহারের শরদ্বর্ণনের শ্লোকগুলো একেবারে মিলে যাচ্ছে। 'স্বচ্ছ প্রফুল্ল কমলোৎপল ভূষিতানি। মন্দপ্রভাত পবনোদ্গত বীচিমালা' বিলটা কি সুন্দর! শুধু যে আপনার "ভিন্নাঞ্জনকান্তি মনোজ্ঞ নভঃ"ই—

—ক্বচিদ্রজত শঙ্খ মৃণাল গৌরৈঃ
স্ত্যক্তাম্বুভির্লঘুতয়া শতশঃ প্রয়াতৈঃ।
সংলক্ষ্যতে পবন বেগ চলৈঃ পয়োদৈ
রাজেব চামরবরৈ রুপ বীজ্যমানঃ।"

কেবল তা নয়; এই বিলটিকেও একটি রাণী বলা যায়। এঁরও কাশের চামর, হাঁসের বৈতালিক—কিছুরই তো অভাব নেই। আবার চারিদিকে "অপক্ক শালিধান্যের মখমলের আসন"ও বিছানা রয়েছে। নাঃ, মহেন্দ্রবাবু, আপনি একেবারে শরৎলক্ষ্মীর পায়ের তলায়ই যে আস্তানা গেড়েছেন, তা স্বীকার করতেই হবে। এই লোভেই বুঝি সহরে যেতে আপনার রুচি হ'ল না—না?" মহেন্দ্র নিঃশব্দে একটু হাসিল মাত্র; তার পরে তাহার সেই উদাসদৃষ্টি সেই বিলের পানে মেলিয়া দিল বটে, কিন্তু কি সেই প্রভাত স্বচ্ছ জলের সুনীল কান্তি, কিম্বা সেই পদ্মদহের অগণ্য প্রস্ফুট পদ্মের আরক্ত আভা—কিছুই যেন সে দৃষ্টিকে রঞ্জিত করিতে পারিল না। নিরঞ্জন তাহার পানে ক্ষণিক স্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "যে পথে আপনি গিয়েছেন, তাতে বোধ হয় এ সব একেবারে ভুলেই বসে আছেন। প্রথম যখন আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তখন আপনি যেন আর এক রকমেরই ছিলেন মহেন্দ্র বাবু। সংস্কৃতের এমন কোন ভাল কাব্য ছিল না, যার কিছু-না-কিছু শ্লোক আপনার কণ্ঠস্থ ছিল না। এখনো কিছু কিছু তার মনে আছে ত?" "না নিরঞ্জন। সে সব ভুলবার জন্যেই তো কায করতে চাই।"

"কিন্তু এ কাযে, সুখ বা আনন্দ আছে কিছু, বলতে

পারেন? এর চেয়ে যদি আপনি ইস্কুলের পণ্ডিতিও নিতেন, তাতেও নিশ্চয় অনেকটা সুখ থাকৃত।"

"আবার সেই সুখ আর আনন্দের কথা? সুখ যে না চায়, তার এইই ঠিক্ পথ।" "সুখান্বেষণ জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম যখন, তখন আপনিও নিশ্চয়ই তা চান। হয় ত তা পাননি বলেই সেই ক্ষোভে জগতের বাকী আর সমস্তের ওপরই খড়্গ-হস্ত হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু তবু একবার ভেবে দেখা উচিত যে—" "থামো, থামো—আর না। তুমি নিজেই স্বীকার করলে তো, যে, সুখ-লাভের ইচ্ছাই মানুষের ধর্ম্ম। যা মানুষকে ধারণই করে আছে, আমায় তার ওপরেও আবার কি ভেবে দেখ্‌তে বল্‌ছ? ভাব্‌বার আর কিছু নেই ওর ওপরে। মানুষ নীতি-শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যতই বচন আওড়াক, কিন্তু সকলের ওপর জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্মই বড়, এটা মনে রেখো।" নিরঞ্জন ধীরে-ধীরে উত্তর দিল, "মানুষ এই স্বভাবকেও দমন করে স্ববশে আন্‌তে পারে। এইখানেই অন্য জীবে আর মানুষে প্রভেদ।" "কার বশে? একে স্ববশে বলা ভুল। স্ব অর্থাৎ তার আত্মন্ যা চাচ্চে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, অর্থাৎ কেবল মানুষেরই তৈরী কতকগুলা বচনের বশে? আমি মানুষের এত বশ্য নই নিরঞ্জন। বশ যদি হই,—সে কেবল তারই হ'তে চাই, যে আমার সব জানে, সব বোঝে! নীতিশাস্ত্রের বাঁধা-বুলির কোনই দাম নেই,—যতক্ষণ সে মানুষের অন্তরকে না স্বীকার করে। কিন্তু তুমি এত ক্ষুণ্ণ হচ্চ কেন নিরঞ্জন। আমি তো ভালই আছি। আমি যে-রকম আজন্ম পরাশ্রয়ে পালিত, ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তিশূন্য, আত্মীয়-স্বজনহীন মানুষ, তাতে আমার কি চিরদিন সুখের জীবন নিয়ে থাকলে চল্‌ত? কাযের মধ্যে না গেলে উন্নতি হবে কেন? বিদ্যাচর্চ্চা নিয়ে সুখে থাক্‌তাম—তাইই যদি তোমার বিশ্বাস হয়, কিন্তু তাতে অর্থের কতদূরই-বা সাহায্য করত? জগতে অর্থ সঞ্চিত না থাকলে মানুষের জীবনই যে মিথ্যা। কাব্যের মোহ মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে বড় অকর্ম্মণ্য করে, বড় শক্তিহীন করে ফেলে। এককালে কাব্যগত, ভাবগত জীবন ছিল বলে' চিরদিনই কি তাই রাখলে চলে ভাই? এ কথা যাক্—এখন আরও এক দোষ ভেবে দেখ দেখি! তুমি হলে কি না আমার প্রভুর ছেলে, অথচ এই ভাবুকতার দোষে এমন করে আমার সঙ্গে কথা কইবে যে, আমাকে তাও ভুলিয়ে দেবে।" নিরঞ্জন ব্যথিত, ক্ষুব্ধ স্বরে "মহেন্দ্রবাবু" এইটুকুমাত্র বলিয়াই নিস্তব্ধ হইলে, মহেন্দ্র স্নেহ-কোমল ভাবে তাহার হাত ধরিল। ঈষৎ ব্যথিত স্বরে বলিল, "ক্ষমা করো ভাই, যদিও তুমি আমার চেয়ে ছোট, তবু তোমার স্নেহের বলেই আমি তোমায় বন্ধুজ্ঞানে মাত্র ঠাট্টা করেছি; আর সেই স্নেহেই বাধ্য হয়ে, যা জগতে আর কারুকেই দিতে পারব না, তাও দিচ্চি। বলছি তোমায়—শোন; আমার জীবনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের তুলনা হয় না। এ দীনতার কথা কারুকে যে বলার নয়। আমার বল্‌তে আমি জগতে কিছুই আজ পর্য্যন্ত পাইনি। যেখানে তা ভেবেছি, পরে দেখেছি তা ভুল। জগতে যখন কায ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়, তখন সেই কাযই আমি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করেছি। এর জন্য তুমি আর মিছে ক্ষুণ্ণ হয়ো না।"

নিরঞ্জন বুঝিল, সাংসারিক কোন আঘাতেই মহেন্দ্রের জীবন এরূপ রূঢ় পথে চলিয়াছে। যে কোন পথ দিয়াই হোক, সে নিজে শীঘ্র একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইতে চায়। যদিও তাহার কার্য্যে এরূপ কিছুই বুঝা যায় না, কিন্তু তাহার অদ্যকার শেষ কথাবার্ত্তায় বিংশবর্ষীর সরল-অন্তঃকরণ যুবক নিরঞ্জন এইরূপই বুঝিল। বুঝিল যে, পরাশ্রয়, পরদয়াপ্রত্যাশী অপবাদ ভালরূপেই ঘুচাইবার জন্য মহেন্দ্র এরূপ জীবন বরণ করিয়া লইয়াছে। তাহার মত অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক। সে এবার মনে করিয়াছিল যে, বন্ধু-স্নেহের দোহাই দিয়া যে প্রকারেই হোক্, মহেন্দ্রকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া যাইবে; কিন্তু এখন আর তাহা উচিত বলিয়া মনে করিল না।

বিলের অগাধ, সুনীল জলরাশির পানে চাহিয়া নিরঞ্জন বলিল, "বর্ষাকালে এখানে পাথার,—বেড়াতে খুব সুবিধা দেখ্‌ছি। মাছধরা নৌকগুলার একখানাকে ডেকে নিয়ে, খানিকটা জলে-জলে ঘুরে আসা যাক্, চলুন।"

মহেন্দ্র চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "মাছধরার নৌকায় যাবে? না; তার চেয়ে অন্য কোন সুবিধা হয় কি না দেখি।"

উভয়ে এদিকে-ওদিকে চাহিতে-চাহিতে দেখিল, নিকটেই একখানা সুশ্রী, সুন্দর, ক্ষুদ্র বোট বাঁধা রহিয়াছে। মহেন্দ্র বলিল, "ঐখানা পেলে ভাল হয়।" নিরঞ্জন বাধা

দিল, "না—না, বোট্ কি হবে? জেলেডিঙ্গিতেই যাওয়া যাক্।" মহেন্দ্র সে-কথা না শুনিয়া বোটের অভিমুখে চলিল; অগত্যা নিরঞ্জনও তাহার অনুসরণ করিল। নিকটে গিয়া মহেন্দ্র মাঝিকে ডাকিল, "ওহে বাপু মাঝি! ও মাঝি!" মাঝি নৌকার গুলুইয়ের উপর বসিয়া থর্সান টিপিতেছিল,—তাহাদের ডাকাডাকিতে প্রথমে কিছুক্ষণ কাণই দিল না। শেষে ডাকের বৃদ্ধি দেখিয়া বিশেষ বিরক্ত হইল। "ওহে, ভাড়ায় যাবে?" উত্তরে মাঝি পেচকের মত গম্ভীর চালে বলিল, "না।" "কেন হে বাপু, সকালে বসে তো তামাকই টিপ্‌ছ;—তার চেয়ে একটু কাজই কর না কেন।" মাঝি উত্তর দিল না। মহেন্দ্র আশান্বিত হইয়া বলিল, "বেশীক্ষণের কাজ নয়, আমরা বিলটার খানিকটা বেড়াবো মাত্র। বখ্‌শিষের জন্য ভেব না।—কেমন রে যাবি?" মাঝি সমধিক 'গেরেম্ভারী' চালে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থর্সানই টিপিতে লাগিল। নিরঞ্জন মহেন্দ্রের হতভম্ব মুখখানার পানে চাহিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল, "বোটের সখ্ মিট্‌ল তো আপনার? আসুন, এই যে মাছের ডিঙ্গিখানা ছাড়্‌ছে—এরাই যদি দয়া করে,—একটু তারই চেষ্টা দেখা যাক্।" ক্রুদ্ধ মহেন্দ্র মাঝিটাকে একটু সম্‌ঝাইয়া দিবার জন্য ইচ্ছুক হইতেছিল; কিন্তু নিরঞ্জনের বাধায় তাহা আর ঘটিল না। নিকটে একখানা জেলে-ডিঙ্গির দুইজন মাঝি তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া আপনা হইতেই বলিল, "বাবু, ওখানা কোন্ জমীদারের বোট্। ওরা কি ভাড়ায় যায়? গুমরে কথাই কচ্চে না দেখ্‌ছেন না।" "জমীদারের বোট্? এই গাঁয়ের জমীদারের, না আর কারও?" "এজ্ঞে এ গাঁয়ের নয়। অন্য কোন্ জমীদার বাবুদের বোট্! বেটা তাই বল্‌লে শুন্‌লাম।" নিরঞ্জন বলিল, "তা যা হোক্, এখন তোমরা বাপু আমাদের একটু জায়গা দিতে পার কি?" বক্তা মাঝি কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "এজ্ঞে, তা পারি বই কি—কিন্তু ছোট ডিঙ্গি,—চার জনের ভার তো সবে না মশায়।"

মহেন্দ্র বলিল—"তিন জনের তো সবে? তা'হলে এঁকেই নিয়ে যাও। খানিকটা নিয়েই কিন্তু ফিরো নিরঞ্জন, বেশী দূর যেও না। আমি তোমার অপেক্ষায় রইলাম।" নিরঞ্জন মাঝিদের অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়া অপ্রস্তুত ভাবে তাড়াতাড়ি বলিল, "তাও কি হয় মহেন্দ্র বাবু! এ বেচারাদের যে তাতে কাযের ক্ষতি হবে।" "কি ছেলে-মানুষি কর্‌ছ। ওরা না হয় মাছ আজ নাই ধরিল, ওদের সে ক্ষতি সুদে-আসলে পুষিয়ে দেওয়া যাবে। তুমি এখন একটু বেড়িয়ে সাধটা মিটিয়ে নাও তো।" "আপনি যাবেন না—আমার আর যেতে বড় ইচ্ছে নেই। থাক্‌গে, আর যাব না।" মাঝিরা তখন বুঝিতেছিল যে, ইঁহারা, অথবা ইনি একজন কেউ-কেটা নহেন। তখন তাহারা নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদের ব্যগ্রতা দেখিয়া মহেন্দ্র বলিল, "বেচারাদের এতক্ষণ কামাই করিয়ে না যাওয়াটা ভাল হয় না, নিরঞ্জন।" "বাঃ, তা কেন করাবেন। ওদের ক্ষতিটা পুষিয়ে দিতে হবে বই কি।" মাঝিরা কিন্তু তাহাতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না; বলিল, "আজ্ঞে, সেও কি একটা কথা! বেড়াতে যেতেন যদি, খুসী করে বখ্‌শিষ নিতাম। দুটো কথা কয়ে তা কি নিতে পারি? আমরা ছোটলোক হ'লেও আক্কেল আছে তো।" তাহারা ফিরিয়া যায় দেখিয়া মহেন্দ্র ব্যস্ত ভাবে নিরঞ্জনকে বলিল, "যাও না একটু বেড়িয়ে এস; বেশী দূর যেও না, তা'হলেই হবে। বেচারারা ফিরে যায় যে।" নিরঞ্জনও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল; সেজন্য মহেন্দ্রকে আর বেশী কিছু বলিতে হইল না,—নিরঞ্জন ডিঙ্গিতে গিয়া চড়িয়া বসিল। মহেন্দ্র বলিল, "সাবধানে যেও বাপু তোমরা।" "এজ্ঞে, কোন ভয় নেই কর্ত্তা, আমাদের এ ডিঙ্গি তো জলেরই জীব। আমরাও জলের টোপা-পানা। ডুব্‌তে জানি না, ভেসেই থাকি। আমাদের এ ডিঙ্গিও তাই।" মাঝিদের অভয়-বাণীতে মহেন্দ্র ও নিরঞ্জন যুগপৎ হাসিয়া উঠিল। মাঝিরাও খুসী হইয়া তাহাদের জলের জীবটিকে বিলের অগাধ জলের দিকে লইয়া চলিল। ক্রমেই তাহারা দূর হইতে দূরে চলিয়া গেল।

মহেন্দ্র নিস্তব্ধ ভাবে শরতের সুনীল আকাশের শুভ্র লঘু গমনশীল মেঘখণ্ডের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; পশ্চাতে মনুষ্য কণ্ঠ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, অদূরে কতক-গুলি মনুষ্য আসিতেছে। তাহারা সেই দিকেই আসিতেছে বুঝিয়া, এবং ক্ষুদ্র দলটির মধ্যে দু'তিন জন ভদ্র-মহিলার মত দেখিয়া, মহেন্দ্র নিকটস্থ আম্র বৃক্ষ কয়টির অন্তরালের দিকে চলিয়া গেল এবং সেখানকার শ্যাম-শষ্পাচ্ছন্ন আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া বিলের পানে চাহিয়া দেখিল নিরঞ্জনের

ডিঙ্গিখানা ক্রমেই দূরে যাইতেছে। মহেন্দ্র বুঝিল, নিরঞ্জন যখন যাইতে বাধ্য হইয়াছে, তখন সাধ না মিটাইয়া আর সহজে ফিরিতেছে না। অগত্যা অলস ভাবে একটা বৃক্ষ-কাণ্ডে মাথা রাখিয়া মহেন্দ্র চক্ষু মুদিল।

একটা বাদানুবাদের কণ্ঠস্বর ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়া মহেন্দ্রের শ্রান্ত চক্ষুকে উন্মীলিত করিবার উপক্রম করিল। তথাপি মহেন্দ্র সহজে চক্ষু খুলিল না; কিন্তু প্রবুদ্ধ মন অনন্যোপায় ভাবে অগত্যা কর্ণকেই প্রবল ভাবে অধিকার করিল। মহেন্দ্র শুনিতে লাগিল, একজন পুরুষের পরুষ কণ্ঠ যেন কাহাকেও জোরের সহিত কিছু বলিতেছে; এবং একটী বামা-স্বর যেন এক-একবার ঈষৎ তীব্র কণ্ঠে, আবার এক-একবার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে মৃদুস্বরে তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। উভয়ের পক্ষে আরও দু' একটী নর-নারী সেইসঙ্গে মাঝে-মাঝে কথা কহিতেছে। পরুষ কণ্ঠ ক্রমে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। "আমি আপনার সঙ্গে অত তর্ক-বিতর্ক করতে পারি না। এখন মেয়ে নিয়ে নৌকায় উঠ্‌বেন কি না. শুন্‌তে চাই!" বামাস্বরও জেদের সহিত বলিতেছে, "না, পরেশকে তো আমি এ কথা বলেই পাঠিয়েছিলাম, যে, আমি যাব, কিন্তু কমলাকে নিয়ে যাব না; সে আমার পিসির কাছে থাক্‌বে।" "আমি তা জানি না। আমাকে তিনি যা বলে দিয়েছেন, আমি তাই করতে চাই।" "আমি না নিয়ে গেলে, কে ওকে নিয়ে যেতে পারে? হরির-মা, কমলাকে বাড়ী নিয়ে যা ত।" মলের ঝুনুঝুনু শব্দের সঙ্গে মধুর বালকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"মা, তুমি নৌকায় ওঠো, নৌকা অনেক দূর চলে যাক্‌; যখন আর দেখা না যাবে, তখন আমি বাড়ী যাব মা।" "না মা, তুমি এখনি যাও, তোমার দিদিমা একলা বাড়ী আছেন। আমি তো দু-তিন দিনের মধ্যেই আস্‌ব, তবে আর কেন! বাড়ী যাও, লক্ষ্মী মাণিক আমার।" জননীর শঙ্কাকম্পিত কণ্ঠস্বর মহেন্দ্রের রুদ্ধ চক্ষুকে মুক্ত করিল। মহেন্দ্র চাহিয়া দেখিল, ঐ ছোট বোটখানার নিকটে দলটি গিয়া দাঁড়াইয়াছে। জলের একটু উপরে বালেন্দুলেখার মত একটী বালিকা ঐ মহিলার কটি জড়াইয়া ধরিয়া ব্যগ্র মিনতি-পূর্ণ মুখে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। মহিলাটিও মুখ নত করিয়া বালিকার পানে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া আছেন; এক হস্তে তাহার ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কেশগুলি কবরীর মধ্যে গুঁজিয়া দিতেছেন, ও অন্য হস্তে তাহার প্রভাত-প্রস্ফুট ফুলের মত মুখখানাকে বুকের কাছে ধরিয়া রাখিয়াছেন। মহেন্দ্রের কৌতূহলী চক্ষু এই মাতা-কন্যার বিদায়-দৃশ্যে এমনি মুগ্ধ হইয়া গেল যে, স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া স্তব্ধ ভাবে চাহিয়াই রহিল। এরূপ অপ্রকাশ্য ভাবে দেখিয়া সে যে এই ভদ্র পরিবারটির অসম্মান করিতেছে, সে-কথা তাহার মনেই পড়িল না। যেন প্রচুর স্নেহধারাপূর্ণা প্রৌঢ়া ভাদ্রের প্রকৃতি জননীর মত স্নেহে বালা শরৎ-লক্ষ্মীকে আপনার হরিৎ অঞ্চলের আসনে স্থাপনান্তে ললাট চুম্বন করিয়া বিদায় লইতেছে। এই দৃশ্যে মহেন্দ্রের এমনিই একটা তুলনা যেন মনে আসিয়াছিল।

পরুষ কণ্ঠ আবার হাঁকিল, "নেন্‌—নেন্‌, আর দেরী কর্‌বেন না; মেয়ে নিয়ে নৌকায় উঠুন।" কন্যা চমকিয়া উঠিল। মাতা অমনি তাহাকে আরও নিকটে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"ষাট্‌—ভয় কি? হরির মা, কমিকে নিয়ে বাড়ী যা ত বাছা। পিসিকে যা বলেছি, যেন সে মনে রাখে,—আর তুইও রাখিস্‌। পিসির হাতে-হাতে দিস্‌ কমিকে। ওর আব্‌দার শুনে ওকে আমার এখানে আনাই অন্যায় হয়েছে। চড়া কথা শুন্‌লেও যে ও ডরিয়ে উঠে। যা কমা, বাড়ী যা মাণিক।" দাসীর মত জনৈক রমনী অগ্রসর হইয়া বলিল, "কিসের ডর দিদিমণি, এস ঘরে যাই। মা ততক্ষণ আসুন গিয়ে।" অগত্যা বালিকা মায়ের বক্ষ হইতে মাথা তুলিল,—জলভরা ছলছল চক্ষুতে মায়ের মুখের পানে চাহিতে-চাহিতে ধীরে-ধীরে তাঁহার শ্লথ বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অগ্রসর হইতে চাহিবামাত্র, সেই কর্কশকণ্ঠ আবার বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, "আঃ—কেন—মেয়ে, ধাষ্টামো করেন! ভাল কথায় বল্‌ছি, আপনাকে যোড়-হাত করে বল্‌ছি, আর তর্কাতর্কি করবেন না—মেয়েকে নিয়ে নৌকায় উঠুন নইলে—" "নইলে—" কুপিতা ফণিনীর মত মাথা তুলিয়া জননী বলিলেন—"নইলে তুমি আমার কি কর্‌বে গোপীনাথ? তুমি জান আমি কার পুত্রবধূ? তুমি পরেশ-দের একজন মাইনে-খেকো লোক, আর আমি তাদের মামী? তুমি আমায় ভয় দেখাতে এসেছ?" মহেন্দ্রও লোকটার অভদ্রতায় বিরক্ত হইয়া এবং ব্যাপারটা কি বুঝিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া তাহার পানে চাহিয়াছিল। দেখিল, মহিলাটির রুষ্ট তীব্র বাক্যে লোকটা একটু কুঞ্চিত

হইয়া পড়িয়াছে; তথাপি নিজের জেদও ছাড়িল না,—কেবল নম্রকণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে, তা কি আর জানিনে—আপনাকে আমি কি ভয় দেখাচ্চি? - আমি তো যোড়-হাত করেই বল্‌ছি। আর আপনি বোধ হয় জানেন না—বাবুরা আমার ভাই হন্‌,—সাক্ষাৎ পিসতুতো ভাই! সামান্য কর্ম্মচারী দিয়ে কি তাঁরা আপনাকে নিতে পাঠাতে পারেন? কি বল গো হাবুর মা! তুমি ত কতক কালের লোক বলেই তোমায় পাঠিয়েছেন, আর আমিও আপনার লোক বলেই আমায় পাঠালেন, --না কি?"

লোকটার আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টায় কেহই যে কোন সাড়া দিল না, তাহা দেখিয়া সে আবার ডাকিল, "যেও না গো দিদিমণি, নৌকায় ওঠো এসে। তোমার মা ডাক্‌ছেন—ফিরে এস।" কন্যা গতি থামাইয়া ফিরিয়া চাহিতেই মাতার হস্ত-সঙ্কেতে নিষেধবাণী তাহার চক্ষে পড়িল। সে আবার তীরে উঠিতে লাগিল। এইবার সেই পরুষ-কণ্ঠ, কর্কশ-কান্তি লোকটা অসহিষ্ণু ভাবে মাতার পানে চাহিয়া বলিল, "ভাল চান তো মেয়েকে ডাকুন--নইলে-" রমণী স্থির কণ্ঠে বলিল, "আবার তুমি ভয় দেখাচ্চ? এ আমার বাপের দেশ, আমার আপন বাড়ী,- তোমার মতন একটা চাকরে আমার কি করতে পারবে শুনি?" "আমি তা'হলে আমার মনিবের হুকুম ভাল করেই মেনে চল্‌ব। দেখ্‌ছেন আমার সঙ্গে দু-তিনজন লোক রয়েছে। ভাল মুখে বল্‌ছি, যোড় হাত করে বল্‌ছি, মেয়ে নিয়ে নৌকায় উঠুন,—তাও যখন্‌ শুন্‌ছেন না, তখন আমরাও যেমন করে পারি মনিবের হুকুম তামিল করব।"

"কি, তোমরা জোর করে আমাদের নিয়ে যাবে? জান, আমারও এখানে সম্মান-প্রতিপত্তি আছে। আমার বাপেরও তোমার মত চাকর আছে, আমারই মুর্খামিতে আমি এমন অসম্ভ্রম হলাম। তবু দেখি, তোমরা কি করে আমাদের নিয়ে যাও।" রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং জনৈক বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হাবুর-মা, শ্বশুর ঠাকুর যদি বেঁচে থাকেন এখনো, তাঁকে আমার প্রণাম দিও, আর তাঁকে বলো আমার ভাগ্য-দোষেই তাঁর চরণ-দর্শন হলো না। তিনি আমায় কতকাল পরে ডাক্‌লেন; কিন্তু আমার এমনি অদৃষ্ট যে তাঁর শেষ পায়ের ধুলো নেওয়া কপালে ঘট্‌ল না।" বৃদ্ধা অস্পষ্ট ভাষায় বিড়-বিড় করিয়া কি যেন বলিতে-বলিতে কপালে হাত দিল। রমণী আর কোন দিকে না চাহিয়া কন্যার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "ভয় কি, চল মা, বাড়ী যাই।" বোটের মাঝি দুইজন এবং একটা বরকন্দাজের মত লোককে সঙ্গে লইয়া কর্কশকান্তি ব্যক্তিটা এইবার কয়েক লম্ফে একেবারে মাতা ও কন্যার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল,—সগর্জ্জনে বলিল, "এখনো বল্‌ছি, সহমানে ফিরে চলুন--নইলে—" বালিকা আতঙ্কে মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া মাতার গতিরোধ করিয়া দিল; দাসীটা ভয়ে চীৎকার করিতেও না পারিয়া দাঁড়াইয়া থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মাতা ভয়-ব্যাকুলা কন্যাকে বাহুপাশে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন,—নিকটে জনসমাগমমাত্র নাই, লোকালয়ও বৃক্ষবাধায় তেমন চক্ষে পড়ে না। জেলে-ডিঙ্গিগুলাও অতি দূরে বিলের বক্ষে পাল উড়াইয়া শ্বেত পাখীর মত দৃষ্ট হইতেছে। মাতা ডাকিলেন, "কমা—কমা—ভয় কি মা—চল. তবে তোমার দাদার বাড়ীই যাই! ভয় কি চল।" "না—মা- না—বাড়ী চল," কন্যা আর্ত্তকণ্ঠে প্রায় কাঁদিয়া উঠিল।

কন্যার বিবর্ণ, শঙ্কিত মুখে হস্ত মার্জ্জনা করিতে-করিতে মাতা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ভয় কি,—ভগবান আমাদের দেখ্‌বেন্‌, সেখানে তোমার দাদা আছেন। চল, এখানে এ ছোটলোকদের সঙ্গে কথা কয়ে কোন ফল নেই তো?" "হাঁ—তাই চলুন—তাই চলুন!—" গোপীনাথ দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল। মহেন্দ্র অন্যমনস্কে দলটির অলক্ষিতে বৃক্ষান্তরাল হইতে একেবারে কন্যা ও মাতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনারা দাঁড়ান্‌—কিম্বা, যেমন বাড়ী যাচ্চিলেন, তেমনি বাড়ী চলে যান্‌। আপনাদের অনিচ্ছায় কেউ নৌকায় আপনাদের তুল্‌তে পারবে না।" "কে হে—কে হে তুমি?" একসঙ্গে তিন-চারিটে কণ্ঠ গর্জ্জিয়া উঠিল। গোপীনাথ পরুষ কণ্ঠে চেঁচাইল, "কে তুমি? নৌকায় উঠাতে পারবে না? লাট এলে যে একেবারে! হুকুমজারী করতে আর যায়গা পাওনি। ভাল চাও তো যে হও আপনার চর্‌কায় তেল দাও গে।" "খবর্দ্দার! মুখ সামলে কথা ব'লো। তোমরাও ডাকাতি করবার আর জায়গা পাওনি?" ঈষৎ শঙ্কিত মুখে গোপীনাথ একটু থমকিয়া দাঁড়াইল; আগন্তুকের পানে ভাল করিয়া চাহিয়া, তাহার বিস্তৃত ললাট ও উদার মুখকান্তি, দীর্ঘচ্ছন্দ দেহ, বিস্তৃত বপু দেখিয়া তাহার

একটু ভয় হইল ; স্ত্রীলোকের উপরে যে বীরত্ব সে এতক্ষণ ফলাইতেছিল, তাহার সে বীরদর্প সহসা যেন কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, "মশাইকে ভদ্রলোকের মতই দেখাচ্চে। তা আপনি হয় ত সব ঘটনাটা জানেন না। শুনুন—" "থাক্, আপনাকে আর কষ্ট পেতে হবে না। আমি যতটুকু বুঝেছি তাই যথেষ্ট। মা, আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে বাড়ী চলে যান—কেউ আপনাকে বাধা দিতে পারবে না।"

"বাবা তুমি কে? তোমায় কি ভগবানই আমার অপমান থেকে বাঁচাবার জন্য পাঠালেন?" মহেন্দ্র নম্র স্বরে বলিল, "মা, পরিচয়ের এ সময় নয়,—আপনারা ঘরে যান্।" "মশায়, আপনি যেই হোন, কিন্তু—" "কেউ এমন নই ; দেখ্‌ছই তো তোমাদের মতন একজন মানুষ। কিন্তু তোমার ঐ বরকন্দাজ আর মাঝি-দুটোর জোরে এই স্ত্রীলোকদের ওপর যা অত্যাচার কচ্ছিলে, তার শাস্তি দেবার জন্য আমায় আর অন্য লোক ডাকতে হবে না, আমি একাই সেটুকু পারব।" "মশায়, আপনি সব না জেনে, না শুনে অপমানের কথা কচ্চেন কেন? জানেন, আমি এক জমীদারের লোক! আর লোক ডাক্‌বার কথাই বা কেন কচ্চেন, এই গাঁয়ের নায়েব আমার সম্বন্ধী—তা জেনে রাখুন। আমিই ইচ্ছে কর্‌লে এখনি লোক ডাক্‌তে পারি।"

"বটে? সেই জোরেই তা'হলে এই অন্য জমীদারের এলাকায় দিনে-ডাকাতি কর্‌তে এসেছ? তা'হলে আর দেরী কোরো না; আমি এই গাছতলায় বস্‌লাম, তোমার নায়েব সম্বন্ধীকে ডেকে পাঠাও। সে তার লোকজন নিয়ে আসুক। যাও, দেরী কোরো না। মা, আপনারা আর কেন দাঁড়িয়ে আছেন? আপনাদের কোন ভয় নেই, ঘরে যান।" "বাবা, তোমার পরিচয় না পেলে আমি যে যেতে পাচ্চিনে। আমি এই গ্রামের মেয়ে, এখানকার সকলকেই চিনি; তোমায় তো কখনো দেখিনি। তুমি কে বল?" "আমার পরিচয় দেবার মত এমন কিছু নেই মা; আমি সামান্য লোক মাত্র।" "যেই হও, আমি না জেনে স্থির হতে পার্‌ছিনে।" "আচ্ছা, এর পর আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনার বাড়ী—" "ঈশ্বর উমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে আমি, তাঁর নাম কর্‌লে, এ গ্রামের সকলেই বাড়ী দেখিয়ে দিতে পার্‌বে। বাবা, আমি মস্ত ভুল করেই এই অপমান সহ্য কর্‌লাম—" "আপনার বাড়ী গিয়ে সব কথা শুন্‌ব এর পরে, আপনারা এখন যান্।" ঈষৎ প্রকৃতিস্থা কন্যার বাহু ধরিয়া দাসী সমভিব্যাহারে রমণী চলিয়া গেলেন। গোপীনাথ প্রমুখ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তি কয়টির পানে চাহিয়া মহেন্দ্র বলিল, "এখন তোমরা 'শ্রীহরিঃ' করবে, না, শ্রীঘর-বাসের ইচ্ছে আছে?" ভীরু দলপতির ভীতিতে দলশুদ্ধ দমিয়া গিয়াছিল। গোপীনাথ ভাবিতেছিল, গাঁয়ের নায়েবকে ভয় করে না এমন কোন্ ব্যক্তির সম্মুখে না জানি সে পড়িয়াছে! মানে-মানে নিজের এলাকায় পলাইতে পারিলে হয়, নতুবা কি জানি কপালে কি ঘটে। অবৈধ অত্যাচারের জন্য জেলেও দিতে পারে—লোকটার হয় ত এমন ক্ষমতাও আছে। গোপীনাথ আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল,—"আজ্ঞে, বুঝতেই তো পার্‌ছেন,—মনিবের হুকুম, না মেনে উপায় তো নেই।" "আজ্ঞে, তা বুঝেছি বৈ কি! মশায়ের জমীদারের নাম-ধাম আর তোমাদের নাম-টাম-গুলো অনুগ্রহ করে বল দেখি শুনি?" "সে তো আপনি ওঁর কাছে থেকেই শুন্‌তে পারেন, আমরা তো মশা—আমাদের মার্‌তে কামান পেতে কি কর্‌বেন। আমরাও আর সময় নষ্ট করতে পারব না। এরই নাম গ্রহ আর কি! এলাম এক কাযে, হল আর এক কায। আদর করে তিনি মামীকে নিতে পাঠালেন, মেয়েমানুষের কাণ্ড—অবুঝ যত,—একটা ঝগড়া-ঝাঁটিই হয়ে গেল। বাবু নিশ্চয় মামীর হাতে পায়ে ধ'রে, তাঁকে ঠাণ্ডা ক'রে, মেয়ে সঙ্গে নিয়েই যাবেন এর পরে। আপনার লোকের সঙ্গে ঝগড়া কি চিরদিন থাকে?"

গোপীনাথের চতুর বুদ্ধিতে মহেন্দ্রের অত্যন্ত হাসি পাইল। তথাপি সে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। গোপীনাথ যষ্টি-আহত কুক্কুরের ন্যায় ধীরে-ধীরে সদলে বোট ছাড়িয়া দিয়া পলাইল। ঘটনাটা সম্পূর্ণ না জানিয়াই বিবাদ বাধাইবার ইচ্ছা না হওয়ায়, এবং দ্বিতীয় সঙ্গী না থাকায় মহেন্দ্র তাহাদের গমনে বাধা দিতে ইচ্ছা করিল না। স্থানটী নির্জ্জন হইলে আবার সে নিরঞ্জনের প্রতীক্ষায় সেই শষ্প-আস্তরণে শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিল। (ক্রমশঃ)

উৎকল সাহিত্য

[শ্রীরমেশচন্দ্র দাস]

উৎকল সাহিত্য—কার্ত্তিক, ১৩২৫

১। বালেশ্বর—লেখক—শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বসু, বি-এল।

পূর্ব্বে বালেশ্বর সমুদ্র-কূলে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান অবস্থান সমুদ্র হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী। মহাভারতের সময়ে বালেশ্বর বভ্রুবাহনের মণিপুর রাজ্যভুক্ত এবং মোগল অধিকারে 'বন্দর বালেশ্বর' নামে খ্যাত ছিল। বালেশ্বরের প্রকৃত নাম বাণেশ্বর—বাণাসুরের রাজধানী। পূর্ব্বনাম শোণিতপুর। বর্ত্তমান সুনট প্রগণা তাহারই চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান আছে। বালেশ্বর নগর ঐ সুনট বা শোণিত প্রগণার অন্তর্গত। অধুনা 'উষামেড়' নামে এক উচ্চ ভূখণ্ড দেখা যায়। প্রবাদ, এই স্থানে অনিরুদ্ধ আবদ্ধ ছিলেন। বাণেশ্বর, গর্গেশ্বর, মণিনাগেশ্বর, খজ্জুরেশ্বর ও চন্দ্রেশ্বর নামে বাণাসুর-স্থাপিত পঞ্চ বাণলিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান। সমুদ্র-কূলে চান্দিপুরের নিকটবর্ত্তী 'বাণাসুর-ঘাট' অবস্থিত। প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে রেমুনার 'ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ' মন্দির অন্যতম। তৎপরে রাইবেলিয়ার সুবিশাল ও সুদৃঢ় 'কটাসেন' দুর্গ কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অপেক্ষা বৃহত্তর। প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রশস্ত প্রাচীর ও জলপূর্ণ বিশাল পরিখা বহুকাল পর্য্যন্ত মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিল। তুগ্রল খাঁ উড়িষ্যা আক্রমণ কালে রাইবেলিয়া দুর্গের নিকটে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হন। উক্ত যুদ্ধ ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাংলার ইতিহাসে 'কটাসেন যুদ্ধ' বলিয়া খ্যাত। নূতন বাজারে অধিষ্ঠিত 'ঝাড়েশ্বর' মহাদেব বিশেষ জাগ্রত দেবতা। মারাঠা বীর ভাস্কর পণ্ডিত বালেশ্বরে অবস্থান কালে ঝাড় বা জঙ্গল মধ্যস্থ মৃত্তিকা গর্ভ হইতে এই দেবমূর্ত্তি উত্তোলন করিয়া স্থাপন করেন। ভাস্কর পণ্ডিত বালেশ্বরে যেখানে বাস করিতেন, তাহা 'ভাস্কর-বাটী' (ভাস্করগঞ্জ) বলিয়া পরিচিত। মোতিগঞ্জ বাজারে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ও বারবাটীতে শ্যামসুন্দরের বৃহৎ মন্দির অবস্থিত। মির্জা লালবেগ নামক জনৈক মোগল উক্ত শ্যামসুন্দর মন্দিরে সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। তদ্বিরচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সুমধুর ও সুললিত গীতাবলী বালেশ্বরে প্রচলিত। দিনেমারডিঙ্গা, ফরাসীডিঙ্গা ও ওলন্দাজসাহী নামে কয়েকটী উপনিবেশ কুঠী বর্ত্তমান। ওলন্দাজ-সাহীতে একটী সমাধি-ক্ষেত্র আছে। ২৩।১১।১৬৯৬ অর্থাৎ ২২০ বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থানে মাইকেল সেইন্স নামক জনৈক ওলন্দাজ ও এন, বেলা নাম্নী কোনও মহিলা সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের সমাধির উপরে দুইটী ত্রিকোণ স্তম্ভ। উচ্চতা যথাক্রমে ৩০ ও ৪৫ ফিট। পুরাতন মসজিদগুলির মধ্যে মুসলমানদিগের সময়ে নির্ম্মিত 'কদম রসুল'ই অধিক উৎকৃষ্ট। বালেশ্বর পূর্ব্বে লবণ-ব্যবসায় দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। গোরাব, সুপ ও দ্রোণী নামে ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদ্রগামী পোত এখানে নির্ম্মিত হইত। অনেক বাঙ্গালী তাম্বুলী ও সুবর্ণবণিক বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করিয়া এখানে বাস করিতেছেন।

২। বিবিধ প্রসঙ্গ—সম্পাদক—শ্রীবিশ্বনাথ কর।

(১) "চিন্তার মুক্তি"—আদিম মানব অদ্ভুত-শক্তি-সম্পন্ন প্রকৃতির নানা বস্তুতে ও মহাপ্রভাবশালী মানবে দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিয়াছে। জ্ঞানের বিকাশ ও চিন্তার স্ফূর্ত্তির সঙ্গে-সঙ্গে মানব প্রকৃতি পূজার অযৌক্তিকতা অনুভব করিলেও, মহৎ মানবের পূজা একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন। ইহাই অবতার-বাদের মূল। অতিবড় বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য-ভূমি আজিও খৃষ্টকে পরমেশ্বরের আসনে বসাইয়া পূজা করিতেছে। কিন্তু চিন্তা-ক্ষেত্রে মুক্তির সন্ধান পাইয়া তাহারা দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের দেশে অবতারের সীমা নাই। মহৎ মানবে ঈশ্বরত্বের আরোপ করিয়া পূজা করিতে ভারতের নর নারী একান্ত উন্মুখ। ভারতবাসীর হৃদয় ভক্তিপ্রবণ বলিয়া কোটী কোটী মানব নানাবিধ বাহ্য-পূজায় যুগ-যুগ ধরিয়া আবদ্ধ। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার তুল্য স্বাধীন চিন্তার শত্রু মানব-সমাজে আর দ্বিতীয় নাই। ভারতবাসী আজিও চিন্তাক্ষেত্রে মুক্তি হইতে বহুদূরে অবস্থিত। সেই জন্য অনেক স্থলে প্রাচীন আবর্জ্জনার উপর নূতন আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইতেছে। ধর্ম্ম, সমাজ, শাস্ত্র প্রভৃতির বিচিত্র ব্যাখ্যা কেবল ঘন কুহেলিকা সৃজন পূর্ব্বক দৃষ্টিকে ক্ষীণ ও চিন্তার জড়তা বৃদ্ধি করিতেছে। আমাদের সর্ব্বপ্রকার শক্তিহীনতার ইহাই মূল কারণ। সবলে ঐ জড়তা দূর করিতে না পারিলে কোন ক্ষেত্রেই আমাদের মুক্তি নাই।

(২) "পুরস্কার ঘোষণা"—উৎকল সাহিত্য-সমাজ নামে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে পুরস্কার ঘোষণার কথা সাধারণে অবগত আছেন। তদনুসারে কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে ৮।১০টা প্রবন্ধের জন্য ঘোষণা করা হইলেও, ২।১টী বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত প্রবন্ধও 'তথৈবচ'। বড়ই লজ্জার কথা যে, তালচের-রাজ-প্রদত্ত পুরস্কারের জন্য ৩ বর্ষকাল জগন্নাথ দাস ভাগবত বিষয়ে প্রশ্ন প্রকাশ করিয়াও 'সমাজ' একখানিও উত্তর প্রাপ্ত হন নাই। 'পল্লী-জীবন ও পল্লী-সংস্কার' প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া অতি কষ্টে দুইটী মাত্র প্রবন্ধ সমাজের হস্তগত হইয়াছে। এইরূপ হইবার কারণ কি? দেশে ত সাহিত্যিকের সংখ্যা-বৃদ্ধি, নূতন নূতন পত্রিকার প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলি গদ্যে-পদ্যে পূর্ণ হইতেছে। তবে কি ব্যক্তি বা সমাজ-বিশেষের নিকট পরীক্ষাধীন হওয়া লজ্জার কথা? মূল কথা, স্বীয়

মনোমত কিছু লিখন, আর কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আশানুরূপ শ্রম-সাধন, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ যথেষ্ট। এই শেষোক্ত ভাবটী প্রবল না হইলে এ দেশের সাহিত্যোদ্যম ছলনা মাত্র হইয়া রহিবে।

মুকুর—আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২৫

১। "প্রাচীন উৎকল" (বীরত্ব প্রসঙ্গ)—লেখক শ্রীজগবন্ধু সিংহ।

আধুনিক উৎকল জাতির শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া, সাহস প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে কে বিশ্বাস করিবে—এই জাতি এক সময়ে বীর জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং এই জাতির বিজয়-পতাকা একদিন আকাশ-মার্গে উড্ডীয়মান হইয়াছিল। যে জাতি এক সময়ে অন্য এক প্রপীড়িত জাতিকে নিঃশঙ্কচিত্তে আপন ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল, আজ সেই জাতি 'ওড়িয়া' নাম শুনিলে ঘৃণা প্রকাশ করে। এই অবস্থা-বিপর্য্যয় প্রকৃতির চিরন্তন প্রথা। যে জাতির প্রাচীন ইতিহাস নাই, সে নূতন ইতিহাস গঠন করিতেছে; এবং যাহার ছিল, সে পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাহাতে নূতনত্বের সংযোগ করিয়া উন্নতি মার্গে ধাবিত হইতেছে। উড়িষ্যার নূতন ইতিহাসের আবশ্যকতা নাই; কিন্তু পুরাতনের গর্ভে যাহা সঞ্চিত আছে, নব অনুশীলনে তাহা বিকশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বীরগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা, ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর। পুরীর জগন্নাথ মন্দির ওড়িয়া জাতির প্রধান কীর্ত্তি। এই ধর্ম্মানুষ্ঠান উৎকল-জাতির মস্তিষ্ক প্রসূত। এখানে সাম্যনীতির সম্পূর্ণ বিকাশ। এখানে জাতিভেদ বা ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক বাদ বিসম্বাদ নাই। এখানে সনাতন ধর্ম্মের 'একব্রহ্ম দ্বিতীয়োনাস্তি' মহামন্ত্রের পূর্ণ প্রভাব। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরা এ মন্দিরে নত-মস্তক। ইহা দণ্ডী, সন্ন্যাসী, যোগী, গৃহী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর শান্তি নিকেতন। জগৎবাসীকে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মনীতি শিক্ষা প্রদানে জগন্নাথদেবের বিশাল ভুজ প্রসারিত। উৎকলীয় ধর্ম্মবীরের সেই বিজয়-বৈজয়ন্তী নীলচক্র-উপরি আজিও উড্ডীয়মান। মহাত্মা চৈতন্য অন্যতম ধর্ম্মবীর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ যখন শাক্ত-ধর্ম্মের অপব্যবহারে জর্জ্জরিত, সেই সময়ে ইঁহার আবির্ভাব। অনেকের ধারণা, তিনি বাঙ্গালী; কিন্তু তাহা ভ্রমমূলক। সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র ছিল। উৎকলের যাজপুর গ্রামে তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের নিবাস এবং তিনি ওড়িয়া ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত। রাজা কপিলেন্দ্রের সহিত মিশ্র-বংশের মনো-মালিন্য ঘটায় তাঁহারা উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টে বাস করেন। চৈতন্যদেবের জন্মের মাত্র ৩১ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা বাঙ্গালায় গমন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী হইবার অব্যবহিত পরে চৈতন্যদেব পুরী গমন করিয়া কাশী মিশ্রের বাটীতে অবস্থান করেন এবং পুরীধামে ২৮ বৎসর কাল লীলা প্রকাশ করিয়া অপ্রকট হন। জগন্নাথ দাস ও রায় রামানন্দের প্রতি প্রভু কিরূপ জাতীয় প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, জগন্নাথ চরিতামৃতে তাহা বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। অন্যান্য উৎকলীয় ধর্ম্মবীরগণ স্বদেশে আপন কার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ভক্তাগ্রণী জগন্নাথ, মত্ত বলরাম, সারলা, অচ্যুত, অনন্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কর্ম্মের নানা বিভাগ। তন্মধ্যে শিল্প বিভাগে কেবল হস্ত সাহায্যে উৎকলবাসী যে শিল্প-চাতুরী ও কলা-কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি ভুবনেশ্বর ও কোণার্ক মন্দিরে জীবন্ত ভাবে বিদ্যমান। দেশ-দেশান্তরের দর্শকবৃন্দ নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করিয়া মুক্তকণ্ঠে ইহাদের প্রশংসা করিতেছেন। স্থূলতঃ অন্যান্য প্রাচীন প্রাদেশিক সাহিত্যের তুলনায় উৎকল সাহিত্য কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়, বরং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। উপেন্দ্রভঞ্জ, সামন্তসিংহার, দীনকৃষ্ণ বিরচিত পুস্তকাবলী ভাষান্তরে প্রকাশিত হইলে জগৎবাসী ওড়িয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

যুদ্ধ বিদ্যায় উৎকলবাসী হীনতা প্রদর্শন করেন নাই। শকজাতি উড়িষ্যা আক্রমণ পূর্ব্বক জয়লাভ করেন এবং ৩০ বৎসর রাজত্ব করিবার পরে রাজা বিক্রমাজিৎ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। উৎকল বাসীর বীরত্ব কাহিনীর ইহাই প্রথম ইতিহাস। শোভন দেবের রাজত্ব সময়ে রক্তবাহু উড়িষ্যা বিজয় করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজা যযাতি-কেশরী পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করেন। রাজা গঙ্গেশ্বর দেব যুদ্ধ দ্বারা গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। রাজা পুরুষোত্তম দেব সসৈন্যে কাঞ্চিরাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক কাঞ্চিরাজকে পরাজিত করিয়া তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উড়িষ্যার ইতিহাসে ইহাই কাঞ্চি যুদ্ধ নামে খ্যাত। তৎপরে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেবের রাজত্ব কালে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কালাপাহাড়ের ভীষণ আক্রমণে রাজ্য লুণ্ঠিত ও হিন্দু দেবমূর্ত্তি ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। অন্তর্বিবাদের ফলে মুকুন্দদেব শত্রু-হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেইদিন হইতে উড়িষ্যার স্বাধীনতা লোপ পায়। রামচন্দ্রদেব টোডর মলের সাহায্যে 'খুরদার' রাজা হন। মোগল, পাঠান ও মারাঠাগণ উড়িষ্যা আক্রমণ ও লুণ্ঠনাদি দ্বারা লোকদিগকে লণ্ডভণ্ড করিলেও, উৎকলবাসী যুদ্ধে ত্রুটী প্রদর্শন করে নাই। মারাঠাদির ক্রূর অত্যাচারে উড়িষ্যা অন্তঃসারশূন্য, সমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল, এবং খাদ্যাভাবে দেশে হাহাকারধ্বনি উত্থিত। সেই সময়ে ইংরেজেরা এদেশে আগমন করেন। উড়িষ্যাবাসী তাঁহাদিগকে ঈশ্বর-প্রেরিত রক্ষক রূপে, ভক্তি ও বিশ্বাসে, বরণ করিয়া লইলেন।

উৎকলবাসী যে যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতি ছিলেন, তাহার প্রমাণ অদ্যাপি ক্ষীণ ভাবে বর্ত্তমান। পাইক, খণ্ড, মহানায়ক ও ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং গুণ ও কর্ম্মানুসারে রাজদত্ত উপাধি দ্বারা ভূষিত হইতেন। ঐ উপাধিগুলি স্বতঃই বীরত্বব্যঞ্জক; যথা—রাউত, রাউত রায়, সিংহ, বলিয়ার সিংহ, ঝপট সিংহ, বাহুবলেন্দ্র, পাইক রায়, ভুজবল, রণসিংহ, দক্ষিণ কপাট, মহারথী, সেনাপতি, বাহিনীপতি, নায়ক, পট্টনায়ক, চম্পতি সিংহ, মানসিংহ শত্রুবল,

দানদাতা ইত্যাদি। আজিও তাহাদের বংশধরগণ উক্ত উপাধি ব্যবহার করিতেছে।

তাম্রশাসন ও শিলালিপি হইতেও উড়িষ্যার বীরত্ব-কাহিনী জানা যায়। উৎকলীয় বীরগণ সমর সম্বন্ধে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ সামন্ত রায় সংস্কৃত ভাষায় "বীর-সর্ব্বস্ব" ও গোদাবরী মিশ্র "হরিহর চতুরঙ্গ" প্রণয়ন করেন।

"পাইসা ফণ্ড গ্লাস ফেক্টরী"—লেখক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সাহু বি-এ।

পূর্ব্বে অম্বালায় একটী কাচের কারখানা স্থাপিত হইয়া একরূপ চলিতেছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মান্দ্রাজ এবং ভাগলপুরের কাচ-ফ্যাকটরীরও সেই দশা হইয়াছে। নানা কারণে ১০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের কাচের কারখানাগুলির পতন হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পুনা ষ্টেসনের কিছু দূরে টালিগাঁ নামক স্থানে "পইসা ফণ্ড গ্লাস ফেক্টরী" স্থাপিত হয়। প্রথম মূলধন ৪০ হাজার টাকা, কেবল ১ পয়সা বা তদূর্দ্ধ চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত হইয়া কার্য্যারম্ভ হয়। পরে কয়েক বৎসরের মধ্যে আরো ২০ হাজার টাকা সংযুক্ত হইয়াছে। উক্ত কারখানার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কোনও বিদেশীয় কর্ম্মচারী নাই। সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোকের ধন, বিদ্যা ও বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত। ইহার কমিটীর সদস্য, তত্ত্বাবধারক ও বিশেষজ্ঞ—সকলেই দেশীয় লোক। বোম্বাই, অম্বালা, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, পিপ্‌পোড়, বিজোই, করাড়, বরোদা, ফিরোজাবাদ, শিয়রোড় প্রভৃতি স্থানে যে প্রকার কাচ প্রস্তুত হইতেছে, তাহার তুলনায় টালিগাঁর কাচ খুব উত্তম না হইলেও অনেক বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ জাপানী কাচ অপেক্ষা যথেষ্ট মজবুত। টালিগাঁ কারখানায় সাধারণতঃ ২০০ ভাগ বালি, ৫০ ভাগ সোডা ও ২০ ভাগ চূণ মিশ্রিত হইয়া কাচ প্রস্তুত হইতেছে। কখন-কখনও তাহার সহিত পূর্ব্ব-সঞ্চিত ভাঙ্গা কাচ মিশ্রিত হইয়া থাকে। এ ফ্যাক্টরী হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বর্ষে গড়ে বার্ষিক ৩ হাজার টাকা মূল্যের মাল বিক্রীত হইয়াছে। পরিচালকগণের অনুমান, এ বৎসর ১ লক্ষ টাকার মাল বিক্রীত হইতে পারে; সুতরাং লাভ ৩০ হাজার টাকা থাকিবে। দেশীয় লোকদিগকে কাচ নির্ম্মাণ ও তৎসহ ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া এই কারখানার প্রধান উদ্দেশ্য; এবং নীচ, অস্পৃশ্য জাতি সমাজে যাহাতে অধিকতর আদরণীয় হয়, সে দিকেও কারখানার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আছে। উড়িষ্যায় কি একরূপ একটী কাচের কারখানা স্থাপন করা সম্ভব নয়? এত বড় বিস্তৃত দেশে কি ৩০ হাজার টাকা মূলধন পাওয়া যায় না? তবে কথা এই যে, উড়িষ্যার লোকে আজিও গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে সাহসী নয়। ভারতের বাহিরের কথা বলিতেছি না। এই ভারতের মধ্যে কত শিখিবার আছে, কিন্তু সেরূপ লক্ষ্য ও চেষ্টা কোথায়?

পরিচারিকা—ভাদ্র ১৩২৪

১। "পারিবারিক শিক্ষা"—লেখিকা শ্রীমতী সরোজিনী দাসী।

দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে এ সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের প্রাণরক্ষা ও সুখ বিধান জন্য পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছেন। পিতামাতার অকৃত্রিম বাৎসল্য, ভাইভগিনীর অসীম স্নেহ, দম্পতির অকপট প্রেম ও সন্তানের প্রগাঢ় ভক্তি আমাদিগকে সতত আনন্দ প্রদান করিতেছে। ঈশ্বর-প্রদত্ত স্নেহ, প্রেম, করুণা, ভক্তি, ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশিতে ভূষিত হইয়া আমাদের জীবন সার্থক করা উচিত। একতা সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রধান সহায়। শিক্ষার দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয়। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষিত পুরুষ ও রমণী অপেক্ষা পূর্ব্বেকার অল্পশিক্ষিত পুরুষ ও নিরক্ষরা রমণী অনেকাংশে উন্নত ছিলেন। আজকাল অনেকে আপন-আপন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা লইয়া পৃথক পরিবার গঠন করিয়া থাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একান্নবর্ত্তী-পরিবারপ্রথা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। একত্রে বাস করিতে হইলে সুদক্ষ কর্ত্তার পরিচালনা আবশ্যক। তাঁহার হৃদয়ে যাহাতে স্বার্থপরতা, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি স্থান না পায় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। পরিবারবর্গেরও কর্ত্তার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া একান্ত বিধেয়; বিশেষতঃ আলস্যপরায়ণ ও অসহিষ্ণু ব্যক্তিরা সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার অনুপযুক্ত।

যে দিন সুব্যবস্থাগুণে প্রত্যেক গৃহ হিংসা কুটিলতাদি বর্জ্জিত হইয়া উদারতার পুণ্যালোকে উদ্ভাসিত হইবে, সেই দিনই এ সংসার শান্তি ও পবিত্রতার লীলাভূমি রূপে অনন্ত সুখ প্রদান করিবে। পরমেশ্বর করুন সে দিন নিকটবর্ত্তী হউক।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(৬)

পথে যাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে-করিতে এই বিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঘটনাচক্রে তাহারা রহিয়া গেল সহরের একপ্রান্তে, আর আমার আশ্রয় মিলিল অন্য প্রান্তে। সুতরাং, পোনর-ষোল দিনের মধ্যে ও-দিকে আর যাইতে পারি নাই। তাহা ছাড়া সারাদিন চাকুরির উমেদারীতে ঘুরিতে-ঘুরিতে এমনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি,

যে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিয়া এ শক্তি আর থাকে না যে, কোথাও বাহির্ হই। ক্রমশঃ, যত দিন যাইতেছিল, আমারও ধারণা জন্মিতেছিল যে, এই সুদূর বিদেশে আসিয়াও চাক্‌রি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে ঠিক দেশের মতই সুকঠিন।

অভয়ার কথা মনে পড়িল। যে লোকটির উপর নির্ভর করিয়া সে স্বামীর সন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে,—সন্ধান না মিলিলে, সে লোকটির অবস্থা কি হইবে! বাটীর বাহির হইবার পথ যথেষ্ট উন্মুক্ত থাকিলেও, ফিরিবার পথটিও যে ঠিক তেম্নি প্রশস্ত পড়িয়া আছে, বাঙ্‌লা দেশের আব হাওয়ায় মানুষ হইয়া এত বড় আশার কথা কল্পনা করিবার সাহস আমার নাই। নিজেদের অধিক দিন প্রতিপালন করিবার মত অর্থবলও যে সংগ্রহ করিয়া তাহারা পা বাড়ায় নাই, তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। বাকি রহিল শুধু সেই রাস্তাটা, যাহা পোনর-আনা বাঙালীর একমাত্র অবলম্বন; অর্থাৎ, মাস-মাহিনায় পরের চাক্‌রি করিয়া মরণ পর্য্যন্ত কোনমতে হাড়-মাসগুলাকে একত্র রাখিয়া চলা। রোহিণী বাবুরও যে সে-ছাড়া পথ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, এই রেঙ্গুনের বাজারে কেবল মাত্র নিজের উদরটা চালাইয়া লইবার মত চাক্‌রি জোগাড় করিতে আমারই যখন এই হাল, তখন একটি স্ত্রীলোককে কাঁধে করিয়া সেই হাবা গোবা বেচারা-গোছের অভয়ার দাদাটির যে কি অবস্থা হইবে, তাহা মনে করিয়া আমার পর্য্যন্ত যেন ভয় করিয়া উঠিল। স্থির করিলাম, কাল যেমন করিয়াই হোক, একবার গিয়া তাহাদের খবর লইয়া আসিব।

পরদিন অপরাহ্ণ-বেলায়, প্রায় ক্রোশ-দুই পথ হাঁটিয়া তাঁহাদের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট মোড়ার উপর রোহিণী দাদা আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল নবজলধরমণ্ডিত আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের ন্যায় গুরু-গম্ভীর; কহিলেন, "শ্রীকান্ত বাবু যে! ভাল ত?"

বলিলাম, "আজ্ঞে, হাঁ।" "যান, ভেতরে গিয়ে বসুন।" সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, "আপনাদের খবর সব ভাল ত?" "হুঁ—ভেতরে যান্ না। তিনি ঘরেই আছেন।" "তা যাচ্ছি—আপনিও আসুন?" "না:—আমি এইখানেই একটু জিরুই। খেটে-খেটে ত একরকম খুন হবার যো হয়েচি,—দুদণ্ড পা ছড়িয়ে একটু বসি।" তিনি পরিশ্রমাধিক্যে যে মৃতকল্প হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা তাঁহার চেহারায় প্রকাশ না পাইলেও, মনে-মনে কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। রোহিণী দাদার মধ্যেও যে এতখানি গাম্ভীর্য্য এতদিন প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিতেছিল, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ত বিশ্বাস করাই কঠিন। কিন্তু ব্যাপার কি? আমি নিজেও ত পথে-পথে ঘুরিয়া আর পারি না। আমার এই দাদাটিও কি—

কপাটের আড়াল হইতে অভয়া তাহার হাসিমুখখানি বাহির করিয়া নিঃশব্দ-সঙ্কেতে আমাকে ভিতরে আহ্বান করিল। দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে কহিলাম, "চলুন না রোহিণী-দা, ভিতরে গিয়ে দুটো গল্প করিগে।" রোহিণী-দা জবাব দিলেন, "গল্প! এখন মরণ হলেই বাঁচি, তা' জানেন শ্রীকান্ত বাবু?"

জানিতাম না—তাহা স্বীকার করিতেই হইল। তিনি প্রত্যুত্তরে শুধু একটা প্রচণ্ড নিঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, "দুদিন পরেই জান্‌তে পারবেন।" অভয়ার পুনশ্চ নীরব আহ্বানে আর বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা-কাটাকাটি না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে রান্নাঘর ছাড়া শোবার ঘর দুটি। সুমুখের খানাই বড়, রোহিণীবাবু ইহাতে শয়ন করেন। একধারে দড়ির খাটের উপর তাঁহার শয্যা। প্রবেশ করিতেই চোখে পড়িল—মেঝের উপর আসন পাতা, একখানি রেকাবিতে খানকয়েক লুচি ও তরকারি, একটু হালুয়া ও এক গ্লাস জল। গণনায় নিরূপণ করিয়া এ আয়োজন যে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে আমার জন্য করিয়া রাখা হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং? এক মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলাম, একটা রাগা-রাগি চলিতেছিল। তাই, রোহিণী-দা'র মুখ মেঘাচ্ছন্ন,—তাই তাঁর মরণ হইলেই তিনি বাঁচেন। নীরবে খাটের উপর গিয়া বসিলাম। অভয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছেন? এত দিন পরে বুঝি গরীবদের মনে পড়্‌ল?" খাবারের থালাটা দেখাইয়া কহিলাম, "আমার কথা পরে হবে; কিন্তু, এ কি?" অভয়া হাসিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ও কিছু না। আপনি কেমন আছেন বলুন।"

কেমন আছি—সে তো নিজেই জানি না, পরকে বলিব কি করিয়া? একটু ভাবিয়া কহিলাম, "একটা

চাক্‌রির জোগাড় না হওয়া পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। কিন্তু রোহিণীবাবু যে বল্‌ছিলেন—" আমার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। রোহিণী-দা তাঁহার ছেঁড়া চটিতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ তুলিয়া, পটাপট্‌ শব্দে ঘরে ঢুকিয়া, কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া, জলের গেলাসটা তুলিয়া লইয়া, এক নিঃশ্বাসে অর্দ্ধেকটা এবং বাকিটুকু দুইতিন চুমুকে জোর করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া, শূন্য গ্লাসটা কাঠের মেজের উপর ঠকাস্‌ করিয়া রাখিয়া দিয়া, বলিতে-বলিতে বাহির হইয়া গেলেন,—"থাক্‌, শুধু জল খেয়েই পেট ভরাই! আমার আপনার আর কে আছে এখানে, যে, ক্ষিদে পেলে খেতে দেবে!" আমি অবাক্‌ হইয়া অভয়ার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, পলকের জন্য তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্ম-সংবরণ করিয়া সে সহাস্যে কহিল, "ক্ষিদে পেলে কিন্তু জলের গেলাসের চেয়ে খাবারের থালাটাই মানুষের আগে চোখে পড়ে।" রোহিণী সে কথা কাণেও তুলিলেন না,—বাহির হইয়া গেলেন; কিন্তু, অর্দ্ধ মিনিট না যাইতেই ফিরিয়া আসিয়া কপাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সারাদিন আফিসে খেটে-খেটে ক্ষিদেয় গা মাথা ঘুরছিল শ্রীকান্ত বাবু,—তাই তখন আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারিনি—কিছু মনে করবেন না।"

আমি বলিলাম, "না।" তিনি পুনরায় কহিলেন, "আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে আমার একটুকু বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন?"

তাঁহার মুখের ভঙ্গীতে আমি হাসিয়া ফেলিলাম; কহিলাম, "কিন্তু, সেখানে লুচি-মোহনভোগ হয় না।" রোহিণী-দা বলিলেন, "দরকার কি! ক্ষুধার সময় একটু গুড় দিয়ে যদি কেউ জল দেয়, সেই যে অমৃত! এখানে তাই বা দেয় কে?" আমি জিজ্ঞাসু মুখে অভয়ার মুখের প্রতি চাহিতেই, সে ধীরে-ধীরে বলিল, "মাথা ধরে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই খাবার তৈরি করতে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে শ্রীকান্ত বাবু।" আমি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, "এই অপরাধ?" অভয়া তেমনি শান্ত ভাবে কহিল, "এ কি তুচ্ছ অপরাধ, শ্রীকান্ত বাবু?" "তুচ্ছ বই কি।" অভয়া কহিল, "আপনার কাছে হতে পারে; কিন্তু যিনি গলগ্রহকে খেতে দেন, তিনি এই-বা মাপ করবেন কেন? আমার মাথা ধরলে তাঁর কাজ চলে কি করে?" রোহিণী ফোঁস্‌ করিয়া গর্জ্জাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "তুমি গলগ্রহ—এ কথা আমি বলেচি?" অভয়া বলিল, "বল্‌বে কেন, হাজার রকমে দেখাচ্চো।" রোহিণী কহিলেন, "দেখাচ্ছি! ওঃ—তোমার মনে-মনে জিলিপির প্যাঁচ! তোমার মাথা ধরেছিল—আমাকে বলেছিলে?" অভয়া কহিল, "তোমাকে বলে লাভ কি? তুমি কি বিশ্বাস করতে?" রোহিণী আমার দিকে ফিরিয়া উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "শুনুন, শ্রীকান্ত বাবু, কথাগুলো একবার শুনে রাখুন। ওর জন্যে আমি দেশ-ত্যাগী হলুম,—বাড়ী ফেরবার পথ বন্ধ—আর ওর মুখের কথা শুনুন! ওঃ—" অভয়াও এবার সক্রোধে উত্তর দিল, "আমার যা' হবার হবে,—তুমি যখন ইচ্ছে দেশে ফিরে যাও। আমার জন্যে কেন তুমি এত কষ্ট সইবে? তোমার কে আমি? এত খোঁটা দেওয়ার চেয়ে—" তাহার কথা শেষ না হইতেই রোহিণী প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "শুনুন, শ্রীকান্ত বাবু, ছুটো রেঁধে দেবার জন্যে—কথাগুলো আপনি শুনে রাখুন! আচ্ছা, আজ থেকে যদি তুমি আমার জন্যে রান্নাঘরে যাও ত তোমার অতি বড়—আমি বরঞ্চ হোটেলে—" বলিতে-বলিতেই তাঁহার কান্নায় কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল; তিনি কোঁচার খুঁটটা মুখে চাপা দিয়া দ্রুতবেগে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। অভয়া বিবর্ণ মুখ হেঁট করিল,—কি জানি চোখের জল গোপন করিতে কি না; কিন্তু আমি একেবারে কাঠ হইয়া গেলাম। কিছুদিন হইতে উভয়ের মধ্যে যে কলহ চলিতেছে, সে তো চোখেই দেখিলাম; কিন্তু, ইহার নিগূঢ় হেতুটা দৃষ্টির একান্ত অন্তরালে থাকিলেও, সে যে ক্ষুধা এবং খাবার তৈরির ত্রুটি হইতে বহু-বহু দূর দিয়া বহিতেছে, তাহা বুঝিতে লেশ মাত্র বিলম্ব ঘটিল না। তবে কি স্বামী-অন্বেষণের গল্পটাও—

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই নীরবতা ভঙ্গ করিতে নিজেরই কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিলাম, "আমাকে অনেক দূর যেতে হবে,—এখন তা'হলে আসি।" অভয়া মুখ তুলিয়া চাহিল; কহিল, "আবার কবে আস্‌বেন?" "অনেক দূর।"—"তা' হলে একটু দাঁড়ান" বলিয়া অভয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট-পাঁচ ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে একটুক্‌রা কাগজ দিয়া বলিল, "যে জন্যে আমার আসা, তা' সমস্তই এতে সংক্ষেপে লিখে দিলুম। পড়ে দেখে যা ভাল বোধ

হয় করবেন। আপনাকে এর বেশি আমি বল্‌তে চাইনে।” বলিয়া আজ সে আমাকে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার ঠিকানাটা কি ?” প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমি সেই ছোট্ট কাগজখানি মুঠার মধ্যে গোপন করিয়া ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম। বারান্দার সেই মোড়াটি এখন শূন্য—রোহিণী-দাদাকে আশে-পাশে কোথাও দেখিলাম না। বাসা পর্য্যন্ত কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না। অনতিদূরেই পথিপার্শ্বে একখানি ছোট চা'য়ের দোকান দেখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম, এবং এক-বাটি চা লইয়া ল্যাম্পের আলোকে সেই লেখাটুকু চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিলাম। পেন্সিলের লেখা, কিন্তু ঠিক পুরুষ মানুষের মত হস্তাক্ষর। প্রথমেই সে তাহার স্বামীর নাম এবং তাঁহার পূর্ব্বেকার ঠিকানা দিয়া নীচে লিখিয়াছে “আজ যাহা মনে করিয়া গেলেন, সে আমি জানি; এবং বিপদে আপনার উপর আমি যে কতখানি নির্ভর করিয়াছি, সেও আপনি জানেন। তাই আপনার ঠিকানা জানিয়া লইলাম।” অভয়ার লেখাটুকু বারবার পড়িলাম; কিন্তু ওই কয়টা কথা ছাড়া আর একটা কথাও বেশি আন্দাজ করিতে পারিলাম না। আজ তাহাদের পরস্পরের ব্যবহার চোখে দেখিয়া যে-কোন একটা বাহিরের লোক যে কি মনে করিবে, তাহা অভয়ার মত বুদ্ধিমতী রমণীর পক্ষে অনুমান করা একেবারেই কঠিন নয়। কিন্তু তথাপি সে সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে একবিন্দু ইঙ্গিত করিল না। তাহার স্বামীর নাম ও ঠিকানা ত পূর্ব্বেই শুনিয়াছি; বিপদে আমার উপর নির্ভর করিতে ত তাহাকে বারম্বার চোখেই দেখিয়াছি;—কিন্তু তার পরে ? এখন তাঁহার অনুসন্ধান করিতে সে চায় কি না, কিম্বা আর কোন বিপদ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া সে আমার ঠিকানা জানিয়া লইল—কোনটার আভাস পর্য্যন্ত তাহার লেখার মধ্যে হাতড়াইয়া বাহির করিতে পারিলাম না। কথায়-বার্ত্তায় অনুমান হয়, রোহিণী কোন একটা আফিসে চাকুরি জোগাড় করিয়াছে। কি করিয়া করিল জানি না—তবে খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তাটা আপাততঃ আমার মত তাহাদের নাই;—লুচিও জোটে। তথাপি যে কি রকম বিপদের সম্ভাবনাটা আমাকে শুনাইয়া রাখিল, এবং শুনাইবার সার্থকতাই বা কি, তাহা অভয়াই জানে।

তথা হইতে বাহির হইয়া সমস্ত পথটা, শুধু ইহাদের বিষয় ভাবিতে-ভাবিতেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিছুই স্থির হইল না; শুধু এইটা আজ নিজের মধ্যে স্থির হইয়া গেল, যে, অভয়ার স্বামী লোকটি যেই হোক, এবং যেখানে যে ভাবেই থাকুক, স্ত্রীর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ইহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করার কৌতূহল আমাকে সংবরণ করিতেই হইবে।

পরদিন হইতে পুনরায় নিজের চাকরির উমেদারীতে গেলাম; কিন্তু সহস্র চিন্তার মধ্যেও অভয়ার চিন্তাকে মনের ভিতর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলাম না।

কিন্তু, চিন্তা যাই করি না কেন, দিনের পর দিন সমভাবেই গড়াইয়া চলিতে লাগিল। এদিকে অদৃষ্টবাদী দা' ঠাকুরের প্রফুল্ল মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। ভাতের তরকারি প্রথমে পরিমাণে, এবং পরে সংখ্যায় বিরল হইয়া উঠিতে লাগিল,—কিন্তু চাকরি আমার সম্বন্ধে লেশমাত্র মত পরিবর্ত্তন করিলেন না; যে চক্ষে প্রথম দিনটিতে দেখিয়াছিলেন, মাসাধিক কাল পরেও ঠিক সেই চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন। কাহার 'পরে জানি না, কিন্তু, ক্রমশঃ উৎকণ্ঠিত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু তখন ত জানিতাম না, চাকরি পাবার যথেষ্ট প্রয়োজন না হইলে আর ইনি দেখা দেন না! এই জ্ঞানটি লাভ করিলাম হঠাৎ একদিন রোহিণী বাবুকে পথের মধ্যে দেখিয়া। তিনি বাজারে পথের ধারে তরি-তরকারি কিনিতেছিলেন। আমি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে দেখিতে লাগিলাম,—যদিচ তাঁহার গায়ের জামা-কাপড় জুতা জীর্ণতার প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে,—তীক্ষ্ণ রৌদ্রে মাথায় একটা ছাতি পর্য্যন্ত নাই,—কিন্তু, আহার্য্য দ্রব্যগুলি তিনি বড়লোকের মতই ক্রয় করিতেছেন; সেদিকে তাঁহার খোঁজা-খুঁজি ও যাচাই-বাছাইয়ের অবধি নাই। হাঙ্গামা ও পরিশ্রম যতই হোক, ভাল জিনিসটি সংগ্রহ করিবার দিকে যেন তাঁহার প্রাণ পড়িয়া আছে। চক্ষের পলকে সমস্ত ব্যাপারটা আজ আমার চোখে পড়িয়া গেল। এই সব কেনা-কাটার ভিতর দিয়া তাঁহার ব্যগ্র ব্যাকুল স্নেহ যে কোথায় গিয়া পৌঁছিতেছে, এ যেন আমি সূর্য্যের আলোর মত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। কেন যে এই সকল লইয়া তাহার বাড়ী পৌঁছানো একান্তই চাই, কেন যে ইহার মূল্য দিতে চাকরি তাহাকে পাইতেই হইল, এ সমস্যার মীমাংসা করিতে আর

লশমাত্র বিলম্ব হইল না। আজ বুঝিলাম, কেন সে এই জনারণ্যের মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং আমি পাই নাই! ঐ যে শীর্ণ লোকটি রেঙ্গুনের রাজপথ দিয়া, এক-রাশ মোট হাতে লইয়া, শতছিন্ন মলিন বাসে গৃহে চলিয়াছে, —আড়ালে থাকিয়া আমি তাহার পরিতৃপ্ত মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। নিজের প্রতি দৃক্‌পাত করিবার তাহার যেন অবসরমাত্র নাই। হৃদয় তাহার যাহাতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহাতে তাহার কাছে জামা-কাপড়ের দৈন্য যেন একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেছে! আর আমি? বস্ত্রের সামান্য মলিনতায় প্রতিপদেই যেন সঙ্কোচে জড়-সড় হইয়া উঠিতেছি; পথচারী একান্ত অপরিচিত লোকেরও দৃষ্টিপাতে লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছি!

রোহিণী দা' চলিয়া গেল,—আমি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলাম না; এবং পরক্ষণেই লোকের মধ্যে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেন জানি না, এইবার অশ্রুজলে আমার দু' চক্ষু ঝাপ্‌সা হইয়া গেল। চাদরের খুঁটে মুছিতে-মুছিতে পথের একধার দিয়া ধীরে-ধীরে বাসায় ফিরিলাম, এবং নিজের মনেই বারবার বলিতে লাগিলাম, এই ভালবাসাটার মত এতবড় শক্তি, এতবড় শিক্ষক সংসারে বুঝি আর নাই। ইহা পারে না এতবড় কাজও বুঝি কিছু নাই।

তথাপি বহু-বহু-যুগ-সঞ্চিত অন্ধ-সংস্কার আমার কাণে-কাণে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিতে লাগিল,—ভাল নয়, ইহা ভাল নয়! ইহা পবিত্র নয়,—শেষ পর্য্যন্ত ইহার ফল ভাল হয় না!

বাসায় আসিয়া একখানি বড় লেফাফার পত্র পাইলাম। খুলিয়া দেখি, চাকরির দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। সেগুন কাঠের প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী—অনেক আবেদনের মধ্যে ইঁহারাই গরীবের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ভগবান তাঁদের মঙ্গল করুন।

চাক্‌রি বস্তুটির সহিত সাবেক পরিচয় ছিল না; সুতরাং পাইলেও সন্দেহ রহিল, তাহা বজায় থাকিবে কি না। আমার যিনি 'সাহেব' হইলেন, তিনি খাঁটি সাহেব হইলেও, দেখিলাম, বেশ বাঙ্‌লা জানেন। কারণ, কলিকাতার আফিস হইতে তিনি বদ্‌লি হইয়া বর্ম্মায় গিয়াছিলেন। দুই সপ্তাহ চাকুরির পরে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্রীকান্তবাবু, তুমি ঐ টেবিলে আসিয়া কাজ কর,—মাহিনাও প্রায় আড়াইগুণ বেশি পাইবে।" প্রকাশ্যে এবং মনে-মনে সাহেবকে একলক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া হাড়-বাহির করা টেবিল ছাড়িয়া একেবারে সবুজ-বনাত মোড়া টেবিলের উপর চড়িয়া বসিলাম। মানুষের যখন হয়, তখন এম্‌নি করিয়াই হয়। আমাদের হোটেলের দা'-ঠাকুর নেহাৎ মিথ্যা বলেন না।

গাড়ী-ভাড়া করিয়া অভয়াকে সুসংবাদ দিতে গেলাম। রোহিণী-দা' আফিস হইতে ফিরিয়া সেইমাত্র জলযোগে বসিয়াছিলেন। আজ তাঁহার গ্লাসের জলে, অর্থাৎ নিছক ।।২০ দিয়া উদর পূর্ণ করিবার প্রবৃত্তি কিছুমাত্র দেখিলাম না। বরঞ্চ, যা দিয়া পূর্ণ করিতেছিলেন, তা দিয়া পূর্ণ করিতে সংসারে আর যাহারই আপত্তি থাক্‌, আমার ত ছিল না। অতএব, অভয়ার প্রস্তাবে যে অসম্মত হইলাম না, তাহা বলাই বাহুল্য। খাওয়া শেষ হইতেই রোহিণী দা' জামা গায়ে দিতে লাগিলেন। অভয়া ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিল, "তোমাকে বারবার বল্‌চি রোহিণী-দা, এই শরীরে তুমি এত পরিশ্রম কোরো না, তুমি কি কিছুতেই শুন্‌বে না? আচ্ছা, কি হবে আমাদের বেশি টাকায়? দিন ত বেশ চলে যাচ্ছে।" রোহিণী-দা'র দু' চক্ষু দিয়া স্নেহ যেন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তার পরে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। একটা বামুন পর্য্যন্ত রাখ্‌তে পারচিনে—খেটে-খেটে দু'বেলা আগুন-তাতে তোমার দেহ যে শুকিয়ে গেল!" বলিয়া পান মুখে দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। অভয়া একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া, জোর করিয়া একটু-খানি হাসিয়া বলিল, "দেখুন ত শ্রীকান্ত বাবু, এঁর অন্যায়! সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনির পরে বাড়ী এসে কোথায় একটু জিরুবেন, তা নয়, আবার রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত ছেলে পড়াতে বেরিয়ে গেলেন। আমি এত বলি, কিছুতে শুনবেন না। এই দুটি লোকের রান্নায় আবার একটা রাঁধুনি রাখার কি দরকার বলুন ত? ওঁর সবই যেন বাড়াবাড়ি! না?" বলিয়া সে আর একদিকে চোখ ফিরাইল। আমি নিঃশব্দে শুধু একটু হাসিলাম। না, কি, হুঁ, এ জবাব দিবার সাধ্য আমার ছিল না,—আমার বিধাতা-পুরুষেরও ছিল কি না সন্দেহ।

অভয়া উঠিয়া গিয়া একখানি পত্র আনিয়া আমার হাতে

দিল। কয়েক দিন হইল, বম্মা রেল কোম্পানির আফিস হইতে ইহা আসিয়াছে। বড় সাহেব দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, অভয়ার স্বামী প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কি একটা গুরুতর অপরাধে, কোম্পানীর চাকরি হইতে অব্যাহতি পাইয়া কোথায় গিয়াছে—তাঁহারা অবগত নহেন।

উভয়েই বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। অবশেষে অভয়াই প্রথমে কথা কহিল; বলিল, "এখন আপনি কি উপদেশ দেন?" আমি ধীরে ধীরে কহিলাম, "আমি কি উপদেশ দেব?" অভয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, সে হবে না। এ অবস্থায় আপনাকেই কর্ত্তব্য স্থির করে দিতে হবে। এ চিঠি পাওয়া পর্য্যন্ত আমি আপনার আশাতেই পথ চেয়ে আছি।" মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ কথা। আমার পরামর্শ লইয়া বাহির হইয়াছিলে কি না; তাই, আমার উপদেশের পথ চাহিয়া আছ!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাড়ী ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আপনার মত কি?" অভয়া কহিল, "কিছুই না। বলেন, যেতে পারি; কিন্তু, আমার ত সেখানে কেউ নেই।" "রোহিণী বাবু কি বলেন?" "তিনি বলেন, তিনি ফিরবেন না। অন্ততঃ দশ বছর ও মুখো হবেন না।" আবার বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলাম, "তিনি কি বরাবর আপনার ভার নিতে পারবেন?" অভয়া বলিল, "পরের মনের কথা কি করে জান্‌ব বলুন? তা' ছাড়া, তিনি নিজেই বা জান্‌বেন কি কোরে?" বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার নিজেই কহিল,—"একটা কথা। আমার জন্যে তিনি এক বিন্দু দায়ী ন'ন। দোষ বলুন, ভুল বলুন, সমস্তই একা আমার।"

গাড়োয়ান বাহিরে হইতে চীৎকার করিল, "বাবু, আর কত দেরি হবে?"

আমি যেন বাঁচিয়া গেলাম। এই অবস্থা-সঙ্কটের ভিতর হইতে সহসা পরিত্রাণের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। অভয়া যে যথার্থই অকূল পাথারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, আমার মন তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিল না সত্য, কিন্তু, নারীর এত রকমের উল্টা-পাল্টা অবস্থা আমি দেখিয়াছি, যে, বাহিরে হইতে এই দুটা চোখের দৃষ্টিকে প্রত্যয় করা কতবড় অন্যায়, তাহাও নিঃসংশয়ে বুঝিতেছিলাম।

গাড়োয়ানের পুনশ্চ আহ্বানে আর আমি মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, "আমি শীঘ্রই আর একদিন আস্‌ব" বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলাম। অভয়া কোন কথা কহিল না, নিশ্চল মূর্ত্তির মত মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল; কিন্তু দশ হাত না যাইতেই মনে পড়িল, ছড়িটা ভুলিয়া আসিয়াছি। তাড়াতাড়ি গাড়ী থামাইয়া ফিরিয়া বাড়ী ঢুকিতেই চোখে পড়িল—ঠিক দ্বারের সম্মুখেই অভয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া, শরবিদ্ধ পশুর মত অব্যক্ত যন্ত্রণায় আছাড় খাইয়া যেন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে।

কি বলিয়া যে তাহাকে সান্ত্বনা দিব, আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার তেমনি নীরবে ফিরিয়া গেলাম। অভয়া যেমন কাঁদিতেছিল, তেমনি কাঁদিতেই লাগিল। একবার জানিতেও পারিল না,—তাহার এই নিগূঢ় অপরিসীম বেদনার একজন নির্ব্বাক সাক্ষী এ জগতে বিদ্যমান রহিল।

(৭)

রাজলক্ষ্মীর অনুরোধ আমি বিস্মৃত হই নাই। পাটনায় একখানা চিঠি পাঠাইবার কথা, আসিয়া পর্য্যন্তই আমার মনে ছিল। কিন্তু, একে ত, সংসারে যত শক্ত কাজ আছে, চিঠি লেখাকে আমি কারও চেয়ে কম মনে করি না; তার পরে, লিখিবই বা কি? আজ কিন্তু অভয়ার কান্না আমার বুকের মধ্যে এম্‌নি ভারি হইয়া উঠিল যে, তার কতকটা বাহির করিয়া না দিলে যেন বাঁচি না, এম্‌নি বোধ হইতে লাগিল। তাই বাসায় পৌঁছিয়াই কাগজ কলম জোগাড় করিয়া বাইজীকে পত্র লিখিতে বসিয়া গেলাম। আর সে ছাড়া আমার দুঃখের অংশ লইবার লোক ছিলই বা কে! ঘণ্টা-দুই-তিন পরে সাহিত্য চর্চ্চা সাঙ্গ করিয়া যখন কলম রাখিলাম, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে। কিন্তু পাছে সকাল-বেলায় এ চিঠি পাঠাইতে লজ্জা করে, তাই, মেজাজ গরম থাকিতে-থাকিতেই তাহা সেই রাত্রেই ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

একজন ভদ্র নারীর নিদারুণ বেদনার গোপন ইতিহাস আর একজন রমণীর কাছে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য কি না, এ সন্দেহ আমার ছিল; কিন্তু, অভয়ার এই পরম এবং চরম শঙ্কটের কালে, যে রাজলক্ষ্মী একদিন পিয়ারী বাইজীরও মর্ম্মান্তিক তৃষ্ণা দমন করিয়াছে, সে কি হিতোপদেশ দেয়, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, প্রশ্নটা উল্টা দিক দিয়া একবারও ভাবিলাম না। অভয়ার স্বামীর উদ্দেশ না পাওয়ার সমস্যাই বারবার মনে উঠিয়াছে; কিন্তু পাওয়ার মধ্যেও যে সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিতে পারে, এ চিন্তা একটিবারও মনে উদয় হইল না। আর এ গোলযোগ আবিষ্কার করিবার ভারটা যে বিধাতা-পুরুষ আমার উপরেই নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বা কে ভাবিয়াছিল! দিন-চার-পাঁচ পরে আমার একজন বর্ম্মা কেরাণী টেবিলের উপর একটা 'ফাইল' রাখিয়া গেল,—উপরেই নীল পেন্সিলে বড় সাহেবের মন্তব্য। তিনি 'কেস'টা আমাকে নিজেই নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিয়াছেন। ব্যাপারটা আগাগোড়া পড়িয়া মিনিট-কয়েক স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই—

আমাদের প্রোম অফিসের একজন কেরাণীকে সেখানকার বড় সাহেব কাঠ-চুরির অভিযোগে সস্পেণ্ড করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। কেরাণীর নাম দেখিয়াই বুঝিলাম, ইনিই আমাদের অভয়ার স্বামী। ইঁহারও চার-পাঁচ-পাতা-জোড়া কৈফিয়ৎ ছিল। বর্ম্মা রেলওয়ে হইতে যে কোন্ গুরুতর অপরাধে চাকুরি গিয়াছিল, তাহাও এই সঙ্গে অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। খানিক পরেই আমার সেই কেরাণীটি আসিয়া জানাইল, এক ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহে। ইহার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। নিশ্চয় জানিতাম, প্রোম হইতে তিনি কেসের তদ্বির করিতে স্বয়ং আসিবেন। সুতরাং কয়েক মিনিট পরেই ভদ্রলোক সশরীরে আসিয়া যখন দেখা দিলেন, তখন অনায়াসে চিনিলাম, ইনিই অভয়ার স্বামী। লোকটার প্রতি চাহিবামাত্রই সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরণে হ্যাট-কোট,—কিন্তু যেমন পুরানো, তেম্‌নি নোঙরা। সমস্ত কালো মুখখানা শক্ত গোঁফ-দাড়িতে সমাচ্ছন্ন। নীচেকার ঠোঁটটা বোধ করি দেড় ইঞ্চি পুরু। তাহার উপর, এত পান খাইয়াছে যে, পানের রস দুই কসে যেন জমাট বাঁধিয়া আছে; কথা কহিলে ভয় করে, পাছে-বা ছিট্‌কাইয়া গায়ে পড়ে।

পতি নারীর দেবতা,—তাহার ইহকাল পরকাল; সবই জানি। কিন্তু, এই মূর্ত্তিমান ইতরটার পাশে অভয়াকে কল্পনা করিতে আমার দেহ-মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অভয়া আর যাই হোক্, সে সুশ্রী, এবং সে মার্জ্জিত-রুচি ভদ্রমহিলা; কিন্তু এই মহিষটা যে বর্ম্মার কোন্ গভীর জঙ্গল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল, তাহা যে দেবতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন।

তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার বিরুদ্ধে নালিশটা কি সত্য? প্রত্যুত্তরে লোকটা মিনিট দশেক অনর্গল বকিয়া গেল। তাহার ভাবার্থ এই যে, সে একেবারে নির্দ্দোষ; তবে সে থাকায় প্রোম অফিসের সাহেব দুই হাতে লুঠ করিতে পারেন না বলিয়াই তাহার আক্রোশ। কোন রকমে তাহাকে সরাইয়া একজন আপনার লোক ভর্ত্তি করাই তাঁহার অভিসন্ধি। এক বিন্দু বিশ্বাস করিলাম না। বলিলাম, "এ চাকুরি গেলেই বা আপনার বিশেষ কি ক্ষতি।" তাঁর মত কর্ম্ম-দক্ষ লোকের বর্ম্মা মুলুকে কাজের ভাব্‌না কি? রেলওয়ের চাকুরি গেলে কয়দিনই বা তাঁকে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল?

লোকটা প্রথমে থতমত খাইয়া পরে কহিল, "যা বল্‌চেন, তা নেহাৎ মিথ্যে বল্‌তে পারিনে। কিন্তু কি জানেন মশাই, ফ্যামিলি-ম্যান, অনেকগুলি কাচ্চা বাচ্চা—" "আপনি কি বর্ম্মার মেয়ে বিয়ে করেচেন না কি?" লোকটা হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল, "সাহেব ব্যাটা রিপোর্টে লিখেচে বুঝি? এই থেকেই বুঝ্‌বেন শালার রাগ।" বলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি নরম হইয়া কহিল, "আপনি বিশ্বাস করেন?" আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, "তা'তেই বা দোষ কি?" লোকটা উৎসাহিত হইয়া কহিল, "যা বলেচেন মশাই। আমি ত তাই সবাইকে বলি, যা কোরব, তা বোল্‌্লি স্বীকার কোরব। আমার অমন ভেতরে এক বাইরে আর নেই। আর পুরুষ-মানুষ,—বুঝ্‌লেন না? যা' বোল্‌ব তা স্পষ্ট বোল্‌ব মশাই, আমার

ঢাক্-ঢাক্ নেই। আর দেশেও ত কেউ কোথাও নেই—আর এখানেই যখন চিরকাল চাক্‌রি করে খেতে হবে—বুঝলেন না মশাই?" আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, সমস্ত বুঝিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার দেশে কি কেউ নেই?"

লোকটা অম্লান মুখে কহিল,"আজ্ঞে, না, কেউ কোথাও নেই,—কাকস্য পরিবেদনা—থাকলে কি এই স্থদূর-মামার দেশে আস্‌তে পারতাম? মশাই, বল্‌লে বিশ্বাস করবেন না, আমি একটা যে সে ঘরের ছেলে নই, আমরাও একটা জমিদার!—এখনো আমার দেশের বাড়ীটার পানে চাইলে আপনার চোখ্ ঠিক্‌রে যাবে। কিন্তু অল্প বয়সে সবাই মরে-হেজে গেল,—বললাম, দূর হোক্‌গে; বিষয়-আশয় ঘর-বাড়ী কার জন্যে? সমস্ত জ্ঞাত-গুষ্টিদের বিলিয়ে দিয়ে বর্ম্মায় চলে এলাম।" একটুখানি স্থির থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, "আপনি অভয়াকে চেনেন?" লোকটা চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, "আপনি তাকে জানলেন কি করে?" বলিলাম, "এমন ত হতে পারে, সে আপনার খোঁজ নিয়ে থাওয়া পরার জন্যে এ আফিসে দরখাস্ত করেচে।" লোকটা অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল কণ্ঠে কহিল, —"ওঃ—তাই বলুন! তা' স্বীকার করচি, এক সময়ে সে আমার স্ত্রী ছিল বটে—" "এখন?" "কেউ নয়। তাকে ত্যাগ করে এসেচি।" "তার অপরাধ?" লোকটা বিমর্ষতার ভাণ করিয়া বলিল, "কি জানেন, ফ্যামিলি-সিক্রেট বলা উচিত নয়। কিন্তু আপনি যখন আমার আত্মীয়ের সামিল, তখন বলতে লজ্জা নেই যে, সে একটা নষ্ট স্ত্রীলোক। তাই ত মনের ঘেন্নায় দেশত্যাগী হোলাম। নইলে সাধ করে কি কেউ কখনো এমন দেশ পা' দিয়ে মাড়ায়! আপনিই বলুন না এ কি সোজা মনের ঘেন্না!" জবাব দিব কি, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। গোড়া হইতেই এই ঘোর মিথ্যাবাদীটার একটা কথাও বিশ্বাস করি নাই; কিন্তু এখন নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, এ যেমন নীচ, তেম্‌নি নিষ্ঠুর।

অভয়ার আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তবুও শপথ করিয়া বলিতে পারি—যে অপবাদ স্বামী হইয়া এই পাষণ্ড নিঃসঙ্কোচে দিল,—পর হইয়াও আমি তাহা উচ্চারণ করিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিলাম, "তার এই অপরাধের কথা আপনি আস্‌বার সময় ত বলে আসেন নি! এখানে এসেও কিছুদিন যখন চিঠিপত্র এবং টাকাকড়ি পাঠিয়েছিলেন, তখনও ত লিখে জানান নি?"

মহাপাপিষ্ঠ স্বচ্ছন্দে তাহার বিরাট স্থূল ওষ্ঠাধর হাস্যে বিস্ফারিত করিয়া বলিল,—"এই নিন্ কথা! জানেন ত মশাই, আমরা ভদ্রলোক, শুধু চুপি-চুপি সহ্য করতেই পারি,—ছোটলোকের মত নিজের স্ত্রীর কলঙ্ক ত আর ঢাক-পিটে প্রচার করতে পারিনে। থাক্‌গে, সে সব দুঃখের কথা ছেড়ে দিন মশাই,—এ সব মেয়েমানুষের নাম মুখে আন্‌লেও পাপ হয়। তা'হলে কেসটা ত আপনিই ডিস্‌পোজ করবেন? যাক্, বাঁচা গেল; কিন্তু তা'ও বলে রাখ্‌চি, সাহেব ব্যাটাকে অম্‌নি-অম্‌নি ছাড়া হবে না। বেশ এমন একটু দিয়ে দিতে হবে, বাছাধন যাতে আর কখনো আমার পেছুনে না লাগেন। আমারও মুরুব্বির জোর আছে, এটা যেন তিনি মনে-মনে বোঝেন। বুঝলেন না? আচ্ছা, আমি বলি, হারামজাদাকে হেড-আফিসে টেনে আনা যায় না?" আমি বলিলাম, "না।" লোকটা হাসির ছটায় ফাইলটা একটুখানি সুমুখে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "নিন্, তামাসা রাখুন। বড় সাহেব একেবারে আপনার মুঠোর মধ্যে, সে খবর কি আমি না নিয়েই এসেছি ভাবেন? তা' মরুক্‌গে, আর একবার আমার সঙ্গে লেগে যেন তিনি দেখেন। আচ্ছা, বড় সাহেবের অর্ডারটা আজই বার করে আমার হাতে দিতে পারা যায় না? ন'টার গাড়ীতেই চলে যেতুম, রাত্তিরটা কষ্ট পেতে হোতো না। কি বলেন?" হঠাৎ জবাব দিতে পারিলাম না। কারণ, খোসামোদ জিনিসটা এম্‌নি যে, সমস্ত দুরভিসন্ধি জানিয়া, বুঝিয়াও,—ক্ষুণ্ণ করিতে ক্লেশ বোধ হয়। উল্টা কথাটা মুখের উপর শুনাইয়া দিতে বাধবাধ করিতে লাগিল; কিন্তু সে বাধা মানিলাম না। নিজেকে শক্ত করিয়াই বলিয়া ফেলিলাম, "বড় সাহেবের হুকুম হাতে নিয়ে আপনার লাভ নেই। আপনি আর কোথাও চাক্‌রির চেষ্টা দেখ্‌বেন।" এক মুহূর্ত্তে লোকটা যেন কাঠ হইয়া গেল। খানিক পরে কহিল, "তার মানে?" "তার মানে, আপনাকে ডিস্‌মিস্ করবার নোটই আমি দেব। আমার দ্বারা আপনার কোন সুবিধে হবে না।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল,—হাত যোড় করিয়া কহিল, 'বাঙালী হয়ে বাঙালীকে মারবেন না বাবু; ছেলে পুলে নিয়ে আমি মারা যাবো।" "সে দেখবার ভার আমার ওপরে নেই। তা ছাড়া, আপনাকে আমি জানিনে, আপনার সাহেবের বিরুদ্ধেও আমি যেতে পারব না।" লোকটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বোধ করি বুঝিল, কথাগুলা পরিহাস নয়। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরেই অকস্মাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেরাণী, দরওয়ান, পিয়ন—যে যেখানে ছিল, এই অভাবনীয় ব্যাপারে অবাক্ হইয়া গেল। আমি নিজেও কেমন যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। তাহাকে থামিতে বলিয়া কহিলাম, "অভয়া আপনার জন্যেই বর্ম্মায় এসেছে। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে আমি অবশ্য নিতে বলিনে; কিন্তু, আপনার সমস্ত কথা শুনেও যদি সে মাপ করে,—তার কাছ থেকে চিঠি আন্‌তে পারেন,—আপনার চাক্‌রি আমি বজায় রাখবার চেষ্টা দেখ্‌ব। না হলে আর আমার সঙ্গে দেখা করে লজ্জা দেবেন না—আমি মিছে কথা বলিনে।"

এই নীচ-প্রকৃতির লোকগুলা যে অত্যন্ত ভীরু হয়, তাহা জানিতাম। সে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কোথায় আছে?" "কাল এম্‌নি সময়ে আস্‌বেন, তার ঠিকানা বলে দেব।" লোকটা আর কোন কথা না কহিয়া দীর্ঘ সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যাবেলায় আমার মুখ হইতে অভয়া নিঃশব্দে নতমুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আঁচল দিয়া শুধু চোখ মুছিল, কিছুই বলিল না। আমার ক্রোধেরও সে কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ পরে আবার আমিই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি তাঁকে মাপ করতে পারবে?" অভয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল। "তোমাকে নিয়ে যেতে চাইলে যাবে?" সে তেম্‌নি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল। "বর্ম্মা মেয়েদের স্বভাব যে কি, সে ত তুমি প্রথম দিনেই টের পেয়েচ;—তবু সেখানে যাবার সাহস হবে?" এবার অভয়া মুখ তুলিতে, দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুর ধারা বহিতেছে। সে কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তার পরে বারবার আঁচলে চোখ মুছিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, "না গেলে আর আমার উপায় কি বলুন?" কথাটা শুনিয়া খুসি হইব, কি, চোখের জল ফেলিব,—ভাবিয়া পাইলাম না; কিন্তু উত্তর দিতে পারিলাম না।

সেদিন আর কোন কথা হইল না। বাসায় ফিরিবার সমস্ত পথটা এই একটা কথাই পুনঃ পুনঃ আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন দিকে চাহিয়া কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। শুধু বুকের ভিতরটা—তা' সে কাহার উপর জানি না—একদিকে যেমন নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনই এক নিরাশ্রয় রমণীর ততোধিক নিরুপায় প্রশ্নে ব্যথিত, ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। পরদিন অভয়ার ঠিকানার জন্য যখন লোকটা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ঘৃণায় তাহার প্রতি আমি চাহিতে পর্য্যন্ত পারিলাম না। আমার মনের ভাব বুঝিয়া, আজ সে বেশি কথা না কহিয়া, শুধু ঠিকানা লিখিয়া লইয়াই বিনীতভাবে প্রস্থান করিল। কিন্তু তাহার পরের দিন আবার যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন তাহার চোখমুখের ভাব সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গেছে। নমস্কার করিয়া অভয়ার এক ছত্র লেখা আমার টেবিলের উপর ধরিয়া দিয়া বলিল, "আপনি যে আমার কি উপকার করলেন, তা মুখে বলে কি হবে,—যতদিন বাঁচব আপনার গোলাম হয়ে থাক্‌ব।"

অভয়ার লেখাটার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিলাম, "আপনি কাজ করুন গে, বড় সাহেব এবার মাপ করেছেন।" সে হাসিমুখে কহিল, "বড় সাহেবের ভাব্‌না আর আমি ভাবিনে, শুধু আপনি ক্ষমা করলেই আমি বর্ত্তে যাই—আপনার শ্রীচরণে আমি বহু অপরাধ করেচি।" এই বলিয়া আবার সে বকিতে সুরু করিয়া দিল—তেম্‌নি নির্জ্জলা মিথ্যা এবং চাটুবাক্য; এবং মাঝে মাঝে রুমাল দিয়া চোখ মুছিতেও লাগিল। অত কথা শুনিবার ধৈর্য্য কাহারও থাকে না—সে শাস্তি আপনাদের দিব না—আমি শুধু তাহার মোট বক্তব্যটা সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি। তাহা এই যে, সে স্ত্রীর নামে যে অপবাদ দিয়াছিল, তাহা একেবারেই মিথ্যা। সে কেবল লজ্জার দায়েই দিয়াছিল; না হইলে, অমন সতীলক্ষ্মী কি আর আছে! এবং মনে-মনে অভয়াকে সে চিরকালই প্রাণের অধিক ভালবাসে। তবে, এখানে এই যে আবার একটা উপসর্গ জুটিয়াছে, তাহাতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা

ছিল না, শুধু বর্ম্মাদের ভয়ে প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই করিয়াছে (কিছু সত্য থাকিতেও পারে)। কিন্তু আজ রাত্রেই যখন সে তাহার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে লইয়া যাইতেছে, তখন সে বেটিকে দূর করিতে কতক্ষণ! আর ছেলে-পিলে? আহা! বেটাদের যেমন শ্রী ছাঁদ, তেম্‌নি স্বভাব! তারা কি কাজে লাগ্‌বে? সময়ে দুটো খেতে-পরতে দেবে, না মরলে এক গণ্ডুস জলের প্রত্যাশা আছে! গিয়াই সমস্ত একসঙ্গে কাঁটাইয়া বিদায় করিবে, তবে তাহার নাম— ইত্যাদি ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "অভয়াকে কি আজ রাত্রেই নিয়ে যাবেন?" সে বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিল, "বিলক্ষণ! যতদিন চোখে দেখিনি, ততদিন কোনরকমে না হয় ছিলাম; কিন্তু, চোখে দেখে আর কি চোখের আড়াল করতে পারি? একলা এত দূরে এত কষ্ট সয়ে সে যে শুধু আমার জন্যেই এসেচে! একবার ভেবে দেখুন দেখি, ব্যাপারটা।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাকে কি একসঙ্গেই রাখবেন?" "আজ্ঞে, না। এখন প্রোমের পোষ্টমাষ্টার মশায়ের ওখানেই রাখ্‌ব। তাঁর স্ত্রীর কাছে বেশ থাক্‌বে। কিন্তু শুধু দুদিন—আর না। তার জন্যেই একটা বাসা ঠিক করে, ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাবো।" অভয়ার স্বামী প্রস্থান করিলে, আমিও আমার দিনের কাযে মন দিবার জন্য সুমুখের ফাইলটা টানিয়া লইলাম।

নীচেই অভয়ার সেই লেখাটুকু পুনরায় চোখে পড়িল। তার পরে কতবার যে সেই দুই ছত্র পড়িয়াছি, এবং আরও কতবার যে পড়িতাম, তাহা বলিতে পারি না। পিয়ন বলিতেছিল, "বাবুজী, আপনার বাসায় কি আজ কাগজ-পত্র কিছু দিয়ে আস্‌তে হবে?" চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, কখন্ সুমুখের ঘড়িতে সাড়ে চারিটা বাজিয়া গেছে, এবং কেরাণীর দল দিনের কর্ম্ম সমাপন করিয়া যে যাহার বাড়ী প্রস্থান করিয়াছে।

কোনারক

(প্রত্যাবর্ত্তন)

[শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ]

আবুল ফজল প্রভৃতিকে রেহাই দিয়া এখন কোনারক পরিত্যাগের কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

বেলা দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিয়া সকলের প্রস্তুত হইবার কথা; কিন্তু দেখিলাম, উৎকলেও আমাদের বঙ্গদেশেরই ন্যায় ডাকহাঁক, তাড়াতাড়ি করিয়াও অনেক কার্য্য ঠিক সময়ে হইয়া উঠে না। যাহা হউক, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা জিনিসপত্র বাঁধিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দলপতি মহাশয় আমাদিগের কষ্ট নিবারণার্থ সোজা পথ দিয়া লইয়া যাইবার জন্য স্থানীয় চাপরাসীটিকে পথ-প্রদর্শক হইবার আদেশ করিলেন। আমরা আন্দাজ ১৷৷টা কি পৌনে দুইটার সময় বাহির হইয়াছিলাম। কতকদূর নূতন পথে আসিয়া শুনিলাম, পূর্ব্বদিন বৃষ্টি হওয়ায় পথে অত্যন্ত কাদা হইয়াছে; তাই গাড়োয়ান মহাশয়গণ কর্দ্দম অপেক্ষা বালুখণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছেন। নাসিকা বেষ্টন করিয়া পুনরায় নিয়াখিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইতে হইল। মধ্যে শ্রীমান ভু-চন্দ্র কতকগুলি হরিণ দেখিয়া, বিনা অস্ত্রেই মৃগয়া করিবেন বলিয়া, কোমর বান্ধিয়া চটি-জুতা পায় ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন। ভু-চন্দ্রের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও তাঁহার সরস বাক্ চাতুর্য্যের গুণে আমাদিগের সুদীর্ঘ গো-শকট বাসও সেরূপ কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় নাই। উড়ো জাহাজের আমদানী না হইলে, উটের ডাক বসাইয়াও কোনারক-গমনের এই পথক্লেশ নিবারণের উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

এক সময়ে চিত্রোৎপল নামক একটী নদ মন্দিরের অনতিদূরে প্রবাহিত ছিল। শুনা যায়, পরস্পর প্রণয়বদ্ধ কোন চণ্ডাল-যুবক ও ব্রাহ্মণ-যুবতীর দেহ-ধৌত জল হইতে

নদটীর উৎপত্তি, এবং তাহাদেরই নামানুসারে ইহার নামকরণ হয়। দেব মকরকেতন যে সর্ব্বজয়ী—বর্ণাশ্রমধর্ম্মী দেশীয় জনসাধারণও তাহা ভুলিতে পারে নাই। অনেকের মতে মন্দিরের মালমসলা ও প্রস্তরাদি এই নদ অবলম্বন করিয়া জলপথেই আনীত হয়। পণ্ডিতগণের মতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্-সঙের গ্রন্থে চি-লি-তা লো নামক যে নদের উল্লেখ পাওয়া যায়, উহা চিত্রোৎপল ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখন নদটীর আর কোনও চিহ্ন নাই। কেবল চন্দ্রভাগা নামক তীর্থস্থানে ইহার কিয়দংশ একটি পবিত্র জলাশয়রূপে বিরাজ করিতেছে। স্থানটি কোনারক হইতে প্রায় একমাইল কি দেড়মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের সেখানে যাওয়া ঘটে নাই; শুনিয়াছি, সেখানে না কি মেলা বসিয়া থাকে। কোনারকের প্রাচীন নাম "অর্কক্ষেত্র" ও "মৈত্রেয় বন।" কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব স্নানকালে বিমাতৃগণকে দর্শন করায় পিতৃ-অভিশাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি মৈত্রেয় বনে আসিয়া সূর্য্যের একবিংশতি নাম জপ করিয়া রোগমুক্ত হয়েন। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত কপিল-সংহিতায় এ কাহিনী বর্ণিত আছে। শাম্ব এই চন্দ্রভাগা তীর্থে স্নানকালেই না কি সূর্য্যের সুন্দর মূর্ত্তি পাইয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন। সূর্য্যোপাসনা বা Heliolatry শকজাতি কর্ত্তৃক ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল কি না, পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করিবেন। তবে একসময়ে যে ইহা আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড মন্দির এবং এই কোনার্ক বা কোনারকের অর্ক মন্দির হইতেই বুঝিতে পারা যায়।*

কোনারকে কিছুই মিলে না; দোকানপাট নাই, খাদ্য-দ্রব্যাদি না লইয়া গেলে, প্রায় উপবাসী থাকিতে হয়। ডাক-বাঙ্গালায় দুইটিমাত্র খট্টা;—অধিক লোক গেলে মঠ বাবাজীর কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন অন্য গতি নাই। মন্দিরের কারুকার্য্যের খ্যাতি যতই দেশে-বিদেশে প্রচারিত হইতেছে, শিল্পকলাবিদ্ মনস্বী ব্যক্তিগণ ততই এই প্রাচীন কীর্ত্তির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। র-ভায়ার নিকটে গিয়া দেখিয়াছিলাম, বাঙ্গলোর বহিতে অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় সুপণ্ডিতগণের নাম রহিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সভ্যগণ এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। মহামতি জজ উড্রফ এবং Ideals of the East-প্রণেতা জাপানী ওকাকুরাও আসিয়াছিলেন। কয়েকজন শিক্ষিতা মহিলাও আসিয়াছিলেন শুনিলাম। অপরাপর দর্শকগণের মধ্যে সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মদীয় অধ্যাপক বহরমপুর কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরও নাম রহিয়াছে দেখিলাম। রহস্যপ্রিয় র—না কি মন্তব্য-বহির কিয়দংশ নকল করিয়া লইতে ক—বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ক—বাবুর মুখে শুনিলাম, কলিকাতাবাসী একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি কোনারকে বরফ ও সুগন্ধি কেশতৈল পাওয়া যায় না বলিয়া নালিশ করিয়া-ছিলেন। মন্তব্যটি পূর্ত্তবিভাগের কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরিত হইলে, তিনি লেখকের উদ্দেশে যে কয়েকটী তীব্র শ্লেষাত্মক বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, র—বোধ হয় তাহা বন্ধুমহলে প্রচারের উদ্দেশ্যেই হুবহু নকল করাইয়া লইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বানুবৃত্তি করিতে গিয়া প্রায় নিয়াখিয়ার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছি। মহারথীগণের প্রত্যাবর্ত্তনের কথা পুনরায় আরম্ভ করি। স্থানীয় লোকের দেশীয় ভূগোলের জ্ঞান অধিক হওয়ারই সম্ভাবনা; কিন্তু বন্ধু র—প্রদত্ত চাপরাসীটির বেলায় তাহার ব্যতিক্রম দেখা গেল। সে অনেক ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া 'খোদার' উপর নির্ভরশীল এই "নিরাশ্রয়"দিগকে পুনরায় নিয়াখিয়া তীরেই আনিয়া ফেলিল। তখন অন্ধকার বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিয়াছে। বাতাস বেগে বহিতেছিল; গাড়ীর ভিতরে অতি কষ্টে গোটাদুই 'বিড়ি' ও দুইটি লণ্ঠন জ্বালাইয়া লওয়া হইল। শকট-চালকেরা দোকান অভিমুখে প্রস্থান করিল। পথে অকারণ বিলম্ব করিতে উৎকলনিবাসীরা বেশ সুপটু। শুনিলাম, নিয়াখিয়ায় জোয়ার আসিতে আর বিলম্ব নাই; জোয়ার

* খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্য-ভারতেও সৌরোপাসনা প্রচলিত ছিল; কিন্তু পরে ইহা বিষ্ণু-উপাসনার সহিত মিশিয়া যায়। "সূর্য্য-নারায়ণ" এই নামটি এখনও এ উক্তির সমর্থন করিতেছে। মধ্য ভারতে খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত সূর্য্যমন্দিরের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে (Report of Arch. Survey, W. India, Vol. IX p.73 74)। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে বঙ্গদেশে সেনরাজগণের সময়েও রাজপরিবারের মধ্যে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। সেনরাজগণের মধ্যে কেহ-কেহ আপনাকে পরম সৌর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

আসিলে আর ৩৷৪ ঘণ্টার মত গাড়ী পার করান যাইবে না। অনেক তর্জনগর্জনের পর গাড়োয়ানদিগকে ফিরাইয়া আনা হইল। পার হইবার সময় একখানি গাড়ি নদীর মধ্যে আট্‌কাইয়া রহিল। অপর গাড়োয়ানগণ ইতিমধ্যে নদী পার হইয়া নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা আর পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া দেখিতেও রাজী নহে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন, ভারতবাসীগণের বিশেষতঃ বাঙ্গালী ও উড়িয়াদিগের এই সহানুভূতির অভাবই জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়। অবশেষে মন্নু চাপরাসীর গালি খাইয়া কয়েকজন ফিরিয়া গিয়া অতি কষ্টে গাড়ীখানিকে উদ্ধার করিয়া আনিল। তাহার পর পুনরায় গোঁড়ি-গুগ্‌লা অপেক্ষাও মন্থর গতিতে শকটপঙ্ক্তি বালির উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

রাত্রিটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল, এবং সন্ধ্যাবেলা আহারাদির আর কোনও হাঙ্গাম ছিল না বলিয়া, আমরা অনেকেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় আড়াইটা তিনটার সময় হঠাৎ শিরোদেশ অধঃস্ত বোধে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখিলাম, গাড়ী থামাইয়া গাড়োয়ান ডাকাডাকি করিতেছে। তাহার কথার মর্ম্মবোধ মাত্রই নিদ্রা-জড়িমা পলকে ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিতেছিল, তাহার একটি গরু "পড়িয়া" গিয়াছে, সে আর যাইতে পারিবে না। আমাদিগকে একক্রোশ দূরে অবস্থিত বালিঘাই বাঙ্গলোয় যাইয়া, গাড়ীর সন্ধান করিতে পরামর্শ দিয়া জানাইল, তাহার বলীবর্দ্দটী সুস্থ হইলে সে নিকটস্থ গ্রামে তাহার কোনও আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় লইবে। এবার আর গাড়ী বালিঘাইয়ের পথে যাইতেছিল না। পথপ্রদর্শক মহাশয়ের নূতন পথ আবিষ্কার করিবার প্রবৃত্তি তখনও মিটে নাই। আমরা ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নামিয়া পড়িলাম। কোথায় রাত্রিটুকু নির্ব্বিবাদে যাইতে পারিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম,—কোথা হইতে পথমধ্যে এই বিপদ। মরুভূমে অতর্কিতে ফাঁপরে পড়িয়া মরু-বংশজাতাস্বাদ ওমার খৈয়াম কবির একটি চতুষ্পদী কবিতার কথা মনে পড়িল।

'The Worldly Hope men set their
Heart upon,
Turns Ashes—or it prospers; and anon,
Like Snow upon the Desert's Dusty fall
Lighting a little hour or two—is gone."
—Rubaiyat, XVI.

মানবের সুখ আশা এ ছার জগতে
ফলে—কিম্বা শুধু ভস্মে-হয় পরিণত।
কোথা মিলাইয়া যায় ক্ষণেক উজলি
ধূলিময় মরুমুখে তুষারের মত॥

অগ্রগামী গাড়ী-কয়খানির আরোহীরা সকলেই নিদ্রাতুর; ডাকিয়াও বড় সাড়া পাওয়া যায় না। আমি অধ্যাপক ক—এর সহিত বালিঘাই অভিযানেই বদ্ধপরিকর হইলাম। এমন সময় মুন্সী মহাশয়ের গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। তিনি স্বেচ্ছায় অপকৃষ্ট গাড়ীখানি বাছিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া এতাবৎ পিছনে পড়িয়া ছিলেন। সহৃদয় মুন্সীজী আমাদের অবস্থা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া, জিনিসপত্রাদি অন্য গাড়ীতে ভাগ করিয়া দিয়া, নিজ শকটে আমাদিগের জন্য স্থান করিয়া দিলেন; নিজের কষ্টের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। সে রাত্রি মুন্সীজির আর বড় ঘুম হয় নাই। তিনি গরু ও গাড়োয়ান তাড়াইয়াই রজনীর বাকি অংশটুকু কাটাইয়া দিলেন। প্রাতঃকালে একটি পুষ্করিণীর সন্নিকটে গাড়ীগুলি আসিয়া লাগিল। দুধের পসরাবাহী একজন গোপ-যুবকের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সংগ্রহ করা হইল। আমরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া জলযোগে নিযুক্ত হইলাম।

প্রাতরাশ সমাধা করিয়া পুনরায় যাওয়ার উদ্যোগ করিতে-করিতে অৰ্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল। ভূ-চন্দ্র কোথা হইতে একটি "কেতকী পনস" (কেয়াগাছের ফল) সংগ্রহ করিয়াছিলেন। "আনারস" মনে করিয়া অনেকেরই লুব্ধ দৃষ্টি উহার প্রতি ধাবিত হইতেছিল। পরে শুনা গেল, পূর্ব্বক্রীত আনারসটি পথে কোথায় গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়াছে। কেতকী-ফলগুলির আনারসের সহিত বর্ণ ও আকারগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু মনুষ্যগণের আহারের যোগ্য নহে, এই যা দুঃখ। উড়িয়ারা এগুলি শুকাইয়া অনেক সময় ইন্ধন রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

বন্ধুবর র—এর নিকট শুনিয়াছিলাম, "বালুখণ্ডে" মধ্যে-মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকা দেখা যায়। ভূ-চন্দ্র সহজে আশ্চর্য্য হইবার লোক নহেন। তাঁহার মতে, মৃগ যখন আছে, তখন মৃগতৃষ্ণিকাই বা থাকিবে না কেন! আমরা দূরে ধবল

সৌধশ্রেণীর ন্যায় কি যেন দেখিতে পাইতেছিলাম। মিত্র মহাশয় বলিলেন, উহাই মরীচিকা। এই উপলক্ষে ভূ চন্দ্র উষ্ট্রের সহিত অত্রস্থ হরিণগুলির বর্ণগত সাদৃশ্য ও মরু-বিচরণ-প্রিয়তা প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া যে নব-উদ্বর্ত্তন বাদের উদ্ভাবনা করিলেন, তাহাতে স্বয়ং দার্ব্বিনও গুঁড়া হইয়া যান। হয় ত পুরীর সমুদ্রতীরস্থ সৌধগুলি (Refraction—প্রতিভঙ্গ বা আলোক-রশ্মির দিক-পরিবর্ত্তন) বশতঃ প্রতিফলিত হইয়া এইরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকিবে; কারণ, মরুভূমে বায়ুস্তরের ঘনত্ব প্রায়ই সকল স্থলে সমান থাকে না। মধ্যে আর একটি গরুর দুরবস্থা দেখিয়া মুন্সী সাহেব বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি হিন্দু নহেন বটে, কিন্তু এই উৎকল বৈষ্ণবগণ অপেক্ষা তাঁহার জীবে দয়া অনেক অধিক। তিনি অপর কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে পথিমধ্যে চারি আনা দিয়া একটি বলদ ভাড়া করিয়া লইয়া শ্রমকাতর পশুটির বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে প্রায় বেলা তিনটার সময় বালুরঘাটে আসিয়া পৌঁছান গেল। হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে broom বা planter quister রোপণ করিয়া সৈকতভূমির যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করা হইয়া থাকে, দেখিলাম, মরুখণ্ডের সীমান্তভাগেও সেই-রূপ cactus প্রভৃতির বেড়া দিয়া বালুময় উষরক্ষেত্র মনুষ্য-ব্যবহারোপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। এখানে আবার ঘণ্টাখানেক স্থিতি।

আমরা ক্রমে গুণ্ডিচা-বাড়ীর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী গুণ্ডিচা-দেবীর নামানুসারে এই মন্দিরটি অভিহিত হইয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্নের নামে মাত্র একটী পুষ্করিণীর নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই পুষ্করিণী ব্যতীত একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে স্থাপিত একটি নৃসিংহ-মূর্ত্তিও তথাকথিত বৌদ্ধ রাজা ইন্দ্র-দ্যুম্নের কীর্ত্তি-ঘোষণা করিতেছে। যাইবার দিন এ স্থানটি দেখা হয় নাই; তাই সদলবলে এখানে অবতীর্ণ হওয়া গেল। কেবল মিত্র মহাশয় একাত্ম-গৌরবে পুরী চলিয়া গেলেন। গুণ্ডিচা-বাড়ীতে বড় কিছু দেখিবার নাই। পাণ্ডা মহাশয়েরা কিছু কিছু দর্শনী আদায় করিয়া লইয়া থাকেন। উহা দিতে অঙ্গীকার করার ফলস্বরূপ রত্নবেদী স্পর্শ করিবার অধিকার পাওয়া গেল। মধ্যাকার বড় হলটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত, ইহার মধ্যাংশের সম্মুখেই রত্নবেদী। গুণ্ডিচা-বাড়ীতে বেদীটি কিরূপ সম্মানিত হয় জানি না, তবে শ্রীমন্দিরের বেদী যে পবিত্রতায় বিগ্রহত্রয়ের সমতুল্য জ্ঞানে অর্চ্চিত হইয়া থাকে, একথা অনেকেরই মুখে শুনিয়াছি। গুণ্ডিচা-গৃহের বহির্দ্দেশে কিছু "দঙ্কের" (পন্থের) কাজ আছে। 'মহাবীর' অঞ্জনানন্দন প্রভৃতির আধুনিক চিত্রেরও অভাব নাই। ভিতরের (Hall) হলের যে অংশটি গির্জ্জাঘরের nave বা মধ্যভাগ-সদৃশ, সেখানেও অনন্তশয্যা, সীতার বিবাহ ও পৌরাণিক যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতির চিত্র রহিয়াছে। প্রস্তরে খোদিত যে সকল পুরাতন চিত্র আছে, তাহার উপর সযত্নে চূণকাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গুণ্ডিচা-বাড়ী না কি জগন্নাথ দেবের বিলাস গৃহ। কোথায় পড়িয়াছিলাম, "এতৎ ন গুণ্ডিচা গৃহং" প্রভৃতি শ্লেষ-বাক্যে বিদগ্ধা প্রণয়িনী "জগবন্ধুর" কর্ত্তব্য জ্ঞান উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; সুতরাং এখানে যে দুই একটি সম্ভোগ চিত্র দেখা যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এগুলি পন্থের কাজ - তাহাও পুরাতন নহে; শুনা যায়, প্রাচীনত্বে বৎসর-চল্লিশের অধিক হইবে না। Les monuments de L' Inde (ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য শিল্পের স্মরণচিহ্ন) নামক গ্রন্থপ্রণেতা ডাঃ গুস্তাভ লে বঁ (Dr. Gustave le Bon) গুণ্ডিচা-বাড়ীর কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার মতে এই মন্দিরটি জগন্নাথ মন্দিরের সমসময়েই নির্ম্মিত। মসিয়ে বঁ বলিয়াছেন, "পবিত্রতার হিসাবে জগন্নাথের মন্দিরের পরেই গুণ্ডিচা-গৃহের স্থান; কিন্তু এখানে প্রস্তরে খোদিত বা গৃহ-প্রাচীরে নানাবর্ণে রঞ্জিত যে সকল চিত্র চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, অশ্লীলতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, সেগুলি বাস্তবিকই অত্যন্ত কুৎসিত (particulierement hideuses)। নিকটস্থ ভুবনেশ্বরের আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্যের সহিত তুলনা করিলে - এমন কি পুরীর মন্দিরের কয়েকটি খোদিত দরজার সহিত মিলাইয়া দেখিলেও, এগুলি শিল্প-কলার কি অত্যধিক অবনতি সূচিত করিতেছে, তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকা যায় না। একই জাতি কর্ত্তৃক যে এরূপ নিতান্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কারুকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা সহজে স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না।" গুণ্ডিচা-বাড়ী সমুচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত বলিয়া গুণ্ডিচা গড় নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। লে বঁ সাহেব নিজ পুস্তকে ভ্রমক্রমে গুণ্ডিচা-গাড়ী লিখিয়াছেন।

গুণ্ডিচা-বাড়ী ত দেখা সাঙ্গ হইল। এখান হইতে পদ-ব্রজেই বাসায় যাওয়া গেল; তবে পথপ্রদর্শক মহাশয় সোজা পথ মনে করিয়া কিছু ঘুরান পথ দিয়াই গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইলেন। আমরা পুরী-প্রবেশ করিলাম।

মোড়ল

(ছোট্টো গল্প)

[শ্রী—————————]

গ্রামের নাম হরিবপুর। অধিবাসী দেড়শত ঘর চণ্ডাল, দুইতিন ঘর কামার কুমার, আর এক ঘর দরিদ্র ব্রাহ্মণ। চণ্ডালদিগের অনেকেরই অবস্থা ভাল; তাহার মধ্যে রঘুনাথই সর্ব্বপ্রধান;—পাটের কাজ করিয়া সে যথেষ্ট অর্থশালী হইয়াছে।

ব্রাহ্মণটীর ভিন্ন-ভিন্ন গ্রামবাসী আত্মীয় কুটুম্বেরা তাঁহাকে কতবার বলিয়াছে যে, এই চণ্ডালের গ্রামে একাকী বাস করা তাঁহার পক্ষে নানা কারণেই কর্ত্তব্য নহে; বিশেষতঃ চণ্ডালেরা যখন ক্রমে ধনসম্পত্তিশালী হইতেছে, তখন হয় ত ঠাকুর মহাশয় কোন্ দিন বিপন্ন হইয়া পড়িবেন। ঠাকুর কিন্তু সে কথায় কর্ণপাতও করিতেন না,—তিনি বলিতেন "নারায়ণ সহায় আছেন,—ভয় কি?"

আত্মীয় স্বজন যে বিপদের ভয় করিয়াছিল, তাহাই হইল। এক শনিবার সন্ধ্যার সময় ঠাকুর মহাশয় সংবাদ পাইলেন যে, সোমবারে রঘুনাথের ছেলের বিবাহ; সে বিবাহে সাতখান গ্রামের সমস্ত চণ্ডাল নিমন্ত্রিত হইবে। রঘুনাথ এবার ঠাকুর মহাশয়কেও তাহার বাড়ীতে পাত পাড়াইবে। ঠাকুর মহাশয় অস্বীকার করিলে, তাহাকে আর সপরিবারে ধানের ভাত খাইতে হইবে না।

সংবাদ শুনিয়াই ঠাকুর মহাশয়ের স্ত্রী পুত্র-কন্যা মহা ব্যাকুল হইয়া পড়িল; তাহারা ঠাকুর মহাশয়কে বলিল যে, জাতি বাঁচাইতে হইলে সেই রাত্রিতেই তাহাদের গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন "তোমরা ভয় পাচ্ছো কেন? বেশ ত রঘুনাথ নিমন্ত্রণ করুক না। আমি তাহার বাড়ীতে পাত পাড়িব। নারায়ণ আছেন—ভয় কি?" অনুনয়-বিনয়, কান্নাকাটি কিছুতেই ঠাকুর মহাশয় টলিলেন না।

পরদিন রঘুনাথ নিমন্ত্রণ করিতে আসিল,—ঠাকুর মহাশয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সোমবার মধ্যাহ্নে নামাবলি গায়ে দিয়া, শুভ্র উপবীত দোলাইয়া ঠাকুর মহাশয় রঘুনাথের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ-ভোজন ত হইবে! ঠাকুর মহাশয়ই একমাত্র ব্রাহ্মণ! তাঁহার জন্য পাতা দেওয়া হইল। ঠাকুর মহাশয় সহাস্যবদনে আসনে গিয়া বসিলেন। সাত গাঁয়ের চণ্ডালেরা এই ব্রাহ্মণ-ভোজন দেখিবার জন্য কাতার দিয়া দাঁড়াইল!

তখন ঠাকুর মহাশয় সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "দেখ, আমার ত জাতি যাইবেই; তাহাতে আমি দুঃখিত নই। তোমাদের কাছে আমার একটী অনুরোধ। তাহা কিন্তু পালন করিতেই হইবে।" সকলেই হাঁ হাঁ করিয়া স্বীকার করিল। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন "আমার অনুরোধ এই যে, আমার ভোজন-দক্ষিণাটা আগেই দিতে হইবে; এবং তোমাদের এই 'সাতখানি গ্রামের চণ্ডালের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি, সেই আমার দক্ষিণা এখনই হাতে করিয়া দিবে।"

'এ কথা খুব ভাল কথা' বলিয়া সকলেই স্বীকার করিল। তখনই এই সাত গাঁয়ের চণ্ডালের বৈঠক বসিল। এ বলে 'আমিই সাত গাঁয়ের মোড়ল', ও বলে 'সে কি কথা, আমিই মোড়ল'। মহাগণ্ডগোল আরম্ভ হইল। প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তাহার পর ঝগড়া;—তাহার পর হাতা-হাতি;—তাহার পর লাঠালাঠি;—রক্তারক্তি ব্যাপার! তখন মার-মার শব্দে ক্রিয়াবাড়ী কম্পিত হইতে লাগিল। সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। ঠাকুর হাসিতে-হাসিতে গৃহে ফিরিয়া গৃহিণীকে বলিলেন "গিন্নী, মোড়লই আজ জাত বাঁচিয়েছে। নারায়ণ আছেন—জাত মারে কে?"

ভাবের অভিব্যক্তি

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

[এই 'ভাবের অভিব্যক্তি'র অভিনেতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃতিত্বের পরিচয় আজ কয়েক-মাস হইতে 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণ পাইতেছেন। ইনি একজন উৎকৃষ্ট চিত্রকর, ইঁহার অঙ্কিত তৈলচিত্র অনেক রাজা-মহারাজ ও ধনীলোকের গৃহে আছে। ইনি কোন ব্যবসাদার রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা নহেন; সখের রঙ্গমঞ্চে ইতঃপূর্ব্বে দুই একবার অভিনয় করিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু ইনি মানুষের বিভিন্ন ভাব এমন সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত করিতে পারেন যে, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিতে হয়। অনেক সময় মনে হয়, হয় ত একই ব্যক্তি অভিনয় করিতেছেন না। এ ক্ষমতা বড় সাধারণ নহে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত বাঙ্গালী অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই-তিনজনের এ প্রকার অভিব্যক্তির ক্ষমতা ছিল। আমরা এই নবীন শিল্পী, প্রতিভাবান্ অভিনেতাকে সহস্র ধন্যবাদ করিতেছি; তিনি ক্রমেই যে অধিকতর যশস্বী হইবেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বর্ত্তমান সংখ্যায় চারি অঙ্কে চারিখানি অভিব্যক্তির পরিচয় শ্রীযুক্ত শচীনন্দন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদিগকে প্রদান করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

— ভারতবর্ষ-সম্পাদক]

"কেন তুমি—?"

"তাতে হয়েছে কি ?"

মুসলমান বেশে

একাধারে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন

বাতব্যাধিগ্রস্ত—ফোকলা—টেরা—হাবার স্ফূর্ত্তি

প্রথম অঙ্ক

হুর্‌রে! বাবা লিখেছেন, আস্‌ছে ৩০শে বিয়ে!

বিয়ের চিঠি

দ্বিতীয় অঙ্ক

অবাক্ কর্‌লে, হাঁট্‌বো কি হে! গাড়ী ডাক, গাড়ী ডাক!

জামাই বাবু

প্রথম অঙ্কের বিষয়—কলেজ প্রত্যাগত যুবক মেসে ফিরিতেই পিতার চিঠিতে আপনার বিবাহের সংবাদে উৎফুল্ল হইয়াছে। ভাবটা যেন—হুর্‌রে, বাবা লিখেছেন, আস্‌ছে ৩০শে বিয়ে! আহ্লাদের মাত্রাটা মুখে বেশ ফুটিয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের বিষয়—বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জামাই-বাবু এখনও ছাত্রজীবন যাপন করিতেছেন (বলা বাহুল্য শ্বশুর মহাশয়ের অনুগ্রহে)। বায়স্কোপ জিনিসটা ইনি বড়ই পছন্দ করিয়া থাকেন। সে-দিন বায়োস্কোপে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন। জনৈক বন্ধুর হাঁটিয়া যাইবার প্রস্তাবটা ইঁহার মোটেই পছন্দ হয় নাই। ভাবটা যেন—অবাক্ কর্‌লে, হাঁটবো কি হে? গাড়ী ডাক, গাড়ী ডাক।

তৃতীয় অঙ্ক

বাবা!—দশ আনা দিয়ে তোয়ালে কেনা হইয়েছে ?

আর্থিক সমস্যা।

চতুর্থ অঙ্ক

আঃ—আমার কপাল ! খুকীর এরারুট ত আনা হয় নি

শেষ দশা

তৃতীয় অঙ্কের বিষয়—ছাত্র-জীবন অনেক দিন গত হইয়াছে। সংসারের বোঝা ঘাড়ে পড়িয়াছে। বায়স্কোপে আর যান না। দুই একটী পুত্রকন্যাও হইয়াছে। তাহাদিগকে মিতব্যয়িতা শিক্ষা দিয়া থাকেন। সে দিন দৈনিক হিসাবের খাতা দেখিতেছিলেন—গিন্নির একটা বাহুল্য খরচ দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। বড় খুকীর জন্য ৷৵০ আনা দিয়া একখানা তোয়ালে আনা হইয়াছিল। ভাবটা যেন—বাবা! দশ আনা দিয়ে তোয়ালে কেনা হয়েছে? কেন, দশ পয়সার গামছায় কি চল্‌তে পারতো না?

চতুর্থ অঙ্কের বিষয়—ছাত্র-জীবনের সে আশা, সে উদ্যম আর এখন নাই। দারিদ্র্য ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দিয়াছে। অর্থচিন্তায় অকাল-বার্দ্ধক্য আনয়ন করিয়াছে। নগ্নপদে বাজার করিয়া ফিরিতেছিলেন। খুকীর জন্য এ্যারোরুট আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ভাবটা যেন—আঃ—আমার কপাল, খুকীর এ্যারোরুট ত আনা হয় নি! ব্যাচারির মুখ দেখিলে করুণার উদ্রেক হয় না কি?

রোষ

হিংসা

কান্না

হাসি

ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট জেনারেল

শ্রীযুক্ত সার বিনোদচন্দ্র মিত্র

(ইনি এই নববর্ষে নাইট হইয়াছেন)

সাময়িকী

এবার আমাদের বাঙ্গালা দেশ বড়দিনের মান রাখিয়াছে; বড়দিনের উৎসব এবার কলিকাতায় খুব বড় রকমেই হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বড় বড় লোকেরা এই বড়দিনের বড় উৎসবে যোগদান করিতে কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন; বাঙ্গালী বড় লোকেরা এই বড়দিনের বড় বড় অতিথিবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এবারের বড়দিনকে বাঙ্গালী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ 'National Week' বা জাতীয় সপ্তাহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; বড়দিনের এই সপ্তাহে প্রাহ্নে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, রজনীযোগে কত সভা, সমিতি ও সঙ্ঘের অধিবেশন হইয়াছে, তাহার বিবরণ প্রদান করা ত অসাধ্যই, তাহাদের নাম করিতে গেলেও পৃষ্ঠা ভরিয়া যায়। সভাসভাই লোকে একেবারে হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল; যাঁহারা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলাইয়া কাজ করিয়া থাকেন, তেমন লোকেও সব দিক রক্ষা করিতে পারেন নাই—সকল সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

এই সকল সভা-সমিতির শীর্ষস্থানীয় হইতেছেন—জাতীয় মহা-সমিতি—National Congress। 'কন্‌গ্রেস্‌' কথাটা এখন চলিত হইয়া গিয়াছে—'জাতীয় মহাসমিতি'

না বলিলেও চলে। যেবার যেখানে এই কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হয়, সেখানেই অপর সভা-সমিতিরও অধিবেশন হইয়া থাকে। এবার কলিকাতায় কন্‌গ্রেসের অধিবেশন; তাই সেই সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় মস্‌লেম লীগ, ভারতীয় মুসলমান-শিক্ষা-সমিতি, শিল্প-সমিতি, মদ্যপান নিবারণী-সমিতি, হিত-সাধক-মণ্ডলী, একেশ্বরবাদ-সমিতি, সামাজিক-সমিতি প্রভৃতির অধিবেশনও কলিকাতায় হইয়া গেল। থিওসফি-সমিতির অধিবেশন কন্‌গ্রেসের অধিবেশন স্থানেই এতদিন হয় নাই; কিন্তু এবার থিওসফি সমিতির নেত্রী শ্রীমতী আনি বেসান্ত কন্‌গ্রেসের সভানেত্রী হওয়ায় থিওসফি-সমিতির বার্ষিক উৎসব কলিকাতাতেই সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। এই সভা-সমিতির মরসুমে এবার ভারতীয় চিকিৎসকগণও এক সমিতির অধিবেশন করেন, জমিদারবৃন্দের সম্মিলন হয়, গো-রক্ষিণী সভারও অধিবেশন হয়; কৃষিসমিতিরও অধিবেশন হয়; মহিলা শিল্প সমিতির প্রদর্শনী হয় ও মহিলা সভাও আহুত হয়; বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতিও নীরব ছিলেন না; কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমিতি ও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনই এই National Weekএ—এই জাতীয় সপ্তাহে উৎসব করেন নাই; তবে তাঁহারাও একেবারে নীরব ছিলেন না;-গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমিতির উদ্যোগে একটী বক্তৃতার আয়োজন হয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত প্রতিনিধিগণকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের পরিষৎ মন্দির ও প্রদর্শনাগার দেখান। আর্য্য-সমাজ প্রতিবৎসর যেমন উৎসব করিয়া থাকেন, এবারও তাহাই করিয়াছেন। ভগবানের নিকট এই সকল সভা-সমিতির উদ্দেশ্য-সিদ্ধি কামনা করি। আমাদের আপাততঃ লাভ সাধুদর্শন! এই উপলক্ষে অনেক সাধু-মহাত্মার পদধূলিতে কলিকাতা তথা বঙ্গদেশ পবিত্র হইয়াছে।

এই সকল সভা সমিতির উৎসবের কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতার স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজে সার ডানিয়েল হ্যামিল্‌টন (Sir Daniel Hamilton) মহোদয় একটী বক্তৃতা করেন। আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য এই বক্তৃতার কয়েকটী স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। সার ডানিয়েল হ্যামিল্‌টন মহোদয় বলিতেছেন—

"But what I feel is that the economic aspect of the problem of responsible government is not being studied as it must be, if the new India is to be established on lasting foundations. For, whatever form the building may take, whether Indian or European, if it does not rest on a sound economic base, it is doomed to fall about our ears. In short, we are up against the money problem and I mean nothing personal when I say that Finance is the Asses' bridge of Indian Politics, through which Governments, and district boards, and municipalities, and villages, down to the *rayat* all fall in their attempt to pass from the dry herbage on this side to the green grass and clover on the other."

উপরিউদ্ধৃত কথা কয়টীর সার মর্ম্ম এই—Responsible Government বা দায়িত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থার যে একটা অর্থনীতির দিক আছে, তাহা সম্যক্‌ভাবে কেহই বিবেচনা করিতেছেন না; অথচ উক্ত শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বিধান করিতে হইলে, নব ভারতবর্ষে উহার সাফল্য সংসাধন করিতে হইলে অর্থনীতির (Economic Aspect) কথাটা বিশেষ ভাবে আলোচিত ও বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য। ভারতীয় ভাবেই হউক বা য়ুরোপীয় ভাবেই হউক, যে ভাবেই এই শাসন-সৌধ নির্ম্মিত হউক, ইহার শিলাবিন্যাস যদি অর্থনীতিশাস্ত্রানুমোদিত না হয়, তাহা হইলে সে সৌধের অচির-পতন অনিবার্য্য। সোজা কথা এই যে, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির মহাসমস্যাই হইতেছে অর্থ—টাকা; এই যে অর্থরূপী গাধার সেতু (Asses' Bridge) ইহা পার হওয়াই বিষম গোলের কথা। এই টাকার সচ্ছলতা না হইলে, তোমার গবর্ণমেণ্টই বল, জেলা বোর্ডই বল, লোকাল বোর্ডই বল, মিউনিসিপালিটীই বল, পল্লীসমাজই বল, আর রায়তই বল, কাহারও সেই গাধার সেতু পার হইয়া সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা প্রদেশে উপনীত হইবার উপায় নাই।

তাহার পর সার হ্যামিল্‌টন বলিতেছেন –

"Financial reform must precede political reform. You must first of all get money into the pockets of the people before you can get it out for improved public services. This is the teaching of Adam Smith and of common sense. But the pockets of the people are empty, so the public purse is empty, and Responsible Government remains an empty dream. That the pockets of the people are empty, everyone who knows India knows; how to fill them is the problem."

কথাটার সার এই যে—"রাজনীতিক সংস্কারের পূর্ব্বে অর্থনীতির সংস্কার প্রয়োজন; অর্থাৎ টাকার কথাটা আগে ভাবিতে হইবে, তাহার পর শাসন-সংস্কারের ভাবনা। আগে দেশের লোকের পকেটে টাকা আমদানী করিয়া দেও, তাহার পর নানাবিষয়ের উন্নতি, নানাকার্য্যের সংস্কার করিবার জন্য তাহাদের নিকট টাকা চাহিও। অর্থনীতি-বিশারদ এডাম স্মিথও (Adam Smith) এই কথা বলিয়াছেন, আমাদের সোজা বুদ্ধিও (Common Sense) এই কথাই বলে। আমাদের দেশের লোকের পকেট শূন্য, সুতরাং রাজ্যের ধনাগারও শূন্য, অতএব Responsible Government বা দায়িত্বমূলক শাসন ব্যবস্থাও শূন্যগর্ভ স্বপ্ন। ভারতের লোকের পকেট যে শূন্য, এ কথা, যিনি ভারতবর্ষের অবস্থা জানেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। সেই শূন্য পকেট পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা-চিন্তাই এখন সর্ব্বপ্রধান কথা—একমাত্র কথা।"

এই আর্থিক সচ্ছলতা কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহারও কথা সার ডানিয়েল্ হ্যামিল্‌টন মহোদয় বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—যৌথ ঋণদান-সমিতি, যৌথ কৃষিব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা এই আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হইতে পারে। ভারত কৃষিপ্রধান স্থান। এখানকার কৃষি-সম্পদ বাড়াইতে পারিলে, শিল্পের উন্নতি করিতে পারিলে আর্থিক সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে, লোকের অভাব অনটন দূর হইতে পারে। তিনি বলিতেছেন—

"India has, however, nothing to fear but everything to gain by the levelling up of the masses, for the labour of the masses, freed from the chain which now binds it to the oppressor, and organised into a living power by the union of their credit, and set in motion by the one rupee note, will provide money and employment for all. Railways and railway appointments will double. Irrigation and the Public Works Department will be calling for thousands of men. India's 700,000 villages will want 700,000 teachers and 700,000 doctors and not less than 10,000 organisers and supervisors of the people's banks."

অর্থাৎ—জনসাধারণকে যদি মহাজনের নির্দ্দয় কবল হইতে মুক্ত করা যায়, তাহাদিগকে যদি যৌথ-ভাণ্ডার হইতে সাহায্য করা যায়, কৃষকদিগের জন্য যদি প্রয়োজনানুরূপ অর্থ-সংস্থানের উপায় সর্ব্বত্র কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা করা যায়, তাহাদিগের শক্তি সামর্থ্য যদি মিলিত করা যায়, তাহা হইলেই উন্নতির উপায় হয়। এই যে এক টাকার নোট হইয়াছে, ইহার দ্বারা সাধারণ লোকের কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করা যাইতে পারে; সাধারণ লোকদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। তাহা হইলে রেলপথ ও রেলের চাকরী বাড়িতে পারে; জল-সেচন-বিভাগ ও পবলিক ওয়ার্কস বিভাগে শত সহস্র লোকের কাজ জুটিতে পারে। ভারতের সাতলক্ষ গ্রামে সাতলক্ষ শিক্ষক, সাত-লক্ষ চিকিৎসক নিযুক্ত হইতে পারে; আর এই সকল কৃষি-ব্যাঙ্ক পরিদর্শনের জন্যও দশহাজার পরিদর্শক নিযুক্ত হইতে পারে।

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা সার হ্যামিল্‌টন তাঁহার কথাটা আরও বিশদ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

If, for example, they will print and issue to the Government of Bengal for the Young Men's Zemindary Society a lakh of one

rupee notes, and the Bengal Government will lease to the Society ten thousand biggahs of the land now leased to the tiger and crocodile of the Sunderbans, I will see that the Society hand over in exchange within a few years for thousand biggahs of excellent rice land, the home of a thousand people. The Government of India would score Rs. 5,000 yearly in interest. The Bengal Government would score Rs. 5,000 yearly as rental after paying interest, and the Young Men's Society would score Rs. 5,000 from its members who would live as petty zemindars on their property, and make a decent and honourable living by cultivating the land, partly for themselves, and by letting it out, partly, to the *rayats*. India would gain an addition to her food supply of nearly two lacks worth of rice yearly, which she could either consume or export in exchange for two lacks worth of gold, 20 lakhs in ten years, two crores in a hundred years in exchange for a few scraps of paper, costing a few rupees. Which is the sounder finance, to increase the food supply or to stint it ?"

সার হ্যামিল্টনের কথার সংক্ষিপ্তসার এই যে—"এদেশে ইয়ং-মেনস্ জমিদারী সোসাইটি নামে একটা যৌথ-সমিতি আছে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই সমিতির জন্য এক লক্ষ টাকার পরিমাণ এক টাকার নোট প্রচার করেন এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই সমিতিকে যদি সুন্দরবনের দশ হাজার বিঘা জমি বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে কি করিতে পারা যায়, তাহাই হিসাব করিয়া দেখা যাউক। যে বিস্তৃত ভূখণ্ড এখন ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের বসতিস্থান, যেখানে এখন বিশাল বন, সেই স্থান কয়েক বৎসরে শস্য-পূর্ণ হইবে—দশ হাজার বিঘা ধানের জমি হইবে; সহস্র কৃষক পরিবার সেখানে সুখে-সচ্ছন্দে বাস করিবে। তাহার পর এই জমি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় ভারত গবর্ণমেণ্ট সুদের হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা পাইবেন; বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা খাজনার হিসাবে পাইবেন, জমিদারী সোসাইটীও প্রজার নিকট হইতে বৎসরে যেমন করিয়া হউক পাঁচ হাজার টাকা লাভের হিসাবে লইবে; আর যে সমস্ত বড় প্রজা বেশী পরিমাণ জমি লইবে, তাহারাও প্রজা বিলি করিয়া বা খাসে চাষ করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইবে। মোটামুটি হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, প্রতি বৎসরে এই সুন্দরবনের দশ হাজার বিঘা জমি হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার ধান পাওয়া যাইবে; এই ধানে কত লোকের অন্নসংস্থান হইবে, বিদেশে চালান দিলেও কত টাকা পাওয়া যাইবে। অথচ ইহার জন্য গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অতি সামান্য—অল্প কয়েকটা টাকা ব্যয় করিয়া কতকগুলি এক টাকার নোট প্রস্তুত করা মাত্র।"

সার ডানিয়েল হ্যামিল্টন একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; এ প্রকার অনেক পন্থা দেখান যাইতে পারে, যাহাতে প্রকৃত পক্ষে প্রচুর ধনাগম হইতে পারে। এবং এই প্রকারে ধনাগম হইলে সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে, সকল দিকেরই উন্নতি হইতে পারে। বিনা পয়সায় কিছুই হইবে না, হয় না। সুতরাং ধন-বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনই সর্ব্বপ্রধান কথা—সর্ব্বপ্রথম কথা। তাই সার ডানিয়েল হ্যামিল্টন বলিতেছেন—

"India has no use for Europe's second-hand political rags and old top hat. Give her the chance and on her co-operator's loom she will weave a beautiful garment of her own, in which the many colours will be blended into one. The question before India to day is whether she is to have a civilisation based on Antagonism or on Co-operation, and if the latter, she must at once demand that "substantial steps be taken as soon as possible" along the co-operative way to her destined goal—'Responsible Government

within the British Empire.' God save the King and India."

অর্থাৎ—"য়ুরোপের পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র বা ছাতাপড়া টুপীর দরকার ভারতবর্ষের নাই। ভারতবর্ষকে পথ দাও, সে তাহার স্বদেশী যৌথ বয়নযন্ত্রে এমন পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবে, যাহাতে সকল বর্ণ মিলিত হইয়া এক মনোরম বর্ণে পরিণত হইবে। ভারতের সম্মুখে এখন এই একই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে—তাহার সভ্যতা প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, না মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে? যদি শেষোক্ত পথের অনুসরণই কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ এখনই দাবী করুক যে, তাহাকে অনতিবিলম্বে এই যৌথপথে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করা হউক, এবং তাহাই Responsible Government within the British Empire. ভগবান আমাদের রাজাকে ও ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন!"

আমাদের কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, কন্‌ভেনসন প্রভৃতিতে যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, তাহার সমস্ত বিবরণ, ভিন্ন ভিন্ন সভাপতির অভিভাষণ, প্রতিনিধিগণের বক্তৃতা প্রভৃতির সার সঙ্কলন করিবারও আমাদের স্থানাভাব; অথচ, ভিন্ন-ভিন্ন সভা-সমিতিতে এত বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে যে, তাহা সকলেরই পাঠ করা কর্তব্য। আমরা এ স্থলে কেবল একজন সভাপতির একটা কথা উদ্ধৃত করিতেছি। সামাজিক সমিতির সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় আমাদের বাঙ্গালা দেশের বিবাহে পণ-গ্রহণ সম্বন্ধে আমাদের যুবকগণকে উদ্দেশ করিয়া যে কয়টা কথা বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় বলিতেছেন—

"Many of you with academic distinctions on your brow do not hesitate to sell yourselves to the highest bidder in the matrimonial market. It rends my heart to have to confess that some of you at any rate consciously or unconsciously have been or will be the instruments of self-immolation of many a Snehalata! Many a leading member of our society is found to prate on the platform on the evils of the dowry system, but when his own turn comes he gives the go-by to his preachings and is extortionate in his demands, and when he is taken to task he roundly lays the blame at the door of his mother and grandmother, or his wife, and washes his hands clean. I appeal to you the rising hopes of our country to take a solemn vow not to be a party to such bargaining."

এ ইংরাজীটুকুর আর অনুবাদ দিবার প্রয়োজন নাই; কারণ ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণকে উদ্দেশ করিয়াই রায় মহাশয় কথাগুলি বলিয়াছেন। তিনি যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকগণই সেই অভিযোগের এক নম্বরের আসামী। তাঁহারা এই কথাগুলি ভাল করিয়া পড়িলে এবং তদনুসারে কাজ করিলেই রায় মহাশয়ের তথা অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইবেন।

সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের "সমসাময়িক ভারতের" একবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়াছেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি মুঘল যুগের উপাদান প্রসঙ্গে রাজপুতনার খিয়াট, দোহা, বোখার, গান্ধালি, যুদ্ধ-সঙ্গীত, হিন্দি সাহিত্য প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে এইগুলির অধিকাংশই অল্পাধিক পরিমাণে পরিজ্ঞাত। "কিন্তু তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল তথ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা এতাবৎকাল সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। সপ্তদশ শতাব্দীতে সমগ্র ভারতখণ্ডে পণ্ডিতবৃন্দের মধ্যে বিশেষ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে মৌলিকতা ছিল না বটে, কিন্তু যে সকল শাস্ত্রে হিন্দুগণ অনুরক্ত ছিলেন, পণ্ডিতবৃন্দ সেইগুলি ব্যাখ্যা করিতে, রূপান্তরিত করিতে, আধুনিক ভাবে প্রবর্ত্তিত করিতে ও ধারাবাহিক রূপে গ্রথিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর এই কার্য্যের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল বারাণসী ও নবদ্বীপ।... সংস্কৃত-শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত দ্বারা শিক্ষিত শত সহস্র

শিক্ষার্থী বারাণসী ও নবদ্বীপ হইতে হিন্দু অধিবাসীর প্রাধান্যপূর্ণ সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থানীয় আচরণসমূহকে প্রণালীবদ্ধ করিয়াছিলেন ও যাহা অধর্ম্মানুমোদিত ছিল তাহা শাস্ত্রানুমোদিত করিয়াছিলেন। এই সকলের প্রভাব মুসলমানগণের উপরেও বিস্তৃত হইয়াছিল এবং ইহারই ফলে মুসলমানগণ হিন্দুদের কতকগুলি আচরণ আদান ও নিজেদেরও কিছু কিছু হিন্দুদিগকে প্রদান করিয়াছিল। মধ্যভারতের বন্যভূমিতেও হিন্দুজীবনের বিকাশ এবং হিন্দু-সভ্যতার মহাকেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ভারতীয় জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে, এই সকল উপাদান সংগৃহীত, পঠিত, প্রণালীবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করিতে হইবে।" আমাদের বিশেষ ভরসা আছে যে শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল উপাদানের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, কোন না কোন ঐতিহাসিক এ সকল উপাদান সংগ্রহে ব্রতী হইয়া ভারত ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেন।

আমাদের দেশের বিদ্যালয় ও কলেজসমূহে অধ্যাপনা ইংরাজী ভাষার সাহায্যেই হইবে, কি বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে হইবে, এই কথা লইয়া বহুদিন হইতেই আন্দোলন চলিতেছে; কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-কমিসন বসিবার পর হইতে এই আন্দোলন আরও একটু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জানুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিউ (Modern Review) পত্রে অধ্যাপকপ্রবর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় এই সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাপ্রদান সম্বন্ধে যাঁহাদের অমত আছে, অধ্যাপক সরকার মহাশয় তাঁহাদের মতের সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দেশীয় ভাষায় ইতিহাস প্রভৃতির অধ্যাপনা হইলে ঐ সকল বিষয় অধিগত করিতে সময় কম লাগিবে; সুতরাং শিক্ষার্থীগণ অবশিষ্ট সময় ইংরাজী-সাহিত্য পাঠে নিযুক্ত করিলে ইংরাজী শিক্ষার অবনতি হইবে না, বরং উন্নতিই হইবে। প্রবন্ধশেষে অধ্যাপক সরকার মহাশয় বলিতেছেন —

"I think it is practicable and necessary at the present day to make Bengali the medium of teaching and examination in our Schools and also in our Colleges up to the Intermediate standard only. The boys may read English books, but they must answer in Bengali. In scientific subjects, English technical terms should be freely either written in English or transliterated in Bengali."

অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের অভিমত এই যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে সমস্ত বিষয় বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পড়ান কর্ত্তব্য এবং পরীক্ষাও বাঙ্গালা ভাষাতেই করিতে হইবে; আপাততঃ মধ্যপরীক্ষাতেও (Intermediate) বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা ও পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত আদি ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পাঠ করিতে পারে, কিন্তু পরীক্ষাকালে তাহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষাতেই উত্তর লিখিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখিবার সময় ইংরাজী পরিভাষা যথেচ্ছ ব্যবহার করা যাইতে পারে বা ইংরাজী শব্দই বাঙ্গালায় লিখিতে হইবে। ইঁহার পরই অধ্যাপক সরকার মহাশয় বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন "But angels and ministers of grace defend us from the philological horrors coined by the Bangiya Sahitya Parishad and the Nagri Pracharini Sabha in their "Glossary of English Scientific terms translated into the Vernacular Baijnanik Paribhasha." অর্থাৎ আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও নাগরী প্রচারিণী সভা যে 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, দেবতাগণ সে সঙ্কট হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।" অধ্যাপক সরকার মহাশয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার বিভীষিকা দর্শনে ভীত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আমাদের দেশের যাঁহারা এই পরিভাষা প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা অতি ধীরে কাজ করিতেছেন; এখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ভয়ে লেখকগণ বিজ্ঞানালোচনা বন্ধ রাখেন নাই; সকলেই ইংরাজী শব্দই চালাইতেছেন; এমন কি আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও আমাদের 'ভারতবর্ষে' যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহাতে ইংরাজী শব্দই অধিক ব্যবহার করিতেছেন। তবে

একেবারে পরিভাষা প্রণয়ন ও প্রচলন বন্ধ করিয়া দেওয়া আমরা সমীচীন মনে করি না; ধীরে-ধীরে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে স্থান পাইলে ভাষার সম্পদ যে বৃদ্ধি হয়, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। আপাততঃ 'ডায়কৃসাইড্'কে 'দ্বয়ম্ভান' মূর্ত্তিতে দেখিলে ভয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের একদল গণ্যমান্য মুসলমানের মত হইয়াছিল যে, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিবেন না; তাঁহারা মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র বাঙ্গালা-ভাষার প্রচলনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, এবং এ সম্বন্ধে সে সময়ে আন্দোলনও হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে সুর ফিরিয়া গিয়াছে; এখন শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানগণ বর্ত্তমান বাঙ্গালাভাষার চর্চ্চায় অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন। কন্‌গ্রেসের সপ্তাহে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ-সংলগ্ন মোস্‌লেম ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির যে অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে সভাপতি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম-এ, বি-এল মহোদয় যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন "আরবী আমাদের ধর্ম্মের ভাষা, ইংরাজী আমাদের রাজভাষা, আর বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা।" কথাটী অতি ঠিক। বঙ্গীয় মুসলমানগণ যদি এই বাঙ্গালাভাষাকে এতদিন ঘৃণার চক্ষে না দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই ভাষার যথেষ্ট উন্নতিবিধান করিতে পারিতেন। তাহার পর সেদিন ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির (All India Mahomedan Educational Conference) সভাপতি শ্রীযুক্ত নজর আলি হাইদারি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে অতি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন—"I can conceive of no greater calamity to the Mahomedans here than that they should remain ignorant of the vernacular of the place in which they spend their lives, and thus estrange themselves from the neighbours with whom they must come in daily contact in social intercourse and in business. Nothing do I deprecate more than the association of any vernacular with any particular faith, Are not the points of cleavage between the different communities in India already too many in all conscience for another to be added, so potent in creating bitterness ?"

উপরিউদ্ধৃত কথাগুলির সার মর্ম্ম এই যে—"মুসলমানেরা যে স্থানে বাস করেন, সেখানকার স্থানীয় ভাষা সম্বন্ধে তাঁহারা অনভিজ্ঞ; সুতরাং তাঁহারা সামাজিক জীবনে বা কার্য্যক্ষেত্রে নিত্য যাঁহাদের সংস্রবে আসেন, সেই প্রতিবেশীদিগের কাছে থাকিয়াও তাঁহাদিগকে দূরে রাখিতে হয়; মুসলমানগণের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অধিকতর লজ্জার কথা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। কোন একটা দেশীয় ভাষা কেবল একটীমাত্র ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট—তাহার অপর কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না—ইহা আমি কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ত বহু বিষয়েই পার্থক্য রহিয়াছে; তাহার উপর আরও একটা যোগ করিয়া বিদ্বেষ-বুদ্ধি প্রবলতর না করিলেই কি চলে না?" বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির সমবেত চেষ্টা আরম্ভ হইলে সত্যসত্যই আমাদের অনেক গোল মিটিয়া যাইবে, দুইজাতির মিলনের অনেক বাধা অন্তর্হিত হইবে; ভাষা-জননী তাঁহার সন্তানগণকে এমন সোণার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিবেন যে, সন্তানগণের মধ্যে কোনপ্রকার মনান্তর, ভাবান্তর থাকিবে না।

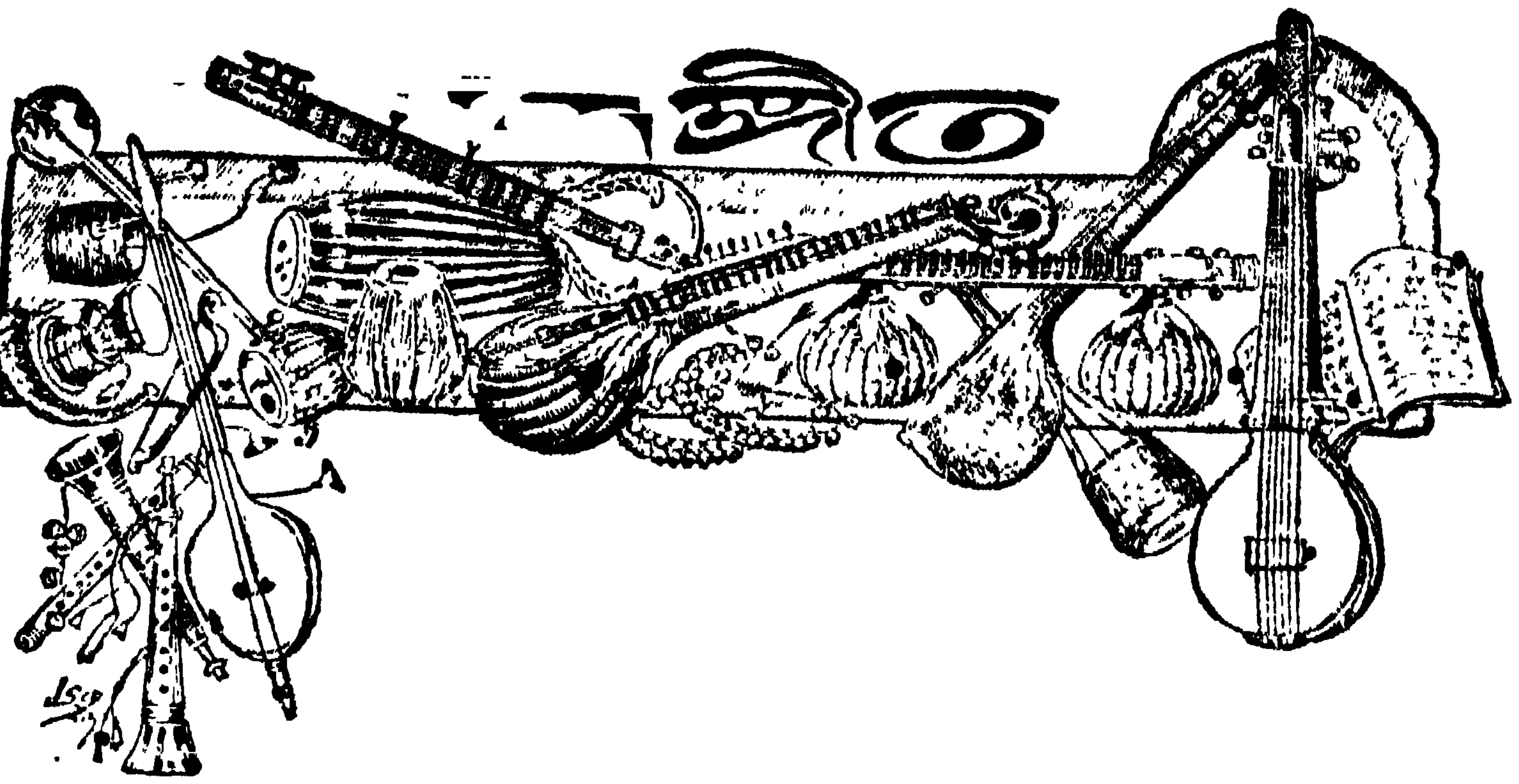

কবি

তাল—কাহারবা

আমি একটা উচ্চ কবি, এমনই ধারা উচ্চ,—
শেলি, ভিক্টর হিউগো, মাইকেল আমার কাছে তুচ্ছ।
আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে চস্‌কে
পড়েছি এ বঙ্গভূমে বিধাতার হাত ফস্‌কে!
(কোরাস্)—মর্ত্তভূমে অবতীর্ণ 'কুইলের' কলম হস্তে,
কে তুমি হে মহাপ্রভু?—নমস্তে নমস্তে!

আমি লিখ্‌ছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্যে,
নিজেই বুঝি না তার অর্থ, বুঝ্‌বে কি তা' অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং আজকাল যা সব লিখ্‌ছি;
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক শিখ্‌ছি।
(কোরাস্)—মর্ত্তভূমে—ইত্যাদি।

আমার কাব্যের উপর আছে আমার অসীম ভক্তি;
আমি ত লিখ্‌ছি না সে সব, লিখ্‌ছেন বিশ্ব-শক্তি;
তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি কাব্য বস্তা বস্তা—
পা'বে গুরুদাসের নিকট ওজনদরে শস্তা।
(কোরাস্)—মর্ত্তভূমে—ইত্যাদি।

আমি নিশ্চয় এইছি বিশ্বে বোঝাতে এক তত্ত্ব—
(যদিও তায় নেইক বড় বেশী নূতনত্ব)
যে, ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড অখণ্ড পদার্থ,
—আমি না বোঝালে তাহা ক'জন বুঝ্‌তে পার্ত্ত?
(কোরাস্)—মর্ত্তভূমে—ইত্যাদি।

এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম, অত্য বড়ই গ্রীষ্ম,
তোমাদিগের মঙ্গল হউক, ভো ভো ভক্ত শিষ্য!
এখন কর গৃহে গমন নিয়ে আমার কাব্য,
আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাব্‌ব।
(কোরাস্)—মর্ত্তভূমে—ইত্যাদি।

কথা ও সুর—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়] [স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

+				২				+		.		২			
সা	রা	সা	রা	সা	রা	সা	রা	গা	মা	গা	রা	মা	গা	-া	-া
আ	মি	এক্	টা	উ	চ্চ	ক	বি	এম্	নি	ধা	রা	উ	চ্চ	-	-
আ	মি	লিখ্	ছি	যে	সব	কা	ব্য	মা	নব	জা	তির	জ	ন্যে	-	-
আ	মার্	কা	ব্যের	উ	পর	আ	ছে	আ	মার	অ	সীম	ভ	ক্তি	-	-
আ	মি	নি	শ্চয়	এই	ছি	বি	শ্বে	বো	ঝা	তে	এক্	ত	ত্ত্ব	-	-
এ	খন্	বে	দ	ব্যা	সের	বি	শ্রাম্	অ	দ্য	ব	ড়ই	গ্রী	ষ্ম	-	-

গা। গা। গা। মগা। রা। রা। পা। পা। গা। রা। গা। মা। গা। রা। - । - ।
শে লি ভি ক্ট র্ হিউ গো মাই কেল্ আ মার কা ছে তু চ্ছ - -
নি জেই বু ঝি না তার অ র্থ বুঝ্ বে কি তা অ ন্যে - -
আ মি ত লি খ্ ছি না সে সব লিখ্ ছেন্ বি শ্ব শ ক্তি - -
য দি ও তা য়্ নেই ক ব ড় বে শী নূ ত ন ত্ব - -
তো মা দি গে র্ ম ঙ্গল্ হ উক্ ভো ভো ভ ক্ত শি ষ্য - -

\+ ২ + ২
র্সা। র্সা। র্সা। র্সা। না। না। ধা। পা। পা। ধা। পা। না। ধপা। গা। - । - ।
আ মি নি শ্চয় কো ন্ও হু পে স্ব র্গ থে কে ঢস্ কে - -
আ মি যা লি খে ছি এ বং আজ কাল্ যা সব্ লিখ্ ছি - -
তাই তে আ মি লি খে যা চ্ছি কা ব্য ব স্তা ব স্তা - -
যে ব্র হ্মা ণ্ড এক্ প্র কা ণ্ড অ খ ণ্ড প দা র্থ - -
এ খন্ ক র গৃ হে গ মন্ নি য়ে আ মার্ কা ব্য - -

\+ ২ + ২
র্রা। গা। গা। না। না। না। না। না। ধা। না। না। র্রা। র্সা। র্সা। - । - ।
প ড়ে ছি এ ব ঙ্গ ভূ মে বি ধা তার হাত্ ফস্ কে - -
সে সব্ খে কে মা ঝে মা ঝে আ মিই অ নেক্ শিখ্ ছি - -
পা বে গু রু দা সের নি কট্ ও জন্ দ রে স স্তা - -
আ মি না বো ঝা লে তা হা ক জন্ বুঝ্ তে পা র্ত্ত - -
আ মি আ মার ত পো ব নে এ খন্ এক্ টু ভাব্ ব - -

\+ ২ + ২
র্সা। র্সা। র্সা। র্সা। না। না। ধা। পা। না। না। ধা। পা। মা। মা। - । - ।
ম র্ত্ত্য ভূ মে অ ব তী র্ণ কুই লের্ ক লম্ হ স্তে - -

\+ ২ + ২
না। ধা। ধা। পা। গা। গা। রা। সা। গা। গা। রা। না। রা। সা। - । - ।
কে তু মি হে ম হা প্র ভু ন ম স্তে ন ম স্তে - -

বাগীশ্বরী—আড়াঠেকা

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি,
তাই যোগী ধ্যান ধরে, হয়ে গিরিগুহাবাসী।
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্ব্বাণ হিল্লোলে,
চির শান্তি পরিমল, অবিরত যায় ভাসি।
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে ও মা, কে তুমি গো ? একা বসি।
অভয়-পদ-কমলে প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে, শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥

স্বরলিপি—লালা মুক্তিপ্রকাশ নন্দে (বিদ্যারত্ন)　　　　কথা—বিবেকানন্দ স্বামী

স্বর-শিক্ষক—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

১ ২´ ৩ ০ ১
সা II রা মা মা -া I পমা পা -া ধা | মা পা মজ্ঞা -া | রা -া -া রা | মা পধা না ধা I
নি বি ড় আঁ ০ ধা ০ রে ০ ০ ০ মা তো ০ ০ ০ ০ র্ চ ম কে ০ ০ অ

২´ ৩ ০ ১
পা মা -া জ্ঞা | -া পা মজ্ঞা -া | রা সা -া সা | রা রা রা -া I রা রা সরা-সমা |
রূ প ০ ০ ০ রা শি ০ ০ ০ ০ ০ তা ই যো গী ০ ধ্যা ন ০ ০ ০ ০

৩ ০ ১ ২´ ৩
জ্ঞা -া রা সা | ন্‌া -া ধ্‌প্‌া সা | রা মা মা -া I পা পধা-ধনা-নর্সা | -না র্রা র্সনা -া |
০ ০ ধ রে ০ ০ ০ ০ হ য়ে গি রি ০ গু হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ বা সী ০ ০

০ ১
ধপা ধনা -া না | ধা মা মা -া II II
০ ০ ০ ০ ০ "নি বি ড় আঁ ০"

১ ২´ ৩ ০ ১
{সা II মা না-ধা না I র্সা র্সা -া না | র্সা র্সা র্সা -া | -া -া -া র্সা | না র্সা র্রা-র্সা |
অ ন ন্ত ০ আঁ ধা র ০ ০ ০ কো লে ০ ০ ০ ০ ম হা নি র্ব্বা ০

২´ ৩ ০ ১ ২´
র্সা র্সা -া না | -া র্রা র্সা -া | না -া ধপা } মা | মা মা -া মা I পা মা -া জ্ঞা |
ণ হি ০ ০ ০ ল্লো লে ০ ০ ০ ০ ০ চি র শা ০ ন্তি প রি ০ ০

৩ ০ ১ ২´
-া জ্ঞা রা সা | -া -া -া স | রা মা মা -া I পধনা ধনর্সা নর্সর্রা র্সর্রর্সা |
০ ম ল ০ ০ ০ ০ অ বি র ত ০ যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

৩ ০
র্মা জ্ঞর্রর্সা নধধা না | মা জ্ঞা রসা সা II II
ভা সি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ "নি"

১ ২´ ৩ • ১
সা II ধা না -া না I ধা ধা পধা -ধনা | -া না ধা পা | -া -া -া মা | নধা না র্সা -া I
ম হা কা • ল রূ প • • • • • ধ রি • • • • আঁ ধা • র ব •

২´ ৩ • ১ ২´
র্সা র্সা না -া | -া র্রা র্সা না | ধা পা -া মা | ধা না না -া I না ধা মা -া |
স ন • • • প রি • • • • স মা ধি ম • ন্দি রে • •

৩ • ১ ২´ ৩
জ্ঞা জ্ঞা রা -া | -া -া -া সা | রা পা মা -া I পা মা জ্ঞা -া | রসা রজ্ঞা -া জ্ঞা |
• ও মা • • • • কে তু মি গো • এ কা • • • • • • • • ব

• ১ ২´ ৩ •
রা সা -া {মা | মা না ধা না I সা র্সা -া না | র্সা র্সা র্সা -া | -া -া -া র্সা |
সি • • অ ভ য় • পী দ ক • • • ম লে • • • • প্রে

১ ২´ ৩ • ১
না র্সা র্রা র্সা I র্সা র্সা -া না | -া র্রা র্সা না | ধা পা -া } মা | মা মা -া মা I
মে র বি • জ লী • • • জ লে • • • • চি ন্ম য় • মু

২´ ৩ • ১ ২´
পা মা -া জ্ঞা | রা রা জ্ঞা জ্ঞা | রা সা -া সা | রা মা -া মা I পা পধনা ধনর্সা
খ ম • • • • • ও লে • • শো ভে অ • ট্ট অ ট্ট • • • • •

৩ •
নর্সর্রা | র্সর্রার্মা জ্ঞর্রর্সা নধধা না | মা জ্ঞা রসা সা II II II II
• • • হা • • সি • • • • • • • • • • "নি"

৩ •
১ম তান | জ্ঞমা পধা ননা ননা | ধপা মজ্ঞা রসা সা I
আ • • • • • • • আ • • • • • "নি"

৩ •
২য় তান | র্রর্সা নধা পধা ননা | ধমা জ্ঞরা সা সা I
আ • • • • • • • • • • • "নি"

১ • ২´ ৩
৩য় তান | সরা | সমা জ্ঞপা মধা পনা | ধর্সা নর্রা র্সর্মা জ্ঞর্রা | সর্জ্ঞা র্রর্সা নধা-ধনা |
আ •

•
ধমা জ্ঞরা সা সা II II II II
• • • • • •

[১ম তান ও ২য় তান "নিবিড় আঁধারে" পর্য্যন্ত গাইয়া এবং ৩য় তান "নিবিড় আঁধারে মা তোর" পর্য্যন্ত গাইয়া ধরিতে হইবে।]

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সে-শয্যা স্পর্শ করিতেও: আজ অচলার ঘৃণা বোধ হওয়া উচিত ছিল, তাহাই যখন সে যথা-নিয়মে প্রস্তুত করিতে অপরাহ্ন-বেলায় ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সমস্ত মনটা যে তাহার কোথায়, এবং কি অবস্থায় ছিল মানব-চিত্ত সম্বন্ধে যাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারই অগোচর রহিবে না।

যন্ত্র-চালিতের মত অভ্যস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া ফিরিবার মুখে, পাশের ছোট টেবিলটির প্রতি অকস্মাৎ তাহার চোখ পড়িয়া গেল; এবং ব্লটিং প্যাডখানির উপর প্রসারিত একখানি ছোট্ট চিঠি সে চক্ষের নিমিষে পড়িয়া ফেলিল। মাত্র একটি ছত্র। বার, তারিখ নাই; মৃণাল লিখিয়াছে—"সেজদা মশাই গো, কোরচ কি? পরশু থেকে তোমার পথ চেয়ে-চেয়ে তোমার মৃণালের চোখ দুটি ক্ষয়ে' গেল যে!" বহুক্ষণ অবধি অচলার চোখের পাতা পড়িল না। ঠিক পাথরে-গড়া মূর্ত্তির পলক-বিহীন দৃষ্টি সেই একটি ছত্রের উপর পাতিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ চিঠি কবেকার, কখন্, কে আসিয়া দিয়া গেছে—সে কিছুই জানে না। মৃণালের বাটী কোন্ দিকে, কোন্ মুখে তাহার বাড়ী ঢুকিতে হয়, কোন্ পথটার উপর কি জন্য সে এমন করিয়া তাহার ব্যগ্র, উৎসুক দৃষ্টি পাতিয়া রাখিয়াছে, তাহার কিছুই জানিবার যো নাই। সম্মুখের এই ক'টি কালীর দাগ শুধু এই খবরটুকু দিতেছে, যে, কোন্ এক পরশু হইতে একজন আর একজনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া, চোখ নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু দেখা মিলে নাই। এদিকে সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে একদৃষ্টে চাহিয়া-চাহিয়া, তাহার নিজের চোখদুটি বেদনায় পীড়িত, এবং কালো-কালো অক্ষরগুলা প্রথমে ঝাপ্‌সা এবং পরে যেন ছোট-ছোট পোকার মত সমস্ত কাগজময় নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তবুও, এম্‌নি একভাবে দাঁড়াইয়া হয় ত সে আরও কতক্ষণ চাহিয়া থাকিত; কিন্তু. নিজের অজ্ঞাতসারে এতক্ষণ ধরিয়া তাহার ভিতরে ভিতরে যে নিঃশ্বাসটা উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই যখন অবরুদ্ধ স্রোতের বাঁধ ভাঙার ন্যায়, অকস্মাৎ সশব্দে গর্জিয়া বাহির হইয়া আসিল, তখন সেই শব্দে সে চমকিয়া সম্বিত ফিরিয়া পাইল। দ্বারের বাহিরে মুখ তুলিয়া দেখিল, সন্ধ্যার আঁধার প্রাঙ্গণতলে নামিয়া আসিয়াছে, এবং যদু চাকর হারিকেন লণ্ঠন জ্বালাইয়া বাহিরের ঘরে দিতে চলিয়াছে। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু ফিরে এসেচেন, যদু?" যদু কহিল, "না, মা, কৈ এখনো ত তিনি ফেরেন নি।" এতক্ষণে অচলার মনে পড়িল, দুপুরবেলার সেই লজ্জাকর অভিনয়ের একটা অঙ্ক শেষ হইলে, সেই যে তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই। স্বামীর প্রাত্যহিক গতিবিধি সম্বন্ধে আজ তাহার তিলমাত্র সংশয় রহিল না। সুরেশের আসা পর্য্যন্ত এমনই একটা উৎকট ও অবিচ্ছিন্ন কলহের ধারা এ বাটীতে প্রবাহিত হইয়াছিল, যে, তাহারই সহিত মাতামাতি করিয়া অচলা আর সব ভুলিয়াছিল। সে যে স্বামীকে ভালবাসে না, অথচ ভুল করিয়া বিবাহ করিয়াছে, সারাজীবন সেই ভুলেরই দাসত্ব করার বিরুদ্ধে তাহার অশান্ত চিত্ত বিদ্রোহ-ঘোষণা করিয়া অহর্নিশি লড়াই করিতেছিল। মৃণালের কথাটা সে একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াই গিয়াছিল,—কিন্তু আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই মৃণালের একটিমাত্র ছত্র তাহার সমস্ত পুরাতন দাহ লইয়া যখন উল্টা স্রোতে ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন একমুহূর্ত্তে প্রমাণ হইয়া গেল, তাহার সেই ভুল-করা স্বামীরই অন্য নারীতে আসক্তির সংশয় হৃদয় দগ্ধ করিতে সংসারে কোন চিন্তার চেয়েই খাটো নয়।

লেখাটুকু সে আর একবার পড়িবার জন্য চোখের কাছে তুলিয়া ধরিতে হাত বাড়াইল, কিন্তু নিবিড় ঘৃণায় হাতখানা তাহার আপনি ফিরিয়া আসিল। সে-চিঠি সেইখানে তেম্‌নি খোলা পড়িয়া রহিল; অচলা ঘরের বাহিরে আসিয়া

বারান্দার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল,—সব মিথ্যা! এই ঘর-দ্বার, স্বামী-সংসার, খাওয়া-পরা, শোওয়া-বসা কিছুই সত্য নয়,—কোন কিছুর জন্যেই মানুষের তিলার্দ্ধ হাত-পা বাড়াইবার পর্য্যন্ত আবশ্যকতা নাই। শুধু মনের ভুলেই মানুষে ছট্‌ফট্ করিয়া মরে, না হইলে পল্লীগ্রাম-সহরই বা কি, খড়ের-ঘর-রাজপ্রাসাদই বা কি, আর স্বামী-স্ত্রী, বাপ-মা, ভাই-বোন সম্বন্ধই বা কোথায়! আর কিসের জন্যেই বা রাগা-রাগি, কান্না-কাটি, ঝগড়া ঝাটি করিয়া মরা! দুপুরবেলার অতবড় কাণ্ডের পরেও যে স্বামী স্ত্রীকে একলা ফেলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চিন্ত হইয়া বাহিরে কাটাইতে পারে, তাহার মনের কথা যাচাই করিবার জন্যই বা এত মাথা-ব্যথা কেন! সমস্ত মিথ্যা! সমস্ত ফাঁকি! মরীচিকার মতই সমস্ত অসত্য! কিন্তু সংসার তাহার কাছে এতদূর খালি হইয়া যাইতে পারিত না, একবার যদি সে মৃণালের ঐ ভাষাটুকুর উপরেই তাহার সমস্ত চিত্ত ঢালিয়া না দিয়া, সেই মৃণালকে একবার ভাবিবার চেষ্টা করিত। অন্য নারীর সহিত সেই পল্লীবাসিনী সদানন্দময়ীর আচরণ একবার মনে করিয়া দেখিলে, তাহার নিজের মনটাকে ঐ কটা কথার কালিমাই এমন করিয়া কালো করিয়া দিতে বোধ করি পারিত না।

যদু ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বাবু জিজ্ঞেসা করলেন, চায়ের জল গরম হয়েছে কি?" অচলা ঠিক যেন ঘুম ভাঙিয়া উঠিল; কহিল, "কোন্ বাবু?" যদু জোর দিয়া বলিল, "আমাদের বাবু। এইমাত্র তিনি ফিরে এলেন যে। চায়ের জল ত অনেকক্ষণ গরম হয়ে গেছে মা।" "চল যাচ্চি" বলিয়া অচলা রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। খানিক পরে চা এবং জলখাবার চাকরের হাতে দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, মহিম অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করিতেছে, এবং সুরেশ ঘরের মধ্যে লণ্ঠনের কাছে মুখ লইয়া একমনে খবরের কাগজ পড়িতেছে। যেন কেহই কাহারও উপস্থিতি আজ জানিতেও পারে নাই। এই যে অত্যন্ত লজ্জাকর সঙ্কোচ দু'টি চিরদিনের বন্ধুর মাঝখানে আজ সহজ শিষ্টাচারের পথটা পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহার উপলক্ষটা মনে পড়িতেই, অচলার পা দু'টা আপনি থামিয়া গেল। ফিরিবার মুখে মহিম থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সুরেশকে চা' দিতে এত দেরি হল যে?" অচলার মুখ দিয়া কিছুতেই কথা বাহির হইল না। সে মুহূর্ত্তকাল মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, নীরবে ধীরে-ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যদু চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলে, সুরেশ কাগজখানা রাখিয়া দিয়া মুখ ফিরাইল; কহিল, "মহিম কৈ? সে এখনো ফেরেনি না কি?" সঙ্গে-সঙ্গেই মহিম প্রবেশ করিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল; কিন্তু সে যে মিনিট-দশেক ধরিয়া তাহারই কাণের কাছে বারান্দার উপরে হাঁটিয়া বেড়াইতেছিল, এই বাহুল্য কথাটা মুখ দিয়া উচ্চারণ করার প্রয়োজন বোধ করিল না। তার পরেই সমস্ত চুপ-চাপ। অচলা নিঃশব্দ অধোমুখে দু'বাটি চা প্রস্তুত করিয়া, একবাটি সুরেশকে দিয়া, অন্যটা স্বামীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া, নীরবেই উঠিয়া যাইতেছিল, মহিমের আহ্বানে সে চমকিয়া দাঁড়াইল। মহিম কহিল, "একটু অপেক্ষা কর" বলিয়া নিজেই চট্ করিয়া উঠিয়া গিয়া কপাটে খিল লাগাইয়া দিল। চক্ষের নিমিষে তাহার ছয় নলা পিস্তলটার কথাই সুরেশের স্মরণ হইল; এবং হাতের পেয়ালা কাঁপিয়া উঠিয়া খানিকটা চা চল্‌কিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সে মুখখানা মড়ার মত বিবর্ণ করিয়া বলিল, "দোর বন্ধ করলে যে?" তাহার কণ্ঠস্বর, মুখের চেহারা ও প্রশ্নের ভঙ্গীতে অচলারও ঠিক সেই কথাই মনে পড়িয়া, তাহার মাথার চুল পর্য্যন্ত শিহরিয়া কাঁটা দিয়া উঠিল। বোধ করি বা একবার যেন সে চীৎকার করিবারও প্রয়াস করিল, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না। মহিম ক্ষণকালমাত্র অচলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্ত বুঝিল। তার পরে সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "চাকরটা না এসে পড়ে, এই জন্যেই;—নইলে পিস্তলটা আমার চিরকাল যেমন বাক্সে বন্ধ থাকে, এখনো তেম্‌নি আছে। তোমরা এত ভয় পাবে জান্‌লে, আমি দোর বন্ধও করতাম না।" সুরেশ চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া, হাসিবার মত মুখের ভাব করিয়া বলিল, "বাঃ, ভয় পেতে যাবো কেন হে? তুমি আমার ওপর গুলি চালাবে,—বাঃ—প্রাণের ভয়! আমি? কবে আবার তুমি দেখ্‌লে? আচ্ছা যা হোক্—" তাহার অসংলগ্ন কৈফিয়ৎ শেষ হইবার পূর্ব্বেই

মহিম কহিল,"সত্যিই কখনো ভয় পেতে তোমাকে দেখিনি। প্রাণের মায়া তোমার নেই বলেই আমি জান্‌তাম। সুরেশ, আমার নিজের দুঃখের চেয়ে তোমার এই অধঃপতন আমার বুকে আজ বেশি করে বাজ্‌ল। যাতে তোমার মত মানুষকেও এত ছোট করে আন্‌তে পারে—না, সুরেশ, কাল তুমি নিশ্চয় বাড়ী যাবে। কোন ছলে আর দেরি করা চল্‌বে না।" সুরেশ তবুও কি একটা জবাব দিতে চাহিল; কিন্তু, এবার তাহার গলা দিয়া স্বরও ফুটিল না, ঘাড়টাও সোজা রাখিতে পারিল না; সেটা যেন তাহার অজ্ঞাতসারেই ঝুঁকিয়া পড়িল। "তুমি ভেতরে যাও অচলা" বলিয়া মহিম খিল খুলিয়া পরক্ষণেই অন্ধকারের মধ্যে বাহির হইয়া গেল। এইবার সুরেশ মাথা তুলিয়া জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, "শোন কথা। অমন কতগণ্ডা বন্দুক্‌-পিস্তল রাত-দিন নাড়াচাড়া করে বুড়ো হয়ে এলুম,— এখন ওর একটা ভাঙা-ফুটো রিভলভারের ভয়ে মরে গেছি আর কি! হাসালে যাহোক্‌—" বলিয়া সুরেশ নিজেই টানিয়া-টানিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসিতে যোগ দিবার মত লোক ঘরের মধ্যে অচলা ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে কিন্তু যেমন ঘাড় হেঁট করিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনি ভাবেই আরও কিছুকাল স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া, ধীরে-ধীরে পাশের দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে মহিম নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কেহ নাই। পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, মাটিতে মাদুর পাতিয়া, হাতের উপর মাথা রাখিয়া অচলা শুইয়া আছে। স্বামীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল। পাশে একটা খালি তক্তপোষ ছিল, মহিম তাহার উপর উপবেশন করিয়া বলিল, "কেমন, কাল তোমার বাপের বাড়ী যাওয়া ত ঠিক?" অচলা নীচের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না। মহিম অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনশ্চ কহিল, "যাকে ভালবাস না, তারই ঘর করতে হবে, এত বড় অন্যায় উপদ্রব আমি স্বামী হলেও তোমার ওপর করতে পারব না।" কিন্তু অচলা তেমনি পাষাণ-মূর্ত্তির মত নিঃশব্দ স্থির হইয়া রহিল দেখিয়া মহিম বলিতে লাগিল, "কিন্তু তোমার উপর আমার অন্য নালিশ আছে। আমার স্বভাব ত জানো। শুধু বিয়ের পর থেকেই ত নয়, অনেক আগেই ত আমাকে জান্‌তে যে, আমি সুখ-দুঃখ যাই হোক্‌, নিজের প্রাপ্য ছাড়া এক বিন্দু উপরি পাওনা কখনো প্রত্যাশা করিনে—পেলেও নিইনে। ভালবাসার ওপর ত জোর খাটে না অচলা। না পারলে হয় ত তা দুঃখের কথা, কিন্তু লজ্জার কথা ত নয়। কেন তবে এতদিন কষ্ট পাচ্ছিলে? কেন আমাকে না জানিয়ে ভেবে নিয়েছিলে, আমি জোর করে তোমাকে আট্‌কে রাখ্‌বো? কোন দিন, কোন বিষয়েই ত আমি জোর খাটাইনি। তাঁরা তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে, তবেই তোমার প্রাণ বাঁচবে,—আর আমাকে জানালে কি কোন উপায় হোতো না? তোমার প্রাণের দামটা কি শুধু তাঁরাই বোঝেন?" অচলা অশ্রু-বিকৃত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর যতদূর সাধ্য সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া চুপি চুপি বলিল, "তুমিও ত ভালবাসো না।" মহিম আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "এ কথা কে বল্‌লে? আমি ত কখনো তোমাকে বলিনি।" অচলার উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না; কহিল, "শুধু কথাই কি সব? শুধু মুখের বলাই সত্যি, আর সব মিথ্যে? রাগের মাথায় মনের কষ্টে যা' কিছু মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকেই কেবল সত্যি ধরে নিয়েই তুমি জোর খাটাতে চাও? তোমার মতন নিক্তির ওজনে কথা বল্‌তে না পারলেই কি তার মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে?" বলিতে-বলিতেই তাহার গলা ধরিয়া প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। মহিম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "তার মানে?" অচলা উচ্ছ্বসিত রোদন চাপিয়া বল্লি, "মনে কোরো না—তোমার মত সাবধানী লোকেও মিথ্যেকে চিরকাল চাপা দিয়ে রাখতে পারে! তোমারও কত ভুল হতে পারে—দেখগে চেয়ে তোমারই টেবিলের ওপর! শুধু আমাদেরই—" মহিম প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি আমার টেবিলের ওপর?" অচলা মুখে আঁচল গুঁজিয়া মাদুরের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। তাহার কাছে আর কোন জবাব না পাইয়া, মহিম আস্তে-আস্তে উঠিয়া তাহার টেবিল দেখিতে গেল। তাহার পড়ার ঘরের টেবিলের উপর খানকতক বই পড়িয়া ছিল; প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া সেইগুলা উল্‌টিয়া-পাল্‌টিয়া দেখিয়া, তাহার নীচে, আশেপাশে সমস্ত তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও, স্ত্রীর অভিযোগের কিছুমাত্র তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, বিমূঢ়ের ন্যায় ফিরিয়া আসিবার পথে শোবার ঘরটার প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, ভিতরে একটা পা দিয়াই মৃণালের সেই চিঠিখানার উপর তাহার চোখ পড়িল। সেখানা হাতে তুলিয়া লইয়া

পড়িবামাত্রই, অকস্মাৎ অন্ধকারে বিদ্যুৎ-হানার মতই আজ এক মুহূর্ত্তে মহিম পথ দেখিতে পাইল। অচলা যে কি ইঙ্গিত করিয়াছে, আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সেটুকু হাতের মধ্যে লইয়া মহিম বিছানার উপর বসিয়া, শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। যেমন করিয়া সে প্রথম দিনটিতে আসিয়াছিল, যে ভাবে সে চলিয়া গিয়াছিল, সতীন বলিয়া সে অচলাকে যত পরিহাস করিয়াছে,—একটি-একটি করিয়া তাহার সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল। পল্লীগ্রামের এই সকল রহস্যালাপের সহিত যে মেয়ে পরিচিত নয়, তা প্রতিদিন তাহার যে কিরূপ বিঁধিয়াছে, এবং সে নিজেও যখন কোনদিন এই পরিহাসে খোলা মনে যোগ দিতে পারে নাই, বরঞ্চ স্ত্রীর সম্মুখে লজ্জা পাইয়া বারম্বার বাধা দিবার চেষ্টাই করিয়াছে,—তাহার সেই লজ্জা যদি এই উচ্চশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী রমণীর দৃষ্টিতে অপরাধীর সত্যকার লজ্জায় ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়া থাকে, ত, আজ তাহার মূলোচ্ছেদ করিবে সে কি দিয়া? বাহিরের অন্ধকারের ভিতর হইতে আজ অনেক সত্য তাহাকে দেখা দিতে লাগিল;—কেমন করিয়া অচলার হৃদয় ধীরে-ধীরে সরিয়া গেছে, কেমন করিয়া স্বামীর সঙ্গ দিনের পর দিন বিষাক্ত হইয়াছে, কেমন করিয়া স্বামীর আশ্রয় প্রতিমুহূর্ত্তে কারাগার হইয়া উঠিয়াছে,—সমস্তই সে যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। এই প্রাণান্তকর অবরোধের মধ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার সেই যে আকুল প্রার্থনা সুরেশের কাছে তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল,—সে যে তাহার অন্তরের কোন্ অন্তরতম দেশ হইতে উত্থিত হইয়াছিল, তাহাও আজ মহিমের মনশ্চক্ষের সম্মুখে প্রচ্ছন্ন রহিল না। অচলাকে সে যথার্থই সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসিয়াছিল। সেই অচলার এতদিন এত কাছে থাকিয়াও, তাহার এতবড় মনোবেদনার প্রতি চোখ বুজিয়া থাকাটাকে সে গভীর অপরাধ বলিয়া গণ্য করিল। কিন্তু, এমন করিয়া আর ত একটা মুহূর্ত্তও চলিবে না! স্ত্রীর হৃদয় ফিরিয়া পাইবার উপায় আছে কি না, তাহা কোথায় কতদূরে সরিয়া গেছে, অনুমান করাও আজ দুঃসাধ্য; কিন্তু, অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও একদিন স্বামী বলিয়া যাহাকে সে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারই কাছে অপমান এবং লাঞ্ছনা পাইয়া যে আর-একদিন ফিরিয়া যাইতেছে না,—একথা তাহাকে তো জানানো চাই মহিম ধীরে-ধীরে উঠিয়া গিয়া, অচলার দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিল, কবাট রুদ্ধ। ঠেলিয়া দেখিল, তাহা ভিতর হইতে বন্ধ। আস্তে-আস্তে বার-দুই ডাকিয়াও যখন কোন সাড়া পাইল না, তখন শুধু যে জোর করিয়া শান্তিভঙ্গ করিবারই তাহার প্রবৃত্তি হইল না, তাহা নহে; একটা অতি কঠিন পরীক্ষার দায় হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইয়া নিজেও যেন বাঁচিয়া গেল।

মহিম ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল; কিন্তু যাহার অভাবে পার্শ্বের স্থানটা আজ শূন্য পড়িয়া রহিল, ও-ঘরে সে অনশনে মাটীতে পড়িয়া আছে, মনে করিয়া কিছুতেই তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। উঠিয়া গিয়া ঘুম ভাঙাইয়া তাহাকে তুলিয়া আনা উচিত কি না, ভাবিতে-ভাবিতে এবং দ্বিধা করিতে-করিতে অনেক রাত্রে বোধ করি সে কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল; সহসা মুদ্রিত চক্ষে তীব্র আলোক অনুভব করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। শিয়রের খোলা জানালা দিয়া, এবং চালের ফাঁক দিয়া অজস্র আলোক ও উৎকট ধূমে ঘর ভরিয়া গেছে, এবং অত্যন্ত সন্নিকটে এমন একটা শব্দ উঠিয়াছে, যাহা কাণে প্রবেশমাত্রই সর্ব্বাঙ্গ অসাড় করিয়া দেয়। কোথায় যে আগুন লাগিয়াছে, তাহা নিশ্চয় বুঝিয়াও ক্ষণকালের জন্য সে হাত-পা নাড়িতে পারিল না। কিন্তু সেই কয়েকটা মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার মাথার ভিতর দিয়া ব্রহ্মাণ্ড খেলিয়া গেল। লাফাইয়া উঠিয়া, দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল রান্নাঘর এবং যে ঘরে আজ অচলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহারই বারান্দার একটা কোণ বিদীর্ণ করিয়া প্রধূমিত অগ্নিশিখা উপরের সমস্ত জাম গাছটাকে রাঙা করিয়া ফেলিয়াছে। পল্লীগ্রামে খড়ের-ঘরে আগুন ধরিলে তাহা নিবাইবার কল্পনা করাও পাগ্‌লামি; সে চেষ্টাও কেহ করে না। পাড়ার লোক যে যাহার জিনিসপত্র ও গরু-বাছুর সরাইতে ছুটাছুটি করে, এবং ভিন্ন পাড়ার লোক একদিকে মেয়েরা, এবং একদিকে পুরুষেরা সমবেত হইয়া অত্যন্ত নিরুদ্বেগে হায়-হায় করিয়া এবং কি পরিমাণের দ্রব্য-সম্ভার দগ্ধ হইতেছে এবং কি করিয়া এ সর্ব্বনাশ ঘটিল, তাহারই আলোচনা করিয়া সমস্ত বাড়ীটা ভস্মসাৎ

হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। তার পরে ঘরে ফিরিয়া হাত-পা ধুইয়া বাকি রাত্রিটুকু বিছানায় গড়াইয়া লইয়া পুনরায় সকাল-বেলা একে-একে গাড়ু-হাতে দেখা দেয়। এবং আলোচনার জেরটুকু সকালের মত শেষ করিয়া বাড়ী গিয়া স্নানাহার করে। কিন্তু একজনের গৃহ-প্রাঙ্গণের বিরাট ভস্মস্তূপ আর একজনের নিয়মিত জীবন-যাত্রার লেশমাত্র ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে না। মহিম পল্লীগ্রামের লোক, সকল কথাই সে জানিত। তাই, নিরর্থক চেঁচা-চেঁচি করিয়া অসময়ে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙাইয়া দিল না। বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও ছিল না, কারণ, তাহার আম-কাঁঠালের এত বড় বাগানটা অতিক্রম করিয়া এই অগ্ন্যুৎপাত যে আর কাহারও গৃহ স্পর্শ করিবে, সে সম্ভাবনা ছিল না। বাহিরের সারের যে কয়টা ঘরে সুরেশ এবং চাকর-বাকরেরা নিদ্রিত ছিল, অগ্নিস্পৃষ্ট হইবার তখনও তাহাদের বিলম্ব ছিল; বিলম্ব ছিল না শুধু অচলার ঘরটার। সে তাহারই দ্বারে সজোরে করাঘাত করিয়া ডাকিল, "অচলা!"

অচলা ঠিক যেন জাগিয়া ছিল, এমনি ভাবে উত্তর দিল, "কেন?" মহিম কহিল, "দোর খুলে বেরিয়ে এস।" অচলা শ্রান্ত-কণ্ঠে জবাব দিল, "কি হবে? আমি ত বেশ আছি।" মহিম কহিল, "দেরি কোরো না, বেরিয়ে এসো, —বাড়ীতে আগুন লেগেছে।" প্রত্যুত্তরে অচলা একবার ভয়-জড়িত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল; তার পরেই সমস্ত চুপচাপ। মহিমের পুনশ্চ ব্যগ্র আহ্বানে সে আর সাড়াও দিল না। ঠিক এই ভয়ই মহিমের ছিল; কারণ, বাটীতে আগুন লাগা যে কি ব্যাপার, তাহার কোন প্রকার ধারণাই অচলার ছিল না। মহিম ঠিক বুঝিল ইতিপূর্ব্বে সে চোখ বুজিয়াই কথা কহিতেছিল, কিন্তু চোখ মেলিয়া যে দৃশ্য তাহাকেও কিছুক্ষণের জন্য অবশ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই অপর্য্যাপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত সমস্ত ঘরটা চোখে পড়িবামাত্র অচলারও সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে। এই দুর্ঘটনার জন্য মহিম প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সে একটা কপাট টানিয়া উঁচু করিয়া হাঁস-কলটা খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল; এবং মূর্চ্ছিতা স্ত্রীকে বুকে তুলিয়া লইয়া অবিলম্বে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। এইবার সে বাটীর অন্য সকলকে সজাগ করিবার জন্য নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সুরেশ পাংশুমুখে বাহির হইয়া আসিল, যদু প্রভৃতি অপর সকলেও দ্বার খুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পরেই একটা প্রচণ্ড শব্দ সাড়ায় অচলা সচেতন হইয়া দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ প্রাণপণ বলে জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মহিম সকলকে লইয়া যখন বাহিরের খোলা যায়গায় আসিয়া পড়িল, তখন বড়-ঘরের চালে আগুন ধরিয়াছে। এইবার তাহার মনে পড়িল অচলার অলঙ্কার প্রভৃতি দামী জিনিস যাহা কিছু আছে, সমস্তই এই ঘরে, এবং আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে কিছুই বাঁচানো যাইবে না।

অচলা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল; সে সজোরে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না, সে হবে না। প্রতিশোধ নেবার এই কি সময় পেলে? কিছুতেই ওর মধ্যে তোমাকে আমি যেতে দেব না। যাক্, সব পুড়ে যাক্।"

"না গেলে চলবে না অচলা—" বলিয়া জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া মহিম সেই জমাট ধূমরাশির মধ্যে দ্রুতবেগে গিয়া প্রবেশ করিল। যদু চেঁচাইতে চেঁচাইতে সঙ্গে ছুটিল। সুরেশ এতক্ষণ পর্য্যন্ত অভিভূতের মত চাহিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল; অকস্মাৎ সম্বিত পাইয়া সে পিছু লইবার উপক্রম করিতেই অচলা তাহার কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, "আপনি যান্ কোথায়?" সুরেশ টানাটানি করিয়া বলিল, "মহিম গেল যে—।" অচলা তিক্ত স্বরে বলিল, "তিনি গেলেন তাঁর জিনিস বাঁচাতে। আপনি কে? আপনাকে যেতে আমি কোনই মতে দেব না।"

তাহার কণ্ঠস্বরে স্নেহের লেশমাত্র সম্পর্ক ছিল না,—এ যেন শুধু সে অনধিকারীর উৎপাতকে তিরস্কার করিয়া দমন করিল। মিনিট দুই-তিন পরেই মহিম দুই হাতে দু'টা বাক্স লইয়া এবং যদু প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ মাথায় করিয়া উপস্থিত হইল। মহিম অচলার পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল, "তোমার গহনার বাক্সটা যেন কিছুতে হাত-ছাড়া কোরো না, আমরা বাইরের ঘরের যদি কিছু বাঁচাতে পারি, চেষ্টা করিগে।"

অচলার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। তাহার মুঠার মধ্যে তখনো সুরেশের কোঁচার খুঁট ধরা

ছিল, তেম্‌নি ধরা রহিল। মহিম পলকমাত্র সে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যদুকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতের প্রথম আলোকে স্বামীর মুখের প্রতি চোখ পড়িবামাত্রই অচলার বুকের ভিতরটা হাহা রবে কাঁদিয়া উঠিল। চোখের জল আর সে কোন মতে সম্বরণ করিতে পারিল না। এ কি হইয়াছে! মাথার চুল ধূলাতে, বালুতে, ভস্মে রুক্ষ, বিবর্ণ; শীর্ণ, বিরস মুখ অগ্নুত্তাপে ঝলসিয়া একটা রাত্রির মধ্যেই তাহার অমন সুন্দর স্বামীকে যেন বুড়া করিয়া দিয়া গেছে। গ্রামের লোক চারিদিকে ঘুরিয়া-ফিরিয়া কলরব করিতেছে। পিতল-কাঁসার বাসন-কোসন সে ত সমস্তই গেছে দেখা যাইতেছে। তা' যাক,—কিন্তু শাল-দোশালা গহনা-পত্র তাই বা আর কত ঐ একটিমাত্র তোরঙ্গে রক্ষা পাইয়াছে,—এই লইয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সমালোচনা চলিতেছে। ইহাদেরই একটু দূরে নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিস্তূপের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া মহিম চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সমস্তই শুনিতে পাইতেছিল, কিন্তু কৌতূহল নিবারণ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। ও-পাড়ার ভিখু বাঁড়ুয্যে—অত্যন্ত গণ্য-মান্য ব্যক্তি—বাতের জন্য এ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিতে পারেন নাই; এখন লাঠিতে ভর দিয়া সদলবলে আগমন করিতেছেন দেখিয়া মহিম অগ্রসর হইয়া গেল। বাঁড়ুয্যে মহাশয় বহুপ্রকার বিলাপ করিয়া শেষে বলিলেন, "মহিম, তোমার বাবা অনেক দিন স্বর্গীয় হইয়াছেন বটে, কিন্তু, আমি আর তিনি ভিন্ন ছিলাম না। আমরা দুজনে হরিহর আত্মা ছিলাম।" মহিম ঘাড় নাড়িয়া সবিনয়ে জানাইল যে, ইহাতে তাহার কোন সংশয় নাই। শুনিয়া তিনি কহিলেন যে, এই কাণ্ডটি যে ঘটিবে, তাহা তিনি পূর্ব্বাহ্ণেই জানিতেন। মহিম চকিত হইয়া জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল। পাশ্বেই বেড়ার আড়ালে অচলা জিনিস-পত্র লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল, সেও শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। ভূমিকা এই পর্য্যন্ত করিয়া বাঁড়ুয্যে মশাই বলিতে লাগিলেন, "ব্রহ্মার ক্রোধ ত শুধু-শুধু হয় না বাবা! আমাদের একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করলে না, এত বড় বামুনের ছেলে হয়ে কি অপকর্ম্মটাই না করলে বল দেখি।"

মহিম কথাটা বুঝিতে পারিল না। তিনি নিজের কথাটার তখন বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে অনুচরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা সবাই বলাবলি করি যে, কিছু একটা ঘটবেই। কই আর কারুর প্রতি ব্রহ্মার অকৃপা হল না কেন! বাবা, বেম্মও যা খৃষ্টানও তাই। সাহেব হলেই বলে খৃষ্টান, আর বাঙালী হলেই বলে বেম্ম। এ আমাদের কাছে—যাদের শাস্ত্রজ্ঞান জন্মেছে—তাদের কাছে চাপা থাকে না।" উপস্থিত সকলেই ইহাতে অনুমোদন করিল। তিনি উৎসাহ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "যাই কর না বাবা, আগে একটা প্রাশ্চিত্ত করে ওটাকে ত্যাগ করে—"

মহিম হাত তুলিয়া বলিল, "থামুন। আপনাদের আমি অসম্মান করতে চাইনে,—কিন্তু যা নয়, তা' মুখে আনবেন না। আমি যাঁকে ঘরে এনেচি, তাঁর পুণ্যে ঘর থাকে ভালই, না হয়, বার-বার পুড়ে যাক্ সেও আমার সহ্য হবে।" বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বাঁড়ুয্যে মশায় সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, লাঠি ঠক্-ঠক্ করিয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন। মনে-মনে যাহা বলিতে-বলিতে গেলেন, তাহা মুখে না আনাই ভাল।

অচলা সমস্ত শুনিতে পাইয়াছিল; তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া আবার বড়-বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। যদু আসিয়া কহিল, "মা, তোমাকে জিজ্ঞেসা করে বাবু পাল্‌কি-বেহারা ডেকে আন্‌তে বল্‌লেন। আন্‌ব?" অচলা আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "বাবুকে একবার ডেকে দাও ত যদু।" "পাল্‌কি?" "এখন থাক্।" মহিম কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইতেই মহিম বিস্মিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। হয় ত, সে স্বামীর হাত দুটা ধরিয়া কাছে টানিয়া বসাইত, হয় ত বা, আরও কিছু ছেলে-মানুষি করিয়া ফেলিত;—কি করিত, তা' সে তাহার অন্তর্যামীই জানিতেন; কিন্তু, সকাল হইয়া গেছে—চারিদিকে কৌতূহলী লোক;—অচলা আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, "পাল্‌কি কেন?" মহিম কহিল, "ন'টার ট্রেণ ধরতে পারলেই ত সব দিকে সুবিধে। একটার মধ্যে বাড়ী

পৌঁছে স্নানাহার করতে পারবে। কাল রাত্রেও ত কিছু খাওনি।" "আর তুমি?" "আমি?" মহিম একটুখানি চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল, "আমারও যা হোক্ একটা উপায় হবে বৈ কি।" "তা'হলে আমারও হবে। আমি যাবো না।" "কি উপায় হবে বল?" অচলা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। একবার তাহার মুখে আসিল,—বনে, গাছতলায়! কিন্তু সে তো সত্যই সম্ভব নয়। আর পাড়ায় কাহারও বাটীতে একটা ঘণ্টার জন্যও আশ্রয় লওয়া যে কতদূর অপমানকর, সে ইঙ্গিত ত সে এইমাত্র ভাল করিয়াই পাইয়াছে। মৃণালের কথা যে তাহার মনে পড়ে নাই, তাহা নহে; বরঞ্চ বারম্বার স্মরণ হইয়াছে; কিন্তু লজ্জায় তাহা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, "তুমিও সঙ্গে চল!"

মহিম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমি সঙ্গে যাবো? তাতে লাভ কি?" অচলা বলিল, "লাভ-লোকসান দেখ্‌বার ভার আজ থেকে আমি নেব। তোমার শুভানুধ্যায়ী এখানে যে বেশি নেই, সে আমি জান্‌তে পেরেচি। তা' ছাড়া, তোমার মুখের চেহারা এক রাত্রির মধ্যেই যা' হয়ে গেছে, সে তুমি ত দেখ্‌তে পাচ্চো না, আমি পাচ্চি। আমার গলায় ছুরি দিলেও, এখানে একলা ফেলে রেখে তোমাকে আমি যেতে পারবো না।" মহিমের মনের ভিতরে তোলপাড় করিতে লাগিল; কিন্তু, সে স্থির হইয়া রহিল। অচলা বলিতে লাগিল, "কেন তুমি অত ভাব্‌চ? আমার গয়না-গুলো ত আছে। তা' দিয়ে পশ্চিমে যেখানে হোক্ কোথাও একটা ছোট বাড়ী অনায়াসে কিন্‌তে পাবো। যেখানেই থাকি, আমাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেল্‌তে তুমি পারবে না। সে চেষ্টা তোমাকে করতেই হবে। আর বলেইচি ত, তোমার ভার এখন থেকে আমার ওপর।" যদু অদূরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাল্‌কি আন্‌তে যাবো মা?" উত্তরের জন্য অচলা উৎসুক চক্ষে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মহিম ইহার জবাব দিল। যদুকে আনিতে হুকুম করিয়া স্ত্রীকে বলিল, "কিন্তু, আমি ত এখুনি যেতে পারিনে।" শুনিয়া অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও তৃপ্তিতে অচলার বুক ভরিয়া গেল। সে অন্তরের আবেগ সম্বরণ করিয়া সহজভাবে কহিল, "সে সত্যি, এক্ষুণি তোমার যাওয়া হয় না; কিন্তু সন্ধ্যের গাড়ীতে নিশ্চয় যাবে বল? নইলে আমি খাবার নিয়ে বসে-বসে ভাব্‌ব, আর—" কিন্তু তাহার ওষ্ঠাধরের চাপা হাসির দীপ্তি অকস্মাৎ মহিমের দীর্ঘশ্বাসে নিবিয়া গেল। সে মলিন হইয়া সভয়ে কহিল, "ও-বেলা যেতে পারবে না? এই অন্ধকার রাত্রে কার বাড়ীতে—" কিন্তু বলিতে-বলিতেই সে থামিয়া গেল। যাহার বাটীতে তাহার স্বামীর রাত্রি-যাপনের সম্ভাবনা, সে কথা মনে হইতেই তাহার মুখশ্রী গম্ভীর ও বিবর্ণ হইয়া গেল। বোধ করি, তাহার মনের কথা মহিম বুঝিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "কল্‌কাতায় আমাকে কোথায় যেতে বল?" অচলা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল,—"কেন, বাবার ওখানে।" মহিম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না।" "না কেন? সেও কি তোমার নিজের বাড়ী না?" মহিম তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, "না।" অচলা কহিল, "না হয় সেখানে কেবল দুটো দিন থেকেই আমরা পশ্চিমে চলে যাবো।" "না।" অচলা জানিত তাহাকে টলানো সম্ভব নয়। একটুখানি চিন্তা করিয়া বলিল, "তবে চল, এখান থেকেই আমরা পশ্চিমের কোন সহরে গিয়ে উঠিগে। আমি সঙ্গে থাক্‌লে কোথাও আমাদের কষ্ট হবে না, আমি বেশ জানি। কিন্তু গহনা-গুলো ত বেচ্‌তে হবে; সে কলকাতা ছাড়া হবে কি করে?" মহিম আর-একদিকে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিল। অচলা ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "পশ্চিমেও ত বড়-বড় সহর আছে, সেখানেও ত বিক্রী করা যায়? আমার বাক্সে প্রায় দু'শ টাকা আছে এখন তাতেই ত আমাদের যাওয়া হতে পারে? চুপ্ করে রইলে যে? বল না শীগ্‌গীর।" মহিম স্ত্রীর চোখের দিকে চাহিতে পারিল না, কিন্তু জবাব দিল; ধীরে ধীরে বলিল, "তোমার গয়না নিতে পারব না অচলা।" অকস্মাৎ একটা গুরুতর ধাক্কা খাইয়া যেন অচলা পিছাইয়া গেল। খানিক পরে কহিল, "কেন পারবে না, শুন্‌তে পাই?" মহিম তাহার উত্তর দিল না, এবং কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। হঠাৎ অচলা একসঙ্গে এক রাশ প্রশ্ন করিয়া বসিল। কহিল, "পৃথিবীতে স্বামী কি তুমি কেবল একটি? দুঃসময়ে তাঁরা নেন কি কোরে? স্ত্রীর গয়না থাকে কি জন্যে? এত কষ্টে এগুলো বাঁচাতে গেলেই বা কেন?" বলিয়া সে ছোট টিনের বাক্সটা হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া

কহিল, "আর বিপদের দিনে এরা যদি কোন কাজেই না লাগে, ত মিথ্যে বোঝা বয়ে বেড়িয়ে কি হবে? আগুন ত এখনো জ্বল্‌চে, আমি টান মেরে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাই;—তোমার যা মনে আছে, কোরো।" বলিয়া সে আঁচল দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিল।

মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া মহিম ধীরে ধীরে কহিল, "আমি সমস্ত ভেবে দেখ্‌লাম অচলা। কিন্তু, তুমি ত জানো, আমি কোন কাজ ঝোঁকের ওপর করিনে; কিম্বা আর কেউ করে, সেও চাইনে। তুমি যা' দিতে চাচ্চো, তা' নিজের বলে' নিতে পারলে আজ আমার সুখের সীমা থাক্‌ত না; কিন্তু কিছুতেই নিতে পারিনে। দুঃখ দেখে তোমার মত' আরও একজন আরও ঢের বেশি আমাকে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেও যেমন দয়া, এও তেমনি দয়া। কিন্তু এতে না তোমাদের, না আমার কারও শেষ পর্য্যন্ত ভাল হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।" অচলা আর সহিতে পারিল না। কান্না ভুলিয়া বোধ করি প্রতিবাদ করিবার জন্যই দৃপ্ত চক্ষু দুটি উপরে তুলিবামাত্রই স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইল, কতকটা দূরে তাহাদের যে পুষ্করিণী আছে, তাহারই ঘাটের পাশে বাঁধানো নিমগাছ-তলায় সুরেশ হাতে মাথা রাখিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। অচলার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, এবং উচ্চ্রিত মাথা তাহার আপনি হেঁট হইয়া গেল। কিন্তু মহিম যেন কতকটা অন্যমনস্কের মত আপন মনেই বলিতে লাগিল, "শুধু যে কখনো শান্তি পাবো না তাই নয়, তোমাকে বারম্বার বঞ্চিত করতে পারি এ সম্বন্ধই কোন দিন আমাদের মধ্যে হয় নি।" একটুখানি থামিয়া কহিল, "অচলা, নিজেকে রিক্ত করে দান করবার অনেক দুঃখ। কিন্তু, ঝোঁকের উপর হয় ত তা' এক মুহূর্ত্তে পারা যায়, কিন্তু তার ফল-ভোগ হয় সারা জীবন ধরে। আমি জানি, একটা ভুলের জন্যে তোমাদের মনস্তাপের অবধি নেই। আবার একটা ভুল হয়ে গেলে তুমি না পারবে কোন দিন নিজেকে ক্ষমা করতে, না পারবে আমাকে মাপ করতে। এ ক্ষতি সইবার মত সম্বল তোমার নেই;—এ কথা আজ না টের পেতে পারো, দুদিন পরে পারবে। তাই তোমার কাছ থেকে কিছুই আমি নিতে পারব না।" কথাগুলা অচলার বুকের ভিতরে গিয়া বিঁধিল। স্বামীর চক্ষে সে যে কত পর, তাহা আজ যেমন অনুভব করিল, এমন আর কোন দিন নয়। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই মৃণালের স্মৃতিতে সে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেও কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি এতক্ষণ ধরে যা' বোঝাচ্চো, সে আমি বুঝেছি। হয় ত তোমার কথাই সত্যি, হয় ত তোমার মুখ দেখে দয়া হওয়াতেই আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে দিতে চেয়েছিলুম। হয় ত, দুদিন পরে আমাকে সত্যি এর জন্যে অনুতাপ কর্ত্তে হোতো;—সব ঠিক, কিন্তু ত্যাখো, অপরের মনের ইচ্ছে বুঝে নেবার মত যত বুদ্ধিই তোমার থাক্, তোমাকে বুঝিয়ে দেবারও জিনিস আছে। স্ত্রীর জিনিস জোর করে নেওয়া ত দূরের কথা, হাত পেতে নেবার মত সম্বল তোমারই কি আছে? আর তোমার সঙ্গে আমি তর্ক কোরব না। এটুকু বিবেক-বুদ্ধি যে এখনো তোমাতে বাকি আছে, আজ থেকে তাই হবে আমার সান্ত্বনা। কিন্তু, যেখানেই থাকি, একদিন না একদিন তোমাকে সব কথা বুঝতেই হবে। হবেই হবে।" বলিয়া সে হাত দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কান্না রোধ করিল।

নটার ট্রেণে সুরেশও বাটী ফিরিতেছিল। গত রাত্রের অগ্নি-কাণ্ড কেমন যেন একরকম তাহাকে করিয়া দিয়াছিল। কাহারও সহিত কথা কহিবার যেন শক্তিই তাহাতে ছিল না। গাড়ী আসিতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল; সুরেশ মহিমকে ষ্টেশনের এক প্রান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "মহিম, আগুন লাগার জন্যে আমাকে ত তুমি সন্দেহ করোনি?" মহিম তাহার হাত দুটা সজোরে ধরিয়া ফেলিয়া শুধু বলিল, "ছিঃ!" সুরেশের দুই চোখ ছল্-ছল্ করিতে লাগিল। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিল, "কাল থেকে এই ভয়ে আমার শান্তি নেই মহিম!" মহিম নীরবে শুধু একটু তাহার হাতের মধ্যে চাপ দিল। তাহার পরে কহিল, "সুরেশ, একটা সত্যকার অপরাধ অনেক মিথ্যা অপবাদের বোঝা বয়ে আনে। কিন্তু অনেক দুঃখ পেয়ে তুমি যাই কর না কেন, যাকে 'ক্রাইম' বলে, সে তুমি কোন দিন করতে পারো না বলে আজও আমি বিশ্বাস করি।" একটুখানি থামিয়া কহিল "সুরেশ, তুমি ভগবান মানো না

বটে, কিন্তু যে যথার্থ মানে, সে অহর্নিশি প্রার্থনা করে, এ বিশ্বাস তিনি যেন তার না ভেঙে দেন।"

ট্রেণ আসিয়া পড়িল। মেয়েদের গাড়ীতে অচলা এবং তাহার দাসীকে তুলিয়া দিয়া মহিম সুরেশের কাছে আসিতেই সে জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "তোমার কাল্‌কের ক্ষতিটা পূর্ণ করে দেবার প্রার্থনাটা ত আমার কিছুতেইমঞ্জুর করলে না; কিন্তু, তোমার ভগবান তোমার প্রার্থনাটা যেন মঞ্জুর করেন ভাই! আমাকে যেন আর তিনি ছোট না করেন" বলিয়াই সে হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

ওদিকে জানালায় মুখ রাখিয়া অচলা যদুর সঙ্গে এতক্ষণ চুপি-চুপি কি কথা কহিতেছিল; মহিম নিকটে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিল, "মৃণাল দিদির স্বামী না কি আজ মারা গেছেন?" মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে মারা গেছেন শুন্‌লাম।" অচলা জিজ্ঞাসা করিল, "প্রায় পোনর-ষোলদিন ধরে নিমোনিয়ায় ভুগ্‌ছিলেন। এ খবরটাও আমাকে দেওয়া কোন দিন তুমি আবশ্যক মনে করোনি?" মহিম জবাব দিতে চাহিল, কিন্তু কি করিয়া কথাটা গুছাইয়া বলিবে, ভাবিতে-ভাবিতেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। (ক্রমশঃ)

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

চরিত্র চিত্রণ—স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকঃ—

নাটক ও আখ্যানকাব্যের প্রধান বিষয় মনুষ্য চরিত্র। মনুষ্য-চরিত্রকে অবলম্বন করিয়াই কবিকে এক্ষেত্রে গল্প জমাইবার চেষ্টা করিতে হয়।

এখানে এখন এক কথা উঠিতে পারে যে, চরিত্র চিত্রণই যদি আখ্যান কাব্য ও নাট্য-কাব্যের প্রধান অঙ্গ হয়, তাহা হইলে আরব্যোপন্যাসে তাহার অত অভাব দেখিতে পাই কেন?—ঘটনাই তবে উহার সর্ব্বস্ব কেন?

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আরব্যোপন্যাসকে উপন্যাস বলিলেও, এখনকার দিনে উপন্যাস বলিলে যাহা বুঝায়, উহা তাহা নহে।—উহা কাব্য নহে। আরব্যোপন্যাস যিনি লিখিয়াছেন, তিনি ঘটনা-লেখক। 'তারপর এই হইল', 'তারপর এই হইল'—এই তাঁহার বুলি। ইহাতে বালক ভুলিতে পারে, এবং ভুলিয়াও থাকে; কিন্তু যিনি রসজ্ঞ, তিনি ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। তিনি অনুসন্ধান করেন রস বস্তুর। এই রসের আধার কিন্তু মনুষ্য-হৃদয়। আরব্যোপন্যাসে সেই হৃদয়কে বাদ দিয়া কেবল ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। আখ্যান-কাব্যে বা নাট্যকাব্যে উহা চলে না। সেখানে প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে অন্তরের সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া চরিত্র-চিত্রণ করিতে হয়।

এই চরিত্র-চিত্রণ-শক্তি জগতে অতি দুর্ল্লভ। নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক এখন অসংখ্য বটে; এবং বাঙ্গালা কাগজের সমালোচনার পৃষ্ঠায় সচরাচর দেখিতেও পাই যে লেখা থাকে—"গ্রন্থকার চরিত্র-চিত্রণে সিদ্ধ-হস্ত।" কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বহি পড়িতে গেলে সমালোচকের উক্তির বিশেষ কোনও সার্থকতা উপলব্ধি হয় না। প্রায়ই দেখিতে পাই যে, নাটক ও উপন্যাস রচয়িতারা অধিকাংশ স্থলেই 'শিব গড়িতে বানর' বা 'বানর গড়িতে শিব' গড়িয়া ফেলেন।

তবে বুঝিবার দোষেও যে অনেক সময় আমরা কবির সৃষ্ট-চরিত্রের প্রতি অবিচার করিয়া থাকি, তাহা অস্বীকার করি না। আমরা যখন তখন 'স্বাভাবিক' ও 'অস্বাভাবিক' কথা দুইটা লইয়া লোফালুফি করি বটে, কিন্তু এ কথা সত্য যে, সকল সময়ে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি না। মনে পড়ে, বঙ্কিমবাবু "উত্তর রাম-চরিতে"র সমালোচনা-প্রসঙ্গে তাহার রাম চরিত্রকে খুব স্পষ্ট করিয়া অস্বাভাবিক না বলিলেও যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা উহারই নামান্তর মাত্র। তিনি বলেন যে, ভবভূতির "রাম-চরিত্রে বীর লক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণস্থল।" কিন্তু কথা হইতেছে, বিলাপ করিলেই কি কাপুরুষ হয়? প্রথম বর্ষের 'ভারতী' পত্রিকাতেও এক সমালোচক একবার প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, মাইকেলের রাবণ কোথাও খুব বীর, কোথাও বা খুব কাপুরুষ হইয়াছেন। বীরবাহুর শোকে রাবণের ক্রন্দন দেখিয়া তিনি মাই-কেলকে ধিক্কার প্রদান করেন। তাঁহার মতে, রাবণের এ ক্রন্দন কাপুরুষোচিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের কথা ঐ;—বীরেরা কি কখনও কাঁদেন না? এমন আদর্শ চরিত্র কোথায় আছে, যিনি দুঃখের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া চক্ষের জলে বুক ভাসান নাই? শ্যাম-সলিলা কালিন্দী-কূলে শ্যামসুন্দরের প্রাণপোড়ান মর্ম্মশ্বাস,—জাহ্নবী-তীরে পুত্র-শোকাতুর বশিষ্ঠের আত্মত্যাগের জন্য ব্যাকুল ব্যর্থ-প্রয়াস,—পুত্র-

বিরহ-কাতর দ্বৈপায়নের কাতর আক্ষেপ,—মায়ামুক্ত যোগীশ্রেষ্ঠ শুকদেবের নিজ পরিধান বস্ত্রের জন্য ব্যাকুলতা,—এ সমস্ত চিত্র কি ভুলিবার? সতীহারা পাগল ভোলার ছবি যে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে জাজ্বল্যমান। এততেও কি রাম বা রাবণের চক্ষে জল দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইব? কাপুরুষ বলিব? দুঃখে ও শোকে বিলাপ করা দুর্ব্বলতা নহে, তাহা হৃদয়বত্তারই পরিচায়ক। অতএব এখানে বঙ্কিমবাবুর বা 'ভারতীর' সমালোচকের বিচার ঠিক হইয়াছে, এমন মনে করি না।

তবে চরিত্রের অসঙ্গতি, অমিল বা অস্বাভাবিক জিনিষটা কিরূপ? 'শিব গড়িতে বানর গড়া' কাহাকে বলে? এ কথাটা আমাদের দেশের এক বড় কবির বড় আখ্যান কাব্যের চরিত্র-অঙ্কন হইতেই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবি মধুসূদন বীররসের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,

"[illegible] আকৃতি দেখি ডরিল [illegible],
[illegible] নাব [illegible] ... *
[illegible] এ বাঁচাম সখে কেন বাধিলাম?"

এখানে মধুসূদন রামকে ঠিক রাখিতে পারেন নাই। রাম, যে রাম [illegible] দল লইয়া [illegible],—

"জনম [illegible] রামা, রঘু-[illegible]
[illegible]"—[illegible]!

সেই রামের মুখে "[illegible] আকৃতি দেখি [illegible]" কথাটা শোভা পায় না। রাম চরিত্রে উহা খাপ খায় না। গিরিশবাবু বলিতেন যে, যে অভিনেতাকে এই রামের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইত, তিনি ঈষৎ হাসিয়া উপেক্ষাব্যঞ্জক স্বরে ঐ কথা কয়টি আবৃত্তি করিতেন। এই হাসির ও স্বরের অর্থ এই যে, রাবণের সীতা-হরণ কার্যে অনন্ত সাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়াছি—রমণীর বীরত্ব আর কি দেখিব!

এখানেও একটা কথা উঠিতে পারে যে, স্বভাবে কি ব্যতিক্রম হয় না? বীরেরা কি ভয় পায় না?—হাঁ, তাহা অসম্ভব নহে। সংসারে এমন ঘটনা অতি বিরল নহে, যাহা চরিত্রের সহিত খাপ খায় না। এমন দেখিয়াছি যে, অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ হঠাৎ কেমন অতি নির্ব্বোধের মত কার্য করিয়া ফেলিয়াছেন। এমনও ঘটনা দেখিয়াছি যে, অতি নির্ব্বোধ সহসা কেমন অতি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। কোনও ঘাত প্রতিঘাত নাই, অথচ স্বভাবের উল্টা রকম কার্য্য হইল, এমন দুই একটা ঘটনা স্বভাবে ঘটে। কিন্তু তাই বলিয়া কাব্যে উহার স্থান নাই। সাহিত্যের ও সংসারের প্রকাশ ঠিক এক ভাবে হয় না। গিরিশবাবু যথার্থই বলিয়াছেন,—"কলাবিদ্যা—কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। চিত্রকর যখন কোন স্বভাব-দৃশ্য অঙ্কিত করিতে চান, সেই দৃশ্যের অনেক বাদ দিয়া, অনেক যোগ করিয়া, তাহাকে চিত্রাঙ্কন করিতে হয়। Art Galleryতে Approaching storm অর্থাৎ ঝড় আসিতেছে, এই নামে একখানি ছবি আছে। ঘোর মেঘ উঠিয়াছে, বৃক্ষ সকল স্পন্দহীন, পশু-পক্ষী ভয়াকুল, ঝড়ের পূর্ব্বে এই দৃশ্য স্বভাবে দেখা যায়। চিত্রকর সেই দৃশ্য আঁকিয়া তাহাতে কতকগুলি চাষা, পথিক, গাভী প্রভৃতি দিয়াছেন। ঝড় আসিবার পূর্ব্বে যেখানে সেখানে চাষা, পথিক, গাভী প্রভৃতি দেখা যায় না। কিন্তু চিত্রকর তাঁহার চিত্রপটে উহা দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত মেঘ ও স্পন্দন বৃক্ষ অপেক্ষা অঙ্কিত মানবের মুখভাবে ঝড়ের আশঙ্কা বেশী প্রতীয়মান হইয়াছে।"—আসল কথাই ঐ;—সুকুমার কলাবিদ্যা স্বভাবের প্রতিকৃতি বটে, কিন্তু অবিকল স্বভাব নহে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, বেখাপ সংযোজনা হইলেই অস্বাভাবিকতা বা অসঙ্গতি-দোষ হয়। আর খাপ-সই সংযোজনা হইলে তাহা হয় না। সকল সময়ে ঐটুকু বুঝিয়া চলা বড় কঠিন। এমন কি, সেক্সপীয়রের মত কবিশ্রেষ্ঠও সকল সময়ে ঐ মাত্রা বুঝিয়া চলিতে পারেন নাই। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র মিরান্দাকে যখন ফার্দ্দিনন্দের নিকট বলিতে শুনি,—"At mine unworthiness, that dare not offer what I desire to give; and much less take, what I shall die to want; But this is trifling: And all the more it seeks to hide itself, the bigger bulk it shows. Hence, bashful cunning! And prompt me, plain and holy innocence! I am your wife, If you will marry me; If not, I'll die your maid; to be your fellow you may deny me, but I will be your servant, whether you will or no."—তখন বাস্তবিকই বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা, সমাজপ্রবর্ত্তিত সর্ব্ব শিক্ষা ও সংস্কারবর্জ্জিতা মিরান্দা এত বাকচাতুরী কোথা হইতে শিখিল! কপালকুণ্ডলায় এ দোষ নাই। বঙ্কিমের ও গিরিশের কোনও সৃষ্ট চরিত্রে এমনতর দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা কোনও চরিত্রের মুখ দিয়া অসাময়িক বা অখাপস্ত কথা বড় একটা বলান নাই।

কোনও এক সমালোচনায় পড়িয়াছিলাম বটে যে, বঙ্কিম তাঁহার রমা-চরিত্রে এবং গিরিশ তাঁহার প্রফুল্ল-চরিত্রে সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভীরুস্বভাবা, কোমল-হৃদয়া রমা, যাহার সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু নিজেই বলিয়াছেন যে, "রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে-ধোয়া জুঁই ফুলের মত বড় কোমল প্রকৃতি"—সেই রমার মুখে দরবারে দাঁড়াইয়া অমন বক্তৃতা কি শোভা পায়? গিরিশের কোমল-স্বভাবা, লজ্জাশীলা প্রফুল্ল মদন দাদার নিকট যে বক্তৃতা দিয়াছে, তাহা কি স্বভাব-সঙ্গত হইয়াছে? বলা বাহুল্য, একথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা ঘাত-প্রতিঘাত জিনিষটা যে কি, তাহা আদৌ বুঝেন না। আমরা 'Merchant of Venice'এর পোর্সিয়ার চরিত্র তিন অবস্থায় তিন রূপ দেখিতে পাই। "প্রথম যখন ব্যাসানিও সিন্ধুক খুলিয়া তাহার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতেছে যে, সে পোর্সিয়াকে পাইবে কি না, সে সময়ে প্রেমিকা সরলা যাহার প্রতি হৃদয় আকর্ষিত, সে তাহার হইবে কি না, এই ভয়ে অভিভূতা ব্যাকুলা বিহ্বলা যুবতী। কিন্তু যথায় এণ্টোনিওর পরীক্ষা হইতেছে, তথায় আইনজ্ঞ পোর্সিয়ার আর সে ভাব নাই। গম্ভীর মুখকান্তি, তীব্রদৃষ্টি, হাবভাবে লোকের উপর আধিপত্য স্থাপনে

সক্ষম, যাহার বুদ্ধিশক্তি বলে সাইলকের কুটিলতাপূর্ণ ষড়যন্ত্র বিফল হইল—এ আর এক ভাবের পোর্সিয়া। আবার যখন স্বামীর নিকট যে অঙ্গুরী উকীলবেশে ছলপূর্ব্বক লইয়াছেন, সেই অঙ্গুরী লইয়া স্বামীর সহিত রসপ্রসঙ্গকারিণী পোর্সিয়া—পোর্সিয়ার অপর ছবি।"—ইহা সত্ত্বেও পোর্সিয়াকে অস্বাভাবিক চরিত্র বলিতে কে সাহস করিবে? পোর্সিয়া চরিত্রের ঐ পরিবর্ত্তন অকারণে হঠাৎ হয় নাই। উহা অবস্থার ও হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাতের ফল। উহা না হইলে বরং বলিতাম যে, চরিত্র অসঙ্গতি দোষে দুষ্ট হইয়াছে। বঙ্কিমের রমা, গিরিশের প্রফুল্লও তাই। অবস্থার বিপাকে পড়িয়া তাহাদের চিত্তের যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা অসংলগ্ন হয় নাই—বে খাপ হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চরিত্র অঙ্কন করা বড় কঠিন কাজ। এ দুর্লভ শক্তির অধিকারী সকলে হইতে পারেন না। ইহাতে যিনি যতটা ক্ষমতা দেখাইতে পারেন, কবি সমাজে তাঁহার স্থান ততটা উচ্চে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই জন্য বোধ করি, সেক্সপীয়র ও হিউগোর আদর, প্রতিপত্তি এত বেশী। এ জিনিষটার এমনই গুণ যে, কাব্যগত অন্যান্য দোষ থাকিলেও তাহা ঢাকিয়া দিয়া উহা পাঠক-হৃদয়ে কাব্যের আসন চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে পারে। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, "একখানি গ্রন্থে দুই একটি চরিত্র সুচিত্রিত হইলেই তাহার প্রশংসা করা যায়।"

(বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১২৮২।)

শোক-সংবাদ

পরলোকগত কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়

এখনকার নবীন সাহিত্যিকগণ হয় ত বা কবি গোবিন্দচন্দ্রের নাম সর্ব্বদা স্মরণ না করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা প্রবীণ সাহিত্যিক, তাঁহারা এখনও গোবিন্দচন্দ্র রায়ের নাম সর্ব্বদা মনে করেন। এখন অনেক স্বদেশী গান রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন ঠাকুর বাড়ীর 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' এবং কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কতকাল পরে, বল ভারত রে, দুখ সাগর সাঁতারে পার হবে' বাঙ্গালীর প্রধান স্বদেশ-সঙ্গীত ছিল। আমরা যখন বিদ্যালয়ে পড়িতাম, তখনই কবি গোবিন্দচন্দ্রের 'কতকাল পরে' গান বাহির হইয়াছিল এবং তাহার অব্যবহিত পরে বা সেই সময়েই তাঁহার 'যমুনা লহরী' কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা 'নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও!' কবিতা তখন কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই তখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ছিল। সে বহুদিনের কথা! তাহার পর ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আগরা নগরীতে সেই ঋষিকল্প কবিকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইয়াছিলাম; আগরার যমুনাতীরে বসিয়া কবির 'যমুনা-লহরী' গান করিয়াছিলাম। সেই বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি, সুদূর আগরা-প্রবাসী কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় আর ইহলোকে নাই। পরিণত বয়সে তিনি অনন্ত ধামে গমন করিয়াছেন। কবি গ্রে যেমন 'এলিজি' লিখিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, আমাদের কবি গোবিন্দচন্দ্র তেমনই 'কতকাল পরে বল ভারত রে!' ও 'যমুনা-লহরী' লিখিয়াই অমর হইয়াছেন। তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন গোবিন্দচন্দ্রের নাম থাকিবে। 'যমুনা লহরী'র কবি বলিলেই গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় হয়; তবুও তাঁহার অন্য একটা পরিচয় দিই; ঢাকার সর্ব্বপ্রধান উকিল, স্বদেশ হিতরত, জননায়ক শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় গোবিন্দ বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর। গোবিন্দ বাবু যৌবনকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আগরায় গমন করেন এবং সেখানে গোমিওপেথী চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হন। তিনি আগরাতেই জীবন কাটাইয়াছেন এবং আগরার যমুনাতীরেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয় এখন কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক। আমরা কবি গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র ও অন্যান্য পরিজনগণের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺হেমেন্দ্রনাথ সিংহ

আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, সুলেখক, প্রবীণ সাহিত্যিক হেমেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। একদিনের সামান্য জ্বরে হৃদ্-পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে। তাঁহার 'প্রেম' নামক গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ব্ব রত্ন। অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে যখন তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার 'প্রেম' পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে, বিলাতে ছাপা হইতেছে। সে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন। হেমেন্দ্রবাবু নানা স্থানে কার্য্য করিয়া অল্পদিন হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং এই অবসর সময় সাহিত্যচর্চ্চায় অতিবাহিত করিবেন, ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা আর হইল না;—'প্রেমের' লেখক অনন্ত প্রেমধামে চলিয়া গেলেন।

বন্ধু

[শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়]

আমি একা বসে সিগারেট টানছি, আর এলোমেলো কত কি যে ভাবছি, তার আর অন্ত নাই। এমনি সময় সহসা আমার বন্ধু এসে হাজির। একখানা চিঠি পকেট হতে বার ক'রে আমার গায়ে ফেলে দিয়ে বল্‌লে, "পড়ে দেখ, বেশ মজা আছে!" চিঠিখানা গ্লাস্‌গো সহরের এক এটর্ণির লেখা। আমার বন্ধুকে তিনি লিখেছেন যে, "মশায়ের পিসী সম্প্রতি দেহত্যাগ করায় আপনি ত্রিশ হাজার টাকার উত্তরাধিকারী হয়েছেন। আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন, আপনার পিসী কিছু খাম্‌খেয়ালী মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি ঐ টাকাটা আপনার নামে উইল করবার সময় আপনাকে একটা সর্ত্তে আবদ্ধ করে গেছেন। অর্থাৎ আপনি সেই সর্ত্তটি পালন কর্‌লেই সমস্ত টাকা পাবেন। আমাদের সঙ্গে আপনার সত্বর সাক্ষাৎ হওয়া একান্ত আবশ্যক। সাক্ষাতে সকল কথা আপনাকে জানাবারও সুবিধা হইবে।" আমি বন্ধুর পিঠে সবলে দুই চাপড় ধরিয়ে দিয়ে বল্‌লাম, "আর দেরি না, শীঘ্রই বেরিয়ে পড়। গাড়ী কখন? টাইম্‌-টেবল্‌ দেখেছ?" "তুমি যেমন একটি আস্ত গাধা! কাল নাগাৎ যাব মনে করেছি, তবে—।" সে কি একটু ভাবলে, তার পর বল্‌লে, "দেখ, আমি এ পিসীকে জীবনে কখনও দেখি নি'—এক-আধ বার তাঁর কথা শুনেছি মাত্র। তাঁর আজ্ঞানুযায়ী কাজ করলে তবে টাকা—, আমার মনে হয়, আমার পক্ষে সেটা অসম্ভব!" "কি অসম্ভব?" "পিসার হুকুম তামিল।" "ষ্টুপিড্‌! তিনি যতই খামখেয়ালী মেজাজের হোন্‌, এমন কোনও সর্ত্ত হতে পারে না, যেটা তুমি অসম্ভব মনে করতে পার! সে সর্ত্তে যে তোমাকে স্বধর্ম্মত্যাগী হতে হবে না, অথবা দিনের মধ্যে পাঁচবার উপাসনাও করতে হবে না, এটা নিশ্চয়! আমার খুব বিশ্বাস, তুমি সে সর্ত্ত অনায়াসেই পালন করতে পারবে। টাকাটা নাও—ভবিষ্যৎ ভেবে দেখো! এই যে চিত্রশিল্প শিখেছ, এর সম্পূর্ণ বিকাশলাভ তো সমস্ত য়ুরোপের চিত্রবিদ্যালয়ের সঙ্গে তুমি পরিচিত না হলে হবে না। আজ ভগবানের ইচ্ছায় তোমার সে সুযোগ উপস্থিত। আহাম্মকি করে হেলায় হারিও না বন্ধু!" "সত্যি, চিত্রশিল্প সম্পূর্ণ শেখার জন্যে য়ুরোপ-ভ্রমণের বাসনা যে কতদিনের তা' তুমিই জান। কিন্তু কোনও দিন বিশ্বাস করতেই পারি নি' যে, সে সাধ আমার কখনো পূর্ণ হবে। আজ বোধ হয়, সে সাধ পূর্ণ হ'বার সুযোগ হ'ল। দেখা যাক, বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!"

এতক্ষণে বন্ধুর আমার মুখখানি প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলো। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বলে ইংলণ্ডে তার নাম হয়েছিল, কিন্তু তার তাতে তৃপ্তি হয় নি'! সে কত দিন আমাকে বলেছে, একবার যদি সমগ্র য়ুরোপ ভ্রমণ করতে পাই—কিন্তু তা' কি আর হবে, সে যে বিস্তর টাকার দরকার! আজ বন্ধুর আমার সেই বাসনা পূর্ণ হবে—এ কি আমার কম আনন্দ!

তার গ্লাসগো সহরে যাবার সময় ঠিক করা হ'ল। সেই সঙ্গে তাকে হেলেনের ঠিকানাটাও দিয়ে বলে দিলাম, "গ্লাস্‌গোতে তোমার কাজ সেরে একবার আমার হেলেনের সঙ্গেও দেখা করবে।" বন্ধু খুব হেসে উঠে বল্‌লে, "নিশ্চয়—নিশ্চয়! তবে তাকে নিয়ে যদি আমি উধাও হয়ে যাই!"

হেলেন আমার ভাবী জীবন-সঙ্গিনী।

* * * *

আমি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। মফঃস্বলের একটা ডাকে যেতে বাধ্য হওয়ায় বন্ধুর বিদায়ের সময় আর উপস্থিত থাক্‌তে পারলাম না। সেইখানেই আমাকে চারদিন থাকতে হ'ল। এসে দেখি আমার টেবিলের উপর একখানি চিঠি রয়েছে। সেই গোল-গোল সুন্দর হরফ্‌।

"প্রিয়তম, এইমাত্র গ্লাসগো হতে ফিরেছি। এখনি য়ুরোপ ভ্রমণে চল্‌লাম। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেতে পারলাম না, সে জন্যে বিশেষ দুঃখিত; তার কারণ জানাতেও সম্পূর্ণ অসমর্থ। সমস্ত মঙ্গল। পরে আবার লিখ্‌ছি, ইতি তোমার বন্ধু।"

চিঠি পড়ে অবাক্‌! এ কি! টাকা পেয়ে তার কি মাথা খারাপ হ'ল! টাকা পেয়েছে নিশ্চয়, কারণ "সমস্ত মঙ্গল", আর তা' নইলে য়ুরোপ-ভ্রমণই বা হবে কোথা

হ'তে! কিন্তু, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করার "কারণ জানাতেও সম্পূর্ণ অসমর্থ"—কেন? কি কারণ এমন ঘটতে পারে! আচ্ছা পাগল! কই, হেলেনের কথাও ত কিছু লিখ্‌লে না; দেখা করলে, কি না, কিছুই না! কি ষ্টুপিড্‌! প্রাণটা ভারি চটে গেল! এমন মানুষ, ছিঃ!

(২)

সপ্তাহ-পক্ষ—মাস কেটে গেল, বন্ধুর কোন সংবাদই নাই! "পরে আবার লিখ্‌ছি"—কই, কিছু নয়! বড় অস্থির হয়ে উঠ্‌লাম। হঠাৎ হেলেনের এক টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত। "জরুরি খবর—উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক।" গ্লাস্‌গোতে তার কাছে গিয়ে দেখে তো অবাক্‌! আমাকে পেয়ে তার কি হাসি, কি আনন্দ! ভাবলাম এ আবার কি! বন্ধু নিরুদ্দেশ—হেলেন বুঝি শেষে পাগল!

"বড় শুভ সংবাদ-বড় শুভ সংবাদ!" আমি বল্‌লাম "কি সংবাদ তা' বলো।" "আমাদের বিয়ের আর কোনও বাধা নেই।" "অর্থাৎ!" "পয়সার অভাব নেই!" "কেমন ক'রে?" "কপাল জোরে!" "বল কি!" তার হাতটা আমার হাতের মধ্যে চেপে ধরলাম। "ভাল ক'রে বল, ব্যাপার কি!" "শোন তবে! জান তো, আমি গত এক বছর কাল এক বৃদ্ধার সহচরী হয়েছিলাম। সেই বুড়ী খাম্‌খেয়ালী মেজাজের হোন্‌—আমার উপর তাঁর কিন্তু বিশেষ স্নেহ জন্মেছিল। তিনি তাঁর কেউ আত্মীয় আছে কি না, আমাকে কিছুই কখন বলেন নি'। আপন মনেই থাকতেন, কখন-কখন নভেল নাটক পড়াও তাঁর দেখ্‌তাম। এই মাস দুই তিনি মারা গেছেন। তিনিই উইল করে আমাকে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন। এখন আমাদের বিয়ের খরচের তো আর অভাব হবে না। তুমি বলেছিলে, তোমার ডাক্তারী ব্যবসা বেশ জমলে, টাকা সঞ্চয় করে তবে বিয়ে করবে। এখন তোমার ব্যবসা জমাবারও কত সুবিধা হবে! নয়?" হেলেন আমার মুখের কাছে মুখ এনে চোখের একটা ভঙ্গী করে আধ হেসে যখন "নয়" বল্‌লে, আমি তখন আনন্দের আবেগে ও তার চোখের বিদ্যুতে এমন হয়ে উঠ্‌লাম যে, সে কথা কিছুতেই প্রকাশ করতে পারি না,—তা সে আর্টের খাতিরেও নয়! আমি সেই দিনটা মাত্র থেকে ব্যবসার জন্যে ফিরে আস্‌তে বাধ্য হ'লাম। আহ্লাদে মনটা এমনি ভরপূর হয়েছিল যে, বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কি না সে কথাও জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম। এক মাসের মধ্যেই আমাদের বিয়ে হ'ল।

(৩)

প্রায় দেড় বৎসর পরে হাসপাতালে হঠাৎ আজ বন্ধুর সঙ্গে দেখা। কি অবস্থায়, কোথায়? পরে বলছি। তিন মাস হ'ল জার্ম্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে। আমি সৈন্যদের ডাক্তার নিযুক্ত হয়েছি। যুদ্ধক্ষেত্রের অনতিদূরেই আমাদের তাঁবু-নির্ম্মিত হাসপাতাল। জার্ম্মানরা প্রথম যখন ভীমবেগে আক্রমণ করে, সেই সময় আহত সৈন্যদল যেন জলস্রোতের মত হাসপাতালে আস্‌তে লাগল। আমরা তো আর দু'একজন ডাক্তার নয়, এক একটা হাসপাতালেই কত; তাতেও নিমেষের অবসর আমাদের কা'রও ছিল না। গুরুতর আহত জন-কয়েক সৈন্যের চিকিৎসায় নিযুক্ত হয়ে একজনের মুখ দেখে চমকে উঠ্‌লাম। তার মুখের বাম দিকটা কপালের রক্তে একেবারে ভেসে যাচ্ছে, বাম হাতের অর্দ্ধেক উড়ে গেছে, দক্ষিণ চরণ বিশেষ ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত। চোক্‌ মুখ রক্তাক্ত। সে মুখ যে আমার বহু-বহুকালের পরিচিত। বন্ধুর অতি নিকটেই একটা গোলা ফেটেছিল, তারি এই পরিণাম। অদ্ভুত সাহস, দুর্দ্দমনীয় তেজের সঙ্গে সে অগ্নিবৃষ্টির ভিতর দিয়ে শত্রু-আক্রমণে ছুটেছিল; মধ্যপথেই সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়ে। বন্ধুর চক্ষু এখনও মুদিত। বাস্তবিক, আমি আজ অবধি অত প্রাণ-মন ঢেলে কোনও রোগীকে দেখিনি। তখনি জেনেছিলাম, বন্ধু আর অধিকক্ষণ থাকিবে না, কিন্তু তবুও—! ঘণ্টা দুই চেষ্টার পরে বন্ধুর জ্ঞান হ'ল। সে তাকালে, আমায় দেখে ঈষৎ হাস্‌লে মাত্র। বোধ হয় সে ভাবলে, তার এ শেষ সময় আমাকে তো তার কাছে থাক্‌তেই হবে। সে প্রথমেই বল্‌লে, "এইটুকুই তৃপ্তি! সম্মানের জন্যে, দেশের জন্যে আপনাকে বলি দিতে পেরেছি। আর কতক্ষণ বাঁচব বলে মনে হয়, বন্ধু!" "সে কি! তুমি ভাল হয়ে উঠবে। শীঘ্রই সেরে উঠে রাজার প্রাসাদে গিয়ে রাজার হাত থেকে তোমার অদ্ভুত বীরত্বের জন্য তুমি মেডেল নেবে।" "তুমি নিতান্ত গাধা!"

সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে একটু হাসলে। "কেন, বিশ্বাস হচ্চে না।" "কেন, তুমিই কি জান না, আমার শেষ সময় হয়ে এসেছে। আমি মেডেল্ চাইনে ভাই! আমি, আমার কর্ত্তব্য করেছি, ঠিক করেছি;—হাঁ, তাই আমার এত তৃপ্তি! ভাই, তুমি এখন বেশ সুখী, কেমন?" আমি তার কথাই শুনছিলাম; তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি চোখের কোলে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। ঠোঁট দুখানি নীল, কেবল চোখ দুটো তখনো ধক্-ধক্ করে জ্বলছে। আমি কেমন থতমত খেয়ে বল্লাম, "সুখী? হাঁ—তা কেন বন্ধু? সুখই কি এমন! হাঁ, আমি হেলেনকে বিয়ে করেছি।" সে একটু স্থির হ'লে, আমিও নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে নিয়ে ধীরে-ধীরে প্রশ্ন করলাম, "বন্ধু, এত দিন কোথায় ছিলে? দেখা না করে হঠাৎ অমন ভাবে গেলে কেন?" "আমেরিকায় ছিলাম, কৃষিকাজে যোগ দিয়েছিলাম। চিত্র শিল্প ভাল নয়, তাই ছেড়ে দিলাম।" এইটুকু বলে সে আমার পানে চেয়ে ঈষৎ হাসলে। "টাকাগুলো? তোমার উইলের দরুণ টাকা!" "টাকা?" সে একেবারে ঝেঁকে উঠ্লো। ক্রোধ ও বিরক্তিতে তার মুখ কি রকম বিকৃত হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে বল্লে, "টাকা—আমি তার একটা কড়িও স্পর্শ করি নি।" "কেন? সর্ত্তটা কি ছিল?" সে স্থির হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, কিছু পরে ভাঙ্গা গলায় বললে, "প্রতিজ্ঞা কর আগে, তুমি তাকে বল্বে না। তোমার সুখের জন্য আমি তা' পারি নি। কিছুতেই পারিনি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর ভাই!" "কি! কিছু তো বুঝতে পাচ্ছিনে।" "প্রতিজ্ঞা কর!" "বেশ, প্রতিজ্ঞা করলাম।" "ভগবান সাক্ষী।" "ভগবান সাক্ষী।" "কিন্তু কাকে বলব না?" "কেন ভাই, তোমার স্ত্রী—" বন্ধুর আর বাকস্ফূর্ত্তি হ'ল না। ক্ষত দিয়ে আবার শোণিতস্রোত;—সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল! বন্ধুর আর জ্ঞান হ'ল না; প্রভাতেই সব শেষ হয়ে গেল!

(৪)

দু'দিন পরেই আমি এক সপ্তাহের ছুটী নিয়ে বাড়ী এলাম। আমার প্রথম ও প্রধান কাজ হ'ল, সেই গ্লাসগো সহরের এটর্ণির সঙ্গে দেখা করা।

আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে খবর দিলে এক গম্ভীর প্রকৃতির লোক আমায় অভিবাদন করে বসতে অনুমতি করলেন। আমি একেবারেই আমার বক্তব্য আরম্ভ করে দিলাম। আমার বন্ধুর নাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, "তাঁর নামে তাঁর পিসীর উইলের দরুণ যে টাকা ছিল, সেটা কি হ'ল!" "সে কথায় আপনার দরকার কি?" "সে আমার বিশেষ বন্ধু—আর হেলেন আমার স্ত্রী।" হেলেনের নাম করার একটা সার্থকতা ছিল। "আপনার বন্ধু কোথায়?" "গত সপ্তাহে তিনি যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।"

"তবে এখন আপনি সকল কথাই শুন্তে পারেন। সেই বৃদ্ধা যে উইল করেন, তাতে এই সর্ত্ত ছিল যে, ওই ত্রিশ হাজার টাকা আপনার বন্ধু পাবেন যদি তিনি হেলেনকে বিবাহ করেন। কারণ, হেলেন সেই বৃদ্ধার সঙ্গিনী ছিলেন, হেলেনের প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ ছিল। আর যদি ইনি হেলেনকে বিবাহ না করেন, তা' হ'লে ওই টাকাটা হেলেনের প্রাপ্য হবে। আমি আপনার বন্ধুকে সর্ত্তের কথা জানালাম। তিনি একেবারে চমকে উঠলেন, বল্লেন 'অসম্ভব, অসম্ভব!' আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। হেলেন সম্বন্ধে তাঁর অন্তরে যে কোনও কু-ভাব ছিল না, কোনও মন্দ ধারণা তার সম্বন্ধে যে তিনি পোষণ করেন না, তাও তিনি আমাকে জানালেন। তবু তাঁর এমন অটল প্রতিজ্ঞা দেখে আমি বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। বিবাহের প্রস্তাবটা আমিই না হয় করব বলায়, তিনি আমার হাত দুটো চেপে ধরে বল্লেন, "হতেই পারে না! কখনই না! আমি বলছি, আমাকে বিশ্বাস করুন, এর দ্বারা আর একজন বিশেষ সুখী হবে, আমি তাকে জানি।" শেষে এমন কি এই সর্ত্ত সম্বন্ধেও হেলেনকে না জানাতে তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে গেছেন। সেই জন্যে, হেলেনেরই যে এই টাকা প্রাপ্য, শুধু এই কথাই জানিয়ে আমরা তাকে টাকা দিয়েছি। দেখ্বেন মশায়, তিনি মহাবীর, তাঁর অনুরোধ যেন উপেক্ষিত না হয়। হেলেন যেন কোনও কথা না জান্তে পারেন।"

"নিশ্চয়ই নয়।" আমি আর কোনও কথা বল্তে পারলাম না। আমার চোখ জলে ভরে এল, তাড়াতাড়ি মুখ ফেরালাম, পাছে তিনি আমার চোখে জল দেখ্তে পান। *

---

* ইংরাজী গল্প অবলম্বনে।

পুস্তক-পরিচয়

স্বেচ্ছাচারী

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।

এখানি বড় উপন্যাস। শ্রীযুক্ত বিভূতি বাবু ইতঃপূর্ব্বে কয়েকটা ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন; বড় উপন্যাস লেখার চেষ্টা এই তাঁহার প্রথম, কিন্তু প্রথম হইলেও তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। উপন্যাসখানির আখ্যানভাগ সুন্দর; গ্রন্থের কলেবর ঘটনা সংস্থানেই বৃহৎ হইয়াছে, অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরে পুস্তকের দেহ স্ফীত করা হয় নাই। কার্ত্তিক এই গল্পের নায়ক; সে ই 'স্বেচ্ছাচারী'। তাহার স্বেচ্ছাচার অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; শৈলজার চরিত্র-অঙ্কনেও লেখক বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। উপন্যাসখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

লীলার স্বপ্ন

শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল্ প্রণীত, মূল্য আট আনা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ প্রকাশিত আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার দ্বাবিংশ গ্রন্থ এই লীলার স্বপ্ন। অবতরণিকায় লেখক বলিয়াছেন 'এই আখ্যায়িকাটি একটি প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।' লীলাবতী পরম তান্ত্রিক ও দার্শনিক ভাস্করাচার্য্যের পত্নী। লীলাবতীর নাম বাঙ্গালী পাঠকের অবিদিত নহে। তাহারই জীবন-কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাসখানি লিখিত হইয়াছে। আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার অন্য গ্রন্থের ন্যায় এখানিও সাদরে পরিগৃহীত হবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি।

তরুতীর্থ

শ্রীহেমনলিনী দেবী প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।

'তরুতীর্থ' কয়েকটী ছোট গল্পের সংগ্রহ; প্রথম গল্পের নামানুসারেই বইখানির নামকরণ হইয়াছে। গল্পগুলি সমস্তই বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত দুইটি গল্পও এই সংগ্রহে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। লেখিকা মহাশয়া গল্প রচনায় নূতন ব্রতী হইলেও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে যে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিবেন, তাহা তাঁহার 'মুস্কিল-আসান' 'গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে' গল্প দুইটি পড়িলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

উদ্‌যাপন

শ্রীসূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্ প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।

এখানি উপন্যাস। আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং এ কথা বলিতে পারি যে, লেখক এই কার্য্যে নূতন ব্রতী হইলেও তাঁহার এই উপন্যাসখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। তিনি ইহাতে যে কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার কোনটিই অস্বাভাবিক হয় নাই; সুধাংশুমোহন ও সরযূর চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। উপন্যাসখানি সকলেই আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নবীন গ্রন্থকার ভবিষ্যতে এই প্রকার আরও উপন্যাস লিখুন।

মোতি কুমারী

অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত, মূল্য আট আনা।

সাহিত্যাচার্য্য পরলোকগত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বহু পূর্ব্বে রচিত ও নানা মাসিকপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি ছোট গল্প সংগৃহীত হইয়া, তাঁহার পরলোক-গমনের পর 'মোতি-কুমারী' প্রকাশিত হইয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে যখন 'নবজীবন' প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন আমরা 'পূজার গল্প' পড়িয়াছিলাম। তাহার পর এত দিনের মধ্যে কত ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সেই 'পূজার গল্পের' কথা আমরা ভুলি নাই; সেই 'হাসি পায় হে—ধরা দিন-পড়লে মনে' এখনও আমাদের মনে আছে। এতকাল পরে প্রকাশক মহাশয় পুরাতন নবজীবন ও বঙ্গদর্শন খুঁজিয়া সেই গল্পটা এই সংগ্রহে স্থান দান করিয়াছেন। পাকা হাতের পাকা লেখার আর সমালোচনা কি করিব? সকলেই একখানি করিয়া 'মোতি কুমারী' কিনিয়া পড়ুন, এই আমাদের অনুরোধ।

Twelve Portraits

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত, মূল্য দুই টাকা।

এখানি ছবির বই। আমাদের দেশের ১২ জন প্রধান ব্যক্তির ছবি শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত উড্রফ মহোদয় এই ছবির বইখানির ভূমিকা ইংরাজীতে লিখিয়াছেন। ইহাতে শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপযুক্ত শিষ্য; অবনীন্দ্র বাবুর নিকট তাঁহার প্রথম শিক্ষা, তাহার পর শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তিনি জাপান ও আমেরিকায় গমন করিয়া চিত্রবিদ্যায় যে কৃতিত্ব লাভ করিয়া আসিয়াছেন, এই ছবির বইখানিতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ছবি কয়খানিই সুন্দর হইয়াছে, এবং

তাহার মধ্যে [illegible] নাথ [illegible] য়ের প্রতিকৃতিটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট [illegible] র। আমরা শিল্পী শ্রীযুক্ত মুখ [illegible]

[illegible] ৩, মূল্য দেড় টাকা।

[illegible] নহে, কবিতা-পুস্তকও নহে— [illegible] উপকরণ;—ইহা ভক্তিমান্ ও জ্ঞানগরিষ্ঠ [illegible] বিকাশ। আমরা এই গ্রন্থে লিখিত [illegible] সহকারে পাঠ করিয়াছি; সকল তত্ত্ব বুঝিতে [illegible] কথা কিছুতেই বলিতে পারিব না; তবে, এ কথা [illegible] যে, আমরা শিক্ষালাভ করিয়াছি; এবং যাঁহারা [illegible], যাঁহারা সাধন-পথের পথিক, তাঁহারা এই পুস্তকের [illegible] অনেক কথা পাইবেন। আমরা সকলকেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

জোহ্‌রা

শ্রীমোজাম্মেল হক্ প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক্ মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠকগণের নিকট অপরিচিত নহেন। তিনি বহুদিন হইতে একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার হজরত মহাম্মদ, মহর্ষি মনসুর, শাহ্‌নামা, ফেরদৌসী চরিত, তাপস-কাহিনী ও কয়েকখানি কবিতাপুস্তক ইতঃপূর্ব্বেই যথেষ্ট জনাদর লাভ করিয়াছে; অনেকগুলি পুস্তকের তিন চারিটী সংস্করণও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে তিনি কখন উপন্যাস লেখেন নাই; এই জোহ্‌রা তাঁহার প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি পরম সুন্দর হইয়াছে, ভাষা বেশ ঝরঝরে, বর্ণনাকৌশল অতি সুন্দর; আর কাহিনীটিও বিষাদময়। আমরা এই পুস্তকখানির প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে করিতেছি।

সাহিত্য সংবাদ

ভ্রম-সংশোধন—এবারকার ত্রিবর্ণ চিত্রে দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকটি ভ্রম থাকিয়া গিয়াছে। পাঠকেরা "ইণ্ডিয়ান সিলভার বিল" স্থলে "পিদ্‌ড়ি" মুনিয়া (Indian Silver-bill), "ষ্ট্রিয়েটেড ফিঙ্ক" স্থলে ষ্ট্রায়েটেড্ মুনিয়া (Striated Finch), "দি বেঙ্গলী" স্থলে "বেঙ্গলী" বা জাপান মুনিয়া, এবং জাভা স্প্যারো স্থলে "রামগোরা" (Java Sparrow) পাঠ করিলে বাধিত হইব।

গৌহাটী সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক 'বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তনের উপায়' শীর্ষক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা প্রবন্ধের জন্য বনমালী বেদান্ততীর্থ রৌপ্য-পদক নামক একটী রৌপ্য-পদক প্রদত্ত হইবে। প্রবন্ধ আগামী ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে সম্পাদকের নিকটে প্রেরিতব্য।

ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতি নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার ঘোষণা করিতেছেন—

(১) দ্বিজেন্দ্র পদক—বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের অভিব্যক্তি ও দ্বিজেন্দ্রলাল; (২) গোপাল পদক—বৈষ্ণব যুগে বাংলাদেশের অবস্থা; (৩) স্নেহলতা পদক (মহিলাদের জন্য)—বঙ্গনারী, সেকাল ও একাল। (৪) নীতিকা পদক—(স্কুলের ছাত্রদের জন্য)—শ্রীচৈতন্য। ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত সময় আছে। প্রবন্ধাদি সমিতির সম্পাদক, ভবানীপুর কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম এ প্রণীত 'রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়' জীবন-চরিত, মাননীয় সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভূমিকা ও ৪০খানি চিত্রে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দেড় টাকা।

'কণ্ঠহার'-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত দাশরথী মুখোপাধ্যায় এই যুদ্ধের মরশুমে "রণভেরী" বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পাঠিকা দক্ষিণায় কালোয়াতী রণভেরীর আওয়াজে শ্রবণ পরিতৃপ্ত হইবে। বইখানি সময়োপযোগী হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ঠাকুর সদানন্দ" প্রকাশিত হইল। পাঠকেরা আট আনা প্রণামী দিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করুন।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় এবার "অদ্ভুত আবিষ্কার" করিয়া বসিয়াছেন। বারআনা দর্শনী দিয়া পাঠকেরাও এই আবিষ্কারের ফল ভোগ করিতে পারিবেন।

আটআনা সংস্করণ গ্রন্থমালার চতুর্ব্বিংশ গ্রন্থ শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত "মধুমল্লী" প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হরিভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "সিঁথির সিন্দুর" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য একটাকা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

পল্লী-পথে

শিল্পী— শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

The Emerald Printing Works
CALCUTTA

ফাল্গুন, ১৩২৪

দ্বিতীয় খণ্ড] পঞ্চম বর্ষ [তৃতীয় সংখ্যা

মনোবিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম-এ]

প্রত্যক্ষ

তুমি আলোকরাশি দেখিতেছ, বা তুমি মিথ্যাবাদীকে ঘৃণা কর, বা তোমার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে—ইত্যাদি বিষয় তোমাকে যুক্তি-তর্কের দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয় না। এরূপ জ্ঞান তোমার অনায়াসলব্ধ, এরূপ জ্ঞান সদ্যসদ্যই লাভ হইয়া থাকে; এরূপ জ্ঞানের জন্য মীমাংসার প্রয়োজন হয় না, প্রমাণের আশ্রয় লইতে হয় না। যে শক্তি প্রভাবে আমাদের এই প্রকার সদ্য জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তাহার

নাম -
- প্রত্যক্ষ-শক্তি
- বোধি-শক্তি
- গ্রাহিকা শক্তি
- গোচরী শক্তি
- সহজ প্রজ্ঞা-শক্তি

জলের শৈত্য আছে, ফুলের গন্ধ আছে, আগুনের উত্তাপ আছে—ইত্যাদি জ্ঞান আমার প্রত্যক্ষ। আমার বোধি-শক্তি হেতু সহজেই এই সকল জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই শক্তি-প্রভাবে সদ্য বস্তুজ্ঞান গ্রহণে সমর্থ হই বলিয়া, ইহাকে গ্রাহিকা শক্তি বলা হইয়া থাকে। এই শক্তির সাহায্যে জ্ঞাত বিষয় বুদ্ধির গোচরীভূত হয় বলিয়া, ইহাকে গোচরী-শক্তিও বলা হয়। আবার এই শক্তি-প্রভাবে প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ হয় বলিয়া, ইহাকে সহজ-প্রজ্ঞাশক্তিও বলা হইয়া থাকে।

জড়জগৎ, মনোজগৎ এবং তত্ত্বজগৎ—এই ত্রিবিধ জগতেরই কিছু-না-কিছু আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; সুতরাং আমাদের ত্রিবিধ বোধশক্তিও আছে। এই ত্রিবিধ বোধ শক্তির—

নাম --
- ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ
- সংজ্ঞা-প্রত্যক্ষ
- অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ

ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সাহায্যে জড়-জগতের, সংজ্ঞা-প্রত্যক্ষ সাহায্যে

মনোজগতের এবং অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সাহায্যে তত্ত্ব-জগতের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

জড়-জগতে ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের প্রথম সোপান। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই মনের বাহিরের, বাহ্যজগতের এবং বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। এবংবিধ সদ্যজ্ঞানের—

নাম- { ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, বহিঃপ্রত্যক্ষ, বাহ্যপ্রত্যক্ষ, বস্তুপ্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ }

জড়জগতের ন্যায় মনোজগতেও আমাদের অবাধ-গতি। আমার জ্ঞান, আমার অনুভূতি, আমার ইচ্ছা—আমার মানস-প্রত্যক্ষ। আমার মন স্নেহার্দ্র হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহা জানিতে পারি। মনের মধ্যে যখনই যে ভাবের উদয় হইতেছে, তখনই আমি তাহা জানিতেছি—এ জ্ঞান আমার সদ্যজ্ঞান এবং মনোজগৎ সম্বন্ধীয় এরূপ সদ্যজ্ঞানের—

নাম- { সংজ্ঞা-প্রত্যক্ষ, আন্তর-প্রত্যক্ষ, আত্ম প্রত্যক্ষ, সংজ্ঞা-বোধি, মানস-প্রত্যক্ষ }

তত্ত্ব-প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা চরম সত্যের সদ্যজ্ঞান লাভ করিতে পারি। এই প্রত্যক্ষের সাহায্যেই আমাদের দেশ, কাল এবং হেতু সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এ প্রত্যক্ষও নানাবিধ নামে অভিহিত।

নাম— { তত্ত্ব-প্রত্যক্ষ, তত্ত্ব-বোধি, সত্য-প্রত্যক্ষ, সাত্ত্বিক-প্রত্যক্ষ }

তত্ত্ব-প্রত্যক্ষ মনোবিজ্ঞানের বিষয়াধীন নহে। প্রত্যক্ষ অর্থে সচরাচর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই বুঝাইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

চক্ষু মেলিয়াই সম্মুখের ঐ কদলী-বৃক্ষটি দেখিতে পাইলে; উহা দেখিবার জন্য তোমার কোন প্রকার আয়াস হইল না। মাত্র উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই উহার পল্লবসমূহের বর্ণ, ফুলের শোভা, ত্বকের মসৃণতা ও শৈত্য, কাণ্ডের ব্যাস এবং বৃক্ষটির উচ্চতা—সকলই যুগপৎ তোমার নয়ন-পথে পতিত হইল। ঐ সঙ্গে বৃক্ষটি কত দূরে এবং কোন্ দিকে অবস্থিত, তাহাও প্রত্যক্ষ করিলে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এত বিভিন্ন গুণসমূহ একই মুহূর্ত্তে মাত্র চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইতেছ। কেবল যে গুণগুলি প্রত্যক্ষ করিতেছ তাহা নহে—ঐ সবুজ বর্ণ ও ঐ দৃঢ়তা, মসৃণতা প্রভৃতি গুণসকল প্রত্যক্ষ কদলী বৃক্ষে আরোপ করিয়া, কদলীবৃক্ষটির গুণ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছ। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল বিভিন্ন গুণ যদিও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বিষয়, তথাপি মাত্র একই ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছ। স্পর্শ না করিলে মসৃণতা জানা যায় না। হস্ত বা অঙ্গুলীর দ্বারা বলপ্রয়োগ না করিলে, কাঠিন্য বুঝা যায় না। ফলের আস্বাদন জিহ্বারই প্রত্যক্ষ। দিক্ ও দূরত্ব শরীর ও হস্ত-পদাদির দ্বারাই গ্রহণ করা সম্ভব। তথাপি একমাত্র চক্ষু-ইন্দ্রিয় দ্বারাই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণসমূহ প্রত্যক্ষ করিতেছ। আমাদের মনে হয় যে, জন্মাবধি চোখে দেখিয়া, বা কাণে শুনিয়া, বা ত্বক দ্বারা স্পর্শ করিয়া আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ বস্তুসকল প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। অবশ্য এরূপ প্রত্যক্ষ অসম্ভব হইলে, জগতে জীবনরক্ষা প্রাণীমাত্রেরই পক্ষে অসম্ভব হইত। তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান কদলী বৃক্ষটি একটি বস্তু। সাধারণ চক্ষে জ্ঞানের বিকাশ হইতে উহা ঐ প্রকার একটি বস্তুই রহিয়াছে; কিন্তু বিজ্ঞান কোন বস্তুকে অবিভাজ্য মৌলিক বলিয়া ধরিয়া লইতে নারাজ—যতক্ষণ না বস্তুবিভাগের ও বিশ্লেষণের সর্ব্বপ্রকার উপায় ব্যর্থ হইয়াছে। তাই মনোবিজ্ঞান এই প্রত্যক্ষ বস্তুকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছে। সদ্যজাত শিশু সম্মুখস্থ বস্তুর দিক ও দূরত্ব নিরূপণ করিতে অক্ষম। বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের ঐ শক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। তবে কি আমাদের জীবনে এমন দিন ছিল, যখন আমাদের দূরত্ব, দিক প্রভৃতির আদৌ জ্ঞান ছিল

না? বস্তুর আকৃতি এবং পরিমাণ বিষয়েও ঐরূপ। বৈজ্ঞানিকেরা এ প্রশ্নের উত্তরে এক প্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দিক, দূরত্ব, আকৃতি, পরিমাণ প্রভৃতির জ্ঞান আমাদের সহজাত নহে। মানসিক নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ঐ জ্ঞানের আরম্ভ ও বিকাশ হইয়াছে। আলোচনা-বলে আমরা এই জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারি ও করিয়া থাকি। ব্যক্তি বিশেষে ঐ জ্ঞান যেমন শুদ্ধ ও নির্ভুল দেখা যায়, অপর ব্যক্তিতে সেরূপ দেখা যায় না। প্রথমোক্ত ব্যক্তির ঐ উন্নতি অভ্যাস ও বিশেষ কর্ষণ দ্বারা সাধিত হইয়াছে, দেখা যায়। আরও এক কথা—চক্ষু আলোক ও বর্ণ মাত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ; কিন্তু কি উপায়ে একটি দ্রব্য দেখিবামাত্র উহার শব্দ, ঘ্রাণ, রস প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ গুণ আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা আশ্চর্য্য।

বর্ণ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার; উহারা "মনের ভিতর" আছে। কিন্তু যখন গৃহ, বৃক্ষ প্রভৃতি কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, তখন ঐ বস্তুর বর্ণকে ঐ বস্তুর গুণ বলিয়া বুঝি। আভ্যন্তরিক মানসিক ব্যাপার কি উপায়ে বাহিক বস্তুর গুণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—ইহা একটি জটিল সমস্যা। ঐ বৃক্ষটির সবুজ বর্ণ ঐ বৃক্ষে পাই; কিন্তু আমার মনে আছে—ইহা সাধারণ মনুষ্যের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সবুজ বর্ণ যে আমার মনের বিকার, তাহা উপলব্ধি করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। অন্ধের শ্বেত, পীত বর্ণের জ্ঞান অসম্ভব। তুমি চক্ষু মুদিয়া থাক, বৃক্ষটির বর্ণও গুপ্ত থাকিবে; অথবা চক্ষু মেলিয়া রাখিয়া অন্য বিষয়ে মনকে ব্যাপৃত রাখ, বর্ণ দেখিতে পাইবে না। যেখানে আলোকের অভাব আছে, অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তু হইতে চক্ষের উপর আলোক প্রতিফলিত না হয়, সেখানে বর্ণও থাকে না। ইহা ছাড়া প্রকৃতি-তত্ত্ববিদেরা দেখাইয়াছেন যে, দৃশ্যমান বস্তুতে বর্ণ নাই। দৃশ্য বস্তু হইতে ইথর নামক অতি সূক্ষ্ম অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাষ্পময় পদার্থ-স্পন্দনের তরঙ্গ চক্ষুর উপর প্রতিঘাত হইয়া দর্শন-স্নায়ুর ও মস্তিষ্কের দর্শনক্ষেত্রের স্নায়ুগ্রন্থিসমূহে স্পন্দন উৎপাদন করিলে, কোন অভাবনীয় কারণে মনেরমধ্যে আলোক ও বর্ণের জ্ঞান হয়। ইথর-তরঙ্গের সংখ্যা অনুসারে বর্ণের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়; সুতরাং আমাদের মনের বাহিরে বর্ণের স্থানে পৃথিবীর তরঙ্গ মাত্র রহিয়াছে। ইথর-তরঙ্গ বা স্পন্দন বর্ণ নহে। এই প্রকার, শব্দও একটি মানসিক ব্যাপার মাত্র। বাহ্যজগতে বায়ুর স্পন্দন ও তরঙ্গ মাত্র রহিয়াছে। কর্ণ-পটহের উপরে উহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে মস্তিষ্কের শ্রবণক্ষেত্র স্পন্দিত হইয়া শব্দ-জ্ঞান উৎপন্ন করে। অতএব যাহাকে আমরা বস্তুর গুণ বলিয়া জানি, তাহা প্রকৃত পক্ষে মনের ব্যাপার ও মনের মধ্যেই অবস্থিত। যদি তাহাই হয়, তবে বিচার্য্য কোন উপায়ে শ্বেত, পীত ইত্যাদি বর্ণ মন হইতে বাহির হইয়া বৃক্ষ, গৃহাদি বাহ্যবস্তুর গুণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা জ্ঞান মাত্র প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু কি করিয়া অন্তর্জ্জগতের ব্যাপারসমূহ হইতে বাহ্যজগতের বস্তুসমূহের জ্ঞান হয়, ইহার মীমাংসা করা বড়ই কঠিন। যাহাকে বাহ্য বস্তু বলি, আমরা তাহার গুণমাত্র প্রত্যক্ষ করি; এবং এক-একটি গুণ আমাদের মনের এক-একটি বিকার মাত্র। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, আমাদের বাহ্য বস্তুর জ্ঞান উহার গুণসমষ্টির জ্ঞান মাত্র। বাহ্যবস্তু গুণসমষ্টি মাত্র। যদি গুণগুলি মানসিক ব্যাপার হয়, তাহা হইলে জ্ঞানময় বস্তুটিকেও মানসিক ব্যাপার বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। কারণ ঐ বৃক্ষটি বাহিক বস্তু, "বাহিরে" আছে; আমার দর্শন, স্পর্শন ব্যতিরেকেও উহার অস্তিত্ব থাকে। এরূপ জ্ঞান সার্ব্বজনীন, এবং অপর সকল জ্ঞানের প্রমাণ ও ভিত্তিস্বরূপ। বৈজ্ঞানিককে বুঝাইয়া দিতে হইবে, কি করিয়া এই স্বতন্ত্র বাহিক বস্তুর জ্ঞান আমাদের হইল। কি করিয়া মানসিক ব্যাপার সমষ্টিতে "বস্তুত্ব" "বহিত্ব" "দূরত্ব" প্রভৃতি আরোপিত হইল। বাহিরে দূরে স্বতন্ত্র বাহ্য বস্তু সম্বন্ধীয় এই সকলের জ্ঞান আমাদের কোন্ মানসিক নিয়ম অনুসারে ও কি করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, উহা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দেওয়া মনোবিজ্ঞানের অন্যতম কর্ত্তব্য। এই সমস্যাকে বাহিক-জগৎ-জ্ঞানের সমস্যা বলা হইয়া থাকে।

অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিচার করিতে হইলে, আমাদের মনে সাধারণতঃ এই দুইটি প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে—

১। মনের বাহিরেও কি "কিছু" আছে?

২। যদি থাকে, তবে উহা কি এবং কেমন?

সুতরাং প্রথমতঃ বিচার করিতে হইবে যে, কেমন করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, মনের বাহিরেও কিছু আছে; পরে জানিতে হইবে যে, কি উপায়ে আমরা বুঝিতে

পারি যে, ঐ "কিছু"টি কি, কেমন এবং কোথায় আছে। অতএব প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের এই দুইটি মাত্র উপাদান; যথা—

১। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান—

২। বাহ্যবস্তুর পরিচয়।

প্রথম উপাদানটি সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টা পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ।

মাত্র সংবিত্তির সাহায্যেই মনাতিরিক্ত বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। কিন্তু সংবিত্তি মনের অবস্থা মাত্র; সুতরাং মনের অবস্থা হইতে মনের বাহিরের বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? সংবিত্তি যখন মনের বিকার মাত্র, তখন সংবিত্তির সাহায্যে মনের আভ্যন্তরীণ বিষয়ই অবগত হওয়া সম্ভব; কিন্তু মনের বাহিরেও যে কিছু আছে, এ জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? সংবিত্তির ভিতর এমন একটি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, যে শক্তি প্রভাবে মন স্বতঃই মনাতিরিক্ত বস্তুর বিষয় চিন্তা করিতে বাধ্য হয়। মনের ভিতর যখন কোন সংবিত্তির উদয় হয়, তখনই আমি বুঝিতে পারি যে, আমার মন এ সংবিত্তির কর্ত্তা নহে, আমার মন ইহার উৎপাদক নহে; ইহার উপর আমার মনের কোন আধিপত্য নাই। মন ইহার সৃষ্টি করিতে যেমন অসমর্থ, তদ্রূপ ইহার বিলোপ সাধনেও অসমর্থ। ইহার আবির্ভাব-তিরোভাব মনের ক্ষমতাতিরিক্ত। সংবিত্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না; সুতরাং সংবিত্তির উৎপাদক—বস্তুরও অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। মন যখন সংবিত্তির হেতু নহে, তখন মন ব্যতীত অন্য "কিছু" ইহার কারণ—ইহা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। আমার শব্দ সংবিত্তি হইল, মনের পরিবর্ত্তন ঘটিল—এ সংবিত্তি, এ পরিবর্ত্তন স্বকৃত নহে; মন ইহার কর্ত্তা নহে; সুতরাং মন ব্যতীত অপর "কিছু" ইহার কর্ত্তা। সংবিত্তি আমার ইচ্ছাধীন নহে। আমার ইচ্ছার উপর ইহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নির্ভর করে না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ইহা আমার মনের উপর আরোপিত হইয়া থাকে; আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহা আমার মন হইতে তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব মন যদি সংবিত্তির উদ্বোধক না হয়, তবে মন ব্যতীত অপর "কিছু" ইহার উদ্বোধক। এইরূপে সংবিত্তি হইতে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব-জ্ঞান হইয়া থাকে। এ জ্ঞান সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ।

এক্ষণে দেখা যাউক, কিরূপে আমাদের "বস্তু-পরিচয়" হইয়া থাকে। সম্মুখে একটি বস্তু দেখিয়া বলিলাম, "আমি লেবু দেখিতেছি।" লেবু দেখিতেছি—এই জ্ঞান আমার কেমন করিয়া হইল? প্রথমতঃ আমার জ্ঞান হইল যে, আমি শুনিতেছি না, স্পর্শ করিতেছি না, আস্বাদন করিতেছি না, আঘ্রাণ করিতেছি না—কিন্তু দেখিতেছি মাত্র। কিন্তু কি দেখিতেছি? অবশ্য "কিছু" দেখিতেছি, এবং "যাহা" দেখিতেছি, তাহার বর্ণ কাল নয়, সাদা নয়, লাল নয়—উগ্র পীতবর্ণের। ঐ পীতবর্ণ পদার্থটি চতুষ্কোণ নহে, ত্রিকোণ নহে—কিন্তু গোলাকার। "আমি লেবু দেখিতেছি"—এই বাক্যটি বিশ্লেষণ করিলে, পাঁচটি বাক্য পাওয়া যায়; যথা—

১। আমি দেখিতেছি

২। আমি "কিছু" দেখিতেছি

৩। আমি পীতবর্ণ "কিছু" দেখিতেছি

৪। আমি পীতবর্ণ গোলাকার "কিছু" দেখিতেছি

৫। আমি লেবু দেখিতেছি।

লেবু হইতে একপ্রকার উদ্বায়ী তরল পদার্থের স্পন্দন দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর আঘাত করিতেছে; ঐ আঘাতজনিত দর্শনেন্দ্রিয়ের স্পন্দন অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে আনীত হইতেছে এবং মস্তিষ্কও স্পন্দিত হইতেছে। এই মস্তিষ্ক-স্পন্দনের উপর মনের প্রতিক্রিয়া হইল। বুঝিলাম যে, এই স্পন্দন নাসিকা, কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-প্রেরিত স্পন্দন হইতে পৃথক, কিন্তু পূর্ব্বপরিচিত চক্ষু-প্রেরিত স্পন্দন সদৃশ। এই প্রকার মনের প্রতিক্রিয়া হইতে দর্শনেন্দ্রিয়ানুভূতি হইল। বুঝিতে পারিলাম, "আমি দেখিতেছি।" কিন্তু এই সংবিত্তির উদ্বোধক আমার মন নহে। কোন বাহ্য শক্তি ইহার উদ্বোধক। আমি এই সংবিত্তির কর্ত্তা নহি, জ্ঞাতা মাত্র। যখন সংবিত্তি আছে, তখন ইহার কর্ত্তাও আছে। আমার মন যদি ইহার কর্ত্তা না হয়, তবে মন ছাড়া "কিছু" ইহার কর্ত্তা। এইরূপে, সংবিত্তি হইতে সংবিত্তির কারণ নির্ণয় করিলাম; আমি মনের বাহিরের কোন বস্তু দেখিতেছি, এই জ্ঞান হইল। এইরূপে আমার সংবিত্তিকে "বিষয়ীকরণ" করিলাম। আমি পূর্ব্বে শ্বেত, পীত লোহিত প্রভৃতি অনেক বর্ণ দেখিয়াছি; কিন্তু বর্ত্তমান বর্ণটি আমার পূর্ব্বপরিচিত পীতবর্ণের মত—অন্য বর্ণের

মত নহে। সুতরাং আমার দৃষ্ট বস্তুটি পীতবর্ণের। আমি ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতি নানা আকারের বস্তু দেখিয়াছি —কিন্তু বর্ত্তমান বস্তুটির আকার আমার পূর্ব্বপরিচিত গোলাকারের মত—অন্য আকারের মত নহে। আমি পূর্ব্বে যে সকল লেবু দেখিয়াছি, এই বস্তুটির তাহাদের সহিত সাদৃশ্য আছে; সুতরাং আমি যাহা দেখিতেছি, সেটিও লেবু। আবার যখনই আমি বুঝিলাম যে এই বস্তুটি লেবু, তখনই লেবুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদির কথা আমার মনে উদয় হইল। এতগুলি মানস-প্রক্রিয়ার পর একটি বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইল। প্রক্রিয়াগুলি এত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয় যে, সাধারণতঃ আমরা উহাদিগকে লক্ষ্য করি না।

তুমি একটি শব্দ শুনিলে, শুনিয়া বলিলে, "কলেজের ঘণ্টা বাজিতেছে।" এই বাক্যটিকেও বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পাওয়া যায়ঃ—

১। আমি শুনিতেছি

২। আমি "কিছুর" ধ্বনি শুনিতেছি

৩। আমি ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি

৪। আমি কলেজের ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি।

ঘণ্টার স্পন্দন হইতে বায়ুর স্পন্দন, বায়ুস্পন্দন হইতে কর্ণপটহের স্পন্দন, কর্ণপটহের স্পন্দন হইতে মস্তিষ্ক-স্পন্দন হইল; স্পন্দিত মস্তিষ্কের উপর মনের প্রতিক্রিয়া হইল। বুঝিলাম, এই স্পন্দন অন্যান্য ইন্দ্রিয়জনিত স্পন্দনের তুল্য নহে,—ইহা শ্রবণেন্দ্রিয়জনিত স্পন্দন সদৃশ। এই রূপে শব্দ-সংবিত্তি হইল। কিন্তু এই শব্দের কর্ত্তা আমার মন নহে—আমার মন হইতে এ শব্দ হইতেছে না। এ শব্দের উপর মনের কোন আধিপত্য নাই। শব্দ বাহিরে হইতেছে —মন শুনিতেছে মাত্র। সুতরাং এ শব্দের উৎপাদক মন নহে—কোন বাহ্যবস্তু ইহার উৎপাদক। পূর্ব্বে আমি অনেক প্রকার শব্দ শুনিয়াছি—পিয়ানোর শব্দ, পাপিয়ার শব্দ ইত্যাদি কত প্রকার শব্দ শুনিয়াছি—কিন্তু এ শব্দ ঐ সকল শব্দের মত নহে। এ শব্দটির পূর্ব্বপরিচিত ঘণ্টাধ্বনির সহিত সাদৃশ্য আছে; অতএব আমি ঘণ্টার শব্দ শুনিতেছি। আমি গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াছি, আদালত-গৃহের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াছি, ডাকঘরের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াছি; কিন্তু এ ধ্বনি ঐ সকল ধ্বনির মত নহে—ইহা আমার পূর্ব্বপরিচিত কলেজের ঘণ্টাধ্বনির মত। সুতরাং আমি কলেজের ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি। যখন ঘণ্টাধ্বনি বলিয়া বুঝিতে পারিলাম, তখন স্মৃতি এবং সঙ্গ-শক্তির সাহায্যে ঘণ্টার আকার-প্রকার আমার মনে হইল। যখন কলেজের ঘণ্টা বাজিতেছে বলিতেছি, তখন যে কেবল আমার মনে সংবিত্তি মাত্র হইল তাহা নহে; সংবিত্তির সঙ্গে-সঙ্গে ঘণ্টার চিত্র, কলেজের চিত্র, ঘণ্টাটি কোথায় এবং কতদূরে অবস্থিত ইত্যাদি কত বিষয় মনে হইল। এইরূপে আমাদের "বস্তু পরিচয়"—হইয়া থাকে। ইহা পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ-জ্ঞান।

এই দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে দেখা যাইতেছে যে, কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংবিত্তির প্রয়োজন, এবং সংবিত্তির উদ্বোধক বস্তুর প্রকৃতি পরিচয়ও আবশ্যক। রূপ-রসাদির আধার নিরূপণ ও করণ-জ্ঞান ব্যাপারের নাম "প্রত্যক্ষজ্ঞান" বা "বস্তুজ্ঞান।" রূপ দেখিলাম, বা রস আস্বাদন করিলাম, কিন্তু ঐরূপ রসের আধার নিরূপণ না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। আমি রূপ অনুভব করিতেছি সত্য, কিন্তু আমার মন এ রূপের স্রষ্টা নয়, আমার মন এ রূপের আধার নহে। সুতরাং এ রূপের আধার এবং করণ নির্ণয় প্রয়োজন। মনে করিও না, প্রথমে সংবিত্তি—পরে আধার-নির্ণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। একটির পর আর একটি নহে—দুইটিই একসঙ্গে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বহু সংবিত্তির সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট বস্তুর জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যখন প্রথমে আমি লেবু দেখিয়াছিলাম, তখন জিহ্বার দ্বারা ইহার রস আস্বাদন করিয়াছিলাম, নাসিকার দ্বারা ইহার ঘ্রাণ লইয়াছিলাম, চক্ষুর সাহায্যে ইহার বর্ণ নির্ণয় করিয়াছিলাম, ত্বকের সাহায্যে ইহার মসৃণতা এবং ত্বক ও পেশির সাহায্যে ইহার আকার নির্ণয় করিয়াছিলাম। এইরূপে কতকগুলি সংবিত্তির সমবায়ে আমার লেবুর জ্ঞান হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে আমি একটি বস্তু দেখিয়া বলিলাম, "ঐ বস্তুটি লেবু" —এখন আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি না, আস্বাদন করিতেছি না, স্পর্শ করিতেছি না—কেবল দেখিতেছি মাত্র। এক্ষণে একটি মাত্র সংবিত্তি উপস্থিত,—অপরগুলি অনুপস্থিত। কিন্তু, বস্তুর বর্ণটি দেখিলেই, উহার আকার, আস্বাদন, গন্ধ প্রভৃতি সকলগুলিই আমার মনে যুগপৎ উপস্থিত হইতেছে। এখানে দর্শনেন্দ্রিয়ানুভূতি প্রত্যক্ষ

ভাবে উপস্থিত, এবং অপরাপর সংবিত্তি প্রত্যক্ষ ভাবে অনুপস্থিত হইলেও, স্মৃতি এবং সঙ্গশক্তি প্রভাবে পুনরায় চিত্তপটে উপস্থিত হইতেছে। এই স্মৃত সংবিত্তিগুলিকে পরোক্ষ সংবিত্তি বলা যাইতে পারে। অতএব' দেখা যাইতেছে যে, বস্তু জ্ঞান পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ উপাদানের সমন্বয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ উপাদান উপস্থিত সংবিত্তি এবং পরোক্ষ উপাদান স্মৃতি-সংবিত্তি। অতএব বস্তুজ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপাদানের সমন্বয়। এইরূপে—

"দেহ আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার!
এ কি জ্যোতিঃ! এ কি ব্যোম দীপ্ত দীপ জ্বালা'
দিবা আর রজনীর চির-নাট্যশালা!
এ কি শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্ব্বতে কঠিন, তরু-পল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার। এ কি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয় যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ!
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।"

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এই কয়টি মানসক্রিয়ার প্রয়োজন—

১। সংবিত্তি—
২। স্মৃতি—
৩। অবধান—
৪। বিকার—
(ক) সাদৃশ্যানয়ন
(খ) বৈসাদৃশ্যানয়ন।
৫। বিশ্বাস- (বাহ্যজগতের অস্তিত্বে)।

এবং এই কয়টি প্রধান উপকরণ—

১। প্রত্যক্ষ সংবিত্তির গ্রহণ—
২। অপ্রত্যক্ষ সংবিত্তির স্মরণ—
৩। বিষয়ী-করণ (সংবিত্তির আধার নিরূপণ)
৪। দেশ এবং কাল নিরূপণ।
৫। জাতি-জ্ঞান—বস্তুটি কোন্ জাতীয়।

সংবিত্তি এবং প্রত্যক্ষ-জ্ঞান—দুইটিই মানসিক ব্যাপার হইলেও, উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে—যথা—

সংবিত্তি—

১। অমিশ্র মানসিক অবস্থা—
২। উপাদান—প্রত্যক্ষ—
৩। স্মরণ কষ্ট-সাধ্য—
৪। মন নিষ্ক্রিয়—
৫। অনুভূতির মাত্রা অধিক।

প্রত্যক্ষীকরণ—

১। মিশ্র মানসিক অবস্থা (প্রত্যক্ষজ্ঞান = সংবিত্তি + চিন্তা
২। উপাদান—প্রত্যক্ষ + অপ্রত্যক্ষ
৩। স্মরণ—সহজসাধ্য—
৪। মন সক্রিয়—
৫। বুদ্ধির মাত্রা অধিক।

বাহ্যবস্তু গুণ-সমষ্টি মাত্র। বাহ্যবস্তুর জ্ঞান বলিতে উহার গুণ-সমষ্টির জ্ঞান বুঝিয়া থাকি; কারণ আমরা যাহাকে বাহ্যবস্তু বলি, তাহার গুণমাত্র প্রত্যক্ষ করি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব এবং পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। অতএব এক্ষণে বস্তু-গুণের বিচার আবশ্যক। আমরা যে জগতে বাস করিতেছি, ইহা দৃশ্যমান জগৎ। ইহার দ্রব্যসমূহ দৃশ্যমান, অথবা দর্শনার্হ। ইহার যে-কোন বস্তুটি লই না কেন, উহা চক্ষু দ্বারা জানিতে পারি; অথবা, যাহা প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা স্থল, সময় ও ঘটনা-বিশেষে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব—এরূপ ধারণা আমাদের আছে। যতক্ষণ না বস্তুবিশেষকে প্রত্যক্ষ করি, ততক্ষণ যেন উহা জানা হয় না বলিয়া মনে হয়। সত্য বটে, অন্ধেরও জগৎ আছে; কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তির জগৎ ও চক্ষুহীন ব্যক্তির জগতের মধ্যে অভাবনীয় পার্থক্য আছে। কতকগুলি দ্রব্য, গুণ ও দ্রব্যের ক্রিয়া লইয়া অন্ধের জগৎ। চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াবলির নিকট উহা অতি সামান্য। আমাদের জ্ঞান মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তুই চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকি। এই দৃশ্যমান বস্তুসমূহের সংখ্যার বা প্রকারের ইয়ত্তা নাই। অনন্ত দ্রব্যরাশির সকল প্রকার সাদৃশ্য ও বৈষম্য আমরা চক্ষু দ্বারাই উপলব্ধি করি। দুইটি পুষ্পের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা দৃশ্যমান, অর্থাৎ পুষ্প দুইটি বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও "আলো-আঁধারের" বিচিত্র সমন্বয় মাত্র। স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ডের পার্থক্য বুঝিতে প্রধানতঃ বর্ণেরই

পার্থক্য বুঝা যায়। প্রত্যেক বস্তুই সাধারণতঃ বর্ণ ও আলোকের বিশেষ সমন্বয় বলিয়া মনে হয়। উপরে কথিত হইল, বস্তুটির রূপ কি, না জানিলে ইহা জানাই হইল না; তদ্রূপ বস্তুটির আকৃতি, পরিমাণ, কাঠিন্য, গুরুত্ব প্রভৃতি না জানিলে বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে জানা হইল বলিয়া মনে হয় না। যতক্ষণ না বস্তুটি হস্ত দ্বারা বা শরীরের কোন অংশ দ্বারা স্পর্শ করতঃ উহার কাঠিন্য, দার্ঢ্য ইত্যাদি উপলব্ধি না করি, ততক্ষণ উহার অস্তিত্ব বিষয়েও আমাদের প্রতীতি হয় না। চক্ষু দ্বারা দর্শন করিবামাত্র বস্তুটিকে স্পর্শ করিয়া উহার অস্তিত্ব অনুভব করা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় মনে হয়। প্রত্যেক বস্তুরই বর্ণ, আকৃতি, কাঠিন্য ইত্যাদি গুণ ব্যতিরেকে ঘ্রাণ, শব্দ, শৈত্য ইত্যাদি গুণও আছে; কিন্তু আকৃতি, অবস্থান, গুরুত্ব ইত্যাদি গুণগুলিকে আমরা অপরাপর গুণ-সমূহের আধার বলিয়া মনে করি। দ্রব্যবিশেষের বর্ণ, ঘ্রাণ, স্বাদ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। অন্ধকারে কোন দ্রব্যরই বর্ণ থাকে না। বায়ু-মধ্যে কম্পমান না হইলে কোন দ্রব্যেরই শব্দ হয় না। সুতরাং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি দ্রব্যের স্থায়ী গুণ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। পরন্তু, কোন দ্রব্যের বর্ণ, রস জানিলেই উহার অপর গুণ বা ধর্ম্মের বিষয় নিশ্চিতরূপে জানা যায় না; কিন্তু আকার-প্রকার, পরিমাণ জানা থাকিলে, বস্তুটি সকল স্থানে ও সকল সময়ে কি প্রকার থাকিবে, তাহা জানা হইল—অর্থাৎ উহার তথ্য জানা হইল। কোন বস্তুর গন্ধের, বা বর্ণের, বা রসের অভাব হইতে পারে; কিন্তু উহার আকৃতি, পরিমাণ বা বিস্তৃতির একান্ত অভাব হইতে পারে না। যে কোন অবস্থাতেই থাকুক, উহার কোন-না-কোন আকৃতি বা কিছু-না-কিছু পরিমাণ থাকিবেই থাকিবে। সূক্ষ্মতম অবস্থাতেও কোন বস্তু একবারে পরিমাণশূন্য হয় না। এই কারণে বিস্তৃতি, অভেদ্যতা প্রভৃতি গুণ-সমূহকে বস্তুর প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ও বর্ণ গন্ধ ইত্যাদিকে মনের বিকার বলিয়া দার্শনিকেরা মনে করিতেন; কিন্তু যে ইন্দ্রিয়-প্রণালী দ্বারা আমরা বর্ণ, রস, গন্ধ অনুভব করি, সেই ইন্দ্রিয়-প্রণালী দ্বারাই আকৃতি, পরিমাণ, কাঠিন্য, গুরুত্ব ইত্যাদি অনুভব করিয়া থাকি। যদি প্রথমটি মনের বিকার মাত্র হয়, তবে শেষোক্তটি না হইবে কেন? তথাপি উপরি-উক্ত কারণে আকৃতি, পরিমাণ প্রভৃতি গুণকে মুখ্য ও বর্ণ-গন্ধ ইত্যাদিকে গৌণ ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

মুখ্যগুণ—
১। সার্ব্বজনিক
২। অপরিবর্ত্তনশীল
৩। সর্ব্ববাদিসম্মত
৪। অত্যাবশ্যক

গৌণগুণ।
১। অসার্ব্বজনিক
২। পরিবর্ত্তনশীল
৩। সর্ব্ববাদিসম্মত নহে
৪। অত্যাবশ্যক নহে (ক্রমশঃ)

রঙ্গলাল

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

(৪)

প্রেম কবির চিরসঙ্গী—কবিতার সৃষ্টিদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল কবিই প্রেমের গান গাহিয়াছেন এবং চিরদিনই গাহিবেন। মধুসূদন ও রঙ্গলাল উভয়েই প্রেমের কবি; কিন্তু এই প্রেমের দিক্ হইতেই উভয়ের মধ্যে বিষম পার্থক্য। মধুসূদন শুধু প্রেমের উপাসক, কিন্তু তিনি প্রেমের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই, তিনি প্রেমের স্বরূপ ধরিতে পারেন নাই; আর রঙ্গলাল একাধারে প্রেমের উপাসক এবং বিশ্লেষণ-কর্ত্তা,—তিনি প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন; তিনি সেই মধুময় রাজ্যের সকল প্রদেশেই পরিভ্রমণ করিতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদন বঙ্গের বায়রণ কিম্বা শেলী; রঙ্গলাল বঙ্গের ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিম্বা কীট্‌স। রঙ্গলালের লজ্জা ও প্রণয়ের গূঢ় সমস্যার উদ্ঘাটনেই তাঁহার প্রেম-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়—

"লজ্জাসহ প্রণয়ের হয় হাতাহাতি।
যথা প্রাতে তমঃ সহ তপনের ভাতি॥
ক্রমে যত তেজঃ-বৃদ্ধি হয় ভানুকরে।
ততই তিমিরচয় বিগত অন্তরে॥
পরিশেষে পরিপূর্ণ প্রভার বিজয়।
সেইরূপ লজ্জা গতে প্রেমের উদয়॥
ফলে যথা তিমির মিহির ছাড়া নয়।
লজ্জা সহ প্রণয়ের সেইভাব হয়॥"

(কর্ম্মদেবী)

কবি প্রেমকে শুধু কোমলতার আধারের ভিতর রাখেন নাই, তিনি প্রেম-প্রবণতাকে বীরত্বের সহিত মিশ্রিত করিয়াছেন—

"প্রেম ছাড়া বীর কোথা, বীর্য্য ছাড়া প্রেমী,
ধুরা ছাড়া কভু স্থির নহে চক্রনেমী।"

(শূরসুন্দরী)

প্রেম-প্রাসাদের গুপ্ত ও নিভৃততম কক্ষে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে এ কথা কেহ বলিতে পারে না—মহাকবির চিহ্ন না থাকিলে এ উক্তি সম্ভবপর নহে। প্রেমের উপাসনা এবং বিশ্লেষণ করিতে-করিতে যখন বার্দ্ধক্যের সীমায় উপনীত হইলেন, তখন কবি গায়িলেন—

"অমূল্য পদার্থ প্রেম, মূল্য কিবা তার ?
যে জেনেছে, এ সংসার তার কাছে ছার॥
প্রেমধর্ম্ম সার ধর্ম্ম, প্রেম-সুখ সার।
প্রেমময় এ জগৎ সন্দেহ কি আর॥"

(কাঞ্চীকাবেরী)

এই সকল উক্তির ভিতরও কবির স্বাভাবিকতাই প্রধান গুণ, এবং সেইজন্যই এইগুলি এত মাধুর্য্যময়, এত প্রাণস্পর্শী—এই সকল উক্তি প্রকৃতই চির-অমরত্ব লাভের উপযুক্ত। রঙ্গলালের পর রবীন্দ্রনাথই প্রেমকে এইরূপ সূক্ষ্মভাবে ধরিতে পারিয়াছেন।

কবি নিসর্গের পুরোহিত ;—এই পৌরোহিত্য করিতে গিয়া কবি প্রকৃতদেবীর আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া লন। কিন্তু ক্রমবিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী ; মেটারলিঙ্ক যেমন জগতের অন্যতম মহাকবি হইয়াও সঙ্গীতবিদ্যার বিরুদ্ধবাদী, সেইরূপ টেনিসনও একজন মহাকবি হইয়াও প্রকৃতিদেবীকে কবির চক্ষে না দেখিয়া বরং তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের এই রাজকবি ব্যতীত কবির ভিতর এই উদাহরণ আর নাই। প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদিগের ভিতর নৈসর্গিক জ্ঞানের জন্য চণ্ডীদাস অপেক্ষা মৈথিল কবি বিদ্যাপতির মূল্য অধিক। পাশ্চাত্য কবিকুলের ভিতর ওয়ার্ডসওয়ার্থ অপেক্ষা প্রকৃতি-পুরোহিত আর কেহ জন্মে নাই। রঙ্গলাল প্রকৃতিকে বিদ্যাপতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। কবি কুলু-কুলু-নাদিনী তরঙ্গিণীর তটে বসিয়া, প্রভাতে পূর্ব্বাকাশে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া, নিভৃত পল্লীর স্বভাব-কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া, অম্বরভেদী পর্ব্বতগাত্রে উপবিষ্ট হইয়া, নীরব নিশীথে নক্ষত্র খচিত গগনপটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, আষাঢ়ের প্রাবৃটাকাশে নির্নিমেষ-নেত্র হইয়া নিসর্গের মনোমোহকর সৌন্দর্য্য পাতি-পাঁতি করিয়া দেখিয়া লইয়াছেন ; আমরা এই স্থলে পাঠককে কবির নিসর্গানুভূতির কতিপয় নিদর্শন উপহার দিলাম—

(ক) "পশ্চিমে দ্বিজেশসম রোহিণীর পাশে॥
সারা নিশা গেল তাঁর তারার সভায়।
তাই বুঝি বিপাণ্ডুর সরমের দায়॥
অথবা অগ্রজমুখ নিরখি অম্বরে।
লজ্জা ভয়ে শশধর পাংশুরাগ ধরে॥"

(পদ্মিনী)

(খ) "যেন উৎস বদ্ধ ছিল শেখর-গহ্বরে।
পর্ব্বতের বক্ষঃ ভেদি ধাইল সত্বরে॥" ঐ

(গ) "এক ভাগ লাল অন্য ভাগ শ্বেতোজ্জ্বল।
শারদী ঊষায় কিবা শোভা নিরমল॥"

(কর্ম্মদেবী)

(ঘ) "আঁখি মুদি চারুশীলা, রথোপরি আরোহিলা,
মেঘাতায়ে নলিনী যেরূপ॥" ঐ

(ঙ) "কত ভাব সমুদিত, তাহে চিত সুমুদিত,
যেন নব ঝুমুকা কুসুম।"

(কর্ম্মদেবী)

(চ) "নিদাঘ-নীরদ মত নাহি বরিষণ।
মৃদু রব কভু শ্রুত নহে গরজন॥"

(শূরসুন্দরী)

(ছ) "শীতল অনল প্রায় লাবণ্যের ছটা।
ধূমাকারে শোভে নীল চিকুরের ঘটা॥"

(কাঞ্চীকাবেরী)

এমন কি, জীবনে কখনও বালুময় মরুভূর সাক্ষাৎ না পাইলেও, কবি তাঁহার অত্যদ্ভুত কল্পনাশক্তির বলে তাহার যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই মরুবাসী আরব কবির উপযুক্ত এবং অতি কবিত্বপূর্ণ ও মাধুর্য্যময় হইয়াছে—

"মার্ত্তণ্ড-ময়ূখমালা মৃত্যুর কিঙ্করী।
মায়াবিনী মরীচিকা যার সহচরী॥"

(কর্ম্মদেবী)

প্রকৃতির সহিত সূক্ষ্মভাবের পরিচয় হইতে কবির কাব্যের আর একটি দিক্ অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপমা-প্রয়োগ কবিকুলের বড় প্রিয় বস্তু; দাশরথি যখন উপমা দিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাকে 'কবি থামুন' না বলিলে আর তাহার বিরাম হয় না; কিন্তু রঙ্গলালের উপমা মোটেই এই শ্রেণীর নহে। তিনি দেবপূজার কুসুম-চয়নের ন্যায় স্বভাব সৌন্দর্য্য হইতে একটি-একটি করিয়া সুন্দর উপমাগুলি বাছিয়া লইয়াছেন। ইহাতে রঙ্গলাল মহাকবির কবিত্ব-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। রঙ্গলালের কাব্য-নিচয় যে সুখপাঠ্য হইয়াছে, উপমা-প্রয়োগও তাহার অন্যতম কারণ।

পাশ্চাত্য জগতে একই ছন্দে বৃহৎ-বৃহৎ মহাকাব্য রচিত হইয়া থাকে; ইহা য়ুরোপখণ্ডের মহাকাব্য প্রণয়নের কু-প্রথা বিশেষ; কারণ ইহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমাদিগের দেশের কাব্য-মাত্রের সর্গগুলি বিভিন্ন ছন্দে রচিত হইয়া থাকে। মধুসূদন এই প্রাচীন প্রথা পরিহারপূর্ব্বক পাশ্চাত্য প্রণালীতে কাব্য-প্রণয়ন করেন। হেমচন্দ্র পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও, ভারতীয় প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিলেন; রঙ্গলাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকশিত-জ্ঞান হইয়াও, কালিদাস-ভবভূতির পদাঙ্কের অনুগমন করিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার কাব্যগুলির মিষ্টত্ব রক্ষিত হইয়াছে। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' মুদ্রিত হইবার পর 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হয়। এই দুই কাব্যের যথেষ্ট প্রশংসা হইলেও, রঙ্গলাল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ গ্রহণ করেন নাই। রঙ্গলাল পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের সহিত অপরিচিত ছিলেন, এ কথা স্বীকার্য্য নহে। 'পদ্মিনী'র কবি এই ছন্দের মহত্ত্ব, প্রয়োজন এবং প্রশংসা ব্যক্ত করিলেও, কেন যে আপনার কাব্যে উহার ব্যবহার করিলেন না, তাহার কারণ বুঝাইবার জন্য একদিন স্বয়ং 'মেঘনাদে'র কবিকে বলিয়াছিলেন—

"I acknowledge the Blank Verse to be the noblest measure in the language, but I say, that no one but men accustomed to read the poetry of England would appreciate it for years to come."

মহাজ্ঞানীরও ভ্রমের নিকট হইতে মুক্তি নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ সম্বন্ধে রঙ্গলালের এই উক্তি যে নিষ্ফল হইয়াছে, তাহা 'তিলোত্তমা' ও 'মেঘনাদ' প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই প্রমাণিত হয়। রঙ্গলাল সকল স্থলেই মিত্রাক্ষর-ছন্দঃই নানারূপে ব্যবহার করিয়াছেন; এমন কি, ভারতচন্দ্রের 'মালঝাঁপ' প্রভৃতিও অতি নিপুণতার সহিত রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কয়েকস্থলে সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বনে স্তোত্র লিখিয়াছেন। এই সকল বিষয় রঙ্গ-লালের কাব্যের প্রাচ্য ভাবের পরিচায়ক। ছন্দের ন্যায় অলঙ্কারও কাব্যের সৌন্দর্য্য-বিধায়ক এবং মিষ্টত্ব-সঞ্চারক; এই অলঙ্কারও রঙ্গলাল কুশলতা ও কবিত্বের সহিত প্রয়োগ করিয়াছেন। ললনার অলঙ্কারের ন্যায় কাব্যালঙ্কারও বহু প্রকারের,—উপমা ইহাদিগের অন্যতম। রঙ্গলালের উপমা-প্রয়োগের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি। উপমা ব্যতীত উৎপ্রেক্ষা, বাক্য-লিঙ্গ (implied causality), দৃষ্টান্ত, উল্লেখ (manifold predication) প্রভৃতি অনেক সরল এবং সুকবির উপযুক্ত অলঙ্কার রঙ্গলালের চারিখানি কাব্যের ভিতর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অনুপ্রাসও অলঙ্কারের বিষয়ীভূত। এই অনুপ্রাস লইয়া সকল কবিই নাড়াচাড়া করিয়াছেন; ইহাদিগের ভিতর দাশরথি আবার এই অলঙ্কারটির বিশেষ ভক্ত,—অনুপ্রাসের অযথা প্রয়োগ এবং বাহুল্যে তাঁহার রচনামালার মহতী বিকৃতি সাধিত হইয়াছে। রঙ্গলালও অনুপ্রাসের ভক্ত; কিন্তু তিনি দাশরথির ন্যায় অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। রঙ্গলালের অনুপ্রাস-প্রয়োগ দুই-এক স্থল ভিন্ন অপর সকল স্থানেই মাধুর্য্যময় হইয়াছে। আমরা এই স্থলে কবির অলঙ্কার-প্রয়োগ-নৈপুণ্যের কয়েকটি উদাহরণ দিলাম—

(ক) "যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ-ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।

বিকশিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেক ভাগে কেবল চীৎকার ॥"
(পদ্মিনী)

(খ) "কি চিকণ চালাকী চতুর চূড়ামণি।
চপল কিরণ কিবা চপলা চালনী ॥"
(কর্ম্মদেবী)

(গ) "গলিত নয়ন জলে দলিত অঞ্জন।
কপোল কমলে যেন দ্বিরেফ রঞ্জন ॥"
(শূরসুন্দরী)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রঙ্গলাল স্বভাব কবি—স্বাভাবিকতাই তাঁহার কবিতার প্রধান গুণ। একদিকে যেমন স্বাভাবিকতা, অন্যদিকে সেইরূপ হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা, রচনার প্রাঞ্জলতা, কবিত্বের পরিস্ফুট উন্মেষ, মাধুর্য্য, ওজঃ ও কারুণ্য গুণ, জটিলতা ও কষ্ট কল্পনার অভাব, মেঘনাদের "যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে" অথবা, বৃত্রসংহারে "চিরদীপ্ত চিরগুণ প্রাক্তন-বিভাস" প্রভৃতি আভিধানিক শব্দাড়ম্বরের অবিদ্যমানতা এবং সুরুচিসম্পন্নতা বঙ্গ-সাহিত্যে কবি রঙ্গলালের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে। রঙ্গলালের রচনামালার এই সকল গুণ বিবৃত করিলেও, তাঁহার কাব্যগুলি যে সম্পূর্ণ নিখুঁত—এ কথা আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারিলাম না। তাঁহার কাব্যগুলির ভিতর গ্রাম্যতা দোষের কিছু প্রাচুর্য্য দেখা যায়। তিনি 'সাচ্চা বাচ্ছা', 'আঁচি', ভেগে', 'তেড়ে ফুঁড়ে', 'অতিচার' প্রভৃতি বহু গ্রাম্য শব্দ বিশুদ্ধ সংস্কৃতজ কথার সহিত মিশ্রিতভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। রঙ্গলালের ভিতর যে তাঁহার কাব্য-গুরু ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব ছিল, ইহা তাহারই প্রমাণ। গ্রাম্য শব্দ ব্যতীত রঙ্গলালের রচনার ভিতর 'গরিমা-মাদক' 'সমতুল' 'সন্ধায়ী' পিতা-সঙে', 'সশঙ্কিত' প্রভৃতি বহু ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ পদের প্রয়োগ আছে। ইহাও গুপ্ত কবির প্রভাব সপ্রমাণ করিতেছে। রঙ্গলালের শব্দাড়ম্বর না থাকিলেও, 'কস্তুরা', 'ধাসিক্ত', 'মহাবেত' প্রভৃতি চারি-পাচটি শব্দ আমাদিগের নিকট দুর্ব্বোধ বলিয়া বোধ হইল। রঙ্গলালের রচনার ভিতর স্বভাবমাধুরী থাকিলেও, "তান ধরে আর একজন", "চালকের ইঙ্গিত মাত্রেই দেয় ছুট", "ধনহীন, উপায়বিহীন, ভ্রাতৃহীন" প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র ছত্র নিতান্ত নীরস এবং পদ্যের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। এইগুলি ব্যতিরেকে রঙ্গলালের কাব্য-চতুষ্টয়ের ভিতর 'সন্দিগ্ধতা,' 'শব্দানৌচিত্য', 'অর্থপুনরুক্ততা', 'অবাচকতা, 'বাচ্যানভিধানতা' প্রভৃতি কতিপয় কাব্য-দোষ পরিদৃষ্ট হয়; নিম্নে তাহার কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল—

(ক) "নানা জাতি বিহঙ্গ সুরঙ্গে গান করে।
সন্তাপীর তাপ দূর, মনঃ প্রাণ হরে ॥"

(খ) "অই শুন মন্দ মন্দ মলয়জ বহে।
মৃদু স্বরে মনের উল্লাস বুঝি কহে ॥"

(গ) "মহামহীপালগণ্ সভার ভিতর।
মহারত্নরূপে খ্যাত দেশ দেশান্তর ॥
কিন্তু তাঁরা সেই সব সভার বর্ণনে।
কটা কথা লিখেছেন ভাব আকর্ষণে ॥"

(ঘ) "যশে যেন দ্বিজরাজ, বিক্রমেতে পশুরাজ,
মহারাজ ভীম নরপতি।
ভয়ানক শত্রুগণে, নিধন করিয়া রণে,
পালিছেন রাজ্য শান্তমতি ॥"

এতদ্ব্যতীত, এই চারিটি স্থলে যতি-ভঙ্গের দোষও ঘটিয়াছে। ফলতঃ, এই সকল ত্রুটি থাকিলেও রঙ্গলালের কাব্যচতুষ্টয় যে বঙ্গসাহিত্যে মূল্যবান্ সামগ্রী, এ কথা অবিসংবাদিতরূপে বলা যাইতে পারে।

কবি বলিলেই,—কোন্ শ্রেণীর কবি-সে কথার মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। রঙ্গলালকে আমরা কবি বলিয়াছি; কিন্তু তিনি কোন্ শ্রেণীর কবি, সে কথার উল্লেখ করি নাই। রঙ্গলালের বাল্যসখা মেঘনাদের কবি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"My opinion of him is—that he has practical feeling—that some fancy, perhaps, imagination."

ইহাই তাঁহার প্রকৃত মূল্য; তিনি ইহার অধিক আর কিছুর আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন না। রঙ্গলাল যে কবিত্ব শক্তির হিসাবে মধুসূদনের সমকক্ষ নহেন, তাহা মেঘনাদের কবি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—

"He is a touchy fellow, but I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than he."

সত্য বটে, যদিও আমরা রঙ্গলালকে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীর কবিদিগের ভিতর আসন দিতে পারি না; তথাপি, তাঁহার ভিতর যে মহাকবির গুণ-নিদর্শন একেবারেই ছিল না, এ কথা বলা সম্ভবপর নহে। রঙ্গলাল দ্বিতীয়শ্রেণীর কবি; কিন্তু তিনি দ্বিতীয়শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান কবি। সত্য বটে, আমরা রঙ্গলালকে 'কবিবর' আখ্যা দিতে পারি না, কিন্তু আমরা এ কথা সুনিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, রঙ্গলাল উচ্চশ্রেণীর কবি, রঙ্গলাল সুকবি। বাঙ্গালী আজ এই কবিকে ভুলিতে বসিয়াছে; কিন্তু এ দুর্ভাগ্য কবির নহে- দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসীর, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালার। যে দেশে কবি যশোলাভ করিয়া থাকেন সে দেশ ধন্য -আর যে দেশে কবি জীবিত কালেই স্বজাতির ভক্তিমাল্য পাইয়া থাকেন, সে দেশ ধন্য। বঙ্গভূমি এ তিন সৌভাগ্যই লাভ করিয়াছে। কালচক্রের কুটিল ঘূর্ণনে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। একদিন পোপের যশঃ প্রভাবে সেক্‌স্‌পীয়রের কাব্য-প্রশংসা মন্দীভূত হইয়াছিল; কিন্তু ইংলণ্ডের সাহিত্য সমাজ তখনও প্রাণহীন হয় নাই, তখনও বিবেকযুক্তিশূন্য হয় নাই; সেই জন্যই আজ হ্যামলেটের মহাকবি তাঁহার পূর্ব্বাসনে অধিষ্ঠিত, আর Rape of the Lockএর মহাকবিও তাঁহার উপযুক্ত আসনে সমাসীন হইয়াছেন। রঙ্গলাল তাঁহার জীবিতকালে সুকবির খ্যাতি অর্জ্জন করিলেও, আজ ক্রমশঃ তাঁহার দেশবাসীর নিকট অপরিচিত হইতে বসিয়াছেন; ইহা বাস্তবিক বড় দুঃখের বিষয়। বাঙ্গালী যদি পুনরায় শ্রদ্ধার সহিত কবি রঙ্গলালের কাব্য-কলাপ অধ্যয়ন করিতে থাকেন, তবে এই জাতি আপনার গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিবেন; আর সেই সঙ্গে কবির যশঃ ফিরিয়া আসিবে—কবি রঙ্গলাল তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুনরুপবিষ্ট হইবেন। মেঘনাদের 'সপ্তমসর্গ', বৃত্রসংহারের 'দশমসর্গ' এবং 'গীতাঞ্জলী' যেরূপ কবির কবিত্বশক্তির উৎকর্ষের চরম নিদর্শন, সেই প্রকার 'শূরসুন্দরী'র 'তৃতীয় সর্গ' অথবা 'পদ্মিনী উপাখ্যান' অধ্যয়ন করিলেই রঙ্গলালের কবিত্বশক্তি পাঠক অনুভব করিবেন,- বঙ্গের কাব্য সাহিত্য জগতে রঙ্গলালের স্থান কোথায়, তাহাও পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মানুষের সাধনা

[শ্রীনলিনী রায়]

কাণ ধরিয়া টানিলে মাথাটাও সঙ্গে-সঙ্গে আসে! কেন যে আসে, যদিও তাহার কোন দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক, কি ঐতিহাসিক কারণ এ যাবৎ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তবু সাধারণে বলেন, শুনিতে পাই, মাথায় আর কাণে না কি একটা দারুণ যোগাযোগ আছে।

মানুষের যে-কোন দিক ধরিয়া বাড়াবাড়ি করিয়া পরখ করিতে গেলেই, অনেকগুলি বিরাট-বিরাট ব্যাপারের গন্ধ পাই, আর বড়-বড় সমস্যার ঝন্‌ঝনি শুনিতে পাই। এখানেও এসবগুলিতে একটা যোগাযোগ থাকা সম্ভব। দেখা যাউক কি আছে।

যোগ দেখিতে হইলে, প্রথমেই জিজ্ঞাস্য—কিসে কিসে? মানুষের জীবনের মধ্যে একটা ঐক্য দেখিতে হইলে, তাহার বিভিন্ন দিকগুলির সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করিতে হয়।

পল্লীগ্রামে কাহারও গৃহে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলেই, সর্ব্বকোলাহল ছাপাইয়া, পক্ককেশ নিষ্কর্ম্মা বার্দ্ধক্য যে গগনভেদী বিসংবাদ জাগাইয়া তোলে, অভিশপ্ত নিরন্ন গৃহস্থের হৃদয়-শোণিত ও পঞ্জরমেদে ষোড়শোপচারে অর্ঘ্য না পাইলে তাহার আর উপশান্তি হয় না। নিঃস্ব, রিক্ত পিতার দিনান্ত-সংস্থানটুকু ঋণগ্রস্ত না হইলে, দেশের দুর্ভাগা কন্যার আর সদ্গতি হয় না। 'রমেশ' দেশত্যাগী না হইলে 'যতীনের' উপনয়নে 'রমার' গৃহে কেহ জলস্পর্শ করিবেননা। পিতৃশ্রাদ্ধে যুগান্তের প্রত্যাগত শোকতপ্ত পুত্রের গৃহে প্রতিবেশীবর্গ যেন পদার্পণও না করেন, এজন্য নিতান্ত নিকট আত্মীয়ও অপর সাধারণের, এমন কি প্রতিপক্ষদের বাড়ী বাড়ী গিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া বাঙ্গলার ঐতিহাসিক মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কুরুক্ষেত্রে নারায়ণ অর্জ্জুনকে ডাকিয়া

বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। মানবগোষ্ঠিও এমন শত শত ভাবে আপনার স্বরূপ আজ বিশ্বময় প্রকটিত করিতেছে। সাহিত্যে—ভাষায় এ রূপের বিশেষণ—সামাজিক। এই প্রথম দিক।

এক হাতে কোরাণ, আর এক হাতে কৃপাণ লইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রচারকগণ অত্যধিক বীরদর্পে সভ্যতার স্বাধীনতা গ্রাস করিয়া দেশে-দেশে ফিরিয়াছে, দেবমন্দির ধূলিসাৎ করিয়া মস্‌জিদের ভিত্তিভূমি গাঁথিয়া তুলিয়াছে। বৌদ্ধ-ভিক্ষুকুল মানুষের স্বভাবগত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া যজ্ঞের অশ্বের মত, ললাটে ত্রিপিটক আঁটিয়া, জলে-স্থলে, ভূধরে-কন্দরে সর্ব্বত্র অশ্রান্ত পরিভ্রমণ করিয়াছে। আর তাহারই ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের কণ্ঠনিরোধ করিয়া কৃতান্তের সহোদরের মত ভগবান শঙ্কর মহাভাষ্যের বজ্রপাশ কষিয়াছিলেন। আর মোহমুদ্গর সুযোগ বুঝিয়া তাহার কর্ণকুহরে তারক-ব্রহ্ম নাম শুধাইয়াছিল। তাহারও পরে শুনিতে পাই, পরশুরামের মত কুমারিলভট্ট দাক্ষিণাত্য নির্বৌদ্ধ করিয়াছিলেন।

ইহাই মানুষের দ্বিতীয় দিক। ইহার নাম "রিলিজিয়ন"। বাঙ্গলা ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ নাই; তাই অভাবে মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া নেহাৎ বলিতে হয় বলিব—ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্মের দেখাদেখী লইয়া রক্তারক্তি করিতে য়ুরোপের সঙ্গে সমানেও আর কোন দেশ দাঁড়াইতে পারে না। মানুষের পর মানুষ, সংঘের পর সংঘ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়া, কিম্বা কুঠারতলে বলি দিয়া য়ুরোপ যে নিষ্ঠুর ক্রূরতার অমর-কাহিনী শোণিতরূপে বহ্নিদীপ্তিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছে, সমগ্র সুসভ্য জাতি জানে, তাহাই প্রতীচ্য ইতিহাস। ইহারই জন্য প্রভু যীশু ক্রুশাঙ্কে বিদ্ধবপু হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। আর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হরিদাস দ্বাবিংশ হট্টে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন; ইহারই কল্যাণে হজরৎ মহম্মদকে একদিন নৈশ-তমসায় নীরবে মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করিতে হইয়াছিল; আর ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণকে সজ্ঞানে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে মহাপ্রসাদরূপে হলাহল পান করিতে হইয়াছিল। ধন্য রে ধর্ম্ম, এ কি তোরই লীলা, না, এ শুধু sufferings are the wages of sin!

মানুষের তৃতীয় দিক, আজ এই ভারতময় উচ্চ কোলাহলের মধ্যে আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠে কেহ শুনিতে পাইবেন কি? এই কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স্‌, হোমরুল, ইণ্টার্ণমেণ্ট ইত্যাদি করিয়া বিস্যুদবারের বারবেলায় "bear out" (১) পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই যাহার কীর্ত্তি, "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" (২) যাহার ধুয়া, আর "বুদ্ধিমানের কর্ম্মে" (৩) যাহার ধ্বনি,—সাহিত্য সমিতি অনুমতি করিলে (৪) শুধু তাহার নামটি করি;—তাহারই নাম রাজনীতি ওরফে পলিটিক্স্‌। ইংরেজ, রুষ, ফরাসী, ইটালীয়ান একপক্ষ—ইহাও পলিটিক্স্‌; জাপান-যুক্তরাজ্য একই পরিপন্থী—ইহাও পলিটিক্স্‌! পলিটিক্স্‌, সব পলিটিক্স্‌, বাঙ্গালী পল্টনও পলিটিক্স্‌!

মানুষের তবে তিন ধারা—সামাজিক, ধর্ম্মগত ও রাজনৈতিক। এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসঙ্গমে দাঁড়াইয়া আমরা আজ সর্ব্বস্তীরূপিণী রাজনীতিকে এ প্রসঙ্গে বিলুপ্ত রাখিতে চাহি—কারণ নক্র-চক্র-কুম্ভীর-সঙ্কুল এ পথে প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে।

আমাদেরই প্রার্থনামত রাজশক্তি ব্যতীত আর দুই শক্তি মানুষের উপর নিত্য নিত্য খেলা করিতেছে। আপাত-দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে যে ঘোর অনৈক্য দেখিতে পাই, তাহার তলের তলেও এতটুকু একটু ঐক্য আছে কি না, তাহাই আমরা দেখিব। মানুষ বলিতে আজ যাহা বুঝায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগে কি ঠিক এই ই বুঝাইত? আজ যে ত্রিমূর্ত্তিতে মানুষকে দেখিতে পাই, জগৎসৃষ্টির অরুণ ঊষালোকের মধ্যেও কি মানুষের এই ত্রিমূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছিল? এ প্রশ্নের সমাধান ইতিহাস করিতে পারে না। কল্পনায় যে উত্তর পাইব, তাহাকে অভ্রান্ত ঈশ্বর বাণী বলিতে ভরসা করি না—তবে, গতাগতি কিম্বা কার্য্য-কারণদ্বারা তাহার সত্যতা সাব্যস্ত হইতেও পারে।

মানববংশে এমন এক সময় ছিল, যখন সমাজ ছিল না, নীতি ছিল না, ধর্ম্ম ছিল না। ধরিত্রী-মায়ের গর্ভ

---

(১) Congressএর Reception Committeeর সভায় হীরেন্দ্র বাবু ও সুরেন্দ্রবাবুর বিবাদ।—Indian Association Room, 1917.

(২) স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত।

(৩) শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কর্ত্তৃক অর্দ্ধ-পঠিত।

(৪) সাহিত্য-সমিতিতে রাজনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ বা আলোচনা নিষিদ্ধ। তাই নামোচ্চারণের জন্য এই অনুমতি প্রার্থনা।

হইতে প্রথম মানবশিশু তখন সদ্যঃভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, প্রকৃতিও দেহ লইয়া নির্ব্বিকার নিঃশঙ্কভাবে পৃথিবীর কোনও শ্বাপদসঙ্কুল প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তখন তাহাদের সহচর ছিল—সিংহ-ব্যাঘ্র-বৃক-ভল্লুক, প্রতিবেশী ছিল মেমথ ও মেগাথেরিয়ম, মোসেপুরাস ও ডাইনোথেরিয়স্ (৫)। প্রথম জীবনসংগ্রামে ইহারাই মানুষের প্রতিপক্ষ ছিল।

অথচ কর্ণ ব্যতীত এ যাবৎ আর কেহ সহজাত যুদ্ধোপকরণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। নখদন্তপুচ্ছশৃঙ্গ প্রকৃতিদত্ত আত্মরক্ষার সমস্ত অস্ত্রে মানুষকে বঞ্চিত করিয়া বিনিময়ে বিধাতা পুরুষ দিয়াছিলেন শুধু একটু বুদ্ধি!

সেই বুদ্ধিরই বলে, মানুষ পাশবসংগ্রামে আত্মসংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছে, অধিকন্তু মনুষ্যেতর জীব জগতের উপর এই বুদ্ধিরই কৃপায় কর্ত্তৃত্বও করিতেছে।

অতিকায় পশু-প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একৈক বুদ্ধি লইয়া মানুষকে যুঝিতে হইলে, কোন অস্মরণীয় যুগেই মানবকুল, ধ্বংসের গর্ভে বিলয় পাইত। একতায় অনুপ্রাণিত হইয়া দলবদ্ধ মানুষ আত্ম-স্বতন্ত্র মহাবল পশুগুলিকে পরাভূত করিয়া একদিকে যেমন আত্মরক্ষা করিয়াছে, পক্ষান্তরে তেমনই জীবজগতের অবিসংবাদিত প্রাধান্য পাইয়াছে।

পশুরা যেখানে বাঁধনহারা জীবনধারা বাহিত করিত, মানুষ সেখানে আসিয়া সমাজ-সংযমের প্রথম পতাকা উড়াইয়াছিল। এই সংযমই মানুষের বিশেষত্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব! স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করি ক্ষোভে দুঃখে, ঘৃণা-সরমে! কিন্তু সংযম ও অধীনতাই যে মানুষকে মানুষ করে, জীবকে শিব করে, কল্যাণ বোধন করে, মাহাত্ম্য উদ্দীপ্ত করে, জীবন ও জাতির ইতিহাস তাহা কি আমাদিগকে শিক্ষা দেয় না?

কোন কিছুরই অধীন না হইয়া সকলেই আত্মতন্ত্র, স্বাধীন হইলে সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে—জীবন-সংগ্রামে সামর্থ্যের গ্রাসে পড়িয়া পলকে এই মানববংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। সমাজ তাই নিবিড় বন্ধনে সকলকে বাঁধিয়াছে; এতটুকু অব্যাহতি দিতেও সে কোনমতেই রাজি নয়!

প্রাথমিক যুগের প্রাথমিক সমাজে এ বন্ধন নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল না। অবস্থা-বিপর্য্যয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সে তখনও এতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারে নাই। অভিজ্ঞতা ও সংযম ব্যতীত ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ নিরূপিত হইতে পারে না। এই সম্বন্ধবোধের শুভ মাহেন্দ্রক্ষণেই নীতির আবির্ভাব হয়। তাই মনে হয়,সেই অতীতের অতীতে অজাত নীতি, কালের গর্ভশয়নে ভ্রূণের মত সুপ্তশায়িত ছিল, আর কল্পনা পার্থিব পদার্থে অপার্থিব শক্তি আরোপ করিয়া, সমাজ-বন্ধনের জন্য বিধিব্যবস্থার শৃঙ্খল গাঁথিতে-গাঁথিতে সেই মহাসন্তানের সুদূর জন্মক্ষণ পল-পল করিয়া গণনা করিত। এই কল্পনা-রচিত religionই সেই প্রাথমিক মনুষ্যসমাজকে বেত্র-হস্তে লইয়া শাসনে রাখিত; আর পক্ককেশ পণ্ডিত মহাশয়ের মত মাথা নাড়িয়া-নাড়িয়া মানবশিশুগুলিকে প্রাথমিক-যুগের প্রথম-পাঠ পড়াইত।

একই প্রেরণার প্রণোদনে সকলে মিলিয়া একই পীঠ-তলে সমবেত হইত, একই মন্ত্রে সমস্বরে একই অভীষ্ট দেবতার আবাহন করিত; কিন্তু প্রকৃতির নির্দ্দেশে সমাজ তখনও অন্তর্বিগ্রহশূন্য ছিল না।

Religionএর বন্ধনের মধ্যেও—সেই পাশবশক্তির পরিপূর্ণ প্রতিপক্ষতার দিনেও মানুষে-মানুষে বিসংবাদের ইয়ত্তা ছিল না; আজও এই অপর শত বিহিত শাসনে সমাজের নিবিড়তার অভ্যন্তরে বেশ সংগ্রাম চলিতেছে। তখনও যেমন স্বার্থের জন্য একে অন্যের বক্ষে অসি বসাইত, আজও তেমনিই আত্মপুষ্টির জন্য মানুষ মানুষের রক্তে তর্পণ করিতেছে। তখনও যা, আজও তাই! মানুষের প্রকৃতিই এই।

এই প্রকৃতিই মানুষকে সংযমের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া উন্মুক্ত অনধীন হইবার জন্য প্রাণের তলে বসিয়া নিরন্তর কুপরামর্শ দিতেছে। সমাজবন্ধন ও জনস্বাতন্ত্র্যের মধ্যে তাই সেই প্রথমাবধি এ যাবৎ কাল বেশ একটা বল-পরীক্ষা চলিয়াছে। সমাজবন্ধন অপরিহার্য্য, অন্যথা পাশব শক্তির বিরুদ্ধে জীবনসংগ্রামে নিধন অনিবার্য্য। আবার এই সমাজের আভ্যন্তরীণ বিসংবাদও অবশ্যম্ভাবী; কারণ ভোগ্য পদার্থ পরিমিত, ভোগ্যাভাবে জীবনযাত্রা অসম্ভব।

(৫) প্রাচীনকালের জীব—এখন নির্ব্বংশ।

এই প্রতিকূল শক্তিদ্বয়ের উভয়ই কার্য্যকরী। কেমন করিয়া কে জানি ইহাদের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য করিয়া দিয়াছিল; তাই মানবকুল নির্ব্বংশ না হইয়া বরং রক্তবীজের গোষ্ঠীর মত বৃদ্ধি পাইয়া-পাইয়া আজ বিশ্ব ব্যাপিয়া বাসা বাঁধিয়াছে।

এই ক্রমিক বৃদ্ধির অনুসরণ করিতে-করিতে দেখিতে পাই, সমাজ কেমন করিয়া বন্ধনটাকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্ব্বাসী মনুষ্যসমূহের উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিয়া স্বাতন্ত্র্যকে সমাহিত করিতে চাহিয়াছে। সমাজের এই প্রয়াসই মানুষের অধীনতার নিদান—ধর্ম্মশাসন, নৈতিক-শাসন, রাজশাসন ইত্যাদি সর্ব্বশাসনের ইহাই মূলমন্ত্র। ইহাই মনুষ্যত্বের মহিমা, জীবনের স্থিতি।

আবার ভোগ্য পদার্থের জন্য সমাজের মধ্যে জনে জনে যুদ্ধ—দুইয়ে দুইয়ে দ্বন্দ্ব। আপনাকে শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিবার চেষ্টাতেই, মানুষের শক্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করে—অবস্থা উন্নত হয়। এমনি শত ব্যক্তিগত শ্রী লইয়াই সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়। ব্যক্তিগত অসংযম পশু সমাজের যোগ্য, স্বীকার করি। কিন্তু হে সমাজতন্ত্রী, তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, এতদ্ব্যতীত সমাজের শ্রীর, কল্যাণের, উন্নতির আর গত্যন্তর নাই।

শুধু সমাজবন্ধনে সমাজে স্থিতিশীলতা বাড়িতে পারে; কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভাবে সে স্থিতি উত্থানশক্তিহীন স্থবির হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে জন-স্বাতন্ত্র্যের সম্প্রসারণে সমাজের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি, সত্য; কিন্তু তাহার জীবনীশক্তিও যে সঙ্গে-সঙ্গে হ্রস্ব হইতে থাকে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

অনুশাসনের ও স্বাতন্ত্র্যের সীমা লইয়া তাই মহা বিতর্ক বাধিয়াছে। দুইদিকই যাহাতে বজায় থাকে, এমন একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে। সে ব্যবস্থাটা কি—প্রতি সভ্যদেশ, প্রতি সভ্যসমাজ, তাহাই নির্দ্দেশ করিতে আজ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। ফলে, একদিকে যেমন ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে—পক্ষান্তরে সমাজবন্ধনরূপ অনুশাসনগুলিও তেমনিই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ফ্রান্স ও আমেরিকায় পরিপূর্ণ প্রজাতন্ত্র চলিতেছে; সার্ভিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস এমন কি এসিয়ার জাপানেও প্রজার প্রতিনিধিগণই প্রকৃত-পক্ষে রাজ্যশাসন করিতেছে। চীনে দুই তিন বৎসর ধরিয়া এই হাঙ্গামা চলিয়াছে। রাজশক্তির লীলানিকেতন রুশিয়াতেও আজ ইহারই উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। Wilberforceএর ভয়ে দাসব্যবসায় ইতিহাসের নিথর পত্র-স্তূপের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। ইহুদী আজ অকুতোভয়ে রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্টের সমধর্ম্মী, সমকর্ম্মী। মুদ্রাকরের মুখ খুলিয়াছে, পোপের অপ্রতিহত প্রভুত্ব গিয়াছে। এত স্বাধীনতা শতাব্দীপূর্ব্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। Rosebury ইহাকেই বলিয়াছেন universal emancipation। কিন্তু তাই বলিয়া conscription কিম্বা compulsory education জনস্বাতন্ত্র্য নয়। এত যে আইন-কানুন হইতেছে, এগুলি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য নয়। সমাজ-জীবনের প্রতি পদক্ষেপে দশদিক হইতে বিধিবিধানের বিরাট মুখব্যাদান দেখিতে পাই। আহার বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ পর্য্যন্ত সমস্তই Corporation বা Municipalityর ব্যবস্থাতেই সম্পন্ন করিতে হইবে। সন্তানোৎপাদনে যে স্বাধীনতাটুকু আছে, উৎপাদিত সন্তানের উপর তাহার শতাংশের একাংশও নাই। নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যেই—তাহা সে অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বেই হউক কি পরেই হউক—নবজাতকের নাম-ধাম গোত্র-বৃত্তান্ত হুজুরের খাতায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; আর তাহার সুকুমার দেহ ছিন্ন করিয়া বসন্তের বিষাক্ত বীজাণু বপন করিতে করিতেই হইবে। মরিলেও অব্যাহতি নাই, মিউনিসিপালিটীর চিত্রগুপ্তের খাতায় কুলজীসহ আধিব্যাধি সমস্তই বিবৃত করিতে হইবে, আর অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হন আর নাই হন সৎকারের ন্যায্য দক্ষিণাটা তাঁহাকে দিতেই হইবে।

জন্মের ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই সমাজশক্তি অধীনতার যে নাগপাশ বাঁধিয়া দেয়, শ্মশান পার হইয়া না গেলে সে বন্ধনের আর মুক্তি নাই। Herbert Spencerএর মতে "mankind has been drifting since the middle of the 19th century towards slavery either in the form of regimentation of militarism or the regimentation of Socialism." ("Lest we forget" p. 38, top para)।

এখন তবে বুঝিলাম, এই প্রতিকূল শক্তিদ্বয় সম্বন্ধে মনীষার মধ্যেও মতভেদ আছে। উভয় শক্তিরই খেলা

চলিতেছে, কিন্তু কোন্‌টী ছাড়িয়া কোন্‌টীকে বাড়াইয়া তুলিতে হইবে, কি উভয়কেই ন্যূনাধিক পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করিতে হইবে, সমস্ত সুসভ্য জগৎ মূঢ়ের মত পরস্পরের মুখ চাহিয়া নীরবে তাহাই আজ জিজ্ঞাসা করিতেছে। বিংশ-শতাব্দীতে ইহাই সর্ব্বপ্রকার শাসনের প্রধান সমস্যা। সমাজের ক্রমিক অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া এ সমস্যার মীমাংসা কবে হইবে—কেমন করিয়া হইবে—আর কিই বা হইবে-- কে জানে!

আমরা শুধু এই জানি—দেশে-দেশে যুগে-যুগে, দলে-দলে বিভক্ত হইয়া মানুষ অনেক সমাজই সৃজন করিয়াছে। নৈসর্গিক কারণে, স্বভাবের দোষে মানুষে মানুষে যেমন হয়, এই সমাজে সমাজেও তেমনি জীবন-সংগ্রাম বাধিয়াছে। অতীত যুগের এই সমস্ত সামাজিক বিগ্রহ ইতিহাসে দেখিতে পাই ; বর্ত্তমানেও সে সংগ্রামের অবসান হয় নাই ; —আজও প্রত্যহ প্রভাতে প্রাভাতিক সংবাদপত্রে এই অনির্ব্বাণ সমরানলের নির্ম্মম কাহিনীই পাঠ করিয়া থাকি।

সমাজে-সমাজে এ সংগ্রাম কেন, কে বলিবে? মানুষের লোভে,--সুখস্বাচ্ছন্দের লালসায়? সংগ্রামে যদি নিহত হই, তবে বিজয়লাভ করিয়াই বা আমার লাভ কি, আমার লালসার চরিতার্থতা কোথায়? যুদ্ধমান সমাজ এ কথা কি একবারও চিন্তা করে না? সমাজ কি এতই অদূর-দর্শী? লোভে—লালসায় মানুষ অন্ধ হয় শুনিতে পাই ; এ হঠকারিতা কি সেই অন্ধত্বের ফল? অনেকে গম্ভীর ভাবে বলেন, হাঁ তাই। মানুষের প্রকৃতিই এই। কিন্তু প্রকৃতি এমন কেন, জানি না। আর কেহ বা আর একটু অগ্রসর হইয়া দার্শনিকের সুরে বলেন - ভগবানের এই বিধান। যখন কোন সমাজের জনসংখ্যা এতই বৃদ্ধি পায় যে, আপন শক্তি প্রয়োগে ভোগ্য পদার্থ পর্য্যাপ্ত রূপে সমুৎপাদিত করিয়া লইবার সময় সহে না, প্রবৃত্তি আসে না ; তখনই সেই সমাজ অন্যের মুখের গ্রাস আত্মসাৎ করিতে সমুদ্যত হয়। এমনি করিয়া সমাজে-সমাজে সংগ্রামের সূচনা হয়, আর সেই সংগ্রামের ফলেই সমাজের লোকক্ষয় হইয়া ভোগ্য ও ভোক্তার মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্যের সূচনা করে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমে যে বহু সমৃদ্ধ জনপদ অগণিত অধিবাসী সমভিব্যাহারে ভূগর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস নীরবে নত চক্ষে অদ্যাপি তাহাদের উদ্দেশে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। আর বিজ্ঞান এই বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে যে, নৈসর্গিক নিয়মে এই অগ্ন্যুৎপাতেই জগতের মহত্তর হিতরাজি সংসাধিত হইতেছে (?)। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে লণ্ডনের ধনজনসম্পন্ন অংশবিশেষই ভস্মীভূত হইয়া যায়, Sanitary Society বলেন, তাহাতেই নগরী-ব্যাপী প্লেগ প্রশমিত হইয়াছিল। এ কথা সত্য হইতে পারে ; কিন্তু দুঃখ এই যে পথাশ্রিত, গৃহহারা, পতিপুত্র-বণিতা-দুহিতা-হীন সহস্র-সহস্র পরিবারের অবাধ অশ্রুধার সে কথায় নিরুদ্ধ হয় নাই।

বৃহত্তর বলিদানেই মহত্তর মাঙ্গল্যের উদ্বোধন হয়। দুঃখের বিষয়, কিন্তু সত্য কথা। বিশালতর সমাজের সুখ-স্বার্থের জন্য জনক্ষয়কর মহাসংগ্রামের প্রয়োজন, দার্শনিকের এ কথা না হয় স্বীকারই করিলাম। কিন্তু স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে স্বল্পায়াসে বহু সংখ্যক মানুষ নিহত করিবার জন্য আসুরিক যন্ত্রগুলি আবিষ্কার ও নির্ম্মাণ করিতে সুসভ্য প্রদেশে আজ অসীম উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিতে পাই,—এ দুঃখের সান্ত্বনা সমগ্র দর্শনশাস্ত্র তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও পাই না ত। হা রে মহাকাল! কি তোর প্রভাব! রণক্ষেত্র হইতে বহুদূরে শান্ত জনপদে স্তব্ধ নিশীথে নিশ্চিন্তচিত্তে অধিবাসীবর্গ যখন সুপ্ত থাকে, তখন তাহাদের উপর অতর্কিত গুপ্ত-ঘাতকের মত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিতে সুসভ্য স্বাধীন জাতি তুমি, তোমার কি এতটুকু লজ্জাও করে না! তোমাদের ভাষায় (?) সভ্যতা কাহাকে বলে বুঝি না। যেখানে নির্ব্বিচারে পাশব প্রবৃত্তির হাতে পুত্তলিকার মত পরিচালিত হইতে সঙ্কোচও হয় না, সেখানে মনুষ্যত্ব আবার কি? আর যে মনুষ্যত্ব লাভ করাই সর্ব্বপ্রচেষ্টার লক্ষীভূত, তাহাকে উপেক্ষা করিলে, জিজ্ঞাসা করি এ ছার জীবনভার যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারবাহী গর্দ্দভের মত বহন করিয়া মরিবারই বা প্রয়োজনটা কি? শিথিলগ্রন্থী সমাজের জীর্ণ প্রান্ত হইতে শ্বাপদের গ্রাসে খসিয়া পড়িয়া ধরার এ মহাগুরুভার লঘু করিলেই হয় ভাল।

এই সমস্ত বীভৎস সংঘাতের মধ্যে জনসম্পদ হারাইয়া শান্তির দিনে বিরলে বসিয়া সমাজ কত অশ্রু বিসর্জ্জন করে, ইতিহাসই তাহা জানে ; তাই অতি বড় দুঃখে যক্ষের

মত সকলকে আগুলিয়া থাকে, আর পশুপ্রকৃতি দমন করিয়া সেই সকলকে সংহত ও একত্র করিবার জন্য নীতির স্বস্তিবচন শুনাইতে থাকে।

এই নীতিই বগলামূর্ত্তিতে জনস্বার্থের লেলিহান রসনা আকর্ষণ করিয়া, কর্ত্তন করিয়া মানুষের মধ্যে শান্তি বিধান করে। অপর-সাধারণের সুখ, সুবিধা ও হিতের জন্য তোমার একজনের সকল অসুবিধা সকল দৈন্য শিরোধার্য্য করিতে—এক কথায় পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিতেই নীতি শিক্ষা দেয়। সমাজ বন্ধনের অপর অনেক প্রকারের মধ্যে এ ও একটি। সমাজের স্থিতিপক্ষে ইহার সাহায্য নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়।

নীতির সাদা কথা, পশুধর্ম্মা মানুষ সহজে শুনিতে চায় না; অথচ না শুনিলেও নয়, শুনাইতেই হইবে। এ জন্যই রাজশক্তির প্রয়োজন। পশুকুলের ভয়ে একা না পারিয়া যাহারা একশ জনে মিলিয়াছিল, দৈহিক ভয়ে তাহারাই যে আপন ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরূপাচরণ করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

দিনের পর দিন, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হিতোপদেশ দিয়া কোন ফলই হয় না। সুখান্বেষী মানুষ সম্মুখে ঘন ঘোর দুঃখের আঁধার দেখিতে না পাইলে আপন পথ কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। সে দুঃখ প্রথম ও প্রধানতঃই শারীরিক। রাজশক্তি তাই দণ্ড হস্তে লইয়া রোষরক্তিম নেত্রে তোমার উচ্ছৃঙ্খলতা নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছে—সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষা হইয়া নীতিপথ হইতে একচুল তোমাকে ভ্রষ্ট হইতে দিবে না। বিরাট মাঙ্গল্যের পুরোহিত রূপে এই রাজশক্তি যেখানে বজ্রমুষ্টিতে দণ্ডধারণ করে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মুণ্ডভক্ষণে সমাজ সেখানেই বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। সেখানে সে সমাজ একাই অপর দশ সমাজের বিরুদ্ধে অটল দৃঢ়ভাবে সুদীর্ঘ কাল দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু সেই দণ্ডধারী রাজহস্ত যেখানে শিথিল, জন-স্বাতন্ত্র্যের স্বপ্রাধান্যের মধ্যে নীতিবাদ রক্ষিত হইলেও সেখানে সমাজের শক্তি আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় না। ব্যক্তিগত শ্রীসঞ্চয়ের সঙ্গে সমাজ যে প্রভূত উন্নতি অর্জ্জন করে, তাহাতেও তাহার বাহুবল বৃদ্ধি করিয়া জীবনযুদ্ধে তাহাকে অটল অথর্ব্ব রাখিতে সমর্থ হয় না।

এই কারণেই জনতন্ত্রে দেশের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়; রাজতন্ত্রে, প্রজা সাধারণের অনুন্নত অধীনতার মধ্যেও, দেশের দৈহিক বল বাড়িয়াই যায়। Aristotle প্রভৃতি অনেক মহাজ্ঞানী মহাত্মাদিগের এইরূপই বিশ্বাস। Benevolent monarchy বা প্রজানুরক্ত রাজশক্তি অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে জনস্থানের যে মহতী উন্নতি সাধন করিতে পারে, Democracy বা প্রজাতন্ত্রের শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়া যায়, তবু তাহা আর অর্জ্জিত হয় না। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, রাজা অর্থগৃধ্নু, অত্যাচারী হইলে, সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই এত অবনতি সাধন করিতে পারেন যে, তাহা প্রজাপুঞ্জের প্রতিনিধিবর্গের বহু-বর্ষব্যাপী অত্যাচারও সংসাধন করিতে সমর্থ হয় না। অথচ রাজবংশের পারম্পর্য্যের মধ্যে রাম অপেক্ষা রাবণের সংখ্যাই সমধিক। বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পাইলে মানুষের সদ্গুণরাজি পরাভূত করিয়া পশু প্রকৃতিই প্রতাপশালী হইয়া উঠে;—সাক্ষী সীতারাম। সুখের চেয়ে সোয়াস্তিই ভাল। তাই আশু উন্নতির লোভে, বিষম দুর্দ্দশার সবিশেষ সম্ভাবনার মধ্যে, কি আপনার, কি সমাজের—কাহার জীবনই বিপন্ন করিতে মনস্বীবৃন্দ ইচ্ছুক নহেন। জার্ম্মেন রাজ-শক্তির দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে ফরাসী দেশ আজ মরণের উপকণ্ঠে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে দারুণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহাই বুকে লইয়া শত Sedanএ পরাভব স্বীকার করিবে—বারে বারে লিলীবার্দ্দুন ছাড়িয়া পলায়ন করিবে—রাজধানী পারী ও বর্দোর মধ্যে দোদুল্যমান করিবে, তথাপি কস্মিনকালে রাজ তন্ত্রের নামোল্লেখও করিবে না; এই বুঝি তার প্রাণান্ত প্রতিজ্ঞা।

রাজতন্ত্রই হউক, কি প্রজাতন্ত্রই হউক, সকল তন্ত্রেরই সার কথা—obedience to external authority বা পরবশ্যতা! এই external authority'ই বিধি-বিধান বা 'আইন কানুন' রূপে সর্ব্বসমক্ষে দাঁড়াইয়া আপন প্রভুত্ব প্রচার করে। এই সমস্ত বিধি-বিধান জন-প্রবচনেই থাকুক, কি পুস্তকনিবদ্ধ থাকুক,—সমানই কথা। ইহার অমর্য্যাদা সকলের পক্ষেই অমার্জ্জনীয়—যিনি বিধি-প্রণেতা, তাঁর পক্ষেও। কারণ, বিধি প্রণয়ন যিনিই করিয়া থাকুন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমাজের এবং তদ্ধেতু গৌণভাবে তাঁহার নিজের অসুবিধা বা একটা কিছু অভাব বুঝিয়াই তিনি

এ কার্য্য করিয়াছিলেন; তিনিই law-giver,—সার্ব্বজনীন সুখ-সুবিধার নিয়ন্তা। কিন্তু তিনিও ত মানুষ, তাঁহারও ত নিকৃষ্টতর প্রবৃত্তির তাড়না থাকা সম্ভব। তাই সর্ব্বহিতের পুরোহিতরূপে যিনি law-giver, স্বার্থের প্ররোচনায়, মানুষী দৌর্ব্বল্যে তিনিই সময়ে আবার law-breaker হইতে পারেন। বিধি-ব্যবস্থা তাই তার নিরপেক্ষ শাসনের দায় হইতে কাহাকেও—এমন কি স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা কি রক্ষাকর্ত্তাকেও, অব্যাহতি দেয় না; রাজাই হউন, কি প্রজাই হউন—কাহারও নিষ্কৃতি নাই। তাই মনে হয় the king can do no wrong একটা বিরাট মিথ্যা কথা। তবে ব্যবস্থারও বিবর্ত্তন হয়। স্থান, কাল ও পাত্রের পক্ষে যে ব্যবস্থা উপযোগী বিবেচনায় সংস্থাপিত হইয়াছিল, কালবশে—নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনে, কিম্বা জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাহারও পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এমনি ভাবে যুগে-যুগে রাজ-বিধানের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, লৌকিক আচারের আবর্ত্তন হইয়াছে—ধর্ম্ম-শাসনের বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—অবতারের পর অবতার, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের পর ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক আসিয়াছেন। কিন্তু অনেকে বলেন, নীতি সনাতন—সর্ব্ব-শাসনের মধ্যে কেবল এই শাসনেরই কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে পারি না। প্রাচীন স্পার্টায় চৌর্য্যও বিহিত ছিল; কার্থেজে রুগ্ন শিশু-সন্ততি পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপ করিয়া নৃশংস ভাবে হত্যা করা হইত। ভারতে সে দিনও শিশু-হত্যা দণ্ডনীয় ছিল না। ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া যে ভীষণ ব্যভিচার ভারতের গুহক ও তান্ত্রিক সাধকদিগের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, নেড়ানেড়ী ও কালাচান্দী সম্প্রদায় তাহাতেই আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়া সুমহান বৈষ্ণবধর্ম্মের একাংশ আজও নির্দ্দেশ করিতেছে। পূর্ব্বাপর দেশ-প্রচলিত নীতিগুলি যেমন সংশোধিত হইয়াছে, অদ্যাপি যে-গুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেগুলিও যদি বাস্তবিকই দুর্নীতি হয়, তবে একদিন সেগুলিও সংশোধিত ও রূপান্তরিত হইবে সন্দেহ নাই। কারণ এই সকল বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই মানবের উন্নতির পথ বহিয়া গিয়াছে। সমাজের উত্থানের সঙ্গে-সঙ্গে বিধানেরও সম্প্রসারণ না হইলে, জীবন-স্রোত রুদ্ধধার হইয়া কেবল পঙ্কপুঞ্জই সঞ্চয় করিতে থাকে। কিন্তু ইতিহাসে দেখিতে পাই, প্রতি পরিবর্ত্তন ও প্রবর্ত্তনেই ন্যূনাধিক বিপ্লব বাধিয়াছে; এই সমস্ত বিপ্লবেই সমাজের জীবনী শক্তির ও সামাজিকগণের নিষ্ঠার পরিচয় পাই। সমাজের স্থিতিশীলতার ইহাই পরিমাণ-দণ্ড।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এ বিরুদ্ধাচরণ সমাজের হিতার্থে স্বার্থের প্ররোচনায় নয়। বশ্যতা-স্বীকার করিতেই হইবে, আর সেই বশ্যতা-স্বীকৃতির যদি কোন অন্তরায় উপস্থিত হয়, তবে তার বিপক্ষে অসি উত্তোলন অবশ্য কর্ত্তব্য। লৌকিক কিম্বা ঐহিক ব্যাপারে আমার ইহ-সর্ব্বস্ব, সমাজেরই সম্পত্তি, এ কথা প্রতি পদে—প্রতি মুহূর্ত্তে মনে রাখিতে হইবে। তাই প্রয়োজনের সময় সমাজের পায়ে আপনাকে বলি দিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। পূজনীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের ভাষায়, কারণ, "প্রথমে তোমার সামাজিকত্ব, পরে তোমার ব্যক্তিত্ব। সমাজ-ধর্ম্মের সমীপে ব্যক্তি ধর্ম্মের আসন নাই। সিটিজেন বা সামাজিক জীব, সমাজের বেতনভুক্ সৈনিক মাত্র; বশ্যতা ব্যতীত সৈনিকের অন্য ধর্ম্ম নাই।"

শ্রীকৃষ্ণের মত এই বশ্যতারও বুঝি শত নাম বিদ্যমান। গুরুভক্তি, রাজভক্তি, দেবভক্তি, দ্বিজভক্তি ইত্যাদি যত ভক্তি-গোষ্ঠি, সন্তান বাৎসল্য ইত্যাদি বাৎসল্যকুল, আর দাম্পত্য-প্রীতি, স্বজাতি-প্রীতি, বন্ধু-প্রীতি প্রভৃতি প্রীতি-পর্য্যায় সমস্তই এই বশ্যতা-সম্ভূত। এই ভক্তি, প্রীতি বা বাৎসল্য যখন যেখানে স্বতঃই উৎসারিত হয় না, সমাজ তখনই সেখানে মূর্খস্য লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই দৈহিক বল প্রয়োগেও মানুষের উদ্দাম প্রবৃত্তি যখন পরাভূত হয় না, রিলিজিয়ন তখন নিকটে আসিয়া ভয়-বিস্ফারিত চকিত-নেত্রে, বিশীর্ণ কম্পিত তর্জ্জনী তুলিয়া কাল্পনিক অজ্ঞাত লোকের এক অলৌকিক পৈশাচিক বিভীষিকা দেখাইতে থাকে। অসুরের ভয়ার্ত্ত চিত্ত সে বিভীষিকার ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এইরূপে সমাজ স্বীয় মনস্কামনা পূর্ণ করে। ভগবান একদিকে মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি যেমন উচ্ছৃঙ্খল করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি তার দেহখানি ভঙ্গুর করিয়াছেন—আর চিত্তভরা ভয়-ভাবনা দিয়াছেন। মানুষ বাঁচিয়া গিয়াছে। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি শক্তির পদে মাথা নোয়াইয়াছে। রাজ-শাসন ও ধর্ম্ম-শাসন, উভয়ই, এই শক্তিরই অবতার।

নীতি যাহাকে দমন করিতে পারে না, এই শক্তিই তাহাকে বশীভূত রাখে। ইহাতে তাহার কোন ব্যক্তিগত বাস্তব কল্যাণ সংসাধিত হয় কি না, তাহা বিষম সংশয়ের বিষয়। তবে এ কথা সত্য যে, এমন শাসনে, 'তাহার স্বভাবের হয়ত কোন উৎকর্ষ্য হয় না, তথাপি অনিষ্টকারী উদ্ধত মানুষগুলি দমিত থাকে বলিয়া, সমাজের ক্ষতির ভীতি ইহাতে তেমন আর থাকিতে পারে না!

সমাজের জন্য স্বতঃ প্রেরণায় সামাজিক মানুষমাত্রেই যতদিন পর্য্যন্ত স্বার্থে বলি দিতে প্রস্তুত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্তই,—রামেন্দ্রসুন্দরের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি—কারাগার ও গির্জ্জাঘরের উভয়েরই সমান প্রয়োজন। রুশো ইহাকেই usurpation বলিয়াছেন;—সমাজ তাহাতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত নহে। সব মানুষই সমান ও সমমাত্রায় স্বাধীন—ফরাসী দার্শনিকের এই মৌলিক তথ্য, সমাজের এই usurpation এর অমর্য্যাদা করে না। সাম্য ও স্বাধীনতায় সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইলে বিশ্বমানবের যে মহামৈত্রীর প্রয়োজন, যতদিন তাহার অভাব থাকিবে, সমাজ ততদিনই আপন authority বা প্রভুত্ব পরিচালন করিবে। প্রভুত্ব রাজশাসনও বটে, religionও বটে। সকল মানুষেই শুদ্ধসত্ব নীতির চরমোৎকর্ষ, কোনও কালে, কোনও সুদূর ভবিষ্যতেও বিকশিত হইবে কি না, utopiaতেও বোধ হয় তাহা লেখে না। তাই মনে হয়, এই প্রভুত্ব স্বাকার ব্যতীত কল্যাণকামী মানুষের বুঝি আর উপায়ান্তর নাই—এই বুঝি তার নিয়তি! একদিকে রাজপ্রযুক্ত শুভঙ্করী পাশবশক্তি, অন্যদিকে বিশ্রব্ধ কল্পনাপ্রসূত ধর্ম্মানুগত অনুশাসনগুলি between Silla and Cheribdisএর মত এই দ্বিবিধ সঙ্কটের মধ্য দিয়াই সমাজের স্থিতি ও উন্নতির পথ বহিয়া গিয়াছে। এ কথায় নীতি যদি ক্ষুব্ধ হয়, ইতিহাস তাহাতে নাচার! আসিরিয়া-বেবিলোনিয়া হইতে বিস্মার্কের জার্ম্মেনী পর্য্যন্ত প্রথম পক্ষে, আর ইহুদি ও হিন্দু দ্বিতীয় পক্ষে সাক্ষ্য দিবে!

প্রাচীন মিশরে নৈতিক দৌর্ব্বল্যের অবসরে ভীমবল অধিবাসিবর্গ যে কদাচারে নিমগ্ন ছিল, দুর্দান্ত রাজশক্তি হার্কিউলিসের মত অমানুষী শক্তি প্রয়োগে মন্দুরার আবর্জ্জনা-স্তূপেরই মত সে পঙ্ক উদ্ধার করিয়াছিলেন। পিরামিডের স্তরে-স্তরে এই রাজপ্রতাপ বিলীন ভাবে অদ্যাপি বর্ত্তমান। বেবিলোনের জগদ্বিখ্যাত শূন্যোদ্যান নেবুকজেনেদারের শক্তি-সংহত বিপুল জনবাহিনীর পুঞ্জীভূত-শক্তির উপর সংস্থিত ছিল, আর সেই যৌথশক্তি দ্বারাই আসিরিয়ার আক্রমণ বারে-বারে ব্যর্থ করিয়া বিশ্বের সেই মহৈশ্বর্য্য সুদীর্ঘকাল সংরক্ষিত হইয়াছিল।

প্রাচীন গ্রীসে যে বহু বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র নগরী ও জনপদ বিদ্যমান ছিল, তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক কোন বন্ধন না থাকিলেও একটা মহা সাম্য সমুদয় হেলেনিকগণকে একটা মহাজাতি করিয়া তুলিয়াছিল; সে সাম্য-বন্ধনের ভিত্তি ছিল জিউস্ ও এপলো, সিরিস্ ও ভিনাস্, হোমার ও হিসীয়ড্, বেকাসের পূজা ও ইলিউসের উৎসব, ডেল্ফীর অরাকল ও আলম্পীয় এম্ফিথিয়েটার। "দেবদেবী নিন্দা করিয়া কীর্ত্তি লাভের পর প্রভাতেই Aristophenes পারস্যের বিচারালয়ে স্বদেশদ্রোহী ও উৎকোচগ্রাহী বলিয়া অভিযুক্ত হন।" (ত্রিবেদী) তৎকাল-প্রচলিত ধর্ম্মমত অস্বীকার করিয়া Socrates যে মহা অন্তর্ব্বাণীর কথা জগজ্জনে শুনাইয়া গিয়াছেন, তাহাই কীর্ত্তন করিয়া Plato ও Xenophone অমর হইয়াছেন; কিন্তু কই Tyrantএরা যখন 'হেম্‌লক্' পান করিতে আদেশ দিলেন, তখন কেহই Socratesকে রক্ষা করিতে পারেন নাই ত।

প্রাচীন রোমে এরূপ কোন বন্ধন ছিল না বটে; কিন্তু যে অত্যুগ্র রাজশক্তি দানব-বলে শাসনদণ্ড পরিচালন করিত, তাহারি তলে, পশ্চিমে গল ও বৃটন এবং পূর্ব্বে গ্রীস্, ফিনিস, মিশর ও পারস্য সকলেই মাথা নত করিয়াছিল। কিন্তু রাজশক্তি যেই একটু দুর্ব্বল হইল, অপর কোন বন্ধনের অভাবে বিপুল রোমক সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু সৌভাগ্য এই যে, তখনই আবার খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের নিবিড় বন্ধনে পড়িয়া শিথিলাঙ্গ মহা-সাম্রাজ্যের আবার একটা অভ্যুত্থান হইয়াছিল। রোম-সম্রাটের একক আসুরিক বল যাহা সাধন করিতে পারে নাই, পোপের সহায়তায় তাহাই বেশ সুসাধ্য হইয়াছিল।

কিন্তু কালক্রমে প্রাচ্য খৃষ্টানেরা আপনাদের মধ্যে নব-নব সম্প্রদায় সৃজন করিয়া পোপের এবং তৎসঙ্গে রোম-সম্রাটের নিবিড় বন্ধন শিথিল করিতে লাগিল। এই বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলিতে গ্রীসের মত কিন্তু কোনরূপ সাম্প্রদায়িক একতা ছিল না। তাই সুযোগ বুঝিয়া ইস্‌লাম

শাসন এগুলিকে যখন নীরবে গ্রাস করিতে লাগিল, রাজ্যের স্বপ্রধান প্রতিভূবর্গের উচ্চ কোলাহলের ভিতর ব্যতিব্যস্ত সম্রাট কিম্বা সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের তর্কাবতারণার মধ্যে বধির পোপ বুঝি তাহা জানিতেও পারেন নাই। তবুও এই পোপের অধিনায়কতাতেই একীভূত খৃষ্টান বিপুল বিক্রমে ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত বিজয় বৈজয়ন্তী জিব্রাটর পারে সিন্ধু-সলিলে বিসর্জ্জন দিয়াছিল। রোম-সম্রাট স্তাম্বুলের রাজ-আসনে বসিয়া যতদিন বজ্রমুষ্টিতে শাসন-দণ্ড ধারণ করিতেন, দামস্কস্ কি বাগ্‌দাদের খলিফারা ততদিন পর্য্যন্ত বস্‌পোরাস্ পার হইতে সাহসী বা সমর্থ হন নাই। আর যে দিন রোমে ভেটিকেন (Vatican) প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইদিনই বুঝি কার্ডোভার খলিফার, মেরোবিঞ্জীয় রাজ্যের উচ্ছেদ করিয়া কৈসারের রত্ন-বিতানমণ্ডিত সিংহাসনে আরোহণের সুখ-স্বপ্ন আকাশে মিশিয়া গিয়াছিল। (ত্রিবেদী)।

তার পরেই মুসলমান, মহম্মদের মৃত্যুর পর সার্দ্ধেক শতাব্দী মধ্যে এসিয়ার সম্পূর্ণ পশ্চিমাংশ এবং ভূমধ্যসাগর-তীরবর্ত্তী আফ্রিকায় উত্তর উপকূল ভাগ পদানত করেন, পরে ক্রীট ও সিসিলি বিধ্বস্ত করিয়াই একেবারে ভুবনধন্য রোমে পুরপ্রবেশ করেন! অষ্টম শতাব্দীতে রোমে যেমন পল ও পিটারের সমাধি-মন্দির লুণ্ঠন করেন, একাদশ শতাব্দীতেও তেমনই জেরুসালেমে খৃষ্টিয় পীঠমন্দির ভূমিসাৎ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টানেরা ইস্‌লামের কবল হইতে স্পেনের পুনরুদ্ধারের জন্য যখন উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, অটোমনে তুর্ক তখনই প্রাচ্য রোমক-সাম্রাজ্য গো-গ্রাসে কুক্ষিগত করিতেছিলেন। খ্রীষ্টীয় ইউরোপের বিভিন্ন রাজশক্তি একই ধর্ম্মপ্রেরণায় মিলিত হইয়া ক্রুসেডার্স্ নামক যে পুণ্য-কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, মুসলমান-শক্তি পরাভূত করিয়া জেরুসালম উদ্ধার করিতে ২০০ বৎসর পূর্ব্বে তাহারাও সমর্থ হন নাই। মুসলমান অধীনতা হইতে খ্রীষ্টান প্রদেশগুলি মুক্ত করিবার জন্য ১৮২৯ খৃঃ অব্দে এড্রিয়ানোপলে, ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে স্কেলেনীতে, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে সেন-ষ্টিফেনোতে এবং বার্লিনে, এই চারিবার সন্ধিরূপে তুরস্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হইয়া গিয়াছে। এই গুপ্ত অভিসন্ধির প্ররোচনাতেই সেদিনও ট্রিপলিতে ও বল্‌কানে মহা যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই মহাজাতি, কালদীয়া ও বেবিলোনিয়ার শ্মশানে সাধনা করিয়া যে মহাশক্তি অর্জ্জন করিয়াছিল, সেই শক্তি লইয়াই পশ্চিম এসিয়া হইতে দেশের পর দেশ, জনপদের পর জনপদ পদানত করিয়া দ্বিশত-বর্ষ মধ্যে রোমের রাজ-তোরণে হুঙ্কার দিয়াছিল; কিন্তু একটী-একটী করিয়া ছয়টী শতাব্দী বহিয়া গিয়াছিল, তথাপি ইহারা নিকটতম প্রতিবেশী বহুজন-শাসিত এই হিন্দুস্থানে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হয় নাই। রাজনৈতিক ঐক্যহীনতায় ভারত মুসলমানের অধীন হইল বটে, তবুও তার সেই যুগান্তের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য সঙ্কুচিত হয় নাই। "নয়শত বর্ষ দিন ভারত যে পরাধীন, বাঁধা আছে দাসত্ব-শৃঙ্খলে,"—তাহাতেও তাহার বাস্তব জাতীয়তা বিনষ্ট হয় নাই। মুসলমান শুধু শরীর শক্তিতে শাসনদণ্ড দুদিনের জন্য কাড়িয়া লইয়াছিল মাত্র; সে দুদিন পরেই,—থাক্ সেই অতীত কাহিনী কহিয়া আজ আর কি হইবে?

হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ বিড়ম্বনায় সমদুঃখী এ বিশ্বে এক ইহুদি ছাড়া আর বুঝি কেহ নাই। বাস্তবিকই sufference is the badge of our tribe, একথা এক ইহুদিই বলিতে পারে। বেবিলোনীয়, পারসিক, গ্রীক, রোমান, ও মুসলমান, যখন যে জাতি পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, চির-নিগৃহীত অভাগারা তখনই তার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু জেহোবাকে কেন্দ্র স্থির করিয়া যে নিবিড় ধর্ম্ম-বন্ধনে ইহাদের সমাজকে গঠিত ও সামাজিকগণকে বিনিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহারই অক্ষয় কবচের অভয় আশ্রয়ে বারে-বারে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও অবশেষে গৃহ-বিতাড়িত হইয়াও আপনাদের জাতীয়তা অদ্যাপি অক্ষত ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দেশে-দেশে কত মহা অপরাধীর মত বেড়াইয়াছে; নিরাশ্রয় হইয়া বৈদেশিকের দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া ফিরিয়াছে; কিন্তু হায় রে সনাতন-পরিপন্থী জেহোবার গর্ব্বিত সন্তান, সেদিন—কা'ল পর্য্যন্ত কেউ বুঝি তোর দুঃখ বোঝে নাই—চক্ষু মোছে নাই।

ইতিহাস এমন শত সুখ-দুঃখের বার্ত্তার মধ্যে পরোক্ষে প্রচার করে যে, সমাজের জীবনরক্ষার্থ রাজ-শাসন ও ধর্ম্ম-শাসন এ দুয়েরই প্রয়োজন। আর এই উভয়বিধ শাসনই প্রজা বা সাধারণের স্বাধীনতা বিলোপনের জন্য প্রাণপণ

প্রয়াস পাইয়াছে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশে প্রায়ই দেখিতে পাই, এই উভয় শক্তিই রাজা একাধারে—আপনাতে একীভূত করিতে সদা সচেষ্ট। টিউডরের সময় ইংরেজ পোপের অধীনতা অস্বীকার করে। ফলে অষ্টম হেন্‌রী ও এলিজাবেথের রাজত্বে প্রজার, রাজনৈতিক কি ধর্ম্মগত সমস্ত স্বাতন্ত্র্যই বিলোপ পাইবার উপক্রম হয়; ষ্টুয়ার্টেরা বিলোপ করিয়াছিলেনও; কিন্তু প্রজারা বিদ্রোহ করিল, রাজার শিরশ্ছেদ হইল। তাতে লাভ বিশেষ কিছুই হয় নাই। ক্রমেওয়েল প্রজাকে স্বাধীনতা দিতে আসিয়া নিজেই কবলিত করিলেন। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে অধীন থাকিয়া স্বাধীনতার জন্য অজস্র শোণিতপাত করিয়া ইংলণ্ড সেদিন—বিগত শতাব্দীতে.যাহোক্ কিছু লাভ করিয়াছে! এইটুকুই আজ বুঝি তার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার বেশী হইলে সমাজ-বন্ধন একেবারে শিথিল হইয়া, জীবন-সংগ্রামে তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। কিন্তু কোথায় যে এই ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্যের ও সমষ্টি-বন্ধনের সীমারেখা বর্ত্তমান—কে বলিতে পারে? কিন্তু তাহা না পারিলেও এ নিঃসন্দেহ সত্য কথা যে, এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই সমাজ ও সামাজিককে উন্নতি লাভ করিতে হইবে।

জগৎ ধীরে-ধীরে যে এই উন্নতির দিকেই চলিয়াছে, ইতিহাসে তাহা আমরা বেশ দেখিতে পাই। প্রাচীন বর্ব্বরতার দিনে মানুষে-মানুষে রক্তারক্তি হইত; পারিবারিক বন্ধনে সে রক্তারক্তি থামিয়াছে। কিন্তু, তখনও পরিবারে-পরিবারে,—পল্লীতে-পল্লীতে যুদ্ধ হইত। সে যুদ্ধ যখন থামিল, সমাজে-সমাজে, Squareএ Squareএ তখন সংঘর্ষ হইত। তারপর রাজ-বিচারে তাহাদের কলহের মীমাংসা যখন বিহিত হইল, তখন এই দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে সংগ্রাম চলিয়াছে। দেশে-দেশে সমর এমন ভয়াবহ ভাবে জগতের জীবিত-কালে আর কখনও বুঝি হয় নাই। পূর্ব্বে দেশের শাসন শিথিল ছিল বলিয়া দেশ-শক্তির ঘনতা ছিল না। জাতীয় বন্ধন এখন এত আশানুরূপ নিবিড় হইয়াছে যে, একবাক্যে দেশ সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে। সংগ্রামে এত অপরিসীম রক্তপাত দেশের ঘনীভূত শক্তি-সংঘর্ষেরই দারুণ পরিণাম। সর্ব্বদেশের এই নিবিড় একতার পূর্ণ লক্ষণের দিনে স্বভাবতঃই ভরসা হয়, দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে একতা সংস্থাপিত হইয়া জগদ্ব্যাপী একটা বিশ্বমানব-সংঘ সংগঠিত হইবে; আর এই দেশ ও জাতিগত বিসংবাদ সেই সংঘই মীমাংসা করিবে। জগতের অভিব্যক্তি এ আশাকে বোধ হয় একেবারে আকাশকুসুম বলিবে না।

জীবন-সংগ্রামের নিত্য-নূতন সমস্যার মীমাংসা করিতে-করিতে সমাজ ও ব্যক্তির কেমন ক্রম-বিকাশ হইয়াছে, এখন তাহাই আমরা দেখিব। প্রথমেই সমাজ;—রাজা ও যাজক, ইহার প্রধান শরীররক্ষী। এই সামাজিক শাসন-দ্বয়ের অভিব্যক্তি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সংঘটিত হয় নাই। কোথাও রাজশক্তি হইতে ধর্ম্মশক্তির উত্থান হইয়াছে, আর কোথাও বা ধর্ম্মশক্তিই রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। সভ্যতার প্রথম প্রভাতে কোন দেশে এই দুই শক্তিই হয় ত অন্যোন্যসাপেক্ষ ছিল। সেই প্রাথমিক যুগে রাজপূজাই ছিল হয় ত একমাত্র বন্ধন। রাজা ছিলেন শক্তির অবতার। শক্তি অবিনশ্বর, সুতরাং রাজা মরিয়াও অমর; তাঁর পূজায় কখনও বিসর্জ্জন, নিরঞ্জন কি অবসান নাই। এই হইতেই প্রেতপূজার উদ্ভব। দেবতারা এই প্রেতেরই উচ্চ স্তর। অনেক ক্ষেত্রেই এই স্তর-নির্দ্দেশের বিশেষ গণ্ডীরেখা নাই।

Gods,
To quench, not hurl the thunder-bolt,
to stay
Not spread the plague, the famine;
Gods indeed,
To send the moon into the night,
and break
The sunless halls of Hades into Heaven!

এ কথায় বেশী কিছু বুঝিলাম না ত। ইন্দ্র, কৃতান্ত, জেহোবা, জোভ্, এঁরা তবে কি?—দেবতা, না অপদেবতা? Religionএর এ জটিলতা চিরদিনই আছে। আর মানুষ যতদিন Cosmic progressএর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, ততদিন সংশয়াতীত শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানময় মহদ্ধর্ম্মের তত্ত্বাবগত হইতে পারিবে না। কারণ Cosmic progressএর মূল কথা সুখ-দুঃখ। সুখবৃদ্ধি ও দুঃখ-নিবৃত্তিই ইহার মৌলিক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লইয়াই Physics ও Biology তত্ত্বকথা শুনাইতে আইসে, আর ব্যবহারিক ethics পথ-

নির্দ্দেশ করে। এই সিদ্ধান্তবাদীদিগের মতে সুখবৃদ্ধি ও দুঃখ-নিবৃত্তির চেষ্টাই মানুষের জীবন; আর সে চেষ্টার অবসানই মৃত্যু। ইহুদি, পারসিক, এমন কি খ্রীষ্টানও অনেকটাই এই মতাবলম্বী। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণই কেবল আর একটু অগ্রসর হইয়া এই Cosmic progressএরও একটা পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া বলেন,—একটা অনাদি কর্ম্ম-প্রবাহ আছে। এই জন্যই transmigration বা জন্মান্তর তাঁহারা স্বীকার করেন। কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগের এই পরম্পরাগত বিহারকেই তাঁহারা সংসার বা 'ইহ' বলেন। এই সমস্ত স্বীকৃতির উপর সমাজ বা সংঘের কোন হাত বা অধিকার নাই। এইখানেই মানুষের পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা। এই ব্যাপারে প্রচারকের কোন প্রতিপত্তি নাই, যাজকের কথাও অগ্রাহ্য করা চলে, রাজা তাহাতে এতটুকু কটাক্ষ করিতে পারেন না; কারণ Cosmic progress এতদূর আসিতে পারে না, বিজ্ঞান এইখানে কাজেকাজেই অজ্ঞান। বিজ্ঞান বা বিচারের যেখানে কথা ফুটে না, সমাজেরও সেখানেই হাত উঠে না।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের ঐক্য এই পর্য্যন্ত—এই extreme idealistic position পর্য্যন্ত। তারপরে হিন্দুর মুখ খোলে, নানা কথা শুনাইতে থাকেন, বৌদ্ধ তখন নীরব! 'বিচিত্র-প্রসঙ্গে' পূজ্যপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সর্ব্বদেশের religionএর মৌলিক ও ব্যবহারিক ঐক্য বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করিয়াছেন! Religionএর গতি যদি হিন্দুর পারমার্থিক ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, তবে, সর্ব্ব religionএর ঐক্যের মধ্য দিয়া যে একটা সত্য আভাসে প্রকাশ পায়, ধর্ম্মের পশ্চাতেও সেই ভূমানন্দময় ধ্রুব-সত্যের অস্তিত্ব স্বীকৃতি নিতান্তই আষাঢ়ে হয় ত নয়! কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দুর সেই সমস্ত মহোচ্চ Conception ও realisationগুলি আমি জানি না,—বুঝিতেও পারি নাই। সুতরাং এ-সম্বন্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।

ধর্ম্মশক্তি গেল; এবার রাজশক্তির অভিব্যক্তির কথা। মানব বংশের প্রাথমিক সময়ে পশ্বাদি ইতর প্রাণীর মত যৌন-নির্ব্বাচনই একমাত্র বন্ধন ছিল কি না, কেহই তাহা বলিতে পারেন না। তবে সম্ভব, এইটুকু বলা চলে। তাই matriarchy বা মাতৃ-প্রাধান্যকেই এ অভিব্যক্তির প্রথম স্তর বলিতে পারি। কিন্তু ইতর প্রাণীর ন্যায় মানবের সন্তান অত শীঘ্র আহার্য্য-আহরণ করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহাকে পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয়। এই জন্যই মানুষের সমাজে যৌন-বন্ধন দৃঢ় ও দীর্ঘকালস্থায়ী করা আবশ্যক হইয়াছিল। যে প্রাণীর যত দীর্ঘকাল সন্তান-পালন করিতে হয়, যৌন-বন্ধন সে প্রাণীর মধ্যেই তত দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী। এই বন্ধন-স্থায়িত্বে মানুষ অপর সমস্ত জীবকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বভাবতঃই নারী পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল, তাই সেই শারীরিক শক্তির প্রাধান্যের দিনে পুরুষেরাই প্রাধান্য পাইল, সমাজে patriarchy প্রতিষ্ঠা পাইল। কিন্তু সুখ সুবিধার আহ্বানে এই নারী, পুরুষ ও সন্তান সম্বলিত পরিবারগুলি একত্র গ্রথিত হইয়া পল্লী বা Clan সৃষ্ট হইল। ক্রমে-ক্রমে এই সমস্ত পল্লীতে-পল্লীতে মিলিয়া tribe, tribeএ tribeএ মিলিত হইয়া race বা community এবং কতকগুলি race বা community একত্র হইয়া nation গঠিত হইল। এই nationএর অধিষ্ঠানকে আমরা দেশ বা প্রদেশ বলি; আর শাসন-শক্তিকে Government বলি। এই Governmentএর ইতিহাস সম্বন্ধে নানা-জনে নানা কথা বলেন। নজির দেখাইয়া কেহ বলেন, tribe বা communityর সময় সমাজের নায়কেরা স্বতন্ত্র ভাবে বহু ভাগে দেশ শাসন করিতেন। তারপর সমাজের ক্রমোন্নতিতে tribe ও community যখন nationএ পর্য্যবসিত হইল, সমগ্র সংহত নেতৃবর্গের শীর্ষেও একজন তখন সংস্থাপিত বা অধিরূঢ় হইলেন; অথবা তাঁহারাই সকলে মিলিয়া যৌথভাবে দেশ-শাসন করিতে লাগিলেন। সুতরাং —তাঁহাদের মতে—প্রথমেই aristocracy তারপরে monarchy বা democracy। আবার অনেকে বলেন, সমগ্র দেশের বা nationএর অধিনায়ক ছিলেন রাজা; কিন্তু বংশপরম্পরায় রাজশক্তি যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, রাজ্য-মধ্যে কতিপয় ধনজনশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রধান হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে রাজ্যটাকে বিভাগ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু এই বিভাগের সময়, রাজ্যের অন্তর্বিদ্রোহের মধ্যে সমাজ সাধারণ-নির্ব্বাচিত প্রতিভূ বরণ করিয়া তাহারই পদে মাথা নত করিত। অনেক স্থলে এই সম্ভ্রান্ত নেতৃ-প্রাধান্য ও জন-নির্ব্বাচিত প্রতিভূ-প্রাধান্য এত স্বল্প সময় মধ্যে সংঘটিত

হইয়াছে যে, ইতিহাস তাহা লক্ষ্য করিবার অবসরও পায় নাই। ইঁহাদের মতে আগেই monarchy, তারপরে aristocracy ও democracy। কখনও এই aristocracy ও democracy একেবারে সমসাময়িক।

দেশশাসন যেমন প্রণালীতেই সমাধা হউক, এই যে nation এ nation এ, জাতিতে জাতিতে মিলন হইয়াছে,—এই মিলনের নামই Imperialism। এই জাতি বা nation গুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দিকে মিলিত শক্তির যখন প্রখর দৃষ্টি থাকে, তখন তাহাকেই বলে Imperial Federation.

কিন্তু এই Imperial Federation এর পরেও কি মানুষের কাম্য আর কিছু নাই? মানুষের উদারতা বিশ্ব ব্যাপিয়া আপন বিস্তার দিতে চায় না কি? ক্রমাভিব্যক্তি এই Imperial Federationকে Universal Federation (বা manhood) রূপেই দেখিতে চায়; আর একদিন দেখিবেও। মানুষের একদিনের সঙ্কীর্ণ সমাজ পুরাণের মৎস্য অবতারের মত বিস্তৃত হইয়া-হইয়া আজ এত বিস্তীর্ণ হইয়াছে যে, আর একটু প্রসার পাইলেই, সমুদয় বিশ্বকেই পরিব্যাপ্ত করিবে। সমগ্র চরাচর স্তম্ভিত হইয়া শুনিবে, মানুষ গম্ভীর নাদে বলিতেছে—I am a Cosmopolitan—a citizen of the World. সেদিনের আর কত দেরী, কে জানে?

সমাজের অভিব্যক্তির ধারা সর্ব্বত্র সমভাবে প্রবাহিত হয় নাই। জীবন-সংগ্রামের মত, পারিপার্শ্বিক ঘটনা-পরম্পরায় নানা ভাবে, অসমগতিতে কালে-কালে এ ধারা বহিয়া গিয়াছে। সংসর্গের মধ্যে, আদান-প্রদানের ফলে, অভিব্যক্তির গতি দ্রুত হয়। বায়ু যেমন অদৃশ্যভাবে পুষ্পের পরাগে-পরাগে মিলন ঘটায়, ব্যবসায় বাণিজ্যও তেমনি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে দেশে-দেশে মিলন-সাধন করে।

বাণিজ্যই লক্ষ্মী! ভারত লক্ষ্মীর তুষ্টি-সাধনার্থ বাণিজ্যের ব্যপদেশে দেশে দেশে যে পণ্যদ্রব্য-সম্ভার প্রেরিত হইত, তাহারই গন্ধ অনুসরণ করিতে গিয়া ফার্ডিনেণ্ড ও ইসাবেলার Sea-dog আমেরিকা আবিষ্কার করে—ভাস্কো-ডি গামা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে আসিবার পথ প্রস্তুত করে। শ্রদ্ধেয় রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া একটা বিরাট গ্রন্থই প্রণয়ন করিয়াছেন।

ইউরোপে ইটালীই বোধ হয় ভারত সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথমে বাণিজ্যের প্রভাব অনুভব করে। একই রাজশক্তির অধীনতার সুযোগে এই অনুভূতির ব্যাধি আল্‌প্‌স্ পার হইয়া বল্‌টিক পারে প্রুসিয়াকেও সংক্রামিত করে। বাণিজ্যে দেশের প্রজাসাধারণের কল্যাণ হয়; সুতরাং রাজশক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দী aristocratic প্রভাব মন্দীভূত করিবার জন্য, প্রুসীয় সম্রাট অটো-দি-গ্রেট এবং তৎপিতা হেন্‌রী বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা সাধন করিয়াছিলেন। এই পিতাপুত্রে বল্‌টিককূলে যে সমস্ত বন্দর নির্ম্মাণ করেন, জলদস্যুর আক্রমণ হইতে বাণিজ্যরক্ষার্থ সেগুলি ও অন্যান্য অনেকগুলি,—এই সর্ব্বসমেত নূনকল্প শতনগরী মিলিত হইয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'হান্‌সা' নামক একটী লীগ্ বা যৌথ সমিতি স্থাপন করে। কার্য্যসৌকার্য্যার্থ, এই লীগ যে সমস্ত বিধি প্রণয়ন করে, তাহা হইতেই বর্ত্তমান সভ্য-জগতের Navigation law বা নৌ বিধানের অভ্যুদয়। জলপথে আহার-সংগ্রহার্থ যে তরণী তৈয়ারি হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা অনলোদ্গারী রণপোতে পরিণত হইয়াছিল। হান্‌সার কার্য্যকারিতায় মুগ্ধ হইয়া অনেক দেশই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া বা অপর প্রকারে ইহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল। ঐ ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই হান্‌সা ব্রুজেস্ বন্দরে, ইংলণ্ডে, নভোগরডে এবং বার্জেনে চারিটী মহাকেন্দ্র স্থাপন করে। ইহাদের লণ্ডন কার্য্যালয়ের নাম ছিল Steel-yard; ইষ্টার্লিং নামে ইংরেজদিগের নিকট অভিহিত থাকিয়া হান্‌সাই ইংলণ্ডে মুদ্রা প্রস্তুত করিত। ইংলণ্ডের স্বর্ণমুদ্রার starling নামই তার সাক্ষী।

ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়াই ইংরেজের বাণিজ্য-বাসনা প্রথম জাগিয়াছিল। তৃতীয় এডোয়ার্ড দেশহিতার্থে বিদেশীয় বণিকদিগকে তাই আহ্বান করেন। ভাগ্যক্রমে ১৫,০০০ ফ্লেণ্ডার্জ শিল্পী তখন নিগৃহীত হইয়া দেশত্যাগ করায়, ইংলণ্ড তাহাদিগকে আনিয়া অনেক সুবন্দোবস্ত করিয়া দেয়। যদিও হেন্‌রীর সময়ে এই সব শিল্পীরা বিতাড়িত হইয়াছিল, তবুও এই সময় মধ্যেই তাহারা ইংলণ্ডের এত শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিল যে, মেরী ও এলিজাবেথের সময়

'হান্‌সা' আবার ইংলণ্ডে ব্যবসার সুযোগ পাইয়াও প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে নাই।

তারপর ধীরে-ধীরে উন্নতিলাভ করিয়া ইংলণ্ড একদিকে যেমন জগদ্ব্যাপী ব্যবসা চালাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, অপরদিকে হান্‌সাও তেমনি ধীরে-ধীরে ধ্বংসের গর্ভে ডুবিতে ডুবিতে ১৬৩০ খৃঃ অব্দে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। যাহাদের বাণিজ্যোপলক্ষে "পোলণ্ডের কৃষিক্ষেত্র ও চাষ আবাদের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, বেল্‌জিয়মের শিল্প ও কারুকার্য্য এবং সুইডেনের লৌহব্যবসা এত সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে, ইংলণ্ড মেষপালন ও পশমবয়ন" হইতে যাত্রা করিয়া আজ বিশ্বেশ্বর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের এ ঘোর অধঃপতনের কারণ, বিস্তারিত আলোচনা এ প্রসঙ্গে অনাবশ্যক বোধে, এই বলিয়াই নিরস্ত হইব যে—তাহাদিগের ভিতর সামাজিক বন্ধন, স্বদেশপ্রিয়তা কিম্বা অন্যান্য প্রীতি ছিল না,—স্বীয় সঙ্কীর্ণ, আশু স্বার্থই তাহারা বুঝিত ও চিনিত।

ইউরোপে যখন এই বাণিজ্য-ব্যাপার লইয়া রেশারেশী চলিয়াছিল, ভারত তখন পোত-বাণিজ্য বিসর্জ্জন দিয়া কৃষিকর্ম্মে মন দিয়াছে। তার নিত্য-প্রয়োজনীয়ের জন্য গৃহশিল্পের আশ্রয় লইয়াছিল; অদ্যাপি সে আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে তার মনে চলে না—পা সরে না। তাই শিল্পবিপ্লবে ইউরোপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে অভিব্যক্তি হইয়াছে, ভারত এতদিন তাহা যেন জানিতেও পারে নাই। ইউরোপ হইতে সহস্র-সহস্র নরনারী আমেরিকায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপনকালে, আবালবৃদ্ধবনিতা সমভাবেই কর্ম্ম করিয়াছে। সুতরাং ইউরোপের জনসাম্য আমেরিকায় আরও বিস্তৃত হইয়া পরিবার-বন্ধনকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দিতেছে! নারী-সমস্যা তাই আজ সেখানে এত প্রখর হইয়া উঠিয়াছে যে, ইব্‌সেন, বার্ণাড্‌-স্‌, প্রভৃতির মনীষার প্রভাব পাইয়াও ইউরোপ তার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। আমেরিকাতে মানুষে-মানুষে যে সাম্য সংস্থাপিত হইয়াছে, ইউরোপ অদ্যাপি জাতি-দ্বন্দ্বহীন হইয়া সে সাম্য আয়ত্ব করিতে পারে নাই। আমেরিকা বলে নারী নারীমাত্র,—মাতা নয়, বনিতা নয়, দুহিতা নয়; সেখানে পুরুষ আর নারী এই দুই সমান ও সমকক্ষ জাতি লইয়াই মানবসমাজ গঠিত। বিস্তর রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইয়া বিশ্বমানবসংঘের সভ্যরূপে সেখানে নারীরা বিবাহ বর্জ্জন, সন্তানপালন-বর্জ্জন, নারীস্বত্ব-সংরক্ষণী-সভাসমিতি দ্বারা পারিবারিক জীবনের মূলে কুঠার প্রহার করিতেছে! ইউরোপ দূরে থাকিয়া দেখিয়া-শুনিয়া, সন্তর্পণে আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু যৌথ-পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে, নারীকণ্ঠের স্বাধীনতার আবেদন ভারত অদ্যাপি শুনে নাই;—যা কিছু শুনিয়াছে, তাহা বুঝি ব্যোমমণ্ডলে, দূরাগত উচ্চ ধ্বনির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞান-চর্চ্চার সঙ্গে-সঙ্গে শিল্পবাণিজ্য বিস্তারের ফলে, ইউরোপ ও আমেরিকার মত এখানেও গার্হস্থ্যজীবন বিষাক্ত করিয়া, একদিন যে নারী-সমস্যা বলীয়সী হইবে না—এমন কথা বলিতে পারি না। পরিবারহীনতার মধ্যে নারী ও পুরুষে সমান স্বত্ব লইয়া কেমন করিয়া সমাজ গঠিত হইবে, এ প্রশ্নের উত্তরে আমেরিকার Suffragistদের নেত্রী মিসেস্‌ ক্রেট বলিয়াছেন, "ভবিষ্যতে কি হইবে জানি না; আজি যা কর্ত্তব্য বুঝিতেছি, তাহাই করিয়া চলিয়াছি মাত্র।"

সমাজ-সংস্কারকমাত্রেরই এই একই কথা। ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কোনরূপ জল্পনা না করিয়া কর্ত্তব্যই শুধু অনুষ্ঠেয়। এই কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে আপন sentiment যেন পঙ্কিল না করে, সংস্কারক সেই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পদবিক্ষেপ করেন! হিন্দুর পারমার্থিক সাধনা ব্যতীত সর্ব্ব-কর্ম্মেই মানুষ সমাজের বা দশের আজ্ঞাবহ,—কোন মতেই সমাজের এতটুকু অমর্য্যাদা করিবারও তার অধিকার নাই। সমাজের নির্দেশ অমান্য করিয়া আমি সমাজের বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। এই বাহিরে বসিয়া উপদেশ বা দৃষ্টান্ত দিলে, সমাজ আমার কথা গ্রাহ্য করিবে কেন? সুলেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন—সমাজকে শিক্ষা দিতে হইবে তার ভিতরে বসিয়া, আপামর সাধারণের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া।

উপরোক্ত নারী প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে হইল। সভ্য-অসভ্য সর্ব্বদেশেই বারবনিতা বিদ্যমান। কেহ বলেন ইহারা সভ্যতার কারণ না হইলেও একটা সমসাময়িক লক্ষণ; আবার কেহ বলেন ইহারা দেশোন্নতির অন্তরায়। সে বিতর্ক ছাড়িয়া ইহাদিগকেও যদি নারীরূপেই সমাজের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে মানিয়া লই, তবে ইহাদের প্রতিও কতকগুলি কর্ত্তব্য, সমাজ অস্বীকার করিতে পারে

না। একপক্ষের দোষেই এই পতিতাদের প্রাদুর্ভাব যখন অসম্ভব, তখন অনুকূল প্রতিপক্ষ, সমাজের প্রভুরূপে ইহাদিগকে তুচ্ছ করিতে পারে না। তাই ইউরোপ আজ ইহাদের স্বাস্থ্য ও সুব্যবস্থা বিধানে মনোযোগী হইয়াছে; এবং ঘৃণা তাচ্ছিল্য না করিয়া সমাজের একটি দুর্ব্বল অঙ্গরূপে সাদরে গ্রহণ করিতেছে; পরিবারবন্দী ভারত আপন উদার ধর্ম্মের মহিমা বিস্মৃত হইয়া এই পাশ্চাত্য ব্যবস্থায় হয় ত ভ্রূকুঞ্চিত করিতেছে!

এই ভ্রূকুটিই ভারতের জাতীয়তা বা nationalism। এই nationalism শুধু রাজনীতি নয়, স্বায়ত্বশাসন নয়, স্বাধীনতা নয়। রাজনীতির মত, ধর্ম্মগত মর্ম্মগত ইত্যাদি সর্ব্বগতের মধ্য দিয়া যে স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠে, তাহারই নাম nationalism। ইউরোপে সকল দেশেই ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার-নিষ্ঠা প্রায় একই। তাই সেখানে nationalismএর ভিত্তি ভৌগোলিক অভিজ্ঞা মাত্র। তুমি স্বাধীন, তুমি free citizen, এ তোমার nationalism নয়; হিন্দু হই, কি মুসলমান হই, বাঙ্গালী হই, কি মারাঠী হই, আমি ভারতবাসী,—ইংরেজ, জার্ম্মাণ, চীনা আমেরিকান নই—এই আমার nationalism।

কিন্তু nationalismত অভিব্যক্তি অস্বীকার করে না। সুতরাং সমাজের অভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তি হইতেই যদি ব্যবহারিক ধর্ম্ম বা religion এবং নীতির উদ্ভব হয়, তবে দেশ ও কালের মধ্য দিয়া এগুলিরও যে বিবর্ত্তন ঘটিবে, এ কথায় ত nationalism এতটুকু আপত্তি করিতে পারে না। "তীরবদ্ধ বাপীর মত একই বিধির ভিতর যুগ-যুগ বদ্ধ থাকায় ভারতীয় সমাজ আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। গতিই এ বিশ্বের মহাপ্রাণ। সচলতার সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ববেগ,—অর্জ্জন ও বর্জ্জনের স্রোত-সংঘাতের প্রচণ্ডতার ভয়ে যে স্থিতির বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, বিশ্বগ্রন্থের কোন পত্রে তার সম্বন্ধে কোন সূত্রের সন্ধান পাই না। প্রাচীন বিধি ও বিধানের অঙ্কে নির্ব্বিচারে আত্মসমর্পণ করিতে-করিতে ভারত বুঝি বোধশক্তি-বর্জ্জিত, ও আত্মনির্ভর-ক্ষমতা-রহিত হইয়া গিয়াছিল। যুগান্তরের জীর্ণতার বিগলিত স্তূপের ভিতর হইতে যে কীটদষ্ট পাতা কয়টি বর্ত্তমান ভারতের হস্তগত হইয়াছে, তাহা তাহাকে কতদূর নিয়ন্ত্রিত করিয়া উন্নতি-মার্গে উত্থিত করিতে পারে, সে বিচারের ক্ষমতা, বুঝি তার কাল পর্য্যন্তও ছিল না। আচারের অববাহিকায় শবের মত নিশ্চেষ্টভাবে ভাসিতে-ভাসিতে রুদ্ধধার পল্বলের মধ্যে স্থবির হইয়াছিল, আপন সামর্থ্যে সমাজ-প্রবাহের পুরোরোধী অন্তরায়ের শিলারাশি সরাইবার উপযুক্ত শক্তিও বুঝি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সেই অতীতকালে মানুষ যেমন করিয়া মানুষ হইত —সেই আশ্রম-বিধান, সামাজিক-প্রথা, আচার-ব্যবস্থা, বর্ণপর্য্যায়—শতাব্দীর পর শতাব্দীর উত্তাল তরঙ্গাবক্ষেপে যাহা শুধু ক্ষয় পাইয়াই আসিয়াছে, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই,—মহাকালের বিঘূর্ণিত প্রভঞ্জন-নিপীড়নে যাহা শুধু জীর্ণ ই হইয়াছে, কখনও পুনর্নির্ম্মিত হয় নাই, বিশ্বের সঙ্গে সমতা সংরক্ষা করিতে হইলে তাহা আমাদের বর্ত্তমান অভাব পূরণ করিতে পারে না। প্রাচীন জীর্ণতার অরণ্যান্ধকারে বিপন্ন ভারত, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে, মানুষকে ও মানুষের মনুষ্যত্বকেই আজ একান্তভাবে বরণ করিয়া লইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।—জল্পনা জুটিল, কি কল্পনা ফুটিল, বৃথা আশ্বাসে ভুলাইবার দিন আজ আর নাই। ভারতের শান্তসাম্পদ তপোবন ধ্বংস করিয়া যে সমস্ত জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের সর্ব্বত্রই আজ মানুষের এই সাধনাই জাগিয়াছে—সর্ব্ব বিসংবাদ ও সর্ব্ব জড়তা বিদীর্ণ করিয়া কবে এ সাধনা সিদ্ধিলাভ করিবে, আকুল উৎকণ্ঠায় ভারত সেই পুণ্যাহেরই অপেক্ষা করিতেছে।" *

---

* শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

রঙ্গ-চিত্র

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি।

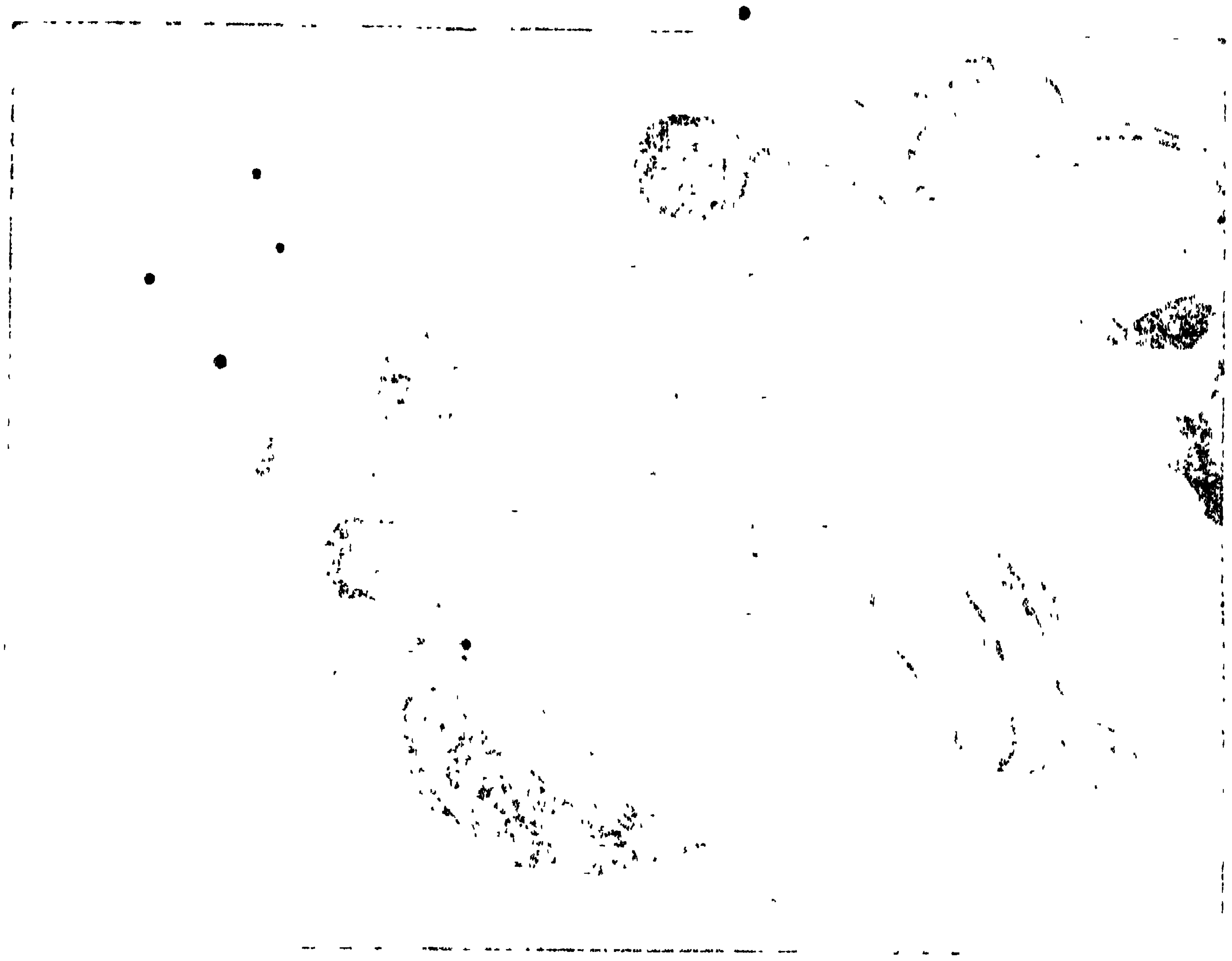

নিমন্ত্রণ রক্ষা

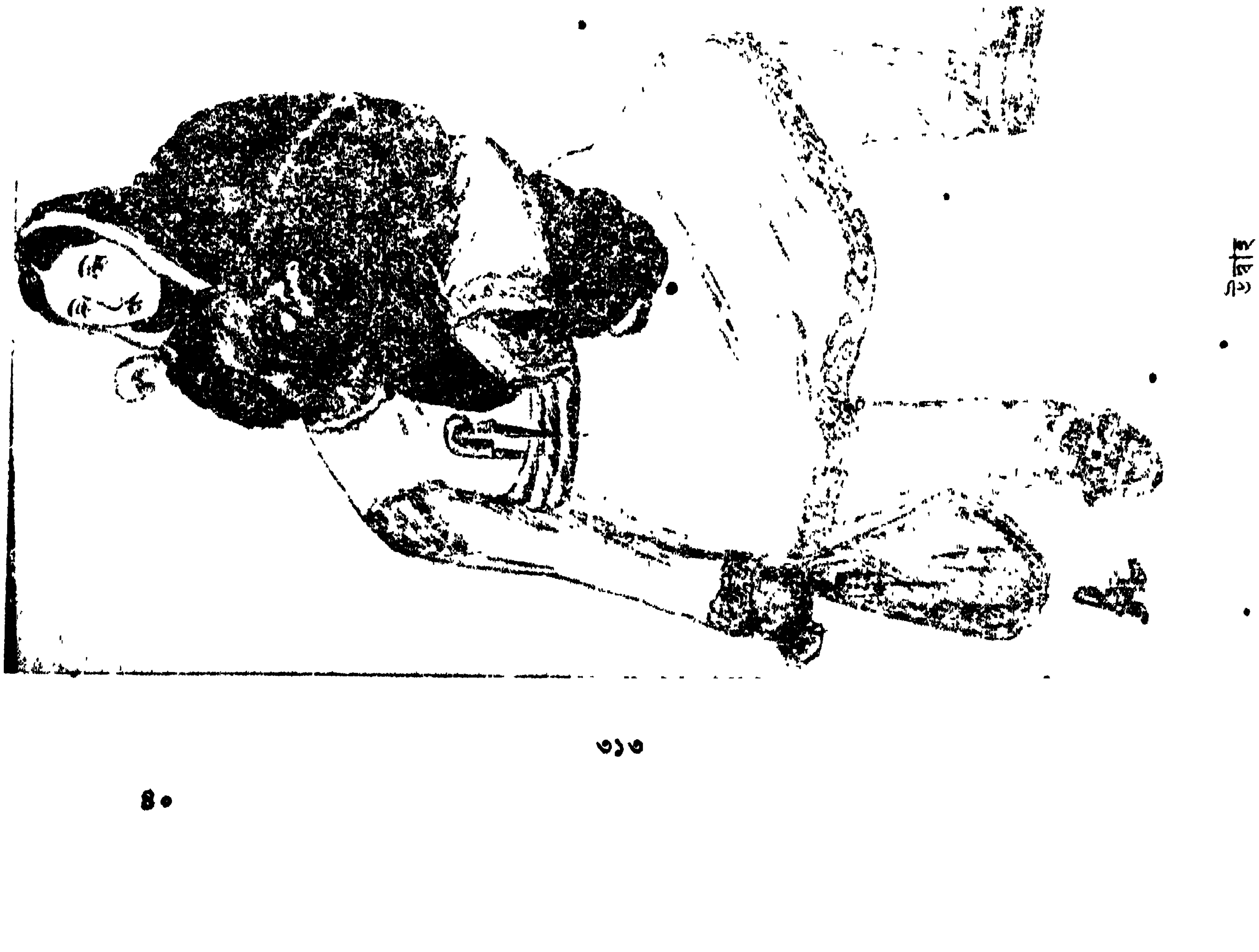

উদ্বাহ

[illegible]

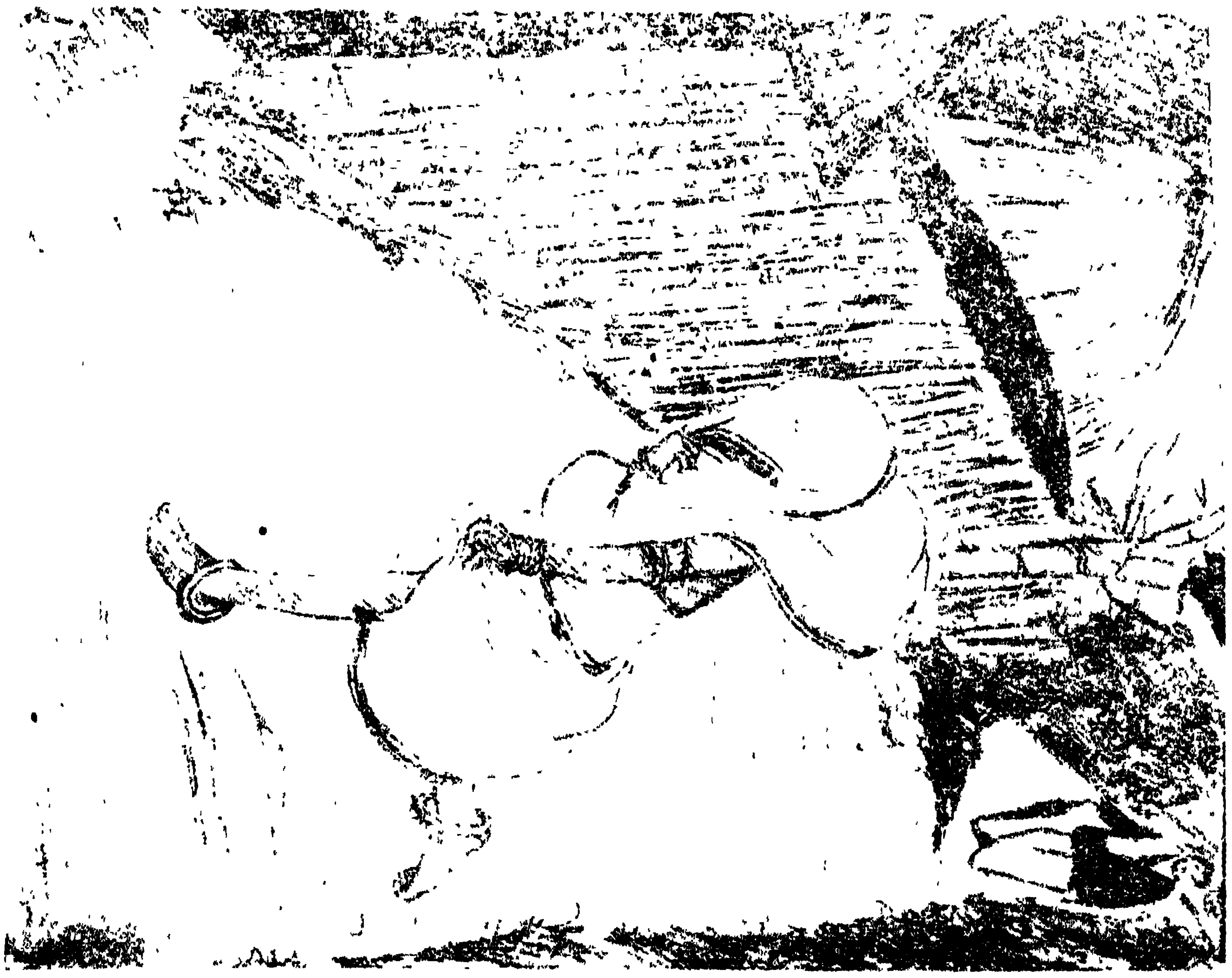

লজ্জাশীলা

মোগল-সম্রাট্ আক্‌বর

বংশ পরিচয় ; সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে আক্‌বর

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

সর্ব্বসৌভাগ্য-সমন্বিত, বিধি বিড়ম্বিত এই ভারতভূমে যে সকল লুণ্ঠন-লোলুপ বৈদেশিক ধূমকেতুর ন্যায় সময়-সময় উদিত হইয়াছিলেন, মধ্য-এসিয়ার তুর্ক তৈমুর লঙ্‌ সেই সকল দুর্নিমিত্ত দুর্গ্রহের শেষ অনুচর। মহান্ হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সম্রাট্ আক্‌বর তাঁহারই বংশ-সম্ভূত।

মধ্য এসিয়ার 'মোঙ্গোল' (বা মোগল) জাতীয় শোণিতের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। এই জন্য তৈমুর বংশধরগণের রাজত্ব ভারতে 'মোগল রাজত্ব' বলিয়া ইতিহাসে অভিহিত ; কিন্তু বংশ-মর্য্যাদায় আক্‌বরকে 'মোগল' অপেক্ষা 'তুর্ক' বলাই সঙ্গত ; তাঁহার মাতা পারস্য রমণী।

সম্রাট হুমায়ুন

আফগানপতি শের শাহ

'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' আক্‌বরকে, ভারতবর্ষে জন্মহেতু অনেকে ভারতীয় বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার দেহে ভারতীয় শোণিত বিন্দুমাত্র ছিল না। আক্‌বরের পিতৃপুরুষগণ 'চঘ্‌তাই' তুর্ক ; এই তুর্করক্তও আবার খাঁটি তুর্ক-শোণিত নহে ; বৈবাহিক সূত্রে

তৈমুর হিন্দুস্থানে যে মোগল-সাম্রাজ্যের সূচনা করিয়া যান, মহাকর্ম্মী বাবর তাহার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন ; ভাগ্যহীন হুমায়ুন তাহার উপাদান মাত্র সংগ্রহ করেন এবং সুকৃতিসম্পন্ন আক্‌বর কর্ত্তৃক তাহা জনমনোহর, বিস্ময়কর গঠনে পরিণত হয়। সে বিশাল বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের গৌরব-

গরিমা আকৃবরের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ তৈমুর পর্য্যন্ত কেহ স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। তৈমুর ও আকৃবরের মধ্যবর্ত্তী বাবর সেই উচ্ছৃঙ্খল লুণ্ঠন-ব্যবসায় ও সুশৃঙ্খল-শাসিত সাম্রাজ্যের মিলন-সন্ধি;—ভারত ও মধ্য-এসিয়ার সঙ্গম-সেতু।

কলকূজিত, ষড়্‌ঋতু-পূজিত, অতুল স্বভাব-শিল্প-শোভা-শালিনী স্বর্ণধূলিকীর্ণ এই বিস্তীর্ণ রত্নভূমির বিচিত্র কাহিনী, করগত হইল। আপাততঃ ইহাতে উত্তরাপথে মুসলমান-শক্তির হ্রাস হইল বটে, কিন্তু চিতোরাধিপতি রাণা সঙ্গ (বা সংগ্রাম সিংহ) প্রমুখ প্রবল পরাক্রান্ত রাজপুত দল এই নবীন অভ্যুদয়ের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু মোগলের অভিনব রণকৌশলবলে রাজপুত-প্রতিষ্ঠা পরাজিত হইল; পাণিপথ যুদ্ধের পর, বৎসর পূর্ণ না হইতে (১৬ই

বৃদ্ধ তৈমুর লঙ্

হুমায়ুনের প্রাণরক্ষাকল্পে বাবরের প্রার্থনা

শৈশবে শ্রুত রূপকথার মত, উদার কল্পনাকুশল বাবরের উপর রমণীয় ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছিল। হিন্দুস্থান-বিজয়ে বারবার বিফলপ্রযত্ন হইয়াও ভাগ্যপরীক্ষাপ্রিয় বীর সে মোহতন্ত্র ছিন্ন করিতে পারেন নাই। অবশেষে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ এপ্রিল দিল্লীর উত্তরে পানিপথ ক্ষেত্রে বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার উপর প্রসন্নহাস্য বর্ষণ করিলেন; হিন্দুস্থানের তদানীন্তন পাঠান-সুলতান ইব্রাহীম্ লোদী পরাস্ত, এবং আগ্রা প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশও নূতন সম্রাটের মার্চ্চ, ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে) সাকৃরীর সন্নিকটে খানুয়া ক্ষেত্রে সঙ্গের বিপুলবাহিনী প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গেল।

বাবর তথাপি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। বাঙ্গালার দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠিত আফ্‌গান-শক্তি দিল্লীর সিংহাসন-লালসায় ষড়্‌যন্ত্র ও সেনাসঞ্চয় করিতেছিল; কিন্তু গঙ্গা ও ঘাগ্‌রা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট আফ্‌গানগণকে বিধ্বস্ত করিয়া নবসম্রাট্ তাহাদের দুরাকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।

বাবরের সাম্রাজ্য এখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ

হইতে পূর্ব্বদিকে সুদূর বঙ্গের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত; কিন্তু বীর্য্য, বাহুবল ও অসম-সাহস-প্রতিষ্ঠিত, বাবরের আবাল্য-বাঞ্ছিত, এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য তাঁহার অদৃষ্টে অধিক দিন ভোগ হইল না। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ৪৮ বর্ষ বয়সে আগ্রার উদ্যান-প্রাসাদে উল্কার ন্যায় ক্ষণজ্যোতিঃ ভারত-সম্রাট্ চিরনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয়ভূমি কাবুলে শৈলপাদমূলে অবস্থিত এক সুরম্য উদ্যানে রাজদেহ সমাহিত করা হয়।

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন ২২ বর্ষ বয়সে পিতৃসিংহাসন নির্ব্বিবাদে অধিকার করিলেন সত্য, রণঢোল বাজিয়া উঠিল। সে শব্দে সম্রাট্ চকিত হইয়া উঠিলেন। বীরকরে তরবারি ধরিলেন; কিন্তু সকলই বিফল হইল। সিংহাসন-লোলুপ শের শাহ্‌র আশা সম্পূর্ণ ফলবতী না হইলেও, তাঁহার ধীর-সঞ্চিত সৈন্যবল চৌসা-ক্ষেত্রে (১৫৩৯ খ্রীঃ) বাদশাহ্-বাহিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল। ইহার এক বৎসর পরে (১৫৪০, মে) কনৌজ-সমরে আবার উভয়ের ভাগ্য-পরীক্ষা হইল। কিন্তু প্রতিকূল দৈবের সহিত কে যুঝিবে? ভাগীরথী সহসা স্ফীত হইয়া গভীর গর্জ্জনে আফ্‌গান-পতির বিজয় ডঙ্কা বাজাইয়া উঠিলেন;—হতভাগ্য সম্রাট্‌ সৈন্য বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল;

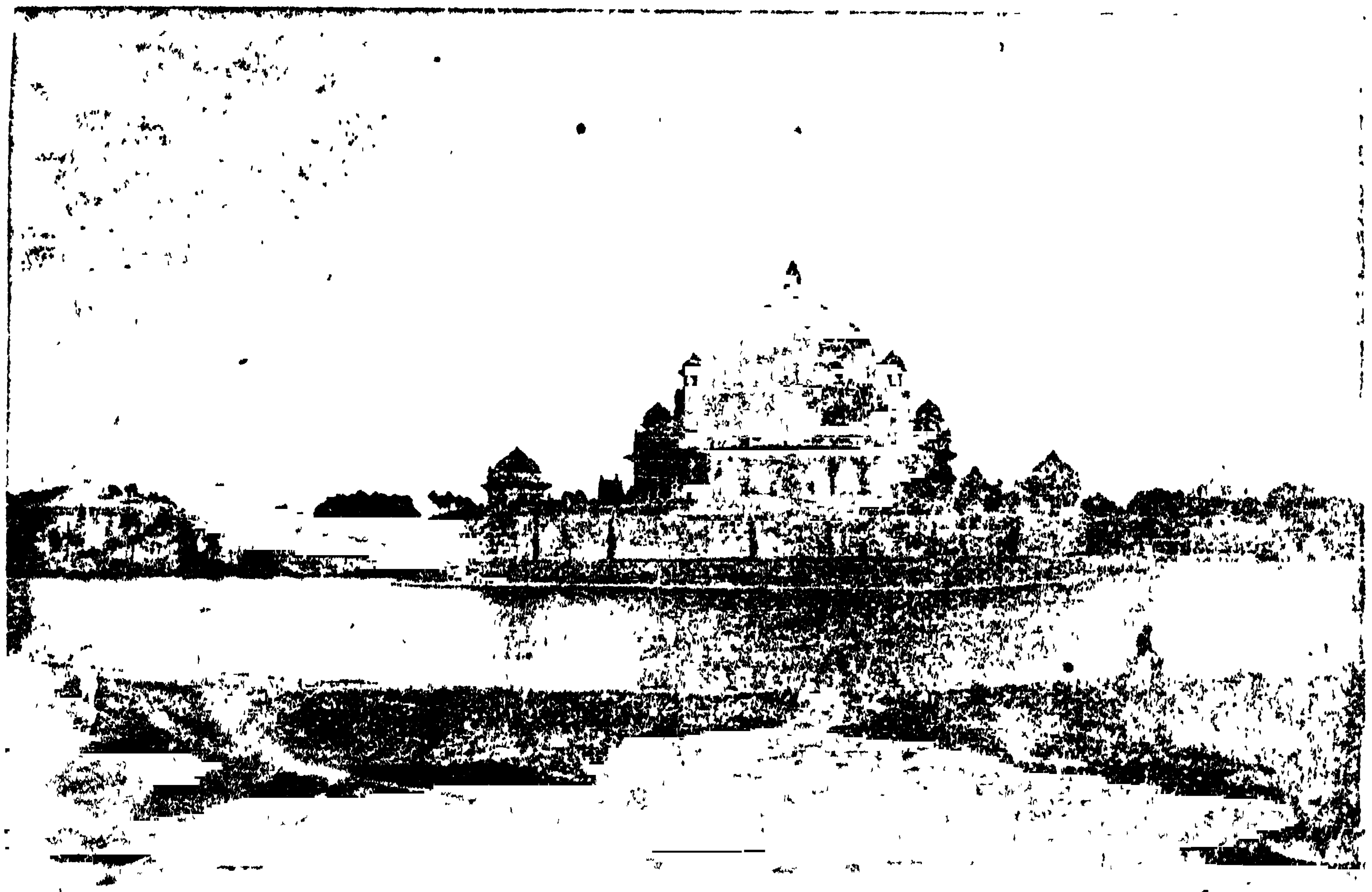

শের শাহ্‌র সমাধি—সাসারাম্

কিন্তু সে অধিকার বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কামরাণ পঞ্জাব, কাবুল, কন্দাহার ও ঘজ্‌নী প্রদেশের প্রভূত অধিকার প্রাপ্ত হইলেও, ভারত-সম্রাটের ঈর্ষাবশে শত্রুতাসাধনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অলস, বিলাসপ্রিয়, অতিমাত্রায় অহিফেনসেবী, শিথিল-স্বভাব সম্রাট্ সেদিকে নেত্রপাত না করিয়া নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম-সুখে নিমগ্ন হইলেন; কিন্তু অচিরে সে অসতর্ক-আরামে ব্যাঘাত জন্মিল। গঙ্গার অঞ্চলে বিপুল রোলে আফ্‌গানপতি শের শাহ্‌র সে প্লাবনে বিধি-বিড়ম্বিত বাদশাহের ছত্র, দণ্ড, সিংহাসন সকলই ভাসিয়া গেল।

বিজয়ী আফ্‌গানপতি শের শাহ্ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার পর অবগত হইলেন যে, হৃতরাজ্য নৃপতি আশ্রয়-প্রত্যাশায় পঞ্জাব অভিমুখে কামরাণের নিকট গমন করিয়াছেন। শের তাঁহাকে বলসঞ্চয়ের অবকাশ না দিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। কামরাণও পঞ্চনদ প্রদেশ জেতৃকরে সমর্পণ করিয়া কাবুলে চলিয়া গেলেন।

সুযোগ বুঝিয়া ভ্রাতৃগণ এখন দুর্ভাগ্য, তাড়িত হুমায়ুনের প্রতিকূলাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। স্বজনপরিত্যক্ত নৃপতি পরাশ্রয়-প্রার্থনায় সিন্ধু-অধিপতির দ্বারস্থ হইলেন। হুমায়ূনের কামনা পূর্ণ হইল না; কিন্তু বিমুখ নিয়তি অন্যদিকে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিল। এই প্রদেশের পাটু নামক স্থানে বিমাতা দিলদার-

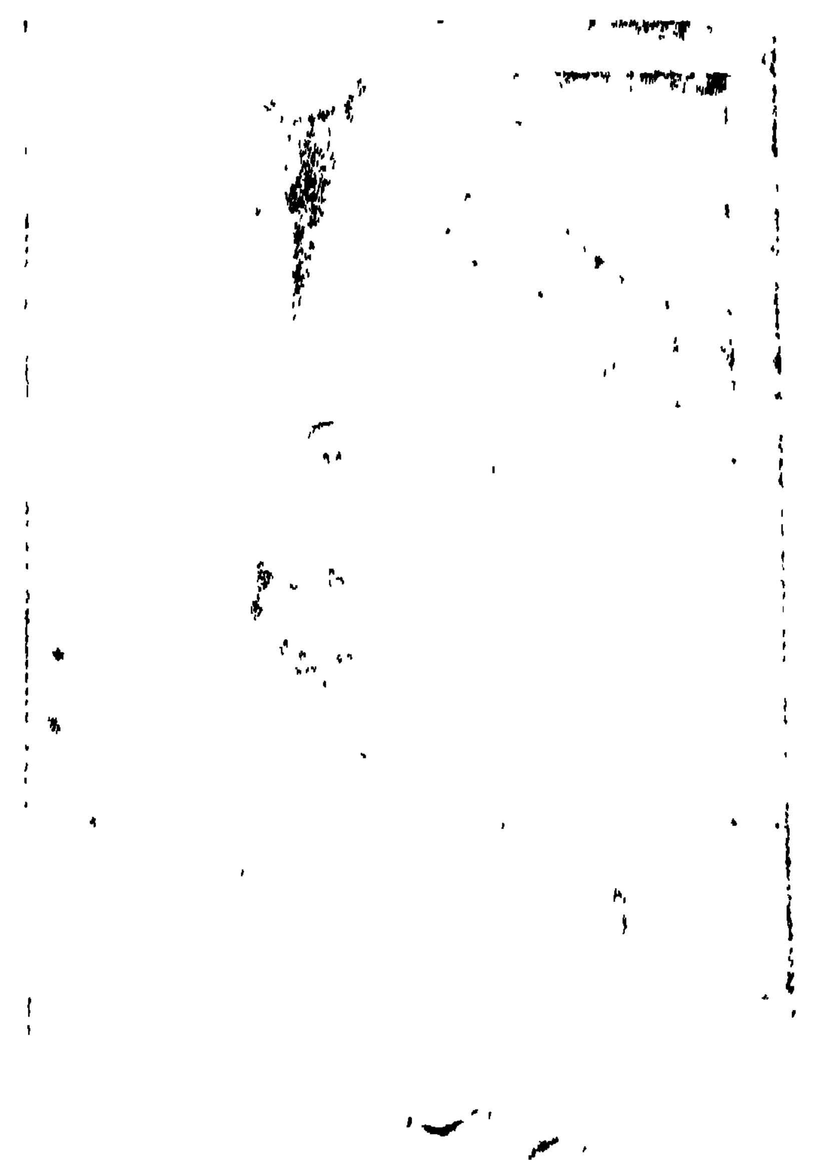

ভারত সম্রাট্ বাবর

ভবনে একদিন এক কিশোরী কন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। কন্যা দরিদ্র দুহিতা হইলেও উচ্চবংশ সম্ভূতা;—হুমায়ুন জননী মাহমের দূর আত্মীয়া। বালিকা সহোদর মুয়জ্জমের সহিত প্রায়ই সম্রাট্-জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী এই বালাকে দেখিয়া হৃতরাজ্য সম্রাট্ হৃদয় হারাইলেন। দুর্দিন, দুর্ভাগ্য, নিরাশা, নিরাশ্রয় দশা, সকল ভুলিয়া হুমায়ুনের চিত্ত চতুর্দ্দশবর্ষীয়া এই কন্যার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত অধীর হইয়া উঠিল; এবং দিলদার বেগমের যত্নে তাহা সম্পন্ন হইয়া গেল (১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ বা ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ)।* রত্নপ্রসূ এই কন্যারত্নের নাম হামীদা বানু—রাজরাজেশ্বর, মোগলকুলতিলক আকবর শাহ্‌র জননী।

সিন্ধুরাজের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া হুমায়ূন যোধপুর-পতি মালদেওর শরণাপন্ন হইলেন। মৌখিক সৌহৃদ্য-প্রদর্শনে ধূর্ত্ত রাজপুত তাঁহাকে শের শাহ্‌র করে সমর্পণ করিবার দুরভিসন্ধি পোষণ করিতেছে বুঝিতে পারিয়া, নিরুপায় নরপতি মুষ্টিমেয় অনুচর সহ মরুভূমি আশ্রয় করিয়া কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নিদারুণ যন্ত্রণাময় মরুজীবনে দিনেকের তরেও হুমায়ুন শান্তিতে অবস্থান করিতে পারেন নাই। পশ্চাতে মালদেওর অনুচরগণ দুষ্ট শিকার ব্যাধের মত তাঁহাকে তাড়না করিয়া ফিরিতে লাগিল। নবপরিণীতা সতিসাধ্বী হামীদা এ দুর্দিনেও পতিপার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই।

জ্বালাময় মরুদেশে দীর্ঘকাল দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া শ্রান্ত হুমায়ুন ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে অবশেষে সিন্ধু প্রদেশস্থ মরুভূমির পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী অমরকোট দুর্গে উপস্থিত হইলেন। সহৃদয় দুর্গাধিপতি রাণা প্রসাদ ক্ষুৎপিপাসাতুর পরিশ্রান্ত রাজ অতিথিকে সাদরে আশ্রয় দিয়া যথাসাধ্য

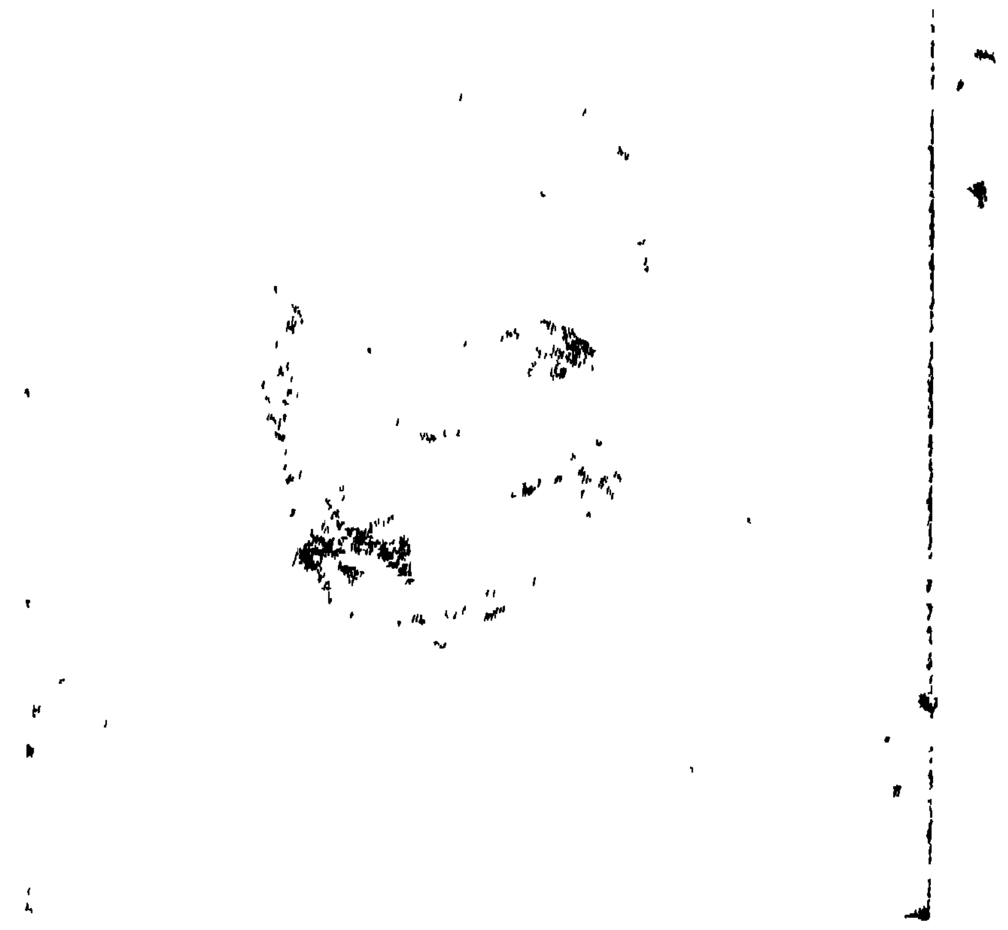

মোগলকুলতিলক আকবর

আতিথ্য করিলেন। এতদিনে হুমায়ুনের অল্পকালের জন্য নিরাপদে বিশ্রামলাভ করিবার অবসর হইল। মরুভ্রমণে সম্রাটের যে সকল অনুচর ছত্রভঙ্গ হইয়াছিল, ক্রমে একে একে তাহাদেরও সমাগম হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র দুর্গাধিপতির সকলকে আশ্রয় দিবার মত সামর্থ্য ছিল না। এই সময় প্রসাদ তাঁহার পিতৃহন্তা টট্টারাজকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত যুদ্ধাভিযানের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, সম্রাটের অনুচরগণসহ নিজসৈন্য মিলিত করিবার প্রস্তাব করিলেন।

* হুমায়ূনের সহিত হামীদার বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ গুলবদন ও জৌহরের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। হামীদার পিতা শেখ্ আলী আকবর জামী মীর বাবা দোস্ত নামেও পরিচিত : এ বিষয়ে শ্রীমতী বেভারিজ আলোচনা করিয়াছে (Humayun-Nama p. 237-9.)

হামীদা তখন আসন্নপ্রসবা। হুমায়ুন তাঁহাকে শ্যালক মুয়জ্জম্ ও কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরের তত্ত্বাবধানে অমরকোটে রাখিয়া যুক্তবাহিনীসহ টট্টা ও বক্কর আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। ইহার তিনদিন পরে পূর্ণিমা রজনীতে হামীদা পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন (২৩এ নভেম্বর ১৫৪২; ১৪ই

আকবরের জন্ম

বান্ ৯৪৯ হিঃ) ইনিই মোগলকুলতিলক, ইতিহাস-বিশ্রুত, ামধন্য সম্রাট্ আক্‌বর।

হুমায়ুন তখন অমরকোট হইতে ২০ মাইলেরও অধিক এক সুবৃহৎ জলাশয় সন্নিকটে শিবির সংস্থাপন করিয়া- । তর্দীবেগ প্রমুখ কয়েকজন অনুচর অশ্বারোহণে আগমনে তাঁহাকে সুসংবাদ দিল। নিরানন্দ নরপতির ন্দের অবধি রহিল না। ধর্ম্মপ্রাণ সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে জানু পাতিয়া উন্মুক্ত হৃদয়ে বিশ্ব-সম্রাট্‌কে পরম ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। শিবিরে সুসংবাদ প্রচার হইবামাত্র অনুচর প্রধানগণ আসিয়া আনন্দে যোগদান করিলে, নিঃস্ব সম্রাট্ তাঁহার পানপাত্রবাহক (Ewer bearer) জৌহরের দ্বারা একটী অভগ্ন মৃগনাভি

চম্পানীর দুর্গাবরোধে হুমায়ুন

আনাইয়া সকলকে বিভাগ করিয়া দিয়া বলিলেন,—"এই অকিঞ্চিৎকর উপহার ব্যতীত আজ আমার দেয়-সম্বল কিছুই নাই। আমার বিশ্বাস, এই মৃগমদগন্ধে এখন যেমন এই ক্ষুদ্র শিবির পূর্ণ, আমার বংশধরের যশঃসৌরভ একদিন তেমনই এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলে বিকীর্ণ হইবে।" আনন্দবাদ্য-কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইল।

হুমায়ুন পুত্রের নামকরণ করিলেন—'বদর-উদ্দীন'—

তখন উচ্চনীচ সকল শ্রেণীর লোকই অভিচার-ক্রিয়ায় ধ্রুব বিশ্বাস করিত। গ্রহাচার্য্য জ্যোতিষীগণ বিরূপ বা রুষ্ট হইলে জাতক্ষণ গণনা করিয়া, অনর্থসূচনা এবং বৈরসাধনার সময় নির্ণয় করিয়া দিতেন। শত্রু কর্তৃক এই সকল অনিষ্টাশঙ্কা হইতে সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য পিতামাতা যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জন্মদিন পরিবর্ত্তন করিবেন, তাহা বিচিত্র কি? হুমায়ূনের তখন অতি দুর্দ্দিন; এবং দুঃসময়ে কাল্পনিক অনিষ্টভয় মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ; ঘটনা তাহার সহায়তা করে। জন্মাবধি আক্‌বর বারবার বিপন্ন হইতেছেন দেখিয়া, দুর্দ্দশাগ্রস্ত সম্রাট্ তাঁহার তদানীন্তন একমাত্র সৌভাগ্যস্বরূপ বংশধরকে রক্ষা করিবার জন্য যে সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা কেবলমাত্র সম্ভবপর নহে, পরন্তু স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা সকলই মিথ্যাপ্রচারের অনুকূল,—দূর মরুদেশে আক্‌বরের জন্ম এবং মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত অনুচরমাত্র সে নির্দ্দিষ্ট দিন অবগত। জন্মদিন প্রকৃষ্টরূপে প্রচ্ছন্ন রাখিবার প্রয়োজনবোধে সম্রাট্ 'বদর্' নামের সার্থকতা ঘুচাইয়া, প্রায় একার্থবোধক, 'জলালুদ্দীন্' (ধর্মজ্যোতিঃ—Splendour of Religion) নাম রাখিলেন; আক্‌বরের এই নামও ইতিহাস-বিশ্রুত। ত্বক্‌চ্ছেদ উৎসবের সময়ই আক্‌বর সাধারণে 'কুমার' রূপে প্রথমে অবতীর্ণ হ'ন; সুতরাং এই সময়েই তাঁহার নূতন নামকরণ এবং সরকারী জন্মতারিখ প্রচলিত হয়,* এরূপ অনুমান করিলে অন্যায় হয় না। জন্ম-তারিখ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য অনুষ্ঠানের তারিখও অনুরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া সরকারী বিবরণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

উক্ত অনুষ্ঠানের পরবর্ত্তী চারি বৎসরের ইতিহাস অতীব জটিল। কাবুল অধিকারের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধাভিযান এবং অন্যান্য ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকায় হুমায়ূন সর্ব্বদা তৎপ্রদেশে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। কামরাণ তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাবুল অধিকার করিয়া, অথবা তাঁহার শত্রুপক্ষের সহিত যোগদানে তাঁহাকে যথাসাধ্য নির্য্যাতিত করিতেন। এই চারি বৎসরের মধ্যে আক্‌বর দুইবার কামরাণের কবলগত হইলেও দুইবারই পিতার নিকট নিরাপদে প্রত্যর্পিত হইয়াছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত কামরাণের হস্ত হইতে কাবুল উদ্ধার করিবার নিমিত্ত হুমায়ূন যখন দ্বিতীয়বার অবরোধ করেন (১৫৪৭ খ্রীঃ এপ্রেল) সেই সময় সম্রাট্‌সৈন্যের গোলাবর্ষণ বন্ধ করিবার অভিসন্ধিতে কামরাণ পঞ্চমবর্ষীয় বালক আক্‌বরকে দুর্গপ্রাচীরে স্থাপন করিয়াছিলেন!

বারবার ব্যর্থমনোরথ হইয়াও কামরাণ হুমায়ূনের হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইবার চেষ্টায় বিরত হইলেন না; কিন্তু এইবার তাঁহার শেষ উদ্যম। এই উদ্যম নিষ্ফল করিবার জন্য হুমায়ূন ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিন্দাল উভয়ে মিলিয়া জুই শাহী (জলালাবাদ) প্রদেশে গমন করিলেন। ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ নভেম্বর রাত্রিযোগে কামরাণ চালিত আফগান সৈন্য সম্রাট্-শিবির আক্রমণ করিল; কিন্তু হুমায়ূনের তখন দুর্ভাগ্য-রজনী অবসান-প্রায়;—সম্রাটের জয়লাভ ঘটিল। কিন্তু এই আক্রমণে

---

* যাঁহারা আক্‌বরের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা "Journal of the Asiatic Socy of Bengal" (1881) পত্রে প্রকাশিত কবি-রাজ শ্যামলদাসের প্রবন্ধ এবং "Indian Antiquary" (Nov. 1915) পত্রে V. A. Smith সাহেবের "The Date of Akbar's Birth" পাঠ করিবেন। পণ্ডিত-প্রবর বেভারিজ (H. Beveridge) জৌহরের তারিখ বিশ্বাস করিতে চাহেন না; তিনি বলেন:—'Mr. Smith insists upon regarding the date given by Jauhar in one or more manuscripts for Akbar's birth as being correct. But the evidence the other way is overwhelming and it appears from a translation of Jauhar in the Elbert MSS in the British Museum that at least one manuscript gives the date corresponding to Octr 15. Jauhar was an old and uneducated man, and supposing that he did put a date corresponding to Novr, it is of no value against the testimony of Abul-fazl and others. I believe there is no authority in Jauhar or elsewhere for the statement that a false official date was adopted to protect the child from necromancers. The child was then the offspring of a banished King, and not of importance enough to make falsification necessary or advisable. (Asiatic Review, July 1915, pp 68 69; See also *A. N.* i, 59*n*). এক্ষেত্রে আমরা আবুল-ফাজল, গুলবদন প্রভৃতির পরিবর্ত্তে জৌহরকেই অধিকতর প্রামাণ্য বোধে গ্রহণ করিয়াছি।

হিন্দাল প্রাণ হারাইলেন; হুমায়ূনের হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল।

আক্‌বর এই আক্রমণকালে পিতৃ-শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। ভারতের ভাবী সম্রাটের বয়ঃক্রম তখন দশ বৎসর। ইতঃপূর্ব্বেই কাবুলের দক্ষিণ পূর্ব্বাবস্থিত লহুগর প্রদেশস্থ চরখ্ গ্রামখানি আক্‌বরকে জাগীরস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল; এক্ষণে মৃত পিতৃব্যের ঘুজ্‌নী প্রভৃতি সকল জাগীর তাঁহার অধিকারভুক্ত, এবং হিন্দালের কর্ম্মচারীবর্গ তাঁহার অধীনে নিয়োজিত হইল। খুব সম্ভব, এই সময়েই আক্‌বরের প্রথমাপত্নী হিন্দাল-দুহিতা রুকয়া সুল্‌তান্ বেগমকে সম্রাট্ পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করেন।

১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষভাগে আক্‌বর প্রাদেশিক-শাসনকর্ত্তা রূপে তাঁহার নবলব্ধ জাগীর ঘুজনীতে গমন করিলেন এবং কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে তথায় রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। ইহার ছয়মাস কাল পরে, অশ্ব হইতে পতিত হইয়া হুমায়ূনের জীবন-সংশয় হইল। সম্রাট্ ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইয়া পুত্রকে কাবুলে আনাইলেন।

নানাস্থানে পলায়ন করিয়াও কামরাণ আর আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন না। অবশেষে জ্যেষ্ঠের নিকট বন্দীভাবে নীত হইলেন। ক্ষমাশীল সম্রাট্ অশেষ অনর্থকারী দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতাকে মার্জ্জনাদানে উন্মুখ হইলেও, ওমরাহ্‌গণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁহাকে অন্ধ করিয়া ভাবী অনিষ্টাশঙ্কা হইতে চিরমুক্তি লাভ করিলেন (১৫৫৩ নভেম্বর)। অনতিকাল পরে কামরাণের ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে মক্কায় প্রেরণ করা হয়। গমনকালে কামরাণ তাঁহার পুত্রকন্যাকে জ্যেষ্ঠের করে সমর্পণ করিয়া যান। হুমায়ূন ভ্রাতার শেষ অনুরোধ সযত্নে পালন করিয়াছিলেন; কিন্তু আক্‌বর ভবিষ্যতে সে পবিত্র বিশ্বাস অটুট রাখিতে পারেন নাই; ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে উজ্‌বেগ-বিদ্রোহের সময় কামরাণ-পুত্র আবুল কাসিমকে সিংহাসনের কণ্টকজ্ঞানে গোয়ালিয়রে গুপ্তহত্যা করাইয়া জনসমাজে তাঁহার করুণাময় খ্যাতি কলঙ্কিত করেন। আক্‌বরের এই দুর্নীতি তাঁহার বংশ পরম্পরায় শাহজহান্ ও আওরংজীব কর্ত্তৃক সমধিক পরিমাণে অনুসৃত হইয়াছিল।

এদিকে সম্রাটের একমাত্র জীবিত ভ্রাতা অস্করী জ্যেষ্ঠের বশ্যতা স্বীকার করিয়াও প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের প্রয়াস করিতে লাগিলেন। ভবিষ্যতে নিরাপদ হইবার জন্য হুমায়ূন ভ্রাতাকে মক্কা পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু সে পুণ্যতীর্থ দর্শন অস্করীর অদৃষ্টে ঘটিল না; পথিমধ্যেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় (১৫৫৭-৫৮ খ্রীঃ)।

কামরাণ ও অস্করীর হস্ত হইতে হুমায়ূন এখন নিরুদ্বিগ্ন। জীবনের চিরাকাঙ্ক্ষিত দিল্লীর হৃত সিংহাসনের উপর পুনরায় তাঁহার লালায়িত দৃষ্টি অবাধে ধাবিত হইল। শের্ শাহ্‌র বংশধর ইস্‌লাম্ শাহ্‌ও মৃত (১৫৫৪), আফগানগণ গৃহ বিচ্ছেদে হৃতবল; নষ্ট সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের ইহাই চরম এবং পরম সুযোগ। তিনি পরিবারবর্গ ও শিশুপুত্র মুহম্মদ হকীমকে নিরাপদ কাবুলে রাখিয়া বয়রাম্ খাঁকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া, আক্‌বর সমভিব্যাহারে সমরাভিযান করিলেন (১৫৫৪ নভেম্বর)।

দিল্লীর সিংহাসন পণ করিয়া শের শাহ্‌র আত্মীয়গণ তখন রণস্থলে দ্যূতক্রীড়া করিতেছিলেন। ইস্‌লাম্ শাহ্‌র শিশুপুত্র ফিরোজ শাহ্‌কে হত্যা করিয়া তাঁহার মাতুল মুহম্মদ শাহ্ আদিল্ দিল্লীর অধীশ্বর হইলেন; কিন্তু রাজদণ্ড ধরিলেন নীচ জাতীয় হিন্দু,—তাঁহার উজীর হীমু। সহজেই ছত্রভঙ্গ উপস্থিত হইল। শের শাহ্‌র এক ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্রাহীম্ খাঁ সুর বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন। শেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (?) সিকন্দর সুর পঞ্জাব হস্তগত করিয়া, তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন।

এই ছত্রভঙ্গ প্রবাসী হুমায়ূনকে স্বর্ণ সুযোগ প্রদান করিল; অবিলম্বে লাহোর তাঁহার পদানত হইল (১৫৫৬ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী) সিকন্দর বিপুল বাহিনী লইয়া বিধিমতে তাঁহাকে বাধা-দানের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু, ২২এ জুন সর্‌হিন্দ্-সমরে সম্রাট্-সেনাপতি বয়রামের রণ-কৌশলে আফ্‌গান-সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল; বিতাড়িত সম্রাটের সৌভাগ্য-সূর্য্য পুনরুদিত হইল; পরাজিত সিকন্দর সেওয়ালিকের পার্ব্বত্য-প্রদেশে আশ্রয় লইলেন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পঞ্চদশ বর্ষ পরে হুমায়ূন দিল্লীর সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত হইলেন।

নভেম্বর মাসে আক্‌বরকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান হইল; কিন্তু ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক এ গুরুভার

বহনে অসমর্থ; বয়রাম্ খাঁ অভিভাবকরূপে তাঁহার সহগামী হইলেন।

হুমায়ুন নষ্ট-সাম্রাজ্য পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিলেন; কিন্তু বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে রাজ্যসুখ সম্ভোগ লিখেন নাই। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে এক দিন সায়াহ্নে সম্রাট্ শেরমণ্ডল প্রাসাদ হইতে অবতরণ কালে মসৃণ মর্ম্মরে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ৪৯ বর্ষ বয়সে এই গুরুতর আঘাত তাঁহার সহ্য হইল না; তিন দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

হুমায়ূন এবং বাবরের ভাগ্যচক্রের উত্থান-পতন প্রায় অনুরূপ—একদিন সম্রাট্, পরদিন পথের ভিখারী। দুর্ভাগ্যের চিহ্নিত-সেবক হুমায়ূনের জীবন-কাহিনী যেমন বিচিত্র, মৃত্যু তেমনই বিস্ময়কর। দ্বিতীয়বার সিংহাসন অধিকার করিয়া দুরদৃষ্ট-তাড়িত সম্রাট্ যেন পুত্র আক্‌বরের জন্য সাম্রাজ্যের রাজপথ পরিষ্কৃত করিয়া গেলেন। *

* এই প্রবন্ধে যে সকল চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একখানি মিঃ লেনপুলের 'বাবর' হইতে, একখানি মিঃ স্মিথের 'আক্‌বর' হইতে এবং অবশিষ্টগুলি খুদাবক্স লাইব্রেরীর চিত্র হইতে গৃহীত। এজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে।

বিধিলিপি

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

নবম পরিচ্ছেদ

দিন দুই তিন পরেই নিরঞ্জন বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিল। নিরঞ্জন ভাবিয়াছিল, মহেন্দ্র যদিও তাহার সঙ্গে ফিরিল না, তথাপি অন্ততঃ তাহাকে আরও দুই চারি দিন সেখানে থাকিতেও অনুরোধ করিবে; কিন্তু মহেন্দ্রের সেরূপ কোন ভাবই বুঝিতে না পারিয়া সে মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণও হইল। অগত্যা নিরঞ্জনই তাহাকে প্রশ্ন করিল "পূজো তো এসে পড়্‌ল মহেন্দ্র বাবু, বাড়ী যাবেন না?"

"বাড়ী? আমার আর বাড়ী কোথায় নিরঞ্জন?" নিরঞ্জন আঘাত পাইয়া একটু নীরব হইল; তারপরে আবার বলিল "যে বাড়ী আপনাকে চিরদিন কোলে করে আছে, যার কোলে ছোট থেকে বড় হয়েছেন, সেই আপনার বাড়ী।" মহেন্দ্র কোন' উত্তর দিল না, কেবল একটু হাসিল মাত্র। নিরঞ্জন বলিল "কিন্তু একটু আমার বল্‌বার আছে। আমি যতটুকু দেখেছি, ততটুকুর কথাই অবশ্য বল্‌ছি। তাঁদের তো আপনার উপর স্নেহহীন বলে বোধ হয় না।" মহেন্দ্র গম্ভীর মুখে বলিল "স্নেহহীন! না। আমার মত অনাথ দরিদ্রের ছেলেকে যাঁরা এতকাল ধরে পালন করেছেন, তাঁদের কি নিঃস্নেহ বলা চলে?" "উনি আপনাকে ঠিক্ মায়ের মত চক্ষে দেখেন বলেই আমার মনে হয়েছিল। আপনি তাঁদের কাছে এই বৎসরকার দিনেও যাবেন না?" মহেন্দ্র অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কিছুক্ষণ পরে গাঢ় স্বরে বলিল "যাব; পূজোর পর বিজয়ার দিন হয় ত, মাকে প্রণাম করে আস্‌ব।" ক্ষুণ্ণ নিরঞ্জন তাহার পানে চাহিয়া বলিল "পূজোর ক'টা দিন বন্ধুদের বাড়ীই চ'লুন না কেন! বন্ধুর বাড়ী কি বাড়ী নয়?"

মহেন্দ্র উভয় হস্ত মস্তকে ঠেকাইয়া বলিল "আমায় অপরাধী কর না নিরঞ্জন! সে আমার আশ্রয়দাতা প্রতিপালকের বাড়ী, সে আমার দেবমন্দির।" "বাবার সম্বন্ধে আপনার যা ইচ্ছা বলুন বা ভাবুন, আমার তাতে আপত্তি কর্‌বার কিছু নেই; কিন্তু আমায় কেন আর আপনি বন্ধু বলে ভাবেন না মহেন্দ্র বাবু? কেন এত পরের মত দেখেন?" বলিতে বলিতে নিরঞ্জনের স্বর যেন বাধিয়া আসিল; পাছে মহেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারে, সেই লজ্জায় সে নীরব হইয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। মহেন্দ্রও ক্রমে একটু বেশী রকম বিস্মিত হইতেছিল। তাহার মত লোকের উপরেও ইহাদের এতখানি মনোযোগ কেন। সে কি নিরঞ্জনের বন্ধুর উপযুক্ত? নবীন জীবনের চাপল্যে যখন সে প্রথম নিরঞ্জনের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল বা আলাপ-সূত্রে ক্রমে তাহার সহিত সৌহৃদ্যের সূচনা হইয়াছিল, তখন কি মহেন্দ্র নিজের ভবিষ্যতের বিষয়ে এতখানি ভাবিয়া লইতে পারিয়াছিল? তখনো যে আশা ছিল। যতদিন

প্রণয় লিপি

শিল্পী- শ্রীচন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

Emerald Printing Works
CALCUTTA

হইতে সে আশা সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেও ততদিন হইতে জগতের সহিত তাহার সামান্য স্নেহের লেনা-দেনার ব্যবসাও তুলিয়া দিতেছে। ও-জিনিটা এ জগতে সে আর কাহারো নিকট হইতে সামান্য পরিমাণেও লইবে না—অন্তরে তাহার এই দৃঢ়পণ! না, বন্ধুত্ব-বন্ধনও সে আর সহ্য করিতে পারে না, জগতের স্নেহের উপর এমনি সে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু নিরঞ্জন এ কি করিতেছে? তাহার কি বন্ধুর অভাব? নিরঞ্জনের জীবন আর তাহার জীবনে কিসের এমন সমত্ব আছে, যাহাতে ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র এই তরুণ যুবক তাহার সহিত বন্ধুত্ব যাচনা করে? তার মতন অভাগার উপরেও তাহার কেন এত স্নেহ? স্নেহ? না না, জগতে ও-নাম তাহার পক্ষে যে উপহাস। তাহা নয়! এ কেবল উদার অন্তঃকরণের অনুগ্রহ মাত্র। যাহাদের অভাগা বলিয়া ইহারা বুঝিতে পারে, তাহাদের উপর ইহারা এমনিই করুণা পরবশ হইয়া উঠে; তাহার অনেক প্রমাণই যে সে দেখিয়াছে।

মহেন্দ্র ধীরে-ধীরে উত্তর দিল "এমনি বিচিত্র পথেই আমার এ জীবন চল্‌ছে নিরঞ্জন! জগতে বিধিদত্ত কোন অধিকার পাইনি বলেই হয় ত মানুষের দয়া বা স্নেহকেও আমি নিতে পারলাম না। আশৈশব যাঁদের দয়ায় ও স্নেহে আমার শরীর পুষ্ট, তাঁদেরও এই অকৃতজ্ঞতা দিয়ে চলেছি; আবার তোমরাও যদি আমায় এমনি অযাচিত স্নেহ দিতে এস, কে জানে তোমাদেরও আমি কতখানি কৃতঘ্নতা দিয়ে বস্‌ব। সেই জন্যই বল্‌ছি, আমায় স্নেহ-বন্ধনে বাঁধতে বৃথা চেষ্টা পেও না ভাই, সে আমারও সহ্য হবে না, তোমরাও কষ্ট পাবে। ও-জিনিষটা আর আমার ধাতে সইছে না।" নিরঞ্জন স্তব্ধ হইয়া গেল; এ কথার উপরে আর ত কথা চলে না। তাহার একবার মনে হইল বন্ধুত্ব যাচ্‌ঞা করার উত্তরে এ কথা কি অপমানের মতই নয়? মহেন্দ্রের উপরে তাহার রাগ হওয়া কি উচিত নয়? উচিত তো নিশ্চয়ই, কিন্তু নিরঞ্জন নিজেই বিস্মিত হইতেছিল যে—কেন তা হইতেছে না। উপরন্তু, যখন সে বাটী যাইবার জন্য ঘোড়ায় উঠিল, এবং মহেন্দ্র তাহার সঙ্গে-সঙ্গে গ্রামের প্রান্ত-ভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাকে বিদায় দিল, তখন সে সহসা বলিয়া উঠিল "আপনি যাই বলুন মহেন্দ্রবাবু, চিরদিন আপনাকে বন্ধু বলেই জান্‌ব, আর সেই রকম দাবীও কর্‌ব! এতে আপনি যতই বিরক্ত হন্, আর যাই করুন।" নিরঞ্জন আর দাঁড়াইল না—ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। খানিকটা গিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, মহেন্দ্র সেই স্থানেই একভাবে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। এই মহেন্দ্র কি সত্যই এমন হৃদয়হীন বর্ব্বর যে, আন্তরিক সৌহৃদ্যেরও সম্মান জানে না? মহেন্দ্রকে ঐ কথাটা বলিয়া যখন সে ঘোড়া ছাড়ে, তখন একনিমিষে মহেন্দ্রের যে বিচলিত মুখশ্রী, সজলায়ত চক্ষু তাহার নজরে পড়িয়াছিল, সে কি বর্ব্বরে কখনো সম্ভব হইতে পারে! আর ঐ যে সে মাঠের পানে দৃষ্টি মেলিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে, এতদূর হইতেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন জানাইয়া দিতেছে, সে ব্যথিত, সে জগতের নিকট বড় অবিচার-প্রাপ্ত! নিরঞ্জন সমস্ত পথ এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

নিরঞ্জন দৃষ্টিপথের অতীত হইলেও অন্যমনা মহেন্দ্র কিছুক্ষণ সেইদিকেই একভাবে চাহিয়া ছিল, পরে সহসা যেন সংযত হইয়া প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিল এবং তারপরে গ্রামের দিকে ফিরিল। কয়েকখানা মেটে বাড়ী অতিক্রমের পর ইটের প্রাচীর ঘেরা একটা একতালা অথচ বেশ একটু সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের দ্বারের নিকট দিয়া যাইতেই কে যেন তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে একটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া উঠায় মহেন্দ্রও বিস্মিত ভাবে সেই দিকে দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল, সেদিন কন্যাসহ যাঁহাকে বিলের ঘাটে দেখিয়াছিল, সেই রমণীই সেই গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। মহেন্দ্রকেও থমকিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন "সত্যই কি বাবা তুমি? তোমায় যে আবার দেখ্‌তে পাব, এ আর মনে করিনি।" মহেন্দ্রের মনে পড়িল একদিন ইঁহাকে সে আশ্বাস দিয়াছিল, শীঘ্রই ইঁহার আবাস খোঁজ করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবে; কিন্তু পরে এ কয়দিন এ কথা তাহার মনে পড়া দূরে থাকুক, ঘটনাটাই প্রায় সে ভুলিয়া বসিয়াছে। এক্ষণে ইঁহার সম্মুখে পড়িয়া সমস্ত কথা স্মরণ হওয়ায় লজ্জিত মুখে মহেন্দ্র বলিল,—"আমার ভুল হইয়াছিল; আপনার বাড়ী খোঁজ করে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌ব ভেবে-ছিলাম, কিন্তু তারপরে কেমন ভুলে গিয়েছিলাম মা—" "সেজন্য তোমায় লজ্জা পেতে হবে না বাবা, তোমায় যে আমি আবার দেখতে পেলাম, এই-ই যথেষ্ট! তোমাকে

যে আমাদের মানুষ বলেই মনে হয়নি ক।" মহেন্দ্র দ্বিগুণ লজ্জা বোধ করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল "আমার খুবই অন্যায় হয়ে গেছে।" "কিছু অন্যায় হয়নি। এখন কি তবে আমার বাড়ীতে একবার পায়ের --" বাধা দিয়া মহেন্দ্র ত্রস্তে বলিল "কি বলেন মা, আমি যে আপনার ছেলের মত, ওতে আমার অপরাধ হয়" বলার সঙ্গেসঙ্গেই নত হইয়া রমণীর পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। রমণী একটু সরিয়া গিয়া মহেন্দ্রের অলক্ষ্যে দুইহাত কপালে ঠেকাইয়া বলিল "বলেছি তো বাবা, তোমায় আমি মানুষের ছেলে বলে মনে করতেই পারিনি, এখন দেখ্‌ছি তুমি বামুণের ছেলে বামুণ! প্রণাম কর্‌লে যখন, তখন আমি যে তোমার মায়ের মত, একথা আমিও স্বীকার করে নিচ্চি। তা'হলে আমার বাড়ীর মধ্যেও তোমায় তো আমি না বল্‌লেও যেতে হবে।" "চলুন" বলিয়া মহেন্দ্র তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। রমণী ডাকিল "কমা, ছাখ কে এসেছেন?"

অঙ্গনে দুইতিনজন দাসদাসী কর্ম্মে ব্যস্ত রহিয়াছে—এবং একজন বৃদ্ধা তাহাদের কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কমলার মাতার কথায় সকলেই মুখ তুলিল এবং অপরিচিত প্রিয়দর্শন যুবককে দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় চাহিল; কেবল একজন দাসী ব্যস্ত হইয়া উঠিল। "ওমা, তেনাকে কোথায় পেলে? বাড়ীতেই ওনাকে যে দেখতে পাওয়া যাবে এ কে ভাব্‌তে পেরেছিল? ঘাটে পথে বেরুই আর তাকাই যে সেদিনের ঠাকুরমশাই কি এ গাঁয়ে আছেন! তা থাক্‌লে কি এতদিন আমাদের দেখ্‌তে বাকী থাক্‌ত। ওনাকে কোথায় পেলে মাঠাকরুন" বলিতে বলিতে গোময় লিপ্ত হস্তে অগ্রসর হইয়া সে মহেন্দ্রের উদ্দেশে অঙ্গনেই দুই চারিবার মাথা ঠুকিল। মহেন্দ্রও ইহাকে চিনিতে পারিল। সেদিন বিলের ঘাটে এই দাসীই ইহাদের সঙ্গে ছিল বটে। দাসীর এই কথাতেই মহেন্দ্রের পরিচয় যেন তাহারা পাইয়াছে, তাহাদের মুখচোখের ভাবে ও সানন্দ বিস্ময়ে মহেন্দ্র তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। বর্ষীয়সী রমণীটিও "এ ছেলেটিকে কোথায় পেলে—কেমন করে দেখ্‌তে পেলে বাছা? আহা তাই ত—দেবতার মতই চেহারা তো বটে। এস বাবা এস, আমাদের আজ পরম ভাগ্য" বলিয়া মহেন্দ্রকে অভ্যর্থনা করায় মহেন্দ্র এইবার একটু বেশী সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ইহাদের অত্যধিক ভক্তিবাহুল্যে সে যেন কেমন একটু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। কমলার মাতা তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসি মুখে বলিলেন "এটি আমার ছেলে হয়েছে পিসিমা! শিবের মন্দির থেকে এসে বাড়ীর দুয়োরে পা দিতেই দেখি ওদিক থেকে আস্‌ছেন, অমনি ডাক্‌লাম। তোমার নাম কি বাবা?" "মহেন্দ্র—মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

"আমার পিসিমাকে প্রণাম কর বাবা, উনি তোমার দিদিমা হলেন যে।" অপ্রস্তুত মহেন্দ্র বর্ষীয়সীর পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিতেই তিনিও "আঃ, আশ্বিন মাসের দিন বামুণ হয়ে গড় হয়ে পেন্নাম কর্‌লে বাছা" বলিয়া হাসি মুখে দুই হাত কপালে ঠেকাইলেন। মহেন্দ্র এইবার সপ্রতিভ ভাবে বলিল "কেন ওঁর কাছে শুন্‌লেন তো, আপনি আমার দিদিমা হন্‌, তাতে আর প্রণামে দোষ কি!" "তা বটে তা বটে, বাছা, না দাদা—যা বল নিজের গুণেই বল। ও হতভাগীর কি এমন ভাগ্যি হবে যে, তোমার মতন ছেলে পাবে। তা যদি হত, তা হলে আজ ওর কি এমন দশা হ'ত। সে কপাল কি ওর বাবা!"

মহেন্দ্র কিন্তু চারিদিক চাহিয়া সম্পন্ন গৃহস্থালীর অধিকারিণী সেই দিব্যদর্শনা সৌম্যা শান্তা বিধবার 'মন্দ দশার' কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। ইঁনি যে সেই জমীদারের উদ্ধত কর্ম্মচারীটাকে চাকর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পদস্থাই যে ইঁনি বটেন, তাহা মহেন্দ্র বেশ বুঝিতে পারিল। বিস্তৃত অঙ্গনের একপার্শ্বে সারিসারি ধান্যের গোলা, গোশালায় সুদর্শন গাভী, বৎসের বাহুল্য, অন্যদিকে সুবিন্যস্ত ইষ্টক-গৃহগুলি এ গৃহের স্বামিনী যে একজন গ্রাম্য বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তির কন্যা, তাহার পরিচয় দিতেছিল।

মহেন্দ্রের কৌতূহলী চক্ষের দিকে চাহিয়া পিসিমার উৎসাহ বাড়িয়া গেল। তাঁহার মত বয়সে একজন মনোযোগী শ্রোতা পাইবার বিশেষই প্রয়োজন হইয়া পড়ে,—বিশেষ যদি সে নবাগত এবং তাঁহাদের কাহিনীর বিষয়ে অনভিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে তো আর কথাই নাই। পিসিমা বলিয়া চলিলেন "আপনার রাজত্বে আপনি চোর যাকে বলে, তাই আর কি! সে কি একটা সোজা বিষয়! একটা রাজত্বি। দাদারও আমার যেমন এক মেয়ে মহামায়া, তেমনি জুটল ও কি এক বাপের এক ছেলে এক

রাজপুত্তুর! রাজপুত্তুর না ত কি! নগাঁর জমীদারেদের নাম এ পৃথিমিতে না জানে কে? হাতীই তাদের কত! সম্পত্তিই বা কি! আহা তা সবই ভস্মে ঘি পড়ল! কপাল পুড়ল পুড়ল একটা ছেলেও যদি থাকত! পঁচিশ বছর ছেলে হলনা-হলনা করে মার আমার যদি ঐ কমা হ'ল, তো মেয়ে হয়েই বাপ্‌কে অমনি খেলেন। আর কোত্থেকে শ্বশুর মিন্‌সের প্রথম পক্ষের কোন্ যুগের বিয়ের এক মেয়ে কবে মরে গিয়েছিল, তারই পেটের নাকি একটা ছেলে—তিনিই এসে শোকে দুঃখে মতিচ্ছন্ন বুড়ো মিন্‌সেকে হাত করে বসে,—যার সর্ব্বস্ব তাকেই দিলে শ্বশুরের দুচক্ষের বিষ করে! কোথায় রাম রাজা, না কোথায় বনবাস! মা আমার একবছরের মেয়ে কোলে করে ভাগ্‌নের দৌরাত্মীতে বাপের বাড়ী চলে এল! আহা—সেদিন দাদার আমার কি দিনই গিয়েছে! সেই বা ক'দিনের কথা, এগারো বছর হল কি না হল! দাদা আমার সেই জামাইয়ের শোকে পাঁচটা বছরও আর বাঁচ্‌তে পারলেন না"—কমলার মাতা দেখিলেন পিসিমাকে বাধা না দিলে আর চলে না; বলিলেন—"পিসিমা, কমা কই? কোথায় গেল সে?" "যাবে আবার কোথায় বাছা! তাকে কি চক্ষের আড় আর হ'তে দিই? ঠাকুরঘরেই তো পুজোর গোছ কচ্ছিল এতক্ষণ! এখন হয় ত রামায়ণ নিয়ে কোন্ কোণায় ঢুকেছে। নিজেও বাছা বাপের শিক্ষেয় ছোট থেকে অমনি কর্‌তে,—মেয়েকেও তাই শিখুলে মেয়ে;—মানুষের ওসব শাস্তর পড়ায় কি যে ভাল হয়, তাও তো বুঝিনে।" সেই দাসীটির আর সইল না, সেও এ প্রসঙ্গে যোগ দিয়া ফেলিল "দিদিমা ঠাকুরণের মন পাবার জো নেই। ওমা, এই দিদিমণির কাছ থেকে কত পুঁথি শোন, কত 'পিতিষ্ঠে' কর, আবার তুমিই এই কথা বল্‌ছ। ঐ তো মেয়ে, কেমন পুঁথি শোনায়, আমরা অবাক্ হয়ে যাই, আর তুমি কি না আজ নিন্দে কর্‌ছ।" "তুই থাম্ তো বাছা, বলে যতই হোক্ মেয়ের বিধি বই তো নয়! আজ যদি ও ছেলে হত, তাহলে কি ওর মার এত দুর্দ্দশা হয়। পয়ার পড়্‌তে পারলেই যদি দুঃখু যেত—"কমলার মাতা নিজে অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন, "এস বাবা, ঘরে বস্‌বে এস, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাক্‌বে, উঠোনে বড় রোদ,—দালানে চল।" পরিচ্ছন্ন অঙ্গনটি পার হইয়া উভয়ে রোয়াকে উঠিলে কমলার মা আবার আহ্বান করিলেন "কমু"! কোন্ ঘরের কোণ হইতে একটী ছোট্ট 'উঁ' শব্দ উভয়ের কাণে আসিল। "বেরিয়ে আয় শীগ্‌গির, ত্থাখ্ কে এসেছেন।" ঝুন্ ঝুন্ শব্দে সেই বিলের তীরে দৃষ্ট কিশোরী বালিকাটি বাহিরে আসিয়াই অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। মাতা বলিলেন "দেখ্‌ছিস্ কে? প্রণাম কর্—আজ থেকে ইনি তোর দাদা হলেন্।" কমলা প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই মাতা বলিলেন "আসন এনে দালানে পেতে দে।" মহেন্দ্র এইবার বাধা দিয়া বলিল "ছেলেকে কি মায়ে আসন পেতে বস্‌তে দিতে বলে থাকে?" নিজের কথা ক্রমশঃই মহেন্দ্রর বুকে যেন এতক্ষণ মৃদু-মৃদু আঘাত দিতেছিল। ইঁহাদের পরিচয় জানিয়া ঘাটের সেই ব্যাপারটার অর্থ অবিষ্কার করার কৌতূহলেই সে বুকের সেই মৃদু আঘাতগুলাকে এতক্ষণ বল করিতে দেয় নাই; এখন এই মা ও ছেলে এই কথাটা বার-বার উচ্চারণ করিতেই সে আঘাতটা সহসা যেন এইবার হাতুড়ির মত তাহার বুকে এক ঘা বসাইয়া দিল। তাহার সেই স্নেহময়ী মা থাকিতে সে কি না আজ কোন্ একজন অপরিচিতাকে 'মা' বলিতেছে এবং নিজে তাহার ছেলে হইতেছে! হায়, তাহার কি আর এই দুইটা শব্দ মুখে উচ্চারণ করিতে আছে, না জগতের আর কোথাও এই সম্বন্ধ পাতাইতে আছে? মা, তাহার সেই মা, সেই মাকেই যখন সে মা বলিয়া ডাকিতে পায় না, ছেলের মত কাছে থাকিতে পায় না, তখন আবার সেই নাম লইয়া ব্যবহার! না না, ভদ্রতার দায়ে, সৌজন্যতার খাতিরেও জগতে মহেন্দ্র আর কাহাকেও মা বলিয়া ডাকিতে পারিবে না—ভাবিতে পারিবে না এবং কাহারো ছেলেও হইতে পারিবে না। ইহাদের সহিত আর বেশী ঘনিষ্ঠতা সে পাতাইবে না, দু'চার কথা কহিয়া এখনি চলিয়া যাইব।

মহেন্দ্র যখন নতমুখে দাঁড়াইয়া তাহার অন্তরের এই বিদ্রোহকে ভদ্রতা-রক্ষার উপযোগী আবরণে যথাসাধ্য আচ্ছাদন দিতে ব্যস্ত, ততক্ষণ কমলা একখানা আসন আনিয়া দালানে পাতিয়া দিয়াছে। কমলার মাতা মহেন্দ্রকে অন্যমনস্ক ভাবে বাহিরেই দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার কথার উত্তর স্বরূপে শান্তস্বরে বলিলেন "দয়া করে তুমি নিজেকে ছেলে বলেছ, তাই আমার এ সাহস, নৈলে তোমার মত ছেলের মা হবার ভাগ্য তো আমি করিনি বাবা। তোমার পরিচয়ও আমি জানিনে, আমারও তুমি জান না;

কেবল নিজের স্বভাবের যে পরিচয় দিয়েছ, তাতেই ঘরে এনে আসনে বসাতে পার্‌লে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি! সেদিন যে সর্ব্বনাশ হ'তে আমাদের তুমি বাঁচিয়েছ, তাতে তোমার আবার দেখা পাওয়াই আমি যথেষ্ট বলে মনে কর্‌ছি। তার বেশী যা বল্‌ছ যা কর্‌ছ বাবা, তাতে তোমার সেই মহত্ত্বেরই পরিচয় দিচ্চ। আমার মত দুর্ভাগিনীর কি তোমায় ছেলে বলার আস্পর্দ্ধা হতে পারে! আসনে এসে বস,—এই-ই আমার পরম ভাগ্য বলে মান্‌ব।"

মহেন্দ্র নিজের মনের ঔদ্ধত্যের নিকটে সহসা নিজে যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল! এই ভদ্র পরিবার তাহাকে উপকারী এবং নিজেদের উপকৃত বোধ করিয়াই তাহার সহিত এইরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিতেছে! তাহার অন্তরের মাতা-পুত্র সম্বন্ধের উপর দস্যুতা করিবার জন্য ইহাদের এ আত্মীয়তা করা নয়। জগতে উপকারের বিনিময়ে যাহারা এ কৃতজ্ঞতাটুকু না প্রকাশ করে, জগতের খাতায় তাহাদের নাম অকৃতজ্ঞ! মহিলাটির তো স্নেহ-প্রকাশের কোন বাহুল্য নাই; অপরিচিত একজন যুবককে একবার মাত্র দেখায় তিনি তো স্নেহাভিনয়ের বাড়াবাড়ি রকম অশিষ্টতা করিতেছেন না। মহেন্দ্র তাঁহাকে মাতৃসমানা বলাতেই তিনি ভদ্রতার সহিতই সে সম্বন্ধের কথা এক-এক বার উল্লেখ করিতেছেন মাত্র; কিন্তু উপকারীর উপর লোকে সাধারণতঃ যে সম্ভ্রমটুকু প্রকাশ করিয়া থাকে, ইনি তাহারও অধিক করিতেছেন। এই বয়োজ্যেষ্ঠা সম্ভ্রান্ত রমণীটির এতটা সম্ভ্রম গ্রহণ করাই যে মহেন্দ্রের পক্ষে অসঙ্গত। ঘটনাক্রমে যখন ইহার সহিত পরিচয় ঘটিয়া গিয়াছে, তখন মাতৃশব্দ ব্যবহার না করিলে ইঁহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে? মহেন্দ্রের না হয় এইখানে একরাশ ব্যথা লুকানো আছে; কিন্তু জগতের রমণীদিগকে সম্বোধনের এই যে সার্ব্বভৌমিক শব্দ,—এ শব্দকে ব্যবহার না করিলে তাঁহাদের সহিত আপ্যায়নের আর তো পথ নাই! সৌজন্যও তাহা হইলে রক্ষা হয় না। মহেন্দ্র লজ্জিত কুণ্ঠিত ভাবে আসনখানার একপাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল "আপনি অত করে বল্‌লে আমি বেশীক্ষণ বস্‌তে পারব না! মানুষ মাত্রেই যা করে থাকে, তার বেশী কি এমন কাজ হয়েছে যে আপনি বারে বারে সেই কথা উল্লেখ কর্‌ছেন।" "মানুষ মাত্রেই করে কি বাবা! যারা সেদিন আমার অপমান কর্‌ছিল, তারাও তো মানুষ। আমার এতখানি বয়সের অভিজ্ঞতায় সেদিন যে দুরকমের মানুষ দেখ্‌লাম, তা এতদিন আর যেন দেখিনি। এক দেখ্‌লাম যারা সর্ব্বস্ব নিয়েছে তাহাদের তাতেও তৃপ্তি নেই, তারা আরও সর্ব্বনাশ কর্‌তে চায়, আর এক দেখ্‌লাম যাকে কখনো দেখিনি,—জানিনি, সেও এসে সেই সর্ব্বনাশের সময় বুক দিয়ে রক্ষা করে,—বাঁচায়।"

রমণীর চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল। মহেন্দ্র এবার বিচলিত অন্তঃকরণে বলিল "সে কথা ছেড়ে দেন্, মানুষের মধ্যেই পিশাচও আছে, আবার কেউ বা মানুষ। যাক্ আপনি যে সেদিন কি বল্‌বেন বলেছিলেন?" "তোমার পরিচয় মাত্র চেয়েছিলাম বাবা! আমার দুর্ভাগ্যের কথা বলে তোমার মত ছেলেকে আর বেশী উদ্বিগ্ন কর্‌তে চাই না। তুমি যে সেদিন আমাদের সেই বিপদে—" বাধা দিয়া মহেন্দ্র বলিল "আমি এমন কেউ নই মা, যার পরিচয়ের জন্য আপনি ব্যস্ত হয়েছেন, আমি এই গ্রামের জমীদারের একজন কর্ম্মচারী মাত্র, এঁর মহালের তদারক করে বেড়াই।" "বাবা, একে তো পরিচয় বলে না—কোন্ গ্রামে তোমার বাড়ী, বাপের নাম কি, এই শুন্‌তে চাই।" "জমীদারের গ্রামেই আমি থাকি, আমার নিজের কোন পরিচয় নেই যা আপনাকে বল্‌তে পারি। আমি পরান্নে প্রতিপালিত, পরের ঘরই আমার ঘর—জ্ঞান জন্মাবার আগেই আমি পিতৃহীন।" "তোমার কি মাও নেই বাবা?" "মা—হ্যা না, আমার মাও নেই" মহেন্দ্রের মুখের অস্বাভাবিক বিবর্ণতা দেখিয়া কমলার মাতা এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এখানে তুমি কি অল্পদিনই এসেছ?" "মাসখানেক হবে। আবার শীঘ্রই এখান থেকে চলে যাব।" "তোমায় কি কেবল এমনি করে ঘুরেই বেড়াতে হয়।" "হ্যাঁ, এখন আপনার কথা বলুন মা, সেদিনের সে লোকগুলো কেন আপনাকে আপনার অমতে মেয়ে নিয়ে যাবার জন্য বাধ্য কর্‌ছিল্! এই একটি সন্তানই বুঝি আপনার?" "হ্যাঁ বাবা—আর তাই নিয়েই এই দশবৎসর যতদূর সম্ভব নিশ্চিন্তও ছিলাম! আমি থাকলে যাদের স্বার্থে বাধা পড়ত,—তাদের আমার জীবন্ত শ্বশুর আর মৃত স্বামীর ভিটা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আসায় তারা এ পর্য্যন্ত আমায় আর কোন উৎখাত্ করেনি। এখন শুন্‌ছি আমার শ্বশুরঠাকুর মৃত্যু-শয্যায়, তাই তারাও আমার ওপর আবার নতুন করে দৌরাত্ম্য বাধিয়েছে।" মহেন্দ্র উৎসুক ভাবে

চাহিয়া বলিল "কেন? আপনার পরিচয় আর আপনার জীবনের কথা আপনার পিসিমার মুখে যা শুন্‌লাম, তাতেই অনেকটা বুঝ্‌তে পেরেছি; কিন্তু এখন তবে আপনার ভাগ্নের আপনাকে বিব্রত করার উদ্দেশ্য কি। পরেশ বাবু যখন এতদিন তাঁর দাদামশায়কে হাত করে রেখেছেন, তখন নিশ্চয়ই সম্পত্তিও লেখাপড়া করে নিয়েছেন, নইলে অবশ্য তিনিও কিছু পেতে পারেন না, কেন না তাঁর মায়েও তো বিষয় বর্ত্তায়নি! কমলার পিতাও যখন তাঁর বাপ বর্ত্তমানেই মারা গেছেন, তখন কমলাও কিছুই পাবে না; তবে অবশ্য আপনি মোকদ্দমাটমা করে তার ও আপনার খোর্‌পোষ বা তার বিয়ের খরচ এসব কিছু-কিছু আদায় কর্‌তে পারেন; কিন্তু তা আপনার বোধ হয় দরকারও নেই।" কমলার মাতা মহেন্দ্রের কথার উত্তর না দিয়া কমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন "কমু, ভাল করে একখানা জলখাবার সাজিয়ে আন্‌ তো।" মহেন্দ্র বাধা দিতে গেলে রমণী মহেন্দ্রের পানে এমনভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন, যাহাতে মহেন্দ্র বুঝিল যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াই কন্যাকে সরাইয়া দিতেছেন। মহেন্দ্র আর কিছু বলিল না। মাতা কন্যার মস্তকে হস্ত দিয়া তাহার আলুলায়িত সদ্যস্নানার্দ্র কেশগুচ্ছ-গুলি ঈষৎ স্পর্শ করিতে-করিতে বলিলেন, "সন্দেশ তো এখানকার তেমন ভাল নয়, কি খেতে দিবি তোর দাদাকে? শুধু ফল? তার চেয়ে দ্যাখগে, এতক্ষণ গাই দোহা হয়েছে। তোর দিদিমার কাছ থেকে দেখিয়ে টাট্‌কা ছানা করতে পারিস্‌ যদি, আর মোহনভোগ।" কমলা সোৎসাহে মাতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া বলিল, "আমি তো সেদিন ছানা করেছিলাম, আমি একাই পারব।" "না একা উনুনের কাছে যেও না মা, কোথায় কি হবে,—দিদিমাকে ডেকে নিয়ো।" মহেন্দ্র আবার বলিল, "ছানা মোহনভোগ বাদ দেন;—না কমলা, তুমি শুধু ফলই কেটে আন দেখি, যদি তার সঙ্গে হাত না কাটো, তবেই বুঝব খুব লক্ষ্মী মেয়ে তুমি।" কমলা সহজ মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আমি মোহনভোগও করতে পারি, ফলও কাটতে পারি, তাতে হাত কাটেও না, পোড়েও না, দেখ্‌বেন আপনি।"

"আচ্ছা তা না হয় দেখ্‌ব, কিন্তু তুমি কি কি পড়তে পার, তা কবে শুন্‌ব? শুন্‌লাম তুমি নাকি খুব ভাল পয়ার পড়তে পার? কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়্‌তে জান?" কমলা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া সলজ্জ হাসিভরা মুখে মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল "জানি"। মাতা বলিলেন "কাশী-দাসী মহাভারতের সব এখনো পড়ে উঠ্‌তে পারে নাই, কিন্তু রামায়ণ ওর কণ্ঠস্থ। তাহলে আর দেরী করিস্‌ না কমু।"

কমলা চলিয়া গেলে মহেন্দ্র বলিল "জল না খাইয়েও কি ছাড়্‌বেন না?" "বাবা, সেও তোমার দয়া,--বাড়ী এসে মিষ্টিমুখ না করেই যাবে?' "না-খাব বই কি। কেন পরেশ বাবু আপনাকে এরকম"- "হাঁ—সেই কথা বল্‌তেই আরও ওকে সরিয়ে দিলাম। ওর বড় ভীতু স্বভাব,—একটু ভয় পেলে ঘুমিয়েও এমন আঁত্‌কে-আঁতকে উঠবে, আর মুখ একেবারে শুকিয়ে এমন হয়ে যাবে--" "তা সেদিনও দেখেছি, ভয়ে যেন অজ্ঞানের মতই হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি আপনার দেখ্‌তেও যেমন কমলার মত, স্বভাবটিও ফুলের মতই নরম।"

মাতা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"কিন্তু ভাগ্য ভাল নয় বাবা, নৈলে এমন পেটে জন্মালো যে এক বছরের না হতেই সব ফুরিয়ে গেল! কার মেয়ে কার নাত্‌নি, কিন্তু ও আজ কোথায়!—তাতেও তো এ দশবৎসর একদিনও দুঃখ বোধ করিনি, যখন বাপের কি ঠাকুরদাদার কোলই পেল না, তুচ্ছ বিষয়ের জন্য কিসের ক্ষোভ! কিন্তু এখন আবার যে ভয় পাচ্চি, জানি না আরও ওর অদৃষ্টে কি আছে!" "ওর ওপরে তো তাদের আক্রোশের কোন কারণ দেখ্‌ছি না, তবে কেন?" "তারা বলে পাঠিয়েছিল যে শ্বশুর-ঠাকুর আমাকে আর কমাকে দেখ্‌তে চেয়েছেন। আমিও তাই শুনে ওকে নিয়ে যাবার জন্য তৈরী হয়েছিলাম, কিন্তু তাদের সঙ্গে যে বুড়ো ঝিটি আসে, দেখেছ তুমিও তাকে, সেই চুপি-চুপি আমায় এমন কথা বল্‌লে যে, শুনে আর তাকে নিয়ে যেতে সাহস কর্‌লাম না। বুড়িটি কমার বাপ্‌কে মানুষ করেছিল, তাই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বারে-বারে সে বারণ কর্‌লে"—বলিতে বলিতে কমলার মাতা উদ্গত অশ্রুকে অতি কষ্টে দমন করিয়া মহেন্দ্রের নিকটস্থ হইয়া মৃদু স্বরে বলিল "শুনছি শ্বশুরঠাকুর না:কি এখন তাঁর স্বর্গগত ছেলের নাম করে আর তাঁর নাত্‌নির নাম করে খুব কাঁদ্‌ছেন—আর উইল্‌ করে কমাকেও না কি পরেশের সঙ্গে বিষয়ের অর্দ্ধেক-অর্দ্ধেক ভাগ লিখে দিয়েছেন। পরেশ

এখন আর তাকে সাম্‌লাতে পারেনি,—অনেক লোকের সামনেই এই উইল হয়ে গেছে না কি !"

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ ! তাহলে তো তারা কমলাকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল্‌তেও পারে ।"

"তাও পারে, কিন্তু তার পত্রের ভাবে আর বুড়ীর কথায় আমার আর একটা সন্দেহ হয়েছে ।" "আর কি হতে পারে ? মেরে ফেলাই ত তাদের পক্ষে সব চেয়ে নিরাপদ !" কমলার মাতা অন্তরে অন্তরে একবার শিহরিয়া উঠিয়া পুনঃ-পুনঃ উদ্গত অশ্রুকে দমন করিতে-করিতে বলিলেন "আরো একটা উপায় তাদের হাতে আছে বাবা, যাতে মেরে ফেলারও বেশী কাজ করতে পারবে,—অথচ নিরাপদ থাকবে। শ্বশুরের ঘর বড় উঁচু, মুখ্য নিকষ কুলীন ওঁরা,—ওঁদের মেয়ে নীচু ঘরে দেবার জো নেই। যদিও আমি ইচ্ছা করলেই তা পারতাম, কিন্তু আমার বাবাও কুল ভাঙ্গতে বারে-বারে নিষেধ করে গেছেন, তাই বারো বছর বয়সেও এখনো কমার বিয়ে দিতে পারিনি। সমান কুলের পাত্রের জন্য আর দেরী না করে যদি এতদিন ওর বিয়ে দিয়ে দিতাম, তা হলে আমায় আজ এ ভাবনায় পড়তে হত না।" "ওরা কি তা হলে কমলার বিয়ের সম্বন্ধেই কিছু করতে চায় ? জোর করে কোথাও বিয়ে দিতে চায় বুঝি ?" "এ নিষ্ঠুর পরামর্শকে আন্দাজে কেউ ধরতে পারে না ! পরেশ লিখেছে, কুলভঙ্গ করে যে অঘরে মেয়ের বিয়ে দেন্‌নি, এতে আপনার ওপর আমি ও দাদামহাশয় বড়ই সন্তোষ হয়েছি, তিনি আপনার মেয়েকে উপযুক্ত যৌতুকের সঙ্গে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে দান করবারও সঙ্কল্প করেছেন ; আপনি মেয়ে নিয়ে শীঘ্র আসবেন।' তিনি যে উইল করেছেন একথা আমায় লেখেনি, তার লোকজনও কেউ বলেনি ; সে ভেবেছে এই যৌতুকের লোভেই আমি মেয়ে নিয়ে ছুটব। তা ছুটছিলামও বটে, কিন্তু সে কেবল তাকে একবার জন্মের মত দেখবার জন্য - কমাকেও একবার দেখাবার জন্য। মন্দ অদৃষ্টে তাও আর বুঝি ঘটল না। তাছাড়া আরও যে কি আছে, তাও যে বুঝ্‌তে পারছি না।" "বিয়ে দেওয়াটা নিশ্চয় ছল। নিজের কোটে নিয়ে গিয়ে যা ইচ্ছা তাই করত।" "বুড়ীর মুখে শুন্‌লাম, সে লুকিয়ে শুনেছে, তাদের পরামর্শ হয়েছে যে মেরে ফেলা ভয়ানক ল্যাঠা" বলিতে-বলিতে মহামায়া দেবী আর একবার চোখের জল মুছিয়া একটু যেন দম লইলেন। তাহার পরে বলিতে লাগিলেন, "পরেশরাই কেবল ওঁদের পাল্‌টি ঘর, তাই আমার শ্বশুর সেখানে কন্যাদান করেছিলেন। অনেক খোঁজ করেই তবে সমান ঘর পান্, নইলে এ অঞ্চলে না কি ওঁদের সমতুল্য ঘর আর নেই। তাই তারা পরামর্শ করেছে, সমান ঘরে বিয়ের ছল ধরে শ্বশুরের আদেশ বলে পরেশের সঙ্গেই কমার—" তিনি আর যেন বলিতে পারিলেন না, মহেন্দ্রও সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "সে কি ? পরেশবাবু যে সম্পর্কে ভাই হলেন। আপনার পিসতুতো ভাই না হলেও বৈমাত্র সম্বন্ধেও যে এ বিয়ে অবৈধ।" "কুলীনের কুলের দায়ে এ রকম অবৈধ বিয়ে কি কখনো শোননি বাবা ? এতে তাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক মানতে হয় না,—কেউ কারও কখনো নিকটস্থ হতে পায় না। কেবল এমনি করে তারা কুল রাখে! এই কুল-কাঠের আগুনে আমার কমাকে আহুতি দেবার জন্য সেই রাক্ষস ফন্দী এঁটেছে ! এতেই তারা তাকে মেরে না ফেলেও অনায়াসে তার বিষয়টাও দখল করতে পারবে।" মহেন্দ্রের বিস্ময় মাত্রা অতিক্রম করিতেছিল, "কি ভয়ানক ! আমি ভাব্‌ছিলাম বুঝি মেরেই ফেল্‌বে। কিন্তু এখন মনে হল,—না তাতে তো তাদের সুবিধা হবে না—তাহলে তখন বিষয় আবার আপনাকে অর্শাবে যে ! বরং বিয়ে করে তার পরে সেটা করলে তাদের সুবিধা হতে পারে।"

"তাই হয় ত করবে শেষে,—কিন্তু আপাততঃ তারা এই ফন্দীই এঁটেছে। সেদিন তুমি রক্ষা করেছ, কিন্তু বিপদ এখনো কাটেনি। শুনেছ তো বাবা, সেই গোপীনাথটার সম্বন্ধীই এই গ্রামের নায়েব। আমার বাপের জমিজমা দেখ্‌বার একজন কর্ম্মচারী আছেন ; এই গ্রামেরই লোক তিনি। তিনি আজ বল্‌ছিলেন যে, নায়েব না কি আমার বাপের কতটা সম্পত্তি, ক'জন আমার চাকর-বাকর—কৃষাণ-মুনিস ক'জন, তাই খোঁজ নিয়েছেন,—আর কৃষাণ বল্‌ছিল যে, মাঠে তাকে না কি নায়েবের একটা পাইক জিজ্ঞাসা করেছে, রাতে আমার বাড়ী তারা থাকে কি না,—ক'জন পুরুষ বাড়ীতে শোয়।"

মহেন্দ্র আসন হইতে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "সত্যি ? এতবড় ষড়যন্ত্র ? কিন্তু যাই হোক্, এ আপনি স্থির জেনে রাখুন, আর এ ফন্দী তাদের খাটবে না। আমি

এখানে থাকতে আপনাদের কোন ভয় নেই। দেখি তারা কতদূর করতে পারে!" কমলার মাতা ক্ষণকাল নির্নিমেষ নেত্রে মহেন্দ্রের পানে চাহিয়া শেষে বলিলেন "তুমি যে একা বাবা, একা কি আমাদের এতগুলো বিপদকে ঠেকাতে পারবে! তোমার কাছ থেকে এই যে সহানুভূতি পেলাম, এই আমার যথেষ্ট! আমার এ মনের চিন্তা জানাবার পর্য্যন্ত একটী লোক নেই। পিসিমা বুড়োমানুষ, উনি যেটুকু শুনেছেন, তাই নিয়েই চেঁচিয়ে অস্থির হচ্চেন। এসব শুনলে তো গাঁয়ের টিকটিকিরও একথা জানতে বাকী থাকত না, আর তাতে বিপদ হয় ত বেড়েই যেত। মেয়ে শুনলে হয় ত ভয়েই কাঠ হয়ে মারা যেত। তোমাকে আজ কথাগুলো বলতে পেয়েও যেন আমি একটু বাঁচলাম; কিন্তু এই আমার যথেষ্ট। আমাদের ভাল করতে গিয়ে বাবা, তুমি যেন আর নিজের কোন বিপদ ডেকে এনো না।" "আমার কি বিপদ হতে পারে? আপনি কিছু ভাববেন না, আমি এ গ্রামে একা বটে, কিন্তু ন্যায়ের পক্ষে মনের বল নিয়ে একজনও যদি উঠে দাঁড়ায়, তাতে হাজারটা লোকে তাকে ভয় করে। আর তাছাড়া নায়েবও আমায় ভয়ের চোখেই দেখেন, জমীদারের নিজস্ব তত্ত্বাবধারক আমি। আমি আপনাদের কথা সব জেনেছি,—এ জানলে খুব সম্ভব সে আর এর মধ্যে মাথাই দেবে না"। "কিন্তু বাবা তোমায় তো শীগ্‌গিরই চলে যেতে হবে। তবে যে কটা দিন থাকবে, সেই কটা দিনই আমাদের পরম লাভ; তার পরে ভগবান যা করেন।" "আমায় চলে যেতে কেউ বাধা করে না মা,—আপনি ঘুরে-ঘুরে বেড়াই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যতদিন না আপনি নির্ভয় হতে পারবেন, ততদিন আমি এ গ্রাম থেকে যাব না।"

মহামায়াদেবী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া ভূমিপানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে অশ্রুপূর্ণনেত্রে মহেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন "তা'হলে সত্যই কি কোন দেবতা আমার কমার দুঃখে প্রসন্ন হয়ে আমায় আজ বরাভয় দিতে এসেছে। তাই কি সেদিন অমন করে—" "মা চুপ্ করুন, কমা আসছে! এস কমা, দেখি তো কেমন ছানা করলে—হাত পোড়াও নি তো? ফল ছাড়াতেও হাত কাটনি?" কমলা বিব্রতভাবে তাহার সম্মুখে জলের গ্লাস ও জলখাবারের রেকাব নামাইয়া বলিল "এই দেখুন না,—আমার হাত-কিছু হয়নি। দিদিমাকে আমি আজ ডাকিনি পর্য্যন্ত—" "সত্যি? আচ্ছা তা'হলে চেখে দেখি কেমন ছানা রেঁধেছ।" কমলা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল "ছানা তো রাঁধে না, ছানা কাটতে হয়।" "কাটতে হয়? কি দিয়ে? বঁটী দিয়ে না দা দিয়ে।" মহেন্দ্রের এই পরিহাসে অত্যন্ত লজ্জিত ও নির্ব্বাক হইয়া এইবার কমলা মাতার পৃষ্ঠে মুখ লুকাইল। মাতা সস্নেহ মুখে বলিলেন, "বাবা, ওতো জীবনে ভাইয়ের স্নেহ বা এই রকম খুটিনাটি কথনো পায়নি, তাই লজ্জা পাচ্চে। তাহলে একটু মুখে দাও বাবা।" "একটু কেন মা, এ সবই ত খাব, আর যদি কিছু খারাপ হয়ে থাকে কমলার নিন্দা করব। মুখ লুকচ্চ যে, শুনলে না, আমি তোমার দাদা হই। বল দেখি মোহনভোগে কতখানি নুণ ঝাল দিতে হয়।" কমলা এইবার অত্যন্ত হাসিয়া ফেলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। সেই ফুলের মত সুন্দর ও সরল মেয়েটির পানে চাহিয়া মহেন্দ্র মনে মনে ভাবিল "আহা, এরি ওপরে জগতের এত অত্যাচার। এত রকমে এই পাখীর মত প্রাণটুকুকে টিপে মারবার ষড়যন্ত্র। মানুষে এ শুনে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারে। যেমন করেই হোক্, একে এ বিপদ থেকে বাঁচাতেই হবে।"

ছদ্মবেশ

পুরুষের নারীবেশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ]

পাঠক-সম্প্রদায়কে ভরসা দিয়াছিলাম যে পুরুষের নারীবেশের কথা পূর্ব্বপ্রবন্ধেই শেষ করিয়াছি এবং এই প্রবন্ধে নারীর পুরুষবেশের আলোচনা করিব। কিন্তু নারীর পুরুষবেশের সন্ধানে বাহির হইয়া আরও কয়েকটি নারীবেশী পুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। অনেক সময়ে একই কাব্যে বা নাটকে উভয় প্রকার ছদ্মবেশের দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। অতএব সূচিকটাহ-ন্যায়ে, পূর্ব্বপ্রবন্ধের পুনশ্চ স্বরূপ, পুরুষের নারীবেশের নব-সংগৃহীত কয়েকটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া এই সংখ্যায় আলোচ্য নারীর পুরুষবেশের অবতারণা করিব।

(১) রাজশেখরের 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' নাটিকায় একজন দাসকে বধূবেশে সজ্জিত করিয়া বিদূষকের সহিত কৌতুক-বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। ইহা শুধু মজামারার জন্য। এই নাটিকার মুখ্য ব্যাপার নারীর পুরুষবেশ। (সে কথা যথাস্থানে বলিব।) পুরুষের নারীবেশের এই সামান্য ঘটনা মুখ্য ব্যাপারের (set-off) পাল্টা হিসাবে নাটিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। (আমরা পরে দেখিব, এলিজাবেথের আমলের কয়েকখানি নাটকেও এই কৌশল পাল্টা-হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।)

(২) গ্রীকজাতির পৌরাণিক উপাখ্যানে দেখা যায়, গ্রীক্ মহাবীর হার্কিউলিস্ লিডিয়া-দেশের রাজ্ঞী Omphaleর প্রেমের গোলাম হইয়া নারীর ন্যায় দাসীসমাজে বসিয়া কাটনা কাটিতেন আর রাজ্ঞী মহাবীরের গদা ও সিংহচর্ম্ম ধারণ করিতেন! একবার প্রেমের খেয়ালে হার্কিউলিস্ রীতিমত নারীবেশে ও রাজ্ঞী রীতিমত পুরুষ-বেশে সজ্জিত হইলে এক বিড়ম্বনার উদ্ভব হয়। রাজ্ঞীর সঙ্গপ্রার্থী (Pan) প্যান্-দেব নারীভ্রমে হার্কিউলিসের সম্ভাষণ করিতে গিয়া মহাবীরের প্রচণ্ড পদাঘাত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ল্যাটিন সাহিত্যে ইহার বর্ণনা আছে।

(৩) রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের ইংরেজ কবি স্পেন্সার 'ফেয়ারি কুইনে' হার্কিউলিসের এই কাটনাকাটা অবস্থার অনুকরণ করিয়াছেন। উক্ত কাব্যের পঞ্চম কাণ্ডের পঞ্চম সর্গে (Book V. Canto V) বীর আর্টিগল (Artegall) বীরনারী Radigundএর হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়া নারীবেশে কাটনা কাটিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আরও বহু বীর এইরূপে পরাজিত হইয়া বন্দীশালে এই দশায় ছিলেন। তবে Sir Artegall অবশ্য গ্রীক্ মহাবীরের মত প্রেমের দায়ে গোলাম হন নাই। বরঞ্চ তিনি বন্দীদশায় উক্ত বীরনারী ও তাঁহার দূতীর প্রণয় প্রত্যাখ্যান করেন। পরে সপ্তম সর্গে তিনি প্রণয়িনী ব্রিটোমার্ট-কর্তৃক মুক্ত হন। এই ব্রিটোমার্ট পুরুষবেশে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেন ইত্যাদি কথা নারীর পুরুষবেশের প্রসঙ্গে বলিব। বুঝা গেল, এক্ষেত্রেও নারীর পুরুষবেশ কাব্যের মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু, পুরুষের নারীবেশ তাহার পাল্টা-হিসাবে বর্ণিত।

(৪) শেক্স্পীয়ারের ঈষৎ পূর্ব্ববর্ত্তী নাটককার (Lyly) লিলির The Woman in the Moon নাটকে পত্নীর বেশে স্বামী পত্নীর অন্যান্য প্রেমিকদিগের সঙ্কেতস্থানে উপনীত হইয়া প্রায় কীচকবধের পুনরভিনয় করিয়াছেন।

(৫) আবার উক্ত নাটককারের Mother Bombie নাটকে আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই নাটকখানি প্রেমের পথের বিঘ্ন-বাধা-বর্ণনায় পরিপূর্ণ। বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য একযোড়া বিদূষক একযোড়া নায়ক-নায়িকার বেশ ধারণ করিয়াছে। এখানেও প্রেমের ব্যাপার, তবে নারী-বেশধারী স্বয়ং প্রেমের মহাজন নহে।

(৬) উক্ত নাটককারের Gallathea নাটকে নারীর পুরুষবেশের খুব ঘোরালো ব্যাপার আছে। (সে কথা যথাস্থানে বলিব।) আবার তাহারই পাল্টা-হিসাবে কন্দর্প-

ঠাকুরের নারীবেশ-ধারণের প্রসঙ্গ আছে। ইহাও এই নাটকে চিত্রিত প্রেমের জটিলতার একটি উপাদান।

(৭) এই নাটককারের Love's Metamorphosis নাটকে প্রোটিয়া নাম্নী নারীর আত্মরক্ষার জন্য জেলিমার-মূর্ত্তি এবং প্রেমাস্পদকে (Siren) মায়াবিনীর মায়াজাল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ইউলিসিসের প্রেতাত্মার মূর্ত্তি ধারণের প্রসঙ্গ আছে। তবে এখানে ছদ্মবেশ নহে, দেবতার কৃপায় মূর্ত্তিপরিগ্রহ।

(৮) শেক্‌স্‌পীয়ারের ঈষৎ পূর্ব্ববর্ত্তী আর একজন নাটককার গ্রীনের George-a-Green নাটকে (নাটকখানি গ্রীনের রচিত কিনা তদ্‌বিষয়ে মতভেদ আছে)—অনেক প্রকারের ছদ্মবেশ আছে। পুরুষের নারীবেশ তাহার অন্যতম। নায়ক George-a-Green বালকভৃত্য অন্বর্থনামা Wilyকে দাসীবেশে নিজ প্রণয়িনীর নিকট দৌত্যে পাঠাইলেন, প্রণয়িনী আবার ঐ দাসীর সহিত নিজবেশের বিনিময় করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য।) এখানে প্রেমের সহায়তা করিবার জন্য পুরুষের নারীবেশ—কতকটা সুবল সাঙ্গাতের ধরণে। আবার পুরুষের নারীবেশের ব্যাপারটা ঘোরালো ও মজাদার করিবার জন্য নাটককার একটু ফ্যাংড়া যুড়িয়াছেন,—নায়িকার পিতা দাসীভ্রমে নায়কের বালকভৃত্যের প্রেমে পড়িলেন (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য) এবং তাঁহার সহিত নায়ক ঐ দাসীর বিবাহ দিবেন এই সর্ত্তে নায়কের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে রাজি হইলেন। তাহার পর ছদ্মবেশ ঘুচিলে বিয়েপাগলা বুড়োর চৈতন্য হইল (৫ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য।) আমরা পরে দেখিব, ইহার উল্টা ব্যাপার অর্থাৎ পুরুষভ্রমে নারীর অপর নারীর প্রেমে পড়ার ব্যাপার শেক্‌স্‌পীয়ারের ও এলিজাবেথের আমলের অন্য নাটককারদিগের অনেকগুলি নাটকে কেমন সরসভাবে বর্ণিত আছে।

(৯) শেক্‌স্‌পীয়ারের সমসাময়িক ফোর্ডের The Lover's Melancholy নাটকে নায়িকা Erocleaর পুরুষবেশের এবং অন্য নারীর পুরুষভ্রমে তাঁহার সহিত প্রেমে পড়ার ব্যাপার আছে। (সে কথা যথাস্থানে বলিব।) ইহাই নাটকের মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু। ইহারই পাল্টা-হিসাবে পুরুষের নারীবেশেরও যৎকিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ আছে। বালক-ভৃত্যকে একজন ছিট-গ্রস্ত নির্ব্বোধ রাজসভাসদের দাসী সাজান হইয়াছে, ইহা নিরবচ্ছিন্ন খেয়াল।

(১০) শেক্‌স্‌পীয়ারের সমসাময়িক (Marston) মার্ষ্টনের Antonio & Mellida নাটকে নায়িকা মেলিডা পুরুষবেশ ধরিয়াছেন। (সে কথা যথাস্থানে বলিব।) ইহারই পাল্টা-হিসাবে নায়কের নারীবেশও বর্ণিত আছে। নায়ক নায়িকার দর্শনসুখের সুবিধার জন্য বীরনারীর বেশ ধারণ করিয়াছেন। ইহা স্পষ্টতঃ সিড্‌নির আর্কেডিয়ার জের। পূর্ব্বপ্রবন্ধে সিড্‌নির প্রসঙ্গে বলিয়াছি, এরূপ কৌশল বহু ইতালীয় গল্পে আছে। এই স্থলে ইতালীয় কাব্য Pastor Fidoর উল্লেখ করা যাইতে পারে।*

(১১) ফীল্ডের Amends for Ladies নাটকে একটি দৃষ্টান্তের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। এই নাটকে পুরুষের নারীবেশের আরও দুইটি দৃষ্টান্ত আছে। দুইটিতেই প্রেমিক অভিমানিনী প্রেমপাত্রীকে ধোঁকা দিবার জন্য অন্য নারীকে বিবাহ করিয়াছেন বা বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এই ভাণ করিয়া একজন পুরুষকে নারী সাজাইয়া নব-প্রণয়িনী বলিয়া চালাইয়াছেন। একটিতে আবার ঐ নারীবেশে প্রতারিত হইয়া একজন বিয়েপাগলা বুড়া নারীবেশীকে বিবাহ করিতে উৎসুক, এরূপ রগড়ও আছে। আবার ঐ নাটকে নারীর পুরুষবেশেরও সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। (সে কথা যথাস্থানে বলিব।) তাহারই পাল্টা-হিসাবে এত ঘন ঘন পুরুষের নারীবেশের ব্যাপার।

(১২) Beaumont & Fletcherএর The Loyal Subject নাটকে একটি যুবক নারীবেশ ধারণ করিয়াছে এবং তাহার নারীবেশে মুগ্ধ হইয়া ওলিম্পিয়া নাম্নী নারী তাহার প্রেমে পড়িয়াছে। ইহা সিড্‌নির আর্কেডিয়ার জের।

(১৩) আবার Beaumont & Fletcherএর Love's Cure নাটকে একজন যুবক নারীর ন্যায় ও একজন যুবতী পুরুষের ন্যায় লালিত পালিত হইয়াছিল, পরে

---

* 'In the Pastor Fido there is the incident of a lover disguising himself as a female at a festival in order to obtain a species of interview with his mistress which in his own character he could not procure.'

Dunlop's History of Fiction, ch XI.

প্রেমের কল্যাণে তাহারা স্ব স্ব জাতির অনুরূপ মনোভাব প্রাপ্ত হইলে প্রেমের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিল!

(১৪) (Shirley) শার্লির Love Tricks or The School of Compliment নাটকের শেষ দুই অঙ্কে দুই ভগিনীতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন এবং এক ভগিনী পুরুষ সাজিলেন! আবার অন্য একজন পুরুষ নারী সাজিয়া পুরুষবেশিনী 'ভগিনী'র সহিত নৃত্য করিল! কবির চূড়ান্ত খেয়াল বটে! এখানেও দেখা গেল, নারীর পুরুষ-বেশের পাল্টা হিসাবে পুরুষের নারীবেশের ফোড়ন দেওয়া হইয়াছে।

২। নারীর পুরুষবেশ

সংস্কৃত ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য

এইবার নারীর পুরুষবেশের পালা। এ ক্ষেত্রেও কৃষ্ণ-লীলাত্মক সাহিত্যে গোপীগণের রাখালবেশ ইহার একটি পরিপাটী উদাহরণ। একটু নমুনা দিতেছি :—

বঁধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেন্ধে যাব চল সেথা কমল আঁখি॥
বিপিনে ভেটিব যায়্যা শ্যাম-জলধরে।
রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে॥

* * *

সাজল রাখাল-বেশ রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি॥

* * *

ললিতা হাসিয়া বলে শুন শ্যামধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন॥

এই রাই-রাখালবেশ শ্রীরাধার প্রেমলীলারই একটি অঙ্গ। শাক্ত কবিরা ইহার দেখাদেখি জগদম্বাকে একাম্রকাননে গোষ্ঠলীলা করাইয়াছেন, কিন্তু পুরুষবেশে নহে,—'কষিত-কাঞ্চনকান্তি গোপবধূবেশে।' তাই বৈষ্ণব কবি টিটকারী দিয়াছেন :—

না জানে পরমতত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব,
নারী হয়ে ধেনু কি চরায় রে!
তা যদি হইত যশোদা যাইত
গোপালে কি পাঠায় রে!

সংস্কৃত সাহিত্যে রাজশেখরের 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' নাটিকায় অপুত্রক লাটরাজ চন্দ্রবর্ম্মা দুহিতা মৃগাঙ্কাবলীকে বালকবেশে সজ্জিত করিয়া মৃগাঙ্কবর্ম্মা নামে পুত্র বলিয়া চালাইতেন। এই কন্যাকে যে বিবাহ করিবে সে রাজ-চক্রবর্ত্তী হইবে দৈবজ্ঞেরা এইরূপ বলাতে ত্রিলিঙ্গরাজ বিদ্যাধরমল্লের মন্ত্রী যৌবনস্থা কন্যাকে বালকবেশে স্বীয় প্রভুর প্রাসাদে লইয়া আসেন। পাটরাণী খেয়ালের বশে তাহাকে আবার নারীবেশে সজ্জিত করেন, মন্ত্রীর কৌশলে রাজা ও মৃগাঙ্কাবলীর পূর্ব্বরাগ হয়, এবং পরে পাটরাণী রাজার সহিত তাহার কৌতুক বিবাহ দেন; সাতপাক হইয়া গেলে পাটরাণী আসল ব্যাপার টের পান।

এখানেও প্রেমের ব্যাপার, তবে কৌশলটি নায়িকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবলম্বন করে নাই, সে পরের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলী। এই ডবল্ ছদ্মবেশে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো ও মজাদার হইয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ ডবল্ ছদ্মবেশের কৌতুককর ব্যাপার এলিজাবেথের আমলের দুইখানি ইংরেজী নাটকেও দেখা যায়। সেগুলিতেও বিবাহের পর প্রকৃত ব্যাপার ধরা পড়ে এবং যে নারী এই ব্যাপারে আমোদবোধ করিতে-ছিলেন তিনি বিলক্ষণ আক্কেল পান।

ইউরোপীয় সাহিত্য

যতদূর জানি, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এই শ্রেণীর অর্থাৎ নারীর পুরুষবেশের আর অধিক দৃষ্টান্ত নাই। পক্ষান্তরে, ইউরোপীয় সাহিত্যে, বিশেষতঃ রাজ্ঞী এলি-জাবেথের আমলের ইংরেজী সাহিত্যে, এই শ্রেণীর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। পাশ্চাত্য নারী প্রাচ্য নারী অপেক্ষা স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সাহসিকতা, আত্মনির্ভর প্রভৃতি পুরুষোচিত-গুণ-সম্পন্না, এই কারণেই কি পাশ্চাত্য সাহিত্যে নারীর পুরুষ-বেশের এত দৃষ্টান্ত-বাহুল্য? যে সমাজে অবরোধ-প্রথা নাই, সে সমাজে নারী অবাধে সকলের সহিত মিশিতে পারেন, সুতরাং তাঁহার পুরুষবেশেও লজ্জাশীলতার তাদৃশ ব্যাঘাত হয় না, সমাজ-বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয় না; পক্ষান্তরে যে সমাজে অবরোধ-প্রথার কড়াক্কড়, সে সমাজে এইরূপ সংস্কার বদ্ধমূল যে নারী পুরুষের ছদ্মবেশে সকলের সহিত মিশিলে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার লজ্জাশীলতার

ব্যাঘাত ঘটে, পরিণামে লজ্জাহীনতার জন্য তাঁহার নিন্দা হয়। ইহাই কি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এই শ্রেণীর ছদ্মবেশের বিরলতার কারণ?

সে যাহাই হউক, পুরুষের নারীবেশ অপেক্ষা নারীর পুরুষবেশে অধিকতর চমৎকারিত্ব আছে—অবশ্য আমাদের অর্থাৎ পুরুষজাতির চক্ষে। সম্ভবতঃ এই জন্যই ইহার প্রতি ইউরোপীয় গল্পলেখক ও নাটকলেখকদিগের এতটা টান। আর পুরুষের নারীবেশ অনেক সময় অসদুদ্দেশ্যে পরিগৃহীত হয়, নারীর পুরুষবেশে অসদুদ্দেশ্যের সম্ভাবনা কম,—এই কারণেও বোধ হয় ইউরোপীয় গল্পলেখক ও নাটকলেখকগণ নারীর পুরুষবেশের অধিকতর পক্ষপাতী হইয়াছেন।

সমাজের দিক্‌ হইতে বলা যাইতে পারে যে, নারীকে বাধ্য হইয়া স্বাধীনভাবে বিদেশে গমন ও অপরিচিত পুরুষ-সমাজে মেলামেশা করিতে হইলে তাঁহাকে পুরুষজাতির সম্ভাবিত অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য পুরুষের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিতে হয়। ইহাই এই শ্রেণীর ছদ্মবেশের কৈফিয়ত।*

অবলা প্রবলা হইয়া বীরত্ব প্রকাশের জন্য পুরুষবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছে; এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে ও ইউরোপের বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে কখনও কখনও ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু কাব্য-জগতে তাহার চিত্র দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারেও হয় ত কখন কখন নারীর পক্ষে এইরূপ ছদ্মবেশের প্রয়োজন হইয়াছে। ইতিহাসে আছে যে ইংলণ্ডের রাজ্ঞী Eleanor স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী পুত্রগণের সহিত যোগ দিবার জন্য পুরুষবেশে গৃহত্যাগের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কাব্যরসের দিক্‌ হইতে ব্যাপারটির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্থলে প্রেমের দায়েই এই ছদ্মবেশ, কোথাও কোথাও বা ছদ্মবেশগ্রহণের পর প্রেমের উদ্ভব। প্রেমিকা প্রেমাস্পদের সঙ্গছাড়া হইবেন না, তাঁহাকে চোখের আড়াল করিবেন না, ছায়ার ন্যায় (তাঁহার অজ্ঞাতসারে) তাঁহার অনুগমন করিবেন, এই উদ্দেশ্যে বালক-ভৃত্যের ছদ্মবেশে তাঁহার চাকুরি গ্রহণ করিতেছেন। প্রেমাস্পদ চিনিতে না পারিয়া প্রেমিকার প্রেমের প্রতিদান করিতেছেন না, পরন্তু প্রেমিকাকে বালক-ভৃত্য-জ্ঞানে নব-প্রণয়িনীর নিকট প্রণয়-দৌত্যে প্রেরণ করিতেছেন, প্রেমিকা 'নয়নের বারি নয়নে নিবারি' প্রিয়তমের প্রিয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, আবার অপর নারী (অনেক স্থলে প্রেমাস্পদের নব-প্রণয়িনী) পুরুষভ্রমে তাঁহার প্রেমে পড়িতেছেন, ইত্যাদি বিড়ম্বনা-বৈচিত্র্যে বহুস্থলে আখ্যানগুলি বেশ জটিল ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। ফলতঃ আখ্যানগুলি রীতিমত রোমান্স।

শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকাবলির প্রসাদাৎ অনেক পাঠক এবংবিধ ব্যাপারের রসগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ গবেষণা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, শেক্‌স্‌পীয়ারের কয়েকখানি নাটকে এই শ্রেণীর সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত থাকিলেও তিনি এ বিষয়ে অগ্রণী নহেন। তাঁহার পূর্ব্বগামী ও সমসাময়িক ইংরেজ গল্প-লেখক ও নাটকলেখকদিগের রচনায় ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁহারও পূর্ব্বে ইতালীয় (ফরাসী ও স্প্যানিশ) গল্পে এই কৌশলের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। স্থূল কথা, এই সকল গল্পেই কৌশলটির মূল এবং এই সকল গল্প হইতেই রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের সাহিত্যে (গল্পে ও নাটকে) ইহার আমদানী হইয়াছিল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক Dunlop's History of Fiction নামক অমূল্য পুস্তকখানি পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে প্রকৃত হদিস্‌ পাইবেন। সম্ভবতঃ ইউ-রোপের ক্ষাত্রযুগে (the age of chivalry), বিশেষতঃ ইউরোপের বিখ্যাত ধর্ম্মযুদ্ধের (Crusades) সময় কোমল-হৃদয়া নারীরা প্রেমাস্পদকে দূরদেশে বিপৎসঙ্কুল সমর-তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রেমাস্পদের অজ্ঞাতসারে তাঁহার সঙ্গিনী হইতেন, এইরূপ বাস্তব ঘটনা বা কবিকল্পনা হইতে ইহার উদ্ভব। ডন্‌লপ্‌ এ কথা কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তবে তিনি ইউরোপের ক্ষাত্রযুগের সাহিত্য হইতে একটি উদাহরণ দিয়াছেন যে মার্থা নাম্নী রমণী চারণের ছদ্মবেশে প্রেমাস্পদের সন্ধানে দেশেদেশে ভ্রমণ করিয়াছিল *। সম্ভবতঃ ইহাই প্রেমের জন্য নারীর পুরুষ-

* শেক্‌স্‌পীয়ারের কোন কোন নাটকে ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেক স্থানে এই কৈফিয়ত স্পষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। পরে The Two Gentlemen of Verona ও As You Like It সম্বন্ধে আলোচনায় ইহার দৃষ্টান্ত দিব।

* 'Martha having......adopted......the intention of uniting herself in marriage to Ysaie...set out in quest

বেশের প্রাচীনতম কাহিনী। সে যাহাই হউক, রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বালকে নারীর ভূমিকা গ্রহণ করিত, সুতরাং নারীর পুরুষবেশের বেলায় ডবল্ ছদ্মবেশে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হইত, বোধ হয় সেইজন্য তখনকার নাটক-কারগণ এই কৌশল পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াও ক্লান্তিবোধ করিতেন না বা ইহাকে একঘেয়ে মনে করিতেন না। ফলতঃ উক্ত আমলের নাট্য-সাহিত্য এই রসে ভরপুর।

ইতালীয় (ফরাশী ও স্প্যানিশ) গল্পসাহিত্যের সহিত বর্ত্তমান লেখকের (ও অধিকাংশ পাঠকের) সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় নাই; অতএব উক্ত (তিনটি) সাহিত্য হইতে উদাহরণ-সংগ্রহের বরাত পূর্ব্বকথিত ডন্‌লপ্ সাহেবের উপর দিয়া ইংরেজী সাহিত্য হইতেই দৃষ্টান্ত দিব। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজী সাহিত্যের এ সকল দৃষ্টান্ত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইতালীয় (ফরাশী ও স্প্যানিশ) সাহিত্য হইতে গৃহীত। অনেকগুলি বিদেশী গল্প এই আমলে ইংরেজীতে তর্জ্জমা হইয়াছিল। কোন কোন ইংরেজ লেখক ঐ শ্রেণীর নূতন গল্পও রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলিকেও এই আমলের নাটককারগণ নাটকীয় আখ্যানের কাঁচামাল (raw materials) হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। পরন্তু নাটকগুলির সমধিক খ্যাতির জন্য গল্প-পুস্তকগুলি চাপা পড়িয়াছে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভিন্ন অন্য কেহ এক্ষণে সেগুলির খবর রাখে না। অতএব এই আমলের গল্প সাহিত্য ছাড়িয়া দিয়া নাটকাবলি হইতেই দৃষ্টান্ত দিব।

এলিজাবেথের আমলের সাহিত্য

(১) নাটকাবলি হইতে দৃষ্টান্ত দিবার পূর্ব্বে এই আমলের একখানি কাব্য হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, সম্ভবতঃ কাব্যখানি নাটকগুলির পূর্ব্বে রচিত। স্পেন্‌সারের ফেয়ারি কুইনের তৃতীয় কাণ্ডের (Book III) বর্ণনীয় বস্তু (Chastity) সতীত্বের আদর্শরূপে চিত্রিতা বীরনারী ব্রিটোমার্টের আবদান-পরম্পরা। তিনি রাজকন্যা, শৈশব হইতেই বালিকাসুলভ ক্রীড়া উপেক্ষা করিয়া অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন এবং যৌবনোদ্গমে বীরপুরুষের ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া বীরগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সূত্রে নিরন্তর দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। ঐন্দ্রজালিক বর্শার প্রভাবে তিনি অজেয় ছিলেন। যাহা হউক, বীররসের এত বাহুল্য-সত্ত্বেও এক্ষেত্রেও গোড়ার কথা প্রেম। ব্রিটোমার্ট ঐন্দ্রজালিক মুকুরে একজন বীরপুরুষের মূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিয়া তাঁহার প্রেমে পড়িলেন এবং বৃদ্ধা ধাত্রীর পরামর্শে বীরের ছদ্মবেশে প্রেমাস্পদের সন্ধানে দেশেদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা ধাত্রী (Squire) ভৃত্যের ছদ্মবেশে তাঁহার সঙ্গ লইল,—ইহাই আখ্যানটির গৌরচন্দ্রিকা। এক জন নারী (Malecasta) পুরুষভ্রমে তাঁহার প্রেম যাচ্ঞা করিয়া একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছিল এবং তাঁহার নিকট ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিল, এই ভ্রান্তিবিলাসে ব্যাপারটা একটু ঘোরালো হইয়াছে। (কবি স্পষ্ট বলিয়াছেন ইহা প্রেম নহে, একটা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি।) পাঠক-দিগের আশ্বাসের জন্য জানাইতেছি যে, কাব্যের চতুর্থ কাণ্ডে (Book IV) বীরনারী প্রেমাস্পদ বীরপুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, পরে পরস্পরের পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং উভয়ে উভয়ের প্রেমলাভে ধন্য হইয়া-ছিলেন। কাব্যের পঞ্চমকাণ্ডে (Book V) আবার পরস্পরের দেখা হইয়াছে, কিন্তু চিরদিনের মত মিলন ঘটে নাই। (ব্রুয়ারের Handbook of Allusionsএ লিখিত আছে যে পঞ্চমকাণ্ডে তাঁহাদিগের শুভ-পরিণয় ঘটিয়াছিল, কিন্তু কাব্যে ত তাহা দেখিতেছি না। যাহা হউক, খোস-খবরের ঝুটাও ভাল।) এক্ষেত্রে দেখা গেল, ক্ষাত্রযুগোচিত বীরত্বচর্চ্চার ফলে প্রণয়িযুগলের মিলন ঘটিল। পরবর্ত্তী আখ্যানগুলিতে দেখা যাইবে, প্রেমিকা (রণক্ষেত্রে নহে, শান্তিময় নাগরিক জীবনে) বালক-ভৃত্যবেশে প্রেমাস্পদের পরিচর্য্যা করিতেছেন। ইহা ক্ষাত্রযুগের অবসান-সূচক।

শেক্‌স্‌পীয়ারের পূর্ব্বগামী নাটককারদিগের মধ্যে লিলি (Lyly) প্রথমে নাটকে নারীর পুরুষবেশের আমদানী করেন এবং শেক্‌স্‌পীয়ার লিলির নিকটেই ইহা নাটকের উপাদান-স্বরূপ ব্যবহার করিতে শিক্ষা করেন, ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদিগের এই

---

of him, disguised as a minstrel, and wandered from tower to tower singing lays expressive of her pain and her passion :"—Dunlop's History of Fiction Ch. III.

মত। * (২) লিলির Gallathea নাটকের আখ্যান এইরূপ,—গ্যালেথিয়া ও ফিলিডা-নাম্নী দুইটি যুবতী বরুণদেবের নিকট বলি প্রদত্ত হইবেন, এই আশঙ্কায় উভয়ের পিতা উভয়কে পুরুষের ছদ্মবেশ ধরাইলেন। এখানে গ্রীক্ পৌরাণিক উপাখ্যানের একিলিসের বৃত্তান্তের † ঠিক উল্টা, কিন্তু উদ্দেশ্য একই; অর্থাৎ সেখানে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পুরুষকে নারীবেশে সজ্জিত করা হইয়াছে, এখানেও সেই উদ্দেশ্যে নারীকে পুরুষবেশে সজ্জিত করা হইয়াছে; আবার সেখানেও নায়ক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ছদ্মবেশ ধরেন নাই, স্নেহময়ী জননীর প্ররোচনায় ধরিয়াছেন; এখানেও যুবতীদ্বয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ছদ্মবেশ ধরেন নাই, স্নেহময় জনকের প্ররোচনায় ধরিয়াছেন। অতএব ইহা সম্ভবতঃ উক্ত গ্রীক্ পৌরাণিক উপাখ্যানের অনুকরণ। মতান্তরে ইহা ল্যাটিন কবি অভিডের একটি আখ্যানের (Iphis & Ianthe) অনুকরণ। এই আখ্যানে কন্যা Iphisকে তাহার মাতা পুত্র বলিয়া চালাইতেন, শেষে পিতা তাহার সম্বন্ধ করিলে মাতা অনন্যোপায় হইয়া দেবীর শরণ লইলেন। দেবী কৃপা করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত পুরুষে পরিবর্ত্তিত করিলেন। বিপদুদ্ধারের জন্য ছদ্মবেশ গৃহীত হইলেও, লিলির নাটকেও গ্রীক্ উপাখ্যানের ন্যায় প্রেমের উদ্ভব হইয়াছে। ডায়েনা দেবীর সহচরীগণ পুরুষভ্রমে যুবতীদ্বয়ের প্রেমে পড়িল এবং যুবতীদ্বয়ও পরস্পরকে পুরুষ ভাবিয়া পরস্পরের প্রেমে পড়িলেন! অবশেষে প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভীনাস্ যুবতী-যুগলের অবস্থা দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া একজনকে প্রকৃত পুরুষে পরিবর্ত্তিত করিতে স্বীকৃতা হইলেন,—তবে উভয়ের মধ্যে কে পুরুষ হইবেন সে প্রশ্নের মীমাংসার ভার তাঁহাদিগের উভয়ের উপর দিলেন। মীমাংসা কি দাঁড়াইল, তাহা বিক্রমাদিত্য ও বেতাল ভিন্ন কেহই জানেন না—প্রবন্ধকারও না, নাটককারও না!

* একজন সমালোচক বলিয়াছেন, (৩) (Peele) পীলের Sir Clyomon & Sir Clamydes নাটকেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। নাটকখানি শেক্স্‌পীয়ারের নাটকগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী। তবে ইহা ঠিক কোন্ বৎসরে লিখিত এবং কাহার রচিত তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। নাটকখানি চক্ষে দেখি নাই সুতরাং পাদটীকায় পরের মত উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

† ভারতবর্ষ, মাঘ-সংখ্যা, পুরুষের নারীবেশ দ্রষ্টব্য।

(৪) আবার এই নাটককারের The Maid's Metamorphosis নাটকে একটি কুমারীর পুরুষে পরিবর্ত্তন এবং পরে আবার নারীতে পরিবর্ত্তনের বিবরণ আছে। তবে ইহা বেশপরিবর্ত্তন নহে, দেবতার প্রভাবে রীতিমত মূর্ত্তিগ্রহ।

(৫) শেক্স্‌পীয়ারের আর একজন পূর্ব্বগামী নাটককার গ্রীনের James IV নামক ঐতিহাসিক নাটকে নারীর পুরুষবেশের আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। (ইহার মূল একটি ইতালীয় গল্প।) এক্ষেত্রেও ছদ্মবেশধারণ প্রাণরক্ষার জন্য। কিন্তু পতির অন্যায় প্রতি প্রেমের ফলেই পত্নীকে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে বাধ্য হইতে হয়, সুতরাং এখানেও প্রেমের পরোক্ষ প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে। নাটকের নায়ক স্কট্‌লণ্ডের রাজা চতুর্থ জেম্স ইংলণ্ডের রাজকন্যা ডরোথিয়াকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু বিবাহের সমকালেই আইডা নাম্নী কুমারীর প্রেমে পড়িলেন। তিনি যখন মোসাহেবের কুমন্ত্রণায় গোপনে রাজ্ঞীর প্রাণসংহার করিতে মনঃস্থ করিলেন, তখন রাজ্ঞী শুভানুধ্যায়িগণের মুখে সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগের পরামর্শে ও সাহায্যে অনেক আপত্তি ও লজ্জার পর পুরুষবেশ ধারণ করিলেন এবং বিশ্বস্ত বামনের সঙ্গে পলায়ন করিলেন। শেক্স্‌পীয়ারের Cymbeline নাটকের আইমোজেনের ঘটনার সহিত এই ঘটনার (তথা পরে অপরাধী অনুতপ্ত স্বামীকে ক্ষমা করা এবং পতি ও পিতা উভয়ের মিল করিয়া দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে) সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। শেক্স্‌পীয়ারের এই নাটকখানি গ্রীনের নাটকের অনেক পরে লিখিত। আবার এখানেও পুরুষভ্রমে নারীর সহিত নারীর প্রেমে পড়ার ব্যাপার আছে, তবে নাটককার অল্পেই সারিয়াছেন, অধিক বাড়াবাড়ি করেন নাই। পুরুষবেশিনী রাজ্ঞী গুপ্তঘাতক কর্ত্তৃক আহত হইলে একজন স্কচ্ লর্ড তাঁহাকে গৃহে লইয়া যান। তথায় আহতের শুশ্রূষা করিতে করিতে লর্ডপত্নীর আয়েষার দশা ঘটিল। যাহা হউক, রাজ্ঞী পরে আত্মপ্রকাশ করিলে লর্ডপত্নীর ঘোর কাটিল।

আমরা পরে দেখিব, শেক্স্‌পীয়ারের কয়েকখানি নাটকে, স্পেন্সার, লিলি ও গ্রীনের চিত্রিত এই ভ্রান্তিবিলাস কিরূপ উজ্জ্বলতর ও সুন্দরতর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। তবে শেক্স্‌পীয়ারও এসকল চিত্রের জন্য ইতালীয় (ফরাসী বা স্প্যানিশ) অথবা ইংরেজী গল্পের নিকট ঋণী।

আগামী বারে শেক্স্‌পীয়ারের নাটকাবলি হইতে নারীর পুরুষবেশের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিব।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(৮)

আবার অভয়ার স্বামীর পত্র পাইলাম। পূর্ব্ববৎ সমস্ত চিঠিময় কৃতজ্ঞতা ছড়াইয়া দিয়া, এবার সে যে কি সঙ্কটে পড়িয়াছে, তাহাই সসম্ভ্রমে ও সবিস্তারে নিবেদন করিয়া, আমার উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে, তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সে একটা বড় বাড়ী ভাড়া লইয়াছে; এবং তাহার একদিকে তাহার 'বর্ম্মা'-স্ত্রীপুত্রকে আনিয়া, অন্যদিকে অভয়াকে আনিবার জন্য প্রত্যহ সাধ্যসাধনা করিতেছে; কিন্তু কোন মতেই তাহাকে সম্মত করিতে পারিতেছে না। সহধর্ম্মিণীর এবম্প্রকার অবাধ্যতায় সে অতিশয় মর্ম্ম পীড়া অনুভব করিতেছে। ইহা যে শুধু "কলিকালের" ফল, এবং সত্য যুগে যে এরূপ ঘটিত না,—বড় বড় মুনি-ঋষিরা পর্য্যন্ত যে—দৃষ্টান্ত সমেত তাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া সে লিখিয়াছে, 'হায়! সে আর্য্য-ললনা কৈ? সে সীতা সাবিত্রী কোথায়? যে আর্য্য-নারী স্বামীর পদযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া, হাসিতে-হাসিতে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, স্বামী-সহ অক্ষয় স্বর্গ-লাভ করিতেন, তাঁরা কোথায়? যে হিন্দুমহিলা হাস্যবদনে তাহার কুষ্ঠ-গলিত স্বামী দেবতাকে স্কন্ধে করিয়া বারাঙ্গনার গৃহে পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল, কোথায় সেই পতিব্রতা রমণী! কোথায় সেই স্বামীভক্তি! হায় ভারতবর্ষ! তুমি কি একেবারেই অধঃপথে গিয়াছ! আর কি আমরা সে সকল চক্ষে দেখিব না? আর কি আমরা'—ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় দুইপাতা জোড়া বিলাপ। কিন্তু অভয়া পতি দেবতাকে এই পর্য্যন্ত মনোবেদনা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। আরও আছে। সে লিখিয়াছে, শুধু যে তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী এখনও পরের বাটীতে বাস করিতেছে, তাই নয়; সে আজ পরম বন্ধু পোষ্ট-মাষ্টারের কাছে জ্ঞাত হইয়াছে যে, কে একটা রোহিণী তাহার স্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছে এবং টাকা পাঠাইয়াছে। ইহাতে হতভাগ্যের কি পর্য্যন্ত যে ইজ্জৎ নষ্ট হইতেছে, তাহা লিখিয়া জানানো অসাধ্য।

চিঠিখানা পড়িতে-পড়িতে হাসি সামলাইতে না পারিলেও, রোহিণীর ব্যবহারে রাগ কম হইল না। আবার তাহাকে চিঠি লেখাই বা কেন, টাকা পাঠানোই বা কেন? যে স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর করিতে এত দুঃখ স্বীকার করিয়াছে, বুঝিয়া হোক্ না বুঝিয়া হোক্, আবার তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন কি? আর অভয়াই বা এরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে কিসের জন্য? সে কি চায়, তাহার স্বামী যাহাকে স্ত্রীর মত গ্রহণ করিয়াছে, ছেলেমেয়ে হইয়াছে, তাহাদের ত্যাগ করিয়া শুধু তাহাকে লইয়াই সংসার করে? কেন, বর্ম্মাদের মেয়ে কি মেয়ে নয়? তার কি সুখ দুঃখ মান-অপমান নাই? ন্যায় অন্যায়ের আইন কি তাহার জন্য আলাদা করিয়া তৈরি হইয়াছে? আর তাই যদি, তবে সেখানে তাহার যাওয়াই বা কেন? সব ঝঞ্ঝাট এখান হইতে স্পষ্ট করিয়া চুকাইয়া দিলেই ত হইত!

সেই পর্য্যন্ত রোহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই। সে যে অযথা ক্লেশ পাইতেছে, তাহা মনে মনে বুঝিয়াই, বোধ করি সেদিকে পা বাড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। আজ ছুটির পূর্ব্বেই গাড়ী ডাকিতে পাঠাইয়া উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময়ে অভয়ার পত্র আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলাম, আগাগোড়া লেখা রোহিণীর কথাতেই ভরা! যেন সর্ব্বদাই তাহার প্রতি নজর রাখি,—সে যে কত দুঃখী, কত দুর্ব্বল, কত অপটু, কত অসহায়—এই একটা কথাই ছত্রে-ছত্রে অক্ষরে-অক্ষরে এম্নি মর্ম্মান্তিক ব্যথায় ফাটিয়া পড়িয়াছে, যে, অতিবড় সরল-চিত্ত লোকও এই আবেদনের তাৎপর্য্য বুঝিতে ভুল করিবে মনে হইল না। নিজের সুখ দুঃখের কথা প্রায় কিছুই নাই। তবে, নানা কারণে

এখনও সে যে সেইখানেই আছে, যেখানে আসিয়া প্রথমে উঠিয়াছিল, তাহা পত্রের শেষে জানাইয়াছে।

পতিই সতীর একমাত্র দেবতা কি না, এ বিষয়ে আমার মতামত ছাপার অক্ষরে ব্যক্ত করার দুঃসাহস আমার নাই ; তাহার আবশ্যকতাও দেখি না। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন সতীধর্ম্মের একটা অপূর্ব্বতা, দুঃসহ দুঃখ ও একান্ত অন্যায়ের মধ্যেও তাহার অভ্রভেদী বিরাট মহিমা - যাহা আমার অন্নদা দিদির স্মৃতির সঙ্গে চিরদিন মনের ভিতরে জড়াইয়া আছে, চোখে না দেখিলে যাহার অসহ্য সৌন্দর্য্য ধারণা করাই যায় না—যাহা একই সঙ্গে নারীকে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি বৃহৎ করিয়াছে,—আমার সেই যে অব্যক্ত উপলব্ধি—তাহাই আজ এই অভয়ার চিঠিতে আবার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

জানি, সবাই অন্নদা দিদি নয় ; সেই কল্পনাতীত নিষ্ঠুর ধৈর্য্য বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবার মত অতবড় বুকও নারীতে থাকে না ; এবং যাহা নাই, তাহার জন্য অহরহ শোক প্রকাশ করা গ্রন্থকারমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য কি না, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখি নাই ; কিন্তু তবুও সমস্ত চিত্ত বেদনায় ভরিয়া গেল। রাগ করিয়াই গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম ; এবং সেই অপদার্থ, পরস্ত্রীতে আসক্ত রোহিণীটাকে বেশ করিয়া যে দু'কথা শুনাইয়া আসিব, তাহাই মনে-মনে আবৃত্তি করিতে-করিতে তাহার বাসার অভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া, কপাট ঠেলিয়া যখন তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলাম, তখন সন্ধ্যার দীপ জ্বালানো হইয়াছে, কি হয় নাই ; অর্থাৎ দিনের আলো শেষ হইয়া রাত্রির আঁধার নামিয়া আসিতেছে মাত্র।

সেটা মাহ ভাদরও নয়, ভরা বাদরও নয়,—কিন্তু শূন্য মন্দিরের চেহারা যদি কিছু থাকে তো, সেই আলো-অন্ধকারের মাঝখানে সেদিন যাহা চোখে পড়িল, সে যে এ ছাড়া আর কি, সে তো আজও জানি না। সব কয়টা ঘরেরই দরজা হাঁ-হাঁ করিতেছে, শুধু রান্নাঘরের একটা জানালা দিয়া ধূঁয়া বাহির হইতেছে। ডানদিকে একটু আগাইয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, উনুন জ্বলিয়া প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে এবং অদূরে মেঝের উপর রোহিণী বঁটি পাতিয়া একটা বেগুন দুখানা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমার পদশব্দ তাহার কাণে যায় নাই ; কারণ, কর্ণেন্দ্রিয়ের মালিক যিনি, তিনি তখন আর সেখানেই থাকুন, বেগুনের উপরে যে একাগ্র হইয়া ছিলেন না, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। আরও একটা কথা এমনি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া একে-একে সেই ঘর দুটার মধ্যে গিয়া যখন দাঁড়াইলাম, তখন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত সমাজ, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ, পুণ্যের অতীত একটা উৎকট বেদনা-বিদ্ধ রোদন সমস্ত ঘর ভরিয়া যেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে।

বাহিরে আসিয়া বারান্দার মোড়াটার উপর বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ পরে বোধ করি আলো জ্বালিবার জন্যই রোহিণী বাহির হইয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, "কে ও?" সাড়া দিয়া বলিলাম, "আমি শ্রীকান্ত।" "শ্রীকান্ত বাবু? ওঃ—" বলিয়া সে দ্রুতপদে কাছে আসিল, এবং ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া আমাকে ভিতরে আনিয়া বসাইল। তাহার পরে কাহারো মুখে কথা নাই—দু'জনেই চুপ-চাপ। আমিই প্রথমে কথা কহিলাম। বলিলাম, "রোহিণী দা, আর কেন এখানে? চলুন আমার সঙ্গে।" রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" বলিলাম, "এখানে আপনার কষ্ট হচ্চে, তাই।" রোহিণী কিছুক্ষণ পরে কহিল, "কষ্ট আর কি!" তা' বটে! কিন্তু এ সকল বিষয়ে ত আলোচনা করা যায় না। কতই না তিরস্কার করিব, কতই না সৎপরামর্শ দিব, ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলাম ;—সব ভাসিয়া গেল। এতবড় ভালবাসাকে অপমান করিতে পারি,—নীতি শাস্ত্রের পুঁথি আমি এত বেশি পড়ি নাই। কোথায় গেল আমার ক্রোধ, কোথায় গেল আমার বিদ্বেষ! সমস্ত সাধু সঙ্কল্প যে কোথায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল, তাহার উদ্দেশও পাইলাম না। রোহিণী কহিল, সে প্রাইভেট টিউশানিটা ছাড়িয়া দিয়াছে ; কারণ তাহাতে শরীর খারাপ করে। তাহার আফিসটাও ভাল নয়,—বড় খাটুনি। না হইলে আর কষ্ট কি!

চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ, এই রোহিণীর মুখেই কিছুদিন পূর্ব্বে ঠিক উল্টা কথা শুনিয়াছিলাম। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,—"আর এই রাঁধা-বাড়া, আফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে এসে ভারি বিরক্তি-

কর। কি বলেন শ্রীকান্ত বাবু?" বলিব আর কি! আগুন নিবিয়া গেলে শুধু জলে যে ইঞ্জিন চলে না, এ তো জানা কথা।

তথাপি সে এই বাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে রাজী হইল না। অভয়াকে সে নিশ্চয় চিনিতে পারিয়াছিল। কল্পনার ত কেহ সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে না, সুতরাং সে কথা ধরি না। কিন্তু অসম্ভব আশা যে, কোন ভাবেই তাহার মনের মধ্যে আশ্রয় পায় নাই, তাহা তাহার কয়টা কথা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তবুও যে কেন সে এই দুঃখের আগার পরিত্যাগ করিতে চাহে না, তাহা আমি ভাবিয়া পাইলাম না বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না যে, যে-হতভাগ্যের গৃহের পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গেছে, তাহাকে এই শূন্য-ঘরের পুঞ্জীভূত বেদনা যদি খাড়া রাখিতে না পারে, ত, ধূলিসাৎ হইতে নিবারণ করিবার সাধ্য সংসারে আর কাহারও নাই।

বাসায় পৌঁছিতে একটু রাত্রি হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখি, এক কোণে বিছানা পাতিয়া কে-একজন আগাগোড়া মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। ঝিকে জিজ্ঞাসা করায় কহিল, 'ভদ্দর লোক'। তাই আমার ঘরে। আহারাদির পরে এই ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ হইল। তাঁর বাড়ী চট্টগ্রাম জেলায়। বছর চারেক পরে নিরুদ্দিষ্ট ছোট ভাইয়ের সন্ধান মিলিয়াছে। তাহাকেই ঘরে ফিরাইবার জন্য নিজে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "মশাই, গল্পে শুনি, আগে কামরূপের মেয়েরা বিদেশী পুরুষদের 'ভেড়া' করিয়া ধরিয়া রাখিত। কি জানি, সে-কালে তাহারা কি করিত; কিন্তু এ-কালে বর্ম্মা মেয়েদের ক্ষমতা যে তার চেয়ে এক তিল কম নয়, সে আমি হাড়ে-হাড়ে টের পাইয়াছি।" আরও অনেক কথা কহিয়া, তিনি ছোট ভাইকে উদ্ধার করিতে আমার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য সফল করিতে আমি কোমর বাঁধিয়া লাগিব, কথা দিলাম। কেন, তাহা বলাই বাহুল্য। পরদিন সকালে সন্ধান করিয়া ছোট ভাইয়ের বর্ম্মা-শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বড় ভাই আড়ালে রাস্তার উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

ছোট ভাই উপস্থিত ছিলেন না, সাইকেল করিয়া প্রাতঃভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। বাড়ীতে শ্বশুর শাশুড়ী নাই, শুধু স্ত্রী তাহার একটি ছোট বোন লইয়া এবং জনদুই দাসী লইয়া বাস করে। ইহাদের জীবিকা বর্ম্মা-চুরুট তৈরি করা। তখন সকালে সবাই এই কাজেই ব্যাপৃত ছিল। আমাকে বাঙালী দেখিয়া এবং সম্ভবতঃ তাহার স্বামীর বন্ধু ভাবিয়া, সমাদরের সহিত গ্রহণ করিল। ব্রহ্ম-রমণীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী; কিন্তু পুরুষেরা তেম্‌নি অলস। ঘরের কাজ-কর্ম্ম হইতে সুরু করিয়া বাহিরের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় সমস্তই মেয়েদের হাতে। তাই লেখাপড়া তাহাদের না শিখিলেই নয়। কিন্তু পুরুষদের আলাদা কথা। শিখিলে ভাল, না শিখিলেও লজ্জায় সারা হইতে হয় না। নিষ্কর্ম্মা পুরুষ স্ত্রীর উপার্জ্জনের অন্ন বাড়ীতে ধ্বংস করিয়া, বাহিরে তাহারই পয়সায় বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইলে, লোকে আশ্চর্য্য হয় না। স্ত্রীরাও ছি ছি করিয়া, ঘ্যাণ-ঘ্যাণ, প্যান-প্যান করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলা আবশ্যক মনে করে না। বরঞ্চ ইহাই কতকটা যেন তাহাদের সমাজে স্বাভাবিক আচার বলিয়া স্থির হইয়া গেছে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই 'বাবু সাহেব' দ্বিচক্রযানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ইংরাজি পোষাক, হাতে দু'তিনটা আংটি, ঘড়ি-চেন;—কাজ-কর্ম্ম কিছুই করিতে হয় না,—অথচ অবস্থাও দেখিলাম বেশ স্বচ্ছল। তাহার বর্ম্মা-গৃহিণী হাতের কাজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপি এবং ছড়িটা হাত হইতে লইয়া রাখিয়া দিল। ছোট বোন চুরুট দেশলাই প্রভৃতি আনিয়া দিল, একজন দাসী চায়ের সরঞ্জাম এবং অপরে পানের বাটা আগাইয়া দিল। বাঃ—লোকটাকে যে সবাই মিলিয়া একেবারে রাজার হালে রাখিয়াছে! লোকটার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। বোধ হয় চারু-টারু এম্‌নি কি একটা যেন হইবে। যাক্‌গে, আমরা না হয় তাঁকে শুধু 'বাবু' বলিয়াই ডাকিব। বাবু প্রশ্ন করিলেন—আমি কে? বলিলাম, আমি তাঁর দাদার বন্ধু। তিনি বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, "আপনি ত 'কলকেতিয়া,' কিন্তু আমার দাদা ত কখনো সেখানে যাননি। বন্ধুত্ব হ'ল ক্যাম্‌নে?"

কেমন করিয়া 'বন্ধুত্ব' হইল, কোথায় হইল, কোথায় আছেন, ইত্যাদি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্যটাও জানাইলাম। এবং তিনি যে ভ্রাতৃরত্নের

দর্শনাভিলাষে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, তাহাও নিবেদন করিলাম।

পরদিন সকালেই আমাদের হোটেলে 'বাবুটির' পদধূলি পড়িল; এবং উভয় ভ্রাতায় বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে দুই ভাইয়ের কি যে মিল হইয়া গেল,—সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, 'বাবুটি' দাদা বলিয়া ডাক দিয়া যখন-তখন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ফিস্‌ফিস্ মন্ত্রণা, আলাপ আপ্যায়ন, খাওয়া-দাওয়ার আর অবধি রহিল না। একদিন অপরাহ্নে দাদাকে ও আমাকে চা-বিস্কুট ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করিয়া গেলেন।

সেই দিন তাঁহার বর্ম্মা-স্ত্রীর সহিত আমার ভাল করিয়া আলাপ হইল। মেয়েটি অতিশয় সরল, বিনয়ী এবং ভদ্র। ভালবাসিয়া স্বেচ্ছায় ইহাকে বিবাহ করিয়াছে এবং সেই অবধি বোধ করি একদিনের জন্যেও তাহাকে দুঃখ দেয় নাই। দিন চারেক পরে 'দাদাটি' আমাকে একগাল হাসিয়া কাণে-কাণে জানাইলেন যে, পরশু সকালের জাহাজে তাঁহারা বাড়ী যাইতেছেন। শুনিয়াই কেমন একটা ভয় হইল; জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ভাই আবার ফিরে আস্‌বেন ত?" দাদা বলিলেন, "আবার! রাম রাম বলে একবার জাহাজে চড়তে পারলে হয়।" জিজ্ঞাসা করিলাম "মেয়েটিকে জানিয়েছেন?" দাদা কহিলেন, "বাপ্‌রে! তা'হলে আর রক্ষা থাক্‌বে! বেটির যে যেখানে আছে, রক্তবীজের মত এসে ছেঁকে ধরবে।" বলিয়া চোখ দু'টো মিট্‌মিট্ করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "'ফ্রেঞ্চ লিভ' মশাই, 'ফ্রেঞ্চ লিভ'—এ আর বুঝলেন না?" অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইল। কহিলাম, "মেয়েটি ত তা'হলে ভারি কষ্ট পাবে?" আমার কথা শুনিয়া দাদা ত একেবারে হাসিয়াই আকুল। কোন মতে হাসি থামিলে, বলিতে লাগিলেন, "শোন কথা একবার! বর্ম্মা বেটিদের আবার কষ্ট! এ শালার জেতের লোক খেয়ে আঁচায় না,———না আছে এঁটো-কাঁটার বিচার, না আছে একটা জাত-জন্ম! বেটিরা সব নেপ্পি (একপ্রকার পচা মাছ যাহাকে 'ঙাপি' বলে) খায়, মশাই, নেপ্পি খায়! গন্ধের চোটে ভূত-পেত্নি পালায়। এ ব্যাটা-বেটিদের আবার কষ্ট! একটা যাবে, আর একটা পাক্‌ড়াবে——ছোট জাত ব্যাটারা——"

"থামুন মশাই, থামুন। আপনার ভাইটিকে যে এই চার বচ্ছর ধরে রাজার হালে খাওয়াচ্চে পরাচ্চে, আর কিছু না হোক্, তারও ত একটা কৃতজ্ঞতা আছে!" দাদার মুখ গম্ভীর হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আপনি যে অবাক্ করলেন মশাই। পুরুষ-বাচ্চা বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে বয়সের দোষে না হয় একটা সখ করেই ফেলেচে। কোন্ পুরুষ মানুষটাই বা না করে বলুন? আমার ত আর জান্‌তে বাকি নেই। এর না হয় একটু জানা-জানি হয়েই পড়েচে—তাই বলে বুঝি চিরকালটা এম্নি করেই বেড়াতে হবে? ভাল হয়ে সংসারধর্ম্ম করে পাঁচজনের একজন হতে হবে না? মশাই, এ বা কি! কাঁচা বয়সে কত লোকে হোটেলে ঢুকে যে মুর্গী পর্য্যন্ত খেয়ে আসে! কিন্তু বয়স পাক্‌লে কি আর সে তাই করে, না, করলে চলে? আপনিই বিচার করুন না, কথাটা সত্যি বল্‌চি, না, মিথ্যে বল্‌চি!" বস্তুতঃই এ বিচার করিবার মত বুদ্ধি আমাকে ভগবান দেন নাই, সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম। আফিসের বেলা হইতেছিল, স্নানাহার করিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

কিন্তু আফিস হইতে ফিরিলে তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ভেবে দেখলাম, আপনার পরামর্শই ভাল মশাই। এ জাতকে বিশ্বাস নেই, কি জানি শেষে একটা ফ্যাসাদ বাধাবে না কি,—বলে যাওয়াই ভাল। এ বেটিরা আর পারে না কি! না আছে লজ্জা সরম, না আছে একটা ধর্ম্ম জ্ঞান! জানোয়ার বল্‌লেই ত চলে!" বলিলাম, "হাঁ, সেই ভাল।" কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কেমন যেন মনে হইতে লাগিল, ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র আছে। ষড়যন্ত্র সত্যই ছিল। কিন্তু সে যে এত নীচ, এত নিষ্ঠুর, তাহা চোখে না দেখিলে কেহ কল্পনা করিতে পারে বলিয়াও ভাবিতে পারি না।

চট্টগ্রামের জাহাজ রবিবারে ছাড়ে। আফিস বন্ধ; সকালবেলাটায় করিই বা কি; তাই তাঁকে see off করিতে জাহাজ-ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জাহাজ তখন জেটিতে ভিড়িয়াছে। যাহারা যাইবে এবং যাহারা যাইবে না—এই দুই শ্রেণীর লোকেরই ছুটাছুটি, হাঁকা-হাঁকিতে কে বা কাহার কথা শুনে—এমনি ব্যাপার। এদিকে-ওদিকে চাহিতেই সেই বর্ম্মা মেয়েটির দিকে চোখ পড়িল। একধারে

সে ছোট বোনটির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সারা রাত্রির কান্নায় তাহার চোখ দুটি ঠিক জবাফুলের মত রাঙা। ছোট 'বাবু' মহা ব্যস্ত। তাঁহার দু'চাকার গাড়ি লইয়া, তোরঙ্গ বিছানা লইয়া আরও কত কি যে লট-বহর লইয়া কুলিদের সহিত দৌড়-ধাপ করিয়া ফিরিতেছেন,—তাঁহার মুহূর্ত্ত অবসর নাই।

ক্রমে সমস্ত জিনিস-পত্র জাহাজে উঠিল, যাত্রীরা সবাই ঠেলা-ঠেলি করিয়া গিয়া উপরে উঠিল, অ-যাত্রীরা নামিয়া আসিল, সুমুখের দিকে নোঙর তোলা চলিতে লাগিল,—এইবার ছোট'বাবু' তাঁহার দ্রব্য-সম্ভারের হেফাজত করিয়া যায়গা ঠিক করিয়া তাঁহার বর্ম্মা-স্ত্রীর কাছে বিদায়ের ছলে সংসারের নিষ্ঠুরতম এক অঙ্কের অভিনয় করিতে জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী,—সে অধিকার তাঁহার ছিল।

আমি অনেক সময়ে ভাবি, ইহার কি প্রয়োজন ছিল? কেন মানুষ গায়ে পড়িয়া আপনার মানব আত্মাকে এমন করিয়া অপমানিত করে! সে মন্ত্র পড়া স্ত্রী নাই বা হইল, কিন্তু সে ত নারী! সে ত কন্যা ভগিনী-জননীর জাতি! তাহারই আশ্রয়ে সে ত এই সুদীর্ঘকাল স্বামীর সমস্ত অধিকার লইয়া বাস করিয়াছে! তাহার বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য্য, সমস্ত অমৃত সে ত সমস্ত কায়মনে তাহাকেই নিবেদন করিয়া দিয়াছিল! তবে কিসের লোভে সে এই অগণিত লোকের চক্ষে তাহাকেই এতবড় নিদয় বিদ্রূপ ও হাসির পাত্রী করিয়া ফেলিয়া গেল! লোকটা একহাতে রুমাল দিয়া নিজের দু'চক্ষু আবৃত করিয়া এবং অপর হাতে তাহার বর্ম্মা-স্ত্রীর গলা ধরিয়া কান্নার সুরে কি সব বলিতেছে; এবং মেয়েটি আঁচলে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে।

আশেপাশে অনেকগুলি বাঙালী ছিল। তাহারা কেহ মুখ ফিরাইয়া হাসিতেছে; কেহ বা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি একটু দূরে ছিলাম বলিয়া প্রথমটা কথাগুলা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু কাছে আসিতেই সকল কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। লোকটা রোদনের কণ্ঠে বর্ম্মা ভাষায় এবং বাঙ্লা ইতর ভাষায় মিশাইয়া বিলাপ করিতেছে। বাঙ্লাটা কথঞ্চিৎ মার্জ্জিত করিয়া লিখিলে এইরূপ শুনায়—"একমাস পরে রংপুর হইতে তামাক কিনিয়া যা আসিব, সে আমিই জানি! ওরে আমার রতনমণি! তোকে কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম রে, কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম!" এগুলি শুধু আমাদের মত কয়েকজন অপরিচিত বাঙালী দর্শকদের আমোদ দিবার জন্যই; কিন্তু মেয়েটি ত বাঙ্লা বুঝে না, শুধু কান্নার সুরেই তাহার যেন বুক ফাটিয়া যাইতেছে। এবং কোনমতে সে হাত তুলিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটা টানিয়া-টানিয়া, ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া বলিতে লাগিল—"মোটে পাঁচশ' টাকা তামাক কিন্তে দিলি,—আর যে তোর কিচ্ছু নেই—পেট ভরল না—অম্‌নি তোর বাড়ীটাও বিক্রী করিয়ে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যেতে পারতাম, তবে ত বুঝতাম, একটা দাঁও মারা গেল! এ যে কিছুই হল না রে! কিছুই হল না!"

আশ-পাশের লোকগুলা অবরুদ্ধ হাস্যে ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু, যাহাকে লইয়া এত আমোদ, তাহার চক্ষু-কর্ণ তখন দুঃখের বাষ্পে একেবারে সমাচ্ছন্ন! মনে হইতে লাগিল, বুঝি বেদনার ভরে ভাঙিয়া পড়ে বা!

খালাসিরা উপর হইতে ডাকিয়া কহিল, "বাবু, সিঁড়ি তোলা হইতেছে।" লোকটা গলা ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি পর্য্যন্ত গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিল। মেয়েটির হাতে সাবেক কালের একটি ভাল চুণির আংটি ছিল, সেইটির উপর হাত রাখিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিল, "ওরে, দে রে, আংটিটাও বাগিয়ে নিয়ে যাই। যেমন করে হোক্ দু'শ-আড়াইশ' টাকা দাম হবে—এটাই বা ছাড়ি কেন!" মেয়েটি তাড়াতাড়ি সেটি খুলিয়া প্রিয়তমের আঙুলে পরাইয়া দিল। 'যথা লাভ!' বলিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে গিয়া উঠিল। জাহাজ জেটি ছাড়িয়া ধীরে-ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং মেয়েটি মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাঁটু গাড়িয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। অনেকেই দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেল। কেহ বা কহিল, আচ্ছা ছেলে! কেহ বা বলিল বাহাদুর ছোক্‌রা! অনেকেই বলিতে-বলিতে গেল কি মজাটাই করলে! হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে ব্যথা ধরে গেল!—এম্‌নি কত কি মন্তব্য। আমি শুধু সেই সকলের হাসি-তামাসার পাত্রী বোকা মেয়েটার

অপরিসীম দুঃখের নিঃশব্দ সাক্ষীর মত স্তব্ধভাবে চাহিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছোট বোনটি চোখ মুছিতে-মুছিতে পাশে দাঁড়াইয়া দিদির হাত ধরিয়া টানিতেছিল। আমি কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই, সে আস্তে-আস্তে কহিল, "বাবুজী এসেছেন, দিদি, ওঠো।" মুখ তুলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে কান্না তাহার বাঁধ ভাঙিয়া আছড়াইয়া পড়িল। আমার সান্ত্বনা দিবার কি-ই বা ছিল! তবুও সেদিন তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তারই পিছনে-পিছনে তাহারই গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। সমস্ত পথটা সে কাঁদিতে-কাঁদিতে শুধু এই কথাই বলিতে লাগিল, "বাবুজী, বাড়ী আমার আজ খালি হইয়া গেছে। কি করিয়া আমি সেখানে গিয়া ঢুকিব! এক মাসের জন্য তামাক কিনিতে গেছেন—এই একটা মাস আমি কি করিয়া কাটাইব! বিদেশে না জানি কত কষ্টই হবে, কেন আমি যাইতে দিলাম! রেঙ্গুনের বাজারে তামাক কিনিয়া ত এতদিন আমাদের চলিতেছিল; —কেন তবে বেশি লাভের আশায় এতদূরে তাঁকে পাঠালাম। দুঃখে আমার বুক ফাটিতেছে, বাবুজী, আমি পরের মেলেই তার কাছে চলিয়া যাইব।" এমনি কত কি!

আমি একটা কথারও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চোখের জল গোপন করিতে লাগিলাম। মেয়েটি কহিল, "বাবুজী, তোমাদের জাতের লোক যত ভালবাসিতে পারে, এমন আমাদের জাতের লোক নয়। তোমাদের মত দয়ামায়া আর কোন দেশের লোকের নাই।" একটু থামিয়া আবার বার দুইতিন চোখ মুছিয়া কহিতে লাগিল, "বাবুজীকে ভালবাসিয়া যখন দু'জনে একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম, কত লোক আমাকে ভয় দেখাইয়া নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু আমি কারও কথা শুনি নাই। এখন কত মেয়ে আমাকে হিংসা করে।" চৌমাথার কাছে আসিয়া আমি বাসায় যাইতে চাহিলে, সে ব্যাকুল হইয়া দুই হাত দিয়া গাড়ীর দরজা আটকাইয়া বলিল, "না বাবুজী, তা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে গিয়া এক পিয়ালা চা' খাইয়া আসিবে চল।" আপত্তি করিতে পারিলাম না। গাড়ী চলিতে লাগিল। সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা বাবুজী, রঙ্গপুর কতদূর? তুমি কখনো গিয়াছ? সে কেমন যায়গা? অসুখ করিলে ডাক্তার মিলে ত?" বাহিরের দিকে চাহিয়াই জবাব দিলাম, "হাঁ, মিলে।" সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ফয়া ভাল রাখুন। তাঁর দাদাও সঙ্গে আছেন, তিনি খুব ভাল লোক, ছোট ভাইকে প্রাণ দিয়া দেখিবেন। তোমাদের যে মায়ার শরীর! আমার কোন ভাবনা নাই, না, বাবুজী?" চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু ভাবিতে লাগিলাম, এ মহাপাতকের কতখানি অংশ আমার নিজের? আলস্য বশতঃই হোক, বা চক্ষু-লজ্জাতেই হোক, বা, হতবুদ্ধি হইয়াই হোক, এই যে মুখ বুজিয়া এত বড় অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে দেখিলাম, কথাটি কহিলাম না, ইহার অপরাধ হইতে কি আমি অব্যাহতি পাইব? আর, তাই যদি হইবে, ত, মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারি না কেন? তাহার চোখের প্রতি চাহিতে সাহস হয় না কিসের জন্য?

চা-বিস্কুট খাইয়া, তাহাদের বিবাহিত জীবনের লক্ষ কোটী তুচ্ছ ঘটনার বিস্তৃত ইতিহাস শুনিয়া যখন বাটীর বাহির হইলাম, তখন বেলা আর বেশি নাই। ঘরে ফিরিতে প্রবৃত্তি হইল না। দিনের শেষে কর্ম্ম-অন্তে সবাই বাসায় ফিরিয়াছে—দাঁ'ঠাকুরের হোটেল তখন নানাবিধ কলহাস্যে মুখরিত। এই সমস্ত গোলমাল যেন বিষের মত মনে হইতে লাগিল।

একাকী পথে-পথে ঘুরিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ সমস্যার মীমাংসা হইত কি করিয়া? বর্ম্মাদের মধ্যে বিবাহের বিশেষ কিছু একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। বিবাহের ভদ্র অনুষ্ঠানও আছে, আবার স্বামী-স্ত্রীর মত যে কোন নর-নারী তিন দিন একত্রে বাস করিয়া তিন দিন এক পাত্রে হইতে ভোজন করিলেও সে বিবাহ। সমাজ তাহাদের অস্বীকার করে না; সে হিসাবে মেয়েটিকে কোন মতেই ছোট করিয়া দেখা যায় না। আবার 'বাবুটির' দিক দিয়া হিন্দু-আইন-কানুনে এটা কিছুই নয়। এই স্ত্রী লইয়া সে দেশে গিয়া বাস করিতে পারে না। হিন্দু-সমাজ তাহাদের গ্রহণ না করুক, আপামর সাধারণ যে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, সেও সারাজীবন সহ্য করা কঠিন। হয় চিরকাল প্রবাসে নির্ব্বাসিতের ন্যায় বাস করা, না' হয়, এই দাদাটি ছোট ভাইয়ের যে ব্যবস্থা করিল তাহাই ঠিক। অথচ, 'ধর্ম্ম' কথাটার যদি কোন অর্থ থাকে, ত,—সে হিন্দুরই হোক, বা আর কোন জাতিরই হোক,—এত বড় একটা

নৃশংস ব্যাপার যে কি করিয়া ঠিক হইতে পারে, সে ত আমার বুদ্ধির অতীত। এ সকল কথা না হয় সময়মত চিন্তা করিয়া দেখিব ; কিন্তু এই যে কাপুরুষটা আজ বিনা দোষে এই অনন্যনির্ভর নারীর পরম স্নেহের উপর বেদনার বোঝা চাপাইয়া, তাহাকে মুখ ভাঙ্‌চাইয়া পলায়ন করিল, এই আক্রোশটাই আমাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল।

পথের এক ধার দিয়া চলিয়াছি ত চলিয়াছি। বহুদিন পূর্ব্বে একদিন অভয়ার পত্র পড়িবার জন্য যে চায়ের দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই দোকানদারটি বোধ করি আমাকে চিনিতে পারিয়া ডাক দিয়া কহিল, "বাবুসাব, আইয়ে!" হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙিয়া দেখিলাম, এ সেই দোকান এবং ওই রোহিণীর বাসা। বিনা বাক্যে তাহার আহ্বানের মর্য্যাদা রাখিয়া ভিতরে ঢুকিয়া এক পেয়ালা চা পান করিয়া বাহির হইলাম। রোহিণীর দরজায় ঘা দিয়া দেখিলাম, ভিতর হইতে বন্ধ। কড়া ধরিয়া বার দুই নাড়া দিতেই কবাট খুলিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, সম্মুখে অভয়া। "তুমি যে?" অভয়ার চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিল ; এবং কোন জবাব না দিয়াই সে চক্ষের নিমিষে ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু লজ্জার যে মূর্ত্তি সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট আলোকেও তাহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম, তাহাতে জিজ্ঞাসা করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই রহিল না। অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীরবে ফিরিয়া যাইতেছিলাম,—অকস্মাৎ আমার দুই কাণের মধ্যে যেন দু'রকম কান্নার সুর একই সঙ্গে বাজিয়া উঠিল। একটা সেই পাপিষ্ঠের, অপরটা সেই বর্ম্মা-মেয়েটির। চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। মনে-মনে বলিলাম, না, এমন করিয়া অপমান করিয়া আর আমার যাওয়া হইবে না। নাই, নাই,—এমন বলিতে নাই, এমন করিতে নাই—এ উচিত নয়, এ ভাল নয়—এ সব অভ্যাস-মত অনেক শুনিয়াছি, অনেক শুনাইয়াছি, কিন্তু আর না। কি ভাল, কি মন্দ, কেন ভাল, কোথায় কাহার কিসে মন্দ—এ সকল প্রশ্ন পারি যদি তাহার নিজের মুখে শুনিয়া তাহারই মুখের পানে চাহিয়া বিচার করিব ; না পারি ত শুধু পুঁথির লেখা অক্ষরের প্রতি চোখ পাতিয়া মীমাংসা করিবার অধিকার আমার নাই, তোমার নাই, বোধ করি বা বিধাতারও নাই!

বিবিধ-প্রসঙ্গ

নিরক্ষর কবি

[শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ]

পাগলা কানাই

পাগল কানাই জারী-গীতের কবি। যশোহর জেলার ঝিনাইদহ উপবিভাগে সুপ্রসিদ্ধ ভদ্রপল্লী গয়েসপুরের নিকট "বেড়বাড়ি" নামক এক গণ্ডগ্রাম এই কবির জন্মভূমি। কানাই জাতিতে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, দরিদ্র কৃষি গৃহস্থ। ইঁহারা দুই সহোদর,—উজল আর কানাই। সাধারণে কানাইকে পাগল কানাই বলিয়া ডাকিত। এই বিশেষণ পদ দ্বারা দুগ্ধে মধু সংযোগবৎ এক অতি অপূর্ব্ব ভাবের মিলন হইয়াছে। কানাই বাল্যে দুরন্ত, যৌবনে বড় উচ্ছৃঙ্খল ছিল। এই কারণে তাহার ভাবুক পিতা "কুড়ন শেখ" তাহাকে পাগল উপাধি দিয়াছিলেন। যখন কানাই তাহার উদয়োন্মুখী প্রতিভাকে উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত মিশাইয়া কবিত্বের কমনীয় ভাবরাজ্যে লইয়া গেল, তখন তাহার পাগল উপাধি সার্থক হইল।

এই দেশীয় মুসলমানগণ হিন্দুর সংসর্গে থাকিয়া অধিকাংশ সময় হিন্দুর অনেক বিষয়ের অনুকরণ করিয়া চলে। অদ্যাপিও বঙ্গের মুসলমান-সম্প্রদায়ে অনেক হিন্দুভাবের নাম আছে। এখনো বহু মুসলমান পুত্রের যাদব, কানাই, ঝড়ু, মধু, হিরু, দোকড়ি, পাঁচকড়ি নাম শুনা যায়। কানাইর পিতামহ তাহার পিতার নাম "কুড়ন শেখ", আর তাহার নাম কানাই রাখিয়াছিল। তাহার পর কুড়ন শেখ তাহাতে পাগল বিশেষণ দিয়া তাহার ভাবী-জীবনের মহত্বের সূচনা করিয়াছিল।

যখন পাগল কানাই শিশুকালে প্রান্তরমধ্যে সমবয়স্ক শিশুদিগের সঙ্গে "হাডুডুডু" খেলা করিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, তখন তাহার অশ্লীল ভাষা শুনিয়া, ও দুরন্ত চরিত্র দেখিয়া কে ভাবিয়াছিল যে, এই

বালক দেশবিখ্যাত হইবে। কানায়ের কুলগৌরব বংশগৌরব শিক্ষা-গৌরব ও ধনগৌরব কিছুই ছিল না। থাকিবার মধ্যে তাহার হৃদয়ে কবিত্ব, মুখে মিষ্ট কথা, আর কণ্ঠে কলকণ্ঠ পাপিয়ার সুর, এবং অপূর্ব্ব বিনয়শীলতা ছিল। অঙ্গের গঠন যেমন কদর্য্য, বেশভূষাও তদনুরূপ আড়ম্বরশূন্য। তাহার বাল্যজীবনী জানিবার ততটা সুবিধা পাই নাই। কিন্তু পূর্ব বয়সের কাহিনী তাহার রচিত সঙ্গীতে যথেষ্ট পাইয়াছি। একটি জারী গীতের ধুয়ায় আছে—

"শোন উজল ভাই, তোকে কয়ে যাই,
একজনার হাতে পড়ে আছি ভবের পর।
তার গুণ কিবা কব আর।
ঠিক্ যেন ভাই কানাকুয়ো * চেয়ে আছে আস্মান জমির পর।
দানাপাণি লয়ে থাকো থালের উপর।
বিবির সুরৎ যেন দুতীয়ের চাঁদ— আমি তালপাতের সিপাই
তার কলামে ভাইরে ভাই—
ওরে— হাসলে বিবি দেখায় ছবি পটোর পটের পর।
আমার কাছে এলে পরে নড়ে যেন কল,
বিকেলে যেন জলো ডাবা সুনিনাদের গল।
সেই পিরিতি মজেরে ভাই, আছি ভবের পর।"

এই গীতের ভাব সংগ্রহ করিলে বুঝিতে বাকি থাকে না যে, কবি কানায়ের একমাত্র রূপসী স্ত্রী ছিল। কানাই সম্পূর্ণরূপে তাহারি প্রেমে আবদ্ধ ছিল। সাধারণ মুসলমানগণ একটুকু ক্ষমতাপন্ন হইলে প্রায়ই একাধিক পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে, বাদশাহ আমীর ওমরাহগণের তো কথাই নাই। কুবিবংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেও চারি পাঁচটি বিবাহ করিতে দেখা যায়। মুসলমান নিরক্ষর কবি কানাই মুসলমানের তালাক আর বিধবা-বিবাহ আদৌ পছন্দ করিত না। নিম্নের গীতে তাহা সুস্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ; যথা—

"পড়লে তরী তুফানেতে সামাল দেওয়া দায়—
তাঁতে আরো ডবল পালে তরি ডুবে যায়।
এক নারীর এক পতি খোদার কলাম এই,
দুই হাতে পড়লে নারীর ছুরত মরে যায়।
ইচ্ছা-বরী হয়ে নারী যার তার কাছে যায়,
আশোকের সোহাগে তার পরাণ ভরা রয়।
এটা তো বিধির বিধি নয়।
মরে নারীর পতি যদি—
এক লতা আরেক গাছে জড়ান কি যায়?
তার ফুল পাতা সব ঝরে পড়ে
খালি রসে ভাষা রয়, নইলে রস শুখায়ে যায়।"

কবি নিজে সুপুরুষ ছিল না, তাহা নিজেই ব্যক্ত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না; নিম্নের গীতে তাহা প্রকাশ। অভিমানশূন্য সরলতা লইয়া এই গীতটি রচিত। তাহার কনিষ্ঠ উজলকে লক্ষ্য করিয়া অধিকাংশ সময় ধুয়া -(গীতি) রচিত হইত। নিম্নের ধুয়ায় উজলের শিক্ষাদানও অন্যতম উদ্দেশ্য। উজল রূপগর্ব্বে বড় গর্ব্বী ছিল; এবং তাহার বেশভূষায় অতি পারিপাট্য ছিল। ভ্রাতাকে নিজের আদর্শ দেখাইয়া কবি গায়িয়াছিল—

"শোন্ উজল, তুই প্রাণের ভাই,
দেখ দেখি লোকে কি কয়।
আমাকে তুচ্ছ করা এ তো তোর উচিত নয়।
শোন ভাইরে তোর গায়ে ঢাকাই ছিট্
ছেড়া বাবরি, দেখতে ফিট্
পাগল কানাই যেন কাপ পরে যাচ্ছে বাদায়।
টেপাটেপি কচ্ছে সবায় উজলকে পুষ্ট দেখা যায়।
হারে কানাইও তো পুরুষ মন্দ নয়।
ভাইয়ে ভাই দাখিল যেন "পাগলা বুড়ো"
খোপাবাটায় ভিদেম খুড়ে,
আবার এই মানুষের এমন গুণ দিয়েছেন খোদায়।"

এইরূপ সরলভাবে নিজে নিজের রূপ বিষয়ক শ্লোকে শিশু বৃদ্ধ বনিতার পরিচিত জারীর ধুয়ার বর্ণনা করিয়া যে নিরভিমানের পরিচয় দিয়াছে—তাহার তুলনা কোথায়?

এদিকে আবার যৌবনকালের কুপ্রবৃত্তিগুলিকে কানাই কেমন সুন্দরভাবে উচ্চ পথে লইয়া আসিয়াছিল। বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌমিক প্রেমপ্রবাহে জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎকে পর্য্যন্ত সমদৃষ্টিতে দেখিতে তাহার কবি চক্ষু পূর্ণ অভ্যস্ত ছিল। হিন্দু মুসলমান বলিয়া তাহার ঘৃণা-স্নেহ ছিল না; নিম্নের ধুয়ায় তাহা প্রকাশ—

এক বাপের দুই বেটা, তাজা মরা কেহ নয়।
সকলিরই এক রক্ত, এক ঘরে আশ্রয়।
এক মায়ের দুধ খেয়ে এক দরিয়ায় যায়,
কারো গায়ে শালের কোর্ত্তা কারো লক্ষ্ণৌ ছিট্,
দুই ভায়েরে দেখতে কেমন ফিট;
কেবল জবানিতে ছোট বড়, বোবা বাচাল চেনা যায়।
কেউ বলে দুগ্‌গা হরি, কেউ বলে বিসমেল্লা আখেরি,
সবাই কিন্তু পাণি পেতে যায় এক দরিয়ায়।
মালা পৈতা একজন ধরে, কেহ বা সুন্নত করে,
তবে ভাই-ভাইয়ে মারামারি করে যাস্ কেন সব গোল্লায়।"

হৃদয়ের উদার ভাব ইহা হইতে আর কি হইতে পারে? যে অমার্জ্জিত অসংস্কৃত হৃদয় হইতে এইরূপ মহৎ স্বর্গীয় প্রেমপূর্ণ উচ্ছ্বাস সহজভাবে বাহির হইতে পারে—সে হৃদয় কত মহান্, কত উচ্চ, কত উন্নত, তাহা বলিতে গেলে, চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। যখন কানাই যুবক, তখন তাহার এইরূপ জ্ঞান, এইরূপ শিক্ষা আপনা হইতেই জন্মিয়াছিল। কোন দিন কোন স্থানে যদি হিন্দু-মুসলমানে ধর্ম্ম লইয়া বাদানুবাদ হইত, তাহা হইলে কানাই বলিত—

* একরূপ পাখী।

"যে পথে যে হাঁটে উজান, সবই শিমুলের কাঁটা।
যে পারে সে-ন ড়েচ'ড়ে পথ করে নেয় আঁটা।
একজনের এক সোহাগে পুত—
দাদায় ডাকে ভুলো আর দিদি বলে ভূত—
ছেলেটি ঠিক আসে যেন উজান ভাটার মত।
হায় রে হায় করে না কভু পালটা সোতের ছুতো।"

কানাই পূর্ণ নিরক্ষর। গীতাও পড়ে নাই, মিল কোমতও পড়ে পড়ে নাই, অথবা মহাকবি ফারদৌসির বিবেক-জ্বলন্ত ফারশী কবিতাও জানে না। পড়িয়াছে মাত্র মহা বিশ্বগ্রন্থ, শিখিয়াছে মাত্র প্রাণস্পর্শী অপূর্ব্ব ভাবুকতাময়ী শব্দযোজনা। সে কোন দিন কাহারোও নিকট প্রকাশ করে নাই যে, আমি কিছু জানি।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-লেখক একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তুমি এই রচনা করিবার শক্তি কাহার নিকট শিক্ষা করিলে?"—কানাই উত্তর দিয়াছিল—"তোমার ন্যায় ছোকরা লোকের নিকট।" এই সময় লেখকের বয়স ১২।১৩ হইবে। যেমন সহজ সরল প্রকৃতি, আবার তেমনি সে শিশুবেলা হইতে সহজ সরল অবস্থায় কবিতা রচনা করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিল।

কানাই স্বভাব-কবি, তাই তাহার রচিত কবিতায় কাব্যের শ্রেষ্ঠগুণ প্রসাদ-গুণের বাহুল্য ছিল। সাধারণের বোধ্য সহজ শব্দ মাধুর্য্যে গভীর ভাব ব্যঞ্জক গীতি পাগল কানায়ের কবিতায় পূর্ণরূপে ছিল। যে সকল গীত বা গীতাংশ এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইল, উহার অধিকাংশ আমরা লোক-পরম্পরায় শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে এমন কোন ব্যক্তি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—যিনি এই জারী গীতের ভাষা বুঝিতে কষ্ট অনুভব করেন। কানায়ের যৌবন কালের কোন বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা অবগত হইতে পারি নাই। মাত্র তাহার একটী সামান্য চাকুরীর পরিচয় পাইয়াছি। যশোহর জেলায় মাগুরা মহকুমার নিকটস্থ বাশকোটার চক্রবর্ত্তীদিগের বেড়া-বাড়ি গ্রামের নীলকুঠিতে কানাই নাকি দুই টাকা বেতনে খালাসির কার্য্য করিত। এ সময় কানাই নবীন যুবক। নীলকুঠির প্রভাব তখন অত্যধিক। নীলকর সাহেব আর তাঁহাদের বাঙ্গালি কর্ম্মচারিরা তখন দেশের সাধারণ প্রজার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। নীলের অত্যাচার এবং বিস্তৃতি লইয়া যে সময় তুমুল দেশব্যাপী আন্দোলন উঠিয়া, পাদরি মহামতি লংসাহেবের কারাবাস, আর হিন্দুপেট্রিয়টের স্মরণীয় সম্পাদক হরিশ বাবুর জলন্ত দেশ হিতৈষণা এবং বঙ্গীয় কবি নাট্যকার প্রাতঃস্মরণীয় পরলোকগত দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নাটক "নীলদর্পণ" প্রকাশিত হয়, উহা তৎসময়ের ঘটনা। এই দেশব্যাপী নীল-আন্দোলন সময়ে কবি কানাই খালাসির কার্য্য করিয়া দুই পয়সা পাইত। কিন্তু তাহার মনিব প্রাচীন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন যে কানাই কখনো কোন নিঃস্ব গৃহস্থের প্রতি অত্যাচার করে নাই। অথবা গবাদি পশুকে বিশেষ কষ্ট দেয় নাই। প্রত্যহ নীল রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নীলের জমীর মধ্যেই তাহার ভাবী জীবনের সূচনা হইয়াছিল।

এই সময় হইতেই জারী-গীত গাইতে-গাইতে কানাই ধুয়া রচনা আরম্ভ করে। খালাসির কার্য্য কানাই চারি বৎসর করিয়াছিল। এ সময় তাঁহার পিতা বর্ত্তমান। সংসার অচলও নহে, সচলও নহে। উদর পুরিয়া আহার আর সামান্য পরিধেয় পাইলে বঙ্গীয় কৃষকের আর বড় অন্য বস্তু আবশ্যক হয় না।

অতঃপর আমরা তাহার বার্দ্ধক্য জীবন লইয়া আলোচনা করিব। যখন কানাই প্রবীণ তখন একদিন যশোহর জেলার প্রসিদ্ধ বন্দর কেশবপুরে জারী-গীত গাইতে গিয়া বলিয়াছিল—

তিন সন ধরে গাচ্ছি জারী এই কেশবপুর,
এর শব্দ গেছে বহু দূর।
আর ফিরব না রে ভবের হাটে
পরাণ রবি বসেছে পাটে
সাড় লেগেছে নাকে ঠোঁটে—মিটে এল গলার সুর॥
ছিল হাটে দোকানি যারা—ক্রমে সরে পড়লো তারা
হলেম নজর ধরা, দিশেহারা,
বেশাতির হিসাব রইল দূর।

এই সঙ্গীতটির মর্ম্মাবগত হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, কানাই অন্তিমের সেই "ভীষণ দিনের" জন্য কেমন সুন্দর ভাবে প্রস্তুত ছিল। ভবের খেলা খেলিয়া প্রাপ্ত মানবগণ শেষের বন্ধু মৃত্যুর জন্য এই ভাবেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। মরিবার কথা উপস্থিত হইলে কবি কানাই বলিত—

ডেঙ্গায় জলে আছে পা,
হাত ধরে আয় নিয়ে যা,
আর চাইনে ভেল্‌কী খেলতে,
বাড়ি যাই হাসতে হাসতে,
শুকনো গাছে ঝুলছে ফল,
দূরে গেছে গায়ের বল।
আয়রে মৌত্‌ হাওয়ায় দুলে
উড়িয়ে দিয়ে বাও—কাণামাছি
আসি বসে—হাত ধরে আয় নিয়ে যা।"

কানাই বলিতেছে—"আয় মৃত্যু আয়, হাত ধরিয়া লইয়া যা, হাসিতে হাসিতে তোর সঙ্গে বাড়ি চলিয়া যাই।" যে ব্যক্তি এইরূপ কবিতার কবি—সে ব্যক্তি কত মহান। কানাই কখন গীতাও পড়ে নাই অথবা ইউরোপীয় মহাত্মা ঈশার মহাবাক্যও শ্রবণ করে নাই। কেবল মহাযোগী মহম্মদের "কেরামতের" কথাই কাণ পাতিয়া শুনিয়া-ছিল। অথচ নিজের স্বাভাবিক হৃদ্‌চৈতন্যের সাহায্যে ঐরূপ নির্লিপ্ত অনাসক্তের জ্বলন্ত চিত্র কবিতায় ছড়াইয়া প্রকৃত দেশে যাইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। ইহা অপেক্ষা উন্নত ভাব আর কি হইতে পারে!

ইহার পর শুনুন, কেমন প্রাণমন-মুগ্ধকারী মৃত্যুকালের সুন্দর বিবেক-সঙ্গীত। কানাই মৃত্যুর অর্দ্ধ ঘণ্টা থাকিতে শ্রেষ্ঠ শিষ্য বালকচাঁদকে বলিয়াছিল—

আস্‌মানের গায় ফুট্‌ল আলো চাঁদ সুরযের গায়—
ওরে বাল্লক দেখ্‌রে কানাই মিশে গেল তায়।
তোরা পাল্লিনে আর রাখ্‌তে ধরে, পরাণ পাখী মেলে ধায়।"
বড় সুখের দিন আমার—যাবো শান্তিপুরে, বাঁশী ডাকিতেছে সুরে,
* * * ওরে তোরা কাকন নিয়ে আয়।

ধন্য কানাই! ধন্য তোমার সাধনা! ধন্য তোমার ভগবদ্‌ভক্তি! তুমি সামান্য কৃষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে দেবদুর্লভ পরাভক্তি লইয়া কবিত্বের ভাবরাজ্যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলে, তাহা চিরদিনই শিক্ষিত মানবের চিরলক্ষ্য। তুমি সুধু কবি নহ—তুমি সাধক।—তুমি যোগী—তুমি ভক্ত—তুমি অমর কবি—আদর্শ পুরুষ। যাঁহারা কবিতাকে দর্শন শাস্ত্রের জটিলতার মধ্য দিয়া সরল ভাবে মিলন করিতে পারেন—তাঁহারা মানবদেহের অনেক গুপ্তকাহিনী লইয়া কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কবিতাকে লোকে সাধারণতঃ "দেহতত্ত্ব" কহে। দেহতত্ত্বজ্ঞানী কবিগণের কবিতা বড় গভীর ভাবব্যঞ্জক; তুলসীদাস—তুকারাম—কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকির (হরিনাথ মজুমদার) প্রভৃতি কবিগণ আধ্যাত্মিক রাজ্যের অমর কবি। নিরক্ষর কবি পাগল কানাইও দেহতত্ত্ব সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিল। যথা—

"ফুল ফুটেছে প্রেম-সরোবরে—ফুলের তালাস বল কে করে।
যোগী যোগ সাধন করে—সেই ফুলের তরে।
শুনেছি, ফুল ছাড়া তার মূল রয়েছে চৌদ্দ ভুবনের পরে।
এক ভাবেতে মূল এসে, দুই গাছে এক ফুল ধরে।
দিনকাণা সব জান্তে না পেরে ঘুরে মরে।
শুনি বার মাসে বার ফুল আসে,
ফুটে তিন দিন ছাড়া পুর-পাশে,
কত ফুল উড়ে যায় বাতাসে।
শুনি লগ্ন-যোগে এক ফুল ধরে—
সেই ফুলে হয় ফলের গঠন
আর সব যায় অকারণ জলে ভেসে।
অধরচাঁদ বিরাজ করে সেই ফুলে বসে।
ফুল ফুটে হয় জগত আলো ব্যাপিত হয় সব ঘটে—
বার মাসেই দুই পক্ষ—কোন্ পক্ষে কোন্ ফুল ফোটে—
যে ফুল আছে সব ঘটে।
কতজন হয়ে বেভোলা—পড়ে আছে গাছতলা,
ফুলের আশে ঘুরছে দুবেলা।
ফুলের ফল কিছু নয় সামান্য ধন—
যে করেছে সাধ্য সাধন, দেছে যারে সেই কালো—
ফুলের ফল পেলে হয় চৌদ্দ পুরুষ উজল।
কানাই তাই ভাবছে বসে—ভেবে কিছু পায় না দিশে,
ফুলের আশে ঘুরছে দেশান্তরে,
কি ভাবে এক ফুল এসে দুই গাছে এক ফুল ধরে।"

এই সঙ্গীতটির ভাবানুসন্ধানে বুঝিতে বাকি থাকে না যে, কবি "ফুল" বলিয়া দুইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। একে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক রজঃক্রিয়া। দ্বিতীয় গর্ভস্থ জীব বা জীবাত্মার ক্রিয়া।

কবি কানাই অনেক দেহতত্ত্ব সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহার মধ্যে আর একটা নিম্নে প্রকাশিত হইল—

পাগল কানাই বলে, গড়া রথ নূতন কলে
চালাতাম সাবেক বলে, এই শেষকালে কল বিকলে চলে না।
আমি ঠেলে ঠুলে চালাতে চাই, যে ঠেলবার সে ঠেলে না—
আমার ঠেল্‌তে ঠেলতে দিন গিয়াছে,
এখন আর ঠেলন আসে না।
এ রথে ছিল যারা—ক্রমে সরে পলো তারা,
হয়েছি দিশেহারা, নজর-ধরা, সরে যেতে পাল্লেম না।
আমি যার কাছে যাই সেই রাগ করে বলে
আমি ভাটি রথে থাকবো না।
ইন্দ্র চন্দ্র রিপু তারা—প্রবোধ মানে না ভাটি রথ চলে না।
এ রথ নূতন ছিল গড়া—খুব টনক ছিল দড়া,
কত জোরে চলতো ঘোড়া কি পরিপাটি—
আমরা এই ষোলজনে এ রথ দেখে শুনে
দিনকতক টেনেটুনে দিয়াছি কত বাহার।
এর সারথি হয়েছে ভাটি, দড়াতে জোর নাইকো আর;
পাগল কানাইর হল কেবল টানিটানি সার;—
এ রথ চলে নাকো আর।
যদি ছুতর পেতাম—তালি দিতাম,
সাবেক সাবেক বহাল রাখিতাম—এ রথ পুরাণ হতো না;
আমি যার কাছে যাই সেই রাগ করে—
বলে ভাঙ্গা রথে থাকব না।—ইত্যাদি।

কানাইয়ের প্রচারিত সমস্ত সঙ্গীত সংগ্রহ করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোথাও তেমন ভাবে পাই নাই। এই নিরক্ষর কবির জন্মস্থানে বহু অনুসন্ধান করিয়াও কিছু পাই নাই, কেবল বেড়বাড়ি গ্রামের নিকটবর্ত্তী গায়েসপুরের এক গৃহস্থের বাড়ি ভুষণাই তুলট কাগজে লিখিত নিম্নের গানটা পাইয়াছিলাম। যথা—

মরার আগে মর শমনকে শান্ত কর
যদি তা করতে পার, ভবপারে যাবিরে মন-রসনা
মৃতদেহ জেন্দাকর থাকতে কেন কর না,
মরার সময় মনে পড়লে কিছুই হবে না।
মরা কি এমন মজা, মরে দেহ কর তাজা,
শমন বলে ভয় কিরে, তার কালাকালের ভয় থাকে না।
মার ডঙ্কা ভবের পর, মৃতদেহ জেন্দা তোর হবে ভবপর,
গুরু হবেন কাণ্ডারি;
এড়াবে অপার বারি, যাবে ভবসিন্ধু পার;

নইলে মরে দেখিছি, কতদিন বেঁচেও আছি
মরার বসন পরেছি।
কয়ে যায় তাই পাগল কানাই,
আমি চ'ক্ বুজিলে সলক দেখি—মেঘে পরে আঁধার হয় ;
তাইতে আমার নাইকো এখন মরণ বলে ভয়।
তোরা মরবি কেরে আয়,
আর অধর ধরা জিয়ন্তে মরা, জীব হয়েছে ভজন সার।
জীবের কিছু জ্ঞান হল না—ওরে মরার সময়
মনে পড়লে কিছুই হবে না—ইত্যাদি।*

পরমাণুর প্রকৃতি

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় এম-এসসি]

প্রকৃতির নাট্যশালায় কত যে নূতন-নূতন লীলা-খেলা চলিতেছে, কত যে অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহা কয় জনই বা লক্ষ্য করে? আর কত আশ্চর্য্য তথ্য যে তাহার অন্তরে লুক্কায়িত আছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? চাঁদের কলঙ্কের মত বিজ্ঞান শাস্ত্রে একটা কলঙ্ক চিরদিন রহিয়া গিয়াছে। এ কলঙ্কের মুক্তি নাই। যাহা চিরন্তন সত্য, তাহাই বিদ্যা। এই অর্থে বিজ্ঞান-বিদ্যাকে সাধারণ লোকে একটা বিদ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে সহসা রাজী হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা আজ যাহাকে ধ্রুব, নিত্য পদার্থ বলিয়া নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, জগতে নূতন-নূতন জ্ঞান বিস্তার করিতেছেন, হঠাৎ দুদিন পরে চাহিয়া দেখেন, তাঁহার নিত্য বস্তু অনিত্য পদার্থে পরিণত হইয়াছে। যে বিদ্যার ভিত্তি এত ক্ষীণ, এত দুর্ব্বল, যাহা কথায়-কথায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে—তাহার মূল্য কতটুকু? আজ তুমি জল জল বলিয়া কত আদরে পাত্রে করিয়া গলাধঃকরণ করিতেছ—আর বলিতেছ জল আমাদের জীবন, জল ছাড়া আর আমাদের কিছুই নাই এবং জলই একটা মূল পদার্থ। ইহাকে যতই ভাঙ্গ, ইহা জল ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না; সোণাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সেই সোণাই থাকিবে, গুঁড়া করিয়া ফেলিলে স্বর্ণরেণু অবশিষ্ট থাকিবে। এই মত স্থির করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বেশ করিয়া নিজের মনের মত তথ্যসকল আবিষ্কার করিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া গেল যে, জল একটা মূল পদার্থ নহে; তাহাকে ভাঙ্গিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ পাওয়া যায়। আজ যাহাকে মূল পদার্থ বলিতেছি, কাল তাহাকে আর মূল পদার্থ বলিতে পারিতেছি না; আজ যাহাকে নিত্য পদার্থ বলিয়া নানাপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছি, কাল তাহা এক ফুৎকারে উড়িয়া যাইতেছে। এই সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া কি কেহ বিজ্ঞান-বিদ্যার কোন সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতে পারে? যাঁহারা বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্তে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, তাঁহারা যেন বিচারকের আসনে বসিয়া বিজ্ঞান-বিদ্যার সিদ্ধান্তগুলি এক-এক করিয়া পরীক্ষা করিয়া কোনটার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন আবার কোনটাকে অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন; তাঁহারাই যেন দিন দুনিয়ার মালিক হইয়া বসিয়া আছেন। বৈজ্ঞানিকদের দুরদৃষ্ট, নচেৎ এত পরিশ্রম, এত সাধনা করিয়া যাহা আবিষ্কার করিলেন, তাহা কি না এক কথাতেই ভাসিয়া গেল। বাস্তবিক পক্ষে ইহা বৈজ্ঞানিকদের দোষ নহে। ইহা চঞ্চলা প্রকৃতির খেলা মাত্র। মানবের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বিধাতা আমাদিগকে যে ইন্দ্রিয়-শক্তি দিয়াছেন, তাহার সাহায্যে প্রকৃতি দেবীর কতটুকু পরিচয় পাই, তাহা স্থির-চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। আজ প্রকৃতিকে ধরিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া চলিতেছি, তাহাকে বুঝিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার দুয়ারে মাথা খুঁড়িতেছি, তিনি তাঁহার অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া দিয়া কোথায় যে সরিয়া যাইতেছেন, তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা প্রত্যক্ষ হইতে যাত্রা করিয়া অনুমানের পন্থা ধরিয়া লক্ষ্য অভিমুখে চলিতে-চলিতে সে সকল অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়; এবং তাঁহাদের কথা যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্য, তাহা বিশ্বাস না করা অসম্ভব হইয়া উঠে। জড় দ্রব্যের প্রকৃতি নিরূপণ করিবার প্রবৃত্তি

---

* এই প্রবন্ধ লেখক মহোদয় যে কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত শত শত গান যশোহর, ফরিদপুর ও পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আমরা বাল্যকালে অনেকবার পাগলা কানাইয়ের গান শুনিয়াছি। বৎসর ঠিক স্মরণ হইতেছে না, ফরিদপুরের কৃষি-প্রদর্শনী মেলাতে কানাইয়ের সাহিত আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়। সেবার আমি পূজনীয় কাঙ্গাল হরিনাথের সহিত ফরিদপুরে গিয়াছিলাম। কাঙ্গালেরও বাউলের দল ঐ প্রদর্শনীতে গান করিতে গিয়াছিল; পাগলা কানাইও গান করিতে গিয়াছিল। পাগলা কানাইয়ের সে দিনের গানের বিশেষ বিবরণ আমার 'কাঙ্গাল হরিনাথ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার এখনও মনে পড়ে, পাগলা কানাইয়ের গানের পর, সেই আসরে আমরা ফকিরের দলের গান করি। আমাদের গান শেষ হইলে আমরা যখন আসর হইতে বাহির হইতেছিলাম, সে সময় কানাই আসিয়া কাঙ্গালের পদধূলি লইতে উদ্যত হইল; কাঙ্গাল তখন কানাইকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন 'আজ আমার বুক জুড়িয়ে গেল।' এতকাল পরে আজও সেই পবিত্র দৃশ্য যেন চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। তাহার পরে যখন কাঙ্গাল এই অধমকে কানাইয়ের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন,—পরিচয়ই বা কি মধুর—কাঙ্গাল বলিলেন "এটী আমার ছোট ভাই" তখন সেই বৃদ্ধ কানাই—সেই পাগলা কানাই আমাকে আলিঙ্গন করিলেন; সে পবিত্র স্পর্শে আমার শরীরে রোমাঞ্চ হইয়াছিল; কানাই যে একজন সাধক, একজন মহাত্মা, তাহা সেই স্পর্শেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এতকাল পরে 'পাগলা কানাই' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সেই দিনের দৃশ্য মনে হওয়ায়, এই সামান্য কথা কয়টি লিপিবদ্ধ করিলাম।—'ভারতবর্ষ'—সম্পাদক।

বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; সাংখ্য, বৈশেষিক দর্শনে ইহার বিষয় নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রীসেও Democritus, Lucretius এবং Epicurus এই জড় দ্রব্য এবং তাহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা করিয়া জীবনের অধিকাংশ কালই কাটাইয়া দিয়াছেন। য়ুরোপীয় সভ্যতার আদি গুরু গ্রীস। তাহাদের জড় বস্তুর গঠন-প্রণালী সম্বন্ধীয় মতের হিন্দুদের মতের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিল না হইলেও আংশিক ভাবে যে মিল আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক পক্ষে সূক্ষ্ম হইতে যে স্থূলের উৎপত্তি, ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া না মানিলে বিশেষ দোষের হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে সকল দেশে সকল সময়ে এই ভাবই গ্রহণ করা হইয়াছে; নচেৎ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি, কি স্থূল হইতে সূক্ষ্মে পরিণতি, ইহা লইয়া একটা বিষম তর্ক বাধিয়া উঠিবে। সে তর্কের মীমাংসা অদ্যাপি হয় নাই এবং ভবিষ্যতে যে কখনও হইবে, তাহার ভরসাও অল্প। শিক্ষার স্রোত যে দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার ফলেই সকলে জাগতিক প্রত্যেক বস্তুকে সূক্ষ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন। এই যে জড়জগৎ, যাহাকে কবি নানাপ্রকার রঙ্গিন কল্পনায় মণ্ডিত করিয়া কখন তাহার নগ্ন সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যান, আবার কখন তাহার প্রলয়কালীন ভীষণ মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া ভয়ে এবং বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকেন; তাহার মূল তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গেলে সেই এক সূক্ষ্মাবস্থা ব্যতীত আর কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মাটী হউক, জল হউক, সোণা হউক, ঊর্দ্ধে সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্য্যন্ত সবই যে সেই এক সূক্ষ্মতম অবস্থার রূপান্তর মাত্র, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রও স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আধুনিক বলি কেন, হিন্দু, গ্রীক সভ্যতার কালেও এই মতের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া জাগতিক প্রত্যেক ব্যাপারের বিশদ্ ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক বস্তুর সূক্ষ্মাবস্থাই আমাদের পরমাণু। এই পরমাণু লইয়া আবার ভিন্ন-ভিন্ন মত আছে। সাংখ্যের মতে জাগতিক প্রত্যেক জড়বস্তুর পরমাণু যে নিদানীভূত কারণ, তাহা স্বীকার করিলেও জড় দ্রব্যের বিরাম যে পরমাণুতে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। পরমাণু হইতে সূক্ষ্মতর অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্মতর মহান এবং মহান হইতে সূক্ষ্মতর প্রকৃতি। এই যে ঘর বাড়ী, চন্দ্র, সূর্য্য, ইট পাথর এই সব প্রকৃতির খেলা মাত্র। প্রকৃতিই মূল কারণ, এবং প্রকৃতি হইতেই ইহাদের সৃষ্টি। আধুনিক বিজ্ঞান বিদ্যায় পরমাণু যে স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা সাংখ্যের তন্মাত্র। ইংরাজীতে যাহাকে atom বলে, আমরা তাহাকে পরমাণু বলিব; আর যাহাকে molecule বলিয়াছে, তাহাকে দ্ব্যণুক বলিব। অবশ্য molecule বলিলে একটি, দুইটা কি তিনটী পরমাণুর সমষ্টি বুঝাইতে পারে। কাজেকাজেই molecule কথাটি ঠিক দ্ব্যণুক অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না, তাহা আপনারা বিচার করিবেন। কণাদের পরমাণু (atom) অর্থে ব্যবহৃত হইলে বিশেষ দোষের না হইতেও পারে; তবে molecule বলিলে অণু, দ্ব্যণুক প্রভৃতি বুঝাইতে পারে। পার্থিব বস্তুর উপাদান যে পরমাণু, তাহা কণাদের পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কণাদের মতে দুইটা পরমাণুতে একটা দ্ব্যণুকের সৃষ্টি হয় এবং তিনটী দ্ব্যণুকের সমষ্টি এক স্থূল পদার্থের পরমাণুর সৃষ্টি করে। পার্থিব বস্তুর ক্রম-বিশ্লেষণের পরই পরমাণুর উৎপত্তি। একখণ্ড সোণাকে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিতে থাকিলে ক্রমশঃ ছোট ছোট সোণার টুকরা ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না; যতই কেন ভাঙ্গিয়া যাও এবং গুঁড়াইয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্বর্ণরেণুতে পরিণত কর, তবুও সে সোণা ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। এই যে ক্ষুদ্র স্বর্ণ কণিকা, তাহা আমাদের কথিত দ্ব্যণুক বা পরমাণুতে পৌঁছায় নাই। এই স্বর্ণ-কণিকাকে আরও ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে। এই বিভাগের বিরাম আছে কি না, তাহা একটুকু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। পার্থিব বস্তুকে ভাঙ্গিতে-ভাঙ্গিতে এমন অবস্থায় আনা যাইতে পারে, যখন তাহার অংশগুলি আর চোখে দেখা যায় না, এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যায় না; তখনই সেই অংশের নাম পরমাণু দেওয়া যাইতে পারে।

এখন এই জড়পদার্থের মধ্যে যদি ফাঁক বা অবকাশ না থাকে, তবে তাহা অনন্ত বিভাগক্ষম। যতই কেন ভাঙ্গ, সেই ভাঙ্গার বিরাম নাই। গ্রীসে কিছুকালের জন্য এই মত প্রচলিত হইয়াছিল। এই মতের উপর নির্ভর করিলে পরমাণুর প্রকৃতি জানা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। জড়ের কোন্ অবস্থা যে পরমাণু, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তাহার পর Lucretius, Democritusএর আবির্ভাবের সময় পরমাণুবাদের একটুকু বিশেষ ব্যাখ্যা প্রচলিত হইল। তাঁহারা বলেন, যে জড় বস্তুর মধ্যে অবকাশ আছে। এই জড় পদার্থ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে পরিণামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে পরিণত হয়; তখনই ভাঙ্গার বিরাম হয়। এই ক্ষুদ্র অংশগুলিই জড় বস্তুর পরমাণু। জড়-বস্তুর অভ্যন্তরে দুইটি পরমাণু গায়ে গায়ে লাগিয়া নাই, তাহাদের মাঝে কিছু ফাঁক বা অবকাশ আছে; এবং এই ফাঁক আছে বলিয়াই জড় বস্তু বিভাগক্ষম।

এই ত গেল প্রাচীন যুগের কথা। সে যুগের পরমাণুর অস্তিত্ব এবং তাহার সম্বন্ধে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা পরীক্ষিত সত্য না হইলেও যে নির্ভুল অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্যা স্বীকার করিতেছেন।

এখন একটা কথা উঠিতে পারে, বিজ্ঞান-শাস্ত্র যখন প্রত্যক্ষ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন আর অনুমানের স্থান কোথায়? মানবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমাদের সামান্য জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে ধরিবার এবং বুঝিবার চেষ্টা করি; কিন্তু কোন প্রকারে তাহাকে বুঝিতে পারি না; তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য নানা প্রকার কল কারখানা করিতেছি; তাহাকে প্রত্যক্ষের মাঝে ধরিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু তবুও ধরিতে পারিতেছি না। তাই প্রকৃতি এত চঞ্চলা এবং তাই সে এত শোভাময়ী। আজ আমরা চন্দ্র সূর্য্য দেখিতেছি, তাহার আলোর ধারা জগতের উপর পড়িয়া প্রকৃতির মহিমা ঘোষণা

করিতেছে, অবাক্ হইয়া তাহাই দেখি, আর কল্পনার রাজ্যে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, তাহার অভ্যন্তর হইতে নূতন কোন তথ্য আবিষ্কারের জন্য ভাবিতে বসি। হঠাৎ কেন জানি না, প্রকৃতিদেবী সন্তুষ্ট হইলেন, আর সেই রজতের মত আলোকধারা নানা বর্ণে,—লাল, নীল, সবুজ, হলুদে প্রভৃতি বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রকৃতির লীলা দেখাইয়া জগতে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করিল। মানুষের চেষ্টার ফলে প্রকৃতির অসংখ্য দুয়ার খুলিয়া যাইতেছে। কিন্তু আরও কত দ্বার যে বন্ধ রহিয়াছে—তাহা কে বলিতে পারে? এই সব দেখিয়া এবং এক-একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার অন্তরালে কি আছে, তাহা জানিবার জন্য মন স্বতঃই ব্যগ্র হইয়া উঠে। কাজেকাজেই বাধ্য হইয়া কল্পনার আশ্রয় লইয়া নানাপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। সেই কারণেই প্রাচীন পণ্ডিতেরা জড়-বস্তু লইয়া সত্যসত্যই কাটিতে আরম্ভ করিলেন। যখন সেই বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়-কণিকায় পরিণত হইল, তখন তাঁহারা থামিয়া দাঁড়াইলেন। আর কাটিতে বা ভাঙ্গিতে পারেন না; তেমন অস্ত্র নাই। তেমন অস্ত্র থাকিলেও অতি ক্ষুদ্র টুক্রা দেখিবার যন্ত্র নাই। কাজেকাজেই তাঁহারা ঠিক করিলেন যে, সেই ক্ষুদ্র কণিকাও ভাঙ্গা যাইতে পারে; ভাঙ্গিতে-ভাঙ্গিতে এমন অবস্থায় দাঁড়াইবে যে, আর ভাঙ্গা যাইবে না; তখনই জড়-দ্রব্য পরমাণুতে পরিণত হইবে। এই অনুমান যে ভ্রান্ত নহে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্যা হাতেকলমে দেখাইয়াছে। আর অণু পরমাণুর অস্তিত্ব হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান-বিদ্যা জড়-বস্তুর গঠনপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে পরমাণু ব্যতীত আর একটি জিনিসের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এতক্ষণ আমরা সোণা, লোহা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছি। তাহা যতই ভাঙ্গি না কেন, পরিণামে সোণা, লোহা ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। অবশ্য, তাহারা এত সূক্ষ্ম যে মানব-চক্ষুর অতীত। তাহা দেখিবার জন্য বিশেষ রকম চোখের আবশ্যক। সে চোখ আজও কাহারও হয় নাই, কখনও যে হইবে তাহার ভরসাও নাই। এইরূপ যে বস্তুর সূক্ষ্মতম অবস্থা, তাঁহাকে আধুনিক পণ্ডিতেরা পরমাণু না বলিয়া অণু বলিয়াছেন। তাহা হইলে জড়বস্তু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অণুর সমবায়ে নির্ম্মিত। এই অণুগুলি ভাঙ্গা কঠিন এবং ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ফাঁক বা অবকাশ আছে। এই প্রকার অণু ভাঙ্গিয়া যখন আরও সূক্ষ্মতর জড় দ্রব্যে পরিণত হয়, তখন তাহাকে জড়দ্রব্যের পরমাণু বলে। এই যে অতি ক্ষুদ্র পরমাণু, তাহা যে জড় দ্রব্য হইতে উৎপন্ন, তাহার গুণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। স্বর্ণের পরমাণু স্বর্ণের গুণ লইয়াই উৎপন্ন হয়। লোহা, তামা, দস্তা প্রভৃতি ধাতব পদার্থের পরমাণুসকল নিজ-নিজ গুণবিশিষ্ট হইয়াই প্রকাশিত হয়। এখন বুঝিলাম যে, জড়-বস্তুর বিরাম অণুতে নহে, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পরমাণুতে। সোণা, লোহা, রূপা, বায়ু, জল সকলই ত জড়-দ্রব্য। তাহা হইলে সকলেই পরমাণুর সমবায়ে নির্ম্মিত। এতক্ষণ সোণা লইয়া কারবার করিতেছিলাম। এখন দেখা যাউক, জল ভাঙ্গিলে কি পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে একটুকু নূতন ব্যাপার দেখা গেল, যাহা সোণা, লোহার সময়ে দেখা যায় নাই। জল ভাঙ্গিতে-ভাঙ্গিতে এমন একটি অবস্থায় আসিল, যাহা জলের সূক্ষ্মতম অবস্থা অর্থাৎ যাহাকে জলের অণু বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারি। পদার্থবিদ্যাবিশারদেরা জড়-দ্রব্যকে অণুতে পরিণত করিয়াই নিশ্চিন্ত। তাঁহাদের আর কোন অস্ত্র নাই, যাহার দ্বারা—এই অণুকে ভাঙ্গিয়া পরমাণু বাহির করিতে পারেন। এখন রসায়নবেত্তাদের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা নানা উপায়ে জলে জল মিশাইয়া, আগুন লাগাইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের মধ্যে ঘুরাইয়া, বা তাড়িৎ সংযোগে এমন এক কাণ্ড বাধাইয়া দিলেন যে, যাহাতে অণুকে ভাঙ্গা আর কঠিন হইল না। পরমাণুর অস্তিত্ব যেন চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল। এই প্রকার কোন উপায়ে জলকে তাঁহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অণু ভাঙ্গিয়া দুইটি ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী গ্যাস বাহির করিলেন। তাহারা দেখিতে ঠিক বাতাসের মত। একটিতে আগুন লাগিলে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, আর একটি নিজে জ্বলে না বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে দীপশিখা উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং লোহা প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যও কাগজের মত জ্বলিয়া যায়। এই দুই প্রকার গ্যাসই জলের প্রাণ। এই দুইটার মধ্যে একটাকে জল হইতে বাহির করিলে জলের ধ্বংস হইবে। যত বেশী জল লওয়া যাউক না কেন, বিশ্লেষণের ফলে এই দুই প্রকার গ্যাস ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যাইবে না। এই দুই গ্যাসের ভিন্ন-ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। যেটা দুম্ করিয়া শব্দ করিয়া দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তাহাকে Hydrogen বা জলজান নাম দেওয়া হইয়াছে; আর যাহার মধ্যে লোহা জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায়, তাহাকে Oxygen বা অম্লজান নাম দেওয়া হইয়াছে। জল ভাঙ্গিলে যে দুই gas পাওয়া যায়, তাহাই জলের পরমাণু। ইহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য। এই Hydrogen এবং Oxygen জল হইতে বিশ্লিষ্ট হইবামাত্র তাহাদের জন্মদাতা জলের সহিত সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া বসিয়া থাকে। জলের কোন প্রকার গুণ তাহাদের মধ্যে থাকে না, তরলতা ত দূরের কথা।

আগে সোণা লোহা প্রভৃতির পরমাণুর কথা বলিয়াছি; তাহারা স্থূল স্বর্ণ বা লৌহের সহিত সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করে না। ক্ষুদ্র হইয়াও স্থূলের মহিমা প্রকাশ করেনা। জলের পরমাণু, শুধু জলের পরমাণু বলি কেন, যৌগিক পদার্থের (Compound substance) পরমাণু স্থূল পদার্থের সহিত সম্বন্ধ রাখে না। এই ত গেল পরমাণুবাদ। এখন দেখা যাক্ পরমাণু ভাঙ্গা যায় কি না? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরমাণু অচ্ছেদ্য, অভেদ্য। যতদিন না মহামতি Dalton রসায়ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ততদিন এই ব্যাপারটা অন্ধকারের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। তিনি আসিয়া ঠিক করিলেন যে, (১) ভিন্ন ভিন্ন জড় বস্তুর পরমাণু ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী (গুণে, ভাবে, কোন রকমেই তাহারা এক-রূপ নহে।) (২) এক বস্তুর পরমাণু এক প্রকারেরই হইবে। ইহা পরীক্ষিত সত্য। (৩) পরমাণুকে ভাঙ্গা যায় না। একটা পরমাণু,

দুইটা পরমাণু, দশটা পরমাণু বা বিশটা পরমাণু হইতে পারে, কিন্তু আধখানা, বা দেড়খানা পরমাণু হইতে পারে না।.

আমরা দেখিয়াছি যে, একটি জলের অণুকে ভাঙ্গিলে Hydrogen এবং Oxygen পাওয়া যায়। আবও দেখা যায় যে, ৯ সের জলে আট সের Oxygen এবং এক সের Hydrogen থাকে। তাহা হইলে দেখিতেছি যে, একটি জলের অণুতে (molecule) ১টি Oxygen এবং ২টি Hydrogenএর পরমাণু (atom) বর্ত্তমান আছে। আর উহাতে Hydrogenএর ওজন ১ সের বা এক ছটাক হইলে Oxygenএর ওজন ৮সের বা আট ছটাক হইবে। বাস্তবিক জলের অণুকে (molecule) ২টি Hydrogen এবং ১টি Oxygen আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় জলের অণুতে Oxygenএর ওজন Hydrogen এর তুলনায় ১৬গুণ। জলে যে পরিমাণ Hydrogen তাহা সকল দেশে সত্য এবং অভ্রান্ত, সে পচা পুকুরের হউক বা ice-cold বা boiling waterই হউক। যেখানকার জল লওয়া হউক না কেন, তাহার অভ্যন্তরস্থ Hydrogen এবং Oxygenএর পরিমাণের এই অনুপাত।

আর এক প্রকার তরল পদার্থ আছে, যাহাকে ইংরাজীতে Hydrogen Peroxide বা Hydroxyl বলে। তাহাকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে জলের ন্যায় Hydrogen এবং Oxygen ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না (যেখানে Hydrogen এবং Oxygen কিরূপ ভাবে মিশ্রিত, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, নচেৎ পরমাণুতত্ত্ব যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। সেইজন্য রসায়নবেত্তারা নানা পরীক্ষার ফলে স্থির করিলেন যে Hydroxyl (molecule) অণুতে দুই পরমাণু Hydrogen এবং দুই পরমাণু Oxygen। এখানে Hydrogenএর ওজন ১ হইলে Oxygenএর ওজন ৮ নহে, ১০ নহে, ১২ নহে, একেবারে কাটায়-কাটায় ১৬। ৮ × ২ গুণে ১৬। যদি এখন আরও পদার্থ পাই, যাহা হইতে বিশ্লেষণের ফলে শুধু Hydrogen এবং Oxygen পাওয়া যায়, তবে দেখিবে যে, তাহাতে Oxygenএর ওজন ২৪, ৩২,—৮এর multiple হইবে। এ এক মজার ব্যাপার। Oxygen এবং Hydrogenএর সম্বন্ধ যেন এক তারে বাঁধা। যেখানে Hydrogen Oxygenএর সম্মিলন, সেইখানেই এই সম্বন্ধ। জলের অণুতে Hydrogenএর পরমাণু ২ এবং Oxygen এর পরমাণু ১। Hydroxyl অণুতে Hydrogenএর পরমাণু দুই, দেড় নয়, আড়াই নয়, কোন ভগ্নাংশই নয়, পুরোপুরি গোটা পরমাণু। যেখানে পরমাণুর সম্মিলন, সেইখানেই গোটা-গোটা পরমাণুতে মিলন, একটায় আধটায় নয়, একটায় দেড়টায় নয়। তাহা যদি সম্ভব হইত, তবে পরমাণুর অংশের সম্ভব হইত; তাহা হইলে পরমাণু ভাঙ্গাও যাইত। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এমন কোন যৌগিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয় নাই, যেখানে গোটা পরমাণুর সহিত কোন পরমাণুর অংশের মিলন হইয়াছে।

তাহা হইলে বুঝা গেল যে, অণু ভাঙ্গিয়া পরমাণু পাওয়া যায়; এবং আরও জানা গেল যে জড়-বস্তুর বিরাম অণুতে নহে পরমাণুতে। সেই পরমাণু অবিচ্ছেদ্য এবং ধ্বংসহীন। ভবিষ্যতে দেখাইব যে, পরমাণুও ভাঙ্গা যায় এবং এই ভাঙ্গার ফলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাড়িৎকণা বাহির হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে electron বলা হইয়াছে। বারান্তরে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র electronএর প্রকৃতি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

রাঢ়ে বৌদ্ধধর্ম্ম

[শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ভূষণ বি-এ]

আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেকেরই বিশ্বাস যে, শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমগ্র ভারতের অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল; সুতরাং তৎকালে জাতিভেদ এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছিল, আর আন্তর্জাতিক বিবাহ দ্বারা আর্য্যের ও অনার্য্যের শোণিত বিমিশ্রিত হইয়া সমগ্র ভারতবাসিগণকে একটা মিশ্র জাতিতে পরিণত করিয়াছিল। উল্লিখিত অনুমানটা আংশিকরূপে সত্য হইলেও এ কথা সত্য নহে যে, যাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সকলেরই জাতিভেদের লোপ পাইয়াছিল। এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, অনেক ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংরক্ষা করিতেন। পরন্তু, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের কালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ঘটিলেও তৎকালেও বৌদ্ধেতর ভারতবাসীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল আঘাতে হিন্দুধর্ম্মের বিরাট সৌধ তৎকালে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ভূমিসাৎ হয় নাই;—বৌদ্ধধর্ম্মের উত্তপ্ত সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুগণ ম্লানপ্রভ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহারা হিন্দুত্ব বর্জ্জিত হয় নাই। সাধারণ বৌদ্ধগণের মধ্যে জাতিভেদ লোপ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা যখন হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গৃহীত হয়, তখন তাহারা আর উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণের মধ্যে স্থান পায় নাই, এ কথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এস্থলে নির্ণয় করিতে হইবে যে, হিন্দুগণের মধ্যে কাহারা অধিক সংখ্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল; এ বিষয়ে কাহাদের স্বার্থ অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতীয় হিন্দুগণ যে আবহমানকাল প্রচলিত পিতৃপুরুষগণের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, মনে হয় না। আধুনিক কালেও যে সকল হিন্দু ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধি হয়, যশোলিপ্সা এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের একতম কারণ—কেবলমাত্র ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণের দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীনকালে বৈশ্যগণ বাণিজ্যাদির জন্য পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন; অর্থোপার্জ্জনের জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত; সুতরাং বেদবিহিত ধর্ম্মরক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব না হইলেও কষ্টসাপেক্ষ ছিল। সেইজন্য তাঁহারা বাহ্যিক

অনুষ্ঠানাদি বিবর্জ্জিত বৌদ্ধধর্ম্মকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইহাই স্বাভাবিক। সমাজতত্ত্বের নিয়মই এই যে, সামাজিক ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বাধাহীন পন্থারই অনুসরণ করিবে (Social activity follows the line of least resistance—vide Giddings page 369 the Social Process)। উপরিউক্ত অনুমান বঙ্গের ক্ষত্রিয়গণের পক্ষেও আংশিকরূপে খাটে। ইহা হইতে কি মনে হয় না যে, বাঙ্গলা দেশের বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় জাতি অধিক সংখ্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যখন পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, তখন যে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের সামাজিক অবস্থা প্রদান করা হয় নাই—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরূপে গৃহীত হয় নাই, পরন্তু তাঁহাদিগকে শূদ্ররূপে সমাজে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

অন্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল বঙ্গদেশের সম্বন্ধে এ কথা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্গে বিশেষতঃ রাঢ়প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম কখনও প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। আদিশূর যৎকালে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সহচরগণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন, তখন হিন্দুধর্ম্মের বা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের অস্তিত্ব বঙ্গ হইতে একেবারে লোপ পায় নাই। তবে তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে দেশ হইতে বেদাবিহিত ক্রিয়াকর্ম্মের লোপ পাইয়াছিল ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছিল। অনেকেই হয় ত একথা জানেন যে, আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নকালে বঙ্গদেশে সাতশত গোষ্ঠি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বসতি ছিল; এই সপ্তশত ব্রাহ্মণের বংশধরগণ এক্ষণে "সপ্তশতী" নামে অভিহিত হইয়া বঙ্গের নানাস্থানে বাস করিতেছেন; তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। শ্রীহর্ষাদি পঞ্চব্রাহ্মণ এ দেশে সপত্নীক হইয়া আসেন নাই সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও মনে করিতে হইবে না যে, তাঁহারা বৌদ্ধগণের মধ্য হইতে পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, এ দেশে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর তাহারা কান্যকুব্জ হইতে পরিবারাদি আনয়ন করিয়াছিলেন—কেহ বা সে কথা স্বীকার করেন না। এই শেষোক্ত মতে শ্রীহর্ষাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোল্লিখিত "সপ্তশতী"গণের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই দুইটি মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ; তবে পঞ্চব্রাহ্মণ যে জাতিভেদ বিবর্জ্জিত বৌদ্ধদিগের মধ্য হইতে পত্নীনির্ব্বাচন করেন নাই, একথা অনেকেই স্বীকার করেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম-পুস্তকাদি পাঠে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, রাঢ়দেশে কখনই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মকে রাঢ়বাসিগণ সন্দেহের চক্ষুতে দেখিতেন; আর বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকগণ অশিক্ষিত জনসাধারণের হাতে বিষম লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল ইহা আজকাল অনেকেই শুনিয়াছেন। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও বৌদ্ধগণ রাঢ়ের নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচার ও চৈত্য-বিহারাদি সংস্থাপন করিয়াছিল। পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এখনও রাঢ়প্রদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের, অন্ততঃ বৌদ্ধজাতির সম্পূর্ণ লোপ হয় নাই—এখনও বৌদ্ধজাতি অজ্ঞাত ও অনাদৃতভাবে রাঢ়ের নানা স্থানে বাস করিতেছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ময়ূরাক্ষী নদীতীরে "পেটারি" নামক গ্রামে "বৌড়ো" নামক এক জাতি এখনও বাস করে। তাহারা সদ্গোপ প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর হিন্দুর ন্যায় সদাচারসম্পন্ন ও কৃষিজীবী। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, পূর্ব্বে তাহারা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ছিল—পরে "বৌড়ো" ধর্ম্মগ্রহণ করে। এ অঞ্চলে আরও অনেক "বৌড়ো" ছিল, কিন্তু অতি প্রাচীনকালে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহারা সদগোপ শ্রেণীর মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। যে সকল "বৌড়ো" প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত হয় নাই তাহাদের বংশধরগণ একাল পর্য্যন্ত উপেক্ষিত অবস্থায় বাস করিতেছে। তাহারা হিন্দু নহে—হিন্দুধর্ম্ম তাহাদিগকে নিজের সীমা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। তাহারাও হিন্দুধর্ম্মের কোনও ধার ধারে না। আর তাহারা বৌদ্ধ, সে কথাও বোধ হয় তাহারা জানে না। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়া এই "বৌড়ো"গণ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় সকলই ভুলিয়া গিয়াছে—এখন তাহারা নাস্তিক, অন্ততঃপক্ষে, তাহারা কোনও ধর্ম্মের নিয়মাদি এখন পালন করে না। তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, অনেক সময়ে নিকট আত্মীয়ের মধ্যেও তাহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া এই "বৌড়ো"গণের সংখ্যা ও জীবনী শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সামাজিক নিয়মের কোন আকস্মিক পরিবর্ত্তন যদি ধ্বংসোন্মুখ এই জাতিকে রক্ষা করিতে পারে ত বলা যায় না—অন্যথা ইহাদের বিলোপ দুই এক শতাব্দীর মধ্যেই অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়। এই "বৌড়ো"গণের অনেকেরই সহিত আমার পরিচয় আছে; কিন্তু তাহারা যে বৌদ্ধ, এ কথা ইতঃপূর্ব্বে আমার কেন, আর কাহারও মনে হয় নাই; সুতরাং তাহাদের গ্রামে বা গৃহে বৌদ্ধধর্ম্মের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় কি না, তাহা দেখিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই; আর এক্ষণে আমি কার্য্যোপলক্ষে এক দূরে আছি যে, শীঘ্র যে এ বিষয়ে অনুসন্ধানের সুযোগ ঘটিবে, তাহাও মনে হয় না। তবে কেবলমাত্র "বৌড়ো" এই নাম-সাদৃশ্যের উপরই আমি আমার অনুমানের ভিত্তি স্থাপন করি নাই, পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতেও ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। উক্ত গ্রামের অতি নিকটে চৈত্যপুর (চলিত কথায় চৈৎপুর) নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে পথে-ঘাটে এখনও বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়,—আমি নিজেও দেখিয়াছি। এই চৈত্যপুরে যে প্রাচীনকালে কোনও বৌদ্ধ চৈত্য ছিল, তাহা সহজেই অনুমান হয়। এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের আরও অনেক নিদর্শন আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। সুবিধা ও সামর্থ্য হইলে ভবিষ্যতে সে সম্বন্ধে আলোচনার বাসনা আছে।

উল্লিখিত "বৌড়ো" জাতি বীরভূম জেলার রামপুরহাটের নিকটবর্ত্তী "খরবনা কান্দুরি" নামক স্থানেও বাস করে। বোধ হয় আরও কোনও কোনও স্থানে এই জাতির বসতি আছে; কিন্তু এবিষয়ে আমি সবিশেষ সংবাদ লই নাই। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের এবিষয়ে অনুসন্ধান

করা কর্ত্তব্য। Census Reportএ এই "বৌড়ো"গণকে কি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা জানি না; তবে তাহারা যে বৌদ্ধ, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই; আর এতকাল একথা কেন যে কাহারও মনে হয় নাই, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

এই বৌদ্ধগণের পূর্ব্বপুরুষগণ হয় ত ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা যখন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম পরিগ্রহণ করে, তখন তাহাদের সকলকেই "সদ্‌গোপ" শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে হইয়াছিল- কেহই তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে স্থান পায় নাই। ইহাই পুরুষপরম্পরাগত স্থানীয় প্রবাদ, আর উল্লিখিত পতিত "বৌড়ো"গণও এই প্রবাদ স্বীকার করিয়া থাকে। এই প্রবাদের সত্যতা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধধর্ম্ম রাঢ় অঞ্চলে কখনও সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই;—ইহার আরও একটা প্রমাণ এই যে, "বৌড়ো" কথাটা এ অঞ্চলে গালিরূপে ব্যবহৃত হয়। কেহ কাহাকেও গালি দিতে হইলে সময়ে সময়ে "দূর বেটা বৌড়ো" বলিয়া গালি দিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে এই প্রকারের গালি এই অঞ্চলে অধিক প্রচলিত। এই "বৌড়ো" কথা যে "বৌদ্ধ" কথার অপভ্রংশ, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

বৌদ্ধগণের হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ-প্রবেশের পদ্ধতি যদি সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে—আর হিন্দুধর্ম্মের রক্ষণশীল প্রকৃতির কথা মনে করিলে এইরূপই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়—তাহা হইলে কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধগণের হিন্দু হওয়ার সহিত অনার্য্যরক্ত আর্য্যরক্তে মিশিত হইয়াছে? বরং এ কথা বলিলে অতিরঞ্জিত হইবে না যে, বৌদ্ধগণের হিন্দু হওয়ার সহিত অনেক শূদ্রের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের রক্ত প্রবেশ করিয়াছে; সেইজন্য আধুনিক সদ্‌গোপ প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর শূদ্রগণকে অনার্য্যবংশ সম্ভূত বলিয়া মনে হয় না,—বরং তাহারা বৈশ্যজাতির রূপান্তর বলিয়াই মনে হয়।

এবিষয়ে সবিশেষ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেবলমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণকে একটা ইঙ্গিত প্রদান ও তাঁহাদের সম্মুখে চিন্তার একটা বিষয় সংস্থাপন বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য;—ভবিষ্যতে এ বিষয়ের পুনরালোচনার ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে এ কথা বলিয়া রাখি যে, রাঢ় প্রদেশে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অনুসন্ধানের এখনও যথেষ্ট স্থান আছে। বরেন্দ্রভূমিতে যেরূপ পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান চলিতেছে, রাঢ় প্রদেশে এ পর্য্যন্ত সেরূপ কোনও অনুষ্ঠান হইয়াছে কি? মুর্শিদাবাদ জেলার-কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে কখনও কোনও পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। আশা করি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে।

টাকার লীলাতত্ত্ব

[অধ্যাপক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ]

হে রজতখণ্ড, তোমার কথায় তোমার অনন্ত মহিমার কথাই আসিয়া পড়ে। তোমাকে চিবান যায় না বটে, কিন্তু তুমিই লোকের চিবাইবার একমাত্র ব্যবস্থা করিয়া থাক। লোকের হাত-নাড়া, তাড়াহুড়া, মাথা-ঘামান, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা, বচসা, আস্ফালন, হরেক রকমের ভঙ্গী, কোমর বাঁধিয়া লাগা, ভুঁড়ির বৃদ্ধি, এমন কি অম্ল উদ্গার, চোঁয়া-ঢেঁকুর—এ সকলের মূলে তোমার অনন্ত প্রভাব। তোমাকে সকলেই আজন্ম চিনিয়াছে। তুমি কাহাকেও রূপেগুণে মজাইতে বাকি রাখ নাই। তোমাকে দর্শন করাইবামাত্র শিশু তোমার আকাঙ্ক্ষায় হাত বাড়াইয়া দেয়। শিশুর প্রতি তোমার এই স্বাভাবিক টান্ দেখিয়া পেচক-গম্ভীর অল্পমতি ব্যক্তিগণ সদীর্ঘ নিঃশ্বাসে "ঘোর কলিকাল" বলিয়া তোমাকে বাস্তবিক অপদার্থ গণ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করিলেই তৎক্ষণাৎ উত্তর পাইবেন, এই জ্ঞান শিশুর প্রাক্তন জন্ম-সংস্কার অথবা *A priori* Knowledge! তোমার দিকে লম্বমান হস্তবিশিষ্ট এই লোকেরা জানেন যে, তুমিই সংসারের ক্রমোন্নতির মূল! Teleological Evolution তোমারি লক্ষ্যে!!

হে গোলক-শ্রেষ্ঠ! তুমিই সংসার-চক্রের মূল কেন্দ্র বা Axis—সংসার-স্থিতির বা সংসারের Equilibrium রক্ষার তুমিই ব্যবস্থাপক। "কেবা চক্ষু মেলে" গোছের কুড়েকে পানির বলদের ন্যায় খাটাইতে তুমিই বিশুদ্ধ মকরধ্বজ বা Silver tonic। তোমার চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে মনে কল্পনার 'আরব্যোপন্যাস জাগিয়া উঠে—প্রাণ প্রত্যক্ষে লক্ষ্মীর ঝাঁপির আর দাঁড়াইতে ইচ্ছা হয় না। হে টঙ্কা, উড়িয়াগণের মহাপ্রভু—খাল্‌তামসের মাথায় তুমিই মহা টনক্ লাগাইয়া দিয়াছিলে! নজিরের জাল রচনায় তপ্তমস্তিষ্ক উকীলকে, নোটে ও বক্তৃতায় ওষ্ঠাগত-প্রাণ বা "স্নায়বিক" প্রফেসরকে, ঔষধ প্রয়োগের দৈখ্য সম্পাদনে গলদ্ঘর্ম্ম ডাক্তারকে প্রকৃতিস্থ করিতে তুমিই একমাত্র অপূর্ব্ব সোমরস। "অর্থ-মনর্থং" বলিয়া যে সকল বৈরাগী তোমাকে অপমান করিবার "বাহ্বাস্ফোট" করেন, তাঁহারাও কিন্তু "ধনাৎ ধর্ম্ম" ভিন্ন আবার গত্যন্তর দেখেন না।

ব্রাহ্মণ-ভোজন হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক-মুণ্ডন, নাপিত-পুরোহিত বন্ধ প্রভৃতি পরম পবিত্র কার্য্যে তুমিই একমাত্র চালক। অতএব কে তোমার "ঈদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা" নিরূপণ করিবে? "দুধের দাঁত" উঠিবারি সময় হইতে ইংরাজ তোমার রসে রসিক হইতে শিখে, তাই আজ ইংরাজ, ইংরেজ! কিন্তু হায়, এখনও ত ইংরাজ Shopkeeper-গণ তোমার অজস্র মহিম্ন স্তোত্র রচনা করিলেন না। তুমি লক্ষ্মী নামে প্রকীর্ত্তিত। তুমি যাহার দিকে দৃষ্টি কর, সে শুধু গণিতের বড়-বড় সংখ্যার পতি বলিয়াই পরিচিত হয়। "লাকী" তুইদিকেই সার্থক! তোমাকে অবহেলায় ছড়াইলে যেমন লোকের প্রতি কাণাকাণি হয়, তেমনি তোমাকে বাঁধিয়া কারাবাস করাইলেও লোকের সমাজে "রবির্-সন্‌কুলো' হইয়া থাকিতে হয়; কঞ্জুস প্রভৃতি অপূর্ব্ব আখ্যালাভ ঘটে। প্রভাতে এরূপ ব্যক্তির নামোচ্চারণে দিবসের একাদশী অনিবার্য্য হইয়া উঠে। হে ঐন্দ্রজালিক, তোমার প্রভাবে নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ

কর্ম্মচারীর মুখবন্ধ হইয়া যায়—তাহা ত open secret। তোমার চন্দ্র-মুখ দর্শন করাইবামাত্র নিজের অপেক্ষা পরের চাকর, কুলী, চাপরাসী, পাণ্ডার দ্বারা ইচ্ছানুরূপ যা' তা' কার্য্য আদায় করা যায়। তোমাকে বাজাইবার মত অঙ্গুলীর সঙ্কেত করিবামাত্র রুষ্টকে তুষ্ট, নির্দ্দয়কে সদয়, বিরক্তকে অনুরক্ত করিয়া ফেলা যায়। দারগার আয়েস ও ডিপুটার বাৎসরিক উদর-স্ফীতির, তথা উপরওয়ালার কটূক্তি-সহিষ্ণুতার একমাত্র তুমিই নিমিত্ত কারণ।

বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গে লোকে তোমার তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকে। তুমি যাহার গৃহে অধিক পরিমাণে বিরাজ কর বা তুমি তাহার গায়ের রক্ত হইয়া দাঁড়াও, তাহাকে লোকে তোমার "কুমীর" বলিলেও, সেইই কিন্তু সংসার সমুদ্রে সকলের মাথার উপরে বিচরণ করে। সি-আই-ই বা রাজাবাহাদুর হইবার কাহারও সাধ থাকিলে, আগে তাহাকে তোমার "শৌণ্ড" হইতে হয়। মালিক ভাবে তুমি যাহাকে যে ভাবে কৃপাদৃষ্টি কর, সমাজে তাহার "বড়"ত্ব সেই ভাবে মাপা হইয়া থাকে। আজকালকার culture বা বিদ্যালাভ তুমি না হইলে সম্ভবে না। অতএব সরস্বতীও বুঝি লক্ষীর দাস্যবৃত্তি করিতেছেন। গৃহশিক্ষক হইতে আরম্ভ করিয়া কাঁদাতা পরীক্ষার্থী সকলের উপর তুমি চোখ রাঙাইতেছ। ষ্টার থিয়েটার, হোয়াইটওয়েরের দোকান, আলিপুরের বাগান, প্রেসিডেন্সী কলেজ, রেলের ষ্টেশন, কালীঘাটের মন্দির—সর্ব্বত্র, তুমি ভিন্ন "গলাধাক্কা"র রীতিমত ব্যবস্থা আছে।

তোমার একমাত্র দোষ তুমি জগতে যত বাড়িতেছ, লোকের অভাব ও অস্থিরতা ততই বাড়িতেছে। মিলনের তুমি বর্দ্ধনী হইলেও, এ কথা আজ চিন্তাশীল অর্থনীতিজ্ঞকে মহা ভাবনায় ফেলিয়াছে। তথাপি হে রজতেন্দু, তুমিই বরং চল, তোমার প্রতিনিধি কাগজের নোট যেন তত করিয়া না বাড়ে। হে রূপচাঁদ, তোমাকে যদি কেউ মনে-প্রাণে চিনিয়া থাকে, তবে সে কৃপণ ধনী। সে তোমার প্রেমে আত্মহারা। তোমার বিরহে "এ প্রাণ আর রাখব না" গোছের হইয়া পড়ে। তোমাকে নিশ্চল ভাবে বুকে ধরিয়া রাখিতেই তাহার একমাত্র আনন্দ। "যক্ষী" "মুদ্রারাক্ষস" নামের অপবাদে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। একেবারে নীরব, নিথর। তোমার গাঢ় প্রেমে সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। আহার করে না, তোমার ক্ষয় হইবার ভয়ে। নিদ্রা যায় না পাছে তুমি চুরি যাও এই ভয়ে। কাহিল অবস্থা। সে Lover হইয়া এমনি Lunatic, যে তুমি অপর একটা আনন্দের উপায় মাত্র, নিজে যে আনন্দ নও সে কথায় তাহার মোটেই হুঁস নাই। একেবারে আস্ত চণ্ডীদাসের প্রেম বা Platonic love আরও মজার কথা। সে শুধু তোমার রূপালি মুখখানাই চিনিয়াছে; তোমার অনন্ত শক্তির পরিচয়ে বা প্রত্যক্ষ প্রমাণে তাহার বিন্দুমাত্র অভিলাষ নাই। হে রজতানন, তুমি ইহাদিগকেও একেবারে সিন্দুকের মধ্যে গাঢ় বন্ধনে বাঁধিতে পার না? তাহা হইলেই ত আর যক্ষের বা যক্ষীর বিরহ সম্ভবে না। হায়! তোমার তত্ত্ব সিন্দুকের গুহায় নিহিত। তোমার লোভ জগতের বৃহত্তম লোভ। নরহত্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ঘণ্টার গড়ুরের ন্যায় বসিয়া 'তোয়াজ' ও তৈলদান করা পর্য্যন্ত সকলি তোমারি লোভে। সৎকর্ম্ম বা অপকর্ম্ম করিতে তোমারি আশায় লোকে মাসান্তে দিন গণে। তোমাকে পাইলে লোকের আর কিছুই ভাল লাগে না। তুমি দিন-মজুরী হইতে আরম্ভ করিয়া মাসকাবারি, সালতামামি, কিস্তীবন্দি সকল প্রকারেই লোকের জীবন-যৌবন বাঁচাইয়া রাখ। তোমাকে আদায় করিতে বা উদ্ধার করিতে লোকে পঞ্চমে চড়িয়া লঙ্কাকাণ্ড বাধাইতে পশ্চাৎপদ হয় না। রোজগারের জিনিষ তুমি। তোমাকে রোজগার করিবার আশায় আজকাল ছাত্রগণ পড়াশুনায় বিদ্যা চাহে না, তোমাকে চাহে। আজকালকার গ্রন্থকর্ত্তৃগণ পর্য্যন্ত কীর্ত্তি চাহে না, তোমাকে চাহে। তুমি যে নোবেল প্রাইজের লোভ দেখাইয়াছ! গৃহিণীর নথ নাড়ার, হাতনাড়ার, পলকে-পলকে মুখ ভার করার বিপুল লক্ষ্য অলঙ্কারদাতার দিকে নহে, তোমারি রজতবর্ণের দিকে। অতএব হে নটবর, তোমার সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিকে অসংখ্য প্রণিপাত। দেখা যায়, টাকার ভাবনায় কাহার-কাহারও টাক পড়িলেও তুমি যাহাকে-তাহাকে অনুগ্রহ কর না। তুমি হঠাৎ লোককে ফাঁপাইয়া থাক। তেলা মাথায় তেল ঢালার অভ্যাস তোমার বিলক্ষণ আছে। প্রেমারার আড্ডায় তুমি অতি লোভীকে একেবারে আকাশে তুলিয়া আবার পাতালে ফেলিয়া দাও। শুনা গিয়াছে, লটারীতে তোমার অকস্মাৎ প্রাপ্তিতে একজনের অত্যানন্দে প্রাণবিয়োগও ঘটিয়াছিল। "অধনং চর্ম্মধনং" যাহারা বলে, তাহাদের হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নাই। তাহারা ইউরোপীয়গণকেও এইভাবে একদিন চামার বলিতে কুণ্ঠিত হইবে না। বস্তুতঃ তাহারাই চামার। তোমাকে লইয়া পণ্ডিতগণ কত কত শাস্ত্র-রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন,—অর্থনীতি, অর্থশাস্ত্র। কিন্তু অর্থশাস্ত্রকার চাণক্য এত করিয়াও তোমাকে ভাল করিয়া বুঝিলেন না। অবশেষে তোমার সব সংসর্গ ত্যাগ! নিতান্ত ব্রাহ্মণ কি না? বিলাসের নিকেতন সাজাইতে, শিল্প সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রপুরী রচনা করিতে তোমা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। প্রাসাদের নানারূপ ঐশ্বর্য্য সম্ভার দেখিয়া লোকে শুধু বলিয়া উঠে "এসব তোমারি ছড়াছড়ি, খালি তোমাকে ঢালা হইয়াছে।" তোমারি অহঙ্কার লোকের একমাত্র অহঙ্কার। আজ War Loanএ একথা বিশ্ব-বিখ্যাত হইয়াছে।

রূপী রূপায়—তোমার রূপ আছে বলিয়াই সার্থক-নাম হইয়াছে। তোমার কি আদর। কোন কোন দেশে "ধন এস যাদু এস—সোনা আমার" বলিয়া ছেলেকে সোহাগ করা হয়, সমজদার ইংরাজগণও তোমার মান বাড়াইয়া "মানী" নাম দিয়াছে।

হে মুদ্রে, তোমার চারিদিকেই জয়-জয়কার। কুসংস্কার নয়, অঙ্গুলী অগ্রভাগে তোমার রেখা দেখিয়া লোকে সৌভাগ্যের নির্ণয় করিয়া থাকে। দশাঙ্গুলীতে তুমি আবির্ভূত হইলে আর চাই কি? তুমি একেবারে লোককে দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্ত করিয়া তোলো। এদিকে যেমন তুমি বিষয়ের মূল, আবার অপরদিকে তুমি বিষয়শূন্য যোগীকেও মহা মুদ্রায় ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বসাইয়া ইহকাল-পরকালের পথ পরিষ্কার করিয়া থাক। তোমার সর্ব্ব-ব্যাপকতায় একটি মস্ত প্রমাণ—

সমুদ্র মুদ্রার সহিত বর্ত্তমান বলিয়াই ত সমুদ্র। সমুদ্র যে আবার রত্নাকর।

সাহিত্যেও তোমার কত ছড়াছড়ি! Economics মুদ্রাতত্ত্ব, Econography প্রকৃত প্রস্তাবে মুদ্রাসনতত্ত্ব, Numismatics মুদ্রাতত্ত্ব! নিছক্ সাহিত্যে মুদ্রারাক্ষস, অর্থকথা, অর্থসংক্ষ, "অর্থাৎ কিনা" ইত্যাদি। মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের রাক্ষস না হইলে সাহিত্যের এত "বাড়্" কেহ কি কল্পনা করিতে পারিত?

গতিসম্বন্ধে এই বিংশ শতাব্দীতে তোমার ন্যায় সবল পদার্থ আর কিছুই নাই। তুমি এতই "আদুরে গোপাল" যে তোমার গায়ে আঁচড়টী লাগিলেই তুমি অভিমান করিয়া বস, একেবারে অচল হইয়া পড়।

তোমাকে নিত্যই আঁচলে করিয়া বেড়াইলেই ভাল, তোমাকে লইয়া জালজুয়াচুরি করিলে ত সর্ব্বনাশ! একেবারে দেপতার বা হাতকড়ি।

কিন্তু এ ক্ষেত্রেও লোককে বাঁচাইতে যদি কেহ পারে, তবে সে তুমিই রূপার চাঁদ। "উপরি"টা বোধ হয় সকলের উপরেই থাকে।

মুসলমানেরা বড় আদর করিয়া তোমাকে "শিক্কা" নাম দিয়াছিল। শিক্কাবাদের দেশে মসগুল তাহারা আর কি বলিয়া তোমায় আদর করিবে?

রাজার রাজ্যলাভ ও রাজ্যনাশ তুমিই ঘটাইয়া থাক। তোমার আগমনের দিন পুণ্যাহ তোমার তিরোভাবের দিন নিলামের দিন বলিয়া গণ্য হয়।

তোমাকে আমরা অতিরিক্ত ভাবে ভুলিয়াছিলাম, অশান্তিও সদেহে হইয়াছে। কপর্দ্দককেও আমরা সম্মান করিতে শিখিলে সুখের দিন আবার ফিরিয়া আসে। কিন্তু মোটর গামোফোনের মায়ায় তোমাকে দেশান্তরী করিতেছি যে আমরা সুজলা দেশকে গরিবখানায় পরিণত করিতেছি।

গুরুচরণ

[শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এম-এ]

ছয় মাস ছুটীর পর যখন কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইবার সময় আসন্ন হইয়া আসিল, তখন চিফ্ সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিলাম যে, আমি সদ্য রোগশয্যা হইতে উঠিয়াছি; এখন একটী স্বাস্থ্যকর স্থানে নিযুক্ত হইবার আশা রাখি। ছুটীর আর সপ্তাহখানেক মাত্র বাকি আছে, এমন সময় তারযোগে হুকুম আসিল যে, আমি ধুবুড়ীতে বদ্‌লী হইয়াছি। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে গৌহাটিতে ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিতে যাইবার পথে কয়েক ঘণ্টার জন্য ধুবুড়ী দেখিয়াছিলাম। ব্রহ্মপুত্র ও গদাধর নদদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে ছোট্টো সুন্দর সহরটী। রাস্তাগুলি পরিষ্কার, ঘরবাড়ী পরিচ্ছন্ন; প্রায় সকল ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখেই ছোট ছোট পুষ্পোদ্যান; নানারকম দেশী ও বিলাতী মরসুমী ফুলের বর্ণ ও গন্ধে চক্ষু ও মন প্রফুল্ল করিয়া তোলে। সহসা দেখিলে মনে হয়, কোন উচ্চপদস্থ রাজপ্রতিনিধির আগমন-প্রতীক্ষায় বুঝি বা সহরটাকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এমন একটী সুন্দর স্থানে নূতন কর্ম্মক্ষেত্র স্থিরীকৃত হইয়াছে জানিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল।

মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া ধুবুড়ী আসিলাম;—দুই মাসের কোলের মেয়েকে লইয়া স্ত্রী কলিকাতায় রহিয়া গেলেন। নূতন স্থানে একটা থাকিবার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া পরে তাহাদের লইয়া যাইব, কথা রহিল।

ছোট ছোট ঝাউগাছের জঙ্গলভরা বালির চড়ার মধ্য দিয়া স্বল্পসলিল গদাধর যেখানে বিশাল ব্রহ্মপুত্রে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, সেই স্থানে ধুবুড়ী গোকাল রোডের একটা প্রশস্ত বাংলো ভাড়া লইয়াছিলাম। নদীর ঘাটের কাছে ঐরাবতের মত বড় বড় কালো পাথর ছিল; আর ছিল বহু পুরাতন প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান-শ্রেণীর ভগ্নাবশেষ। লোকে বলিত, এই ঘাটে বেহুলার উপাখ্যানের নেতাই ধোপানী কাপড় কাচিত। কামরূপ প্রদেশের সর্ব্বত্র বেহুলা-লখিন্দরের কিম্বদন্তী প্রচলিত। কোথায়ও চাঁদ সওদাগরের সপ্ত ডিঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের এই ঘাটে বাঁধা ছিল শুনা যায়; কোথায়ও শুনিবে নদীর এই তটভাগে মৃত লখিন্দরকে বুকে লইয়া ভাসিতে-ভাসিতে সতী বেহুলার ভেলা আসিয়া ঠেকিয়াছিল। সন্ধ্যার পর যখন সহরের জনকোলাহল নীরব হইয়া যাইত, তখন ব্রহ্মপুত্রের চঞ্চল জলরাশি ঘাটের পার্শ্বে সেই বড় পাথর-গুলির উপর পড়িয়া অবিশ্রান্ত যে মর্ম্মরধ্বনি জাগাইয়া তুলিত, আমি তাহা শুনিতে-শুনিতে ভাবিতাম, এ কি বেহুলার অনন্ত বিলাপ,—আমার এই অভাগা দেশের

কোটা বিধবার চিরন্তন ক্রন্দন! ওগো বিশ্বের স্বামী! এমন দিনও ত ছিল, যেদিন তুমি বেহুলা-সাবিত্রীর রিক্ত ললাটে সধবার গৌরব-তিলক নিজের মঙ্গলহস্তে পুনঃ আঁকিয়াছিলে। আজ তুমি পতিহীনার চোখের জল কি এতই তুচ্ছ বলিয়া জানিয়াছ, যে সে নীরব গভীর আর্ত্তনাদ দেশের মুমূর্ষু সমাজ শুনিয়া—অন্তিম-শয্যার রুদ্ধকণ্ঠেও সান্ত্বনার বাণী কহিবার জন্য অন্ততঃ দুটা-একটাবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা তুমি অবহেলায় উপেক্ষা করিয়া রহিয়াছ? ওগো নির্লিপ্ত! ওগো নির্ম্মম! ওগো আনন্দময়! বেদনার তুমি কতটুকু বোঝো?

ধুবড়ীতে আসিবার চার পাঁচ দিন পরে একদিন কাছারী হইতে ফিরিয়া বারান্দায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় কে একজন আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, হঠাৎ পায়ে হস্তস্পর্শে চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মাথায় বড়-বড় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল, দৃঢ়কায়, মলিন-বর্ণ, সহাস্য-বদন প্রৌঢ়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি চাও তুমি?" বৃদ্ধ উত্তর দিল, "কিছু চাইনে বাবু, এই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

"তোমার নাম কি?" "গুরুচরণ।" "বাড়ী কোথায়?" "ফরিদপুরে।"

ফরিদপুর আমার জন্মভূমি;—সুদূর আসামের প্রবাস-ক্ষেত্রে এই অপরিচিত বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে আমার দেশের চাষার গানের মেঠোসুর, নৌকার মাঝির সারি-গান, পল্লীবালিকার মুখরতা, সব যেন এক মুহূর্ত্তে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, এ যে দেশের হাওয়া গায়ে মাখিয়া আসিয়াছে;—দেশের কথা, বাড়ীর সংবাদ সব যেন ইহার জানা। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহাকে জানিতাম না, মনে হইতে লাগিল সে যেন চিরপরিচিত। ইহার পর আলাপ জমাট বাঁধা আর কঠিন রহিল না। অনেক গল্প হইল; আমার চেয়ারের পার্শ্বে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে বৃদ্ধ তাহার জীবনের কাহিনী আমার নিকট বিবৃত করিল। হায়! সে যে আমা হইতেও কত অধিকদিন গৃহহারা, প্রবাসী। দশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থোপার্জ্জনের আশায় সে দেশ ছাড়িয়াছে, আর ফিরে নাই। যতদিন শরীরে সামর্থ্য ছিল, টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে, পরিবার প্রতি-পালন করিয়াছে। সাত-আট বছরের ছেলেটিকে কাঁদাইয়া তাহার স্ত্রী মৃত্যুর অজ্ঞাত পথে যাত্রা করিয়াছে, এই সংবাদ ধুবড়ীতে পাইয়া অবধি সে দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিল। সেই ছেলে এখন সাবালক, উপার্জ্জনক্ষম। বিপত্নীক বৃদ্ধ সংসারের মায়া কাটাইয়া এই প্রবাসেই জীবন শেষ করিয়া দিবে স্থির করিয়াছে। সহসা গুরুচরণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কেন এখানে আছি তা জানেন বাবু?"

আমি বলিলাম "কেন?"

"পড়িবার সুবিধা হয় বলিয়া।"

আমি ভাবিলাম, হয় ত বা ভুল করিয়াছি, গুরুচরণ বোধ হয় সাধারণ জনমজুর খাটিয়া খাইবার মত লোক নহে; নতুবা লেখা-পড়ার কথা তুলিবে কেন? অথচ সে নিজেই বলিয়াছে, সে জাতিতে কৈবর্ত্ত ও ব্যবসায়ে করাতি। একটু কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি পড় গুরুচরণ?" গুরুচরণ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "প্রথম ভাগ।" বলিয়াই একখানি ছোট ফ্রেমহীন শ্লেট ও খবরের কাগজের মলাট-লাগান পুরাতন, জীর্ণ একখানি 'প্রথম ভাগ শিশুশিক্ষা' আমার হাতে দিল।

মনে হইল, একটা পাগলের পাল্লায় পড়িয়াছি; কিন্তু গুরুচরণের কথাবার্ত্তা কিংবা ব্যবহার এমনই সংযত ও ধীর যে, তাহাতে উন্মাদের উচ্ছৃঙ্খলতা কিছুই দেখিলাম না। ব্যাপারটা সত্যসত্যই কি, তাহা জানিবার কৌতূহলও ছাড়িতে পারিতেছিলাম না। বলিলাম, "গুরুচরণ, কোথায় পড়?" বই খুলিয়া পুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় গুরুচরণ পড়িতে আরম্ভ করিল, "ক, খ, গ, ঘ, ঙ,"—অনুস্বার বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু শেষ করিয়া বৃদ্ধ নিরস্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই দশ বৎসরে তাহার অধ্যয়ন ইহার অধিক আর অগ্রসর হয় নাই। দুঃখ করিয়া বৃদ্ধ বলিল, তাহার মনের মতন শিক্ষকের অভাবে তাহার পাঠের ক্ষতি হইতেছে; এবং সেই কারণেই সে আজ আমার নিকট আসিয়াছে, তাহার ইচ্ছা ও অনুরোধ যেন আমি তাহার শিক্ষকতা গ্রহণ করি।

বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে, বৃদ্ধ গুরুচরণ বাতিকগ্রস্ত। পরদিন হইতে বই শ্লেট লইয়া পড়িতে

আসিবে বলিয়া প্রণাম করিয়া সে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার পর সিনিয়র একষ্ট্রা-অ্যাসিষ্টেন্ট কমিশনার বন্ধুবর যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাটীর মজ্‌লিসে গুরুচরণের কথা তুলিতেই সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। একজন বলিলেন, "গুরুচরণ তবে এবারে আপনাকে পাকড়াও করেছে;—যা'হোক্ তা'র পুরোনো গুরুদের এখন নিষ্কৃতি।" আর একজন বলিলেন, "পাগলটাকে যেন বেশী আস্কারা দিবেন না; বড় জ্বালাতন করে' তুল্‌বে।"

কি জানি কেন, গুরুচরণকে লইয়া এই হাসি-ঠাট্টায় তেমন করিয়া যোগ দিতে পারিতেছিলাম না। আমার কেবলই মনে পড়িতেছিল, বৃদ্ধের সহাস্য সরল শিশুর মত মুখখানি; কেবলই মনে হইতেছিল, সে আমারই স্বদেশের লোক। তাহারও বাড়ীর পাশ দিয়া আমার শৈশবের স্মৃতিমাখা সেই পদ্মা বহিয়া যায়। বর্ষার সন্ধ্যায় পদ্মার জঙ্গলধরা পাড়ে বসিয়া বালক গুরুচরণ কতদিন হয় ত আমারই মত, পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালার সহিত পাল-তোলা ইলিশমাছধরা ডিঙ্গির যুদ্ধ দেখিয়াছে; বাঁশবনের ছায়ায় ঢাকা, ঘুঘুর ডাকে মুখরিত গ্রামের রাস্তার পাশে বসিয়া আমারই মত হয় ত চৈত্রের দ্বিপ্রহরে সে ঘুড়ি উড়াইয়াছে; ভাদ্রের জলে-ডোবা ধানের ক্ষেতে আমারই মত বাড়ীর ছোট নৌকাটী বাহিয়া লইয়া সে-ও হয় ত কল্‌মীর শাক তুলিয়া আনিত, আর আজ আমারই মত সে-ও প্রবাসী, মায়ের কোল-ছাড়া। স্বতঃই আমার মনটা যেন গুরুচরণের সহিত সমবেদনায় ভরিয়া উঠিতেছিল,—বন্ধুবর্গের কৌতুকে যোগ দিতে পারিলাম না।

পরদিন হইতে গুরুচরণকে পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। হায় বৃদ্ধ! জীবনের এই শেষ-বেলায় মস্তিষ্ক যখন অবসাদ-কাতর, তখন তোমার এই জ্ঞানার্জ্জন-চেষ্টা যে ব্যর্থতার নিশ্চয়তায় কত করুণ, তাহা বুঝিয়া আমি ব্যথিত হইতাম, কিন্তু তোমার অন্ধ আশা, তোমার নির্বিকার উৎসাহ তাহাতে এতটুকুও দমিত না। গুরুচরণ আজ যাহা পড়িত, কাল তাহা ভুলিয়া যাইত; পরশু আবার তাহাই দ্বিগুণ উৎসাহে নূতন-পড়ার সামিল করিয়া লইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিত না। তাহার অধ্যবসায় দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া যাইতাম। সন্ধ্যার সময় গদাধর নদের বাঁধের উপর দিয়া সহরের পশ্চিম প্রান্তে, যেখানে একটা প্রকাণ্ড ছাতিম গাছের নীচে গুরুচরণের ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীর, সেইখানে বেড়াইতে গেলে শুনিতে পাইতাম ঘরের মধ্যে বাঁশের মাচার উপর বসিয়া আমার এই অক্লান্তশ্রমা ছাত্রটি পড়িতেছে, "ক, খ, গ, ঘ, ঙ; ক, খ, গ, ঘ, ঙ";—অথচ তাহার পরদিন প্রাতে যখন পাঠ বলিতে গিয়া তাহার সব ভুল হইয়া যাইত, তখনো তাহার অদম্য উৎসাহ কমিত না;—"বাবু, আর একবার বলে দিলেই আমি পড়া তৈরী করে ফেল্‌বো।"

"বাবু আপনি ত অন্য মাষ্টারদের মত আমাকে বকেন না, বিরক্ত হন্ না" বলিয়া গুরুচরণ যেদিন করুণ কৃতজ্ঞ নয়নের দৃষ্টিতে আমাকে তাহার ভক্তির অর্ঘ্যে আপ্লুত করিয়া দিত, সেদিন চোখের জল থামাইতে পারিতাম না কেন, তাহা, আজও মনে হয়, ভাল করিয়া বুঝি নাই। ভগবান! এই অক্ষম বৃদ্ধ শিশুটীকে এমন সহায়হীন, স্নেহহীন করিয়া ফেলিয়া রাখিলে কেন?

পড়িতে-পড়িতে গুরুচরণ একদিন জিজ্ঞাসা করিল "বাবু, মা আস্‌বেন কবে?" অন্যমনস্ক ছিলাম, প্রশ্নটার অর্থ ভাল করিয়া না বুঝিয়া উত্তর দিলাম, "মা,—কেন মা ত এখানেই আছেন!" আমার উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল, "হাঁ, হাঁ, তোমার মা ত আছে, আমার মা আস্‌বে কবে?" শান্ত,-সসম্ভ্রম বৃদ্ধকে আমি কোনোদিন এমন করিয়া আত্মহারা হইতে দেখি নাই। তখন মনে পড়িল আমার জননীকে গুরুচরণ 'মা' বলিয়া ডাকে না, 'ঠাকুমা' বলে। নিত্য জননীর স্নেহ যত্নে লালিত, আত্মসুখরত, স্বার্থান্ধ আমাকে আজ এই বৃদ্ধের মাতৃস্নেহের জন্য ক্ষুধাতুর শিশুহৃদয় যে তীব্র ভর্ৎসনা করিল, তাহার উত্তরে আমার বলিবার কিছু ছিল না। তারপর আমার স্ত্রী যেদিন আসিলেন, সেদিন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার সকল অধিকার গুরুচরণ জোর করিয়া গ্রহণ করিল; কাহাকেও সে ব্যাপারে সে অংশী করিতে সম্মত হইল না। ভোরের বেলা হইতে সে কোমরে চাদর বাঁধিয়া তাহার মায়ের আসিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিয়া গেল। পাল্কী লইয়া গাড়ী আসিবার দুই-তিনঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে ষ্টেসনে গিয়া বসিয়া রহিল; গাড়ী হইতে আমার স্ত্রীকে পাল্কীতে উঠাইয়া, পাল্কীর সহিত দুই মাইল রাস্তা দৌড়াইয়া বাড়ী আসিল। তারপর যখন তিনি ছোট মেয়েটীকে বুকে

করিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন গুরুচরণ ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা দুইহাতে মুছিয়া লইয়া মাথায় দিল, বুকে মাখিল; তারপর দুইটী হাত যোড় করিয়া নীরবে যখন উঠিয়া দাড়াইল, তখন তাহার মুখে হাসি, চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু। মুখ ফুটিয়া সে কিছুই বলিতে পারিল না, ভক্তি ও আনন্দের আতিশয্য তাহাকে মূক করিয়া রাখিল; কিন্তু তাহার ভক্তিনম্র, স্নিগ্ধ চাহনি ও মধুর হাসি যেন বলিতেছিল, "মা, মা আমার, তুমি যে আসিয়াছ মা, সন্তানকে যে দেখা দিয়াছ, ইহাতেই আমার হৃদয়ভরা আনন্দ, কোনো সাধই আমার আর অপূর্ণ রাখিলে না।"

ইহার পরই কিন্তু গুরুচরণ আমার সহিত বড় কৃতঘ্নের মত ব্যবহার করিল; হঠাৎ সে আমার সহিত গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। আমাকে তাহার এই অভিসন্ধির কথা সে ত কিছু জানিতেই দিল না, পরন্তু এতই সহজে ও অনায়াসে সে ইহা সিদ্ধ করিল যে, ইহাতে তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ কিম্বা দ্বিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। দুই তিনদিন সকালবেলা গুরুচরণকে পড়ার সময় অনুপস্থিত দেখিয়াও কিছু সন্দেহ করি নাই; মনে করিলাম বোধ করি তাহার কোনো অসুখ হইয়া থাকিবে। সপ্তাহ খানেক যখন সে আসিল না, তখন একটু উদ্বিগ্ন হইয়া গৃহিণীকে বলিলাম, "গুরুচরণ আজ ক'দিন থেকে আস্‌ছে না, অসুখ টসুখ কিছু হোলো নাকি? একবার খোঁজ নিতে হবে।" স্ত্রী উত্তর করিলেন, "কেন, সে ত রোজই পড়্‌তে আসে।"

আমি অবাক্ হইয়া বলিলাম, "রোজ পড়তে আসে? কই, আমি ত তাকে এক সপ্তাহ দেখি নাই।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওঃ! সে যে তুমি কাছারি যাবার পর রোজ দুপুরবেলা এসে পড়ে যায়।"

ভাবিলাম এই ব্যাপার! তা আমাকে একবার জানাইলও না। মনে মনে একটু অভিমান হইল।

শনিবার কোর্টে বিশেষ কিছু কায ছিল না। আড়াইটা-তিনটার সময় বাড়ী ফিরিয়া দেখি গুরুচরণ আমার স্ত্রীর কাছে বসিয়া পড়িতেছে, আর মাদুরে শায়িত খুকীকে এক-একবার খেলা দিতেছে; ক্ষুদ্রশিশু বৃদ্ধের রকম দেখিয়া হাসিতেছে। আমাকে দেখিয়া গুরুচরণ প্রণাম করিল। আমি বলিলাম, "কি গুরুচরণ, তাহলে আমার কাছে পড়াশুনাটা ছেড়ে দিলে?" গুরুচরণ তাহার সরল শিশুর মত চক্ষু দুইটী আমার মুখের উপর তুলিয়া নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল, "হাঁ বাবু, মা আপনার চেয়ে ভাল করিয়া পড়ান!"

হায় বৃদ্ধ! তোমার সত্য কথার শ্লেষটুকু কত তীব্র, তাহা তুমি বুঝিতে পারিলে না। আজ অধ্যাপকের হৃদয়ে শিষ্যের প্রতি পিতৃস্নেহ নাই বলিয়া, গুরুগৃহে ছাত্রের স্থান নাই বলিয়া, দেশের শিক্ষা সমস্যা দিন দিন কত দুরূহ ও জটিল হইয়া উঠিতেছে, ইহা তোমার জানা নাই; তবু তুমি এতটুকু বুঝিয়াছ যে, তোমার মায়ের স্নেহপ্রবণ অধ্যাপনা আর কিছু না হোক্ কেবল স্নেহের জোরেই তোমাকে সাধনার পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। আমাদের দেশে হৃদয়বান্, পিতৃতুল্য, মাতার অধিক স্নেহশীল অথচ "বজ্রাদপি কঠোর' অধ্যাপকগণের কাল আবার ফিরিয়া আসিবে কি? শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান সমিতিগুলি, "অধ্যাপনা-কার্য্যে হৃদয়ের স্থান কোথায়?" এ সমস্যার মীমাংসা করিয়া লইবেন না কি?

অবান্তর কথার আলোচনা করিব না, গুরুচরণের কথা বলিতে বসিয়াছি, শিক্ষা-সংস্কার করিতে বসি নাই। মাস চার পাঁচ পরে শুনিলাম, গুরুচরণ যুক্তাক্ষর আরম্ভ করিয়াছে। তাহার শিক্ষক-নির্ব্বাচন সফল হইল; দশ বৎসরে যাহা হয় নাই, পাঁচমাসে তাহা হইয়া গেল।

খুকীর সঙ্গে গুরুচরণ বড় ভাব করিয়া লইল। শিশু মাদুরে শুইয়া থাকিত, আর তাহার পাশে বসিয়া গুরুচরণ পাঠ আবৃত্তি করিত। খুকী তাহার অজানা ভাষায় "গ্, গ্" করিয়া উঠিলে বৃদ্ধ হাসিত; বলিত, "মা, খুকী পড়্‌তে চায়।" ছোট্‌টো মেয়েটী, কিন্তু বড় দুষ্টু। ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়াইবার সময় হাত-পা ছুড়িয়া, কুল্‌কুচো করিয়া দুধ ফেলিয়া দিয়া, হাসিয়া অস্থির হইত; তখন গুরুচরণের ডাক পড়িত। গুরুচরণ যখন, "দিদিমণি, আমি গান করি, তুমি খাও" বলিয়া তাহার ভাঙ্গা গলায় গান ধরিত, তখন খুকী স্থির হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া গান শুনিত, দুধ খাওয়াইতে আর কষ্ট পাইতে হইত না।

গুরুচরণ ভাঙ্গা গলায় গাহিত বটে, কিন্তু এমন ভাবের সহিত, এমন তন্ময় হইয়া গান করিতে আমি খুব অল্প

লোককেই শুনিয়াছি। একটী পুরাতন, জীর্ণ বেহালা ছিল তার গানের সাথী। আজ তাহার সে সমস্ত গানের কথাগুলি আমার মনে নাই, দু' একটির ভাবমাত্র মনে পড়ে। ভারতের শেষ-অবতারে শ্রীকৃষ্ণ নদীয়ার দুলালের রূপে জন্ম লইয়াছেন। ভক্ত-হৃদয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছে, তুমিই কি সেই শ্যামরায়, কালোবরণ—সেই কি তুমি? তবে তোমার এ রূপ কেন? এ শুভ্র শ্রী, এ গৌর-অঙ্গ তোমার আসিল কোথা হইতে? শ্রীহরি তাই ভক্ত হৃদয়ের বিবাদ-ভঞ্জন করিবার জন্য গাহিতেছেন, "জান কি? রূপ-সাগরে ডুব দিয়া গৌর হয়েছি। ভক্তির দাস আমি মূর্ত্তিমতী ভক্তি শ্রীরাধিকার প্রেমে আমি আত্মহারা হইয়াছি, স্ব-রূপ হারাইয়াছি; সে আমাকে তাহার রূপে সাজাইয়াছে। অরূপকে রূপ দিবার মালিক ভক্ত।" গানটি গাহিতে-গাহিতে গুরুচরণের দুই চক্ষু বহিয়া জল ঝরিত।

এই সময়ে গুরুচরণ আব্দার ধরিল, সে আমার চাপরাসির কাজ করিবে। ইহার পূর্ব্বে সে আমার জনৈক ব্রাহ্মবন্ধুর অধীনে কার্য্য করিত। বন্ধু ধুব্ড়ী হইতে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে বিজনীর জঙ্গলে মহিষের বাথান ও একটা ডেয়ারী খুলিয়াছিলেন। দধি, ঘৃত ইত্যাদি প্রায়ই কলিকাতায় চালান দিতেন এবং ধুব্ড়ীর ভদ্রলোকদিগের অনুরোধে উৎকৃষ্ট মাখন ও ভেজাল-রহিত ঘৃত সহরে অল্প দামে বিক্রয় করিতেন। গুরুচরণ ছিল তাঁহার ফেরিওয়ালা। হঠাৎ একদিন এই কাজে ইস্তাফা দিয়া সে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাকে আমার চাপরাসির কাজ দিতে হইবে। সরকার হইতে বাহাল আর্দ্দালিকে যে বিনা দোষে ছাড়াইয়া দেওয়া যায় না, ইহা তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। সেই দিনই মফঃস্বলে যাইতেছিলাম, তাহাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম; ভাবিলাম চার-পাচ দিন পরে ফিরিয়া আসিলে, বুঝাইয়া-সুঝাইয়া আবার তাহাকে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিব।

গোলোকগঞ্জের ডাক-বাঙ্গলার বারান্দায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বসিয়া গুরুচরণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন সে সরকারী চাকরী চায়। গুরুচরণ বলিল, সরকারী চাক্‌রীতে খুব উপরি মেলে, অনেক পয়সা রোজগার হয়, তাই সে সরকারী চাক্‌রী করিবে। দুই তিন মাসের মধ্যে হাতে ঢের টাকা হইবে; তখন সে বাড়ী যাইবে। বলিল, "বাবু, বাড়ীর জন্য কি জানি কেন মনটা বড় আন্‌চান্ করে।* ছেলেটিকে আজ দশ বৎসর দেখি নাই—এখন তাহার জন্য বড় পরাণটা কেমন করে।"

মফঃস্বল হইতে বাড়ী ফিরিয়া গুরুচরণকে বলিলাম যে কাছারীর কাযে তাহার সুবিধা হইবে না; পূর্ব্বের কর্ম্মে তাহাকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম। সে তাহাতে সম্মত হইল না। আমি তাহার হস্তে চারটি টাকা দিয়া বলিলাম, "এই কয়দিনের মাহিনা লও।" সে টাকা লইল না; বলিল, "আমাকে দিয়া ত কোনো কায করান হয়নি, মাহিনা লইব কি করিয়া?" তারপর কাতরকণ্ঠে আমাকে বলিল, "বাবু, আপনিই আমাকে বাড়ী যাইতে দিলেন না।" আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "গুরুচরণ, আমি তোমাকে টাকা দিতেছি, তুমি বাড়ী যাও।" গুরুচরণ আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "বাবু, আমি ভিক্ষা করি না।" বলিয়াই হন্-হন্ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার সেই আত্মমর্য্যাদা-দৃপ্ত কণ্ঠস্বর আজও আমার কর্ণে বাজে, "বাবু, আমি ভিক্ষা করি না।"

গুরুচরণ আমার নিকট আর ফিরিয়া আসিল না, তাহার পুরাতন কর্ম্মও লইল না, পড়াশুনা ছাড়িয়া দিল। প্রথম প্রথম তাহার অভাব সকলেই বড় অনুভব করিতাম। প্রায় তাহার খোজ লইতাম। বাঁধের উপর সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে গিয়া শুনিতাম যুক্তাক্ষর ছাড়িয়া আবার সে উচ্চকণ্ঠে ক, খ, গ, ঘ, ঙ আবৃত্তি করিতেছে। লোকে বলিত, তাহার বড় কষ্ট। কতদিন অনশনে কাটিয়া গিয়াছে শুনিয়া ব্যথিত হইতাম, অথচ সাহস করিয়া তাহাকে অর্থ-সাহায্য করিতে পারিতাম না। দরিদ্রের আত্মাভিমানে আঘাত করিবার ইচ্ছা আর ছিল না। এইরূপে গুরুচরণ যেন আমাদের নিকট হইতে ক্রমে-ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। ইহার মাস দুই পরে বর্ষা আরম্ভ হইল। দিবা-রাত্রি কেবল মেঘের গর্জ্জন, বাতাসের দীর্ঘশ্বাস, বৃষ্টির পতন-শব্দ। পনের দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর ব্রহ্মপুত্রের জল বাড়িতে লাগিল; বৃদ্ধেরা বলিলেন ব্রহ্মপুত্রের এরূপ প্রচণ্ড মূর্ত্তি তাঁহারা পূর্ব্বে কখনো দেখেন নাই। তিন দিনের মধ্যে ধুবড়ী সহরের অর্দ্ধেক জলমগ্ন হইয়া গেল, লোকের কষ্টের অবধি রহিল না। সরকার

হইতে ও সাধারণের নিকট চাঁদা আদায় করিয়া দরিদ্রদিগকে অন্ন ও পয়সা বিতরণ করা হইতে লাগিল। শুনিলাম গুরুচরণের ক্ষুদ্র কুটীরখানিকে ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি গ্রাস করিয়াছে; কিন্তু ভিক্ষালব্ধ অর্থে তাহা পুনঃ নির্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায়ে একদিনও সে আসিল না। অগত্যা আমিই একদিন তাহার বাড়ীতে গেলাম; দেখিলাম ঘরখানি জলে পড়িয়া গিয়াছে; জিনিষপত্র সে বাঁধের উপর তুলিয়া রাখিয়াছে। ছেড়া কাঁথা ও মাদুর এবং কয়েকখানি জীর্ণ চটে একটি ভাঙ্গা বাক্স ঢাকা; তাহার উপরে তাহার চিরপ্রিয় শ্লেট ও বইখানি এবং বেহালাটি সযত্নে রক্ষিত। গুরুচরণকে দেখিলাম না; লোকেরা বলিল সে সকালবেলা উঠিয়া গৃহ-নির্ম্মাণের বাঁশ-খড় ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে কোন্ গ্রামে চলিয়া গিয়াছে।

পক্ষাধিক জলধরের কবলে থাকিয়া সূর্য্যদেব যখন নিষ্কৃতি পাইলেন, তখন তাহার ক্রোধে আরক্তিম আঁখি পলাতক মেঘরাশিকে ভস্ম করিতে না পারিয়া হতভাগ্য নরলোকবাসীদিগের উপর পতিত হইল। দিনের বেলায় গৃহের বাহির হয়, এমন সাধ্য কাহার? সন্ধ্যায় বুবড়ীর সকল লোক ব্রহ্মপুত্র-তীরে এতটুকু স্নিগ্ধ বায়ুর আশায় আসিয়া মিলিত হইত। সেদিন বড় গরম; সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তবুও শীতল নদীতীর ছাড়িয়া গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা হইতেছে না, এমন সময় বন্ধু রমণীবাবু উকিল আসিয়া বলিলেন, "শুনেছেন, গুরুচরণকে হাস্‌পাতালে নিয়ে গেছে—ডাক্তারবাবু বলেছেন, তার পক্ষাঘাত হয়েছে।"

বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল, মনে হইল বড় কঠিন আঘাতে কে যেন একেবারে অবশ করিয়া ফেলিয়াছে। কেবলি মনে হইতে লাগিল; আমিই গুরুচরণের এই ব্যাধির কারণ। আমি তাহার সকল আশা বিফল করিয়াছি, তাহার বাড়ী যাইবার পথ বন্ধ করিয়াছি; তাই সে আর পথ না পাইয়া অভিমানে মৃত্যুর পথ ধরিয়া চলিল। নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া হাসপাতালে ছুটিলাম। আমার মন কেবলি বলিতে লাগিল, "গুরুচরণ, তুমি মরিও না, তুমি বাঁচিয়া ওঠো; তুমি যাহা চাহিবে আমি তাহাই দিব; তুমি যে কায করিতে চাও, তাহাতেই তোমাকে নিযুক্ত করিব। তুমি মরিও না মরিও না।"

ডাক্তার বাবু আমাকে দেখিয়া গুরুচরণের শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া আমাকে বারান্দায় লইয়া গেলেন। বলিলেন, "রোগীর অবস্থা অতিশয় মন্দ, এখনো সে অজ্ঞান। যতদূর জানা গিয়াছে, দুপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে সে তাহার ক্ষুদ্র ঘরটির সংস্কার করিয়াছে। বৃদ্ধের মস্তিষ্ক সেই তীব্র রৌদ্রতেজ সহ্য করিতে পারে নাই; মস্তিষ্কের অসাড়তা (Paralysis of the brain) হইয়াছে। জীবনের আশা বিন্দুমাত্র নাই, তবে রোগী মৃত্যুর পূর্ব্বে সচেতন হইতে পারে।"

ভিতরে গিয়া গুরুচরণের বিছানার পাশে বসিলাম। স্থির অচঞ্চল বৃদ্ধের অচেতন শরীর; তবু মনে হইতেছিল তাহার মুখে সেই সরল সুন্দর শিশুর হাসিটি লাগিয়া আছে। তাহার মাথায়-গায়ে হাত বুলাইয়া দিলাম। মাঝে-মাঝে সে যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ করিতেছিল। রাত্রি প্রায় নয়টার সময় হঠাৎ চীৎকার করিয়া গুরুচরণ চোখ মেলিল। অসহ্য-অপরিমেয় যন্ত্রণা তাহার লুপ্ত চেতনাশক্তিকে যেন আঘাত দিয়া জাগাইয়া তুলিল। আমি তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলাম, "গুরুচরণ, আমি কে, চিন্‌তে পার্‌ছো?" গুরুচরণ চক্ষু উন্মীলিত করিবার চেষ্টা করিল, পারিল না,—মাংসপেশী সকল অসাড় হইয়া গিয়াছিল। চেঁচাইয়া বলিলাম, "গুরুচরণ, আমি আসিয়াছি, আমি, আমি।" বৃদ্ধের ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মুখের কাছে কাণ লইয়া গেলাম, জড়িত কণ্ঠে অস্পষ্ট স্বরে গুরুচরণ বলিল, "বাবু, বাড়ী যেতে দেবে না।"

হায় বৃদ্ধ! আজ কাহার সাধ্য তোমাকে বাড়ীর পথ হইতে ফিরাইয়া আনে? আনন্দলোক হইতে বিশ্বমায়ের প্রসারিত যে বাহুযুগে তোমার চির-স্নেহাতুর আত্মা ঝাঁপাইয়া পড়িল, হে মায়ের শিশু! সেই ক্রোড়ে তুমি আমারও জন্য একটু স্থান করিয়া রাখিও।

পাখীর খাঁচা

[শ্রীসত্যচরণ লাহা এম-এ, বি-এল]

মেম্বর, ন্যাচারেল হিষ্ট্রি সোসায়িটি (বোম্বাই)

বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের পাখীদিগকে পিঞ্জরে রাখিয়া পালনের প্রথা একেবারে নূতন। স্বাধীন অবস্থায় পাখীরা যেরূপ-ভাবে থাকে—উহাদের উপযোগী খাদ্যাদি, রৌদ্রের উত্তাপ, বিশুদ্ধ বায়ু, পানীয় জল, অতিরিক্ত তাপ

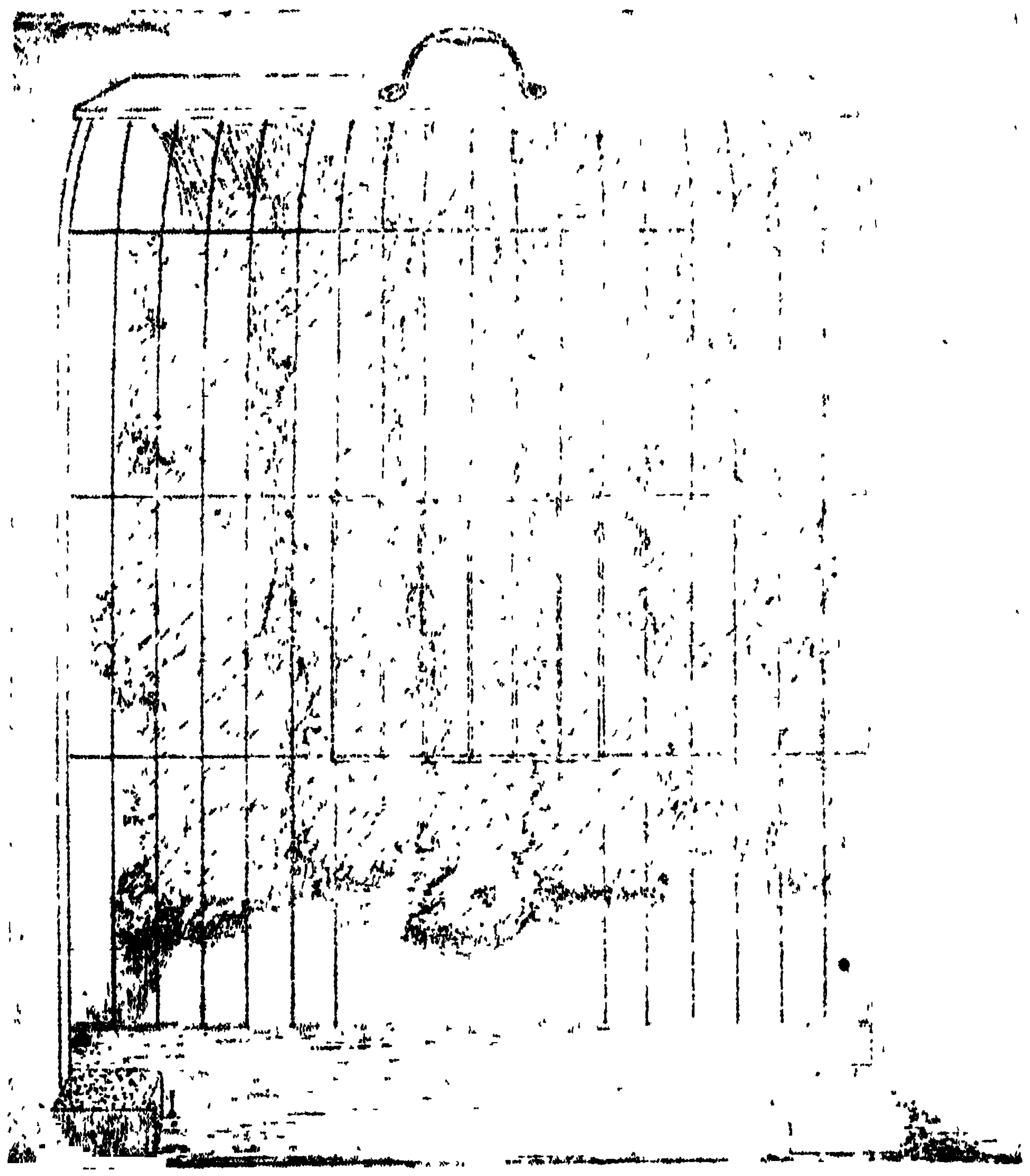

কাঠঠোকরা পাখীর খাঁচা

এবং ঝড়বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য আচ্ছাদিত স্থান প্রভৃতি প্রাণধারণের অত্যাবশ্যক সামগ্রীগুলি উহাদিগকে সুপ্রণালীতে উপভোগ করিতে দিয়া যাহাতে পাখীগুলি আপনাদিগের আবদ্ধ জীবনের ক্লেশ অণুমাত্র অনুভব করিতে না পারে, ইহাই পণ্ডিতগণের একমাত্র লক্ষ্য। পাখীগুলিও এই প্রকারে পালকদিগের যত্নে রক্ষিত হইয়া—মনের আনন্দে গান গাহিয়া পুচ্ছ দোলাইয়া পিঞ্জর মধ্যে উড়িয়া বেড়ায়; এমন কি মনোমত পত্নী-সহযোগে শাবকোৎপাদন করিয়া আপনাদের জীবন সুখময় করিয়া তুলে। এই প্রণালীতে পক্ষিপালনই য়ুরোপে Aviculture নামে অভিহিত হয়।

পালন-ব্যাপারে সার্থকতা লাভ করিতে হইলে কতকগুলি উপকরণের একান্ত প্রয়োজন। এই উপকরণগুলি সংগ্রহ করা পালকের পক্ষে যেরূপ বাঞ্ছনীয়, তদ্রূপ বিহঙ্গগুলির স্বাভাবিক অবস্থার জ্ঞান সঞ্চয়ও কতকটা আবশ্যক। কারণ, এরূপ জ্ঞান না থাকিলে আবদ্ধাবস্থায় পক্ষিগণের উপযোগী আহারাদি প্রদানের অভাবে বিষময় ফল ঘটিতে পারে। এই নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাই যে য়ুরোপীয় পক্ষিপালকগণ দলবদ্ধ হইয়া কতিপয় ক্লব বা সমিতির সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য বনে-বনে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পক্ষীদিগের স্বাভাবিক জীবন পরিদর্শন। বলা বাহুল্য, এই প্রকার পরিদর্শনের ফলে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ হয়, আবদ্ধ বিহঙ্গগুলির পালন-ব্যাপারে উহা নিয়োজিত হইয়া যথেষ্ট সুফল প্রসব করে। আমরা যথাক্রমে উল্লিখিত উপকরণ সমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

সর্ব্বপ্রথমে পালক কিরূপ বা কোন জাতীয় পক্ষী পালন করিতে অভিলাষী আছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে মনোনীত পাখীগুলির রক্ষণোপযোগী স্থান ঠিক করিতে হইবে। পাশ্চাত্য প্রথানুসারে পক্ষিসংরক্ষণের স্থান সাধারণতঃ দ্বিবিধ—পিঞ্জর (cage) এবং বৃক্ষাদিশোভিত পক্ষিগৃহ (aviary)। সহজে স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়, এরূপ বৃহৎ খাঁচাও aviary নামে অভিহিত হয়। এই দ্বিপ্রকার আবাসস্থানের মধ্য হইতে যেটি পালকের পক্ষে

অনায়াসলভ্য, অথচ যাহা তাহার নির্দ্ধারিত পক্ষীর সুখ ও স্বাস্থ্যের অনুকূল, তাহাই বাছিয়া লইতে হইবে। সচরাচর আমাদের দেশে যে সকল খাঁচা ব্যবহৃত হয়, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত খাঁচার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর; বস্তুতঃ সেগুলি পক্ষি-রক্ষণের আদৌ উপযোগী নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, পিঞ্জরগুলিতে পরিষ্কার করিবার সদুপায় না থাকায় ময়লা এবং কীটাণুর সৃষ্টি হইয়া পাখীদিগের স্বাস্থ্যহানি করে। এই অহিতকর পিঞ্জর সমূহের মধ্যে প্রায়ই গোলাকার খাঁচার অধিক প্রচলন দেখা যায়। ইহা পক্ষিগণের প্রাণনাশক একপ্রকার যন্ত্র বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, কারণ উৎপতন ও উল্লম্ফনের বশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইহার মধ্যে পাখীগুলি ঘূর্ণরোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং অচিরকাল মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পিতলাদি কতিপয় ধাতুনির্ম্মিত পিঞ্জর বাহ্য সৌন্দর্য্যশালী বটে, কিন্তু উহাদের মরিচা দ্বারা পক্ষীদিগের প্রাণনাশের সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দারু এবং লৌহের তার দ্বারা নির্ম্মিত পিঞ্জর ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। পক্ষীর আয়তন ও স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পিঞ্জরের পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইবে। কতিপয় পক্ষী ক্ষুদ্রকায় হইলেও অতিশয় চঞ্চল; ইহাদিগকে পিঞ্জরে রাখিতে হইলে পিঞ্জরটি ছোট হইলে চলিবে না; কারণ ইতস্ততঃ উল্লম্ফনের দ্বারা পিঞ্জরগাত্রে আঘাত লাগিয়া উহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইবার সম্ভাবনা। অপর কতিপয় পক্ষী দীর্ঘকায় হইলেও স্থিরস্বভাব বশতঃ তাহাদিগকে অল্প-পরিসর পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন তাহাদিগের অঙ্গসঞ্চালনের ব্যাঘাত না হয়; কারণ যথেষ্ট অঙ্গসঞ্চালন ব্যতীত পাখী কখনই জীবিত থাকিতে পারে না! এই প্রসঙ্গে প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ব্রেমের (Dr. Brehm) কথা স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়—"Life and motion aro in the case of the bird identical" বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বিহঙ্গজাতির ক্ষুদ্র প্রাণ উহাদিগের অঙ্গসঞ্চালনরূপ উপাদানের সমষ্টিমাত্র। অঙ্গ-সঞ্চালনই পক্ষীদিগের হৃদয়ের আনন্দভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।

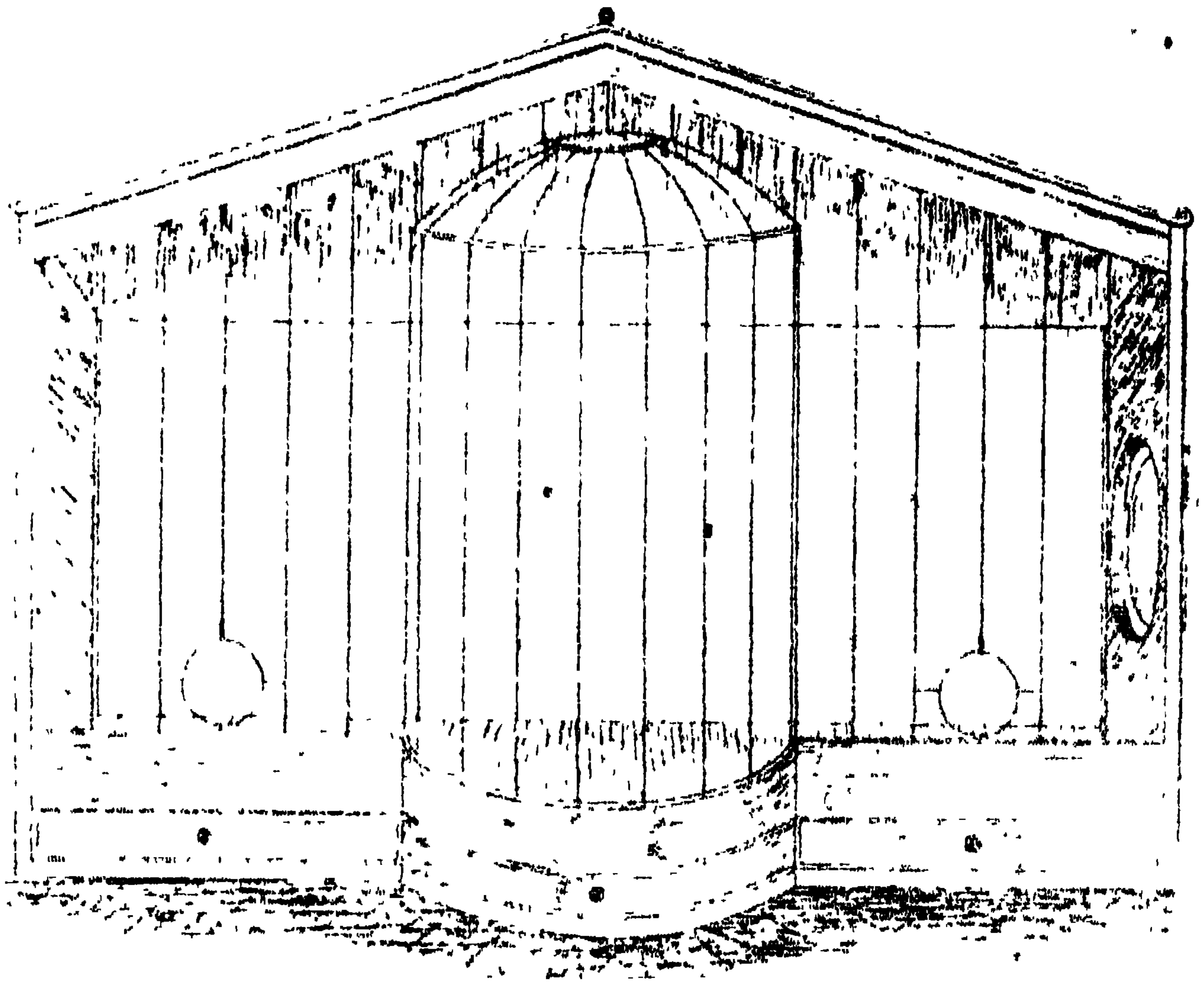

লাব জাতীয় পক্ষীর পিঞ্জর

উক্ত প্রকারে পিঞ্জরের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া উহার অভ্যন্তরে কতিপয় আনুষঙ্গিক দ্রব্যের স্থাপন একান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ পক্ষীটির পানীয় জল(১) ও খাদ্যের আধার রাখিবার স্থান এরূপভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে, যেন অতি সহজে উহা-

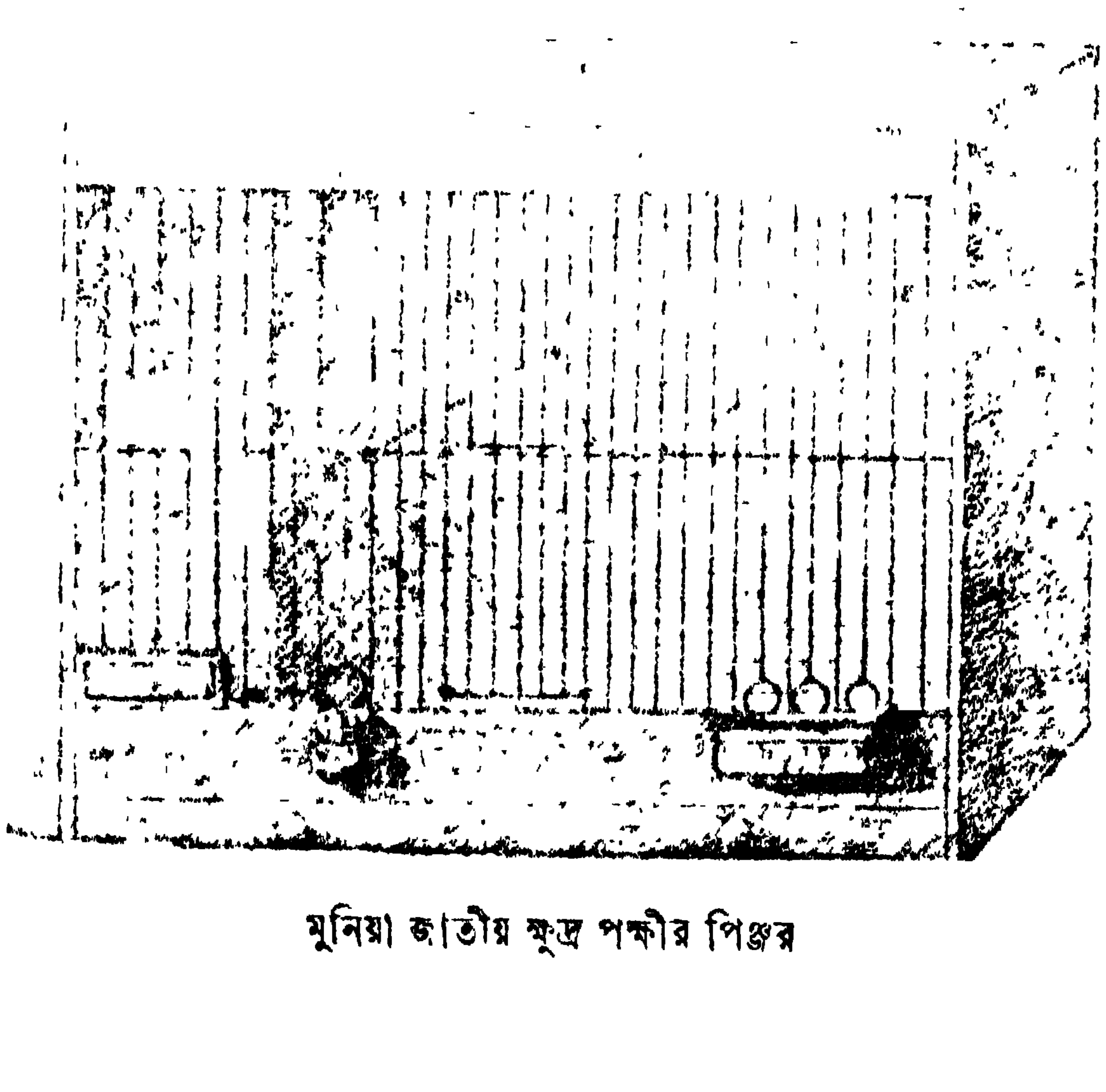

মুনিয়া জাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষীর পিঞ্জর

(১) কেহ কেহ পানীয় জলের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাহাতে

দিগকে বাহির করিয়া পুনরায় পিঞ্জরাভ্যন্তরে স্থাপন করিতে পারা যায়; অর্থাৎ খাঁচার মধ্যে হস্তপ্রবেশ না করাইয়া বাহির হইতে খাদ্য ও জল-পাত্রগুলির প্রবেশ এবং নিষ্ক্রামণের উপায় থাকে। পাত্রগুলি উত্তমরূপে ধৌত হইলে উহাদিগকে স্বচ্ছ সলিল ও পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা পূর্ণ করিয়া পুনরায় স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিতে হইবে। উক্ত পাত্রসমূহের সন্নিবেশ ও বহিষ্করণের জন্য পিঞ্জরাভ্যন্তরে হস্তপ্রবেশ করাইলে পাখীগুলি অতিশয় ভীত হইয়া ছট ফট করিতে থাকে এবং পিঞ্জরগাত্রে আঘাত লাগিয়া উহাদের বিপৎপাতের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত বাহির হইতে পাত্রসমূহের ভিতরে বিন্যাস ও নিষ্ক্রামণের জন্য পিঞ্জরগাত্রে কয়েকটি ছিদ্রের (২) ব্যবস্থা থাকা উচিত; এবং তাহাদের পরিমাণ খাদ্যাদি পাত্রসমূহের আয়তনানুযায়ী হওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে পাত্রগুলি সংলগ্ন হাণ্ডেলের (handle) সাহায্যে আলমারির টানার (drawer) ন্যায় ইহার মধ্যে ঢুকাইতে এবং টানিয়া বাহির করিতে পারা যায় (৩)। (২য়) খাঁচার তলদেশের আবরণটি এরূপ ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া উচিত, যেন ইহাতে আবর্জ্জনাদি পতিত হইলে দুর্গন্ধের সৃষ্টি না হয়; কারণ এই দুর্গন্ধে পক্ষীর স্বাস্থ্যনাশের সম্ভাবনা। খাদ্য ও জলপাত্রের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট প্রকারে এই আবরণটিকে সহজে বাহির করিবার উপায় থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রতিদিন সকালে উহাকে

পানীয় পান ও স্নানের উভয়বিধ কার্য্য সমাধা করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার দোষ এই যে, স্নানের পর জল দূষিত হয় বলিয়া ইহা পরে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত দুইটি স্বতন্ত্র জলাধার রাখা দরকার এবং স্নানের পর স্নানপাত্রটি বাহির করা আবশ্যক।

(২) ছিদ্রগুলি পিঞ্জরগাত্রের তলদেশের ঈষৎ ঊর্দ্ধভাগে এরূপভাবে স্থাপিত করিতে হইবে, যাহাতে পাত্রগুলি ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া খাঁচার তলদেশস্থ আবরণের সহিত সংলগ্ন হয়; নচেৎ উহারা টেরা বা আড়ভাবে উল্টাইয়া পড়িবে। খাদ্যাদি পাত্রসমূহের বহিষ্করণের সঙ্গে সঙ্গে ছিদ্রগুলির দ্বারদেশ অতি সহজে আবৃত করিবার উপায় বিধান করিতে হইবে; নচেৎ পাত্রসমূহ বহিষ্কৃত হইলে পিঞ্জরাভ্যন্তরস্থ পাখীগুলি বাহির হইয়া পলাইতে পারে।

(৩) বৃক্ষাদিশোভিত পক্ষিগৃহ বা aviary রচনাকালে কিন্তু এই সব খুঁটিনাটি লইয়া ব্যস্ত থাকিবার দরকার হয় না, কারণ তত্রস্থ পক্ষীগুলি প্রচুর জায়গা পাইয়া স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে পারায় তাহারা খাদ্যাদি পাত্রের প্রবেশ ও নিষ্ক্রামণকালে ত্রস্ত হয় না।

কলিকাতার ২৮ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ ভবনের উদ্যানে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহার তত্ত্বাবধানে রচিত ভারতবর্ষীয় বিশিষ্ট পক্ষি-জাতির আবাস গৃহ

মিঃ এজরার হল-এর সম্মুখস্থ বারান্দায় পিঞ্জরস্থ বার্ড অভ প্যারাডাইস

পরিষ্কার করিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিতে হইবে। (৩য়) কোন কোন জাতীয় পাখীর নিমিত্ত বালির একান্ত আবশ্যক বোধে বালুকাপূর্ণ পাত্র পিঞ্জরের অভ্যন্তরে স্থাপন করিতে হইবে। অনেকে স্বতন্ত্র বালির পাত্র না রাখিয়া পিঞ্জরের তলদেশের আবরণটি বালুকাপূর্ণ করিয়া থাকেন। বালির প্রয়োজনীয়তা এই যে, ইহা পাখীর পরিপাকশক্তির সহায়তা করে। (৪র্থ) পিঞ্জরাভ্যন্তরে পক্ষীর উপবেশনোপযোগী দুইটী দাঁড়ের প্রয়োজন; এই দাঁড় ধাতু নির্ম্মিত না হইয়া নিম্বকাষ্ঠের দ্বারা গঠিত হওয়া উচিত, কারণ এই কাষ্ঠে কীটাদি সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। দাঁড় দুইটির স্থূলতা এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে পাখীটি অনায়াসে অঙ্গুলিদ্বারা উহাকে আয়ত্ত করিতে পারে; নচেৎ কোনও প্রকারে অঙ্গুলিতে ব্যথা জন্মিয়া গুরুতর উপসর্গাদি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। পিঞ্জরের আভ্যন্তরিক বিষয়গুলির যেরূপ নিপুণতার সহিত সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে, বহির্দ্বার নির্ম্মাণ বিষয়েও তদনুরূপ যত্ন লওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। উক্ত দ্বার পিঞ্জরগাত্রে সংলগ্ন অবস্থায় ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিয়া উন্মুক্ত এবং অধোভাগে আকর্ষণ করিয়া আবদ্ধ করিবার পদ্ধতি সুকৌশলে সাধন করিতে হইবে। এরূপ হইলে পক্ষিপালক আবশ্যক মত উক্ত পিঞ্জর-দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া অথবা ইচ্ছামত অবনমিত করিয়া এমনভাবে পিঞ্জরাভ্যন্তরে দ্রব্যাদি সন্নিবেশিত করিতে পারেন যে, অভ্যন্তরস্থ পক্ষীর পলায়নের

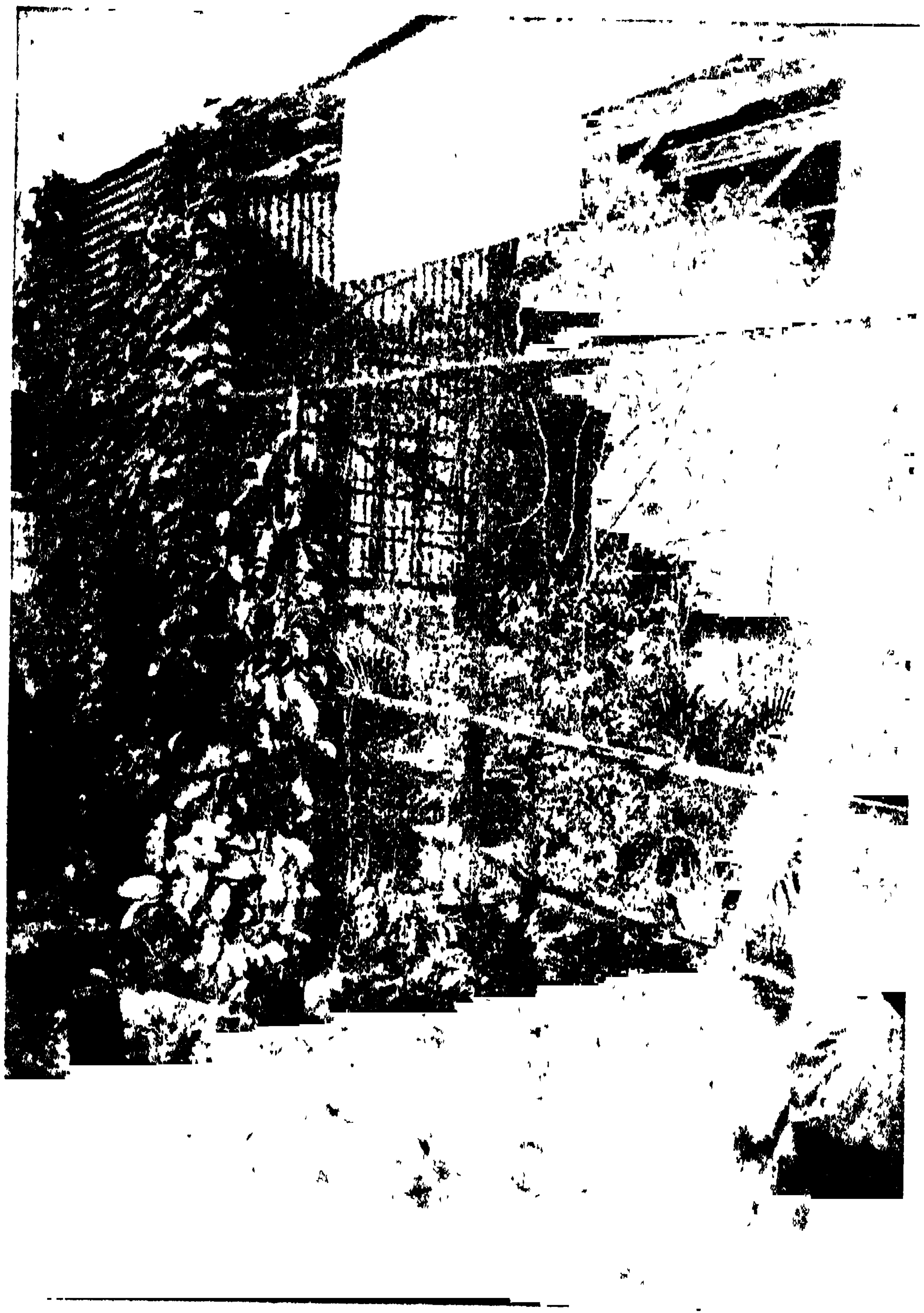

কলিকাতার ৯৩।৩ নং অপার সার্কুলার রোডস্থ ভবনে বৃক্ষাদি শোভিত পক্ষি গৃহ

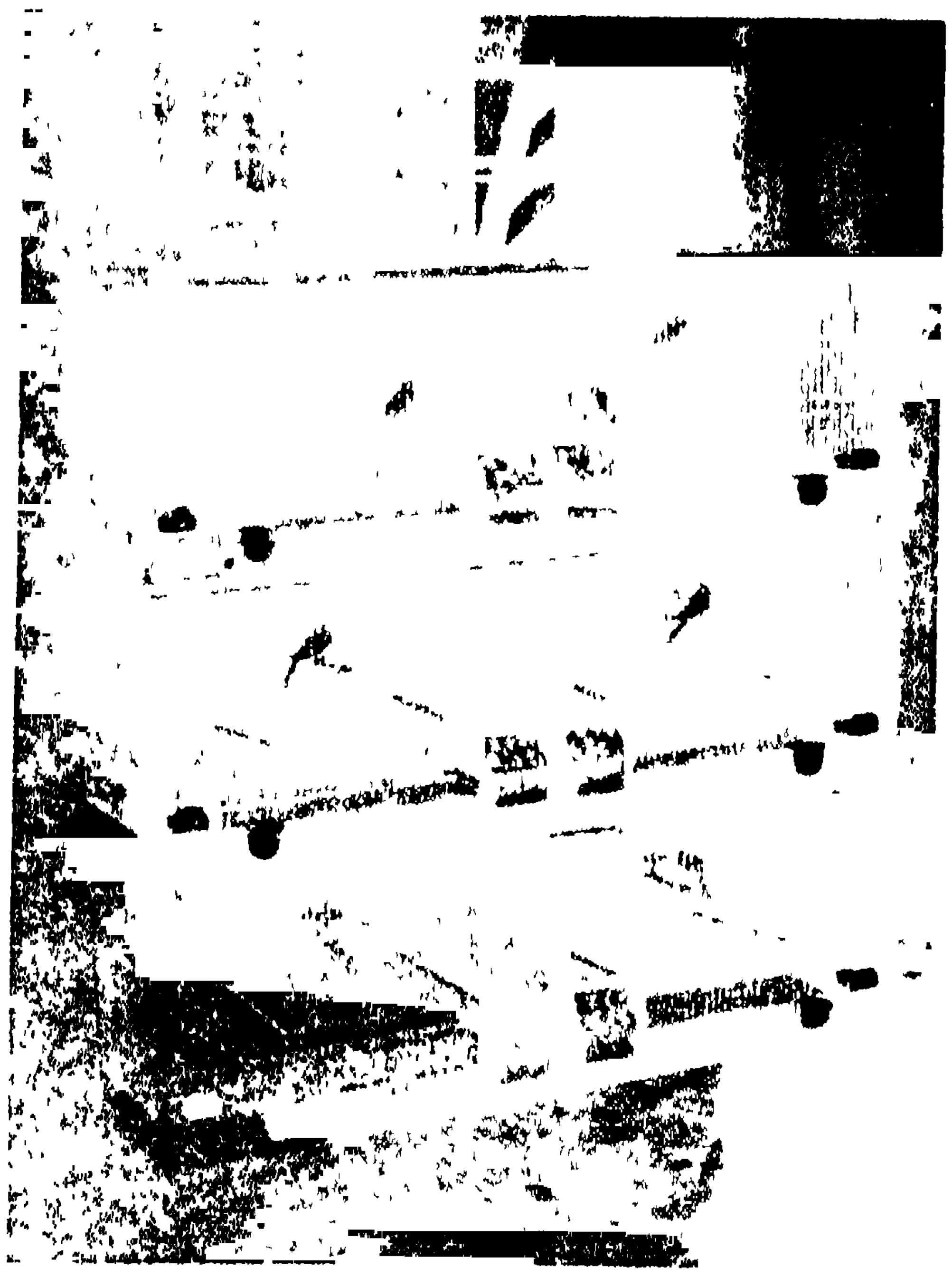

কলিকাতার ৯৩,৩ নং অপার সার্কুলার রোডস্থ ভবনে শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মণ্ডলের আদেশ অনুসারে লণ্ডনে রচিত তিনটী পিঞ্জর স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রহিয়াছে।

কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা থাকে না। কেবলমাত্র বহির্দ্দিকে উন্মোচনশীল দরজা দ্বারা পালকের পক্ষিসংরক্ষণের ব্যবস্থা নিরাপদ হয় না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বুদ্ধি কৌশলে বিভিন্ন প্রকার পক্ষি-রক্ষণের অনুকূল পিঞ্জর সমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের কতিপয় চিত্র প্রদর্শিত হইল।

একটি সুবৃহৎ জলপাত্র ইহার নির্দ্দিষ্ট পিঞ্জর মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাহাতে সহজ উপায়ে পাত্রটি বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ অপরিষ্কৃত জল ফেলিয়া দিয়া পুনরায় স্বচ্ছ সলিল দ্বারা পূর্ণ করিয়া উক্ত পাত্রটি যথাস্থানে স্থাপন করিতে পারা তদুপায় ও বিহিত হইয়াছে।

কাটঠোক্‌রা পাখীর সর্ব্বদা কাষ্ঠে ঠোকর মারা স্বভাব।

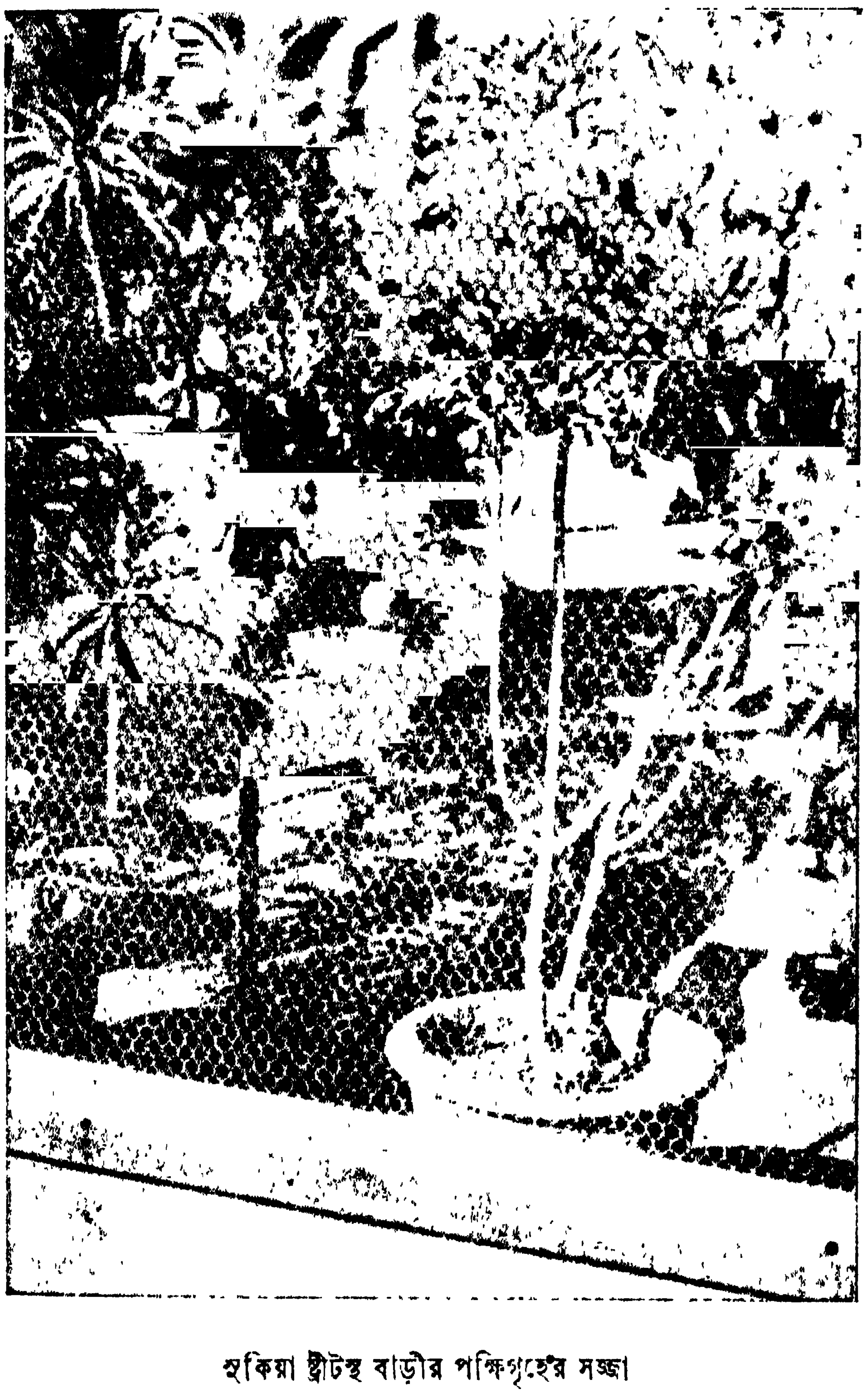

সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীর পক্ষিগৃহের সজ্জা

মিঃ ডেভিড্ এজ্‌রার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ আল্‌ফ্রেড্ এজ্‌রার লণ্ডনস্থ ভবনে বৃক্ষলতাদি পরিশোভিত দুর্গা-টুন্‌টুনির (হিন্দ সকর খোরা ; ইংরাজী Sun bird) আবাসগৃহ

পিঞ্জরগুলি যে নির্দ্দিষ্ট পক্ষিসমূহ সংরক্ষণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা সহজে অনুমিত হয়। খঞ্জনপক্ষী স্বভাবতঃ স্নানপ্রিয়; চঞ্চল পদক্ষেপে জল আলোড়িত করিয়া লঘু ললিত ভঙ্গিতে পুচ্ছ কাঁপাইয়া ত্বরিত গতিতে সলিল বক্ষে সঞ্চরণ করিতে ইহারা বড় ভালবাসে। এই নিমিত্ত দেখুন

স্বভাবের সহিত স্বাচ্ছন্দ্যের নিকট সম্বন্ধ; এই নিমিত্ত পাঠকবর্গ অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে কি কারণে ইহার পিঞ্জরের একপার্শ্বে কাক (cork) গাছের বল্কল দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইয়াছে। ইহাকে কাষ্ঠ নির্ম্মিত পিঞ্জরে রাখিতে হইলে পিঞ্জরের অভ্যন্তর দস্তার চাদরের

(Zinc sheet) দ্বারা আবৃত করিতে হইবে ; নচেৎ ইহা ঠোকর দ্বারা কাষ্ঠমধ্যে ছিদ্র করিয়া অকস্মাৎ উড়িয়া পলাইতে পারে।

লার্ক (lark) জাতীয় পক্ষীদিগের মধ্যে প্রকারভেদে বা শ্রেণীগত পার্থক্য হেতু কতকগুলি শ্যামল প্রান্তরে কতকগুলি বা বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতে বিচরণ করিতে ভালবাসে। স্বভাবতঃ ইহারা ভূমিতলে অবস্থান করে এবং ভূগর্ভে নীড়নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে ডিম্বপ্রসব ও শাবকোৎপাদন করিয়া থাকে। বৃক্ষশাখায় অবস্থান করিতে ইহারা অনভ্যস্ত। এই নিমিত্ত ইহাদিগের খাঁচার মধ্যে দাঁড়ের ব্যবস্থা না করিয়া ঘাসের চাপড়া কিম্বা বালুকা রক্ষা করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত টানার (drawer) সাহায্যে ঘাসের চাপড়া কিম্বা বালুকা বহিরানয়ন পূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া অনায়াসে তদভ্যন্তরে সংস্থাপন করিবার উপায় বিহিত হইয়াছে। পিঞ্জর মধ্যে উহাদের স্নানের নিমিত্ত জলপাত্র রাখিবার আবশ্যক নাই ; কারণ উহারা মৃত্তিকা বা বালুকারাশিতে পতিত হইয়া তদুপরি অঙ্গঘর্ষণ দ্বারা গাত্রমল বিদূরিত করিয়া থাকে।

উপরে যে কয়েকটি পিঞ্জর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র শ্রেণীর বিহঙ্গগণের পক্ষে অতি উপাদেয় পিঞ্জরটির বাহ্যাভ্যন্তরিণ কারুকৌশল নিরীক্ষণ করিলে পাঠকবর্গের

৩ নং বিড ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সারি সারি পক্ষিবাটিকার সম্মুখে মিসেস এড্রা হংস সারসাদি বিহঙ্গকে খাওয়াইতেছেন

সহজে বোধগম্য হইবে যে খাঁচার ভিতরে খাদ্যাদি পাত্র রাখিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত টানার সাহায্য না লইয়া অপর একটি সুন্দর উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন পিঞ্জরগাত্রে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র এরূপ ভাবে রচিত হইয়াছে যাহা দ্বারা পিঞ্জরাভ্যন্তরস্থ পক্ষী কেবলমাত্র চঞ্চুপুট বিনির্গম দ্বারা খাঁচার বহির্ভাগে ছিদ্রগুলির মুখে সুকৌশলে স্থাপিত পাত্র সমূহ হইতে খাদ্যাদি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। পাত্রগুলিতে একটি আবরণ সংলগ্ন থাকায় বাহির

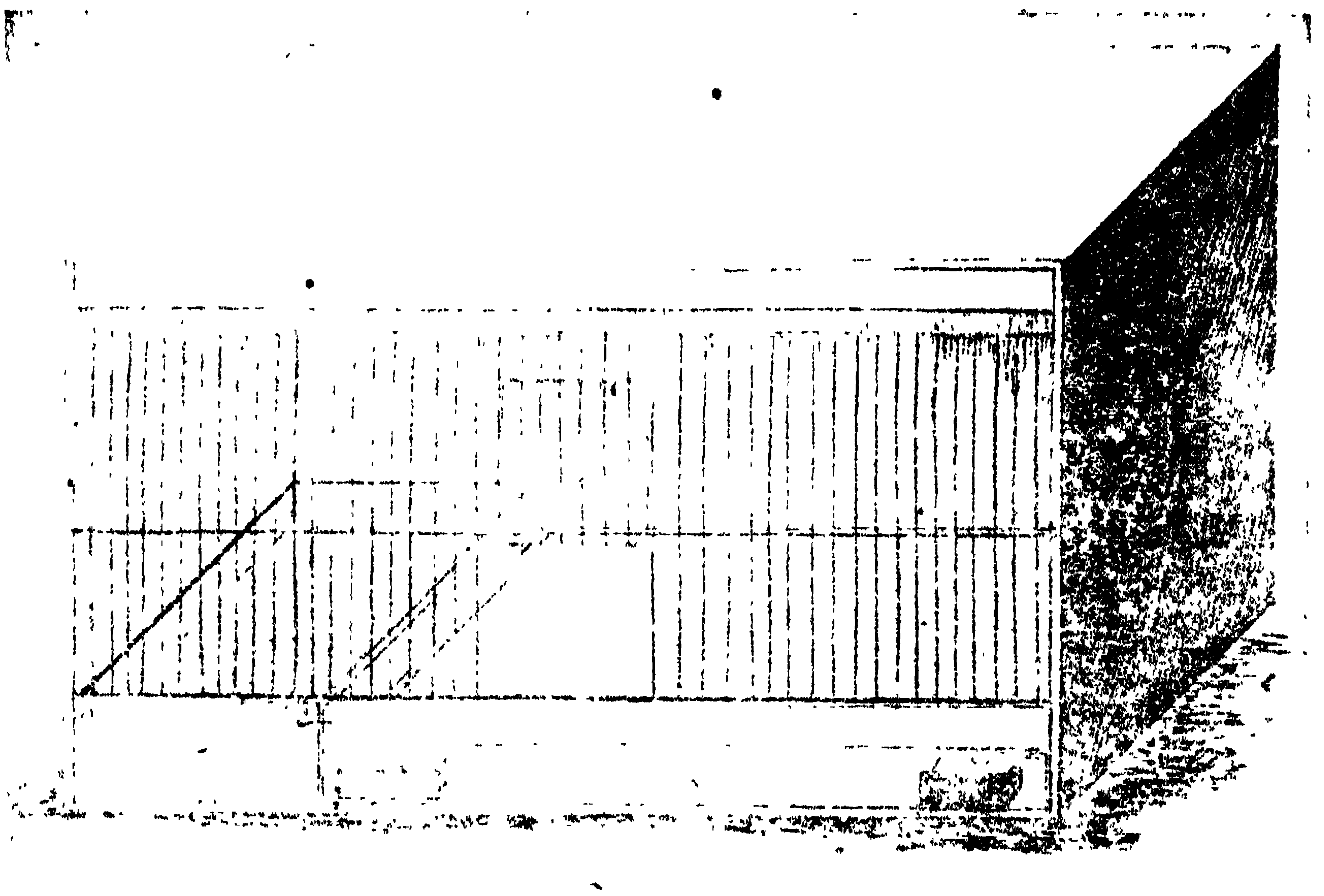

খঞ্জনের পিঞ্জর

হইতে কোনও পক্ষী খাদ্যাদি গ্রহণ বা অপচয় করিতে পারে না; পরন্তু সেগুলি বহির্দ্দেশে সন্নিবেশিত থাকায় অভ্যন্তরস্থ পক্ষীর আবর্জ্জনা সংমিশ্রণে খাদ্যাদি দূষিত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

বলা বাহুল্য উল্লিখিত প্রত্যেক পিঞ্জরই একটি বা এক জাতীয় পক্ষি মিথুন সংরক্ষণের অনুকূল। বিভিন্ন জাতীয় বহুবিধ পক্ষি-রক্ষণোপযোগী স্থান সংবিধানের উপায় একমাত্র aviary বা বৃক্ষাদি শোভিত অসঙ্কীর্ণ পক্ষিগৃহ। ইহার অভ্যন্তরে বৃক্ষাদির সুবিন্যাস এবং বায়ু ও আলোকের যথেষ্ট সদ্ভাব-প্রযুক্ত পক্ষিগণের স্বায়ত্তাধীন সঞ্চরণ ও অবস্থান বশতঃ স্বাস্থ্যভঙ্গের কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থাকায় এই পক্ষি গৃহের প্রয়োজনীয়তা অল্প পরিসর পিঞ্জরাপেক্ষা এত অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্ভীক এবং উৎফুল্লচিত্তে পাখীরা ইহার মধ্যে গান গাহিয়া জীবন যাপন করে; এমন কি অতি চঞ্চল স্বভাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষি-মিথুন ও (যাহাদিগের পিঞ্জর মধ্যে শাবকোৎপাদনের কোনও সম্ভাবনা নাই) বিভিন্ন ঋতুতে সুকৌশলে নীড় নিৰ্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে ডিম্বপ্রসব ও সন্তানোৎপাদন করিয়া থাকে। পক্ষি-পালক মাত্রেরই এইরূপ পক্ষিগৃহ চির আকাঙ্ক্ষিত হইলেও বহুব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া সকলের ইহা সাধ্যায়ত্ত নহে। যে সমস্ত উপকরণ সামগ্রী অল্প পরিসর পিঞ্জরের নিমিত্ত আবশ্যক হয় এই পক্ষিগৃহে তদপেক্ষা অধিক সাজ-সজ্জার প্রয়োজন। এই সামগ্রী সমূহ আহরণ করিবার পূর্ব্বে পালককে পাখীদিগের বাস ভবন নিৰ্ম্মাণের উপযোগী এমন একটি জায়গা বাছিয়া লইতে হইবে যথায় পাখীগুলি যথেচ্ছ বায়ু এবং পরিমিত তাপ উপভোগ করিয়া সুখে কালযাপন করিতে পারে। পক্ষিগৃহ মধ্যে আলোক ও বায়ু সঞ্চারের ব্যবস্থা করিতে গিয়া পালকের স্মরণ রাখা উচিত যে ঝড়বৃষ্টি এবং প্রচণ্ড উত্তাপের সময় পাখীরা আশ্রয় অভাবে যাহাতে ক্লেশ অনুভব না করে গৃহ নিৰ্ম্মাণকালে তদ্বিষয়ে তাঁহাকে মনোযোগী হইতে হইবে। সাধারণতঃ পালকের নিজবাটীর কোনও দেয়াল পক্ষি-গৃহের উত্তর দিকের প্রাচীর স্বরূপ রাখিয়া পক্ষিনিকেতন নিৰ্ম্মাণ করিতে পারিলে ভাল হয়; ইহার দক্ষিণ এবং পূর্ব্বদিকের প্রাচীর সংযোগ না করিয়া কেবলমাত্র লৌহের সূক্ষ্মজালে দ্বারা বেষ্টিত রাখা শ্রেয়ঃ;

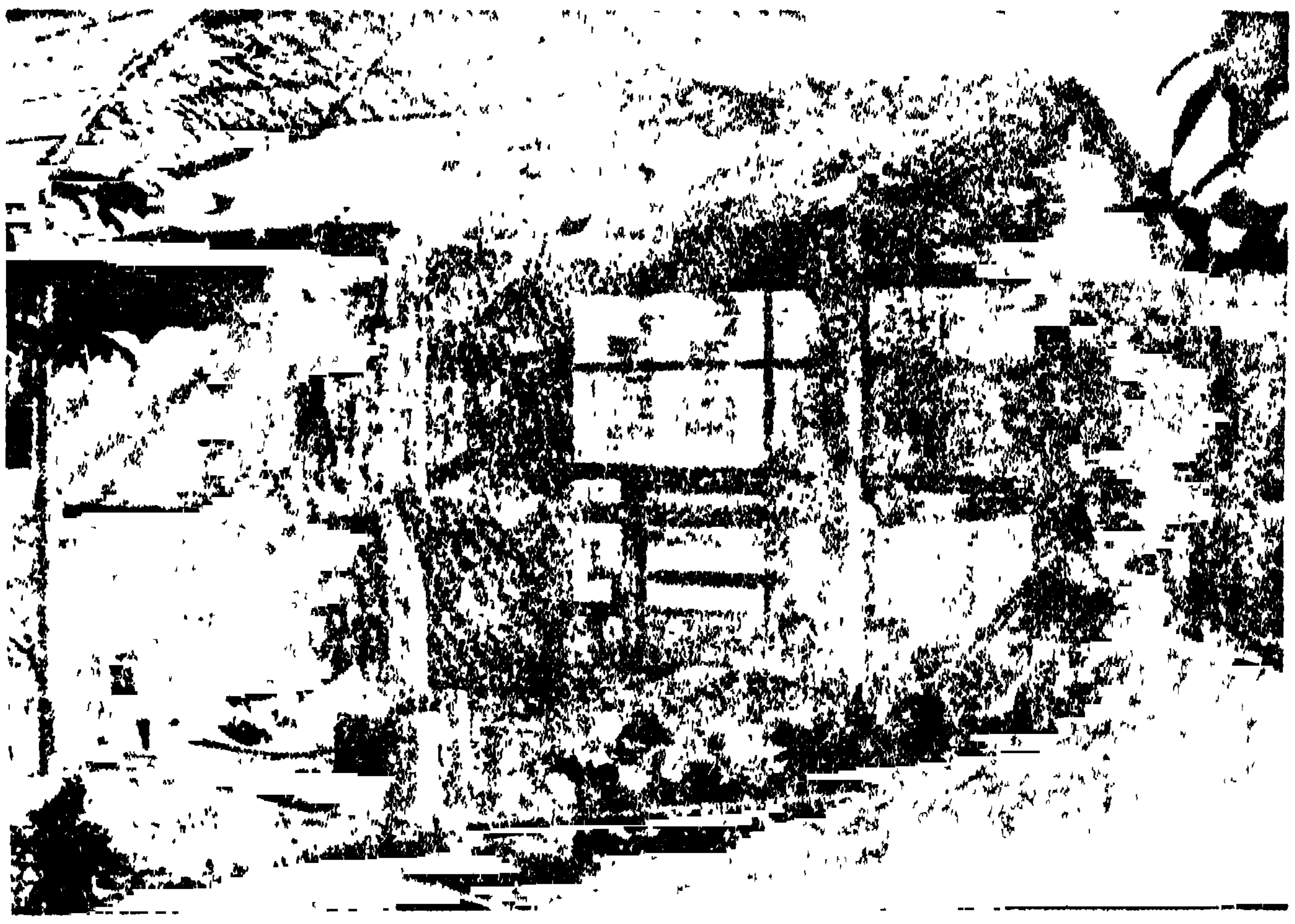

২৪ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ ভবনের অপর একটী পক্ষি গৃহ। ইহার ছাদের কিয়দংশ আবৃত ও অপর অংশ অনাবৃত

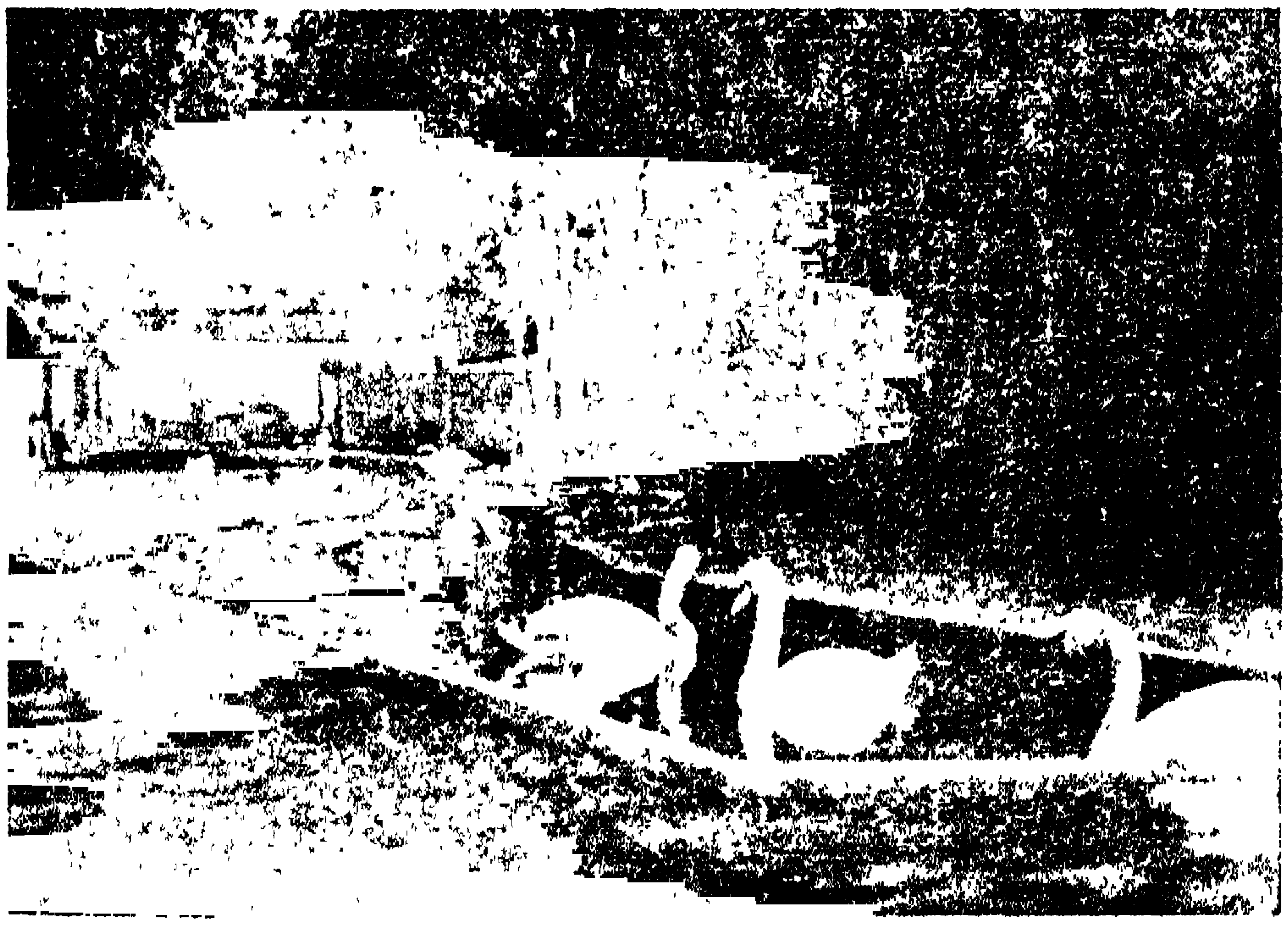

মিঃ এজ্রার পক্ষি ভবনের সম্মুখস্থ কৃত্রিম হ্রদে হংস মিথুনগুলি জলক্রীড়া করিতেছে

এরূপ স্থানে বিশুদ্ধ দক্ষিণ বায়ু অবাধে গৃহমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া এবং সূর্য্যরশ্মি প্রাতঃকাল হইতে তন্মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া পাখীদিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিবে। যদি পক্ষিগৃহ নির্ম্মাণে পালকের বাস ভবনের

কলিকাতার ৩ নং কিড্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে খাঁচার পার্শ্বে উপবিষ্ট মিঃ এজ্‌রা

কোনও প্রাচীর দ্বারা পক্ষিগৃহের উত্তর দিক অবরোধের সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে ঐ দিক ইষ্টকের গাঁথুনি বা লৌহের চাদর দ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। গৃহের ছাদটির কিয়দংশ ঐরূপ টালি কিম্বা তক্তার আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে হইবে; কারণ ঝড়বৃষ্টি ও প্রখর উত্তাপের সময় পাখীরা এই আবৃত প্রদেশে আশ্রয় পাইলে ইহাদের বিপৎপাতের সম্ভাবনা থাকিবে না। বৃক্ষের কতিপয় কর্ত্তিত শাখা ছাদে সংলগ্ন করিয়া পাখীগুলির অবস্থানোপযোগী দাঁড়ের ন্যায় ঐস্থানে ঝুলাইয়া রাখা উচিত। পক্ষিগৃহের অনাবৃত পার্শ্বদেশগুলি (অর্থাৎ উত্তর ব্যতীত অপরাপর দিক সমূহ এবং ছাদের অনাচ্ছাদিত অপরাংশ) লৌহের সূক্ষ্ম জাল দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত করিতে হইবে। মূষিকাদি হিংস্র প্রাণী গর্ত্ত কাটিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারে তন্নিমিত্ত পক্ষীদিগের আবাস গৃহের মেজে কিঞ্চিৎ সমুন্নত করিয়া ইষ্টকাদি দ্বারা কঠিন ভাবে গঠন করা কর্ত্তব্য।

কোন কোন পক্ষিপালক এইরূপে স্বতন্ত্র পক্ষিগৃহ নির্ম্মাণ না করিয়া স্ব স্ব বাটীর বারান্দার কতক অংশ জাল দ্বারা বেষ্টিত করিয়া এবং উহার সম্মুখস্থ মুক্ত প্রাঙ্গণ বা উদ্যানের কিয়দংশ ঐ প্রকারে আবৃত করিয়া পক্ষিগৃহ নির্ম্মাণে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এইরূপ গৃহ নির্ম্মিত হইলে পাখীগুলি যে ঝড়বৃষ্টির সময় বারান্দার আচ্ছাদিত প্রদেশে নিরাপদে আশ্রয় লইতে পারিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উল্লিখিত গৃহ রচনায় পক্ষিপালকের ব্যয় সংক্ষেপ হয় বটে কিন্তু এই প্রকার ব্যয় সংক্ষেপ করিতে গিয়া তিনি যেন বিস্মৃত না হন যে উত্তর চাপা ও দক্ষিণ খোলা বারান্দাই এ বিষয়ে একমাত্র ব্যবহার্য্য। য়ুরোপ প্রভৃতি শীত-প্রধান দেশে পাখীদিগকে ভীষণ শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গৃহমধ্যে সুকৌশলে নলসংযোগে অগ্নির উত্তাপ প্রদত্ত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশেও সময়ে-সময়ে শীতের প্রাবল্য ও প্রচণ্ড বর্ষার আক্রমণ

মিঃ এজ্‌রার উদ্যানে রক্ষিত বিবিধ বৃহৎ পিঞ্জর বা পক্ষিগৃহ (aviary)
এগুলি ইচ্ছামত স্থানান্তরিত করা যায়

হইতে পাখীগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য কোনপ্রকার পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাহাতে উহারা উক্ত প্রকার উপসর্গাদি দ্বারা উপদ্রুত হইয়া অকালে মরিয়া না যায়। যদিও এখানে তাপদায়ক কোনরূপ যন্ত্রের আবশ্যক হয় না বটে তথাপি দারুণ শীত ও বর্ষার সময় পক্ষীদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত

শীত-নিবারক পর্দ্দা কিম্বা অন্য কোনও আবরণের দ্বারা পক্ষিগৃহ আবৃত রাখার ব্যবস্থা করা উচিত।

এইরূপে পক্ষিগৃহ নির্ম্মিত হইলে পর উহার আভ্যন্তরীণ উপকরণ সামগ্রীগুলি যাহাতে গৃহমধ্যে সুবিন্যস্ত হয়, পালককে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। এই সমস্ত অত্যাবশ্যক উপকরণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; এখন এই সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। গৃহমধ্যে বনলতা ও বৃক্ষাদি রোপণ, কৃত্রিম হ্রদ পর্ব্বত প্রস্রবণাদি নির্ম্মাণ এবং পাখীদিগের স্বাস্থ্যের অনুকূল বালুকা ও শ্যামল তৃণের সমাবেশ দ্বারা গৃহটি এরূপে সজ্জিত করা আবশ্যক, যাহাতে ইহা সহজে পাখীগুলির মনে বনস্থলীর ভাব জাগাইয়া দেয়। বহুবিধ কীট পতঙ্গ লতায় পুষ্পে অসঙ্কোচে আশ্রয় লইয়া পাখীগুলির রুচিকর খাদ্যরূপে পরিণত হইবে এবং বৃক্ষগুলি ইহাদিগের সুবিধামত নীড় নির্ম্মাণাদি গার্হস্থ্য ব্যাপারে সবিশেষ সহায়তা করিবে। পক্ষিদিগের স্বভাব এবং সংখ্যানুযায়ী খাদ্যাদির সুব্যবস্থা করা আবশ্যক; সেগুলির বিন্যাস এরূপ স্থানে করিতে হইবে যথায় পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র কীটের সঞ্চার অথবা রৌদ্র ঝড় বৃষ্টির দ্বারা ইহারা নষ্ট বা দূষিত না হয়। গৃহমধ্যে বহুবিধ পক্ষি-সংরক্ষণ হেতু খাদ্য ও খাদ্যপাত্রগুলির স্বল্পতা হইলে পক্ষিদিগের মধ্যে পরস্পর তুমুল বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা; এই নিমিত্ত অনেকগুলি খাদ্যপাত্র প্রচুর খাদ্যের দ্বারা পূর্ণ করিয়া গৃহমধ্যে নানাস্থানে রাখিতে হইবে, যাহাতে ছোট বড় সকল রকমের পক্ষী অবাধে ভোজন করিতে পারে। ইহাদিগের পান ও স্নানের নিমিত্ত জলপাত্রের আবশ্যক। উল্লিখিত কৃত্রিম হ্রদে এই উভয়াবশ্য কার্য্যের সমাধা হইতে পারে; কিন্তু লক্ষ্য রাখা উচিত যেন হ্রদটি গভীর না হয়, কারণ তাহা হইলে ক্ষুদ্র পক্ষীগুলির পক্ষে ইহার মধ্যে অবতরণ করিয়া স্নানের বিঘ্ন ঘটিবে এবং অনেক সময়ে স্নান করিতে গিয়া ইহাদিগের পক্ষপুট জলসিক্ত হওয়ায় হ্রদ মধ্যে সহসা পড়িয়া যাইবে ও প্রাণ রক্ষণে নিরুপায় হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

উল্লিখিত সাজসজ্জার প্রতি পালকের যেরূপ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ প্রতিদিবস প্রক্ষালনাদি দ্বারা যাহাতে ইহারা আবর্জ্জনা-বর্জ্জিত হয়, তদ্বিষয়ে তাহার লক্ষ্য রাখা উচিত; পক্ষিগৃহের অভ্যন্তর ও তলদেশেও তদনুরূপ সুশৃঙ্খলায় ধৌত এবং পরিমার্জ্জিত করিবার সদুপায় রাখা আবশ্যক।

আধুনিক জগতে মানুষ যতপ্রকার উপায়ে বিহঙ্গজাতির বিচিত্র জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত পিঞ্জরাদি রচনা করিয়াছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে যথাসম্ভব দিবার প্রয়াস পাইলাম। হয় ত পাঠক-পাঠিকার সম্যক অবগতির জন্য সকল কথা গুছাইয়া বলা হইল না। যাহা হউক, বারান্তরে পক্ষিপালন সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবৃন্দাবনে হোলী

[মহারাজকুমার শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী]

স্বর্গীয় পিতৃদেবের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ইতঃপূর্ব্বে একবার শ্রীবৃন্দাবনধাম সন্দর্শনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না; তাই এই কয়েকটী কথা লিখিতেছি।

শ্রীবৃন্দাবন গমনের ব্যবস্থা ও পরামর্শাদি ইতিপূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। সন ১৩২১ সাল ২৩শে মাঘ প্রাতের ট্রেণে দুবরাজপুর হইতে যাত্রা করিতে হইবে; সুতরাং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া অনতিবিলম্বেই কতকগুলি সজীব ও নির্জীব লগেজ সঙ্গে লইয়া শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক বাহির হইয়া পড়িলাম। দুবরাজপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখি, ট্রেণ আসিয়াছে; আমাদের 2nd Classএর Reserved করা গাড়ীখানি তাহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা গিয়া একবারে গাড়ীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। দেড়টার সময় আসনশোলে পঁহুছিলাম। যথাসময়ে Express Train উপস্থিত হইলে আমাদের গাড়ীখানি যেমন তাহার সহিত

সংযুক্ত করিয়া দিবে, অমনি ভয়াবহ চীৎকারধ্বনি সমুত্থিত হইল। গাড়ী পিছাইয়া আসিয়া কিছুদূরে থামিয়া গেল। জিজ্ঞাসাবাদে জানিলাম আমাদের গাড়ীখানি অগ্রবর্ত্তী হইবার সময় তাহার বিপরীত দিক হইতে আর একখানি এঞ্জিন সেই পথে আসিতেছিল। একজন কুলী তাই দেখিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। তাহারই সতর্কতায় ও ভগবদাশীর্ব্বাদে আমরা উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। ঘর হইতে বাহির হইয়াই মাথায় এই 'চাল ঠেকিল' বলিয়া মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। যাহা হউক গাড়ী জোড়তাড় শেষ হওয়ায় ট্রেণ ষ্টেশন ত্যাগ করিল। রাত্রি ৩টার সময় আমরা হাতরাস্ জংসনে গিয়া পৌঁছিলাম। কি দারুণ শীত!

রিজার্ভ গাড়ীর পরমায়ু এইখানেই শেষ হইল। শ্রীবৃন্দাবনের ন্যারো-গজ লাইনে এই সকল বড় গাড়ী খাপ খাইবে কেন? গাড়ী হইতে নামিলাম, কিন্তু সেখান হইতে প্রায় তিনশত গজ দূরে এবং প্রায় ২৪ ফুট উচ্চে ষ্টেশন। তথায় গিয়া গাড়ীতে চড়িতে হইবে। সেই প্রচণ্ড শীতে সেই রাত্রিতে যেরূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, ইহজীবনেও তাহা ভুলিব না। যথাসময়ে গাড়ী ষ্টেশন ত্যাগ করিল এবং ২৫শে মাঘ প্রভাত হইতে না হইতেই যমুনা সেতু পার হইয়া মথুরা নগরীতে গিয়া প্রবেশ করিলাম। দূর হইতে সে দৃশ্য কত সুন্দর! ধীর-প্রবাহিতা, নীল সলিলা যমুনা, আর তাহারই বক্ষোত্থিতা সৌধ-কিরীটিনী মথুরার স্তরে-স্তরে সুসজ্জিত অভ্রংলিহ শুভ্র সৌধমালা! দেখিলেই মনে হয় যেন একখানি অমল-ধবল শ্বেতবসনপ্রান্তে নিপুণ শিল্পী একটী নীলরংএর পাড় বসাইয়া দিয়াছে। মথুরা দেখিলাম, মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কে যেন কাণের কাছে বলিয়া গেল "এই সেই মথুরাপুরী!" মথুরা ষ্টেশনে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়া পরবর্ত্তী ট্রেণে বেলা নয়টার সময় শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া উপনীত হইলাম। শরীরে রোমাঞ্চ হইল, হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। আমরা পবিত্র হইলাম, ধন্য হইলাম। দুই একজন যাত্রী আনন্দ-গদ্গদ স্বরে গাহিতে লাগিলেন—

"শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে ঐ বৃন্দাবন—"

মাঘের তখন প্রায় শেষ। বসন্ত এখনও আসে নাই। বৃন্দাবনে পূর্ণ বসন্ত আসে বোধ হয় ঝুলনের কাছাকাছি তবু বসন্তের পূর্ব্বরাগে শ্রীবৃন্দাবন এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী কোন তরু-শাখা হইতে কচিৎ একটী কোকিল গাহিয়া উঠিল; অমনি তরুতলে দলে-দলে নাচিতে-নাচিতে ময়ূর কেকা ডাকিল। কুহু ও কেকার পঞ্চম ও ষড়জের সে কি মধুর সংমিশ্রণ। এমনি দিনেই বুঝি কবি গাহিয়াছিলেন—

"নব বৃন্দাবন ' নবীন তরুগণ
নব-নব বিকশিত ফুল,
নবীন বসন্ত নবীব মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল;
বিহরই নওলকিশোর;
কালিন্দী পুলিনে কুঞ্জ নব-শোভন
নব-নব প্রেম বিভোর;
নবীন রসাল মুকুল মধু মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।—"

স্থানে স্থানে মৃগকুল পালে-পালে দল বাঁধিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে; আবার ট্রেণ নিকটবর্ত্তী হইলেই কুঞ্জান্তরালে পলায়ন করিতেছে। পার্শ্বে ও সম্মুখে নূতন ও পুরাতন মন্দিরসকল দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। তাহারই মধ্য হইতে ধীরে-ধীরে একটী লাল-রঙের মন্দির চূড়া নয়নের পথে জাগিয়া উঠিল; অমনি সমবেত যাত্রীকণ্ঠে উচ্চারিত 'জয় রাধারাণীকি জয়' নাদ দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। স-সম্ভ্রমে মস্তক আপনা-আপনি অবনত হইয়া আসিল। সেটী শ্রীশ্রী৺মদনমোহনজীউর পুরাতন মন্দির। বেলা প্রায় ১০টার সময় স্বর্গীয় পিতৃদেব-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাসবিহারীর মন্দিরে (অষ্টসখীর কুঞ্জে) গিয়া উপস্থিত হইলাম।

শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতেই এখানে বাসন্তী-উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ সকলের অঙ্গেই নানারঙের বাস। সকলের মুখেই উৎসবের আনন্দ-দীপ্তি! শ্রীবৃন্দাবন প্লাবিত করিয়া নৃত্য-গীতের প্রবাহ বহিয়াছে। আহারাদির পর স্ত্রীলোকগণ একস্থানে একত্র সমবেত হইয়া যখন নৃত্যগীতে মাতিয়া উঠে, দেখিলেই বিদ্যাপতির একটী সঙ্গীত স্মৃতিপথে উদিত হয়;—

* * * *

মধুর বৃন্দা-বন-মাঝ,
মধুর মধুর রসরাজ
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ,
মধুর মধুর রসরঙ্গ,
মধুর যন্ত্র সুরসাল,
মধুর মধুর করতাল
মধুর নটগতিভঙ্গ
মধুর নটনী নটরঙ্গ।

একে হোলি-উৎসবের দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহার উপর শ্রীবৃন্দাবনে এবার কুম্ভমেলা বসিয়াছে, সুতরাং আনন্দময় শ্রীবৃন্দাবনের আনন্দ-উৎস যেন শতধারে উৎসারিত হইয়াছে। নানাস্থান হইতে সমাগত সাধুবৃন্দ কেহ বা বস্ত্রাবাসে, কেহ বা উন্মুক্ত আকাশতলে সিকতাশয্যা মাত্র আশ্রয় করিয়াছেন। সে দৃশ্য দেখিয়া পুরাণপ্রসিদ্ধ নৈমিষারণ্যের স্মৃতি মনে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থায়ী হইতে পায় নাই। কেন, তাহাই বলিতেছি। ২৭শে মাঘ তারিখে স্বর্গীয় পিতৃদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইল। তদুপলক্ষে অনেকেই সাধু-ভোজন করাইতে পরামর্শ দিলেন। আমরা আনন্দের সহিত তাহাতে সম্মত হইয়া প্রথম দিন ৺পুরীধামের জগন্নাথ দাস মোহান্তের ঠৌর (দল) নিমন্ত্রণ করিতে গেলাম। মোহান্ত-জীউ পাঁচ-শত টাকা প্রণামী চাহিয়া বসিলেন। শেষে একটা রফারফির পর তিনি পঞ্চদশ শত সাধুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। পরদিন বেলা ৩টার সময় তুমুল বাদ্যভাণ্ডের কোলাহলের সহিত 'সাধু আসিতেছেন, সাধু আসিতেছেন' একটা রব উঠিল। বাহির হইয়া দেখিলাম একদল 'ব্যাণ্ড'-ওয়ালাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া 'আসাসোটা' ও পতাকা প্রভৃতি পরিবৃত একখানি পাল্কী ও তৎপশ্চাতে সাধুর দল আমাদের মন্দিরের দিকেই আসিতেছেন। পাল্কীখানিতে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি রহিয়াছেন। পাল্কী মন্দিরে প্রবেশ করিল; অমনি সঙ্গে-সঙ্গে একজন মাথায়-জটা, গলায় মোটা-মোটা তুলসীর মালা, দীর্ঘকায় সাধু আসিয়া মন্দির-প্রবেশপথে দাঁড়াইয়া সাধুদলের শৃঙ্খলার সহিত মন্দির-প্রবেশকার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। শুনিলাম, তিনিই দলের কোতোয়াল বা শান্তিরক্ষক। দেখা গেল পনের শতের স্থানে আড়াই হাজারেরও অধিক সাধু শুভাগমন করিয়াছেন। নীচে স্থান অকুলান হওয়ায় তাঁহাদিগকে ছাদের উপরেও বসাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, ভোজন-কার্য্য এ দিন একরূপ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়া গেল। দ্বিতীয় দিনে ৺ব্রজধামের ঠৌর নিমন্ত্রণ করিলাম। কিন্তু তাঁহারা অসঙ্গত প্রণামীর দাবীতে নিমন্ত্রণ ফেরত দিলেন। সেদিন আর কোন প্রকারেই তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করান গেল না। একটা রফারফির পর পরদিনে তাঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। কথা হইল, অষ্টাদশ শত সাধু শুভাগমন করিবেন। কিন্তু আসিয়াছিলেন তাহার অনেক বেশী, এবং সব চেয়ে বেশী করিয়াছিলেন তাঁহারা হট্টগোল। সে এত, যে লিখিতেও লজ্জা করে। শেষে ব্যাপার দাঁড়াইল এমনি যে, তাঁহারা তাঁহাদেরই দলের পরিবেশনকারীর হস্ত হইতে ভোজ্য-দ্রব্য কাড়িয়া লইতে লাগিলেন; কেহ বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ইতস্ততঃ ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। মারামারি হয় হয়; অবশেষে অনেক কষ্টে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করা গেল। অপরাধ হইলেও বলিতে হইতেছে যে, নৈমিষারণ্যের স্মৃতি সেইদিনই উপিয়া গিয়াছিল, এবং সাধুসেবার পুণ্যার্জ্জনের লোভ সম্বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। শুনিলাম এইরূপ গোলমাল আরও অনেক স্থানেই হইয়াছিল। সাধুদের ব্যাপার যেমন দেখিয়াছিলাম বলিলাম। একস্থানে একজন চেলার হাঙ্গামেও পড়িয়াছিলাম। কথাটা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীবৃন্দাবনধামে ৺কালীয় দমন ঘাটের সন্নিকটে জগদীশ বাবাজী নামে একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বাস করেন। সংপ্রতি নিত্যধামগত রাজর্ষি-কল্প রায় বনমালী রায় বাহাদুরের সহিত ইঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

জগদীশ বাবাজী এ অধমকেও যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন। বাবাজীর অসুখের সংবাদ পাইয়া তাঁহার কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পাদবন্দনা করিলাম; কিন্তু তিনি অন্যমনস্ক। নিকটে একটা 'চেলা' দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি পরিচয় দিলেন। কথাগুলি বড় জোরে-জোরে বলিতে হইল; বুঝিলাম বাবাজী ইদানিং কাণে বড় কম শুনিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে আমায় চিনিতে পারিলেন এবং প্রসন্ন-বদনে আমার কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "বাবা, আর বাঁচিতে সাধ নাই, এখন কৃষ্ণ ব'লে পেরুতে পারলেই বাঁচি।" আমি আর কি বলিব। যাহা মনে আসিল বলিলাম। শেষে

শ্রীবৃন্দাবন-বাসী কয়েক জনের পরামর্শে বাবাজীর একখানি ফটো লইব বলিয়া অনুরোধ জানাইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন "ও আর কি হবে। বনমালি অনেক চেষ্টা করেছিল, আমি সম্মত হই নাই। কি জানি বাবা, মনের অবস্থা, ঐ একটা ছবি তোলাতেই অহঙ্কার আসতে পারে।" কিন্তু আমি 'নাছোড়বান্দা'; অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর বলিলেন "আমার চেহারা তোলাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?" আমি বলিলাম—"হাঁ।" তখন তিনি বলিলেন "তবে তোলাও।" আমি পরদিন প্রাতে আসিব বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু পরদিন ফটোগ্রাফার পাওয়া গেল না। তৎপরদিন অর্থাৎ ৭ই ফাল্গুন তারিখে ফটোগ্রাফার সঙ্গে লইয়া বাবাজীর ভজন কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আজ প্রণাম করিবামাত্রই তিনি বলিলেন "এসেছ, বসো।" দুইচারি কথার পর আমি বলিলাম "আপনাকে একবার বাহিরে যাইতে হইবে।" তিনি বলিলেন "কেন?" আমি একটু 'থতমত' খাইয়া বলিলাম "আপনার চেহারা তুলিবার লোক আসিয়াছে।" কথা কয়েকটী বাবাজী ভালরূপ শুনিতে না পাওয়ায় আমি চেলাটীকে একটু জোরে বলিয়া বুঝাইয়া দিতে বলিলাম। দেখিলাম চেলার মুখ অতি গম্ভীর। তিনি বলিলেন "ফটো তোলান হইবে না। বনমালী দাদা অনেক চেষ্টাতেও পারেন নাই। আপনি বৃথা চেষ্টা করিতেছেন।" আমার একটু দুঃখও হইল, রাগও হইল; বলিলাম, "মহাশয় আমার কথাটা বাবাজীকে বুঝাইয়া দিউন, তাহার পর যাহা হয় আমি বুঝিতেছি।" তিনি রাগে গর গর করিতে করিতে বাবাজীকে বলিলেন "ইনি আপনার চেহারা তোলাতে এসেছেন; তাই বাইরে যেতে বলছেন।" বাবাজী মহাশয় অমনি বালক-সুলভ সরলতার সহিত বলিয়া উঠিলেন "বেশ ত, বাহিরে লইয়া চল।" আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। শিষ্যটীকে বলিলাম "চলুন, দুইজনে বাবাজীকে বাহিরে লইয়া যাই।" (কারণ প্রাচীন বাবাজী মহাশয় কাহারও সাহায্য ব্যতীত বাহিরে আসিতে পারিতেন না)। শিষ্যটী দেখিলাম নিতান্ত নারাজ। তিনি বলিলেন "মশায়, ওঁর এখন মতি স্থির নাই; দাঁড়ান, ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলি।" এই বলিয়া তিনি বুঝাইতে লাগিলেন যে "বনমালি দাদা কত অনুনয়-বিনয় করিয়া যা পারেন নাই, ইনি আপনার সেই চেহারা তোলাবার জন্য বলছেন।" বাবাজী বলিলেন, "বেশ, বাহিরে লইয়া চল না। তোমার কোন আপত্তি আছে কি?" চেলাটী বলিলেন "আমার আবার আপত্তি কি। পাছে আমায় অপরাধী করেন, তাই বলছি।" বাবাজী বলিলেন "না, তোমায় কেন অপরাধী করবো।" শিষ্য তখন বিরক্তিভরে বলিলেন "তবে চলুন।" বাবাজীকে বাহিরে লইয়া আসিলাম। ফটোগ্রাফারও তৈয়ারি হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে বাবাজীর আতপত্র স্বরূপ চেলাটীও তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম, তিনি দাঁড়াইয়া থাকিলে চেহারা খারাপ হইয়া যাইবে বলিয়া তাঁহাকে সরাইয়া দিলাম। তিনি সরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন। আমি কাহারও প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ফটোগ্রাফারকে ইসারা করিলাম; সে উপর্যুপরি দুইখানি ফটো তুলিয়া

সাধু শ্রীজগদীশ বাবাজী

লইল। বাবাজী মহাশয় বলিলেন 'হয়েছে ত'; আমরা 'আজ্ঞে হয়েছে' বলিয়া তাঁহাকে প্রণামান্তর বিদায় গ্রহণ করিলাম। তখন সেই শিষ্য ও অপর সকলে একখানি ফটো লইবার জন্য আমায় বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; আমি আর কোন উত্তর না দিয়াই চলিয়া আসিলাম। যাঁহার ফটো তোলান হইল, সেই বাবাজীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় না দিলে অন্যায় করা হইবে। এ পরিচয় তাঁহার নিজ মুখেই শুনিয়াছিলাম। বাবাজী বলিয়াছিলেন:—

"আমি ডাক্তারী ব্যবসায় করিতাম। দেখে শুনে ডাক্তারি শেখা; কিন্তু যৎসামান্য পাওয়ার পক্ষে তাতে তেমন ব্যাঘাত ঘটতো না। আমার চরিত্র খুব খারাপ ছিল। সংসারে পাপপুণ্য বলে কোন জিনিষ আছে কি না কখনও ভাবি নাই। জীবনের কোন উদ্দেশ্য আছে কি না, কখনও বুঝি নাই; মাথার উপর যে একজন বিচারক আছেন, এ কথাও কখনও মনে হইত না। এ সব কথা ভাবতে বা বুঝতে কখনও চেষ্টাও করি নাই। বেশ আনন্দেই দিন কাট্‌তো। অতিরিক্ত মদ খাওয়ায় হঠাৎ একদিন মুখ দিয়ে রক্ত উঠলো। আমার বড় ভয় হ'ল। পরিণাম চিন্তায় প্রাণ অধীর হ'য়ে উঠলো। আমি যা করেছি, সে সব যে ভয়ানক পাপের কাজ, তখন একে একে তাই মনে হ'তে লাগলো। আরও মনে হলো, মাথার উপর ভগবান আছেন। প্রাণের ব্যাকুলতায় ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা জানালাম। এবার যদি সেরে উঠি, আমি খুব ভাল ভাবে চল্‌বো, মদটদ খাওয়া সব ছেড়ে দেব। ভগবান আমার প্রার্থনা শুনলেন। দুদিনের মধ্যে ব্যারামের উপসর্গ কমে এলো। একটু সুস্থ হতেই বন্ধুবান্ধবেরা এসে জুটলো, জেদ কর্ত্তে লাগলো—মদ খাও। মদ খাওয়ার জন্য আমারও মন কেমন কর্ত্তে লাগলো; কিন্তু এ ধারণা কিছুতেই গেল না যে, এবার মদ খেলেই সর্ব্বনাশ! এখানে থাকলেই মদের হাত থেকে, বিশেষ এই বন্ধুবর্গের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া দায়। সুতরাং স্থানত্যাগই শ্রেয় বিবেচনা ক'রে কালনার ভগবান দাস বাবাজীর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেম। তিনি ত আমায় দেখেই জ্ব'লে উঠলেন, খড়ম হাতে তেড়ে মার্ত্তে এলেন। মার খাবার ভয়ে বাইরে গিয়ে বসলেম। ভাবলেম এ আবার কি? হু হু ক'রে কান্না আস্‌তে লাগলো; কিন্তু বাড়ী ফিরবো না, মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প কল্লেম। সমস্ত দিন-রাত্রি এক রকম বাইরে বসেই কেটে গেল। পরদিন প্রাতঃকালে সাহস করে আবার আশ্রমে ঢুকে পড়লেম। নিকটে একগাছ ঝাঁটা প'ড়েছিলো, তাই নিয়ে আস্তে-আস্তে আশ্রম প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিচ্ছি, আর এক একবার চেয়ে দেখ্‌ছি বাবাজী আসছেন কি না, মতলব, মার্ত্তে আসেন তো পালিয়ে যাব। বাবাজী এলেন, আমার সঙ্গে চোখোচোখি হলো, কিন্তু কিছু বললেন না। আমি তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেম। এমনি করে ছমাস কেটে গেল। অভাগার দুঃখ রাত্রির সুপ্রভাত হলো। বাবাজী দয়া ক'রে একদিন শুভক্ষণে আমায় নামব্রহ্ম দান করলেন। কালনায় কিছুদিন নাম-ব্রহ্ম জপ ক'রে সেই নাম মাহাত্ম্যে গুরুদেবের কৃপায় এই শ্রীবৃন্দাবন লাভ কল্লেম। অদৃষ্টের দোষ! এখানে এসে লোকে বড় বিরক্ত কর্ত্তে লাগলো। নিরালার জন্য হরিদ্বার গিয়ে উপস্থিত হলেম। কিন্তু মন টিকলো না। শ্রীবৃন্দাবনের জন্য প্রাণ বড় কাঁদতে লাগলো; কষ্টে সৃষ্টে তিন দিন রইলাম। আর পারি না। এদিকে হাতেও ত একটি পয়সা নাই। ভাবলেম হেঁটেই শ্রীবৃন্দাবনে যাব। আবার কি মনে হ'ল, ষ্টেশনে চলে এলেম। আনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। নন্দনন্দনের এমনই মহিমা যে, আমার হরিদ্বারে আসার কাহিনী শুনে শ্রীবৃন্দাবনে ফিরবার রেলভাড়া তিনিই দিয়ে দিলেন। আমি শ্রীবৃন্দাবনে এসে পৌঁছলেম। সেই অবধি আমার সংকল্প ছিল আমি শ্রীবৃন্দাবন ছেড়ে আর কোথাও যাব না। নন্দনন্দন আমার সে সাধ পূর্ণ করেছেন। তবে বলতে পারি না, শেষের দিন পর্য্যন্ত কি হবে।"

বৃন্দারণ্যের মধ্যে বাবাজীকেই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, বয়স অনুমান একশত বৎসরের উপর হইয়াছে। ইদানীং তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন প্রায়ই কাঁদেন; আর যে যায়, তাকেই বলেন "ওগো আর বাঁচতে সাধ নাই, আমায় যমুনায় ভাসাইয়া দাও।" আজিও তিনি বর্ত্তমান আছেন।

ইতিপূর্ব্বে যখন শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলাম, তখন শুনিয়াছিলাম নন্দগ্রামে ও বর্ষাণে 'হোলি'র খুব ধুম হইয়া

থাকে। দেখিবার বড় ইচ্ছা হইল। ১০ই ফাল্গুন প্রাতে মথুরা জংশন ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু যাওয়া তেমন সুবিধাজনক মনে হইল না। ষ্টেশনে শুনিলাম নন্দগ্রামে যাইতে হইলে 'সংকেত' ষ্টেশনে গিয়া নামিতে হইবে; এবং কশি ষ্টেশন পর্য্যন্ত Branch lineএ 3rd class গাড়ীতেই যাইতে হইবে। (১ম ও ২য় শ্রেণীর গাড়ী পাওয়া যায় না)। যাহা হউক কোন রকমে যাওয়াই স্থির হইল।

যথাকালে ট্রেণ আসিল। আমি ত গাড়ী দেখিয়াই অবাক্। একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী, তুইখানি ব্রেকভ্যান, এই তিনখানি মাত্র গাড়ী। যাহা হউক এই গাড়ীতেই আমরা সংকেত পৌছিয়া হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

পূর্ব্বদিনে আমাদের একজন কর্ম্মচারী তথায় পৌছিয়া আহার্য্য ও আশ্রয়ের একটা ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেখিলাম তিনি শকট লইয়া ষ্টেশনেও উপস্থিত হইয়াছেন। সংকেত ষ্টেশন হইতে শকটারোহণে আমরা বর্ষাণের পথে যাত্রা করিলাম। সংকেত গ্রামের মধ্য দিয়াই যাইতে হইল। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে গ্রাম। গ্রামের মধ্যে একটি প্রাচীন উচ্চ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ দেখাইয়া পাণ্ডাগণ বলিলেন, এই স্থান হইতেই নন্দনন্দন মোহন-মুরলী-গীতি-সংকেতে বৃষভানুনন্দিনীকে আহ্বান করিতেন। গ্রামটীর নাম সেইজন্য সঙ্কেত। মনে হইল ইহার গগনে-পবনে আজিও সেই সঙ্কেত গীতি ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুপবিত্র মিলন মাধুর্য্যে স্থানটি যেন আজিও মধুময় হইয়া রহিয়াছে।

অনেকগুলি পাণ্ডা আমাদের সঙ্গ লইয়াছিলেন; দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহাদের কাহাকেও পাণ্ডা নিযুক্ত করিতে পারা গেল না। আমাদের প্রেরিত কর্ম্মচারিটী পূর্ব্বে এখানে আসিয়াই একজন পাণ্ডা নিযুক্ত করিয়া তাহারই সাহায্যে আশ্রয় ও আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তিনিই আমাদের পাণ্ডা হইলেন। আমরা মধুমঙ্গল ও প্রিয়াজীর সন্দর্শন জন্য বৃষভানুপুরাভিমুখে (বর্ষাণ) যাত্রা করিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, সুউচ্চ শৈল-রাজির উপর মেঘের গায়ে একখানি চিত্রের মত প্রিয়াজীর মন্দির শোভা পাইতেছে। শুনিলাম মধুমঙ্গল শেষ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই; সুতরাং ক্ষিপ্রগতিতে সোপানাবলী বহিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম। এরূপ উচ্চে উঠা কখনও অভ্যাস নাই। পায়ে এক-আধটু ব্যথা না লাগিতে-ছিল, এমন নয়! কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ কোথায়? মধু-মঙ্গল যে শেষ হইয়া যাইবে! কায়ক্লেশে একটি বারান্দার মত দরদালানের মধ্য দিয়া প্রিয়াজীর মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। জনাকীর্ণ প্রাঙ্গণে তিল-ধারণের স্থান নাই। জনমণ্ডলীর মধ্যে ঘাগড়াদার চাপ্‌কানপরা একটী লোক নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য ও গান জুড়িয়া দিয়াছেন। অপর কয়েকজন মৃদঙ্গ-মন্দিরা সহযোগে দোহারী করিতেছিল।

কোনক্রমে জনতা ঠেলিয়া পাণ্ডাজী আমাদিগকে সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। শ্রীরাধারাণীর দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। তাহার পর আমরা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশালায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। রাত্রির জন্য পাণ্ডাজী তাঁহার বাড়ীর তৈরি খাবার আনিয়াছিলেন। বড় আনন্দে দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার পরিসমাপ্ত হইল। শয়নের আয়োজন করিতেছি, হঠাৎ অশনি-গর্জ্জনের মত বিকট শব্দে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। ভূমিকম্প হইতেছে ভাবিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম। অদূরে দেখি দামামা বাজিতেছে! বলরামের দামামা,—চারিটী চক্রের উপর স্থাপিত এবং আট দশজন লোক দ্বারা বাহিত! দামামার ব্যাস প্রায় দুই হাত হইবে। দুইজন লোকে সজোরে তাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিতে-করিতে যাইতেছে, আর দামামা এই ভীষণ রোলে নিনাদিত হইতেছে। শুনিলাম এই বিচিত্র বাহিনী গ্রামের চতুর্দ্দিক পরিক্রমে চলিয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা নিকটস্থিত একটি কুণ্ডে পূর্ব্বাহ্ন-কৃত্যাদি সমাপন করিয়া বর্ষাণ গ্রামটী একবার ঘুরিয়া আসিলাম। এখন তেমন কিছু না থাকিলেও বর্ষাণ যে এক সময় সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহার বহু চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনেকগুলি অট্টালিকা যেন শূন্য হৃদয়ে কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। ঘর-বাড়ী আছে, কেবল অধিবাসী নাই। অল্পদিন হইল কাশিম-বাজারের মহারাজা বাহাদুর এইরূপ একটি বাড়ী খরিদ করিয়াছেন। ৩০।৩২ বিঘা ব্যাপিয়া এই বাড়ী, তাহাতে অনেকগুলি গৃহ। দেখিলাম এমন আরও দুই একটি বাড়ী ক্রেতার অপেক্ষা করিতেছে।

যে পাহাড়ে প্রিয়াজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, বৃষভানুপুর (বর্ষাণ) তাহার পাদদেশেই অবস্থিত। পাহাড়টী পূর্ব্ব-

পশ্চিমে লম্বা। পাহাড়ের সোপানশ্রেণী আসিয়া যেখানে ভূমির সহিত মিশিয়াছে, গ্রামের সেই গলিটীর নাম রঙ্গিলা গলি। প্রবাদ শ্রীকৃষ্ণ এই গলিতেই গোপবালা-গণের সহিত হোলী খেলিয়াছিলেন। গলিটী পাহাড়ের পাদদেশ হইতে উত্তর দক্ষিণে লম্বা হইয়া সদর পথে আসিয়া মিশিয়াছে। গলির দুইধারে পাণ্ডাদের বাড়ী। আমরা রঙ্গিলা গলির মধ্যেই বাসা লইয়াছিলাম।

আজ ১২ই ফাল্গুন। চতুর্দ্দিকেই একটা বিশেষ উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন, যাত্রীগণের মধ্যে অন্যত্র হইতে কিঞ্চিৎ রজ সঞ্চয় করিয়া আনিয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে জমা করিয়া রাখার প্রথা প্রচলিত আছে। আমরা প্রথামত কার্য্য করিলাম। আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় পূর্ব্বকথিত বলরামের দামামা বাহির হইল। আজ আর একটি নহে; তিন-চারিটি একসঙ্গে তুমুল নিনাদে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতেছে। শুনিলাম এইরূপ সাতটি দামামা ছিল। বাকী কয়টা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ক্রমেই হোলী-খেলার সময় নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; দর্শকের ভিড়ও বাড়িতে আরম্ভ করিল। দর্শকের মধ্যে টিকমগড়ের রাজাকে দেখিয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন দেশের ধনী-সম্প্রদায়ের অপর কাহাকেও দেখিলাম না। সাধু-সন্ন্যাসী দু-দশজন ছিলেন। গলির স্থানে-স্থানে যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ সমবেত হইয়া হোলীর গান গাহিতে লাগিলেন। বেলা অবসানকালে কতকগুলি নানা রকমের অশ্লীল চিত্র লইয়া নন্দগ্রামবাসীবৃন্দ বর্ষাণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একদলের মাথায় মস্ত পাগড়ী, এক হাতে ঢাল,অন্য হাতে জোড়া-জোড়া করিয়া বাঁধা হরিণের শিং। ইঁহারা প্রথমে অন্য রাস্তা দিয়া প্রিয়াজীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় হোলী খেলিয়া রঙ্গিলা গলি দিয়া অবতরণ করিলেন। তৎপূর্ব্বে বর্ষাণের প্রায় ৩০।৪০জন রমণী বিচিত্র পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইয়া রঙ্গিলা গলির উভয় পার্শ্বের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মানা ছিলেন। রমণীগণের সর্ব্বাঙ্গ নানা সজ্জায় আবৃত। মুখের ঘোমটা লম্বিত; কেবল হাত দুখানি দেখা যাইতেছিল। প্রত্যেকের হাতে এক-এক গাছি করিয়া লাঠি। যেমন নন্দগ্রামবাসীরা হোলী খেলিয়া প্রিয়াজীর মন্দির হইতে রঙ্গিলা গলির মধ্যে অবতরণ করিলেন, অমনি লাঠির তুমুল চট্‌চটাধ্বনি ঘর-দ্বার কাঁপাইয়া তুলিল। চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখি ৩০।৪০ গাছি লাঠি উঠিতেছে, পড়িতেছে, আর তাহার মধ্যে নন্দগ্রামের পাগড়ীবাঁধা লোকেরা ঢাল আড় দিয়া আত্মরক্ষা পূর্ব্বক গলি পার হইবার চেষ্টা করিতেছেন। লাঠীর উত্থান পতন যেরূপ গতিতে চলিতে লাগিল, আমাদের মত ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালী তাহার দুই তিনটা আঘাতেই পঞ্চত্ব পাইতে পারেন। রমণীগণ লাঠী চালাইবার সময় কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া মনে হইল না। তাঁহারা দৃক্‌পাতশূন্য হইয়াই লাঠী চালাইতে লাগিলেন। ফলে নন্দগ্রামবাসীরা আত্মরক্ষার প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও যথেষ্টরূপে প্রহৃত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা কখন বা সেই রমণীব্যূহে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কখন বা পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে-করিতে তাঁহারা গোপীব্যূহ পার হইয়া সদর রাস্তায় পড়িলেন এবং পশ্চিমে বাজার অভিমুখে দৌড়িলেন। ব্রজবালাগণও লাঠী হস্তে তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। দুই চারিটা স্ত্রীলোক ছুটাছুটি করিয়া প্রহারে অনিচ্ছুক হইলেন; তাঁহারা রঙ্গিলা গলির মধ্যেই রহিলেন। ইত্যবসরে নন্দগ্রামবাসী সুবেশধারী দুই চারিজন পুরুষ আসিয়া তাঁহাদের মুখের সামনে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে নানারূপ অশ্লীল গান গাহিতে লাগিলেন। গান সম্পূর্ণ না বুঝিতে পারিলেও ইহা বেশ বুঝিলাম যে, পুরুষগণ গানে যাহা বলিতেছেন, রমণীগণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনেই তাহার উত্তর দিতেছেন।

এইরূপ খেলা প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া চলিল; মনে হইল সেদিন দিবাভাগ এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যদেব ঠিক সময়ে অস্তাচল-প্রস্থানে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। বর্ষাণে প্রবাদ আছে, হোলী খেলা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব অস্তমিত হইতে পারেন না। খেলা সাঙ্গ হইলে সকলেই রঙ্গিলা গলির রজ সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, প্রহারের তুলনায় আঘাত কাহারও সাংঘাতিক হয় নাই; কোথাও একআধটু আঁচড় লাগিয়াছে মাত্র।

পরদিন প্রত্যূষে নন্দগ্রাম উপস্থিত হইলাম। তথায় প্যারীচাঁদ নামক একজন পাণ্ডার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশালায় আড্ডা

দেওয়া হইল। এই পাণ্ডাটী বেশ সজ্জন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহার যত্নে আমরা বেশ সুখেই ছিলাম। নন্দগ্রামের পাহাড়ের উপরে মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নন্দ যশোদার মূর্ত্তিও আছেন। মন্দিরটী প্রাচীন। পাণ্ডারা বলিলেন, গোয়ালিয়রের মহারাজ ইহার জীর্ণসংস্কার করিয়া দিয়াছেন। প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরটীর মধ্যে যাত্রীদের বিশ্রামগৃহও রহিয়াছে। ৩৪টার সময় হোলী দেখিতে বাহির হইলাম। নন্দগ্রামে এক উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে হোলী-খেলা হয়। প্রান্তরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইলাম। নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ব্রজ-নর-নারীবৃন্দ কাতারে-কাতারে দাঁড়াইয়া গিয়াছেন, আর তাহার মাঝে মাঝে সংখ্যাতীত এক্কা গাড়ী, মাঝোলী ও রথগুলি যেন দ্বিতীয় পাহাড় তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের পাণ্ডা একটী মাঝোলী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা তাহার উপর চাপিয়া বসিলাম। বলরামের দামামা নিনাদ, খেলা আরম্ভের ঘোষণা করিয়া দিল। অনতিবিলম্বে বর্ষাণের সুসজ্জিত সখিগণ তথায় আসিয়া সমবেত হইলেন। বৃন্দাবনবাসীরা নন্দগ্রামের লোকদের সখা এবং বর্ষাণের লোকদের সখী বলিয়া অভিহিত করেন। শ্রীমন্দিরে হোলী-খেলা হইল। তাহার পর অবতরণ সময়ে ঠিক আগের দিনের মত প্রহার আরম্ভ হইল। নন্দগ্রামের মহিলাগণ বর্ষাণের পুরুষগণের উপর লাঠি চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ আমোদ উৎসবের পর খেলা বন্ধ হইল। এ বৎসরের মত নন্দগ্রামের হোলী শেষ হইল। সেদিন নন্দগ্রামে অবস্থিতি করিয়া তৎপর দিন শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শুনিলাম, স্নানের সময় ভয়ানক ভিড় হইয়াছিল; দুই একজন লোকও মারা পড়িয়াছে। শ্রীরাসবিহারীকে প্রণাম করিয়া আমরা তৎপরদিনই স্বদেশ যাত্রা করিলাম।

চুম্বক-তত্ত্ব

[অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য বি-এস্‌সি]

(৫)

বিপরীত বর্গবিধি—Law of Inverse Squares.

৩। অপসরণ-প্রণালী—Deflection Method.

একটী ছাতার শিক লইয়া তাহাকে **"এক-চুম্বক-স্পর্শ-প্রণালী"** (ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩২৪, পৃঃ ৪৫৭ দ্রষ্টব্য) দ্বারা চুম্বকে পরিণত কর। তার পর **চুম্বক-মাপক** যন্ত্রটীকে ঘুরাইয়া **"সমতলন-কারক-স্ক্রু"** সাহায্যে (levelling screw) (ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩২৪, পৃঃ ৫৯১ দ্রষ্টব্য) এমন অবস্থায় লইয়া এস, যেন **"প্রদর্শক কাঁটাটি"** (index) অংশজ্ঞাপক বৃত্তের ০—০ চিহ্নিত দাগের উপর স্থির থাকে। (অংশ-জ্ঞাপক বৃত্ত সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক। বৃত্তটী কিরূপ ভাবে চিহ্নিত হইয়াছে, ২১নং চিত্র দর্শনেই বুঝিতে পারা যাইবে, বলিবার আবশ্যক হইবে না।) প্রলম্বিত চুম্বক-শলাকার পূর্ব্ব বা পশ্চিম বাহুতে চুম্বকে পরিণত শিকটীকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে শোয়াইয়া রাখিলে প্রলম্বিত চুম্বক-শলাকাটী অপসৃত হইবে। প্রদর্শক কাঁটা দ্বারা এই **"অপসরণ"** (deflection) মাপিয়া লও। "গতি বিজ্ঞান" পাঠে আমরা জানি যে **"অপসারক বল"** (deflecting force) **অপসরণের ট্যান্‌জেণ্টের** ("স্পর্শজ্যা" tangent of the angle of deflection) **সহিত আনুপাতিক** (proportional)। মনে কর, যখন প্রলম্বিত চুম্বক ও শিকের মেরুর (যে মেরুটী প্রলম্বিত চুম্বকের নিকটে আছে সেই মেরুর) মধ্যে দূরত্ব 'দ' সেঃ মিঃ $_১$ তখন অপসরণের পরিমাণ φ, (গ্রীসবাসীদিগের অক্ষর বিশেষ উচ্চারণ "ফাই") যখন পূর্ব্বোক্ত দূরত্ব 'দ' সেঃ মিঃ, $_২$ তখন অপসরণের পরিমাণ, মনে কর φ'। এখন যদি

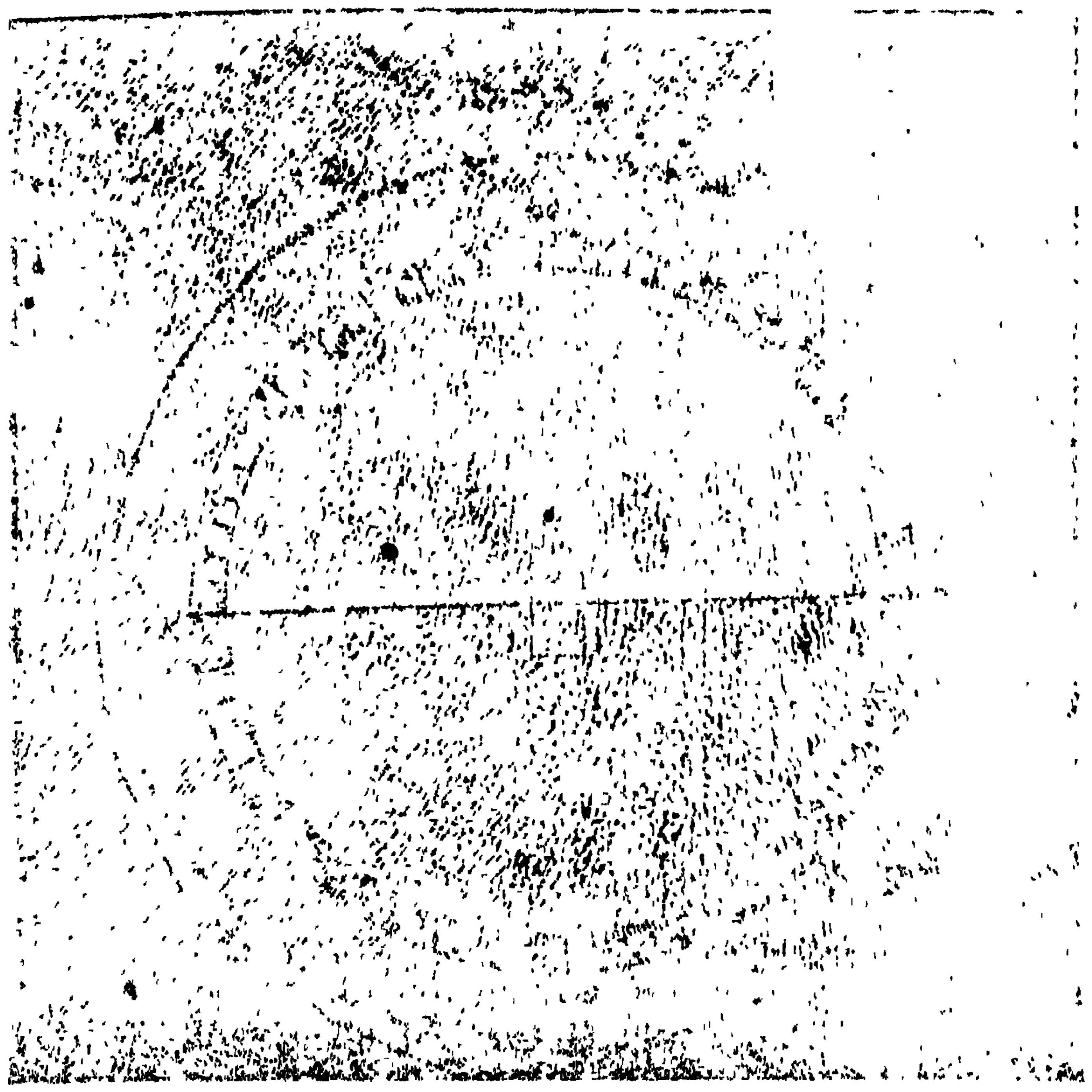

চিত্র ২২

দূরত্ব-বর্গের গুণফলটী একটী ধ্রুবাঙ্ক, তাহা হইলেই বিপরীত বর্গাবধির সত্যতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

লম্বা শিক ব্যবহারের উপকারিতা সম্বন্ধে এখন বিচার করা যাক। যদি ছোট চুম্বক ব্যবহার করা যায়, তাহাতে কি দোষ হয়? ছোট চুম্বকের মেরুদ্বয় চুম্বকমাপক যন্ত্রের প্রলম্বিত শলাকার প্রত্যেক মেরুর উপর বিপরীত ভাবে কার্য্য করে। চুম্বকের এক মেরু যদি প্রলম্বিত চুম্বক শলাকার কোন নির্দ্দিষ্ট মেরুকে আকর্ষণ করে, তবে তাহার অপর মেরু প্রলম্বিত চুম্বকের সেই মেরুকে বিকর্ষণ করিবে। এই বিপরীত কার্য্যফলের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য দুটী উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। (১) যদি চুম্বকের একটী মেরু খুব দূরবর্ত্তী হয় অর্থাৎ তাহাকে এত দূরে রাখা যায় যে, সেই মেরুর প্রলম্বিত চুম্বকের কোন নির্দ্দিষ্ট মেরুর উপর ফল নিকটস্থ চুম্বক মেরুর প্রলম্বিত চুম্বকের সেই নির্দ্দিষ্ট মেরুর উপর ফল তুলনায় অতি কম হয়, অর্থাৎ এত কম যে তাহাকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। দীর্ঘ চুম্বকে পরিণত শিকের ব্যবহার দ্বারা এরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে। (২) যদি কোন একটী চুম্বকদণ্ডকে চুম্বক-মাপক যন্ত্রের নিকট এরূপ ভাবে রাখা হয় যে, তাহার একটী মেরু প্রলম্বিত চুম্বককেন্দ্রের ঠিক লম্বভাবে উপরে থাকে, (চিত্র ২২) ও অপর মেরু বাহুলগ্ন মাপকাটির উপর থাকে, তাহা হইলে প্রলম্বিত শলাকার উপর সেই ঊর্দ্ধস্থিত মেরুর শক্তি-প্রয়োগের ফলে অপসরণের কিছুই তারতম্য বা হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না।

বিপরীত বর্গফল বিধি সত্য হয়, তাহা হইলে

প্রথমবারে $ব = ধ_১ \times \text{ট্যান্}\ \phi = \frac{ধ'}{দ_১^২}$

অর্থাৎ $\text{ট্যান}\ \phi \times দ_১^২ = \frac{ধ'}{ধ_১} = ধ$

সেইরূপ দ্বিতীয়বারে

$ব = ধ_১ \times \text{ট্যান্}\ \phi' = \frac{ধ'}{দ_২^২}$

অর্থাৎ $\text{ট্যান্}\ \phi' \times দ_২^২ = \frac{ধ'}{ধ_১} = ধ$

[এখানে ব = অপসারক বল

$ধ_১$ = ধ্রুবাঙ্ক

ধ' = অপর একটী ধ্রুবাঙ্ক

ট্যান = ট্যানাজেণ্টের সাঙ্কেতিক চিহ্ন]

সুতরাং ভিন্ন-ভিন্ন দূরত্বে চুম্বকে পরিণত শিকটীকে রাখিয়া প্রলম্বিত চুম্বকশলাকাটীর অপসরণ স্থির করিয়া আমরা দেখাইতে পারি যে, অপসরণের ট্যান্‌জেণ্ট ও

'হাতে-কলমে' পরীক্ষা করিবার সময় অপসরণ অভ্রান্ত-রূপে কিরূপে মাপিতে হয়, নিম্নে তাহার "চক্র" (table) প্রদত্ত হইল। প্রথমে প্রদর্শক কাঁটাটী (index) o-o দাগে মিলাইয়া লইবার পর চুম্বকে পরিণত শিকটী পূর্ব্ব বাহুতে পূর্ব্ব-পশ্চিম ভাবে রাখিয়া, বাহুসংলগ্ন মাপকাটীতে চুম্বকমাপকের নিকটস্থ শিকপ্রান্ত প্রদর্শিত দাগটী লিখিয়া রাখ; ও প্রদর্শক কাঁটার পূর্ব্ব ও পশ্চিম

প্রান্ত প্রদর্শিত অপসরণের পরিমাণ লিখিয়া রাখ। তাহার পর শিকের যে মেরুটী চুম্বকমাপকের নিকটস্থ ছিল, সেই মেরুটী পশ্চিম বাহুতে (পূর্ব্ব বাহুতে যত দূরে ছিল ঠিক তত দূরে) রাখিয়া প্রদর্শক কাঁটার পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্ত প্রদর্শিত অপসরণ লিখিয়া রাখ। এখন এই চারিটী অপসরণের যোগফলকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে গড় অপসরণ (mean deflection) পাওয়া যাইবে। এইরূপে নির্দ্ধারিত গড় অপসরণ ভ্রমশূন্য।

পর্য্যবেক্ষণ-ফল লিখিবার চক্র।

দূরত্ব	বাহু	অপসরণ	
২০ সেঃ মিঃ	পূর্ব্ব	পূর্ব্বপ্রান্ত—	ঐ গড় অপসরণ ০
		পশ্চিমপ্রান্ত—	
	পশ্চিম	পূর্ব্বপ্রান্ত—	গড় ০
		পশ্চিমপ্রান্ত—	
১৫ সেঃ মিঃ	পূর্ব্ব	পূর্ব্বপ্রান্ত—	গড় × [illegible]
		পশ্চিমপ্রান্ত—	
	পশ্চিম	পূর্ব্বপ্রান্ত—	[illegible] = অ
		পশ্চিমপ্রান্ত—	

৪। গষ প্রণালী—(Gauss's Method).

(১) একটী চুম্বকদণ্ডের প্রবর্দ্ধিত অক্ষদণ্ডের উপর যে কোন এক বিন্দুতে চৌম্বকবল (magnetic intensity) (ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩২৪, পৃঃ ৫৮৯) কত, তাহা স্থির করা যাক। মনে কর সু কু একটী চুম্বকদণ্ড। গ বিন্দু চুম্বকের প্রবর্দ্ধিত অক্ষদণ্ডের উপর অবস্থিত। মনে কর চুম্বকদণ্ডের মেরুবল (pole strength) 'চ'। 'সুকু' এর দৈর্ঘ্য = '২ল' সেঃ মিঃ (cms) 'সুকু' এর কেন্দ্র হইতে গ এর দূরত্ব দ সেঃ মিঃ। 'সু' মেরু দরুণ 'গ' বিন্দুতে চৌম্বক বল $= \frac{চ}{(দ-ল)^২}$।

(এখানে বিপরীত বর্গবিধি মানিয়া লওয়া হইল) আর কুমেরু দরুণ গ বিন্দুতে

চৌম্বক বল $= \frac{চ}{(দ+ল)^২}$।

তাহা হইলে দুই মেরুর একযোগে গ বিন্দুতে—

$$চৌম্বক\ বল = \frac{চ}{(দ+ল)^২} - \frac{চ}{(দ-ল)^২}$$

$$= \frac{চ(দ^২ - ২দল + ল^২ - দ^২ - ২দল - ল^২)}{(দ+ল)(দ-ল)(দ+ল)(দ-ল)}$$

$$= -\frac{৪চ \times দ \times ল}{(দ^২ - ল^২)^২}$$

$$= -\frac{২ম \times দ}{(দ^২ - ল^২)^২}$$

[∴ চ × ২ল = ম = চৌম্বক মোমেণ্ট।]

যদি ল'এর পরিমাণ 'দ'এর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র হয় তবে—

$$চৌম্বক\ বল = -\frac{২ম \times দ}{দ^৪}$$

$$= -\frac{২ম}{দ^৩}$$

বিযুক্ত চিহ্ন বিকর্ষণ শক্তি-জ্ঞাপকমাত্র। তাহা হইলে চৌম্বক বল $= \frac{২ম}{দ^৩}$ বলা যাইতে পারে। যদি চুম্বকটী ঘুরাইয়া রাখা হয়, অর্থাৎ কু মেরু 'গ' বিন্দুর নিকটতর হয়, তবে চৌম্বক বল বিযুক্ত চিহ্ন-যুক্ত না হইয়া যুক্ত চিহ্ন-যুক্ত হইবে, তদ্দ্বারা আকর্ষণ বুঝাইবে।

(২) এখন সেই চুম্বকদণ্ডের কেন্দ্র হইতে তাহার অক্ষদণ্ডের সমকোণে একটী সরল রেখা কল্পনা কর, এবং এই সরল রেখায় চুম্বকের কেন্দ্র হইতে পূর্ব্বোক্ত 'দ' এর সহিত সমান করিয়া 'গ' বিন্দু লওয়া হইল। এখন এক্ষেত্রে 'গ' বিন্দুতে চৌম্বক বল কত হয়, দেখা যাক। এখানেও চৌম্বক বল বাহির করিতে 'বিপরীত বর্গবিধি' মানিয়া লওয়া হইল। সু মেরু দরুণ 'গ' বিন্দুতে 'গ ঘ' দিকে

চৌম্বক বল $= \frac{চ}{সুগ^২}$। মনে কর 'গ ঘ' =

$\frac{চ}{স্থুগ^২}$ ।* এখন 'স্থুগ' = 'কুগ'। সুতরাং উপরি-উক্ত চৌম্বক বল দুটী পরিমাণে পরস্পর সমান। এখন এই চৌম্বক বল দুটীকে 'ক গ' র দিকে ও তাহার সমকোণে অবস্থিত 'গছ' এর দিকে যদি বিশ্লেষ করা হয়, তবে 'ক গ' এর দিকে বিশ্লিষ্ট অংশদ্বয় পরিমাণে সমান ও বিপরীতগামী বলিয়া পরস্পর পরস্পরের শক্তিকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। তবে চুম্বকের মেরুদ্বয় উৎপন্ন চৌম্বক বল সমষ্টি = ২ গছ। এখন 'গছ' এর পরিমাণ স্থির করিতে হইবে, 'খগছ' ত্রিভুজ 'গস্থক' ত্রিভুজের সহিত Similar

২ল

চিত্র [illegible]

অর্থাৎ একের তিনটী কোণ অপরের তিনটী কোণের সহিত যথাক্রমে সমান। সুতরাং জ্যামিতি সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে—

$$\frac{গছ}{গখ} = \frac{স্থক}{স্থগ}$$

অথবা $গছ = গখ \times \frac{স্থক}{স্থগ}$

$$= \frac{চ}{স্থগ^২} \times \frac{স্থক}{স্থগ}$$

$$= \frac{চ \times স্থক}{স্থগ^৩}$$

$$= \frac{চ \times ল}{(দ^২ + ল^২)^{\frac{৩}{২}}}$$

∴ চৌম্বক বল সমষ্টি = ২ গছ

বা একত্রযোগে চৌম্বক বল)

$$= \frac{২চ \times ল}{(দ^২ + ল^২)^{\frac{৩}{২}}}$$

যদি 'দ' এর পরিমাণ তুলনায় 'ল' অতি সামান্য হয়, তবে 'ল' কে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি। তাহা হইলে—

একত্র যোগে চৌম্বকবল $= \frac{২ল \times চ}{দ^৩}$

$$= \frac{ম}{দ^৩}$$

[ম = ২ল × চ = চুম্বকদণ্ডের মোমেণ্ট]

এখন তড়িতাচার্য্য গস্ সাহেব চুম্বকের কেন্দ্র হইতে সমদূরবর্ত্তী পরস্পর সমকোণে অবস্থিত বিন্দু দুটীর বিশেষ-বিশেষ নামকরণ করিয়াছিলেন। চুম্বকের অক্ষদণ্ডে অবস্থিত বিন্দুর নাম "গসের ট্যানজেণ্ট 'এ' বিন্দু"। কেন্দ্র হইতে সমদূরবর্ত্তী ও অক্ষদণ্ডের সমকোণে অবস্থিত বিন্দুর নাম গসের "ট্যানজেণ্ট 'বি' বিন্দু"। আমাদের ভাষায় অক্ষদণ্ডস্থ বিন্দুকে "অক্ষবিন্দু" ও তাহার সমকোণে

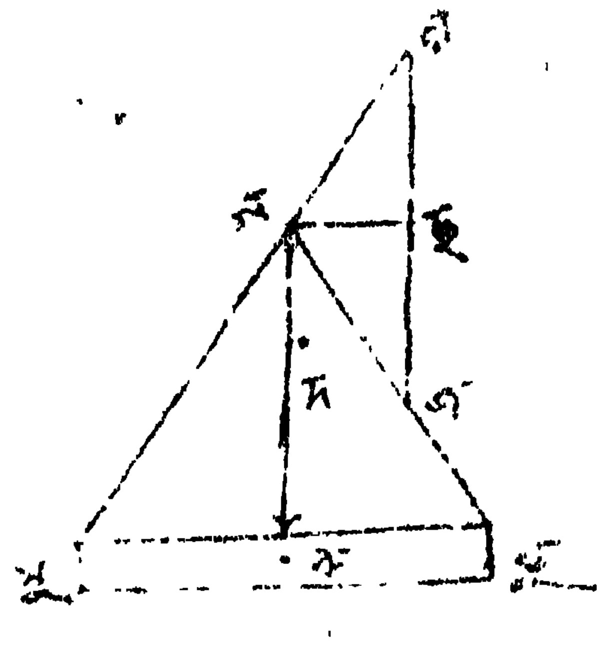

চিত্র ২৮

অবস্থিত ও সমদূরস্থ বিন্দুর নাম "বক্ষবিন্দু" বলিলে মন্দ হয় না।

এখন, চুম্বক দণ্ডের 'অক্ষবিন্দু'তে ও 'বক্ষবিন্দু'তে চৌম্বকবল তুলনা করিয়া দেখা যাক।

* আবার 'কু' মেরু দরুণ সেই 'গ' বিন্দুতে 'গকু' দিকে চৌম্বক বল $= \frac{চ}{কুগ^২}$। মনে কর, গজ $= \frac{চ}{কুগ^২}$।

গরুটাও আরামে চোখ বুজিয়া গলা উঁচু করিয়া ছেলেটার সেবা গ্রহণ করিতেছে।

এই দুটি বিজাতীয় জীবের সৌহৃদ্যের সহিত তাহার মনের পুঞ্জীভূত বেদনার কি যে সংযোগ ছিল, বলা কঠিন; কিন্তু চাহিয়া-চাহিয়া অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু দুটি অশ্রু-প্লাবিত হইয়া গেল। এ বাটীতে এই ছেলেটি ছিল তাহার ভারি অনুগত। সে চোখ মুছিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া সস্নেহে কৌতুকের সহিত কহিল "হাঁরে পরেশ, তোর মা বুঝি তোকে এই কাপড় কিনে দিয়েচে? ছিঃ—এ কি আবার একটা পাড় রে?" পরেশ ঘাড় বাকাইয়া, আড় চোখে চাহিয়া নিজের পাড়ের সঙ্গে বিজয়ার সাড়ীর চমৎকার চওড়া পাড়টা মনে-মনে মিলাইয়া দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার ভাব বুঝিয়া বিজয়া নিজের পাড়টা দেখাইয়া কহিল, "এমনি না হলে কি তোকে মানায়? কি বলিস্ রে?" পরেশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল, "মা কিছু কিন্‌তে জানে না যে।" বিজয়া কহিল, "আমি কিন্তু তোকে এমনি একখানা কাপড় কিনে দিতে পারি, যদি তুই—" 'যদি'তে পরেশের প্রয়োজন ছিল না। সে সলজ্জ হাস্যে মুখখানা আকর্ণ প্রসারিত করিয়া প্রশ্ন করিল, "কখন দেবে—?" "দিই, যদি তুই আমার একটা কথা শুনিস্।" "কি কথা—" বিজয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "কিন্তু তোর মা কি আর কেউ শুন্‌লে তোকে করতে দেবে না।" এ সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য করিবার মত মনের অবস্থা পরেশের নয়। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "মা জান্‌বে কামনে? তুমি বল না, আমি এক্ষুণি শুনব।" বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই দিঘড়া গাঁ চিনিস্?" পরেশ হাত তুলিয়া বলিল, "ওই ত হোথা। গুটিপোকা খুঁজতে কতদিন ত দিঘ্‌ড়ে যাই।" বিজয়া প্রশ্ন করিল "ওখানে সবচেয়ে কাদের বড় বাড়ী তুই জানিস্?" পরেশ বলিল—"হিঁ—বামুনদের গো। সেই যে আর বচ্ছর রস খেয়ে তিনি ছাত থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছ্যালো গো। এই যেন হেথায় গোবিন্দের মুড়কি-বাতাসার-দোকান, আর ওই হোথায় তেনাদের দালান। গোবিন্দ কি বলে জানো মাঠান্? বলে, সব মাগ্যি-গোণ্ডা,—আধ পয়সায় আর আড়াইগোণ্ডা বাতাসা মিলবে না, এখন মোটে দুগোণ্ডা। কিন্তু তুমি যদি একসঙ্গে গোটা পয়সার আনতে দাও মাঠান, আমি তা হলে সাড়ে-পাঁচ গোণ্ডা নিয়ে আস্‌তে পারি।" বিজয়া কহিল, "তুই দু'পয়সার বাতাসা কিনে আন্‌তে পারবি?" পরেশ বলিল, "হিঁ—এ হাতে এক পয়সার সাড়ে পাঁচ গোণ্ডা গুণে নিয়ে বোল্‌ব দোকানি, এ হাতে আরো সাড়ে পাঁচ গোণ্ডা গুণে দাও। দিলে বোল্‌ব, মাঠান্ বলে দেছে দুটো হাতে দেব, নাঃ?" বিজয়া হাসিয়া কহিল, "হাঁ, তবে পয়সা দিবি। আর, অমনি দোকানিকে জিজ্ঞেস কোরে নিবি, ওই যে বড় বাড়ীতে নরেনবাবু থাকৃত, সে কোথায় গেছে? বোল্‌বি 'যে বাড়ীতে তিনি আছেন, সেটা আমাকে চিনিয়ে দিতে পারো দোকানি?' কি রে, পারবি ত?" পরেশ মাথা নাড়িতে-নাড়িতে কহিল, "হিঁ,—আচ্ছা, পয়সা দাও তুমি। আমি ছুটে গিয়ে নে আসি।" "আর যা জিজ্ঞেসা করতে বল্লুম?" পরেশ কহিল, "হিঁ—তা ও—।"

"বাতাসা হাতে পেয়ে ভুলে যাবিনে ত?" পরেশ হাত বাড়াইয়া বলিল, "তুমি পয়সা আগে দাও না? আমি ছুটে যাই।" "আর তোর মা যদি জিজ্ঞেসা করে, পরেশ গিয়েছিলি কোথায়? কি বল্‌বি?" পরেশ অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত হাস্য করিয়া কহিল,—"সে আমি খুব বলতে পারব। বাতাসার ঠোঙা এমনি কোরে কোঁচড়ে লুকিয়ে বোল্‌ব, মাঠান পাঠিয়েছ্যালো—ঐ হোথা বামুনদের নরেনবাবুর খবর জান্‌তে গেছলাম। তুমি দাও না শীগ্‌গীর পয়সা।" বিজয়া হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "তুই কি বোকা ছেলে রে পরেশ, মায়ের কাছে কি মিছে কথা বল্‌তে আছে? বাতাসা কিন্‌তে গিয়েছিলি, জিজ্ঞাসা করলে তাই বল্‌বি। কিন্তু দোকানির কাছে সে খবরটা জেনে আস্‌তে ভুলিস্‌নে যেন। নইলে কাপড় পাবিনে তা বলে দিচ্চি।" "আচ্ছা" বলিয়া পরেশ পয়সা লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলে বিজয়া শূন্যদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে সংবাদ জানিবার কৌতূহলের মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা নাই, যাহা সে যে-কোন লোক পাঠাইয়া অনেকদিন পূর্ব্বেই স্বচ্ছন্দে জানিতে পারিত, তাহাই যে কেন এখন তাহার কাছে এত বড় সঙ্কোচের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, একবার তলাইয়া দেখিলে এই লুকোচুরির লজ্জায় আজ সে নিজেই মরিয়া যাইত। কিন্তু লজ্জাটা না কি তাহার চিন্তার ধারার সহিত অজ্ঞাতসারে মিশিয়া এমনি

একাকার হইয়া গিয়াছিল, যে তাহাকে আলাদা করিয়া দেখিবার দৃষ্টি যে কোন কালে তাহার চোখে ছিল, ইহাও আজ তাহার মনে পড়িল না। কয়েকখানা চিঠি লিখিবার ছিল। সময় কাটাইবার জন্য বিজয়া টেবিলে গিয়া কাগজ কলম লইয়া কথাগুলা এম্নি এলো-মেলো অসম্বদ্ধ হইয়া মনে আসিতে লাগিল যে, কয়েকটা চিঠির কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহাকে কলম রাখিয়া দিতে হইল। পরেশেরও দেখা নাই। মনের চাঞ্চল্য আর দমন করিতে না পারিয়া বিজয়া ছাদে উঠিয়া তাহার পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণে দেখা গেল, সে হন্ হন্ করিয়া নদীর পথ ধরিয়া আসিতেছে। বিজয়া কম্পিতপদে, শঙ্কিত-বক্ষে নীচে নামিয়া বাহিরের ঘরে ঢুকিতেই ছেলেটা বাতাসার ঠোঙা কোঁচড়ে লুকাইয়া চোরের মত পা টিপিয়া কাছে আসিয়া সেগুলি মেলিয়া ধরিয়া বলিল, "ছপয়সায় বারো গোণ্ডা এনেছি মাঠান্।" বিজয়া ভয়ে ভয়ে কহিল, "আর দোকানি কি বল্লে?" পরেশ ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "পয়সায় ছ'গোণ্ডার কথা কাউকে বল্‌তে মানা কোরে দেছে। বলে কি জানো মা—" বিজয়া বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আর সেই বামুনদের নরেনবাবুর কথা—"পরেশ কহিল, "সে হোথা নেই—কোথায় চলে গেছে। গোবিন্দ বলে কি জানো মাঠান? বারো গোণ্ডায়—" বিজয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রুক্ষস্বরে কহিল, "নিয়ে যা তোর বারো গোণ্ডা বাতাসা আমার সুমুখ থেকে" বলিয়া সরিয়া গিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই অচিন্তনীয় রূঢ়তায় ছেলেটা এতটুকু হইয়া গেল। সে এত দ্রুত গিয়াছে এবং আসিয়াছে, এগার গণ্ডার স্থানে কত কৌশলে বার গণ্ডা সওদা করিয়াছে, তবুও মাঠান্‌কে প্রসন্ন করিতে পারিল না, মনে করিয়া তাহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। সে ঠোঙা দুইটা হাতে করিয়া মলিন মুখে কহিল, "এর বেশি যে দেয় না মাঠান্।" বিজয়া ইহার জবাব দিল না, কিন্তু, এদিকে না চাহিয়াও সে ছেলেটার অবস্থা অনুভব করিতেছিল। তাই খানিক পরে সদয় কণ্ঠে কহিল, "যা পরেশ, ওগুলো তুই খেগে যা।" পরেশ ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "সব?" বিজয়া মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, "সব। ওতে আমার কাজ নেই।" পরেশ বুঝিল এ রাগের কথা। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাপড়ের কথাটা স্মরণ হইতেই আরও একটা কথা মনে পড়িল। আস্তে-আস্তে কহিল, "ভট্‌চায্যি মশায়ের কাছে জেনে আসব মাঠান্?" "কে ভট্‌চায্যি মশাই? কি জেনে—" বলিয়া উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াই বিজয়া মুখ ফিরাইয়াই থামিয়া গেল। মুখের বাকি কথাটুকু তাহার মুখেই রহিয়া গেল, আর বাহির হইল না। বারান্দার উপর ঠিক সম্মুখেই অকস্মাৎ নরেন্দ্রকে দেখা গেল,—এবং পর-ক্ষণেই সে ঘরে পা দিয়া হাত তুলিয়া বিজয়াকে নমস্কার করিল। পরেশ বলিল, "কোথায় গেছে নরেন্দর বাবু—" বিজয়া প্রতি-নমস্কারেরও অবসর পাইল না, নিদারুণ লজ্জায় সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, যা, যা,—আর জিজ্ঞেসা করবার দরকার নেই।" পরেশ বুঝিল এ-ও রাগের কথা। ক্ষুন্নস্বরে কহিল "কানা ভট্‌চায্যি মশাই ত তেনাদের পাশের বাড়ীতেই থাকে মাঠান্। গোবিন্দ দোকানি যে বল্লে—" বিজয়া শুষ্ক হাসিয়া কহিল "আসুন, বসুন।" পরেশের প্রতি চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই এখন যা না পরেশ। ভারি ত কথা, তার আবার—, সে আর একদিন তখন জেনে আসিস্ না হয়। এখন যা।" পরেশ চলিয়া গেলে নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নরেন বাবুর খবর জানতে চান্? তিনি কোথায় আছেন, তাই?" অস্বীকার করিতে পারিলেই বিজয়া বাঁচিত; কিন্তু মিথ্যা বলিবার অভ্যাস তাহার ছিল না। সে কোন মতে ভিতরের লজ্জা দমন করিয়া বলিল, "হাঁ। তা সে একদিন জানলেই হবে।" নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কোন দরকার আছে?" প্রশ্নটা তাহার কাণের মধ্যে ঠিক বিদ্রূপের মত শুনাইল। কহিল, "দরকার ছাড়া কি কেউ কারও খবর জান্‌তে চায় না?" "কেউ কি করে না করে, সে ছেড়ে দিন। কিন্তু তার সঙ্গে ত আপনার সমস্ত সম্বন্ধ চুকে গেছে; তবে আবার কেন তার সন্ধান নিচ্চেন? দেনাটা কি সব শোধ হয় নি?" বিজয়ার মুখের উপর ক্লেশের চিহ্ন দেখা দিল, কিন্তু সে উত্তর দিল না। নরেন নিজেও তাহার ভিতরের উদ্বেগ সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারিল না। পুনরায় কহিল, "আমি যতদূর জানি, তার এমন কিছু আর নেই, যা থেকে বাকি ঋণটা পরিশোধ হতে পারবে। এখন আবার তার খোঁজ করা—" "কে আপনাকে বল্লে

আমি দেনার জন্যেই তাঁর অনুসন্ধান করচি?" "তা ছাড়া আর যে কি হতে পারে, আমি ত ভাবতে পারিনে। তিনিও আপনাকে চেনেন না, আপনিও ত তাঁকে চেনেন না।" "তিনিও আমাকে চেনেন, আমিও তাঁকে চিনি।" নরেন হাসিল; কহিল, "তিনি আপনাকে চেনেন, এ কথা সত্যি, কিন্তু, আপনি তাঁকে চেনেন না। ধরুন, আমিই যদি বলি, আমার নামই নরেন, তা'হলেও ত আপনি—" বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তা'হলে আমি বিশ্বাস করি এবং বলি, এই সত্যি কথাটা অনেক দিন পূর্ব্বেই আপনার মুখ থেকে বার হওয়া উচিত ছিল।" ফুঁ দিয়া আলো নিবাইলে ঘরের চেহারার যেমন বদল হয়, বিজয়ার প্রত্যুত্তরে চক্ষুর নিমিষে নরেনের মুখ তেমনি মলিন হইয়া গেল। বিজয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াই পুনশ্চ কহিল, "অন্য পরিচয়ে নিজের আলোচনা শোনা, আর লুকিয়ে আড়ি পেতে শোনা, দুটোই কি সমান বলে আপনার মনে হয় না? আমার ত হয়। তবে কি না, আমরা ব্রাহ্ম, এই যা বলেন।" নরেন্দ্রর মলিন মুখ এইবার লজ্জায় একেবারে কালো হইয়া উঠিল। একটুখানি মৌন থাকিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে অনেক রকম আলোচনার মধ্যে নিজের আলোচনাও ছিল বটে, কিন্তু তাতে মন্দ অভিপ্রায় ত কিছুই ছিল না। শেষ দিনটায় পরিচয় দেব মনেও করেছিলাম, কিন্তু হয়ে উঠল না। এতে আপনার কোন ক্ষতি হয়েছে কি?" এ প্রশ্ন গোড়াতেই করিয়া বসিলে এ পক্ষেও উত্তর দেওয়া নিশ্চয়ই শক্ত হইত। কিন্তু, যে আলোচনা একবার সুরু হইয়া গেছে, নিজের ঝোঁকে সে অনেক কঠিন স্থান আপনি ডিঙাইয়া যায়। তাই সহজেই বিজয়া জবাব দিতে পারিল। কহিল, "ক্ষতি একজনের ত কত রকমেই হতে পারে। আর যদি হয়েও থাকে, সে ত হয়েই গেছে, আপনি ত এখন তার উপায় করতে পারবেন না। সে যাক্। আপনার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা জান্‌তে চাইলে কি—" "রাগ কোরব? না।" বলিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত নির্ম্মল হাস্যে তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এতদিন এত কথাবার্ত্তাতেও এই লোকটির যে পরিচয় বিজয়া পায় নাই, এই এক মুহূর্ত্তের হাসিটুকু তাহাকে সেই খবর দিয়া গেল। তাহার মনে হইল, ইহার সমস্ত অন্তর-বাহির একেবারে যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। যে লোক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কাছেও ইহার 'না', 'না'ই বটে। এবং ঠিক এইজন্যই বোধ করি সে তাহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া আর প্রশ্ন করিতে পারিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখন আছেন কোথায়?" নরেন্দ্র বলিল, "আমার দূর-সম্পর্কের এক পিসি এখনো বেঁচে আছেন; তাঁর বাড়ীতেই আছি।" "আপনার সম্বন্ধে যে সামাজিক গোলযোগ আছে, তা কি সে গ্রামের লোকেরা জানেন না?" "জানেন বৈ কি।" "তবে?" নরেন্দ্র একটুখানি ভাবিয়া বলিল, "যে ঘরটায় আছি, সেটাকে ঠিক বাড়ীর মধ্যে বলাও যায় না; আর আমার অবস্থা শুনেও বোধ করি সামান্য কিছুদিনের জন্যে তাঁর ছেলেরা আপত্তি করে না। তবে, বেশী দিন থেকে তাঁদের বিব্রত করা চল্‌বে না, সে ঠিক।" বলিয়া সে একটুখানি থামিল। কহিল, "আচ্ছা, সত্যি কথা বলুন ত, কেন এ সব খোঁজ নিচ্ছিলেন? বাবার আরও কিছু দেনা বেরিয়েচে। এই না?" উত্তর দিবার জন্যই বোধ করি বিজয়া তাহার মুখপানে একবার চাহিল; কিন্তু সহসা হাঁ, না, কোন কথাই তাহার গলা দিয়া বাহির হইল না। নরেন্দ্র কহিল, "পিতৃ-ঋণ কে না শোধ দিতে চায়, কিন্তু, সত্যি বল্‌চি আপনাকে, স্বনামে, বেনামে এমন কিছুই আমার নেই, যা' বেচে দিতে পারি। শুধু মাইক্রস্‌কোপ্‌টা আছে,—তাও বেচে তবে বম্মায়: ফিরে যাবার খরচটা যোগাড় করতে হবে। পিসীমার অবস্থাও খারাপ,—এমন কি সেখানে খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত—" বলিয়াই সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

বিজয়ার চোখে জল আসিয়া পড়িল; সে ঘাড়টা ফিরাইল। নরেন্দ্র বলিল, "তবে, যদি এই দয়াটা করেন, তাহলে বাবার দেনাটা আমি নিজের নামে লিখে দিতে পারি। ভবিষ্যতে শোধ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা কোরব। আপনি রাসবিহারী বাবুকে একটু বল্‌লেই আর তিনি এ নিয়ে এমন পীড়াপীড়ি করবেন না।" পরেশ আসিয়া দ্বারের বাহির হইতে কহিল, "মাঠান্, মা বল্‌চে বেলা যে অনেক হয়ে গেল—ঠাকুর মশাইকে ভাত দিতে বল্‌বে।" সুমুখের ঘড়িটার প্রতি চাহিয়া নরেন্দ্র চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; লজ্জিত হইয়া বলিল, "ইস্! বারোটা বাজে। আপনার ভারি কষ্ট হল।" বিজয়া

চোখের জল সাম্‌লাইয়া লয়াছিল; কহিল, "আপনি কি জন্যে এসেছিলেন, সে তো বল্‌লেন না?"

নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিল, "সে থাক্।" বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেই বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পিসীমার বাড়ী এখান থেকে কত দূর? এখন সেখানেই ত যেতে হবে?" নরেন্দ্র কহিল, "হাঁ। দূর একটু বৈ কি,—প্রায় ক্রোশ দুই।" বিজয়া অবাক্ হইয়া বলিল, "এই রোদের মধ্যে এখন দু'ক্রোশ হাঁট্‌বেন? যেতেই ত তিনটে বেজে যাবে।"—"তা' হোক্, তা' হোক্, নমস্কার!" বলিয়া নরেন্দ্র পা বাড়াইতেই বিজয়া দ্রুতপদে কবাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল, "আমার একটা অনুরোধ আপনাকে আজ রাখ্‌তেই হবে। এত বেলায় না খেয়ে আপনি কিছুতেই যেতে পাবেন না।" নরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল, "খেয়ে যাবো? এখানে?" "কেন, তাতে কি আপনারও জাত যাবে না কি?" প্রত্যুত্তরে পুনরায় তেমনি প্রশান্ত হাসিতে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কহিল, "না, সে ভয় আমার এ দুনিয়ায় আর নেই। তা'ছাড়া, ভগবান আমার প্রতি আজ ভারি প্রসন্ন, নইলে এত বেলায় সেখানে যে কি জুট্‌ত, সে তো আমি জানি।" 'তবে, একটু বসুন, আমি আস্‌চি" বলিয়া বিজয়া তাহার প্রতি না চাহিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিলে নরেন্দ্র পুনরায় সেই কথাই বলিল; কহিল, "এত বেলা পর্য্যন্ত উপোস করে আমাকে সুমুখে বসিয়ে খাওয়াবার কোন দরকার ছিল না। কোন দেশে এ প্রথা নেই।" বিজয়া হাসিমুখে জবাব দিল, "বাবা বল্‌তেন, সে দেশের ভারি দুর্ভাগ্য, যে দেশের মেয়েরা অভুক্ত থেকে পুরুষদের খাওয়াতে পায় না, সঙ্গে বসে খেতে হয়। আমিও ঠিক তাই বলি।" নরেন্দ্র কহিল, "কেন তা' বলেন? অন্য দেশের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু আমাদের দেশেও ত অনেকের বাড়ীতে খেয়েচি; তাঁদের মধ্যেও ত এ প্রথা …ব দেখেচি।" বিজয়া কহিল, "বিলিতি প্রথা যাঁরা …খেচেন, তাঁদের বাড়ীতে হয় ত চলে, কিন্তু সকলের নয়। আপনি নিজে সে দেশে অনেক দিন ছিলেন বলেই আপনার ভুল হচ্চে। নইলে, পুরুষদের সাম্‌নে বার হই, দরকার হলে কথা কই, বলেই আমরা সবাই মেম-সাহেবও নই, এদের চাল-চলনেও চলিনে।" নরেন্দ্র কহিল, "না চল্‌লেও চলা ত উচিত। যাদের যেটা ভাল, তাদের কাছে সেটা ত নেওয়া চাই।" বিজয়া বলিল, "কোন্‌টা ভাল, একসঙ্গে বসে খাওয়া?" বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া কহিল, "আপনি কি জান্‌বেন, মেয়েদের কতখানি জোর এই খাওয়ানোর মধ্যে থাকে? আমি ত বরঞ্চ আমাদের অনেক অধিকার ছাড়তে রাজী আছি, কিন্তু এটি নয়,—ও কি, সমস্ত দুধই যে পড়ে রইল! না, না,—মাথা নাড়লে হবে না। কখনই আপনার পেট ভরেনি, তা' বলে দিচ্চি।" নরেন হাসিয়া বলিল, "আমার নিজের পেট ভরেচে কি না, সেও আপনি বলে দেবেন! এ তো বড় অদ্ভুত কথা!" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কথাটা শুনিয়া বিজয়া নিজেও একটু হাসিল বটে, কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সে এটুকু দুধ না খাওয়ার জন্য ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

বেলা পড়িলে বিদায় লইতে গিয়া নরেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "একটা বিষয়ে আজ আমি ভারি আশ্চর্য্য হয়ে-গেছি। আমাকে রোদের মধ্যে আপনি যেতে দিলেন না, না খাইয়ে ছেড়ে দিলেন না, একটু কম খাওয়া দেখে ক্ষুণ্ণ হলেন,—এ সব কেমন করে সম্ভব হয়। শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না,—আমি শ্লেষ বা বিদ্রূপ করার অভিপ্রায়ে এ কথা বল্‌চিনে;—কিন্তু আমি তখন থেকে কেবলি ভাব্‌চি, এ রকম কেমন কোরে সম্ভব হয়।" বিজয়া কোন উপায়ে এই আলোচনার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "সব বাড়ীতেই এই রকম হয়ে থাকে? সে থাক্; আপনি আর কতদিনের মধ্যে বর্ম্মা যাবার ইচ্ছে করেন?" নরেন্দ্র অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, "পরশু। কিন্তু, আমি ত আপনার একেবারেই পর; আমার দুঃখ-কষ্টতে সত্যিই ত আপনার কিছু যায়-আসে না; তবু আপনার আচরণ দেখে বাইরের কারুর বল্‌বার যো নেই যে, আমি আপনার লোক নই। পাছে কম খাই বা খাওয়ার সামান্য ত্রুটি হয়, এই ভয়ে নিজে না খেয়ে, সুমুখে বসে রইলেন। আমার বোন নেই, মাও ছেলেবেলায় মারা গেছেন। তাঁরা বেঁচে থাক্‌লে এম্‌নি ব্যাকুল হতেন কি না

আমি ঠিক জানিনে; কিন্তু আপনার যত্ন করা দেখে আমি ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। অথচ, এ কিছু আর যথার্থই সত্যি হতে পারে না, সে আমিও জানি, আপনিও জানেন; বরঞ্চ একে সত্যি বল্‌লেই আপনাকে ব্যঙ্গ করা হবে—অথচ মিথ্যে বলে ভাবতেও যেন ইচ্ছে করে না।" বিজয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল; সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে, সে কি আপনি আর কোথাও দেখেন নি?"

"ভদ্রতা? তাই হবে বোধ হয়।" বলিয়া হঠাৎ তাহার একটা নিঃশ্বাস পড়িল। তার পরে হাত তুলিয়া আবার একবার নমস্কার করিয়া কহিল, "যেমন কোরে হোক, বাবার ঋণটা যে সমস্ত শোধ হয়েচে, এই আমার ভারি তৃপ্তি। আপনার মন্দিরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক্—আজকের দিনটা আমার চিরকাল মনে থাক্‌বে। আমি চল্‌লুম।" বলিয়া সে যখন ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন ভিতর হইতে অস্ফুট আহ্বান আসিল, "একটু দাঁড়ান—" নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া দাড়াইতে, বিজয়া মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মাইক্রস্কোপটার দাম কত?"

নরেন্দ্র কহিল, "কিন্‌তে আমার পাঁচ-শ টাকার বেশি লেগেছিল, এখন আড়াই শ টাকা—দু'শ টাকা পেলেও আমি দিই। কেউ নিতে পারে আপনি জানেন? একেবারে নূতন আছে বল্‌লেও হয়।" তাহার বিক্রী করিবার আগ্রহ দেখিয়া বিজয়া মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত কমে দেবেন, আপনার কি তার সব কাজ হয়ে গেছে?" নরেন্দ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কাজ? কিছুই হয়নি।" এই নিঃশ্বাসটুকুও বিজয়ার লক্ষ্য এড়াইল না। সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমার নিজেরই একটা অনেক দিন থেকে কেন্‌বার সাধ আছে, কিন্তু, হয়ে ওঠেনি। কাল একবার দেখাতে পারেন?" "পারি। আমি সমস্ত আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাবো।" একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিল, "যাচাই করবার সময় নেই বটে, কিন্তু আমি নিশ্চয় বল্‌চি, নিলে আপনি ঠক্‌বেন না।" আবার একটু মৌন থাকিয়া বলিল, "টাকার বদলে দাম হয় না, এ এম্‌নি জিনিস। আমার আর কোন উপায় যে নেই, নইলে—, আচ্ছা কাল দুপুর-বেলায় আমি নিয়ে আস্‌ব।"

সে চলিয়া গেলে যতক্ষণ দেখা গেল, বিজয়া অপলক চক্ষে চাহিয়া রহিল; তার পরে ফিরিয়া আসিয়া সুমুখের চৌকিটার উপর বসিয়া পড়িল। কখনো বা তাহার মনে হইতে লাগিল, যতদূর দৃষ্টি যায়, সব যেন খালি হইয়া গেছে,—কিছুতেই যেন কোন দিন তাহার প্রয়োজন ছিল না,—কিছুই যেন তাহার মরণকাল পর্য্যন্ত কোনো কাজেই লাগিবে না। অথচ, সেজন্য ক্ষোভ বা দুঃখ কিছুই মনের মধ্যে নাই। এমনি শূন্যদৃষ্টিতে বাহিরের গাছপালার পানে চাহিয়া, মূর্ত্তির মত স্তব্ধভাবে বসিয়া কি করিয়া যে সময় কাটিতেছিল, তাহার খেয়াল ছিল না। কখন্ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে, কখন্ চাকরে আলো দিয়া গেছে, সে টেরও পায় নাই। চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তাহার নিজের চোখের জলে। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া, হাত দিয়া দেখিল, কখন্ ফোঁটা-ফোঁটা করিয়া অজ্ঞাতসারে ঝরিয়া বুকের কাপড় পর্য্যন্ত ভিজিয়া গেছে। ছি ছি—চাকর বাকর আসিয়াছে গেছে,—হয় ত তাহারা লক্ষ্য করিয়াছে,—হয় ত তাহারা কি মনে করিয়াছে;—লজ্জায় আজ সে প্রয়োজনেও কাহাকেও কাছে ডাকিতে পারিল না। রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া, জানালা খুলিয়া দিয়া তেম্‌নি বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়া রহিল; অম্‌নি বস্তু-বর্ণহীন শূন্য অন্ধকারের মত নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎটা তাহার চোখে ভাসিতে লাগিল। কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহার মনে নাই; কিন্তু, ঘুম যখন ভাঙিল, তখন প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে ঘর ভরিয়া গেছে;—প্রথমেই মনে পড়িল তাহাকে, যাহার সহিত সে জীবনে পাঁচ ছয় দিনের বেশি কথা পর্য্যন্ত বলে নাই। আর মনে পড়িল, যে অজ্ঞাত বেদনা তাহার ঘুমের মধ্যেও সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল, তাহারই সহিত কেমন করিয়া যেন সেই লোকটিরই ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু যখনই মনে পড়ে সমস্ত কাজকর্ম্মের মধ্যে কোথায় তাহার একটি চোখ এবং একটি কাণ আজ সারাদিন পড়িয়া আছে, তখন নিজের কাছেই তাহার ভারি লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু এ যে কিছুই নয়, এ যে শুধু সেই যন্ত্রটা দেখিবার জন্যই মনের কৌতূহল, একবার সেটা দেখা হইয়া গেলেই সমস্ত আগ্রহের নিবৃত্তি হইবে, আজ না হয়-ত কাল হইবে—এমন করিয়াও আপনাকে আপনি অনেকবার বুঝাইল;—কিন্তু কোন

কাজেই লাগিল না। বরঞ্চ, বেলার সঙ্গে-সঙ্গে উৎকণ্ঠা যেন রহিয়া-রহিয়া আশঙ্কায় আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। পৌষের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য ক্রমশঃ একপাশে হেলিয়া পড়িল; আলোকের চেহারায় দিনান্তের সূচনা দেখিয়া বিজয়ার বুক দমিয়া গেল। কাল যে লোক চিরদিনের মত দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, আজ সে যদি এত দূরে আসিতে, এতখানি সময় নষ্ট করিতে না পারে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! তাহার শেষ সম্বলটুকু যদি অপর কাহাকেও বেশি দামে বিক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়া থাকে, তাহাতেই বা দোষ দিবে কে? তাহাদের শেষ কথা-বার্ত্তাগুলি সে বারবার তোলাপাড়া করিয়া নিরতিশয় অনুশোচনার সহিত মনে করিতে লাগিল যে, মনের মধ্যে তাহার যাহাই থাক্, মুখে সে এ সম্বন্ধে আগ্রহাতিশয্য একেবারেই প্রকাশ করে নাই। ইহাকে অনিচ্ছা কল্পনা করিয়া সে যদি শেষ পর্য্যন্ত পিছাইয়া গিয়া থাকে ত, দপিতার উচিত শাস্তিই হইয়াছে, বলিয়া হৃদয়ের ভিতর হইতে যে কঠিন তিরস্কার বারম্বার ধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহার জবাব সে কোন দিকে চাহিয়াই খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু পরেশকে কিম্বা আর কাহাকেও কোন ছলে তাঁহার কাছে পাঠানো যায় কি না, পাঠাইলেও তাহারা খুঁজিয়া পাইবে কি না, তিনি আসিতে স্বীকার করিবেন কি না, এম্‌নি তর্ক-বিতর্ক করিয়া, ছট্‌ফট্ করিয়া, ঘড়ির পানে চাহিয়া, ঘর-বাহির করিয়া যখন তাহার সময় কাটিতে-ছিল না, এম্‌নি সময়ে পরেশ ঘরে ঢুকিয়া সম্বাদ দিল, "মাঠান্, নীচে এসো, বাবু এসেচে।"

বিজয়ার মুখ পাংশু হইয়া গেল; কহিল, "কে বাবু রে?" পরেশ কহিল, "যে এসেছ্যালো, – তেনার হাতে মস্ত একটা চামড়ার বাক্স রয়েচে মা'ঠান।"

"আচ্ছা, তুই বাবুকে বস্‌তে বল্‌গে, আমি যাচ্চি।" মিনিট-দুই-তিন পরে বিজয়া ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিল। আজ তাহার পরনের কাপড়ে, মাথার ঈষৎ রুক্ষ এলোচুলে এমন একটা বিশেষত্ব, পারিপাট্য ছিল, যাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নহে। গতকল্যের সঙ্গে আজকের এই প্রভেদটায় ক্ষণকালের জন্য নরেন্দ্রর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তাহার বিস্মিত, মুগ্ধ দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বিজয়ার নিজের দৃষ্টি যখন নিজের প্রতি ফিরিয়া আসিল, তখন লজ্জায়-সরমে সে একেবারে মাটির সঙ্গে যেন মিশিয়া গেল। মাইক্রস্কোপের ব্যাগটা এতক্ষণ তাহার হাতেই ছিল; সেটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে কহিল, "নমস্কার। আমি বিলেতে থাক্‌তে ছবি আঁক্‌তে শিখে ছিলাম। আপনাকে ত আমি আরও কয়েকবার দেখেচি, কিন্তু আজ আপনি ঘরে ঢুক্‌তেই আমার চোখ খুলে গেল। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, যে ছবি আঁক্‌তে জানে, তারই আপনাকে দেখে আজ লোভ হবে। বাঃ, কি সুন্দর!" বিজয়া মনে মনে বুঝিল, ইহা সৌন্দর্য্যের পদমূলে অকপট ভক্তের স্বার্থগন্ধহীন নিষ্কলুষ স্তোত্র অজ্ঞাতসারে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; এবং এ কথা একমাত্র ইহার মুখ দিয়াই বাহির হইতে পারে; কিন্তু তথাপি নিজের আরক্ত মুখখানা যে সে কোথায় লুকাইবে, এই দেহটাকে তাহার সমস্ত সাজ-সজ্জার সহিত যে কি করিয়া লুপ্ত করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া গম্ভীরস্বরে কহিল, "আমাকে এ রকম অপ্রতিভ করা কি আপনার উচিত? তা' ছাড়া, একটা জিনিস কিন্‌ব বলেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, ছবি আঁক্‌বার জন্যে ত ডাকিনি।" জবাব শুনিয়া নরেনের মুখ শুকাইল। সে লজ্জায় একান্ত সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া অস্ফুট কণ্ঠে এই বলিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল যে, সে কিছুই ভাবিয়া বলে নাই,—তাহার অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে —আর কখনো সে—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার অনুতাপের পরিমাণ দেখিয়া বিজয়া হাসিল। স্নিগ্ধ হাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, "কৈ, দেখি আপনার যন্ত্র?" নরেন বাঁচিয়া গেল। "এই যে দেখাই" বলিয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া তাহার বাক্স খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। এই বসিবার ঘরটায় আলো কম হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া বিজয়া পাশের ঘরটা দেখাইয়া কহিল, "ও-ঘরে এখনো আলো আছে, চলুন ঐখানে যাই।" "তাই চলুন" বলিয়া সে বাক্স হাতে লইয়া গৃহস্বামিনীর পিছনে-পিছনে পাশের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটি ছোট টিপয়ের উপরে যন্ত্রটি স্থাপিত করিয়া উভয়ে দুই দিকে দু'খানা চেয়ার লইয়া বসিল। নরেন্দ্র কহিল, "এইবার দেখুন। কি করে ব্যবহার করতে হয়, তার পরে আমি শিখিয়ে দেব। এই অণুবীক্ষণ-যন্ত্রটির সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় নাই, তাহারা ভাবিতেও পারে না

কত বড় বিস্ময় এই ছোট জিনিসটির ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরের অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মত এম্‌নি সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডও যে মানুষের একটি ক্ষুদ্র মুঠার ভিতরে ধরিতে পারে, সে আভাস শুধু এই যন্ত্রটির সাহায্যেই পাওয়া যায়।" এইটুকুমাত্র ভূমিকা করিয়াই সে বিজয়ার মনোযোগ আহ্বান করিল। বিলাতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করার পরে তাহার জ্ঞানের পিপাসা এই জীবাণু-তত্ত্বের দিকেই গিয়াছিল। তাই একদিকে যেমন ইহার সহিত তাহার পরিচয়ও একান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সংগ্রহও তেম্‌নি অপর্য্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে সমস্তই সে তাহার এই প্রাণাধিক যন্ত্রটির সহিত বিজয়াকে দিবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, এ সকল না দিলে শুধু শুধু যন্ত্রটা লইয়াই আর একজনের কি লাভ হইবে! প্রথমে ত বিজয়া কিছুই দেখিতে পায় না—শুধু ঝাপ্‌সা আর ধোঁয়া। নরেন যতই আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করে, সে কি দেখিতেছে, ততই তাহার হাসি পায়। সেদিকে তাহার চেষ্টাও নাই, মনোযোগও নাই। দেখিবার কৌশলটা নরেন প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে; প্রত্যেক কল-কব্জা নানাভাবে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখাটা সহজ করিয়া তুলিবার নিমিত্তে প্রয়াস পাইতেছে;—কিন্তু দেখিবে কে? যে বুঝাইতেছে, তাহার কণ্ঠস্বরে আর একজনের বুকের ভিতরটা দুলিয়া-দুলিয়া উঠিতেছে, প্রবল নিঃশ্বাসে তাহার এলোচুল উড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত করিতেছে, হাতে হাত ঠেকিয়া দেহ অবশ করিয়া আনিতেছে,—তাহার কি আসে-যায় জীবাণুর স্বচ্ছ দেহের অভ্যন্তরে কি আছে, না আছে, দেখিয়া? কে ম্যালেরিয়ায় গ্রাম উজাড় করিতেছে, আর কে যক্ষ্মায় গৃহশূন্য করিতেছে, চিনিয়া রাখিয়া তাহার লাভ কি?—করিলেও ত সে তাহাদের নিবারণ করিতে পারিবে না! সে ত আর ডাক্তার নয়! মিনিট-দশেক ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিয়া নরেন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সোজা উঠিয়া বসিল; কহিল, "যান্‌, এ আপনার কাজ নয়। এমন মোটা বুদ্ধি আমি জন্মে দেখিনি।" বিজয়া প্রাণপণে হাসি চাপিয়া কহিল, "মোটা বুদ্ধি আমার, না আপনি বোঝাতে পারেন না!" নিজের রূঢ় কথায় সে মনে-মনে লজ্জিত হইয়া কহিল, "আর কি করে বোঝাবো বলুন? আপনার বুদ্ধি আর কিছু সত্যিই মোটা নয়, কিন্তু, আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে, আপনি মন দিচ্চেন না। আমি বকে মরচি, আর আপনি মিছিমিছি ওটাতে চোখ রেখে মুখ নীচু করে শুধু হাস্‌চেন।" "কে বল্‌লে আমি হাস্‌চি?" "আমি বল্‌চি।" "আপনার ভুল।" "আমার ভুল? আচ্ছা, বেশ, যন্ত্রটা ত আর ভুল নয়, তবে কেন দেখ্‌তে পেলেন না?" "যন্ত্রটা আপনার খারাপ, তাই।"

নরেশ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বলিল, "খারাপ! আপনি জানেন এ রকম পাওয়ারফুল মাইক্রস্কোপ এখানে বেশি লোকের নেই। এমন স্পষ্ট দেখাতে—" বলিয়া স্বচক্ষে একবার যাচাই করিয়া লইবার অত্যন্ত ব্যগ্রতায় ঝুঁকিতে গিয়া বিজয়ার মাথার সঙ্গে তাহার মাথা ঠুকিয়া গেল। উঃ—করিয়া বিজয়া মাথা সরাইয়া লইয়া, হাত বুলাইতে লাগিল। নরেন অপ্রস্তুত হইয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "মাথা ঠুকে দিলে কি হয় জানেন? শিং বেরোয়।" নরেনও হাসিল। কহিল, "বেরোতে হলে আপনার মাথা থেকেই তাদের বার হওয়া উচিত।" "তা' বৈ কি। আপনার এই পুরোনো ভাঙা যন্ত্রটাকে ভাল বলিনি বলে আমার মাথাটা শিং বেরোবার মত মাথা।" নরেন হাসিল বটে, কিন্তু তাহার মুখ শুষ্ক হইল। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আপনাকে সত্যি বল্‌চি ভাঙা নয়। আমার কিছু নেই বলেই আপনার সন্দেহ হচ্চে, আমি ঠকিয়ে টাকা নেবার চেষ্টা কর্‌চি, কিন্তু আপনি পরে দেখ্‌বেন।" বিজয়া কহিল, "পরে দেখে আর কি কোরব বলুন? তখন আপনাকে আমি পাবো কোথায়?" নরেন তিক্তস্বরে কহিল, "তবে কেন বল্‌লেন আপনি নেবেন? কেন মিথ্যে কষ্ট দিলেন?" বিজয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "তখন আপনিই বা কেন না বল্‌লেন, সেটা ভাঙা।" নরেন মহা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "একশ'বার বল্‌চি ভাঙা নয়, তবু বল্‌বেন ভাঙা!" কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধ সম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই ভাল। আমি আর তর্ক করতে চাইনে,—এটা ভাঙাই বটে। আপনি আমার এইটুকু মাত্র ক্ষতি করলেন যে, কাল আর যাওয়া হ'ল না। কিন্তু সবাই আপনার মত অন্ধ নয়,—কলকাতায় আমি অনায়াসে বেচ্‌তে পারি, তা' জানবেন। আচ্ছা, চল্‌লুম" বলিয়া সে যন্ত্রটা বাক্সের মধ্যে পুরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। বিজয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "এখুনি যাবেন কি কোরে? আপনাকে যে খেয়ে যেতে হবে।"

"না, তার দরকার নেই।" "দরকার আছে বৈ কি।" নরেন মুখ তুলিয়া কহিল, "আপনি মনে-মনে হাস্‌চেন। আমাকে কি পরিহাস করচেন?" "কাল যখন খেতে বলেছিলাম, তখন কি পরিহাস করেছিলাম? সে হবে না, আপনাকে নিশ্চয় খেয়ে যেতে হবে। একটু বসুন, আমি এখুনি আস্‌চি" বলিয়া বিজয়া হাসি চাপিতে-চাপিতে সমস্ত ঘরময় রূপের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট-পাঁচেক পরেই সে স্বহস্তে খাবারের থালা, এবং চাকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম দিয়া ফিরিয়া আসিল। টিপয়টা খালি দেখিয়া কহিল, "এর মধ্যে বন্ধ করে ফেলেচেন, আপনার রাগ ত কম নয়!" নরেন্দ্র উদাস কণ্ঠে জবাব দিল, "আপনি নেবেন না, তাতে রাগ কিসের? কিন্তু ভেবে দেখুন ত, এত বড় একটা ভারি জিনিস এতদূর বয়ে আন্‌তে, বয়ে নিয়ে যেতে কত কষ্ট হয়।" থালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বিজয়া কহিল, "তা' হতে পারে। কিন্তু কষ্ট ত আমার জন্যে করেন নি, করেছেন নিজের জন্যে। আচ্ছা, খেতে বসুন, আমি চা তৈরি করে দিই।" নরেন খাড়া বসিয়া রহিল দেখিয়া সে পুনরায় কহিল, "আচ্ছা, আমিই না হয় নেব, আপনাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। আপনি খেতে আরম্ভ করুন।" নরেন্দ্র নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া বলিল, "আপনাকে দয়া করতে ত আমি অনুরোধ করিনি।" বিজয়া কহিল "সেদিন কিন্তু করেছিলেন, যে দিন, মামার হয়ে বল্‌তে এসেছিলেন।" "সে পরের জন্যে, নিজের জন্যে নয়। এ অভ্যাস আমার নেই।" কথাটা যে কতদূর সত্য, বিজয়ার তাহা অগোচর ছিল না। সেই হেতু একটু গায়েও লাগিল; কহিল, "যাই হোক্, ওটা আপনার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না,—এইখানেই থাক্‌বে। আচ্ছা, খেতে বসুন।" নরেন অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "তার কারণ? আপনি কেনবার ছলে কাছে আনিয়ে আট্‌কাতে চান না কি? এও কি বাবা আপনার কাছে বাঁধা রেখেছিলেন? আপনি ত তা' হলে দেখ্‌চি আমাকেও আট্‌কাতে পারেন? অনায়াসে বল্‌তে পারেন, বাবা আমাকেও আপনার কাছে বাঁধা দিয়ে গেছেন।" বিজয়ার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে ঘাড় ফিরাইয়া কহিল, "কালীপদ, তুই দাঁড়িয়ে কি করচিস্? ওগুলো নাবিয়ে রেখে যা', পান নিয়ে আয়।" ভৃত্য কেৎলি প্রভৃতি টেবিলের একধারে নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলে বিজয়া নিঃশব্দ নতমুখে চা' প্রস্তুত করিতে লাগিল, এবং অদূরে চৌকির উপর নরেন্দ্র মুখখানা রাগে হাঁড়ির মত করিয়া বসিয়া রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সৃষ্টিতত্ত্বের যাহা অজ্ঞেয় ব্যাপার, তাহার সম্বন্ধে বিজয়া বড় বড় পণ্ডিতের মুখে অনেক আলোচনা, অনেক গবেষণা শুনিয়াছে; কিন্তু যে অংশটা তাহার জ্ঞেয়, সে কোথায় সুরু হইয়াছে, কি তাহার কায়া, কেমন তাহার আকৃতি প্রকৃতি, কি তাহার ইতিহাস, এমন দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে সে যে আর কখনো শুনিয়াছে, তাহার মনে হইল না। যে যন্ত্রটাকে সে এইমাত্র ভাঙা বলিয়া উপহাস করিতেছিল, তাহারই সাহায্যে কি অপূর্ব্ব এবং অদ্ভুত ব্যাপারই না তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই রোগা এবং ক্ষ্যাপাটে গোছের লোকটি যে ডাক্তারি পাশ করিয়াছে, ইহাই ত বিশ্বাস হইতে চায় না। কিন্তু শুধু তাহাই নয়। জীবিতদের সম্বন্ধে ইহার জ্ঞানের গভীরতা, ইহার নিষ্ঠার দৃঢ়তা, ইহার স্মরণ করিয়া রাখিবার অসামান্য শক্তির পরিচয়ে সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। অথচ, সামান্য লোকের মত ইহাকে রাগাইয়া দেওয়াও কত না সহজ! শেষা শেষি সে কতক বা শুনিতেছিল, কতক বা তাহার কাণেও প্রবেশ করিতেছিল না। শুধু মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নিজের ঝোঁকে সে যখন নিজেই বকিয়া যাইতেছিল, শ্রোতাটি হয় ত তখন ইহার ত্যাগ, ইহার সততা, ইহার সরলতার কথা মনে-মনে চিন্তা করিয়া স্নেহে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে বিভোর হইয়া বসিয়া ছিল।

হঠাৎ একসময়ে নরেনের চোখে পড়িয়া গেল যে, সে মিথ্যা বকিয়া মরিতেছে। কহিল, "আপনি কিছুই শুন্‌চেন না।" বিজয়া চকিত হইয়া বলিল, "শুন্‌চি বৈ কি।" "কি শুন্‌চেন বলুন ত?" "বাঃ—একদিনেই বুঝি সবাই শিখ্‌তে পারে?" নরেন হতাশ ভাবে কহিল, "না, আপনার কিছু হবে না। আপনার মত অন্যমনস্ক লোক আমি জন্মে দেখিনি।" বিজয়া লেশমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "এক দিনেই বুঝি হয়? আপনারই না কি একদিনে হয়েছিল?" নরেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আপনার যে এক-শ বচ্ছরেও হবে না। তা' ছাড়া এ সব শেখাবেই

বা কে?" বিজয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "আপনি। নইলে ঐ ভাঙা যন্ত্রটা কে নেবে?" নরেন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিল, "আপনার নিয়েও কাজ নেই, আমি শেখাতেও পারব না।" বিজয়া কহিল, "তা' হলে ছবি-আঁকা শিখিয়ে দিন। সে তো শিখ্‌তে পারবো?" নরেন উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তাও না। যে বিষয়ে মানুষের নাওয়া খাওয়া জ্ঞান থাকে না, তাতেই যখন মন দিতে পারলেন না, মন দেবেন ছবি-আঁকাতে? কিছুতেই না।" "তা হলে ছবি-আঁকাও শিখ্‌তে পারব না?" "না।"

বিজয়া ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, "কিছুই না শিখ্‌তে পার্‌লে মাথায় শিং বেরোবে।" তাহার মুখের ভাবে ও কথায় নরেন পুনরায় উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। কহিল, "সেই আপনার উচিত শাস্তি।" বিজয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিয়া বলিল, "তা' বই কি। আপনার শেখাবার ক্ষমতা নেই, তাই কেন বলুন না। কিন্তু চাকরেরা কি করচে, আলো দেয় না কেন? একটু বসুন, আমি আলো দিতে বলে আসি।" বলিয়া দ্রুতপদে উঠিয়া দ্বারের পর্দা সরাইয়াই অকস্মাৎ যেন ভূত দেখিয়া থামিয়া গেল। সম্মুখেই বসিবার ঘরের দুটা চৌকি দখল করিয়া পিতা-পুত্র, রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী বসিয়া আছেন। বিলাসের মুখের উপর কে যেন এক ছোপ কালী মাখাইয়া দিয়াছে। বিজয়া আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কখন্‌ এলেন কাকা বাবু? আমাকে ডাকেন নি কেন?"

রাসবিহারী শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন, "প্রায় আধ ঘণ্টা এসেছি মা। তুমি ও ঘরে কথায়-বার্ত্তায় ব্যস্ত আছো বলে আর ডাকিনি। ও বুঝি জগদীশের ছেলে? কি চায় ও?" পাশের ঘর পর্য্যন্ত শব্দ না পৌঁছায়, বিজয়া এম্‌নি মৃদুস্বরে বলিল, "একটা মাইক্রস্কোপ বিক্রী কোরে উনি বর্ম্মায় যেতে চান। তাই দেখাচ্ছিলেন।" বিলাস ঠিক যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"মাইক্রস্কোপ্‌! ঠকাবার যায়গা পেলে না ও!" রাসবিহারী মৃদু ভর্ৎসনার ভাবে ছেলেকে বলিলেন, "ও কথা কেন? তার উদ্দেশ্য ত আমরা জানিনে, —ভালও ত হতে পারে।" বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত ঘাড়টা নাড়িয়া কহিলেন, "যা' জানিনে, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমি উচিত মনে করিনে। তার উদ্দেশ্য মন্দ নাও ত হতে পারে,—কি বল মা? অবশ্য জোর করে কিছুই বলা যায় না, সে ঠিক। তা সে যাই হোক্‌গে, ওতে আমাদের আবশ্যক কি? দূরবীণ হলেও না হয় কখনো কালে-ভদ্রে দূরেটুরে দেখ্‌তে কাজে লাগ্‌তেও পারে। ও কে কালীপদ? ও-ঘরে আলো দিতে যাচ্চিস্‌? অম্‌নি বাবুটিকে বলে দিস্‌, আমরা কিন্‌তে পার্‌বো না—তিনি যেতে পারেন।" বিজয়া ভয়ে-ভয়ে বলিল, "তাঁকে বলেছি আমি নেব।" রাসবিহারী কিছু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "নেবে? কেন? তাতে প্রয়োজন কি?" বিজয়া মৌন হইয়া রহিল। রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি কত দাম চান?" "দু'শ টাকা।"

রাসবিহারী দুই ভ্রূ প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "দু'শ? দু'শ টাকা চায়? বিলাস ত তা'হলে নেহাৎ—কি বল বিলাস, কলেজে তোমার এফ এ ক্লাসের কেমিষ্ট্রিতে ত এ-সব অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেচ,—দু'শ টাকা একটা মাইক্রস্কোপের দাম? কালীপদ, যা—ওঁকে যেতে বলে দে,—এ সব ফন্দি এখানে খাটবে না।"

কিন্তু যাহাকে বলিতে হইবে, সে যে নিজের কাণেই সমস্ত শুনিতেছে তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কালীপদ যাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া বিজয়া তাহাকে শান্ত, অথচ, দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়া দিল, "তুমি শুধু আলো দিয়ে এসেগে, যা' বলবার আমি নিজেই বল্‌ব।" বিলাস শ্লেষ করিয়া তাহার পিতাকে কহিল, "কেন বাবা, তুমি মিথ্যে অপমান হতে গেলে? ওঁর হয় ত এখনো কিছু দেখিয়ে নিতে বাকি আছে।" রাসবিহারী কথা কহিলেন না, কিন্তু ক্রোধে বিজয়ার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। বিলাস তাহা লক্ষ্য করিয়াও বলিয়া ফেলিল, "আমরাও অনেক রকম মাইক্রস্কোপ দেখেচি, বাবা, কিন্তু হো হো করে হাস্‌বার বিষয় কখনো কোনটার মধ্যে পাই নি।"

কাল খাওয়ানোর কথাও সে জানিতে পারিয়াছিল, আজ উচ্চহাস্যও সে স্বকর্ণে শুনিয়াছিল। বিজয়ার আজিকার বেশভূষার পারিপাট্যও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ঈর্ষার বিষে সে এম্‌নি জ্বলিয়া মরিতেছিল যে, তাহার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। বিজয়া তাহার দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া রাসবিহারীকে কহিল, "আমার সঙ্গে কি আপনার কোন বিশেষ কথা আছে কাকা বাবু?"

রাসবিহারী অলক্ষ্যে পুত্রের প্রতি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বিজয়াকে কহিলেন, "কথা আছে বৈ কি মা। কিন্তু তার জন্যে তাড়াতাড়ি কি!" একটু থামিয়া কহিলেন "আর—ভেবে দেখ্‌লাম, ওঁকে কথা যখন দিয়েচ, তখন, যাই হোক্ সেটা নিতে হবে বৈ কি। দু'শ টাকা বেশি, না, কথাটার দাম বেশি! তা' না হয় ওঁকে কাল একবার এসে টাকাটা নিয়ে যেতে বলে দিক্ না মা?" বিজয়া এ প্রশ্নের জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সঙ্গে কি কাল কথা হতে পারে না কাকা বাবু?" রাসবিহারী একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "কেন, মা?"

বিজয়া মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া, দ্বিধা সঙ্কোচ সবলে বর্জ্জন করিয়া কহিল, "ওঁর রাত হয়ে যাচ্চে,—আবার অনেকদূর যেতে হবে। ওঁর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা করবার আছে।"

তাহার এই স্পর্দ্ধিত প্রকাশ্যতায় বৃদ্ধ মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেও বাহিরে তাহার লেশমাত্র প্রকাশ পাইতে দিলেন না। চাহিয়া দেখিলেন, পুত্রের ক্ষুদ্র চক্ষু-দুটি অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মত ঝক্-ঝক্ করিতেছে; এবং কি একটা সে বলিবার চেষ্টায় যেন যুদ্ধ করিতেছে। ধূর্ত্ত রাসবিহারী অবস্থাটা চক্ষের নিমিষে বুঝিয়া লইয়া তাহাকে কটাক্ষে নিবারণ করিয়া প্রফুল্ল হাসিমুখে কহিলেন, "বেশ ত মা, আমি কাল সকালেই আবার আস্‌ব। বিলাস, অন্ধকার হয়ে আস্‌চে বাবা, চল, আমরা যাই" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং ছেলের বাহুতে একটু মৃদু আকর্ষণ দিয়া তাহার অবরুদ্ধ উদ্দাম ক্রোধ ফাটিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বিজয়া সেই অবধি বিলাসের প্রতি একেবারেই চাহে নাই। সুতরাং তাহার মুখের ভাব ও চোখের চাহনি স্বচক্ষে দেখিতে না পাইলেও মনে-মনে সমস্ত অনুভব করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কালীপদ এ ঘরে বাতি দিতে আসিয়া কহিল, "ও-ঘরে আলো দিয়ে এসেচি মা।" "আচ্ছা," বলিয়া বিজয়া নিজেকে সংযত করিয়া পরক্ষণে দ্বারের পর্দা সরাইয়া ধীরে-ধীরে এ-ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নরেন ঘাড় হেঁট করিয়া কি ভাবিতেছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিঃশ্বাস চাপিবার ব্যর্থ চেষ্টাও বিজয়ার কাছে ধরা পড়িল। একটু-খানি চুপ করিয়া নরেন দুঃখের সহিত কহিল, "এটা আমি সঙ্গে নিয়েই যাচ্চি, কিন্তু আজকের দিনটা আপনার বড় খারাপ গেল। কি জানি, কার মুখ দেখে সকালে উঠে-ছিলেন, আপনাকে অনেক অপ্রিয় কথা আমিও বলেচি, ওঁরাও বলে গেলেন।" বিজয়ার মনের ভিতরটায় তখনো জ্বালা করিতেছিল; সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার অন্তরের দাহ দুইচক্ষে দীপ্ত হইয়া উঠিল; অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "তার মুখ দেখেই আমার যেন রোজ ঘুম ভাঙে। আপনি সমস্ত কথা নিজের কাণে শুনেছেন বলেই বল্‌চি যে, আপনার সম্বন্ধে তাঁরা যে সব অসম্মানের কথা বলেছেন, সে তাঁদের অনধিকারচর্চ্চা। কাল তাঁদের আমি তা' বুঝিয়ে দেব।" অতিথির অসম্মান যে তাহার কিরূপ লাগিয়াছে, নরেন তাহা বুঝিয়াছিল; কিন্তু শান্ত সহজ ভাবে কহিল, "আবশ্যক কি? এ সব জিনিসের ধারণা নেই বলেই তাঁদের সন্দেহ হয়েচে, নইলে আমাকে অপমান করায় তাঁদের কোন লাভ নেই। আপনার নিজেরও ত প্রথমে নানা কারণে সন্দেহ হয়েছিল, সে কি অসম্মান করবার জন্যে? তাঁরা আপনার আত্মীয়, শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার জন্যে তাদের ক্ষুণ্ণ করবেন না। কিন্তু রাত হয়ে যাচ্চে,—আমি যাই।" "কাল, কি পরশু একবার আস্‌তে পারবেন?" "কাল, কি পরশু? কিন্তু তার ত সময় হবে না। কাল আমি যাচ্চি। অবশ্য কালই বর্ম্মায় যাওয়া হবে না; কলকাতায় কয়েকদিন থাক্‌তে হবে, কিন্তু আর দেখা করবার—"

বিজয়ার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল; সে না পারিল মুখ তুলিতে, না পারিল কথা কহিতে। নরেন আপনিই একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "আপনি নিজে এত হাসাতে পারেন, আর আপনারই এত সামান্য কথায় এমন রাগ হয়। আমিই বরঞ্চ একবার রেগে উঠে আপনাকে মোটা-বুদ্ধি প্রভৃতি কত কি বলে ফেলেচি; কিন্তু, তাতে ত রাগ করেন নি, বরঞ্চ মুখ টিপে হাস্‌ছিলেন দেখে আমার আরও রাগ হচ্ছিল। কিন্তু আপনাকে আমার সর্ব্বদা মনে পড়বে,—আপনি ভারি হাসাতে পারেন।" ক্ষান্ত-বর্ষণ বৃষ্টির জল দম্‌কা হাওয়ায় যেমন করিয়া পাতা হইতে ঝড়িয়া পড়ে, তেম্‌নি শেষ কথাটায় কয়েক ফোঁটা চোখের জল বিজয়ার চোখ দিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া মাটির উপর ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু, পাছে

হাত তুলিয়া মুছিতে গেলে অপরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এই ভয়ে সে নিঃশব্দ নতমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন বলিতে লাগিল, "এটা নিতে পারলেন না বলে আপনি দুঃখিত—" বলিয়াই সহসা কথার মাঝখানে থামিয়া গিয়া এই কাণ্ড-জ্ঞান-বর্জ্জিত বৈজ্ঞানিক চক্ষের নিমিষে এক বিষম কাণ্ড করিয়া বসিল। অকস্মাৎ হাত বাড়াইয়া বিজয়ার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—"এ কি, আপনি কাঁদ্চেন?" বিদ্যুদ্বেগে বিজয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। নরেন হতবুদ্ধি হইয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল?"

এ সকল ব্যাপার সে বেচারার বুদ্ধির অতীত। সে জীবাণুদের চিনে, তাহাদের নাম ধাম, জাতি গোত্রের কোন খবর তাহার অপরিজ্ঞাত নয়, তাহাদের কার্য্যকলাপ, রীতি-নীতি সম্বন্ধে কখনো তাহার একবিন্দু ভুল হয় না, তাহাদের আচার-ব্যবহারের সমস্ত হিসাব তাহার নখাগ্রে;—কিন্তু এ কি? যাহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া গালি দিলে লুকাইয়া হাসে, এবং শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় তদ্গত হইয়া প্রশংসা করিলে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়, এমন অদ্ভুত প্রকৃতি জীবকে লইয়া সংসারে জ্ঞানী লোকের সহজ কারবার চলে কি করিয়া? সে খানিকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে-আস্তে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই বিজয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওটা আমার, আপনি রেখে দিন।" বলিয়া কান্না আর চাপিতে না পারিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সেটা নামাইয়া রাখিয়া নরেন হতবুদ্ধির মত মিনিট-দুই-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। আরও মিনিটখানেক চুপ করিয়া অপেক্ষা করিয়া, অবশেষে শূন্যহাতে অন্ধকার পথ ধরিয়া প্রস্থান করিল। বিজয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ব্যাগ আছে, মালিক নাই। সে টাকা আনিতে নিজের ঘরে গিয়াছিল; কিন্তু বিছানায় মুখ গুঁজিয়া কান্না সামলাইতে যে এতক্ষণ গেছে, তাহার হুঁস ছিল না। ডাক শুনিয়া কালীপদ বাহিরে আসিল। প্রশ্ন শুনিয়া সে মুখে-মুখে সাংসারিক কাজের বরাট ফর্দ দাখিল করিয়া কহিল, সে ভিতরে ছিল, জানেও না বাবু কখন্ চলিয়া গেছেন। দরওয়ান কানাই সিং আসিয়া বলিল, সে অড়র ডাল নামাইয়া চপাটি গড়িতেছিল, কোন্ ফুরসতে সে বাবু চুপ্‌সে বাহির হইয়া গেছেন, তাহার মালুমও নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিলাসবিহারীর প্রচণ্ড কীর্ত্তি—পল্লীগ্রামে ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার শুভদিন আসন্ন হইয়া আসিল। একে-একে অতিথি-গণের সমাগম ঘটিতে লাগিল। শুধু কলিকাতা নয়, আশ-পাশ হইতেও দুই-চারিজন সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাল সেই শুভদিন। আজ সন্ধ্যায় রাসবিহারী তাঁহার আবাস-ভবনে একটি প্রীতি-ভোজের আয়োজন করিয়া-ছিলেন।

সংসারে স্বার্থহানির আশঙ্কা কোন কোন বিষয়ী লোককে যে কিরূপ কুশাগ্র-বুদ্ধি ও দূরদর্শী করিয়া তুলে, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে।

সমবেত নিমন্ত্রিতগণের মাঝখানে বসিয়া বৃদ্ধ রাস বিহারী তাঁহার পাকা দাড়িতে হাত বুলাইয়া অর্দ্ধমুদিত নেত্রে তাঁহার আবাল্য-সুহৃৎ পরলোকগত বনমালীর উল্লেখ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবান তাঁকে অসময়ে আহ্বান করে নিলেন,—তাঁর মঙ্গল ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার এতটুকু নালিশ নেই;—কিন্তু সে যে আমাকে কি করে রেখে গেছে, আমার বাইরে দেখে সে আপনারা অনুমান করতে পারবেন না। যদিচ আমাদের সাক্ষাতের দিন প্রতিদিন নিকটবর্ত্তী হয়ে আস্‌চে, সে আভাস আমি প্রতি মুহূর্ত্তেই পাই, তবুও সেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর অসীম করুণায় সেই দিনটিকে যেন আরও সন্নিকটবর্ত্তী করে দেন—" এই বলিয়া তিনি জামার হাতায় চোখের কোণটা মুছিয়া ফেলিলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ আত্ম সমাহিত ভাবে মৌনী থাকিয়া, পুনরায় অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল কণ্ঠে কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাল্যের খেলা-ধূলা, কিশোর বয়সের পড়া-শুনা,—তার পরে যৌবনে সত্যধর্ম্ম গ্রহণের ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিলেন, "কিন্তু বনমালীর কোমল হৃদয়ে গ্রামের অত্যাচার সহ্য হল না,—তিনি কলকাতায় চলে গেলেন। কিন্তু আমি সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করে গ্রামে থাকতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোলাম। উঃ—সে কি নির্য্যাতন! তথাপি মনে-মনে বল্‌লাম সত্যের জয় হবেই হবে। তাঁর

মহিমায় একদিন জয়ী হব। সেই শুভদিন আজ সমাগত—তাই এখানে এতকাল পরে আপনাদের পদধূলি পড়্‌ল। বনমালী আমাদের মধ্যে আজ নেই—দুদিন পূর্ব্বেই তিনি চলে গেছেন;—কিন্তু আমি চোখ বুজ্‌লেই দেখ্‌তে পাই, ওই তিনি উপর থেকে আনন্দে মৃদু-মৃদু হাস্য করচেন।” বলিয়া তিনি পুনরায় মুদিত নেত্রে স্থির হইলেন।

উপস্থিত সকলের মনই উত্তেজিত হইয়া উঠিল,—বিজয়ার দু-চক্ষে অশ্রু টল্‌-টল্‌ করিতে লাগিল। রাসবিহারী চক্ষু মেলিয়া সহসা দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“ওই তাঁর একমাত্র কন্যা বিজয়া। পিতার সর্ব্বগুণের অধিকারিণী,—কিন্তু কর্ত্তব্যে কঠোর! সত্যে নির্ভীক! স্থির! আর ওই আমার পুত্র বিলাসবিহারী। এম্‌নি অটল, এমনি দৃঢ়চিত্ত। এঁরা বাইরে এখনো আলাদা হলেও অন্তরে—, হাঁ, আর একটি শুভদিন আসন্ন হয়ে আস্‌চে, যেদিন আবার আপনাদের পদধূলির কল্যাণে এঁদের সম্মিলিত নবীন জীবন ধন্য হবে।” একটি অস্ফুট, মধুর কলরবে সমস্ত সভাটি মুখরিত হইয়া উঠিল। যে মহিলাটি পাশে বসিয়া ছিলেন, তিনি বিজয়ার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া একটু চাপ দিলেন। রাসবিহারী একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, “ঐ তাঁর একমাত্র সন্তান,—এটি তাঁর চোখে দেখে যাবার বড় সাধ ছিল;—কিন্তু সমস্ত অপরাধ আমার! আজ আপনাদের সকলের কাছে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করচি, এর জন্যে দায়ী আমি একা। পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দুর মত যে মানব-জীবন, এ শুধু আমরা মুখেই বলি, কিন্তু কাজে ত করি না! সে যে এত শীঘ্র যেতে পারে, সে খেয়াল ত করলাম না।” এই বলিয়া তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত নীরব হইলেন। তাঁহার অনুতাপ-বিদ্ধ অন্তরের ছবি উজ্জ্বল দীপালোকে মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল। পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “কিন্তু এবার আমার চৈতন্য হয়েচে। তাই, নিজের শরীরের দিকে চেয়ে এই আগামী ফাল্গুনের বেশি আর আমার বিলম্ব করবার সাহস হয় না। কি জানি, পাছে আমিও না দেখে যেতে পারি।” আবার একটা অব্যক্ত ধ্বনি উত্থিত হইল। রাসবিহারী দক্ষিণে ও বামে দৃষ্টিপাত করিয়া বিজয়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “বনমালী তাঁর যথাসর্ব্বস্বের সঙ্গে মেয়েকেও যেমন আমার হাতে দিয়ে গেছেন, আমিও তেমন ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রেখে আমার কর্ত্তব্য সমাপন করে যাবো। ওঁরাও তেম্‌নি আপনাদের আশীর্ব্বাদে দীর্ঘজীবন লাভ করে, সত্যকে আশ্রয় করে, কর্ত্তব্য করুন। যেখান থেকে ওঁদের পিতাকে নির্ব্বাসিত করা হয়েছিল, সেইখানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সত্যধর্ম্ম প্রচার করুন, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।”

বৃদ্ধ আচার্য্য দয়ালচন্দ্র ধাড়া মহাশয় ইঁহার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন।

রাসবিহারী তখন বিজয়াকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “মা, তোমার বাবা নেই, তোমার জননী সাধ্বী সতী বহুপূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করেছেন, নইলে, এ কথা আজ আমায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হ’ত না। লজ্জা কোরো না, মা, বল, আজ এইখানেই আমাদের এই পূজনীয় অতিথি-গণকে আগামী ফাল্গুন মাসেই আবার একবার পদধূলি দেবার জন্য আমন্ত্রণ করে রাখি।” বিজয়া কথা কহিবে কি ক্ষোভে, বিরক্তিতে, ভয়ে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে অধোবদনে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রাসবিহারী ক্ষণকালমাত্র অপেক্ষা করিয়াই মৃদু হাসিয়া কহিলেন, “দীর্ঘজীবী হও মা, তোমাকে কিছুই বল্‌তে হবে না,—আমরা সমস্ত বুঝেচি।” তাহার পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, দুই হাত যুক্ত করিয়া বলিলেন, “আমি আগামী ফাল্গুনেই আর একবার আপনাদের পদধূলির ভিক্ষা জানাচ্চি।”

সকলেই বারবার করিয়া তাঁহাদের সম্মতি জানাইতে লাগিলেন। বিজয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া অব্যক্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “বাবার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে—” প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে কথাটা সে শেষ করিতেও পারিল না। রাসবিহারী চক্ষের পলকে ব্যাপারটা অনুভব করিয়া গভীর অনুতাপের সহিত তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, “ঠিক্ ত মা, ঠিক্ ত। এ যে আমার স্মরণ ছিল না। কিন্তু তুমি আমার মা কি না, তাই এ বুড়ো ছেলের ভুল ধরে দিলে।” বিজয়া নীরবে আঁচলে চোখ মুছিল। রাসবিহারী ইহাও লক্ষ্য করিলেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া আর্দ্রস্বরে বলিলেন, “সকলই তাঁর ইচ্ছা।” একটু পরে কহিলেন, “তাই হবে। কিন্তু, তারও ত আর বিলম্ব নেই।” সকলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “বেশ, আগামী বৈশাখেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হবে। আপনাদের কাছে এই আমাদের পাকা কথা হয়ে রইল।

বিলাসবিহারী, বাবা, রাত্রি হয়ে যাচ্চে—কাল প্রভাত থেকে ত কাযের অন্ত থাকবে না—আমাদের আহারের আয়োজনটা—না–না, চাকরদের উপর আর নির্ভর করা নয়—তুমি নিজে যাও,—চল, আমিও যাচ্চি। তা' হলে, আপনাদের অনুমতি হলে আমি একবার--"বলিতে-বলিতেই তিনি পুত্রের পিছনে-পিছনে অন্দরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে প্রীতি-ভোজের কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। আয়োজন প্রচুর হইয়াছিল, কোথাও কোন অংশে ত্রুটি ঘটিল না। রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে, একটা থামের আড়ালে, অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া বিজয়া পাল্‌কির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। রাসবিহারী তাহাকে যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া একেবারে চমকিয়া গেলেন—"এখানে একলা দাঁড়িয়ে কেন মা? এসো, এসো,—ঘরে বস্‌বে এসো।" বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, কাকাবাবু, আমি বেশ দাঁড়িয়ে আছি।" "কিন্তু ঠাণ্ডা লাগ্‌বে যে মা?" "না, লাগ্‌বে না।"

রাসবিহারী তখন পাশে দাড়াইয়া 'ঘরের লক্ষ্মী' প্রভৃতি বলিয়া আর একদফা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বিজয়া পাথরের মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক হইয়া এই সমস্ত স্নেহের অভিনয় সহ্য করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাঁহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, "তোমাকে সে কথাটা বল্‌তে একেবারেই ভুলে গিয়াছিলাম, মা। সেই মাইক্রস্কোপের দামটা তাকে আমি দিয়ে দিয়েচি।"

আট 'দশ দিন হইয়া গেল, নরেন্দ্র সেই যে সেটা রাখিয়া গেছে, আর আসে নাই। এই কয়টা দিন যে বিজয়ার কি করিয়া গেছে, তাহা শুধু সেই জানে। তাহার পিসির বাড়ীর দূরত্বটাই সে জানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু সে যে কোথায়, কোন্ গ্রামে, তাহা জিজ্ঞাসাও করে নাই। এই ভুলটা তাহাকে প্রতিমুহূর্ত্ত তপ্ত শেলের বিঁধিয়া গেছে; কিন্তু, কোন উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। এখন রাসবিহারীর কথায় সে চকিত হইয়া বলিল, "কখন্ দিলেন?" রাসবিহারী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কি জানি, তার পরের দিনেই হবে বুঝি। শুনলাম, তুমি সেটা কিন্‌বে বলেই রেখেচ। কথা, কথা। যখন কথা দেওয়া হয়েচে, তখন ঠকাই হোক, আর যাই হোক্, টাকা দেওয়াও হয়েচে—এই ত আমি সারাজীবন বুঝে এসেচি মা। দেখ্‌লাম, সে বেচারার ভারি দরকার,—টাকাটা হাতে পেলেই চলে যায়,—গিয়ে যা হোক্ কিছু করবার চেষ্টা করে। হাজার হোক্, সেও ত আমার পর নয়, মা, সেও ত এক বন্ধুরই ছেলে। দেখ্‌লাম, চলে যাবার জন্যে ভারি ব্যস্ত—পেলেই চলে যায়। আর-তোমার দেওয়াও দেওয়া, আমার দেওয়াও দেওয়া। তাই, তখনি দিয়ে দিলাম। তার ধর্ম্ম তার কাছে,—দশ টাকা বেশি নিয়ে থাকে নিক্।"

বিজয়ার মুখের মধ্যে জিভটা যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল,—কিছুতেই যেন আর কথা ফুটিবে না, এম্‌নি মনে হইল। কিছুক্ষণ প্রবল চেষ্টায় বলিয়া ফেলিল, "কোথায় তাঁকে টাকা দিলেন?"

রাসবিহারী কেমন করিয়া জানি না প্রশ্নটাকে সম্পূর্ণ অন্য বুঝিয়া চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "না—না, বল কি, টাকাটা দুবার করে নিলে না কি? কিন্তু কৈ, সে রকম ত তার মুখ দেখে মনে হল না? আর,—আর, কাকেই বা দোষ দেব। এম্‌নি কোরে লোকের কথায় বিশ্বাস করে ঠক্‌তে-ঠক্‌তেই ত দাড়ি পাকিয়ে দিলাম মা। না হয়, আর দু'শ গেল। তা' সে টাকাটা আমিই দেব,—চিরকাল এ রকম দণ্ড বইতে-বইতে কাঁধে কড়া পড়ে গেছে, মা, আর লাগে না। যাক্—সে আমি" বিজয়া আর কিছুতেই সহিতে না পারিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "কেন আপনি মিথ্যে ভয় করচেন, কাকাবাবু। দুবার করে টাকা নেবার লোক তিনি ন'ন,—না খেতে পেয়ে মরবার সময় পর্য্যন্ত ন'ন। কিন্তু কোথায় দেখা হ'ল? কবে টাকা দিলেন?"

রাসবিহারী অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "যাক্, বাঁচা গেল। টাকাটাও ত কম নয়,—দু'শ! যাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত! হঠাৎ দেখা হতেই—কে দাঁড়িয়ে? বিলাস? পাল্‌কির কি হ'ল বল দেখি? ঠাণ্ডা লেগে যাচ্চে যে! যে কাজটা আমি নিজে না দেখ্‌ব, তাই কি হবে না!" বলিয়া অত্যন্ত রাগ করিয়া তিনি আর একটা থামকে বিলাস মনে করিয়া দ্রুতবেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। (ক্রমশঃ)

সাময়িকী

কলিকাতায় এবং মফঃস্বলের সহরে, এমন কি গ্রামে, পথে-ঘাটে বাহির হইলেই দেখা যায়, ৫।৭ বৎসর বয়স্ক বালকেরা সিগারেট, না হয় বিড়ি টানিয়া এক মুখ ধোঁয়া বাহির করিতে-করিতে পথ দিয়া চলিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিয়া—দেশের এবং দেশবাসীর প্রতি যাঁহার কিছুমাত্র মমতা আছে তাঁহার—হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না। ধূমপান যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টকর, তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, সে কথায় এখানে আলোচনায় কোন প্রয়োজন নাই। এখন ছোট-ছোট ছেলেদের ধূমপানের অভ্যাস কিরূপে দূর করিতে পারা যায়, তাহাই বিবেচ্য। কলিকাতায় এবং ভারতের অন্যান্য স্থলে ধূমপান-নিবারণী সভা সমিতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নাই; কিন্তু এ পাপ একবার সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে তাহা দূর করা দুষ্কর; সদুপদেশ বা সদ্‌দৃষ্টান্তের দ্বারা এ সকল স্থলে কোন ফল ফলিতে দেখা যায় না। কাযেই আইনের সাহায্যে এই পাপ দূর করিবার কথা সহজেই মনে পড়ে। আমরা যদিও সচরাচর আইনের পক্ষপাতী নহি, তথাপি, যেখানে অন্য সকল উপায় নিষ্ফল হয়, সেখানে আইন প্রণয়ন ব্যতীত পাপ-দমনের আর কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে? অতএব এক্ষণে আইনের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেই হয়।

—

ধূমপান এমন সংক্রামক ব্যাধি যে, ইহা নিবারণের জন্য অনেক দেশেই আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক দেশীয় রাজ্যে অল্পবয়স্ক বালকগণের ধূমপান নিবারণের জন্য আইন প্রণীত হইয়াছে। বঙ্গদেশে এত দিন পরে আইনের প্রস্তাব হইয়াছে। মাননীয় ডাক্তার সুহ্রাওয়ার্দ্দি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ধূমপান-নিবারণ-সংক্রান্ত একটা আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করিয়াছেন। এরূপ একটা আইনের আবশ্যকতা বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল এবং বহুদিন পূর্ব্বেই ধূমপান-নিবারক আইন প্রচলিত হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, Better late than never। এতদিনেও যে আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা উপলব্ধ হইয়াছে, ইহাতেই দেশের লোকে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। তবে আইনের পাণ্ডুলিপি মাত্র ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইয়াছে; এখনও উহা পাশ হয় নাই, বিবেচনাধীন রহিয়াছে। পাশ না হইলে সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হইতে পারা যাইবে না।

—

আইনটি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণের আপত্তির বিশেষ কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। কেবল যে সকল লোকের উপর বালকদিগের হাত হইতে সিগারেট বিড়ি কাড়িয়া লইবার ভার দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে দেশের লোক সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। কেহ-কেহ ইতোমধ্যেই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং সে আপত্তি অসঙ্গত বলিয়াও বোধ হয় না। এদেশের লোকে পুলিশকে যেরূপ ভয় করে, তাহাতে পুলিশের উপর ছেলেদের হাত হইতে সিগারেট, বাড়সাই বা বিঁড়ি কাড়িয়া লইবার ভার দিতে লোকে যে সহজেই নারাজ হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। আর ছেলেদের মধ্যে দুর্নীতি নিবারণের জন্য যাঁহারা স্বভাবতঃই অধিকারী, এবং যাঁহারা ছেলেদের সুনীতি-শিক্ষার জন্য স্বভাবতঃই দায়ী, তাঁহাদিগকে একেবারে বাদ দেওয়া সঙ্গত হয় নাই। আশা করি ব্যবস্থাপক সভায় আইনের আলোচনাকালে এই সকল সামান্য ত্রুটি সংশোধিত হইয়া বিলটি অচিরে আইনে পরিণত হইবে।

—

সম্প্রতি মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কবিরাজী প্র্যাকটিসনার্স বিল নামে একটা আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু সূচনাতেই কবিরাজ সম্প্রদায়ের ঘোর আপত্তি দেখিয়া তিনি সুবিবেচনা পূর্ব্বক এই কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন। কুমার বাহাদুর স্বয়ং যখন বিলটির প্রত্যাহার করিলেন, তখন এ সম্বন্ধে আর আলো-

চনা না করিলেও চলিতে পারিত; কিন্তু কয়েকটি কারণে আমরা ইহার আলোচনার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। আইনের প্রস্তাব হইবামাত্র কবিরাজ মহাশয়গণ যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় নাই; কারণ এই আইন পাশ হইলে, অনেক কবিরাজ-নামধারী ব্যক্তির অন্নে হাত পড়িত এবং মফস্বলের দরিদ্র সম্প্রদায়েরও সমূহ কষ্ট উপস্থিত হইত। পক্ষান্তরে এ কথাও সত্য যে, মফস্বলে কবিরাজ বলিয়া পরিচিত এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কবিরাজীর 'ক'ও জানে না, তাহাদের পেটে বোমা মারিলেও 'ক' অক্ষর বাহির হয় না। তাহারা কবিরাজী ব্যবসায়ে দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে! অনেক স্থলে ২০।২৫ খানা গ্রামের মধ্যেও এইরূপ এক-আধজন হাতুড়ে বৈদ্য ছাড়া অন্য কোনরূপ চিকিৎসকই মিলে না; এবং পল্লীগ্রামের দরিদ্র সম্প্রদায় এই শ্রেণীর লোকের হাতে তাহাদের জীবন-মরণের ভার অর্পণ করিয়া দিনযাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। এরূপ স্থলে কুমার বাহাদুর কবিরাজী প্র্যাকটিসনার্স বিল ব্যবস্থাপক সভার উপস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় স্বদেশ হিতৈষণা-প্রণোদিত হইয়াই কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। তবে তাঁহার এইটুকু ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে, তাঁহার বিলটি বিধিবদ্ধ হইলে, মফস্বলে যে নামমাত্র বৈদ্যশ্রেণী বিদ্যমান আছে, তাহাও লোপ পাইবে; আর সহজে তাহাদের স্থান পূরণের জন্য শিক্ষিত কবিরাজ বা ডাক্তার পাওয়া যাইবে না। এখনও যদিও মফস্বলবাসী দরিদ্র ব্যক্তিরা সুচিকিৎসকের সহায়তা লাভে বঞ্চিত, তবু পীড়িত হইলে হাতুড়ে বৈদ্যের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাহারা যেটুকু চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিতে পারে, আইন হইলে সেটুকু যে তাহারা পাইবে না! তাহাদিগকে এই সামান্য আশা-ভরসায় বঞ্চিত করিয়া লাভ কি? সুতরাং বলিতে হয় এই বিলটি এখন সময়োপযোগী হয় নাই।

—

তবে এ সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয়দিগেরও একটী গুরু কর্ত্তব্য রহিয়াছে। মফস্বলে সুচিকিৎসকের অভাব মোচন করা, হাতুড়ে বৈদ্যদিগের হস্ত হইতে নিরীহ মফস্বলবাসী দরিদ্র সম্প্রদায়ের রক্ষার ব্যবস্থা করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে জানি, অনেক কবিরাজের তামাক-সাজা ভৃত্য বা গাছ-গাছড়া-বাঁটা ভৃত্য ক্রমশঃ নিজের নামের পূর্ব্বে কবিরাজ উপাধি বসাইয়া অবাধে কবিরাজী ব্যবসায় চালাইতেছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা একটু চতুর এবং বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট, তাহারা নামের পূর্ব্বে কবিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না,—নামের শেষে ধন্বন্তরি, কবিচিন্তামণি প্রভৃতি দেবদুর্লভ গালভরা উপাধি জুড়িয়া দেয়। তাহাদের বাচ-বিচার করিবার বা এইরূপ অনধিকার-চর্চ্চা নিবারণ করিবার কোনরূপ ব্যবস্থাই নাই! আইন হইলে এরূপ অব্যবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে নিবারিত হইতে পারিত। কবিরাজ মহাশয়গণ যখন আইনের বিরোধী, তখন অনধিকারীর কবিরাজী ব্যবসায় চালানো নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করা তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য। তাঁহারা ইহা করিতে না পারিলে কাযেই আইনের প্রার্থনা করিতে হইবে। এখন ত অনেক বড় বড় কবিরাজ নিজ গৃহে ছাত্র প্রতিপালন করিয়া তাহাদিগকে কবিরাজী শিক্ষা দিয়া কবিরাজ গড়িয়া তুলিতেছেন। দুই-একটী আয়ুর্ব্বেদীয় স্কুল-কলেজও স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতেও অনেকে শিক্ষালাভ করিতেছেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই প্রায় কলিকাতায় থাকিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া ব্যবসায়ের পক্ষপাতী; মফস্বলে বাস করিয়া ব্যবসায় করিতে অতি অল্প লোককেই প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। ইহা ত ভাল কথা নহে। মফস্বলে বাস করিলে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হয় না, স্বীকার করি; কিন্তু সকলেই কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় করিতে গেলেও ত উপার্জ্জন কমিয়া যাইতে পারে! আর কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে কবিরাজী ব্যবসায় চালাইতে গেলে এই সুমহৎ বৃত্তিটিরই যে কেবল অপমান করা হয় তাহা নহে, অভিজ্ঞতার অভাবে কবিরাজী বৃত্তিটিরও পরিণাম খারাপ হইতে পারে। যে নাড়ীজ্ঞানের জন্য এককালে কবিরাজগণ দেশবিশ্রুত হইতেন, বিজ্ঞাপন-সহায়তায় ব্যবসায় চালাইতে গিয়া কবিরাজ মহাশয়গণের মধ্যে সেই অনন্য-সুলভ জ্ঞান ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছে। কবিরাজের ব্যবসায়ের পক্ষে ইহা সুলক্ষণ নহে। আশা করি, কবিরাজ মহাশয়গণ এই কথাটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং প্রয়োজনানুরূপ

ব্যবস্থা করিয়া আইন-প্রণয়নের অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ যাবৎ যে প্রণালীর শিক্ষা বিতরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা অনেকেরই মনোনীত হয় নাই। প্রথম-প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাবের কিছু মাহাত্ম্য ছিল;—দু'একটা পাশ করা থাকিলে লোকে সমাজে যেমন একটু খাতির পাইত, তেমনি বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পর পাশের খাতিরে কিছু-কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিত। কিন্তু অধুনা বৎসর-বৎসর হাজার-হাজার ছেলে এণ্ট্রান্স, এল-এ, বি এ, এম-এ, অথবা ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ, আই-এস্‌সি, বি-এ, বি-এসসি, এম-এ, এম এস্‌সি পাশ হইতেছে, সুতরাং পাশেরও তেমন আদর নাই, উপার্জ্জনও তেমন হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষার প্রতি লোকের যে তেমন আস্থা থাকিতে পারে না, তাহা বিচিত্র নহে। অন্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এখন বঙ্গদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষার ফলে, আর কিছু না হউক বিবাহের বাজারে বরের দাম যে চড়িয়া উঠিতেছে, এ কথা আজকাল সকলেই জানেন। এমন কি আমাদের বড়লাট বাহাদুর পর্য্যন্ত বক্তৃতায় একথা স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষার এইরূপ অবস্থা দেখিয়াই বড়লাট বাহাদুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন বসাইয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্যাডলার এই কমিশনের সভাপতি বলিয়া ইহাকে কেহ-কেহ 'স্যাডলার কমিশন' নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে "ঢালিয়া সাজা"র প্রয়োজন আপামর-সাধারণ সকলেই অনুভব করিতেছেন এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় কি ভাবে ঢালিয়া সাজিতে হইবে—বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশন তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন—লোকে এইরূপ আশা করিতেছে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়-কমিশন এখন দেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন। বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ শেষ করিয়া এক্ষণে তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছেন। তার পর তাঁহারা সমুদায় ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন করিবেন। তাঁহারা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করিয়াছেন, করিতেছেন এবং আরও করিবেন। তার পর কমিশনের সদস্যগণ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিবেন। পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে আরও দুই এক বৎসর কাটিয়া যাইবে; কারণ কমিশনের রিপোর্ট লইয়া অনেক কথা কাটাকাটি, অনেক আলোচনা, অনেক পত্র ব্যবহার করিতে হইবে। হয় ত বা নূতন আইন রচনা করিবার প্রয়োজনও হইতে পারে।

বিশ্ব বিদ্যালয় কমিশন যাঁহাদের মতামত সংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারা কে কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের মতামত কমিশন গ্রাহ্য করিবেন কি না, তাহাও আমরা জানি না। কিন্তু বিশ্ব বিদ্যালয়ে যখন আমাদেরই ছেলেরা শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং করিবে, তখন তাহাদের ভালমন্দের কথা আমাদিগকেও চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হইবার পর বড় আশা করিয়া দেশের লোকে ছেলেদের তথায় বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সে আশা যে ষোল আনা পূর্ণ হয় নাই, একথা ত অস্বীকার করিতে পারি না; আর তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই বিশ্ব বিদ্যালয়-কমিশন। এখন যখন বিশ্ব বিদ্যালয়টিকে ঢালিয়া সাজিবার কথা হইতেছে তখন বিশ্ব-বিদ্যালয় কিরূপ ভাবে গঠিত হইলে আমাদের মনের মতন হইতে পারে, যে সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলিবার অধিকার বোধ হয় আমাদের আছে। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যাহা নির্দ্ধারণ করিবেন, ভাল হউক, মন্দ হউক, সকলে যেমন তাহা মানিয়া লইবেন, আমরাও তেমনি লইব। তবে পরামর্শের সময় আমাদের কথাটাও বিবেচনা করিয়া দেখা হয়, ইহাই আমাদের অনুরোধ, এবং গৃহীত হউক আর নাই হউক, বিবেচিত হইলেই আমরা যথেষ্ট মনে করিব।

আমাদের প্রস্তাব এই;—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-প্রণালী দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলা হউক। এই দুইটী শাখার একটার নাম হউক "উচ্চ-শিক্ষা" বা

High Education ; আর অপর শাখার নাম হউক অর্থকরী শিক্ষা বা Reproductive Education। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর নাম দেওয়া হইয়াছে উচ্চ-শিক্ষা ; কিন্তু ছেলেরা প্রকৃত পক্ষে চায় অর্থকরী-শিক্ষা। উকীল, ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার হইয়া দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিবে, এই ভাবিয়া ছেলেরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে। যাহারা এতটা পারিয়া উঠে না, অন্ততঃ কেরাণী-গিরি বা স্কুলমাষ্টারির দিকেও তাহাদের লক্ষ্য থাকে। অথচ প্রতি বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় (Convocation) চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলার প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিগণ বক্তৃতায় উচ্চশিক্ষার কত উচ্চ আদর্শ ছেলেদের সম্মুখে ধরিয়া থাকেন। মোট কথা, ছেলেরা উচ্চশিক্ষার নাম করিয়া অর্থকরী-শিক্ষা লাভ করিতে যায় বলিয়া না রাম, না গঙ্গা কিছুই তাহাদের শেখা হয় না। ইহাতে আমরা ছেলেদের বিশেষ কিছু দোষ দেখিতে পাই না। উচ্চ-শিক্ষা এবং অর্থকরী শিক্ষা এই দুইটা বিভিন্ন বিষয় একসঙ্গে জড়াইয়া ফেলাতেই এই অসুবিধাটুকু উপস্থিত হইয়াছে। এই দুইটাকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিলে গোলযোগ অনেকটা কমিতে পারে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যাহাদের অন্নচিন্তা করিতে হইবে না, অর্থোপার্জ্জনের ভাবনা ভাবিতে হইবে না, যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, কেবল তাহারাই নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে উচ্চ শিক্ষা লাভ করুক এবং সেই জ্ঞান দেশের মধ্যে নানা ভাবে বিস্তারের সহায়তা করুক। এই বিভাগটি কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। আর মধ্যবিত্ত কিন্তু জ্ঞানলাভেচ্ছু ছাত্রগণকে গবর্ণমেণ্টই হউন বা দেশের ধনী সম্প্রদায়ই হউন, বৃত্তি দান করিয়া তাহার অন্নচিন্তা দূর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানার্জ্জনের সুযোগ প্রদান করুন। আর দ্বিতীয় শাখায় কেবল অর্থকরী-বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হউক। এই বিভাগে শিক্ষা যেন খুব ব্যয়সাধ্য না হয়। এ বিভাগের ছাত্রেরা চলনসই গোছের ইংরেজী, এবং সে যে ব্যবসায় গ্রহণে ইচ্ছুক, সেই বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষালাভ করুক। এখন কেবল ডাক্তারী, ওকালতী ও ইঞ্জিনীয়ারি অর্থকরী বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। নূতন ব্যবস্থায় আরও অধিকসংখ্যক অর্থকরী বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হউক। আমাদের মনে হয়, এই উপায়ে শিক্ষা-সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে।

আজকাল কংগ্রেস, কনফারেন্স প্রভৃতির কল্যাণে রাজনীতি-ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতব্যাপী একটা চেতনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; সেই সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষে একটী রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রবর্ত্তনের কথাও উত্থাপিত হইয়াছে। জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীকে লইয়া যেমন একটা 'নেশন' গঠনের চেষ্টা হইতেছে; সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য সমগ্র ভারতব্যাপী একটা রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং একটা রাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদের আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রীয় ভাষা ও রাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদের মধ্যে প্রথমটাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। কারণ, পরিচ্ছদ বিভিন্ন প্রকারের হইলেও ততটা আসিয়া যায় না; কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগকে লইয়া একটী নেশন গঠন করিতে হইলে পরস্পরের মনোভাবের আদান-প্রদানের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাগ্রে অনুভূত হয়। অতএব যাঁহারা ভারতবাসীদের লইয়া একটী নেশন গঠনের অভিলাষী, তাঁহাদের মনে একটা রাষ্ট্রীয় ভাষার কথাই যে সর্ব্বাগ্রে উদিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন্ ভাষা ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া গণ্য ও অবলম্বিত হইবার গৌরবের অধিকারী, ইহাই বিবেচ্য। এই প্রসঙ্গে দুইটা ভাষার নাম অনেকের মুখে শুনা যাইতেছে এবং কার্য্যক্ষেত্রে তৃতীয় একটা ভাষা আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষার স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে। প্রথম দুইটা ভারতের নিজস্ব—হিন্দী ও উর্দ্দু ; আর তৃতীয়টি বিদেশী—ইংরাজী। যাঁহারা ঘোর স্বদেশী, হোমরুলের পক্ষপাতী, তাঁহারা কোন দেশীয় ভাষাকেই রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করিতে চাহেন। তন্মধ্যে একদল বলেন, হিন্দীই রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবার উপযুক্ত; অপর দল বলেন, না, ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবার উপযুক্ত কোন দেশীয় ভাষা যদি থাকে, তবে তাহা উর্দ্দু। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ, ইংরাজী আমাদের রাজ-ভাষা। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক—প্রয়োজনানুরোধে ভারতের সর্ব্বত্রই লোককে কিছু না কিছু ইংরাজী শিক্ষা করিতে

বাধ্য হইতে হইতেছে; এবং ইংরাজী যখন শেখাই হইতেছে, তখন অন্য উপায়াভাবে ইংরাজী ভাষাতেই বিভিন্ন প্রদেশবাসীর পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করিতে হইতেছে। অতএব, যাঁহারা নেশন গঠনে কতক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা আপাততঃ ইংরাজীকেই রাষ্ট্রীয় ভাষার আসন দিতেছেন। ইংরাজীর কথা ছাড়িয়া দিলে, কোন্ দেশীয় ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে পারে, আমাদের মনে হয়, তাহা এখন নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। জোর করিয়া কোন ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ভাষার প্রসার বৃদ্ধি অনেকটা প্রকৃতির উপর এবং কতকটা সময়ের উপর নির্ভর করে। ভারতের কোন দেশীয় ভাষার যদি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা একটী মাত্র উপায়ে সাধিত হইতে পারে। যে ভাষায় সাহিত্যের যতটা বেশী উন্নতি হইবে সেই ভাষাই ততটা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিবে। কারণ, উন্নত সাহিত্যের রসাস্বাদনের লোভে বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা সেই ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন। এই জন্যই আমরা মনে করি, যে ভাষায় যত দ্রুত সাহিত্যের উন্নতি হইবে, সেই ভাষাই কালে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষার স্থান লাভ করিতে পারিবে; এবং ইহা সময়-সাপেক্ষ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের দশা এবার কি দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া আমরা কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি। ইষ্টার পর্ব্ব সমাগত-প্রায়, অথচ উদ্যোগ-পর্ব্বের কথা দূরে থাকুক, কাহারও মুখে কোনরূপ উচ্চ-বাচ্যও শুনা যাইতেছে না। ব্যাপার কি? এবার মাতৃযজ্ঞ পণ্ড হইবে না কি? গতবারে বাঁকিপুরের অধিবেশনে ঢাকার প্রতিনিধিরা সম্মেলনকে ঢাকায় নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন; ঢাকায় আসিয়া সম্মেলন কি ঢাকাই থাকিবে, তাহা কি আর খোলা হইবে না? ঢাকা বঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী; ঢাকাবাসী আতিথেয়তায়ও অদ্বিতীয়; তথাপি সম্মেলনের সম্বন্ধে ঢাকা এতটা উদাসীন কেন? শুনিতে পাই, ঢাকার পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত কতকগুলি ভদ্রলোক না কি বলিয়াছেন, যাঁহারা বাঁকিপুরে সম্মেলনকে ঢাকায় নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন, তাঁহারা ঢাকার জনসাধারণের সম্মতি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা নিজের দায়িত্বে যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য ঢাকাবাসী দায়ী হইবেন না। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, ইহা অভিমানের কথা, দলাদলির কথা। যাঁহারা এমন কথা বলিতেছেন, তাঁহাদের এই কথাটি বুঝিয়া দেখা উচিত যে, বাঁকিপুরে ঢাকার প্রতিনিধিরা ঢাকার নাম করিয়া সম্মেলনকে যে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন, এখন ঢাকা সে নিমন্ত্রণ মঞ্জুর না করিলে সমগ্র ঢাকাবাসীর পক্ষেই তাহা লজ্জার কথা হইবে। দলাদলি যদিই থাকে, তবে তাহা আপোষে মিটাইয়া লইয়া সকলের এক-মনে, এক প্রাণে, একত্রযোগে মাতৃপূজার আয়োজন করা কর্ত্তব্য। আর যদি এমন অবস্থাই হয় যে, মিটমাটের কোন সম্ভাবনাই না থাকে, তাহা হইলে সে কথাও তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলুন এবং নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করুন; অপর কোথাও সম্মেলনের অধিবেশন হউক। যাহা হয়, সময় থাকিতে হওয়া উচিত। যদি ঢাকায় অধিবেশন করিবার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে সে কথা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কারণ, অন্য জায়গায় সম্মেলনের অধিবেশন করিতে গেলেও স্থান-নির্দ্দেশ এবং উদ্যোগ আয়োজন করিতে হইবে ত!

উৎকল-সাহিত্য

[শ্রীরমেশচন্দ্র দাস]

উৎকল সাহিত্য—মার্গশির, ১৩২৫

১। "বিবিধ-প্রসঙ্গ"—সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ কর।

(১) "শিক্ষার ব্যবস্থা"—দেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহ প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা অতি শুভ লক্ষণ। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ব্যবস্থা দেশে কোথায়? বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিদের স্থান-সঙ্কুলান হইতেছে না। অন্য কথা থাকুক, কলিকাতার দুইটি বড় বড় কলেজে শিক্ষার্থিনী বালিকাদের স্থানাভাব! বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষালাভ ক্রমশঃ বিশেষ ব্যয়সাধ্য হইয়াছে এবং তাহার উপর অতি কঠোর নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইতেছে। তথাপি স্রোতের গতি অপ্রতিহত বেগে প্রধাবিত। শিক্ষার দ্বার সর্ব্বসাধারণের

প্রতি মুক্ত থাকিলেও কর্তৃত্বটা সম্পূর্ণরূপ সরকারের হাতে। এ অবস্থায় নানা শ্রেণীর শিক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা জন্য সরকার ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ দায়ী। সুতরাং রাজার উপর প্রজাসাধারণের দাবী সমীচীন। কিন্তু এ দাবী ও দায়িত্বের তুলনায় শিক্ষার ব্যয় কি সামান্য! আবার ঐ টাকা হইতে গৃহ, সাজসজ্জা, পরিদর্শন প্রভৃতির খরচ দিয়া প্রকৃত শিক্ষার জন্য আর কি থাকে? এই ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে; কিন্তু নূতন বিদ্যায় প্রতিষ্ঠা বা শিক্ষক ও অধ্যাপক সংখ্যার বৃদ্ধি করিতে অর্থাভাবের প্রবল আপত্তি।

উৎকলে হাইস্কুলের সংখ্যা অতি অল্প, কলেজও মাত্র একটি; প্রতিদিন বর্দ্ধনশীল ছাত্রদের তাহাতে একান্ত স্থানাভাব। বিজ্ঞান বিভাগে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রের ব্যবস্থা থাকায় সম্প্রতি প্রথম বার্ষিক শ্রেণী গঠনে বিশেষ গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা শিক্ষালাভ করিতে ব্যাকুল, অথচ যাহাদের অন্য কোথাও স্থান বা সুবিধা নাই, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার সরকার বা শিক্ষা বিভাগের নাই। এই গুরুতর অভাব পূরণ সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য।

(২) 'হিন্দু মুসলমান'—গত কয়েক বর্ষ হইতে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মুসলমান মধ্যে ধর্ম্মঘটিত বিবাদ সময়ে সময়ে অতি গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থে গো-হত্যাই মূল কারণ। প্রাথমিক মুসলমান আক্রমণকালে এবং কোনও কোনও ব্যক্তির একদেশদর্শিতা বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষফলে যাহা সংঘটিত হইত, কালক্রমে তাহার চিহ্ন বিলুপ্ত হইতেছিল। এবং বহুকাল একত্র বাস হেতু হিন্দু মুসলমান পরস্পরের প্রতি আত্মীয় ও উদার ভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। কি কারণে, লুপ্তপ্রায় বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল? এ দেশ এক সময়ে কেবল হিন্দুর ছিল। আজ ভারত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকলের স্বদেশ। নির্বিবাদে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বীয় আচার অনুসরণ ও অনুষ্ঠান সম্পাদন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে অনেক অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে। দুর্গাপূজায় ছাগ, মেষ, মহিষ বলি যেরূপ ধর্ম্ম, ঈদ উপলক্ষে গোহত্যাও তাহাই। এ ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে কবে লুপ্ত হইবে, তাহা এক বিধাতাই জানেন। এক শ্রেণীর লোক যে কেবল শত শত নিরীহ দেশবাসীর ধনপ্রাণ নষ্ট করিতেছে তাহা নহে, দেশীয় নেতৃ-মণ্ডলীর সর্ব্বপ্রকার মিলন চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছে। ইহারা ধর্ম্মের, দেশের ও মানব-জাতির শত্রু। এই শ্রেণীর লোকের প্রভাব যাহাতে খর্ব্ব হয়, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তির তাহার উপায় বিধান করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

(৩) "আচার্য্য বসুর বিজ্ঞান মন্দির"—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার সমগ্র জীবনের সঞ্চয় পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয়ে বিজ্ঞান-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার পরিপূর্ণতা সাধন নিমিত্ত আরও দশ লক্ষ টাকার আবশ্যক। বোম্বাইর বিখ্যাত ধনী বোমানজী একলক্ষ ও মুলরাজ খাণ্ডাই দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গের ধনকুবেরগণ এ পর্য্যন্ত সে দিকে অগ্রসর হন নাই। এইরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠান ও মহৎ দান দ্বারা জাতি বড় হইয়া উঠে এবং জাতীয় উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষোপ-জীবী জাতি চিরদিন ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ নিম্নস্তরে পড়িয়া থাকে।

দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দ্বারা পাশ্চাত্য জাতিসমূহ উন্নত হইয়া পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করিতেছে। আর আমরা কেবল পূর্ব্বপুরুষের ও কাল্পনিক সত্য যুগের 'দোহাই' দিয়া নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করিতেই ব্যস্ত! সুখের কথা, ক্রমশঃ দেশের লোকদিগের চক্ষু ফুটিতেছে এবং তদনুরূপ কিছু কিছু আয়োজন হইতেছে।

(৪) 'মহরম'—লেখক—শ্রীশশিভূষণ রায়।

মহরম মুসলমানদের প্রধান পর্ব্ব। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ইউফ্রেটিস নদীতীরস্থ বিশাল কারবালা প্রান্তরে যে বিষাদময় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল মহরমে তাহারই স্মৃতি জাগ্রত রহিয়াছে। সেই বিজন মরুপ্রান্তরে নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার যে নগ্ন মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল, নরনারীর মানসপট হইতে আজিও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও এক শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায় এই উৎসব সময়ে হাসান ও হোসেনের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বিষাদে নিজ বক্ষে করাঘাত করিয়া থাকেন। এ দৃশ্য কলিকাতা, হুগলী প্রভৃতি স্থানে বিরল নয়। নিম্নে উক্ত বিষাদময়ী কাহিনীর কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মহম্মদের জামাতা হজরৎ আলীর তিরোধানের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মপ্রাণ এমাম্ হাসান কুফানগরীর অধিবাসী দ্বারা খলিফাপদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু এরাকবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় উক্ত পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া প্রতিপক্ষ মাবিয়র সহিত কয়েকটা সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হন। তাহার মর্ম্ম এই যে, হাসানের জীবিতকাল পর্য্যন্ত মাবিয় খলিফা হইবেন, কিন্তু মাবিয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র এজিদ উক্ত পদ না পাইয়া হাসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন প্রাপ্ত হইবেন। মাবিয় মুসলমান ধর্ম্মের খলিফা হইয়া আলী প্রতিষ্ঠিত কুফানগরী পরিত্যাগ করিয়া ডামাস্কস নগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন; এবং পূর্ব্ব অঙ্গীকার অবহেলা করিয়া আপন পুত্র এজিদকে পরবর্ত্তী খলিফা নির্ব্বাচিত করিলেন। এইরূপে ৭৮০ খৃষ্টাব্দে বিলাসী, মদ্যপায়ী অত্যাচারী এজিদ ডামাস্কস সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মুসলমান-সমাজের প্রধান পুরুষরূপে পরিগণিত হইলেন। কিন্তু বীর, ধার্ম্মিক ও সত্যনিষ্ঠ এমাম্ হোসেন এজিদকে খলিফা বলিয়া স্বীকার না করায় বিবাদ আরম্ভ হয়। কুফাবাসী খলিফার অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ জন্য হোসেনের সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি সপরিবারে ৭২ জন অনুচরসহ কুফা নগরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইতঃমধ্যে এরাকবাসিগণ শত্রুবশীভূত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা না করায় তিনি সঙ্কিতচিত্তে ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম কূলস্থিত কারবালা প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। দেখিতে-দেখিতে এজিদের প্রতিনিধি পাপিষ্ঠ

ওবায়েদুল্লার প্রেরিত একদল সৈন্য হোসেনের শিবির অবরোধ করিয়া হোসেনের অনুচরবর্গকে ইউফ্রেটিস নদীর জল ব্যবহার করিতে বাধা প্রদান করিল।

অতঃপর এজিদের প্রধান সেনাপতি ওমরসাদ হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে তাঁহার অন্যতম সেনাপতি শূরশ্রেষ্ঠ হোর, পয়গম্বর মহম্মদের দৌহিত্রের বিপদ দেখিয়া ৩০ জন মাত্র অনুচরসহ তৎ পক্ষে যোগদান করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে হোসেনের সমস্ত অনুচর নিহত হইলেন। শত্রুশরে জর্জ্জরিত ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া হোসেন জলপান নিমিত্ত নদীর দিকে অশ্বচালনা করিলেন; কিন্তু অগ্রসর হইতে সমর্থ না হইয়া শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুত্রকে আপন ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, হঠাৎ শত্রু নিক্ষিপ্ত একটি তীর আসিয়া শিশুর শরীরে বিদ্ধ হইল ও শিশু যন্ত্রণায় পিতৃক্রোড়েই পঞ্চত্বলাভ করিল। এইরূপে সকল পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করে। তৃষ্ণার্ত্ত হোসেন জলপাত্র মুখে তুলিয়াছেন মাত্র, সেই সময়ে আর একটি শর আসিয়া তাঁহার মুখে বিদ্ধ হইল। ভূমিতে জলপাত্র রাখিয়া তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং যুদ্ধ করিতে-করিতে প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। তাঁহার কর্ত্তিত মুণ্ড ওবায়েদুল্লার নিকট প্রেরিত হইল এবং তিনি সেই মুণ্ডে বেত্রাঘাত করিয়া নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিলেন। এই পাপাত্মার আদেশে হোসেনের বংশ নিহত হয়, কেবল তাঁহার ভগিনী জয়নাব অতিকষ্টে তদীয় একমাত্র পীড়িত পুত্রকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। আলীর বংশধরগণ এই শোচনীয় জীবনান্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হাসান ও হোসেন নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বক্ষে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। মহরম সেই শোচনীয় ঘটনার স্মৃতি উৎসব!

দিদারগঞ্জ যক্ষিণী-মূর্ত্তি

আমরা এইস্থলে যে দুইটী চিত্র প্রদান করিতেছি, ঐগুলি অধ্যাপক সমাদ্দার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটী ৫ ফিট ২ ইঞ্চি প্রস্তর-মূর্ত্তির চিত্র। পাটনা হইতে ছয় মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত দিদারগঞ্জ নামক স্থানে গঙ্গার উপকূলে এই মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটীর বিশেষত্ব এই যে ইহার সর্ব্বাঙ্গে একপ্রকার পালিস (polish) মাখা। কলিকাতা যাদুঘরে এই জাতীয় দুইটী মূর্ত্তি আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার স্পুনারের মতে এই মূর্ত্তি খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহা চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক হইতে পারে। মূর্ত্তিটী সম্প্রতি পাটনার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। ডাঃ বুকানন হ্যামিলটন নামক সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছেন

যে কুমড়াহার (প্রাচীন পাটলিপুত্র) হইতে পাটনার অধিবাসিগণ একটা সুবৃহৎ নারীমূর্ত্তি পাটনায় লইয়া যায় এবং তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে দেবীরূপে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবসই অগ্নিকাণ্ডে সহর ভস্মীভূত হয় এবং মূর্ত্তিটার দেবত্বে সন্দিহান হইয়া অধিবাসীরা উহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। অনুমিত হয় যে অধ্যাপক সমাদ্দার-আবিষ্কৃত মূর্ত্তিটাই সেই মূর্ত্তি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মচারিগণ অনুমান করেন যে বিগত পঞ্চবিংশ বৎসরের মধ্যে এরূপ অভিনব ও মূল্যবান মূর্ত্তি আবিষ্কার হয় নাই। "ভারতবর্ষে"ই সর্ব্বপ্রথম এই মূর্ত্তির আলেখ্য অধ্যাপক সমাদ্দারের সৌজন্যে প্রকাশিত হইল।

ভাবের অভিব্যক্তি

[অভিব্যক্তিকর্ত্তা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] [আলোকচিত্রকর—শ্রীবিমল পাল]

প্রথম প্রণয়

সহসা প্রিয়তমার আবির্ভাবে—

প্রণয় মন্দা

"আঃ—দেখ্‌চ, কাগজটা নিয়ে বসেছি,—তোমার কি সময়-অসময় নেই না কি?"

প্রেম-সঙ্কট

"লোকে দূর করব—তবে ছাড়ব।"

ভয়ানক প্রেম

অপ্রিয় সত্য শ্রবণে—

বাউল

কল্পনাক্লিষ্ট

উন্মাদ বালক নিজের হাতের রুটির টুকরা প্রাণপণে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে;—পৃথিবীশুদ্ধ লোক যেন উহার রুটী কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যস্ত।

গুলিখোর

উঃ! (যন্ত্রণায়)

ব্যর্থতা

অ্যা——(আরামে)

শোক-সংবাদ

৺প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য

আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য আর ইহ-জগতে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রমথনাথ তেমন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন না; তবুও তিনি সাহিত্যিকগণের অপরিচিত নহেন; তাঁহার রচিত 'মিসরমণি বা ক্লিয়োপেট্রা' নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল; তাঁহার কয়েকটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ আমাদের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঁচিয়া থাকিলে তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে পরিচিত হইতে পারিতেন, এ বিশ্বাস আমাদিগের ছিল।

৺ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য

কিন্তু তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে আমাদের কোন আশাই সফল হইল না। কলিকাতা হইতে বহু দূরে ছত্রপুর (রাজপুতানায়) কর্ম্মস্থলে তিনি দেহত্যাগ করিলেন; আমরা একজন অকৃত্রিম, অমায়িক, কর্ম্মী বন্ধু হারাইলাম। প্রমথনাথের সহিত আমাদের 'ভারতবর্ষে'র বিশেষ সম্বন্ধ ছিল; 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের মূলই প্রমথনাথ। সেই কথাটা আজ তাঁহার দেহাবসানের পর আমরা বলিব। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ইভনিং ক্লব (Evening Club) নামে একটী ক্লব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; প্রমথনাথ এই ক্লবের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং ক্লবের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল এই ক্লবের সভাপতি ছিলেন। ইহার পরের কথা সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত 'দ্বিজেন্দ্রলাল' নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "ইভনিং ক্লবের সম্পাদক প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বহুদিন হইতে একটি Club Magazine প্রচার করার কল্পনা ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালকে তিনি সে ইচ্ছা জানাইলে তিনিও তাঁহাকে উৎসাহ দেন। পুস্তক-প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু ক্লবের একজন প্রধান সভ্য ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ওরূপ একখানা কাগজ বাহির করিতে কি রকম খরচ আবশ্যক, তদ্বিষয়ে একটা estimate (আনুমানিক হিসাব) করার ভার হরিদাস বাবুর উপর অর্পিত হয়। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন—এ কল্পনা বৃথা, কেন না এরূপ কাগজ কিছুতেই চলিতে পারে না। তিনি প্রমথ বাবু ও দ্বিজেন্দ্রলালকে বুঝাইলেন যে, 'ক্লবের আর্থিক অবস্থা এমন কিছু নহে যে, তাহা হইতে পত্রিকার কোন সাহায্য সম্ভব; তার উপরে, এরূপ একটা ক্লবের কাগজ বাহিরের দশজনে যে লইবে, সে আশাও দুরাশা। কাজেই, এ ভাবে এ কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা কোন ক্রমেই উচিত বা সুপরামর্শ নহে।' হরিদাস বাবুর মন্তব্যে প্রস্তাবকারীরা মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তখন হরিদাস বাবু তাঁহাদের অত আগ্রহ দেখিয়া, দ্বিজেন্দ্রলালকে কহিলেন যে, 'আপনার এ ইচ্ছা পূর্ণ না হইলেও, আমি কিন্তু আর একটী প্রস্তাব করিতে পারি। আপনি যদি স্বয়ং সম্পাদকত্ব স্বীকার করেন, ত, আমি নিজব্যয়ে, বাঙ্গালা দেশে প্রকাশিত আর সমস্ত মাসিক পত্রের চেয়ে বড় ও আপনারই নামের যোগ্য একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র বাহির করার ভার গ্রহণে সম্পূর্ণ রাজী আছি।' দ্বিজেন্দ্রলাল হরিদাস বাবুর এ কথায় উল্লসিত হইলেন।" প্রমথনাথ এই কার্য্যে একেবারে প্রাণমন উৎসর্গ করিলেন। 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের যাহা কিছু উদ্যোগ-আয়োজন, যাহা কিছু কর্ত্তব্য, সে সমস্ত ভারই প্রমথনাথ গ্রহণ করিলেন; সমস্ত কাজ

প্রমথনাথ একাকী করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন প্রথম সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের পূর্ব্বেই দ্বিজেন্দ্রলাল পরলোকগত হইলেন, তখন একা প্রমথনাথই এই আয়োজনকে সাফল্যদানের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সে সময় তিনি যে প্রকার চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। পূর্ব্ব হইতে এবং দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোকগমনের পর প্রমথনাথ যদি এমন করিয়া অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে একাকী হরিদাস বাবু 'ভারতবর্ষ' প্রচার করিতে পারিতেন কি না, সন্দেহের কথা। প্রমথনাথের ন্যায় কর্ম্মী যুবকের সহায়তা লাভ 'ভারতবর্ষে'র জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। সেই প্রমথনাথ অকালে চলিয়া গেলেন। 'ভারতবর্ষে'র সূচনাতেই আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের জন্য শোক করিয়াছিলাম, আজ আবার 'ভারতবর্ষ' প্রচারের প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী প্রমথনাথের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে হইল। কার্য্যোপলক্ষে প্রমথনাথকে বাঙ্গালা দেশ হইতে বহুদূরে যাইতে হইয়াছিল; কিন্তু সেখান হইতেও প্রমথনাথ 'ভারতবর্ষে'র উন্নতির জন্য যখন যাহা মনে হইত লিখিয়া পাঠাইতেন। 'ভারতবর্ষে'র এমন বন্ধুর বিয়োগে আমরা বড়ই শোকার্ত্ত হইয়াছি। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়গণের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

স্বর্গীয় সার চন্দ্রমাধব ঘোষ

স্বর্গীয় সার চন্দ্রমাধব ঘোষ

গত ২০শে জানুয়ারী, ১৯১৮, রবিবার প্রত্যূষে সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করিয়াছেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত ঘোলঘর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব ছিলেন। পরে হাইকোর্টের পিউনী জজের পদে নিযুক্ত হন। মধ্যে কিছুদিন তিনি অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ-বঙ্গে যে সকল ভদ্রলোক সর্ব্বপ্রথম ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া সেটেলমেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন, রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের একমাত্র পুত্র। চন্দ্রমাধব তদানীন্তন হিন্দু কলেজের ছাত্র। ২১ বৎসর বয়সে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হ'ন। পরে কিছুদিন বর্দ্ধমানে উকীল-সরকারের কার্য্য করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। পরে চন্দ্রমাধব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। তিনি বহু বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অব ল'য়ের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমাধব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হ'ন। পর বৎসর তিনি হাইকোর্টে পিউনি জজের পদে নিযুক্ত হ'ন। ১১ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি সার

ফ্রান্সিস ম্যাক্‌লীন্ কিছুদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিলে সার চন্দ্রমাধব ঐ সময়ে তাঁহার পদে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করেন।

সার চন্দ্রমাধব সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। বঙ্গীয় কায়স্থ সভার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কায়স্থগণের চারি শাখার মিলন হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক আদান-প্রদান কার্য্য চলে—ইহা তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি স্বয়ং বঙ্গজ কায়স্থ হইয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্রের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন।

সার চন্দ্রমাধবের পরলোক গমনে বাঙ্গলার রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষতি যথেষ্টই হইল। এ ক্ষতি পূরণ হইবার নহে। চন্দ্রমাধবের তিন পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর বাঙ্গলার রাজনীতি ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত।

আমরা সার চন্দ্রমাধবের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ।

যে সকল ইউরোপীয়ান নিজগুণে ভারতবাসীর অবিমিশ্র, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন,সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এই ভারতবন্ধু সার উইলিয়ম সম্প্রতি লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। বিলাতে যখন সর্ব্বপ্রথম সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ সেই প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সিবিলিয়ান হ'ন। তিনি বরাবর বোম্বাই প্রদেশে কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তিনি ভারতবাসীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে থাকেন। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই বৎসর পরে তিনি ইহাতে যোগদান করেন। কৃতজ্ঞ ভারতবাসীও তাঁহার সহানুভূতির প্রতিদানে তাঁহাকে দুইবার জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত করেন। মহাত্মা মিঃ হিউম, সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ প্রভৃতি উদারচেতা মহানুভব ইংরেজের সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে কংগ্রেস আজ এতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহস্থল। সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও ভারতবাসীর এবং ভারতবর্ষের হিত-চিন্তায় বিরত ছিলেন না। বিশেষ-বিশেষ রাজনীতিক সঙ্কটকালে ভারতবাসী তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিত, এবং তিনিও সর্ব্বদা সুপরামর্শ দানে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে সুপথে পরিচালিত করিতেন। ভারতবাসী যে এরূপ একজন বন্ধুর সহায়তা লাভে বঞ্চিত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বন্ধুর সহমরণ

কৃষ্ণনগরের সুপরিচিত সরকার-বংশীয় ইন্দুভূষণ সরকার কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু নদীয়ার অন্যতম প্রধান জমিদার বাবু রামদুলাল চেৎলাঙ্গিয়ার মৃত্যুতে বন্ধুবিচ্ছেদ-কাতর হইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে গভীর নিশীথে পরলোকগত বন্ধুর প্রতিমূর্ত্তি এবং পত্রাদি পুষ্পের দ্বারা পূজা করিয়া তিনি নিজের প্রস্ফুটনোন্মুখ জীবন-কুসুমটিও তাঁহারই পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করেন। এই মহাপ্রাণ যুবক দেশের নানাপ্রকার হিতসাধন করিবেন বলিয়া বন্ধুর সহিত সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু বন্ধুর মৃত্যুতে সব আশা ব্যর্থ হইল মনে করিয়া নিদারুণ শোকে প্রাণ-বিসর্জ্জন করেন। মরণের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি দেখা যায় নাই; এমন কি বিষপানের পরও কোনও ছটফটানি বা বিকৃতি লক্ষিত হয় নাই। ইন্দুভূষণ ইণ্ডিয়ান্ ডিফেন্স ফোর্সে নাম লিখাইয়াছিলেন—কিন্তু কৃষ্ণনগর কলেজ ইউনিট্ না হওয়ায় উক্ত সেনাদলে যোগদান করিতে পারেন নাই। ইঁহার চিন্তাপূর্ণ রচনা 'কৃষ্ণনগর কলেজ-ম্যাগাজিনে' কিছু-কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। কলেজ এবং সহরের যাবতীয় সৎকার্য্যে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কৃষ্ণনগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই যুবকের জন্য দুঃখিত। আমরা ইন্দুভূষণের পরলোকগত আত্মার মঙ্গল কামনা করি। ভগবান তাঁহার বিধবা মাতাকে ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তি দান করুন।

হাসি ও অশ্রু

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য, বি-এ]

নলিনদের বাড়ী আমাদের যে আড্ডা বসে, তাহাকে অনায়াসে বনিয়াদি বলা যাইতে পারে। আমরা সবাই, কেহ প্রবেশিকা-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, কেহ বা তাহাতে ভরাডুবি হইয়া, যখন কলিকাতা এবং নানা দিগ্‌দেশে চাকরি ব্যাপার উপলক্ষে চলিয়া গেলাম, নলিন তখন নিশ্চিন্ত আরামে দেশেই বসিয়া রহিল। তাহার পিতা যে বিষয় রাখিয়া গিয়াছেন, এবং মায়ের হাতে যে নগদ টাকা আছে, তাহা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে সে অনেক জনকে চাকরী দিতে পারিবে; সুতরাং সে কেন অপরের চোখ-রাঙানি সহিতে যাইবে?

আমাদের কাহারও মাসিক বেতন ২৫৲, কাহারও ৩০৲ (অবশ্য ৫০৲।৬০৲ ও ২।১ জনের ছিল) হইলেও, যথাসময়ে এক-একটী ভাগ্যবতী আসিয়া আমাদিগকে পতিপদে বরণ করিয়া লইলেন। প্রথমে আমরা মাসে দুইবার বাড়ী আসিতাম। যে সময় হইতে কনসেসন্ টিকিট আরম্ভ হইল, তখন হইতে আমরা প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া বাড়ী আসা আরম্ভ করিয়া দিলাম। এই পুণ্যে যে রেলওয়ের অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; আপাততঃ ত প্রচুর অর্থলাভ হইতেছে; এবং শুনিয়াছি, অর্থ হইলেই স্বর্গ হয়; যেহেতু কিছু বেশী টাকা দিয়া পূর্ব্বাহ্ণে স্বর্গের খানিকটা জায়গা রিজার্ভ করিয়া রাখিলে স্বর্গবাস রোধ করে কে?

নলিন ইতঃপূর্ব্বেই খাসা বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছিল। আগে সে একটু মুখচোরা ছিল; কিন্তু নববধূ গৃহে আসার পর হইতে তাহার মুখ ও বুক দুই-ই খুলিয়া গেল।

একদিন সে বলিল—"ভাই, তোমরা ত কল্‌কাতা থেকে এসে কেউ এখানে কেউ ওখানে বস, শনি-রবিবার আমার ওখানে বসা ঠিক করে ফেল না কেন? আমি গান-বাজনার সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।"

শাস্ত্রে বলে—'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরং'—নলিন যখন এমন অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী হইয়া পড়িল, আমরা তাহাকে উৎসাহ দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলাম না। তাহার পরদিন হইতেই আমরা তাহার স্কন্ধে ভর করিলাম।

শনি ও রবিবার রাত্রে গান হইত ও গল্প চলিত। বাড়ীর ভিতর হইতে চা ও পান প্রত্যহ যথাসময়ে আসিত এবং মাঝে-মাঝে লঘু জলযোগের ব্যবস্থাও হইত।

একদিন নলিন ভাবাধিক্যে বলিয়া ফেলিল- তাহার স্ত্রী বড় গান ভালবাসে; তাহার অনুরোধেই সে আমাদের এখানে ডাকিয়াছে। তখন বুঝিলাম, অন্তরালে এক সোণার কাঠি কার্য্য করিতেছে; তাহার স্পর্শে নলিনের নীরস হৃদয়ও মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই হইতেই এখানে আমাদের নিয়মিত আড্ডা বসে।

(২)

আশ্বিন মাসে পূজার কয়দিন একাদিক্রমে দেশে থাকিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। অষ্টমীর দিন সন্ধ্যাকালে আমরা সকলে নলিনের বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি; ললিত বলিল—"ওহে, আজ মহা-অষ্টমী, আজ তোমাদের এক জায়গায় নিয়ে যাই চল। সেখানে এমন গান শুন্‌তে পাবে যা কখন শোন নি; দ্বিজেন বাবুর হাসির গান তার কাছে হার মানে।"

প্রভাত বলিল—"এখানে আবার কে হাসির গান গায় হে?" ললিত উত্তর দিল—"তোমরা সকলেই তাঁকে চেন, অথচ তিনি যে গান গাইতে পারেন, সেইটে জান না। আর তাঁর মজা হচ্ছে এই যে, তিনি গান বাজনা আদৌ জানেন না, অথচ তাঁর বিশ্বাস তিনি একজন মস্ত ওস্তাদ। বাজান আবার এক পচা বেহালা—অথচ কি ক'রে টিপ ধরতে হয় তাও জানেন না; শুধু ছড় চালান। আমি একদিন সেখানে গিয়ে পড়েছিলাম, শেষে হাসতে হাসতে মরি আর কি! যারা তাকে নিয়ে মজা করে, তারা এমন গম্ভীরভাবে থাকে এবং এত ভক্তি দেখায় যে, তা দেখ্‌লে হাসি রাখা আরও দায় হয়ে ওঠে।"

আমরা সকলেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"লোকটী কে বল ত?"

ললিত বলিল—"হরিশ চক্কত্তি।"

আমরা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম—"বল কি! তিনি

যে রীতিমত গম্ভীর লোক। তাঁর যে মাথায় কোন গোলমাল আছে, তা ত মোটেই বিশ্বাস হয় না।".

ললিত—"না–আর সব বিষয়ে ও অন্য সময়ে যেমন লোকে স্বাভাবিক হয়ে থাকে তেম্‌নি। কেবল রাতে গান-বাজনা নিয়ে পড়লেই, মাথায় যেন কি এসে চাপে। কেউ-কেউ যেমন রাতকানা হয়, এও প্রায় অনেকটা তেমনি।"

আমরা তখনি সেখানে যাওয়া স্থির করিলাম। ললিত বলিল—"চল, এই বেলা যাওয়া যাক্। কিন্তু কিছুতেই কেউ যেন হেসে ফেল না। তাহ'লে কিন্তু রসভঙ্গ হয়ে যাবে।"

আমরা তথাস্তু বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

(৩)

আমরা যখন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম, তখন তিনি জনকয়েক ভদ্রলোকের সহিত গল্প করিতেছিলেন। ললিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল—"খুড়ো মহাশয়, আজ আমরা অনেক আশা করে এইছি। আপনার গান ২।১টা দয়া করে আমাদের শোনাতে হবে।"

চক্রবর্ত্তী আমাদের বসিতে বলিয়া উত্তর দিলেন—"আমি আর কি এমন জানি বাপু, যে, তোমাদের শোনাব।"

ললিত সবিনয়ে বলিল—"আজ্ঞে আপনি জানেন না, ত, এদেশে আর কে জানে? আমাদের এ দিকের লোক সবাই ত আপনাকে ওস্তাদ বলে মানে।"

চক্রবর্ত্তী একটু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তা বাবা, তোমরা যখন এয়েছ, একটা বাগেশ্রী শুনে যাও" বলিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থিত বেহালাখানি তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুলি দিয়া একজোড়া বাঁয়া-তবলা দেখাইয়া বলিলেন—"শরৎ, একটু সঙ্গত কর ত।" বেহালাখানি জীর্ণ এবং ভগ্নপ্রায়; বাঁয়া-তবলাও তদ্রূপ। ক্ষিপ্র-হস্তে বেহালায় গোটাকয়েক মোচড় দিয়া চক্রবর্ত্তী সঙ্গতকারীকে উপদেশ দিলেন—"বাজাও আড়াঠেকা।"

তাঁহার এক ভক্ত বলিলেন—"সা, রে, গা, মা টা এক-বার শুনিয়ে দিলে হ'ত না।"

"তা মন্দ কি, তাই হোক্" বলিয়া তিনি সা রে গা মা আরম্ভ করিলেন। আলাপ শুনিয়া আমরা ত স্তম্ভিত! তাঁহার সেই উচ্চকণ্ঠের 'সা', নিম্নস্বরে 'রে', দাঁতে-দাঁতে চাপিয়া 'গা' এবং খাদের 'মা' উচ্চারণ শুনিয়া হাস্য-সম্বরণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার সহিত বেহালার ছড়ের যদৃচ্ছ চালনা দেখিয়া জনকয়েক হাসি চাপিতে না পারিয়া ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

আমি চুপি-চুপি ললিতকে বলিলাম—"এঁকে এ অবস্থায় দেখ্‌লে, এঁর যে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, সে বিষয়ে, আর কোন সন্দেহই থাকে না।"

ললিত বলিল—"আবার সকালবেলা দেখো—কোন বালাই নাই, যেন এ মানুষই ন'ন্।"

এদিকে সা রে গা মা আলাপ শেষ হইল।

চক্রবর্ত্তীর তখন প্রচুর সম্মান; কেহ তাঁহার তামাক সাজিতে বসিয়া গেল; কেহ কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল। ললিত পাখা লইয়া বাতাস আরম্ভ করিল। চক্রবর্ত্তীর মুখে প্রসন্ন হাস্য। বুঝিতে পারা গেল, তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে—তিনি সকলকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

একজন বলিল "এই রকম ক'রে সুর না সাধলে কি গান হয়।" চক্রবর্ত্তী খুব গৌরবের সহিত বলিল—"হবে কোত্থেকে। এই ত হ'ল আসল জিনিস। এই যে 'সা'—" বলিয়া তিনি সুর-সহযোগে বর্ণনা আরম্ভ করিলেন—

"'সা—আ—আ,—এ হচ্ছে নারায়ণের কণ্ঠের ধ্বনি, এর স্থান হচ্ছে জিহ্বা থেকে কণ্ঠ। 'রে—এ—এ' হচ্ছে সূর্য্যদেবের রথের শব্দ, এর স্থান হচ্ছে কণ্ঠ থেকে কণ্ঠ। 'গা' হচ্ছে গাধার আওয়াজ—এ কণ্ঠ থেকে যাচ্ছে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত। তার পর 'মা',—মা হচ্ছে মহাদেব আর ময়ূর। 'পা—পা' এ হচ্ছে কোকিল আর লক্ষ্মীর স্বর; এই দেখ 'পা—পা—"

অমনি একজন বলিয়া উঠিল—"কু-উ, কুউ—বাঃ ঠিক একেবারে কোকিলের পঞ্চম স্বর।"

চক্রবর্ত্তী সগর্ব্বে বলিলেন—"তা না হলে মিলে যাবে কোথায়?"

অপর একজন বলিল—"ওস্তাদজী এবার বাগেশ্রী হোক্।" তৎক্ষণাৎ বাগেশ্রী আরম্ভ।

"বসিয়ে কি করিস রে মন ছাড়ল যে তোর পারের তরী
বেলাবেলী বার করে দে ও তোর হরিনামের—
খেয়ার কড়ি।"

এই গান নানা ভঙ্গে চলিতে লাগিল। গানের সহিত দ্রুত শিরশ্চালন। বেহালার টিপ ধরা নাই—শুধু ছড়

অবিরাম চলিতেছে। মিনিট ২০ পরে চক্রবর্ত্তীর গীত সমাপ্ত হইল। চারিদিকে বাহবা পড়িয়া গেল।

ললিত সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, খুড়োমশায়, এ সব সুর আপনার কোত্থেকে শেখা ?" চক্রবর্ত্তী বলিলেন —"আমি বাবাজী কারো কাছে সাক্‌রেদী করিনি। আমার সব উড়িয়ে নেওয়া। উড়িয়ে নেওয়ার অর্থ হ'চ্ছে দূর হ'তে একবার শুনে সঙ্গে সঙ্গে শিখে নেওয়া।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"অদ্ভুত ক্ষমতা !"

চক্রবর্ত্তী বেশ তৃপ্তি অনুভব করিয়া বলিলেন—"দেখ বাবা, আমার কাছে তান্‌সেনের একখানা বই ছিল; কি ক'রে সেখানা হারিয়ে গিয়েছে। দেখ, সুর প্রথমে মহাদেবের কাছে থাকে; পরে মহাদেব ব্রহ্মাকে দেন। ব্রহ্মা তিন জনকে দেন—একজন নারদ, একজন হনুমন্ত, বাকী একজনের নাম আমি ভুলে গিইছি।"

একজন একটু স্মরণ করিবার ভাণ করিয়া খুব বিনয়ের সহিত বলিল—"আর একজন বোধ হয় জাম্বুবান।"

চক্রবর্ত্তী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই বটে !"

"এরা একটু নবা, এবার সেই গানটা হোক"—বলিয়া এক ভক্ত তাঁহার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার অর্থ এই যে, 'সেই গানটা' শুনিলে ইহারা একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িবে।

সেই গান আরম্ভ হইল। তাহার বুঝা গেল কেবল— "মেরি মিঠি খিলি।" সঙ্গে অবিশ্রান্ত বেহালা ও নির্ব্বিচারে সঙ্গৎ চলিতে লাগিল।

ললিত একটা বালিস লইয়া শুইয়া পড়িল। বলিল— "খুড়ো মশায়, আসল সুরের কাজই এই। এর এমন একটা মাদকতা যে, সমঝ্‌দার লোক একটু না ঝিমিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না।"

গান শেষ হইলে চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"এবার তোমাদের উদারা মুদারা তারা শুনিয়ে দিয়ে শেষ করে দিই।"

উদারার বিকট চীৎকার সাঙ্গ করিয়া ভয়াবহ মুদারা আরম্ভ করিতেছেন, চারিদিকে গুপ্ত হাসি ও প্রকাশ্য বাহবার বিরাম নাই, এমন সময় একটা ৭ বছরের ছেলে আসিয়া বলিল—"মামা, মামীমা ডাক্‌ছেন, বাড়ী ভিতর একবার আসুন।"

চক্রবর্ত্তী তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"সে পরে হবে 'খন। আমি ত বলে দিইছি, গানের সময় আমাকে যেন বিরক্ত করা না হয়।" বালক বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। মুদারা পুরাদমে চলিতে লাগিল; চক্রবর্ত্তীর মাথা ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম হইল, এমন সময় আবার বালকটী আসিয়া বলিল—"মামা, আসুন আপনি একবার, মামীমা বড় কাঁদছেন।"

চক্রবর্ত্তীর মুদারা তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল।

"আমি গান গাইলেই কেন সে কাঁদে—আমি গান গাইলেই কেন সে কাঁদে"—বলিতে-বলিতে তিনি একবার বাড়ীর ভিতর গেলেন। ললিত আমাকে টানিয়া লইয়া দুয়ারের দিকে গেল। দুয়ারের ফাঁক দিয়া দেখি, চক্রবর্ত্তী উঠানে নামিতেই, একজন স্ত্রীলোক তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল। আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম—"ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি গান গেও না। ওরা অমন করে হাস্‌ছে, ঠাট্টা কর্‌ছে, তুমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছ না।"

আমাদের সমস্ত আনন্দ, সকল উৎসাহ এক মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কে জানিত এই অনাবিল হাস্য-রাশি মুহূর্ত্তমধ্যে এমন করিয়া অশ্রুজল-পঙ্কিল হইয়া উঠিবে! যাহাকে নির্দ্দোষ পরিহাস মনে করিয়াছিলাম, তাহা যে অন্তরালের একজন নিরপরাধাকে নির্ম্মম ভাবে আঘাত করিয়া এমন হিংস্র আকার ধারণ করিবে—তাহা ত ভাবি নাই!

সাজাহান

(প্রতিবাদ)

[শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র]

বিগত পৌষসংখ্যার "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত এব্রাহিম খাঁ বি-এ মহাশয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের "সাজাহান" নাটকের সমালোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইহার প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি ইতিহাস সম্মত হয় নাই। লেখক মহাশয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের বহু পরিশ্রম ও গবেষণার ফল "History of Aurangzib" গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই সমালোচনা করিয়াছেন, একথা প্রবন্ধের পাদ-টীকায় সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। "ইতিহাসের ব্যভিচার করিয়া যদি এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের অতীতের কল্পিত কলঙ্ক-কাহিনী প্রচার করেন, তবে তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হয়"—একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু তিনি যে লিখিয়াছেন, "হিন্দু দ্বারা মুসলমানের কল্পিত কলঙ্ক-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পক্ষে বহু অন্তরায়ও ঘটিয়াছে" —ইহা কতদূর নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহাই আমরা আলোচনা করিব। দ্বিজেন্দ্রবাবু তাঁহার নাটকের ঐতিহাসিক মুসলমান চরিত্রসমূহ যে ইতিহাসের সহিত যথাসাধ্য সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই দেখাইতেছি।

খাঁ সাহেবের প্রবন্ধটী পাঠ করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, যদুবাবুর "History of Aurangzib" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডখানি তাঁহার দেখিবার অবসর হয় নাই। এই তৃতীয়খণ্ড আলোচনা করিলে তাঁহার প্রবন্ধ এরূপ যুক্তির পথ অনুসরণ করিত না। আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে মনে হয়, লেখক মহাশয় আলোচ্য প্রবন্ধে সর্ব্বস্থলে দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রতি সুবিচার করেন নাই। এখন দেখা যাউক, তাঁহার উক্তিগুলি সত্যের নিকষ-পাথরে যাচাই করিলে কতদূর টিকে।

দ্বিজেন্দ্রবাবু তাঁহার "সাজাহান" নাটকে আওরঙ্গজীব যে "অদম্য রাজ্যলিপ্সাকে ধর্ম্মের আবরণে ঢাকা দিতে নিষ্ফল প্রয়াস" পাইয়াছিলেন, তাহা দেখাইতেছেন। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, দ্বিজেন্দ্রবাবু আওরঙ্গজীবের যথার্থ চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু খাঁ সাহেব তাহা স্বীকার করেন না। তিনি আওরঙ্গজীবের চরিত্র-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"বীরত্ব ও শাঠ্য এক ঘরে বাস করে না। ইতিহাসের দিক্ হইতে, এবং কবির নিজ চিত্রে, আওরঙ্গজীবের উপর সুবিচার হয় নাই।" অর্থাৎ তাঁহার মতে আওরঙ্গজীব বীরত্বের আদর্শ—শঠতা ও নীচতার লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না, বা থাকিতে পারে না। লেখক মহাশয় যদি "History of Aurangzib" গ্রন্থখানি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহার প্রথম খণ্ডেই দেখিতে পাইতেন যে, আওরঙ্গজীবের বাহিক ধর্ম্মভাব কেবল তাঁহার স্বার্থাকাঙ্ক্ষার আবরণ মাত্র। "Indeed so wholly did Murad enter into Aurangzib's policy of throwing a religious cloak on their war of personal ambition." (History of Aurangzib, Vol. I, Pp. 328.) এতদ্ব্যতীত আওরঙ্গজীব যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার শিশুপুত্র অজিত সিংহের প্রতি যে দুর্ব্যবহার ও কপটাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। "He proclaimed Ajit Singh to be a counterfeit prince, and for many years cherished a beggar boy in his Court under the significant name of Muhammadi Raj as the true son of Jaswant! (Anecdotes of Aurangzib, pp. 13-14.)।

"সাজাহানের" ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি যে কতদূর অনৈতিহাসিক হইয়াছে, তাহা দেখাইতে গিয়া লেখক আওরঙ্গজীব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"তিনি দরবেশ হইয়া

অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ধর্ম্মালোচনায় রাজকার্যের ক্ষতি হইতে লাগিল। পুত্র যৌবনে যোগী সাজিয়াছেন, এ সংবাদে শাহ্‌জাহান মর্ম্মাহত হইলেন; এমন কি, রাগ করিয়া ফেলিলেন; এবং তাঁহাকে সুবেদারী হইতে 'পদচ্যুত করিলেন।" এই ব্যাপারটী লেখক আবদুল হামিদের রাজকীয় বিবরণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু "যৌবনে যোগী সাজা" আরঙ্গজীবের পদচ্যুতির যথার্থ কারণ নহে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা ক্রমশঃ সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া আরঙ্গজীব সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ে বিদ্বেষ ও সংশয়ের বীজ বপন করিতেছিলেন। সূক্ষ্ম ও বহুদর্শী আরঙ্গজীব ইহাতে রুষ্ট হইয়া স্বয়ং পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের কারণ ১৬৫৪ খৃঃ অব্দে ভগিনী জাহানারাকে অনুযোগ করিয়া লিখিত একখানি পত্রে আরঙ্গজীব স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন,—

"Ten years before this I had realised this fact and known my life to be aimed at by my rivals, and therefore I had resigned my post." (History of Aurangzib, Vol, I, p. 77.) এ সম্বন্ধে অধ্যাপক যদুবাবুর উক্তিও উদ্ধৃত হইল,—"A literal interpretation of a Persian phrase (manzavi ikhtiar kardan) has given rise in some English histories to the myth that young Aurangzib turned hermit in a fit of religious devotion. The fact is that at this time he felt no religious call at all; his motive was political, not spiritual: he merely resigned his office, but did not actually take to a hermit's life." (History of Aurangzib, Vol. I, pp. 78.)

আরঙ্গজীবের চরিত্র-প্রসঙ্গে লেখক মহাশয় অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন,—"রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পিতাকে রাজকার্য্য হইতে দূরে নজরবন্দী করিয়া রাখিতে হইত,—ইহারই নাম পিতৃবন্দী।" 'নজরবন্দী' কথাটী ব্যবহার করায় আমাদের আপত্তি আছে। শাহ্‌জাহান জীবনের অবশিষ্ট কাল কঠোর কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। যিনি একসময়ে শাহানশাহ ছিলেন, সেই শাহজাহান এই কারাবাসে পুত্রের কথা দূরে থাক, খোজা প্রহরীগণ কর্ত্তৃকও নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, (History of Aurangzib, Vol. III, Pp. 150)। আরঙ্গজীবের পিতার প্রতি দুর্ব্যবহার কেবলমাত্র নৈতিক দোষদুষ্ট নহে, ইহাতে সামাজিক শিষ্টতারও ব্যভিচার হইয়াছিল। যদু বাবু সত্যই লিখিয়াছেন—

(১) Aurangzib's treatment of his father outraged not only the moral sense but also the social decorum of the age. Rebellion against a reigning father was the curse of the Mughal Imperial family. Jahangir had risen against Akbar's government and Shah Jahan against that of Jahangir. They had unhesitatingly encountered and even slain their father's generals or rival brothers, but shrunk from facing their fathers in battle. At the arrival of the Emperor in person the the rebellious Prince had either made his submission or fled in shame. But Aurangzib's ambition had ridden over decency and the established conventions of society. Hence he now came to be execrated by the public as a bold bad man without fear, without pity, without shame.

To recover public respect, he had to pose as the champion of Islamic orthodoxy, as the reluctant and compelled instrument of the divine will in a mission of much-needed religious reform. Hence he displayed extreme zeal in restoring the ordinances of pure Islam and removing heretical innovations that the people might forget his past conduct as a son and as a brother, till at last his Court historian could write of him, "His imperial robe of state thinly veiled the *darvish's* frock that he wore beneath it." (M. A. 333)

আরঙ্গজীবের হিন্দুবিদ্বেষ সম্বন্ধে লেখক মহাশয় বলিয়াছেন,—"তাঁহার চরিত্রে সার্ব্বজনীন হিন্দুদ্বেষ আরোপ করিতে পারি না," এবং "সাহাজান" নাটকে "তাঁহাকে যেরূপ হিন্দুবিদ্বেষীরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুগণের আরঙ্গজীবের উপর ব্যক্তিগত ঘৃণাসঞ্চার ভিন্ন মুসলমানের উপর সাধারণভাবেও একটা জাত-ক্রোধের ভাব জাগাইয়া তুলিবে।" লেখকের বক্তব্য পড়িয়া মনে হয়, তিনি সুবিচার করিয়া কথাগুলি বলেন নাই। পরন্তু তিনি আরঙ্গজীবের চরিত্রের মসীলিপ্ত অংশ 'চুণকাম' করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা ঐতিহাসিকের পক্ষে সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। 'History of Aurangzib' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে "Temple Destruction" বা মন্দির ধ্বংস নামক অধ্যায়ে যদুবাবু দেখাইতেছেন যে, সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে ও পরে সম্রাট্ আরঙ্গজীব কাশী, মথুরা, মেবার, সোমনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থানের অগণিত হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে; বিগ্রহগুলির দুর্দ্দশা সম্বন্ধে "মাসির-ই-আলমগীরী" (১৭৫ পৃষ্ঠা) নামক মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, রত্নালঙ্কার ভূষিত প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য বা অন্যান্য ধাতব মূর্ত্তিসমূহ মুসলমানের পদদলিত হইবার জন্য জুম্মা মস্‌জিদের প্রাঙ্গণ ও সোপানতলে নিক্ষিপ্ত করিবার আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার পর জিজিয়া-করের কথা। রাজ্যে এত প্রজা থাকিতে কেবলমাত্র হিন্দুর উপর জিজিয়া-করের ব্যবস্থা হইল কেন? আরঙ্গজীব হিন্দুদের তীর্থস্থানের উৎসব নিবারণ ও তাহাদিগকে সরকারী কার্য্যপ্রাপ্তির অধিকার-চ্যুত করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে "মাসির-ই আলমগীরী" গ্রন্থে (৫২৮ পৃষ্ঠা) লিখিত হইয়াছে;—"By one stroke of the pen Aurangzib dismissed all the Hindu writers from his service." তাঁহার পুত্র মুহম্মদ আজাম কোনও হিন্দুকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে আরঙ্গজীব প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"Why do you recommend a Hindu to be appointed vice a Muslim knowing it to be opposed to my wishes." (Ruqat No—33). দেওয়ালী ও হোলি উৎসব সম্বন্ধে আরঙ্গজীবের নিষেধাজ্ঞা এইরূপ ছিল;—"ordered to be held only outside bazars and under some restraints." (History of Aurangzib, Vol. III. Pp. 318).

এইগুলিকে যাঁহারা আরঙ্গজীবের হিন্দুপ্রীতির নিদর্শন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে আর আমাদের কোনও কথা বলিবার নাই। লেখক যে যদুবাবুকে বিশেষজ্ঞরূপে গ্রহণ করিয়া আরঙ্গজীবের "সার্ব্বজনীন হিন্দুদ্বেষের" সাফাই গাহিয়াছেন, সেই যদুবাবুই আরঙ্গজীবের ভীষণ হিন্দুবিদ্বেষ সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—"Fierce as was Aurangzib's hatred of the Hindus." (Anecdotes of Aurangzib, Pp. 16)। এ সম্বন্ধে আমরা আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না। সম্রাটের হিন্দুবিদ্বেষের বিস্তারিত বিবরণ যাঁহারা জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা "Anecdotes of Aurangzib, pp. 11, 12" ও "History of Aurangzib, Vol. III. Chap. XXXIV.—The Islamic State Church in India"—পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

তার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমবাবুর 'রাজসিংহে' রৌশনারা ও জেবন্নিসার পুষ্পে পুষ্পে বিহারিণী স্বাধীনা ভ্রমরীর ন্যায় অবাধ ব্যভিচার, × × × × 'রিজিয়ায়' রিজিয়ার পৈশাচিক প্রণয়পিপাসা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক।" সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র জেবুন্নিসার চরিত্র মসীবর্ণে চিত্রিত করায় অনেক মুসলমানেরই অপ্রিয় হইয়াছেন। কিন্তু সেজন্য মুসলমানগণই প্রকৃত প্রস্তাবে দায়ী। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কয়েকজন মুসলমান উর্দ্দু গ্রন্থকারই সর্ব্বপ্রথমে জেবুন্নিসার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন,—বঙ্কিমবাবু তাহা অবলম্বন করিয়া ভদ্রভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। এ সকল বঙ্কিমবাবুর নিজের সৃষ্টি নহে।

লাহোরের মুন্সী অহমদুদ্দীন বি-এ মহাশয়ের তথাকথিত জেবের জীবনচরিত "দুরর্-ই-মক্তুম" নামক গ্রন্থ বর্ত্তমানে প্রচলিত (এই গ্রন্থকার আবার পুস্তকরচনাকালে মুন্সী মুহম্মদুদ্দীন খালিকের "হাইয়াৎ-ই-জেব্-উন্নীসা" নামক কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন)। বার্ণিয়ার (p. 13) জাহানারার নির্ম্মল চরিত্রে যে কলঙ্ক

আরোপ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত উর্দ্দু গ্রন্থকার কর্তৃক তাহা জেব-চরিত্রে আরোপিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে; ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে, বার্ণিয়ার না কি এই সকল কলঙ্কমূলক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু যখন উপন্যাস লিখেন, তখন দেশে ইতিহাসের আদর হয় নাই। অধুনা মোগল-ইতিহাসের যে সমস্ত নব' নব উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎকালে তাহা ছিল না। তখন মানুসী, বার্ণিয়ার, টিভার্ণিয়ার, হুইলার প্রভৃতিই একমাত্র অবলম্বন ছিল। সুতরাং বঙ্কিমবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যে "কল্পিত অনৈতিহাসিক" একথা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? জেব-উন্নিসার চরিত্রে মসীলেপন করায় যদি কাহারও অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ দায়ী উর্দ্দ নভেল লেখকগণ। হিন্দুলেখকগণের পক্ষে মুসলমানযুগের ইতিহাসের জন্য মুসলমান লিখিত বিবরণের উপর আস্থা স্থাপন করাই স্বাভাবিক। সুতরাং যাঁহারা বঙ্কিমবাবুকে এ বিষয়ে দোষী করেন, তাঁহারা তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়া থাকেন।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম-এ মহাশয়ের উপাদান অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় জেব উন্নিসার কলঙ্ককালিমা ক্ষালন করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। (ভারতবর্ষ-১৩২৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধটী মুসলমানসমাজের মুখপত্র "আল্ ইস্লাম" পত্রে (১৩২৩—পৌষ সংখ্যা) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার পরও কি লেখক মহাশয় বলিতে চাহেন যে, হিন্দুসাহিত্যিকগণ কর্তৃক লিখিত মুসলমান যুগের ইতিহাসের কথা কেবলই বিদ্বেষবিজৃম্ভণ ও সাম্প্রদায়িক কুৎসা-রটনায় পূর্ণ?

ইহার পর রোশেনারার চরিত্রদোষের কথা। সেজন্য বার্ণিয়ার দায়ী। কিন্তু সম্প্রতি অন্যান্য উপাদান আবিষ্কৃত হওয়ায় বার্ণিয়ারের অনেক কথাই অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রোশেনারার চরিত্র-দোষের কথাও বঙ্কিমবাবুর স্বকপোলকল্পিত নহে।

লেখক মহাশয় রিজিয়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"রিজিয়া এক নীচ-কুলোদ্ভব ওমরাহকে ভালবাসিয়াছিলেন—ইতিহাসে এরূপ পাওয়া যায়। * * * * ছোটর সঙ্গেও পবিত্রতম ভালবাসা হইতে পারে; রিজিয়ার ভালবাসা যে পবিত্রতম ছিল না, তেমন কোনও প্রমাণ নাই।" বহুগুণ-সমন্বিত রিজিয়ার চরিত্রে চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় দোষ ছিল—অশ্বশালার আবিসিনীয় অধ্যক্ষ মালিক জমাল-উদ্দীন ইয়াকুতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যখন বেগম হস্তী বা অশ্বে আরোহণ করিতেন, সেই সময়ে তিনি বেগমকে ধরিয়া উঠাইয়া দিতেন। বদাউনি আবার ইহাকে অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিয়াছেন যে,—"When she mounted an elephant or horse, she *leant upon* him." টমাসের "Pathan Kings of Delhi" নামক গ্রন্থেও স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, "It was not that a virgin queen was forbidden to love—she might have indulged herself in a submissive Prince-consort, or revelled almost unchecked in the dark recesses of the Palace Harem, but wayward fancy pointed in a wrong direction, and led her to prefer a person employed about her Court (he was Amir i-Akhur, or Lord of the Stables—Master of the Horse—a high office only conferred upon distinguished persons), an Abyssinian moreover, the favour extended to whom the Turki nobles resented with one accord." সর্ব্বদিক বিবেচনা করিয়া মনে হয়, রিজিয়ার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল না। সুতরাং রিজিয়ার চরিত্রদোষ একেবারে অনৈতিহাসিক নহে। "তবকাৎ-ই-নাসিরী"-প্রণেতা মিনহাজ-উস্ সিরাজ রিজিয়ার চরিত্র-দোষের কথা লেখেন নাই। তাঁহার পক্ষে এ কলঙ্কের কথা লেখা অসম্ভব; কেন না তিনি রিজিয়ার অনুগৃহীত ব্যক্তি।

আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, দ্বিজেন্দ্রবাবুর সাজাহানের প্রধান মুসলমান চরিত্রগুলি কল্পিত ও অনৈতিহাসিক নহে। বরং খাঁ সাহেব আরঙ্গজীবের তথাকথিত চরিত্র-সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাই অনৈতিহাসিক। তাহার পর আর একটা কথা। বঙ্কিম বাবু, দ্বিজেন্দ্রবাবু প্রভৃতি উপন্যাস ও নাটক লিখিয়াছেন—তাঁহারা ইতিহাস লিখেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বিচার প্রয়োগ সহ

তিন দিন মাঠে মাঠে ঘুরে বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি—ঘুম পাচ্ছে, একটু শুই—যাও তুমি খেয়ে এসো গে।"

শান্তি স্বামীর পাতে বসিল মাত্র—কিছুই খাইতে পারিল না। তাহার মন আজ শোক-ভারাক্রান্ত। হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া দেখিল স্বামী ঘুমাইতেছে। তাহার পর আলোটা কমাইয়া দিয়া আসিয়া আস্তে-আস্তে তাহার পার্শ্বে শয়ন করিল।

* * * *

রাত্রি প্রায় একটা। কি একটা শব্দে অসীমের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। স্তম্ভিত হইয়া সে দেখিল—শান্তি উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া গিয়া ঘরের দরজা খুলিতেছে। কি সর্ব্বনাশ! অসীম বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তড়িৎবেগে গিয়া শান্তির হাত চাপিয়া ধরিতেই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে শান্তি চোখ মেলিল,—তার পর অসীমের মুখের দিকে উদাস ভাবে চাহিয়া অতি নিম্ন-স্বরে বলিল—"কে এসেছিল?"

"কে?"

"প্রীতি—যেন সে আমার কাছে ছুটে এসে বল্লে, 'দিদি! আমাকে বাঁচাও—ওই মারতে আস্‌চে।' আমি তাকে আগলাতে যাচ্ছিলাম—তুমি এসে আমাকে ধরে ফেল্লে। তাকে বাঁচাতে পাল্লাম না?"

অসীম দেখিল, প্রথমে শান্তির চোখ ছল্‌-ছল্‌ করিয়া উঠিল,—তাহার পর সে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অসীম কিছুই বুঝিতে পারিল না—চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল, শান্তির এ কি ভাব হইয়াছে? আগে তো এমন ছিল না;—টাইফয়েড হইতে উঠিয়া দিন-দিন সে স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হইতেছিল, তাহার পূর্ব্বের লাবণ্য ধীরে-ধীরে ফিরিয়া আসিতেছিল—কিন্তু আজ কয়েকদিন কি একটা চিন্তা তাহাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে! সে ঘুমাইতে-ঘুমাইতে চম্‌কাইয়া ওঠে। কিছুই তো বুঝা যাইতেছে না। আর প্রীতিই বা তার দিদির কাছে করুণা-প্রার্থিনী হইয়া ছুটিয়া আসিবে কেন? একটু থামিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি প্রীতির কোন অসুখের খবর পেয়েছ?"

কাঁদিতে-কাঁদিতে শান্তি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল,—"হাঁ, তুমি তাকে বাঁচাও।" তাহার পর উঠিয়া গিয়া শয্যা-তলদেশ হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল,—"এই নাও, পড়ে দেখ, প্রীতি কি লিখেছে। কাল এই চিঠি এসেছে। সেই অবধি আমি ভয়ে আকুল; তোমাকে বল্‌ব বলে উৎসুক ছিলাম,—তার পর তুমি বল্লে বড় ক্লান্ত ঘুম পাচ্ছে—তাই ভাবলাম, ঘুম থেকে উঠ্‌লে পরে তবে জানাব।" অসীম প্রীতির লিখিত চিঠিখানি লইয়া পড়িল—

শ্রীশ্রীহরি শরণম্ — শিবনিবাস, ১৭ই অগ্রহায়ণ।

দিদি,

অনেকদিন তোমার খবর পাইনি। তোমার শরীর এখন কেমন আছে লিখো। এখনও কি ওষুধ খাচ্চো? জামাই বাবু কেমন আছেন? তাঁকে আমার প্রণাম দিও। তিনি কি কখনও আমার নাম করেন?

আজ তোমাকে আমার একটা বিপদের কথা জানাবো। আমার কপাল পুড়েছে। আমার সোণার সংসারে বাজ পড়েছে। বিয়ের পর থেকে আজ দু' বছর যে কি সুখে কাটিয়েছি দিদি, তা আজ আর বল্‌তে কোন সঙ্কোচ কচ্চি নে। স্বামীর আদর ভালবাসা পূর্ণমাত্রায় পেয়েছি।—তার পর সে দিন ভাদ্রমাসে যখন মা মারা গেলেন—তখন থেকে ওঁর মনটা কেমন হ'য়ে গেল—শরীরও ভেঙে পড়্‌লো—কোনও কাজকর্ম্মে তেমন মনোযোগ দিতেন না।—কিন্তু কাল হোলো এই পূজোতে। তিনি বল্লেন, এবার ছুটীতে আমি একটু দূরেই বেড়াতে যাবো—দেখি তাতে মনটা সারে কি না? মথুরা, বৃন্দাবন হয়ে একবার রাজ-পুতানার তীর্থ, মন্দির সব দেখে বেড়াবো।—ও-ধারে না কি অনেক সুন্দর-সুন্দর জৈন মন্দির আছে বল্লেন,—মার্ব্বেল পাথরের ওপর সুন্দর কারুকার্য্য করা।—আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে কল্‌কাতায় রেখে দিয়ে তিনি বেড়াতে গেলেন। কাশী থেকে, আগ্রা থেকে, মথুরা থেকে, বৃন্দাবন থেকে, জয়পুর থেকে, আবু থেকে চিঠি লিখেছিলেন। তার পর অনেকদিন তাঁর চিঠিপত্র না পেয়ে আমার আহার-নিদ্রা বন্ধ হোলো। সে কথা তোমাকে আগেই জানিয়েছি। কোথায় যে চিঠি লিখ্‌বো, তাও জানি না। বাড়ীর ঠিকানায় ৩।৪ খানি চিঠি লিখ্‌লাম, কোনও উত্তর পেলাম না। শেষে

দিনকতক পরে শিবনিবাসে লোক পাঠালাম। সে ফিরে এসে বল্লে, তিনি এসেছেন বটে—কিন্তু বাড়ীর ভিতরেই থাকেন, বড় একটা বাহিরে আসেন না। তাঁর অবস্থার কথা ভেবে আমি আর থাক্‌তে পাল্লাম না, একটা খবর দিয়েই বাড়ীতে চলে এলাম। এসে যা দেখ্‌লাম, তাতে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। এ কি চেহারা হয়েছে তাঁর,—চোক কোটরে ঢুকেছে মুখ শীর্ণ হয়ে গেছে। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে যাব, এমন সময় তিনি বেরিয়ে গেলেন—কাজেই মনঃ-ক্ষুন্ন হয়ে আমার ঘরে গেলাম। দাসদাসীরা আমার দিকে কি জানি কেমন করে চাইতে লাগ্‌ল। এ ক'টা দিনে যেন সব বদলে গেছে। একদিন ওঁকে জিজ্ঞাসা কল্লাম, 'কেমন আছো?'—ক্ষীণ মরা হাসি হেসে বল্লেন—'ভালই আছি।' আর কোন কথা হোলো না। সেই যে তিনি বাইরে চলে গেলেন—রাত্রেও আর এলেন না। শুন্‌লাম নাকি কোথায় গেছেন।—কি যে কর্‌বো? এ সব দেখে আমাতে আর আমি ছিলাম না।—বড় একটা ধরা-ছোঁয়া দিতেন না তিনি। এমনি করে সপ্তাহখানেক কেটে গেল। একটা রহস্যের ঢাকনায় যেন সব ঢাকা রয়েছে বোধ হল।

একদিন রাত্রে আমার ঘরটিতে এসে কবাট দিয়ে আঁচল বিছিয়ে ভুঁয়েই শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বামীর আর একটা স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ পেলাম। যেন তাঁরা সিঁড়ির কাছের ঘরে রয়েছেন। ব্যাপার কি জানবার জন্যে পা টিপে-টিপে অন্ধকারে ঘরের কাছটিতে গিয়ে—আধখোলা জানালার পাশে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম—এখনও ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে দিদি। যেমন হা-ঘরেদের মেয়ে দেখেছি, তেমনি ছপছিপে চেহারা—উজ্জ্বল গৌর রঙ্‌—পরণে নানা বর্ণের ঘাঘরা—ভোমরার মতো কালো চুল হাঁটু পর্য্যন্ত এলিয়ে পড়েছে—কতক সাম্‌নে কতক পিছনে—কপালে একটা বড় লাল টীপ—আঙ্গুলে বড় বড় দুটি আংটি—তাতে আলো পড়ে ঝিক্‌মিক্‌ কচ্চে—বুক খোলা—একটা বড় সোণার রতন গলা থেকে ঝুলছে—এমনি একটি যুবতী চেয়ারের উপর পা দিয়ে—ওঁর চোখের উপর চোক রেখে, ওঁর দিকে তর্জ্জনী উদ্যত ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হোল। আমার স্বামী আর্ত্তস্বরে বলে উঠলেন—'আমি, আমি তা পারব না মুন্নি। তুমি আমার প্রাণ দিয়েছো, সত্য; সেদিন রাজপুতানার মরুভূমি অতিক্রম করবার সময় যখন জাঠ দস্যু দু'জন এসে আমাদিগকে আক্রমণ কল্লে—তখন কোথা থেকে ঝড়ের মতন ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তুমি আমাকে তার ওপর চড়িয়ে নিয়ে বরাবর সেই দূর ঝরণার কাছে এনে ফেল্লে—আমার প্রাণ বাঁচালে। সেই মুহূর্ত্ত হ'তে আমি আমার জীবন-দাত্রীর মোহে আর প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়লাম।—কিন্তু প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ! এমন কঠিন আদেশ কোরো না, মুন্নি।' তীক্ষ্ণ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে যুবতী কহিল—'তোমাকে অন্য নারীর সংস্পর্শ হ'তে আমি বিচ্ছিন্ন করবো। আমি প্রাণ চাই—প্রীতির!' উনি লাফিয়ে উঠে বল্লেন, 'অমন করে চেও না, পিশাচি! তোমার চোখে যাদু আছে—তুমি আমার রক্ত পান কর—প্রীতির কেশাগ্রও স্পর্শ কর্ত্তে দেব না তোমাকে—' কি একটা দানবীয় ছায়া যুবতীর মুখের উপর খেলা করে গেল। তার মুষ্টি বদ্ধ হয়ে এলো—চোখ জল্‌ জল্‌ কর্ত্তে লাগল—ঘরের আলো যেন তার কাছে নিষ্প্রভ হ'য়ে এলো। কালো-কালো—বড়-বড় চোখ—এমন দেখিনি, যেন তার হাত, পা, মুখ, অন্য কোন অঙ্গই নেই—খালি অগ্নিময় দুটি চোখ। আমার গা কাঁপ্‌তে লাগল্‌, মাথা ঝিম্‌-ঝিম্‌ কর্ত্তে লাগলো। দু'হাত দিয়ে জোরে মাথা টিপে টল্‌তে টল্‌তে কোনও রকমে আমার ঘরে এসে বেশ করে কপাট দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কালই এ ঘটনা ঘটেচে দিদি। কে এ যাদুকরী এসে আমার স্বামীকে পর করে দিলে? আমি ওর সম্ভোগের অন্তরায়—আমাকে ও আহুতি দিতে চায়। যাক্‌, আমরা মেয়েমানুষ, মরে গেলে কোন ক্ষতি নেই—কিন্তু উনি, ওঁর যে চেহারা হয়েছে—ওঁর তো স্বস্তি নেই! পিশাচীর অসাধ্য কিছুই নেই—সে যে প্রাণ দিয়েছে. হিংস্র হয়ে আবার তাই কেড়ে নিতে কতক্ষণ তার? ভাই দিদি, তুমি একবার এসে আমাকে আর ওঁকে এখান থেকে নিয়ে যাবার জোগাড় কর। লজ্জায় আর কাউকে এ কথা লিখ্‌তে পাল্লাম না।—আমাকে না বাঁচাতে পারো, আমার স্বামীকে বাঁচিও।—ইতি হতভাগিনী প্রীতি।—"

চিঠিখানি পড়িয়া অসীম স্তম্ভিত হইয়া গেল। জিপসী-

দের সম্বন্ধে সে এরূপ উপন্যাস পড়িয়াছে। উল্কার মতন তাহারা মাঝে-মাঝে গৃহস্থের প্রাঙ্গণে পড়িয়া সে গৃহকে উৎসন্ন করিয়া দেয়। শান্তি অসীমের পা জড়াইয়া ধরিয়া প্রীতির প্রাণভিক্ষা চাহিল।

৩

তাহার পরদিন বেলা ১২টার সময় মোটরে করিয়া অসীম ও শান্তি নাটোর অভিমুখে যাত্রা করিল। সেখানে আসিয়া কলিকাতায় একটা তার করিয়া দিল যে তাহারা দু'জনে কাল সকালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিবে।

সন্ধ্যা ৭৷৷০টার সময় গাড়ী। যথাসময়ে তাহারা গাড়ীতে উঠিল। দরবার-ক্যারেজ ধরণের মধ্যম শ্রেণীতে কোণের একটা বেঞ্চিতে তাহারা বসিল। ক্রমে ভিড় হইতে লাগিল—রাত্রি ১০৷৷০টার সময়—পোড়াদহে অনেক লোক ঢুকিল—তাহার মধ্যে কতকগুলি মহিলা। তাহারা শান্তির দিকে আসিতেই অসীম সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া অন্য একটা বেঞ্চিতে গিয়া বসিল—কিন্তু বেঞ্চিতে ঠাসাঠাসি হওয়াতে নীচে কম্বল বিছাইয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল। শীত করিতেছিল বলিয়া শান্তি মুড়ি-সুড়ি দিয়া কোণে বসিয়া ছিল। সে ঘুমাইতেছে ভাবিয়া অসীম একটু চোখ বুজিবার উদ্যোগ করিল।—তন্দ্রাবেশে শুনিল চুয়াডাঙ্গায় গাড়ী আসিল। তাহার পর আবার একটা ষ্টেশনে যেন কতকগুলি লোক তাহাদের কামরায় উঠিল,—যেন কে তাহার পাশ দিয়া গিয়া তাহারই পিছনের বেঞ্চিতে বসিল। মুখ বাড়াইয়া অসীম দেখিল, কালো ভালুকের মত কম্বলে ঢাকা একটা মূর্ত্তি বেঞ্চিতে বসিয়া ঢুলিতেছে। আবার সে মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সকাল হইয়া গিয়াছে,—শিয়ালদহে গাড়ী আসিয়া পৌছিয়াছে। শান্তিকে গাড়ী হইতে নামাইতে না নামাইতে তাহার দাদা তাহাদের কামরার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাল রাত্রে উহারা তার পাইয়াছিল।—শান্তি তাহার দাদার পিছনে-পিছনে যাইতে লাগিল। অসীমও কুলীদের ঘাড়ে জিনিসপত্র উঠাইয়া দিয়া তাহাদের পশ্চাতে আসিতেছিল। এমন সময় চীৎকার করিয়া একটি কুলি বলিল—"বাবু, আপকা একঠো মোটরী ছুট গিয়া হ্যায়! ইঁহা কামারেকো অন্দর পড়া হ্যায়।" অসীম নিজের জিনিসগুলি গণিয়া লইয়া চেঁচাইয়া বলিল—"নেহি, মেরে চীজবাস্ সব আ গয়ে কুছ নেহি ছুটা হ্যায়—"

কুলী একটা বস্তা বেঞ্চির তলা হইতে হিঁচড়াইয়া বাহির করিয়া প্লাটফরমে ফেলিয়া বলিল—"ইঃ তো দেখিয়ে' তাহার পর হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বিকৃতকণ্ঠে কহিল—"আরে রামজী, ইঃ কা হ্যায়, ইঃ খুন নিকলতা বস্তামে—আরে এ ভাই আকৃলু, দেখ দেখ—পুলিশ বোলা—"

গোলমালের শব্দ শুনিয়া জি-আর-পির কনেষ্টবল, সবইন্‌স্পেক্টর, ষ্টেশন-মাষ্টার, টিকিট-কালেক্টর সকলেই দৌড়াইয়া আসিল;—সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"জিনিস আপনার?" অসীম বলিল "না—।" কাল সে নাটোর হইতে সস্ত্রীক বরাবর এখানে আসিতেছে, বস্তা-গাঁটরীর কথা সে কিছু জানে না। সবইন্‌স্পেক্টর বলিল "এখন আপনি কিম্বা আপনার স্ত্রী এখান থেকে যেতে পাবেন না—যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের তদন্ত না শেষ হয়।" তখন অসীম ভাবিতেছিল—'কি ভীষণ! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার এ! আমি সমস্ত রাত্রি মড়াটার পাশে শুয়ে এসেছি! একই কম্বলে জীয়ন্ত আর মড়া। কি বীভৎস!'

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া অসীম নিজের নির্দ্দোষিতার কথা বারংবার বলিয়াও কোন ফল পাইল না। এত বড় একটা খুনের সংবাদ পাইয়া ইন্‌স্পেক্টর আসিলেন। অনেক বয়স হইয়াছে তাঁহার—শান্ত গম্ভীর প্রকৃতি। আসিয়া শান্তিকে বলিলেন—"মা, যা তুমি জানো বলো, কোনও কথা ঢাকিও না।" শান্তি যাহা জানিত বলিল। পরে তাহার দাদাকে দু'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উভয়কে যাইতে দিলেন। একজন হেড কনেষ্টবল তাহাদের সঙ্গে গিয়া বাড়ী দেখিয়া আসিল।

ইন্‌স্পেক্টরের ঘরে লাশ লইয়া যাওয়া হইল। অসীমকেও সঙ্গে-সঙ্গে যাইতে হইল। অসীমকে ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন "এ খুনের সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?"

অসীম বলিল—"কিছুই না।"

"এ বস্তা তবে কি করে আপনার সঙ্গে এলো?"

"কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

"আচ্ছা।"

তাহার পর বস্তা খুলিয়া লাস বাহির করিতেই অসীম চমকিয়া উঠিল। তাহার বক্ষ যেন হিম হইয়া গেল—

কি সর্ব্বনাশ! এ যে প্রীতি!—হতভাগিনীকে বুঝি সেই পিশাচী হত্যা করিয়াছে। কাণ হইতে কাণ পর্য্যন্ত কণ্ঠদেশ শাণিত অস্ত্রে ছিন্ন; চোখ বাহির হইয়া পড়িয়াছে; চোখে যেন একটা আতঙ্ক অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। অসীম শিহরিয়া উঠিল। ইন্‌স্পেক্টর লক্ষ্য করিলেন—কহিলেন "আপনি লুকোচ্চেন। আচ্ছা, আমরা খবর নিচ্চি, ততক্ষণ আপনি হাজতে থাকুন—মাপ করবেন, আপনাকে ছাড়তে পারছিনে।"

অসীম আটক রহিল।

* * * *

সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময়ে ইন্‌স্পেক্টার আসিয়া আসামীকে হাজত হইতে মুক্তি দিয়া কহিলেন,—"আপনি নির্দ্দোষ, যেতে পারেন। খুনী-স্ত্রীলোক, ধরা পড়েছে। শিবনিবাস ষ্টেশন থেকে লাশ নিয়ে উঠেছিল; পরের ষ্টেসনে গাড়ী থামতে না থামতেই প্লাটফরমে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারে মিশিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। গায়ে একটা কালো কম্বল জড়ান ছিল; আর আপনাদের গাড়ীতেই একজন ডিটেক্টিভ ইন্স্‌পেক্টার ছিলেন—তিনিও গাড়ী থেকে নেমে দৌড়িয়ে গিয়ে তাকে ধরেন—হাতে এক ঘা ছোরার আঘাতও পেয়েছেন তিনি। যখন আর পালাবার কোন উপায় থাকে নি, তখন সে চুপ্ করেছে। রাণাঘাটে এসে সমস্ত কবুল করেছে যা বলেছে, একটা তাজ্জব ব্যাপার। সে নাকি একটা জিপ্‌সি (Gipsy) মেয়ে। শিবনিবাসের অনুকূল বাবুর সঙ্গে না কি রাজপুতানা থেকে এসেছে। তাঁর বিবাহ স্ত্রীটিকে - প্রীতিলতা বুঝি নাম —ঈর্ষা-বশে খুন করেছে- ধন্য মেয়ে।—আপনি যেতে পারেন এখন। একজন হেড্ কনেষ্টবল আপনাকে পৌছে দিচ্চে।"

রাত্রি আটটার সময় অসীম তাহার শ্বশুর বাড়ী পৌছিল। শান্তি দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল,—"ভগবানকে ধন্যবাদ—তোমাকে ওরা ছেড়ে দিলে—এ আবার কি ফ্যাসাদেই পড়েছিলাম। আমি তো ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিলাম।"

অসীম সে সব কথার কোন জবাব না দিয়া বলিল, "আমারও দেখা হোলো তার সঙ্গে।"

"কার সঙ্গে?"

"প্রীতির সঙ্গে। সেদিন রাত্রে তোমাকে সে দেখা দিয়ে গেছে, আজ আমাকেও দেখা দিতে সে এসেছিল।"

"কোথায়—কোথায় সে?"

"বস্তার লাশ—প্রীতির।"

শান্তি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

পুস্তক-পরিচয়

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ বিরচিত; মূল্য দেড় টাকা।]

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় 'মানসী' পত্রে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের জীবন-কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই লেখাগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া এই জীবন-চরিত ছাপাইয়াছেন। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, পূর্ব্বে উপরিউক্ত মাসিক পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তদতিরিক্ত অনেক তথ্য তিনি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জীবন-চরিত লিখিয়া মন্মথ বাবু যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহার সে প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। বাঙ্গালা-সাহিত্যে ইতঃপূর্ব্বে কয়েকখানি জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে এবং যথেষ্ট আদরও লাভ করিয়াছে; কিন্তু এখন জীবন-চরিত লিখিবার একটা নূতন ধারা দেখা যাইতেছে এবং এই নূতন ধারা যে জীবন-চরিত প্রণয়নে কতখানি উপযোগী, মন্মথ বাবুর পুস্তকখানি পাঠ করিলেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। পুস্তকখানিতে অনেকগুলি ছবি আছে, ছাপা, কাগজ ও বাধাই সুন্দর। এই ছোট পুস্তকখানির দেড় টাকা মূল্য একটু অধিক বোধ হইতে পারে; কিন্তু এই কাগজের মহার্ঘতার সময় গ্রন্থকারগণের যে উপায়ান্তর নাই।

সিঁথির সিন্দূর

[শ্রীহরিভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য এক টাকা।]

এখানি উপন্যাস। ইহাতে একটু ইতিহাসেরও গন্ধ আছে; কিন্তু তাই বলিয়া এখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। লেখকের ইহা প্রথম উদ্যম কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু প্রথম হইলেও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, লেখকের উদ্যম সম্পূর্ণ প্রশংসনীয়; তিনি ব্যর্থমনোরথ হন নাই; আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ

করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। মায়া ও সুকুমারীর চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে; যতীন্দ্রনাথের চরিত্রও সুন্দর হইয়াছে। মোটের উপর এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া পাঠকমাত্রেই সন্তোষলাভ করিবেন। ছাপার ভুল যেগুলি আছে, তাহা তেমন মারাত্মক নহে; একটী প্রধান ভুল লেখক মহাশয় 'নিবেদনে'ই ধরিয়া দিয়াছেন। বইখানি দেখিতেও বেশ সুন্দর হইয়াছে।

জীবনী-সন্দর্ভ

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা।]

এই সুন্দর পুস্তকখানিতে আমাদের দেশের তের জন স্বনামধন্য পুরুষের জীবন-কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই তের জন—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজা নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণ পান্তি, রামদুলাল সরকার, রাজা রামমোহন রায়, লালা বাবু, রাজা রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ ও তারকনাথ প্রামাণিক। ইঁহাদের জীবন কথা সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। আশু বাবু সংক্ষেপে এই কয় মহাত্মার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা বেশ গোছাইয়া সরল ও সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ পান্তি ও লালা বাবু ব্যতীত অন্য সকলেরই সুন্দর চিত্র এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। সুলেখক আশু বাবু ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, তিনি শীঘ্রই এই জীবনী-সন্দর্ভের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত করিবেন। আমরা সেই খণ্ড দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

মা

[শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য আট আনা।]

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি কয়েকটি গানের সমষ্টি। গানগুলি রামপ্রসাদী সুরে গেয়; সুতরাং যাঁহার একটু সুরবোধ আছে, গানগুলি তাঁহারই উপভোগ্য। গ্রন্থকার পুস্তকখানির "মা" নামকরণে যেরূপ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন প্রত্যেক গানের প্রত্যেক চরণেও সেইরূপ একটা অবাধ ভাবস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। শিশু যেমন মা ছাড়া আর কাহাকেও জানে না, তাহার যত কিছু আদর আবদার, মান-অভিমান সমস্তই মায়ের কাছে—গ্রন্থকারও সেইরূপ সরল প্রাণ শিশুর ন্যায় মায়ের কাছে আত্মনিবেদন করিয়াছেন; মায়ের কাছে কত না আব্দার করিয়াছেন। পুস্তকে গ্রন্থকারের দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক পরলোকগত পুত্র ঋতীন্দ্রের একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। আমরা আশা করি, বইখানি মাতৃভক্ত, সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বি-এল্ কর্ত্তৃক ভাষাচ্ছন্দে অনূদিত, মূল্য ছয় আনা।

এই ক্ষুদ্র অনুবাদগ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। অতি সুন্দর সুললিত পদ্যে গীতার শ্লোকগুলি অনূদিত হইয়াছে; অনুবাদে কোনপ্রকার দোষ নাই, বেশ সরল ও সহজ অনুবাদ, পড়িতে বেশ মিষ্ট লাগে। মূল্যও যথাসম্ভব অল্প।

Studies in Ancient Hindu Polity

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস্ প্রণীত,

মূল্য তিন টাকা।

পুস্তকখানি যে ইংরাজী ভাষায় লিখিত, তাহা নাম দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমরা ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকের সমালোচনা করি না। তবে এ পুস্তকখানির পরিচয় দিবার কারণ আছে। এখানি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ। আমাদের দেশে এখনও এমন লোকের অসদ্ভাব নাই, যাঁহারা আমাদের দেশের গ্রন্থও ইংরাজীতে পড়িতে পছন্দ করেন; তাঁহাদের অবগতির জন্যই এই পরিচয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকখানির একটি সুদীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শ্যাম শাস্ত্রী মহাশয় ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাবুর এই অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনি শুধু অনুবাদ করিয়াই কার্য্য শেষ করেন নাই, তিনি সকল কথারই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাবুর ব্যাখ্যা বেশ হইয়াছে।

মহরম চিত্র

ফজলুর রহিম চৌধুরী বি-এ প্রণীত, মূল্য বার আনা।

এখানি কাব্য। মহরমের পবিত্র কাহিনী অবলম্বন করিয়া লেখক এই কাব্যখানি লিখিয়াছেন। এই তাঁহার প্রথম উদ্যম; প্রথম উদ্যমে ত্রুটী থাকিয়া যায়; এ কাব্যেও ত্রুটী আছে। কিন্তু আমরা তাহার উল্লেখ করিব না। আমরা বলিতে পারি যে, লেখকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তিনি চেষ্টা করিলে সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিবেন; তাহা তাঁহার এই মহরম-চিত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমরা এই নবীন মুসলমান কবিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ যদি একাগ্রচিত্তে বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবায় অগ্রসর হন, তাহা হইলে আমরা বড়ই আনন্দিত হইব।

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

একবিংশ পরিচ্ছেদ

তখনও কেদার বাবু আগেকার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। খাওয়া-দাওয়ার পরে বাহিরের বারান্দায় একখানা ইজি চেয়ারে পড়িয়া খবরের কাগজ পড়িতে-পড়িতে হয় ত একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলেন, দরজায় ঠিকা গাড়ীর কঠোর শব্দে চোখ মেলিয়া দেখিলেন, সুরেশ এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার কন্যা এবং ঝি অবতরণ করিল। ঘুমের ঝোঁক তাঁহার নিমিষে উড়িয়া গেল; কি একটা অজ্ঞাত শঙ্কায় শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িয়া গলা বাড়াইয়া চীৎকার করিলেন, "অচলা যে? সুরেশ, তুমি কোথা থেকে? ঝি, ব্যাপার কি? এ সব কি কাণ্ড-কারখানা, আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারিনে!"

অচলা উঠিয়া আসিয়া পিতার পদধূলি গ্রহণ করিল, সুরেশ প্রণাম করিয়া কহিল, "মহিমের টেলিগ্রাম পান নি?" কেদার উদ্বিগ্ন মুখে কহিলেন, "কৈ, না!" সুরেশ একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিয়া বলিল, "তা'হলে হয় সে টেলিগ্রাফ করতে ভুলেচে, না হয় এখনো এসে পৌঁছায় নি।" কেদার বাবু কহিলেন, "টেলিগ্রাফ যাক্। ব্যাপার কি তাই আগে বল না। তুমি এদের কোথা থেকে নিয়ে এলে?"

সুরেশ বলিল, "কাল রাত্রিতে আগুন লেগে মহিমের বাড়ী পুড়ে গেছে।" "বাড়ী পুড়ে গেছে? সর্ব্বনাশ! বল কি,—বাড়ী পুড়ে গেল? কেমন কোরে পুড়্‌ল? মহিম কৈ? তুমি এদের পেলে কোথায়?" এক নিঃশ্বাসে এতগুলা প্রশ্ন করিয়া কেদার বাবু ধপ্ করিয়া তাঁহার ইজি-চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সুরেশ বলিল, "এঁদের সেখান থেকেই নিয়ে আস্‌ছি। আমি সেইখানেই ছিলাম কি না।" কেদার বাবুর মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন এবং গম্ভীর হইয়া উঠিল; কহিলেন, "তুমি ছিলে সেখানে? কবে গেলে, আমি ত কিছু জানিনে। কিন্তু সে কই?"

সুরেশ বলিল, "মহিম ত আস্‌তে পারলে না, তাই—"

তাঁহার গম্ভীর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না না, এ সব ভাল কথা নয়। অতিশয় মন্দ কথা। যৎপরোনাস্তি অন্যায়। এ-সব ত আমি কোন মতেই—" বলিতে-বলিতে তিনি চোখ তুলিয়া কন্যার মুখের প্রতি চাহিলেন।

অচলা এতক্ষণ একটা চেয়ারের পিঠে হাত রাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। পিতার এই সংশয় তাহার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। তাহার এই অকস্মাৎ আগমনের হেতু যে তিনি লেশমাত্র বিশ্বাস করেন নাই, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া লজ্জায় ঘৃণায় তাহার মুখে আর রক্তের চিহ্ন রহিল না।

কেদার বাবু এখানেও ভুল করিলেন। মেয়ের মুখের চেহারায় তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। আরাম চেয়ারটায় হেলিয়া পড়িয়া হাতের কাগজখানা মুখের উপরে টানিয়া দিয়া ফোঁস্ করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যা' ভাল বোঝ তোমরা কর। আমি কালই বাড়ী ছেড়ে আর কোথাও চলে যাবো।" সুরেশ ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ের সহিত কহিল, "এ সব আপনি কি বল্‌চেন কেদার বাবু? আপনিই বা বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন কেন, আর হয়েছেই বা কি?" বলিয়া সে একবার অচলার প্রতি, একবার তাহার পিতার প্রতি চাহিতে লাগিল; কিন্তু কাহারও মুখ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। কেদার বাবুর কাছে কোন জবাব না পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যাক্, আমার ওপর মহিম যা' ভার দিয়েছিল, তা' হয়ে গেছে। এখন আপনারা যা' ভাল বোঝেন, করুন। আমার নাওয়া খাওয়া এখনো হয়নি, আমি বাড়ী চল্‌লুম।" বলিয়া সে কয়েক পদ দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেই কেদার বাবু উঠিয়া বসিয়া ক্লান্ত কণ্ঠে কহিলেন "আহা, যাও কেন হে। ব্যাপারটা কি, তবু শুনিই না। আগুন লাগ্‌ল কি কোরে?" সুরেশ অভিমান ভরে বলিল, "তা' জানিনে।"

"তুমি গেলে কবে সেখানে?"

"দিন পাঁচ ছয় পূর্ব্বে। আমি থাইনি এখনো, আর দেরি করতে পারিনে" বলিয়া পুনরায় চলিবার উপক্রম করিতেই কেদার বাবু বলিয়া উঠিলেন, "আহা-হা নাওয়া-খাওয়া ত তোমাদের কারও হয়নি দেখ্‌চি—কিন্তু জলে ত পড়নি, এটাও ত বাড়ী, এখানেও ত চাকর-বাকর আছে। অচলা, ডাকো না একবার বেয়ারাটাকে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন। বোস, বোস, সুরেশ ব্যাপারটা কি হল খুলেই সব বল, শুনি।"

সুরেশ ফিরিয়া আসিয়া বসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "রাত্রে ঘুমোচ্চি, মহিষের চীৎকারে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে দেখি সমস্ত ধুধু কোরে জ্বলচে। খড়ের ঘর, নিবোবার উপায়ও ছিল না, সে বৃথা চেষ্টাও কেউ করলে না—সমস্ত পুড়ে গেল আর কি।"

কেদার বাবু ব্যাকাঙ্খা উঠিয়া বলিলেন, "বল কি হে! সর্ব্বস্ব পুড়ে গেল? কিছুই বাঁচাতে পারা গেল না? অচলার গয়না-পত্র গুলো?" "সে গুলো বেঁচেচে!" "তবু রক্ষে হোক্!" বলিয়া বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। থানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবু, কি কোরে আগুনটা লাগ্‌ল?" সুরেশ কহিল, "বল্লুম ত আপনাকে, সে খবর এখনো জানা যায়নি। তবে, গ্রামের মধ্যে বড় কেউ আর তার শুভাকাঙ্ক্ষী নেই, তা' জেনে এসেচি।"

"নেই বুঝি?" "না।" কেদার বাবু আর কোন কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিয়া পরিশেষে আর একটা গভীর নিঃশ্বাস মোচন করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যাও, স্নান করে এসোগে সুরেশ, আর বেলা কোরো না। দেখি, রান্না-বান্নার কি জোগাড় হচ্চে।" বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আহারাদির পরেও তিনি সুরেশকে মুক্তি দেন নাই। সে একটা আরাম-চৌকির উপরে অর্দ্ধ-নিদ্রিতাবস্থায় পড়িয়া ছিল। অচলাও সেই যে স্নানান্তে তাহার ঘরে গিয়া খিল দিয়াছিল, আর তাহার কোন সাড়াশব্দ ছিল না। বিশ্রাম ছিল না শুধু কেদার বাবুর। এখন যে টেলিগ্রাফ আসা না আসার বিশেষ কোন সার্থকতা ছিল না, তাহারই জন্য সমস্ত বেলাটা ছট্‌ফট্‌ করিয়া, সন্ধ্যার সময়, অসময়ে ঘুমানো উচিত নয়, এই অজুহাতে মেয়েকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া, প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা যে বল্‌লে সে টেলিগ্রাম করেচে টেলিগ্রাম করেচে—কই তার ত কিছুই দেখিনে। তোমরা ট্রেনেতে এসে পড়লে, আর তারের খবর এতক্ষণেও পৌঁছল না! আচ্ছা, দাঁড়াও ত দেখি—" বলিয়া মেয়ের মুখের জবাব না শুনিয়াই চটি জুতা ফট্‌ফট্‌ করিতে-করিতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন এবং ক্ষণকাল পরেই নীচে হইতে তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। অচলার দাসীকে ধরিয়া তিনি নানাপ্রকারে জেরা করিতেছেন, এবং প্রত্যুত্তরে সে আশ্চর্য্য হইয়া বারম্বার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে, "সে কি বাবু, আগুন লেগে ঘর দোর সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল, চক্ষে দেখে এলুম, আর আপনি বল্‌চেন পোড়েনি! আর আগুন যদি নাই লাগ্‌বে, তবে ঘর-দোর পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল কি কোরে, একবার বিবেচনা করে দেখুন দেখি!"

সুরেশ সমস্তই শুনিতেছিল; সে মাথা তুলিয়া দেখিল অচলা চৌকাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া বিবর্ণ মুখে কাণ পাতিয়া প্রত্যেক কথাটি গিলিতেছে। শুষ্ক উপহাসের ভঙ্গীতে কহিল, "তোমার বাবার হোলো কি, বল্‌তে পারো?" অচলা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "না।"

সুরেশ কহিল, "আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, উনি বিশ্বাস করেন নি। ওঁর ধারণা, আগুন লাগার গল্পটা আমাদের আগাগোড়া বানানো।" একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সত্যি-মিথ্যে একদিন টের পাবেনই, কিন্তু ওঁর সন্দেহটা এমন যে, এখানে আসা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেচে।"

অচলা শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আর আস্‌বেন না?"

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বোধ করি সম্ভব নয়। আমারও ত কিছু আত্ম-সম্মান-বোধ আছে। কোন লোককে দিয়ে আমার ব্যাগটা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ো।" অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।" কিন্তু তাহার এখানে আসা-না-আসার সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না।

"তা'হলে কাল সকালেই দিয়ো। অনেক দরকারি

জিনিস আমার ওর মধ্যে আছে।" বলিয়া সে কেদার বাবুর জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

কেদার বাবু ফিরিয়া আসিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলেন বটে, কিন্তু মনে-মনে যে অপ্রসন্ন হইয়াছেন তাহা বোধ হইল না।

রাত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শয্যার উপর ছট্‌ফট্‌ করিয়া অচলা উঠিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা, বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া, সম্মুখের রাজপথের উপরে লোক-চলাচলের প্রতি চাহিয়া কিছুক্ষণের জন্যও সে অন্যমনস্ক হয়।

তাহার ঘরের ওদিকের কবাট খুলিয়া সে বারান্দায় আসিয়া দেখিল, তখনও বসিবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। প্রথমে মনে করিল, চাকরেরা গ্যাস বন্ধ করিতে ভুলিয়া গেছে; কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই ভিতর হইতে তাহার পিতার কণ্ঠস্বর কাণে আসিতে তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। চিরদিন তিনি দশটা বাজিতে-না-বাজিতেই শয্যা-গ্রহণ করেন; কিন্তু আজ সাড়ে দশটা বাজিয়া গেছে। পরক্ষণেই দাসীর গলা স্পষ্ট শোনা গেল। সে বলিতেছে, এখন সোয়ামী মারা গেছে,—আর সে মৃণাল দিদিমণি শ্বশুর-ঘর করে, এমন ত আমার মনে হয় না বাবু। জামাইবাবুর সঙ্গে কি যে দাদা-নাতনি সুবাদ, তা তেনারাই জানে।" প্রত্যুত্তরে কেদার বাবু শুধু 'হুঁ' বলিয়াই চুপ করিয়া রহিলেন।

অচলা বুঝিল, ইতিপূর্ব্বে অনেক কথাই হইয়া গেছে। মৃণালের সম্বন্ধে, মহিমের সম্বন্ধে, তাহার সম্বন্ধে- কিছুই বাদ যায় নাই। কিন্তু পাছে, নিজের সম্বন্ধে নিরতিশয় অপ্রিয় কথা নিজের কাণেই শুনিতে হয়, এই ভয়ে সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নীরবেই ফিরিয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু কিসে যেন তাহার দুই পা লোহার শিকলে বাঁধিয়া দিয়া গেল।

কেদার বাবু অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "দু'জনের তাহলে বনি-বনাও হয়নি বল্‌?"

ঝি কহিল, "মোটে না বাবু, মোটে না। একটি দিনের তরে না।"

এই দাসীটিকে অচলা নির্ব্বোধ বলিয়াই এতদিন জানিত; আজ দেখিল, বুদ্ধি তাহার কাহারো অপেক্ষা কম নয়। কেদার বাবু আবার মিনিট-খানেক মৌন থাকিয়া বলিলেন, "কাল রাতে তাহলে কারও খাওয়া পর্য্যন্ত হয়নি বল্‌? সুরেশ যাওয়া পর্য্যন্তই এক রকম ঝগড়া ঝাঁটিতেই দিন কাটছিল!"

দাসীর উত্তর শোনা গেল না বটে, কিন্তু পিতার মুখের মন্তব্য শুনিয়াই বুঝা গেল, সে গ্রীবা আন্দোলনের দ্বারা কিরূপ অভিমত ব্যক্ত করিল। কারণ, পরক্ষণেই কেদার বাবু একটা গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, "এমনটি যে একদিন ঘটবে, আমি আগেই জানতুম। আজকাল-কার ছেলে মেয়েরা ত বাপ মায়ের কথা গ্রাহ্য করে না; নইলে, আমি ত সমস্তই একরকম ঠিক করে এনেছিলুম। আজ তা হলে ওর ভাবনা কি!" বলিয়া আর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল। ঝি পূর্ণ সহানুভূতির সহিত প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কহিল, "তাই বলুন ত বাবু, নইলে আজ ভাবনা কি! কোন্‌ অজ পাড়াগাঁয়ে কি না একটা খোড়ো মেটে বাড়ী! তাও রইল কৈ! আর জামাই বাবুও ত—" বলিয়া সেও কথাটাকে শেষ না করিয়াও একটা দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা অনেক দূর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দিল।

"কপাল!" বলিয়া কেদার বাবু মিনিট দুই নিঃশব্দে থাকিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তুই যা।" বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া আলো নিবাইবার জন্য বেয়ারাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

অচলা পা-টিপিয়া আস্তে আস্তে তাহার ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। পিতার উদারতা, তাঁহার ভদ্রতা-বোধের ধারণা, কোনদিনই তাহার মনের মধ্যে খুব উচ্চ অঙ্গের ছিল না; কিন্তু সে যে বাটীর দাসীর সহিত নিভৃতে আলোচনা করিবার মত এত ক্ষুদ্র, ইহাও সে কখনও ভাবিতে পারিত না। আজ তাহার নিজের মন ছোট হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে,—কিন্তু, তাহার স্বামী, তাহার পিতা, তাহার দাসী, তাহার বন্ধু—সবাই যখন তাহারই মত ভূমি-তলে পড়িয়া, তখন, কাহাকেও অবলম্বন করিয়া কোন দিন যে সে এই ধূলিশয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, এ ভরসা সে কল্পনা করিতেও পারিল না।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত :—

গত মাঘ মাসের 'ভারতবর্ষে' "কবি রঙ্গলাল" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একস্থলে লিখিত দেখিলাম,—"বঙ্গভূমি যখন দাশরথি এবং ঈশ্বরচন্দ্রের আদিরসে প্লাবিত, তখন তিনি (রঙ্গলাল) বঙ্গভাষায় বহু-পূর্ব্ব-লুপ্ত বীররসের পুনরুদ্ধার করেন।"—রঙ্গলাল সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য ঠিক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না। ঈশ্বরগুপ্তের রচনায় মার্জ্জিত রুচির অভাব, বা অন্য কোনও গুণের অসদ্ভাব থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু আদিরসের সৃষ্টি করিয়া যে তিনি বঙ্গভূমি প্লাবিত করিয়াছিলেন, একথা বলিলে তাঁহার প্রতি ঘোর অবিচার করাই হয়।

ঈশ্বরগুপ্তের তুলনা ঈশ্বরগুপ্ত। বঙ্গদেশে একটি বৈ দুইটি ঈশ্বরগুপ্ত আবির্ভূত হন নাই। তাঁহার অপেক্ষা পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী লেখক এদেশে যে জন্ম-গ্রহণ না করিয়াছেন, তাহা নহে। কিন্তু দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া তাঁহার কার্য্যের বিচার করিলে, তাহা অতুলনীয় বলিয়াই মনে হয়। ভারতচন্দ্রের যুগ হইতে যে আদি-রসের স্রোত অবাধগতিতে প্রবাহিত হইতেছিল, যে স্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া প্রতিভার অবতার রামমোহন রায়ও কাব্য লিখিতে ভয় পাইয়াছিলেন,—সেই স্রোতের গতি যদি কেহ ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে তিনি ঈশ্বরগুপ্ত। ভারতচন্দ্রের কবিতায় ও কবি-ওয়ালাদের গানে বাঙ্গালীর মন যখন ভরপুর, যখন বাঙ্গালী বাবুর বৈঠকখানার প্রধান গান—"এমন পীরিতি প্রাণ জানিলে কে করে,"—তখন ঈশ্বরগুপ্তের মুখে বাঙ্গালী শুনিল—"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ-ভরা।" এই রঙ্গ-ভরা বঙ্গদেশেরই তিনি কবি। এই রঙ্গ-ভরা বঙ্গ সমাজই তাঁহার সাহিত্যের আধার। তাঁহার গদ্য-পদ্য রচনাবলী একটু ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলে শুধু তাঁহার কৃতিত্ব নহে,—সেই সঙ্গে তখনকার বঙ্গ-সমাজের অবস্থাও অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

ঈশ্বরগুপ্তের রচনা সাগরতুল্য। সে রচনা-সমুদ্র অনুসন্ধান করিলে তাহার ভিতর হইতে যে দুই-চারি বিন্দু আদিরস সংগ্রহ করিতে না পারা যায়, এমন নহে। কিন্তু তাহা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, সেজন্য তাঁহাকে আদিরসের কবি বলিয়া ঘোষণা করিলে নিতান্তই অসঙ্গত হয়। তাঁহার রচনামধ্যে যদি অক্ষমতা কোথাও প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে ঐ আদিরসাত্মক রচনায়। ঐ জিনিষটা তাঁহার হাতে ভাল হইতও না; এবং তিনি উহা লিখিয়া গিয়াছেনও অতি সামান্য। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার শিষ্যবর্গকেও উহা বেশী লিখিতে তিনি নিষেধ করিতেন। মনে পড়ে, তাঁহার 'প্রভাকর' পত্রের ফাইলে দেখিয়াছি, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রেমের কবিতা ছাপাইয়া তাহার নীচে এই টিপ্পনীটুকু লিখিয়া দিয়াছিলেন,—"বঙ্কিমচন্দ্রের বিরচিত কবিতায় সুবঙ্কিম ভাব কৌশল সকল অতিশয় সন্তোষ-জনক।...এই স্থলে একটি অনুরোধ এই যে, বঙ্কিম পদ্য রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্য হইবে, কিন্তু ভাবগুলিন প্রকাশার্থে যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহার না করেন, যত ললিত শব্দে পদ-বিন্যাস করিতে পারিবেন ততই উত্তম হইবেক। এবং 'ছেনু' 'গেনু' ইত্যাদি প্রাচীন কবিগণের প্রিয় শব্দগুলিন পরিহার করিতে পারিলে আরো ভাল হয়। অপিচ প্রতিনিয়তই আদিরসের সেবা না করিয়া এক একবার অন্য রসের উপাসনা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে, তাঁহার পদ্য অস্মদাদির অন্তঃকরণকে প্রেমাভিষিক্ত করিয়া থাকে, এ জন্য অবিলম্বে আদ্য ছাড়িয়া অপর কোন এক রসের এক

প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন।"—শেষের এই কথা কয়টা হইতে অনেকটা বুঝা যায় যে, প্রেম-কবিতার বাহুল্য তিনি তেমন পছন্দ করিতেন না। কলিকাতার কক্‌নি কবিদের উপদ্রবে প্রেমের কবিতা এখন যেমন ছ্যা-ছ্যা হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহা ছিল না;—তবু কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত তাহার সঙ্কোচ সাধনে একটু সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বোধ করি, দেশের দুর্দ্দশা ভাবিয়া স্বামী বিবেকানন্দের মত তাঁহারও মন বলিয়াছিল,—

"ভাঙ্গ বীণা প্রেম সুধা-পান, মহা আকর্ষণ, দূর
কর নারী-মায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রু জল পান,
প্রাণপণ যাক্ কায়া॥"

বাস্তবিকই দেশের দুঃখ তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। ১২৫৫ সালের ১লা বৈশাখ তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকরে' তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন,—

"দেশের দারুণ দুখ দেখিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
লিখিতে লেখনী কাঁদে, ম্লানমুখ মসী চাঁদে,
শোক-অশ্রু করে বরিষণ॥"

—একথা ঈশ্বরগুপ্তের পূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালা-লেখকের কলম হইতে বাহির হয় নাই। আজ আমরা "অয়ি ভুবন মনোমোহিনী" বলিয়া দেশ-মাতার রূপ-বর্ণনা করিতেছি, কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের মনে মায়ের রূপের কথা উদিত হয় নাই। তিনি মায়ের প্রতি সন্তানের যে ভালবাসা, সেই ভালবাসার অভাব অনুভব করিয়া ব্যথিত চিত্তে বলিয়াছিলেন,—

"জান না কি জীব তুমি, জননী—জনম-ভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?"

বঙ্গ-সাহিত্যে এমন সামগ্রী ছিল না, তিনিই ইহার প্রথম আমদানী করেন। এ আমদানী অনুচীকির্ষা বা ফর-মায়েসীর ফলে হয় নাই। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ কবি যখন দেখিয়াছিলেন যে, দেশের লোক স্বদেশের "স্ব"টাকে ভুলিয়া বিদেশের সর্ব্বস্বকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই তাঁহার প্রাণ স্বতঃই বলিয়া উঠিয়াছিল,—

"শিবের কৈলাস ধাম, শিব পূর্ণ বটে নাম,
শিব ধাম স্বদেশ তোমার।
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।"

স্বদেশ সঙ্গীতের তো আজকাল ছড়াছড়ি দেখিতে পাই, কিন্তু স্বদেশ প্রেমের এমন সুন্দর অভিব্যক্তি সে সকল সঙ্গীতের কয়টার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়?

এই স্বদেশানুরাগ তাঁহার মধ্যে অতি প্রবল ছিল বলিয়াই দেশের কোনও কিছুকেই তিনি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। দেশের কুকুরটিকেও তিনি ভালবাসিতেন। জাতিভেদ জিনিষটা জাতীয়তার অন্তরায় মনে করিয়া ইংরেজী নবীশ সমাজ সংস্কারকের দল উহার উপর আজ খড়্গহস্ত, কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষাই যে এ দেশে বিষম ভেদের প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে, সে কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। ইংরেজী শিক্ষার এই কুফল কিন্তু ঈশ্বর-গুপ্তের চোখে ধরা পড়িয়াছিল। তিনি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে—শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সহৃদয়তা লোপ পাইতেছে দেখিয়া তখনই দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া!
কতরূপে স্নেহ করি, দেশের কুক্কুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আজ সাম্যবাদের প্রচার করিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের ঐ কয়ছত্রের নিকট তাহা দাঁড়াইতে পারে কি? কুক্কুর হইলেও যদি তাহা স্বদেশের হয়, তাহা হইলে বিদেশের ঠাকুরকে ফেলিয়া তাহাকেই যত্ন করিব তাহাকেই স্নেহ করিব; একথা আজ পর্য্যন্ত এদেশের কোনও পেট্রিয়টের বা কোনও সমাজ-সংস্কারকের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে কি? স্বদেশী ভাবের প্রথম প্রচারক বলিয়া যদি এ দেশের কোনও বাঙ্গালী লেখককে অভিহিত করা যায়, তবে তাহা ঈশ্বরগুপ্তকেই বলিতে

হইবে। জাতি বৈরের বীজ তাঁহার লেখাতেই প্রথম উপ্ত হইয়াছিল। তিনিই জাতি বৈরের প্রথম ঘটক।

শুধু স্বদেশ ও স্বজাতি নহে;—স্বদেশের সমাজ, স্বদেশের শাস্ত্র এবং স্বদেশের সাহিত্যও তাঁহার পরম প্রিয় ছিল। স্বদেশের ভাষা লইয়া আজ আমরা হৈ চৈ করিতেছি বটে, কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত যখন লেখেন,—

"যে ভাষায় হয়ে প্রীত, পরমেশ গুণ গীত,
বৃদ্ধ কালে গান কর মুখে।
মাতৃ সম মাতৃ ভাষা, পুরাবে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে॥"

—তখন মাতৃভাষাকে ঘৃণা করাই ইংরাজী-নবীশ বাবুদের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। আজ শ্রীমতী বেসান্ট আমাদের বলিতেছেন,—"মাতৃ ভাষার সাহায্যেই হৃদয়ে অনুভূতি ও মস্তিষ্কে চিন্তার সৃষ্টি সম্ভব।" আজ কর্ম্মবীর গাঁধি আসিয়া আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন,—"The greatest service we can render society is to free ourselves and it from the superstitious regard we have learnt to pay to the learning of the English language." কিন্তু প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে কবি ঈশ্বরগুপ্ত আমাদিগকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনিই বাঙ্গালীকে সর্ব্ব প্রথম শুনাইয়াছিলেন,—"সম্প্রতি স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি কল্পে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ যত্ন করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেশের উচ্চ গৌরব কোন মতেই রক্ষা হইতে পারে না। অধুনা আমরা অন্য কোন বিষয়ের অধিক আন্দোলন না করিয়া দেশীয় মহাশয়দিগে কেবল দেশের ভাষার প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিতে অধিক অনুরোধ করিতেছি, কারণ ভাষাই সকল বিষয়ের মূলাধার হইয়াছে, ভাষা ভিন্ন কিছুই হয় না, আমরা শুদ্ধ ভাষার পরিচয়েই পরস্পর পরিচিত হইতেছি, সংসারিক তাবৎ কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি, পরমেশ্বরকে জানিতে পারিয়াছি, সুতরাং এমত মহোপকারিণী যে জাতীয় ভাষা, তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করাতে কিরূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে, তাহা কি কেহই বিবেচনা করেন না? * * আমারদিগের ভাষা অতি সুশ্রাব্য ও সুকোমল এবং মাধুর্য্যরসে পরিপূরিত। এই ভাষার বাক্য দ্বারা ও লেখনীদ্বারা উত্তমরূপে নানা কৌশলে ও সহজে মনের অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করা যায়, অতএব ইহার প্রতি বাবুদিগের এত আন্তরিক দ্বেষ কেন হইল? কেবল আপনারা দ্বেষ করিলেও হানি ছিল না, যাঁহারা মনের সহিত অনুরাগ করেন তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়াও জ্ঞান করেন না। হায় কি আক্ষেপ! নব্য বেঙ্গাল বাবু সাহেবেরা যে জাতির দৃষ্টান্ত দ্বারা সভ্য বলিয়া অহঙ্কার করেন, তাঁহারা দেশের ভাষার প্রতি কিরূপ যত্ন করেন, তাহা কি দেখিতে পান না? ০ ০ ০ কয়েকজন যুবাব্যক্তি এ বৎসর টাউনহলে অতিশয় সদ্বক্তৃতাপূর্ব্বক বড় বড় ইংরাজদিগকে হতগর্ব্ব করিয়াছেন, তাহাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু বাবু সাহেবেরা যদি দেশস্থ জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিবর্গের দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নিমিত্ত বঙ্গভাষায় এইরূপ সুবক্তৃতা করিতে পারিতেন, তবে অস্মৎ পক্ষে কি এক আশ্চর্য্য সুখের ব্যাপার হইত। ফলে তাহার চেষ্টা নাই, বাঙ্গালা দুইটি কথা এক করিয়া কহিতে হইলে মাথায় অমনি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। অতি সম্ভ্রান্ত কোন আত্মীয় ব্যক্তি যিনি ইংরাজীভাষা জ্ঞাত নহেন, অথচ জাতীয় ভাষায় অতি নিপুণ, তাঁহার সহিত কোনও নবীন বেঙ্গলের সাক্ষাৎ হইলে কথোপকথন কালীন শুনিতে বড় কৌতুক হয়। যথা,—কেমন ভাই, বাড়ীর সকল মঙ্গল তো,—মশয়, আসুন, লাষ্ট্ নাইটে বড় ডেঞ্জারে পড়েছি, আঙ্কেলের কলেরা হয়েছে, পলস্ বড় উইক হোয়েছিল, আজ মর্নিংয়ে ডাক্তার এসে অনেক রিকভার করেছে, এখন লাইফের হোপ হয়েছে।—সে ভাল মানুষ—বাবুজির উত্তর শুনিয়া ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারে না। ভ্যা ভ্যা রামের ন্যায় অবাক হইয়া থাড়া থাকে। এইরূপ কত আছে, যাহা লিখিতে লেখনীর মুখে হাস্য আইসে।"—'সংবাদ প্রভাকরে'র লেখা হইতে অনেক বাদ-ছাদ দিয়া ইহা তুলিলাম, তবু একটু বড় হইয়া গেল। ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ভুল ধারণা, তাহাতে ঐরূপ ভাবে তাঁহার লেখা পাঠকের সম্মুখে না ধরিলে পাঠক তাঁহাকে বুঝিতে বা চিনিতে পারিবেন না বলিয়াই উহা করিতে হইল। পাঠক একটু মনোযোগপূর্ব্বক উহা পড়িলে উহার মধ্যে দুইটি জিনিস দেখিতে পাইবেন। একটা

জিনিস—মাতৃভক্ত সন্তানের সন্তপ্ত হৃদয়ের দারুণ অভিব্যক্তি। মাতার প্রতি সন্তানের দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া তিনি যেন দুঃখে ও ক্ষোভে ফুলিতে-ফুলিতে উহা লিখিয়াছেন। আর একটা জিনিস উহার মধ্যে যাহা দেখা যায়, তাহা হইতেছে তখনকার দিনের ইংরেজী-নবীশ বাবুর প্রকৃত চিত্র। এখনকার কালেও যে অমন মাতৃভাষা-বিদ্বেষী বাবু দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা নহে। তবে তখনকার তুলনায় এখনকার সে বেহায়া-বাবুর সংখ্যা কিছুই নয় বলিলে হয়। তখন মাতৃ-ভাষাকে ঘৃণা করা বাবুদের একটা ফ্যাসান ছিল।—সেটা তাঁহারা গর্ব্বের ও গৌরবের পরিচায়ক বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহাদের সে গর্ব্বসুখটুকুকে—সে গৌরবানুভূতিকে লোক সমক্ষে সর্ব্বপ্রথম ধূলায় লুটাইয়াছিলেন—ঈশ্বরগুপ্ত। এ সাহস—এ শক্তি সে সময়ে একমাত্র ঈশ্বরগুপ্ত ব্যতীত আর কাহারও ছিল না।

শুধু কি তাই? বঙ্গদেশের "স্থানে স্থানে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে, তত্তাবৎ উচ্ছেদ করিয়া ইংরাজী ভাষা প্রচলিত করণাভিপ্রায়ে" যখন জন কয়েক ইংরাজ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, তখন বঙ্গীয় সাহিত্য দেবীদের মধ্যে একা ঈশ্বরগুপ্তই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন।—বাঙ্গালীকে সে যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য তিনিই আকুল হৃদয়ে আহ্বান করিয়াছিলেন। মহৎ চিন্তার—প্রবল আন্তরিকতার বিনাশ নাই, এ কথা সত্য। ঈশ্বরগুপ্তের অকপট উচ্ছ্বাস—আকুল আহ্বান অনেকেরই তখন মর্ম্ম-স্পর্শ করিয়াছিল। এমন কি, ইংরাজী স্কুলের অনেক ছাত্রকেও 'ইংরাজী লিখিয়া যশস্বী হইবার অস্বাভাবিক দুরাকাঙ্ক্ষার বন্ধন' হইতে তাঁহার আহ্বান তখন মুক্তি দিয়াছিল। রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, দ্বারিকানাথ ও মনোমোহন প্রভৃতি সকলেই তখন স্কুলের ছাত্র;—তাঁহারা তখন তাঁহারই উৎসাহের বাতাস পাইয়া সাহিত্য-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। মাতৃ-ভাষার সেবা ও মাতৃ-সেবা যে সমান, এ জ্ঞান তাঁহাদিগকে ঈশ্বরগুপ্তই প্রথম দিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন যে, "বাঙ্গালা-সাহিত্য প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বরগুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন।"

বঙ্গদেশ প্রভাকরের নিকট আর একটা কাজের জন্য অশেষ ঋণে ঋণী। আজ যে আমরা ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, হরুঠাকুর ও রামবসু প্রভৃতির জীবন কথা জানিবার সুযোগ পাইয়াছি,—তাঁহাদের রচনাবলী ছাপার অক্ষরে দেখিবার সুবিধালাভ করিয়াছি, তাহাও প্রভাকরেরই প্রসাদে। কি পরিশ্রম, কি অধ্যবসায় এবং কি কষ্ট স্বীকার করিয়া যে ঈশ্বরগুপ্তকে এ লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিতে হইয়াছিল, তাহা শুনিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। ১২৬২ সালে তিনি ভারতচন্দ্রের যে জীবন বৃত্তান্তটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তাহারই ভূমিকায় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন কবিদিগের জীবন বৃত্তান্ত পূর্ব্বে কেহ লিখিয়া রাখেন নাই, এবং সেই সেই কবি মহাশয়েরাও আপনাপন বিরচিত প্রবন্ধ প্রকরণ প্রকটন পুরঃসর তন্মধ্যে স্বস্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া মানব-লীলা সম্বরণ করেন নাই, সুতরাং এইক্ষণে তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকের সুগোচর করা যদ্রূপ কঠিন ব্যাপার হইয়াছে তাহা বিজ্ঞজনেরাই বিবেচনা করুন। আমি একপ্রকার সর্ব্বত্যাগী হইয়া শুদ্ধ এই বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমার অবস্থা যদ্রূপ হইয়াছে তাহা আমিই জানিতেছি, এবং যিনি সর্ব্বসাক্ষী তিনিই জানিতেছেন। আশা ও সাহসের আশ্রয় লইয়া অনুরাগ চেষ্টা এবং যত্ন না করিয়া যদি স্যাৎ আর পাঁচ বৎসর আলস্যের ক্রীতদাস হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বৃথা কালযাপন করিতাম, তবে এই দেশে ঐ সমস্ত কবিদিগের কবিতা ও সর্ব্ববিষয়ের পরিচয়াদি প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত একেবারে লোপ হইয়া যাইত, যুবকেরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেন না।" তার পর আর এক স্থানে বলিতেছেন,—"নিয়তই আহার নিদ্রা ও আর আর কার্য্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছি। স্থলপথে ও জলপথে ভ্রমণ পূর্ব্বক নানাস্থানি হইয়া নানা লোকের উপাসনা করিতেছি।"—বলা বাহুল্য, এ কষ্ট স্বীকারের অন্তরালে পয়সার আশার বা যশের আশার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। বরং দেখা যায়, এজন্য তাঁহার স্বাস্থ্যের ও অর্থের বিশেষ ক্ষতিই হইয়াছিল। কিন্তু তবু এ পথ তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। স্বদেশ-

সাহিত্য-সংবাদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ মহাশয়ের "ছদ্মবেশ" শীর্ষক প্রবন্ধের যে অংশ বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল সেই প্রবন্ধের যে অংশে ইউরোপীয় সাহিত্য হেডিং দিয়া তৎসম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা আছে, সেই অংশে "অবলা প্রবলা হইয়া ইত্যাদি (৩৩৫ পৃঃ, প্রথম কলম, তৃতীয় প্যারা) বাক্যের শেষাংশে নিম্নলিখিত ফুটনোটটি যোগ করিয়া লইতে পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি" —* যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর পুরুষবেশের দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে কৌতূহলী, তাঁহাদিগকে আমার (মাতৃষ্বস্রেয়) ভ্রাতা শ্রীমান্ গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "রণে-রমণী" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রবন্ধটি ভারতী' পত্রিকায় (১৩১৯ ফাল্গুন) প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধে এই শ্রেণীর দৃষ্টান্তের কথাও যেন সংবাদপত্রে একবার পড়িয়াছিলাম, স্মরণ হয়।

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের "করুণা' শীর্ষক বৌদ্ধ যুগের উপাখ্যানমূলক উপন্যাসখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় ভারতীয় সমর ঋণের লেখক হইয়া "পূজার পরোয়ানা" ও "মেস্তা রূপেয়া" নামধেয় পুস্তিকা ও কবিতা রচনা করিয়াছেন। বঙ্গ সমর ঋণের এজেণ্ট মহাশয় বিনামূল্যে নিয়মিত রূপে তাহার প্রচার করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "রতনে রতন" প্রহসন প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ।• আনা।

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত প্রহসন "শেষ বেশ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ।/• আনা।

স্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত "তত্ত্বমালা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ॥৵• আনা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পালের "কালের কোলে" বাহির হইয়াছে; মূল্য ১৲ টাকা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে;—"কৃষ্ণ কীর্ত্তন"; মূল্য – সদস্য পক্ষে ২৲ মফঃস্বলের সদস্য পক্ষে ২।• এবং সাধারণের পক্ষে ২॥•; "গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস"—।•, ।/•, ও ।৵•। "জ্ঞানসাগর"—।৵•, ।৶• ও ॥•। "সারদামঙ্গল"—॥•, ॥৵• ও ৸•। "নেপালে বাঙ্গালা নাটক" ১৲, ১৶• ও ১।•।

দ্বিজেন্দ্রলালের "গান"এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল; ইহাতে আর্য্য গাথার অধিকাংশ সন্নিবেশিত হইল; মূল্য পূর্ব্ববৎ ২৲ টাকা।

Publisher – Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ

শিল্পী শ্রী[illegible]নাথ মুখোপাধ্যায়

The Emerald Printing Works
Calcutta

চৈত্র, ১৩২৪

দ্বিতীয় খণ্ড] পঞ্চম বর্ষ [চতুর্থ সংখ্যা

সবিতা-দেব

[অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

(১)

অমর কোষে 'সবিতা' শব্দে সূর্য্যের একটি নাম ধরা হইয়াছে (১)। ঋগ্বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য, ঋগ্বেদের যেখানে সবিতা শব্দ দ্বারা দেবতা বুঝাইয়াছে, সেইখানেই উহার সূর্য্য অর্থ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আমরা, ঋগ্বেদের সবিতা দেব কে ছিলেন, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব। এই বিচারের প্রধান আবশ্যকতা এই জন্য যে, বৈদিক যুগের রচনাবলীর প্রকৃত অর্থ করিতে হইলে, দেবতাদিগের সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

বৈদিক যুগে সবিতা শব্দ দ্বারা যেমন দেববিশেষকে বুঝাইত, সেইরূপ উহার একটি সাধারণ অর্থও ছিল। সায়নাচার্য্য বিভিন্ন স্থলে যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, সবিতা অর্থে প্রেরক (২)। নিম্নোদ্ধৃত (ক) ও (খ) ঋকে সবিতা শব্দ ত্বষ্টাদেবের বিশেষণ করা হইয়াছে। (গ) ঋকে সবিতাকে দেবতা এবং (ঘ)

(১) ভানুর্হংস সহস্রাংশুস্তপনঃ সবিতা রবি।

(২) (ক) দেবঃ। ত্বষ্টা। সবিতা। বিশ্বরূপঃ। পুপোষ। প্রজাঃ।

পুরুধা। জজান॥ ৩।৫৫।১৯

সবিতান্তর্যামিতয়া সর্বস্য প্রেরকঃ ইতি সায়ন।

(গ) গর্ভে নু নৌ জনিতা দম্পতী ক দেব ত্বষ্টা সবিতা

বিশ্বরূপঃ।১০।১০।৫

সবিতা সর্বেষাং শুভাশুভস্য প্রেরকঃ ইতি সায়ন।

(গ) অনাগসঃ। অদিতয়ে। দেবস্য। সবিতুঃ। সবে॥

বিশ্বা। বামানি। ধীমহি॥৫।৮২।৬

সবিতুঃ প্রেরকস্য দেবস্য সবে অনুজ্ঞায়াং সত্যাং...

ইতি সায়ন।

(ঘ) সোমঃ। বধূয়ুঃ। অভবৎ। অশ্বিনা। আস্তাং। উভা। বরা।

সূর্যাং। যৎ। পত্যে। শংসন্তীং। মনসা। সবিতা।

অদদাৎ॥ ১০।৮৫।৯

অর্থঃ পতি-আকাঙ্ক্ষিনী সূর্য্যাকে যখন সবিতা মন দ্বারা দান করিয়াছিলেন, (তখন) সোম বধূকামী (বর) ছিলেন (ও) অশ্বিদ্বয় উভয়ে বর (অর্থাৎ মিত্রবর) ছিলেন।

সবিতা সূর্যঃ ইতি সায়ন। এ স্থলে সবিতা অর্থে প্রেরণকর্ত্তা ধরিলে সূর্য্যাকেই বুঝায়।

ঋকে শুধু সবিতা বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তে সবিতা-দেবের স্তব আছে। সেই সকল সূক্তে সবিতা-দেবের যে সকল গুণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে সূর্য্যকে বুঝায় না। এক্ষণে আমরা ঐ সকল সূক্ত ও অপরাপর ঋক্ উদ্ধার করিয়া, 'সবিতা'-দেব প্রকৃত কে, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

১ম মণ্ডলের ৩৫ সূক্তে সবিতা-দেবতার বর্ণনা দেখিতে পাই (৩)। উহার ২য় ঋকে প্রকাশ যে, সবিতা হিরণ্ময় রথে ভুবন সকল দেখিতে-দেখিতে যাইতেছেন (ক)। সবিতার রথ কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতিঃযুক্ত; সবিতার ভ্রমণকালে অমর ও মর্ত্ত্যগণ স্ব স্ব গৃহে আগমন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই বর্ণনা হইতে আমাদের মনে হয়, সবিতা চন্দ্রকে বুঝাইতেছে। কারণ চন্দ্রেই কলঙ্ক আছে, এবং রাত্রিতেই অমরগণ তাঁহাদের নক্ষত্ররূপ গৃহে এবং মর্ত্ত্যগণ স্ব স্ব গৃহে দিবসের কার্য্যশেষে আগমন করেন। ৭ম ঋকে দেখা যায়, সূর্য্য তখন আকাশে নাই (খ)। অতএব তখন রাত্রিকাল; তাহা হইলে সবিতা-দেব কখনই সূর্য্য নহেন। ৯ম ঋকে সবিতা দেব কলঙ্কযুক্ত জ্যোতিঃ দ্বারা আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিতেছেন এবং সূর্য্যের অভিমুখে গমন করিতেছেন, বর্ণিত হইয়াছে (গ)। এই ঋকের ব্যাখ্যায় সায়ন বলেন—যদ্যপি সবিতৃ সূর্য্যয়ো রেক দেবতাত্বং তথাপি মূর্ত্তি-ভেদেন গন্তৃগন্তব্যভাবঃ। সায়নাচার্য্যের মতে সবিতা অর্থে সূর্য্য। 'বৈতি সূর্য্যং' এই অংশের ব্যাখ্যায় সায়ন বলেন, 'সবিতা সূর্য্যে গমন করিতেছেন।' ইহাতে সবিতা ও সূর্য্য দুইটি বিভিন্ন দেবতা হইয়া পড়ে। সায়নাচার্য্য সেইজন্য ইহার এইরূপে মীমাংসা করিয়াছেন। সূর্য্যের কোন সময়ের মূর্ত্তিকে সবিতা বলে ও অপর সময়ের মূর্ত্তিকে সূর্য্য বলে। এই ব্যাখ্যা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ সবিতা-দেব রাত্রিতে আকাশে দেখা দেন, সূর্য্য কখন রাত্রিকালে দেখা দেন না। দশম ঋক হইতে আমরা স্পষ্ট জানিতেছি, সবিতা দেব প্রতি রাত্রিতে স্তূয়মান হন (ঘ)। ৫ম ঋকে সবিতা দেবের অশ্বের বর্ণনা দেখিতে পাই (ঙ)। তাহা

(৩) ক। আ। কৃষ্ণেন। রজসা। বর্ত্তমানঃ
নিবেশয়ন্। অমৃতং। মর্ত্ত্যং। চ।
হিরণ্যয়েন। সবিতা। রথেন। আ
দেবঃ। যাতি। ভুবনানি। পশ্যন্॥ ১।৩৫।২

অর্থঃ—কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতিঃর সহিত (বা, কলঙ্কযুক্ত জ্যোতিঃর সহিত) বর্ত্তমান, অমর ও মর্ত্ত্যকে (স্ব-স্ব) গৃহে স্থাপনকারী দেব সবিতা হিরণ্ময় রথে ভুবন সকল দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন।

খ। বি। সুপর্ণঃ। অন্তরিক্ষাণি। অখ্যৎ
গভীরবেপাঃ। অসুরঃ। সুনীথঃ।
ক্ব। ইদানীং। সূর্য্যঃ। কঃ। চিকেত
কতমাং। দ্যাং। রশ্মিঃ। অস্য। আ।
ততান॥ ১।৩৫।৭

অর্থঃ—সুন্দর গমনশীল (বা, সুন্দর পক্ষযুক্ত), গভীর কম্পনযুক্ত, অসুর, সুন্দর পথপ্রদর্শক (সূর্য্য) অন্তরিক্ষ সকল প্রকাশ করেন। এক্ষণে সূর্য্য কোথায়, কে জানেন? ইঁহার রশ্মি কোন্ দিব্যলোকে বিস্তৃত হইয়াছে?

গ। হিরণ্যপাণিঃ। সবিতা। বিচর্ষণিঃ
উভে। দ্যাবাপৃথিবী। অন্তঃ। ঈয়তে।
অপ। অমীবাং। বাধতে। বেতি। সূর্য্যং। অভি
কৃষ্ণেন। রজসা। দ্যাং। ঋণোতি॥ ১।৩৫।৯

অর্থঃ—হিরণ্যপাণি সবিতা দর্শন করিতে-করিতে উভয় দ্যাবা পৃথিবীর মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন। রোগ দূর করিতেছেন। সূর্য্যের অভিমুখে গমন করিতেছেন। কলঙ্কযুক্ত জ্যোতিঃ দ্বারা দিব্য-লোক ব্যাপিয়া ফেলিতেছেন।

ঘ। হিরণ্যহস্তঃ। অসুরঃ। সুনীথঃ
সুমৃড়ীকঃ। স্ববান্। যাতু। অর্বাঙ্।
অপসেধন্। রক্ষসঃ। যাতুধানান্
অস্থাৎ। দেবঃ। প্রতিদোষং। গৃণানঃ॥ ১।৩৫।১০

অর্থ—হিরণ্যহস্ত, অসুর, সুন্দর পথপ্রদর্শক, সুন্দর সুখদাতা, স্ববান্, অভিমুখে আগমন করুন। রাক্ষস ও যাতুধানদিগকে দূর করিয়া দিন। দেব (সবিতা) প্রতি রাত্রিতে স্তূয়মান হইয়া থাকেন।

[সবিতা "অসুরঃ সুনীথঃ" কিন্তু সূর্য্য "গভীর বেপাঃ অসুরঃ সুনীথঃ" দ্রষ্টব্য।]

ঙ। বি। জনান্। শ্যাবাঃ। শিতিপাদঃ। অখ্যন্
রথং। হিরণ্যং। প্রউগং। বহন্তঃ।
শশ্বৎ। বিশঃ। সবিতুঃ। দৈব্যস্য
উপস্থে। বিশ্বা। ভুবনানি। তস্থুঃ॥ ১।৩৫।৫

অর্থঃ—হিরণ্য-যুগযুক্ত রথকে বহন করিয়া শ্বেত-পদযুক্ত শ্যামবর্ণ (অশ্বগণ) জনগণকে প্রকাশ করিতেছে। সবিতার অমর প্রজাগণ (ও) বিশ্বভুবন দেবলোকের নিকটে ছিল।

হইতে জানা যাইতেছে যে, তাঁহার অশ্বগণ শ্যামবর্ণ এবং শ্বেত-পদযুক্ত। সূর্য্যরথের অশ্বগণের বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই, তাহারা সংখ্যায় সাতটী, বর্ণে হরিত এবং তাহারা স্ত্রীজাতি (৪)। ইহাতেও দেখা যাইতেছে যে, সবিতা-দেব ও সূর্য্য এক নহেন।

এক্ষণে আমরা ঋগ্বেদের অপরাপর স্থল হইতে ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখাইব যে, সবিতা-দেব সূর্য্য নহেন। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৭১ সূক্তের ৪র্থ ঋকে সবিতা-দেব প্রতি রাত্রিতে উদিত হন, বর্ণিত হইয়াছে (৫)। এই ঋকের টীকায় সায়নাচার্য্য 'প্রতিদোষং' শব্দের অর্থ করিতেছেন, "প্রতিরাত্রং রাত্রেরবসানে।" সায়নাচার্য্যের মতে 'সবিতা' অর্থে সূর্য্য। অতএব রাত্রিকে দিন বলিয়া ব্যাখ্যা করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। ৪র্থ মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ১ম ঋকেও বর্ণিত হইয়াছে, দেব সবিতা রাত্রি সকল দ্বারা উদিত হন। সায়নাচার্য্য ব্যাখ্যাকালে বলিতেছেন, "অক্তুভিঃ রাত্রিভিঃ এতদ্ব্যাপ্যলক্ষণং সর্বৈ র্দিবসৈঃ সর্ব্বেষু দিবসেষু নো অস্মাকং উদায়ন্ উৎযচ্ছতু করোতু ইত্যর্থঃ (৬)। এই সূক্তের

(৪)　সপ্ত। ত্বা। হরিতঃ। রথে। বহন্তি। দেব। সূর্য্য।
শোচিঃ কেশং। বিচক্ষণ ॥ ১।৫০।৮

অর্থঃ—হে বিচক্ষণ সূর্য্যদেব! উজ্জ্বল কেশযুক্ত তোমাকে সাতটী হরিৎবর্ণ (অশ্বী) রথে বহন করিতেছে।

সপ্ত। স্বসারঃ। সুবিতায়। সূর্য্যং। বহন্তি। হরিতঃ। রথে ॥ ৭।৬৬।১৫

অর্থঃ—সাতটী হরিৎ (বর্ণ) ভগিনীগণ কল্যাণের নিমিত্ত সূর্য্যকে রথে বহন করিতেছে।

অযুক্ত। সপ্ত। শুন্ধ্যুবঃ। সূরঃ। রথস্য। নপ্ত্যঃ।
তাভিঃ। যাতি। স্বযুক্তিভিঃ ॥ ১।৫০।৯

অর্থঃ—রথবহনকারিণী সাতটী অশ্বীকে সূর্য্য (রথে) যোজিত করিয়াছেন। সেই সকল সুন্দররূপে যোজিত (অশ্বী সকলের) দ্বারা গমন করিতেছেন।

(৫)　উৎ। উ। স্যঃ। দেবঃ। সবিতা। দমূনা
হিরণ্যপাণিঃ। প্রতিদোষং। অস্থাৎ। ৬।৭১।৪

অর্থঃ—সেই (প্রসিদ্ধ) দান্ত, হিরণ্যপাণি, দেব সবিতা প্রতি রাত্রিতে উদিত হন।

(৬)　তৎ। দেবস্য। সবিতুঃ। বার্য্যং। মহৎ
বৃণীমহে। অসুরস্য। প্রচেতসঃ।
ছর্দিঃ। যেন। দাশুষে। যচ্ছতি। ত্মনা
তৎ। নঃ। মহান্। উৎ। অযান্। দেবঃ।
অক্তুভিঃ ॥ ৪।৫৩।১

আর এক ঋকেও রাত্রির উল্লেখ দেখিতে পাই (৭)। সবিতার দুই বাহুর কথা এই ঋকে আছে। মনে হয়, চন্দ্রকলার দুই প্রান্তকে সেকালের ঋষিগণ দুই বাহুর সহিত তুলনা করিতেন।

(২)

বৈদিক যুগে চন্দ্র শব্দের অর্থ ছিল আনন্দদায়ক। আমরা যাহাকে চন্দ্র বলি, বৈদিক যুগে তাহাকে চন্দ্রমা বলা হইত। মাসকৃৎ অর্থাৎ মাসরূপ কাল করেন বলিয়া চন্দ্রমা নাম চন্দ্রে প্রযুক্ত হইয়াছিল। চন্দ্রের জ্যোতিঃ স্নিগ্ধ ও মনোরম; ইহা দেখিলেই মনে আনন্দ হয়। এই নিমিত্ত চন্দ্রমা শব্দ দ্বারা চন্দ্রকেই বুঝাইত। চন্দ্রের আর একটি নাম সোম। কারণ স্বর্গীয় সোমলতা চন্দ্রেই বর্ত্তমান। অনুমান করি, চন্দ্রমণ্ডলের মৃগচিহ্ন বা কলঙ্ক বৈদিক যুগে সোমলতারূপে কল্পিত হইত। সোমের আর এক নাম ছিল ইন্দু। সোমরস বিন্দু রূপে ক্ষরিত হইত বলিয়া ইহাকে ইন্দু ও দ্রপ্স বলা হইত। চন্দ্রে ইন্দু বা সোম আছে বলিয়া ইন্দু ও সোম শব্দদ্বয়ে চন্দ্রকেই বুঝাইতেছে। বৈদিক ঋষিগণ মনে করিতেন, 'স্ব' 'একঃ' বা পুরুষ যখন বিরাট রূপ ধারণ করেন, তখন তাঁহার মন হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হয়(৮)। পুরুষের মনে তাঁহার কামনার উদয় হয়। সেই কামনা রসরূপে পরিণত হয় (৯)। এই রসই স্বর্গীয় সোমরস

অর্থঃ—এক্ষণে অসুর, প্রচেত, সবিতা দেবতার বরণীয় মহৎ (ধন) প্রার্থনা করি। (হবি) দাতাকে যে আত্মন্ দ্বারা গৃহ দান করেন, মহানদেব তাহা আমাদিগকে (দিবার জন্য) রাত্রি সকলের দ্বারা উদিত হউন।

(৭)　প্র। বাহূ। অস্রাক্। সবিতা। সবীমনি
নিবেশয়ন্। প্রসুবন্। অক্তুভিঃ। জগৎ ॥৪।৫৩।৩

অর্থঃ—সবিতা প্রেরণ করিবার জন্য দুই বাহু প্রসারণ করিতেছেন। জগৎ অর্থাৎ গমনশীলদিগকে প্রেরণ করিয়া রাত্রি সকলের দ্বারা নিবাস-যুক্ত করিয়াছেন।

(৮)　চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত। ১০।৯০।১৩

অর্থঃ—(পুরুষের) মন হইতে চন্দ্রমা জন্মিয়াছেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছেন।

(৯)　কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধি মনসো রেতঃ প্রথমং
যদাসীৎ। ১০।১২৯।৪

অর্থঃ—তৎপরে (অর্থাৎ প্রলয়াবসানে) কাম সম্যক প্রকারে বর্ত্তমান হইল। ইহাই মনের প্রথম রেত ছিল।

এবং অমৃত। এই রস হইতে সকল উৎপন্ন হইয়াছে ও ইহার দ্বারা জীবিত রহিয়াছে (১০)। অতএব চন্দ্রেই অমৃত বর্ত্তমান। অমরদেব ও ঋষিগণ এই অমৃত পান করেন (১১)। সেইজন্য চন্দ্রের হ্রাস হয়; কিন্তু ভগবানের মনে কামনার উদয়ে চন্দ্র ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। চন্দ্র-স্থিত অমৃত পুণ্যবানদিগকে বিতরণ করিবার ভার এক দেবতার হস্তে থাকে। তিনি সবিতা দেব। কারণ, তিনিই দেবতাদিগকে ও যজ্ঞকারীকে উহা প্রেরণ করেন। অতএব সবিতা-দেব চন্দ্রলোকেই অবস্থান করেন। মনে রাখিতে হইবে, সবিতা-দেব সোম নহেন। স্বর্গীয় অমৃত-সোম যখন যাহার হস্তগত, তখন সেই দেবই বিশ্বসংসারের ঈশ্বর। সেই দেবকে তখন সবিতা ও বিশ্বরূপ এই দুই বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। ঋগ্বেদে ত্বষ্টা দেবকে এই দুই উপাধি-যুক্ত দেখি (১২)। ত্বষ্টাদেব, দেবপত্নীদিগের গর্ভে সন্তানের রূপ প্রদান করেন এবং মানব, পশু ও পক্ষীদিগের গর্ভেও রূপ প্রদান করেন (১৩)।

যখন পশু-পালনই মনুষ্য-সমাজের প্রধান অবলম্বন ছিল, তখন পশুদিগের রূপ প্রদানকারীই শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া গণ্য হইতেন। সেই জন্য ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে ত্বষ্টা-দেবই সবিতা ও বিশ্বরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃষিকার্য্যের প্রাধান্য স্থাপিত হইলে ইন্দ্র দেব-শ্রেষ্ঠ হইলেন। কারণ, বৃষ্টি কৃষি-কার্য্যের প্রাণ স্বরূপ। ইন্দ্রই স্বর্গীয় বারি আনয়নে দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বরুণ জলের দেবতা হইলেও, বৃত্র জল অবরোধ করিয়া থাকিলে মনুষ্য-কৃষক জল প্রাপ্ত হয় না। ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া পৃথিবীতে জল আনয়ন করেন। ঋগ্বেদে দেখা যায়, ইন্দ্র বলপূর্ব্বক ত্বষ্টা-দেবের সোম পান করিয়াছিলেন এবং নিজে বিশ্বরূপ হইয়াছিলেন (১৪)। এমন কি, কথিত আছে, ত্বষ্টা ইন্দ্রের

(১০) সোমঃ। পবতে। জনিতা। মতীনাং
জনিতা। দিবঃ। জনিতা। পৃথিব্যাঃ।
জনিতা। অগ্নেঃ। জনিতা। সূর্যস্য
জনিতা। ইন্দ্রস্য। জনিতা। উত। বিষ্ণোঃ॥ ৯।৯৬।৫

অর্থঃ—জ্ঞানীদিগের জনক (বা মতিবিশিষ্টদিগের জনক), দিব্য-লোকের জনক, পৃথিবীর জনক, সোম ক্ষরিত হইতেছেন। (সোম) অগ্নির জনক, সূর্য্যের জনক, ইন্দ্রের জনক ও বিষ্ণুর জনক।

(১১) মহৎ। তৎ। সোমঃ। মহিষঃ। চকার
অপাং। যৎ। গর্ভঃ। আবৃণীৎ। দেবান্।
অদধাৎ। ইন্দ্রে। পবমানঃ। ওজঃ
অজনয়ৎ। সূর্যে। জ্যোতিঃ। ইন্দুঃ॥ ৯।৯৭।৪১

অর্থঃ—মহৎ, পূজ্য, সোম জল সকলের সেই (গর্ভ) করিয়াছিলেন, যে গর্ভ দেবতা সকলকে বরণ করিয়াছিলেন। পবমান ইন্দু (অর্থাৎ সোম) ইন্দ্রে ওজ (বা শক্তি) দিয়াছেন, সূর্যে জ্যোতিঃ জন্মাইয়াছেন।

ইন্দুং। রিহন্তি। মহিষা। অদব্ধাঃ।
পদে। রেভন্তি। কবয়ঃ। নি। গৃধ্রাঃ॥ ৯।৯৭।৫৭

অর্থঃ—অন্য দ্বারা অজিত পূজ্য (দেবগণ) ইন্দুকে লেহন করিতে-ছেন; কবিগণ পক্ষীর মত পদে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

সোমেন। আদিত্যাঃ। বলিনঃ। সোমেন। পৃথিবী। মহী। ১০।৮৫।২

অর্থঃ—সোমের দ্বারা আদিত্যগণ বলবান্, সোমের দ্বারা পৃথিবী মহতী হইয়াছেন।

যৎ। ত্বা। দেব। প্রপিবন্তি। ততঃ। আ। প্যায়সে।
পুনঃ। ১০।৮৫।৫

অর্থঃ—হে দেব (সোম)! যখন তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পান করে, তৎপরে পুনরায় (তুমি) পূর্ণ হও।

(১২) দেবঃ। ত্বষ্টা। সবিতা। বিশ্বরূপঃ। পুপোষ। প্রজাঃ।
পুরুধা। জজান। ৩।৫৫।১৯

অর্থ—সবিতা বিশ্বরূপ, দেব ত্বষ্টা বহু প্রজা উৎপাদন ও পালন করিয়াছেন।

(১৩) ত্বষ্টা। রূপাণি। হি। প্রভুঃ। পশূন্। বিশ্বান্।
সম্ আনজে। ১।১৮৮।৯

অর্থঃ—ত্বষ্টা সকল রূপের প্রভু, সকল পশুকে ব্যক্ত করেন।

গর্ভে নু নৌ জনিতা দম্পতী-ক দেব ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ।
১০।১০।৫

অর্থঃ—সবিতা, বিশ্বরূপ জনক দেব ত্বষ্টা আমাদিগকে (যম ও যমীকে) গর্ভে দম্পতী করিয়াছেন।

তৎ। নঃ। তুরীপং। অধ। পোষয়িত্নু
দেব। ত্বষ্টঃ। বি। ররাণঃ। স্যস্ব।
যতঃ। বীরঃ। কর্মণ্যঃ। সুদক্ষঃ
যুক্তগ্রাবা। জায়তে। দেবকামঃ॥ ৩।৪।৯ (বা ৭।২।৯)

অর্থঃ—হে দেব ত্বষ্টা! যাহা দ্বারা বীর, কর্ম্মকুশল, বলশালী ও সোমাভিষবের জন্য মুষল-হস্ত দেবাভিলাষী পুত্র উৎপন্ন হয়, রমণকারী তুমি আমাদিগকে শীঘ্র প্রাপ্ত হইয়া (সেইরূপ) তেজস্কর (বীর্য্য) পাত কর।

(১৪) ত্বষ্টারং। ইন্দ্রঃ। জনুষা। অভিভূয়। আমুষ্য।
সোমং। অপিবৎ। চমূষু। ৩।৪৮।৪

অর্থঃ—ইন্দ্র ত্বষ্টাকে সামর্থ্য দ্বারা পরাভূত করিয়া চমূসকলে স্থিত সোমবলপূর্ব্বক লইয়া পান করিয়াছিলেন।

নিকট পরাজিত হইলে, বিশ্বরূপ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাকেও ইন্দ্র সংহার করেন (১৫)। ত্বষ্টা-দেব সিংহাসন চ্যুত হইলে ইন্দ্রের বজ্র-নির্ম্মাণ, দেবতাদিগের পান-পাত্র-ধারণ এবং পশুদিগের গর্ভে সন্তানের রূপ প্রদান এই সকল কার্য্যের অধিকার প্রাপ্ত হন (১৬)।

মনুষ্য-সমাজে অশ্ব-পালন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে গো গৃহপালিত হইয়াছিল। ইন্দ্র যখন ত্বষ্টার নিকট হইতে বল-পূর্ব্বক সোম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার গো সকলও গ্রহণ করেন (১৭)। ত্বষ্টার গো সকল চন্দ্রমার গৃহে ছিল, ইন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া তাহা জানিয়াছিলেন। ইহা দ্বারাও দেখা যাইতেছে যে, ত্বষ্টাই চন্দ্রের অধিষ্ঠাতৃ দেব বা সবিতা ছিলেন। ইন্দ্র দেবরাজ হইলে, ত্বষ্টাদেবও ইন্দ্রের ভয়ে কম্পান্বিত হইতেন (১৮)।

(৩)

নিম্নে উদ্ধৃত ঋকদ্বয়ে সবিতা দেবের কিছু বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে দেখি যে, দেব সবিতার কার্য্য দেবতাদিগকে অমৃত প্রেরণ করা। ভূতজাতের তিনিই প্রজাপতি। তাঁহার হস্তেই পিতা পুত্র ক্রমে মনুষ্য-বংশের জীবন-সূত্র ন্যস্ত। সবিতা পীতবর্ণ কবচ পরিধান করিতে-ছেন (১৯)—এই বর্ণনা দ্বারা আমরা বুঝিতেছি যে, দিবা-ভাগে চন্দ্র শ্বেতবর্ণ দেখায়; কিন্তু রাত্রির আগমনে পীতবর্ণ ধারণ করে। এই পরিবর্ত্তনের কথাই ঋষি ঋকে প্রকাশ করিতেছেন। অতএব সবিতা যে চন্দ্র তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। নিম্নোদ্ধৃত ঋকে (২০) কোন ঋষি সবিতাকে

রূপং রূপং। প্রতিরূপঃ। বভূব। তৎ। অস্য। রূপং। প্রতি চক্ষণায়। ইন্দ্রঃ। মায়াভিঃ। পুরুরূপঃ। ঈয়তে। যুক্তাঃ। হি। অস্য। হরয়ঃ। শতা। দশ॥ ৬।৪৭।১৮

অর্থঃ—ইন্দ্র নানাবিধ রূপের প্রতিরূপ হইয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার রূপ নিয়ত দর্শনীয় (হইয়াছে)। ইন্দ্র মায়া সকল দ্বারা বহু রূপ ধারণ করেন। তাঁহার দশ শত (অর্থাৎ অসংখ্য) অশ্ব যোজিত রহিয়াছে।

(১৫) ভূরি। ইৎ। ইন্দ্রঃ। উৎ ইনক্ষন্তং। ওজঃ
অব। অভিনৎ। সৎপতিঃ মন্যমানং।
ত্বাষ্ট্রস্য। চিৎ। বিশ্বরূপস্য গোনাং
আচক্রাণঃ। ত্রীণি। শীর্ষা। পরা। বর্ক্॥ ১০।৮।৯

অর্থঃ—সৎপতি ইন্দ্র, অত্যন্ত বল প্রাপ্ত অহঙ্কারীকে বিদারণ করিয়াছিলেন। ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের গোবৎ (বা গোদিগের স্বামীর) শব্দকারী তিন মস্তককে ছিন্ন করিয়াছিলেন।

অস্মভ্যং। তৎ। ত্বাষ্ট্রং। বিশ্বরূপং। অরন্ধয়ঃ। সাখ্যস্য।
ত্রিতায়। ২।১১।১৯

অর্থঃ—সখিত্বের অনুরোধে ত্রিতের জন্য (যেরূপ) আমাদিগের জন্য সেই ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে সংহার কর।

(১৬) মহ্যং। ত্বষ্টা। বজ্রং। অতক্ষৎ। আয়সং
ময়ি। দেবাসঃ। অবৃজন্। অপি। ক্রতুম্। ১০।৪৮।৩

অর্থঃ—ত্বষ্টা আমাকে (ইন্দ্রকে) আয়স বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; দেবতাগণ আমাতেই যজ্ঞ করেন।

বিভ্রৎ। পাত্রা। দেবপানানি। শান্তমা। ১০।৫৩।৯

অর্থঃ—(ত্বষ্টা) শ্রেষ্ঠ দেব-পান-পাত্র সকল ধারণ করেন।

(১৭) অত্র। অহ। গোঃ। অমন্বত। নাম। ত্বষ্টুঃ। অপীচ্যং।
ইত্থা। চন্দ্রমসঃ। গৃহে॥ ১।৮৪।১৫

অর্থঃ—(ইন্দ্র) এইরূপে চন্দ্রমার গৃহে—ঐ স্থানেই—ত্বষ্টার গাভীর অপ্রকাশিত নাম জানিয়াছিলেন।

রমেশ বাবুর অনুবাদ:—এইরূপে আদিত্য-রশ্মি এই গমনশীল চন্দ্র-মণ্ডলের অন্তর্হিত ত্বষ্টতেজ পাইয়াছিল।

ত্বষ্টা অর্থে আদিত্য এবং গো অর্থে রশ্মি করিয়াছেন।

(১৮) ত্বষ্টা। চিৎ। তব। মন্যবে। ইন্দ্র। বেবিজ্যতে। ভিয়া ১।৮০।১৪

অর্থঃ হে ইন্দ্র! ত্বষ্টাও তোমার ক্রোধ হেতু ভয়ে কম্পমান হন।

(১৯) দিবঃ। ধর্ত্তা। ভুবনস্য। প্রজাপতিঃ
পিশঙ্গং। দ্রাপিং। প্রতি। মুঞ্চতে। কবিঃ।
বিচক্ষণঃ। প্রথয়ন। আপৃণন। উরু
অজীজনৎ। সবিতা। সুম্নং। উক্থ্যম॥ ৪।৫৩।২

অর্থ—দিবালোকের ধারণকর্ত্তা, ভূতজাতের প্রজাপতি, কবি পীতবর্ণ কবচ পরিধান করিতেছেন। সকলের দ্রষ্টা সবিতা তেজ বিস্তার ও পরিপূর্ণ করিয়া বৃহৎ, সুন্দর (বা সুখকর) স্তুত্যকে (সূর্য্যকে) জন্ম দিয়াছেন।

বৃহৎ ও সুন্দর স্তুত্য যে কে, সায়ন তাহা বলেন নাই। চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যে একটা হইবে। বেদের কোথাও দেখা যায় না, সূর্য্য চন্দ্রের জনক। কিন্তু সোম যে সূর্য্যের জনক তাহা উদ্ধার করিয়া দেখান গিয়াছে। অতএব আমরা 'সুম্নং উক্থ্যং' কে সূর্য্য মনে করি।

দেবেভ্যঃ। হি। প্রথমং। যজ্ঞিয়েভ্যঃ
অমৃতত্বং। সুবসি। ভাগং। উত্তমম্।
আৎ। ইৎ। দামানং। সবিতঃ। বি। ঊর্ণুষে
অনূচীনা। জীবিতা। মানুষেভ্যঃ॥ ৪।৫৪।২

অর্থঃ—হে সবিতা! যজ্ঞীয় দেবতা সকলকে প্রথম (ও) উত্তম অমৃতাংশ প্রেরণ কর। তৎপরে মনুষ্যদিগের নিমিত্ত (পিতা-পুত্রাদি) ক্রমে জীবন-সূত্র ব্যক্ত কর।

(২০) অপ্সু। প্রদিষ্টঃ। মধুমান্। ঋতাবা। দেবঃ। ন। যঃ।
সবিতা। সত্যমন্মা॥ ৯।৯৭।৪৮

অপ্ সকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাদু এবং মধু-সদৃশ বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা শুধু সোমকেই বুঝায়। কেহ-কেহ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, সবিতা সোমের অধিপতি দেবতা, তিনি সোম নহেন। ঋষি এখানে, সোম ও সবিতার মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাহা গ্রহণ করেন নাই, দেখা যাইতেছে। সূর্য্যাকে কোন স্থলে মধুর রস সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই।

একটী ঋকে, সবিতা সূর্য্যের রশ্মির সহিত যুক্ত হইয়া থাকে, এবং রাত্রিকে উভয় দিক হইতে পরিক্রম করে, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (২১)। ইহাতে বেশ উপলব্ধি হইতেছে যে, চন্দ্র দিবাভাগে সূর্য্যের রশ্মির সহিত যুক্ত হইয়া দৃষ্ট হয় - এই কথা বলা হইতেছে। আরো, চন্দ্র শুক্ল পক্ষে পশ্চিম দিকে এবং কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বদিকে, উদিত হইয়া রাত্রি পরিক্রম করে। এই বর্ণনায় সবিতা শব্দে চন্দ্র ভিন্ন সূর্য্যাকে বুঝাইতে পারে না। আর এক ঋকে দেখিতে পাই, সবিতা দিবা ও রাত্রি উভয়ে আগমন করে। ইহা কখন সূর্য্যে প্রয়োগ করিতে পারা যায় না।

ঋগ্বেদের যুগে যদিও ইন্দ্র-পূজা বিস্তার লাভ করিয়াছে, তথাপি প্রাচীন দেব সবিতা--ত্বষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনও লুপ্ত হয় নাই। ঋগ্বেদেরও প্রাচীন কালে সবিতা-ত্বষ্টা দেব দেবরাজ ছিলেন। পরে ইন্দ্র বজ্র লাভ করিয়া দেবরাজ হন এবং সোমেরও রাজা হন (২২)। জর্ম্মাণ পণ্ডিত Hillebrandt ত্বষ্টা-দেবকে চন্দ্র মনে করেন (২৩)। ঋগ্বেদে সূর্য্যাকে মিত্রবরুণের চক্ষু বলা হইয়াছে। এক স্থলে বিরাট পুরুষের চক্ষুও বলা হইয়াছে। সূর্য্য দেবতাদিগের চর স্বরূপ; লোকে যজ্ঞাদি কার্য্য করিতেছে কি না, তিনি দেখিয়া বেড়ান। সেই জন্যই সূর্য্যের উদয় হইবার পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। সূর্য্যই সুকৃতকারীদিগকে স্বর্গে লইয়া যান। সূর্য্যের এই সকল বিশেষ কার্য্যের বিষয় আমরা একটী প্রবন্ধে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

অর্থঃ—সত্য মননকারী, সবিতা, যিনি দেব সদৃশ, যজ্ঞবান, ও জল সকলের মধ্যে স্বাদুতম ও মধুর।

(২১) উত। যাসি। সবিতঃ। ত্রীণি। রোচনা
উত। সূর্য্যস্য। রশ্মিভিঃ। সং। উচ্যসি।
উত। রাত্রীং। উভয়তঃ। পরি। ঈয়সে
উত। মিত্র। ভবসি। দেব। ধর্ম্মভিঃ॥ ৫।৮১।৪

অর্থঃ - এবং হে সবিতা! (তুমি) তিন দিব্যলোকে গমন কর; এবং সূর্য্যের রশ্মি সকলের সহিত সম্যক প্রকারে গমন কর (বা যুক্ত হও); এবং উভয় দিক হইতে রাত্রিকে পরিক্রম কর; এবং হে দেব! ধর্ম্ম সকলের দ্বারা মিত্র হও।

যঃ। ইমে। উভে। অহনী। পুরঃ। এতি। অপ্রযুচ্ছন্। সু আধীঃ। দেবঃ। সবিতা॥ ৪।৮২।৮

অর্থঃ—দেব সবিতা সুকর্ম্মা, যিনি এই দুই দিবারাত্রির সম্মুখে অপ্রমত্ত হইয়া আগমন করেন।

(২২) তুর্ব্বন্। ওজীয়ান্। তবসঃ। তবীয়ান্
কৃত ব্রহ্মা। ইন্দ্রঃ। বৃদ্ধমহাঃ।
রাজা। অভবৎ। মধুনঃ। সোমস্য
বিশ্বাসাং। যৎ। পুরাং। দর্ত্নুং। আবৎ॥ ৬।২০।৩

হিংসকদিগের নাশক, অতিশয় ওজস্বী, বলবত্তম, ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত, মহৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্র মধুর সোমের রাজা হইয়াছেন, যখন পুরবিদারক বজ্র পাইয়াছেন।

(২৩) Only he (Hillebrandt) makes out Tvashtar to be the moon itself.

Ragozin's Vedic India; foot note, p 249.

মনোবিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম-এ]

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়-সাহায্যেই প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সকল গুণ প্রত্যক্ষ করা যায় না। বিশেষ-বিশেষ ইন্দ্রিয় বস্তুজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ দ্বার। নাসিকা দ্বারা সুগন্ধ গ্রহণ করিয়া পুষ্প-বিশেষের জ্ঞান লাভ করিতে পারি; জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন করিয়াও বস্তুবিশেষকে জানিতে পারি; কিন্তু অধিকাংশ বস্তুই আমরা ত্বক, কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা জানিয়া থাকি। এই জন্য বস্তুর জ্ঞান বিষয়ে শেষোক্ত তিন ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আবার, এই তিনের মধ্যে ত্বক ও চক্ষুর প্রাধান্য আরও গুরুতর। চক্ষু দ্বারা আমরা অধিকতর সংখ্যার ও প্রকারের দ্রব্যগুণসমূহ জানিতে পারি। শ্রবণ বা স্পর্শন দ্বারা এত পরিমাণ ও এত বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য-গুণ আমরা জানিতে পারি না। শব্দমাত্রেই শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। মানুষের ভাষা শব্দ ও শব্দের বিভিন্ন প্রকারের সমাবেশ মাত্র। ভাষা আছে বলিয়াই মানুষের প্রাধান্য। এই ভাষার দ্বারাই আমরা পরস্পরকে জানিতে পারি। ভাষার দ্বারাই অপ্রত্যক্ষ যাবতীয় বস্তুকে জানিতে পারি এবং অপরকে জানাইয়া থাকি। সাধারণ ভাষার তাল মান-রাগ নাই। শব্দসমূহ তাল-মান-রাগে সন্নিবিষ্ট হইলেই সঙ্গীত হয়। রাগের অসংখ্য প্রকার-ভেদ আমরা কর্ণ দ্বারা অনুভব করিতে পারি। ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারাও আমরা জগতের অনেক বস্তু ও দ্রব্যগুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ; কিন্তু সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের হিসাবে জিহ্বা ও নাসিকা-গ্রাহ্য দ্রব্যগুণ অপরেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে ন্যূন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন বস্তুর স্বাদ বা ঘ্রাণ জ্ঞানের পক্ষে তত প্রয়োজনীয় নহে, যত প্রয়োজনীয় রূপ, আকৃতি, শব্দ ইত্যাদি। সাধারণতঃ পঞ্চেন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া আমরা জগতের বস্তু সকলকে প্রত্যক্ষ করি। প্রজ্ঞাত দ্রব্যসমূহকে আমাদের জীবন রক্ষা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের হিসাবে উচ্চ ও নিম্ন স্থান দেওয়া হয়। এতদনুসারে যে সকল ইন্দ্রিয় আমাদের জ্ঞানের অধিক সহায়, সেই সকল ইন্দ্রিয়কে উচ্চতর ইন্দ্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই শ্রেণীবিভাগে দর্শনেন্দ্রিয় সর্ব্বোচ্চ, তন্নিম্নে শ্রবণেন্দ্রিয়, তন্নিম্নে স্পর্শনেন্দ্রিয় ও তৎসহগামী গতীন্দ্রিয়। তৎপরে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও সর্ব্বনিম্নে রসনেন্দ্রিয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ—প্রধানতঃ এই দুইটি মাত্র গুণ গ্রহণ করিয়া থাকি, এবং ইহাদের কতকগুলি প্রকার ভেদও অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু দুর্গন্ধবিশেষের বা সুগন্ধবিশেষের জ্ঞান ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। গন্ধ দ্বারা অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ দ্রব্যের জ্ঞান হয়; রসনা দ্বারা অম্ল, মধুর, তিক্ত, কটু, কষায়, লবণ ইত্যাদির জ্ঞান হয়, এবং আস্বাদ দ্বারা বহু দ্রব্যের গুণ ও প্রকৃতি আমরা জানি ও পরীক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু দুইটি মিষ্ট রসের মধ্যে পার্থক্য রসনা দ্বারা অনুভব করা অনেক সময়ে সুকঠিন। অনেক সময় ঘ্রাণ রস বলিয়া ও রস ঘ্রাণ বলিয়া ভ্রম হয়। চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা আমরা বহু দূরস্থ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারি; কিন্তু জিহ্বার দ্বারা মাত্র সেই বস্তুই উপলব্ধি করিতে পারি, যাহা ইহার উপরে স্থাপিত; এবং নাসিকা দ্বারা অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ দ্রব্যেরই ঘ্রাণ গ্রহণ করিতে পারি। জিহ্বার ন্যায় ত্বক দ্বারা আমরা ত্বক সংলগ্ন বস্তুরই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি; কিন্তু ত্বকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংলগ্ন ভিন্ন-ভিন্ন বস্তুর পৃথক-পৃথক জ্ঞান হইয়া থাকে। মাত্র ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা উষ্ণ ও শীতল, মসৃণ ও রুক্ষ বস্তু অনুভব করি; কিন্তু আমাদের শরীরের গতিশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহে ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত গতীন্দ্রিয়ের সাহচর্য্যহেতু, আমরা ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুণ সকলের জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হই। বস্তুর দূরত্ব, দেশ, অবস্থান, বিস্তার, কাঠিন্য, গুরুত্ব, আমরা ত্বগিন্দ্রিয় ও গতীন্দ্রিয়ের সংযোগ-ক্রিয়ার দ্বারা অনুভব করি। এই দুই ইন্দ্রিয়ের সহযোগ ও সাহচর্য্য এত ঘনিষ্ঠ যে, উভয় ইন্দ্রিয়ের সমন্বয় গতি-স্পর্শেন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়। ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের জীবনরক্ষার উপযোগী দ্রব্য ও দ্রব্যগুণসমূহকে উপলব্ধি করা সম্ভব বলিয়াই অন্ধ ও বধির ব্যক্তিও বস্তু-জগতের সহিত প্রয়োজনমত কারবার

করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ত্বগিন্দ্রিয় অতি অল্প মাত্র ব্যবধানান্বিত দ্রব্যকেও গ্রহণ করিতে অসমর্থ; সেই জন্য চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ অধিকতর জ্ঞানলাভ দ্বারা জীবন সংগ্রামে অধিকতর কৃতকার্য্য হয়। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় অসংখ্য শব্দ ও অসংখ্য রাগাদির জ্ঞান গ্রহণে সমর্থ। যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গতি ও স্পর্শজ্ঞানের সংযোগ হেতু ত্বগিন্দ্রিয় বহু জ্ঞানের উপায়ভূত হইয়াছে, তদ্রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় গতিশীল হওয়াতে উহা দ্বারা আমরা অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছি। চক্ষুদ্বয় গতিশীল না হইলে আমাদের ঐ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান অপেক্ষাকৃত কম হইত। কর্ণ গতিশীল নহে। উহার মাংসপেশীর গতি আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। তথাপি, আমাদের মস্তক কতক পরিমাণে সঞ্চালন করিতে পারি বলিয়া, ঐ সঞ্চালন সাহায্যে কর্ণ দ্বারা শব্দের দিক্ নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। উপরে যে ইন্দ্রিয়ের শ্রেণী-সন্নিবেশ করা হইয়াছে, তাহাতে গতীন্দ্রিয়ের স্থান বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করা হয় নাই। ইহা স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহিত অভিন্ন ভাবে বহুদিন যাবৎ গৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই দুইএর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; সে জন্য উহা স্পর্শেন্দ্রিয়ের সমান স্থান পাইবার যোগ্য।

সাধারণতঃ মনুষ্য দর্শন ও স্পর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ বস্তুর জ্ঞান গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তিও যে উহাদিগকে জানিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই বস্তুটি দূরে, অপরটি নিকটে, একটি দক্ষিণে, অন্যটি বামে, একটি উর্দ্ধে, একটি নিম্নে, একটি বৃহৎ, একটি ক্ষুদ্র, একটি গোলাকার, একটি চতুষ্কোণ—ইত্যাদি জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, তেমনি অন্ধ ব্যক্তিও দূর নিকট, দক্ষিণ-বাম, বৃহৎ-ক্ষুদ্র, গুরু-লঘু প্রভৃতি বাহ্যবস্তুর মুখ্য গুণসমূহ সম্যক অনুভব করিতে সমর্থ। চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মনে হয় যে, সে আলোক ও বর্ণমালা ছাড়া উপরি-উক্ত গুণসমূহকে মাত্র চক্ষু দ্বারাই জানিয়া থাকে—যেন অন্য ইন্দ্রিয়ের ইহাতে কোন প্রকার সহায়তা নাই। আমরা পরে দেখিব যে, দ্রব্যের মুখ্য ধর্ম্মগুলির মধ্যে কাঠিন্য ও গুরুত্ব মাত্র ত্বগিন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য এবং অপরগুলি ত্বগিন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় উভয়েরই গ্রাহ্য। আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় ত্বগিন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বলিয়া ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণগুলিও দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণে অনূদিত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশেষতঃ, দুইটি ইন্দ্রিয়ই একযোগে সর্ব্বদা কর্ম্ম করে এবং পরস্পরের সহায়তা করে বলিয়া, কোন্‌টি চক্ষুর বিষয়, কোন্‌টি বা ত্বকের বিষয়, তাহা আমাদের পৃথক করার প্রয়োজন হয় না, বা করা সম্ভব হয় না। সাধারণ মনুষ্যের বাহ্যবস্তু সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞানমাত্রই এই দুই ইন্দ্রিয়ের সহযোগ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তিতে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে উৎপন্ন। বাহ্যবস্তুর জ্ঞান ত্বাচ ও দর্শন-প্রত্যক্ষ হইলেও, উহাদের পৃথক প্রকৃতি, প্রকার, উৎপত্তি ও বিকাশের নিয়ম বিশেষ ভাবে মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য। আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, বস্তুর কোন্ কোন্ গুণ ত্বক দ্বারা উপলব্ধি করি, এবং কি উপায়ে তত্তৎ জ্ঞানের পরিণতি হয়। আমরা চক্ষুষ্মান। চক্ষুর্বিহীন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা আমাদের থাকিতে পারে না। সুতরাং অন্যত্র অন্ধ ব্যক্তির ব্যবহার ও নিজের অভিজ্ঞতার উপর অনুমান প্রতিষ্ঠিত করিয়া যতদূর সম্ভব এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব।

মাত্র ত্বক দ্বারা উষ্ণ, শীত, মসৃণ, রুক্ষ—কেবল ইহাই অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু যখন কোন দ্রব্য হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া উহা কঠিন কি নরম, উহা এত স্থান ব্যাপিয়া আছে, উহা এত বড় কি এই আকৃতির—এইরূপ জ্ঞান হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্পর্শের সহিত অঙ্গুলি অথবা অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতির সংযোগ হওয়াতে, এইরূপ জ্ঞান হইতেছে। গতিবিহীন স্পর্শ আমাদের হয় কি না সন্দেহ। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একবারে নিশ্চল রাখিয়া, ঈষদুষ্ণ জলপূর্ণ পাত্রে শরীর নিমজ্জিত করিলে, কতক পরিমাণে কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের অনুভূতি হয়—নতুবা প্রায়ই স্থলে উভয়েন্দ্রিয়ের নিয়ত সংযোগ দেখা যায়। যখনই কোন দ্রব্য স্পর্শ করি, তখনই উহার আকার, কাঠিন্য, দূরত্ব ইত্যাদি জ্ঞান আমাদের মনে উদিত হয়। অন্ধ ব্যক্তি এই সচেষ্ট স্পর্শ দ্বারা বস্তুর দূরত্ব, আকৃতি ইত্যাদি অনুভব করিয়া থাকে। অথবা, যেখানে আলোকের অভাব, সেখানে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিও বিনা চক্ষুর সাহায্যে বস্তুর ঐ সকল গুণ জ্ঞাত হইয়া থাকে। মুখ্য গুণমাত্রই আমরা এই প্রকারে জানিতে সমর্থ হই। ইহার মধ্যে অভেদ্যতা, গুরুত্ব ও কাঠিন্য আমরা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানিতে পারি না। অবশিষ্ট মুখ্য গুণ দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারাও জানিতে পারি; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারাই উহাদের

জ্ঞান হয়। কোন অন্ধকার স্থানে উপবেশন করিয়া তোমার নিকটস্থ কোন দ্রব্যের দূরত্ব বা পরিমাণ বা আকৃতি কি প্রকারে অনুভব কর, প্রণিধান করিয়া দেখিলে, অন্ধ ব্যক্তির কি প্রকারে ঐ সকল জ্ঞান হয়, কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিবে। অথবা, কোন অন্ধ ব্যক্তি কি প্রকারে দ্রব্য সকলের দূরত্ব ইত্যাদি জ্ঞাত হয়, তাহা অনুধাবন করিলে, এ বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে। অন্ধ ব্যক্তি পথ চলিবার সময় পদ দ্বারা অথবা পদ ও যষ্টি দ্বারা এবং কোন-কোন স্থলে হস্ত দ্বারাও প্রত্যেক পদবিক্ষেপে ভূমিকে ভাল করিয়া স্পর্শ করে, এবং দ্বিতীয় পদবিক্ষেপের পূর্ব্বে কোন্ দিকে কত দূরে পদক্ষেপ করিবে, তাহা মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লয়। "এত দূরে বস্তুটি রহিয়াছে" ইহার অর্থ অন্ধের মনে "এতটুকু চলা", অথবা যদি দ্রব্যটি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে এত দূরে অর্থে, অন্ধ ব্যক্তির হস্তে এতটুকু ক্রিয়া বা চেষ্টা বা গতিমাত্র বুঝায়। দূর অর্থে মনের মধ্যে এই চেষ্টা-পরম্পরামাত্র। কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শরীরের চেষ্টা বা গতি বুঝিতে আমরা তত্তৎ অঙ্গ বা শরীরের দৃশ্যমান স্থান পরিবর্ত্তনমাত্র বুঝিব না। আমরা চক্ষু ব্যবহার না করিয়াও, আমার অঙ্গুলিটি বা হস্তটি বা জিহ্বাটি কোন দিকে এবং কতদূর চালনা করিতেছি, তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও সমগ্র শরীরের চলাচল বা গতি মাংসপেশীর আকুঞ্চন বা প্রসারণের ফল। যখনই কোন মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়, তখনই আমাদের মনে গতি বা চেষ্টার জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। অঙ্গুলি-বিশেষের বা হস্তবিশেষের চেষ্টাতে এই প্রকার একটির পর একটি করিয়া ক্রমিক কতকগুলি চেষ্টা বা ক্রিয়ার জ্ঞান হয়। আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যতগুলি চেষ্টা হয়, সেই চেষ্টা-সমষ্টি আমার মনের মধ্যে দূরত্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সাধারণতঃ সকলেই জানে যে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শরীরের গতি দ্বারা মাপ করিয়া থাকি। লোকে জানে যে, দূরত্ব ঐখানে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা হস্ত দ্বারা বা গতিশীল অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দ্বারা উহার মাপমাত্র করিয়া থাকি। এই দূরত্বের পরিমাপক আমাদের চেষ্টার পরম্পরামাত্র। চেষ্টা-পরম্পরা অধিক হইলে দূরত্ব অধিক, কম হইলে দূরত্ব কম। মনে কর, তোমার সম্মুখে একটি ছোট টেবিল রহিয়াছে। তুমি উহার একপ্রান্ত একটি অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলে; পরে ঐ প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলে, করিয়া বুঝিলে, টেবিলটি এত বড়। প্রথম যখন তোমার অঙ্গুলি টেবিলের এক প্রান্তে স্থাপিত হইল, তখন অবশ্য টেবিলটির কাঠিন্য, উষ্ণতা ইত্যাদির জ্ঞান হইল। তাহার পর-মুহূর্ত্তে তোমার অঙ্গুলির এই নূতন চেষ্টা ও তৎসংযুক্ত স্পর্শজ্ঞান ও তৃতীয় মুহূর্ত্তে আর এক নূতন চেষ্টা ও তৎসংযুক্ত স্পর্শজ্ঞান, এই প্রকারে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমার অঙ্গুলি টেবিলের অপর প্রান্তে উপস্থিত হয়,—ততক্ষণ পর্য্যন্ত কতকগুলি সংযুক্ত চেষ্টা ও স্পর্শজ্ঞান প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই ও টেবিলের প্রত্যেক অংশেই হইবে। আমাদের এই স্পর্শ ও চেষ্টা-জ্ঞানের সংযোগে সাধারণ জ্ঞান হইয়া থাকে; এবং ইহা এতদূর বলিতে, আমরা এই সমবায়-জ্ঞানের পরম্পরা বুঝিয়া থাকি। যেখানে এই পরম্পরা একবারে অবিচ্ছিন্ন, আমরা বুঝি ঐ স্থানটি পরিপূর্ণ। শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চলাচল বা গতি অর্থে আমরা সাধারণতঃ উহাদের দৃশ্যমান স্থান-পরিবর্ত্তন মাত্র বুঝিয়া থাকি। কিন্তু চক্ষুহীন ব্যক্তি উহাদের স্থান পরিবর্ত্তন দেখিতে পায় না; তবে কি করিয়া উহারা বুঝিতে পারে যে, উহার দক্ষিণ হস্ত পড়িতেছে, বামহস্তটি উপরের দিকে বা নীচের দিকে কিংবা ডান হইতে বামে, বা অধঃ হইতে উৰ্দ্ধে চলিতেছে? নিশ্চিতই হাত-পায়ের গতির পরিচায়ক জ্ঞান উহার আছে। ভিন্ন ভিন্ন গতির পরিচায়ক বিভিন্ন জ্ঞান আছে, এবং ঐ জ্ঞান দর্শনেন্দ্রিয় হইতে উদ্ভূত নহে। স্পর্শনের দ্বারা আমরা শীত, উষ্ণ, কর্কশ, মসৃণ অবস্থামাত্র অনুভব করি। অন্য দ্রব্যের সহিত সংস্পর্শে চর্ম্মস্থ স্নায়ু-সূত্রগুলির ক্রিয়া জন্যই এই জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি পেশীর আকুঞ্চন-প্রসারণে উৎপন্ন হয়। পেশীমধ্যস্থ স্নায়ু-সূত্রের ক্রিয়া জন্য গতি-জ্ঞান হয়। স্পর্শেন্দ্রিয়-জ্ঞান এই গতি জ্ঞান হইতে পৃথক এবং উহাদের দৈহিক যন্ত্রও পৃথক। সেই জন্য বৈজ্ঞানিকেরা একটি পৈশিক ইন্দ্রিয় নামে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্বীকার করেন—ইহাকে গতীন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। আমরা গতি বলিতে হস্ত-পদাদির দৃশ্যমান সঞ্চালন বুঝিব না; উক্ত সঞ্চালনের সহগামী মানস-প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বুঝিব। এই জ্ঞান গতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের। দিক, দূরত্ব ও দ্রুততা অনুসারে

গতি বিভিন্ন। দিক অর্থে দক্ষিণ ও বাম, উৰ্দ্ধ ও অধঃ, পশ্চাৎ ও পুরঃ বুঝাইয়া থাকে। হস্ত দক্ষিণ দিকে লইয়া যাইতে কতকগুলি মাংসপেশী সঙ্কুচিত ও কতকগুলি প্রসারিত হয়; আবার ঐ হস্তটি উহার বিপরীত দিকে লইয়া গেলে পূর্ব্বে যে পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়াছিল, সেইগুলি প্রসারিত, এবং যেগুলি প্রসারিত হইয়াছিল, সেগুলি সঙ্কুচিত হয়। এই বিপরীত সঙ্কোচন-প্রসারণের জ্ঞান দ্বারাই আমাদের দিক্ নির্ণয় হইয়া থাকে। হস্তটি একই ভাবে অৰ্দ্ধমিনিট চালনা করা ও একমিনিট চালনা করা এক নহে। সময়ের পরিমাণ অনুসারে জ্ঞানেরও পার্থক্য হয়। আমার হস্তের গতির প্রারম্ভ স্থান হইতে দূরত্ব অনুসারে জ্ঞানের বিভিন্নতা হয়: আমার হস্ত এক ফুট চলিল বা এক গজ চলিল, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি। এক গজ দূরে হস্তটি লইয়া যাইতে এক সেকেণ্ড বা একমিনিট লাগিতে পারে—গতির দ্রুততা অনুসারে আমাদের জ্ঞানের বিভিন্নতা হয়। যখন নিশ্চল হইয়া উপবিষ্ট আছ, তখনও তোমার শরীর বা অঙ্গবিশেষ কোন্ অবস্থায় আছে · অর্থাৎ কোন্ দিকে বা কোন্ স্থানে আছে তাহা তুমি বুঝিতে পার। এই অবস্থানের জ্ঞানও গতীন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। আমাদের সকল গতিই শরীরের বা শরীর-অংশবিশেষের নিশ্চেষ্ট অবস্থা হইতে প্রারব্ধ।

চেষ্টা বা গতি জ্ঞান দ্বিবিধ —অব্যাহত গতি এবং ব্যাহত বা বাধিত গতি। যেমন শূন্যে হাত নাড়িলে বোধ হয় আমার চেষ্টার কোন বাধা হইতেছে না, আমি ইচ্ছামত শরীর বা অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারিতেছি; কিন্তু যখন কোন গুরু দ্রব্য তুলিতে চেষ্টা করি, বা দেওয়াল ইত্যাদির প্রতি চেষ্টা প্রয়োগ করি, তখন আমার চেষ্টা বাধিত হয়।

আমরা শক্তি বলিয়া যাহা বুঝি, তাহা এই বাধিত চেষ্টা বা বাধা-জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমার চেষ্টা বাধিত হওয়াতেই, চেষ্টা-প্রয়োগকারী ও চেষ্টা-প্রতিরোধকারী শক্তির যুগপৎ জ্ঞান হয়। অনেকে এই বাধিত চেষ্টা হইতে অনুমান করেন যে, আমার ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র ও চেষ্টার প্রতিরোধক অপর এক বস্তু বাহ্যজগতে আছে। যদি আমার চেষ্টা ও ইচ্ছা ব্যতীত কিছু না থাকিত, তাহা হইলে আমার চেষ্টা পর্ব্বতের প্রতি প্রয়োগ করিলেও ফলবতী হইত। কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও পর্ব্বতকে স্থানচ্যুত করিতে পারি না; সুতরাং পর্ব্বতটি একটি স্বতন্ত্র পদার্থ—হয় ত আমাকে বাধা দিবার যোগ্য ক্ষমতাও ইহার আছে। আমার চেষ্টা ইহার চেষ্টার নিকট পরাভূত। দ্রব্যের গুরুত্ব, অভেদ্যতা, কাঠিন্য, তরলতা ইত্যাদি গুণ এই বাধাজ্ঞানের বিভিন্ন মাত্রা। যে দ্রব্য তুলিতে বা সরাইতে অধিক বলপ্রয়োগ করিতে হয় তাহা গুরু, এবং যাহা তুলিতে কম বল প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লঘু। প্রথমটিতে আমার চেষ্টা অধিকতর এবং দ্বিতীয়টিতে অল্পতর বাধিত। অধিক চেষ্টা সত্ত্বেও যাহার মধ্য দিয়া আমার শরীরের বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি অসম্ভব তাহা কঠিন; অল্প চেষ্টাতে যেখানে ঐ গতি সম্ভব তাহা তরল, বা যেখানে আরও অল্প চেষ্টার প্রয়োজন তাহা বাষ্পীয় পদার্থ।

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের স্থানভেদে গুণভেদ পরিলক্ষিত হয়। তোমার কপোলে মশক দংশন করিবামাত্র, দংশন-যন্ত্রণা নিবারণের উদ্দেশ্যে তোমার হস্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে দষ্টস্থানে উপস্থিত হইল। শরীরের কোন্ স্থানে মশক উপবিষ্ট, এবং তোমার হস্ত ও অঙ্গুলিগুলি কোন্ দিকে ও কতক্ষণ এবং কি প্রকারে চালনা করিলে উহারা উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া তোমার দংশন-যন্ত্রণা নিবারণ করিবে, নিমেষ মধ্যে এ সকল বিষয় তুমি মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া লইলে, এবং উপযোগী সঞ্চালন সংঘটিত হইল। শরীরের অন্য প্রদেশে মশকটি দংশন করিলে অন্যপ্রকার হস্তচালনা দ্বারা দংশন যন্ত্রণা উপশম করিতে হইত। আমাদের মনে হয়, এই ব্যাপারটি আমাদের সহজাত। এত শীঘ্র কলের মত আমার হস্তটি যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া যন্ত্রণার লাঘব করে যে, উহা অযত্ন-সম্ভূত না হইলে সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্র শিশুটির কপোলে মশক দংশন করিতেছে; শিশুটি ক্রন্দন করিতেছে; ইহার হস্ত-পদও চারিদিকে চলিতেছে; কিন্তু দষ্ট প্রদেশে ত হস্তটি যাইতেছে না! কোথায় কপোল, কোথায় কপোলের সেই অংশ যেখানে দংশন হইতেছে, শিশু তাহা জানে না। কোন্ দিকে কেমন করিয়া হাত চালাইতে হইবে, তাহাও সে জানে না। আমাদের এই জ্ঞান শিক্ষালব্ধ। যেমন হস্তপদাদি শরীরের দ্বারা বাহ্যজগতের বস্তু সকলের অবস্থান, দিক, দূরত্ব নির্ণয় করিতে হয়, ঠিক সেইরূপে স্বশরীরেরও বিভিন্ন অংশের অবস্থান ইত্যাদি ঐ সকলের গতি দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়।

দৈবাৎ একটি অঙ্গুলি কি কিছু একবারে মশক দষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে যাতনার কিছু উপশম হইল; অমনি মনের মধ্যে উক্ত প্রকার অঙ্গের গতি ও যন্ত্রণা-লাঘব জন্য সুখের অনুভূতি সংযুক্ত হইয়া গেল। এই সংযোগ বা সঙ্গ বলে ভবিষ্যতে মশক দংশন হইবামাত্র সংযুক্ত হস্তচালনাও সংঘটিত হয়। এই প্রকারে শরীরের কোন্ অংশ কোন্দিকে কত দূরে স্থিত, আমরা ক্রমশঃ তাহা শিক্ষা করি, এবং বিভিন্ন অংশের চিত্র-মনোমধ্যে চিত্রিত করিয়া লই। যে সকল স্থান হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যায় না—যেমন শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি—উহাদের ঠিক অবস্থান আমরা জানিতে পারি না। তবুও কতক পরিমাণে শরীরের বহিঃপ্রদেশের সহিত আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির স্থানের স্থানিক সম্বন্ধ বুঝিতে পারি। এই প্রকারে শরীরের অংশবিশেষে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের স্থাননির্ণয়কে আন্তর্দৈহিক স্থান নির্ণয় বলে। গন্ধ, স্পর্শ, বর্ণ, শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষগুলির স্থান শরীরের চতুর্দ্দিকস্থ বাহ্যজগতে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এই প্রকার নির্দ্দেশকে বহির্দৈহিক স্থান নির্দ্দেশ বলে।

একই মশক শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে দংশন করিলে, হস্ত ও অঙ্গুলি প্রভৃতির বিভিন্ন গতি হয়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শরীরের স্থান অনুসারে দংশন-অনুভূতিও পৃথক পৃথক। এই পার্থক্য উদ্বোধকের বা ইন্দ্রিয় যন্ত্রের পার্থক্য জন্য নহে; কারণ, মশক দংশন সকল স্থানেই উদ্বোধক ও কর্ম্মই ইন্দ্রিয় যন্ত্র। উদ্বোধক ও ইন্দ্রিয় এক হওয়া সত্ত্বেও যে পার্থক্যের জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রাদেশিক বা স্থানিক পার্থক্য বলে; এবং ইন্দ্রিয়-জ্ঞানবিশেষকে শরীরের স্থানবিশেষে আরোপ করাকে ইহার স্থান নির্ণয় বলে।

ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ মাত্রেরই স্থানভেদে গুণভেদ নাই। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অংশবিশেষে গুণবিশেষের বিশেষ ঘ্রাণের অবস্থান নাই। রসনেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রদেশই উদ্বোধিত হউক না কেন, এক উদ্বোধকের দ্বারা একমাত্র জ্ঞানেরই বিকাশ হইবে। শ্রবণেন্দ্রিয়েরও দৈহিক যন্ত্র-প্রদেশের পার্থক্য অনুসারে শ্রবণের পার্থক্য হয় না। যে সকল ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রান্তভাগ বিস্তৃত এবং শরীরের বহিঃপ্রদেশে স্থাপিত সেই সকল ইন্দ্রিয়েরই উদ্বোধকের স্থানানুসারে জ্ঞানেরও বিভিন্নতা হয়। স্পর্শেন্দ্রিয়ের চর্ম্ম ও দর্শনেন্দ্রিয়ের রেটিনা এ বিষয়ে সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চর্ম্মের বিভিন্ন প্রদেশে একই দ্রব্যের সংস্পর্শে বিভিন্ন স্পর্শ-জ্ঞানের উদয় হয়। তেমনি রেটিনার বিভিন্ন প্রদেশে একই আলোক-রশ্মির ক্রিয়াতে বিভিন্ন জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। প্রধান-প্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় অন্যতম; কিন্তু ইহার বিস্তৃত যন্ত্রান্ত নাই এবং সেইজন্য শব্দের স্থানিক গুণভেদ হয় না। রসনা ও নাসিকার যন্ত্রান্ত বিস্তৃত হইলেও বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জ্ঞানের আরোপ করা যায় না।

বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দুইটি পরস্পরের সম্মুখীন ও সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্ম-সংযুক্ত। বহির্জগৎ বিরাট, অন্তর্জগৎ ক্ষুদ্র, বহির্জগৎ দেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে; অন্তর্জগৎ কোনও দেশব্যাপী নহে। বহির্জগতের বস্তুমাত্রেই এক-একটি দেশ বা স্থানব্যাপক; অন্তর্জগতের বস্তুসমূহ একটির পর একটি করিয়া সংঘটিত হয়; বহির্জগতের ঘটনাবলি যুগপৎ সংঘটিত হয়। বহির্জগৎ শরীরের বাহিরে অবস্থিত; অন্তর্জগৎ শরীরের বাহিরে কি ভিতরে—এ কথা অর্থহীন; অন্তর্জগৎ চৈতন্যময়, বহির্জগৎ জড়; অন্তর্জগৎ আত্মময়; বহির্জগৎ অনাত্মময়; বহির্জগৎ আমাদের শরীর হইতে স্বতন্ত্র; ইহা বিরাট দেশ মধ্যে অবস্থিত; ইহার প্রত্যেক বস্তুই ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মহাকায় পর্ব্বত হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যেরই দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ আছে। বহির্জগতের সকল দ্রব্যই স্থানব্যাপক ও অভেদ্য; অর্থাৎ আমাদের গতি বা চেষ্টাকে বাধা দিতে সমর্থ। চেষ্টা করিলেই আমরা হস্ত দ্বারা পর্ব্বত ভেদ করিতে পারি না। আমাদের পর্ব্বত-ভেদের চেষ্টা প্রতিহত হয় ও স্বতন্ত্র,—আমাদের চেষ্টা-রোধ-কারী অপর পদার্থে বিশ্বাস আমাদের মনে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হয়। যাহা আমাদের ইচ্ছাকে বাধা দেয়, তাহা অবশ্য আমাদের ইচ্ছার বহির্ভূত ও বলপ্রয়োগে সমর্থ অন্য বস্তু। এই যে আমার হস্তস্থিত কলমটি দীর্ঘ, প্রস্থ, গভীর ও কঠিন; এবং ইহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিলে ইহাও বিপরীত বলপ্রয়োগ দ্বারা আমার ইচ্ছাকে বাধা দেয়। ইহা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধবিশিষ্ট স্বতন্ত্র পদার্থ, এ জ্ঞান কিরূপে হইল—এ প্রশ্ন স্বতঃই মনের মধ্যে উদয় হয়।

উপরিউক্ত পাঁচ বা ছয় ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের বস্তুজ্ঞানের অন্য উপায় নাই। দীর্ঘ বা প্রস্থ বা যে কোন দ্রব্য-গুণই হউক, আমরা এই কয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ

করি। দ্রব্যের গুণ-মাত্রেই আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। বিস্তার ও অভেদ্যতাই বস্তুর সর্ব্বপ্রধান ও মুখ্য গুণ। অপর গুণ সকল ইহাদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কাঠিন্য পেশীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বাধা-জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিস্তার অর্থে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ বুঝায়। ইহারা দেশ বা স্থানে এক-একটি রূপ মাত্র। ইহারা এক-একটি পেশীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অর্থাৎ গতি-জ্ঞানের সমষ্টি মাত্র।

দক্ষিণ হইতে বাম বা বাম হইতে দক্ষিণ দিকে হস্ত পদ বা সমগ্র শরীরের অবাধ গতিতে প্রতিমুহূর্ত্তে যে গতি-জ্ঞান হয়, উহার পর্য্যায়কে প্রস্থ এবং উর্দ্ধ হইতে অধঃ বা অধঃ হইতে উর্দ্ধ দিকে ঐ গতিতে যে প্রত্যক্ষ-পরম্পরা হয় উহাকে দৈর্ঘ্য, এবং তোমার উপস্থিত অবস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া শরীর হইতে দূরদেশের গতিতে যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হয় উহার সমষ্টিকে বস্তুর বেধ বা গভীরতা বলে।

দেশের আর একটি রূপ দ্রব্যের আয়তন। পর্ব্বতের আয়তন বৃহৎ, ধূলিকণার আয়তন ক্ষুদ্র। কিন্তু আয়তন উভয়েই বর্ত্তমান। প্রথমোক্তটির আয়তন পরিমাণ করিতে সমস্ত শরীরটিকে নানাদিকে চালাইতে অর্থাৎ পর্ব্বত বেষ্টন করিতে হইবে, উহার উপরে উঠিতে হইবে এবং নামিতে হইবে। একটি টেবিলের আয়তন স্থির করিতে হইলে মাত্র হস্তটিকে চালিত করিলেই হয়। আবার হস্তস্থিত আমলকীটির আয়তন স্থির করিতে হইলে, উহার চতুর্দ্দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলেই হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শরীর বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির চালনা দ্বারাই বস্তুমাত্রের আয়তন উপলব্ধি হয়। চালনার পরিমাণ অনুসারে, আয়তন অধিক কি স্বল্প তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। একটি আম্রফল হস্তে রক্ষিত হইল। ইহা কি আকারের এবং কত বড়, তাহা আমরা অক্লেশে বুঝিয়া থাকি। হস্তে রক্ষিত দ্রব্যটির চতুর্দ্দিক আমার অঙ্গুলি-গুলি বেষ্টন করে; অঙ্গুলির মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় এবং উহার সহিত আম্র-সংস্পর্শের সঙ্গে-সঙ্গে স্পর্শ-প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপে গতি ও স্পর্শ-সংবিত্তির সহযোগে, বস্তুটি কত বড় ও কি আকারের, তাহা আমরা জানিতে পারি। এইরূপে যতপ্রকার ক্ষেত্র আছে, প্রত্যেকটিই সচেষ্ট স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহায়তায় আমরা জানিতে পারি।

মনের ভাব একটির পর একটি করিয়া সংঘটিত হয়। একই মুহূর্ত্তে দুই কি ততোধিক ভাব একত্র সংঘটিত হয় না। পক্ষান্তরে, স্থূল পদার্থের বিভিন্ন অংশ একই মুহূর্ত্তে অবস্থিত। অপিচ উহারা এক-একটী ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা মানস-ব্যাপার। এরূপ স্থলে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-পরম্পরা কি করিয়া যুগপৎ অবস্থিত স্থূল পদার্থের অংশ-সমষ্টিতে পরিণত হয়? মনে কর, তোমার সম্মুখে একটি টেবিল রহিয়াছে। তুমি উহার এক প্রান্ত অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছ। তন্মুহূর্ত্তে তোমার একটি স্পর্শজ্ঞান এবং অঙ্গুলি ও শরীরের অবস্থান জ্ঞান হইল। পর মুহূর্ত্তে দ্বিতীয় স্পর্শজ্ঞান ও অঙ্গুলির একটি বিশেষ গতি জ্ঞান হইল। এই প্রকারে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে একটি স্পর্শজ্ঞান ও তৎসঙ্গে একটি গতি-জ্ঞান হইয়া সংযুক্ত জ্ঞানের একটি ধারা হইল। মনে রাখিবে যে, যখন দ্বিতীয় জ্ঞানটি হইল, তখন প্রথমটির অন্তর্ধান হইয়াছে—উহা তোমার স্মৃতিতে মাত্র বর্ত্তমান। এইরূপে পরবর্ত্তী জ্ঞানটির উদয় ও পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানটির লোপ হইতেছে। এক মুহূর্ত্তে কোন দুইটিরই উপলব্ধি হইতেছে না। কিন্তু তুমি জান, টেবিলের স্পৃষ্ট বিন্দুসমূহ পাশাপাশি একই মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান—তুমি যেটিকে ইচ্ছা স্পর্শ করিতে পার। অপর পক্ষে দেখিলে, স্পৃষ্ট বিন্দুসমূহ তোমার মানস-প্রত্যক্ষের ধারা-মাত্র। নিম্নলিখিত প্রকারে এই পারম্পর্য্য যৌগপদ্যে পরিণত হয়। তোমার অঙ্গুলি টেবিলের অপর প্রান্তে উপস্থিত হওয়ার পর বিপরীত দিকে ইহাকে চালনা করিলে, তুমি পূর্ব্বকথিত স্পৃষ্ট বিন্দুসমূহ অনুভব করিবে—কিন্তু উহাদের ক্রম বিপরীত। এবম্প্রকারে যদি তোমার অঙ্গুলির গতির হ্রাস বা বৃদ্ধি কর, তবুও সেই-সেই বিন্দু সেই-সেই ক্রমেই অনুভব করিবে। বিন্দু সকলের যৌগপদ্য অর্থে আমরা ইহা ভিন্ন আর কিছু বুঝি না। আর এক কথা—যদি প্রথম বিন্দু হইতে আরম্ভ না করিয়া তুমি একবারে দ্বিতীয় বিন্দু স্পর্শ করিতে, তাহা হইলে দ্বিতীয় বিন্দুর স্পর্শ-জ্ঞান অন্যরূপ হইত। প্রথম বিন্দুর স্পর্শজ্ঞান থাকা জন্য দ্বিতীয় বিন্দুর স্পর্শজ্ঞান একটু রূপান্তরিত হয় ও সেইরূপে দ্বিতীয় বিন্দুর সংস্কার জন্য তৃতীয় বিন্দুর স্পর্শজ্ঞান পরিবর্ত্তিত হয়। এই শেষ বিন্দুর স্পর্শজ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী সমগ্র স্পর্শ-জ্ঞানের সংস্কারের ফলে পরিবর্ত্তিত। এই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানের সংস্কারের সহিত উপস্থিত জ্ঞানের মিশ্রণে প্রত্যেক স্পৃষ্ট বিন্দুর এক অভিনব স্পর্শজ্ঞান হয়। বিন্দু বিশেষের অবস্থান আমরা এই সংযুক্ত জ্ঞান দ্বারা বুঝি। বিস্তার অর্থে যুগপৎ অবস্থিত বিন্দু-

সমষ্টি মাত্র বুঝিয়া থাকি। কিন্তু তোমার অঙ্গুলি যে বিন্দুটি ছাড়াইয়া আসিয়াছে, তাহাও এই মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান আছে। ইহার অর্থ মাত্র এই যে, তোমার সংস্কার অনুযায়ী অঙ্গুলি চালনা করিলে, তুমি পূর্ব্ব-পরিচিত স্পর্শ জ্ঞান পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের এই স্থায়ী সম্ভাবনার নাম জগতের দ্রব্যসমূহের বস্তুত্ব। তবে শব্দ, স্পর্শ আদি গুণের সহিত বাধা-জ্ঞানের সংযোগ হইলে, অর্থাৎ এই এই বর্ণ বা শব্দ যখনই প্রত্যক্ষ হয় তখনই বিশেষ বাধা-জ্ঞানের অনুভব হইলে, বাধাকারী দ্রব্যের সেই-সেই গুণ আছে, এই জ্ঞান হয়। তখনই আমার বাহ্যবস্তুটি এই-এই গুণবিশিষ্ট, এইরূপ জ্ঞান হয়।

একটি জিনিস কোন্ দিকে, কত দূরে, বড় কি ছোট, গোল কি ত্রিকোণ, তাহা আমরা চক্ষু দ্বারাই দেখিয়া থাকি। তবে অন্ধেরা কি করিয়া দেখে, সাধারণতঃ আমরা তাহা ভাবি না। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যে চক্ষু দ্বারা ঐ সকল বিষয় বিনা আয়াসে সুন্দররূপে প্রত্যক্ষ করে, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ হইবে। আবহমান কাল হইতে এই জ্ঞান ও বিশ্বাস মানুষের আছে। ধর্ম্মাচার্য্য বারক্লে সাহেব খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কিন্তু এমত খণ্ডন করিয়া তাঁহার সুবিখ্যাত বাণী প্রচার করিলেন,—"দূরত্ব আমরা দেখি না, স্পর্শ করি।" দূরত্বাদি দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে—স্পর্শেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। সত্য বটে, চক্ষু দ্বারাও দ্রব্যের ঐ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত উহা সম্ভব নহে। চক্ষু দ্বারা আমরা বস্তু সকলের বর্ণ, উজ্জ্বলতা এবং উহাদের বহু প্রকার-ভেদ অনুভব করি। উহাদেরই ইতর-বিশেষে দ্রব্যের দূরত্ব প্রভৃতির জ্ঞান হয়। অর্থাৎ আমরা জানি, নিকটের একটি জিনিস যে বর্ণের ও যেরূপ উজ্জ্বল দেখায়, দূর হইতে ঠিক সেই বর্ণের বা সেইরূপ উজ্জ্বল দেখায় না। উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল বর্ণ আর বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন প্রকার সমাবেশ দূরত্বের ও নৈকট্যের নিদর্শন, পরিচায়ক। চক্ষুর দ্বারা দূরত্বের পরিমাপ করি, ইহার অর্থ—চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষগুলিকে স্পর্শ প্রত্যক্ষে অনুবাদ করি। বর্ণ ইত্যাদি যেন চাক্ষুষ ভাষা। আমাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা বলে ঐ ভাষার অর্থ করাকে দূরত্বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। বাস্তবিক উহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান নহে। বর্ণবিশেষের রূপান্তর ও বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন প্রকার সমাবেশমাত্র চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব; কিন্তু কোন দ্রব্যের গুরুত্ব, কি আকার কি পরিমাণ, কি দূরত্ব আমরা দেখিতে পাই না। চক্ষুগ্রাহ্য বর্ণ ইত্যাদি দূরত্বের নিদর্শনমাত্র—বিভিন্ন দূরত্বের বিভিন্ন নিদর্শন। চাক্ষুষ ভাষাকে স্পার্শিক ভাষায় অনুবাদ করাকেই দূরত্বের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ বলে।

বারক্লের এই মীমাংসা বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান সম্মত মীমাংসা। চাক্ষুষ বস্তু জ্ঞান আমাদের সহজাত নহে—ইহা জন্ম হইতে আরব্ধ শিক্ষার পরিণতি; অর্থাৎ চোখ দিয়া দূরত্ব ইত্যাদি বুঝা শিক্ষা করিতে হয়। বারক্লের এই মীমাংসা সাধারণ মনুষ্য-জ্ঞানের বিরোধী। তাঁহার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত এক বিপক্ষদল রহিয়াছেন, যাঁহারা বলেন, স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত, চক্ষু দ্বারা দূরত্ব অনুভব করা সম্ভব। বারক্লের সময় পৈশিক ইন্দ্রিয়ের পৃথক অস্তিত্ব লোকে জানিত না। অধুনা ঐ ইন্দ্রিয়ের পৃথক স্থিতি লোকে বুঝিতে পারিয়াছে, এবং দূরত্ব ইত্যাদি যে আমার শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির গতিমাত্র অনুমেয় তাহাও সপ্রমাণ হইয়াছে। ঐ সকল গুণ মাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়-লব্ধ নহে, প্রকৃত-পক্ষে উহারা গতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; তবে স্পর্শ ও গতীন্দ্রিয় অভিন্নভাবে পরস্পরের সহায়তা করাতে উভয় ইন্দ্রিয়কে যেন এক ইন্দ্রিয় বলিয়া মনে হয়। উহাদের এই সংযোগকে সচেষ্ট স্পর্শ বলা হয়।

বর্ত্তমান কালের বারক্লের শিষ্যগণ বলেন, চক্ষুর চেষ্টা বা গতির দ্বারা দিকের দক্ষিণ বা বাম, ঊর্দ্ধ ও অধঃ, বস্তুর আকৃতি ও আকার আমরা অনুভব করিতে সমর্থ। আমাদের চক্ষুর্দ্বয়কে আমরা এদিক হইতে ওদিক এবং অধঃ হইতে ঊর্দ্ধে চালনা করিতে পারি, এবং উহার অক্ষরেখার চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে পারি। এই সকল গতির সাহায্যে আমরা দ্রব্যের উক্ত সকল গুণ অনুভব করিতে পারি; কিন্তু স্ব-অবস্থান-বিন্দু হইতে যেমন হস্তকে আমরা সম্মুখে ও দূরে চালাইতে পারি, চক্ষুকে উহার কোটর হইতে সেরূপ বাহির করা অসম্ভব। সুতরাং যাহাকে ক্ষেত্রের গভীরতা বা বেধ বলে, তাহা চক্ষু-গ্রাহ্য নহে। কোনও দ্রব্যের এক দিক হইতে অপর দিক, ও নিম্ন হইতে উপরে ও উপর হইতে নীচে চক্ষু চালনা করিয়া ও উহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দ্রব্যাদির আকার ইত্যাদি জানিতে পারি; কিন্তু

দ্রব্যের গুরুত্ব, অভেদ্যতা ও গভীরতা আমরা চক্ষু দ্বারা অনুভব করিতে পারি না।

বিপক্ষ মতাবলম্বীরা এখনও বলেন যে, চক্ষুকে নিশ্চল রাখিয়া দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আকার ও পরিমাণ আমরা জানিতে পারি। চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পদ্দার উপরিভাগ বিস্তারযুক্ত। একই মুহূর্ত্তে উহার বিভিন্ন অংশ উত্তেজিত হইলে, যুগপৎ বহু আলোক ও বর্ণ প্রত্যক্ষ না হইয়া পারে না। সুতরাং চক্ষু স্থির রাখিলে, যুগপৎ বহু বিন্দু-জ্ঞান অর্থাৎ বিস্তৃতি জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। বস্তুর আয়তন চাক্ষুষ গতি ব্যতীতও আমাদের বোধগম্য; প্রত্যক্ষ বিন্দুটি যত বড়ই হউক না কেন, রেটিনায় প্রতিফলিত ছবির দ্বারা উহার উত্তেজিত ভাগের বিস্তার অনুযায়ী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইবে। বস্তুর বাস্তব আয়তন ও রেটিনাস্থ ছবির আয়তন দুইটি পৃথক। প্রথমোক্তটিকে চাক্ষুষ ও শেষোক্তটিকে বাস্তব আয়তন বলে। একই বস্তু যত দূরে যাইবে উহার প্রতিচ্ছবিও তত ক্ষুদ্র হইবে; আবার, দূরস্থ দ্রব্য নিকটে আসিলে উহার প্রতিচ্ছবি বড় হইবে। চাক্ষুষ কোণের পরিমাণ দূরত্বের বিপরীত ভাবে বেশী ও কম হয়। কোণ বড় হইলে দূর কম ও কম হইলে দূর বেশী হইবে। দৃষ্ট বস্তুর দুই প্রান্ত হইতে আলোক-রশ্মিদ্বয় রেটিনার বিন্দুবিশেষে মিলিত হইয়া যে কোণ উৎপন্ন করে, তাহাকে চাক্ষুষ কোণ বলে।

মানুষের সাধারণতঃ দুইটি চক্ষু। যাহারা একচক্ষু-হীন তাহারা অবশ্য এক চক্ষু দ্বারা যাবতীয় পদার্থ দর্শন করিয়া থাকে। দুই চক্ষুর যন্ত্র প্রান্ত পৃথক। বিভিন্ন রেটিনাতে পৃথক-পৃথক ছবি প্রতিফলিত হয়—দুইটি পৃথক ছবি, কিন্তু দৃষ্ট বস্তু এক। কি করিয়া পৃথক ছবির দ্বারা এক বস্তুর উপলব্ধি হয় ইহার মীমাংসা কঠিন। কখন-কখন দেখা যায়, দুই চক্ষুতে দুইটি পৃথক বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। চক্ষুপ্রান্তে ঈষৎ চাপ দিয়া চক্ষু গোলককে বিভিন্নমুখী করিলে, এক বস্তু প্রত্যক্ষ না করিয়া দুই বস্তু প্রত্যক্ষ করি। সাধারণতঃ সহজ অবস্থাতে কিন্তু দুই চক্ষু দ্বারা আমরা একটি বস্তুরই উপলব্ধি করিয়া থাকি। রেটিনাক্ষেত্রের নিম্নভাগ বা দর্শনকেন্দ্রে দৃশ্য বস্তুর আলোক-সম্পাত হইলেই বস্তুটি সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। উহার বাহিরে রেটিনার মধ্যভাগে আলোক-সম্পাত হইলে উহা অস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। ক্রমে কেন্দ্র হইতে যত দূরে আলোক-সম্পাত হয়, দ্রব্যটি ততই অধিক অস্পষ্ট হয়। ক্রমে দূরে গিয়া বস্তুটি দর্শনক্ষেত্রের বহির্ভূত হইয়া যায়। কেন্দ্র হইতে একই দিকে সমদূরস্থ কোনও বিন্দুতে আলোক-সম্পাত হইলে বস্তুটি এক দেখায়। দূরত্ব বা দিকের পৃথকত্ব হইলে বস্তু দুইটি দেখায়। আমাদের এক চক্ষু হস্ত দ্বারা আবৃত করিয়া কোনও বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিলে, আমরা উহার ঠিক অবস্থান-বিন্দু নির্ণয় করিতে পারি না। বাম চক্ষু আবৃত করিলে উহা অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে, এবং দক্ষিণ চক্ষু আবৃত করিলে উহা বামে যেন সরিয়া যায়; দক্ষিণ চক্ষুর রেটিনাতে প্রতিফলিত ছবি ও বাম চক্ষুর রেটিনাতে প্রতিফলিত ছবি এক নহে। তাহা হইলে ইহাই বুঝা গেল যে, কোন দ্রব্যকে লক্ষ্য করিলে আমাদের উভয় চক্ষু পরস্পরের সহায়তা করে। দৃষ্ট বস্তুর ঠিক সম্মুখস্থ অংশের একই ছবি উভয় রেটিনাতে প্রতিফলিত হয়। উভয় চক্ষু দ্বারা আমরা এক অভিন্ন বস্তু প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু উহার কতক অংশ উভয় চক্ষুর গোচর হয় না। বস্তুর বাম প্রান্তে অবস্থিত অংশের ছবি মাত্র বাম চক্ষুর রেটিনার বাম প্রান্তভাগে প্রতিফলিত হওয়াতে, উহা বাম চক্ষুরই গোচর হইয়া থাকে; সেইরূপে উহার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত অংশ সমূহের ছবি দক্ষিণ রেটিনার দক্ষিণপ্রান্তে প্রতিফলিত হওয়াতে উহা দক্ষিণ চক্ষুরই গোচর হইয়া থাকে। এখন উভয় রেটিনাতে প্রতিফলিত ছবির সংযোগে সমগ্র বস্তুটির একটি ছবি আমাদের চিত্তে প্রতিফলিত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, একচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির বস্তু প্রত্যক্ষ দুইচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ ও হীন।

আরাবল্লীর কথকতা

বা

আর্য্যাবর্ত্তের জন্ম

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়]

বাল্যকালের সংস্কার আজীবনই রহিয়া যায়। উহার "হাত এড়ান" বড়ই শক্ত। নিজের মুখে নিজের কথা কি সহজে বলা যায়? আত্মপ্রশংসাকে লোকে পূর্ব্বে মৃত্যু-তুল্যই মনে করিত। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি। আজকাল সবই কেমন যেন উল্টা হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন সংস্কার আর বর্ত্তমান ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে স্থান পায় না। এখন ঢাকে ঢোলে নিজের কথা দশজনকে জানানই প্রথা হইয়া উঠিয়াছে। যে দুইদিনের জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছে, দুই দিনে যাহা সামান্য দেখিয়াছে, তাহাই বলিবার জন্য তাহার কত আগ্রহ, কত চেষ্টা। আর যাহার "বয়সের গাছ পাথর নাই", তোমাদের ঐ হিমালয়ও যাহার তুলনায় ছেলেমানুষমাত্র, যে তোমাদের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—তিন কালই জানে, পৃথিবীর অনেক ঘটনাই যাহার চোখের উপর ভাসিতেছে—নখদর্পণস্বরূপ রহিয়াছে, সে এই সুদীর্ঘ জীবনে যাহা কিছু দেখিয়াছে, তাহাদের দুই-একটা ঘটনা বলিলে দোষ না হওয়াই ত ঠিক। আর কোন্ দিন হঠাৎ মরিয়া যাইব, এই ভগ্ন দেহ রাজপুতানার বালিতে মিশিয়া যাইবে। তখন কে তোমাদিগকে এ-সব কথা শুনাইবে?

এ বয়সে ত অনেক ঘটনাই দেখিয়াছি। সবগুলাই ত বাহির হইবার জন্য পেটের মধ্যে জটলা করিতেছে—যেন রেলযাত্রীর টিকিট্ কেনার জন্য ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইয়াছে। এখন কোন্‌টাকে বাদ দেই আর কোন্‌টাকে আগে বলি! কি? ভাল কথা বলেছ, আজ তবে আর্য্যাবর্ত্তেরই জন্মকথা আরম্ভ করা যাউক। অপরের জন্ম বর্ণনার পূর্ব্বে নিজের বয়সের হিসাবটা দিতে পারিলে অবশ্য ভাল হইত, কিন্তু ঐ বিষয়টা ত শিখি নাই। সুতরাং কোন্ সালের কোন্ তারিখে এ অধমের জন্ম হয়, তাহা এখন সঠিক বলিবার কোন উপায় নাই। তবে তোমাদের আদিপুরুষেরও যে তখন কোন সন্ধান ছিল না, একথা হলপ্ করিয়া বলিতে পারি। বলিলে হয় ত বিশ্বাস করিবে না যে, তখন তোমাদের ইংলণ্ড, ফ্রান্স, যীশুখৃষ্টের জন্মভূমি ঐ প্যালেষ্টাইন্ ও উহার নিকটবর্ত্তী আরব, পারশ্য, আফ্‌গানিস্থান, বেলুচিস্থান, তিব্বত, এমন কি পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ ঐ হিমাচলেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। তখন তোমাদের বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা জাহ্নবীই বা কোথায় ছিলেন, ব্রহ্মপুত্র বা সিন্ধুনদই বা কোথায় ছিলেন? শুনিলে অবাক্ হইবে যে, তখন একটি প্রশস্ত সাগর বর্ত্তমান আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্রান্স, স্পেন্, সাহারা মরু, ইজিপ্ত (বা গুপ্তদেশ), আরব, পারশ্য, বেলুচিস্থান, আফ্‌গানিস্থান এমন কি তিব্বতেরও উপর দিয়া চীন দেশের দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল (১)। উহার একটি অগভীর শাখায় পাঞ্জাব, সিন্ধু, থর মরুর উপর দিয়া যশল্মীর পর্য্যন্ত জোয়ার-ভাটা খেলিত। (২) সেই রাজপুতানা-সমুদ্রের তরঙ্গমালা আমারই পাদদেশ

(1) From France, this gastropod ranged through Italy, Egypt, Persia, Cutch, Sind and Western Burma, being a widely distributed inhabitant of the great Mediterranean sea which stretched as a belt across this area in early Tertiary times Imperial Gazetteer of India, New edition, Vol. I, page 95.

The great central ocean known to geologists as Tethys flowed over a belt stretching across Central Asia, leaving deposits in which fossil contents of places so widely separated as Burma, China, the Central Himalayas, Siberia and Europe, show the marked affinities due to free migration in the ocean. Ibid. page 68.

(2) In the neighbourhood of Jaisalmir, however,

ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। তখন আটলান্টিক মহাসমুদ্র হইতে নানাবিধ সামুদ্রিক জীব ঝাঁকে-ঝাঁকে তিব্বতদেশ পর্য্যন্ত অবাধে সন্তরণ করিয়া বেড়াইত। অপর দিকে স্থলচর জীবগণ কুমারিকা অন্তরীপ হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে পারিত (৩)। বর্ত্তমানে লুপ্ত প্রাচীনকালের সেই দক্ষিণ মহাদেশটি আধুনিক অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার সহিত কতকটা সংযুক্ত ছিল (৪)। ঐ যে সহ্যাদ্রি বা পশ্চিমঘাট পর্ব্বত দেখিতেছ, উহাই সেই দক্ষিণ মহাদেশের মেরুদণ্ড (watershed) স্বরূপ থাকিয়া বৃষ্টির জলকে কতকটা পূর্ব্বদিকে ও বাকীটাকে পশ্চিম দিকে যাইতে বাধ্য করিত। উহার সে অভ্যাস আজিও যায় নাই। ইহারই গুণে সেদিনকার ঐ গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদীগুলা এখন পূর্ব্বদিকে চলিয়াছে। যাহারা তখন পশ্চিমদিকে ছুটিত, ঐ স্থলভাগের সঙ্গে-সঙ্গে তাহারা সমুদ্রে মিশিয়াছে। নর্ম্মদা ও তাপ্তী এখন তাহাদের প্রতিভূ-স্বরূপ রহিয়াছে। নীলগিরি ও আনামালাই পর্ব্বতের মধ্য দিয়া পূর্ব্বে যে নদীটি পশ্চিম সমুদ্রে পড়িত, তাহা এখন দৃষদ্বতী ও ফল্গু নদীর ন্যায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কি জানি কেন, আমার ঐ ছোট-ভাই হিমাচলের জন্মের কিছুকাল পূর্ব্বে ধরিত্রী মাতা অত্যন্ত বিচলিতা হয়েন। ঐরূপ ভাবে আর কখন তাঁহাকে কাঁপিতে দেখি নাই। ইহারই ফলে ঐ দক্ষিণ মহাদেশটী ক্রমে ভূতলে প্রবেশ করে। সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণ মহাসমুদ্র উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া রাজপুতানার সাগরের সহিত মিলিত হয়। পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধের মানচিত্রে ঐ যে মাদাগাস্কার ও সিকোল দ্বীপ দেখিতেছ, উহারাই ভগ্নদূতের ন্যায় দক্ষিণ মহাসমুদ্রের জয় এবং দক্ষিণ মহাদেশটীর পাতালে প্রবেশ ঘোষণা করিতেছে (৫)। উহারাই তখন উচ্চ ছিল বলিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিত। এখনও মাদাগাস্কার দ্বীপ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভারত সমুদ্র মাপিলে দেখিতে পাইবে, উহা দক্ষিণ মহাসাগরের ন্যায় গভীর নহে। আর দক্ষিণ মহাসমুদ্রের পর্ব্বতাকার তরঙ্গমালা ঐ স্থলভাগের দক্ষিণাংশে তখন চূর্ণীকৃত হইত। এখনও ঐ নিমজ্জিত স্থলভাগের বাধা পাইয়া দক্ষিণ মহাসাগরের বরফশীতল জলরাশি আরবসাগরে প্রবেশ করিতে পারে না। নতুবা উভয় সাগরের অনুরূপ গভীর জলের উষ্ণতা একই রূপ হয় না কেন? (৬) যখন আফ্রিকার জলহস্তী সকল

---

there are highly fossiliferous limestones which include many forms identical with those characteristics of Cutch......We thus have proof, that the sea extends so far eastwards during upper Jurrasic period. Ibid. p 76

(3) That India and the southern and central parts of Africa were once united into one great stretch of nearly continuous dry land is proved by overwhelming evidence...So far as evidence goes, it points either to a complete land-connection or to an approximation sufficiently close to permit free migration of land animals and plants. Ibid. p 85.

(4) In Gondwana times India, Africa, Australia and possibly South America, had a closer connection than they appear to have at present. Although probably at no time forming a continuous stretch of dry land, they were sufficiently connected to permit of the free commingling of plants and land animals. Ibid. pp. 80-81.

A flora closely resembling that of Indian Gondwana was found represented also in Australia, south and East Africa, Argentina and Brazil. The remarkable agreement between the glossopteris (Gondwana) flora of India and the fossil plants of similar formations in Australia, Africa and South America can only be explained on the assumption that these lands, now separated by the ocean, once constituted a great southern continent. Ibid page 85.

(5) Then (*i. e.*, at the close of the cretaceous period) ensued a series of volcanic cataclysims such as the eastern world had probably never seen since. Probably it was then that the connecting link between Africa and America was severed and that the western continent indicated by the coral archipelagoes of Maldive and Laccadive Islands were submerged. Ibid. pp. 2—3.

(6) It is found that between the Seychelles which are connected by comparatively shallow waters

ভারতের কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত অবাধে ভ্রমণ করিত, তখন কে অনুমান করিতে পারিত যে, দক্ষিণে মহাসমুদ্র ঐ স্থলভাগকে কালে গ্রাস করিয়া পারস্যদেশের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে? তখন কে মনে করিত যে, ইউরেশিয়া সাগর (Tethys) সরিয়া গিয়া সাহারা, আরব ও রাজপুতানা মরুর সূত্রপাত করিবে? তখন কে ভাবিতে পারিত যে, সমুদ্রতল উচ্চ হইয়া ব্যাবিলন, পারস্য, আফ্‌গানিস্থান, হিমালয়, তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের সৃষ্টি করিবে, (৭) এবং ঐ সকল স্থান কালে হস্তী, গো, মেষ, মহিষাদি স্থলচর জীব ও মনুষ্যের আবাসভূমি হইয়া উঠিবে? কালের কি বিচিত্র গতি! প্রকৃতির কি অদ্ভুত লীলা!

কি বলিতেছ? আমার আফিমের মাত্রাটা আজ কিছু বেশী হইয়াছে? হাঁ, তা বলিবে বই কি! বুড়োর কথায় বিশ্বাস হইবে কেন? এখন যে তোমাদের কথায়-কথায় প্রমাণ চাই! ভাল, প্রমাণই না হয় দিতেছি। চোখে যাহা দেখা যায় নাই, তাহাই কি মিথ্যা বলিতে হইবে? কেহ কি আপন বৃদ্ধপ্রপিতামহকে চোখে দেখিয়াছে? তবে কি তিনি ছিলেন না? পথে চাকার দাগ দেখিয়া গাড়ী যাওয়ার অনুমান করা যায় না? মাঠময় গোময় বা গোবর থাকিলে সেখানে কিছু পূর্ব্বে গরু চরিয়াছিল বা বাথান ছিল, এরূপ অনুমান করা কি একান্তই অসম্ভব? তাহা যদি না হয়, তবে আমি চোখে আঙ্গুল দিয়া তোমাদিগকে দেখাইতেছি যে, আমার কথার একবর্ণও মিথ্যা নয়।

আচ্ছা, ভারতের পদ্মা ও চীনের হোয়াংহো বা পীতনদী যে মধ্যে-মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করে—এক খাত ছাড়িয়া অন্য খাতে প্রবাহিত হয়—তাহা ত অন্ততঃ শুনিয়াছ। এখন মনে কর, কোন একখানা বড় নৌকা উহাদের একটার চরে "বাণচাল" হইল—মাটিতে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, এবং নদীগর্ভে চিরকালের জন্য আশ্রয় লইল। স্রোতের সঙ্গে বালি ও মাটি আসিয়া উহার উপর জমিতে-জমিতে নদীগর্ভ ক্রমশঃ উচ্চ চরে পরিণত হইল। ঐ যে গঙ্গাসাগরের মোহানায় বড় একখানা জাহাজ ডুবিয়াছিল, তাহা ত শুনিয়াছ? কালে গঙ্গার পলি জমিতে-জমিতে ঐ স্থানটি উচ্চ হইলে, সমুদ্রকে বাধ্য হইয়া দূরে সরিতে হইবে। তখন ঐ স্থানটি একটা দ্বীপে পরিণত হইবে ও পশুপক্ষী দ্বারা আনীত নানাবিধ ফলমূল এবং বায়ুচালিত তুলা প্রভৃতির বীজ পড়িয়া দ্বীপটা ক্রমে জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। তখন কেহ হয় ত গবর্ণমেণ্টকে টাকা দিয়া ঐ স্থানটি আপন জমিদারীভুক্ত করিয়া লইবেন এবং সস্তা হারে প্রজাবিলি করিবেন। সুন্দরবনের অনেক স্থান ত এইরূপে আবাদ হইতে সুরু হইয়াছে। চাষবাসের সুবিধার জন্য দ্বীপটি ক্রমে-ক্রমে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পল্লীতে পূরিয়া উঠিবে। কালক্রমে সমুদ্র আরও অনেক দূর সরিয়া গেলে, ঐ সকল পল্লীবাসীরা অনুমানও করিতে পারিবে না যে, তাহাদের উচ্চ ক্ষেত্রসকল এক কালে সমুদ্রের তলে ডুবিয়া ছিল। কেহ এ কথা বলিলে, গাঁজার সহিত তাহার পরম প্রীতির সম্বন্ধ আছে বলিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিবে। নয় কি? কিন্তু মাটির নীচে যে ভাঙ্গা নৌকা বা জাহাজখানা রহিয়া গেল, তাহা ত সহজে নষ্ট হইবে না। উহাদের তক্তাগুলা মাটির মধ্যে অনেককাল পর্য্যন্ত রহিয়া যাইবে। দৈবক্রমে ঐ স্থানটিতে পাতকূয়া খুঁড়িলে, তখন ঐ সকল তক্তা বাহির হওয়া ত অসম্ভব নয়। তখন ত আর এ কথা অবিশ্বাস করিবার উপায় থাকিবে না যে, হাজার উচ্চ হইলেও গ্রামের জমিগুলা এককালে জলের তলে ডুবিয়া ছিল। নতুবা,

with Madagascar and Africa and the Maldives, which are on the Indian continental platform, there exists a submarine bank, preventing the ice-cold Antarctic currents that characterizes the great depths of the South Indian ocean from entering into the Arabian sea, which has thus a higher temperature than the water at corresponding depths to the south of this bank. Ibid. p. 86.

(7) The sea which once flooded the area of the western frontier hills, Tibet and Burma, was driven back....Ibid. p. 3. As the period of volcanic activity ceased, there commenced in the far north, the throes of an upheaval which has gradually (acting through inconceivable ages) raised the marine limestone of Nummulitic age to a height of 20,000 feet above the sea-level and resulted in the most stupendous mountain system of the world. The north western Himalayas, Tibet and Burma were gradually upraised and fashioned during this (i. e., the close of cretaceous) epoch. Ibid. p. 2.

পূর্ব্বকালে শুক্‌না ডাঙ্গায় নৌকা ও জাহাজ চলিত বলিয়া অনুমান করিতে হয়।

মরা গরু ও মহিষকে পাড়াগাঁয়ের লোকেরা "ভাগাড়ে" ফেলিয়া দেয়। আর অল্প সময়ের মধ্যেই শকুনি, গৃধিনী, কাক, চিল ও শিয়াল, কুকুর জড় হইয়া "মচ্ছব" (মহোৎসব) লাগাইয়া দেয়। পরদিন ভাগাড়ে কেবলমাত্র হাড়-ক'খানা পড়িয়া থাকে। কালে ঐ সকল হাড় রৌদ্র, বৃষ্টি ও বাতাসে নষ্ট হইয়া যায়, কোন চিহ্ন থাকে না। কিন্তু বরফের মধ্যে চাপা দিলে মাছ-মাংস যে শীঘ্র নষ্ট হয় না, তাহা ত অবশ্য জান। এই যে শিমলা সহরে বসিয়া বার শ' মাইল দূরবর্ত্তী গোয়ালন্দের টাট্‌কা ইলিস মাছ খাইতেছ, উহা কিসের গুণে জান না কি? একবার মেছোবাজারে গেলেই দেখিতে পাইবে যে, মাছের বাক্সের মধ্যে বরফ বোঝাই রহিয়াছে; তাই মাছগুলা পচিতেছে না। সাইবিরিয়াবাসী কাঁচা মাংসখোর অসভ্য এস্কিমোরাও এ কথাটা জানে। তাহারা উত্তর মহাসাগর হইতে সিল, তিমি প্রভৃতি শিকার করিয়া বরফের মধ্যে লুকাইয়া রাখে। অনেক দিনের পরেও উহা ঠিক থাকে, পচিয়া যায় না। বরফের গুণে মাংসই যদি অনেক দিন ঠিক থাকে, তবে, কাঁটা ও হাড় কতকাল থাকিতে পারে, তাহা অনুমান করিতে পার। এই সে-দিন সাইবিরিয়া প্রান্তরে বরফের নীচে একটা অতিকায় হস্তীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। অত বড় হাতী এখন আর অন্য কোন দেশে দেখা যায় না বটে, কিন্তু উহার হাড়গুলাই কি প্রমাণ করিতেছে না যে, ঐ অঞ্চলে এককালে অতিকায় হস্তী বিচরণ করিত? তবেই দেখ, কাণ থাকিলে পুরাতন জাহাজের ভগ্নাবশেষ ও হাড়ের নিকট অনেক প্রাচীন ইতিহাস শোনা যাইতে পারে।

কি বলিলে? আবোল-তাবোল বকিতে আরম্ভ করিয়াছি? তা', কি আর করিব, বুড়া হইলে অনেক কথাই একসঙ্গে মনের মধ্যে আসিয়া জোটে; কাজেই খেই হারাইয়া যায়। তা' কিছু মনে কর না। কি বল্‌ছিলাম? হাঁ, ভাগাড়ে পড়িলে গরু বাছুরের মাংস ত দূরের কথা, হাড়গুলা পর্য্যন্ত রোদ-বাতাসে নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু জলে ডুবিলে কি দশা হয়? নদী বা সমুদ্রের জানোয়ারগুলা মরিয়া গেলে, মাংসগুলা ত নানা জীবে খাইয়া ফেলে; এবং হাড়গুলা তলাইয়া গিয়া মাটির উপর চিরকালের জন্য আশ্রয় লয়। স্রোত না থাকিলে আর এক পা'ও নড়ে-চড়ে না। এ কথা ত বিশ্বাস করিতে পার? আচ্ছা, এখন মনে কর, একটা তিমি মাছ ইয়াংসিকিয়াং, আমেজান বা অন্য কোন একটী বড় নদীর মোহানার কিছু দূরে মরিল, এবং উহার হাড়গুলা সমুদ্রের তলে জড় হইল। নদীর ঘোলা জলের সঙ্গে পলি-মাটি আসিয়া উহার উপর প্রতি বৎসর জমিতে লাগিল। তাহার ফলে অল্পকালের মধ্যেই হাড়-ক'খানা মাটি চাপা পড়িয়া গেল। আর সমুদ্রের জলের চাপের চোটে মাটি ও হাড় মিশিয়া পাথর হইল। কি বলিলে? হাড় ও পলিমাটি মিশিয়া কখন পাথর হইতে পারে না? আচ্ছা, কাঠ পাথর হইতে পারে কি? না, তাও পারে না? লালপাণিতে গিয়া সেদিন তোমাদেরই যে অনেকে কাঠের পাথর আনিয়াছিল, তাহাও কি দেখ নাই? আচ্ছা, তোমাদেরই জগদানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা কর, শান্তি নিকেতনের মাঠে রবীন্দ্র বাবুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাল বা শালের পাথর লইয়া খেলা করে কি না? "খোয়াই"এর মধ্যে সেখানে এখনও অর্দ্ধেকটা কাঠ ও বাকীটা পাথরের নমুনা অনেকই পাওয়া যায়। কাঠ হইতেই ত কয়লা হয়। ঐ কয়লা ত পাথর হইতে পারে। তোমাদের পাথুরে কয়লা ত কয়লারই পাথরে পরিণতি মাত্র। হাতে লইলেই উহাকে পাথরের মত ভারী ও ঐ রকম অনেকটা শক্ত মনে হইবে। ফলতঃ, প্রাচীন কালের বড়-বড় বন মাটি চাপা পড়িয়া কালে পাথুরে কয়লায় পরিণত হইয়াছে। এখনও ঐরূপ না হইতেছে এমন মনে করিও না।

কি বলিতেছিলে? শান্তি-নিকেতনের কাছে নদী কোথায়? অত উঁচু ভুবনডাঙ্গা কখনই নদীর নীচে থাকিতে পারে না? কেন? "খোয়াই"এর ঐ কাঁকরগুলাই সাক্ষ্য দিতেছে যে, প্রাচীন কালে ঐ স্থানে নদী ছিল। অজয় নদের পুরাতন পলি জমিয়া ঐ সকল কাঁকরের সৃষ্টি করিয়াছিল (৮)। পাহাড়ে—অজয় নদের প্রবল স্রোতের সঙ্গে-সঙ্গে আসিয়া ছোট-ছোট পাথরের নুড়ি পর্য্যন্ত প্রথম-

(8) Throughout the great Indo-Gangetic alluvial area, a sandy micaceous and calcareous clay forms the prevailing material, the older alluvium being

প্রথম ঐ সকল স্থানে জমিয়াছিল। পাতকূয়া বা ইঁদারা খুঁড়িবার সময় আজিও উহা দেখা যায়। নদীর মধ্যস্থলে পলি জমিয়া যে উঁচু চর পড়ে, সেই চরে কেশে, ঝাউ ও নল খাগ প্রভৃতি গাছপালা জন্মে এবং বন্যার জলে পচিয়া মাটির মাত্রা বৃদ্ধি করে, এবং ক্রমে তীরের প্রায় সমান উঁচু হয়, তাহাও কি দেখ নাই? রাজসাহী ও দামুকদিয়ার মধ্যে পদ্মা-নদীর চর দেখিলেই আমার কথায় তোমাদের বিশ্বাস হইবে। যে-কোন বড় নদীর চর পরীক্ষা করিলেই ইহা বুঝিতে না পারিবে, এমন নহে। চরের জন্য নদী ক্রমে এক স্থান হইতে সরিয়া অন্য স্থানে গমন করে। চাষবাসের মাটি ধুইয়া পুরাতন খাত ক্রমে ভরাট্ হয়। কালে তথায় নদীর চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না। এইরূপেই উত্তর নদীয়ার ভৈরব নদের চিহ্ন পর্য্যন্ত অনেক স্থানে লোপ পাইয়াছে। গঙ্গা-নদীর মোহানায় আজকাল যে পলি জমিতেছে, উহা জমাট বাঁধিয়া কালে যে বেলে পাথরের সৃষ্টি করিবে না, তাহা কি বলিতে পার? নবদ্বীপ অঞ্চলে পাতকূয়া খুঁড়িবার সময় ২৮।২০ ফিট নীচে যে মধ্যে-মধ্যে বালির "জমাট্" বাহির হয়, উহা এত শক্ত যে কোদালে কাটা যায় না। উহা বেলে পাথরের প্রথম সূত্রমাত্র। ফলতঃ, বালি জমিয়া যেমন পাথর হইতে পারে, কাঠ ও বালি মিশিয়া সেইরূপ পাথর না হইতে পারে এমন নয়। ব্রহ্মদেশে যে ইরাবতী নদী আছে, উহার তীরে মাটীর মধ্যে এইরূপ পাথুরে কাঠের নমুনা অনেকই পাওয়া যায়। আর, যদি কাঠ ও মাটী মিশিয়া পাথর হইতে পারে, তবে হাড় জমিয়া পাথুরে হাড় হওয়া অসম্ভব হইবে কেন? সমুদ্রে যেমন তিমি, মকর, কড়ি, প্রবাল প্রভৃতি জীবের হাড় জমিয়া কালে পাথর (fossil) হইতে পারে, বড়-বড় নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া পশু-পাখী, এমন কি মানুষ প্রভৃতি অনেক স্থলচর জীবের কঙ্কালও হ্রদের নীচে জমিয়া পাথরে পরিণত হইতে পারে। এখনও মধ্য এসিয়ায় আমুর ও শিরনদী আরাল হ্রদে এবং উরাল ও য়ুরোপের ভল্গা-নদী কাস্পীয়ান সাগরে পলি মাটি জমাইয়া হ্রদগুলিকে ভরাট্ করিতেছে। যদি তুচ্ছ দামোদরের বানে বর্দ্ধমান জেলার অনেক গ্রাম ডুবিতে পারে এবং তাহার ফলে অনেক গরু-বাছুর ভাসিয়া যাইতে পারে, তবে বড়-বড় নদীর প্রবল বানে নিকটস্থ প্রদেশের গরু, বাছুর, বুনো বাঘ, ভালুক, হাতী, এমন কি মানুষও ভাসিয়া গিয়া অবশেষে হ্রদের তলে চিরকালের জন্য আশ্রয় লইতে পারে না কি? প্রতি বর্ষাকালেই হ্রদগুলায় যথেষ্ট পলি জমিতেছে। কালে ঐ সকল হ্রদ পূরিয়া উঠিবে। আর উহাদের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অনেক হাড় পাথরে পরিণত হইয়া রহিয়া যাইবে।

distinguished by the segregations of carbonate of lime, called *kankar* used largely as a source of lime and as road metal. Ibid. p. 100.

কৈ, মাগুর, ল্যাঠা, চ্যাং প্রভৃতি পাকাল মাছ বিল খালের আবদ্ধ জলে বাস করে। ইলিসমাছ স্রোতের জল ভিন্ন থাকিতে পারে না। নদীর সুমিষ্ট জলে উহারা ডিম পাড়ে। ঐ ডিম স্রোতে ভাসিয়া নদীর মোহানায় পৌছিলে, সমুদ্রের লোণা জলের গুণে ফুটিতে থাকে। তখন পোনামাছগুলা স্বাভাবিক সংস্কারের বশে আবার নদী উজাইতে আরম্ভ করে। এইজন্য জেলেরা স্রোতে নৌকা ও জাল ভাসাইয়া সহজে ইলিসমাছ ধরিতে পারে। আটলাণ্টিক মহাসাগরেও একপ্রকার মাছ আছে, উহারা ডিম পাড়িবার সময় বাল্টিক সাগরে প্রবেশ করে এবং প্রসবের পর স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। ইহাদের পক্ষে সমুদ্রের লোণা ও নদীর সুমিষ্ট উভয় প্রকার জলই আবশ্যক। তিমি, কড়ি, প্রবাল, উড্ডয়নশীল মৎস্য প্রভৃতি জীব কখন নদী বা হ্রদের জলে বাস করে না। সুতরাং নদীর সুমিষ্ট জলে যে সকল জীব বাস করে, তাহাদের হাড় হয় ত কোন হ্রদের মধ্যে, নয় ত নদীর মোহানাতে জলের নীচে আশ্রয় লয়; নদীর খাতেও যে জমিতে পারে না, এমন নহে। কিন্তু সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল সমুদ্রেই জমিয়া থাকে, হ্রদে বা নদীতে নহে। কালে ঐ সকল কঙ্কাল পাথুরে-হাড়ে পরিবর্ত্তিত হওয়া বিচিত্র নয়।

চির পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর কোন স্থান হয় ত উঠিতেছে, আবার কোন স্থান হয় ত বসিয়া গিয়া সাগরে পরিণত হইতেছে। আবার উঠিতেছে, আবার বসিতেছে। ইতালীর উপকূলে Pozzuoli নামক স্থানে রোমানেরা একটা গীর্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উপকূলভাগ বসিয়া যাওয়ায় গীর্জাটিও বসিয়া যায়। আর উহার নীচের তলায় সমুদ্রের লোণা জল প্রবেশ করে। সুযোগ পাইয়া সামুদ্রিক জীব সকল অর্দ্ধমগ্ন থামগুলির গায়ে গর্ত্ত করিয়া বসবাস আরম্ভ করে। মনে করে, চিরকালই

বুঝি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে তথায় সুখে বাস করিবে; কিন্তু তাহা ঘটে নাই। কিছুকাল পরে ঐ উপকূল আবার উচ্চ হইতে আরম্ভ করে। সমুদ্রকে বাধ্য হইয়া দূরে সরিতে হয়। নানা স্থানে পলি মাটির সঙ্গে সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল জমিয়া যায়। আজিও থামগুলির গাত্র পরীক্ষা করিলে, আমার কথা সত্য কি মিথ্যা জানিতে পারিবে (৯)। আর অত দূর বিদেশেই বা যাইবার আবশ্যকতা কি? বোম্বাই-দ্বীপের পূর্ব্বাংশে কতকগুলি গাছ আছে। ভাটার সময় তাহাদের নীচের ১২ ফুট এখনও জলের নীচেই থাকিয়া যায়। তোমাদেরই অনেকে মান্নার উপসাগরে টিনেভেলী উপকূলে জলমগ্ন বনের সন্ধান পাইয়াছ। ঐ সকল স্থান যে এককালে সমুদ্রের নীচে ছিল না—জাগিয়া ছিল—তাহা অনায়াসেই অনুমান করিতে পার। দ্বারকার দক্ষিণে যে সকল দ্বীপ সেদিনও বর্ত্তমান ছিল, উহারা এখন কোথায়?

জল ও স্থলের লড়াই সর্ব্বদা চলিতেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্য বিরাম নাই। একবার সমুদ্র হটিতেছে, আবার দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইয়া পরক্ষণেই পিছাইতে বাধ্য হইতেছে। নরওয়ে দেশের উপকূলভাগ এখন বসিয়া যাইতেছে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, একশত বৎসরে প্রায় ৪ ফুট হিসাবে সুইডেনের উপকূল উচ্চ হইতেছে। এরূপভাবে দীর্ঘকাল চলিলে, বাল্টিকসাগর হয় ত কালে মজিয়া গিয়া, বাঙ্গালাদেশের ন্যায় একটা সমতল দেশের সৃষ্টি করিবে। ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবীর নানা স্থান উঠিতেছে ও বসিতেছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কচ্ছপ্রদেশ (Rann of Cutch) বসিয়া গিয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যে বিষম ভূমিকম্প হয়, তাহার ফলে আসামের অনেক স্থান উঁচু-নীচু হইয়া যায়। কয়েকদিন পূর্ব্বে জাপানের একটি দ্বীপ ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের অতলজলে ডুবিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা ও রেঙ্গুনের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে একটা কাদার দ্বীপ উঠিয়া কয়েক সপ্তাহ পরে আবার ডুবিয়া যায়। ইহা আগ্নেয়-গিরিরই খেলা বলিতে হইবে। ফলতঃ জল-স্থলের লড়াইএর অন্ত নাই; এই গজ-কচ্ছপ-যুদ্ধ চারি যুগ ধরিয়াই চলিতেছে। যখনই সমুদ্র জিতিয়াছে, তখনই উহার আনুসঙ্গিক সামুদ্রিক জীবসকল স্থলের উপর বিজয়চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। কোথাও তাহাদের হাড় জমিয়াছে; কোথাও সামুদ্রিক প্রবাল কীটগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া দ্বীপের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। ভারতমহাসাগরে ঐ যে লাক্ষা ও মালদ্বীপপুঞ্জ দেখিতেছ, উহা প্রবাল-কীটেরই উপনিবেশমাত্র। আবার যখন স্থলভাগ মাথা খাড়া করিয়া সমুদ্রকে দূরে তাড়াইয়াছে, তখন উহার উপর গাছপালা জন্মিয়াছে, এবং হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি স্থলচর জীবগণ বিচরণ করিয়াছে। তাহাদের কঙ্কালই ইহার প্রমাণ। ফলতঃ পুরাতন অস্থি-প্রস্তর বা পাথুরে হাড় (fossils) জল ও স্থলের চিরদ্বন্দ্বের — জয়-পরাজয়ের বর্ত্তমান সাক্ষী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিমালয়ের জন্মের কিছুকাল পূর্ব্বে পৃথিবী যেরূপ কাঁপিয়াছিলেন, এমন কম্পন আর কখন দেখি নাই। তখন মনে হইতেছিল, বুঝি আর স্থির থাকিতে পারি না। ভীষণ শব্দে বিচলিত হইয়া পশ্চিমদিকে চাহিয়া দেখি, দক্ষিণমহাদেশটি যেন হঠাৎ বসিয়া যাইতেছে, আর দক্ষিণ মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা ঐ স্থলভাগকে গ্রাস করিবার জন্য উৎসাহে অগ্রসর হইতেছে। ভয় হইতে লাগিল, আমিও বুঝি আর বাঁচি না। বিন্ধ্যাচলও ভয়ানক চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—উভয়েই বুঝি বা সাগরের জলে তলাইয়া যাই। উত্তরদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ-মাত্র মনে হয়, ভূমধ্যমহাসাগরের (Tethys) মধ্য হইতে দিগন্তব্যাপী এক স্থলভাগ "মাথাখাড়া" দিতেছে। অল্পকালের (১০) মধ্যেই দেখি নানাদিকে ডাঙ্গা জাগিতেছে। এই দেখি, তোমাদের আফগানিস্থান জাগিল, ঐ বেলুচিস্থান, সঙ্গে সঙ্গে পারস্য, আরব, সাহারা, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড জাগিতে সুরু করিল। তোমাদের ভূতত্ত্ববিদদিগের ইউরেশিয়া সমুদ্র (ভূমধ্য মহাসাগর) যেন রণে ভঙ্গ দিয়া আরব সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরে আশ্রয় লইল। উহার গভীর অংশ সকলের চারিপার্শ্বের জমি সকল জাগিয়া উঠায় সাগর, উপসাগর, ও হ্রদের সৃষ্টি হইল। এইরূপে তোমাদের বর্ত্তমান ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান বা কাস্পীয়ান্ ও আরাল প্রভৃতি হ্রদের জন্ম হয়। বুঝিলে ত?

চারিদিকে এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি, এমন সময় আকাশ যেন অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। মেঘ হইল কি?

(৯) First year of Scientific Knowledge, by Paul Bart.

(১০) আরাবল্লী পাহাড়ের অল্পকালে মানবের যুগ-যুগান্তর বুঝিতে হইবে।

না, এ যে ছাই উড়িয়া গায়ে পড়িতেছে। ব্যাপার কি? দেখিতে-দেখিতে তরল আগুনের স্রোত আসিয়া বিন্ধ্যাচলকে আক্রমণ করিল ও সেই সঙ্গে ছাই-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মেঘগর্জ্জনকেও তুচ্ছ করিয়া গর্জ্জন উঠিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিন্ধ্যাচলের অনেক স্থান গলা পাথর (Lava) ও ভস্মরাশিতে চাপা পড়িয়া গেল। আমার দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হইল, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল; আমি অজ্ঞান হইলাম। কতকাল এ অবস্থায় ছিলাম, জানি না। শেষে একদিন দেখি, প্রবল বাতাস বহিতেছে। ভস্মরাশি উড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পশ্চিম হিমাচল ও আমার মধ্যে তখনও যে রাজপুতানা সমুদ্রের আংশিক ব্যবধান ছিল, তাহারই উপর ছাই গিয়া পড়িতেছে। কেবল যে বিন্ধ্যাচলেরই মাথায় উড়িতেছে, এরূপ নহে। সেই প্রবল ঝড়ে আমার অঙ্গের বিভূতি, রাঙ্গা বালিও উড়িয়া ঐ সাগরশাখাকে ছাইয়া ফেলিতেছে। ভালই হইতেছে। ঐ রাজপুতান সাগর শুকাইলে যে ছোট ভাই—হিমাচলের সহিত পশ্চিম অঞ্চলেও মিলিতে পারিতাম। অল্পকালের মধ্যেই যে সেদিনকার হিমাচল আমাদের অপেক্ষাও উচ্চ হইয়াছে। বৃদ্ধবয়সে আর কতকাল রৌদ্র, বৃষ্টি ও বাতাসের সঙ্গে লড়াই করিব? মাথা কি আর চিরকালই সমান উচু থাকিবে? এ কি? উহার মাথার উপর যে শাদা-শাদা বরফ জমিতেছে! কি আশ্চর্য্য! যেখানে পূর্ব্বে ভূমধ্য মহাসাগরের দক্ষিণ উপকূল ছিল, আজ সেই স্থানটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বেও যে স্থানটা সকলের চেয়ে নীচু ছিল, যাহার কূলে ভূমধ্য মহাসাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গ সকলকে প্রতিহত হইতে দেখিয়াছি, তাহা যে কালে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থলভাগ হইবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। গৌরীশঙ্কর, ধবলগিরি, নন্দাদেবী প্রভৃতি অত্যুচ্চ শৃঙ্গগুলি যে পূর্ব্বের সেই উপকূলে সারি দিয়া দাঁড়াইবে, ইহা পূর্ব্বে কে অনুমান করিতে পারিত? সামুদ্রিক জীব সকল যে স্থানে আনন্দে সাঁতার দিয়া বেড়াইত, এবং মৃত্যুর পর যেখানে চিরকালের জন্য বিশ্রাম লাভ করিত, সেই গভীর সমুদ্রতল উচ্চ তিব্বত আকারে উত্থিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? হিমালয়ের উত্তর গাত্রে এখনও যে ঐ সকল প্রাচীন সমুদ্রচরদিগের কঙ্কাল দেখা যায়! উহারাই আমার কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ ভাবিতেছি, এমন সময় মনে হইল, যেন দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে সজোরে হাওয়া আসিতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণ মহাসাগর দলে-দলে মেঘ পাঠাইয়া আমাদিগকে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিন্ধ্যাচল ও সহ্যাদ্রিও বাদ পড়ে নাই। মেঘগুলা যতক্ষণ হিমালয়ের মাথায় পৌঁছিতে না পারে, ততক্ষণ বৃষ্টির আকারে পড়িয়া হিমালয়ের গায়ের ময়লা ধুইয়া সমুদ্রে ফেলিতেছে। পরের মন্দ করিতে গেলে যে আপনার মন্দ আগেই হইয়া থাকে। আমাদিগকে ডুবাইতে গিয়া নিজেরই জ্ঞাতি রাজপুতানা সাগরকে প্রকারান্তরে ভরাট করিতেছে। আর যে মেঘগুলা খুব উঁচু দিয়া চলিতেছে, উহারা—"পেঁজা তুলার" মত উড়িয়া-উড়িয়া হিমাচলের উচ্চ শৃঙ্গ সকলের উপর পড়িতেছে এবং বিটচিনির গাদার মত উহাদের গায়ে জমা হইতেছে। মন্দ ব্যাপার নহে! পূর্ব্বে এমন ত কখন দেখি নাই। কিছুকাল পরে দেখি, সূর্য্যদেবের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া হিমালয়ের গা হইতে বরফগুলা গলিয়া আবার জোরে নামিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে তোমাদিগের ঐ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু-সরস্বতী প্রভৃতির সৃষ্টি হইতেছে। বৃষ্টির ফলে বিন্ধ্যাচলের গা ধুইয়া শোণ, নর্ম্মদা ও তাপ্তীর জন্ম হইতেছে। ঐ সঙ্গে সহ্যাদ্রির স্নান-জলে গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতির উদ্ভব হইতেছে। ঐ সকল নদীর স্রোতের সঙ্গে পাথর ও মাটি আসিয়া মোহানার কাছে নিয়ত জমা হইতেছে। চারিদিকের বহুবিধ পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিতেছি, বিশ্ব-শিল্পীর কি অদ্ভুত রচনা-প্রণালী!

এ কি! আমাদের গায়ে যে কোথা হইতে কত রকমের গাছপালা আসিয়া জুটিতেছে! রৌদ্র ও বৃষ্টির সাহায্য পাইয়া রক্তবীজের ন্যায় উহারা বাড়িয়া যাইতেছে। যে দিকে চাই, সেইদিকই যেন জঙ্গলে পূরিয়া যাইতেছে। এমন অদ্ভুত রকমের গাছ ত তোমরা কখন দেখ নাই। বড়-বড় দেবদারু গাছের মত Fern (ফার্ণ) জাতীয় সেই সকল গাছের শোভাই বা কত! হিমালয়ের পূর্ব্বাংশে, মধ্যভারতে, ব্রহ্মদেশে, মলয় উপদ্বীপে ও লঙ্কায় ইহাদের বংশ এখনও দেখা যায়।

এ কি হইল! আবার যে পৃথিবী কাঁপিতেছেন! সেবার ত কোন রকমে টি কিয়া গিয়াছিলাম। এইবার কি সকলেই রসাতলে যাইব? হিমাচল ত কখন এমন কাপুনি দেখে নাই। তাহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। ও কি হইল! প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড জঙ্গল যে বসিয়া যাইতেছে! দেখিতে-দেখিতে নানা স্থান অদৃশ্য হইল। আসাম পর্ব্বতমালা যে রাজমহল শ্রেণী হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল! আরব সাগর আবার পূর্ব্বস্থান অধিকার করিয়া হিমালয়কে পৃথক করিয়া দিল। তাহার প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ঢেউগুলা আনন্দে নাচিতে নাচিতে হিন্দুস্থানের উপর দিয়া বঙ্গোপ-সাগরে গিয়া মিলিতে লাগিল। আরব সাগরের আজ কি আনন্দ! যেন সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে গ্রাস করিবে। কিন্তু চিরকাল কাহারও সমান যায় না। সুখ বড়ই ক্ষণস্থায়ী। জ্ঞাতি-শত্রু বড়ই বিষম। বিভীষণের সাহায্যে লক্ষ্মণ ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদকে বধ করে। হিন্দুস্থান—সমুদ্রের আনন্দোল্লাস দর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীগুলি—সাঙ্গোপাঙ্গ শতদ্রু, যমুনা, শোণ, ঘঘরা, গণ্ডক, সুর্ম্মা প্রভৃতির সাহায্যে রাশি-রাশি বালি ও মাটি আনিয়া প্রত্যেক মোহানাকে ভরাট করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং সমুদ্রকে ক্রমে এক পা এক-পা করিয়া পিছাইতে হয়। আমার গায়ের ধূলামাটি বাতাসে উড়িয়া পড়িতেও ক্রটি করে নাই। ঐ যে সব লাল পাথর দেখিতেছ, যাহা দিল্লীর জুম্মা মসজিদে আজিও বিরাজমান রহিয়াছে, উহা আমারই দেহের ময়লা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। এইরূপে হিন্দুস্থান দেখিতে-দেখিতে আবার মাথা খাড়া করিল, জল-রাশি কচ্ছ ও বঙ্গোপসাগরে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হইল। জল ও স্থলের এইরূপ যুদ্ধ—গজ-কচ্ছপ-সমর যে কতবার হইয়াছে, তাহা আর বলিবার নয়। অবশেষে স্থলেরই জয় হয়। বাতাসের সাহায্য লইয়া সমুদ্র এখনও মধ্যে-মধ্যে হিন্দুস্থানকে আক্রমণ করে, তীর অতিক্রম করিতেও চেষ্টার ক্রটি করে না বটে। এমন কি উপকূলস্থ ২।৪ খানা গ্রামও কখন-কখন ভাসাইয়া না দেয় এমনও নহে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার পলাইতে বাধ্য হয়। এরূপ যুদ্ধই বৃথা। ইহা মহাসমরে হারিয়া শত্রু সৈন্যকে উদ্ব্যস্ত করিবার বৃথা চেষ্টা মাত্র।

এখন বুঝিলে ত, তোমাদের আবাসভূমি এই হিন্দুস্থান আমার চক্ষের সম্মুখে এই সেদিন জন্মিয়াছে। আর তোমাদের আদিপুরুষের জন্মও কত অল্পকালের। ফলতঃ, আমি ভারতের অতি প্রাচীন অধিবাসী, সত্যযুগের লোক। আমার সঙ্গীরা অনেকেই এখন আরব সাগরের তলে সমাধিস্থ রহিয়াছে। আমারই চক্ষের সম্মুখে বিন্ধ্যাচলের দুর্দ্দশা ঘটে; আগ্নেয়গিরির অত্যাচারে ভস্ম ও গলিত প্রস্তরে—লাভায় উহার অঙ্গ ঝলসিয়া যায়। সেই পোড়া কাল মাটিতে তুলার আবাদ করিয়া এখন তোমরা লাভবান হইতেছ। সমুদ্রের গর্ব্ব আমাদেরই নিকট খর্ব্ব হইয়াছে। বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভূভাগ কখন সমুদ্রে অবগাহন করে নাই। অল্পকাল পরেই আফ্রিকার সহিত দাক্ষিণাত্যের সংস্রব লোপ পায়। মাদাগাস্কার ও সিকেলী দ্বীপদ্বয় ঐ দক্ষিণ মহাদেশেরই স্মৃতিচিহ্ন রূপে বিরাজমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার সহিত যে যোগ ছিল, তাহাও লোপ পায়। দক্ষিণ মহাসমুদ্রের জয়-জয়কার হইয়া উঠে এবং তাহা ভূমধ্য মহাসাগরের সহিত মিশিয়া যায়। কিন্তু দেখিতে দেখিতে হিমালয়ের জন্ম হয়। আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, তিব্বত প্রভৃতি জাগিয়া উঠে। কাজেই ভূমধ্য মহাসাগর রণে ভঙ্গ দিয়া আটলান্টিকে আশ্রয় লয়। ইহারই ফলে সাইবিরিয়া-প্রান্তরে আরাল, বল্‌খাস, কাশ্যপ বা কাস্পীয়ান হ্রদ ও বর্ত্তমান ক্ষুদ্রকায় ভূমধ্যসাগরের জন্ম হয়। সাহারা, আরব প্রভৃতি মরুভূমি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ব্রহ্মদেশেরও জন্ম এই সময়েই ঘটে। আর ভূমধ্য মহাসাগরের যে অগভীর শাখা পাঞ্জাব ও থর মরুর উপর দিয়া যশল্মীর পর্য্যন্ত বিরাজ ক'রত, তাহাও আরব সাগরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের কল্যাণে বন্ধুর আর্য্যাবর্ত্ত পলি-পূর্ণ হইয়া সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হয়। লক্ষ্ণৌ সহরে সমুদ্র-পৃষ্ঠের (sea-level) একহাজার ফিট নীচেও মোটা বালি ভিন্ন অন্য কোনরূপ পাহাড়ের চিহ্ন যে দেখিতে পাও নাই, তাহা ত জান। সুতরাং নদী হইতেই যে আর্য্যাবর্ত্তের বর্ত্তমান আকার ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছ। তোমাদের কলিকাতার ৪৮১ ফিটের নীচেও কোনরকম পাথরের চিহ্ন পাওয়া যায় না। ভাগীরথীকে কতদিনে যে ঐ পলি জমাইতে হইয়াছে, তাহা বুঝিতেই পার। পলি-পূর্ণ হিন্দুস্থান শীঘ্রই নানাবিধ উদ্ভিদ ও বন্য জীবে পূর্ণ হইয়া উঠে। অবশেষে তোমাদের জন্ম হয়। দেখিতে-দেখিতে

আবার অনেক জীবই ডো-ডো পক্ষীর ন্যায় অনন্তকালের মত বিলুপ্ত হইয়া যায়। উহাদের কঙ্কালই উহাদের অস্তিত্বের বর্ত্তমান প্রমাণ। নেপালের দক্ষিণে অবস্থিত শিবালিক প্রদেশে পূর্ব্বে যে ১১ প্রকারের হস্তীকে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেবল একটি জাতি আজকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্মের শ্বেতহস্তীও বিলুপ্ত-প্রায়। নাসিক জেলায় গোদাবরী উপত্যকায় অতিকায় হস্তীর কঙ্কাল বাহির হইয়াছে। উহাই তাহাদের আকারের সাক্ষী (১১)। সরীসৃপগুলার প্রাণ কঠিন। উহাদের দুই জাতির বংশ নাই। বাকী ১০ জাতি আজিও নানাস্থানে বিচরণ করিতেছে। আর কত বলিব—শিবালিক অঞ্চলে পূর্ব্বে যে ৬৪ প্রকার স্তন্যপায়ী জীব ছিল, তাহাদের মধ্যে ২৫ জাতি লুপ্ত হইয়াছে। উহাদের হাড়গুলা দেখিলে আমার সেই প্রাচীন স্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠে। এই সেদিন উহারা জন্মিল দেখিলাম। অল্প কিছুদিন আনন্দ উপভোগ করিয়াই যে উহারা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইবে, পূর্ব্বে এ কথা জানিলে কি উহাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিতাম? তবে আমার বড়ই সৌভাগ্য যে, উহাদের কঙ্কাল প্রস্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়া মাঠের নীচে রহিয়া গিয়াছে। নতুবা তোমাদের বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কে আমার কথা হয় ত আদৌ স্থান পাইত না। এইরূপ প্রমাণ ভিন্ন, আফ্রিকার সহিত যে ভারতের এককালে যোগ ছিল, এ কথা তোমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে পারিতাম কি? আরও কিছুকাল পরে তোমাদের বংশাবলীকে হয় ত ব্রহ্মের বর্ত্তমান শ্বেতহস্তীর কথা বিশ্বাসই করাইতে পারিব না। হাড়ের উপর ত আর গায়ের রংএর ছাপ থাকে না। সবাই চলিয়া যাইবে, কেবল আমি—এই ভুষণ্ডী কাক—আজিও বর্ত্তমান আছি, এবং আরও কতকাল থাকিব, কে জানে? তবে রাজপুতানা মরুপ্রান্তরে মিশিতে বোধ হয় আর অধিক দিন বাকী নাই। ভগবান আমার আশা কবে পূর্ণ করিবেন কি জানি। আজ এই পর্য্যন্ত।

(11) Recently among older alluvium of the higher part of the Godavari valley in the Nasik district of Bombay, remains of extinct vertebrates have been found, including a skull of Elephas namadicus, Fale and Cant of exceptional size. Imperial Gazetteer of India, New edition, page 100.

বিধিলিপি

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

দশম পরিচ্ছেদ

সরল পথে দ্রুতধাবনশীল বস্তুকে সহসা সম্মুখ হইতে বাধা দিয়া ধাক্কা দিলে, সে যেমন যতখানি বেগে সম্মুখে চলিতেছিল, ততখানি বেগেই আবার তাহার বিপরীত দিকে ফিরিয়া চলে, কামাখ্যানাথও তেমনি কাত্যায়নীদের চিন্তা হইতে সম্প্রতি তেমনি জোরের সহিতেই বিপরীত দিকে গতি ফিরাইয়াছেন। তিনি এতদিন অত্যন্ত দাঢ্যতার সহিতই অদৃষ্ট-নামক বস্তুটির সঙ্গে যুদ্ধ দিবার জন্য পুরুষকারের বর্ম্ম-চর্ম্ম পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই সুপ্ত ব্যাঘ্রের সদ্যোজাগ্রত একটা প্রচণ্ড থাবড়া খাইয়া সহসা একেবারে পশ্চাদ্‌পদ হইয়া পড়িয়াছেন। কাত্যায়নীর জন্য যেখানে-যেখানে সুপাত্রের সন্ধান লইতেছিলেন, হঠাৎ সে সমস্ত চেষ্টা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। যে ক'টি পাত্রের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের আর প্রয়োজন নাই বলিয়া বিদায় করিয়াছেন। জমীদার মহাশয়ের নিকট তাঁহার প্রতিপত্তি এবার সুদৃঢ় হইবে বলিয়া অনেক জ্যোতিষ ব্যবসায়ী আশান্বিত হইয়াছিলেন, এবং কেহ-কেহ পাঁজি-পুঁথি বাঁধিয়া জমিদারের শুভ আমন্ত্রণ-পত্রের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন। সহসা তাঁহাদের সে আশা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল। জমিদার সংবাদ পাঠাইলেন, তাঁহাদের গণনা এবং জ্যোতিষশাস্ত্র-জ্ঞান অমোঘ,: তাহাতে কামাখ্যানাথের সন্দেহ মাত্র নাই; তবে এক্ষেত্রে তাঁহাদের আর কষ্ট পাইতে হইবে না, কেন না যে সমস্যার মীমাংসার

জন্য তিনি তাঁহাদের ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সে বিষয় প্রাঞ্জল হইয়া গিয়াছে। অগত্যা জ্যোতিষার্ণব এবং জ্যোতিষশাস্ত্রদিগ্‌গজ মহাশয়েরা এক-এক টিপ নস্য লইয়াই ক্ষান্ত হইলেন।

সম্মুখে শারদীয় মহোৎসব। জমিদারবাড়ীতে অত্যন্ত ধূমের সহিতই শারদীয়া পূজা হইয়া থাকে। ষষ্ঠীর দুই দিন পূর্ব্বে নিরঞ্জন গ্রামস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ সারিয়া পিতার নিকটে গিয়া দেখিল, তিনি নিবিষ্ট মনে কিসের একটা হিসাব দেখিতেছেন। পুত্রকে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াই পিতা মুখ তুলিয়া বলিলেন, "নির ?" "বাবা !" "কোন কথা আছে ?" "হ্যাঁ, মহেন্দ্র বাবু বাড়ী এলেন না কেন ?" "মহেন্দ্র ? সে কি বাড়ী আসেনি ? তার খবর তো আমি এর মধ্যে পাইনি—অর্থাৎ নিতে পারিনি ; কোথায় আছে সে,- দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করি।" "আমি জানি ! ক'মাস থেকে শোদপুরে আছেন। ৺জ্যোতিরত্ন মহাশয়ের ব্রাহ্মণী আজ ভয়ানক কান্নার সঙ্গে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা কল্লেন।" কামাখ্যানাথ অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে বলিলেন, "আমি এখনি খোঁজ নিচ্ছি।"

"তিনি আরও বল্লেন—'তোমাদেরও আর এখন দেখ্‌তে পাই না, রমাও অনেক দিন থেকে আর আসে না। জগতে তোমরাই মাত্র অনাথাদের সহায় ছিলে'"—নিরঞ্জন থামিয়া গেল। পুত্রের কারুণাপূর্ণ মুখচ্ছবি দেখিয়া অভিজ্ঞ পিতা অনুতপ্ত হইয়া উঠিলেন। মনে পড়িল, সেই ঝুলনের রাত্রির পর হইতে সত্যই তিনি তাহাদের আর কোন সংবাদ রাখেন নাই। তাহাদের নামেই তাঁহার কেমন একটা আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। বান্ধবহীনা অসহায়াদের উপর দিয়া ভাগ্য-দেবতার রথ স্বচ্ছন্দে চলিয়াছে,—নিঃশব্দেই তাহারা সে রথের চক্রতলে পিষ্ট হইতেছে দেখিয়া, তিনি তাহাতে বাধা দিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু তার পরে সেই রথ-চক্র-নেমীর সহসা অচিন্ত্যরূপে বাঁকিয়া দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখিয়া, সভয়ে তিনি দূরে পলাইয়া আসিয়াছেন। পুরুষকারের পথ ত্যাগ করিয়া কাপুরুষত্বই এস্থলে তাঁর আচরণীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সেই বিমূঢ় পরিবারকে সে দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করিতে গিয়া, নিজে যে উপহাসতভাবে সেই রথের চাকার তলে গুঁড়া হইয়া যান, ইহা তাঁহার একেবারেই ইচ্ছা হয় নাই। কিন্তু কালই সর্ব্বভয়নিবারক, সর্ব্বশান্তি-সান্ত্বনা-দায়ক। মাঝের এই বহমান সময়টিতে তাহাদের নামমাত্র মনে বা মুখে না আনায়, তাঁহার মনের সে সদ্যোজাগ্রত বিপুল আশঙ্কাটা এখন যেন লঘু হইয়া গিয়াছে। তাই পুত্রের মুখে এত দিন পরে আবার তাহাদের নাম শুনিয়া, পুত্রের পরদুঃখার্দ্র, উদ্বেলিত কণ্ঠস্বরকে অনুভব করিয়া জ্যোতিরত্নের পরিবারের উপরে কামাখ্যানাথের প্রনষ্ট সহানুভূতি আবার জাগরিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে। মহেন্দ্রকে শীঘ্র আস্‌তে বলে পাঠাচ্ছি।" তার পরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, "হয় ত তাঁদের অর্থকষ্টও হয়েছে। কিন্তু ওঁদের সম্পত্তির তো বেশ ভালরকম ব্যবস্থা করাই আছে—কষ্ট হবার তো কথা নয়।"

"আমিও একবার তা ভেবেছিলাম ; কিন্তু তাঁর কথাতেই তখনি তা ভেঙে গেল। তিনি নিজে থেকেই বল্লেন 'আমাদের জন্য অন্য ভার কারুকে দিতে তো কর্ত্তা রাজী হননি। যা অল্প তিনি রেখে গেছেন আমাদের তিনজনের পক্ষে তাইই যথেষ্ট। তবু মহেন্দ্র এই রকমে আমাকে কাঁদাচ্ছে। আর তোমরা—তোমাদের বাবাও তাঁকে বাপের মত ভক্তি-শ্রদ্ধা কর্‌তেন ; তিনিও তেমনি দেখ্‌তেন। তাই মাঝে-মাঝে তোমাদের মুখ দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়।' "

দেওয়ান আসিলে কামাখ্যানাথ তাহাকে মহেন্দ্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "মহেন্দ্র এখন শোদপুরেই থাকার ইচ্ছা জানিয়েছে।" কামাখ্যানাথ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কেন ?" "সে যেখানে কায দেখে, অব্যবস্থা দেখে, বা প্রজাদের ওপর কোন অকর্ত্তব্য হচ্ছে বোঝে, সেইখানেই এইরকম ভাবে দু'-একমাস থেকে ক্রমশঃ তার সুবন্দোবস্ত করে। তাই আমি তাকে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করি না। আর তার কাযও তো এই রকম স্বাধীন ভাবেই চল্‌ছে।" "তা হোক্। তাকে জানাও যে, তার মার আদেশ—শীঘ্র যেন সে বাড়ী আসে।" "যে আজ্ঞে।" "আর এই নাও ; তোমার হিসাব দেখা শেষ হয়েছে।"

জমিদার উঠিয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন। বাটীর মধ্যে গিয়া ডাকিলেন "রমু।" খানিকক্ষণ পরে রমা আসিয়া পিতার নিকটে দাঁড়াইল। "তুমি জ্যোতিরত্ন মহাশয়ের বাড়ীর কোন খবর জান ?" "খবর ? কেন ?

তাদের কি কিছু হয়েছে?” রমা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। “না, কিছু হয়নি। তুমি কি এখন আর তাঁদের কাছে যাও না?” রমা নিঃশব্দে শুধু মুখ নত করিল; এবং তাহার উদ্বিগ্ন মুখশ্রী দেখিতে-দেখিতে পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল। “কোনো খবরও নিতে পারনি?” রমা ক্ষীণস্বরে বলিল “না।” “কেন রমু?” রমা আবার নীরবে রহিল। কামাখ্যানাথ একটু বিস্মিত ভাবে কন্যার পানে চাহিয়া থাকিয়া, সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন, “একি রমু, তুই এত রোগা হয়ে গেছিস্ কেন? কিছু কি অসুখ করেছে?” উত্তর না পাইয়া, এবং কন্যার মুখ উত্তরোত্তর বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, পিতা কন্যার নিকটে গিয়া তাহার মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন, “রমু!” “বাবা!” “কি অসুখ হয়েছে মা?” “অসুখ তো হয়নি।” “তবে কি হয়েছে? কেন এমন হয়েছিস্?” কন্যাকে এই প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকেও আত্মগতভাবে প্রশ্ন করিতেছিলেন, “এ কি! আমি কিসে এত দিন এত অন্যমনা ছিলাম যে, রমু এত রোগা হয়ে যাচ্ছে —এ আমার চোখে পড়েনি!” তাঁহার ক্রমে মনে পড়িল, কন্যা কতদিন পার্শ্বে বসিয়া মাঝে-মাঝে একদৃষ্টে পিতার মুখ পানে চাহিয়া থাকিত; কি যেন বলি বলিও করিত। কিন্তু তিনি এতই অন্যমনস্ক ছিলেন যে, দুঃখিনী কন্যাকে একবারও সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন নাই। তাই আজ বুঝি অভিমানে রমা আর সে কথা তাহাকে বলিতে পারিতেছে না! নিজের কাছে নিজে লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া, কামাখ্যানাথ রমাকে আর বেশী প্রশ্ন করিতেও পারিলেন না; কেবল সন্তপ্ত হৃদয়ে কন্যার মস্তকে নিঃশব্দে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

পিতার এইরূপ স্নেহাদরে কিছুক্ষণ পরে সহসা রমা কাঁদিয়া ফেলিল। এইবার কামাখ্যানাথ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—“রমু কি হয়েছে আমায় বল? কেন কাঁদ্‌ছিস! কি করেছি আমি—” বলিতে-বলিতে কামাখ্যানাথের স্বর ভাঙ্গিয়া আসিল। রমা দুই হাতে পিতার হস্ত সাপটিয়া ধরিয়া আরও জোরে কাঁদিয়া উঠায়, আর বেশী বলিতেও পারিলেন না।

একটু পরে রমা চোখ মুছিয়া স্থির হইলে, তখন কামাখ্যানাথ ম্লান মুখে কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন, “এইবার বল্‌বি রমু?” রমা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, “বল্‌তে পার্‌ছি না যে বাবা।” “কেন বল্‌তে পারছ না মা! আমাকে না বলে' তো কিছুই তোমার চলে না।” “আজ বল্‌তে পার্‌ছি না,— ভয় করছে — আর —”

“আমাকে তোর ভয় কর্‌ছে আজ রমু?” “ভয় না বাবা — বল্‌তে পার্‌ছি না বলে কষ্ট হচ্চে।” “কিসের কষ্ট? আমায় লুকস্ না।” “আমি আর ওদের বাড়ী—কাত্যায়নী-দের বাড়ী যে যেতে পারি না।” “কেন যেতে পার না মা? আমি তো বারণ করিনি।” “না, তা করেন নি। আমারই কেমন কষ্ট হয়, আর লজ্জা করে বাবা।” “কিসের লজ্জা তোমার? কার কাছে?” “কাত্যায়নীর কাছে বাবা! তার কাছে মুখ দেখাতে আমার কষ্ট হয়।”

কামাখ্যানাথ সহসা একটু চমকিত হইয়া উঠিলেন—এ কি! রমা এ কথা বলে কেন? কাত্যায়নীর নাম এর মধ্যে আনে কেন! তাহার কাছে মুখ দেখাইতে রমার লজ্জা - এ কথার অর্থ কি! তবে কি সেও সমস্ত কথা জানিয়াছে? ছিঃ! কে এমন নির্লজ্জ পাষাণ, যে এই মাতৃহীনা বালিকাকে এত কথা শুনাইয়া কষ্ট দিয়াছে! তাই - তাই কি রমার এই চাঞ্চল্য—এই মনঃকষ্ট? পিতার কাছেও এই ভীত ভাব? হায়, বালিকা বুঝি ভাবিয়াছে—পিতা না জানি এই বয়সে কি করিবেন! ভগবানের এ কি বিড়ম্বনা! কামাখ্যানাথ যখন এইরূপে চিন্তা সাগরে ডুব দিতেছেন, তখন রমা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া যাইতেছিল, “আজ এক মাসের ওপর তাঁদের কাছে যাইনি —ডাক্‌তে পাঠাই না বলে তারাও ঠাকুরবাড়ীতেও আসেন না! যেতে এত ইচ্ছা করে—তবু পারি না। কি মনে করেন ওঁরা জানি না,—তাই বড় লজ্জা হয়।” কামাখ্যানাথ ক্রমে রমার কথায় বুঝিলেন, রমা যাহা জানিয়াছে বলিয়া তিনি সন্দেহ করিতেছেন, তাহা নয়। রমা সে ভয়, বা পিতাকে সে সন্দেহ করে নাই। তাহার এ কথাগুলি যেন অন্য জিনিস। তখন আশ্বস্ত ভাবে তিনি বলিলেন, “রমু, বুঝেছি বল্, তাদের কাছে তোর এ লজ্জা কেন?” “তারা আমা-দের এত আপনার, তবু কেন পরের মতন থাক্‌বেন বাবা?” কামাখ্যানাথের এইবার মনে হইল, তাঁহার অমৃতার আদরে পরদুঃখকাতরা মেয়ের এ একটা আবদারেরই অভিনয়। ‘কাত্যায়নীর বাপ নেই’ এ কথা রমার একেবারে জপমালা যে! তখন স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন,

"তোকে তো কখনো কারুকে পর ভাব্‌তে আমি শেখাইনি রমু। এ গ্রামের সকলেই যে তোর আপনার। তবে তারাই বা কেন তোর পর হবে! এ পৃথিবীতে কেউ তো কারু পর নয়। প্রত্যেকেরই যখন সুখ-দুঃখ, শোক-অভাব প্রত্যেকেরই মতই, তখন কে কার পর! যত দূরেই থাক্‌, জীব কখনো জীবের পর হতে পারে না। একটা বড় প্রাণই সমস্ত জগৎ ব্যেপে এমন টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছড়িয়ে আছে। সবই যখন এক জিনিস, তখন পর কোন্‌টা? দূরে থাক্‌লেও সে পর হয় না। তার অস্তিত্ব না জান্‌তে পারলেও সে পর নয়।" কামাখ্যানাথের মন কন্যার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে নিজ চিন্তার অতল গহ্বর হইতে ক্রমে ক্রমে মুক্ত আকাশে উঠিয়া পড়িতেছিল। যে আশঙ্কা তাঁহার মনে আসিয়াছিল, তাহাও ক্রমে মিলাইয়া গিয়াছিল। রমাও পিতার এ কথায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "তবে কারুকে-কারুকে বেশী আপনার বলে কেন বোধ হয় বাবা?" "যাদের সঙ্গে চিরদিন আছি,—যাদের জানি, চিনি,—যারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের মনে স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি বা মায়ার উদ্রেক করায়, তাদেরই বেশী আপনার বলে বোধ হয় রমা।"

"ওঁদেরও আমার সবচেয়ে বেশী আপনার বলে মনে হয়।" "তার কারণ ওঁদের কাছে, ঐ জিনিসগুলোর মধ্যে কোন-কোনটা বেশী প্রত্যক্ষ কর; তাই তুমি তোমার এত আপনার লোকের মধ্যেও ওঁদের বেশী ভালবাস।" পিতার পানে চাহিয়া-চাহিয়া সরল শিশুর মত সহসা রমা বলিয়া উঠিল, "ওদের কাছে সর্ব্বদাই থাক্‌তে আমার ইচ্ছে করে বাবা।" কামাখ্যানাথ একটু থামিয়া বলিলেন, "সে তো সম্ভব নয় রমু। মনের ইচ্ছের কাছে জগতের ব্যবহারিক নিয়মকে তুচ্ছ করা উচিত নয় তো। তুমিও ওঁদের কাছে তেমন ভাবে থাক্‌তে পার না; আর, ওঁরাও নিজের ঘর ছেড়ে তোমার কাছে সর্ব্বদা থাক্‌তে পারেন না।" "কেন পার্‌বেন না? আপনি বল্‌লেই পার্‌বেন—নিশ্চয় পারবেন।" "এমন অন্যায় জোর তোমার বাবাকে কি ক'রে করতে বল্‌ছ রমু! ছিঃ মা,—মনের ইচ্ছার অত বশীভূত হতে নেই। কাছে না পেলে কি তাকে ভালবাসা যায় না! ভগবানকে লোকে যে এত ভক্তি করে, পূজো করে, ভালবাসে,—তাঁকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লোকে কাছে পায় কি?" "কেন বাবা, আপনিই তো বলেন, তাঁকে কাছে এনে পূজো কর্‌বার জন্যই বিগ্রহ-মূর্ত্তির সৃষ্টি। আরও--" বলিতে গিয়া রমা যেন লজ্জার সহিত থামিল। কন্যার কথার উত্তরে কামাখ্যানাথ আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এইবার আমাকে হারিয়েছিস্‌ রমু! ঠিকই বলেছিস্‌। কাছে না আন্‌লে ভক্তি, শ্রদ্ধা, পূজা বা ভালবাসা কিছুই করা যায় না। কিন্তু মা, সেটা যে কেবল বাইরের কাছে আনা তা নয়, অন্তরেরই কাছে আন্‌তে হবে। সেবা-পূজা-ভালবাসা দিয়ে অন্তরেই তাঁকে প্রত্যক্ষ কর্‌তে মানুষের বিগ্রহ-আরাধনা। সেইটেই মুখ্য, আর সব গৌণ—বুঝ্‌লে রমু?" উচ্চ তত্ত্বের আলোচনায় আনন্দোজ্জ্বল মুখে পিতা কন্যাকে বলিলেন, "তোর এখন কি চাই তাই বল,—কি কর্‌তে হবে এখন আমায়? তাদের কাছে যখন ইচ্ছে যাবি—এই ত?" রমাও আর কিছু বলিতে পারিল না—বলিতে ইচ্ছাও করিতেছিল না। কেবল, তখন তাহার পিতার মুখে যে প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িয়াছে, তাহারই সম্বন্ধে আরও কিছু শুনিতে ইচ্ছা হইতেছিল। সে যে বাপের এই কথাগুলির সঙ্গেই নিজের সদ্যস্ফুট ফুলের মত জীবনের যত কিছু মধুগন্ধ বা সৌন্দর্য্যকে দেব-চরণেই উৎসর্গ করিয়া, নির্ম্মাল্য গ্রহণ স্বরূপ তাহা আবার জগতের শোক-দুঃখের সহিত মিশাইয়া দিতেছে! পিতার এই বাণীতেই তাহার গোবিন্দ বিগ্রহ যে তাহার নিকটে চৈতন্যময় হইয়া উঠেন! আর রমা একা সে আনন্দ ভোগ করিতে না পারিয়া, তার একান্ত আপনার জগতে তাহা ছড়াইয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ে!

কিন্তু তখনি নিরঞ্জন আসিয়া পিতা-পুত্রীর সে প্রসঙ্গে বাধা দিল—"কি চাই আবার এখন রমুর? কি কর্‌তে বল্‌ছে আপনাকে বাবা?" কামাখ্যানাথ হাসিয়া বলিলেন, "তা কি এখনো বার্‌ করতে পেরেছি! সেই থেকে কান্না আর দুঃখের স্রোত চল্‌ছে—তবু আসল কথা এখনো ভাঙ্‌তে পার্‌লাম না।" সলজ্জ বালিকার প্রতি সস্নেহ নেত্রে চাহিয়া নিরঞ্জন বলিল, "সত্যি না কি! তা আপনি যে তা ভাঙ্‌তে পারবেন না, সে তো জানা কথাই। আপনার সঙ্গে এই রকম দুষ্টুমি করে, আপনাকে ভাবিয়ে অস্থির করে, শেষকালে সে "ফুস্‌ মন্তর" কথাটি রমু চিরদিন তো

আমার কাণেই ঢেলে থাকে। আপনাকে আজ তা বল্‌বে কি? না রে?" রমা দ্বিগুণ লজ্জিতা হইয়াও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—"হাঁ, তাই বল্‌ব,—বাবাকে বল্‌ব না।" "বেশ; তবে এখন স্নান করতে যাই আমি, কেমন?" "যান্—দাদা তুমি ব'স।" উৎফুল্ল মুখে নিরঞ্জন একটা জানালায় বসিয়া পড়িল; এবং পিতাও নিশ্চিন্ত মনে এই ভাবিয়া চলিয়া গেলেন যে, নিরঞ্জন তাহার এ আব্‌দারের অসঙ্গতত্বটি তাহাকে বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিবে! আর ইহা ছাড়া অন্য কোন কথা যদি তাহার থাকে,—যেমন আবদার সে চিরদিন লইয়া থাকে, তাহাই যদি হয়,—তাহাও নিরঞ্জনের নিকটে তিনি জানিতে পারিবেন।

স্নান-পূজা সমাপনান্তে কামাখ্যানাথ যখন আহারে বসিলেন, দেখিলেন,—নিরঞ্জন বা রমা কেহই উপস্থিত নাই। বিস্মিত হইয়া একজন দাসীকে তাহাদের খোঁজ লইতে পাঠাইয়া জানিলেন, নিরঞ্জন তখনি কেবল স্নান করিতে গিয়াছে।

"এখনো স্নান করেনি? এতক্ষণ কি কর্‌ছিল? রমা কই?" "তিনিও পূজোর ঘরে গেলেন।" "তারও পূজো হয়নি?" কামাখ্যানাথ অধিকতর বিস্মিত হইয়া পুত্রের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। কোন রকমে স্নান সারিয়া নিরঞ্জন ব্যস্ত ভাবে আসিয়া আসনে বসিতে বসিতে বলিল, "আপনি কেন বস্‌লেন না। ভাত জুড়িয়ে গেল।" পিতা সে কথায় কাণ না দিয়া বলিলেন, "গায়ের জলগুলো ভাল করে মুছে এস।" কোঁচার কাপড়ে জলবিন্দুগুলা মুছিয়া ফেলিতে-ফেলিতে নিরঞ্জন বলিল, "সামান্যই ছিল, আর নেই।"

আহার করিতে-করিতে কামাখ্যানাথ বলিলেন, "তোমাদের এত দেরী হল কেন? সেই থেকেই কি এতক্ষণ তোমরা কথা কচ্ছিলে?" ভাত মুখে দিতে দিতে নিরঞ্জন অস্পষ্ট ভাবে উত্তর দিল "হ্যাঁ।"

"রমার সে আব্‌দারটা কিসের, জান্‌তে পেরেছ?"

"হুঁ!" পুত্র আর কিছু বলে না দেখিয়া, আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন ঠাণ্ডা হয়েছে?" পুত্র ভাত লইয়া কেবলই নাড়াচাড়া করিতেছে, উত্তরও দিতেছে না, ভাল করিয়া খাইতেছেও না দেখিয়া, তিনি এইবার উদ্বিগ্ন মুখে বলিলেন, "কি হয়েছে? আমায় লুকিও না তোমরা!" "এমন কিছু হয়নি,—কিন্তু এখন থাক্, পরে শুন্‌বেন।"

পুত্রের অনিচ্ছুক ভাব বুঝিয়া পিতা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। আহার শেষ হইলে আচমনান্তে শয্যার উপরে বসিলেন—অন্য দিন শয়ন করেন। চাকরে পান তামাক দিয়া গেল। নিরঞ্জনও সেই অবসরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রমা আসিয়া দুই হাত দিয়া একেবারে পিতার পা জড়াইয়া শুইয়া পড়িল। দ্বিগুণ বিস্মিত, ব্যথিত পিতা "ও কি রে রমু, ও কি" বলিয়া আস্তে ব্যস্তে তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিলেন। কন্যা উঠিল না, সজোরে পায়ের মধ্যে মুখ-খানাও লুকাইল। তখন নিরুপায় কামাখ্যানাথ ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিলেন "নিরু, নিরু!" নিরঞ্জন নিকটে আসিল। "রমা কি করে ছাখ্। ওকে তোল্। কেন ও এমন কর্‌ছে?" নিরঞ্জন নত মুখে এক ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

"রমা, বল্, কেন এমন কর্‌ছিস! আর পিতৃহত্যা করিস্‌নে।" "বলুন, আমি যা চাই, তা দেবেন?" "তোদের কি অদেয় আছে? কেন কষ্ট দিস্ পাগ্‌লি?" "না, বলুন, দেবেন? আমার মাথায় হাত দেন্। দাদা সরে এস। দাদাকে ছুঁয়ে বলুন?" বিস্ময়ে কামাখ্যানাথ অবাক্ হইতেছিলেন, অথচ রমার ব্যবহারে স্থির হইতেও পারিতেছিলেন না। কেবল বলিতে লাগিলেন, "আগে বল, কি নিবি? কি চাই তোর?"

"আগে আমার মাথায় হাত দেন্, তবে বল্‌ব—পা ছাড়ব্।" নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া কামাখ্যানাথ বলিলেন, "এ কি ব্যাপার নিরু?"

"এমন কিছু তো নয়। আপনি স্বীকার করতে কেন ভয় পাচ্চেন? আমরা ছেলেমেয়ে হয়ে কি আপনাকে কোন অন্যায় প্রতিজ্ঞা করাব বাবা?"

"তোদের ছুঁয়ে শপথ কি কর্‌ব, যা তোদের একবার দেব বল্‌ব, তা কি আমার সেই শপথের মতই হবে না? বল রমু, কি চাস্? স্বীকার করছি তাই দেব। পা ছেড়ে ওঠ্।" "কাত্যায়নীকে আমার কাছে এনে দেন্।"

কামাখ্যানাথ একটু স্তব্ধ হইয়া পরে বলিলেন, "সেই খেয়াল্ তোর এখনো আছে? তারই জন্যে এত কাণ্ড করছিস? আমি না হয় ৺জ্যোতিরত্ন মহাশয়ের স্ত্রীকে

অনুরোধ করলাম যে, তাঁরা আমার বাড়ীতে এসে থাকুন। কিন্তু এ কথাটা একবার ভাবছিস্‌নে রমু, যে এ অন্যায় জোর করবার—” “অন্যায় জোর কেন হবে? যিনি আমাদের মা হবেন, তিনি আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বেন না তো কোথায় থাক্‌বেন?”

“কি হবে?—কি বল্‌লি রমা?” রমা পিতার পদযুগলের মধ্যে আবার মুখ লুকাইয়া বলিল, “আমাদের মা হবেন। ওকে আমাদের মা করে আমার কাছে আপনার এনে দিতে হবে।” কামাখ্যানাথ আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া, নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া বলিলেন, “এ কি ষড়যন্ত্র করেছ তোমরা?”

“ষড়যন্ত্র কিসের! আমরা আপনার কাছে ধর্ম্মসঙ্গত ভিক্ষাই চাচ্চি।” “তুমিও তা’ হলে এর মধ্যে আছ! কিন্তু রমার এ অসঙ্গত প্রলাপ আমার কাছে না উচ্চারণ করতে দেওয়াই কি তোমার উচিত ছিল না?”

“রমার এ অসঙ্গত প্রলাপ নয় তো বাবা—ধর্ম্মসঙ্গত কথাই সে বলেছে। নইলে আপনারই অন্যায় করা হবে। আমরা আপনার ছেলেমেয়ে হয়ে যদি আপনার এই অবশ্যকর্ত্তব্য কাজে আপনাকে বাধা না করি, তো, আমাদেরও ভয়ানক অন্যায় হবে।”

“কিসের অন্যায়? তোমরা কি পাগল হয়েছ নিরঞ্জন—?” “অন্যায় নয়? তাঁর বাপ তাঁকে আমাদের বাপকে সম্প্রদান করে গেছেন; অথচ তিনি তাঁকে স্ত্রী বলে ঘরে আনবেন না—এ কি শুধু অন্যায়? ভয়ানক পাপ!”

“কে তোমায় এ কথা বল্‌লে? কে বল্লে, তিনি আমায় তাঁর কন্যা সম্প্রদান করে গেছেন! কতকগুলো বালিকায় মিলে তোমার পর্য্যন্ত বুদ্ধিভ্রংশ করেছে দেখ্‌ছি।”

“বুদ্ধিভ্রংশ কেন বল্‌ছেন, আমিও যে ৺জ্যোতিরত্ন মহাশয়ের মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলাম! রমার মুখে আজ এ কথা শুনে আমার বরং জ্ঞানই এল যে, তাঁর কন্যা যা স্থির বলে ধরেছেন, তা বালিকা-বুদ্ধির কথা নয়! বাপের দানেই মেয়ের বিয়ে!”

সে কি সেই রকম দান, নিরঞ্জন! সে কেবল—” “না, আমরা তাই মনে করলেও আসলে তা নয়। তিনি তাঁর মেয়েকে সম্প্রদানই করেছিলেন।” “তোমরা কি বলতে চাও যে, বালক-বুদ্ধিই এত অভ্রান্ত?”

“বালিকা হলেও, এ বিষয়ে তাঁর অভ্রান্ত হবারই কথা—তিনি যে তাঁর বাপের মনোগত ইচ্ছা জান্‌তেন। আর, তাঁর যতখানি বালিকা-বুদ্ধি বলে আপনি ভাবছেন, ততখানি তিনি ন’ন্‌।”

“যতখানি বুদ্ধিই তার হোক, সতের আঠারো বছরের কাছে পঞ্চাশ বছরের বুদ্ধির নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু তারতম্য আছে—তাও কি তোমরা ভুলে যাচ্চ?”

“কেন আপনি পঞ্চাশ বছর বল্‌বেন? পঞ্চাশ বছরের এখনো আপনার অনেক দেরী। আর ঐ বয়সেই ওঁরা যে সন্তানের মা হ’ন্‌। যিনি আমাদের মা, তাঁকে আপনি আমাদের কাছে বালিকা বল্‌তে পাবেন না।”

“বড়ই অন্যায় হচ্চে নিরঞ্জন তোমাদের! ওঠ্‌ রমা—পা ছাড়্‌।”

রমা দ্বিগুণ বলে পা চাপিয়া ধরিয়া আবার মুখ লুকাইল। নিরঞ্জন বলিতে লাগিল, “আপনিই জোর করে এই গুরুতর বিষয়ে অবহেলা করছেন; আমরা আর তা আপনাকে করতে দেব না!”

“এ কি বালকের মত কথা বলছ? হতে পারে ব্রাহ্মণের তাই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আমার তাতে কি? তিনি যদি আমার অজ্ঞাতে, অনিচ্ছায় মনে মনে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করে গিয়ে থাকেন, তাতে আমার কোন ধর্ম্মসঙ্গত দায় হতে পারে না।” “মৃত্যুমুখ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনুপায় দেখে আপনাকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করে গেছেন, অথচ আপনি তাঁকে স্ত্রী বলে ঘরে আন্‌বেন না—এইই কি ধর্ম্মসঙ্গত কাজ? আর সেই ব্রাহ্মণ কন্যা আপনাকে স্বামী বলে জেনেও, চিরদিন কুমারী ভাবে অনাথার মত দিন কাটাবেন,—তাঁকে ঘরে না আন্‌লে প্রত্যবায় হবে না আমাদের? এত বড় পাপ আমরাও করব না, আপনাকেও করতে দেব না।” “আর এই বৃদ্ধ বয়সে এ আমার পক্ষে খুব ধর্ম্মসঙ্গত কাজ হবে, তোমরা এই বল্‌তে চাও?—ধর্ম্মে আমায় এখন বানপ্রস্থ নেবার সময় ঠিক করছে, আর তোমরা ছেলেমেয়ে হয়ে এই ভয়ানক অধর্ম্মের কাজ করাতে জোর করছ? রমার অতি বালক-বুদ্ধি—জগতের কোন জ্ঞানই এখনো তার জন্মায়নি। বালকের বুদ্ধি শুনে বালকে খুব সহজেই একমত হয়ে পড়ে। কিন্তু তুমি নিরঞ্জন—বয়সে তুমি এখনো বালক হলেও, বিদ্যাবুদ্ধিতে কেউ তো তোমায়

বালক বল্‌তে পারে না। তুমিও কি একবার—কি আমার দিক থেকে—কি তোমাদের দিক থেকে—এ ব্যাপারের গুরুত্ব ভেবে নিতে পারছ না? তুমিও কি করে রমার মতে মত দিচ্ছ?" "বাবা, আপনার শিক্ষায় আমরা বড় হয়েছি—আমরা আপনার ছেলেমেয়ে; বয়সে বা বুদ্ধিতে যদি আমরা বালকও হই, তবু আমরা ছোটবেলা থেকেই যে ন্যায়-অন্যায় বুঝ্‌তে শিখেছি। আমাদের জন্য যে আপনি এই অধর্ম্মের কাজ করবেন, তা আমরা কিছুতেই করতে দেব না। এ জোর, এ জেদ্ আমরা সেই জন্যই আরও করতে পারছি। বলুন, আমরা কখনো কি আপনার কাছে এত কথা, এত তর্ক করতে পেরেছি? আজ কেবল—" বলিতে-বলিতে নিরঞ্জনের চক্ষু সজল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। কামাখ্যানাথ আস্তে আস্তে বলিলেন—"কখনো না—কোন দিন না।" "আজ কেবল অধর্ম্ম ভেবেই আপনাকে এত উত্যক্ত করে, এত উপদেশ দেবার মত তর্ক করছি,—" "ওরে, তোদের কথা কি আমার তর্ক বলে মনে হতে পারে? এ যে তোদের আব্‌দার! যখন অতি ছোট ছিলি, তখনকারই মত অসঙ্গত আবদার করছিস্ যে তোরা আজও।" "আচ্ছা তাই মনে করুন! আমাদের সে আব্‌দার যে কখনো ভাঙ্‌তে হয়েছে, এতো আমাদের জ্ঞানের মধ্যে নেই। আজও আমাদের এ আব্‌দার আপনাকে রাখ্‌তে হবে।" "তেমন অজ্ঞান তোমরা এখন তো নও নিরঞ্জন, যে, তোমাদের বৃদ্ধ বাপকে এতখানি পাপ করালে তোমাদেরও পাপ হবে না! 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' এ কথা ত তুমিও জান।" "আপনি কি আর বছর কতক পরে আমাকে ছেড়ে—রমাকে ছেড়ে বনে যেতে পারবেন বাবা? যদিও আপনি পারেন—আমরা কি আপনাকে তা ছেড়ে দিতে পারব? তা যখন পারব না—আমাদের জন্য যখন আপনাকে সংসারে থাক্‌তেই হবে, তখন এ অধর্ম্মটাই বা আপনাকে কেন করতে দেব? শাস্ত্রে যা বলে বলুক, আমরা সংসারী—আমাদের কাছে এটা অধর্ম্ম।"

রমা এতক্ষণে কথা কহিল। বাপের পায়ে মুখ ঘষিয়া বলিল "বলুন,—দেবেন বলুন।" কামাখ্যানাথ দ্বিগুণ অস্থির হইয়া কন্যার মস্তক ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, "ওঠ রমু, ওঠ।" "আগে বলুন তবে উঠ্‌ব।"

"নিরঞ্জন—রমাকে তোল! থাম্ তোরা এইবার, আর না।" "থামছি—কিন্তু এ আপনাকে করতেই হবে বাবা। বলুন, এতে কিসে অধর্ম্ম হবে? আমরা কি কোন রকম স্বার্থের উদ্দেশ্যে এ কাজ কর্‌তে যাচ্ছি? যেমন কাজ আপনি সর্ব্বদাই করে থাকেন, এও তেমনি একটা কাজ মনে করুন না কেন! একজন মহৎ লোকের অন্তিম ইচ্ছা পালন কর্‌বার জন্য, একজন সধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার অন্যায় রকম কুমারীত্ব, আর তাঁর চিরজীবনের অসহায় অবস্থা দূর কর্‌বার জন্যেই তো আমরা এ কাজ কর্‌তে চাই। আপনি বনে গিয়ে কি এত বেশী কাজ করবেন বাবা? এখানে আপনি যা করেন, জগতে তার চেয়ে কোন্ কাজ বড় আছে? দয়ামায়া, পরের উপকার—"

কামাখ্যানাথ মৃদুস্বরে বলিলেন, "আছে, নিরঞ্জন, আছে! দয়া আর পরোপকারের শক্তি ভগবান মানুষের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করেই দিয়েছেন। তাঁর এই প্রকাণ্ড রাজ্যে তিনিই একমাত্র রাজা। তাঁর দয়া ভিন্ন জগতের অভাব মোচন করবার সাধ্য কার! ও বৃত্তিগুলো দিয়ে কেবল তিনি মানুষের আত্মার উৎকর্ষতা বাড়িয়ে দেন মাত্র। ওর ওপরেও মানুষের আরও আছে—আরও কিছু আছে নিরঞ্জন, সেইই মনুষ্যত্বের চরম ও পরম উৎকর্ষতা।"

"হোক—কিন্তু আমাদের কাছে আমাদের এই ধর্ম্মই সবচেয়ে বড়। আর যে উৎকর্ষের কথা আপনি এখন ভাবছেন, তাকে বাধা দেবার জগতে কি আছে? তাও মানুষ এই দয়া ধর্ম্ম বৃত্তির সঙ্গে এই সংসার থেকেই লাভ করে। এদের পাশাপাশি সেও এই জগতে বাস করছে। তাদের মধ্যে কেউ কাউকে তো বাধা দেয় না বাবা, বরং পরস্পর পরস্পরের সহায় বলেই তো বলি। মনে করে দেখুন, এ আপনারই কথা,—আজ একেবারে মরিয়া হয়ে কি না আপনাকেই এ সব কথা আমি উপদেশ দিচ্ছি—"

পুত্রের এ কুণ্ঠাটুকুও পুত্রবৎসল পিতা সহ্য করিতে পারিলেন না—ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ছেলেও যে এক সময়ে বাপ হয়ে দাঁড়ায় নিরু, ছেলের এ অধিকার আছে যে!"

"ও কথা বল্‌বেন না! আমাদের এ আবদার বলেই মনে করুন বাবা। যত বল্‌ছি সবই তাই।"

"নিরঞ্জন, লোক-নিন্দার কথাও কি একবার ভাবছ না?"

"অধর্ম্মের চেয়ে লোক নিন্দা বড় নয়। আর লোকের

কাছে সুযশ—সেও তো একটা স্বার্থ? সে স্বার্থ-বুদ্ধি-টুকু ছেড়েই আমাদের এ কাজ করতে হবে।"

"শোন, কোন উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-কন্যার বিবাহের চেষ্টা কর্‌ছি আমি—"

"আপনি বলেন কি বাবা? তিনি আমাদের মা—এ চেষ্টা কি আমাদের দ্বারা সম্ভব?"

"তোমাদের কিছু কর্‌তে হবে না, আমিই দেখছি। তোমরা ঠাণ্ডা হও।"

"কেন অনর্থক কষ্ট পাবেন আবার! তিনি অন্য কারও ঘরে কেন যাবেন—আর আমরাই বা তা যেতে দেব কেন? মিথ্যা তাঁকে আর উত্যক্ত করবেন না। আমাদের স্বর্গের মার মতনই যে তাঁর ধর্ম্মজ্ঞান আর দৃঢ় স্বভাব, তা রমার কাছে শুনেছি। এই শেষ কথা বাবা, আমরা তাঁকে ঘরে আন্‌বই! ওঠ্‌ রমা, পা ছাড়্‌। বাবার সাধ্য কি—এর অন্যথা কর্‌তে পারেন! তা'হলে ওঁর ওপর আমরা হত্যা হব, দেখবেন্‌।"

রমা এইবার পিতার পদধূলি মাথায় দিয়া সলজ্জ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। কামাখ্যানাথ নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন, রমা ও নিরঞ্জন বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তির ক্ষমতা দেখিল না। রমা কাতর ভাবে ভ্রাতার পানে চাহিল,—পিতার এ অবস্থা দেখিয়া তাহার কষ্ট হইতেছিল। নিরঞ্জন ইঙ্গিতে রমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়া পিতাকে বলিল, "আপনি ঘুমুন। আপনার ছেলেমেয়ে হয়ে আমরা যখন নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি ছাড়তে পারলাম, তখন আপনি কি ধর্ম্মরক্ষার জন্য একটু লোকনিন্দা সহ্য কর্‌তে পার্‌বেন না? নিশ্চয়ই পারবেন। এতে ধর্ম্ম ছাড়া অধর্ম্ম হবে না আমাদের। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে এইবার ঘুমুন।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে কাত্যায়নী তাহাদের ক্ষুদ্র অঙ্গনের এক কোণে তাহার পিতার পরিত্যক্ত স্থানটিতে বসিয়া ছিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া বেশ একটু রাত্রি হইয়াছে। সপ্তমীর অর্দ্ধস্ফুট জ্যোৎস্না ক্রমে সরিয়া যাইতেছে,—চাঁদও পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। জমিদার-বাড়ীর সন্ধ্যারতি অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ গ্রামের পথকে বিচিত্র শব্দে মুখরিত করিতে-করিতে গ্রামবাসীরা প্রতিমা দর্শন করিয়া ফিরিতেছিল; ক্রমে সে শব্দও নীরব হইল। কাত্যায়নীও নীরবে বসিয়া ছিল। তাহার মাথার উপরের কালো আকাশে অগণ্য তারার রাশি যেন শৃঙ্খলাহীন ভাবে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করিয়া ছড়াইয়া রহিয়াছে। কোথাও অসংখ্য, অগণ্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জ সেই বিশাল কৃষ্ণ পটের এক-এক স্থানে যেন উপেক্ষিত ভাবে জমা হইয়া রহিয়াছে। আবার কোন স্থলে ঝক্‌ঝকে-চক্‌চকে বড়-বড় তারা যেন আকাশের গায়ে বৃহৎ মণিখণ্ডের মতই জ্বলিতেছে! পৃথিবীর মত আকাশের রাজ্যেও এ কি বিশৃঙ্খল নিয়ম, এ কি বিষমতা! কাত্যায়নী তাহার পিতার নিকট হইতে যদিও জানিয়াছিল যে, সেই গ্রহ-নক্ষত্রের দল কেহই অনিয়মে চলে না! তাহাদের অনেকেরই উদয়-গতি এবং অস্তের বিষয় তাহার লক্ষ্য করাও ছিল, এবং অনেককেই সে চিনিত, কিন্তু আজ সে সেখানে যেন কিছুমাত্র শৃঙ্খলা দেখিতে পাইতেছিল না। পৃথিবীর মানুষের সঙ্গেই আজ সে নভোরাজ্যের সেই ক্ষুদ্র বৃহৎ জ্যোতিষ্কদের মিলাইতেছিল। উহাদেরই মত তাহারা কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ, কেহ সুখ-সৌভাগ্যের জ্যোতিঃতে ঝলমল করে, কেহ বা অতি নগণ্য অতি ম্রিয়মাণ,—যেন লক্ষ্যের মধ্যেই আসে না। মানুষের জন্ম ও মৃত্যুও উহাদেরই উদয় ও অস্তের মতই। কিন্তু তাহার পরে? উহারা যে আবার ফিরিয়া-ফিরিয়া আসে! উহাদের গতি যে বড় সুস্পষ্ট! আর মানুষের জীবন? কি তার উদ্দেশ্য, কি তার গতি, আর কিই বা তার পরিণাম! সেও কি এই গ্রহ-নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সুসংযত ভাবে কোন এক নির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিতেছে? কোন্‌ দিকে সে যাইতেছে,—কি সে পথ? এই গতিশীল প্রকাণ্ড জগৎকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মানুষ ইহার অনেক কথাই তো জানিতে পারিয়াছে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের জন্ম মৃত্যু, গতি-স্থিতির কথা কি কেহ তেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে! শাস্ত্রের কথা? মানুষের চিন্তার সমুদ্রেও তো একটি দ্বীপ কল্পনা করা মাত্র! উহাতে কি সব সন্দেহের নিরাকরণ হইতে পারে? হয় না,—তাহা হয় না! এ সমুদ্রের উহাও তো কূল নয়, উহাতে মানুষের চিত্ত সম্পূর্ণ আশ্বাস পায় না।

সঙ্গে-সঙ্গে তাহার রমার কথাও মনে হইল। সেই

কিশোর জীবনটিও এই সমুদ্রেই তো ভাসিতেছে; কিন্তু সে এমন কূল পাইল কিসে! অথচ, সে যেমন অনেকগুলি প্রাণের দুঃখ-শোকের ভাগ লইয়াছে, অনেক অনুভূতির অংশ লইয়াছে, কাত্যায়নীর তো তাহা নয়! কেবল সে নিজে, তাহার মাতা ও মহেন্দ্র—এই তিনটি প্রাণীই তো মাত্র তাহারা! আর রমার মনের মধ্যে এমন কত-কত লোকই আছে! কাত্যায়নী এই তিনজনের ভবিষ্যৎ—তিনজনও ঠিক্ নয়—মাতার আর কয়দিন? কেবল কাত্যায়নী নিজে আর মহেন্দ্র,—এই দুইটি প্রাণীর মাত্র জীবনের দৃষ্টান্তে সে এ সমুদ্রে কূল দেখিতেছে না; আর রমাদের দুয়ারে রমার কাছে কত-কত জীবনের উত্তাল সমুদ্র যে উথাল্ পাতাল্ করিতেছে! রমা সর্ব্বদা তাহাদের শত তরঙ্গ বুকে লইয়া, নিজেরও কৈশোর জীবনের এই সহস্র সংঘাতময় ধারাও তাহার সঙ্গে মিশাইয়া, কোন্ কূলের সন্ধান পাইয়া এমন শান্ত, সহিষ্ণু, কারুণ্যভরা মন্দাকিনীর মত বহিয়া চলিয়াছে! রমা বুঝি সত্যই বলিয়াছে—স্নেহ, প্রেম, দয়া, ধর্ম্ম কিম্বা সমাজ যাহারই হউক্ না কেন—একটা কিছুর বন্ধন পরা বিশেষ দরকার! যাহারা তাহা না পারিয়াছে, তাহাদেরই জীবন বুঝি এমনি অশান্তি-আবিল সমুদ্রের মত দিনরাত জগতের তটে আছড়াইয়া পড়িয়া এমনি হাহাকার করে!

নিজের জীবনও তো সে একটা বন্ধনের মধ্যে ফেলিয়াছে! তাহার জীবন-দেবতার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই তো তাহার জীবনকে সে সেই গণ্ডির মধ্যে পুরিয়াছে! তবে কেন তাহার এ অস্বস্তি, এ অশান্তি! কিসের তাহার এত চিন্তা! নিজের জীবন সম্বন্ধে আর তো তাহার ভাবিবার কিছুই নাই।

সত্যই তাহা নাই বটে; কিন্তু আর একটা জীবনের অস্পষ্ট ছায়াই যে অজ্ঞাতে তাহার জীবনের উপর আসিয়া পড়িয়া মাঝে-মাঝে তাহাকে এমন দিশাহারা করিয়া তুলে! মহেন্দ্রকে যদি তাহার মাতা এমন করিয়া চিরদিন উদ্ভ্রান্ত না করিতেন, আজ যদি সে ভাইয়ের মতই তাহাকে একটা নূতন সংসার গড়াইয়া দিত, তাহা হইলে কাত্যায়নীর দিন কি আজ এমনি কেবল মৃত পিতার স্মৃতি এবং তাঁহার রূঢ় আদেশমাত্র সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বহিয়া চলিত? মহেন্দ্রের জন্য কাত্যায়নী তাহার এই অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তো কিছুই ভাবে নাই। কিন্তু এখন আর কেন তাহা হয় না? নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া কিছু চিন্তা করিতে গেলেই, সহসা চমকিত হইয়া সে এখন চাহিয়া দেখে, যে, অন্তরে একটা অকূল সমুদ্রই যেন বহিয়া যাইতেছে। তেমনি উদ্বেল উচ্ছ্বাস, তেমনি বাতাসের শব্দ, তেমনি দিক্‌হারা অশান্তি। কিন্তু কেন?—তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া যখন সে সে-সমুদ্রে ডুব দেয়, তখন সে সেখানে কি দেখিতে পায়?

অন্যমনে সম্মুখে দৃষ্টি ফিরাইতেই কাত্যায়নী দেখিল, সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকে তাহার মুখের উপর অচঞ্চল দৃষ্টি ফেলিয়া মহেন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অন্তরে-বাহিরে চমকিয়া উঠিয়া কাত্যায়নী বলিল "মহেন্দ্র?" "হ্যা—ভয় পেয়েছে কাত্যায়নি?" "ভয় নয়,—কখন এসেছ জানি না কি না, তাই হঠাৎ চম্‌কে উঠেছি। মা তোমার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন। তোমার কাজ মিটল?" "আজকের মত। তোমরা আমার প্রতীক্ষা কর্‌ছিলে? আমার তো না আসাই সম্ভব ছিল।" "জানি,—তবু যদিই এস, এই ভেবে মা তার পাতের প্রসাদ নিয়ে বসে ছিলেন।" "চল, দেবে চল" বলিয়া মহেন্দ্র একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিল। কাত্যায়নী তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "একটু জিরোও, তোমায় বড্ড শ্রান্ত বোধ হচ্চে যেন।" "শ্রান্তি নয় কাত্যায়নি। ভাব্‌ছিলাম, কতদিন—কতদিন মার প্রসাদ খাইনি!" কাত্যায়নী চক্ষু নত করিল। মহেন্দ্রের স্বরে ও কথায় তাহার চোখ সহসা জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। চেষ্টার দ্বারা সেটুকু দমন করিয়া বলিল, "চল, খাবে।" "একটু বসি" বলিয়া মহেন্দ্র কাত্যায়নীর খানিকটা দূরে একটা কাষ্ঠাসনের গায়ে পীঠ রাখিয়া মাটীতেই বসিয়া পড়িল। কাত্যায়নী মৃদুস্বরে বলিল, "মাটীতে কেন বস্‌লে, উঠে বস।" "থাক্, আজ ক'মাস পরে? চার মাস—না কাত্যায়নি?" "হ্যাঁ, তুমি এখন কোথায় থাক?" "শোদপুরে। এতদিন নির্দ্দিষ্ট ভাবে কোথাও থাকিনি—এইবার একটা কায পেয়ে এখানেই থাক্‌ব ভেবেছি।" "কেন, অনেকদিন থেকেই তো তুমি কাযই করে আস্‌ছ!" মহেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, "না কাত্যায়নি, সে সব নিছে! এইবার যথার্থ কায পেয়েছি।" "ভালই। ব'স, মাকে ডাকি।" "সমস্ত দিন উপোসের পর ক্লান্ত হয়ে শুয়েছেন, এখন ডেকো না। কই, তুমি আজ

ঠাকুর দেখ্‌তে জমিদার-বাড়ী যাওনি?" "সকালে গিয়েছিলাম। মার উপোসের জন্যে এ-বেলায় আর যাইনি।" "কই, ওবেলায়ও তোমায় দেখিনি, কেবল মাকেই দেখেছি।" "তিনি পূজো শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন—আমি তার আগেই চলে আসি।" "কেন চলে এস? তার কোন দরকার কি জানা ছিল তোমার?" মহেন্দ্রের এই সহসা-পরিবর্ত্তিত রুক্ষ স্বরে কাত্যায়নী একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "দরকার ছিল বই কি;—বাড়ীতে কায নেই! কিন্তু এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করচ?" "কারণ আছে বই কি—আর এও জানি যে, এ কাজের কথাও তোমার অছিলা মাত্র।" কাত্যায়নী এইবার একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তাতেই বা কি হয়েছে? ঘর ছেড়ে কোথাও গিয়ে আমার বেশীক্ষণ ভাল লাগে না।" "কিন্তু ঘনিষ্ঠতা করতে তো এত দিন কম করনি।" এ ভাবান্তর তোমার এইবারই দেখ্‌ছি।" কাত্যায়নী মহেন্দ্রের এই অকারণ বাক্যব্যয়ে আরও একটু রাগিয়া বলিল, "তুমি কি ভুলে গিয়েছ মহেন্দ্র, যে, কে তাদের সঙ্গে এ ঘনিষ্ঠতার মূল?" "কিন্তু, তাই বলে তিনি এমন ঘনিষ্ঠতা করতেও তো বলে যান্‌নি!" "তুমি কি বল্‌ছ, ভাল করে বুঝিয়ে বল। কিসের ঘনিষ্ঠতা, আর তাই বা কে কর্‌ছে?" "জমীদারের মেয়ে রমা মাকে আজ যা বলেছেন—কিছু শুনেছ তার?" "কই, না! কি বলেছে সে?" কাত্যায়নী সহসা যেন একটু বিচলিত ও অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। চাহিয়া দেখিল, মহেন্দ্র তীক্ষ্ণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছে। কাত্যায়নীর চক্ষু এবার আপনিই নত হইয়া গেল; বলিল, "মা কিছু তো বলেন নি।" "না বলুন—তোমার ভাবে বোধ হচ্চে, তুমি সে কথার কিছু না-কিছু জান।" "স্পষ্ট করে বল, কি কথা। আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্চে না?" "হতে পারে, তুমি জান না! তুমি যে আমাদের কর্ত্রী হবে, প্রভুপত্নী হবে!" কাত্যায়নী ক্ষণকাল নির্ব্বাক ভাবে থাকিয়া তখনি সরোষে বলিল, "তামাসা করতে চাও বুঝি!" "তামাসা! মাকে জিজ্ঞাসা করো, সত্যি কি না।" "এখনি করব" বলিয়া কাত্যায়নী উঠিল। মহেন্দ্র বাধা দিল—"শোন কাত্যায়নি, আমি বুঝেছি। রমা তোমায় এখন বল্‌তে বারে-বারে নিষেধ করলেন, তাও শুন্‌লাম। কিন্তু তাঁরা তোমার অমতেই এই কাজ করতে চান? আশ্চর্য্য।" "কে বল্লে, তাঁরা এ কায করতে চান্? সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য কথা!"

"না কাত্যায়নি, কথা সত্য—আর তাঁর ছেলেমেয়েই এ বিষয়ে উদ্যোগী। কিন্তু আমি এই ভেবে অবাক্ হচ্চি যে, কামাখ্যাবাবু এতবড় একটা লোক হ'য়ে—" "এ কখনই সম্ভব নয় মহেন্দ্র; এ তুমি নিশ্চয় জেনো। এ তাঁর মেয়েরই পাগ্‌লামি মাত্র।" "কাত্যায়নি, রাগ ক'র না—আমি কি সত্যই কেউ নই? মান্‌লাম, তোমার বাবা কামাখ্যাবাবুকেই তোমাদের সমস্ত ভার দিয়ে গেছেন; কিন্তু তাঁর কি আমায় একটা কথাও বলার দরকার নেই?" "কেন মিথ্যা রাগ কর্‌ছ—তিনি হয় ত কিছুই জানেন না! আমি বুঝেছি একান্ত রমারই—" "কি অসম্ভব কথা বল্‌ছ কাত্যায়নি? বাপের ইচ্ছা না বুঝ্‌লে ছেলেমেয়ে কখনো এই কথা বল্‌তে পারে?"

"তারা তা পারে বোধ হয়! এর কারণও আমি বুঝেছি। এই ভয়ই করেছিলাম—" বলিতে-বলিতে কাত্যায়নী সহসা থামিয়া গেল। মহেন্দ্র তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "বল তবে, কি কারণ? কিসের ভয় করেছিলে তুমি? কেন তারা এতদূর সাহস করে! জেনো, এ কথা জিজ্ঞাসা করবার আমার অধিকার আছে। তুমি না মানো, কেউ স্বীকার না করুক, ধর্ম্মতঃ আমিই তোমার অভিভাবক!"—"তা কি তুমি ব'লে বোঝাবে মহেন্দ্র?" "বল তবে, কিসের অধিকারে তারা এমন অসঙ্গত কথা বলে?" "মিছিমিছি কেন অত রাগ করছ? শোন বল্‌ছি! তুমি চলে যাবার পরও উনি—কামাখ্যাবাবু—আমায় বুঝুতে আসেন। তিনি আমার বিয়ের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন—জান ত? তাই তাঁকে আমায় স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হ'ল যে, আমার বাবার আজ্ঞা, আমি চিরকুমারী থাক্‌ব—তাঁর ও সব চেষ্টা মিথ্যা।" "তাই তিনি নিজেই বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন! এই বুঝি বুঝ্‌লেন তিনি?" "তিনি নন্—তাঁর মেয়ে যে সেদিন পেছনে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, তা আমি জান্‌তাম না।" "তাঁর মেয়েই বা তাতে এ রকম বুঝ্‌বে কেন! তুমি সব স্পষ্ট করে বল্‌ছ না।" কাত্যায়নী নীরবে রহিল। ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া মহেন্দ্র বলিল, "সত্যে আজ তোমার এত ভয়?" কাত্যায়নী এইবার মুখ তুলিল; মহেন্দ্রের পানে

স্থির চক্ষে চাহিয়া বলিল, "সত্যে আমার কখনই ভয় নেই, তা তুমি বিশেষই জানো! ভয় নয়,—তবে সব কথা বল্‌তে ইচ্ছা নেই, এও ঠিক্। কেন না, সে কথা তোমার জানবার কোন দরকার নেই।" "তাই কাত্যায়নি, যাঁর জান্‌বার দরকার, তাঁকে অবশ্য সবই জানিয়েছ? সত্যই জমিদার-গৃহিণী হতে সাধ গিয়েছে কি? লুকুচ্ছ কেন,—এ তো ভাল কথা।" কাত্যায়নী বৰ্দ্ধিত রোষে ক্ষণেক মহেন্দ্রের পানে চাহিয়া, তখনি মুখ ফিরাইয়া গৃহ অভিমুখে চলিল। মহেন্দ্র ছুটিয়া গিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল; যুক্ত-করে বলিল, "মাপ কর, তোমায় অন্যায় অপমান করেছি, আমায় ক্ষমা কর। সমস্ত দিন মনের ভাব চেপে, তাদেরই সাম্‌নে তাদেরই চাকরের মত থেকে, মন আমার বিকৃত হয়ে উঠেছিল কাত্যায়নি,—তাই তোমায় এমন শ্লেষ করেছি। কাত্যায়নি,—কাত্যায়নি,—তুমি জান না, বুঝ্‌তে পার্‌বে না—যেই বলুক,—আর তা' সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্,—তবু এ কথায় কত লাগে!" কাত্যায়নী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে বলিল, "কিন্তু, আজ আমার মনে হচ্চে—কথাটা সত্যি হলেই তোমার পক্ষে ভাল হত মহেন্দ্র।" "ভাল হত? তাই কি কাত্যায়নি, আজ আমি পাগলের মত বেড়াচ্চি? তাই কি—না কাত্যায়নি, তুমি কারুরই হয়ো না—যেমনি আছ, তেমনি থাক।"

"জান মহেন্দ্র, শরীরে দুষ্ট ক্ষত হলে, সেখানে অস্ত্রাঘাত কর্‌তে হয়? সেই তার ব্যবস্থা; নইলে ভাল হবার আশা থাকে না। কষ্ট হলেও সে আঘাতের বিশেষ দরকার।" "জানি। কিন্তু কেন এ কথা বল্‌ছ? কি কর্‌বে না জানি আবার! থাক্ কাত্যায়নি, আমার ভয় কর্‌ছে।" "শোন, সেদিন আমি কামাখ্যা বাবুকে কি বলেছিলাম! বলেছিলাম, আমার বিয়ে হয়ে গেছে, আমার বাবা আমায় সম্প্রদান করে গেছেন। আর অন্য বিয়ে হবার উপায় নেই।" "সে কি কাত্যায়নি? কাকে দান করে গেছেন? কোথায় তোমার বিয়ে হল?" "তুমিও তো শুনেছ মহেন্দ্র, আমার ভাগ্য-বিধাতার, আমার জীবন-দেবতার সেই শেষ কথা—সেই তাঁর শেষ আদেশ! কাত্যায়নীকে শেষ মুহূর্ত্তে তিনি কা'কে সমর্পণ করে-ছিলেন?" মহেন্দ্র কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া, সহসা বলিয়া উঠিল, "এইই কি তুমি কামাখ্যাবাবুকে বুঝিয়েছ? ওঃ! তা'হলে তো আর কথাই নেই—" "আমি যাই তাঁকে বুঝিয়ে থাকি, তাতে তাঁর কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, এও তুমি জেনো।" "তাঁর ওপর তোমার এতই বিশ্বাস? আশা করি, এইবার সে বিশ্বাস ভাঙ্‌বে! যদি তুমি তোমার বাপের সে কথাকে এই বলেই বুঝে থাক, আর তাঁকেও তাই বুঝিয়ে থাক, তা'হলে আর বেশী দিন এমন করে থাক্‌তে হবে না কাত্যায়নি! ওঃ তাই—তাই কামাখ্যাবাবুর ছেলেমেয়ে অতখানি বুড়ো বাপেরও বিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়েছে! এ সব তাঁরই কারসাজি তা'হলে!" "মহেন্দ্র, তোমায় বারণ করে দিচ্ছি, এমন ভাবে আর আমার সামনে তাঁর কথা বলো না—আমি কুমারীর মতই থাক্‌ব বটে, কিন্তু আমার যে তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, এটা মনে রেখো।" "তাই বা আর কেন থাক্‌বে? আর তিনিই কেমন তা থাক্‌তে দেন্ দ্যাখ এইবার! কাত্যায়নি,—কাত্যায়নি,—তোমার এ ভুঁইফোড়্ কল্পনায় কতদূর কি দাঁড়াতে পারে, তাও কি একবার ভাব্‌লে না? এ কি কর্‌লে তুমি?"

"কেন তুমি অত ব্যস্ত হচ্চ মহেন্দ্র,—তুমিই দেখো, তিনি যেমন আছেন, তেমনি থাক্‌বেন; আমিও তাই। এ আমার ভুঁইফোড়্ কল্পনা নয়। আমার বাবার ইচ্ছা যে আমার কাছে কতখানি সত্য, তা তো তুমিও বেশ জানো! আর কামাখ্যাবাবুকেও তুমি এখনো চেননি। তাঁর ছেলেমেয়ে যতই বলুক, তিনি কি তাঁর ঐ বয়সে আমার মত এমন মেয়েকে বিয়ে করে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হতে পারেন? কখনই না।" "এর ওপর আর হাসিও না কাত্যায়নি, এই যথেষ্ট! তোমার মত এমন মেয়েটা—কি শুনি? অযোগ্য—না? দ্যাখো, সেই অযোগ্যটির জন্যই এই বয়েসেও তিনি কি করেন!" কাত্যায়নী এইবার বিস্ফারিত চক্ষে মহেন্দ্রের পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তা'হলে বুঝ্‌ব, শিবেরও পদচ্যুতি সম্ভব। কিন্তু সে অসম্ভবও যদি সম্ভব হয়, তবু জেনো, আমার সঙ্কল্প টল্‌বে না।" আমায় অন্ততঃ তুমি ভাল রকমেই জান।" "তবে কিসের জন্য এ কাণ্ড করলে! মনে-প্রাণে তোমায় কুমারী বলে জানারও যে সুখ, সে স্বর্গটুকুও আমার কেড়ে নিলে, নিজের অবস্থারও বদল করলে না—এ কি করলে কাত্যায়নি! এতে তোমার কি লাভ হল? অথচ এতে একজনকে—" "ঠিক্ কাজই করেছি মহেন্দ্র—আমাদের তিনজনেরই জানা-

জানির দরকার হচ্ছিল।" "এইই যদি তোমার মনে ছিল, তা'হলে এর শেষটুকু আর কেন বাকী রাখ্‌চ? কার মুখ চেয়ে? না, না—তোমায় আর কারও মুখ চাইতে হবে না। এমন ভাবে সুমুখে থাকার চেয়ে, যাও তুমি,—মনে যে পথ নিলে, বাইরেও সেই পথে যাও—" "তাই যাওয়াই আমার উচিৎ ছিল মহেন্দ্র। তাতে আমারও ভাল হত, তোমারও ভাল হত। কিন্তু, তাই বলে, তুচ্ছ আমাদের জন্যে তাঁর এতখানি অপমান আমি করাতে পারব না। এতে আমাদের কপালে যাই ঘটুক্।" মহেন্দ্র এইবার স্থির চক্ষে কাত্যায়নীর পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, শেষে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "তাঁর জন্য তোমার এতখানি ভাবনা কাত্যায়নী যে, তার জন্য জগতের আর কিছুই ভাব্‌তে পারছ না?" "না, সেই ভাবনাই আমার সবচেয়ে বড় যে, তাঁর আসন থেকে পাছে তাঁকে আমরা টেনে নামাই।" "এত ভক্তি কর তাঁকে তুমি? এত ভালবাস?"

"তিনি দেবতা,—দেবতার পতন কেউই সহ্য করতে পারে না।" "তা'হলে শুধু পিতৃ আজ্ঞা কেন বল্‌ছ—তুমি তাঁকে ভালও বাস!" গৃহমধ্য হইতে মাতা ডাকিলেন, "কাত্যায়নি, কে কথা কইছে? মহেন্দ্র কি?"

"হ্যাঁ মা! অনেক রাত হয়েছে খাবে চল।" উত্তর না পাইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, মহেন্দ্র অন্তর্হিত হইয়াছে। নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হইয়া কাত্যায়নী দাঁড়াইয়া রহিল, মাতার পুনঃপুনঃ আহ্বানেও উত্তর দিতে পারিল না;

অতি প্রত্যূষে কামাখ্যানাথ প্রাত্যহিক বায়ু সেবনের জন্য পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতেছেন। অমাবস্যার শ্যামাপূজার পর শয়ন করিতে আর বেশী রাত্রি ছিল না। তাই ঘণ্টাখানেক মাত্র বিশ্রাম করিয়া, প্রভাত না হইতেই তিনি বাগানে আসিয়াছেন; ইচ্ছা, আর একটু বেড়াইয়াই একেবারে গঙ্গাস্নানে যাইবেন। শিশিরজড়িত বায়ু তাঁহার অনিদ্রাক্রান্ত শরীরে রোমাঞ্চের সঞ্চার করিতেছিল। সম্মুখে বৃক্ষতলে নীহারসিক্ত শ্রান্ত শেফালিকাপুঞ্জ ধীরে-ধীরে একটি সাদা ও পুরু আসন বিছাইতেছিল। পূর্ব্বগগন শান্ত নদীবক্ষের মত। দীপগুলি একে-একে নিভিয়া আসিতেছে। অন্ধকার আকাশ যেন কাহার পিঙ্গল হাস্যচ্ছটায় ক্রমে-ক্রমে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। পূজাবাটীর অঙ্গনে তখন যাত্রার দলে মহিষাসুর-বধের পালা পুরাদমে চলিতেছিল। বেহালা, তবলা প্রভৃতি বাদ্যের সঙ্গে জুড়ীদের আকাশভেদী কণ্ঠ এইবার বেহাগ সুরে আলাপ ধরিয়াছে। কামাখ্যানাথের মন বোধ হয় তখন নিস্তব্ধ, শান্ত প্রকৃতিকেই কামনা করিতেছিল। তাই বাদ্য ও সঙ্গীতের উচ্চ রোল তাঁহার এই প্রভাতের শুদ্ধ বাসনাকেও মথিত করিতেছে দেখিয়া, তাঁহার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। স্নান করিতে যাইবার জন্য পিছনে ফিরিয়া সহসা দেখিলেন, একটি রমণী,—মুখে অল্প অবগুণ্ঠন,—যেন তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

তিনি বিস্মিত ভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণী ক্রমে তাহার নিকটস্থ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রভাতের আলো তখন ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতেছিল। কামাখ্যানাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রমণীটিকে চিনিতে পারিলেন সে কাত্যায়নী।

কাত্যায়নী যেন অত্যন্ত চেষ্টার সঙ্গেই এতক্ষণ অগ্রসর হইতেছিল,—সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। বুঝিল যে, এইবার সে অত্যন্ত নিকটস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আর তাহার পা কিছুতেই চলিতে চাহিল না।

প্রভাতের শান্ত শোভার পরিবর্ত্তে ঠাকুরবাড়ীর কোলাহলে কামাখ্যানাথের মন পূর্ব্বেই অপ্রসন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে এই বিপরীত ব্যাপারে একেবারে যেন বিরক্ত হইয়া উঠিল। সম্মুখের এই উজ্জ্বলদর্শনা বালিকাটিকে তাঁহার একটি দুষ্ট গ্রহের মতই বোধ হইল। যেন ইহারই দৃষ্টিপাতে তাঁহার এই এত দিনের শান্তিপূর্ণ জীবনে একটা তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। মনে হইল, ইহার পিতা এই জন্যই ইহার বিবাহ দেন নাই। তিনি জানিয়াছিলেন, যে ইহার নিকটে আসিবে, কিম্বা ইহার শুভাকাঙ্ক্ষা করিবে—তাহাকেই ইহার ভাগ্যের সহিত মিলিত হইয়া অশান্তি ভোগ করিতে হইবে। মেয়েটির দুর্লক্ষণ এতই অমোঘ।

ইতোমধ্যে কামাখ্যানাথ অগত্যা তাঁহার কর্ত্তব্যও যেন কতকটা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। পুত্রকন্যার ব্যাপারে ক্রমশঃ বুঝিতেছিলেন যে, বিবাহ ভিন্ন বুঝি আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু তথাপি জীবনের সেই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনকে তখনও তাঁহার মন সম্পূর্ণ ধারণা করিয়া লয় নাই। একটা অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একটা দুরূহ ব্রতের মত কিছু-একটা তাঁহাকে করিতে হইবে—এই পর্য্যন্তই তিনি

ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। সে কথা লইয়া আর নিজের মনকে বেশীক্ষণ তোলাপাড়া করিতে দেন নাই। যাহা যখন উপস্থিত হইবে, তখনি তাহা পূর্ণমাত্রায় ভোগের কাল। তাহার পূর্ব্ব হইতেই সে বিষয়ে নিমগ্ন হইয়া পড়া কামাখ্যানাথের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু আজ এই উষালোক-উদ্ভাসিত মূর্ত্তি যেন সহসা তাহাকে তাঁহার নবাগত জীবনের একটা ছবি দেখাইল। কামাখ্যানাথ সহসা একটু তীব্র স্বরে বলিলেন, "কি চাও?" চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার এতক্ষণের দৃষ্টিপাতে কাত্যায়নী একটি ফুলগাছের ডাল ধরিয়া যেন তাহার সঙ্গে মিশিয়া যাইবার মত হইয়াছে। বুঝিলেন, বালিকা লজ্জিত হইয়াছে। তাহার উপর, তাঁহার তীব্র স্বরে সে যেন একেবারে চমকিয়া উঠিল। কামাখ্যানাথও একটু লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া পড়িলেন। হয় ত সে বাগানে বেড়াইতেই আসিয়াছিল। অপ্রস্তুত হইয়া তখনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "রমাকে খুঁজছ কি? সে বোধ হয় ঠাকুরবাড়ী।" কামাখ্যানাথ পশ্চাৎ ফিরিয়া অন্যদিকে চলিয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইতেই, শুনিলেন—মৃদুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "আপনার কাছেই এসেছিলাম।" "আমার কাছে? কেন?" কামাখ্যানাথ আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কাত্যায়নী আর কিছু বলিতে পারিতেছে না দেখিয়া, একটু পরে নিজেই বলিলেন, "যদি কিছু বল্‌বার থাকে,—নিজে না বল্‌তে পার—রমাকে দিয়ে বলিও।" "রমাকে বলে' কোন ফল হবে না।" "তা'হলে বলে নাও,—আমায় এখনি গঙ্গাস্নানে যেতে হবে।" তবুও কাত্যায়নী কথা কহিতে পারে না দেখিয়া, ঈষৎ মাত্র হাসিয়া কামাখ্যানাথ বলিলেন, "তোমার মত বালিকাদের এই রকম লজ্জাই স্বাভাবিক; কিন্তু তুমি যখন তাদের মত নও, তখন লজ্জার তো কোন প্রয়োজন দেখ্‌ছি না।" কামাখ্যানাথের এমন কথায়ও কাত্যায়নী শীঘ্র মুখ তুলিতে পারিল না। এই স্বভাব-প্রগল্‌ভা বালিকার এই অসঙ্গত সময়ের এ লজ্জায়ও ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কামাখ্যানাথ আবার ফিরিয়া চলিলেন। তখন মুখ তুলিয়া কাত্যায়নী আবার তাঁহাকে ডাকিল, "অনুগ্রহ করে একটু দাঁড়ান, আমার একটা কথা আছে।" "কিন্তু তা' বল্‌ছ কই?—এখানে এখনি কেউ আস্‌তে পারে।" "তাতে আমারি লজ্জা,—কিন্তু আমি যে লজ্জাহীন, তা'তো বরাবরই দেখ্‌ছেন।" "তোমার না থাক্‌, আর কারও সেটা থাকৃতে পারে ত! সে যাক্—তোমার কথাটা কি?" "রমা আমায় বড্ড বেশী স্নেহ করে, আপনিও বোধ হয় তা জানেন?" "জানি।" "সে তারি বশে আপনাকে এক অন্যায় অনুরোধ করেছে—শুন্‌লাম। তার এই ছেলেমানুষিতে আমি খুব কষ্ট পাচ্চি। আপনাকে তাই বলতে এসেছি, তার কথায় আপনিও ভুল বুঝ্‌বেন না।" কামাখ্যানাথ নিস্তব্ধ ভাবে কাত্যায়নীর এই থামিয়া থামিয়া একটি-একটি-করিয়া-উচ্চারিত কথাগুলি শুনিয়া গেলেন। তাহার পরে বলিলেন, "তাকে এই ভুল বোঝাবার জন্য দায়ী কে?" "আমি,—কিন্তু সেদিন যে সে ঘাটে গিয়েছিল, তা আমি জান্‌তাম না।" "রমা কি সে দিনের ঘাটের কথাই শুনেছিল? তোমার মুখে আর কোন দিন সে এ কথা জানেনি?" "তাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।" কাত্যায়নীর কণ্ঠস্বরটা এইবার যেন গাঢ় হইয়া গেল; সে মাথা হেঁট করিল।

তাহার দুঃখিত ভাবটা বুঝিতে পারিয়া, কামাখ্যানাথ ঈষৎ যেন সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "তা' তো আমি জান্‌তাম না, তাই তোমার ওপর হয় ত একটু বেশী অবিচার করেছি।" কাত্যায়নী মাথা না তুলিয়াই বলিল, "তার জন্য নয়; রমাকে বলি না বলি, তার ফল একই দাঁড়াচ্চে। প্রথম যে দিন এ কথা শুনি, ভেবেছিলাম, রমার এমন অসঙ্গত আবদার আপনি কখনই রাখবেন না। কিন্তু আজ শুন্‌লাম—সে কথা অনেকেই বল্‌ছে। কেন এ কথা উঠ্‌ছে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই!" কামাখ্যানাথ এবার কোমল ভাবেই বলিলেন, "তুমিই উঠিয়েছ! কেন তুমি আর কোথাও বিয়ে করতে এত অসম্মত?" "তাতে কি এই প্রমাণ হবে যে আমি—" কাত্যায়নী আবার মুখ নীচু করিল। "তোমার মুখেই তার প্রমাণ হয়ে গেছে, রমা তা' নিজের কাণেই তো শুনেছে।" "আমি বলেছি, আমার বাপের আজ্ঞা—আমি কারুকে বিয়ে করব না।" "তোমার বাবা তোমাকে আমায় সম্প্রদান করে গেছেন, এ কথা তুমিই বুঝিয়ে দিয়েছ।" "আমি কি বলিনি যে, আমি চিরকুমারী থাক্‌ব? আমার বাপের এক পিসি বুড়ো হয়েও কুমারী অবস্থায় মরেন—আমিও তেমনি থাক্‌তে চেয়েছি, এই মাত্র।" "যদি কেউ তোমার মনের ধারণা না জানত, তবে তাই হত; কিন্তু তা' যে প্রকাশ হয়ে গেছে!" কাত্যায়নী ক্ষোভে অধর দংশন করিল। রুদ্ধ স্বরে বলিল, "কারও মনের ধারণা নিয়ে তার

ওপর জোর চলে কি! আপনি কি রমার মত ছেলেমানুষের কথায় কায করবেন?" কামাখ্যানাথ এইবার আর একটু বেশী রূঢ় হাসি হাসিলেন। "রমাকে ছেলেমানুষ বলছ, আর নিজে তার চেয়ে কত বড়, তা' ভেবে দেখেছ কি? তোমার এই প্রবীণ বুদ্ধির কাছেই আমায় নিজের কর্ত্তব্য বুঝে নিতে হচ্চে এখন।" কাত্যায়নী এবার আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। কামাখ্যানাথের এই হাসি দিয়া ঢাকা রুক্ষ ব্যঙ্গে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া, দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়া বসিয়া পড়িল। ঝর্‌ঝর্ করিয়া তাহার দুই চক্ষে অশ্রুর ধারা ছুটিয়া নামিল। হাত দুটি জোড় করিয়া কামাখ্যানাথের পায়ের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, "মাপ করুন, দয়া করুন! সে কথায় যে এতদূর দাঁড়াবে, তা আমি বুঝতে পারিনি।" বিস্মিত কামাখ্যানাথ একটু সরিয়া গিয়া, বিস্ময়পূর্ণ চক্ষে কাত্যায়নীর জলভরা দুই চোখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "কি কর কাত্যায়নি—তোমায় তো আমি এখন আর দোষী করছি না। এ তোমার-আমার দু'জনেরই ভাগ্যের বিধান,—নইলে এমন কাণ্ডই বা হবে কেন! ওঠো, তুমি বাড়ী যাও,—যা ঘটে গেছে,আর ঘটছে, তার জন্য আর অনর্থক কষ্ট বোধ কোরো না। ওঠো, কেউ দেখতে পাবে।" কাত্যায়নী উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোখ মুছিয়া চাহিয়া দেখিল, সেই মেঘাচ্ছন্ন পর্ব্বতের মত গম্ভীর মূর্ত্তির স্থলে প্রভাতের আলোকে কৈলাস ভূধরের রজতকান্তি এখন শুভ্রোজ্জ্বল আভায় উদ্ভাসিত। তাঁহার বিরক্তির সেই পাষাণ-স্তূপকে ঠেলিয়া একটা প্রসন্ন ধারাকে কাত্যায়নী নামাইয়া আনিতে পারিয়াছে দেখিয়া, আনন্দের একটা সূক্ষ্ম রশ্মি অতর্কিতে কাত্যায়নীর মনের উপরে আসিয়া পড়িল। কামাখ্যানাথের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিতেই, কাত্যায়নী চক্ষু নত করিল। কে দেখিবে—এ কথায় তাহারও কোথা হইতে তখন একটু লজ্জা আসিয়া পড়িয়াছে। নীল আকাশে ও শুভ্র মেঘের উপর কোথা হইতে তেমনি একটা রাঙা আলো আসিয়া পড়িয়াছিল।

সে লজ্জিত ভাবটুকু তখনি দমন করিয়া কাত্যায়নী বলিল,—"যা ঘটেছে,তার জন্য আমার এক বিন্দুও কষ্ট নেই; কিন্তু যা ঘট্‌বে শুনছি, সেটি আপনি এখনো ইচ্ছে করলেই বন্ধ করতে পারেন। দয়া করে আপনি সেইটি করুন, এই কথাটি মাত্র আমি আপনাকে বলতে এসেছি।" কামাখ্যানাথ একটু স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিলেন,"আচ্ছা সে কথা পরে হবে; এখন,আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে দাও দেখি। আমার পক্ষে এ ঘটনা যাই হোক্, তুমি যখন মনে এই বিশ্বাস নিয়ে রয়েছ, তখন তোমার এতে এত চঞ্চল হবার কি আছে?" কাত্যায়নী উত্তর দিল না, নিঃশব্দে চোখ্ মুছিতে লাগিল। কামাখ্যানাথ তাহার পানে চাহিয়া-চাহিয়া আবার বলিলেন, "এতে লজ্জা, অপমান, অধর্ম্ম, অকর্ত্তব্য—সব আমার পক্ষেই খাটতে পারে; কিন্তু তোমার দিকে তো তার কিছুই নেই। তবে তুমি কেন এত কাতর হচ্চ?" "কিসের জন্য আপনি এ-সব সহ্য করবেন? যাতে আমারো একেবারে অনিচ্ছা, আর আপনার এই লজ্জা, অপমান, অধর্ম্ম—এ আপনি তবে কেন করবেন?" "আমায় এই কথাটাই আগে বুঝোও যে, যদি তোমার এ বিয়েয় এতই অনিচ্ছা, তবে এ কথা আমাদের বুঝিয়ে দিলে কেন, নিজেই বা এমন ধারণা করে নিলে কেন?" "নিজের ইচ্ছায় কি নিয়েছি? এমন অসঙ্গত সাহস কি আমার হতে পারে? আমার যিনি ভগবান তিনিই যে—তাঁরই যে এ ইচ্ছা! আপনাদেরও এ কথা কি সহজে জানিয়েছি? ভেবে দেখুন, কি জেদ তখন আপনি ধরেছিলেন!" "মনে আছে। কিন্তু যখন তোমার বিধাতা তোমার এই বিধান করলেন বলেই তুমি বুঝেছ, আর তা মাথা পেতেও নিয়েছ, তখন বাকীটুকুতেই বা তোমার অনিচ্ছা কেন? আমারও বিধির বিধানে যখন সে কথা আমার জানা হয়ে গিয়েছে, তখন এ না করলে হয় ত আমারও একটা পাপ আছে।" "এতে আপনার কিছু পাপ হবে না। আমি যা আপনাকে জানিয়েছি, তার উদ্দেশ্য এ নয়।" "বুঝলাম,—তোমার-আমার বয়সের আর চারদিকের অসঙ্গতিতে এ অনিচ্ছাটাও তোমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক; কিন্তু এ ব্যাপারের মূলোচ্ছেদ করতেও তুমি আমায় একটু সাহায্য কর না কেন! আমি বলছি, তোমারও তাতে কিছুমাত্র পাপ হবে না। তোমার বাবা যা করে গিয়েছেন, ও তাঁর ইচ্ছার বিকার মাত্র। মৃত্যুকালের বিকার আর প্রলাপেই তিনি তোমার মনে এই ধারণা ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তোমার অন্য পাত্রে বিয়ে হলে, তোমার বা আমার এতটুকুও অধর্ম্ম হবে না কাত্যায়নি! কিন্তু তুমি এই ধারণা নিয়ে চিরজীবন এই রকমে বসে

থাকলে,—সংসারী আমি—আমার তাতেই অধর্ম্ম হবে। আমি যোগ্য পাত্র খুঁজে—ওকি চলে যেও না—দাঁড়াও।" "কাত্যায়নী অনেকক্ষণ উঠিয়া দাঁড়াইয়াই ছিল; এইবার চলিয়া যাইতে-যাইতে দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনার সঙ্গে আর আমার কোন কথা নেই। আপনারও যা ইচ্ছা তাই করুন, আমারো যা ইচ্ছা তাই করতে পারব।" "শোন, তবে তুমি প্রস্তুত হয়ে থাক, আমাকেই তোমার বিয়ে করতে হবে।" "কিছুতেই নয়!" কাত্যায়নী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আপনি আমায় আপনার লজ্জা আর অপমানের ভয়ে মরতে দেখে, এই সুযোগে আরও একটা অধর্ম্ম করিয়ে নেবার ফন্দী দেখতে পেলেন বুঝি? দুটোর একটাও আমার দ্বারা পারবেন না।" "আমার লজ্জা ও অপমানে তোমায় ভয় করতে আমি তো বলিনি কাত্যায়নি! তোমার এ বিষয়ে অনিচ্ছা দেখেই আমি ও প্রস্তাব করছিলাম।" "কিন্তু সে অনিচ্ছার একটুও কারণ খুজে পেলেন না? কেবল যা খুসী তাই বুঝলেন। একবার ভাবলেন না যে, একটা সামান্য মেয়েমানুষ তার নিজের অবস্থার বদলের জন্য আপনার মত একটা লোককে এই রকম অপমানে ফেলতে পারে? এ লজ্জায় তারও কি লজ্জা নেই?" কামাখ্যানাথ একটু যেন অপ্রস্তুত ও বিনীত ভাবে বলিলেন, "তুমি কেবল লজ্জা আর অপমানের কথাই ভাবছ কাত্যায়নি! কিন্তু আমরাও তোমার মত একটা জীবনের বিফলতার কথাই যে ভাবছি।" "সেইটাই আপনাদের কাছে এত বড় হ'ল, যার কাছে আপনার মান-অপমান, সুযশ-কুযশ সব তুচ্ছ? আশ্চর্য্য কথা যে! একটা মেয়েমানুষের জীবন—কি তার দাম—কি তার দরকার —তার সফলতা-বিফলতাই বা কি! তারই জন্য আপনারা এই বদল করতে বসেছেন? আপনার এ অধর্ম্ম, অকর্ত্তব্য, —এ আপনিই না এখনি বল্লেন! কিসের জন্য আপনি এ অধর্ম্ম করবেন? একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষের জীবনের সফলতার জন্য? ধিক্ সে মেয়েমানুষকে, যে এমনি করে তার জীবনকে সফল করতে চায়! আপনারা এ ভুল করলেও, আমি তা কিছুতেই ঘটতে দেব না।" কামাখ্যানাথ স্তব্ধ, নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাত্যায়নীকে আবার প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া তখন জড়িত স্বরে বলিলেন, "তা'হলে এইই স্থির? আমার এ জন্য কোন অধর্ম্ম হবে না?"

"একটুও না! না হয় মনে করবেন তিনি যে রকম দান করেছিলেন, আপনি সেই রকম গ্রহণও করেছেন।" "কাত্যায়নি! এখনো ভেবে দ্যাখ—যাকে তুমি স্বামী বলে জানবে, সে তোমায় কি মনের মধ্যেও স্ত্রী বলে জানবার—"

"তারও তো কিছু দরকার নেই। ও গ্রহণ কথাটা আপনাকে কথার কথা মাত্র বলেছি। আপনি আমার কথা —আমাদের কথা মনে থেকেই একেবারে মুছে ফেলবেন, তাতেও আমার কিছু দুঃখ নেই।" "আর একটু দাঁড়াও কাত্যায়নি! আমি বুঝে নিই একটু,—এ কি বলছ তুমি! সত্যই কি তোমার কিছুতেই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই? কিছুই চাও না তুমি জগতের কাছে? এ কি সম্ভব?" কাত্যায়নী এইবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। মুখ তুলিয়া চাহিতেই কামাখ্যা-নাথ দেখিলেন, যেন শরৎ প্রতিমায় নবরৌদ্রচ্ছটা পড়িয়া চারিদিকে একটা রশ্মি চ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ধরুদ্ধ রহস্যময় কণ্ঠ "এ আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন্ না?" "না" বলিতে গিয়া কামাখ্যানাথ সহসা থামিয়া গিয়া চক্ষু নামাইলেন। স্বচ্ছ সলিলা নদীর মত কাত্যায়নীর দুই বিশাল নয়নেও সেই নবরৌদ্রপ্রভা পড়িয়া যেন সে নদীর স্বচ্ছ সরল অভ্যন্তর পর্য্যন্ত মানুষকে ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিতে-ছিল। কাত্যায়নী একটু ক্ষুন্ন কণ্ঠে বলিল, "বলুন তবে, কিসে আপনার বিশ্বাস হবে যে, আমি কোন অভিসন্ধি নিয়ে এসব কথা বলিনি। আর এখনো কোন মন্দ উদ্দেশ্যে বলছি না?" "ও কি বলছ তুমি কাত্যায়নি? আমাকে একটা অপূর্ব্ব রহস্যভরা লোকে পৌঁছে দিয়ে, ও আবার কোন্ পথে নিজে চলেছ? আমি যে কেবল বলছি— এ কি সম্ভব! তুমি যা বলছ, তুমি যা করছ,—এ যে কখনো শুনিনি, কখনো কেউ দেখেনি! আবার তাতে অবিশ্বাসেরও তো উপায় নেই। হাঁ, আমি বিশ্বাস করেছি; তাই তো এতবার প্রশ্ন করছি তোমায়! এ কি—আমায় বুঝিয়ে দাও, এমনও কি জগতে সম্ভব?" "এত অসম্ভব কিসে ভাবছেন! বাইরে কোন সম্বন্ধে না থাকার এমন দৃষ্টান্তও জগতে অনেক আছে। বিশেষ, মেয়েমানুষের পক্ষে এ মোটেই অসম্ভব নয়।" "কিন্তু তারা কি তোমার মত এমনি স্বেচ্ছায় এ কাজ করতে পারে? যার সঙ্গে মনে সম্বন্ধ রাখতে হচ্ছে, তার অপযশের ভয়েই এমন ভাবে বাইরে সে সম্বন্ধ ত্যাগ—এ বোধ হয় তুমি ছাড়া আর কেউ পারেনি।"

কাত্যায়নী আর উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে শুধু অবনত হইয়া কামাখ্যানাথকে প্রণাম করিল। তাহার পরে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, কামাখ্যানাথ একটু বেগের সহিতই বলিলেন, "আমায় দুর্নামের আর অধর্ম্মের হাত থেকে বাঁচাতে তুমি নিজের জীবনটাকে এমন অবস্থার মধ্যে ফেললে কাত্যায়নি! এতে তবু কি না আমি মাত্র তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হচ্চি! না, আমিও আর এতটা অধর্ম্ম করব না! তুমি যখন এমন ভাবে থেকেও এই কথাই মনে রাখবে, তখন আমারও এ কথা স্বীকার করাই কি এত বেশী যে -! কিন্তু কি তোমার ভাগ্যলিপি কাত্যায়নি!—" "আমি জানি—আমি ভাগ্যবতী!" "কাত্যায়নি!" কাত্যায়নী মুখ তুলিয়া চাহিল। "এ কথাও কি বিশ্বাস করতে বল?" "হ্যাঁ! আর জানবেন, আমি এই রকমে থাকতে যত সুখ বোধ করব অন্য আর কিছুতে তেমন করতাম না! এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে।" আবার সেই স্বচ্ছ নদীর মত চক্ষুর পানে চাহিয়া কামাখ্যানাথ বলিলেন "করেছি।"

কাত্যায়নী আবার মাথাটা খানিক নত করিয়া, যেন কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ ভাবেই চলিয়া গেল। কাত্যায়নী চলিয়া যাওয়ার পর বহুক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া, সহসা কামাখ্যানাথ ঈষৎ যেন আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"দুর্গে—দুর্গে! এ বয়সে এ আবার কি করলি মা!"

হিমালয়ে

[শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম-এস্‌সি]

(১)

আমরা হিমালয়ের অনেকটা ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখনও আমাদের অনেকটা যাইতে হইবে। হিমালয়ের যে স্থান হিমাচ্ছন্ন, ঐ স্থানে আমরা যাইব। ঐ স্থান সমস্ত বৎসর ধরিয়া হিমাবৃত থাকে—ইহাই হিমালয়ের প্রসিদ্ধ চিরহিমানী। এই চিরহিমানী হিমালয়ের অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। ইহা হইতে এক একটি হিমধারা এক-একটি উপত্যকা-পথে অবতরণ করিতেছে। এরূপ কত হিমধারা আছে, তাহার ঠিকানা নাই। পিণ্ডারীর উপত্যকা পথে এইরূপ একটি হিমধারা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই হিমধারা দেখিতে বাহির হইয়াছি। আমরা এখন ঐ পথের যাত্রী।

দলে আমরা পাঁচজন আছি। প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্‌-এ, এফ্‌-জি-এস মহাশয় দলের নায়ক, সঙ্গী আর চারিজন। এই চারিজনই হেমবাবুর ছাত্র; তবে আমি পুরাতন ছাত্র—তখন বাঙ্গালী জীবনের চরম-সাধনার বস্তু তক্‌মা লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই স্থানে বলা আবশ্যক, ভূতত্ত্ব শিক্ষা কতকটা কলেজ গৃহে ও কতকটা উন্মুক্ত প্রকৃতির ভিতর দেওয়া হইয়া থাকে। সেইজন্য ভূতত্ত্বের ছাত্রবর্গকে মধ্যে-মধ্যে কলেজ-গৃহ ছাড়িয়া হাতুড়ী-স্কন্ধে পাহাড়ে যাইতে হয়। উন্মুক্ত প্রকৃতির অনাবৃত আকাশের নীচে রাশি-রাশি প্রস্তরের ভিতর ঘুরাইয়া শিক্ষক ছাত্রগণকে ভূ-ত্বকের তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া থাকেন। শিক্ষক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ছাত্রবর্গকে পাথর ভাঙ্গিতে হয়। ইহা "পেনাল কোড" নির্দ্দিষ্ট নহে। ইহা ভূতত্ত্ব শিক্ষার বিধিমাত্র। এরূপ না করিলে ভূতত্ত্ব শিক্ষা হয় না। প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতত্ত্বের ছাত্রবর্গ হেমবাবুর তত্ত্বাবধানে পাহাড়ে গিয়া পাথর ভাঙ্গে। যে সকল স্থান নির্দ্ধারিত হয়, পঠদ্দশায় ঐ সকল স্থানে গিয়া ছাত্রকে পাথর ভাঙ্গিতে হয়। সকলের অদৃষ্টে ভারতবর্ষের সকল স্থানে যাওয়া ঘটে না। আমিও ভূতত্ত্ব পাঠের সময়, সেই সময়ের নির্দ্ধারিত স্থানে গিয়া পাথর ভাঙ্গিয়াছি। শুনিলাম, এইবার হেমবাবু তাঁহার এম্‌-এ ক্লাসের ছাত্রত্রয়কে হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী পিণ্ডারীর হিমধারা দেখিতে লইয়া যাইতেছেন। হিমালয়ের ভিতর দিয়া সুদীর্ঘ পথ—এই সুদীর্ঘ পথও প্রস্তরের উপর। স্থির হইয়াছে, হেমবাবুর পরিচালনে ছাত্রগণ পাথর ভাঙ্গিতে-ভাঙ্গিতে হিমধারা অবধি গমন করিবে। এইরূপে ছাত্র-গণ হিমালয়ের ভূতত্ত্ব, চিরহিমানী ও হিমধারার তথ্য অবগত

হইবে। আমি এ প্রলোভন ছাড়িতে পরিলাম না। পাথর-ভাঙ্গা যে অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর হিমালয়ের হিমধারা। এই আকর্ষণে—ভূতত্ত্বের নেশায় উদ্দীপ্ত ছাত্রের স্থির থাকা কঠিন। তাই আমি এই দলে যোগ দিয়াছি।

আমরা এখন হিমালয়ের সুদীর্ঘ পথে। বাম স্কন্ধে পাথর ভাঙ্গা হাতুড়ী। পৃষ্ঠে প্রস্তরখণ্ড-পূর্ণ "হ্যাপসাক্"। দক্ষিণ হস্তে বন্ধুর পার্ব্বতীয় পথের প্রধান সহায় "হিল ষ্টিক।" আমরা অনেকটা পথ আসিয়াছি। হিমালয়ের পাদমূলের রেলওয়ে ষ্টেসন কাঠগুদাম হইতে পর-পর ভীমতাল, রামগড়, পিউরা, আলমোরা, তাকুলা হইয়া বাঘেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এ পথে রেল নাই। সমতলের রেল কাঠগুদামে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এ পথে ডাণ্ডি ও অশ্ব সাহায্যে গমনাগমন করা যায়—আমরা পদব্রজেই চলিয়াছি। আমাদের ভৃত্যগণ আমাদের সঙ্গেই পথ চলিত। আজ তাহারা সঙ্গে নাই। যে দিন আমরা আলমোরা হইতে তাকুলাভিমুখে গমন করিতেছিলাম, ঐ দিন ভৃত্যেরা নিজেদের উপর নিভর করিতে গিয়া, পথ হারাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। আমরা তাহাদের অনুসন্ধানের বন্দোবস্ত করিয়াছি। তাকুলা দীর্ঘকাল অবস্থানের পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক স্থান নহে দেখিয়া, ভৃত্যেরা না আসা পর্য্যন্ত, আমরা সহজসাধ্য খাদ্য-সামগ্রীপূর্ণ, মৎস্যময় নদী তীরবর্ত্তী বাঘেশ্বরে অপেক্ষা করিব—ইহা স্থির হইয়াছে। হেমবাবু বাঘেশ্বরে পৌঁছিয়া ডাক বাংলায় উঠিয়াছেন। আমরা পুণ্যতোয়া সরযূ তীরে তাম্বু ফেলিয়াছি। রাত্রি কোথা দিয়া কাটিয়া গিয়াছে জানি না।

বাঘেশ্বরে অবস্থান

১৪ই জুন। তাম্বুর বাহিরে আসিয়া দেখি, সূর্য্যের লোহিতরশ্মি অনতিদূরের ধূসর পর্ব্বতশ্রেণীর উপর দিয়া উঁকি মারিতেছে। একজন তেজীয়ান পুরুষ যেন পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া বাঘেশ্বরের উপর অবিরাম অগ্নিময় শরজাল নিক্ষেপ করিতেছে। শরাঘাতে উৎপন্ন অগ্নি যেন তরল হইয়া সরযূতে গড়াইয়া পড়িতেছে। সরযূর লাল জল চিক্‌মিক্ করিতে-করিতে আমাদের সম্মুখ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। আমরা সরযূ-তীরে। সরযূর দুই পারেই সহর। সহরটী ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র সহরের ক্ষুদ্র কোলাহল বাঘেশ্বরের ক্ষুদ্র গগনটিকে পূর্ণ করিয়াছে। সরযূর অবিরাম ঝরঝর শব্দ সহরের ঐ কোলাহলের সহিত মিশিয়াছে। নদী শিলাখণ্ডে ছিন্ন স্রোতপূর্ণ হইলেও বেশ বেগবতী। নদী-বক্ষস্থিত বিশাল উপলখণ্ডগুলি দেখিলে মনে হয়, একপাল হস্তিশিশু জলে পড়িয়া আছে—উঠিবার নামটি নাই।

বাঘেশ্বর এ অঞ্চলের একটি বড় তীর্থ। আলমোরার উত্তরে বহু পর্ব্বতশ্রেণী পার হইয়া, সুদূর প্রসারিত পার্ব্বত্য দেশের ভিতর এরূপ বড় তীর্থ আর নাই। বাঘেশ্বরের নিকটে একটি স্থান আছে—ইহার নাম বৈজনাথ। ইহা পবিত্র স্থান হইলেও, বাঘেশ্বরের মত এত বড় তীর্থ নহে। বাঘেশ্বরে প্রতি বৎসর শীতের পূর্ব্বে একটি মেলা হয়। ইহা নন্দাদেবীর মেলা। নন্দাদেবীর পরিচয়—নন্দাদেবী পার্ব্বতীর ভগিনী ও দেবাদিদেব মহাদেবের শ্যালিকা। এ অঞ্চলের পাহাড়ীরা শ্যালিকার উপাসনা করিয়া থাকে—কেন করে তাহা জানি না। ইহাদের দেখিলে বোধ হয় না যে, ইহারা শ্যালিকা ও শ্যালিকা-সম্পর্কীয়াদিগকে আমাদের অপেক্ষা বেশী উচ্চে স্থান দিতে পারিয়াছে। অন্য কোন দেশও যে পারিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। অন্য কোন দেশে শ্যালিকা-সম্পর্কীয়াদিগের জন্য যে চাকরী মহার্ঘ হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ কখনও পাওয়া যায় নাই। যাহাই হউক, পাহাড়ীদিগের উপাস্য দেবীর মেলাতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। উপর হইতে পাহাড়ীরা নামিয়া আসে। ইহারা বরফের দেশ হইতে ছাগল, ভেড়া ও বাঘের ছাল, ভেড়ার লোমে প্রস্তুত শীতবস্ত্র ইত্যাদি আনয়ন করে। এই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে ইহারা নিম্ন হইতে আনীত জিনিসপত্র লইয়া থাকে। কাপড় লবণ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি এইরূপে ইহারা সংগ্রহ করে। এই সময়ে নানাদিক হইতে নানা প্রকার দ্রব্য বাঘেশ্বরে আসিয়া পড়ে। ইহাতে বাঘেশ্বরের বাজার পূর্ণ হয়। গ্রীষ্মকালে বাজারের যে সকল গৃহ শূন্য পড়িয়া থাকে, ঐ সকল গৃহে এই সকল দ্রব্যসম্ভাবের দোকান-পাট বসে। টাকা পয়সা ও দ্রব্যের বিনিময়ে বেচা-কেনা হইয়া থাকে। সে সময় বাঘেশ্বরে ভয়ঙ্কর জনতা হয়। সহরের একটী গৃহও খালি থাকে না। মেলা শেষ হইলে জনতা কমিতে থাকে, কতক দোকানপাট ক্রমে চলিয়া যায়। উপর হইতে যে সকল

পাহাড়ী মেলার সময় আসে, উহারা সমস্ত শীতকাল বাগেশ্বরে থাকে; শীতাপগমে উহারা উপরে চলিয়া যায়। এইজন্য মেলা শেষ হইলেও অনেক দোকানপাট সমস্ত শীতকাল ধরিয়া থাকে।

শীত শেষ হইলে, যেমন পাহাড়ীরা উপরে চলিয়া যায়—এই সকল দোকানপাটও সঙ্গে-সঙ্গে ভাঙ্গিয়া যায়। পুনরায় মেলার সময় এগুলি আসে। হিন্দুতীর্থের এই বড়-বড় মেলাগুলি যে কেবল নানাদেশজাত দ্রব্যের বিনিময়ের স্থান তাহা নহে; ইহাতে সমাজ ও ধর্ম্মনীতির ও নানা ভাবের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। এগুলি হিন্দু-সভ্যতা-বিস্তারের কেন্দ্রস্থল। এ অঞ্চলের পাহাড়ীদিগের ভিতর এখনও খাঁটী হিন্দুভাব আছে। যখন এই সরল ও পবিত্র চিত্ত পাহাড়ীদিগের বিপুল জনতা মেলার সময় এই তীর্থে স্নান করে, সে না কি এক অদ্ভুত ব্যাপার। শঙ্খ ঘণ্টা-ধ্বনিতে ও মন্ত্রোচ্চারণে বাঘেশ্বর মুখরিত হইয়া উঠে। এরূপ পবিত্র চিত্র দর্শনীয় ব্যাপার।

এ অঞ্চলের পাহাড়ীদিগের দেবদেবীর উপর ভক্তি যেরূপ প্রগাঢ়, মনও সেইরূপ সরল এবং কর্ম্মও সেইরূপ নির্ম্মল। ইহাদিগের ভিতর-বাহির সমান। ইহাদের অন্যায় অভাব নাই, তাহার সৃষ্টিও ইহারা করে নাই। ইহারা জামার বোতাম গলা পর্য্যন্ত এখনও দেয়। কাহাকেও মাফলার অভাবে গেঞ্জি ঢাকা বক্ষের উপর ওপ্‌ন-ব্রেষ্ট কোট, শেষ দুইটী বোতাম ভিন্ন ওপ্‌ন করিয়া রাখিতে দেখি নাই। ইহারা অল্পে সন্তুষ্ট। ইহারা লাঠালাঠি জানে না; কেহ কাহারও দ্রব্য অপহরণ করে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঘেশ্বর সহরে পুলিশ পাহারা নাই—এ যুগ-ধর্ম্মের প্রচার এখনও এ দেশে হয় নাই। বাঙ্গালী সাধক ভিন্ন এ ধর্ম্ম প্রচার আর কে করিতে পারে? এখন কেবল প্রচারকের প্রয়োজন।

বড় তীর্থের চারিদিকে দেবদেবী থাকেন। বাঘেশ্বরে তাহার অভাব ছিল না। সরযূর দুই তীরেই দুইটী পর্ব্বত চূড়া আছে। ইহার একটী মহাদেবের ও অপরটী পার্ব্বতীর আসন বলিয়া খ্যাত। হরপার্ব্বতী উপর হইতে অহরহঃ কৃপাকণা বর্ষণ করিতেছেন। তাহাতে বাঘেশ্বরের সমস্ত বিপদ-আপদ কাটিয়া যায়।

সরযূর উজানে রামের মন্দির। নিম্নে গোমতী সরযূ-সঙ্গম। সঙ্গমের ঠিক উপরেই বাঘনাথ। পার্শ্বে হনুমানজীর মন্দির। মন্দিরগুলির কাছেই ধর্ম্মশালা আছে। সঙ্গমে জলে স্নান করিলে সমস্ত পাপরাশি ধৌত হয়, সঙ্গমে মৃতে সৎকারে আত্মার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়—ইহাই পাহাড়ীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস।

তখনও সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব আছে। সূর্য্য পর্ব্বত মালার আড়ালে গিয়াছে; কিন্তু তাহার রশ্মি-জাল পশ্চিম গগনে তখনও ছড়াইয়া রহিয়াছে। দিকচক্রবাল পর্ব্বত মালায় আড়াল পড়িয়াছে। সম্মুখে সরযূ-গোমতী-সঙ্গম ইহা বিপুল ও বিশাল। প্রবল বায়ু তরঙ্গ ধূসর পদার্থ উদ্গীরণ করিয়া স্থলচিত্রকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। আমরা সঙ্গমের ঠিক উপরে একটা শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যাকালে এই পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্য দেখিতেছি। বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে কতক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। মন ভরিয়া উঠিয়াছিল; নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম অদূরে সঙ্গমের উপলখণ্ড-বিকীর্ণ চরের উপর এক স্থান হইতে ধূমরাশি কুণ্ডলীকৃত হইয়া উপরে উঠিতেছিল। উহা চিতার ধূম। আত্মার বন্ধন অনলে খানিকটা ধূম ও খানিকটা ভস্মে পরিণত হইতেছে। ভস্ম সঙ্গমের জলস্পর্শে আত্মার মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিবে—পাহাড়ীদের ইহাই বিশ্বাস। তাই তাহারা সঙ্গমে মৃতের সৎকার করিয়া থাকে।

আমাদের পায়ের নীচেই গোমতী। ইহার জলরাশি গড়াইয়া বেগে চলিয়া যাইতেছে। নদীতে যেমন বেগ, তেমনি তরঙ্গ। বেগেরও বিরাম নাই, তরঙ্গেরও বিরাম নাই। এক দিকে এক ভাবে বেগে তরঙ্গ ছুটিতেছে। নদীর এই অংশে জোয়ার-ভাঁটা খেলে না। নদীর নিম্নদিক বা মোহানার দিক জোয়ার-ভাঁটার লীলাস্থল—নদীর উৎপত্তির দিক হইতে মাধ্যাকর্ষণের টানে জল একভাবে নিম্নের দিকেই তরঙ্গময় স্রোতে অবতরণ করে; এস্থানে জোয়ার-ভাঁটার সম্পর্ক নাই। উৎপত্তি-স্থানের দিকে এত জল সমস্ত নদীতে থাকে না। নদী দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে। একপ্রকার নদী আছে, যাহাতে সমস্ত বৎসর ধরিয়া জল থাকে। বর্ষার সময় জল কিছু বর্দ্ধিত হয় মাত্র। এই সকল নদীর জল বরফমণ্ডিত পর্ব্বত-মালার বরফ গলিয়া উৎপন্ন হয়। বরফ সমস্ত বৎসর ধরিয়া পর্ব্বত-শিখরে জমিয়া থাকে। জলও সমস্ত বৎসর ধরিয়া বরফ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই

জন্য এই সকল স্থান হইতে উৎপন্ন নদীতে সমস্ত বৎসর ধরিয়া জল থাকিতে পারে। ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার নদী আছে—যাহাতে বর্ষার সময় জল থাকে, বৎসরের অন্য সময় জল থাকে না। যদি থাকে, তাহার ধারা অতি ক্ষীণ। এই সকল নদী যে সকল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নীচু—তাহার উপর বরফ পড়েও না, বরফ জমেও না। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু—এই সকল নদীর উৎপত্তি স্থান হিমালয়ের চিরহিমানী ; এগুলিতে জল সমস্ত বৎসর থাকে। গোদাবরী, দামোদর, অজয়—এ সকল নদী বর্ষায় প্রবল হয়। এগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর নদী। এগুলির উৎপত্তি-স্থানে চিরহিমানী নাই। যাহা হউক, সম্প্রতি চিরহিমানীর জল আমাদের সম্মুখ দিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া যাইতেছে। পদপ্রান্তে গোমতী। গোমতীর তরঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ। মনও তরঙ্গের সহিত তরঙ্গায়িত। গোমতীর এই একটানা, বেগময় তরঙ্গ ঠিক মানুষের কর্ম্মময় জীবনের তরঙ্গের মত ; ইহা তাহারই প্রতিমূর্ত্তি। এই বিষয় চিন্তা করিতে-করিতে শিলাখণ্ড হইতে উঠিয়া আমরা বাঘনাথ ও হনুমানজী দর্শন করিতে অগ্রসর হইলাম। মন্দিরগুলি পুরাতন—অনেক স্থান মেরামত হইয়াছে। নীরব মন্দির পাহাড়ীদিগের ভক্তি ও পবিত্রতার যেন নীরব মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। পাহাড়ীদিগের ভক্তি জীবন্ত, মন্দিরও জীবন্ত। আমরা ঠাকুর দর্শন করিয়া মন্দিরের নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে একজন সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলাম। সন্ন্যাসীর সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড। অগ্নিকুণ্ডে রাশি-রাশি কাষ্ঠ জ্বলিতেছে। স্থানটী ঠিক সঙ্গমের উপর হইলেও, ইহা সরযূ নদীর তীরেই অবস্থিত। স্থানটী যেরূপ মনোরম, তাহাতে মন সহজেই ভগবদ্‌ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে বাঘেশ্বরে নন্দাদেবীর মেলা হয়। ঐ মেলার সময় এই স্থানটীতে এই বৃক্ষতলে বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। এই পুণ্য-দিবসে ইহারা পবিত্র সঙ্গমে স্নান করে। যাহা হউক, আমরা ধীরে ধীরে অগ্নিকুণ্ডের নিকটে গিয়া সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। আলাপে হৃদয় ভক্তি-রসে পূর্ণ হইল। মন মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া একটা অদ্ভুত শক্তির সন্ধান পাইল। সেই শক্তির আভায় মন আলোকময় হইল। তখন একবার ভাবিলাম, ধর্ম্মের ঘণ্টানাড়া উকীল পূজারীকুলের ওকালতী কথা। পূজারীর হস্তেই ঘণ্টা নড়ে—প্রাণের ঘণ্টা তাহাতে বাজে কই ? সাধুসঙ্গ সহজে ছাড়া যায় না। আমরা যখন তাম্বুতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। সরযূতীরে আলোকমালায় ভূষিত সহর শোভা পাইতেছে। নীল আকাশে তারা

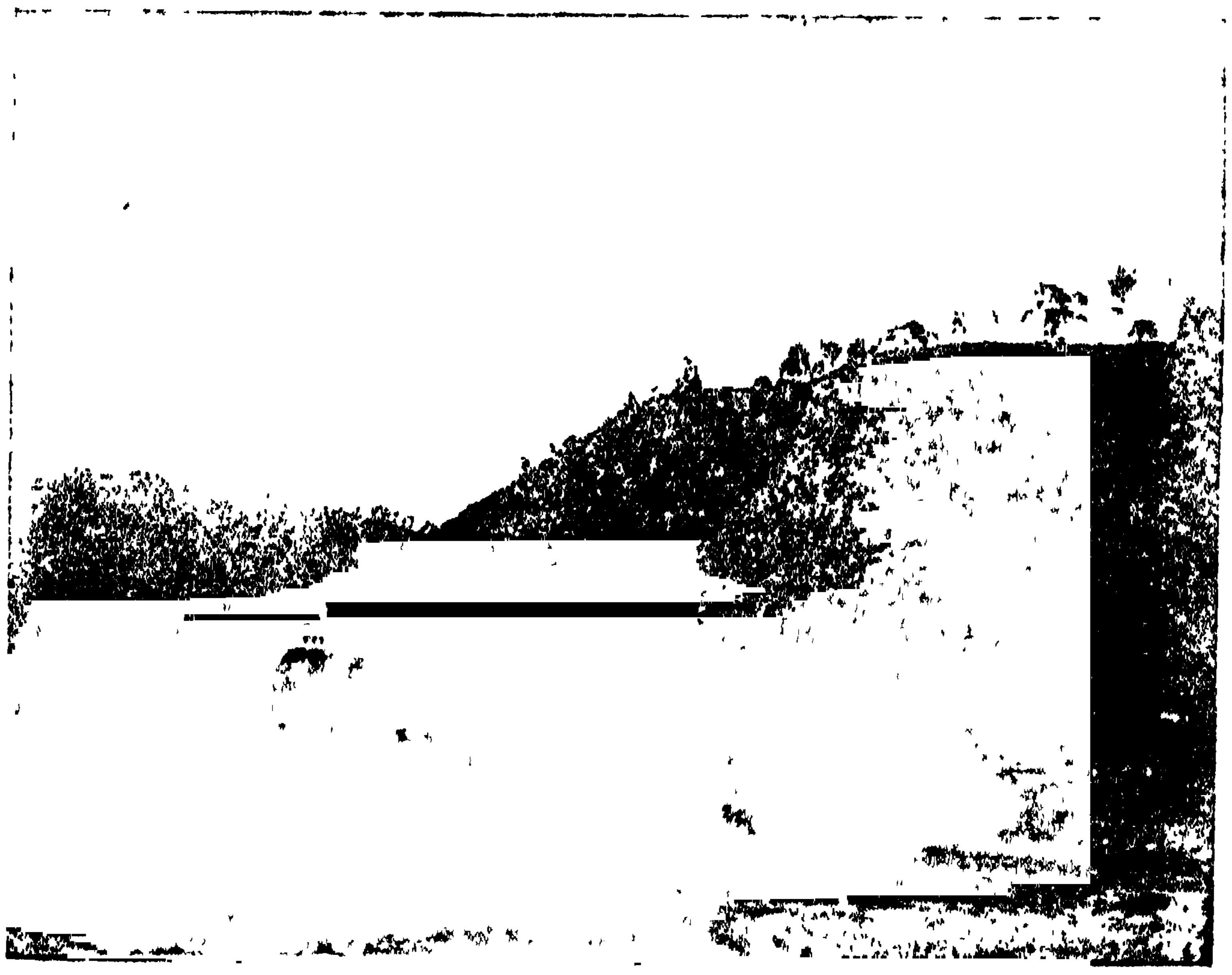

সরযূতীরে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির

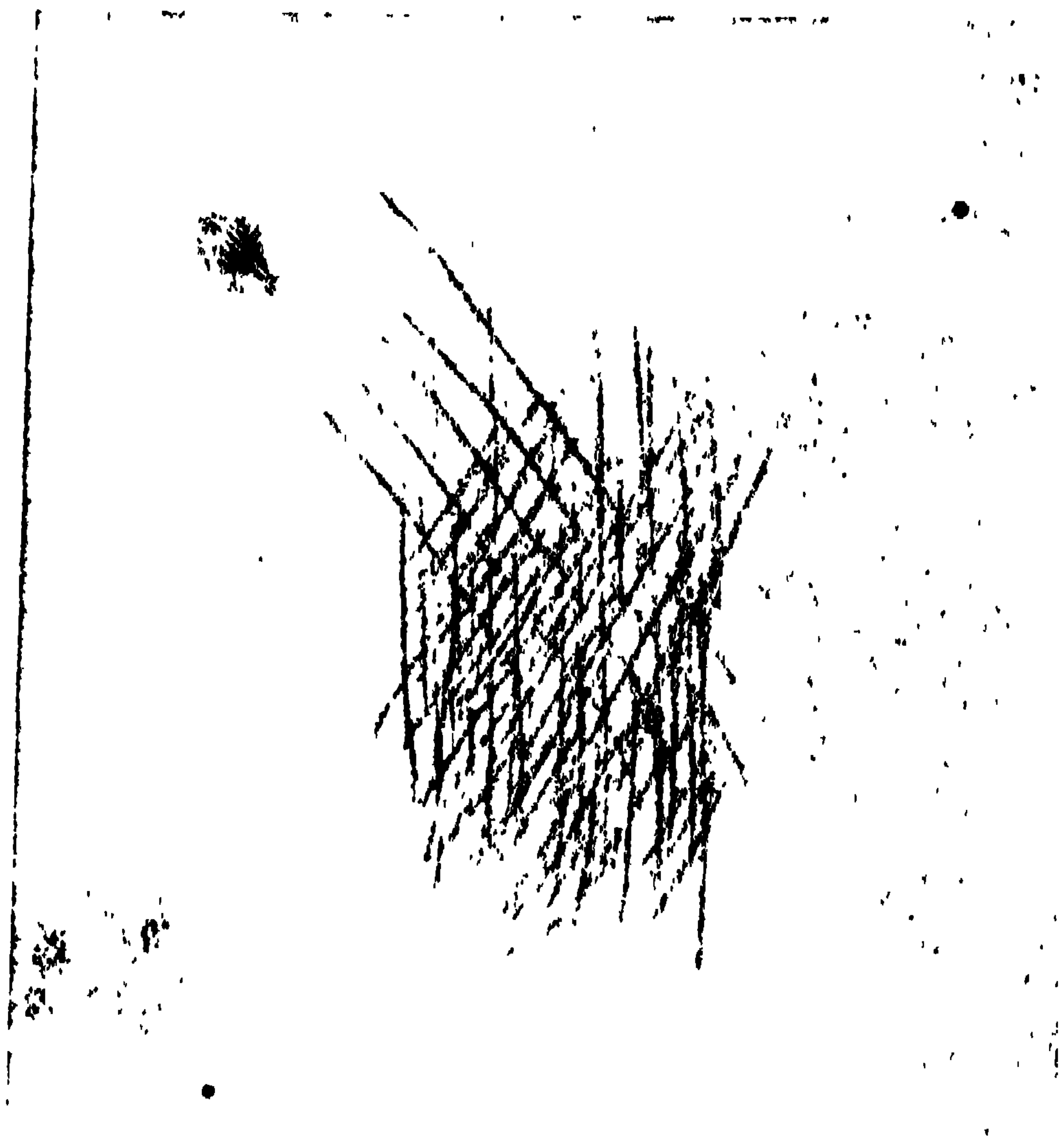

লাইম স্টোনে মাংস কোপাইবার কাঠের দাগের মত দাগ

ফুটিয়াছে—মনে হইতেছে, ইহাদেরই কতকগুলি সহরে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

১৫ই জুন। ভোরের ম্লান আলোয় সহর জাগিয়া উঠিয়াছে। সরযূতীরে লোকারণ্য। মনে হইল, সহরের সমস্ত লোক নদীতীরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কেহ ধীরে-ধীরে সাবধানে জলে নামিতেছে; কেহ বুক-জলে দাঁড়াইয়া ডুব দিতেছে; কেহ বা হাঁটু জলে থাকিয়া গা মুছিতেছে। সকলের মুখ হইতেই মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। যাহারা স্নান সারিয়া লইয়াছে, তাহারা কপালে তিলক-মাটী ও চন্দন লেপন করিতেছে। স্থানে স্থানে রমণীগণ দল বাঁধিয়া জলে অবগাহন

চিররঙ্গ-পরিশোভিত সুন্দর পর্ব্বতশ্রেণী

করিতেছে। ইহাদের মস্তক ঘোমটায় ঢাকা। স্রোতে ঘোমটা ভাসিয়া গেলে, মনে হয়, যেন হঠাৎ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইতেছে। রমণী লজ্জায় তাড়াতাড়ি ডুব দিয়া মাথার কাপড় ঠিক করিয়া লইতেছে। যাহাদের স্নান শেষ হইতেছে, তাহারা গাগরী জলে পূর্ণ করিয়া উঠিয়া যাইতেছে। রমণীর আরক্ত গণ্ডস্থলে রঙ্গশীল তরঙ্গরাশি—ইহাদের উঠিয়া যাইতে দেখিয়া দুঃখে চরণে বিদায় চুম্বন করিতেছে। সরযূ-নদীর ভোরের দৃশ্য বেশ।

তখন সূর্য্য উঠে নাই। পাহাড়ীরা সকলেই যে যাহার কার্য্যে লাগিয়াছে। ইহারা স্রোত-পূর্ণ সরযূতে ডুব দিয়া যেমন পবিত্র মনে উঠিয়া আসে, সমস্ত দিনের স্রোতপূর্ণ কর্ম্মপ্রবাহ হইতে তেমনভাবে উঠিয়া আসিতে পারে। ইহাদের জীবন-সংগ্রাম ধর্ম্মময়। তাই অভাবের কোলাহল নাই—বুকফাটা চীৎকার নাই—নয়নে অশ্রু নাই। আর নাই পুলিশের পায়ের অজগর নাগরার আতঙ্কময় শব্দ। হিমালয় তাহার পবিত্র বক্ষে যে এরূপ পবিত্র সহর এ যুগেও রাখিতে পারিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য। প্রভাতের চন্দ্রের ন্যায় হিমালয়ে এই সহর পুরাতন ভারতের কিরণ বিকীরণ করিতেছে। কলিকাতার নব্য সভ্যতার হিসাবে বোকা বলিতে হয় বোকাই হউক আর যাহাই হউক—পাহাড়ীরা অতি ধার্ম্মিক ও সরল। পবিত্র জলে অবগাহন

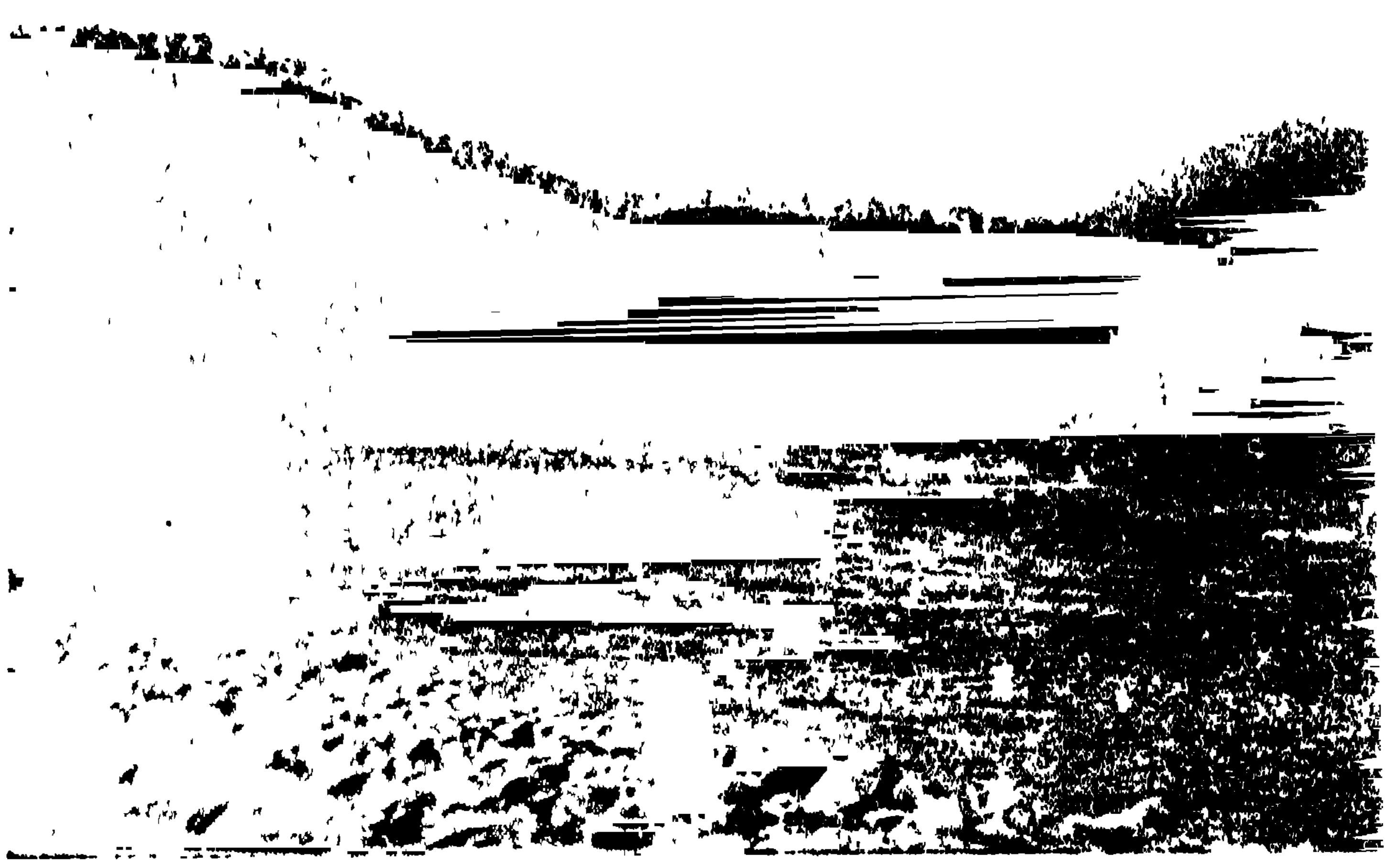

সরযূ গোমতী সঙ্গমে প্রজ্বলিত চিতা

করিয়া মুখে পবিত্র ভাব দেখাইয়া—গাঁটকাটারূপ সূক্ষ্ম কর্ম্মের ইহারা এখনও সন্ধান পায় নাই, নব্য সভ্যতার কমলবনে ইহারা এখনও কেলি করিতে শিক্ষা করে নাই। পাঠক, কুসুমে কীট দেখিয়াছ—গোলাবী ওষ্ঠের নীচে বিষ দেখিয়াছ,—গালভরা হাসির ভিতর ছুরী দেখিয়াছ; এ প্রদেশে আমি এ সকল দেখি নাই। তাই বলিতেছি—ইহারা বেশ সরল—বেশ সুখী।

তখন বেলা হইয়াছে। সহরে হঠাৎ আতঙ্ক উপস্থিত।

বাংলার দুইটী খানসামার একটা পলাতক—পাহাড়ীরা ভয়ে আড়ষ্ট। —প্রফুল্ল কুসুমের ন্যায় রমণীকুল ছুটিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া হাঁফ ছাড়িতেছে। ইহার কারণ, ইন্‌জিনিয়র সাহেবের আগমনবার্ত্তা। ইন্‌জিনিয়র সাহেব না কি বাংলায় আসিতেছেন। সরযুর উপর যে পুল মেরামত হইতেছে তিনি উহাই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তাহাতে আতঙ্ক কেন? করিতেছিলাম। ইহাদের মুখ শুষ্ক; চক্ষু কোটরগত; দন্তরুচিকৌমুদী বিকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, আলমোরা ছাড়িয়া কুলীর দল-ছাড়া হওয়ায়, তাকুলা ও বাগেশ্বরের অপ্রশস্ত পথ না ধরিয়া তাহারা সুপ্রশস্ত রাণীক্ষেতের পথে চলিয়া গিয়াছিল। আমাদের বা আমাদিগের কুলীর যখন কোনও সন্ধান

সরযুর একটী সুন্দর উপত্যকা

অদ্রি দেশের ভিতর নদী অনেক উচ্চ হইতে অবতরণ করিতেছে

ইন্‌জিনিয়র সাহেব যথাসময়ে বাগেশ্বরের বাংলায় উপস্থিত হইলেন। আমরা তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলাম। পাহাড়ীরা উহাকে "পাগলা সাহেব" বলে। আমরা দেখিলাম, একে সাহেব, তাহাতে পাগল—দূরে থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। ক্রমে সাহেবের সহিত আলাপ হইল। তখন দেখিলাম, সাহেব লোক ভাল।

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমাদের ভৃত্যেরা আসিয়া উপস্থিত। ইহারা পথ হারাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। আমরা ইহাদেরই জন্য বাগেশ্বরে অপেক্ষা পাইল না, তখন তাহারা ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বুঝিল পথ হারাইয়াছে। তখন অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়া আলমোরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমরা পূর্ব্বেই আলমোরার পুলিশে এ সংবাদ দিয়াছিলাম। তাহারা ইহাদের বাগেশ্বরে প্রেরণ করিয়াছে। ইহাদের একে আহার-নিদ্রা হয় নাই—তাহার উপর চিন্তায় ও পাহাড়ে পথ চলিয়া একেবারে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন ভৃত্যেরা চিন্তার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে—আমরাও আশ্বস্ত হইয়াছি।

সন্ধ্যা-সমাগমে আমরা আবার সঙ্গম দেখিতে বহির্গত হইলাম। পূর্ব্বদিবস সরযূর যে তীর ধরিয়া গিয়াছিলাম, আজ তাহার অপর তীর ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। শুনিয়াছি, এই সঙ্গমকে ত্রিবেণী বলা হয়। কেবল সরযূ ও গোমতী এ স্থানে যুক্ত হয় নাই—সরস্বতী বলিয়া আর একটা নদী এই স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। সরস্বতী দেখিতে হইবে ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। পথের নীচে সরযূ চলিয়াছে; উপরে আমরা চলিতেছি। সরযূ আমাদের হারাইতে চায়, আমরা সরযূকে হারাইতে চাহি। সরযূ হারিল কৈ? সরযূর

লোহাক্ষেতের দুটী ছোট ছেলে

তরঙ্গরাশি নাচিয়া-নাচিয়া উদ্ধনেত্রে আমাদের উপর নজর রাখিয়া চলিতেছে—পথে শিলা পড়িলে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে এবং শিলারাশির ফাঁকে-ফাঁকে অতি বেগে চলিতেছে। আমাদের খট্‌খটাখট্ বুটের শব্দ অদূরবর্ত্তী পাহাড়কে জাগরিত করিয়াছে। পাহাড় তামাসা দেখিতেছে এবং মাঝে-মাঝে খটখটাখট শব্দে, কঠিন প্রস্তরের হাতে হাততালি দিয়া নিজ কন্যা সরযূকে উৎসাহ দিতেছে। সরযূ উর্দ্ধমুখে নিম্ন দিকে বেগে চলিয়াছে। দমের দরকার হয় না। আমরা হার মানিলাম। কিন্তু সঙ্গমের দিকে যাওয়া ছাড়িলাম না; সরস্বতী দেখিতেই হইবে। আমাদের পথ কখন প্রস্তরের উপর, কখন মাটীর উপর পড়িতেছে। এ মাটী প্রস্তর ধ্বংস হইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত মাটীই সেইরূপে উৎপন্ন। ইহা প্রতিদিনই উৎপন্ন হইতেছে—যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন উৎপন্ন হইবে। তবে পৃথিবী এককালে যেরূপ উত্তপ্ত বাষ্পের গোলক ছিল, ইহা আবার যদি ঐরূপ হয়, তাহা হইলে অন্য কথা। পর্ব্বতের প্রস্তর ধ্বংস হইয়া যে সকল মাটী উৎপন্ন হয়, বৃষ্টির জল বা চিরহিমানীর বরফ-গলা জল তাহা উপত্যকা-পথে বহন করিয়া সমতলে আনিয়া ফেলে। সমতলের প্রান্তেই সমুদ্র। সমুদ্র নদীর গতিরোধ করে। ইহাদের দ্বন্দ্বের ফলে নদীর শক্তি ক্ষীণ হয় এবং দুর্ব্বল জল মাটীর রাশি নিক্ষেপ করিয়া 'ব' আকারে দ্বীপপুঞ্জ গঠন করে। ইহা নদীর দুর্গ। ইহার ভিতর থাকিয়া নদী শতসহস্র মুখে সমুদ্রের সহিত দ্বন্দ্ব করে, ক্রমে সমুদ্রকে হটাইয়া লইয়া যায়। আমাদের বাংলা দেশ এই ভাবেই নির্ম্মিত হইয়াছে। হিমালয়ের মাটীতেই বাংলা তৈয়ারী। বাংলা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের দুর্গ। হিমালয়ের যে মাটী পাহাড়ের পাদদেশে কোনক্রমে বাধা পাইয়া জল হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, তাহা সেই স্থানেই থাকিয়া যায়। এই পার্ব্বত্যদেশে সরযূর উপত্যকার উপর যে মাটী জমিয়াছে, তাহা ঐ প্রকারেই এ স্থানে আসিয়াছে। যে জল মাটী বহন করিতেছে, উহার গতি কোন রূপে কমিলেই, মাটী জল হইতে থিতাইয়া পড়িয়া যাইবে। তবে বেশীর ভাগ মাটী সমতলে গিয়াই পতিত হয়। কারণ, পার্ব্বত্য দেশে নদীর পথ বেশ গড়ানে বলিয়া জল অত্যন্ত বেগপূর্ণ হয়, এবং জলের কার্য্যকরী ক্ষমতাও বেশী হয়। নদী সমতলে প্রবেশ করিলে, পথ প্রায় সমতল বলিয়া স্রোত কমিয়া আসে এবং তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতাও কমিয়া যায়। কার্য্যকরী ক্ষমতা বেশী হইলে জল বেশী বোঝা বহন করে; আর, ক্ষমতা যেই কম হয়, জল অমনি বোঝা নামাইয়া ফেলিতে থাকে। বলা বাহুল্য, জলের এই শক্তি মাধ্যাকর্ষণপ্রসূত।

সরস্বতী এখনও দূরে। আমাদের এখনও অনেকটা যাইতে হইবে। পথটি নির্জ্জন। নির্জ্জনতার জন্য প্রকৃতি স্তব্ধ গম্ভীর বলিয়া বোধ হইতেছে। আমাদের পথ যখন

প্রস্তরের উপর দিয়া পড়িতেছে, তখন বুটের শব্দ হইতেছে এবং এই শব্দ অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া গিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। শব্দে প্রকৃতির গম্ভীর ভাব চলিয়া যাইতেছে। আমরা যখন প্রস্তরের উপরে সঞ্চিত মাটীর উপর দিয়া চলিতেছি, তখন বুটের বীরবাক্য রোধ হইতেছে এবং নির্জ্জন পার্ব্বত্য দেশের সন্ধ্যায় গম্ভীর প্রকৃতির নির্জ্জনতা মনে যেন একটা গম্ভীর ভাব আনয়ন করিতেছে। আমরা যখন সঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখনও অন্ধকার হয় নাই। সঙ্গমের উপরেই একটা মন্দির। মন্দিরের পার্শ্বে সরস্বতী। সরস্বতী অন্তঃসলিলা। সরস্বতীকে ঠিক নদী বলা চলে না—ইহা একটি ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ ঝরণা মাত্র। প্রস্তররাশির ভিতর হইতে একটি জলধারা অতি অস্ফুট শব্দে সরযূ ও গোমতীর বিশাল সঙ্গমে পড়িতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাঘেশ্বরের এই সঙ্গম একটি তীর্থ। তীর্থ ত্রিবেণী হইলে একটি বড়-দরের তীর্থ হয়। বাঘেশ্বরকে বড়দরের তীর্থ করিবার জন্যই বোধ হয় এই ক্ষীণ ঝরণা সরস্বতী রূপে কল্পিত হইয়াছে। সরস্বতীর ক্ষীণতার সহিত আমাদের উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া গেল। আমরা ক্ষুন্নমনে ধীরে ধীরে তাম্বুতে ফিরিয়া আসিলাম।

বাঘেশ্বরে ঘুরিয়া-ফিরিয়া সব দেখা হইয়াছে। বাঘেশ্বর বেশ প্রাচীন সহর। সে বহু দিনের কথা—দিগ্বিজয়ী বীর তৈমুরলঙ্গের হস্তস্থিত রক্তমাখা তরবারী দেখিয়া একদিন এই সহর আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল—এরূপ প্রবাদ আছে। দুর্দ্দমনীয় রক্তপিপাসু এই বীরের হস্তে তৎকালীন সভ্য-জগতের কত সহরে ক্রন্দন রোল উঠিয়াছে—কত সহরে রক্তস্রোত বহিয়াছে—কত সহর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে—তাহা কে বলিতে পারে? দিল্লীতে মুসলমানের সিংহাসন ইহার ভয়ে একদিন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল—বীরবর দিল্লীসহর রক্তে প্লাবিত করিয়া বহুসংখ্যক নরনারীকে দাসরূপে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন দিল্লী হাঁফ ছাড়িল—ভারতবর্ষ আশ্বস্ত হইল। তৈমুরলঙ্গ তাঁহার এই রুধিরাক্ত কর্ম্মজীবনের পথে, বাঘেশ্বরে ছাউনি করিয়াছিলেন। বাঘেশ্বরের আর কত ইতিহাস আছে, কে বলিতে পারে? বাঘেশ্বরের প্রবাদে, মাটীতে, প্রস্তর পৃষ্ঠে প্রকৃতির অক্ষরে ইহা লেখা আছে—প্রকৃতির সাধক ভিন্ন তাহা আর কে উদ্ধার করিতে পারিবে?

চিত্রে বসরা নগরী

[শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

(২)

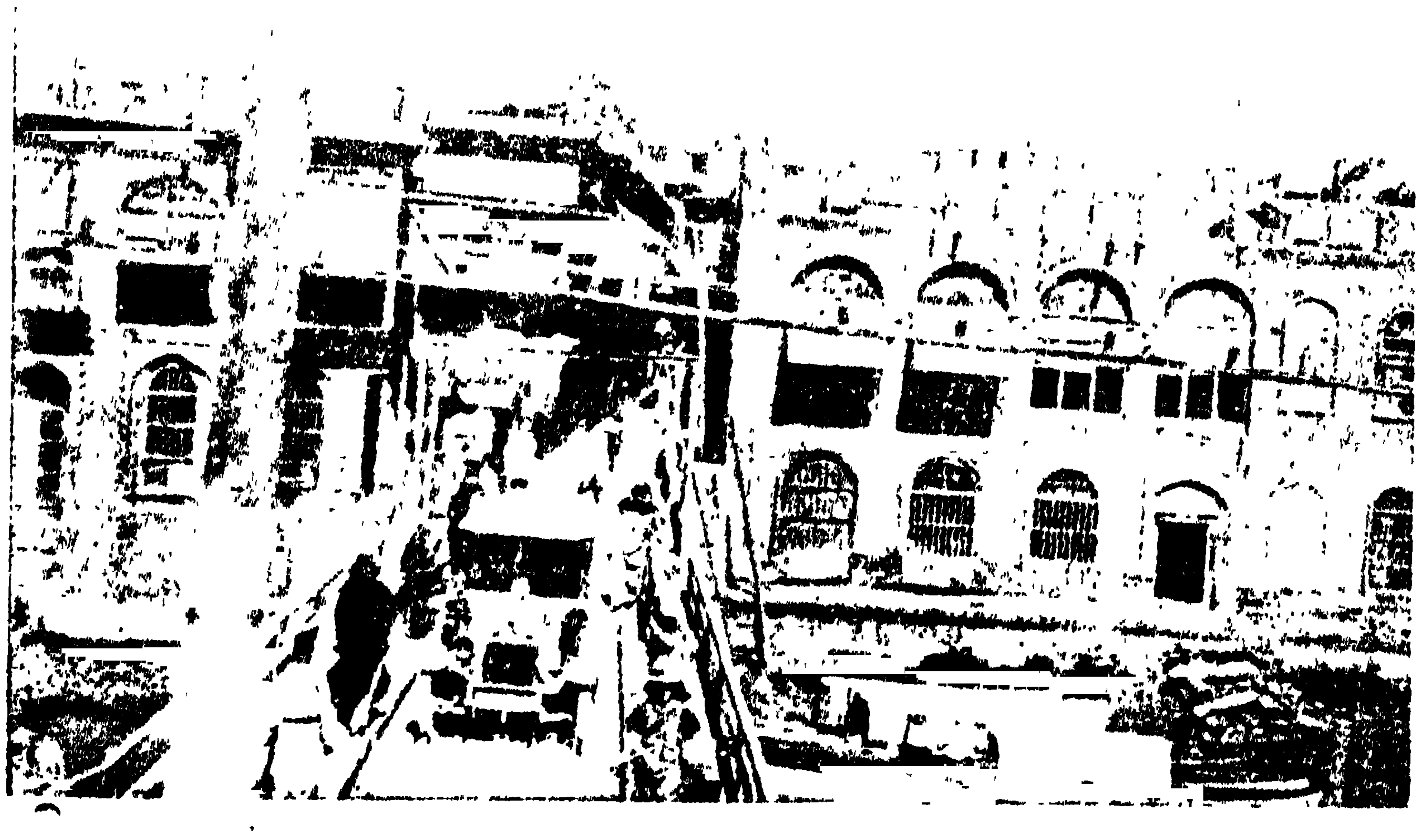

বসরা—হোয়াইটলে সেতু

আশারের নিকটে খাড়ীর অংশ

খোরা ক্রীক

চিত্রে, সাঁকোর উপর দিয়া একখানি মোটর গাড়ি যাইতেছে, এবং দুই পাশের সঙ্কীর্ণ ফুটপাথের উপর দিয়া লোকে যাতায়াত করিতেছে—প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সাঁকোর নীচেই খাল। এই খাল দিয়াই বসরা নগরীতে যাইতে হয়। খালের জলে পরদা ফেলিয়া কয়েকখানি বেলাম নৌকা রহিয়াছে। সাঁকোর উপরের অট্টালিকাশ্রেণী উচ্চপদস্থ আরব ও তুরকী রাজ-কর্ম্মচারীদিগের বাসভবন ছিল। এক্ষণে বিভিন্ন আপিসের সরকারী কর্ম্মচারীদিগের বাসভবনরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বাটীর স্বত্বাধিকারীগণ ইংরাজ সরকারের নিকট হইতে উহার নিমিত্ত উচিত ভাড়া পাইয়া থাকেন।

বসরায় নবাগত ব্যক্তির পক্ষে দুইটলি সাঁকোর

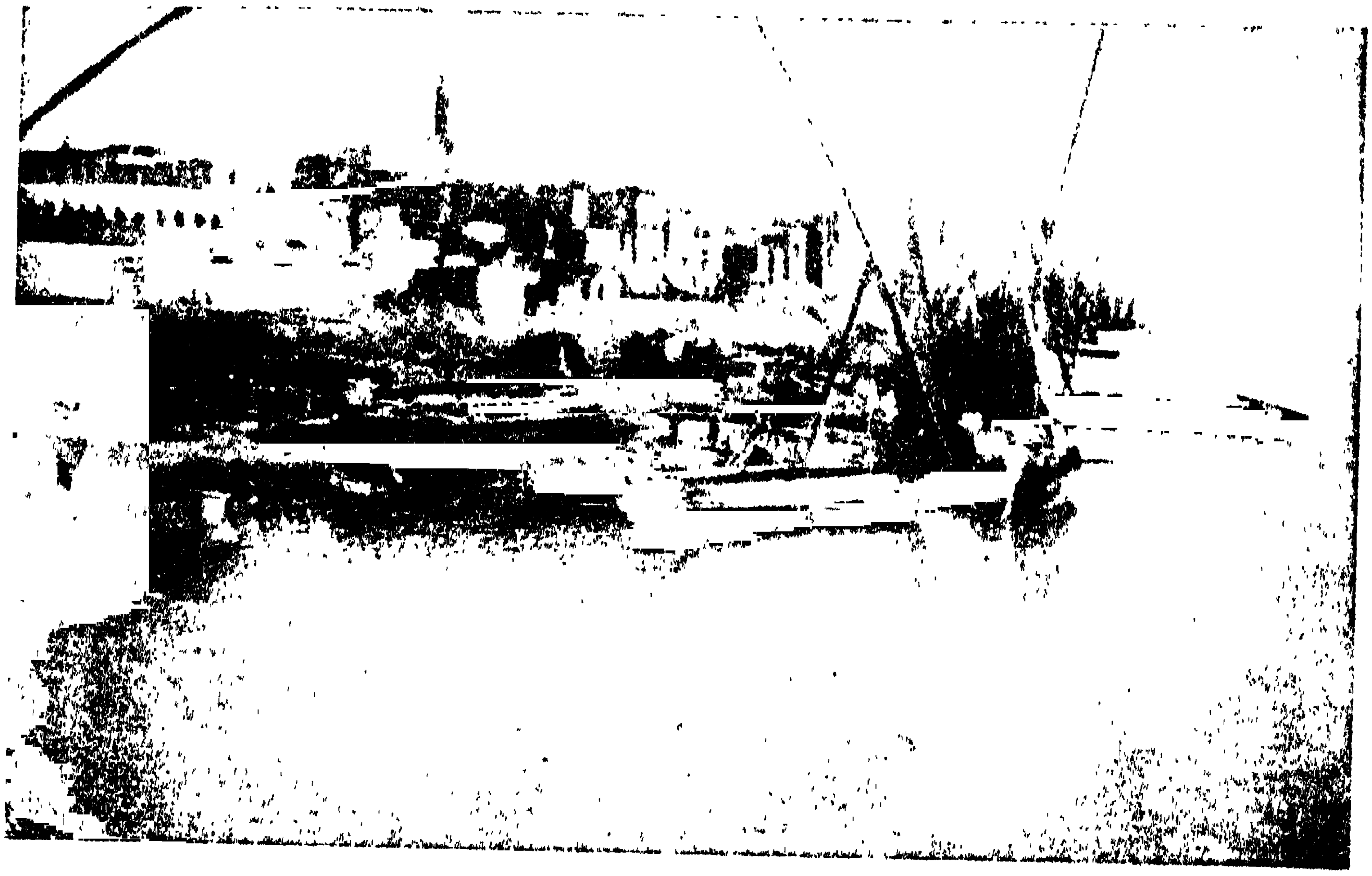

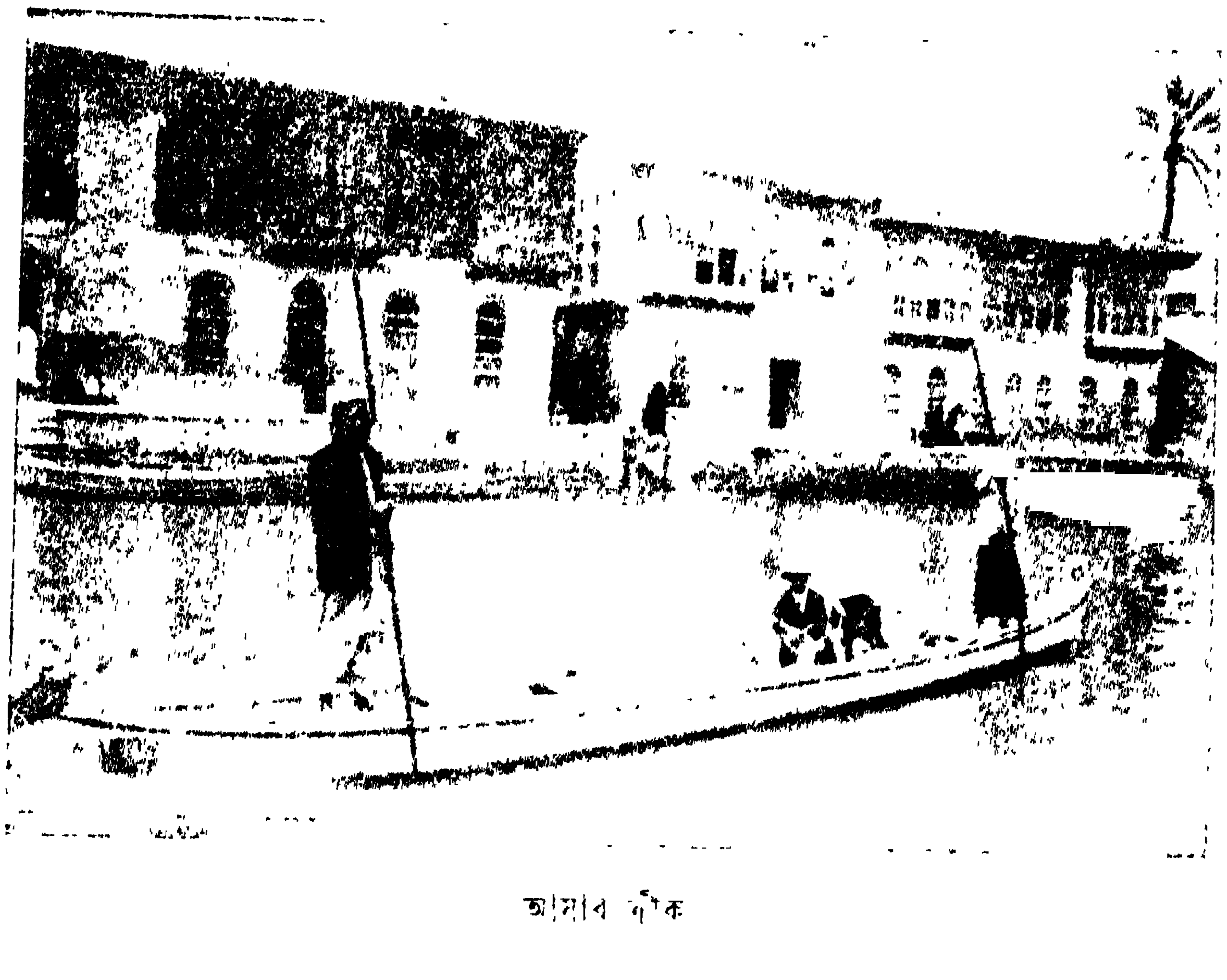

আসার বাঁক

হোয়াইটলে সেতু

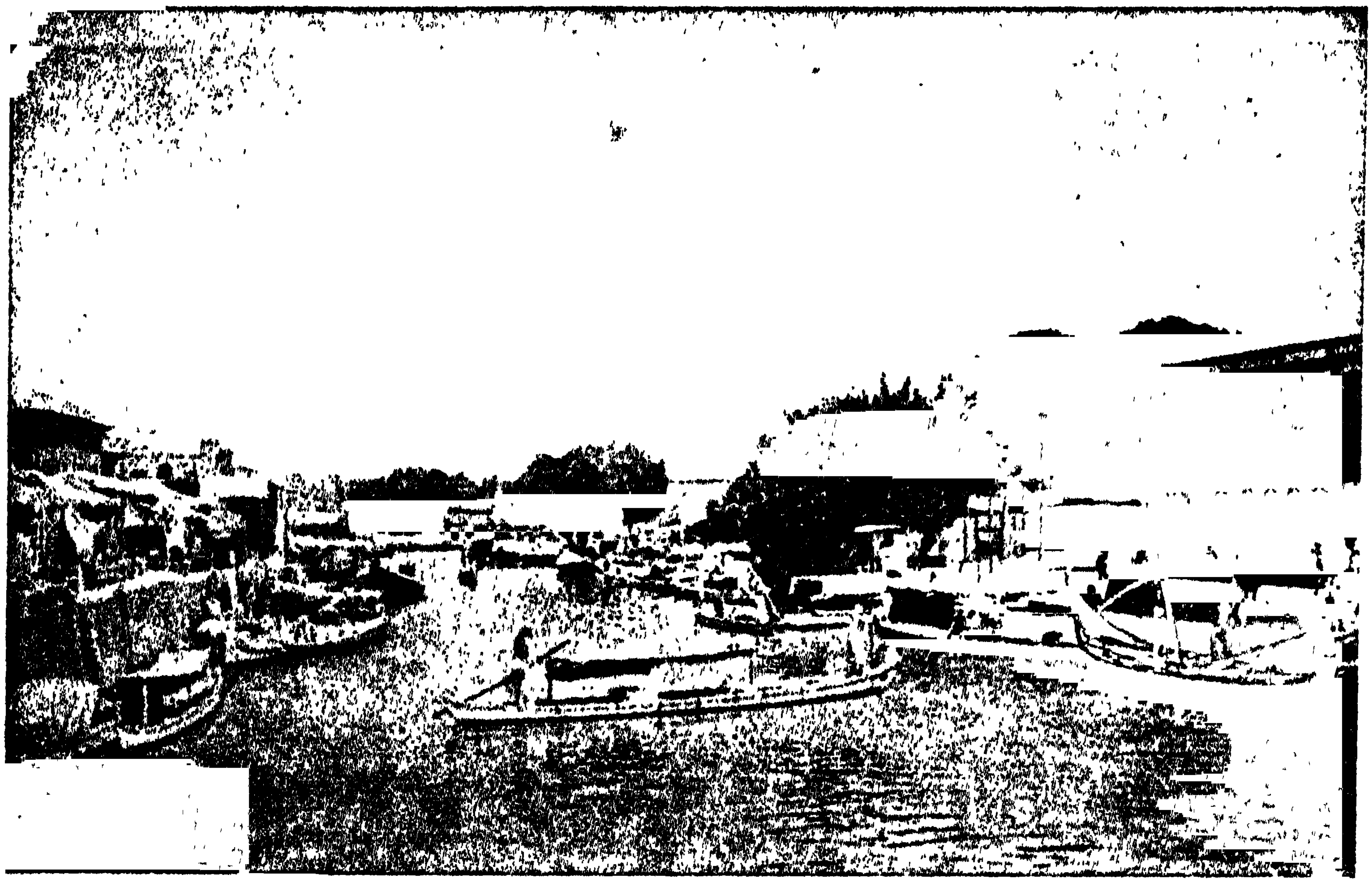

আসার

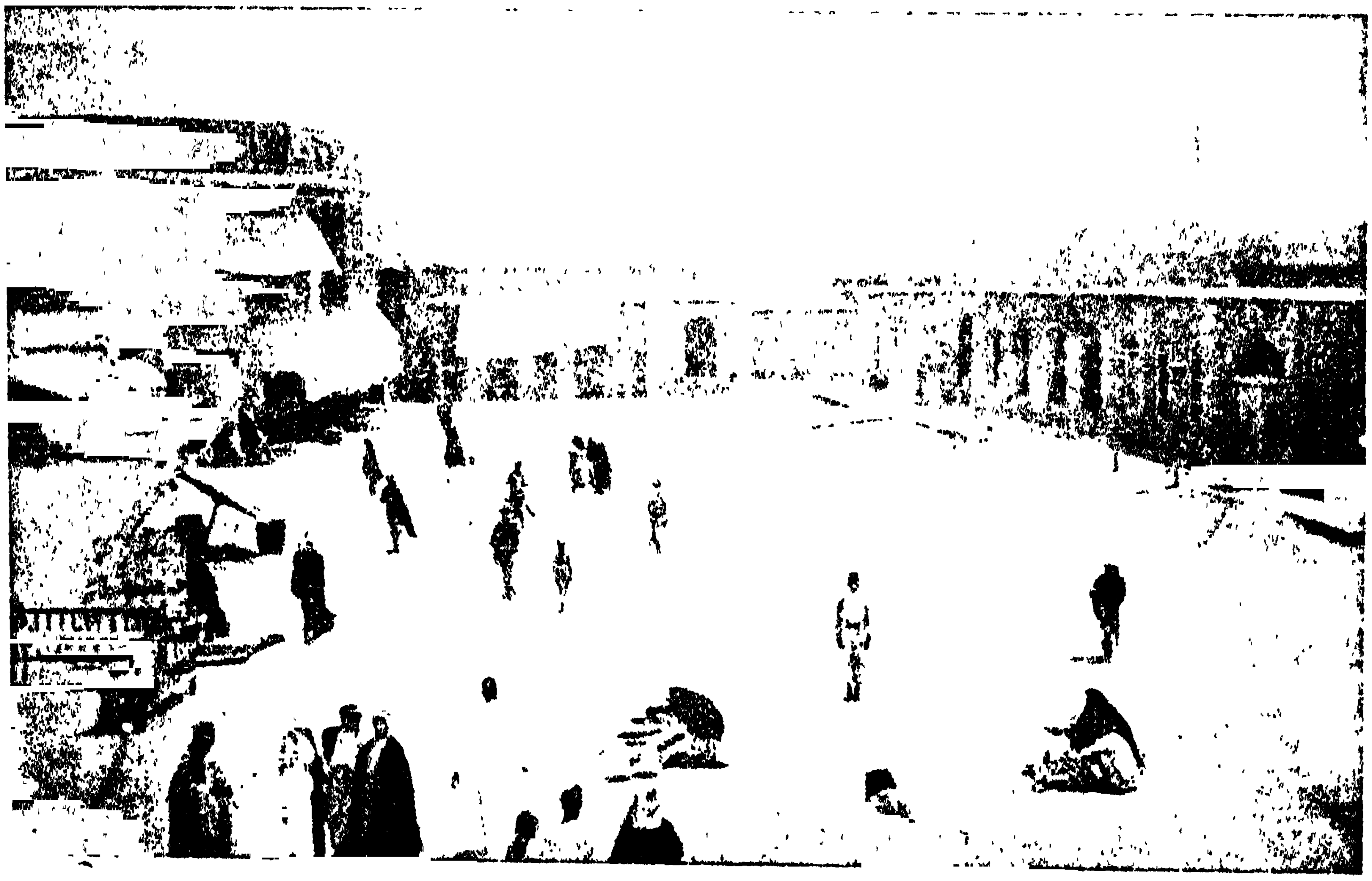

বসরা—স্কোয়ার

সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক; কারণ, আসারে—বাজার, দোকান ইত্যাদিতে যাইতে হইলে, এই সাঁকো পার না হইয়া যাইবার উপায় নাই। অবশ্য ব্যারাট সাঁকো দিয়াও আসারে যাওয়া যায়; কিন্তু দোকান পশার ও বাজার এই সাঁকোর ওপারেই; সুতরাং কাছে হয়।

এই সাঁকো পার হইয়া ক্লাব রোডের উপর মটর ট্যাক্সি

পাওয়া যায়। উহা কেবল দিনমানে আসার খালের ধার হইতে বসরা নগরীর প্রবেশ-দ্বার পর্য্যন্ত যায় ও আসে। একজন যাইবার ভাড়া চারআনা মাত্র।

সাঁকো পার হইয়া ক্লাব রোডের রাস্তা গিয়াছে, এবং সাঁকোর সম্মুখেই সিবিল পোষ্ট আপিস—টেলিগ্রাফ ও টেলিগ্রাম-সেনসারের আপিস। উহার নিকট দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ রাস্তা ষ্ট্রাণ্ডরোডে মিলিয়াছে। ঐ রাস্তার উপর দণ্ডায়মান ভদ্রলোক Mr. S. B. Negarkar, সরকারী ডকের ভূতপূর্ব্ব হেডক্লার্ক্। এখন ইনি পার্সিয়ার অন্তর্গত হেনজাম নামক স্থানের Coal Conductor। ইনি জাতিতে মহারাষ্ট্রীয়;—ইন্দোরের কনিষ্ঠ মহারাণীর বিশেষ আত্মীয়। উপস্থিত এই প্রবন্ধে ইঁহার নাম উল্লেখের কারণ এই যে, বসরায় থাকা কালে ইনি বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণের বিশেষ বন্ধু ছিলেন; আপদে-বিপদে নিজের ক্ষতি করিয়াও অপরের উপকার করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন নাই। এরূপ সদয় হৃদয় পরোপকারী ভদ্রলোক খুব কমই দেখা যায়।

তৃতীয় চিত্রে বসরার সাধারণ নৌ-যান—বা বেলাম এবং দুইজন আরব মাঝির প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। ক্রীকের্ বাম-তীরস্থ প্রথম বাড়ীখানিতেই আপাততঃ আসার পুলিশ ষ্টেসন অবস্থিত। উহার পাশেই একটি ঘাটের সোপানশ্রেণীর উপর বোরখা-আবৃত আরব মহিলাগণ দণ্ডায়মানা। দ্বিতীয় অট্টালিকাখানি সরকারী কাষ্টম হাউসের কর্ম্মচারীদিগের আবাসস্থান।

বসরায় খোলা ফিটন ছাড়া বন্ধ গাড়ী পাওয়া যায় না;—গাড়ীর সংখ্যাও খুব কম। তাহার উপর মিলিটারী কর্ম্মচারীদিগের জন্য গাড়ী সব সময়ে পাওয়াও দুর্ঘট। দেশীয় আরব ও সিদ্দিগণই গাড়ীর চালক। গাড়ীর আড্ডার নিকটেই সরকারী গাড়ী ভাড়ার হার কাষ্ঠ-ফলকে দোদুল্যমান থাকা সত্ত্বেও আরব গাড়ী চালক নবাগত ব্যক্তির নিকট হইতে উচিত ভাড়ার চারিগুণ বেশী ভাড়া হাঁকিয়া বসে। আসার হইতে বসরা নগরী যাইতে হইলে, একখানি গাড়ীর ভাড়া ৮৹ আনা লাগে। সেয়ারেও তিন-আনা হিসাবে অনেক সময়ে পাওয়া যায়। তবে গাড়ীর আড্ডায় সন্ধ্যার পর কিম্বা প্রাতঃকালে গাড়ী মেলে না; কারণ, গাড়ীর সমস্ত আস্তাবলই বসরা নগরীতে—আসারে একটিও নাই।

এই গাড়ীর আড্ডার সন্নিকটেই খেজুর-বাগানের ভিতর আসার সিনেমা। প্রতি শনিবারে সিনেমা প্রদর্শিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ সংক্রান্ত আপিসের কর্ম্মচারীদিগের আপন-আপন উপরওয়ালা মিলিটারী তকমাধারী প্রভুর ছাড়পত্র না থাকিলে প্রবেশ-নিষেধ। ছাড়পত্র থাকিলে অর্দ্ধমূল্যে সিনেমা দর্শন হয়। এইরূপ আর একটি সিনেমা বসরা সহরের মধ্যেও আছে। উহার নাম Oriental Cinema। সিনেমায় সাধারণের প্রবেশের দক্ষিণা আটআনা ও এক-টাকা। ইহা ছাড়া সঙ্গীতপ্রিয় স্থানীয় অধিবাসিগণ প্রায়ই থিয়েটারে যায়। ক্ষুদ্র আসার বাজারেই ৬।৭টি থিয়েটার আছে। এখানকার নাট্যালয় গুলিও অদ্ভুত। দিন-মানে নাট্যমন্দিরগুলি চা ও কাফিখানা—রাত্রিতে আরব, গ্রীক ও ইহুদি অভিনেত্রীগণের রঙ্গভূমি। এই সকল থিয়ে-টারকে ঠিক নাট্যালয় নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না; কারণ, নাটক-অভিনয় মোটেই হয় না। থিয়েটারে ষ্টেজের উপর রং-বেরংঙ্গের ছবি-আঁকা একখানি কাপড় টাঙ্গান থাকে—উহাই ড্রপসিন। উহা উঠিলেই থিয়েটার আরম্ভ। সচরাচর ২।৩টি আরব অভিনেত্রী ষ্টেজের উপর চেয়ারে বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহে; উহাদের পাশেই বাদক-দল বাজনা বাজায়।

অভিনেত্রীরা এক-এক জন করিয়া নৃত্য ও গান করে। একজনের শেষ হইলে সে বিশ্রাম করে, আর একজন তাহার স্থান গ্রহণ করে। এইরূপ অবিরাম নৃত্য-গীত রাত্রি ১১।১২টা পর্য্যন্ত হয়।

গান সমস্তই তুর্কী ও আরবী ভাষায়; স্থানীয় লোক ভিন্ন অপর দেশীয়ের বুঝিবার উপায় নাই। দর্শকমণ্ডলী নর্ত্তকীদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত টাকা ও নোট ষ্টেজের উপর নিক্ষেপ করে—নর্ত্তকীদের উপহার দেওয়াই উদ্দেশ্য। নর্ত্তকীগণ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীর সহিত নৃত্য করে; গীতের ভাষাও সুরুচিসঙ্গত নয়। এ-হেন রঙ্গালয়েরও দর্শনী আটআনা এবং এক টাকা। থিয়েটারেও ছাড়পত্র না থাকিলে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের প্রবেশ-নিষেধ।

পঞ্চম চিত্রে প্রদর্শিত বড় নৌকাগুলিকে এখানে মহেলা বলে—মালপত্র প্রায় এই মহেলাতেই বোঝাই হয়। বড়-বড় মহেলা খেজুর বোঝাই লইয়া বসরা হইতে করাচী পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। আসারে বেলামের সংখ্যা অনেক,

তবুও রবিবারে বা কোন স্থানীয় পর্ব্বদিনে ভাড়ার জন্য বেলাম মেলাও সুকঠিন হয়।

সাধারণতঃ বেলামে চারিজন আরোহীর বেশী বসিবার স্থান নাই। আরোহীদের জন্য ছোট তোষক, তাহার উপর চাদর বিছান ও হেলান দিবার বালিস থাকে। পরিশ্রম-জীবীদিগের আবাস-স্থান হওয়ায় খোরার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনেকটা বিনষ্ট হইয়াছে। এখনও দুইপাশে সারি-সারি খেজুর-গাছের ঝোপ। মধ্যে খাল; উহার উপর দিয়া নৌকা করিয়া বেড়াইতে তৃপ্তি অনুভব হয়। এই খোরার খালের সঙ্গে আসার খালেরও যোগ আছে। এই খোরার খালেই সৈনিকদের স্নানের জন্য কাষ্ঠের মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বসরায় এই স্থানটিই সাধারণের বিশ্রাম স্থান। ইহার অতি নিকটেই একটি কাওয়া বা কাফিখানা আছে; নগরীর ইতর-ভদ্র লোকেরা বিশ্রাম বা পর্ব্ব-দিনে এই স্থানে সমবেত হয়। ঐ হেলান দেওয়া কাষ্ঠাসনই এখানকার সাধারণ বসিবার আসন। চকে এক দিকে Ottoman Bank House; অপর পাশে বসরার Military Governorএর আপিস। ঐ চকের নিকটেই সিবিল হাস-পাতাল ও সরকারী ডাকঘর। বসরায় দুইটি প্রধান বাজার আছে। তাহার মধ্যে বড় বাজারটির মুসলমানদিগের বিপণিশ্রেণী মুসলমানদের পর্ব্বদিন শুক্রবারে বন্ধ রাখা হয়; এবং ইহুদিদিগের পর্ব্বদিন শনিবারে ঐ জাতীয় দোকানদারদের দোকান বন্ধ থাকে। দোকানীর মধ্যে ইহুদিই বেশী।

বসরায় বড় রাস্তা একেবারেই নাই; সবই গলি-রাস্তা এবং তার মাঝে-মাঝে খিলান-দেওয়া ফটক। দুইটি ধর্ম্ম-মন্দির;—একটি Syrian Church ও অপরটি Caldean Church—নগরের প্রবেশের পথে আছে। তা'ছাড়া মুসল-মানদের মসজিদও আছে। Christian, Jew ও Armenianদিগকে স্থানীয় আরবেরা নস ইরাণী বলিয়া থাকে। স্থানীয় Christian, Jew, Armenian স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকারা দেখিতে সুশ্রী ও তাহাদের রং ফরসা। তাহাদের রং অধিকাংশেরই গোলাপী;—সাদা, ফেকাশে, শ্বেত চর্ম্ম নয়। এই সকল জাতির স্ত্রীলোকগণ বাটীর বাহির হইবার সময় সাটিনে বা ওড়নায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া থাকে। পরদা প্রথা না থাকিলেও, জালের ঘোমটার দ্বারা মুখ আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। পুরুষদের পোষাক প্রায় স্থানীয় আরবদিগের ন্যায়। তাহারা সুতার গাঁঠরীর পরিবর্ত্তে লাল মোগলাই টুপি ব্যবহার করে। খাওয়া-দাওয়া আরব-দিগের ন্যায়; কথাবার্ত্তাও আরবী ভাষায় কহিয়া থাকে।

মেসোপোটেমিয়ার অপর সকল স্থান অপেক্ষা আমারার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর; সেইজন্য বড়-বড় সৈনিক হাসপাতাল-গুলি প্রথমে আমারায় ছিল। বেঙ্গল এ্যাম্বুলেন্স কোরের দল এই আমারাতেই ছিলেন। জলবায়ু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইলে সৈনিক বা সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে আমারায় পাঠান হয়। আমারার নদী-তীরবর্ত্তী দৃশ্য অতি সুন্দর।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শঙ্কর-মিশ্র

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী নৈয়ায়িক শ্রীধরাচার্য্যের পরিচয় দিয়াছি [ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪]; অদ্য মৈথিল নৈয়ায়িক শঙ্করমিশ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব। বৈশেষিক সূত্রের ও 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে'র টীকা রচনার জন্য শঙ্কর মিশ্র বিদ্বৎ-সম্প্রদায়ে সুপ্রসিদ্ধ। অল্পদিন হইল, ইহাঁর রচিত "বাদিবিনোদ" ও "কণাদ রহস্য" নামক আরও দুইখানি দার্শনিক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। কি ভাবে সভাক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিচার করিতে হয়, তাহারই বিস্তৃত বিবরণ "বাদিবিনোদে" লিখিত আছে। গ্রন্থের উপক্রমেই শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন,—

"উপকর্ত্তুং বিজিগীষূনপকর্ত্তুমহঙ্কৃতান্ বিদুষঃ।
বাদিবিনোদঃ ক্রিয়তে শঙ্কর কৃতিনা বিবিচ্য তন্ত্রাণি॥"

"জয়েচ্ছুগণের উপকারের জন্য এবং অহঙ্কারী পণ্ডিতগণের দর্পচূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রসমূহের অনুশীলনপূর্ব্বক শঙ্কর মিশ্র "বাদিবিনোদ" প্রণয়ন করিতেছেন।"

শব্দ নিত্য, না অনিত্য—এই বিষয় লইয়া বাদী-প্রতিবাদী কত দূর পর্য্যন্ত বিচার করিতে পারে, তাহার উদাহরণরূপে শঙ্কর মিশ্র, প্রথম উল্লাসের প্রারম্ভে পরস্পরের বহু উক্তি-প্রত্যুক্তি লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। বাদী বলিলেন, 'শব্দঃ অনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ'—শব্দ অনিত্য, যে হেতু তাহার উৎপত্তি আছে। প্রতিবাদী বলিলেন, "কৃতকত্বম-সাধকম্ অসিদ্ধত্বাৎ'—তোমার প্রদর্শিত 'কৃতকত্ব' হেতু অসিদ্ধ, শব্দের উৎপত্তি হয় না। এই ভাবে শব্দের অনিত্যত্ব স্থাপনায় দোষ দেখাইয়া প্রতিবাদী শব্দের নিত্যত্ব স্থাপনার জন্য বলিলেন,—'শব্দো নানিত্যো নিত্য এব, আকাশমাত্র ধর্ম্মত্বাৎ'—শব্দ অনিত্য নহে, তাহা নিত্যই; যে হেতু তাহা কেবল আকাশেই থাকে। যাহা কেবল আকাশের ধর্ম্ম, তাহা নিত্য,—দৃষ্টান্ত আকাশের পরম মহৎ পরিমাণ। বাদী তখন স্বপক্ষের দোষোদ্ধারের জন্য বলিলেন, 'শব্দে কৃতকত্বং নাসিদ্ধং যত ইদানীমুৎপন্নো গকার ইত্যনুভূয়তে'—কৃতকত্ব হেতু শব্দে অসিদ্ধ নহে, যেহেতু ইদানীং গকার উৎপন্ন হইল, এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। মৃদঙ্গবাদক শব্দ করিতেছে—এই ভাবেও শব্দোৎপত্তি অনুভূত হয়। তা'র পর, শব্দের নিত্যত্ব স্থাপনের জন্য 'আকাশমাত্র ধর্ম্মত্ব'রূপ যে হেতু প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা 'সোপাধিক' বলিয়া অসাধক।—'অজন্যত্ব সোপাধেরুপলম্ভাৎ'—এখানে 'অজন্যত্ব'ই উপাধি। এইরূপ বাদ-প্রতিবাদের পর বাদী সপ্তদশ কক্ষায় শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিলেন। অন্যান্য বিষয় লইয়াও এই ভাবের বাদ-প্রতিবাদের রীতি "বাদিবিনোদে" প্রদর্শিত হইয়াছে। শঙ্কর মিশ্র, এই গ্রন্থে গৌতমোক্ত বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, ছল, জাতি, হেত্বাভাস প্রভৃতিরও বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তার্কিক-গণের সিদ্ধান্তিত যে সকল বিষয়ে অন্যান্য দার্শনিকগণ বিবাদ উত্থাপন করিয়া থাকেন, সেই সকল পদার্থ স্থাপনের বিবিধ উপায়ও এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় উল্লাসে দ্রব্যগুণাদি পদার্থের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য, ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ প্রভৃতি নিরূপণের পর শঙ্কর মিশ্র পদার্থ সম্বন্ধে দার্শনিকগণের মতভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি—"ননু মতভেদেন কেষাং কতি পদার্থাঃ কতি বা কেষাং প্রমাণম্ ইতি কস্ত বা কঃ সিদ্ধান্তঃ"—এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন,—কণাদ এবং গৌতম দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব—এই সাত প্রকার পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও সামান্য—এই চারিটী মাত্রই পদার্থ, ইহা তুতাত ভট্টের মত। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সংখ্যা, সমবায়, সাদৃশ্য, শক্তি—এই আটটী পদার্থ প্রভাকরের সম্মত। একদেশী মীমাংসক চন্দ্রের মতে এগারটী পদার্থ। তিনি পূর্ব্বোক্ত আটটী ব্যতীত উপচার, সংস্কার ও অন্ধকার—এই তিনটী পদার্থ অধিক স্বীকার করিয়া থাকেন। 'মহার্ণব'কারের মতে দ্বাদশ পদার্থ; তিনি আবার ঔপাদানিক নামক আর একটী অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন। প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুইটীই পদার্থ, মহত্ত্বাদি প্রকৃতির পরিণাম, ইহা সাংখ্যের মত। বেদান্তীর মতে একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক পদার্থ। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু—প্রত্যক্ষের বিষয় এই চারিটী মাত্রই পদার্থ, ইহা চার্ব্বাকের মত। ইহার পর শঙ্কর মিশ্র দার্শনিকগণের নানা অবান্তর মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

চতুর্থ উল্লাসে প্রশ্নখণ্ডনের রীতি লিখিত আছে। যদি কেহ প্রশ্ন করে, 'ঈশ্বরে কিং প্রমাণম্'—ঈশ্বরে প্রমাণ কি? তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তাকে বলিবে, ঈশ্বর-বিষয়ক প্রমাণ জানিয়া বা না জানিয়া তুমি এই প্রশ্ন করিলে? যদি তুমি ঈশ্বর বিষয়ক প্রমাণ জান, তাহা হইলে তোমার প্রশ্নই হইতে পারে না। কেন না, যে বিষয়ে জ্ঞান থাকে, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা সম্ভবপর নহে। জিজ্ঞাসার প্রতি জ্ঞান প্রতিবন্ধক। আর যদি ঈশ্বর-বিষয়ক প্রমাণ না জান, তাহা হইলেও প্রশ্ন করা অসম্ভব। অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে কোনও প্রকার প্রশ্নেরই অবকাশ থাকে না। এইভাবে প্রশ্ন-খণ্ডনের আরও অনেক উপায় অভিহিত হইয়াছে। শঙ্কর মিশ্র, "বাদিবিনোদের" পঞ্চম উল্লাসে, কি ভাবে সভারঞ্জন করিতে হইবে, তাহার রীতি দেখাইয়াছেন। এই উল্লাসেই গ্রন্থের সমাপ্তি। শঙ্কর মিশ্র স্বকৃত "বৈশেষিক সূত্রোপস্কারে" ও "কণাদ-রহস্যে" এই "বাদিবিনোদের" উল্লেখ করিয়াছেন (১)।

"কণাদ রহস্য" প্রশস্তপাদভাষ্য অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র বিবিধ বিপ্রতিপত্তি নিরাস পূর্ব্বক মহর্ষি কণাদের সম্মত সমস্ত পদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন। বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনার্থ গ্রন্থকার এই "কণাদ-রহস্যে" নানা প্রকার সুসঙ্গত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। জৈন দার্শনিকেরা এবং বৈয়াকরণেরা গুণ ও গুণীর অভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই মতে দোষ দেখাইবার জন্য শঙ্কর মিশ্র লিখিয়াছেন,—

'শুক্ল পট'—এইরূপ সামানাধিকরণ্যে প্রতীতি হয় বলিয়া রূপ এবং রূপবিশিষ্ট পটাদির অভেদ হউক, এ কথা বলিতে পার না। তাহা হইলে অন্ধেরও রূপ প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঘৃতাদি পার্থিব পদার্থ বা সুবর্ণাদি তৈজস দ্রব্য বর্ত্তমান থাকিলেও তদ্গত দ্রবত্ব গুণ নষ্ট হইতে দেখা যায়, দুইটী বস্তুর সংযোগ নষ্ট হইলেও বস্তুদ্বয় অব্যাহতভাবে থাকে; সুতরাং গুণ আর গুণী যে ভিন্ন, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। মতুপের লোপ, বা মত্বর্থীয় অব্ প্রত্যয়ের জন্যই 'শুক্লপট' এইরূপ সামানাধিকরণ্যে প্রতীতি হইয়া থাকে। অথবা 'গুণে শুক্লাদয়ঃ পুংসি গুণি লিঙ্গাস্তু তদ্বতি'—এই অভিধানানুসারে শুক্লাদি পদ নানার্থক,—গুণ ও গুণীর উভয়েরই বাচক; কাজেই 'শুক্লপট' এইরূপ অভেদ প্রতীতি অনুপপন্ন নহে।

"কণাদ-রহস্য" পাঠে আমরা আর একটা নূতন কথা জানিতে পারি। বাঙ্গালীরা যে দন্ত্য স ও মূর্দ্ধন্য ষ এক ভাবে উচ্চারণ করে, শঙ্কর মিশ্র অন্ধকারের বিচার প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন,—

(১) "অত্র চ বাদজল্পবিতণ্ডানাং প্রবৃত্তি প্রকার চ্ছল নাতিনিগ্রহ স্থানলক্ষণানি চ বাদিবিনোদেঽস্মেষ্টব্যানি"—উপস্কার, ৯।২।২

"অধিকং মণিময়ূখে বাদিবিনোদে চ দ্রাষ্টব্যম্।"—কণাদ-রহস্য ১,৩ পৃঃ

"বাদিবিনোদে কিরণাবলী নিরুক্তি প্রকাশে চ কৃতব্যুৎপাদন মেতৎ।"

—কণাদ-রহস্য, ১৭৭ পৃঃ।

"সমবায়োস্থিব সব্যবহারে জোড়ানাং"—কণাদ-রহস্য, ৪৮ পৃঃ।

শঙ্কর মিশ্র, বৈশেষিক দর্শনের স্বকৃত 'উপস্কার' টীকাতে একাধিকবার এই কণাদ-রহস্যের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন (২)।

বৈশেষিক সূত্রের ব্যাখ্যা 'উপস্কার' শঙ্কর মিশ্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই 'উপস্কারে' তিনি বৈশেষিক শাস্ত্র-সম্মত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে বহু নূতন কথাও জানিতে পারা যায়। "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ করা হইয়াছে—'শব্দেতরোদ্ভূত বিশেষ গুণানাশ্রয়ত্বে মতি জ্ঞান কারণ মনঃ সংযোগাশ্রয়ত্বম্'; কিন্তু শঙ্কর মিশ্র 'উপস্কারে' ইন্দ্রিয়ের আর একটী লঘু লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"ইন্দ্রিয়ত্বঞ্চ স্মৃত্যজনক জ্ঞান কারণ মনঃ সংযোগাশ্রয়ত্বম্।"

—উপস্কার, ৪।১।১

বৈশেষিক-মতে দুইটী পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক, তিনটী দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু—এই ভাবে ক্রমশঃ কার্য্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। অদ্বৈতবাদিগণ, এই মতে দোষ দেখাইবার জন্য বলিয়া থাকেন যে, উপাদানদ্বয়ের অংশবিশেষে সংযোগের দ্বারাই কার্য্য দ্রব্য উপচয় লাভ করে। পরমাণু নিরবচয়—তাহার অংশ নাই, কাজেই পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ কেমন করিয়া দ্ব্যণুকের উৎপাদক হইতে পারে? এই আপত্তির উদ্ধারের উদ্দেশ্যে—"অন্যতর কর্ম্মজ উভয় কর্ম্মজঃ সংযোগজশ্চ সংযোগঃ" (৭।২।৯)- এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন,—

"পরমাণু নিষ্ঠস্যাপি সংযোগস্য দিগাদয়োঽবচ্ছেদকাশ্চিন্তনীয়াঃ।"

কার্য্য-দ্রব্যের উৎপত্তির প্রতি যে কেবল অংশবিশেষাবচ্ছিন্ন সংযোগই নিয়ামক, তাহা নহে; দিগ্‌বিশেষাবচ্ছেদে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগের দ্বারাই দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়।

শঙ্কর মিশ্র এই 'উপস্কারে' বৈশেষিক মতের সমর্থনের জন্য নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত খণ্ডনেও পশ্চাৎপদ হন নাই। নৈয়ায়িকেরা সমবায় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন, বৈশেষিক-মতে সমবায় অতীন্দ্রিয় (৩)। "তত্ত্বম্ভাবেন" (৭।২।২৮)—এই সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শঙ্কর মিশ্র সমবায়ের অতীন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধির জন্য অনুমান রূপ প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"সমবায়োঽতীন্দ্রিয়ঃ আত্মান্যত্বে মতি অসমবেত ভাবত্বাৎ, মনোবৎ কালাদিবদ্ বা"—সমবায় অতীন্দ্রিয়, যেহেতু তাহা আত্মভিন্ন অসমবেত ভাব, যে ভাব পদার্থ আত্মভিন্ন হইয়া অসমবেত, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না; দৃষ্টান্ত মনঃ, কাল প্রভৃতি।

"খণ্ডন খণ্ড খাদ্যের" টীকাতেও শঙ্কর মিশ্র অত্যন্ত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। যদিও "খণ্ডনের" 'বিদ্যাসাগরী' প্রভৃতি অন্যান্য অনেক টীকা আছে, কিন্তু "খণ্ডনের" মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে 'শাঙ্করী' টীকাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শঙ্কর মিশ্র যে বহু দার্শনিক গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, "খণ্ডন খণ্ড খাদ্যের" তৎকৃত টীকার অনুশীলন করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই টীকাতে উদ্যোতকর, কুমারিল ভট্ট, উদয়নাচার্য্য প্রমুখ দার্শনিকগণের বিবিধ মত ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন (৪)। শঙ্কর মিশ্র, "খণ্ডন খণ্ড খাদ্যের" টীকা রচনা করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলেও, তিনি যে জীব ও ব্রহ্মের পারমার্থিক ভেদ স্বীকার করিতেন, তাঁহার "ভেদ প্রকাশ" গ্রন্থ-রচনাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি "বাদিবিনোদের" প্রথম উল্লাসের শেষে লিখিয়াছেন,—

"ভেদস্থাপনা ভেদ প্রকাশে চাস্মাভিঃ প্রপঞ্চিতা।"—(বাদিবিনোদ ৪৪ পৃঃ)

"ভ্রম বিষয় নিষেধবচ্চ প্রতিযোগিনঃ সর্ব্বথৈবাসিদ্ধ্যাপি ন কাচিৎ ক্ষতিঃ।"—ইত্যাদি 'খণ্ডন' গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও শঙ্কর মিশ্র স্বকৃত "ভেদ প্রকাশ" গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন (৫)। এই "ভেদ প্রকাশ" গ্রন্থ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা এম-এ মহোদয় "বাদিবিনোদের" ভূমিকায় "ভেদরত্ন" নামে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই গ্রন্থ "খণ্ডন খণ্ড খাদ্যের" খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছিল। তিনি ভূমিকায় এই গ্রন্থের প্রতিজ্ঞা শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন (৬)।

শঙ্কর মিশ্র "তত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থের "মণিময়ূখ" নামে এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। স্বকৃত "কণাদ-রহস্যে" তিনি এই "মণিময়ূখের" উল্লেখ করিয়াছেন (৭)। শঙ্কর মিশ্র কৃত "উপস্কারে"ও একাধিক-বার "মণিময়ূখের" নাম উল্লিখিত হইয়াছে (৮)।

---

(২) "কণাদ-রহস্যে ব্যুৎপাদিতং বিস্তরতঃ।"—উপস্কার, ২।২।১৬

"বিবৃতঞ্চৈতৎ কণাদ-রহস্যে।"—উপস্কার, ৭।১।১৬

(৩) "সমবায়স্য প্রত্যক্ষ বর্ণনং ন্যায়মতেন। বৈশেষিক মতে তু সমবায়োঽতীন্দ্রিয়ঃ।"—তর্ককৌমুদী, ৮ পৃঃ।

(৪) "এতচ্চাচার্য মতেন বার্ত্তিককার মতে তু প্রত্যভিজ্ঞাপি স্মৃতিজন্যা।"—খণ্ডন খণ্ড খাদ্য, ১৭৩ পৃঃ।

"ননু ভট্টেনাণু পরিমাণ তারতম্যং নেষ্যতে তেন ত্রুটেরেব নিরবয়বত্ব মহত্তোঽঙ্গীকারাৎ।"—"খণ্ডন খণ্ড খাদ্য", ৪৮৩ পৃঃ।

(৫) "ইত্যাদি বিস্তরঃ যদ্যপি ভেদ প্রকাশে, তথাপি জ্ঞানান্তর মপ্য প্রমেতি হৃদয়ম্।"—খণ্ডন খণ্ড খাদ্য, ৬১ পৃঃ।

(৬) "ভেদ রত্ন পরিত্রাণে তার্কিকা এব যামিকাঃ।
অতো বেদান্তিনঃ স্তেনান্ নিরস্যত্যেব শঙ্করঃ॥"

(৭) "অধিকং মণিময়ূখে বাদিবিনোদে চ গ্রাহ্যম্।"—কণাদ-রহস্য, ১০৩ পৃঃ।

(৮) "অবশিষ্টং ময়ূখে দ্রষ্টব্যম্।"—

"গ্রন্থ গৌরব ভয়াৎ প্রপঞ্চো ন কৃতো ময়ূখে বিস্তরোঽন্বেষ্টব্যঃ।"

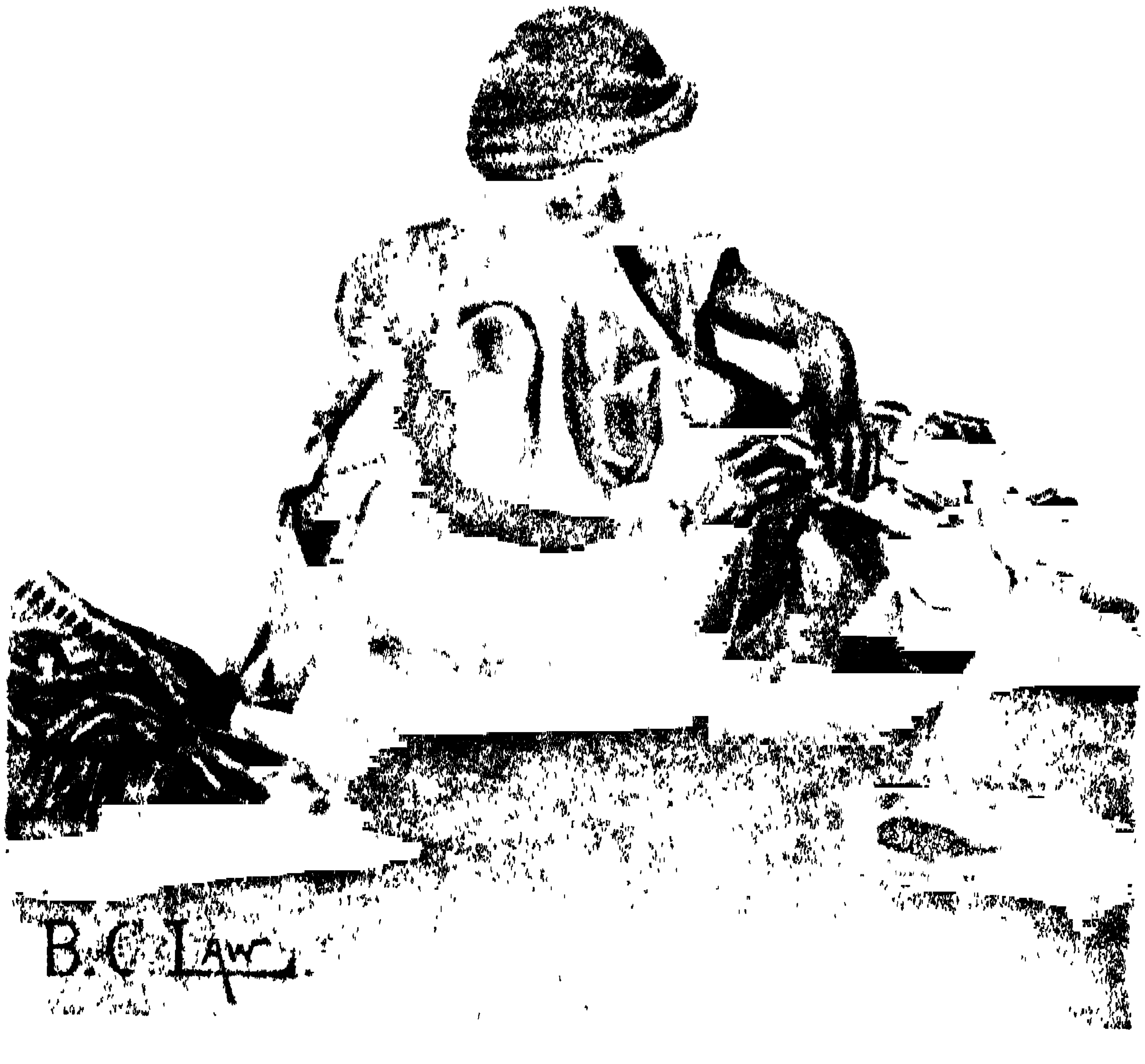

সাপুড়ে

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা

THE
Emerald Printing Works
CALCUTTA

"বাদিবিনোদে"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা মহোদয়, "অনেন নির্ম্মিতা গ্রন্থা যথা—" বলিয়া "অনুমান-ময়ূখ" নামে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের নাম "অনুমান ময়ূখ" নহে,—"মণি ময়ূখ"ই নাম। "কণাদ-রহস্যে" শঙ্কর মিশ্র নিজেই এই গ্রন্থের "মণি ময়ূখ" নামই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "প্রত্যক্ষ-ময়ূখ", "অনুমান-ময়ূখ" ইহা এক-এক খণ্ডের নাম। "তত্ত্বচিন্তামণি"র প্রত্যক্ষ-খণ্ডের টীকার নাম 'প্রত্যক্ষ-ময়ূখ', অনুমান-খণ্ডের টীকার নাম 'অনুমান-ময়ূখ'। সেই জন্যই "উপস্কার" গ্রন্থে 'প্রত্যক্ষ-ময়ূখ', 'অনুমান-ময়ূখ' এই ভাবে "মণি-ময়ূখে"র খণ্ডবিশেষের নামও অভিহিত হইয়াছে।

শঙ্কর মিশ্রের পিতার নাম ভবনাথ, মাতার নাম ভবানী। শঙ্কর মিশ্রের যে চারিখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থের শেষেই তিনি পিতার নাম এবং দুইখানি গ্রন্থের শেষে মাতার নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন (৯)।

উদয়নাচার্য্যকৃত "ন্যায়কুসুমাঞ্জলির" রামচন্দ্র সার্ব্বভৌমের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ যে টীকা আছে, তাহার প্রথমে –

"ভবানী ভবনাথাভ্যাং পিতৃভ্যাং প্রণমাম্যহম্।
যৎপ্রসাদাদিদং শাস্ত্রং করক্ষীরোপমং কৃতম্॥

এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্লোকে গ্রন্থকার ভবানী নাম্নী মাতা ও ভবনাথ নামক পিতাকে প্রণাম করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা এম-এ মহোদয়, "বাদি বিনোদের" ভূমিকায় শঙ্কর মিশ্র বিরচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে—"কুসুমাঞ্জলি-টীকা আমোদ-নাম্নী"—এই ভাবে এই টীকারও নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু "কুসুমাঞ্জলি"র এই টীকা রামচন্দ্রের প্রণীত বলিয়াই পণ্ডিত সমাজে চিরকাল প্রসিদ্ধ। এমন কি, আমাদের নিকটে দেড় শত বৎসরেরও পূর্ব্বে (১৬৮৩ শকাব্দে) লিখিত যে প্রাচীন টীকা-গ্রন্থ আছে, তাহার শেষে স্পষ্টই লিখিত আছে,—

"ইতি মহামহোপাধ্যায় রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিরচিতা ন্যায়কুসুমাঞ্জলি কারিকা ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

এই জন্য কেহ কেহ কল্পনা করিয়া থাকেন যে, রামভদ্রেরও পিতার নাম ভবনাথ ও মাতার নাম ভবানী ছিল। কিন্তু আমাদের নিকটেই বিভিন্ন লেখকের লিখিত আর দুইখানি অতি প্রাচীন অসম্পূর্ণ উক্ত টীকাগ্রন্থ আছে; তাহাতে "প্রমাণান্তরঞ্চ নাস্মদভি-মতং ন বা সম্ভবতি কিন্তাদেরভাবাদিতি।"—ইহার পরে লিখিত আছে,—"এতাবৎ শঙ্কর মিশ্র কৃতং ততঃ সার্ব্বভৌমীয়ম্।"—"এই পর্য্যন্ত শঙ্কর মিশ্রের কৃত, অতঃপর সার্ব্বভৌমের রচনা।" সুতরাং শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা'র অবধারণ ও বিদ্বৎসম্প্রদায়ের ধারাবাহিক প্রসিদ্ধি, উভয়েরই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইল।

"বাদিবিনোদ", "কণাদ রহস্য," "উপস্কার", "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য টীকা," "ভেদ প্রকাশ", "মণি-ময়ূখ" ও "ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি"র অসম্পূর্ণ টীকা ব্যতীত শঙ্কর মিশ্র 'আত্মতত্ত্ব-বিবেক টীকা' ও 'কিরণাবলী নিরুক্তি প্রকাশ' নামে আরও দুইখানি দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা শঙ্কর মিশ্র-কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থখানির নাম করেন নাই। কিন্তু শঙ্কর মিশ্র নিজেই "কণাদ-রহস্যে"র শেষে স্বকৃত "কিরণাবলী নিরুক্তি প্রকাশে"র নামোল্লেখ করিয়াছেন (১০)।

শঙ্কর মিশ্রের পিতা ভবনাথও নানাশাস্ত্রে অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। শঙ্কর মিশ্রের যে সমস্ত পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহার প্রত্যেক পুস্তকেই তিনি নিজের পিতার পাণ্ডিত্য ঘোষণা করিয়াছেন। "খণ্ডনের" 'শাঙ্করী টীকা'র প্রারম্ভে লিখিত আছে,—

"ভবনাথ সূক্তি গুম্ফনমিহ খণ্ডন খাদ্য টীকায়াম্।
শ্রীশঙ্করেণ বিদুষা বিদুষামানন্দবর্দ্ধনং ক্রিয়তে॥"
—(৩য় শ্লোক)

এমন কি, শঙ্কর মিশ্র, খণ্ডন খণ্ড খাদ্যের টীকার শেষে বলিয়াছেন, 'আমার পিতা ভবনাথ, নিজের ভ্রাতা জয়নাথকে খণ্ডনের যে ব্যাখ্যা বলিয়াছিলেন, সেই বিশদ ব্যাখ্যা আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি (১১)। "কণাদ-রহস্যে"র শেষেও তিনি বলিয়াছেন, 'আমার পিতা ভবনাথ, মহর্ষি কণাদের রচিত শাস্ত্রের যে সকল রহস্য উপদেশ করিয়াছিলেন,

---

"আত্মনি প্রমাণানি বহূনি গ্রন্থ গৌরবভিয়া ত্যক্তানি ময়ূখে দ্রষ্টব্যানি।"—

"ইতি ময়ূখে বিপঞ্চিতম্।"—

"সমবায়প্রতিবন্ধিঃ প্রত্যক্ষ-ময়ূখে মোচিত এবেত্যাস্তাদ্।"—
উপস্কার, ৭।২।২৬

"অনুমানময়ূখে বিস্তরোহত্রান্বেষ্টব্যঃ।"—উপস্কার, ৯।২।৫

(৯) "অকৃত ভবানীতনয়ো ভবনাথসুতো ভবার্চ্চনে নিরতঃ।
এতং কণাদসূত্রোপস্কারং শঙ্করঃ শ্রীমান্॥"—উপস্কার, ১০।২।৯

"মহর্ষেঃ শ্রীকণাদস্য রহস্যমতি নির্গতম্।
পিত্রা যদ্ ভবনাথেন স্ববেদি তদিহালিখম্॥—
কণাদ রহস্য, ১৭৭ পৃঃ।

"অকৃত ভবানীতনয়ো ভবনাথসুতো ভবার্চ্চনে ব্যগ্রঃ।
এতং বাদিবিনোদং জগদুপকারায় পরিকরঃ (শঙ্করঃ ?)
শ্রীমান্॥"—বাদিবিনোদ, ৭৩ পৃঃ।

"স্বভ্রাতুর্জ্জয়নাথস্য ব্যাখ্যামাখ্যাতবান্ যতঃ।
মৎপিতা ভবনাথোঽয়ং তামিহালিখমুজ্জ্বলাম্॥"—খণ্ডন খণ্ড খাদ্যের শাঙ্করী টীকা, ৭৩২ পৃঃ।

(১০) "কিরণাবলী নিরুক্তি প্রকাশে চ কৃতব্যুৎপাদনমেতৎ।"
—কণাদ-রহস্য, ১৭৭ পৃঃ।

(১১) "স্বভ্রাতুর্জ্জয়নাথস্য ব্যাখ্যামাখ্যাতবান্ যতঃ।
মৎপিতা ভবনাথোঽয়ং তামিহালিখমুজ্জ্বলাম্॥"
—শাঙ্করী টীকা, ৭৩২ পৃঃ।

তাহাই আমি এই গ্রন্থে লিখিয়াছি' (১২)। আর কুসুমাঞ্জলির টীকার প্রথমেও শঙ্কর মিশ্র, পিতারই কৃতিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন (১৩)। শঙ্কর মিশ্র পিতার ছাত্রও ছিলেন। "উপস্কারে"র প্রারম্ভের দ্বিতীয় শ্লোক দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, শঙ্কর মিশ্র ভবনাথের নিকটে অধ্যয়ন করিয়া, বৈশেষিক শাস্ত্রে সম্যগ্ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। শ্লোকটী এই,—

"যাভ্যাং বৈশেষিকে তন্ত্রে সম্যগ্ ব্যুৎপাদিতোঽস্ম্যহম্।
কণাদ ভবনাথাভ্যাং তাভ্যাং মম নমঃ সদা ॥"

এই শ্লোকে কণাদের নাম দেখিয়া অনেকে বলেন যে, শঙ্কর মিশ্র কণাদেরও শিষ্য ছিলেন। এই কণাদ সমগ্র "তত্ত্বচিন্তামণি"র টীকাকার প্রসিদ্ধ নব্য নৈয়ায়িক মথুরানাথ তর্কবাগীশের ছাত্র। কণাদের প্রকৃত নাম রঘুদেব ভট্টাচার্য্য। ইনি 'অভিনব কণাদ' নামেই অধিক বিখ্যাত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মথুরানাথ কৃত "তত্ত্বচিন্তামণি"র টীকার মধ্যে 'অবয়ব' প্রকরণের টীকা এই কণাদেরই লিখিত। ইনি বৈশেষিক শাস্ত্রানুসারে "ভাষারত্ন" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আমাদের নিকটে এই গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিপি আছে। গ্রন্থের প্রথম শ্লোক এইরূপ, --

"চূড়ামণিপদাম্ভোজ ভ্রমরীভূত মৌলিনা।
সংক্ষিপ্য শ্রীকণাদেন ভাষারত্নং বিতন্যতে ॥"

এই কণাদ বা রঘুদেব, "তর্কবাদার্থমঞ্জরী" নামক আর একখানি গ্রন্থও যে রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ "ভাষারত্নে"ই পাওয়া যায় (১৪)। এই "ভাষারত্নে" একাধিকবার 'দীধিতি'কার রঘুনাথ শিরোমণির নামও উল্লিখিত হইয়াছে (১৫)।

পক্ষান্তরে ইহাও বলা যায় যে, "যাভ্যাং বৈশেষিকে তন্ত্রে" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে শঙ্কর মিশ্র বৈশেষিক শাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি কণাদকেই নমস্কার করিয়াছেন। অধ্যাপকের ন্যায় শাস্ত্র রচয়িতাও ব্যুৎপাদনের কর্ত্তা। সেই জন্য শাস্ত্রকারদিগকেও অধ্যাপক বলিয়া ব্যবহার করা হয়। "প্রামাণ্যবাদে"র 'দীধিতি'র প্রারম্ভে রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়দর্শনকার মুনিপ্রবর গৌতমের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"ন চানধিকারিণঃ শূদ্রাদীন্ ধ্যাপয়াম্বভূব প্রথমো মুনীনাং যেনা-শক্যোতাপি প্রত্যবায়স্তস্য। ন চানধিকারিণাং শাস্ত্রাবলোকনেনার্থা-বগমে প্রত্যবয়ন্তি প্রণেতারঃ শাস্ত্রাণাম্।"

—প্রামাণ্যবাদ-দীধিতি, ৪-৫ পৃঃ।

শঙ্কর মিশ্রের সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী মৈথিল সমাজে প্রচলিত আছে। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা এম-এ মহোদয় নিজেকে এই শঙ্কর মিশ্রের অধস্তন দশম পুরুষ বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি বলেন, দ্বারভাঙ্গার আট ক্রোশ পূর্ব্বে 'সরিসব' গ্রামে শঙ্কর মিশ্রের বাস ছিল। তিনি 'সিংহাসময়' নামক উচ্চ মৈথিল ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্ম সময়ে গ্রামস্থ চর্ম্মকারের গৃহে সহসা ভেরী শব্দায়মান হইয়া কোনও মহাপুরুষের জন্মের সূচনা করিয়াছিল। এই চর্ম্মকারের পত্নীই শঙ্কর মিশ্রের জন্মকালে ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছিল। শঙ্করের মাতা ভবানী সে সময়ে এই ধাত্রীকে কিছু দিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমার পুত্র বড় হইয়া প্রথম যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা তোমারই হইবে।"

শঙ্কর মিশ্র, বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত প্রতিভাশালী। একবার তদ্দেশীয় রাজা ভ্রমণে বহির্গত হইয়া শঙ্কর মিশ্রদের গ্রামে শিবির-স্থাপনপূর্ব্বক রাত্রিবাস করেন। শৈশবসুলভ কৌতূহলবশতঃ অন্যান্য বালকের সঙ্গে শঙ্কর মিশ্রও রাজা দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন শঙ্করের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসরমাত্র। রাজা এই প্রিয়দর্শন বালকটীকে দেখিয়া বলেন, "একটী শ্লোক শুনাও ত।" বালক রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "আমার নিজের বা অন্যের রচিত শ্লোক শুনাইব ?" রাজা বলিলেন, "তুমিও কি শ্লোক রচনা করিতে পার ?" বালক শ্লোকেই উত্তর দিল,—

"বালোঽহং জগদানন্দ ন মে বালা সরস্বতী।
অপূর্ণে পঞ্চমে বর্ষে বর্ণয়ামি জগৎত্রয়ম্ ॥"

[হে প্রজানন্দবর্দ্ধন, আমি বালক, কিন্তু আমার বিদ্যা বালিকা নহে। পঞ্চম বর্ষ পূর্ণ না হইতেই আমি ত্রিভুবন বর্ণনা করি।]

রাজা মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,—"নিজের এবং অন্যের লেখা মিলাইয়া একটী শ্লোক পড়।" বালক শঙ্কর, বৈদিক পুরুষ-সূক্তের দুই চরণ লইয়া পূর্ণ করিল,—

"চলিতশ্চকিতশ্ছন্নঃ প্রয়াণে তব ভূপতে।
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥"

[হে রাজন্, আপনি যখন যুদ্ধার্থ অভিযান করেন, তখন বিপুল সৈন্যবাহিনীর পদভরে সহস্রশীর্ষ অনন্ত বিচলিত হইয়া উঠে, অসামান্য ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া সহস্রাক্ষ ইন্দ্র ভীত হইয়া পড়ে এবং অশ্বখুরোত্থিত ধূলিরাশিতে সহস্রপাৎ (সহস্রকিরণ) সূর্য্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়।]

রাজা বালকের শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বালককে বলিলেন, "তুমি নিজে যত স্বর্ণমুদ্রা বহিয়া লইয়া যাইতে পার, আমার ভাণ্ডার হইতে লইয়া যাও।" বালক, বহু স্বর্ণমুদ্রা লইয়া গৃহে ফিরিল। বাড়ী আসিলে মাতা ভবানী শঙ্করকে বলিলেন, "তোমার

(১২) "মহর্ষেঃ শ্রীকণাদস্য রহস্যমতি নির্গতম্।
পিত্রা যদ্ ভবনাথেন ন্যবেদি তদিহালিখম্ ॥"

—কণাদ-রহস্য, ১৭৭ পৃঃ।

(১৩) "মকরন্দে প্রকাশে যা ব্যাখ্যা পরিমলেঽথবা।
ততোঽধিকাং পিতুর্ব্যাখ্যামাখ্যাতুময়মুদ্যমঃ ॥"

—৩য় শ্লোক।

(১৪) "অতিবিস্তরস্তু অস্মাকং তর্কবাদার্থ মঞ্জর্য্যামনুসন্ধেয়ঃ।"

১২শ পত্র।

(১৫) "দীধিতিকৃতস্তু ত্রসরেণু পর্য্যন্তং জলত্বজাতিঃ প্রত্যক্ষ সিদ্ধৈবে —ইতি প্রাহুঃ।"

"দীধিতিকৃন্মতে তু পরমাত্মনো নবগুণাশ্রেনাথ্য নিত্যসুখ স্বীকারাৎ।"

জন্ম সময়ে আমি ধাত্রীর নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তুমি যাহা প্রথম উপার্জ্জন করিবে, সেই ধন তাহাকেই দিব।” তখন শঙ্করের মাতা সেই চর্ম্মকার-পত্নীকে ডাকিয়া সমস্ত সুবর্ণমুদ্রা অর্পণ করিলেন।

শঙ্কর মিশ্রের মাতা ও পিতা উভয়েই অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও নির্লোভ ছিলেন। শঙ্করের পিতা ভবনাথ এমন অযাচিত ব্রত ছিলেন যে, কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন নাই। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার দ্বারা প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিয়া ভবনাথ পরিশেষে মনোরম জাহ্নবীতটে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন,—ইহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়;—

“অধীতমধ্যাপিত মার্জ্জিতং যশো
ন শোচনীয়ং কিমপীহ ভূতলে।
অতঃপরং শ্রীভবনাথ শর্ম্মণো
মনো মনোহারিণি জাহ্নবীতটে।”

শঙ্কর মিশ্রও নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি নিজে বাটার দক্ষিণ অংশে সিদ্ধেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্ত্তি অদ্যাপি গ্রাম্য দেবতারূপে পূজিত হইয়া থাকেন। শঙ্কর মিশ্র যে অত্যন্ত শিবভক্ত ছিলেন, তাহা তৎকৃত গ্রন্থ সমূহের মঙ্গলাচরণ শ্লোকাদি পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায় (১৬)। কিন্তু তিনি বিষ্ণুদ্বেষী শৈব ছিলেন না। শঙ্কর মিশ্র, “খণ্ডন খণ্ড খাদ্য” টীকার সর্ব্বপ্রথমে যে মঙ্গলাচরণ শ্লোক নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, তিনি বিষ্ণু ও শিবকে অভিন্ন মনে করিতেন (১৭)।

শঙ্কর মিশ্র স্বীয় বাসভূমির পূর্ব্বভাগে এক জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। অদ্যাপি মিথিলাবাসীরা এই জলাশয়ের চতুষ্পার্শবর্ত্তী উচ্চ ভূমিকে শঙ্কর মিশ্রের বাসস্থান বলিয়া পরিচয় দেয়। এই জলাশয়েরই পূর্ব্বাংশে শঙ্কর মিশ্রের চতুষ্পাঠী ছিল। শঙ্কর মিশ্র বহু ছাত্রের অধ্যাপনা করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রের সংখ্যা এতই অধিক ছিল যে, তাহারা এক রাত্রিতে সমস্ত হরিবংশ পুরাণ লিখিয়া ফেলিয়াছিল। এই পুঁথি এখনও নষ্ট হয় নাই। পুস্তকের শেষেই পুঁথি লিখিবার এই ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে। শঙ্কর মিশ্রের যে বিরাট্ ছাত্রসম্প্রদায় ছিল, তাহা তৎকৃত “উপস্কারের” অন্তিম শ্লোক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় (১৮)।

যে স্থানে শঙ্কর মিশ্র অধ্যাপনা করিতেন, বহু বিদ্যার্থিগণের অধ্যুষিত সেই পবিত্র ভূমিতে স্বর্গীয় দ্বারবঙ্গাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহের জ্যেষ্ঠা মহিষী একটা সংস্কৃত বিদ্যালয় ও একটা ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন।

শঙ্কর মিশ্র কবিত্বশক্তিতেও যে প্রশংসার্হ ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থ সমূহের মঙ্গলাচরণাদির শ্লোক দেখিলেই তাহা অনুভূত হয়। তিনি “রসার্ণব” ও “গৌরী প্রহসন” নামে দুইখানি সাহিত্য-গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। “রসার্ণব” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র রাজা পুরুষোত্তমকে সম্বোধন করিয়া একটা কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই পুরুষোত্তম (অপর নাম গরুড়নারায়ণ) ১৫৮৫ সম্বতের (১৫২৮ খৃঃ) পর মিথিলারাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন, ইহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর পণ্ডিতের মত। সুতরাং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীই শঙ্কর মিশ্রের সময় বলিয়া অবধারিত হয়।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় গ্রীক সংস্পর্শ

[শ্রীসুধাংশুমোহন দাসগুপ্ত]

মহাবীর সেকেন্দার সাহের পঞ্জাব আক্রমণ ভারতবর্ষে গ্রীক উপনিবেশ স্থাপনে কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য প্রদান করে নাই। যখন সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সেকেন্দার সাহ পারস্যপথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন হয় ত তাঁহার মনে হইয়াছিল, হাইডাস্‌পাস্-তটে (খৃঃ পূঃ ৩২৬) তাঁহার দিগ্বিজয়ী সেনাবাহিনীর একমাত্র বাধা-

---

(১৬) “জয়তি রতিবিলাসে সাজসঃ শঙ্করস্য
স্মরনিগড়নিবদ্ধা কাঞ্চনী শৈলপুত্র্যাঃ।
সরলকালকালী ভূতভূতেশকণ্ঠ
স্থলজলধরবিদ্যুদ্বিভ্রমা বাহুবল্লী॥”
—বাদিবিনোদ ও কণাদ রহস্যের মঙ্গলাচরণ।
“ঊর্দ্ধবদ্ধজটাজূট ক্রোড়ক্রীড়ৎসুরাপগম্।
নমামি যামিনীকান্তকান্তজ্বলস্থলংহরম্॥”
—উপস্কারের মঙ্গলাচরণ।
“অকৃত ভবানীতনয়ো ভবনাথসুতো ভবার্চ্চনে ব্যগ্রঃ।”
বাদিবিনোদের অন্তিম শ্লোকাংশ।
“——ভবার্চ্চনে নিরতঃ।”—উপস্কারের উপান্ত্য শ্লোকাংশ।
“বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়সন্নিপাতেঽপ্যভেদ এবেতি বিভাবয়দ্ভম।
পুনাতু ভেদপ্রতিভামশূন্যং স্ত্রীপুংসরূপং শিবয়োঃ শরীরম॥”
খণ্ডন টীকার মঙ্গলাচরণ।
“আমোদৈঃ পরিতোষিতাঃ পরিষদঃ প্রত্যেকমাশাগতাঃ
সান্দ্রৈঃ পিঞ্জরিতাঃ পরাগপটলৈরাশাবকাশা দশ।
আহূতা মকরন্দ বিন্দুনিকরৈঃ পুষ্পন্ধয় শ্রেণয়ো
যেনাহুায় স বঃ পুনাতু নটতঃ শম্ভোঃ প্রসূনাঞ্জলিঃ॥”
কুসুমাঞ্জলি টীকার মঙ্গলাচরণ।

(১৭) “হরিশঙ্করয়োঃ সিতাসিতং ভুজগারাতি ভুজঙ্গলাঞ্ছনম।
বপুরস্তু মুদে বিরুদ্ধয়োরপি সংসর্গিন ভিন্নতা গতম্॥”

(১৮) “প্রাণাস্পদং যদ্যপি নেতরেষা
মিয়ং কৃতিঃ স্যাদুপহাসযোগ্যা।
তথাপি শিষ্যৈর্গুরু গৌরবেণ
পরঃ সহস্রৈঃ সমুপাসনীয়া॥”

প্রদানকারী হিন্দু সম্রাট তক্ষশিলাধিপতি পুরুকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্য বিফল হইল। কোনও পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে এই বিজয়ী ম্যাসিডন বীর এবং পঞ্চনদতীরে তাঁহার অদ্ভুত বিজয়-কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি প্রচলিত কিম্বদন্তীর অন্তর্গত বিয়াসনদতটে তাঁহার স্থাপিত দ্বাদশটি বৃহৎ বেদিকার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

সেকেন্দার সাহের আক্রমণ বস্তুতঃই ভারত-ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ঘটনা; কারণ ইহা হইতেই য়ুরোপ এবং এসিয়ার দুইটী পুরাতন সভ্যতা পরস্পরের সান্নিধ্যে বিকশিত হইবার প্রয়াস পাইয়াছে। এই যুগ হইতেই ভারতীয় সভ্যতার কি কলা, কি বিজ্ঞান সকল বিভাগেই গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সেকেন্দার সাহের মৃত্যুর পর সেলুকস্ নিকেটর (Seleucus Nicator) তদীয় এসিয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হন। তৎকাল ভারতবর্ষে মৌর্য্যবংশীয়গণ তাঁহাদের ভাগীরথীতটবর্ত্তী রাজধানী পাটলীপুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) নগরে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। গ্রীক্ লেখকগণ কর্ত্তৃক পাটলীপুত্র "প্যালিবোথরা" (Palibothra) নামে উক্ত হইয়াছে। এই স্থানেই গ্রীক দর্পচূর্ণকারী মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস্ নামক জনৈক গ্রীক দূত সেলুকসের প্রতিভূ স্বরূপে অবস্থান করেন। মেগাস্থিনিস লিখিত চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বর্ণনা নামক পুস্তকখানি যদিও বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি অন্যান্য পুস্তকে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়।

চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট অশোক ভারতের নানা স্থানে স্তম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক তদগাত্রে বুদ্ধবাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত ত্রয়োদশ সংখ্যক স্তম্ভগাত্রে লিখিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভারতের বহির্ভাগেও বুদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ইচ্ছা তাঁহার ছিল। উক্ত লিপিতে লিখিত ছিল যে, "এই বিজয় দ্বারা পবিত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরও জয়সাধন হইল। ছয়শত যোজন বিস্তৃত পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ, যোনরাজ (Yonas) এন্টিয়োকা (Antiyoka), রাজা টুরুমায়া (Turumaya), অ্যান্টিকিনি (Antikini), মাকা (Maka) এবং এলিকসুদ্র (Alikasudra) প্রভৃতি নৃপতির সাম্রাজ্যেও ইহা বলবতী থাকিবে। উল্লিখিত পঞ্চ নৃপতি বোধ হয় সিরিয়াধিপতি দ্বিতীয় এন্টিয়োকাস (Antiochus), মিশরাধিপতি দ্বিতীয় টলেমি (Ptolemy), ম্যাসিডন ভূপতি এন্টিগোনাস গোনাটাস্ (Antigonus Gonatus), সিরিনাধিপতি ম্যাগাস্ (Magas of Cyrene) এবং এপিরাসাধিপতি আলেকসান্দর। এই সমুদয় নৃপতির উল্লেখ হেতু অশোকের রাজত্ব কাল খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দ বলিয়া অনুমিত হয়। এই কাল-নির্দ্ধারণ ভারত-ইতিহাসের অতি প্রয়োজনীয় ঘটনা।

এই ঘটনার সমসাময়িক অব্দে ব্যাকট্রিয়ার প্রাচীন সাট্রাপিক্-বংশ (Satrapy of Bactria) সেলুসিডান-সাম্রাজ্যের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে এবং ডাইওডোটাস্ (Diodotus) নামক জনৈক নৃপতির অধীনতায় স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করে। প্রায় দুই শতাব্দীকাল এই সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহারা প্রায়শঃই উত্তর-ভারতে আগমন করিত। বিশেষতঃ গ্রীকো ব্যাকট্রিয়ান (Graeco-Bactrian) নৃপতি ডেমেট্রাস্ (Demetrius) পঞ্জাব পর্য্যন্ত স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তদীয় মুদ্রা মধ্যে হস্তিশুণ্ডবৎ সর্প-চিহ্ন দর্শনে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি হৃদয় মধ্যে সমগ্র ভারত-জয়ের আশা পোষণ করিতেন।

এতদসম্বন্ধীয় একটী স্তম্ভ গোয়ালিয়রের অন্তঃপাতী 'বেজনগরে' পরিদৃষ্ট হয়। এই স্তম্ভ হেলিওডোরাস নামক জনৈক কৃষ্ণভক্ত তক্ষশীলার নৃপতি এন্সিয়ালসিডাস (Antialcidas) কর্ত্তৃক "ভগলভদ্র" নামক নৃপতির সভায় প্রেরিত গ্রীক দূত কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। এন্সিয়ালসিডাসের মুদ্রা দর্শনে অনুমিত হয় যে, তিনি উত্তর-ভারত-শাসনকারী গ্রীকো-ব্যাকট্রিয়ান নৃপতিগণের অন্যতম এবং তদীয় রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দ। বেজনগরের স্তম্ভলিপি পাঠে অনুমিত হয় যে, ঐ সকল বৈদেশিক নৃপতিগণ মধ্যভারতেও স্ব স্ব ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রয়াস পাইতেন। মিনাণ্ডারের অধীন গ্রীকশক্তি ভারতবর্ষে উচ্চতার শ্রেষ্ঠ সোপানে অধিষ্ঠান করে। এই মিনাণ্ডার মিলিণ্ডা আখ্যায় একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে পরিচিত এবং বুদ্ধ-ভক্ত রূপে উক্ত হইয়াছেন।

খৃঃ পূঃ ৫০ অব্দে উত্তর ভারতে গ্রীকো-ব্যাকট্রিয়ান সাম্রাজ্যের শাসন শেষ হয় এবং সিথিয়ান বংশ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি কনিষ্ক এবং বৌদ্ধ জগতে তিনি সম্রাট অশোকের নিম্নেই স্থান প্রাপ্ত হন।

তাঁহার রাজধানী পেশোয়ার নগরে তিনি একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেই মন্দির হইতে গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধের দন্ত, নখ, কেশ প্রভৃতি স্মারক চিহ্নসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎসমুদয় মাণ্ডালয় নগরে প্রেরিত হইয়াছে। শুধু ব্রোঞ্জধাতু নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র পেটিকা পেশোয়ার নগরের যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। ১ম খৃষ্টাব্দেই কনিষ্ক প্রবল প্রতাপান্বিত হন এবং ইহা লইয়াই বর্ত্তমান কালে ঐতিহাসিক এবং পুরাতত্ত্ববিদগণের মধ্যে বহু আলোচনা ও মতভেদ প্রভৃতি চলিতেছে।

ভারতীয় সভ্যতায় গ্রীক সংস্পর্শ পুরাতন মুদ্রাসমূহ দ্বারা প্রকটিত হয়। ইউথাইডেমাস্ (Euthydemus) এবং ইউক্রেটিডেস্ (Eucratides) প্রভৃতি নৃপতিগণের মুদ্রা সম্পূর্ণরূপে পুরাতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিষয়। তাহাদের একপার্শ্বে সম্রাটের অর্দ্ধপ্রতিকৃতি (Bust); তদুপরি একটী কবিতায় তিনি রাজাধিরাজ (Basilens Casilaon) আখ্যায় উক্ত হইয়াছেন এবং অপর পার্শ্বে জুসএথেন (Zeus Athene) পোসিডন (Poseidon বরুণ), হারকিউলস্ (Hercules) প্রভৃতি গ্রীক দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত।

শেষোক্ত নৃপতিগণের মুদ্রা মধ্যে ভারতসংস্পর্শ পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে গ্রীক্ এবং খারোশিথি (Kharosithi), উত্তর ভাষাতেই কবিতা লিখিত হইত; এবং এই শেষোক্ত ভাষাই তৎকালে উত্তর-ভারতের

সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। এই প্রকার মুদ্রাই জেমস্ প্রিন্সেপকে (James Princep) উক্ত ভাষা পাঠে বহু সাহায্য করিয়াছিল।

কনিষ্কের মুদ্রায় ভারতীয় প্রভাব বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তাহার এক পৃষ্ঠে হেলা (Hela) প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতিমূর্তি ব্যতীত ইরাণ দেশীয় এবং ভারতীয় দেবতার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। কিন্তু মুদ্রায় উৎকীর্ণ অক্ষরগুলি গ্রীকভাষায় লিখিত ছিল। কনিষ্কের মুদ্রায় বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি এবং গ্রীক অক্ষরে লিখিত "বোধো" শব্দ অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বোধ হয় গ্রীকেরাই মুদ্রাসমূহে অক্ষর লিখন প্রথার প্রথম পথ প্রদর্শক। গ্রিকো-ব্যাকট্রিয়ান যুগের পূর্ববর্ত্তী মুদ্রা সচরাচর চতুষ্কোণ হইত এবং তন্মধ্যে দু' একটা সামান্য দাগ ভিন্ন অপর কিছুই থাকিত না। বোধ হয় গ্রীক শব্দ "ড্রাক্‌মার" অপভ্রংশ "দ্রামা" হইয়া মোগল যুগের "দাম" নামক তাম্রমুদ্রার প্রচলন হইয়াছে।

শুদ্ধ মুদ্রা ব্যাপারেই গ্রীক্ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। স্থাপত্যেও ইহার প্রভাব সম্যক পরিদৃষ্ট হয়। সারনাথের সিংহদ্বারযুক্ত প্রাসাদ বোধ হয় কোন মৌর্য্য নৃপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত গ্রীক স্থপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। গান্ধার প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ হর্ম্ম্যসমূহে গ্রীক স্থাপত্য-কৌশল সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এককালে গান্ধার বৌদ্ধদের পীঠ ছিল। তত্রত্য হর্ম্ম্যরাজি দর্শনে অনুমিত হয় যে, তৎকালে গ্রীক ভাস্করগণ নিশ্চয়ই মন্দির, মঠ প্রভৃতির নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

গান্ধারস্থিত ভাস্কর্য্যের কোন-কোন স্থলে বিষ্ণু-বাহন গরুড় কর্ত্তৃক ধৃত নাগমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বোধ হয় জুস্ দেবতা কর্ত্তৃক ধৃত গ্যানিমেডের প্রতি অত্যাচারের অনুরূপ করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে।

কিন্তু মধ্যভারতের সাঁচী প্রভৃতি নগরস্থিত স্তূপসমূহে অঙ্কিত বুদ্ধদেবের জীবন ঘটনার প্রতিচ্ছবিসমূহ হইতে গ্রীকো ব্যাকট্রিয়ান কলাবিদ্‌গণকর্ত্তৃক অঙ্কিত প্রতিচ্ছবিগুলির বিভিন্নতা যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। সাঁচীতে প্রাপ্ত প্রতিমূর্তিগুলি এমন অস্পষ্ট ঘটনাবলী লইয়া অঙ্কিত হইয়াছে, যে, তাহা হইতে প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু গান্ধারে প্রাপ্ত প্রতিমূর্তি হইতে বুদ্ধ-জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই সহজে উপলব্ধি হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতীয় সম্রাট্‌গণকর্ত্তৃক স্থাপিত পুরাতন স্তম্ভসমূহে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না; কেবল বোধিদ্রুম, বুদ্ধদেবের চরণ-রেখা কিংবা অন্য কোন প্রকার বিশেষ চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু গান্ধারস্থিত গ্রীকো বৌদ্ধ কলাসমূহে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে, উত্তর পশ্চিম ভারতের হেলিনিষ্টিক ভাস্করগণই বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি প্রথম অঙ্কিত করে। তদীয় পরিধেয় বস্ত্র এবং শিরোবেষ্টনী স্বর্গীয় আভা প্রতীচ্যের প্রভাবেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

প্রথম শতাব্দীতে গান্ধারস্থিত গ্রিকো-বৌদ্ধ প্রভাব অত্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হয়; এবং সেই সময় হইতেই ভারতের এবং নিকটবর্ত্তী রাজ্যসমূহের কলা, সাহিত্য প্রভৃতি সমস্ত বিভাগেই গ্রীক্ প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই সময়ে মথুরায় শিল্প-বিদ্যালয় উন্নতির শীর্ষস্থানে অবস্থান করে; কিন্তু উহাও সম্পূর্ণরূপে গ্রীক্ প্রভাবশূন্য নহে।

কনিষ্ক এবং তাহার পরবর্ত্তী কয়েকজন সম্রাটের রাজত্বের পর ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে গ্রীকো বৌদ্ধ প্রভাবের অবনতি ঘটে। কিন্তু মধ্যভারত এবং অন্যান্য স্থানে ভাস্কর্য্য এবং চিত্রচর্য্যা ইহার প্রভাবাপন্ন হইয়া তাহাতে গ্রীক প্রভাবের মাত্রা প্রদান করিতে থাকে। কিন্তু ঐ সমুদয় ভাস্কর্য্যে গ্রীক প্রভাবের সহিত ভারতীয় প্রভাবের পাশাপাশি মিলন অতীব বিস্ময়কর, কারণ উহা দেখিলেই দুইটা বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সভ্যতার মিলন আদিম অবস্থার কি প্রকার উন্নতি হয় তাহা অনুমান করা যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সমুদয় কলা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল অজন্তা গুহায় প্রাপ্ত চিত্রগুলিই অবশিষ্ট রহিয়াছে। ঐ সমুদয় সম্ভবতঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে জেমস্ ফারগুসনের ন্যায় একজন বিশেষজ্ঞের মত এই যে, গ্রীকরাই ভারতে প্রস্তর দ্বারা প্রাসাদ নির্ম্মাণ-প্রণালীর সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক। কিন্তু বর্ত্তমান কালের আবিষ্কারসমূহের ফলে এ মতের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা অসম্ভব। গান্ধার প্রভৃতি নগরস্থিত প্রাচীন হর্ম্ম্যসমূহে যদিও প্রতীচ্য প্রভাব অল্পই পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি প্রকৃত ভারতীয় ভাস্কর্য্য হইতে তাহা কতকাংশে বিভিন্ন। কাশ্মীরের প্রাচীন মন্দিরসমূহও গান্ধারস্থিত অট্টালিকাসমূহের অনুরূপ।

জেনারেল সার এলেকজাণ্ডার কানিংহাম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত তক্ষশিলাস্থিত স্তম্ভসমূহে কিন্তু গ্রীক প্রভাব একেবারেই দৃষ্ট হয় না। ঐ সকল স্তম্ভে ভাস্কর্য্য চাতুর্য্য কিঞ্চিন্মাত্রও নাই, উহারা কেবল বাহ্য চটকে পরিপূর্ণ।

কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত "টেরাকোটা" এবং "জেম" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তিসমূহে গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যদিও ঐ সমুদয়ের অধিকাংশ বুদ্ধদেব সম্বন্ধীয়, তথাপি তন্মধ্যে গ্রীক দেবতার মূর্ত্তি স্থলে স্থলে পরিদৃষ্ট হয়। পেশোয়ারে প্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত ধাতুনির্ম্মিত পেটিকার উপরে গ্রীকদেবতা কিউপিডের (Cupid মদন) মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

ভাস্কর্য্যের অনুপাতে প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় গ্রীক সংস্পর্শ অতি অল্প। শুধু নাট্যকলাতেই এই প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি হয়। অধ্যাপক ভেবরের মতে ভারতীয় প্রাচীন নাটকসমূহে বিদূষক, রাজ-শ্যালক, প্রেমিকযুগল প্রভৃতির আবির্ভাব গ্রীসের সর্ব্বপ্রথম নাট্যকার মিনাণ্ডারের মিলনান্ত নাটকসমূহ হইতে গৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক ভেবর একমাত্র "মৃচ্ছকটিক" নাটক পাঠ করিয়াই এইরূপ ধারণা করিয়াছিলেন। অবশ্য এই নাটকখানিই ভারতীয় সর্ব্বপ্রথম নাটক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ও স্বীকৃত। কিন্তু কালিদাস, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি প্রভৃতি পরবর্ত্তী নাটককারগণের নাটকে গ্রীক প্রভাব একেবারেই পরিলক্ষিত হয় না।

ডাক্তার থিয়োডোর ব্লক (Theodore Bloch) কর্ত্তৃক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাস্কর্য্যের একটা আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। "রামগড় পাহাড় এবং তত্রত্য গুহাসমূহ" নামক তাঁহার একটি প্রবন্ধে তিনি "সীতাবেঙ্গা" নামক একটী গুহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গুহার সম্মুখস্থ নাট মন্দির এবং তন্মধ্যস্থ অর্দ্ধগোলাকৃতি উপবেশন-যোগ্য আসনসমূহ গ্রীক নাট্যশালার অনুরূপেই গঠিত হইয়াছে। গুহামধ্যস্থ লিপি পাঠে তিনি আরও অবগত হইয়াছেন যে, ঐ গুহাতে সংসারত্যাগী বিলাসবাসনাশূন্য, কামহীন যোগিগণ ভগবদারাধনায় দিনাতিপাত করিতেন। সেই স্থানে কবিগণ কবিতা পাঠে, প্রণয়ী প্রণয় সঙ্গীতে এবং নটগণ নাট্যকলার উৎকর্ষ সাধন করিয়া প্রাতঃ দেবীর মনোরঞ্জন করিতেন। প্রাচীনতম নাটকসমূহ হইতেই "যবনিকা"র ব্যবহার বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বোধ হয় এই "যবনিকা" শব্দ গ্রীক "অভন" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বিজ্ঞানের বহু বিভাগ বিশেষতঃ জ্যোতিষ, ভেষজ্যশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন ভারত গ্রীসের নিকট ঋণী। কয়েকটি উদাহরণ হইতে তাহার উপলব্ধি হইবে।

প্রাচীন ভারতের ভৈষজ্যশাস্ত্র "আয়ুর্ব্বেদ মানব-জীবনের চারিটি বিভিন্ন অবস্থা লইয়া গঠিত হইয়াছে। ইহা গ্রীকদিগের ভৈষজ্যশাস্ত্রের ঠিক অনুরূপ। বোধ হয় এই প্রভাব বিখ্যাত গ্রীক বৈদ্য হিপোক্রেটি এবং গালেনের সমসাময়িক (খৃঃ পূঃ ৪—২য় খৃঃ)। গ্রীক বৈদ্যগণ বৈদ্য ব্যবসায় গ্রহণের সময় যে শপথ গ্রহণ করিতেন, তাহা ভারতীয় বৈদ্যগণের সুশ্রুত এবং চরকোল্লিখিত শপথের ঠিক অনুরূপ। কথিত আছে, চরক প্রসিদ্ধ হুন সম্রাট কনিষ্কের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন।

বৈদিক যুগ হইতেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রচলন রহিয়াছে। এ শাস্ত্র-সাহায্যে তৎকালে ব্রাহ্মণগণ বলিদান প্রভৃতির সময় নির্দ্ধারণ করিতেন। উহা প্রাচীন এবং বর্ত্তমান কালের ভারতীয় জীবনে অদ্ভুত প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রেও গ্রীক প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ জ্যোতিষোক্ত কতকগুলি চিহ্নের সংস্কৃত নাম গ্রীক নামেরই অপভ্রংশ—যথা—ক্রিয়া, গ্রীক ক্রিয়োস্ (Crios—Aries), টাবুরি—গ্রীক টাউরস্ (Tauros—Taurus), জিতুমা—গ্রীক ডিডোমস্ (Didumos—Gemein) প্রভৃতি। অনেকগুলি গ্রহের নামও গ্রীক শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে ; যথা, হেলি—গ্রীক হেলিয়স্ (Helios—The Sun), আরা—গ্রীক অরেস্ (Ares - Mars) হিম্না—গ্রীক্ হেরমেস্ (Hermes—The Mercury)। ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতীয় সাপ্তাহিক দিনসমূহের নাম যুরোপের ন্যায় সূর্য্য, চন্দ্র, এবং অন্য পঞ্চ গ্রহের নামানুসারে হইয়াছে। "গার্গী সংহিতা" নামক জ্যোতিষ-পুস্তকে উক্ত হইয়াছে, "যবনগণ বর্ব্বর, কিন্তু তাহারাই জ্যোতিষশাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে।"

এই প্রকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এরূপ বিরাট বিষয়ের বিশদ ভাবে আলোচনা করা অসম্ভব। কিন্তু এতদ্দারা সপ্রমাণ করা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় গ্রীক্ প্রভাব পরিস্ফুট এবং অনেকাংশে ভারত গ্রীসের নিকট ঋণী।

বিষের আংটী *

[শ্রীসুধাংশু চট্টোপাধ্যায়]

ষোড়শ শতাব্দীর প্রান্তভাগে রাণা উদয়সিংহ ও তাঁহার আদর্শ পুত্র রাণা প্রতাপের রাজত্বকালে মোগলবাহিনীর পুনঃ-পুনঃ আক্রমণে সুখশান্তিময়ী মেবারভূমিতে কি ঘোর অশান্তির উদয় হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতগণ অবগত আছেন। মোগল আক্রমণ-স্রোতে গতিরোধ করিবার জন্য,—দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজপুত নরনারীগণ অকুণ্ঠিত চিত্তে কত অর্থব্যয় করিয়াছেন, কত মহৎ প্রাণ বলি দিয়াছেন—তাহা ধীর প্রাণে চিন্তা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এই স্বাধীনতা সমরে রাজপুত আর্য্য ললনাগণ যেরূপ আত্মশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন—সে সকল দৃষ্টান্ত আজও ভারতের,- এমন কি জগতের ইতিহাসে বিরল। রাজপুত নারীগণ নিজের প্রাণপুত্তলীকে স্বীয় হস্তে সমরসাজে সাজাইয়া যুদ্ধে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন ; নারীর কোমল প্রাণ বজ্রের ন্যায় কঠিন করিয়া স্বীয় স্বামীকে দেশের কল্যাণার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছেন ; এমন কি

"অঙ্গনা ভূষণপ্রিয়া সে দেশ রক্ষণে
অকুণ্ঠিতা উন্মোচনে গাত্র অলঙ্কার।
সুকেশিনী শিরঃশোভা কেশের ছেদনে
ক্ষুব্ধা নহে যদি তাহে হয় উপকার।"

অনেক লেখক সত্যসত্যই বলিয়াছেন যে, "রাজপুতনারীগণ স্পার্টান রমণী অপেক্ষা শতগুণে অধিক পূজ্যা। তাহারা স্বামীকে বা পুত্রকে রণস্থলে পাঠাইয়া নিজে বিলাসভবনে অবস্থিতি করিতেন না ; স্বয়ং সমর সাজে সাজিয়া অসি-হস্তে রণাঙ্গনে স্বামী বা পুত্রের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য যুদ্ধ করিতে-করিতে স্বদেশ রক্ষা-যজ্ঞে প্রাণাহুতি দিতেন। আর যখন স্বদেশ-রক্ষা অসম্ভব মনে করিতেন, তখন সেই বিদ্যুল্লতিকা সকল সতীত্ব-রক্ষার জন্য পরস্পর শৃঙ্খলিত করে জহরে বা অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন।" রাজপুতগণের মধ্যে জহরে মৃত্যুর বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত ছিল। সংযুক্ত চিত্রে † একপ্রকার ত্রিবিভক্ত বিষাঙ্গুরীয়ের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। উহা এককালে সমগ্র রাজপুত-মহিলার হস্তে শোভা পাইত, এবং অধুনা বহুমূল্য প্রাচীন স্মৃতি-দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। অষ্টধাতু, তাম্র ও রৌপ্য দ্বারাই সাধারণতঃ এই অঙ্গুরীয় নির্ম্মিত হইত বলিয়া

* বুন্দেলখণ্ড-সাহিত্য-সভার নওগাঁ অধিবেশনে পঠিত মল্লিখিত হিন্দী প্রবন্ধাবলম্বনে।—লেঃ।

† লেখক কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রখানি ইতঃপূর্ব্বে Statesman পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

বোধ হয়; কিন্তু বহুমূল্য হীরক-খচিত স্বর্ণাঙ্গুরীও আবিষ্কৃত হইয়াছে। চিত্র দর্শনেই উপলব্ধি হইবে যে—অঙ্গুরীয় তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশের সহিত সচরাচর একখানি দর্পণ সংযুক্ত থাকিত; দ্বিতীয় অংশে, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ রক্ষিত থাকিত ও সর্ব্বনিম্ন অর্থাৎ তৃতীয় অংশে প্রাণনাশক দ্রব্য লুক্কায়িত থাকিত।* রাজপুত নারীগণ স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে বিহ্বলা হইলে, অথবা অকস্মাৎ যবন-হস্তে ধৃত হইলে, গোপনে এই বিষ পান করিয়া জীবন শেষ করিতেন।

রাজপুতানায় জহর-ব্রতের দিনে বিষাঙ্গুরীয়ের প্রচলন বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু ইহা যে এককালে য়ুরোপেও সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা শুনিলে অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সে সকল প্রদেশেও অন্যান্য অলঙ্কারের মধ্যে অঙ্গুরীয়ই বিষপাত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। এই অঙ্গুরীয় ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন গঠন প্রাপ্ত হইত। পাশ্চাত্য দেশে সাধারণতঃ অঙ্গুরীয়ের প্রস্তরাধারেই (Bezel) তরল বিষ নিহিত থাকিত।

গ্রীসের ইতিহাসে গরলাধার অঙ্গুরীয় দ্বারা আত্মহত্যার বহু দৃষ্টান্ত আছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬১ অব্দে পোণ্টাসের বিখ্যাত অলঙ্কারপ্রিয় নৃপতি মিথ্রিডেটস্ (Mithridates) সর্ব্বদা একটা গরলপূর্ণ অঙ্গুরীয় বহন করিতেন। শেষ জীবনে তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র ফেমেসিস্ (Phomeces) কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যখন তাঁহার পক্ষে মৃত্যু অথবা বন্ধন এই দুই উপায় বর্ত্তমান ছিল, তখন তিনি হৃদয়ের আবেগে প্রথম উপায় নির্ব্বাচন করিয়া বিষাঙ্গুরীয় দন্তের দ্বারা ভাঙ্গিয়া বিষ পান করিতে বিরত হন নাই। কিন্তু তাঁহার যৌবনকালে পাছে কেহ বিষ-প্রয়োগে তাঁহার প্রাণনাশ করে, এই আশঙ্কায় তিনি বিষের প্রতিষেধক যে সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার বলে বিষ পানে তাঁহার কিছুই হয় নাই। শুনা যায়, পরে তিনি স্বেচ্ছায় গলজাতীয় কোন বীরের অসির আঘাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

পৃথিবী-বিখ্যাত কার্থেজের প্রধান সেনাধ্যক্ষ হানিবল (Hannibal) শত্রুর হস্তে পতিত হইবার ভয়ে তাঁহার রাজচিহ্নযুক্ত অঙ্গুরীয় নিহিত বিষ পান করিয়া জীব-লীলা সাঙ্গ করেন। জেনারেল্ রেগুলাস্ও বিষাঙ্গুরীয় দ্বারা মৃত্যু-মুখে পতিত হইবার বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে অন্যতম।

ডিমস্থেনেস্ (Demosthenes) প্রাচীন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। আণ্টিপিটর কর্ত্তৃক এথিনিয়ানগণ পরাভূত হইলে তিনি তাঁহার বিষাঙ্গুরীয় হইতে বিষ পান করিয়া পরলোকে গমন করেন। সক্রেটিসকে (Socrates) বন্দী করিয়া মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইলে, তিনিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় বিষাঙ্গুরীয় ভাঙ্গিয়া আত্মহত্যার নিমিত্ত বিষ বহিষ্কৃত করেন।

J. L. Motley কর্ত্তৃক লিখিত "Rise of the Dutch Republic" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বিষাঙ্গুরীয় ষোড়শ শতাব্দীতে হলাণ্ডে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রিন্স অব্ অরেঞ্জের (Prince of Orange) মৃত্যুর উল্লেখ করা যাইতে পারে। Lamoral Egmont নিষ্কৃতিকে রাখা করিবার লোভে উক্ত নৃপতির সুরাপাত্রে একটী বিষের আংটী নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। সিজার বোর্জিয়ার রাজচিহ্নযুক্ত যে অঙ্গুরীয় কিছুদিন পূর্ব্বে গ্রাসের Continental Galleryতে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাতে বিষের জন্য একটী গুপ্ত আধার ছিল। তাহা সুরাপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক কত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে।

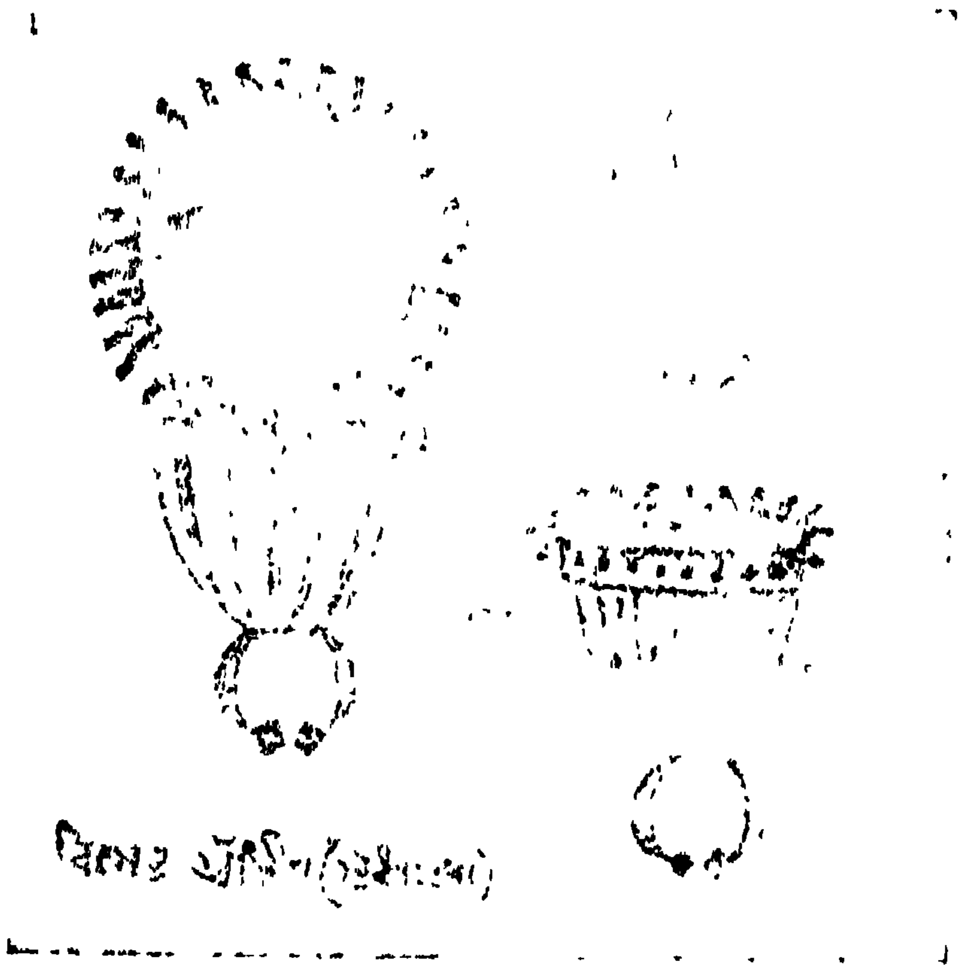

বিষাঙ্গুরীয়

মধ্যযুগে কোন ভেনিসবাসীর দুষ্টবুদ্ধির ফলে একরূপ Annello della Morta ("মৃত্যুর অঙ্গুরী") নামক অঙ্গুরী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অঙ্গুরীর শিলাধারের নিম্নে একটী ক্ষুদ্র গহ্বরে রক্ষিত বিষের সহিত একরূপ সম্বন্ধ ছিল যে, উপরে টিপিলেই একটা সূচী বাহির হইয়া সেই ভয়ানক বিষ শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিত। করমর্দ্দন কালে বহু ব্যক্তিকে এইরূপে বিষ প্রয়োগ করা হইত।

ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের কালেও ইহা য়ুরোপ ভূভাগে প্রচলিত ছিল। বিদ্রোহকালিন্ ফরাসী কর্তৃত্ব-সভার সদস্য মারকুইস্ ডি কনডরসেট্ (Marquis de Condorset) যখন প্যারিসের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন, তখন রাজার প্রাণদণ্ড করিতে স্বীকৃত না হওয়াতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক তিনি বন্দীকৃত হন। Mademoiselle Guillotineএর হস্তে ভীষণ মৃত্যুর আশঙ্কায় তিনি তাঁহার ভ্রাতা তৎকালিন্ প্রসিদ্ধ

* 'সহমরণ' নামক একখানি প্রাচীন হিন্দী পুস্তকে বিষাঙ্গুরীয় প্রয়োগ করিবার প্রণালী বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। লেখক বলিয়াছেন যে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ফিরিলে স্বামীর বদনমণ্ডল কিরূপ গৌরব-দীপ্ত হইত, তাহা দেখাইতে নারীগণ অঙ্গুরীতে একখানি দর্পণ রক্ষা করিতেন। বিজয়ী পুরুষগণকে 'বিজয়-তিলক' পরাইবার নিমিত্ত চন্দনাদি থাকিত। অতএব অঙ্গুরীতে অভ্যর্থনা করিবার ও মৃত্যুর—উভয়েরই উপকরণ প্রস্তুত থাকিত।

ভিষক্ ক্যাবারিস (Cabares) কর্ত্তৃক প্রস্তুত অমোঘ বিষ সেবন করেন।

বর্ত্তমান কালেও আত্মহত্যা ও নরহত্যা করিবার নিমিত্ত জার্ম্মাণ যুবকবৃন্দকর্ত্তৃক একপ্রকার বিষাক্ত অঙ্গুরীয় ব্যবহৃত হয়। ইহার গুরু ভার বশতঃ সময় সময় ইহা বহন করা দুষ্কর হইয়া উঠে। আঘাত করিবার নিমিত্ত অঙ্গুরীতে বিষাক্ত তীক্ষ্ণ সূচীখণ্ড সকল যুক্ত থাকে।

বিষ লুক্কায়িত রাখিবার নিমিত্ত অঙ্গুরী ব্যতীত অন্য অলঙ্কার ব্যবহৃত হয় নাই, এরূপ নহে। ভারতবর্ষে গায়োগণ কর্ত্তৃক একপ্রকার বিষাক্ত কর্ণফুল ব্যবহৃত হইত, তাহার স্পর্শমাত্রেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। ক্লিওপেট্রা চুলের কাঁটার মধ্যে একটা বিষময় ক্ষুদ্রাকার সর্প বহন করিতেন, ইত্যাদি বিবরণ সকলের বিদিত আছে।‡

প্রণাম, নমস্কার ও অভ্যর্থনাদির বিভিন্ন ধরণ

[শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন]

শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন- পত্রের এই অংশটুকু পাঠকালে পাঠকের মানস-নয়নে পত্র-প্রেরক আত্মীয়ের সাঙ্গভঙ্গী মূর্ত্তি-বিশেষ জাগিয়া উঠে। প্রণতিকালে অঙ্গ-বিশেষের ভঙ্গীকরণ এক একটি জাতির বিশিষ্ট ধারা। এই বিশাল ধরিত্রী যেমন বিভিন্ন মানব-জাতির বাসস্থান, আচার ভেদে ঐ বিভিন্ন মানব সঙ্ঘের প্রণতি-পদ্ধতিও তদ্রূপ বিচিত্র।

ভদ্রতা ও অমায়িকতা জ্ঞাপন করিবার প্রাণস্থানীয় আচারগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—অঙ্গ-বিশেষের স্পর্শনে এবং নত্রীকরণে উহা সদাচার অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। আপনাকে অপরের চরণমূলে আনত করিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিবার যে ভঙ্গী, তাহা মানুষ প্রকৃতি হইতে পাইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়; কারণ, 'সবলের চরণ দুর্ব্বলের পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ বেগের সহিত প্রযুক্ত হইলে, দুর্ব্বলের শরীরের ভারকেন্দ্র আপনা হইতেই ভূতল অন্বেষণে তৎপর হয়, ইহা পদার্থ বিজ্ঞান সম্মত প্রাকৃতিক নিয়ম' *। অঙ্গ-সংশ্লেষ দ্বারা অভ্যর্থনা করিবার যে আচার সমগ্র মানবসমাজে পরিব্যাপ্ত দেখা যায়, তাহার সহিত কোন নৈসর্গিক সম্বন্ধ আছে কি না, ইহা খুঁজিলে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, যাহাকে আপনার মনে করা যায়, তাহাকে অঙ্গে অঙ্গে মিলাইবার—আপনার বুকে টানিয়া আনিবার পক্ষে মানুষের উপর প্রকৃতির এক অচিন্তনীয় প্রেরণা আছে; আত্মীয়তা ক্ষেত্রে বিশ্বের লীলাময়ী প্রকৃতির সেই ক্রীড়া-ভঙ্গীরই এগুলি কৃত্রিম অনুসরণমাত্র।

এইরূপে দেখিতে গেলে প্রণতি, নমস্কার, সংবর্দ্ধনা ও আশীর্ব্বাদাদি যে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন বিচিত্র ভঙ্গী দেখা যায়, তাহা আপাতদৃষ্টিতে যত অনর্থক ও আজগুবি বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, মানব সমাজে অতি প্রাচীন অবস্থায় এই প্রথা-গুলির উৎপত্তি হইয়াছিল; এবং তখ ইহা সম্পূর্ণ অর্থশূন্য বা নিষ্প্রয়োজন ছিল না, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

মানবের হৃদয়ে ভয়, ভক্তি, নম্রতা ইত্যাদি গুণরাজির আবির্ভাব হইলে, মানবদেহে তাহা বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। কালাত্যয় বশতঃ সভ্যতার তারতম্যানুসারে মানুষ সামাজিক কাজ চালাইয়া লইবার জন্য যে সমস্ত আচারের অধীনতা অনর্থক মানিয়া লইয়াছে সেগুলি তাহার প্রকৃতিরই আত্মবিস্মৃত বংশধর।

লোকস্থিতি সমাজের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ, সমাজের খাতিরেই মানুষকে এই সমস্ত কৃত্রিম বা মিথ্যাচারের দাস হইতে হইয়াছে। যে সমাজ যত ভদ্র বা উন্নত, তাহার উক্ত আচাররূপ আলঙ্কারিক অংশের পারিপাট্যও তত বেশী এবং বিচিত্র।

আদিম অবস্থায় মানব ঈদৃশ মিথ্যাচারের ধার ধারিত না। ভদ্র য়ুরোপীয়দিগকে গুরুজনের নিকট মস্তক অনাবৃত এবং দেহ আনত করিতে দেখিয়া অসভ্য গ্রীণল্যাণ্ডবাসীরা হাসিয়া আকুল হইয়াছিল। ফিলিপাইন দ্বীপের নিকটবর্ত্তী দ্বীপবাসিগণ, যাহাকে নমস্কার করিতে হইবে, তাহার হস্ত এবং পদ লইয়া ধীরে-ধীরে মুখে ঘসিয়া থাকে। ল্যাপল্যাণ্ডবাসীরা যাহাকে সংবর্দ্ধিত করিবে, তাহার গায়ের উপর দিয়া জোরে নাকে খৎ লইয়া থাকে। নিউগিনিয়ার অধিবাসীরা সংবর্দ্ধনাচ্ছলে মস্তকে পল্লবের মুকুট পরাইয়া দেয়।

কোন কোন জাতির নমস্কারের ভঙ্গী বড়ই বিরূপ এবং কষ্টকর। হঠযোগীর আসন এবং মুদ্রাগুলি আয়ত্ত করিবার মত এগুলির অনুষ্ঠান করাও দীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলনসাপেক্ষ। হাউটম্যান লিখিয়াছেন, সাউণ্ড প্রণালীর অধিবাসী। তাঁহাকে এক অদ্ভুত ভাবে অভ্যর্থিত করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের বামপদ দক্ষিণ পদের উপর দিয়া ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের উপর ধরিয়াছিল।

নব-সভ্য-পর্য্যায়ে গণ্য হইতে অভিলাষী ফিলিপিনোদিগের অভিবাদনভঙ্গী বড় জটিল এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য। তাহারা তাহাদের দেহ আনত করিয়া হস্তদ্বয় গণ্ডতলে স্থাপন করে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বক্রজানু হইয়া এক পদ ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া থাকে।

এথিপিয়াবাসীরা বন্ধুর গাত্রাবরণ কাড়িয়া লয়, এবং তদ্দ্বারা আপনারা বদ্ধ পরিকর হইয়া বন্ধুকে অর্দ্ধনগ্ন করিয়া অভিবাদন করিয়া থাকে। কোন স্থলে আপনাকে নগ্ন করিয়া গুরুজনকে সম্মান দেখান হইয়া থাকে। দুই জন ওটাহেইটিয়ান রমণী সার জোসেফ ব্যাঙ্ককে নগ্নমূর্ত্তিতে মান্য করিয়াছিল।

কোথাও বা অঙ্গবিশেষের আচ্ছাদন উন্মোচন সম্মান দেখাইবার ভঙ্গীরূপে গণ্য হইয়া থাকে। জাপানীরা তাহাদের খড়ম খুলিয়া রাখে। আরাকানবাসীরা পথিমধ্যে পাদুকা পরিত্যাগ করে; গৃহে গুরুজনকে অভ্যর্থনা করিতে হইলে তাহাদিগকে মোজা খুলিতে হয়।

---

‡ এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে Mr. Rob : Macdonald এর নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি—লেঃ।

* কর্ম্মকথা। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

কালক্রমে নগ্নীকরণ-পদ্ধতি ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। স্পেনের অভিজাতবর্গ আবৃত অবস্থায় রাজসকাশে উপনীত হইবার দাবী করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, সাধারণ প্রজার মত আর তাঁহারা রাজদ্বারে দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া ঘৃণ্য হইবেন না। কোন লেখক লিখিয়াছেন, ইংরেজের আত্মসম্মান-বোধ বড় বেশী; এজন্য তাঁহারা য়ুরোপের অপরাপর জাতির ন্যায় তত বেশী টুপি খুলেন না। তুর্কী, মুর এবং অন্যান্য মুসলমান জাতিরা মস্তক অনাবৃত করা সম্মান-জ্ঞাপক বোধ না করিয়া মানহানিকর মনে করেন। ইহুদীরাও মাথায় টুপি পরিয়া ভদ্রতা দেখাইয়া থাকেন।

নিগ্রোরা অনেক প্রকার অদ্ভুত আচারের পক্ষপাতী। ইহারা অভ্যর্থনাচ্ছলে আঙুল মট্‌কাইয়া দেয়। স্নেলগেভ লিখিয়াছেন, দুইজন নিগ্রো রাজ মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যমাঙ্গুলী লেহন করিয়াছিলেন।

অসভ্যদের আচারে তাহাদের বর্ব্বরতার ছাপ মারা থাকে। অ্যাথেনী লিখিয়াছেন, কারমেনার অধিবাসীরা তাহাদের ধমনীর রক্তে পানপাত্র পূর্ণ করিয়া বন্ধুকে অর্ঘ্য দিত। ফ্রাঙ্কেরা গুরুজনকে অভিবাদন করিবার দায়ে 'শিরঃ শোভা কেশের ছেদনে' ক্ষুব্ধ ছিল না।

চীনা ভদ্রতার নিক্তি আচারের খুঁটিনাটি বড় সূক্ষ্ম হিসাবে মাপিয়া থাকে। চীনেরা প্রিয়-সঙ্গমে হস্তদ্বয় বক্ষের উপর ব্যস্ততা সহকারে নাড়িতে থাকে, এবং শিরোদেশ ঈষৎ আনত করে। সম্মান দেখাইতে হইলে, তাহারা কৃতাঞ্জলি-হস্ত ঊর্দ্ধে উঠায় এবং দেহকে নত করিয়া তাহাদিগকে ভূমুখে আনয়ন করে। দীর্ঘবিচ্ছেদের পর বন্ধুদ্বয় মিলিত হইলে, উভয়ে নতজানু হইয়া উপবেশন করে, এবং সমভাবে মস্তক আনত করে। এ প্রক্রিয়া দুই তিন বার অনুষ্ঠিত হইয়া মৈত্রীর গাঁথনী পোক্ত করিয়া দেয়।

আচারে, ব্যবহারে, কথায় ভদ্রতার উনিশ-বিশ চীনাদের পক্ষে বড়ই বিরক্তিজনক। যখন চীনে রাজতন্ত্র ছিল, তখন বৈদেশিক দূত-দিগকে এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হইতে হইত। অন্ততঃ চল্লিশ দিনের কমে ইহাদিগকে আয়ত্ত করা অসম্ভব ছিল।

স্বেচ্ছাচারী রাজারা হয়ত প্রজাগণের খাড়া চেহারা দেখিতে সাহস পাইতেন না, এজন্য অনেক স্থলে রাজদরবারে ঢুকিবার পূর্ব্ব হইতেই প্রবেশার্থীকে গোড়াইতে-গোড়াইতে মাথা কুটিতে কুটিতে রাজার পুরোভাগে গমন করিতে হইত। শুনা যায়, পোপের পুরা প্রতাপের সময় তাঁহার কাছে যাইতে হইলে, উপরিউক্ত আদব-কায়দা দুরস্ত হইয়া চলিতে হইত। মোগল-দরবারেও না কি কতকটা ঐরূপ নিয়ম ছিল। বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন, মোগল-দরবারে ঢুকিবার পথে শরীর কুব্জ না করিয়া ভিতরে যাওয়া যাইত না। পারসীকেরা তৎকালে মোগল দরবারে সহজে আপনাকে খাটো করিতে চাহিত না। একজন পারসীক দূত মস্তক অবনত না করিয়া বাদশাহের দরবারে ঢুকিতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া, সম্রাট সাজাহান না কি বলিয়াছিলেন, ও লোকটা গাধার মত আচরণ করিতেছে কেন? পারসীক দূত না কি ত্বরিত জবাব দিয়া বলিয়াছিল, এরূপ খোঁয়াড় যে অন্য জীবের হইতে পারে তাহা জানিতাম না। উক্ত বর্ণনার মূলে কতটা সত্য আছে, তাহা ঐতিহাসিকগণের বিবেচ্য; তবে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন, এই সকল কৃত্রিম অনুষ্ঠানের সম্পাদনে অভ্যাগতের তৃপ্তি সাধন যতটা হউক না হউক, অনুষ্ঠানের সামান্য ত্রুটি অনেক সময় অতৃপ্তি, অশান্তি ও মনোমালিন্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে জনশিক্ষা

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, বি-এ]

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নদীয়া-শাখায় ১৩২৪ সালের ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

জনশিক্ষা আজকাল সকল সভ্যদেশেই একটি অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকল দেশের সুধিগণই একমত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে জনশিক্ষা কিরূপ ছিল—তাহার একটা মোটামুটি ধারণা করিতে চেষ্টা করিব।

মানবের চরিত্র প্রধানতঃ জন্ম, শিক্ষা এবং সঙ্গের প্রভাব দ্বারা নিরূপিত হয়। জন্মের প্রভাবের জন্য মানুষ ঠিক প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী নয়। তবে এ বিষয়ে বাপ-মা'র শুচি সংযম প্রভৃতি অনেকটা কাজ করে। যাহা হৌক, জন্মের পর হইতেই মানবের শিক্ষা কার্য্যতঃ আরম্ভ হয়। এই শিক্ষা পারিপার্শ্বিকের দ্বারা ওতপ্রোত ভাবে প্রভাবিত। শৈশবে মানুষের মন ভালমন্দ যাহা দেখে শুনে, তাহাই শিখে। শিক্ষার কাজ মোটামুটি হিসাবে দুইটি—চিত্তের সৎপথে গমনে সাহায্য করা, এবং অসৎপথে গমন হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা। এই শিক্ষা নানাপ্রকারে হইতে পারে। শুধু অক্ষর পরিচয়ের মধ্য দিয়াই যে এই শিক্ষা লাভ হয়, এমন নয়। তাহা হইলে আমরা নিরক্ষর আকবর, শিবাজী, রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে আজ দেখিতে পাইতাম না। বর্ত্তমান যুগেও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তথা-কথিত বিদ্বান্ না হইয়াও আদর্শ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। কেন না, তাঁহার ভগবৎদত্ত অন্তঃশক্তি প্রাকৃতিক শিক্ষা এবং লোকমুখনিঃসৃত জ্ঞানগর্ভ কথা ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ করিয়া তুলিয়াছিল। শাস্ত্র শ্রবণ, সৎসঙ্গ করণ, প্রভৃতি হইতে শিক্ষা গ্রহণাদির দ্বারাও মানুষের চরিত্র বেশ ভাল ভাবে তৈয়ারি হইতে পারে। জগতের শ্রেষ্ঠ কবি সেই জন্যই বলিয়াছেন—There are books in brooks and sermons in stones। ফরাসী দেশীয় মহাপুরুষ প্রকৃতি পূজক রুসোও সেই কথাই অন্য ভাবে বলিয়াছেন।

গগনস্পর্শী ভূধর, নদীরূপমালা ধৃত-প্রান্তর, নীল-সিন্ধু-সেবিত চরণ যুগল সুষমা সৌন্দর্য্যের প্রিয় নিকেতন ভারতের শিশু কেমন করিয়া প্রকৃতির মহান্ শিক্ষার উদারতাপূর্ণ প্রভাবে প্রভাবান্বিত

না হইয়া থাকিবে? ইহার উপর পুরাণপাঠ, কথকতা এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে, যাত্রা, মনসার ভাসান, তর্জ্জা, পাঁচালি, ফকির-বৈষ্ণবের গান, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি জনসাধারণের মধ্যে ভারতীয় সাধনার চরম সত্যসমূহ প্রচার করিয়া, বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মনকে সরস শিক্ষা প্রদান করিত। কিন্তু বড়ই দুখের বিষয়, এই সকল অত্যাবশ্যক অনুষ্ঠানগুলি গর্ব্বিত অবহেলায় এবং নির্ম্মম উপেক্ষায় দিন দিন লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

পাকা স্কুল-ঘর এবং লম্বা লম্বা ব্ল্যাকবোর্ড না হইলে আর আমাদের শিক্ষা হইবে না,—এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া আমরা বেশ নির্ব্বিবাদে গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবণ, দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে উপরি-উক্ত অনুষ্ঠানগুলি কিরূপ সহজে শিক্ষা-প্রচারে সাহায্য করিতে পারে, আমরা তাহা মোটেই ভাবিয়া দেখিতেছি না। অবশ্য কথকতা, যাত্রা প্রভৃতিতেও বর্ত্তমান কালের উপযোগী জাতীয় এবং স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধীয় ভাবগুলির আবশ্যক। আমাদের দেশের প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের এ দিকে অতি শীঘ্র হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয়।

অক্ষর-পরিচয়ের মধ্য দিয়া শিক্ষা-প্রচারের আবশ্যকতা কম, এ কথা আমরা বলি না। আক্ষরিক শিক্ষার দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ লাভ করাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই শিক্ষায় মানুষ পুস্তকের সাহায্যে একা-একা বসিয়াই জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের অনেক রত্নরাজির পরিচয় লাভ করিতে পারে। প্রাচীন ভারত যে এইরূপ শিক্ষাদানে পশ্চাৎপদ ছিল, তাহা বোধ হয় না।

বেদ অধ্যয়ন আর্য্যগণের জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ব্রাহ্মণগণ তো জ্ঞানচর্চ্চাকেই জীবনের মুখ্য ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস্, ফা হিয়ান্, য়ুয়ান চোয়াং প্রভৃতি বৈদেশিকগণ ভারতবর্ষের বিদ্যাচর্চ্চার কথা শতমুখে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কথা হইতে পারে, হয় ত সে সময়ে সমাজের উন্নত শ্রেণী সমূহে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ছিল কিন্তু জনসাধারণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিত। আমরা কিন্তু এ কথাটি একবারে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই।

ছান্দোগ্য উপনিষদের একস্থলে আছে—কেকয়াধিপতি অশ্বপতি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মুনিগণকে বলিতেছেন "ন মে স্তেনো জনপদে, ন কদর্য্যো, ন মদ্যপো, নানাহিতাগ্নি নাবিদ্বান্, ন স্বৈরী, স্বৈরিণীকুতঃ।" অর্থাৎ "আমার এ রাজ্যে চোর নাই, আচারভ্রষ্ট নাই, মদ্যপায়ী নাই, অনাহিতাগ্নি নাই, অবিদ্বান্ নাই, স্বেচ্ছাচারী পুরুষ নাই, স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীর তো কথাই নাই।" ইহা হইতে আমরা দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। হয় রাজা অশ্বপতির রাজ্যে শূদ্র ছিল না, না হয় মুনিগণের উপদেষ্টা ব্রহ্মজ্ঞ নৃপতি মিথ্যা বলিতেছেন। উভয়ই একপ্রকার অসম্ভবের মধ্যে। অতএব আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল।

তার পর বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-যুগ—খৃঃ পূঃ ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর কথা ধরা যাউক। আমরা জানি, ভগবান বুদ্ধের দক্ষিণ হস্ত অর্থাৎ উপালি একজন ক্ষৌরকার ছিলেন। সুশিক্ষিত, দার্শনিক, বৌদ্ধ সংঘের প্রধান নেতার বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করিবেন না। সুতরাং সে সময়েও সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের মধ্যেও বিদ্যাশিক্ষা লাভের এবং বড় হইবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। হিন্দুর শাস্ত্র শূদ্রগণকে বেদশিক্ষায় অধিকার না দিলেও পুরাণ অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করে নাই। সম্রাট অশোকের অনুশাসনসমূহ প্রাচীন ভারতে জন-শিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধে স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। "গিরি-গাত্রে তীর্থ-সমূহে রাজপথে এই সকল অনুশাসন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই অনুশাসনগুলি তাৎকালিক প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, তখন জনসমাজে বিদ্যাশিক্ষার বহুল প্রচার ছিল; নতুবা, এত নৈপুণ্য সহকারে প্রাদেশিক অক্ষরে প্রচলিত ভাষায় ইহা উৎকীর্ণ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? অশোকের এই অবিনশ্বর কীর্ত্তি পরিদর্শন করিলে বোধ হয় যে, সাধারণ প্রজাবৃন্দের বোধগম্য করিবার জন্য অশোক নিরলঙ্কার চলিত ভাষায় অনুশাসন-সকল উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ বিহারে বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল; এখনও ব্রহ্মদেশে ইহার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৯০১ অব্দে আদম সুমারিতে প্রকাশ যে, আগ্রা ও অযোধ্যা প্রদেশে প্রতি সহস্রে ৫৭ জন পুরুষ ও ২ জন নারী শিক্ষিত। কিন্তু ব্রহ্মদেশে, যেখানে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে প্রতি সহস্রে ৩৭৮ জন পুরুষ এবং ৪৫ জন নারী লিখিতে পড়িতে জানে। ইহাতে বোধ হয় বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ বিহারে বহু বালকবালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিত। অশোক-যুগে বিদ্যাশিক্ষা সমগ্র জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল।" *

এই ত গেল সহস্রাধিক বৎসরের কথা। খৃষ্টের জন্মগ্রহণের পরেও ভারতে বিদ্যা চর্চ্চার বেগ কখনও মন্দীভূত হয় নাই। নালন্দা, বিক্রমশিলা কাঞ্চি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাহার প্রমাণ। বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সকল শ্রেণীর ছাত্রের জন্য দ্বার উন্মুক্ত ছিল। এক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচশত অধ্যাপক এবং দশহাজার ছাত্র থাকিতেন। বর্ত্তমান সভ্যজগতে এরূপ বৃহৎ বিদ্যাকেন্দ্র একটিও আছে কি? খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর রাজা মহীপালের এবং তাঁহার শতবৎসর পরবর্ত্তী মালবাধিপতি, ভোজরাজ প্রভৃতি ভারতীয় নৃপগণের বিদ্যোৎসাহিতার কথা কোন্ ঐতিহাসিকের অবিদিত?

হিন্দু ভারতের গৌরবের যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, তৎপরবর্ত্তী মুসলমান অধীনতেও আমরা ভারতের জ্ঞানলাভে শৈথিল্য দেখিতে পাই না। চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে যাঁহারা নব হিন্দুধর্ম্মের নেতা হইলেন, তাঁহারা অধিকাংশই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোক। কবীর জোলা তাঁতি,—রবিদাস চর্ম্মকার, দাদুপন্থী-প্রবর্ত্তক দাদু ধুনুরী, সেনপন্থী-প্রবর্ত্তক সেন নাপিত এবং তুকারাম শূদ্র ছিলেন। গ্রন্থগত

* অশোক, চারুচন্দ্র বসু।

বিদ্যার সহিত ইহাদের কতটা সম্বন্ধ ছিল, ঠিক জানি না; কিন্তু তাঁহারা যে প্রকৃত জ্ঞানী ছিলেন, এবং শিক্ষালাভের যাহা চরম ফল তাহা যে তাঁহাদের জীবনে সম্যকরূপে ফলিয়াছিল—এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কবীরের সুমধুর দোঁহাগুলির সারবত্তার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। হিন্দুকুলতিলক সূর্য্যবংশাবতংস উদয়পুরের রাণা এবং তাঁহার রাজ্ঞী মালি চম্মকার রবিদাসের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। রবিদাস বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—"ভগবান্, তোমাতে আমাতে কি প্রভেদ? তুমি স্বর্ণ, আমি কঙ্কণ; তুমি জল, আমি তরঙ্গ।" ইহা অপেক্ষা জ্ঞানের কথা আর কি হইতে পারে? "সেন পন্থী প্রবর্ত্তক সেন পূর্ব্বে বন্ধগড়ের রাজাদিগের কুল নাপিত ছিলেন। শেষে ধর্ম্মজগতে তাঁহার প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনি ও তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি উক্ত রাজবংশের কুলগুরু হইয়া অতিশয় খ্যাতি ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন।" *

ইহার পরবর্ত্তী সময়েও জনসাধারণের মধ্যে—এমন কি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণের মধ্যেও শিক্ষার কিরূপ প্রচার ছিল, তাহা আমরা দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে কতক কতক তুলিয়া দেখাইতেছি। "চৈতন্যদেবের সমসাময়িক গোবিন্দদাসের করচা পড়িয়া মনে হয়, সেকালেও 'অস্ত্র হাতা বেড়ী গড়া' অপেক্ষা কর্ম্মকার শ্রেণীর মধ্যেও কেহ কেহ উৎকৃষ্টতর ব্যবসায়ের জন্য যোগ্যতা দেখাইতেন; সমাজের অস্থায়ী সীমাবন্ধনী কোনও কালেই মানব প্রকৃতির প্রকৃত সীমা-বন্ধনী বলিয়া গণ্য হয় নাই।" কৈবর্ত্তবংশোদ্ভব রামদাস আদক নামক জনৈক কবি "অনাদি মঙ্গল" নামে একখানি ধর্ম্মকাব্য প্রণয়ন করেন। এই কবি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। ইনি কবি হইয়াও নিজের জাত ব্যবসায় ছাড়েন নাই; গ্রন্থের একস্থলে নিজের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন, "পুরুষে পুরুষে চাষ করি বিধিমতে।" ইহার পরবর্ত্তী সময়ে মধুসূদন নাপিত "নলদময়ন্তী" নামে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কবির পরিচয় হইতে জানা যায়, ইঁহার পিতামহও কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। মধুসূদনের রচনা সরল ও হৃদয়গ্রাহী। তিনি সংস্কৃতও জানিতেন, এবং বিদ্বান্ হইলেও, জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন নাই।

দীনেশবাবু বলেন,—"নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনেকে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইতেন; কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালারই বেশী অনুশীলন করিতেন। ২০০—১০০ বৎসর পূর্ব্বের যতগুলি বাঙ্গালা পুঁথি পাইয়াছি, তাহাদের অনেকগুলি নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তির হাতের লেখা।" উদাহরণ স্বরূপ তিনি ভাগ্যমন্ত ধুপি, রামনারায়ণ গোপ, কালীচরণ গোপ প্রভৃতি লেখকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন "ত্রিপুরা জেলার রাজপাড়া গ্রামে ১০০ বৎসরের প্রাচীন একখানি নলদময়ন্তী এক ধোপা-বাড়ীতে আছে, উহা সেই ধোপার পিতামহের লেখা, লেখাটি মুক্তার ন্যায় গোটা গোটা, বড় সুন্দর। আমি জেলায় জেলায় প্রাচীন পুঁথি খুঁজিয়া দেখিয়াছি,—ভদ্রলোকগণের ঘরে বাঙ্গালা পুঁথি বড় নাই, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর লোকের ঘরে উহা রাশি রাশি পাওয়া যায়।" অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃষ্ণ মুচি, নীলমণি পাটুনী, ভোলা ময়রা প্রভৃতি নিম্নবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ কবিওয়ালারূপে জনসমাজে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদের প্রথম প্রচারিকা অম্ভৃণ কন্যা বেদমন্ত্র রচয়িত্রী বাক দেবী, পাণ্ডিত্যা গার্গী, পরাবিদ্যাগত মৈত্রেয়ী, জ্যোতিষী শ্রেষ্ঠা খনা, বীজগণিত জন্মদাত্রী লীলাবতীর দেশে নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকগণের মধ্যেও বিদ্যাচর্চ্চার অভাব হয় নাই। রাজা কৃষ্ণদেবের সমসাময়িক দাক্ষিণাত্য নিবাসিনী কুম্ভকার কন্যা মল্লী সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ যশোলাভ করেন। "শিক্ষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং তাঁহার রচনা মৌলিকতা ও প্রতিভাপূর্ণ ছিল। কথিত আছে, স্নানের পর চুল শুকাইবার সময় তিনি লিখিতে বসিতেন, এবং এইরূপে একখানি রামায়ণ রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার রামায়ণখানি এতদূর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল যে, পণ্ডিতগণ সেখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করেন।" চণ্ডীদাসের প্রেমাস্পদ রামী ধোপানির পদ দুইটি কি সুন্দর! প্রেমের আবেগের পূর্ণতা যেন এই রচনার মধ্যে ব্যাকুলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে! কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে জানা যায়, বণিক রমণী খুল্লনা স্বামীর অক্ষর চিনিতেন, চৈতন্যদেবের কথিত—কৃপাপাত্রগণের মধ্যে শিখি মাইতির ভগিনী মাধবী অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই সুন্দর পদগুলি পদকল্পতরুতে দেখা যায়।

এই সকল প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইলেও, পরাধীনতার অন্ধকারে ভারত দিশেহারা না হইয়া, স্বকীয় জ্ঞানের প্রদীপটি অটলভাবে উজ্জ্বলিত রাখিয়াছিল।

দুই-তিন শত বৎসর আগে যখন ভারতের জাতীয় জীবন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল—তখনও ভারতীয় সমাজের নিম্নতম স্তরেও বিদ্যাচর্চ্চা কিরূপ প্রবল ছিল তাহা আমরা দেখিলাম। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায়, ভারতে বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত জনসমাজে জ্ঞানের স্রোতোধারা সমান বেগে বহিয়া আসিয়াছিল। তবে, কখনও এই বেগ গ্রীষ্মের তাপে শুষ্ক, কখনও বা বর্ষার প্রবল উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া চলিয়াছিল। ভারতের তেমন ইতিহাস নাই—থাকিলে আরো অনেক প্রমাণ দেওয়ার সুবিধা হইত। কিন্তু এই প্রাচীন দেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে যেখানেই একটু আলোক পড়িয়াছে—সেখানেই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত জ্ঞানচর্চ্চার কথা লোক-চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে। তাপস ভারতের জ্ঞানই একমাত্র সম্বল ছিল—জ্ঞানের এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই ভোগী ভারতকে উদাস যোগীতে পরিণত করিয়াছিল। যে অজ্ঞান মেঘ-পটলে এখন ভারত-গগন সমাচ্ছন্ন, আশা করি, তাহা শীঘ্রই কাটিয়া যাইবে, এবং জ্ঞানের নবীন গরিমা ভারত ললাটে আবার পূর্ণতেজে ভাতিয়া উঠিবে।

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭০ শক

চিঠির মূল্য

[শ্রীশচীন্দ্রভূষণ দাসগুপ্ত এম এ]

(১)

কি কুক্ষণেই যে সেবার কৃষ্ণনগর থেকে বদলী হয়ে ফরিদপুরে যাই তা জানি না। কি আর করি? সরকারের ডেপুটিগিরি চাকরী করি, সরকার বাহাদুর যখন যেখানে বদলী করেন, "সুশীল সুবোধ বালকের" মত নতশিরে তা মেনেই চল্‌তে হয়। মালদহতে যখন ছিলাম, তখন "ধ্রুবতারা" লেখক যতীন সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল; তাঁর কাছ থেকে ওখানকার বটবৃক্ষশ্রেণী সজ্জিত রাস্তা ও শ্যামল দূর্ব্বাদলাচ্ছাদিত অতিবিস্তৃত মাঠের কথা কিছু-কিছু শুনেছিলাম। সেখানে গিয়ে কিছুদিন বেশ ছিলাম। তার সহরের ভিতরে পল্লীগ্রামের ভাবটা আমার ভারি সুন্দর লাগ্‌তো। কিন্তু সেবার পুজোর পর থেকে যে ভীষণ ম্যালেরিয়ায় কি অশান্তিতেই ফেলেছিল, তা আর এ জীবনে কখনো ভুল্‌বো না। জ্বরে-জ্বরে ছেলে মেয়েগুলো একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে গেল। আফিস থেকে বাড়ী ফিরে এসেই দেখ্‌তে হত, কেউ-না-কেউ শুয়েই আছে।

একদিন আফিস থেকে এসেই দেখি, জলখাবারটা তৈরি নেই। সময়মত খাবারটি না পেয়ে ভারি চটে যাই। ঘরে ঢুকেই চীৎকার করে স্ত্রীকে ডাক্‌লাম, "সরোজ, সরোজ",—ডাক্‌তেই শুনি, বিছানার উপরে সরোজ ছট্‌ফট্ কচ্চে। দেখেই কেমন একটু থম্‌কে গেলাম। ছেলেমেয়ের অসুখ কর্লে আমার নিজের খাওয়া দাওয়ার কোন অসুবিধা হ'ত না—শুধু তাদের জন্যেই ভাব্‌তে হ'ত। কিন্তু স্ত্রীর অসুখ কর্লে যে এতটা অসুবিধা হতে পারে, সেটা আমার বড়-একটা খেয়াল্ ছিল না। আস্তে আস্তে গিয়ে তার কাছে বস্‌তেই, সরোজ বলে উঠ্‌ল, "দেখো, আজ এই ছুটো-আড়াইটের সময় ভারি জ্বর হয়েছে; তাই তোমার খাবারটা তৈরি করে রাখ্‌তে পারিনি—ভারি জ্বর হয়েছে—।" গায়ে হাত দিয়ে দেখি, প্রায় ১০৪ পর্য্যন্ত উঠে থাক্‌বে। সেই থেকেই স্ত্রী, পুত্র ও মেয়ে সবাই মিলে জ্বরে-জ্বরে একেবারে কাঠিটির মত হয়ে যায়। ভেবে ভেবে ঠিক কর্লাম্, স্থান পরিবর্ত্তন না কর্‌লে আর এ দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। চেষ্টায় থাক্‌লাম, পশ্চিমে কোন জায়গায় একটা ভাল বাড়ী পাওয়া যায় কি না—বাড়ী একটা জুটলোও এসে কপালে।

কল্‌কাতার নামজাদা এটর্ণি উপেন মিত্তির—তাঁরই একখানা বাড়ী আছে গিরিদিতে; সেখানা তিনি তিন মাসের জন্যে ভাড়া দেবেন। অনেক করে খোঁজ খবর নিয়ে তবে এই বাড়ীখানা পাওয়া গেল। বাড়ীখানার নামটি বেশ "নির্ম্মল কুটীর।" তিনি তাঁর আদরের দুলাল নাতিটির নামে ঐ বাড়ীটি করেছিলেন।

বাড়ী ত পেলাম; কিন্তু সরকারী চাকুরীতে ছুটি পাওয়া মহা দায়। কত যে খাট্‌তে হ'ল, আর কত যে খোসামোদ কর্ত্তে হ'ল, তার আর সীমা ছিল না। যা হ'ক, শেষকালে ছুটিও পাওয়া গেল। "চেঞ্জে" যাবার আয়োজন কর্ত্তে সুরু কর্লাম। মনে-মনে ঠিক থাক্‌লো যে, এই ছুটিটা থাক্‌তে থাক্‌তেই, অন্য জায়গায় বদ্‌লী হবার চেষ্টা কর্ত্তে হবে—এ ভীষণ জায়গায় আর আস্‌ছি না। সরোজও একদিন আমাকে বল্‌লে, "দেখ, এ জায়গায় আর যাতে না আস্‌তে হয়, তার চেষ্টা করো; এখানে যদি আবার ফিরে আস্‌তে হয়, তবে কিন্তু আমি আমার বাবার কাছে গিয়ে থাক্‌বো।" সরোজের এই রকম কথাটা আমাকে বদ্‌লী হবার চেষ্টা কর্ত্তে আরও দ্বিগুণ করে উৎসাহিত করেছিল।

[২]

গিরিধিতে এসে কিছুদিন পরেই সবাই বেশ একটু ভাল হ'য়ে উঠ্‌ল। তারা গায়ে একটু জোর পেতেই, আমি সরোজ, ৮ বছরের ছেলে নেপু, আর পাঁচ বছরের মেয়ে কণাকে নিয়ে সকালে ও বিকেলে বেড়াতে বেরুতাম। মাঝে-মাঝে একটু দূরে গিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠি;

সেখানে বসে খানিকক্ষণ নানারকম গল্প স্বল্প করি—আবার নেমে এসে, এধারে-ওধারে বেড়িয়ে, বেশ একটু বেলা হলেই, বাড়ী ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করি। নেপু ও কণা এদের জন্যে—শুধু এদের জন্যেই বা কেন বলি; আমাদেরও তো দরকার হ'ত—"টিফিন্ ক্যারিয়ার"এ করে' কিছু খাবার চাকরটাকে দিয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতাম।

গিরিধিতে সময়টা বেশ কেটে যেত। সবারই শরীর দিন-দিন ভাল হতে লাগ্ল। সরোজ ও নেপু-কণাদের স্বাস্থ্যের রক্তিম আভা আবার ফিরে এল। এদের দিকে চেয়ে মনে বেশ একটু স্ফূর্ত্তিই অনুভব কর্ত্তাম।

এদিকে আবার, একটু ভাল হয়েই, সরোজ এখানকার মেয়েমহলে বেশ মেশামিশি করে, খুব সুনাম কিনে ফেল্লে। একটা গুণ ছিল তার, সে ভারি সুন্দর গান গাইতে পারত। প্রথমটা সেই খাতিরেই সে কতকটা মিশে পড়ে; কিন্তু আস্তে-আস্তে দুই-একটী মহিলা-সভাতে "স্ত্রীশিক্ষা" ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু-কিছু "বক্তৃতা" করে তার ভারি নাম হয়ে যায়। শেষকালে এমন হয়েছিল যে, গিরিধির সরোজিনী সেনকে না চেনে, এমন লোক খুব কমই ছিল। সত্যি কথা বল্তে কি, অনেক জায়গায় তার নাম দিয়েই আমার নিজের পরিচয় দিতে হয়েছে। মনে-মনে একটু কেমন-কেমন লাগ্তো মাঝে মাঝে—নিজের নামটা একেবারে লোপ পাবার মত হয়ে উঠ্ল যে! কিন্তু মনটাকে আমার প্রবোধ দেবার মত নজিরও ছিল ঢের। এই তো মিসেস্ এ্যানি বেশাণ্ট্‌কে কত লোকেই জানে; কিন্তু তাঁর স্বামীকে কটা লোকে জানে? তেম্নি, সরোজিনী নাইডুকে সবাই জানে; কিন্তু তার স্বামীর খোঁজ কটা লোকে দিতে পারে? সাহেবদের ভিতরেও অনেক আছে, যথা, মিসেস্ হিম্যান্স্, জর্জ্জ ইলিয়ট্, ইত্যাদি। এই রকম করে ভাবতে গেলে, আমার মনে আর কোন ক্ষোভই থাক্‌তো না;—বরং তখন যেন মনে একটু গর্ব্বই অনুভব কর্ত্তাম।

একদিন সকালবেলা চা খেতে খেতে অনেক রকম গল্প-স্বল্প হচ্ছিল। বাইরেরও দুই-চারিজন লোক ছিল। চা খাওয়াটা হয়ে গেলে, কেউ-কেউ সরোজকে একটা গান গায়িতে অনুরোধ করেন। সরোজ প্রথমটা আপত্তি করে। যখন আর এড়াতে পার্লে না, তখন অগত্যা টেবিল-হারমোনিয়মটা টেনে গান ধর্‌লে। এটাওটা আরম্ভ করতেই, সবাই "গীতাঞ্জলির" একটা গান গায়িতে অনুরোধ করায়, সরোজ গায়িল—

"জীবনে যত পূজা হল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে, পড়েছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
জীবনে আরো যারা রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও হয়নি মিছে।
আমারি অনাগত, আমারি অনাহত,
তোমারি বীণা-তারে বাজিছে তারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

গানটা শেষ হতেই, পিয়ন এসে ডাক ছাড়্ল, "চিঠ্ঠি হায়, বাবু—"। নেপু দৌড়ে গিয়ে এক তাড়া চিঠি এনে আমাকে দিল। দরকারী চিঠিপত্রগুলি পড়ে নিচ্ছি, তখনই সবাই উঠে পড়্লেন। অনেকটা বেলা হয়েছে বলে সবাই যে-যার বাড়ী চল্লেন। উপযুক্ত ভদ্রতা করে তাঁদের বিদায় দিয়ে চিঠি পড়্তে লেগে গেলাম। সরোজের নামে একখানা চিঠি ছিল; মনে করলাম, তার বাপের বাড়ীর কেউ লিখে থাক্বে; সেখানা তাকে দিয়ে দিলাম। সরোজ চিঠি-খানা খুলে দেখেই একেবারে চম্‌কে গেল; বলে উঠ্‌লো, "ওগো, দেখ ত এ আবার কি? এ কার চিঠি আমাদের দিয়ে গেছে?" জিজ্ঞাসা কল্লাম, "কেন, হয়েছে কি?" "এই দেখ না পড়ে, কি সব লেখা! কাকে কে, কি সব লিখেছে, কিছুই তো বুঝ্তে পাচ্ছি না আমি!" বলেই চিঠিখানা আমাকে এনে দিলে। পড়ে দেখি, চিঠিখানা এই ভাবে লেখা—

"১৭নং হবিনাথ মল্লিকের লেন, কলিকাতা।

"সরোজিনি! তুমি এখান থেকে গেছ পরে, আমি যে কি ভাবে আছি, তা খুলে বল্‌তে পারি না। তোমার শরীর ভাল হচ্ছে কি না লিখো। কত দিন পরে আবার তুমি যে ফিরে আসবে, তা ভেবে পাই না। তোমার শরীর ভাল না হয়ে থাকে তো আমাকে লিখো, আমি একবার গিয়ে দেখে

আস্‌বো। ভগবান তোমাকে অচিরে সুস্থ করুন। ইতি—তোমারই খগেন।”

খামের উপরে “সরোজিনী দেবী, নির্ম্মল-কুটীর, গিরিধি” এই মাত্র লেখা। চিঠিখানা পড়ে তো অবাক্। কার চিঠি, কে লিখেছে, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। ভাব্‌তে-ভাব্‌তে হঠাৎ আমার কাছে যেন ঐ গলিটার নাম চেনা চেনা বলে মনে হতে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ পরে মনে হল, আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ্‌-এ পড়ি, তখন ঐ বাড়ীর একটি ছেলে আমাদেরই সঙ্গে পড়্‌তো, তার নাম ছিল খগেন দত্ত। সে তার বাপের একমাত্র ছেলে। বাপ ছিল তার হাইকোর্টের উকীল। ওকালতি করে যথেষ্ট পয়সা করেছিলেন, জুড়ি গাড়ী, ঘোড়া ছিল,—মস্ত বাড়ী। আমার আস্তে-আস্তে আরো মনে পড়ে গেল, খগেনের সঙ্গে তাদের বাড়ীতেও গেছি; বি-এ পাশ করার পরও তাকে মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখ্‌তাম। সেবার সে ফেল্‌ করে; তার পর আর কলেজে আস্‌তো না। কি যে কর্‌তো, কোথায়-কোথায় বেড়াতো, তা আর কিছুই জান্‌তাম না। ক্রমে সে দলের ভিতর থেকে শুধু খসে পড়্‌ল না, আমাদের ছাত্র জীবনের শুভ্র গগন থেকে একটি তারকা, মনে হ'ল, যেন চিরদিনের জন্য অস্তমিত হ'ল। বহুদিন পরে একবার, মনে পড়ে, শুনেছিলাম যে তার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে সে ভারি খারাপ হয়ে গেছে। কতকগুলি কু-লোকের সঙ্গে মিশে চরিত্রটি একেবারে খারাপ করে ফেলেছে। আস্তে-আস্তে এতটা যখন মনে পড়ে গেল, তখন এই পত্র-লেখক খগেন যে আমাদেরই সেই খগেন, সে বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ থাক্‌ল না। উপরে তাদের বাড়ীর ঠিকানাই তো রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল যে, এ “সরোজিনী দেবী” কে? ঠিকানা লেখা খামখানি আর একবার পড়ে দেখ্‌লাম, ঠিক আমার বাড়ীর নামটিই লেখা রয়েছে—পরিষ্কার লেখা, “নির্ম্মল কুটীর”। তবে এইটুকু সহজেই অনুমান করে নিলাম যে, নিশ্চয়ই তার পরিচিত কোন রমণী অসুখে ভুগে এখানে “চেঞ্জে” এসেছে,—ঠিকানা ভুল করেছে, তাই চিঠি-খানা আমার হাতে এসে পড়েছে। এটাও বেশ বুঝ্‌তে পারা গেল যে, খগেন তার প্রতি বড়ই অনুরক্ত। আর একটা কথা। সরোজ এখানে যেমন পরিচিতা হয়ে পড়েছে, তাতে ডাকঘরের লোকগুলিও শুধু তার নামটা দেখেই চিঠি বিলি কর্ব্বার সময় আমার এখানেই দিয়ে যায়। প্রায়ই এমন হয়েছে যে, শুধু সরোজের নাম লেখা, আর নীচে গিরিধি লেখা কত চিঠি আমার বাড়ীতে এসেছে—তবে এরকম অন্যের চিঠি কোন দিন তো আসে নি!

সরোজের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, সে হঠাৎ বলে বস্‌ল, “দেখ, এই খগেনবাবু যদি সত্যি-সত্যিই তোমার বাল্যবন্ধু হ'ন, তবে তুমি একবার চেষ্টা করে দেখো না, তাঁকে যদি সুপথে ফেরাতে পার?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কেমন করে ফেরাবো বল।” সরোজ বল্লে, “এক কাজ কর্লে হয় না?” “কি?” “তুমি এই চিঠিখানার উত্তর লেখ। তাঁকে ডেকে পাঠাও; লেখ যে, শরীর ভারি খারাপ, একবার দেখে যাবে; যেন সেই সরোজিনীই তাঁকে লিখ্‌ছে।” “তা পারি—কিন্তু আমার হাতের লেখা দেখেই তো সে বেশ বুঝতে পার্‌বে যে, মেয়ে লোকের লেখা নয়? আর, এত খাতির যার সঙ্গে, তার হাতের লেখাটি কি আর এতদিনে সে দেখেনি? এ সরোজিনীর হাতের লেখা এখন পাই কোথায়? নামে-নামে না হয় তোমার সঙ্গে বেশ মিলেছে; কিন্তু নাম এক হলেই তো হাতের লেখাও একই রকম হয় না! তা না হলে না হয় তোমাকে দিয়েই লিখিয়ে নেওয়া যেত। ও হয় না।”

খানিকক্ষণ কি ভেবে সরোজ বল্লে, “আচ্ছা, এক কাজ কর্লে হয় না? এই, তুমি কি আমিই একখানা উত্তর লিখে পাঠাই, যেন ঠিক ঐ সরোজিনীই লিখ্‌ছে তাঁকে; আস্‌তেও লিখে পাঠাই তাঁকে। আর, শেষকালে এইটুকু লিখে দিলেই হবে, ‘এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি যে, নিজে চিঠিখানা লিখ্‌তে পর্য্যন্ত পারি না’ এই রকম একটা কিছু। তা হ'লে তো আর কোন গোল থাক্‌বে না?” “হ্যাঁ, এটা একরকম মন্দ বলনি! এ-রকম কর্লে হয় বটে।”—ঠিক কর্‌লাম, এই রকম করেই একখানা চিঠি তাকে লিখে, এখানে যে দিন আস্‌বে, সেই দিন ষ্টেসনে গিয়ে তাকে পাক্‌ড়াও করে বাড়ীতে এনে, একবার চেষ্টা করে দেখ্‌বো—পুরানো বন্ধুটিকে সুপথে আন্‌তে পারি কি না। বিকেলে বসে সরোজের সঙ্গে পরামর্শ করে একখানা চিঠি লিখে ডাকে পাঠিয়ে দিলাম। তাতে পত্রপাঠ তাকে আস্‌তে বারবার করে অনুরোধ করে লিখ্‌লাম। যে দিন আস্‌বার সম্ভাবনা,

সে দিন সময়মত ষ্টেসনে যেতে হবে, তাও মনে-মনে ঠিক রইল।

[৩]

গাড়ী আস্‌বার প্রায় আধঘণ্টা আগেই সেদিন ষ্টেসনে গিয়ে বসে আছি। বাড়ীতে সরোজকে অতিথি-সেবার উপযুক্ত আয়োজন করে রাখ্‌তে বলে গেছি।

সময় হলে গাড়ী এসে পৌছল। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে কুলী, প্যাসেঞ্জার, বাক্স, বিছানার মোট ইত্যাদিতে প্লাট্‌ফরম্‌টা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। এত ভিড়ের ভিতর খগেনকে চিনে বার করা অসম্ভব মনে করে, খানিকক্ষণ চুপ্‌ করেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লাম। ভিড়্‌টা একটু কম্‌লে প্লাট্‌ফরমে কয়েকজন লোক হাঁটাহাঁটি কর্‌ছিল - তার ভিতর একজনকে যেন বহুপূর্ব্বের পরিচিত আমাদেরই সেই খগেন বলে' মনে হ'ল। দেরী না করে,' চট করে' গিয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে বলে ফেল্লাম, "কি রে, খগেন যে! কত কাল পরে দেখা হ'ল তোর সঙ্গে। চিন্‌তে পাচ্ছিস্‌ তো? সেই প্রেসিডেন্সী কলেজের শিশিরকে তোর মনে নেই?"—দেখ্‌লাম, সে অবাক্‌ হয়ে' চুপ করে হাবার মত আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি ভীষণ চেহারা হয়ে গেছে তার! একেবারে চেনাই যায় না তাকে। চক্ষুর্দ্বয় কোটরগত, দুটি চোখের চারিধারে সুস্পষ্ট কালিমা-রেখা পড়ে গেছে; একেবারে কাঠির মত সরু হয়ে গেছে। কোথায় বা তার সেই ছোট-বেলাকার গায়ের ধব্‌ধবে ফরসা রং, কোথায় বা তাঁর পরিপুষ্ট দেহ, আর কোথায়ই বা তার মূল্যবান কাপড়-চোপড়! ভাব্‌লাম, কি অবস্থা থেকে কত নীচে নেমে গেছে সে! একটি অতি পুরাতন 'গ্লাডষ্টোন্‌' ব্যাগ তার হাতে; পরনে তার একখানি ময়লা কাপড়; একটি দীর্ঘ ঝুলওয়ালা চুড়িদার; তার উপরে একটি বহুকালের মোটা জামা তার গায়ে।

তাকে এত তাড়াতাড়ি করে, এতগুলি কথা বলায়, সে যেন কেমন একেবারে থম্‌কে গেল। কিন্তু আমার নামটি যাই করেছি, অম্‌নি চিনেছে আমাকে! তাড়াতাড়ি করে শুধু বললে, "ওঃ, তাই না কি? তুই সেই শিশির সেন? তাই তো, অনেক দিন পরে দেখা হ'ল; কিন্তু আমি তো তোকে চিন্‌তে পার্‌ছিলাম না। ভাল আছিস্‌ তো?"

আমি উত্তর কর্‌লাম, "হ্যাঁ ভাই, ভালই আছি। তুই ভাল আছিস্‌ তো? ভাই দেখ, এখানে যেখানেই এসে থাকো, এখন কিন্তু আমি তোমাকে আমার ওখানেই নিয়ে যাব। এমন হঠাৎ যখন দেখা হয়েছে, তখন আর আমি তোমাকে ছাড়ছি না ভাই। আমার ওখানে খাওয়া-দাওয়া করে, তার পরে যেখানে হয় তুমি যাবে। "আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। চল, যাওয়া যাক,—" বলে সে আমার সঙ্গে চল্‌তে লাগ্‌লো। আমি পরিষ্কার দেখ্‌লাম, তার মনের ভিতরে যে মস্ত একটা ওলট্‌-পালট্‌ হচ্ছিল, তার ধাক্কাটা তার মুখের ভাব, চোখের চাহনি ও হাত-পায়ের চালচলনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ছে। তার চোখদুটি কেবলই এদিক ওদিক ফিরছিলো, কথাগুলি কেমন বেধে-বেধে যাচ্ছিল, তার হাত-পাগুলি অযথা সঞ্চালিত হচ্ছিল। কথায়-কথায় আমার বাড়ীর ধারে এসে পড়্‌তে, আমি বল্‌লাম, "ভাই, এইটিই আমার বাড়ী।"

খগেন বাড়ীটার দিকে চেয়ে, গেটের ডানদিকের পিলার টার গায়ে মার্বেলখানাতে বাড়ীর নামটা পড়েই বলে উঠ্‌লো, "তোমার বাড়ীর নাম কি 'নির্ম্মল কুটীর' শিশির?"

আমি বল্লাম "হ্যাঁ"— বলেই বেশ লক্ষ্য কর্‌লাম, তার চোখমুখের ভাবটা যেন কেমন সাদা হয়ে গেছে। বুঝ্‌লাম, সে যে চিঠিতে ঠিকানা ভুল করেছিল, সেটা তার এইমাত্র খেয়াল হয়েছে। আর কিছু না বলে, তাকে নিয়ে বাড়ীতে ঢুকে ডাক্‌লাম, "সরোজ!" সরোজ "যাই" বলে এসে দাঁড়াতেই, তাকে অতিথির সেবার আয়োজন কর্‌তে বল্‌লাম। সরোজ সলজ্জ ভাবে "আচ্ছা" বলে', মাথার কাপড়টুকু একটু টেনে ভিতরে চলে গেল।

সময়মত স্নানাহার সেরে, বাইরে দু'খানা "ইজি চেয়ারে" বসে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত খগেনকে নিয়ে ছেলেবেলার অতীত স্মৃতি টেনে এনে কত কথাই দুজনে বল্‌লাম। আমার উদ্দেশ্য খগেনকে একটু স্ফূর্ত্তি দেওয়া; কিন্তু তাতে বিশেষ কৃতকার্য্য হলাম না। আগাগোড়াই আমি স্পষ্ট লক্ষ্য কর্‌ছিলাম, সে যেন কিছুতেই তেমন সুখ পাচ্ছিল না—সব সময়ই যেন তার কেমন একটা অন্যমনস্ক ভাব। কারণটা বুঝ্‌তে আমার বাকী ছিল না—আমি তো সবই জান্‌তাম।

গল্প কর্‌তে-কর্‌তে আমি তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "খগেন, তুমি এখানে কার বাড়ীতে উঠ্‌বে বলে এসেছিলে?"

খগেন একটু অপ্রতিভ হয়ে উত্তর করলে, "হ্যাঁ—না—

আমি কারো বাড়ীতে উঠ্‌বো বলে আসিনি। এই কিছুদিন ধরে শরীরটা তেমন ভাল নেই,—মনে কর্লাম্, একটু পশ্চিম থেকে ঘুরে আসি। এখানে এসে কোন একটা বোর্ডিং কিংবা হোটেল—এই রকম একটা জায়গায় কিছুদিন থাক্‌বো। তা' তোমাকে যখন পাওয়া গেছে, তখন এখানেই কিছুদিন থেকে আবার কল্‌কাতা ফিরে যাব।"—কথাগুলি কিন্তু খগেন একটু না বেধে বলে উঠ্‌তে পার্‌লো না। উত্তরে বল্লাম, "বেশ ত, ভালই ত। এখানে যদিও আলাপ-সালাপ হয়েছে কারু-কারু সঙ্গে, তাহলেও, তোমাকে পেয়েছি, বেশ ভাল করে স্ফূর্ত্তি করে কিছুদিন কাটান যাবে। হাজার হলেও বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে কি আর কারো তুলনা হয়?"

সে দিনটা আর খগেনকে একা কোথাও বেরোতে দিই নি। বিকেলে চা খাওয়াটা সেরে সরোজকে ডেকে বল্লাম, "নতুন লোক্‌টা এসেছে,—তোমার ২।১ খানা গান-টান শোনাও না খগেনকে।"

খগেনকে বল্লাম "আমার "ওয়াইফ্" বেশ গাইতে পারে, শুন্‌বে খগেন?"

অতিশয় স্ফূর্ত্তিতে খগেন বলে উঠ্‌ল, "বেশ ত, ভালই ত। হক্ না, বাঃ।"

সরোজ গাহিল —

"আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ।
*　　*　　*
'ও পথে যেও না, ফিরে এস' বলে
কানে কানে কত কয়েছ।
(আমি) তবু চলে গেছি; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ॥
*　　*　　* ইত্যাদি।"

গানটা শেষ হতেই খগেন মস্ত বড় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে—আমি সেটা লক্ষ্য কর্‌লাম।

রাত্রিবেলা সরোজের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক কর্‌লাম, কাল সকালেই খগেনকে সব বলে ফেল্‌তে হবে, আর দেরী করা ঠিক নয়। যদি এরই মধ্যে সে সরে পড়ে, তবে আর হয় ত তাকে কোন দিনই পাওয়া যাবে না। হাতের ভিতরে পেয়ে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক নয়।

[৪]

খগেনকে সবই বলা হয়ে গেছে। সে দিন সকালবেলা তার সাম্‌নে সেই চিঠিখানা খুল্‌তেই সে কেঁদে ফেল্লে। তাকে শান্ত করে পরে সবই শুনেছি—সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত সোজা হয়ে গেছে।

খগেনের বাবা মারা যাওয়ার পরেই সমস্তই তার হাতে পড়ে; তার লেখাপড়া শেষ হয়ে যায়। বি-এ ফেল্ কর্‌বার পর সে আর পড়েনি। আমরা যে তার সম্বন্ধে একটা গুজব শুনেছিলাম সে খারাপ হয়ে গেছে, সেটা সত্যি-সত্যিই ঠিক কথা। তার বিধবা মাতা বর্ত্তমান, আর ভাই নেই—যে কয়টি বোন ছিল, তাদের সবাইকেই বাবা বেঁচে থাক্‌তেই ভাল ঘরে বিয়ে দিয়ে গেছেন। নিজে বিয়েটাও করেনি—কাজেই তার আপনার বল্‌তে আর কেউ ছিল না, এক মা ছাড়া। একা পড়ে গিয়ে, কতকগুলি কু-লোকের পাল্লায় পড়ে, সে তার চরিত্রটাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। মামা বাড়ীর কেউ কেউ এসে তার বাড়ীতে থাকেন; তার মা তাঁদের সাহায্যেই, যা কিছু আছে তা দেখে শুনে, দরকারমত খরচপত্রাদি চালান। কতবার তিনি তাকে বিয়ে করে ঘর-সংসার কর্‌বার জন্যে মাথার দিব্যি পর্য্যন্ত দিয়েছেন, কিন্তু সে ঘাড় পাতেনি।

খগেনের কাছ থেকে শুন্‌লাম,—সরোজিনী দেবী কে! তিনি হচ্চেন, কল্‌কাতার রামবাগানের নাম-করা একজন বেশ্যা! কিছুদিন ধরে নানারকম অসুখ করায়, তিনি এই গিরিধিতে বাড়ী ভাড়া করে "চেঞ্জে" এসেছেন। এই পর্য্যন্ত আমাদের অনুমানই ঠিক হয়েছে। তাঁর বাড়ীর নামটি হচ্চে "বিমল কুটীর'—খগেন ভুল করেই 'নিম্মল কুটীর' লিখেছিল।

খগেন আমাকে সেদিন বড় দুঃখ করেই বল্‌ছিল "ভাই, তুই কি সুখেই আছিস্। বিয়ে করেছিস্, ছেলেমেয়ে হয়েছে, তুই বাস্তবিকই সুখী। আমি এত সুখ-স্বচ্ছন্দতা থাক্‌তেও নিজের দোষেই আমার মাথাটা খেয়েছি। সেদিন যখন তোর স্ত্রী গান গাচ্ছিল, আর নেপু-কণা পাশে বসে খেলা কচ্ছিল—সে দৃশ্য দেখে আমি সংসারের সুখ-শান্তি অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করেছি। ভাই শিশির, তুই সত্যিই আমার বাল্যবন্ধু শিশির। তোকে আমি যে কি বলে ধন্যবাদ দেব, তা জানি না। তুই আমার যা উপকার কর্‌লি, ভগবান তোকে তার উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন!

আরো কিছুদিন তাকে আমার বাড়ীতে রেখে যখন দেখলাম, তার শরীরটা একটু ফিরেছে, তখন তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। পরমেশ্বরের দিব্য দিয়ে তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি, সে বিয়ে করে ঘর-সংসার করবে, আর কুপথে যাবে না।

* * *

এখন আমি বর্দ্ধমানে আছি। সে দিন সরোজের সঙ্গে ভারি তর্ক হচ্ছিল, এই খগেনের বিষয় নিয়ে। সে বল্‌ছিল, "আমি না হলে তোমার বুদ্ধিতে তুমি কখনই খগেনবাবুকে ফেরাতে পার্‌তে না।" আমি বললাম, "ওঃ, তুমি ভারি করেছিলে তো? আমিই তো তাকে সব বলে কয়ে বুঝিয়ে তবে ফিরিয়ে আনি।"

সরোজ বল্‌লে, "তা করেছিলে মানি। কিন্তু আমি যদি তাঁকে কল্‌কাতা থেকে গিরিধিতে নেবার ফিকির বার করে না দিতুম, তা হলে তুমি তো তাঁকে নিতেই পার্ত্তে না ওখানে। এতখানি বুদ্ধি খাটিয়ে করেছিলাম বলেই তো তিনি ফির্‌লেন; আর অত করে সে দিন তোমার জন্যে শুভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে গেলেন!"

দেখ্‌লাম, সরোজের জন্যেই অনেকটা হয়েছিল; তাই আর ওদিক দিয়ে একেবারেই না গিয়ে বলে ফেল্লাম, "সে যে শুভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল, তাতে আমার তা ভারি লাভ হয়েছে,—ভগবান আর একটি কন্যারত্ন পুরস্কার দিয়েছেন!' সরোজ খানিকটা হেসে বল্লে, "কাজ যেটুকু, তা ঐ চিঠিখানা এসে পড়েছিল বলেই হয়েছিল। ঐ চিঠিখানার বড় দাম।"

গিরিধিতে এই ব্যাপারের পর থেকে খগেন আমাকে রীতিমত চিঠিপত্র লেখে। সেদিন চিঠি পেলাম, ভবানীপুরের বিখ্যাত মার্চেণ্ট (ব্যবসাদার) যদুনাথ ঘোষের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে। তার মা আমাকে অনেক করে যেতে লিখেছেন। স্থির কর্‌লাম, দু'এক দিনের ছুটি পেলে, খগেনের বিয়েতে নিশ্চয়ই যাবো।

দীনের দাবী

[শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ এম-এ]

(খোলা চিঠি) *

বন্ধুবর সহরবাসী নাগরিক মহাশয় সমীপেষু
সুহৃদ্‌বরেষু—

আপনারা পল্লীর দুরবস্থার কথা জানিয়া বিচলিত হইয়াছেন, ইহা আমাদের সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আপনারা কৃপা করিয়া পল্লীর সেবা করিতে, গ্রামের দুর্দ্দশা দূর করিতে আসিতেছেন জানিয়া আমরা ভীত হইয়াছি। কথাটা বড় হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম—এটা আমাদের স্বভাব-দোষ। চিরকাল জানি, গ্রামের চাল-চলতি "গ্রাম্যতা" বলিয়া উপহসিত হয়। শুধু আপনাদের দোষ দিই না—আমাদের এ দুর্ভাগ্য সুপ্রাচীন। ভারতবর্ষ যখন উজ্জয়িনীর নবরত্নের ভাতিতে উজ্জ্বল, সেই গৌরবময় দিনের কবি-শিরোমণি কালিদাস সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে আমাদের উপহাস করিয়াছেন। আপনাদের বাক্যবাণ আমাদের দৃঢ় চর্ম্মে আর বেদনা দিতে পারে না। যাহাকে চির নির্ব্বোধ বলিয়া নিন্দা করা যায়, নিন্দাকারীর নিকট নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরাও যে নগরের অহঙ্কৃত ঔদ্ধত্যের নিকট চিরকাল অমার্জ্জিত রুচির পরিচয় প্রদান করি, তাহা, আপনাদের রুচিকর না হইলেও, স্বাভাবিক।

যাক সে কথা,—কাজের কথাই বলিতেছি। আমাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই, তুলনা নাই সত্য; কিন্তু সকলের চাইতে বড় দুর্ভাগ্য যে, আমরা কৃপার পাত্র। কৃপা সে দিন সত্যই ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়, যে দিন দয়ার দ্বারা সে মানুষকে, সমাজকে, দেশকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। ইরাণ দেশে দয়া করিয়া যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের দয়ার ফলে ইরাণেরা ভারতে আসিয়া প্রাণ বাঁচায়। চীন দেশে যাঁহারা সে দয়া করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কৃপায় বক্সারের যুদ্ধ। নগর যখনই গ্রামের জন্য উদ্বেল হইয়া

* করিমগঞ্জ ক্লাবের সাহিত্য শাখায় গত ২৯শে জানুয়ারি তারিখে পঠিত।

তাহার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, সে দিন গ্রামকে একেবারে উজাড় না করিয়া রেহাই দেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন নেপোলিয়নের একাদশে বৃহস্পতি, সমস্ত য়ুরোপ তাঁহার করতলগত,—তখন তাঁহার আক্রমণের আশঙ্কায় ইংলণ্ডের নজর খাদ্যের দিকে পড়িল। দেশের শস্য-উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির দরকার; সেই জন্য ইংলণ্ডের গ্রামের কি দুর্দ্দশা না করা হইয়াছিল! গ্রামে আর গরু চরাইবার উপায় থাকিল না। ঘাসের মাঠে চাষ আরম্ভ হইল। গরু বাঁচাইবার জন্য ক্ষুদ্র কৃষক শস্যের ক্ষেত্রে ঘাস ফলাইতে বাধ্য হইল। শেষে যে দিন দেখিল, বাকী জমিটুকুতে আর তিষ্ঠান যায় না, সে দিন গরু-লাঙ্গল বেচিয়া সহরে কুলিগিরি করিতে চলিয়া গেল। আজ ইংলণ্ডের গ্রামের মত প্রাণহীন গ্রাম অন্য দেশে আছে কি না সন্দেহ। সহরের খাদ্য যোগাইবার জন্য যে গ্রামের লক্ষ্মীকে এমন ভাবে শ্রীহীন করা হইল, তাহার সর্ব্বনাশ সে দিন পূর্ণ হইল, যে দিন নগর-প্রধান ইংলণ্ড বিদেশ হইতে অবাধে (বিনা শুল্কে) খাদ্য আমদানি করিবার বিধান করিয়া আপনার দেশীয় কৃষির শক্তিনাশ করিল। এই বৈশ্য-যুগের শক্তি-কেন্দ্র নগর যখন পরার্থের কথাও ভাবে, তখনও অলক্ষ্যে স্বার্থই তাহাকে অনুপ্রাণিত করে। ইংলণ্ডের বৈশ্য সম্প্রদায় যে দিন নিরন্নের দুঃখে ব্যথিত হইয়া "কাঙ্গালী আইন" (Poor Law) প্রবর্ত্তন করেন, সে দিন সে-শ্রেণীর জন্য যে অনর্থের সৃষ্টি হইল, তাহা তাহাদের চিরদুঃখী করিয়া, সর্ব্বরিক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিল। ইহাদের অধোগতি এতদূর গড়াইয়াছিল, যে, একজন ইংরেজ লেখক পরিষ্কার ভাষায় লিখিয়াছেন—"The English Law has abolished female chastity"—ইংলণ্ডের (কাঙ্গালী) আইন নারীর সতীত্বকে উঠাইয়া দিয়াছে। জার্ম্মাণি যে দিন দেখিল যে, ১৮৩০ সালে তাহাদের শতকরা ৮০ জন গ্রামে বাস করিত, আর আজ সেখানে আছে মাত্র ৩৫ জন, সে দিন তাহারা জোর করিয়া বলিল, গ্রামকে রক্ষা করিতে হইবে, কৃষিকে সর্ব্বপ্রযত্নে সঞ্জীবিত করা চাই। কিন্তু এর মধ্যে তার গূঢ় উদ্দেশ্য গ্রাম নয়। যে পরিবার তিন-পুরুষ সহরে বাস করিয়াছে, তাহারা একেবারে শক্তিশূন্য হইয়া পড়ে, দেখা গিয়াছে। কৈসারের বাহিনীর জন্য সৈন্য ত সেখানে পাওয়া যাইবে না, তাই গ্রামের আবশ্যকতা; সহর বৈশ্য-কেন্দ্র, বীর প্রসব করা গ্রামের কাজ। আবার তিন পুরুষে যে সকল মজুর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহাদের স্থান পূরণ করিবার জন্যও একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

নগরের যে উদার দাতা আপনার বিশাল ধনরাশি লইয়া পল্লীর দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি যে মহৎ উদ্যমে শুধু বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন, তাহা নয়; ব্যর্থপ্রয়াসে তাঁহার সহৃদয়তা ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সে ব্যর্থ চেষ্টার যে দাগ পল্লীর ইতিহাসে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, অপ্রত্যাশিত, অযত্নলব্ধ অর্থগৃহীতার চরিত্রে যে দুর্ব্বলতার ছাপ দিয়া গিয়াছে, তাহার ফল বাস্তবিকই অত্যন্ত শোচনীয়। দারিদ্র্য তেমন ভয়ানক নয়, যেমন দারিদ্র্য দূর করিবার মত চরিত্রের অভাব। তার দারিদ্র্য বাস্তবিকই অচিকিৎস্য- যার অভাব চরিত্রবলের।

ফরাসী ও জার্ম্মাণ দেশে যখনই দানবীরগণ অর্থসাহায্যের দ্বারা দীনের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণী ততদিনই শোচনীয় দারিদ্র্য ভোগ করিতেছিল, যতদিন চাতকের মত তাহারা আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল। আপনাদের কষ্টলব্ধ অর্থ দুর্ভিক্ষ-জলপ্লাবনে আমাদের প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেও, দারিদ্র্য দূর করিতে পারে না। আপনাদের রবিবারের ভিক্ষা-মুষ্টি অলস, শ্রমকাতর ভিক্ষুক-শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে। কৃপা করিয়া আর আমাদের "উন্নতি-বিধায়িনী" সভা করিয়া কষ্ট পাইবেন না। আপনাদের সহকারিতা আমাদের প্রার্থনীয়, কৃপা নয়। আমাদের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে দিন। আমাদের এ দাবী প্রাণ বাঁচাইবার দাবী।

গ্রামের প্রধান অভাব অর্থের ও অর্থাগমের। গ্রামে টাকা নাই। এমন দিন ছিল, যখন টাকার আবশ্যকতাও কম ছিল। জিনিসের বদলে জিনিস দিলে, কাজের পারিশ্রমিক জিনিসে দিলে, চলিত। সে দিন ত আর নাই। আজ গ্রামের ক্ষুদ্রতম হাটের সঙ্গে পৃথিবীর যোগ সাধিত হইয়াছে। দ্রব্যের মূল্য সহরে আজ আর দ্রব্য নাই। গ্রামে এখনো ষোল-আনা সে প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাই কিছু রক্ষা। তা না হইলে গ্রামে টাকার অভাব আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত; এবং তাহাতে গ্রাম্য দ্রব্যাদির দর কমিয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল। বাহির হইতে গ্রামে

যেমন টাকা আসিতেছে,—(ধানের ও পাটের মূল্যরূপে যে টাকা কৃষকের হাতে পৌছিতেছে)—তাহা গ্রামের ঐ প্রাচীন প্রথার মূলচ্ছেদন করিয়া দিতেছে। জমির পরিবর্ত্তে কাজ চাহিলে আজ আর কেহ সে কথাটা পছন্দ করে না। জমির খাজনার অনুপাতে কাজের মূল্য বেশী বাড়িয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর যে স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা উচ্চতর শ্রেণীর বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে। এ সকল পরিবর্ত্তনের ফলে, টাকার যে শুধু অভাব নয়, গ্রামে যে তার রীতিমত দুর্ভিক্ষ,—তার প্রমাণ টাকার সুদেই পাওয়া যায়। কলিকাতার ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গলের বাৎসরিক সর্ব্বোচ্চ সুদের হার যদি হয় শতকরা ৫৲ টাকা, গ্রামে সেই সময়ের সুদের হার শতকরা ১২৲ হইতে ৭৫৲, এবং দুই বৎসরে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত। আমি মহাজনদের দোষ দিই না। হাজার হোক্ তাহারা মানুষ—লাভের "দাও" হাতে পাইয়া তাহারা ছাড়িয়া দিবে, এ আশা করা বৃথা। কিন্তু কথা এই যে, যে প্রকার সম্পত্তি জামিন রাখিলে ব্যাঙ্ক ৪।৫৲ সুদে টাকা ধার দেয়, সেই সম্পত্তি বন্ধক দিলেও গ্রামে ৮।১০।১২৲ টাকা সুদে টাকা ধার পাওয়া শক্ত হয় কেন? যে ঋণীর টাকা আদানের ক্ষমতা অল্প অথবা অনিশ্চিত, তাহার নিকট হইতে অনিশ্চিততার বীমা স্বরূপ উচ্চতর সুদ গ্রহণ করিতে হয়,—সে কথা না হয় মানিলাম। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে যে সকল ব্যক্তি ঋণ আদায় দিতে সমর্থ এবং প্রস্তুত, তাহাদের নিকট হইতে যদি বর্দ্ধিত হারে সুদ আদায় করা যায়, তাহা অন্যায় নয় কি? আসল কথা এই, মহাজন সুদের দরের মধ্যে ইতর-বিশেষ করিতে অক্ষম। য়ুরোপে মহাজনেরা যখন দরিদ্রদের জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া অল্পহারে টাকা ধার দিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা একটা মস্ত ভুল করিয়া বসিলেন। কোন্ দরিদ্র সেই দয়ার প্রকৃত উপযুক্ত, কে নয়—তাহা তাঁহারা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ফলে, হিতে বিপরীত হইল। আমাদের গ্রামে সুদের হার এত উচ্চ হওয়াতে, মহাজনের নিকট হইতে ধার করিয়া ব্যবসা পরিচালন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষক যে দিন বাধ্য হইয়া ব্যবসায় রক্ষার জন্য তাহার শরণাপন্ন হয়, সে দিন তাহার লাভ-ক্ষতি খতাইবার অবসর নাই। বীজের জন্য যে দিন তাহার টাকার দরকার, সে দিন সে শুধু ব্যবসায়ের হিসাব করে না। ঐ বীজ না হইলে তাহার ভাগ্যে উপবাস,—এই কথাই বড় হইয়া দাঁড়ায়। ফলে, মহাজনের লাভের সঙ্গে ব্যবসায়ের সর্ব্বনাশ হইতেছে। কৃষি কৃষকের প্রাণধারণের উপায় মাত্র, লাভের ব্যবসা নয়। তাই লাভের আশায় সে যদি গ্রাম পরিত্যাগ করে, তাহাকে দোষ দিই না। বক্তৃতার জোরে তাহারা গ্রামে ফিরিবে না। গ্রামের সকল ব্যবসায়ের, সকল উপজীবিকার রক্তশোষণকারী এই যে রাক্ষস সুদ,- ইহার একটা ব্যবস্থা না করিতে পারিলে, ক্রমশঃ গ্রাম হইতে আরও লোক সরিয়া পড়িবে। আপনারা গ্রামে আসিয়া বসবাস করিবেন, আদর্শের দ্বারা গ্রামকে শিক্ষিত করিবেন—ইহা সাধু ইচ্ছা। কিন্তু নিতান্ত ঘরের খাইয়া যাঁহারা বনের মহিষ তাড়াইতে প্রস্তুত না হইবেন, তাঁহারা যে এই উৎসাহ বেশী দিন বজায় রাখিতে পারিবেন, সে আশা করি না। আপনাদের যদি গ্রামে আসিয়া গ্রামের লোক হইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে গ্রামের উপযুক্ত উপজীবিকা গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের একজন না হইয়া, যদি মুরব্বিয়ানা করিতে আসেন, তাহা হইলে শেষে বিরক্ত হইয়া উঠিবেন।

ব্যবসায়ের রক্ত টাকা,—যাহা সুলভ করিতে না পারিলে ব্যবসায়ে শক্তি সঞ্চারিত হয় না। দেশের আর্থিক উন্নতি-অবনতির নিদর্শন -সুদের হার। মনু হইতে চাণক্যের যুগ পর্য্যন্ত ভারতে শতকরা ২০৲ টাকার অধিক সুদ আইন-সঙ্গত ছিল না। আসল যত টাকা, মহাজন তাহার অধিক সুদ কখনো দাবী করিতে পারিত না। তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করুন। গবর্ণমেণ্ট অন্যায় সুদের জন্য আইন করিতেছেন, আমরা তাহাতে আশান্বিত হইতে পারিতেছি না। মহাজনের হাত বাঁধিয়া দিলেই হইবে না, সস্তায় টাকা ধার পাইবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। আপনাদের সহরের দশজনের কৃপায় আইন ঠকাইবার উপায় সহজ হইয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে আপনাদের শিষ্য গ্রাম্য "টাউট" গুরুকে ডিঙ্গাইয়া উঠিয়াছে। মহাজন আইনকে বেশ ঠকাইয়া চলিতে জানে। ১০৲ টাকা কর্জ্জ দিয়া ২০৲ টাকার তমসুক আদায় প্রভৃতি অনেক উপায় তাহার জানা আছে। যে পর্য্যন্ত না গ্রামে-গ্রামে সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গ্রামে টাকা সুলভ হয়, তত দিন কি কৃষি, কি অন্য ব্যবসায়ে লাভের কোঠায় শূন্য পড়িতে

থাকিবে। গ্রামে যতদিন না এই ভাবে ব্যবসায়ের রক্তশোষণ বন্ধ হয়, ততদিন লোকে সহরের দিকে ছুটিবেই। সমবায়-সমিতি যে মৃদুমন্দ গতিতে দেশে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে আমরা হতাশ হইয়াছি। এই বিষয়ে আপনারা একটু মনোযোগ প্রদান করুন। আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের আত্মনির্ভরের এই প্রতিষ্ঠান প্রতি গ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

মহাজন কখনও আমাদিগকে সঞ্চয় করিতে শিক্ষা দিতে পারে না। এতে যে শুধু অক্ষম নয়—এটা তাহার স্বার্থবিরুদ্ধ। আর সমবায় সমিতির শক্তি-বৃদ্ধি হয় সভ্যদিগের সঞ্চয়ের সঙ্গে। টাকা জিনিসটার একটা মস্ত গুণ এই যে, ব্যবহার করিতে জানিলে, তাহার শক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়। রক্তবীজের বংশবৃদ্ধির গল্প অবশ্য জানেন। মুদ্রা রক্তবীজের কলি-সংস্করণ কি না, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদেরা স্থির করিবেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিলিত হইলে তাহার শক্তি যে চার পাঁচ গুণ বাড়ে, তাহা প্রত্যক্ষ সত্য। সমবায় সমিতির সাহায্যে তাহার শক্তি সেই পরিমাণে না বাড়িলেও, বৃদ্ধি যে পায় তাহা আপনারা অবশ্যই জানেন। সমবায়-সমিতিও ব্যাঙ্কজাতীয়। ইহাদের সকলেরই সাধারণ ধর্ম্ম,—টাকার চলাচল সহজ ও দ্রুত করিয়া দেওয়া। যাহার হাতে যত অতিরিক্ত টাকা আছে, তাহা যদি ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া যায়, তাহা হইলে যাহার আবশ্যক, সে সেই ব্যাঙ্ক হইতে উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য পাইতে পারে। আমাদের দরিদ্র গ্রামগুলিতেও কত টাকা পড়িয়া থাকে, যাহা ব্যাঙ্কের হাতে পড়িলে কতগুলি মোহরের কাজ দিত। সহরের ব্যবসায়গুলিও এই একই কারণে নির্জ্জীব ও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যদি আমাদের দেশীয় শিল্পকে সাহায্য করিবার জন্য দেশীয় ব্যাঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে কত শিল্পের অকালমৃত্যু নিবারিত হইতে পারিত, কত শিল্প ও ব্যবসায়ের লাভ বৃদ্ধি পাইতে পারিত। শিল্প-ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে সহরের জন্য দরকার, আর আমাদের জন্য গ্রাম্য সমবায়-সমিতি।

লাভের আশায় লোক সহরে যায়। গ্রামে জীবিকার পথ সুগম করিয়া দিলে গ্রাম পরিত্যাগ বন্ধ হইবে। এখনও ভীত হইবার কারণ নাই—শতকরা ৯০ জন গ্রামেই বাস করিতেছে। সমাজের যাঁহারা মস্তিষ্ক, তাঁহাদের গ্রামে যে আর কখনও ধরিয়া রাখা যাইবে—তাহা আমরা আশা করি না। সহর রাষ্ট্রীয় শিল্প বা শিক্ষার কেন্দ্র। প্রাচীন মুর্সিদাবাদ, নবদ্বীপ—এই শ্রীহট্ট জিলার কত প্রতিভাবান্ সন্তানকে টানিয়া লইয়াছে, স্মরণ করুন। জগন্নাথ, নিমাই, রঘুনাথ শিরোমণি, মুরারি গুপ্ত, অদ্বৈত প্রভৃতি বৈষ্ণব-যুগের শিরোমণি শ্রীহট্টের কৃতী সন্তানগণ কি গ্রাম ছাড়িয়া নগরে গমন করেন নাই? প্রাচীন ভারতের নালন্দ বা বর্ত্তমানের কাশী, পাশ্চাত্য অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজের প্রাচ্য সংস্করণ মাত্র। ইহারা ত গ্রাম নয়। সেকালে নগরের সংখ্যা ছিল অল্প, যাতায়াত ছিল কষ্টকর, তাই বহু প্রতিভা গ্রামেই অখ্যাতির মধ্যে শুকাইয়া যাইত। এখন সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাহারা সহরে যাইতেছে। আমরা তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, হা-হুতাশ করা বৃথা মনে করি। গ্রামের অবস্থা এমন, যে, হয় গ্রামে শিল্পের পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, না হয়, আরো কিছু লোকের সহরে অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে একদল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, যাহাদের জমি মোটেই নাই। আর বেশীর ভাগ লোকের জমির পরিমাণ এত অল্প যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা চালানো যায় না। জমিকে যদি টানিয়া লম্বা করা যাইত, তাহা হইলে মন্দ ছিল না। এত সুবিস্তৃত ভারত মহাসাগরের তেমন কি প্রয়োজন? কিন্তু তাহা যখন হইবার আশা নাই, তখন গ্রামের জন্য অন্য জীবিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। হাতের শিল্প 'মিলের' সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়াছে। আবার তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, নূতন কালের উপযোগী করিতে হইবে। জার্ম্মাণি, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে "কেন্দ্র তাড়িৎ সরবরাহ কোম্পানী" (Central Electric Supply Co.) স্থাপন করিয়া তাড়িৎ সরবরাহ করা হয়। সেখানে ছোট-ছোট বৈদ্যুতিক কলে ক্ষুদ্র শিল্পী আপন কুটীরে কাজ করে। এই ভাবে তাহারা কুটীরে থাকিয়া আধুনিক শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। শ্রীহট্ট জিলার পাহাড়ে যে অসংখ্য জলপ্রপাত আছে, তাহা হইতে অল্প ব্যয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি জন্মাইতে পারা যায়। সেই শক্তি তার-সংযোগে কুটীরে-কুটীরে পাঠানও দুঃসাধ্য নয়; এবং তাহা হইলে, কুটীরে প্রাচীন যন্ত্রের পরিবর্ত্তে আধুনিক মিলের মত যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া কাজ করা

যাইতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে কুটীর শিল্পের সংস্কার ব্যয়-সাপেক্ষ, এবং ব্যবসায়কে লাভজনক করিবার জন্যও ব্যাঙ্কের সাহায্য আবশ্যক। ভাল-ভাল যন্ত্রাদি দীর্ঘ মেয়াদে, ছোট-ছোট কিস্তিতে, বিক্রয় করিবার জন্য প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। শিল্পীদিগকে কাঁচা মাল সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া তৈয়ারী মাল উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিবার জন্যও প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। চাষী মহাজনের বা পাইকারের দাদন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হয় ত আপনারা জানেন। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় এই সকলের প্রতিকার হইতে পারে। ইহাতে সহর ও গ্রামের স্বার্থ এক। এই জন্য ইহাতে আপনাদের সহযোগিতা বিশেষ উপযোগী হইবে। হয় ত বলিতে পারেন, ব্যাঙ্ক-ব্যবসা সফল হইতে পারে না,—যদি না স্থানীয় লোকের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের উপযুক্ত অভ্যাস (banking habits) থাকে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী অন্ততঃ তাঁহাদের সকল আয় ব্যাঙ্কে জমা রাখেন; এবং ব্যাঙ্কের উপর চেক্ দিয়া, বা ব্যাঙ্ক নোট দ্বারা * ব্যয় চালান। রোক টাকা বড় একটা তাহাদের আবশ্যক হয় না। ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবারের প্রথম সোপান নোটের ব্যবহার। আমাদের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোকেদের নোট ব্যবহারের অভ্যাস থাকিলেও, নিম্নশ্রেণী তাহার সহিত আজও অপরিচিত। কাগজ যে টাকা হয়, সোণা-রূপা-তামা ছাড়াও যে ভাল মুদ্রা হয়, তাহা অনেকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয়। অথচ এ কথাও সত্য যে, সর্ব্বপ্রথম মানব যে মুদ্রার ব্যবহার করিত, তাহা সোণা বা রূপার ছিল না। রাজার নাম বা অন্য কোন অর্থজ্ঞাপক চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইত বলিয়া তাহার নাম মুদ্রা। ঐ মুদ্রিত দ্রব্য চামড়ার হইতে পারিত। চীন দেশে চায়ের কেক্ মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। সোণা-রূপার মুদ্রার সুবিধা এই যে, তাহা সহজে নষ্ট হয় না; আর বৈদেশিক বাণিজ্যে তাহা সুবিধাজনক। আজকাল পাশ্চাত্য দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের মোট মূল্যের অতি অল্প অংশই সোণা বা রূপার টাকায় দিতে হয়; বেশীর ভাগ কাগজেই চলিয়া যাইতেছে। ইহাতে বিশেষ সুবিধাই এই যে, দেশের মুদ্রার কার্য্যে যে পরিমাণ সোণা বা রূপা আবদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহার বেশীর ভাগের দ্বারা কলকারখানা স্থাপন করিয়া দেশের ধন-বৃদ্ধি করা যায়। আমাদের দেশে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত নোট বাহির করিতে হইলে, গবর্ণমেণ্ট, সেই মূল্যের মুদ্রিত টাকা বা সোণা জমা রাখিয়া তবে বাহির করেন। যদি গবর্ণমেণ্ট এই প্রকার জমা ছাড়া নোট বাহির করিতেন, তাহা হইলে সরকারী ব্যয় অনেক কমিয়া যাইত। সুতরাং সরকার বহু নূতন প্রয়োজনীয় কার্য্যে সেই অর্থ ব্যয় করিতে পারিতেন, অথবা দেশের ট্যাক্স কমাইয়া দিতে পারিতেন। এমন ভাবে নোট বাহির করা উচিত কি না তাহা বলিতেছি না। নিম্নশ্রেণীর উপযুক্ত নোট বাহির করিলে যে দেশের লোকের ব্যাঙ্ক-কারবারী অভ্যাস (banking habits) বাড়িবে, তাহা নিঃসন্দেহ। এক টাকা ও আড়াই টাকার নোট তাই আমরা আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ব্যাঙ্ক—ব্যবসায়ের হৃৎপিণ্ড। তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে।

অর্থের অভাবে আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। বাঙ্গালা দেশ ম্যালেরিয়ার ঘরবাড়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার এক কারণ আমাদের দারিদ্য, এবং দ্বিতীয় কারণ নদী নালার দুর্দ্দশা। বিশেষভাবে সহরের সুবিধার জন্যই রেল রাস্তার সৃষ্টি, এবং রেল-রাস্তাই নদীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আগে লোকে রাস্তা করিত, কিন্তু মাঠের ভিতর দিয়া সড়ক করিত না। বর্ষার দিনে সড়ক অপেক্ষা খালের আবশ্যকতা আমাদের বেশী। তাহাতে শুধু যে জল নিকাশ হয় তাহা নয়, যাতায়াতেরও সুবিধা হয়। আপনারা চান, গাড়ী ঘোড়ায় চড়িবার জন্য সড়ক; আর আমরা চাই, জলের জন্য খাল। আচ্ছা, একটা কায করিলে হয় না,—আপনারা রাস্তা না করিয়া, খাল খনন করুন; এবং খালের সমস্ত মাটি এক পাড়ে ফেলিয়া সড়ক করিয়া ফেলুন, তাহাতে জলের ও সড়কের দুইয়েরই একসঙ্গে বন্দোবস্ত হয়। রাস্তার সংস্কার আপনারা বছর-বছর করাইতেছেন,—নদী-বেচারা এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার জন্য আপনারা পয়সাটি ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন ?

* পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষতঃ আমেরিকায় ব্যাঙ্কের নোট বাহির (issue) করিবার ক্ষমতা আছে। ভারতীয় ব্যাঙ্কের সে অধিকার নাই। ইংলণ্ডে একমাত্র ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের সে ক্ষমতা আছে।

আমরা যে নিতান্ত গরীব, তাহার এক ফলই আমাদের অস্বাস্থ্য। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে আমরা ম্যালেরিয়া ও শোষে (Tuberculosis) মরিতেছি। শুধু খাদ্য নয়,—গৃহ ত বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; এবং তার উপর বাসস্থানেরই অভাব। গ্রামে কোন-কোন ঘরে এতগুলি মানুষ থাকে যে, ততগুলি গরুও সেখানে থাকিতে পারে না। ঐ বাসস্থানের অভাব কেবল কি স্বাস্থ্যের অনিষ্ট করিতেছে? চরিত্রের কি ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা বলা অনাবশ্যক। সহরে বাসগৃহের অভাব আরও গুরুতর। ছোট একটা ঘরের মধ্যে ৩।৪টি বয়স্ক সন্তানসহ স্বামী স্ত্রীর বাস করার কুফল সর্ব্বদাই দেখিতেছি। গ্রামের মজুরদের অবস্থা প্রায় সকল দেশেই অপেক্ষাকৃত হীন। ইংলণ্ডেও গ্রাম্য মজুর প্রতিবেলায় জনপ্রতি এক আনার (দৈনিক ৶০ আনার) বেশী ব্যয় করিতে পারে না। ওয়াকার (General Walker) বলিয়াছেন, সকল দেশেই কৃষি মজুরের পারিশ্রমিক অন্য সকল মজুরের অপেক্ষা কম। কিন্তু কৃষক বা কৃষি-মজুরের বাসস্থানের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য আজও ত ভারতবর্ষে কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই। আমাদের জন্য য়ুরোপের মত সমবায় গৃহ নিম্মাণ সমিতি (Co-operative Housing Society) গঠন করিয়া দিয়া বাসস্থানের, স্বাস্থ্যের ও চরিত্রের উন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারেন।

কৃষির উন্নতির অন্তরায়ের মধ্যে গো-সমস্যা অন্যতম। গরু শুধু দুর্ব্বল নয়, মড়কের ফলে তাহাদের বংশ লোপ পাইতে চলিয়াছে। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ গরু আমাদের আছে, তাহা চাষের জন্য যথেষ্ট নয়; তার উপর ক্রমাগতই তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। গো-মড়ক নিবারণের চেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গে গো-বীমার (Cattle Insurance) প্রবর্ত্তন না করিলে কৃষকের উপায় নাই। হঠাৎ যে দিন গরু মরিতে আরম্ভ করে, সে দিন সম্পন্ন গৃহস্থও হঠাৎ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। গো-বীমার জন্য একটা বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ২১১টি গো-বীমা-সমিতি স্থাপিত হইয়া সফলতা লাভ করিয়াছে, শুনিয়াছি।

জাম্মাণি ও ইংলণ্ডে দরিদ্র শ্রমজীবীর জন্য সরকারী বাধ্যতা-মূলক বীমার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে তাহার আবশ্যকতা আরও বেশী। স্বীকার করি, কৃষি-প্রধান দেশে দরিদ্রের উপযুক্ত সরকারী বীমা প্রবর্ত্তন করা কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু তথাপি তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

বৈজ্ঞানিক চাষ-প্রণালীর প্রবর্ত্তনের কথা বলিলেই আপনারা বলিয়া থাকেন, "শিক্ষার অভাবে এ দেশে চাষের উন্নতি অসম্ভব। গ্রামের লোক নিরক্ষর ও পরিবর্ত্তন-বিরোধী (Conservative)।" গ্রাম নিরক্ষর সত্য, কিন্তু পরীক্ষিত কোন্ নূতন সত্যকে আমরা অগ্রাহ্য করিয়াছি? আপনারা সোলার টুপী চড়াইয়া আমাদের "সাহায্য" করিবার কথা বলিলেই, আমাদের প্রীহা চমকিয়া যায়। ঐ জিনিসটার সহস্র গুণের মধ্যে হৃদয়ের পরিচয় পাইতে আমরা অভ্যস্ত নই। আমাদের মত সাদাসিধা লোক পাঠাইবেন, দেখিবেন, আমাদের হৃদয়ের দ্বার কত উন্মুক্ত। আমরা হুকুমকে অবিশ্বাস করিলেও, চোখকে মানি। আমরা দেখিয়া শিখিতে জানি। আপনাদের মত পুস্তকই আমাদের গুরু নয়। আমাদের চোখের সামনে দেখাইয়া দিন, আমরা মাথা পাতিয়া লইব। ছাপার পুঁথিতে লিখিয়া পাঠান, নমস্কার করিয়া বোচ্‌কায় তুলিয়া রাখিব। এটা বদ্ অভ্যাস হইতে পারে, কিন্তু এটা আপনাদিগকে জানাইয়া রাখা ভাল। কেন না, ঐ কথাটা ভুলিয়া গিয়া আপনারা পদে-পদে হোঁচট্ খাইতেছেন। এবং সেই সঙ্গে আমাদের প্রতি যে সকল বিশেষণ-বাণ প্রয়োগ করেন, তাহার—জবাব না দিলেও—প্রশংসা করিতে পারি না।

কিন্তু তার বাড়া আপনাদের উপর এক দফে নালিশও আমাদের আছে। সে সহরের আদালত। ঝগড়া মিটাইবার যে অধিকরণ, তাহা ঝগড়া-সৃষ্টির যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঝগড়া যেখানে ছিল না, সেখানে ঝগড়া-সৃষ্টির উপায়—আদালতজীবী, ব্যবহারজীবী ও তাহাদের এজেণ্ট গ্রামের "তালাবিকারদের" স্মরণ নেওয়া! আদালতওয়ালাদের কৃপায় ধর্ম্মাবতারদের নিকট হলপ করিয়া মিথ্যা বলার লজ্জা ঘুচিয়া গিয়াছে! আইন-আদালতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। রাস্তায় ধরিয়া রাম আমাকে মারপিট করিল, তাহার জন্য প্রতিকার পাইতে হইলে—আমাকে রাস্তা-খরচ করিয়া সহরে আসিতে হইবে, উকীল-মোক্তার বাবুদের বাসায় ধন্না দিতে হইবে, আদালতে ন্যায্য ও অন্যায্য পয়সা খরচ করিয়া—তবে প্রতিকার পাইতে হইবে। তার পর,

মারিল আমাকে, শাস্তি দিল আর এক জন,—এতে না মিটে প্রতিহিংসা, না হয় ক্ষতিপূরণ। দণ্ডিত ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করিয়া, সংযত হওয়া দূরে থাকুক, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চেষ্টিত হয়। আমাদের পঞ্চায়তি বিচারই ছিল ভাল,—পয়সা খরচ নাই, হাঁটাহাঁটি নাই, সাক্ষীর জন্য "জোগাড়ের" আবশ্যকতা নাই, আর্জি ও রায় প্রকাশের মধ্যে সুদীর্ঘ ব্যবধান নাই। আপনাদের আয়ের উপর কোন আক্রোশ নাই; কিন্তু সাধারণ মোকদ্দমার, পঞ্চায়তি বিচার করাইয়া, সহরে যাওয়া বন্ধ করিলে মন্দ হয় কি? তাহাতে গ্রামের শুধু যে অর্থের অপব্যয় বন্ধ হইবে তাহা নয়, গ্রামের নির্জ্জীবতা দূর হইবে। গ্রামের যে শক্তিকেন্দ্র শাসনের দ্বারা শান্তিরক্ষা করিত, তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

গ্রাম হইতে যাহারা সহরে যাইতেছে, তাহাদের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিবেন। সহরে কি জঘন্য গৃহে, কি কুখাদ্য খাইয়া, কি ঘৃণ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাহারা বাস করিতেছে, তাহা কি আপনারা দেখিতেছেন না? ইহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারিলে, সে দৃষ্টান্তের ফল গ্রামেও দেখিতে পাইবেন। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের মজুর ও অন্য দরিদ্র শ্রেণী কি অস্বাস্থ্যকর ও চরিত্র হানিকর অবস্থায় বাস করে, তাহা বলা অনাবশ্যক। রোগ সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়াছে। ইহাদের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে কার্য্যকুশলতা বাড়াইবার চেষ্টা করুন। দেখা গিয়াছে, ইহাদের কার্য্যকুশলতা তেমন নয় বলিয়া ভারতীয় মিলে যুরোপের অপেক্ষা, ছয়গুণ না হইলেও, তিন-চারি-গুণ বেশী মজুর আবশ্যক হয়। ইহাদের দক্ষতা শিক্ষার দ্বারা বাড়াইয়া দিতে পারিলে, শুধু যে মিলের লাভ বাড়িবে তাহা নয়, ইহাদের আয়ও বাড়িবে, সহরের ভিড়ও কমিবে এবং ভারতব্যাপী "শিক্ষিত" মজুরের (trained labour) যে অভাব, তাহা কমিয়া যাইবে। গ্রামের লোকসংখ্যা কম হ্রাস হইবে। চীন দেশে মিশনারী পাঠাইবার আগে ঘর সামলান। ভারতের আধুনিক সহর ত নির্ম্মিত হয় নাই—অনাথ বালকের মত বাড়িয়া উঠিয়াছে। নগর-নির্ম্মাণ যে একটা বিদ্যা, তাহা আপনারা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। জয়পুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরে যেমন বাসিন্দার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি আছে, কলিকাতায় তাহা পাওয়া যায় না। এখানে ইমারতগুলি যেমন শ্রীহীন, সহরের নির্ম্মাণ প্রণালীও তেমনি অবৈজ্ঞানিক। গ্রামে বরং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে সূতারপাড়া, কুমারপাড়া ইত্যাদি আছে, বাড়ীগুলির গঠনের একটা যুক্তিযুক্ততা ছিল দেখা যায়; কিন্তু আজকালকার নগরে ত তাহা দেখি না। তাই বলিতেছিলাম, আগে ঘর সামলান।

শিক্ষার অভাব ত ভারতব্যাপী। শিক্ষা আমাদের চাই—কিন্তু গ্রামের উপযোগী শিক্ষা। আমরা শিক্ষক চাই গ্রামের উপযোগী। আমরা ইংরাজী পড়া ডাক্তারের প্রার্থী নই—কিন্তু বৈজ্ঞানিক ডাক্তার চাই, যে গরীবের স্বেচ্ছাদত্ত অর্থে সন্তুষ্ট হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারী বিদ্যা শিখাইলে গ্রামে-গ্রামে ডাক্তার পাওয়া সহজ হইবে। বড়-বড় ডাক্তার, ল্যাটিন নামের বোঝাই লইয়া, বড় লোকের জন্যই থাকুক। গ্রামের জন্য বাঙ্গালানবীশ ইঞ্জিনীয়ারই যথেষ্ট। আমাদের জন্য সেই প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন ত করুন। এখন ত আপনারা শুধু সহরের লোক তৈয়ার করিতেছেন। যদি কৃষি-বিদ্যা আমাদের জন্য শিখান, তাহা হইলে ঘরের কাছে তাহার জন্য বিদ্যালয় হউক,—যেখানে গ্রামের পাঠ শেষ করিয়া বাঙ্গালানবীশ চাষীর ছেলে শিক্ষালাভ করিতে পারে। আপনাদের কৃষি-কলেজ চাকুরিজীবী শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি করুক, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বা ক্ষোভ নাই। শিক্ষা দিবেন যদি আমাদের শিখাইবার জন্য, তাহা হইলে সেটা আমাদের উপযোগী করিয়া দিন—যেন শিক্ষা পাইয়া, গ্রামে থাকিয়া নিজের ও দশের উন্নতি করিতে পারি।

আমাদের দাবীর লিষ্ট লম্বা হইয়া গেল। সমাজে যে হীন, সমাজের উপর তাহার অধিকার সমধিক। পত্র দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, আজ এইখানে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। ইতি—

নিবেদক

শ্রীগ্রামিক।

এক্ষেত্রে প্রেমের জন্য ছদ্মবেশ নহে, তবে পিতৃব্যের প্রাসাদে বাসকালেই (নির্ব্বাসনের অব্যবহিত পূর্ব্বে) রোজালিণ্ড অর্ল্যাণ্ডো-নামক বীর যুবকের প্রেমে পড়িয়াছিলেন। তিনি পিতার নির্ব্বাসন-ভূমি আর্ডেন-বনে (ইহা শেক্স্পীয়ারের পঞ্চবটীবন) পৌঁছিলে, ঘটনাচক্রে অর্ল্যাণ্ডোও সেই বনে পৌঁছিলেন। অর্ল্যাণ্ডোও যে তাহার প্রেমে পড়িয়াছেন, ক্রমে রোজালিণ্ড তাহার প্রমাণ পাইলেন; পরন্তু, এক শুভদিনে শুভক্ষণে প্রেমিকের দেখা পাইলেন। প্রেমিক অবশ্য ছদ্মবেশিনীকে চিনিলেন না। গ্যানিমিড (রোজালিণ্ড) কৌতুকচ্ছলে প্রেমিকের প্রেমজ্বর সারাইবার ভার লইলেন; এবং প্রেমিক তাঁহাকেই প্রেম প্রতিমা রোজালিণ্ড মনে করিয়া তাহাকে প্রেমজ্ঞাপন করিবেন, ঘন ঘন দর্শন দিবেন, আর তিনি নারীসুলভ খামখেয়ালি মেজাজে কখন আদর, কখন অবহেলা, কখন বিরাগ, কখন অনুরাগ, কখন উপহাস, কখন সমবেদনা প্রকাশ করিয়া চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিবেন বলিলেন। প্রেমিক ব্যাপারটা ঝুটো বুঝিয়াও রাজী হইলেন; কেন না, এরূপ ভানেও একটু তৃপ্তি হয় (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)। রোজালিণ্ড এই ভূমিকা গ্রহণ করিয়া পোর্শিয়া অপেক্ষাও স্ফূর্ত্তিবোধ করিয়াছেন। তিনি প্রেমিকের সহিত কথাবার্ত্তায় কখন কখন একটু প্রগল্ভতার পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা আত্মগোপনের জন্য, প্রকৃত মনোভাব চাপিবার জন্য; তাহাতে তাঁহার লজ্জাহীনতা প্রকাশিত হয় নাই। তিনি নারী হইয়াও পুরুষবেশে যে নারীনিন্দা করিয়াছেন, তাহা বড়ই উপভোগ্য। এই কৌতুকের অন্তরালে তাঁহার যে সুগভীর প্রেমের নিদর্শন তাহার ভগিনীর সহিত কথাবার্ত্তায় পাওয়া যায়, তাহা বড় নির্ম্মল, বড় মধুর (৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)। বিশেষতঃ, যখন অর্ল্যাণ্ডো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিতে গিয়া আহত হইয়াছেন এই সংবাদে রোজালিণ্ড মূর্চ্ছিতা হইলেন, এবং মূর্চ্ছাপগমে 'কেমন ভান করিয়াছি!' বলিয়া প্রেমিকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সারিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, তখনকার ব্যাপার বড়ই প্রাণস্পর্শী (৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)।

এই কৌতুকের উপর আরও মাত্রা চড়াইয়া গল্পলেখক ও নাটককার আবার আর এক ভ্রান্তিবিলাসের আয়োজন করিয়াছেন। ফীবি (Phoebe)-নাম্নী যুবতী প্রেমিক যুবক সিল্‌ভিয়াসের ভালবাসার প্রতিদান করিতে কিছুতেই রাজি নহে; কিন্তু গ্যানিমিড (রোজালিণ্ড)কে দেখিবামাত্র পুরুষভ্রমে তাহার প্রেমে পড়িল*। রোজালিণ্ড ফীবিকে বেগোরে পাইয়া খুব গরম গরম দু'কথা শুনাইয়াছেন। এই প্রেমের গোলকধাঁধা (love at cross-purposes) বড়ই মজাদার। সিল্‌ভিয়াস্ ফীবিকে ভালবাসে, ফীবি গ্যানিমিডকে ভালবাসে, গ্যানিমিড (রোজালিণ্ড) অর্ল্যাণ্ডোকে ভালবাসে, অর্ল্যাণ্ডো রোজালিণ্ডকে ভালবাসে কিন্তু গ্যানিমিডই যে রোজালিণ্ড তাহা জানে না—এবম্প্রকার ঘোরালো ও মজাদার ব্যাপার The Two Gentlemen of Veronaয় নাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এক্ষণে এই গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইবার পথ খোঁজা যাউক। গ্যানিমিড শেষে অর্ল্যাণ্ডোর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া বলিল, 'ইন্দ্রজাল বলে আমি তোমার আসল রোজাকে আনিয়া দিব, তখন তাহাকে বিবাহ করিবে ত?' আর ফীবিকে বলিল, 'আমি যদি কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করি, তবে তোমাকেই বিবাহ করিব; কিন্তু তুমি যদি কোনও কারণে পরে আমাকে বিবাহ করিতে না চাও, তাহা হইলে সিল্‌ভিয়াস্‌কে বিবাহ করিবে ত?' [৫ম অঙ্ক, ২য় ও ৪র্থ দৃশ্য), উভয়েই সম্মত হইলে গ্যানিমিডের খোলস হইতে রোজালিণ্ড বাহির হইলেন; অর্থাৎ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি নববধূবেশে আত্মপ্রকাশ করিলেন। অর্ল্যাণ্ডো কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন—আর ফীবি নেশার চট্‌কা ভাঙ্গিলে অনন্যগতি হইয়া লক্ষ্মীমেয়ের মত মামুলি প্রণয়ার্থী সিল্‌ভিয়াস্‌কেই মঞ্জুর করিল।

ফীবি সম্বন্ধে একটি কথা বলিব। তাহার প্রেমের উদ্দামতা কেমন-কেমন লাগে বটে, কিন্তু তথাপি ইহা প্রেম; স্পেন্‌সারের কাব্যে পুরুষবেশিনী ব্রিটোমার্টের সঙ্গপ্রার্থিনী ম্যালিকাষ্টার জঘন্য প্রবৃত্তি নহে। তবে তাই বলিয়া স্পেন্‌সারের রুচির নিন্দা করিলে, তাঁহার প্রতি অবিচার

* অন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রণয়ী বালকভৃত্য-বেশিনী পূর্ব্ব-প্রণয়িনীর মারফত নবপ্রণয়পাত্রীর নিকট প্রণয়লিপি, প্রণয়োপহার প্রভৃতি প্রেরণ করিয়াছেন (The Two Gentlemen of Verona, এবং Twelfth Night দ্রষ্টব্য), কিন্তু এক্ষেত্রে ফীবি তাঁহার প্রণয়প্রার্থীর মারফত প্রণয়াস্পদ পুরুষবেশিনীর নিকট প্রণয়লিপি পাঠাইয়াছে, তবে পত্রের মর্ম্মার্থ সম্বন্ধে দূতের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে।

করা হইবে; কেন না, সে ক্ষেত্রে স্পেন্সারের গূঢ় উদ্দেশ্য রূপকচ্ছলে (allegorically) নারীর শুচিতা (chastity) ও উদ্দাম লালসার (contrast) বিরোধিতা প্রদর্শন।

রোজালিণ্ডের পুরুষবেশ ধারণে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ-বোধ, তাঁহার রসিকতা ও বাক্‌পটুতা, তাঁহার রঙ্গব্যঙ্গ ও চতুরালি এবং ইহার অন্তরালে তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য্য, গভীর প্রেম, তাঁহার চরিত্রকে সম্মাতিশায়িনী রমণীয়তায় মণ্ডিত করিয়াছে। পুরুষবেশধারিণীর এমন উজ্জ্বল চটকদার চিত্র শেক্‌স্পীয়ারের আর কোন নাটকে নাই।

(৪) Twelfth Night.

ইহার পরবর্ত্তী নাটক Twelfth Nightএ নারীর পুরুষবেশের আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই নাটক রচনার পূর্ব্বে অনেকটা এই প্রকারের আখ্যান দুইটি ইতালীয় গল্পে, একটি ফরাসী গল্পে, একটি ইংরেজী গল্পে এবং একাধিক ইতালীয় নাটকে প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ ইংরেজী গল্পটি হইতেই শেক্‌স্পীয়ার আখ্যানটি লইয়াছেন, হয় ত ইতালীয় নাটকগুলিও তাঁহার পরিচিত ছিল এবং সেগুলি হইতেও তিনি দুই একটা জিনিস লইয়াছেন; ইংরেজী গল্পটি ইতালীয় গল্প হইতে গৃহীত, ইহা একপ্রকার নিঃসন্দেহ। As You Like Itএ আমরা দেখিয়াছি যে, যদিও নায়িকা গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই প্রেমে পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি জুলিয়া-জেসিকার মত প্রেমের দায়ে পুরুষ-বেশ ধারণ করেন নাই, তদপেক্ষা গুরুতর কারণে করিয়াছিলেন। যে সকল নাটক ও গল্প Twelfth Nightএর মূল বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার অনেকগুলিতে নায়িকা প্রেমের দায়েই প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইবার জন্য পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছেন, কোন কোনটিতে প্রেমাস্পদ প্রোটিয়াসের মত বিশ্বাসঘাতকতাও করিয়াছেন। যাহা হউক, শেক্‌স্পীয়ারের নাটকে প্রেমের জন্য ছদ্মবেশ নহে। ইহার আখ্যান এইরূপ:—

ভায়োলা-নাম্নী যৌবনস্থা কুমারী জলমগ্ন জাহাজ হইতে কোন প্রকারে রক্ষা পাইলেন; কিন্তু কোথায় যাইবেন কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, জাহাজের কাপ্তেনের নিকট উপকূলবর্ত্তী দেশের পরিচয় লইলেন। তথায় এক ডিউক রাজত্ব করেন শুনিয়া ডিউক বিবাহিত কি না জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইচ্ছা, তাঁহার পত্নীর দাসীবৃত্তি করেন, কিন্তু ডিউক বিবাহিত নহেন শুনিয়া নারীর পক্ষে তাঁহার আশ্রয় লওয়া অসঙ্গত মনে করিয়া, ডিউকের কাহারও সহিত প্রণয় ও পরিণয়ের কথাবার্ত্তা চলিতেছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন; তৎপ্রসঙ্গে অলিভিয়ার নাম শুনিয়া তাঁহারই দাসীবৃত্তি করিবেন মনে মনে স্থির করিলেন; কিন্তু তিনি ভ্রাতৃশোকে অধীরা হইয়া কাহাকেও দর্শন দেন না এই কথা শুনিয়া অনন্যোপায় হইয়া ডিউকের আশ্রয় গ্রহণই সাব্যস্ত করিলেন, এবং অগত্যা অনূঢ় পুরুষের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করার পক্ষে পুরুষবেশধারণ করাই সুযুক্তি বিবেচনা করিলেন (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)। তিনিও জুলিয়া-জেসিকা প্রভৃতির ন্যায় নিজেই এই ছদ্মবেশ স্থির করিলেন, অন্যের পরামর্শে নহে। তিনি কেন ডিউক সম্বন্ধে এত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অবশেষে ডিউকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন, ইহার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকাতে, কোন কোন সমালোচক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি ডিউককে প্রেমের ফাঁদে ফেলিবার জন্য আটঘাট বাঁধিয়া কার্য্য করিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত,— সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকদিগের যাহা সিদ্ধান্ত, তাহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি।

এক্ষেত্রেও প্রেমের দায়ে ছদ্মবেশ নহে, কিন্তু ছদ্মবেশ ধারণের পর প্রেমের উদ্ভব হইয়াছে। ভায়োলা সিজারিয়ো ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া ডিউকের অধীনে বালক ভৃত্যের কার্য্য করিতে-করিতে প্রভুর অজ্ঞাতে প্রভুকে একান্ত ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। এদিকে ডিউক তাঁহাকে প্রণয়পাত্রী অলিভিয়ার নিকট প্রণয়-দৌত্যে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার স্বগতোক্তি হইতে জানা যায় যে, তিনি ইহাতে (জুলিয়ার মত) বেদনা পাইতেছেন (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য); কিন্তু তথাপি নিঃস্বার্থভাবে প্রণয়ব্যাপারে ডিউকের আনুকূল্য করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার স্থান জুলিয়া অপেক্ষা অনেক উচ্চে। তিনি হাসিমুখে অলিভিয়ার সঙ্গে একটু রঙ্গ করিয়াছেন, কিন্তু সে কেবল হৃদয়ের বেদনা গোপন করিবার জন্য, তিনি মতিবিবির মত প্রণয়াস্পদের প্রণয়পাত্রীর অবগুণ্ঠনমুক্ত মুখ দেখিতে চাহিয়াছেন এবং প্রাণ খুলিয়া সেই মুখখানির প্রশংসা করিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি ডিউকের হইয়া অলিভিয়াকে অনুরোধ করিয়া যখন ফল পাইলেন না, তখন তাঁহাকে গর্ব্বিতা বলিয়া ভর্ৎসনা পর্য্যন্ত করিলেন। এই ভর্ৎসনায় কিন্তু

অলিভিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকের কীবির দশা হইল, তিনি সিজারিয়ো (ভায়োলা)র প্রেমে পড়িলেন এবং ইঙ্গিতে সে ভাব প্রকাশও করিলেন (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)।

ভায়োলা রোজালিণ্ডের মত রঙ্গরসিকা নহেন, এবং রোজালিণ্ডের ন্যায় ছদ্মবেশ-ধারণে স্ফূর্ত্তিবোধ করেন নাই; বরং তিনি অলিভিয়ার দশা বুঝিয়া ছদ্মবেশের দোষ দিলেন এবং নারীর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বিড়ম্বিতা অলিভিয়ার জন্য করুণার উদ্রেক হইল (২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)। ইহার পরে একটি দৃশ্যে (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য) ডিউক-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভায়োলা তাঁহাকে নিজের প্রেমের সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দিয়াছেন, কিন্তু এমন কৌশলে যে ডিউক সেই বালক ভৃত্যের প্রেমকাহিনী হইতে ভিতরকার কথা কিছুই বুঝিলেন না। আবার ডিউক যখন বলিলেন, নারীর প্রণয় পুরুষের প্রণয়ের মত গভীর নহে, তখন ভায়োলা ভগিনীর জোবানী নিজের গোপন ব্যথার কথা বলিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিলেন। এই স্থানটি নাটকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ।

দ্বিতীয়বার দৌত্যে আসিলে অলিভিয়া সিজারিয়ো (ভায়োলা) কে প্রথমে ঠারেঠোরে, তাহার পর স্পষ্টবাক্যে প্রেমজ্ঞাপন করিলেন। ভায়োলা রোজালিণ্ডের মত তাঁর শ্লেষে বিড়ম্বিতাকে দগ্ধ করিলেন না, করুণায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। অলিভিয়ার আত্মনিবেদনের উত্তরে তিনি হেঁয়ালির হারে যে কথা বলিলেন তাহা অবশ্য অলিভিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)।

ইহার পর অলিভিয়া অধৈর্য্য হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তিনি আসিলে তাঁহাকে আত্মদান করিতে চাহিলেন (৩য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)। ভায়োলা তখনও প্রভুর তরফে ওকালতী করিলেন। এই দৃশ্যে পুরুষবেশের জন্য তাঁহার এক বিপদ্ ঘটিল,—মাতালের হাতে তাঁহার লাঞ্ছনার উপক্রম হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে উদ্ধার হইল।*

এই পর্য্যন্ত দেখা গেল, ভায়োলা ডিউককে (তাঁহার অজ্ঞাতে) ভালবাসে, ডিউক অলিভিয়াকে ভালবাসে, অলিভিয়া পুরুষ ভ্রমে ভায়োলাকে ভালবাসে,—প্রেমের গোলকধাঁধা বটে, কিন্তু As You Like Itএর ফীবি অপেক্ষাও অলিভিয়ার অবস্থা শোচনীয়; কেন না, তাঁহার সিল্‌ভিয়াসের মত প্রত্যাখ্যাত প্রণয়প্রার্থীও শেষ অবলম্বন নাই। এইবার কিন্তু তাঁহার উপায় হইল, প্রজাপতি সদয় হইলেন। এই সন্ধিক্ষণে ভায়োলার যমজ ভ্রাতা (তিনিও জাহাজডুবিতে বিপন্ন হইয়াছিলেন) সিবাষ্টিয়ান আসিয়া পড়িলেন। অলিভিয়া তাঁহাকেই সিজারিয়ো (ভায়োলা) ভাবিয়া প্রথমে বাগ্‌দান ও পরে বিবাহ করিলেন (৪র্থ অঙ্ক, ১ম ও ৩য় দৃশ্য)। সিবাষ্টিয়ানও সুবুদ্ধির মত 'যাচা মেয়ে' গ্রহণ করিতে গররাজি হইলেন না। (মূল ইংরেজী গল্পে বিধবার ব্যাপারে আরও অনেক দর গড়াইয়াছে।)

তাহার পর পঞ্চম অঙ্কে যমজ ভ্রাতা ও পুরুষবেশিনী ভগিনীর চেহারার সৌসাদৃশ্যবশতঃ অনেক ভ্রান্তিবিলাস ঘটিল। যেটুকু প্রাসঙ্গিক সেইটুকুই বিবৃত করিব। অলিভিয়া ডিউকের সম্মুখে সিজারিয়ো (ভায়োলা)কে সিবাষ্টিয়ান-ভ্রমে স্বামী বলিয়া দখল করিতে উদ্যত হইলেন, ডিউক প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া সিজারিয়ো (ভায়োলা)কে শাস্তি দিতে প্রস্তুত হইলেন। ভায়োলা কিন্তু ডিউককে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, আর কাহাকেও বাসেন না, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিলেন। শেষে অলিভিয়ার আসল স্বামীর আবির্ভাব হইল, ভায়োলা ছদ্মবেশ ত্যাগ করিলেন, ভ্রাতা-ভগিনীর মিলন হইল, নব পরিণীত পতি-পত্নীরও মিলন হইল,—আর ডিউক হার-কাত দেখিয়া ভায়োলাকে বলিলেন, 'তুমি ত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছ আমাকে ভালবাস, অতএব তোমাকেই পত্নীভাবে গ্রহণ করিব।' এতদিনে ভায়োলার নীরব সাধনার সিদ্ধি হইল, নিঃস্বার্থ প্রেমের পুরস্কার হইল।

এই নাটকে ভায়োলার চরিত্র ধীরতায়, কোমলতায়, প্রেমের গভীরতা ও নিঃস্বার্থতায়, শুচিতায় ও আত্ম-সংযমে অতুলনীয়। রোজালিণ্ডের চরিত্রে উজ্জ্বলতা অধিক, কিন্তু ভায়োলার চরিত্রে মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অধিক।

(৫) Cymbeline.

শেক্‌স্‌পীয়ারের Cymbeline নাটকে নায়িকা রাজকন্যা

* গ্রীনের নাটকে (ভারতবর্ষ ফাল্গুন, ৩৩৭ পৃ.) রাজ্ঞী ডরোথিয়া আততায়ীর হস্তে পড়িয়া সাহস দেখাইয়াছেন। পোর্শিয়া ও রোজালিণ্ড সশস্ত্র পুরুষের বেশ ধারণ-কালে খুব বীরত্বের আস্ফালন করিয়াছেন, বিপদে পড়িলে এই আস্ফালন কতদূর টিকিত বলা যায় না। বেচারা ভায়োলা কখনও ওরূপ আস্ফালন করে নাই, কিন্তু বিপদে পড়িতে সেই পড়িল! হায় কি বিধির বিবেচনা!

আইমোজেনের বালক-ভৃত্য-বেশ শেক্‌স্‌পীয়ারের কল্পনা-লীলায় নারীর পুরুষবেশের শেষ দৃষ্টান্ত। নাটকখানি তাঁহার শেষ বয়সের রচনা। এই নাটকের প্রধান আখ্যানের অনুরূপ আখ্যান একটি ইতালীয় গল্পে ও একটি ইংরেজী গল্পে আছে। ইহা ছাড়া একাধিক ফরাসী কাব্য-নাটকে, এমন কি ইউরোপের অন্য কোন কোন দেশের সাহিত্যেও, এইরূপ আখ্যান আছে। তবে শেক্‌স্‌পীয়ার যে ইতালীয় গল্পটির (বা সেইটির কোন পুরাতন ইংরেজী অনুবাদের) নিকট ঋণী ইহা নিঃসন্দেহ। ইংরেজী গল্পটি তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল কি না, এমন কি গল্পটি তাঁহার নাটকের পূর্ব্ববর্ত্তী কি না, সে বিষয়ে বিলক্ষণ সংশয় আছে। ইতালীয় গল্পটির শেষভাগে শেক্‌স্‌পীয়ার বহু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, অন্যত্রও ছোটখাট পরিবর্ত্তন আছে; চরিত্রাঙ্কনে মূল গল্পের সহিত যথেষ্ট প্রভেদ আছে।

গল্পের একটি অংশ বড় কদর্য্য, সেটুকু যথাসম্ভব চাপিয়া মোটামুটি ছদ্মবেশের ব্যাপারটা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।—কোন কারণে রাজকন্যা আইমোজেনকে অসতী বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নির্ব্বাসিত স্বামী Posthumus বিশ্বস্ত ভৃত্য Pisanioকে আদেশ পাঠাইলেন যে রাজকন্যাকে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎকারের ছলে রাজধানী হইতে বহুদূরে আনিয়া তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করিবে। ভৃত্য তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া এবং প্রভুর বিশ্বাস অমূলক স্থির করিয়া, তাঁহাকে দূরদেশে আনিয়া সকল কথা জানাইল এবং পুরুষের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া একজন অভিজাতের চাকুরি গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিল। তিনি বিপদের গুরুত্ব-বিবেচনায় এই ছদ্মবেশে লজ্জা-শীলতার ব্যাঘাত ঘটিবে বুঝিয়াও উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন (৩য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)। গ্রীনের James IV নাটকের সহিত এই অংশের কিঞ্চিৎ মিল আছে।* তবে সেখানে রাজ্ঞী ডরোথিয়া শুভানুধ্যায়ীদিগের প্রস্তাবে অনেক ওজর-আপত্তি, অনেক লজ্জা সঙ্কোচের পর সম্মত হইয়াছিলেন। আইমোজেন অধিকতর ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া সহজেই সম্মত হইলেন। অথচ আইমোজেন একাকিনী অপরিচিত পথে চলিবেন, পক্ষান্তরে বিশ্বস্ত বামন রাজ্ঞী ডরোথিয়ার সহচর হইতে প্রস্তুত হইল।

পুরুষবেশ ধারণ করিয়া তিনি পোর্শিয়া-রোজালিণ্ডের মত স্ফূর্ত্তিবোধ করিলেন না, ভায়োলার মত বেশ একটু অস্বস্তি ও সঙ্কোচ বোধ করিলেন। আর এক কথা। এই একটি মাত্র স্থলে শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে নায়িকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুরুষবেশ ধারণ করেন নাই, পরের পরামর্শে করিয়াছেন। অথচ তাঁহার বিপদ্ রোজালিণ্ড প্রভৃতির অপেক্ষা বহুগুণে গুরুতর। জুলিয়া জেসিকা-পোর্শিয়া নেরিসা, এমন কি, রোজালিণ্ড ভায়োলাও যেমন খেলায় পুরুষবেশ ধরিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে সেরূপ নহে। বোধ হয় ইহা পরিণত বয়সের রচনার একটি লক্ষণ। এই নাটক কবির যৌবনের রচনা হইলে হয় ত পতির নির্ব্বাসনকালে অথবা যখন গূঢ় অভিসন্ধিতে স্বামী তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে, তিনি পতির সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে পুরুষবেশে গৃহত্যাগ করিতেন। আরও বলা যাইতে পারে যে তিনি যখন ছদ্মবেশে ভৃত্যের চাকুরি লইলেন, তখনও প্রেমাস্পদের অধীনে চাকরী নহে, অপরের অধীনে। কোনও নারী তাঁহার পুরুষবেশে প্রতারিত হইয়া তাঁহার প্রেমে পড়ে নাই। যৌবনের রচনা হইলে কবি এ সমস্ত সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ফলতঃ যৌবনের ছেলেমানুষির কোন লক্ষণই এই নাটকে নাই। (এ সকল হালকা ব্যাপার আইমোজেনের গভীর প্রকৃতির সহিত খাপও খাইত না।) সত্য বটে, শেক্‌স্‌পীয়ার যে মূল গল্পের অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতেও আমাদের কল্পিত এ সব ব্যাপার নাই; কিন্তু আমরা অন্ততঃ জেসিকার বেলায় দেখিয়াছি যে, মূল গল্পে জেসিকার গৃহত্যাগ ব্যাপারে পুরুষবেশের কৌশল না থাকিলেও শেক্‌স্‌পীয়ার তাহার প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি সব সময়েই 'সদৃষ্টং তদ্‌লিখিতম্' করেন নাই, প্রয়োজন বুঝিলেই গল্পের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন করিতেন, এই গল্পেও বহু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকগুলির বর্ণিত ব্যাপারের সহিত এই প্রভেদ তাঁহার পরিণত বয়সের প্রভাবে ঘটিয়াছে, ইহা বলিলে কষ্ট কল্পনা হইবে না।

এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি। পুরুষবেশে অজ্ঞাত জনপদে পথে চলিতে-চলিতে আইমোজেন পথিশ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া একটি গিরিগুহায় নিজেরই ভ্রাতৃদ্বয় ও তাহাদিগের পালক পিতার আশ্রয় লইলেন।

* ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ৩৩৭ পৃঃ।

ভ্রাতৃদ্বয় শৈশব হইতেই পিতৃগৃহচ্যুত, সুতরাং তিনি তাহাদিগকে চিনিলেন না, তাহারাও (বিশেষতঃ তাঁহার ছদ্মবেশের জন্য) তাঁহাকে চিনিল না। কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি মায়া জন্মিল। আমাদের কবি বলিয়াছেন—'অবিজ্ঞাতেঽপি বন্ধৌ হি বলাৎ প্রহ্লাদতে মনঃ।' অথবা 'নিজো বা সম্বন্ধঃ কিমু বিধিবশাৎ কোঽপ্যবিদিতো মমৈতস্মিন্ দৃষ্টে হৃদয় মবধানং রচয়তি।'

পুরুষবেশ ধারণ করিয়া তিনি নারীসুলভ কোমলতা কিছুমাত্র বিসর্জ্জন দেন নাই। তাঁহার নিজের ব্যবহারে ও তাঁহার প্রতি ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্যবহারে তাঁহার স্বভাবের মাধুর্য্য বুঝা যায় (৩য় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য)। তাহার পর তাঁহার অলীক মৃত্যু প্রভৃতি অনেক ঘটনা ঘটিল। সে সকলের বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা নাই।

শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে তিনি যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং স্বামীর সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহার কণ্ঠলগ্না হইলেন, তাহা অতি সুন্দর, অতি মধুর। এরূপ মর্ম্মস্পর্শী আত্মপ্রকাশ শেক্‌স্পীয়ারের অন্য কোন নাটকে নাই।

আইমোজেন-চরিত্র পুরুষবেশে সম্যক্ বিকশিত হয় নাই, পুরুষ-বেশ ধারণের পূর্ব্বে তাঁহার বাক্যে, কার্য্যে ও আচরণে তাহার চরিত্রের সম্যক্ বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার সুশীলতা, শুচিতা, ধীরতা, আত্মসংযম ও পতিপ্রেমের গভীরতার পরিচয় পরিস্ফুট। ফলতঃ প্রসিদ্ধ সমালোচকদিগের মতে তিনিই শেক্‌স্পীয়ারের মানসকন্যাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। যাহা হউক, সে প্রশ্নের আলোচনার স্থল এই প্রবন্ধ নহে।

শেক্‌স্পীয়ারের নাটকাবলি হইতে নারীর পুরুষবেশের দৃষ্টান্ত-সংগ্রহ শেষ হইল। অতএব প্রবন্ধ আপাততঃ এইখানেই শেষ করি। আগামী বারে শেক্‌স্পীয়ারের সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী নাটক লেখক ও গল্প-লেখকদিগের রচনা হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিব। শেক্‌স্পীয়ারের নাটকাবলির আলোচনা একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। লেখক স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তাঁহাকে ব্যবসায়ের খাতিরে সর্ব্বদাই শেক্‌স্পীয়ারের গ্রন্থ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়, সুতরাং সে কথা একবার উঠিলে তাঁহার পক্ষে লেখনী সংযত করা কঠিন হইয়া পড়ে। তবে ভরসা এই যে, ইংরেজী শিক্ষিত লোকমাত্রেই শেক্‌স্পীয়ারের কথা শুনিতে ভালবাসেন, শুনিয়া আনন্দলাভ করেন, সুতরাং এক্ষেত্রে মাত্রাধিক্য তত গুরুতর দোষ নহে। তবে লেখার দোষে যদি এমন সরস বিষয় নীরস হইয়া থাকে, তাহা হইলে বড় আপ্‌শোষের কথা। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রবন্ধটি শেক্‌স্পীয়ারের সমালোচনা নহে, শুধু প্রস্তুত বিষয়ে যেটুকু প্রাসঙ্গিক হইয়াছে, তাহারই আলোচনা। সুতরাং শেক্‌স্পীয়ারের অতুলনীয় প্রতিভার অতি সামান্য পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছি। আশা করি, এই ত্রুটির জন্য শেক্‌স্পীয়ারের ভক্তগণ লেখককে মার্জ্জনা করিবেন।

আমার বৈঠকখানা

[শ্রীযতিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়]

হঠাৎ রামবাবু (বয়স প্রাচীন, পুত্র-পৌত্র-পরিবেষ্টিত সংসার, পূর্ব্বে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল এবং বর্ত্তমানে অর্থের অনটন নাই বলিয়া সকলের নিকট বুদ্ধিমান ও প্রবীণ বলিয়া পরিগণিত) বলিয়া উঠিলেন, "যাই বলুন মহাশয়, আজকাল ছেলেদের নৈতিক উন্নতি যাই হো'ক, পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান-প্রদর্শন সম্বন্ধে সেকালের ছেলেদের অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট।"

"আমার মত এই যে, ছেলেদের পক্ষ হইতে পাল্টা মোকদ্দমা (counter case) বুড়োদের বিপক্ষে অতি সহজেই প্রমাণ হইবে; কিন্তু অন্যপক্ষে মামলা ভাল করিয়া লড়িলে, আপনার নিজের পক্ষেও প্রমাণ থাড়া (onus discharge) করা বড় কঠিন হইয়া উঠিবে। ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও admiration ইত্যাদির যোগফল ভক্তি। শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতি যত বাড়িবে, সঙ্গে-সঙ্গে admire করিবার ক্ষমতা বাড়িবে,—কিন্তু বড় সূক্ষ্মদর্শী (discriminating) হইবে। এখন যদি দেখা যায় যে, আপনাদের

এমন কোন মালমসলা নাই, যাতে আধুনিক ছেলেরা আপনাদের ভক্তি করিয়া তৃপ্তি পায়, ত, দোষটা কার— বিবেচনার কথা হইয়া পড়ে। ভারতে অস্ত্র-আইন (Arms Act) হইতে ইংরেজের exemptionএর মত নৈতিক জগতে এমন কোন আইন নাই, যাতে আপনারা কেবল গুরুজন বলিয়া দায়িত্ব হইতে exemptionএর পরোয়ানা হাসিল করিতে পারেন। জটিলতা (complexity) উচ্চাঙ্গের অভিব্যক্তির (higher evolution) নিয়ম; সুতরাং সেকেলে সাদাসিধে গুরুভক্তি অপেক্ষা একেলে ছেলেদের বাঁকাচুরা, গোলমেলে, কষ্টসাধ্য গুরুভক্তি তাদের নৈতিক উন্নতি ও তাদের নিজেদের প্রতি সম্মানের পরিচায়ক ছাড়া আর কিছুই নয়।"

দেখিলাম, বৈঠকখানায় আমার কথাটা কাহারও ভাল লাগিল না। রামবাবুর মতে কথাগুলি নৈতিক জগতের anarchistএর মত কেবল অসংযত, অল্পবয়স্ক, ধর্ম্মের বিধিবদ্ধ (codified) আইনে বদ্ধ থাকিতে অনিচ্ছুক যুবকেরই প্রযোজ্য। এ কথার উত্তরে যথেষ্ট বলিবার থাকিলেও, বলা আবশ্যক মনে করিলাম না।

নরেন, (কলেজের ছাত্র - মতগুলা এখনও elastic) জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বলিতে চান, গুরুজন গুণহীন হইলে সন্তানের তাদের প্রতি ভক্তি করিবার দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কমিয়া যাইবে?" "মোটেই না। তুমি সম্পূর্ণ অন্য কথা আনিয়া ফেলিলে। 'সেকেলে' ও 'একেলে' ছেলেদের ভক্তির qualityর কথা হইতেছিল। একালের ছেলেরা তাদের ideal লইয়া যদি গুণহীন গুরুজনকে ভক্তি করিতে পারে, ত, নৈতিক জগতের কোন কর্ত্তব্য কঠিন হইলেও, তাহা পালন করার ক্ষমতা সেকেলে ছেলেদের অপেক্ষা এদের অধিক আছে, ইহাই বুঝাইবে।"

রামবাবুর নৈতিক জগতের anarchistএর কথা হইতে বোমা ও রাজনৈতিক হত্যার (political murder) কথা উঠিল। "আধুনিক যুবাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতাই কি ইহার কারণ নয়? এতেও কি তাহারা বুড়াদের বিপক্ষে উল্টা মোকর্দ্দমা (counter case) আনিতে পারে না কি?"

"অবশ্য পারে।" আমার কথা শুনিয়া সকলে একটু চমকাইয়া উঠিলেন। নরেন বলিল, "পৃথিবীতে democratic ideaর প্রসারে এবং অন্য যে কোন কারণেই হৌক, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার নেক্ড়,—anarchism, এদেশে এসেছে; এতে ঐ ছেলেদের অভিভাবকদের কি অপরাধ, বোঝা শক্ত। অভিভাবকরা যে ইহার অনুমোদন করেন না, তাহার অনেক প্রমাণ আছে।"

"প্রমাণ অনাবশ্যক; অভিভাবকেরা যে অনুমোদন করেন, ইহা আমার case নহে। বৃটিশ গভরমেণ্টের সহিত ছেলেদের যথেষ্ট ভালবাসা জন্মায়, এরূপ উপদেশ তাঁরা দেন না; বরং কাজকর্ম্মে, কথাবার্ত্তায়, খবরের কাগজ পড়ায় এবং লেখায়, টেক্স দিবার সময়, কলেজে ছেলে পড়াবার সময় এমন কি, সেকাল অপেক্ষা বেশী দাম দিয়া চাল কিনিবার সময়, এমন ভাবে কোম্পানার সমালোচনা করা হয় যে, অদূরদর্শী emotional বালকের মনে ভালবাসার স্থানে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, এবং কুসঙ্গে পড়িলেই সহজেই উহা anarchismএ পরিণত হয়। অভিভাবকেরা মনে করিতে পারেন, ইংরাজ রাজ্যের যে সুবিধা, তা ত সবাই জানে; আমাদের মন খুলিয়া সমালোচনা করিবার ক্ষমতা এই রাজত্বের উপযুক্ত একটী শ্রেষ্ঠ অধিকার,— ইহার যে-কোন রকম ব্যবহারে কাহারও কোন ক্ষতি নাই। ইহা বড় ভুল। যাকে ভালবাসিতে হইবে, যার ভালবাসার উপর জীবনের অনেকটা সুখ-দুঃখ নির্ভর করিতেছে, তাকে নিতান্ত আপনার করিবার জন্য, তার সৌন্দর্য্য ও সদ্গুণের প্রতি উপেক্ষা করিয়া যদি কেবল তার দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে উক্ত ভালবাসার পাত্রে যথেষ্ট ভালবাসিবার মত জিনিস থাকিলেও, তাহাতে ভালবাসা না জন্মিয়া বিপরীত ফল হয়। ভালবাসা জন্মিলে স্নেহের দাবীর জন্য ঝগড়ায় ক্ষতি নাই; কিন্তু ঘোড়ার আগে গাড়ী জোতায় ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই। Burke কি Chathamএর মুখে বিলাতি মন্ত্রিসভার (British Ministry) গালাগালি, আর আমাদের মুচিরাম দেশভক্তের বক্তৃতা - এক জাতীয় আবেগের ফল নহে।"

Mr. Chatterjiর মুখে অবজ্ঞা-সূচক হাসির রেখা দেখা দিল। ইনি ব্যারিষ্টার, এখনও সাহেবী নেশা কাটে নাই; বাঁকা বাঙ্গলা ও সোজা ইংরাজী বলেন, এবং আমরা বিলাত যাই নাই বলিয়া আমাদের কৃপাদৃষ্টিতে দেখেন। মুখ হ'তে হাভানা (Havana) নামাইয়া বলিলেন, "I say, it's going too far. আপনি কি বলিতে চান

যে, civilisationএর প্রধান privilege যে স্বাধীন মত প্রকাশ করা, তা' হ'তে নিজেকে বঞ্চিত করা মূর্খের লক্ষণ নহে ?"

"আমি তা মোটেই বলিতে চাহি না। ছেলে মানুষ করিতে না জানিলে যদি ছেলে খারাপ হয়, ত, দোষ বাপ-মায়ের কম নয়—সেই কথাই হইতেছিল। তবে মূর্খের লক্ষণ সম্বন্ধে আপনি যা উল্লেখ করিলেন, তা' ছাড়া আরও অনেক গুলি আছে। তার মধ্যে ছেলে মানুষ করণোপযোগী জ্ঞানের অভাব Herbert Spencerএর মতে একটা।"

Spencerএর নাম শুনিয়া, চাটুর্য্যে সাহেব, চুপ করিবার বিশেষ কারণ না থাকিলেও, চুপ করিলেন দেখিয়া, বড় হাসি পাইল। বেশ দেখা যায়, বাঙ্গলার জলবায়ু স্বাধীন মত পরিপোষণের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী ; তা' বিলাত হইতে ফিরিয়া পিছনের চুল খুব ছোট করিয়া কাটিয়া সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার কথাই বলি, আর ভট্টপল্লীকে পৃথিবীর শীর্ষস্থান মনে করিয়া পিছনের চুল টিকির আকারে বড় রাখিয়া নিজেকে শুদ্ধাচারী পণ্ডিত মনে করিয়া এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর বাকি লোকগুলাকে ম্লেচ্ছই মনে করি,—অস্থিমজ্জায় উভয়ই সমান। যুক্তি থাক আর নাই থাক, Spencer, Mill বা Comteএর নাম করিলে এবং পয়ার-ছন্দে সংস্কৃত শ্লোক শাস্ত্রে আছে বলিয়া উদ্ধৃত করিতে পারিলে, উভয় পক্ষকেই কতকটা চুপ করান যায়। বাহ্যিক আকার ব্যবহারে যাহাই বৈষম্য থাক, উভয়ের প্রকৃতিগত সাম্য যথেষ্ট আছে। আর খাঁটি সাহেব ও ইঙ্গ-বঙ্গে বাহ্যিক সাম্য থাকিলেও, তাদের প্রকৃতিগত সর্ব্বব্যাপী বৈষম্য অলঙ্ঘনীয়। উভয় পক্ষের গোঁড়ারাই কেবল এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটিকে স্বীকার করেন না।

"Materialistic idea ও scientific knowledge যে রকম পৃথিবীতে grow করিতেছে, তাতে অপরিবর্ত্তনীয় বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিসর ক্রমে ছোট হইয়া আসিয়া সমগ্র জাতির উহা গ্রাহ্য হইবে ; এবং আপনাদের পিতামহীর আমল হইতে চলিত নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল কুসংস্কারগুলি লোপ পাইয়া তৎস্থানে বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর স্থাপিত materialism সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিবে।" Mr. Chatterji এই বলিয়া তাঁর Havanaর ছাই ঝাড়িয়া মুখে তুলিলেন।

"কথাটা বেশ বলিয়াছেন। কিন্তু আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৈজ্ঞানিক সত্যকে যত অপরিবর্ত্তনীয়, এবং মিথ্যা কু-সংস্কারকে যত পরিবর্ত্তনশীল মনে করিতেছেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, বরং ইহার বিপরীত। আমাদের পিতামহীর কেন, মনুর আমলের কুসংস্কারগুলি আজও বলবৎ। বরং বয়সের সঙ্গে যেন ভাল করিয়া পাকা (seasoned) হইয়া মজবুদ হইতেছে, ব্যবহারে-ব্যবহারে যেন আরও ঝক্‌ঝকে হইতেছে ; আর, একটা বৈজ্ঞানিক মত (theory), যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি হয় না, তাহা সাধারণ লোকের মতের জলকাচা হ'য়ে কিছুদিন টিঁকিয়া থাকিলেও, দুই-একটা পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক যাচাইএর (experiment) ধোপে টিঁকে না। যে materialismকে আপনি ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান-রাজ্যের রাজা করিবেন স্থির করিতেছেন, বিজ্ঞানের বিচারে যে তার ফাঁসির হুকুম হইয়া গিয়াছে, সেটার খোঁজ রাখেন না। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসকে বিজ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল ; Mind আর Matter। Matter বেচারা ধোপে টিকিল না। দেখা গেল, Matter বলিয়া কোন জিনিস নাই ; উহা energyরই একটা manifestation ; সুতরাং আপনি—আপনি আপনার ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান-রাজ্যের রাজাকে আপাততঃ materialism না বলিয়া energyism বলিতে পারেন।"

"আমি শিকার করি কেন ? I do not understand the philosophy and fun of shooting tigers ; বনের বাঘ বনে আছে, civilisationএর কি অধিকার আছে—বনে গিয়া তাকে হত্যা করে ?" আমাদের সতীনাথবাবুর একটু রাগত ও বিজ্ঞতাসূচক অবজ্ঞা মিশ্রিত এই প্রশ্ন। ইনি M. A. পাশ, Legislative Councilএর মেম্বর ও সাহিত্যসেবী ; বিস্তৃত জমিদারী ও ঈষৎ ভুঁড়ির অধিকারী ; বাল্যাবধি কোন শারীরিক পরিশ্রমের ধার ধারেন বলিয়া বোধ হয় না। পোষাক-পরিচ্ছদে রৌদ্রে গলিয়া যাইবার ও শীতে জমিয়া যাইবার ভয় পরিস্ফুট।

"Sportsএর philosophy, বিশেষ fun মহাশয়ের না বুঝিবারই বিষয়। বরং বুঝিলে একটু আশ্চর্য্যের কথা হইত। কিন্তু তা বলিয়া, ইহার fun ও philosophy নাই, তা মনে করিবেন না। উহা বুঝাইবার দুইটি ভাষা আছে—

একটি Sportsএর, অপরটি Scienceএর। প্রথমটিতে বুঝান শক্ত, কারণ তাহার অক্ষর-পরিচয়ই আপনার হয় নাই। কোন জিনিস ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, তার জন্য বিশেষ শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন। শিকারে হাতে-খড়ি দিয়া যদি বিশ বৎসর আপনাকে দিয়া শিকার করান যায়, ত, civilisationএর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া বনে গিয়া তাবু ফেলিলেই শিকারের মাদকতা অনুভব করিতে পারিবেন। তাঁবুর খোঁটা-পোতার শব্দে সঙ্গীত শুনিবেন, এবং অনন্ত-ব্যাপী বনের সেই সর্ব্বব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে কি অনির্ব্বচনীয়তা আছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন; এবং ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠ-ত্বক দৃষ্টি-পথে আসামাত্র, সমস্ত শরীরে যে বৈদ্যুতী ভরিয়া উঠে এবং সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে নিজে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে একটা দুর্দ্দমনীয় তন্ময়ত্বে পৌছান যায়, তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধের কথা ভাবুন না কেন—উহা আমার মতে highest form of sport। স্বদেশ-রক্ষা, দুষ্টের দমন, আত্মরক্ষা ইত্যাদি অনেক যুক্তি যুদ্ধের পক্ষে থাকিলেও, যোদ্ধারা সাধারণতঃ sportsএর spiritএই যুদ্ধে উন্মত্ত হয়। যুদ্ধের বিজয় সঙ্গীত, সাহসের যশোগান, প্রতিযোগিতার দুর্দ্দমনীয়তা, মাদকতা ইত্যাদি যা'তে উন্মত্ততা আনে, তাহা স্থানবিশেষে higher principles of morality দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইলেও, উহা sportএর spiritই সাধারণতঃ যোদ্ধার মনে লইয়া আসে। Pomp and circumstance of glorious war that make ambition virtue বড় ঠিক কথা। Ambitionকে virtue করুক আর না করুক, gloryর মালমসলা pomp ছাড়া আর কিছুই না;— জাঁদরেল sport। Oxford ও Cambridge boat-race বা international cricket matchএ সমগ্র ইংলণ্ড যে উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়, Boer warএও তাই হইয়াছিল—quantityর তফাৎ থাকিতে পারে, quality এক। আমরা বাঙ্গালী— ৭।৮ শত বৎসর ধরিয়া ও-জাতীয় sport অনভ্যাস করিয়াছি; সুতরাং ওর fun ও philosophyতে কোন দাবী করিতেও পারি না। Arms Actএর কল্যাণে ও নিজের মনুষ্যত্বের অভাবে ভারতবর্ষের মত শিকার-বহুল দেশের মানুষ হইয়াও শিকারের fun ও philosophyতে, মাপ করিবেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় অজ্ঞ। যাক, অনেক কথা বেড়ে যাচ্ছে; ও কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্,—তর্কে দরকার নাই। একবার আমার সঙ্গে শিকারে যাইবেন; দেখিবেন, আপনার মত অনধিকারীও, Holmesএর ভাষায় বলিতে গেলে, contagion of the electricity of sports দ্বারা আক্রান্ত হইবেন।"

"বেশ কথা। আপনি বুঝাবার জন্য দুইটি ভাষা আছে বলিয়াছিলেন,—একটা sportsএর, আর একটা scienceএর। যেটা বলিলেন, সেটা বোধ হয় sportsএর ভাষা; অপরটা কি শুনি?"

"সে Biologyর কথা; তাতে অনেক তর্ক উঠিবে;— আর এক দিন সে কথা হইবে।"

রামবাবু—"আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন আমাদের অপেক্ষা উন্নত স্বীকার না করিলেও, তাঁদের স্বাস্থ্য যে আমাদের অপেক্ষা উন্নত ও ভাল ছিল, অন্ততঃ এটা বোধ হয় বিনা তর্কে আপনি স্বীকার করিবেন। তবে আপনাকে একটা intellectual bully বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। হয় ত এ বিষয়ও বিনা তর্কে ছাড়িবেন না। সেকালের লোক স্বচ্ছন্দে দশ ক্রোশ পথ হাঁটিত, চার আনার মুড়ি খেয়ে হজম করিত এবং 'অম্বল' কাহাকে বলে জানিত না। শারীরিক বলও যথেষ্ট ছিল; "নবজীবনে" পড়িতেছিলাম, কলিকাতা যখন বন ছিল, তখন লাঠি দিয়া বাঘ মারিবার সাহস ও বল তখনকার লোকের ছিল।"

"ইহা প্রতিবাদেরও অযোগ্য। প্রথমতঃ, উন্নত ও ভাল স্বাস্থ্য বলিতে যদি মুড়ি-হজম করা ও সাওতালের মত লাঠি দিয়া বাঘ-তাড়ান বোঝেন, ত, আপনার তর্কের বিপক্ষে বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু আপনার bully গালিটা যত সহজে স্বীকার করিয়া লইতে পারি, সাঁওতালি স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলাকে সভ্য মনুষ্য সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের ভাল ও উন্নত অবস্থা বলিয়া তত সহজে স্বীকার করিতে পারি না। স্বাস্থ্যেরও সভ্য ও অসভ্য অবস্থা আছে। শারীরিক ও মানসিক উভয় স্বাস্থ্যই মানুষের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য-বিষয়ক বিচারের সময় বিবেচ্য। সভ্যতা যত বাড়িবে, স্বাস্থ্যের idealএর তত পরিবর্ত্তন হইবে, এবং তার complexity বড়ই বাড়িয়া উঠিবে। তখন বিবেচনা করিতে হইবে, সভ্য স্বাস্থ্য দশক্রোশ পথ চলিতে যেমন পারিবে, তেমনি দশ ঘণ্টা কঠিন মনোনিবেশেও অপটু হইবে না; দশটা সংক্রামক

ব্যাধির বিষও যেমন হজম করিতে পারিবে, (হজম করাটা literally সত্য, Bacteriologyর মতে আমরা ভাত ডালের সহিত প্রত্যহ উহা করিয়া থাকি) সভ্যতার high-pressure lifeএর সঙ্গে তেমনি অভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া যুদ্ধ করিতেও পারিবে। এক কথায় বলিতে গেলে, সভ্যতার উন্নতির সহিত এবং অন্য সভ্য জাতির সংঘর্ষে আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন বিষম complex হইয়াছে ; তার প্রত্যেক বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সংগ্রামে জয়ী হওয়াই সর্ব্বোচ্চ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। শুধু মুড়ি হজম করিলে চলিবে না। দুষ্পাচ্য জিনিস হজম করাটা স্বাস্থ্যের চূড়ান্ত লক্ষণ হইলে অসভ্য জঙ্গলীরা লোপ না পাইয়া এতদিন সভ্য জাতিদের লোপ করিত।” কথাটা সতীনাথবাবুর ভাল লাগিল বটে, কিন্তু রামবাবুর মনঃপূত হইল না। তাঁর intellectual bullyর theoryটা আরও বদ্ধমূল হইল।

Mr. Chatterjee—“আপনাদের (যেন ওঁর নয়) হিন্দু সমাজের আর আছে কি ? ইহার ক্রমে যে রকম অবনতি ও শাসনের হ্রাস হইয়াছে, তাতে ক্রমে এটা লোপ পাইবে।”

“লোপ পাইয়া বাঙ্গালার হিন্দুগুলি দশ হাজার বৎসরের পূর্ব্বের সামাজিক সংস্কারহীন মনুষ্যে পরিণত হইয়া ঝাড়া হাত-পা হইয়া যে আবার নূতন সামাজিক জীবন সুরু করিবে, ভরসা করি তাহা বলিতেছেন না। আপনি যে অর্থে উঠিয়া যাওয়া, বা সাধারণতঃ লোকে যে অর্থে উঠিয়া যাওয়া বোঝে, তা' হইতে পারে, কিন্তু তাতে ক্ষতি কি লাভ, বিবেচনার কথা। ধোপা নাপিত বন্ধ ও 'একঘরে' হবার শাসনভয় সমাজের প্রৌঢ়াবস্থায় তিরোহিত হওয়াই স্বাভাবিক। বাল্যজীবনের শাসন প্রণালী প্রৌঢ়াবস্থায় শোভা পায় না। দেশ কাল পাত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজেরও evolution অবশ্যম্ভাবী। আমাদের সমাজের নিজের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও, সমগ্র মনুষ্য-সমাজের ইহা যে একটা অংশ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় যখন নাই, তখন মনুষ্য-সমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে ইহারও অভিব্যক্তি অনিবার্য্য। এই transition periodএ ইহার বিশেষ কোন অবস্থা অনিষ্টকর মনে হইলেও, একটু ভাবিয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই অভিব্যক্তি ক্রমোন্নতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির উন্নতিকর যে সমস্ত আবিষ্কার হইয়াছে ও ঘটনা ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে, আমার মতে, এই সামাজিক জীবনের productএর ন্যায় আশ্চর্য্যজনক আর কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমরা এই বিংশ-শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তরাধিকার-সূত্রে সামাজিক জীবন হইতে কি লাভ করিয়াছি, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী রাজার পক্ষেও যে সুখ ও বিলাসিতা দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য ছিল, এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে সাধারণ লোকে শুধু তাহা যে ভোগ করে তাহা নয়, তাহাতে এত অভ্যস্ত যে, তাহার অভাবে কষ্ট বোধ করে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বড়-বড় পণ্ডিতেরা সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্মাধর্ম্মের যে সূক্ষ্ম বিচারে অক্ষম ছিলেন, এখন অজ্ঞানও তাহার প্রকৃত তত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া জানে। সব দিক দেখিলে, আমরা মোটের উপর অধঃপাতে যাইতেছি, এরূপ ভাবিবার কারণ নাই।”

“বাঙ্গলা দেশের কবি Nobel Prize পাইয়াছেন—এতে আশ্চর্য্য হওয়া অপেক্ষা, এতদিন কেন পান নাই, এতেই বরং আশ্চর্য্য হওয়া উচিত। এমন স্বভাবের শোভা ও পরিপূর্ণতা কোথায় আছে ? কবির প্রধান সম্বল যে imagination তার উদ্দীপন ও পরিপোষণ এমন সরস শস্যশালী বিচিত্র দেশে হ'বে না ত কি, “কাটখোট্টা” ও পেটের-দায়ে-বিজ্ঞান-চর্চ্চা-রত ম্লেচ্ছদেশে হবে ?”

“কথাটা সতীবাবু মন্দ বলেন নাই। তবে imaginationএর দৌড়টা কবির অপেক্ষা যে বৈজ্ঞানিকের কম, এটা মানা যায় না। বরং উল্টাটা মানার অনেক কারণ আছে। Science লইয়া যারা নাড়াচাড়া করে, তাদের মত imaginationএর audacity কার ? পৃথিবীর এমন কোন কবির নাম করিতে পারেন যে, এই মনে করুন না, Nebular theoryর মত একটা উন্মাদকর ছবি গদ্যে বা পদ্যে সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে ? সমস্ত সৌরজগৎটা একটা ঘূর্ণায়মান অনন্তব্যাপী mist of incandescent gas—তার আয়তনটা সূর্য্য অপেক্ষা প্রায় দশ লক্ষ গুণ বড় ; ক্রমে সেটা যখন ঠাণ্ডা হতে লাগল, তখন সেই বিরাট আয়তনটা গরমে যে রকম ফুলিয়াছিল, তার চেয়ে ক'মে ছোট হয়ে এল ; কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক সামান্য lawএর নিয়মাধীনে তার ঘূর্ণিটা সেই তুলনায় বাড়িয়া গেল ; তখন এই পৃথিবীটা সূর্য্যের সঙ্গে কি রকম জড়াজড়ি হ'য়ে ছিল, কি রকমে

ক্রমে planetগুলা তা' হতে evolved হল,—এ সব ভাবিতে গেলে মাথা গুলাইয়া যায়। বৈজ্ঞানিকরা যে শুধু ভেবেছে তা নয়; স্থির মস্তিষ্কে, সামান্য প্রমাণ-করণীয় সত্যের ন্যায় ইহার বিচার করেছে এবং আবশ্যকমত অনেক modifications এবং amendments suggest করিয়াছে, meteoric theoryর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তার audacity ভাবিতে গেলে Milton এর Paradise Lost মেঘ-গর্জ্জনের তুলনায় শিশুর ক্রন্দনের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। এই ৫৭ ক্রোর বৎসর পূর্ব্বে যখন চন্দ্রটা পৃথিবী হতে সূর্য্যের টানে ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তার যৌবনের মাতামাতিটা কি ভয়ানক ছিল, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কি রকম ছয়বার চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্ত হ'ত, পৃথিবীতে সমুদ্র তরঙ্গ, বজ্র-পতন ইত্যাদির যে কি দুর্দ্দমনীয়তা ছিল,—বৈজ্ঞানিক তা ভেবেছে। কোনও কবিতা পেরেছে কি?"

"আপনি কি বলিতে চান যে, এই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্যশ্যামলা বাঙ্গলা দেশের সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করাটা রবীন্দ্রনাথের এত বড় কবি হওয়ার অন্যতম কারণ নহে? তা' ছাড়া, imaginationএর দৌড়টা বৈজ্ঞানিকের যদি এত বেশী হয়, ত, আমাদের দেশটা বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্বন্ধে এত পিছাইয়া রহিয়াছে কেন?"

"নরেনের প্রথম প্রশ্নটা কতকটা বুদ্ধিমানের মত হইলেও, দ্বিতীয়টা আমাদের যে বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তার সব দিক ভাল করিয়া বুঝিতে না পারার ফল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুজলা, সুফলা মলয়জ-শীতলা দেশটা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের একমাত্র কারণ না হইলেও যে অন্যতম কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শুভ্র জ্যোৎস্না, ফুলের রাশি, চাঁদের হাসি, আকাশের স্নিগ্ধ মেঘের গুরুগুরু রব, তাঁহার কাব্যের যৌবনকে যে শুধু উচ্ছ্বসিত করিয়াছে, তা নয়; একটু উচ্ছৃঙ্খলও করিয়াছে। প্রেমের তলস্পর্শী গভীরতা দেখাইতে ও তার সূক্ষ্মতত্ত্বের মীমাংসা করিতে না পারিলেও, ঐ কাব্যে বসন্তরাত্রে যুবতীর নীলাঞ্চলে, নূপুর-ঝঙ্কারে ও কাঁকণ-নিক্কণে যে ভাবের পরিপোষণ হয়, তাহাতে Western Cultureএর, ভাষার, styleএর ও artএর setting দেওয়াতে উহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।"

"তাহার পর ক্রমে যখন ঐ কাব্য প্রৌঢ়াবস্থায় আসিয়াছে, তখন জীবনের গুরুতর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের জন্য উহার Soulএর hankeringএর পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ বিগত যৌবন প্রৌঢ় কাব্যেও যুবতীর নীলাঞ্চলের বকেয়া নেশার খোঁয়ারির চিহ্নের অভাব নাই।"

"সে যাহাই হউক, য়ুরোপের আধ্যাত্মিক জীবন বড় শুষ্ক। আধ্যাত্মিকতার দারিদ্র্যে তাহারা একেবারে জর্জ্জরিত; তাই 'গীতাঞ্জলির' আধ্যাত্মিক দান তাহারা অন্তঃখেদ-সন্তাপিত পাপীর শান্তিজল গ্রহণের ন্যায় অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের নিকট উপনিষদ বেদান্তের উত্তরাধিকারীর দান হাত ঝাড়িলে পর্ব্বত সমান।"

"আর রবিবাবুর গীতিকাব্যে পাশ্চাত্য বহু-বিষয়ব্যাপী Cultureএর এই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে আমাদের চকিত ও মুগ্ধ হইবারই কথা।"

"তাই বলিতেছিলাম যে, বাঙ্গালাদেশ রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের অন্যতম কারণ হইলেও, উহার শেষ পরিচয় নহে। য়ুরোপীয় বহুবিষয়ব্যাপী Cultureএর সংমিশ্রণ ঐ কবিত্বের প্রাণ; তাহা বাদ দিলে, রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের ইন্দ্রজাল খসিয়া পড়িবে।"

"তার পর, নরেনের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এক কথায় তাহার উত্তর এই যে, বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য কেবলমাত্র imagination সম্বল থাকিলে চলে না। তাহাকে জীবন দান করিতে হইলে, তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে, যে সমস্ত আয়োজন, মন্ত্র, উপকরণ, অধ্যবসায়, কঠোর ব্রত, অর্থ, সুযোগ, লগ্ন, ও ঘোটক আবশ্যক, তাহা আমাদের কিছুই নাই। সে ব্রত আমরা গ্রহণ করি নাই। সুতরাং তাহার অভাবও অনুভব করি নাই। সে পথ দিয়া চলি নাই। উপনিষদ-দর্শন-গীতা প্রণেতৃগণ, মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা ও মহাবিত্তত ঋষিগণ—যাহারা ভারতবাসীদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন শাসিত করিতেন, তাঁহারা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া ভারতকে যে পথে চালাইয়াছেন, ভারতবর্ষ সেই পথেই চলিয়াছে! সে পথ আধ্যাত্মিকতার পথ, পারলৌকিক উন্নতির পথ, আত্মার উন্নতির পথ। সে কল-কব্জার ধার দিয়াও যায় নাই। ইহা না বুঝিলে ভারতবর্ষের Culture কি, সভ্যতা কি,—বোঝা যায় না। অনেক য়ুরোপীয় বুদ্ধিমান ইহা না বুঝিয়াই, ভারতে ইহলৌকিক উন্নতির অভাব দেখিয়া, আমাদের বর্ব্বর ও অসভ্য সাব্যস্ত করিয়াছেন। আমি অন্য কথা আনিয়া ফেলিতেছি,—অতএব এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।"

চিকিৎসক

[শ্রীবিভূতিভূষণ লাহিড়ী]

পরের সমস্ত দুঃখ আপনার করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া, চিরকাল তাঁহাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে অবিশ্রান্ত লড়াই করিয়া আসিতে হইয়াছে। সেইজন্য যুদ্ধজীবি বীরের শরীরে অস্ত্র ক্ষত চিহ্নের মত তাঁহার কপালে চিন্তার গভীর ও বিস্তৃত রেখা মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। অথচ, এখনও তিনি প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হন নাই।

তিনি একখানি প্রথমশ্রেণীর কামরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক কোণে গিয়া বসিলেন এবং একখানা খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন। তাহার চাকর আসিয়া একটা বালিশ রাখিয়া গেল। কামরার মধ্যে আরও চারিজন আরোহী তাস খেলিতেছিলেন; এবং ঐ খেলারই সূত্রে তাঁহাদের মধ্যে একটা তর্ক বাধিয়া গিয়াছিল। ইহার প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত গোলমাল থামিয়া গেল। একজন নিম্ন স্বরে বলিলেন, "ইনিই সেই বিখ্যাত ডাক্তার অধিকারী!" সকলে প্রশংসা মিশ্রিত ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন,—এই দৃষ্টি চতুষ্টয়ের কেন্দ্রীভূত ব্যক্তিটির অখণ্ড মনোযোগ কিন্তু খবরের কাগজেই সন্নিবিষ্ট ছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে খবরের কাগজ রাখিয়া তিনি মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন,—জ্যোৎস্নার আলোক তাঁহার সুগৌর মুখের উপর আসিয়া পড়িল। ঈষৎ কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর কোণে বিষাদ এবং চিন্তার ছায়া পরিস্ফুট ছিল। তাঁহার শরীরের আয়তন দীর্ঘ কিন্তু ক্ষীণ। পরিধানে একটা পেণ্টুলন ও তদুপরি একটা কেপকলার কোট। এখানেও অবস্থায় তাঁহাকে ততটা ক্ষীণ দেখাইতেছিল না। তাঁহার মস্তক উন্মুক্ত, তাহাতে কোনও শিরস্ত্রাণ ছিল না।

তিনি উপাধানে মাথা রাখিয়া গদার উপর শুইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

"সম্ভবতঃ কোটার দেওয়ান সাহেবকে দেখিতে যাইতেছেন; তিনি নাকি ভয়ঙ্কর পীড়িত।"

"বেশ দুএকপয়সা পাইবেন বোধ হয়। কিন্তু ইহার মুখ দেখিয়া ইহার যে এত টাকাকড়ি আছে, তাহা বোধ হয় না। আমি এরূপ অবসাদমাখা মুখ খুব কমই দেখিয়াছি।"

"অতিরিক্ত পরিশ্রমে এইরূপ হইয়াছে। পরিশ্রম হইতে ইহাকে বিরত করিবে এরূপ লোকও কেহ নাই। ইনি বিবাহ করেন নাই—বাড়ীতে দুইজন চাকর আছে মাত্র।"

"এত টাকা লইয়া ইনি কি করেন? সে দিন কাশ্মীরে গিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইলেন না?"

"সে টাকা তো তিনি ধরমপুর স্বাস্থ্য নিবাসে দান করিয়াছেন।" "লোকটার টাকার উপর কোনও মায়া আছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে এত পরিশ্রম কি জন্য করেন? শরীরটা কি দুর্ব্বল দেখিয়াছ! এরূপ ভাবে চলিলে ইনি বেশী দিন বাঁচিবেন না; যদি হঠাৎ কোনও খবরের কাগজে পড়ি যে, ডাক্তার অধিকারী হার্ট ফেল (heart fail) হইয়া মারা গিয়াছেন; তাহা হইলে আমি বিস্মিত হইব না।"

এরূপ কথাবার্ত্তার সঙ্গে-সঙ্গে আবার তাস খেলা চলিতে লাগিল। যথাসময়ে ট্রেণ কোটা ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। ডাক্তার অধিকারীর চাকর আসিয়া তাঁহাকে জাগাইল, এবং তিনি গাড়ী হইতে নামিলেন। ষ্টেসনের বাহিরে তাঁহার জন্য গাড়ী প্রস্তুত ছিল;—তিনি গাড়ীতে উঠিলেন এবং অনতিবিলম্বে দেওয়ান সাহেব চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন কর্ম্মচারী তাঁহাকে সসম্মানে একটী সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গেল। ডাক্তার আলোক হইতে দূরে একটী কোণে একটী আরাম-কেদারার উপর গিয়া বসিলেন এবং চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন।

কর্ম্মচারীটি বলিল, "আপনি আসিয়াছেন, আর কোনও ভাবনা নাই। ডাঃ ঘাটে বলেন, আপনি এই রোগের চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী। সেইজন্যই আপনাকে তার করিয়া আনাইয়াছেন। আপনার আসার সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে,—তিনি রোগীর শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। দেওয়ান-সাহেব এখন ঘুমাইয়াছেন, তিনি উঠিলেই আপনাকে উপরে লইয়া যাওয়া হইবে।"

ডাঃ অধিকারী কোনও কথা বলিলেন না—অবসন্ন ভাবে আরাম-কেদারার উপর পড়িয়া রহিলেন। কর্ম্মচারী বলিয়া যাইতে লাগিল, "দেওয়ান-গৃহিণী অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন,—তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন।" ডাঃ শুধু বলিলেন, "আচ্ছা।" কর্ম্মচারী চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেওয়ান-গৃহিণী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম আন্দাজ ত্রিশ বৎসর হইবে। তাহার চেহারায় একটা শান্ত অথচ দীপ্ত শ্রী মাখান— একটা স্নিগ্ধবর্ণ কাচের অন্তর্বর্ত্তী দীপশিখার মত। সুন্দর মুখখানি চিন্তায় ও উদ্বেগে ঈষৎ ম্লান। ডাঃ অধিকারী প্রত্যভিবাদনার্থ কেদারা হইতে একটুখানি উঠিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলেন। দেওয়ান-গৃহিণী আর একটা কেদারার পিঠে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন, এ আমাদের বড়ই সৌভাগ্য। আপনি যে এত শীঘ্র আসিতে পারিবেন, তাহা আশা করি নাই। আপনাকে যে কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" শিষ্টালাপে অনভ্যস্ত ডাক্তার একটু সঙ্কুচিত হইয়া কেদারার উপর আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া রহিলেন।

দেওয়ান-গৃহিণী একটা কেদারা টানিয়া লইয়া অভ্যাগতের নিকট হইতে অল্প দূরে গিয়া বসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "বিশেষতঃ আপনি আবার বাঙ্গালী—এই মহাবিপদের সময় সে একটা খুব ভরসার কথা। আমরা খুব অল্প দিন এখানে আসিয়াছি, তাহা হয় ত জানেন। সেইজন্যই ভাগলপুরে আর আপনার সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটে নাই।"

ডাক্তারকে বেশ একটু বিচলিত হইতে দেখা গেল;—বাক্যালাপে অপটুতার জন্য কি? তিনি ঈষৎ ঝুঁকিয়া গৃহস্বামিনীকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন—তাঁহার পূর্ব্বেকার ক্লান্ত ও অবসন্ন ভাবের আর কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। দেওয়ান-গৃহিণী তাঁহার চঞ্চলতা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি কিছু আবশ্যক আছে? আপনার খাওয়া হইয়াছে কি? এত রাত হইয়া গিয়াছে—আমার পূর্ব্বেই ইহা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।"

"আমার কিছুই আবশ্যক নাই, আমার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতে হইবে না। আমি আসিবার সময় গাড়ীর Restaurantএ (রেষ্টরাঁতে) খাইয়া আসিয়াছি—" এই বলিয়াই তিনি সহসা উঠিয়া গৃহস্বামিনীর সমীপে গিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার দৃষ্টিও এ পর্য্যন্ত ঐ মহিলার মুখের উপর হইতে একবারও স্খলিত হয় নাই। এতক্ষণ ডাক্তার আলোকের অন্তরালে ছিলেন, সেজন্য দেওয়ান-গৃহিণী তাহার মুখ ভাল রকম দেখিতে পান নাই। ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইতে কক্ষস্থ আলোক তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল;—দেওয়ান-গৃহিণী সেই মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার মুখ সহসা সাদা হইয়া গেল।

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দ রহিলেন। দেওয়ান-গৃহিণী একটা কথা বলিলেন—একটা কথামাত্র—জড়িত ও কম্পিত;—উত্তেজনায় তাঁহার হাত পা কাঁপিতেছিল—তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, "তুমি!"

ডাক্তার রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিলেন "প্রতিমা!" এই অভাবনীয় সাক্ষাতে ডাক্তার অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিমা দেবীর মত কাঁপিতেছিল। বিস্ময়ের উত্তেজনায় তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন— কিন্তু এতটা আবেগ তাঁহার দুর্ব্বল শরীর সহ্য করিতে পারিল না, তিনি অবসন্ন ভাবে পুনরায় নিকটস্থ একখানি কেদারার উপর বসিয়া পড়িলেন।

প্রতিমা দেবী বলিলেন, "তুমি! তুমিই সেই বিখ্যাত ডাঃ অধিকারী!" ডাক্তার বলিলেন "আর, তুমি, প্রতিমা,— তুমি—" "হাঁ! আমি তাঁহারই স্ত্রী!" প্রতিমা কথাটা যেন একটু জোরের সহিত বলিলেন। "তাঁহার—যোগেনের— যোগেনই তাহা হইলে দেওয়ান সাহেব?" "হাঁ; কেন, তুমি কি তাহা জানিতে না?" "না, আমি জানিতাম না। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আমি তোমার—তোমার স্বামীকে দেখিতে আসিতেছি। আমার ধারণা ছিল যে, তোমরা দাক্ষিণাত্যে কোথাও আছ।" "হাঁ, আগে আমরা ত্রিবাঙ্কুরে (Travancore) ছিলাম, সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি। আর তুমি?" "আমি আর এলাহাবাদে থাকিতে পারিলাম না,—ভাবিয়াছিলাম যে, সময়ে সব ভুলিয়া যাইব; কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, স্মৃতিও আমাকে ততই চাপিয়া ধরিতে লাগিল। আমি দিল্লীতে চলিয়া আসিলাম, এবং সেই অবধি সেখানেই আছি।" সেই স্বল্পালোকিত

কক্ষপ্রান্তে প্রতিমার চক্ষু অন্তঃস্থিত আবেগের উত্তাপে যেন জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার হাতে একখানা রেশমী রুমাল ছিল, তিনি তাহা হাতে জড়াইতে লাগিলেন। এত জোরে জড়াইতেছিলেন যে, তাহা ছিঁড়িয়া গেল,—সে দিকে তাঁহার লক্ষ্যও ছিল না। গত জীবনের সুখ, দুঃখ ও তাহার কারণ-পরম্পরা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়া তোলপাড় করিতে লাগিল;—তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "এখন তুমি বিখ্যাত ডাক্তার অধিকারী!" "বিখ্যাত! হাঁ, তাহা বলিতে পার—" ডাক্তার ইতিমধ্যে এই উৎকট উত্তেজনাকে অনেকটা দমন করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রায় স্বাভাবিক; কেবল হৃদয়ের তারে যে প্রবল সুর কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে উঠিয়াছিল, তাহার সামান্য একটু রেশ এখনও তাঁহার কণ্ঠস্বরে ছিল,—কিন্তু তাহা অতি সামান্য। তিনি জানিতেন যে, এই সাক্ষাৎ একদিন হইবেই হইবে, এবং সেই জন্য অনেক দিন হইতে তিনি আপনাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। কিন্তু মর্ম্মের অন্তরতম স্থান—সে বড় কোমল প্রদেশ,—তাহাকে কঠিন করা অতি বড় শক্ত কাজ; তাই তিনি এই আকস্মিক প্রথম আঘাতে এতটা বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"জীবন আমাকে আমার সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এ বঞ্চনায় আমার হৃদয় প্রথমে একেবারে ফাঁকা হইয়া গিয়াছিল। যখন আমি একটু স্থির হইলাম, তখন জীবনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে আমাকে আর কি দিতে পারে? সে আমাকে খ্যাতি দিল। কিন্তু হায়! প্রেমের স্থান কি খ্যাতি পূর্ণ করিতে পারে? খ্যাতি বাহিরের জিনিস,—অন্তরের নয়।"

এই কথাগুলিতে বিশেষ কিছু তিক্ততা মাখান ছিল না; তথাপি প্রতিমা দেবীকে ইহারা বেশ একটু পীড়ন করিল। তিনি সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত ও ভ্রূ-যুগল আকুঞ্চিত,—তাহাতে বেশ একটু ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "আমি জানিতাম না যে তুমি,—তুমি আসিবে; তাহা হইলে আমি কখনই ডাকিতে পাঠাইতাম না।" তিনি কেদারার উপর পুনরায় বসিলেন। ডাক্তার এই আকস্মিক ভাবান্তর দেখিয়া খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন,—কিন্তু প্রশান্ত স্বরে বলিলেন, "কেন আমাকে ডাকিতে না? এইরূপ রোগে আমার একটু পারদর্শিতা আছে। আর তুমিই তো কিয়ৎ-কাল পূর্ব্বে আমাকে বিখ্যাত ডাক্তার অধিকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছ। তাহা ছাড়া, তুমি এককালে আমার চরিত্রের কিয়দংশ বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলে; তাহা দ্বারা তোমার বিশ্বাস হওয়া উচিত যে, আমার অন্ততঃ এতটুকু মহত্ত্ব আছে যে, আমি আমার হস্তার্পিত রোগীর উপর অন্যায় করিব না;—বিশেষতঃ যখন আমি মনে কোনও প্রকার বিদ্বেষ ভাব পোষণ করি না—যদিও করিবার আমার যথেষ্ট কারণ ছিল।"

প্রতিমা দেবীর চক্ষু হইতে সেই ঘৃণার ভাব মুহূর্ত্তে অপসারিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তথায় বিস্ময় সূচিত হইল। তিনি বলিলেন "বিদ্বেষ! তোমার? তোমার বিদ্বেষের কি কারণ থাকিতে পারে?"

"আমার বিদ্বেষের কি কারণ থাকিতে পারে?" ডাক্তার অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্বরে এই কথা বলিলেন। "হাঁ, তাই। বরং আমি ভাবিয়াছিলাম যে, একজন উপেক্ষিতা, অবমানিতা রমণীরই বিদ্বেষের কারণ আছে।" "উপেক্ষিতা, অবমানিতা রমণী! তুমি কি বলিতেছ প্রতিমা, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কে সে?" প্রতিমা তীব্রস্বরে বলিলেন, "তুমি এত নির্ব্বোধ নও যে, তাহা তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে। আমার প্রতি তোমার আচরণ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি—"

"প্রতিমা! প্রতিমা! তুমি কি বলিতেছ? তোমার প্রতি আমি কি এমন আচরণ করিয়াছি, যাহার জন্য আমাকে লজ্জিত বোধ করিতে পারি! আমার একমাত্র অপরাধ, আমি তোমাকে ভালবাসিতাম। বাসিতাম কেন? —এখনও—না, সে অধিকার আর আমার নাই;—যাহা হউক, এই আমার একমাত্র অপরাধ—কিন্তু বল দেখি, ইহার জন্য একলা কি আমিই দায়ী,—তুমি কি আমাকে এ দুরাশা পোষণ করিতে কখনও অবকাশ দাও নাই? সে কথা যাক্!—তুমি এখন যাহাই বল না কেন, এমন এক দিন ছিল, যখন আমরা পরস্পরকে ভালবাসিতাম! সে সব কি সুখের দিনই ছিল—এক-একটা সুখ-স্বপ্নের মত,—এবং সেই সুখ-স্বপ্নের মতই শীঘ্র তাহারা বিলীন হইয়া গেল। তার পর কিছুদিনের জন্য আমাকে প্রবাসে যাইতে হইল। যাহাকে আমি আবাল্য ভালবাসিয়া আসিয়াছি, এবং

যার হৃদয়ও আমার প্রতি প্রতিকূল নয় বলিয়া জানিতাম,—তাহাকে পত্র লেখা আমি অন্যায় মনে করিলাম না;—কিন্তু তাহার কি পরিণাম হইল? প্রথম-প্রথম তো পত্রের উত্তর পাইলাম না,—তারপর পত্র পাইলাম, কিন্তু তাহা তোমার নিকট হইতে নয়—তুমি আমাকে সে সম্মানেরও উপযুক্ত ভাব নাই!—তুমি আমার হৃদয়ের দীন উচ্ছ্বাসগুলি আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যঙ্গ-হাস্য-মণ্ডিত নয়নের সম্মুখে ধরিয়াছিলে; আর, সফলতার মত্ততায় সে আমাকে কি লিখিয়াছিল জান?" ডাক্তারের কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপিতে লাগিল,—"লিখেছিল যে, আমার পত্র তোমার বিরক্তি উৎপাদন করে মাত্র; এবং আমার প্রেমের অভিব্যক্তি তোমাকে অপমান ভিন্ন আর কিছু করে না। আমি বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া গেলাম! কিন্তু এইখানেই শেষ নয়; তোমার পিতাও আমাকে এক পত্র লেখেন;—যাক্ সে সব কথার আর কাজ নাই—তুমি তোমার ধনী স্বামী ও আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ পাইয়াছ,—ঈশ্বর তোমাকে সুখী করুন,—আর আমি আজ তাহাকে বাঁচাইতে আসিয়াছি, ঈশ্বর আমাকে সফলকাম করুন!"

প্রতিমার চক্ষুর তার ছায়া নিভিয়া আসিল—তাঁহার গণ্ডের রোষদীপ্ত রক্তিমা ধীরে-ধীরে পাংশুতায় পরিণত হইল। তিনি বলিলেন, "এ সব কি কথা? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—আমার মাথা ঘুরিতেছে—" "আমায় ক্ষমা কর,—আমার এ সব অপ্রিয় কথার উত্থাপন করিবার ইচ্ছা ছিল না,—তুমিই আমাকে উত্তেজিত করিয়াছিলে। তোমার উপর আমার কোনও রাগ নাই। তুমি যোগ্যতর ব্যক্তির নিকট তোমার প্রেম ন্যস্ত করিয়াছ,—তাহার জন্য কোনও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিব, এত অধম আমি নই। তবে বড় দুঃখ যে, তুমি নিজে কেন আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে না—তুমি তাহাকে দিয়া লিখাইয়া আমাকে অপমান করিলে কেন—"

প্রতিমা দেবী বাধা দিয়া বলিলেন, "না, না,—আমি কাহাকেও কিছু লিখিতে বলি নাই—কেবল আমি তোমাকে পত্রের পর পত্র লিখিয়াছি—কিন্তু তুমি কোনও উত্তর দাও নাই!" ডাক্তার বলিলেন, "মিথ্যা কথা!" "ভগবান জানেন, আমি সত্য কথা বলিতেছি। আর তুমি—তুমি বল যে, তুমি যাহা বলিলে সব সত্য—আমার সুখশূন্য জীবনে তবু একটু সুখ পাইব—"

"আচ্ছা, আমি তোমাকে সেই চিঠিই দেখাইতেছি—" এই বলিয়া ডাক্তার তাঁহার কোটের ভিতরকার পকেট হইতে একটী চামড়ার বাঁধান পকেট-বুক বাহির করিলেন, এবং তাহার ভিতর হইতে একখানি অতি জীর্ণ পত্র লইয়া প্রতিমা দেবীকে দিলেন;—পত্রের প্রত্যেক ভাঁজ ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং লেখা প্রাচীনতার জন্য মলিন হইয়া গিয়াছে। এই পত্র শক্তিশেলের মত আসিয়া তাঁহার বুকে বাজিয়াছিল।—শক্তিশেলের ফলক তুলিতে গেলে পাছে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সে জন্য তাহা আর তোলা হয় নাই—এ পত্র আর তিনি ফেলিতে পারেন নাই,—এ পত্র বরাবরই তিনি বুকের উপর বহন করিয়া আসিতেছেন।

প্রতিমা দেবী পত্রখানি পড়িয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন—"মিথ্যা কথা! সব মিথ্যা কথা! হায়, এতকাল তুমি আমার সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বহন করিয়া আসিতেছ!" "আর তুমি?"—"আমি? আমার জীবন একটা শোকের অধ্যায়! আমার সম্বন্ধে তোমাকে যখন তাহারা এত সব কথা লিখিয়াছিল, তখন বুঝিতেই পারিতেছ, তোমার সম্বন্ধে তাহারা আমাকে কি না বলিয়াছে। জীবনের প্রাক্কালে আমার স্বপ্ন চূর্ণ হইয়া গেল—কিন্তু তাহারা আমাকে তবুও ছাড়িল না। আমার উপর পিতার ভীষণ উৎপীড়ন চলিতে লাগিল—পরিশেষে তাহাকে বিবাহ করিতে আমি বাধ্য হইলাম। তার পর এই দীর্ঘ সময় এই প্রেমহীন জীবন লইয়া কাটাইতেছি।" ডাক্তার একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন—"ওঃ"—তাহাতেই অনেক কথা বলা হইয়া গেল।

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। দু'জনের বক্ষের স্পন্দন বোধ হয় দু'জনে শুনিতে পাইতেছিলেন। টং টং করিয়া দুইটা বাজিল—তাঁহাদের চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল।

ডাক্তার বলিলেন, "ধূমকেতু যেমন ঘুরিতে-ঘুরিতে কোনও এক গ্রহের কক্ষে উপস্থিত হইয়া আবার কিছুকাল পরে ছাড়িয়া চলিয়া যায়,—আমিও সেইরূপ একটা অশান্তির পরিবেষ্টন লইয়া তোমার দাম্পত্য জীবনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। ধূমকেতুর মত আবার আমি একটা তীব্র হতাশায় শূন্যের মধ্য দিয়া ছুটিতে-ছুটিতে যাইব,—আর

তাহার পূর্ব্বে আমার অশান্তির জ্বালা, তোমার পার্থিব সুখের যাহা অবশিষ্ট ছিল, সেগুলিকে ঝল্‌সাইয়া দিয়া যাইবে। কেবল দু'দণ্ডের জন্য এই মিলন। তার পর তুমি কোথায়, আর আমি কোথায়? এই দু'দণ্ডের জন্য, মনে কর, পৃথিবীতে আর কিছু নাই,—সুখ নাই, দুঃখ নাই—আর কেহ নাই,—কেবল তুমি ও আমি—" এই বলিয়া ডাক্তার প্রতিমা দেবীর হস্ত গ্রহণ করিলেন।

প্রতিমা দেবী ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া লইলেন, এবং বলিলেন, "না, আর আমাদের পরস্পরের কর গ্রহণের অধিকার নাই। আজ আমি অপরের বিবাহিতা স্ত্রী!" ডাক্তার উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "সে তোমাকে বিবাহ করে নাই—চুরি করিয়াছে, সে চোর!"

"হাঁ, সে চোর! সে শুধু তোমার নিকট হইতে নয়, আমার নিকট হইতেও আমাকে অপহরণ করিয়াছে। আমি তাহাকে কখনও ভালবাসি নাই—তবে আমি তাহাকে আর ঘৃণা করি না—কারণ সে আমার স্বামী!" উভয়ে আবার কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। প্রতিমা বলিলেন, "বোধ হয় তোমাকে এখনই ডাকিতে আসিবে—কারণ ২॥০ সময় ঔষধ খাওয়াইবার কথা,—তখন তাহাকে জাগান হইবে। সে বড়ই পীড়িত—জীবনের আশা নাকি খুবই কম। তাহার ঘুম বেশী হয় না বলিয়া ডাক্তার ঘাটে তোমাকে এতক্ষণ ডাকেন নাই।" "তুমি কি আশা কর যে, এই সব কথা জানিবার পরও আমি তাহাকে দেখিব—তাহার চিকিৎসা করিব?—" "শুনিয়াছি—একমাত্র তুমিই তাহাকে এ রোগ হইতে বাঁচাইতে পার!" "আমি তাহার চিকিৎসা করিব না।" ডাক্তারের কণ্ঠস্বর দৃঢ়। "কিসের জন্য? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমি তোমার স্বামীর গৃহে জলস্পর্শ পর্যন্ত করি নাই—আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য যে একটা বাধ্য-বাধকতা, তাহাও আমার নাই। আর অপর দিকে ভাবিয়া দেখ যে, সে আমার কি সর্ব্বনাশই না করিয়াছে! আর তোমার—যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর—তার জীবনের সমস্ত সুখ চূর্ণ করিয়া দিয়াছে,—না, না,—আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিব না।"

একটা তৃপ্তির দীপ্তি প্রতিমার মুখে প্রকাশ পাইল—বহুদিনকার অবরুদ্ধ প্রীতির নির্ঝর খুলিয়া গিয়া তাঁহার চক্ষুকে স্নেহ-স্নিগ্ধ করিয়া দিল;—কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল যে, উপরকার ঘরেই তাঁহার পীড়িত স্বামী মৃত্যুর প্রসারিত কবলের সন্নিকটে রহিয়াছেন। তিনি যতই কেন দোষী হউন না, তবু তিনি তাঁহার স্বামী! তাঁহার মুখ আবার ম্লান হইয়া গেল। তিনি তাঁহার স্নেহ-কোমল অথচ ঈষৎ চিন্তাবিষণ্ণ দৃষ্টি ডাক্তারের উপর স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "ছিঃ! সুধীর!"

এই এক "ছি" এবং এই সজলোজ্জ্বল দৃষ্টি অনেক কাজ করিল। ডাক্তার তাঁহার জীবনানুগত পরোপকার-ধর্ম্ম, তাঁহার চিকিৎসকের কর্ত্তব্য—সব ভুলিয়া যাইতেছিলেন,—কিয়ৎক্ষণের জন্য দানব প্রকৃতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাঁহার মহত্ত্বকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছিল—কিন্তু এই রমণীর স্নেহ-কোমল ধিক্কারে তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইলেন। হৃদয়ের তার বড় ক্ষীণ, বড় ভঙ্গুর—সামান্য আঘাতে ছিঁড়িয়া যায়;—কিন্তু মৃদু স্পর্শে তাহা ঝঙ্কৃত হয়।

এমন সময় ডাক্তার ঘাটে আসিয়া খবর দিলেন যে, দেওয়ান সাহেব জাগিয়াছেন। ডাক্তার অধিকারী কতকগুলি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে দেওয়ানের অবস্থা জানিয়া লইলেন এবং বলিলেন "চলুন, আমি যাইতেছি।"

ডাক্তার ঘাটে চলিয়া গেলেন। অনতিবিলম্বে ইঁহারাও উপরে চলিলেন। রোগীর ঘরের সামনে গিয়া হঠাৎ একটা কথা প্রতিমা দেবীর মনে হইল। তাঁহার মনে হইল যে, কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার স্বামীর জীবন তাঁহার স্বামী-কর্ত্তৃক ক্লিষ্ট এই ব্যক্তির হস্তে নির্ভর করিবে। যদি সে তাহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়—যদি সে—না, না,—তাহা কখনও সম্ভব নহে। তিনি ডাক্তারের হাত ধরিয়া আস্তে টানিলেন—ডাক্তার ফিরিলেন। প্রতিমা দেবী দেখিলেন যে, তাঁহার ললাটে কুচিন্তার কোনও ভ্রূকুটী-ভঙ্গী নাই। তিনি আশ্বস্ত হইলেন এবং বলিলেন, "সুধীর! আমায় ক্ষমা কর—আমি তোমাকে মুহূর্ত্তের জন্য একবার সন্দেহ করিয়াছিলাম।" ডাক্তার ঈষৎ হাস্য করিয়া হস্ত সঞ্চালন করিলেন—উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এক ঘণ্টা ধরিয়া মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম চলিতে লাগিল। সমস্ত কৌশল প্রয়োগ যখন ব্যর্থ হইল, তখন ডাক্তার ঘাটে বলিলেন যে, আর উপায় নাই। ডাক্তার অধিকারীও

বলিলেন, "না, আর কোনও উপায় দেখিতেছি না।" প্রতিমা দেবীর বুক কাঁপিয়া উঠিল,—তিনি ডাক্তার অধিকারীর দিকে চাহিলেন—দেখিলেন যে, শয্যাস্থিত আসন্ন-মৃত্যু রোগীর অপেক্ষাও তাঁহার মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার অধিকারী হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন, "আপনারা সকলে বাহিরে যান—আমি একলা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।" সকলে চলিয়া গেল। প্রতিমা দেবী ইতস্ততঃ করিতেছিলেন; কিন্তু ডাক্তারের দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁহাকেও চলিয়া যাইতে হইল।

অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গেল—প্রতিমা দেবী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; ভাবিতে লাগিলেন, "এতক্ষণ সে কি করিতেছে—একাকী তাহার শত্রুর সহিত সে কি করিতে পারে?"—দারুণ দুশ্চিন্তায় তিনি পীড়িত হইলেন, এবং তাড়াতাড়ি রোগীর ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার ঘাটে নিষেধ করিলেন; তিনি বলিলেন, যে এরূপ অন্তিম সময়ে ডাক্তার অধিকারী একেলা থাকা পছন্দ করেন। প্রতিমা দেবী দ্রুতপদে দরজার নিকট আসিলেন—দরজা ঠেলিলেন, কিন্তু দরজা বন্ধ। ডাকিলেন, "সুধীর, সুধীর!"—ডাক্তার ঘাটে আসিয়া বলিলেন, "আপনি বড় অস্থির হইয়াছেন—কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। এই শেষ চেষ্টার সময় ডাক্তার অধিকারীকে আর বিরক্ত—"

দরজা খুলিয়া গেল—ডাক্তার অধিকারী বলিলেন, "আপনারা ভিতরে আসিতে পারেন।" বলিয়াই তিনি নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাপ্লুত—সার্টের আস্তিন ওল্টানো। ডাক্তার ঘাটে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলেন, ইনি কি কৃত্রিম উপায়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রসাধন করাইতেছিলেন?—

* * * *

রাজবাড়ী হইতে পরদিন প্রাতঃকালে সংবাদ লইবার জন্য লোক আসিয়াছিল;—একজন পরিচারিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহা হইলে বাহিরে যাহা শুনিলাম তাহা সত্য?"—পরিচারিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হাঁ"। সে লোকটা গম্ভীর ভাবে বলিল, "বড়ই দুঃখের কথা। রাজ দরবারের বড়ই ক্ষতি হইল। তবে গোউএনকর—তিনিও খুব কার্য্যক্ষম ব্যক্তি—তিনি দেওয়ানের পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, একূপ আমরা আশা করি।" ডাক্তার ঘাটে এমন সময় তথায় আগমন করিয়া বলিলেন "আপনাদের এতটা আশা করিতে হইবে না; কারণ দেওয়ান সাহেব ভাল আছেন। তাঁহাকে বাঁচাইতে গিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে ডাক্তার অধিকারী হার্ট ফেল (Heart fail) হইয়া মারা গিয়াছেন।"*

* বিদেশী গল্পের ছায়ানুসরণে।

কল্পতরু

কৃতান্তের অনুচর

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় "ভারতবর্ষে" তাঁহার অপূর্ব্ব, উপাদেয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির একস্থলে এইরূপ ভাবের একটা কথা বলিয়াছেন যে, এই জগৎ বিরোধে পরিপূর্ণ; প্রত্যেক অণুপরমাণু পরস্পরের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত; বিরোধই প্রকৃতির নিয়ম; বিরোধের অভাব এই নিয়মের ব্যতিক্রম।

কেবল বৈজ্ঞানিকের-জগতে নহে, জীব-জগতেও এই বিরোধ নিত্য বর্ত্তমান। মানুষের সহিত মানুষের, মানুষের সহিত পশুর, পশুর সহিত পশুর বিরোধ লাগিয়াই আছে। কেহ বা খাদ্যের জন্য, কেহ বা আত্মরক্ষার্থ, কেহ বা ভোগ-সুখের জন্য অপরের সহিত বিরোধ করে। মানুষ, বাঘ দেখিলেই তাহাকে বধ করিবার চেষ্টা করে—আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য। বাঘও সুবিধা পাইলে মানুষ বা অন্য পশুকে বধ করে—নিজের ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য, বা, প্রকারান্তরে আত্মরক্ষার জন্য। এইরূপে মানুষের সহিত মানুষের বিবাদও স্থলবিশেষে আত্মরক্ষার জন্য, আবার স্থলবিশেষে বা নিজের প্রভুত্ব-বিস্তারের জন্য।

বস্তুতঃ, সৃষ্ট জীব ও পদার্থসমূহের পরস্পরের মধ্যে এই বিরোধের ভাব বিশ্ব-সৃষ্টির অন্যতম রহস্য। এইটুকু না থাকিলে সৃষ্টি রক্ষা করা দায় হইত। ভেদনীতি যেমন রাজনীতি-ক্ষেত্রে সময়বিশেষে অপরিহার্য্য, সেইরূপ জীব-জগতে এই বিরোধ ভাব সৃষ্টি-রক্ষার পক্ষেও

যে একেবারে চলে না, তা' নয়। তবে ইহা টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত কঠিন পাকা রাস্তা প্রস্তুত না করিলে চলে না; মাঠের উপর দিয়া এ কামান লইয়া যাইবার উপায় নাই; কর্ণের রথচক্র যেমন মাটীতে বসিয়া গিয়া রথখানিকে অচল করিয়া দিয়াছিল, মাঠের উপর এই কামানেরও সেই দশা ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তা' ছাড়া, যুদ্ধক্ষেত্রে মাঠের মাঝখানে 'কংক্রিটে'র গাঁথুনি করিয়া কামান বসাইবার স্থান প্রস্তুত করিয়া না লইলে কামান চালানো যায় না। ইহাতে অসুবিধা এই যে, গোলার ঘা খাইয়া শত্রু পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, এই কামান লইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিবার উপায় নাই। কেবল, কোন দুর্গ আক্রমণ কালে, বা নগর অবরোধ কালে এই কামান খুব উপযোগী। কিন্তু এই কামান রণতরীতে স্থাপন করিয়া জলযুদ্ধের সময় যেখানে ইচ্ছা জাহাজ লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বকালে রণতরী ব্যবহারের উদ্দেশ্য যাহাই থাক, এখন সুপার-ড্রেডনট শ্রেণীর রণতরীর বড় কামান ব্যবহার করা ছাড়া আর কোন কাম নাই।

এই কামানের গোলায় প্রলয় কাণ্ড ঘটানো যায় বটে, কিন্তু কামানগুলির পরমায়ু বেশী নহে। একরূপ একটি কামান হইতে দুই শতের অধিক গোলা ছাড়া যায় না; ছাড়া গেলেও তাহাতে বেশী ফল হয় না। এক-একটি গোলা ছাড়িতে এক সেকেণ্ডের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। সে হিসাবে, অবিশ্রান্ত ভাবে গোলা চালাইলে, পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে ইহার পরমায়ু শেষ হয়। তখন কেবল ইহার মৃতকল্প দেহটি অবশিষ্ট থাকে। তবে এক একখানি রণতরীতে কায়দায় পাইলে অল্পেতেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। আবার, এক একটা জলযুদ্ধের পর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কামান বদলাইয়া লওয়া চলে। কেবল অস্ত্রাগারে যথেষ্ট সংখ্যক কামান মজুত থাকিলেই হইল।

৭৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন "ওয়ারিয়ার" বা "ভিক্টোরিয়া" শ্রেণীর রণতরী নির্ম্মিত হয়, তখন এক একখানি রণতরী নির্ম্মাণ করিতে ২৫০০০০ হইতে ৫০০০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইত। ড্রেডনট শ্রেণীর অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল রণতরী নির্ম্মিত হয়, তাহাদের এক-একখানির প্রতি ১০০০০০০ হইতে ১৭৫০০০০ পাউণ্ড খরচ পড়িত। ড্রেডনটগুলির নির্ম্মাণে ২০০০০০০ পাউণ্ড ব্যয় হয়। আর এখনকার এক-একখানি সুপারড্রেডনট ৩০০০০০০ পাউণ্ডের কমে তৈয়ার করা যায় না। ১৫ টাকায় এক পাউণ্ড ধরিলে টাকার অঙ্কে একখানি সুপারড্রেডনট নির্ম্মাণ করিতে ৪৫০০০০০০ টাকা পড়ে। অথচ, একটী টর্পেডোর আঘাতে বা একটি 'মাইনে'র সংস্পর্শে এই রণতরী জলমগ্ন হয়।—একেবারে সাড়ে চারি কোটী টাকা লোকসান। তাহার উপর সরঞ্জাম ইত্যাদি এবং সহস্রাধিক মানব জীবন ফাউ।

এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট একখানি চিত্র হইতে পাঠক "কুইন এলিজাবেথ" শ্রেণীর এক একখানি সুপারড্রেডনটের শক্তির পরিচয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাইতে পারেন। ইহার ১৫ ইঞ্চি কামান হইতে প্রায় একটন ওজনের শেল ছাড়া যায়। অর্থাৎ এইরূপ এক-একটা শেলের ওজন১২ 'ষ্টোন'

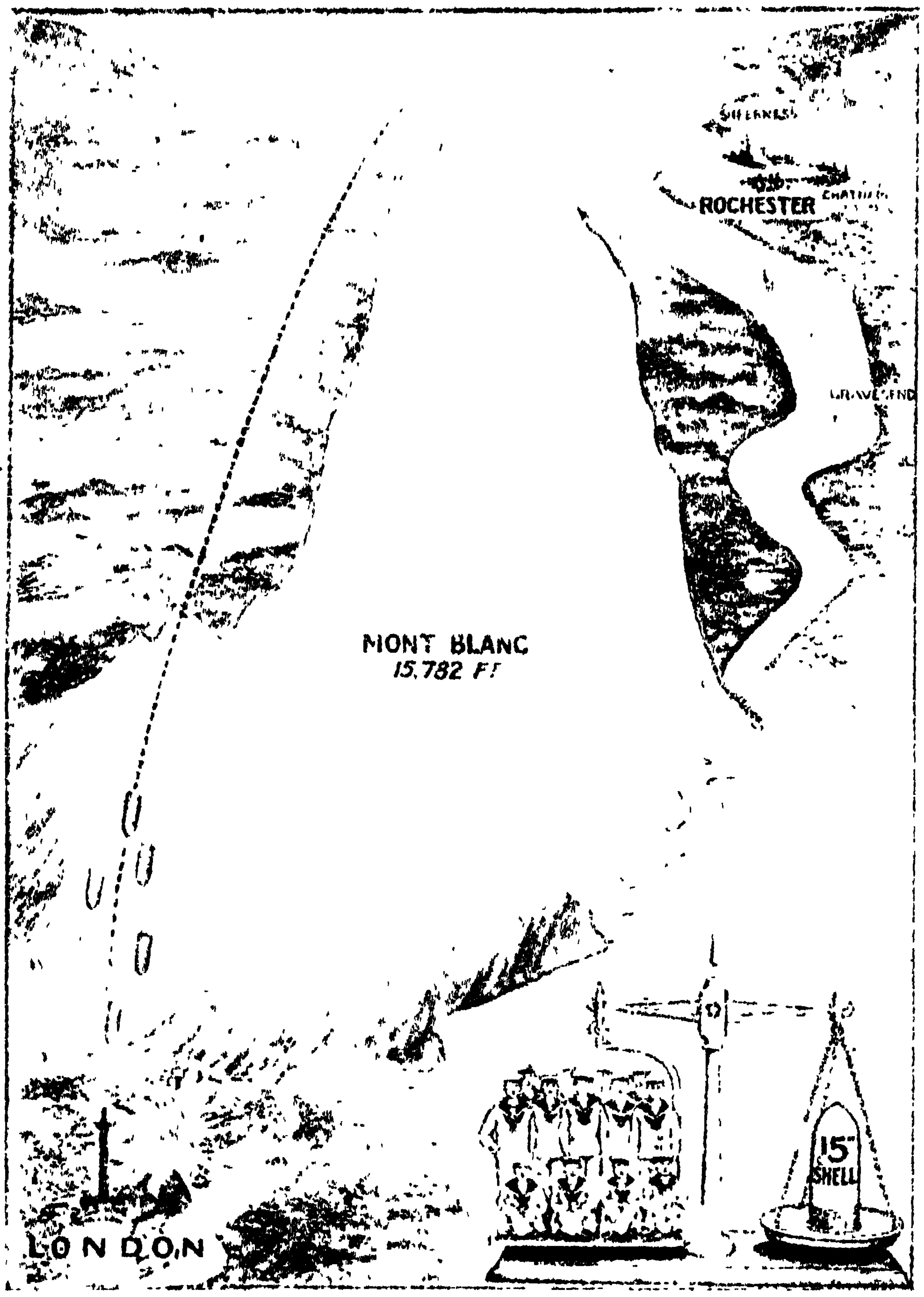

১৫ ইঞ্চি কামানের পাল্লা

একরূপ ১৩জন লোকের ওজনের সমান। জাহাজখানি যদি টেমস নদীর মোহানার কাছে, রচেষ্টার বন্দরের পার্শ্ববর্ত্তী খাঁড়িতে থাকে, তবে তাহার ঐ একটন ওজনের শেল তথা হইতে ২৭ মাইল দূরবর্ত্তী লণ্ডনের মাঝখানে ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারে আসিয়া পড়িতে পারে। পথের মাঝখানে যদি ১৫৭৮২ ফিট উচ্চ মণ্ট ব্লাঙ্ক নামক পর্ব্বত চূড়াটি স্থাপন করা যায়, তাহা হইলেও উহা শেলগুলিকে বাধা দিতে পারিবে না- শেল উহার মাথার উপর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইবে। এক-একখানি ড্রেডনটে ৯০০ এবং সুপারড্রেডনটে ১০০০ হইতে ১২০০ নাবিক থাকে। একখানি ড্রেডনটের একমাসের খোরাকের পরিমাণ বড় কম নয়। সে কিরূপ বিরাট ব্যাপার তাহা স্থানান্তরের

চিত্রখানি দেখিলেই কতকটা আন্দাজ করিতে পারা যাইবে। ড্রেডনট ছাড়া আরও অনেক প্রকার রণতরী আছে। তন্মধ্যে ড্রেডনটের পরেই টর্পেডো বোট ডেষ্ট্রয়ারের নাম উল্লেখযোগ্য। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বেকার ডেষ্ট্রয়ারগুলি বড় জোর ৮৯০ টন মাল লইতে পারিত। কিন্তু দশ বৎসরের মধ্যেই ১৮৫০ টন মাল বহনের শক্তিযুক্ত ডেষ্ট্রয়ার সকল নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের এখনকার সর্ব্বাপেক্ষা বড় টর্পেডো বোট ডেষ্ট্রয়ারের নাম-'স্বইফ্ট'। ইহাতে ৩০০০০ ঘোড়ার জাহাজ যে নির্ম্মিত হইতে পারে, ইহা কেহ কল্পনা করিতে পারিতেন না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষার স্বরূপ 'হলণ্ড' নামক প্রথম সবম্যারিণ নির্ম্মিত হয়। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়ায় আরও ১০।১২ খানি সবম্যারিণ ক্রমে ক্রমে নির্ম্মিত হয়। তাহাদের মধ্যে বৃহত্তমখানিতে ১৭০ টন মাল ধরিতে পারিত। তাহারা জলের নীচে ঘণ্টায় ৭ হইতে ৯ নট বেগে গমন করিতে পারিত এবং তাহাদের ভ্রমণসীমার পরিধির ব্যাসার্দ্ধ ৫০০ মাইলের অধিক ছিল না। এখনকার সবম্যারিণগুলি যথেষ্ট উন্নত

বৃহত্তম বৃটিশ টর্পেডোবোট ডেষ্ট্রয়ার "স্বইফ্ট"

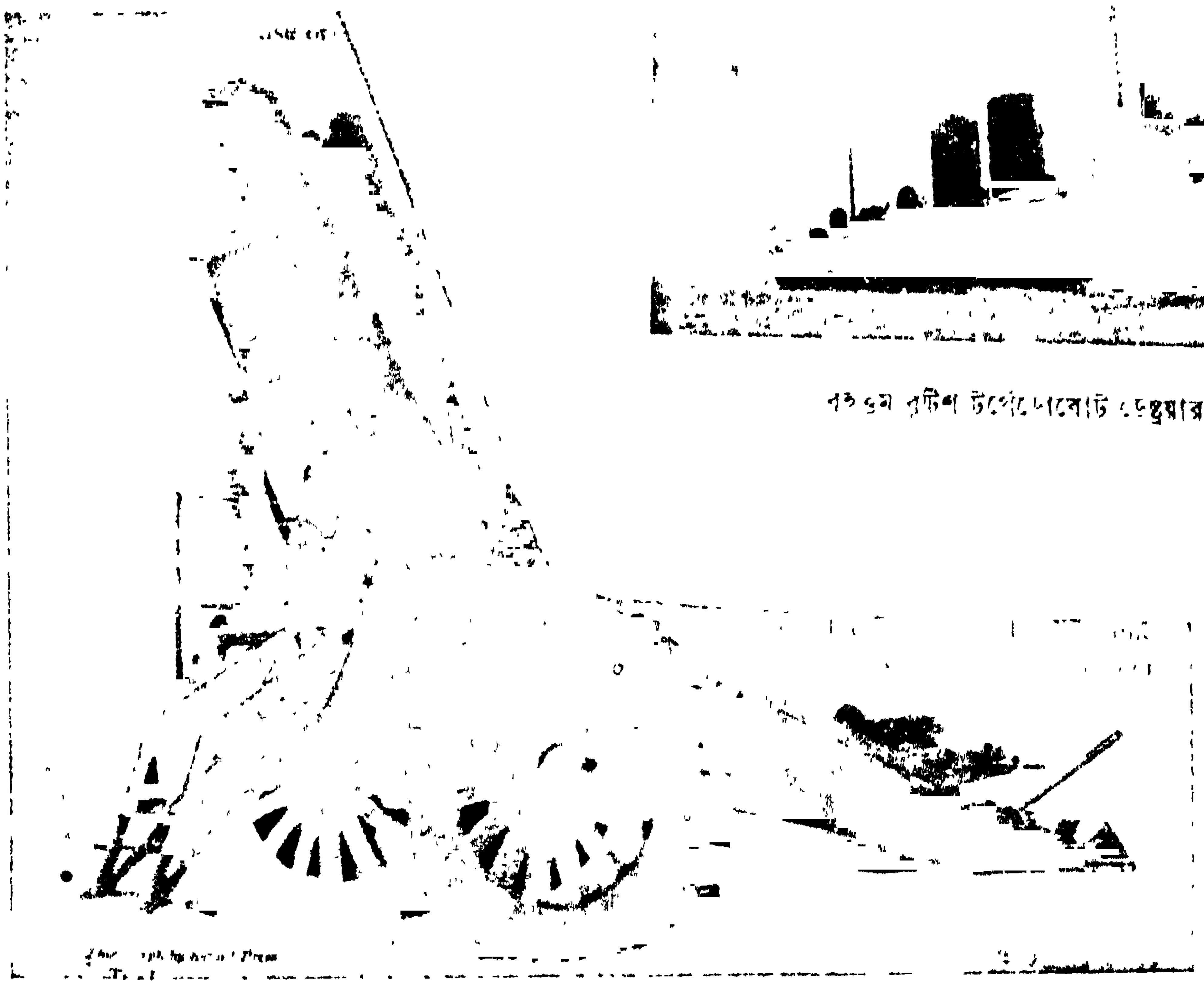

হাউইট্জার

জোর ইঞ্জিন আছে এবং ইহার বেগ ঘণ্টায় ৩৬ নট। ইহাতে ২০০০ টন মাল স্বচ্ছন্দে লওয়া চলে।

জলের উপর ভাসমান রণতরী যতই ভয়ানক এবং শক্তিশালী হউক, সমুদ্রের গর্ভে বিচরণকারী সবম্যারিণগুলি তদপেক্ষা অনেক বেশী ভয়ানক। কারণ, ইহাদের গতিবিধি গুপ্তভাবে নির্ব্বাহ হয়। প্রকাশ্য বলবান শত্রুর অপেক্ষা দুর্ব্বল গুপ্তশত্রু অধিকতর ভয়ানক। কারণ, ইহারা কখন কোন্ দিক হইতে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিবে, তাহা জানা না থাকায় সাবধান হইতে পারা যায় না। এই কারণে, লোকে সিংহ, ব্যাঘ্রাদি জন্তুকে যতটা ভয় করে, সর্পকে তদপেক্ষা অধিক ভয় করে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে এই সবম্যারিণের অস্তিত্ব ছিল না; একপ ধরণের। তাহারা অনায়াসে ৪০০০ হাজার মাইল ভ্রমণ করিতে পারে। ইহারা ১০০০ টন ভার বহনে সমর্থ এবং ইহাদের গতি বেগ ঘণ্টায় ৮ নট। সবম্যারিণ যে কেবল সমুদ্রের গর্ভেই ভ্রমণ করে তাহা নহে। ইহারা অন্যান্য শ্রেণীর জাহাজের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। ভাসমান অবস্থায় ব্যবহারের জন্য ইহাতে দ্রুত গোলা-নিক্ষেপকারী কামান থাকে। আর, জলের নীচে ভ্রমণের সময় ব্যবহারের জন্য ইহারা টর্পেডো বহন করে। টর্পেডো চালাইবার জন্য ইহাদের গাত্রে ছিদ্র থাকে।

এই টর্পেডো অতি মারাত্মক অস্ত্র। এক-একখানি সবম্যারিণ হইতে অল্প সময়ের মধ্যে ছয়টি ছিদ্র দিয়া ক্রমান্বয়ে ছয়টি টর্পেডো ছাড়িতে

জেপেলীন

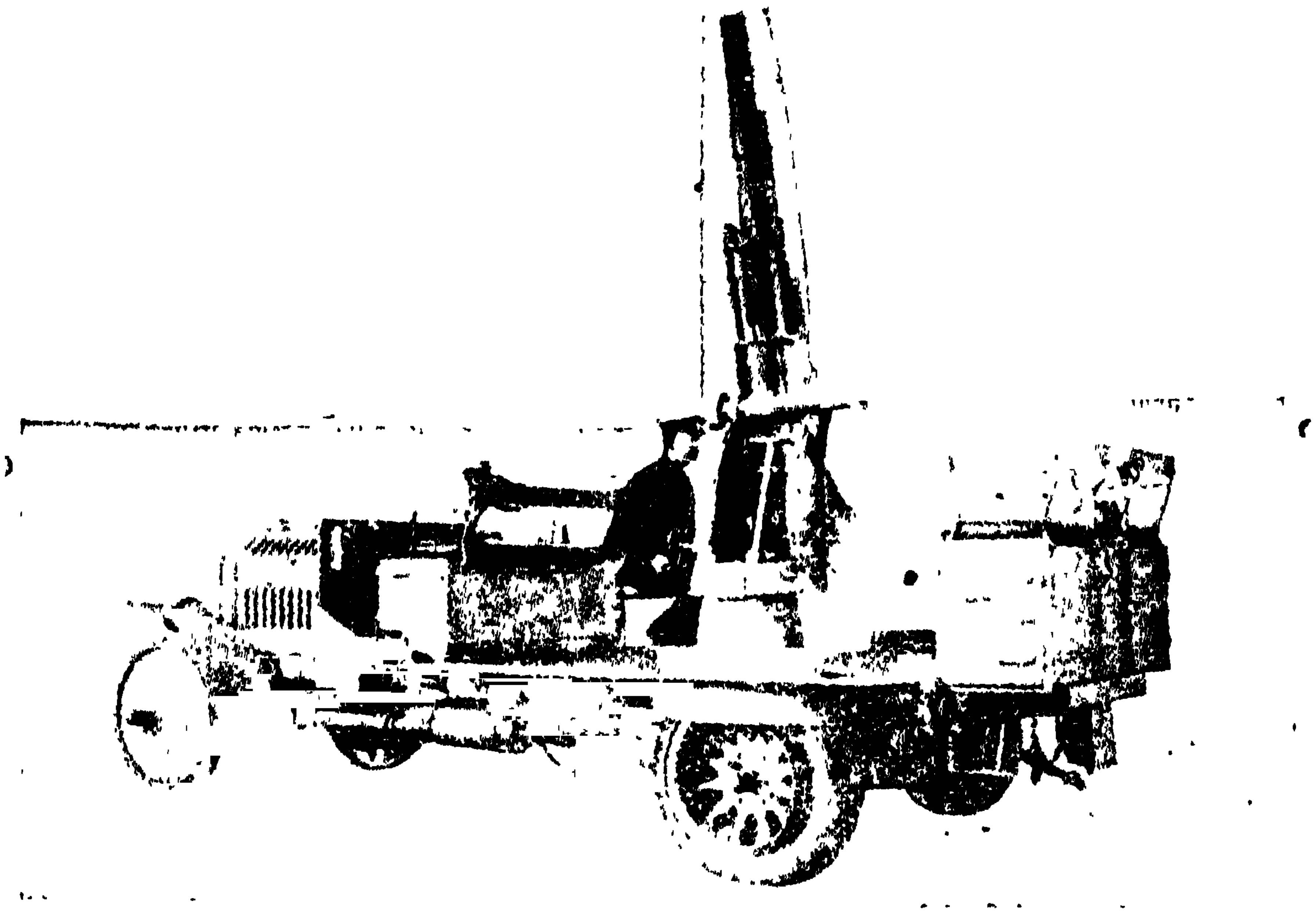

বিমানধ্বংসী কামান

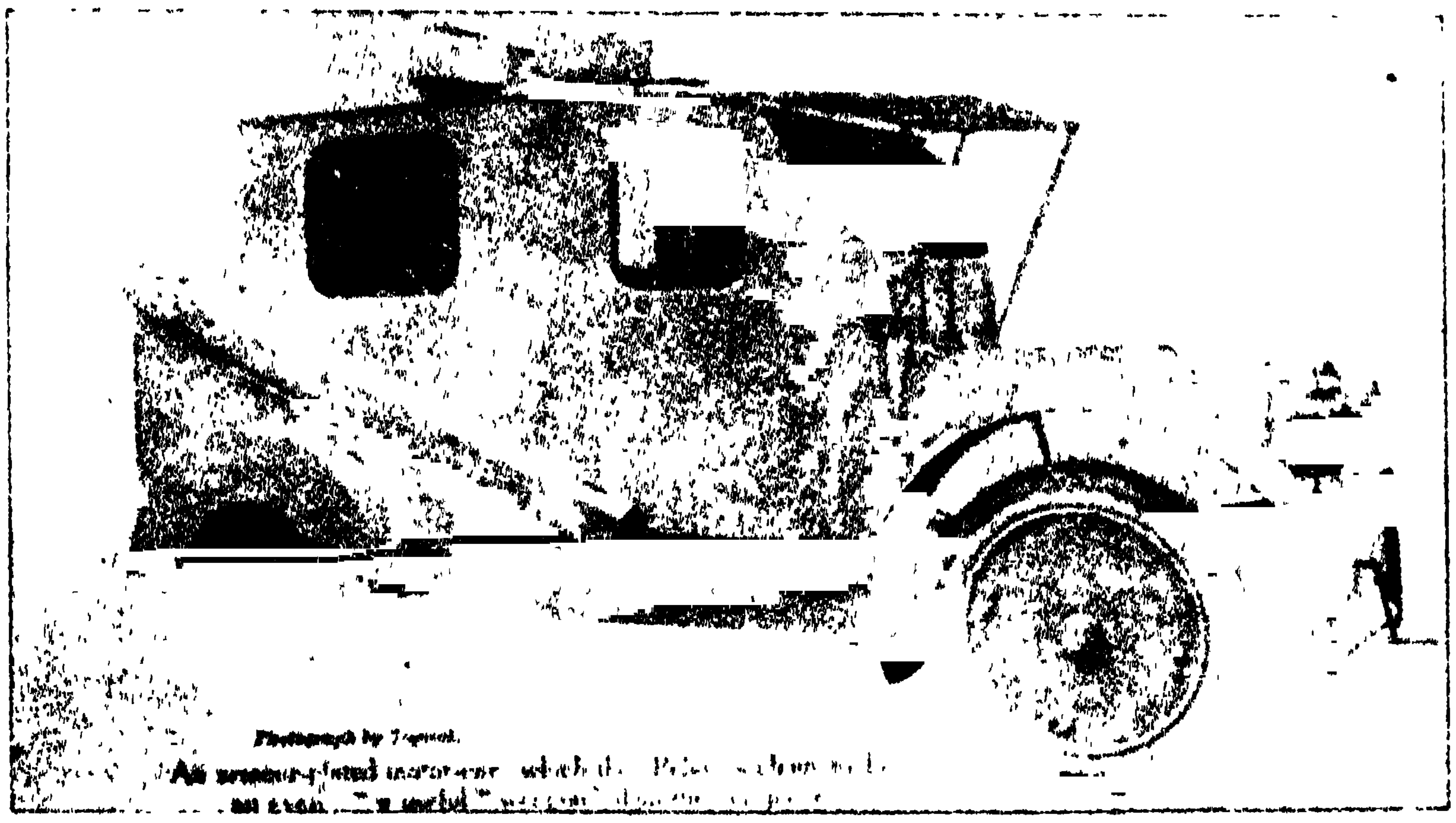

বর্ম্মাকৃত মোটর গাড়ী

পারা যায়। লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে পারিলে এই টর্পেডো অতিমাত্রায় সর্ব্বনাশ সাধনে সমর্থ। পুরাতন টর্পেডো সমূহে ৮০ পৌণ্ড ওজনের দাহ্য পদার্থ ব্যবহৃত হইত। সম্পূর্ণ আধুনিক টর্পেডোগুলিতে দুই শতাধিক পৌণ্ড ওজনের দাহ্য পদার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার ধ্বংস-কারী শক্তির পরিমাণ অতি অদ্ভুত। ৩০০০০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে নির্ম্মিত এক-একখানি সুপারড্রেডনট লোকজন, কামান গোলা, সাজ-সরঞ্জাম, রসদ প্রভৃতি সহ এই একটি মাত্র টর্পেডোর আঘাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমুদ্রতলে নিমগ্ন হইতে পারে। আবার, এই সকল টর্পেডো

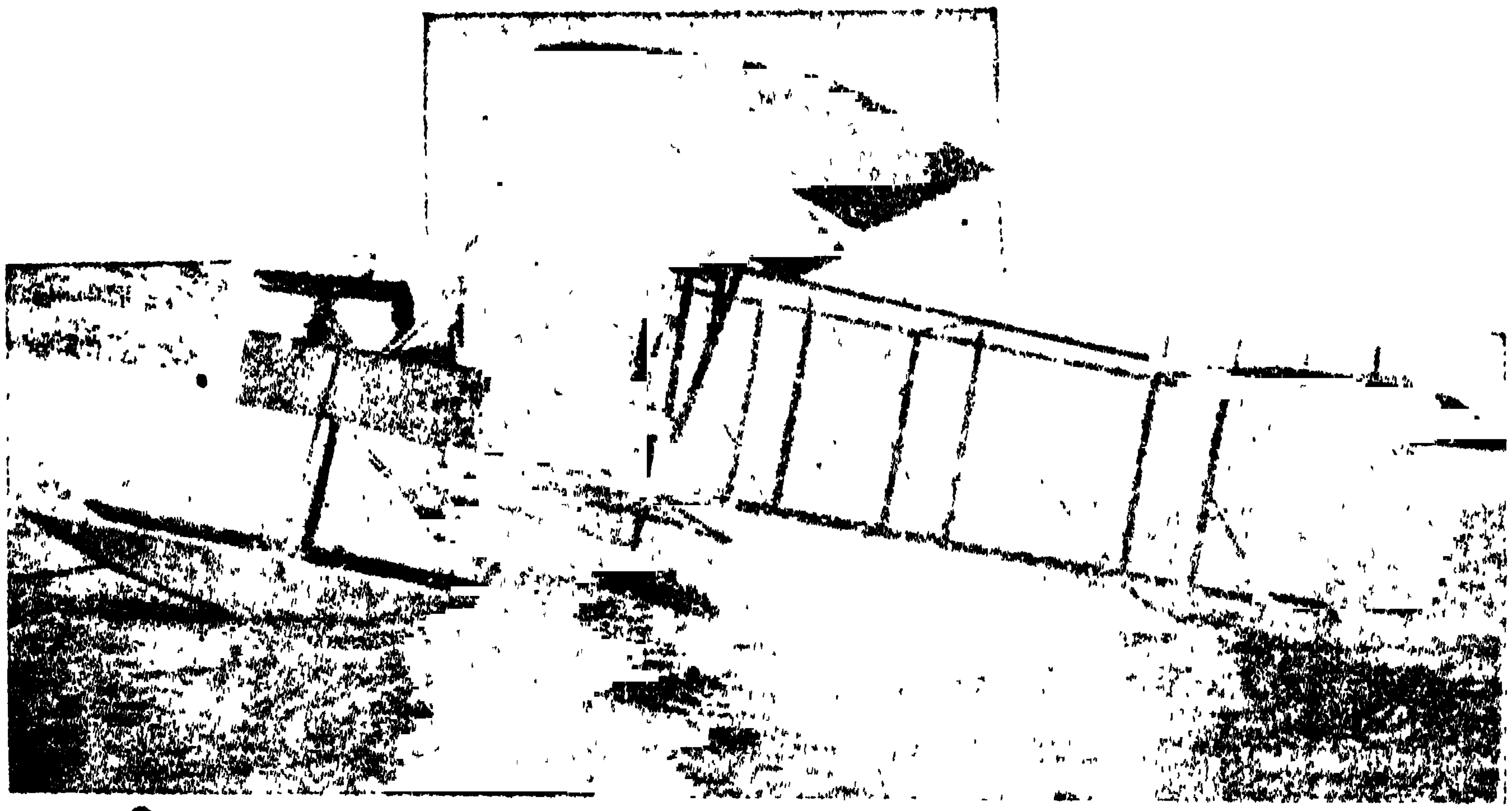

সী-প্লেন

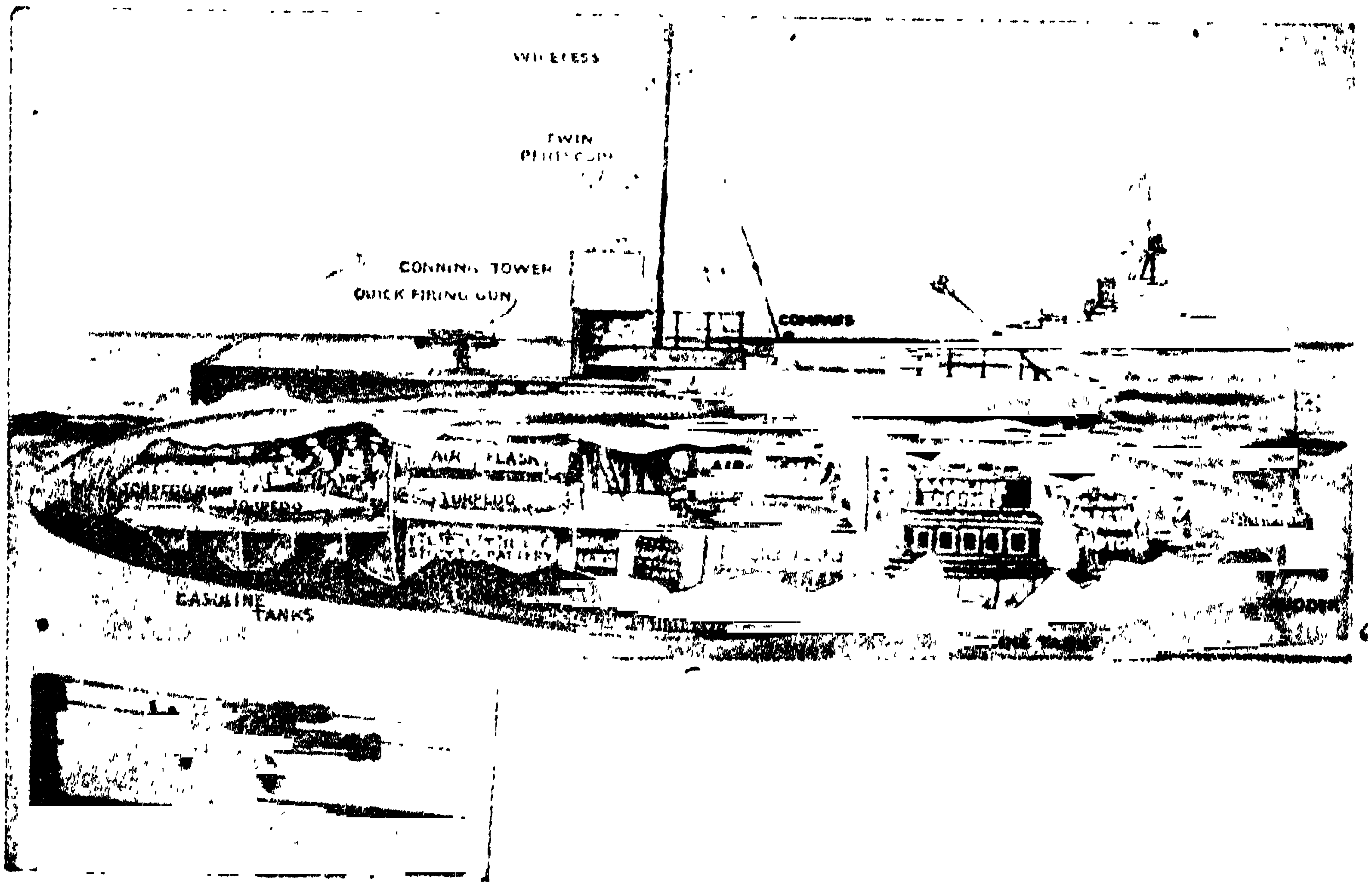

সবম্যারিণের অভ্যন্তর-ভাগ

প্রায় সবম্যারিণ হইতেই গুপ্তভাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সবম্যারিণও যে কতখানি ভয়ঙ্কর, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

সবম্যারিণ জলের ভিতর দিয়া চলে বলিয়া, জলের উপর কোথায় কি অবস্থিত, কোন্‌খান দিয়া কোন্ জাহাজ যাইতেছে, তাহা দেখিবার জন্ত "পেরিস্কোপ" নামে একটি যন্ত্র ইহতে সংযুক্ত থাকে। এই পেরিস্কোপই সবম্যারিণের চক্ষু। যন্ত্রটি এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, সমুদ্র গর্ভে জাহাজের খোলের ভিতর বসিয়া থাকিয়া সমুদ্রপৃষ্ঠস্থিত সমুদায় জাহাজের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। সবম্যারিণের সবটাই জলের নীচে থাকে, কেবল এই পেরিস্কোপটুকু জলের উপর জাগিয়া থাকে। দূর হইতে একখানা বড় মাড়োয়ারী জাহাজ যত শীঘ্র লক্ষ্য করা যায়, ক্ষুদ্র পেরিস্কোপ-যন্ত্রটি তত শীঘ্র দেখা যায় না। সুতরাং পেরিস্কোপ যতক্ষণে রণতরীর নাবিকের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইবে, তাহার বহুপূর্ব্বেই সবম্যারিণের নাবিকেরা লক্ষ্য স্থির করিয়া রণতরী উদ্দেশে টর্পেডো ছাড়িতে পারে—রণতরী আত্মরক্ষার্থ সাবধান হইবার পর্য্যন্ত অবসর পায় না। তবে

সমুদ্রে কুয়াসা হইলে রণতরীর বাঁচিবার কিছু সম্ভাবনা আছে। পেরিস্কোপ ছাড়া, প্রায় প্রত্যেক সবম্যারিণেই এখন বিনা তারে সংবাদ প্রদান ও গ্রহণের যন্ত্র থাকে।

টর্পেডোর ন্যায় আর একপ্রকার জাহাজধ্বংসী অস্ত্র আছে। তাহার নাম 'মাইন'। ইহা দুই প্রকার,—ভাসমান ও নিমজ্জমান। উভয়েই সমান সাংঘাতিক। টর্পেডোর সহিত ইহাদের পার্থক্য এই যে, টর্পেডো

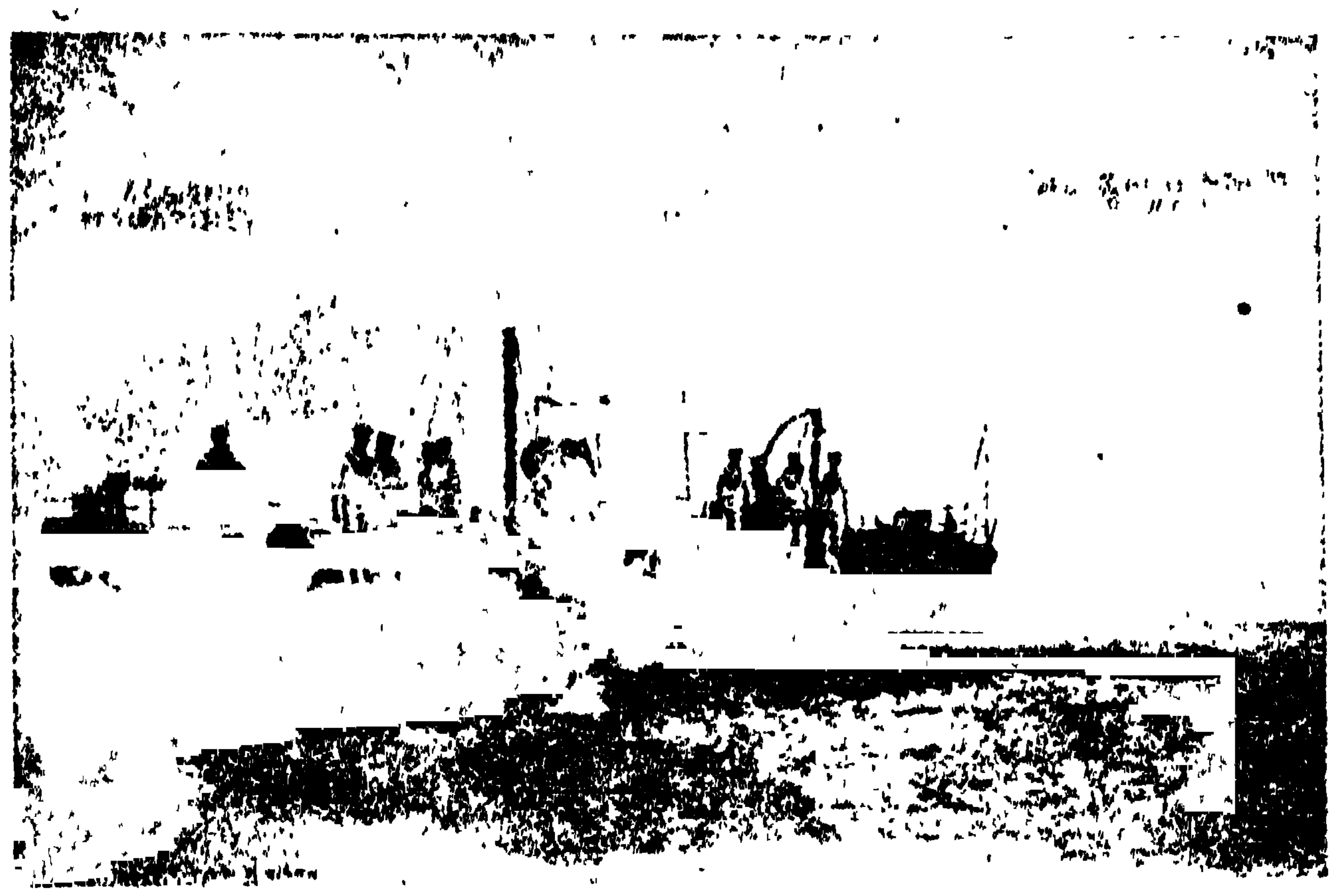

টর্পেডো

৭৭ এম এম ফরাসী ফীল্ড গান

জাহাজ লক্ষ্য করিয়া ত্যাগ করা যায়; আর মাইন ভাসিতে ভাসিতে বা জলের মধ্যে থাকিয়া জাহাজের গায়ে ঠেকিলেই জাহাজ নষ্ট হয়; না ঠেকিলে ইহার দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় না।

বর্ত্তমান যুদ্ধের বিশেষত্ব, ইহাতে বিমানের ব্যবহার। বিমানের বয়সও বেশী নয়। ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে একখানিও বিমানের সৃষ্টি হয় নাই। আর, আজ সমুদ্রপৃষ্ঠে রণতরীর ন্যায় আকাশে বিমান যান অন্যতম প্রধান শক্তিশালী যুদ্ধোপকরণে পরিণত হইয়াছে। সমর নীতিবিদ্ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, কালে কেবল আকাশেই যুদ্ধ চলিবে, ভূপৃষ্ঠে যুদ্ধের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর সাণ্টোজ ডিউমণ্ট নামক একজন ভদ্রলোক প্যারী নগরীর নিকটবর্ত্তী বাগাটেলী নামক স্থানে সর্ব্বপ্রথমে বিমান চালনা করেন। তিনি ৮০ গজ যাইতে পারিয়াছিলেন। ইহার এক বৎসর পরে হেনরী ফারমান ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত বিমান চালাইয়া জগৎকে বিস্মিত, স্তম্ভিত করিয়া দেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে বিমান-চালকের সংখ্যা চারিজনের অধিক ছিল না। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বিমান বিহারীর সংখ্যা ৩০০০ দাঁড়ায়। আজ, সমস্ত পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক বিমান চালাইতেছে।

'এরোপ্লেন', 'মনোপ্লেন,' 'বাইপ্লেন', 'ডিরিজিবল্', 'জেপেলিন', 'টব', প্রভৃতি ভেদে বিমান নানাপ্রকার

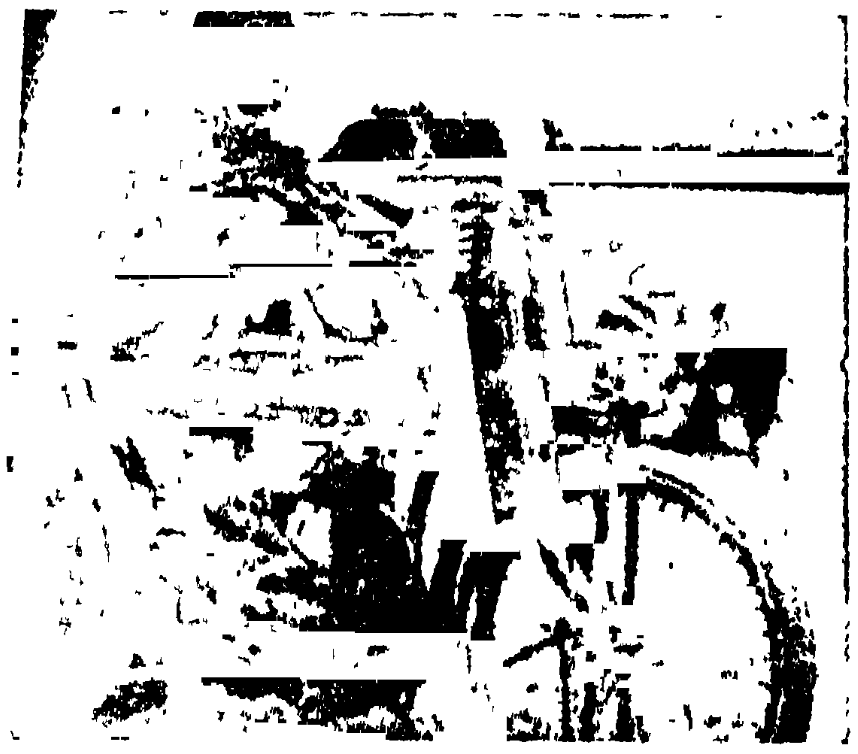

মোটর সাইকেলের উপর মেসিন গান

আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বহু-ভারসহ। অধিকাংশ বিমানে আজকাল বোমা, কলের কামান, তারহীন বার্ত্তাবহ প্রভৃতি যুদ্ধের সরঞ্জাম থাকে। কয়েক শ্রেণীর বিমান ভূমিতে একবারও অবতীর্ণ না হইয়া ৫০০ মাইল ঘুরিয়া আসিতে পারে। বিমানে যে বোমা ব্যবহৃত হয়, তাহা এত অল্প ঘাতসহ যে, নরম মাটি, কর্দ্দম, বরফ, এমন কি জলে পড়িলেও ফাটিয়া যায়। বিশেষ ভাবে বিমানে ব্যবহৃত হইবার জন্য টর্পেডো, প্রাপনেল প্রভৃতি কয়েক প্রকার অস্ত্রও নির্ম্মিত হইয়াছে। বিমানের সাহায্যে যুদ্ধ ত চলেই; কিন্তু যুদ্ধ করাই বিমানের প্রকৃত বা প্রধান কায নহে। বোমা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া শত্রুর ক্ষতি সাধন বিমানের একটা কায হইলেও, শত্রুসৈন্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া নিজের দলকে সংবাদ দেওয়া (sconting) বিমানের প্রধানতম কার্য্য। এই সূত্রেই শত্রুর বিমানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয়। কারণ, একপক্ষের বিমান

অপর পক্ষের গতিবিধির সন্ধান লইবার জন্য আকাশে উঠিলেই, তাহাকে বাধা দিয়া তাহার কার্য্য পণ্ড করিবার জন্য অপর পক্ষের বিমান আকাশে উঠে। কাযেই যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

সী-প্লেন নামক আর এক শ্রেণীর বিমান আছে। ইহাকে নৌ-বিমান বলা চলে। ইহা সমুদ্রে এবং অন্তরীক্ষে সমান ভাবে কার্য্য করে। এগুলি নৌ-বিভাগের অধীন থাকে।

সেকালের উৎকৃষ্টতম বন্দুকের গুলি ৮০০ গজের অধিক দূরে ছুটিতে পারিত না। আজকাল এমন উন্নত ধরণের ম্যাগাজিন রাইফেল নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহার গুলি দুই মাইল দূরবর্ত্তী লোককেও বিদ্ধ করিয়া তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিতে পারে।

ভূমিতে যুদ্ধ করিবার জন্য রাইফেল ব্যতীত অন্য যে সকল অস্ত্র আছে, তন্মধ্যে হাউইট্জার (howitzer) কামান অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ইহা এত ভারী যে, ঘোড়ায় ইহা টানিতে পারে না, ইহার জন্য মোটর শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। এক একটা হাউইট্জার হইতে ৭৫০ পৌণ্ড ওজনের এক একটা তীব্র বিস্ফোরক শেল নিক্ষিপ্ত হইতে পারে।

ঘোর অন্ধকার রজনীতে শত্রু-সৈন্যদের দেখিবার উপায় না থাকায় পূর্ব্বে নৈশ যুদ্ধ প্রায় হইত না। কিন্তু রুস জাপান যুদ্ধকালে উভয় পক্ষ এমন গোলা ব্যবহার করিয়াছিল, যাহা আকাশে উঠিয়া কিয়দ্দূর গমন করিবার পর ফাটিয়া গিয়া উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইত। সেই আলোকে শত্রু-সৈন্যের গতিবিধির সন্ধান পাওয়া যাইত। তখন হইতেই নৈশ যুদ্ধ সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই আলোক বারুদ হইতে উৎপন্ন এবং ক্ষণস্থায়ী। অধুনা বৈদ্যুতিক সার্চ লাইট ব্যবহার করিয়া নৈশ যুদ্ধ পরিচালন করা হয়।

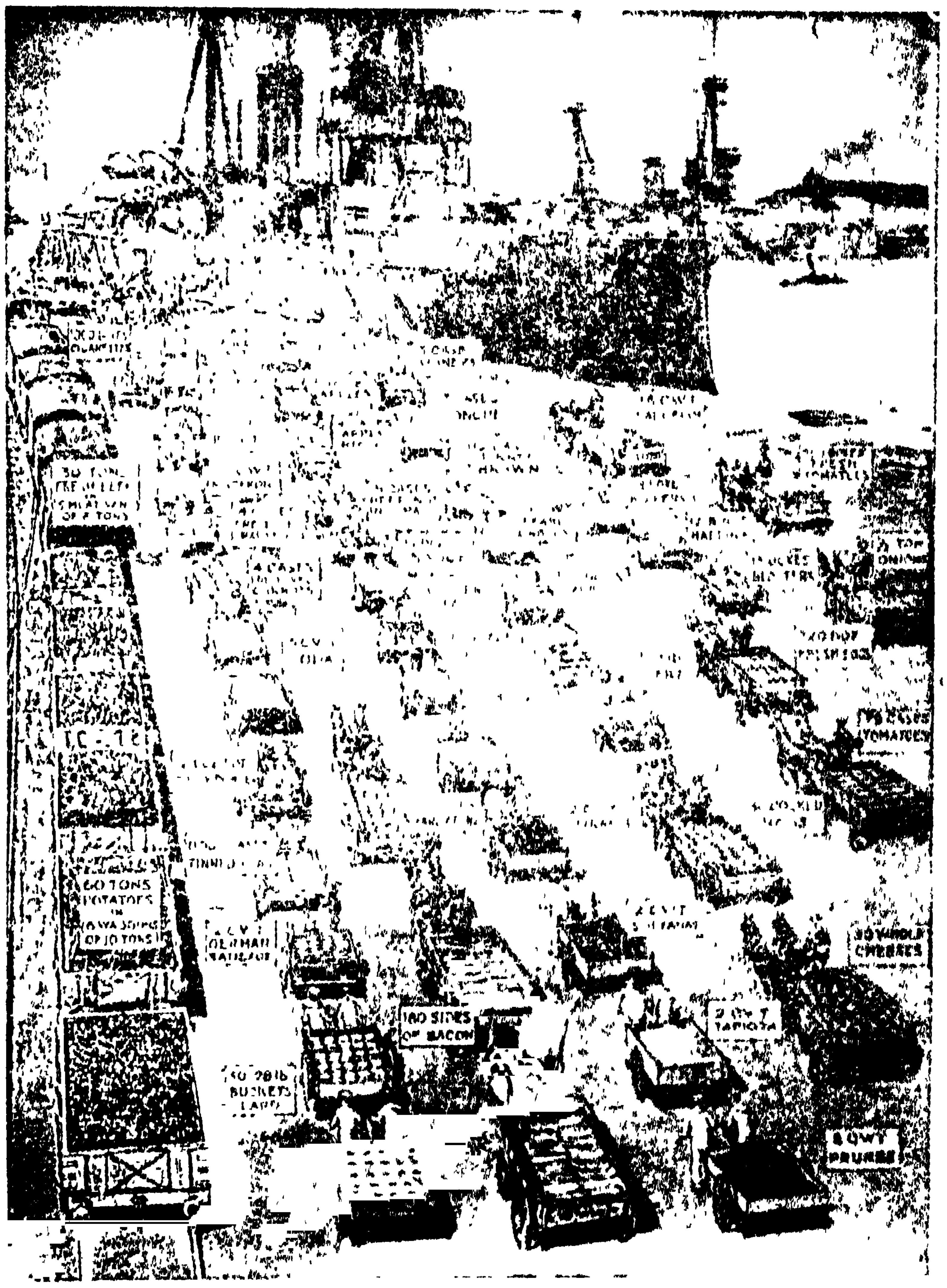

রণতরীর রসদ

শত্রুর বিমান আসিয়া ঘরের সন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে এক প্রকার বিমানধ্বংসী কামান নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার গোলা ১০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিতে পারে। অনেক সময় এই গোলার আঘাতে বিমান যথেষ্ট পরিমাণে জখম হইতে দেখা গিয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে অন্যান্য জিনিসের ন্যায় মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে। ইহারা কেবল যে পদস্থ সেনানীগণ এবং সংবাদবহগণকে বহন করে, তা নয়। এই সাইকেল মেসিন গান, ফীল্ড গান প্রভৃতিও বহন করিয়া থাকে। আবার সম্প্রতি বৃটিশরা "ট্যাঙ্ক" নামে এক প্রকার মোটর ব্যবহার করিতেছেন,—ইহার গতি অবাধ, কোন কিছুতেই ইহার গতি রোধ করিতে পারে না। গাছ পালা, বনজঙ্গল, বাড়ীর দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ইহা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে। অন্যান্য মোটর গাড়ী বর্ম্মে আবৃত করিয়া শত্রুর গোলার আঘাত হইতে রক্ষা করা হয়।

কামান-নির্ম্মাণবিদ্যায় ফরাসীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহারা ৭৫ মিলিমিটার মাপের এক প্রকার ফীল্ড গান নির্ম্মাণ করিয়াছে; অন্য কোন প্রকার ফীল্ড গান ইহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ইহা যেমন ক্ষিপ্র-গতি, তেমনি ইহাকে যথেষ্ট ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়। অপর কোন ফীল্ড গানের এতটা সুবিধা নাই।

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি]

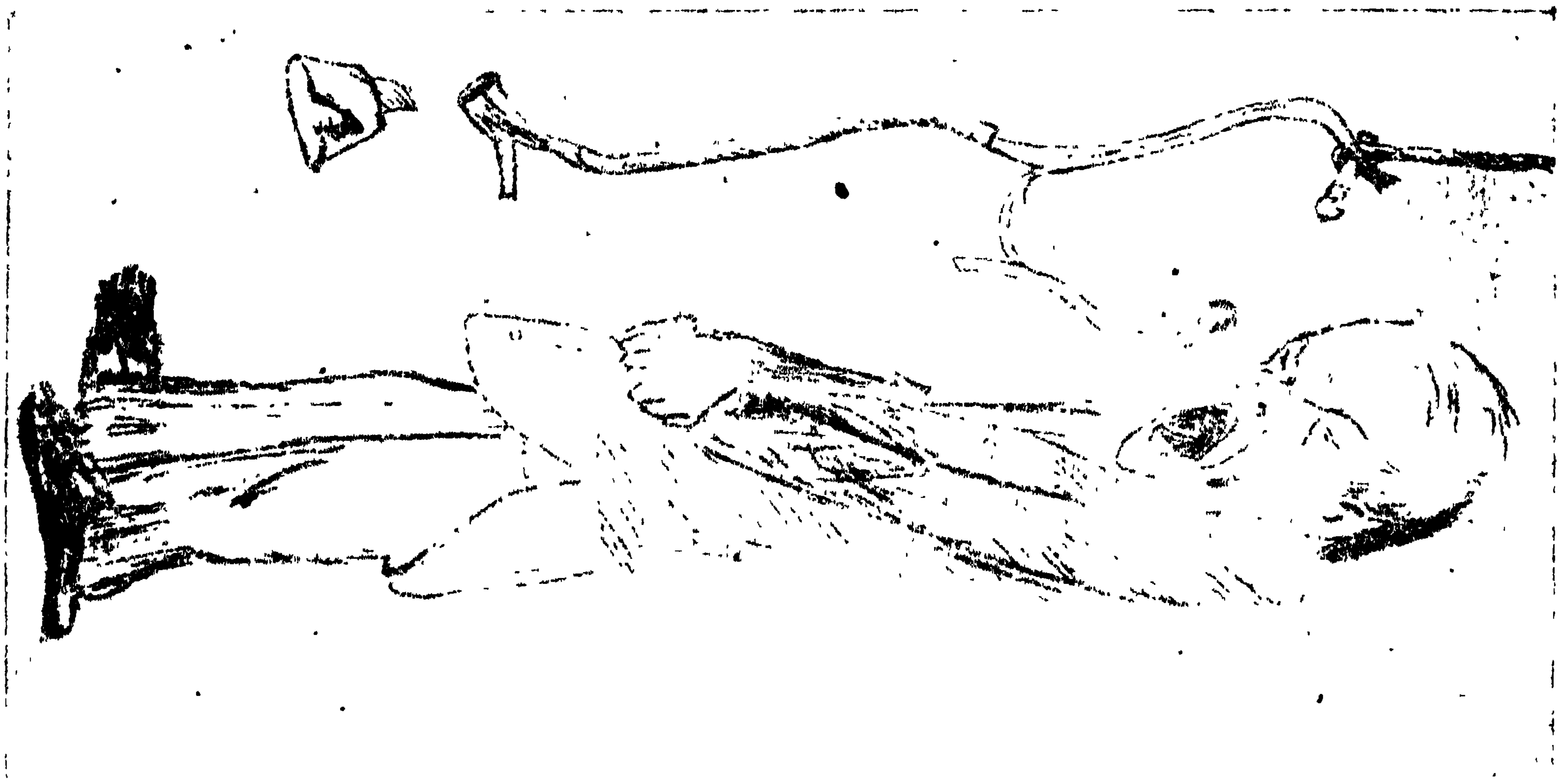

প্রাইভেট প্র্যাকটিসের M.B.
Private Practice.

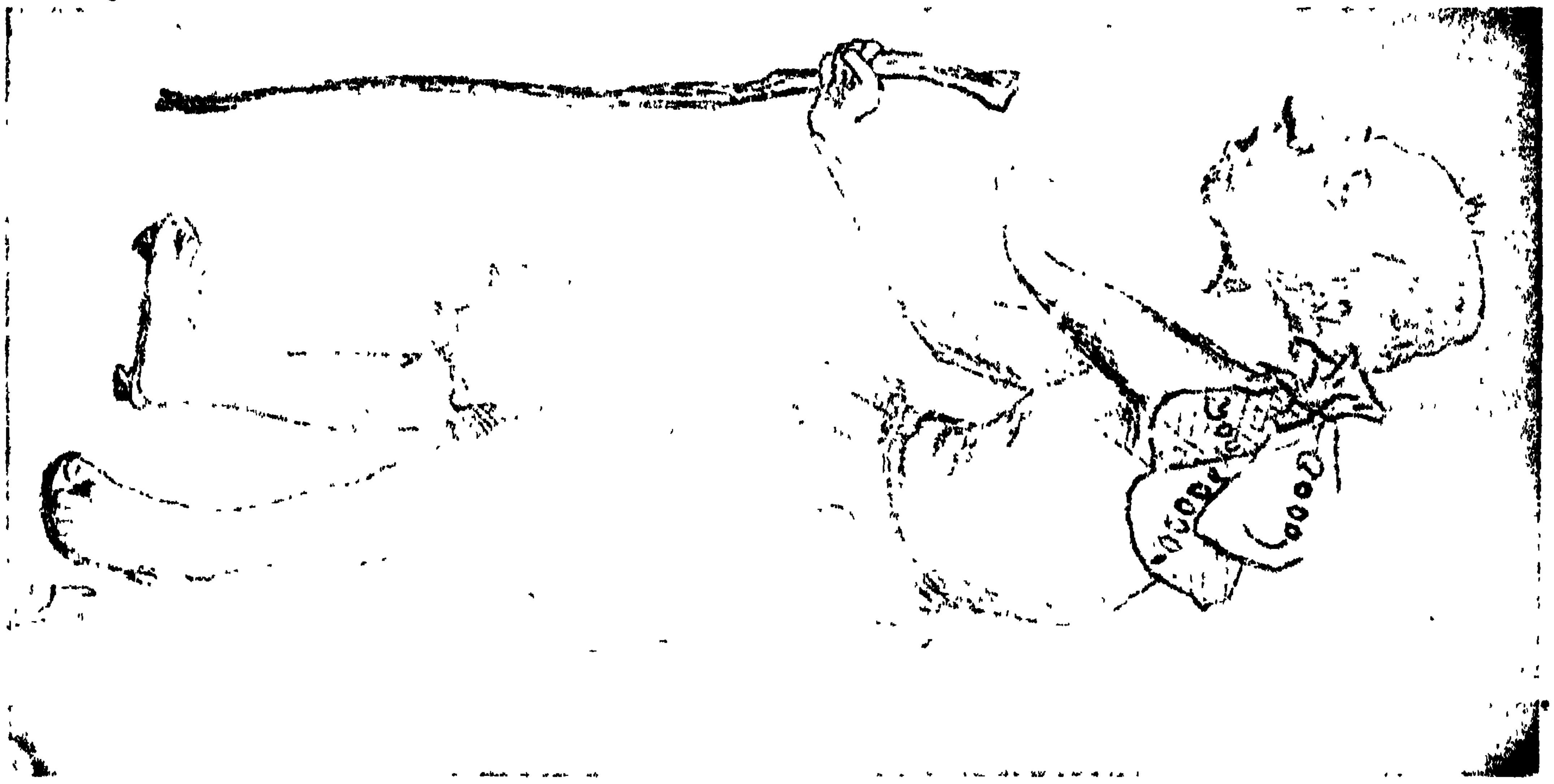

কর্তার কর্ম্ম

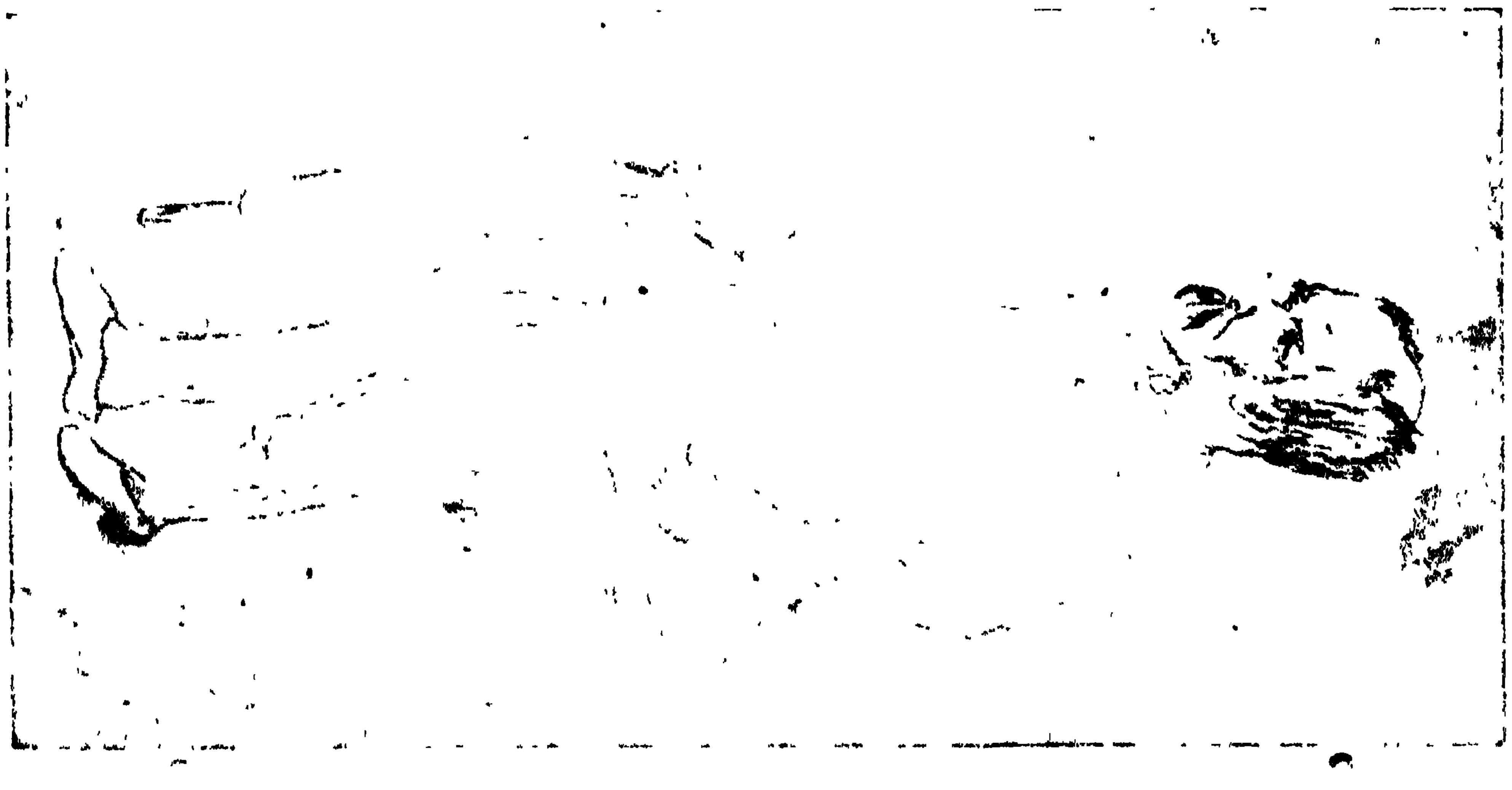

গৃহস্থ

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(৯)

হঠাৎ অভয়া দ্বার খুলিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "জন্ম-জন্মান্তের অন্ধ-সংস্কারের ধাক্কাটা প্রথমে সাম্‌লাতে পারিনি বলেই পালিয়েছিলুম, শ্রীকান্ত বাবু, নইলে ওটা আমার সত্যিকারের লজ্জা বলে ভাব্‌বেন না যেন।"

তাহার সাহস দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। অভয়া কহিল, "আপনার বাসায় ফিরে যেতে আজ একটু দেরি হবে। রোহিণীবাবু এলেন বলে। আজ দুজনেই আমরা আপনার আসামী। বিচারে অপরাধ সাব্যস্ত হয়, আমি তার প্রায়শ্চিত্ত কোরব।"

রোহিণীকে 'বাবু' বলিতে এই প্রথম শুনিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ফিরে এলেন কবে?"

অভয়া কহিল "পরশু। কি হয়েছিল জান্‌তে নিশ্চয়ই আপনার কৌতূহল হচ্চে।" বলিয়া সে নিজের দক্ষিণ বাহু অনাবৃত করিয়া দেখাইল, বেতের দাগ চামড়ার উপর কাটিয়া-কাটিয়া বসিয়াছে। বলিল, "এমন আরও অনেক আছে, যা' আপনাকে দেখাতে পারলুম না।"

যে সকল দুঃখে মানুষের পৌরুষ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে, ইহা তাহারই একটা। অভয়া আমার স্তব্ধ কঠিন মুখের প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিমিষে সমস্ত বুঝিয়া ফেলিল, এবং এইবার একটুখানি হাসিয়া কহিল, "কিন্তু ফিরে আসার এই আমার কারণ নয়, শ্রীকান্ত বাবু, আমার সতীধর্ম্মের সামান্য একটু পুরস্কার। তিনি যে স্বামী, আর আমি যে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী - এ তারই একটু চিহ্ন।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় কহিতে লাগিল, "আমি যে স্ত্রী হয়েও স্বামীর বিনা অনুমতিতে এত দূরে এসে তাঁর শান্তি ভঙ্গ করেচি—মেয়েমানুষের এতবড় স্পর্দ্ধা পুরুষমানুষে সইতে পারে না। এ সেই শাস্তি। তিনি অনেক রকমে ভুলিয়ে আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন, কেন রোহিণীর সঙ্গে এসেচি। বল্লুম, শ্বশুরের ভিটে যে কি, সে আমি আজও জানিনে। আমার বাপ নেই, মা মারা গেছেন—দেশে খেতে-পরতে দেয় এমন কেউ নেই; তোমাকে বারবার চিঠি লিখে জবাব পাইনে—" তিনি একগাছা বেত তুলে নিয়ে বল্লেন, "আজ তার জবাব দিচ্চি।" বলিয়া অভয়া তাহার প্রহৃত দক্ষিণ বাহুটা আরও একবার স্পর্শ করিল।

সেই নিরতিশয় হীন অমানুষ বর্ব্বরটার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা পুনরায় আলোড়িত হইয়া উঠিল, কিন্তু যে অন্ধ সংস্কারের ফল বলিয়া অভয়া আমাকে দেখিবামাত্রই ছুটিয়া লুকাইয়াছিল, সে সংস্কার ত আমারও ছিল! আমিও ত তাহার অতীত নই! সুতরাং 'বেশ করিয়াছ' এ কথাও বলিতে পারিলাম না, 'অন্যায় করিয়াছ' এমন কথাও মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। অপরের একান্ত সঙ্কটের কালে যখন নিজের বিবেক ও সংস্কারে, স্বাধীন চিন্তায় ও পরাধীন জ্ঞানে সংঘর্ষ বাধে, তখন উপদেশ দিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলাম, "চলে আসাটা যে অন্যায়, এ কথা আমি বলতে পারিনে, কিন্তু—"

অভয়া কহিল, "এই 'কিন্তু'টার বিচারই ত আপনার কাছে চাইচি শ্রীকান্ত বাবু। তিনি তাঁর বর্ম্মা স্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নালিশ কচ্চিনে; কিন্তু স্বামী যখন শুধু মাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে, তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার কোরে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কি না, আমি সেই কথাই ত আপনার কাছে জানতে চাইচি।"

আমি কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম;—সে আমার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় কহিল, "অধিকার ছাড়া ত কর্ত্তব্য থাকে না শ্রীকান্ত বাবু। এটা ত খুব মোটা কথা! তিনিও ত আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন! কিন্তু সে শুধু একটা নিরর্থক প্রলাপের মত তাঁর প্রবৃত্তিকে,

তার ইচ্ছাকে ত এতটুকু বাধা দিতে পারলে না! অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল,—কিন্তু সে কি তার সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়েমানুষ বলে আমারি উপরে? শ্রীকান্ত বাবু, আপনি একটা 'কিন্তু' পর্য্যন্ত বলেই থেমে গেলেন। অর্থাৎ, সেখান থেকে চলে আসাটা আমার অন্যায় হয়নি, কিন্তু এই 'কিন্তু'টার অর্থ কি এই যে, মেয়েমানুষের জীবন এম্নি নিষ্ফল, এম্নি বৃথা যে, যার স্বামী এতবড় অপরাধ করেচে, তার স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারাজীবন জীবন্মৃত হয়ে থাকাই তার নারী জন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল,—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? এতবড় অন্যায়, এতবড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না! আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আর আমার মা হবার অধিকার নেই,—সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দ্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই? এই জন্যেই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? সব জাত, সব ধর্ম্মেই এ অবিচারের প্রতিকার আছে,—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেচি বলেই কি আমার সকল দিক বন্ধ হয়ে গেছে শ্রীকান্ত বাবু?"

আমাকে মৌন দেখিয়া অভয়া বলিল, "জবাব দিন না শ্রীকান্ত বাবু?" বলিলাম, "আমার জবাবে কি যায় আসে? আমার মতামতের জন্য ত আপনি অপেক্ষা করেন নি?"

অভয়া কহিল, "কিন্তু তার ত সময় ছিল না!"

কহিলাম, "তা' হবে। কিন্তু আপনি যখন আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন, তখন আমিও চলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আবার ফিরে এলুম কেন জানেন?"

"না।"

"ফিরে আসার কারণ, আজ আমার ভারি মন খারাপ হয়ে আছে। আপনার চেয়েও ঢের বেশি নিষ্ঠুর আচরণ একটি মেয়ের উপর হ'তে আজই সকালে দেখেচি।" এই বলিয়া জাহাজ-ঘাটের সেই বর্ম্মা মেয়েটির সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই মেয়েটির কি উপায় হবে, আপনি বলে দিতে পারেন?"

অভয়া শিহরিয়া উঠিল। তার পরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, আমি বল্‌তে পারিনে।"

কহিলাম, "আপনাকে আরও দুটি মেয়ের ইতিহাস আজ শোনাব। একটি আমার অন্নদা দিদি, অপরটির নাম পিয়ারী বাইজী। দুঃখের ইতিহাসে এঁদের কারুর স্থানই আপনার নীচে নয়।"

অভয়া চুপ করিয়া রহিল। আমি অন্নদা দিদির সমস্ত কথা আগাগোড়া বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, অভয়া কাঠের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া বারবার নমস্কার করিয়া উঠিয়া বসিল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, "তার পরে?"

বলিলাম, "তার পরে আর জানিনে। এইবার পিয়ারী বাইজীর কথা শুনুন। তার নাম যখন রাজলক্ষ্মী ছিল, তখন থেকে একজনকে সে ভাল বাস্‌ত। কি রকম ভালবাসা জানেন? রোহিণীবাবু আপনাকে যেমন ভালবাসেন তেম্নি। এ আমি স্বচক্ষে দেখে গেছি বলেই তুলনা দিতে পারলুম, না হলে পারতুম না। তার পরে বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন দু'জনের দেখা হয়। তখন সে আর রাজলক্ষ্মী নয়, পিয়ারী বাইজী! কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে মরেনি, পিয়ারীর মধ্যে চিরদিনের জন্যে অমর হয়ে ছিল, সেই দিন তার প্রমাণ হয়ে যায়।"

অভয়া উৎসুক হইয়া বলিল, "তার পরে?"

পরের ঘটনা একটি-একটি করিয়া সমস্ত কহিয়া বলিলাম, "তার পরে এমন এক দিন এসে পড়ল, যে দিন পিয়ারী তার প্রাণাধিক প্রিয়তমকে নিঃশব্দে দূরে সরিয়ে দিলে।"

অভয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তার পরে কি হ'ল জানেন?"

"জানি। তার পরে আর নেই।"

অভয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আপনি কি এই বল্‌তে চান যে আমি একা নই—এম্নি দুর্ভাগ্য মেয়েমানুষের অদৃষ্টে চিরদিন ঘটে আসচে, এবং সে দুঃখ সহ্য করাই তাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব?"

আমি কহিলাম, "আমি কিছুই বল্‌তে চাইনে। শুধু

এইটুকু আপনাকে জানাতে চাই, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ নয়। তাঁদের আচার ব্যবহার এক তুলাদণ্ডে ওজন করাও যায় না, গেলেও তাতে সুবিধে হয় না।" "কেন হয় না, বল্‌তে পারেন?" "না, তাও পারিনে। তা' ছাড়া আজ আমার মন এমনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে যে, এই সব জটিল সমস্যার মীমাংসা করবার সাধ্যই নেই। আপনার প্রশ্ন আমি আর এক-দিন ভেবে দেখ্‌ব। তবে আজ শুধু আপনাকে এই কথাটি বলে যেতে পারি যে, আমার জীবনে আমি যে ক'টি বড় নারী চরিত্র দেখ্‌তে পেয়েছি, সবাই তাঁরা দুঃখের ভেতর দিয়েই আমার মনের মধ্যে বড় হয়ে আছেন। আমার অন্নদা দিদি যে তাঁর সমস্ত দুঃখের ভার নিঃশব্দে বহন করা ছাড়া জীবনে আর কিছুই করতে পারতেন না, এ আমি শপথ করেই বল্‌তে পারি। সে ভার অসহ্য হলেও যে তিনি কখনো আপনার পথে পা দিতে পারেন, এ কথা ভাব্‌লেও হয় ত দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "আর সেই রাজলক্ষ্মী। তার ত্যাগের দুঃখ যে কত বড়, সে তো আমি চোখে দেখেই এসেচি। এই দুঃখের জোরেই আজ সে আমার সমস্ত বুক জুড়ে আছে।"

অভয়া চমকিয়া কহিল, "তবে আপনিই কি তাঁর—" বলিলাম, "তা' না হলে সে এত স্বচ্ছন্দে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না, হারাবার ভয়ে প্রাণপণে কাছে টেনে রাখ্‌তেই চাইত।" অভয়া বলিল, "তার মানে রাজলক্ষ্মী জানে আপনাকে তার হারাবার ভয় নেই।"

আমি বলিলাম, "শুধু ভয় নয়,—রাজলক্ষ্মী জানে আমাকে তার হারাবার যো' নেই। পাওয়া এবং হারানোর বাহিরে একটা সম্বন্ধ আছে, আমার বিশ্বাস সে তাই পেয়েছে বলে আমাকেও এখন আর তার দরকার নেই। দেখুন, আমি নিজেও বড় এ জীবনে কম দুঃখ পাইনি। তার থেকে এই বুঝেচি, দুঃখ জিনিষটা অভাব নয়, শূন্যও নয়। ভয় ছাড়া যে দুঃখ, তাকে সুখের মতই উপভোগ করা যায়।"

অভয়া অনেকক্ষণ স্থির-ভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আমি আপনার কথা বুঝেচি শ্রীকান্ত বাবু। অন্নদা দিদি, রাজলক্ষ্মী এঁরা দুঃখটাকেই জীবনে সম্বল পেয়েছেন, কিন্তু আমার তাও হাতে নেই। স্বামীর কাছে পেয়েছি আমি অপমান,—শুধু লাঞ্ছনা আর গ্লানি নিয়েই আমি ফিরে এসেচি। এই মূলধন নিয়েই কি আমাকে বেঁচে থাক্‌তে আপনি বলেন?"

অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া অভয়া পুনরায় বলিল, "এঁদের সঙ্গে আমার জীবনের কোথাও মিল নেই শ্রীকান্ত বাবু। সংসারে সব নর নারীই এক ছাঁচে তৈরি নয়, তাদের সার্থক হবার পথও জীবনে শুধু একটা নয়। তাদের শিক্ষা, তাদের প্রবৃত্তি, তাদের মনের গতি কেবল একটা দিক দিয়েই চালিয়ে তাদের সফল করা যায় না। তাই, সমাজে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমার জীবনটাই একবার ভাল কোরে আগাগোড়া ভেবে দেখুন দেখি। আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও উপায় হল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আর আমার নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকতেই কি আমার জীবন ফুলে ফলে ভরে উঠে সার্থক হোতো শ্রীকান্ত বাবু? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন বয়ে বেড়ানোই কি আমার নারী জন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা? রোহিণী বাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন? তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই? এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্ত বাবু।"

হাত তুলিয়া অভয়া চোখের কোণ দু'টা মুছিয়া ফেলিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"একটা রাত্রির বিবাহ অনুষ্ঠান যা স্বামি স্ত্রী উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যা হয়ে গেছে, তাকেই জোর কোরে সারাজীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এই এতবড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ কোরে দেব? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েছেন, তিনি কি তাতেই খুসি হবেন? আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাব্‌বেন, ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুসি বলে ডাক্‌বেন, যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্ত বাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোটো হবে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় বলে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটা তারা দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিষ তাদের বাপ মায়ের হয় ত কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু

দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেচে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই। এ বস্তু থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তাদের কিছুতে চল্‌বে না। তা' হলে তারা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে।"

অভয়া চুপ করিল, কিন্তু সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকালের জন্য মনে হইল এই মেয়েটির মুখের কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এম্‌নিই বটে। সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন ইহারা সজীব; যেন ইহাদের রক্ত মাংস আছে; যেন তার ভিতরে প্রাণ আছে; —নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে, 'চুপ কর। মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিয়ো না।'

অভয়া সহসা একটা সোজা প্রশ্ন করিয়া বসিল, কহিল, "আপনি নিজে কি আমাদের অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌বেন শ্রীকান্ত বাবু? আর আমাদের বাড়ীতে আস্‌বেন না?"

উত্তর দিতে আমাকে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে হইল। তার পরে বলিলাম, "অন্তর্যামীর কাছে আপনারা হয় ত নিষ্পাপ,—তিনি আপনাদের কল্যাণ করবেন; কিন্তু, মানুষ ত মানুষের অন্তর দেখ্‌তে পায় না, —তাদের ত প্রত্যেকের হৃদয় অনুভব কোরে বিচার করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা নিয়ম গড়তে গেলে ত তাদের সমাজের কাজ কর্ম্ম, শৃঙ্খলা সমস্তই ভেঙ্গে যায়!"

অভয়া কাতর হইয়া কহিল, "যে ধর্ম্মে, যে সমাজের মধ্যে আমাদের তুলে নেবার মত উদারতা আছে, স্থান আছে, আপনি কি তবে সেই সমাজেই আমাকে আশ্রয় নিতে বলেন?"

ইহার কি জবাব দিব, ভাবিয়া পাইলাম না।

অভয়া কহিল, "আপনার লোক হয়ে আপনার জনকে আপনারা সঙ্কটের কালে আশ্রয় দিতে পারবেন না, সে আশ্রয় আমাদের ভিক্ষে নিতে হবে পরের কাছে? তাতে কি গৌরব বাড়ে শ্রীকান্ত বাবু?" প্রত্যুত্তরে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকার পরে কহিল, "যাক্, আপনারা যায়গা নাই দিন, আমার সান্ত্বনা এই যে জগতে আজও একটা বড় জাত আছে, যারা প্রকাশ্যে এবং স্বচ্ছন্দে স্থান দিতে পারে।" তাহার কথাটায় একটু আহত হইয়া কহিলাম, "সকল ক্ষেত্রে আশ্রয় দেওয়াই কি ভাল কাজ বলে মেনে নিতে হবে?"

অভয়া বলিল, "তার প্রমাণ ত হাতে-হাতে রয়েছে শ্রীকান্ত বাবু। পৃথিবীতে কোন অন্যায়ই বেশি দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। এই যদি সত্য হয়, তা' হলে কি তারা অন্যায়টাকেই প্রশ্রয় দিয়ে দিন দিন বড় হয়ে উঠচে, আর আপনারা ন্যায়-ধর্ম্ম আশ্রয় করেই প্রতিদিন ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ হয়ে যাচ্চেন বল্‌তে হবে? আমরা ত এখানে অল্প দিন এসেছি, কিন্তু এর মধ্যেই আমি দেখেচি মুসলমানেতে এ দেশটা ছেয়ে যাচ্চে। শুনেচি এমন গ্রাম না কি নেই, যেখানে একঘর মুসলমানও বাস করেনি, যেখানে একটা মসজিদও তৈরি হয়নি। আমরা হয় ত চোখে দেখে যেতে পারবো না, কিন্তু, এমন দিন শীঘ্রই আসবে, যেদিন আমাদের দেশের মত এত বড় দেশটাও একটা মুসলমান-প্রধান স্থান হয়ে উঠবে। আজ সকালেই জাহাজ ঘাটে যে অন্যায় দেখে আপনার মন খারাপ হয়ে আছে, আপনিই বলুন ত, কোন মুসলমান বড়-ভায়েরই কি ধর্ম্ম এবং সমাজের ভয়ে এই ষড়যন্ত্র, এই হীনতার আশ্রয় নিয়ে এমন একটা আনন্দের সংসার ছারখার করে দিয়ে পালাবার প্রয়োজন হোতো? বরঞ্চ সে সবাইকে দলে টেনে নিয়ে আশীর্ব্বাদ কোরে অগ্রজের সম্মান ও মর্য্যাদা নিয়ে বাড়ী ফিরে যেতো। কোন্‌টাতে সত্যকার ধর্ম্ম বজায় থাক্‌তো শ্রীকান্ত বাবু?"

গভীর শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, আপনি ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, আপনি এত কথা জান্‌লেন কি কোরে? আমার ত মনে হয় না, এত বড় প্রশস্ত হৃদয় আমাদের পুরুষমানুষের মধ্যেও বেশি আছে। আপনি যার মা হবেন, তাকে দুর্ভাগা বলে ভাবতে ত অন্ততঃ আমি কোন মতেই পারব না।"

অভয়া ম্লান মুখে একটুখানি হাসির আভাস ফুটাইয়া বলিল, "তা' হলে শ্রীকান্ত বাবু, আমাকে সমাজ থেকে বার করে দিলেই কি হিন্দুসমাজ বেশি পবিত্র হয়ে উঠবে? তাতে কি কোন দিক দিয়েই সমাজে ক্ষতি পৌঁছুবে না?

একটু স্থির থাকিয়া পুনরায় একটু হাসিয়া কহিল, "আমি কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে যাবো না। সমস্ত অপযশ,

সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত দুর্ভাগ্য মাথায় নিয়েই আমি চিরদিন আপনাদের হয়েই থাকব। আমার একটি সন্তানকেও যদি কোন দিন মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পারি, সেদিন আমার সকল দুঃখ সার্থক হবে, এই আশা নিয়েই আমি বেঁচে থাকব। সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না তার জন্মের হিসেবটাই জগতে বড়, এ আমাকে যাচাই করে দেখতে হবে।"

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

বিপিন বাবুর "একখানি পত্র" : -

'প্রবাসী' পত্রে শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী যখন বৈষ্ণব কবিদের উপর কলমের খোঁচা মারিয়া ব্রাউনিং সেলী প্রভৃতিকে বড় করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলি নাই,—কিছু বলা প্রয়োজন মনেও করি নাই। কারণ, যে সমালোচনায় বারবার উপেক্ষিত হইয়া দাশানিব তত্ত্বই কবিত্বের মাপকাটি হইতে দেখা যায়, তাহার আবার আলোচনা কি? যে লেখায় বাংলা রসের নিদর্শনরূপ এইরূপ ছত্র --

"ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।"

উদাহৃত হয়, তাহা পড়িয়া হাসিই আসে, --কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হয় না।

কিন্তু এই লেখাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় গত মাঘ মাসের 'নারায়ণে' যে একখানি পত্র ছাপাইয়াছেন, তাহা পড়িয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই পত্রে এমন দুই একটা কাঁচা কথা আছে, যাহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে অন্যায় হয় মনে করি।

'প্রবাসী'র সমালোচনায় আছে,—"পৃথিবীর মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবি, যেমন দান্তে বা শেলি বা ব্রাউনিং তাঁদের কারো সঙ্গেই কোন বৈষ্ণব কবি কোন দিক দিয়াই তুলনীয় নন।"—এমন আশ্চর্য্য মৌলিক মন্তব্য এক-আধ স্থানে নহে, —ঐ প্রবন্ধের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়; কিন্তু সে সব দেখিয়া-শুনিয়াও বিপিনবাবু বিন্দুমাত্র বিস্মিত বা বিরক্ত হন নাই। বরং সেটা স্বাভাবিক বলিয়াই তিনি মনে করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পত্র-খানিতে বৈষ্ণব রস-তত্ত্বের আলোচনা করিতে-করিতে বলিয়া ফেলিয়াছেন,—

"অজিত কি এ সকল কথা বুঝিবে? সে কি এ সকল কথাকে অজ্ঞানের উদ্গার বা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবে না? একদিন আমিও ত তারই মতন নিরাকারবাদী ছিলাম। আর যতদিন এই সাধারণ ব্রাহ্ম-মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ছিলাম, ততদিন আমিও এ সকল তত্ত্বের সন্ধান পাই নাই।" তার পর আর এক স্থানে তিনি লিখিতেছেন,—"অজিতের উপরেই কেবল জুলুম কর কেন? অজিত বৈষ্ণব কবিতার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝে নাই, মানিলাম। কিন্তু যারা অজিতের লেখা পড়িয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, তাদের সকলেই কি বৈষ্ণব রসতত্ত্ব বুঝেন?" বেশ, তাহাই যেন হইল। বিপিনবাবুর কথামত না হয় মানিয়া লইলাম যে, যাহারা 'প্রবাসীর' লেখাটা পড়িয়া চটিয়াছেন, তাহাদের 'সকলেই বৈষ্ণব-রস-তত্ত্ব বুঝেন না।' কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রবাসীর ঐ লেখা বুঝিবার জন্য কি বৈষ্ণব রস-তত্ত্বের সহিত পরিচয় থাকাটা বিশেষ দরকার? 'বৈষ্ণব কবিতার নিগূঢ় মর্ম্ম' না জানা বা না বুঝা থাকিলে কি ঐ সমালোচনা প্রহসন বুঝিতে পারা যায় না? অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই মোটামোটি রস বোধ বলিয়া যে একটা জিনিস আছে, বিপিনবাবু কি সেটাকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে চাহেন? তিনিই তো ১৩২২ সালের ভাদ্রের 'নারায়ণে' 'কবিতার কষ্টিপাথর' বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন,—"কেবল বস্তুত্বে কবিতা হয় না। কেবল মিষ্টত্বেও হয় না। বস্তুত্বের সঙ্গে মিষ্টত্বের, মিষ্টত্বের সঙ্গে বস্তুত্বের মিলন যেখানে, সেইখানেই সত্য কবিতা জন্মে। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিতা মাত্রেই রসাত্মক এবং বস্তুতন্ত্র।"---এই কষ্টিপাথরে বৈষ্ণব কবিতা কষিয়া দেখিলে

কি 'প্রবাসী'র সমালোচনার সহিত একমত হইতে পারা যায় ?

না,—তাহা পারা যায় না। বিপিনবাবু স্বয়ং যখন 'ব্রাহ্ম মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন' ছিলেন, তখনও তিনি তাহা পারেন নাই। তিনি নিজমুখেই একদিন স্বীকার করিয়াছেন যে,—"শৈশবে কৃষ্ণ কাকে বলে জানি নাই। যৌবনে যখন জানিলাম, তখন তাঁ'র প্রতি কোনো শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল না। দেবতা হওয়া তো দূরের কথা, মানুষের হিসাবেও লোক ভাল নন। শৈশবে ইনি যার-তার ঘরে ননীচুরি করিয়া খাইতেন। আপনার মার তো কথাই নাই, পাড়াপ্রতিবেশীরাও তাঁকে চোর বলিয়া বাঁধিয়া রাখিত। যৌবনে তিনি পর-স্ত্রীর পশ্চাতে পশ্চাতে বাঁশী হাতে করিয়া বেড়াইতেন। কুলবধূরা যমুনায় স্নানে যাইলে, তাদের বস্ত্র লইয়া গাছে চড়িয়া বসিতেন, আর তা'রা আপনাদের অঙ্গ শোভা ঢাকিতে না পারিয়া কেমন লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিত, তাই হাসিয়া হাসিয়া দেখিতেন। রাস লীলায়, একটি দুটি নয়, ষোল হাজার কুলবধূর কুল মজাইয়া, তাঁদের সঙ্গে রঙ্গরস করিতেন। আর আপনার গুরু গর্ব্বিণী কুটুম্বিনী শ্রীরাধার সঙ্গে গোপনে মিলিত হইয়া, তার কুলনাশ ও ধর্ম্মনাশ করিতেন। এই কারণে ধর্ম্মের ভাবে কৃষ্ণকথা শুনা বা কৃষ্ণ লীলার আলোচনা করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। তবে সাহিত্যের দিক্ দিয়া, কাব্যের হিসাবে, তখনও কৃষ্ণকথা মিষ্টি লাগিত। তখন সবে অক্ষয়বাবুর প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থেই প্রথমে বাংলার ইংরেজি নবীশেরা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির সন্ধান পাইলেন। আমরা নব যুবকদল এ সকলে ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম।

"শৈশব যৌবন, দুঁহু মিলি গেল
শ্রবণক পথ দুঁহু লোচন নেল" ইত্যাদি

* * * *

"কি পুছসি সখি অনুভব মোয়
সোহি পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।" ইত্যাদি

* * * *

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো!"
ইত্যাদি—

এই সকল পদ কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। ধর্ম্মের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধের সঙ্গে, এ সকল পদাবলীর কোনও কিছু সম্পর্ক আছে, এ জ্ঞান তখন হয় নাই। কিন্তু কৃষ্ণের ধর্ম্ম যাই হউক না কেন, কৃষ্ণের প্রেম যে সাহিত্যের একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এটা তখন বেশ বুঝিতে লাগিলাম।...কাব্যের হিসাবেই এগুলির আলোচনা করিতে লাগিলাম। করিয়া দেখিলাম, বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদিগের এই সৃষ্টি অদ্ভুত, অতুলনীয়। তখন ইংরেজী কাব্য পড়িতেছি। সেক্সপীয়র, শেলী, বায়রন, স্কট প্রভৃতির সঙ্গে স্বল্প বিস্তর ঘনিষ্ঠতা জন্মিতেছে। কিন্তু এ সকলের কোথাও আমাদের শ্রীরাধিকার মতন কোনও নায়িকা বা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মতন কোনও প্রেমের ছবি খুঁজিয়া পাইলাম না। দেখিলাম আমাদের রাধার সঙ্গে মিরান্দা, ডেস্‌ডিমনা, জুলিয়েট,—সেক্সপীয়রের কোনও নায়িকারই তুলনা হয় না।

"নব যৌবন নব সুপুরুখ সঙ্গ"

এ পদের কাছে দাঁড়ায়—কোনও কিছু ইংরেজী সাহিত্যে খুঁজিয়া পাইলাম না। জুলিয়েট তো প্রেমিকার শিরোমণি। পাশ্চাত্য সাহিত্যে বোধ হয় আজি পর্য্যন্ত অমন ছবি আর কেহ আঁকিতে পারে নাই। কিন্তু জুলিয়েটের প্রেমও দেখিলাম, আমাদের রাধার প্রেমের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর,—টেনিসনের কথায় বলিতে গেলে,—As water unto wine—জলের কাছে যেমন সুরা, জুলিয়েটের প্রেমের নিকটে রাধার প্রেমও তাহাই। জুলিয়েট রোমিওকে বিদায় দিবার কালে বলিতেছেন:—

Good Night. Good Night, Parting is
such Good sorrow
I' ll say Good night, till it be morrow.

আর শ্রীরাধিকার প্রেম এমনি অদ্ভুত যে কৃষ্ণকে বুকে ধরিয়াও তিনি বিরহ ভয়ে আকুল হইতেছেন।

এমন পিরীতি কভু নাই শুনি,
নিমিখে মানায় যুগ কোরে দূর মানি।

সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা,
মুখ ফিরাইলে তাঁর ভয়ে কাঁপে গা।
এক তনু হৈয়া দোঁহে রজনী গোঙায়,
রজনী প্রভাতে, দেহ ছাড়ি যেন তার প্রাণ চলি যায়।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ভিতরে যে কোনও আধ্যাত্মিক সঙ্কেত—ভগবদারাধনার কোনও সূত্র আছে বা থাকিতে পারে, এ কল্পনাও যখন প্রাণে জাগে নাই, তখনও রাধিকার প্রেমের অদ্ভুত মধুরিমা ও অনুপম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম।"*

কাজেই বলিতে হয় যে, বিপিনবাবু বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের বিন্দু বিসর্গ না জানিয়াও বৈষ্ণব কবিতা হইতে যে রস পাইয়াছিলেন, 'প্রবাসী'র লেখক তাহা পান নাই। বিপিন বাবু একদিন যে ধর্ম্ম ও যে সমাজের আশ্রয়ে থাকিয়া বৈষ্ণব কবিতাকে 'অদ্ভুত-অতুলনীয়' ভাবিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম ও সমাজের আশ্রয়ে থাকিয়াই 'প্রবাসী'র লেখক বৈষ্ণব-কবিতাকে আজ 'কিছু নয়, সামান্য' বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বিপিনবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবের কথা তুলিয়া 'প্রবাসী'র লেখকের বিচার বিভ্রাটকে যে স্বাভাবিক মনে করিয়াছেন, সে অনুমানের কোনও মূল্য নাই। আজ পর্য্যন্ত কোনও ব্রাহ্ম—কোনও খ্রীষ্টানের নিকটেই অমন রসজ্ঞানের পরিচয় পাই নাই। গায়ের জোরে উল্টা কথা বলিয়া যে একরকম মৌলিকতার পরিচয় দিবার চেষ্টা কাহার কাহারও মধ্যে দেখা যায়, ইহা তাহাই। এই জন্যই 'প্রবাসী'র লেখা পড়িয়া কেহ হাসিয়াছেন, কেহ বা বিরক্ত হইয়াছেন। এ প্রসঙ্গে বিপিনবাবু বৈষ্ণব রসতত্ত্বের কথা তুলিয়া 'প্রবাসী'র সমালোচনার প্রতিবাদকারীদের প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়াছেন কেন বুঝিতে পারি না। কবিতা বুঝিবার মত হৃদয় যাহার আছে, সেই তো উহা ধরিতে পারে!

* প্রবাহিনী, শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩০১।

প্রায়শ্চিত্ত

[শ্রীজলধর সেন]

(১)

আইন ক্লাশের পড়া শেষ করিয়া বেলা এগারটার সময় অক্ষয় তাহার মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মেসে আসিয়া দেখিল, তাহার টেবিলের উপর একখানি ডাকের চিঠি রহিয়াছে। খামের উপর তাহারই গ্রামের পোষ্ট-আফিসের ছাপমারা; কিন্তু হাতের লেখাটা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। বাড়ীর চিঠি, অথচ লেখা অপরিচিত হাতের! অক্ষয়ের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। দুইমাস পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম পাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে যাইয়াও সে তাহার মাতাকে জীবিতা দেখিতে পায় নাই—মায়ের মৃতদেহ পুত্রের অগ্নি-সংস্কারের অপেক্ষা করিয়াছিল। আবার আজ এ কি?

অক্ষয় কম্পিত-হস্তে পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। একটু পড়িয়াই অক্ষয়ের মুখ লজ্জায়, ঘৃণায় ও ক্রোধে যেন কেমন হইয়া গেল; সে পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

মিনিট দুই-তিন স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া সে পুনরায় পত্রখানি তুলিয়া লইল। পত্র-খানিতে অল্প কয়েকটী কথাই লিখিত ছিল। যিনি পত্র লিখিয়াছেন, তিনি নাম প্রকাশ করেন নাই, লিখিয়াছেন—"কোন আত্মীয়।" অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াও অক্ষয় হাতের লেখা চিনিতে পারিল না।

তাহার পর সে পকেট হইতে বাক্সের চাবী বাহির করিয়া পত্রখানি রাখিবার জন্য বাক্স খুলিল; এবং বাক্স বোঝাই কাপড় চোপড় তুলিয়া তাহার নীচে পত্রখানি রাখিয়া দিয়া বাক্স বন্ধ করিল, এবং তৎক্ষণাৎ ছাত্রাবাস হইতে বাহির হইয়া গেল।

হ্যারিসন রোডের ডাকঘরে উপস্থিত হইয়া অক্ষয় বাড়ীতে পিতার নিকট টেলিগ্রাম করিল যে, সে বিশেষ কারণে অপরাহ্ণ ৩টার লোকাল ট্রেণেই বাড়ী যাইতেছে; ষ্টেসনে যেন পাল্‌কী-বেহারা উপস্থিত থাকে।

অক্ষয়ের যে গ্রামে বাড়ী, তাহার নাম—ঠিক নামটা

না হয় নাই বলিলাম—এই ধরিয়া লউন,—সে গ্রামের নাম রহিমপুর; ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের শক্তিগড় ষ্টেশন হইতে এই গ্রাম তিন মাইল দূরে। অক্ষয়ের পিতা শ্রীযুক্ত রামকমল ঘোষ বর্দ্ধমানরাজের একজন বড় পত্তনীদার। অবস্থা খুব ভাল। সন্তানের মধ্যে ঐ একই ছেলে অক্ষয়কুমার। অক্ষয় এম এ পাশ করিয়া বি-এল পড়িতেছে। বড়মানুষের এম-এ পাশ, একমাত্র পুত্র—কিন্তু এখনও বিবাহ হয় নাই। লেখাপড়া একরকম শেষ না হইলে অক্ষয় বিবাহ করিবে না,—ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন কেহই সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে পারেন নাই। মায়ের অদৃষ্টে পুত্রবধূর মুখদর্শন ছিল না—তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। অক্ষয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া আইন পড়িয়া জ্ঞান সঞ্চয় করে, আর তাহার পিতা দেশে বসিয়া আইনবিরুদ্ধ কাজ করিয়া অর্থ ও অধর্ম্ম সঞ্চয় করেন; পুত্র পিতার অন্যায় অত্যাচারের কথা শুনিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করে, আর পিতা সেই একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য প্রজা পীড়ন করিয়া কোম্পানীর কাগজে লোহার সিন্দুক পূর্ণ করেন। অন্দরমহলে ছেলে মায়ের কাছে কাঁদিত—মা ছেলের কাছে কাঁদিত; কিন্তু কর্ত্তাকে কোন কথা বলিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না;—রামকমল ঘোষ তেমন বাপের বেটাই ন'ন যে, স্ত্রী পুত্রের কথা শুনিয়া জমিদারী চালান। ছইমাস পূর্ব্বে মাতা স্বর্গে গেলেন—ছেলের কাঁদিবার স্থানও থাকিল না। মাতার শ্রাদ্ধাদির পর অক্ষয় যখন কলিকাতায় আসে, তখন সে মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল যে, শীঘ্র আর বাড়ীতে যাইবে না। কিন্তু এই বেনামী চিঠি পাইয়া সে বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইল। চিঠিতে কি লেখা ছিল, তাহা যখন সে কাহাকেও বলিল না, তখন গল্প-লেখক সর্ব্বজ্ঞ হইলেও সে কথা পাঠকগণের গোচর করা সঙ্গত মনে করিতেছেন না।

(২)

শক্তিগড় ষ্টেশনে নামিয়া অক্ষয় দেখিল বাড়ী হইতে পাল্‌কী-বেহারা আসিয়াছে; সঙ্গে আসিয়াছে বাড়ীর বৃদ্ধ ভৃত্য কালিদাস। কালিদাস অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করিল "দাদাভাই, হঠাৎ এলে যে? শরীর ভাল আছে ত?"

অক্ষয় শুষ্ককণ্ঠে কহিল "শরীর ভাল আছে কালীদা! মনটা কেমন খারাপ ঠেক্‌ল; তাই একবার তোমাদের দেখ্‌তে এলাম।"

কালিদাস অনেক কালের চাকর; অক্ষয়কে কোলে-পীঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, অক্ষয়কে সে ভালরূপই চেনে। সে বলিল, "না, দাদাভাই, তোমার শরীর-মন দুই-ই খারাপ হোয়েছে। বুড়োর কাছে গোপন করো না। তা, এখন থাক্, চল বাড়ী যাই, তার পর সব শুন্‌ব।" এই বলিয়া অক্ষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে সে ষ্টেশনের বাহিরে আসিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে; বেহারারা লণ্ঠন জ্বালাইয়া লইল। একজন বলিল "কালীদা, তুমি একটা লণ্ঠন নিয়ে পিছনে এস, আমরা একটা আলো নিয়ে চলে যাই।"

কালিদাস বলিল "আমাকে আর ফেলে যেতে পার্‌বি নে; তোরা যত দৌড়েই যাস্ না কেন, কালিদাস তোদের সঙ্গে চল্‌তে পারবে।" কালিদাস পাল্‌কীর সঙ্গে-সঙ্গেই চলিল। পাল্‌কী যখন গ্রাম পার হইয়া মাঠের মধ্যে পড়িল, তখন কালিদাস গলা ছাড়িয়া গান ধরিল—

"আমার মন কেন উদাসী হ'তে চায়,
ওগো দরদী গো—।"

কালিদাসের এই করুণ সুর অক্ষয়ের হৃদয় স্পর্শ করিল;—তাহার মনও যে আজ সত্য সত্যই উদাসী হইতে চাহিতেছিল। কালিদাস কি তাহার মনের বেদনা বুঝিতে পারিয়াই এমন করুণ সুরে, ঐ গানটী গাহিতেছে? কালিদাস গাহিল—

"সে যে এমন করে দেয় গো মন্ত্রণা,
ও সে উড়ায়ে দেয় প্রাণের পাখী, মানা মানে না;
সে যে উড়ে যায় বিমানেরি পথে,
শীতল বাতাস লাগে গায়।"

অক্ষয় পাল্‌কীর মধ্যে শয়ন করিয়া অতৃপ্ত-হৃদয়ে কালিদাসের গান শুনিতেছিল; তাহার প্রাণ-পাখী আজ শীতল বাতাসের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু সে শীতল বাতাস ত সে বাড়ী যাইয়া পাইবে না;—আজ ত আর তার স্নেহময়ী জননী তাহার পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া নাই;—আজ যে সে নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইবার জন্য বাড়ী যাইতেছে!

কালিদাস গান শেষ করিয়া নীরব হইতেই একজন

বেহারা বলিল, "ও কালীদা, আর একটা ভাল গান ধর না।"

কালিদাস বলিল "আর গান-টান ভাল লাগে না ভাই!" এই বলিয়াই সে গান ধরিল—

"রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন,
একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
এতকাল করে খেলা, গেছে বেলা,
এই সন্ধ্যাবেলা আর কি হবে;
জগতের কারণ যিনি, দয়ার খনি,
তিনিই মশার ভরসা ভবে।"

অন্ধকার রাত্রি, মাঠ নির্জ্জন; তাহার পর কালিদাসের মধুর কণ্ঠস্বর;—অক্ষয় আর পাল্‌কীর মধ্যে থাকিতে পারিল না;—তাহার প্রাণের মধ্যে কেবলই ধ্বনিত হইতে লাগিল—

"ওরে, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।"

সে তখন বেহারাদিগকে পালকী থামাইতে বলিল। বাহকেরা পালকী নামাইলে সে বাহির হইয়া বলিল "তোরা পাল্‌কী নিয়ে চল, আমি কালীদার সঙ্গে একটু হাটি। ঐ ত গ্রাম দেখা যাচ্ছে, আমি এ পথটুকু হেঁটেই যেতে পারব।"

কালিদাস আপত্তি করিল; বাহকেরা বলিল "কর্ত্তা শুনলে রাগ করবেন।" অক্ষয় সে কথায় কর্ণপাত করিল না। বাহকেরা পাল্‌কী লইয়া অগ্রসর হইল।

তখন কালিদাস বলিল "দাদাভাই, এখন বল ত, তুমি পড়া কামাই করে কেন হঠাৎ বাড়ী এলে। নিশ্চয়ই তোমার মনে কিছু আছে।"

অক্ষয় বলিল "কালীদা, তোমার কাছে গোপন করব না, আমি বাবার একটা ব্যবস্থা করবার জন্য এসেছি।"

"বাবার ব্যবস্থা! তুমি কি পাগল হয়েছ দাদাভাই!"

"না কালীদা, আমি পাগল হইনি এখনও, কিন্তু হবারও দেরী নেই।"

"কেন, কি হয়েছে, আমাকে খুলেই বল না ভাই!"

অক্ষয় বলিল "কালীদা, সে কথা বলতেও আমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি কি বাবাকে জান না যে আমার মুখ দিয়ে পিতৃনিন্দা শুনবে?"

কালিদাস বলিল "তা হ'লে কথাটা তোমার কাছেও গিয়েছে! কে তোমাকে এসব কথা লিখেছে?"

"কে লিখেছে, তা জানিনে, সে নাম প্রকাশ করে নাই। কি লজ্জা, কি ঘৃণার কথা কালীদা! কি আমার দুরদৃষ্ট! ছেলেকে বাপে শাসন করে এই ত এতদিন জান্‌তাম; আমার অদৃষ্টে তার উলটো হলো।"

কালিদাস বলিল "তা কি করবে মনে করেছ? কর্ত্তাকে ত জান, আর তুমি কিই বা বলবে তাঁকে? বল্‌তেই বা পারবে কেন? না দাদাভাই, ও সব ব্যাপারের মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নেই। যার যা হচ্ছে, সে তাই করুক। তুমি কালই কলকাতায় ফিরে যাও। যে দিন মা-লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন, সেইদিনই—আর সেই দিনই বা কেন, আমি অনেক আগে থেকেই সব জানি।"

অক্ষয় বলিল "সে কি আর আমিই জান্‌তাম না, কালীদা! কিন্তু মায়ের ভয়ে, তারই অনুরোধে আমি চুপ করে ছিলাম। আর বাড়ীর মধ্যে যা হচ্ছিল, তা হচ্ছিল, এখন যে বাইরে গেল। ছিঃ ছিঃ, কালীদা আমার যে মরতে ইচ্ছা করে।"

কালিদাস বলিল "তা তুমি যে বাড়ী এলে, কি মতলব করে এসেছ বল দেখি। জান ত, কর্ত্তার মেজাজ!"

"সব জানি কালীদা! কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, হয় বাবাকে কাশী যেতে হবে, আর না হয় ত আমার সঙ্গে চিরদিনের মত সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হবে। এই দুইয়ের এক আমি করে যাবই।"

এই সময় তাহারা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালিদাস অক্ষয়কে বলিল "দেখ দাদাভাই, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া হঠাৎ কোন কাজ করিও না। জান ত, তোমার বাবাকে। সাবধান!"

অক্ষয় কোন কথা না বলিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

(৩)

কর্ত্তা রামকমল ঘোষ মহাশয় পুত্রের প্রতীক্ষায় বৈঠক-খানার বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। অক্ষয় বারান্দায় উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি কহিলেন "তোমার কলেজ কি এরই মধ্যে বন্ধ হোলো অক্ষয়!"

অক্ষয় বলিল "না, কলেজ বন্ধ হয় নাই। মনটা ভাল ছিল না, তাই একবার বাড়ীতে এলাম।"

"তা এসেছ, বেশ করেছ। তবে কলেজ কামাই করাটা বোধ হয় ভাল নয়; পড়াশুনার বোধ হয় তাতে

ক্ষতি হয়। তা হোক; যখন এসেছ, তখন, আজ হোলো বৃহস্পতিবার, কাল পরশু দুটো দিন থেকে রবিবারে বোধ হয় কল্‌কাতায় গেলেই ভাল হয়।”

অক্ষয় ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

সারারাত্রি অক্ষয় কত কথা ভাবিল, সে মনে মনে যে পন্থা স্থির করিয়া আসিয়াছিল, বাড়ী আসিয়া ভাবিয়া দেখিল, তাহার কোনটাই অবলম্বন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপরও নহে, কর্ত্তব্যও নহে। কিন্তু সে যে এ অবস্থায় কি করিতে পারে, পিতাকে কুপথ হইতে ফিরাইবার জন্য কি করা যাইতে পারে, তাহা সে মোটেই ভাবিয়া পাইল না; স্বধু নিজের উপরই তাহার ধিক্কার জন্মিতে লাগিল। আর মনে হইতে লাগিল তাহার সেই স্নেহময়ী, সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপিণী জননীর কথা। আজ তাহার মা বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার কাছে সে মনের বেদনা জানাইতে পারিত। এখন তাহার একমাত্র পরামর্শদাতা পুরাতন ভৃত্য কালিদাস—তাহার পরম সুহৃদ্‌ কালীদা!

প্রাতঃকালে উঠিয়া অক্ষয়ের গৃহে মন টিকিল না। ইতিপূর্ব্বে বাড়ী আসিয়া সে প্রায়ই গ্রামের কোথাও যাইত না। আজ তাহার কাছে বাড়ীতে বসিয়া থাকা ভাল লাগিল না; সে রাস্তায় বাহির হইল।

অল্পদূর যাওয়ার পর সে দেখিল যে, অলক্ষিত ভাবে সে পীতাম্বর ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর সম্মুখেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন পূজার ফুল তুলিবার জন্য সাজি-হস্তে বাহিরবাটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। অক্ষয় তাড়াতাড়ি বাড়ীর সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন “এই যে অক্ষয়, কবে বাড়ী এলে বাবা? শরীর ভাল আছে ত?”

অক্ষয় তখন কি করে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল “আজ্ঞে কা’ল এসেছি।”

“হঠাৎ কি মনে করে বাড়ী এলে বাবা?”

অক্ষয় বলিল “এমনি দুই-এক দিন ঘুরে যাবার জন্য এসেছি। রবিবারেই আবার কলিকাতায় ফিরে যাব।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন “বাবা অক্ষয়, তোমার সঙ্গে—” কথাটা অর্দ্ধপথেই বন্ধ হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি কাতর-নয়নে অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। সে চাহনিতে বিষাদমাখা; সে চাহনি যেন একটু সহানুভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ!

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এমন করিয়া কথাটা অসমাপ্ত রাখিতে দেখিয়া অক্ষয়ও কাতর হইল; বুঝিতে পারিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেন অমন করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন, কেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন! রামকমল ঘোষের ছেলের সঙ্গে যে তাঁহার কি দরকার, তাহাও অক্ষয়ের বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার মনে হইল, কেন সে মূর্খের মত তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়াছিল? কেন সে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া এ পথে আসিয়াছিল? অক্ষয়ও চুপ করিয়া রহিল। সে কি বলিবে? তাহার কি কিছু বলিবার মুখ আছে?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন “তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ অক্ষয়?”

অক্ষয় বলিল “বিশেষ কোথাও নয়, এই একটু বেড়াতে বেরিয়েছি।”

“তুমি রবিবারে কল্‌কাতায় যাবে বল্‌ছিলে না?”

“আজ্ঞা, রবিবারেই যাব মনে করেছি।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া থামিয়া-থামিয়া বলিলেন “তা—দেখ—এই যাবার আগে,—নাঃ, আর কাজ নেই। তুমি এখন যাও বাবা! আমারও বেলা হোলো। মা জগদম্বা!”

অক্ষয় এইবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; অতি সঙ্কোচের সহিত বলিল “যাবার আগে কি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবার কথা বল্‌ছেন?”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন “হাঁ—;—না, তা আর কাজ নেই।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মলিন মুখ ও তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া অক্ষয়ের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে বলিয়া উঠিল “আপনাকে আর কিছু বল্‌তে হবে না; আমি সব জানি, আমি—”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অক্ষয়ের কথায় বাধা দিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া “বাবা—” বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; আর একটি কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অক্ষয় তখন বলিল "সে সব কথা আর আপনার ব'লে কাজ নেই। এখন বলুন ত, এর উপায় কি? আমি তারই জন্যই বাড়ী এসেছি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন "আমি গরিব ব্রাহ্মণ, তোমরা বড়মানুষ, আমি কি বল্‌ব। কথাটা ত আর গোপন নেই; আমি যে আর মুখ দেখাতে পারিনে বাবা! উপায়ের কথা বল্‌ছ? একমাত্র উপায় আছে। নিজের হাতে মেয়েটার মুখে বিষ তুলে দেওয়া। তা ছাড়া আর কোন পথ নেই; তারপর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমার আর ব্রাহ্মণীর আত্মহত্যা! বাবা, এ সংসারে ঐ বিধবা মেয়েটির মুখ চেয়েই আমরা বেঁচে ছিলাম। শেষে কি না এই হোলো। ব্রাহ্মণের মেয়ে—কি বল্‌ব বাবা! তোমরা গ্রামের জমিদার; তোমরা গরিবের ধর্ম্মরক্ষা করবে, না তোমরাই এমন কাজ করলে। অভিশাপ দেব না বাবা, কিন্তু বল্‌তে পার, কি পাপে আমার এই শাস্তি!"

অক্ষয় বলিল "তা বল্‌তে পারিনে; কিন্তু আপনারা উচিত প্রতীকার করলেন না কেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "বাবা, তাতে কি হোতো; —তাতে কি আমার এই জাতিনাশের প্রতীকার হোতো; অপমান যে আরও বেড়ে যেত। না বাবা, সে দুর্ম্মতি আমার হয় নাই।"

অক্ষয় বলিল "বেশ। আমি কি করতে পারি, তাই বলুন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তাই করব। এদেশে আর আমি মুখ দেখাব না; বিষয়-সম্পত্তি কিছু আমি চাই না। আপনার জন্য কি করতে পারি, তাই বলুন; সেই কাজ শেষ করে আমি জন্মের মত গ্রাম ছেড়ে চলে যাব।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাতর কণ্ঠে বলিলেন "তোমার অপরাধ কি বাবা, তুমি যে সোণারচাঁদ ছেলে। তুমি আমাদের জন্য তোমার পিতা—তোমার জন্মদাতাকে অপমান কোরো না। না বাবা, এমন কাজও কোরো না। জান ত আমাদের শাস্ত্রে আছে পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ।"

"ঠাকুর মশাই, আমার ধর্ম্মও নাই, আমি স্বর্গও চাই না। সে দ্বার আমার কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এমন পিতার পুত্র কিছুরই অধিকারী নয়।"

"তা হ'লে তুমি কি করতে চাও?"

"সেই কথাই ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

"আমি কি বল্‌ব বাবা!"

অক্ষয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "দেখুন, আমি এক কথা বলি। আপনি সপরিবার কাশী চ'লে যান। যা খরচ লাগে, আমি আজই আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। তারপর সেখানে আপনাদের যা ব্যয় হবে, সে সব আমি দেব।"

"বাবা অক্ষয়, মনে কিছু কোরো না। আমার কন্যাকে যে ধর্ম্মপথভ্রষ্ট করেছে, তারই অর্থে আমি কাশীবাস করব; সে আমি পারব না বাবা! সে কিছুতেই না।"

অক্ষয় বলিল "তার অর্থ নয় ঠাকুর মশাই! আমার স্বোপার্জ্জিত টাকা আছে। আমার পরীক্ষার জলপানির টাকা। তাই আমি আপনাকে দিতে চাচ্ছি। তবে আমি তার পুত্র; এই ব'লে যদি আপনি আমার সাহায্য না নিতে চান, তা হ'লে ত আর কোন উপায় দেখি না। কিন্তু আপনার পায়ে ধ'রে বলছি, আমার এই অনুরোধ রক্ষা করুন। পাপের সামান্য প্রায়শ্চিত্ত—অতি সামান্য প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে দিন।" এই বলিয়া অক্ষয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল।

অক্ষয় ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন অন্দরে যাইবার দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আর একজন তাঁহাদের কথা শুনিতেছিল। সে আর কেহই নহে—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিধবা কন্যা তারা। তারা যে ঘরে ছিল, তাহার পশ্চাতে বহির্ব্বাটীর অঙ্গনে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা হইতেছিল। তারা প্রথমে দুইচারিটি কথা অল্প শুনিতে পাইয়াছিল, তাহার পরই সে উঠিয়া আসিয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল।

অক্ষয় যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল, তখন তারা উন্মাদিনীর মত বাহির হইয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল "না,—না বাবা—না না, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করছি।" তাহার পরই সে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাড়াতাড়ি যাইয়া কন্যাকে কোলে লইয়া বসিলেন; দেখিলেন তাহার সংজ্ঞা নাই। অক্ষয় দৌড়িয়া বাড়ীর মধ্যে যাইয়া জল লইয়া আসিল এবং তারার মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল। কিন্তু সকলই বৃথা!

তারার ঘৃণিত, অভিশপ্ত প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তারার মুখের দিকে চাহিয়া অবিচলিত স্বরে বলিলেন "জীবনদানে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। সহস্র জীবন নরকভোগেও নয় তারা—কিছুতেই নয়;—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

তারার অকস্মাৎ দেহপাতে অক্ষয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে একদৃষ্টিতে তারার দিকে চাহিয়া রহিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অক্ষয়কে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন "বাবা অক্ষয়, আর কি দেখছ, এখন বাড়ী যাও।"

অক্ষয় কাতরস্বরে বলিল "এ জীবনে আর নয়।"

"সে কি কথা অক্ষয়? তুমি বাড়ী যাবে না কেন?"

অক্ষয় বলিল "আমার পাপেরও ত প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "তোমার পাপ! তুমি ত কোন অপরাধই কর নাই বাবা!"

অক্ষয় তীব্র কঠোর স্বরে বলিল, "অপরাধ করি নাই? আপনি কি বলছেন ঠাকুর? আমি মহা অপরাধী। আমার অপরাধ—আমি রামকমল ঘোষের পুত্র।—এ অপরাধেরও প্রায়শ্চিত্ত নেই।" এই বলিয়াই অক্ষয় উন্মাদের মত দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

* * * * *

তাহার পরে অক্ষয় যে কোথায় গেল, কেহই এত কালের মধ্যে সে সন্ধান দিতে পারিল না।

বিজ্ঞানের রূপরেখা

[শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি এস্ সি]

সেদিন, বঙ্গ বিজ্ঞান মন্দিরে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "রূপরেখা" প্রবন্ধ শুনিতে ও দেখিতে গিয়াছিলাম। বক্তৃতাটী ও তাহার বিষয়ীভূত প্রদর্শনী যন্ত্র (Projection apparatus) সাহায্যে দর্শিত চিত্রগুলি বড়ই মনোরম বোধ হইয়াছিল। কিন্তু প্রবন্ধের আরম্ভেই চিত্রকবি একটী কথা বলেন, সেটী সারাক্ষণটাই আমার কাণে বাজিতেছিল। চিত্রকবি প্রথমেই বলেন, চিত্রবিদ্যা বা ভাস্কর-বিদ্যা, গণিত ও অপরাপর অনুযায়ী শাস্ত্রের মত, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাপ লইয়া আসিলেই বোঝা যায় না। কবির কথায় বোধ হইল, যেন তিনি বলিতেছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বা ইহারই অনুরূপ অন্য স্থানে, যে বিজ্ঞান, গণিত, প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহাই ঐ সকল বিদ্যার প্রকৃত রূপ।

এই কথাটা পূর্ব্বেও বহুবার, পরিচিত ও অন্তরঙ্গ-জনের নিকট শুনিয়াছিলাম, তথাপি, প্রতিভাশালী, অপূর্ব্বদৃষ্টি-সম্পন্ন রসবেত্তার মুখে কথাটী শুনিয়া বড়ই একটা বিস্ময় বোধ হইল। তখনই ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম, একদিকে অসাধারণ অনুভূতি শক্তি থাকিলেও, মানুষের আর একদিক একেবারে অনুভূতিহীন হইতে পারে।

সাধারণতঃ আমরা কবি বলি তাঁহাকেই যিনি, গানে, কবিতায়, চিত্রে, বা ভাস্কর্য্যে, এক-একটা মহান ভাবের প্রকাশ করেন। কবির মনের ভাবের তীব্র উচ্ছ্বাসটী শব্দের ঝঙ্কার ও পরম্পরায়, রেখার লালিত্যে ও তরঙ্গে, বর্ণের সমন্বয়ে ও বিন্দুপাত-কৌশলে, যে পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাঁহার মানসমূর্ত্তি যে অনুপাতে অভিব্যক্ত হয়; সুর, গান, চিত্র বা মূর্ত্তি কলাজগতে তাহারই অনুযায়ী উচ্চস্থান অধিকার করে। সেই ভাবের উচ্ছ্বাস শিল্পীর শ্রমফল হইতে নিজের মনোজগতে নবজাত করিতে হইলে, শিল্পীর সহিত সহানুভূতির প্রয়োজন, তাহার মনোভাব বুঝিবার ক্ষমতার আবশ্যক। সেজন্য একটী বিশেষ শিক্ষার

প্রয়োজন সন্দেহ নাই। সে কথা সেদিনের ঐ চিত্র ও মূর্ত্তি ব্যাখ্যায় বেশ উপলব্ধি করা গিয়াছিল।

কিন্তু বিজ্ঞানকবির মানসমূর্ত্তির রূপরেখা যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে যে কি পরিমাণ শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা কেহই প্রায় বুঝিতে চাহে না। মিষ্ট সুর, ভাবময় চিত্র ও মূর্ত্তি, এ সকলের মাধুর্য্য বহুযুগ হইতেই মানব বুঝিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে; তাহার ফলে এখন অনেকটা কম আয়াসেই এগুলি খানিকটা উপভোগ করা যায়। তবে বিশেষ শিক্ষা থাকিলে ঐ সকলের সৌন্দর্য্য, উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ভাবে ফুটিয়া উঠে। অপূর্ব্ব ভাবোন্মেষক সুর বা চিত্র, ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াও বেশ একটা আনন্দের সৃষ্টি করিল না, এরূপ মানুষ সভ্য জগতে খুব কমই দেখা যায়।

কিন্তু বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কবিত্ব শুনিয়া-দেখিয়াও, সেই সভ্যজগতেরই অধিকাংশ লোক যে তাহাকে নীরস বলে, অথবা কেবলমাত্র ভদ্রতার খাতিরে তাহাকে ঈষৎ করুণা-মাখান প্রশংসা প্রদান করে, এটা, বিজ্ঞান কবিত্ব বুঝিবার শিক্ষার বিশেষ অভাবের চিহ্ন। বিজ্ঞান জিনিসটাকে, আমাদের পার্থিব আরাম প্রদানের একটা উপায় বলিয়া ধরা হয়; যাঁহারা ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন, তাঁহারাও ঈষৎ অনিচ্ছার সহিত বলেন, এটাও সত্যের রূপ-প্রকাশের একটা পন্থা। কিন্তু এ কথাটা অনেকটা মুখের কথাতেই রহিয়া যায়, মনে অনুরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস উৎপন্ন করে না। সাধারণতঃ বিজ্ঞানের আবিষ্কারে ও বিজ্ঞান শ্রমীগণের অসামান্য অধ্যবসায়ে মনে একটা বিস্ময়ের ভাবই আবির্ভাব করে, আনন্দ উৎপন্ন করে না। ফলে, বিজ্ঞান একটা অদ্ভুত জিনিস; ইহাতে সত্য আবিষ্কার হয়, তথাপি ইহা নীরস, এই ধারণাই প্রচলিত হইয়াছে। একদিন আমার এক বন্ধুর সহিত এ বিষয় লইয়া তর্ক হইতেছিল; তিনি মনের এই ভাবটা বড়ই পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করেন। অনেকক্ষণ আমার কথা শুনিয়া, তিনি বলিলেন, "দেখ যাই বল, তোমাদের বিজ্ঞান অতি নীরস; তবে ঐ যে অধ্যবসায়, ঐ একটা কাজে সারাজীবন পড়ে থাকা, ঐটে একটা খুব আশ্চর্য্যের আর প্রশংসার বিষয়।"

কিন্তু এটা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে, যে একটা সজীব জীবন্ত মানুষ, প্রাণ, ভাব, অনুভূতি, সকলই ছাড়িয়া দিয়া, শুষ্ক কাঠের মত একটা নীরস জিনিস লইয়া তাহার সমস্ত জীবনটা, তাহার সমগ্র শক্তি, তাহার শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলির প্রয়োগে বিভোর হইয়া তৃপ্তিলাভ করে, আর সেই নীরসতার আনন্দে সে উন্মত্ত হইয়া, আপনার মধ্যে নিজের উচ্ছ্বাস ধারণ করিতে না পারিয়া, তাহা অভিব্যক্ত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা পায়? এ উন্মত্ততা, এ উচ্ছ্বাস, এ আবেগ কি কখনও প্রাণহীন নীরসতায় সম্ভবে? কিন্তু এ যে তাহা নয়, এ যে সরস, এ যে সজীব, এ যে নিত্য নূতন; নবীনতা যে ইহার অঙ্গে-অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে। তাই যে মানুষ একবার ইহার রস আস্বাদন করিয়াছে, ইহার নবীনতায় একবার সজীব হইয়াছে, আর সে অন্যত্র যাইতে চাহে না, নিয়ত নবীন রূপের মোহে মুগ্ধ থাকিয়া তাহারই পূজায় নিরত থাকে। রূপকথায় অঞ্জন প্রলেপের মত যাহার নয়ন মুক্ত হইয়াছে, সেই বিজ্ঞান রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিতে পায়; সে মন্ত্রময় সোণা ও রূপার কাঠি যাহার হাতে পৌঁছিয়াছে, দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা, তাহারই সম্ভবে; তাহারই তুলিকায় বিজ্ঞানের রূপ রেখা তরঙ্গে তরঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়া, অনুভূতিময় মহান বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে।

গণিতের একটা সূত্র আছে; যদি কোনও দুইটী স্থানের একটার প্রতি বিন্দু (Point) ও প্রতি সমতলের (Plane) অনুযায়ী বিন্দু ও সমতল, অপরটাতে থাকে, তাহা হইলে এই পরস্পর সম্বন্ধ ভাবটা এইরূপে প্রকাশ করা হয়:—

$$x' = \frac{a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1}{ax + by + cz + d}$$

ও ইহারই সমরূপ y' এবং z' এর দুইটি সমীকরণ (Equation)। এই তিনটী সম্বন্ধ সাধারণে দেখিলে কেবলমাত্র কতকগুলি অর্থহীন অক্ষরের যোজনা বলিয়া মনে করিবে। সাধারণ গণিত পাঠ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেও এটাকে কেবল গণিতের একটা সাধারণ সত্য বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু কোট্‌স্ (Cotes), গাউস্ (Gauss) প্রভৃতির, অনুসন্ধানের পরে যখন প্রফেসর আবে (Abbe) আলোকরশ্মির বিজ্ঞানের (Geometrical Optics) মূল তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহারই

আবিষ্কার তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিলেন, তখন, একদিন তাঁহার মানস-চক্ষুর সম্মুখে বিজ্ঞানের ঐ তিনটী রূপরেখা ফুটিয়া উঠিয়া, রশ্মি-বিজ্ঞানের মূল সত্য যাহা কিছু বলিবার ছিল, প্রায় সকলই ব্যক্ত করিল। বিজ্ঞান-কবির সেই মুহূর্ত্তের উচ্ছ্বাস, ও তাহার রূপ স্বরূপ ঐ তিনটী সত্য কি কলাবিদের গভীর ভাবময় রেখা-আবিষ্কারের ও তাহার দ্বারা যথাসম্ভব ভাবের অভিব্যক্তি অপেক্ষা কোনও অংশে হীন ?

এই আবেগ, এই উচ্ছ্বাসের একটা প্রতিবিম্বিত ছায়াই আমি দুইবৎসর আগে প্রথম দেখি। তখন বিজ্ঞানের এই অতুলনীয় রূপের কণামাত্রও অনুভব করিবার শক্তি আমার ছিল না। সে দিন, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়, আমাদের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীকে পড়াইতেছিলেন ও মধ্যে-মধ্যে রহস্য-পরিহাসে বক্তৃতাটীকে বেশ সরল করিতেছিলেন। একটা কথার মাঝে আমি একবার জিজ্ঞাসাচ্ছলে বলিলাম "মাষ্টার মশায়, সেদিন (Benzene) বেনজিনের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ শুনছিলুম, ভাল বুঝতে পার্লুম না"। এক মুহূর্ত্তে বিজ্ঞানাচার্য্যের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি খড়ি লইয়া বোর্ডে বেনজিনের গঠন সম্বন্ধে কেকুলের (Kekule) চিত্র আঁকিলেন ও কিরূপ স্বপ্নের আবেশে সেই মূর্ত্তি কেকুলের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা বলিলেন। কিন্তু তিনি আর বেশী বলিতে পারিলেন না; তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল; সমস্ত শরীর কি একটা উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল, তিনি ঠিক যেন উন্মত্ততার আবেগে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেদিন আমি শুধু বিস্মিত হইয়াছিলাম। তখন একেবারেই বুঝি নাই, কত শত বৎসরের শ্রম, কত শত সহস্র মানবের অতুল অধ্যবসায়, কত লক্ষ বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলাফল ঐ কয়টী সাদা ও কালোর আঁচড়ে ব্যক্ত হইতেছিল। হইতে পারে এখনও অনেক প্রক্রিয়ার পরিণাম কেকুলএর অঙ্কিত ঐ রূপরেখায় অভিব্যক্ত হয় না; ইহাও সম্ভব যে, তাঁহারই শিষ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী বেয়ার (Von Bayer) এর চিত্রে কোন-কোন অংশে সত্যের পূর্ণতা আরও নির্ম্মম ভাবে প্রকাশ পায়; কিন্তু তাহা বলিয়া এ দুইটির কোনটী কি ভুল? বিজ্ঞানের রূপরেখা কি তাহার ফলে ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে? এ ভ্রান্তি যে গান্ধার-শিল্পের শ্রেষ্ঠ দান, শান্ত গৌতম মূর্ত্তিতেও রহিয়াছে। এ যে রূপরেখার জন্মগত, তাহার সারাজীবনের সঙ্গী। তাই সে কখনও পূর্ণতা পায় না, ভ্রান্তও হয় না; নিয়তির মত দৃঢ়গতিতে সম্মুখে চলিতে থাকে; কখনও দ্রুত, কখনও মৃদু, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চল থাকে না।

এই সত্যেরই প্রকৃত উপলব্ধির অভাবে বিজ্ঞানের গবেষণার প্রতি অবজ্ঞা ও প্রকৃত রসবেত্তার নিকটেও কলাবিদ্যার আসন বিজ্ঞানের বহু উচ্চে স্থাপিত হইয়াছে। যেদিন এ সত্যের আন্তরিক অনুভূতি বিশ্বমানবের নিকট পৌঁছিবে, সেদিন আইন্‌ষ্টাইন্ (Einstein) এর সর্ব্বব্যাপী সম্বন্ধবাদ (Relativity) ও বেদান্তের "ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ", ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের (Maxwell) তড়িৎ-আলোক-তত্ত্ব (Electromagnetic theory) ও প্রস্তরময় ধর্ম্মরাজ মূর্ত্তির প্রচণ্ড গতিরেখা, সগর্ব্বে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া পরস্পরকে মহিমান্বিত করিবে। তাহারই সূচনা বোধ হয় প্রবীণ কবির নবীন জ্ঞানমন্দিরের দেহখানি দ্বিবিধ সাজে উজ্জ্বল করিয়াছে।

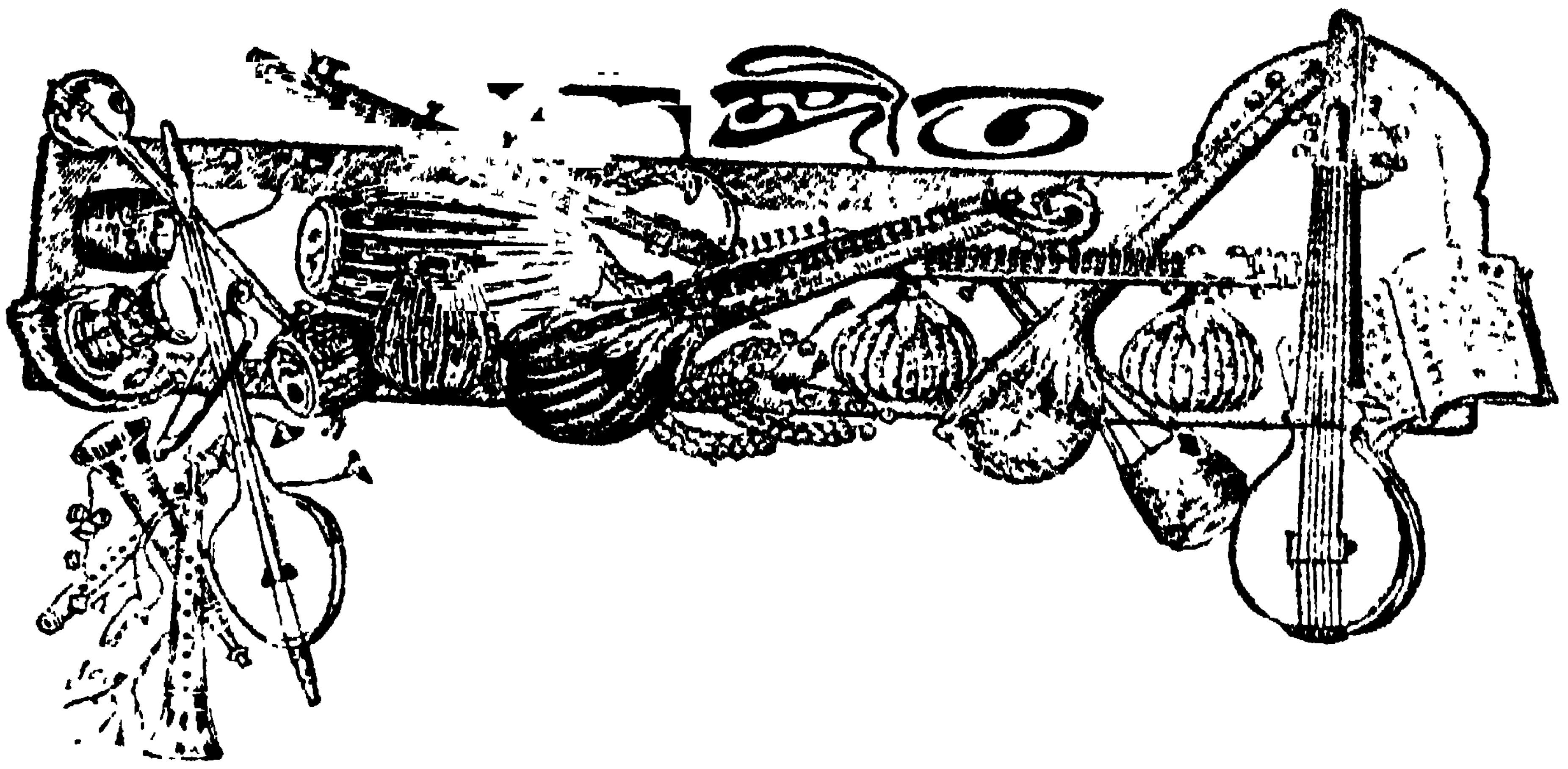

স্বরলিপি

রাগিণী গৌরী— তাল একতালা।

সোই সোই ঠাকুর মোই যো হরি পরকাশা।
নাম স্মরত রূপ ধরত তাকেরি হামু দাসা॥
পণ্ডিতে পড়ে শাস্ত্র মাত্র, সার ভকতে লিয়ে।
অন্তর জল ছুটয় কমল, মধু মধুকর পিয়ে॥
যাহে ভকতি তাহে মুকুতি, ভকতে এ তত্ত্ব জানে,
যৈসে বণিক চিন্তামণিক জানিয়া গুণ বখানে॥
কৃষ্ণ কিঙ্কর শঙ্কর কহে ভজ গোবিন্দক পায়।
সোহি পণ্ডিত সোহি মণ্ডিত যো হরিগুণ গায়॥

কথা—৺শঙ্করদেব। [স্বরলিপি—শ্রীঅরুণা বেজবড়ুয়া

২´ ৩ ০ ১
II পা পা পা | পা গা ঋা | ঋা ঋা সা | সা সা -া I
সো ই সো ই ঠা ০ কু র মো ই যো ০

২ ৩ ০ ১
I সা সা সা | সা সঋা সঋা | ঋা ঋসা সা | সা সা সা I
হ রি প র কা০ ০ ০ ০০ শা ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা সা সন্‌া | ন্‌া ন্‌া ন্‌ধ্‌া | ধ্‌ন্‌া ন্‌া ন্‌ধ্‌া | ধ্‌া ধ্‌প্‌া পা I
না ০ ম স্ম র ত০ রূ ০ প ধ র ত

২´ ৩ ০ ১
I প্‌া প্‌া ধ্‌া | প্‌া প্‌া প্‌া | পস্‌া সা সা | সা সা সা I
তা ০ কে রি হা মু দা ০ ০ ০ সা ০

২ ৩ ০ ১
I পা পা পা | পা গা ঋা | ঋা ঋসা সা | সা সা সা I
সো ই সো ই ঠা ০ কু র০ মো ০ই যো ০

২´ ৩ ০ ১
I সা সা সা | সন্‌া ন্‌ঋা ঋা | ঋা সা সা | া া া I
হ রি প র০ কা০ ০ ০ ০ শা ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা সা সা | সা সা সন্‌া | ণঋা ঋা সা | সা সা সা I
না ০ ম স্থ র ত রূ ০ প ধ র ত

২ ৩ ০ ১
I সা সা সা | সা সা ঋা | ঋা গা ঋা | সা সা সা II
তা ০ কে রি হা মু দা ০ ০ ০ সা ০

২ ৩ ০ ১
II পা গা পা | পা পা ধা | র্সা র্সা সা | র্সা -া সা I
প ০ ণ্ডি তে প ড়ে শা ০ স্ত্র মা ০ ত্র
যা ০ হে ভ ক তি তা ০ হে মু ক্ত তি

২ ৩ ০ ১
I সা ঋা গা | ঋা ঋা ঋা | ঋা র্সা সর্ঋন্‌া | র্সা র্সা র্সা I
সা ০ ০ ০ র ত ক ত লি ০ ০ ০ য়ে ০
ভ ক তে ০ এ ত ০ হু ভা ০ ০ ০ নে ০

২ ৩ ০ ১
I র্সা না ধা | ধা ধা ধা | না ধা ধা | া ধপা পা I
অ ০ স্থ র জ ন ছু ট য় ক ম ল
নৈ ০ সে ব ণি ক চি ০ স্তা ম ণি ক

২´ ৩ ০ ১
I ক্ষপা পা পা | পধা পক্ষা পা | গা গপা গা | ঋা সা সা II
ম ০ ধু ম ধু ০ ক ০ র পি ০ ০ ০ য়ে ০
জা নি য়া ০ ০ গু ০ ণ ব খা ০ নে ০ ০

২ ৩ ০ ১
II পা গা পা | পা পা ধা | ধর্সা র্সা সা | সা সা সা I
কৃ ষ্ণ কি ০ ঙ্ক র শ ০ ঙ্ক র ক হে

২ ৩ ০ ১
I সা ঋা গা | ঋা ঋা ঋা | ঋা র্সা সর্ঋনা | র্সা সা া I
ভ ক্ত গো ০ বি ন্দ ০ ক পা ০ ০ ০ য় ০

২ ৩ ০ ১
I সা না ধা | ধা ধা ধা | না ধা ধা | ধা ধপা পা I
সো ০ হি প ণ্ডি ত সো হি ম ০ ণ্ডি ত

২´ ৩ ০ ১
I ক্ষপা পা পা | পধা পক্ষা পা | গা গা ঋা | ঋা সা সা I
যো ০ ০ নু রি গু ০ ণ গা ০ ০ ০ ০ য়

২´ ৩ ০ ১
I সা না ধা | ধা ধা ধা | না ধা ধা | ধা ধপা পা I
সো ০ হি প ণ্ডি ত সো হি ম ০ ণ্ডি ০ ত

২´ ৩ ০ ১
I ক্ষপা পা পা | পধা পক্ষা পা | গা পা গা | ঋা সা সা II
যো ০ ০ হু রি ০ গু ০ ণ ০ ০ ০ গা ০ য়

ভাবের অভিব্যক্তি

[অভিব্যক্তি-কর্ত্তা —শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আলোক-চিত্রকর—শ্রীবিমল পাল

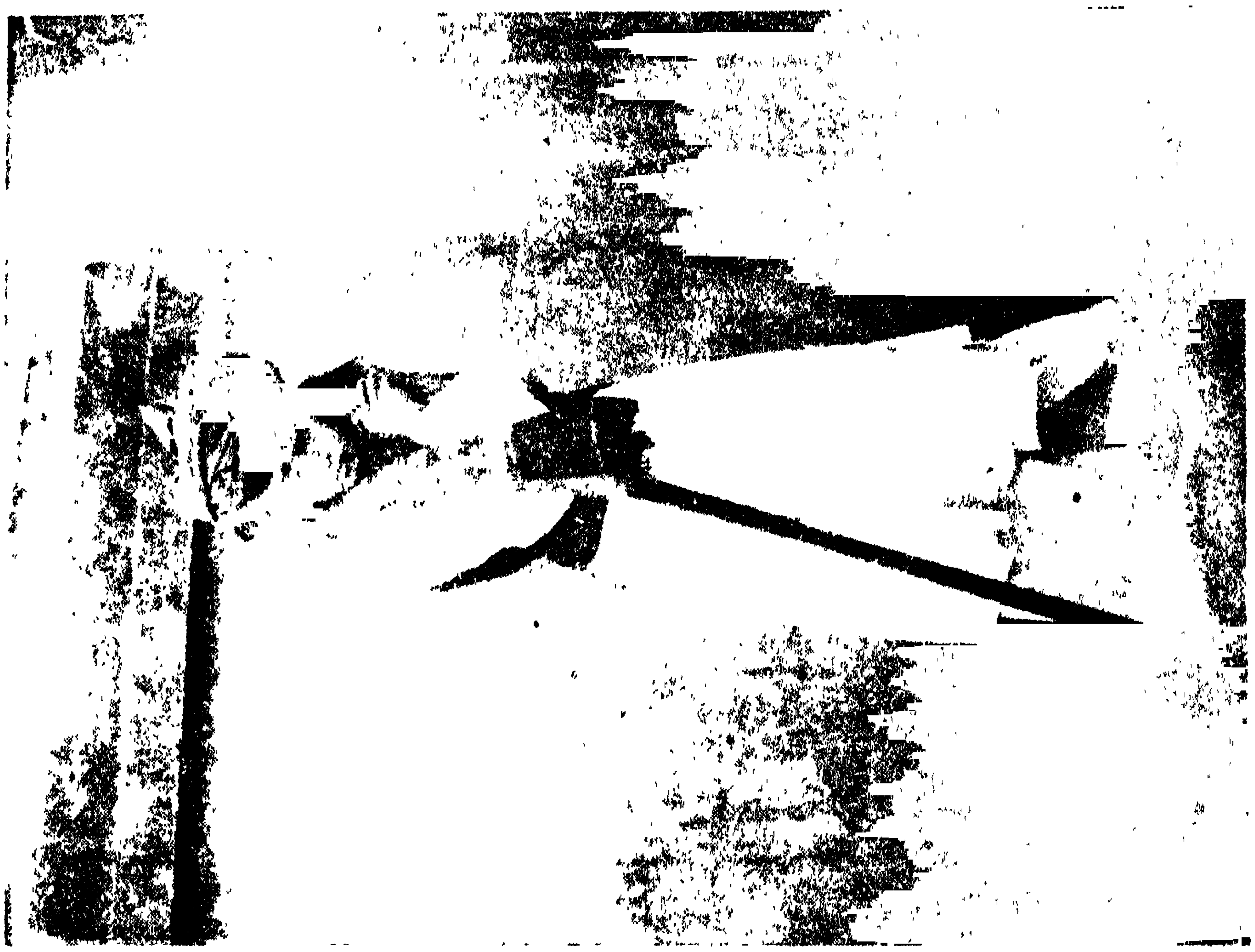

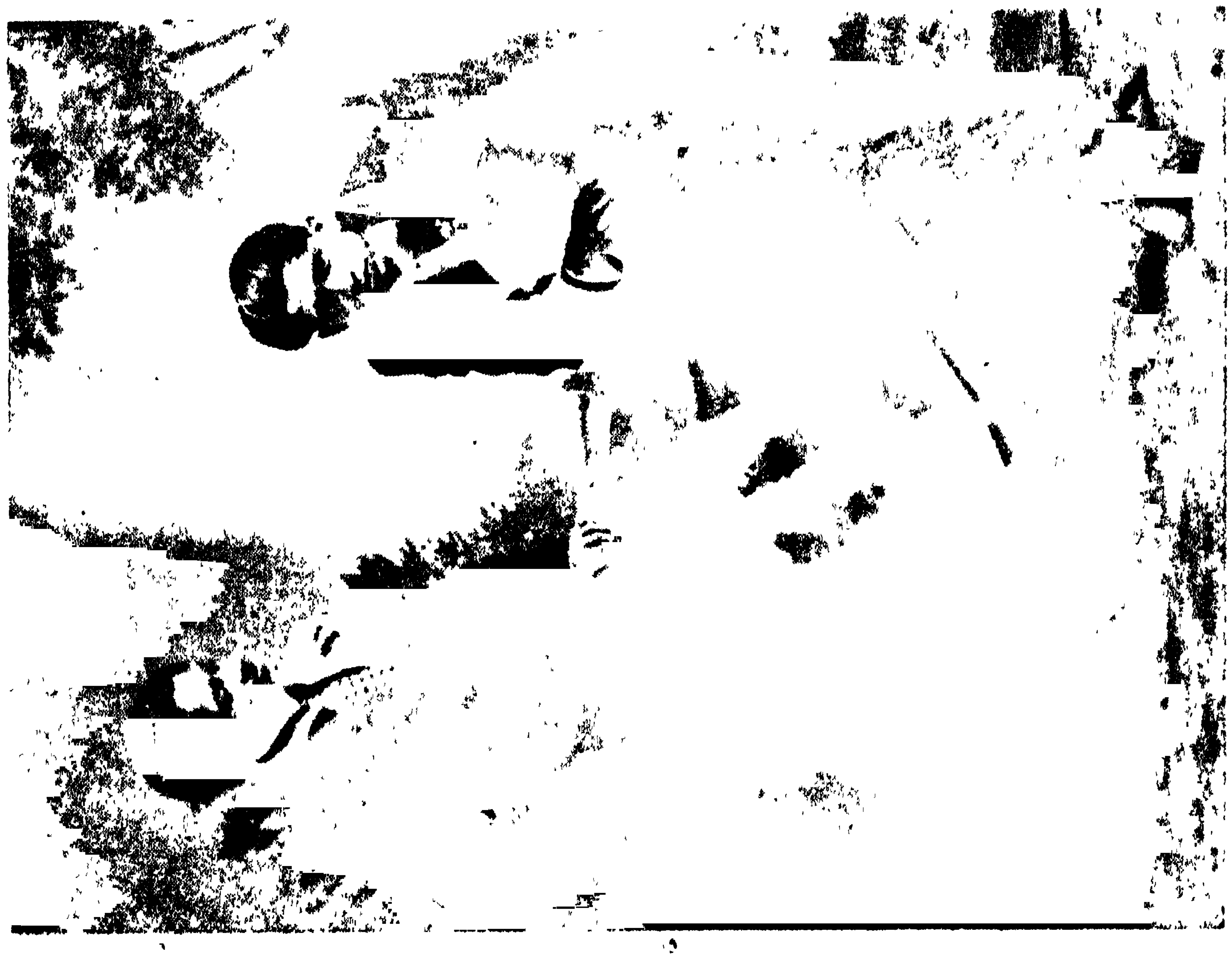

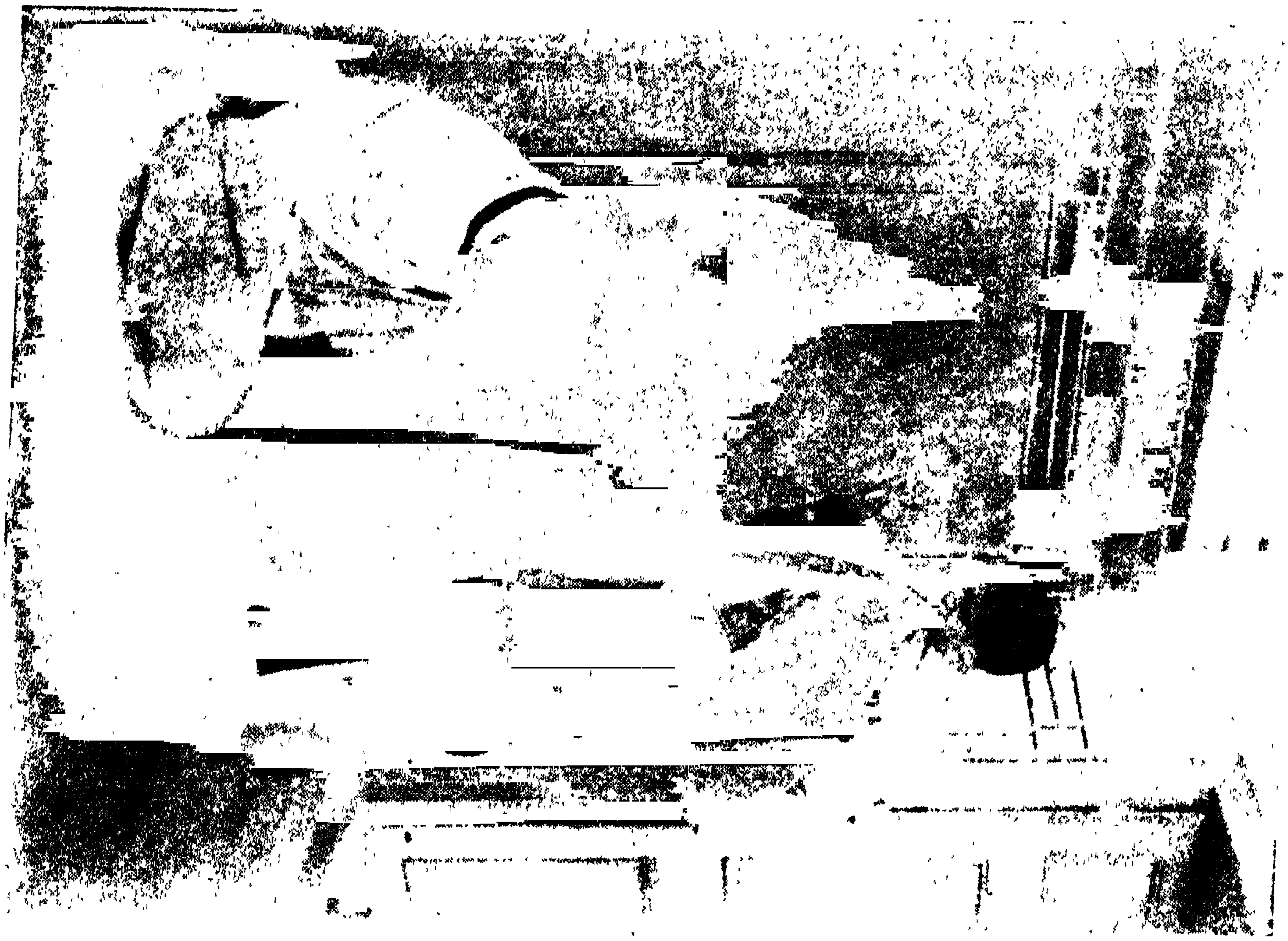

সমাজ-চিত্র

[শ্রী ——— ———]

Wedding Presents

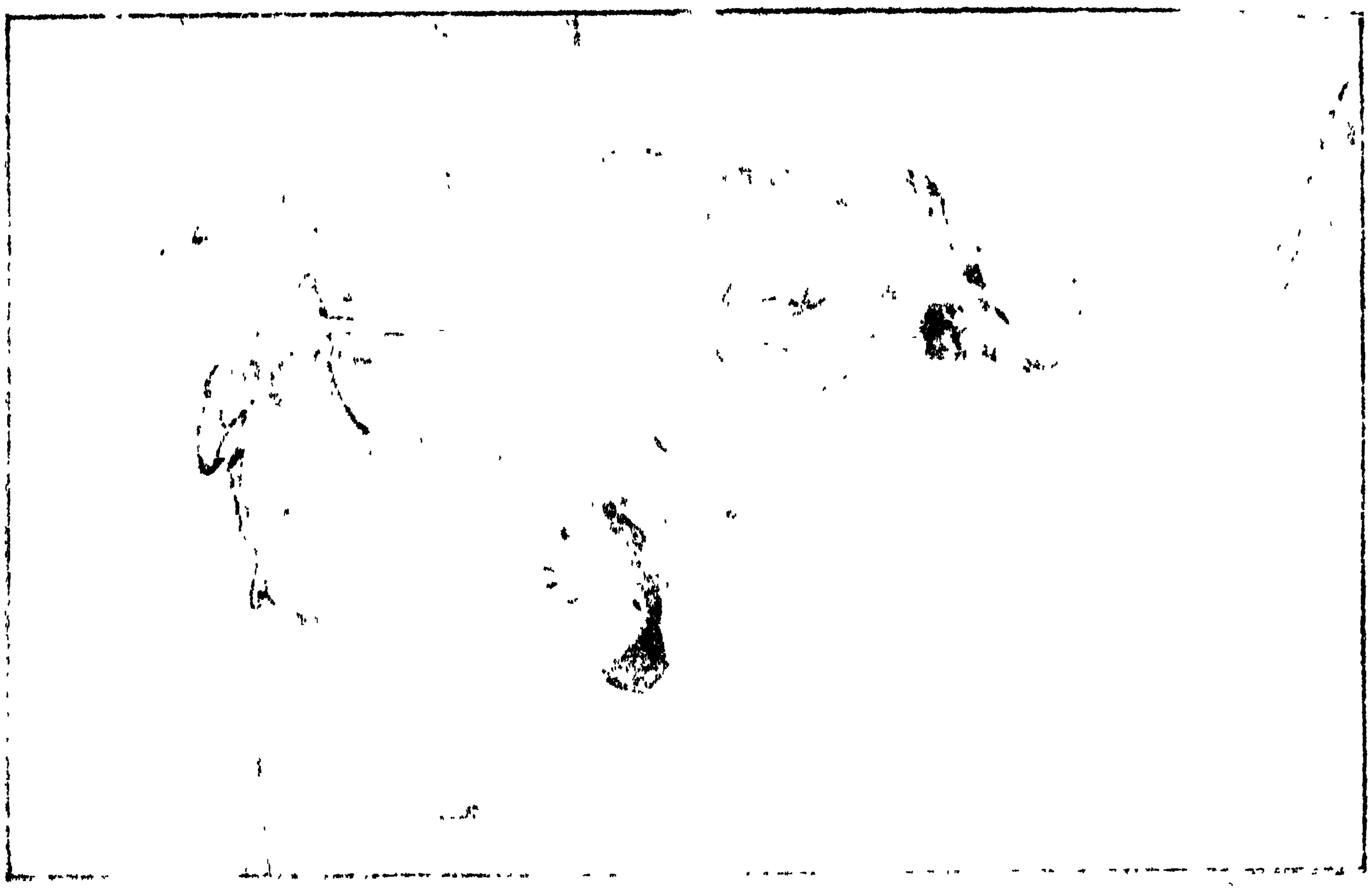

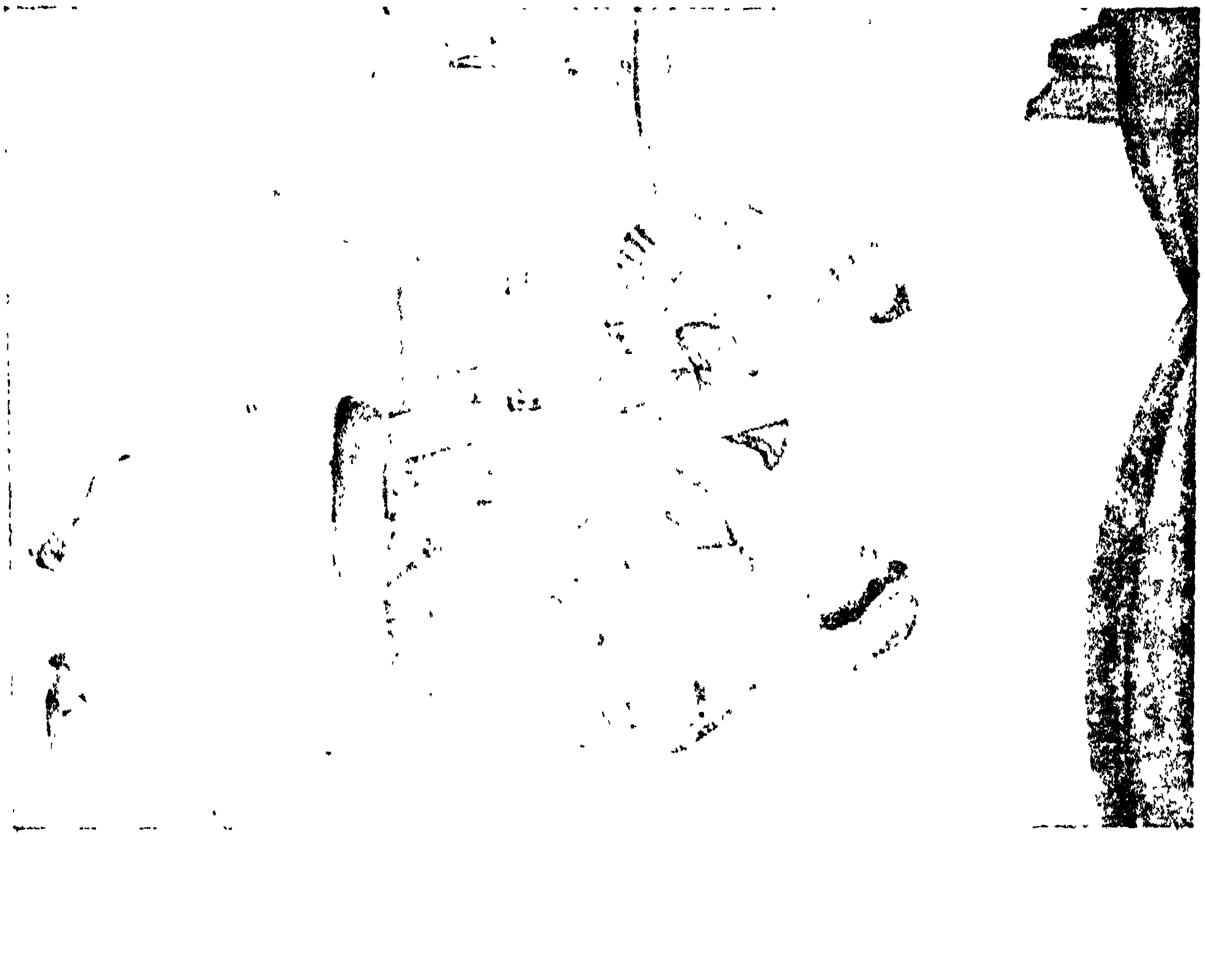

সন্ধি

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার]

বর্ষার মেঘে আকাশ ঢাকিয়া আসিয়াছিল, এবং দিগন্তে অল্প-অল্প বিদ্যুত চমকিতেছিল। সমস্ত দিনে দুই তিন পসলা বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছে,— আবার এই আসন্ন বৃষ্টির ভয়ে প্রকৃতি যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে! রাজপথে গাড়ী দৌড়াইতেছে, মটর ছুটিতেছে—ট্রাম গড়াইতেছে—লোক জন ব্যস্তভাবে চলিতেছে,—এ সকলই যেন এই আসন্ন বৃষ্টির ভয়ে মাথা লুকাইবার জন্য!

মেঘের এই অবস্থা দেখিয়া কালিপদও আজ একটু সকাল-সকাল অফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আর তাহা ছাড়া আজ সকালে অফিসে আসিবার সময় তাহার স্ত্রীর সহিত যে ঝগড়া করিয়া আসিয়াছে, তাহার শেষ স্ফুলিঙ্গটুকু এখনও তাহার মনে একটু-একটু জ্বালা দিতেছিল!

সংসারে কালিপদ ও তাহার স্ত্রী কাদম্বিনী। পুত্র নাই, কন্যা নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই,— কেবল তাহারা দুইজন মাত্র। কিন্তু উভয়ের মাঝে কলহের কারণ অসংখ্য! আজ সকালবেলার কথাটাই বলি;—কালিপদ যখন আহার শেষ করিয়া জলের গেলাসটি মুখে তুলিয়া এক নিঃশ্বাসে সব জলটুকু নিঃশেষ পান করিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল "কাদু, আর একটু জল দাও ত।" তখন কাদম্বিনী পান সাজিতে-সাজিতে অম্লান বদনে বলিল, "মুখ ধুইয়া জল খেও না।" কালিপদ কাদম্বিনীর এ উত্তর নীরবে সহ্য করিল না; কারণ অনেক দিন হইতে একটু-একটু করিয়া কাদম্বিনীর উপর কালিপদর মনটা বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল; সেইজন্য অতি-সাবধান কালিপদও আজ একটু বেশী রকমের কঠোর কথা বলিয়া ফেলিল! স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামীর 'সেবা' বলিয়া যে কিছু প্রাপ্য আছে, ইহা কাদম্বিনী মোটেই বুঝিতে পারিত না। সে মনে করিত স্বামীর নিত্য-নৈমিত্তিক যাহা দরকার, তাহার ত্রুটী না হইলেই হইল; কালিপদ মনে করিত, কাদম্বিনী তাহাকে তাচ্ছিল্য করে। এই মনের ভাবের ফলেই আজ সামান্য জলটুকু উপলক্ষ্য করিয়া নানা কঠোর বাক্যের আদান-প্রদান হইয়া গেল।

অফিসের ফেরত কালিপদ বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বাহিরের দরজা খুব জোরেই বন্ধ করিয়া দিল; তত জোরে না বন্ধ করিলেও চলিত, কিন্তু তাহার মনে আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। তাহার প্রত্যাগমনবার্ত্তা জানানই অভিপ্রেত, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। কালিপদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার স্ত্রীকে দেখিতে পাইল না। শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কাদম্বিনী দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া বিছানায় শুইয়া আছে; ঘুমাইতেছে কি না বুঝিতে পারা গেল না। কালিপদ জামা খুলিয়া, কাপড় ছাড়িয়া পা' ধুইবার জন্য বাহিরে আসিল। ঠিকা ঝি বাহিরে বালতি করিয়া জল রাখিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেখানে ঘটি বা অন্য জলপাত্র কিছুই ছিল না, যাহাতে বালতি হইতে জল উঠাইয়া পা' ধুইতে পারা যায়। কালিপদ কাহাকেও সম্বোধন না করিয়া আপন মনে "ঘটী কোথায় গেল" "এখানকার ঘটী কি হ'ল" ইত্যাদি শব্দে দু'তিনবার ডাকিল, —কিন্তু সে ডাকাডাকিতে ঘটী কালিপদর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল না, সুতরাং তাহাকেই ঘটী খুঁজিয়া আনিতে হইল। পা' ধোয়া শেষ হইয়া গেল, তখন গামছার কথা মনে পড়িল;—কিন্তু হাতের কাছে গামছা পাওয়া গেল না—ভিজা পায়ে গামছা খুঁজিতে খুঁজিতে যখন গামছা পাওয়া গেল, তখন হাতের ও পায়ের জল প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে, গামছার আর বিশেষ প্রয়োজন হইল না।

ঘরের এক কোণে একখানা পুরাণ টেবিল এবং তাহারই পার্শ্বে একখানি জরাগ্রস্ত চেয়ার ছিল। কালিপদ তামাক সাজিয়া আনিয়া সেই চেয়ারে আসিয়া বসিল এবং গুড়গুড়ির নলটি মুখে দিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতে লাগিল। কালিপদ বিছানার দিকে মুখ করিয়া তামাক টানিতে লাগিল—আর কাদম্বিনী দেওয়ালের দিকে মুখ রাখিয়া শুইয়া জাগিয়া রহিল। কাদম্বিনী যে নিদ্রিতা নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা-যাইতেছিল, কারণ ঘুমন্ত মানুষের দেহ এত সচেতন থাকে না।

এরূপ কলহ এ দম্পতির মধ্যে প্রায়ই হইত। কালিপদ অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক। বাহিরে সে যেমনই হউক, সংসারের ভিতরে সে কাদম্বিনীকে ভাল করিয়া নিজের মুঠার মধ্যে রাখিতে পারিত না, বরং তাহার বিপরীতই হইয়াছিল,—সে আপনিই কাদম্বিনীর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের অধীনে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে তাহার যে বিশেষ কোন অসুবিধা হইয়াছিল ঠিক তাহা নহে, বরং সে নিজেকে নিজের কর্তৃত্বের মধ্যে রাখিলে তাহার পক্ষে যতটা সুবিধা হইত, কাদম্বিনীর কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া সে সুবিধা বাড়িয়াছিল বই কমে নাই। কতকগুলা বিষয়ের জন্য কালিপদ কাদম্বিনীকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত,—আবার কতকগুলি কারণে তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্তও হইত। বিবাহের পর এতদিন গিয়াছে, কিন্তু কাদম্বিনী কখনও তাহার স্বামীকে একখানি গহনার জন্য বা ভাল জামা কাপড়ের জন্য বা অন্ততঃ একদিন থিয়েটার বা সার্কাস বা বায়োস্কোপ দেখিতে যাইবার জন্য কোনরূপ পীড়াপীড়ি করে নাই। মধ্যবিত্ত স্বামী মহাশয়দিগের পক্ষে এরূপ স্ত্রী লাভ বড় একটা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। আবার যখন কালিপদর বেতন কম ছিল এবং তাহার ছোট ভাই দু'টী তাহার নিকট থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিল, তখন সে ঠিকা ঝি পর্যান্তও রাখিতে পারে নাই। তখন কাদম্বিনী একাই সংসারে দাসীর মত গৃহকার্য্য করিত—পাচিকার মত রন্ধন-কার্য্য করিত, নিপুণা কর্ত্রীর মত সকলের তত্ত্বাবধান করিত। সে জন্য কখনও যে কাহারও সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই।

যে ঠিকা ঝি কাজকর্ম্ম করিয়া যাইত, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় তাহার বাতজ্বর প্রায়ই হইত। সেই জ্বর লইয়া ধুঁকিতে-ধুঁকিতে যখন সে সংসারের কাজ করিয়া বেড়াইত, তখন কাদম্বিনী তাহাকে স্নেহ করুণ কণ্ঠে ডাকিয়া বলিত "আহা মা, তোর যদি জ্বর এসেছে, তবে এলি কেন? আমিই না হয় দু'খানা বাসন ও পোড়াটা মেজে নিতুম, এত জ্বরে কি কাজ করতে পারা যায়;—যা', তুই ঘরে গিয়ে একটু শুগে যা'।" স্নেহমাখা এই সহানুভূতির কথা শুনিয়া ঝির চোখের পাতাদুটী ভিজিয়া আসিত, আর ঘরের ভিতর হইতে এই কথাগুলি শুনিয়া কালিপদর মনে হইত "এ করুণার নির্ঝর আমার দিকে বহে না কেন?" আবার যখন বুড়ী গোয়ালিনী তাহাদের বাড়ী দুধ দিতে আসিয়া তাহার বহুদিন পূর্ব্বের এক সাতবৎসর বয়স্কা নাতিনীর বিয়োগ-শোককে নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিত, তখন কাদম্বিনী তাহাকে সান্ত্বনার স্বরে বলিত, "আহা কি করবি মা বল,—ও কি আর মানুষের হাত—ও যে ভগবানের মার!" কাদম্বিনীর ব্যথিত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি তাহার এই কম্পিত কণ্ঠের করুণ সান্ত্বনার মধ্য দিয়া যেন বড় স্পষ্ট দেখা যাইত।

পৃথিবীর যতটুকু লইয়া কাদম্বিনীর পৃথিবী—সে পৃথিবীর সকলেই কাদম্বিনীকে ভাল বলিত। আর কাদম্বিনীও তাহাদের সকলকে স্নেহময় ও দয়ালু হৃদয়ের মিষ্ট ব্যবহারে আর্দ্র করিয়া তুলিত! জগতের সকলকে এইরূপ স্নেহ ও করুণা মুক্তহস্তে বিলাইতে-বিলাইতে যখন সে তাহার স্বামীর নিকট আসিয়া দাড়াইত, তখনই তাহার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইত! পিপাসাতুর কালিপদ যখন আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে কাদম্বিনীর মুখের দিকে চাহিত, তখন কাদম্বিনী তাহার বাসা খরচের হিসাবের খাতাখানি কালিপদর সম্মুখে রাখিয়া বলিত "দেখ ত, এমাসে ধোপার খরচ বেশী হল কি না!"

কিন্তু তবুও সে তাহার স্ত্রীকে ভালবাসিত, এবং সেইজন্য তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে মান, অভিমান, ক্রোধ, কলহ প্রভৃতি যাহা কিছু তিক্ত ও কটু সামগ্রী পাইত, তাহা সহনশীল পর্ব্বতের ন্যায় অটল-অচল ভাবে সহ্য করিত! এতদিন তাহাদের মধ্যে যত কলহ হইয়াছে, সে কলহের পর সকলবারেই প্রথম কথা কহিয়াছে কালিপদ; আজও কাদম্বিনী সেইরূপই আশা করিতেছিল। সে প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল যে, তাহার স্বামীটি চেয়ারে বসিয়া তাহারই দিকে মুখ করিয়া তামাকু খাইতেছেন। সেজন্য সে আরও অধিকতর সতর্ক হইয়া, অধিকতর নিশ্চেষ্ট হইয়া, চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। কিন্তু বাদলের হাওয়া মুক্ত বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিয়া তাহার কৃত্রিম জড়ভাবকে বড় শিথিল করিয়া দিতেছিল; কিন্তু তাহা বলিয়া ত আর উঠিয়া জানালাটি বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় না!

এদিকে কালিপদ গুড়গুড়ির নলটি মুখে দিয়া অত্যন্ত ব্যবধানে, অত্যন্ত অনামনস্ক ভাবে মাঝে-মাঝে ফুর্-র্ ফুর্-র্

শব্দে তামাকু টানিতেছিল। তামাক খাইবার ইচ্ছাটা যেন তাহার মোটেই সচেতন ছিল না। কালিপদর এই অনাদর দেখিয়া কলিকার তামাকু আপনা-আপনি গুমরিয়া-গুমরিয়া পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছিল! কাদম্বিনী প্রতিক্ষণে আশা করিতেছিল, এইবার কালিপদর ভ্রান্তি দূর হইয়াছে, এইবার "কাত্ত" বলিয়া ডাক পড়িবে! উৎকর্ণা কাদম্বিনী প্রতি মুহূর্ত্ত গণিতে লাগিল,—কিন্তু ডাক আর পড়িল না। কালিপদও তাহার মনকে আজ খুব উঁচু সুরে বাঁধিয়া রাখিল। কাদম্বিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া যত সময় কাটিতে লাগিল, ততই তাহার বক্ষ স্ফীত হইতে লাগিল। আজ আর সে হার মানিয়া কিছুতেই খেলিবে না। এতদিন ত সে বরাবরই হারিয়া আসিয়াছে,—আজ সে যুদ্ধে জয়লাভ করিবেই!

কাদম্বিনীর প্রতি ভালবাসা কিন্তু তখনও তাহার মনে সজাগ ছিল। মাঝে মাঝে সেই ভালবাসা বুকের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিতেছিল এবং অতি ধীরে ধীরে, অতি ভয়ে ভয়ে কাদম্বিনীকে ডাকিবার জন্য মাথা তুলিতেছিল। কিন্তু কালিপদর অভিমানমত্ত মন দস্যুর মত আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল,—তখন যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে সেই কোমলপ্রাণ ভালবাসার আজ অপঘাত-মৃত্যু হইল।

কাদম্বিনী প্রতি মুহূর্ত্তে মনে করিতেছে এইবার ডাক পড়িবে,—কিন্তু ডাক আর পড়িল না। ক্রমে সে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, হয় ত কালিপদ অন্যমনস্ক হইয়া কিছু করিতেছে। সেই জন্য সে কালিপদর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য হাতের চুড়িগুলি নাড়িয়া একবার একটু শব্দ করিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। তখন তাহার মনে হইল, হয় ত কালিপদ কখন উঠিয়া গিয়াছে—সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। তখন—সেই কথাটাই তাহার ঠিক বলিয়া মনে হইল, কারণ অনেকক্ষণ ত আর তামাক খাইবার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় নাই! নিঃসন্দেহ হইবার জন্য কাদম্বিনী পাশ ফিরিল; পাশ ফিরিতেই পরস্পর চোখোচোখি হইল। কালিপদ তাহা হইলে বাহিরে যায় নাই বা অন্যমনস্কও নহে, তাহারই দিকে চাহিয়া বেশ স্বচ্ছন্দ-চিত্তে বসিয়া আছে! কালিপদর এই উপেক্ষার ভাব কাদম্বিনীর হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত করিল। এতক্ষণ এমন ভাবে থাকিয়া তাহার চঞ্চল চিত্ত যে কালিপদর কাছে শেষে ধরা পড়িয়াছে, এই অভিমান তাহার মনকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া তুলিল; সে আবার ভাল করিয়া শয়ন করিল।

ধীরে-ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু কালিপদর মনের অন্ধকার বড় দ্রুত গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। শেষে ঘরের ভিতরের সকল জিনিস অস্পষ্ট হইয়া আসিল। কিন্তু কে প্রদীপ জ্বালিবে? সুতরাং দুই জনেই সেই অন্ধকারের মধ্যে পূর্ব্বের মত নীরবে শুইয়া ও বসিয়া রহিল। কলহ ত প্রায়ই হয়, আবার অল্পক্ষণের মধ্যে সে কলহ মিটিয়া যায়। কিন্তু আজ এ দুটি প্রাণের মধ্যে কেহ হাসিতে পারিল না, বা কেহ কাঁদিতে পারিল না, সুতরাং কলহও মিটিল না। কালিপদর উপেক্ষা কাদম্বিনীর বুকে আজ বড় বাজিয়াছিল—কারণ এ উপেক্ষা তাহার নিকট একেবারে নূতন। তাহার দাম্পত্য শেষ স্থির হইয়া সে সামলাইতে পারিল না। আজ তাহারও হৃদয় অমাবস্যার সমুদ্রের মত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ এমনি ভাবে কাটিয়া গেল। শেষে কালিপদ আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, চেয়ার হইতে উঠিয়া জুতা পায়ে ও জামা গায়ে দিয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তখন নারী-হৃদয় আর সহ্য করিতে পারিল না। সমস্ত বেদনা ভুলিয়া, সমস্ত অভিমান ত্যাগ করিয়া কাদম্বিনী বিছানায় উঠিয়া বসিল, কিন্তু কালিপদ তাহা লক্ষ্যই করিল না। কাদম্বিনী উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই সে প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িল। কাদম্বিনী তখন তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিল, "ওগো, এত রাতে কোথায় যাচ্ছ?" ততক্ষণে কালিপদর জুতার শব্দ ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া বাহিরের দরজায় মিলাইয়া গেল!

কাদম্বিনী বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত গেল। দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেখিল, কালিপদ তখন সেই গলির মোড় ফিরিতেছে—লজ্জানম্র নারী কণ্ঠের সীমা ছাড়াইয়া সে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইবার—আর উপায় নাই! দূরস্থিত গ্যাসালোকের ম্লান রশ্মি তাহার পশ্চাদ্ভাগের জামা ও কাপড়ের উপর উজ্জ্বলতর ভাবে পড়িয়া পরমুহূর্ত্তেই যেন নিবিয়া গেল। কাদম্বিনী

সেই আলো-আঁধারের মধ্যে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ার ন্যায় অল্পক্ষণ দাড়াইয়া রহিল, তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের দরজা ঠেকাইয়া দিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া প্রদীপ জ্বালিল এবং যে সকল গৃহকার্য্য অসম্পূর্ণ ছিল, ধীরে ধীরে করিতে লাগিল।

অভ্যাস বশতঃ কাদম্বিনী গৃহকার্য্য করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন ও কর্ণ বাহিরের দরজার উপর নিবিষ্ট ছিল। আধ ঘণ্টার উপর হইয়া গেল, তখনও যখন তাহার স্বামী ফিরিয়া আসিল না, তখন কাদম্বিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না; সকল কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া ঘরের বাহিরে আলো লইয়া আসিল, পাছে তাহার স্বামীর আসিবার সময় অন্ধকারে উঠানে আসিতে কষ্ট হয়। এমনি করিয়া অপেক্ষায় অপেক্ষায় আরও কতক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু তবুও কালিপদ আসিল না। তখন কাদম্বিনীর হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশন আরম্ভ হইল এবং অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে কেবল ঘর আর বাহির করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার স্বামী যেখানেই যান, বেশী দূর যে যান নাই, ইহা সে স্থির-নিশ্চয় করিল. কারণ যাইবার সময় তিনি ত ছাতা লইয়া যান নাই। বেশী দূর যাইবার হইলে অবশ্যই ছাতা লইতেন। কিন্তু তাহা হইলে এখনও আসিতেছেন না কেন? কাদম্বিনী ভাবিতে লাগিল "তবে কি তিনি আমারই অত্যাচারে গৃহে আর ফিরিয়া আসিবেন না! হায় হায়, আমিই তাঁহাকে গৃহছাড়া করিয়াছি!" কাদম্বিনীর দহন আরম্ভ হইল।

স্নেহ ও ভালবাসার সামগ্রী যখন চক্ষের সম্মুখে থাকে, তখন তাহাদিগকে মনের বাহির করিয়া দেওয়া সহজ হয়। কিন্তু যখন তাহারা চক্ষের উপর হইতে সরিয়া যায়, তখন হৃদয়ের সকল স্থানটুকু অধিকার করিয়া বসে! যতক্ষণ কালিপদ নিকটে বসিয়া ছিল, ততক্ষণ কাদম্বিনী তাহার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া আপনার নিষ্ঠুর অভিমান ও অন্ধ আত্ম-গৌরবকে পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু কালিপদ যাই বাহির হইয়া গেল, অমনি বায়ুমুখে লঘু মেঘখণ্ডের মত তাহার অভিমান, আত্মগৌরব সমস্ত মুহূর্ত্তে উড়িয়া গেল; তখন কালিপদর জন্য শূন্য হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল।

কাদম্বিনী ভাবিল—"হয় ত পাড়ার বিষ্ণুবাবুদের বাড়ী বেড়াতে গেছেন। কিন্তু তা'হলে রাত্রি ১১টা বেজে গেল, এখনও এলেন না কেন? কখনও ত তিনি এমন সময় কোথাও বাইরে থাকেন না। একবার বিষ্ণুবাবুদের বাড়ী খবর নিলে হ'ত, কিন্তু কাকে দিয়ে খবর নিই।" অবশেষে এ উদ্বেগ অসহ্য হইয়া উঠিল। কাদম্বিনী উঠিয়া আসিয়া বাহিরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া সেইখানে আলো লইয়া বসিয়া রহিল, উপরে থাকিলে যদি সে তাহার প্রিয়তমের ডাক না শুনিতে পায়! যখনই রাস্তায় কোন পদশব্দ শুনা যায়, তখনই তাহার বুক দুড়্‌দুড়্‌ করিয়া উঠে, তখনই সে আলো হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সে আকুল প্রতীক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া পথের শব্দ পথেই মিলাইয়া যায়;—কাদম্বিনী তাহার ভগ্নহৃদয় লইয়া বসিয়া পড়ে।

রাত্রির অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আরও অন্ধকার হইয়াছে। সে কেবল দীপ মাত্রটিকে সঙ্গে করিয়া সেই নির্জ্জন গৃহে সেই অন্ধকারে একাকী সেইখানে বসিয়া আছে। শেষে দীপই তাহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন উঠানের উলঙ্গ অন্ধকার বীভৎস নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। সে যেন তাহার বাড়ীর মধ্যে বসিয়া নাই,—যেন কোথায় কোন্ অন্ধকার সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে।

তখন বাহিরের দরজায় বসিয়া থাকিতে তাহার আর সাহস হইল না; ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া অবসন্ন দেহে মেজের উপর লুটাইয়া অবিরল অশ্রুধারার কক্ষতল প্লাবিত করিতে লাগিল, আর দীন ভাবে কাতর কণ্ঠে ভগবানকে বলিতে লাগিল "হে ঠাকুর, এবার তাঁহাকে আমার কাছে আনিয়া দাও—আমাকে ক্ষমা মাগিবার অবকাশ দাও।" কাদম্বিনীর আজ এমনি করিয়া সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল!

সকাল হইলে ঝি আসিয়া বাহিরের কড়া নাড়িল; কাদম্বিনী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, তখনও সে কাঁদিতেছিল। ঝিকে দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল "মা, তুই একবার বিষ্ণুবাবুদের বাড়ী গিয়ে খবর নিয়ে আয় দিকি, বাবু আছেন কি না;—কাল সন্ধ্যের পর বেরিয়েছেন, এখনও আসেন নি;—কি জানি মা, অদৃষ্টে যে কি আছে!"

"ও মা সে কি গো—কল্‌কেতার রাস্তাঘাট" বলিতে-বলিতে ঝি বিষ্ণুবাবুদের বাড়ীর উদ্দেশে চলিয়া গেল। কাদম্বিনী আসিয়া উঠানের সিঁড়ির উপর বসিল।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণুবাবুর ছোট ছেলে অমূল্য দৌড়াইয়া

আসিয়া বলিল "ও কাকি—কাকি, কালিকাকার কাল রাত্রে খাবার কিনে আনবার সময় মটর-গাড়ী চাপা পড়ে মাথা ফেটে গেছে, আর হাত ভেঙ্গে গেছে!—ইঃ কি রক্ত! রাস্তায় এখনও রক্ত জমে রয়েছে, আমি খাবার কিনতে গিয়ে দেখে এলুম—"

অমূল্যর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাদম্বিনী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সিঁড়ি হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া অমূল্য রণে ভঙ্গ দিল। তখন ঝি "ওগো কি হবে গো—বাবু আমাদের গাড়ী চাপা পড়েছে গো-" বলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে দু'একজন প্রতিবেশিনী আসিয়া জুটিলেন। কাদম্বিনী ততক্ষণে একটু সামলাইয়াছে। ঝিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল বাবু যখন কাল রাত্রে খাবার কিনিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন রাস্তা পার হইবার সময় একখানা মটর গাড়ী তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে। বাবু সাংঘাতিক জখম হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সকলে বলিতেছে, তাঁহার একটা হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও মাথা ফাটিয়া গিয়াছে। সেই মটর ওয়ালারাই তাঁহাকে তখনই পটল ডাঙ্গার হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছে।

যে সকল প্রতিবেশিনী দয়াপরবশ হইয়া সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা নিজেরাই মহা অশান্ত হইয়া উঠিলেন এবং পরস্পরে নানাবিধ তর্ক ও বাদানুবাদ করিয়া বাড়ী কোলাহল-মুখরিত করিয়া তুলিলেন এবং অযাচিত ভাবে বিবিধ পরামর্শ দিতে লাগিলেন। গুটুর মা বলিল, তাহার ছোট মেয়ে ক্ষেন্তি যখন বীচিশুদ্ধ লিচু গিলে ফেলে, তখন ঐ কাল হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। মুখপোড়া ডাক্তারগুলো মিলে বাছার গলাটা কেটে দিলে—তাতে লিচুর বীচিটা বের হল বটে—কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটির প্রাণটাও বেরিয়ে গেল! ক্ষেতুর পিসি বলিল—ক্ষেতুর যে বচ্ছর কাণের অসুখ হয়—বাছা আমার যন্ত্রণায় ঐ হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হ'ল। এক বেটি মেম এসে তাকে খাটে শুইয়ে পেটে বেলেস্তারা দিতে লাগল; ক্ষেতু অস্থির হয়ে খুব বলতে লাগল, মেম সাহেব আমার পেটে পিলে হয়নি, আমার কাণের অসুখ—মেমসাহেব তাকে ধমক দিয়ে—ঐ পেটের জায়গায় চার পোচ বেলেস্তারা দিয়ে দিল। তার পাশের কম্বলটির একপোঁচ দিলে, আর সে বেচারীকে ধরে তার কাণে অমন লাগাতে লাগল, সে ত চেঁচিয়ে হাঁসপাতাল মাথায় করতে লাগল। এই ত ওদের দাক্তারখানা।

কাদম্বিনী এ সকল কথায় বড় একটা কাণ দিল না। শোকের প্রথম মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেলে সে ঝিকে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকিয়া আনিতে বলিল। গাড়ী করিয়া ঝিকে লইয়া সে পটলডাঙ্গার হাঁসপাতালে গেল। যে ঘরে কালিপদ ছিল জিজ্ঞাসা করিয়া ঝি সেই ঘরের দরজায় কাদম্বিনীকে আনিয়া উপস্থিত করিল। কাদম্বিনী দূর হইতে কালিপদকে দেখিতে পাইল, মাথায় ও হাতে পটি বাঁধা নিশ্চেষ্ট ভাবে বিছানায় শুইয়া আছে! কাদম্বিনী দৌড়াইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চারিদিক হইতে খানসামারা তাহাকে একসঙ্গে নিষেধ করিয়া উঠিল। নার্স তর্জ্জন করিতে করিতে সেই দিকে দৌড়াইয়া আসিল। কালিপদর তখন জ্ঞান হইয়াছে;—গোলমাল শুনিয়া ব্যাপারটা কি, দেখিবার জন্য সে কষ্টে মাথাটাকে একপাশে ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কাদম্বিনী তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল!

কালিপদ ধীরে ধীরে অতি কষ্টে তাহার ভগ্ন হস্তখানি কাদম্বিনীর মস্তকের উপর স্থাপন করিল। এতদিন কালিপদর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হস্ত কাদম্বিনীর যে হৃদয়কে মোটেই স্পর্শ করিতে পারে নাই, আজ তাহার এই ব্যথাতুর স্পর্শের মধ্যে কাদম্বিনীর সেই হৃদয় আপনি আসিয়া ধরা দিল! তখন তাহাদের উভয়ের সঞ্চিত অশ্রুধারা নয়নপথে উচ্ছ্বসিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

উৎকল-সাহিত্য

[শ্রীরমেশচন্দ্র দাস]

উৎকল সাহিত্য—পৌষ, ১৩২৫।

১। "বিবিধ-প্রসঙ্গ"—সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ কর।

(১) "সাহিত্য-সম্মেলন"—সাহিত্যের উন্নতির জন্য দেশের নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোচনা কেন্দ্রের প্রয়োজন। এইরূপ কেন্দ্র দ্বারা সকল উন্নত দেশে সাহিত্য মার্গ সুপরিষ্কৃত। উৎকলে সাহিত্যিক কেন্দ্রের অভাব নাই। বিশেষতঃ যুবক ও ছাত্রবৃন্দ দ্বারা সুদূর পল্লীগ্রামেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা সমিতি আলোচনার কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক সমিতির সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক অধিবেশন এবং বহু স্থানে হস্তলিখিত পত্রিকাদি পরিচালিত হইতেছে। অবশ্য ইহা আশা ও আনন্দের কথা, কিন্তু কাহারও সাহিত্য জ্ঞান কিছুই বৃদ্ধি পাইতেছে না। অন্য কথা থাকুক, অনেকের ভাষাজ্ঞানও পরিস্ফুট হইতেছে না। কেবল নাম প্রতিষ্ঠা ও ভাসাভাসা ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি নাই, অথচ ফল এরূপ বিপরীত হইতেছে কেন? কারণ আর কিছুই নহে আদর্শের অভাব। অধিকাংশ স্থলে দেখা যাইতেছে অর্জন অপেক্ষা প্রচারের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। উপদেষ্টা নাই, পরিচালক নাই, পথ প্রদর্শন করিবে কে? আদর্শের উন্নত ধারণা ও গভীর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা না জন্মিলে সমস্ত অনুষ্ঠানের নিষ্ফলতা অবশ্যম্ভাবী।

(২) "ডেপুটেশন সঙ্কট"—ভারত সচিবের আগমনে দেশে নূতন উৎসাহ-তরঙ্গ প্রবাহিত। চারিদিকে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সচিব মহোদয় অসংখ্য ডেপুটেশন গ্রহণ করিতেছেন। দেশে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান হইতে না হইতে কত বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায় আজ নিজ নিজ দাবী লইয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! ইহা কি দেশাত্মবোধের পরিচায়ক? মনে হয়, আজিও দেশবাসীর উচ্চ ধারণা ও আত্মনির্ভরতা জন্মে নাই, পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ, তপস্যার আসন দৃঢ়, হৃদয়ের সঙ্কল্প পরিশুদ্ধ হয় নাই। সিদ্ধিও বহু দূরে। কেবল অসার আড়ম্বর, ছলনা, কপটতাদি বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্যের প্রতি দোষারোপ করিয়া লাভ কি? রোগ ভিতরে, বাহিরে প্রতিকার খুঁজিলে কি হইবে? সঙ্কীর্ণতা ও ভেদজ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া বুদ্ধিহীনতার পরিচয় প্রদান করা উচিত নয়। ভগবান করুন, সকল ক্ষুদ্রতা লুপ্ত হইয়া মহৎ আকাঙ্ক্ষায় লোকের হৃদয় পূর্ণ হউক।

(৩) "জাতীয় অনুষ্ঠান"—জাতীয় মহাসমিতি বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। ইহার সহিত প্রতিবৎসর নিখিল ভারতীয় সামাজিক সমিতির অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। দেশের বহু বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছেন যে, সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার ভিন্ন দেশে যথার্থ জাতীয় জীবন গঠিত হইবে না। রাজনীতি ক্ষেত্রে মানব ন্যায্য অধিকারের দাবী করিবে—অন্যায় অবিচারের প্রতিকার চাহিবে;—কিন্তু সমাজ ক্ষেত্রে অন্যের দাবী অস্বীকার করিয়া— সামাজিক অন্যায়-অবিচারের প্রতি অন্ধ হইয়া থাকিবে—এ কিরূপ ন্যায় বিচার? ভিতরে-ভিতরে কত কুরীতি, কুপ্রথা, সঙ্কীর্ণতা সমাজের রক্ত শোষণ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সমাজ যেরূপ আছে তাহাই থাকিবে, অথচ সুস্থ, সবল, সুন্দর মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া জাতিকে উন্নত করিয়া দিবে—ইহা অসার কল্পনা। সেইজন্য সংস্কারপ্রিয় মনীষিগণ সমাজ-সংস্কার বিষয়ে জনসাধারণের মত গঠন করিবার অভিপ্রায়ে এই সামাজিক সমিতি সংগঠন করিয়াছেন। বঙ্গের স্বনামধন্য, কৃতী সন্তান, দূরদর্শী, স্বাধীনচেতা আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয়কে বর্ত্তমান বৎসরে সভাপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া সমিতি সৌভাগ্যশালিনী।

২। "ভ্রান্ত বিশ্বাস"—লেখক শ্রীজলন্ধর দেব।

প্রকৃত বস্তুতে মিথ্যা জ্ঞানের নাম ভ্রম, কিম্বা কোনও প্রকৃত বস্তু বা বিষয় অন্যরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবার নাম ভ্রম। সেই মিথ্যা-জ্ঞান সংশোধন না করিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখার নাম ভ্রান্ত বিশ্বাস। ভ্রান্ত বিশ্বাস ব্যক্তিগত, সমাজগত, ও জাতিগত। ব্যক্তিগত ভ্রান্ত বিশ্বাস সময়ে সমাজ ও জাতিগত হইয়া উঠে। ভ্রান্ত বিশ্বাসের অন্ত নাই। নিম্নে কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।

(ক) ভূত, প্রেত।—মনুষ্য মৃত্যুর পর ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি হইয়া থাকে। কোন কোনও ব্রাহ্মণ মরণের পর 'ব্রহ্ম রাক্ষস'—ব্যাঘ্র ভক্ষিত ব্যক্তি "বাঘিয়া" মৃত শিশুগণ 'মাটিয়া'—উপবীত ধারণের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যু হইলে 'ওথরা'—গর্ভিনী বা নবপ্রসূতির মৃত্যু হইলে 'প্রেতিনী' হইয়া থাকে। এইরূপে ভূত-সমাজেও জাতিভেদ বর্ত্তমান! এই সমস্ত কিম্ভূত-কিমাকার ভূতগণ স্নেহ-বাৎসল্য, দয়া-মমতা ভুলিয়া জীবিত ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন এবং কখন কখনও বা তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে! ভূতের গল্প কে না শুনিয়াছে?

(খ) ভূতাবেশ।—কোন-কোনও স্ত্রীলোকের উপর না কি ভূতাবেশ হইয়া থাকে! সে অতি অদ্ভুত ব্যাপার। তবে সুখের কথা পূর্ব্বাপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

(গ) সর্পবিষ।—সর্পবিষ মনুষ্যের আজ্ঞাকারী ও মন্ত্রের মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ—এ ধারণা অনেকের দেখা যায়। ইহার অপেক্ষা অধিক

ভ্রান্ত বিশ্বাস আর কি হইতে পারে? মন্ত্রে বিশ্বাস করিয়া কত নিরীহ লোক যে সর্পবিষে প্রাণ হারাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

(ঘ) ভাষা।—সংস্কৃত ভাষাকে পণ্ডিতগণ গীর্ব্বাণ বাণী বা দেব-ভাষা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাষার অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে সম্মত ন'ন। কোন্ দেব কবে ভারতবাসীকে এ ভাষা শিক্ষা দিয়াছেন তাহার প্রমাণ নাই। পূজ্যপাদ দয়ানন্দ সরস্বতীর ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিরও বিশ্বাস, বৈদিক ভাষা সমস্ত মানব জাতির আদি ভাষা এবং তাহা ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিয়া অসংখ্য ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

(ঙ) সনাতন হিন্দুধর্ম্ম—মানব জাতির ধর্ম্ম ঈশ্বর-সৃষ্ট নয়। হিন্দুধর্ম্ম কোন সর্ব্বনিয়ন্তা দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলে কাহার সাধ্য তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারে? ধর্ম্ম মনুষ্যকৃত বলিয়া জগতে নানা ধর্ম্মের উদয় ও প্রচার। যদি ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন বা উচ্ছেদ সাধন পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহার সনাতনত্ব কোথায়? ভারতের 'সনাতনধর্ম্মে'র মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। বেদে দেবাদির স্তবস্তুতি ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে গোমেধ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের বিস্তৃতির পর উপনিষদ যুগ উপস্থিত। পূর্ব্বাচরিত ধর্ম্ম দ্বারা আত্মার তৃপ্তি না হওয়ায় ঋষিগণ পরা ও অপরা বিদ্যার প্রচার করিলেন। ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ও পৌত্তলিক ধর্ম্মের উৎপত্তি।

(চ) এক সময়ে ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান যুগে তাহার প্রচার সম্ভব কি? বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম দ্বারা ভারতের কি অবস্থা হইয়াছে, অনেকে তাহা ভাবিতেছেন না। কোন শূদ্র বিচারক ব্রাহ্মণ আসামী দেখিয়া বিচারাসন ত্যাগ করিয়া প্রণত হইবেন? কোন শূদ্র ছাত্র বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণ ছাত্রের সহিত এক আসনে বসিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইবে? আর কোন্ আত্মোন্নতিকামী নব্য যুবক সমুদ্রযাত্রা করিতে নিরস্ত হইবে? তথাপি কতিপয় প্রাচীন মতাবলম্বী 'আমাদের সবই ভাল' এই মহাভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ না করিয়া দৃঢ়ীকরণে সতত যত্নবান!

(ছ) উল্কা, ইন্দ্রধনু, ইত্যাদি।—মনুষ্যের বিশ্বাস, তাহাদের নেত্রের প্রীতির জন্য জগতের সমস্ত সুন্দর বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যাকালে হঠাৎ একটীমাত্র গ্রহ বা নক্ষত্র দেখিয়া সপ্ত ব্রাহ্মণের নাম উচ্চারণ করিতে তাহারাই অধীরতা প্রকাশ করে। আবার শীতকালের দিবাভাগে কখনও শুক্রগ্রহ দৃষ্ট হইলে অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠে। প্রতি রজনীতে কতই উল্কাপাত হইতেছে; কিন্তু হঠাৎ একটা উল্কা পতিত হইতে দেখিয়া রাম-নাম কি কারণে গ্রহণ করে? কোন-কোন ব্যক্তি ধূমকেতুর উদয়ে শঙ্কিত হইয়া পড়ে; আবার কেহ বা শোভার আধার ইন্দ্রধনু অপরকে দেখাইয়া দেওয়া দোষাবহ মনে করিয়া থাকে।

এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস অসংখ্য। যাঁহারা সমাজ কি জাতিগত ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহের উন্মূলন করিতে যত্নবান, তাঁহারা দেশের ও সমাজের প্রকৃত বন্ধু।

মুকুল—মার্গশির ও পৌষ, ১৩২৫

"প্রাচীন উৎকল" (রাজবংশানুচরিত)—

লেখক শ্রীজগবন্ধু সিংহ।

উৎকল রাজ সিংহাসনে বহু ব্যক্তি আরোহণ করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। উৎকল জননী কত নৃপতিগণের লীলা, প্রতাপ ও বিক্রম পরিদর্শন করিয়াছেন। আজ উৎকলের সে বিভব নাই!

পুরীর মাদলা পাঁজিতে উৎকল রাজবংশের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে মন্দিরের আয় ব্যয়, রীতিনীতি, রাজভোগের ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয় লিখিত আছে। 'দেউল করণ' ও 'তড়াউ করণে'র ঘরে মাদলা পাঁজি রক্ষিত হইয়া থাকে। পাঁজি লিখন তাহাদের অন্যতম পেশা। দেউলকরণ কর্ত্তৃক মন্দিরের আয় ব্যয় বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় এবং তড়াউ রাজভোগের ইতিহাস লিখিয়া থাকেন। হণ্টার সাহেব মাদলা পাঁজি হইতে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিয়া কোথাও তাহার অনুসরণ, কোথাও বা পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন।

মাদলা পাঁজি হইতে জানা যায় সপ্ত রাজবংশ উড়িষ্যা সিংহাসনে আরোহণ করেন। যথা

১।	সোমবংশ	যুধিষ্ঠির	হইতে কেশরীবংশ	খৃঃ পূঃ		৩১০১	হইতে
				খৃঃ	„	৫৫৭	পর্য্যন্ত
২।	কেশরীবংশ	যযাতি	„ সুবর্ণ	খৃঃ	„	১১০২	„
৩।	গঙ্গাবংশ	চূড়গঙ্গদেব	„ ভানুদেব	খৃঃ	„	১৪৩২	„
৪।	সূর্য্যবংশ	কপিলেন্দ্রদেব	হইতে প্রতাপ	খৃঃ	„	১৫৩৩	„
৫।	ভোইবংশ	গোবিন্দ বিদ্যাধর	„ রঘুরাম	খৃঃ	„	১৫৫৯	„
৬।	চালুক্যবংশ	মুকুন্দ হরিচন্দন	„ ঐ	খৃঃ	„	১৫৬৮	„
৭।	যদুবংশ	রামচন্দ্রদেব	„ মুকুন্দদেব	খৃঃ	„	১২১৬	„

রাজগণের রাজত্বের সময় নিরূপণ সহজ নয়। তৎসম্বন্ধে বহু অসামঞ্জস্য থাকিলেও পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোণার্ক মন্দিরে খোদিত শিলালিপি এবং নরসিংহ তাম্রশাসন হইতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়।

মাদলা পাঁজিতে ২১ কি ২২ জন নৃপতির রাজত্বকালের উল্লেখ আছে। 'অংকবর্ষ' অনুসারে অনেক রাজার নামের পর 'ইত্যাদি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অনেক স্থলে বংশের রাজত্ব সময় লিখিত হইতে দেখা যায়। নিম্নে কয়েকটা প্রধান ঘটনা বিবৃত হইল:

মহেন্দ্রদেব গোদাবরী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বত স্থাপন করেন। পরম বিষ্ণুভক্ত অশোকদেব মন্দিরস্থিত বৃক্ষাদি পরিষ্কার করিয়া সংস্কারের জন্য প্রভূত অলঙ্কার নির্ম্মাণ করেন। বজ্রনাভদেবের সময়ে বাবলদেশ (কাবুল) হইতে আগত মোগলগণ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। দিলীর হিমারিত যবনেরাও আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নরসিংহ বা শরণ্ধদেবের রাজত্বকালে শরণ্ধ ও দীতন (বিদ্যাধর) নামক সুবৃহৎ সরোবর খোদিত হয়। ভোজরাজ চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। কালিদাস প্রভৃতি

কবিগণ দ্বারা সভাস্থাপন ও মহানাটক শ্লোকাদি প্রণয়ন করাইলেন। সিন্ধুদেশাগত যবনেরা উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হন। বীর বিক্রমাদিত্য অষ্টবেতাল সাধন এবং অগ্নি স্তম্ভন, পাদুকাসিদ্ধি প্রভৃতি বহুবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। শোভনদেবের রাজত্বকালে রক্তবাহু সমুদ্রপথে আগমন করিয়া কণিকার নিকটে অবতরণ পূর্ব্বক পুরুষোত্তমে প্রবেশ করেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সেবকগণ মহাপ্রভুকে গোপালীতে পাতালি করিয়া রক্ষা করেন। বাঁকি মোহানা ভগ্ন হওয়ায় সমুদ্র জলে নগর প্লাবিত হয়। সেই সময় হইতে চিল্কা হ্রদের উদ্ভব।

রক্তবাহুকে মাদলা পাঁজি মোগল আখ্যা প্রদান করিয়াছে; কিন্তু হণ্টার সাহেবের মতে তিনি বৌদ্ধ। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সদাশিব মিশ্র ইহার প্রতিবাদ করেন। তাঁহার 'জগন্নাথ মন্দিরে' রক্তবাহুকে তিনি ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন "বৌদ্ধগণ" আর্য্য হিন্দু সম্প্রদায়ের শাখাভুক্ত।

দত্তা.

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অনতিকাল পূর্ব্বেই এমন দিন ছিল, যখন বিলাসের হাতে আত্মসমর্পণ করা বিজয়ার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। কিন্তু, আজ শুধু বিলাস কেন, এত বড় পৃথিবীর এত কোটী লোকের মধ্যে, কেবল একটিমাত্র লোক ছাড়া আর কেহ তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে ভাবিলেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায়, ও লজ্জায়, এবং, সমস্ত অন্তঃকরণ কি যেন একটা গভীর পাপের ভয়ে ত্রস্ত, সশঙ্কিত হইয়া উঠে। এই ভাবনাটিকেই সে রাসবিহারীর নিমন্ত্রণ সারিয়া গাড়িতে উঠিয়া পর্য্যন্ত নানাদিক দিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করিতে-করিতে বাটী আসিয়াছিল।

তাহার সম্বন্ধে তাহার পিতার মনোভাব ঠিক কি ছিল, তাহা জানিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহার নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের ধারাটা যে বিলাসবিহারীর সহিত সম্মিলিত হইয়াই প্রবাহিত হইবে, তাহা স্থির হইয়া গিয়াছিল। কোন মতেই যে ইহার ব্যত্যয় ঘটিতে পারে, এ সম্ভাবনার কল্পনাও কোন দিন তাহার মনে উদয় হয় নাই।

অথচ, এই যে একটা অনাসক্ত উদাসীন লোক আকাশের কোন্ এক অদৃশ্য প্রান্ত হইতে সহসা ধূমকেতুর মত উঠিয়া আসিল, এবং এক নিমেষে তাহার বিশাল পুচ্ছের প্রচণ্ড তাড়নায় সমস্ত লণ্ড-ভণ্ড, বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া তাহার সুনির্দ্দিষ্ট পথের রেখাটা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া টান্ মারিয়া তাহাকে আর একদিকে ফেলিয়া দিয়া, নিজেও কোথায় সরিয়া গেল,—চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিয়া গেল না,—ইহা সত্য, কিম্বা নিছক স্বপ্ন, ইহাই বিজয়া তাহার সমস্ত আত্মাকে জাগ্রত করিয়া আজ ভাবিতেছিল। যদি স্বপ্ন হয়, সে মোহ কেমন করিয়া কতদিনে কাটিবে, আর যদি সত্য হয়, তাই বা জীবনে কি করিয়া সার্থক হইবে।

ঘরে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল, কিন্তু নিদ্রা তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কাছেও ঘেঁসিল না। আজ যে আশঙ্কাটা তাহার মনে বারবার উঠিতে লাগিল, তাহা এই যে, যে চিন্তা কিছুদিন হইতে তাহার চিত্তকে অহর্নিশি আন্দোলিত করিতেছে, তাহাতে সত্য বস্তু কিছু আছে, কিম্বা সে শুধুই তাহার আকাশ কুসুমের মালা। এই নিদারুণ সমস্যার গ্রন্থিভেদ করিয়া তাহাকে কে দিবে?

তাহার মা নাই, পিতাও পরলোকে; ভাই-বোন্ ত কোন দিনই ছিল না,—আপনার বলিতে একা রাসবিহারী ব্যতীত আর কেহ নাই। তিনিই বন্ধু, তিনিই বান্ধব, তিনিই অভিভাবক। অথচ, কোন্ শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে যে তিনি এমন তাড়া করিয়া তাহাকে তাহার আজন্ম-পরিচিত কলিকাতার সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেশে আনিয়া ফেলিয়াছেন, সে আজ বিজয়ার কাছে জলের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেছে। এই স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, আজ সমস্তই তাহার চোখে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। বিদেশ-যাত্রায় নরেন্দ্রকে অযাচিত সাহায্য-দান, নিজের গৃহে এই খাওয়ানোর আয়োজন, সম্মানিত

অতিথিদের সম্মুখে এই বিবাহের প্রস্তাব, তাহার সলজ্জ নীরবতার অর্থ মৌন সম্মতি বলিয়া অসংশয়ে প্রচার করা—তাহাকে সকল দিক দিয়া বাঁধিয়া ফেলিতে এই বৃদ্ধের চেষ্টা-পরম্পরার কিছুই আর তার কাছে প্রচ্ছন্ন নাই।

কিন্তু অত্যাচার-উপদ্রবের লেশমাত্র চিহ্নও রাসবিহারীর কোন কাজে কোথাও বিদ্যমান নাই। অথচ, বৃদ্ধের বিনম্র স্নেহ, সরস মঙ্গলেচ্ছার অন্তরালে দাঁড়াইয়া কত বড় দুর্নিবার শক্তি যে তাহাকে অহরহ ঠেলিয়া জালের মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে—উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের উপায়বিহীনত্বের ছবিটা এমনি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল যে, বিজয়া একাকী ঘরের মধ্যেও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে সে মুহূর্ত্তের জন্য ঘুমাইতে পারিল না; তাহার পরলোকগত পিতাকে বারম্বার ডাকিয়া কেবলই কাঁদিয়া-কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, 'বাবা, তুমি ত এদের চিন্‌তে পেরেছিলে, তবে কেন আমাকে এমন কোরে তাদের মুঠোর মধ্যে সঁপে দিয়ে গেলে?' এক সময়ে সে যে বিলাসকে পছন্দ করিয়াছিল, এবং তাহারই সহিত একযোগে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নরেন্দ্রের যে সর্ব্বনাশ কামনা করিয়াছিল, সেই কামনার ফলই অবশেষে তাহার আন্তরিক কামনাকেও পরাভূত করিয়া আজ জয়লাভ করিয়াছে, ইহাই স্মরণ করিয়া তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। স্নেহে অন্ধ হইয়া কেন তিনি এই সর্ব্বনাশের মূল স্বহস্তে উন্মূলিত করিয়া গেলেন না;—কেন তাহারই বুদ্ধি বিবেচনার উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া গেলেন? আর তাই যদি গেলেন, তবে কেন তাহার স্বাধীনতার পথ এমন করিয়া সকল দিক দিয়া রুদ্ধ করিয়া গেলেন! সমস্ত উপাধান সিক্ত করিয়া সে কেবলই ভাবিতে লাগিল, তাহার এই রুদ্ধ অভিমানের নিষ্ফল নালিশ আজ সেই স্বর্গবাসী পিতার কানে কি পৌঁছিতেছে না? আজ প্রতিকারের উপায় তাঁহার হাতে কি আর একবিন্দুও নাই?

পরদিন পরেশের মায়ের ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা হইয়াছে। উঠিয়াই শুনিল, তাহার বাহিরের ঘর পরিপূর্ণ হইয়া গেছে—নিমন্ত্রিতগণের অভ্যাগমে শুধু সে-ই উপস্থিত নাই। এই ত্রুটি সারিয়া লইতে সে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি করিবে কি,—আজিকার সারাদিনব্যাপী উৎসবের হাঙ্গামা মনে করিতেই তাহার ভারি যেন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিল। শীতের প্রভাত-সূর্য্যালোক বাগানের আমগাছের মাথায় মাথায় একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল, এবং তাহারই পাতার ফাঁকে ফাঁকে সুমুখের মাঠের উপর দিয়া রাখাল বালকেরা খেলা করিতে করিতে গরু চরাইতে চলিয়াছিল, দেখিতে পাওয়া গেল। দেশে আসা পর্য্যন্ত এই দৃশ্যটি দেখিতে তাহার কোন দিন ক্লান্তি জন্মিত না। অনেক দিন অনেক দরকারী কাজ ফেলিয়া রাখিয়াও সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাদের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিত।

আজ সে ভাবিয়াই পাইল না, এত দিন কি মাধুর্য্য ইহাতে ছিল! বরঞ্চ এ যেন একটা অত্যন্ত পুরানো বাসি জিনিসের মত তাহার কাছে আগাগোড়া বিস্বাদ ঠেকিল। এই দৃশ্য হইতে সে তাহার শ্রান্ত চোখ দুটি ধীরে ধীরে ফিরাইয়া লইতেই দেখিতে পাইল, কালীপদ এক এক লাফে তিন তিনটা সিঁড়ি ডিঙাইয়া উপরে উঠিতেছে। চোখোচোখি হইবামাত্রই সে বারান্দাতেই থামিয়া গিয়া, একটা মহাব্যস্তভাব হাসিতে জানাইয়া, হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "মা, শিগ্‌গির, শিগ্‌গির! ছোটবাবু ওখানে বসে রয়েচেন। আজ এত দেরী করতে আছে!" কিন্তু, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একরাশ বারুদের মধ্যে পড়িয়া যে বিপ্লবের সৃষ্টি করে, ভৃত্যের এই সংবাদটাও বিজয়ার দেহমনে ঠিক তেমনি প্রলয় কাণ্ড বাধাইয়া দিল। মনে হইল, তাহার পদতল হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত যেন এক মুহূর্ত্তেই এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ সে কোন কথা কহিতে পারিল না, শুধু স্ফটিকখণ্ড মধ্যাহ্ন-সূর্য্যকিরণে যেমন করিয়া অগ্নিতেজ বিকীর্ণ করিতে থাকে, তেমনি তাহার দুই প্রদীপ্ত চক্ষু হইতেও অসহ্য জ্বালা ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল। কালীপদ তাহার প্রতি চাহিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, সে কি একটা পুনরায় বলিবার চেষ্টা করিতেই, বিজয়া আপনাকে সামলাইয়া ফেলিয়া কহিল, "তুমি নীচে যাও কালিপদ" বলিয়া নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

এ বাটীতে 'ছোটবাবু' বলিতে যে বিলাসবিহারীকে এবং 'বড়বাবু' বলিতে তাহার পিতাকে বুঝায়, বিজয়া তাহা জানিত। কিন্তু এই দুটি পিতা-পুত্রে যে এখানে এত বড় হইয়া উঠিগাছেন, যে, তাঁহাদের ক্রোধের গুরুত্ব

আজ চাকরবাকরদের কাছে বাড়ীর মনিবকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, এ খবর বিজয়া এই প্রথম পাইল। আজ সে স্পষ্ট দেখিল, ইহারই মধ্যে বিলাস এখানকার সত্যকার প্রভু এবং সে তাহার আশ্রিতা অনুগ্রহজীবী মাত্র। এ তথ্য যে তাহার মনের আগুনে জলধারা সিঞ্চিত করিল না, তাহা বলাই বাহুল্য।

আধঘণ্টা পরে সে যখন হাত মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া আসিল, তখন চা' খাওয়া চলিতেছিল। উপস্থিত সকলেই প্রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল, এবং তাহার মুখ চোখের শুষ্কতা লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলা অস্ফুট কণ্ঠের উদ্বিগ্ন প্রশ্নও ধ্বনিয়া উঠিল। কিন্তু সহসা বিলাসবিহারীর তীব্র, কটু কণ্ঠে সমস্ত ডুবিয়া গেল। সে তাহার চায়ের পেয়ালাটা ঠক্ করিয়া টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "ঘুমটা এ-বেলায় না ভাঙলেই ত চল্‌ত। তোমার ব্যবহারে আমি ক্রমশঃ ডিস্‌গস্টেড্ হয়ে উঠ্‌চি, এ কথা না জানিয়ে আর আমি পারলাম না।" বিরক্তি জানাইবার অধিকার তাহার আছে—এ একটা কথা বটে। কিন্তু এতগুলা বাহিরের লোকের সমক্ষে ভাবী স্বামীর এই কর্ত্তব্যপরায়ণতা নিরতিশয় অভদ্রতার আকারেই সকলকে বিস্মিত এবং ব্যথিত করিল। কিন্তু বিজয়া তাহার প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র করিল না। যেন কিছুই হয় নাই, এম্‌নি ভাবে সে সকলকেই প্রতি-নমস্কার করিয়া, যেখানে বৃদ্ধ আচার্য্য দয়াল বাবু বসিয়া ছিলেন, সেই দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। বৃদ্ধ মনে মনে কুণ্ঠিত হইয়া বসিয়া ছিলেন। বিজয়া তাঁহার কাছে গিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, "আপনার চা' খাওয়ার কোন বিঘ্ন হয়নি? আমার অপরাধ হয়ে গেছে—আজ সকালে আমি উঠ্‌তে পারিনি।"

বৃদ্ধ দয়াল স্নেহার্দ্র স্বরে একেবারেই 'মা' সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না মা, আমাদের কারও কিছুমাত্র অসুবিধে হয়নি। বিলাসবাবু, রাসবিহারীবাবু কোথাও কোন ত্রুটি ঘট্‌তে দেননি। কিন্তু তোমাকে ত তেমন ভাল দেখাচ্চে না মা; অসুখ-বিসুখ ত কিছু হয়নি?" ইনি সর্ব্বদা কলিকাতায় থাকেন না বলিয়া বিজয়া পূর্ব্বে ইহাতে ইঁহাকে চিনিত না। কালও সে ভাল করিয়া ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই। কিন্তু আজ ঘরে পা দিয়া দৃষ্টিপাতমাত্রই এই বৃদ্ধের শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি যেন নিতান্ত আপনার জন বলিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই, সকলকে বাদ দিয়া সে একেবারে ইঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন ইঁহারই স্নিগ্ধ, কোমল কণ্ঠস্বরে তাহার অন্তরের দাহ অর্দ্ধেক জল হইয়া গেল। এবং সহসা মনে হইল, কেমন করিয়া যেন এই কণ্ঠস্বরে তাহার পিতার কণ্ঠস্বরের আভাস রহিয়াছে।

দয়াল একটা কোচের উপর বসিয়া ছিলেন, পাশে একটু যায়গা ছিল। তিনি সেই স্থানটুকু নির্দ্দেশ করিয়া পরক্ষণেই কহিলেন, "দাঁড়িয়ে কেন মা, বোস এইখানে; অসুখ-বিসুখ ত কিছু করেনি?"

বিজয়া পার্শ্বে বসিয়া পড়িল বটে, কিন্তু জবাব দিতে পারিল না, ঘাড় বাঁকাইয়া আর এক দিকে চাহিয়া রহিল। অশ্রু দমন করা তাহার পক্ষে যেন উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। বৃদ্ধ আবার সেই প্রশ্নই করিলেন। প্রত্যুত্তরে এবার বিজয়া মাথা নাড়িয়া কোন মতে শুধু কহিল, "না।" এই ধরা-গলার সংক্ষিপ্ত উত্তর বৃদ্ধের লক্ষ্য এড়াইল না—তিনি মুহূর্ত্তকালের জন্য মৌন থাকিয়া ব্যাপারটা অনুভব করিয়া মনে মনে শুধু একটু হাসিলেন। যিনি এ বাটীর মালিকের যায়গাটি মাস-তিনেক পূর্ব্বেই দখল করিয়া বসিয়াছেন, তিনি যদি তাঁর প্রণয়িনী গৃহস্বামিনীকে একটু তিক্ত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন ত, আনাড়িদের কাছে তাহা যত রূঢ়ই ঠেকুক, যাঁরা যৌবনের ইতিহাসটুকু পড়িয়া শেষ করিয়া দিয়াছেন, তেমন জ্ঞানবৃদ্ধ কেহ যদি মনে মনে একটু হাস্যই করেন, ত তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। তখন বৃদ্ধ তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্টা এই নবীনা অভিমানিনীটিকে সুস্থ হইবার সময় দিতে নিজেই ধীরে-ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন। এত অল্প বয়সেই এই সত্য-ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের অবিচলিত নিষ্ঠা ও প্রীতির অসংখ্য প্রশংসা করিয়া অবশেষে বলিলেন, "ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমাদের মহৎ উদ্দেশ্য দিন-দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক; কিন্তু, মা, যে মন্দির তুমি তোমার গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে, তাকে বজায় রাখতে তোমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক স্বার্থ-ত্যাগের আবশ্যক হবে। আমি নিজেও ত পাড়া-গ্রামেই থাকি; আমি বেশ দেখেছি, এ ধর্ম্ম এখনও আমাদের পল্লীসমাজের রস নিয়ে

যেন বাঁচতেই চায় না। তাই আমার মনে হয়, একে যদি যথার্থই জীবিত রাখতে পারো মা, এ দেশে একটা সত্যিই বড় সমস্যার মীমাংসা হবে। তোমাদের এই উদ্যমকে আমি যে কি বলে আশীর্ব্বাদ কোরব, এ আমি ভেবেই পাইনে।”

বিজয়ার মুখে আসিয়া পড়িতেছিল—বলে, মন্দির-প্রতিষ্ঠায় আমার আর কোন উৎসাহ নেই, এর লেশমাত্র সার্থকতা আর আমি দেখতে পাইনে। কিন্তু সে কথা চাপিয়া গিয়া মৃদু স্বরে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, “একটা জটিল সমস্যার সমাধান হবে আপনি কেন বল্‌চেন ?”

দয়াল কহিলেন, “তা’ বই কি মা। আমার আন্তরিক বিশ্বাস, বাঙলার পল্লীর সহস্রকোটী কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিতে শুধু আমাদের এই ধর্ম্মই পারে। কিন্তু এও জানি, যার যেখানে স্থান নয়, যার সেখানে প্রয়োজন নেই, সে সেখানে বাচে না। কিন্তু চেষ্টায়, যত্নে যদি একটিকেও বাঁচাতে পারা যায়, সে কি মস্ত একটা আশা ভরসার আশ্রয় নয় ? আমাদের বাঙালী-ঘরের দোষ গুণের কথা তুমি নিজেও ত কম জানো না, মা! সেইগুলি সব অন্তরের মধ্যে ভাল কোরে একটুখানি তলিয়ে ভেবে দেখ দেখি ?”

বিজয়া আর প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। স্বদেশের মঙ্গল-কামনা তাহার মধ্যে যথার্থই স্বাভাবিক ছিল, আচার্য্যের শেষ কথাটায় তাহাই আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-সংস্পর্শে একটা মস্ত নামের অন্তরালে থাকিয়া বিলাস তাহার হৃদয়ের অত্যন্ত ব্যথার স্থানটাতেই পুনঃপুনঃ আঘাত করিতেছিল। সে বেদনায় ছটফট করিতেছিল, অথচ প্রতিঘাত করিবার উপায় ছিল না বলিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত সমস্ত ব্যাপারটার বিরুদ্ধেই বিদ্বেষে প্রায় অন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দয়াল যখন তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি ও স্নিগ্ধ কণ্ঠের আহ্বানে বিলাসের চেষ্টার এই বিশেষ দিক্‌টায় চোখ মেলিতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন, তখন বিজয়া সত্য-সত্যই যেন নিজের ভ্রম দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বিলাস হয় ত বাস্তবিকই হৃদয়হীন এবং ক্রূর নয়, তাহার কঠোরতা হয় ত প্রবল ধর্ম্মানুরক্তিরই একটা প্রকাশ মাত্র। মানুষের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের ত অভাব নেই! তাহার মনে পড়িল, সে কোথায় যেন পড়িয়াছে, সংসারে সকল বড় কার্য্যই কাহারো-না-কাহারো ক্ষতিকর হয়; যাঁহারা এই কার্য্যভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন, তাঁহারা অনেকের মঙ্গলের জন্য সামান্য ক্ষতিতে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর পান না। সেই জন্য অনেক স্থলেই তাঁহারা নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর বলিয়া জগতে প্রচারিত হন। চিরদিনের শিক্ষা ও সংস্কার বশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বিজয়ার কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। সেই ধর্ম্মের বিস্তৃতির উপর দেশের এতখানি মঙ্গল নির্ভর করিতেছে শুনিয়া, তাহার উচ্চ-শিক্ষিত সত্যপ্রিয় অন্তঃকরণ তৎক্ষণাৎ বিলাসকে মনে মনে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিল না। এমন কি, সে আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, সংসারে যাহারা বড় কাজ করিতে আসে, তাহাদিগের ব্যবহার আমাদের মত সাধারণ লোকের সহিত বর্ণে বর্ণে না মিলিলেই তাহাদিগকে দোষী করা অসঙ্গত, এমন কি অন্যায়; এবং অন্যায়কে অন্যায় বুঝিয়া কোন কারণেই তাহার প্রশ্রয় দিব না।

বেলা হইতেছিল বলিয়া সকলেই একে একে উঠিতে-ছিলেন। বিজয়াও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাসবিহারী ছেলেকে একটু আড়ালে ডাকিয়া কি একটা কথা বলিবার পরে, সে এই সুযোগটার জন্যই যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল; কাছে আসিয়া বলিল, “তোমার শরীরটা কি আজ সকালে ভাল নেই বিজয়া ?”

আধঘণ্টা পূর্ব্বেও হয় ত সে প্রশ্নটাকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া যা’ হোক একটা কিছু বলিয়া চলিয়া যাইত; কিন্তু, এখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল। সহজভাবে বলিল, “না, ভালই আছি। কাল রাত্রে ঘুম হয়নি বলেই বোধ করি একটু অসুস্থ দেখাচ্চে।”

বিলাসের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা আঘাতের বদলে প্রতিঘাত না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না। নিজের সমূহ ক্ষতি বুঝিয়াও সহিতে পারে না। বিলাস তাহাদেরই একজন। বিজয়ার আচরণ তাহার প্রতি প্রতিদিন যতই অপ্রীতিকর হইতেছিল, তাহার নিজের আচরণও ততোধিক নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেছিল। এইরূপে ঘাত-প্রতিঘাতের আগুন প্রতি মুহূর্ত্তেই যখন মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেছিল, তখন পক্ক-কেশ অভিজ্ঞ পিতার পুনঃপুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুযোগ, সহিষ্ণুতার পরম লাভ ও চরম সিদ্ধি

সম্বন্ধে নিভৃত গভীর উপদেশ অনভিজ্ঞ উদ্ধত পুলেব কোন কাজেই লাগিতেছিল না; কিন্তু বিজয়ার মুখের এই একটি মাত্র কোমল বাক্য বিলাসের স্বভাবটাকেই যেন বদলাইয়া দিল। সে স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠ যতদূর সাধ্য করুণ করিয়া কহিল, "তাহলে তুমি এ বেলায় রোদে আর বার হোয়ো না। সকাল সকাল স্নানাহার সেরে যদি একটু ঘুমোতে পারো, সেই চেষ্টা করো। সিমন চেঞ্জের সময়টা ভাল নয়—অসুখ বিসুখ না হয়ে পড়ে।" বলিয়া মুখের চেহারায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া, বোধ করি বা নিজের ব্যবহারের জন্য একবার ক্ষমা চাহিতেও উদ্যত হইল; কিন্তু এ বস্তুটা তাহার স্বভাবে না কি একেবারেই নাই, তাই আর কিছু না কহিয়া দ্রুতপদে ভদ্রলোক দিগের অনুসরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যতক্ষণ দেখা যায়, বিজয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাহার উপরের ঘরে চলিয়া গেল। কিছুকাল অবধি একটা অব্যক্ত পীড়া কাঁটার মত তাহার মনের মধ্যে খচখচ করিয়া অহরহ বিঁধিতেছিল, আজ তাহার অকস্মাৎ বোধ হইল সেটার যেন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। ভিতরে বিশেষ একটা যায়গায় দুখানা ভাল চেয়ার আজ পাশাপাশি রাখা হইয়াছিল। তাহার একটাতে যখন অত্যন্ত সমারোহের সহিত বিজয়াকে বসানো হইল, তখন পাশের শূন্য আসনটা যে কাহার দ্বারা পূর্ণ হইবার অপেক্ষা করিতেছে, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। পলকের জন্য বিজয়ার মনের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু ক্ষণেক পরেই বিলাস আসিয়া যখন তাহার নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল, তখন, সে জ্বালা নিবিতেও তাহার বেশি সময় লাগিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পোড়া তুবড়ির খোলাটার ন্যায় তুচ্ছ বস্তুর মত এই ব্রহ্মমন্দির হইতেও পাছে সমারোহ শেষে লোকের দৃষ্টি অবজ্ঞায় অন্যত্র সরিয়া যায়, এই আশঙ্কায় বিলাসবিহারী উৎসবের জেরটা যেন কিছুতেই আর নিকাশ করিতে চাহিতেছিল না। কিন্তু যাঁহারা নিমন্ত্রণ লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাড়ীঘর আছে, কাজকর্ম্ম আছে, পরের খরচে কেবল আনন্দে মাতিয়া থাকিলেই চলে না; সুতরাং শেষ একদিন তাহাদের করিতেই হইল। সে দিন রাসবিহারী ছোট একটি বক্তৃতা করিয়া শেষের দিকে বলিলেন—"যাহার অসীম করুণায় আমরা পৌত্তলিকতার ঘোর অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতে পারিয়াছি, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম, নিরাকার, পরব্রহ্মের পাদপদ্মে এই মন্দির যাঁহারা উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের কল্যাণ হোক্। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, যে,—অচির ভবিষ্যতে সেই দুটি নির্ম্মল নবীন জীবন চিরদিনের জন্য সম্মিলিত হইবে;—সেই শুভ মুহূর্ত্ত চক্ষে দেখিতে ভগবান যেন আমাদের জীবিত রাখেন।" এই বলিয়া সেই দুটি নবীন জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মা বিজয়া, বিলাস, তোমরা এঁদের প্রণাম কর। আপনারাও আমার সন্তানদের আশীর্ব্বাদ করুন।" বিজয়া ও বিলাস পাশাপাশি মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, তাঁহারাও অস্ফুট কণ্ঠে ইহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পরে সভা ভঙ্গ হইল।

সন্ধ্যার পরে বিজয়া যখন বাটিতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহার মনের মধ্যে কোন বিরোধ, কোন চাঞ্চল্য ছিল না। ধর্ম্মের আনন্দে ও উৎসাহে হৃদয় এমনি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, যে, সে আপনাকে আপনি কেবলই বলিতে লাগিল, 'পার্থিব সুখই একমাত্র সুখ নয়,—বরঞ্চ ধর্ম্মের জন্য, পরের জন্য সে সুখ বলি দেওয়াই একমাত্র শ্রেয়ঃ।' বিলাসের সহিত তাহার মতের আর কোথাও যদি মিল না হয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে তাহাদের কোন দিন অনৈক্য ঘটিবে না, এ কথা সে জোর করিয়াই নিজেকে বুঝাইল। বিছানায় শুইয়াও সে বারবার ইহাই কহিতে লাগিল—এ ভালই হইল যে তাহার মত একজন স্থিরসঙ্কল্প, স্বধর্ম্মপরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোকের সহিত তাহার জীবন চিরদিনের জন্য মিলিত হইতে যাইতেছে। ভগবান তাহার দ্বারা নিজের অনেক কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লইবেন বলিয়াই এমন করিয়া তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন।

পরদিন বিলাস সকলকেই করজোড়ে আবেদন করিল, তাঁহারা যদি অন্ততঃ মাসে একবার করিয়া আসিয়াও মন্দিরের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন, ত, তাহারা আজীবন কৃতজ্ঞ

হইয়া থাকিবে। এ অনুরোধ অনেকেই স্বীকার করিয়াই বাড়ী গেলেন।

রাসবিহারী আসিয়া বলিলেন, "মা বিজয়া, তোমার মন্দিরের স্থায়িত্ব যদি কামনা কর, ত, দয়ালবাবুকে এখানে রাখিবার চেষ্টা কর।"

বিজয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি সম্ভব কাকাবাবু?" রাসবিহারী হাসিয়া কহিলেন, "সম্ভব না হলে বোলব কেন মা? তাঁকে ছেলেবেলা থেকে জানি,—এক রকম আমারই বাল্যবন্ধু। অবস্থা ভাল না হলেও দয়াল খাঁটি লোক। তোমার জমিদারীতে কোন একটা কাজ দিয়ে তাঁকে অনায়াসে রাখা যেতে পারে। মন্দিরের বাড়ীতেও ঘরের অভাব নেই, স্বচ্ছন্দে দু'চারটে ঘর নিয়ে তিনি সপরিবারে বাস করতে পারেন।"

এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির প্রতি বিজয়ার স্বভাবতঃ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাঁহার সাংসারিক হীনাবস্থা শুনিয়া সেই শ্রদ্ধায় করুণ যোগ দিল। সে তৎক্ষণাৎ রাসবিহারীর প্রস্তাব সানন্দে অনুমোদন করিয়া বলিল, "ওঁকে এখানেই রাখুন। আমি সত্যিই ভারি খুসি হব কাকাবাবু।" তাহাই হইল। দয়াল আসিয়া সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। পৌষ শেষ হইয়া মাঘের মাঝামাঝিতে আসিয়া পৌঁছিল। জমিদারী এবং মন্দিরের কাজ সুশৃঙ্খলায় চলিতে লাগিল—কোথাও যে কোন বিরোধ বা অশান্তি আছে, তাহা কাহারও কল্পনায়ও উদয় হইল না।

নরেন্দ্রের কোন সংবাদ নাই। থাকিবার কথাও নহে। শুধু দু'দিনের জন্য সে দেশে আসিয়াছিল, দু'দিন পরে চলিয়া গেছে। তবে, একটা ব্যথা বিজয়ার মনে বাজিত, যখনই সেই মাইক্রস্কোপটার প্রতি তাহার চোখ পড়িত। আর কিছু নয়,—শুধু যদি তাহার সেই একান্ত দুঃসময়ে কিছু বেশি করিয়াও জিনিসটার দাম দেওয়া হইত। আর একটা কথা স্মরণ হইলে সে যেমন আশ্চর্য্য হইত, তেমনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত। দু'দিনের পরিচয়ে কেমন করিয়াই না জানি এই লোকটার প্রতি এত স্নেহ জন্মিয়াছিল! ভাগ্যে তাহা প্রকাশ পায় নাই! না হইলে, মিথ্যা মোহ একদিন মিথ্যায় মিলাইয়া যাইতই,—কিন্তু সারাজীবন লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই থাকিত না। তাই, সেই দু'দিনের স্নেহ-মমতার পাত্রটিকে যখনই মনে পড়িত, তখনই প্রাণপণ বলে মন হইতে তাহাকে সে দূরে ঠেলিয়া দিত। এম্‌নি করিয়া মাঘ মাসও শেষ হইয়া গেল।

ফাল্গুনের প্রারম্ভেই হঠাৎ অত্যন্ত গরম পড়িয়া চারিদিকে জ্বর দেখা দিতে লাগিল। দিন দুই হইতে দয়ালবাবু জ্বরে পড়িয়াছিলেন। আজ সকালে তাঁহাকে দেখিতে যাইবার জন্য বিজয়া কাপড় পরিয়া একেবারে প্রস্তুত হইয়াই নীচে নামিয়াছিল। বুড়া দরওয়ান কানাই সিং লাঠি আনিতে তাহার ঘরে গিয়াছিল, এবং সেই অবকাশে বাহিরের ঘরে বসিয়া বিজয়া এক পেয়ালা চা' খাইয়া লইতেছিল।

"নমস্কার!"

বিজয়া চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, নরেন্দ্র ঘরে ঢুকিতেছে।

তাহার হাতের পেয়ালা হাতেই রহিল, শুধু অভিভূতের মত নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। না করিল প্রতি-নমস্কার, না বলিল বসিতে।

একটা চেয়ারের পিঠে নরেন্দ্র তাহার লাঠিটা হেলান দিয়া রাখিয়া, আর একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল, কহিল, "এ কাজটা আমারও এখনো সারা হয়নি—আর এক পেয়ালা চা আনতে হুকুম করে দিন ত।"

"দিচ্ছি" বলিয়া বিজয়া হাতের বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু, কালিপদকে বলিয়া দিয়াই তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিতে পারিল না। উপরে যাইবার সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতরটা পীযূষ-ফেন সমুদ্রের মত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন কারণেই হৃদয় যে মানুষের এমন করিয়া দুলিয়া উঠিতে পারে, ইহা সে জানিতই না। তথাপি এ কথাও স্পষ্ট বুঝিতেছিল, এ আন্দোলন শান্ত না হইলে কাহারো সহিত সহজ ভাবে কথাবার্ত্তা কহা অসম্ভব। মিনিট পাঁচ ছয় সেখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যখন দেখিল, কালিপদ চা লইয়া যাইতেছে, তখন সেও তাহার পিছনে-পিছনে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কালিপদ চলিয়া গেলে নরেন্দ্র বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, "আপনি মনে-মনে ভারি বিরক্ত হয়েছেন। আপনি কোথাও বার হচ্ছিলেন, আমি এসে বাধা দিয়েচি। কিন্তু মিনিট পাঁচেকের বেশি আপনাকে আটকে রাখ্‌ব না।"

বিজয়া কহিল, "আচ্ছা, আগে আপনি চা' খান।"

হঠাৎ পশ্চিম দিকের জানালাটার প্রতি নজর পড়ায় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও জানালাটা কে খুলে দিয়ে গেল?"

নরেন বলিল, "কেউ না, আমি।"

"কি কোরে খুললেন?"

"যেমন কোরে সবাই খোলে তেমনি। কোন দোষ হয়েচে?"

বিজয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, না। মুহূর্ত্ত কয়েক তাহার লম্বা সরু সরু আঙুলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনার আঙুলগুলো কি লোহার? ঐ জানালাটা বন্ধ থাকলে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা না দিয়ে শুধু টেনে খুলতে পারে এমন লোক আমি দেখিনি।"

কথা শুনিয়া নরেন হো হো করিয়া উচ্চ হাস্যে ঘর ভরিয়া দিল। সেই হাসি মনে পড়িয়া বিজয়ার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। হাসি থামিলে নরেন সহজ ভাবে কহিল, "সত্যি, আমার আঙুলগুলো ভারি শক্ত। জোরে টিপে ধরলে যে কোন লোকের বোধ করি হাত ভেঙ্গে যায়।"

বিজয়া হাসি চাপিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, "আপনার মাথাটা তার চেয়েও শক্ত। টের পাবেন—"

কথাটা শেষ না হইতেই নরেন আবার তেমনি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। এই লোকটির হাসি প্রভাতের আলোর মত এমনি মধুর, এমনি উপভোগের বস্তু যে, কোনমতেই যেন লোভ সম্বরণ করা যায় না।

নরেন পকেট হইতে দু'শ টাকার নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল, "সেই জন্যেই ত এসেচি। আমি জোচ্চোর, আমি ঠক কত কি গালাগালি ওই কটা টাকার জন্যে বলে পাঠিয়েছিলেন। আপনার টাকা নিন্,—দিন আমার জিনিস।" বিজয়ার মুখ পলকের জন্যে আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনই আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল, "আর কি কি বলে পাঠিয়েছিলুম বলুন ত?"

নরেন কহিল, "অত আমার মনে নেই। সেটা আন্‌তে বলে দিন, আমি সাড়ে ন'টার গাড়াতেই কলকাতায় ফিরে যাবো। ভাল কথা, আমি কলকাতাতেই বেশ একটা চাক্‌রি পেয়েচি—অত দূরে আর যেতে হয়নি।"

বিজয়ার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কহিল, "আপনার ভাগ্য ভাল।" নরেন বলিল, "হাঁ। কিন্তু, আমার আর সময় নেই, ন'টা বাজে।" বিজয়ার মুখের দীপ্তি নিমিষে নিবিয়া গেল; কিন্তু নরেন তাহা লক্ষ্যও করিল না; কহিল, "আমাকে এখুনি বার হতে হবে,—সেটা আন্‌তে বলে দিন।"

বিজয়া তাহার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া বলিল, "এই সর্ত্ত কি আপনার সঙ্গে হয়েছিল, যে, আপনি দয়া কোরে টাকা এনেছেন বলেই তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিতে হবে?" নরেন্দ্র লজ্জিত হইয়া কহিল, "না, তা নয় সত্যি; কিন্তু আপনার ত ওতে দরকার নেই।"

"আজ নেই বলে কোন দিন দরকার হবে না, এ আপনাকে কে বল্‌লে?" নরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমি বল্‌চি, ও জিনিস আপনার কোন কাজেই লাগ্‌বে না। অথচ, আমার—"

বিজয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "তবে যে বিক্রী কোরে যাবার সময় বলেছিলেন, ওটা আমার অনেক উপকারে লাগ্‌বে! আমাকে ঠকিয়ে গেছেন বলে পাঠিয়েছিলুম বলে আপনি আবার রাগ কচ্চেন? তখন একরকম কথা, আর এখন একরকম কথা?" নরেন্দ্র লজ্জায় একেবারে মলিন হইয়া গেল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "দেখুন, তখন ভেবেছিলুম, অমন জিনিসটা আপনি ব্যবহারে লাগাবেন, এ রকম ফেলে রেখে দেবেন না। আচ্ছা, আপনি ত জিনিস বাঁধা রেখেও টাকা ধার দেন, এও কেন তাই মনে করুন না। আমি এ টাকাটার সুদ দিচ্চি।" বিজয়া কহিল, "কত সুদ দেবেন?" নরেন্দ্র বলিল, "যা ন্যায্য সুদ, আমি তাই দিতে রাজী আছি।" বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আমি রাজী নই। কলকাতায় যাচাই করে দেখিয়েচি, ওটা আমি অনায়াসে চারশ টাকায় বিক্রী করতে পারি।"

নরেন্দ্র সোজা উঠিয়া দাড়াইয়া কহিল, "বেশ, তাই করুন গে—আমার দরকার নেই। যে দু'শ টাকায় চারশ' টাকা চায়, তাকে আমি কিছুই বল্‌তে চাইনে।"

বিজয়া মুখ নীচু করিয়া প্রাণপণে হাসি দমন করিয়া যখন মুখ তুলিল, তখন, কেবল এই লোকটি ছাড়া সংসারে আর কাহারও কাছে বোধ করি সে আত্মগোপন করিতে পারিত না। কিন্তু সেদিকে নরেনের দৃষ্টিই ছিল না। সে তীক্ষ্ণভাবে কহিল, "আপনি যে একটি শাইলক, তা' জান্‌লে আমি আস্‌তামও না।" বিজয়া ভালমানুষটির মত কহিল,

"দেনার দায়ে যখন আপনার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করে নিয়েছিলুম, তখনও ভাবেন নি ?"

নরেন কহিল, "না। কেন না, তাতে আপনার হাত ছিল না। সে কাজ আপনার বাবা এবং আমার বাবা দু'জনে করে গিয়েছিলেন। আমরা কেউ তার জন্যে অপরাধী নই। আচ্ছা, আমি চল্‌লুম।" বিজয়া কহিল, "খেয়ে যাবেন না ?" নরেন উদ্ধত ভাবে কহিল, "না, খাবার জন্যে আসিনি।" বিজয়া শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনি ত ডাক্তার,—আপনি হাত দেখ্‌তে জানেন ?" এইবার তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা ধরা পড়িয়া গেল। নরেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি কি আপনার উপহাসের পাত্র ? টাকা আপনার ঢের থাক্‌তে পারে, কিন্তু সে জোরে ও অধিকার কারও জন্মায় না জান্‌বেন। আপনি একটু হিসেব কোরে কথা কইবেন,—" বলিয়া সে লাঠিটা তুলিয়া লইল। বিজয়া কহিল, "নইলে আপনার গায়ে জোর আছে, এবং হাতে লাঠি আছে ?" নরেন লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া হতাশ ভাবে চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া বলিল—"ছি ছি—আপনি যা মুখে আসে, তাই যে বল্‌চেন। আপনার সঙ্গে আমি আর পারিনে।"

"কিন্তু মনে থাকে যেন!" বলিয়া আর সে আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া হাসি চাপিতে-চাপিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। একাকী ঘরের মধ্যে নরেন হতবুদ্ধির মত খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহার লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "আপনার জন্যই আমার যখন দেরি হয়ে গেল, তখন আপনারও চলে যাওয়া হবে না। আপনি হাত দেখ্‌তে জানেন,—চলুন আমার সঙ্গে।" নরেন যাওয়ার কথাটা বিশ্বাস করিল না। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হবে হাত দেখ্‌তে ?"

তাহার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইবার বিজয়া গম্ভীর হইল; কহিল, "এখানে ভাল ডাক্তার নেই। আমাদের যিনি নূতন আচার্য্য হয়ে এসেছেন,—তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি—আজ দু'দিন হ'ল তাঁর ভারি জ্বর হয়েচে; চলুন, একবার দেখে আস্‌বেন।" "আচ্ছা, চলুন।" বিজয়া কহিল, "তবে একটু দাঁড়ান। সেই পরেশ ছেলেটিকে ত আপনি চেনেন,—পরশু থেকে তারও জ্বর। তার মাকে আন্‌তে বলে দিয়েচি।" বলিতে-বলিতেই পরেশের মা ছেলেকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন নিমিষমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই কহিল, "তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও, আমার দেখা হয়েচে।"

তাহার মা এবং বিজয়া উভয়েই আশ্চর্য্য হইল। মা মিনতির স্বরে বলিল, "সমস্ত গায়ে ভয়ানক বেদনা বাবু, নাড়ীটা দেখে একটু ওষুধ টষুধ যদি দিতেন—" "বেদনা আমি জানি বাপু, তোমার ছেলেকে ঘরে নিয়ে যাও, হাওয়া টাওয়া লাগিয়ো না, ওষুধ আমি পাঠিয়ে দিচ্চি।" মা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই ছেলেকে লইয়া চলিয়া গেল। তখন নরেন বিজয়ার বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "ছেলেটির বসন্ত হয়েচে,—একটু সাবধানে রাখ্‌তে বলে দেবেন।"

বিজয়ার মুখ কালো হইয়া গেল,—"বসন্ত ? বসন্ত হবে কেন ?" নরেন কহিল, "হবে কেন, সে অনেক কথা। কিন্তু হয়েচে। আজও ভাল বোঝা যাবে না বটে, কিন্তু, কাল ওর পানে চাইলেই জান্‌তে পারবেন। আমার মনে হচ্চে আপনার আচার্য্য বাবুকেও দেখ্‌বার বিশেষ আবশ্যক নেই—তাঁর অসুখটাও খুব সম্ভব কালকেই টের পাবেন।"

ভয়ে বিজয়ার সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতে লাগিল। সে অবশ নির্জ্জীবের মত চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "আমারও নিশ্চয় বসন্ত হবে নরেনবাবু—আমারও কাল রাত্রে জ্বর হয়েছিল, আমারও গায়ে ভয়ানক ব্যথা।" নরেন হাসিল, কহিল, "ব্যথা ভয়ানক নয়, ভয়ানক যা হয়েচে তা' আপনার ভয়। বেশ ত, জ্বরই যদি একটু হয়ে থাকে, তাতেই বা কি! দু'একজনের বসন্ত দেখা দিয়েচে বলেই যে গ্রামসুদ্ধ সকলেরই তাই হতে হবে, তার কোন মানে নেই।" বিজয়ার চোখ ছল ছল্‌ করিয়া উঠিল। কহিল, "হলেই বা আমাকে দেখ্‌বে কে? আমার কে আছে ?"

নরেন পুনরায় হাসিয়া কহিল, "দেখ্‌বার লোক অনেক পাবেন, সে ভাবনা নেই—কিন্তু কিছু হবে না আপনার।"

বিজয়া হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না হলেই ভাল। কিন্তু কাল রাত্রে আমার সত্যিই খুব জ্বর হয়েছিল। তবু সকাল বেলা জোর কোরে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দয়াল বাবুকে দেখ্‌তে যাচ্ছিলুম। এখনও আমার একটু-একটু জ্বর রয়েচে, এই দেখুন—" বলিয়া সে ডান হাত বাড়াইয়া দিল। নরেন কাছে গিয়া তাহার কোমল শীতল

হাতখানি নিজের শক্তিমান কঠিন হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া মুহূর্ত্তকাল পরেই ধীরে-ধীরে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "আজ আর কিছু খাবেন না, চুপ করে শুয়ে থাকুন গে। কোন ভয় নেই, কাল-পরশু আবার আমি আস্‌ব।" "আপনার দয়া"—বলিয়া বিজয়া চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু কথাটা তীরের মত গিয়া নরেন্দ্রর মর্ম্মমূলে বিঁধিল। প্রত্যুত্তরে আর সে কোন কথাই বলিল না বটে, কিন্তু নীরবে লাঠিটি তুলিয়া লইয়া যখন ঘরের বাহির হইয়া গেল, তখন এই ভয়ার্ত্ত রমণীর অসহায় মুখের দয়া ভিক্ষা তাহার বলিষ্ঠ পুরুষ চিত্তকে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত মথিত করিতে লাগিল।

পরদিন কাজের ভিড়ে কোনমতেই সে কলিকাতা ত্যাগ করিতে পারিল না। কিন্তু তাহার পরদিন বেলা নয়টার মধ্যেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাগানে পা দিতেই কালিপদ তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল, "মায়ের বড় জ্বর বাবু, আপনি একেবারে ওপরে চলুন।"

নরেন্দ্র বিজয়ার ঘরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন সে প্রবল জ্বরে শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে। কে একজন প্রৌঢ়া নারী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে, এবং অদূরে চৌকির উপর পিতা পুত্র রাস ও বিলাস বিহারী মুখ অসাধারণ গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছে। উভয়ের কাহারই চিত্ত যে ডাক্তারের আগমনে আশায় ও আনন্দে নাচিয়া উঠিল না, তাহা না বলিলেও চলে।

বিলাসবিহারী ভূমিকার লেশমাত্র বাহুল্য না করিয়া সোজা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি না কি পরশু এসে বসন্তের ভয় দেখিয়ে গেছেন?"

কথাটা এতবড় মিথ্যা যে, হঠাৎ কোন জবাব দিতেই পারা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া বিজয়া রক্তচক্ষু মেলিয়া চাহিল। প্রথমটা সে যেন ঠাহর করিতে পারিল না; তার পরে দুই বাহু বাড়াইয়া কহিল, "আসুন।"

নিকটে আর কোন আসন না থাকায় নরেন্দ্র তাহার শয্যার একাংশে গিয়াই উপবেশন করিল। চক্ষের পলকে বিজয়া দুই হাত দিয়া সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কাল এলে ত আজ আমার এত জ্বর হোতো না—আমি সমস্ত দিন পথ চেয়ে ছিলুম।"

নরেন্দ্র ডাক্তার,—তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, প্রবল জ্বর উগ্র মদের নেশার মত অনেক আশ্চর্য্য কথা মানুষের ভিতর হইতে টানিয়া আনে; কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব, না মুখে না অন্তরে, কোথাও হয় ত থাকে না। কিন্তু অনতিদূরে বসিয়া দুর্ভাগ্য পিতাপুত্রের মাথার চুল পর্য্যন্ত ক্রোধে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। নরেন সহজ সান্ত্বনার স্বরে প্রসন্ন মুখে কহিল, "ভয় কি, জ্বর দুদিনেই ভাল হয়ে যাবে।"

তাহার হাতখানা বিজয়া একেবারে বুকের উপর টানিয়া লইয়া একান্ত করুণ সুরে কহিল, "কিন্তু আমি ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না বল? তুমি চলে গেলে আমি হয় ত বাঁচ্‌ব না।" জবাব দিতে গিয়া নরেন মুখ তুলিতেই দুই যোড়া ভীষণ চক্ষুর সহিত তাহার চোখো চোখি হইয়া গেল। একান্ত সন্নিকটবর্ত্তী নিঃশঙ্কচিত্ত শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বাহ্ণে ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেমন করিয়া চাহে, ঠিক তেমনি দুই প্রদীপ্ত চক্ষু মেলিয়া বিলাসবিহারী তাহার প্রতি চাহিয়া আছে!

সাময়িকী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-প্রদানের সভা (Convocation) হইয়া গিয়াছে। এবার দুই দিন সভা হইয়াছে। সনন্দলাভের জন্য এত ছাত্র সমাগত হন যে, এক দিনে সমস্ত ছাত্রকে সনন্দ দান ও মামুলী বক্তৃতা শেষ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িত; এই জন্য এবার দুই দিন অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া কার্য্য শেষ করা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার মাননীয় শ্রীযুক্ত বড় লাট বাহাদুর এবার উপাধি-দান সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই; বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর (Rector) বাঙ্গালার গবর্ণর মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড রোনাল্ডসে মহোদয় দুই দিনই সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় চারি বৎসর পরে

এবার অবসর গ্রহণ করিতেছেন ; তজ্জন্য মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর ও মাননীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর তাঁহার ধন্যবাদ করিয়াছেন। এখন কে ভাইস-চ্যান্সেলার হইবেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই ; তবে অনেকেই বলিতেছেন যে, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহোদয়ই উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান-সভায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও বক্তৃতা হইয়াছিল ; মাননীয় রেক্টর শ্রীযুক্ত রোনাল্ডসে মহোদয় ও ভাইস-চ্যান্সেলার মাননীয় শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারী মহোদয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। গবর্ণর বাহাদুর দুইদিনেই কয়েকটা সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে সেই কয়েকটা কথার উল্লেখ করিব। প্রথম দিনের বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনেক ছাত্র উত্তীর্ণ হইতেছে, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই কলিকাতার কলেজসমূহে প্রবিষ্ট হইবার জন্য আসিয়া থাকে ; কিন্তু কলিকাতায় যে কয়েকটা কলেজ আছে, তাহাতে এত অধিক সংখ্যক ছাত্রের স্থান হয় না এবং যতগুলি ছাত্রাবাস আছে, তাহাতেও তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হয় না। এ জন্য অনেক ছাত্রকে বিফলমনোরথ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে হয়। মফস্বলের কলেজগুলিও এত ছাত্রের স্থান দিতে পারে না। এই অসুবিধা দেখিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট ১৯১৭ সালের ২৯শে মে তারিখের এক পত্রে বলেন—

"It is thought that the University might consider the propriety of taking steps for discouraging the immigration of first and second year students into Calcutta and increasing the facilities for their education in cheaper and more suitable surroundings nearer their homes. Such education could be provided in second grade colleges outside Calcutta, in towns where no first grade colleges exist or in additional classes to be attached to a certain number of high schools in which students might be permitted to prepare for the Intermediate Examination."

ইহার মর্ম্ম এই যে, মফস্বল হইতে অধিকাংশ ছাত্র কলিকাতায় পড়িতে না আসিলেই ভাল হয়, মফস্বলে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ আরও খুলিলে এবং বড় বড় এণ্ট্রান্স স্কুলে কলেজের দুইটা শ্রেণী খুলিলে, অনেক ছাত্র অল্প ব্যয়ে পড়িতে পারে, তাহাদের কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজন হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যবস্থা করা উচিত। শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুরও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। আমরাও বলি, প্রত্যেক জেলায় যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ খোলা হয় এবং যে সমস্ত বড় জেলায় একটা কলেজ আছে, সেখানে আরও দুই একটা কলেজ স্থাপিত হয়, তাহা হইলে ছাত্রগণের পাঠের বিশেষ সুবিধা হয় এবং ব্যয়ও অল্প হয়। মাননীয় বড়লাট বাহাদুরের এই অভিপ্রায় সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোন ব্যবস্থা করেন নাই ; বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিসন এ সম্বন্ধে কি করেন, তাহাই দেখিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এ কার্য্যে অগ্রসর হন নাই। কমিসনের মন্তব্য প্রকাশিত হইলেই এ বিষয়ের কর্ত্তব্য স্থির হইবে।

দ্বিতীয় দিনের উপাধি দান-সভায় মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর অধিক কথা বলেন নাই ; তিনি মাত্র দুইটী কথা বলিয়াছেন এবং সে দুইটীই প্রধান কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে যে অধ্যাপনা হয়, তাহা বিশেষ কার্য্যকরী হইতেছে না, এ কথা গবর্ণর বাহাদুর স্পষ্টই বলিয়াছেন ; প্রবেশিকা বিদ্যালয়সমূহে যে ভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে ছাত্রগণ কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সমস্ত ভাষার সাহায্যে অধীত বিষয়সমূহ অধিগত করিতে পারে না। গবর্ণর বাহাদুর বলিয়াছেন যে, যে সকল ছাত্র ইংরেজী সাহিত্যে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে চায়, তাহারা ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করুক, কিন্তু "I should have thought that the boy who could translate a column of a vernacular newspaper into good plain English would be far better equipped for the struggle of life than the boy who could give an answer to such questions as I have quoted." অর্থাৎ "আমার মনে হয় যে, আমি যে প্রকারের প্রশ্নের কথা বলিয়াছি (অর্থাৎ

স্যাম্সন এগোনষ্টেসের কাব্য-সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা প্রভৃতি), তাহার যথাযথ উত্তর দিবার শিক্ষালাভ অপেক্ষা, ছাত্র যদি তাহার দেশীয় ভাষায় লিখিত কোন সংবাদপত্রের কোন অংশের সুন্দর ইংরেজী অনুবাদ করিতে পারে, তাহা হইলে সে ছাত্র ভবিষ্যৎ জীবন সংগ্রামের জন্য অধিকতর প্রস্তুত হইয়াছে, বলিতে হইবে।" সেই সঙ্গে-সঙ্গেই গবর্ণর বাহাদুর বলিতেছেন—"By all means let those whose bent lies in that direction, study the master-pieces of English literature, but that is a very different thing from compelling all and sundry to study a literature which is not their own and which has no relation whatsoever to the daily experience of their own lives."—অর্থাৎ যাহাদের ইংরেজী সাহিত্য অধিগত করিবার আগ্রহ আছে, তাহারা উক্ত সাহিত্য বিশেষভাবে পাঠ করুক না; কিন্তু তাই বলিয়া যাহাদের সে দিকে প্রবৃত্তি নাই এবং যে সাহিত্য বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়া যাহাদের দৈনিক জীবন যাত্রার কোন সুবিধাই হয় না, তাহার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করা হয় কেন? গবর্ণর বাহাদুর বলিতে চান যে, ইংরেজী সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ করা যাহাদের ইচ্ছা, তাহারা সেই পথে যাক; কিন্তু যাহারা সে দিকে যাইতে চাহে না, তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া সে পথে লওয়ায় কোন ফল নাই; তাহার পরিবর্ত্তে কাজ চলা রকম ইংরেজী শিখিলেই তাহাদের লাভ হয়।

তাহার পর মাননীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর একটী অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে সকল ছাত্র বি-এ পরীক্ষা দেয়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই দর্শন-শাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকে। গবর্ণর বাহাদুর ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ; এ দেশের ছাত্রগণের যে দর্শন শাস্ত্রের দিকেই বিশেষ ঝোঁক হইবে, তাহা স্বাভাবিক; এবং তাহাতে আমি আশ্চর্য্য বোধ করি নাই। কিন্তু "What did surprise me was to learn that up to the B. A. degrees Indian Philosophy finds no place in the curriculum."—অর্থাৎ "আমার আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে যে, দর্শনশাস্ত্রে যাহারা বি-এ পরীক্ষা দেয়, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের বহি একখানিও নাই।" গবর্ণর বাহাদুর আরও বলিতেছেন যে,—"That an Indian student should pass through a course of Philosophy at an Indian University without even hearing mention of, shall I say, Sankara, the thinker who perhaps has carried idealism farther than any other thinker of any other age or country; of the subtleties of the Nyaya System which has been handed down through immemorial ages, and is to-day the pride and glory of the Tols of Navadwip, does, indeed, appear to me to be a profound anomaly." অর্থাৎ—"ভারতবাসী একটী ছাত্র দর্শন বিষয়ে উপাধি লাভ করিতেছে, অথচ সে আচার্য্য শঙ্করের নাম জানে না, তাঁহার কথা পড়ে না। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় দার্শনিক পণ্ডিত, তাঁহার মায়াবাদের ন্যায় উচ্চ দর্শন পৃথিবীর কোন যুগে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করে নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। যে ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে উপাধিলাভ করিতেছে, সে হিন্দু ন্যায় দর্শনের একটা কথাও জানে না; অথচ সেই ন্যায়-দর্শন যুগ যুগান্তর হইতে ভারতের গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিতেছে এবং এখনও নবদ্বীপের টোলসমূহ সেই ন্যায় দর্শনের গৌরবে গৌরবান্বিত। এমন গভীর অব্যবস্থা ত আমি কখনও দেখি নাই।" গবর্ণর বাহাদুরের মুখে কথাটা শুনিয়া আমাদের বিশ্বপণ্ডিতগণ বলিবেন "তাই ত! কথাটা ত ঠিকই!"

আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা। শিক্ষার প্রভাবে আত্মপ্রত্যয়, এবং আত্মপ্রত্যয়ের প্রভাবে অন্তর্নিহিত শক্তি জাগিয়া উঠে। এই শক্তি জাগিলে মানুষ নিজে চিন্তা করিতে—নিজে সন্ধান করিতে—নিজে কাজ করিতে শিখে। কাজেই শিক্ষা জিনিসটার যেমন করিয়াই হউক বিস্তার সাধন করিবার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক। যিনি সে চেষ্টা করেন, তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদ লাভের

যাগা। এইজন্য প্রথমেই আমরা শ্রীযুক্ত অনারেবেল সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সুরেন্দ্রবাবু সম্প্রতি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার উদ্দেশ্যে এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করিয়াছেন। স্যর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ সে পাণ্ডুলিপির প্রতি যৎকিঞ্চিৎ সহানুভূতিও দেখাইয়াছেন। ইহাই তো চাই! রবীন্দ্রবাবুর ভাষাতেই বলি, দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্ব্বপ্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হইব;—অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব—ইহা নিশ্চয়। যে নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম ও চরিত্র বিকার—বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোন সভা সমিতি, কোন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের দ্বারা তাহা নিবারণের কোন উপায় নাই।"

তবে শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে কিরূপ প্রণালীতে তাহা দেওয়া উচিত, তাহাই এখন ভাবিবার কথা। কারণ, যে শিক্ষায় দেশে কেবল অক্ষরবিদের সৃষ্টি করে, সেই শিক্ষার বিস্তার করা যদি সুরেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমরা স্পষ্টই বলিতেছি যে, সে শিক্ষার আদৌ প্রয়োজন নাই।—তাহাতে দেশে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। সে শিক্ষায় মানুষের মন খাটে না,—কেবল তোতা-পাখী বনিয়া যায়। জগত নিগ্রো কর্ম্মবীর বুকার টি ওয়াশিংটন এ সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা হইতে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা বড় খাঁটি কথা।—তাহা আমাদেরও এ সময়ে মনে রাখা দরকার। তিনি বলিয়াছেন,—"অনেক স্থলে দেখিয়াছি, শিক্ষা-প্রচারকেরা সমাজের অবস্থা বুঝিয়া বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করেন না। অবনত ও দরিদ্র লোক-সমাজে শিক্ষা-বিস্তার করিতে যাইয়া বহু সৎপ্রয়াসী কর্ম্মিগণ এজন্য সুফল সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। অন্য এক সমাজে যে অনুষ্ঠানে ফললাভ হইয়াছে, তাহাই অবনত সমাজে প্রবর্ত্তন করিতে যাইয়া তাঁহারা বিফল হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝেন না যে, এক সমাজের যাহা শুভ, অন্য সমাজের তাহা অশুভও হইতে পারে। শ্বেতকায় সমাজে যাহাকে উন্নত শিক্ষাপ্রণালী বলি, তাহাই যে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো সমাজে সুফল প্রসব করিবে, কে বলিতে পারে? এমন কি, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন যুগে হয় ত একটা অনুষ্ঠানের দ্বারা সুফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার দ্বারাই যে এখনও উপকার হইবে, এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি? কিন্তু শিক্ষা-প্রচারকেরা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়াই অনেক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, দেখিতে পাই। শিক্ষকেরা মনে করেন যে, ছাত্রেরা সকলেই একরূপ, সকলকেই একই প্রণালীতে, একই আদর্শে, একই জীবন-যাপন-প্রথার ভিতর দিয়া মানুষ করা যায়। এজন্য সকলের উপর একটি পেটেণ্ট ছাপ মারিয়া দিবার জন্য শিক্ষকেরা সাধারণতঃ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, মানুষ বিচিত্র, ছাত্রগণের স্বভাব বিভিন্ন; এক একজনের এক একপ্রকার মেজাজ, প্রবৃত্তি ও ধারণা। সুতরাং প্রত্যেকের অভাব বুঝিয়া শিক্ষা দিলেই সুফল আনিতে পারে।"—আমাদেরও এই বক্তব্য। শিক্ষায় সমাজ;—শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ কোন্ মূর্খ করিবে? তবে কথা এই যে, স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া শিক্ষাদান-প্রণালীর ব্যবস্থা করিতে হইবে; নহিলে, শিক্ষা বিড়ম্বনার নামান্তর হইয়া দাঁড়াইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, এই শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা কোথা হইতে আসিবে? আমাদের উত্তর এই যে, কর্ত্তৃপক্ষ যদি এ বিষয়ে একটু উদ্যোগী হন, তাহা হইলে টাকার অভাব হইবে না। কর্ত্তৃপক্ষ উদ্যোগী হইয়াছেন, অথচ অর্থাভাবে কার্য্য ব্যর্থতাবহন করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে বলিয়া মনে হয় না। কর্ত্তৃপক্ষ হাত পাতিলে এদেশের লোক কখনও হাত গুটাইয়া লয় না। এদেশের স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি সমস্তই এদেশবাসীর টাকায় নির্ম্মিত।—এখন শুধু কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতির প্রয়োজন। আমরা আশা করি, সুরেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবও সহানুভূতির অভাবে শুকাইয়া মরিবে না।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী প্রণীত 'রসির বাজারী' প্রকাশিত হইয়া আট আনা-গল্পমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল প্রণীত "[illegible]" নামক গল্পের বই প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আট আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "স্বামী" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য বার আনা।

শ্রীযুক্ত কালোবরণ ঘোষ প্রণীত "বিধি নিষেধ" প্রকাশিত হইল। মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র সান্যাল প্রণীত 'আত্মদর্শন' প্রকাশিত হইয়াছে। দক্ষিণা বার আনা।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "বাগ্দত্তা"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য দুই টাকা।

এবার ইন্দোর নগরে আগামী ২৯, ৩০ ও ৩১শে মার্চ তারিখে অষ্টম হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গান্ধি সভাপতির পদে বৃত হইয়াছেন। এতৎসহ একটি সাহিত্যিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হইয়াছে। এতজ্জন্য স্বাগতকারিণী সমিতির মন্ত্রী রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরজুপ্রসাদ হিন্দী সাহিত্য সংক্রান্ত প্রদর্শনযোগ্য পুস্তকাদি সমিতির সাহিত্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বনারসী-দাস চতুর্বেদী মহাশয়ের নিকট অবিলম্বে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। প্রদর্শনী সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য সংবাদ চতুর্বেদী মহাশয়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুই টাকা মূল্যে বৌদ্ধ যুগের "করুণা" বিতরণ করিতেছেন।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকদার প্রণীত '[illegible]' উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ হইতেছে।

গত ৪ঠা [illegible] বেলা সাড়ে চারি ঘটিকার সময় সঙ্গীত সঙ্ঘের উদ্যোগে [illegible] কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে একটি সঙ্গীত আসরের অধিবেশন হইয়াছিল। সঙ্গীত সঙ্ঘ একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়—শ্রীমতী প্রতিভা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া গত দশ বৎসর কাল চলিতেছে। এই বিদ্যালয়ে সঙ্গীত-শিক্ষার উত্তমরূপ ব্যবস্থা আছে। কণ্ঠসঙ্গীতের উচ্চশ্রেণীর প্রফেসর ভারতবর্ষের বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—এবং সেতারের ক্লাশের উচ্চশ্রেণীতে শিক্ষাদানের জন্য প্রফেসর কেরামতুল্যা খাঁ সাহেব এবং প্রফেসর শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর মিশ্র প্রভৃতি বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্গণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইঁহারা রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদিগের বাৎসরিক পরীক্ষা কালে যাঁহারা যেরূপ শ্রেণীতে উঠিয়াছেন, তাহাদিগকে উক্ত দিবস কোচবিহারের মহারাণী অধিরাণী স্বয়ং পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনে যন্ত্রাদি সহযোগে ছাত্রছাত্রীদের গান হইয়া সভাভঙ্গ হয়। সুজাতা সেন ও ও বেলা, গার্গী, মেধা প্রভৃতি উত্তম হিন্দী গান গাইয়াছিলেন।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

শিল্পী শ্রীভবানীচরণ লাহা

Emerald Printing Works

বৈশাখ, ১৩২৫

দ্বিতীয় খণ্ড] পঞ্চম বর্ষ [পঞ্চম সংখ্যা

পুরাণে প্রাকৃতিক ইতিহাসের মূল নিদর্শন

[অধ্যাপক শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ]

পাশ্চাত্যদিগের নবপ্রচারিত "প্রাকৃতিক ইতিহাস" (Natural History) ইতিহাসের ক্ষেত্র অতি আশ্চর্য্য রূপেই বিস্তীর্ণ করিয়াছে। প্রাকৃতিক ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, মানবজাতির ইতিহাসই ইতিহাসের একমাত্র বিষয় নয় ; কিন্তু পৃথিবীতে মানবাতিরিক্ত জীব ও জীবনও ইতিহাসের বিষয়। ভারতবর্ষে মানবজাতিরই ধারাবাহিক ইতিহাস নাই বলিয়াই যখন অপবাদ প্রচলিত হইয়াছে, তখন জীব ও জীবনের যে ইতিহাস থাকিবে, তাহা কাহারও প্রত্যয়যোগ্য হওয়ার বিষয় নহে। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে স্বতন্ত্র 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' প্রণীত না হইলেও, পুরাণ হইতে আমরা প্রাকৃতিক ইতিহাসের মূল উপাদান উদ্ধারের আশা করিতে পারি ; কারণ, পুরাণে কেবল মানববংশাদিই কীর্ত্তিত হয় নাই ; পরন্তু সর্গ, প্রতিসর্গ প্রভৃতি পৃথিবীর আদি বৃত্তান্তও বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ নিবিষ্ট ভাবে পুরাণের আলোচনা করিলে, তাহাতে প্রাকৃতিক ইতিহাসের বিশেষ নিদর্শনই আমরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই। এই প্রসঙ্গে আমরা সেই নিদর্শন সকলই পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতে উদ্যত হইয়াছি।

পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে বায়ু-পুরাণের বিবরণ হইতে কয়েকটী স্থল আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিব :—

"তদানাত্যম্বু শীতোষ্ণা যুগে তস্মিংশ্চরন্তি বৈ ॥"

"ন তাসাং প্রতিঘাতোঽস্তি নদ্বন্দ্বং নাপিচক্রমঃ।

পর্ব্বতোদধি সেবিন্যো হ্যনিকেতাশ্রয়াস্ততাঃ

বিশোকাঃ সত্ত্ববহুলা একান্ত সুখিতপ্রজাঃ ॥

পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব ন তদাসন্ সরীসৃপাঃ ॥

নোদ্ভিজ্জা নারকাশ্চৈব তেহ্যধর্ম্ম প্রসূতয়ঃ।

নমূলফলপুষ্পঞ্চ নার্ত্তব গৃতবোনচ ॥" অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

"সেই যুগাদিম-কালে শীত, বৃষ্টি ও আতপাদি অত্যল্পই ছিল।" "তৎকালে সেই সহস্র-সহস্র প্রজার শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বক্লেশ, ক্রম কিছুই ছিল না ; তাহারা পর্ব্বত-সাগরাদির সেবা করিয়া শোকহীন, সত্ত্বপ্রধান ও একান্ত সুখী ছিল। কাহারও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না।"

"তখন পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উদ্ভিদ্ বা অধস্তজাত নারকীয় জীব ছিল না। মূল, ফল, পুষ্প আর্ত্তব কিংবা ঋতু কিছুই ছিল না।"

উদ্ধৃত বিবরণের সহিত তুলনা করিবার জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পৃথিবীর আদিযুগের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাই আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিব :—

"The further conclusion was drawn that the climate of the earth, owing to this dense atmosphere, was semitropical from pole to pole; that there was no appreciable zones of climate and no seasons, but a murky, cloud-laden, moist summer all the year round, all over the known earth, until the close of the carboniferous, when the atmosphere was relieved." The Evolution of Mind, by McCabe, pp. 135-6.

"আরও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এই ঘনীভূত বায়ুমণ্ডলবশতঃ এক মেরু হইতে অন্য মেরু পর্য্যন্ত পৃথিবীর জলবায়ু আংশিক ভাবে উষ্ণমণ্ডলের ন্যায় ছিল। জলবায়ুর কোন অনুভবযোগ্য বৃত্ত ছিল না এবং কোন ঋতুও ছিল না। কিন্তু সমগ্র বর্ষ ব্যাপিয়াই পৃথিবীর পরিজ্ঞাত সর্ব্বাংশেই অন্ধকারময় মেঘভারাক্রান্ত আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বিরাজিত ছিল। অঙ্গারোৎপাদক কালের শেষ পর্য্যন্ত যত দিন বায়ুমণ্ডল ভারমুক্ত না হইয়াছিল, ততদিন এই অবস্থাই বর্ত্তমান ছিল।"

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 'অর্দ্ধোষ্ণ' (semitropical), 'মেঘভারাক্রান্ত' (cloudladen) এবং 'আর্দ্র গ্রীষ্মকাল' (moist summer) প্রভৃতি বর্ণনায় পুরাণের 'নাত্যুষ্ণশীতোষ্ণ' বর্ণনার সহিত ঐক্যই দৃষ্ট হইতেছে। পুরাণে ঋতুর অস্তিত্ব যেরূপ স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হইয়াছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও তদ্রূপ স্পষ্ট ভাবেই অস্বীকার করা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিলুরিয়ান্ যুগ (Silurian Age) সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"A subdivision of the Palaeozoic, containing hardly any vertebrates and plants."—Chamber's Twentieth Century Dictionary—ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই যুগে "মেরুদণ্ডী জীব ও স্থল-বৃক্ষের নিদর্শন প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না।" সুতরাং এই যুগকে আমরা পুরাণের সত্যযুগ বলিয়াই মনে করিতে পারি। সত্যযুগে পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি ছিল না বলিয়া যে বর্ণিত হইয়াছে—সিলুরিয়ান্ যুগের বর্ণনায় তাহা বিশেষ রূপেই প্রমাণিত হয়। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ মেরুদণ্ডী জীব ও স্থলে বিচরণকারী জন্তু। ইহাদের সহিত উল্লিখিত হওয়ায় উদ্ভিদ্‌ও স্থলজ উদ্ভিদ্ বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে সত্যযুগের বর্ণনার সহিত সিলুরিয়ান্ যুগের বর্ণনার বর্ণে-বর্ণেই মিল হয়।

পুরাণে কৃত বা সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগে উদ্ভিজ্জাদির উৎপত্তি হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"সকৃদেব তয়া বৃষ্ট্যা সংযুক্তে পৃথিবীতলে।
প্রাদুরাসংস্তদা তাসাং বৃক্ষাস্তু গৃহসংস্থিতাঃ॥
সর্ব্বপ্রত্যুপভোগস্তু তাসাং তেভ্যঃ প্রজায়তে।
বর্ত্তয়ন্তি হি তেভ্যস্তাস্ত্রেতাযুগমুখে প্রজাঃ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ, বায়ুপুরাণম্।

"একবার মাত্র সেই বৃষ্টি হইলেই প্রজাগণের বাসস্থান-সমূহে বিবিধ বৃক্ষ সমুৎপন্ন হয়। তাহা হইতে প্রজাবর্গের বিবিধ উপভোগ-প্রাপ্তি ঘটে। ত্রেতাযুগের প্রথমাবস্থায় প্রজাবর্গ তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।"

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বর্ণনায়ও দেখিতে পাওয়া যায়, Silurian বা প্রথম যুগের শেষে অঙ্গারোৎপাদক কালের শৈত্য প্রভাবের মধ্যেই বিবিধ উদ্ভিজ্জের উৎপত্তি হয় :—

"Professor Chamberlain grants that in the Silurian and Devonian there is "much to suggest uniformity of climate," and that the lower carboniferous climate seems to have been "essentially uniform, genial, and moist." The subtropical vegetation spreading from Spitzbergen to Australia in the carboniferous plainly points to this. On the other hand, it is not disputed that the climate fell considerably, that trees of the pine and yew character appear for the first time, and that

fields of snow and ice covered large stretches of the Earth's surface, at the close of the carboniferous." The Evolution of Mind, by McCabe, p. 137.

"অধ্যাপক চেম্বারলেন্ স্বীকার করেন যে, সিলুরিয়ান ও ডিভোনিয়ান্ যুগে জলবায়ুর সমতা সম্বন্ধে আভাস প্রদান করিবার যথেষ্ট প্রমাণই আছে; এবং আরও স্বীকার করেন যে, অঙ্গারোৎপাদক কালের মৃদু জলবায়ু মূলতঃ সমতাবিশিষ্ট, সুখকর ও আর্দ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অঙ্গারোৎপাদক কালে স্পিজ্‌বার্গেন হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত গ্রীষ্মমণ্ডলোচিত উদ্ভিদ্ পরিষ্কাররূপেই এতদ্বিষয় সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করে। পক্ষান্তরে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই যে, জলবায়ু যথেষ্ট ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল এবং তখন প্রথম দেবদারু ও ইয়ু জাতীয় বৃক্ষ সকলের আবির্ভাব হয়। অপরন্তু অঙ্গারোৎপাদক কালের শেষে পৃথিবী-পৃষ্ঠের বহুদূর পর্য্যন্ত নীহার ও তুষারের প্রান্তর দ্বারা আবৃত হইয়াছিল।"

পুরাণে ত্রেতাযুগে বৃষ্টিপাতের দ্বারা বৃক্ষাদি উৎপাদনের যে উল্লেখ আমরা পাইয়াছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে অঙ্গারোৎপাদনকালের মৃদু ও ঠাণ্ডা জল বায়ুর বর্ণনার সহিত উদ্ভিদাদির উৎপত্তির বিবরণে সেই বৃষ্টিপাতের স্পষ্ট আভাসই প্রাপ্ত হই; কারণ পূর্ব্বে যে বাষ্পপূর্ণ বায়ুমণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, শৈত্য প্রভাবে তাহা ঘনীভূত হইয়াই নীহারাদি উৎপাদনের হেতু হয়। জলবায়ুর সমতা ও সুখজনকতার বর্ণনাও পুরাণের "বিশোকাঃ সত্ত্ববহুলা একান্ত সুখিতপ্রজাঃ" এই বর্ণনাকেই সমর্থিত করে।

ত্রেতাযুগের প্রাগুক্ত বৃক্ষাদি উৎপত্তির বর্ণনার পর আবার আমরা তৎ সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার বিবরণ প্রাপ্ত হই। নিম্নে সেই বর্ণনাটী উদ্ধৃত হইতেছে :—

"বিপর্য্যয়েণ তাসাং তু তেন কালেন ভাবিনা।
প্রণশ্যন্তি ততঃ সর্ব্বে বৃক্ষাস্তে গৃহসংস্থিতাঃ॥"

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ, বায়ুপুরাণম্।

"ক্রমে কাল-পরিবর্ত্তন বশে প্রজাবর্গের নিবাসভূত পূর্ব্বোৎপন্ন বৃক্ষসমূহ বিনষ্ট হয়।"

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে অঙ্গারোৎপাদক কালের উদ্ভিদসমৃদ্ধি ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতেই কয়লা-স্তরের উৎপত্তি হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে উল্লিখিত বিপর্য্যয়ের এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে :—

"Their growth is checked at the end of the Devonian by a deep submergence of the surface of Europe * * * * In our coal we have the remains of the great forests that sprang up from the Arctic to the Equator, and even in Australasia from North America to Europe and China." Ibid, p. 132.

"ডিভোনিয়ান্ যুগের অবসানে ইউরোপের উচ্চ পৃষ্ঠের নিমজ্জন দ্বারা উদ্ভিদ্ সকলের উৎপত্তি বাধা প্রাপ্ত হয়। যে বিশাল অরণ্য সকল সুমেরু হইতে বিষুবমণ্ডলে এমন কি অষ্ট্রেলিয়াতে উত্তর আমেরিকা হইতে ইউরোপ ও চীনে উৎপন্ন হয়, আমাদের কয়লাতে আমরা তৎসমস্তেরই অবশেষ প্রাপ্ত হই।"

এইরূপে পৃথিবী-পৃষ্ঠ-নিমজ্জন রূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবের মধ্যেই আমরা পুরাণোক্ত ত্রেতাযুগে উদ্ভিদ্ উৎপত্তির পর উদ্ভিদ্ ধ্বংস বর্ণনার প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইতেছি।

উল্লিখিত উদ্ভিদ্ ধ্বংসের পর আবার উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়; কিন্তু কালে এই উদ্ভিদও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইহার বর্ণনা পুরাণে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

"প্রণষ্টা মধুনাসার্দ্ধং কল্পবৃক্ষাঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
তস্যামেবাল্প শিষ্টায়াং সন্ধ্যাকালবশস্তদা॥
প্রাবর্ত্তন্ত তদা তাসাং দ্বন্দ্বান্যভ্যুত্থিতানি তু॥
শীতবাতাতপৈস্তীব্রৈস্ততস্তা দুঃখিতাভৃশম্।
দ্বন্দ্বৈস্তাঃ পীড্যমানাস্তু চক্রুরাবরণানিচ॥
কৃত্বা দ্বন্দ্বপ্রতীকারং নিকেতানিহি ভেজিরে।
পূর্ব্বং নিকামচারাস্তে অনিকেতাশ্রয়াভৃশম্॥"

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ—বায়ুপুরাণম্।

"তৎ সমস্ত কল্পবৃক্ষ মধুসহ স্থানে-স্থানে বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই সন্ধ্যাংশকালে কল্পবৃক্ষ সকল ক্ষীণ হইলে তখন প্রজাবর্গের শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বক্লেশ প্রাদুর্ভূত হয়। যাহাতে শীত, বাত, আতপ দ্বারা পীড়িত প্রজাবর্গ তখন গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। সেই যথেচ্ছ-

বিহারী গৃহস্থগণ গাত্রাবরণ দ্বারা শীতবাতাতপ ক্লেশ নিবারণ করিয়া বাসস্থানসমূহ আশ্রয় করিতে আরম্ভ করে।"

এস্থলে শীতবাতের প্রাদুর্ভাবের যে কথা পাওয়া যায়, তাহাই বৃক্ষাদি নাশের এবং পশু-পক্ষীর উৎপত্তির কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও শীতপ্রভাবের মধ্যেই পশু-পক্ষীর উৎপত্তি হয় বলিয়া উপপাদিত হইয়াছে।

পশু পক্ষীদিগের উৎপত্তির যে বিবরণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পাওয়া যায়, তাহা হইতে শৈত্যপ্রভাবই যে প্রকৃত কারণ, তাহা স্পষ্টই জানিতে পারা যায়। এস্থলে আমরা সেই বিবরণটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Meantime the supervening cold had developed a new type, or two new types, of animals. The first bird as yet discovered belongs to the Jurassic, the first mammals to the end of the Permian, or beginning of the Triassic. We need not rely on geological speculations in attributing their birth to the supervening cold. Any Zoologist would pronounce independently of the geological record, that the substitution of feathers or fur for scales, the development of a four-chambered heart, and the new care of the young, mean special adaptation to colder environment." Ibid. p. 187.

"ইত্যবসরে মধ্যবর্ত্তী শৈত্য একটী বা দুইটী নূতন আদর্শের জন্তুর বিকাশ সাধন করিল। এ পর্য্যন্ত আদি পক্ষীর যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় যুগের দ্বিতীয়ভাগের অর্থাৎ সরীসৃপ যুগের জীব; প্রথম আবিষ্কৃত স্তন্যপায়ী জীব (পশু) প্রথম যুগের শেষভাগের বা দ্বিতীয় যুগের প্রথমভাগের জীব। ইহাদিগের উৎপত্তি মধ্যবর্ত্তী শৈত্যপ্রভাবজনিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গেলে আমাদিগের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনুমানের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন হইবে না। যে-কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতই ভূবৃত্তান্ত নিরপেক্ষ হইয়াও প্রকাশ করিবেন যে, শল্কের স্থলে পালক ও রোমের উৎপত্তি। চতুর্দ্ধা-বিভক্ত হৃদয়ের বিকাশ এবং শাবকদিগের জন্য নূতন প্রকারের যত্ন, এই সমস্তই শীতল পরিবেষ্টনের সহিত বিশেষ সামঞ্জস্যের কথা জ্ঞাপন করে।"

পশুদিগের বহু জাতিই যে বাসের জন্য বৃক্ষাশ্রয় করে, তাহা আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতেই জানিতে পারি। মনুষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বিকাশ লেমার নামক বানর জাতিকেও বৃক্ষবাসীই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সেই বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Probably enough, many of the mesozoic mammals like the South American Opposum to-day had taken to the trees and the advance from arboral to a lemur is intelligible." Ibid, p. 236.

"খুব সম্ভবতঃ মধ্যযুগের বহু স্তন্যপায়ী জীবই বৃক্ষাশ্রয় করিয়াছিল। তাহাতেই বৃক্ষবাসী দিগের পশু হইতে লেমার জাতীয় বানরে পরিণতি বোধগম্য হইয়াছে।"

লেমার জাতীয় বানরের ন্যায় মনুষ্যও এক সময় বৃক্ষবাসী ছিল বলিয়াই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রমাণ পাইয়াছে। পুরাণে কেবল যে মনুষ্যের আদি বৃক্ষবাসের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নহে; কিন্তু মনুষ্যের বর্ত্তমান গৃহের 'শালা' নাম যে সেই আদি ইতিহাসেরই স্মৃতি বহন করিতেছে—তাহাও স্পষ্টাক্ষরেই প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে পুরাণের সেই কৌতুকাবহ বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যথা তে পূর্ব্বমাসন্ বৈ বৃক্ষাস্তু গৃহসংস্থিতাঃ।
তথাকর্ত্তুং সমারব্ধাশ্চিন্তয়িত্বা পুনঃ পুনঃ॥
বৃক্ষাশ্চৈবঃ গতাঃ শাখা নতাশ্চৈব পরাগতাঃ।
অত ঊর্দ্ধং গতাশ্চান্যা এবং তির্য্যগ্ গতাঃ পুরা॥
বুদ্ধ্যান্বিষ্য স্তথান্যায়ো বৃক্ষশাখা যথাগতাঃ।
তথা কৃতাস্তু তৈঃ শাখাস্তস্মাচ্ছালাস্ততাঃ স্মৃতাঃ॥
এবং প্রসিদ্ধাঃ শাখাভ্যঃ শালাশ্চৈব গৃহাণিচ।
তস্মাত্তা নৈস্থতাঃ শালা শালাত্বং চৈব তাস্তুতৎ॥"

অষ্টমোধ্যায়ে :—বায়ুপুরাণম্॥

"সেই প্রজাবর্গ এই সমস্ত করিয়া, পূর্ব্বে তাহারা যেমন বৃক্ষাশ্রয়ে গৃহ নির্ম্মাণ করিত, তদ্রূপ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল। বিশেষ চিন্তাপূর্ব্বক বৃক্ষ নিদর্শনে বৃক্ষের শাখা বিস্তারের ন্যায় কাষ্ঠ বিস্তার করিয়া উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ করিল।

বৃক্ষশাখা যেমন একটা সম্মুখে, একটা পার্শ্বে, একের উপর আর একটা ইত্যাদিক্রমে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ ভাবে বিন্যস্ত হওয়ায় সেইসকল গৃহের "শালা"নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শাখাকারে নির্ম্মিত বলিয়া গৃহ সকল তৎকালাবধি শালা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; ইহাই শালাশব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্যার্থ।"

পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক বিপ্লবের নূতন গাত্রাবরণ ও বাসস্থানের পরিণতির সঙ্গে আমরা জীবিকা সম্বন্ধে নূতন পরিণতির বর্ণনাও পুরাণে প্রাপ্ত হই যথা :—

কৃত্বা দ্বন্দ্বোপঘাতাংস্তান্ বার্ত্তোপায়মচিন্তয়ন্।
নষ্টেষু মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষেষু বৈ তদা॥
বিষাদব্যাকুলাস্তা বৈ প্রজাস্তৃষ্ণাক্ষুধাত্মিকাঃ।
ততঃ প্রাদুর্বভৌ তাসাং সিদ্ধিস্ত্রেতাযুগে পুনঃ॥
বার্ত্তার্থসাধিকাপ্যন্যা বৃষ্টিস্তাসাং নিকামতঃ।
তাসাং বৃষ্ট্যুদকানীহ যানি নিম্নগতানি তু॥
বৃষ্ট্যা তদভবৎ স্রোতঃ খাতানি নিম্নগাঃ স্মৃতাঃ।
এবং নদ্যঃ প্রবৃত্তাস্তু দ্বিতীয়ে বৃষ্টিসর্জ্জনে॥
যে পরস্তাদপাং স্তোকা আপন্নাঃ পৃথিবীতলে।
অপাং ভূমেশ্চ সংযোগাদোষধ্যস্তাস্তদাভবন্॥
পুষ্পমূলফলিন্যস্তু ওষধ্যস্তাঃ প্রজজ্ঞিরে।
অকালকৃষ্টাশ্চানুপ্তা গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ॥
ঋতুপুষ্পফলৈশ্চৈব বৃক্ষাগুল্মাশ্চ জজ্ঞিরে।
প্রাদুর্ভাবশ্চ ত্রেতায়াং বার্ত্তায়ামৌষধস্য তু॥
তেনৌষধেন বর্ত্তন্তে প্রজাস্ত্রেতাযুগে তদা॥"

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ—বায়ুপুরাণম্।

"তাৎকালিক প্রজাবর্গ এইভাবে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব ক্লেশ নিবারণের উপায় করিয়া, তার পর জীবিকাবিষয়ক চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। কল্পবৃক্ষসকল বিনষ্ট এবং মধু বিলুপ্ত হওয়ায় প্রজাগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিষাদ-ব্যাকুল হইয়া পড়ে। অতঃপর সেই ত্রেতাযুগে পুনরায় তাহাদিগের অপর সত্যযুগের ন্যায় কামানুরূপ বার্ত্তার্থ সাধক বৃষ্টিরূপ সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। সেই দ্বিতীয় বৃষ্টি সৃষ্টিতে ভূতলে যে সকল স্থান পূর্ব্বে জলহীন শুষ্ক ছিল, তৎসমস্ত জলপূর্ণ হয়, খাত সকল নদী রূপে পরিণত হয়; আর স্থানে-স্থানে যে সকল জল আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার দ্বারা পৃথিবী রসবতী হইয়া শস্যশালিনী হয়। তখন অকালকৃষ্ট, অনুপ্ত পুষ্পমূলফলান্বিত গ্রাম্য ও আরণ্য চতুর্দ্দশবিধ ওষধি সমুদ্ভূত হয়। ঋতুভেদজাত পুষ্পফলান্বিত বিবিধ বৃক্ষ এবং বার্ত্তাসাধন নানাবিধ ওষধ এই ত্রেতাযুগেই আবির্ভূত হয়। সেই সকল ঔষধের গুণে তদানীন্তন প্রজাগণ সুখে কালাতিপাত করিতে থাকে।"

এই বর্ণনায় পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তির স্বাভাবিক বিকাশের সহিত স্বাভাবিক জীবিকা বিকাশের অতি চমৎকার বিবরণই পাওয়া যায়। প্রবন্ধের প্রথমেই সত্যযুগের বর্ণনায় 'ফলপুষ্পের' উৎপত্তি তখন হয় নাই বলিয়া আমরা উল্লেখ পাইয়াছি। ত্রেতা যুগের শেষে আসিয়া আমরা ফলপুষ্পের উৎপত্তির উল্লেখ পাইলাম। ইহা বিকাশ ইতিহাসের বিশেষ প্রমাণ বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে ফলের বিকাশ পশুদিগের বৃক্ষবাস জীবনের সমকালীন বলিয়াই জানিতে পারা যায় "The development of fruit on the Tertiary (or late Mesozoic) trees had, together with the feeling of greater security, led to the habit of climbing." The Evolution of Mind. p. 257.

"তৃতীয়যুগে বা মধ্যযুগের শেষে বৃক্ষসকলের ফলের বিকাশ ও তৎসঙ্গে অধিক নিরাপদ ভাবের ধারণা বৃক্ষারোহণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল।"

ইহা হইতে পাশ্চাত্য মধ্যযুগ ও পুরাণের ত্রেতাযুগ একই যুগ বলিয়া আমাদের বোধ হয়। এইপ্রকারে প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তের দ্বারা পুরাণের আপাত-প্রতীয়মান অসংলগ্ন যুগ-বর্ণনা সকলের আশ্চর্য্যরূপে সঙ্গতি সঙ্ঘটিত হইয়া পুরাণের প্রামাণিকতা অভাবিতরূপেই সাধিত হয়।

মহাকবি ভাস-প্রণীত

প্রতিমা

(নাটক)

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল সরস্বতী এম-এ, বি-এল]

(নান্দী হইয়া গেলে, তাহার পর সূত্রধার প্রবেশ করিল)

সূ। রাবণের যিনি অরি, সীতার মঙ্গলকারী
সুগ্রীব (১) সে রাম, সদা যিনি অতুলন,
সুমন্ত্রে (২) সন্তুষ্ট আর, বিভীষণ আত্মা যাঁর (৩)
ভরত, লক্ষ্মণ সীতা সহিত সে জন ;
জন্ম জন্ম আমাদের করুন রক্ষণ।

(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) আর্যে, এইদিকে এস।

নটী। (প্রবেশ করিয়া) আর্য্য, এই এসেছি।

সূ। আর্যে, এখন এই শরৎকালের বিষয়েই একটি গান গাও।

ন। আর্য্য, আচ্ছা। (গান গাহিল)

সূ। এই সময়ে
কাশাংশুক পরিধানে আনন্দে বিভোর প্রাণে
নদীর পুলিনে হংসী করে বিচরণ,

(নেপথ্যে) আর্য্য, আর্য্য

সূ। (শ্রবণ করিয়া) ও, বুঝেছি।
আজি ওই আনন্দিতা, প্রতীহার-রক্ষী যথা
দ্রুতপদে প্রবেশিছে নরেন্দ্র ভবন॥

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইল)

স্থাপনা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রতীহারী। (প্রবেশ করিয়া) আর্য্য, কঞ্চুকীদের মধ্যে কে এখানে উপস্থিত আছে ?

কাঞ্চুকীয়। (প্রবেশ করিয়া) ওগো, আমি আছি; কি করব ?

প্র। দেবাসুর সংগ্রামে যাঁহার রথের গতি অপ্রতিহত, সেই মহারাজ দশরথ আজ্ঞা করছেন, "যাহার দ্বারা রাজ্য-প্রভাব উৎপন্ন হয়,—ভর্তৃদারক রামের অভিষেক নিমিত্ত সেই সকল দ্রব্য শীঘ্র আনয়ন কর।"

কা। ওগো, মহারাজ যা আজ্ঞা করেছেন, তা সবই ঠিক রাখা হয়েছে। দেখ—
ছত্র ও চামর ওই, পটহ প্রস্তুত হোথা,
দাঁড়াইয়া বৈতালিকগণ,
কুশে ফুলে তীর্থ জলে ভরা হেমঘট শোভে,
রাখিয়াছে হের সিংহাসন ;
চক্রযুত রথ ওই (৪) সকল সচিব সহ
আসিয়াছে পৌরজনগণ,
এ সকল মঙ্গলের নিদান সে ভগবান
বেদী'পরে বশিষ্ঠ শোভন।

প্র। তা যদি হয়, তা হ'লে বেশ করেছ।

কা। ওগো—
রাম নামে প্রথিত যে শশাঙ্ক শোভন,
তার অভিষেক ছলে, আজি নৃপ ধরাতলে
চরিতার্থ করিলেন যত প্রজাগণ।

প্র। আর্য্য, এখন তাড়াতাড়ি করুন।

কা। ওগো, এই যে তাড়াতাড়ি করছি।

(নিষ্ক্রান্ত হইল)

প্র। (পরিক্রমণ করিয়া দেখিয়া) আর্য্য, সংভবক !

---

(১) সুগ্রীব=সুন্দর গ্রীবাবিশিষ্ট; অপর পক্ষে সুগ্রীব নামক বানর-পতি। (২) সুমন্ত্র=শোভন মন্ত্রণা; অপর পক্ষে সুমন্ত্র নামক অমাত্য। (৩) বিভীষণ আত্মা যাঁর=শত্রুদের পক্ষে যিনি ভয়ঙ্কর; অপর পক্ষে রাবণ-ভ্রাতা বিভীষণ যাঁহার প্রাণস্বরূপ।

(৪) অভিষেকের সময় একখানি রথও থাকিত, ইহা এই কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহা যুদ্ধার্থ ব্যবহৃত রথ নহে। মূলে আছে "পুষ্প রথ"। অমরকোষে আছে, "অসৌ পুষ্পরথশ্চক্রযানং ন সমবায় যৎ।" অর্থাৎ চক্রযুক্ত যে যান যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় না, তাহাই পুষ্প রথ। এখনও পাশ্চাত্য দেশে অবধি শোভাযাত্রার সময় নৃপতিগণের জন্য বহুমূল্য শকট ব্যবহৃত হয়। 'পুষ্পরথ'ও সেই শ্রেণীর।

সংভবক! যাও, তুমিও মহারাজের আদেশানুসারে আর্য্য পুরোহিতকে উপযুক্ত প্রকারে ত্বরা করতে বল। (অন্য দিকে গিয়া) সারসিকে! সারসিকে! সঙ্গীতশালায় গিয়া অভিনেতাদের জানাও—সময়োচিত নাটক অভিনয়ের জন্য সজ্জিত হোক্। (৫) আমিও এখন মহারাজকে জানাই যে সব ঠিক করা হয়েছে। (নিষ্ক্রান্ত হইল)

[তাহার পর বল্কল লইয়া (৬) অবদাতিকা প্রবেশ করিল]

অব। ওঃ, এই সাহসের কাজ করে কি ভয় হচ্ছে। পরিহাসচ্ছলে এই বল্কল আনাতে আমার এত ভয় হচ্ছে,—যারা লোভে পরধন হরণ করে, তাদের না জানি কি হয়? আমার হাস্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে। একলা হেসে কোন ফল নাই।

[তাহার পর পরিজন-পরিবৃতা সীতা প্রবেশ করিলেন]

সী। ওলো, অবদাতিকাকে শঙ্কিতার মত দেখাচ্ছে। কি আবার হ'ল?

চেটী। ভর্ত্তি, পরিজনেরা প্রায়ই অপরাধ করে। কোন কিছু অপরাধ করে থাক্‌বে।

সী। না, না, যেন হাস্‌তে ইচ্ছা করছে।

অ। (অগ্রসর হইয়া) ভর্ত্রীর জয় হোক্। ভর্ত্তি, আমি কোন অপরাধ করি নাই।

সী। কে তোমায় তা জিজ্ঞাসা করছে? অবদাতিকে, বাম হাতে এ কি ধরে রয়েছ?

অ। ভর্ত্তি, এ বল্কল।

সী। বল্কল কোথা থেকে আন্‌লে?

অ। ভর্ত্তি, শুনুন। নেপথ্য-পালিনী (৭) আর্য্যা রেবার কাছে,—অভিনয় হয়ে গেলে আর দরকার নাই, এমন অশোক গাছের একটি কিশলয় আমি চেয়েছিলুম। কিন্তু আমায় দেন নাই। সুতরাং অপরাধ হওয়া উচিত, এই মনে ক'রে আমি এটা নিয়েছি।

সী। অন্যায় করেছ। যাও, ফিরিয়ে দিয়ে এস।

অ। ভর্ত্তি, আমি তামাসা কর্‌বার জন্য এটা এনেছি।

সী। তুমি পাগল। এই রকম করেই দোষ বেড়ে যায়। যাও, ফিরিয়ে দিয়ে এস; ফিরিয়ে দিয়ে এস।

অ। যে আজ্ঞে। (যাইবার উদ্যোগ করিল)

সী। ওলো, আয় ত একবার।

অ। ভর্ত্তি, এই যে এসেছি।

সী। ওলো, আমি পরলে মানাবে?

অ। ভর্ত্তি, সুন্দরের সকলই শোভন; ভর্ত্তি, পরুন।

সী। আন্ দেখি। (লইয়া পরিধান করিয়া) ওলো, দেখ্ দেখি, ভাল দেখাচ্ছে?

অ। আপনাকে শোভাই পাচ্ছে। বল্কল যেন সোণার মত হয়েছে।

সী। কিলো, তুই যে কিছু বল্‌ছিস্ নি?

চে। কথা বলার কি দরকার? আমার আনন্দিত রোমগুলিই বলছে। (রোমাঞ্চ প্রদর্শন করিল)

সী। ওলো, আয়না আন্ দেখি।

চে। যে আজ্ঞে। (নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল) ভর্ত্তি, এই আয়না।

সী। (চেটীর মুখের দিকে চাহিয়া, আয়না থাক্। তুই কি যেন বল্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছিস্।

চে। ভর্ত্তি, আমি এই শুন্‌লুম। কঞ্চুকী আর্য্য বালাকি বল্‌ছেন "অভিষেক—অভিষেক।"

সী। কে রাজ্যের রাজা হবে।

[আর একজন চেটী প্রবেশ করিল]

চে। ভর্ত্তি, সু-খবর, সু-খবর।

---

(৫) ভাসের সময়ে রাজাদের প্রাসাদে নট নটী থাকার বিষয় এই কথা হইতে অনুমিত হইতে পারে। উৎসববিশেষে তাহারা সময়োচিত নাটক অভিনয় করিত।

(৬) অভিষেকের আয়োজন হইতেছে, এমন সময় কবি অন্য প্রকারে বল্কলের অবতারণা করাইয়া সূচনা করিলেন যে, পরে রামচন্দ্রের অভিষেকের পরিবর্ত্তে বল্কলধারণ করিয়া বনভ্রমণ ঘটিবে। ইহাকে আলঙ্কারিকেরা পতাকা-স্থান বলেন।

"যত্রার্থে চিন্তিতেঽন্যস্মিন্ তল্লিঙ্গোঽন্যঃ প্রযুজ্যতে।
আগন্তুকেন ভাবেন পতাকাস্থানকন্তুতৎ॥"

—সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(৭) সেকালে যে অভিনয়ে সাজসজ্জা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বল্কল প্রভৃতি পরিচ্ছদ, অশোক বৃক্ষের শাখা প্রভৃতি বস্তু ব্যবহৃত হইত। সাজসজ্জার দ্রব্যাদি একজনের অধিকারে থাকিত। এই ভারপ্রাপ্ত রমণীই 'নেপথ্য পালিনী'।

সী। কি ? কি মনে করে বল্‌ছিস ?

চে। ভর্ত্তৃদারকের অভিষেক হচ্ছে।

সী। তাত ভাল আছেন ত ?

চে। মহারাজই অভিষেক করছেন।

সী। তা যদি হয়, তাহ'লে আর একটা সু-খবর শোনালি। কোলের কাপড় পাত।

চে। যে আজ্ঞে, ভত্রি। (ঐরূপ করিল)

সী। (আভরণ খুলিয়া দিলেন)।

চে। ভত্রি, যেন পটহ শব্দ ব'লে মনে হচ্ছে।

সী। তাই বটে।

চে। একবার বেজেই পটহ শব্দ থেমে গেল।

সী। অভিষেকের আবার কি ব্যাঘাত ঘট্‌ল! রাজকুলে কত কি ঘটে থাকে।

চে। ভত্রি, আমি এই রকম শুনেছি—ভর্ত্তৃদারকের অভিষেক করে মহারাজ বনে যাবেন।

সী। তা যদি হয়, তাহ'লে এ ত অভিষেক নয়, এ মুখোদক।

[তাহার পর রাম প্রবেশ করিলেন]

রাম। আঃ—

পটহ বাজিল যবে, দাঁড়াইল গুরুজন,
সিংহাসনে করি আরোহণ,
স্কন্ধে করি উত্তোলন, নত-মুখ ঘটগণ,
সলিল যে করিল সেচন ;
ডাকিয়া আমারে রাজা, করিলেন বিসর্জ্জন,
ধৈর্য্যে মোর যত জনগণ,
সুবিস্মিত সেই কালে, পিতৃ আজ্ঞা পুত্র পালে,
বিস্ময়ের কি আছে কারণ ?

"পুত্র, এখন বিশ্রাম কর"—স্বয়ং রাজা এই বলে আমায় বিদায় দিলে, ভার দূর হ'ল বলে আমার মন যেন উচ্ছ্বসিত হয়েছে। ভাগ্যবশে আমি সেই রামই রইলুম, মহারাজ মহারাজই থাক্‌লেন। এখন সীতার সহিত দেখা করি।

অ। ভত্রি, ভর্ত্তৃদারক আসছেন। বল্কল এখনও খোলেন নি ?

রা। মৈথিলি! বসে আছ ?

সী। হাঁ, আর্য্যপুত্র। আর্য্যপুত্রের জয় হোক্‌।

রা। মৈথিলি! বস। (উপবেশন করিলেন)

সী। আর্য্যপুত্র যা আজ্ঞা করছেন। (উপবেশন করিলেন)

অ। ভত্রি, ভর্ত্তৃদারকের সেই বেশই রয়েছে (৮)। এ বোধ হয় তাহ'লে মিথ্যা কথা।

সী। ওরূপ লোকে মিথ্যা বলে না। অথবা রাজকুলে কত কি ঘটে।

রা। মৈথিলি, কি বল্‌ছ ?

সী। না, কিছু নয়। এও কি বল্‌ছে 'অভিষেক, অভিষেক'।

রা। তোমার কৌতূহল বুঝ্‌তে পারছি। অভিষেকই বটে। শোন। আজ মহারাজ উপাধ্যায়, অমাত্য, প্রজাগণের সাক্ষাতে ছেলেবেলা থেকে যে কোল আমার পরিচিত সেই কোলে আমায় বসিয়ে, স্নেহস্বরে মায়ের গোত্র উচ্চারণ করে, কোশল রাজা যেন এক জায়গায় সাক্ষিপ্ত করে আমায় বল্‌লেন, "পুত্র! রাম! রাজ্য গ্রহণ কর।"

সী। তখন আর্য্যপুত্র কি বল্‌লেন ?

রা। মৈথিলি! কি বল্‌লুম—তুমি কি মনে কর বল দেখি।

সী। আমি মনে করি, আর্য্যপুত্র কিছু না ব'লে, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে, মহারাজের পদতলে পতিত হয়েছিলেন।

রা। ঠিক অনুমান করেছ। একরূপ আচরণ যাদের, এমন দম্পতি বিধাতা অল্পই সৃষ্টি করেছেন। আমি সেইখানে চরণতলেই পতিত হয়েছিলুম।

মোর অশ্রু তাঁর 'পর, তাঁর অশ্রু মোর 'পর
এককালে ঝরিল তখন ;
অধোমুখে অবস্থিত, ভিজিল আমার শির
ভিজাইনু পিতার চরণ।

সী। তার পর? তার পর ?

রা। তার পর তাঁর অনুনয়ে স্বীকৃত না হ'লে তিনি জরাদোষ প্রাপ্ত নিজ প্রাণের শপথ দিলেন।

(৮) অর্থাৎ রামচন্দ্র রাজবেশ পরিধান করেন নাই। সুতরাং অভিষেকের কথা মিথ্যা।

সী। তার পর? তার পর?

রা। তার পর, তখন

শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ করে, অভিষেক-ঘট ধরে,
স্বয়ং নৃপতি ধরে সবাষ্প-নয়ন
রাজছত্র মোর শিরে, হেনকালে কণে ধীরে
ব্যস্ত হ'য়ে মন্থরা কি করে নিবেদন,
তার পর—রাজা আমি নহিক এখন।

সী। ভালই হয়েছে। মহারাজ মহারাজই রইলেন, আর্য্যপুত্র আর্য্যপুত্রই রইলেন।

রা। মৈথিলি! কি জন্য অলঙ্কার খুলে ফেলেছ?

সী। আমি পর্‌ব না। (৯)

রা। পর্‌বে না। অলক্ষণ হ'ল অলঙ্কার খুলেছ। কেন না—

ত্বরা করি অপনীত করেছ ভূষণ তাই
বক্রপাশ শ্রবণযুগল,
খসায়েছ আভরণ শুভ্র করতল তাই
আভরণ ভারে নত স্থল,
এখনও রয়েছে বিকল।

সী। আর্য্যপুত্র মিথ্যাকেও সত্যের মত ক'রে বলতে পারেন।

রা। তবে অলঙ্কার পর। আমি আয়না ধরি। (ঐরূপ করিয়া দেখিয়া) দাঁড়াও—

বল্কলের মত এ কি নেহারি মুকুরে,
রবিকর সম রাঙা? হাসিতেছ ধীরে।
সংযমের চিহ্ন তরে অভিলাষী মন,
বুঝিলাম ক্রীড়া এই বল্কল ধারণ॥

অবদাতিকে! এ কি?

অ। ভর্ত্তা, পর্‌লে মানায় কি না জান্‌বার কৌতূহলে পরেছেন।

রা। মৈথিলি! ইক্ষ্বাকুবংশের বৃদ্ধেরা এ অলঙ্কার ধারণ করেন। তুমি কেন পরেছ। আমারও সখ্ হচ্ছে। আন।

সী। না—না—আর্য্যপুত্র, অমন অমঙ্গলের কথা বল্‌বেন না।

(৯) সীতার অলঙ্কার উন্মোচন ও ভাবী নিরাভরণ অবস্থার সূচক পতাকা-স্থান।

রা। মৈথিলি! বারণ করছ কেন?

সী। তাক্তাভিষেক আর্য্যপুত্রের অমঙ্গলের ন্যায় মনে হচ্ছে।

রা। অর্দ্ধাঙ্গ আমার তুমি, পরিহাসচ্ছলে আজি
নিজেই ত পরিয়াছ আগে;
বল্কল পরিতে হেরি, কোন্ হেতু তব মনে
বল দেখি শঙ্কা হেন জাগে?

[নেপথ্যে] হা হা মহারাজ!

সী। আর্য্যপুত্র! এ কি?

রা। (শ্রবণ করিয়া)

নারী ও পুরুষদের উচ্চারিত উচ্চধ্বনি
মর্য্যাদারে করিছে লঙ্ঘন,
"সবার উপর আমি", এই বলি দৈব ঠিক
মনে আমি করিছে তাড়ন।

শীঘ্র জান কিসের শব্দ।

কাঞ্চুকীয়। (প্রবেশ করিয়া) কুমার! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রা। আর্য্য, কাকে রক্ষা কর্‌ব?

কা। মহারাজকে।

রা। মহারাজকে! আর্য্য! তা হ'লে বলুন, এক শরীরের মধ্যে সংক্ষিপ্ত পৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে? কোথা হ'তে দোষ উৎপন্ন হ'ল?

কা। স্বজন হ'তেই।

রা। স্বজন হ'তে? হায়! তা হ'লে আর প্রতীকার নাই।

শত্রু যেই, দেহে আসি প্রহার সে ক'রে,
স্বজনই কেবল ক'রে প্রহার অন্তরে।
স্বজন বলিতে এবে লজ্জা হবে হায়,
কেবা সেই জন আজি কহ তা আমায়॥

কা। পূজনীয়া কৈকেয়ী।

রা। কি? মা? তা হ'লে ভাবী ফল ভালই হবে।

কা। কিসে?

রা। শোন—

ইন্দ্র-সম স্বামী, আর পুত্র আমি যার,
অকার্য্য করিবে কেন? কোন্ স্পৃহা তার?

কা। কুমার! এই বিমূঢ় স্ত্রী-বুদ্ধিতে আর নিজের

সরলতা স্থাপন করবেন না। তাঁর কথাতেই আপনার অভিষেক স্থগিত হয়েছে।

রা। আর্য্য, এতে গুণই দেখা যাচ্ছে।

কা। কিসে?

রা। শুনুন—

নৃপতির বনবাস নিবারণ হ'ল এবে
রহিলাম বালভাবে পিতার অধীন;
নব রাজা লাভে প্রজা সশঙ্কিত নাহি হ'ল
ভ্রাতৃগণ নহে প্রবঞ্চিত, ভোগহীন।

কা। অনাহূত ভাবে উপস্থিত হ'য়ে তিনি বলেছেন, "ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করুন।" এতেও কি তাঁর লোভহীনতা?

রা। আর্য্য! আপনিই আমার প্রতি পক্ষপাত বশতঃই প্রকৃত বিষয় বুঝ্‌ছেন না। কেন না—

পণ হ'তে লব্ধ রাজা, তনয়ের তরে তিনি,
আজ যদি করেন প্রার্থন
লোভ নাহি তাঁর হৃদে, দাতৃ রাজা অপহারী
মোর হেথা লোভের কারণ।

কা। তবে?

রা। এর পর আর মাতৃনিন্দা শুন্‌তে ইচ্ছা করি না। মহারাজের অবস্থা কি বলুন।

কা। তার পর তখন—

শোকে বাক্যহীন রাজা হস্ত-সঞ্চালনে
ইঙ্গিতে বিদায় দিয়া, কিবা স্থির মনে
করিলেন সেইক্ষণে, দেখিলাম হায়,
মূর্চ্ছিত হইয়া নৃপ পড়িল ধরায়।

রা। কি? মূর্চ্ছিত হলেন?

[নেপথ্যে]

"কি? কি? মূর্চ্ছিত হলেন?
নৃপতির মূর্চ্ছা যদি নাহি সহ, ধর ধনু
দয়া নাই-"

রা। (শুনিয়া সম্মুখে দেখিয়া)

প্রশান্ত লক্ষ্মণ যেই ধৈর্য্য-পারাবার
চঞ্চল কে করে তারে, রোষবশে এবে যার
প্রলয়সম সমুদ্রেতে নেহারি' আকার।

[তাহার পর ধনুর্ব্বাণ হস্তে লক্ষ্মণ প্রবেশ করিলেন]

ল। (সক্রোধে)

নৃপতির মূর্চ্ছা যদি নাহি সহ, ধর ধনু
দয়া নাই, স্বজনের মাঝে যেই জন,
মৃত স্বভাবেতে থাকে অপমান সেই সহে,
রুচি নাহি হয়, কর আমারে মোচন,
যুবতী-রক্ষিত ধরা করিব সংকল্প মোর
আমাদের সকলেরে করেছে বন্ধন।

সী। আর্য্যপুত্র! কাঁদবার সময়ে লক্ষ্মণ ধনু ধারণ করেছে। এর চেষ্টা অপূর্ব্ব দেখছি।

রা। সুমিত্রা-পুত্র! এ কি?

ল। কি? কি? এ কি?

ক্রমবশে উপাগত অপহৃত রাজ্য আজি,
ধরাতলে দীনাসনে নৃপতি শয়ান,
এখনও সন্দেহ তব? এ কি ক্ষমা? কভু নহে
বীরত্বের অভাবেরই ইহা ত প্রমাণ।

রা। সুমিত্রা-পুত্র! আমার রাজ্যাংশ তোমার এই উদ্যোগ উৎপাদন করেছে। আঃ—তুমি বিচক্ষণ নও।

ভরতই হউক রাজা, অথবা আমিই হই
উভয়ই ত তোমার সমান,
ধনু ধর এই শ্লাঘা থাকে যদি তবে যাও
সেই নৃপে কর পরিত্রাণ!

ল। ক্রোধ সংবরণ করতে পারছি না। আচ্ছা, আচ্ছা। তবে যাই। [যাইতে লাগিলেন]

রা। লক্ষ্মণ-ললাট-পুটে বিকসিত এ ভ্রূকুটি
তিন লোক দহিবারে যেন আকিঞ্চন,
অলঙ্ঘ্য নিয়তি সম শোভিছে ভীষণ।

সুমিত্রা পুত্র! একবার এদিকে এস।

ল। আর্য্য! এই এসেছি।

রা। তোমার স্থৈর্য্য উৎপাদন করিবার জন্যই আমি এরূপ বলেছি। এখন বল দেখি—

সত্য বাক্য পালনেতে রত পিতৃদেব-'পরে
তুলিবে ধনুক, কিম্বা মোদের জননী
নিতেছেন নিজ ধন তার প্রতি সংযোজন
করিবে শায়ক তব, অথবা যে গণি
বাহ্যিক দোষের হেতু বধিবে ভরতে রোষে
তিন পাতকের কিসে রুচি তব শুনি।

ল। (সবাষ্প নয়নে) ধিক্ আমায়। না জেনে তিরস্কার করছেন।

যেই জন্য নিদারুণ ক্লেশে কিম্বা রাজ্যে মম
কিছুমাত্র নাহি আকিঞ্চন,
চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি, বনবাস হবে তব
এই বর করেছে যাচন।

রা। এই জন্য পূজনীয় পিতা মূর্চ্ছিত হয়েছেন। হায়! তিনি আমাদের প্রভু নন, এই জানাচ্ছেন? মৈথিলি!

মঙ্গলের তরে দত্ত সেই যে বল্কলগুলি
কর দেখি এবে আনয়ন,
লইব আজিকে আমি অন্য নৃপ যেই ধর্ম্ম
পালে নাই, করেনি গ্রহণ।

সী। এই নিন্, আর্য্যপুত্র।

রা। মৈথিলি! কি স্থির করেছ?

সী। আমি আপনার সহধর্ম্মিণী।

রা। একলাই আমায় যেতে হবে।

সী। তাই ত আমি আপনার সঙ্গে যাব।

রা। বনে বাস করতে হবে।

সী। সেই আমার প্রাসাদ।

রা। তোমায় শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করতে হবে।

সী। ইঁহাদের উদ্দেশে দেবতাদিগকে প্রণাম করছি।

রা। লক্ষ্মণ, একে নিষেধ কর।

ল। আর্য্য, শ্লাঘনীয় কালে ইঁহাকে নিষেধ করতে আমার উৎসাহ নাই। কেন না—

রাহুগ্রাসে পড়িলেও শশাঙ্ক, তারকা তার
সদা করে পশ্চাতে গমন;
কাননেতে ভূপতিত বিটপি হইলে, লতা
ধরাতল করে যে চুম্বন;
পঙ্কে মগ্ন হ'লে গজ করেণু তথাপি তারে
পরিত্যাগ না করে কখন,
যান্ ইনি, আচরণ করুন নিজের ধর্ম্ম
নারীদের পতিই শরণ।

চেটী। (প্রবেশ করিয়া) ভর্ত্তার জয় হোক্। নেপথ্য পালিনী আর্য্যা রেবা প্রণাম ক'রে জানাচ্ছেন, "অবদাতিকা সঙ্গীতশালা থেকে জোর করে বল্কল এনেছে। এই অন্য বল্কল, এগুলি আগে আর কেউ পরে নাই। যা দরকার তা এগুলি দিয়ে করুন।"

রা। ভদ্রে, আন। উনি ত' পেয়েছেন, আমি এখন প্রার্থী।

চে। ভর্ত্তা, নিন্। (দিয়া চলিয়া গেল)

[রাম গ্রহণ করিয়া পরিধান করিলেন]

ল। আর্য্য, কৃপা করুন।

ভূষণ অথবা মালা সকলেরই অর্দ্ধভাগ
করিয়াছ আমারে প্রদান,
বল্কলই একেলা শুধু কর পরিধান এবে
তুচ্ছ এ বল্কলে এত টান?

রা। মৈথিলি! একে বারণ কর।

সী। সৌমিত্রি! নিবৃত্ত হও।

ল। আর্য্যে

একাকিনী চাহ তুমি সেবিবারে গুরুর চরণ,
দক্ষিণ তোমার থাক্, বাম থাক আমার কারণ।

সী। দিন্ আর্য্যপুত্র। সৌমিত্রি দুঃখিত হচ্ছে।

রা। সৌমিত্রি! শোন—

তপস্যা সংগ্রাম কালে বর্ম্মরূপী এ বল্কল
নিয়ম মাতঙ্গ শিরে অঙ্কুশ মতন
ইন্দ্রিয় তুরঙ্গগণে বল্গা সম সংযমনে
ধর্ম্মরথ সারথি এ করহ গ্রহণ।

ল। অনুগৃহীত হলুম।

(গ্রহণ করিয়া পরিধান করিলেন)

রা। যে পৌরজনেরা এ বৃত্তান্ত শুনেছে, তারা যে রাজপথ অবরোধ করেছে। সরিয়ে দাও, সরিয়ে দাও।

ল। আর্য্য, আমি আগে আগে যাচ্ছি। সরিয়ে দাও, সরিয়ে দাও।

রা। মৈথিলি, অবগুণ্ঠন মোচন কর।

সী। আর্য্যপুত্র যে আজ্ঞা করছেন।

(অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন)

রা। ওহে পৌরগণ! শোন—তোমরা শোন।

স্বেচ্ছায় নেহার আজি সজল-নয়নে

জায়ারে আমার, যজ্ঞে, বিবাহে, কাননে,
বিপদে বা, নাহি দোষ নারীর দর্শনে। (১০)

কাঞ্চুকীয়। কুমার! যাবেন না, যাবেন না। এই যে মহারাজ—

ভ্রাতৃপ্রেমে বদ্ধকাম লক্ষ্মণ চলিছে পিছে,
বধূসহ শুনি তব অরণ্যে গমন,
ধরার ধূলায় মাথা জীর্ণ বন্যগজ সম
উঠিয়া আসিছে রাজা স্খলিতচরণ।

ল। আর্য্য—

উত্তরীয় যাহাদের, কেবল বল্কলমাত্র
কি দেখিবে? বনে যারা করিছে গমন

রা।

আমরা চলিয়া গেলে আমাদের শিরঃস্থলে
মহারাজ আসি হেথা করুন দর্শন।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল]

(১০) ইহা দ্বারা বুঝা যায়, ভাসের সময় অবগুণ্ঠনের প্রথা ছিল; তবে বিশেষ-বিশেষ সময়ে অবগুণ্ঠন না দিলে তাহা দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত না।

আমার বৈঠকখানা

[শ্রীযতিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়]

আমাদের হরনাথ ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরত্ন মহাশয় বৈঠকখানায় আসিলেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সংস্কৃতজ্ঞ, ইংরাজির ধার ধারেন না। গোত্র ছাড়া সর্ব্ববিষয়ে চাটুর্য্যা সাহেবের ঠিক বিপরীত। ছেলেবেলায় একখানা কেতাবে পড়িয়াছিলাম যে, Evolutionটাকে এক কথায় সর্ব্ববিষয়ে changing order ও orderly change বলিলেই চলে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের evolutionএর দুইটা দিক এই দুই মূর্ত্তিমান দেখাইতেছেন। Orderly changeএর কোনও লক্ষণ নাই, একেবারে changing order। এই havana টানা কন্দর্প-সন্তানকে দেখিয়া অনেকবার আমার Hugo de Vriesএর mutation theoryর কথা বড় প্রামাণিক বলিয়া মনে হইয়াছে। Darwinismএর fluctuationsএ নয়, একেবারে stable, sudden ও large change in speciesএর মত। এই দুই সমগোত্র আমার বৈঠকখানায় একত্র হইলেই frictional electricityর একটা সাধারণ lawর অধীনস্থ হইয়া উভয়ে উভয়কে repel করেন। চাটার্জি সাহেবের, তাঁর স্বগোত্র এই ভট্টাচার্য্যটিকে আমার বৈঠকখানায় পাইলেই, তাঁকে উপলক্ষ করিয়া দু'কথা বলিবার বিজাতীয় একটা রসনা-কণ্ডুয়ন জন্মায়।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা হইতেছিল?"

"এতক্ষণ আমরা রবিবাবুর কবিত্বের রস গ্রহণের জন্য, গাছ পাদপে যেমন খোঁচা দিয়া জল বাহির করে, সেইরূপ সমালোচনা খোঁচা লাগাইতেছিলাম। রসের আস্বাদ সম্বন্ধে আমাদের বোধ হয় অনেকের অনেক রকম মত হইবে। আপনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, রবিবাবুর কাব্যরসে আপনার কোন অধিকার নাই, কারণ, যে বিজাতীয় মধুতে মাদকতা আনে, তাহা আপনার মত নিষ্ঠাবানের অপেয়।"

হঠাৎ Mr. Chatterji বলিয়া উঠিলেন, "ও কথা মানি না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ইউরোপীয় cultureএর দিকটা ওঁদের অপেয় হইলেও, sensualityর রসটা খুবই পেয়। ওঁদের বৈষ্ণব-ধর্ম্মটা ত আগাগোড়া অবৈধ যুবতী-প্রেমের উপর গঠিত। ওঁদের তীর্থে সেবাদাসী, উৎসবে রাসলীলা; বিগ্রহে কৃষ্ণ ও পরস্ত্রী রাধাই তো দেখিতে পাই। তার পর মহাভারতে, ভাগবতে রাধাঘটিত সবই অবৈধ, অশ্লীল ব্যাপার। বৈষ্ণব ধর্ম্মটা অশ্লীলতা ছাড়া যে আর কিছুই নয়, তাহা প্রমাণ করার জন্য brief লইয়া, সংস্কৃতানভিজ্ঞ হইয়াও লড়িতে পারি।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিস্ফারিত-লোচন। বলিলেন, "দেখিলেন মহাশয়, অর্ব্বাচীনতা! 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' —যাঁরা এ কথাটা বোঝেন না, তাঁদের সহিত তর্ক করাও পাপ।"

"স্মৃতিরত্ন মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক। আমার মনে হয় যে, তাহার অধিক বিড়ম্বনা—প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের তর্ক দ্বারা কোন বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা। একটা জিনিসকে দুই জনে পৃথিবীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই সীমান্ত হইতে দেখিলে, ঐ জিনিসটা সম্বন্ধে দিক্-ভ্রম হইবারই কথা। ভারত ও ইউরোপীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে এ দিক্‌ভ্রম বড় বড় ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের ও হিন্দু পণ্ডিতের অনেক দিন হইতে হইয়া আসিতেছে। বিশেষ হিসাব করিয়া, সহৃদয়তা দেখাইয়া ও allowance দিয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিলে, এ দিক্‌ভ্রম অপসারিত হয় না। নিজের জাতীয় সভ্যতাটিকে, ধর্ম্মটিকে যখন দেখা যায়, তখন ছবির সোজা দিকটাই দেখা হয়। তার বিপরীত দিক হইতে অন্য পক্ষ যে ছবির পিঠটাই কেবল দেখিতে পান, সেটা উভয়ে না বুঝায় মধ্যে মধ্যে বড় গণ্ডগোল হয়—তবে বিড়ম্বনার একশেষ হয়। তাই বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন যে, 'হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের মীমাংসার জন্য ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের গ্রন্থাদি পাঠ করার ন্যায় মহাপাপ পণ্ডিত জগতে নাই'।

"এই বিড়ম্বনার উপর যদি তাহারা গোস্বামীবিবিশ্বাসী 'কাটি কৃষ্ণ' পালবীর মত কোন 'পড়াশুনা' না করিয়া কৃষ্ণকে ননীচোর ও পারদারিক বলিয়া কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, ত একেবারে 'গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং'।"

"ব্যাধিটি বহু পুরাতন। এই বিস্ফোটকের জ্বালা নিবারণের জন্য রামমোহন রায় হইতে বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি পর্য্যন্ত অনেক পণ্ডিত অনেক প্রকারের counter irritant প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ঐ সমস্ত প্রলেপ প্রয়োগে গণ্ডের বিশেষ কোন উপশম না হইলেও বিস্ফোটকের জ্বালা গিয়াছে, ইহাই তো আমার বিশ্বাস। এবং সেই জন্য মনে হয় যে, Mr. Chatterji রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে যে brief না পড়িয়াই মোকদ্দমা লড়িতে চান, তাহা আধুনিক খুব বড়-বড় আইন-ব্যবসায়ীগণের লক্ষণ হইলেও, সাধারণ হিন্দু পাঠকেরা বর্ত্তমান হাকিমদের মত বুদ্ধিমান (?) না হওয়ায়, মোকদ্দমা জিতিবার chanceএর percentageটা আদালতের ঐ শ্রেণীর মোকদ্দমা জিতিবার chanceএর percentageএর সঙ্গে একেবারেই মিলিবে না। তা ছাড়া, আর এক বিপদ—এই যে, special tribunalএর রায়ের মত এই জনসাধারণের রায়ের উপর আপিল নাই। বিচার-প্রণালীও হাইকোর্টের Appellate Jurisdictionএর বিচার-প্রণালী হইতে একেবারে বিভিন্ন। Factএর গোজামিল থাকিলে, শুধু point of lawতে জিতিবার কোন সুনিয়ম এ বিচারালয়ে নাই। Law point ও নজির আপনার স্বপক্ষে যাহাই থাক, "বিসমিলায় গলদ" হইলে ইহারা শুনে না। তাই মনে হয়, যদি এ মোকদ্দমার brief লইতেই চান, ত, কাগজপত্রগুলা আর একটু ভাল করিয়া না পড়িলে চলিবে না।"

"আমি আইন ব্যবসায়ী না হইলেও এই মোকদ্দমায় আপনার বিপক্ষ পক্ষের উকিলের (যিনি ভগবান অচ্যুতানন্দ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে ও রাসমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী শ্রীরাধাকে defend করিবেন) পূর্ব্বকথিত point গুলি সম্বন্ধে যাহা বলিবার সম্ভাবনা আছে, সে বিষয়ে কিছু বলিয়া আপনাকে সাবধান করিয়া দিতে পারি।—

"যথা, (১) বৈষ্ণব ধর্ম্মের আগাগোড়া দূরে থাক, ভিত্তির একখানি ইষ্টকেও, আপনি অবৈধ প্রেম বলিতে যাহা বুঝিতেছেন, তাহা নাই। সে প্রেমকে penal code বা সামাজিক শাসন ছোঁইয়া পায় না। সে এক সর্ব্ব লোক রমণীয়, এবং বাঙ্গলায় পরম পবিত্র পদার্থ—যাহাকে বঙ্কিমবাবু এক কথায়, "চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরোন্মুখী কর", বলিয়াছেন।"

(২) "তার পর গীতের সেবাদাসী। সেটা ত গীত-গোবিন্দের বর্ণনার অপদার্থ কাম পরায়ণ আমাদেরই সৃষ্টি। এ সৃষ্টির পিতৃত্ব আরোপের জন্য বৈষ্ণব ধর্ম্মকে লইয়া কেন টানাটানি করেন?"

(৩) "রাসলীলা বৈষ্ণব সাহিত্যে থাকিলেও, এবং নেড়া বৈরাগীর সর্ব্বস্ব হইলেও, তাহাই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নহে। উহা তাহার একটা exaggerated fraction মাত্র। আর রাস অর্থে ওখানে ক্রীড়াবিশেষ; এক প্রকার নৃত্য। বালক বালিকা, যুবক যুবতী সকলেই তাহাতে যোগদান করিত। ঠিক বিলাতের পূর্ব্বকালের বসন্তোৎসব, Maypole danceএর মত, কোন প্রভেদ নাই। কোন

নয়। বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধান করিতে হইলে, শুধু মহাজনী পথে হাঁটিলে চলিবে না।"

"মনুষ্যজাতি যখন সভ্য হইয়া অভিব্যক্তির উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়, তখন পুরুষদের মুখাবয়ব, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি feminine ও delicate হইয়া পড়ে। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য সহরে ভদ্রলোকের সহিত অসভ্য বর্ব্বরদের তুলনা করিলে এটা বেশ বুঝা যায়। এটা অধঃপতনের দিকে অভিব্যক্তি নহে। স্ত্রীজন-সুলভ অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যে evolutionএর উচ্চাঙ্গ, ইহা তারই প্রমাণ।"

"তাহার পর এই ধরুন sense of colour. পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের ইহা সম্বন্ধে উন্নত, তীক্ষ্ণতর, এবং অপেক্ষাকৃত অধিক discriminating। Differentiation of organএর কোন বিশেষ তত্ত্ব ইহার ভিতর কিছু আছে—ইহা স্বীকার না করিলেও, অভিব্যক্তির উচ্চাবস্থার এ প্রমাণটি বড় তুচ্ছ নহে। দেখা গিয়াছে বর্ব্বর জাতিরা কেবলমাত্র দুইটি বর্ণের পার্থক্য বুঝিতে পারে,—তার অধিক পারে না। Colour blindness রোগটা পুরুষদেরই অধিক।"

"আর একটা কথা হয় ত আপনারা সকলেই জানেন যে, ভীষণ যুদ্ধ বিগ্রহের পর যুদ্ধক্লিষ্ট জাতির মধ্যে পুরুষ-সন্তান অনেক অধিক জন্ম গ্রহণ করে। Russo Japanese warএর পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই Japanএ পুরুষ-সন্তানের percentage প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহার গূঢ় অর্থ কি? যুদ্ধের পর national vitality এত low হইয়া যায় যে, evolutionএর নিম্নস্তরের দুর্ব্বল পুরুষ সন্তানের জন্ম দিবার পক্ষে উপযুক্ত হইলেও এ যুদ্ধক্লিষ্ট জাতি সবল স্ত্রীজাতি উৎপন্ন করিতে অক্ষম হয়। দরিদ্রের ঘরে যেখানে অন্নাভাব, সেখানে পুরুষের জন্ম বেশী। বড়-বড় ধনীর ঘরে কন্যারই প্রাদুর্ভাব।"

নরেন বলিল, "সেই জন্যই কি কুলীনের ঘরে এত 'অমর'—কন্যাসন্তান জন্মে? নবধা কুল-লক্ষণ লোপ পাইয়াছে; কিন্তু কন্যাসন্তানের এত আমদানি কেন?"

"তোমার এ কথার উত্তর এখন দিতে পারি না। তুমি শ্লেষ করিয়া যাহাকে অমরত্ব বলিতেছ, তাহা একেবারে উপহাসের কথা নয়। উহাই survival of the fittest। ষণ্ডামার্ক চেহারা ও বর্ব্বরজাতি-সুলভ শারীরিক বল যে উচ্চ স্বাস্থ্য নহে—এ প্রসঙ্গ একদিন এই বৈঠকখানায় হইয়া গিয়াছে। তবে কুললক্ষণগুলি বর্ত্তমান কুলীনেরা তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে কি ভাবে inherit করিয়াছেন, তাহা লইয়া কোন কথা বলা এখন অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও, অনেক নূতন তর্কের অবতারণার ভয়ে, আমার অভিপ্রেত নহে।"

"যাক্, তার পর যে কথা হইতেছিল,—হাসপাতালের statistics দ্বারা স্ত্রীজাতি যে constitutionally পুরুষাপেক্ষা strong, তাহা অনেক রকমে প্রমাণ করা যায়। অসুস্থ না হইয়া রাত্রি জাগরণে, শুশ্রূষোপচার সহ্য করায় ও নানা সংক্রামক ব্যাধি resist করার ক্ষমতায় ইহারা পুরুষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।"

"তার পর এই ধরুন, বিকৃতাঙ্গ যে সমস্ত সন্তান জন্মে, তাহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীর অপেক্ষা অনেক অধিক। আর আর অনেক কথা যাহা বলিবার আছে, তাহা বাহুল্য ভয়ে না বলিলেও, Eugenistরা যে স্ত্রীজাতিকেই তাহাদের ...."

সতীনাথ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "আর মহাশয়, প্রমাণের আবশ্যক নাই। আপনার বৈঠকখানাটি আজ একেবারে Biologyর ক্লাশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এখন ক্ষান্ত হউন। আপনি যাহাই বলুন, যতদিন স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন হইয়া থাকিবে, ততদিন আমাদের মত পরিবর্ত্তন হইবে না।"

"স্ত্রীজাতি যে পুরুষের অধীন, এ কথাটাই ত আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।"

Mr. Chatterji উঠিয়া দাঁড়াইয়া পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, "মাপ করিবেন, আর তর্কে আবশ্যক নাই। আমি উঠিলাম। আমার dinnerএর সময় হইয়াছে। আমার Biological better-half অথবা কোন suffragist আজ আপনার বক্তৃতা শুনিলে বড় আনন্দ পাইতেন।"

"আপনি ঠিক বলিয়াছেন। তবে আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষিতা সহধর্ম্মিণীরা শুধু biological better-half নহেন; ইঁরা economical better-halfও বটেন। এ সম্বন্ধে Punchএর একটি কথা মনে পড়িল। একজন নববিবাহিত ইংরেজ তার এক Scotch বন্ধুকে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। "I say, Bob, can you tell me why they call our wives our better-halves?' Scotch জাতিটা টাকার মূল্যটা আঠার আনা রকম বুঝে। Bob বেচারা মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, 'You will understand, my boy, when you come to divide your salary with her."

এই অসংলগ্ন কথাটা বলা, অবস্থা বিবেচনায়, আমার একটু অন্যায় হইলেও, চাটুয্যে সাহেব মহা খুসী হইয়া উচ্চ হাস্যের সহিত বলিলেন, "That's right! That's right! Very smartly hit" এবং আমার হাতটা উৎসাহের সহিত ঝাঁকাইয়া দিয়া havana ধরাইয়া dinner উদ্দেশে ধাবমান হইলেন।

রাত্রি ৮টা বাজিয়াছে। বৈঠকখানার আসর জমিবার সময় হইয়া আসিল। প্রত্যহ রাত্রি ১টা না বাজিলে আমাদের পালা শেষ হয় না। মান্যবর ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার নস্যের কৌটা লইয়া চশমা মুছিতে-মুছিতে দেখা দিলেন। ইনি আমাদের সকলের অপেক্ষা বয়সে ও জ্ঞানে প্রবীণ। ইংরাজি ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় সুপণ্ডিত, এবং এঁর মতগুলি আশ্চর্য্য রকমের সার্ব্বভৌমিক। Browning পড়া এ রকম নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রায় দেখা যায় না। নরেন বেচারার কলেজে পড়া আধুনিক মতগুলিকে পীড়ন করা ছাড়া এই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কোন দোষের অপবাদ তাঁর কোন শত্রুও এ পর্য্যন্ত দিতে পারেন নাই।

আমাদের খাঁ সাহেবও তাঁহার দলবল লইয়া উপস্থিত হইলেন। এঁর মত 'গুণী" ও কর্কশভাষী লোক আজ কাল দুর্লভ। এমন কর্কশভাষী ব্যক্তি যখন তানপূরার তার মিলাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া সঙ্গীতের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন কি যে এক স্বপ্নরাজ্য সৃষ্ট হইয়া, মূর্ত্তিমান রাগ-রাগিণী সকল কি ভাবে সকলের প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহা নিজে উপভোগ না করিলে বিশ্বাস করা কঠিন।

এতক্ষণ "কচ্‌কচির" পর একটু সঙ্গীতচর্চ্চা করিয়া স্নিগ্ধ হইব মনে করিতেছি, এমন সময় নরেনকে দেখিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় সব গোলযোগ করিয়া দিয়া, আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "বেশ তো বাপু, তোমরা তানপূরা ও তবলার সুর বাঁধ,—আমি ততক্ষণ নরেন ভায়াকে (নরেন তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দা বলিত) দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বিরক্ত হইও না,—তোমরাও ত বাবু রবিবাবুর এত ভক্ত হইয়াও তাঁর সঙ্গীতের idealটার সঙ্গে মতের মিল করাইতে পার নাই; আর আমি তাঁর বর্ত্তমান সর্ব্বগ্রাসী individualismটার সঙ্গে রফা করিতে পারি নাই বলিয়া এত রাগ করিলে চলিবে কেন?"

মনে-মনে ভাবিলাম, কিছু পরেই রবিবাবুর কথা হইতেছিল,—না জানি এখন ন্যায়রত্ন মহাশয় আসলে কি গণ্ডগোলই বাধাইবেন, কারণ, এঁকে আমরা আঁটিয়া উঠিতে পারি না।

সর্ব্বাপেক্ষা মজার বিষয় এই যে, সমস্ত বাক্যবাণ নরেনের মস্তকে বর্ষিত হইলেও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত তর্ক করিবার সময় নরেন এক অপূর্ব্ব ভক্তির পরিচয় দিত। ইহার psychology এখনও পর্য্যন্ত আমরা ভাবিয়া পাইলাম না।

নরেন বলিল, "ঠাকুর্দ্দা যখন আমায় দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন, তখন আমি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইতে পারি না,—বিশেষ, হাল আইনে আমাদের অর্থাৎ কায়স্থদের যখন ক্ষত্রিয় সাব্যস্ত করা হইয়াছে।"

আমি প্রমাদ গণিয়া যোড়হস্তে বলিলাম, "দোহাই আপনার, নাতি ঠাকুর্দ্দাতে বৈঠকখানাটিকে কুরুক্ষেত্রে পরিণত করিলে, আপনাদের অস্ত্রের ঝনঝনানিতে খাঁ সাহেব ও তানপূরা একেবারে ডুবিয়া যাইবে—সব মাটী হইবে। যদি নেহাত না ছাড়েন, ত, পিতামহ ভীষ্মের মত শরশয্যা দশহাজার রথী সংহারটা সারিয়া লউন, বাকি যুদ্ধটা কালিকার জন্য স্থগিত রাখুন।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন "তথাস্তু, কেবল রবিবাবুর 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে' ও এ শ্রেণীর লেখা সম্বন্ধে তোমাদের সহানুভূতির কারণটা শুনিতে পাইলেই চুপ করিতে রাজি আছি।"

নরেন বলিল, "সরুন, ওটা Art for Art's sake।" আমি বলিলাম, "আপনার সহানুভূতি কেন নাই, সেটা আগে শুনিলে বুঝিতে পারিতাম আপনার রাগটুকু সঙ্গত কি না? আমাদের হরনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে বুঝান শক্ত হইলেও, আপনার না বোঝার ত কারণ নাই।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, "Art যে কি, সে সম্বন্ধে

সকলের মতের মিল হয় নাই; সুতরাং কতকগুলি বিভিন্ন পক্ষের মতামতের চর্বিত চর্ব্বণে প্রয়োজন নাই। তোমাদের দলেরই একজনের মত সে দিন পড়িয়া শুনাইতেছিলে 'সত্যকে বাদ দিয়া, নীতিকে খেদাইয়া, প্রেমকে অপমানিত করিয়া, সমস্ত মনুষ্য সমাজকে আহ্বান না করিয়া, কেবল সৌন্দর্য্য বিলাস পরিতৃপ্তির জন্য যে শিল্প সাহিত্য তাহা কখনই সত্য নহে'।"

আমি বলিলাম "বেশ ত, রবিবাবু কি সর্ব্বত্র তাহা করিয়াছেন? কোন সাম্প্রদায়িক নীতি শাস্ত্রানুমোদিত না হইলেও, সার্ব্বজনীন সত্যকে রসের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে গিয়া রবিবাবু যদি -

"স্থির হও বাপু, আগে আমার কথাটা শেষ করিতে দাও। তোমার এ সার্ব্বজনীন সত্যটা কি, তাহা এখনও ঠিক ধারণা করিতে পারি নাই। Problem of truth সম্বন্ধে philosophy এখনও শেষ কথা বলে নাই, কখনও বলিবে কি না, জানি না। সুতরাং 'সার্ব্বজনীন সত্য', 'সার্ব্বজনীন সত্য' বলিয়া একটা গোলযোগ করিও না।"

"কথাটা হইতেছিল, রবিবাবু আধুনিক individualism এর দিকে ঝোঁক দিয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা Art এর দিক দিয়া দেখিতে গেলে, একেবারে third class জিনিস হইতেছে কি না, একটু ভাবিবার কথা। প্রয়োজনের সহিত সৌন্দর্য্যের সন্ধি করিয়া কবি কিছু গড়িতে বাধা কি না, সে বিচারের আবশ্যকতা নাই; কিন্তু কবি যেটা ভাঙ্গিয়া গড়িতে চান সেটা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকায়, অথবা অন্য কারণে, যেটা গড়িতে চান, সেটাকে গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, যে মাল মসলা দিয়া জিনিসটা গড়িতেছেন, তাহা যথেষ্ট artistic ও powerful হইলেও মোট জিনিসটা যে কুশ্রী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। Destructive criticismটাকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া সাহিত্য বলিয়া চালাইলে, তাহা কোন বিশেষ জাতীয় কুসংস্কার ও বন্ধনের মুক্তির পক্ষে উপযোগী হইলেও উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যও হইবে না, Art ও হইবে না।

"হিন্দুধর্ম্মের যে সকল পূর্ব্বকালের আচার-ব্যবহার দেশ কাল পাত্র হিসাবে এখন অর্থহীন হইয়া ব্যক্তিগত ও জাতীয় চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হইয়াছে, তাহা হইতে উন্মুক্ত হইবার প্রয়োজনীয়তার বাণী যে রবিবাবু ইউরোপ হইতে সম্প্রতি বহন করিয়া আনিয়াছেন, তা আমি মানি না। তা' ছাড়া, পশ্চিমের আদর্শের ভিতর যাহা কিছু উদার ও উন্নত, তাহার সহিত হিন্দুর আদর্শের যে একটা সৌসামঞ্জস্য (reconciliation) সাহিত্যে ফুটাইতে পারিয়াছেন, তাহা আমি একেবারেই স্বীকার করি না।"

নরেন বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! আপনি যে মস্ত উল্টা কথা জবরদস্তি করিয়া চালাইতে চান, দেখিতেছি। রবিবাবুর প্রতিভা ও লিপি-কুশলতার উপর আপনার যে এত শ্রদ্ধা ছিল, হঠাৎ তাহার পরিবর্ত্তনের কারণগুলাও সঙ্গে সঙ্গে একটু বলিয়া গেলে মন্দ হইত না। তার পর আপনার মতগুলির বিপক্ষে আমাদের যাহা বলিবার আছে তাহা আপনি একটু না থামিলেই বা বলি কি করিয়া?"

"আমার বক্তব্যগুলি যে গ্রহ নক্ষত্রের মত অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে, সে ভয় করিও না। আমার কথাগুলি আগে শেষ করিতে দাও, পরে তোমাদের কি বলিবার আছে, শুনিতে রাজি আছি। তুমি যে বলিতেছিলে, রবিবাবুর প্রতিভা ও লিপিকুশলতার উপর আমার শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়াছে, তাহা ভুল। হিন্দু সভ্যতার সহিত প্রতীচ্যের ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বাধীনতার ideal এর সামঞ্জস্য ঘটাইয়া কোন উচ্চ সাহিত্য তিনি যে গড়িয়া তুলিতে পারিতেছেন না, তাহার কারণ তাঁহার প্রতিভা ও লিপি-কুশলতার অভাব নহে।"

"তবে কি?"

"রবিবাবুর হিন্দু সভ্যতা ও nationalism এর সবটা ও তাহার সমস্ত ধারাটার উপর দৃষ্টির অভাব,—যাকে বলে historic imagination এর অভাব। Surgical operationকে successful করিতে গেলে যে অঙ্গটার উপর ছুরি চালান যায়, শুধু সেই অঙ্গটার anatomy জানলে চলিবে না, সব মানুষটাকে জানা চাই। Nationalism এর যে একটা বড় দিক আছে, সেটা ভুলিলে চলিবে না; কেন না ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সে দিন যে বলিয়াছেন যে 'মানব ইতিহাসের ধারা একটা বিরাট ভ্রম নহে' এটী বড় পাকা কথা।"

আমি বলিলাম Nationalism এর যে একটা বড় দিক আছে তাহা রবিবাবু স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার

বিবিধ রচনায় সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন, তাহা ডাক্তার শীল মহাশয়ই ত স্বীকার করিয়াছেন। তা ছাড়া Dr. Seal একথাও বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিত্বের দিকে রবিবাবু একটু বেশি ঝোঁক দিলেও nationalism এর ন্যায্য স্থান অধিকার তিনি অস্বীকার করেন না।"

"সেটা Dr. Seal হয়ত সৌজন্যের খাতিরে বলিতে পারেন; সকলে সে কথা স্বীকার করে না।"

আমি বলিলাম "মাপ করিবেন, Dr. Seal যা বলিয়াছেন তাহার খানিকটা আপনাকে আর একবার পড়িয়া শুনাই; 'পূর্ব্ব ও পশ্চিমের এই আদান প্রদানের দ্বারা কি সাব্যস্ত হইতেছে? ইহাই সাব্যস্ত হইতেছে যে পশ্চিমের সামাজিক আদর্শের ভিতর যাহা কিছু উদার ও উন্নত, তাহার সহিত পূর্ব্ব দেশীয় হিন্দুর সামাজিক আদর্শের reconciliation বা সৌসামঞ্জস্যের স্থান আছে। Ritual (পদ্ধতি) symbols (প্রতীক) ceremonials (অনুষ্ঠান) myths (পুরাণ) প্রভৃতি ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে বরাবর একটা বিশাল মুক্তির ভাব আছে; হিন্দুসভ্যতার তাহা এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব। সেই মুক্তি তত্ত্বে ও মুক্তি সাধনায়; সাম্য বৈষম্য, অসীম সসীম, ভোগ ও ত্যাগের এক মহা সম্মিলন, এক মহাশ্চর্য্য সমাধান দেখিতে পাই। হিন্দুধর্ম্ম কেবলি কর্ম্মকাণ্ড নহে, কেবলি Rituals (পদ্ধতি) symbols (প্রতীক) প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত নহে। এই ভারতবর্ষে নানা জাতির ও ধর্ম্ম বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া এই এক বিশাল মুক্তির আদর্শ হিন্দুধর্ম্মের ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই আদর্শ বিশ্বজগৎকে দান সম্বন্ধে হিন্দুর গুরুতর দায়িত্ব আছে। যুগে যুগে হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে এই আদর্শই নানা ভাবে প্রচারিত হইয়াছে, এবং রাজা রামমোহন রায় তাহারি বার্ত্তা বহন করিয়া এই যুগে আসিয়াছিলেন। Rituals (প্রতীক) symbols (পদ্ধতি) প্রভৃতির বন্ধন হইতে সেই বিশাল মুক্তির তত্ত্বকে মুক্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে প্রদান করিতেছেন এবং ইউরোপের সর্ব্বোচ্চ মুক্তির আদর্শের সহিত তাহার সৌসামঞ্জস্য দেখাইতেছেন।"

ন্যায়রত্ন—"রবিবাবুর আধুনিক লেখার Art এর দিক হইতে আমি এইটুকু দেখিতে পাইতেছি যে, হিন্দুধর্ম্ম যে কেবলি কর্ম্মকাণ্ড নহে কেবলি Rituals, symbols প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত নহে, ইহা ছাড়া হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বরাবর যে একটা বিশাল মুক্তির ভাব আছে—হিন্দু-সভ্যতার ইহা যে এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব, তাহা রবিবাবু ভাল করিয়া না বোঝায় ও তাহা শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস না করায়, এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইতেছে।"

আমি বলিলাম, "তাঁর এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকে যদি গণ্ডগোল সৃষ্টি বলেন, ত আমরা নাচার। আপনার কথা মানিয়া লইলেও, এটা কি আপনি স্বীকার করেন না যে, হিন্দু সমাজের ও ধর্ম্মের ideal এর সহিত এখনকার বিশ্বজনীন ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করিতে সক্ষম না হইলেও, বর্ত্তমান যুগে উক্ত সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে একটি গুরুতর problem দাঁড়াইয়াছে, তাহা powerfully সাহিত্যে ফুটাইয়া তোলাটাই কি যথেষ্ট আর্টের পরিচয় নহে?"

ন্যায়রত্ন,—"হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে historic imagination এর অভাবজনিত presentationটির অঙ্গহানি না হইলে, অবশ্যই উহা উচ্চ শ্রেণীর Art হইত, সন্দেহ নাই।"

দেখিলাম, খাঁ সাহেব কোনও কথা না বলিয়া, তান পূরার তার মিলাইয়া, আমাদের তর্কবক্তির উপর একবার একটী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, পরক্ষণেই নয়ন মুদ্রিত করিয়া ইমনকল্যাণের আলাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার এই অবজ্ঞাসূচক কটাক্ষ আমাদের যেন খোঁচা দিয়া তার নীরব ভাষায় বলিয়া দিল যে, কোন উচ্চাঙ্গের Art appreciation ভাষার দ্বারা হয় না, তার definition নাই। তার সাধনা তর্কে নহে, ধ্যানে। সর্ব্ববিধ প্রাচ্য কলার এই যে এক বিশেষত্ব, তাহা ন্যায়রত্ন মহাশয় খুব বুঝিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চুপ করিলেন। সঙ্গীত চলিল। স্থির, গম্ভীর ও একটা অস্ফুট সুর সকলকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল।

মিনিটের পর মিনিট—ঘণ্টার পর ঘণ্টা,—এই রকম করিয়া তিন ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইল। এতগুলি বাক্য বাগীশ একেবারে নীরব। Maeterlink এর Treasure of the Humble নামক পুস্তকে নীরবতা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের কথা আমার মনে পড়িল। যে Art এতগুলি তর্কপ্রিয় লোককে এত দীর্ঘকালব্যাপী নীরবতা সহ্য করাইতে পারে,

তাহা বড় সামান্য নহে। মনে হইল, তানপুরার এই বাঁধা সুরের আসরের উপর আসিয়া মন্ত্রবলে নানাবিধ রাগ-রাগিণী নানা তালে, ছন্দে, তানে ও মূর্চ্ছনায়—তাহাদের রূপের মধ্যে কোথায় বা মাদকতা, কোথায় বা মোহ, কোথায় বা বিবশতা, কোথায় বা বৈরাগ্য, কোথায় বা বেদনা, কোথায় বা জ্বালাময়ী বাসনা লুক্কায়িত আছে—তাহা যেন অন্তর্গূঢ় স্থান হইতে উদ্ঘাটিত করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে।

ভাবিলাম, যদি কোন কারণে তানপুরার তার ছিঁড়িয়া ও খাঁ সাহেবের বাক্‌রোধ হইয়া হঠাৎ গান ও বাজনা বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে,—পৃথিবী চলিতে চলিতে থামিয়া গেলে বাস্তব জগতে যে বিশ্বব্যাপী tragedy এক মুহূর্ত্তে সংঘটিত হইতে পারে—সেইরূপ একটা tragedy এই রাগ রাগিণীর স্বপ্নরাজ্যের আসরের মধ্যে উপস্থিত হইবে।

কিন্তু তার ছিঁড়িল না। ক্রমে-ক্রমে গান বন্ধ হইয়া আস্তে-আস্তে তানপুরা থামিয়া তাহার স্বপ্নরাজ্যের আসর গুটাইয়া লইয়া নিস্তব্ধ হইল। খাঁ সাহেব আমাদের সম্মিলিত বাহবাকে ঘন-ঘন সেলাম দ্বারা প্রত্যভিনন্দিত করিয়া কহিলেন, "বাবু সাহেব, আব্ ত গানা পুরা হো গিয়া ; আভি আপ্‌লোগ তক্‌রার সুরু কিজিয়ে।" ন্যায়রত্ন মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া এক টিপ নস্য লইয়া বলিলেন, "না, খাঁ সাহেব, Art লইয়া আজ আর তর্ক করিব না ; উহা আরাধনার জিনিস তর্কের নহে।"

বিধিলিপি

শ্রীনিরুপমা দেবী

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৈশাখী পূর্ণিমার পূত, শুভ্র চন্দ্রালোকে, গঙ্গাতীরস্থ দেব মন্দিরের সৌম্য, মৌন মহিমার পার্শ্বেই ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানে মাধবী দেবী যেন একখানি পুষ্পপাত্র হাতে করিয়া সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভাতে, বৈকালে কত ফুল তোলা হইয়া গিয়াছে ; তথাপি এখনও বেলা-মল্লিকা গন্ধরাজের ঝাড়ের নূতন করিয়া ফোটার বিরাম নাই। আর শুভ্র জোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের গন্ধগুলিও যেন একটা জমাট সৌরভের অশরীরি মূর্ত্তি ধরিয়াই সেখানে স্থির হইয়া আছে। রমাও আবার নূতন করিয়া ফুল তুলিতেছিল। সন্ধ্যাবেলায়ই তাহার ঠাকুর আজ ফুলদোলে উঠিয়াছেন ; কিন্তু সেজন্য আজ ঠাকুরবাড়ীতে কোন গণ্ডগোল হয় নাই। পুষ্পদোলায় ফুলের সাজে সজ্জিত বিগ্রহকে দর্শন করিবার জন্য গ্রামবাসী যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা প্রসাদ পাইয়া তখনি-তখনি চলিয়া গিয়াছে ; কেন না, আজ সেখানে ফলাহার বা নৃত্য-গীতের কোন বন্দোবস্ত নাই। খানিকটা রাত্রিও হইয়াছে ; সন্ধ্যায় উদিত পূর্ণচন্দ্র ক্রমেই উপরে উঠিবার চেষ্টায় আছেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে ঠাকুরের ভোগ সারিয়া শয়ন-আরতির উদ্যোগ হইতেছে।

সে রাত্রির মত শেষ পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য রমা আবার নূতন ফুলের সন্ধানে বাগানে গিয়াছিল, তাহার সঙ্গে কাত্যায়নীও ছিল। রমা বলিতেছিল, "এই সময়ে এত ফুলও ফোটে ; তাই ঠাকুরকেও এই সময়ে ফুলদোলে বসতে হয়! ফুলগুলো তাঁর পরা চাই ত! কিন্তু দুঃখ এই যে, একটি রাত্রিমাত্র কেন এ দোলের ব্যবস্থা! আজ পূর্ণিমা, কিন্তু অমাবস্যার রাত্রিতেও তো এমনি ফুল ফুটেছে! চৈত্র বৈশাখ-ভোর কেন এ দোল টাঙ্গান থাকে না?"

কাত্যায়নী রমার উপহাসে একটু হাসিল মাত্র, উত্তর দিল না। রমা খানিক ভাবিয়া আপনিই আপনার প্রশ্নের উত্তর সমাধান করিল, "মানুষের অল্প শক্তির জন্যই বোধ হয় এ ব্যবস্থা! তারা যে তাতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌বে! তাই সবচেয়ে সুন্দর, আর ফুলের পূর্ণভাবে ফোটার রাতটিতেই মানুষের জন্য তাঁর দোলে ওঠার নিয়ম! কিন্তু তাই বলে চোত্‌-বোশেখ্ মাসের কোন দিনরাতেই কি তাঁর এ দোলের বাদ থাকে? এ মাস দুটির নামই যে সেই রকম! কি নাম ভাই তাদের—মনে পড়্‌ছে না?"

কাত্যায়নী মৃদু স্বরে বলিল, "মধু আর মাধব।"

"কি সুন্দর নাম ছুটি ভাই! আর কোন মাসের তো এমন নাম নেই! শুন্‌লেই যেন মনে হয়—" কাত্যায়নী এতক্ষণ মন্দির-নিম্নে প্রবাহিতা ক্ষীণ-শরীরা জাহ্নবীর অপর পারের বিস্তৃত বালুচরের পানে চাহিয়া ছিল—এইবার রমার দিকে চোখ্ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, "রাত অনেক হয়েছে, বাড়ী যাবে কখন্?"

"এই যে, এই ফুল-ক'টা ঠাকুরের বিছানায় দিয়েই যাব। এমন জায়গাটি ছেড়ে বাড়ী যেতেই তোমার এত তাগাদা? তুমি ভাই এত কি কোণায় থাক্‌তে ভালবাস।"

"সত্যি, আমাদের ঝোপ ঝাপে ঢাকা উঠোনটিই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।"

রমা সনিশ্বাসে বলিল, "তাই কি আর কোথাও না গিয়ে ঐখানেই জীবনটা কাটালে?"

"সেটা সুখের কথাই নয় কি? তোমায় যদি কেউ অন্য যায়গায় নিয়ে যেত?"

"আমার কথা আলাদা,—আমার যে কোথাও সবই আছে ভাই। তোমার মা ছাড়া আর কে আছে?"

"আমারও সব আছে। তোমার দাদার বিয়ের কথা বলছিলে, তার কতদূর ঠিক হ'ল?"

"আরও বছরখানেক পরে নইলে দাদা বিয়ে করবেন না বলেছেন। বাবা তো তার ইচ্ছার উপর কোন জোর করেন না—কাজেই এখন আর কৈ হ'ল! তুমি যে আর এখন আমাদের বাড়ী যেতেই চাও না—তা সব খবর জানবে কি! কাল যাবে ভাই?"

"পারি তো যাব। তোমাদের বাড়ীতে যার কাছে যাব, তাকে তো আমি রোজই কাছে পাই, তাই আর যাই না! তোমার আর-সব আপনার জনগুলির খবর কি রমা?"

রমা মৃদু হাসিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল, "জগতের যা খবর,—সুখে-দুঃখে মেশানো। কানাইয়ের পা'টা প্রায় সেরে এসেছে, জান ভাই? দুর্বলতার জন্যই আরও সে খুঁড়িয়ে হাঁট্‌ত! তার হাড় ভাঙেনি—পেশীতে জোর ছিল না! দাদা ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়ায়, এখন প্রায় সোজা ভাবেই হাঁট্‌তে পারে।"

"আরও কত লোকই যে তোমার কাছে আসে; তাদের সুখে-দুঃখে-মেশানো খবরের মধ্যে সুখের খবরও একটু বল শুনি।"

"সুখের খবর! চাড়ুয্যেদের বৌয়ের ছেলেটি বেঁচেছে; কানাইয়ের পা সেরেছে, আর তার মামার বাড়ীর গাঁয়ের মানুষটির নতুন ঘর হয়েছে। কাল সে তার ছেলে মেয়েগুলির সঙ্গে এক মুখ হাসি নিয়ে বলতে এসেছিল।" তার পর একটু ভাবিয়া রমা বলিল, "আর সবচেয়ে স্বস্তির খবর—রামের মা বুড়ী মারা গেছে।"

কাত্যায়নী হাসিয়া বলিল, "কার স্বস্তি? তোমার, না তার?"

"তার—তাই আমারো।"

কাত্যায়নী গম্ভীর মুখে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, "তোমার এটুকুও আমি বুঝতে পারি না। যত যন্ত্রণাই পাওয়া যাক্—সত্তা লোপ হয়ে যাওয়ার চেয়ে গতি আর কি কিছু আছে? ও যে ভাব্‌তেও ভয়ানক।"

"ভয়ানক নয়, সুন্দর! যন্ত্রণা ভরা জীবনের এই একমাত্র মুক্তির পথ। যে তার মরা মুখ দেখেছে, সেই বলেছে,—কি সুন্দর শান্তিতে সে তখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। [illegible] অনেকদিন থেকে '[illegible]' চেয়ে ছিল।"

"তার সেই যন্ত্রণা বোধের নিবৃত্তির সঙ্গে সকল বোধই যে একেবারে নির্বাণ হয়ে গেল, এও মনে রেখো।"

রমা গম্ভীর হইয়া বলিল, "কি করে এ কথা ভাব? মানুষ কি একটা যন্ত্রমাত্র যে, তার কলকব্জা নষ্ট হয়ে গেলে, তার পরে আর তার কিছুই থাকবে না?"

কাত্যায়নী অটল ভাবে উত্তর দিল, "মানুষ যে তার বেশী আরও কিছু, এমন কোন স্পষ্ট প্রমাণ দেখাতে কই পাওয়া যায়?"

রমা বিস্ফারিত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া শেষে বলিল, "যদি তাহাই তোমার বিশ্বাস, তবে কিসের জন্য নিজের জীবনটাকে এমন করে রেখেছ? কার প্রীতির জন্য তাকে উৎসর্গ করছ? তিনিও তো তা' হলে একটা যন্ত্রমাত্র ছিলেন, সকলের মতই যথানিয়মে চিরদিনের জন্য তাঁরও অস্তিত্ব তো লোপ পেয়েছে! তবে সে যন্ত্রের ইচ্ছার কথা মনে করে কেন এমন নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করেছ?"

কাত্যায়নী মাথা নামাইল; কিন্তু একটু পরেই উত্তর দিল, "আমি যদি বলি যে, আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নেই;

তিনি নেই, কিন্তু তাঁর চিরজীবনের ইচ্ছাটা কেবল তাঁরই সন্তানের মধ্যে বেঁচে আছে।"

"তাঁর এখন আর কিছু নেই, এ কথা তুমি মনে করতে পার? তা'হলে তুমি তোমার বাপকে শুধু ভক্তিই করেছ—ভালবাসনি!"

এইবার দেখিতে-দেখিতে কাত্যায়নীর চক্ষু অশ্রুতে পূরিয়া উঠিল। রমা তাহা দেখিয়া ম্লান মুখে বলিল, "তোমায় ব্যথা দিলাম, কিন্তু কি কর্‌ব! তোমার মনের বিশ্বাসগুলো দেখে আমিও যে আপনি কষ্ট পাই, তাই সামলাতে পারি না।"

কাত্যায়নী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এ ব্যথাটুকুর কথা ছেড়েই দাও; কিন্তু জগৎ কি আমাদের ভালবাসার জন্য আর বেদনার জন্য তার কোন সত্যকে চেপে রাখে রমা?"

"তুমি কি বল্‌তে চাও, জগতের কর্ত্তা তা'হলে একটা প্রকাণ্ড ফাঁকির জালমাত্র বুনে মানুষকে এমনি নাস্তানাবুদ্‌ করছেন? তা'হলে তাঁর মত নিষ্ঠুর আর ভয়ানক জগতে আর তো কিছু নেই!"

"তোমরাই জান, তোমাদের তিনি কি!"

রমা সবেগে সজোরে কাত্যায়নীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "হাঁ, তাই বল, আমরাই জানি—আমাদের তিনি কি! আর তুমিও আমার মুখের দিকে চেয়ে বোঝ, আমার অন্তরের স্পর্শ থেকে বোঝ—কি তিনি! তিনি আমাদের দয়াময়, স্নেহময়, সুন্দর! যিনি আমাদের এত দিয়েছেন, তিনি আমাদের শেষে এমন করে ফাঁকি কখনই দেন্‌ না। এত নিষ্ঠুর, এত ভয়ানক কখনই তিনি ন'ন্‌,—এ কথা তোমায় বুঝ্‌তেই হবে আজ। বোঝ, এ কথা বোঝ তুমি একবার। তিনি ভালবাসবার, নির্ভর করবার জিনিস, তিনি অসুন্দর ন'ন্‌।" ক্রমে ক্রমে রমার স্বর নিস্তব্ধ হইয়া গেল,—কেবল তাহার বেগবান্‌ বক্ষের উত্থান-পতন শব্দ, আর ভাব বিগলিত দেহ কাত্যায়নী নিজের বক্ষের উপরে, দেহের উপরে অনুভব করিতে লাগিল। ভাবই ভাবের উদ্বোধক। কাত্যায়নী কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে রমার এই ভাবময়ী মূর্ত্তিকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে-থাকিতে সহসা আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, তোমায় ছুঁয়ে আজ এ কথাও এক-একবার যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্চে রমা।" একটা পরম বিস্ময়ের আভাসে কাত্যায়নীর চক্ষে সহসা যেন অশ্রু জ্বলিয়া উঠিল। রমা এইবার চোখ্‌ মেলিয়া কাত্যায়নীর পানে চাহিল; মৃদুস্বরে বলিল, "শুধু আমাকে ছুঁয়ে? জগতের আর কিছুতেই কি এ কথা কখনো তোমার মনে হয়নি? সত্যি কি তুমি কারুকেই কখনো ভালবাসনি?"

"তাই বোধ হয় হবে। আমার বাবা আমায় যা শিখিয়েছেন, তার নাম বোধ হয় ভালবাসা নয়।"

"তবে কি শিখিয়েছেন তিনি এতকাল ধরে?"

"যা শিখিয়েছেন, তা দেখ্‌তেই পাচ্চ! কিন্তু তুমি এত সম্পদ কোথায় পেলে রমা? তোমায় যে আমি ধারণা করেও উঠতে পাচ্চি না।"

"আমার বাবাকে যদি জান্‌তে, তা'হলে এ কথা বলতে পারতে না।"

কাত্যায়নী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া সহসা একটু হাসিল, এবং তখন যেন প্রসঙ্গান্তর আনিয়া বলিল, "আচ্ছা রমা, শ্রদ্ধার পূজা আর তোমাদের এই ভালবাসা,—এদের মধ্যে কে বড়, বলতে পার?"

"কে বড়? না, তা বল্‌তে পারি না; তবে শ্রদ্ধার জিনিস বড় উঁচুতে থাকে না কি? নিজের সুখ-দুঃখও তাঁকে দেওয়া চলে না—তার সুখ-দুঃখেরও ভাগী হ'তে পারা যায় না। কিন্তু ভালবাসায় পরের মত এ দূরত্বটা থাকে না।"

"থাকলই বা এ দূরত্ব! নাই বা সুখ-দুঃখের ভাগ দিতে পারা গেল? আমার মনে হয়, এইই বড় রমা। জগতে তোমাদেরও ভালবাসার এমন কিছু জরুরী কাজ নেই।"

"তা'হলে চিরদিন আধখানা মানুষই থাক্‌তে হয় যে!"

"তাও ভাল; তবু যার ভেতরে এত উচ্ছৃঙ্খল বেগ, এত অন্যায় অদম্য ইচ্ছা—সে জিনিসকে আমার জেনে কাজ নেই।"

রমা বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল, "সে কি? তুমি কি বলছ? অন্যায়, উচ্ছৃঙ্খল, অদম্য বেগ ভালবাসার? সে কি!"

রমার বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া কাত্যায়নী মৃদুস্বরে বলিল, "এও ভুল বলেছি হয় ত, রমা! তুমি ভালবাসার যে মূর্ত্তি এঁকেছ, আমি যে তা দেখিনি। আমি যা দেখিছি, তার নাম হয় ত আসক্তি আর মোহ; কিন্তু তুমি যা পেয়েছ, সে বুঝি আর এক জিনিস।"

রমার আর প্রশ্ন করার অবসর হইল না,—দেবতার আরতির শব্দে শশব্যস্তে সে মন্দিরের পানে চলিল। আর কাত্যায়নীও অন্য দিকে চলিতে চলিতে তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "তোমার ঝিকে নিয়ে আমি বাড়ী চল্লাম; অনেক রাত হয়েছে, মা একলা আছেন। তোমার তো দিদিমাদের কে-কে মন্দিরে আছেন—ঝিও এখনি ফিরে আসবে।" রমা "আচ্ছা" বলিয়া উত্তর দিয়া অদৃশ্য হইল, কাত্যায়নীও ঝিকে ডাকিয়া লইয়া বাটী অভিমুখে চলিল।

কাত্যায়নীকে দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া দাসী ফিরিয়া গেলে, কাত্যায়নী জ্যোৎস্নালোকিত অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, কে একজন বসিয়া আছে। সবিস্ময়ে বলিল, "কে, মহেন্দ্র? কখন এলে?"

"অনেক ক্ষণ,—সন্ধ্যার পরেই এসেছি।"

"মা কই?"

"এতক্ষণ গল্প করে-করে, এই শুতে গেলেন। তুমি ব্যস্ত হয়ো না আমার খাওয়াও হয়েছে।"

কাত্যায়নী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "এবারে অনেক দিন পরে এসেছ। পূজোর সময় সেই তিন-চার দিন—তার পরে প্রায় সাত মাস পরে এসেছ আজ।" মহেন্দ্র মুখ তুলিয়া একটু হাসিল, হাসিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, "এই সাত মাস রোজই ভেবেছি, আমার ডাক্ এল বলে! কিন্তু এতদিনেও তা না পেয়ে মনে হ'ল, তবে কি আমার এটুকুও আর জান্‌বার অধিকার নেই! তাই দেখ্‌তে এলাম, আর কতটুকু দাবী আমার বাকী আছে, আর—"

"কিসের ডাক্ তুমি পাওনি? কি তোমার জান্‌বার অধিকার নেই?"

"তোমার বিয়ের সময় আমাকে একবার ডাকারও প্রয়োজন হবে কি না, তাই বুঝ্‌তে এসেছি। চলে যাচ্ছ? আমার সঙ্গে কি আর একটু কথাবার্ত্তা কওয়াও চলে না?"

"ক্রমে তুমি সেই রকমই ব্যাপার করে তুলছ মহেন্দ্র!"

"বল, এ কি মিথ্যা বলছি? আশ্বিন মাসে শুনে গিয়েছিলাম—শীগ্‌গিরই কর্ত্তার বিয়ে—পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি আর গৃহশূন্য হ'য়ে থাক্‌বেন না।"

"মহেন্দ্র, কেবল তোমার মনের দুরবস্থা দেখেই এ কথার উত্তর দিচ্ছি! আমাকে যা বল্‌তে হয় বল, যা ভাবতে হয় ভাব; কিন্তু যাঁর হাতে বাবা তোমায় সমর্পণ করে গেছেন, যিনি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক,—তাঁর সম্বন্ধে তুমি এ রকম ধারণা মনে স্থান দিও না। এতে আমাদের ভাল হবে না মহেন্দ্র! তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন, তাতে তাঁকে আমাদের দেবতা মনে করা উচিত।"

"হতে পারে তিনি দেবতা, কেন না তাঁর মত অবস্থায় দেবতা হওয়া খুবই সহজ। যাক্, আমার আসল কথার উত্তর কি, কাত্যায়নি?"

"অপেক্ষা কর, দেখ্‌তেই পাবে। তোমার এ সব ভুল কতদিনে ভাঙবে?" "কখনো ভাঙ্‌বে বলে মনে হয় না। তোমার আপত্তিতেই এ বিয়ে স্থগিত আছে, বুঝ্‌তে পারছি, কিন্তু কতকাল এ জোর রাখ্‌তে পারবে? জীবনের যে সবই তোমার পড়ে আছে এখনো;—এ জেদ কতদিন স্থায়ী হবে! বিশেষ, যাকে এত ভক্তি কর, ভালবাস,—তাঁর কাছে এ কি আর বেশী দিন টিক্‌বে?"

"বেশ, তবে তাই হবে! কথাটাও সত্যি তাই। লোকের চক্ষে আমার বিয়ে হয়নি বটে, কিন্তু তুমি-আমি—আমরা তো জানি—আমি অদত্তা নই। তিনিও তা জেনেছেন। এ রকম থাকা—এ কেবল ইচ্ছা করে থাকা মাত্র। কিন্তু তোমার মনের গতি দেখেই কেবল আমার কষ্ট হচ্চে মহেন্দ্র, তুমি এ কি হচ্চ? জগতের কারুকেই আর তোমার বিশ্বাস নেই! এমন তো তুমি ছিলে না!"

"তুমিই করেছ! এই বা কি, এর পরে আরও কি হব না জানি! কাত্যায়নি, তুমি না কামাখ্যা বাবুকে দেবতা বলছিলে! আমিও বিশ্বাস করছি—হ্যাঁ, তিনি দেবতাই বটেন; এতদিনও যদি না হয়ে থাকেন, এখন হবেন বা হয়েছেন। মানুষকে দেবতা কিসে করে জান? অবস্থা! তিনি যদি তোমায় বিবাহও না করেন, তবু তাঁর মত ভাগ্যবান কে? তুমি তাঁকে দেবতা বলে জান,—তাঁর ওপর তোমার এত বিশ্বাস, এত শ্রদ্ধা! এত ভালবাস তুমি তাঁকে! তিনিও তোমার এ ভক্তির কথা নিশ্চয়ই জানেন,—তিনি দেবতা না হবেন কেন? আর এই যে আমি দিন-দিন তোমার কাছে নীচমনা, ক্রূর, পরশ্রীকাতর হয়ে দাঁড়াচ্ছি,—এর পর আরও কি হব না জানি! হয় ত এর পরে ক্রমে তুমি আমার মুখ দেখ্‌তেও ঘৃণা করবে; এ কেন! তোমার কি আজ মনে হবে কাত্যায়নি,—

একদিন আমায়ও শত্রু-মিত্রে প্রশংসা করেছে; তুমিও, আর কিছু না হোক্, শ্রদ্ধার চোখে দেখেছ! তখন আমার জীবনে আশা ছিল, আনন্দ ছিল,—তাই আমিও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হতে পেরেছিলাম! আজ আমার তা নেই, তাই আমি আজ মানুষ নামেরও অযোগ্য হয়ে পড়ছি। অবস্থা মানুষকে ক্রমে পিশাচ পর্যান্ত করে, জান?"

"কেউই তোমায় অশ্রদ্ধা করে নি মহেন্দ্র! আমার তো তুমি ভাই,—আমাদের মায়ের একমাত্র আশার স্থল তুমি,—তোমায় আমি অশ্রদ্ধা করব? কিন্তু তুমি অন্যায় পথে চলেছ। আমাকে তুমি যা ইচ্ছে বলতে পার; কিন্তু যিনি তোমার প্রতিপালক, তাঁর ওপরেও বিদ্বেষ আনছ—এ কি ভাল করছ, মহেন্দ্র?"

"কাত্যায়নি, এর আগে দেখেছি, তোমাকে আমি এতটুকুও এসব বল্‌লে তুমি সহ্য করতে না! কিন্তু এখন আর সব সহ্য করতে প্রস্তুত আছ—কেবল কামাখ্যাবাবুকে মন্দ বললে সেইটাই মাত্র তোমার অসহ্য। এ কি আমার ভালর জন্যই তুমি সহ্য করতে পারছ না কাত্যায়নি? তা যদি হ'ত, তোমার এ কথা আমি মাথায় করে নিতাম। তা তো নয়, এ যে তোমার,—যাক্। তুমি যখন জমিদার গৃহিণী হবে, তখন একটা খবর পাব নিশ্চয়—কেমন?"

"পাবে বই কি। এখন মা যে বারে বারে ডাক্‌ছেন, শুনতে পাচ্চ না কি? ও কি, ওদিকে চল্‌লে যে? মার কাছে যাও!"

"ভোরেই চলে যেতে হবে, থাক্‌বার উপায় নেই।"

"তা'হলে মাকে ডাকি—বলে যাও, প্রণাম করে যাও—"

চলিতে-চলিতে মহেন্দ্র বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "না, আবার যখন আস্‌ব তখন।"

মহেন্দ্র চলিয়া গেলে, মাতার পুনঃ-পুনঃ আহ্বানে কাত্যায়নী দ্বার বন্ধ করিয়া গৃহমধ্যে মাতার নিকটে গেল। মাতা বলিলেন, "মহীন্ কই?"

কাত্যায়নী কষ্টে উচ্চারণ করিল, "জমিদার বাড়ী।" সে যে একেবারে চলিয়া গেল, তাহা আর মাতাকে সাহস করিয়া বলিতে পারিল না; কেন না, তাহা হইলে মাতা এখনি কাঁদিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইবেন।

মাতা সনিশ্বাসে বলিলেন, "রাতটুকুও আমার কাছে থাকল না, থাক্, যেখানে থাক্‌লে ভাল থাকে থাক্।"

কাত্যায়নী নিঃশব্দে মাতার পার্শ্বে শুইয়া পড়িল। মাতাও একটু পরে আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি শেষে তিনি কাত্যায়নীকে ডাকিয়া চেতন করাইলেন, "কাত্, একখানা গায়ের কাপড় দে, বড় শীত কচ্চে।"

মাতার ললাটে হস্ত দিয়া কাত্যায়নী দেখিল, তাহার কপাল অত্যন্ত গরম। প্রবল জ্বর সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। দু'তিনটা গাত্রবস্ত্র উপরি উপরি চাপাইয়াও তাঁহার কম্পন নিবারণ করিতে পারিল না। বাকী রাত্রিটুক মাতাকে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়াই কাটাইল। প্রভাতে মহেন্দ্রের সন্ধানে জমিদার বাড়ী লোক পাঠাইয়া জানিল, মহেন্দ্র অতি প্রত্যুষেই মফঃস্বলে রওনা হইয়াছে।

মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী

[শ্রীসারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়]

নানাপ্রকার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়াও পুণ্যময়ী ভারতজননী কখনই সুসন্তান লাভে বঞ্চিতা হন নাই। জননী প্রায় সহস্র বৎসর হইল রাজ-সিংহাসন হারাইয়াছেন, কিন্তু যে রত্ন হাজার রাজার মুকুটমণি দিয়াও লাভ করা যায় না, সেই ধর্ম্মরত্ন চিরকালই জীর্ণ বস্ত্রে আবরিয়া দীর্ণ বক্ষে চাপিয়া রাখিয়াছেন। সেই মহারত্ন বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার যে সকল সুসন্তান ভারতের মুখোজ্জ্বল ও বসুন্ধরাকে পুণ্যবতী করিয়াছেন, বাবা গম্ভীরনাথজী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বহু লোককে ধর্ম্মান্ন ও ভক্তিবারি দানে কৃতার্থ করিয়াছেন। বঙ্গদেশেও বহু নরনারী তাঁহার কৃপা-লাভ করিয়াছেন।

কাশ্মীরদেশের অন্তর্গত জম্বু নামক স্থানে বাবা গম্ভীরনাথজী একজন রাজ-পুরোহিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যাবধিই সংসারে অনাসক্ত এবং চিরকুমার ছিলেন।

তাঁহার পিতা জায়গীরদার, সুতরাং অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। বাবা গম্ভীরনাথ ১৭।১৮ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্থানই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। গৃহত্যাগের পরই তিনি গোরক্ষপুরের শ্রীমৎ গোপালনাথ জীউর (নাথ যোগী) নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

"দশনামী" সন্ন্যাসী-দলভুক্ত ব্রহ্মাগিরি নামক জনৈক সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথের প্রসাদ লাভ করিয়া "অওঘড়" নামে এক সম্প্রদায় গঠিত করেন। পাতঞ্জল দর্শন অবলম্বনে "হঠপ্রদীপিকা", "দত্তাত্রেয় সংহিতা" ও "গোরক্ষ সংহিতা" এই তিন সংহিতায় যোগী শ্রেণীর যে বিবরণ বর্ণিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই যোগিগণ নানা ভাগে বিভক্ত এবং তাঁহাদের সাধারণ উপাধি "নাথ"। ইহাদের মধ্যে সাড়ে বারটী শ্রেণী আছে। কনফট্, অওঘর, মচ্ছেন্দ, ভর্তৃহরি, সারঙ্গী, ডুরীহার, কানিপা, নাগডা, সিদ্ধিকেবালি, অঘোরপন্থী, যোগিনী ও সংযোগী এই হইল ১২ শ্রেণী, আর অর্দ্ধশ্রেণীর বিবরণ এই যে, একজন মুসলমান ছদ্মবেশে কোন সিদ্ধ "নাথ" যোগীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এই বর গ্রহণ করেন যে, যতদূর হইতে তাঁহার শব্দ শ্রুত হইবে, ততদূর পর্যান্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত ও তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত হইবে। বর গ্রহণের পর তিনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র মুসলমান-ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। বরদাতা গুরু এই সংবাদে রুষ্ট হইয়া তাঁহার শক্তি নষ্ট করেন। এই মুসলমান যোগীকেই "অর্দ্ধযোগী" বলা হয়, এবং তাহাতেই নাথ সম্প্রদায় সাড়ে বার শ্রেণীতে বিভক্ত। ইঁহাদের প্রধান-প্রধান ক্ষেত্র দক্ষিণাপথে কাজলীতে, পেশোয়ারে, দ্বারকায়, হরিদ্বার গোরক্ষসুড়ঙ্গে, নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরে, কলিকাতা দমদমার নিকট গোরখবাসলীতে ও হুগলী জেলার অন্তর্গত মহানাদ গ্রামে জটেশ্বর মন্দিরে এবং গোরক্ষপুরে। শেষোক্ত স্থানই ইঁহাদের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান।

এই গোরক্ষপুরে (গোরখপুর) "গোরক্ষনাথের" আসন প্রতিষ্ঠিত আছে। ত্রেতাযুগ হইতে এই আসন প্রতিষ্ঠিত, ইহা স্বয়ং গম্ভীরনাথ বাবা বলিয়াছেন। "এই মন্দিরও ত্রেতাযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে কি?" জিজ্ঞাসা করাতে বাবা বলিয়াছিলেন "না, কিন্তু আসন ঠিকই আছে।" সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজির সময়ে একবার এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে একবার এই স্থানের মন্দির ধ্বংস করা হইয়াছিল; কিন্তু ঐ সময়েও আসন রক্ষিত হয়। পরে "বুদ্ধনাথ" বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কনফট্ যোগী সম্প্রদায় গুরু "গোরক্ষনাথ" প্রবর্ত্তিত। "আদিনাথকে নাতী, মচ্ছেন্দনাথকে পুত, মৈঁ যোগী গোরখ অবধুত।" অনেকের মতে ইনি নয় নাথের এক নাথ; কেহ কেহ বলেন গোরক্ষনাথ স্বয়ং মহাদেব।

বাবা গম্ভীরনাথ "অওঘর" যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত। দশনামীর ব্রহ্মগিরির প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি গলদেশে নাদ ও শেলি ধারণ করিতেন, এবং সন্ধ্যার পর মন্দির প্রদক্ষিণ সময়ে তিনি ঐ নাদের ব্যবহার করিতেন।

বাবা গম্ভীরনাথ সাত্ত্বিক স্বভাব ও অতি কঠোর সাধক ছিলেন। সাংসারিক মান মর্য্যাদা বা পদাদি তিনি সাধনের বিঘ্ন বলিয়া মনে করিতেন। সাধনই তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব ছিল, এই জন্যই তিনি নিজ গুরুদেবের দেহান্তে গোরক্ষপুরের গদীতে বসিবার অধিকার ও নিমন্ত্রণ পাইয়াও নিজে তাহা গ্রহণ করিলেন না। নিজের চাচাগুরুর এক শিষ্য ঐ মন্দিরে পূজারীর কার্য্য করিতেন, —তাহাকে একেবারে পূজারীর পদ হইতে দায়িত্বপূর্ণ মোহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং নিজে গয়া প্রভৃতি স্থানের নির্জ্জনদেশে কঠোর সাধনে মগ্ন থাকিলেন। গোরক্ষনাথের স্থাবর সম্পত্তির বার্ষিক আয় বেশ আছে,— প্রণামী ও পূজা প্রভৃতি হইতেও অর্থ সমাগম হয়। ঐ মোহান্তের পদ সাধুদিগেরও সম্মানার্হ, সুতরাং বাবা গম্ভীরনাথ ধন, মান ও পদগৌরবকে উপেক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে, যৌবনেও ভোগতৃষ্ণা তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

তিনি কয়েক বৎসরকাল প্রয়াগক্ষেত্রের দুই ক্রোশ ব্যবধানে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে ঝুসি নামক স্থানের এক গুহায় তপস্যা করেন। গয়াতে ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের নিকট কপিলধারায় তিনি দুইবারে ১২ বৎসরকাল তপস্যা করেন। এতদ্ভিন্ন "বরাবর" নামক প্রসিদ্ধ পাহাড়ের নিভৃত গহ্বরে ও অন্যান্য বহুস্থানে ধর্ম্মলাভের জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছেন।

গত বৎসরে (১৩২৪ সনে) বারুণী স্নানের দিবসে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে দিবা ১০টা ১৫ মিনিটের

সময় বাবা গম্ভীরনাথজী গোরখপুরে জড়দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আমার পরম সৌভাগ্য যে একবার ৺পুরী-ধামে গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদের নরেন্দ্র সরোবর-তীরস্থ আশ্রমে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম। তখন যে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি, সেই দৃশ্য তাঁহারই কৃপায় চিরদিনের তরে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

বাবা গম্ভীরনাথ পুরীধামে আসিয়া কোন পাণ্ডার বাটীতে আছেন এই সংবাদ পাইয়া, দাদা ৺যোগজীবন গোস্বামী অতিশয় আদর করিয়া তাঁহাকে আমাদের আশ্রমে আনিয়াছিলেন। তখন শ্রীগুরুদেব দেহে নাই, আশ্রমের আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল না; তথাপি ৺যোগজীবন গোস্বামী ঋণ করিয়াও অতিশয় ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। আমাদের প্রতি স্নেহ দেখাইয়া তিনি ৭ দিন এই আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। আমি আশ্রমের সেবা কার্য্য করিয়া মাঝে মাঝে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহার নিকট গিয়া বসিতাম। তাঁহার নিকট বসিলেই আমার গুরুদত্ত নাম আপনা আপনি স্রোতবেগে চলিতে থাকিত। কিছুক্ষণ পরে বাবা বলিতেন, "যাও, এখন সেবাব বাগো চল।" আমি তখন উঠিয়া গিয়া শ্রীমন্দিরে গুরুদেবের আরতি করিতাম, বাবা দাঁড়াইয়া উহা দর্শন করিতেন।

আমরা তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতাম ও তাঁহার প্রদত্ত আহারীয় গ্রহণ করিতাম। তাঁহার ধর্ম্মের কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। পরিধানে একখানা সাদা ধুতি মাত্র এবং উত্তরীয়রূপে একখানা সাদা চাদর থাকিত। তিনি কাহারও সহিত বেশী কথা বলিতেন না, নিরন্তর সাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। মাঝে-মাঝে সঙ্গীয় লোকদের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে যাইতেন।

এই সময়ে শ্রদ্ধাভাজন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় ৺পুরী ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "কাঁহা যায়েগা, কাহে এধার উধার ঘুমেগা, গোসাইজী ত ইঁহাই হায়।"

বিশ্বাস মহাশয়ের সহিত বাবার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড় গোস্বামী-প্রভুর বিশেষ একটা তপস্যা স্থল। আকাশগঙ্গা হইতে অনতিদূরে ব্রহ্মযোনী পর্ব্বতের নিকটে কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের সংলগ্ন গোফায় তখন বাবা গম্ভীরনাথ তপস্যা করিতেন। গোস্বামী মহাশয় আকাশ-গঙ্গা হইতে বহুবার বাবা গম্ভীরনাথকে দেখিতে গিয়াছেন; তাঁহারই সঙ্গে গিয়া শ্রদ্ধেয় বিশ্বাস মহাশয় বাবাকে পুনঃ-পুনঃ দর্শন করিয়াছেন।

এই দর্শন সম্বন্ধে বিশ্বাস মহাশয়ের নিজের উক্তি এই স্থানে যুক্ত করিয়া দিলাম। বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন, "সেবারে আমি আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা পাই, সেবার গোস্বামী মহাশয় একদিন বলিলেন যে, চলুন, বাবা গম্ভীরনাথকে দর্শন করিয়া আসি। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে বর্দ্ধমানের দেবপ্রতিপালক নামে এক বাবাজী ও আমি চলিলাম। আমরা আশ্রমে গেলে, গম্ভীরনাথজী খবর পাইয়া আমাদিগকে দর্শন দিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "বাবা, দয়া করিয়া কিছু ধর্ম্মের উপদেশ দিন।" বাবা বলিলেন "আমি কিছুই জানি না (হাম কুছ্ নহি জান্‌তা), তবে যদি ইচ্ছা হয়, আমি যাহা করি, আমার ভজন গৃহে গিয়া দর্শন করিয়া আসিতে পারেন।" ইহা শুনিয়া আমি ও বর্দ্ধমানের বাবাজী বাবার ভজন কুটীরে প্রবেশ করিলাম। গৃহটি ৮।৯ হাত লম্বা ও ৫।৬ হাত চওড়া। উহার একটীমাত্র দ্বার, সেটা দুই ফুট লম্বা ও দেড় ফুট আন্দাজ চওড়া হইবে। গোস্বামী মহাশয় স্থূল-কায় বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না,—গলা বাড়াইয়া ভিতর দর্শন করিলেন। আমরা ভিতরে গিয়া দেখিলাম, একখানা আসন পাতা রহিয়াছে; সম্মুখে কোসা-কুশি আছে, প্রদীপ জ্বলিতেছে ও হোমকুণ্ডে অগ্নি রহিয়াছে; ভিতরে আর কিছু নাই। আমরা দর্শন করিয়া বাহিরে আসিলাম। গোস্বামী মহাশয় পুনরায় বাবাকে অনুরোধ করিলেন, "বাবা, কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিন।" বাবা তদুত্তরে বলিলেন, "হাম্ সাচ বোল্‌তা, হাম কুছ নেহি জান্‌তা।" অতঃপর বাবা আমাদিগের প্রত্যেককে এক-একখানা "বজরংকারুট" (একরকম খাজা বিশেষ) এবং ১০।১২টী উৎকৃষ্ট গুজরাটি এলাচি খাইতে দিলেন। আমরা ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আশ্রমে ফিরিলাম। * * আকাশগঙ্গার আশ্রমে আমরা শয়ন করিয়া আছি। জ্যোৎস্না রাত্রি, চরাচর সমস্ত নিস্তব্ধ, নীরব। শুনিতে পাইতাম, পাহাড়ের শৃঙ্গে রাত্রি ১টা ২টার সময় সেতার বাজাইয়া কে যেন ভজন করিতেছেন। গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে বলিতেন, "ঐ শুনুন, বাবা

গম্ভীরনাথ কি মিষ্টি ভজন করিতেছেন।" কোন-কোনও দিন ঐ ভজন শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় একাকী সেই নিশীথ সময়ে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেন। দুই এক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিতেন। একদিন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "বাবা বড় প্রেমিক, এবং খুব শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা। হিমালয়ের নীচে এরূপ আর দেখা যায় না। পাহাড়ে কত বাঘ, সাপ, প্রভৃতি হিংস্র জন্তু রহিয়াছে, বাবার শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া কেহই অনিষ্ট করে না।" বাবা এইরূপ নিশীথ সময়ে সেতার বাজাইয়া ভজন করিতে-করিতে পাহাড়ের এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে চলিয়া যাইতেন।"

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীমান্ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী বলিলেন, "গোস্বামী মহাশয় বাবা গম্ভীরনাথজী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, হিমালয়ের নীচে আর এখন এরূপ শক্তিশালী মহাপুরুষ নাই। ইনি ঐশ্বর্য্যভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া এখন মাধুর্য্যাতে ডুবিয়া গিয়াছেন। ইঁহার অলৌকিক শক্তি আছে।"

আমি আকাশ-গঙ্গাতে যখন ভজন করিতাম, তখন প্রায়ই বাবাকে দর্শন করিতে যাইতাম। বাবার আমার প্রতি বড় কৃপা ছিল। আমি না গেলে লোক পাঠাইয়া আমাকে নেওয়াইতেন এবং কাছে বসাইয়া রাখিতেন। আমি সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া ভজন করিতাম ও পরে চলিয়া আসিতাম। একদিন তিনি আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "অভি আপ্ চলা যাইয়ে কাশীজী।" আমি বলিলাম, "কাশীতে থাকিতে আমি ভইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছি। আর আমার যাইতে ইচ্ছা হয় না।" তিনি বলিলেন, "নেহি—নেহি, চলা যাইয়ে, উঁয়া আপ্‌কা লিয়ে সব বন্দোবস্ত হো চুকা।" আমি বলিলাম, "এ কি আপনিই বলিতেছেন, না, কাশী যাওয়া আমার ঠাকুরেরও ইচ্ছা?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, উনিকা হুকুম। অভি চলা যাইয়ে।" ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে আমাকে বাবাজী একদিন বলিয়াছিলেন, "ভজন কা লিয়ে আপ্ লোগোন্‌কা যো ৺পুরীজীমে গুরুজীকি সমাধি স্থান হ্যায়, এইসান্ ভূমি আউর হ্যায় নেহি।"

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন, "কুম্ভ মেলাতে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমরা গম্ভীরনাথ বাবাকে দর্শন করিতে যাই। গিয়া দেখি, তিনি একটা খড়ের ঝুপড়িতে বিচালির উপরে একটা কম্বল মুড়ি দিয়া একটা ঝাড়ি শিয়রে দিয়া শয়ন করিয়া আছেন। দর্শনানন্তর ফিরিয়া আসিবার সময় গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে বলিলেন, 'দেখিলে তো, ইনি ভক্তিপথে পড়িয়া মাটি* হ'য়ে গিয়াছেন।'" মহেন্দ্রবাবু আরও বলিলেন, "বরদাবাবুর সহিত গম্ভীরনাথ বাবাকে যখন গয়াতে তাঁহার আশ্রমে দর্শন করিতে যাইতাম, আশ্রম বড় রাস্তা হইতে প্রায় এক মাইলের অর্দ্ধাংশ দূর হইলেও, সেই স্থান হইতে বাবার শক্তির একটা প্রবল প্রভাব টের পাওয়া যাইত। আশ্রমে তিনি একখানা ভাঙ্গা চৌকিতে বসিয়া থাকিতেন। একটা হুকা,—সেটার খোলের নীচের দিকের পোড়া ফেলা হয় নাই—তাহাতেই আনমনে বসিয়া এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা ধরিয়া তামাক খাইতেছেন। শুনিয়াছি, বাবাজি দুই দিন অন্তর তাঁহার ভজন কুটীর হইতে বাহির হইতেন।"

"গয়াতে কপিলেশ্বর শিব মন্দিরের নিকট বাবার আসন ছিল। তাঁহার আশ্রমটি বড় নির্জ্জন স্থানে, তিন দিকে উচ্চ পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। এই আশ্রমের মধ্যে উচ্চ বেদীর মধ্যস্থলে একটা নিম্ববৃক্ষ আছে,—এ বৃক্ষের মূলে বাবার স্বহস্ত রোপিত ত্রিশূল রহিয়াছে। এই উচ্চ বেদীর চারি কোণে চারিটি আসন স্থান আছে। বাবা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঐখানে আসিয়া বসিতেন। অন্য সময়ে কখনও আশ্রমের গোলা ঘরের নিকটস্থ আসনে, আর কখনও তৎসংলগ্ন গুহার নিভৃত আসনে বসিয়া সাধন করিতেন। শুনিয়াছি, কখনও কখনও তিনি একাসনে সপ্তাহকাল যোগে থাকিতেন; ঐ সময়ের মধ্যে আহার বা মলমূত্রাদি ত্যাগেরও প্রয়োজন হইত না। অতি গভীর রাত্রিতে কখন কখনও অপর যোগিগণ ব্রহ্মযোনির অত্যন্ত নিভৃত গুহা হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত ভজনে যোগ দিতেন। তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং নিজে অতি সুন্দর রূপে সেতার বাজাইতে পারিতেন। একদিন আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তাঁহার সেতার বাজনা শুনি। প্রাতে উঠিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি খাটিয়ার উপর বসিয়া একটি সেতার আনাইলেন ও বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বাদ্য শুনিয়া আমি মুগ্ধ ও আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। তিনি

* এখানে মাটি শব্দের অর্থ নিরভিমান।

আমার মনের কথা বুঝিয়া যে আমার বাসনা পূর্ণ করিলেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম। এই প্রসঙ্গে আর একদিনের একটি ঘটনা বিবৃত করিতেছি। আমি শুনিয়াছিলাম, বাবা বড় ভাল চা প্রস্তুত করেন। একদিন প্রভাতে বাবার নিকট চা খাইবার জন্য উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলাম, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলাম না। আশ্রমে তখন চা হইত না, কিন্তু আমি বসিবার পরই বাবা জল গরম করিয়া চা প্রস্তুত করিতে বলিলেন এবং প্রস্তুত হইলে জনৈক সেবককে বলিলেন "বাবুকো চা দেও।" সেবক পিতলের গ্লাসে চা আনিলে বাবা বলিলেন "নেহি, লে যাও, পাথ্থরকা গ্লাসমে চা দেও।" এ কথাটি এই জন্য বলিলাম যে, মহাপুরুষগণ গৃহীলোকদিগেরও মর্য্যাদা রক্ষা ও আদর যত্ন কি ভাবে করেন, তাহা দেখিবার ও শিখিবার জিনিস। চা পানের পর তিনি সেবক দ্বারা স্থান পরিষ্কার করাইলেন, আমাকে হাত ধুইতেও উঠিতে হইল না।

"বাবাকে আমি তিন অবস্থায় দর্শন করিয়াছি। প্রথম অবস্থায় তাঁহাকে মলিন একখানি ছোট বস্ত্রখণ্ড বহির্ব্বাস রূপে ব্যবহার করিতে দেখি। এই সময় তিনি সর্ব্বদাই যেন কি ভাবে মগ্ন থাকিতেন। দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ, মুখে একটি শব্দ নাই। তামাক খাইতেন বটে, কিন্তু তামাক দিয়া গেল, তাহা জলিয়া গেল, টানা হইল না। পুনরায় দিয়া গেল, দুই-তিন টান দিলেন, ধূম বাহির হইল না, আগুন নিবিয়া গেল; হাতে ডাবা ধরিয়া বসিয়াই আছেন, যেন দেহটি রাখিয়া কোথায় কোন্ রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। পুনরায় তামাক আসিল, এবার ২।৩টি টান দিলেন, ধূঁয়া বাহির হইল, পরে রাখিয়া দিলেন। এই সময়ে প্রায়ই মৌনাবস্থায়ই থাকিতেন। কচিৎ এক আধটি কথা বলিতেন; যেমন, "বৈঠিয়ে, আইয়ে"।

"দ্বিতীয় অবস্থায় একটু পরিষ্কার প্রমাণ ধুতি পরিতেন, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতেন। অতি অল্প কথা বলিতেন; কিন্তু খাটিয়ায় শয্যা ব্যবহার করিতে দেখি নাই।

"তৃতীয় অবস্থায়, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মূল্যবান বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। খাটিয়াতে পরিষ্কার বিছানায় বসিতেন। লোকের সহিত আলাপ বা ভজন গান চর্চ্চাদি করিতেন এবং গোরক্ষ-মন্দিরের হিসাব ও অর্থাদি রক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিতেন। এই সময়ে তিনি অনেক বাঙ্গালীকে দীক্ষা দান করেন। সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী দীক্ষাপ্রার্থীকে আমিই তাঁহার নিকট উপস্থিত করি।

"বাবা অতি ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট যোগৈশ্বর্য্য থাকিলেও তাহার কোনও পরিচয় দিতেন না। নিজেকে অত্যন্ত গোপনে রাখিতেন। তাঁহার চাল চলন দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারিত না যে, তিনি অতি বড় যোগৈশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ।

"মহাপুরুষদের নিকট বসিলে সমস্ত বিকার তাঁহারা যেন টানিয়া বাহির করেন। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাবার নিকট বসিয়া জপ করিতেছি, কিন্তু মনের মধ্যে ভোগবাসনা উদয় হইতে লাগিল; চেষ্টা করিয়াও নিবারণ করিতে পারিলাম না। বাবা তখন বলিয়া উঠিলেন, "উকীল সাহেব, সাম্ হো গিয়া, আভ্ ঘর যাইয়ে।" আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম, বুঝিলাম, বাবা আমার মনের চাঞ্চল্য বুঝিতে পারিয়াছেন।

"একদিন শ্রীশ্রীগুরুদেবের (গোস্বামী মহাশয়ের) দেহ-রক্ষার কথা নিবেদন করিতেই দেখিলাম, তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, শিরাগুলি মোটা হইয়া উঠিল, চোখ্ ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর বলিলেন "আভ্ সংসারমে সাধু লোগোঁকা রহনেকা জায়গা নেহি রহা, কয়েক বরষমে সবকোই চলা যায়েঙ্গে।" কেন যে এই কথা বলিলেন তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

"ইতিমধ্যে গোরক্ষপুরে নানা গোল উপস্থিত হয়। তিনি যে মোহান্তকে গদীতে বসাইয়াছিলেন, তাঁহার আচরণ বড়ই গর্হিত বলিয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। দেবোত্তর সম্পত্তির টাকা হইতে তিনি আত্মীয়গণকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন, নানা প্রকার অপব্যয়ে সাধুসেবার টাকা উড়াইতে লাগিলেন, আশ্রমে স্ত্রীলোকের গতিবিধি আরম্ভ হইল। এই সমস্ত সংবাদে বাবা মনে বড় ব্যথা পাইলেন এবং তৎপ্রশমনকল্পে গোরক্ষপুরে যাইতে বাধ্য হইলেন। যদিও মোহান্তই সর্ব্বেসর্ব্বা, তথাপি বাবার নিকট তাঁহার মস্তক অবনত হইল। বাবা তাঁহার মাসিক খরচের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সমস্ত ভার নিজে গ্রহণ করিলেন। ঐ জন্য একরারনামা রেজেষ্টারি করা হইল।

ইতিমধ্যে গয়ায় বাবার শূন্য আশ্রমে পাতিয়ালার প্রসিদ্ধ পরমহংস রতনগিরি বাবা (ভাস্করানন্দ স্বামীর গুরুভাই, ন্যাংটা বাবা নামে গয়ায় প্রসিদ্ধ) আসিয়া আসন করিয়া বসিলেন। রতনগির বাবা আশ্রমের অনেক উন্নতি সম্পাদন করেন।

প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য আমাদের প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় বলিলেন, —"বাংলা ১৩০০ সনের মাঘ মাসে প্রয়াগ ক্ষেত্রে পূর্ণকুম্ভের মহাধিবেশন হইয়াছিল। সেই ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাদিগের নিকট বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েকজন সাধু, যোগী, সন্ন্যাসী ও ভক্তের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিষয় অবলম্বন করিয়া আমি "প্রয়াগধামে কুম্ভ মেলা" নামক পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। সেই পুস্তকে বাবা গম্ভীর নাথজীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। বড়ই ইচ্ছা ছিল যে, কিছু দিন বাবার নিকট থাকিয়া পরে তাঁহার আচার ব্যবহার ও নিত্যকর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে লিখিব। শুধু কতকগুলি বড় বড় ঘটনা বা অলৌকিক কার্য্য লিখিয়া মহাপুরুষদিগের পরিচয় দেওয়া যায় না; উহা অনেকটা ফটোগ্রাফের মতন হয়, জীবন্ত হয় না। ছোট-ছোট কার্য্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়াই তাঁহাদের অসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠে। তাঁহাদের হাটা, চলা, শোয়া বসা, আহার-বিহার, আলাপ ব্যবহার সকলই সাধারণ লোকের কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র। অকৃত্রিমতা, অমায়িকতা শান্তা, সরলতা ও নির্ভীকতা এবং প্রেম ও পবিত্রতা, তাঁহাদের সকল কার্য্য, সকল অনুষ্ঠানে জড়াইয়া আছে। সঙ্গলাভ না করিলে এ সকল প্রত্যক্ষ হয় না। আমার ভাগ্যে তাঁহার সঙ্গলাভ আর ঘটিয়া উঠিল না।

"সেই ১৩০০ সনের কুম্ভ-মেলায় যখন গুরুদেবের সঙ্গে সাধুদর্শনে বাহির হইয়া বাবা গম্ভীরনাথজীর নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন সাধুরা চা পান করিতেছিলেন। বাবা নিজ হাতে ধরিয়া আমাকে একবাটি চা দিলেন, আমি তাঁহার হাত হইতে গ্রহণ করিলাম; এখনও সেই কাঁসার বাটিটা এবং চায়ের সুগন্ধ ও সুস্বাদ আমার নয়ন, ঘ্রাণ ও রসনায় যেন লাগিয়া আছে। সেই জিনিসগুলিতে সাধুতা মাখানো ছিল। সেই পবিত্র হস্তের কি স্নেহের দান! যখন বাটি ধরিয়া আমি আনমনে অপেক্ষা করিতেছিলাম, তখন ঈষৎ নয়ন ভঙ্গিমা করিয়া একটু মাথা নাড়িয়া আমাকে চা পান করিতে ইঙ্গিৎ করিলেন,—সেটা যে কত মধুর, তাহা বুঝাইতে পারিব না! নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী, কোনও বস্তুর বা ব্যক্তির জন্যই আসক্তি নাই; অথচ প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ। অনাসক্ত জীবন্মুক্তি, আত্মারাম অথচ বিশ্ব-প্রেমিক মহাপুরুষদিগের যাহারা সঙ্গলাভ করেন নাই, তাহারা ভারতমাতার অমূল্য রত্ন কিছুই দেখিতে পান নাই। প্রথম যখন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ইঁহাদের দর্শন পাইলাম, তখন মনে হইল, যেন ভারতভূমির একটা অপূর্ব্ব ও অমূল্য রত্নভাণ্ডার আমার নিকট প্রকাশিত হইল।

মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী

"প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "যাঁহার সঙ্গ হইলে আপনি মুখে কৃষ্ণনাম আইসে তাঁহাকেই প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।" আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যাঁহারা সদ্গুরুর শিষ্য, কোনও সাধুসঙ্গ হইলেই তাঁহাদের দীক্ষামন্ত্র যেন গাড়ীর চাকার মতন আপনি চলিতে থাকিবে, বাধা দিয়া নিবারিত করার শক্তি আসিবে না। বাবা

গম্ভীরনাথের সংসর্গে অনেকেই এই তত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন।

"শ্বাপদ সঙ্কুল গয়ার পাহাড়ে, কপিলধারার শৃঙ্গে বসিয়া গম্ভীরনাথজী গভীর রাত্রে সেতার বাজাইয়া ভজন করিতেছেন, আর আকাশ-গঙ্গার পাহাড় হইতে গোস্বামী মহাশয় সঙ্গীগণকে ফেলিয়া বনজঙ্গল কাটা কাঁকর অগ্রাহ্য করিয়া উন্মাদ মনে ছুটিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। এ কিসের প্রেম? কিসের টান? কোন্ প্রেমে ইঁহারা বাঁধা পড়িয়াছেন? এ বন্ধনের সূত্র কোথায়? কোন্ মালাকার মাঝখানে আসিয়া দুইটী হৃদয় এমন করিয়া বাঁধিয়াছেন? এই পুণ্যকাহিনী শুনিলেও জীবের ধর্ম্ম হয়, লোকের হৃদয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়। টাকা নয়, কড়ি নয়, মান মর্য্যাদার বা রক্ত-মাংসের সম্পর্ক নাই, কিসের সম্পর্ক মানুষকে এতদূর উন্মত্ত করে? যিনি ভগবানকে ভাল বাসেন, ভক্ত তাঁহার প্রাণের প্রাণ হইবেনই হইবেন; আর যাঁহারা ভক্তকে ভালবাসেন না, ভগবানের প্রতি তাঁহাদের প্রেম কখনও সম্ভবে না। এই যে ভক্তে ভক্তে কোলাকোলি, ইহার মধ্যেই ভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশ।

"১৩০০ সনের কুম্ভমেলার পর হইতে অনেক হিন্দুস্থানী সাধু, বাঙ্গালী সমাজে পরিচিত হইয়াছেন। অসঙ্কোচে বলা যায় যে, গোস্বামী মহাশয়ই এই পরিচয়ের প্রধান কারণ। তিনি পরিচিত না করিলে লোকেরা এই সকল মহাপুরুষকে চিনিতে পারিতেন না। আর তাঁহার মতন লোক না বলিলে সহজে কেহ বিশ্বাস করিতেও পারিত না।

"যাহারা বেশী সাধু ভালবাসেন না, তাহারা বলিত যে, 'গোস্বামী মহাশয় বাজিকরের ঝুলির মতন তাঁহার তবিল হইতে সাধু বাহির করিতেছেন,—এ সকল সাধু এতকাল কোথায় ছিল? তিনি নিজে সরলচিত্ত ও প্রেমিক, তাই যাহাকে দেখেন, তাহাকেই অসাধারণ সাধু করিয়া তুলেন।' এইরূপ অনেককে বলিতে আমি শুনিয়াছি। গোস্বামী মহাশয় যে মহৎকে মাথায় করিয়া তুলিয়া ধরেন, নিজে সকলেরই পদানত হন, তাহা আমরা জানি; কিন্তু তিনি যে সাধু চিনেন না এবং যাহাকে-তাহাকে বাড়াইয়া তুলেন, সেরূপ অসঙ্গত কথায় আমরা মোটেই বিশ্বাস করি না। আজ বাবা গম্ভীরনাথজীর জীবনকাহিনী পাঠ করিলেই অনায়াসে বুঝা যাইবে যে, বাবা গম্ভীরনাথকে তিনি হঠাৎ সাধু করিয়া তুলেন নাই। তাঁহার সঙ্গে গোস্বামী প্রভুর কত কালের পরিচয়—বাবাকে তিনি কত বৎসর হইতে কতরূপ কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছেন, বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি তাঁহাকে কিরূপ প্রেম করিয়া আসিতেছেন, এই সকল পরিচয় পাইয়াও যাহারা বলিবে যে, গোঁসাইজী অনেককে হঠাৎ সাধু করিয়া তুলিয়াছেন, তাহারা একান্তই ভক্তদ্বেষী। আজি এই প্রবন্ধে বাবা গম্ভীরনাথজীর সঙ্গে প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের পূর্ব্বপরিচয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমার আনন্দের সীমা নাই।

"শ্রীশ্রীগুরুদেব কয়েকজন হিন্দুস্থানী মহাপুরুষকে বাঙ্গালার নয়নসমক্ষে আনিয়া দিয়া নিজে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ইহার পরে সহস্র-সহস্র বাঙ্গালী নরনারী এই হিন্দুস্থানী সাধুদিগের নিকট দীক্ষালাভ করিয়া বুদ্ধি এবং সঙ্গে-সঙ্গে ধর্ম্ম ও শান্তিলাভ করিয়াছেন। আমার আত্মীয়স্বজন অনেকেই বাবা গম্ভীরনাথজীর কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার একটী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের পিতা তাহাকে কোনও একজন বিশিষ্ট সাধুর নিকট দীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সেই সময় উক্ত যুবক স্বপ্নে এক সাধুমূর্ত্তি দেখিলেন, তিনি পিতৃনির্দ্দিষ্ট সাধু নহেন। অবশেষে বাবা গম্ভীরনাথের দর্শন পাইয়া যুবক বলিলেন যে, তিনি স্বপ্নে ইঁহাকেই দেখিয়াছেন, তাঁহার নিকটই দীক্ষা পাইলেন। এই ঘটনায় পিতা রুষ্ট হইবেন ভাবিয়া যুবক ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই দীক্ষার কথা শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। এগুলি 'মিরাকেল' নয়। মানুষের মনরাজ্যটা আমাদের নিকট যেরূপ অন্ধকার, সকলের নিকট সেরূপ নয়। যাঁহাদের চিত্ত সংযত, মনরাজ্যের উপর তাঁহাদের অনেক ক্ষমতা জন্মে। নিজের মন, পরের মন- সকলের উপরই জন্মে।

শ্রীকবির সাহেব বলিয়াছেন,--

"অলখ্ পুরুখ্‌কো আর্সী সাধুহিকা দেহ।
লখ্ যো চাহে অলখ্‌কো উন্‌হিমে লখ্‌লেহ॥"

যিনি অলক্ষ্য পুরুষ (ব্রহ্ম), সাধুদিগের দেহই তাঁহাকে দেখিবার দর্পণ স্বরূপ, যিনি সেই অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করিতে চাহেন, সাধুর মধ্যেই তাহাকে দেখিতে হইবে।

যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পুত্রকে দেখিয়াছে, সেই পিতাকে দেখিল।"

উপনিষৎ বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

অতএব প্রকৃত সাধুদিগের দর্শনে, ধ্যানে, পূজায় ও পরিচর্য্যায় ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়। বাবা গম্ভীরনাথ এই শ্রেণীর পূজ্যপাদ মহাত্মা ছিলেন।"

জীবন্মৃত

[শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়]

গ্রহাচার্য্য মহাশয় আমার কোষ্ঠী দেখিয়া মাতা ঠাকুরাণীকে বলিয়া গেলেন যে, এ বৎসরটা আমার কোষ্ঠীতে ত্রিপাপী সপ্তশূন্য রহিয়াছে; অর্থাৎ ফাঁড়াটা এমন কঠিন, যে, এ বৎসরটা পার হইব কি না সন্দেহ। শুনিয়া মনটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। বহুবার বহু গ্রহাচার্য্য কোষ্ঠী দেখিয়া বড় বেরড়ের ফাঁড়ার কথা কহিয়াছেন; এবং মাতাঠাকুরাণীর নিয়োগক্রমে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়াছেন, এবং আমিও নির্ব্বিবাদে আমার পৈতৃক জীবনটা ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি। কিন্তু শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ফলে, কি আমারই শুভাদৃষ্টবশতঃ, আমি আজ পর্য্যন্ত আমার পৈতৃক জীবনটাকে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি, তাহার একটা নিশ্চিত মীমাংসায় আজ পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারি নাই। কখনও মনে হয়, শান্তি স্বস্ত্যয়নের ফলেই কোন প্রকার বিপদ ঘটিল না; কখন মনে হয়, হুঁঃ, ও সব গ্রহাচার্য্যদের একটা পয়সা আদায় করবার ফাঁকি; আমি আমার শুভদৃষ্টি ক্রমেই বাঁচিয়া আছি। কিন্তু, তথাচ, শুভ-শান্তির খরচ দিবার সময় বিনা আপত্তিতে তাহা দিতাম; এবং যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে শান্তি সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতাম—পাছে কোন প্রকার অঙ্গহানি বা অক্রিয়া দ্বারা জীবনে কোন বিঘ্ন ঘটে। নিজের জীবনটা এমনি প্রিয় যে, জীবন হানি সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিলে, ঠিক বিশ্বাস না করিয়াও, সে সম্বন্ধে অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লোকে কুণ্ঠিত হয় না,—আমিও হইতাম না।

কোষ্ঠীতে এমনি আস্থাস্থাপন আমরা বংশপরম্পরায় স্ত্রী পুরুষ-ভেদে করিয়া আসিতেছি; কিন্তু আমার স্ত্রী পাঁচ-সাত বৎসর আমাদের এই আব-হাওয়ার মধ্যে থাকিয়াও কোষ্ঠীর ফলে বিশ্বাস করিত না; কারণ, তাহার প্রকৃতি সাধারণ মহিলার তুলনায় অনেকটা স্বতন্ত্র ছিল। যেটা করিতে নিষেধ করা হইবে, সেটা তাহার সর্ব্বাগ্রেই করা চাই। আমাকে বিরক্ত করিয়া সে যেন একটা বিশেষ রকমের আনন্দ অনুভব করিত। কেন করিত, তাহা তাহার ও আমার—উভয়েরই অজ্ঞাত ছিল। যখন মেজাজ ভাল থাকিত, তখন জিজ্ঞাসা করিলে স্বীকার করিত, যে, কি কারণে সে যে অমন করে, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না; কিন্তু তখন কেমন একটা জেদ চড়িয়া যায়—এবং কোনক্রমেই আমার প্রতিকূলাচরণে বিরত হইতে পারে না। কিন্তু সে যে লোক মন্দ ছিল, এমন কথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়; কারণ, অসুখে বিসুখে তাহার অক্লান্ত সেবা এবং বৈষয়িক ও সাংসারিক বিপদে তাহার আন্তরিক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি। কিন্তু যখন তাহার মেজাজ ভাল থাকিত না, তখন ভাল কথা ভাল ভাবে বুঝাইতে গেলেও উল্টা বুঝিয়া, এমন কি সঠিক বুঝিয়াও বিদ্রোহাচরণ করিত। আবার মেজাজ সুপ্রসন্ন হইলে, সে অপরাধ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তবে এই বিদ্রোহাচরণের মাত্রা সময় সময় এতদূর বাড়িত যে, আমাদের ধৈর্য্য রাখা কঠিন হইয়া উঠিত, এবং ধৈর্য্য চ্যুত হইয়া যদি দুইচারটা রূঢ় প্রত্যুত্তর প্রদান করিতাম, তবে এক মাস বা ততোধিক কাল পর্য্যন্ত বাক্যালাপ বন্ধ থাকিত; এবং যে পরিমাণে সাধ্য সাধনা করিতে হইত, তাহাতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতাম যে, ন্যায় অন্যায় যাহাই করুক, আর কখনও এমন উত্তর দিব না।

কোষ্ঠীর সুফল শুনিয়া উল্লসিত এবং কুফল শুনিয়া বিষাদিত হইলেও, আমি লোকটা একেবারে মর্ম ছিলাম না। তাহার প্রমাণ, আমি অনেক বাঙ্গালা মাসিকপত্র, এমন কি, দুই চারিখানি ইংরাজী ভুতুড়ে পত্রিকারও গ্রাহক ছিলাম। ভুতুড়ে পত্রগুলির সকল রহস্যই আমার ভাল লাগিত; কারণ, প্রেতাত্মার অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে লেখক যেমন বুঝাইতে চাহিতেন, তেমনি বুঝিতাম; অলৌকিক ক্রিয়ার লৌকিকতা খুঁজিবার প্রয়োজন হইত না সুতরাং ভাবিবারও বিশেষ কিছু ছিল না। তবে একটা ভাবনা আপনি মনে হইত যে, একা ঘরে কি করিয়া শয়ন করিব, বা একা পথে কি করিয়া চলিব! এই সাহিত্য-চর্চ্চার ফলে সন্ধ্যার পর একা বাহির হইবার ক্ষমতা

বিলুপ্ত হইয়াছিল। রাত্রি অন্ধকার হইলে, দুই-তিন জনের সঙ্গে বাহির হইতেও গা'টা ছম্-ছম্ করিত; এবং তামাসা করিয়া যদি কেহ অকস্মাৎ "ওরে বাবা" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিত, তবে আমিও "ওরে বাবা" শব্দে যাহাকে সম্মুখে পাইতাম তাহাকেই জাপ্টাইয়া ধরিতাম। এই প্রকার ভূতের ভয়ের জন্য মনে-মনে লজ্জিত হইতাম;—কিন্তু লজ্জার খাতিরে কে কবে ভূতের ভয় ত্যাগ করিতে পারিয়াছে?

(২)

ত্রিপাপী সপ্তশন্যের ভয়ে অশঙ্কিত হইয়া গোটা বৎসরটা কাটাইলাম; আর একটা দিন মাত্র ভালয়-ভালয় কাটাইতে পারিলেই বুঝিতে পারি যে, এখনও কয়েক বৎসর নির্ব্বিবাদে জীবনটাকে ভোগ করিতে পারিব।

শেষ দিনটা আসিল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিবামাত্রই ছ্যাৎ করিয়া মনে হইল যে, সেটা আমার শেষ দিন। ভগবানের নিকট যুক্ত করে, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিলাম, "হে ভগবান! আজকের দিনটা আমায় কোন রকমে ঠেলে গুঁজে পার করে দাও, তা'হলেই আরও কয়টা বৎসর বেঁচে নিতে পাই।" সারা সকালটা মনটা ভার রহিল; কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, আজ বুঝি আর নিরাপদে কাটিবে না। হয় ত সিঁড়ির ধারে একটা সাপ আমার জন্য মাথা গুঁজিয়া লুকাইয়া আছে; নয় ত হঠাৎ appoplexy বা cholera দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, কিম্বা Heart fail করিয়াও মৃত্যুর কবলিত হইব। যত রকমে মানুষের মৃত্যু হয় জানিতাম, সেই সব রকমের জন্যই যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করিলাম। গাড়ীর চাকা খুলিয়া বা ঘোড়া ভড়কাইয়া পাছে গাড়ী চাপা পড়িয়া মরি, তাই সে দিন গাড়ীতে চাপিলাম না। এমন কি, অন্য গাড়ী পাছে ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, সেই ভয়ে বাটীরও বাহির হইলাম না। পাছে জল গ্লাসটীও বিষাক্ত হইয়া থাকে, এই ভয়ে প্রথমে এক চুমুক খাইয়া কিছুক্ষণের জন্য গ্লাসটী রাখিয়া দিলাম; পরে বিষের ক্রিয়া যখন আরম্ভ হইল না বুঝিলাম, তখন অবশিষ্ট জল পান করিলাম। তবে নিশ্চিত বোঝাও সঙ্কট হইয়া উঠিল; কারণ, শরীর রীতিমত সুস্থ থাকিলেও মনে হইতে লাগিল, গা'টা বুঝি কেমন-কেমন করিতেছে।

বেলা প্রায় ৮ টার সময় পিয়ন কতকগুলি চিঠি এবং এক কপি আমেরিকান ভুতুড়ে কাগজ দিয়া গেল। আজ এই ভুতুড়ে কাগজখানির প্রাপ্তিটাকে অশুভ যোগ বলিয়া মনে হইল। জীবনের এই শেষ দিনে এই পত্রিকাখানি হস্তগত হইতে দেখিয়া মনে হইল, বুঝি বিধাতা এমন দিনে এই পত্রিকার আগমন দ্বারা আমার পরমায়ু-শেষের ইঙ্গিত করিতেছেন। পড়িতে ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু পড়িব-না, পড়িব না ভাবিতে ভাবিতেই দু'চার পৃষ্ঠা এবং ক্রমেই শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলিলাম। ফলে, প্রেতাত্মার চিন্তায় মাথাটা পূর্ণ হইয়া উঠিল; এবং এমনও মনে হইতে লাগিল যে, হয় ত কোন প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত বা সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট না হইয়াও, প্রেতাত্মা কর্ত্তৃকই বিনষ্ট হইব।

রাত্রিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আহার করিয়া শয়ন করিলাম এবং সারা রাত্রি সতর্কভাবে জাগিয়া থাকিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। মশারিটি ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিলাম, যাহাতে সর্প বা কোন প্রকার কীটপতঙ্গাদি শয্যার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। তথাচ মনে হইল, ইহাতে কি নিষ্কৃতি বোধ করিতে পারিব? যদি তাহা হইত, তবে লক্ষীন্দ্রের লোহার বাসর ঘরে সূচ পরিমাণ ছিদ্র রহিয়া যাইত না। তবুও মশারিটা পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, উহা ভাল ভাবে গোঁজা হইয়াছে কি না এবং কোন কিছু ভিতরে রহিয়া গেল কি না।

আমার এইরূপ ভীতিকে বিন্দু ঠাট্টা করিত এবং আমার স্ত্রীলোক হইয়া জন্মান উচিত ছিল, এইরূপ মতামত প্রকাশ করিত। সেইজন্য আমার এই সমস্ত ভাবনা ঘুণাক্ষরেও তাহার নিকট প্রকাশ করি নাই। এমন কি, আজ যে আমার শেষ দিন, তাহাও তাহাকে জানাইতে লজ্জা বোধ করিয়াছিলাম।

ছেলেটী শুইয়া অবধি কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিন্দু নানা প্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিয়াও যখন পারিল না, তখন প্রহার আরম্ভ করিল। ক্রমে কান্না এবং প্রহার উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। যখন নিজের ভাবনায় মরিতেছি, তখন বিন্দুর এই প্রহার ও ভর্ৎসনা এবং সন্তানের এই চীৎকার আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইল। বিরক্তির স্বরে বিন্দুকে বলিলাম, "কেন ছেলেটাকে মেরে খুন করছ?" বিন্দুর মেজাজের সেই অবস্থায়, আমার এই বিরক্তির স্বর দাবানল-প্রজ্জ্বলিত

করিয়া দিল। সে কহিল, "বেশ করব, মারব, তোমার কি? আমাকে মানুষ কর্ত্তে হ'লে আমি মারব, আমার যা ইচ্ছা তাই করব; তোমার পছন্দ না হয়, এই নাও তোমার ছেলে, তুমি মানুষ কর; আমি মারতেও আসব না, কিছু বলতেও আসব না।" বলিয়া ছেলেটাকে টিপ করিয়া আমার গায়ের উপর ফেলিয়া দিল। আমি কতকটা তামাসা, কতকটা খোটা দিবার সুরে বলিলাম, "তা'হলে ছেলেকে অনেক লোকে গিনি দিয়ে দেখেছে, সে সব গিনিগুলোও আমাকে দাও।"

যেমন বলা, অমনি বিন্দুর ওঠা এবং বাক্স হইতে কয়েকটা গিনি বাহির করিয়া বিছানায় ছড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া। সর্ব্বনাশ! আমার অত যত্ন করিয়া গোজা মশারি আলু-থালু করিয়া দিল। শুধু গিনি দিয়াই বিন্দু ক্ষান্ত হইল না। "নামের মহিমা নাম করায় স্মরণ।" গিনির কথাতে আমার প্রদত্ত গহনার কথাও মনে পড়িল, এবং অকস্মাৎ নোয়া বাতীত সমস্ত অলঙ্কার নিজ গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া বিছানার উপরে ফেলিতে লাগিল। আমার মন আবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। হলুদে কাগজ প্রাপ্তিতেও আমার বিশ্বাস হয় নাই দেখিয়া, বিধাতা বুঝি এই অলঙ্কার উন্মোচনের দ্বারা আমার ইঙ্গিত করিতেছেন, যে, আজ তোমার ত্রিপাপী নক্ষত্রের ফলে তোমার স্ত্রীর বৈধব্য ঘটিবে, অর্থাৎ আমি মরিব। নচেৎ অকস্মাৎ আজ বিন্দু অলঙ্কার উন্মোচন করিবে কেন?

আমার মনের অবস্থা খুলিয়া বলিয়া বিন্দুকে গহনাগুলি পরিতে মাথার দিব্য দিলাম। তাহার স্বাভাবিক জেদের বশবর্ত্তী হইয়া সে কিছুতেই কিন্তু গহনাগুলি পরিল না। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল যে, এমন নিদারুণ কথা শোনার পর, গহনাগুলি খুলিয়া রাখা উচিত নহে, এ কথা সেও ভাবিতেছিল; কিন্তু জেদ খাটো হইবার লজ্জায়, প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও কিছুতেই পরিতে পারিতেছিল না।

সাধ্য-সাধনায়, দুর্ভাবনায় ক্লান্ত হইয়া আমার তন্দ্রা আসিল। পুত্রটী ঘুমাইয়া পড়িল, এবং বিন্দু পিছন ফিরিয়া শুইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোক চাহিতেই বারান্দার দিকের খোলা জানালায় আমার নজর পড়িল;—যেন দেখিলাম, একটী প্রৌঢ় পুরুষ মূর্ত্তি, অর্দ্ধপক্ব কেশ, সুবৃহৎ গুম্ফ, কোটরগত চক্ষু, গলায় তুলসীর মালা;—সেই জানালার সম্মুখে স্থির হইয়া আমাকে দেখিতেছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইল, উহা একজন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী লম্পটের মুখ; কারণ, তাহার চোখে মুখে একটা অতৃপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে বিন্দুকে জড়াইয়া ধরিতে যাইব, এমন সময় আমার হাত পুত্রটীর গায়ে লাগিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং পুত্রটী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অকস্মাৎ কাঁদিয়া ওঠাতেই আমার মনে হইল, আমি বুঝি মরিয়া গিয়াছি, তাই পুত্রটি কাঁদিয়া উঠিয়াছে এবং স্ত্রীও অলঙ্কার উন্মোচন করিয়াছে। আমার কথা কহিবার এবং হস্তপদাদি সঞ্চালনের সামর্থ্য লুপ্ত হইল। যেন অশরীরি হইয়া দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আমি আমার নিজের শবদেহ ও বিন্দুর বেদনা বেশ দেখিতে লাগিলাম, এবং স্বজনের শোক-ক্রন্দন শুনিতে লাগিলাম। এমন সময় যেন দেখিলাম, সেই প্রেতাত্মা আমার শবদেহ লইবার জন্য বহু অগ্রসর হইল। দেহ হইতে আত্মা বাহির হইয়া আসিয়াছে, অথচ সেই প্রেতাত্মা কি উদ্দেশ্যে গেল, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, সব শেষ হইয়া যায় দেখিয়া যেন আমি (অর্থাৎ আমার অশরীরি দেহ) আমার নিজ শবদেহকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। সেই চেষ্টার ফলে আমার শবদেহটা নড়িয়া উঠিল। তখন বুঝিলাম যে, এখনও আমি মরি নাই। তখন প্রাণপণ চেষ্টা সহকারে বিন্দুকে জড়াইয়া ধরিলাম, অমনি সেই প্রেতাত্মা পুনরায় সেই জানালার গোড়ায় গিয়া দাঁড়াইল। জড়াইয়া ধরিবার ভঙ্গীতে বিন্দু বুঝিল, আমি কোন কারণে আন্তরিক ভয় পাইয়াছি। শান্ত স্বরে বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, অমন করছ কেন?"

আমি। বিন্দু! আমায় নিতে এসেছে।

বিন্দু। ও কি কথা গো! নিতে আবার কে আসবে?

আমি। ওই দেখ, জানালায়!

বিন্দু। কে?

আমি। ঐ জানালায়!

বিন্দু সেই দিকে চাহিয়া বলিল "কে? কোথায় কি?"

আমি। ঐ যে দেখতে পাচ্ছ না,—কাঁচা-পাকা চুল, বড়-বড় গোঁফ, বসা বসা কালি পড়া চোখ, গলায় তুলসীর মালা।

বিন্দু। তুমি ক্ষেপেছ নাকি? ও তোমার মনের ভয়। এ ভুতুড়ে পত্রিকা পড়ে' ভয়ে তুমি ঐ স্বপ্ন দেখ্‌ছো।

আমি। এ স্বপ্ন নয় বিন্দু, চাক্ষুষ দেখ্‌ছি।

আমার এই ভীতি-বিহ্বলতা দেখিয়া সাধ্বী বিন্দুর স্বর সহানুভূতিপূর্ণ হইয়া আসিল; কহিল, "ও ভয় ক'রো না। আমার কাছ থেকে তোমাকে নিয়ে যায়, এমন সাধ্য কাহারও নাই।"

এই বলিয়া বিন্দু আমাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। জানালার পানে চাহিয়া দেখিলাম, সঙ্গে-সঙ্গে, ধীরে ধীরে সেই মূর্ত্তি জানালা হইতে চলিয়া যাইতেছে; এবং একটা অকৃতকার্য্যতার ভঙ্গী স্পষ্ট ভাবে তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাখী ডাকিল, ভোর হইল, আমার ফাঁড়ার বৎসরও শেষ হইল; এবং আমি সাধ্বী বিন্দুর কৃপায় এই ত্রিপাপী-সপ্তশূন্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম।

রস-সাহিত্য

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

সে অনেক দিনের কথা। মস্তকে এখন যেখানে পূর্ণিমার শুভ্র বিভা বিভাসিত, সেখানে তখন অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার ছিল। যে ওষ্ঠের উপর আজ শমনের শ্বেত জয়পতাকা দম্ভভরে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে শুধু হাসিরই আর কোন বালাই ছিল না। বয়ঃসন্ধির সঙ্গে তখন ব্যাকরণের সন্ধি সমাস সবে সদ্ভাব স্থাপন করিতে সুরু করিয়াছে। ধাতু ছিল তখন হৃকণ এবং প্রত্যয় প্রকৃতিগত। সে সময় মনে হইত, কোন ভেল নাই বলিয়াই বুঝি এমন উপাদেয় বস্তুর নাম 'ন-ভেল্‌' হইয়াছে। সে সময় ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী মানুষের মত কথা কহিয়া যে অদ্ভুত উপন্যাস বলিত, মন তাহা অসঙ্কোচে বিশ্বাস করিত। মনে হইত, আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ খুঁজিলেই পাওয়া যায়। এখন সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে যে সংশয়ের পর্ব্বত উঠিয়াছে, তাহা কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতেও দুর্লঙ্ঘ্য। বাস্তবের কঠোর অভিজ্ঞতায় ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী এখন চিরস্তব্ধ। পরশ-পাথর লোহাকে আর সোনা করে না। সোনার-কাঠির স্পর্শে সুপ্ত রাজকন্যা আর জাগে না। কল্পনার কুবের-বৈভব-প্রদর্শক আশ্চর্য্য প্রদীপ চির-নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। কিন্তু মনের সে নিরঙ্কুশ বিশ্বাস বাঁচিয়া থাকিলে, বোধ করি, বড় সুখের হইত। তাহা হইলে সত্য-মিথ্যা, আসল-নকল, সোণা-পিতল, সাচ্চা-ভেল, যাচাই করিতে-করিতে প্রাণ যে কুচ্‌কুচে কালো কঠিন কষ্টি-পাথরে পরিণত হইয়াছে, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইতাম। তাহা হইলে বিজ্ঞানের বিজ্ঞতা, দর্শনের দৃষ্টি, রসায়নের তৌলদণ্ড লইয়া রস সাহিত্যের বিচার করিতে বসিতাম না।

কিন্তু বাস্তবিক ঐ ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর উপকথায়, আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপে, স্পর্শমণি এবং সোণার কাঠি রূপার-কাঠিতে কি কোন ভাবগত, রসানুগত সত্য নাই? মানুষ কি এতাবৎকাল কেবল মিথ্যার, নিছক আকাশ কুসুমের আদর করিয়া আসিতেছে? মানুষের ত সেরূপ স্বভাব নয়! মিথ্যায় তাহার প্রকৃতিগত অরুচি। যিনি প্রয়োজনে নিষ্প্রয়োজনে করকার মত মিথ্যা বর্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহার কাছে কেহ মিথ্যা বলিলে তিনিও আন্তরিক চটিয়া বলেন—বেটা মিথ্যাবাদী! যে ঠকায় সেও ঠকিতে চায় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কাব্য যদি কেবল অলীক কল্পনা এবং নাটক মিথ্যা জল্পনা হইত, উপন্যাস যদি কেবল কথার বিন্যাস হইত, তাহা হইলে কখনই রস সাহিত্যের এত আদর হইত না। মানব অন্তরে-অন্তরে ইহার সত্যানুভব করে, তাই এই জাতীয় সাহিত্যের এত আদর। এ সত্য যাচাই করিয়া লইতে হয় না। ইহার সাক্ষী-সাবুদ, প্রমাণ-প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। মানবের অন্তশ্চক্ষুতে এ সত্যের চেহারা স্বতঃই প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হয়। মানবের অন্তরাত্মাই ইহার সাফাই সাক্ষী। যাহাকে আমরা কাল্পনিক চিত্র বলি, তাহা এই সত্যের সংসারে প্রকাশ্য রাজপথে আনাগোনা করিতেছে। সাধারণ লোকে তাহাকে চিনিতে পারে না; কিন্তু দৈবশক্তিসম্পন্ন কবির

কপালে আর একটা চক্ষু থাকে,—সেই তৃতীয় নেত্র বলে তিনি উহাকে চিনিয়া আমাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। আবার বিস্ময়ের উপর বিস্ময় এই, সত্যস্বরূপ এই সকল কাল্পনিক রসমূর্ত্তি আমাদেরই অন্তরের অন্তঃপুরবাসী। দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রকটিত-রূপে টাইমন্, রাজ্যলিপ্সার ভীষণ দুরাকাঙ্ক্ষা-রূপে ম্যাক্‌বেথ্ আমাদেরই অন্তরে বাস করিতেছে। ঈর্ষ্যারূপী ওথেলো আমাদেরই হৃদয়কন্দরে অধিষ্ঠিত। রূপজ মোহের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ নগেন্দ্র, গোবিন্দলাল তোমার-আমার মনের ভিতরে কুন্দনন্দিনী, রোহিণীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে, সময় ও সুযোগ পাইলেই তাহারা আত্মপ্রকাশ করে। সূক্ষ্মদর্শী লোকশিক্ষক কবি তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতার ভীষণ পরিণাম উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া লোক-চক্ষুর সমক্ষে ধারণ করেন;—মানবের অন্তঃশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। রবিবাবু একস্থলে লিখিয়াছেন—"মানুষের ভিতরে এমন সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে, এমন সকল দুর্দ্দাম দুরন্ত শক্তি থাকে, যাহা সমস্ত হিসাব-কিতাব, শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়-ছয় করিয়া দেয়।" সত্য! কখন্ সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিবে,—এই সকল দুর্দ্দাম, দুরন্ত শক্তি জাগিয়া উঠিয়া চিত্তক্ষেত্রে পৈশাচিক নৃত্য আরম্ভ করিবে, কে বলিতে পারে! দেব ও দানব-প্রকৃতির মিশ্রণে মানব-প্রকৃতি গঠিত মানুষ চরিত্রে সৎ অসৎ, শুভাশুভ, ভাল-মন্দ, কু-সু একাধারে বিদ্যমান। সংসার-বৈচিত্র্যে কাহারও সৎ, কাহারও বা অসতের দিকে আকর্ষণ অধিক। কর্ম্মফলে মানুষ আপনার অদৃষ্ট-শৃঙ্খল আপনিই গঠন করে। মহাকবি, ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার মানবের অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলন করিবার জন্য সেই শুভাশুভ কর্ম্মফলের রসোজ্জ্বল চিত্র লোক-সমক্ষে বিকাশ করেন। সে চিত্র এমন হৃদয়গ্রাহী করিয়া অঙ্কিত হয় যে, তাহাতে পুণ্যের পুরস্কার, পাপের দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিতে হয় না। দৃষ্টিমাত্রে মানবের অন্তশ্চক্ষু আপনি উন্মীলিত হয়,—কোন্‌টা হেয়, সে নিজেই বুঝিতে পারে। এরূপ উদ্বোধনের প্রয়োজন আছে।

মানব হঠাৎ একদিন নবজীবনে জাগিয়া উঠিয়া দেখে—তাহার চারিদিকে রহস্য। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়। সে দেখে, তাহার আগু-পাছু সমান অন্ধকার। কোথা হইতে সে আসিয়াছে, কোথায় তাহার গতি, কেন সে অন্ধের মত প্রতিপদে প্রতিহত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সে কি চায়, কি খুঁজে—সবই জটিল, সকলই দুর্ব্বোধ। কিন্তু সকল দুর্ব্বোধ রহস্যের পর রহস্য সে নিজে। আবার বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা,—সে কি চায়, তাহাও সে জানে না, কিন্তু তাহা পাইবার জন্য দুষ্ট শিশুর মত দুই বাহু উত্থিত করিয়া সে ছুটিয়াছে! বারবার ব্যর্থ প্রশ্ন করিয়া তীক্ষ্ণ মেধা কঠিন প্রস্তর প্রায় সে রহস্যের গায় মাথা কুটিতেছে, উত্তর পায় না! বিজ্ঞান, দর্শন, তর্ক যুক্তি সব এখানে মূক—সে আবহমান কাল হইতে প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অসমর্থ। কেবল কবিই এই বিচিত্র প্রহেলিকার সমাধান করিতে সমর্থ। তিনি বলিয়া দেন—যাহাকে ধরিবার জন্য তোমার প্রাণ তোমার অগোচরে ব্যগ্র, তাহা সেই চিরসুন্দর,—যাহার সৌন্দর্য্যে সৃষ্টি বিভাসিত। যে রসের আকর্ষণে তুমি ছুটিতেছ—তাহা আনন্দ। মানবের অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলন করিয়া তিনিই দেখাইয়া দেন যে, মিথ্যা মোহে আপাত-মনোরম বলিয়া যে ভোগের পশ্চাৎ তুমি ছুটিতেছ, তোমার সকল চেষ্টা, আগ্রহ একত্র সংযোজিত করিয়া ব্যয় করিতেছ, তাহা প্রকৃত ভোগ নহে—কষ্টভোগ মাত্র। ক্ষণিক অনিত্য সুখ ভোগের জন্য ধাবিত হইয়া তুমি কেবল মরীচিকাকে আলিঙ্গন করিতেছ। আশা তোমায় প্রতারিত করিতেছে। বাসনার বিরাম নাই, ভোগ তৃপ্তিহীন। যে আনন্দ তুমি চাও, তাহা ভোগে নাই—আছে কেবল ত্যাগে।

মানবের কল্যাণ উদ্দেশ্যে প্রকৃত রস সাহিত্যের সৃষ্টি। সে উদ্দেশ্য বিধবা-বিবাহ, বরপণ-প্রথা বা নারীশিক্ষার বাদ-প্রতিবাদ নহে, সমাজ-সংস্কারের বিধি বিধান নহে। অশ্বের চক্রান্ত-ভেদী ডিটেক্‌টিভের জয়গান নহে। কিংবা তাহা সজ্জন রঞ্জন, দুর্জ্জন দলন কাব্যও নহে। রস সাহিত্যের লক্ষ্য উচ্চতর। সংসারে ভাল-মন্দ, কু সু, মনোজ্ঞ-কুৎসিত, সকল বস্তুরই একটি 'চিরসুন্দর ভাব আছে, তাহা কেবল কবিরই অনুভূতি-প্রত্যক্ষ। মহা সাধক ভক্তের ন্যায় কবিও সর্ব্বভূতে সেই চিরসুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন। 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' সেই চিরসুন্দরের সৌন্দর্য্যরসে ওতঃপ্রোতভাবে আপ্লুত। 'সদসচ্চাহমর্জ্জুন'—সৎ, অসৎ সকলেরই ভিতর চিরসুন্দর বিরাজমান। ললিত রস-সাহিত্য সেই অনন্ত সুন্দর, অনন্ত সত্যের সুললিত ছন্দ-

পান। তাহার লক্ষ্য মানবকে সেই "সত্যং শিবং সুন্দরম' অভিমুখে আকৃষ্ট করা। ইহারই জন্য কবির অপূর্ব্ব রস কলা সৃষ্টি। এই উদ্দেশে কখন তিনি অপূর্ণ মানবের অন্তর্দৃষ্টির সমক্ষে পূর্ণতর সৌন্দর্য্যের আদর্শ ধরেন; অথবা কখন স্বার্থ চালিত, রিপু তাড়িত, যথেচ্ছাচারময়, কুৎসিৎ সংসার চিত্র অঙ্কিত করিয়া পরোক্ষভাবে মানবকে কল্যাণের অভিমুখে প্রেরণ করেন।

প্রথমোক্ত রস সাহিত্য ভাবতান্ত্রিক, অর্থাৎ Idealistic; দ্বিতীয়টি Realistic বা বস্তুতান্ত্রিক। এই বস্তুতন্ত্রতা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। চরিত্রের কতকগুলি সাধারণ দোষ গুণের শ্রেণী-বিভাগ করিয়া কেহ কেহ সেই নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর আদর্শ অর্থাৎ type চিত্রিত করেন; কেহ কেহ অবস্থাবিশেষে বিশিষ্টভাবে পরিপুষ্ট individual বা স্বতন্ত্র চরিত্র আঁকেন। বঙ্কিমচন্দ্র type বা শ্রেণীর চিত্রকর। রবিবাবু, শরৎবাবু individual বা স্বতন্ত্র চরিত্রের চিত্রকর। 'বিষবৃক্ষে'র পাপ প্রলোভন নিষিদ্ধ ফলভক্ষ, ভ্রষ্ট সংযম নগেন্দ্রনাথ ঐ শ্রেণীর লোকের type বা আদর্শ। কিন্তু 'চোখের বালি'র মহেন্দ্রনাথ সমভাবাপন্ন হইলেও তাহার স্বাতন্ত্র্য আছে। নগেন্দ্রনাথ অথবা গোবিন্দলালের ন্যায় সে লোক তাহার অন্তর্গত নহে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষ জটিল এবং সূক্ষ্ম। মহেন্দ্রকে উচ্ছৃঙ্খল, সংযমভ্রষ্ট করিতে রাজলক্ষ্মীর ন্যায় মাতা, আশার ন্যায় স্ত্রী এবং বিনোদিনীর মত নারীর প্রয়োজন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিকে সংযমভ্রষ্ট করিতে প্রলোভনের উদ্রেকই যথেষ্ট। সূর্য্যমুখীর ন্যায় সুন্দরী, গুণবতী, বুদ্ধিমতী ভার্য্যাও তাহার চরিত্র-রক্ষার পক্ষে প্রচুর নহে। অশ্বরশ্মি সূর্য্যমুখীর হস্তে ন্যস্ত থাকিতে এবং 'দংশিতাধরে নগেন্দ্রের মুখ চাহিয়া টিপি টিপি হাসিতে হাসিতে,' সূর্য্যমুখী চালিত অশ্বদ্বয় অন্তঃপুরের সীমানা লঙ্ঘন করিয়া সদর রাস্তায় গিয়া পড়িল। কিন্তু আশার পোষা কোকিলটা যে মারা গেল, সে কেবল তত্ত্বাবধানের অভাবে।

কিন্তু প্রতিভা-প্রভাবে চিত্রিত (individual) স্বতন্ত্র চরিত্র যতই চিত্তহারী হউক, তাহা নাটকের উপযোগী নহে। ঔপন্যাসিক তাঁহার সৃষ্ট স্বতন্ত্র চরিত্রের আঁক্ বাঁক্, কোণ্ কানাচ্ সবই বিস্তীর্ণ বর্ণনায় পাঠককে বুঝাইয়া দিতে পারেন,—নাট্যকারের সে সুযোগ নাই। এই কারণে বিষয়-নির্ব্বাচনে নাট্যকারকে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে হয়। যে চেহারা সহজে চেনা যায়, প্রতিভাশালী নাট্যকার তাহাই লোক সমক্ষে ধারণ করেন। অপরিচিতের সহিত মানুষের সহজ সহানুভূতি হয় না। কিন্তু সহানুভূতি আকর্ষণের উপরেই রস-সাহিত্যের সকল সাফল্য নির্ভর করে। যেমন শিখা হইতে অনুরূপ শিখা জ্বলে, ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়,—কল্পনার কুহকে কবি ও ভাবগ্রাহীর চিত্ত তেমনি শূন্যে-শূন্যে আলিঙ্গন করিয়া এক ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। প্রতিভাশালী কবি স্বীয় সংস্কার, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি-বলে যে রসচ্ছবি অঙ্কিত করেন, তদ্দর্শনে দর্শক বা পাঠকের অন্তর্নিহিত গুপ্ত ভাবমূর্ত্তি জাগিয়া উঠে; সে আত্মহারা হইয়া আপন মানসচিত্র দেখিতে দেখিতে হাসিয়া, কাঁদিয়া বিস্ময়ে বিভোর হয়। দৈবশক্তি ব্যতীত এ ছবি আঁকা যায় না। কবি শিক্ষায় গঠিত হন না জন্ম-গ্রহণ করেন। প্রতিভার রসনা বাণীর পবিত্র আসন। কবির হৃদয়তন্ত্রী লইয়া সর্ব্বরূপে বসন বাণী বীণা বাদন করেন, তাহাই নির্ম্মল রসধারারূপে প্রবাহিত হইয়া ভুবন পাবন করে, মানব নির্ম্মল আনন্দ ও নিঃস্বার্থ সুখভোগ করিয়া চরিতার্থ হয়।

মানব হৃদয় দেব দানবের দ্বন্দ্বভূমি। তাহার সৃষ্টি পরিমিত সংসারের উপর সুরাসুরে, সদসতে নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলিতেছে। কখন্ দেবতার স্বর্গ দানবের বিলাসভূমি হয়, সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া উদ্বেলিত উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যা আসে, সয়তানের কুমন্ত্রণায় বিহিত ভোগ ত্যাগ করিয়া কখন মানব নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে, কেমন করিয়া সুপ্ত রিপুসকল, নিদ্রিত পিশাচদল জাগিয়া উঠে, কবে কোন্ ঘটনা-বায়ু-চালিত ক্ষুদ্র বীজ চিত্তক্ষেত্রে পতিত হইয়া কালে মহাবৃক্ষে পরিণত হয়, কেবল প্রজ্ঞা-চক্ষু প্রতিভার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিই তাহা সূক্ষ্মরূপে লক্ষ্য করিতে সমর্থ। প্রতিভা দৈবশক্তিশালিনী। মানব-মনের অব্যক্ত ভাব, ঘটনার অস্পষ্ট গতি, কার্য্য-কারণের অদৃশ্য শৃঙ্খল কবির তৃতীয় নয়নের সমক্ষে আত্মগোপন করিতে পারে না। এই জন্যই রস-সাহিত্যের আলোচনা প্রকৃত জীবনগ্রন্থ পাঠের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু কবির শিক্ষা নীতিপাঠের নীতির ন্যায় সূত্রাকারে নিবদ্ধ নহে। তাঁহার অলিখিত, অব্যক্ত নীতি ভাবের উচ্ছ্বাসে, রসের অমিয়ধারায় হৃদয়কে নিষিক্ত করে। তাহা চাণক্য শ্লোকের মত স্মৃতির কোটরগত করিয়া রাখিবার বস্তু নহে,

তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার সামগ্রী। শিক্ষাদান রস-সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে। শিক্ষালাভ তদালোচনার অবশ্যম্ভাবী ফল। এইজন্য, বোধ করি, ভারতে মোক্ষপথ প্রদর্শক বেদ-বেদান্তাদির পর, রস-সাহিত্য পুরাণের এত আদর। বৃহৎ ব্যোম বৃত্তান্ত হইতে জীবাণু পর্য্যন্ত বাহ্য-প্রকৃতির যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, মানবের হৃদয় রহস্য তদপেক্ষা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। এই হৃদয়-রহস্য রস সাহিত্যের বিষয়ীভূত। বিজ্ঞান মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করে সত্য, কিন্তু উচ্চ রস সাহিত্য তাহার বুভুক্ষু আত্মার পুষ্টিকর অন্ন। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের পথ কীর্ত্তন করিয়া উচ্চাঙ্গের রস সাহিত্য মনুষ্যের মনুষ্যত্ব গঠনে সহায়তা করে। কেবল তাহাই নহে, উচ্চাঙ্গের রস মুক্তিপথ প্রদর্শক ; কেন না - 'রসোবৈসঃ।' ভাব-রসে সেই পরম রস-বিগ্রহের সাধনাই রসের চরম পরিণতি। রস সাহিত্যের আধিপত্য মানবের হৃদয়ের উপর,-- এইজন্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতিকে শ্রদ্ধার আসন দান করিয়া কবিকে মানুষ হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। বর্ত্তমান বঙ্গে জগৎপূজ্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক থাকিতে সাধারণ জনহৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা সমধিক।

যাহা চিরকল্যাণময়, চিরসত্য এবং চিরসুন্দরের অভিমুখে আকর্ষণ করে, সেরূপ রস-সাহিত্য পাঠে মানবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। অন্যথা নিরন্তর নিরুদ্দেশ্য রসোচ্ছ্বাসে মনের ভাবপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। হৃদয় স্বাস্থ্য হারাইয়া দুর্ব্বল এবং ব্যাবহারিক জগতের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী হইয়া পড়ে। যাহা কল্যাণকর, তাহাই মহা অকল্যাণ সাধন করে। যে অস্ত্রে শত্রুনাশ হয়, তাহাই আত্মহত্যার যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারে। আলোক অন্ধকার দূর করে, আবার ঘরে আগুনও দেয়।

বঙ্গদেশ আজিকালি নাটক নভেল--রস-সাহিত্যে প্লাবিত। কথা সাহিত্যের ত কথাই নাই। রস সাহিত্য সৃষ্টি যে কিরূপ একাগ্র ধ্যান, একনিষ্ঠ সাধনা ও যত্নসঞ্চিত অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ, তাহা যদি সকলে একবার চিন্তা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে বিস্তর পণ্ডশ্রম নিবারণ হইত। পটুয়া যে প্রাণহীন চিত্র আঁকে, অথবা কুম্ভকার যে মাটির পুতুলি গঠন করে, তাহাতে যদি শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সজীব রসমূর্ত্তি সৃষ্টি করা যে কত কঠিন, তাহা আপনা আপনি না বুঝিলে বুঝান দুষ্কর। শ্রদ্ধাস্পদ প্রতিভাশালী গল্পলেখক শরৎবাবু তাঁহার 'চরিত্রহীন' পুস্তকের এক স্থলে বলিয়াছেন—'এ তোমার সাহিত্য চর্চ্চা নয়, অনধিকার চর্চ্চা।' ঠিক ! শুধু আমাদের দেশে নয়, অনেক স্থানেই সাহিত্য ক্ষেত্রে কলমের পরিবর্ত্তে হল চালনা হয়। অধিক মন্থনে হলাহল উঠে। ভারতে ঋষিগণ রস সাহিত্য রচয়িতা ছিলেন। বর্ত্তমান দুই চারিজন প্রতিভাশালী লেখককে গৌরবের আসন দিয়া অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, ঋষির কার্য্য এখন কৃষিকার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

মিক্‌টিলা ভ্রমণ

[লেপ্টেন্যাণ্ট শ্রীকিরণ সেন, এম-বি, আই-এম-এস্]

রেঙ্গুনে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিলাম ; হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম, মিক্‌টিলা যাইতে হইবে,—বদ্‌লি হইয়াছি। বিলম্ব করিবার যো নাই—সেইদিনই যাত্রা করিতে হইবে—জরুরী আদেশ। দেশ-ভ্রমণের প্রবল ইচ্ছা থাকায়, এই বদ্‌লিতে আমি সুখীই হইয়াছিলাম। যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা সকলেই বলিয়াছিলেন—সরকারী চাকুরীর অসুবিধা আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, এই ঘন-ঘন বদ্‌লি ব্যাপারটা প্রথমে ভাল লাগিলেও, শেষে বড়ই অস্বস্তিকর হইয়া দাঁড়ায়। আমি যে কাজ লইয়া আসিয়াছি, এটা কিছু অসুবিধাই নহে ; আর অসুবিধা হইলেও তাহার জন্য ক্ষুব্ধ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

বদলির খবর পাওয়ায় প্রথম উত্তেজনাটা কাটিয়া গেলে, রেলের টাইম টেবল খুলিয়া দেখিলাম—যায়গাটা কোথায়—কোন সুদূরে অবস্থিত। রেঙ্গুন হইতে মাত্র ৩২০

মাইল? তবে আর তেমন দূরই বা কি? দুপুরবেলা টেলিফোঁ-সাহায্যে, একটা প্রথমশ্রেণীর 'বার্থ' রিজার্ভ করিবার জন্য ষ্টেশন-মাষ্টারকে খবর পাঠাইলাম।

বাক্স, তোরঙ্গ, বিছানাপত্তর ও বিহার-গৌরব 'বয়'টাকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা ছয়টায় ষ্টেশনে হাজির হইলাম; E Form-এর জোরে দ্বিতীয়শ্রেণীর ভাড়ায় প্রথমশ্রেণীর টিকেট কিনিয়া মেলগাড়ীতে চাপিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এবার একটু এপাশ-ওপাশ দেখিবার সময় পাওয়া গেল। বাহিরে সমস্ত আকাশটা মেঘে ঢাকা; বাতাসের আভাস-মাত্রও কোথাও নেই; বর্ষণের পূর্ব্বে প্রকৃতির যে রকম নিশ্চল অবস্থা হয়, এও তাই। যথাসময়ে ট্রেণ চলিতে লাগিলে, রেঙ্গুন সহর ধীরে ধীরে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলেও, 'সিউডেগন পেগোডোর' স্বর্ণচূড়া যখন আমাদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল, তখন আমাদের ট্রেণ প্রকৃতি রাণীর শ্যামল অঞ্চলের উপর দিয়া চলিয়াছে। দু'পাশেই যতদূর দৃষ্টি যায়, শ্যামল শস্যক্ষেত্র; চক্রবাল-রেখার নিকটে দু'পাশেই পর্ব্বতমালার ধূম্রশীর্ষ কাল মেঘের সঙ্গে মিশিয়া অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ধীরে-ধীরে আমরা আঁধারের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। এইবার বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অস্পষ্টতায় ছাইয়া গেল।

সহযাত্রী একজন সাহেব,—কোন এক যায়গার ডেপুটী কমিশনার; আর একজন জাপানী ডাক্তার। যুদ্ধের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আমরা পেগু ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখানেই রেল কোম্পানী সান্ধ্য ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এখন আহার অর্থাৎ কি না 'ডিনার' শেষ করিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম—তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, মেঘের গুমোটও কাটিয়া গিয়াছে। খুব ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছিল বলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

যখন জাগিলাম, তখন রাত্রি কয়টা জানি না, ট্রেণ একটা বনের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; দু'পাশে বড়-বড় গাছগুলি অসংখ্য ডালপালা মেলিয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারের সৃষ্টি করিলেও, স্থানে-স্থানে অস্পষ্ট চন্দ্রালোক অনধিকার-প্রবেশ করিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। দুপুর রাত্রিতে এই আলো-আঁধারের খেলা যদিও মনকে ভূত প্রেতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটু সন্দিগ্ধ করিতে পারে, তবুও বড়ই উপভোগ্য। গাছের পাতায়-পাতায় জোনাকীগুলো জ্বলিয়া অল্প পরিসর স্থানকে সামান্য আলোকিত করিয়া আবার তাহাকে গাঢ়তর আঁধারে ডুবাইয়া দিতেছিল। লোহার কল এর আর কি বুঝিবে? সে অনতিবিলম্বে (যেন ভুতের ভয়ে হাঁকাইতে হাঁকাইতে) জ্যোৎস্না-স্নাত সমতলভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের অর্দ্ধ-ক্ষয়প্রাপ্ত চাঁদ তখন সাদা-সাদা কোদালে মেঘকে সোণার রঙ পরাইয়া তাহার সহিত লুকোচুরী খেলিতেছিল। চাঁদ একবার ডোবে আবার বাহির হইয়া আসে। কেমন এক ভাবের তন্ময়তায় ('চন্দ্রগ্রস্ত' অবস্থায়?) আবার কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম, নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙিয়া গেল, তখন কতকগুলো পাহাড়ের পাশ দিয়া চলিয়াছি। পাহাড়ের উপরের অংশ সাদা কোয়াসার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, অদূরে কালো পাহাড়ের কোলে সাদা-সাদা মেঘগুলি মনোরম মেখলার সৃষ্টি করিয়াছে।

৯টায় 'থাজি' জংশনে পৌঁছিলাম। এখানে আমাকে গাড়ী বদল করিতে হইবে। প্রাতরাশটা শেষ করিয়া ধীরে-সুস্থে নূতন গাড়ীতে উঠা গেল। আর মাত্র ১৪ মাইল গেলেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছি। এই ট্রেণখানা গজেন্দ্র গমনে 'লদাই লস্কর' চালে চলিতে লাগিল। লোক্যাল গাড়ী বলিয়া এর তেমন কোন তাড়াতাড়ি নাই,—গড়াইতে-গড়াইতে কোনরকমে এক ঘণ্টার স্থানে দুই ঘণ্টা অযথা বিলম্ব করিয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলেই হইল। রেলরাস্তার দু'ধারেই ব্রহ্মদেশের গৌরবস্থল ধান্যক্ষেত্র, এক যায়গায় হঠাৎ দূর হইতে মনে হইল কে যেন খুব বড় একখানা লাল কাপড় পাতিয়া রাখিয়াছে। শীঘ্রই আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম,—লাল লঙ্কা শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে।

১১টার সময় মিক্‌টিলায় পৌঁছিলাম। রেঙ্গুনে থাকিতেই শুনিয়াছিলাম, মিক্‌টিলা একটা বিভাগের কেন্দ্র,—খুব বড় সেনানিবাস, এবং স্থানটা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। শরীর সারাবার জন্য অনেকে এখানে আসেন। তাতেই মনে করিয়াছিলাম, বুঝি বা একটা বেশ বড় সুন্দর সহর হইবে। আসিয়া দেখি, ও হরি, আদত সহরটা একান্তই ছোট,—দীর্ঘে, প্রস্থে কোনদিকে আধ মাইলের বেশী হইবে না। রাস্তাগুলি বেশ পরিষ্কার, সোজাসোজি ভাবে

চলিয়াছে; শুধু Lake Roadটাই যা বাঁকাচোরা ভাবে হ্রদের ধার দিয়া গিয়াছে। দোকানগুলি ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সব বাড়ীগুলিই প্রায় একতালা, Town Committee দরিদ্র হইলেও বৈকালে রাস্তায় জল দিয়া পথিক ও বায়ুসেবিগণকে ধূলার কবল হইতে রক্ষা করে।

মিক্‌টিলা মানব শিল্পের গর্ব্ব করিতে পারে না; পুরাতন কোন রাজার দুলালী নগরী এ নয়। কিন্তু প্রকৃতি দেবী তাহাকে স্বহস্তে সাজাইয়াছেন; তাই সে এখন আস্তে-আস্তে মানবের কাছে আদৃত হইতেছে। তাহাকে বহুদিন দূরে ফেলিয়া রাখা যায় না। সহরের পশ্চিমে অর্দ্ধবৃত্তাকারে 'হ্রদ' অবস্থিত। হ্রদটা বিশেষ বড় নয়; দৈর্ঘ্য যদিও তিন মাইলের উপর, প্রস্থ অনেকস্থানে খুব কম, হয় ত ৬০।৭০ গজের বেশী হইবে না। জল নীল; চার পাশ সবুজ ঘাসে ঢাকা, পাড়গুলি আস্তে-আস্তে ঢালু হইয়া একেবারে জলের সঙ্গে মিশিয়াছে। হ্রদটা যেন সবুজ ফ্রেমে বাঁধা। হ্রদের উপর দুইটা সেতু—একটা রেলের লাইনের, এবং অপরটা Civil linesএ যাবার জন্য। শেষোক্ত সেতু সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তি আছে,—প্রায় ১০০ বছর আগে এখানকার রাজা এই সেতু বাঁধিবার মতলব করেন। অনেকবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু প্রত্যেকবারই পাথরের বাঁধ ভাঙিয়া যায়। ঢেউ নাই, স্রোত নাই, তবুও পাথরের বাঁধ থাকে না। এতে সকলেই খুব বিস্মিত হইয়া গেল। রাজা এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন—যেন একজন সুন্দরকান্তি, অমিত তেজ-সম্পন্ন পুরুষ তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "তুই ধনমদে অন্ধ হইয়া আমার অপমান করিতেছিস্। আমার তুষ্টি-সাধন না করিলে তুই কিছুতেই এই সেতু বাঁধিতে পারিবি না। শীঘ্রই সাতজন রাজকন্যা ও একজন রাজপুত্র তোর রাজ্যের ভিতর দিয়া গমন করিবে; তখন যদি তাহাদের আমার কাছে বলি দিতে পারিস্, তাহা হইলে আমি তুষ্ট হইব, তোরও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" তাহার পর সাত রাজকন্যা ও এক রাজপুত্র এই রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা বিদেশীয় রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের মহাধূমধামে হ্রদের দেবতার নিকট বলি দিলেন; তার পর নির্ব্বিঘ্নে সেতু তৈয়ার হইয়া গেল। সেতু পার হইয়া গেলেই—একটা ছোট কাঠের ঘরে পাথরের ছোট-ছোট ৭টী স্ত্রী মূর্ত্তি ও একটা অশ্বারোহী পুরুষের মূর্ত্তি দেখা যায়। এ মূর্ত্তিগুলি সেই নিহত রাজকন্যা ও রাজপুত্রের। এ দেশীয় পুরুষ ও স্ত্রী অনেকেই ফুল দিয়া এঁদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে; এবং অনেক সময় সন্ধ্যায় সারি সারি মোমবাতী জ্বালাইয়া দিয়া থাকে।

এই সেতুর উপর দিয়া, হ্রদের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পাড় ঘুরিয়া Lake Road। রাস্তার দু'পাশেই সারি সারি গাছ। এই সাত মাইল জনবিরল, ছায়াশীতল রাস্তাটাই একটা avenue—প্রভাতে ও সন্ধ্যায় বায়ুসেবনের বিশেষ উপযোগী। দু'পাশে নিম ও তেঁতুল গাছই বেশী, স্থানে-স্থানে নাগকেশর ফুলের গাছ। মৃদুমন্দ সমীরণ এই ফুলের সব গন্ধটাকেই চুরি করিয়া অযাচিত ভাবেই চারিদিকে বিলাইয়া দিতেছে।

হ্রদের চারিপাশেই সরকারী কর্ম্মচারীদের থাকিবার জন্য বাংলো। যে কোন বাংলো হইতেই ছোট-ছোট ঢেউগুলির খেলা অতীব মনোরম দেখায়। জলের উপর তরল সোণার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া সূর্য্যদেব যখন পশ্চিমে ঢলিয়া পড়েন এবং ধীরে ধীরে আপনাকে 'পোপা' পাহাড়ের পশ্চাতে মানব চক্ষুর অন্তরালে লইয়া যান, তখন চঞ্চল বায়ুপ্রবাহে ছোট ছোট ঢেউগুলি একটার পেছনে আর একটা ছুটিয়া চলিতে থাকে এবং সবাই মিলিয়া এক হইয়া তীরের উপর ঝাপাইয়া পড়ে।

'পোপা' পাহাড় একটি আগ্নেয়গিরি। এই পাহাড়ের বৃষ্টির জলেই হ্রদ পুষ্ট থাকে। যখন জল খুব বেশী হয়, তখন তাহা বাহির করিয়া দিবার জন্য বন্দোবস্ত আছে।

সহরের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে ক্যান্টনমেণ্ট বা সেনানিবাস। এখানে দেশী ও গোরা সৈন্যেরা থাকে। সহর হইতে ক্যান্টনমেণ্টে প্রবেশ করিয়াই বাম পাশে সৈন্যদের কুচ করিবার মাঠ—তার মাঝখানেই Signal Pagoda। এইটা মোটেই পেগোডা নয়; তবে পেগোডার ধরণে প্রস্তুত বলিয়াই একে পেগোডা বলা হয়। এই 'পেরেড' মাঠের ডাইনে গির্জ্জাঘর ও সৈনিক বিভাগের ডাক্তারের থাকিবার বাংলো; বামে হাসপাতাল।

এখানে অনেক তুর্কী বন্দীকে রাখা হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে দেড় মাইল ও প্রস্থে এক মাইল একটা স্থান; চার পাশে কাঁটা-দেওয়া তার (Barbed wire) দিয়ে ঘেরা। এর

ভিতরেই বন্দীদের থাকিবার ব্যারাক, রান্না-ঘর ও স্নানের ঘর। ফুটবল ও অন্যান্য ব্যায়ামের বন্দোবস্ত আছে। বন্দীরা যাহাতে আবশ্যক জিনিসপত্র কিনিতে পারে, তার জন্য এই গণ্ডীর ভিতরে একটা বাজারেরও বন্দোবস্ত আছে। 'বেরা'র বাহিরে সঙ্গিন চড়ান গুলি ভরা বন্দুক কাঁধে লইয়া দেশীয় ও গোরা সৈন্যেরা পাহারা দেয়। মোটের উপর, বন্দীরা খুব সুখেই আছে বলিতে হইবে। ইহাদের কাজকর্ম্ম তেমন কিছুই নাই—কাজের মধ্যে শুধু খাই আর শুই।

ক্যান্টনমেন্টের ভিতর সব যায়গাই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শুধু এখানেই জল ফিলটার করিবার কল ও সরবরাহ করিবার জন্য পাম্প ও হাইড্রেন্ট আছে। সহরে ও Civil linesএ সবাই হ্রদের জলই পান করে; সে জলও ভাল।

সহরের উত্তর পশ্চিমে Civil Lines। এখানে আদালত, জেল, পূর্ত্ত বিভাগের আফিস, টিকা দেবার lymph তৈয়ারী করিবার ও পরীক্ষা করিবার লেবরেটরী এবং সব Civil কর্ম্মচারীর বাংলো। সব বাংলোই যেন এক-একখানি বাগান বাড়ী। ছোট দোতালা কাঠের বাড়ীর চারিপাশেই অনেকখানি করিয়া খালি জায়গা; ঘরগুলি লাল টাইল দিয়ে ছাওয়া। সব বাড়ীই একরকমের।

রেলষ্টেশনের ওভারব্রিজের উপর দিয়া বাজারে যাইতে হয়। এখানে পাঁচ দিন অন্তর বাজার বসে, তাই বাজার দেখিবার জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল; কারণ রবিবারে বাজারের দিন না হইলে আমার সুবিধা হয় না। ব্রহ্মদেশের সব বাজারই এক রকমের—complete in itself; লোকের যে সব জিনিস দরকার হইতে পারে, সে সব জিনিসই বাজারে পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড়, ওষুধপত্র, গহনা, লোহার জিনিস, সুগন্ধ তেল, এসেন্স, আতর, সাবান, জুতো, এমন কি রান্না-করা ভাত-তরকারী পর্য্যন্ত; তবে এদের দেশের চাট্নির (নাপ্পি) বাজারটা খুব জমে; এমন বদ্ গন্ধ বোধ হয় আমার নাকে খুব কমই ঢুকিয়াছে। এই গন্ধেই আমাকে মেডিকেল কলেজের শব ব্যবচ্ছেদের ঘরের কথা মনে করাইয়া দিয়াছিল।

বাজারের বিশেষত্ব—মেয়েরাই সব জিনিস বিক্রি করে। মেয়ে ও পুরুষ সবাই বাজারে আসে। অনেক বড় ঘরের মেয়েকেও বাজারে আসিতে দেখিয়াছি। যারা বাজারে আসে, তাদের সকলেরই যে কিছু কিনিবার উদ্দেশ্য থাকে—এই কথা বলিলে ভুল বলা হয়। কেউ আসে কিছু কিনিতে, কেউ বা বিক্রি করিতে, কেউ একটু গল্পগুজব করিবার জন্য, কেউ flirt করিতে ও কেউ শুধু মজা দেখিবার জন্য। অনেক বর্ম্মী যুবক যুবতীর মধ্যে কথাবার্ত্তার সঙ্গে হৃদয়ের বিনিময়ও এখানেই হইয়া থাকে। শাক, শবজি, মাছ, মাংস বেশ সস্তা। আগে না কি আরও সস্তা ছিল; তুর্কী বন্দীরা আসার পর হইতে দাম একটু চড়িয়াছে।

এখানকার জল-বায়ু ও স্বাস্থ্য খুব ভাল। যাঁহারা এখানে হাওয়া বদলাইতে আসেন, তাঁহাদের পক্ষে ক্যান্টনমেণ্ট কিংবা Civil lineএ বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকাই সুবিধা। যাঁহারা অল্প দিনের জন্য বেড়াইতে আসেন, তাঁহারা ডাক-বাংলো, কিংবা সরকারী বড় কর্ম্মচারী হইলে Circuit Houseএ থাকিতে পারেন। শেষোক্ত স্থানে বন্দোবস্ত খুব ভাল; ডাক-বাংলোতেও শুনিয়াছি থাকিবার বেশ সুবিধা আছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের তেমন কোন সুবন্দোবস্ত এখানে নাই। American Baptist Missionএর স্কুলই ইংরাজি শিক্ষার এক এবং অদ্বিতীয় উপায়; তাতেও আবার Matriculation পর্য্যন্ত পড়ান হয় না। সম্প্রতি 9th Standard পর্য্যন্ত পড়ান আরম্ভ হইয়াছে। তবে ব্রহ্ম, তামিল ও তেলেগু ভাষা শিক্ষার জন্য কয়েকটা বিদ্যালয় আছে। শুধু বাংলা শিক্ষারই ব্যবস্থা নাই। বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কম; সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী মাত্র ২।৩ জন আছেন; তাঁদের অল্প কয়েকটি বালকের জন্য আর কি ব্যবস্থা হইতে পারে?

ভারতীয় অধিবাসীদের আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত কিছুই নাই বলিলেও চলে। সবাই নিজের কাজ লইয়াই ব্যস্ত। একটা শিবমন্দির আছে বলিয়াই পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও চেনা-পরিচয়ের একটু সুবিধা আছে। পনর দিন অন্তর অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় শিবমন্দিরে 'Meeting' হয়। আমার বোধ হয়, মিটিং নাম না দিয়ে 'অমাবস্যা' ও 'পূর্ণিমা'-মিলন নাম দিলেই শোভন হইত।

বর্ম্মাদের যারা আফিসে কাজকর্ম্ম করে, তাদের সাহেবি-ধরণের একটা ক্লাব আছে। সাধারণ লোকদের আমোদ-

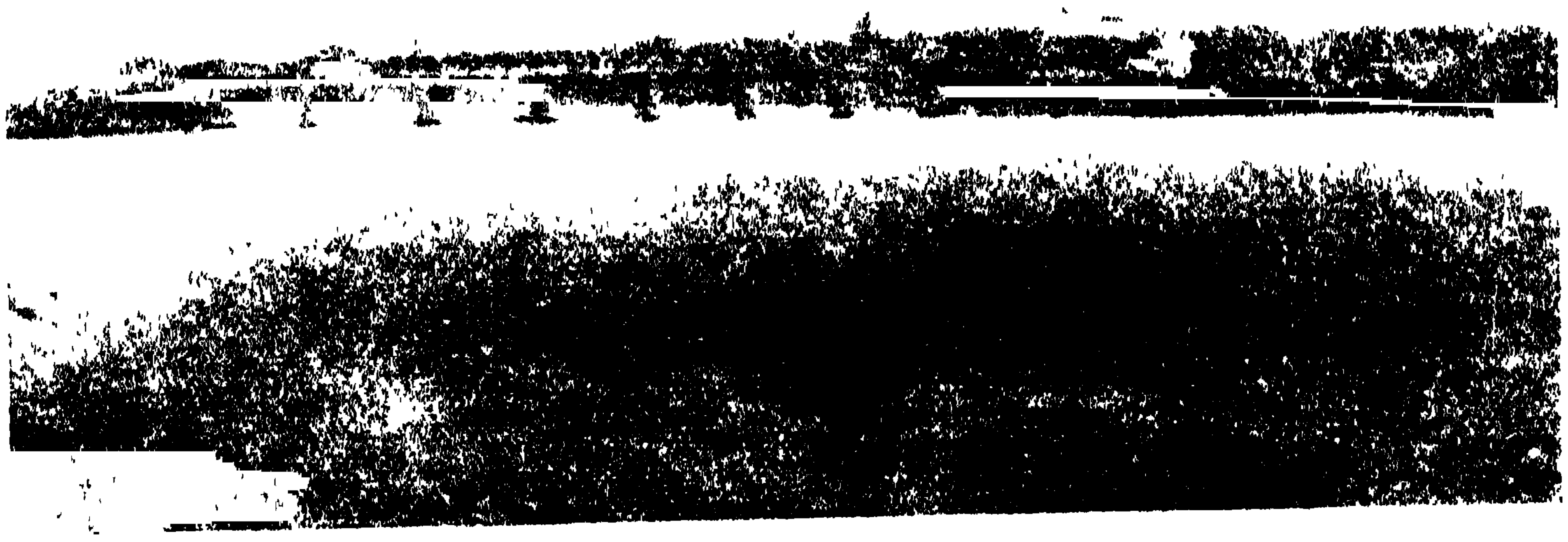

মিক্‌টিলা হ্রদ।

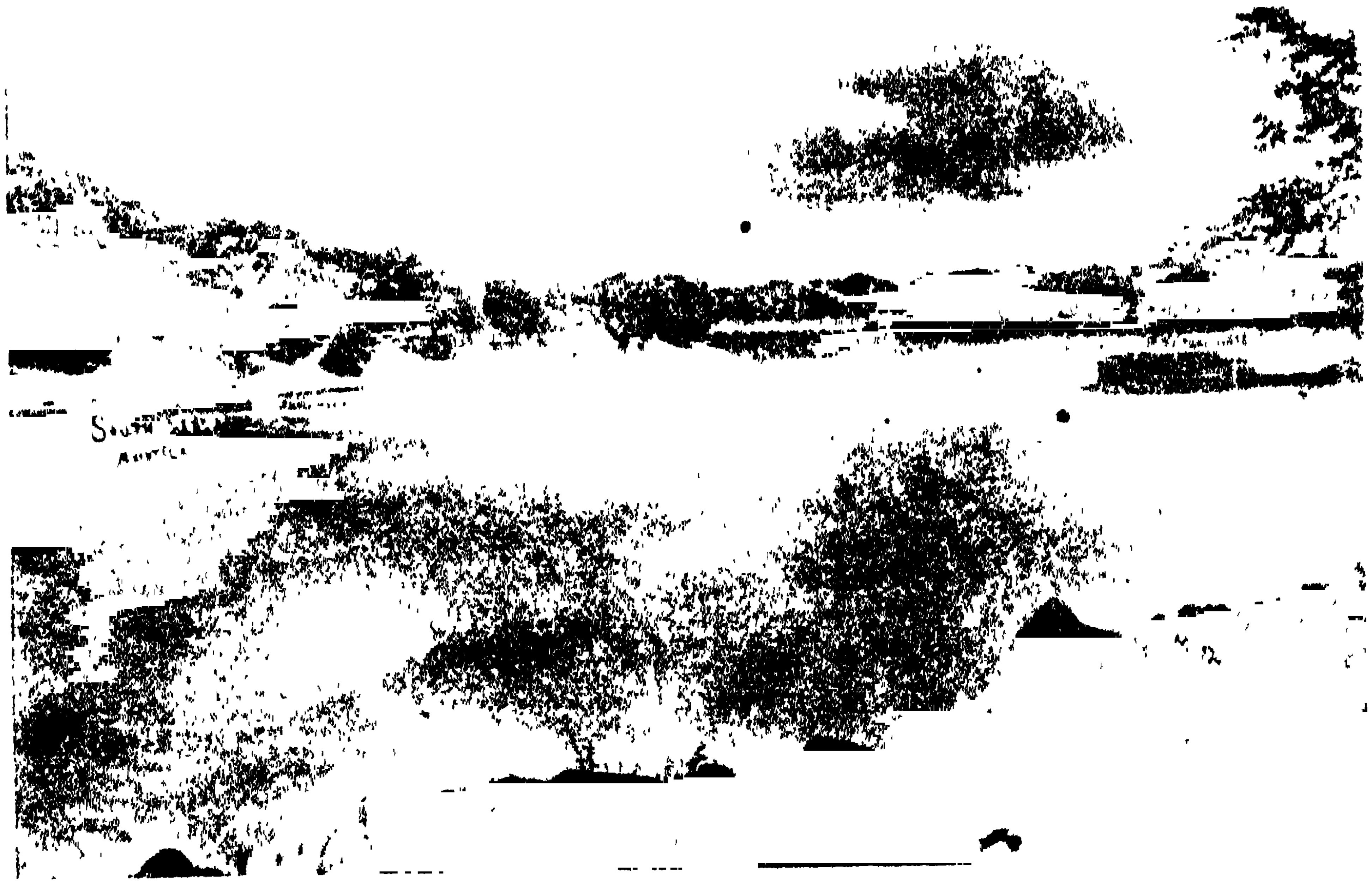

হ্রদের দক্ষিণের দৃশ্য। Lake Roadএর খানিকটা দেখা যাইতেছে

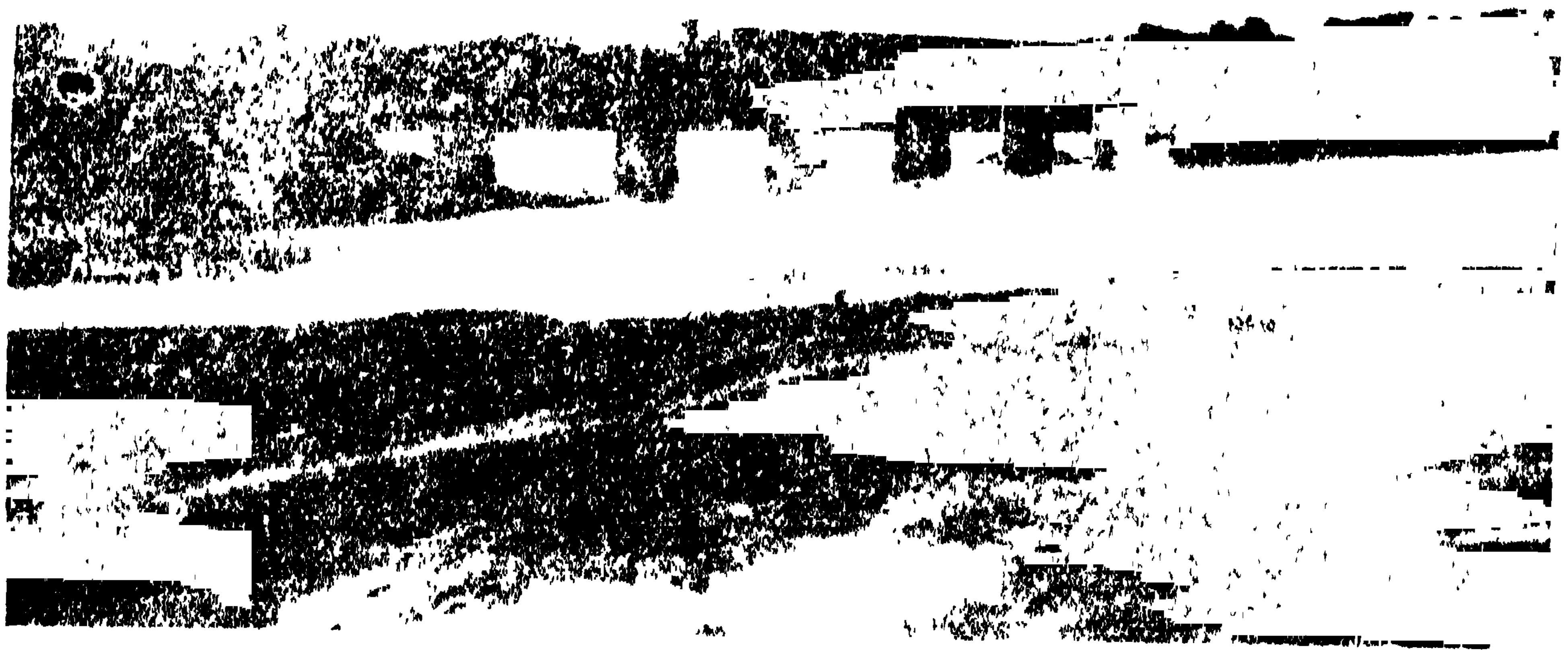

রেলওয়ে সেতু

সগন্থান প্যাগোডা

প্রমোদের স্থান 'পোয়ে' বা নৃত্যশালা। সবাই দলে-দলে চিত্ত-বিনোদনের জন্য 'পোয়ে'তেই যায়।

সাহেবদের জন্য 'জিমখানা' ক্লাব, টেনিস, পোলো, তাস, বিলিয়ার্ডস ও গল্‌ফ খেলার বন্দোবস্ত আছে। ক্লাবের নিয়মাবলীর মধ্যে 'বোটিং'এর নাম থাকিলেও—'বোট' না থাকাতে 'বোটিং' রামবিহীন রামায়ণের মতন হইয়া দাড়াইয়াছে। অনেক দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজ এবং ছোটখাট সুন্দর সাজান লাইব্রেরী থাকাতে

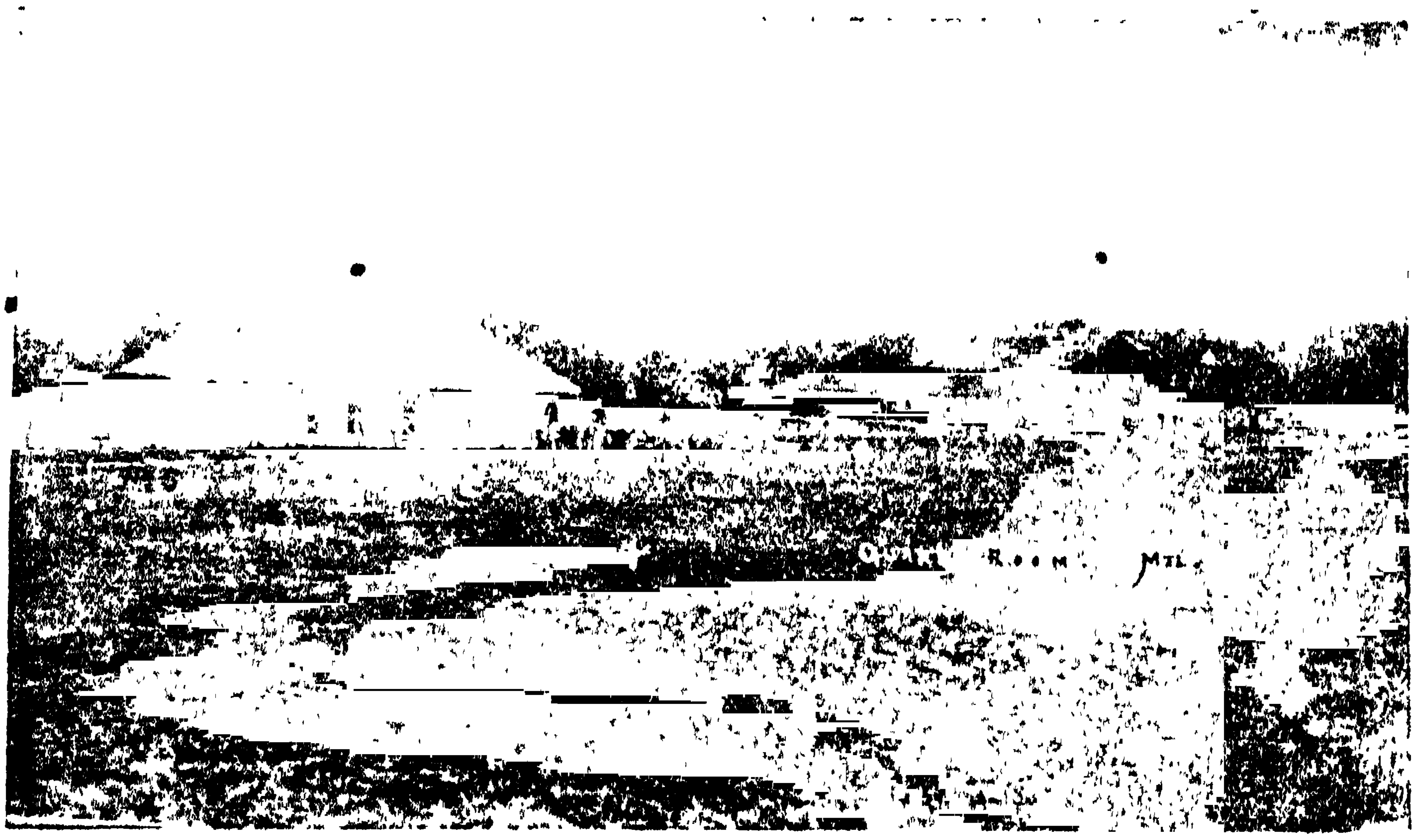

সৈন্যদের লাইব্রেরী ও পাঠকক্ষ

ভারতীয় সেনানিবাস

পড়িবার খুব সুবিধা। গল্পগুজবের সুবিধা ত আছেই,—সময়ে-সময়ে নাচগানের বন্দোবস্তও হইয়া থাকে। মোটের উপর, ঘরের কোণে অলস জীবন যাপন না করিয়া, যাহাতে দিনগুলিকে স্ফূর্ত্তিতে ও আনন্দে কাটান যাইতে পারে, তাহার জন্যই ক্লাবের সৃষ্টি।

বর্ম্মাদের নৈতিক চরিত্র যে রকম হয় হউক; কিন্তু ইহারা যে খুব ধর্ম্মপ্রবণ, তাহাতে মোটেই সন্দেহ নাই। যাঁহারা একবার বর্ম্মাতে আসিয়াছেন, তাঁহারা সবাই এই কথা স্বীকার করিবেন। যেখানে-সেখানে পেগোডার (ফয়া) অবস্থান এই কথাটা সবাইয়ের চোখে আঙ্গুল দিয়া

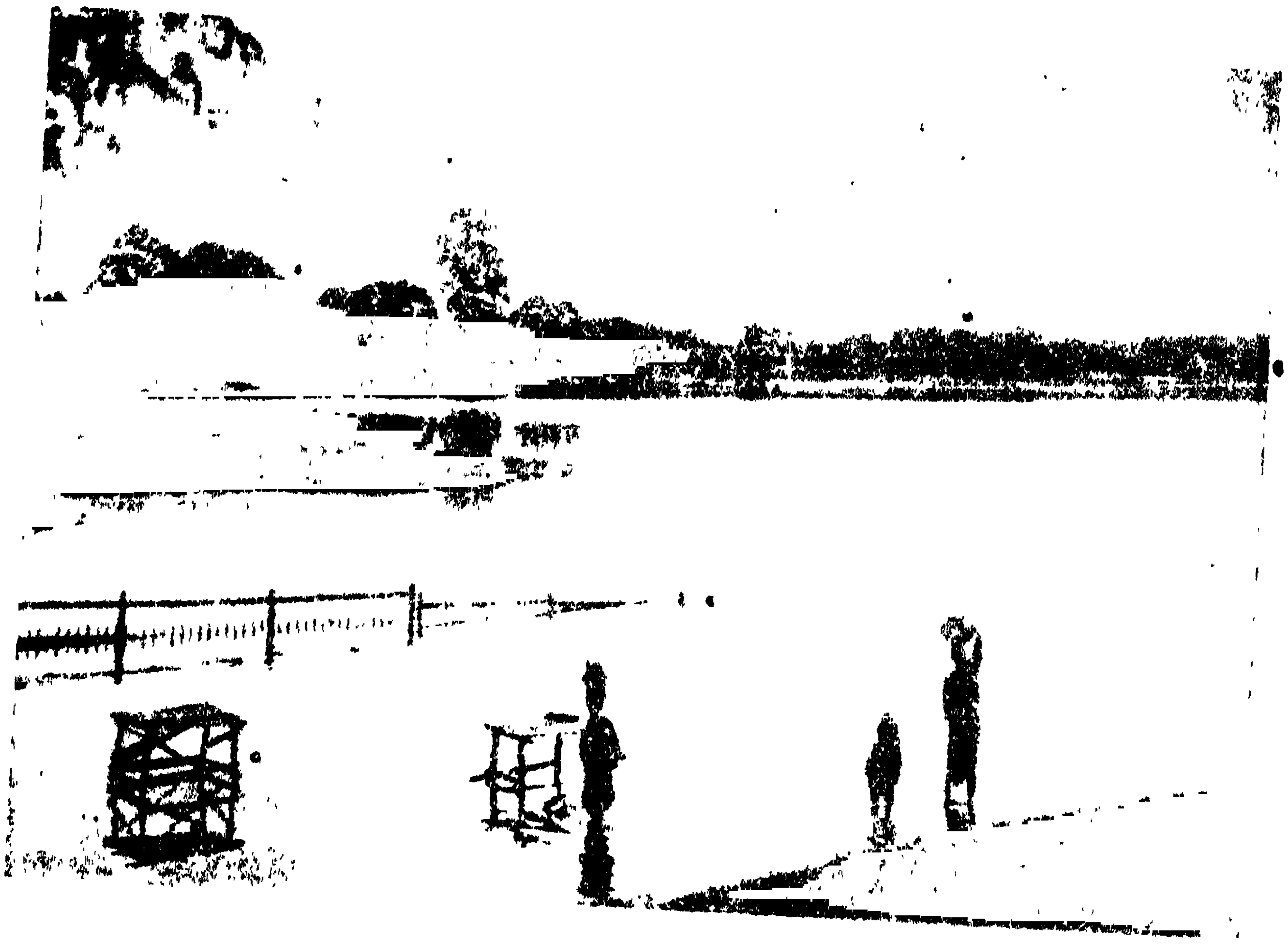

ইন্‌সেন লেক — ব্রহ্ম নারীর জল তুলিবার ঘাট

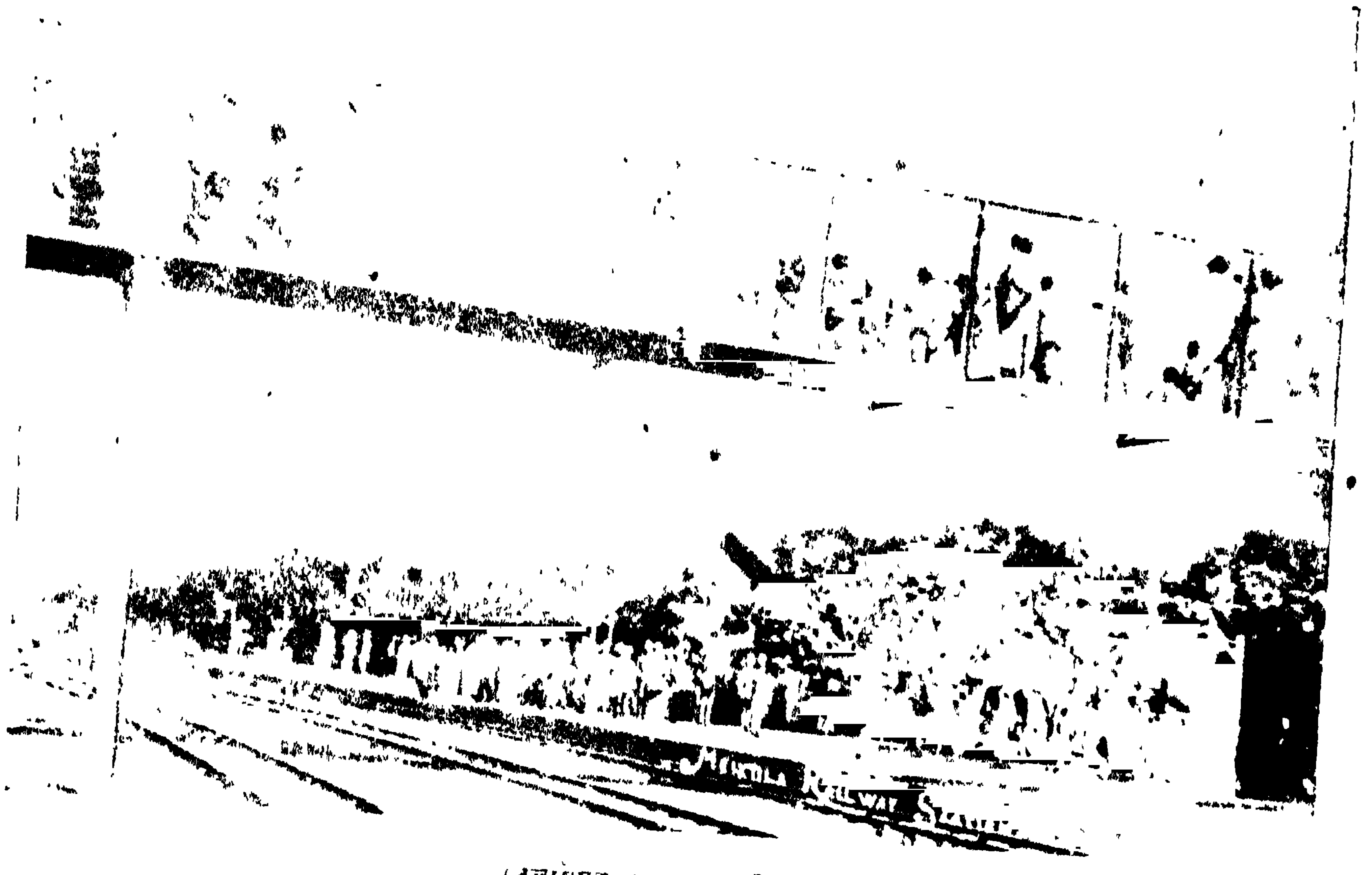

রেলষ্টেসন এবং ওভারব্রিজ

দেখাইয়া দিতেছে। ব্রহ্মদেশকে ‘পেগোডার দেশ’ বলা হয়; এখানেও এই প্রবাদের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রায় সব ‘ফয়া’রই চূড়া সুবর্ণপাত দ্বারা মণ্ডিত; এবং চার পাশে ছোট-ছোট ঘণ্টা টাঙান। বাতাসে যখন এই ঘণ্টাগুলি টুনটুন করিয়া মিষ্টি মধুর বাজিতে থাকে, তখন সাহেবদের মনে প্রিয়ার চম্পক-অঙ্গুলির মৃদু আঘাতে পিয়ানোর শব্দের, এবং বাঙালীদের মনে প্রিয়ার হাতের চুড়ির সুমধুর শব্দের স্মৃতি ফুটিয়া উঠে বলিয়া বোধ হয়।

হাসপাতাল

বাস্তবিকই দিনরাত্রির শুভ মিলনক্ষণে, গোধূলি সময়ে দূরে দেবালয়ে আরতির ঘণ্টাধ্বনির মতনই এই শব্দ অতীব মধুর, 'ফয়া'র ভিতরে বুদ্ধমূর্ত্তি,—প্রায় সকল স্থানেই ধ্যান-স্তিমিত নয়ন বুদ্ধদেব ক্রোড়ের উপর দুই হাত রাখিয়া উপবিষ্ট। কয়েক স্থানে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। তাহাতে, সহাস্যবদন বুদ্ধদেবের কোমল নয়ন হইতে করুণা যেন ঝরিয়া পড়িতেছে; তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাতে আপামর সকলকেই অভয় প্রদান করিতেছেন।

ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে বাঙ্গালী সৈন্যগণ

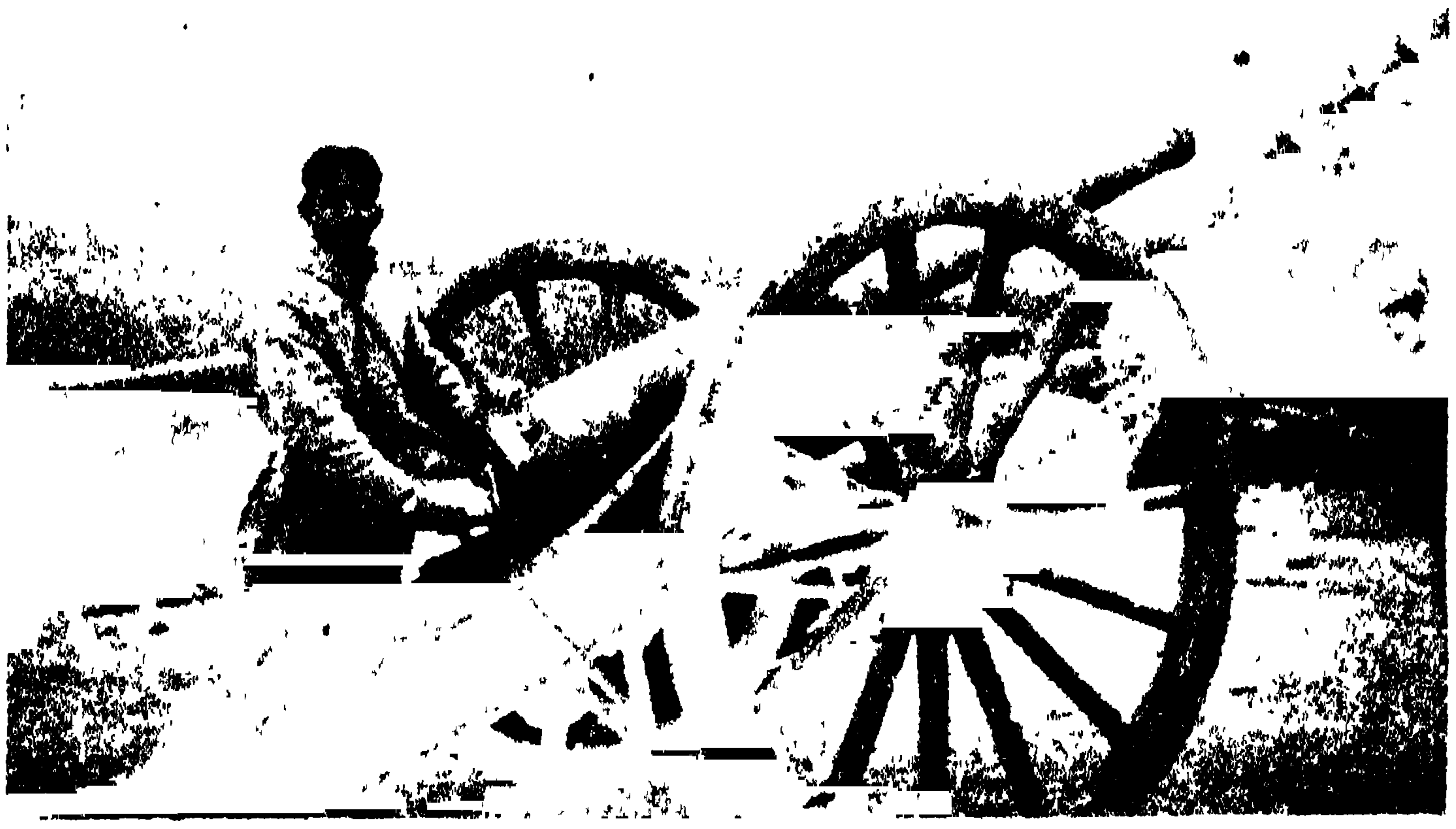

ফরাসীদিগের বিখ্যাত ৭৫ ( ) কামান লইয়া শিখিতেছে

মধ্যাহ্ন-ভোজন (দাঁড়াইয়া) তারাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত সতীশচন্দ্র শেঠ, অমিতাভ ঘোষ, ব্রজমোহন দত্ত
(বসিয়া) সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, করুণাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী ঘোষ ও ফণীন্দ্রনাথ বসু

দুপুর বেলার আহারের পর খবরের কাগজ পড়া হইতেছে
তারাপ্রসন্ন, অমিতাভ, সিদ্ধেশ্বর বিপিন ব্রজমোহন, ফণীন্দ্রনাথ, একজন ব্রেকম্যান, করুণা ও সতীশ

অমিতাভ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ রায়

ইহার বাঁ হাতের তিনটি আঙুলের ডগা জর্ম্মাণদের শেলে উড়িয়া গিয়াছে

[ফরাসীদিগের বিখ্যাত ৭৫ C M. কামান লইয়া

পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ ও অক্ষয়প্রসাদ বসু

বিপিনবিহারী ঘোষ ও ব্রহ্মমোহন দত্ত

দুইজনের মধ্যে যে ডাগ্‌-আউটটা রহিয়াছে, শত্রুপক্ষ যখন বোমবাড় করে, তখন উহার মধ্যে আশ্রয় লইতে হয়।

তীর্থ-যাত্রী

শিল্পী - শ্রীযুক্ত রামেশ্বরপ্রসাদ

বিবিধ-প্রসঙ্গ

কন্নাড় ভাষা

[শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস]

কন্নাড় (সংস্কৃত কর্ণাট, ইংরাজী Canarese) ভাষা দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্গত। ইহা পঞ্চ দ্রাবিড় মধ্যে পরিগণিত হয়। অপর চারিটি দ্রাবিড় ভাষার নাম তামিল, তেলুগু, মলয়ালম এবং তুলু। এতদ্ভিন্ন কুড়ুগু, তুড়ু, কোটু, বড়গু নামক দ্রাবিড় শ্রেণীভুক্ত আরও কয়েকটি ভাষা আছে।

নাগবর্ম্মা-কৃত কন্নাড় ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ব্যাকরণের ইংরাজি অনুবাদক Mr. Lewis Rice বলেন যে, কন্নাড় এবং তেলুগু ভাষা যবদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য হইতেই ইহা যবদ্বীপে প্রচারিত হইয়াছিল। পশ্চিম ভারতীয় গুহাসমূহের শিলালিপি এবং দাক্ষিণাত্যের অশোক-লিপির অনুকরণে কন্নাড় এবং তেলুগু ভাষার বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে।

উক্ত অশোক লিপি গিরনারের অশোক স্তম্ভে খোদিত আছে। এই স্তম্ভ খৃঃ পূর্ব্ব ২৫০ অব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। Dr Rice বলেন যে, উক্ত অব্দের পূর্ব্বকার কোন শিলালিপি ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অনেকে এ কথা স্বীকার করেন না। Dr Rice আরও বলেন যে, ব্রিটিশ মিউজিয়মে Professor Sayce একখণ্ড শিলালিপি পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা খৃঃ পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর ব্যাবিলনীয় ওরায়ন (Oraon) ভাষায় লিখিত। উক্ত লিপির বর্ণাবলী দেখিলে অনুমান হয় যে, উহা হইতেই অশোক-লিপির বর্ণমালা সংগৃহীত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে গণ্ড (Gond), খণ্ড (Khund), রাজমহলী প্রভৃতি ভাষাও দ্রাবিড়-শ্রেণীভুক্ত। জনৈক পণ্ডিত বেলুচিস্থানের ব্রাহুই (Brahui) ভাষাকে দ্রাবিড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এই নিদর্শন মতে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, আর্য্যদিগের ন্যায় দ্রাবিড় জাতিও পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ মহাশয় বলেন যে, বাংলা দেশের আদিমনিবাসিগণও দ্রাবিড়ী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরে সবিস্তার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল দক্ষিণ দেশীয় দ্রাবিড় ভাষাগুলির বিষয়ই উল্লেখ করিব। অধুনা দ্রাবিড় ভাষা বিন্ধ্যগিরি এবং নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত উড়িষ্যা, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র দেশ ভিন্ন, সকল স্থলেই প্রচলিত আছে। অন্ধ্রদেশে অর্থাৎ উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমা হইতে দ্রাবিড় বা খাস মান্দ্রাজ প্রদেশের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত তেলুগু ভাষা, অন্ধ্রদেশের দক্ষিণ সীমা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তামিল ভাষা, নিজাম রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে, দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে, মহীশূর রাজ্যে, কয়েম্বাটোরে এবং উত্তর দক্ষিণ কানাড়ায় কন্নাড় ভাষা, মলয়দেশে মলয়ালম এবং দক্ষিণ কানাড়া ও পর্ত্তুগিজ রাজ্যের কোন-কোন স্থানে তুলু ভাষা ব্যবহৃত হয়। কুর্গদেশে কড়ুগু ভাষা এবং নীলগিরি প্রদেশের অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে তুড়ু, কোটু এবং বড়গু ভাষার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ দেশীয় দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে তামিল, তেলুগু, কন্নাড় এবং মলয়ালম এই চারিটি ভাষাই বিশেষরূপে সংবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। ইহাদের স্বতন্ত্র সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং বর্ণমালা বর্ত্তমান আছে। তুলু কড়ুগু, তুড়ু, কোটু এবং বড়গু প্রভৃতি ভাষা অতি অল্প সংখ্যক লোকেই ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের স্বতন্ত্র সাহিত্য, ব্যাকরণ বা বর্ণমালা কিছুই নাই। ইহারা কেবল কথিত ভাষারূপে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, এইগুলি কন্নাড় ভাষার অন্তর্গত অথবা তাহার রূপান্তর বিশেষ।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে মলয়ালম একটী স্বতন্ত্র ভাষা নহে। ইহাকে তামিল ভাষার শাখা বলা যাইতে পারে। মলয়ালমের বর্ণমালা এবং পদবিন্যাস তামিলভাষার অনুরূপ। Dr Caldwell এই অনুমান মতে বলিয়াছেন, "Malayalam is a very ancient offshoot of Tamil."

তামিল, তেলুগু এবং কন্নাড় ভাষার মধ্যে অনেক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বাক্য কথন ও শব্দ বিন্যাস হিসাবে তামিল ভাষার সহিত কন্নাড়-ভাষার যতদূর নিকট সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তামিল ও তেলুগু ভাষার মধ্যে তত নৈকট্য নাই। অপরন্তু বর্ণমালা সম্বন্ধে তেলুগু এবং কন্নাড় ভাষার মধ্যে এতদূর সামঞ্জস্য আছে যে, একের বর্ণমালার সহিত পরিচয় থাকিলে, অপরটির বর্ণমালা অতি সহজেই বুঝিতে এবং পড়িতে পারা যায়। ধাতু এবং বৈয়াকরণিক নীতি সম্বন্ধে তামিল এবং তেলুগু ভাষার মধ্যে অনেকটা ঐক্য পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেগুলি এরূপ বিকৃত এবং রূপান্তরিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহাদের মৌলিকতা নির্দ্ধারণ করা অতি সুকঠিন। তবে তামিল এবং কন্নাড় ভাষার শব্দাবলী ও বৈয়াকরণিক নীতি-সমূহের মধ্যে এরূপ ঐক্যভাব বর্ত্তমান আছে যে, বিনা পরিবর্ত্তনে একের শব্দাদি অপরের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ভাষা-ভূষণ রচয়িতা নাগবর্ম্মা বলেন সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং পৈশাচক নামক তৃতীয় এবং অর্দ্ধাংশ ভাষা হইতে দ্রাবিড়, অন্ধ্র

(তেলুগু), কর্ণাটক (কন্নাড়) প্রভৃতি চারিটি ভাষা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে অনেক মুসলমানী শব্দও দ্রাবিড়ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তবে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবহারিক শাস্ত্রমূলক (legal) শব্দ। এইরূপ শব্দের ব্যবহার মহীশূর রাজ্যে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বাংলার চলিত ভাষায়ও এইরূপ অনেক মুসলমানী শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

আমরা এক্ষণে পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ তামিল, তেলুগু এবং কন্নাড় ভাষার বর্ণমালাগুলি যথাযথ ভাবে নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি। মলয়ালম ভাষার বর্ণমালা তামিলেরই অনুরূপ। যেমন তেলুগু ও কন্নাড় বর্ণমালার মধ্যে অধিক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না, তামিল এবং মলয়ালম বর্ণমালার মধ্যেও সেইরূপ অধিক পার্থক্য নাই। দুঃখের বিষয় মলয়ালম ভাষার অক্ষর সংগ্রহ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া উক্ত ভাষার বর্ণমালা প্রদর্শন করিতে অক্ষম হইলাম।

তামিল বর্ণমালা

[illegible]

[illegible]

অ আ ই ঈ উ ঊ এ এ ঐ ও ও ঔ

ঃ (দ্বিত্ব—চিহ্ন)

ক ঙ চ ঞ ট ণ ত ন প ম য র ল

ব ঝড় লড় ড় নড়

জ শ স ক্ষ হ

না রা নাই লাই লই নই

কা কি কী কু কূ কে কে কৈ কো কো

কৌ

তেলুগু বর্ণমালা

[illegible]

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ৯ ৡ

এ এ ঐ ও ও ঔ ং ঃ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম য র র ল ড়

ব শ ষ স হ ক্ষ

ক কা কি কী কু কূ কৃ কৄ কে কে

কৈ কো কো কৌ কং কঃ

শ্রী ক্ত ক্র ত্প ক্র ক্র

কন্নাড় বর্ণমালা

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ

এ এ ঐ ও ও ঔ অং অঃ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম য র ল ব

শ ষ স হ ক্ষ ড়

ক কা কি কী কু কূ কে কে কৈ

কো কো কৌ কং কঃ

শ্রী ক্ত ত্র স্প ঘ ন্ন ল্ল দ্গ

দ্রাবিড় ভাষার বিশেষত্ব এই যে, ইহার বর্ণমালার দীর্ঘ 'এ' কার এবং দীর্ঘ 'ও'.কার এবং র, ড় প্রভৃতি প্রচলিত আছে। তামিল ভাষায় 'ক'এর পর ঙ, 'চ'এর পর ঞ, 'ট'এর পর ণ 'ত'এর পর ন এবং 'প'এর পর 'ম' আছে। খ গ ঘ, ছ জ ঝ, ঠ ড ঢ, থ দ ধ, ফ ব ভ প্রভৃতি মহাপ্রাণ বর্ণ নাই। তামিল-ভাষায় শ ষ স হ বর্ণ অল্পদিন হইল গৃহীত হইয়াছে। এইজন্য তামিল বর্ণমালা অদ্যাবধি অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। আমরা অবগত হইলাম যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক এই অসম্পূর্ণতা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্ভবতঃ অচিরে তিনি আবশ্যক বর্ণাভাব মোচন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু তামিল ভাষায় অদ্যাবধি ঐ সকল বর্ণের ব্যবহার করিবার আবশ্যকতা বিবেচিত হয় নাই। তামিল ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিলেন যে, তাঁহাদের উচ্চারণ প্রণালীতে উক্ত বর্ণগুলির প্রয়োগ আবশ্যক হয় না। তবে অধুনা অপর ভাষার শব্দাদি তামিল ভাষানুগত করায় বর্ণমালা পরিবর্দ্ধিত করার আবশ্যক বোধ হইতেছে।

পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তামিল ভাষী হিন্দুগণ হিন্দু দেবদেবীর নাম বা সংস্কৃত মন্ত্রাদি বর্ণাভাবে কি প্রকারে লিখিতেন বা উচ্চারণ করিতেন। ইহার উদাহরণ স্বরূপ আমরা একটি শব্দের এখানে উল্লেখ করিব। "শিব" শব্দ তামিল ভাষায় "চিব" এইরূপ লিখিত এবং উচ্চারিত হয়। যাহা হউক, অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষা অপেক্ষা তামিল ভাষা অদ্যাবধি মৌলিকতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

আদিম কন্নাড় ভাষাতেও খ ঘ, ছ ঝ, প্রভৃতি মহাপ্রাণ বর্ণের ব্যবহার ছিল না। ঋ, ৠ, র ষ ও বিসর্গ কান্নাড় বর্ণমালার মধ্যে ছিল না। কিন্তু মধ্যকালে জৈন এবং শৈব কবিগণ বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কন্নাড় ভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। নাগবর্ম্মা এবং বর্ম্মকোষ নামক অভিধানে কন্নাড় ভাষা কর্ত্তৃক পরিগৃহীত সংস্কৃত শব্দাবলী এবং তাহাদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কন্নাড় ভাষায় সংস্কৃত শব্দ দুই ভাবে গৃহীত হইয়াছে। যে সকল সংস্কৃত শব্দ অল্প পরিবর্তন করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে "তৎসম" বলে। যথা- সংস্কৃত নদী, কন্নাড় "নদি"। পরন্তু, যে সকল শব্দ বিশেষ রূপান্তরিত করিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহাদিগকে "তদ্ভব" কহে। যথা —সংস্কৃত "গ্রহ"—কন্নাড় "গহ"। এই সকল সংস্কৃত শব্দের লিখন ও উচ্চারণের জন্যই মহাপ্রাণ প্রভৃতি বর্ণের আবশ্যকতা হইয়াছিল। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কেশিরাজ কবি তাঁহার শব্দ মণি-দর্পণ নামক ব্যাকরণে কয়েকটি মহাপ্রাণ বর্ণের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেশিরাজ বলেন যে, পূর্ব্বে কন্নাড় বর্ণমালায় মোট ৪৭টি বর্ণ ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে নাগবর্ম্মাও ছন্দ ভূষণ গ্রন্থে ৪৭টি বর্ণের কথা বলিয়াছেন। যথা

অকারাদ্যঃ প্রসিদ্ধা বর্ণাঃ ৪৭

তেষাদৌ চতুর্দ্দশ স্বরাঃ ১৪

কাদয় স্ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যঞ্জনানি ৩৩

অ-কার হইতে ঃ কার পর্য্যন্ত অক্ষরকে বর্ণ কহে। তন্মধ্যে প্রথম চতুর্দ্দশটি স্বরবর্ণভুক্ত। কাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ অক্ষর ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হয়

নাত্র প্রাণেন বর্ণানাং দ্বিতীয় চতুর্থঃ ১১।

কন্নাড়-ভাষায় বর্গের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বর্ণ যথা খ ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ ধ, ফ ভ প্রভৃতি বর্ণ "প্রায়ই" ব্যবহৃত হয় না। প্রায় বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোন-কোন স্থলে মহাপ্রাণ বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা ইচ্ছাশির (২০০০) পড়িয়নে (হর্ম্মে)

শষৌ চ। সূ ১২

শ ষ বর্ণদ্বয়ও কন্নাড় ভাষায় ব্যবহার হয় না।

শ কারানিয়ণ্ড হ্রিদনাণ্ড , :৬

ক্ষ ঙ্ক ‍ঃ এই চারিটি বর্ণও ব্যবহৃত হয় না।

এতদ্ভিন্ন অনুস্বর (ং) এবং বিসর্গ (ঃ) ব্যবহৃত হইত।

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্বে কন্নাড় ভাষায় ত্রয়স্ত্রিংশটি বর্ণেরই ব্যবহার হইত। সুতরাং বোধ হয় যে, অবশিষ্ট বর্ণগুলি সংস্কৃত হইতে গৃহীত শব্দের লিখন ও পঠনের সুবিধার জন্য সংস্কৃত বর্ণমালার অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে আরও পাঁচটিও বর্ণ কন্নাড় ভাষার বর্ণমালাভুক্ত হইয়াছিল।

কন্নাড় ভাষার ন্যায় তেলুগু ভাষাতেও অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। সেই জন্য তেলুগু ভাষার বর্ণমালা কন্নাড় বর্ণমালার ন্যায় মহাপ্রাণাদি বর্ণ দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তবে সংস্কৃত শব্দ অগে কন্নাড় ভাষার মধ্যে অথবা তেলুগু ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে অথবা এক অন্যের অনুকরণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে আমরা এখনও কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

তামিল ভাষায় যুক্তাক্ষর নাই। তবে দ্বিত্ব জ্ঞাপক একটি চিহ্ন (.:) আছে। ইহা উপরিউক্ত তামিল বর্ণমালার স্বরবর্ণের নীচে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই চিহ্ন কেবল ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হয়। ইহার নাম "ইকন"। কোন বর্ণের সহিত সংযোগ কালে ইহার নিম্নের দুইটি বিন্দু লোপ প্রাপ্ত হয় এবং কেবল উপরের বিন্দুটি বর্ণের শিরোদেশে সংযুক্ত হয়।

যথা "ক" + ".:" = কঁ, উচ্চারণ "ক্"।

তেলুগু এবং কন্নাড় ভাষায় বাংলা ভাষার ন্যায় যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কন্নাড়-ভাষার যুক্তাক্ষরে দুইটি বর্ণই পূর্ণাবয়বে বর্ত্তমান থাকে। কন্নাড় যুক্তাক্ষরে একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। "গ" "ঙ" "ন" "ল" "ম" এবং রেফ সংযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইলে ঐ সকল বর্ণের পরিবর্ত্তে ১, ২, ৩, ৪, ৮, ৯ অঙ্ক ব্যবহার হয়। "গ"র পরিবর্ত্তে "১", "ঙ"র পরিবর্ত্তে "২", "ন"র পরিবর্ত্তে "৩", "ল"র পরিবর্ত্তে "৪", "ম"র পরিবর্ত্তে "৮" এবং রেফের পরিবর্ত্তে "৯" অঙ্ক দিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। যথা খড়্গ লিখিতে হইলে "খ" এবং "ড়"র নিচে "গ" না দিয়া "১" অঙ্ক দিলেই খড়্গ বুঝাইবে। "ক্ত" লিখিবার কালে "ক" বর্ণের নীচে "ত"র পরিবর্ত্তে "২" অঙ্ক সংযোগ করিলেই "ক্ত" বুঝাইবে।

অনেক সংস্কৃত শব্দ যেমন দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ অনেক দ্রাবিড় শব্দও সংস্কৃত ভাষায় স্থান পাইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। Dr. Kettle—তাঁহার কন্নাড় অভিধানে এইরূপ ৪২০টি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন।

এই ৪২০টি শব্দের মধ্যে কয়েকটি শব্দ নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

অঙ্গবাচক

দ্রাবিড়	সংস্কৃত
কুন্তল	কুন্ত
কুন্তল	কুণ্ডল
গলে	গল
পক্কি	পক্ষ
পরে	পর
পালে	পালিকা
পোরে	পুর
মুক	মুখ
ভৈর	ভের
হলু	হালু

জন্তুবাচক

কাগে	কাক
কুরে	কুরকুর
কুকিল	কোকিল
কোনা	গোনা
গন্নে	ঘুনে
ঘোল	ঘোট
পল্ল	পল্লব
পিল্লু	পিল্লু
মরকর মরকা	মরকট

ওষধিবাচক

এর্কে	অর্ক
এরাড়	এবণ্ড
এলাক্কি	এলা, এলাচি
কন্দে	কন্দে কন্দ
কাট,	কাষ্ঠ
কেশু	কেশুক
কন	কনক
তামরে	তামরক
নাগরঙ্গ	নারঙ্গ
টিপ্পলি	পিপ্পলি
পুল	পিলু
পল	ফল
মল্লিগি	মল্লিকা
মুগুল	মুকুল

ধাতুবাচক

কেনকা	কণক
কর্ব্বুন	কর্ব্বুর
তাম্র	তাম্র

বস্তুবাচক

কুলা	কুল
ময়ড়ী	মরু

বর্ণবাচক

কিশু	কসায়
নেলাম	নীল

ব্যক্তিবাচক

অরিকে	অর্ক (পণ্ডিত)
অলু	অলি (স্ত্রী বন্ধু)
কিরু	কিরক
কল	খল
মুন	মুনি

গৃহবাচক

কেট্টি গে	কুটিক
চেরে	চার
নেলে	নিলয়
পট্টু, পট্টু	পট্টন
	ইত্যাদি

সংস্কৃত ভাষা কর্ত্তৃক দ্রাবিড় শব্দ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ পণ্ডিত Dr. Gundert বলেন—

"It might have been expected that a great many Dravidian words would have found their way into Sanskrit. How could the Aryans have spread themselves all over India without adopting a great deal from the aboriginal races they found, therein, whom in the course of thousands of years they have subdued partly by peaceful means, partly by force and yet imperfectly after all upto this day. Where people speaking different languages are in constant intercommunication with one another—when they trade or fight with one another, and have many joys and sorrows in common, they naturally borrow much from one another, without examination or consideration. And this must have happened to the greatest extent in the earliest times, when those nations still stood face to face in their premitive conditions. It might be anticipated, therefore, that as the Aryans penetrated further and further to the south, and became acquainted with new objects bearing Dravidian names, they would as a matter of course adopt the names of these things together with the things themselves."

Professor Benfey তাঁহার Complete Sanskrit Grammar গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"Words which were originally quite foreign to the Sanskrit have been included in its vocabulary."

কবি কুমারিল ভট্ট ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তন্ত্রবার্ত্তিকা নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"এক্ষণে যে সকল শব্দ আর্য্যগণ অবগত ছিলেন না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। যদি ঐ সকল শব্দের অর্থ ম্লেচ্ছগণের জানা থাকে, তবে সেই অর্থ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না? একটু পরিবর্ত্তন করিলেই অনেক দ্রাবিড় শব্দ সংস্কৃতে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। যথা দ্রাবিড় "চোর" অন্ন সংস্কৃত "চরু॥"

সংস্কৃত ভাষান্তর্গত দ্রাবিড় শব্দাবলীর কি কি উপায়ে পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে Dr. Caldwell নিম্নলিখিত নিয়মগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"1. When the word is an isolated one in Sanskrit, without a root and without derivatives but is surrounded in the Dravidian languages with collateral related or derivative words.

2. When Sanskrit possesses other words expressing the same idea whilst the Dravidian tongues have the one in question alone.

3. When the word is not found in any of the Indo-European tongues allied to Sanskrit but is found in every Dravidian dialect however rude

4. When the derivations which the Sanskrit lexicographers have attributed to the word is evidently a fanciful one whilst Dravidian lexicographers reduce it from some native Dravidian verbal theme of the same or similar signification from which a variety of words are found to be derived.

5. When the signification of the word in the Dravidian languages is evidently radical and physiological whilst the Sanskrit signification is metaphorical or only collateral.

6. When native Dravidian scholars notwithstanding their high estimation of Sanskrit as the language of the gods and the mother of all literature classify the word in question as a purely Dravidian one.

দরকার। (৩) Home Economics। (৪) Household management; (৫) Millinery। (৬) Child Nature, (৭) House Sanitation; (৮) Art and Design এবং (৯) Physical Training। ঐ সকল বিষয়ে অগ্রে পাশ করা প্রয়োজন এবং ঐ সকল বিষয় পড়িতে পড়িতে নিম্নলিখিত subjectগুলিও লওয়া যাইতে পারে:- (১) English, (২) Bengali, (৩) Mathematics, (৪) Nature Study প্রভৃতি। ছাত্রীরা যদি এইভাবে শিক্ষা পায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী লইয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। কারণ তাহারা vocational education পাইতেছে। তাহারা চাকরী না পাইলেও নিজ নিজ জীবনকে কোন না কোন কাজে ব্যস্ত রাখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় I. Aতে Sanskrit, Logic, Botany ও B. Aতে English, History, Botany প্রভৃতি combination of subjects ছাত্রীদিগকে লইবার অনুমতি দিয়াছেন। Chemistry ও Soil Physics না জানা থাকিলে Botany বুঝা শক্ত হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত ছাত্রীর বিদ্যাও সেইরূপ হয়। তাহারা জানে যে, ঐ রকম subjectগুলি সংসারের কোন কাজেও আসিবে না, উপস্থিত পাশ করা নিয়ে দরকার। তবে যদি তাহাদিগকে পাশ্চাত্য জগতের ন্যায় Applied Botany শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে vegetable Gardening বা নূতন রকম ফল সৃষ্টি, বা কোন ফুলের গন্ধ বৃদ্ধি, বা কোন মিষ্টতা ও তৈলাক্ত পদার্থ বৃদ্ধি করা প্রভৃতি কাজে মেয়েরা আপন-আপন জীবনকে ভবিষ্যতে নিযুক্ত রাখিতে পারে। (এই সব কাজ কি বাঙ্গালীর মেয়েরা পছন্দ করিবেন? ইহাও ভাবিবার কথা।) মূল কথা- যে কোন শিক্ষাই হউক না কেন, কেবল পরীক্ষায় পাশ করা তাহার উদ্দেশ্য নহে; শিক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা হইলে বিষয়গুলি শিখিয়া চাকরীর অভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে না।

কলিকাতার অনেক ছাত্রীর স্বাস্থ্য ভগ্ন। তাহার কারণ, (১) তাহারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা পায় না; (২) মেয়েদের বেড়াইবার বা ব্যায়াম করিবার সুবিধাজনক স্থান নাই। (যদিও গ্রীয়ার (পর্দ্দানশিন) পার্ক হইয়াছে, তথাপি তথায় বড় লোকের মেয়ে ভিন্ন গরীবের মেয়েদের যাওয়া একরূপ শক্ত। দূর হইতে যাইতে হইলে গাড়ী ভাড়া দরকার। তাহা যোগাড় করা সব ছাত্রীর পক্ষে সম্ভবপর নহে।), (৩) হোষ্টেলে বা বোর্ডিং হাউসে সকল সময় ভালরূপ আহার পায় না।

কোন-কোন পিতামাতা মনে করেন যে, মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শিখাইলে তাহারা বড় বেশী স্বাধীনতা পায়, পুরুষকে dominate করিতে চায়। উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের বিবাহ দেওয়া একরূপ শক্ত হয়, তাহাদের উপযুক্ত বরও সমাজে পাওয়া যায় না। আবার অল্প-শিক্ষিত যুবক উচ্চশিক্ষিত যুবতীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক নহে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিবার ইহাও একটী অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে।

মেয়েদের কলেজে মেয়ে প্রফেসর থাকাই উচিত; কিন্তু বেথুন কলেজে তাহা নাই। অথচ মেয়ে প্রফেসরের অভাব নাই। আজকাল প্রতি বৎসর B. A. ও M. A. listতে মেয়েদের নাম দেখা যায়। মেয়েদের শিক্ষা মেয়েদের নিকট হইলে তাহারা নিঃসঙ্কোচে তাহাদের যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা বুঝিয়া লইতে পারে। যদি উপযুক্ত মেয়ে প্রফেসর না পাওয়া যায় তখন experienced প্রফেসরকে নিযুক্ত করা উচিত।

তড়িৎ-বিজ্ঞান

[শ্রীনরেশচন্দ্র রায়, বি-এস্‌সি]

যে যে বিষয় এই বিংশ শতাব্দীতে নবযুগের অবতারণা করিয়া ইহাকে জ্ঞানে, মানে ও সভ্যতায় এতদূর উন্নত করিয়া তুলিয়াছে,—একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, তড়িৎ-বিজ্ঞান তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এখন প্রায় কঠিন সকল কার্য্যই তড়িৎ-সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। টেলিগ্রাফ, Locomotives, ছাপাখানা, বৈদ্যুতিক আলো ও ফ্যান- এ সমস্তই আমাদিগের অশেষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

এই তড়িৎ সাহায্যে কত অসম্ভব কার্য্য সহজসাধ্য ও সম্ভব হইতেছে; ইহার আশ্চর্য্যজনক ও কৌতূহলোদ্দীপক ক্ষমতা দর্শন করিলে অনেকেরই বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এই সব বিষয় জানিবার জন্য কাহারও যে কৌতূহল হয় না এমন নয়। কিন্তু সাধারণকে এই সব বিষয় বুঝান একটু কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে; অধিকন্তু বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান-পরিভাষার একান্ত অভাব বলিয়া বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চা করা বড়ই প্রমাদজনক। বঙ্গভাষায় এই এক বিষয়ে যে অভাব রহিয়া গিয়াছে তাহা যে কতকালে পূরণ হইবে, তাহা ভাবিতে গেলে আর কোনই কুল-কিনারা পাওয়া যায় না। যাহা হউক, তড়িৎ সম্বন্ধে অনেকগুলি কৌতুকাবহ বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে সাধারণকে তড়িতের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্মের সহিত পরিচিত করিয়া না দিলে, এ সম্বন্ধে কোন বিষয়ই তাঁহাদিগের বুঝিবার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তড়িতের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিব; যাঁহারা একটু ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ইহা পাঠ করিবেন, তড়িৎ-রাজ্যে প্রবেশের পথ তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুগম হইবে; এবং পরে আমরা যে সব কৌতুককর বিষয় লইয়া আলোচনা করিব, তাহা তাঁহাদিগের নিকট গল্পের ন্যায় মনোরম ও বিস্ময়কর হইবে সন্দেহ নাই।

তড়িৎ সাধারণতঃ দুই প্রকারে উৎপন্ন করা যাইতে পারে; (১) ঘর্ষণের দ্বারা (by friction); (২) রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা (chemical method)। আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ঘর্ষণজ তড়িৎ (frictional electricity) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ব্যাবহারিক জগতে ঘর্ষণজ তড়িতের প্রয়োগ বিশেষ না থাকিলেও, ঐতিহাসিক হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে; বিশেষতঃ, আকাশস্থ সৌদামিনীর উদ্ভবও এই ঘর্ষণ-প্রক্রিয়ার দ্বারাই হইয়া থাকে।

ঘর্ষণজ-তড়িৎ* (Frictional Electricity)

খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৬০০ অব্দে গ্রীক বৈজ্ঞানিক থেলস্ (Thales) পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছিলেন যে, amberকে সিল্ক দ্বারা ঘসিলে ইহা কাগজের টুকরা প্রভৃতি হাল্কা দ্রব্য আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করে। এই ক্ষমতা বা শক্তিকে তিনি তড়িৎ শক্তি বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার পর বহুকাল আর কেহই এ বিষয়ে বিশেষ কোন গবেষণা করেন নাই; সুতরাং এ বিষয়ে আর বিশেষ কোন তথ্যই বহুদিন আবিষ্কৃত হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের চিকিৎসক ডাক্তার গিলবার্ট (Gilbert) কতকগুলি পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, এই তড়িৎ শক্তি যে শুধু amber এই সীমাবদ্ধ, তাহা নহে; গন্ধক, মোম ও কাচেও উহা অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

একটি কাচদণ্ডকে সিল্ক দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, উহা কাগজের টুকরা প্রভৃতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হাল্কা দ্রব্য আকর্ষণ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত কাগজের টুকরা প্রথমে কাচদণ্ড কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া উহাতে সংলগ্ন হয়; কিন্তু সংলগ্ন হইবার ক্ষণকাল পরেই উহা হইতে বিকৃষ্ট (repulsed) হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় কাচদণ্ড তড়িৎ শক্তি সম্পন্ন বা তড়িতাবিষ্ট (electrified) হইয়াছে বলা হয়। তড়িতের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাকে তড়িৎ-জ্ঞাপক (electroscope) বলে। একটি pithball অথবা শোলার দোলক (pendulum) দ্বারাও তড়িৎ-জ্ঞাপকের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে।

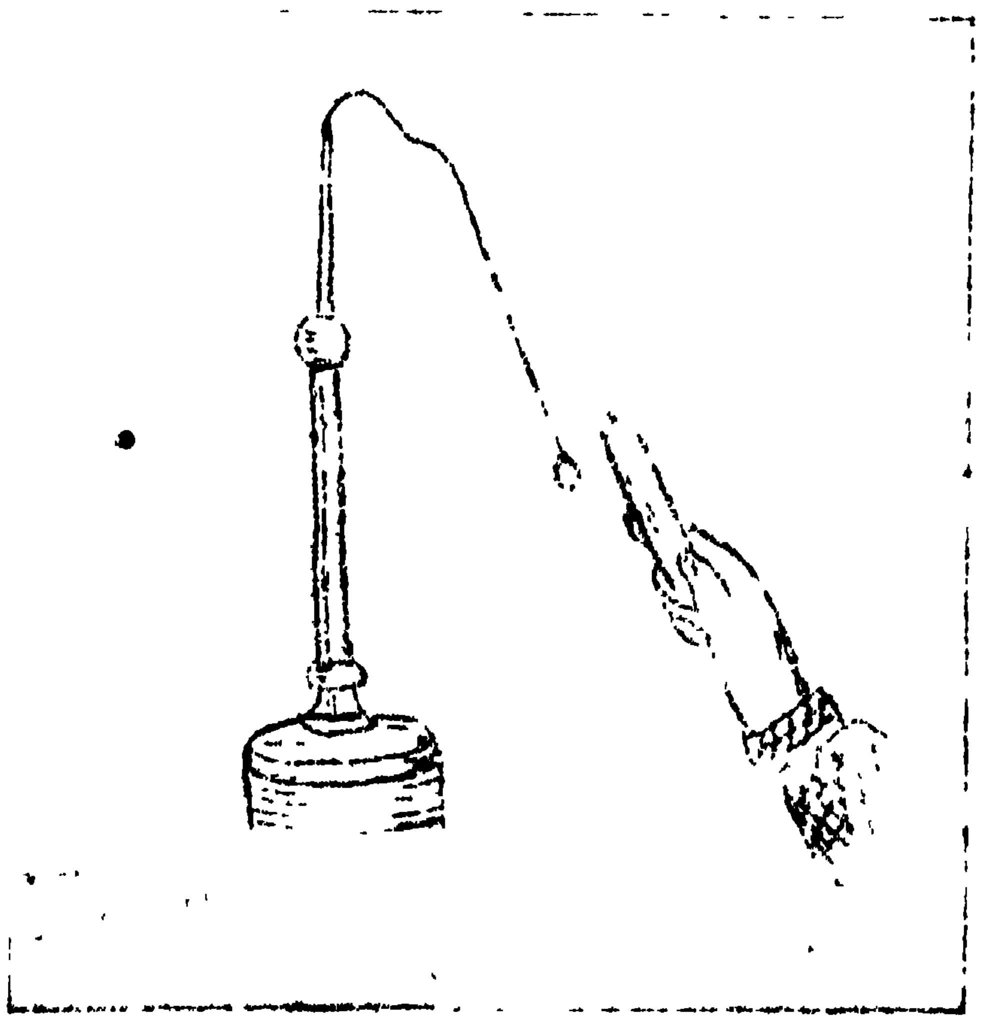

চিত্র ১

১ম পরীক্ষা—সিল্কের সূতা দিয়া শোলার একটি দোলক নির্ম্মাণ করিয়া তড়িতাবিষ্ট (electrified) একটি কাচদণ্ড উহার নিকটে লইলে দোলকটী আকৃষ্ট হইয়া উহাতে সংলগ্ন হইবে (১ম চিত্র)। সংলগ্ন হইবার কিয়ৎকাল পরেই কাচদণ্ড কর্ত্তৃক বিকৃষ্ট হইয়া দূরে সরিয়া যাইবে। এখন কাচদণ্ড যতই উহার নিকটে লওয়া যাইবে, ততই দোলকটি তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইবে।

পরিচালক ও অপরিচালক—কতকগুলি দ্রব্য দিয়া সহজে তড়িৎ পরিচালিত হইয়া যায়। আবার কতকগুলি দ্রব্য তড়িৎ দিয়া ভালরূপে পরিচালিত হইতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলি তড়িতের পরিচালক ও পরবর্ত্তী দ্রব্যগুলি অপরিচালক নামে অভিহিত। ধাতব পদার্থ মাত্রেই সুপরিচালক; এই নিমিত্ত ঘর্ষণের দ্বারা উহাতে কোন তড়িৎ-লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এতদ্ব্যতীত প্রাণীদেহ, জল ইত্যাদি পরিচালক। কাচ, রবার, বায়ু, শুষ্ক বাষ্প (dry vapour), শুক্না কাগজ, সিল্ক ইত্যাদি অপরিচালকের মধ্যে গণ্য। এতদ্ব্যতীত শুষ্ক কাষ্ঠ অর্দ্ধ-পরিচালক।

এইজন্য কোন পরিচালক দ্রব্যে তড়িতের উদ্ভব করিতে হইলে, উহাকে কোন অপরিচালক দ্রব্য দ্বারা মৃত্তিকা হইতে অথবা অন্য কোন পরিচালক দ্রব্য হইতে পৃথক করিয়া দিতে হয়। ইহাকে পৃথক করণ (insulation) বলে।

তড়িতের প্রকারভেদ :—(১) আমরা দেখিয়াছি যে, সিল্কের ঘর্ষণে কাচদণ্ড তড়িতাবিষ্ট হয় এবং তখন উহা শোলার দোলককে আকর্ষণ করে। দোলকটী কাচদণ্ড স্পর্শ করিবার পরই উহা হইতে বিকৃষ্ট হয়; কিন্তু ঐ বিকৃষ্ট দোলকের নিকট সিল্কখণ্ড ধরিলে উহা সিল্ক কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়।

(সিল্ক দিয়া কাচ দণ্ড মার্জ্জন করিবার সময় রবারের দস্তানা হাতে দেওয়া উচিত; নতুবা উদ্ভূত তড়িৎ আমাদের শরীর দিয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে চলিয়া যাইতে পারে।)

(২) পুনরায় কাচ দণ্ড ঘসিবার পর সিল্কের টুকরাটুকু অতড়িতাবিষ্ট দোলকটির নিকট ধর,—দেখিবে দোলকটি আকৃষ্ট হইয়া আসিবে; এবং সিল্কে সংলগ্ন হইবার পর আবার উহা হইতে বিকৃষ্ট হইবে।

(৩) ফ্লানেল দ্বারা 'আবলুস'-দণ্ড (ebonite rod) ঘর্ষণেও তড়িতের উদ্ভব হয়, এবং এই তড়িতাবিষ্ট আবলুস দণ্ড কর্ত্তৃকও দোলক আকৃষ্ট হয় এবং সংলগ্ন করিবার পর বিকৃষ্ট হয়। এই বিকৃষ্ট অবস্থায় ঐ ফ্লানেল যদি দোলকটির নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে ফ্লানেল কর্ত্তৃক উহা আকৃষ্ট হইবে।

অধিকন্তু তড়িতাবিষ্ট কাচ-দণ্ড স্পর্শ করিবার পর বিকৃষ্ট দোলক তড়িতাবিষ্ট আবলুস-দণ্ড কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয় এবং আবলুস-দণ্ড স্পর্শ করিবার পর বিকৃষ্ট দোলক তড়িতাবিষ্ট কাচ-দণ্ড কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কাচ-দণ্ডে ও আবলুস-দণ্ডে যে তড়িতের উদ্ভব হইয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। কাচ দণ্ড যাহাকে আকর্ষণ করে, আবলুস-দণ্ড তাহাকে বিকর্ষণ

* 'ঘর্ষণজ' শব্দটির উচ্চারণ তেমন শ্রুতিসুখকর নহে। 'ঘর্ষজ' শব্দটি ঐ স্থলে ব্যবহার করিলে উচ্চারণ সহজ হয়; কিন্তু ঘর্ষজ কথাটি অভিধানে পাওয়া যায় না। তবে আমাদের সুবিধার জন্য 'ঘর্ষজ' ব্যবহার করিলে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না।—লেখক।

করে এবং আবলুস-দণ্ড যাহাকে আকর্ষণ করে, কাচ-দণ্ড তাহাকে বিকর্ষণ করে।

আমরা ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে, কাচ দণ্ডের ও ফ্লানেলের তড়িতে এবং সিল্কের ও আবলুস দণ্ডের তড়িতে একটা সামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে।

অতএব ঘর্ষণে দুই প্রকার তড়িৎ উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে সিল্কের ঘর্ষণে কাচ-দণ্ডে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকে যোগ-তড়িৎ (positive electricity) এবং ফ্লানেল ঘর্ষণে আবলুস দণ্ডে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিয়োগ তড়িৎ (negative electricity) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

তড়িৎ-বাদ (Theories of Electricity) :—এই তড়িৎ উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিনের মতানুসারে প্রত্যেক বস্তুতে একটা অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য পদার্থ বিদ্যমান আছে। স্বাভাবিক অথবা অতড়িতাবস্থায় উহার একটা বিশেষ পরিমাণ আছে। কিন্তু ঘর্ষণের ফলে ঘর্ষণকারী ও ঘৃষ্ট এই দুই দ্রব্যের একটাতে ঐ পদার্থের হ্রাস ও অপরটাতে বৃদ্ধি হয়। যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহাকে যোগ-তড়িতাবিষ্ট এবং যাহার হ্রাস হয়, তাহাকে বিয়োগ তড়িতাবিষ্ট বলা হয়।

সাইমার (Symmer) বলেন, প্রত্যেক বস্তুতে একটা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ আছে; এই পদার্থ বিভিন্ন (যোগ ও বিয়োগ) পদার্থের সংযোগে নিষ্ক্রিয় অবস্থাপন্ন। কিন্তু ঘর্ষণ দ্বারা ঐ সূক্ষ্ম পদার্থ যোগ ও বিয়োগ পদার্থে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন এই যোগ ও বিয়োগ পদার্থের পরিমাণ কখনই সমান থাকে না। যাহাতে যোগ-পদার্থের আধিক্য হয়, তাহাকে যোগ-তড়িতাবিষ্ট, এবং যাহাতে বিয়োগ পদার্থের প্রাবল্য হয়, তাহাকে বিয়োগ-তড়িতাবিষ্ট বলা হয়। এই সব কেবল কল্পনা মাত্র। ইহাতে আর কোন যুক্তিই নাই। তবে এই অনুমান দ্বারাই আমাদের পরবর্ত্তী বিষয়গুলির কাজ চলিবে।

এতদ্ব্যতিরিক্ত, অধুনা এ সম্বন্ধে আরও অনেক ভাল-ভাল যুক্তিপূর্ণ ও সঙ্গত মত প্রচারিত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে।

দোলকের পরীক্ষায় দেখিয়াছি, দোলকটী কাচ দণ্ডে লাগিবার পর বিকৃষ্ট হয়; তাহার কারণ, কাচ দণ্ডের সংস্পর্শে আসিবামাত্র উহা কাচ-দণ্ড হইতে তড়িৎ গ্রহণ করিয়া যোগ-তড়িতাবিষ্ট হয়। তখন কাচ-দণ্ডের তড়িৎ ও দোলকের তড়িৎ একই জাতীয় এবং উহারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এই একই কারণে আবলুস দণ্ডের সংস্পর্শে বিয়োগ-তড়িতাবিষ্ট হইলে দোলক বিকৃষ্ট হয়। সুতরাং :—

(১) সমতড়িৎ বিশিষ্ট পদার্থসকল পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

(২) বিষম তড়িৎ বিশিষ্ট পদার্থগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

ঘৃষ্ট ও ঘর্ষণকারী এই উভয় দ্রব্যে যে বিভিন্ন প্রকারের তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক (Faraday) ফ্যারাডে দেখাইয়াছেন যে, উদ্ভূত ঐ দুই তড়িতের পরিমাণও সমান।

পরীক্ষা :—একটী আবলুস-দণ্ড ফ্লানেলের টোপর দিয়া ঘষিয়া ফ্লানেল সহ একটা দোলকের নিকট লইলে, কোনই তড়িৎ-লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কিন্তু ফ্লানেল সংলগ্ন সিল্কের সূতা ধরিয়া ফ্লানেলের টোপরটা দোলকের নিকট লইলে, উহা আকৃষ্ট হইবে, অথবা শুধু আবলুস দণ্ডটি দোলকের নিকট ধরিলেও তড়িতের লক্ষণ দেখা যাইবে। উদ্ভূত এই দুই বিভিন্ন তড়িতের পরিমাণ সমান বলিয়া আবলুস দণ্ড

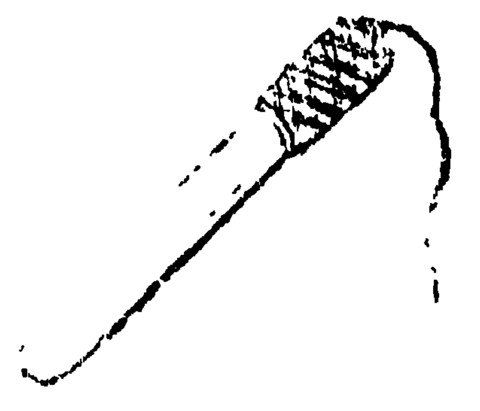

চিত্র ২

টোপর ঢাকা থাকিলে (অর্থাৎ দুই বিভিন্ন তড়িৎ একত্র থাকিলে) ফ্লানেলের যোগ তড়িৎ ও দণ্ডের বিয়োগ-তড়িৎ উভয়ে একত্রে জড়-ভাবাপন্ন হয়। এই নিমিত্তই এ অবস্থায় দোলকটী মোটেই আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট হয় না।

(২)

তড়িৎ-বিভাগ

(Distribution of Electricity)

তড়িৎ-জ্ঞাপক-যন্ত্র :—তড়িতের বিদ্যমানতা পরীক্ষা করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে স্বর্ণপাত-তড়িৎ-জ্ঞাপক যন্ত্রই (Gold leaf Electroscope) প্রকৃষ্ট।

এই যন্ত্রটী একটী মোটা কাচের বোতলের ন্যায়; তবে ইহার তলাটা ফাঁকা,—একখানি কাঠের চাক্তির উপর বসান হইয়াছে; আর উপরের মুখ দিয়া একটা পিত্তলের দণ্ড উহার ভিতরে অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করান হইয়াছে। এই দণ্ডটার উপরিভাগ একটা গোলকের মত করিয়া প্রস্তুত এবং ইহা যে তলটার মুখের সহিত paraffin wax (মোম) দ্বারা সম্বদ্ধ। এই দণ্ডটার নিম্ন-প্রান্তে দুইখানি সোণার পাত (৩ সেঃ মিঃ (centimeter) দীর্ঘ এবং ৫ সেঃ মিঃ প্রস্থ) লাগান হইয়াছে। এখন এই দুইখানি সোণার পাত অতড়িতাবস্থায় পরস্পর মিলিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা তড়িতাবিষ্ট হইলে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ যত অধিক হইবে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধানও তত বাড়িয়া যাইবে। কোন তড়িতাবিষ্ট দণ্ড বা পদার্থ এই যন্ত্রের নিকট ধরিলে, সোণার পাত

দুইটী পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। স্বর্ণপাতের এই ব্যবহার দ্বারা কোন দ্রব্যে তড়িতের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কাচ-দণ্ডারূঢ় একটী নিরেট ধাতুর গোলককে যোগ-তড়িতাবিষ্ট করিয়া সমাকৃতিবিশিষ্ট কাচ-দণ্ডারূঢ় আর একটী ছিদ্রবিশিষ্ট ফাঁপা অতড়িতাবিষ্ট ধাতব গোলকের সংস্পর্শে লও; এখন প্রথমটীকে একটা

পরীক্ষা—(১) উপরিউক্ত ফাঁপা গোলকটীর তড়িতাবিষ্টাবস্থায় সঙ্কর্পণে উহার ছিদ্রপথে একটা প্রুফ্‌প্লেন (proof plane) প্রবেশ করাইয়া উহার অভ্যন্তর স্পর্শ করাও। ধীরে ধীরে ঐ প্রুফ্‌প্লেন আনিয়া একটা তড়িৎ-জ্ঞাপক যন্ত্রের নিকট লও। দেখিবে তড়িতের কোন লক্ষণ নাই, —সোণার পাত অবিকৃত থাকে।

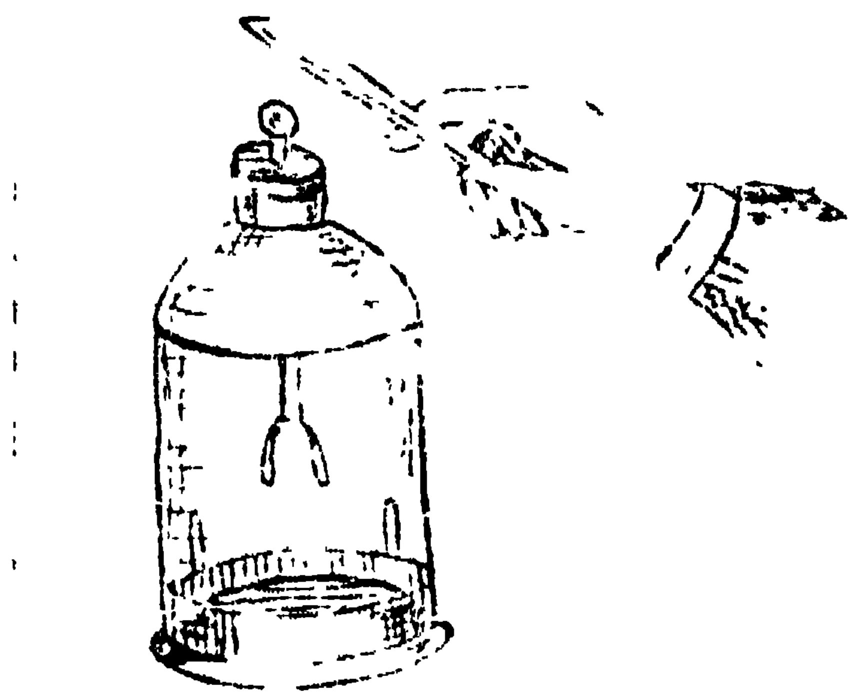

চিত্র ৩

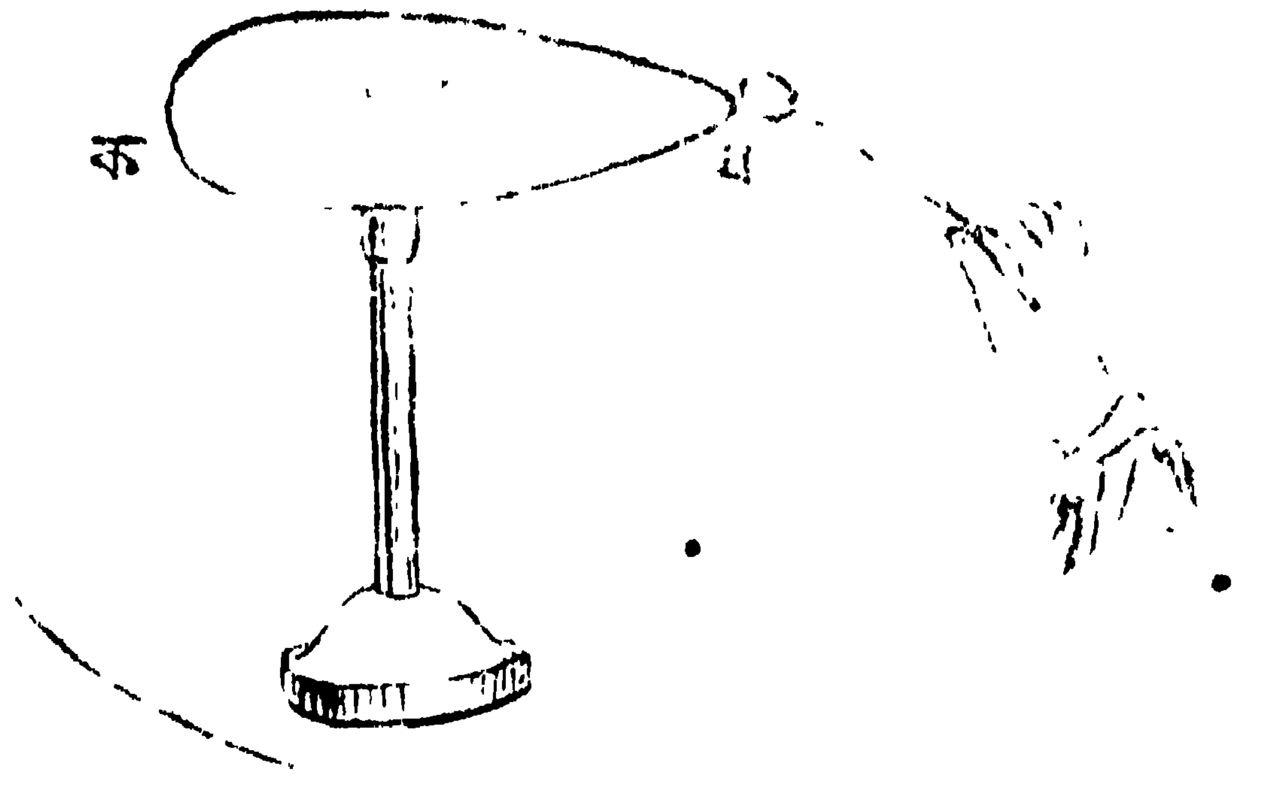

চিত্র ৫

স্বর্ণপাত তড়িৎ জ্ঞাপকের নিকট লইয়া গেলে, সোণার পাত দুইটী পরস্পর বিসৃষ্ট হইবে। পুনরায় দ্বিতীয় গোলকটীকেও আনিয়া উক্ত যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রেই সোণার পাত দুইটী পরস্পরকে সমপরিমাণে বিকর্ষণ করে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তড়িতাবিষ্ট নিরেট গোলক, অতড়িতাবিষ্ট ফাঁপা গোলকের সহিত আপন তড়িৎ সমভাবে বিভক্ত করিয়া লইয়াছে।

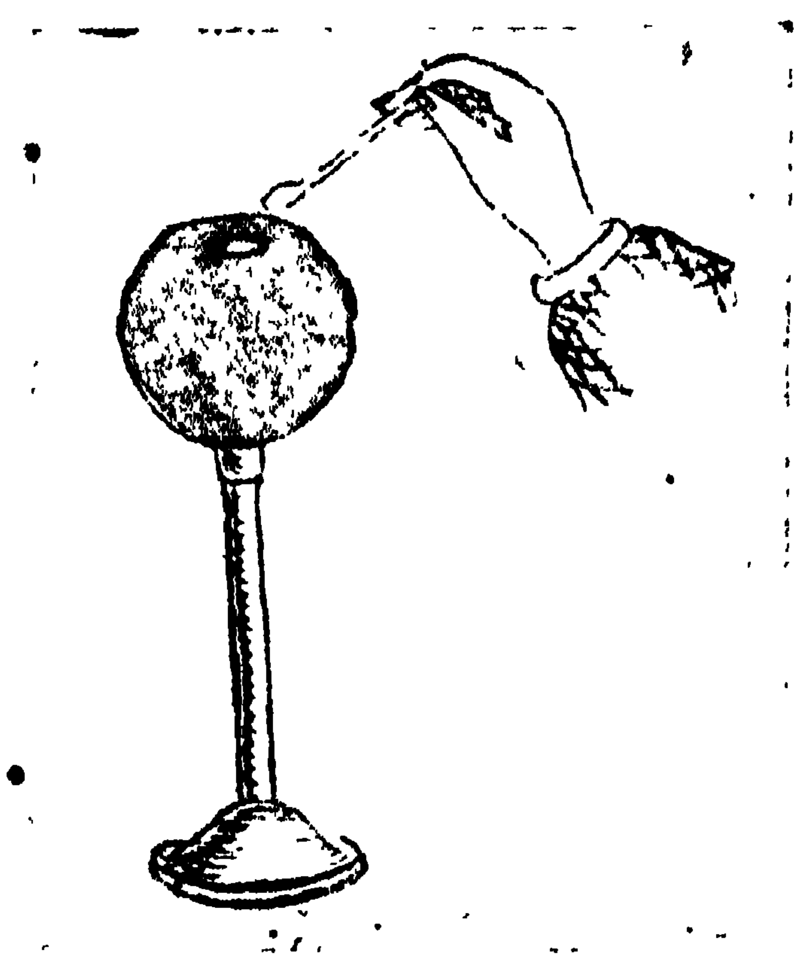

চিত্র ৪

তড়িতাবিষ্ট দ্রব্যের বহির্ভাগে তড়িতের অবস্থিতি:—পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, তড়িৎ তড়িতাবিষ্ট বস্তুর বাহিরের তলে বা বহির্ভাগে অবস্থান করে (Resides on the surface)।

প্রুফ্‌প্লেন—এই যন্ত্রটা আর কিছুই নহে কেবল একটী ছোট পিতলের চাকি, একটা কাচ-দণ্ডাগ্রে সন্নিবিষ্ট। ইহা দ্বারা একটী তড়িতাবিষ্ট দ্রব্য স্পর্শ করিলে, ঐ চাকি তড়িতাবিষ্ট দ্রব্য সংস্পর্শে কিঞ্চিৎ তড়িৎ গ্রহণ করিয়া তড়িতাক্রান্ত হয়। এখন ঐ প্রুফ্‌প্লেন তড়িৎ-জ্ঞাপকের নিকট লইলে, তড়িৎ জ্ঞাপকের স্বর্ণপাত্তি বিসৃষ্ট হয়।

অধিকন্তু, অতড়িতাবস্থায় ঐ ফাঁপা গোলকটীর ছিদ্রপথ দিয়া একটা তড়িতাবিষ্ট দণ্ড সাহায্যে ভিতরটা স্পর্শ করিয়া দণ্ড সরাইয়া লও। এখন প্রুফ্‌প্লেন (পরীক্ষা-চাকি) সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, গোলকটীর অভ্যন্তরে তড়িৎ লক্ষণ নাই। সমস্ত তড়িৎ গোলকের বহির্ভাগে আসিয়াছে।

এ সম্বন্ধে ফ্যারাডে (Faraday) আর একটা বেশ কৌতুক-জনক পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন: একটা কাচ দণ্ডের উপর পিতলের তারের একটী রিং বা বৃত্ত সংলগ্ন করা হইয়াছে এবং এই রিংটীতে একটী খুব সূক্ষ্ম তারের জাল দিয়া একটী টোপরের মত তৈয়ার করা হইয়াছে। টোপরের কোণে দুইটা সিল্কের সুতা বাঁধা আছে। এই সুতার এক প্রান্ত ধরিয়া টান দিলে, টোপরটী একবার বামদিকের এবং অপর প্রান্ত ধরিয়া টান দিলে ডান দিকে যায়। এই প্রক্রিয়ায় টোপরটীর ভিতর-পীঠ একবার বাহিরে ও বাহির-পীঠ একবার ভিতরে পরিণত করা হয়।

এখন টোপরটীকে তড়িতাবিষ্ট করিয়া প্রুফ্‌প্লেন সাহায্যে দেখা যায় যে, তড়িৎ টোপরটীর বহির্ভাগে অবস্থান করে, ভিতরে নহে। সুতা

টানিয়া টোপরের অন্তর বাহির করিলেও দেখা যায় যে, প্রত্যেক বারেই টোপরের বহির্ভাগে তড়িৎ-লক্ষণ দেখা যায়, ভিতরে নহে।

এ সম্বন্ধে ফ্যারাডে (Faraday) আর একটা অতি আশ্চর্য্য-জনক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ১২ ফিঃ দীর্ঘ ১২ ফিঃ প্রস্থ একটা কাঠের বাক্স নির্ম্মাণ করিয়া, টিনের পাত দিয়া বেশ করিয়া মুড়িয়া কাচ-দণ্ড সাহায্যে মৃত্তিকা হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন, এবং পরে ঐ বাক্স একটী তড়িতোৎপাদক কলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন। তৎপরে তিনি স্বয়ং ঐ বাক্সের ভিতর তড়িৎ-জ্ঞাপক যন্ত্রাদি লইয়া প্রবেশ করেন। তড়িতোৎপাদক কল সাহায্যে বাক্সটী প্রবল ভাবে তড়িতাক্রান্ত করা হইল। বাহির হইতে তড়িতের স্ফুলিঙ্গ ভীষণ ভাবে বাহির হইতে লাগিল। অনেকে ভাবিল, হায়! ফ্যারাডেকে (Faraday) আর বোধ

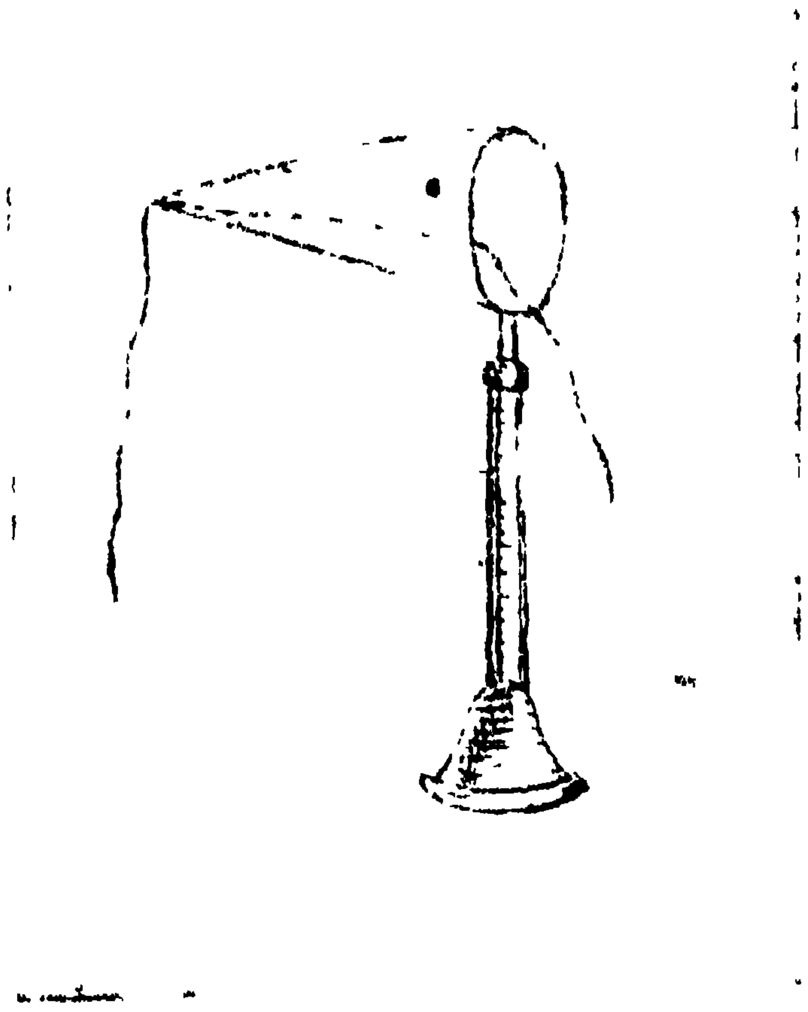

চিত্র ৬

হয় জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তিনি অক্ষত অবস্থায় বাক্সের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, বাক্সের অভ্যন্তরে তড়িতের কোন লক্ষণই পাওয়া গেল না। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন: "I went into the cube and lived in it, using lighted candles, electrometes and all other tests of electrical states. I could not find the least influence upon them or indication of anything particular given by them, though all the time the outside of the cube was powerfully charged and large sparks and brushes were darting off from every part of its outer surface."

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সমাকৃতি বিশিষ্ট দুইটী ধাতব গোলক পরস্পরের মধ্যে সমভাগে তড়িৎ ভাগ করিয়া লয়। কিন্তু ঐ গোলকের আকৃতি যদি সমান না হয়, তাহা হইলে কি হইবে? পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, উহাদের মধ্যে তড়িদ্বিভাগ উহাদিগের ব্যাসার্দ্ধের অনুপাতে হইবে। যদি প্রথম গোলকটীর আকৃতি দ্বিতীয়টীর দ্বিগুণ হয়, অর্থাৎ যদি প্রথমটীর ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ দ্বিতীয়টীর দ্বিগুণ হয়—তবে প্রথমটীতে ও দ্বিতীয়টীতে তড়িত বিভাগের অনুপাত ২।১ হইবে।

এখন কথা হইতেছে, তাড়িতের পরিমাণ কি তড়িতাবিষ্ট বস্তুর সর্ব্বত্রই সমান হইবে? তড়িতাবিষ্ট বস্তুর আকৃতির বৈষম্যের সহিত তড়িৎ বিভাগের কোন বৈষম্য আছে কি না? আমরা দেখিতে পাই, একটা গোলকের সর্ব্বত্রই তড়িতের পরিমাণ সমান। কিন্তু তড়িতাবিষ্ট

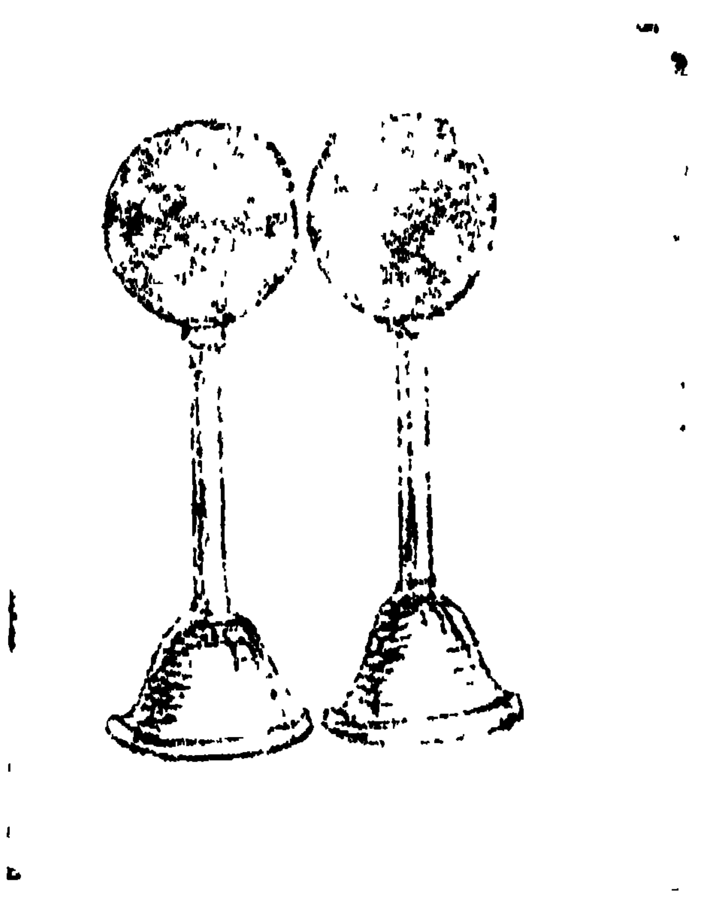

চিত্র ৭

বস্তু যদি গোলক না হইয়া ডিম্বাকৃতি হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, ডিম্বাকৃতি দ্রব্যের অপেক্ষাকৃত সরু বা চুঁচল অংশে তড়িতের পরিমাণ অধিক। একটী প্রুফ্‌প্লেন দ্বারা ক অংশ স্পর্শ করিয়া তড়িৎ-জ্ঞাপকের নিকট লও। স্বর্ণপাতের বিকর্ষণের পরিমাণ লক্ষ্য কর। পুনরায় প্রুফ্‌প্লেন দ্বারা খ অংশ স্পর্শ করিয়া তড়িৎ-জ্ঞাপকের নিকট লও। দেখিতে পাইবে, এবারে স্বর্ণপাতের বিকর্ষণের মাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

প্রুফ্‌প্লেন (পরীক্ষা চাক্তি) সাহায্যে ডিম্বাকৃতি দ্রব্যের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া তড়িৎ-জ্ঞাপক সাহায্যে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই, ডিম্বাকৃতি বস্তুটার যে প্রান্ত ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে, সেই দিক দিয়া তড়িতের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

অঘটন

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

১

সে দিন শচী সবে খেয়ে উঠ্‌তে-না উঠ্‌তেই প্রতিবেশী হীরু-দা এসে মহা পেড়াপিড়ী করে তাকে থিয়েটারে টেনে নিয়ে গেল!

শচী প্রথমটা যেতে চায়নি; তার আপত্তি ছিল স্ত্রীর জন্যে। 'কচি ছেলে নিয়ে বিদ্যুৎ একা থাকতে পার্বে না; ঝিয়ের দেশ থেকে কে আপনার লোক এসেছে,—সে গেছে তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে; কখন আস্‌বে তার ঠিক নেই; চাকরটাও আজ ক'দিন হল জ্বর হ'য়ে বাড়ী গেছে: সুতরাং তার যাওয়া অসম্ভব।'

তখন হীরু-দা ধরে বসলেন—"তোমার স্ত্রীকেও নিয়ে চল।"

এই রাত্রে শীতে, হিমে কচি ছেলে নিয়ে বাইরে বেরুলে, পাছে ঠাণ্ডা লেগে খোকার কোন অসুখ-বিসুখ হয়, এই ভয়ে বিদ্যুৎ কিছুতেই যেতে চাইলে না, তবে শচীকে তখনই যাবার হুকুম দিলে। শচী কিন্তু যেতে ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগল। "তাই ত'—একলা থাক্‌তে পার্ব্বে কি!—বাড়ীতে কেউ রইল না—"

বিদ্যুৎ হাস্‌তে-হাসতে খোকাকে দেখিয়ে বল্‌লে, "কেন থাক্‌বে না? এই ত একজন মস্ত পুরুষমানুষ বাড়ীতে রইল! তুমি যাও, কিন্তু বেশী রাত কোর না; কি জানি, যদি ঝি মাগী না আসে!"

অগত্যা শচীকে শেষটা সকাল-সকাল ফিরে আস্‌বার করারেই হীরু-দার সঙ্গে যেতে হল।

ওরা যাবার একটু পরেই বাড়ীর সেই 'মস্ত পুরুষ-মানুষটি' মায়ের কোলের ভিতর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ খোকার পশমের মোজার বাকিটুকু বুনে শেষ করে ফেল্‌লে। তার পর "বিন্দুর ছেলে" বইখানা টেনে নিয়ে খোকার পাশে শুয়ে পড়ল।

২

শচীর শোবার ঘরের এক কোণে মার্ব্বেল পাথরের টেবিলের ওপর বড় ফ্রেঞ্চ ক্লকটায় 'টুং টাং' করে যখন রাত্রি সাড়ে-বারটা বাজ্‌তে সুরু হল, শীতের কুয়াসা-ঢাকা, কন্‌কনে ঠাণ্ডা রাত তখন সমস্ত সহরটাকে প্রায় নিস্থতি করে ফেলেছে! গাঢ় অন্ধকারে গলির মোড়ের গ্যাসের আলোগুলো পর্য্যন্ত ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে। ঠিক সেই সময় নিঃশব্দে নীচের তলার জানালার গরাদে ভেঙ্গে একটা দুর্দ্ধর্ষ জোয়ান লোক চোরের মতন আস্তে আস্তে পা টিপে বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌ল।

লোকটা আর কেউ নয়, সেই নামজাদা গুণ্ডা—খাঁ আব্বাস্। কতকগুলো বড়-বড় ডাকাতির জন্যে পুলিশ তার পেছনে লেগে আছে, কিন্তু কিছুতেই তাকে ধর্‌তে পাচ্ছে না। এই জন্যে আব্বাসের আর একটা নাম রটে গেছে 'খলিফা'! তবে পুলিশের কড়াকড়িতে খলিফার দলটা আজকাল একেবারে ছোড়্‌ভঙ্গ হয়ে গেছে।

এদের বাড়ীখানার উপর আব্বাসের অনেকদিন থেকেই নজর ছিল। বাবু বড়লোক, জমীদারের জামাই; বাড়ীতে লোকজনও কম; এখানে একদিন সুবিধে বুঝে ঢুক্‌তে পার্‌লে যে বেশ মোটা রকম কিছু পাওয়া যাবে, এ খবরটা সে আগেই জেনে রেখেছিল; সুতরাং আজকের এমন নিরাপদ সুযোগটা সে কিছুতেই ছাড়তে পাল্লে না।

বরাবর বাড়ীর ভেতর ঢুকে, ঘটি-বাটি-থালা-বাসন—যা-কিছু নীচের তলায় ছিল, সমস্ত সংগ্রহ করে গায়ের কাপড়খানিতে বেঁধে সিঁড়ির নীচের রেখে আব্বাস নির্ভয়ে উপরে উঠে গেল। যে ঘরটায় শচীর লোহার সিন্দুক, বিদ্যুতের হীরে জহরত, শাল-দোশালা, জরী-বারাণসী, রূপোর বাসন ইত্যাদি—খলিফা আব্বাসকে সে ঘর খুঁজে বার করতে বিশেষ কষ্ট পেতে হল না। একটু জোরে

গোটা-কতক মোচড় দিতেই, দরজায় আঁটা লোহার তালা-চাবীটা আব্বাসের বজ্র-মুঠোর ভেতর এলিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে, আব্বাস স্বচ্ছন্দে ঘরের ইলেক্‌ট্রিক্ আলোটা জ্বেলে দিলে; জানে বাড়ীতে একলা একটা মেয়ে আছে বই ত নয়,—সে আর তার মতন একটা দুর্দ্দান্ত অসুরের কি কর্ব্বে? ঠিক আলোর নীচেই দেয়ালের ধারে একটা কাঠের সিন্দুক বসান ছিল, আব্বাসের আগেই সেইটের ওপর নজর পড়্‌ল। কোমরপেটি থেকে একটি যন্ত্র বার করে সিন্দুকের ডালাটার নীচেয় দু'একটা চেপে চাড়া দিতেই, ডালাটা ক্রমশঃ ছেড়ে গেল। আস্তে-আস্তে সেটিকে তুলে ধর্‌তেই, আব্বাসের চোখের সাম্‌নে এক সিন্দুক রূপোর বাসন ইলেক্‌ট্রিক আলোয় চক্‌চক্ করে উঠলো!

একটা আরামের নিঃশ্বেস ফেলে আব্বাস কাঁধের গামছাখানা ঘরের মেজেয় বিছিয়ে ফেল্লে। তার পর একটি-একটি করে রূপোর বাসন সিন্দুকের ভেতর থেকে বা'র করে তার ওপর জড় করতে লাগ্‌ল। মোটা-মোটা, ভারি-ভারি চাঁদির আস্‌বাব হাতে ঠেক্‌তেই আব্বাসের প্রাণে যা' স্ফূর্ত্তি হ'তে লাগ্‌ল, সেটা তার সেই সময়ের প্রফুল্ল চোখ দুটো দেখলে সবাই বুঝতে পারতো।

৩

সিন্দুক প্রায় সাবাড় হ'য়ে এসেচে; আব্বাস তার ডোরাকাটা চৌখুপী গামছাখানার দিকে চেয়ে দেখছে—আর তাতে ধরবে কি না—এমন সময়ে সজোরে দুই দরজা হাট ক'রে খুলে, একটা সতর-আঠার বছরের মেয়ে পাগলের মত ছুটে সেই ঘরে ঢুকলো।

আচম্‌কা মেয়েটা ঢুক্‌তেই আব্বাসের মতন খলিফার হাত থেকেও সিন্দুকের ডালাটা ধড়াস্ করে পড়ে গেল। ফস্ করে কোমরের পাশ থেকে একখানা প্রকাণ্ড ছোরা বার করে আব্বাস্ সোজা হয়ে দাঁড়াল। মেয়েটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে দেখে, ছোরাখানা তুলে, খুব চোখ রাঙিয়ে মেয়েটাকে শাসিয়ে দিলে যে, আর এক পা এগুলেই এই ছোরা তার বুকে বস্‌বে!

মেয়েটা ভয় পাওয়া চুলোয় যাক্—বরং হাঁফাতে-হাঁফাতে বল্‌তে লাগল "ওগো! তোমরা শিগ্‌গীর এস একবার—আমার খোকা কেন অমন কর্চ্ছে?" আব্বাস্ এবার ছোরাখানা উঁচিয়ে মেয়েটার দিকে হুম্‌কে তেড়ে এল—ধমক্ দিয়ে বল্লে, "খবরদার্—চেঁচালেই খুন কর্ব্ব!"

মেয়েটার তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই! আব্বাসকে এবার দু'এক পা পেছু হঠে যেতে হ'ল! একটু আশ্চর্য্য হয়ে মেয়েটার দিকে ভাল করে চাইতেই দেখ্‌লে, তার দু'টো বড়-বড় জলভরা সকাতর চোখের করুণ মিনতি-পূর্ণ দৃষ্টি আব্বাসের মুখের ওপর এসে পড়েছে! ইলেক্‌ট্রিক লাইটের সমস্ত আলোটা তখন মেয়েটার মুখময় ছড়ান। আব্বাস তেমন সুন্দর মুখ জীবনে কখনও দেখেনি! তার চোখের পলক পড়তে না-পড়তে মেয়েটা তার সেই লম্বা-চওড়া, কাদা-মাখা পা'দুখানা একেবারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলতে লাগল, "ওগো! তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার ছেলে বাঁচাও!"

খলিফা খাঁ আব্বাস অবাক্!—প্রবল পুত্র-স্নেহের অভেদ্য কবচে ঢাকা এই মেয়েটার কাছে দুর্দ্ধর্ষ আব্বাস্ খাঁর সমস্ত ভীতি-প্রদর্শন এত সহজে ব্যর্থ হয়ে গেল দেখে, জীবনে আজ এই প্রথম যেন নিজেকে তার একান্ত অপদার্থ বলে মনে হ'ল!—ছেলের প্রাণের আতঙ্কে বিহ্বলা জননীর কাতর চোখ-মুখের সেই করুণ কাকুতি সহসা আজ একটা অনেক দিনের নিদারুণ স্মৃতি নিয়ে এমন জোরে, এমন স্পষ্ট হয়ে আব্বাসের বুকের ভেতর ঠেলে উঠ্‌লো যে, সেই পাথরের মতন শক্ত বুকের মাঝখানটা আজ একেবারে ফেটে চৌচির হয়ে গেল!

সে আজ বিশ বছর আগের কথা—যখন তার দরাজ বুকখানা একদম তাজা, কাঁচা ছিল; তখন আব্বাসের মত পরোপকারী, জোয়ান ছোক্‌রা কোন পাড়ায় ছিল না। তার পর হঠাৎ এক দিন উপর্য্যুপরি ক'টা অসহ্য আঘাতে সেই ছাতি একেবারে পিষে, থেতলে, গুঁড়ো হয়ে গে'ছল! সে দিন ভীষণ প্লেগের মুখে—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে—তার জানের জান ছেলেমেয়ে দুটিকে, তার দিল-কলিজার বিবিকে, একটির পর একটি, একলা গিয়ে মাটির নীচে পুঁতে আস্‌তে হয়েছিল! সে দিন মানুষের নিমকহারামী—আল্লার অবিচার—এই সব ভাব্‌তে-ভাব্‌তে তার নিজের-হাতে-কাটা সেই পেয়ারের কবর-কটিতে মাটি চাপা দিতে-দিতে সেই যে তার বুকের ওপর মাটি চাপা পড়েছিল, সেই মাটি তার জীবনের সমস্ত রসকস টেনে, শুষে নিয়ে, তার

সমস্ত প্রাণটাকে পাথরের মত কঠিন করে, তাকে মরিয়া করে ছেড়ে দিয়েছিল।

আরও কত পুরোনো কথা—সুখে-দুঃখে-জড়ান কত বিস্মৃত ঘটনা—বায়োস্কোপের ছবির মত আব্বাসের চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে গিয়ে, তাকে আত্মহারা করে তুল্‌তে লাগল! ব্যাকুল বিদ্যুৎ তখন ব্যস্ত হয়ে আব্বাসের হাত ধরে খোকার ঘরে টেনে নিয়ে চল্‌ল!—

স্প্রীংয়ের খাটের ওপর বড় বিছানা। তারই মাঝখানে একটি ছোটখাট রংচংএ বিছানায় কুঁদফুলের কুঁড়ির মত একটি ধব্‌ধবে কচি ছেলে কি যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণায় হাত পা ছুঁড়ছে! তার দুধে মুখখানি একেবারে রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠেছে—চোখ দু'টি উল্টে রয়েছে—পেট ফুলে ফুলে ঘন-ঘন সজোরে নিঃশ্বাস পড়ছে!

খোকার অবস্থা দেখে ঝরঝর করে বিদ্যুতের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল!—"ওগো! কি হবে? দেখ না, বাছা আমার এখনও যে কেমনতর কচ্ছে! তুমি শিগ্‌গির যাও, একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস—উনি থিয়েটারে আছেন—ওঁকে আগে খবর দাও—আমাদের ঝীয়ের দেশের লোকের বাসা চেন?"

আব্বাস্ একটা অস্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে ধমক্ দিয়ে বিদ্যুতের এই অসম্বন্ধ প্রলাপ বন্ধ করে, তাকে চট্ করে এক লোটা জল আন্‌তে হুকুম করলে;—বিদ্যুৎ তখনি বিদ্যুতের মত ছুটে চলে গেল।

আব্বাস্ একদৃষ্টে ছেলেটির দিকে চেয়ে আছে;—এই ননীর দলার মত তুল্‌তুলে এতটুকু ছেলেটির এই বুক-ফাটা যাতনা দেখে, তার সমস্ত কঠোর প্রাণটা আজ সমবেদনায় টন্‌টন্ করে উঠ্‌তে লাগল;—"ছুঁড়ীর জল আন্‌তে এত দেরী হচ্ছে কেন?"—ব্যস্ত হয়ে আব্বাস্ জলের সন্ধানে ঘরের চারদিকে চাইতেই, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি খাটের নীচে জলচৌকীর ওপর—মুখে-গেলাস-ঢাকা একটি কুঁজোর ওপর গিয়ে পড়ল! ধাঁ করে তখনি কুঁজোটা শোলার মত বাঁ হাতে তুলে নিয়ে আব্বাস্ খোকার চোখে-মুখে ক্রমাগত সেই ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগল!

খানিক পরে সেই শীতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে বিদ্যুৎ যখন শুক্‌নো মুখে ফিরে এসে হতাশ ভাবে বললে, "ওগো! একটাও যে ঘটি-বাটি পাচ্ছিনি! কি হবে? কিসে করে জল আনবো?"—আব্বাস্ সে কথা শুনে, অমন বিপদের মাঝখানেও মনে-মনে না হেসে থাক্‌তে পারলে না! এদের ঘটি-বাটিগুলো যে সমস্ত আগেই সে চাদরে বেঁধে সিঁড়ির নীচে রেখেঁ এসেছে!

বিদ্যুৎকে অভয় দিয়ে খোকার মাথায় পাখার বাতাস করতে বলে', আব্বাস নিজের পরণের লুঙ্গীর একটা কোণ ছিঁড়ে ফেলে, খোকার কপালে একটা জলপটি বসিয়ে দিলে; আর ক্রমাগত একটু-একটু করে' চোখে-মুখে জলের ছাট্ দিতে লাগল!

মিনিট-পাঁচ সাত পরেই আস্তে-আস্তে খোকার নিঃশ্বেসটা বেশ সরল হয়ে এল,—হাত-পায়ের খিঁচুনি ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে গেল, চখের তারা নেমে এসে দৃষ্টি বেশ স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াল। তারপর একেবাঁরে সাম্‌লে উঠে পুট্ পুট্ করে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। সামনেই মাকে দেখতে পেয়ে, এক গাল হেসে, ছোট-ছোট, মোমে-গড়া নিটোল হাত দু'খানি মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

বিদ্যুৎ কখন নিজের অজ্ঞাতসারে হাতের পাখা নাড়া বন্ধ করে, একেবারে অসীম আগ্রহে সন্নত হয়ে, একদৃষ্টে খোকার মুখের এই সুন্দর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছিল। চাঁদমুখের টোল-খাওয়া দু'টি টোপা গালে হাসির সঙ্গে-সঙ্গে যখন ডালিম-দানার মত সেই টুক্‌টুকে তাজা রংটুকু ফিরে এল,—বিদ্যুৎ একেবারে দু'হাত বাড়িয়ে, খোকাকে তার ব্যগ্র ব্যাকুল বুকের ওপর টেনে তুলে নিলে! কত ভয়, কত দুর্ভাবনার দুর্ব্বহ পাহাড় নিমেষে যেন তার বুকের ওপর থেকে গলে জল হয়ে নেমে গেল! আশঙ্কায়, উদ্বেগে বিবর্ণ জননী যখন হারানিধি ফিরে পেয়ে, সেই বুকজুড়োন ধনের টুক্‌টুকে মুখখানিতে বার-বার চুমু দিতে লাগলেন,—তরুণী মায়ের মুখময় যেন দুধে-আলতার রাঙা ছোপ ধরে যেতে লাগল! পেটুক খোকন সুযোগ বুঝে তখন মায়ের 'মেনু' খেতে সুরু করে দিলে।

মাতা ও পুত্রের এই নিবিড় স্নেহ-মিলনের অপূর্ব্ব দৃশ্যে দেখতে-দেখতে সেই অতি দুর্দ্দান্ত কঠোর আব্বাসের পাথরপানা ছাতিখানা আজ যেন গলে গেল—গলে গেল! বহুদিনের মাদক-দ্রব্য-সেবনে বিবর্ণ শুষ্ক চোখ দুটো বিশ বছর পরে আজ আবার জলে ভরে উঠে টস্-টস্ করতে লাগল!

৫

বিদ্যুৎ যখন সুস্থির হয়ে তার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য এই নিশীথ আগন্তুকের দিকে ফিরে চাইলে, আব্বাসের বাইরের চেহারা তখনই বেশি সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট হয়ে তার চোখের সামনে পড়ল! বিশ বছরের অসহ্য অত্যাচারে তার সেই বাইরের মূর্ত্তি এমনই ভয়ানক হয়ে উঠেছিল যে, বেচারী বিদ্যুৎ দেখবামাত্র তার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত ঘন-ঘন শিউরে উঠল!

অন্য কোনও দিন, অন্য কোনও সময় বাড়ীর ভিতর হঠাৎ দোতলার ঘরের মাঝখানে এই ভীষণ মূর্ত্তিটিকে দেখলে বিদ্যুৎ নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে পড়তো; কিন্তু আজ সে জ্ঞান হারালে না। আজ যে এই যমদূতের মত মানুষটাই তার প্রাণের 'দুলাল'কে সদ্য যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছে!

আব্বাসের গলায় কালো-কারে বাঁধা একটা রূপোর তিন-কোণা পদক ছিল। ইলেক্‌ট্রিক লাইটে সেটা চক্‌চক্ করছিল। খোকা তার মায়ের কোল থেকে মিট-মিট করে এই নতুন লোকটির গলার এই অপরূপ সামগ্রীটি এতক্ষণ একদৃষ্টে দেখ্‌ছিল। হঠাৎ সেটা ধরবার লোভ আর সামলাতে না পেরে, তিনি মায়ের কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিদ্যুৎ খোকার এই আকস্মিক লম্ফ-প্রদানের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না—সুতরাং খোকাবাবু লাফ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মায়ের কোল থেকে খসে পড়লেন আর একটু হলেই পাথরের মেঝের ওপর পড়ে মাথাটি গুঁড়ো হয়ে যেত; কিন্তু তার আগেই আব্বাসের মজবুত লম্বা হাত দু'টো চক্ষের নিমেষে খোকাকে লুফে নিলে!

এই একমুঠো ফুলের মত নরম তুলতুলে ছেলেটিকে বুকে করে আব্বাসের অনেক দিনের দগ্ধ প্রাণটা আজ যেন কি অগাধ আরামে—জুড়িয়ে গেল! শতবর্ষের খরতপ্ত বালুকাময় মরুভূমি নিমেষে যেন কার যাদু-মন্ত্রে স্নিগ্ধ শিশিরসিক্ত শ্যাম প্রান্তরে পরিণত হয়ে গেল!

একটানে নিজের গলা থেকে পীরের পদকখানা খুলে নিয়ে আব্বাস হাসতে-হাসতে খোকার গলায় পরিয়ে দিলে! বারবার নাচিয়ে, দুলিয়ে, কাঁধে পিঠে চড়িয়ে আব্বাসের সে কি প্রচণ্ড আদর! বিশ বছর পরে তার বুকের পাথর ঠেলে বাৎসল্যের স্নেহ-নির্ঝর আজ যে আবার পরিপূর্ণ বেগে উথলে উঠেছে! দুষ্টু ছেলেটাও এই দুরন্ত আদরে উৎফুল্ল হয়ে, হেসে একেবারে লুটোপাটি খেয়ে তার সঙ্গে খেলা করতে লাগল!—আব্বাসের মুখে হাসি, চোখে জল! কেবলই ঘুরে ফিরে তার মনে পড়তে লাগল, এমনই আর একটা কচি ছেলের মুখ!—আব্বাস্ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো, আবদুল! আবদুল! এ যে ঠিক আমার সেই আবদুল! কেয়া তাজ্জব! কচি ছেলেগুলো কি জগতে সব একজাত!

৬

নগদ টাকা-কড়ি, সোনা-রূপো, হীরে, জহরত – যা-কিছু তাদের পুঁজিপাটা ছিল, একখানি বড় ট্রে করে সর্ব্বস্ব সাজিয়ে এনে বিদ্যুৎ যখন আব্বাসের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল—আব্বাস্ সে ট্রেখানা দেখেই—খুনী যেমন সহসা অর্দ্ধরাত্রে হতব্যক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি দেখলে চম্‌কে উঠে—তেমনি করে চম্‌কে উঠে, খোকাকে খাটের ওপর বসিয়ে দিয়ে, তীরের মত ছুটে পালিয়ে গেল! যেতে-যেতে যেন জড়িয়ে-জড়িয়ে বলে গেল, "না—না, আর আমি ওসব ছোঁব না---!"

বিদ্যুৎ বিস্ময়ে নির্ব্বাক!—মাকে অন্যমনস্ক দেখে খোকা যখন আব্বাসের গলার সেই "ধুক্‌ধুকি"খানা মুখে পুরে তার আস্বাদ গ্রহণের চেষ্টায় উদ্যত, ঠিক সেই সময় থিয়েটার থেকে ফিরে এসে হাসতে-হাসতে শচী জিজ্ঞাসা করলে, "সমস্ত রাত সদর দরজা খুলে রেখে আমার জন্য জেগে বসে আছ বিদ্যুৎ? তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি আর হবে না? যদি একটা চোর আস্‌তো, তা হলে—?" *

* আখ্যানভাগ ইংরেজী হইতে গৃহীত।

ছদ্মবেশ

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম-এ]

২। নারীর পুরুষবেশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইবার শেক্‌স্‌পীয়ারের সমসাময়িক ও ঈষৎ পরবর্ত্তী নাটককারদিগের প্রসঙ্গ তুলিব।

Beaumont and Fletcher : Philaster.

এই শ্রেণীর মধ্যে Beaumont and Fletcher নামক নাটককার-যুগলের রচিত Philaster নাটকের ছদ্মবেশ-ব্যাপার সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। শেক্‌স্‌পীয়ারের Twelfth Night তথা Cymbelineএর সহিত ইহার স্থানে স্থানে সাদৃশ্য আছে। অতএব এইখানির কথাই প্রথমে বলিব। ইহা Twelfth Nightএর পরে রচিত, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা Cymbelineএর পূর্ব্বে কি পরে রচিত, তদ্‌বিষয়ে মতভেদ আছে। সুতরাং কে কাহার কাছে ঋণী, তাহার মীমাংসা হয় না।

এক্ষণে নাটকখানির প্রয়োজনীয় অংশের সংক্ষিপ্তসার দিব। ইউফ্রেসিয়া-নাম্নী কুমারী প্রথমে 'শ্রবণাৎ', পরে 'দর্শনাৎ' নায়ক ফিলাষ্টারের প্রতি বদ্ধভাবা হইয়া তাঁহার সান্নিধ্য-সুখ-লালসায় (Bellario) বেলারিয়ো নাম লইয়া বালক-বেশে, তাঁহার দয়ার উদ্রেক করিয়া তাঁহার চাকুরি লইলেন। নায়ক বালক-ভৃত্যের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রণয়-দৌত্যের সুবিধার জন্য নিজ-প্রণয়িনী রাজকন্যা (Arethusa) এরিথিউজার নিকট প্রীতি-উপহার দিলেন। বালক-ভৃত্য প্রিয়তম প্রভুর নিকট থাকিবার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করিলে প্রভু তাহাকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাহার এই নব-নিয়োগ প্রয়োজনীয়; এবং কার্য্যোদ্ধার হইলে তিনি আবার তাহাকে নিজের নিকটে রাখিবেন, এরূপ আশ্বাসও দিলেন। বালক-ভৃত্য নিতান্ত অনিচ্ছায় প্রণয়াস্পদের ব্যবস্থায় সম্মত হইল এবং গলদশ্রু-লোচনে বিদায় লইল (২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)। সে প্রণয়াস্পদের প্রণয়িনীর নিকট দশমুখে প্রণয়াস্পদের গুণগান করিতে এবং তাঁহার তরফে ওকালতী করিতে লাগিল (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)। বরং শেক্‌স্‌পীয়ারের ভায়োলা নিজের মনোবেদনা স্বগতোক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু ইউফ্রেসিয়া তাহাও করেন নাই। ভায়োলা কল্পিত ভগিনীর নাম দিয়া নিজের গোপন প্রণয়-সম্বন্ধে যে সুন্দর কথা কয়টি * বলিয়াছিলেন (Twelfth Nightএ ঐ উক্তিটিই সর্ব্বোত্তম) বোধ হয় তাহা ভায়োলার অপেক্ষাও ইউফ্রেসিয়ার আচরণের সহিত অধিকতর সুসঙ্গত।

শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের ন্যায় এক্ষেত্রে ইউফ্রেসিয়ার পুরুষবেশে প্রতারিত হইয়া তাঁহার প্রিয়তমের প্রণয়পাত্রী (অথবা অন্য কোন নারী) তাঁহার প্রেমে পড়িল না বটে, কিন্তু তদপেক্ষাও ঘোরতর অনর্থ ঘটিল। বালক-ভৃত্যের সহিত রাজকন্যার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া নষ্টলোকে রাজকন্যার নামে কুৎসিত কলঙ্ককাহিনী প্রচার করিল। নায়ক প্রথমে সে কথায় অবিশ্বাস করিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহারও মন টলিল। তিনি ভোগা দিয়া, এবং তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া, খুন করিব বলিয়া ভয় দেখাইয়া, বালক-ভৃত্যকে রাজকন্যার সহিত প্রসক্তির কথা স্বীকার করাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে রাজকন্যার উপর অবিচলিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিল, এবং তিনি তাহাকে জননীর মত স্নেহ করেন —এই কথাই বলিল; এবং নায়ক খুন করিব বলিয়া ভয় দেখাইলে, সানন্দে তাঁহার হস্তে মরিতে চাহিল। নায়ক যখন বিজাতীয় ক্রোধে ও ঈর্ষ্যায় তাহার মুখদর্শন করিবেন না বলিলেন, তখন সে দেশত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া শুধু এই

---

* She never told her love,
But let concealment, like a worm i'the bud,
Feed on her damask cheek.

Twelfth Night, II. iv.

বলিয়া বিদায় লইল, 'কে আপনাকে ভীষণ প্রবঞ্চনা করিয়াছে ; পরে যখন সত্য কথা জানিতে পারিবেন, তখন বুঝিবেন যে, আমি বিশ্বাসঘাতক নহি, আপনার একান্ত অনুরক্ত। আর আমার মৃত্যু-সংবাদ পাইলে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিবেন, তাহা হইলেই আমি শান্তি পাইব, (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)।

উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত নায়ক যখন রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন রাজকন্যা বালক-ভৃত্যের জন্য স্নেহ ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে নায়ক প্রণয়িনীর চরিত্রে আরও সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং (ভর্ত্তৃহরির ন্যায় নারীনিন্দা করিয়া) ভগ্নহৃদয়ে বনে গেলেন। এ দিকে বালক-ভৃত্য দেশত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া রাজকন্যার নিকট বিদায় লইতে আসিল। রাজকন্যা তাহাকেই কলঙ্করটনার মূল মনে করিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। সে দুঃখিত-চিত্তে উক্ত বনে আশ্রয় লইল (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)। আবার রাজকন্যাও মৃগয়ার্থ সেই বনে প্রবেশ করিয়া সঙ্গিহারা হইলেন। উভয়েই ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে বালক-ভৃত্যকে দেখিলেন, এবং সে ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া তাঁহাদিগের দয়া প্রার্থনা করিলে শুধু তিরস্কার লাভ করিল (৪র্থ অঙ্ক, ১ম ও ৩য় দৃশ্য)। আবার নায়ক রাজকন্যা ও বালক-ভৃত্যকে একত্র দেখিয়া অসহ্য বেদনায় কাতর হইয়া উভয়কে বলিলেন, 'তোমরা আমাকে মারিয়া ফেলিয়া নিষ্কণ্টক হও', এবং নিজের অসি তাহাদিগকে দিলেন। তাহারা অসম্মত হইলে, নায়ক নায়িকাকে এবং পরে বালক-ভৃত্যকে অসিপ্রহার করিলেন (৪র্থ অঙ্ক, ৩য় ও ৪র্থ দৃশ্য)। বালক-ভৃত্য হাসিমুখে সে আঘাত সহ্য করিল, সোরগোল শুনিয়া নায়ককে গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিল এবং 'আমিই রাজকন্যাকে আঘাত করিয়াছি' বলিয়া ধরা দিল। নায়ক তাহার মহত্ত্ব দেখিয়া গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া ধরা দিলেন এবং বালক-ভৃত্যকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা ও আলিঙ্গন করিলেন। উভয়েই 'আমি মারিয়াছি', 'আমি মারিয়াছি' বলিয়া একরার করিলেন। সুতরাং রাজা উভয়কেই কারাগারে লইয়া যাইতে বলিলেন। রাজকন্যা তাহাদিগের শাস্তির ভার লইলেন (৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)। তাহার পর রাজা নায়কের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। কারাগার-দৃশ্যে নায়ক, বালক-ভৃত্য, ও রাজকন্যা তিনজনই হৃদয়ের কোমলতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। (৫ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) পরবর্ত্তী দৃশ্যে বালক-ভৃত্য রাজার নিকট নায়ক ও রাজকন্যাকে বরবধূ বলিয়া হাজির করিল ; রাজা ক্রোধে কন্যার পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ডে উদ্‌যোগী হইলেন। যাহা হউক, এই সন্ধিক্ষণে প্রজা-বিদ্রোহ ঘটাতে রাজা শেষে রাজনীতিক কারণে নায়কের প্রাণদণ্ড মকুব করিতে এবং তাঁহাকে জামাতৃপদে বরণ করিতে বাধ্য হইলেন (৫ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)। কিন্তু এই সময়ে আবার রাজকন্যার সেই পূর্ব্ব কুৎসার কথা উঠাতে, রাজা বালক-ভৃত্যকে অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য শারীরিক যন্ত্রণা দিবার (torture) আদেশ দিলেন। বালক-ভৃত্য (সীতারামের নির্য্যাতনে জয়ন্তীর দশা ঘটার আশঙ্কায়) অগত্যা আত্মপ্রকাশ করিল, তবে সকলের সমক্ষে নহে, রাজসভায় উপস্থিত নিজের পিতাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া। পিতা আবার সকলের নিকট বালক-ভৃত্য ছদ্মবেশিনী নারী—একথা প্রকাশ করিলেন। (নাটককার সুকৌশলে বরাবর ছদ্মবেশ-রহস্য, শুধু পাত্রপাত্রীদিগের নিকটে কেন, পাঠকদিগের নিকটেও গুপ্ত রাখিয়া শেষ-দৃশ্যে রহস্যভেদ করিয়াছেন। আমরা বক্তব্যের সুবিধার জন্য গোড়া হইতেই কথাটা ফাঁস করিয়া দিয়াছি।) নায়ক-কর্তৃক ছদ্মবেশ-গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ইউফ্রেসিয়া তাঁহার নীরব প্রণয়ের কাহিনী আদ্যন্ত বর্ণনা করিলেন এবং কখনও ইহা প্রকাশ করিবেন না শপথ করিয়াছিলেন, এখন নির্য্যাতিতা হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাও বলিলেন। তিনি রাজকন্যার দাসী হইতে চাহিলেন, রাজকন্যাও উদারভাবে তাঁহাকে সঙ্গিনী করিতে সম্মত হইলেন।

রাজকন্যার চরিত্রে প্রণয়ীর সন্দেহ ও অন্য কোন-কোন ব্যাপারে (সেগুলি আমাদের প্রয়োজনীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত নহে) এবং ইউফ্রেসিয়া-আইমোজেন উভয়ের চরিত্র-মাধুর্য্যে 'Cymbeline'এর সহিত এই নাটকের সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু Twelfth Nightএর সহিতই Philaster নাটকের আমাদের প্রয়োজনীয় অংশের সাদৃশ্য বেশী। ভায়োলা ও ইউফ্রেসিয়া উভয়েরই প্রেম নিঃস্বার্থ, নির্ম্মল, নীরব। কিন্তু বোধ হয় ইউফ্রেসিয়ার প্রেমের চিত্র আরও মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার প্রেম এত প্রগাঢ় যে তাহাতে

বিন্দুমাত্র ঈর্ষা নাই, অণুমাত্র প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা নাই; মনে হয় যেন প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াই তাঁহার সকল আশা মিটিয়াছে। আত্মসংযম ও আত্মবিস্মৃতির প্রভাবে তিনি প্রণয়াস্পদকে অনাসক্ত দেখিয়া ব্যথা পান নাই, প্রিয়তমের সুখেই তাঁহার সুখ। কেবল মধ্যে মধ্যে তিনি কথাবার্ত্তায় মরণের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন; তাহা হইতেই তাঁহার গভীর বেদনার আভাস পাওয়া যায়। ভায়োলার সাধনার শেষে সিদ্ধি হইয়াছে, তাহার নীরব প্রেমের পুরস্কার মিলিয়াছে, সে আকাঙ্ক্ষিতকে পাইয়া নারী জন্ম সার্থক করিয়াছে; কিন্তু ইউফ্রেসিয়ার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই, রেবেকা-আয়েষার ন্যায় এ জগতে তাহার প্রেম সার্থক হয় নাই। যাহারা বিফল প্রণয়ের চিত্রদর্শনে মর্ম্মাহত হয়েন, তাঁহারা ইউফ্রেসিয়ার চিত্র অপেক্ষা ভায়োলার চিত্রের অধিকতর পক্ষপাতী হইবেন; কিন্তু আমাদের চক্ষে এই চিত্র বড় মধুর, বড় সুন্দর, বড় উজ্জ্বল, বড় প্রাণস্পর্শী। শেক্স্পীয়ারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও নাটককার-যুগল যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, ইহা সকলকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

Beaumont and Fletcher : The Maid's Tragedy প্রভৃতি নাটক।

এই নাটককার-যুগলের আর একখানি নাটকে (The Maid's Tragedy) আবার নারীর পুরুষবেশের ব্যাপার আছে। তবে Philasterএর মত সমস্ত নাটকখানি এই রসে ওতপ্রোত নহে, শুধু শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। Aspatia নাম্নী কুমারী সৈনিকের বেশে নিজের ভ্রাতা বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া বিশ্বাসঘাতক পূর্ব্ব প্রণয়ী Amintorকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার হস্তের আঘাতগুলি বুক পাতিয়া লইয়া সাংঘাতিক-রূপে আহত হইলেন। তাহার পর যখন মরণকালে জানিলেন যে, তাঁহার প্রণয়াস্পদ রাজাদেশে বাধ্য হইয়া অন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু সেই পাণিগৃহীতীকে প্রণয়াস্পদ তাঁহারই সম্মুখে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তাঁহার প্রতি প্রণয়ীর প্রেম পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে, তখন তিনি প্রণয়াস্পদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া সুখে মরিলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানে কিঞ্চিৎ বীররসের আভাস থাকিলেও, কুমারীর মরণকালীন করুণ উক্তি * প্রভৃতি হইতে বুঝা যায় যে, তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রণয়াস্পদের হস্তে মৃত্যু-কামনা করিয়াই আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার হৃদয় প্রগাঢ় প্রেমরসেই পরিপূরিত ছিল। এ বিষয়ে তিনি পূর্ব্ববিবৃত নাটকের ইউফ্রেসিয়ার সহোদরা ভগিনী। তবে নাটকের পূর্ব্ব অঙ্কগুলিতে তিনি ইউফ্রেসিয়ার মত আত্মসংযম ও আত্মবিস্মৃতির পরিচয় দিতে পারেন নাই; বরং প্রণয়াস্পদ ও তাঁহার পত্নীর নিকট বিদায়গ্রহণ কালে এবং সখীদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় তিনি নিজের মনের ব্যথা কাতরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, ইউফ্রেসিয়ার মত অত উচ্চপ্রকৃতি না হইলেও এই বিষাদ-প্রতিমা আমাদের হৃদয় অধিকার করে।

Beaumont and Fletcherএর আর একখানি নাটকে নারীর পুরুষবেশের ব্যাপার আছে। সংক্ষেপে এগুলির কথা বলিব। Cupid's Revenge নাটকে Urania নাম্নী কুমারী বালকভৃত্যের ছদ্মবেশে প্রেমাস্পদ রাজপুত্র Leucippusএর অনুগমন করিয়াছেন। এবং ষড়যন্ত্রকারীদিগের হস্ত হইতে রাজপুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। পরে কিন্তু উভয়েই নিহত হন, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রেমের আশা এ জগতে পূর্ণ হইল না। ইহাকেও ইউফ্রেসিয়া ও এসপেসিয়ার সহোদরা ভগিনী বলা যাইতে পারে।

The Pilgrim নাটকে আমরা প্রেমে পাগলিনী Alindaকে বালকবেশে পাগলা গারদে আবদ্ধ দেখি এবং তথায় অনুকূল-দৈববশে প্রণয়ী Pedroর সাক্ষাৎ পাইয়া সে বিমল আনন্দ ও তৃপ্তি পাইয়াছে, এ দৃশ্যও দেখিতে পাই।

আবার The Love's Pilgrimage নাটকে Marc-Antonio নামক প্রেমিক যুবক দুইটি কুমারীকে পরিণয়ের আশা দিয়া তাহাদিগের প্রণয় লাভ করিয়াছিলেন, এবং পরে গা-ঢাকা দিয়াছিলেন। উভয় কুমারীই বালকবেশে তাঁহার সন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন। অনেক সন্ধানে তাঁহারা প্রেমিককে পাইলেন; প্রেমিক অনুতপ্ত হইয়া

* There is no place so fit
For me to die as here......
Those threats I brought with me sought no revenge,
But came to fetch this blessing from thy hand.

বিবাহ হইল এবং পূর্ব্বোক্ত বিবাহিতা নারীর পরপুরুষে অনুরাগ-রোগ জন্মের মত সারিল। As You Like It ও Twelfth Night এর ভ্রান্তি-বিভ্রাটের তুলনায় এক্ষেত্রে একটু রকমফের দেখা যায়। ছদ্মবেশের উপর ছদ্মবেশ চড়ানর ফলে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো ও রগড়দার হইয়াছে। আবার এই আমলের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বালকে নারী সাজিত, একথা স্মরণ করিলে বুঝিতে হইবে যে, এসব ক্ষেত্রে ছদ্মবেশের মাত্রা চরমে উঠিয়াছে।

Ben Jonson : The New Inn.

আবার বেন্ জন্‌সনের The New Inn নাটকে পাঠকদিগের নিকট পুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত (কিন্তু স্ত্রীবেশে সজ্জিত) ব্যক্তির সহিত পুরুষের বিবাহ হইয়াছে; শেষে রহস্যভেদ হইলে জানা গিয়াছে যে, বালিকাকে বালক সাজাইয়া বিক্রয় করা হইয়াছিল,—পালক তাহাকে বালক বলিয়াই জানিত। আবার খেয়ালের জন্য একজন স্ত্রীলোক তাহাকে স্ত্রীবেশ পরান; তাহার ফলে উক্ত স্ত্রীলোকের একজন প্রেমিক ইহার প্রেমে পড়েন, এবং ইহাকে বিবাহ করেন। যাহা হউক, ছদ্মবেশের উপর ছদ্মবেশ চড়ানতে ঠিকে ভুল হইল না। এক্ষেত্রে উভয় ছদ্মবেশই পরের খেয়ালে ঘটিয়াছে, প্রেমের ফেরফের নহে। তবে দ্বিতীয়বার ছদ্মবেশ ধারণের পর যথারীতি প্রেমের উদ্ভব হইয়াছে।

Dekker : The Converted Courtesan.

ডেকারের একখানি নাটকে (ইহার প্রথম প্রদত্ত নামটা বড় বদখত, তাই চাপিয়া গেলাম; পরে সুরুচিসঙ্গত করিবার জন্য The Converted Courtesan এই আনুপ্রাসিক নাম রাখা হয়) - নায়িকা (Bellafront) গোড়ায় পতিতা নারী, কিন্তু Hippolyto নামক একজন চরিত্রবান্ যুবক এমন জ্বলন্ত ভাষায় তাহার পাপজীবনের চিত্র তাহার মনশ্চক্ষুর সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন যে, সে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্তা হইয়া নবজীবন-লাভ করিল (২য় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)। পরে সে উদ্ধারকর্ত্তার অনুরাগিণী হইয়া বালক-ভৃত্যের ছদ্মবেশে তাঁহার সম্মুখীন হইবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে এবং সে উক্ত দৃঢ় চরিত্র ব্যক্তি দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হয় * (৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)।

Heywood : The Wise Woman of Hogsdon.

Heywood এর The Wise Woman of Hogsdon নাটকে পল্লীগ্রামে প্রতিবেশিনী Luce-নাম্নী কুমারীর সহিত বিবাহের সব ঠিকঠাক হইলে, বর হঠাৎ লণ্ডনে পলায়ন করিল। বর তথায় আবার ঐ নামেরই আর একটি কুমারীর নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিতেছে এমন সময় পূর্ব্বের Luce বালক-ভৃত্যবেশে তথায় উপস্থিত হইল। পরে সে একজন ধড়ীবাজ স্ত্রীলোকের সহিত পরামর্শ করিয়া, নারীবেশে অবগুণ্ঠিতা হইয়া, উক্ত যুবকের সহিত বিবাহিতা হইল এবং অপর Luce নিজের অজ্ঞাতসারে আর একজন প্রণয়প্রার্থীর সহিত বিবাহিতা হইল। শেষ অঙ্কে বর মহাশয়ের বিদ্যা প্রকাশ হইল (সে অনেক কথা), এবং পল্লীগ্রামের Luce আত্মপ্রকাশ করিল। পাঠকদিগের নিকট তাহার প্রকৃত পরিচয় গোড়া হইতে বিদিত থাকিলেও, পাত্র-পাত্রীগণ, এমন কি ধড়ীবাজ স্ত্রীলোকটি পর্য্যন্ত, এত দিন জানিত না যে সে স্ত্রীলোক। পূর্ব্ববর্ণিত Widow ও The New Inn নাটক দুইখানির ব্যাপার ইহার সহিত তুলনীয়।

Heywood : The Fair Maid of the West.

হেউডের The Fair Maid of the West or A Girl worth Gold—নায়িকার প্রশংসাসূচক এই সুন্দর নামযুগে অভিহিত নাটকে নায়িকা (Bess Bridges) হোটেলওয়ালী অবস্থায় মুখসাপটে দড় একজন লোককে জব্দ করিবার জন্য পুরুষ সাজিয়া তাহাকে উত্তমমধ্যম দিয়াছিলেন (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)। এখানে দুষ্টের দমনের জন্য, তথা মজামারার জন্য, নারীর পুরুষবেশ। শেক্‌স্‌পীয়ারের ভায়োলা পুরুষ সাজিয়াও নারীর ন্যায় ভীরুস্বভাবা; রোজালিণ্ড পোর্শিয়া পুরুষবেশে বীরত্বের আস্ফালন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে কতদূর দাঁড়াইত, বলা যায় না। কেবল গ্রীনের James IV নাটকে রাজ্ঞী ডরোথিয়া

---

* আশ্চর্য্যের বিষয়, এই নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে উক্ত চরিত্রবান্ পুরুষ (পত্নী বিদ্যমানে) বিবাহিতা অবস্থায় উক্ত নারীকে সৎপথচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু নায়িকা অপূর্ব্ব চরিত্রবলে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে। নরনারীর চিত্তবলের ও নৈতিক আদর্শের কতই অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন ঘটে!

পুরুষবেশধারণ-কালে লজ্জা-সঙ্কোচ প্রকাশ করিলেও, বিপৎকালে কতকটা সাহস দেখাইয়া আততায়ীকে আঘাত করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের তুলনায় এই নাটকের নায়িকা খুব ডাকাবুকো; তবে মনে রাখিতে হইবে, তিনি অভিজাত-তনয়া নহেন, চামারের মেয়ে।

যাহা হউক, হাস্যরসের অবতারণার অবকাশ দিবার জন্য পুরুষবেশ ত গেল সূচনামাত্র। পরে উক্ত নায়িকা প্রেমের দায়ে পুরুষের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সমুদ্রপারে দূরদেশে প্রেমাস্পদের (অলীক) মৃত্যুসংবাদ পাইয়া, মৃতের অস্থি স্বদেশে সমাহিত করিবার জন্য কতক-গুলি অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত সঙ্গী লইয়া পুরুষবেশে সমুদ্রযাত্রা করিলেন; এবং নানা ঘটনার পর প্রেমিকের সহিত মিলিত হইলেন। প্রেমিক দূরদেশে যখন তাঁহাকে প্রথম দেখিলেন, তখন ঠিক চিনিতে পারেন নাই; পরে তিনি নারীবেশ ধারণ করিলে চিনিতে পারিয়া হারানিধি পাইয়া পরম সুখী হইলেন।

Field : Amends for Ladies.

ফীল্ডের Amends for Ladies নাটকের অন্যতম নায়ক (Ingen) অভিমানিনী প্রেমিকা (Lady Honour) কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহাকে ধোঁকা দিবার জন্য নিজের (অলীক) বিবাহ-সংবাদ প্রচার করিলে, প্রেমিকা বালক ভৃত্যের ছদ্মবেশে একখানি প্রেমলিপি লইয়া প্রেমাস্পদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; এবং বালক-ভৃত্যের জবানী নিজের দুঃখকাহিনী বলিলেন, নিষ্ঠুর প্রেমিককে অনুযোগ করিলেন, প্রেমাস্পদের পত্নীকে দেখিতে চাহিলেন এবং তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন (পত্নী নায়কের ছদ্মবেশী কনিষ্ঠ ভ্রাতা); এবং প্রেমাস্পদের চাকুরি লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনিও তাহাতে সম্মত হইলেন (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)। নায়িকার অন্তর্ধানে নায়িকার ভ্রাতার সন্দেহ হইল যে, নায়ক তাঁহাকে খুন বা গুমি করিয়াছেন; ফলে উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য পরস্পরকে আহ্বান করিলেন। নায়িকা (বালক-ভৃত্য) ভ্রাতা ও প্রেমাস্পদের—উভয়েরই জন্য শঙ্কিত হইয়া উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য ও ৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)। শেষে নায়িকার ভ্রাতার অমতে নায়ক চিকিৎসকের ছদ্ম-বেশে নায়িকাকে বিবাহ করিলেন। এই প্রেমময়ী ভায়োলা ও ইউফ্রেসিয়ার মতই আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে।

Shirley : The Grateful Servant &c.

শার্লির কয়েকখানি নাটকে নারীর পুরুষবেশ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে The Grateful Servant নাটকে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো। লিওনোরা-নাম্নী কুমারীর একজন ডিউকের সহিত অন্যোন্যানুরাগ হইয়াছিল; পরে ডিউক মহোদয় অন্যার অনুরাগী হয়েন এবং লিওনোরার অন্যত্র বিবাহ-সম্বন্ধ হয়। লিওনোরা এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বালক-ভৃত্যের ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করিলেন; কিন্তু মামুলি প্রথায় প্রেমাস্পদের আশ্রয় না লইয়া, (ফোর্ডের Eroclea র মত) অপর একজন ভদ্রলোকের আশ্রয় লইলেন; এই ভদ্র-লোক আবার ডিউক মহোদয়ের নব প্রণয়িনীর অনুরাগী ছিলেন; কিন্তু লিওনোরা অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও ঈর্ষ্যাহীনতা দেখাইয়া এই ভদ্রলোককে ডিউক মহাশয়ের সুখের জন্য নিজের প্রণয়বেগ সংবরণ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন। লিওনোরার এই আত্মবলিদান বড় প্রাণস্পর্শী। লিওনোরার এই ভদ্রলোকের সহিত শেষে বিবাহ হইলে বোধ হয় অনেক পাঠক সুখী হইতেন; কিন্তু নাটককার সে পথে যান নাই। না গিয়া বোধ হয় ভালই করিয়াছেন; কেন না, ইহাতে লিওনোরার নিঃস্বার্থ প্রেমের চিত্র ইউফ্রেসিয়ার চিত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছে। নাটকখানির উপর শেক্স্পীয়ারের Twelfth Nightএর প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান; কিন্তু এই নাটককার শেক্স্পীয়ারের ন্যায় যোড়া বিবাহে নাটকখানি সমাপ্ত করেন নাই।

এই নাটককারের Love-Tricks বা The School of Compliment নামক নাটকে দুই ভগিনী যৌবনে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন, এবং এক ভগিনী পুরুষ সাজিলেন। ফলে ভগিনীর প্রণয়ী তাঁহাকে এই ছদ্মবেশে চিনিতে পারিল না, ইত্যাদি বহু বিচিত্র ব্যাপার আছে। এই নাটকখানির উপর শেক্সপীয়ারের As You Like Itএর প্রভাব সুস্পষ্ট।

উক্ত নাটককারের Wedding ও The Maid's

Revenge নামক দুইখানি নাটকেও নারীর পুরুষ-বেশ আছে। যাহা হউক, আর কতকগুলি অপ্রসিদ্ধনামা নাটককারের উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গের বিরক্তি-সঞ্চার করিব না। রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের শেষ নাটককার শার্লির উল্লেখেই এই আমলের নাটকাবলির আলোচনা সারিলাম।

এই আমলে না কি নারীর পুরুষ বেশের ফ্যাশানটা, শুধু নাট্যজগতে কেন, বাস্তব জগতেও এত সংক্রামক হইয়াছিল যে, প্রেমিকাগণ প্রেমিকের সঙ্গে হাওয়া খাইবার জন্য সত্য-সত্যই বালক ভৃত্যের বেশে বহির্গত হইতেন। * সুতরাং নাটকে ও গল্পে ইহার এত উদাহরণ-বাহুল্য ঘটিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। আবার থিয়েটারের হাওয়াও অনেক সময় মানবের দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরকে কলুষিত, বিকৃত করে; এবং তাহার ফলে অনেক বিড়ম্বনা, অনেক অনর্থ ঘটে,—গম্ভীর প্রকৃতি সামাজিকগণ এইরূপ বলেন। আমাদের দেশেও রঙ্গমঞ্চের, তথা কাব্য জগতের হাওয়ার দোষে সমাজে নানারূপ অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার আবির্ভাব হইতেছে,—তাঁহারা এইমত প্রকাশ করেন। এই থিয়েটারি ব্যাপারে আশঙ্কিত হইয়াই না কি। এলিজাবেথের আমলের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ডন্ (Donne) প্রণয়িনীকে তাঁহার সহিত বালক-ভৃত্যের ছদ্মবেশে বিদেশ-গমন করিতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। † আমরা অনেক চেষ্টায়ও কবিতাটি হস্তগত করিতে পারি নাই।

১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্য

ইহার পরবর্ত্তী আমলের অর্থাৎ দ্বিতীয় চার্লসের সময়ের নাটকেও ইহার জের চলিয়াছিল; কিন্তু তখনকার অধিকাংশ নাটক এত অশ্লীলতা-দুষ্ট যে, এই বয়সে আর সেগুলি নূতন করিয়া ঘাঁটিতে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং নাটকের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানি নভেল ও একটি কবিতা হইতে দৃষ্টান্ত দিব।

উক্ত শতাব্দীর Mrs. Byrneএর The Libertine নামক নভেলে নায়ক (Angelo) একটি প্রেমিকা কুমারীকে কুলের বাহির করে; পরে প্রেমিকা পুরুষ-বেশে নায়কের অনুসরণ করে এবং তাহাকে বার-বিলাসিনী (Oriana) ও তাহার গুণ্ডার ছলবলকৌশল হইতে উদ্ধার করে। নায়ক তাহাকে শেষে বিবাহ করিল, কিন্তু সুখী করিতে পারিল না। দুর্ভাগিনী কিছুদিন পরে প্রাণত্যাগ করিল। *

গোল্ডস্মিথের The Hermit বা Edwin and Angelina কবিতাটি বোধ হয় পাঠক-সমাজের সুপরিচিত। এই কবিতাটিতে প্রেমিকার অবহেলায় মর্ম্মাহত হইয়া প্রেমিক নিরুদ্দেশ হইলেন ও বিজন প্রান্তরে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে নায়িকা প্রেমিকের অদর্শনে নিজের ব্যবহারের জন্য অনুতপ্তা হইয়া পুরুষ-বেশে গৃহত্যাগ করিলেন এবং ঘুরিতে-ঘুরিতে ঘটনাক্রমে প্রেমিক-সন্ন্যাসীর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন (অবশ্য সন্ন্যাসি-বেশী প্রেমিককে না চিনিয়া)। অল্পক্ষণ পরে সন্ন্যাসী অতিথির নিকট নারী-নিন্দা করিলে, পুরুষ-বেশিনীর যে নেত্রবক্ত্রবিকার হইল তদ্দর্শনে তিনি তাঁহার ছদ্মবেশ ধরিতে পারিলেন এবং পরে কুমারীর কাহিনী শুনিয়া তাঁহাকে সুস্পষ্টরূপে চিনিলেন। প্রেমিক-সন্ন্যাসীও তখন আত্মপ্রকাশ করিলেন। প্রেমিক-প্রেমিকার যুগলমিলনে কবিতাটির মধুর উপসংহার।

উল্লিখিত দুইটি স্থলেই প্রেমের দায়ে ছদ্মবেশ। তবে

---

* 'a device which in their age was by no means confined to the stage. It seems not to have been unusual then for love-sick ladies in page's attire to accompany their lovers on their walks abroad.' Ward's History of English Dramatic Literature; Vol. II, Ch. VII, pp. 759-60.

† 'Donne has a copy of verses to his mistress dissuading her from a resolution which she seems to have taken up from some of these scenical representations, of following him abroad as a page. It is so earnest, so weighty, so rich in poetry, in sense, in wit and pathos, that it deserves to be read as a solemn close in future to all such sickly fancies as he there deprecates.'—LAMB on PHILASTER. Specimens of Dramatic Poets.

* নভেলখানি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। Saintsbury প্রণীত The English Novel নামক সমালোচনা গ্রন্থ হইতে সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

দ্বিতীয়টিতে প্রিয়তমের সহিত মিলনের আশা লইয়া প্রেমিকা ছদ্মবেশ লন নাই, বোধ হয় পথে আত্মরক্ষার জন্য লইয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহাও প্রেম-কাহিনী।

গোল্ডস্মিথের কবিতার প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, এটি পুরাতন ব্যালাড-শ্রেণীর কবিতার অনুকরণ এবং কয়েকটি পুরাতন ব্যালাডেও নারীর পুরুষ-বেশের কাহিনী আছে। সেগুলি ঠিক কোন্ সময়ে রচিত তদ্বিষয়ে অনেক বাদ-বিতণ্ডা আছে; সে-সব তর্কের অবতারণা না করিয়া, ব্যালাডগুলিরও এইখানেই উল্লেখ করিব। কেন না, সেগুলি এই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বিশপ পার্সি কর্ত্তৃক তাঁহার সাহিত্যে যুগান্তরকারী (epoch-making) পুস্তকের মারফত বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল।

ব্যালাড

(১) Gentle Herdsman নামক ব্যালাডে নায়িকার অবহেলায় ভগ্নহৃদয় প্রেমিকের মৃত্যু হইলে, অনুতপ্তা নায়িকা পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পুরুষ-বেশে তীর্থ-যাত্রা করিয়া একজন মেষপালককে তীর্থের পথ জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে তাহার নিকট নিজের ছদ্মবেশ রহস্য ও জীবন-কাহিনী প্রকাশ করিতেছেন। সমালোচকগণ বলেন, গোল্ডস্মিথ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কবিতাটির জন্য এই ব্যালাডের নিকট ঋণী। কিন্তু গোল্ডস্মিথ কাহিনীটিতে অপূর্ব্ব সরসতা-সঞ্চার করিয়া উচ্চদরের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন; পুরাতন ব্যালাডে বিফল-প্রণয়ীর মৃত্যুর পর বাজেলোকের নিকট নায়িকার আত্মপ্রকাশ ও অরণ্যে-রোদন এবং গোল্ডস্মিথের কবিতায় সন্ন্যাসিবেশী প্রেমিকের নিকট প্রেমিকার আত্মকাহিনী-বর্ণনা ও প্রেমিক প্রেমিকার দীর্ঘ বিরহান্তে মিলন,—এই উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, ইহা সহৃদয় পাঠক-মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

(২) Burd Ellen বা Child Waters নামক ব্যালাডে প্রেমিকা অন্তর্বত্নী হইয়া বালক-ভৃত্য-বেশে প্রেমাস্পদের সঙ্গে-সঙ্গে (তাঁহার জ্ঞাতসারে) তাঁহার গৃহে গেলেন। প্রেমাস্পদ তাঁহাকে ভৃত্যের অন্যান্য কর্ম্মের সঙ্গে ঘোড়ার খবরদারিতে নিযুক্ত করিলেন। শেষে আস্তাবলে সন্তান-প্রসবের পর, প্রেমিকার সেবায় ও একাগ্রতায় বিগলিত-হৃদয় হইয়া নায়ক তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। এই ব্যালাডের নায়িকা বড় মধুর-প্রকৃতি।

(৩) The Lady Turn'd Servingman নামক ব্যালাডে শত্রু-হস্তে পতি নিহত ও গৃহ লুণ্ঠিত হইলে, নায়িকা প্রাণ-ভয়ে পুরুষ বেশে পলায়ন করিয়া পথে এক রাজার সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার আশ্রয় লইলেন ও তাঁহার চাকুরি স্বীকার করিলেন। একদিন রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গ মৃগয়ায় গেলে তিনি নির্জ্জন পাইয়া নারীবেশ পরিলেন ও মনের দুঃখে নিজের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কাহিনী গাহিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাজা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ ও দুঃখের কাহিনী শুনিয়া বিগলিত-হৃদয় হইলেন, এবং তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। মধুর সমাপ্তি বটে, কিন্তু 'বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ' কুমারীর প্রণয়ীর সহিত মিলনের মত মনোরম নহে; বিশেষতঃ হিন্দু পাঠক ইহাতে তেমন প্রীত হইবেন না।

(৪) ইহা ছাড়া, শেক্স্পীয়ারের The Merchant of Veniceএর প্রসঙ্গে The Northern Lord নামক ব্যালাডের উল্লেখ করিয়াছি। উহার প্রয়োজনীয় অংশের সংক্ষিপ্তসার দিতেছি। (শেক্স্পীয়ারের Cymbeline নাটকের ন্যায়) পতি পত্নীকে অসতী মনে করিয়া তাঁহাকে দুর্গ-পরিখায় নিক্ষেপ করিলেন। পত্নী কিন্তু প্রাণ হারাইলেন না, তবে গা-ঢাকা দিলেন। পতি পত্নী-হত্যার জন্য প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইলে, পত্নী পুরুষের ছদ্মবেশে তাঁহার পুনর্বিচার করাইয়া উদ্ধার সাধন করিলেন। পরে আবার পত্নী পতিকে (পোর্শিয়ার ন্যায় পতির বন্ধুকে নহে) ঐ বেশে য়িহুদি উত্তমর্ণের খর্পর হইতে উদ্ধার করিলেন। (পত্নী-লাভ করিবার জন্যই পতিকে পূর্ব্বে এই ঋণ করিতে হইয়াছিল।) উদ্ধার-ব্যাপার শেক্স্পীয়ারের The Merchant of Veniceএর মত। অবশেষে পিতা পত্নী-হত্যার বিচারের জন্য প্রার্থী হইলে, নায়িকা স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য হইতে একটি মাত্র উদাহরণ দিয়াই ইংরেজী সাহিত্যের এই সুদীর্ঘ আলোচনা শেষ করিব। স্কটের Mormion কাব্যে নায়ক মার্মিয়নের প্রেমে বিভোর হইয়া Constance চিরকৌমার্য্য ব্রত ভঙ্গ ও

মঠ ত্যাগ করিয়া বালকভৃত্য সাজিয়া (Constant নাম গ্রহণ করিয়া) প্রেমাস্পদের সঙ্গ লইল। পরে মার্ম্মিয়ন অন্যাসক্ত হইলে সে ঈর্ষ্যাবশে প্রেমাস্পদের প্রেমপাত্রী Clareকে বিষপ্রয়োগে প্রাণে মারিতে অপরকে প্ররোচিত করিল এবং অকৃতকার্য্য হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইল। (উক্ত কাব্যের ১ম ও ২য় সর্গে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত।)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইউরোপীয় সাহিত্যে, বিশেষতঃ রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের ইংরেজী সাহিত্যে, এই শ্রেণীর ছদ্মবেশের ছড়াছড়ি। সুতরাং প্রবন্ধের এই অংশে ইংরেজী সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত-সংগ্রহের বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়াছে।* ইহার জন্য পাঠকবর্গের ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে গিয়া ইংরেজী সাহিত্যের কথাই পাঁচ কাহন বলা নিতান্তই 'ধান ভানিতে শিবের গীত' বটে; সুতরাং পাঠক সাধারণের ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার কথা। তবে প্রবন্ধ-লেখকের যে সকল শুভানুধ্যায়ী তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা-রূপ অনধিকার-চর্চ্চা করিতে নিষেধ করেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে—যে ইংরেজী সাহিত্য লইয়া তাঁহাকে ব্যবসায়ের খাতিরে সর্ব্বদা নাড়াচাড়া করিতে হয়, তাহারই সংবাদ মাতৃভাষার মারফত পাঠক-সমাজে পৌঁছাইয়া দিতে পরামর্শ দেন, এবং ইহাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প, এই অভিমত প্রকাশ করেন, তাঁহারা অন্ততঃ এই সুদীর্ঘ ও নীরস আলোচনা তাঁহাদিগেরই পরামর্শের পরিণতি বুঝিয়া প্রবন্ধ-লেখককে তিরস্কার বা নিন্দা করিবেন না।

যাহা হউক, প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছে। এই সঙ্গেই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে নারীর পুরুষ-বেশের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলে নিতান্ত বেগার-ঠেলা কায হইবে, 'জননী বঙ্গভাষা'র সমৃদ্ধ সাহিত্যের অবমাননা করা হইবে; অতএব আগামী বারে নিরবচ্ছিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিয়া বিদেশীয় সাহিত্য-চর্চ্চা-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

* এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে নিম্ননির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলি হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।—

Dunlop: The History of Fiction.

Ward: A History of English Dramatic Literature.

Courthope: A History of English Poetry.

H. Morley: Longer Works in English Prose and Verse.

Boas: Shakespeare's Predecessors.

Seccombe & Allen: The Age of Shakespeare, Vol. II.

Lamb: Specimens of Dramatic Poets.

Hudson: An Introduction to the Study of Literature.

Saintsbury: The English Novel.

Percy: Reliques of Ancient English Poetry.

ইহা ছাড়া শেক্‌স্‌পীয়ার সম্বন্ধে কয়েকখানি সমালোচনা-গ্রন্থ এবং শেক্‌স্‌পীয়ার ও অন্যান্য নাটককারের নাটকগুলির নানা সংস্করণ হইতেও বিস্তর সাহায্য পাইয়াছি। সেগুলির নাম নির্দ্দেশ করিতে গেলে ফর্দ্দ বেজায় লম্বা হয়। কতকগুলি স্থলে মূল পুস্তক পাই নাই, সমালোচনা বা সাহিত্যের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। তবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা চিরাগত প্রথা, সুতরাং নিন্দনীয় নহে! পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমার পরলোকগত পুত্র ৺শিশিরকুমার এবং আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও বর্ত্তমান সহযোগী স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ পঞ্চানন মিত্র এম্-এ পরীক্ষার জন্য অধ্যয়নকালে পুস্তক পাঠ করিয়া যে সমস্ত সার-সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও কয়েকটি স্থলে সাহায্য পাইয়াছি।

দুইখানি পুস্তক

"দ্বিজেন্দ্রলাল"

[শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী]

সাহিত্য-সাধকের জীবনচরিতের আবশ্যকতা

সাহিত্যসেবীর জীবনচরিতের আবশ্যকতা কি? তাঁহার রচনাই ত তাঁহার চরিত্রের আলেখ্য, জীবনের সর্ব্বস্ব। পাঠকেরও তাহাই সব। ইহার অধিক যাহা, তাহা ব্যক্তিগত,—বাজে। তাহা সাধারণের কোন কাজে লাগে না।—এইরূপ একশ্রেণীর যুক্তি বাজারে চলিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বহুপূর্ব্বে ইহার প্রতিবাদ ছলে বলেন,-গ্রন্থকার কি গুণে তাঁহার কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহা বুঝিতে হইবে।—একথাও কিন্তু যথেষ্ট নহে। আমরা বলি, সাধনার মূলসূত্রটুকু শুধু জানিলে হইবে না, সাধককে চিনিতে হইবে। নাবিক, সৈনিক, রাজনৈতিক, ব্যবহারজীবী, যে কেহ আপনাপন অধিকারে উচ্চতম প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, শুধু তাঁহাদিগের সেই শক্তিটিরই হিসাব-নিকাশ করিলে চলিবে না, তাহার মধ্যে আরও একটা এমন কিছু নিহিত আছে, যাহা সঙ্গে-সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের নিজস্বটির বিকাশে ও নিয়োগপ্রয়োগে সহায়তা করিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সেটি জনের পরিচয় হইলেও গণের পরিচায়ক। তাঁহাদের ভিতরের মানুষটি যে বিশেষত্বটি অবলম্বন করিয়া লীলাখেলা করিয়াছেন, তাহা কাহারও আকস্মিক কৃতীত্ব নয়,-যুগের ক্রমোন্নতির চিত্র। আমাদের বিশ্বাস, মানুষ হিসাবেও অসামান্য প্রতিভার অধিকারীগণ স্খলন পতন ত্রুটি সত্ত্বেও এমন কিছু মহৎ, এমন কিছু বৃহৎ জীবনে প্রকট করিয়া যান, যাহা ভবিষ্যতের জন্মপত্রিকার মত জাতীয় ভবিষ্যতকে গড়িয়া তোলে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির আদর্শ হিসাবেও এই সকল জীবনচরিত পঠন-পাঠনার অপরিত্যাজ্য উপাদান। ইহা ছাড়াও এই শ্রেণীর সাহিত্যের আর একটি সার্থকতা—জাতীয় ঋণ পরিশোধ। প্রত্যেক মনীষাসম্পন্নের যেমন অন্ধ স্তাবক জোটে, তেমনই অকারণ বিদ্বেষ্টাও দেখা দেয়। এই উভয় দলের কবল হইতে ঠিক মানুষটিকে উদ্ধার করিবার জন্য নিরপেক্ষ পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের প্রয়োজন। ইহাই মহৎ মৃতের প্রতি মহান্ সম্মান-প্রদর্শন এবং ব্যক্তিকে পূজা করিতে শিখিয়া জাতিকে পূজনীয় করিবার পাকা বন্দোবস্ত।

অধিকারী ভেদে সাধনার সিদ্ধি

শ্রেষ্ঠ সমালোচক না হইলে কেহ উৎকৃষ্ট চরিতকার হইতে পারে না। সমালোচনা কাব্যের বিচারণা; চরিত-কথা কারণের অনুধাবনা। সমালোচনা বিষয়ের পরিচয়-পত্র; জীবনবৃত্তান্ত ব্যক্তির ইতিবৃত্ত। যেমন সকলের জীবনচরিত রচিতে নাই, তেমনই চরিত-কথা রচনায় সকলের অধিকারও নাই। লিখিতে হইবে তাঁহারই কথা, যিনি লোকমান্য। লেখা সাজে তাঁকেই, যিনি পরের মন সারাটি প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছেন। দশের বা দেশের দুলালের প্রতি ভক্তিই লেখকের শক্তি বা অধিকারের জন্ম উৎস। গদগদ হইতে না পারিলে প্রেরণা আসিবে না! প্রেরণা ছাড়া রচনায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে কে? দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের ইতিহাস প্রকাশে দেববাবু তাঁহার অধিকারের সদ্ব্যবহার কি পরিমাণে করিয়াছেন, তাহা ক্রমশঃ আলোচনায় পরিস্ফুট হইবে। দেবকুমার বাবু সুকবি ও সুলেখক। কবি কবিকে যেমন চেনে, এমন আর কে? হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া, জীবনে জীবন ঢালিয়া তাঁহার অন্তরের অন্তরে যে ধুকধুকটি কত অব্যক্তকে ব্যক্ত করিতেছে, তাহার সে ইঙ্গিত, সে সঙ্গীত সেই রসে রসিক ছাড়া তেমন ভাবে কে বুঝিবে? "দ্বিজেন্দ্রলাল" রচনায় দেবকুমার বাবুর আর একটি দাবি—তিনি তাঁহার গল্পের পাত্রকে তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিবার অবসর করিয়া লইয়াছিলেন ও পাইয়াছিলেন। সুখে দুঃখে, ক্রীড়ায় কৌতুকে, সাধনে ব্যসনে, সম্মানে লাঞ্ছনায় দেবকুমার তাঁর প্রিয়তমের জীবনটিকে সেই একনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার রসে ছানিয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা বলি,—স্বাগত।

শ্রেষ্ঠ জীবনচরিতের লক্ষণ

শ্রেষ্ঠ জীবনচরিতের লক্ষণ সহানুভূতির সঙ্গে নিরপেক্ষতা, হৃদয় অনুশীলনের পাশে পাশেই মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ, সমসাময়িক মিত্রগণের স্মৃতির চিত্রসূচী ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর প্রভাব প্রদর্শনের সহিত সাময়িক ভ্রান্ত সংস্কারের অপনোদন, ও অজ্ঞাত বা দুষ্প্রাপ্যের সংগ্রহ। আলোচ্য গ্রন্থে এ সকলই অল্পবিস্তর পরিণতি লাভ করিয়াছে। তদুপরি, রচনায় যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ, সেই মৌলিকতা আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে আকর্ষণ করিয়াছে। বঙ্গাক্ষরে ইংরাজী জীবনচরিত আছে—এটি যেন তাহার কার্য্যকরী প্রতিবাদ। আমাদের দেশে 'আধুনিক' ('বৈজ্ঞানিক' বলিলে বিশেষণটা আরও জাঁকাল হইত!) জীবনচরিত লিখিবার প্রণালী খুব বেশী দিন আবিষ্কৃত হয় নাই। আমাদের যতদূর ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রবর্ত্তক। এ বিভাগের রচনায় বিদেশীয় প্রভাবের সম্পূর্ণ অভাব একান্ত অসম্ভব। আমরাও সে হিসাবে দেববাবুর বিষয়ের সমাবেশ ও লেখন রীতিটাকে নিছক মৌলিক বলি নাই। কিন্তু তিনি অতি সাবধানে, অত্যন্ত দক্ষতার সহিত আপনাকে সেই অনিবার্য্য প্রবল প্রভাবের হস্ত হইতে যথাসম্ভব রক্ষা করিয়াছেন। ইহা সহজ কৃতীত্বের

কথা নয়। তাঁহার বলিবার ভঙ্গী ও ভাষা অতি সুন্দর। তাঁহার "দ্বিজেন্দ্রলাল" পড়িতে পড়িতে কায়ার দ্বিজেন্দ্রলালকে বার বার মনে আসে। ভাবের ইঙ্গিতকারী অঙ্গভঙ্গীসহ সেই সঙ্গীত, উচ্ছ্বাসাবেগে নর্ত্তনোন্মুখ পদক্ষেপ চোখে চোখে ভাসে। একদিকে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য, সত্যনিষ্ঠা, প্রতিভা ও প্রেম, এবং অন্যদিকে অভিমান, ক্ষোভ, অন্ধতা ও অসংযম ছায়ালোকের ন্যায় পাঠকের সাথে-সাথে কাঁদে, হাসে। যিনি মসীর তুলিতে এমন ছায়াবাজী দেখাইতে পারেন, তাঁহার রচনাকে পুনর্ব্বার বলি,—স্বাগত।

সংযত সহানুভূতি, নিরপেক্ষ বিচার, নির্ভীক স্পষ্টবাদ

দেবকুমার বাবু তাঁহার গ্রন্থের পাত্রকে কোথাও উপন্যাসের নায়ক সাজাইয়া কল্পনার অপব্যয় করেন নাই বটে, কিন্তু স্থানে-স্থানে বন্ধুর প্রীতি ও সদা-সঙ্গীর সহানুভূতি মাত্রা ছাড়াইয়া তাঁহার নিরপেক্ষ বিচারকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি অদ্ভুত দ্রুততার সহিত নিজের ব্যক্তিগত ভাবকে সংযত করিয়াছেন। Boswell একদিন ভক্তের অনাবশ্যক আগ্রহাতিশয্যে Johnsonকে এমন উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, যেখান হইতে এখন তাঁহাকে অত্যন্ত ছোট বলিয়া মনে হয়। তাই সে স্থানটি আর তাঁহার আরাধ্যের অধিকারে নাই;—আছে কেবল বসোয়েলিজমের কলঙ্ককাহিনী। দেবকুমার বাবুর উদার বন্ধুপ্রীতি একদেশদর্শী 'বসোয়েলী' মূঢ় ভক্তি নয়। দেববাবুর প্রেম-পক্ষপাতটী অতিক্রম করিয়া পাঠকের দৃষ্টি তাঁহার স্পষ্টবাদীর নিরপেক্ষতার দিকেই আকৃষ্ট হয়। দ্বিজেন্দ্র চরিতকার নিপুণ চিত্রকরের মত দ্বিজেন্দ্রলালের হুবহু মূর্ত্তিটি লোকলোচনের গোচরে আনিয়াছেন। দুঃখের বিষয় মাঝে মাঝে অতিমাত্রায় রঙের পোঁচড়া দিয়া, অথবা রঙকে হাল্‌কা করিয়া আদত ছবিটিকে বিরূপ বা বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। পাছে পরলোকগত বন্ধুর প্রতি উদ্বেলিত আসক্তি তাঁহার স্বাধীন বিচারবুদ্ধিকে ছাপাইয়া উঠে, দ্বিজেন্দ্র-কথা বলিতে বলিতে দেখিতে পাই দেবকুমার প্রেমের পাষাণের মত সর্ব্বত্র সশঙ্ক, সংযত ও সতর্ক। কিন্তু তাঁহার বন্ধুর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য তাঁহাকে স্থানে স্থানে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। অনেক স্থলেই দেবকুমার বাবু এ অজ্ঞাত মোহ কাটাইয়া উঠিয়াছেন, এবং পাঠককে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন যে, দ্বিজেন্দ্রলালের ভালমন্দের সহিত তাঁহার বক্তব্য যেন তানে তানে গাঁথা, তালে তালে বাঁধা। এমন যে সোদরাধিক প্রিয়, তাঁর ভ্রান্তি দেখিয়া দেবকুমার ক্ষোভে অভিমানে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছেন! "আনন্দ-বিদায়ের" অভিনয় দেখিয়া দেবকুমার যখন সেই মহাযশা নাট্যকারকে বলিলেন,—এ্যাঁ! আপনি এ কি করিলেন!—সে উক্তিটি পাঠকের মর্ম্মে গিয়া আঘাত করে। উহা মামুলী নিন্দাবাদ নয়,—মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ। দেবকুমারের একলার নহে—সমস্ত বাঙ্গলার। আবার যখন দ্বিজেন্দ্রলাল অমর অতুলনীয় বীরসঙ্গীত রচিয়া নাচিয়া নাচিয়া দেবকুমারকে শুনাইতেছেন, গ্রন্থের সেই স্থানটির ভাষা যেন যুদ্ধযাত্রার ভীষণ মধুর জয়বাদ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নীবিয়োগ ও মাতৃহীন শিশু দুটিকে বুকে লইয়া পিতার সকরুণ স্নেহের কথা লিখিতে গিয়া দেবকুমারের লেখনী নিজে কাঁদিয়া পরকে গলদশ্রুধারে কাঁদাইয়াছে। দেববাবু দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা তিনি না বলিলে জানিবার কোন উপায় ছিল না। তাঁর বিষয়ের পরিকল্পনা, অভিব্যক্তির প্রণালী, রস গ্রহণার্পণের ক্ষমতা, যুক্তি-তর্কের শৃঙ্খলা, সুদীর্ঘ ধারাবাহিক বর্ণনায় আগাগোড়া কৌতূহল উদ্দীপ্ত সঙ্গতিরক্ষার চাতুর্য্য বা মাধুর্য্য প্রশংসনীয়। এ গ্রন্থ লঘু সাহিত্যের ন্যায় সরস ও চিত্তাকর্ষক,—অথচ ইহাতে গভীর মনন ও বীক্ষণের নিদর্শন যথেষ্ট।

বাহুল্য-দোষ

এই অতিকায় গ্রন্থের ভীতিকর স্ফীতি পাঠকের পীড়াদায়ক। পোষাক tight fit করিবার জন্য দরজি যেমন নির্ম্মমভাবে কাঁচির সদ্ব্যবহার করে, লেখককেও তেমনই পাষাণ হইয়া রচনার কাট-ছাঁট করিতে হয়। দেবকুমার তাহা পারিতেন, কিন্তু করেন নাই;—এই আকারের দিনেও না! নিজের লেখার উপর এই অতি মমতা ঠিক যেন নষ্ট নাতিটার উপর প্রশ্রয়দাত্রী পিতামহীর আদরের টান। এটি বাহুল্য-বর্জ্জনের যুগ। তাই চীন টিকি কাটিল; জাপানকে চল্লিশ পার হইতে না হইতেই প্রাচীনের দলে আসন গাড়িতে হইল! সে 'আরব-রজনী' অনেককাল পোহাইয়াছে, সেদিনের বাদশাহীচালের 'সহস্র রাত্রি' জীবিত থাকিলে তাহাকে ডাহিনের তিনটি শূন্য মুছিয়াই বুঝি আজ বিশ্বযাত্রার বৈদ্যুতিক ছন্দে পা ফেলিতে হইত! অল্প আয়াসে অধিক পাইবার দাবী এখন সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। সাহিত্যেও এই economyর প্রভাব সুস্পষ্ট। কৃষ্ণনগরের রাজবংশের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের কোন সংস্রব নাই, অথচ সে বংশের একটি বিস্তৃত তালিকা গ্রন্থের কলেবর অকারণে বৃদ্ধি করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাতের পত্রগুলি কেন গ্রন্থস্থ হইল? এই সব পত্রের যে যে স্থানে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষভাবে ফুটিয়াছেন, কেবল সেই স্থানগুলি উদ্ধৃত করিলেই চলিত। দেশাত্মবোধ কবে কিরূপে দ্বিজেন্দ্রলালের উপর প্রভাববিস্তারে সমর্থ হইল, তাহাই মাত্র আলোচ্য। এ সম্বন্ধে অন্যান্য বিস্তৃত বর্ণনা একান্ত পরিত্যাজ্য। এইরূপ আরও অনেক অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথা এ গ্রন্থকে অন্যায়রূপে ভারাক্রান্ত করিয়াছে। তদুপরি, যাহা সহজে সংক্ষেপে বক্তব্য, তাহা অনর্থক টানিয়া বড় করা হইয়াছে।

রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র সংবাদ

রবীন্দ্র বনাম দ্বিজেন্দ্র মামলার বিচার দ্বিজেন্দ্রলাল স্বহস্তে করিয়া গিয়াছেন। এই নিষ্পত্তির পরেও তাঁহার চরিত-কার জটিলকে সরল করিতে, রহস্যকে প্রকাশ্য করিবার অভিপ্রায়ে পুরাতন নথিপত্রগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া ছাপিয়াছেন। উদ্দেশ্য ভাল হইলেও আমরা এই প্রসঙ্গ তোলার বিপক্ষে,—তোলার পক্ষে। কেন?—খুঁটিনাটি না ঘাঁটিয়া মূল ধরিয়া সংক্ষেপে তাহা বলিব। দেবকুমার বাবুর মতে—রবীন্দ্র-মিত্রগণ দ্বিজেন্দ্রকে অতি অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিয়া বন্ধু-

বিচ্ছেদে ইন্ধন যোগাইয়াছেন। এ কথায় রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র উভয়ের প্রতিই অবিচার করা হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্র মতের জন্যই লড়িতেছিলেন। তাই, তাঁহার অসংযমেরও একটা আকর্ষণী ছিল। কিন্তু যখন তাহা ব্যক্তিগত আক্রমণের চরমসীমায় গিয়া পৌঁছিল, বন্ধুপ্রেমে মাতোয়ারা স্বয়ং দেবকুমার বাবুও উহা ক্ষমা করিতে পারেন নাই। তবে তিনি এজন্য দায়ী করিয়াছেন রবীন্দ্র-বন্ধুগণকে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ইহা যদি ভাবিতেন, বন্ধুগণের আঘাতের প্রত্যাঘাতের লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ হইতে যান কেন! কথাটা তা নয়। রবীন্দ্র ক্ষোভে অভিমানে লজ্জায় মরিয়া অন্তরঙ্গের আক্রমণ একান্তে পরিপাক করিতেছিলেন; আর সরল শিশুর ন্যায় অভিমানী দ্বিজেন্দ্রলাল উহা দাম্ভিকের অবজ্ঞা বোধে উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে আমরা হাড়ে হাড়ে চিনি। প্রখর প্রতিভা তাঁহার রসে টস্ টস্ তাজা কাঁচা হৃদয়টিকে কখনও মরুভূমি করিতে পারে নাই। মহিমার গুরুভার তাঁহার স্বাভাবিক চল চল শিশুর চাপল্য, তারল্য ও তারুণ্যকে এখনও জরাগ্রস্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বের রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকট আজিও সেই একই ব্যক্তি,—রঙ্গপ্রিয়, প্রেমে গরগর সদানন্দ পুরুষ। সহজ দুঃখে বাচাল; গভীর বেদনা মূক ও বধির। এমন চির আপনার যিনি—তাঁর ব্যক্তিগত আক্রমণে রবীন্দ্রনাথের নীরবতা কি অন্তরের অন্তরে ধ্বনিত করে নাই,—'Et Tu Brute!' রবীন্দ্র জানেন, দ্বিজেন্দ্র Cassius নহেন,—খাঁটি Brutus। বুঝি এ ভরসাও রবীন্দ্রের ছিল, তাঁর নীরবতা দ্বিজেন্দ্রের মুখরতাকে বশ করিতে পারিবে। হায়, রবীন্দ্রনাথ যদি সেই শুভ পরিণাম বন্ধুর বক্ষে বক্ষ মিলাইয়া অনুভব করিবার সুযোগ পাইতেন! তা না হোক। রবীন্দ্র প্রতিভার পূজারী, দ্বিজেন্দ্র তাই তাঁর প্রিয়—অদ্যাপি—এত অপ্রিয় ঘটনার পরও। "দ্বিজেন্দ্রলাল" গ্রন্থের মুখবন্ধে বন্ধু-বিচ্ছেদের কথা বলিতে গিয়া তাই রবীন্দ্রের মুখ ফুটে নাই,—বুক ফাটিয়াছে। তাই, বঙ্গভাষার অদ্ভুত যাদুকরের অব্যর্থ ইন্দ্রজালে বদ্ধ হইয়া পশ্চিম দেশের আঁধি বেচারী পূবের কাঁধে চাপিয়া আসল কথাটাকে শুধু চাপা দেয় নাই একেবারে উড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-চরিত্রের এ গূঢ় রহস্য যখন লোক-চরিত্রের সূক্ষ্মদর্শী পাঠক ও লেখক দ্বিজেন্দ্রের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইল, মহানুভব দ্বিজেন্দ্র তাঁহার ভ্রম প্রকাশ্যে সংশোধনের জন্য অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। এমন সময় সুদূর যুনানী সমাজকে আলোড়িত করিয়া বিশ্ববিস্ময়কারী রবীন্দ্রনাথের জয়-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। দেশ-ভক্ত গুণগ্রাহী দ্বিজেন্দ্রলাল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আনন্দে সম্ভ্রমে গর্ব্বে সেই বিজয়নাদের তালে তালে রবীন্দ্রের দিগ্বিজয় বা ভারতের জয় "ভারতবর্ষে" ঘোষণা করিয়া বিরোধ-নাট্যের যবনিকা ফেলিয়া দিলেন। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে গৃহপ্রত্যাবৃত্ত বিজয়ী বন্ধুকে প্রেমালিঙ্গনদানের অবসর আর তাঁর হইল না। কিন্তু তাঁহার শ্মশানে দুইটী বিচ্ছিন্ন হিয়ার যে মিলন-বাসর রচিত হইল, তার ভিত্তি আজিও অচল, অটল। দ্বিজেন্দ্রের চিতাভস্ম গোরোচনা ছড়াইয়া [illegible] ও শুচিতায় মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা কেহ যেন সে মিলন মন্দিরের শান্তিভঙ্গ না করি।

দ্বিজেন্দ্রলালের পানদোষ ও রঙ্গালয় আসক্তির প্রসঙ্গ

দ্বিজেন্দ্রলালের পানদোষ ও রঙ্গালয় আসক্তির প্রসঙ্গ এ গ্রন্থের আদৌ যোগ্য হয় নাই। দ্বিজেন্দ্র রচিত সুরার উপর কবিতাও এ গ্রন্থে আগাগোড়া উদ্ধৃত করিবার কোন কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। দেববাবুর কৈফিয়ৎ—তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে—দ্বিজেন্দ্রলাল শেষ-জীবনে সুরাপানের মাত্রা ঠিক রাখিতে পারেন নাই এইরূপ কি একটা কথা তাঁহাকে এ বিষয়ের আলোচনায় বাধ্য করিয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিও (রঙ্গালয় আসক্তি) কতকগুলি মিথ্যা জনরবের প্রতিবাদের জন্য লিখিত। অথচ দেব বাবুর নিজের উক্তির মত—এই শ্রেণীর নিন্দাবাদের প্রতিবাদ শুধু অনাবশ্যক নহে সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়। ইহার উপর আর কোন টীকা অনাবশ্যক।

উপসংহার

"দ্বিজেন্দ্রলাল" লিখিয়া দেবকুমারবাবু সাধারণের নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। দ্বিতীয়খণ্ড রচিয়া দ্বিজেন্দ্র রচনাবলীর আলোচনা করিবেন বলিয়া তিনি তাঁহার দেশবাসীকে আশান্বিত করিয়াছেন; তাঁহার সাধনা সিদ্ধি লাভ করুক। উপসংহারে বক্তব্য, যতকাল বঙ্গভাষা আছে, দ্বিজেন্দ্র থাকিবেন। যতদিন দ্বিজেন্দ্র আছেন, তাঁহার এই জীবনচরিত তাঁহার স্মৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্যে বিরাজ করিবে।

ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

দর্শনের মধ্যে ন্যায়দর্শন সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। দুরূহ হইলেও এই শাস্ত্রে পরিশ্রম না করিলে বিদ্যার পরিপুষ্টি জন্মে না এবং বিদ্বৎ-সমাজেও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। দুঃখপঙ্কনিমগ্ন সংসারী জীবের অশেষ কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরম কারুণিক মহর্ষি অক্ষপাদ, সূত্রাকারে বিবৃত ভাবে এই ন্যায়দর্শন লিপিবদ্ধ করেন। বেদের ন্যায় এই ন্যায়-বিদ্যাও যে বিশ্ব-স্রষ্টারই প্রথম আবিষ্কার, তাহা—"আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা—" ইত্যাদি ভাগবতের (৩।১২।৪৪) শ্লোক পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। জরন্নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টও ভাগবতের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া "ন্যায়মঞ্জরীর" প্রথমে লিখিয়াছেন যে,—অক্ষপাদের পূর্ব্বে বেদ-প্রামাণ্যের নিশ্চয়তা কিরূপে হইত, এরূপ শঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। কারণ, সৃষ্টির প্রথম হইতেই বেদের ন্যায় আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যারও প্রবর্ত্তন

হইয়াছিল। সংক্ষেপে বিস্তাররূপে সংস্কার করিয়াছেন বলিয়া মহর্ষি অক্ষপাদ প্রভৃতিকে সেই-সেই বিদ্যার কর্ত্তা বলা হয় (১)।

ন্যায়দর্শন যে সর্ববিদ্যার প্রদীপ স্বরূপ,—ন্যায়দর্শনের আলোচনা না করিলে বুদ্ধি যে মার্জ্জিত হয় না, ইহা নানা গ্রন্থে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয়-সিদ্ধি হয়। সেই প্রমাণের কথা একমাত্র ন্যায়দর্শনেই বিশদ ও বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদেশ নব্যন্যায়ের আলোচনার জন্য প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও পুস্তকের অভাব বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, গদাধর ভট্টাচার্য্যের পর হইতে সমগ্র গৌতমসূত্র, বাৎস্যায়নভাষ্য, ন্যায়বার্ত্তিক, তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি, প্রকাশ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ বিরল-প্রচার হইয়া পড়িয়াছে। এই গ্রন্থগুলির আলোচনা না করিয়া কেবল নব্যন্যায়ের মতবৈশিষ্ট্য-সকালীনপদ্ধতিও অনুগম অভ্যাস করিলে ন্যায়-শাস্ত্রপাঠের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না,—এ কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। নৈয়ায়িক গুরু মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রমুখ পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ, অচির প্রকাশিত "ন্যায়বার্ত্তিক" প্রভৃতি গ্রন্থ না দেখিলেও তাঁহারা স্বকীয় অসাধারণ প্রতিভা ও অসীম চিন্তাশীলতার প্রভাবে তত্তদ্‌গ্রন্থনিহিত তথ্যসমূহেও পরম ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের ন্যায় শক্তিশালী নৈয়ায়িক আর নাই; সুতরাং এখন প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

ভাষ্যগ্রন্থের মধ্যে বোধ হয় বাৎস্যায়ন ভাষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও দুরূহ। উদ্দ্যোতকর, বাৎস্যায়ন ভাষ্যের যে 'বার্ত্তিক' রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ন্যায়সূত্রেরও ব্যাখ্যা আছে। তিনি বহু স্থলে ভাষ্যকারের সম্মত ব্যাখ্যার খণ্ডন করিয়া স্বাধীন ভাবে অন্য প্রকারে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ষড়্‌দর্শন টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও "ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য-টীকা"য় উদ্দ্যোতকরের মত সমর্থন করিতে গিয়া ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং মনীষীর পরিশ্রম না করিলে প্রতিভাশালী নৈয়ায়িকও বাৎস্যায়ন ভাষ্যের সর্ব্বাংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিতে পারেন না। বড়ই সুখের বিষয় যে, অসীম শক্তিসম্পন্ন, খ্যাতনামা, শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় এই দুরবগাহ বাৎস্যায়ন ভাষ্যের সুবিস্তৃত বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থের প্রথমখণ্ড পাইয়াছি; 'নিবেদনে' দেখিলাম, অবশিষ্ট তিনখণ্ড শীঘ্রই বাহির হইবে। তর্কবাগীশ মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদনে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা অনুভব করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাঙ্গালাভাষায় অনেক দার্শনিক সন্দর্ভের অনুবাদ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত কোনও অনুবাদেই এরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় পাই নাই। এই গ্রন্থে প্রথমে গৌতমসূত্র ও তাহার বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, তার পর সেই অনুবাদকে বিশদ করিবার জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার পর তর্কবাগীশ মহাশয়, বাৎস্যায়ন-ভাষ্য ও তাহার সুস্পষ্ট বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি এবং অধ্যাপকের ন্যায় বক্তব্য বিষয় বুঝাইবার জন্য সুবিস্তৃত টিপ্পনী সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তর্কবাগীশ মহাশয় প্রতিভাবান্ প্রবীণ দার্শনিক, এই টিপ্পনীতে তাঁহার চিরজীবনের পরিশ্রমলব্ধ অনন্যসামান্য ব্যুৎপত্তি ও ভূয়োদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভাষ্যের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য তিনি এই টিপ্পনীতে উদ্দ্যোতকরের "ন্যায়বার্ত্তিক", বাচস্পতিমিশ্রের "তাৎপর্য্য" উদয়নাচার্য্যের "পরিশুদ্ধি" ও বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের "প্রকাশে"র সারাংশের ব্যাখ্যা নিবদ্ধ করিয়াছেন। বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে তর্কবাগীশ মহাশয়, গঙ্গেশোপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি, রঘুনাথের 'দীধিতি' 'দীধিতি'র জাগদীশী মাথুরী ও গাদাধরী টীকা, বৌদ্ধন্যায়, জৈনন্যায়, বেদান্ত, মীমাংসা, সাংখ্য প্রভৃতি গ্রন্থ-সন্দর্ভের সহিত ভাষ্যোক্ত পদার্থের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। অনেক স্থলে তিনি তাঁহার মার্জ্জিত স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে অনেক নূতন রহস্যও আবিষ্কার করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত টিপ্পনী পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, তর্কবাগীশ মহাশয় এই টিপ্পনী প্রণয়নে কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন।

'যৎ পুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং ন্যায়াভাসঃ স ইতি।'—এই ভাষ্য প্রতীকের অভিপ্রেত আগমবিরুদ্ধ অনুমানের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য টিপ্পনীতে লিখিত হইয়াছে,—

"কাপালিক সম্প্রদায় বলিতেন,—"নরশিরঃ কপালং শুচি, প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ, শঙ্খবৎ" অর্থাৎ মরামানুষের মাথার খুলি পবিত্র, যে হেতু তাহা প্রাণীর অঙ্গ, যেমন শঙ্খ। * * * কাপালিকগণ বৈদিক সম্প্রদায়কে বলিতেন যে, কেবল শাস্ত্র হইতেই ধর্ম্মাদি নির্ণয় হয় না, অনিন্দিত আচার হইতেও ধর্ম্মাদি নির্ণয় হয়, ইহা তোমরাও স্বীকার করিয়া থাক। তোমাদিগের মধ্যে দাক্ষিণাত্যদিগের যেমন 'আহ্নৈনেবুক' প্রভৃতি কর্ম্ম অনিন্দিত আচার বলিয়া শ্রেয়স্কররূপে অনুষ্ঠিত হয়, উহা তাহাদিগের অনিন্দিত আচার বলিয়াই ধর্ম্ম বলা হয়; তদ্রূপ আমাদিগেরও মরা মানুষের মাথার খুলিতে পান ভোজনাদি ব্যবহার-পরম্পরা অনিন্দিত আচার বলিয়া উহাতে আমরা প্রত্যবায় হয় বলিয়া মনে করি না, পরন্তু উহা আমাদিগের ধর্ম্ম। উদয়নাচার্য্য "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"তে এখানে বলিয়াছেন যে, যদি বৈদিক সম্প্রদায় বলেন যে, যাহা সার্ব্বত্রিক ব্যবহার, তাহা প্রমাণ হইতে পারে—যেমন কন্যাবিবাহে পুরন্ধ্রীগণের আচার। কিন্তু দেশবিশেষে তোমাদিগের অনুষ্ঠিত আচার প্রমাণ হইবে কেন? এইজন্যই কাপালিকগণ দাক্ষিণাত্যদিগের আচারকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। * * দাক্ষিণাত্যদিগের "আহ্নৈনেবুক" কর্ম্ম কি? এ সম্বন্ধে "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধির" "প্রকাশ" টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে—"কেহ বলেন, গোময়ময়ী দেবতা গঠন করিয়া দূর্ব্বাদির দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাহাতে জ্ঞাতিত্ব কল্পনাই দাক্ষিণাত্যদিগের "আহ্নৈনেবুক"। কেহ বলেন,—মঙ্গলবারে দধি-

---

(১) "নত্বক্ষপাদাৎ পূর্ব্বং কুতো বেদ প্রামাণ্যনিশ্চয় আসীৎ। অত্যল্পমিদ মুচ্যতে। * * * আদিসর্গাৎ প্রভৃতি বেদবদিমা বিদ্যাঃ প্রবৃত্তাঃ। সংক্ষেপ বিস্তরবিবক্ষয়া তু তাঁতাঁস্তত্র তত্র কর্ত্তৃন্ আচক্ষতে।"—ন্যায়মঞ্জরী, ৩ পৃষ্ঠা।

মন্থনা, কেহ বলেন,—একমাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ একমুষ্টি করিয়া তণ্ডুল কোন ভাণ্ডে তুলিয়া রাখিয়া মাসান্তে তদ্দ্বারা ঘৃতযোগে একখানা পিষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা দেবতার পূজা করাই দাক্ষিণাত্যদিগের "আষ্টেনৈবুক"। ফল কথা, মৈথিল বর্দ্ধমানও দাক্ষিণাত্যদিগের ঐ আচারটি কি, তাহা ঠিক করিয়া বলিয়া যাইতে পারেন নাই। "জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরে" 'হোলাকাধিকরণে' পাওয়া যায় যে, করঞ্জক প্রভৃতি স্থাবর দেবতার পূজাই "আষ্টেনৈবুক"। * *

"এখন প্রকৃত কথা এই যে, কাপালিকগণের পূর্ব্বোক্ত অনুমান শ্রুতিমূলক মন্বাদি স্মৃতিরূপ শব্দ প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া ন্যায়াভাস"। * * *

'গঙ্গেশে'র "তত্ত্বচিন্তামণির" হেত্বাভাস সামান্য-নিরুক্তির 'দীধিতি'তে রঘুনাথ শিরোমণি পূর্ব্বোক্ত অনুমানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐস্থলে ঐরূপ অনুমান হইতেই পারে না। কারণ, ঐ স্থলে ঐ অনুমান অপেক্ষায় বিরোধী শাস্ত্র প্রমাণ বলবত্তর কেন? ইহা বুঝাইতে সেখানে দীধিতির টীকাকার জগদীশ বলিয়াছেন যে, ঐ অনুমানে শুচিত্বরূপ সাধ্যপ্রসিদ্ধি প্রভৃতি একমাত্র শাস্ত্রের অধীন। সুতরাং ঐ অনুমানটী শাস্ত্রাধীন। তাহা হইলে ঐ অনুমান হইতে শাস্ত্রই সেখানে বলবৎ প্রমাণ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অনুমানকারী যে শঙ্খকে শুচি বলিয়া দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্রকেই তিনি প্রথমে আশ্রয় করিয়াছেন। শঙ্খের শুচিত্ব তিনি প্রতিবাদীকে শাস্ত্র ভিন্ন আর কোন্ প্রমাণের দ্বারা বুঝাইবেন? প্রতিবাদী যদি বলিয়া বসেন যে, শঙ্খও মৃত প্রাণীর অঙ্গ বলিয়া অশুচি, তাহা হইলে অনুমানকারী শাস্ত্রেরই শরণাপন্ন হইবেন। তাহা হইলে শাস্ত্রই তাঁহার ঐ অনুমানের মূলভূত। সুতরাং তিনি ঐ স্থলে শাস্ত্রকে বলবৎ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। * *" (৩৯ ৪২ পৃঃ)।

ধূম বহ্নির ব্যাপ্য অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহ্নি থাকে—এইরূপ জ্ঞান যাহার আছে, সেই ব্যক্তি কোন স্থানে ধূম দেখিলে 'ধূম থাকিলেই বহ্নি থাকে'—এইভাবে তাঁহার ব্যাপ্তি স্মরণ হয়। তাহার পর 'এই স্থান বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্', এইরূপ জ্ঞান হয়; এই জ্ঞানকেই নৈয়ায়িকেরা লিঙ্গ-পরামর্শ বলিয়াছেন। এই লিঙ্গ পরামর্শের পর 'এই স্থান বহ্নিমান্'—এইরূপ জ্ঞান জন্মে। ইহারই নাম অনুমিতি। লিঙ্গ-পরামর্শ অনুমিতির চরম কারণ বলিয়া 'ন্যায়-বার্ত্তিক'কার উদ্দ্যোতকর, উহাকেই অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। এই মতের সমর্থনের জন্য তর্কবাগীশ মহাশয়, "অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধ মনুমানং--" ইত্যাদি পঞ্চম সূত্রের টিপ্পনীতে অনেক চিন্তাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণ লিঙ্গ-পরামর্শকে ব্যাপার-রূপে নির্দ্দেশ করিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতির কারণ বলিয়াছেন,—'ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তিধীর্ভবেৎ'—(ভাষাপরিচ্ছেদ)। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ, "পক্ষতা"র প্রথমে স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—'করণব্যাপারতয়া সিদ্ধহেতুভাবস্তু পরামর্শস্য—"। কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয়, নব্য নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের লিপি হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নব্য ন্যায়ের মূল আচার্য্য গঙ্গেশ, কিন্তু "লিঙ্গ-পরামর্শ" শব্দের দ্বারাই অনুমান-প্রমাণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুমানত্ব বিষয়ে তাঁহার মত ও সমর্থন থাকিলেও গঙ্গেশ বহু স্থলেই উদ্দ্যোতকরের মত গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্দ্যোত-করের মতানুসারে তিনিও "লিঙ্গপরামর্শ"কে প্রধান অনুমান-প্রমাণ বলিতে পারেন। টীকাকারগণ তাহা না বলিলেও, গঙ্গেশ প্রথমে "লিঙ্গপরামর্শ" শব্দের দ্বারা অনুমান প্রমাণের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন-- ইহা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। পরবর্ত্তী প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "হেতু"কে অনুমান-প্রমাণ বলিলেও, ফলতঃ, তাঁহার মতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার "লিঙ্গপরামর্শ"ও অনুমান প্রমাণ বলিতে হইবে। * * * "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও লিখিয়াছেন,—"লিঙ্গপরামর্শোঽনুমান মিত্যাচার্য্যাঃ"। * * * বস্তুতঃ, যেখানে অতীত অথবা ভাবী হেতুর জ্ঞানপূর্ব্বক অনুমিতি জন্মে, সেখানে ঐ হেতুকে অনুমিতির করণ বলা যায় না। যাহা কার্য্যের পূর্ব্বের থাকে না, তাহা কারণই হইতে পারে না। * * সুতরাং অতীত ও ভাবী পদার্থ হেতু হইলে সেখানে উদয়নও "লিঙ্গপরামর্শ"কে অথবা তৎপূর্ব্বজাত "ব্যাপ্তিস্মরণ"কে অনুমান প্রমাণ বলিতেন।" (১৩৬ পৃঃ)।

"তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশোপাধ্যায়—"তৎকরণমনুমানং তচ্চ লিঙ্গ-পরামর্শো ন তু পরামৃশ্যমানং লিঙ্গমিতি বক্ষ্যতে।" (তত্ত্বচিন্তামণি, ২ পৃঃ)—এই ভাবে 'লিঙ্গপরামর্শ' শব্দের দ্বারা অনুমানের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেও, মথুরানাথ প্রভৃতি টীকাকারগণ, 'লিঙ্গপরামর্শ' শব্দের অর্থ যে এখানে 'ব্যাপ্তিজ্ঞান', তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন,—'লিঙ্গ পরামর্শঃ' ব্যাপ্তিজ্ঞানং, পরামর্শস্য ব্যাপারত্বাভাবেনাকরণত্বাৎ।"—(রহস্য, ১৯ পৃঃ) "তর্কভাষা"র 'ন্যায়প্রদীপ' টীকায় বিশ্বকর্ম্মাও লিখিয়াছেন, "মণিকৃন্মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানমনুমানমিতি।"---(৩৬ পৃঃ)। তন্মতে কেশব মিশ্র, স্বকৃত "তর্কভাষায়" উদ্দ্যোতকরের মতানুসারে, 'লিঙ্গপরামর্শকে'ই অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন - "লিঙ্গপরামর্শোঽনু-মানম্।" (৩৬ পৃঃ)। এখানে যে লিঙ্গপরামর্শের অর্থ ব্যাপ্তিজ্ঞান নহে, তাহা টীকাকার বিশ্বকর্ম্মা স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—"লীনমর্থং গময়তীতি লিঙ্গং তস্য পরামর্শস্তৃতীয়ঃ জ্ঞানং বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়মিত্যেব-মাকারকম্।" বিশ্বকর্ম্মা এই স্থানে আশঙ্কাপূর্ব্বক উদ্দ্যোতকরের মতের পরিষ্কারও করিয়াছেন (২)।

তর্কবাগীশ মহাশয় যে লিখিয়াছেন, উদয়নাচার্য্যও অতীত ও ভাবী পদার্থ হেতু হইলে 'লিঙ্গপরামর্শ'কে অথবা 'ব্যাপ্তিস্মরণ'কে অনুমান-

---

(২) "ননু লিঙ্গপরামর্শস্য চরমকারণত্বাৎ তস্য চ স্বোত্তরভাবি ভাবভূত কারণানপেক্ষত্বরূপত্বাদ্ ব্যাপারাভাবেন করণত্বাভাবাৎ কথ-মনুমানত্বমিতি চেৎ। ন। বার্ত্তিককারমতে যস্মিন্ সতি ক্রিয়া ভবত্যেব তস্যৈব করণত্বেন নির্ব্যাপারস্যাপ্যদোষত্বাদিতি।"—ন্যায় প্রদীপ, ৩৭ পৃষ্ঠা।

প্রমাণ বলিতেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, উদয়নাচার্য্য যে পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতি বর্ত্তমান পদার্থ হেতু হইলেও 'লিঙ্গপরামর্শ'কেই অনুমিতির করণ বলিতেন, তাহা বিশ্ববিশ্রুত নৈয়ায়িক জগদীশের লেখা হইতেও জানিতে পারা যায়। জগদীশ 'দীধিতির' 'অনুমানস্বরূপ' প্রকরণের টীকায় লিখিয়াছেন,—

"কার্য্যং মাত্রং প্রত্যকরণে পারিমাণ্ডল্যাদাবেবানুমিতি করণেতরত্বস্য প্রসিদ্ধিসেলিঙ্গাদাচার্য্যমতেঽপি তদ্ধেতুকানুমিতৌ পরামর্শস্যৈব করণত্বাদিতি দিক্।"

এই গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই তর্কবাগীশ মহাশয়, এই ভাবে নানা নূতন তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন এবং অনুসন্ধিৎসু সুধীগণকে অভিনব চিন্তার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলে কেবল যে বাৎস্যায়ন ভাষ্যের মর্ম্মই হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহা নহে; দর্শন-শাস্ত্রের বহু রহস্যও ইহার সহায়তায় জানিতে পারা যায়। "ভারতবর্ষে" স্থানাভাব, সুতরাং এই গ্রন্থের অন্যান্য উপযোগিতার বিষয় আলোচনা করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত হইতেছি।

বাৎস্যায়ন ভাষ্য প্রাচীন ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত আছে। এত দিন বিদ্যার্থিগণ, অন্ধপরম্পরা ন্যায়ে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষা দিতেন। এইবার তাঁহাদের ভাষ্যের অধ্যয়ন-ভীতি দূর হইল। অধিক কি, অনেক অধ্যাপকও এই গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হইবেন। মুদ্রিত গ্রন্থে ভাষ্যের বহু স্থানের পাঠই বিকৃত ছিল। তর্কবাগীশ মহাশয়, অসীম পরিশ্রমপূর্ব্বক প্রকৃত পাঠের আবিষ্কার করিয়া শাস্ত্রব্যবসায়িগণের পরম উপকার করিয়াছেন। "বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্" এইরূপ মহোপকারক গ্রন্থরত্নের প্রচার করিয়া সাধারণের অত্যন্ত ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা শীঘ্রই ইহার অবশিষ্ট তিন খণ্ড দেখিতে ইচ্ছা করি। প্রথম খণ্ড আট পেজী রয়াল সাইজে প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থের উপযোগিতা ও আকার হিসাবে ইহার মূল্যও অধিক বিবেচিত হইল না। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১৷৹, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২৷৹। আমরা শিক্ষিত সমাজে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

মনোহর চক্রবর্ত্তী বলিয়া একটি প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। দা'ঠাকুরের হোটেলে একটা হরি সঙ্কীর্ত্তনের দল ছিল; তিনি পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে তথায় আসিতেন। কিন্তু কোথায় থাকিতেন, কি করিতেন, জানিতাম না। এই মাত্র শুনিয়াছিলাম,—তাঁর না কি অনেক টাকা, এবং সকল দিক দিয়াই অত্যন্ত হিসাবী। কেন জানি না, আমার প্রতি তিনি নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়া একদিন নিভৃতে কহিলেন, "দেখুন শ্রীকান্তবাবু, আপনার বয়স অল্প,— জীবনে যদি উন্নতি লাভ করিতে চান, ত, আপনাকে এমন গুটি-কয়েক সৎপরামর্শ দিতে পারি, যাহার মূল্য লক্ষ টাকা। আমি নিজে যাঁহার কাছে এই উপদেশ পাইয়াছিলাম, তিনি সংসারে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, শুনিলে হয় ত অবাক্ হইয়া যাইবেন; কিন্তু সত্য। পঞ্চাশটি টাকা মাত্র ত মাহিনা পাইতেন; কিন্তু মরিবার সময় বাড়ী-ঘর, পুকুর-বাগান, জমি-জিরাত ছাড়া প্রায় দুটি হাজার টাকা নগদ রাখিয়া গিয়াছিলেন। বলুন ত, এ কি সোজা কথা! আপনার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে আমি নিজেও ত—"

কিন্তু নিজের কথাটা এইখানেই চাপিয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি মাহিনা পত্র ত মোটাই পান শুনি; কপাল আপনার খুব ভাল,—বর্ম্মায় এসেই ত এমন কারও হয় না; কিন্তু অপব্যয়টা কিরূপ করিতেছেন বলুন দেখি! ভিতরে-ভিতরে সন্ধান লইয়া দুঃখে আমার বুক ফাটিয়া যায়। দেখ্‌তেই ত পান, আমি কোন লোকের কথায় থাকি না; কিন্তু, আমার কথামত, বেশি নয়, দুটো বৎসর চলুন দেখি! আমি বল্‌চি আপনাকে, দেশে ফিরে গিয়ে চাই কি বিবাহ পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন।"

এই সৌভাগ্যের জন্য অন্তরে আমি এরূপ লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি,—এ তথ্য তিনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন জানি না; তবে কি না, তিনি ভিতরে-ভিতরে সন্ধান লওয়া ব্যতীত কাহারও কোন কথায় থাকেন না—তাহা নিজেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

যাই হোক, তাঁহার উন্নতির বীজ-মন্ত্র স্বরূপ সৎপরামর্শের জন্য লুব্ধ হইয়া উঠিলাম। তিনি কহিলেন, "দেখুন, দান-টান করার কথা ছাড়িয়া দিন,—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করিতে হয়,—এক-কোমর মাটি খুঁড়িলেও একটা পয়সা মিলে না! সে কথা বলি না; নিজের মুখে-রক্ত-উঠা কড়ি,—আজ-কালকার দুনিয়ায় এমন পাগল আর কেই বা আছে! নিজের ছেলে-পুলে, পরিবারের জন্য রেখে-থুয়ে তবে ত?—সে কথা ছেড়েই দিন, তা নয়; কিন্তু দেখুন,—যার সংসারে দেখ্‌বেন টানাটানি, কদাচ তেমন লোককে আমল দিবেন না। বেশি নয়, দু'চার দিন আসা যাওয়া করিয়াই নিজে হইতেই নিজের সংসারের কষ্টের কথা তুলিয়া দু' টাকা ধার চাহিয়া বসিবে। দিলে ত গেলই, তা' ছাড়া, বাহিরের ঝগড়া ঘরে টানিয়া আনা। দু' দু'টাকার মায়া কিছু আর সত্যিই কেহ ছাড়িতে পারে না,—তাগাদা করিতেই হয়। তখন হাটা-হাটি, ঝগড়া ঝাঁটি,—কেন, আমার তা'তে আবশ্যক কি বলুন দেখি!" আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "সত্যই ত!"

তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "আপনি ভদ্র সন্তান, তাই কথাটা চট্ করিয়া বুঝিলেন; কিন্তু এই ছোটলোক লোহা-কাটা ব্যাটাদের বুঝাও দেখি! হারামজাদা বেটারা সাত-জন্মেও বুঝিবে না। ব্যাটাদের নিজের এক পয়সা নাই, তবু পরের কাছে কর্জ করিয়া আর একজনকে টাকা আনিয়া দিবে,—এই ছোটলোক ব্যাটারা এমনি আহাম্মুক!"

একটু চুপ করিয়া কহিলেন, "তবেই দেখুন, কদাচ কাহাকেও টাকা ধার দিতে নাই। বলে, বড় কষ্ট! কষ্ট তা আমার কি বাপু! আর যদি সত্যই কষ্ট, ত দু' ভরি সোণা আনিয়া রাখিয়া যাও না, দিচ্চি দশ টাকা ধার! কি বলেন?"

বলিলাম, "ঠিক ত!"

তিনি বলিলেন, "ঠিক নয় আবার! একশ' বার ঠিক! আর দেখুন, ঝগড়া-বিবাদের স্থানে কখনো যাইবেন না। একজন খুন হয়ে গেলেও না। প্রয়োজন কি আমার? ছাড়াইতে গেলেও হয় ত দু'এক ঘা নিজের গায়েই লাগিবে; তা' ছাড়া, এক পক্ষ সাক্ষী মানিয়া বসিবে। তখন করো ছুটা-ছুটি আদালতে। বরঞ্চ, থামিয়া গেলে ইচ্ছা হয় এক-বার ঘুরিয়া এসো, দুটো ভাল-মন্দ পরামর্শ দাও—পাঁচজনের কাছে নাম হইবে। কি বলেন?"

একটু চুপ করিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "আর এই লোকের ব্যামো-স্যামোয়। আমি ত মশাই, গাড়া মাড়াই না। তখ্‌খনি বলিয়া বসিবে, দাদা মরি,—এ বিপদে দু' টাকা দিয়ে সাহায্য কর। মশাই, মানুষের মরণ বাঁচনের কথা বলা যায় না,—তাকে টাকা দেওয়া, আর জলে ফেলে দেওয়া এক—বরঞ্চ জলে দেওয়াও ভাল, কিন্তু সে ক্ষেত্রে না। না হয় ত বলিবে, এসো রাত্রি জাগিতে। আচ্ছা মশাই, আমি যাবো তার অসুখে রাত্রি জাগিতে, কিন্তু এই বিদেশ-বিভুঁয়ে আমার কিছু একটা মা শীতলা না করুন, এই নাক কাণ মলচি মা!" বলিয়া তিনি হাসিয়া তিনি নাকে একবার হাত ঠেকাইয়া লইয়া হাতে নিজের দুই কাণ মলিয়া একটা নমস্কার করিয়া ফেলিলেন, আমরা সবাই তার চরণেই ত পড়িয়া আছি বলিয়া মনে দেখি, সে বিপদে আমায় দেখে কে?"

এবার আমি আর সায় দিতে পারিলাম না। আমাকে মৌন দেখিয়া তিনি মনে মনে বোধ করি একটু দ্বিধায় পড়িয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি বড়লোকদের? তারা কখ্‌খনো ওরূপ স্থানে যায় কি? কখ্‌খনো না। নিজের একটা কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে বস্! হয়ে গেল! তার তাদের উন্নতিটা একবার চেয়ে দেখুন দেখি! তার পরে ভাল হ'লে, আবার যেমন মেলা-মেশা, সব তেমনি। মশাই, কারুর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কখনো যাইতে নাই।"

আফিসের বেলা হইতেছে বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। এই প্রাজ্ঞের সাধু পরামর্শের বলে এ বয়সে যে খুব বেশি মানসিক উন্নতি হওয়া আমার সম্ভবপর, তাহা নহে। এমন কি, মনের মধ্যে খুব বেশি আন্দোলনও উঠিল না। কারণ, এরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তির একান্ত অভাব পল্লীগ্রামেও অনুভব করি নাই; এবং অপরাপর দুর্নাম তাঁহাদের যতই থাকুক, পরামর্শ দিতে কার্পণ্য করেন, এ অপবাদও শুনি নাই। এবং এ পরামর্শ যে সুপরামর্শ, তাহা সামাজিক জীবনে তত না হোক, পারিবারিক জীবনে, জীবন-যাত্রার কার্য্যে যে অবিসম্বাদী সাধু উপায়, তাহা দেশের লোক মানিয়া লইয়াছে। বাঙালী গৃহস্থ-ঘরের কোন ছেলে যদি অক্ষরে-অক্ষরে ইহা প্রতিপালন করিয়া চলে, তাহাতে বাপ-মা

অসন্তুষ্ট হন,—বাঙালী পিতা-মাতার বিরুদ্ধে এত বড় মিথ্যা বদনাম রটনা করিতে পুলিসের সি-আই-ডির লোকেরও বোধ করি বিবেকে বাধে। সে যাই হৌক, কিন্তু এই প্রাজ্ঞতার ভিতরে যে কত বড় অপরাধ ছিল, সপ্তাহ-দুই গত না হইতেই, ভগবান ইহাঁরই সাহায্যে আমার কাছে প্রমাণ করিয়া দিলেন।

সেই অবধি অভয়ার বাড়ীর দিকে আর যাই নাই। তাহার সমস্ত অবস্থার সহিত তাহার কথাগুলা মিলাইয়া লইয়া, আগাগোড়া জিনিষটা জ্ঞানের দ্বারা এক রকম করিয়া দেখিতে পারিতাম—সে কথা সত্য। তাহার চিন্তার স্বাধীনতা, তাহার আচরণের নির্ভীক সততা, তাহাদের পরস্পরের অপরূপ ও অসাধারণ স্নেহ আমার বুদ্ধিকে সেই দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত, ইহাও ঠিক; কিন্তু তবুও আমার আজন্মের সংস্কার কিছুতেই সে দিকে পা বাড়াইতে চাহিত না। কেবলই মনে হইত, আমার অন্নদা দিদি এ কাজ করিতেন না। কোথাও দাসীবৃত্তি করিয়া লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখের ভিতর দিয়াও বরঞ্চ তাঁর বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতেন; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখের পরিবর্ত্তেও,—যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই,—তাহার সহিত ঘর করিতে রাজী হইতেন না। আমি জানিতাম, তিনি ভগবানে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার সেই সাধনার ভিতর দিয়া তিনি পবিত্রতার যে ধারণা, কর্ত্তব্যের যে জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলেন,—সে কি অভয়ার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির মীমাংসার কাছে একেবারে ছেলে-খেলা?

অভয়ার একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িল। তখন ভাল করিয়া সেটা তলাইয়া বুঝিবার অবকাশ পাই নাই। সে দিন সে কহিয়াছিল, "শ্রীকান্তবাবু, দুঃখ ভোগ করার মধ্যে একটা মারাত্মক মোহ আছে। মানুষে বহুযুগের জীবনযাত্রায় এটা দেখিয়াছে যে, কোন বড় ফলই বড় রকম দুঃখ-ভোগ ছাড়া পাওয়া যায় না। তার জন্ম-জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা আজ এই ভ্রমটাকে একেবারে সত্য বলিয়া জানিয়াছে যে, জীবনের মানদণ্ডে এক দিকে যত বেশি দুঃখের ভার চাপানো যায়, আর এক দিকে তত বড় সুখের বোঝা গাদা হইয়া উঠিতে থাকে। তাই ত মানুষ যখন সংসারে সহজ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটুকু স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করিয়া, তপস্যা করিতেছি মনে করিয়া, নিরাহারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন যে তাহার জন্য কোথাও না-কোথাও চতুর্গুণ আহার্য্য সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—এ বিষয়ে না তাহার নিজের, না আর কাহারও মনে তিলার্দ্ধ সংশয় উত্থিত হয়। এই জন্যই সন্ন্যাসী যখন নিদারুণ শীতে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া, এবং ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে রৌদ্রের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড করিয়া, মাটিতে মাথা এবং আকাশে পা করিয়া বসিয়া থাকে, তখন তাহার দুঃখ-ভোগের কঠোরতা দেখিয়া, দর্শকের দল শুধু যে দুঃখই ভোগ করে না তাহা নয়, একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার ভবিষৎ আরামের অসম্ভব বৃহৎ হিসাব খতাইয়া প্রলুব্ধ চিত্ত তাহাদের ঈর্ষ্যাকুল উঠে। এবং ওই পা-উঁচু ব্যক্তিটাই যে সংসারে ধন্য, এবং নরদেহ ধারণ করিয়া সেই যে সত্যকার কায করিতেছে, এবং তাহারা কিছুই করিতেছে না, বৃথায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে,—এই বলিয়া নিজেদের সহস্র ধিক্কার দিতে-দিতে মন খারাপ করিয়া বাড়ী যায়। শ্রীকান্তবাবু, সুখের জন্য দুঃখ স্বীকার করিতে হয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে উল্টাইয়া লইয়া যেমন করিয়া হোক্ কতকগুলা দুঃখ ভোগ করিয়া গেলেই যে সুখ আসিয়া স্কন্ধে ভর করে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ইহকালেও সত্য নয়, পরকালেও সত্য নয়।"

আমি বলিতে গেলাম, "কিন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য—" অভয়া আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, "বিধবার আচরণ বলুন,—তার সঙ্গে ব্রহ্মের বিন্দুবিসর্গ সম্বন্ধ নাই। বিধবার চাল-চলনটাই যে ব্রহ্মলাভের উপায়, আমি তাহা মানি না। বস্তুতঃ ওটা ত কিছুই নয়। কুমারী-সধবা-বিধবা যে-কেহ তাহার নিজের-নিজের পথে ব্রহ্ম লাভ করিতে পারে। বিধবার চাল-চলনটাই সে জন্য একচেটে করিয়া রাখা হয় নাই।"

আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম, "বেশ, না হয় তাই। তাদের আচরণটাকে ব্রহ্মচর্য্য না হয় নাই বল্লেন। নামে কি আসে যায়?"

অভয়া রাগ করিয়া বলিয়াছিল, "নামই ত সব, শ্রীকান্ত-বাবু। কথা ছাড়া আর দুনিয়ায় আছে কি? ভুল নামের ভিতর দিয়া মানুষের বুদ্ধির, চিন্তার, জ্ঞানের ধারা যে কত বড় ভুলের মধ্যে চালনা করা যায়, সে কি আপনি জানেন না? ওই নামের ভুলেই ত সকল দেশে, সকল যুগে বিধবার

চাল-চলনটাকেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ভেবে এসেচে। ইহাই নিরর্থক ত্যাগের নিষ্ফল মহিমা শ্রীকান্তবাবু—একেবারে ব্যর্থ, একেবারে ভুল। মানুষকে ইহ-পরকালে পশু ক'রে দেবার এতবড় ছায়াবাজি আর নেই।" তখন আর তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলাম। বস্তুতঃ, তর্ক করিয়া পরাস্ত করা তাহাকে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। প্রথম যখন জাহাজে পরিচয় হয়, তখন ডাক্তারবাবু শুধু তাহার বাহিরটাই দেখিয়া তামাসা করিয়া বলিয়াছিলেন, মেয়েটি ভারি forward; কিন্তু তখন দু'জনের কেহই ভাবি নাই,—এই forward কথাটার অর্থ কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে! এই মেয়েটি যে তাহার সমস্ত অন্তরটাকে পর্য্যন্ত কিরূপ অকুণ্ঠিত তেজে বাহিরে টানিয়া আনিয়া সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে মেলিয়া ধরিতে পারে, লোকের মতামত গ্রাহ্যও করে না,—তখন তাহার ধারণাও আমাদের ছিল না। অভয়া ত শুধু তাহার মতটাকে মাত্র ভাল প্রমাণ করিবার জন্যই কথা-কাটা-কাটি করিত না,—সে তাহার নিজের কাজটাকে সবলে জয়ী করিবার জন্যই যেন যুদ্ধ করিত। তাহার মত এক রকম—কাজ আর এক রকম ছিল না বলিয়াই বোধ করি অনেক সময়ে তাহার মুখের উপর জবাব খুঁজিয়া পাইতাম না,—কেমন এক রকম থতমত খাইয়া যাইতাম; অথচ, বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মনে হইত, এই ত বেশ উত্তর ছিল! যাই হৌক্, তাহার সম্বন্ধে আজও যে আমার মনের দ্বিধা ঘুচে নাই, এ কথা ঠিক। যতই আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতাম,—এ ছাড়া অভয়ার আর কি গতি ছিল,—ততই মন যেন তাহারই বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত। যতই নিজেকে বলিতাম, তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবার লেশমাত্র অধিকার আমার নাই,—ততই যেন অব্যক্ত বিতৃষ্ণায় অন্তর ভরিয়া উঠিত। আমার মনে পড়ে, এম্নি একটা কুণ্ঠিত অপ্রসন্ন মন লইয়াই আমার দিন কাটিতেছিল বলিয়া, না পারিতাম তাহার কাছে যাইতে, না পারিতাম তাহাকে একেবারে দূরে ফেলিয়া দিতে।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন সহরের মাঝখানে প্লেগ আসিয়া তাঁহার ঘোমটা খুলিয়া কালো মুখখানি বাহির করিয়া দেখা দিল। হায় রে! তাহাকে সমুদ্রপারে ঠেকাইয়া রাখিবার লক্ষ-কোটী যন্ত্র-তন্ত্র, কর্ত্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতম সতর্কতা—সমস্তই একমুহূর্ত্তে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মানুষের আতঙ্কের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। অথচ, সহরের চৌদ্দআনা লোকই হয় চাক্‌রী-জীবী, না হয় বাণিজ্য-জীবী। একেবারে দূরে পলাইবারও যো নাই,—এ যেন রুদ্ধ ঘরের মাঝখানে অকস্মাৎ কে ছুঁচোবাজি ছুড়িয়া দিল। ভয়ে এ-পাড়ার মানুষগুলো স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পোঁট্‌লা-পাঁটলি ঘাড়ে করিয়া ও-পাড়ায় ছুটিয়া পলায়; আর ও-পাড়ার মানুষগুলো ঠিক সেই সব লইয়া এ পাড়ায় ছুটিয়া আসে। 'ইঁদুর' বলিলে আর রক্ষা নাই। সেটা মরিয়াছে কি মরে নাই, তাহা শুনিবার পূর্ব্বেই লোকে ছুটিতে সুরু করিয়া দেয়। মানুষের প্রাণগুলা যেন সব গাছের ফলের মত প্লেগের আবহাওয়ায় এক রাত্রেই পাকিয়া উঠিয়া বোঁটায় ঝুলিতেছে,—কাহার যে কখন্ টুপ্ করিয়া খসিয়া নীচে পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তাই নাই। সে দিনটা ছিল শনিবার। কি একটা সামান্য কাজের জন্য সকালেই বাহির হইয়াছি। সহরের মধ্যে একটা গলির ভিতর দিয়া বড় রাস্তায় পড়িতে দ্রুতপদে চলিয়াছি,—দেখি, অত্যন্ত জীর্ণ পুরাতন একটা বাটীর দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছেন প্রাজ্ঞ মনোহর চক্রবর্ত্তী।

হাত নাড়িয়া বলিলাম, সময় নাই। তিনি একান্ত অনুনয়ের সহিত কহিলেন, "দু' মিনিটের জন্য একবার উপরে আসুন শ্রীকান্তবাবু, আমার বড় বিপদ!"

কাজেই সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপরে উঠিতে হইল। আমি তাই ত মাঝে-মাঝে ভাবি, মানুষের প্রত্যেক চলা-ফেরাটি পর্য্যন্ত কি একেবারে ঠিক করা! নইলে, আমার কাজও গুরুতর ছিল না, এ গলিটার মধ্যেও আর কখনো প্রবেশ করি নাই। আজ সকালেই বা এখানে আসিয়া হাজির হইলাম কেন?

কাছে গিয়া বলিলাম, "অনেক দিন ত আমাদের ও-দিকে যান নি,—আপনি কি এই বাড়ীতেই থাকেন?" তিনি বলিলেন,—"না মশাই, আমি দিন-বারো তেরো এসেচি। একে ত মাসখানেক থেকে ডিসেণ্ট্রিতে ভুগ্‌চি, তার ওপর আমাদের পাড়ায় হ'ল প্লেগ। কি করি মশাই, উঠ্‌তে পারিনে, তবু তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।"

বলিলাম, "বেশ করেছেন।"

তিনি বলিলেন, "বেশ করলে কি হবে মশাই,—আমার

combined hand ব্যাটা ভয়ানক বজ্জাত। বলে কি না, চলে যাবো! দিন দেখি ব্যাটাকে আচ্ছা করে ধম্‌কে।”

একটু আশ্চর্য্য হইলাম। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এই combined hand বস্তুটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। কারণ, যাঁহাদের জানা নাই যে পয়সার জন্য হিন্দুস্থানী জাতটা পারে না এমন কাজই সংসারে নাই, তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই ইংরাজি কথাটার মানে হইতেছে দুবে, চৌবে, তেওয়ারি প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের দল। এখানে যাঁহাদের ‘চৌকার’ ধারে গেলেও লাফাইয়া উঠে, তাহারাই সেখানে রসুই করে, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজে, তামাক সাজে এবং বাবুদের আফিসে যাইবার সময় জুতা ঝাড়িয়া দেয়, তা বাবুরা যে জাতই হোক। অবশ্য দু'টাকা বেশি মাহিনা দিয়া, তবেই এই ত্রিবেদী-চতুর্ব্বেদী প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিকে চাকর ও বামুনের function একাধারে combine করিতে হয়। মূর্খ উড়িয়া বা বাঙালী বামুনদের আজিও এ কাজে রাজী করা যায় নাই, গিয়াছে শুধু ইহঁাদেরই। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পয়সা পাইলে কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে হিন্দুস্থানীয় একমুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। (মুর্গী রাঁধাইতে আরও চারআনা, আটআনা মাসে অতিরিক্ত দিতে হয়। কারণ, মনের দ্বারাই সমস্ত পরিশুদ্ধ হয়, শাস্ত্রের এই বচনাঙ্কের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে, এবং এই শাস্ত্র-বাক্যে অবিচলিত আস্থা রাখিতে আজ পর্য্যন্ত যদি কেহ পারিয়া থাকে, ত, এই হিন্দুস্থানীরা—এ কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।)

কিন্তু, মনোহর বাবুর এই combined handকে আমি কেন ধমক্ দিতে যাইব, আর সেই বা কি জন্য আমার ধমক্ শুনিবে, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। এই হাওটি মনোহর বাবুর নূতন। এতকাল তিনি নিজের combined hand নিজেই ছিলেন,—শুধু ডিসেন্ট্রির খাতিরে অল্প-দিন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনোহর বাবু বলিতে লাগিলেন, “মশাই, আপনি কি সহজ লোক! সহর শুদ্ধ লোক আপনার কথায় মরে-বাঁচে, তা কি আর জানিনে ভাব্‌চেন। বেশি নয়, একটি ছত্র যদি লাটসাহেবকে লিখে দেন, ত, ওর যে চোদ্দবচ্ছর জেল হয়ে যাবে, সে কি আমি শুনিনি? দিন ত ব্যাটাকে বেশ কোরে শাসিত কোরে।”

কথা শুনিয়া আমি যেন দিশেহারা হইয়া গেলাম। যে লাটসাহেবের নামটা পর্য্যন্ত শুনি নাই,—তাঁহাকে, বেশি নয়, মাত্র একটা ছত্র চিঠি লিখিলেই, একটা লোকের চৌদ্দ-বৎসর কারাবাসের সম্ভাবনা,—আমার এত বড় অদ্ভুত শক্তির কথা এত বড় বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়া, কি যে বলিব, আর কি যে করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। তথাপি তাঁহার বারম্বার অনুযোগ ও পীড়াপীড়িতে অগত্যা সেই হতভাগ্য combined handকে শাসন করিতে রান্না-ঘরে ঢুকিয়া দেখি, সে একটা অন্ধকূপের ন্যায় অন্ধকার।

সে প্রভুর মুখে আমার ক্ষমতার বহর শুনিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া হাত-জোড় করিয়া জানাইল যে, এ বাড়ীতে ‘দেও’ আছে, এখানে সে কোন মতেই থাকিতে পারিবে না। কহিল, নানা প্রকারের ‘ছায়া’ রাত্রিদিন ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাবু যদি আর কোন বাড়ীতে যান, ত, সে অনা-য়াসে চাকুরি করিতে পারে, কিন্তু এ বাড়ীতে –

যে অন্ধকার ঘর তা ‘ছায়া’র আর অপরাধ কি! কিন্তু ছায়ার জন্য নয়, একটা বিশ্রী পচা গন্ধ ঢুকিয়া পর্য্যন্তই আমার নাকে লাগিতেছিল; জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ দুর্গন্ধ কিসের রে?”

Combined hand কহিল, “কোই চুহা-উহা সড়্‌ল হোগা।” চমকাইয়া উঠিলাম। “চুহা কিরে? এ ঘরে মরে না কি?”

সে হাতটা উল্টাইয়া তাচ্ছল্য ভরে জানাইল যে, প্রত্যহ সকালে অন্ততঃ ৫।৬ টা করিয়া মরা ইঁদুর সে বাহিরের গলিতে ফেলিয়া দেয়।

কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু পচা ইঁদুরের সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু তবুও আমার গাটা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল; এবং কিছুতেই মন খুলিয়া লোকটাকে সদুপদেশ দিতে পারিলাম না যে, পীড়িত বাবুকে একা ফেলিয়া পালানো তাহার উচিত নয়।

শোবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মনোহর বাবু খাটের উপর বসিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে পাশে বসাইয়া তিনি এ বাড়ীর গুণের কথা বলিতে লাগিলেন,—এমন অল্প ভাড়ায় সহরের মধ্যে এত ভাল বাড়ী আর নাই; এমন ভদ্র বাড়ীআলাও আর নাই, এবং এরূপ প্রতিবেশীও সহজে মিলে না। পাশের ঘরে যে চার-পাঁচজন মাদ্রাজী খৃষ্টান ‘মেস্’ করিয়া বাস করে,

তাহারা যেমন শিষ্ট-শান্ত, তেমনি অমায়িক। একটু ভাল হইলেই এই বামুন ব্যাটাকে তাড়াইয়া দিবেন, তাহাও জানাইলেন। হঠাৎ বলিলেন, "আচ্ছা মশাই, আপনি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন?" বলিলাম, "না।"

তিনি বলিলেন, "আমিও না; কিন্তু কি আশ্চর্য্য মশাই, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লাম, আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছি। আর জেগে উঠেই দেখি, ডানপায়ের কুঁচ্‌কি ফুলে উঠেচে! সত্যি-মিথ্যে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন না মশাই, তাড়সে জ্বর পর্য্যন্ত হয়েছে।" শুনিয়াই আমার মুখ কালী হইয়া গেল। তার পরে কুচ্‌কিও দেখিলাম, গায়ে হাত দিয়া জ্বরও দেখিলাম।

মিনিটখানেক আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিয়া, শেষে বলিলাম, "ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠান্‌নি কেন, শীঘ্র পাঠান্‌!"

তিনি কহিলেন, "মশাই, যে দেশ,—এখানে ডাক্তারের ফি'ত কম নয়! আনলেই ত চার পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল! তা' ছাড়া আবার ওষুধ! সেও ধরুন প্রায় দু'টাকার ধাক্কা।"

বলিলাম, "তা হোক্‌, ডাক্‌তে পাঠান।"

"কে যাবে মশাই? তেওয়ারী ব্যাটা ত চেনেই না। তা' ছাড়া, ও গেলে রাঁধবেই বা কে!"

"আচ্ছা আমিই যাচ্চি" বলিয়া ডাক্তার ডাকিতে আমি নিজেই বাহির হইয়া গেলাম।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া আমাকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, "ইনি আপনার কে?"

বলিলাম, "কেউ না।" এবং কি করিয়া আজ সকালে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাও খুলিয়া বলিলাম।

ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, "এঁর কোন আত্মীয় এখানে আছে?" বলিলাম, "জানি না। বোধ হয় কেউ নেই।"

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, "আমি একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্চি; মাথায় বরফ দেওয়াও দরকার; কিন্তু সব চেয়ে বেশী দরকার এঁকে প্লেগ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া। আপনি থাক্‌বেন না এ ঘরে—আর দেখুন, আমাকে ফিস্‌ দেবার দরকার নাই।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে, আমি বহু সঙ্কোচের পর হাসপাতালের প্রস্তাব করিতেই, মনোহর কাঁদিতে লাগিলেন। সেখানে বিষ দিয়া মারিয়া ফেলে, সেখানে গেলে কেউ কখনো ফিরে না—এমনি কত কি।

ঔষধ আনিতে পাঠাইবার জন্য তেওয়ারীর সন্ধান করিয়া দেখি, combined hand তাহার লোটা-কম্বল লইয়া ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে প্রস্থান করিয়াছে। সে বোধ করি ডাক্তারের সহিত আমার আলোচনা দ্বারের অন্তরাল হইতে শুনিতেছিল। হিন্দুস্থানী আর কিছু না বুঝুক, 'পিলেগ' কথাটা ভার বুঝে।

তখন আমাকেই যাইতে হইল ঔষধ আনিতে। বরফ, আইস ব্যাগ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই কিনিয়া আনিয়া হাজির করিলাম। তাহার পরে রহিলাম, আমি আর তিনি, তিনি আর আমি। একবার আমি দিই তাহার মাথায় আইস ব্যাগ তুলিয়া, একবার সে দেয় আমার মাথায় আইস ব্যাগ তুলিয়া। এই ভাবে ধস্তাধস্তি করিয়া বেলা চটা বাজিয়া গেলে, তবে সে নিস্তেজ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। মাঝে মাঝে তাহার চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়, আবার মাঝে মাঝে সে বেশ জ্ঞানের কথাও বলে। অপরাহ্নের কাছাকাছি সে ক্ষণকালের জন্য সচেতন ভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, "শ্রীকান্ত বাবু, আমি আর বাঁচব না।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন সে বহু চেষ্টায় কোমর হইতে চাবি লইয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, "আমার তোরঙ্গের মধ্যে তিনশ' গিনি আছে,- আমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকানা আমার বাক্স খুঁজ্‌লেই পাবেন।"

আমার একটা সাহস ছিল, পাসের 'মেস'টা। তাহাদের সাড়া-শব্দ, চাপা কণ্ঠস্বর প্রায়ই শুনিতে পাইতেছিলাম। সন্ধ্যার পর একবার তাহাদের একটু বেশি রকম নড়া-চড়ার গোলমাল আমার কানে আসিয়া পৌঁছিল; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যেন মনে হইল, তাহারা দরজায় তালা বন্ধ করিয়া কোথায় যাইতেছে। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তাই বটে,—সবাই দ্বারে তালা ঝুলিতেছে। বুঝিলাম, তাহারা বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তবুও কেমন মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল।

এদিকে আমার ঘরের লোকটি উত্তরোত্তর যে সকল

কাণ্ড করিতে লাগিলেন, সে সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি, তাহা রাত্রে একাকী বসিয়া উপভোগ করিবার মত বস্তু নয়। ওদিকে রাত্রি বারোটা বাজিতে চলিল, কিন্তু পাশের ঘর খোলার সাড়াও পাই না, শব্দও পাই না। মাঝে-মাঝে বাহিরে আসিয়া দেখি, তালা তেমনি ঝুলিতেছে। হঠাৎ চোখে পড়িয়া গেল যে, কাঠের দেয়ালের একটা ফুটা দিয়া ও-ঘরের তীব্র আলো এ-ঘরে আসিতেছে। কৌতূহল-বশে সেই ছিদ্রপথে চোখ দিয়া তীব্র আলোকের যে হেতুটা দেখিলাম, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গের রক্ত হিম হইয়া গেল। সুমুখের খাটের উপর দু'জন যুবা পাশাপাশি বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রা দিতেছে, আর শিয়রে খাটের বাজুর উপর একসার মোম বাতি জ্বলিয়া-জ্বলিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম, রোমান ক্যাথোলিকরা মৃতের শিয়রে আলো জ্বালিয়া দেয়। সুতরাং এ দুজনের ঘুম যে হাজার ডাকাডাকিতেও আর ভাঙিবে না, এবং এমন হৃষ্টপুষ্ট সবলকায় লোক দুটির এত অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িবার হেতুটা যে কি, সমস্তই এক মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলাম।

এ-ঘরেও আমাদের মনোহর বাবু প্রায় আরও ঘণ্টা দুই ছট্‌ফট্ করিয়া তবে ঘুমাইলেন। যাক্, বাঁচা গেল।

কিন্তু তামাসাটা এই যে, যিনি জানা-শুনা লোকের পীড়ার সংবাদে পাড়া মাড়াইতে নাই বলিয়া আমাকে সেদিন বহু উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁরই মৃত দেহটা এবং গিনি-পোরা বাক্সটা পাহারা দিবার জন্য ভগবান আমাকেই নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

তা' যেন দিলেন, কিন্তু বাকি রাত্রিটুকু আমার যে ভাবে কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইবার আমার সাধ্যও নাই, প্রবৃত্তিও হয় না। তবে, মোটের উপর যে ভাল কাটে নাই, এ কথা বোধ করি কোন পাঠকই অবিশ্বাস করিবেন না।

পরদিন death-certificate লইতে, পুলিশ ডাকিতে, টেলিগ্রাফ করিতে, গিনির সুব্যবস্থা করিতে এবং মড়া বিদায় করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। যাক্, মনোহর ত ঠেলা-গাড়ী চড়িয়া বোধ করি বা স্বর্গেই রওনা হইয়া পড়িলেন,—আমিও বাসায় ফিরিলাম। আগের দিন একাদশী করিয়াছি—আজও অপরাহ্ন। বাসায় ফিরিয়া মনে হইল, আমার ডান কাণের গোড়াটা যেন ফুলিয়াছে, এবং ব্যথা করিতেছে। কি জানি, সমস্ত রাত্রি নিজেই টিপিয়া-টিপিয়া বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিলাম, কিম্বা সত্য-সত্যই গিনির হিসাব দিতে স্বর্গে যাইতে হইবে—হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু এটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পরে যাই হোক্, সম্প্রতি জ্ঞান থাকিতে-থাকিতে নিজের বিলি-ব্যবস্থাটা নিজেই করিয়া ফেলিতে হইবে। যেহেতু, আইস-ব্যাগ লইয়া টানাটানি করাটা সঙ্গতও নয়, শোভনও নয়। স্থির করিতে দেরি হইল না। কারণ, চক্ষের পলকে দেখিতে পাইলাম, এত বড় বিশ্রী ব্যামোর ভার কোন পুণ্যাত্মা সাধু লোকের উপর নিক্ষেপ করিতে গেলে, নিশ্চয়ই আমার গুরুতর পাপ হইবে। ভাল লোককে বিব্রত করা কর্ত্তব্য নহে,—অশাস্ত্রীয়! সুতরাং তাহাতে কাজ নাই। বরঞ্চ, সেই যে রেঙ্গুনের আর একপ্রান্তে অভয়া বলিয়া একটা মহা পাপিষ্ঠা, পতিতা নারী আছে,—এতদিন যাহাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি,—তাহারই কাঁধের উপর এই মারাত্মক পীড়ার বিশ্রী বোঝাটা ঘৃণাভরে নামাইয়া দিয়া আসিগে। মরিতে হয় সেই মরুক্। হয় ত তাহাতে কিছু পুণ্য-সঞ্চয়ও হইয়া যাইতে পারে! এই বলিয়া চাকরকে গাড়ী ডাকিয়া আনিতে হুকুম করিয়া দিলাম।

(ক্রমশঃ)

মোগল-সম্রাট্ আক্‌বর

রাণী দুর্গাবতী ; জৌনপুর বিদ্রোহ ; মীর্জ্জা-বিদ্রোহ

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বংশপরম্পরা শোণিতধারায় যে সংস্কার প্রবাহিত হয়, পৃথ্বিজঠরে-সুপ্ত বীজের ন্যায় সময়-সুযোগ পাইলেই তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তৈমুর ও বাবরের বংশধর ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিলেও,—পূর্ব্বপুরুষগণের দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতি, লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি ও দিগ্বিজয়বাসনা, নীতি-সংযম-সভ্যতার সুশাসন অতিক্রম করিয়া, সময় সময় আক্‌বরের উপর অপরিহার্য্য প্রভাব বিস্তার করিত।

এতদিন তিনি যে সকল যুদ্ধব্যাপারে ব্রত ছিলেন, তাহা আত্মরক্ষণ ধর্ম্মানুগত,—বঞ্চিত স্বাধিকার পুনরুদ্ধারকল্পে; কিন্তু এখন হইতে প্রায় তাঁহার সকল সমরোদ্যমই দিগ্বিজয়-লালসা ও লুণ্ঠন-পিপাসা-চালিত। আক্‌বর বলিতেন,—'দিগ্বিজয় রাজধর্ম্ম। সম্রাট্‌কে নিশ্চিন্ত-নিদ্রায় অভিভূত দেখিলে প্রতিবেশী রাজন্যগণ অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় সে ঘুমঘোর ভাঙ্গাইয়া দেয়।' (*Ain*, iii, ৩৯৯)

পিতৃরাজ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবার পর যুবক সম্রাটের বিজয়দৃপ্ত দৃষ্টি তদানীন্তন স্বাধীন রাজ্যসমূহের অভিমুখে ধাবিত হইল। আব্দুল মজীদ্ আসফ্ খাঁ কর্ত্তৃক ইতঃপূর্ব্বে বুন্দেলখন্দ প্রদেশের পান্নারাজ্য অধিকৃত হইয়াছে; কিন্তু উহার পার্শ্বদেশে গণ্ড্‌ওয়ানা রাজপতাকা এখনও দম্ভভরে উড্ডীয়মান। রাণী দুর্গাবতী তখন (১৫৬৪ খ্রীঃ) এই স্বাধীন রাজ্যের অধীশ্বরী।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যে সকল সম্রাট্-সম্রাজ্ঞী প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ উদিত হইয়াছিলেন, রাণী দুর্গাবতী তাঁহাদিগের অন্যতমা। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি যে সকল রাজগুণ সিংহাসনের ভূষণ, অমিততেজসম্পন্না, অপরূপ রূপলাবণ্যবতী এই রমণীতে সে সকলেরই পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল। রাজপুতদিগের চন্দেল শাখায় রাণী দুর্গাবতীর জন্ম। ইঁহার পিতা রাজা শালিবাহন্ বংশ-গরিমায় শ্রেষ্ঠ হইলেও দারিদ্র্যনিবন্ধন হীনবংশীয় গণ্ড্-ওয়ানা রাজপুত্র দলপতকে কন্যাদান করেন। সাত বৎসর রাজত্বের পর দলপৎ সমগ্ররাজ্য ও পঞ্চমবর্ষীয় শিশু বীর-নারায়ণকে দুর্গাবতীর হস্তে অর্পণ করিয়া লোকান্তর যাত্রা করিলেন। দুঃসহ শোক ভুলিয়া রাণী শিশুপুত্রের প্রতিনিধি-স্বরূপে অনন্যমনে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

সঞ্চিত ধন-ধান্য-রত্নে, সুশাসনে এবং বহুল প্রজাহিতকর অনুষ্ঠানে গণ্ড্‌ওয়ানা রাজ্য তৎকালে ভারতবিশ্রুত ছিল। রাজ্যে ব্যাঘ্রভীতি হইলে মৃগয়াপ্রিয় রাণী স্বহস্তে তাহাকে বধ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। অস্ত্রচালনে বা রাজনৈতিক চক্র উদ্‌ঘাটনে রাণীর বহিশ্চক্ষু এবং অন্তশ্চক্ষু দুই-ই শ্যেনদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল। অধর কায়েৎ নামে জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ইঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিল। রাণী তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষ স্নেহ করিতেন।

মোগলযুগে বিন্ধ্যাচল পাদসংলগ্ন গণ্ড্‌ওয়ানা রাজ্য (বর্ত্তমান মধ্য-প্রদেশের উত্তরাংশ) গড়-কটঙ্গ, গড়-কটক বা গড়-মণ্ডলা নামে অভিহিত হইত। সপ্ততি সহস্র গ্রাম-বিশিষ্ট এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বহু দুর্ভেদ্য দুর্গে সুরক্ষিত; সহস্র রণহস্তী ও বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী রাণীর বাহিনীভুক্ত ছিল। এই সুশাসিত, সুরক্ষিত নারীরাজ্যের বিচিত্র বলবীর্য্য ঐশ্বর্য্যকাহিনী আক্‌বরের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হয় নাই; কিন্তু এতদিন তাঁহার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। এখন তাঁহার আশা ফলবতী হইয়াছে;—সম্রাট্ গড়-কটঙ্গ আক্রমণের আদেশ প্রচার করিলেন।

কিন্তু সিংহীর গুহায় প্রবেশ করিতে হইবে; আসফ্ খাঁ অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মালবরাজ বাজ বহাদুর ও মিয়ানা আফ্‌গানদিগের সহিত এই দুর্দ্ধর্ষ রমণীর একাধিকবার বল পরীক্ষা হইয়াছে; প্রতিবারেই তাঁহারা লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়াছেন। আসফ্ প্রথমে তাঁহার দুরভি-সন্ধি গোপন করিয়া রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী গ্রামসমূহে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। রাণীর সৈন্যগণ মোগলের লুণ্ঠনবৃত্তি হইতে নিজনিজ গৃহপরিবার রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছত্রভঙ্গ

হইয়া পড়িল। এই অবসরে সহসা একদিন দস্যু আসিয়া রাজদ্বারে রণডঙ্কা বাজাইল। তখন মোগলের অভিপ্রায় আর প্রচ্ছন্ন রহিল না।

আসন্ন রণোল্লাসে দুর্গাবতীর হৃদয় নাচিয়া উঠিল;- বীরবালা উৎসাহে সমরসাজ গ্রহণ করিলেন। সেই সময় অধর আসিয়া সংবাদ দিল যে, বাহিনী ছত্রভঙ্গ—পঞ্চশত সৈন্য মাত্র ভরসা! কিন্তু রাজপুত রমণীর রণোৎসাহ তাহাতে দমিল না। কোনরূপে দুইসহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজমাতা নিঃশঙ্কচিত্তে শত্রুসিন্ধু মন্থন করিতে অগ্রসর হইলেন। যে অবধি না আরও কিছু সৈন্য সংগ্রহ হয়, রাণীর কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে ততদিন যুদ্ধে নিরস্ত থাকিয়া কোন নিরাপদ স্থান আশ্রয় করিতে মিনতি করিলেন। দুর্গাবতী গৌড় ও নর্ম্মদা নদীর মধ্যবর্ত্তী ভীষণ অরণ্যময় নর্হী গিরিসঙ্কট আশ্রয় করিয়া রহিলেন। সংবাদ পাইয়া মোগল-বাহিনী নর্হী অভিমুখে ছুটিল।

সম্রাট্‌ সৈন্য নর্হী আক্রমণ করিলে রাণী সমবেত অধিনায়কগণকে বলিলেন, 'যদি বলসঞ্চয়ের আশায় এখনও যুদ্ধে বিরত হইতে হয়, তাহা হইলে এস্থানও ত্যাগ করা উচিত। তিনি কাহাকেও বাধা প্রদান করিবেন না; কিন্তু মোগলভয়ে আর কতদিন লুকাইয়া থাকিতে হইবে? তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞা যুদ্ধ। হয় জয়, নয় মৃত্যু—এ দুই ব্যতীত এ যুদ্ধের আর তৃতীয় পরিণাম নাই।' পঞ্চ সহস্র সেনা রাণীর সহিত প্রাণ-বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইল।

পরদিন সংবাদ আসিল যে, ভীষণ যুদ্ধের পর গিরিসঙ্কট-মুখ সম্রাট্‌-সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। দুর্গাবতী আর কালবিলম্ব করিলেন না। শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্ম পরিধান করিয়া অবিলম্বে সৈন্যচালনা করিলেন এবং যুদ্ধার্থ-অধীর সৈন্যদলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "স্থির হও! আর অগ্রসর হইও না। শত্রু সৈন্য গিরিসঙ্কটে প্রবিষ্ট হইলে এখনই বিনষ্ট হইবে। রণকুশলা রাণীর অনুমানই ঠিক হইল। উদ্ধত মোগলবাহিনী পর্ব্বতসঙ্কটে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণপণ পরাক্রমে যুঝিল; কিন্তু রণোন্মত্তা রাণীর অমানুষী বিক্রমে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

বিজয়ী সেনা পলায়নপর মোগলের পশ্চাদ্ধাবন করিল। দিনশেষে রাণীর সমুজ্জ্বল ললাটে শেষ গৌরব-মালা পরাইয়া গণ্ডওয়ানা-সূর্য্য চিরাস্তমিত হইলেন। রাণী নায়কগণকে বলিলেন,—"মোগলকে অবসর দেওয়া উচিত নহে। আজই, নৈশ-আক্রমণে অবশিষ্ট সম্রাট্‌-সৈন্য নিঃশেষে নির্ম্মূল না করিলে কালই প্রভাতে কামানসহ বিপুল বাহিনী আসিবে। পর্ব্বতঘাটে কামান স্থাপন করিলে আমাদের পরাজয় নিশ্চিত।" রণ-ক্লান্ত নায়কগণ নীরবে, নতমুখে দণ্ডায়মান রহিল। রাণী নিরুৎসাহে রণস্থল ত্যাগ করিলেন, এবং সে রাত্রি আহতের শুশ্রূষা ও শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান করিয়া শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে ক্রুদ্ধগর্জ্জনে গিরিভূমি কম্পিত করিয়া মোগলের কামান রাজপুতকে রণে আহ্বান করিল। রণহস্তী 'সারমানে' আরূঢ়া হইয়া রাজমাতা অবিলম্বে রণভূমে অবতীর্ণ হইলেন।

বীরবর বীরনারায়ণ এখন বয়ঃপ্রাপ্ত যুবা;—দুর্দ্ধর্ষবিক্রমে মোগল সৈন্য মথিত করিতে লাগিলেন। শৈলমূলে সিন্ধু যেরূপ প্রতিহত হয়, সেইরূপ তিনবার মোগলের আক্রমণ ব্যর্থ হইল; কিন্তু তৃতীয়বারে বীরনারায়ণ আহত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনশত সৈন্যমাত্র অবশিষ্ট। দুর্গাবতী বুঝিলেন, বিজয়াশা আর নাই। রাজ্যের ভাবী ভরসা বংশধরকে নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়া, প্রাণবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্পা রাণী প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। মোগল বুঝিল যে, এ মূর্ত্তিমতী মহাশক্তি জীবিত থাকিতে যুদ্ধে জয়াশা নাই। সহসা নিয়তি-প্রেরিত শরের ন্যায় এক তীক্ষ্ণ তীর আসিয়া রাণীর চক্ষু ও কর্ণের মধ্যবর্ত্তী ললাট-ভাগে বিদ্ধ হইল। দুর্গাবতী যুঝিতে-যুঝিতে এক হস্তে তাহা আকর্ষণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে অন্য শর আসিয়া তাঁহার কণ্ঠে বিদ্ধ হইল। রাণী এ শরও নিজকরে মুক্ত করিলেন; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার চেতনা হৃত হইল। মূর্চ্ছাভঙ্গে রাণী দেখিলেন, সকলই শেষ হইয়াছে; রণস্থল শত্রু-কোলাহলপূর্ণ; রক্তমোক্ষণে শরীর একান্ত অবসন্ন, এখনই হয় ত মোগল-হস্তে বন্দী হইতে হইবে। অধর তাঁহার অগ্রভাগে বসিয়া হস্তিচালনা করিতেছিল। রাণী তাহাকে বলিলেন, "তোমায় অনেক স্নেহযত্নে পালন করিয়াছি। আশা ছিল, একদিন তুমি আমার উপকার করিবে। আজ আমি যুদ্ধে পরাজিত। ভগবান্‌ করুন, মোগলহস্তে বন্দী হইয়া যেন আমার

নাম কলঙ্কিত, কুলমান কলুষিত না হয়। অধর! আজ আমার এই দুর্দ্দিনে তোমার প্রভুভক্তির পরিচয় দাও। এই শাণিত ছুরিকা লও—আমায় মুক্তিদান কর!"

প্রভুভক্ত ভৃত্য এ নির্দ্দয় আদেশে মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, "মা, চিরদিন যে হস্ত তোমার স্নেহের অজস্র দান অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এ কঠোর কার্য্য সে কেমন করিয়া করিবে? মা, যদি তোমার অনুমতি পাই, আমি এখনও এই বিশ্বস্ত বাহন, বায়ুগতি হস্তি-সাহায্যে তোমাকে এ মৃত্যুক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করিতে পারি।"

অধরের এই মমতাময় কথায় রাজমাতার নয়নে রোষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। দৃপ্তস্বরে অধরকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন,—"আমার অপমানই তবে তোমার কামনা?" তেজস্বিনী রাজমাতা আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিলেন না। করধৃত শাণিত ছুরিকা আপনি আপন বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া গণ্ড্‌ওয়ানা-ভাগ্যলক্ষ্মী চিরতরে চক্ষু মুদিত করিলেন।* মোগলের জয় হইল। গণ্ড্‌ওয়ানা-রাজপতাকা ধূলায় দলিত হইল; রাজ্যে রক্তস্রোত বহিল, হাহাকার উঠিল!

যে দুর্ল্লভ ধনরত্নরাজি মোগলের দুর্জ্জয় লোভ উদ্রিক্ত করিয়াছিল, সে সমস্তই রাণীর রাজধানী চৌরাগড়ে (বর্ত্তমান নরসিংহপুর জেলায়) গুপ্তভাণ্ডারে রক্ষিত; সুতরাং দুই মাস পরে আসফ্ খাঁ চৌরাগড় দুর্গ আক্রমণ করিলেন। বীরনারায়ণ অসীম বিক্রম প্রকাশ করিয়া রণশায়ী হইলেন। একদিকে বিজয়গর্ব্বিত মোগল দুর্গাধিকার করিল; অন্যদিকে রাজপুতের চিরগৌরব জৌহর ব্রতের অনুষ্ঠান হইল। বিশালকায় মহাচিতা প্রজ্বলিত করিয়া রাজপুত-কুলাঙ্গনাগণ হাস্যাননে প্রফুল্ল অনলে প্রাণাহুতি দিয়া সম্রাটের গৌরব-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিলেন।

শত্রুর লেখনী যাঁহার অজস্র গুণগান করিয়া তৃপ্ত হয় নাই, সেই অসামান্যা বীর্য্যবতী রমণীকে পরাস্ত ও তাঁহার আশাতীত সম্পদ হস্তগত করিয়া আসফ্ খাঁ উদ্ধতগর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। মালববিজয়ী আধম্ খাঁর ন্যায় সম্রাটের অধীনতা তাঁহার দারুণ অরুচিকর হইয়া উঠিল। দুইশত হস্তী ব্যতীত লুণ্ঠন দ্রব্যসমূহের আর কিছুই তিনি সম্রাট্‌কে অর্পণ করিলেন না; কিন্তু সুচতুর আক্‌বর আপাততঃ এ স্পর্দ্ধিত তাচ্ছিল্যে দৃষ্টিক্ষেপমাত্র করিলেন না; কারণ, দর্পিত আভিজাত্যকে দমন করিবার মত সৈন্যবল তাঁহার ছিল না, এবং সমগ্র রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া এখনও অমোঘ প্রয়োগোপযোগী হয় নাই। রাজত্বের প্রথমাবস্থায় বিদ্রোহী অভিজাতবর্গ সম্বন্ধে সম্রাট্‌কে সময়ে-সময়ে যে ক্ষমাশীল মহানুভবতার পরিচয় দিতে দেখা যায়, তাহাতে রাজনৈতিক কপটতা ভিন্ন, প্রকৃত আন্তরিকতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। মনোভাব গোপনে আক্‌বর অদ্বিতীয় ছিলেন।

আক্‌বরের জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনা উজ্‌বেগ্ ভ্রাতৃদ্বয় আলী কুলী ও বাহাদুরের বিদ্রোহ (১৫৬৫ খ্রীঃ)। এই উজ্‌বেগ্ জাতি আক্‌বরের বংশগত শত্রু, এবং জঘন্য পাপাচার; অস্বাভাবিক ব্যভিচারাসক্ত বলিয়া আক্‌বর ইহাদিগকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। এই নৈতিক মহাব্যাধি মধ্যে-মধ্যে সম্রাটের সভাসদ্‌গণের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া পড়িত। বদায়ূনীর বন্ধু জলাল্ খাঁ কুরচীর নাম এইরূপ কুক্রিয়ারত বলিয়া ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে (*A. N.*, ii, 403-4)। এই পাপাচার সম্রাটের গোচর হইলেই যে তিনি তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিতেন, ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার কথা, সন্দেহ নাই।

ভারত-সিংহাসন অধিকারকল্পে যে সকল অধিনায়ক হুমায়ূন এবং আক্‌বরকে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অভিজাতবর্গরূপে সুশৃঙ্খল সাম্রাজ্যের গৌরব বর্দ্ধনাপেক্ষা স্বাধীন নৃপতির ভূমিকা অভিনয় করিবার ব্যগ্রতায় সময়-সময় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেন।

খান্ জমান্ (আলী কুলী) একজন উচ্চাঙ্গের সৈনিক ছিলেন। পানিপথে হীমুর পরাজয়কল্পে ইহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া সম্রাট্ ইহাকে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করেন; কিন্তু আলী ও তদ্‌ভ্রাতা বাহাদুর অতীব দুর্ব্বিনীত এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন। বারবার বিদ্রোহী হইয়া সম্রাটের বশ্যতাস্বীকার এবং পুনঃ-পুনঃ

* রাণী দুর্গাবতী সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা *J. A. S. B.* (1837, VI, 621) স্লিমান্ (Sleeman) সাহেবের সুন্দর প্রবন্ধ; *Asiatic Researches* (XV, 436) Capt. Fell প্রকাশিত গড়-মন্দলা উৎকীর্ণ লিপির অনুবাদ; আবুল-ফজলের 'আকবরনামা' (ii, 323-23) ও *Central Province Gazetteer*—Grant পাঠ করিবেন।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেন। ইঁহাদের শেষ চেষ্টা—আক্‌বরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কাবুল-অধিপতি কুমার মুহম্মদ হকীম্‌কে ভারত-সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চক্রান্ত। হকীম্‌ সহজেই প্রলুব্ধ হইয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন; তাঁহার নামে 'খুৎবা' পাঠ করা হইল।

ভ্রাতার গর্হিত আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্‌ স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিলেন (১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দ, নভেম্বর)। ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে লাহোর পৌঁছিয়া সম্রাট্‌ শুনিলেন যে, হকীম্‌ ইতঃপূর্ব্বেই সিন্ধুপারে পলায়ন করিয়াছেন।

পঞ্জাবে অবস্থানকালে সম্রাট্‌ আগ্রা হইতে খান্‌ খানান্‌ মুনিম্‌ খাঁর পত্রে অবগত হইলেন যে, তাঁহার দূর-আত্মীয় মুহম্মদ সুলতান্‌ মীর্জ্জা ও উলুগ্‌ মীর্জ্জার পুত্রেরা বিদ্রোহ করিয়াছে। এই বিদ্রোহ-দমনের আয়োজনার্থ অবিলম্বে আক্‌বরকে পঞ্জাব ত্যাগ করিতে হইল।

আক্‌বর এইবার উজ্‌বেগ্‌ ভ্রাতৃদ্বয় আলী কুলী ও বহাদুরকে নির্ম্মূল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মে মাসের (১৫৬৭) প্রারম্ভে আগ্রা ত্যাগ করিলেন। এলাহাবাদের এক গ্রামে সম্রাট্‌-সৈন্যের সহিত বিদ্রোহীদলের চরম সংঘর্ষ হইল। আলী কুলী নিহত এবং বহাদুর বন্দী হইয়া মস্তক-দানে দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

উকিলের ভাগ্য

[শ্রীকিরণবালা দেবী]

১

কোলের ছেলেটীকে কাছে বসিয়ে সুকুমারী তৈল মাখিবার জন্য অন্যমনে চুলের আধখানা বিনুনী খুলিতেই, ঝি এসে বলিল,—"হ্যাঁ গা মা, ন'টা বেজে গেল, বাজার হবে না? ঘরে চাল যে একেবারে বাড়ন্ত,—কাল তো নিজেই দেখেছো!" ইতিমধ্যে শ্রীমান্‌ পটল মায়ের তেলের বাটীটি উপুড় করে, তেল নিয়ে নিপুণভাবে ঘরের মেজে আরও পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত। "ঐ যা! খোকা সব তেলটা ঢেলে ফেল্লে, কি দুরন্ত ছেলে গা!" ব'লে তাড়াতাড়ি মাতা ছেলেকে সরিয়ে দিয়ে, সেই মৃত্তিকা-লিপ্ত তেল তুলিবার ব্যর্থপ্রয়াস পাইতে-পাইতে বলিলেন,—"তুমিই তো ঝি ভাঁড়ার দাও; আমি তো কাল দেখেছি চাল বাড়ন্ত,—যে ভুলো মন, ছাই সব ভুলেই গিইছি, দেখি দাঁড়াও।" প্রকৃত কথা, মনে সবই ছিল; স্বামীর মনিব্যাগ যে একেবারেই শূন্য, তাহা তাঁ'র অবিদিত ছিল না। তবে তিনি সকালে কয়েকটা টাকা ধার ক'রে যদি পান, তা'থেকে সব আনা হবে, এই আশা ছিল। দুশ্চিন্তায়, অন্যমনস্কতা হেতু, এতটা বেলা যে হইয়াছে, সেটা সে বুঝিতে পারে নাই। এখনই ছেলে-মেয়ে কয়েকটীকে যে ভাত দিতে হইবে! বেচারীরা সকালে এক-একখানা বাসি রুটী গুড় দিয়ে খেয়ে আছে। সুকুমারী ছেলেটী কোলে ক'রে আঁচলটা মাথার উপর দিয়ে, ম্লান মুখে স্বামীর বসিবার ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; অতি সঙ্কুচিতভাবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ গা, কিছু পেলে কি?" সুশীলবাবু কোন জবাবই করিলেন না;—কথাটা তাঁর কাণে যে পৌঁছিয়াছে, তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। টেবিলের উপরিস্থিত একখানা সংবাদপত্রের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ব'সে ছিলেন,—মনটা যে তাঁর মোটেই সেখানে ছিল না, সেটা তাঁর মুখের ভাবেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল।

খোকা যখন আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, সঙ্গে-সঙ্গে মাতার করুণ স্বর "আহা বাছা আমার, চোখ যে লাল হ'য়ে গেছে," সেই সময়ে হঠাৎ তিনি মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি হ'ল?" মাতা ছেলের চোখে কাপড়ের ভাপ দিতে-দিতে বলিলেন, "এ দুরন্ত ছেলের সঙ্গে কি পারবার যো আছে? দেখতে-না-দেখতে একটা অনর্থ বাধিয়ে বসে। বাটীশুদ্ধ তেল চক্ষের পলকে ঢেলে ফেলে, এখন সেই হাত চোখে দিয়েছে; চোখ জ্বালা ক'রবে না?" বলিয়া তিনি আরও নিবিষ্ট মনে ছেলের চোখে ফুঁ দিতে লাগিলেন। "হাতটা ভাল ক'রে ধুয়ে-পুঁছে দাও, নৈলে আবার চোখে তেল যাবে? ওদের দুরদৃষ্ট না হলে আমার ঘরে আস্‌বে কেন?

এ বয়সে ঢালা-ফেলা এই সব কাজের দিকেই তো ঝোঁক বেশী, সেই জন্যই ওদের বেশী সতর্ক ক'রে রাখতে হয়।" বলিয়া তিনি সস্নেহে পুত্রকে কোলে নিতে-নিতে বলিলেন,—"আজকের উপায় কি? কারু কাছে তো একটা আধলাও পেলাম না; এখন কি করা যায়? এ ভাবে ছেলেপিলে নিয়ে অনাহারে মরতে হবে দেখ্‌ছি। একটা কাজকর্ম্ম, মাম্‌লা-মকর্দ্দমা কিছুই নেই, কি ক'রে চ'ল্‌বে! বাকি ফিসের ৩০্ টা টাকা পাওনা আছে,—তাও তো আজ নয়, কাল যদি পাই।" বলিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুকুমারী কাপড়ের খুঁটটা পাকাইতে-পাকাইতে শঙ্কিত মনে আস্তে আস্তে বলিলেন, "ভাঁড়ারে চাল বাড়ন্ত, আনাজপাতিও কিছু নেই,—ছেলেদের জলখাবারের রুটীর আটাও আন্‌তে হবে। আমার বাক্সে মাত্র দুই আনা পয়সা আছে।"

স্বামীর বর্ত্তমান অবস্থায় এই দারুণ অপ্রীতিকর কথাগুলি বলিবার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না; কিন্তু না বলিলেও চলে না। স্বামী আরও মনে কষ্ট বেশী পাইবেন, এই জন্যই সে অত ভয়ে-ভয়ে এক নিশ্বাসে কথাগুলি শেষ করিয়া আবার পূর্ব্ব কার্য্যে মন দিল। কথাগুলি অস্পষ্ট হইলেও উকিল শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার লাহিড়ীর কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না!

পিতামাতার এইরূপ নিস্পন্দ ভাবটা শ্রীমান্ পটলচন্দ্রের মোটেই মনঃপূত না হওয়ায়, সে উচ্চ হাসির লহর তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, মা ভালি দুত্তু; মা তাছে দাব না, তোমা তাছে থাত্‌বো!" বলিয়া যেন মস্ত কাজ করিয়াছেন, এইভাবে পিতামাতা উভয়েরই মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। ছেলের মুখপানে চাহিয়া দুজনেরই মুখে হাসি ও চক্ষুপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু ভাসিয়া উঠিল।

আবার কাংস্য-কণ্ঠে ঝির চড়া আওয়াজ শুনা গেল,—"কৈ গো, একেবারে যে বাগের মাসী হ'লে! দশটা বাজ্‌লো, কলের জলশুদ্ধ চ'লে গেল; রবিবারের বাজার তোমার-আমার জন্যে ব'সে থাক্‌বে না কি? আজ মাছ আর পাওয়া তো যাবেই না; এই বোশেক মাসের রোদে এতটা পথ কখন যাব, কখন আস্‌বো; তোমাদের বাপু কোন হুঁসই নেই।" একাদিক্রমে ৫ বৎসর আছে,—তাতে ২টী ছেলে-মেয়েও মানুষ ক'রেছে; কাজেই ঝি'র কথাবার্ত্তায় একটু জোর ছিল। লোক সে মন্দ ছিল না। মনিবের উপর মায়া, দয়া, একটা আন্তরিক টানও যে না ছিল, তা নয়।

খোকাকে স্ত্রীর কোলে দিয়ে আবার আল্‌নার উপর থেকে চাদরখানা কাঁধে ফেলিতেই, সুকুমারী অতর্কিতে স্বামীর হাত থেকে চাদরখানা যথাস্থানে রাখিতে-রাখিতে বলিল, "এই রোদের ভেতর অনির্দ্দিষ্টভাবে আবার কার দুয়ারে যাবে? এই তো একবার ঘুরে এলে! সে হবে না।" স্ত্রীর মুখপানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সুশীলবাবু পুনরায় আল্‌নার দিকে হাত বাড়াইতে-বাড়াইতে বলিলেন, "দেখি একবার মন্মথর বাড়ী থেকে ঘুরে আসি,—যদি সেখানে কিছু পাই। অন্ততঃ একটা টাকা পেলেও আজকের দিনটা কোন মতে চ'লে যেতে পারে।" "কিছুতে আর এই রোদে অত দূরে তোমায় আমি যেতে দিব না।" বলিয়া স্বামীর পায়ের গোড়ায় ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সুকুমারী চলিয়া গেল।

"ঝি, আজ রবিবার—উনি মাছ খাবেন না বল্লেন। অনেক বেলা হ'য়ে গেছে, বুড় মানুষ আর বাজারে নাই বা গেলে! সাম্‌নের মুদি দোকান থেকে আজকের মত চা'ল, মুসুরীর ডা'ল, আর ছেলেদের জলখাবারের রুটীর ময়দা এনে দাও; কয়েকটা আলু আছে, এবেলা তাতেই হবে। এখনকার মত এই দু' আনা মুদিকে দিয়ে বলো,—ভাঙ্গানো হ'লে কাল তার পাওনা চুকিয়ে দোব।"

বড় ছেলে সুধাংশু নিজের পাঠ শেষ করিয়া, নিকটেই উঠানে তার বহু আয়াসলব্ধ কয়েকটা ফুলের গাছের চারা ও কয়েকটা পাতাবাহারের ডালের গোড়ার মাটী আল্‌গা করিয়া দিবার চেষ্টায়, এবং পাতাবাহারের ডালগুলি ভাল লাগিয়াছে কি না তাহাই নিবিষ্ট মনে পর্য্যবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত ছিল; মাতার কথাগুলি সবই তার কাণে গেল; দশ বছরের ছেলে হইলেও নিজেদের আর্থিক অবস্থা সে সবই বুঝিত। সেখান থেকেই সে বলিয়া উঠিল,—"মা, আমার মানিবক্সে আনা বার পয়সা আছে।" সস্নেহে পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া মাতা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পয়সা কি ক'রে পেলে বাবা?" "কেন, স্কুলে জলখাবারের জন্যে তো তুমি এক মাসের টাকা দাও; শনি, রবি দু'দিনের দু' আনা ক'রে তো আমার খাবারের দরকার হয় না, সেইটা আমার জমা থাকে।" পুত্রের মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পয়সাগুলি দিতে বলিয়া, সুকুমারী গালে হাত দিয়ে সেই

খানেই দাঁড়াইয়া রহিল। বালকের এই বয়সে এতখানি মিতব্যয়িতা ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জানিয়া আনন্দাশ্রুতে তাহার দুই চক্ষু ভরিয়া উঠিল। পুত্র হাসিমুখে তার সযত্ন-সঞ্চিত পয়সাগুলি মাতার হস্তে দিয়া নিজেকে যেন কত কৃতার্থ মনে করিয়া, নিজ আরব্ধ কার্য্যে চলিয়া গেল।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস জোরে ফেলিয়া পরদিন সুশীলবাবু যখন নোটে ও নগদে ৩০৲টা মুদ্রা স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন, "ওগো, এই নাও, তবুও তো দিন কত রাত্রে ঘুমুতে পাব!" স্মিত মুখে টাকাগুলি বাক্সে তুলিতে-তুলিতে সুকুমারী বলিল, "তুমি বড্ড বেশী-বেশী ভাব,—আজকাল তোমার মেজাজও ঠিক থাকে না; কিছু বল্‌তে গেলে যে রকম রেগে ও'ঠ, তাতে আমি কিছু ব'ল্‌তেও সাহস পাই না। বৃথা ভেবে-ভেবে শরীরটা মাটী ক'রে কি হ'বে? যাক্, আমি খুব সাবধানে এই দিয়ে চালাবার চেষ্টা করবো।"

কিন্তু তার পর দিনই দেখা গেল,—অনেক গুলি রৌপ্য-চাক্তিই বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার সংখ্যা অতি অল্পই।

অত্যন্ত অভাবের পর,—সে যে বিষয়ই হোক না কেন, সেটার সংখ্যার হিসাব তখন মনে আসে না, তখনকার মত অনেকটা শান্তিই আনিয়া দেয়। মাস-কাবারের সঙ্গে-সঙ্গে মৌমাছির মত যখন পাওনাদারের দল ঝুঁকিয়া পড়িল, হিসাবের খাতায় বাকীর জেরটা সুস্পষ্ট হইয়া চোখের সামনে দেখা দিতেই, সুশীলবাবুর মনে আরও আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। মাসকাবারে সকলকেই কিছু-কিছু দিবেন বলিয়া তিনি যে তখনকার মত তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় ক্রমাগত তাহাদের ফিরাইয়াছেন; তখন বোধ হয় তাঁহার ব্যবসায়ের উপরে অনেকটা ভরসা ছিল। ২।১টা "কেস্" কোন্ নাই পাইবেন,—যাহাতে সংসার-খরচ বাদে সকলকেই কিছু কিছু দিতে পারিবেন! কিন্তু সে আশাটা তাঁর শেষে আকাশ-কুসুমেই পরিণত হইয়াছিল। এক সঙ্গে বাড়ীভাড়া, বাকী দুধের দাম, চালের দাম মিলাইয়া অঙ্কের ঘর বেশ ভরিয়া উঠিয়াছিল।

ধারে চালওয়ালা আর দোকানে উঠিতে তো দেয়ই নাই, উপরন্তু কতকগুলি অম্লমধুর কথা ঝিকে শুনাইয়া দিয়াছে। বাকীর মধ্যে মাত্র ৫৲টা টাকা পাইয়া আর দুধ দিবে না বলিয়া গোয়ালা শাসাইয়া গিয়াছে। বাড়ীওয়ালা তাগিদের উপর তাগিদ দিয়া ভাড়ার টাকা না পাইয়া "১৫ দিনের মধ্যে উঠে যেতে হবে" বলিয়া নোটীশ দিয়াছে। আয় নাই বলিয়া কোনটাই তো তাহার বাদ দিবার উপায় নাই! কোন কুলকিনারা না পাইয়া নিরুপায়ভাবে যখন স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি দিন-কতকের জন্যে না হয় কুসুমপুরেই যাও, ঝি তোমাদের সঙ্গে যাক্; সুধাংশুর স্কুল কামাই করা ঠিক নয়, আমি ও সে এখানে থাকি; চেষ্টা ক'রে যদি একটা 'প্রাইভেট্ টুইসনী' জুটিয়ে নিতে পারি, মাস দুই পরে গিয়ে তোমাদের নিয়ে আস্‌বো। তখন খরচ তো বেশী থাক্‌বে না; এর মধ্যে পাওনাদারদের কিছু কিছু দিয়ে কতকটা পরিষ্কারও হ'তে পারবো।"

সুকুমারী স্বামীর কথাগুলিতে অত্যন্ত আহত হইয়া, কিছুক্ষণ শূন্য মনে দাঁড়াইয়া থাকার পর, ধীরে-ধীরে রন্ধন-শালায় চলিয়া গেল। একটা রুদ্ধ বাষ্প তাহার কণ্ঠ অবধি ঠেলিয়া উঠিতেছিল। স্বামীর কথার উত্তরে সে একটি কথাও বলিতে পারিল না। স্বামীর কাছ হইতে দূরে গিয়া সে কেমন করিয়া থাকিবে; বাসন মাজা হইতে আরম্ভ করিয়া রান্না পর্য্যন্ত সবই যে তাঁকেই করিতে হইবে! তার পর কোর্ট। সর্ব্বোপরি অর্থ চিন্তা। স্বামীর কষ্ট হইবে বলিয়া, সচ্ছল অবস্থায় পাচক ব্রাহ্মণ থাকা সত্ত্বেও, কোন দিন সে পিত্রালয়ে ১৫ দিনের বেশী থাকে নাই; তাহাও কোন ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে। এখন স্বামীকে এই অবস্থায় ফেলিয়া কেমন করিয়া সে পিত্রালয়ে গিয়া থাকিবে? না যাইয়াও যে উপায় নাই,—৪টা ছেলেমেয়ের জন্যই যে স্বামীর কাঁধে বেশী চাপ, তা কি সে বুঝে না!

সে তো মূর্খের হাতে পড়ে নাই! রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে কোন অংশেই তো তিনি কম নন্! কোন্ দেবতার অভিশাপে তাঁহাকে দীন ভিখারীর মত লোকের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে? যাঁহার অত তেজস্বিতা, কখন কাহারো কাছে মাথা হেঁট করেন নাই,—আজ এমন দৈন্য তাঁহার হইয়াছে যে সামান্য "ছেলে পড়ানর" জন্য লোকের দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরিয়া উমেদারী করিতে হইতেছে! তাহাই বা কপালে জুটে কৈ?

(২)

শ্রীমান্ পটল দাদার খাতায় দোয়াত-শুদ্ধ কালি উপুড় করিয়া, এবং এত বড় কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ ধমক খাইয়া

"জল ফেলো জল আনিতে গিয়া এ যে বিষম দায়"

—(মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ)

শিল্পী— শ্রীনিরঞ্জন সেন

Emerald Printing Works

কাঁদিতে-কাঁদিতে মাতার কাছে আসিয়া, তাঁহার অশ্রুপূর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া-চাহিয়া, কান্না ভুলিয়া যখন ধীরে-ধীরে তাঁহার কোলের ভিতর বসিয়া, নিজের কোমল ক্ষুদ্র বাহু দুটীতে তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিল, তখন সুকুমারী উদ্বেলিত অশ্রুপ্রবাহ কষ্টে দমন করিয়া প্রগাঢ় স্নেহের সহিত পুত্রকে নিজের তপ্তবক্ষে চাপিয়া ভাবিতে লাগিল—হায়! এদের জন্যই তাঁর এত ভাবনা; আবার এরাই যে তাঁর শান্তির ধন! অভাব অনটনে পড়িয়া কতবার তাহার মনে হইয়াছে—এতগুলি সন্তান না হইলে তো তার স্বামীর এত কষ্ট, ভাবনা হইত না। কিন্তু সত্যই যদি সে এদের না পাইত, তা হ'লে কি করিয়া, কি লইয়া সে ঘরে থাকিত!

প্রথম-প্রথম সুশীলকুমারের ওকালতির আয় নেহাৎ মন্দ ছিল না। বছরের পর বছর উকিলের সংখ্যা অধিক হওয়ায়, এবং হাইকোর্ট ভাগ হইয়া যাওয়ায়, তাঁর 'গ্রহ' এমন প্রতিকূল হইয়াছে। বিহারের মোকর্দ্দমাই তাঁহার বেশী ছিল। পরে কোনও অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের ছেলের প্রাইভেট্ টুইসনি করিয়া ৯০৲ টাকা মাসে পাইতেন, কোন প্রকারে স্বচ্ছন্দে তাহাতেই চলিয়া যাইত। মাস-দুই হইল সে ছেলেটার মাষ্টারের প্রয়োজন না থাকায়, জবাব দিয়াছে। সেই থেকে এদের এমন দশা দাঁড়াইয়াছে। লক্ষীর কৃপায় বঞ্চিত হইলেও, মা-ষষ্ঠীর কৃপার কৃপণতা মোটেই ছিল না!

রাজা-জমিদারের এষ্টেটে ম্যানেজারির চেষ্টাও কিছু যে না করিয়াছিলেন, তাহাও নয়; কিন্তু তাহাতেও কোন সুবিধা হয় নাই। বাহিরে সম্মান আছে,—আর এত লেখা-পড়া শিখিয়া সামান্য ৩০।৪০৲ টাকা বেতনের চাকুরীর প্রার্থী হওয়া—সেও যে বড় লজ্জাজনক। মূর্খ হইলেও যে তাঁর পক্ষে ভাল ছিল, এমন করিয়া বাহিরের আবরণে আর কতদিন ভিতরের অবস্থা ঢাকিয়া রাখিবেন!

ইহার প্রায় ১৫।২০ দিন পরে সুকুমারীর ছেলে-পিলে সহ পিত্রালয়ে যাইবার দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। যাইবার পূর্ব্বদিন প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই সুকুমারী ভীত, চিন্তিত মনে স্বামীর ঘুম ভাঙ্গাইয়া বলিল—"ওগো, সুধাংশুর বড় জ্বর এসেছে; একবার দেখবে চল না। ছেলের গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।" সদ্যঃজাগ্রত সুশীলকুমার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া—"সুধাংশুর জ্বর এসেচে! কত উঠেছে দেখেছো?" ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে-করিতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া পুত্রের গায়ে-মাথায় হাত দিয়া বুঝিলেন—জ্বরের বেগ কম নয়। "সুধাংশু!—কি রে, মাথা ব্যথা করছে; দুই ঘণ্টা ধ'রে যে নাইবার ধুম! তার ফল তো একটা আছেই।" পিতার কণ্ঠ-স্বরে চমকিত হইয়া, জ্বরের ঘোরে স্বপ্নাবিষ্টের মত কিছুক্ষণ পিতার মুখপানে চাইয়া থাকিবার পর, নিজ অবস্থাটা বুঝি-বার চেষ্টা করিতে করিতে সে বলিল,—"হাঁ, বড্ড মাথা-ব্যথা কোরছে।" স্ত্রীকে পুত্রের মাথায় বাতাস করিবার আদেশ দিয়া তিনি থার্ম্মোমিটারে পুত্রের গাত্রতাপ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামীর মুখের ভাব বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া সুকুমারী শঙ্কিত মনে জিজ্ঞাসা করিল, "কত উঠেছে?" "৪ পয়েণ্ট ৮। ম্যালেরিয়া জ্বর সহজে আপদ ছেড়ে যাবে। তোমাদের যাবার আবার দেরী পড়ে গেল। সুবিধা ছিল, তোমাদের গাঁ'র সেই ছেলেটার সঙ্গে পাঠাব—সে আর হ'ল না—সে তো আর আমার সুবিধার জন্য বসে থাকবে না! আবার ডবল খরচা ক'রে আমাকেই তোমাদের নিয়ে যেতে হবে আর কি!"

লোকে ভাবে এক, হয় আর। সামান্য জ্বর, আপনা হইতেই সারিয়া যাইবে, বলিয়া সুশীলবাবু যে আশা করিয়াছিলেন—ফল দাঁড়াইল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ৭ দিন পর্য্যন্ত যখন লগ্ন জ্বর রহিল, তখন প্রাণের দায়ে চিকিৎসক না ডাকিয়াই বা মানুষে কি প্রকারে থাকিতে পারে? সেই চিকিৎসক ডাকাটা যে কত কঠিন, তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহার বাজার-খরচ চালান দায়, তাহার পক্ষে ডাক্তারের ভিজিট, ঔষধের দাম, রোগীর পথ্য, এ সকলের যোগাড় করিতে স্ত্রীর যে কয়খানি অলঙ্কার ছিল, এবার তাহাতেই হাত পড়িল। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া ডাক্তারের ভিজিট, রোগীর ঔষধ পথ্য দেড় মাস টানিয়া সুশীলবাবু একেবারে রিক্ত, সম্বলহীন হইয়া পড়িলেন। তবে ছেলেটী এ যাত্রা রক্ষা পাইল, ইহাই তাঁহার ভাগ্য বলিতে হইবে।

কোনও প্রকারে সুধাংশু ও অন্য পুত্রকন্যা সহ স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া, সুশীল বাবু প্রাইভেট টিউ-সনীর বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা না পাইয়া বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে চাকুরীর খোঁজ পাইয়া সে চেষ্টাও কম করেন নাই।

সামান্য একটা ত্রিশ-চল্লিশ টাকা বেতনের চাকুরীও যখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল, তখন ধৈর্য্যের বাঁধ আর কোন মতেই অক্ষুণ্ণ রহিল না। সর্ব্বশেষে একটা নিকেলের ঘড়ি এবং একটা সোণার আংটী বিক্রয় করিয়া, অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য বাড়ীর দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সহরের ভিতরে, বিশেষ যেখানে পাঁচ বৎসর পরিচিত ছিলেন, এই দীন অবস্থায় সেখানে থাকিতে লজ্জা বোধ হওয়ায় একেবারে কলিকাতা সহরই ত্যাগ করিলেন।

তিন চারি দিন মধুপুরে থাকিবার পর, কাশীর এক স্কুলে তৃতীয় মাষ্টারের পদ খালি আছে, সংবাদ জানিবামাত্র, সুশীলকুমার বিবেচনা মাত্রও না করিয়া, সেই রাত্রের মেলে ঈপ্সিত স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

দারুণ দুঃসময়ের মাঝে পড়িলে মানবের বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয়। আরও বিশেষ কথা এই যে, যেখানে সৎপরামর্শদাতারও একান্ত অভাব, সেখানে আলেয়ার আলোকে যেমন পথিকের মতিভ্রম জন্মায়, তেমনি যে যে দ্রব্যের প্রার্থী, সেই প্রার্থিত দ্রব্যের ক্ষীণ রশ্মিটুকু দেখিলে, সেও একরূপ উন্মাদের মত সেই দিক পানে ছুটীতে থাকে;—ভাল মন্দ, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার বিলুপ্ত হইয়া যায়।

—"সিক্‌রোল" —"সিকরোল" উচ্চ চীৎকার ধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ায়, সদ্যজাগ্রত সুশীলকুমার তাড়াতাড়ি উঠিয়া টিকিট বাহির করিতে যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার শেষ সম্বল কয়েকটা মুদ্রা সহ মানিব্যাগ এবং বস্ত্রাদি সমেত ক্যাম্বিসের ব্যাগটা অদৃশ্য। সর্ব্বনাশ! এখন উপায়? টিকিটের জন্য হাজত বাস যে তাঁহার অদৃষ্টে অনিবার্য্য! মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখখানা মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল। কম্পিত পদে গাড়ীর দরজার হাতল খুলিয়া কর্ত্তব্য চিন্তার ব্যর্থ-প্রয়াস পাইবার চেষ্টা করিতে-না করিতেই, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে কুহেলিকার রাজ্য ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নিরাশ মস্তিষ্ক কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বেই, চেতনা হারাইয়া তাঁহার ক্লান্ত দেহভার ষ্টেশনের প্রস্তর-কঙ্করময় কঠিন প্ল্যাটফর্ম্মের উপর লুটাইয়া পড়িল।

৩

আষাঢ়ের শেষ! কয়েক দিন অবিশ্রান্ত বারিপাত হইয়া দিন দুই হইল প্রশমিত হইয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রক্তিমচ্ছটা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গাবক্ষে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ষাস্ফীত গঙ্গাবক্ষ যেন কিসের উন্মাদনায় আকুল হইয়া হৃদয়ের চঞ্চল তরঙ্গ-হিল্লোল বায়ুস্তরে মিশাইয়া কি এক মর্ম্মস্পর্শী করুণ গীতি গায়িয়া-গায়িয়া অদূরবর্ত্তী সুশীলকুমারের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিতেছিল!

আজ ছয় মাস পরে সুশীলকুমার হাসপাতাল হইতে ছুটী পাইয়াছেন। যতদিন রোগশয্যায় ছিলেন, একরূপ ভালই ছিলেন; রোগমুক্তির সঙ্গে-সঙ্গে দুঃসহ মানসিক অশান্তি তাঁহার জীর্ণ দেহ-মন আরও জীর্ণ করিতেছে। এখন তিনি কি করিবেন? চাকুরীর আশা বোধ হয় জন্মের মতই মিটিয়া গিয়াছে। তাঁহার এই বেশ দেখিয়া তাঁহাকে শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান বলিয়া কে বিশ্বাস করিবে? এই দূর-দেশে সম্বলহীন অবস্থায় কি করিয়া তাঁহার দিন কাটিবে? অনাহারের ক্লেশ কয় দিন কে সহ্য করিতে পারে? শেষে বোধ হয় উদর-পূরণের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাই অদৃষ্টে লেখা আছে। পরিচিত এমন কেহ নাই, যাঁহার আশ্রয়ে উঠিবেন। ছত্রে গেলে আহার মিলিতে পারে বটে, কিন্তু সে প্রাণ গেলেও নয়!

কাশী পৌঁছিবার দিনই তো মৃত্যু একরূপ অবধারিত ছিল। সেই সদাশয় ভদ্রলোক যদি দয়া করিয়া হাসপাতালে পাঠাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে তো সেই দিনই এ দুঃখ-ময়, অভিশপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়া যাইত! আহা, কেন মৃত্যু হইল না! তাঁহার যদি দুঃখে মৃত্যু ঘটে, তবে ভোক্তারূপে সংসারের দুঃখ-দৈন্য ভোগ করিবে কে? তাঁহার দুঃখ যতই অফুরন্ত হোক না কেন, তাঁহার সহিষ্ণুতাও যে ততোধিক! ওঃ! কতদিন তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সংবাদ লইতে পারেন নাই। তাহারা কেমন আছে, তাহাও জানেন না। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাদের বিষয় চিন্তা করিতে না চাহিলেও, অজ্ঞাতে তাহাদের চিন্তা আসিয়া যে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে! দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রুও গণ্ড বাহিয়া মলিন বস্ত্র সিক্ত করিতে ছাড়ে না!

নিজ গ্রামে স্কুল-মাষ্টারী করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া তো বেশ সুখে শান্তিতেই থাকিতে পারিতেন! উচ্চ আশাই তো তাঁহার কাল হইয়াছিল। যাহার সহায়-সম্পদ কিছুই নাই, কলিকাতার মত সহরে বড় বাড়ী ভাড়া করিয়া হাইকোর্টে

ওকালতী করা যে তাঁহার পক্ষে উন্মাদের মত কাজই হইয়াছিল! এখন কি ভয়ানক অবস্থা! তাঁর কলিকাতা ফিরিবার রেলভাড়া তো পরের কথা, নিজের পেটে যে কিছু দেন,—এমন সম্বলও নাই। শরীরে এমন সামর্থ্য নাই যে, কোন পরিশ্রমজনক কাজ করিয়া উদর-পূরণের চেষ্টা করেন।

আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া-বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে। নিশীথিনী তাহার কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে বিশ্ব-সংসার লুকাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। দূরে ঝিল্লী-মুখরিত অনাহত ঝঙ্কারে আকাশ বাতাস বেদনাময়! কুলপ্লাবিনী খরস্রোতা গঙ্গাদেবীও যেন সেই সুরে সুর মিলাইয়া অন্তর-বেদনার উচ্ছ্বাস তুলিয়া প্রস্তরময় সোপান-গাত্রে আছড়াইয়া-আছড়াইয়া কি এক করুণ গীতি কাহিনী বিশ্বপিতার চরণোদ্দেশে নিবেদন করিতেছিলেন।

আরতি-শেষে জনবহুল মন্দির ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ নীরব, নিস্তব্ধ! যখন সকলেই চলিয়া গেল, বৃদ্ধ পূজারী সন্দিগ্ধ মনে এই রুগ্ন, ক্লিষ্ট লোকটার নিকটে আসিয়া ক্ষণকাল তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিবার পর, যখন কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি কে? এখানে এমন ক'রে বসে আছ কেন?" মানবকণ্ঠের স্বরাঘাতে সুশীল-কুমারের চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়ায় সুপ্তোত্থিতের মত হঠাৎ কিছু বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া, কিছুক্ষণ বিহ্বল উদাস দৃষ্টিতে আহ্বানকারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"বোধ হয় বড় বিপদে পড়েছ। ভিখারীর বেশ হ'লেও, আকার-প্রকারে ভদ্রসন্তান ব'লেই বোধ হচ্ছে। আজ বোধ হয় খাওয়াও হয় নি?" বলিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত মন্দির হইতে কিছু প্রসাদী ফলমূল হাতের উপর দিয়া গেলেন। সমস্ত দিনের অভুক্ত সুশীলকুমারের মনে হইল, বুঝি সত্য-সত্যই কাশীশ্বর বিশ্বনাথ পূজারীর বেশে আসিয়া তাঁহার ক্ষুধার্ত্ত সন্তানকে আহার দিয়া তৃপ্ত করিয়া গেলেন।

৪

প্রায় বৎসর ঘুরিয়া আসিয়াছে। সুশীলকুমার কাশীতেই আছেন। তবে যে অবস্থায় ছিলেন, সে অবস্থায় নহে; কোনও আকস্মিক ঘটনায় ভাগ্যদেবী তাঁহাকে একটু উচ্চ স্তরে উঠাইয়া দিয়াছেন।

কিশোরীমোহন মৈত্র মহাশয়ের সাত-আট বৎসর বয়স্কা পৌত্রী পিতামহীর সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করিতে যায়। সমবয়স্কা অন্যান্য বালিকার সঙ্গে জল লইয়া খেলা করিতে করিতে বালিকা হঠাৎ গভীর জলে গিয়া পড়ে। বর্ষাস্ফীত গঙ্গার একূল-ওকূল দেখা যায় না,—স্রোতের টানে বালিকাকে বহু দূরে লইয়া গেল। চীৎকার কোলাহলের ত্রুটী না হইলেও নিজ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বালিকাকে রক্ষা করিতে কেহই সেই অগাধ জলরাশি মধ্যে ঝাঁপ দিতে ভরসা পায় নাই। যাহার প্রাণের মায়া ছিল না, সেই সুশীলকুমার অন্য ঘাট হইতে "ওগো, কি হবে গো" উচ্চ ক্রন্দনের রোল সহ সমাগত মনুষ্যের কোলাহল শুনিতে পাইয়া, গঙ্গার দিকে দৃষ্টি-ক্ষেপ করিতেই দেখিতে পাইল, খরস্রোতে বালিকা ভাসিয়া যাইতেছে। এক-একবার আলুলায়িত চুলের রাশির মধ্যে তাহার মুখখানি ফুটিয়া উঠিয়া আবার তখনি ঘূর্ণাবর্ত্তে বিলীন হইতেছে। কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই, তিনি জলে ঝাঁপাইয়া বহু কষ্টে বালিকাকে রক্ষা করেন। কিন্তু তখন শরীরে অতটা সহিল না; জ্ঞানশূন্য সুশীলকুমারকে কিশোরী বাবু নিজ গৃহে লইয়া গিয়া অনেক সেবা যত্নে বাঁচাইয়া তুলিলেন। এমন উপকারী লোককে আর কোথাও যাইতে দিবেন না, বলিয়া একরূপ জবরদস্তি করিয়াই নিজ গৃহে রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে সুশীলকুমারের অবস্থাও কিছু-কিছু জ্ঞাত হইলেন। কাশীর স্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে তাঁহার খুব ভাল আলাপ ছিল এবং তখন থাড মাষ্টারের পদ খালি ছিল,—অল্প আয়াসেই তিনি সুশীলকুমারকে ঐ পদে বসাইয়া দিলেন। তবে নিজ বাড়ী হইতে তাহাকে কোন মতেই অন্যত্র যাইতে না দিয়া তাঁহার দুইটী পৌত্রের শিক্ষার ভার সুশীলকুমারের উপর ন্যস্ত করিলেন।

অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুত্র কন্যার সংবাদের জন্য সুশীলকুমার বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। চিঠি লিখিয়া উত্তরের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিয়া নিরাশ হইলেন। দীর্ঘকাল আশায় আশায় কাটাইবার পর এক দিন যখন তাঁহারই প্রেরিত লেফাপাখানা হলুদে কাগজে "চিঠির মালেক পাওয়া গেল না" ইত্যাদি কয়েকটা বার্ত্তা পৃষ্ঠে বহন করিয়া ফিরিয়া আসিল, সে দিন তাঁহার পক্ষে কি দুর্দ্দিন! বজ্রাঘাতে মানুষের কিরূপ কষ্ট হয়, তাহা তো কেহ স্পষ্ট বলিয়া বুঝাইতে পারে না; কেন না, যাহার মাথায় বাজ পড়ে, সে তো জীবিত থাকিয়া সে যন্ত্রণা

ভোগ করে না। সত্য-সত্যই যদি সুশীলকুমারের মাথায় বাজ পড়িত, তাহা হইলেও বোধ হয় তাঁহার মুখভাব এমন ভয়ানক হইয়া উঠিত না। তাঁহার স্ত্রী এবং সন্তানগণের কি দশা ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না; কারণ, তাঁহার শ্বশুরালয় বড় নদীর ধারে; প্রতি বৎসর বর্ষার সময় অনেকের ঘরবাড়ী নদীগর্ভে বিলীন প্রাপ্ত হয়। হয় ত বা তাঁহার শ্বশুরের আশ্রয়-গৃহও সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে; আর সেই সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণও নদীগর্ভে শেষ শয্যা পাতিয়াছে। আর কিসের আশায় কাহার জন্য?—মুহ্যমান সুশীলকুমার নিদারুণ অন্তর্দাহে ঝলসিত হইয়া মৃতের ন্যায় চাহিয়া চাহিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আরও ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। সুশীলকুমার একরকম অবস্থা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন;—উৎসাহ উদ্যম কিছুতেই নাই। তবে লোকালয়ে, মনুষ্য সহবাসে থাকিতে গেলে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, লোকের সঙ্গে না মিশিয়া উপায় নাই।

৫

মাঘের শেষ! শীতের কুহেলিকায় ভিতর বাহির সমাচ্ছন্ন! সবে সূর্যোদয়ের ক্ষীণ রক্তধারা পৃথিবীর বুকে পড়িয়াছে। সুশীলকুমার তাঁহার বালক ছাত্র দুইটাকে কেবল পাঠ দিতেছেন,—এমন সময় কিশোরী বাবু অতর্কিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহে, আজ ৮টার ট্রেণে তোমাকে আমাদের সঙ্গে এলাহাবাদে যেতে হবে,—আমার শ্যালিকা-পুত্রের বিবাহ। আশা করি, তুমি অমত করবে না।"

সুশীলকুমারের মতামতের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া, বৃদ্ধ যেমন ভাবে আসিয়াছিলেন, তেমনি ভাবে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পরে বরযাত্রী হইয়া সুশীলকুমারকেও কন্যার বাড়ী যাইতে হইল! বিবাহমণ্ডপ দীপালোকে উদ্ভাসিত; জনসমূহের কোলাহলে সে স্থান মুখরিত। নিজের অনিচ্ছা সত্বেও আনন্দ উৎসবে সুশীলকুমারকে যোগ দিতে হইয়াছে! তাঁহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। অন্যমনা হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে তিনি বসিয়া ছিলেন,—সহসা তাঁহার দৃষ্টি অদূরবর্ত্তী একটী বালকের উপর নিপতিত হইল। সবিস্ময়ে সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ কি! কে ঐ বালক আতর-দান হাতে,—এ যে একেবারে সুধাংশুর প্রতিচ্ছবি! বালক একবার এদিকে নিশ্চয়ই আসিবে! দুইজন মানুষ কি এক রকম হইতে পারে না! কিন্তু তাঁহার চিন্তার অবসর বড় বেশীক্ষণ রহিল না;—তিনি দেখিলেন, আরও দুটী বালক-বালিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ যে তাঁহারই পুত্র কন্যা! বিস্ময়-বিমুগ্ধ সুশীলকুমার বিহ্বলের মত সেই দিক পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি পায়ের তলা হইতে মাটী সরিয়া যাইতেছে! অবশেষে সব ঝাপ্‌সা করিয়া সেইখানেই তাঁহার জ্ঞান লুপ্ত হইল।

পুনরায় জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, যেন কাহার কোমল করপল্লব তাঁহার পায়ের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। চক্ষু চাহিতেই সেই চিরপরিচিত মুখখানি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না,—ইহা স্বপ্ন না সত্য?

স্বামীর স্থির দৃষ্টি দেখিয়া, সুকুমারী ভয়চকিত নেত্রে চাহিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ও কি, অমন ক'রে চেয়ে রৈলে কেন? আবার মূর্চ্ছা হ'তে পারে। একটু ঘুমাও।" "ওগো, তুমি সত্য ক'রে বল,—আমি এ সব কি দেখ্‌ছি? এ সত্য, না স্বপ্ন?" "সবই সত্য; ভগবান আমাদের প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন। অনেক দুঃখ-যন্ত্রণার শেষে আবার আমরা মিলিত হ'য়েছি। আমাদের ঘর-দুয়োর নদীতে ভেঙ্গে যাবার পর, আমার পিসিমা তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিয়ে আসেন। তুমি বোধ হয় জান্‌তে না, এলাহাবাদে পিসেমশাই একজন পদস্থ ব্যক্তি। আজ তাঁরই সর্ব্বকনিষ্ঠা মেয়ের বিয়েতে বিশ্বনাথ দয়া ক'রে তোমায় এনে দিলেন। তুমি যে বেঁচে আছ, এ ভরসা একরকম আমার ছিলই না,"—বলিতে-বলিতে সুকুমারীর নেত্রপল্লব হইতে বড়-বড় ফোঁটায় অশ্রুবিন্দুগুলি ঝরিয়া-ঝরিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সুশীলকুমার উন্মাদের মত উঠিয়া দুই হাতে রোরুদ্যমানা পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

মাতৃভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রদান

[অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, এফ-সি-এস্, পি-আর-এস্]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন যে সকল প্রশ্নের সমাধানে নিযুক্ত আছেন, তাহার মধ্যে একটি প্রধান প্রশ্ন হইতেছে—উচ্চ-শিক্ষা এখনকার মত ইংরাজি ভাষার সাহায্যে হওয়া উচিত, না মাতৃভাষাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতদিন আমাদের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, এবং বলিতেছেন যে, এই সকলের পঠন-পাঠন মাতৃভাষার সাহায্যেই হওয়া উচিত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, এই শুভ-মুহূর্ত্তে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্যকরূপে প্রচার করা। এই শুভমুহূর্ত্ত গত হইলে হয় ত এরূপ সুযোগ শীঘ্র নাও মিলিতে পারে।

সুখের বিষয়, এ বিষয়ে মতভেদ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন যখন রাজসাহীতে আসিয়াছিলেন, তখন কলেজের প্রফেসারদের লইয়া একটি সভা করিয়া এই বিষয়ে মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা গেল যে, কেবল একজন ভিন্ন সকলেই বাঙ্গলা ভাষার সপক্ষে মত দিয়াছিলেন। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ এই বিষয়ে যে মতামত দিতেছেন দেখিতেছি, তাহাও মাতৃভাষার অনুকূলে। কয়েকমাস পূর্ব্বে মাননীয় বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড বাহাদুর একটি সভায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি বুঝিতে পারেন না যে, এই দেশের শিক্ষা কেন মাতৃভাষার সাহায্যে হইতেছে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কনভোকেশনে মাননীয় গবর্ণর লর্ড রোনাল্ডশে বাহাদুরও মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়, এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন যদি মাতৃভাষার অনুকূলে মত দেন, তাহা হইলে আমাদের এতদিনের সঞ্চিত আশা সফল হইবে এবং বঙ্গভাষা কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

বঙ্গভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রদানের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে; এবং সঙ্গে-সঙ্গে আপাততঃ আগাগোড়া মাতৃভাষা চলিতে পারে কি না, তাহাও নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব।

ইংরাজি আমরা ছাড়িতে পারিব না

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, ইংরাজি আমরা ছাড়িতেছি না। অনেকে ভয় করেন যে, মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা পরিচালিত হইলে ইংরাজি আর কেহ শিখিবে না, এবং তাহার ফলে ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির পঠন-পাঠন বন্ধ হইয়া যাইবে। এই অমূলক ধারণাই মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাবের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। বলা বাহুল্য, এ ধারণার মূলে কোনই সত্য নাই। যাঁহারা মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে চান, তাঁহারা সকলেই ইংরাজি ভাষাকে অবশ্য পঠনীয় দ্বিতীয় ভাষার (compulsory second language) স্থান দান করিতে ইচ্ছুক। নিম্নলিখিত কারণে আমরা ইংরাজি ভাষার পঠন-পাঠন ও আলোচনা ছাড়িতে পারি না :—

(১) ইংরাজি আমাদের রাজভাষা। দেশের যাবতীয় রাজকর্ম্ম, ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতাদি, সংবাদ-পত্রাদি, আদালতের রাজকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই ইংরাজি ভাষায় হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে। দেশের অনেক ব্যক্তিকে এই সকল বিষয়ে পারদর্শী হইতে হইবে এবং সকল শিক্ষিত ব্যক্তিকে ইহার মর্ম্ম অবগত হইতে হইবে। সেইজন্য ইংরাজি-জ্ঞান প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

(২) ইংরাজি ভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের একমাত্র সার্ব্বজনীন ভাষা। ভারতবর্ষে প্রায় দেড়শতের উপর ভাষা প্রচলিত। তাহার মধ্যে বাঙ্গলা, হিন্দী, উর্দ্দু, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি প্রায় পঁচিশটি প্রধান ভাষা প্রচলিত। সুতরাং ভারতের এক প্রদেশের শিক্ষিত লোক, অন্য প্রদেশে গেলে কেহই মাতৃভাষার সাহায্যে কথাবার্ত্তা বা ভাববিনিময়

করিতে সমর্থ নহেন। ইংরাজিই সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সার্ব্বজনীন ভাষার স্থান অধিকার করিয়াছে। অনেকে বলেন হিন্দীই ভারতের সার্ব্বজনীন ভাষা। বিগত কলিকাতা সামাজিক সম্মিলনে (Social conference) সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত গান্ধি মহোদয়কে এই মত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু আমি ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ কালে দেখিয়াছি যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে হিন্দী জানা থাকিলে সাধারণ লোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা চালান যায় বটে; কিন্তু মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, মহিশূর প্রভৃতি ভারতের দক্ষিণ দেশে হিন্দীভাষা কেহই বুঝে না।* সে অঞ্চলে তামিল, তেলেগু প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় ভাষা প্রচলিত থাকাতে হিন্দী প্রভৃতি আর্য্যভাষার কোনও স্থান নাই। সেখানে ইংরাজিই একমাত্র সম্বল। তাহার উপর ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল দেশে হিন্দীর প্রচলন বেশী, সেখানেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত ভাব বিনিময় করিতে হইলে অন্য প্রদেশবাসীরা ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, হিন্দী ভাষা ব্যবহার করেন না। এবারে জানুয়ারী মাসে বিজ্ঞান সম্মিলন (Science Congress) উপলক্ষে লাহোর গিয়াছিলাম। সেখানে যদি আমায় ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অশুদ্ধ হিন্দীভাষায় পঞ্চনদ-বাসীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে হইত তাহা হইলে "তোমারা বাপ হামাকে মান্য কর্ত্তো, আর তুমি আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিলা কর্ত্তাথা" সদৃশ ভাষাই ব্যবহার করিতে হইত। তাই বলিতে ছিলাম, ইংরাজিই শিক্ষিত ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীর একমাত্র সার্ব্বজনীন ভাষা। ইহা অস্বীকার করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কোনও লাভ নাই। ইংরাজি ভাষার প্রচলনের জন্যই আজ সমগ্র ভারতের অধিবাসী মিলিয়া তাবৎ রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, সভা-সমিতি করা সম্ভবপর হইয়াছে। ইংরাজি-সংবাদপত্রের প্রচলন থাকাতে এক প্রদেশের সংবাদ অন্য প্রদেশের লোক ঘরে বসিয়া পাইতেছেন। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে একটা মিশ্রিত জাতিতে পরিণত করিতে ইংরাজি ভাষা বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। সেইজন্য আমরা ইংরাজী ভাষা ছাড়িতে পারি না।

(৩) ইংরাজি ভাষা পরিত্যাগ না করার তৃতীয় কারণ এই যে, ইহার সাহায্যে এখনও বহুদিবস ভারতবাসীকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের উচ্চতম জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। ভারতের কোনও মাতৃভাষা এই বিষয়ে ইংরাজি বা ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ভারতের অনেক মাতৃভাষা সাহিত্য গৌরবে উন্নত হইয়াছে সত্য, কিন্তু দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি তাবৎ শাস্ত্রের উচ্চ জ্ঞান এখনও বিদেশী ভাষার সাহায্যে আহরিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, প্রভৃতি শাস্ত্রে বাঙ্গালা ভাষায় কোনও উচ্চশ্রেণীর পুস্তকই নাই। সেইজন্য, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের তাবৎ প্রধান মাতৃভাষাগুলিতে এই সকল বিষয়ে পুস্তক রচিত না হইতেছে ততদিন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিতেই হইবে।

(৪) ইংরাজি ভাষা ছাড়িলে আমাদিগকে অতুলনীয় ইংরাজি-সাহিত্য ছাড়িতে হয়। আমরা ইংরাজের সেক্সপিয়ার, মিল্টন, সেলি, বাইরণ, টেনিসন, বার্ক, মেকলে, ইমার্সন, কার্লাইলের অতুলনীয় রচনার আস্বাদ পাইয়াছি। সে আস্বাদ ভুলিবার নয়। তাহাতে মৃতসঞ্জীবনীর মাদকতা আছে, অমৃতের মাধুর্য্য আছে, পারিজাতের সুরভি আছে। যাহারা এই সাহিত্যের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহারা কেমন করিয়া তাহাদের পুত্রকলত্রকে সে আস্বাদ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে? গত বৎসর আমি নিজাম রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদে গিয়াছিলাম। সেখানে নিজাম-সরদারের

* ১৯১৫ সালে দ্বিতীয় বিজ্ঞান সম্মিলন উপলক্ষে মান্দ্রাজে গিয়া বড়ই ভাষাসঙ্কটে পড়িয়াছিলাম, বাজার হাট করা একপ্রকার অসম্ভবই হইয়াছিল। একটা কৌতুকাবহ গল্প মনে পড়িল। একদিন আমরা তিন চারিজন বাঙ্গালী প্রতিনিধি সমুদ্র-স্নান করিতে গিয়া দেখিলাম যে, জেলেরা সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া তীরে ফিরিতেছে। একজনকার কাছে ৮টা সমুদ্রের কাঁকড়া ছিল (এ কাঁকড়া আমাদের দেশের মত নহে), কিন্তু মুস্কিল হইল দর করিতে গিয়া। সেও এক, দুই, তিন, চারি পয়সা বোঝে না, আমরাও সে কত দর চায়, কিছুতেই বুঝিলাম না। শেষকালে একটা বুদ্ধি হঠাৎ যোগাইল—বোবার ভাষা আরম্ভ করিলাম। অঙ্গুলি দেখাইয়া কয় পয়সা দিতে পারি, তাহা দেখাইতে লাগিলাম। চারি, পাঁচ, পরে ছয়, সাতটা পর্য্যন্ত আঙ্গুল দেখাইলেও সে ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল। আটটা আঙ্গুল দেখাইলে সে যখন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল, তখন আটটা পয়সা দিয়া অবশেষে আমরা তাহার কাঁকড়া খরিদ করিলাম।

আদালতের এমন দুই-চারিজন উকিলের সহিত আলাপ হইল, যাঁহারা বর্দ্ধিষ্ণু উকিল বটে, কিন্তু ইংরাজি ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। নিজামরাজ্যে উর্দ্দু রাজভাষা বলিয়া ইংরাজি না পড়িলেও চলে। দশপনের মিনিট কথাবার্ত্তাতেই বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহারা বেশ দু-পয়সা রোজগার করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। এরূপ শিক্ষা আমি আদৌ চাহি না। যে শিক্ষা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনের ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়, সে শিক্ষা ভারতের কল্যাণ সাধন করিতে পারে না বলিয়া আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

ইংরাজি শিখিলেও মাতৃভাষাতেই বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করা উচিত।

উপরিউক্ত অন্যান্য কারণে আমরা ইংরাজি ভাষার পঠন পাঠন ছাড়িতে পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা মাতৃভাষার আদর করিব না? ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করা এক কথা, আর তাহার সাহায্যে অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা করা সম্পূর্ণ অন্য কথা। ইংরাজি ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয়, কিন্তু তাই বলিয়া একটা বিদেশী ভাষার সাহায্যে গণিত, দর্শন, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র কেন শিক্ষা করিতে বাধ্য হইব? যে যে কারণে মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রচলন একান্ত প্রয়োজন, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি :—

(১) প্রথমতঃ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, সকল সভ্যদেশেই মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় শিক্ষার প্রচলন নাই, থাকিতেও পারে না। তাহার কারণও বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। মাতৃভাষা সকলে মাতৃস্তন্যের সহিত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা আয়ত্ত করা অনায়াস-সাধ্য; কিন্তু বিদেশী ভাষার শিক্ষাপ্রণালী যতই উপযুক্ত হউক না কেন, তাহা চিরদিন বিদেশীই থাকিয়া যায়। যখন আমার শিশু পুত্র বা ছোট ভ্রাতাদিগকে অতি অল্প বয়সে ইস্কুলের অবশ্যপাঠ্য ভূগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্র ইংরাজি ভাষার সাহায্যে আয়ত্ত করিতে অপরিসীম কিন্তু বৃথা চেষ্টা করিতে দেখি, তখন মনে হয় যে এইরূপ সময় ও স্বাস্থ্যের অপব্যয় করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা আর এক দিবসও আমাদের থাকা উচিত নয়। তাহাদের সমস্ত বাল্যজীবনটা এই অপরিচিত ভাষায় বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার বৃথা আয়াসে তিক্ত হইয়া উঠে। তাই তাহারা এই সকল শাস্ত্র বুঝে না, মুখস্থ করে। যে বহুমূল্য সময় তাহারা এইরূপে অপব্যয় করে, সেই সময়ের মধ্যে বিবিধ বিষয়ে আরও অনেক জ্ঞান তাহারা মাতৃভাষার সাহায্যে লাভ করিতে পারিত। আমার মনে হয় যে, ইস্কুলে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে (English medium) বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা প্রদানের প্রথা সত্বসত্বই উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

কোনও কোনও শিক্ষকের মুখে শুনিতে পাই যে, ইস্কুলে ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় ইংরাজীতে পড়াইলে ছেলেরা ইংরাজী আরও ভাল শিখিবে। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় (Matriculation Examination) ইতিহাসের প্রশ্ন ইচ্ছা করিলে মাতৃভাষায় উত্তর দিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সফল হয় নাই। এখানে আমার বক্তব্য এই যে, আমরা ইংরাজি ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিব সন্দেহ নাই; কিন্তু ইংরাজের মত নির্দ্দোষ ইংরাজি বলিতে বা লিখিতে না পারিলে যে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে, ইহা বিশ্বাস করি না। আমরা ইংরাজ নহি, ইংরাজি আমাদের মাতৃভাষা নহে,—তবে আমরা একেবারেই ইংরাজের মত ইংরাজি বলিতে ও লিখিতে যাইব কেন? কতকগুলি লোকের পক্ষে ইংরাজি খুব ভাল করিয়া শিক্ষা করা প্রয়োজন সন্দেহ নাই; কিন্তু শতকরা নব্বই জনের পক্ষে কাজ-চলা গোছের (good working knowledge) ইংরাজি জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি।

(২) দ্বিতীয়তঃ, মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষা প্রচলিত না হইলে মাতৃভাষার উন্নতি সুদূর পরাহত। কোনও ভাষার সম্পদ মাত্র তাহার সুকুমার সাহিত্যে আবদ্ধ নহে। নাটক, নভেল, কাব্য, গল্প লইয়া ভাষা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে উপযুক্ত সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর পুস্তক থাকা প্রত্যেক পরিপুষ্ট ভাষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। বঙ্গভাষা সুকুমার সাহিত্যসম্পদে এখন আর দীন নহে। ভারতচন্দ্র, কাশীরাম, কীর্ত্তিবাস, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবি ও লেখকগণ এই বিভাগ

বিবিধ রত্নরাজিতে শোভিত করিয়াছেন। মায়ের এক অঙ্গ অলঙ্কারে শোভিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অপর সকল অঙ্গই অলঙ্কার-বর্জ্জিত। তর্কশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, ললিতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি যাবৎ শাস্ত্রেই বাঙ্গালা ভাষায় দুই একখানি করিয়া সাধারণ বা শিশুপাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য কোনও গ্রন্থ একেবারে নাই। ইহার একমাত্র কারণ হইতেছে—উচ্চ-শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে সম্পন্ন না হওয়া! আমি ছয় মাসের মধ্যে Roscoe এবং Schorlenmerএর মত অতবড় রসায়নশাস্ত্র অনায়াসে রচনা করিতে পারি; কিন্তু সে পুস্তক পড়িবে কে? সাধারণ লোকে ত ঐ পুস্তক পড়িতে পারে না, শিশুরাও ত উহা পড়িবে না—একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই উহা পাঠ করিতে সক্ষম। এই একমাত্র কারণেই মাতৃভাষা বিবিধ শাস্ত্রে পুস্তকাভাবে অন্যান্য সভ্যজাতির ভাষা হইতে হীন হইয়া আছে। ইহার প্রতিকারেরও একমাত্র উপায়ই আছে—"নান্য পন্থা বিদ্যতে।" মাতৃভাষার সাহায্যে যদি উচ্চ-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে আমার দৃঢ় ধারণা যে, সদ্যসদ্যই মাতৃভাষার এই অভাব দূরীভূত হইয়া যায়। কবে এই সকল বিষয়ে পুস্তক রচিত হইবে, তাই বলিয়া যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে কোনও কালেই এই সকল পুস্তক রচিত হইবে না। অপর পক্ষে, যদি অদ্য হইতে কলেজে এই সকল বিষয়ের মাতৃভাষার পঠন-পাঠন-পদ্ধতি প্রচলিত হয়, আগামী কল্য পাঠ্যপুস্তক সকল নিশ্চয়ই রচিত হইবে। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে, মাতৃভাষার উন্নতিকামী প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত হইবে—যাহাতে মাতৃভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ শাস্ত্রের পঠন-পাঠন পদ্ধতি প্রচলিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা।

আপাততঃ কি কর্ত্তব্য?

তাহা হইলে, উপরিউক্ত আলোচনা হইতে দুইটি মূল সূত্র বাহির হইতেছে—প্রথম ইংরাজি ভাষা আমাদিগকে শিক্ষা করিতেই হইবে; দ্বিতীয় ইংরাজির পরিবর্ত্তে মাতৃভাষার সাহায্যে বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষার পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, এই দুইটি মূল সূত্রের মধ্যে কোথাও কোনও বিরোধ নাই। ভাষাশিক্ষা এক কথা, এবং তাহার সাহায্যে বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা করা সম্পূর্ণ অন্য কথা।

এই দুইটি মূল সূত্র স্মরণ রাখিয়া এখন দেখিতে হইবে—আপাততঃ এখনই আমরা কি ভাবে কায আরম্ভ করিতে পারি। মনে রাখিতে হইবে যে, গত ষাট বৎসর ধরিয়া যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহা একদিনে উলটাইয়া দেওয়া সহজ হইবে না। যে বৃক্ষ এতকাল ধরিয়া শিকড় চালাইয়াছে, তাহাকে জোর করিয়া সমূলে রাতারাতি উৎপাটিত করিতে গেলে বৃক্ষটিই মারা যাইতে পারে। যে-যে কারণে আমরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হইতে এম-এ, আইন, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পরীক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে দিবার প্রথা সদ্যসদ্যই প্রচলিত করিতে অক্ষম, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিতেছি:—

(১) আজ যাট বৎসর ধরিয়া উচ্চ স্কুলে ও কলেজে ইংরাজি ভাষাতে অধ্যাপনা করিতে আমাদের শিক্ষক ও অধ্যাপকবৃন্দ অভ্যস্ত। অদ্য হঠাৎ তাঁহাদিগকে সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে বলিলে, তাঁহাদের অনেকেই অক্ষমতা জানাইতে বাধ্য হইবেন। আমি আর একটি প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, আমি নিজে বি-এ ক্লাস পর্য্যন্ত রসায়নশাস্ত্র ইংরাজি ও বাঙ্গালা মিশ্রিত "খিচুড়ি" ভাষায় অধ্যাপনা করিয়া থাকি; এবং আমার বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা ভাষায় রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে কল্য হইতে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে অক্ষম হইব না। কিন্তু আমার সহকর্ম্মী অনেক অধ্যাপকের সহিত আলাপ করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা অনেকে অনভ্যস্ত বলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ক্লাসে বক্তৃতা করিবার প্রথাকে ভয় করেন। অভ্যাস এক দিনে যাইবার নহে—সময় লাগে। সেই জন্য ইংরাজির স্থানে বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা দিবার অভ্যাস আয়ত্ত করিতে অধ্যাপক-গণকে সময় দিতে হইবে।

(২) অনেক কলেজে, বিশেষতঃ সরকারি ও মিশনারি কলেজে, ইংরাজ বা অন্যপ্রদেশবাসী অধ্যাপক আছেন। ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দিবার প্রথা প্রচলিত থাকাতে, এখন তাঁহাদের কোনও অসুবিধা নাই। হঠাৎ বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হইলে, তাঁহাদিগকে জবাব দিতে হইবে; কারণ, দুই চারি মাসে বা বৎসরে বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়া

তাঁহারা সেই ভাষায় বক্তৃতা দিতে সমর্থ হইবেন না। অথচ, এই সকল বিদেশী অধ্যাপকগণকে অদ্যই বিদায় দেওয়া বা তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষা ভালরূপে শিখান অসম্ভব।

(৩) প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে সকল প্রদেশ আছে, সেগুলিতে অনেকগুলি করিয়া মাতৃভাষা প্রচলিত আছে। আমি অপ্রধান ভাষার কথা বলিতেছি না,—প্রধান-প্রধান ভাষার সংখ্যাও কম নহে। মান্দ্রাজে গিয়া দেখিলাম যে, মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তামিল, তেলেগু, মালায়াম এই তিন-ভাষাভাষী ছাত্রের সংখ্যা প্রায় সমান-সমান। নিজাম রাজ্যে গিয়া তথাকার ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত রস মামুদের নিকট শুনিলাম যে, নিজাম রাজ্যে উর্দ্দু, তামিল, তেলেগু, মার্হাটি ও ক্যানারিজ এই পাঁচটি প্রধান ভাষা প্রচলিত, এবং তথায় মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিবার প্রথা প্রচলিত থাকাতে, একই সময়ে, একই ক্লাস চারি-পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। তাহাতে শিক্ষকের সংখ্যা চারি-পাঁচগুণ পর্য্যন্ত রাখিতে হয়; এবং এতগুলি ক্লাসের এতগুলি বিভাগের জন্য ঘর প্রস্তুত করাইতে হয়। এইরূপ ভাষাসঙ্কট অনেক প্রদেশেই আছে।

বাঙ্গলাদেশ কিন্তু এ বিষয়ে অনেকটা সৌভাগ্যবান। সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গলা। এমন একদিন ছিল, যখন অনেক মুসলমান বাঙ্গলাকে স্বীয় মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতেন না। কিন্তু সে দিন গিয়াছে; এখন সকল বাঙ্গালী মুসলমানই বাঙ্গলাকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই রাজসাহী কলেজে প্রায় ৭৫০ ছেলে পড়ে; তাহার মধ্যে প্রায় শতকরা পঁচিশ জন ছাত্র মুসলমান। ইহাদের সকলেরই মাতৃভাষা বাঙ্গলা বলিয়া ইহারা ঐ ভাষাতেই পরীক্ষা দিয়া থাকে। কচিৎ দুই একটি মুসলমান ছাত্র উর্দ্দুতে পরীক্ষা দেয়। সেইজন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মাতৃভাষায় পরীক্ষার প্রথার প্রচলন-কল্পে যে বাধা আছে, বাঙ্গলা দেশে তাহা বড় একটা নাই।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু খাঁটি বাঙ্গলাদেশ লইয়া নহে। ইহার অধীন ব্রহ্মদেশ, আসাম এবং বাঙ্গলাদেশের সীমান্তবর্ত্তী এমন অনেকগুলি জেলা আছে, যেখানে বাঙ্গলা ছাড়া হিন্দী, উড়িয়া ও উর্দ্দু ভাষা প্রচলিত। সেই জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বাঙ্গলা ছাড়া ব্রহ্মদেশের ভাষা, আসামী, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি আরও ভাষা আছে। এ সকল ভাষা বাঙ্গলা ভাষার মত এত সমৃদ্ধিশালী নহে বলিয়া আমার ধারণা। এ সকল ভাষায় স্কুল ও কলেজে শিক্ষা এখনই প্রচলিত হইতে খুব সম্ভবতঃ পারিবে না। হয় ত এই সকল ভাষাভাষী প্রদেশের লোকেরা মাতৃভাষায় শিক্ষা-প্রদান-প্রণালীর প্রচলনে আপত্তি করিতে পারেন। সুখের বিষয় এই যে, ব্রহ্মদেশে শীঘ্রই স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইবে; কিন্তু আসাম প্রদেশকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় পাইবার জন্য আরও অধিককাল অপেক্ষা করিতে হইবে। এই সকল প্রদেশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইলে, বাঙ্গলা ভাষায় তাবৎ শিক্ষা প্রচলনের পক্ষে ভাষাগত আর কোন বাধা থাকিবে না।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় তাবৎ পরীক্ষার শীঘ্র প্রচলনের বিরুদ্ধে চতুর্থ আপত্তি এই যে, এখনও পর্য্যন্ত গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের পরিভাষা স্থির হয় নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাতৃভাষায় শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন হইলে পাঠ্যপুস্তক শীঘ্রই রচিত হইবে। কিন্তু গোল বাধিবে পরিভাষা লইয়া। হাইড্রোজেন - কেহ লিখিবেন উদ্জান, কেহ লিখিবেন জলজান, কেহ লিখিবেন আর্দ্রজান, আবার কেহ লিখিবেন হাইড্রোজেন। এ পর্য্যন্ত পরিভাষা সংকলনের যে সকল চেষ্টা হইয়াছে, আমার মনে হয়, সেগুলি সর্ব্বথাই বৃথা হইয়াছে। বারাণসীর নাগরী-প্রচারিণী সভা এক-দফা পরিভাষা রচনা করিয়াছেন; কলিকাতার সাহিত্য-পরিষৎ এক দফা করিয়াছেন। তাহাতে নানাবিধ উদ্ভট কষ্ট-কল্পনার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, হাসিও আসে, দুঃখও হয়। পুস্তক-রচনা-কালে এ সকল পরিভাষা আদৌ চলিবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। মনে রাখিতে হইবে, এখনও বহু দিবস এ সকল শাস্ত্রের উচ্চতম জ্ঞান ইংরাজি, জার্ম্মাণ বা ফরাসি ভাষা হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। সেই জন্য আমার বক্তব্য এই যে, আমাদিগকে যথাসম্ভব ইংরাজি পরিভাষা অবিকৃত বা সামান্য বিকৃতভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। পরিভাষা আন্তর্জাগতিক জিনিস। সকল জাতি যে পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছে, আমরা তাহা হইতে ভিন্ন পরিভাষা গঠন করিতে পারি না। ইংরেজ জাতি গণিত-

শাস্ত্রে আল্‌ফা, বিটা, গামা, ডেল্টা প্রভৃতি বহু গ্রীক শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ত অনায়াসে ইহাদের পরিবর্ত্তে A, B, C, D, চালাইতে পারিতেন! উদ্ভিদবিদ্যা ও শারীর-বিদ্যার তাবৎ পরিভাষাই ল্যাটিন শব্দের দ্বারা গঠিত। কই, ইংরেজ জাতি ত সেগুলি ইংরাজিভাষায় তর্জ্জমা করেন নাই। এরূপ গোলমাল কিছুদিন চলিবেই। তবে আমার বিশ্বাস, পুস্তক লিখিতে-লিখিতে ক্রমশঃ পরিভাষা আপনা-আপনিই ঠিক হইয়া আসিবে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা বঙ্গভাষায় প্রচলিত করিতে গেলে, পরিভাষা-বিভ্রাট ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এই সকল নানা বাধা, বিঘ্ন ও অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আগামী বৎসর হইতেই ম্যাট্রিকুলেশন হইতে আরম্ভ করিয়া এম-এ, আইন, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি তাবৎ পরীক্ষাই মাতৃভাষার সাহায্যে সম্পন্ন হউক—এরূপ পরামর্শ দিতে সাহসী হই না। আমার বক্তব্য এই যে, এ বিষয়ে আমাদিগকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। যেমন অভিজ্ঞতা বাড়িতে থাকিবে, বিবিধ শাস্ত্রে পুস্তকাদি রচিত হইতে থাকিবে, এবং ইংরেজ বা অন্য প্রদেশবাসী অধ্যাপক-গণের আগমনের প্রয়োজন কমিয়া যাইবে (বা তাঁহারা বাঙ্গালা ভাল করিয়া শিখিয়া লইবেন), আমরাও তেমনই এক-এক করিয়া সকল পরীক্ষাই মাতৃভাষার সাহায্যে প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইব। স্কুল হইতে আমাদের আরম্ভ করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস যে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্য্যন্ত মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদান প্রথার সম্পূর্ণ প্রচলন সদ্যসদ্যই হওয়া উচিত। আপাততঃ আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা নিম্নে নির্দ্দেশ করিলাম।

ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা

ইংরাজি ভাষা সকল ছাত্রেরই অবশ্য শিক্ষণীয় দ্বিতীয় ভাষা (compulsory second-language) হইবে; কিন্তু অন্যান্য যাবতীয় বিষয় মাতৃভাষার সাহায্যেই পরীক্ষা গৃহীত হইবে;—ইহাতে ইংরেজি ভাষাতে পরীক্ষা দিবার option দেওয়া হইবে। আমার বিশ্বাস যে, এই নিয়ম বাঙ্গলা-ভাষাভাষী ছাত্রদের উপর প্রযোজ্য ত বটেই—বর্ম্মিজ, আসামী, উড়িয়া, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রচলনকল্পে বিশেষ আপত্তি কেহ তুলিবেন না। তবে এই কয় ভাষাভাষী ছাত্র ভিন্ন অন্য ভাষাভাষী (যথা নাগা, খাসী প্রভৃতি অপ্রধান ভাষাভাষী) ছাত্রের পক্ষে ইচ্ছা করিলে ইংরাজি ভাষায় পরীক্ষা দিবার অনুমতি (option) দিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলা প্রভৃতি মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিবার বাধ্যকারী নিয়ম প্রচলিত না হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার প্রচলনের আশা সুদূরপরাহত।

I. A. এবং I. Sc. পরীক্ষা

I. A. এবং I. Sc. পরীক্ষাতেও ইংরাজিভাষা বাধ্যকরী দ্বিতীয় ভাষারূপে প্রচলিত থাকিবে। অন্যান্য শাস্ত্রের পরীক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে চালিত হইতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু নানাকারণে আপাততঃ উহা বাধ্যকরী হইতে পারিবে না। আমার প্রস্তাব এই যে, এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা যাহার যে ভাষায় ইচ্ছা, সে সেই ভাষায় দিতে পারিবে। হয় ইংরাজীতে, না হয় মাতৃভাষায় এই সকলের বিষয়ের পরীক্ষা হউক। এই option থাকিলে যে সকল কলেজে সাহেব অধ্যাপক আছেন, সে সকল কলেজে ইংরাজি আপাততঃ বহাল থাকিবে; কিন্তু এরূপ কলেজের সংখ্যা তত বেশী নয়। অন্যান্য কলেজে মাতৃভাষার সাহায্যে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা চলিতে পারিবে। আমার বিশ্বাস যে, আপাততঃ এই optional midium ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হইবে না। ক্রমশঃ, যেমন পুস্তকাদি রচিত হইবে, আমরাও মাতৃভাষার সাহায্য সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব।

B. A. এবং B. Sc. পরীক্ষা

B. A. পরীক্ষায় ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য সকলকেই পড়িতে হইবে; B. Sc. পরীক্ষায় ইংরাজি সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। এই দুই পরীক্ষাও I. A. এবং I. Sc. পরীক্ষার মত ইংরাজি এবং মাতৃভাষা এই দুইএর সাহায্যেই গৃহীত হওয়া উচিত। যাহার যে ভাষা ইচ্ছা, সে সেই ভাষায় পরীক্ষা দিবে। প্রথমতঃ ইংরাজিই চলিবে, পরে উপযুক্ত পুস্তক রচিত হইলে মাতৃভাষা চলিতে পারিবে।

M. A. এবং M. Sc. পরীক্ষা

আপাততঃ এই সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা ইংরাজিভাষার সাহায্য ভিন্ন গৃহীত হইতে পারিবে না বলিয়া ইংরাজির মধ্যবর্ত্তিতাই বাহাল রাখিতে হইবে।

ডাক্তারি পরীক্ষা

মেডিক্যাল কলেজে আপাততঃ ইংরাজির সাহায্য ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তবে ক্যাম্বেল, ঢাকা প্রভৃতি মেডিক্যাল স্কুলে বাঙ্গালা ভাষাতেই পঠনপাঠন চলা ও পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বিশেষতঃ বাঙ্গলাভাষায় চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক পুস্তক ইতিমধ্যেই রচিত হইয়াছে এবং বাকি পুস্তক অচিরেই রচিত হইতে পারিবে।

আইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা

এই দুই পরীক্ষা আপাততঃ ইংরাজির সাহায্যেই গ্রহণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে নিজের কোনও অভিজ্ঞতা না থাকাতে ঠিক কিছুই বলিতে পারিলাম না,—বিশেষজ্ঞেরা ইহার মীমাংসা করিবেন।

এম, এ পরীক্ষায় বাঙ্গলা সাহিত্যের স্থান

ফল কথা, ইহা স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে যে, ইংরাজিভাষা, ও সাহিত্য আমাদের অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনীয় তাবৎ শাস্ত্রেরই পঠনপাঠন ক্রমশঃ মাতৃভাষার সাহায্যে হইবে। অবশ্য এই অভিপ্সিত ফললাভ কিঞ্চিৎ সময়-সাপেক্ষ; কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না,—যতটা সম্ভব ততটা আরম্ভ করিয়া দিতেই হইবে। এখন একটা বিশেষ সুযোগ উপস্থিত;—সে সুযোগ যেন আমরা নিজেদের মধ্যে বিতণ্ডা ও মত-বিরোধের দোষে না হারাইয়া ফেলি। বাঙ্গলা সাহিত্য এখনই যেরূপ উন্নত হইয়াছে, তাহাতে আমি আশা করি যে, বাঙ্গলা সাহিত্য M. A. পরীক্ষার একটি বিষয় বলিয়া অনায়াসে নির্দ্দিষ্ট হইবে। বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বাঙ্গালী ছাত্রকে এখনও বাঙ্গলা সাহিত্যে একটা পরীক্ষা দিতে হয়; কিন্তু দেখিতেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও মাতৃভাষা M. A. পরীক্ষার বিষয়রূপে স্থানলাভ করিতে পারে নাই। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, আধুনিক ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, বাঙ্গালা philology প্রভৃতি মিলাইয়া বাঙ্গলা সাহিত্য এখনই M. A. পরীক্ষায় একটা স্বতন্ত্র স্থান অনায়াসে লাভ করিতে পারিবে *। এইরূপ পরীক্ষায় যাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহারা বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইবেন এবং স্কুল ও কলেজে বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক হইতে পারিবেন।

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, কেহ যেন মনে না করেন এই প্রবন্ধে আমি নিজে বাঙ্গালী বলিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গলাভাষার প্রসার বৃদ্ধির জন্য একটা জোর ওকালতি করিতে বসিয়াছি; আমার উদ্দেশ্য এই যে, কেবল যুক্তির সাহায্যে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিব। এইরূপ যুক্তির সহায়তায় অনেকের ন্যায় আমারও এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, দেশের উচ্চ শিক্ষার এবং মাতৃভাষার কল্যাণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্রমশঃ মাতৃভাষার সাহায্যেই নিষ্পন্ন হওয়া উচিত। যদি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়-কমিশনও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা হইলে বড়ই সুখের কথা হইবে।

---

* অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের এম, এ পরীক্ষা অন্যান্য বিষয় হইতে অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে। এ বিষয়ে আমার প্রস্তাব এই যে, বাঙ্গালায় শতকরা ৭০ নম্বর না পাইলে কাহাকেও First class এবং ৫০ নম্বর না পাইলে Second class দেওয়া হইবে না। বাঙ্গালায় Third class উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

উৎকল-সাহিত্য

[শ্রীরমেশচন্দ্র দাস]

উৎকল-সাহিত্য—মাঘ, ১৩২৫

১। "বিবিধ প্রসঙ্গ"- সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ কর।

(১)। "সমাজ সংস্কার সমিতি"—মহাসমিতি মণ্ডপে দীর্ঘকাল হইতে সমাজ সংস্কার সমিতি ভাঙ্গাহাটের অভিনয় করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বিগত অধিবেশনে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে। প্রায় পনর হাজার লোক অক্লান্তভাবে প্রাতঃকাল হইতে দিবা এক ঘটিকা পর্য্যন্ত সমিতির আলোচনায় যোগদান করিয়া উন্নত সংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাবগুলির উৎসাহ সহকারে সমর্থন করিয়াছেন। সভাপতি সুপণ্ডিত, কর্ম্মযোগী, বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ অতি বিশুদ্ধ সত্য কথায় পরিপূর্ণ। তিনি সুনিপুণ চিকিৎসকের ন্যায় আমাদের সামাজিক ব্যাধির মূল নির্দ্দেশ ও তাহার প্রতিকারের অমোঘ উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে জাতিপ্রথার সংশোধন, পতিত জাতির উদ্ধার, নারীজাতির উন্নতি ও অধিকারলাভ বিনা এদেশে যথার্থ জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ একপ্রকার অসম্ভব। দেশ-নায়কগণের মধ্যে কেহ বা সংস্কার-বিরোধী, কেহ, বা সে সম্বন্ধে নীরব নিশ্চেষ্ট। ফলতঃ, অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আশা হয়, সভাপতির সরল, সুস্পষ্ট উক্তিতে অনেকের চক্ষু ফুটিবে।

সমিতির এই অধিবেশনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রস্তাবসমূহের আলোচনায় বহুসংখ্যক মহিলা যোগদান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কাহার কাহারও বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলী-মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চার করিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, 'নারী নিজের শক্তি ও অধিকার অনুভব করিয়া সমাজের নানা ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিলে, দেশের বহু দুর্নীতি-দুরাচার ও দুঃখ-দুর্গতি তিরোহিত হইবে।

(২) "শিক্ষা-প্রসঙ্গ"--আমাদের শিক্ষা সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। উৎকলে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। অশিক্ষাই অন্যান্য জাতির তুলনায় আমাদের অধঃপতনের প্রধান কারণ। মনে হয়, আমাদের সমস্ত শক্তি ও অর্থ শিক্ষা-বিস্তারে নিয়োজিত হইলে, ভবিষ্যৎ কল্যাণ-পথ সুগম হইতে পারে। কিন্তু আমাদের সে উদ্যম কোথায়? সরকার পক্ষ হইতে যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাতে অন্তরায় দেখিলে, হৃদয় নিরাশায় অভিভূত হইয়া পড়ে। সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষার বহুলপ্রচার জন্য কত আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে; কিন্তু আমাদের এদিকে তাঁহার বিপরীত গতির সূচনা দেখা যাইতেছে। মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি বহুকাল হইতে নানা স্থলে শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করিতেছে; সরকারী সাহায্যের অভাবে তাহাদের কতকগুলির মূলোচ্ছেদ হইবার উপক্রম হইয়াছে। উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যে উদ্যম হইতেছিল, কর্ত্তৃপক্ষের অসম্ভব দাবীর ফলে তাহাও পরিত্যক্ত হইতেছে। আমাদের এ নূতন প্রদেশে শিক্ষার অনেক দিক্ শূন্য! ডাক্তারী কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নাই। স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত স্থাপিত কলেজটির দুরবস্থা বর্ণনীয় নয়। দেশের বড়লোকগণ নিজের কৃতিত্ব ঘোষণায় বা নিজের যশোগানেই ব্যস্ত!

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে 'স্কুল ফাইনেল' পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে এই নব বিধান প্রবর্ত্তিত হইবে, এবং ১৯২১ সালে তদনুসারে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। এ সম্বন্ধে কোথাও কিছু আন্দোলন বা আলোচনা দেখা যাইতেছে না। এত বড় একটা পরিবর্ত্তন কি এত সহজেই হইয়া যাইবে? এই নূতন পরীক্ষা দ্বারা যে উচ্চশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত হইবে, এ সহজ কথা কেহ বুঝিতে পারিতেছেন না মনে করা নিতান্ত ধৃষ্টতা। কেবল নীরবে সমস্ত সহ্য করাই যে আমাদের প্রকৃতি!

২। "অনন্তবর্ম্ম চোর গঙ্গদেব"—লেখক শ্রীতারিণী চরণ রথ বি-এ। বিখ্যাতনামা পরাক্রমশালী চোর গঙ্গদেব উড়িষ্যার গঙ্গবংশের প্রথম পুরুষ। আজিও পুরী নগরীর চুরঙ্গসাহী ও চুরঙ্গ সরোবর এবং কটকের নিকটবর্ত্তী সারঙ্গগড় সংলগ্ন চুড়ঙ্গদহ প্রভৃতিতে সেই নাম রক্ষিত আছে। কিন্তু এই মহাত্মার প্রকৃত নাম অনন্তবর্ম্ম চোল গঙ্গদেব। 'চোল' শব্দ ক্রমে 'চোর' ও 'চোড়' রূপে পরিণত হইয়া চোড়গঙ্গ বা 'চুগঙ্গ' আকার ধারণ করিয়াছে। সুবিস্তৃত পুরাতন উড়িষ্যায় বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলে প্রাপ্ত বহু প্রস্তর-খোদিত লিপি ও তাম্র-শাসন হইতে চোলগঙ্গদেবের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

গঙ্গবংশীয় রাজরাজ দেব চোল বংশের প্রসিদ্ধ নৃপতি রাজেন্দ্র চোলের কন্যা রাজসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারই পুত্র অনন্তবর্ম্ম চোল গঙ্গদেব বিংশ বর্ষ বয়সে ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হন। তাহার বহুকাল পরে তিনি উড়িষ্যা বিজয় করিয়া উভয় রাজ্যের মিলন এবং কলিঙ্গ হইতে রাজধানী উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করেন। এইরূপে উড়িষ্যায় গঙ্গবংশ স্থাপিত হয়। তিনি উড়িষ্যায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার করেন। পুরীর বর্ত্তমান জগন্নাথ মন্দির প্রথমে চোরগঙ্গদেব দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

মুকুর—মাঘ, ১৩২৫

১। "প্রাচীন উৎকল" (আর্থিক অবস্থা)- লেখক শ্রীজগবন্ধু সিংহ। প্রাচীন উৎকলের সকল বিভব বিলুপ্ত। কেবল মন্দির, প্রাসাদ, সরোবর প্রভৃতি অদ্যাবধি মূক সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান। তাহারাই একাধারে প্রাচীন উৎকলের আর্থিক অবস্থা ও ধর্ম্মোন্নতির পরিচায়ক ও পরিমাপক। উন্নত আর্থিক অবস্থা ব্যতিরেকে এরূপ ব্যয়সাপেক্ষ অসংখ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান স্থাপন সম্ভব নয়। উড়িষ্যা রাজগণ আপন বাহুবলে বহু রাজ্য জয় করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যয় করিয়াছিলেন।

মাদলা পাঞ্জি হইতে জানা যায়, গঙ্গবংশের রাজত্বে পূর্ব্বে আয় ছিল। ১৫ লক্ষ মাড় স্বর্ণ। হণ্টার সাহেবের মতে ইহার মূল্য ৪ ৭১০০০ পাউণ্ড। বর্ত্তমানে দেখা যায় ২ মাড় ১ মোহরের সমান। সুতরাং ২০ টাকা হিসাবে তাহার মূল্য ১৫০ লক্ষ টাকা। গঙ্গবংশের রাজত্বের সময়ে উড়িষ্যার সীমা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয় এবং তদনুসারে রাজস্ব বাড়িয়া উঠে। অনঙ্গ ভীমদেবের বার্ষিক আয় ৪৭৮৮০০০ টাকা ছিল। হণ্টার সাহেব বলেন, ১৭শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার আয় পাঃ ৪৩৫০০ আকবরের সময়ে পাঃ ৮৩৫০১৯ এবং ইংরেজ রাজত্বে পাঃ ৮৬০০০। আবুল ফজল প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের বিবরণ হইতে উড়িষ্যার অর্থ সচ্ছলতা জানা যায়। মোগলগণের কাগজে দুই প্রকার জমার উল্লেখ আছে; যথা—টঙ্কাবরি ও কামিল। প্রথমটা টাকায় ও দ্বিতীয়টি কড়িতে প্রকাশিত হইত। কেহ কেহ বলেন, কামিল মহম্মদ কর্ত্তৃক জমা বন্দোবস্ত হয় বলিয়া ইহার নাম 'কামিল জমা'। কিন্তু স্টার্লিং সাহেবের মতে আসফ খাঁ বন্দোবস্ত করিয়া বলিলেন, 'তোমার জমা কামিল', তাহা হইতে এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

ব্যয় হইতেও আয়ের অনুমান করা যাইতে পারে। ভুবনেশ্বর, জগন্নাথ, কোনার্ক প্রভৃতি শিল্প ভাস্কর কার্য্যসমন্বিত বৃহৎ মন্দির, বিন্দুসাগর, নরেন্দ্র, মার্কণ্ডাদি জলাশয়, কাটজুড়ীর প্রস্তর বাঁধ প্রভৃতি প্রাচীন উৎকলের আর্থিক অবস্থার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত দেশের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দেবমন্দির ও পুষ্করিণী লোকসাধারণের অর্থের পরিচয় প্রদান করে। উৎকলীয় রাজগণ মুক্তহস্তে নিষ্কর, অল্পকর ও অর্দ্ধকরে বিপুল ভূমি দান করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে 'চকড়া' দান, মঠাদির পরিচালন এবং দেবতাদের 'ভোগ রাজনীতি যানি যাত্রা' নিমিত্ত প্রভূত অর্থ ও ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। জগন্নাথদেবের মন্দির ও অলঙ্কার নির্ম্মাণ নিমিত্ত অনঙ্গ ভীমদেব যথাক্রমে ১২১০০০০ ও ৪০০০০ মাড় স্বর্ণ এবং ১৩৮৩ বাটী ভূমি দান করেন। কোনার্ক মন্দির নির্ম্মাণকার্য্যে উড়িষ্যার ১২ বৎসরের রাজস্ব ৩৬ কোটী টাকা ব্যয়িত হয়। যযাতি কেশরী ১৮ ব্রাহ্ম-শাসন (বসতি) স্থাপন করিয়া ১৫১৭ বাটী ভূমি প্রদান করেন।

উড়িষ্যার অঙ্গহানি হেতু আয় ক্রমে কমে হ্রাস পাইতে লাগিল। মোগলদিগের আগমনের সহিত দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী উড়িষ্যায় পদার্পণ করিয়া করাল মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক উড়িষ্যাবাসীকে আজিও গ্রাস করিতেছে।

২। "ময়ূর ক্ষেত্র"- লেখক—শ্রীনাথ চন্দ্র মিশ্র কাব্যতীর্থ। ময়ূর ক্ষেত্র বা ময়ূরছড়ি কপিলপদা রাজবাটী হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা মাহেন্দ্র-পর্ব্বত বিশেষ। সম্প্রতি বালেশ্বর হইতে নীলগিরির মধ্য দিয়া মেঘাসন পর্যন্ত যে সরল প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা ময়ূরছড়ির উত্তর পার্শ্ব ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই ময়ূরক্ষেত্র সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসিগণের নানা প্রকার ধারণা ও কিংবদন্তী প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন ময়ূরক্ষেত্র সিদ্ধ যোগী-ঋষির নিত্য যজ্ঞস্থল; প্রাচীন লোকগণ এখানকার 'পাঁচবখরা' ও 'সাতবখরা' যজ্ঞবেদীতে যজ্ঞোপকরণ দেখিয়াছেন। কাহারও কাহারও সৌভাগ্যবলে ময়ূরক্ষেত্রস্থ ঋষিগণের গম্ভীর নিনাদ কীর্ত্তন-নিনাদ শ্রুতিগোচর হইয়াছে। শ্যামাদি সুকণ্ঠ পক্ষিগণের মধুর অস্ফুট কাকলীতে পর্ব্বতের সানুদেশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বনজাত সুগন্ধ পুষ্পরাজির পরিমল বহন করিয়া মৃদু-মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে।

পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে ক্রমে ক্রমে জলধারা প্রবাহিত হইয়া সার্দ্ধহস্ত প্রশস্ত এক পথ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে বৃক্ষগুল্ম এরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, আরোহণ করা অসাধ্য। তাহার বাম পার্শ্ব দিয়া প্রস্তর অবলম্বনে অতি কষ্টে আরোহণ করিতে হয়। এক পার্শ্বে একটি দীর্ঘ গম্ভীর কূপ। তাহার পরিধি ২০ ফুট ও গম্ভীরতা প্রায় ৯ ফুট। জল নাই, কিন্তু শৈবালাচ্ছন্ন। তাহার পর নাটশালা। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে প্রায় ৫০ ফুট পরিষ্কার ও সমতল। উপরে প্রকৃতি দেবীর প্রস্তর নির্ম্মিত রৌদ্র ও বর্ষা হইতে স্থানটিকে রক্ষা করিতেছে। নাটশালা হইতে এক অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ পথ 'সাতবখরা' অভিমুখে গমন করিয়াছে। মধ্যে গুহা, তি-নাতিপ্রশস্ত স্থান কিন্তু বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার উপযুক্ত। এইরূপে কিছুদূর অতিক্রম করিলে সিদ্ধগুহায় উপনীত হওয়া যায়। তাহা হইতে উপরে উঠিবার দুইটি পথ। একটি সুগম হইলেও অপরটি অত্যন্ত দুর্গম। কাষ্ঠদণ্ড সাহায্যে 'বড় পথরি' বা উপর পৃষ্ঠে উঠিতে পারা যায়। এই স্থানের চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। পূর্ব্বে নীলগিরির পর্ব্বতমালা, দক্ষিণে কেন্দুঝরের গো নাসিকা পর্ব্বতশ্রেণী, পশ্চিমে সার্থকনামা মেঘাসনের অভ্রংলিহ শিখরমালা অনন্ত আকাশে মিশিয়া গিয়াছে। কত নদী দিক-চক্রবালের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্ব্বত, গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ ভেদ করিয়া ভীমকায় অজগরের ন্যায় অচল অটলভাবে পতিত রহিয়াছে।

পরিচারিকা—মাঘ, ১৩২৫

১। "মহাসতী হরিপ্রিয়া"—লেখিকা শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী। প্রাচীন উৎকলে অঙ্গপতি নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী ও সদ্‌গুণালঙ্কৃত নরপতি ছিলেন। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াও অনেক দিন দারপরিগ্রহ করেন নাই। একদিন মহারাজ মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া কোনও বরাহের অনুধাবন করিতে-করিতে নগপুরের অরণ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন এক অলোকসামান্যা রূপবতী ষোড়শী বালিকা কঠোর তপস্যায় নিমগ্না এবং সন্নিকটে পূজার উপচারাদি রহিয়াছে

দাসী দণ্ডায়মানা। দাসীর নিকট আপন পরিচয় প্রদান করিয়া তিনি অবগত হইলেন যে ধ্যানরতা কুমারী নাগপুর-রাজকন্যা; নাম হরিপ্রিয়া এবং উৎকলরাজ ক্রতুপতির পাণিগ্রহণ আকাঙ্ক্ষায় তপশ্চারিণী। পূর্ব্ব হইতে হরিপ্রিয়ার গুণরাজি শ্রবণ করিয়া মহারাজেরও বিবাহ-বাসনা প্রবল হইয়াছিল। তিনি সাগ্রহে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে পাণিগ্রহণ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ক্রতুপতি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া নাগপুর রাজ সমীপে পত্রসহ দূত প্রেরণ করিলেন। নাগ পুরাধিপতি উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিলে যথাসময় শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। নব-দম্পতি উৎকল রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া যথা রীতি 'চতুর্থী' 'অষ্টমঙ্গলী' প্রভৃতি সমাপন করিলেন। রাজদম্পতি সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। ক্রতুপতি ক্রমশঃ স্ত্রী পরায়ণ হইয়া রাজকার্য্যে অবহেলা করিলেন। মন্ত্রী যথাসাধ্য রাজ্যশাসন করিয়াও প্রবল, শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাজা স্ত্রী সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

ক্রতুপতি গুণবতী ভার্য্যা সহ বনবাসী হইয়া ফলমূল ভক্ষণে ও তৃণশয্যায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে এক ব্রাহ্মণ শিবপূজার্থে কেতকী পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন। তিনি স্ত্রীর জন্য ব্রাহ্মণের নিকট উক্ত পুষ্প প্রার্থনা করিলেন এবং প্রাপ্ত না হইয়া বলপ্রয়োগে গ্রহণ করিলেন। কুপিত ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে তিনি কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইলেন। সাধ্বী স্ত্রী কায়মনোবাক্যে স্বামীসেবা করিতে লাগিলেন। হরিপ্রিয়া ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া বন হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় এক তাপসের দর্শন লাভ করিয়া স্বামীর রোগমুক্তি প্রার্থনা করেন। তিনি যোগবলে সমস্ত অবগত হইয়া 'বড় উষা' নামক শিবব্রতের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন এবং কি প্রকারে আষাঢ় মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীর প্রভাতে সনারিকেল স্নান ও উপবাস করিয়া শিবনাম জপ ও সেই দিন হইতে প্রতি সোমবারে শিবার্চ্চনা করিয়া কার্ত্তিক কি অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা চতুর্দ্দশীতে ব্রত উদযাপন এবং চৌদ্দ পুরে চতুর্দ্দশ মণ্ডা পাক করিয়া সুব্রাহ্মণের সাহায্যে শিবের নৈবেদ্য প্রদান করিতে হয়—সমস্ত উপদেশ প্রদান করিলেন। হরিপ্রিয়া যথাবিধি বড়উষা ব্রত করায় ক্রতুপতি নিরাময় ও হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। শিবানুগ্রহে তাঁহাদের এক পুত্র লাভ হয় এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পুত্রকে বিবাহিত ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারা কাশীবাসে গমনপূর্ব্বক হরসেবায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

অদ্যাবধি উড়িষ্যায় পরম ভক্তিসহকারে 'বড়উষা' অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

নেত্য পাগলা

[শ্রীবরদাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

প্রথম পরিচ্ছেদ

সতত-কোলাহলমুখরিত নগর হইতে ছায়াস্নিগ্ধ শ্যামকোমল পল্লীশ্রীর মধ্যে আসিয়া ফুলরাণীর অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাহার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখে লুপ্তপ্রায় রক্তিমাভা দিন-দিন ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

লক্ষ্মীপুরের জমিদারীতে আমি পূর্ব্বে কখনও আসি নাই। গ্রাম ভাঙ্গিয়া প্রজারা নূতন মনিব দেখিতে আসিত; বাগান-বাড়ীর সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ প্রতিদিন গ্রামবাসিনী যুবতী, বৃদ্ধা, ও বালিকায় ভরিয়া যাইত।

পিতার মৃত্যুর পর বাগান-বাড়ীটার বোধ হয় কেহ যত্ন করে নাই। কিন্তু কুঞ্জতল, বৃক্ষবীথিকা, নদীর ঘাট ও চিত্রিত গৃহগুলির মধ্যে তখনও স্বর্গীয় পিতৃদেবের সৌন্দর্য্যানুরাগ বিদ্যমান ছিল। শয়নকক্ষের দেওয়ালে পূর্ব্বপুরুষদিগের তৈল-চিত্রাবলী ও বহুবিধ নর-নারীর প্রতিকৃতি সজ্জিত ছিল। তন্মধ্যে একখানি তৈলচিত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখাইতেছিল—চিত্রকরের সমুদয় প্রতিভা যেন সেই রমণী-মূর্ত্তির চিত্রিত সৌন্দর্য্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল!

উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষীণকায়া নদী কুলুকুলুনাদে বহিয়া যাইতেছিল। একদিন সন্ধ্যাকালে তাহার তীরে প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর উপর বসিয়া আছি। ফুলরাণী আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া নদীর জলের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। মাঝিদের সারিগান বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। নদীর পরপারে ছায়াবৃত বৃক্ষান্তরাল হইতে পূর্ণিমার চন্দ্রিমা ধ্বান্তাচ্ছন্ন জগৎকে আলো দিবার নিমিত্ত ধীরে-ধীরে উদিত হইতেছিলেন। কামিনীফুলের মৃদু সৌরভ

সদ্যস্নাতা রমণীর সিক্ত বসনের ন্যায় বাতাসের অঙ্গে-অঙ্গে জড়াইয়া ধরিতেছিল। চারিপার্শ্বে বকুলফুল ঝরিয়া পড়িয়া যেন আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতেছিল। আর একটা মহান শান্তভাব মৃদু-রাগিণী প্রকৃতির শ্যামল বক্ষপঞ্জর হইতে মাথা তুলিয়া সমুদয় বিশ্ব-জগৎকে এক সুরে বাঁধিয়া দিতেছিল। প্রকৃতির সে নগ্ন সৌন্দর্য্য ও শান্ত সঙ্গীতের দর্শক বা শ্রোতা বোধ হয় নিখিল বিশ্বের মধ্যে কেবল আমরাই ছিলাম।

সহসা সেই অমূর্ত্ত রাগিণী মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল; প্রকৃতির সুরের সঙ্গে সুর বাঁধিয়া কে যেন গাহিতেছিল—

"হৃদয় লয়ে ছি ছি এ কি ছলনা!"

আমরা সাশ্চর্য্যে উঠিয়া বসিলাম। পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণচ্ছটায় পৃথিবী তখন জ্যোৎস্নাময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। ফুল্ল প্রসূনচয়ের সুরভি বায়ুকে আমোদিত করিয়া তুলিতেছিল। দূরে একখানি নৌকার মধ্যে একটা স্তিমিতপ্রায় দীপ দৃষ্ট হইতেছিল।

গীত বন্ধ হইল; কিন্তু তাহার কিছুকাল পর পর্য্যন্তও তাহার রাগিণীর ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিক ঝঙ্কৃত করিয়া রাখিল। অনতিদূরে এক শুষ্ক গোলাপকুঞ্জের পার্শ্বে এক শীর্ণকায়া মলিনবসনা রমণী মূর্ত্তি দেখা গেল। তাহার মুখ বিবর্ণ ও কেশ রুক্ষ।

রাণী তাহার মৃণাল ভুজ দ্বারা আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। অপরিচিতা সেই রমণী প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া, উদাসভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ—যেন তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। সহসা সে একটা বিকট হাস্য করিয়া আমাদের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইল।

আমরা উভয়েই স্তম্ভিত ও ভীত হইলাম। ফুলরাণীর হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দনধ্বনি যেন শোনা যাইতে লাগিল।

দূরে আবার সেই গীতধ্বনি অশরীরী বাণীর ন্যায় আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়ের সঞ্চার করিতে লাগিল।

"হৃদয় লয়ে ছি ছি এ কি ছলনা!—
মিছে প্রণয় ফাঁদ কেন বল না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেঘে-মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছিল। সমুদায় প্রকৃতি স্থির; কেবল মধ্যে-মধ্যে শোকসন্তপ্তা অধীরা নারীর দীর্ঘশ্বাসের মত উদাস বায়ু ছুটিয়া আসিতেছিল। দূর গ্রামে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, অশ্বারোহণে গৃহে ফিরিতেছিলাম। পথের উভয়পার্শ্বে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। শ্যামল শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে নদীর বক্ররেখা দৃশ্যমান হইতেছিল। অশ্বত্থবৃক্ষের শাখায় নানাবর্ণের বিহঙ্গ কলরব করিতেছিল।

একটা বটবৃক্ষের তলদেশ পরিষ্কৃত দেখিয়া কৌতূহল হইল,—এমন জনশূন্য স্থান কে পরিষ্কার করিয়া রাখে? গাছের ডালে শিকায় দুইটা হাঁড়ি ঝুলান ছিল। একটা মুড়া ঝাঁটা মূলদেশে পড়িয়া ছিল। একপার্শ্বে একটা ছিন্ন, মলিন মাদুরও পড়িয়া ছিল।

আমার সহিত যে ভৃত্য আসিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল যে, উহা নেত্য পাগলীর আস্তানা। সে আরও বলিল যে, নেত্য পাগলী কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা বা কাহারও অপকার করে না। তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই,—সে এইরূপে বৃক্ষের তলাতেই বাস করে। সর্ব্বত্রই তাহার গতিবিধি।

ক্রমশঃ রাত্রি হইয়া আসিল। আমার ঘোড়া অন্ধকারে ধীরে ধীরে চলিতেছিল। বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। ভৃত্য কিছু পিছাইয়া পড়িল।

সহসা আমার অশ্ব আর অগ্রসর হইতে চাহিল না—যেন সম্মুখে কিছু দেখিয়া ভয় পাইল! আমিও যেন কোন প্রাণীর নিশ্বাসধ্বনি শুনিতে পাইলাম। কিন্তু সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হইল না। আমি আমার পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাহা জ্বলিল না, বাতাসে নিবিয়া গেল। কিন্তু সেই অত্যল্প আলোকেই যেন একটা ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল।

ভৃত্যের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম, এবং ভৃত্যও অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল; তাহার সাহায্যে দেখিলাম, দুইটা কর্দ্দমাক্ত কুকুরের উপর এক অদ্ভুত রমণীমূর্ত্তি! ভৃত্য আমার ভয় দেখিয়া বলিল, "বাবু, ভয় নাই,—এ সেই নেত্য পাগলী।" আমি বিস্মিত হইলাম। এক মাস পূর্ব্বে উদ্যানের মধ্যে আমি ইহাকেই দেখিয়াছিলাম।

নিরীহ কুকুর দুইটী তাহাদের নির্জ্জন সুখের প্রতিবন্ধক দেখিয়া উঠিতে গেল; কিন্তু রাজ্ঞীর ন্যায় দৃঢ় অনুজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে পাগ্‌লী তাহাদিগকে বলিল—"থাম্, নড়িস্ না।" তাহারা আবার নিশ্চল হইয়া শুইয়া রহিল। পাগ্‌লীও পরম কৌতুক-দৃষ্টিতে নীরবে আমাদের দেখিতেছিল। প্রবল বৃষ্টিপাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। অদূরে একটা বজ্রপাত হইল। সে তথাপি তেমনই নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া রহিল! জগতের সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ যেন তাহার কামনাশূন্য হৃদয়কে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে সমর্থ নহে। উন্মাদিনী বটে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শরতের ভরা-নদীতে পাল তুলিয়া আমাদের বজ্‌রা ছুটিতেছিল। ফুলরাণীর দেহে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও বল ফিরিয়া আসিয়াছিল, সুতরাং আমরা দেশে ফিরিতেছিলাম। ফুলরাণী চারিদিকের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া তন্ময় চিত্তে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। ক্রমে-ক্রমে বড় নদী ছাড়াইয়া আমাদের বজ্‌রা ছোট খালের মধ্যে প্রবেশ করিল। খালের উভয় পার্শ্বে প্রকৃতির অসঙ্কোচ স্বাধীনতা, অসংযত সুষমা। বনবাজীচ্ছায়ায় তীরে বর্ষার জল কাঁপিতেছে। শরৎ বধূর সলজ্জ কৌতুকময় কটাক্ষ অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় চতুর্দ্দিক ঝলসাইয়া দিতেছিল। বালকের দল তীরে জটলা করিতেছিল।

এক স্থলে বজ্‌রা ভিড়াইয়া তীরে উঠিয়া দেখিলাম, কতকগুলি বালক ধূলি উড়াইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, এবং একটী দশমবর্ষীয়া বালিকা তাহাদের কৌতুক ও বিদ্রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে।

মনুষ্যজীবনে এমন এক একটা মুহূর্ত্ত আসিয়া থাকে, যখন নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনাও তাহার সমুদয় অন্তরিন্দ্রিয়কে অত্যাচার বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলে। আমি বালিকার নিকট অগ্রসর হইয়া স্নেহমাখা সুরে বলিলাম, "মা! তুমি কাঁদিও না, আর তোমাকে কেহ বিরক্ত করিবে না।" একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ছেলের দল চুপ করিয়া দাঁড়াইল। বালিকা অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিল। তাহার কৃষ্ণতারকা-যুক্ত সজল দৃষ্টিতে অনেকখানি কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। বালিকার ছিন্ন, মলিন বসন ও অনাদৃত সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটি লুক্কায়িত মহিমশ্রী যেন আমি দেখিতে পাইলাম। সহানুভূতিতে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। স্নেহার্দ্রস্বরে বালিকার হাত ধরিয়া বলিলাম, "মা! তোমার বাড়ী কোথায়? চল, তোমাকে রাখিয়া আসি!" বালিকা আবার সকাতরে আমার পানে চাহিল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। ব্যর্থ প্রয়াসের তীব্র যন্ত্রণা যেন তাহার দৃষ্টির সহিত কাঁপিতেছিল। আমি বিস্মিত হইলাম!

অপেক্ষাকৃত বড় একটি বালক অগ্রসর হইয়া বলিল, "বাবু, মেয়েটি বোবা, মোটে কথা বলিতে পারে না।" আমি দুঃখিত হইয়া সেই বালকটাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "উহার কে আছে?" বালক বলিল, "উহার এখন কেহ নাই! এক বৃদ্ধা ভিক্ষা করিয়া বালিকাকে লালন-পালন করিত, আজ কয়েকমাস হইল সেও মরিয়া গিয়াছে। বালিকা এখন পথে পথে বেড়ায়। ভিক্ষাই উহার উপজীবিকা।" হায়! নিষ্ঠুর সংসার কি কেবল হতভাগ্য দরিদ্রকেই চাপিয়া ধরে? ইতঃপূর্ব্বে দুঃখীর দুঃখ বড় একটা বুঝিতে চেষ্টা করি নাই; একটা সৎকার্য্যের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

রাণী যখন ছিন্নবসনা বালিকাটিকে নৌকার উপর দেখিল, তখন একটু বিস্মিতা হইল। তাহার পর আমার নিকট হইতে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনিয়া, সযত্নে তাহাকে আহার করাইল, এবং কোমল শয্যায় ঘুম পাড়াইল। ফুলরাণী তখন আমার কাছে আসিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, "ওগো! আমার একটা কথা রাখ্‌বে?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "কি?" রাণী বলিল, "মেয়েটি অনাথা, উহাকে আমি পালন করিব।" তখন বজরায় পাল তুলিয়াছিল। আমি বলিলাম, "সেই সঙ্কল্পেই ত' উহাকে আনিয়াছি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফুলরাণী আদর করিয়া বালিকার নাম রাখিয়াছিল 'বনবালা'। রবিকরসম্পাতে ইন্দ্রধনু যেমন ধীরে-ধীরে ফুটিয়া উঠে, রাণীর মধুর স্নেহ ও যত্নে বনবালার উপেক্ষিত সৌন্দর্য্যও তেমনি দিন-দিন ফুটিয়া উঠিতেছিল। বনবালাকে আমি বড় স্নেহ করিতাম। আমার হৃদয়ের রুদ্ধ সমস্ত ভগিনী-স্নেহ সে একেবারে একচেটে করিয়া

লইয়াছিল। কিন্তু বনবালার বয়োবৃদ্ধির সহিত আমরা স্পষ্টই অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমাদের প্রাণভরা স্নেহ-যত্ন সত্ত্বেও, সে যেন একটা কিসের অভাব অনুভব করিত; এবং তাহার বদনমণ্ডল সর্ব্বদাই একটা বিষাদ-কালিমাবৃত থাকিত।

বর্ষাকালীন নদীর জলের ন্যায় বনবালার রূপযৌবন দুকূল ছাপাইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু কেহ আসিয়া তাহার সীমন্তে নারীজাতির উজ্জ্বল আশীর্ব্বাদ আঁকিয়া দিল না। এইবার আমাদের মস্ত ভাবনার বিষয় হইল তাহার বিবাহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জমীর দখল লইয়া বিলাসপুর কাছারীর সঙ্গে আমাদের কাছারীর ছোটখাট একটা লাঠালাঠি হইয়াছিল। তদুপলক্ষে আমাকে লক্ষ্মীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে হয়। আমি দেখা করিয়া অপরাহ্নে লক্ষ্মীপুরের কাছারিতে ফিরিয়া গেলাম। হঠাৎ যাইতে হইয়াছিল বলিয়া নায়েবকে সংবাদ দিতে পারি নাই।

পূজার সময় বাড়ী মেরামত হইয়াছিল। ঘরের মধ্যে চূন ফিরাইবার সময় জিনিসপত্র সরান হইয়াছিল। এখন সেগুলি সাজান হইতেছিল। ভৃত্য আমার শয়নকক্ষের চিত্রগুলি টাঙাইয়া রাখিতেছিল। সহসা একখানি তৈল চিত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। ছবিখানির কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আজ সাত বৎসর পরে সেই চিত্র দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। বনবালার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য। চিত্রাঙ্কিত রমণী মূর্ত্তিতে ও বনবালার পূর্ণযৌবনোদ্ভিন্ন মূর্ত্তিতে এত সাদৃশ্য কি করিয়া থাকিতে পারে, আমি বুঝিতে পারিলাম না। কাহাকেও সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিলাম। দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য আর কিছুদিন লক্ষ্মীপুরে থাকিতে হইল। মোকর্দ্দমার গোলমালে চিত্রের কথা ভুলিয়া গেলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তখন সন্ধ্যা। বৈকালে খুব ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল—দুর্য্যোগের চিহ্ন তখনও আকাশে বিদ্যমান।

ভৃত্য আমার শয়নকক্ষে প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। আমি তথায় প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, এক রমণী মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আছে। উজ্জ্বলালোকে চিনিলাম, সে সেই নেত্য পাগ্‌লী।

আমি তাহাকে তাড়াইয়া দিতে ভৃত্যকে আদেশ দিলাম। সে নড়িল না। তখন আমি ভৃত্যকে নিষেধ করিয়া কার্য্যান্তরে পাঠাইলাম। আমি তাহাকে পুলিসে দিবার ভয় দেখাইলাম; তাহাতেও সে গেল না। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "এখন কি আর সে দিন আছে? একদিন তুমিই আমার এই পায়ের তলায়—তখন আলতা পরা ছিল—লুটিয়ে পড়ে কত কেঁদেছিলে। আমি কি সেধে তোমার কাছে এসেছিলুম বাবু? কত লোভ দেখিয়েছিলে, কত সোহাগ করেছিলে; এখন সে যৌবন নাই, সে রূপও নাই। একদিন আমার সেই যৌবন স্বপ্নস্মৃতি স্বহস্তে তুমি ঐ চিত্রে আঁকিয়াছিলে। আমার সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্য ঐ চিত্র দিবে।" এই বলিয়া সে সেই তৈলচিত্রের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিল।

আমার চক্ষুর উপর হইতে কি যেন একটা কালো পরদা সরিয়া গেল। সহসা পাগলিনী কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিল, "আমাকে পায়ে ঠেলিতে হয় ঠেল, কিন্তু তাকে ফিরাইয়া দাও। সে যে বোবা গো, ফিরিয়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি সে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দাও!"

উন্মাদিনী আমার পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, আমি বলিলাম, "কে তোমার মেয়ে লইয়াছে, আমি জানি না।" নেত্য পাগ্‌লী এইবার দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং একখানি ফটোর মত কাগজ লইয়া দেখিতে লাগিল। আমি ফটোখানি কাড়িয়া লইয়া দেখিলাম, সেখানি স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রতিকৃতি!

সন্দেহের স্তূপ ভাঙ্গিয়া অপ্রীতিকর নিষ্ঠুর সত্য ফুটিয়া উঠিল। পাগ্‌লা কখন্ উন্মুক্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, জানিতেও পারি নাই।

দূরে সেই গীতধ্বনি!

"হৃদয় লয়ে ছি—ছি এ কি খেলা!
মিছে প্রণয়-ফাঁদ কেন বল না!"

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন

(Natural Selection)

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী এল-এম-এস্]

"প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" ইংরেজি Natural Selection এর বাঙ্‌লা। কথাটা অধিক দিন আমাদের সাহিত্যে স্থান পায় নাই। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলিলে কি বুঝায়, পাঠকদের মধ্যে হয় ত অনেকের সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণাও নাই। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে দু'চারিটা কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

কি জীবরাজ্য, কি উদ্ভিদ্‌রাজ্য,—আমরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেদিকেই দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক উদ্ভিদ্ টিকিয়া থাকিবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করিতেছে। দার্বিন্ (Darwin) এই চেষ্টাকে "Struggle for Existence" অর্থাৎ "জীবন-সংগ্রাম" নাম দিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক জীবশ্রেণী ও প্রত্যেক উদ্ভিদ্‌শ্রেণী হইতে এত অধিক বংশধর জন্মে যে, তাহাদের সকলের বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হয় না। এই কারণে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ইহাদের মধ্যে একটা অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। এই যুদ্ধে যাহারা বলবান্, অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে যাহাদের সামর্থ্য ও উপযোগিতা সকলের চেয়ে বেশী, কেবল তাহারাই টিকিয়া যায়, অপরগুলি বিনষ্ট হয়। অন্য কথায়—Nature বা প্রকৃতি যাহাদের উপযুক্ত মনে করে, তাহাদের বাছিয়া লয় ও বাঁচিয়া থাকিতে দেয়; অন্যগুলিকে নির্ম্মম ভাবে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। শুধু এই নয়। যে গুণ থাকাতে ইহারা উপযুক্ত বলিয়া স্থির হয়, সেই গুণটি বা গুণাবলি, বংশানুক্রমের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে, উত্তর-বংশীয়দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইহার ফলে পুরুষানুক্রমে বংশের উন্নতি সাধিত হয়। দুটি কারণে বংশের উন্নতি হয়; ১ম—বংশের মধ্যে যাহারা যোগ্যতম—যাহারা সকলের চেয়ে সমর্থ, কেবল তাহারাই বাঁচিয়া থাকিয়া বংশরক্ষা করিতে পায়। ২য় যদি দৈবক্রমে কাহারও মধ্যে এমন কোন গুণ আসিয়া সংযুক্ত হয়, যাহাতে তাহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে, প্রকৃতি তাহাকেই বাছিয়া লয়, এবং তাহাকেই বংশ-বিস্তার করিতে দেয়। ব্যাপারটা যে কেমন,—উদ্যানরক্ষক ও পশুপালকেরা গাছ-পালার ও পশুশ্রেণীর কি করিয়া উন্নতি সাধন করে, সেইটি লক্ষ্য করিলে, কতকটা বুঝিতে পারা যায়। ইহারা যেমন তাহাদের আশ্রিত উদ্ভিদ্ ও পশুশ্রেণীর মধ্যে যাহাদের যোগ্য মনে করে, শুধু তাহাদেরই বংশরক্ষা করিতে দিয়া, ধীরে-ধীরে উদ্ভিদ ও পশুশ্রেণীর উন্নতি সাধন করে, প্রকৃতিও ঠিক সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া জীব ও উদ্ভিদকে ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে আনিতে থাকে।

এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে যদি ক্রমশঃই উন্নতি হইতে থাকে, তবে ত এমন এক দিন আসিতে পারে, যে দিন জীব ও উদ্ভিদ্ তাহাদের উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইবে, ইহার পর, তাহাদের আর কোন উন্নতিরই সম্ভাবনা থাকিবে না? কথাটা খাটিত বটে—যদি জীব ও উদ্ভিদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের কোন রকম পরিবর্ত্তন না ঘটিত। কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিয়তই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন এবং আরও কত হাজার হাজার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার স্থিরতা নাই। এই পরিবর্ত্তনকালে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবার জন্য জীব ও উদ্ভিদকে নিয়ত চেষ্টা করিতে হইতেছে; সুতরাং জীব ও উদ্ভিদের এমন অবস্থা আসিতেই পারে না, যে অবস্থায় তাহাদের গতি স্থির থাকিবে—এক পাও অগ্রসর হইতে থাকিবে না। ইহার ফলে এমন অবস্থা দাঁড়াইতে পারে যে, কোন এক বিশেষ শ্রেণীর জীব বা উদ্ভিদ্ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে চেষ্টা করায়, কোন ক্রমে তাহার এমন সব পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, যাহাতে সে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

এই ত গেল প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। এ যে শুধু একটা থিয়োরী (theory), এমন যেন কেহ মনে না করেন।

ইহার অন্তর্গত সমস্তই প্রত্যক্ষ ব্যাপার। এ কথা কে না জানে,—পৃথিবীতে যে সকল জীব ও উদ্ভিদ্ আছে, তাহাদের বংশধরদের সকলকেই যদি বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে এত বড় বিশ্বে একদিনের জন্যও স্থানে কুলায় না? হাতীর খুবই বিলম্বে সন্তান হয়। একটি হস্তি-দম্পতির যে কয়টি সন্তান হয়, তাহারা সকলেই যদি বাঁচিয়া থাকিয়া বংশ-বিস্তার করিতে পারে, তাহা হইলে ৭৫০ বৎসরের মধ্যে এমন একটি দিন আসিতে পারে, যে দিন উক্ত হস্তিদম্পতির বংশে ১৯,০০০,০০০ বংশধর জগতে বিবরণ করিতে থাকিবে। মনে কর, কোন একটা গাছের বৎসরে দুটিমাত্র বীজ হয়। এই দুইটা বীজ হইতে যে চারা হয়, তাহারা বড় হইয়া যদি বংশ-বিস্তার করিতে পায়, তাহা হইলে ২০ বৎসর মধ্যে ঐ গাছটি হইতে ১১০০০০০টি গাছ জন্মিবে। আমরা সকলেই জানি, বৎসরে দুটিমাত্র বীজ হয় এমন কোন গাছ নাই বলিলেই হয়। আর হাতীর চেয়ে সব জানোয়ারেরই শীঘ্র-শীঘ্র সন্তান হয় এবং সংখ্যাতেও বেশী হয়। মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, জীব বা উদ্ভিদের যে সকল বংশধর জন্মে, তাহাদের মধ্যে গড়ে হাজারটির মধ্যে একটি মাত্র বড় হইয়া বংশ-বিস্তার করিবার মত হয়, বাকীগুলি তাহার পূর্ব্বেই মরিয়া যায়। জীবন সংগ্রাম যে কি ভয়ানক জিনিস, এই ব্যাপার হইতে তাহা কতকটা অনুমান করা যায়। কোন যুদ্ধে যদি অর্দ্ধেক সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে লোকে তাহাকে অতিশয় ভীষণ যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। কিন্তু যে যুদ্ধে হাজারের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত থাকে, সে যে কত বড় ভীষণ যুদ্ধ, তাহা মনে করিতেও আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে, যাহারা প্রবল, যাহাদের সামর্থ্য অধিক, তাহারাই জয়ী হয়। সামর্থ্য শব্দটি এস্থলে শুধু শারীরিক বা মানসিক সামর্থ্য হিসাবে বুঝিলে চলিবে না। এখানে ইহার অর্থ এই যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা-সমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষে যে যত উপযুক্ত, সে তত বলবান, সামর্থ্যবান। এই উপযোগিতা বা সামর্থ্য যে সকল গুণের উপর নির্ভর করে, সেই গুলি বংশানুক্রমে বংশের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। সন্তান যদিচ বাপ-মার শারীরিক ও মানসিক ধর্ম্মসমূহ পায় বটে, তথাপি এ কথা বলা চলে না যে, সে তাহার বাপ-মার অবিকল নকল ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই যে সংসারে এত লোক আছে, ইহাদের মধ্যে একজন যে দেখিতে ঠিক আর একজনের মত, এ কথা কেহই বলিতে পারে না। যতই সাদৃশ্য থাকুক, একটু ভাল করিয়া দেখিলে পার্থক্য চোখে পড়িবেই পড়িবে। অতএব সাদৃশ্যটা জাতিগত জিনিস, ব্যক্তিগত জিনিস নয়। ইহা যে শুধু মানুষের বেলাতেই খাটে, অন্যত্র নয়, এমন কথা বলা যায় না। দুটো তালগাছ কি দুটো ছাগল দেখিতে যতই এক রকম হোক, উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে—এটা ধ্রুব কথা। মানুষের মধ্যেকার পার্থক্য আমাদের চোখে যত সহজে ধরা পড়ে, অন্য জীব-জানোয়ার বা গাছপালার বেলাতে ততটা নয়। তাহার কারণ, আমাদের মনটা না কি আমাদের মধ্যেকার পার্থক্য দেখিতেই বিশেষ অভ্যস্ত। আমরা নিজের-নিজের মনকে এই কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত করিয়া থাকি। ইহা যদি আমরা না করিতাম, তাহা হইলে নিজের পরিবারেরই সকলকে চিনিয়া উঠা আমাদের পক্ষে দায় হইয়া উঠিত; কে শত্রু, কে মিত্র, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। মানুষ ছাড়া অন্য জীব বা উদ্ভিদের বেলায় আমরা নিজেদের মনকে তেমন করিয়া খাটাই না বলিয়াই উহাদের মধ্যেকার পার্থক্য তেমন করিয়া ধরিতে পারি না। কিন্তু আমাদের বিশ্বের আদি জননী যে প্রকৃতি, তাঁর দৃষ্টি কেহই এড়াইতে পারে না; তিনি তাঁহার সকল সন্তানকেই চিনিতে পারেন। ব্যক্তিগত পার্থক্য, তা সে যতই সামান্য হোক্ না কেন, টপ্ করিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। সব বিষয়ে একরূপ হইয়াও যদি এমন হয় যে, একজনের এমন একটা গুণ আছে, যাহা বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে তাহাকে সাহায্য করিতে পারে, তাহা হইলে প্রকৃতি তাহাকেই অন্য সকলের মধ্য হইতে বাছিয়া লয়, এবং তাহাকেই বাঁচিয়া থাকিতে দিয়া বংশ-বিস্তার করিতে দেয়।

প্রসঙ্গক্রমে ইতঃপূর্ব্বে একবার জীবন-সংগ্রামের কথার উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার সম্বন্ধে সকল কথা বলা হয় নাই। এই যে জীবনসংগ্রাম—এ শুধু ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে নয়—জাতিতে-জাতিতেও বটে। একদিকে যেমন কোন জাতির মধ্যেকার প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতিযোগী, অন্যদিকে আবার সমস্ত জাতিটা অন্য জাতির প্রতিদ্বন্দ্বী। যুদ্ধটা civil war (অন্তর্যুদ্ধ) ও বটে, foreign war (বহির্যুদ্ধ) ও বটে। ইহার ফলে শুধু যে ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত তাহারাই টিকিতেছে, তাহা নহে; জাতিদের মধ্যে আবার যে জাতিটার উপযোগিতা বেশী, সেই টিকিয়া রহিতেছে। ব্যক্তিদের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার ফলাফল ব্যক্তিগত উপযোগিতা ও আত্ম-নির্ভরতার উপর নির্ভর করে; আর জাতিতে-জাতিতে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার জয়-পরাজয় জাতিগত উপযোগিতা ও পরস্পর নির্ভরতা (mutual dependence) এর উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

কল্পতরু

জলধি-তলে

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

ভূপৃষ্ঠের তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। স্থলভাগের কোথায় কি আছে, সদা কৌতূহলী মানব অশ্রান্ত অধ্যবসায় সহকারে অনুসন্ধান করিয়া, তাহার অনেক তথ্য অবগত হইয়াছে। বিপদ আপদ গ্রাহ্য না করিয়া, প্রাণের আশঙ্কায় পশ্চাৎপদ না হইয়া, অনেক মনুষ্য-জীবন আহুতি দিয়া, মানব অতি দুর্গম, চিরহিমানীমণ্ডিত অভ্রভেদী পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিয়াছে, বারংবার বিফল-প্রযত্ন হইয়াও সুদূর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব স্থান আবিষ্কার করিয়াছে, অতি দুর্গম হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল সুগভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, দুরতিক্রম্য বিশাল মরুভূমি অতিক্রম করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ভূগর্ভ খনন করিয়া বহু ধন রত্ন আহরণ করিয়াছে। এক কথায়, ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগের অতি অল্প অংশই মানুষের অনুসন্ধিৎসার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিয়াছে।

ভূপৃষ্ঠের যে তিনভাগ জল, তাহার পরিমাণ আনুমানিক হিসাবে ১৪৮০০০০০০ বর্গমাইল। মানুষের অনুসন্ধিৎসা কেবল স্থলভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিবৃত্ত হয় নাই। ডুবুরিরা সমুদ্রে নামিয়া শুক্তি আহরণ করিয়া তাহা হইতে মুক্তা বাহির করিয়া লইয়াছে; জলমগ্ন জাহাজ হইতে পণ্যদ্রব্য উদ্ধার করিয়াছে; সবম্যারিণ নির্ম্মাণ করিয়া আত্মগোপনপূর্ব্বক সমুদ্রগর্ভে বিচরণ করিয়া শত্রুপক্ষীয় জাহাজ ধ্বংস করিতেছে। এ সকল সত্ত্বেও বলিতে হয়, মানুষ ভূমিভাগ যেমন-ভাবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, সমুদ্রগর্ভ তেমনভাবে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সমুদ্রের অভ্যন্তরভাগ এখনও প্রায় সম্পূর্ণরূপেই মানবের অজ্ঞাত। ডুবুরিরা সমুদ্রে প্রবেশ করিলেও অন্ধকারময় সমুদ্রতলে তাহাদিগকে হাতড়াইয়া-হাতড়াইয়া অনুমান ও অনুভূতির সাহায্যে কার্য্য করিতে হয়। জলমগ্ন জাহাজের উদ্ধারও অনেকটা অনুমানের সাহায্যে হইয়া থাকে। সবম্যারিণ সমুদ্রগর্ভে বিচরণ করে বটে, কিন্তু সেখানে তাহাদের চক্ষু চলে না, তাহাদিগকে দৃষ্টিশক্তি বাহিরে রাখিয়া সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিতে হয়; অর্থাৎ তাহারা সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিলেও পেরিস্কোপের সাহায্যে কেবল সমুদ্র পৃষ্ঠের কিয়দংশ মাত্র দেখিতে সমর্থ হয়।—আর ডুবুরি শ্রেণীর লোকেরা কাচের পরকলার ভিতর দিয়া সমুদ্রের গর্ভের অল্পাংশ দেখিতে সমর্থ হইলেও, সাধারণ মানুষ সমুদ্রের গর্ভের কোন সন্ধানই পাইতে পারে না। কিন্তু মানবের শক্তির এই অসম্পূর্ণতা আর বেশী দিন থাকিবে না। মানুষ সমুদ্র-গর্ভের ও তাহার তলদেশের ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, সমুদ্র তলের রহস্য আর তাহার অগোচর নাই।

পাঠক চিত্রে দেখুন, একজন ডুবুরি সমুদ্রের তলায় নামিয়া কি ভাবে কার্য্য করিতেছে। ইহা সুচতুর চিত্রকরের কল্পনা-প্রসূত নহে, ইহা একখানি আসল ফটোগ্রাফের প্রতিলিপি। দেখুন, ডুবুরির চারিদিকে মাছগুলি সন্তরণ করিতেছে। ডুবুরির শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের সুবিধার জন্য নলের ভিতর দিয়া যে বায়ু সঞ্চালন করা হইতেছে, তাহাও বুদ্বুদের আকারে কেমন উঠিয়া যাইতেছে, ক্যামেরার প্লেটে তাহাও কেমন সুন্দররূপে ধরা পড়িয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের গভীরতা ৫০ ফিট।

কি উপায়ে ক্যামেরা ও আলোকসহ ফটোগ্রাফার ৫০ ফিট গভীর সমুদ্রগর্ভে নামিয়া ফটোগ্রাফ তুলিতেছে, তাহা আর একখানি চিত্রে দেখুন। একখানি বিচিত্র গঠনের নৌকা সমুদ্র পৃষ্ঠে ভাসিতেছে। "সার্চ লাইটে"র ন্যায় অত্যুজ্জ্বল একটি বৈদ্যুতিক আলোক নামাইয়া দিয়া সমুদ্রতল আলোকিত করা হইয়াছে। একটি কূপের ন্যায় যন্ত্র নৌকার তলা ভেদ করিয়া নামিয়া গিয়াছে। যথেচ্ছ পরিমাণে এই কূপের হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়। ইতোমধ্যে শতাধিক ফিট গভীর সমুদ্র-তলের ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে। শিল্পী কেমন করিয়া ফটোগ্রাফ তুলিতেছেন, তাহা চিত্রখানি দেখিলেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি যেখানে বসিয়া আছেন, তাহা ইস্পাত নির্ম্মিত গোলাকার কামরা। উহার ভিতর অবশ্য ফাঁপা এবং উহার চারিদিকে জল। জলের প্রবল চাপে উহা যাহাতে চূর্ণ হইয়া না যায়, সেইজন্য উহার ভিতরেও বায়ুর চাপ প্রয়োগ করিয়া জলের চাপের সহিত সমতা রক্ষা করা হইতেছে। এই কলটির ভিতরকার ব্যাস ৪ ফিট। কক্ষ গাত্র হইতে টেলিস্কোপের মত যে নলটি বাহির হইয়া রহিয়াছে, উহা খুব পুরু এবং অতি স্বচ্ছ একখণ্ড কাচের দ্বারা আবৃত। এই কাচ এত পুরু যে, ইহা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৪০ পৌণ্ড জলের চাপ সহ্য করিতে পারে। ৩০০ ফিট গভীর জলে নামিলেও এই কক্ষ বা কাচের কোন অনিষ্ট হয় না। ভিতরের বায়ুর চাপ জলের চাপের সহিত সমান রাখিয়া এই কক্ষটিকে ইচ্ছামত আরও গভীর জলে নামাইয়া দেওয়া যায়। ইস্পাতের ঐ কক্ষটিকে ফটোগ্রাফারের "ষ্টুডিয়ো" বলা চলে; কারণ ইহার মধ্যে তাঁহার ক্যামেরা হইতে ডেভেলপ করিবার যন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত সরঞ্জাম রাখিবার ব্যবস্থা আছে। নৌকাখানি চালাইয়া যথা-ইচ্ছা গমন

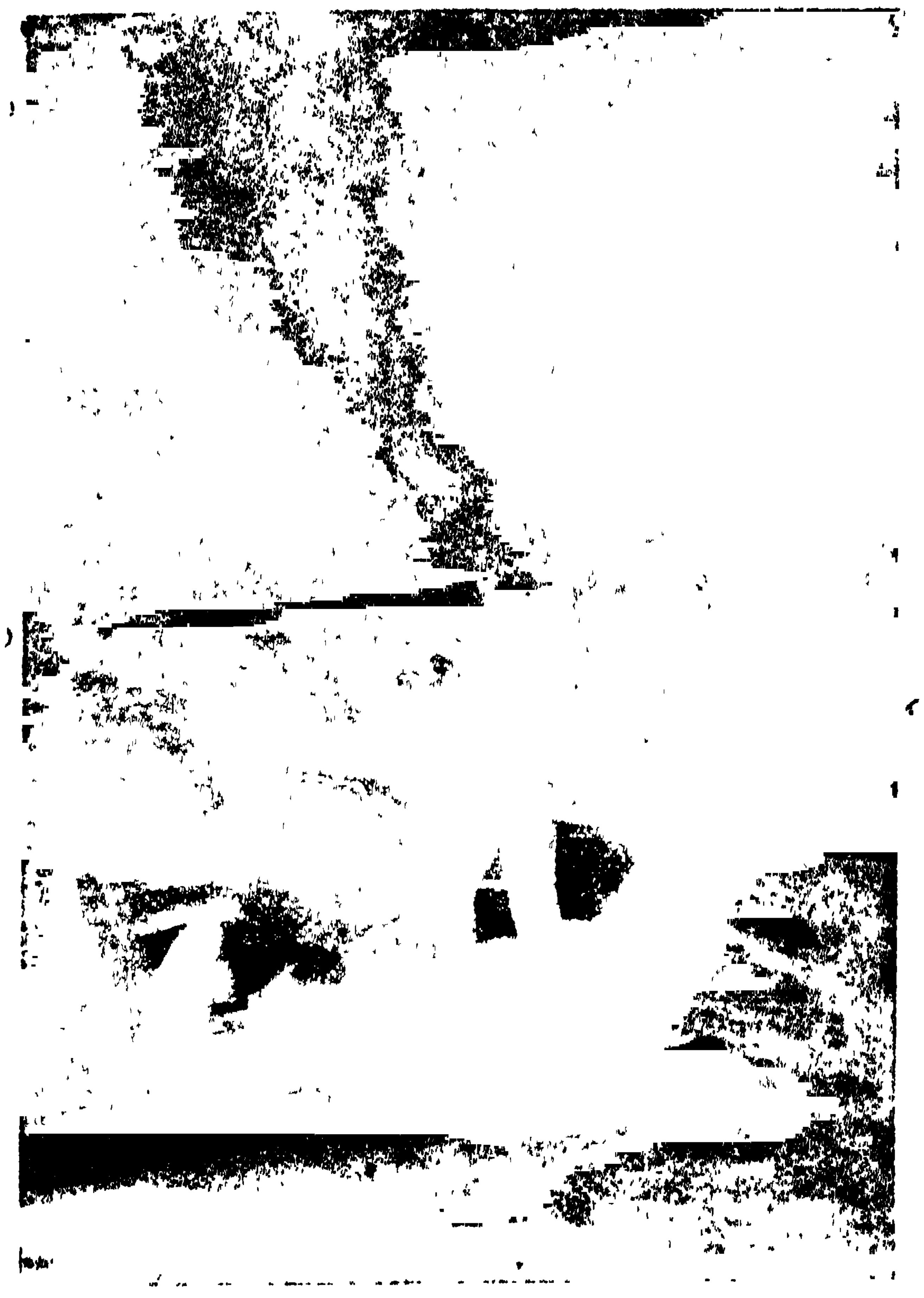

সমুদ্র-তলের সর্ব্বপ্রথম ফটোগ্রাফ
(একজন ডুবুরি সমুদ্রে নামিয়া কি ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহার ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে)

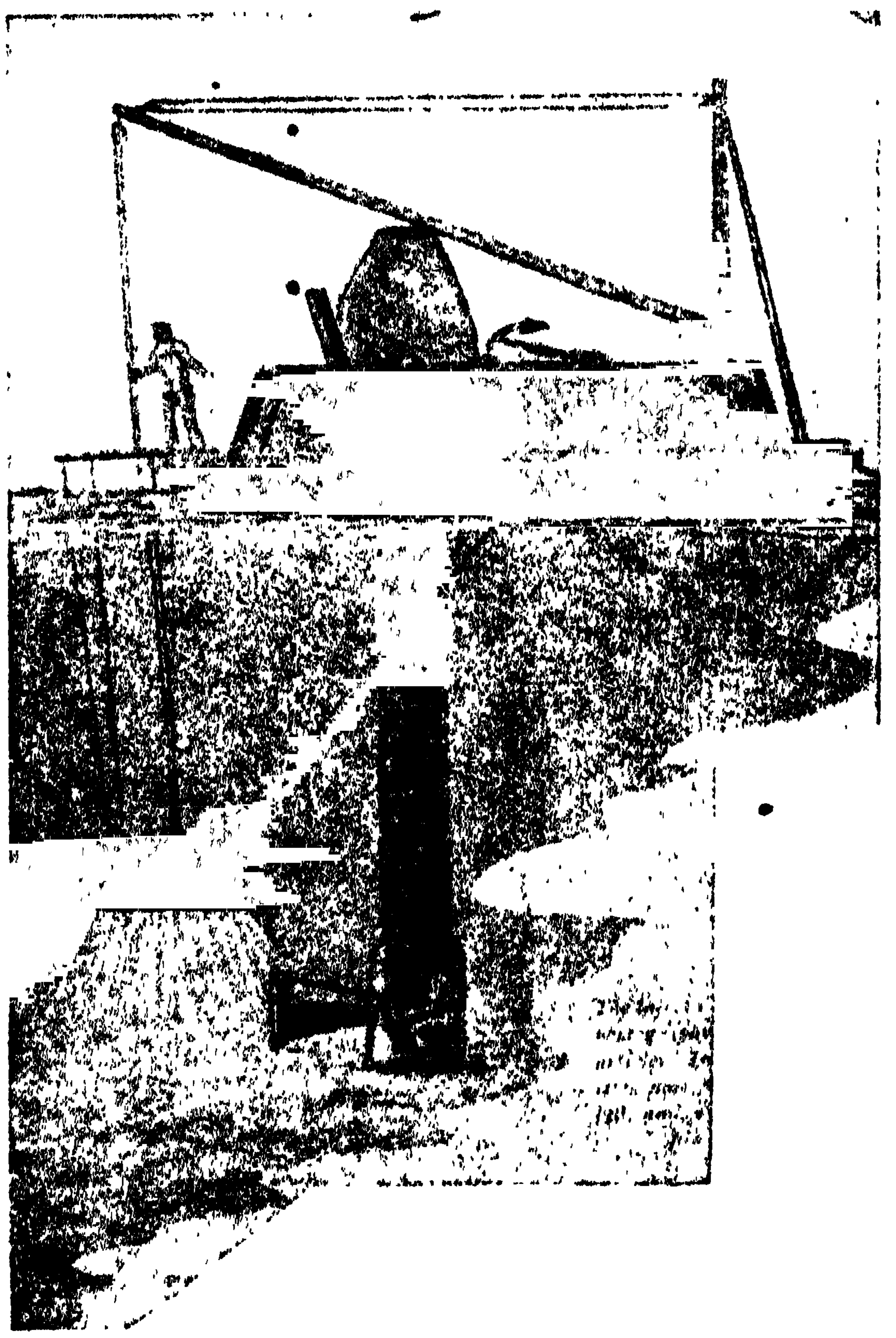

সমুদ্রগর্ভের ফটো-গ্রহণ প্রণালী

করিয়া উহার পাটাতন হইতে কূপটিকে ইচ্ছামত গভীর জলে নামাইয়া দিয়া তন্মধ্য দিয়া কক্ষটিকে নামাইয়া দেওয়া যায়। আজকাল কলিকাতায় অনেক বড়-বড় আপিসের বাড়ীতে যেরূপ ইলেক্‌ট্রিক লিফ্‌ট্ বসানো হইয়াছে, এই কক্ষও অনেকটা সেই ধরণের। ফটোগ্রাফার যন্ত্র-তন্ত্র সহ "ষ্টুডিয়ো"তে বসিয়া নীচে নামিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে সার্চ্চ লাইট নামাইয়া দেওয়া হয় এবং শিল্পী স্বীয় কক্ষে বসিয়া সমুদ্রগর্ভের বা সমুদ্রতলের কিয়দংশের সমস্ত জিনিস স্পষ্টভাবে দেখিতে পান। তবে, বলা বাহুল্য মাত্র, জলের ভিতর আলোকের সাহায্যে টেলিস্কোপের মত নলের ভিতর দিয়া যতটুকু স্থান দেখা যায়, তাহার কিয়দংশের মাত্র ফটোগ্রাফ লওয়া চলে। সমুদ্রগর্ভে ফটোগ্রাফারের কার্য্যক্ষেত্র অনন্ত নহে, খুব সীমাবদ্ধ। সে যাহা হউক, এই উপায়ে ১৪৮০০০০০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান—যাহা পূর্ব্বে মনুষ্যের জ্ঞানের ও দর্শন-ইন্দ্রিয়ের অগোচর ছিল, তাহা এক্ষণে তাহার দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

দিবারাত্রির কোন সময়েই এই ফটোগ্রাফ লইবার পক্ষে বাধা নাই। ফটোগ্রাফার যে আলোক ব্যবহার করেন তাহা ২৪০০ বাতির শক্তিবিশিষ্ট। আর, সকল সময়ে কৃত্রিম আলোকেরও প্রয়োজন হয় না। কারণ, স্থানবিশেষে সমুদ্রের জল এমন স্বচ্ছ যে, দিবালোক অনেকটা দূর পর্য্যন্ত জলের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। বিশেষতঃ, যে সকল অগভীর সমুদ্রের তলদেশে প্রবাল-কীটের বসতি আছে, তথায় সূর্য্যালোক স্বচ্ছ জলের মধ্য দিয়া প্রবালকীটের শ্বেত প্রস্তর তুল্য বাসস্থলে প্রতিহত বা প্রতিফলিত হইয়া সমুদ্রগর্ভের কিয়দংশ আলোকিত করিয়া রাখে। এইরূপ জায়গায় কৃত্রিম আলোকের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও সমুদ্রগর্ভের ফটোগ্রাফ লওয়া যায়।

মিঃ চার্লস উইলিয়াম্‌সন নামক একজন আমেরিকান ভদ্রলোক এই অভিনব প্রণালীর উদ্ভাবনা করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্রগণ পিতৃ-প্রদর্শিত প্রণালীর অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের সংগৃহীত কয়েকখানি ফটোগ্রাফের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া আমাদিগের বক্তব্য ইতি করিতে ইচ্ছা করি।

একখানি ফটোগ্রাফে মার্কিন দেশীয় একজন অধিবাসী

হাঙ্গরের সহিত যুদ্ধ

ডুবুরি নঙ্গর তুলিতেছে

ডুবুরি সমুদ্রতলে নিক্ষিপ্ত মুদ্রা কুড়াইয়া লইতেছে

সমুদ্রগর্ভে মৎস্যবৃন্দের সন্তরণ ক্যামেরার ভিতর ধরা পড়িয়াছে

ডুবুরির সহিত একটা হাঙ্গরের যুদ্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। লোকটার হাতে একখানি ছোরা ছাড়া আর কোন অস্ত্র নাই। সমুদ্রের গর্ভে হাঙ্গরের নিজের 'কোটে' তাহাকে আক্রমণ করিয়া এবং তাহার আক্রমণ এড়াইয়া লোকটী তাহার দেহে ছোরা বিদ্ধ করিয়া দিয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়াছে।

আর একখানি চিত্রে দেখুন, এক যায়গায় মাছ ধরিবার জন্য টোপ ফেলা হইয়াছে; মৎস্যগণ টোপের ইতস্ততঃ সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। টোপ হইতে ২৫ ফিট দূরে বসিয়া ফটোগ্রাফার মৎস্যগুলির গতিবিধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

অপর একখানি চিত্রে একজন মার্কিন আদিমনিবাসী সমুদ্রতলে নিক্ষিপ্ত মুদ্রা সংগ্রহ করিতেছে। তাহার অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে সমুদ্রতলের বালুকারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয় ঐ স্থানের জল ঘোলাইয়া ফেলিয়াছে। আর একখানি চিত্রে সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৬০ ফিট গভীর সমুদ্রতলে একখানি নৌকার নঙ্গর পড়িয়া রহিয়াছে; একজন ডুবুরী ঐ নঙ্গর তুলিয়া দিতে নামিয়াছে।

মিঃ উইলিয়ামসনের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে কেবলই ফটোগ্রাফ লওয়া হইতেছে না,—ইতোমধ্যেই ২০০০০ ফিট সিনেমাটোগ্রাফের ফিল্মও সংগৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ফটোগ্রাফগুলি বাহামা দ্বীপের অন্তর্গত নাসাউ হারবার নামক স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে। মিঃ উইলিয়ামসন তাঁহার ডুবুরীখানির নাম দিয়াছেন, "জুলেস ভার্ণ"। কারণ, সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক জুলেস ভার্ণ প্রণীত "সমুদ্র গর্ভে বিশ হাজার লীগ" নামক সর্ব্বজন সমাদৃত পুস্তকখানির লেখকের নামই এই জাহাজেরও নাম হইবার সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত।

মাতৃ-স্নেহ

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম বি]

"ছাইয়ের ডাক্তার! দুধ দিতে বারণ করেচে!! দুধ না খেলে কখনো ছেলে বাঁচে?"

"কি নিষ্ঠুর তুমি! ছেলেটা কেঁদে সারা হয়ে গেল, তবু ঘড়িটা দিতে দেবে না? একবার 'না' বলেছ ত কিছুতেই দেবে না? ঘড়িটা এতই দামী হ'ল?"

"কি লক্ষীছাড়া ছেলে বাবু ছোট বৌয়ের! খোকাকে নতুন জামা পরিয়েছি, হা করে দেখচে দেখ না। সাতজন্মে এমন দারিদ্দিরে ছেলে দেখিনি! যা যা, তোর মার কাছে যা।"

"দাঁড়িয়ে দেখ্‌চো কি কি? বাড়ীতে ছেলেপুলে থাকলে ঘর একটু নোংরা হয়েই থাকে। তুমি এম্‌নি কাণ্ড করচো—যেন এমন কখনো দেখ নি। যাও, সব পরিষ্কার করে সাজিয়ে ফেল।"

"বল না 'বেশ করিচি পান নিয়েছি'। তুমি বল্‌বার কে? তোমার খাই না পরি? আ মর মিন্‌সে! ছেলেয়-ছেলেয় ঝগড়া করেছে। আর উনি এসেচেন শাসন কর্ত্তে!"

"তা তুমি ভেবো না। মুখপোড়া মাষ্টার হিংসে করে কেলাসে উঠ্তে দেয় নি, তা তোমার দোষ কি বল? আমি ওঁকে বলে কালই তোমাকে আর একটা ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দোবো।"

"মার! এতবড় ছেলেকে ধরে মার! সিগারেট খেয়েচে তা হয়েচে কি? কোন ভদ্দর লোকের ছেলেরা সিগারেট না খাচ্চে? তাই খেয়েচে বলে ধরে মারতে হবে? এই যে আজ সমস্ত দিন জলস্পর্শ করলে না, একবার এসে দেখ্তে পারে না?"

"তাও বলি, বৌ-মা, তোমারও দোষ আছে। ছেলে যে একবারও এ-দিক মাড়াতে চায় না, আর ঘরে এলেই বকাবকি করে, কেন? তুমি যদি মানুষের মত মানুষ হতে, তা হলে কি আর আমার ছেলে এমন করে বেড়ায়।"

"তোমার খুব দরকার বলচে, তাই হাতের বালা খুলে দিলুম। উনি টের পেলে কি হুলস্থূল কাণ্ড করবেন।"

হাবিলদার ৺দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত

হাবিলদার ৺দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত

বর্ত্তমান মহাসমরে বাঙালী জাতিও স্বীয় শৌর্য্য-বীর্য্যের পরীক্ষা দিতে উৎসাহ উৎফুল্ল চিত্তে ছুটিয়াছে। প্রতিদিন দলে-দলে যুবকগণ সৈন্যদলভুক্ত হইতেছে। এই বীর যুবকগণ ভবিষ্যৎ জাতীয় অভ্যুদয়ের স্তম্ভস্বরূপ। তাহাদের জীবন-কথা লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন;—ভবিষ্যৎ জাতীয় ইতিহাস প্রণয়নে সহায়তা হইবে। এ স্থলে আমরা একজন বাঙালী হাবিলদারের জীবনের দু'একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

হাবিলদার ৺দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ঢাকা জিলার অন্তর্গত গয়েশপুর গ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের মধ্যম পুত্র।

সৈনিকের যে সমস্ত গুণ থাকা উচিত, দ্বিজেন্দ্র গুপ্তের চরিত্রে আশৈশব তাহা প্রায় সমস্তই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বাল্যকালেই দ্বিজেন্দ্রের সাহসিকতা, শ্রমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। যে সমস্ত কার্য্য সমবয়স্ক বালকগণ করিতে ভীত হইত, সে সমস্ত কার্য্য তিনি অনায়াসে সম্পাদন করিতেন। সমুদ্রে সন্তরণ কালে তিনি সহচরগণ অপেক্ষা অনেক দূরে যাইতে পারিতেন। তাঁহার কষ্ট-সহিষ্ণুতাও অনন্যসাধারণ ছিল। রোগ-যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করাই তাঁহার স্বভাব ছিল। কেহ প্রশ্ন না করিলে নিজ হইতে কখনও যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করিতেন না। পরোপকারিতা ও শ্রমশীলতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। কাহারও বিপদের কথা শুনিলে তিনি প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিতেন। কেহ মুটে অভাবে জিনিসপত্র স্থানান্তরে লইয়া যাইতে অসমর্থ হইলে, দ্বিজেন্দ্রচন্দ্রের নিকট সে কথা বলিলে, তিনি যথাসাধ্য তাহা স্বীয় মস্তকে বহন করিয়া লইয়া গিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেন। লোকের সাহায্য করিতে তিনি আত্মপর জ্ঞান না করিয়া সর্ব্বদাই তৎপর থাকিতেন। বর্দ্ধমান জলপ্লাবনের সময় যে সমস্ত যুবক প্রাণপণে অক্লান্ত ভাবে দুঃস্থের সাহায্য ও সেবা করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্ গুপ্ত তাঁহাদের অন্যতম। চাউল ও বস্ত্র বোঝাই শকট বলদ অভাবে নিজেরাই টানিয়া লইয়া যাইতেন। সময়-সময় এইরূপ শকটের চক্র কর্দ্দমে অর্দ্ধ প্রোথিত হইয়া গেলে, তিনি যে ভাবে শকটের চক্রে স্কন্ধ প্রয়োগপূর্ব্বক তাহা উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিতেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহার সহকর্ম্মী যুবকগণ বিস্মিত হইতেন। এইরূপ অনন্যসাধারণ শ্রমশীলতা ও উদ্যমের জন্য তিনি সকলেরই প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

শারীরিক ও মানসিক উন্নতির প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। ব্যায়ামাদির প্রতি বেশ অনুরাগ ছিল। নিজে একজন বলশালী ও ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে শিবনারায়ণ দাসের গলিতে ব্যায়ামের ক্লাব স্থাপন করেন। বালক ও যুবকগণের চরিত্র যাহাতে পবিত্র থাকে, এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যাহাতে তাহারা নৈতিক ও চরিত্রবল লাভ করিতে সমর্থ হয়, তদুদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে ক্লাবের সকল সভ্য সমবেত হইয়া সৎবিষয়ের আলোচনা, সৎগ্রন্থ পাঠ, বক্তৃতা ইত্যাদি করিতেন। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনাপূর্ণ "প্রতিষ্ঠা" নামে একখানি মাসিকপত্রও কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া বাহির করিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ সৈন্যদলে যোগদান করিয়া চলিয়া যাওয়ায় সেই ক্লাব ও পত্রিকা উভয়ই উঠিয়া যায়।

তিনি শিল্প ও কলাবিদ্যার অনুশীলনে খুব যত্নবান ছিলেন। আর্টস্কুলের শিক্ষকগণ সকলেই তাঁহার এই চিত্রবিদ্যায় অনুরাগের জন্য তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। তাঁহার ফটো এনলার্জমেণ্ট ও পেন্সিল স্কেচ বড় সুন্দর হইত। সঙ্গীতেও তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি অল্পদিনের চেষ্টাতেই এস্‌রাজ, সেতার ও বেঞ্জো বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজাইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহই সন্ধ্যার পর পিতাকে বাদ্য বাজাইয়া শুনাইতেন। করাচী থাকা কালে অবসরের সময় তিনি প্রায়ই চিত্রাদি অঙ্কন করিতেন ও সেতার বাজাইয়া বন্ধুবর্গকে আনন্দ উপভোগ করাইতেন। অমায়িকতা তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল। ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে তাঁহাকে পাইলে মাকে ছাড়িয়াও থাকিতে পারিত। অতি অল্পদিনের জন্যও যে তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই তাঁহার সরল, অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছে। তিনি খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। পিতামাতার সেবাতেও বিশেষ তৎপর ছিলেন। পীড়ার সময় দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া তাঁহাদের পদসেবা করিতেন। মাতা ঠাকুরাণীর পূজা আহ্নিকের জন্য স্বহস্তে

জল তিনি স্বয়ং কলসী স্কন্ধে গঙ্গা হইতে বহন করিয়া আনিতেন।

হাবিলদার দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ১৯১৬ সালের ১১ই অক্টোবর বুধবার দিবস সৈন্যদলে যোগদান করিয়া নওশেরা গমন করেন। অধ্যবসায় ও কার্য্যকুশলতার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হাবিলদারের পদে উন্নীত হন। তিনি বন্দুক-চালনায় খুব দক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহার একাগ্রতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার জন্য উপরিতন অফিসারগণ তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সৈনিকগণ সকলেই তাঁহার প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল। প্রায়ই সৈনিকগণ তাঁহাকে নানাবিধ উপহার প্রদান করিত।

গত বৎসর দুর্গোৎসবের সময় প্রায় চারিশত বাঙালী সৈনিক আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত করাচী হইতে আসিয়াছিল। হাবিলদার দ্বিজেন্দ্রও তাহাদের সঙ্গে আসিয়া পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা শুনা করিয়া যান। দ্বিজেন্দ্রের জননী খুব পুণ্যবতী ও তেজস্বিনী রমণী। বীরমাতার গর্ভেই বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার প্রশান্ত ও গরীমাময়ী মুখশ্রী সৈনিক যুবক-গণের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি যাত্রাকালে স্বহস্তে পুত্রকে যুদ্ধবেশ পরাইয়া দেন। এই বীর-জননীর আশীর্ব্বাদ ও পদধূলি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সৈনিক যুবকগণ কলিকাতা হইতে যাত্রার পূর্ব্বে দলে দলে তাঁহার প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল। সৈনিক দলের যাত্রার সময় তিনি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রকে মনে-মনে ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক দেশের ও জাতির কল্যাণকার্য্যে প্রশান্ত ভাবে বিদায় দেন। তৎকালে অন্য একজন হাবিলদারও তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। পুত্রের সমরে বিদায়কালে বীর জননীর চিত্তের ধৈর্য্য অতীব প্রশংসনীয়। দুঃখের বিষয় এই বিদায়ই দ্বিজেন্দ্রের চির বিদায় হইল।

দ্বিজেন্দ্রচন্দ্রের চরিত্র খুব নির্ম্মল ছিল। তিনি কখনও ধূমপান করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগও প্রশংসনীয়। তিনি প্রায় নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন এবং কালীঘাট প্রভৃতি পুণ্যস্থানে গমন করিতেন। তিনি স্বীয় জননীকে লিখিয়াছিলেন; "মা কাঁদিও না, কাঁদিয়া সময় নষ্ট না করিয়া ভগবানের নাম করিও; আমি শ্রীহরির চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণে শান্তিলাভ করিয়াছি; তুমিও তাহাই করিও, শান্তি পাইবে।" তিনি বলিয়াছিলেন যে, করাচীতে প্রত্যহ কার্য্যে যাইবার পূর্ব্বে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় একটী নির্দ্দিষ্ট টেবিলের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া কিছুক্ষণ প্রার্থনা ও প্রণাম করা তাঁহার রীতি ছিল।

এই সাধু বীর যুবক গত ৬ই জানুয়ারী ১৯১৮, ২২শে পৌষ রবিবার দিবস দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে মেসোপোটেমিয়াতে ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। ভীরু বলিয়া বাঙালীর বড় অপবাদ ছিল। এই সকল বীরযুবক তাহাদের নিজ শোণিতে বাঙালীর সে কলঙ্ক মুছিয়া দিয়াছে। আজ জগৎ দেখুক, বাঙালী শুধু "প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জ্জয়" নহে; এই প্রতিজ্ঞা, এই সাহস কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতাও তাহাদের আছে। বিপদে আর "চম্পটে পরিপাটি" নয়; ইচ্ছা করিলে ও সুবিধা পাইলে বিপদের মুখে নির্ভীক চিত্তে দাঁড়াইতেও অকুণ্ঠিত। মসীজীবী বাঙালী সুবিধা পাইলেই অনায়াসে অসিজীবী হইয়া উঠিতে পারে। কামানের মুখে বীর দর্পে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে বাঙালী কোনও জাতি অপেক্ষা আজ ন্যূন নহে। যে সমস্ত বাঙালী যুবক "বাঙালী রেজিমেণ্ট" গঠন করিয়া রাজার জন্য, জাতির জন্য, দেশের জন্য আজ সুদূর মেসোপোটেমিয়াতে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই অবস্থাপন্ন ভদ্রসন্তান। এগার টাকা মাহিনার লোভে তাঁহারা স্বীয় প্রাণোৎসর্গে কৃতসঙ্কল্প হন নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। দেশের ও জাতির মঙ্গলই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আজ বাঙালী মরিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, সে বাঁচিয়া আছে। ইচ্ছা করিলেই সে জগতের সম্মুখে মাথা তুলিয়া সদর্পে দাঁড়াইতে সমর্থ।

হাবিলদার ৺দ্বিজেন্দ্রের অমর আত্মা ভগবানের শান্তিময় ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করুক! "হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্" ভগবানের শ্রীমুখের এই বাণী মিথ্যা হইবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। করুণাময় ভগবান দ্বিজেন্দ্রের শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনের প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করুন, তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা।

সাময়িকী

বাঙ্গালা-দেশে মাসিক পত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। লেখকেরও এখন অভাব নাই; সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সকল বিষয়েরই আলোচনায় কৃতবিদ্য লেখক-গণ অগ্রসর হইয়াছেন। মাসিক পত্রাদিতে এই সকল সুলেখকের অনেক সুচিন্তিত, সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। উপন্যাস, ছোট গল্প ও কবিতার সাগরে ত একেবারে বাণ ডাকিয়াছে। এখন আর কোন সম্পাদককেই প্রবন্ধের অভাব অনুভব করিতে হয় না। পত্রিকা সম্পাদনেও অনেক শ্রদ্ধেয় মহোদয় বিশেষ কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। ইহা শুভ লক্ষণ, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু—

এই 'কিন্তু'র কথাটা বলিবার জন্যই আমরা আজ উপস্থিত হইয়াছি। আমরা সকল দিকেই শুভলক্ষণ দেখিতেছি, কেবল এক দিকে একটা বিষয় দেখিয়া আমরা সকল সময়েই ক্ষুব্ধ হইয়া থাকি। তাহা সু সমালোচকের অভাব। এখন প্রায় সকল মাসিক পত্রেই সমালোচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে, অনেক প্রবন্ধের সমালোচনা, পুস্তকের সমালোচনা, গল্পের সমালোচনা, এমন কি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত ক্ষুদ্র একটী কবিতাও সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু অনেকেই মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, সমালোচনা অনেক সময়েই নিরপেক্ষ ভাবে হয় না; অনেক সমা-লোচকই অসংযত ভাষা ব্যবহার করিয়া সমালোচনাকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলেন। ইহাতে সমালোচনার পবিত্র উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়; ব্যক্তিগত হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রী-কাতরতাই অতি বীভৎসভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে। ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?

সমালোচকের আসন অতি পবিত্র। সমালোচক শিক্ষক-স্থানীয়; তাঁহার উপদেশে লেখকগণের যথেষ্ট উপকার হয়, ভ্রম-ত্রুটী সংশোধিত হয়; আলোচনার দ্বারা প্রকৃত তথ্য নির্ণীত হয়। আমরা ত সমালোচককে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকি; তিনি আমাদের ত্রুটী প্রদর্শন করিলে তাহা অবনত-মস্তকে গ্রহণ করি এবং তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া মনে করি। কিন্তু যখন দেখি, কোন সমালোচক তাঁহার পবিত্র আসনের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া, অন্যায় ও অসংযত ভাবে কাহাকেও আক্রমণ করিতেছেন, তখন আমরা লজ্জায়, ক্ষোভে কাতর হইয়া পড়ি। আমরা অনেক সময় অনেক মনীষী সমালোচকের সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়া থাকি; অনেকে বন্ধুভাবে আমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করেন, সুপথ নির্দ্দেশ করেন; আবার অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদিগকে অযথা আক্রমণও করিয়া থাকেন। আমরা ইহাতে কোনদিনই ক্ষুব্ধ হই নাই; নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি; কোন দিনই কোন কথা বলি নাই এবং ভবিষ্যতে বলিবও না। এই ত, অল্পদিন পূর্ব্বে 'উপাসনা' পত্রিকা আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া দশ কথা শুনাইয়া দিলেন। বৈষ্ণবচূড়ামণি, পরম শ্রদ্ধাভাজন মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মনীন্দ্রচন্দ্র বাহাদুর যে পত্রের প্রতিষ্ঠাতা, সুধী অধ্যাপক, সুপণ্ডিত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে পত্রিকার উপযুক্ত সম্পাদক, সেই পত্রিকায় আমাদিগকে অযথা আক্রমণ করা হইল, কোন কারণই প্রদর্শিত হইল না; ইহাও আমরা সহ্য করিয়াছি, একটি কথাও বলি নাই। শুধু ভাবিয়াছি—অপরন্ত কিম্ ভবিষ্যতি। সে কথা থাকুক।

আমরা আমাদের কথা বলিব না, বলিবার প্রয়োজনও দেখি না। সুদীর্ঘকাল বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা করিয়া আর কিছু না শিখিয়া থাকি, সহ্য করিতে শিখিয়াছি; অনেক সহ্যও করিয়াছি। কিন্তু যখন দেখি, আমরা যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি, যাঁহাদিগকে দেশমান্য বলিয়া ভক্তি করি, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে গিয়া কোন-কোন সমালোচক অন্যায়, অসংযত ভাষা প্রয়োগ

করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হন না, তখন আমাদের সহিষ্ণুতাও সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। সেই জন্যই আজ নিতান্ত বাধ্য হইয়া দুই-একটা কথা বলিতেছি। আমরা 'নারায়ণ' পত্রের কথাই একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিব। মত-ভেদ হওয়া খুব স্বাভাবিক, ভ্রমক্রটীও সকলেরই হইতে পারে, হইয়াও থাকে। যুক্তি-তর্কের দ্বারা অপরের ভ্রম সংশোধন করা বন্ধুরই কার্য্য; আলোচনার দ্বারা সত্য নির্ণয়ের সুবিধা হয়। কিন্তু অসংযত ভাষায় শ্রদ্ধেয়, ভক্তি-ভাজন ব্যক্তিগণকে আক্রমণ করিলে যে কি লাভ হয়, তাহা আমরা বুঝি না। 'নারায়ণ' পত্রে সে দিন পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের একটা প্রবন্ধের আলোচনা উপলক্ষে একজন লেখক যে ভাষা প্রয়োগ করিলেন, তাহা কি সমর্থনযোগ্য? শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রবাবুর মতের সহিত লেখকের মতভেদ হওয়া আশ্চর্য্য নহে, রামেন্দ্র বাবুর ভ্রম হওয়াও অসম্ভব নহে; কিন্তু তাঁহার ন্যায় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে যে সংযত ভাষায় মত প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাহার পর, আরও একটা দৃষ্টান্ত দিই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 'নারায়ণ' পত্রে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ মহর্ষি মহোদয়ের মত বা যুক্তি লইয়া আলোচনা কালে অসংযত ভাষা ব্যবহার করিতে দেখিলে, কাহার না কষ্ট হয়? বেদান্তের আলো-চনার মধ্যে 'ধরিয়া বাঁধিয়া পীরিতি' বা ইত্যাকার বচনের প্রয়োগ কি কেহ সমর্থন করিতে পারেন? যিনি এই প্রবন্ধের লেখক, তাঁহাকেই বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি, তিনিই কি এখন ঐ ভাষার সমর্থন করিতে পারেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ 'নারায়ণে'র কথা উল্লেখ করায় কেহ মনে করিবেন না যে, আর সকল পত্রিকা এ বিষয়ে দোষশূন্য বা সাধু। আমরা সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে এই সম্বন্ধে নিন্দাভাজন। অপরের ক্রটীর উল্লেখ করিয়া উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সাধু সাজিবার নিন্দনীয় অভি-প্রায় আমাদের নাই। আমাদের অনেকের সম্বন্ধেই অনেক ক্রটী ও অসংযমের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদেরই হউক বা অপরেরই হউক, এ অসংযম যে নিন্দনীয়, অকর্ত্তব্য, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

এবার সাময়িকীতে আরও একটা অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া করিতে হইতেছে। এই আলোচনার বিষয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্। আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকে ভালবাসি, সাহিত্য-পরিষদ্ আমাদের গৌরবের, আমাদের স্পর্দ্ধার জিনিস। অনেক যত্নে, অনেক চেষ্টায়, অনেক প্রাণপাত পরিশ্রমে ও অনেক শ্রদ্ধেয় মহাশয়গণের আন্তরিক উদ্যমে এই পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পরিষদের গোড়া-পত্তন হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা ইহার কার্য্য দেখিয়া আসিতেছি, ইহার ক্রমোন্নতিতে উৎফুল্ল হইয়া আসিতেছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, বিগত দুই-তিন বৎসর হইতে এই পরিষদের মধ্যে একটা মনোমালিন্য, একটা অশান্তির ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে। বিগত বৎসর এই মনোমালিন্য বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছিল; এবার দেখিতেছি, অশান্তি একেবারে প্রকট হইয়াছে। যাঁহারা সাহিত্য-পরিষদের শুভানুধ্যায়ী, তাঁহারা এই দলাদলি, এই মনোমালিন্য, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া সাহিত্য-পরিষদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছেন। পরিষদের কার্য্য লইয়া মতভেদ হইতে পারে; এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানে তাহা অসম্ভব নহে। কিন্তু মতান্তর হইলেই যে মনান্তর হইবে, মনোমালিন্য জন্মিবে, ইহা আমরা সাহিত্য-পরিষদের মাননীয়, কৃতবিদ্য সেবকগণের নিকট আশা করিতে পারি না। যাঁহারা বাঙ্গালীর মুকুটমণি, যাঁহারা বাঙ্গালা-সাহিত্যের কর্ণধার, যাঁহাদিগকে আমরা সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, যাঁহাদিগের নাম করিয়া আমরা গৌরব অনুভব করি, তাঁহারা যে পরিষদের প্রাণ, সে পরিষদে ব্যক্তিগত নিন্দা, গ্লানি প্রভৃতি কেন স্থান পাইতেছে, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

আমরা শুনিতেছি, ইহা প্রবীণে-নবীনে সংঘর্ষ। প্রবীণ ও নবীনে মিলিয়াই ত এখন কাজ করিতে হইবে। প্রবীণের অভিজ্ঞতা, প্রবীণের সুপরামর্শ ও পরিচালন-শক্তিকে সম্বল করিয়া নবীনেরা নবোৎসাহে, নবীনতেজে কার্য্য করিবেন, ইহাই ত প্রার্থনীয়, ইহাই ত কর্ত্তব্য। নবীনের সহায়তা গ্রহণ না করিলে প্রবীণের চলে না;

প্রবীণের উপদেশ না পাইলে নবীনের নব উৎসাহ, নব স্ফূর্ত্তি কার্য্যক্ষেত্রে বিপন্ন হইতে পারে। এ অবস্থায় কেহই ত কাহাকেও ছাড়িতে পারেন না, উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। তবে এত গোলযোগ কেন? আমরা দেখিলাম, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক পুস্তিকা ছাপাইয়া বিতরণ করিতেছেন; আমরাও একখণ্ড পাইয়াছি। আবার সাহিত্য-পরিষদের নির্ব্বাচন-পত্রের সহিত একই মোড়কে সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ কমিটির মন্তব্যপত্রও আমাদের হস্তগত হইল। ইহাতে শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর কথার উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। সংবাদ-পত্রাদিতেও নানা বাদ প্রতিবাদ, অনুযোগ-অভিযোগ দেখিতে পাই। ইহা কিন্তু একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে ফল এই হয় যে, যাঁহারা পরিষদের সহিত সংসৃষ্ট নহেন, অথচ পরিষদের উন্নতি-প্রয়াসী, তাঁহাদের মনে নানা প্রকার সন্দেহের উদয় হয়। পরিষদের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পক্ষে ইহা বিশেষ বিঘ্নকর। কাজ করিতে গেলেই তাহাতে অল্পবিস্তর ত্রুটী হইয়া থাকে; পরিষদের কার্য্যেও এ প্রকার ত্রুটী হইতে পারে বা হইয়াছে; কিন্তু যাঁহারা পরিষদকে ভালবাসেন, যাঁহারা পরিষদের উন্নতি-প্রয়াসী, তাঁহারা কি মিলিয়া মিশিয়া এ সকল কথার নিষ্পত্তি করিতে পারেন না? আমরা কিন্তু দেখিতেছি যে, পরিষদ্ লইয়া একটা বিষম দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে, একটা জিদাজিদির ভাব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইহা যে কোন প্রকারেই প্রার্থনীয় নহে, তাহা কি আবার বলিতে হইবে? আমরা প্রবীণ ও নবীন উভয় দলকেই বলিতেছি যে, তাঁহারা ধীর, স্থিরভাবে কার্য্য করুন। পরিষদের যে সকল ত্রুটী আছে, তাহা সকলে মিলিয়া সংশোধন করুন। অনর্থক বাদ্‌বিতণ্ডায় এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের কার্য্য কেহ নষ্ট করিবেন না। আমাদের অনেক কাজ এমনই করিয়া নষ্ট হইয়াছে, অনেক শুভ অনুষ্ঠান বিফল হইয়াছে; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদও যেন সেই পথে না যায়, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

এইবার মনে হয়, ম্যালেরিয়া মহাশয়কে দেশ-ছাড়া হইতে হইবে! কারণ, তাহার অত্যাচার-উপদ্রবে স্বয়ং লাট লর্ড রোণাল্ড্‌সে মহোদয় অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুরের আহ্বানে নদীয়া, যশোহর, ২৪-পরগণার জেলা-বোর্ডের কতিপয় প্রতিনিধি, জনকয়েক জমীদার এবং স্যানিটারী বোর্ডের সভ্যগণ গত মাসে তাঁহার প্রাসাদে সমবেত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের সম্মুখে যাহা বলেন, তাহার প্রথমাংশের মর্ম্ম এই যে,—'আজ আমি ম্যালেরিয়ার কথাই বলিব। আমি কলিকাতায় আসিয়া এই ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষরূপ সংবাদ সংগ্রহ করি, এবং সে তদন্তের ফলে যাহা জানিতে পারি, তাহাতে আমার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগে। বাঙ্গালাদেশে প্রতি বৎসর সাড়ে তিন লক্ষ হইতে চারিলক্ষ লোক এই ম্যালেরিয়া রোগেই প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু শুধু এই মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া ম্যালেরিয়ার অত্যাচার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। মৃত্যু ঘটিবার পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই, মনে হয়, একশতবার করিয়া ম্যালেরিয়ার আক্রমণে কষ্ট পায়। ম্যালেরিয়ার জন্য দেশের জন-সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। এখন প্রশ্ন এই যে, কেন এ রোগের এত বিস্তৃতি ঘটিতেছে, এবং গবর্ণমেণ্ট কোনও উপায়ে ইহার প্রতিরোধ করিতে পারেন কি না? প্রফেসর লেভার্ণ ও স্যার রোণাল্ড রসের আবিষ্কার হইতে আমরা জানিয়াছি যে, 'এনোফেলিস' জাতীয় মশকের দংশনে ম্যালেরিয়ার বিষ মানব-শরীরে প্রবেশ করে; এবং এই মশক জাতির ধ্বংস সাধন করিতে পারিলেই ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে দূর করিতে পারা যায়। কিন্তু এই বিপুল বিস্তৃত কীটবংশ ধ্বংস করিতে হইলে, যে অবস্থায় ইহার বংশবৃদ্ধি হয়, সেই অবস্থায়ই ইহার বিপর্য্যস্ত সাধন করা কর্ত্তব্য।'

ঐ সকল কথা বলিয়া লর্ড রোণাল্ডসে জল-সেচন ও জল-নিষ্কাশনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন। তাঁহার মতে এই দুইটার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই, দেশের স্বাস্থ্য ও সম্পদ সমস্তই ফিরিয়া আসিবে। বাস্তবিক কথাও তাই। বাঙ্গালার নদী-নালার জল যদি অবাধে বহিয়া যাইতে পারিত—রেলের এবং রাজপথের বাঁধে যদি তাহা প্রতিরুদ্ধ না হইত, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া কিছুতেই এদেশে এতটা জোর করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত না।

মগরাহাট একদিন ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি ছিল। কিন্তু সে দেশেরও এখন শ্রী ফিরিয়াছে।—কেমন করিয়া তাহা হইল? না,—জল-সেচন, ও জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সেখানে হইয়াছে বলিয়া। লাট মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় এই মগরাহাটের কথাও বলিয়াছেন। মগরাহাটে এখন 'এনোফেলিস' জাতীয় মশকের সত্যই উপদ্রব নাই। তাই তিনি এক্ষেত্রেও মগরাহাটের উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শুধু উপদেশ নহে। আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাগের-খাল কাটাইয়া যমুনাকে পুনরায় প্রবাহিত করিবার তিনি আয়োজন করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এ জন্য খাস তহবিল হইতে দেড়লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুতও হইয়াছেন। আড়ুল বিলের পঙ্কোদ্ধার করিতে একলক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে, গবর্ণমেণ্ট এক্ষেত্রেও পঁচাত্তর হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত। তার পর, নবীগুঁি খাল কাটাইতেও দশলক্ষ টাকা খরচ পড়িবে;—গবর্ণমেণ্ট এজন্যও দুইলক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বাকী টাকা 'স্বাস্থ্য-ড্রেনেজে'র আইন মত জেলাবোর্ডের মারফতে ট্যাক্স বসাইয়া সংগ্রহ করিতে হইবে।—এই ব্যবস্থার কথা শুনিলে সত্যই কি মনে হয় না যে, ম্যালেরিয়াকে এবার এদেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইবে? বাঙ্গালায় এত বড় কাজ করিয়া যাইবার চেষ্টা আর কোনও শাসনকর্ত্তাই করেন নাই। লর্ড রোণাল্ডসের কথা কার্য্যে পরিণত হইলে যে বাঙ্গালী চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে স্মরণ করিবে, একথা বলাই বাহুল্য। তাঁহার আশার বাণী সফল হউক—তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

হারাধনবাবু

(সমাজ-চিত্র)

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি-এ]

আমাদের দীননাথের বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার উত্তরে একটা বড় দোতালা বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে ছোট একটা ফুল-বাগান। হারাধন চট্টোপাধ্যায়, এক্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার, এই বাড়ীর মালিক। বাগানের দক্ষিণে গেটের উভয় পার্শ্বে পাকা প্রাচীর; পূর্ব্বে ও পশ্চিমে আস্তাবল, গাড়ীর ঘর ও গোশালা। বাগানে নানাবর্ণের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে গন্ধহীন উজ্জ্বল বর্ণের বিলাতী ফুলই বেশী। সেগুলি দুই ধারে দুইটি কেয়ারি করিয়া লাগান হইয়াছে। বৃত্তাকার কেয়ারির মধ্যস্থলে দুই দিকে দুইটা গোলাপের ঝাড়। ফুলের কেয়ারির চতুর্দ্দিকে চতুষ্কোণাকৃতি সবুজ ঘাসের কেয়ারি, এবং তাহার চারিদিকে বেলা, যূঁই, চামেলি ফুলের গাছ। গেটের দুই দিকে প্রাচীরের সংলগ্ন এক সারি গাঁদাফুলের গাছে বড়-বড় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। গেট হইতে ঘরের সিঁড়ি পর্য্যন্ত একটা লাল রাস্তা বাগানের মধ্য দিয়া গিয়াছে। বারান্দার সিঁড়ির উপরে দুই ধারে টবে অনেকগুলি বিলাতী তালজাতীয় গাছ (Ornamental Palm)।

গৃহস্বামী হারাধনবাবুর কয়েকটা সখ আছে, তাহার মধ্যে ফুলবাগানের সখ একটা প্রধান। সকালে-বিকালে প্রায়ই তাঁহাকে এই বাগানের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। একখানা আট হাত লম্বা কাপড় পরিয়া, একটা গেঞ্জি গায় দিয়া ও একজোড়া চটীজুতা পায় দিয়া, তিনি বাগানে ঘুরিয়া বেড়ান। কোন জিনিষেরই ব্যয়বাহুল্য বা বাড়াবাড়ি তিনি দেখিতে পারেন না। ঈশ্বরও বোধ হয় তাঁহার মনের ভাব পূর্ব্ব হইতে জানিয়া তাঁহার শরীরটা বেশী লম্বাচোড়া করেন নাই; কারণ তাহা হইলে পরিধেয় বস্ত্রাদির অনেক অপচয় হইত। তাঁহার মাথার চুলও বোধ হয় সেইজন্য বেশী ঘন নহে, কারণ তাহা হইলে বেশী তেল খরচ হইত। তাঁহার দাঁতগুলি প্রায়ই পড়িয়া গিয়াছে, কেবল সম্মুখের দুই-তিনটা দাঁত আছে। তিনি এক সেট্ দাঁত বাঁধাইয়া আনিয়াছেন, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা ব্যবহার করেন না, পাছে শীঘ্র-শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যে গাড়ীর কথা বলিয়াছি, তাহাও ছোট একখানা টম্‌টম্; আর যে ঘোড়াটি সেই গাড়ী টানে, সে একটি বাছুর বিশেষ। তিনি বলেন, "আমার শরীর খুব

হালকা, এক মণ দশ সের মাত্র ; আমার বড় গাড়ী-ঘোড়ার দরকার কি ?" আসল কথা এই, ছোট ঘোড়া খায় কম, আর একজন সইসের দ্বারাই সব কাজ চলে। সেই সইসকে আবার বাগানের মালীর কাজও করিতে হয়; তবে আবশ্যক মতে ঠিকাদারদের লোকজন আসিয়া বাগানে কুলীর কাজ করে।

ঘরের বারান্দায় একটা গোল টেবিল, চারি খানা হাতলশূন্য চেয়ার ও দুই খানা বেঞ্চ পাতা রহিয়াছে। ঘরে ঢুকিলেই বৈঠকখানা। সেখানে তিনটা আল্‌মারি, একটা চতুষ্কোণাকৃতি বড় টেবিল, আর কয়েকখানা চেয়ার আছে। ঘরের দেওয়ালে কয়েকখানা ছবি ও তিনখানা ম্যাপ টাঙ্গান আছে।

হারাধন বাবু একজন বৈদিক হিন্দু; অর্থাৎ তিনি বেদ মানেন, কিন্তু হিন্দুর অন্য কোন শাস্ত্র বড় মানেন না। এক সময়ে তিনি খুব লিবারেল ছিলেন, অর্থাৎ কিছুই মানিতেন না। পরে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করিয়া দিন-কতক বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়াছিলেন। এখন আবার হিন্দু হইয়াছেন ; তাহার নিদর্শনস্বরূপ মাথায় একটা সূক্ষ্ম টিকী রাখিয়াছেন। সময়-সময় সাহেব মনিবদিগকে এই টিকী দেখাইয়া নিজের ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্ব করেন। বেদসম্বন্ধে কয়েকখানা ইংরেজী বই আল্‌মারিতে রাখিয়াছেন, অবসর-মতে তাহার চর্চ্চা করেন, আর কোন ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলে তাঁহার গভীর বৈদিক গবেষণার পরিচয় দেন। আর একটি আল্‌মারিতে বুদ্ধদেবের একটা প্রস্তরমূর্ত্তি এবং আরও কয়েকটা প্রস্তরমূর্ত্তি আছে ; এগুলি তিনি উড়িষ্যায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বৈঠকখানার দেওয়ালে "সত্য পরং ধীমহি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এইরূপ কয়েকটা বাক্যাংশ (Motto) বড়-বড় ছাপার অক্ষরে ফ্রেমে বাঁধাইয়া টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন।

বেলা চারিটা বাজিয়াছে ; কিন্তু ফাল্গুন মাসের বেলা, এখনও রৌদ্রের তেজ খুব প্রখর। হারাধন বাবু তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া কয়েকটি আগন্তুক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতেছেন। পশ্চিম দিকের দরজায় ও জানালায় খস্‌খসের পর্দ্দা ঝুলিতেছে। একটি বালক পাখা টানিতেছে। হারাধন বাবু টেবিলের পশ্চাৎ একখানা চৌকীতে বসিয়া-ছেন, আর সেই তিনটি ভদ্রলোক তাঁহার দক্ষিণদিকে এক লাইনে বসিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা বোধ হয় পাঠক-পাঠিকার মনে হারাধন বাবুর একটা ছবি কতকটা অঙ্কিত হইয়াছে। আর দুই-একটা কথা বলিলেই সেই ছবিটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। তাঁহার মুখে দাড়িগোঁফ নাই, মাথার চুল সব সাদা, মুখে সর্ব্বদা হাসি লাগিয়া আছে ; কিন্তু সকলে বলে সেই হাসির অন্তরালে জিলেপির প্যাঁচের মত বুদ্ধি খেলে! তাঁহার দুইটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবেন—তিনি কথা কহিতে-কহিতে বক্তব্য বিষয় কাগজের উপর পেন্‌সিল দিয়া অথবা মাটীর উপরে লাঠি বা আর কিছু দিয়া আঁকিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন। আর নিজের কোন একটা বিশেষ অভ্যাসকে হঠাৎ সাধারণ অভ্যাসে পরিণত করেন। যেমন, হয় ত মাসের কোন একটা রবিবারে তিনি সখ করিয়া নিরামিষ খাইয়াছিলেন, কিন্তু সকলকে বলেন, আমি রবিবারে নিরামিষ খাই।

তিনি নিজে পান-তামাক খান না, তবে কোন ভদ্র-লোক আসিলে পান-তামাক দিয়া আদর আপ্যায়ন করিতে ছাড়েন না। তিনি সেই ভদ্রলোক তিনটিকে বলিলেন,— "আপনারা এই রৌদ্রের মধ্যে এসেছেন, বড় কষ্ট হয়েছে —ওরে জগুয়া— ওরে রাধুয়া"—

তখন দুইটি উড়িয়া ছোকরা আসিয়া হাজির হইল। তাহারা প্রায় সমবয়স্ক। তাহারা হারাধন বাবুর সঙ্গে উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছে। তিনি বেশী বয়সের একজন চাকরের স্থলে কম বয়সের দুই জন রাখিতে ভালবাসেন। কারণ, তাহারা খায় কম, আবার একজনের স্থলে দুই জন লোকের কাজ পাওয়া যায়। সেই যুগলমূর্ত্তিকে তিনি বলিলেন—

"যা, একজন তামাক আন্, আর একজন পান নিয়ে আয়।"

"যাউছি"—বলিয়া তাহারা অন্তর্হিত হইল।

যে তিনটি ভদ্রলোক আসিয়াছেন, তাঁহাদের এক বিষয়ে প্রবল সাদৃশ্য আছে। তাঁহাদের তিন জনের গোঁফ ঠিক একই রকমের উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এবং খুব জমকাল। জগুয়া যখন পান আনিয়া দিল, তখন তিন জনে তিনটি পান মুখে দিয়া চিবাইতে আরম্ভ করিলেন,—তাঁহাদের তিন জোড়া গোঁফ আকাশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উড্ডীয়মান তিনটি কালো পক্ষীর পক্ষশোভা ধারণ করিল।

তাঁহাদের মধ্যে একজন—ললিতবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে, কালিদাস বাবু আমাদের পাঠিয়েছেন। এই ফাল্গুন মাসেই তাঁর মেয়ের বিবাহ দিতে চান। আপনার ছেলের সঙ্গে"—

হারাধন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সে কথা ত তিনি নিজেই আমাকে কতদিন বলেছেন; কিন্তু ললিত বাবু, আমি ত তাঁকে আগেই বলেছি—আমার ছেলে এখন বিয়ে ক'রতে মোটেই রাজি হয় না।"

দ্বিতীয় আগন্তুক অবিনাশবাবু বলিলেন—"কেন, তিনি ত এম-বি পরীক্ষা দিয়াছেন, এখন আর আপত্তির কারণ কি ?"

হারাধনবাবু পূর্ব্ববৎ হাসিতে-হাসিতে বলিলেন,—"ছেলের মত এম-বি পাশ ক'রবে, পরে এম-ডি পাশ ক'রবে, পড়া-শুনা শেষ ক'রে তবে বিবাহ ক'রবে। ঐ যে তামাক এনেছে—নরেশবাবু তামাক খান।"

নরেশবাবু হুঁকা হাতে করিয়া বলিলেন—"ছেলের ত মত এই। আপনার মত কি, তাই একবার বলুন দেখি, হারাধনবাবু!"

হারাধনবাবু বলিলেন—"আমার আবার মত কি ? ছেলের মতেই আমার মত। তবে গিন্নীর মত এই যে, ছেলের বিয়েটা শীঘ্র দিলে ভাল হয়।"

নরেশবাবু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন—"এবার কাছে আসুন। গিন্নীর যখন মত হয়েছে, তখন আপনার মত হওয়ার বোধ হয় বেশী বিলম্ব হবে না।"

অবিনাশবাবু বলিলেন—"আর তা' হ'লে ছেলেরও মত না হ'য়ে পারবে না। ছেলে ত আপনার অবাধ্য নয়।"

নরেশবাবু অবিনাশবাবুর হাতে হুঁকা দিয়া বলিলেন,—"অবশ্যই ছেলের মত হবে। আমি সে ছেলেকে বেশ জানি। কিন্তু হারাধনবাবু, একবার আসল কথাটা বো'লে ফেলুন দেখি। ক' হাজার চাই ?"

হারাধনবাবু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন—"রামঃ—টাকার কথা বল্‌ছেন কেন ? আমার ত জানেন—অনেক বিষয়ে আধুনিক লোকের সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না। আচ্ছা মেয়েটি দেখ্‌তে কেমন ?"

ললিতবাবু বলিলেন—"মেয়ের চোখ, মুখ, নাক এসব খুবই ভাল, গায়ের রঙ্ ঠিক ফরসা নয়, তবে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।"

হারাধনবাবু—"বেশ ত, তা'তে কোন দোষ নেই। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে বিলেতি মেমের মত ফরসা হবে, এরূপ আশা করাই অন্যায়। এই যে হিন্দুজাতি দেখছেন, এদের মধ্যে সেই প্রাচীন আর্য্যরক্ত কয় ফোঁটা আছে ?"

এই বলিয়া কাগজের উপর পেন্‌সিল দিয়া দাগ কাটিয়া দেখাইতে লাগিলেন—"এই দেখুন—এই সরল-রেখাটা যদি হয় বাঙ্গালীর রক্ত, তার এই ক্ষুদ্রতম অংশ হবে আর্য্যরক্ত। হয় ত লক্ষ-লক্ষ ফোঁটার এক ফোটা।"

অবিনাশবাবু বলিলেন—"ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেও কি অন্য জাতির রক্ত মিশেছে ?"

"মিশেছে বৈ কি ? ব্রাহ্মণ কা'কে বলেন ? আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ যখন মধ্য-এসিয়ায় ছিলেন, তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এ সব জাতিভেদ ছিল না। বেদে আছে, বিষ্ণু তিন জায়গায় পা ফেল্‌লেন, সেইজন্য তাঁর একটি নাম 'ত্রিবিক্রম'। সে তিন জায়গা কোথায় ? এই দেখুন—(কাগজ পেন্‌সিল লইয়া)—এই মধ্য-এসিয়া—এই পাঞ্জাব—আর্য্যাবর্ত্ত। আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমে মধ্য-এসিয়ায় ছিলেন, পরে পাঞ্জাবে এলেন, পরে আর্য্যাবর্ত্তে এসে উপনিবেশ স্থাপন ক'রলেন। ত্রিবিক্রম শব্দের দ্বারা এই বুঝাচ্ছে।"

অবিনাশবাবু।—"মধ্য-এসিয়ায় যে ছিলেন, তার প্রমাণ কি ?"

"প্রমাণ—অকাট্য প্রমাণ আছে। কশ্যপ মুনির নাম ত শুনেছেন, ঐ যে কশ্যপ মুনির নামে কাশ্যপ গোত্র হয়েছে,—আমাদের যে গোত্র। সেই কশ্যপ আবার দেবতা এবং অসুরদিগেরও পিতা—অর্থাৎ সকলের আদিপুরুষ ছিলেন। সেই কশ্যপ ঋষি কোথায় থাক্‌তেন ? তাঁরই নাম থেকে কাশ্‌পিয়ান হ্রদ (Caspean Sea) হয়েছে। কাশ্‌পিয়ান হ্রদের কূলে তাঁর আশ্রম ছিল। সেখানে তাঁর যজ্ঞকুণ্ড পর্য্যন্ত বেরিয়েছে। সেই যজ্ঞকুণ্ডটা এখন একটা লবণের গোলায় পরিণত হয়েছে। তিব্বতে অনেকগুলি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; সে গুলিকে বলে টেঙ্গুর। আমাদের একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সেই টেঙ্গুরের পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে এই সব প্রাচীন বিবরণ পাওয়া গিয়াছে; তা' শীঘ্রই ছাপা হবে।"

নরেশবাবু বলিলেন—"কিন্তু আমরা ত জানি, দেবতারা স্বর্গে আছেন। স্বর্গ কোথায় ?"

হারাধনবাবু।—"স্বর্গ আকাশে নয়, এই পৃথিবীতে। কোন-কোন পণ্ডিত বেদ থেকে প্রমাণ করেছেন, স্বর্গ মোঙ্গলিয়ায় ছিল। কিন্তু আমি তা' মানি না। স্বর্গ হিমালয়ের খুব নিকটে, কারণ পাণ্ডবেরা স্বর্গে যাবার পথে হিমালয়ে লয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন,—কেবল এক যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন, এ কথা অবশ্য সকলেই জানেন। স্বর্গ হিমালয়ের নিকটে যদি ঠিক হ'লো, তবে কোন্ দিকে ? আমার মতে, ঐ যে ব্রহ্মদেশে অমরাপুরী আছে, উহাই স্বর্গ ছিল। তার আর একটা বিশেষ প্রমাণ এই যে, স্বর্গে ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তী ছিল, তারই নাম থেকে ঐরাবতী নদী হয়েছে। বুঝ্লেন ত ?"

নরেশবাবু।—"আজ্ঞে, এখন অনেকটা বুঝ্লাম।"

"আচ্ছা বেশ—আরও একটু পরিষ্কার ক'রে বুঝাচ্ছি।"

এই বলিয়া হারাধনবাবু কাগজের উপর পেন্‌সিল দিয়া হিমালয়, ব্রহ্মদেশ, অমরাপুরী ও ঐরাবতী নদী আঁকিয়া দেখাইলেন।

অবিনাশবাবু তাহা দেখিয়া বলিলেন—"এবার জলের মত পরিষ্কার বুঝ্লাম। এক গেলাস খাবার জল আনতে বলুন।"

"ওরে রাধুয়া, টিকে পিয়িবাক্ পানি,—কিন্তু শুধু জল খাবেন, কিছু মিষ্টিটিষ্টি আনিয়ে দিই ?"

"আজ্ঞে না, মাপ করবেন।" ইহা বলিতে-বলিতে অবিনাশ বাবু রাধুয়ার আনীত জল পান করিলেন। তখন হারাধনবাবু তাঁহার হাতে আর একটা পান দিয়া বলিলেন— "যে কথা বল্‌ছিলাম। আর্য্যগণ যখন মধ্য-এসিয়ায় ছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পরে তবে সমাজে জাতিভেদ প্রচলিত হয়। ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী—অনার্য্যদিগের সঙ্গে ক্রমে আর্য্যদিগের রক্ত মিশ্‌তে লাগল। সেই অনার্য্যেরা কৃষ্ণবর্ণ জাতি ; আর্য্যেরা তাদের শূদ্র, দাস এই সব নাম দিয়েছিলেন। অথচ কালে তাদের সঙ্গে আবার আর্য্যদের বিবাহাদিও হ'তে লাগল। তার ফলে আর্য্যদের বর্ণও কালো হ'তে লাগল। প্রথম আর্য্যেরা ছিলেন শ্বেতবর্ণ ; কারণ তাঁরা শীতপ্রধান দেশের লোক ছিলেন। রামায়ণের যুগে দেখ্‌তে পাই, রামচন্দ্রের বর্ণ "নবদূর্ব্বাদলশ্যাম"—অর্থাৎ তখন আর্য্যের সঙ্গে অনার্য্যের রক্ত অনেকটা মিশেছে। পরে মহাভারতের যুগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কৃষ্ণ, দ্রৌপদী—এঁরা সব ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ—"নবঘনশ্যাম"—অর্থাৎ তখন আর্য্যজাতির সহিত অনার্য্যের রক্ত সম্পূর্ণরূপে মিশে গিয়েছে। বুঝলেন ত ?"

নরেশবাবু।—"আজ্ঞে, এখনও সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নাই, একটু খট্‌কা আছে। রামায়ণের যুগে রাম ছিলেন কালো, আবার তাঁর ভাই লক্ষ্মণ ত ছিলেন সাদা ? অনার্য্য-রক্তটা কি কেবল রামের মধ্যেই বেশী করে মিশেছিল ? মহাভারতের যুগে ব্যাস ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তাঁর মা সত্যবতী খুব সুন্দরী ছিলেন, যাঁর রূপ দেখে পরাশর ঋষি ভুলে গিয়াছিলেন। সত্যবতী ছিলেন আবার এক জেলের মেয়ে ; জেলেরা আর্য্য না অনার্য্য ছিল ? কৃষ্ণ ছিলেন অবশ্যই খুব কালো, কিন্তু রাধিকা ছিলেন খুব সুন্দরী, তিনি ছিলেন গোপকন্যা ;—অরণ্যবাসী গোপেরা আর্য্য না অনার্য্য ছিল ?"

হারাধনবাবু।—"ও-সব জাতিতত্ত্বের কথা নরেশবাবু—বড় জটিল। সোসিওলজি, বাইওলজি না পড়লে উহা বুঝ্‌তে পারবেন না। এই ধরুন না কেন, এক বোঁটায় ফুল ফোটে ; তার একটা হয় সাদা, আর একটা হয় লাল—ঐ দেখুন আমার বাগানে গেটের উপর সে ফুল আছে।"

নরেশবাবু।—তা' হলে আমাদের দেশে কতক লোক সাদা হওয়া, কতক লোক কালো হওয়া, আমাদের দেশের জলবায়ুর গুণ ধরি না কেন—যেমন ফুলের বেলায় দেখতে পাচ্ছি ?"

হারাধনবাবু।—"কেবল জলবায়ুর গুণ ব'ললে চলবে না নরেশবাবু। এর মধ্যে আরও কত factors (বিবেচ্য বিষয়) আছে, সে সব সমাজতত্ত্ব পড়লে জান্‌তে পারবেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে অনার্য্য-রক্ত মিশেছে, তার কোন সন্দেহ নাই ; নচেৎ দুর্ব্বাসা, ব্যাস, এ সব ঋষি কালো ছিলেন কেন ? এ সব ঐতিহাসিক সত্য, বুঝ্লেন ত ?"

অবিনাশবাবু বলিলেন—"এবার জলের মত বুঝেছি। আপনার ঐতিহাসিক গবেষণা যথেষ্ট। আর একবার তামাক দিতে বলুন।"

"ওরে রাধুয়া, গুড়াকু দে ;—আপনারা প্রাচীন

ইতিহাসের একটা আশ্চর্য্য জিনিস দেখবেন? আচ্ছা দেখাচ্ছি।"

হারাধনবাবু তাঁহার সম্মুখের কাচের আলমারি খুলিয়া একখণ্ড লম্বা প্রস্তর দেখাইয়া বলিলেন—"এই দেখুন এটা একটা শিলালিপি। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনিকে তাঁর সমগ্র রাজ্য দান করেছিলেন, অবশ্য শুনেছেন। এই শিলালিপিতে তার ঘোষণাপত্র (Edict) অতি প্রাচীন অক্ষরে খোদা আছে। সে কোন আধুনিক ভাষায় নয়, বৈদিক ভাষায়। জার্ম্মাণির একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত এর পাঠোদ্ধার করেছেন। আমি উড়িষ্যার এক পাহাড়ে এই শিলালিপি আবিষ্কার করি এবং এর ফটো নানা স্থানে পাঠিয়েছিলাম। পৌরাণিক কথাতে আগে আমার আদৌ বিশ্বাস ছিল না; কিন্তু এখন অনেক অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি—কাজেই মান্‌তে হয়। আবার দক্ষিণ-আমেরিকায় বলিভিয়া ব'লে একটা দেশ আছে শুনেছেন? সেখানে সংপ্রতি একটা তাম্রফলক বেরিয়েছে। বলিরাজা যে তাম্রফলক লিখে বামনকে পৃথিবী দান করেছিলেন, সেটা সেই তাম্রফলক। তা' হলে জানা গেল, বলিভিয়া হচ্ছে বলিরাজার দেশ—আর আমেরিকা পাতালপুরী। এ সব আর এখন অবিশ্বাস ক'রবার উপায় নেই।"

এই বলিয়া হারাধনবাবু কাগজের উপরে আমেরিকা ও বলিভিয়া আঁকিয়া দেখাইলেন।

অবিনাশবাবু বলিলেন—"অতি আশ্চর্য্য! চমৎকার!"

হারাধনবাবু বলিলেন—"আমি সেই তাম্রফলকের একটা ফটো শীঘ্র আনা'ব এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জার্ণেলে এ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখ্‌ব।"

ললিতবাবু হাই তুলিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে, তবে আমাদের সেই আসল কথাটার কি বলেন? কালিদাস বাবুকে আমরা কি ব'লব?"

হারাধনবাবু।—"ও হো, সেই বিয়ের কথা? কালো মেয়ে ব'লে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে এখন বিয়ে ক'রতে ছেলের মত হয় কি না, তাকে একবার ভাল ক'রে জিজ্ঞেস ক'রে ব'লব।"

নরেশবাবু।—"আজ্ঞে, কত টাকা হো'লে—"

হারাধনবাবু।—"মহাভারত! টাকার কথা কেন বল্‌ছেন নরেশবাবু? এই সেদিন কমলাকান্তবাবুর মেয়ে—সে পরমাসুন্দরী মেয়ে—সেই মেয়ের জন্য সম্বন্ধ করতে এসেছিলেন। তাঁরা দশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আমি ব'ললাম—টাকার কথা তুলবেন না, আমি কি ছেলে বেচে টাকা নেব? আসল কথা, ছেলের এখন বিবাহে মত নেই, নরেশবাবু।"

নরেশবাবু।—"তবে আমরা এখন আসি। ছেলের কি মত হয় ২।৩ দিনের মধ্যে আমাদের অনুগ্রহ ক'রে জানাবেন; নমস্কার।"

ললিতবাবু এবং অবিনাশবাবুও হারাধনবাবুকে নমস্কার করিয়া বাহির হইলেন। রাস্তায় আসিয়া ললিতবাবু বলিলেন—"নরেশবাবু, কি বুঝ্‌লেন?" নরেশবাবু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন—"সুন্দরী মেয়েতে যদি হয় দশ হাজার, তবে কালো মেয়েতে হবে পনের হাজার।"

অবিনাশবাবু।—"আর কালো মেয়েতে কোন আপত্তি নাই, কেন বুঝলেন ত?"

নরেশবাবু।—"অবশ্য! টাকাটারই বেশী দরকার কি না?"

অবিনাশবাবু।—"আমার বোধ হয় উনি বেশী টাকার লোভে কালো মেয়ে খুঁজছেন; সেজন্য ছেলের বিবাহে মত হয় না।"

ললিতবাবু।—ঠিক কথা! আপনি সব কথা জলের মতন বুঝতে পারেন—একেবারে জলের মতন!

অবিনাশবাবু।—নিশ্চয়ই! আমি যে একজন প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ। পেত্নীতত্ত্ব, নরতত্ত্ব, জানোয়ারতত্ত্ব—কোন তত্ত্বই আমার আট্‌কায় না।

এই কথা বলিয়া হাসিতে-হাসিতে গাড়ীতে উঠিলেন।

দত্তা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল—বিজয়ার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হইল না। চোখের হিংস্র দৃষ্টি শুধু মানুষ কেন, অনেক জানোয়ারে পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে। সুতরাং এই লোকটি যতই সোজা মানুষ হোক, এবং সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার যত অল্পই থাকুক, এ কথাটা সে এক নিমিষেই টের পাইল যে, ওই চেয়ারে আসীন পিতাপুত্রের চোখের চাহনিতে আর যে ভাবই প্রকাশ করুক, হৃদয়ের প্রীতি প্রকাশ করে নাই। ইঁহারা যে তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, তাহা সে জানিত। সেই মাইক্রস্কোপটা বিজয়াকে দেখাইতে আসিয়া নিজের কানেই অনেক কথা শুনিয়া গিয়াছিল; এবং রাসবিহারী নিজের হাতে বাড়ী বহিয়া যেদিন তাহার দাম দিতে গিয়াছিলেন, সেদিনও হিতোপদেশচ্ছলে বৃদ্ধ কম কটু কথা শুনাইয়া আসেন নাই। কিন্তু, সে যখন সত্যই ঠকাইয়া যায় নাই, এবং জিনিষটা আজ যখন দুই শতের স্থানে চারি শত ঘুরাইয়া আনিতে পারে, যাচাই হইয়া গেছে, তখন সেদিক দিয়া কেন যে এখনো রাগ থাকিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। আর এই বসন্তের ভয় দেখাইয়া যাওয়া। কিন্তু সে ত ভয় দেখাইয়া যায় নাই,—বরঞ্চ ঠিক উল্টা। এ মিথ্যা আর কেহ প্রচার করিয়াছে, কিম্বা, বিজয়ার নিজের মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বেই বিলাসবিহারী আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিল। ভৃত্য কালিপদ বোধ করি নিছক কৌতূহলবশেই পর্দ্দা একটুখানি ফাঁক করিয়া মুখ বাড়াইয়াছিল, বিলাসের চোখে পড়িতেই সে একেবারে হিন্দী গর্জ্জন ছাড়িল। খুব সম্ভব হিন্দীভাষায় অধিক রোক্ প্রকাশ পায়। কহিল, 'এই শূয়ারকা বাচ্চা, একঠো কুর্সী লাও।" ঘরের সকলেই চমকিয়া উঠিল। কালিপদ 'শূয়ারকা বাচ্চা' এবং 'লাও' কথাটার অর্থ বুঝিতে পারিল, কিন্তু 'কুর্সী' বস্তুটি যে কি, তাহা আন্দাজ করিতে না পারিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে মুখ ফিরাইতে লাগিল। বৃদ্ধ রাসবিহারী নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়াছিলেন; তিনি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ও-ঘর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এসো, কালিপদ, বাবুকে বস্‌তে দাও।" কালিপদ দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলে তিনি ছেলের দিকে ফিরিয়া, তাঁহার শান্ত উদার কণ্ঠে বলিলেন, "রোগা মানুষের ঘর—অমন hasty হেছি হোয়ো না বিলাস। temper lose করা কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই শোভা পায় না।" ছেলে উদ্ধতভাবে জবাব দিল—"মানুষ এতে temper lose করে না ত করে কিসে শুনি? হারামজাদা চাকর, বলা নেই, কওয়া নেই, এমন একটা অসভ্য লোককে ঘরে এনে ঢোকালে, যে ভদ্র-মহিলার সম্মান রাখতে পর্য্যন্ত জানে না!" অকস্মাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় মাতালের যেমন নেশা ছুটিয়া যায়, বিজয়ারও ঠিক তেম্‌নি জ্বরের আচ্ছন্ন ঘোরটা ঘুচিয়া গেল। সে নিঃশব্দে নরেন্দ্রের হাতটা ছাড়িয়া দিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইল। কালিপদ তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার আনিয়া রাখিয়া যাইতেই, নরেন্দ্র বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহাতে বসিল। রাসবিহারী বিজয়ার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি একটু প্রসন্ন হাস্য করিয়া পুত্রকেই উদ্দেশ করিয়া পুনশ্চ বলিলেন, "আমি সমস্তই বুঝি বিলাস। এ ক্ষেত্রে তোমার রাগ হওয়াটা যে অস্বাভাবিক নয়, বরঞ্চ খুবই স্বাভাবিক, তাও মানি, কিন্তু, এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল যে, সবাই ইচ্ছা করে অপরাধ করে না। সকলেই যদি সব রকম রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার জান্‌তো, তা'হলে ভাবনা ছিল কি! সেই জন্যে রাগ না কোরে শান্তভাবে মানুষের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দিতে হয়।" এই দোষ-ত্রুটি যে কাহার, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বিলাস সরোষে কহিল, "না বাবা, এ রকম impertinence সহ্য হয় না। তাছাড়া, আমার এ বাড়ীর চাকরগুলো হয়েচে যেমন হতভাগা, তেম্‌নি বজ্জাত। কালই আমি ব্যাটাদের সব দূর কোরে তবে

ছাড়্ব।” রাসবিহারী আবার একটু হাস্য করিয়া সস্নেহ তিরস্কারের ভঙ্গীতে এবার বোধ করি ঘরের দেওয়াল-গুলোকে শুনাইয়া বলিলেন, “এর মন্ খারাপ হয়ে থাক্‌লে যে কি বলে, তার ঠিকানাই নেই। আর শুধু ছেলেকেই বা দোষ দেব কি, আমি বুড়োমানুষ, আমি পর্য্যন্ত অসুখ শুনে কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম! বাড়ীতেই হ'ল একজনের বসন্ত, তার ওপর উনি ভয় দেখিয়ে গেলেন—” এতক্ষণ পর্য্যন্ত নরেন্দ্র কোন কথা কহে নাই; এইবার সে বাধা দিয়া কহিল, “না, আমি কোন রকম ভয় দেখিয়ে যাইনি।” বিলাস মাটিতে একটা পা ঠুকিয়া সতেজে কহিল, “আল্‌বৎ ভয় দেখিয়ে গেছেন। কালিপদ সাক্ষী আছে।” নরেন্দ্র কহিল, “কালিপদ ভুল শুনেচে।” প্রত্যুত্তরে বিলাস আর একটা কি কাণ্ড করিতে যাইতেছিল, তাহার পিতা থামাইয়া দিয়া বলিলেন, “আঃ—কি কর বিলাস। উনি যখন অস্বীকার কর্‌চেন, তখন কি কালিপদকে বিশ্বাস করতে হবে? নিশ্চয়ই ওঁর কথা সত্যি।” তথাপি বিলাস কি যেন বলিবার প্রয়াস করিতেই বৃদ্ধ কটাক্ষে নিষেধ করিয়া বলিলেন, “এই সামান্য অসুখেই মাথা হারিয়ো না, বিলাস, স্থির হও। মঙ্গলময় জগদীশ্বর যে শুধু আমাদের পরীক্ষা করবার জন্যেই বিপদ পাঠিয়ে দেন, বিপদে পড়লে তোমরা সকলের আগে এই কথাটাই কেন ভুলে যাও, আমি ত ভেবে পাইনে।” একটু স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, “আর তাই যদি একটা ভুল অসুখের কথা বলেই থাকেন, তাতেই বা কি? কত পাশ-করা ভাল-ভাল বিচক্ষণ ডাক্তারের যে ভ্রম হয়, উনি ত ছেলেমানুষ।” বলিয়া নরেন্দ্রর প্রতি মুখ তুলিয়া বলিলেন, “যাক্—জ্বর ত তা'হলে অতি সামান্যই আপনি বল্‌চেন? চিন্তা করবার ত কোনই কারণ নেই, এই ত আপনার মত?” নরেন্দ্র আসিয়া পর্য্যন্ত অনেক অপমান নীরবে সহিয়াছিল, কিন্তু এইবার একটা বাঁকা জবাব না দিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল, “আমার বলায় কি আসে-যায় বলুন, আমার ওপর ত নির্ভর কর'চেন না। বরং তার চেয়ে কোন ভাল-পাশ-করা বিচক্ষণ ডাক্তার দেখিয়ে তাঁর মতামত নেবেন।” কথাটায় নিহিত খোঁচা যাই থাক, এ জবাব দিবার তাহার অধিকার ছিল। কিন্তু বিলাস একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া, মারমুখী হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—“তুমি কার সঙ্গে কথা কইচ মনে কোরে কথা কোয়ো, বলে দিচ্চি। এ ঘর না হয়ে আর কোথাও হ'লে তোমার বিদ্রূপ করা—” এই লোকটার কারণে-অকারণে প্রথম হইতেই একটা ঝগড়া বাধাইয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিবার প্রাণপণ চেষ্টা দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিন্তু কেন, কিসের জন্য,—কোথায় তাহার ব্যবহারের মধ্যে কি অপরাধ ঘটিতেছে, কিছুই সে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। আসল কারণ হইতেছে এই যে, কোথায় যে এই লোকটার অন্তর্দাহ, নরেন্দ্র তাহা আজিও জানিত না। বিজয়া এখানে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই গ্রামের অনুসন্ধিৎসু প্রতিবেশীর দল যখন বিলাসের সহিত তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিত, তখন, ভিন্ন-গ্রামবাসী এই নবীন বৈজ্ঞানিকের অখণ্ড মনোযোগ কীটাণুকীটের সম্বন্ধ নিরূপণেই ব্যাপৃত থাকিত; গ্রামের জনশ্রুতি তাহার কাণে পৌছাইত না। তাহার পরে ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে যখন কথাটা পাকা হইয়া রাষ্ট্র হইতে কোথাও আর বাকি রহিল না, তখন সে কলিকাতায় চলিয়া গেছে। আজ পিতা-পুত্রের কথার ভঙ্গীতে মাঝে-মাঝে কি যেন একটা অনির্দ্দেশ্য এবং অস্পষ্ট ব্যথার মত তাহাকে বাজিতেছিল বটে, কিন্তু চিন্তার দ্বারা তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিবার সময় কিম্বা প্রয়োজন কিছুই তাহার ছিল না। ঠিক এই সময়ে বিজয়া এদিকে মুখ ফিরাইল। নরেন্দ্রের মুখের প্রতি ব্যথিত, উৎপীড়িত দুটি চক্ষু ক্ষণকাল নিবদ্ধ করিয়া কহিল, “আমি যতদিন বাঁচব আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাক্‌ব। কিন্তু এঁরা যখন অন্য ডাক্তার দিয়ে আমার চিকিৎসা করা স্থির করেচেন, তখন আর আপনি অনর্থক অপমান সইবেন না। কিন্তু ফিরে যাবার পথে দয়ালবাবুকে একবার দেখে যাবেন, শুধু এই মিনতিটি রাখ্‌বেন”—বলিয়া প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই সে পুনরায় মুখ ফিরাইয়া শুইল। রাসবিহারী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন,—“বিলক্ষণ! তুমি যাঁকে ডেকে পাঠিয়েছ, তাঁকে অপমান করে কার সাধ্য!” তারপর ছেলেকে নানাপ্রকার ভর্ৎসনার মধ্যে বারম্বার এই কথাটাই প্রচার করিতে লাগিলেন যে, অসুখের গুরুত্ব কল্পনা করিয়া উৎকণ্ঠায় বিলাসের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে একমাত্র ও

অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক আধ্যাত্মিক ও নিগূঢ় তত্ত্ব-কথার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া দেখাইলেন। নরেন্দ্র কোন কথা কহিল না। পিতা-পুত্রের হাত হইতে তত্ত্ব-কথা ও অপমানের বোঝা নিঃশব্দে দুই স্কন্ধে ঝুলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং লাঠি ও ছোট ব্যাগটি হাতে লইয়া তেমনি নীরবে বাহির হইয়া গেল। রাসবিহারী পিছন হইতে ডাকিয়া কহিলেন, "নরেন্দ্রবাবু, আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আলোচনা করবার আছে—" বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছেলেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, একমাত্র ও অদ্বিতীয়রূপে বিজয়ার ঘরের মধ্যে অধিষ্ঠিত রাখিয়া দ্রুত-বেগে তাহার অনুসরণ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

নরেন্দ্রকে পাশের একটা ঘরে বসাইয়া তিনি ভূমিকাচ্ছলে কহিলেন, "পাঁচজনের সাম্‌নে তোমাকে বাবুই বলি আর যাই বলি, এটা কিন্তু ভুল্‌তে পারিনে, তুমি আমাদের সেই জগদীশেরই ছেলে। বনমালী, জগদীশ দুজনেই স্বর্গীয় হয়েছেন, কিন্তু আমরা তিনজনে যে কি ছিলাম, সে আভাস তোমাকে ত সেইদিনই দিয়েছিলাম, কিন্তু, খুলে বল্‌তে পারিনে বাবা,—আমার যেন বুক ফেটে যেতে চায়।" মাইক্রস্কোপটার দাম দিতে গিয়া তিনি অনেক কথাই সেদিন কহিয়াছিলেন। নরেন চুপ করিয়া রহিল ; তাঁর সেই কথাটাই যেন হঠাৎ মনে পড়ায় বলিয়া উঠিলেন, "ওই দরকারী যন্ত্রটা বিক্রী করায় আমি সত্যই তোমার উপর বড় বিরক্ত হয়েছিলাম।" একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "'বিরক্ত হয়েছিলাম' কথাটা রূঢ় ; 'হইনি' বল্‌তে পারলেই সাংসারিক হিসাবে হয় ভাল,—বল্‌তে শুন্‌তে সব দিকেই নিরাপদ,—কিন্তু যাক্।" বলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় কহিলেন, "আমার দ্বারা যা অসাধ্য, তা নিয়ে দুঃখ করা বৃথা। কত লোকের অপ্রিয় হই, কত লোকে গাল দেয়, বন্ধুরা বলেন, 'বেশ, মিথ্যা বল্‌তে যখন কোন কালেই পারলে না, তখন, তা' বল্‌তেও আমরা বলিনে, কিন্তু, একটু ঘুরিয়ে বল্‌লেই যদি গাল-মন্দ হতে রেহাই পাওয়া যায়, তাই কেন বল না?' আমি শুনে শুধু অবাক্ হয়ে ভাবি বাবা, যা' ঘটেনি তা' বানিয়ে বলা, ঘুরিয়ে বলা যায় কি কোরে? এরা আমার ভালই চায়, তা' বুঝি ; কিন্তু সেই মঙ্গলময় আমাকে যে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছেন, সে অসাধ্য-সাধন করিই বা আমি কেমন করে? যাক্ বাবা,—নিজের সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমি কোন দিনই ভাল বাসিনে,—এতে আমার বড় বিতৃষ্ণা। পাছে তুমি দুঃখ পাও, তাই এত কথা বলা।" বলিয়া উদাস নেত্রে কড়িকাঠের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া চোখ নামাইয়া কহিলেন, "আর একটা কি জানো নরেন, এই সংসারেই চিরকাল আছি বটে, চুল পাকিয়েও ফেল্‌লাম সত্য, কিন্তু কি করলে, কি বল্‌লে যে এখানে সুখ-সুবিধে মেলে, তা' আজও এই পাকা-মাথাটায় ঢুক্‌ল না। নইলে, তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম, এ কথা মুখের ওপর বলে তোমার মনে আজ ক্লেশ দেব কেন?" নরেন বিনয়ের সহিত বলিল, "যা সত্য তাই বলেছেন—এতে দুঃখ করবার ত কিছু নেই।" রাসবিহারী ঘাড় নাড়িতে-নাড়িতে বলিলেন, "না না, ও কথা বোলো না, নরেন,—কঠোর কথা মনে বাজে বই কি! যে শোনে তার ত বাজেই, যে বলে তারও কম বাজে না বাবা! জগদীশ্বর!" নরেন অধোমুখে চুপ করিয়া রহিল। রাসবিহারী অন্তরের ধর্ম্মোচ্ছ্বাস সংযত করিয়া লইয়া পরে বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু তার পরে আর চুপ করে থাক্‌তে পারলাম না। ভাবলাম, সে কি কথা! সে অনেক দুঃখেই নিজের অমন আবশ্যকীয় জিনিসটা বিক্রী কোরে গেছে। তার মূল্য যাই হোক্, কিন্তু কথা যখন দেওয়া হোয়েচে, তখন, আর ত ভাবাও চলে না, দাম দিতেও বিলম্ব করা চলে না। মনে মনে বল্‌লাম, আমার বিজয়া মা যখন ইচ্ছে, যত দিনে ইচ্ছে টাকা দিন, কিন্তু, আমি যাই, নিজে গিয়ে দিয়ে আসিগে। সে বেচারা যখন ঐ টাকা নিয়েই তবে বিদেশে যাবে, তখন একটা দিনও ত দেরি করা কর্ত্তব্য নয়। তা'র ওপর সে যখন আমার জগদীশের ছেলে!" নরেন তখনকার কটু কথাগুলা স্মরণ করিয়া বেদনার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর কি দাম দেবার ইচ্ছে ছিল না?" বৃদ্ধ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "না, সে কথা আমার ত মনে হয়নি নরেন। কিন্তু তবে কি জানো,—না, থাক্।" বলিয়া তিনি সহসা মৌন হইলেন। চারিশত টাকায় যাচাই করার কথাটা একবার তাহার জিহ্বায় আসিয়া পড়িল, কিন্তু, সেই সঙ্গেই কেমন একটা ক্লেশ বোধ হওয়ায় এ সম্বন্ধে আর সে কোন কথা কহিল না। রাসবিহারী এইবার দরকারী কথাটা পাড়িলেন।

তিনি লোক চিনিতেন। নরেনের আজিকার কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে তাঁহার ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, এখনও সে আসল কথাটা জানে না; এবং এই সকল অন্যমনস্ক, ও উদাসীন প্রকৃতির মানুষগুলোর একেবারে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া না দিলে নিজে হইতে অনুসন্ধান করিয়াও ইহারা কোন দিনই কিছু জানিতে চাহে না। বলিলেন, "বিলাসের আচরণে আজ আমি যেমন দুঃখ তেম্নি লজ্জা বোধ করেছি। ওই মাইক্রস্কোপটার কথাই বলি। বিজয়া একবার যদি তার মত নিয়ে সেটা কিন্‌ত, তা' হলে ত কোন কথাই উঠ্‌তে পারত না। তুমিই বল দেখি, এ কি তার কর্ত্তব্য ছিল না!" বিজয়ার কর্ত্তব্যটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া নরেন্দ্র জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া রহিল। রাসবিহারী কহিলেন, "তার অসুখের খবর পেয়েই বিলাস যে কি রকম উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেচে, এ ত আমার বুঝ্‌তে বাকি নেই। হওয়াই স্বাভাবিক,—সমস্ত ভাল মন্দ, সমস্ত দায়িত্ব ত শুধু তারই মাথার উপরে। চিকিৎসা এবং চিকিৎসক স্থির করা ত তারই কাজ? তার অমতে ত কিছুই হতে পারে না? বিজয়া অবশেষে ত তা বুঝলেন, কিন্তু, দুদিন পূর্ব্বে চিন্তা করলে ত এ সব অপ্রিয় ব্যাপার ঘট্‌তে পারত না। নিতান্ত বালিকা নয়,—ভাবা ত উচিত ছিল।"

কেন যে উচিত ছিল, তাহা তখন পর্য্যন্তও বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া নরেন বৃদ্ধের প্রশ্নে সায় দিতে পারিল না। কিন্তু তবুও তাহার বুকের ভিতরটা আশঙ্কায় তোল-পাড় করিতে লাগিল। অথচ, বুঝিয়া লইবার মত কথাও তাহার কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। সে শুধু শঙ্কিত দুই চক্ষু বৃদ্ধের মুখের প্রতি মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। রাসবিহারী বলিলেন, "তুমি কিন্তু, বাবা, বিলাসের মনের অবস্থা বুঝে, মনের মধ্যে কোন গ্লানি রাখ্‌তে পাবে না। আর একটা অনুরোধ আমার রইল নরেন, এদের বিবাহ ত এই বৈশাখেই হবে, যদি কলকাতাতেই থাকো, শুভ-কর্ম্মে যোগ দিতে হবে, তা বলে রাখলাম।"

নরেন কথা কহিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা। রাসবিহারী তখন পুলকিত চিত্তে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। এ বিবাহ যে মঙ্গলময়ের একান্ত অভিপ্রেত, এবং বর-কন্যার জন্ম-কাল হইতেই যে স্থির হইয়াছিল, এবং এই প্রসঙ্গে বিজয়ার পরলোকগত পিতার সহিত তাঁহার কি-কি কথা হইয়াছিল, ইত্যাদি বহু প্রাচীন ইতিহাস বিবৃত করিতে-করিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ভাল কথা, কলকাতাতেই কি এখন থাকা হবে? একটু সুবিধে-টুবিধে হবার কি আশা—" নরেন্দ্র কহিল, "হাঁ। একটা বিলিতি ওষুধের দোকানে সামান্য একটা কাজ পেয়েচি।" রাসবিহারী খুসি হইয়া বলিলেন, "বেশ-বেশ। ওষুধের দোকান—কাঁচা পয়সা। টিকে থাক্‌তে পারলে আখেরে গুছিয়ে নিতে পারবে।" নরেন এ ইঙ্গিতের ধার দিয়াও গেল না। কহিল, "আজ্ঞে, হাঁ।" শুনিয়া রাসবিহারী আর কৌতূহল দমন করিতে পারিলেন না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তাহলে মাইনেটা কি রকম দিচ্চে?" নরেন্দ্র কহিল, "পরে কিছু বেশি দিতে পারে। এখন চারশ' টাকা মাত্র দেয়।" "চারশ"! রাসবিহারী বিবর্ণ মুখে চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, "আহা, বেশ-বেশ! শুনে বড় সুখী হোলাম।"

এদিকে বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল দেখিয়া নরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। দয়ালবাবুর দুই-চারিটা বসন্ত দেখা দিয়াছিল, তাঁহাকে একবার দেখিতে যাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিল, "সেই পরেশ ছেলেটি কেমন আছে, বলতে পারেন?" রাসবিহারী অম্লান মুখে জানাইলেন, তাহাকে তাহাদের গ্রামের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—সে কেমন আছে বলিতে পারেন না।

উভয়েই ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে আবার একবার উপরে যাইতে হইবে। ছেলে তখনও অপেক্ষা করিয়া আছে; সে চিকিৎসার কি রূপ ব্যবস্থা করিল, তাহারও খবর লওয়া আবশ্যক। বারান্দার শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া নরেন মুহূর্ত্তের জন্য একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ধীরে-ধীরে ফিরিয়া আসিয়া রাস-বিহারীকে কহিল, "আপনি আমার হয়ে বিলাসবাবুকে একটা কথা জানাবেন। বল্‌বেন, প্রবল জ্বরে মানুষের আবেগ নিতান্ত সামান্য কারণেও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌তে পারে। ডাক্তারের মুখের এই কথাটা তিনি যেন অবিশ্বাস না করেন।" বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া একটু দ্রুতগতিতেই প্রস্থান করিল। স্নান নাই, আহার নাই,—মাথার উপর কড়া রৌদ্র,—মাঠের উপর দিয়া নরেন্দ্র দিগ্‌ঘড়ায় চলিয়াছিল।

কিন্তু কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তাই চলিতে-চলিতে আপনাকে আপনি সে বারম্বার প্রশ্ন করিতেছিল, তাহার কিসের গরজ? কে একটা স্ত্রীলোক তাহার শ্রদ্ধার পাত্রকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে বলিয়াই, সে যাহাকে কখনো চোখেও দেখে নাই, তাহাকে দেখিবার জন্য এই রৌদ্রের মধ্যে মাঠ ভাঙিতেছে! এই অন্যায় অনুরোধ করিবার যে তাহার একবিন্দু অধিকার ছিল না, তাহা মনে করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, এবং ইহা রক্ষা করিতে যাওয়াও যে নিজের সম্মানের হানিকর, ইহাও সে বার-বার করিয়া আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, অথচ, মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেও পারিল না। এক-পা এক-পা করিয়া সেই দিঘড়ার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল; এবং অনতিকাল পরে সেই নিতান্ত স্পর্দ্ধিত অনুরোধটাকেই বজায় রাখিতে নিজের বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এক-টুকরা কাগজের উপর নরেন নিজের নামের সঙ্গে তাহার বিলাতি ডাক্তারি খেতাবটা জুড়িয়া দিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিয়াছিল। সেইটা পাঠ করিয়া দয়াল অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। এতবড় একটা ডাক্তার পায়ে হাঁটিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে, ইহা তাঁহার নিজেরই যেন একটা অশোভন স্পর্দ্ধা ও অপরাধের মত ঠেকিল। এবং ইঁহাকেই বঞ্চিত করিয়া নিজে এই বাটীতে বাস করিতেছেন, এই লজ্জায় কি করিয়া যে মুখ দেখাইবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। ক্ষণেক পরে একজন গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, ছিপছিপে যুবক যখন তাঁহার ঘরে আসিয়া ঢুকিল, তখন মুগ্ধনেত্রে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল ব্যাধি তাঁহার যাই হোক, এবং যতবড়ই হৌক্, আর ভয় নাই,—এ যাত্রা তিনি বাঁচিয়া গেলেন। বস্তুতঃ, রোগ অতি সামান্য, চিন্তার কিছুমাত্র হেতু নাই, আশ্বাস পাইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন, এমন কি, ডাক্তার সাহেবকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে ষ্টেসন পর্য্যন্ত সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হইবে কি না, ভাবিতে লাগিলেন। বিজয়া নিজে শয্যাগত হইয়াও তাঁহাকে বিস্মৃত হয় নাই; সেই অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে শুনিয়া, কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে দয়ালের চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে এই নবীন চিকিৎসক ও প্রাচীন আচার্য্যের মধ্যে আলাপ জমিয়া উঠিল। নরেন্দ্রের চিত্তের মাঝে আজ অনেকখানি গ্লানি জমা হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এই বৃদ্ধের সন্তোষ, সহৃদয়তা ও অন্তরের শুচিতার সংস্পর্শে তাহার অর্দ্ধেক পরিষ্কার হইয়া গেল। কথায়-কথায় সে বুঝিল, এই লোকটির ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পড়া-শুনা যদিচ নিতান্তই যৎ-সামান্য, কিন্তু, ধর্ম্ম বস্তুটিকে বৃদ্ধ বুক দিয়া ভালবাসে। এবং সেই অকৃত্রিম ভালবাসাই যেন ধর্ম্মের সত্য দিকটার প্রতি তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে অসামান্যরূপে স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে। কোন ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই তাঁহার নালিশ নাই, এবং মানুষ খাঁটি হইলেই যে, সকল ধর্ম্মই তাহাকে খাঁটি জিনিসটি দিতে পারে, ইহাই তিনি অকপটে বিশ্বাস করেন। এরূপ অসাম্প্রদায়িক মতবাদ বিলাস-বিহারীর কাণে গেলে তাঁহার আচার্য্য পদ বাহাল থাকিত কি না, ঘোর সন্দেহ; কিন্তু বৃদ্ধের শান্ত, সরল ও বিদ্বেষ-লেশহীন কথা শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীরও তিনি অনেক গুণগান করিলেন। তিনি যাহারই কথা বলেন, তাঁহারই মত সাধু পুরুষ জগতে আর দ্বিতীয় দেখেন নাই। বৃদ্ধের মানুষ চিনিবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া নরেন্দ্র মনে-মনে হাসিল। পরিশেষে বিলাসের প্রসঙ্গেই তিনি আগামী বৈশাখে বিবাহের উল্লেখ করিয়া, অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত জানাইলেন যে, সে উপলক্ষ্যে তাঁহাকেই আচার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই বিজয়ার অভিলাষ। এবং এই বিবাহই যে ব্রাহ্ম-সমাজে বিবাহের যথার্থ আদর্শ হওয়া উচিত, এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতেও তিনি বিস্মৃত হইলেন না। দয়াল সৌভাগ্য ও আনন্দের আতিশয্যে নিজে এতদূর বিহ্বল হইয়া না উঠিলে অত্যন্ত অনায়াসেই দেখিতে পাইতেন, এই শেষের আলোচনা কি করিয়া তাঁহার শ্রোতার মুখের উপর কালীর উপর কালী ঢালিয়া দিতেছিল। স্নানাহারের জন্য তিনি নরেন্দ্রকে যৎপরোনাস্তি পীড়াপীড়ি করিয়াও রাজী করিতে পারিলেন না। ঘণ্টা দেড়েক পরে সে যখন যথার্থ শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল, তখন কোথায় যে তাহার ব্যথা, কেন যে সমস্ত মন এমন উদ্‌ভ্রান্ত, সমস্ত সংসার এরূপ তিক্ত, বিস্বাদ হইয়া গেছে, তাহা জানিতে তাহার বাকি ছিল না। নদী পার হইয়া

বামদিকে অনেক দূরে জমীদার-বাটীর সৌধ-চূড়া চোখে পড়িয়া আর একবার নূতন করিয়া তাহার দুই চক্ষু জ্বলিয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সোজা মাঠের পথ ধরিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনের দিকে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। আজ এমন অকস্মাৎ এতবড় আঘাত না খাইলে সে হয় ত এত সত্বর নিজের মনটাকে চিনিতে পারিত না। এতদিন তাহার জানা ছিল, এ জীবনে হৃদয় তাহার একমাত্র শুধু বিজ্ঞানকেই ভালবাসিয়াছে। সেখানে কোন কালে আর কোন জিনিসেরই যে যায়গা মিলিবে না, তাহা এমন নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিত বলিয়াই জগতের অন্যান্য সমস্ত কামনার বস্তুই তাহার কাছে একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ আঘাত খাইয়া যখন ধরা পড়িল, হৃদয় তাহার তাহারই অজ্ঞাতসারে আর একটা বস্তুকে এম্নিই একান্ত করিয়া ভালবাসিয়াছে, তখন ব্যথায় ও বিস্ময়েই শুধু চমকিয়া গেল না, নিজের কাছেই নিজে যেন অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল। আজ কোন কথারই যথার্থ মানে বুঝিতে তাহার বাধিল না। বিজয়ার সমস্ত আচরণ, সমস্ত কথাবার্ত্তাই যে প্রচ্ছন্ন উপহাস, এবং এই লইয়া বিলাসের সহিত না জানি সে কতই হাসিয়াছে, কল্পনা করিয়া সর্ব্বাঙ্গ তাহার বারবার করিয়া শিহরিতে লাগিল। এই ত সেদিন যে তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া পথে বাহির করিয়া দিতেও একবিন্দু দ্বিধা করে নাই, তাহারই কাছে দৈন্য জানাইয়া তাহার শেষ সম্বলটুকু পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে যাইবার চরম দুর্ম্মতি তাহার কোন্ মহাপাপে জন্মিয়াছিল! নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া কেবলই বলিতে লাগিল, এ আমার ঠিকই হইয়াছে। যে লজ্জাহীন সেই নিষ্ঠুর রমণীরই একটা সামান্য কথায় নিজের সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া এতদূরে ছুটিয়া আসিতে পারে, এ শাস্তি তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। বেশ করিয়াছে বিলাস তাহাকে অপমান করিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়াছে! ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিল, যে মাইক্রস্কোপটা এত দুঃখের মূল, সেইটাকে লইয়াই কালিপদ দাঁড়াইয়া আছে। সে কাছে আসিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু, মা-ঠা'ন্-আপনাকে এইটে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

নরেন তিক্তস্বরে কহিল, "কেন?" কেন, তাহা কালিপদ জানিত না। কিন্তু জিনিষটা যে ডাক্তার বাবুর, এবং ইহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া যত প্রকারের অপ্রিয় ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, সম্মুখে এবং দ্বারের অন্তরাল হইতে কিছুই তাহার অবিদিত ছিল না। সে বুদ্ধি খাটাইয়া হাসিমুখে বলিল, "আপনি ফিরে চেয়ে ছিলনে যে!" নরেন্দ্র মনে মনে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "না, চাইনি। দাম দেবার টাকা নেই আমার।" কালিপদ বুঝিল ইহা অভিমানের কথা। সে অনেক দিনের চাকর, টাকা-কড়ি সম্বন্ধে বিজয়ার মনের ভাব এবং আচরণের বহু দৃষ্টান্ত সে চোখে দেখিয়াছে। সে তাহার সেই জ্ঞানটুকু আরও একটু ফলাও করিয়া একটু হাসিয়া একটু তাচ্ছল্যের ভাবে বলিল, "ইঃ—ভারি ত দাম। মা-ঠানের কাছে দু' চারশ' টাকা না কি আবার টাকা! নিয়ে যান আপনি। যখন জোগাড় করতে পারবেন, দামটা পাঠিয়ে দেবেন—" অর্থ সম্বন্ধে তাহার প্রতি বিজয়ার এই অযাচিত বিশ্বাস নরেন্দ্রর ক্রোধটাকে একটু নরম করিয়া আনিলেও তাহার কণ্ঠস্বরের তিক্ততা দূর করিতে পারিল না। তাই, সে যখন দুইশতের পরিবর্ত্তে চারিশত দিবার অক্ষমতা জানাইয়া যন্ত্রটাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে কহিল, "না না, তুই ফিরিয়ে নিয়ে যা কালিপদ, আমার দরকার নেই। দু'শ টাকার বদলে চারশ টাকা আমি দিতে পারব না।" তখন, কালিপদ অনুনয়ের স্বরেই বলিয়া উঠিল, "না ডাক্তার বাবু, তা' হবে না—আপনি সঙ্গে নিয়ে যান,—আমি গাড়ীতে তুলে দিয়ে যাবো।" এই জিনিসটা সম্বন্ধে তাহার নিজের একটুখানি বিশেষ গরজ ছিল। বিলাসকে সে দুচক্ষে দেখিতে পারিত না বলিয়া তাহার প্রতি অনেকটা আক্রোশ করিয়াই নরেন্দ্রর প্রতি তাহার একপ্রকার সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। সেইজন্য দরওয়ানকে দিয়া পাঠাইতে বিজয়া আদেশ করিলেও কালিপদ নিজে যাচিয়া এতটা পথ এই ভারি বাক্সটা বহিয়া আনিয়াছিল। নরেন্দ্র মনে-মনে ইতস্ততঃ করিতেছে কল্পনা করিয়া সে আরও একটু কাছে ঘেঁসিয়া, গলা খাটো করিয়া বলিল,—"আপনি নিয়ে যান ডাক্তার বাবু। মা'ঠান ভাল হয়ে চাই কি দামটা আপনাকে ছেড়ে দিতেও পারেন।" ইঙ্গিত শুনিয়া নরেন্দ্র অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। বটে! সে ডাকিয়াছে, অথচ তাহার বিলাস অপমান করিয়াছে,—এ তাহার যৎকিঞ্চিৎ কৃপার বক্‌সিশ্! কিন্তু প্লাটফরমের উপর আরও লোকজন ছিল, বলিয়াই সে-যাত্রা কালিপদর

একটা ঝাঁড়া কাটিয়া গেল। সে কোন মতে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া, বাহিরের পথটা হাত দিয়া নির্দ্দেশ করিয়া শুধু বলিল—"যাও আমার সুমুখ থেকে।" বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া আর একদিকে চলিয়া গেল। কালিপদ হতবুদ্ধি বিহ্বলের ন্যায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা যে কি হইল, তাহার মাথায় ঢুকিল না। মিনিট পোনর পরে গাড়ী আসিলে নরেন্দ্র যখন উঠিয়া বসিল, তখন কালিপদ আস্তে-আস্তে সেই ফার্ষ্টক্লাস কামরার জানালার কাছে আসিয়া ডাকিল, "ডাক্তার বাবু?" নরেন্দ্র অন্য দিকে চাহিয়া ছিল, মুখ ফিরাইতেই কালিপদর মলিন মুখের উপর চোখ পড়িল। চাকরটার প্রতি নিরর্থক রূঢ় ব্যবহার করিয়া সে মনে-মনে একটু অনুতপ্ত হইয়াছিল; তাই একটু হাসিয়া সদয় কণ্ঠে কহিল, "আবার কিরে কালিপদ?" কালিপদ এক টুক্‌রা কাগজ এবং পেন্সিল বাহির করিয়া বলিল, "আপনার ঠিকানাটা একটুখানি যদি—" "আমার ঠিকানা নিয়ে কি কোরবি রে?" "আমি কিছু কোরব না—মা'-ঠান বলে দিলেন—" মা'-ঠানের নামে এবার নরেন্দ্রের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। সে প্রচণ্ড একটা ধমক্ দিয়া বলিয়া উঠিল—"বেরো সাম্‌নে থেকে বল্‌চি—পাজি নচ্ছার কোথাকার।" কালিপদ চমকিয়া দু'পা হটিয়া গেল; এবং পরক্ষণেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সে ফিরিয়া আসিয়া যখন উপরের ঘরে প্রবেশ করিল, তখন বিজয়া খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া হেলান দিয়া বসিয়া ছিল। পদ-শব্দে চোখ মেলিতেই কালিপদ কহিল, "ফিরিয়ে দিলেন,—নিলেন না।" বিজয়ার দৃষ্টিতে বেদনা বা বিস্ময় কিছুই প্রকাশ পাইল না! কালিপদ হাতের কাগজ ও পেন্সিলটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিতে-দিতে বলিল, "বাবা, কি রাগ! ঠিকানা জিজ্ঞেসা করায় যেন তেড়ে মারতে এলেন।" ইহার উত্তরেও বিজয়া কথা কহিল না।

সমস্ত পথটা কালিপদ আপনা-আপনি মহলা দিতে-দিতে আসিতেছিল মনিবের আগ্রহের জবাবে সে কি-কি বলিবে। কিন্তু সে-পক্ষে লেশমাত্র উৎসাহ না পাইয়া সে চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল বিজয়ার দৃষ্টি তেম্‌নি নির্ব্বিকার, তেম্‌নি শূন্য। হঠাৎ তাহার মনে হইল যেন সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াই বিজয়া এই একটা মিথ্যা কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাই সে অপ্রতিভ ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে আস্তে-আস্তে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই বিজয়ার রোগ সারিয়া গেল বটে, কিন্তু শরীর সারিতে দেরি হইতে লাগিল। বিলাস ভাল ডাক্তার দিয়া বলকারক ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত করিতে ত্রুটি করিল না, কিন্তু দুর্ব্বলতা যেন প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এদিকে ফাল্গুন শেষ হইতে চলিল, মধ্যে শুধু চৈত্র মাসটা বাকি; বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই ছেলের বিবাহ দিবেন, রাসবিহারীর ইহাই সঙ্কল্প। এদিকে পাত্র যত দিনদিন পরিপুষ্ট ও কান্তিমান হইয়া উঠিতে লাগিলেন, কন্যা তেম্‌নি শীর্ণ ও মলিন হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাসবিহারী প্রত্যহ একবার করিয়া আসিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অথচ, চেষ্টার কোন দিকে কিছুমাত্র কম্‌তি হইতেছে না,—কিন্তু এ কি! সেই মাইক্রস্কোপ ঘটিত ব্যাপারটা বাহিরে হইতে কেমন করিয়া না জানি একটু অতিরঞ্জিত হইয়াই পিতা-পুত্রের কানে গিয়াছিল। শুনিয়া ছোটতরফ যতই লাফাইতে লাগিল, বড়তরফ ততই তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ছেলেকে তিনি বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এই সকল ছোট-খাটো বিষয় লইয়া দাপাদাপি করিয়া বেড়ানো শুধু যে নিষ্প্রয়োজন, তাই নয়, তাহার অসুস্থ দেহের উপর হাঙ্গামা করিতে গেলে হিতে-বিপরীত ঘটাও অসম্ভব নয়। বিলাস পৃথিবীর আর যত লোককেই তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করুক, পিতার পাকা-বুদ্ধিকে সে মনে-মনে খাতির করিত। কারণ ঐহিক ব্যাপারে সে বুদ্ধির উৎকর্ষতার এত অপর্য্যাপ্ত নজির রহিয়া গেছে, যে তাহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করা একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং এই রুইয়া বুকের মধ্যে তাহার যত বিষই গাঁজাইয়া উঠিতে থাকুক, প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু আর সহিল না। সেদিন হঠাৎ অতি তুচ্ছ কারণে সে কালিপদকে লইয়া পড়িল। এবং

প্রথমটা এই মারি-ত-এই-মারি করিয়া, অবশেষে তাহার মাহিনা চুকাইয়া দিতে গমস্তার প্রতি হুকুম করিয়া তাহাকে ডিস্‌মিস্ করিল।

চিকিৎসক বিজয়ার সকালে বিকালে যৎকিঞ্চিৎ ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেদিন সকালে সে নদীর তীরে একটু ঘুরিয়া-ফিরিয়া বাটী ফিরিতেই কালিপদ অশ্রুবিকৃত স্বরে বলিল, "মা, ছোটবাবু আমাকে জবাব দিলেন।" বিজয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" কালিপদ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "কর্ত্তাবাবুর কাছে কখনো গাল-মন্দ খাইনি মা, কিন্তু আজ—" বলিয়া সে ঘন-ঘন চোখ মুছিতে লাগিল; তারপরে কান্না শেষ করিয়া যাহা কহিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, যদিচ সে কোন অপরাধ করে নাই, তথাপি ছোটবাবু তাহাকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। ডাক্তার বাবুর কাছে সেই বাক্সটা দিতে যাওয়ার কথা কেন আমি তাহাকে নিজে জানাই নাই, কেন আমি তাঁহাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছিলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিজয়া চৌকির উপর অত্যন্ত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল,—বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও কহিল না;—পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায়?" কালিপদ বলিল, "কাছারি-ঘরে বোসে কাগজ দেখ্‌চেন।" বিজয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আচ্ছা দরকার নেই,—এখন তুই কাজ করগে যা।" বলিয়া নিজেও চলিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে জানালা দিয়া দেখিতে পাইল বিলাস কাছারি-ঘর হইতে বাহির হইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। কেন যে আজ আর সে তত্ত্ব লইতে বাড়ী ঢুকিল না, তাহা সে বুঝিল।

দয়াল আরাম হইয়া আবার নিয়মিত কাজে আসিতেছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘরে ফিরিবার সময় এক-একদিন বিজয়া তাঁহার সঙ্গ লইত, এবং কথা কহিতে-কহিতে কতকটা পথ আগাইয়া দিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিত।

নরেনের প্রতি দয়ালের অন্তঃকরণ সম্ভ্রমে, কৃতজ্ঞতায় একেবারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পীড়ার কথা উঠিলে বৃদ্ধ এই নবীন চিকিৎসকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সহস্র-মুখ হইয়া উঠিতেন। বিজয়া চুপ করিয়া শুনিত, কিন্তু কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিত না বলিয়াই দয়াল মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না যে, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ইঁহাকে ডাকাইয়াই একবার বিজয়ার অসুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয়। ভিতরের রহস্য তখনো তাঁহার সম্পূর্ণ অগোচর ছিল বলিয়াই বিজয়ার নীরব উপেক্ষায় তিনি মনে-মনে পীড়া অনুভব করিয়া সহস্র প্রকার ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করিতে চাহিতেন, হোক্ সে ছেলেমানুষ; কিন্তু যে সব নামজাদা, বিজ্ঞ চিকিৎসকের দল তোমার মিথ্যা চিকিৎসা করিয়া টাকা নষ্ট করিতেছে, তাহাদের চেয়ে সে ঢের বেশি বিজ্ঞ, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

কিন্তু এই গোপন-রহস্যের আভাস পাইতে তাঁহার বেশি দিন লাগিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরেই একদিন সহসা তিনি বিজয়ার ঘরে আসিয়া বলিলেন, "কালিপদকে আর ত আমি বাড়ীতে রাখ্‌তে পারিনে মা।" বিজয়ার এ আশঙ্কা ছিলই; তথাপি সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" দয়াল কহিলেন, "তুমি যাকে বাড়ীতে রাখতে পারলে না, আমি তাকে রাখ্‌ব কোন্ সাহসে বল দেখি মা?" বিজয়া মনে-মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "কিন্তু সেটাও ত আমারি বাড়ী।" দয়াল লজ্জা পাইয়া বলিলেন, "তা'ত বটেই। আমরা সকলেই ত তোমার আশ্রিত মা। কিন্তু—" বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কি আপনাকে রাখ্‌তে নিষেধ করে-ছেন?" দয়াল চুপ করিয়া রহিলেন। বিজয়া বুঝিতে পারিয়া কহিল, "তবে আমার কাছেই কালিপদকে পাঠিয়ে দেবেন। সে আমার বাবার চাকর, তাকে আমি বিদায় দিতে পারব না।"

দয়াল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, "কাজটা ভাল হবে না মা। তাঁর অবাধ্য হওয়াও তোমার কর্ত্তব্য নয়।" বিজয়া ভাবিয়া বলিল, "তা'হলে আমাকে কি করতে বলেন?" দয়াল কহিলেন, "তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কালিপদ নিজেই বাড়ী যেতে চাচ্ছে। আমি বলি, কিছুদিন সে তাই যাক্।"

বিজয়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলিল, "তবে তাই হোক্। কিন্তু যাবার আগে এখানে একবার তাকে পাঠিয়ে দেবেন।" দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চকিত

হইয়া বৃদ্ধ মুখ তুলিতেই এই তরুণীর মলিন মুখের উপর একটা নিবিড় ঘৃণার ছবি দেখিতে পাইয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিতে সেদিন তাঁহার আর সাহস হইল না।

ইহার পরে চার পাঁচ দিন দয়ালকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। বিজয়া কাছারি-ঘরে সংবাদ লইয়া জানিল, তিনি কাজেও আসেন নাই; শুনিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে ভাবিতেছে, লোক পাঠাইয়া সম্বাদ লওয়া প্রয়োজন কি না, এম্নি সময়ে দ্বারের বাহিরে তাঁহারই কাশির শব্দে বিজয়া সানন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে ঘরে আনিয়া বসাইল।

দয়ালের স্ত্রী চিররুগ্না। হঠাৎ তাঁহারই অসুখের বাড়াবাড়িতে কয়দিন তিনি বাহির হইতে পারেন নাই। নিজেকেই পাক করিতে হইতেছিল। অথচ, তাঁহার নিরুদ্বেগ মুখের চেহারায় বিজয়া বুঝিতে পারিল, বিশেষ ভয় নাই। তথাপি প্রশ্ন করিল, "এখন কেমন আছেন?" দয়াল বলিলেন, "আজ ভাল আছেন। নরেন বাবুকে চিঠি লিখ্‌তে কাল বিকালে এসে তিনি ওষুধ দিয়ে গেছেন। কি অদ্ভুত চিকিৎসা, মা, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পীড়া যেন বারো-আনা আরোগ্য হয়ে গেছে।" বিজয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "ভাল হবে না? আপনাদের সকলের কি সোজা বিশ্বাস তাঁর উপরে?" দয়াল বলিলেন, "সে কথা সত্যি। কিন্তু বিশ্বাস ত শুধু-শুধু হয় না মা? আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি কি না। মনে হয়, ঘরে পা দিলেই যেন সমস্ত ভাল হয়ে যাবে।" "তা' হবে," বলিয়া বিজয়া আবার একটুখানি হাসিল। এবার দয়াল নিজেও একটু হাসিয়া কহিলেন, "শুধু তাঁরই চিকিৎসা করে যান নি, মা, আরও একজনের ব্যবস্থা করে গেছেন।" বলিয়া তিনি টেবিলের উপর এক-টুকরা কাগজ মেলিয়া ধরিলেন।

একখানা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সান্। উপরে বিজয়ার নাম লেখা। লেখাটুকুর উপর চোখ পড়িবামাত্রই ওই কয়টা অক্ষর যেন আনন্দের বান হইয়া বিজয়ার বুকে আসিয়া বিঁধিল। পলকের জন্য তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়াই একেবারে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। বৃদ্ধ নিজের কৃতিত্বের পুলকে এম্নি বিভোর হইয়াছিলেন যে, সে দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। বলিলেন, "তোমাকে কিন্তু উপেক্ষা করতে দেব না মা। ওষুধটা একবার পরীক্ষা করে দেখ্‌তেই হবে, তা' বলে দিচ্চি।"

বিজয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "কিন্তু এ যে অন্ধকারে ঢিল ফেলা—"

বৃদ্ধ গর্ব্বে প্রদীপ্ত হইয়া বলিলেন, "ইস্! তাই বুঝি! এ কি তোমার নেটিভ্ ডাক্তার পেয়েছ, মা, যে দক্ষিণা দিলেই ব্যবস্থা লিখে দেবে? এ যে বিলাতের বড় পাশ-করা ডাক্তার। নিজের চোখে না দেখে যে এঁরা কিছুই করেন না! এঁদের দায়িত্ব-বোধ কি সোজা মা?"

অকৃত্রিম বিস্ময়ে বিজয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিল। কহিল, "নিজের চোখে দেখে কি রকম? কে বল্‌লে আমাকে তিনি দেখে গেছেন? এ শুধু আপনার মুখের কথা শুনেই ওষুধ লিখে দিয়েছেন।" দয়াল বার-বার করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "না না, না। তা' কখনই নয়। কাল যখন তুমি তোমাদের বাগানের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলে, তখন ঠিক তোমার সুমুখের পথ দিয়েই যে তিনি হেঁটে গেছেন। তোমাকে তিনি ভাল করেই দেখে গেছেন;—বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলে বলে—" বিজয়া হঠাৎ চমকিয়া কহিল, "তাঁর কি সাহেবি পোষাক ছিল? মাথায় হ্যাট ছিল?"

দয়াল কৌতুকের প্রাবল্যে হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "কে বল্‌বে যে খাঁটি সাহেব নয়? কে বল্‌বে আমাদের স্বজাতি বাঙালী। আমি নিজেই যে হঠাৎ চম্‌কে গিয়েছিলুম, মা।"

সুমুখ দিয়া গিয়াছে, ঠিক চোখের উপর দিয়া গিয়াছে, তাহাকে দেখিতে-দেখিতে গিয়াছে—অথচ, সে একটি বারের বেশি দৃষ্টিপাত করে নাই। পুলিশের কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী হইবে ভাবিয়া বরঞ্চ সে অবজ্ঞায় চোক নামাইয়া লইয়াছিল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে কি ঝড় বহিয়া গেল, বৃদ্ধ তাহার কোন সম্বাদই রাখিলেন না। তিনি নিজের মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"মাঝে শুধু চৈত্র মাসটা বাকি। বৈশাখের প্রথম, না হয় বড় জোর দ্বিতীয় সপ্তাহেই বিবাহ। মায়ের যে শরীর সারে না ডাক্তারবাবু, একটা

কিছু ওষুধ দিন, যাতে—" তাঁহার মুখের কথাটা ঐখানেই অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

এভাবে অকস্মাৎ থামিয়া যাইতে দেখিয়া বিজয়া মুখ তুলিয়া তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিতেই দেখিল বিলাস ঘরে ঢুকিতেছে। একটা আলোচনা চলিতেছিল, তাহার আগমনে বন্ধ হইয়া গেল,—ইহা প্রবেশমাত্রই অনুভব করিয়া বিলাসের চোখ-মুখ ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। কিন্তু আপনাকে যথাসাধ্য সম্বরণ করিয়া সে নিকটে আসিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। ঠিক সম্মুখেই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনটা পড়িয়া ছিল, দৃষ্টি পড়ায় হাত দিয়া সেখানা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া আগা-গোড়া তিন-চার-বার করিয়া পড়িয়া যথাস্থলে রাখিয়া দিয়া কহিল, "নরেন ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপসন্‌ দেখ্‌চি। এলো কি কোরে, ডাকে না কি?" কেহই সে কথার উত্তর দিল না। বিজয়া ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

বিলাস হিংসায় পোড়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, "ডাক্তার ত নরেন ডাক্তার! তাই বুঝি এঁদের ওষুধ খাওয়া হয় না, শিশির ওষুধ শিশিতেই পচে; তার পরে ফেলে দেওয়া হয়? তা নয় হোলো, কিন্তু এই কলির ধন্বন্তরিটি কাগজখানি পাঠালেন কি কোরে শুনি? ডাকে না কি?"

এ প্রশ্নেরও কেহ জবাব দিল না। সে তখন দয়ালের প্রতি চাহিয়া কহিল, "আপনি ত এতক্ষণ খুব লেক্‌চার দিচ্ছিলেন—সিঁড়ি থেকেই শোনা যাচ্ছিল—বলি আপনি কিছু জানেন?"

এই জমিদারী সেরেস্তায় বিলাসবিহারীর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করা অবধি দয়াল মনে-মনে তাহাকে বাঘের মত ভয় করিতেন। কালিপদর মুখে শুনিতেও কিছু বাকি ছিল না। সুতরাং প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনখানা হাতে করা পর্য্যন্তই তাঁহার বুকের ভিতরটা বাঁশপাতার মত কাঁপিতেছিল। এখন প্রশ্ন শুনিয়া মুখের মধ্যে জিভটা এম্‌নি আড়ষ্ট হইয়া গেল যে, কথা বাহির হইল না।

বিলাস এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া ধমক দিয়া কহিল, "একেবারে যে ভিজে বেরালটি হয়ে গেলেন? বলি, জানেন কিছু?"

চাকরীর ভয় যে ভারাক্রান্ত দরিদ্রকে কিরূপ বিচলিত করিয়া তুলে, তাহা দেখিলে ক্লেশ বোধ হয়। দয়াল চম্‌কাইয়া উঠিয়া অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। আমিই এনেচি।" "ওঃ—তাই বটে! কোথায় পেলেন সেটাকে?" দয়াল তখন জড়াইয়া-জড়াইয়া কোন মতে ব্যাপারটা বিবৃত করিলেন।

বিলাস স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, "গেল বছরের হিসাবটা আপনাকে সারতে বলেছিলাম, সেটা সারা হয়েচে?" দয়াল বিবর্ণ মুখে কহিলেন, "আজ্ঞে, দু'দিনের মধ্যেই সেরে ফেল্‌ব।"

"হয়নি কেন?"

"বাড়ীতে ভারি বিপদ যাচ্ছিল,—রাঁধ্‌তে হোতো—আস্‌তেই পারিনি।"

প্রত্যুত্তরে বিলাস কুৎসিৎ কটু-কণ্ঠে দয়ালের জড়িমার নকল করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "আস্‌তেই পারিনি! তবে আর কি, আমাকে রাজা করেছেন!" বলিয়া তীব্র স্বরে কহিল, "আমি তখনই বলেছিলাম বাবাকে, এ সব বুড়ে-হাবড়া নিয়ে আমার কাজ চল্‌বে না। আমি—"

এতক্ষণ পরে বিজয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তাহার মুখের ভাব প্রশান্ত, গম্ভীর; কিন্তু দুই চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। অনুচ্চ, কঠিন কণ্ঠে কহিল, "দয়ালবাবুকে এখানে কে এনেচে জানেন? আপনার বাবা ন'ন—আমি।"

বিলাস থমকিয়া গেল; তাহার এরূপ কণ্ঠস্বরও সে আর কখনো শুনে নাই, এরূপ চোখের চাহনিও আর কখনো দেখে নাই। কিন্তু নত হইবার পাত্রও সে নয়। তাই পলক-মাত্র স্থির থাকিয়া জবাব দিল, "যেই আনুক আমার জানবার দরকার নেই। আমি কাজ চাই, কাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ।"

বিজয়া কহিল, "যাঁর বাড়ীতে বিপদ, তিনি কি কোরে কাজ করতে আস্‌বেন?" বিলাস উদ্ধত ভাবে বলিল, "অমন সবাই বিপদের দোহাই পাড়ে। কিন্তু সে শুন্‌তে গেলে ত আমার চলে না! আমি দরকারী কাজ সেরে রাখ্‌তে হুকুম দিয়েছিলাম, হয় নি কেন সেই কৈফিয়ৎ চাই। বিপদের খবর জান্‌তে চাইনে।"

বিজয়ার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। কহিল, "সবাই মিথ্যাবাদী নয়,—সবাই মিথ্যা বিপদের দোহাই দেয় না; অন্ততঃ মন্দিরের আচার্য্য দেয় না। সে যাক্, কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আমি, যখন জানেন দরকারী কাজ হওয়া চাই-ই, তখন নিজে কেন সেরে রাখেন নি? আপনি কেন চার দিন কাজ কামাই করলেন? কি বিপদ হয়েছিল আপনার শুনি?"

বিলাস বিস্ময়ে হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া কহিল, "আমি নিজে খাতা সেরে রাখবো! আমি কামাই করলাম কেন!"

বিজয়া কহিল, "হাঁ তাই। মাসে-মাসে দু'শ টাকা মাইনে আপনি নেন। সে টাকা ত আমি শুধু-শুধু আপনাকে দিইনে, কাজ করবার জন্যেই দিই।"

বিলাস কলের পুতুলের মত কেবল কহিল,—"আমি চাকর? আমি তোমার আমলা?" অসহ্য ক্রোধে বিজয়ার প্রায় হিতাহিত জ্ঞান লোপ হইয়াছিল; সে তীব্রতর কণ্ঠে উত্তর দিল, "কাজ করবার জন্যে যাকে মাইনে দিতে হয়, তাকে ও-ছাড়া আর কি বলে? আপনার অসংখ্য উৎপাত আমি নিঃশব্দে সয়ে এসেছি; কিন্তু যত সহ্য করেচি, অন্যায় উপদ্রব ততই বেড়ে গেছে। যান্, নিচে যান। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ছাড়া আজ থেকে আপনার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ থাকবে না। যে নিয়মে আমার অপর কর্ম্মচারীরা কাজ করে, ঠিক সেই নিয়মে কাজ করতে পারেন, করবেন, নইলে আপনাকে আমি জবাব দিলুম, আমার কাছারীতে আর ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।"

বিলাস লাফাইয়া উঠিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী কম্পিত করিতে-করিতে চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমার এত সাহস!"

বিজয়া কহিল, "দুঃসাহস আমার নয়, আপনার। আমার ষ্টেটেই চাকরি করবেন, আর আমারই উপর অত্যাচার করবেন! আমাকে 'তুমি' বল্‌বার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে? আমার চাকরকে আমারি বাড়ীতে জবাব দেবার, আমার অতিথিকে আমারই চোখের সাম্‌নে অপমান করবার এ সকল স্পর্দ্ধা কোথা থেকে আপনার জন্মালো?"

বিলাস ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া চীৎকারে ঘর ফাটাইয়া বলিল, "অতিথির বাপের পুণ্য যে, সে দিন তার গায়ে হাত দিই নি—তার একটা হাত ভেঙে দিই নি। নচ্ছার, বদমাইস, জোচ্চোর, লোফার কোথাকার। আর কখনো যদি তার দেখা পাই—"

চীৎকার শব্দে ভীত হইয়া গোপাল কানাই সিংকে ডাকিয়া আনিয়াছিল; দ্বারপ্রান্তে তাহার চেহারা দেখিতে পাইয়া বিজয়া লজ্জিত হইয়া কণ্ঠস্বর সংযত এবং স্বাভাবিক করিয়া কহিল, "আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি সেটা আপনারই কত বড় সৌভাগ্য যে, তাঁর গায়ে হাত দেবার অতি-সাহস আপনার হয় নি। তিনি উচ্চশিক্ষিত বড় ডাক্তার। সে দিন তাঁর গায়ে হাত দিলেও হয় ত তিনি একজন পীড়িত স্ত্রীলোকের ঘরের মধ্যে বিবাদ না করে সহ্য করেই চলে যেতেন; কিন্তু এই উপদেশটা আমার ভুলেও অবহেলা করবেন না যে, ভবিষ্যতে তাঁর গায়ে হাত দেবার সখ যদি আপনার থাকে, ত হয় পিছন থেকে দেবেন, না হয়, আপনার মত আরও ৫।৭ জনকে সঙ্গে নিয়ে তবে সুমুখে থেকে দেবেন। কিন্তু বিস্তর চেঁচা-মেচি হয়ে গেছে, আর না। নিচে থেকে চাকর-বাকর, দরওয়ান, পর্য্যন্ত ভয় পেয়ে ওপরে উঠে এসেচে। যান্, নিচে যান্।" বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া পাশের দরজা দিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল।

সাহিত্য সংবাদ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত উপন্যাস "অনুপমা" যন্ত্রস্থ; ১০ই বৈশাখ প্রকাশিত হইবে। মূল্য দুই টাকা। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত—"হারাধন বাবু" শীর্ষক সমাজ-চিত্রটি এই পুস্তকেই প্রকাশিত হইবে। যতীন্দ্র বাবুর "তোড়া" প্রকাশিত হইয়াছে! মূল্য আট আনা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছয় মাস ধরিয়া ছদ্মবেশের আলোচনা করিয়া, 'ভারতবর্ষে'র ষষ্ঠ বর্ষে 'কাব্যে সখীর কার্য্য' সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন; অর্থাৎ তিনি বিদেশিনী বেশ, রাই রাখাল বেশ প্রভৃতি ছাড়িয়া সখীসংবাদ ধরিবেন।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'গোপালের মা' নামক সুদীর্ঘ উপন্যাস বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে; মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত 'ফুলের তোড়া' আট আনা সংস্করণ-ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষালের প্রণীত 'বৈরাগ্যের পথে' প্রকাশিত হইয়াছে; পাথেয় মাত্র ৷৷০।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'জমিদারী মহাজনী হিসাব বিজ্ঞান' প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৷০।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত 'ঋতুবর্ণন' বাহির হইয়াছে; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'পদ্মিনী'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল—১৷৷০।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'গৃহশ্রী' তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল; রাজসংস্করণ ২৲।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রকাশিত 'ঋগ্বেদ সংহিতা' বাহির হইল; মূল্য ২৷৷০।

শ্রীযুক্ত রসময় লাহা প্রণীত 'ঋতুলীলা' প্রকাশিত হইল; মূল্য ৷৵০।

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস প্রণীত 'ভারতবর্ষের ভাগ্য পরিবর্ত্তন' ১৲ টাকা মূল্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত 'গৃহ-বিচ্ছেদ' বাহির হইল। মাত্র ২৲ টাকায় 'গৃহ বিচ্ছেদ' নির্ব্বাপিত হইবে।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 'শমন সহচরী' বাহির হইয়াছে; মূল্য ৷৵০।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত 'সরল হোমিওপ্যাথিক জ্বর চিকিৎসা' বাহির হইল; মূল্য ১৵০।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'উমা'র ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল; ১৵০

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত—'নারীপিলি' দ্বিতীয় সংস্করণে রঙ্গিন চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল; মূল্য ১৷০।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

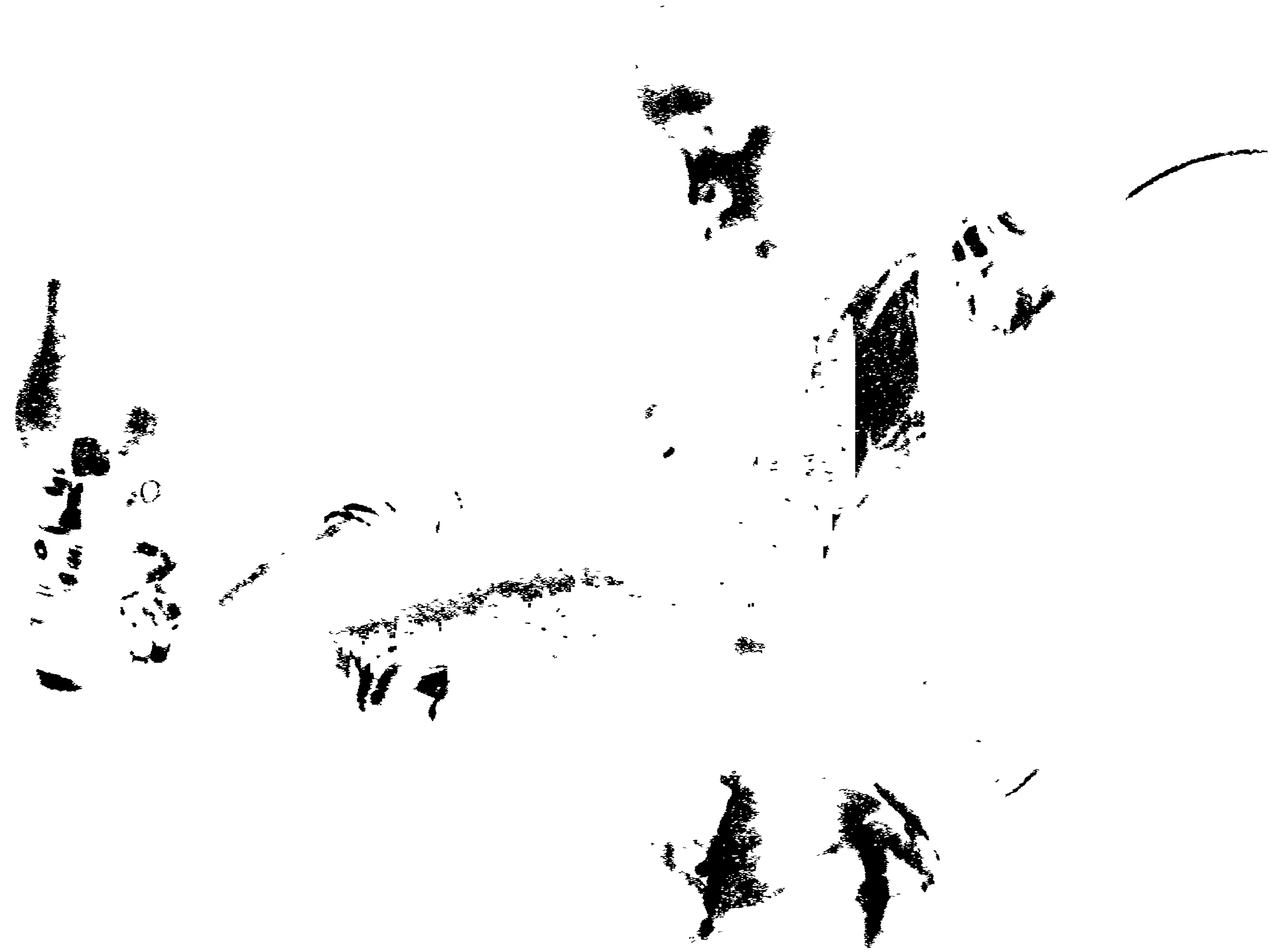

অধ্যয়ন-নিরত

Photo by Messrs P. C. Sen & Co.

Emerald Printing Works
CALCUTTA

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

দ্বিতীয় খণ্ড] পঞ্চম বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

প্রাচীন যুগের জ্যোতিষ্ শাস্ত্র *

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস গুপ্ত বি-এ]

গ্রীক দার্শনিক সেনেকা বলেন, "মানব এই অনন্ত তারকাখচিত নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভ্রাম্যমান গ্রহ-উপগ্রহদিগের গতি ও পর্য্যটন নিরীক্ষণ করিলে, নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারে না ; এবং সেই অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কুশল বিশ্ব-রচয়িতার উদ্দেশে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিয়া থাকে।" তাই মানব-সভ্যতার সর্ব্বপ্রথম বিকাশের সময়ে যখন জ্ঞান-রবির ঊষার ছটা সবেমাত্র দেখা দিতেছিল, তখন হইতেই এই অতি-প্রাচীন বিজ্ঞানের প্রতি মানবের দৃষ্টি পড়ে। সেই অতি পুরাকালীন যুগেও সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের মহিমময় বর্ণ-বৈচিত্র্য ও রজনীর স্বপ্নমাখা শোভাসমৃদ্ধি নিরপেক্ষ দর্শকের মনেও বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল। সেই জন্যই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট প্রথমেই এই মিনতিপূর্ণ প্রশ্ন আসিল—

ভগবন্ কিং প্রকারা ভূঃ কিমাকারা কিমাশ্রয়া।
কিং বিভাগা কথং চাত্র সপ্তপাতাল ভূময়ঃ ॥
অহোরাত্রব্যবস্থাঞ্চ বিদধাতি কথং রবিঃ।
কথং পর্য্যেতি বসুধাং ভুবনানি বিভাবয়ন্ ॥

হে সর্ব্বশক্তিমান্, এই পৃথিবীর পরিমাণ কত? ইহার আকার কিংবিধ? ইহাকে কে ধারণ করিতেছে? ইহার কি-কি বিভাগ আছে? ইহার মধ্যে সপ্তপাতাল ভূমিই বা কোথায়? সূর্য্য হইতে অহোরাত্র কি প্রকারে হয়? বিভিন্ন ভুবন প্রকাশ করিয়া তিনি কিরূপেই বা পরিক্রমণ করিতেছেন?

ঋগ্‌বেদের সূর্য্য ও ঊষার স্তুতি এবং গ্রহ-উপগ্রহগণের বন্দনাসমূহ সম্ভবতঃ এই অসীম নভোমণ্ডলের পরম বৈচিত্র্য ভাষায় প্রকাশ করিবার সেই প্রাচীনতম মানবজাতির অস্ফুট চেষ্টামাত্র। যদিও সেই মহাবৈচিত্র্যের যবনিকা

* প্রেসিডেন্সী কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্য সভার সাধারণ অধিবেশনে অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত। এবং সাহিত্য সমিতির সাধারণ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত।

এই সামঞ্জস্যই প্রাচীনতম মানবকে আকাশে গ্রহগণের গতি নিরীক্ষণ করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, - যেন কোনও ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণেই মানব নভোমণ্ডলে সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের দৈনিক গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে নিযুক্ত হয়; এবং পার্থিব জড়বস্তুগণের সাহায্যে পৃথিবী ও ব্যোমের দৈনিক পরিদৃশ্যমান সন্ধিস্থল এবং গ্রহগণের পর্য্যটনকালে আবির্ভাব ও তিরোধানের স্থানসমূহ নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হয়। যেমন একদিকে এক অখণ্ড নিয়মে পরিচালিত এই নৈসর্গিক ব্যাপারসমূহ একটা চমকপ্রদ সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মানবের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, সেইরূপ অপর দিকে উহা মানবের দৈনিক জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার সহিত এমন সূক্ষ্মভাবে জড়িত ছিল যে, ঐ নৈসর্গিক তত্ত্বসমূহ ঠিকমত নির্দ্দেশ করিবার জন্য কোনরূপ মান-যন্ত্র আবিষ্কার করা সেই প্রাচীনতম যুগেও জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে বেলি সাহেব তদ্‌রচিত "হিন্দু জ্যোতিষ" শীর্ষক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্রহগণের গতি পর্য্যবেক্ষণ করা হইত। এমন কি, কেহ কেহ বলেন, বেদের যাগযজ্ঞও জ্যোতিষ-গণনার ফল প্রসূত। অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন কি, বৈদিক যুগেও ভারতবাসীরা জ্যোতিষশাস্ত্রের বহুল উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন; কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদিক যাগযজ্ঞ নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য্যের পারস্পরিক অবস্থিতির দ্বারা নিয়মিত, এবং সেই ধর্ম্মোদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পর্য্যবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

সেই অতি প্রাচীন যুগে বিশেষ কোনরূপ মান-যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ নির্দ্ধারণ করাই জ্যোতিষশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুগণ চান্দ্র ও সৌর গ্রহণ নির্দ্দেশ করিবার সামর্থ্যলাভ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত তথ্য এখনও আমরা অবগত হইতে পারি নাই; সেই পুরাকালেও তাঁহারা গ্রহণসমূহের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির যথাযথ এবং যদিও সাধারণ জনগণের ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাস চন্দ্রগ্রহণ ও সৌর গ্রহণের বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের উপর একটা ভীতিমূলক কুসংস্কার জাল আরোপিত করিয়া রাখিয়াছিল, তথাপি, হিন্দু জ্যোতিষিগণ উহাদের যথাযথ কারণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ এরূপ সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। এই স্থলেই সৌরগ্রহণের একটি বিশিষ্টতার উল্লেখ করিতে গিয়া "সিদ্ধান্ত-শিরোমণি"কার বলিয়াছেন, সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েরই বৃত্তাকার অবয়ব; কিন্তু সূর্য্যের আকার চন্দ্রের আকার অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; সুতরাং যখন সূর্য্য চন্দ্রের অন্তরালে আইসে, তখন অতিদূরবর্ত্তী পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত দর্শকের নিকটে সূর্য্যগ্রহণ হইলেও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের দর্শকগণ গ্রহণের কোনও উদ্দেশ পাইতে পারেন না; কারণ, ঐ স্থানবর্ত্তী দর্শকের দৃষ্টিরেখা সূর্য্য ও চন্দ্রের কেন্দ্রভেদ করিয়া যায় না; এই জন্যই সূর্য্যগ্রহণে অক্ষাংশ ও ভুজাংশের লম্বন-গণনা (Correction of parallax in latitude and longitude) আবশ্যক হইয়া পড়ে।

এই চান্দ্র ও সৌর-গ্রহণের তথ্যসমূহ হিন্দুর চক্ষে এত পবিত্র বলিয়া মনে হইত যে, উহাদিগের প্রচার সম্বন্ধে "সূর্য্য-সিদ্ধান্তে" একটা বিশেষ আদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এমন কি, চীনদেশেও ঠিক এইরূপ ভীতিব্যঞ্জক পবিত্রতার সহিত গ্রহণসমূহ লক্ষিত হইত; তাই আমরা দেখিতে পাই, খৃষ্টপূর্ব্ব ২১৫৯ অব্দে রাজকীয় জ্যোতিষিদ্বয় হি ও হো একটি গ্রহণের পূর্ব্বসংবাদদানে অসমর্থ হওয়ায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কারণ, তৎকালীন লোকসাধারণের নিকট একটি সৌর বা চান্দ্রগ্রহণ তদ্দেশের শুভ বা অশুভ বার্ত্তা সূচিত করিয়া দিয়া যাইত। ইহা তেমন আশ্চর্য্যের কথা নয়। কারণ, নভোমণ্ডলের যে আলোকোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য মানবের হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও ভক্তিপ্রবণতার উদ্রেক করিয়া দিয়া যাইত, তাহা একটা গ্রহণের দ্বারা ক্ষণকালের জন্যও লুপ্ত হইলে, মানবের মনে একটা খণ্ড-প্রলয় বা জলপ্লাবনের আশঙ্কা হইতে পারিত; সুতরাং, গ্রহণসমূহ একটা অদ্ভুত ভীতিব্যঞ্জক চিত্তবিকারের সহিত

জড়িত ছিল। এই জন্য যাঁহারা এই প্রাকৃতিক তথ্যসমূহের বিশদ বৃত্তান্ত নির্দ্ধারণে সমর্থ ছিলেন, তাঁহারা সাধারণের নিকট অত্যধিক জ্ঞানী ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। এইরূপে জ্যোতিষশাস্ত্রের অতি শৈশবে ফলিত-জ্যোতিষ জ্যোতিষশাস্ত্রের গণিত-বিভাগের সহিত একত্র মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছিল। এই হি ও হো'র প্রাণদণ্ড হইতে আমরা ইহাই অনুমান করিতে পারি যে, সেই সময়েও চীনদেশীয় জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্‌গণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে চান্দ্র ও সৌর-গ্রহণ গণনা করিবার নিয়মাবলী অবগত ছিলেন।

এই গ্রহণ-গণনা সম্বন্ধে বেবিলনবাসী জ্যোতিষিগণের কৃতিত্বও অল্প প্রশংসনীয় নহে। গ্রীক সভ্যতা যখন ভবিষ্যতের অতল গর্ভে নিহিত ছিল, তখনই বেবিলনবাসী চেলডীয়ান ঋষিগণ চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণের পুনরাবর্ত্তনের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাকে তাঁহারা সেরস্ (saros) বা পুনরাবর্ত্তন বলিতেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, দুই শত তেইশ চান্দ্র-মাসে অথবা আঠার বৎসর এগার দিনে চন্দ্রের কেতুদ্বয় পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণরূপে আবর্ত্তন শেষ করে। এই দুই শত তেইশ চান্দ্র-মাসকে তাঁহারা একটা কল্প বলিতেন, এবং ভূয়োদর্শনের ফলে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এইরূপ একটি কল্পে যেরূপ ভাবে গ্রহণ হইয়া থাকে, পরবর্ত্তী কল্পেও ঠিক একই পদ্ধতি অনুসারে একই প্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সেইরূপ ভাবে গ্রহণসমূহের পুনরাবির্ভাব হইতে থাকিবে। ইহা সম্যক্ রূপে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন সূর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র ও চন্দ্রকক্ষের নীচবিন্দু (node) একই সরল রেখায় অবস্থিত হয়, তখনই গ্রহণ হইবে। এই গ্রহণের বিশেষত্বটি চেলডীয়ানদিগের প্রতি কল্পে সমান ভাবে পরিলক্ষিত হয় বলিয়াই পুনরাবর্ত্তন নিয়মের উপযোগিতা। হইতে পারে চেলডীয়ান্ ঋষিগণ কোনও জ্যোতিষিক বেধালয়ে মান-যন্ত্রের সাহায্যে এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার করেন নাই,—সম্ভবতঃ তাঁহারা ভূয়োদর্শনের ফলে এই সাধারণ নিয়মটি লিপিবদ্ধ করেন; কিন্তু এই সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের বহুকালব্যাপী ভ্রমশূন্য গ্রহণ-গণনায় নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে নক্ষত্রপুঞ্জের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল, এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহণের গতি-নির্দ্ধারণের জন্য রাশিচক্রের দ্বাদশরাশির ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং এই পুনরাবর্ত্তন (saros) কল্পের নির্দ্ধারণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতির পক্ষে অল্প প্রয়োজনীয় ছিল না।

এই গ্রহণ গণনার আলোচনায় আমরা দেখিলাম যে, ইহাতে ক্রান্তিবৃত্ত (ecliptic) বা সূর্য্যকক্ষা ও রাশিচক্রের (zodiac) বিভাগের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। হিন্দুদিগের গণনা করিবার দুইটি ভিন্ন পদ্ধতি ছিল,—একটি চান্দ্র তিথির দ্বারা, অপরটি রাশির সাহায্যে। অবশ্য প্রথমটি দ্বিতীয়টির বহুপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়। কারণ, তারকাপুঞ্জের মধ্যে চন্দ্রের দৈনিক অবস্থান বা গতি আমরা প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে পারি; কিন্তু দৈনিক গতির দ্বারা নিয়মিত সূর্য্যের তারকাপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিতি পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে; যে হেতু সূর্য্যের নয়ন-ঝলসান আলোকে নিকটবর্ত্তী তারকাপুঞ্জও দৃষ্টিপথে আসিতে পারে না। অথচ বিবিধ বাহ্য শক্তিপুঞ্জের আকর্ষণে চন্দ্রের গতি সূর্য্যের গতির ন্যায় একটা শৃঙ্খলার অধীন নহে এবং আমাদিগের দৈনিক অভিজ্ঞতার সহিত সূর্য্যের গতি-নির্দ্ধারণ একেবারে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কারের জন্য রাশিচক্রের দ্বারা জ্যোতিষগণনা একান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়িল; এবং ক্রমে পূর্ব্বোক্ত তিথিবিভাগ প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে পরিগণিত হইল। এই যে তিথিবিভাগের দ্বারা জ্যোতিষ গণনার প্রচলন, ইহা বহু প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রথম তিথিবিভাগের অনুক্রমে কৃত্তিকা নক্ষত্র মহাবিষুববিন্দুর (vernal equinox) চিহ্ন স্বরূপ রহিয়াছে। তাহাতে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, অন্ততঃ ২৩০০ বৎসর খ্রীষ্টপূর্ব্বে এরূপ বিভাগ সম্ভব হইতে পারিত। তাঁহারা আরও সিদ্ধান্ত করেন যে, ক্রান্তিবৃত্তের এইরূপ বিভাগ জ্যোতিষিগণের প্রাচীনতম চেষ্টা। সুতরাং আমাদিগের মনে হয়, যখন হিন্দুগণ একটি বিভাগের আবিষ্কর্ত্তা, তখন সম্ভবতঃ ক্রমিক উন্নতির সাধারণ নিয়মানুসারে অপেক্ষাকৃত কার্য্যোপযোগী রাশিচক্রের বিভাগটিও হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গবেষণাপ্রসূত।

এই তিথিবিভাগ সম্বন্ধে এই স্থলে আর একটু আলোচনা করা আবশ্যক;—তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, চন্দ্রের দৈনিক গতির সহিত তিথিবিভাগের কিরূপ

সংযোগ আছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুরা ক্রান্তিবৃত্তের সন্ধান জানিতেন; তাঁহারা আরও জানিতেন যে, রাশিচক্রের সহিত চন্দ্রকক্ষার অবনতি (inclination of the moon's orbit to the ecliptic) অতি সামান্য,—এত সামান্য যে চন্দ্রের দৈনিক গতির নির্দ্ধারণকালে উহা গণনা না করিলেও চলিতে পারে। সুতরাং তাঁহারা চন্দ্রের দৈনিক গতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য ক্রান্তিবৃত্তকে প্রথমে ২৮শ ভাগে, পরে ২৭শ ভাগে বিভক্ত করেন; এবং প্রতি বিভাগ সূচিত করিবার নিমিত্ত এক-একটি তারকাপুঞ্জ স্থির করেন। তাঁহাদিগের শেষ বিভাগটিই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত; কারণ, ইহাতে এক-একটি বিভাগের পরিমাণ চন্দ্রের দৈনিক গতির প্রায় সমান, এবং একটি নাক্ষত্রিক আবর্ত্তনের সময় (mean sidereal revolution) অর্থাৎ চন্দ্রের গতি একটি তারকাপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রের সেই তারকাপুঞ্জে ফিরিয়া আসিতে ২৭ $\frac{1}{3}$ দিন যাপিত হয়, এবং ভগ্নাংশ বাদ দিলে ২৮ দিন না ধরিয়া ২৭ দিন ধরাই বিধেয়। এই ২৭টি চান্দ্রবিভাগ সূচিত করিবার জন্য হিন্দুরা ২৭টি তারকাপুঞ্জ স্থির করিয়াছিলেন। প্রতি পুঞ্জের উজ্জ্বলতম তারকাটিকে তাঁহারা যোগতারা বলিতেন এবং সমগ্র পুঞ্জটিকে নক্ষত্র বলিতেন। ঐ যোগতারা প্রতি বিভাগের আদিপ্রান্ত সূচিত করিত। এইরূপে প্রত্যেক বিভাগ বিভাগীয় নক্ষত্রের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিত, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট বিভাগ গুলির সাহায্যে চন্দ্রের দৈনিক গতি স্থিরীকৃত হইত। স্থানান্তরে প্রকাশিত চিত্রে যোগতারার সহিত ক্রান্তিবৃত্তের ২৭টি বিভাগ প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, তিথি-গণনায় ক্রান্তিবৃত্তের এই ২৭টি বিভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও, চন্দ্রের দৈনিক গতির একটা শৃঙ্খলা নাই বলিয়া, জ্যোতিষ-গণনা কালে উহার তত উপযোগিতা নাই। সুতরাং রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিতে বিভাগ আবশ্যক হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য দেশের অনেকের ধারণা, এই রাশিচক্রের বিভাগ গ্রীসদেশে জন্মলাভ করিয়া অন্যান্য প্রাচীন সভ্য দেশসমূহে প্রচারিত হইয়াছিল। এ ধারণাটা আমরা একেবারেই বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া মনে করি না। অবশ্য সাধারণতঃ সকল দেশের লোকেরই হৃদয়ে স্বজাতির বা প্রতিবেশী জাতির গৌরব-বর্দ্ধনের প্রবল ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়; কোনও একটা প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি আপনার দেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি উহার একটা বিশিষ্ট সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। এইজন্যই বলিতেছি, এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইবার কারণ,—পাশ্চাত্য লেখকগণ প্রাচীন জ্যোতিষের আলোচনা কালে হিন্দু জ্যোতিষের উল্লেখ দেখিলে, অধিকাংশস্থলে একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া, ভারতবাসীর প্রাপ্য প্রশংসাটুকু আপনাদিগের বা প্রতিবেশী অপর য়ুরোপীয় জাতির জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখেন। আবার যাঁহারা প্রাচীন জ্যোতিষের ক্রমিক উন্নতির ধারার একটা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হন, তাঁহাদিগের কেহই বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ নহেন। অবশ্য তাঁহারা শ্রমপরায়ণ ঐতিহাসিক সন্দেহ নাই। এইজন্য জ্যোতিষিক ঘটনাবলীর ঠিকমত পর্য্যালোচনা করিয়া সময় নির্দ্দেশ করিতে এবং দেশবিশেষকে আবিষ্কারের প্রাপ্য কৃতিত্বটুকু দিয়া উঠিতে পারেন না। ইহা কিন্তু অল্প ক্ষোভের বিষয় নহে। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে ইহার যথাযথ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। আমরা পূর্ব্বেই অনুমানের উপর বলিয়াছি যে, সম্ভবতঃ হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ রাশিচক্রের বিভাগটি (twelve signs of the Zodiac) আবিষ্কার করিয়াছেন। এক্ষণে জ্যোতিষিক ঘটনাসমূহের বিচারের দ্বারা দেখা যাউক, উহা কতটা প্রমাণসঙ্গত। বায়ট সাহেব বলেন যে, প্রথমে চীন জ্যোতিষগণ সাইএন (sien) নাম দিয়া ক্রান্তিবৃত্তের বিভাগ বাহির করেন। পরে ইহা হইতে হিন্দুদিগের নক্ষত্র ও আরবদিগের মঞ্জিল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাপক ওয়েবার সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, চীনবাসিদিগের সাইএন ও আরবদিগের মঞ্জিল হিন্দুজ্যোতিষের পরবর্ত্তী কালের বিভাগ হইতে গৃহীত। এই বিভাগে উপনীত হইবার পূর্ব্বে হিন্দু জ্যোতিষকে বিবিধ স্তর পার হইয়া আসিতে হইয়াছে। ইহাতে তিনি বলেন যে, চন্দ্রের গতি-নির্ণয়ের জন্য তিথি-বিভাগ হিন্দুর গবেষণাসম্ভূত; এবং পরে আরববাসীরা উহার অনুকরণে আপনাদিগের মঞ্জিল বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলেই আবার অধ্যাপক ওয়েবার বলেন যে, বেবিলন দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রথমে এই বিভাগ-প্রণালীর আবিষ্কার করেন। এই সিদ্ধান্তটি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নহে; কারণ, পাশ্চাত্য গণিতজ্ঞগণ স্থির

করিয়াছেন যে, বেবিলন দেশের বিভাগ-প্রণালীটি সূর্য্যের দৈনিক গতির সহিত সম্বদ্ধ। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, হিন্দুদিগের প্রথম বিভাগটি চন্দ্রের দৈনিক গতির উপর নির্ভর করে এবং ইহাও বলিয়াছি যে, পাশ্চাত্য গণিতজ্ঞগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চান্দ্র বিভাগটি প্রথমে আবিষ্কৃত হয়, এবং পরে ক্রমিক উন্নতির সাধারণ নিয়মানুসারে রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিতে বিভাগ প্রচলিত হয়। তাই আমাদিগের মনে হয়, যে দেশে মূল ভিত্তিটি নিহিত ছিল, সেই দেশেই ঐ ভিত্তির উপর বনিয়াদও প্রস্তুত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভবপর। সুতরাং ইহা অনেকটা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, বেবিলনবাসীদিগের বিভাগ-প্রণালী হিন্দুদিগের বিভাগ-প্রণালীর নিকট অনেকটা ঋণী।

কিন্তু বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রমাণসমূহের আলোচনা করিলে আমাদিগের মনে হয়, হিন্দু-জ্যোতিষ, চীন-জ্যোতিষ ও বেবিলন-জ্যোতিষ পাশাপাশি ভাবে থাকিয়া পরস্পরের সাহায্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। এই স্থলে ইহাও বলিতে পারি যে, কোলব্রুক সাহেব ঐ সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর নিভর করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত দেশসমূহের জ্যোতিষশাস্ত্র একই মূল হইতে সংগৃহীত। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে তিনি বেশ যুক্তিযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন হিন্দু, চীন ও বেবিলিয়ান্ সকলেই সপ্তাহকে সাত দিনে বিভক্ত করিয়াছেন, দিনগুলির নামেও বেশ সাদৃশ্য আছে। তাঁহাদিগের রবিকক্ষার বিভাগটি একরূপ, রাশিচক্রেরও দ্বাদশরাশিতে বিভাগ সকলেরই একপ্রকার। বৎসরের মাস-সংখ্যাও একরূপ। এবং সর্ব্বশেষে তাঁহাদিগের নক্ষত্রমণ্ডলীর সংখ্যাও যেরূপ এক, সেইরূপ উহাদের কল্পনাপ্রসূত নামকরণেও বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

কেহ-কেহ আবার গ্রীক জ্যোতিষও উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন; কিন্তু কয়েকটি বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিলে আমাদের মনে হয়, গ্রীক জ্যোতিষ হিন্দু ও বেবিলিয়ান জ্যোতিষের সহিত এক সময়ের গড়িয়া উঠে নাই। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, সর্ব্বপ্রথমে থেল্‌স্ (Thales) ই গ্রীসদেশে জ্যোতিষচর্চ্চার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেন, এবং এই থেল্‌স্ মিশর দেশীয় পুরোহিতগণের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। ইহার পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জ্যোতিষের আলোচনা গ্রীসদেশে হয় নাই; ইহার বহু কাল পরেও তেমন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের দ্বারা জ্যোতিষের চর্চ্চা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এমন কি, এরিষ্টটলের (Aristotle) সময়েও গ্রীসদেশে তেমন বৈজ্ঞানিক নিয়মে জ্যোতিষিক প্রমাণের বিচারপদ্ধতি প্রচলিত হয় নাই। পৃথিবীর পরিধি যে গোলকাকার, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া এরিষ্টটল বলিতেছেন, গোলকই সর্ব্বাপেক্ষা সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল আকৃতি, এবং সেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকুশলীর নির্ম্মাণে সুগঠন ও শৃঙ্খলাই স্বাভাবিক; সেই জন্য পৃথিবীর পরিধি গোলকাকার। আর এক স্থলে সূর্য্যের দৈনিক গতির প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখী গতিই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানজনক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রহ সূর্য্যদেব অবশ্যই ঐ গতি অবলম্বন করিবেন। ইহা দার্শনিক বিচার হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার স্থান বড় উচ্চে নয়। গ্রীসদেশের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ হিপার্কাস ও টলেমি। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই গ্রীকজ্যোতিষের সংস্কার করিয়া উহার পুনর্গঠন করেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রায় দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে হিপার্কাস স্থির করেন, সূর্য্যের এক ক্রান্তিপাত হইতে পুনরায় সেই ক্রান্তিপাতে (নক্ষত্রের সহিত তুলনা করিলে) আসিতে পূর্ব্ববৎসর হইতে পর বৎসর অল্প সময় ব্যয়িত হইবে। এই ক্রান্তিপাতে অগ্রে উপস্থিতিকে অয়ন (precession) কহে। এই অয়নের নিমিত্ত দুই প্রকার বৎসর গণনা হয়,—এক সায়ন বর্ষ (tropical year); অর্থাৎ এক ক্রান্তিপাত হইতে পুনরায় সেই ক্রান্তিপাতে আসিতে সূর্য্যের যে সময় ব্যয়িত হয়, তাহাকে সায়ন বর্ষ কহে; আর একটি নাক্ষত্রিক বৎসর (sidereal year); অর্থাৎ এক নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সেই নক্ষত্রে প্রত্যাগমন করিতে সূর্য্যের যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহাকে নাক্ষত্রিক বর্ষ কহে। হিপার্কাস উভয়বিধ বৎসরের পরিমাণ, প্রতি মাসের দিবস-সংখ্যা ও সূর্য্যাদি পঞ্চ গ্রহের আবর্ত্তন-কাল ও গতি নির্দ্ধারণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিরক্ষবৃত্তের সহিত সূর্য্যকক্ষা ও চন্দ্রকক্ষার অবনতি (inclination of the solar and lunar orbits with the equator) স্থির করেন, এবং বিশেষ পারদর্শিতার সহিত নির্ভুলভাবেই এই সমুদায় নির্দ্দেশ

করেন। অবশ্য এই সকল সিদ্ধান্তের জন্য অনেকস্থলে তিনি চেলডীয়ান্ ঋষিগণের গবেষণার সাহায্য লইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইলেও, তিনিই প্রথম গ্রীসদেশে জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে গণিতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার প্রায় চারিশত বৎসর পরে টলেমির আবির্ভাব হয়। এই সময়ের মধ্যে গ্রীসদেশে জ্যোতিষশাস্ত্রের তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনা হয় নাই; এবং হিপার্কাসের পর টলেমিও যে বড় বেশী কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব—পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্বিদ্‌গণের আবিষ্কারসমূহ সুশৃঙ্খল ও সুসংলগ্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করা। কিন্তু সাধারণ লোক-মতের উপর হিপার্কাস অপেক্ষা টলেমির প্রভাব অধিক ছিল। তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন,—পৃথিবী নিশ্চল, সৌরমণ্ডলের গ্রহগণ পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। অবশ্য ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতার দিক দিয়া খুবই সম্ভবপর বলিয়া মনে হইত। এই প্রসঙ্গে টলেমির বিচারপদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত না হইলেও বেশ আমোদজনক। টলেমি বলেন, গ্রহতারকা আগ্নেয় প্রকৃতিবিশিষ্ট, আর পৃথিবী কঠিন পদার্থের সমষ্টি; সুতরাং পৃথিবী অপেক্ষা গ্রহতারকারই একটা গতি থাকা অধিকতর সম্ভবপর; এবং ইহাও অনুমান করা স্বাভাবিক যে, পৃথিবীর যদি একটা গতি থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতটা অনভিজ্ঞ হইব কেন? ইহা সাধারণ জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু বিজ্ঞানে বড় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। ঠিক এই সময়ে প্রাচ্য মনীষার মহিমায় ভারতে বেশ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্রুত উন্নতি হইতেছিল। টলেমির বহু বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-ভট্ট স্থির করিয়াছিলেন যে, নিজকক্ষায় আপনার ব্যাসের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর একটি দৈনিক গতি আছে, এবং সূর্য্যের চারিধারে ইহার একটি বার্ষিক গতি আছে। তিনি আরও বলেন, তারকামণ্ডলী নিশ্চল; পৃথিবীর আবর্ত্তনের দ্বারা তারকাগণ ও গ্রহসমূহের আবির্ভাব ও তিরোধান সাধিত হয়। আর্য্যভট্ট বলেন, প্রবহবায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পৃথিবীর এইরূপ আবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই সকল তথ্য হইতে ইহাই অনুমান করা সঙ্গত যে, গ্রীসদেশে জ্যোতিষ-চর্চ্চার বহুকাল পূর্ব্বে ভারতের হিন্দুগণ জ্যোতিষজ্ঞানের অধিকারী হইবার স্পর্দ্ধা রাখিতেন। টলেমির পর গ্রীস-দেশে জ্যোতিষের আলোচনা একপ্রকার লোপ পাইয়া যায়; এবং আরববাসিগণ যুরোপে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতে যাইয়া সেই জ্ঞানের ধারা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও মৌলিক গবেষণা তেমন আবিষ্কৃত হয় নাই, সাধারণ অনুবাদের উপর দিয়াই সে ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। কেবল আলবাতানি ও আবুল ওয়াফা অয়নাংশবিভাগ (precession) ও চন্দ্রকক্ষার সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র। এই সমস্ত আলোচনা আমাদের পূর্ব্ব মীমাংসার অনুকূল বলিয়াই মনে করি; হিন্দু, চীন ও বেবিলিয়ন জ্যোতিষই সর্ব্ব-প্রথমে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়; আর তাহার কিছুকাল পরে ইহাদের প্রভাবে আসিয়া, গ্রীসবাসী ও আরববাসীরা জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন।

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা পুনরায় আমাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত রাশিচক্রের আলোচনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব। আধুনিক যুগে আমরা আমাদিগের সুপ্রতিষ্ঠিত বেধালয় ও সুগঠিত মানযন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যের অথবা অন্য কোনও জ্যোতিষ্কের দৈনিক অবস্থিতি নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই; কিন্তু প্রাচীন কালের জ্যোতিষ আলোচনাকারীদিগের এই সুবিধার কণামাত্রও ছিল না। আমরা সূর্য্যসিদ্ধান্তের দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, অতি পূর্ব্বেই হিন্দুরা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ একটি অদৃশ্য শৃঙ্খলের দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া নভোমণ্ডলে যেন দৃঢ়সংলগ্ন রহিয়াছে; এবং ঐ সমগ্র নভোমণ্ডলটি ব্যোমস্থ একটি নির্দ্দিষ্ট অক্ষের (axis) চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ব্যোমমণ্ডলের সমগ্র স্থান অধিকার করিয়া বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, এবং এই ব্যোমের মধ্য দিয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগুলি স্ব-স্ব মার্গে গমন করিতেছেন। সুতরাং এই নক্ষত্রপুঞ্জ সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতির দৈনিক গতি ও অবস্থিতির নির্দ্দেশক হইয়া দাঁড়াইল। এই রাশিচক্রের বিভাগ ও গঠন আর একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়, আমরা যদি মনে করি ব্যোমমণ্ডলে একটি বৃহৎ ঘড়ি লম্বিত আছে, সাধারণ ঘড়ির ন্যায় উহাতেও দ্বাদশটি বিভাগসূচক দ্বাদশটি

অঙ্ক রহিয়াছে, আর মধ্যস্থলে সময়-নির্দ্দেশক একটি বড় কাঁটা সংলগ্ন আছে,—তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, রাশিচক্রের সহিত এইরূপ ঘড়ির খুবই সাদৃশ্য রহিয়াছে। এইরূপ ঘড়ির দিকে চাহিলেই যেমন আমরা ঠিক সময় জানিতে পারি, সেইরূপ ঐ রাশিচক্রের একটু পর্য্যবেক্ষণ করিলেই কোনও বিশেষ সময়ে সূর্য্যের অবস্থিতি অবগত হইতে পারি। তাই আমরা বলিতেছিলাম, যে-কেহ এই রাশিচক্রের প্রবর্ত্তক হউন না কেন, ইহা যে প্রাচীন জ্যোতিষের একটা উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

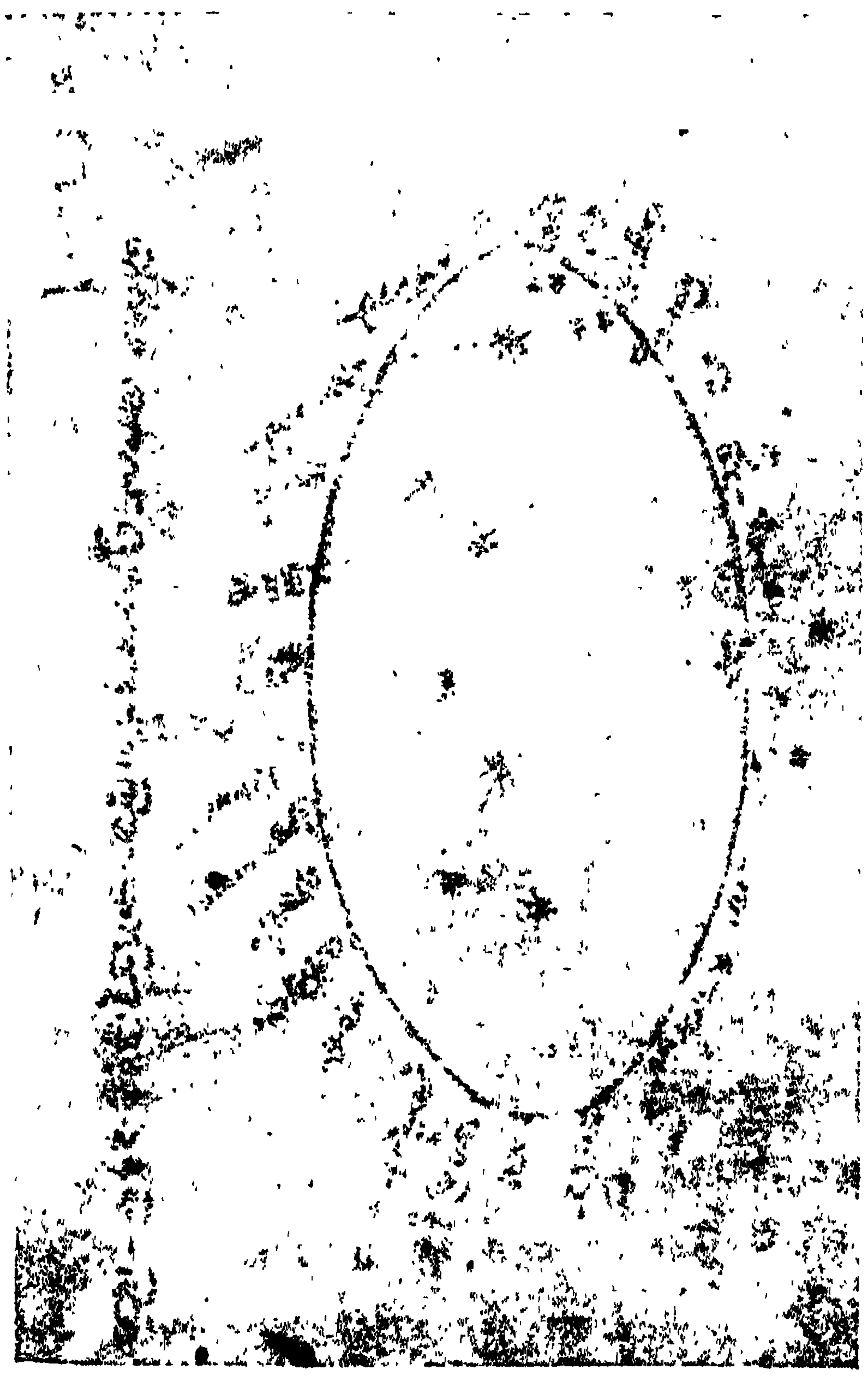

আমরা দেখিলাম, ব্যোমপথে রবিমার্গটি বৃত্তাকার। ঐ রবিমার্গকে যদি দ্বাদশভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এক-একটি বিভাগ এক-একটি নক্ষত্র-পুঞ্জের দ্বারা অধিকৃত রহিয়াছে, ইহাকেই রাশিচক্রের বিভাগ কহে। যে-কোন সময় হইতে আরম্ভ করিলে (সাধারণতঃ বিষুববিন্দুতে সূর্য্যের অবস্থিতির সময় হইতে আরম্ভ করা হয়) দেখিতে পাই, এক-একটি বিভাগ অতিক্রম করিতে সূর্য্যের প্রায় একমাস ব্যয়িত হয়; এবং এই কারণে যে-কোনও সময়ে সূর্য্যের গতি নির্দ্দেশ করিবার একটি উপায় হইবে,—যে বিভাগে সূর্য্য আছে সেই বিভাগটির নাম করা এবং সেই বিভাগের কোন্ স্থলে আছে তাহা স্থির করা। আবার ব্যোমপথে চন্দ্রমার্গও বৃত্তাকার; উহাকেও আমরা ২৭টি তিথিতে বিভক্ত করিয়াছি। ইহার বিষয়ে পূর্ব্বেই আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আরও আমরা দেখি সূর্য্য, চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগণের গতি রবিমার্গের চতুর্দ্দিকে একটি ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া, ঐ রাশিচক্রের বিভাগের অধিকতর উপযোগিতা। সূর্য্য-সিদ্ধান্তে ঠিক এই ভাবেই চান্দ্রমাস ও সৌরমাস নির্ণীত হইয়াছে—

ঐন্দবস্তিথিভি স্তদ্বৎসংক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে।
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং তদহরুচ্যতে ॥ ১।১৩

ত্রিশ চান্দ্র দিনে (তিথিতে) এক চান্দ্র মাস হয়। সূর্য্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে সংক্রমণ কাল এক সৌর মাস। দ্বাদশ সৌর মাসে এক বৎসর; তাহাই দেবতাগণের এক দিন-রাত্রি।

এইরূপে যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত হইলে উহাদের দৈনিক অবস্থিতি নির্দ্দেশ করা সহজসাধ্য হইয়া পড়িল, তখনই জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্রমোন্নতির দ্বিতীয় স্তরে গ্রহণ-গণনার প্রবর্ত্তন হইল। এই গ্রহণ গণনা প্রাচীন প্রায় সকল দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বেশ সূক্ষ্মঃও নির্ভুলরূপে করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য আধুনিক যুগের মত এতটা নিখুঁত হয় নাই। কারণ; প্রধানতঃ গ্রহণ-গণনার সহিত পৃথিবীর গতির বেশী যোগাযোগ নাই; পৃথিবী নিশ্চল হইলে এবং সূর্য্য ইহাকে কেন্দ্র করিয়া পরিক্রমণ করিলেও একই গণনা হইবে। গ্রহণ-গণনার ফলাফল চন্দ্রের ও চন্দ্রকক্ষার নীচবিন্দুর (node) অবস্থিতি অনুসারে পৃথিবীর দ্বারা

প্রতিফলিত কোণিক ছায়ার (cone of shadow) গতির উপর নির্ভর করে; এবং এই ভূচ্ছায়ার গতি সূর্য্য স্থির থাকিলে এবং পৃথিবী ভ্রমণশীল হইলে যাহা হইবে, উহার বিপরীত হইলেও ঠিক তাহাই হইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

ভানোর্ভার্দ্ধে মহীচ্ছায়া তত্তুল্যেহর্ক সমেঽপি বা।
শশাঙ্কপাতে গ্রহণং কিয়দ্ ভাগাধি কোণকে ॥ ৬।৪।
তুল্যৌ রাশ্যাদিভিঃ স্যাতামমাবস্যান্ত কালিকৌ।
সূর্য্যেন্দু পৌর্ণমাস্যন্তে ভার্দ্ধে ভাগাধিকৌ সমৌ ॥ ৭।৪।

অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়া সূর্য্য হইতে সদা ছয় রাশি অন্তরে থাকে। চন্দ্রপাত (node of the moon's orbit) ছায়া কিংবা রবির সমান রাশিতে স্থিত হইলে গ্রহণ হইবে; অথবা ছায়া বা রবির রাশির অংশ হইতে কিঞ্চিৎ অল্প বা অধিক হইলেও গ্রহণ হইবে। অমাবস্যার অন্তিম-কালে রবির রাশির অংশ চন্দ্রের রাশির অংশের সমান। পূর্ণিমার অন্তে চন্দ্র ও সূর্য্যের রাশির অংশে ছয় রাশির পার্থক্য। এইজন্য অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় গ্রহণ হইয়া থাকে।

এইরূপে রাশিচক্রে সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্গণের সম্মুখে একটা নূতন তথ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন, এক বৎসর সূর্য্য যখন বিষুববিন্দু হইতে পরিক্রমণ আরম্ভ করিলেন, তখন যে তারকা সেই বিন্দুতে লক্ষ্য হইতেছিল, বৎসরান্তে সূর্য্য পুনরায় সেই বিষুববিন্দুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পূর্ব্বোক্ত তারকাটি আর সেই বিন্দুতে রহিবে না; অধিকন্তু, বিভাগীয় তারকাগুলি ঐ বিন্দুর একটু পশ্চাতে সরিয়া আসিবে; এবং উহাদের গতি তারকাপুঞ্জের মধ্যে সূর্য্যের বার্ষিক গতির ঠিক বিপরীত দিকে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রীসদেশে খ্রীষ্টের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে হিপার্কাস এই অয়নাংশভাগের (precession) আবিষ্কার করেন। কিন্তু ইহা হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্গণের নিকট একেবারেই নূতন তথ্য ছিল না; তাঁহারা ইহার বহু কাল পূর্ব্বে (প্রায় হাজারি বৎসর পূর্ব্বে) এই তথ্যের উদ্ভাবন করেন।

এই অয়নাংশ গণনা জ্যোতিষশাস্ত্রে বড় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে; কারণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় পর্য্যবেক্ষণ-সমূহ উহাদের বিশুদ্ধি বা নির্ভুলতার জন্য বহু পরিমাণে অয়নাংশ-গণনার উপর নির্ভর করে। এতদ্ব্যতীত ইহার প্রয়োজনীয়তা ও আলোচনার আর একটি কারণ আছে। ইহার সাহায্যে আমরা প্রাচীন জ্যোতিষীয় পর্য্যবেক্ষণগুলির কাল নির্ণয় করিতে পারি এবং তৎকালীন জ্যোতির্জ্ঞান পরীক্ষা করিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর সময় নির্দ্ধারণ করিবার পক্ষেও অনেকটা সহায়তা পাইয়া থাকি। সুতরাং জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্রমিক ধারার নির্দ্দেশ করিতে হইলে অয়নাংশ গণনার বিশদ আলোচনা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; বরং কতকটা সুসঙ্গত হইবে বলিয়াই মনে হয়।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সূর্য্যের গতিমার্গ বৃত্তাকার এবং ব্যোমমণ্ডলে ইহার তলভাগ (plane) নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং ব্যোমের কেন্দ্র ভেদ করিয়া রবিকক্ষার উপর যে লম্ব (perpendicular) অবস্থিত, উহাও নিশ্চল। পৃথিবীর অক্ষ (axis) এই লম্ব রেখার চারিধারে আবর্ত্তিত হয়। ২৬০০০ বৎসরে একটি আবর্ত্তন সমাপ্ত হয়। এই দোলনের গণনাকে অয়নাংশ কহে। এই দোলনের জন্য ধ্রুবাক্ষ (polar axis) ভিন্ন-ভিন্ন বিন্দুতে নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া যায়। এই বিন্দুগুলি ক্রমে ব্যোমে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত গঠিত করে; এবং ইহার ফলে এই বৃত্তের দ্বারা চিহ্নিত পথে যে তারকাগুলি অবস্থিতি করে, উহারাই একটির পর একটি ধ্রুব নক্ষত্র আখ্যা পাইয়া থাকে। এইরূপে যখন দোলনের ব্যাপার চলিতে থাকে, তখন নিরক্ষবৃত্ত (equator) ও ক্রান্তিবৃত্তের (ecliptic) পরস্পর ছেদক রেখা, যাহা বিষুববিন্দুতে অবস্থান কালে সূর্য্যের কেন্দ্র ভেদ করিয়া যায়, তাহা ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে ভিন্ন-ভিন্ন নক্ষত্রের সূচনা করিবে ইহাই আর একটু সরল করিয়া বলিতে হইলে আমরা বলি, ভিন্ন-ভিন্ন আবর্ত্তনে সূর্য্য বিষুববিন্দুতে বিভিন্ন নক্ষত্রের সূচনা করিবেন। এই ভাবে নক্ষত্রের স্থানচ্যুতিকে আমরা নক্ষত্রপুঞ্জের দোলন (libration) বলি, এবং ধ্রুবাক্ষকে (polar axis) দোলনের আলম্ব (fulcrum) আখ্যা দিয়া থাকি। সূর্য্যসিদ্ধান্তের তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার বিশেষ আলোচনা দেখিতে পাই—

ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।
তদ্গুণাদ্ ভূদিনৈর্ভক্তাৎ দ্যুগণাদ্ যদবাপ্যতে ॥৩।৯।
তদ্দোস্ত্রিঘ্নাদশাপ্তাংশাঃ বিজ্ঞেয়া অয়নাবিধাঃ।
তৎসংস্কৃতাদ্ গ্রহাৎ ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদিকম্।
স্ফুটং দৃক্তুল্যতাং গচ্ছেদয়নে বিষুবদ্বয়ে ॥৩।১০।
প্রাক্চক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে
অন্তরাংশৈরথাবৃত্য পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাধিকে ॥৩।১১।

অর্থাৎ বিষুববিন্দুদ্বয়ে (equinoxes) ও অয়নান্ত বিন্দুতে (solstitial points) যখন সূর্য্য থাকেন, তখন সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিলে এই নক্ষত্রপুঞ্জের দোলন বা অয়নাংশের গতি দৃষ্টিগোচর হয়। গণনাদ্বারা প্রাপ্ত সূর্য্যের স্পষ্টস্থান যদি ছায়াগত (অর্থাৎ স্পষ্ট) অর্কস্থান (সূর্য্যের ভুজাংশ "longitude") হইতে যত অংশ ন্যূন হয়, নক্ষত্রপুঞ্জ তত অংশ পূর্ব্বদিকে এবং যত অংশ অধিক হয়, তত অংশ পশ্চিমদিকে স্থিত হইবে।

এই যে পৃথিবীর গতি যাহা হইতে অয়নাংশভাগের উৎপত্তি, ইহা আমাদিগের সাধারণ অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা করিয়া বুঝিতে হইলে আমরা দেখি, যদি একটি লাটিমকে আমরা ভূমিতে ঘুরাইয়া দিই, তাহা হইলে লাটিমটি ঠিক সোজাসুজিভাবে আবর্ত্তিত হয় না; যে অক্ষের (axis) চতুর্দ্দিকে উহা ঘুরিতে থাকে, তাহা একটি উর্দ্ধাধঃলম্বমান রেখার (vertical axis) উপর কিছু অবনত (inclined); লাটিমের অক্ষটি পৃথিবীর অক্ষের স্বরূপ এবং উর্দ্ধাধঃলম্বমান রেখাটি রবিমার্গ বা ক্রান্তিবৃত্তের অক্ষের নির্দ্দেশক; আর এই আবর্ত্তন পৃথিবীর গতি সূচিত করে। পৃথিবীর এই গতি হইতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দৈনিক গতির উৎপত্তি। আমরা এখানে ইহাও বলিয়া রাখিতে পারি যে, এইস্থলে লাটিমের গতিবিজ্ঞান (dynamics of its motion) আর পৃথিবীর গতিবিজ্ঞান একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই অয়নাংশের দরুণ পঞ্জিকা-গণনায় বড় গোলযোগ উপস্থিত হয়; কারণ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অয়নাংশের জন্য বৎসরের পরিমাণ দুইরূপ হয়,—একটি সায়ন বর্ষ (tropical year); আর একটি নাক্ষত্রিক বর্ষ (sidereal year)। ইহা ব্যতীত চান্দ্রযুতিমাসের (synodic month) সাহায্যেও বৎসর গণনা করা যাইতে পারে। এই সময়-গণনা সম্বন্ধে কিরূপ বৈষম্য হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রথম অধ্যায় হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম:—

পশ্চাদ্‌ব্রজন্তোইতিজবাম্ নক্ষত্রৈঃ সততং গ্রহাঃ।
জায়মানাস্ত লম্বন্তে তুল্যমেব স্বমার্গগাঃ ।১।২৫।
প্রাগ্‌গতিত্বমতস্তেষাং ভগণৈঃ প্রত্যহং গতিঃ।
পরিণাহবশাদ্ভিন্না তদ্বশাদ্ ভানি ভুঞ্জতে ।১।২৬
শীঘ্রগস্তান্যথাল্পেন কালেন মহতাল্পগঃ।
তেষাং তু পরিবর্ত্তেন পৌষ্ণান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ ।১।২৭।

অর্থাৎ গ্রহগণ প্রবহবায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া নিজ-নিজ কক্ষোপরি নক্ষত্র সকলের সহিত পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিরন্তর তুল্যবেগে গমনকালে গতি বিষয়ে নক্ষত্রগণের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ নক্ষত্রগণের পশ্চিমবাহিনীগতি গ্রহগতি হইতে অধিক। এইজন্য গ্রহ সকলকে পূর্ব্বদিকে অপসৃত হইতে দেখা যায়। গ্রহদিগের কক্ষার ন্যূনাধিক্যবশতঃ তাহাদিগের প্রাত্যহিক গতি সমান নহে। ভগণ দ্বারা ত্রৈরাশিক করিলেই ঐ গতির ন্যূনাধিক্য জানা যাইবে। শীঘ্রগামী গ্রহগণ অল্প সময়ে ও অল্পগামী গ্রহগণ অধিক সময়ে স্বীয় কক্ষাতে একবার পরিভ্রমণ করে; এইরূপ অসমান গতিতেই গ্রহগণ রাশির চক্র ভোগ করিয়া থাকে। গ্রহগণের এই পরিভ্রমণের নাম ভগণ; অর্থাৎ একটি নক্ষত্রের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার সেই নক্ষত্রের শেষ পর্য্যন্ত একবার ভ্রমণে এক ভগণ হয়।

সুতরাং দেখিতে পাই, ভগণ বা সময়ের পরিমাণ বহুবিধ। ইহার উপরে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পরিমাণ ঠিক করাও বড় কষ্টসাধ্য। ইহা ব্যতীত কোনও পরিমাণই ভগ্নাংশ-বিরহিত নহে। অথচ আমরা দেখিতে পাই, ভারতে প্রচলিত শকাব্দ ও গ্রীসদেশে প্রচলিত জুলিয়াস সিজার-প্রবর্ত্তিত এবং পরে পোপ গ্রীগরী কর্ত্তৃক সংশোধিত অব্দ কতটা শুদ্ধ গণনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই আমরা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে ভাবিতে থাকি, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে, চীনদেশে, মিশরে ও গ্রীসে কেমন করিয়া এতটা নির্ভুল ও সূক্ষ্মগণনাসমন্বিত পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়াছিল! এই কৃতিত্বের যথাযথ তথ্য নির্দ্দেশ করা বহু আয়াস-সাধ্য। আবার ইহা আরও কঠিন হইয়া উঠে—যখন আমরা দেখি, বিদেশীয়গণ প্রাচীন সভ্যদেশসমূহের বিজ্ঞানাদির আলোচনা কালে,

ছদ্মবেশ

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম-এ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২। নারীর পুরুষবেশ

[ইংরেজের আমলের বাঙ্গালা সাহিত্য]

ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, অধিকাংশ স্থলে নারী প্রেমের দায়ে পুরুষের ছদ্মবেশ ধরিয়াছেন; অথবা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে উক্ত বেশ ধরিয়াছেন, এবং পরে প্রেমের উদ্ভব হইয়াছে; কোন-কোন্ স্থলে খেয়ালের বশে, মজামারার জন্য, অথবা দুষ্টের দমন বা পরের উপকারের জন্য উক্ত ছদ্মবেশ গৃহীত হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য হইতে যে দুইটী দৃষ্টান্ত (১) সংগ্রহ করিয়াছি (রাই-রাখালবেশ ও 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা'য় মৃগাঙ্কাবলি ওরফে মৃগাঙ্কবর্ম্মার ব্যাপার) (২) উভয়ত্রই প্রেমের লীলা। এক্ষণে দেখা যাউক, ইংরেজের আমলের, ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট, বাঙ্গালা সাহিত্যে এই শ্রেণীর ছদ্মবেশের কিরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সেকেলে কথা'-শীর্ষক প্রবন্ধে (ভারতী, চৈত্র ১৩২২) পড়িয়াছি—লেখিকার বাল্যে প্রচলিত 'কামিনীকুমার'-নামক বটতলার 'পদ্যে লিখিত উপন্যাসে' কামিনী পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল (নায়িকা কামিনী, নায়ক কুমার)। নায়িকার পুরুষবেশ-ধারণের পূর্ব্বেই নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ হইয়াছিল। 'মিলন আশায় উভয়ের দেশভ্রমণ'; 'কোন কোন স্থানে উভয়ের সন্দর্শন লাভ; কামিনী ছদ্মবেশী পুরুষ, অতএব কুমারের নিকট অপরিচিত; কিন্তু কুমারকে কামিনী চিনিয়া তাহার সহিত রহস্যালাপে রত।' রীতিমত রোম্যাণ্টিক ব্যাপার। জানি না, ইহা গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত, কি, অষ্টাদশ

(১) আমাদের প্রাচীন সাহিত্য হইতে উদাহরণ সংগ্রহ কালে (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩২৪, ৩৩৪পৃ:) মহাভারতোক্ত শিখণ্ডীর বৃত্তান্তটি ছাড় পড়িয়া গিয়াছে। গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম-এ মহাশয় এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সংক্ষেপে বৃত্তান্তটি এই:—কাশিরাজতনয়া অম্বা ভীষ্ম কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া (ভীষ্মবধের জন্য) কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবান্ শূলপাণির নিকট বর পাইলেন যে, তিনি দ্রুপদবংশে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে পুরুষ হইবেন (ও ভীষ্মবধে সমর্থ হইবেন)। দ্রুপদরাজও বর পাইলেন যে তাঁহার এক কন্যা হইয়া পরিণামে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে (ও ভীষ্মবধ করিবে)। যথাসময়ে কন্যা জন্মিলে রাজা ও রাণী সেই কন্যাকে পুত্র (শিখণ্ডী) বলিয়া প্রচার করিলেন ও পুত্রের ন্যায় অস্ত্রশিক্ষা দিলেন। পরে রাজা রাণীর অনুরোধ সেই পুত্রবেশিনী কন্যার দশার্ণাধিপতি হিরণ্যবর্ম্মার কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন; কন্যার মুখে ছদ্মবেশের কথা জানিতে পারিয়া দশার্ণাধিপতি দ্রুপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। শিখণ্ডী সমস্ত শুনিয়া পিতার বিপদ্ দেখিয়া আত্মহত্যার অভিলাষে বনে গেলেন। সেখানে এক যক্ষের সহিত তাঁহার সর্ত্ত হইল—যক্ষ নারী হইবে, তিনি পুরুষ হইবেন, পরে আবার উভয়ে নিজাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু কুবেরের দণ্ডে পরে আর যক্ষের পুরুষ হওয়া হইল না। সুতরাং শিখণ্ডীকে আর পুরুষত্ব ফিরাইয়া দিতে হইল না। উদ্‌যোগ পর্ব্ব, ১৮৬ হইতে ১৯১ অধ্যায়।

এ ক্ষেত্রে নারীর পুরুষবেশ-ধারণ আছে, কিন্তু তাহার উপর অলৌকিক ব্যাপার (নারীর পুরুষে পরিণতি ও তাহার পাল্টা-হিসাবে পুরুষের নারীতে পরিণতি) আছে। কন্যাকে পুত্র বলিয়া চালানর কৌশলটুকু বোধ হয় 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা'র রচয়িতা শিখণ্ডীর বৃত্তান্ত হইতে পাইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঠিক এই কৌশলই ইংরেজী সাহিত্যে বেন্ জন্সনের New Inn ও ঐ আমলের অন্য দুই একখানি নাটকে আছে (পূর্ব্বে সেগুলির কথা বলিয়াছি। ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২৫)। ল্যাটিন কবি অভিডের Iphis ও Ianthe-র আখ্যানের সহিত শিখণ্ডীর বৃত্তান্তের আরও বেশী মিল আছে। (উক্ত আখ্যান ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩২৪, ৩৩৭ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।)

(২) ভারতবর্ষ, (ফাল্গুন ১৩২৪) ৩৩৪ পৃঃ।

শতাব্দীর ইংরেজী নভেল Mrs. Byrneএর The Libertine (৩) এর অনুবাদ বা অনুকরণ। এই বটতলার পুস্তকখানির নাম অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কখনও চক্ষে দেখি নাই। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর উল্লিখিত প্রবন্ধ হইতে ইহার বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

এক্ষণে ইংরেজ আমলের প্রসিদ্ধ লেখকদিগের রচনা হইতে নারীর পুরুষবেশের দৃষ্টান্ত-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। ইঁহাদিগের উপর যে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র

প্রথমেই এই আমলের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ তুলিব। বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাগুলিতে অনেক রোমান্টিক ব্যাপার আছে। আমরা শেক্‌স্‌পীয়ারের প্রসাদাৎ দেখিয়াছি যে, প্রেমের দায়ে নায়িকা পুরুষবেশ ধরিয়াছেন; আবার সখী শুধু সমবেদনা দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনিও ঐ সাজ সাজিয়াছেন, ঐ কাচ কাচিয়াছেন। ইহার অনুকরণে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক স্থলে নারীর পুরুষবেশের অবতারণা করিতে পারিতেন। মৃণালিনী যখন গিরিজায়া সখীকে সঙ্গে লইয়া হেমচন্দ্রের অনুসন্ধানে নবদ্বীপ-যাত্রা করিলেন, রজনী যখন বিবাহের ভয়ে গৃহত্যাগ করিলেন, সূর্য্যমুখী বা কুন্দ যখন মনঃকষ্টে নগেন্দ্রনাথের ভবন হইতে প্রস্থান করিলেন, শ্রী যখন সীতারামের মঙ্গলার্থ চিত্তবিশ্রাম হইতে অন্তর্ধান করিলেন, অথবা বিমলা যখন জগৎসিংহকে তিলোত্তমার সংবাদ দিতে গেলেন, নির্ম্মলকুমারী যখন চঞ্চলকুমারীর সঙ্গ লইবার সঙ্কল্প করিলেন, তখন ইঁহারা মামুলি প্রথায় পুরুষবেশ ধারণ করিতে পারিতেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ সকল স্থলে উক্ত উপায় অবলম্বন করেন নাই। ইন্দিরা যদি পতি-উদ্ধারের জন্য পুরুষবেশে সুদূর পঞ্জাব পর্য্যন্ত ধাওয়া করিতেন, তাহা হইলে রীতিমত রোম্যান্টিক ব্যাপার হইত। যাহা হউক, যাহা হইলে হইতে পারিত, তাহা লইয়া মাথা না ঘামাইয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে যাহা পাইতেছি, তাহা লইয়াই আলোচনা করি।

(৩) ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২৫, ৬৪৮ পৃঃ।

বঙ্কিমচন্দ্রের চারিখানি আখ্যায়িকায় নারীর পুরুষবেশের দৃষ্টান্ত আছে। ক্রমে বলিতেছি।

১। 'কপালকুণ্ডলা'য় পদ্মাবতী

সাধারণতঃ নারী পুরুষের ছদ্মবেশে প্রেমাস্পদের অজ্ঞাতসারে তাঁহার পার্শ্বচারিণী হন। ইহাই রোম্যান্টিক ব্যাপারের পরা কাষ্ঠা। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা'য় প্রতিনায়িকা পদ্মাবতীর বাও অন্য প্রকারের। তবে এক্ষেত্রেও প্রেমের দায়ে ছদ্মবেশ বটে। পদ্মাবতী যখন স্বামিপ্রেমের কাঙ্গালিনী হইয়া স্বামিকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইলেন, তিনি তখন কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য পুরুষের ছদ্মবেশ ধরিলেন,—উদ্দেশ্য, প্রেমাস্পদ নবকুমারের মনে তাঁহার পত্নী কপালকুণ্ডলার চরিত্রে সন্দেহ-উৎপাদন (নিজেকে কপালকুণ্ডলার উপপতি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা তাহার উপায়)। তাঁহার নিজের কথায়, "আপাততঃ কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ। পরে তিনি আমার হইবেন।" (৩য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।) "তোমার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে। আপাততঃ তোমার সতীত্বের প্রতি স্বামীর সংশয় জন্মাইয়া দিতাম।" (৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।)

শেক্‌স্‌পীয়ারের বেলায় দেখিয়াছি যে, পাত্রীগণ (আইমোজেন ছাড়া) সকলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছেন, অন্যের পরামর্শে বা প্ররোচনায় নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলির বেলায়ও ঠিক সেই কথা। পদ্মাবতী জুলিয়া-পোর্শিয়ার ন্যায় সখীর নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিতেছেন, কিন্তু সখীকে সঙ্গিনী হইতে বলিতেছেন না। এ বিষয়ে তাঁহার পোর্শিয়া অপেক্ষা জুলিয়ার সহিত সাদৃশ্য বেশী। জুলিয়া-পোর্শিয়া রোজালিণ্ডের সহচারিণীরা নায়িকার প্রস্তাবে সায় দিয়াছেন, কিন্তু পদ্মাবতীর পরিচারিকা পেষ্‌মন্‌ এই দুঃসাহসিক প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছেন,—"বিবি! ভাল করিয়া বিবেচনা করুন; সে নিবিড় বন, রাত্রি আগত; আপনি একাকিনী।" প্রেমের জন্য দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্যা পদ্মাবতী তাহাতে টলিলেন না। (৩য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।) মনে রাখিতে হইবে, পদ্মাবতী গোড়ায় বাঙ্গালীর মেয়ে হইলেও ভীরুপ্রকৃতি কুলবালা নহেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য অসম্ভব নহে।

পোর্শিয়া-রোজালিণ্ডের মত পদ্মাবতীর পুরুষবেশবর্ণনা

বেশ মনোজ্ঞ। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। "আগন্তুক ব্রাহ্মণবেশী; সামান্য ধুতি পরা; গাত্র উত্তরীয়ে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত। ব্রাহ্মণকুমার অতি কোমলবয়স্ক; মুখমণ্ডলে বয়শ্চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। মুখখানি পরম সুন্দর, সুন্দরী রমণীমুখের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু রমণী-দুর্লভ তেজোগর্ব্ব-বিশিষ্ট। তাঁহার কেশগুলি সচরাচর পুরুষদিগের কেশের ন্যায় ক্ষৌরকার্য্যাবশেষাত্মক নহে, স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় অচ্ছিন্নাবস্থায় উত্তরীয়-প্রচ্ছন্ন হইয়া পৃষ্ঠদেশে, অংসে, বাহুদেশে, কদাচিৎ বক্ষে সংসর্পিত হইয়া পড়িয়াছে। কোষশূন্য এক দীর্ঘ তরবারি হস্তে ছিল। (৪)—" (৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।) এই বেশবিন্যাসে বেশবিন্যাসকারিণীর, তথা গ্রন্থকারের, কৌশল পরিস্ফুট।

গ্রন্থকার শেক্‌সপীয়ারের ন্যায় গোড়া হইতেই পাঠক-বর্গকে ছদ্মবেশরহস্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, বেন্ জন্‌সন্ প্রভৃতির ন্যায় গোপন করেন নাই (৩য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ)। আবার, কপালকুণ্ডলার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই ব্রাহ্মণবেশী 'আমি পুরুষ নহি' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন, তবে সে দিন আর বেশী ভাঙ্গিলেন না। পরদিন (৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ) তিনি সপত্নীকে পুরা পরিচয় দিলেন, নিজের উদ্দেশ্যের কথাও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। 'ব্রাহ্মণবেশী' ছদ্মনামে তিনি, কপালকুণ্ডলাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তৎপাঠে নবকুমারের মনে সন্দেহ জন্মিল (৪র্থ খণ্ড, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম পরিচ্ছেদ), কাপালিক সেই বহ্নিতে ইন্ধন প্রয়োগ করিলেন (৫ম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), কপালকুণ্ডলা ও ব্রাহ্মণ-বেশীকে কাছাকাছি বসিয়া কথাবার্ত্তা 'কহিতে দূর হইতে দেখিয়া নবকুমারের সন্দেহ দৃঢ় হইল' (৭ম পরিচ্ছেদ), ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখের বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা নাই। কেবল প্রসঙ্গক্রমে এইটুকু বলিতে চাহি যে, যদিও পদ্মাবতীর কার্য্যে কপালকুণ্ডলার সর্ব্বনাশ ঘটিল, তথাপি শেষে তিনি কপালকুণ্ডলার সর্ব্বনাশ-সাধনের মন্দ অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে স্বামিত্যাগ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন, (৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ),—কুমতির উপর সুমতির এই ক্রমিক জয়ই পদ্মাবতী-চরিত্রের বিশিষ্টতা। যাক্, পদ্মাবতীর চরিত্র-বিশ্লেষণ এ ক্ষেত্রে প্রস্তুত বস্তু নহে।

২। আনন্দমঠে—শান্তি

'আনন্দমঠে' নায়িকা শান্তির ছদ্মবেশ বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে নারীর পুরুষবেশের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের মেয়ে হইলেও শান্তির পক্ষে পুরুষ-বেশ এবং ঐ বেশে সাহস ও শক্তির পরিচয়-প্রদান অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নহে, এইটি বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার ২য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে গোড়াবন্ধন করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। 'শৈশবে নিয়ত পুরুষ-সাহচর্য্যের প্রথম ফল এই হইল যে, শান্তি মেয়ের মত কাপড় পরিতে শিখিল না, অথবা শিখিয়া পরিত্যাগ করিল। ছেলের মত কোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিল, কেহ কখন মেয়ে কাপড় পরাইয়া দিলে, তাহা খুলিয়া ফেলিত, আবার কোঁচা করিয়া পরিত।...টোলের ছাত্রেরা কাঠের চিরুণী দিয়া তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিত, চুলগুলা কুণ্ডলী করিয়া শান্তির পিঠে, কাঁধে, বাহুতে, ও গালের উপর দুলিত।'

'বিবাহের পর...শান্তি কিছুতেই মেয়ের মত কাপড় পরিল না; কিছুতেই চুল বাঁধিল না।..পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত। পীড়াপীড়িতে.. গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।'

তাহার পর 'শান্তি বাচ্ছা সন্ন্যাসী সাজিল।...শান্তি বালক-সন্ন্যাসিবেশে...ব্যায়াম করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত। ...ক্রমশঃ তাহার যৌবনলক্ষণ দেখা দিল। অনেক সন্ন্যাসী জানিল যে, এ ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক।' এই বাচ্ছা সন্ন্যাসী সাজা, তাহার ভবিষ্যতে মূল ব্যাপারে পুরুষবেশের সূচনা (prelude)। তাহার পর, সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় ছাড়িয়া সে জীবানন্দের ঘরে ফিরিয়া আসিল। 'স্বামিসহবাসে শান্তির চরিত্রের পৌরুষ দিন দিন বিলীন বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আসিল।' এই পর্য্যন্ত গেল পূর্ব্বকথা।

এই আত্মলীলার কথা ছাড়িয়া দিলে, মূল-ব্যাপারে শান্তির পুরুষবেশ প্রেমের দায়ে,—তবে মামুলি প্রথায় প্রেম-লালসা তৃপ্ত করিবার জন্য, নয়নমন জুড়াইবার জন্য,—স্বামীর সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায়, ছদ্মবেশ নহে; ইহার সহিত ইন্দ্রিয়সুখের সম্পর্ক নাই; জিতেন্দ্রিয় স্বামী জীবানন্দ

(৪) A gallant curtle-axe upon my thigh
(Rosalind)—As you Like It.
And wear my dagger with the braver grace.
(Portia)—The Merchant of Venice.

ভগিনীর অনুরোধে পত্নীর সহিত দেখা করিয়া ব্রতভঙ্গ করিলে ভবিষ্যতে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মৃত্যুকে অঙ্গীকার করিবেন জানিয়া ব্রহ্মচারিণী শান্তি স্বামীর পার্শ্বচারিণী হইবার অভিপ্রায় করিলেন (১ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ)। এই উদ্দেশ্যে তিনি সন্ন্যাসিবেশে সন্তানসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলেন ও দীক্ষা গ্রহণ করিলেন (২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ)। (তাঁহার সন্ন্যাসিবেশের বর্ণনা পদ্মাবতীর ব্রাহ্মণবেশের অপেক্ষাও মনোরম। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠকদিগকে ২য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।) দীক্ষাদানের পর সত্যানন্দ তাঁহাকে 'নবীনানন্দ' নাম দিতে গিয়া 'শান্তিরাম দেবশর্ম্মা'কে 'শান্তিমণি পাপিষ্ঠা' বলিয়া চিনিলেন, তাঁহার 'কাল কুচকুচে দেড় হাত লম্বা দাড়ি বাম হাতে জড়াইয়া এক টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল।' (৫) যাহা হউক, তিনি 'ব্রহ্মচারিণী'কে ভর্ৎসনা করিতে গিয়া তাঁহার সহিত তর্কে হারিলেন। শান্তি বুঝাইলেন,—'আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি: স্বামি-দর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই।' (২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।) পরে শান্তি একথা জীবানন্দকে গম্ভীরভাবে বুঝাইয়াছেন (৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা মামুলি প্রথার প্রেমের ব্যাপার নহে; এই কল্পনায় যথেষ্ট মৌলিকত্ব ও চমৎকারিত্ব আছে।

শেক্‌স্‌পীয়ারের পোর্শিয়ার বেলায় বলিয়াছি, গম্ভীর উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ গৃহীত হইলেও, পাছে ব্যাপারটা বেজায় গম্ভীর হইয়া যায়, সেই কারণে সরসতা-সঞ্চারের জন্য শেক্‌স্‌পীয়ার মাঝেমাঝে পোর্শিয়ার বাক্যে ও ব্যবহারে বেশ একটু রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটও এই কলাকৌশল অজ্ঞাত ছিল না। তাই তিনি ইহার পরেই ঘর বাছাই লইয়া শান্তিকে দিয়া জীবানন্দের সহিত বেশ একটু রগড় করাইয়াছেন (২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ)। (প্রথম সংস্করণে একটু বেশী বাড়াবাড়ি ছিল, পরবর্ত্তী সংস্করণে অপেক্ষাকৃত সংযত হইয়াছে।) পরে যখন সন্ন্যাসিবেশিনী শান্তি বীরত্বপ্রকাশ করিয়া কল্যাণীকে বিপন্মুক্ত করিয়াছেন, তখন আবার তিনি কল্যাণীকে লইয়া একটু রগড় করিয়াছেন। পুরুষবেশিনী শান্তি 'কল্যাণীর দুই স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া মুখপানে অতি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল,' 'কল্যাণীকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল,' 'কল্যাণী অকস্মাৎ পুরুষস্পর্শে রোমাঞ্চিত, ভীত, ক্ষুব্ধ, বিস্মিত, অশ্রুবিপ্লুত হইল,' শেষে শান্তির কোমল স্পর্শে অবশ্য নারী বলিয়া চিনিল (৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)। তাহার পর আবার মহেন্দ্রসিংহের অন্তঃপুরে কল্যাণীর সহিত দেখা করিতে গিয়া 'নবীনানন্দ' মহেন্দ্রসিংহের সহিত এক কিস্তি রগড় করিয়াছেন, আবার দাড়ী ছেঁড়ার কাণ্ড; রগড়ের শেষে মহেন্দ্রসিংহের নিকট রহস্য প্রকাশিত হইল (৪র্থ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)। এক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, শেক্‌স্‌পীয়ারের প্রণালীতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হইতেই ছদ্মবেশ-রহস্য পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিয়াছেন অথচ পাত্রপাত্রীদিগের নিকট বেশ সুকৌশলে রহস্যগোপন ও যথাকালে রহস্যভেদ করিয়াছেন। জীবানন্দের নিকট শান্তির উক্তি, 'দুই রাত্রি ঘুমাই নাই—আমি যাই পুরুষ!' Dramatic Irony'র সুন্দর উদাহরণ।

কল্যাণীর উদ্ধারকালে এবং সাহেবের সমক্ষে নবীনানন্দের বীরত্বপ্রকাশ (৩য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ) ও সঙ্গে সঙ্গে রগড় রোজালিণ্ড পোর্শিয়ার মত মুখের আস্ফালন নহে; ইহা গ্রীনের James IV নাটকে রাজ্ঞী ডরোথিয়ার অস্ত্রচালনা অপেক্ষা স্বাভাবিক ও সম্ভব, কেন না পূর্ব্বকথায় (২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ) গ্রন্থকার শান্তির ব্যায়ামচর্চ্চা, অস্ত্রশিক্ষা প্রভৃতির বিবরণ দিয়াছেন।

আখ্যায়িকার গম্ভীর (serious) অবসানে শান্তি কৃত্রিমতা পরিহার করিয়া, পুরুষের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া, নারীবেশ ধরিলেন। 'শান্তি মরিতে যাইতেছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে স্ত্রীবেশ ধরিবে ইহা স্থির করিয়াছিল।' (৪র্থ খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ)। (৬) তাঁহার সহিত আমাদের শেষ দেখা—যখন শান্তি রণক্ষেত্রে জীবানন্দের মৃতদেহের সন্ধানে আসিয়াছেন; তাহার পর মহাপুরুষের কৃপায়

---

(৫) জাল দাড়ির ব্যাপারে ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' স্মর্তব্য। যথাস্থানে এই নাটকের আলোচনা করিয়াছি। 'লীলাবতী' অবশ্য 'আনন্দমঠে'র পূর্ব্বে রচিত।

(৬) তাঁহার বৈষ্ণবীসজ্জার কথা প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি। ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩২৪, ৭৩ পৃঃ।

জীবানন্দ পুনর্জীবিত হইল, স্বামীর সহিত তাঁহার অন্তর্ধান। (৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।)।

৩। 'রাজসিংহে'—দরিয়া

পুনঃপ্রণীত 'রাজসিংহে' দরিয়া বিবির পুরুষবেশ রীতিমত রোম্যাণ্টিক ব্যাপারের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। নারীর পুরুষবেশ সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি :—'সম্ভবতঃ ইউরোপের ক্ষাত্রযুগে কোমলহৃদয়া নারীরা প্রেমাস্পদকে দূরদেশে বিপৎসঙ্কুল সমর-তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রেমাস্পদের অজ্ঞাতসারে তাঁহার সঙ্গিনী হইতেন, এইরূপ বাস্তব ঘটনা বা কবিকল্পনা হইতে ইহার উদ্ভব।' [ভারতবর্ষ, (ফাল্গুন ১৩২৪) ৩৩৫ পৃঃ।] এক্ষেত্রে উদাহরণটি এই শ্রেণীর। মোগলবীর মবারক যখন বাদশাহের হুকুমে রূপনগর হইতে চঞ্চলকুমারীকে আনিতে সসৈন্যে প্রেরিত হইলেন, তখন দরিয়া মোগল-শিবিরে মেহেরজান নাম লইয়া নাচগান করিয়া মোগল সেনাপতি সৈয়দ হাসান আলির মনোরঞ্জন করিল এবং পুরস্কার-স্বরূপ 'অশ্বারোহি-সৈন্যভুক্ত হইবার' প্রার্থনা করিল, তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সে 'প্রার্থনা মঞ্জুর হইল'। (৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।) এইরূপে সে মবারকের অজ্ঞাতে তাঁহার নিকট থাকিবার, বিপদে তাঁহাকে রক্ষা করিবার, উপায় করিয়া লইল। এক্ষেত্রেও দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র শেক্স্পীয়রের ন্যায়, ছদ্মবেশরহস্য প্রথম হইতেই পাঠকদিগের গোচর করিয়াছেন। শীঘ্রই মবারক বিপদে পড়িলেন, তিনি 'রণভূমিতে পর্ব্বতের সানুদেশে' 'অশ্বারোহণে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন', অকস্মাৎ কূপে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইলেন। অন্য কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না, কিন্তু সৈনিকবেশিনী দরিয়া সতর্ক ছিল, সে মবারকের চীৎকার শুনিল এবং প্রত্যুৎপন্নমতির বলে তাঁহাকে উদ্ধার করিল। (৫ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।) ইহাও রীতিমত রোম্যাণ্টিক ব্যাপার।

মবারক-দরিয়ার পূর্ব্বকথা স্থানে স্থানে বিবৃত বা সূচিত হইয়াছে। 'দরিয়া বিবির বয়স সতের বৎসরের বেশী নহে—তাহাতে আবার কিছু খর্ব্বাকার, পনের বছরের বেশী দেখাইত না। দরিয়া বিবি বড় সুন্দরী, ফুটন্ত ফুলের মত, সর্ব্বদা প্রফুল্ল।' (১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।) সে গীতবাদ্যে অদ্বিতীয়া ছিল। (২য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ ও ৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।) এত রূপগুণ নায়িকারই উপযুক্ত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে প্রতিনায়িকা-মাত্র, তাহাও আবার অপ্রধান আখ্যানের। 'স্বদেশে থাকিতে' মবারক দরিয়ার গীত শুনিয়া, দরিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাহার পর দিল্লীতে আসিয়া তাল্লাক দিয়াছিলেন—সম্ভবতঃ বাদশাজাদীকে বিবাহ করিবার উচ্চাভিলাষে। (২য় খণ্ড, ৫ম ও ৭ম পরিচ্ছেদ।) স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া সে বাদশাহের রঙমহলে আতর সুরমা ও সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ বেচিত। মবারককে বাদশাজাদী জেবউন্নিসার মহালে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে মবারককেও দু'কথা শুনাইল, জেবউন্নিসাকেও সব কথা বলিয়া দিল, মবারককে রঙ্মহালে প্রবেশের পূর্ব্বে জ্যোতিষী দ্বারা অদৃষ্ট-গণনা করাইতে বলিল, ইত্যাদি ব্যাপার কয়েকটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। (২য় খণ্ড, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।) যাহা হউক, এ সকল ঘটনা ছদ্মবেশগ্রহণের পূর্ব্বে।

দরিয়া মবারককে উদ্ধার করিয়া তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিল; তখন মবারকের হৃদয়ে আবার দরিয়ার প্রতি পূর্ব্বপ্রেম ফিরিয়া আসিল। তিনি জানিলেন যে তাঁহারই জন্য দরিয়া দিল্লী হইতে এখানে আসিয়াছে, সওয়ার সাজিয়াছে, যুদ্ধে জখম হইয়াছে, সে যথার্থ ভালবাসে, আর 'বাদশাজাদীরা ভালবাসে না,' শুধু সুখ চায়। 'মবারক দরিয়ার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।" দরিয়া মবারকের শুশ্রূষা করিল। দরিয়ার চিকিৎসাতেই মবারক আরোগ্যলাভ করিল। দিল্লীতে পৌঁছিয়া, মবারক দরিয়ার হাত ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া গেল। দিন কত ইহাতে উভয়ে বড় সুখী হইল।' (৫ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।) শেক্স্পীয়রের জুলিয়ার ন্যায় দরিয়ার ছদ্মবেশধারণ সার্থক হইল। এইখানেই যবনিকাপতন হইলে বড় সুখের বিষয় হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। ইহার পরের ঘটনাবলি 'বড় ভয়ানক', বড় মর্ম্মভেদী।

প্রতিদ্বন্দ্বিনীর সুখ দেখিয়া প্রতিহিংসা-পরায়ণা জেবউন্নিসা মবারকের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন, দরিয়া তৎসংবাদে জেবউন্নিসাকে কাটিতে আসিল, কিন্তু বাদশাজাদীর 'চোখে জল' দেখিয়া 'নৃত্য আরম্ভ করিল' এবং 'উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল'। 'সে তখন ঘোর উন্মাদগ্রস্ত।'

(ষষ্ঠ খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ।) তাহার পর মবারক মাণিকলালের চিকিৎসায় পুনর্জীবন লাভ করিলে ও জেবউন্নিসা অনুতপ্তা হইয়া মবারকের প্রকৃত অনুরাগিণী হইলে উভয়ের মিলন হইল, 'দরিয়া দরিয়ায় ভাসিয়া গেল,' সে আড়ি পাতিয়া উভয়ের সুখ দেখিল, তখনও সে দেওয়ানা (৭) অর্থাৎ উন্মাদিনী। (৮ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ।) তাহার পর যুদ্ধক্ষেত্রে দরিয়া মবারককে বন্দুকের গুলিতে বিদ্ধ করিল, তখনও সে 'উন্মাদিনী দরিয়া।' (৮ম খণ্ড ১৪শ পরিচ্ছেদ।) আখ্যানের সম্পূর্ণতার জন্য, পাঠকদিগের স্মৃতি উজ্জীবিত করিবার জন্য, এই অনুচ্ছেদে ঘটনাগুলির উল্লেখ করিলাম। আমাদের বক্তব্যের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, কেন না এ সকল ব্যাপারে দরিয়া ছদ্মবেশিনী নহে।

৪। 'ইন্দিরা'য় শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দাসী

পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে, সাধারণতঃ প্রেমের দায়ে নারীর পুরুষবেশ। বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে যে তিনটি উদাহরণ পাওয়া গেল, সে তিনটিই এই শ্রেণীর; তবে প্রত্যেকটিতেই বিশিষ্টতা আছে। বাকী উদাহরণটি অন্য শ্রেণীর। 'পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত' 'ইন্দিরা'য় বাসরঘরের বর্ণনায় শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দাসীর জাল মোগল সাজা শুধু মজামারার জন্য। (৮) বলা বাহুল্য, এই পুস্তকের এই উপান্তস্থিত পরিচ্ছেদটি (২১শ পরিচ্ছেদ) পুস্তকের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে, 'সেকালে যেমন ছিল' গ্রন্থকার তাহারই একটা চিত্র দিবার জন্য, নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হইলেও, এটিকে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। হয় ত 'কৃষ্ণচরিত্র'-প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও চেলা কোনও দিন গবেষণার দ্বারা পরিচ্ছেদটা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সাব্যস্থ করিয়া বসিবেন!

বৃত্তান্তটি সংক্ষেপে এইঃ—বাসরঘরে বা মেয়ে-মজলিসে (পুরাতন বিবাহের নূতন ঝাল্লান) বর উ—বাবুকে ঘিরিয়া নারীগণ নানান্ ফষ্টি-নষ্টি করিতেছিলেন, ইহার ভিতরে একটা 'সোরগোল' উঠিল, 'একজন দাড়িওয়ালা মোগল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, উ—বাবু তাহাকে তাড়াইবার জন্য ধমক ধামক দিতেছেন, মোগল যাইতেছে না।' এক্ষেত্রে ছদ্মবেশ ক্ষণিকের জন্য, পাঠকের নিকট রহস্যগোপন করা হইয়াছে. তাহার পর উ-বাবু গলাধাক্কা দিতে অগ্রসর হইলে, 'মোগল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, পলায়ন করিবার সময় পরচুলা খসিয়া পড়িল,' পাঠক ও উ-বাবু সমকালেই জানিলেন, "শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দাসী কি জাল মোগল হইতে পারে? আসল দিল্লীর আমদানি!" 'একটা ভারি হাসি পড়িয়া গেল।' বাসরঘরে এরূপ 'বহুরূপী'র কাজ অসাধারণ নহে। বর্ত্তমান লেখকের পরিচিতা একজন ভদ্রমহিলা বাসর হইলেই এমন সুন্দর (?) মাতাল সাজিতেন যে, যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই রহস্যজ্ঞ (in the secret) তাঁহারা ভিন্ন সকলেরই তাক লাগিয়া যাইত।

বঙ্কিমচন্দ্র বাসরঘরের 'নির্লজ্জ ব্যাপারে'র নমুনা-হিসাবে, বাস্তব-চিত্র (realistic picture) হিসাবে, এই পরিচ্ছেদটি লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:—'এ পরিচ্ছেদটা না লিখিলেও পারিতাম। তবে এদেশের গ্রাম্য স্ত্রীদিগের জীবনের এই ভাগটুকু এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।...কিন্তু যাহা লোপ পাইয়াছে তাহার একটা চিত্র দিবার বাসনায়, এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম। তবে জানি না, অনেক স্থানে এ কুরীতি লোপ না পাইয়াও থাকিতে পারে।' পরিচ্ছেদের নামও 'সেকালে যেমন ছিল।' 'এখনকার প্রচলিত রুচি ইংরেজি রুচি, ইংরেজি রুচির বিধানমতে বিচার করিলে ইহাতে নির্লজ্জ ব্যাপার কিছুই পাওয়া যাইবে না।'—এই বলিয়া ইন্দিরা ইংরেজি রুচির উপর একটু টিপ্পনী কাটিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা ত বুঝি যে ইহা খাঁটি স্বদেশী মাল, আমাদের দেশের মাটি ও হাওয়ায় ইহার জন্ম। এই প্রথা লোপ পাইয়াছে বা পাইতেছে, তাহারও ত কোন লক্ষণ দেখি না, সহরে ও পল্লীগ্রামে ইহা পুরাদমে চলিতেছে। যাহা হউক, গ্রন্থকার ও তাঁহার নায়িকা উভয়েই এই নির্লজ্জ ব্যাপারের প্রতিকূলে মন্তব্য প্রকাশ

(৭) রমেশচন্দ্র আখ্যায়িকা-রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র দরিয়ার কল্পনার জন্য যে কতক অংশে 'মাধবীকঙ্কণে' চিত্রিত অভাগিনী জেলেখার কল্পনার নিকট ঋণী, ইহা নিঃসংশয়। 'পুনঃপ্রণীত' 'রাজসিংহ' 'মাধবীকঙ্কণে'র অনেক পরে প্রকাশিত। আবার রমেশচন্দ্রও বোধ হয় স্কটের Marmionএ চিত্রিত Clarence এর কল্পনার নিকট ঋণী।

(৮) ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'তে বাঙ্গালী পুরুষ মাতাল অটলবিহারীর কুৎসিত উদ্দেশ্যে জাল মোগল সাজার ব্যাপার আছে।

করিয়াছেন। বর্ত্তমান লেখকও তাঁহাদিগের সহিত সম্পূর্ণ একমত। ইহাতে বড়ই বেহায়ামি ও ব্যাপকতা প্রকাশ পায়, ইহা female liberty নহে—license। তবে যে সমাজে নারীজাতির পুরুষের সহিত অবাধে নির্দ্দোষ আমোদে মিশিবার ব্যবস্থা নাই, সে সমাজে বিবাহের ন্যায় আনন্দ-উৎসবে এরূপ carnival, এরূপ মাত্রাধিক্য, অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য, তাই বলিয়া বর্ত্তমান লেখক বিলাতী সমাজে প্রচলিত মেয়েমর্দ্দে বল-নাচের পক্ষপাতী নহেন। মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালী কুলনারী বহু পুরুষের সম্মুখে এরূপ বেহায়ামি করেন না, শুধু এক রাত্রির জন্য শত রমণীর মধ্যবর্ত্তী একজনমাত্র পুরুষের সম্মুখে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, গ্রন্থকার এসব নির্লজ্জ ব্যাপারের নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু নিজে ইহার চিত্র দিয়া কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। ইহার দুই প্রস্থ কৈফিয়ত (নিজের জোবানী ও নায়িকার জোবানী) তিনি দিয়াছেন, আমাদের তাহার অধিক আর কিছু বলিবার নাই। তবে এইমাত্র বলিব যে, তিনি বড় স্ফূর্ত্তিতে এই আখ্যায়িকা-খানি 'পুনর্লিখিত' করিয়াছেন এবং

Rarely, rarely, comest thou,
Spirit of Delight!

বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, সেটুকু যেন স্মরণ থাকে।

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী লেখক-দিগের প্রসঙ্গ তুলিব।

৫। ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'

৺দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকে কোন গুরুতর কারণে (উহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন) জমিদারপুত্র অরবিন্দ দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন এবং অরবিন্দের ভগিনী (সহোদরা নহে) চাঁপা গোপনে গৃহত্যাগ করে। বিদেশে অরবিন্দের পীড়াকালে এক প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন এবং অরবিন্দ কোন যুবতীর কৌশলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার উপক্রম হইলে এক নবীন সন্ন্যাসী তাঁহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন। উক্ত প্রবীণ সন্ন্যাসী ভোলানাথ চৌধুরী নামে একজন দুশ্চরিত্র জমিদারকে অহল্যানাম্নী সুচরিতা যুবতীকে বিবাহ করিতে বাধ্য করেন। (পরে জানা যাইবে যে এই যুবতী প্রকৃতপক্ষে অরবিন্দের অপহৃতা সহোদরা তারা।) এ সমস্ত ঘটনা অতীত বিবরণ (retrospective narration) হিসাবে নাটকের শেষ দৃশ্যে (৫ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক) বর্ণিত হইয়াছে। অরবিন্দের পিতা দীর্ঘকাল অনুপস্থিত পুত্রের জীবন-সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পোষ্যপুত্র-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, যোগজীবন-নামক প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁহার চেলা দ্বারা সংবাদ দেন যে অরবিন্দ শীঘ্রই ফিরিবেন। পরে যোগজীবন নিজেকে অরবিন্দ বলিয়া পরিচয় দিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ রহিত করেন। ক্রমে আসল অরবিন্দ আসিলেন, সুতরাং বিলক্ষণ গোল উঠিল। এদিকে অরবিন্দ চিনিলেন যে এই সন্ন্যাসীই পূর্ব্বে তাঁহাকে রোগে শুশ্রূষা করিয়া-ছিলেন ইত্যাদি। ভোলানাথ চৌধুরীও তাঁহাকে চিনিলেন। যাহা হউক, শেষে প্রকাশ হইল, সন্ন্যাসীর 'পাকা দাড়ীও কৃত্রিম, কাঁচা দাড়ীও কৃত্রিম,' সন্ন্যাসী প্রকৃতপক্ষে চাঁপা। নাটককার বরাবর কথাটা গোপন রাখিয়া শেষদৃশ্যে রহস্যভেদ করিয়াছেন, ইহা সুন্দর কলাকৌশলের পরিচায়ক। শেক্‌স্‌পীয়ারের Twelfth Nightএ যেমন যমজ ভ্রাতা ও পুরুষবেশিনী ভগিনীর আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য ছিল, এক্ষেত্রেও সেইরূপ যমজ, এমন কি সহোদর না হইলেও, অরবিন্দের সহিত চাঁপার আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য ছিল। যাহা হউক, এক্ষেত্রে প্রেমের জন্য ছদ্মবেশ নহে। চাঁপা ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া সন্ন্যাসিবেশে অরবিন্দের নানাভাবে উপকার করিয়াছিল এবং অহল্যার ব্যাপারেও পরোপকার-সাধনের জন্যই সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধরিয়াছিল। ইহা একটু নূতন ধরণের।

৬। ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হিরণ্ময়ী'

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হিরণ্ময়ী'তে কিরণ-হিরণ দুই বোন ধীরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রণয়বতী ছিল। কিন্তু তাহাদিগের মাতা-পিতা ধীরেন্দ্রনাথের সহিত জ্যেষ্ঠা কিরণময়ীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলে অসহ্য যন্ত্রণায় কনিষ্ঠা হিরণ্ময়ী গৃহত্যাগ করিল—তবে পুরুষের ছদ্মবেশে নহে। কিরণময়ী কিন্তু হিরণ্ময়ীর সন্ধানে বাহির হইয়া চণ্ডাল-বালকের ছদ্মবেশ ও মাখন ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া এক কাপালিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। ছদ্মবেশ-সম্বন্ধে কিরণময়ী পরে কৈফিয়ত দিয়াছে:—'পুরুষ না সাজিলে সকল স্থলে পর্য্যটন করা

হয় না।' এই ভাবিয়া আমি অন্য কোন জাতীয় পুরুষ না সাজিয়া, একেবারে চণ্ডাল সাজিয়াছিলাম। কেন না, তাহা হইলে আমাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য বলিয়া কেহ স্পর্শ করিবে না। সুতরাং আমার ছদ্মবেশধারণেরও কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিবে না।' ('সমাপ্তি'-নামক শেষ পরিচ্ছেদে)।

এই কাপালিকের নিকট হিরণ্ময়ী ও তাহার সন্ধানার্থ গৃহত্যাগী ধীরেন্দ্রনাথ উভয়েই বন্দী ছিলেন। মাখন তাহা জানিতে পারিয়া উভয়কেই উদ্ধার করিল। পরে মাতাপিতার সহিত হিরণ্ময়ীর পুনর্মিলন-কালে তাঁহারা কিরণময়ীর জন্য খেদ করিলে মাখন ওরফে কিরণময়ী আত্মপ্রকাশ করিল। এখানেও, ৺দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায়, গ্রন্থকার বরাবর রহস্য গোপন করিয়া শেষ পরিচ্ছেদে রহস্যভেদ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে প্রণয় ও ব্যর্থপ্রণয়ের ব্যাপার আছে বটে, কিন্তু কিরণময়ী সেজন্য গৃহত্যাগ ও পুরুষবেশ ধারণ করে নাই। ভগিনীস্নেহের বশবর্তিনী হইয়াই করিয়াছিল। কনিষ্ঠার সহিত প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলেও তাহার ভগিনীস্নেহ ও তজ্জন্য স্বার্থত্যাগ অতুলনীয়। কিরণময়ীর আত্মপ্রকাশ-ব্যাপারে শেক্‌স্‌পীয়ারের The Two Gentlemen of Veronaর জুলিয়ার মত অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ের ঘটনাও আছে। (৯)

৭। ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ'

৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণে' প্রেমের দায়ে নারীর পুরুষবেশের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু এই নারী কোমলা বঙ্গবালা নহে, উগ্রস্বভাবা তাতার-বালা অভাগিনী জেলেখা। জেলেখা যুদ্ধে আহত নরেন্দ্রনাথের শুশ্রূষা করিতে করিতে আয়েষার মত হিন্দুযুবকের প্রেমে পড়িল। (১১শ পরিচ্ছেদ ও ৩১শ পরিচ্ছেদ।) নির্দয়হৃদয়া জেহানারা (সাজাহানের কন্যা) এই দোষের জন্য উভয়েরই প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। তাতার-রমণী কৌশলে নিজেকে ও প্রণয়াস্পদকে বাঁচাইয়া 'দেওয়ানা' হইয়া এক 'অপরূপ গণক' সাজিল। 'তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক হইবে না, মুখমণ্ডল অতিশয় কোমল ও অতিশয় গৌরবর্ণ।' (১৪শ পরিচ্ছেদ।) দিল্লীতে নরেন্দ্রনাথের মহাবিপদ্ বলিয়া সে তাঁহাকে দিল্লীত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বলিল এবং নিজেও তাঁহার সঙ্গে যাইবে বলিল। 'দেওয়ানা তোমার অপকার করিবে না, বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।' নরেন্দ্রনাথ বা পাঠক কেহই তাহাকে এই ছদ্মবেশে চিনিলেন না, কেবল এইটুকু বুঝিলেন যে, বালক অল্পবয়সেই প্রেমের জন্য 'দেওয়ানা' হইয়াছে। উক্ত ভূমিকায় তাহার প্রেমের গানগুলি হৃদয়দ্রাবী। (১৫শ পরিচ্ছেদ।)

পরে সে নরেন্দ্রনাথের প্রেমলাভের জন্য গোপনে অনেক চেষ্টা করিল, তবে সে সব পুরুষের ছদ্মবেশে নহে। অবশেষে সে ভগ্নমনোরথ হইয়া আত্মহত্যা করিল এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে পত্রে ('অভাগিনী জেলেখার পত্র', ৩১শ ও ৩২শ পরিচ্ছেদ) আত্মপ্রকাশ করিল। নায়কের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও জানিলেন :--'এ অভাগিনীও দেওয়ানা নাম ধারণ করিয়া পুরুষবেশে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইল। নরেন্দ্র! তোমার প্রণয়ভাজন হইব এরূপ আশা হৃদয়ে ধারণ করি নাই, দিবারাত্রি তোমার নিকটে থাকিব, দিবারাত্রি তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের মত তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব, দিবসে তোমার অমৃত-কথা শ্রবণ করিব, রজনীতে সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কখন কখন দ্বিপ্রহর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত তোমার সুপ্তকান্তি দেখিয়া হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করিব, কেবল এই আশায় আমি তোমার সহিত দিল্লী হইতে শিপ্রাতীরে, শিপ্রাতীর হইতে রাজস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি! জগতে কোন্ স্থল আছে, নরকে কোন্ স্থল আছে, যথায় এই সুখের আশায় অভাগিনী যাইতে পরাঙ্মুখ?' (৩১শ পরিচ্ছেদ।)

প্রবল পরিপ্লাবী প্রণয় বটে, কিন্তু জেলেখার কতকগুলি কার্য্য হইতে বুঝা যায় যে, এই প্রণয় ভায়োলা-ইউফ্রেসিয়ার প্রণয়ের ন্যায় নিঃস্বার্থ নহে। উগ্রপ্রকৃতি তাতার-রমণী এক সময়ে নিস্ফল আক্রোশে প্রণয়াস্পদকে স্বহস্তে বধ করিতেও উদ্যত হইয়াছিল, 'হস্ত হইতে খড়্গ পড়িয়া গেল'। (৩২শ পরিচ্ছেদ)। ইহা ছাড়া সে শৈলেশ্বর গোস্বামীর দ্বারা প্রণয়াস্পদের মনে যে পরিবর্ত্তন

(৯) ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩২৪, ৫০৯ পৃঃ।

ঘটাইবার প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহা হইতেও বুঝা যায়, তাহার প্রণয় নিতান্তই স্বার্থকলুষিত।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে, 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' ও কোন কোন ইংরেজী নাটকে নারীর পুরুষবেশ মুখ্য ব্যাপার, পুরুষের নারীবেশ তাহার পাল্টা-হিসাবে গৌণ ব্যাপার। এই আখ্যায়িকায়ও (২৭শ পরিচ্ছেদে) জেলেখার প্ররোচনায় নরেন্দ্রনাথের নারীবেশধারণ ঐ রূপ পাল্টা-হিসাবে আছে। ইহার বিবরণ পুরুষের নারীবেশ-প্রবন্ধে দিয়াছি। (১০)

৮। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্ব্বাণ'

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্ব্বাণে' স্বামী কবিচন্দ্র বা চন্দ্রপতির উদ্ধারের জন্য পত্নী প্রভাবতী ও তাঁহার সখী শৈলবালা পুরুষবেশ ধরিয়াছেন। ইঁহারাও কোমলা বঙ্গবালা নহেন, সাহসিকা রাজওয়ারা নারী, সুতরাং 'ধায় অশ্বপৃষ্ঠে অশঙ্কিত চিতে'। এক্ষেত্রে জুলিয়া-জেসিকার মত কুমারীর প্রণয়াস্পদের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় ছদ্মবেশ নহে, পোর্শিয়া-নেরিসার মত বিবাহিতার ব্যাপার, তবে তাঁহাদিগের মত স্বামীর বন্ধুর প্রাণরক্ষার জন্য নহে, প্রভাবতীর খোদ স্বামীর বন্দীদশা হইতে উদ্ধারের চেষ্টায়। আবার রোজালিণ্ড সিলিয়ার বিদূষককে সঙ্গে লওয়ার ন্যায় তাঁহারাও ভৃত্য সঙ্গে লইয়াছেন। দুইটি নারীতে দুঃসমসাহসিক হইয়া বন্দীর উদ্ধার করিবে ইহা বড় বেশী অস্বাভাবিক হইয়া যায় বলিয়া গ্রন্থকর্ত্রী শৈলবালার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন:—'আমরা দুটি নিঃসহায় স্ত্রীলোক ত আর সত্যি সত্যি তাঁকে উদ্ধার করে আন্‌তে পারব না, দিল্লী গিয়ে মহারাজকে জানিয়ে এর যাতে কোন সদুপায় হয়, তাই করা যাবে।' গ্রন্থকর্ত্রী পুরুষবেশের কৈফিয়ত দিয়াছেন:—"সম্মুখে যুদ্ধ উপস্থিত, মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়াছে, এখন স্ত্রীবেশে গমন করিলে পাছে কোন বিপদ ঘটে; এই আশঙ্কায় ও শীঘ্র যাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা পুরুষবেশ ধারণ করিলেন।" (২১শ পরিচ্ছেদ।) ইহার পর তাঁহাদিগের পুরুষবেশের ও তাহা লইয়া উভয় সখীর রঙ্গরসের বেশ ঘোরালো বর্ণনা আছে। ইহা পোর্শিয়া-নেরিসা বা রোজালিণ্ড-সিলিয়ার রঙ্গরস অপেক্ষাও সরস।

পথে ঝড়জলের জন্য তাঁহারা এক পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইয়া আততায়ীর হস্তে বিপদে পড়িলেন। শৈলবালা (রোজালিণ্ডের) মত বীরবেশের গুমর করিয়া সত্য সত্য বিপদে পড়িলেন। এবং সাহসে ভর করিয়া আততায়ীকে আঘাত করিলেন, কিন্তু শেষে প্রাকৃত নারীর ন্যায় প্রভাবতী চীৎকার সম্বল হইল। যাহা হউক, শৈলবালার প্রণয়াস্পদ দৈবানুকূল্যে তথায় উপস্থিত হইয়া উভয়কে উদ্ধার করিলেন শৈল তাঁহাকে চিনিলেন, কিন্তু তিনি ছদ্মবেশিনীকে চিনিলেন না। সুতরাং শৈল রোজালিণ্ডের মত এবং 'কামিনীকুমার' আখ্যায়িকার কামিনীর মত, প্রণয়ী দিলীপ ওরফে কুমার কিরণসিংহকে লইয়া বেশ একটু রঙ্গ করিলেন। পরে প্রভাবতী তাঁহার নিকট নিজেদের ছদ্মবেশের কথা প্রকাশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে "শৈল" নাম শুনিয়া 'কুমার এবার সেই বালকের বদনমণ্ডলে শৈলবালার মুখাবয়ব দেখিতে পাইলেন, তিনি ঘন ঘন তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন, ঘন ঘন তাঁহার নাম অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তিনি তাঁহার বাল্যসখীকে চিনিতে পারিলেন।' ইত্যাদি (২২শ পরিচ্ছেদ।) যথাসময়ে কিরণ-সিংহ কৌশলে (জেলিয়ার ছদ্মবেশে) কবিচন্দ্রের উদ্ধার করিলেন এবং পতি পত্নীর মিলন করিয়া দিলেন। তবে তখন অবশ্য প্রভাবতী ছদ্মবেশিনী নহেন। (২৩শ পরিচ্ছেদ।) আমরা পাঠকবর্গকে পূর্ব্বোক্ত সরস পরিচ্ছেদ দুইটি (২১শ ও ২২শ) পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বহু স্থলেই পোর্শিয়া-নেরিসা রোজালিণ্ড-সিলিয়ার কথা মনে পড়ে, এবং মনে হয় যে, গ্রন্থকর্ত্রীর শেক্‌স্‌পীয়ার-পাঠ সার্থক হইয়াছে। স্থূল কথা, সমগ্র ব্যাপারটি রীতিমত রোম্যান্টিক।

'এসিয়ার রাজকবি' রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' এই তিনখানি পুস্তকে নারীর পুরুষবেশের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে শেষ দৃষ্টান্তটি বড়ই মধুর, বড়ই মনোজ্ঞ।

৯। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'

'রাজা ও রাণী'তে প্রেমের দায়ে, প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায়, ছদ্মবেশ নহে। রাণী সুমিত্রা স্ত্রৈণ রাজাকে রাজকার্য্যে অমনোযোগী দেখিয়া রাজার প্রতি

(১০) ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩২৪, ২১০ পৃঃ।

প্রণয়বতী হইয়াও 'সীতারামে'র শ্রীর ন্যায় রাজার চরিত্র-সংশোধনের জন্য রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করিলেন; এবং পলায়নের সুবিধার জন্য পুরুষবেশ ধরিলেন।

"তুমি যাও, রাজধর্ম্ম উঠুক্ জাগিয়া,
ধন্য হোক্ রাজা, প্রজা হোক্ সুখী, রাজ্যে
ফিরে আসুক্ কল্যাণ, দূর হোক্ যত
অত্যাচার ভূপতির যশোরশ্মি হতে
ঘুচে যাক্ কলঙ্ককালিমা।" ২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য।

নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রভাবে এরূপ আত্মত্যাগ সম্পূর্ণ অভিনব কল্পনা। গ্রীনের 'James IV' নাটকে রাণী রাজার সংসর্গত্যাগ করিয়া পুরুষবেশে পলায়ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে—অন্যাসক্ত স্বামীর হস্ত হইতে আত্মপ্রাণরক্ষার্থ। (১১)

ত্রিবেদী ঠাকুর এই ছদ্মবেশ দেখিলেন, সুতরাং যথাসময়ে ইহা রাজার গোচর হইল। পাঠকও প্রথম হইতে ছদ্মবেশ-রহস্য অবগত হইলেন। রাণী পিতৃরাজ্যে ছদ্মবেশে পৌঁছিয়া শৈশবের প্রতিপালক ভৃত্যের নিকটও আত্মগোপন করিলেন (তৃতীয় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য), কেবল ভ্রাতার নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন (তৃতীয় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)। পরে এই আত্মগোপনের প্রয়োজন হইল না, সুতরাং পরবর্ত্তী ঘটনা সকলের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই।

১০। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'

পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, অনেক স্থলে প্রেমের দায়ে নারীর পুরুষবেশ, অথবা উক্ত ছদ্মবেশ-ধারণের পরে প্রেমের উদ্ভব হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'য় এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সুন্দর দৃষ্টান্ত। 'মণিপুর-রাজসুতা', চিত্রাঙ্গদা স্পেন্সারের ব্রিটোমার্টের মত, শৈশব হইতে পুরুষোচিত অস্ত্রশিক্ষা পাইয়াছিলেন এবং 'পুরুষের বেশে যুবরাজ-রূপে করি' রাজকাজ স্বেচ্ছামত ফিরি'তেন। একদিন তিনি 'সঙ্কীর্ণ পথ রোধিয়া শয়ান' অর্জ্জুনকে 'উদ্ধত অধীর রোষে ধনু-অগ্রভাগে তাড়না' করিলেন; কিন্তু অচিরে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের স্পর্শে নারীত্ব আসিল। (১২)

(১১) ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩২৪, ৩৩৭ পৃঃ।

(১২) Beaumont & Fletcherএর Love's Cure নামক নাটকে এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটুকু আছে। ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২৫, ৬৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

"শিখে' পুরুষের বিদ্যা, পরে' পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে,...
সেই মুহূর্ত্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্ত্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।" চিত্রাঙ্গদার উক্তি।

"সে শিক্ষা আমারি
সুলগ্নে! আমিই চেতন করে' দিই
একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।"
মদনের

আর তাঁহার সমরসাধ রহিল না, (এইখা সারের ব্রিটোমার্টের সহিত তাঁহার প্রভেদ);

"বাল্য-দুরাশায় কতদিন করিয়াছি
মনে, পার্থকীর্ত্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।"

কিন্তু প্রেমের স্পর্শে তাঁহার সে দর্প-দম্ভ চূর্ণ হইল,

"পরদিন প্রাতে দূরে ফেলে' দিনু
পুরুষের বেশ।"

বালকবেশে তিলে তিলে বাঞ্ছিতের হৃদয় অধিকার করিবার কল্পনা তাঁহার মনে একবার জাগিয়াছিল বটে—

'সখীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভৃত্যরূপে
করিতাম সেবা, ক্ষত্রিয়ের আর্ত্তত্রাণ
মহাব্রতে হইতাম সহায় তাঁহার।
একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি,
ভাবিতেন মনে মনে "এ কোন্ বালক,
পূর্ব্বজনমের কোন্ চিরদাস, সঙ্গ
লইয়াছে এ জনমে সুকৃতির মত।"
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা।' চিত্রাঙ্গদার উক্তি।

কিন্তু উদ্দাম বাসনার নিকট সে কল্পনা ঠাঁই পাইল না। তাহার পর বসন্তসখ মদনের সহায়তায় অপূর্ব্ব রূপ-যৌবন

লইয়া তিনি কিরূপে প্রিয়তমের সঙ্গলাভ করিলেন, সে কথায় প্রয়োজন নাই।

১১। রবীন্দ্রনাথের 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ'

রবীন্দ্রনাথের 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে' শৈলবালার পুরুষ-বেশ-ধারণের ব্যাপার 'যেন ফুলের ভিতরকার লুকানো মধুটুকুর মত মধুর, শিশিরটুকুর মত করুণ।' শৈলবালা কিন্তু (চিত্রাঙ্গদার মত) রাজকন্যা বা (সুমিত্রার মত) রাজরাণী নহেন, তিনি সোজাসুজি বাঙ্গালী সমাজের গৃহস্থকন্যা। এই শ্রেণীর নারীর পুরুষবেশ-ধারণে একটু অতিসাহসিকতা ও অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়, তজ্জন্য গ্রন্থকার আটঘাট বাঁধিয়া কায করিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন, শৈলবালার পিতা 'হিন্দুসমাজে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চালচলন অত্যন্ত নব্য ছিল', আবার তাঁহার মৃত্যুর পর জামাতা অক্ষয় শ্যালী-গুলিকে 'নব্য সমাজের খোলাখুলি মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক', তবে শাশুড়ীর ভয়ে বাড়াবাড়ি করিতে পারেন নাই। নব্যতন্ত্রের হিসাবে—অথচ প্রাচীন কৌলীন্যের দোহাই দিয়া—অক্ষয়ের দুইটি শ্যালীকে 'দীর্ঘকাল অবি-বাহিত' রাখা হইয়াছিল। পুস্তকখানিতে তাহাদের বর-খোঁজার পালা কীর্ত্তিত। ব্যাপারটা টেনিসনের 'Princess' কাব্যের ঠিক উল্টা; উক্ত কাব্যে কুমারী-ব্রতধারিণী রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার গুপ্ত উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রেমিক রাজপুত্র দুইজন বন্ধুর সহিত নারীবেশে রাজকন্যার স্থাপিত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন; এই পুস্তকে বিধবা শৈলবালা ভগিনীদ্বয়ের বরের চেষ্টায় পুরুষবেশে চিরকুমার-সভার সভ্য হইলেন, উদ্দেশ্য কুমারগুলির ব্রতভঙ্গ। (শেক্‌স্‌পীয়ারের Love's Labour's Lost স্মর্ত্তব্য, তবে সেখানে নারীর পুরুষবেশ নাই।) শৈল বলিতেছেন; 'আমি পুরুষবেশে ওদের সভার সভ্য হব, তার পরে সভা কতদিন টেঁকে আমি দেখে নেব।' যাহা হউক, এক্ষেত্রে মামুলি প্রেমের দায়ে ছদ্মবেশ নহে, ভগিনী-স্নেহের প্রভাবে, ভগিনীদের বর মিলাইবার জন্য। এই কল্পনায় বেশ একটু মৌলিকতা আছে। গ্রন্থে চিত্রিত চারিটি ভগিনীর পরস্পরের প্রতি স্নেহ অতি উজ্জ্বল, অতি মধুর।

শৈলবালা রসিক ঠাকুরদাদা ও ভগিনীপতি অক্ষয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া (তবে কৌশলটা শেক্‌স্‌পীয়ারের জুলিয়া-জেসিকা পোর্শিয়া-নেরিসা রোজালিণ্ড-ভায়োলার মত তাহার নিজের) প্রাগুক্ত উদ্দেশ্যে পুরুষবেশ ধরিলেন।

রসিক দাদা এই প্রসঙ্গে রসিকতা করিয়াছেন," "ভগবান্ হরি নারী-ছদ্মবেশে পুরুষকে ভুলিয়েছিলেন, তুই শৈল যদি পুরুষ-ছদ্মবেশে পুরুষকে ভোলাতে পারিস্ তাহলে হরিভক্তি উড়িয়ে দিয়ে তোর পূজোতেই শেষ বয়সটা কাটাব।" শৈলবালার পুরুষবেশের সুবিধার জন্য গ্রন্থকার আগেভাগেই বলিয়া রাখিয়াছেন—"চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা বলিয়া ছেলের মত দেখিতে।" তাহার পুরুষবেশের চিত্র বড় সুন্দর। 'যেন কিশোর কন্দর্প! যেন সাক্ষাৎ কুমার!' পুরুষবেশে যে তাহার রূপ আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে রসিক দাদা ইহাও বলিয়াছে, 'ইয়মধিক-মনোজ্ঞা চাপকানেনাপি তন্বী।' সে বেশ দেখিয়া যে শুধু রসিক দাদা মোহিত হইলেন তাহা নহে, ভগিনীরাও 'শৈলের তরুণ সুকুমার প্রিয়দর্শন পুরুষমূর্ত্তিতে মনে মনে মুগ্ধ হইতে-ছিল।' পরে চিরকুমার-সভার সভ্যগণ অবলাকান্ত নামধারিণী শৈলবালার পুরুষবেশের কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য প্রভাবে, তাহার সলজ্জ আচরণে, 'তাহার মুখের স্নিগ্ধ কোমল করুণ ভাবে' তাহার প্রতি স্নেহাবিষ্ট হইলেন। সাধে কি রসিক দাদা বলিয়াছেন, 'স্ত্রী সভ্যরা যদি পুরুষ সভ্যদের অজ্ঞাতসারে বেশ ও নাম পরিবর্ত্তন করে' আসেন ত'াহলে সহজে নিষ্পত্তি হয়!'

শৈলবালা পুরুষবেশ ধারণের পূর্ব্বেই ভূমিকা করিয়া রাখিয়াছিলেন, 'লজ্জা যে স্ত্রীলোকের ভূষণ, পুরুষের বেশ ধরতে গেলেই সেটা পরিত্যাগ করতে হয়।' সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার তাঁহার দোষক্ষালনের জন্য, তাঁহার প্রতি সম-বেদনা জাগাইবার জন্য, বিবাহিতা ভগিনী পুরবালার মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন, 'হতভাগিনী যেমন করিয়া ভুলিয়া থাকে থাক্' অর্থাৎ এইসব খেয়াল লইয়া বালবিধবা বৈধব্য-বেদনা ভুলিয়া থাকে, তাহাই প্রার্থনীয়। শৈলবালা পুরুষবেশের rehearsal দিতে গিয়া ভগিনী-ভগিনীপতিকে একটু চমকাইয়া দিয়াছেন, শাস্তির মত 'আপনার সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে' বলিয়া একটু রসিকতা করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার লজ্জারক্ষার দিকে বরাবর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তিনি ভগিনীপতি ও ঠাকুরদাদার নিকট যাহাই করুন না কেন, বাহিরের

লোকের নিকট সুসংযত ব্যবহার করিয়াছেন, চিরকুমার-সভা নিজেদের বাটীতে বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যান নাই, সভ্যদিগের নিকট সলজ্জ সঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন, (রসিক দাদা সব সময়েই কাছে কাছে আছেন) নারীর ন্যায় নিষ্ঠার সহিত অতিথি-সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে জলখাবার খান নাই, 'খাওয়ার চেয়ে পরিবেষণে বেশী খুসী হব' এই বলিয়া ঢাকিয়া লইয়াছেন। তাহার পর নানা কৌশলে দুইটি আস্ত কুমার চিরকুমার-সভার স্থির সরোবর হইতে তাঁহার দুই ভগিনীর প্রেমজালে পড়িলে, অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, তিনি আর তাঁহাদিগের সম্মুখে বাহির হইলেন না, দরজাবন্ধ করিয়া শিবপূজায় মন দিলেন (অবশ্য ভগিনীদের কল্যাণ-কামনায়)। বর-আশীর্ব্বাদ হইয়া গেলে তিনি একটিবার সকলের সমক্ষে বাহির হইয়াছেন—কিন্তু তখন নারীবেশে অর্থাৎ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া। রসিক দাদার ভাষায়, 'শৈলজা ভবানী এতদিন কিরাতবেশ ধারণ করে-ছিলেন, আজ ইনি আবার তপস্বিনীবেশ গ্রহণ করিলেন।' শৈল এখন ছদ্মবেশের জন্য চিরকুমার-সভার সভাপতি পিতৃতুল্য ভক্তিভাজন চন্দ্রবাবুর ক্ষমাভিক্ষা করিলেন; কিন্তু ভবিষ্যতে নূতন ভগিনীপতিদিগের সহিত শ্যালীসুলভ রসিকতা করিবেন বলিয়া শাসাইতে ছাড়িলেন না।

শেক্‌স্পীয়ার রোজালিণ্ড-ভায়োলার বেলায় পুরুষ ভ্রমে ফীবি-অলিভিয়ার হৃদয়ে যে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রেও তাহার একটু আভাস পাওয়া যায়, তবে অতি সূক্ষ্মভাবে। পুরুষবেশী শৈলর প্রতি চিরকুমার-সভার সভাপতি চন্দ্রবাবুর ভাগিনেয়ী নির্ম্মলার বেশ একটু টান হইয়াছিল। তদ্দর্শনে নির্ম্মলার অনুরাগী পূর্ণবাবুর বেশ একটু অস্বস্তি হইয়াছিল। তাহার পর শৈলর ছদ্মবেশ ঘুচিলে নির্ম্মলার ভ্রম ঘুচিল, পূর্ণও নির্ম্মলার প্রেমলাভে কৃতার্থ হইল।

"সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু।"

১২। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের, 'শশাঙ্ক'

এই উজ্জ্বলে-মধুরে মিশ্রিত চিত্রের পর আর কোন চিত্র বোধ হয় পাঠক সমাজের চোখে লাগিবে না। তথাপি প্রবন্ধের সম্পূর্ণতার জন্য উদীয়মান লেখকদিগের রচনা হইতে দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দিয়া শেষ করিব।

ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাকার শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্কে' এই শ্রেণীর দুইটি দৃষ্টান্ত আছে। যূথিকার সখী তরলা যূথিকার প্রেমাস্পদ বসুমিত্রকে বৌদ্ধ-মঠ হইতে মুক্ত করিবার জন্য বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়াছেন এবং কৌশলে কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে প্রেমিকা প্রেমের দায়ে স্বয়ং পুরুষ সাজেন নাই, তাঁহার সমপ্রাণা সখী তাঁহার সুখের জন্য, তাঁহার প্রিয়তমকে মিলাইবার জন্য, পুরুষ সাজিয়াছেন, একটু নূতনত্ব আছে। (১ম খণ্ড, ১৮শ পরিচ্ছেদ)। পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা' ও কয়েকখানি ইংরেজী নাটকে নারীর পুরুষ-বেশের পাল্টা হিসাবে পুরুষের নারীবেশও আছে। এই পুস্তকে, বৌদ্ধমঠের আচার্য্য বুড়া বাঁদর দেশানন্দের (প্রেমচর্চ্চার সুবিধার জন্য প্রেমপাত্রী তরলার পরামর্শে) নারীবেশ ধারণ এইরূপ পাল্টা-হিসাবে আছে। (১৩)

আবার এই আখ্যায়িকায় তরলার পুরুষবেশ অপেক্ষা সুন্দর আর একটি দৃষ্টান্ত আছে। সম্রাট্ শশাঙ্কের অনুরাগিণী লতিকা সম্রাট্ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া শরীররক্ষী সৈনিকের বেশ ধারণ ও রমাপতি নাম গ্রহণ করিয়া শশাঙ্কের কাছে কাছে ছায়ার ন্যায় থাকিতেন। (ইহা স্পষ্টতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের দরিয়ার অনুকরণ।) লতিকা শশাঙ্ককে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, আহত শশাঙ্ককে বহন করিয়া নিরাপদ্ স্থানে লইয়া গিয়াছেন এবং শেষে প্রেমাস্পদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মরণেও প্রিয়তমের সঙ্গিনী হইয়াছেন, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্বে। (৩য় খণ্ড, ১৭শ ও ১৮শ পরিচ্ছেদ।) রীতিমত রোমান্টিক ব্যাপার বটে। ললিতার প্রেমের কাহিনী বড় মধুর, বড় করুণ।

১৩। শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'আলেয়া'

শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'আলেয়া' গল্পে নারীর পুরুষ-বেশের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। দেওঘরের অদূরে ত্রিকূট পর্ব্বতে নিঃসঙ্গবাসী একজন অনতিক্রান্তযৌবন সন্ন্যাসী একদিন একটি কিশোর বালকমূর্ত্তি দেখিয়া ও

(১৩) ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩২৪, ২০৮ পৃষ্ঠায়।

তাহার করুণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া স্নেহাকৃষ্ট ও মোহাবিষ্ট হইলেন। বালক তাহার তীর্থ-যাত্রী রুগ্ন বৃদ্ধ পিতার জন্য সন্ন্যাসীর সাহায্য প্রার্থনা করিল। কয়েক মাস ধরিয়া তাহারা সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে থাকিল। প্রকৃতির প্রভাবে ও বালকের অকৃত্রিম সারল্যে ও শ্রদ্ধাভক্তিতে সন্ন্যাসীর 'সেই প্রথম-দর্শনের অকারণ-উদ্ভূত স্নেহ এই কয় মাসের অবিরত সাহচর্য্যে সুদৃঢ় বন্ধনেই পরিণত হইয়াছিল।' বৃদ্ধ পিতা বালক পার্ব্বতীকে 'চেলা' করিবার জন্য সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী মায়াপাশে বদ্ধ হইবার ভয়ে সম্মত হইলেন না। তখন পিতা-পুত্রে পুরুষোত্তম যাত্রা করিল। পার্ব্বতী সন্ন্যাসীর উপর বড়ই অভিমান করিল। তাহার প্রস্থানের পরে সন্ন্যাসী সর্ব্বত্র একটা শূন্যতা অনুভব করিতেন।

দীর্ঘ দুই বৎসর পরে পিতার মরণান্তে পার্ব্বতী সন্ন্যাসীর নিকট ফিরিল, কিন্তু এখন আর কিশোর বালক-মূর্ত্তি নহে, অপূর্ব্ব তরুণীমূর্ত্তি। সে এই বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিল,—"পিতা আমার জ্ঞানোন্মেষ হইতেই আমাকে বালক সাজাইয়া রাখিতেন, আমিও চিরদিন ঐ ভাবেই কাটাইয়া আসিয়াছি। তিনি প্রথমেই এ কথা আপনাকে জানান নাই বলিয়া, পরে পাছে আপনি কিছু মনে করেন, এই আশঙ্কায়, আর সে কথা আপনাকে বলিতে পারেন নাই। বিশেষ পথে বালিকা সঙ্গে লইয়া চলা অপেক্ষা আমায় বালক-বেশে রাখিতেই তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। পিতা শেষে এজন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার সম্মুখে আর ছদ্মবেশে আসি নাই। সারা পথ আমি বালক সাজিয়াই আসিয়াছি।" এবারেও পার্ব্বতী সন্ন্যাসীর উপর অভিমান করিল। তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অগত্যা সন্ন্যাসী তাহাকে ঐ পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু মোহপাশ ছিন্ন করিবার জন্য, বিশেষতঃ নারীসঙ্গ বর্জ্জন করিবার জন্য, দূর পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। তাহার পর যে নিদারুণ পরিণতি ঘটিল, তাহা আর বর্ণনা করিব না, পাঠকবর্গকে এই করুণরসাত্মক সমগ্র গল্পটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বলা বাহুল্য, এখানেও রীতিমত রোম্যান্টিক ব্যাপার (তবে শেষ অংশে পার্ব্বতিয়ার ছদ্মবেশ নাই)। বৃত্তান্তটি বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

শেষ কথা

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি হইতে নানাশ্রেণীর ছদ্মবেশের উদাহরণসংগ্রহ ও সেগুলির আলোচনা করিবার জন্যই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলাম; সঙ্গে সঙ্গে, এই সুপরিচিত সাহিত্য-কৌশলের মূলসূত্র কি ও নানাদেশের সাহিত্যে কৌশলটি কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করাতে, প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ ও একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। তবে আশা করি, যে সকল পাঠক সাহিত্য-কৌশলের মূলসূত্র, ইতিহাস ও তুলনা-মূলক সমালোচনার অনুরাগী, তাঁহারা এই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলিতে সঙ্কলিত নানা তথ্য অবগত হইয়া যথেষ্ট আমোদ লাভ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, যে সকল পাঠক ছয় মাস ধরিয়া একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনায় বিরক্তি-বোধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ক্ষমাভিক্ষা করিয়া এ যাত্রা বিদায় গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র ষষ্ঠ বর্ষে নূতন ভূমিকায় 'পুনরাগমনায় চ'।

বিধিলিপি

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কর্ম্ম-প্রবাহ নাকি অনন্ত;—কিন্তু মহেন্দ্রের নিকটে সম্প্রতি তাহারও অন্তদেশ আবিষ্কৃত হওয়ায়, সে আবার "কি করি, কি করি" ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িতেছিল। কর্ম্মহীন শোদপুরে আর তো তাহার চলে না। বৎসর ঘুরিতে চলিল, সে এই গ্রামে আছে, এবং অবস্থানির্ব্বিশেষে গ্রামের অর্দ্ধেক লোককে শত্রু ও মিত্র করিয়া তুলিয়াছে। বলা বাহুল্য, অসহায় এবং দরিদ্র প্রজারাই তাহার মিত্র, এবং বাকী সকলেই অন্য দলভুক্ত। গ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীযুক্ত

নায়েব মহাশয়ই সে পক্ষের প্রধান ব্যক্তি। যেখানে প্রধানে ও অপ্রধানে এমন দলাদলি, সেখানে তাহাদের সংঘর্ষও নিত্য-সত্য এবং অনন্ত। কেন না, ক্ষুদ্র-প্রাণ হইলেও সে বেচারাদের বাঁচিয়া বজায় থাকিবার স্থান এই পৃথিবীতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে! কিন্তু বিধির কি যে অভিশাপ,—বলিষ্ঠদের দুয়ারে তাহাদের অপরাধের অন্ত নাই! তথাপি এ কর্ম্মজাল মহেন্দ্রের উৎসাহকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। এ যেন আর তাহার অসাড় মনে সাড়া জাগাইয়া রাখিতে পারে না। প্রায় প্রত্যহই সেই একই ধরণের কায! সবলের পেষণ হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে গিয়া সবলের সহিত বিরোধ,—তাহার পরে গ্রামের প্রধানতম যিনি—সেই নায়েব মহাশয়ের সহিত যে বিষয়ে মতদ্বৈধ লইয়া বচসা ও বিবাদ, এবং সর্ব্বশেষে তাহাতে দুর্ব্বলের পক্ষে জয় বা পরাজয় যাহাই ঘটুক, সবলে-দুর্ব্বলে এই যে সংঘর্ষ, ইহা অনাদি অনন্ত ভাবেই চলিতে-ছিল, তাহার আর 'ক্ষয় বায়' নাই। কাজেই, এই বর্ত্তমান বিবাদ-স্রোতের মধ্যে মহেন্দ্র আর নিজেকে ডুবাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার নিজের কর্ম্ম ক্রমে তাহার নিজের কাছে অকর্ম্মের মতই হইয়া দাঁড়াইতেছিল; কিন্তু মহেন্দ্রের স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা বুঝিতে পারিবামাত্র সেই তাহার দুর্ব্বলের দল এমন করিয়া কাঁদিয়া হাট বাধাইতেছে যে, যাওয়াটাও মহেন্দ্রের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছিল। তথাপি তাহাকে যাইতেই হইবে, এমন করিয়া আর তাহার চলে না।

যদিও মহেন্দ্র তাহাদের পক্ষ লওয়ার পর হইতেই সে গ্রামের দুর্ব্বল প্রজাদের এ সব বিপদের বৃদ্ধি হইয়াছে,—মহেন্দ্র যে পক্ষে দাঁড়ায়, নায়েব মহাশয় ন্যায়-অন্যায় বিচার-হীন হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিপক্ষে দাঁড়ান্। মহেন্দ্রের স্বপক্ষতায় আপাততঃ হয় ত তাহারা জিতিয়া আসে; কিন্তু তখন হইতে তাহাদের ক্রমবর্দ্ধমান বিপদের আর অন্ত থাকে না। নায়েব মহাশয় তো আগে এমন ছিলেন না,—তাহাদের জমীদার ও জমীদারের কর্ম্মচারীবর্গের সুনাম চিরদিনই অমলিন ছিল। আজ যে মহেন্দ্রের সঙ্গে গুপ্ত কোন মনো-মালিন্যেই নায়েব তাহার উপস্থিতি মাত্রে বিরূপ হইয়া অন্যায় করিতে থাকেন, তাহাও গরীব প্রজারা কতকটা বুঝিতে পারিতেছে; তথাপি মহেন্দ্রকে তাহারা ছাড়িয়া দিতে পারিবে না। এমন হৃদয় দিয়া বুঝিবার লোক আর যে তাহারা কখনো পায় নাই! ইহার পূর্ব্বে অনেক বিবাদে প্রমাণের জোরে কিম্বা অভাবে তাহাদের জয়-পরাজয় বহুবারই হইয়াছে; কিন্তু অন্য প্রমাণের দিকে না চাহিয়া, মাত্র মনুষ্যত্বের সাক্ষ্যে এমন করিয়া তাহাদের পক্ষে দাঁড়াইবার লোক যে তাহারা আর কখনো দেখে নাই!

সব চেয়ে বিপদ হইয়াছিল মৃত উমাকান্ত বন্দ্যো-পাধ্যায়ের ত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিসান্, তাঁহার বিধবা কন্যা মহামায়া দেবীর। তাঁহার জমীজমা লইয়া তাঁহার কর্ম্ম-চারীরও বিভ্রাটের অন্ত নাই। কেন না, এত দিনের দখলী স্বত্বেরও নানা রকম গলদ বাহির করিয়া নায়েব মহাশয় সর্ব্বদা তাহাদের উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কখন্ কোন্‌টা বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়, কোন্‌টা জমীদারের খাসে গিয়া জমা হয়, কোন্ প্রবল বিপক্ষ নায়েবের স্বপক্ষতায় কোন্ জমীটা দখল করিয়া লয়—তাহার কোন ঠিক নাই। আবার তাঁহার কৃষাণ-চাকর প্রভৃতিরও বিপদের অন্ত নাই। চিরকালের নির্দ্দিষ্ট জমীতে তাহারা লাঙ্গল চষিতেছে, চাষ-আবাদ করিতেছে; হয় ত জমীদারের কাছারীর লোকে অনর্থক তাহাদের সহিত বিবাদ বাধাইয়া, মারপিট করিয়া, শেষে ধরিয়া লইয়া গেল; কেন না, অন্যে সে জমীর দখলীস্বত্ব দাবী করিতেছে। চাষ আবাদ পড়িয়া থাকিল, গ্রামের কাছারীতে সে মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতেই তাহা-দের দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। গরুগুলাকে মাঠ হইতে ধরিয়া কাছারীর লোকে পাউণ্ডে দিয়া আসে; অভিযোগ, তাহারা জমীদারের জমীতে ঢুকিয়া লোকসান করিয়াছে। মহেন্দ্র বুঝিতেছিল, বিধবার এ-সব বিপদের মূল সেই নায়েবের শ্যালিপতি শ্রীমান্ গোপীনাথ। অন্য জমীদারের উৎকোচ্ খাইয়া নায়েব নিজের অধীন প্রজার উপর এইরূপ অত্যাচার করিতেছে দেখিয়া মহেন্দ্র ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়াছিল, এবং সেই হইতে এই বিধবার যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া বিবাদ ছাড়া তাঁহার বেশী কিছু ক্ষতি হইতেও দেয় নাই। কিন্তু তাহাতে মহেন্দ্রের আর এক বিপদ জন্মিতে-ছিল। তাহার আশ্রিত স্বপক্ষীয় লোকগুলি পর্য্যন্ত যখন আনন্দ-সম্ভ্রমের সহিত মহামায়া দেবীকে মহেন্দ্রের ভাবী শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী নামে অভিহিত করিয়া, মহেন্দ্রকে নিজ গ্রামে একেবারে আপনার ভাবে পাইবার আশা জানাইয়া

আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন মহেন্দ্র মহামায়া দেবীর পক্ষ লইয়া নায়েব মহাশয় ও বিপক্ষ-প্রধানদের নিকটে যে ঈষৎ বিদ্রূপ-হাস্যের উপহার পাইতেছিল, তাহার কারণ বুঝিতে পারিল। ইহাতে তাহারও একটু হাসি আসা ছাড়া অন্য কোন বিকার মনে আসিল না; কিন্তু পাছে মহামায়া দেবী শুনিয়া কোনরূপ কিছু ভাবিয়া বসেন—এই একটু আশঙ্কা মাঝে-মাঝে মনে আসিতেছিল। নায়েবের সহিত তাহার নিজেরও এই ক্রমবর্দ্ধনশীল বিবাদ-স্রোতকে আর তাহার ভাল লাগিতেছিল না। মহেন্দ্র গেলে তাহার সূত্র ধরিয়া দুর্ব্বল প্রজারাও আর অনর্থক উৎপীড়িত হইবে না, এই কথাটাও আর বাড়িতে পাইবে না; কিন্তু মুস্কিল এই—সেই প্রজারাই যে তাহাকে ছাড়িতে চাহে না। আর সে গেলে, মহামায়া দেবীরও যে বিপদের সীমা থাকিবে না, তাহাও মহেন্দ্র বুঝিতেছিল। যদি মহেন্দ্র এ-সব বিষয়ে জমীদারের শক্তি গ্রহণ করিত, যদি দেওয়ান প্রমুখ কামাখ্যানাথকে কিছু কিছু জানাইত, তাহা হইলে মহেন্দ্রের এ সব ব্যাপারে এত বেগ পাইতে হইত না। জমীদারের পরিদর্শক বলিয়া চিহ্নিত হইলেও, সে কেবল আপনার মনুষ্যত্বের স্বাধীন শক্তির বলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া যাইত; এবং তাহার ফল যাহাই হউক, সে বিষয় লইয়া জমীদারের নিকট নালিশ পাঠাইত না। নায়েব প্রথমটা তাহাকে ভয় করিয়াই চলিতেন; কিন্তু ক্রমে তাহার স্বভাব বুঝিয়া লইয়াছেন। সম্মুখে অসম্মান করিতে সাহসী না হইলেও, তলে-তলে তিনি এখন মহেন্দ্রকে সর্ব্বদা উদ্বাস্ত করিয়া সেখান হইতে তাড়াইবার চেষ্টায় আছেন। মহেন্দ্র বা মহেন্দ্রের সাহায্যপ্রাপ্ত প্রজাগণ জমীদারের নিকট এই সব হাঙ্গাম লইয়া বিচারপ্রার্থী না হইলেও, নায়েব মাঝে মাঝে দেওয়ানকে জানাইতেছেন যে, মহেন্দ্রের উত্তেজনায় ক্রমশঃ সে গ্রামের গরীব ও কোন-কোন সমৃদ্ধিশালী প্রজা জমীদারের বিপক্ষতাচরণ করিতেছে। দেওয়ান এমন নালিশ পাইয়াও যে এ পর্য্যন্ত তাহার কোন উচ্চ-বাচ্য করিলেন না, মাত্র এই খট্‌কাতেই নায়েব এখনো মহেন্দ্রের প্রকাশ্য বিপক্ষতা-চরণ করিতে নিরস্ত আছেন; এবং মনে মনে একটু ভয়ও রাখেন। নহিলে এই যুবককে তিনি একবার দেখিয়া লইতেন।

নূতন কোন বিভ্রাটে পড়িয়াই বোধ হয় মহামায়া দেবী কয়েক দিন হইতে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেছেন; কিন্তু মহেন্দ্র নিজের মনের অস্থিরতায় অন্য কোন দিকে আর মন দিতে পারিতেছিল না। তাই 'যাব, যাচ্চি' বলিয়াও সে দিকে যাইতে পারে নাই। আজ যখন সে জমীদারের প্রেরিত লোকের মারফৎ কাত্যায়নীর পত্রে মাতার ব্যারামের সংবাদ আর তাহাকে বাড়ী যাইবার জন্য অনুরোধ পাইল, ঠিক্ সেই সময়ে মহামায়া দেবীর কর্ম্মচারী আসিয়া তাহাকে ডাকিল, "মশায়, এখনি একবার আপনাকে যেতেই হচ্চে। মা অস্থির হয়ে পড়েছেন, আমরা বড়ই বিপদের আশঙ্কা করছি।" মহেন্দ্র বিরক্তপূর্ণস্বরে বলিল, "আমার এখন মোটেই সময় নেই। আমায় এখ্‌খনি বাড়ী যেতে হবে মশায়—" "বাড়ী যাবেন? তা'হলে কিছু দিনের মতই? তা'হলে কি উপায়!" বৃদ্ধ বেচারা দুর্ভাবনার সমুদ্রে পড়িয়া যেন কূল পাইবার আশায় ঘন-ঘন মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল। মহেন্দ্র তাহার গতিক দেখিয়া অগত্যা জিজ্ঞাসা করিল, "কি আবার নতুন বিপদ হ'ল আজ? এ সব দাঙ্গা-হাঙ্গামাই তো?" "না মশায়, এ বড় সঙ্গীন্ কথা,—এখানে তা বলা যেতে পারে না। মা বলে দিলেন, এ বিপদে আপনি ভিন্ন তাঁর আর গতি নেই। একবার দয়া করে—" "চলুন যাচ্চি, কিন্তু শোনা ছাড়া আর কোন কিছু বোধ হয় আপনাদের করতে পারব না। আমায় এখনি বাড়ী যেতে হবে।" "সেইটুকুই আমাদের এখন যথেষ্ট। আপনার একটা পরামর্শেরই বিশেষ দরকার।"

মহামায়া দেবী কথা কহিবার পূর্ব্বেই মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "আমায় এখনি বাড়ী যেতে হবে, আমার মার বড় ব্যারাম।"

"তোমার মার?" বিস্মিত ভাবে মহামায়া মহেন্দ্রের পানে চাহিলেন, "তুমি যে বলেছিলে, তোমার মা নেই?" মহেন্দ্র অসহিষ্ণু ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আছেন।" "তিনি তোমার গর্ভধারিণী মা কি বাবা?" "তার চেয়েও অনেক বেশী,—তিনিই আমার মা।" মহামায়া বুঝিলেন। বলিলেন, "তাঁর কি কঠিন অসুখের খবর পেয়েছ?" "হাঁ, গিয়ে দেখ্‌তে পাই তো ভাল।" বলিতে-বলিতে মহেন্দ্রের স্বর রুদ্ধ এবং শরীর মৃদু মৃদু কম্পিত হইতে লাগিল। কাত্যায়নী অবশ্য এমন কথা লেখে নাই; কিন্তু মহেন্দ্রের এমনি মনে

হইতেছিল। মহামায়া মহেন্দ্রের ভাব লক্ষ্য করিয়া কুণ্ঠিত ও ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তবে আর কেন সময় নষ্ট করছ বাবা, এখনি রওনা হও গিয়ে।" "আপনার কর্ম্মচারী বল্লেন আপনাদের খুব বিপদ।" "হ্যাঁ, কিন্তু তবু তোমার সময় আর নষ্ট করতে পারিনে। ভগবান যা করেন, আমাদের তাই হবে।"

মহেন্দ্র বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সহসা বিধবা ব্যগ্রস্বরে বাধা দিয়া বলিল, "বাবা, একটা কথা। তোমার বাড়ীও না জমীদারের গ্রামে?" "হ্যাঁ।" "তা'হলে তাঁকে কি একবার জানালে হয় না যে, তাঁর প্রজার ওপরে অন্য জমীদারের লোকে কোন্ অধিকারে ক্ষমতা চালায়?" মহেন্দ্র একটু ভাবিয়া বলিল, "সে ক্ষমতা কারো হয় না, যতক্ষণ না তারা ঘরভেদী বিভীষণের সাহায্য পায়! বোধ হয় নায়েব মশায় এর তলে আছেন।" "সে তো বুঝ্‌তেই পারা যাচ্চে। সেইজন্যই বল্‌ছি বাবা, জমীদারকে যদি একটু—" মহেন্দ্রের অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী দেখিয়া মহামায়া দেবীর স্বর ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। মহেন্দ্র বলিল, "কিন্তু তাতে অনেক কথাই আপনার তাঁকে জানাতে হবে। আপনি নবগ্রামের জমীদারবধূ। এ জমীদারের চেয়ে আপনার শ্বশুরকুলের মান-প্রতিপত্তি কিছু মাত্র কম নয়। সেই বংশের বধূ আপনি, অথচ তাদেরই হাতে এই ভাবে লাঞ্ছিত হচ্চেন,—সমকক্ষ লোকের কাছে এর জন্যে সাহায্য-ভিক্ষা—এ কি অনেকখানি লজ্জারই কথা নয়?"

মহামায়া দেবী কিছু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "আমি যখন বাপের কুলেই আশ্রয় পেয়েছি, তখন সে অভিমান আমার মিথ্যা নয় কি বাবা? আমি যখন এঁরই প্রজা হয়ে আছি, তখন এঁর কাছে সাহায্য-ভিক্ষায় আমার লজ্জার বিষয় হতে পারে কি? আর চিরকাল এঁর কথা যা শুনে আস্‌ছি, তাতে এ রকম জমীদারের কাছে এ বিষয় জানালেও বোধ হয় অন্যায় কিছু হত না।"

মহেন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনি জানাতে পারেন, তাতে আমার বাধা দেবার কিছু নেই; কিন্তু আমার দ্বারা সে কাজটা বাদ্ দিয়ে দেবেন। আমি যদি আপনাদের কোন কিছু সাহায্য করতে পেরে থাকি, সেটুকু কেবল—মানুষ নিজের ক্ষমতার ওপরে যতটুকু বিশ্বাস রাখে—সেইটুকুই মাত্র নিয়ে করেছি। সত্য, ন্যায় আর সহৃদয়তা—মনুষ্যত্বের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। তবে বেশী যেটা, সেটা তার নিজস্ব কিছু নয়; সে জোরের বল মাত্র। তার পেছনে কিছু একদেশ-দর্শিত্ব, কিছু অন্যায় বিচার—এ থাক্‌বেই। আমি সেই জোরের আশ্রয় নিতে অপারগ জান্‌বেন। আপনি অন্য কারও দ্বারা জানান।" যে উপকারী যুবক তাঁহাকে মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে, এবং এ পর্য্যন্ত অশেষ প্রকারে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে,—গ্রামের দুর্ব্বল, বিপন্ন ব্যক্তিরা যাহাকে একপ্রকার দেবতা বলিয়াই জানে—তাহার মুখে জমীদারের সাহায্য নেওয়ার প্রস্তাবে এরূপ কথা শুনিয়া কমলার মাতা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। না জানি, মহেন্দ্র তাঁহাকে কি অকৃতজ্ঞই ভাবিতেছে! এর চেয়ে যে তাঁহার যে কোন বিপদও প্রার্থনীয়। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি আগে তা'হলে তোমার মা কেমন আছেন দেখে এস; তার পরে আমার বিপদের গুরুত্ব শুনে যেমন পরামর্শ দেবে তেমনি আমি করব।" মহেন্দ্র বলিল, "হয় ত আমি আর এ গ্রামে না আস্‌তেও পারি।" মহামায়া দেবী যেন সহসা অপ্রত্যাশিত আঘাতে বসিয়া পড়িলেন, স্তব্ধ নেত্রে কিছুক্ষণ মহেন্দ্রের পানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"আর এ গ্রামে তুমি আসবে না? বুঝ্‌লাম, তা'হলে আর আমার কন্যা'র কোনই আশা নেই।"

সেই ব্যথিতার মুখচ্ছবি মহেন্দ্রের হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল। এই বিপদাপন্ন রমণীদের কতটুকু উপকারই বা সে করিয়াছে? কিন্তু ইহারা যে মহেন্দ্রের উপরে কতখানি ভরসা রাখে, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই মহেন্দ্র আজ বুঝিতে পারিল। সঙ্গে-সঙ্গে সন্তানের অমঙ্গল-চিন্তায় মাতার অপরিসীম বেদনার সেই আভাযে মহেন্দ্র নিজের মাতার মুখকান্তি কমলার মাতার মুখে পরিস্ফুট দেখিল। নিজের চিন্তাকে বড় করিয়া সে যে একজন মাতাকে আবার আঘাত দিতেছে! মহেন্দ্র ধীরে-ধীরে নিজের অজ্ঞাতেই বলিল, "আপনি যদি বলেন,—আপনার যদি কোন বিশেষ দরকার থাকে,—আবার আস্‌ব"। "বিশেষ দরকার? এ কথার উত্তর কি দেব বাবা! সব তো তোমায় বলেছি। এবারে তারা মরিয়া হ'য়ে লাগ্‌বার উপক্রম করছে। তাতে যদি তুমি আর না এস,—আর বেশী কথা বলে তোমার বিপদের সময় তোমার মনে

আর কোন ভাবনা দিতে চাই না। কেবল এইটুকু বল্‌ছি, বৃথা এতদিন আমাদের এত সব উপকার করেছ। যদি কমা'ই আমার গেল—এ সবে আমার কি কাজ!—কি হবে এ ধনজনে?" "আপনি ভাব্‌বেন না মা, আমি নিশ্চয় আবার আসব্‌" "এই কথাটুকুই তোমার আমাদের পক্ষে অনেক! এই ভরসাতেই সব বিপদের সঙ্গে যুঝ্‌তে পারব।" মহেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

* * * *

মহেন্দ্রের যাহা আশঙ্কা হইতেছিল, মাতাকে সেই রকমই সে দেখিল,—সংজ্ঞার লেশমাত্র নাই। মহেন্দ্রের অবশ, স্তব্ধ ভাব দেখিয়া কাত্যায়নী মৃদুস্বরে বলিল, "ভয় পেও না; কবিরাজ বলেছে, আশা আছে।" এ কথা কাত্যায়নী মহেন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজেকেই বলিল; কিন্তু যাহাদের শুনাইল, তাহাদের কেহই এ কথায় যেন নির্ভর পাইল না। মহেন্দ্র বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "ভয় নয় কাত্যায়নি, পৃথিবীর সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধচ্ছেদ,—এই-টুকু মাত্র! ভয় কিসের? এ যে একেবারে মুক্তি!" কাত্যায়নী মাথা নামাইল। নিজের মনের বেদনার উপর মহেন্দ্রের অন্তরের পুঞ্জীকৃত আঁধার ক্রমে যেন তাহার নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তুলিতে লাগিল। মহেন্দ্রকে সে ভয় পাইতে বারণ করিতেছে; কিন্তু তাহাকে কে আশ্বাস দিবে - কে অভয় দিবে? মহেন্দ্রের তীব্র বেদনার উদ্দাম মুক্তির কাছে তাহার নিজের এই নিরাশ্রয়ত্বের চিন্তাও যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই দুইটী বাহ্য সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির কাছে তাহার কাটিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তর বাহির হইতেও একটা শক্তি না পাইয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মে ক্রমে যেন শিথিল-চেষ্ট হইয়া পড়িতেছিল।

বাহিরে শব্দ হইল। কাত্যায়নী বুঝিল, রমা আসিতেছে। তাহার অবসাদ-গ্রস্ত মস্তক ও চক্ষু এক ভাবেই রহিল, আগন্তুকের উদ্দেশে দ্বারের দিকে ফিরিল না! রমা আসিতেছে আসুক!

"কাত্যায়নি!" চমকিয়া কাত্যায়নী মস্তক তুলিল,—দ্বারের সম্মুখে কামাখ্যানাথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। "এ কি! এঁর এমন অবস্থা?" কোন উত্তর না পাইয়া তিনি নিজেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রোগিনীর নিকটে বসিলেন। শোকবিমূঢ় মহেন্দ্রকে তাঁহার নিকটে উবুড় হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার পৃষ্ঠে হস্ত দিলেন, "মহেন্দ্র!" মুহূর্ত্তে তীরের মত বেগে মহেন্দ্র উঠিয়া বসিল। তাহার ভাবে একটু বিস্মিত হইলেও, কামাখ্যানাথ সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কবে এসেছ?" মহেন্দ্রও একটু সাম্‌লাইয়া লইল; মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "ঘণ্টাকতক মাত্র।" কামাখ্যানাথ কাত্যায়নীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "নিরু কি রমুর মুখে এতখানি অসুখের কথা তো শুনিনি। কবিরাজ কোন চিন্তার কারণ নেই বলেছেন, শুনেছিলাম। এমন অজ্ঞান হয়েছেন কবে থেকে?" "আজই শেষরাত্রি থেকে।" "চন্দ্রনাথ কবিরাজ মহাশয়কেই কি ডাকা হয়েছিল?" "না—অন্য আর একজন কে।" "ভয় পেও না, আমি এখনি তাঁরে ডাকাচ্ছি,"—কামাখ্যানাথ উঠিয়া গেলেন। কাত্যায়নী মহেন্দ্রকে বলিল, "উনি নিজে উঠলেন! তোমারই যাওয়া উচিত ছিল, ওঠো তুমি।" মহেন্দ্র কাত্যায়নীর পানে একটু চাহিয়া বলিল, "আমার সব কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেছে কাত্যায়নি! যেটুকু ছিল, এইবার তারও শেষ! তোমাদের কায তোমরা কর।" বিরক্তভাবে কাত্যায়নী কি বলিতে যাইতেছিল—মহেন্দ্রের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই থামিয়া গেল। তার পরে দৃষ্টি পড়িল তাহার নিজের অন্তরের উপরে। এইই কি সে এতক্ষণ চাহিতে-ছিল? এই গভীর কণ্ঠ, উদার দৃষ্টি এবং নিঃশব্দ সহানুভূতির বলেই কি তাহার অবসাদগ্রস্ত অন্তর আবার এমন সতেজ হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে উন্মুখ হইল? যে তীব্র অবসাদের সংক্রামক রোগ তাহাকে এতক্ষণ অবসন্ন, নিস্তেজ করিয়া ফেলিতেছিল, তাহা হইতে এ মুক্তি তাহাকে কে দিল? নিরাশ্রয়ত্বের ভাবী বিভীষিকাও মুহূর্ত্তে কোথায় সরিয়া গিয়া তাহার দারুণ শোকাচ্ছন্ন মনকেও যাহাতে কর্ত্তব্যের একটা দৃঢ় বল আনিয়া দিয়াছে, তাহার কারণ কি উঁহারই আগমন! সঙ্গে-সঙ্গে মহেন্দ্রের মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতেই কাত্যায়নী একটু লজ্জা পাইয়া নিস্তব্ধ হইল।

চন্দ্রনাথ কবিরাজ মহাশয় কয়েক দিন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কাত্যায়নীর মাতাকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার চরম সময় উপস্থিত হইল। নিদাঘ-অপরাহ্নে গঙ্গাগর্ভে অন্তর্জ্জলীর শয্যায় মুমূর্ষুর শেষ জ্ঞান নিভিবার আগে দীপ শিখার মত সহসা একটু জ্বলিয়া

উঠিল। কথা কহিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু কাত্যায়নীর মুখের পানে পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; রোরুদ্যমান মহেন্দ্রকে ইঙ্গিতে নিকটে আনিয়া হস্তের দ্বারা তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন। তার পরে কামাখ্যানাথের পানে দৃষ্টি ফিরাইলেন। কামাখ্যানাথ তাঁহার নির্ব্বাক ভাষা যেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কর্ণের নিকট মুখ লইয়া বলিলেন, "আপনার ছেলেমেয়ের জন্য ভাববেন না—আপনি এখন কেবল ইষ্টচিন্তা করুন।" কিন্তু এ কথায় মাতার সে ভাবনার নিবৃত্তি হইল না। তিনি মহেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া নিজ ললাট স্পর্শ করিয়া উর্দ্ধে অঙ্গুলী-সঙ্কেত করিলেন। তার পরে কামাখ্যানাথের হস্ত ধরিয়া তাঁহার হস্তের উপর মহেন্দ্রের হস্তটি রাখিলেন। কামাখ্যানাথ বুঝিয়া গাঢ় স্বরে বলিলেন, "ভগবান কর্ত্তা, তবে আমার সাধ্যে কোন ত্রুটি হবে না।" তখন যেন নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। খাটের বাজুতে সংলগ্ন কন্যার মস্তক নিকটেই ছিল; একবার যেন মাথা তুলিয়া মুখ দেখিতে ইচ্ছুক ভাবে কন্যার মস্তক স্পর্শ করিয়া অস্ফুট কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা কাতু!" অসম্বৃতা কাত্যায়নী দ্বিগুণ অবশ ভাবে সেই মুমূর্ষুর বুকের মধ্যেই মুখ লুকাইল; এবং কিছুক্ষণ পরে সহসা অনুভব করিল, তাহার মস্তকের নিকটের সেই অতি মৃদু বক্ষোস্পন্দন কখন থামিয়া গিয়াছে!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শ্রাদ্ধাদি শেষ হওয়ার দিন-দুই পরেই মহেন্দ্র কাত্যায়নীকে বলিল "আমায় শীগ্গির যেতে হবে।" কাত্যায়নী একটু যেন বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া বলিল, "এখনি? জমীদার কি যেতে বলেছেন?" "না, তিনি কিছু বলেন নি, আমিই যাবার দরকার মনে কর্‌ছি।" "তা'হলে যাও; কিন্তু আমি যে এমনি একা অসহায় হয়ে থাক্‌লাম, এ-কথা এক-একবার মনে কোরো।" "অসহায়—কাত্যায়নি?" —মহেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু কাত্যায়নীর ম্লান মুখের পানে চাহিয়া আর সে কথা মুখে আসিল না। একটু থামিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "একা সত্য,—কিন্তু আমার দ্বারা আর কোন প্রতিকার হবার আশা কই!" "কেন থাকবে না! তুমি কি আমায় একটী সঙ্গী করে দিতে পার না? একটু সংসার পাতিয়ে দিতে পার না?" মহেন্দ্র হাসিল,—"মাকে এর জন্য কত মনোকষ্ট দিয়ে জগৎ থেকে বিদায় দিলাম। তাঁকে যা' দিতে পার্‌লাম না, তা কি তোমায় পারব!" "তাঁর চেয়েও আমার অবস্থা খারাপ হল না কি? আমাকে এমনি একা রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারবে কি?" "তোমার জন্য ভাবনা-চিন্তার কিছুই যে আমার দরকার নেই। বাবা যাওয়ার পরেই তা যে আমায় জানিয়ে দিয়েছ। আজ আবার এ নতুন কথা কেন? তুমি আমার কে, যে, আমি তোমার জন্য ভাব্‌ব, বা এতখানি কর্‌তে যাব?" কাত্যায়নী যোড় হস্তে মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "ক্ষমা কর! আর মার নামে আমায় তোমার সেই এতখানিই আজ ভিক্ষা দাও! পারবে না কি তা আমায় দিতে?" "কাত্যায়নি! যা তুমি চাইছ, তা যে কতখানি, তা একবার ভেবেও দেখেছ কি? দেখনি,—তাই চাইতে পারছ—নৈলে কখনো পার্‌তে না!—বল, ভেবেছ কখন তা?" মহেন্দ্রের অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চক্ষু এবং উত্তেজিত ভাবে কাত্যায়নী যেন বিমূঢ় হইয়া পড়িল; অন্যমনার ন্যায় অন্যদিকে চাহিয়া ধীরে-ধীরে উত্তর দিল, "না।" "তবে? তবে এ অনুরোধের তোমার অধিকার নেই।" কাত্যায়নী এইবার মহেন্দ্রের পানে চাহিয়া যেন প্রবুদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতে-করিতে বলিল, "অধিকার নেই? চিরদিন এক মায়ের কোলে এক বাপের স্নেহে দু'জনে ভাই-বোনের মত মানুষ হয়েছি। আজ তোমারও যেমন কেউ নেই, আমারও তুমি ছাড়া কেউ নেই। আর কি তোমার—" "না—না, কাত্যায়নি, সে অধিকার তোমার যে নেই, সে এখনি নিজ মুখেই তুমি বলছ। আমারও আর এ কথা বার-বার শোনার মত ক্ষমতা নেই! আমি আজ চল্লেম।" "যাও!" বদ্ধাঞ্জলি খুলিয়া ফেলিয়া কাত্যায়নী নিঃশব্দে রহিল। মহেন্দ্র একটু পরে বলিল, "একা থাক্‌তে হবে বলে তুমি কেন এত ভাব্‌ছ! যিনি তোমার অভিভাবক তিনি তোমায় কখনই তা রাখবেন না।" কাত্যায়নী মহেন্দ্রের স্বরে এইবার মুখ তুলিয়া ঈষৎ অধীর কণ্ঠে বলিল, "আমার অভিভাবক, আর তোমার ন'ন্? এই না সে দিন তোমার মা মৃত্যুকালে তোমায় তাঁরই হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন?" মহেন্দ্র একটা বিকৃত হাসি হাসিয়া বলিল, "তার বহু-বহু দিন আগে হতে মা আমায় যাঁর হাতে সঁপে দিয়েছেন, স্বেচ্ছায়, সানন্দে—অনেক সাধ করে,—তার হাত থেকে আমায় হস্তান্তর করতে আর তাঁরও সাধ্য ছিল না—তা যে তিনি জানতেন

না'।—সে কথা যাক্; কিন্তু তুমি যে আমার মুখে জমীদারের সম্বন্ধে একটি শব্দও সহ্য করতে পারছ না—এই আমার এক পরম উপভোগ্য বিষয় হ'ল দেখ্‌ছি।" "বিনা কারণে কি কায হয়? তোমার সে শব্দটারও কিছু গলদ থাকে—এ নিশ্চয়।" "হ্যাঁ—তা মানি বই কি—ক্রমশঃ আরও বেশী মান্‌তে হবে হয় ত। কাত্যায়নি, আমার মুখ চেয়ে আর কেন এমন একা হয়ে থাক। এইবার—আর দেরী কর না —নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে দাও আমায়! নিশ্চিন্ত কর—আর না।"

"আবার বল্‌ছি মহেন্দ্র, আমার মূর্খতার জন্য মাপ কর! সত্যই আমার জন্য আমারও চিন্তার কিছু নেই, তোমারও আমার জন্য ভাব্‌বার কিছু নেই! আমি তোমায় যা বলেছি, তা প্রত্যেক বোনেই ভাইকে বলে থাকে। সেইটুকু মাত্র,—তার বেশী নয়।" মহেন্দ্র জ্বালাময় হাসি হাসিয়া বলিল, "তা জানি, তোমার এ কৌশল আমারও বুঝতে বাকী নেই।" "কৌশল?" "কৌশলই নয় কি? কিন্তু ব্যস্ত হয়ো না; তুমি লজ্জায় না পার্‌লেও, তোমার অভিভাবক এইবার তাঁর লোকলজ্জা আর ধর্ম্মভানের খোলস্ ছাড়্‌বার খুবই সুবিধা পাবেন। একা অসহায় অবস্থায় কি করে তিনি এখন তোমায় রাখবেন?" মহেন্দ্র আরও কি বলিত, কিন্তু এইবার সরোষে তাহাকে বাধা দিয়া কাত্যায়নী বলিয়া উঠিল, "যাও, যাও তুমি, তোমার সঙ্গে আর আমার কোন কথা নেই।" "যাবার জন্য তো আমি প্রস্তুতই, কিন্তু এইবার যখন দেখা হবে, তখন তোমার স্বামীর ভৃত্য—আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই কি থাকবে! কথা তো পরের কথা!" বর্দ্ধিত রোষে কাত্যায়নী গৃহান্তরে চলিয়া গেল। ক্রমে কিন্তু আর রাগের সে উত্তাপ রহিল না। এক কোণে কেবল স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল, কোন কিছু ভাবিবারও যেন সে শক্তি পাইতেছিল না।

অঙ্গন হইতে সহসা একটা কণ্ঠস্বর পাইয়া সে চমকিয়া উঠিল। দ্বারের অন্তরাল হইতে দেখিল, উঠানে কামাখ্যানাথ দাঁড়াইয়া মহেন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন। কি কথা, তাহা শুনিবার দিকে কাত্যায়নীর মন গেল না। সে কেবল তেমনি স্তব্ধ, বিমনা ভাবে দুইজনের দিকে চাহিয়া রহিল। দুইজনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাবভঙ্গী, দুই রকমের কণ্ঠস্বর তাহার নিষ্ক্রিয় মনের উপর ছায়াবাজীর মত খেলিয়া যাইতেছিল মাত্র। একজনের কণ্ঠস্বর কখনো উত্তেজিত, কখনো বিকৃত,—আবার যেন লজ্জিততর মৃদুতায়—ঝড়ের নানা বিকারের মতই উঠিতেছে, নামিতেছে। আর একটি গম্ভীর, স্নিগ্ধ কণ্ঠ একই ভাবে গভীর জল-স্রোতের ন্যায় একটা শব্দ মাত্র সৃষ্টি করিতেছে। সে স্বরে জলের মত একটা সহজ স্নিগ্ধতা ও সারল্য যেন শ্রোতার কর্ণে বিনা আয়াসেই প্রবেশ করে। এক জন স্থির, ধীর, অটল অথচ স্নিগ্ধ শ্যামলতায় বর্ষার তরুর মত। আর একজন যেন উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গশালী ঘূর্ণাবর্ত্তময় গৈরিকবর্ণ জলরাশি। সহসা মহেন্দ্রের তীক্ষ্ণ একটা কথা কাত্যায়নীর কাণে গিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। মহেন্দ্র বলিতেছে, "আমার সেজন্য এখানে দেরী করবার দরকার দেখিনে। যা স্থির হয়, আমায় জানাতে ইচ্ছে করেন, জানাবেন;—সেই যথেষ্ট।" কাত্যায়নী যে ঘরে আছে সেই গৃহের পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল। গৃহের ভিতর হইতে সে কটাক্ষ দেখিয়া কাত্যায়নী একটা অজ্ঞাত ভয়ে সহসা শিহরিয়া উঠিল। কামাখ্যানাথ অন্যমনস্ক ভাবে উঠানেই পায়চালি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন দেখিয়া, কাত্যায়নী তখন বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে বসিতে আসন দিল। সে দিকে দৃষ্টি না করিয়া কামাখ্যানাথ কি একটা প্রশ্নের মীমাংসায় যেন কাত্যায়নীর মুখের পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টিতে কাত্যায়নীর মুখ আপনিই নামিয়া পড়িল। কামাখ্যানাথ তখন বলিলেন, "তুমি আমায় একটু সাহায্য করবে?" কাত্যায়নী বিস্মিত ভাবে চাহিল; কিন্তু সে কথার উত্তর না দিয়া কেবল বলিল, "বলুন।" "বলি,—কি বল, সাহায্য করতে পার্‌বে?" "বলুন, শুনি।" "তোমার আর মহেন্দ্রের সম্বন্ধে এখন আবার কিছু স্থির করবার দরকার হচ্চে—মান তো?" "নতুন করে আরও কিছু স্থির করতে চান্ কি?" "হ্যাঁ; কেন না, এখন তোমরা একেবারে অভিভাবকশূন্য।" "আপনি বর্ত্তমানে এ কথা আমরা একেবারেই ভাবি না।" "তোমায় আমি মিনতি করছি, এ রকম করে কথার প্রথমেই আমার মুখ বন্ধ ক'র না। তোমার নিজের কথা না হয় ছেড়ে দাও; কিন্তু মহেন্দ্রকে তোমার মা যে ভাবে আবার আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, তাতে তোমার চেয়েও যে এখন মহেন্দ্রের উপর আমার কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বেশী হচ্চে, তা' একবার ভেবে দেখাও

তোমার উচিত।" "তার জন্য কি কর্‌তে চান্?" "তোমার মার যা একান্ত ইচ্ছা ছিল তাই, তার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করা।" "এ কথা তাকে বল্‌লেন কি?" "হাঁ, সে কোন কিছু স্থির কর্‌বে না। তাই আমি তোমার কাছে—এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য—পরামর্শ চাই।" "সত্যই যদি তা চান্ তা'হলে যে যেমন থাক্‌তে চায়, তেমনি তাকে থাক্‌তে দেন আমার এই পরামর্শ।" "তা একেবারেই অসম্ভব! তোমায় এক কথায় বলি, তোমরা অবিবাহিত, এই বয়স তোমাদের; তাতে সহোদর-সহোদরা নও,—এ রকম ভাবে থাক্‌লে লোক-নিন্দার হাত হ'তে নিস্তার পাবে না।" "কি কর্‌তে বলেন?" "তুমি নিজের বিষয়ে একটা কিছু স্থির কর,—নৈলে মহেন্দ্রকে আমি বিয়েতে বাধ্য করতে পারব না বুঝ্‌তে পার্‌ছি।" "তা'হলে আমার বিয়য়ে যা স্থির হবার তা যে হয়ে গেছে, তাকে এ কথা বোঝালেন না কেন?" কামাখ্যা-নাথ হাসিয়া বলিলেন, "এ কথা তোমার মত বালিকার মুখেই সাজে—আমার পক্ষে তা সাজে না। কাত্যায়নি, যদি কিছু সংশোধন কর্‌বার থাকে, এখনো সময় আছে—এখনো এ কথাটা ভাল ক'রে বুঝে ছাখো। ঝোঁকের বশে নিজের জীবন মাটি কর—তাতে কারও তেমন কিছু বলবার নেই; কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যের জীবনও ধ্বংস করে দেবার তোমার কোন অধিকার নেই।" কাত্যায়নী মুখ তুলিয়া একটু জোরের সহিত বলিল, "আপনি কি বল্‌তে চান—বুঝিয়ে বলুন।" "আমার মনে হচ্চে—মহেন্দ্রের বিষয় তুমি একটুও ভেবে দেখ্‌ছ না! নিজের জেদে জগতের দিকে অন্ধ হওয়া উচিত কি? পরে এর জন্য,—এখনো সময় আছে, ভুল ক'র না।" কাত্যায়নী অধীর স্বরে বলিল, "স্পষ্ট করে বলুন। মহেন্দ্র আমার ভাই। কি ভুলের কথা বারে-বারে বলছেন আপনি?" কামাখ্যানাথ মাথা নাড়িলেন, "তোমার মা তোমাদের ভাই-বোন্ বলে তো বোঝান্ নি—" "আমার বাবা আমায় বুঝিয়ে রেখেছিলেন। অবাচ্য কথা আর বেশী আলোচনা করবেন না।" কাত্যায়নীর সজোর স্বরে ও দৃঢ় মুখভঙ্গীতে অগত্যা কামাখ্যানাথ নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কাত্যায়নী কিছুক্ষণ পরে বলিল, "আর কিছু বলিবার আছে আপনার?" "আরও একটু আছে। মা নেই—তবু তুমি একা এই বাড়ীতে এই ভাবে থাক্‌বে?" "একা থাকি না তো! রমা তার বুড়ো ঝি মাকে রাত্রে আমার কাছে পাঠায়। দিনে বিধুর মা সর্ব্বক্ষণ থাকে! আপনারা আমার রক্ষক, আমার ভয় কিসের?" "এতে আমার আর জোর চলে না; কিন্তু আর এক কাজ করলেও তো পার! আমার বাড়ীতে আমার অনেক প্রবীণা আত্মীয়া আছেন,—রমা আছে; তুমি সেইখানে কেন চল না।" কাত্যায়নী মস্তক নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। "গেলে বোধ হয় সব দিকেই ভাল হ'ত। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যে কথা উঠেছিল, সে কথা অনেকে জানে,—তুমি কি সেই কথা ভাব্‌ছ? তুমি আমার বাড়ীতে থাক্‌লে বরং তোমার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তার কোনই দরকার হবে না; কিন্তু এ রকম ভাবে যদি থাক, আমায়ও যে মাঝে-মাঝে আস্‌তে হবে, মনে রেখো।" "আপনি তা যদি অন্যায় মনে করেন, নাই এলেন! এই ভয়ে আপনি কি ব্যস্ত হচ্চেন? কি দরকার আপনার আসার?—আমি—" হঠাৎ কাত্যায়নী অনুভব করিল, তার নিজের স্বর কেমন যেন একটু হইয়া উঠিতেছে। অর্দ্ধ পথে থামিয়া একটু চুপ করিয়া লইয়া নিজের বক্তব্য সমাপ্ত করিল—"রমাকে দিয়েই মাঝে মাঝে একটু খোঁজ নেবেন।" কামাখ্যানাথ কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে কাত্যায়নীর পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন, "মহেন্দ্রের বিষয়ে এ কথা এতো অবাচ্য বলেই তোমার ধারণা থাকে যদি—, এই যদি তোমার শেষ কথা হয়, যদি এই পথেই চল্‌তে চাও—তা'হলে এরও একটা স্পষ্ট দিক নাও। আমার সঙ্গে তোমার অসঙ্গতির বিষয়েও তা হলে আর ভেব না। বিবাহেই রাজী হও। এতে তোমারও ভাল,—মহেন্দ্রের পক্ষেও বোধ হয় ভাল হবে।" "সেই ভালটুকুর জন্য আপনার এত বড় মন্দ আমি কখনই করব না, এও স্থির জেনে রাখুন।" "শুধু তাই নয়,—তোমাদের ভালতে বুঝি আমারো ভাল হ'ত। মহেন্দ্রের বা তোমার মন্দতে আমারও যে কিছু ভাল হবে এ যেন আমার মন বল্‌ছে না।" "এমন কখনই হবে না। আমাদের মত তুচ্ছাতিতুচ্ছ আশ্রিতদের অমঙ্গলে যিনি নিজের অমঙ্গল মনে করেন,—বিধাতা তাঁরও অমঙ্গল যদি বিধান করেন,—তাঁর সে বিধিকে কে শ্রদ্ধা কর্‌বে!" "তাতে তো তাঁর বিধি ফিরবে না কাত্যায়নি! তোমাদের সঙ্গে আমার এই যে অচিন্তনীয় সংযোগ, এতেই মনে হয়—বড় রকম একটা

কি যেন আশঙ্কাই আসছে কেবল। যে দুটো কথা আমার ভাল বলে মনে হ'ল, তার একটাও যখন তুমি উচিত মনে করলে না, তখন, যা হবার তাই হোক্—আমিও আর তাঁর বিধানের ওপর ইচ্ছা চালাতে যাব না। 'দেখি, মহেন্দ্র বোধ হয় যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সাবধানে থেক,—কোন দরকার বুঝ্‌লে রমার দ্বারা জানিও,—আর কি বল্‌ব!" কামাখ্যানাথ উঠিয়া দাঁড়াইতেই কাত্যায়নী তাঁহার পায়ের উপরে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমায় আশীর্ব্বাদ করে যান্।" "কি আশীর্ব্বাদ চাও?" "আমার দ্বারা আপনার না কোন' অমঙ্গল হয়, মনে কোন অশান্তি না হয়! আমার অবাধ্যতা আপনি মাপ্ করুন।" ক্রমে কাত্যায়নীর স্বর বুজিয়া আসিল। "বিধির বিধানেরই জয় হোক,—তোমার ওপর আমি একটুও অসন্তুষ্ট হইনি।" কাত্যায়নী উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোখ্ মুছিতে মুছিতে বলিল, "এইটুকুই আমার যথেষ্ট যে আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হননি। আর যা হবার হোক্, ভয় করিনে।" কামাখ্যানাথ একবার কাত্যায়নীর মুখের পানে চাহিয়া তখনি ধীরপদে নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। সে দৃষ্টিতে স্নেহ ও বিস্ময়ের যেমন আভাষ প্রকাশ পাইল, ততোধিক করুণার একটা আভা দেখিয়া কাত্যায়নী যেন ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। কামাখ্যানাথ তাহার এ দার্ঢ্যতাকে অবিশ্বাসও করিতেছেন না, অথচ ভবিষ্যতের বিষয়ে যেন কিছু একটু ভাবিতেছেন। কেন তাঁহার এ নিরর্থক চিন্তা! তাহার জন্য ভাবিবার আর কিছুই তো নাই!

বিগ্রহের সন্ধ্যারতির পর রমা যথা নিয়মে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল; বলিল, "কি স্থির কর্‌লে? আমাদের কাছে থাক্‌বে তো?" "এ কি আমি তোমাদের কাছে নেই রমা?" "তোমার ও বাজে কথা আমি আর শুনব না; চল, আজই তোমায় যেতে হবে।" কাত্যায়নী হাসিল—"বাজে কথা নয় রমা; আমি এই দূরে থাক্‌লে, তোমাদের কাছে আছি বলে যত জোর পাব—কাছে গেলে তেমন হয় ত থাক্‌বে না।"

কাত্যায়নীকে বেশী কিছু বলা যে মিথ্যা, তাহা রমা এখন বেশ বুঝিয়াছে; তাই হতাশ হইয়া বলিল, "কি করে একা থাক্‌তে পার তাই ভাবি? মন খারাপ করে না?" "একা কেন রমা, এ যে আমার মা-বাপের কোল,—মন কি জন্য খারাপ হবে?" রমার মুখখানি ম্লান হইয়া উঠিল, "এই জন্যই বেশী জোর করতে পারছি না। কিন্তু যাঁরা স্বর্গে গেছেন, তাঁদের জন্য সন্তানে জীবন-ভোর এমন করে' তাঁদের মর্ত্তের স্মৃতি আগ্‌লে বসে থাক্‌লে, স্বর্গেও তাঁদের অশান্তি দেওয়া হয় বলে আমার বিশ্বাস। যে স্মৃতি কেবল শোক এনে দেয়, প্রাণকে অকর্ম্মণ্য, নিস্তেজ করে দেয়, তাদের সংশোধন করে নিতেই কি মানুষের মন চায় না? তাঁরা এখন দেবতা, ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন। তোমার আর তাঁদের মঙ্গলের জন্যই তাঁদের ভগবান নিজের কাছে নিয়েছেন,—তাঁরা সুখে আছেন, এ ভাব্‌তেও কি সুখ নেই? জীবনে ভগবানের ওপর নির্ভর করতে না শিখ্‌লে, সে জীবনই যে বৃথা অশান্তির ঘর হয়ে পড়ে। আবার তোমায় সকাল-বিকালে গোবিন্দদেবের মন্দিরে যেতে অভ্যাস করতে হবে। কি বল,—যাবে ত?"

"যাব—কিন্তু তাঁদের মর্ত্তের স্মৃতি নিয়েই যে আমার জীবনের সব চল্‌ছে—চল্‌বে। তাঁদের মর্ত্ত্য-স্মৃতি আমার ভুল্‌বার যো কই রমা? নিজের জীবন কি কেউ ভুল্‌তে পারে?" "কেন পারবে না? যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছে, সে নিশ্চয় পারে। তুমি যে বাপের নাম দিয়ে নিজের কর্ত্তৃত্বের কাছেই নিজেকে উৎসর্গ করছ, তা কি একবারও বুঝ্‌তে পার না! এ সমর্পণে যে বড় ভুল বোঝায়,—বড় অশান্তি এনে দেয়। নিজের কর্ত্তৃত্ব বা ইচ্ছাকে একটু ভোল; ভাব,—ভগবান যা করছেন, তাই হচ্চে। একবার গোবিন্দদেবকে নিজের ইচ্ছাটা সমর্পণ করে দেখ দেখি, কত সুখ পাও।"

কাত্যায়নী একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার ভগবান আগে আমাদের জন্যে একটু ভাবুন দেখি—তার পরে তাঁর কথা আমিও পারি তো ভাব্‌ব।" রমা কাত্যায়নীর মুখের পানে চাহিয়া-চাহিয়া বলিল, "তবে যে বল—তোমার জন্য কারুরই ভাব্‌বার কিছু নেই? নিজের কাছেও নিজে এমন প্রবঞ্চিত হয়ে থাকছ? বড় খারাপ হচ্চে। যে শোকে মানুষ গলে যায়, নরম হয়ে যায়, সে শোকেও কাজ দেখে; কিন্তু তুমি যে আঘাতে ভেঙে না গিয়ে, উল্টে লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছ। তাই ত আমার মনে হয়, একটা মানুষকেও যদি তুমি ঠিক্ ভালবাস্‌তে পারতে—তুমি এমন হতে না! মানুষকে ভালবাস্‌তে না পারলে সে হয় ত ভগবানকেও ভালবাস্‌তে শেখে না, পার ত' এখনো জীবনের পরিবর্ত্তন কর। এতে তুমি কোন্ পথে চলেছ, তা আমার ভাব্‌তেও ভয় লাগ্‌ছে যে!" কাত্যায়নী শ্রান্ত স্বরে বলিল "যে পথেই যাই—এ জন্মে এর আর কিছু বদ্‌লাতে পারব না। তুমি যা বলছ, তা আর-জন্মের জন্যই আমার তোলা থাক্।"

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

বাস্তব ও আদর্শ চরিত্র

কবি-চিত্রিত চরিত্র কিসে স্বাভাবিক হয়, এবং কিসে অস্বাভাবিক হয়, তাহার আলোচনা গত মাঘ মাসের 'ভারতবর্ষে' করিয়াছি। এবার, বাস্তব-চরিত্রের সহিত আদর্শ-চরিত্রের কি প্রভেদ, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ঐ দুইটা কথার অর্থ লইয়া সাহিত্য সমাজে প্রায়ই একটু গোলযোগ ঘটিতে দেখা যায়। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, বাস্তব-চরিত্র ও আদর্শ-চরিত্র এক জিনিস না হইলেও, উভয়েই কিন্তু স্বাভাবিক,—স্বভাবের অন্তর্ভূত। স্বভাব-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কবিকে ঐ দুই প্রকার চরিত্রই আঁকিতে হয়। যাহা অস্বাভাবিক, কাব্য-জগতে তাহার স্থান নাই। অস্বাভাবিক—সৌন্দর্য্যের শত্রু। অস্বাভাবিকতায় রসের বিপর্য্যয় ঘটে।

তবে স্বাভাবিক চরিত্র মাত্রেই যে হয় আদর্শ, নয় বাস্তব হইবে, এমন কোনও কথা নাই। কবি-সৃষ্ট এমন চরিত্রও অনেক আছে, যাহা বাস্তবও নহে, আদর্শও নহে, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক ;—যেমন সেক্সপীয়রের ক্যালিবন ও এরিয়ল, এবং গিরিশচন্দ্রের জগমণি ও পাগলিনী। এ সকল চরিত্রকে ধরাবক্ষে হয় ত দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তবু ইহাদিগকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি যে, বে-খাপ সংযোজনা হইলেই অস্বাভাবিকতা বা অসঙ্গতি-দোষ ঘটে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। সেক্সপীয়র যে বলিয়াছেন,—

"The poet's eye, in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth, from
earth to heaven ;
And, as imagination bodies forth
The forms of thing unknown, the poet's pen,
Turns them to shapes, and gives
to airy nothing,
A local habitation and a name."

—উপরি-উক্ত চরিত্রগুলি এই কবি-বাক্যেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতেছে। যেখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী, সেইখানেই ঐরূপ চরিত্র-সৃষ্টি সম্ভবপর। কবির কলম সেখানে বায়ুনির্ম্মিত আকাশ-কুসুমকেও নাম ও ধাম দিতে সমর্থ।

কবি-অঙ্কিত আর এক প্রকার চরিত্র আছে, যাহা আদর্শ তো নহেই—ঠিক বাস্তবও নহে ; অথচ তাহাকে স্বাভাবিক বলিলে কোনও দোষ হয় না। যেমন গিরিশ-চন্দ্রের রমেশ এবং সেক্সপীয়রের রিচার্ড দি থার্ড। মনুষ্য-চরিত্র স্বভাবতঃই দ্বি-প্রকৃতিক,—দোষ ও গুণ দুই-ই তাহাতে আছে। কিন্তু রিচার্ড সম্বন্ধে সমালোচক-প্রবর হ্যাজলিট্ বলিতেছেন,—"Richard has no mixture of common humanity in his composition, no regard to kindred or posterity, he owns no fellow-ship with others, he is himself alone." আর গিরিশের রমেশ-চরিত্রও কতকটা তাহাই। মানুষের যতপ্রকার উৎকৃষ্ট বৃত্তি আছে—ভক্তি, প্রীতি, দয়া, প্রেম প্রভৃতি কিছুই রমেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।—রমেশ যেন মূর্ত্তিমান লোভ। কিন্তু তবু এই দুই চরিত্রকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। কবি ঘটনার ও হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া তাহাদের এমন আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত লইয়া গিয়াছেন যে, তাহাদের যেন জীবন্ত মানুষ বলিয়া মনে হয়। এ দুইটি চরিত্র ঠিক বাস্তব নহে বটে ; তবে যাহা সত্য ও প্রকৃত, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া, তৎপরে কল্পনার সাহায্য লইয়া কবি উঁহাদের অঙ্কিত করিয়াছেন। ক্যালিবন ও পাগলিনী জীবনহীন আদর্শের (model) জীবন্ত মূর্ত্তি। কিন্তু রমেশ ও রিচার্ড দি থার্ড তাহা নহে। কবি এ-ক্ষেত্রে জীবন্ত আদর্শকে (model) সম্মুখে রাখিয়া, আপনার কল্পনার ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া, তবে উঁহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন ; যেন হনুমানকে সাজাইতে-সাজাইতে জাম্বুবানে পরিণত করিয়াছেন।

ঐ দুই জাতীয় চরিত্র ব্যতীত কাব্যোপন্যাসে বাকী

যে সকল চরিত্র দেখা যায়, তাহাদের কেহ বাস্তব এবং কেহ বা আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। 'ভ্রান্তি' নাটকের রঙ্গলাল আদর্শ, 'প্রফুল্ল' নাটকের সুরেশ ও যোগেশ প্রভৃতি বাস্তব। বঙ্কিম বাবুর 'ভ্রমর' বাস্তব, তাঁহার সূর্য্যমুখী ও প্রফুল্ল প্রভৃতি আদর্শ। কিন্তু এ বিচার—এ ভেদ-নির্ণয় আমরা কেমন করিয়া করি? ভ্রমরকে যদি আদর্শ চরিত্র বলা যায়, তাহা হইলেই বা দোষের কি হয়?

আদর্শ (Ideal) জিনিসটা বুঝাইতে যাইয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন,—"সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে যে, তার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া, শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি।"—এ বিবৃতি গ্রাহ্য করিলে ভ্রমরকে আদর্শ বলা যায় না। কেন না, যে উৎকর্ষের আদর্শ কেবল কবির কল্পনাগত, তাহাই যে কবির কলমে ভ্রমররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন মনে করি না। হিন্দু-সংসারে ভ্রমর দুর্ল্লভ নহে। দুর্ল্লভ কেন বলিতেছি,—খুঁজিয়া দেখিলে প্রতি সংসারেই এ চরিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। তবে সূর্য্যমুখী সর্ব্বত্রই দুর্ল্লভ বটে। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথের 'সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।'—এমন স্ত্রী ঘরে থাকিতেও নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিলেন! শুধু কি তাই? তেরো বৎসর বয়সের এই অসহায়া বালিকাকে তিনি গৃহে আনিয়াছিলেন।—সূর্য্যমুখীর ভ্রাতার হস্তে তাহাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তার পর, সেই কুন্দ যখন বিধবা হইয়া আবার নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে আসিল, তখন তিনি তাহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। শরণাগত বিধবা কোথায় তাঁহার প্রতিপাল্য কন্যাস্থানীয়া হইবে, তাহা না হইয়া বিপরীত ব্যাপার ঘটিল। কিন্তু তবু সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথকে ভ্রমরের ন্যায় বলিতে পারিল না—"যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই।"—অথচ গোবিন্দলালের তুলনায় নগেন্দ্রনাথের পাপ অনেক বেশী। তথাপি সূর্য্যমুখী বলিতেছে—"আমার সর্ব্বস্বধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়, না আমি বড়?' তার পর 'কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া' সূর্য্যমুখী কমলমণিকে লিখিতেছে,—"তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখন তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখন করিব না। যাঁহাকে মনে হইলেই আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি, তাহাই রহিল, যত দিন না মাটিতে এ মাটি মিশে, ততদিন থাকিবে।"—এ পতি-ভক্তি আদর্শ-স্থানীয়া। সূর্য্যমুখী আদর্শ চরিত্র। তবে হিন্দু ঘরে এমন চরিত্র অপ্রাপ্য নহে;—দুর্ল্লভ বটে!

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, বঙ্কিমের বিবৃতি গ্রাহ্য করিলে সূর্য্যমুখীকেই বা আদর্শ বলা যায় কেমন করিয়া? আমরা কিন্তু বঙ্কিমবাবুর আদর্শের সংজ্ঞাকে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করি না। তাঁহার ন্যায় জনসনও বলিয়াছেন,—"যাহা সত্য, প্রত্যক্ষ, অকৃত্রিম, তাহাই বাস্তব (Real); আর যাহা মানসিক, বুদ্ধিগত, কল্পিত, তাহাই আদর্শ" (Ideal)!—মনীষিশ্রেষ্ঠ বেকনও কতকটা ঐ ধরণের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইতিহাসে ও কাব্যে যে তফাৎ, আদর্শে ও বাস্তবে সেই তফাৎ। আমরা কিন্তু ঐ কথাটার অর্থ ভাল বুঝিতে পারি না। ইতিহাসের শঙ্কর, বুদ্ধ, নানক ও চৈতন্য প্রভৃতির চেয়ে উচ্চদরের চরিত্র কোন্ কবির কলমে অঙ্কিত হইয়াছে? কবি-সৃষ্ট কোন্ স্বদেশ-প্রেমিকের চরিত্র আমাদের ইতিহাসের প্রতাপ-শিবজীর চেয়ে উৎকৃষ্ট?

আসল কথা, আদর্শ (Ideal) মাত্রই আকাশকুসুমবৎ অলীক নহে।—কেবল কল্পনার ভিত্তির উপরই উহা গড়িয়া উঠে না। যাঁহারা বলেন, আদর্শ (Ideal) যেদিন সকলের নয়নগোচর হইবে, সেই দিনই সে 'আদর্শের' পদবী হইতে স্খলিত হইবে,—তাঁহাদের কথা ঠিক বলিয়া মনে করি না। রামকৃষ্ণ পরমহংস বা স্বামী বিবেকানন্দকে 'আদর্শ' পুরুষ

বলিতে কে সঙ্কোচ বোধ করে?—বেশী দূর যাইতে হইবে না;—সম্মুখেই ঐ যে দেখিতেছি, পরের দুঃখে কাতর হইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে পর-দুঃখ দূর করিতেছেন, এবং পরের জন্য নিজে দুঃখ-ভোগ করিতেছেন,—ঐ কর্ম্মবীর পরদুঃখ-কাতর গাঁধিকে কি আমরা 'আদর্শ-পুরুষ' বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না?

তবে আদর্শ চরিত্র বলিলে কি বুঝিব? যে চরিত্রে সদ্‌গুণের ভাগ অত্যন্ত অধিক, সেই চরিত্রকেই আমরা আদর্শ বলিতে পারি। দোষ ও গুণ সকল মনুষ্যেই অল্প বিস্তর আছে। 'কাহারও সদ্‌গুণের ভাগই অধিক, অসদ্‌গুণের ভাগ অল্প; সে ব্যক্তিকে আমরা ভাল লোক বলি। আর যাহার সদ্‌গুণের ভাগ অল্প, অসদ্‌গুণের ভাগ অধিক, তাহাকেই মন্দ বলি'—এই দুই প্রকার চরিত্রের লোকই সংসারে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সচরাচর-দৃষ্ট চরিত্রই আমাদের মতে 'বাস্তব।' আর যে চরিত্র দেবতুল্য, তাহা প্রত্যক্ষ হউক, বা কল্পনাগত হউক, তাহাই 'আদর্শ-চরিত্র'। তবে সে আদর্শ-চরিত্রের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ থাকিতে পারে।

যুদ্ধ-যাত্রা

[শ্রীবিহঙ্গবালা দাসী]

(১)

নৃপেন ধরিয়াছে, "আমি যুদ্ধে যাব।" মাতা শুনিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "বলিস কি রে সর্ব্বনেশে! এই কর্ত্তে কি তোকে মানুষ করেছিলুম।" নৃপেন হাসিয়া বলিল, "কেন মা, আমি ত তোমার এক ছেলে নই। মা বলে ডাকবার আরও ত তোমার রয়েছে, আমার জন্যে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।" ওরে অবুঝ ছেলে, লাভ-ক্ষতির তুই কি জানিস্? মায়ের প্রাণ তুই কেমন ক'রে বুঝ্‌বি? মা বলিলেন, "হ্যাঁ রে, মা বলে ডাকবার আছে বলে' তুই এমনি করে ফাঁকি দিবি বাবা? পাঁচটা আঙুলের একটা আঙুল যদি কেউ কেটে দেয়, তা হলে কি তার কষ্ট হয় না, না, তাতে সে ব্যথা পায় না?" নৃপেনের চিত্ত ঈষৎ বিচলিত হইল; বলিল, "ব্যথা পায় অবশ্য; কিন্তু তেমন কিছু ক্ষতি হয় না মা।" নৃপেনের মুখে সঙ্কল্পের দৃঢ় চিহ্ন।

পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া মাতা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ও বাবা, তুই নিশ্চয় তা হলে যাবি! আমি তোকে কিছুতে ছেড়ে দোব না। ওরে ডাকাত, তুই মায়ের গলায় ছুরি দিয়ে যাবি? এমন খুনে কবে হলি রে—"

নৃপেন বিচলিত চিত্তকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া উচ্চ-হাস্যে মাতার ক্রন্দন ঢাকিয়া ফেলিয়া বলিল, "পাগল হয়েছ মা তুমি! কে বল্লে আমি যুদ্ধে যাব? তুমি যেমন একটুতে ক্ষেপে উঠ, লোকেও তেমনি বলে।" "ওরে, কেউ আমায় বলে নি রে, আমি তোর মুখ দেখে সব বুঝেছি।" নৃপেন তেম্‌নি হাসি হাসিয়া বলিল, "মুখ দেখে বুঝেছ, আমি যুদ্ধে যাব! কে তোমার কাছে লাগায় মা আমার নামে?" নৃপেন মাকে সান্ত্বনা দিবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। দেখিল, ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন অদূরে বসিয়া খেলা করিতেছে। নৃপেন ডাকিল, "নলু, নলু শোন্।" নলু কাকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কি কাকা?" "একটা লাঠি নিয়ে এসে ঘা-কতক মার দাও ত ঠাকুমাকে। কি দুষ্টু মেয়ে বাবু—খালি কাঁদে!" নলিন আধ-আধ ভাষে বলিল, "মালব থা'-মাকে? দুত্তু, কাঁদে। কাকা, আমি নক্ষি?" "হাঁ, তুমি লক্ষ্মী ছেলে, আর আমি লক্ষ্মী ছেলে—কেমন, না, নলিন?" নৃপেন হাসিয়া মাতাকে বলিল, "শুনছ মা, খোকা কি বল্‌ছে! তুমি দুষ্টু মেয়ে, খালি কাঁদ; আমরা নক্ষি ছেলে—কাঁদি না, কিচ্ছু না।" মাতা অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, "তোমরা যা নক্ষি, তা আর বলে কায নাই।" পুত্র আশ্বস্ত হইয়া আদরে-চুম্বনে খোকাকে অস্থির করিয়া তুলিল। মাতা পুত্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। খোকাকে আদর করিতে-

করিতে নৃপেন মায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, মায়ের দৃষ্টি তাহারি উপর নিবদ্ধ। দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌ছ মা?" "দেখ্‌ছি, এই চেহারা নিয়ে তুই যুদ্ধু করতে যাবি।" মায়ের কথা শুনিয়া নৃপেন মৃদু হাসিল। তাহার বলিষ্ঠ, পেশী-বহুল বাহুদ্বয় ঈষৎ সঞ্চালন করিয়া একবার তাহার বিশাল বক্ষের দিকে চাহিয়া লইল। অন্য দিন হইলে সে অনেক কথা বলিয়া ফেলিত; কিম্বা ভূমিতে একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিত, "দেখ্‌ছ মা, আমার মায়ের দুধের জোর কত!" কিন্তু আজ আর সে কোন কথা বলিল না। যুদ্ধের কথা শুনিয়া নলিন বলিয়া উঠিল, "কাকা, আমি যুদ্ধু কল্‌ব।" কাকা ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখ-চুম্বন করিয়া বলিল, "আগে বড় হও।" মাতা তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আগে বড় হও, মা বুকের রক্ত জল করে মানুষ-মুনুষ করে তুলুক, তার পরে এক দিন মায়ের গলায় ছুরি দিয়ে যেও।" নৃপেন হাসিয়া আকুল হইল, "মা যা কথা বলে।" "মা ঠিক কথা বলে রে, মার কথা হেসে ওড়াবার নয়।" "এখন খেতে-টেতে দেবে, না কি, বল দিকিনি মা? খিদেতে এদিকে ত নাড়ী চোঁ চোঁ করছে।"

"তা' ত করে। খিদে পেলে ত অস্থির হয়ে ওঠ বাবা, চোখে-কাণে কিছু দেখ্‌তে পাও না। কায-কম্ম ত কিছু কর্‌লে না। এদিকে এক-এক দিন এক-এক হুজুত এনে আমার বুকের রক্ত জল করে দেবে।" "না গো, না; এবারে খুব ঠাণ্ডা হব।" "তাই হও। মা সুবচনী সুবাতাস দিক, তোর সুবুদ্ধি হোক।"

২

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি ঠাকুর-পো?"

নৃপেন কোন উত্তর না করিয়া শুধু তার বৌদিদির মুখের দিকে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিল। বৌদিদি সে চাহনীর অর্থ বুঝিল। সে চাহনী বলিতেছিল, "তুমি কি জান না বৌদি'—তোমার ঠাকুরপো যা বলে তাই করে?"

বাড়ীর সকলে নৃপেনকে গোঁয়ার-গোবিন্দ বলিয়াই জানিত। থার্ড ক্লাস অবধি পড়িয়া সে মা সরস্বতীর নিকট ইস্তফা লইয়াছিল। কুস্তির আখড়া, ক্রিকেট খেলা, ফুটবল ম্যাচ—এ-সবে তার ভারি উৎসাহ। দাদারা তাহার আশা ত্যাগ করিয়া বলিল, "না, ও লক্ষ্মীছাড়ার কিছু হবে না।" মা বলিলেন, "না হোক,—ও আমার মুক্খু হয়েই বেঁচে থাক। তোরা ত বিদ্বান্ হয়েছিস বাবা! একটা না হয় মুক্খুই হোল।" জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিল, "মুক্খু যেন হোল,—ওটা যে কুলাঙ্গার হয়ে উঠল মা। আজ এর সঙ্গে দাঙ্গা, কাল ওর সঙ্গে মারামারি।" মা বলিলেন, "চিরদিন কি এমনি থাকে রে? ও ছোট-বেলা থেকেই একটু দুরন্ত, তা নইলে তোদের চেয়ে ওর বুদ্ধি আছে।" মধ্যম পুত্র বলিল, "ছাই আছে! তাই সে-দিন ফিরিঙ্গিটার সঙ্গে মারামারি করে কাঁড়ি টাকার ঘণ্ট করালে। কে বাঙ্গালীকে—ভীরু, সাহস নেই, বল্লে—তুই গেলি কি না সাহস দেখাতে! তোর সে-সব কথায় কাণ দেবার দরকার কি বাপু! বল্‌ছে দেশের লোককে—তোর তা গায়ে পেতে, বল জাহির করা কেন? নাঃ, জালাতন হওয়া গেছে।" জ্যেষ্ঠ বলিল, "যাই বল মা, তোমার আদরেই ও আরও গোল্লায় যাচ্ছে।" মাতা বলিলেন, "ও যদি বাঁচে ত দেখ্‌বি তখন।" "বেঁচে দরকার নাই—অমন ছেলের যাওয়াই ভাল।"—মধ্যমপুত্র সাফ কথা বলিয়া দিল। মাতা জিব কাটিয়া বলিল, "ষাট, ষাট. অমন কথা বলিস নি।"

মাতার অষ্টম গর্ভের সন্তান নৃপেন। ছোটবেলায় যে তাহাকে দেখিত, সেই বলিত, 'এ ছেলে যদি বাঁচে, ত, একটা মানুষ হবে বটে।' মায়ের মনে সে কথা এখনও জাগিয়া আছে। তাঁহার বিশ্বাস—একদিন সে মানুষের মত মানুষ হবেই। আর, সে দুষ্টু হোক, একগুঁয়ে হোক, ডানপিটে হোক,—মাকে সে যেমন ভালবাসে, 'অমন করে তার বিদ্বান ছেলেরা ভালবাসে' না।

নৃপেনকে চিনিয়াছিল তাহার বড়-বৌদি লীলা। স্নেহার্দ্র করুণ স্বরে লীলা বলিল, "না ঠাকুরপো, ও-সব মতলব ছেড়ে দাও।" নৃপেন তেমনি বিস্ফারিত চক্ষু বৌদির মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "বড়-বৌদি, তোমার মুখে এমন কথা শোনবার প্রত্যাশা করিনি!"

'প্রত্যাশা করিনি'!—লীলার কাণে ইহা ভর্ৎসনার ন্যায় বাজিল। কিন্তু এ যে বড় কঠিন, বড় কঠিন! এত কঠিন সে কি করিয়া হবে! সংযমের আবরণে যে নারী-হৃদয় লুক্কায়িত ছিল, আজ বুঝি তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে! সে যে নৃপেনকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে!

বৌদিদি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার কত দিনের কত কথা মনে পড়িয়া গেল। প্রথম যে-দিন সে তাহাদের বাড়ী আসে, সেদিন নৃপেনের কি আনন্দ! তখন সে সপ্তম বর্ষীয় বালক। সারাদিন সে বৌদিদির কাছে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া কত খবরই না দিয়াছিল! 'তাহাদের বাড়ীর টিয়াটা একদিন কি রকম করিয়া শিকলি কাটিয়া পলাইয়াছিল,' 'তাহাদের বাগানে কতগুলা আমগাছ,' 'নরেনদের পুকুর থেকে একদিন কি মস্তই একটা মাছ উঠেছিল', 'তাহাদের পাড়ায় সেবার এমন ঘটায় কালীপূজা হয়েছিল, আর এত বাজি পোড়ান হয়েছিল যে, সে রকম কেউ কখন দেখেনি,' ইত্যাদি কত সংবাদ না তাহার নবাগতা বৌদিকে শুনাইয়াছিল! তার পর সমস্ত দিন বকিয়া-বকিয়া সন্ধ্যার পর কখন তাহার কোলের কাছে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল! সে আজ কত দিনেরই বা কথা! তার পর দুরন্ত, একগুঁয়ে ছেলে নৃপেন যখন বাহানা ধরিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত, তখন—সর্প যেমন সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়, তার বৌদিদির কথায় নৃপেনও ঠিক সেইরূপ সুস্থির হইত।

৩

নৃপেনের দোষ ছিল—সে স্বজাতির নিন্দা সহিতে পারে না, বিশেষ বিজাতির মুখে। আবার, কাহাকেও অত্যাচার-পীড়িত দেখিলে, তাহাকে রক্ষা করা এবং অত্যাচারীকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া সে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। দাদারা বলে, "তোর অত মাথা-ব্যথা কেন রে?" প্রতিবেশীরা বলে, "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।" মা বলেন, "এই করে কবে তুই প্রাণটা খুইয়ে আসবি।" মাতা জানিতেন না, তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী একদিন কঠোর সত্যে পরিণত হইবে। এই দোষে সে যেখানে-সেখানে একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া, তাহার দাদাদের মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলা টাকাগুলাকে পুঁটিমাছের মতন করিয়াই খরচ করাইয়া বসে। ইহার জন্য যদিও তাহাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, তবুও কেহ তাহাকে তাহার স্বভাব ত্যাগ করাইতে পারে নাই। সকলেই তাহার কার্য্যে অসন্তুষ্ট; শুধু একজন তাহার কার্য্যের অনুমোদন করিত—সে তাহার বড়-বৌদিদি লীলা। সকলকার কাছে যখন লাঞ্ছিত ও ভৎর্সিত হইয়া রাগে, দুঃখে, অভিমানে নৃপেন ফুলিতে থাকিত, তখন বড়-বৌদিদির প্রশংসাপূর্ণ, প্রসন্ন দৃষ্টি হইতে যাহা সে প্রাপ্ত হইত, তাহা তাহার নিকট কোহিনূর অপেক্ষাও মূল্যবান্ বলিয়া বোধ হইত; এবং সমস্ত লাঞ্ছনা ও ভৎর্সনা মুহূর্ত্তেই তাহার নিকট অতি তুচ্ছ হইয়া যাইত। ছড়াকাটা, টপ্পা-গাওয়া, নাকিসুরে-কথা-কওয়া ললনাগণের নিকট হইতে লীলার স্থান যে কতদূর, তাহা বুঝিত শুধু নৃপেন। উভয়ে উভয়কে ভালবাসিত—শ্রদ্ধা করিত নৃপেন, স্নেহ করিত লীলা। উভয় উভয়কে বুঝিয়াছিল,—তাই চুম্বকের ন্যায় দুইটি হৃদয় পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছিল।

নৃপেন ডাকিল, "বৌদি!" লীলা সচকিত ভাবে আপনাকে সংযত করিয়া লইল। নৃপেন হাসিয়া বলিল, "তোমার মন যে এত দুর্ব্বল, তা আমি জানতাম না বৌদি। তা হলে—" "তা হলে—" বৌদিদি কহিল, "তা হলে কি ঠাকুরপো?"

"তা হলে, মাকে যেমন যাব না বলে বুঝিয়ে স্থির করেছি, তোমাকেও তেমনি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পলায়ন দিতুম।" বৌদিদি কহিল, "যাওয়াই তা'হলে স্থির ঠাকুরপো?" নৃপেন নত-মস্তকে অথচ দৃঢ়তার সহিত বলিল, "হাঁ। শুধু তোমার অনুমতির অপেক্ষা করছি বৌদি। শুধু তুমি আমায় মন খুলে যেতে বলবে, তারই জন্য—" তারই জন্য! তোমায় মন খুলে যেতে বল্‌বে আগুনের মুখে ঝাঁপ দিতে! বৌদিদি প্রকাশ্যে বলিল, "তুমি বড় নিষ্ঠুর ঠাকুরপো! তোমার একটুও মায়া নেই।" নৃপেন হাসিয়া বলিল, "সব সময় মায়া করতে গেলে বৌদি, অনেক বড় কাজে বাধা পড়ে যায়।" লীলা মনে-মনে বলিল তা পড়ে। কিন্তু কর্ত্তব্য যে বড় কঠিন! সে যে এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না! সহসা কর্ত্তব্যের এ কি নিষ্ঠুর আহ্বান! লীলাকে বিচলিত দেখিয়া নৃপেন খানিকটা আনন্দিত হইল, খানিকটা বিস্মিত হইল।—আনন্দিত হইল, তাহার উপরে বৌদিদির ভালবাসার গভীরতা বুঝিয়া; বিস্মিত হইল, নারী-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখিয়া। তা' হইলেও ইহা তাহার নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হইল।

নৃপেন লীলাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিল, "তুমি কাতর হ'চ্ছ বৌদি! আগে রাজপুতদের মেয়েরা স্বামীকে, ভাইকে,—এমন কি নিজের ছেলেকে পর্য্যন্ত হাসতে-হাসতে পাঠাত, আর তুমি তোমার দেওরকে একটা মুখের কথা

বলে অনুমতি দিতে পারছ না ?" লীলা ভাবিল, দেওর কি তাহার এত পর ? ভায়ের চেয়ে, ছেলের চেয়ে সে ত নৃপেনকে কম ভালবাসে না। সে যে তার স্বামীর ভাই। বলিল, "সে শক্তি আমাদের নাই ঠাকুরপো। সে দিনে আর এ দিনে অনেক তফাৎ।" "তফাৎ ভাবলেই তফাৎ; সেই জন্যই ত আমাদের দেশের এ অধঃপতন!"

নৃপেনের মুখমণ্ডল আনন্দের আতিশয্যে, উৎসাহের ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। লীলা দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া চমকিত হইয়া উঠিল। সে কি করিতেছে! তাহার দেশের আশার জ্যোতিঃকে নিরুৎসাহের ফুৎকারে নিবাইতে যাইতেছে! বাঙ্গালীর গৌরবের জিনিস কি অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিবার জন্য ? কিন্তু ক্ষণিকের—শুধু ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা কেন? না—না, যাও,—যাও ভাই, কর্ত্তব্যের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া লইয়া যাও। আমি তোমার মহান উদ্দেশ্যের অন্তরায় হইব না। যাও বন্ধু, স্বজাতির জন্য জীবনকে বলি দাও, দিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। জাতির গৌরব রক্ষা হউক।

নৃপেন বলিল, "পারলে না বৌদি ?" লীলার চক্ষু তখন অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছে, কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। ওষ্ঠে অধর চাপিয়া সে উচ্ছ্বসিত অশ্রুরোধ করিল, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারিল না। কত কথা তাহার বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু একটি কথাও সে প্রকাশ করিতে পারিল না। —ইচ্ছা হইতেছিল, একবার সেই ছোটবেলাকার মত নৃপেনের মস্তকটা আবেগ-ভরে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলে, "ভাই, ভাই আমার!" নৃপেন লীলার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া যাহা প্রত্যাশা করিতেছিল, এতক্ষণে তাহা খুঁজিয়া পাইল। অন্ধকারে যাইতে-যাইতে পথিক যেমন আলোক দেখিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠে, নৃপেনও সেইরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। লীলার নয়নদ্বয় নীরব ভাষায় যাহা জ্ঞাপন করিল, ভাষার সাধ্য কি তাহা প্রকাশ করে। নৃপেন শ্রদ্ধাভরে লীলার পদধূলি গ্রহণ করিল।

৪

বাঙ্গালার আজ একটা স্মরণীয় দিন। বাঙ্গালী পল্টন যুদ্ধে যাইবে। মরণোন্মুখ জাতির আজ নব-অভ্যুত্থান। চতুর্দ্দিকে লোকের অরণ্য। সকলেই দর্শকরূপে দণ্ডায়মান। সকলকার নয়নে একটা আশা, আনন্দ, ঔৎসুক্য। বৃদ্ধদের চক্ষে বিস্ময়! যুবকদের বক্ষে তড়িৎচ্ছটা, চক্ষে উৎসাহ! বালকদিগের নির্ভীক আননে আনন্দের নির্ম্মল জ্যোতিঃ!

যথাসময়ে বাঙ্গালী পল্টন আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমণ্ডলী তাহাদের সসম্মানে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইলেন। কোন কোন গৃহ হইতে পুরাঙ্গনাগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল, কেহ-কেহ তাহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, দু'একজন বিদুষী সম্ভ্রান্ত মহিলা তাহাদের গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। দেখিলাম, ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এই বাঙ্গালী পল্টন!—সমুদ্রের একটি বিন্দু, বহ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ! হউক ক্ষুদ্র,—আমরা জানি, এই ক্ষুদ্রের মাঝেই রুদ্রশক্তি জাগিয়া আছে। বিন্দু লইয়াই সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ, ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গকণাই প্রবল বহ্নির সৃষ্টি করে, ক্ষুদ্র শিশু হইতেই মনস্বী এবং মহাপুরুষের অভ্যুদয়! ক্ষুদ্র উপেক্ষার জিনিস নয়।

তাহারা অগ্রসর হইল—'বীর পদভরে মেদিনী কম্পিত' করিয়া নহে, ধীর পদবিক্ষেপে তাহারা অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহাদের প্রতি পাদক্ষেপ ধরণী-পৃষ্ঠে যে চিহ্ন মুদ্রিত হইয়া ভবিষ্যতের যে সূচনা প্রকাশ করিয়া রাখিল, তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে।

পূর্ব্বগৌরব পুনঃ স্থাপিত দেখিয়া ভারতবাসী যখন এইরূপ আনন্দে নিমগ্ন, ঠিক সেই সময়ে প্রকৃতির ছায়া-নিবিড় একখানি ক্ষুদ্র পল্লীতে একটি পুত্র-বিচ্ছেদ-কাতরা জননীর করুণ আর্ত্তনাদ গগন বিদীর্ণ করিতেছিল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পৃথিবীর গ্রহত্ব

[অধ্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায় এম-এ]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার চতুর্ব্বিংশতি ভাগ—তৃতীয় সংখ্যাতে "আর্য্যভট্ট" ও "আর্য্যভট্ট সম্বন্ধে মন্তব্য" নামক দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ও অপরটির লেখক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মজুমদার।

ব্রহ্মচারী মহাশয় "আর্য্য সিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিতে চান, আচার্য্য আর্য্যভট্ট পৃথিবীর (১) আবর্ত্তন ও (২) সূর্য্যের পরিতঃ-ভ্রমণ— দুইটী ক্রিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। আর্য্য সিদ্ধান্তের অন্যান্য শ্লোকের সঙ্গে, গোলপাদের ৯ম ও ১০ম শ্লোক দ্বারা তিনি স্বীয় মত সমর্থন করিতে প্রয়াসী। ৯ম শ্লোকটি এই :—

অনুলোম গতি র্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সম পশ্চিমগানি লঙ্কায়াং॥

ইহা দ্বারা পৃথিবীর আবর্ত্তন শক্তি স্পষ্টভাবে অঙ্গীকৃত হইয়াছে (যদিও 'ভট্ট দীপিকা' টীকাকার ইহার বিকৃত অর্থ করিয়াছেন)। ১০ম শ্লোকে ইহার বিপরীত ভাব লিখিত আছে। ব্রহ্মচারী মহাশয় এই দুইটী শ্লোকের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া শেষোক্ত শ্লোকের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। ১০ম শ্লোকটি এই :—

উদয়াস্তময় নিমিত্তং নিত্যং প্রবহেণ বায়ুনাক্ষিপ্তঃ।
লঙ্কাসম পশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি॥

এইখানে 'সগ্রহঃ' শব্দটি "ভপঞ্জরঃ," শব্দের বিশেষণ। পূর্ব্ব শ্লোকে গ্রহ শব্দের উল্লেখ নাই, সুতরাং 'সগ্রহঃ' পদের অন্য অর্থ করিলে 'স' পদের কোন সার্থকতা থাকে না। 'ভপঞ্জরঃ' শব্দ প্রথমার এক বচনে, 'ভ্রমতি' ধাতুর কর্ত্তা। অতএব এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এই :—

'উদয় ও অস্ত হেতু গ্রহগণ ও নক্ষত্রসমূহ প্রবহ নামক বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রমণ করে এবং লঙ্কাতে ঠিক পশ্চিম দিকে এই গতি দেখায়।'

যদিও গ্রহসমূহ রাশিচক্রে অবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, তথাপি গ্রহগুলি নক্ষত্রগণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। এই জন্য নক্ষত্র ও গ্রহ দুইটী শব্দেরই উল্লেখ আছে। গ্রহ শব্দ পৃথিবীবাচী —ইহা কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই; সুতরাং গ্রহ শব্দ দ্বারা আধুনিক ভাবে পৃথিবী বুঝান প্রাচীন মতবিরুদ্ধ। পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ জন্য ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল।

"প্রবহ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবী পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিয়া গ্রহ ও তারাগণের উদয়াস্তের কারণ হইতেছে (?)। তাই আকাশমণ্ডল লঙ্কার ঠিক পশ্চিমে ভ্রমণশীল দৃষ্ট হইয়া থাকে (?)।"

আবার কেহ কেহ এই শ্লোকটীর অর্থ করিতে গিয়া বলেন, ভূপৃষ্ঠস্থ দ্রষ্টার নিকট আকাশস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি যেরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব শ্লোকে প্রকৃত অবস্থা এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে আপাততঃ দৃশ্য অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় এইরূপে শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিতেন।

বাস্তব পক্ষে, এই শ্লোকটী আর্য্য সিদ্ধান্তে প্রথম অবস্থায় ছিল কি না, আলোচনা করা যাক। আর্য্য সিদ্ধান্তের ভট্টদীপিকা নামক টীকাকার পরমেশ্বরের পূর্ব্বে গণক চূড়ামণি ব্রহ্মগুপ্তের আবির্ভাব। তিনি তাঁহার 'ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে' আর্য্যভট্টের মত খণ্ডন করিবার জন্য 'তন্ত্র পরীক্ষাধ্যায়' নামক একটী অধ্যায় লিখিয়া গিয়াছেন; তাহাতে প্রধানতঃ আর্য্যভট্টের মত দূষণ ব্যতীত অন্য কিছু বক্তব্য নাই। যদি ১০ম শ্লোকটী তখন আর্য্য সিদ্ধান্তে স্থান পাইয়া থাকে, তবে নিজের মত পোষণ জন্য অথবা আচার্য্যের গ্রন্থে দুইটী পরস্পর-বিরুদ্ধ মতবাদ প্রমাণ করিবার জন্য ব্রহ্মগুপ্ত নিশ্চয়ই এই শ্লোকটী গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে এই শ্লোকটীর বিষয় উল্লেখ না থাকায়, আর্য্য সিদ্ধান্তে প্রথমাবস্থায় এই শ্লোকটীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

সন্দেহের আরও একটী কারণ আছে। আর্য্য সিদ্ধান্ত 'আর্য্যাষ্টশত' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৮টী আর্য্যা আছে। এই জন্যই এই নামকরণ। কিন্তু প্রচলিত আর্য্য সিদ্ধান্তে ১০৮টীর বেশী আর্য্যা আছে। সুতরাং কোন্ শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত বা পরিবর্ত্তিত, তাহার নির্দ্ধারণ কষ্টকর।

এমনও হইতে পারে, 'ভট্টদীপিকা'-টীকাকার নিজের মত পোষণার্থ স্বরচিত একটী শ্লোক সিদ্ধান্তে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ভূভ্রমণ সম্বন্ধে টীকাকারের মত আচার্য্যের মত-বিরুদ্ধ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। টীকাতে স্পষ্ট ভাবে তিনি স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

আর্য্যভট্ট পৃথিবীর দৈনিক গতি স্বীকার করিয়াও বার্ষিক গতি সম্বন্ধে আধুনিক মত গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা স্পষ্টভাবে বলা যাইতে পারে না। বরং দুই এক জায়গায় এইরূপ বলিয়াছেন, যাহাতে অনুমিত হয় যে, বার্ষিক গতি সম্বন্ধে তিনি বিরুদ্ধমত পোষণ করিতেন;

অথবা ভূপৃষ্ঠস্থ দ্রষ্টার পক্ষে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি কিরূপ দৃষ্ট হইবে তিনি শুধু তাহাই বলিয়া গিয়াছেন—

'ভাণামধঃ শনৈশ্চর সুর গুরুভৌমার্ক শুক্রবুধচন্দ্রাঃ।
তেষামধশ্চ ভূমির্মেধীভূতা খমধ্যস্থা॥' (ক, ক্রিপাক—১৫)
'বৃত্তভপঞ্জর মধ্যে কক্ষ্যা পরিবেষ্টিতঃ খমধ্যগতঃ।
মৃজ্জল শিখিবায়ুময়ো ভূগোলঃ সর্ব্বতোবৃত্তঃ॥ (গো, প্রা ৬,

'নক্ষত্রসমূহের অধোভাগে যথাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র অবস্থিত আছে। তাহাদের অধোভাগে আকাশের কেন্দ্রে পৃথিবী মেধীভূত অর্থাৎ আশ্রয়ভূত হইয়া আছে।' (কা, ক্রিপা—১৬) 'বৃত্তাকার রাশিচক্রের মধ্যস্থলে, গ্রহকক্ষা—পরিবেষ্টিত মৃত্তিকা, জল, তেজঃ ও বায়ুময় সম্পূর্ণ গোলাকার পৃথিবী আকাশের কেন্দ্রে অবস্থিত। (গো, পা—৬)

আচার্য্য আর্য্যভট্টের শিষ্য প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ লল্লাচার্য্য তাঁহার 'শিষ্যধী বৃদ্ধি' তন্ত্রে পৃথিবীর আবর্ত্তন গতির বিরুদ্ধে কয়েকটী যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন।

'যদিচ ভ্রমতি ক্ষমা তদা স্বকুলায়ং কথমাপ্নুয়ুং খগাঃ
ইষবোঽভিনভঃ সমুজ্ঝিতা নিপতন্তঃ স্যুরপাম্পতের্দিশি'॥
পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমে ভুবো বরুণাশাভিমুখো ব্রজেদ্ঘনঃ
অথ মন্দগমাত্তদা ভবেদ্কথমেকেন দিবা পরিভ্রমঃ'॥
(মিথ্যাজ্ঞানাধ্যায়—৪২শ, ৪৩শ)

যদি পৃথিবী ভ্রমণ করে তবে পক্ষিগণ নিজের নীড়ে কিরূপে ফিরিয়া আসিতে পারে?—আকাশাভিমুখে নিক্ষিপ্ত শরসমূহ পশ্চিমদিকে কেন পতিত হয় না?

'পৃথিবী পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমণ করিলে মেঘসমূহ পশ্চিমদিকে ভ্রমণ করিবে; যদি পৃথিবী অতি অল্পগতিতে ভ্রমণ করে তবে মন্দগতি হেতু একদিনে একবার আবর্ত্তন কিরূপে হইতে পারে?'

ইহা হইতে মনে হয় লল্লাচার্য্য বুঝিয়াছিলেন বা জানিয়াছিলেন যে, আচার্য্য আর্য্য ভট্ট কেবল আবর্ত্তনবাদের পক্ষপাতী ছিলেন।

ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে ভূ-ভ্রমণ খণ্ডন সম্বন্ধে যে শ্লোক আছে, তাহার অর্থ করিলে পৃথিবীর আবর্ত্তন গতি সম্বন্ধে যে আপত্তি হইয়াছে, তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যদি তর্হি কুতো ব্রজেৎ কমধ্বানম্।
আবর্ত্তনমুর্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়াঃ কস্মাৎ॥
(তন্ত্রপরীক্ষাধ্যায়—১৭শ)

'যদি পৃথিবী এক প্রাণ সময়ে এক কলা পথ গমন করে তবে কোন্ স্থান হইতে কোন্ পথে ভ্রমণ করে? যদি পৃথিবীর আবর্ত্তন হয়—তবে ঐ বেগে উচ্চ অট্টালিকাগুলি পতিত হয় না কেন?

$$\text{এক প্রাণ সময়} = \frac{\text{অহোরাত্র}}{৬০ \times ৬০ \times ৬} = \frac{\text{অহোরাত্র}}{২১৬০০}$$

[কারণ, ৬ প্রাণ = একপল; ৬০ পল = এক দণ্ড; ৬০ দণ্ড = এক অহোরাত্র।

$$\text{এক কলা পরিমাণ পথ} = \frac{\text{চক্র}}{৩৬০ \times ৬০} = \frac{\text{চক্র}}{২১৬০০}$$

[৬০ কলা = এক অংশ; ৩৬০ অংশ = চক্র]

পৃথিবী অহোরাত্রে একবার আবর্ত্তন কার্য্য সম্পাদন করে; সুতরাং একপ্রাণ সময়ে এক কলা পথ গমন করে, এই উক্তি দ্বারা আবর্ত্তন গতিই বুঝায়।

পৃথিবী বলিতে আর্য্যভট্ট 'মৃজ্জল শিখি বায়ুময়ো ভূগোলঃ' অর্থাৎ বায়ু পরিবেষ্টিত ভূগোল বুঝিতেন, পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্গণ এই বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। তজ্জন্যই আবর্ত্তনবাদের বিরুদ্ধে যত যুক্তির অবতারণা।

ব্রহ্মচারী মহাশয় আরও কয়েকটী শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা পৃথিবীর গ্রহত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা কতদূর সমীচীন বলা কঠিন। দশ গীতিকাপাদের ১০ম শ্লোকের—

'দশগীতিকা সূত্রমিদং ভূগ্রহচরিতং ভপঞ্জরে জ্ঞাত্বা।
গ্রহভগণ পরিভ্রমণং স যাতি ভিত্ত্বা পরংব্রহ্ম॥'

ব্যাখ্যাতে 'ভূগ্রহচরিত' শব্দের সহজ অর্থ না করিয়া ভূরূপ গ্রহ বলার কোন প্রয়োজন নাই; বরং দোষ ঘটে। শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নাই মনে করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত পাঠ করিলে ভূ এবং গ্রহ এই অর্থই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ঐ পাদের ৮ম শ্লোকে—

'ভাঽপক্রমো গ্রহাংশাঃ।'

গ্রহের পরম, অপক্রম—২৪ অংশ; ইহাতে গ্রহ বলিতে পৃথিবী বুঝিবার কোন হেতু নাই। মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে এবং পূর্ব্বতন জ্যোতির্গ্রন্থে গ্রহ শব্দে কোন কোন স্থলে সূর্য্য বুঝায়; কিন্তু কুত্রাপি পৃথিবী বুঝায় নাই।

'প্রাণেনৈতি কলাং ... ...' শ্লোকের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী মহাশয় এই সব শ্লোকের অর্থ বর্ত্তমান সিদ্ধান্তোপযোগী ভাবে কিরূপে ব্যাখ্যা করিলেন তাহা বুঝা দুরূহ। ব্রহ্মচারী মহাশয় কোন-কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা নরেন্দ্র বাবু হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব ব্যাখ্যা ও নরেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ হইতে মনে হয়, তিনিও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে পৃথিবীর গ্রহত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন। এ বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে গ্রহ শব্দের অর্থ সমালোচনা করা আবশ্যক।'

ইদানীং আমরা যে সব পাশ্চাত্য জ্যোতির্গ্রন্থ পাঠ করি, তাহাতে Planet বলিতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, য়ুরেনস্, নেপ্চুন্ বুঝি; কিন্তু অতি পূর্ব্বকালের পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে Planet শব্দে এই কয়টী জ্যোতিষ্ক বুঝাইত না। য়ুরেনস্ ও নেপ্চুন্ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; সুতরাং তাহাদের নাম পাওয়া যাইবে

না। পৃথিবীর পরিবর্ত্তে সূর্য্য ও চন্দ্রের নাম দেখিতে পাই। তাহাতে কি প্রাচীন পণ্ডিতগণের অজ্ঞতা বুঝাইবে? বর্ত্তমান সময় Planet শব্দে কতকগুলি জ্যোতিষ্ক বুঝায়—যাহারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয় এবং যাহাদের আবর্ত্তন ক্রিয়া আছে। এই জন্য রবি ও চন্দ্র Planet সংজ্ঞা বহির্ভূত এবং পৃথিবী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন সময়ে planet বলিতে কতকগুলি গতিশীল জ্যোতিষ্ক বুঝাইত। ভূ পৃষ্ঠস্থ ব্যক্তি পৃথিবীর গতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, অথচ সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি প্রত্যক্ষ করে; সেই জন্য পৃথিবীকে planet না বুঝাইয়া রবি ও চন্দ্রকে বুঝাইত। এই ত গেল পাশ্চাত্য জগতের কথা। এখন আমাদের দেশের কথা একটু বলি। কোন প্রাচীন গ্রন্থে পৃথিবীকে গ্রহ বলা হয় নাই; এই জন্য আধুনিক পাশ্চাত্যজ্ঞানাভিমানী মহাশয়গণ এতদ্দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের উপর কটাক্ষপাত করিতে ত্রুটী করেন না। বর্ত্তমান সময়ে গ্রহ শব্দ আধুনিক planet শব্দের পরিভাষামাত্র। পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয় গ্রহ শব্দ বিজাতীয় ভাষার কোন শব্দের পরিভাষামাত্র ছিল না; সুতরাং আধুনিক অর্থে কোন প্রাচীন গ্রন্থে ব্যবহৃত হইতে দেখিব না। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই।

গ্রহ শব্দ গ্রহ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; এই ধাতুর অর্থ গ্রহণ করা, গ্রাস করা (খাওয়া)। এই শব্দটী কর্ম্মবাচ্যে এবং কর্ত্তৃবাচ্যে বিহিত প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে; প্রথমতঃ ইহা কর্ম্মবাচ্যের অর্থেই ব্যবহৃত হইত। যে সব জ্যোতিষ্ক গ্রস্ত হইত বা যাহাদের গ্রাস (গ্রহণ) দৃষ্টিগোচর হইত, তাহাদিগের সংজ্ঞা 'গ্রহ'। সূর্য্য ও চন্দ্র-গ্রহণ সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেন। কোন কোন সময়ে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই কয়টী জ্যোতিষ্কের গ্রহণ দৃষ্টিগোচর হইত। তাই এই সাতটী গ্রহ নামে অভিহিত। এই জন্য অতি প্রাচীনকালে গ্রহ বলিতে মাত্র এই সাতটী জ্যোতিষ্ক বুঝাইত। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত পাঁচটী ক্ষুদ্র,—তারকার মত দৃষ্ট হয়; তজ্জন্য এই পাঁচটীকে 'তারাগ্রহ' বলে। কালক্রমে কর্ত্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন গ্রহ শব্দ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। সূর্য্য ও চন্দ্র-গ্রহণের হেতু-নির্দ্দেশ উপলক্ষে 'রাহু' নামক একটী তমোময় আচ্ছাদক বা গ্রাহকের সৃষ্টি হইল, এবং গ্রহ সংজ্ঞাভুক্ত হইয়া রাহু অষ্টম গ্রহরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কিছুদিন এই 'অষ্ট' গ্রহের কাল চলিতে লাগিল। কতক সময় অতীত হইলে অপর পাঁচটী গ্রহের গ্রহণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে কেতু নামক নবম গ্রহের উৎপত্তি হইল; তদবধি গ্রহ সংখ্যাদ্বারা নয় (৯) বুঝাইতে লাগিল। এই জন্য নবগ্রহস্তোত্রে নিম্ন লিখিত দুইটী শ্লোক দেখিতে পাই।

'অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥'
'পলাল ধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকম্।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্॥"

আজকাল কেহ-কেহ চন্দ্রবর্ত্মের পাতের একটীকে (Ascending node) রাহু ও অপরটীকে (Descending node) কেতু বলেন। কেহ-কেহ বা রাহু অর্থে পৃথিবী বুঝিতে চাহেন। উপরিভাগে উদ্ধৃত শ্লোক দুইটী হইতে মনে হয় রাহু শব্দে দুইটী চন্দ্রপাতই বুঝাইত।

গ্রহ শব্দের তদানীন্তন অর্থ এইরূপ ভাবে গ্রহণ করিলে কোন প্রাচীন গ্রন্থে পৃথিবী গ্রহ শব্দে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে না; কারণ ভূপৃষ্ঠস্থ ব্যক্তি পৃথিবীকে গ্রস্ত দেখিতে পায় না। এই জন্যই প্রাচীন গ্রন্থে পৃথিবীতে গ্রহ শব্দের প্রয়োগ পাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা।

যদি পৃথিবী গ্রহ নামে অভিহিত না হইয়াও কার্য্যতঃ আধুনিক গ্রহের ধর্ম্মানুসরণ করিতে দৃষ্ট হয়, তবে পৃথিবীতে আমরা আধুনিক গ্রহ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রহের একটী ধর্ম—আবর্ত্তন গতি; আর্য্যভট্টের গ্রন্থে ও কোন কোন পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। আর একটী ধর্ম—সূর্য্যের পরিতঃ ভ্রমণ; তাহার উল্লেখ কোন সিদ্ধান্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কোন বিখ্যাতনামা পণ্ডিত বেদের কতকটী ঋকের অর্থ এইরূপ ভাবে করেন যদ্দ্বারা পৃথিবীর সূর্য্য পরিতঃ ভ্রমণ স্বীকৃত হইতে পারে। এই বিষয় অন্য সময়ে আলোচিত হইবে। পৃথিবীর আবর্ত্তন গতি স্বীকার করিলে, আংশিক ভাবে ইহার চলত্ব সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

প্রসাদ-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

প্রসাদ-প্রসঙ্গে কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—'রসিকচন্দ্র বসু 'নব্য ভারতে' রামপ্রসাদকে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু বঙ্গের প্রধান সমালোচক শ্রীযুক্ত দিনেশচন্দ্র সেন মহাশয়-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত 'মধ্যম নারায়ণের' ব্যবস্থায় রসিকচন্দ্রের 'রসিকতা' ঠাণ্ডা হইয়া যায়।' (১) এ সমালোচক রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন ন'ন। 'বঙ্গীয় কবি'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত রসিক বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ ১৩০২ সালের 'নব্যভারতে' 'কায়স্থ-নির্ণয়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর পর শ্রীযুক্ত কালিদাস বরাট 'বঙ্গজীবন' পত্রে (১৩০২ সাল, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা) রসিক বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন। ১৩০৬ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (৩য় সংখ্যা) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া প্রসাদের বৈদ্যত্বের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। রায়সাহেব তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'বৈদ্যবংশোদ্ভব'

(১) জীবন চিত্র, ১৫২ পৃঃ

এই কথাটী মাত্র লিখিয়াছেন, তিনি 'নব্যভারতে' প্রকাশিত রসিক বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদমূলক কোন প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি না।

উপর-উক্ত গ্রন্থকার অন্যত্র (২) লিখিয়াছেন 'ভাজনঘাট (৩) নিবাসী লোকনাথ দাসগুপ্তের কন্যা যশোদা দেবীর সহিত রামপ্রসাদের বিবাহ হয়।' এই বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। চুঁচুড়ার কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্য-তীর্থ কাব্যকণ্ঠ আমাকে লিখিয়াছেন—'ভাজনঘাটে অদ্যাপি লোক-নাথের ভিটা বর্ত্তমান আছে। সেখানেও প্রবাদ শুনিয়াছি যে, রাম-প্রসাদ লোকনাথ-দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের দৌহিত্র বংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। সেই বংশের একব্যক্তি (অতুল চন্দ্র সেন) ৺কৈলাস চন্দ্র সিংহকে বলিয়াছিলেন যে, ৺রামপ্রসাদের স্ত্রীর নাম যশোদা দেবী।' এ সম্বন্ধে প্রসাদ-বংশধর শ্রীযুক্ত মানস-রঞ্জন সেন আমাকে লিখিয়াছেন, '৺রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কোথায় বিবাহ হইয়াছিল, তাহা আমার জানা নাই; এবং ভাজনঘাটে আমাদের পূর্ব্বের আত্মীয় কেহ আছেন বলিয়াও শুনি নাই। আমাদের খুল্ল-পিতামহ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অমরনাথ সেন মহাশয় এ সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন কি না জানি না। আশারঞ্জন তাঁহার নিকট খবর লইতে পারেন।' আমি শ্রীমান্ আশারঞ্জন সেনকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত অমরনাথ সেনের নিকট অনুসন্ধান করিয়া আমাকে জানাইয়াছেন, 'ভাজনঘাটে আমাদের কোন আত্মীয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার এক ভগিনীর ওখানে বিবাহ হইয়াছে। প্রসাদ ভাজনঘাটে বিবাহ করিয়াছিলেন কি না জানি না। তবে তৎপুত্র ৺রামমোহন সেন কাউগাছিতে বিবাহ করিয়াছিলেন, একথা একবার পিতৃমুখে (৺দুর্গাদাস সেন) শুনিয়াছিলাম। মোট কথা, ভাজনঘাটে কোন আত্মীয় নাই। প্রসাদের দৌহিত্রের বংশ সম্বন্ধে কিছু জানি না। এবং তাঁহার স্ত্রীর নাম যশোদা দেবী ছিল কি না আমরা জানি না। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেনকে জানি না বা চিনি না।'

* * * *

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' প্রবন্ধের (প্রতিভা, চৈত্র, ১৩১৯ সাল) একস্থানে আছে, 'অবশেষে প্রসাদ কাশীধামে গিয়া অন্নপূর্ণা দর্শন করতঃ বৃন্দাবনে গেলেন।' (৪) তিনি পদাবলীটা এই ভাবে সঙ্কলন করিয়াছেন:—

'নটবরবেশে বৃন্দাবনে এসে
কালী হলি মা রাসবিহারী।'

'প্রসাদ-প্রসঙ্গে' (৺দয়াল চন্দ্র ঘোষ প্রণীত) আছে:—

'কালী হলি মা রাসবিহারী,
নটবরবেশে বৃন্দাবনে।'

কাব্যবিশারদ প্রভৃতি অন্যান্য সংগ্রহকারগণ সকলেই প্রসাদ-প্রসঙ্গের' এই পদ গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ণ বাবু যে কোথা হইতে 'বৃন্দাবনে এসে' এই পাঠান্তর সংগ্রহ করিলেন, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। প্রসাদ-জীবনীর মূল উপাদান—পদাবলী ও জনশ্রুতি—বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলে,—রামপ্রসাদ যে কাশীতে অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, এই বাক্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রসাদের ধর্ম্মজীবনের দিক্‌টা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি কালী, কৃষ্ণকে অভেদ জ্ঞান করিতেন; কিন্তু তিনি কখনও ব্রজ-ধামে গিয়াছিলেন—এ কথা প্রসাদ-বংশের কেহ অথবা কুমারহট্টবাসীরা (বর্ত্তমান হালিসহর) জানেন না। এই কারণে, বর্ত্তমানে আমরা পূর্ণ বাবুর উক্তি প্রমাণ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যদি তিনি ভবিষ্যতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এই বিষয়টির আলোচনা করেন, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের পরমোপকার সাধন করা হইবে।

কাশীপুরের চিত্রেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলা

'স্বামি-শিষ্য'-প্রণেতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম, একদা রামপ্রসাদ কলিকাতা হইতে নৌকা-যোগে গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গার উপর দিয়া কুমারহট্ট যাইতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মুখ-নিঃসৃত—

'শঙ্কর বৈরাগী তোমার নাও'

এই পদাবলী শুনিয়া গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ ৺সর্ব্বমঙ্গলার মূর্ত্তি মন্দিরসহ দক্ষিণ মুখ হইতে পশ্চিম মুখে ঘুরিয়া যায়। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া সাধক লজ্জায় প্রথমোচ্চারিত অশ্লীল গান ছাড়িয়া—

'শঙ্করী তারিণী তব নাম'

এই গানটি গান। তখন দৈববাণী হইল, 'প্রসাদ, এই গান নয়, প্রথম গানটি গাও।' শরৎ বাবু বলিয়াছিলেন, তিনি এই প্রবাদটি ভক্ত ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিবার জন্য আমি 'উদ্বোধন' অফিসের পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে লিখিয়াছেন:—'চিৎপুরের ৺সর্ব্বমঙ্গলা জগদ্ধাত্রী দুর্গামূর্ত্তি বহুকালের; তাঁহার সম্বন্ধেই প্রবাদ আছে যে, তিনি দক্ষিণমুখী ছিলেন—প্রসাদের মধুর পদাবলী শুনিবার জন্য তিনি পশ্চিমমুখী হইয়াছিলেন। প্রসাদ এই সময়ে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় গান গাহিতে-গাহিতে যাইতেছিলেন।'

'অর্দ্ধকালী' সম্বন্ধেও এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাঘবরামের পুত্র ভক্ত রামেশ্বর যখন মৃণ্ময়ী দশভুজার দক্ষিণদিকে আসন গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া সপ্তশতী পাঠ করিতেছিলেন, তখন দেবী শ্রীউমা রামেশ্বরের দিকে পশ্চিমমুখী হইয়াছিলেন। সেই

(২) জীবন চিত্র, ১৫৪ পৃঃ।

(৩) ভাজনঘাট নদীয়া জিলায়। কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে (শিবনিবাস) নামিয়া যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে গ্রাম ২ ক্রোশ দূরে।

(৪) প্রসাদী কথা, পৃঃ ২১২।

হইতে আজিও নিতরায় অর্দ্ধকালী-বংশধরগণ পশ্চিমদ্বারী চণ্ডীমণ্ডপে দেবী পূজা করিয়া থাকেন।

"শ্রীশ্রী৺চিত্রেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলা মাহাত্ম্যম্" (৫) পুস্তিকায় লিখিত আছে:—'বর্ত্তমান সহর কলিকাতার মহারাষ্ট্রীয় খাতের উত্তরখণ্ড যাহা এক্ষণে কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপালভুক্ত হইয়াছে, এতদুভয় স্থানকে বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ হিন্দুপ্রভাব সময়ে সাধারণে চিত্রপুর নামে অভিহিত করিত। * * * কালক্রমে এই স্থান চিৎপুর নামে অভিহিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের পুরাতন ষ্ট্যাম্পাদিতে এখনও চিত্রপুর নাম দেখা যায়। শ্রীমন্ত সওদাগরের দক্ষিণ যাত্রাকালে উক্ত পুস্তকেও চিত্রপুর গ্রামের উল্লেখ আছে। বর্ত্তমানে চিত্রপুরের উত্তরার্দ্ধ কাশীপুর ও দক্ষিণ অর্দ্ধ চিৎপুর নামে প্রচলিত হইয়াছে। * * * কাহারো কাহারো মতে এই স্থানই জল ও স্থলসম্ভূতা দেবীর চিবুকাঙ্গ-পীঠ বলিয়াও অনুমিত হইত। মোট কথা, আমাদের চিত্রেশ্বরী-পীঠ বা চিত্রেশ্বরী-নাম্নী কোন দেবী নাই; তবে চিত্রপুর গ্রামে আবির্ভূতা হওয়ায় চিত্রেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী বলিয়া উল্লিখিতা হন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ১৮৫২ সালের ছাড়পত্রে চিৎপুরান্তর্গত বহুকালের মন্দির, নাটমন্দির প্রভৃতির উল্লেখ আছে এবং এই ছাড়পত্র অদ্যাপিও সেবাইতগণ মধ্যে বর্ত্তমান আছে। * * * নবাব বাহাদুর আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে পূর্ব্ববঙ্গস্থিত বাগপুরনিবাসী শুদ্ধশ্রোত্রীয় সিমলাই বংশ সম্ভূত মৃত মহাত্মা ৺রামশরণ সিমলাই ৺কালীপীঠান্বেষণে আসিয়া অত্র চিত্রপুর গ্রামে উপস্থিত হয়েন এবং ক্রমশঃ ৺মাতার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়া ভাগীরথী তীরে গুরু উপদেশ ক্রমে অষ্টধাতুর যন্ত্র কালী নির্ম্মাণ করিয়া দেবীক্ষেত্রে আপন ইষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। * * *'

মূর্ত্তি ও মন্দিরের দরজা পরিবর্ত্তন বিষয়ে জ্ঞানানন্দ তীর্থ স্বামী লিখিয়াছেন:—"একদিবস সন্ধ্যা-বন্দনা ও আরত্রিক কার্য্যাদি সমাপনান্তে রামশরণ স্বগৃহ পাইকপাড়া গিয়াছেন। প্রাতে যথাবিধি ৺মাতার বাটী আসিয়া দেখেন, অদ্ভুত কাণ্ড! মন্দির মধ্যে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিতা অর্থাৎ দক্ষিণমুখী ছিলেন, ভাগীরথী-মুখী মাতা ফিরিয়া আছেন! কারণ কি কিছুই জানা নাই। কি করিবেন, অগত্যা ৺মাতা যে দিকে স্বয়ং ইচ্ছায় ফিরিয়াছেন, সেই দিকেই পুনরায় দরজা প্রস্তুত করা হইল। অর্থাৎ সাবেক দক্ষিণমুখী দরজাও থাকিল, তবে ভাগীরথী মুখে নূতন দরজা প্রস্তুত করা হইল। কিন্তু ৺মাতার পূজাদি অদ্যাপি সেই প্রথম আবির্ভাবকালের নিয়মানুসারে উত্তরমুখী পূজা কার্য্য আরতি প্রভৃতি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইত্যবসরে কিছু দিবস পরে সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন আসিয়া অনুসন্ধান করেন, 'এখানে কোন দেবী আছেন কি না।' অনুসন্ধানে বিশেষ ক্লেশ হয় নাই, কারণ তৎকালে ৺মাতার বাটীর অতি নিকটেই ভাগীরথী ছিলেন; তখনও ভরাট হইয়া লোকালয়াদি হয় নাই। মন্দির মধ্যে ৺মাতাকে দর্শন করিয়া মহামায়ার গুণ-কীর্ত্তন করিলেন ও পূর্ব্ব ঘটনা প্রকাশ করিলেন, 'আমি একদা কলিকাতার কর্ম্মস্থান হ'তে কোন কার্য্য উপলক্ষে নৌকাযোগে উত্তরাভিমুখে যাইতে-যাইতে দেবী-সঙ্গীত আপন মনে অসম্পূর্ণ-ভাবে গাহিতেছিলাম। এমতাবস্থায় দেখি, পূর্ব্বকূলে এক ষোড়শী যুবতী কণ্ঠ হ'তে আওয়াজ আসিল,—'ওরে পুরে গা।' আমি রঙ্গচ্ছলে বলিলাম,—'তোর সাধ থাকে তো ফিরে চা।' বলিলাম বটে, কিন্তু মনোমধ্যে কি এক ভীষণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল, এবং দেবী মায়া বুঝিলাম। তদবধি দেবী সন্দর্শন ইচ্ছায় প্রাণ ব্যাকুল ছিল, অদ্য দর্শনে প্রাণ মন শীতল হইল।

"মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥

তদবধি সাধকবর মধ্যে-মধ্যে কুলতিথিতে আগমন জন্য আসিতেন।'

৺সর্ব্বমঙ্গলার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমি আমার কোন বন্ধুকে কলিকাতায় লিখিয়াছিলাম। তিনি নিজে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির পরিদর্শন করিয়া আমাকে লিখিয়াছেন, "গত কল্য (১৩১৪) সন, ৬ই আশ্বিন, শনিবার) বৈকালে সর্ব্বমঙ্গলা সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা মূর্ত্তি ও তাঁহার স্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। স্থানটি মন্দ নহে। বর্ত্তমান সময়ে মন্দির হইতে গঙ্গাতট প্রায় ৫ মিনিটের পথ। মন্দির ও গঙ্গার মধ্যে প্রকাণ্ড Cossipoor Ordnance Factory অবস্থিত। গঙ্গাতীরে এক্ষণে Port Commissionerএর জেটি রহিয়াছে ও সেখানে আজ কাল যে কলিকাতার বড় বাজার হইতে দক্ষিণেশ্বর, শিবতলা ষ্টীমার সার্ভিস্ আছে তাহার একটি ষ্টেসন। মন্দিরটি খুব বেশী দিনের পুরাতন নহে। স্থানীয় লোকদিগের নিকট শুনিলাম যে, পূর্ব্ব মন্দিরের উপর এই নূতন মন্দির তৈয়ার হইয়াছে। মন্দিরটি প্রায় দোতলা উচ্চ এবং ছোট। মন্দিরের দ্বার ও ঠাকুর পশ্চিম মুখে অর্থাৎ গঙ্গার দিকে। সেখানে একটি বৃদ্ধা (যাঁহার বয়স ৯১ বৎসর) আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, ঠাকুর বহুকাল পূর্ব্বে আপনা হইতে প্রত্যক্ষ হন। তাঁহাকে কেহ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ঠাকুর হোগলা বনের মধ্যে উঠেন এবং তাল-পাতা ও হোগলা চেটাই ঘরে পূজা হইতে থাকে। সেটি একটি শিলাখণ্ড। বহুদিন পরে গঙ্গাবক্ষে নিমকাঠ ভাসিয়া আসিয়া স্বপ্না-দেশে তাহা দ্বারা বর্ত্তমান চতুর্ভুজা সিন্দূর-মণ্ডিত সিংহবাহিনী দেবী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ বৃদ্ধা অল্প বয়সে জয়েশ্বর ও শিবু ভট্টাচার্য্যকে পূজা করিতে দেখিয়াছিলেন। শিবু ভট্টাচার্য্যের ১০০ শত বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার পিতা-মাতা কেহই কত বৎসরের সেবা বলিতে পারেন নাই। * * * * প্রসাদ যখন গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে ভোর বেলা গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলেন, তখন গঙ্গা মন্দিরের ঠিক নিম্নে ছিল, এ কথা সকলের নিকট শুনিলাম।

(৫) "শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলা মাহাত্ম্যম্" (২৪ পৃঃ) কাশীপুর ৺সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির হইতে সেবাইত শ্রীপ্রসন্নকুমার সিমলাই (জ্ঞানানন্দ তীর্থস্বামী) কর্ত্তৃক ১৩২২ সালের ১৬ই বৈশাখ প্রকাশিত হয়।

কিন্তু এই বৃদ্ধা ও শিবু ভট্টাচার্য্য দুই জনের বয়স যোগ দিলে ১৫০ বৎসরের উপর হিসাবে যে গঙ্গা মন্দিরের গায়ে ছিল এ কথা পাই না। তৎপূর্ব্বে থাকিতে পারে।'

—

পাণ্ডু-নগরাধিপ শ্রীশ্রীমহেন্দ্রদেব
ও
দনুজমর্দ্দনদেবের সম্বন্ধ নির্ণয়

[শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি-এল]

সম্প্রতি প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম ভাগ)" নাম দিয়া গৌড়-বঙ্গের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে রাখাল বাবু যেরূপ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, অসাধারণ গবেষণা ও নিরপেক্ষ বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বিচার-নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসার্হ ও অতুলনীয়। তথাপি, উক্ত গ্রন্থের দুই একটি স্থানে আমরা তাঁহার যে সামান্য-সামান্য ত্রুটী বুঝিতে পারিয়াছি, অদ্য এস্থলে তাহারই একটির সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

উক্ত 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র ১৩১ পৃষ্ঠায় রাখালবাবু পাণ্ডুনগরাধিপ "শ্রীশ্রীমহেন্দ্রদেব" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার চিত্র দেখিয়া অনুমান করিয়াছিলাম যে, উক্ত মুদ্রা ১৩৩৬ শকাব্দা অর্থাৎ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। ঢাকা-বিভাগের স্কুলসমূহের ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্টন্ (H. E. Stapleton) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত, খুলনাজেলায় আবিষ্কৃত দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রা দর্শন করিতে আসিয়া আমাকে মহেন্দ্রদেবের অনেকগুলি রজতমুদ্রা দেখাইয়াছিলেন। এই সমস্ত মুদ্রা ১৩৪০—, ১৩৪৯ শকাব্দের (১৪১৮-১৪২৭ খৃঃ) মধ্যে কোন সময়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। কারণ, এই সকল মুদ্রার সহস্রাঙ্কের স্থানে ১, শতাঙ্কের স্থানে ৩, দশাঙ্কের স্থানে ৪ অঙ্কিত আছে। প্রায় সকল মুদ্রাতেই একাঙ্কের স্থান কাটিয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পাণ্ডুয়ায় আবিষ্কৃত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রায় '১৩৩৬' পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু মহেন্দ্রদেবের নবাবিষ্কৃত মুদ্রা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, পাণ্ডুয়ার মুদ্রার তারিখের প্রকৃত পাঠোদ্ধার হয় নাই। ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ যে মুদ্রার চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এখন কোথায় আছে বলিতে পারা যায় না। মূল মুদ্রার পরীক্ষা না করিয়া পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা উচিত নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে দনুজমর্দ্দনদেবের যে মুদ্রা রক্ষিত আছে, তাহাতে স্পষ্ট শকাব্দা ১৩৩৯ লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্টন্ মহেন্দ্রদেবের যে মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার তারিখের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে তিনি এবং আমি একমত হইয়াছি। এই সকল মুদ্রা যে ১৪১৮ হইতে ১৪২৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল নবাবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, মহেন্দ্র-দেব দনুজমর্দ্দনের পরবর্ত্তী, পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। সুতরাং মহেন্দ্রদেবের সহিত যদি দনুজমর্দ্দন দেবের কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলেও তিনি দনুজমর্দ্দনদেবের পিতা হইতে পারেন না। সুতরাং বটু ভট্টের 'দেববংশে'র ঐতিহাসিক অংশগুলি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে না।"

অবশ্য, ৺রাধেশ চন্দ্র শেঠ মহাশয়ের সংগৃহীত মূল মুদ্রাদ্বয় এখন আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিন্তু উক্ত শেঠ মহাশয় 'শ্রীশ্রীদনুজ মর্দ্দনদেব' ও 'শ্রীশ্রীমহেন্দ্রদেবে'র মুদ্রাদ্বয়ের বিবরণ সহ যে চিত্র ১৩১৭ সনের, ২ সংখ্যা রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, রাখাল বাবু একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া উক্ত সংখ্যা পত্রিকা পাঠ ও মুদ্রা-চিত্র বিশেষ ভাবে দর্শন করিলেই, তাঁহাকে 'মহেন্দ্রদেবের' মুদ্রার সময় সম্বন্ধে অযথা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত না, এবং সহজেই সত্যোদ্ধার হইতে পারিত।

৺রাধেশ বাবু উক্ত মুদ্রাদ্বয়ের প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "এই দুইটী মুদ্রা পাণ্ডুয়ার আদীনা মসজিদের উত্তর পূর্ব্বাংশে ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ মধ্যে সাঁওতাল কৃষকের হলমুখে হল চালকের দৃষ্টিপথে পড়ে, এবং সাঁওতাল কৃষক তাহা গাজোল হাটে বিক্রয় জন্য লইয়া গেলে পুরাতন মালদহের একজন দোকানদার তাহা খরিদ করে। দোকানদারের নিকট মালদহের 'গৌড়দূত' নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আগরওয়ালা মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আমাকে দেন।"

রাধেশ বাবুর উভয় মুদ্রাই রজত মুদ্রা। উক্ত মুদ্রাদ্বয়ের যে আলোক চিত্র তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীদনুজ মর্দ্দনদেবের মুদ্রাটির লেখা কিছু অস্পষ্ট। কিন্তু শ্রীশ্রীমহেন্দ্র দেবের মুদ্রাটির বর্ণমালা ও শকাঙ্ক বেশ স্পষ্ট আছে। কেবলমাত্র সহস্রাঙ্কের স্থানটি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। উভয় মুদ্রারই পশ্চাদ্ভাগে

শ্রীচণ্ডী
চরণপ
রায়ণ

এই কথা কয়েকটী তিন পংক্তিতে একটী চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের মধ্যে লিখিত আছে।

শ্রীশ্রীমহেন্দ্রদেবের মুদ্রায় "শ্রীচণ্ডী" শব্দের উপরিস্থিত বৃত্তচাপাকৃতি প্রকোষ্ঠে 'পাণ্ড', দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ 'নগর', নিম্নে 'শএর অংশ ও 'কাব্দা', এবং বামপার্শ্বে একটী সংখ্যা আছে। উক্ত সংখ্যার সহস্রাঙ্ক স্থানটী বিলুপ্ত হইয়াছে। শতক ও দশক স্থানে '৩,৩' মুদ্রিত আছে। তৎপর একক স্থানে বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে অঙ্কটিকে, '৬' বলিয়া বোধ হয়। ৺রাধেশ বাবুও একক স্থানীয় অঙ্কটিকে '৬' বলিয়াই

পাঠ করিয়াছেন। স্বয়ং রাখালবাবুও না কি উক্ত অঙ্কটিকে '৬' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা যে ১৩৩৬ শকাব্দায় [অন্ততঃ ১৩৩৯ শকাব্দার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে] 'পাণ্ডুনগরে' মুদ্রিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ পরিদৃষ্ট হয় না।

শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রাটি আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর। উহার পশ্চাদ্ভাগস্থ চতুর্ভুজক্ষেত্রের 'রায়ণ' কথাটির নিম্নে 'পা'এর শেষাংশ ও 'ণ্ডু', বামপার্শ্বে 'নগর', উপরে অস্পষ্ট ও আংশিক ভাবে 'শকাব্দা' ও দক্ষিণ পার্শ্বে একটি সংখ্যা মুদ্রিত আছে। উক্ত সংখ্যাটির দশক ও এককস্থানীয় '৩' ও '৯' খুব পরিস্কৃত ভাবে আছে। শতক স্থানীয় অঙ্কটি অস্পষ্ট ও সহস্রক স্থানীয় অঙ্কটি বিলুপ্ত। যাহা হউক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় 'শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দন দেব" নামাঙ্কিত অপর একটি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়া দনুজমর্দ্দন দেবের সময় সম্বন্ধে মতদ্বৈধের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। সতীশ বাবুর উক্ত মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠায়—

'শ্রীশ্রীদ
নুজ মর্দ্দ
ন দেব'

ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় —

'শ্রী চণ্ডী
চরণ প
রায়ণ'

এবং 'শকাব্দা ১৩৩৯' ও 'চন্দ্রদ্বীপ' অঙ্কিত থাকায় দনুজমর্দ্দন দেবের পাণ্ডুনগরে মুদ্রিত মুদ্রার শকাব্দা-সংখ্যাও যে '১৩৩৯', তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা ব্যতীত ১৩১৯ সালের ১২শ ভাগ ১ম খণ্ড 'প্রবাসী'র ৩৮১, ও ৩৮৬ পৃষ্ঠাতে 'দনুজমর্দ্দনদেব' শীর্ষক প্রবন্ধের গর্ভেও ৺রাধেশবাবুর উক্ত মুদ্রাদ্বয় ও সতীশবাবুর আবিষ্কৃত মুদ্রাটীর আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক একটু কষ্ট স্বীকার করিলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন করিতে পারিবেন। সুতরাং রাজা মহেন্দ্রদেব যে রাজা দনুজমর্দ্দনদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী—উক্ত মুদ্রাত্রয়ে অঙ্কিত শকাব্দাই তাহার অকাট্য প্রমাণ।

দ্বিতীয় কথা, উক্ত মুদ্রাত্রয় হইতে আমরা আরও একটি বিশেষ কথা জানিতে পারিতেছি যে, রাজা মহেন্দ্রদেব 'পাণ্ডুনগরে' রাজত্ব করিতেন; এবং রাজা দনুজমর্দ্দনদেব ১৩৩৯ শকাব্দায় যথাক্রমে 'পাণ্ডুনগরে' ও 'চন্দ্রদ্বীপে' রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাখালবাবু ষ্টেপলটন্ সাহেবের নিকট 'মহেন্দ্রদেব' নামাঙ্কিত যে সকল মুদ্রা দেখিয়াছেন, তাহাতে 'পাণ্ডুনগর' ও 'চণ্ডীচরণ পরায়ণ' পদগুলি অঙ্কিত আছে কি না জানিতে পারিলে, আমাদের আলোচ্য 'মহেন্দ্রদেব' ও ষ্টেপলটন্ সাহেবের মুদ্রার 'মহেন্দ্রদেব' অভিন্ন ব্যক্তি কি না, বুঝিবার সুবিধা হইত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে রাখালবাবু ঐ দুইটী প্রধান বিষয় সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই। ইহা একটী প্রসিদ্ধ কথা যে, রাজা দনুজমর্দ্দনদেব হইতে চন্দ্রদ্বীপে দেববংশের রাজত্বের সূত্রপাত হয়, এবং তিনি দীর্ঘকাল চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়া নানা প্রকার সমাজ সংস্কার করিয়া যান। রাখাল-বাবু নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজা দনুজমর্দ্দনদেব পাণ্ডুনগর পরিত্যাগ করতঃ চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য সংস্থাপন করেন। সুতরাং 'পাণ্ডু-নগরাধিপ' 'চণ্ডীচরণ পরায়ণ' 'শ্রীশ্রীমহেন্দ্রদেব' পাণ্ডুনগর ও চন্দ্রদ্বীপাধিপ' 'চণ্ডীচরণ পরায়ণ' "শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দন দেবে'র পূর্ব্ববর্ত্তীই হইতেছেন। কারণ, 'মহেন্দ্রদেব' 'দনুজমর্দ্দনদেবে'র পরবর্ত্তী হইলে তাঁহার মুদ্রায় 'পাণ্ডুনগর' অঙ্কিত না থাকিয়া 'চন্দ্রদ্বীপ' অঙ্কিত থাকিত। রাখাল বাবুর মতানুসরণ করতঃ মহেন্দ্রদেবকে দনুজমর্দ্দন দেবের পরবর্ত্তী করিতে হইলে বলিতে হয় যে, দনুজমর্দ্দনদেব '১৩৩৯' শকাব্দায় 'চন্দ্রদ্বীপে' রাজা হইয়া অভাব হইলে পর 'মহেন্দ্রদেব' চন্দ্রদ্বীপ হইতে গমন করিয়া ১৩৪০ শকাব্দায় 'পাণ্ডুনগরে'র আধিপত্য লাভ করতঃ তথায় নিজনামে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন, এবং ১৩৪৯ শকাব্দা পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং রাখালবাবুর মতানুসরণ করিলে আমাদিগকে দুইটি বিষয় স্বীকার করিয়া লইতে হয়; প্রথমতঃ ৺রাধেশবাবুর সংগৃহীত 'মহেন্দ্রদেবে'র মুদ্রার শকাব্দার পাঠ '১৩৩৬' না হইয়া অন্যপ্রকার পাঠ কল্পনা করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ ১৩৩৯ শকাব্দার পরে [অর্থাৎ রাখাল বাবুর মতে ১৩৪০ হইতে ১৩৪৯ শকাব্দা পর্য্যন্ত] পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়ায় স্বাধীন হিন্দুরাজত্বের কল্পনা করিতে হয়। অন্যথা রাধেশবাবুর সংগৃহীত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রায় 'পাণ্ডুনগর' অঙ্কিত থাকিবার কোন সার্থকতাই থাকে না। কিন্তু ১৩৩৯ শকাব্দার [১৪১৭ খৃঃ] পরে পাণ্ডুয়ায় যে কোন স্বাধীন হিন্দুরাজা রাজত্ব করিয়া নিজনামে মুদ্রা-প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কোনরূপেই ইহার সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, স্বয়ং রাখালবাবুও উহার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব 'পাণ্ডুনগরাধিপ' 'চণ্ডীচরণ পরায়ণ' 'শ্রীশ্রীমহেন্দ্রদেব'কে 'পাণ্ডুনগর ও চন্দ্রদ্বীপাধিপ' 'চণ্ডীচরণ পরায়ণ' 'শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দনদেবে'র পূর্ব্ববর্ত্তী স্বীকার না করিয়া উপায়ান্তর আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু ষ্টেপল্‌টন সাহেবের নিকট 'মহেন্দ্রদেবে'র নামাঙ্কিত যে সকল মুদ্রা দেখিয়াছেন, হয় উক্ত 'মহেন্দ্রদেব' [পাণ্ডুনগরাধিপ] [চণ্ডীচরণ পরায়ণ] 'শ্রীশ্রীমহেন্দ্রদেব' হইতে ভিন্ন ব্যক্তি; নতুবা রাখালবাবু ও ষ্টেপল্‌টন্ সাহেব উক্ত মুদ্রা-গুলির শকাব্দার প্রকৃত পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হ'ন নাই। আমাদের মনে হয়, ষ্টেপল্‌টন্ সাহেবের সংগৃহীত মুদ্রাগুলির শকাঙ্কের প্রকৃত পাঠ '১৩৪০ হইতে ১৩৪৯' না হইয়া '১৩৩৬ হইতে ১৩৩৯' হইবে। যাহা হউক, মুদ্রাগুলি [অন্ততঃ তাহাদের আলোক-চিত্র] না দেখিয়া এত বড় একটা বিষয় সম্বন্ধে অনুমানমূলক কিছু বলা সঙ্গত বোধ করি না। বটুভট্টের 'দেববংশম্'এর কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কি না, এস্থলে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

নহে। তবে যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত রাখালবাবু 'বটুভট্টের দেববংশ'কে উড়াইয়া দিতে চাহেন, ঐ প্রমাণের যে আদৌ কোন ভিত্তি নাই, তাহা প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

নদীয়ার কথিত ভাষার বিশুদ্ধত্ব।

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, বি-এ]

শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় না কি বলিয়াছিলেন যে, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর এবং শান্তিপুরের লোকেই বিশুদ্ধতম বাংলা ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন। পুরীতে একদিন পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র রায় মহাশয় কথায় কথায় আমায় বলিতেছিলেন—"নদীয়ার উচ্চ-শ্রেণীর লোকের কথাগুলি প্রায় সাধুভাষার তুল্য; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকের কথা তেমন শুদ্ধ নয়। হুগলী জেলায় কিন্তু ইতর-ভদ্র সকলেই শুদ্ধভাষা বলেন—মুসলমানে ব্রাহ্মণে কথায় প্রভেদ ধরিবার জো নাই।" হুগলীর ভাষার এই অবিমিশ্র প্রশংসা শ্রবণে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া একটু অনুসন্ধান করিলাম—তাহাতে জানিলাম—হুগলী অধ্যাপক-প্রবরের জন্মস্থান। সুতরাং স্পেন্সার যাহাকে bias of patriotism বলিয়াছেন, তাহার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হাতে হাতে পাইলাম। অবশ্য এই যুক্তিটি আমার ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না। কারণ, ভাষাতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক মহোদয়ের কথাতেই বলি—"নদীয়া অনেক দিন বাংলার রাজধানী ছিল এবং বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখনও নদীয়ায় শিক্ষার প্রচার বেশ আছে—ইহাতে ভাষার বিশুদ্ধতা আপনিই হইবে ত।"

যাই হৌক্—নদীয়ার ভাষার এই লোভনীয় উচ্চাসন এখন অনেকের ধাক্কায় টলিতে বসিয়াছে। বর্ত্তমানযুগের শ্রেষ্ঠতম কবি ও ভাবুক সাহিত্যসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ তো কলিকাতার ভাষার স্বপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে মহাপরাক্রমশালী "বীরবল" তাঁহার 'সবুজ পত্র'কে প্রধান বাহন করিয়া দিয়াছেন। তবে একটু আশার কথা এই যে, উদীয়মান ভাষাবিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার সঙ্গে-সঙ্গে নদীয়া প্রভৃতি আশপাশের কয়েকটি জেলাকেও বিশুদ্ধ ভাষাভাষীর রাজ্যে স্থান দিয়াছেন।

একটু ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, আজকালকার লিখিত ভাষার সহিত নদীয়ার ভদ্রসমাজে কথিত ভাষার যতটা সাদৃশ্য আছে—কলিকাতার ভাষার ততটা নাই। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণগুলি হইতেই কথাটি পরিষ্কার হইবে। বর্ত্তমান নদীয়া জেলা শাসনকার্য্যের সুবিধার্থ গঠিত বলিয়া অনেক বাহিরের জায়গা এ জেলাভুক্ত হইয়াছে। আবার নদীয়ার ভাষা ও সভ্যতার অনুগামী অনেক স্থান এ জেলা হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সেজন্য আমি এস্থলে কেবল নবদ্বীপ, শান্তিপুর এবং কৃষ্ণনগরের ভাষা লক্ষ্য করিয়াই প্রধানতঃ আলোচনা করিব। কৃষ্ণনগর আমার জন্মভূমি—আমার ২১ বৎসর বয়সের মধ্যে ২০ বৎসর একপ্রকার কৃষ্ণনগরেই অতিবাহিত হইয়াছে—এজন্য কৃষ্ণনগরের ভাষা—তথা নদীয়ার ভাষা সম্বন্ধে—আমার নিজের ভাষাকে অনেকটা প্রামাণিক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

বহুদিন হইতে নবদ্বীপ এবং শান্তিপুর পূর্ব্ববঙ্গবাসী বৈষ্ণবগণের তীর্থস্থান হওয়ায় এবং তাঁহাদের গমনাগমনের পথে কৃষ্ণনগর পড়ায়, পূর্ব্ববঙ্গের কথার প্রভাব—এই তিন স্থানের ভাষার উপর একটু সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ 'ড়' এবং 'র' এর উচ্চারণ ভেদ করণে শিথিলতা, "যাবা" "খাবা" প্রভৃতি শেষমাত্রা-দীর্ঘ ক্রিয়াপদের ব্যবহার। কলিকাতার অধিকাংশ চলিত কথায় প্রথম মাত্রার উপর জোর বেশী—আর কর্ম্মব্যস্ত নাগরিকগণ অনেক কথারই উচ্চারণ সংক্ষেপ করিয়া আনিয়াছেন। নিম্নের উদাহরণগুলি হইতে ইহা বুঝা যাইবে—

লিখিত ভাষা	নদীয়ার চলিত ভাষা	কলিকাতার চলিত ভাষা
পোয়া	পোয়া	পো
দুয়ার	দুয়োর	দোর
জুয়াচোর	জুয়োচোর	জোচ্চোর
বিবাহ	বিয়ে	বে
দিয়াশালাই	দিয়েশালাই	দেশ্‌লাই
পেয়ারা	পেয়ারা	প্যায়রা
গোয়ালা	গোয়ালা	গয়লা
পেঁয়াজ	পেঁয়াজ	প্যাঁজ
তামা	তামা	তাঁবা
আম	আম	আঁব
দুপুর	দুপুর	দুকুর
দেখিয়াছি	দেখিচি	দেখেচি
করিলাম	করলাম	কর্লুম
গিয়াছে	গিয়েছে	গ্যাছে
গিয়াছিলাম	গিছ্‌লাম	গেসলুম্
ছিল, বলিল	ছিল, বল্‌ল	ছেলো, বল্লে

এইরূপ অনেক কথাই উদ্ধৃত করা যাইতে পারে; কিন্তু স্থানাভাবে কেবলমাত্র কয়েকটি typical শব্দ দেওয়া হইল। আরো কয়েকটি শব্দ-সমষ্টি দিতেছি।

আমরা 'মাথার পর হতে বোঝা ছুঁড়ে' ফেলি না কিন্তু 'মাথার উপর থেকে বোঝা ছুড়ে ফেলি।' আমরা 'কুড়েমি'র প্রশ্রয় কখনো কখনো দিলেও 'কুঁড়েমি'র প্রশ্রয় কথাবার্ত্তাতেও দিই না। কলিকাতা অঞ্চলে 'গরমিকালে' অনেক খালবিল হেঁটে 'পেরিয়ে' লোকে যায় বটে কিন্তু আমাদের জলাঙ্গী, ভাগীরথীতে এত জল থাকে যে 'গ্রীষ্মিকালে'ও নৌকাযোগে 'পার হ'য়ে' যেতে হয়।

উপরের উদাহরণগুলি হইতে মোটামুটি দেখা যাইবে, কলিকাতার চলিতভাষার সহিত নদীয়ার চলিত ভাষার প্রভেদ কত অল্প,—যদিও লিখিতভাষার সহিত কলিকাতার অপেক্ষা নদীয়ার ভাষারই সাদৃশ্য

একটু বেশী। কলিকাতার খাঁটি প্রাদেশিক শব্দ বাদ দিলে উভয় স্থানের ভাষা প্রায় এক হইয়া দাঁড়ায়। যাহা কিছু বেশী গোলমাল ক্রিয়াপদের শেষ অংশের উচ্চারণ লইয়া। 'কর্‌লাম্' 'আসলাম্' (কলিকাতায় 'ক্যোর্‌লুম্', 'আসলুম্') প্রভৃতি উচ্চারণে এমন একটা ট্যারচা টান আছে যে, তাহা নদীয়াবাসীর মুখে প্রায় 'করিলাম' 'আসিলাম' প্রভৃতির মতই শোনায়। 'যাবা' 'খাবা' প্রভৃতি অনেক নদীয়াবাসী ব্যবহার করেন; কিন্তু খাস কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ এবং শান্তিপুর অঞ্চলের শিক্ষিত লোককে এগুলি একারান্ত না করিয়া উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

নদীয়ার কৃত্তিবাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সাহিত্যরথীগণের প্রভাব বাংলাভাষার উপর কম নয়। তাঁহাদের রচনার অনেক স্থলেই নদীয়ার কথিত ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে। কটমট পণ্ডিতি বাংলার দিন চলিয়া গিয়াছে। কথিত-ভাষার সহিত যোগ রাখিয়াই প্রাণবান্ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়—ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্বীকার করিয়াছেন। বাংলা ভাষার বর্ত্তমান মহাপরিবর্ত্তনের যুগে নদীয়ার চলিত ভাষা অনেকটা পথ দেখাইতে পারে মনে করিয়া এই সামান্য প্রবন্ধে সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

কয়লার খনি।

[শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত]

ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা বড়-বড় ব্যবসায়ের স্থানে একটু লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালীর ব্যবসায় করিবার—করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পক্ষে সমস্তই আছে; কেবল ইচ্ছার অভাবে, চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের অভাবে বাঙ্গালীর লক্ষ্মী এমন অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। এ সকল বিষয়ে আগ্রহ জন্মাইতে হইলে, ইহার আলোচনা করা ভিন্ন গত্যন্তর দেখা যায় না।

ব্যবসায় সম্বন্ধে একবার আমরা আলোচনা করিতেছিলাম। ভারতে ব্যবসায়ী বলিতে একমাত্র মাড়োয়ারীর দলকে বুঝায়,—ইহাই আমাদের কথা ছিল। সেখানে একজন মাড়োয়ারী মহাজন উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের আলোচনায় যোগদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে—"ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর যোগ্যতার তুলনা নাই তাহা সকলেই জানে। আমি বলি, পাশ্চাত্য দেশেও এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, ধীমান জাতি খুব কম আছে। আমি আমার ব্যবসায়ের কার্য্যোপলক্ষে অনেক য়ুরোপীয় বড়-বড় কর্ম্মচারী রাখিয়া দেখিয়াছি যে, তাহাদের অপেক্ষা বাঙ্গালীর দ্বারা কার্য্য ভাল হয়। এখন আমার সমস্ত কর্ম্মচারী বাঙ্গালী। আমার কার্য্যক্ষেত্র বোম্বাই পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাঙ্গালী ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নামে নাই বলিয়াই, আমরা কিছু করিয়া লইতেছি। যে দিন ইহারা ব্যবসায় করিতে অগ্রসর হইবে, সেই দিন হইতেই ভারতের অন্যজাতিকে সরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কারণ, আমি দেখিয়াছি, বাঙ্গালার একটী দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক ভারতের ভিন্ন স্থানের ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক অপেক্ষাও অধিক বুদ্ধিমান। তবে ইহারা বড় আলস্যপরায়ণ। পরের টেবিল, চেয়ার, দোয়াত-কলমে,—পরের কেদারায় বসিয়া, পরের হুকুমমত কাজ করিয়াই ইহারা নিশ্চিন্ত। ইহাদের দেশ ত আমাদের মত মরুভূমি নহে, আমাদের মত বালি-পাথরে এদের বাস করিতে হয় না,—সুজলা, সুফলা এদের দেশ,—তাই অল্প চেষ্টায় ইহাদের আবশ্যক সমস্তই ইহারা পায়, এবং শৈশব হইতে এই কারণে অল্প পরিশ্রমে অভ্যস্ত থাকিয়া ইহারা এত অলস হইয়া পড়ে। তাই, ইহাদের কিছু টাকা হইলেই, ইহারা জায়গা জমি কিনিয়া জমিদার হয়, এবং এইরূপ হওয়াটাকে ইহারা জীবনের শ্রেষ্ঠ দান বলিয়াই মনে করে। দারিদ্র্য যেমন একটা অভিশাপ, সেইরূপ অলস বড়লোকেও ভগবানের একটা অভিশাপ—জানিও বাবু!" কথাগুলিতে আমরা সকলে নিস্তব্ধ হইয়া গেলাম। দেখিলাম, এই মাড়োয়ারী মহাজন বাঙ্গালীকে যেভাবে চিনিয়াছে,—বাঙ্গালীর মধ্যে কয়জন এ ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা বলা সহজ নহে। এই শ্রমবিমুখতা যে আমাদের সকল কষ্টের কারণ, এত বড় সত্য কথা এমন করিয়া আমার কাছে আর কেহ বলে নাই। তাহার পরে আমার ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার ইচ্ছা হয়, এবং ঘটনাচক্রে আজ প্রায় আট-মাস কাল কয়লার খনির সংস্রবে আসিবার সুযোগ পাওয়ায়, সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির কথা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। এবং সেই কথাগুলি মনে আছে বলিয়াই, আজ কয়লার খনির ব্যবসায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

খনি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। পৃথিবীর রত্নগর্ভে কত রত্ন কি ভাবে রহিয়াছে, তাহার তত্ত্ব ও তথ্য নিরূপণের চেষ্টায় ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কি মহাগবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। আর তাঁহাদের গবেষণার ফল মাথায় লইয়া কর্ম্মী এবং কৃতী পুরুষগণ কতকাল ধরিয়া, কি ভাবে ধরণীর গর্ভ হইতে কত ধনরত্ন আহরণ করিতেছেন, তাহা মনে করিলে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। বিদ্যা, অর্থ এবং শক্তি একাধারে সংযুক্ত হইলে, পৃথিবীতে যে অসাধ্য সাধন করা যায়, তাহা পৃথিবীর ইতিহাস প্রতি পলে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। আর ইহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতি-মানুষ-শক্তিসম্পন্ন কবি, মানুষের মোহ ভাঙ্গিবার চেষ্টায় বলিয়াছেন :—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

যিনি অন্তর্দর্শী কবির আদেশ মাথায় লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে বরণ না করিয়া থাকিতে পারেন

নাই। বিজ্ঞানবিদ্‌, কবি এবং ভাবুক এই ভাবেই মানবের কর্ম্মপথ প্রসারিত করিয়া দিবার জন্য সদা সচেষ্ট রহিয়াছেন। Longfellow এই উদ্দীপনাতেই ইংলণ্ডকে—তথা জগৎকে, জাগাইয়া রাখিয়াছেন। এ সকল কথা এইখানে শেষ করিয়া, যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই আরম্ভ করিতেছি।

বলিতেছিলাম ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার কথা। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পৃথিবীকে তিনটি জিনিসের সমষ্টি বলিয়া স্থির করিয়াছেন—বায়ু, জল এবং প্রস্তর। এই তিনে এক—একে তিন; পৃথিবী ইহারই অপূর্ব্ব খেলা দেখাইয়া জগৎবাসীকে মুগ্ধ করিতেছেন। বায়ু শক্তি, জল শক্তি এবং প্রস্তর-শক্তি যে মহাশক্তির খেলা দেখাইয়া চলিয়াছে, ক্ষুদ্র মানবের অতিক্ষুদ্র গবেষণার শক্তি তাহাতে সামান্য কার্য্য করিতে পারিলেও, সে শক্তির কাছে কেবল বিভোর হইয়াই যাইতেছে। জল-শক্তি মনশক্তির সমান। মন মুহূর্ত্ত মধ্যে যেমন পৃথিবী বিচরণ করে, এই জলও তেমনই জোরে প্রস্তর ভেদ করিয়া জলশক্তির অটুট বলে পৃথিবীর গঠন-কার্য্য এত দ্রুত করিয়া চলিয়াছে। ইহা প্রস্তরকে পচাইয়া যেমন একদিকে বালি মাটির সৃষ্টি করিতেছে, তেমনি অন্য-দিকে সমুদ্রগর্ভে এই মাটি, বালি, গাছ, পাথর, আনিয়া ফেলিয়া পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপের সঙ্গে চাপের ব্যবস্থায় নূতন প্রস্তরের সৃষ্টি করিতেছে। এ রহস্য যিনি প্রথমে ভেদ করিয়াছেন, সেই পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ—সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের দর্শনকে দিব্যদর্শন জানিয়া জগৎবাসী তাই বিজ্ঞানের মহিমা এমন করিয়া প্রচার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে।

পৃথিবীর অভ্যন্তর অত্যন্ত গরম। গরমের জোরে সময়ে-সময়ে এই পাথর উপরের দিকে উঠিয়া পড়ে। এই উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরের অংশবিশেষকে ডাইক (dyke) বলে। এগুলি একেবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া পৃথিবীর বক্ষে এইভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। জলস্রোত অনবরত মাটি, বালি, গাছ, পাথর, জীব-জন্তু সকলই ভাসাইয়া লইয়া সমুদ্রে বা হ্রদে ফেলিতেছে। স্থির জলে আসিয়া এই সকল দ্রব্য নীচে পড়িতে থাকে। প্রথমে ভারি দ্রব্য সকল নীচে পড়িয়া যায়, তাহার পরে স্তরে-স্তরে হাল্‌কা দ্রব্য সকল জমিতে থাকে। এই স্তর সকল আভ্যন্তরীণ উত্তাপে এবং উপরের চাপে প্রস্তরে পরিণত হয়। খড়ি বা চুণ জীবজন্তুর হাড় ও অন্যান্য দ্রব্যের স্বাভাবিক রাসায়নিক শক্তিতে প্রস্তুত হয়, এবং পাথুরে কয়লা গাছ, পাতা, ঘাস প্রভৃতির স্বাভাবিক রাসায়নিক শক্তির ফল বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। এইরূপে কুড়ি মাইল পুরু পাথরকে পণ্ডিতগণ দ্বাদশ স্তরের সমাবেশ বলিয়াছেন। এই সমস্ত সৃজন-কার্য্য মহাসমুদ্রের গভীরতার মধ্যে যুগ যুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে; এবং কালের পূর্ণ পরিণতি ঘটিলে একদিন, আগ্নেয়গিরির গৈরিক-ধারায় পরিণত হইয়া নানা স্থানে নানারূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। বিশ্ব এইরূপ বিবর্ত্তনের পথে আপনাকে ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া উন্নতির দিকে আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

এই ত গেল কয়লার উৎপত্তির কথা। এইটুকু জানিলেই কয়লার খনির কারবার চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে। না জানিলেই বা ক্ষতি কি? এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সকলেই কিছু ভূতত্ত্ববিদ্‌ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন নাই। তাহাতে তাঁহাদের কাহারও কোনও অসুবিধা ঘটিতেছে এমন নহে। প্রথমে জমি সংগ্রহের সময় একজন বিশেষজ্ঞ লোকের সাহায্য গ্রহণ করিলেই হইল। তাহার পরে কার্য্যক্ষেত্রে নানা বিভাগের নানা লোকের সাহায্য অর্থের বিনিময়ে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এবং সকলের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়। এখন এই কার্য্য কি ভাবে চলিতেছে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

জমি স্থির হইয়া গেলে প্রথমে খাদ কাটিতে হয়। ৩০।৪০ বা ৫০ ফিটের মধ্যে কয়লা থাকিলে, এই খাদ ঢালুভাবে সুড়ঙ্গের পথে লইয়া যাইতে হয়।—যেমন কলিকাতার কেল্লায় যাইবার পথ। কিন্তু সকল স্থানে এত অল্প খাদে কয়লা পাওয়া যায় না বিলাতে তিন হাজার ফিট নীচু খাদ আছে। এখানেও স্থানে-স্থানে হাজার বারশত ফিট নীচু খাদ আছে। এই সকল গভীর খাদে কলের সাহায্যে নামা উঠা করা হয়। এই সকল খাদের কার্য্যালয় প্রভৃতি অনেক স্থলে নীচের খাদের কিছু উপরে থাকে। এ সকলের কথা ছাড়িয়া সাধারণতঃ ৩০।৪০ ফিট নীচের খাদে কিরূপ ভাবে কার্য্য হয়, তাহাই আমি বলিব।

খনিজ ভূমিতে সাধারণতঃ প্রস্তর অত্যন্ত অধিক পরিমাণে থাকে। কয়লাও পাথরের বিভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। সুতরাং খাদ কাটিবার সময় পাথর কাটিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই পাথর ফাটাইবার জন্য ডিনামাইট ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমে স্থানে স্থানে সাবল দিয়া ২।৩।৪ ফিট গর্ত্ত করিতে হয়। এই গর্ত্ত বাঁকা ভাবে ঠিক রেকের মত মত হয়। সকল গুলি বাঁকাইয়া মধ্যের দিকে আনয়ন করা হয়। তাহার পরে ডিনামাইট দেওয়া হয়। ইহাতে একেবারে অনেক পাথর ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পরে সেই ভাঙ্গা পাথরের মধ্যে বৃহৎ-বৃহৎ গুলি হাতুড়ির সাহায্যে ভাঙ্গিয়া ছোট করিয়া উপরে উঠাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ভাবে পাথর কাটা চলিতে থাকে। তাহার পরে কয়লা বাহির হইবার পূর্ব্বে শ্লেট পাথর বাহির হয়। সে পাথরও ডিনামাইটের সাহায্যে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। শ্লেট পাথর বাহির হইলেই যে তাহার পরে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা নহে। কোন-কোনও স্থলে আবার কঠিন প্রস্তর বাহির হয়। তাহার পরে আবার শ্লেট পাথর পাওয়া যায়। এই শ্লেট পাথরই কয়লার খনির ছাদ। খাদে কয়লা বাহির হইলে সুড়ঙ্গ কাটা হয়। সুড়ঙ্গ সাধারণতঃ ১০।১২ ফিট চওড়া এবং ঐ পরিমাণ উচ্চ হইয়া থাকে। এই জন্য খনির চারি দিকেই সুড়ঙ্গ কাটিতে হয়। এই সুড়ঙ্গের দেওয়াল সুড়ঙ্গের তিনগুণ মোটা হয়। এই জন্য সুড়ঙ্গপথে যে পরিমাণ কয়লা বাহির হয়, তাহার তিনগুণ কয়লা তখনও বাহির করিবার থাকে। সমস্ত জমির সুড়ঙ্গ কাটা শেষ হইলে দেওয়াল কাটা আরম্ভ হয়। সকলেই যে সমস্ত জমির সুড়ঙ্গ শেষ হইলে দেওয়াল কাটিতে আরম্ভ করেন তাহা নহে। ১০।২০ বিঘার সুড়ঙ্গ শেষ করিয়া অনেকে দেওয়াল কাটিয়া কয়লা বাহির করিয়া

লয়েন। দেওয়াল কাটিবার সময় মোটা শালের খুঁটি ছাদ রক্ষা করিবার জন্য চাড়া দিতে হয়। পুরাতন বাড়ীর দেওয়াল বদ্‌লাইবার সময় যে ভাবে ছাদে চাড়া দেওয়া হয়, ইহা সেই ধরণের ব্যাপার। এই সময় খুঁটি সর্ব্বদা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে হয়, এবং খারাপ সন্দেহ হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা বদ্‌লাইয়া দিতে হয়। দেওয়াল কাটিবার সময় উপরের অধিবাসিগণকে উঠাইয়া দেওয়া হয়। ছয় মাস পূর্ব্বে এই কার্য্য করা হয়। সুড়ঙ্গ যখন কাটা হয়, তখন উপরের অধিবাসিগণ থাকিতে পায়। তখন সুড়ঙ্গের অবস্থা গোলোকধাঁধার মত। এই ভাবে একতালার কয়লা কাটা শেষ হয়। কিন্তু যেখানে কয়লার পরিমাণ ৩০।৪০ ফিট, সেখানে খনি ৩।৪ তলা হয়। দ্বিতীয় তলা হইতে সুড়ঙ্গের ছাদ কয়লার হয়। ৬।৭ ফিট মোটা ছাদ সাধারণতঃ রাখা হয়। বাকী সকল কাযই প্রথম তলার ন্যায় হইয়া থাকে।

কয়লা যাহারা কাটে, তাহাদিগকে মালকাটা বলে। ইহারা স্ত্রী-পুরুষে কায করে। স্ত্রীলোকের নাম কামিন্। একজন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোকে এক গাঁইতি হয়। গাঁইতি অর্থাৎ কয়লা কাটিবার যন্ত্র। রাস্তা সারাইবার সময় যাহা দিয়া রাস্তা খোঁড়ে, ইহা সেই যন্ত্র। ইহারা টন হিসাবে পয়সা পায়। ২০ ফিট চওড়া এবং ১ ফুট পুরু কয়লায় দুই টন হয়। ইহাদের জন্য যে কুলি ব্যারাক আছে তাহার নাম ধাওড়া। ইহাদের আচার-ব্যবহার অত্যন্ত জঘন্য। রোগে ভাত খাওয়া বন্ধ করিতে বলিলে ইহাদের বড় ভয় হয়। ভাত বন্ধ করিলে রোগী মরিয়া যাইবে বলিয়া ইহারা মনে করে। ইহাদের চিকিৎসক ওঝা বা রোজা। তাহারা ভূতের পূজা করে। কঠিন রোগ হইলে ভূতের দানে চড়িয়াছে বলে—অর্থাৎ কোনও কুপিত ভূত রোগীর এই অবস্থা আনিয়া দিয়াছে। ডাক্তারী ঔষধকে ইহারা ভয় করে। ডাক্তার আসিতেছে বলিলেই রোগী ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস, ডাক্তারী ঔষধ খাইলেই রোগী মরিয়া যাইবে। এই জন্য একেবারে মৃত্যু-সময় উপস্থিত না হইলে ইহারা ইহাদের কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দেয় না। ইহাদের খাদ্য চাল হইতে চালের কুঁড়া পর্য্যন্ত। তরকারি ইহারা বড় খায় না। তবে মাংস এবং মদ ইহাদের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। সপ্তাহ শেষে "হাপ্তা" পাইলে ইহাদের মদ এবং নাচ খুব চলে। ইহাদের সমাজ সভ্যসমাজের বাহিরে। এই পশুপ্রকৃতি মানব মানবী এদেশীয় খনির প্রাণস্বরূপ।

খনির জন্য এই গাঁইতি এবং কেরোসিন তেল থাকিলেই এক প্রকার চলে। তবে জল উঠাইবার জন্য পাম্প্ বসাইতে হয়, এবং কয়লা বহনের জন্য ঠেলাগাড়ি নীচে-উপরে চালাইবার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়; এবং রেল লাইনের সঙ্গে সংযোগ রাখিবার জন্য সাইডিং আবশ্যক হয়। আর খনির উন্নতির জন্য বাতাস, বৈদ্যুতিক আলোর সঙ্গে shaft এবং quarry কাটান হয়। এই পর্য্যন্ত বলিলেই এ ব্যবসায়ের মোটামুটি সংবাদ দেওয়া হইল।

এই ভাবে আজকাল অনেক লোকে কয়লার কারবার চালাইতেছন। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যপথে অনেক বাধা আসিয়াছে। যে সমস্ত কুলিমজুর ডাক্তারের নামে ভয় পায়, এবং রোগের কথা যাহারা প্রাণপণে ঢাকিয়া রাখে, তাহাদের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ যে সকল ব্যবস্থার আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিতে বৎসরে ৩।৪ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। বৎসরে এই পরিমাণ টাকা অনেক খনির মালিকের এখন লাভ হয় কি না সন্দেহ। অবশ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং কুলিগণের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক মালিকের কর্ত্তব্য বটে। মালিকগণ সে কর্ত্তব্য বর্ত্তমানে যথাসাধ্য পালন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। আইনের বাঁধাবাঁধিতে তাঁহারা কষ্টে পড়িয়াছেন। তাহার পরে নূতন আইনের বলে অনেক খনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সকলেই কিছু একদিনে বড় হয় না; আর সকল খনি হইতেই কিছু উৎকৃষ্ট কয়লা বাহির হয় না। তবুও তাহারা বর্ত্তমানের বাজারে দুই পয়সা রোজগার করিতেছিল। ইহা খাইবার দ্রব্য নহে যে, নিকৃষ্ট বস্তু খাইয়া প্রজা-সাধারণ রোগে পড়িবে; তবে ইহা খাদ্য প্রস্তুতের একটা উপকরণ বটে। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান আইনে ৩ নং সিম পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ জারী হইয়াছে, এবং তদতিরিক্ত অনেকে বিশেষ বাঁধাবাঁধির মধ্যে পড়িয়াছে। অর্থাৎ মাসে পাঁচ ছয় শত টাকার অধিক কয়লা তোলা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এইভাবে এ কারবারে আঘাত লাগিয়াছে। অনেকে এই ক্ষেত্রে আসিয়া বর্ত্তমানে ব্যবসায়ের প্রতি যত্নবান্ হইতেছিল, তাহাদের শ্রদ্ধায় ঘা লাগিয়াছে। অনেকের চাকুরি যাইতেছে। নিজের পয়সায়, নিজের চেষ্টায় যদি লোকে কার্য্য করিতে গিয়া এইরূপে বাধা পায়, এবং চাকুরির পথ যদি অবারিত না থাকে, তবে এ দেশের লোকের গতি কোথায়? এই প্রকারেই আমাদের দেশে তাঁতির তাঁত উঠিয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে আমরা ৫ৄ টাকায় চট কিনিয়া পরিতেছি। এই প্রকারেই আমাদের শিল্প-বাণিজ্য লোপ পাইয়াছে। পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া কবি বলিয়াছেন:—

"দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত কিবা কুতূহলী,
বিবিধ মানব জাতিরে লয়ে।"

নিজেদের প্রতি চাহিলে কি দেখা যায়? চারিদিকে নৈরাশ্য, চারিদিকে হাহাকার। তবে ঐ সুসজ্জিত ও কুতূহলী হইতে হইলে কি চাই? চাই উদ্যম, চাই বুদ্ধি, চাই ভাবুকতা। নিজের চেষ্টায়, নিজের বুদ্ধি ও চিন্তার বলে যাহারা পথ বাহির করিয়া লইবে, তাহাদের চাই; যাহারা প্রাণপণে ধৈর্য্য এবং সংযমের বলে বিবদ্ধ শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইবার জন্য সচেষ্ট হইবে, তাহাদের চাই। কিন্তু সে টাটা কোম্পানীর দল কবে চারিদিকে দেখা দিবে, তাহা কে বলিতে পারে? বুদ্ধি, উদ্যম এবং ভাবুকতা না থাকিলে, কোনও জাতি বড় হইতে পারে না। কবে সে উদ্যমশীল, বুদ্ধিমান, ভাবুক লোক সকল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তাহা বলা বড় শক্ত। বর্ত্তমানে খনির কার্য্য কিন্তু বড় জটিলতাপূর্ণ হইতে চলিল।

ধীরা

[শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ]

ধীরার বাহিরের দিকটা, পুস্তকের চক্‌চকে মলাটের মত, অজানা লোকের মনে একটা বেশ ভাল ধারণাই করাইয়া দেয়। আঙুরের খোলার মত কোঁকড়া, কালো রেশমী চুলে ঢাকা ফিক্-ফিকে হাসি-মাখা ফুট্‌ফুটে মুখখানার উপর সেই ডাগর টানা-টানা চোখ দুটি দেখিলে কে বলিবে যে, ঐ ছোট্ট মেয়েটি দুনিয়ার দুষ্টামির ডিপো! কিন্তু তার সে দুষ্টামি মুসলমান পুরস্ত্রীর চেয়েও পর্দ্দানসীন্,—চৈনিক সুন্দরীর অপেক্ষাও খঞ্জ! তাই তার দুষ্টামিতে মা-বাপ্ জ্বালাতন হইলেও, পাড়ার লোকে বিশ্বাস করিত না। যে ধীরা পরশু তার বড় সাধের বিলাতী খোকা-পুতুল নাপিতদের 'চেরো' (চারু) চাইতেই দিয়ে দিয়েছে, সে যে আজ একটা দেশলাইয়ের খালি বাক্সের স্বত্ব লইয়া তার ছোট ভাইকে মারিয়া কালশিরা পাড়িয়ে দেছে, এ কথা পাড়ার লোকে বিশ্বাস করে কি করিয়া? এ দিকে বাপ-মাও বুঝিয়া পান না যে, যে ধীরার চঞ্চলতায় বাড়ীতে এখানকার জিনিস—ওখানে, এটা—ভাঙা, ওটা—ছেঁড়া, আর ভাঁড়ারের দ্বার এক মুহূর্ত্ত উন্মুক্ত রাখিবার জো নাই, সেই ধীরা যে কি করিয়া শান্ত-শিষ্টতার জন্য ইস্কুলে ফার্ষ্ট-প্রাইজ পায়!

ধীরাকে তার মা-বাপ্ আরো দেখিতে পারিতেন না তার হিংসুটে স্বভাবের জন্য! ধীরা না কি বড় হিংসুক—বড় স্বার্থপর! অনেকগুলা মরিয়া যাইবার পর বংশে ঐ একটা ছেলে প্রফুল্ল বাঁচিয়া আছে;·তার উপর সে বড় শান্তশিষ্ট—গো-বেচারা গোছের! কাজেই প্রফুল্ল মা-বাপের একটু বেশী আদরের। ধীরারও আক্রোশ সেইজন্য! বাজারে দোকানী, পয়সায় ছয়টার যায়গায় চারিটা 'লজেঞ্জুস্' দিলে ধীরা বিনা আপত্তিতে লইয়া আসে বটে, কিন্তু ঘরে সে বাপ্-মায়ের ওজনে কম দেওয়াটা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিত না! তা'র উপর সে যখন মার মুখে শুনিত, সে মেয়ে, তার অত আব্দারে হইতে নাই,—দুদিন বাদে তাকে পরের বাড়ী যাইতে হইবে,—তখন সে আরো জ্বলিয়া উঠিত এবং তার কপালে যে লাঞ্ছনাই থাক্, সে তবু তার জেদ্ বজায় রাখিতই! ধীরার এই উৎকট জেদে প্রশ্রয় দিত কেবল একজন—সেই প্রফুল্ল, তার ছোট ভাই।

আমের সময় ধীরা একদিন দেখিল প্রফুল্লর হাতে একটা মস্ত আম। অমনি সানুনাসিক সুরে ধীরা বলিয়া বসিল, "এ্যাঁ,—আমার আম নেই!" ধীরার মা আমের ঝুড়ী ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—"এই নাও—গেলো না, কেঁদে মরচ কেন?"

ধীরা বায়না ধরিল—"আমি, ঐ—ই আঁবটা নেব!" প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি দিদির কাছে গিয়া বলিল—"এই নাও,—এই নাও—দিদি।" ধীরা আমটা দূরে নর্দ্দমায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—"আমি—চাই না—ও আঁব!" প্রফুল্ল এবার ছল-ছল চোখে মার পানে চাহিয়া রহিল। মার আর সহ্য হইল না, উঠিয়া আসিয়া ধীরার পিঠে এক চপেটাঘাত! ধীরা তখনই প্রফুল্লর পিঠে মাতৃদান ফিরাইয়া দিয়া চকিতে সরিয়া পড়িল। মা ক্ষুব্ধ ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওরে, তুই মর,—মর,—মর!"

প্রফুল্লর আবার দিদি না হইলে একদণ্ডও চলে না। পিঠের জ্বালাটা একটু কমিলে সে দিদির খোঁজে বাহির হইল। দেখিল, দিদি বাড়ী ঢুকিতেছে, তার কাপড়ের ভিতর কি একটা জিনিস। ধীরা প্রফুল্লকে দেখিয়া, চোখ রাঙাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল "এই!—বাইরের ঘরে শুনে যা।" প্রফুল্ল আসিলে ধীরা যতটা পারে নিজেকে কঠোর করিয়া মোটা গলায় বলিল—"কেমন, খুব লেগেচে ত?—বেশ হয়েচে। এ দিকে আয় দেখি!" ধীরা দেখিল—পিঠটা লাল হইয়া আছে। ধীরার একবার ইচ্ছা হইল ভাইকে একটু মিষ্ট বাক্য বলে; কিন্তু কোনরূপ সান্ত্বনার বাক্য তাহার যোগাইল না; সে শুধু বলিল—"এই নে, তার চেয়ে বড় আঁব,—খা!—মাকে এ আঁবের কথা বল্‌বি তো মেরে ফেল্‌ব!—এইখানে বসে খা।"

প্রফুল্ল আম খাইতে-খাইতে বলিল—"দিদি তুমি খাবে

না ?" ধীরা একটা মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—"আমি ও-আঁব খাই নাঁ!" প্রফুল্ল বলিল—"বাড়ীর ভিতর থেকে এনে দেব ?" ধীরা উদ্দেশে সে আমের নরক ব্যবস্থা করিয়া বলিল—"আমি তোর মত হ্যাংলা কি না!"

২

ধীরার মা মেয়েকে শাসাইতেছিলেন—"মেয়েছেলের এত-বড় গোঁ ?—আচ্ছা, তুই যেমনি আঁব খেলিনি, তেমনি ওপারে বারোয়ারি দেখ্‌তে যেতে পাস কেমন, দেখি!" ধীরা যদি বা না যাইতে সম্মত হইত, কিন্তু এই নিষেধের শাসনে সেও মনে-মনে কোট করিল—যাবেই সে।

'বারোয়ারি'র সময় তিনদিন উৎসবের সীমা থাকে না। দেশ-বিদেশের বড়-বড় যাত্রার দল আসে। সে সময় এ অঞ্চলের অনেকদূর থেকে লোক যাত্রা শুনিতে আসে। ধীরার বাপ স্ত্রীকে বলিলেন—"ওরা কার সঙ্গে যাবে ?—যোগেশের ?" ধীরার মা বলিলেন—"ধীরার আর গিয়ে কাজ নেই—প্রফুল্ল যাবে'খন।" ধীরার বাপ এ ব্যবস্থায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ধীরা যাবে না ?" "অত-বড় মেয়ের আর গিয়ে কাজ নেই।" ধীরার বাপ বলিলেন "ওরকম আট দশ বছরের মেয়ে যায়।" "আট দশ বছরের কি গো ? এই ফাগুনে বারোয় পড়েছে!" ধীরার পিতা একটু হাসিয়া বলিলেন "অমন মেয়েও ঢের যায়,—চলুক।" তখন ধীরার মা আসল কারণ জানাইয়া বলিলেন—"ও—যেতে পাবে না!" ধীরার বাপ মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ও রকম দুষ্টুমি আর করিস্‌নি"—তার পর গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা এবারের মত ক্ষমা কর ওকে!" গৃহিণী তখন বিরক্তির ভরে বলিলেন—"যেতে হয় যাক্‌!" ধীরার বাপ বলিলেন—"যা কাপড়-চোপড় পরে নে!" মার অমতে যাইতে না পারিলে ধীরার জেদ বজায় রহিল কোথা ?—ধীরা বলিল—"আমি যাব না!"

ধীরার বাপ মেয়ের উপর রাগিয়া ছেলেকে লইয়া চলিয়া গেলেন। বাপ চলিয়া গেলে ধীরা গোপনে কাপড় গুছাইয়া বাহিরের ঘরে রাখিয়া আসিল। পিস্‌তুতো ভাই যোগেশকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে,—সে রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করিবে। তার পর কাপড়-চোপড় পরিয়া হঠাৎ মার সম্মুখে আসিয়া বলিল—"মা, আমি ওপারের বারোয়ারি দেখ্‌তে যাব!"

মা গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"হতভাগা মেয়ে!—এই উনি নিয়ে যেতে চাইলেন, তখন যাওয়া হ'ল না—এখন আবার—'যাব';—না, যেতে পাবিনি!" ধীরা এই শেষের কয়টা কথারই প্রতীক্ষা করিতেছিল!—'এই আমি চল্লুম' বলিয়া সে সদর্পে চলিয়া গেল!

আসরে যোগেশের সঙ্গে ধীরাকে দেখিয়া ধীরার পিতা ভাবিলেন—খামখেয়ালী মেয়ের শেষে মত-পরিবর্ত্তন হওয়ায় যোগেশের সঙ্গে আসিয়াছে।

সেদিন পালা ছিল দাতাকর্ণ। কর্ণ যখন ছদ্মবেশী বিষ্ণুর আহারের জন্য পুত্র বৃষকেতুর মাথায় করাত স্থাপন করিল, তখন ধীরা তার দাদা যোগেশকে বলিল "যোগেশ দা', বাড়ী যাবে না ?" যোগেশ বলিল "এখন কি উঠা যায়—আর এখনও সন্ধ্যা হতে ঢের দেরী!" প্রফুল্ল তার দিদির জেদ জানিত; পাছে দিদি বেঁকিয়া বসে, তাই সে সানুনয়ে দিদিকে বলিল "দিদি, আর একটু থেকে যাও ভাই!" ধীরা এখন বাড়ীর বাইরে সুতরাং সে জেদ তার ছিল না। কিন্তু সে সবলে প্রফুল্লকে জড়াইয়া ধরিল। প্রফুল্ল বলিল—"দিদি—উঃ—লাগ্‌ছে!" ধীরা বলিল "না ভাই, আমার বড় ভয় করচে।" প্রফুল্ল বলিল—"ভয় কিসের দিদি!" ধীরা বলিল "কি জানি!" পার্শ্বের একজন শ্রোতা বলিয়া উঠিল—"আঃ, চুপ্‌ কর—খুকী।"

হঠাৎ ধীরার কি মনে হইল—সে যোগেশকে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ যোগেশ দা—বৃষকেতুর বোনের নাম কি ?" যোগেশ বলিল—"চুপ কর—গোল করিস্‌নি!"

৩

তখনও সন্ধ্যার দেরী ছিল—যাত্রা ভাঙিল। ধীরার বাপ যোগেশকে বলিলেন "তুমি ওদের নিয়ে আগে পেরিয়ে যাও, বাতাস বাড়তে পারে।" খেয়াঘাটে বহু লোক, সকলেই চাহে আগে পার হইবে। দুখানা নৌকা যাওয়া-আসা করিয়াও জনতার আগ্রহ তৃপ্ত করিতে পারিতেছিল না। যোগেশ একা হইলে ভিড় ঠেলিয়া নৌকায় উঠিতে পারিত, কিন্তু সঙ্গে ধীরা ও প্রফুল্ল থাকায় জনতার

হ্রাসের অপেক্ষা করিতে হইল। বাতাস একটু-একটু বাড়িতেছিল। আকাশের এক কোণে একখণ্ড কালো মেঘ ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছিল। সহসা একটা দমকা বাতাস উঠিয়া একমুহূর্ত্তে প্রকৃতির মূর্ত্তি ক্ষুধিত বাঘিনীর মত করিয়া তুলিল। ওপারে যে নৌকা গিয়াছিল, তাহা আর আসিতে সাহস করিল না। এপার হইতে তখন একখানা নৌকা উত্তাল তরঙ্গের উপর নাচিতে-নাচিতে স্রোতের টানে বহুদূর ঘুরিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কা করিতে-করিতে কূলের দিকে যাইতে চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় ধীরার বাপ সেখানে উপস্থিত হইয়া উৎকণ্ঠিতভাবে যোগেশের সন্ধান করিতে লাগিলেন। একজন পরিচিত ব্যক্তি নদীবক্ষে তরণী লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তাহারা ঐ নৌকায়!" শুনিয়া যোগেশের মাতুল পাগলের মত হইয়া আর্ত্তস্বরে—"যোগেশ, যোগেশ" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মেঘের কড়্-কড়্ শব্দে সে আর্ত্তস্বরের প্রতিধ্বনি কাঁদিয়া কাঁপিয়া উঠিল!

এপারে ওপারে সকলেই আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় নির্ব্বাক আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। নৌকায় যোগেশ দুইহাতে দুইজনকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বসিয়া ছিল। ধীরা ভাইটিকে তার যতদূর সম্ভব বুকের কাছে আঁকড়িয়া ধরিয়া ঘন ঘন তার যোগেশদাদার মুখের পানে চাহিতেছিল। সকলেই ভয়ে নির্ব্বাক! যোগেশ মাঝিকে বলিল—"আমরা কি মাঝামাঝি এসেছি?" মাঝি বলিল "মাঝামাঝির বেশী এসেছি বটে, কিন্তু ঢের ঘুরে যেতে হবে।" যোগেশ কহিল "যেতে বেশী সময় লাগ্‌বে - না ফিরে যেতে বেশী সময় লাগবে?" মাঝি বলিল - "বোধ হয় ফিরে যেতে কম সময় লাগ্‌বে · এ যে বাতাসের উল্টো দিকে যেতে হচ্চে।" যোগেশ বলিল—"তবে ফিরে গেলে হয় না?" মাঝি বলিল "আমিও তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ।" তখন আবার নৌকা ফিরিল।

৪

নদীবক্ষে একখানা নৌকা ঢেউয়ের তালে উঠিতেছিল, পড়িতেছিল, আর দুপারের দর্শকদের হৃদয় আশা ও আশঙ্কার স্পন্দনে আলোড়িত হইতেছিল। এক-একবার মনে হইতেছিল, আর রক্ষা নাই—পরক্ষণেই বিপদ দলিয়া তরণী প্রকৃতির সঙ্গে যুঝিতে-যুঝিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে অর্দ্ধেক পথ আসিল। তারপর হঠাৎ একটা প্রতিকূল দমকা বাতাস, সঙ্গে-সঙ্গে একটা করুণ ক্ষীণ আর্ত্তস্বর;—তার পর? নৌকা উল্টাইয়া গিয়াছে!

সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল।

যোগেশ বলিষ্ঠ যুবা—সন্তরণে বিশেষ পটু। সে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। নৌকা উল্টাইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দুইজনকে লইয়া সে অসম সাহসে নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়াছিল। যোগেশ দুইজনকে পিঠে লইয়া নদীবক্ষে ভাসিতে-ভাসিতে কূলের দিকে আসিতে লাগিল। মাঝে-মাঝে দুইজনকে সাহস দিতেছিল—"ঐ তীরের কাছে এসে পৌঁছেছি, আর খানিকক্ষণ;—খানিকক্ষণ শক্ত করে আমায় ধরে থাক্ প্রফুল্ল, ধীরা—ভয় কি,—ঐ মামা দাঁড়িয়ে;—আর দেরি নেই—"

বাতাস তেমনি বেগে বহিতেছিল। এপারের লোক-গুলা কেবল বেদনা উদ্বেগের বোঝা লইয়া অসাড়ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল,—সে দুর্যোগে কেহই নদীতে নামিতে সাহস করিল না। ধীরার বাপ সন্তরণে একান্ত অনভিজ্ঞ। তিনি মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া চোখের সম্মুখে জীবন-মরণের ভীষণ যুদ্ধ দেখিতেছিলেন।

যোগেশ অসুরের বলে সেই উন্মত্ত নদীবক্ষ মথিত করিয়া কূলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর নদী-তীর বেশী দূর নাই;- ঐ অদূরে, যোগেশ বেশ চিনিতে পারিল, তাহার মামা দাঁড়াইয়া। কিন্তু হায় এ কি!—তার শরীর যে অবসন্ন হইয়া আসিতেছে! সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"আর তো দুজনকে রক্ষে করতে পারি না—মামা—মামা, কি করব—বলুন!"

যোগেশের সে ভীষণ চীৎকারধ্বনি কালবৈশাখের ভৈরব গর্জ্জনে কোথায় ভাসিয়া গেল। কিন্তু ধীরা—যোগেশের সেই সাংঘাতিক প্রশ্নের কোন উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই, নিজেই চূড়ান্ত উত্তর দিয়া দিল;—সে যোগেশের হাত ছাড়িয়া দিল।

হঠাৎ প্রফুল্ল "দিদি, দিদি" করিয়া উঠিল। যোগেশ চকিত হইয়া দেখিল—ধীরা পার্শ্বে নাই।

ধীরা—সেই ঈর্ষাপরায়ণা ধীরা, যে ধীরা অতি তুচ্ছ

সামগ্রী লইয়া ছোট ভাইকে হিংসা-পীড়ন করিত, যে ধীরা পিতামাতার স্নেহের প্রাপ্য অংশে এতটুকু কম সহ্য করিতে পারিত না,—পিতামাতার অনাদৃতা সেই একান্ত স্বার্থ-পরায়ণা ধীরা আজ স্বেচ্ছায় তার ভাইকে সমস্ত দাবী ছাড়িয়া দিয়া গেল; একথা কেহ বুঝিল না—বিশ্বাস করিল না! সকলেই ভাবিল, সে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া থাকিতে পারে নাই, তাই ভাসিয়া গিয়াছে; এবং এ দুর্ঘটনা যে প্রফুল্লর উপর দিয়া হয় নাই, মেয়ের উপর দিয়াই কাটিয়া গিয়াছে, ইহাই রক্ষা!

কি চাহি না

[শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায় বি-এল]

এক-এক যুগে এক-একটী ভাব-প্রবাহ বিশেষ প্রবল ভাবে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়। সেই যুগধর্ম্ম অল্পাধিক পরিমাণে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট হয়। বর্ত্তমান যুগে যে ভাবটী পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিকাশ লাভ করিতেছে, তাহা যে দেশপ্রীতি সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কি য়ুরোপ, কি আমেরিকা, কি আফ্রিকা, কি আমাদের আসিয়া, সকল মহাদেশই এক নব জাগরণের অরুণালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; সকলেই নব বসনে ভূষিত হইয়া যেন কি উৎসবের অপেক্ষায় উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে; সকলেই দেশের জন্য স্বার্থ বলি দিবার আশায় ও গরিমায় আভান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলাদেশেও সে নিমন্ত্রণ আসিয়াছে, তাহা ত দেখিতে পাইতেছি। সকলেরই যেন নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, সকলেই যেন নূতন ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া বাহিরে যাইবার জন্য উন্মুখ; কিন্তু তবু আমরা বাহির হইতে পারিতেছি না। আমাদের কত অন্তরায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। উৎসব-প্রাঙ্গণে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে ধর্ম্ম চাই, জ্ঞান চাই, অর্থ চাই, ঐক্য চাই। সে সব আমাদের কোথায়? কিন্তু এই সকল নিতান্ত আবশ্যক জিনিসের পূর্ব্বেও আর একটী জিনিসের প্রয়োজন আছে, সেটী স্বাস্থ্য, বল। উৎসব-প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত যাইবার জন্য দেহের যে শক্তি আবশ্যক, তাহা আমাদের কোথায়? আমরা যদিও নব আশার অলঙ্কার পরিয়াছি, তাহা আমাদের প্লীহার ও যকৃতের অস্বাভাবিক স্ফীতিতে অশোভন হইয়া রহিয়াছে; আমাদের প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসে আমাদের পঞ্জরের প্রত্যেক অস্থির যে উত্থান-পতন হইতেছে, তাহাতে কোন উৎসবেরই আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে না। কোনও বসন ভূষণেই আমরা আমাদের কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষু, রক্তহীন মুখ ও কঙ্কালসার দেহকে সুশোভন করিতে পারিতেছি না। উৎসবে যাই কি করিয়া?

দেশের চারিদিকে যে সকল সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইতেছে, তাহা দেখিলে মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। বিজ্ঞান-প্রচারের পন্থা সুবিস্তীর্ণ হইতেছে। সমাজের কু-আচার দূরীভূত করিবার চেষ্টা হইতেছে, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে উচ্চ অধিকার লাভ করিবার প্রয়াস হইতেছে, এ সকলই আবশ্যক; এই সকল চেষ্টায় ও যত্নে যে চিন্তা, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়, তাহা সার্থক, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা কিছু যত্নলভ্য, যাহা কিছু পাইবার জন্য আমরা প্রয়াসী, তাহা অর্জ্জন করিবার জন্য এবং তাহা ভোগ করিবার জন্য বঙ্গমাতার সুস্থ, সবল, দীর্ঘায়ু সন্তান আবশ্যক। কিন্তু হায়! দেশের স্বাস্থ্যের দিকে তাকাইলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অথচ দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমরা কি করিতেছি? কেহ যদি বলে, "তোমরা ত পৃথিবীর প্রধান সভ্য জাতিগণের সহিত সমান অধিকার দাবী করিতেছ, কিন্তু তোমরা ত ধ্বংসোন্মুখ জাতি দেখিতেছি। বাঁচিয়া থাকিলে তবে ত অধিকার আর দাবী। তোমরা সবংশে ধ্বংস না হইয়া কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কি চেষ্টা করিতেছ?" আমরা তাহার কি উত্তর দিব, ভাবিয়া পাই না। একটা উত্তর সহজেই মনে হইতে পারে; কিন্তু সে কেবল আত্ম-প্রবঞ্চনার সহায় মাত্র। আমরা বলিতে পারি যে, আমরা যে সকল অধিকারের দাবী করিতেছি, তাহা না পাইলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। সেই সকল অধিকার পাইলে, কিরূপে বাঁচিতে হয় তাহা দেখাইব। এ কথার ভিতর কিছু সত্য থাকিলেও, আমি ইহা কিছুতেই মনকে বুঝাইতে পারি না যে, বর্ত্তমান

অবস্থায় আমাদের কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই। আমরা কি কেবল মৃত্যুর অপেক্ষায় রুগ্ন দেহ-ভার লইয়া বসিয়া থাকিব, এবং মৃত্যুর না আসা পর্য্যন্ত যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিব, এবং মৃত্যুকেই যন্ত্রণার অবসান বলিয়া বরণ করিয়া লইব? এই অবস্থা আমরা কিছুতেই চাহি না; কিন্তু যাহাতে আমাদের এই অবস্থা না হয়, তাহা করিবার আমাদের সামর্থ্য আছে কি না, এবং আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

আনন্দের বিষয় এই যে, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক পর্য্যালোচনা করিতেছেন। লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গবাসী হিন্দুদিগকে "ধ্বংসোন্মুখ জাতি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বারের সেন্সস বিবরণ হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি মুসলমান জাতির সংখ্যা-বৃদ্ধি ও হিন্দু জাতির সংখ্যা-হ্রাস দেখাইয়া হিন্দুর সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে তাহার ধ্বংসের কারণ নিহিত আছে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরিলাল সরকার মহাশয় ঐ প্রবন্ধের উত্তরে ঐ সকল সেন্সস্ বিবরণী হইতেই দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী হিন্দু ক্ষয় হইতেছে ইহা সত্য; কিন্তু তাহার কারণ হিন্দুর আচার ব্যবহার নহে। তাহার কারণ অন্যত্র; তাহার প্রধান কারণ বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া। চিন্তাশীল শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় বাঁকিপুর সাহিত্য সভায় যে সুলিখিত প্রবন্ধে বাঙ্গালী হিন্দু ধ্বংসোন্মুখ নহে, এই আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন, সেই প্রবন্ধেও সেন্সস্ বিবরণী বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল। তিনি সেই প্রবন্ধে, বাঙ্গালী জাতির স্নায়ুমণ্ডলের শক্তির ও প্রভাবের হ্রাস হয় নাই, এবং তাহাদের জনন-হীনতার অবস্থা আসে নাই, ইহা দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছিল—"বাঙ্গালীদের জন্ম-সংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা অধিক। ইহাদের সহস্র জনে জন্মের হার ৩৩, মৃত্যুর ৩৮ হইয়াছে। বর্ষে-বর্ষে ইহাদিগের মধ্য হইতে ১২ লক্ষ লোক নানাবিধ রোগে মরিয়া যাইতেছে।" শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে আর কিছু উপকার হউক বা না হউক, বাঙ্গালী প্রকৃতই ধ্বংসোন্মুখ কি না, সে বিষয়ে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; এবং তাঁহারা সকলেই সেন্সস্ বিবরণী যথেষ্ট যত্ন সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে অনেক মতভেদ থাকিলেও, ইহা সর্ব্ব-সম্মতি মতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী হিন্দু জাতির সংখ্যা-বৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে; এবং শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্যতীত অপর সকলেই স্বীকার করেন যে, বাঙ্গালী জাতির কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই সংখ্যা-বৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে। এই সংখ্যা-হ্রাসের কারণ এবং তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়; কিন্তু এ কথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, বঙ্গদেশে জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক এবং এদেশে মৃত্যুর হার যেমন ভীষণ, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। জন্মের হার এবং মৃত্যুর হার হাজার-করা হিসাবে ধরা হইয়া থাকে, এবং সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। বাঙ্গালা দেশে জন্মহার খুব অধিক; কিন্তু মৃত্যুহার দেখিলে মনে হয়, এ কেবল মরিবার জন্যই জন্ম।

জন্মহার

দেশ	১৮৮১	১৮৯০	১৯০১	১৯০৪	১৯০৫
বঙ্গদেশ	৪৭ ৯	৫১.৮	৪৬ ৯	৪২.৩৯	৩৯.৫
ইংলণ্ড	৩৪.৭	৩০.২			২৭ ২

মৃত্যুহার

দেশ	১৮৮৫	১৮৯১	১৮৯৩	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
ইংলণ্ড		১৯.৮	১৭	১৫.৪	১৫.৩	১৫.২
বঙ্গদেশ	২২.৭৮	২৬.৯৪	৩১.৩২	৩৩.৩[illegible]	৩২.৪৫	৩৮.৩
বম্বে		২৭২৬	৩২.৩০		৪১.৩৫	৩১.৯৪
মাদ্রাজ		২৬.২	২২.৩		২২.৫	২..৪

বাঙ্গলা দেশে মৃত্যুর বন্যা যেরূপ প্রবল ভাবে বহিয়া চলিয়াছে, এমন আর কোথায়? মৃত্যু সকল দেশেই আছে, সকল মানবেরই আছে; জন্মিলে মরিতেই হইবে। কিন্তু আমাদের এ কি মরণ! স্বাভাবিক বার্দ্ধক্য অনেক সময় মৃত্যুর কারণ; আকস্মিক আধিদৈবিক ঘটনা বহু পরিমাণে মৃত্যুর কারণ; অনেক ব্যাধি, যাহার হস্ত হইতে মানুষ আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ, সেই সকল নিবার্য্য ব্যাধিতেও অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সকল নিবার্য্য ব্যাধির প্রতিপত্তি ইংলণ্ডে কিরূপ শুনিবেন? তাহার দ্বারা হাজার-

করা ৭ জনের অধিক মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। বঙ্গদেশে হাজারকরা প্রায় ৩০ জন ঐরূপ ব্যাধিতে জীবন ত্যাগ করে। আর ঐ ৩০ জনের মধ্যে ২০।২১ জনের একমাত্র জ্বর রোগেই জীবনের অবসান হয়! এ কি মরণ! মৃত্যু চাহি না, এ কথা আমি একবারও বলি না। মৃত্যু ত চাহি; কিন্তু পৃথিবীর লোক যেমন করিয়া মরে, তেমনি করিয়া মরিতে চাহি। এ সৃষ্টি-ছাড়া মরণ চাহি না, এ পৃথিবীর আঁস্তাকুঁড়ে পচিয়া-পচিয়া মরিতে চাহি না। বাঙ্গালা দেশে এখন কিরূপ মৃত্যু বিচরণ করিতেছে, তাহার প্রকৃষ্ট জ্ঞানের জন্য জন্ম-মৃত্যুর তালিকা পরীক্ষা করা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ পূর্ণিমার সৌন্দর্য্য বুঝিবার জন্য যেমন রুদ্ধগৃহে বসিয়া চাঁদের ছবি না দেখিয়া, মুক্ত আকাশ তলে দাঁড়াইয়া, জ্যোৎস্না সাগরে ডুবিয়া যাইতে হয়, তেমনি বঙ্গদেশের এখন কি অবস্থা তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে হইলে, সেন্সস্ বিবরণী ফেলিয়া রাখিয়া বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে যাইতে হয়। সেখানে গেলে আর বিচার-বিতর্ক মনে আসিবে না; বাঙ্গলার যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা আর বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। কোথায় গেল পল্লী-রাণীর সে সৌন্দর্য্য, সে উচ্চ-হাস্য, সে ক্রীড়া-কলরোল, সে আত্মীয়-স্বজনে-ভরা প্রফুল্ল সংসার,—কোথায় গেল সে সম্মুখ-সংগ্রাম, সে জীবন্ত জীবন,—কোথায় গেল সে আনন্দ উৎসব,—কোথায় গেল সে পূজা-পার্ব্বণ? বাঙ্গলার পল্লীগ্রাম – যাহা একদিন উৎসবের আনন্দ-ভবন ছিল,—যেখানে একদিন বালকের কলরোলে, যুবকের সঙ্গীতে, বৃদ্ধের ক্রীড়ায় আনন্দের অসীম প্রস্রবণ উন্মুক্ত ছিল,—যেখানে একদিন কুলবধূগণ সুস্থ, সুন্দর দেহে, সবল শিশু ক্রোড়ে লইয়া "আয়, চাঁদ আয়" বলিয়া মধুর কণ্ঠে আকাশের দেবতাকে মুগ্ধ করিত, নারীগণের ব্রতে, দেবার্চ্চনায়, গুরুসেবায় দেবভাব জাগরিত হইত, যুবক ও প্রৌঢ় জনের কীর্ত্তনে, তর্জ্জায়, যাত্রায়, পাঁচালীতে অনন্ত স্ফূর্ত্তি মুখরিত হইয়া উঠিত,—সেই পল্লীগ্রাম আজ নিরানন্দের ছায়ায় অন্ধকার। সেখানে আজ লোক সংখ্যা বিরল। যাহারা বাচিয়া আছে, তাহারা কঙ্কালসার, ম্রিয়মান্—আনন্দের, স্ফূর্ত্তির চিহ্ন নাই, – শ্মশানের পূর্ব্বাভাব মাত্র।

কোন-কোনও গ্রামে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেক গৃহ জনশূন্য। কোথাও বা একটী বৃহৎ অট্টালিকা, – একদিন সে বাটীতে দোল, দোল, দুর্গোৎসব বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত, এখন সে অট্টালিকা ভগ্নপ্রায়; তাহারই একটী ঘরে দুইটী বিধবা – কেবল বিধবা বলিয়া প্রাণে বাচিয়া আছেন।

অনেক বাটীতে ঘরে-ঘরেই জ্বর,—শুশ্রূষা করিবার লোক পাওয়া যায় না। কাহারও জ্বর আসিয়াছে, কাহারও আসিতেছে, কাহারও বা কিছুক্ষণ পরে আসিবে। কেহ মুমূর্ষু, কেহ বা উত্থানশক্তি-রহিত। পাঁচ জনে দেখা হইলে রোগের কথা, শোকের কথা, দুঃখের কথা। এই ত এখন বাঙ্গলার প্রাণের কথা,—আমি এ কথা চাহি না। একদিন জন্ম—একদিন মৃত্যু, মাঝের দিন কয়টা প্লীহা-যকৃতের বেদনা ও জ্বর। এই ত এখন বাঙ্গলার জীবন। এ জীবন কি জীবন,—না, একটা দুর্ব্বহ ভার! এ জীবনে কি আনন্দ আছে, উৎসাহ আছে, না আশার আলো আছে? আমি এ জীবন চাহি না। ১৯১৬ সালের যে সরকারী স্বাস্থ্য বিবরণ (Report on Sanitation in Bengal for the year 1916) প্রকাশিত হইয়াছে, তদবলম্বনে "ভারতবর্ষ" পত্রের গত মাঘ মাসের সংখ্যায় বঙ্গদেশে ১৯১৬ সালের একটী মৃত্যু সংখ্যার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, "১৯১৬ সালে সারা বঙ্গদেশ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২,৪১,০২১ জন যম-পুরে প্রেরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একমাত্র জ্বর রোগেই ৯০৯৮৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বৰ্দ্ধমান বিভাগ হইতে ১৭৪৬৮০, প্রেসিডেন্সী বিভাগ হইতে ১,৮১৫৮৩, রাজসাহী বিভাগ হইতে ২,৮২১৮৭, ঢাকা বিভাগ হইতে ১,৮৫৩৭৬ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে ৮৬০৫৪ একুনে ৯০৯৮৮০ জন একমাত্র জ্বর রোগেই যমালয়ে গমন করিয়াছে।" কি ভীষণ অবস্থা! ভাই সব, কাহাকে মাণিক দিবে বলিয়া সাগর ছেঁচিতেছ? কাহার জন্য জয়-মাল্য গাঁথিতেছ? তোমাদের বংশধর যে মৃত্যুশয্যায় শয়ান, একবার সেদিকে চাহিয়া দেখ না? যদি তোমাদের বংশধর প্রাণে বাঁচিয়া থাকে, তবেই ত এত যত্ন, এত পরিশ্রম, এত সাধনা সার্থক হইবে? নচেৎ সকলই ত বৃথা। তাই বলিতেছি, যাহাতে প্রাণটা বাঁচে, সকলের অগ্রে সেই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

ম্যালেরিয়া যে বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, এবং এই ম্যালেরিয়াকে বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত করিতে না

পারিলে যে দেশের মঙ্গল নাই, সে বিষয়ে দুই মত হইবার কারণ দেখা যায় না।

স্বদেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বাঙ্গালার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রথম কথা এই যে, আমাদের গ্রামসমূহ ম্যালেরিয়াতে উৎসন্ন যাইতেছে, পল্লী-সমাজ বাঙ্গালীর সভ্যতা-সাধনার কেন্দ্রস্থল, সেই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধিদুষ্ট হইয়া তাহার সঞ্জীবনী-শক্তি হারাইয়া ফেলে, তাহার ফলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই অস্বাস্থ্যতানিবন্ধন পল্লীগ্রাম ক্রমশঃই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। একদিকে ম্যালেরিয়ার আতঙ্ক, আর একদিকে বড়-বড় সহরে বিলাতি ব্যবসা-বাণিজ্যের লোভ ও মোহ; কাজেই এই বড়-বড় সহরগুলা এক একটী বৃহৎ অজগর সর্পের মত গ্রামবাসীদের টানিয়া টানিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে। সুতরাং আমাদের প্রধান কার্য্য গ্রামের ও দেশের স্বাস্থ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।" Calcutta Medical Journalএর এক সংখ্যায় বঙ্গদেশে যে সকল নিবার্য্য ব্যাধি আছে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল যে, "The first in point of importance is malarial fever which accounts for more than half the death rate of the province" অর্থাৎ নিবার্য্য ব্যাধিসমূহের মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে; দেশের সমুদয় মৃত্যু-সংখ্যার অর্দ্ধেক ম্যালেরিয়া-সম্ভূত।

কবিরাজ মহাশয়দিগের "আয়ুর্ব্বেদ" নামক মাসিক পত্রে লিখিত হইয়াছে, "কি কুক্ষণে জানি না ম্যালেরিয়া বিষ বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই বিষের জ্বালায় বাঙ্গালার কত পল্লীরই যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে তাহা ভাবিলেও বুক ফাটিয়া যায়। * * * সর্ব্বাগ্রে আমাদের চিরত্যক্ত পল্লীগুলিকে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পল্লীমাতাকে রক্ষা করিতে পারিলে তবে আমরা নিজেরা রক্ষা পাইব।" কিন্তু ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিবার কথা চিন্তা করিতে গেলে, প্রথমেই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়—এ কি সম্ভব? এত বড় ভীষণ রাক্ষস—যে সমস্ত দেশকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে, তাহাকে বিতাড়িত করিবার শক্তি-সামর্থ্য কোথায়? আমরা অর্থহীন, শক্তিহীন—আমরা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইয়া দিব, ইহা অসম্ভব। আমি মনের এই অসাড় ভাব চাহি না। যে সকল কারণে দেহ শক্তিহীন ও মন অবসাদময় হয়, আমাদের মধ্যে সেই সকল কারণের অভাব নাই তাহা জানি; কিন্তু ইহাও জানি যে, এই অন্ধকারের মধ্যে শ্রীভগবান স্বহস্তে আলোক দেখাইতেছেন; এই কলরোলের মধ্যে শ্রীমুখে আহ্বান-বাণী উচ্চারিত হইতেছে—

"মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

ক্লৈব্য পরিহার করিতে হইবে, ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আমাদের দেশ যায়,—আমাদের জাতি যায়। এক্ষণে আমাদের একাগ্র ঐকান্তিক সাধনা আবশ্যক; সাধনা করিলে সিদ্ধি হইবেই হইবে।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিবসে প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় এই কথাই দেশ-জননীকে নিবেদন করিয়াছেন—"কি সেই মহাসত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোনও উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইয়া থাকে।" আমাদের দেশে সকলেরই মনে এই ভাবটী জাগরিত করিতে হইবে। তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, তেমনই এ দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইবে।

ম্যালেরিয়াকে তাড়িত করিতে হইলে আমাদের কয়েকটী বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক:—

১ম—ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ কি?

২য়—ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ও প্রতিকারযোগ্য কি না; কোনও দেশ হইতে দূরীভূত করা গিয়াছে কি না?

৩য়—ম্যালেরিয়া নিবারণের কি সহজ উপায় আমাদের দেশে অবলম্বিত হইতে পারে?

এই সকল বিষয়ের আলোচনা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারাই হওয়া সম্ভব ও বাঞ্ছনীয়। তবে এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম কথা, ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ। যে দেশ নিম্ন, যেখানে পয়ঃ-প্রণালীর সুব্যবস্থা নাই, যেখানে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র

জলাশয়ের আধিক্য, যে স্থান জঙ্গলাকীর্ণ—সেই সকল স্থানেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া ছিল না, এখন সমস্ত দেশ ম্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছে,—ইহার কারণ কি?

এ ত আমাদের সেই পুরাতন দেশ, এখানে ম্যালেরিয়া কোথা হইতে আসিল?

(১) অনেক মনীষী এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, "পীড়া যত কারণেই হউক, তাহার মধ্যে নবাগত মানব-সংসর্গ একটী প্রধান কারণ। যখন কোন দেশে অন্যত্র হইতে নূতন মানবের সমাগম হয়, তখন কি এক অদ্ভুত কারণে নূতন নূতন পীড়াও আসিয়া উপস্থিত হয়।" শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার মহাশয় প্রভৃতি, তাঁহাদের এই কথা সমর্থনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ ডারউইন সাহেবের Descent of Man নামক গ্রন্থ হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের এক স্থলে লিখিত আছে যে, "দুইটি পৃথক ও ভিন্ন জাতির প্রথম মিলনে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে ইহা প্রকৃত ঘটনা; যদিও ইহার কারণ রহস্যাবৃত।" (It further appears, mysterious as is the fact, that the first meetings of distinct and separated people generates disease.) নূতন জাতির সংস্পর্শে পুরাতন জাতির জাতীয় আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা আপাত-দৃষ্টিতে কুফলপ্রসূ বলিয়া অনুমিত না হইতে পারে, কিন্তু তাহার ফল যে মারাত্মক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আহার, পরিচ্ছদ, উৎসব, আনন্দ, ক্রীড়া—সকল বিষয়েই জাতীয়তা বিসর্জ্জন করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন করিলে, সেই জাতি যে ধ্বংসোন্মুখ হয়, তাহার নিদর্শন পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরাও হইয়াছি।

(২) এ দেশে রেলওয়ে বিস্তারের সহিত ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। রেলপথের দুই ধারে যে নালা থাকে, তাহাতে জল জমিয়া থাকে; এবং রেলপথের দ্বারা গ্রামের জল নিঃসরণের পথ অনেক স্থলে বন্ধ হইয়া যায়। রাজা দিগম্বর মিত্র এই মত সর্ব্বপ্রথমে সাধারণের গোচরে আনয়ন করেন।

(৩) দেশের উত্তরোত্তর-বর্দ্ধমান দারিদ্র্য যে দেশবাসীকে দুর্ব্বল করিয়া আনে, তাহার ফলে নূতন রোগের আবির্ভাব সহজ হয়। আমাদের বিলাস-বাসনা প্রবল, অথচ আমাদের ক্ষেত্রে ধান্য জন্মে না; যে উপায় অবলম্বনে ধান্য জন্মিতে পারে, তাহা আমাদের সাধ্যাতীত। আমাদের শিল্প নাই, বাণিজ্য নাই। আমাদের খাইবার সংস্থান নাই। এরূপ ক্ষেত্রে রোগের বীজ যেমন ফলে, এমন আর কিছুই নহে।

উপরে যে তিনটী কারণের উল্লেখ করিলাম, উহারা সম্পূর্ণ পৃথক নহে,—পরস্পর সংশ্লিষ্ট। ঐ সকল কারণ, এবং আরও কতকগুলি কারণ পরোক্ষভাবে ম্যালেরিয়া উৎপাদনে সহায়তা করে। ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ সম্বন্ধে এক্ষণে বিজ্ঞান স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ম্যালেরিয়া শব্দটী ইটালীয়; উহার ধাতুগত অর্থ মন্দ বাতাস (mala = মন্দ aria = বাতাস); ইংরেজী বৈদ্যক-সাহিত্যে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এই কথাটী প্রবেশ লাভ করে। ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণাবলী এত সুস্পষ্ট যে, ম্যালেরিয়া-নির্ণয় আদৌ দুঃসাধ্য নহে; এবং যে দেশে এই ম্যালেরিয়া রোগ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেই দেশবাসীর দেহের ও মনের যে ইহা সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ইহার নিদান সম্বন্ধে পূর্ব্বে কেহই কোনও স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ ইহা এক প্রকারের বিষ বলিয়া অনুমিত হইত। কোনও প্রকারে উক্ত বিষ শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর আনয়ন করিত। বৈজ্ঞানিকেরা উক্ত বিষের অনুসন্ধান অনেক স্থলে করিয়াছেন; আর্দ্র ভূমিতে, জলায় উদ্ভিদ রাজ্যে;—কিন্তু তাহাতে সফলতা লাভ করেন নাই।

অনেকে অনুমান করিতেন যে, দিবসের অতিরিক্ত উত্তাপের পর সহসা নৈশ আর্দ্র শীত-বায়ু দেহে সংলগ্ন হইয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদন করিত। ম্যালেরিয়ার কারণ-অনুসন্ধিৎসুগণ অবশেষে দেখিতে পাইলেন যে, ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগীর রক্তমধ্যে এক প্রকার জীবাণু পরিলক্ষিত হয়, অপর কোন রোগীর রক্তে উক্ত জীবাণুর অস্তিত্ব নাই; এবং যাহারই রক্তমধ্যে উক্ত জীবাণু পুষ্ট হইতেছে, দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—তাহারই ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে। উক্ত জীবাণু যে ম্যালেরিয়ার নিদান, তাহা বুঝিতে বাকী থাকিল না; পরে কোথা হইতে ঐ জীবাণু আইসে, উহা কি জাতীয় এবং কিরূপে উহা দেহ হইতে দেহান্তরে

পরিচালিত হয়, তাঁহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অনুসন্ধানে যিনি সফল-কাম হইলেন, তিনি নিজের আত্ম-প্রসাদের সহিত পৃথিবীর ধন্যবাদ ও তৎসহ নোবেল পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন। সে অধিক দিনের কথা নহে—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের জনৈক I. M. S. কাপ্তেন Ronald Ross তাঁহার আবিষ্কার সভ্য-জগতের সমক্ষে উপস্থিত করেন। তখন হইতে ম্যালেরিয়ার নিদান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে আর মতদ্বৈধ বা সন্দেহ নাই। এক্ষণে ইহা অবিসম্বাদিতরূপে স্থির হইয়াছে যে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তে যে বিশেষ জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য-দেহের মধ্যে উক্ত জীবাণুর প্রবেশই ম্যালেরিয়ার একমাত্র কারণ; কোনও রূপে দেহে উক্ত

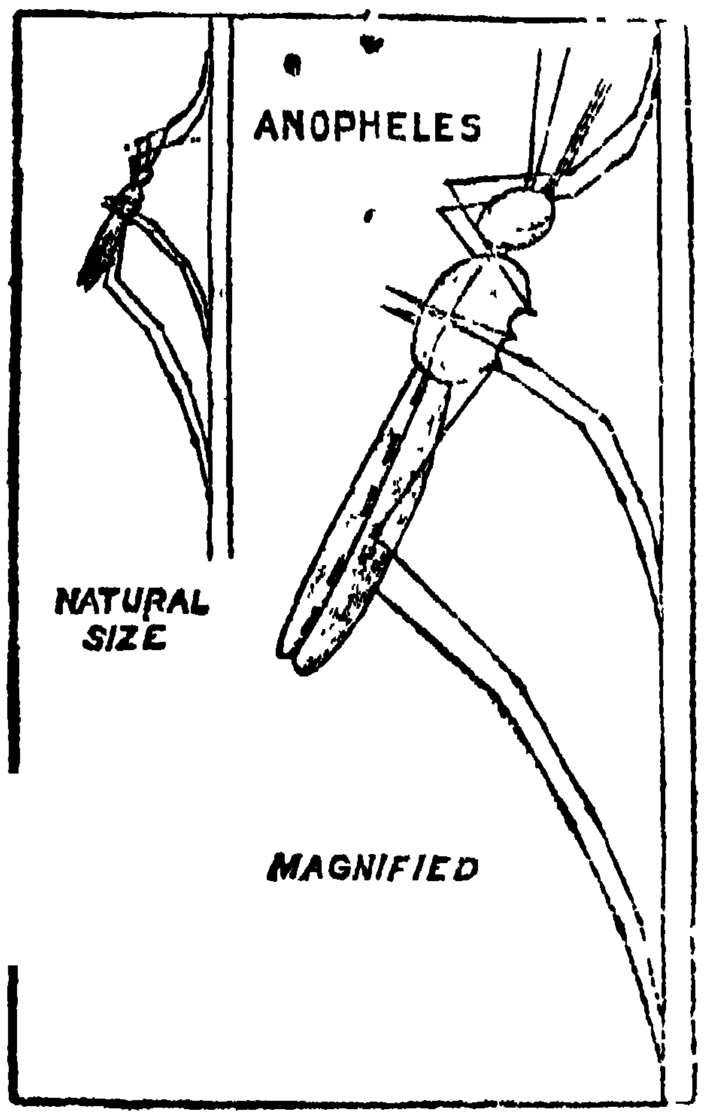

এনোফিলিস্

জীবাণুর প্রবেশ নিবারণ করিতে পারিলে, সেই দেহে ম্যালেরিয়া জ্বর কিছুতেই আসিবে না। সুতরাং উক্ত জীবাণু দেহের মধ্যে কি প্রকারে সংক্রামিত হয়, তাহাই সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য বিষয়। নিঃশ্বাস-বায়ুর সহিত, পানীয় জলের সহিত, খাদ্যের সহিত বা অপর কোনও প্রকারে উহা সংক্রামিত হইতে পারে কি না, তাহার পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষার চরম সিদ্ধান্ত—Ronald Rossএর কীর্ত্তি এই যে, এক জাতীয় মশক আছে,—কেবল তাহারাই উক্ত জীবাণু এক দেহ হইতে দেহান্তরে লইয়া যাইতে পারে এবং লইয়া গিয়া থাকে। ঐ মশকের নাম এনোফিলিস্। উক্ত মশক রক্ত শোষণ কালে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্ত সহ উক্ত জীবাণু শোষণ করিয়া লয়। উক্ত জীবাণু উক্ত মশক-দেহে বিনষ্ট না হইয়া পুষ্টি ও বল লাভ করে।—পরে জীবাণুবাহী এনোফিলিস মশক নীরোগ ব্যক্তির গাত্রে দংশন কালে উক্ত জীবাণু তাহার দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। উক্ত জীবাণু মনুষ্য-রক্ত মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া শীঘ্র-শীঘ্র বংশ-বৃদ্ধি করিতে থাকে; এবং তাহার ফলে সাধারণতঃ ১০।১১ দিবস পরে উক্ত ব্যক্তির শীতকম্প ও পিপাসা হইয়া জ্বর আইসে। ইহা হইতে পরিলক্ষিত হইবে যে, এনোফিলিস মশক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকের রক্ত হইতে ম্যালেরিয়া জীবাণু গ্রহণ পূর্ব্বক নীরোগ দেহে দংশন কালে উক্ত বীজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া ম্যালেরিয়া রোগের প্রসার করিয়া থাকে—ইহাই ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ।

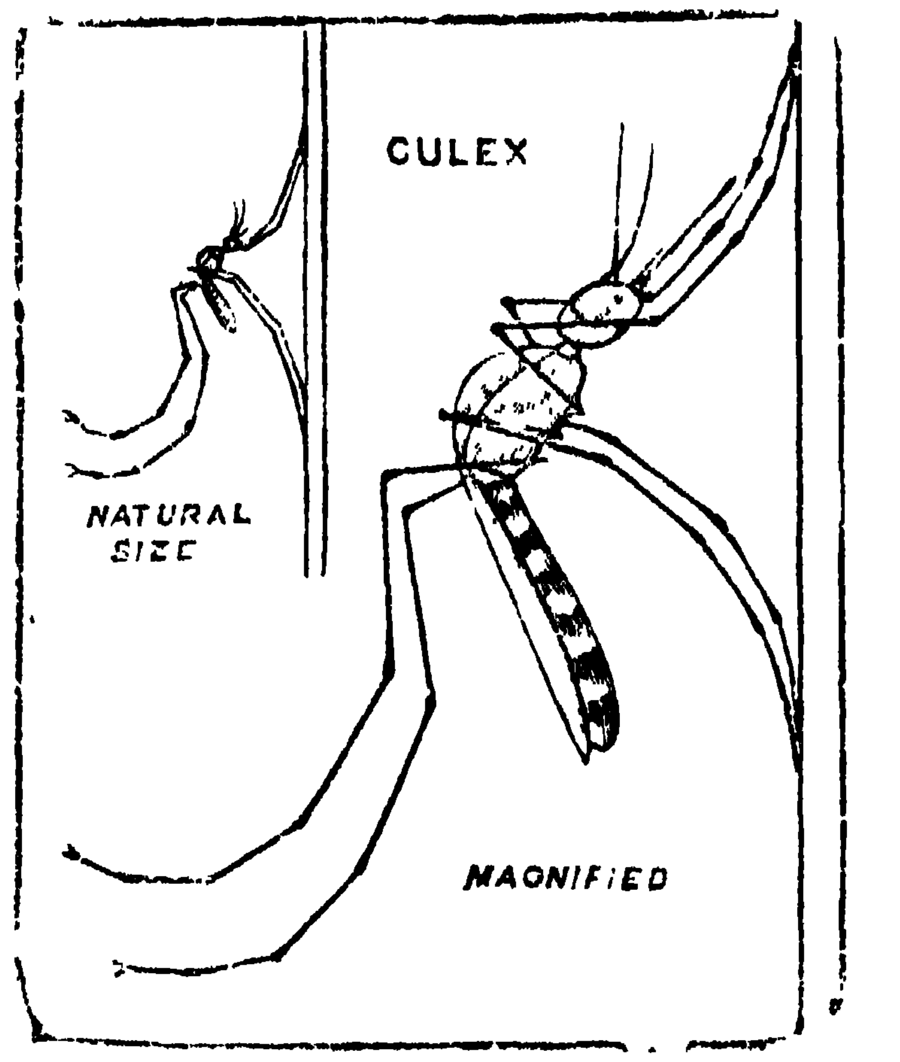

কালেক্স

দ্বিতীয় কথা, ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ও প্রতিকার-যোগ্য কি না?

মানব-শরীরের গঠন-প্রণালীর মধ্যে এমন কিছুই নাই যে, তাহার ম্যালেরিয়া হইবেই হইবে—জরা-মরণের ন্যায় ইহা মানবশরীরের ধর্ম্ম নহে। পৃথিবীর অনেক স্থানেই ম্যালেরিয়া আদৌ নাই। যেখানে এনোফিলিস্ বা ম্যালেরিয়া-মশক নাই, অথবা যেখানে মানুষ ম্যালেরিয়া-মশকের দংশন হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, সেখানে ম্যালেরিয়া হইতে পারে না; সুতরাং ম্যালেরিয়া যে নিবার্য্য ও প্রতিকারযোগ্য, তদ্বিষয়ে দ্বিধা করিবার কোনও কারণ নাই। পৃথিবীর যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়া সংক্রামকরূপে

লোকক্ষয় করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে যে-যে স্থানে তাহা নিবারণ করিবার উপায় বিধিমত অবলম্বিত হইয়াছে, সেই-সেই স্থানে ম্যালেরিয়া প্রশমিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া যে নর-শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করে, তাহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ আছে। তাহার কয়েকটী এক্ষণে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) হাভানায় ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু-সংখ্যা—

বৎসর	সংখ্যা
১৮৮০	৩২৫
১৮৮৮	১০১
১৮৯০	১৭০
১৮৯৫	২০৬
১৯০০	৩৪৪

তৎপরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিবার ব্যবস্থা হইতে থাকে; তখনকার ফল দেখুন।—

বৎসর	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬
মৃত্যু সংখ্যা	১৫৬	১৭৭	৫১	৪৪	৩২	২৬

(২) সুইডেন হ্যাম বন্দরে—

১৯০১ খৃষ্টাব্দে জ্বর বিদূরিত করিবার সূত্রপাত হয়।

বৎসর	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
মৃত্যু-সংখ্যা	৬১০	১৯৯	৬৯	৩২	২৩

(৩) হংকং—

বৎসর	১৮৯৭	১৮৯৮	১৮৯৯	:৯০০
মৃত্যু সংখ্যা	১৯৭	১২৬	৬৩	১৬৩

তৎপরে ১৯০১ অব্দে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টার ফলে

বৎসর	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
মৃত্যু-সংখ্যা	১৩২	১২৮	৬৩	৫৮	৫৪

(৪) ইসম্যালিয়াতে ১৯০২ অব্দে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা হয়। ১৯০২ অব্দের ও পূর্ব্বের ও পরের মৃত্যু-সংখ্যা বিশেষ বিবেচনার বিষয়—

বৎসর	১৮৭৭	১৮৮২	১৮৮৭	১৮৯২	১৮৯৭	১৮৯৯	১৯০০
মৃত্যু-সংখ্যা	৩০০	৪৮০	১:০০	২০২৫	২০৮৯	১৮৭৫	২২৮৪

১৯০১ অব্দে ১৯৯০

১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
:৫৫১	২১৪	৯০	৩৭

ইহা দেখিলে কে না বলিবে যে ম্যালেরিয়াকে দূর করা মানবের শক্তির অধীন? ইহা দেখিলে, নিজের দেশে ম্যালেরিয়ার এরূপ অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত প্রভাব দেখিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? পানামা খাল খননকালে সহস্র-সহস্র কুলি কার্য্য করিয়াছিল। প্রথম বারে পীত-জ্বরে ও ম্যালেরিয়ায় বহু সহস্র কুলি প্রাণত্যাগ করে; কিন্তু দ্বিতীয় বারে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করায় ঐ দুইটী রোগের প্রভাব লক্ষিত হয় নাই। সেই জন্য দ্বিতীয় বারে যাঁহার চেষ্টায় সুফল ফলিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি বিবেচনা করি যে, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ এই ক্ষণে সহজেই দেখাইতে পারেন যে, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে যে কোনও স্থানের অধিবাসিগণকে পীতজ্বর ও ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত; এবং তাহার জন্য যে সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহাও সহজ এবং অল্প-ব্যয়সাধ্য।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "গ্রীষ্মপ্রধান দেশের যে সকল স্থান এক্ষণে ম্যালেরিয়ার কবলগ্রস্ত, সেই সকল স্থান মানব-ইতিহাসের প্রভাতকালে ধনে জনে জ্ঞানে যেমন পরিপূর্ণ ছিল, আবার তেমনি হইবে।" এই আশার বাণী আমার দেশে কি পরিপূর্ণ হইবে না?

তৃতীয় কথা, ম্যালেরিয়া নিবারণ।

ম্যালেরিয়ার যে সকল পরোক্ষ কারণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, বা অন্য যে সকল পরোক্ষ কারণ আছে, তৎ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ম্যালেরিয়ার যাহা প্রত্যক্ষ কারণ তাহা কিরূপে দূর করা যায়, তাহাই এক্ষণে আমাদের প্রধান ও প্রথম আলোচ্য বিষয় হইতেছে।

এনোফিলিস্ বা ম্যালেরিয়া-মশক ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া উক্ত মশকের নির্ব্বাচন, ও উহার আকৃতি, প্রকৃতি, উদ্ভব, স্থিতি, লয় ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা আমাদের অত্যাবশ্যক। তৎপরে উক্ত মশক যাহাতে আমাদিগকে দংশন করিতে না পারে, তাহার উপায় স্থির করা এবং অবলম্বন করা প্রয়োজন।

এনোফিলিস্ বা ম্যালেরিয়া-মশকের আকৃতি সাধারণ মশকের আকৃতি হইতে কিছু বিভিন্ন। [ম্যালেরিয়া মশকের আকৃতি চিত্রে দ্রষ্টব্য] উক্ত মশক সাধারণতঃ দূষিত জলে ডিম্ব ত্যাগ করে। যেখানে ডোবার চতুঃপার্শ্বে নল-খাগড়া বা অন্য ক্ষুদ্র উদ্ভিদের বাহুল্য আছে, সেই স্থানই উহাদের ডিম্ব ত্যাগের প্রকৃষ্ট স্থল। ডিম্ব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হয়। উক্ত কীট কিছুদিন পরে

রূপান্তরিত হইয়া গুটী হইতে মশক দেহ ধারণ করিয়া জল পরিত্যাগ করিয়া বায়ুতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। জলে অবস্থান কালে ইহারা মৎস্যের খাদ্য। ম্যালেরিয়া-মশকের জন্ম ও পুষ্টি জলাশয়ে; সেই জন্য সকল দেশেই দূষিত জলাশয়ের সংস্কার ও পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থাই ম্যালেরিয়া নিবারণের প্রথম ও প্রধান উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে হাভানা, ইস্মালিয়া প্রভৃতি যে সকল স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল স্থানে উক্ত উপায়ই প্রধানতঃ অবলম্বিত হইয়াছিল। এক্ষণে আমাদের দেশে কি প্রকারে দূষিত জলাশয়ের সংস্কার ও পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাই প্রধানতঃ বিবেচনার বিষয়।

বাঙ্গলা দেশে অনেক নদী পুরাতন খাত পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে চলিতেছে,—অনেক নদী শুকাইয়া গিয়াছে। এই সকল নদীর সংস্কার করিয়া গ্রামসমূহের জল প্রণালী উক্ত নদীর সহিত সংযোগ করিয়া দিবার কল্পনা অনেকের মনে আসিয়া থাকে। কিন্তু একেবারে সমগ্র বঙ্গদেশের উন্নতিসাধন করিবার চেষ্টা যে যেরূপ ব্যয় ও শক্তি-সামর্থ্যসাপেক্ষ ও যেরূপ বিপদসঙ্কুল, তাহাতে সে কল্পনা করিতে সাহস হয় না। আমি এমন উপায় চিন্তা করিতে বলি, যাহা আমাদের সাধারণের সাধ্যায়ত্ত, অথচ যাহার ফলও সুনিশ্চিত।

আমি এক-একটী বিশেষ গ্রাম, অথবা পরস্পর-সংলগ্ন দুই-তিনটী গ্রামের এক-একটী গ্রাম্য-মণ্ডলী সম্বন্ধে পৃথক ভাবে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা করিবার কথা বলি। এইরূপ পৃথক চেষ্টার প্রথম ও প্রধান ফল এই যে, যে গ্রামের উন্নতির চেষ্টা হইবে, সেই গ্রামের আপামর, সাধারণ সকল ব্যক্তির উৎসাহ, উদ্যম ও চেষ্টার অবধি থাকিবে না। নিজের সংসার-রক্ষা বংশ-রক্ষা, প্রাণ-রক্ষার বিষয়ে কে উদাসীন থাকিতে পারে? গ্রামের মধ্যে এই উন্নতির আবশ্যকতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে উক্ত উন্নতির জন্য কার্য্য করা সহজ হইবে।

কোনও একটী গ্রামের অধিবাসিগণ তাহাদের গ্রামের ম্যালেরিয়া দমনে অভিলাষী হইয়া কি প্রণালী অবলম্বন করিবেন? সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের মনের একাগ্রতা আবশ্যক, এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে দলাদলি, বিরোধ, স্বার্থপরতা, এ সকল ভুলিয়া যাইতে হইবে। গ্রামের মধ্যে বুদ্ধিমান, বলিষ্ঠ ও ক্লেশ-সহিষ্ণু অল্পসংখ্যক কয়েক জন ব্যক্তির উপর সাধারণতঃ সকল বিষয়ের ভার অর্পণ করিতে হইবে। তাহারা গ্রামে যে সকল পুষ্করিণী, ডোবা, জল-প্রণালী আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যে সকল পুষ্করিণী বৃহৎ, যাহাতে মৎস্য আছে, সেই সকল পুষ্করিণীতে ম্যালেরিয়া-মশকের ডিম্ব মৎস্যের কলেবর বৃদ্ধি করে মাত্র। সুতরাং সেই সকল পুষ্করিণী দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে সকল জলাশয় জঙ্গলাবৃত, সেই সকল পুষ্করিণীর সংস্কার আবশ্যক; কিন্তু পল্লীগ্রামে পুষ্করিণী-সংস্কার এক দুঃসাধ্য বিষয় হইতেছে। অনেক পুষ্করিণীর অধিকারী এক্ষণে নিঃস্ব হইয়াছেন; তাঁহাদের সংস্কার করিবার সামর্থ্য নাই। এরূপ স্থলে গ্রামের অন্য অধিবাসিগণ অপরের পুষ্করিণী-সংস্কারে অর্থব্যয় করিতে কখনই স্বীকার করেন না। এবং এমন কি, পুষ্করিণীর মালিকও অপরের সাহায্য লইতে প্রস্তুত হয়েন না। অনেক স্থলে একটী পুষ্করিণীর অনেকগুলি শরিক থাকায় কেহই তাহার উন্নতিকল্পে কোনও চেষ্টা করেন না। কিন্তু এখন আর সে গোলযোগ করিবার দিন নাই; যে পুষ্করিণীর সংস্কার গ্রামের স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক, তাহা সকলে মিলিয়া করিতে হইবে; তাহাতে শরিকের তর্ক, স্বত্বের তর্ক, হিন্দু মুসলমানের তর্ক করিবার আর অবসর নাই। পুষ্করিণী অসংস্কৃত থাকিলে তাহার বিষময় ফল গ্রামের সকলকেই সমান ভাবে ভোগ করিতে হইবে; সুতরাং পুষ্করিণী সংস্কারের ভারও সকলকেই লইতে হইবে। বৃহৎ পুষ্করিণী ব্যতীত গ্রামে অনেক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জলাশয় থাকে; তন্মধ্যে কতকগুলির সহিত গ্রামের পয়ঃ-প্রণালীর কোনও সংযোগ নাই; তাহারা বদ্ধ জল মাত্র। তাহাদিগকে বুঁজাইয়া ফেলিতে হইবে। আবার কতকগুলি জলাশয়, যাহা আপাতঃ দৃষ্টিতে বদ্ধ-জল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রকৃত পক্ষে পয়ঃ-নালীর অংশ মাত্র, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেইগুলিকে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া এক সমতলে এক বা বহু পয়ঃ-প্রণালী গঠিত করিতে হইবে, যাহা দ্বারা গ্রামের মলিন জলরাশি কোন স্থানে আবদ্ধ না থাকিয়া দূরে নদীগর্ভে বা অন্যত্র নিঃসরিত হইতে পারে।

এই প্রকারে কোনও গ্রামের উন্নতি করিতে গেলে গ্রামবাসিগণকে প্রথমেই একটী অসুবিধা ভোগ করিতে

মুক্তবেণী

শিল্পী— শ্রীরামেশ্বর প্রসাদ

THE Emerald Printing Works CALCUTTA

হইবে। কোন্ পুষ্করিণীর সংস্কার আবশ্যক, কোন্ জলাশয় পূর্ণ করা প্রয়োজন, কোন্ স্থান দিয়া কি ভাবে পয়ঃপ্রণালী গঠন করিতে হইবে, কোথায় ম্যালেরিয়া-মশকের নিবাস, এই সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামবাসিগণের কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সাহস না হওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক। গ্রামবাসিগণের দ্বিতীয় অসুবিধা, যাহা না হইলে কোনও কার্য্যই হয় না, তাহা অর্থের জন্য।

কিন্তু আজ এমন দিন আসিয়াছে যে, আমরা যদি একবার বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াই, তবে ঐ দুইটি অসুবিধার কোনটিই আমাদের পথের অন্তরায় হইবে না।

যেমন পল্লী-সংস্কারের ভার এক দিকে পল্লীবাসীর উপর ন্যস্ত, তেমনি অপর দিকে যাঁহারা কৃতবিদ্য, জ্ঞানবৃদ্ধ, বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা পল্লী হইতে পলাইয়া সহরে আসিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলেই তাঁহাদের সকল কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে না। সহর হইতে তাঁহাদের পল্লীর দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পল্লীবাসীর উদ্যম ও চেষ্টার সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি ও জ্ঞানের সম্মিলন করিতে হইবে। এই সম্মিলনেই আমাদের সকল আশা ও ভরসা নিহিত আছে।

সহরের মধ্যে কলিকাতা প্রধান,—জ্ঞানে ও অর্থে কলিকাতা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই কলিকাতা হইতে বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক বিচ্ছিন্ন হইতেছিল বলিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র বঙ্গদেশের প্রতিও কলিকাতার অনেক কর্ত্তব্য আছে। সৌভাগ্যক্রমে এই কলিকাতা সহরে কয়েকটি দেশ-বৎসল কৃতবিদ্য চিকিৎসক (Anti Malarial League) ম্যালেরিয়া-দমন-সমিতি নামে একটী সমিতি গঠিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা দেশ মধ্যে যে কোন স্থানে গিয়া পল্লীবাসীকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এই সমিতিকে লোকবল, অর্থবল দিয়া স্থায়ী করিতে হইবে। জেলায়-জেলায়, এমন কি প্রতি মহকুমায় যাহাতে উহার শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা করিতে হইবে।

যাঁহার নিকট আমি এই প্রবন্ধের প্রত্যেক তথ্যের জন্য ঋণী, যিনি ম্যালেরিয়া-দমন-সমিতির প্রাণ; তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে তিনি যেরূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন ও তাহার প্রতিকারের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, সেরূপ আর কেহ আছেন কি না, আমি জানি না। তিনিই দশ বর্ষাধিক কাল পানিহাটি মিউনিসিপালিটিতে ধীরে-ধীরে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। প্রথম-প্রথম তাঁহার অভিজ্ঞতা, লোকবল বা অর্থবল কিছুই ছিল না; তজ্জন্য কোনও কার্য্য করা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়া-মশকের আবাসভূমি খুঁজিতে লাগিলেন;—দেখিলেন যে বৃহৎ জলাশয়গুলিতে ম্যালেরিয়া-মশকের ডিম্ব নাই। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জলাশয়গুলি প্রতিবৎসর মিউনিসিপালিটী হইতে কয়েকজন কুলি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন্গুলি পূর্ণ করা প্রয়োজন, কোন্গুলি পরিষ্কার করা প্রয়োজন, তাহার কোনও প্রভেদ না করায় তাহাদের দ্বারা ক্ষতিই হইত। সেই মহানুভব ব্যক্তি গ্রামের সর্ব্বস্থান দর্শন করিয়া, গ্রামের একটী প্লান প্রস্তুত করিয়া, কোন্ জলাশয়গুলির কোনও সংস্কারের আবশ্যক নাই এবং কোন্গুলির কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন, তাহা স্থির করিলেন। গ্রামের পয়ঃপ্রণালীগুলি দ্বারা জল নিঃসারণের পথ স্থির করিলেন, এবং সেই পথগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে বিলুপ্ত না হইয়া যায় এবং তাহার কোথাও কিরূপ সমতল রাখা আবশ্যক, তাহা স্থায়ী করিবার জন্য সেই পথগুলিতে প্রায়শঃ ৫০ ফিট অন্তরে একটী করিয়া পাকা গাঁথনি ইটের চিহ্ন রাখিলেন। পানিহাটী মিউনিসিপালিটীতে ম্যালেরিয়ার দমন সংক্রান্ত এই কার্য্য ধীরে-ধীরে বৎসরে বৎসরে অল্প অল্প করিয়া হইয়া আসিতেছে। ইহার ফল কি শুনিবেন? কার্য্য আরম্ভ হইবার ৮ বৎসর পরে যখন ম্যালেরিয়ায় উক্ত গ্রামের সংলগ্ন দুইটী গ্রামে মৃত্যুসংখ্যা ১৫৯ হইয়াছিল, উক্ত গ্রামে ম্যালেরিয়ায় একটী লোকেও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। উক্ত গ্রামের কার্য্য এখনও সুসম্পন্ন হয় নাই, এখনও কার্য্য চলিতেছে। কার্য্যে কত ব্যয় হইয়াছে জানেন! বৎসর-বৎসর মাত্র ৬০।৭০৲ টাকা করিয়া ব্যয় হইয়া আসিতেছে। এ কথা শুনিলে কাহার না আশা হয়? বিদেশে যাইবার আবশ্যক নাই, নিজের দেশে নিজের চক্ষে যখন দেখিতে

পাইতেছি যে, সামান্ত ব্যয় করিয়া ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীকে দমন করা যায়, তখন কি আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত বা সম্ভব? পানিহাটিতে যাহা হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা দেশের সকল মিউনিসিপালিটিতে ও সকল গ্রামেই হইতে পারে। ম্যালেরিয়া দমন করিতে হইলে একটা রাজশক্তির প্রয়োগ এবং ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে, এ ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৎসর-বৎসর ৫০।৬০৲ টাকা খরচ করিলে এবং ধীর ভাবে অগ্রসর হইলে যদি ম্যালেরিয়া দমন করা যায়, তবে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ কি? প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে, গ্রামের মধ্যে সামান্ত ব্যয়ে অবশ্য এক বৎসর নহে, কয়েক বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়া গ্রামের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যে উপায়ে এই উন্নতি লাভ হইয়াছে, তাহা বহু কষ্টসাধ্য অথবা বহু ব্যয়সাধ্য নহে। গ্রামবাসিগণের ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যালেরিয়া দমন করা সহজ-সাধ্য ও অল্প ব্যয়সাধ্য। কিন্তু গ্রামের মধ্যে পরস্পরের প্রীতি ও ঐক্যমত তত সুলভ নহে। কিন্তু ইহা কি চির-কালই দুর্লভ থাকিবে? কেবল একপ্রাণ হইলে, কেবল চেষ্টা, যত্ন, উদ্যম করিলে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা যাহা অমঙ্গল, তাহাকে দূর করিতে পারি। এ অবস্থায় কি আমরা পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিরোধ সৃষ্টি করিয়া আমাদের যাহা কিছু শক্তি ও যাহা কিছু বুদ্ধি আছে, তাহা ঐ বিরোধ-বহ্নিতে আহুতি স্বরূপ দিয়া দেশের কল্যাণকে ভস্মীভূত করিব, না দেশের কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়া নিজেদের অতি তুচ্ছ, অতি সামান্ত বিরোধের কথা বিস্মৃত হইব? এক্ষণে গ্রামে-গ্রামে গ্রামবাসিগণ নিজের চেষ্টায় যাহাতে গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিতে পারেন, তাহার জন্য কৃতসংকল্প হওয়া আবশ্যক; এবং সহজে, অল্প ব্যয়ে যে উপায়ে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়া সেই পথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

যাহাতে অল্প ব্যয়ে, সহজে, নিজের চেষ্টায় নিজের কল্যাণ হইতে পারে, আমি সেই কথাই বলিতেছি। আমি অপর কাহারও উপর নির্ভর করার কথা বলি নাই। কিন্তু যাহারা নিজের সাহায্য করেন, ভগবান এমন কি গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর বাহাদুর বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়া দমনের জন্য বিধিমত চেষ্টা করিবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম, মনে করিলে আত্মপ্রতারিত হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যে সকল কার্য্য করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প হইতেছে, তাহা কবে আরম্ভ হইবে বা কবে শেষ হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের অনেক বৃহৎ ও প্রধান নদীর সংস্কার করিতে পারেন, তাহা সর্ব্বাংশে সুসম্পন্ন হইলেও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পয়ঃ-প্রণালী সম্বন্ধে আমি যে ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবে না। বৃহৎ নদীর সংস্কার এবং ক্ষুদ্র পল্লীর পয়ঃ-প্রণালীর সুব্যবস্থা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে। বরঞ্চ পল্লীর পয়োনালীর সংস্কার অধিকতর প্রয়োজনীয়, এবং তাহা পল্লীবাসীকেই করিতে হইবে। পরের মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিলে, চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান কালচক্রের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আশায় প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মনে হয়, সে দিন বহু দূরে নহে, যে দিন বঙ্গবাসী বিলাস-ব্যসনের কুহক বিস্মৃত হইবে; যে দিন সেই পুরাতন পরিত্যক্ত পল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে; যে দিন বাঙ্গালীর পল্লী-লক্ষ্মী পরিপূর্ণ পূর্ণিমার অগাধ অনন্ত জ্যোৎস্না-সমুদ্রের মধ্যে বসিয়া পল্লীবাসীর পূজা গ্রহণ করিবেন। সে দিন দূরবর্ত্তী নহে, যে দিন এই অসংখ্য স্রোতস্বতী-বিভূষিত, দিগন্ত-প্রসারী হরিত-ক্ষেত্র-বিমণ্ডিত, শ্যামাদোয়েল-পিকবন্ধ মুখরিত, বিবিধ ফুল-ফলভরা-তরুরাজি-সমলঙ্কৃত সোণার বাঙ্গলা সুস্থ, সবল সন্তান ক্রোড়ে ধরিয়া গৌরব অনুভব করিবে। সেদিন কল্পনার কু-আশায় আচ্ছন্ন নহে, যে দিন বাঙ্গালী বিদ্যায়, জ্ঞানে, স্বাস্থ্যে, বলে নিজের শির উন্নত করিয়া রাখিতে পারিবে। সে দিন আসিবেই আসিবে, যে দিন বাঙ্গালী হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভব করিবে যে, বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার মাটীতে বিধাতার আশীর্ব্বাদ নিহিত আছে। শুধু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—একথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমরা মানুষ, —আমাদের মানুষের মত বাঁচিতে হইবে,—আর আমাদের মানুষের মতই মরিতে হইবে; আমরা সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রতিদিন মরিতে-মরিতে বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না। *

* এই প্রবন্ধ ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে গত ফাল্গুন মাসে পঠিত হইয়াছিল।

দাদা

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ]

(১)

তারের খবর পাইয়াই বিপ্রদাসকে ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীপুর যাত্রা করিতে দেখিয়া বাড়ীর সকলেই বুঝিল, ঠাকুরদাসের পীড়া কঠিনই বটে। এই বিপ্রদাস লোকটি বিলক্ষণ বিষয়ী ও শক্ত। সহজে বিচলিত হইবার বা কাহাকেও জবাবদিহি করিবার পাত্র আদৌ নহে। বিপ্রদাসের গৃহিণী হরিমতি যখন জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গো, ছোট ঠাকুরের কি খুব অসুখ ?" তখন একটি সংক্ষিপ্ত শিরশ্চালনা করিয়া বিপ্রদাস যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল। শিরঃসঞ্চালন 'না' জ্ঞাপক, কি 'হাঁ' জ্ঞাপক হইল, তাহা সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া, হরিমতির উদ্বেগ বাড়িয়াই গেল।

বিপ্রদাসের বয়স যখন ১৬ বৎসর, এবং ঠাকুরদাসের মাত্র ৫ বৎসর, সেই সময়ে একমাসের মধ্যে তাহারা পিতৃ-মাতৃহীন হয়। সেই দুঃসময়ে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণবালক আপনি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া, শিশু ভ্রাতাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এক শুভ মুহূর্ত্তে বিপ্রদাস তাহার সামান্য চাকুরী ত্যাগ করিয়া যৎসামান্য একটি ব্যবসায়ে হাত দিয়াছিল। এখন সে ঐ অঞ্চলের মধ্যে চাউলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাজন। কৃতবিদ্য ঠাকুরদাস এখন মধ্যপ্রদেশের এক রাজষ্টেটের ম্যানেজার। সেখানেই সে সপরিবারে থাকে।

(২)

পীড়িত ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া ও তাহাদের ২টি পুত্র-কন্যা লইয়া এক সপ্তাহ পরে বিপ্রদাস গৃহে ফিরিল। দেবরের শীর্ণ শরীর ও দেবরজায়া ইন্দুর ম্লান মুখ দেখিয়া হরিমতি অলক্ষ্যে অনেকবার অশ্রু মুছিল। বিপ্রদাসের গম্ভীর মুখ আরও একটু বেশী গম্ভীর হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া ঠাকুরদাসের শ্বশুর দয়াল চট্টোপাধ্যায় আসিলেন। জামাতার অবস্থা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা দেখিয়া তাঁহার দুঃখ ও বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। জামাতাকে এক সময়ে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, ইদানীং কত করে পাচ্ছিলে ?" রোগের সময় এইরূপ প্রশ্নে একটু বিস্মিত হইয়া ঠাকুরদাস বলিল, "চারশো টাকা।" শ্বশুর পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তার থেকে কি একটা পয়সাও বাঁচাতে পারতে না ?" এবার প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া জামাতা শ্বশুরের পানে চাহিয়া রহিল। দয়াল বাবু একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "নইলে এমন রোগ একটা আনাড়ি কবিরাজের চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয়।" ঠাকুরদাস ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না না, অমন ভাববেন না ; দাদা কলকাতার বড়-বড় ডাক্তারদের দেখিয়েছিলেন ; তাঁদের মত নিয়ে তবে কবিরাজ দেখাচ্ছেন।" দয়াল বাবু শ্লেষের সহিত বলিলেন, "হুঁ, তাঁরা বুঝি বল্লেন,—আমাদের ওষুধের ঝাঁজ সব বেরিয়ে গেছে, দিনকতক পানের রস, মধু খেয়ে দেখ !—এ কেবল পয়সা বাঁচাবার ফিকির।" ঠাকুরদাসের পাণ্ডুর মুখমণ্ডল মুহূর্ত্তের জন্য রক্তাভ হইয়া উঠিল, বলিল, "দাদার সম্বন্ধে ও-কথা শুন্‌লেও আমার পাপ হবে।" দয়াল বাবু বাহিরে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এমন সরল বিশ্বাসের কি এই প্রতিদান !" মনে-মনে স্থির করিলেন, একবার বিপ্রদাসকে বলিয়া শেষ চেষ্টা দেখিবেন। সে মত না করিলে, আপনার ব্যয়ে কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইবেন। বিপ্রদাসের নিকট কথাটা তুলিতেই, সে বলিল, "আমি বেশ করে জেনেছি, এলোপ্যাথিতে এ রোগের কোন উপশম হবে না।—যদি কোন উপকার হয়, তো, এই কবিরাজী চিকিৎসায় হতে পারে ; তাই এই চিকিৎসাই করাচ্ছি।" দয়াল বাবু বলিলেন, "মস্তিষ্ক সম্বন্ধে নানারকম রোগের প্রতিকার এলোপ্যাথি মতে রয়েছে। কলকাতা থেকে Deare সাহেবকে আনিয়ে তাঁকে দিয়ে চিকিৎসা করাও, শীগ্‌গির সেরে উঠ্‌বে।" বিপ্রদাস স্থির স্বরে বলিল, "যাতে এখনও একটু আশা আছে, তা ত্যাগ করে' বৃথা ডাক্তারী চিকিৎসা এখন কি করে করাই বলুন ?" দয়াল বাবু একটু বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, "এত বড় একটা Medical Science এক কথায় বলে'

দিলে—আমরা এ রোগ হাতে নেব না।" বিপ্রদাস বলিল, "হাতে নেব না বলে নি; হাতে নিলে কোন লাভ নেই বলেছে।" দয়াল বাবু একটু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তবু তাদের হাতেই তোমার রাখা উচিত ছিল—সুচিকিৎসায় মরাও মানুষের একটা সান্ত্বনা।" বিপ্রদাস একবার দয়াল বাবুর মুখের পানে চাহিয়া উত্তর দিল, "যাতে কোন লাভ, কোন আশা নেই, তার পিছনে বাজেখরচ করা আমি বড় অন্যায় মনে করি। তার চেয়ে—" আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া দয়াল বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "বাজেখরচই যদি মনে কর, আমি নিজব্যয়ে Deare সাহেবকে আনাচ্ছি।" বিপ্রদাস বলিল, "আপনি তা স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। তবে চিকিৎসা কবিরাজী মতেই চল্‌বে।" হতাশ হইয়া দয়াল বলিলেন, "তা হলে ওর অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক্। টাকা থাক্‌লেই সুচিকিৎসা হয় না, ও অদৃষ্টসাপেক্ষ। ১০৲ টাকা আয়েও হয়, আবার ৪০০৲ টাকাতেও হয় না।" বিপ্রদাস কোন উত্তর দিল না।

(৩)

শেষ দিনে অষ্টবজ্র-সম্মিলনের ন্যায় সকল চিকিৎসকের একত্র সমাবেশ হইল। সকলেই একবাক্যে মত দিলেন, আজই রোগীর জীবনের অবসান হইবে।

ঠাকুরদাসের ভিতরে তখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল, কিন্তু কথা কহিবার শক্তি লোপ পাইয়াছিল। এক-এক করিয়া চিকিৎসকগণ দর্শনী-ও পাথেয় লইয়া রোগীর কক্ষ ত্যাগ করিলেন। কেবল কয়েকটী নিকটআত্মীয় ও বৃদ্ধ বহুদর্শী কবিরাজ মহাশয় তথায় বসিয়া রহিলেন। দয়ালবাবু শেষবার শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবিরাজ মশায়, আর একবার নাড়ীর অবস্থাটা দেখুন ত।" কবিরাজ মহাশয় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রোগীর হাতখানি পুনরায় শয্যার উপর স্থাপিত করিলেন। দয়ালবাবু নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখ্‌লেন, দুপুর পেরুবে?" কবিরাজ নিঃশব্দে একটীবার ঘাড় নাড়িলেন। দয়ালবাবু তখন কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্তঃপুরের দিকে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে বিপ্রদাসের এক কর্ম্মচারী আসিয়া ডাকিল, "বড় বাবু!" বিপ্রদাস অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল। চমকিত হইয়া উত্তর দিল, "কি বলছ?" একটু স্বর নামাইয়া কর্ম্মচারী বলিল, "ছোট বাবুর শ্বশুর ছোট বাবুর ঘর তালা-বন্ধ করেছেন।" অত্যন্ত উগ্র হইয়া বিপ্রদাস বলিয়া উঠিল—"কি—" পরমুহূর্ত্তে মৃত্যুশয্যাশায়ী নির্ব্বাক্ কনিষ্ঠের জ্যোতিঃহীন চক্ষু তাহার ক্রুদ্ধ মুখের উপর স্থাপিত দেখিয়া, চঞ্চল জিহ্বা সংযত করিয়া ধীর কণ্ঠে কর্ম্মচারীকে আদেশ দিল, "আর একটা ভাল বিলিতি তালা তার উপরে দাওগে।" অগ্রজের প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি মুমূর্ষুর চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কিসের এ অশ্রু? যাহার পিছনে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ সে ব্যয়িত করিয়াছে, তাহার এই নশ্বরতা দেখিয়া? এই প্রিয় জগৎ, এই প্রিয়তর গৃহ, এই প্রিয়তমা আপনার জন সকলই আজ অবিলম্বে ছাড়িতে হইবে বলিয়া? না ইহারি মধ্যে পরমাত্মীয়গণের শকুনি-দৃষ্টি কোন্ স্থানে পড়িতেছে, তাহা অনুমান করিয়া? তার পর পদতলে লুণ্ঠিতা প্রিয়তমার অশ্রুপ্লাবিত মুখের পানে চাহিতে চাহিতে সেই ম্লান নয়নের উপর চিরযবনিকা পড়িয়া গেল। বিধ্বস্ত নদীতীরের শ্লথমূল তরুটার মত জীবনটাকে মরণের প্রবল স্রোত উৎপাটিত করিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল।

(৪)

শ্রাদ্ধ মিটিতেই, দয়ালবাবু আসিয়া দেশের ২।৫ জন ভদ্রলোককে একত্র করিয়া তাহাদের সমক্ষে বিপ্রদাসকে বলিলেন, "যা অদৃষ্টে ছিল তা'ত হল; এখন মেয়েটাকে আমার কাছে নিয়ে যাই। ঐ ছেলে-মেয়ে দুটো যদি বাঁচে, তবু তাই নিয়ে একটু ভুলে থাক্‌বে।" প্রতিবেশিগণ সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, দিন-কয়েক নিয়ে যান্! বড়ই শোক পেয়েছেন, একটু সাম্‌লে আসুন।" দয়ালবাবু একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না, না,—তার এখানে আর আস্‌তে হবে না। এখানকার সব সাধই তার ফুরিয়েছে; আর কেন? মেয়েটার যা ন্যায্য অংশ হয়, আপনারা পাঁচ জনে দাঁড়িয়ে থেকে মীমাংসা করে দিন। তাই আপনাদের আজ ডেকেছি।" কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কোন কথা ফুটিল না। দয়ালবাবুই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "তা হলে বিপ্রদাস, এঁদের সাম্‌নেই আজ ভাগটা মিটে যাক্।" বিপ্রদাস এতক্ষণ অর্থহীন দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল; দয়ালবাবুর

কথায় একটু চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁা. কি বল্‌ছেন ?" দয়ালবাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া পূর্ব্ব কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। বিপ্রদাস বলিল, "যা সামান্য বিষয় আছে, আর এই বাড়ী,—এই কি আপনি ভাগ করে রেখে যেতে চান ?" দয়ালবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না,—এ সব যেমন আছে, তেমনি থাক্ ; তোমার ভাইপো বড় হয়ে যা হয় করবে। নগদ টাকাকড়ি, গহনাপত্র যে সব আছে, পাঁচজনের সমক্ষে তাই ভাগ করে দাও।" বিপ্রদাস যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, "নগদ টাকাকড়ি কোথায় পাব ? আমি ব্যবসাদার—যা পাই ব্যবসাতে খাটাই ; নগদ তেমন তো কিছুই রাখি না।" দয়ালবাবু কঠিন স্বরে বলিলেন, "কি বল্‌ছ বিপ্রদাস তুমি ! তা হলে মেয়েটাকে তুমি ফাঁকি দিয়ে একেবারে পথে বসাতে চাও ?" বিপ্রদাস একটু ভাবিয়া বলিল, "পথে বসাতে যাব কেন ? আর ন্যায্য জিনিস আমি ফাঁকি দিতে গেলেই বা আদালত ছাড়্‌বে কেন ?" দয়ালবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "ওঃ ! তা হলে তুমি একেবারে আদালতের পথ দেখিয়ে দিচ্ছ ! বেশ, তাই হবে, আপনারা সব সাক্ষী রইলেন।" একজন নিরপেক্ষ স্পষ্টভাষী প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, "আজ তোমার এ কি কথা বিপ্রদাস ? তুমি ঠাকুরদাসকে আপন হাতে মানুষ করেছ, সেও তোমাকে বাপের মত মান্য করত ! নিজের খরচ বাদে সবই তো তোমাকে পাঠাত। আজ কি করে সে সব অস্বীকার করছ ?" "আমার যা বল্‌বার তা তো বলেছি ; আমাকে আপনারা আর বিরক্ত করবেন না।" বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিল। দয়ালবাবু ভদ্রলোকদিগকে বলিলেন, "আপনারা তো সব শুন্‌লেন ; নালিশ ভিন্ন অন্য উপায় নেই, তাও দেখ্‌লেন। অগত্যা আমাকে তাই করতে হবে। আজই আমি এদের সব নিয়ে যাচ্ছি। এ পাপ পুরীতে আর একদণ্ডও থাক্‌তে ইচ্ছে নেই।" অগত্যা প্রতিবেশী ভদ্রলোকেরাও উঠিলেন। একজন বলিলেন, "আহা, ঠাকুরদাস এমন নিরীহ ছিল, দাদার উপর এত নির্ভর করত,—তার কি এই ফল ?" আর একজন বলিলেন, "বিপ্রদাস যে এতদিন পরে টাকার লোভে এমন করবে, তা কখন ভাবি নি।" সেই স্পষ্টভাষী ভদ্রলোকটী ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন ; তিনি বলিলেন, "এ কলির ভাইয়ের উপযুক্ত কাজই হয়েছে।"

নিরাভরণা শীর্ণদেহা ইন্দুবালা বড়-জাকে প্রণাম করিয়া কোলের ছেলেটীকে লইয়া যখন কাঁদিতে-কাঁদিতে গাড়ীতে উঠিল, বিপ্রদাস-গৃহিণী হরিমতি সঙ্গে-সঙ্গে আসিয়া, অশ্রুজলে ভাসিয়া বলিল, "ইন্দু, একেবারে পর হয়ে ভুলে থাকিস্ নে ; আবার আসিস্।" ঠাকুরদাসের চার বছরের মেয়েটি জেঠামশায়কে প্রণাম করিবে বলিয়া বাড়ীময় খোঁজ করিয়াও, তাঁহার কোন সন্ধান না পাইয়া, দাদা মহাশয়ের তাড়ায় গাড়ীতে আসিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

(৫)

ছয়মাস রীতিমত মোকদ্দমা চলিল। বিপ্রদাস এমন এক উইল বাহির করিল, যাহার বলে দয়াল বাবু ভাগের একটি পয়সাও বাহিরে আনিতে পারিলেন না।

উইলে লেখা ছিল—বিপ্রদাস ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর অভিভাবক হইবেন, এবং তাহাদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির তিনিই তত্ত্বাবধায়ক থাকিবেন। কি যে সম্পত্তি, তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত উইলে ছিল না।

মোকদ্দমায় হারিয়া দয়ালবাবু বাড়ী ফিরিয়া বলিলেন, "ঠাকুরদাস যে লেখাপড়া শিখে এতখানি বোকা হবে, তা আমি ভাবিনি। তার মৃত্যুর আগে নিশ্চয়ই বিপ্রদাস সাদা কাগজে তার একটা সই করিয়ে নিয়েছিল। তার পর ইচ্ছামত উইল তৈরী করে মামলা জিতে নিলে। উঃ! এমনি করে কি ভাইয়ের সর্ব্বনাশ ভাইয়ে করে !"

মোকদ্দমার ফল শুনিয়া ইন্দুমতী চোখ মুছিয়া ভাবিল, —তিনিই যখন চলিয়া গেলেন, নাই বা আসিল টাকা। মণি আর কিরণ যখন বড় হবে, বড়ঠাকুর কি আর তখনও ইহাদের পানে চাহিবেন না ? দিদি আছেন, একটা ব্যবস্থা তিনি করিবেনই।

ইন্দুবালার মাতা ১০ বৎসর হইল স্বর্গে গিয়াছেন। দয়ালবাবু দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া দুই পুত্র ও দুই কন্যা লাভ করিয়া নূতন করিয়া সংসার পাতিয়াছেন। ইন্দু আসিয়া প্রথম প্রথম বিমাতা ও মাতার কোন পার্থক্য বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু মোকদ্দমার ফল বাহির হইতেই তাহা সুস্পষ্ট হইতে লাগিল। বিমাতার গঞ্জনা ও তাহার পুত্রকন্যার প্রতি অবহেলা ও নির্য্যাতনে ক্রমশঃ পিতৃগৃহবাস তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। ইন্দুর তখন কেবলি মনে

হইতে লাগিল. এখানে না আসিয়া দিদির কাছে থাকিলেই সে ভাল করিত।

এমন সময় একদিন বিপ্রদাসের বড় ছেলে দুর্গাপদ তাহাদের দেখিতে আসিল। স্বামীকে লুকাইয়া হরিমতি তাহাকে পাঠাইয়াছিল। ভগিনী মণিকে নির্জ্জনে পাইয়া দুর্গাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "মণি, তোর গালে এ কিসের দাগ রে?" মণি পিতার কত আদরের কন্যা ছিল। দাদার প্রশ্নে সে কাঁদিয়া ফেলিল। পরে চারিদিকে চাহিয়া, অশ্রু মুছিয়া বলিল, "মামা মেরেছে, মামা বড্ড মারে।" দুর্গাপদ মাতার মত স্নেহ-প্রবণ হৃদয়টি পাইয়াছিল। মণির দুঃখে তাহার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। ইন্দুর সহিত দেখা করিয়া দুর্গাপদ কহিল, "খুড়ীমা, মা তোমাদের যাবার জন্য অনেক করে বলেছেন। তোমার মত হলেই একদিন আমি বা বাবা এসে নিয়ে যাব।" ইন্দু সাগ্রহে যাইতে সম্মত হইল।

দুর্গাপদ বাড়ী ফিরিলে, এই সব কাহিনী তাহার নিকট হইতে শুনিয়া হরিমতি কাঁদিয়া-কাঁদিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তুলিল; মনে মনে স্থির করিল, আজ রাতে স্বামীকে সব কথা বলিয়া যেমন করিয়া হোক্ ইন্দুদের আনাইবে। রাত্রে বিপ্রদাসের আহার শেষ হইলে দুর্গা-পদকে লুকাইয়া ইন্দুর নিকট পাঠান হইতে সমস্ত কথা নিবেদন করিয়া হরিমতি সজল চক্ষে বলিল, "তোমাকে কত দিন তাদের আন্‌বার কথা বলেছি,—তুমি এতকাল মোকদ্দমার ওজর করে রেখেছ। এখন তো সব মিটে গেছে—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এবার তাদের নিয়ে এস। আহা রাজরাণী ছিল সে, এত কষ্টে সে কি বাঁচ্‌বে!" হরিমতির কথা শেষ হইবামাত্র অত্যন্ত চীৎকার করিয়া বিপ্রদাস কহিল, "ও সব কথা কেন আমাকে শোনাতে এসেছ? কেন তুমি দুর্গাকে পাঠাতে গিয়েছিলে? আমি কাউকে আন্‌তে পারবো না। আমি কি তাঁকে যেতে বলেছিলাম? ঠাকুরদাস যা রেখে গেছে, সে সব আমি নেব; সে সব আমার—আমার—" বলিতে বলিতে হরিমতিকে ভীত, চমকিত করিয়া বিপ্রদাস দ্রুতপদে বহির্বাটীতে চলিয়া গেল। সে রাত্রে বিপ্রদাস আর অন্তঃপুরেই আসিল না।

(৬)

পরদিন প্রভাতে হরিমতি সাহস করিয়া ও-সম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। রাত্রিকালে বিপ্রদাস নিজেই গম্ভীর মুখে স্ত্রীকে বলিল, "দেখ, যদি বৌমাদের আন্‌তে ইচ্ছা কর, দুর্গাপদকে পাঠিয়ে আন্‌তে পার। আমি কোথাও যেতে পারব না।" অপ্রত্যাশিত ঈপ্সিত সংবাদ শুনিয়া আনন্দে হরিমতির চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

শীঘ্রই ভাল দিন দেখিয়া নিজের জবানী এক পত্র লিখিয়া দিয়া হরিমতি দুর্গাপদকে পাঠাইয়া দিল। দয়াল বাবু ভাবিলেন,—ছেলেমেয়েরা কাছে থাকিলে যদি বিপ্রদাসের মনে দয়া বা স্নেহের সঞ্চার হয়। এই ভাবিয়া তিনি ইন্দুকে পাঠাইতে কোন আপত্তি করিলেন না। তাহার উপর তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর তাড়না তো ছিলই। পুত্রকন্যা লইয়া ইন্দুবালা আবার স্বামীর আলয়ে প্রবেশ করিল।

বিপ্রদাস সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া হরিমতিকে ডাকিয়া বলিল, "বৌমাকে সঙ্গে করে একবার তাঁর ঘরটায় চল, দরকার আছে।" বিপ্রদাসের পিছনে-পিছনে হরিমতি ও ইন্দু সেই ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সাত মাস আগে দুই পক্ষের দুটী তালা যেমনভাবে বন্ধ করা ছিল, আজও তেমনি রহিয়াছে। বিপ্রদাস ধীরে ধীরে গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া আলোক হস্তে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ডাকিল, "এস।" সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটিকে কোলে করিয়া ইন্দু ও হরিমতিও আসিল। এটী ঠাকুরদাস ও ইন্দুর শয়ন-কক্ষ ছিল। ঠাকুরদাস পীড়িত হইয়া আসিয়া আর এ কক্ষে বাস করে নাই, বহির্বাটীতে ছিল। গৃহসজ্জাগুলি যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে, একটী সামান্য দ্রব্যও স্থানান্তরিত হয় নাই। কক্ষে প্রবেশ করিতেই মনে হইল, এতদিনকার রুদ্ধ বাসনা যেন কক্ষতলে লুটাইয়া-লুটাইয়া কাঁদিতেছিল; আজ গৃহদ্বার মুক্ত পাইয়াও তাহারা বিন্দুমাত্র নড়িল না। তাহাদের নীরব ক্রন্দন পাষাণের মত এই প্রাণী-কয়টীর অন্তস্তল অধিকার করিয়া রহিল।

ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বিপ্রদাস বলিল, "বৌমা, গোটাকতক কথা বলব বলে তোমাদের এ ঘরে ডেকেছি। তোমরা সবাই নিশ্চয় আমাকে খুব নিষ্ঠুর ভেবেছ; আর মনে করেছ, ঠাকুরের মরণ আমার তেমন লাগেনি; কারণ, তা' নহিলে তার টাকা-কড়ির দিকে আমি এত নজর দিতে পারতাম না। সবারই যখন চোখে জল, সবাই যখন হা-হুতাশ করছিল, আমি তখন স্থির নিশ্চল

ছিলাম। আমি কি করে কাঁদি বল? ঠাকুর যে আমার কি ছিল, সে যে আমার কতখানি নিয়ে গেছে,—তা ত তোমরা বুঝতে পারবে না। তেমন নির্ভর, তেমন বিশ্বাস আর কোন ভাইয়ের তো আমি দেখিনি। দুবার হা-হুতাশ করে, দুফোঁটা চোখের জল ফেলে আমার সে দুঃখ তো একটুও কম্‌ত না। মায়ের স্নেহে আমি তাকে মানুষ করেছি, রক্ষা করে এসেছি; কিন্তু শেষরক্ষা তো করতে পারলাম না। তার চেয়ে কত বড় আমি,—আমি পড়ে রইলাম; সে তো তার মস্ত বড় মহৎ প্রাণ নিয়ে চলে গেল। বড় বৌ, তুমিও দেখনি—তাকে আমি কি কষ্টে মানুষ করেছিলাম। মা, বাবা দু'জনেই যখন মারা গেলেন, তখন আমার বয়স ষোল বছর, তার বয়স পাঁচ। ঠাকুরের এখানকার পড়া শেষ হলে, তাকে বল্লভপুরের স্কুলে পড়তে দিলাম। আমি তখন একটা দোকানে দশ টাকা মাইনের কাজ করি। বেলা সাতটার মধ্যে রেঁধে তাকে খাইয়ে আমি কাজে যেতাম। সে একটু পড়াশুনা করে বেরুত। যেতে-আসতে রোজ পাঁচ ক্রোশ পথ তাকে হাঁটতে হত। যখন সকালে স্কুল হ'ত, আমি রাত চারটের সময় ভাত রেঁধে তাকে চাট্টি খাইয়ে আগিয়ে দিতে বেরুতাম। তিন চারটা মাঠ পার হয়ে যখন বেশ সকাল হ'ত, তখন আমি ফির্‌তাম,—সে একা যেত। তার পর ভগবান্ মুখ তুলে চাইলেন। জলপানি পেয়ে ঠাকুর কল্‌কাতায় পড়তে গেল, আর কষ্ট রইল না। তোমরা এখন বল্‌বে'—তাকে আগে যদি এতই ভালবাসতাম, কি করে শেষে এমন হলাম? সেই কথাটাই বল্‌ব বলে আজ তোমাদের ডেকেছি। ঠাকুর শুধু আমাকেই জান্‌ত। আমি থাক্‌তে তার ছেলেমেয়ের ভার বা বিষয়-আশয় আর কারো হাতে যায়, এ তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সে তো বুঝ্‌তে পারেনি যে, এত শীঘ্র তাকে চলে যেতে হবে! তাই সে সম্বন্ধে কোন কথাই সে প্রকাশ করে যেতে পারে নি। বৌমার বাবা ঘরে তালা দিয়েছেন—এ খবর যখন সেই ঘরে একজন দিয়ে গেল, তখন সে যে কি দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়েছিল, তা কেবল আমিই বুঝেছিলাম। তাই আমি তার সামনেই ঘরে আর একটা তালা দিতে বলেছিলাম। সে সময়ে তার মুখ দেখে আমি বুঝেছিলাম, এই সে চায়। তুমি কিছু মনে কোরো না, বৌমা,—তোমার বাপের উপর আমার তেমন বিশ্বাস ছিল না; সে জন্য প্রাণ ধরে তোমার প্রাপ্য জিনিসও আমি তাঁর হাতে দিতে পারি নি। আমি ঠিক জানতাম, তুমি বাপের বাড়ীতে কিছুতে শান্তিতে থাক্‌তে পারবে না। কিন্তু তখন যদি তোমাকে এ সব কথা বল্‌তাম,—তোমার বা কারো সে কথা ভাল লাগত না। শোকের প্রথম ধাক্কায় ওখানে যেতেই তোমার মন বেশী চাইত। সে জন্য তোমাকে আমি তখন একবার বারণ পর্য্যন্ত করিনি। ভেবেছিলাম, সেখানকার ব্যবহারটা দেখে এলে, তুমি এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পারবে। পাছে তোমার সম্পত্তি, তোমার ছেলেমেয়ের জিনিস নষ্ট হয়ে যায়, শুধু এই ভয়ে আমি এতদিন এত কপটতা করে এসেছি। মোকদ্দমা করেছি, তবু তোমার বাপের হাতে কিছুতে দিই নি। এই করে তোমাদের মনে অনেক কষ্ট দিয়েছি; কিন্তু তোমাদের কষ্ট দেখে আমিও যে কষ্ট পাইনি, তা ভেব না। এ ঘরের সিন্দুকে সে দিন যা ছিল, আজও ঠিক তাই আছে—এ সব তোমার। আরও যেখানে যা আছে, তাও তোমার ছেলেমেয়ের। আজ থেকে এ সিন্দুকের চাবী তোমারি কাছে রাখ বৌমা!" তার পরে চক্ষু মুছিয়া চাবীটা ইন্দুর দিকে আগাইয়া দিয়া বিপ্রদাস বলিল, "শেষ ভাল হবে ভেবে তোমার মনে যে কষ্ট দিয়েছি, বৌমা, তা মনে করে আর যেন কষ্ট পেও না।" বিপ্রদাস অনেকদিনের রুদ্ধ আবেগ যতক্ষণ এমনি করিয়া প্রকাশ করিতেছিল, ইন্দু ও হরিমতির ততক্ষণ চোখের জলের আর বিরাম ছিল না। আবেগের আতিশয্যে ইন্দু থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। বিপ্রদাসের কথা শেষ হইলে, কোনমতে আপনার কম্পিত পদদ্বয়কে স্থির করিয়া, ইন্দু অগ্রসর হইয়া নিদ্রিত শিশু পুত্রটীকে বিপ্রদাসের পায়ের কাছে রক্ষা করিল, ও গলে বস্ত্র দিয়া প্রণাম করিতে গিয়া ভাসুরের পদতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

উৎকল-সাহিত্য

[শ্রীরমেশচন্দ্র দাস]

উৎকল-সাহিত্য,—ফাল্গুন, ১৩২৫।

"অভিভাষণ"—(উৎকল-সাহিত্য সমাজের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত) সভাপতি শ্রীআর্ত্তত্রাণ মিশ্র।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণের ভাষা বৈদিক। তাহা হইতে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের উৎপত্তি। পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ কর্ত্তৃক যে ভাষা ব্যাকরণ দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, এবং পরবর্ত্তী পণ্ডিতবর্গ যাহার সংস্কার করেন, তাহাই সংস্কৃত এবং অপর ভাষা প্রাকৃত নামে অভিহিত। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সাধারণের ভাষা 'গাথা' ছিল। ঐ প্রাচীন গাথা হইতে পালী, মাগধী ও অর্দ্ধ-মাগধী পরিপুষ্ট হইয়া প্রথম লিখিত ভাষার স্থান অধিকার করে। কিন্তু তৎসম্বন্ধে নানা মতভেদ রহিয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাকৃত-চন্দ্রিকাকার কৃষ্ণ পণ্ডিত মহারাষ্ট্রীয়, অবন্তী, সৌরসেনী প্রভৃতি যে ৩৪টা বিভিন্ন-দেশ প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন, 'উড্র' বা 'উৎকল' ভাষা তাহাদের অন্যতম। উৎকল ভাষা বৌদ্ধাবনতি ও হিন্দুর পুনরভ্যুদয় কালে সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ উৎকল ভাষায় সংস্কৃত শব্দ সংযুক্ত করিতে লাগিলেন এবং প্রাকৃত ভাব ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইল। বহু প্রাচীন সময় হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোকগণ উড়িষ্যায় স্থায়ী ভাবে বাস করায় উৎকল ভাষায় ভারতীয় অপরাপর ভাষার নিদর্শন রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন মুসলমান রাজত্বকালে আরবী ও পারসী শব্দ প্রচুর পরিমাণে এই ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজ রাজত্বের প্রাক্কালে পর্ত্তুগীজ, মগ, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি বৈদেশিকগণের নিত্য ব্যবহার্য্য কোন-কোনও শব্দ উৎকল ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত উৎকল ভাষায় কোনও পুস্তক রচিত হয় নাই। উৎকল-রাজ কপিলেন্দ্রদেবের সময়ে সারলা দাস তাঁহার মহাভারত রচনা করেন,—তিনিই উৎকলের আদি কবি। প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে বৈষ্ণবধর্ম্মের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক চৈতন্যদেব উড়িষ্যায় আগমন করেন। সুমধুর বৈষ্ণবধর্ম্ম নূতন বেশভূষায় মণ্ডিত হইয়া প্রচারিত হইলে 'দাস' আখ্যাধারী একশ্রেণীর বৈষ্ণব-কবি আবির্ভূত হন। তাঁহাদের মধ্যে অচ্যুত, অনন্ত, যশোবন্ত, বলরাম ও জগন্নাথ—এই পাঁচজন 'পঞ্চসখা' নামে খ্যাত। তাঁহারা উৎকল ভাষায় নানা ছন্দে কবিতায় গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরায় বহু পুস্তক রচিত হয়। প্রাচীন উৎকল সাহিত্য প্রভূত পরিমাণে বৈষ্ণব-কবিগণের নিকট ঋণী।

উড়িষ্যার এক-এক কবি নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অচ্যুতানন্দ ৩৬ সংহিতা, ৭৮ গীতা, ২৭ বংশানু, ১২ উপবংশানু, ১০০ ভবিষ্য এবং পদ-পদাবলী সহিত একলক্ষ কবিতা রচনা করেন। ইহা ভিন্ন সপ্তকাণ্ড বিশিষ্ট হরিবংশ নামক সুবৃহৎ পুস্তক তাঁহারই রচিত। ইঁহার সমসাময়িক বলরাম দাস রামায়ণ, বহু সংখ্যক গীতা ও পুরাণ রচনা করেন। জগন্নাথ দাসের শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুস্তকের পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্তকবি দীন কৃষ্ণদাস তাঁহার রস-বিনোদ গ্রন্থে তল্লিখিত অন্য দ্বাদশখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকুলচন্দ্র উপেন্দ্রভঞ্জ ৫২ খানি পুস্তক রচনা করেন। শব্দ বৈভব-পূর্ণ অর্থপ্রকাশক পদবিন্যাস, সালঙ্কার অর্থযোজনা প্রভৃতি ভাষার নিত্য-সম্পদ উপেন্দ্রভঞ্জের রচনায় পরিলক্ষিত হয়। তৎপরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবি বলদেব ও অভিমন্যু স্ব-স্ব কবিতায় যে সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। প্রাচীন উৎকল সাহিত্য ভাণ্ডারে ইতিহাস, পুরাণ, নীতি, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, গণিত, কাব্য, চম্পূ, সঙ্গীত ও কোষ বিষয়ে নানা গ্রন্থ বিদ্যমান; কিন্তু দেশবাসীর অনুসন্ধিৎসার অভাবে এই বিরাট সাহিত্য লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া রহিয়াছে।

প্রাচীন উৎকল সাহিত্যের অধিকাংশ কবিতায় রচিত। ব্রতকথা, চিকিৎসা এবং গণিত সম্বন্ধীয় কতক পুস্তক গদ্যে লিখিত। মাদলা পাঁজি, 'চকড়া' পুস্তক এবং মন্দিরাদিতে উৎকীর্ণ আদেশাবলীও প্রাচীন গদ্যের নিদর্শন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাব, মিশনরীগণের আগ্রহ, ও দেশীয় প্রতিভার স্ফূর্ত্তির সহিত গদ্য-সাহিত্য নব রচনা গৌরবে উন্নত, ভাব-প্রবাহে সমৃদ্ধ এবং বিবিধ বিষয়ে পরিপুষ্ট হইতেছে।

আধুনিক কবিগুরু স্বর্গীয় রাধানাথ ও মধুসূদন উৎকল সাহিত্যে নব-যুগের প্রবর্ত্তক। উভয়েই ইংরেজী ও সংস্কৃত অবলম্বনে উৎকল সাহিত্যকে ভাব ও শব্দ সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়া গিয়াছেন। উপন্যাস ক্ষেত্রে বর্ত্তমান বৃদ্ধ কবি ফকিরমোহনের কৃতিত্ব অতুলনীয়। শ্রদ্ধেয় রামশঙ্কর উড়িয়া নাটক রচনা ও নাট্য-প্রবর্ত্তনের পথ-প্রদর্শক। চিকিটীর অধীশ্বর রাধামোহন রাজেন্দ্রদেব এ বিষয়ে যেরূপ উত্তরোত্তর ঔৎকর্ষ্য লাভ করিতেছেন, তাহা উৎকল-সাহিত্যের গৌরবের বিষয়। বামুণ্ডাধিপতি স্বর্গীয় বাসুদেব সুচলদেব ও তদীয় উপযুক্ত পুত্র রাজা সচ্চিদানন্দদেব মাতৃভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্র রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

উড়িয়া ভাষায় কতিপয় ব্যাকরণ প্রকাশিত হইলেও, প্রকৃত ব্যাকরণ-পদবাচ্য পূর্ণাবয়ব গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। আশানুরূপ কোষ গ্রন্থ একখানিও দেখা যাইতেছে না। প্রতিবেশী সাহিত্যের তুলনায় তাহার অভাব বিশেষ রূপে অনুভূত হইতেছে। বিজ্ঞমণ্ডলীর দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বর্ত্তমান যুগে প্রত্নতত্ত্ব দ্বারা সাহিত্য ও ইতিহাসের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। আমাদের উড়িষ্যায় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান কার্য্য অচিরে আরম্ভ হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'দেশের অনেক

প্রাচীন লিপি এবং পুঁথি দিন দিন লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহার শীঘ্র উদ্ধার না হইলে, দেশের ঐতিহাসিক উপাদান ক্রমশঃ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। বিভিন্ন ভাষা-নিবদ্ধ উন্নত সাহিত্যের অনুবাদ ভাষার পুষ্টি-সাধনের প্রধান উপায়। বিশেষতঃ আমাদের প্রাচীন দর্শনাদির গদ্যানুবাদ আবশ্যক। আধুনিক সাহিত্য-গঠনের প্রধান সহায় সাময়িক পত্রিকাদির যথোচিত উন্নতি ও প্রচার বাঞ্ছনীয়। পরিশেষে বর্ত্তমান উৎকল সাহিত্যানুরাগী লেখকবৃন্দের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা মাতৃভাষা গৌরবান্বিত হইয়া উৎকলের মুখ উজ্জ্বল করুক।

মুকুর—ফাল্গুন, ১৩২৫

১। "অমরাবতী কটক ও বিনায়ক শৈল" - লেখক - শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সাহু বি-এ।

'দর্পণ' কটকের অন্যতম প্রাচীন জমিদারী। ইহার পূর্ব্বাধিকারীরা পুরী গজপতি রাজ্যের দর্পণ ধারণ বা সংগ্রহ করিতেন বলিয়া, কিংবা কাহার-কাহারও মতে ইঁহার যশোরাশি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হেতু উক্ত নামের উৎপত্তি। এই জমিদারীর পরিমাণ প্রায় একশত বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে মধুপুর, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী ও ব্রাহ্মণী নদী এবং পশ্চিমে করদ রাজ্য ঢেঙ্কানাল। অমরাবতী কটক ও বিনায়ক শৈল এই দর্পণ রাজ্যে অবস্থিত।

অমরাবতী কটক ছাড়িয়া গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের সন্নিকটবর্ত্তী দুর্গ। আকার প্রায় সমচতুরস্র। প্রত্যেক পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ৫০০।৬০০ গজ এবং ৩.৪ গজ প্রশস্ত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। পাহাড়ের সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহার অবস্থান সুদৃঢ় ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার অবস্থা শোচনীয়। দুর্গমধ্যে হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। মন্দিরের 'বেড়া' খনন করিয়া অনেকগুলি সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে; এবং মন্দিরমধ্য হইতে দেবরাজ ইন্দ্র ও তৎপত্নী শচীদেবীর মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। এই দুর্গের ভিতরে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু নাই; কিন্তু অনতিদূরে দক্ষিণে পুষ্করিণীমধ্যবর্ত্তী দ্বারশূন্য মন্দির এক সকরুণ কাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

বিনায়ক শৈল চতুর্দ্দিকে আপনার ভীম প্রশান্ত মূর্ত্তি বিস্তার করিয়া উন্নত অভ্রভেদী শিখরসহ সদর্পে দণ্ডায়মান। মহাবিনায়ক বা গণেশ-ক্ষেত্র এই বিনায়ক শৈলে অবস্থিত। এই তীর্থ উৎকলের পঞ্চ প্রধান তীর্থের অন্যতম। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—গণেশ, ভাস্কর, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা। পাঁচটী দেবমূর্ত্তি একই প্রস্তরে খোদিত। বিনায়ক শৈলের মধ্যভাগে এক ক্ষুদ্র সমতল ক্ষেত্রে এই তীর্থ অবস্থিত। গ্রীষ্ম-কালেও জলবায়ু সমশীতোষ্ণ। চতুর্দ্দিকে রোপিত নানা জাতীয় বৃক্ষশ্রেণী মন্দিরের শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে। বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রস্ফুটিত চম্পকরাশির সৌরভে স্থানটী আমোদিত হয়। আর একদিকে একটী ক্ষীণা নির্ঝরিণী গিরিপ্রদেশ ভেদ করিয়া কলকল নাদে এক-খণ্ড মূর্ত্তির মুখমধ্য দিয়া জলকুণ্ডে পতিত হইতেছে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল ইহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার প্রকৃষ্ট সময়। ভিন্ন-ভিন্ন পর্ব্ব দিবসে এখানে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

২। "প্রাচীন উৎকল" (গৃহ নির্ম্মাণ প্রথা)—লেখক—শ্রীজগবন্ধু সিংহ।

'শিল্পশাস্ত্র' নামক একখানি প্রাচীন তালপত্র পুঁথি জনৈক সূত্রধরের গৃহ হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে রচয়িতার নাম বা রচনাকালের উল্লেখ নাই। তন্মধ্যে কয়েকটী বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইল।

(ক) ভূমি নির্ব্বাচন—সুগন্ধ ও বৃক্ষরাজি-শোভিত ভূমিই গৃহ-নির্ম্মাণের উপযোগী ও শুভপ্রদ। ভূমি চারি প্রকার:—

ব্রাহ্মণ—শুক্লবর্ণ, কষায় ও অশ্বগন্ধ।
ক্ষত্রিয়—রক্তবর্ণ, অম্ল ও রক্তগন্ধ।
বৈশ্য—পীতবর্ণ, তিক্ত ও ক্ষারগন্ধ।
শূদ্র—কৃষ্ণবর্ণ, মধু ও বিষ্ঠাগন্ধ।

ব্রাহ্মণাদি মৃত্তিকা ভেদে উপ্ত তিল হইতে ক্রমে ৩, ৫, ৬ ও ৭ দিনে অঙ্কুর হইয়া থাকে। স্বজাতি কিংবা তন্নিম্ন শ্রেণীর ভূমিতে বাস করা উচিত। ভূমি বর্ণে হীন এবং গৃহস্থ বর্ণে শ্রেষ্ঠ হইলে 'ধন-জন-গোপ-লক্ষ্মী' বৃদ্ধি পায়।

(খ) ভূমির আকার—আয়ত, চতুরস্র, ক্ষত্রদ, ভদ্রাসন, চক্র, বিসমবাহু, ত্রিকোণ, শকটাকার, দণ্ড প্রণাম, সরাচি, বৃহন্মুখ, ব্যঞ্জন, কূর্ম্মপৃষ্ঠ, সূর্পা, চক্র ও ধনু।

(গ) "বন্ধ"—বাস্তুভূমির দৈর্ঘ্যকে গৃহের গর্ভ দ্বারা পূরণ করিয়া তাহাকে ৮ দ্বারা হরণ করিলে ১ হইতে ৮ (?) পর্য্যন্ত ভাগশেষ দ্বারা ক্রমে ধ্বজ, ধূম, সিংহ, শ্বান, বৃষ, খর, গজ ও ধ্বাঙ্ক্ষ বন্ধ নিরূপিত হয়। দেবালয় ধ্বজে, হোমশালা ধূমে, শয়ন সিংহে, কুটনশালা শ্বানে, গোশালা বৃষে, অশ্বশালা খরে, ভাণ্ডার গজে, ও শস্যগৃহ ধ্বাঙ্ক্ষে নির্ম্মাণ করা উচিত।

(ঘ) "শুভ দেওয়া" বা গৃহারম্ভ জন্য প্রথম মৃত্তিকা-খনন—বাস্তু ভূমি নাগ বা সর্পের শরীর বলিয়া কল্পিত। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিকে নাগের শির পূর্ব্বে, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘে দক্ষিণে, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখে পশ্চিমে, এবং জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণে উত্তরে থাকে। নাগ তিন দিক চাপিয়া বাম অঙ্গে শয়ন করে। শির, পৃষ্ঠ ও পুচ্ছ ত্যাগ করিয়া উদরের দিকে খনন করিবে। নাগের শরীর আবার শির, কর্ণ, উদরাদি ভেদে আট অংশে বিভক্ত। উদর সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। ভূমিতে শরণ পঞ্চক হইলে "শুভ দেওয়া" নিষিদ্ধ। উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ—এই পঞ্চ নক্ষত্রকে শরণ পঞ্চক কহে। চন্দ্র ধনুরাশি ত্যাগ করিয়া মকর ও কুম্ভে গমন করিলে শরণ-পঞ্চক হইয়া থাকে।

(ঙ) গৃহ বৃদ্ধি—গৃহ নির্ম্মাণ শেষ হইবার পর পূর্ব্ব দিকে বৃদ্ধি

করিলে গৃহস্থ ধনেশ্বর—পশ্চিমে ধনহানি- দক্ষিণে মৃত্যু ও উত্তরে ধনবৃদ্ধি হয়।

(চ) বৃক্ষ রোপণ—গৃহের পশ্চিম দিকে বটবৃক্ষ থাকিলে নিরন্তর কলহ, উত্তরে উড়ম্বর থাকিলে মৃত্যু, ঈশান কোণে রক্ত পুষ্প শত্রুবৃদ্ধি করে, গৃহ মধ্যে মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, কামোদ ও মন্দার থাকিলে ধন-জন সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং বিল্ব ও দাড়িম্ব পরম শুভফল প্রদান করে।

(ছ) বিগ্রহ নির্ম্মাণ — শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির উচ্চতা ৪, ৮, ৯, ১১ কিংবা ১৩ অঙ্গুলি হইবে। ৩, ৫, ৬ কি ১২ অঙ্গুল করিবে না। ঐ পরিমাপের ঠাকুর যেখানে থাকেন সেখানে কলহ, রাজ্যে রাণীর বিনাশ, গৃহস্থের পুত্রশোক ও বানপ্রস্থ যোগ ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ ৪ ভাগ ও শ্রীরাধিকা ৩ ভাগ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ৮ হইতে ১০৮ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যত উচ্চ হইবেন, শ্রীরাধা তদপেক্ষা ২॥৴ অঙ্গুলি কম হইবেন।

(জ) তুলসী মন্দির—দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা ৪ হাত ৫ অঙ্গুলি। প্রথম ধাপ ১ হা ১ অ, ২য় ধাপ ২ হা ২ অ, ও ৩য় ধাপ ২০ অঙ্গুলি।

(ঝ) স্নান মণ্ডপ—দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা ৭ কাঠী, প্রস্থ ৬ কাঠী ও 'উজানী' ৩ কাঠী। প্রস্তর সংখ্যা ১৬৯২।

(ঞ) দোল মণ্ডপ—দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা ৮ কাঠী, প্রস্থ ৬ কাঠী, উপর মণ্ডপের উচ্চতা ৯ কাঠী, প্রস্তর সংখ্যা ৪০৩২১২।

(ট) যন্ত্রাদির পরিমাপ—কুন্দ—১ হা ১৪ অ, বাটালী—১৪, মুগুর—১৯ অ, বারসী—২৬॥ অ, (বাহির লম্ব), কুরুণ—২৫ অ।

পল্লী চিত্র

ব্রাহ্মণভোজন

[শ্রীজলধর সেন]

গ্রামখানির নাম রঘুনাথপুর। গ্রামে প্রায় দুইশত ঘর লোকের বাস; তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ ও সেকরাই অধিক; কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য জাতিও দুইচারি ঘর করিয়া আছে; মুসলমানের সংখ্যা অতি কম। এই গ্রামে নিতাই সেকরার বাস। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন নিতাইয়ের বয়স ৬০ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। নিতাই সোণারূপার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। শেষ অবস্থায় নিতাইয়ের কাজ বড় ভাল চলিত না, কারণ সে হাল ফ্যাসানের অলঙ্কার মোটেই প্রস্তুত করিতে জানিত না। সে সেকালের মেয়েদের পছন্দসই বাজু, বালা, কাঁকন, নথ—এই সব মোটামুটি প্রস্তুত করিতে জানিত। গ্রামের কেহ যদি নূতন রকমের কিছু প্রস্তুত করিবার জন্য ফরমাইস করিত, নিতাই একই জবাব দিত "তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন আর শিক্ষানবিশী করতে পারি না।" সুতরাং নিতাইয়ের দোকানের কাজ ক্রমেই মন্দা পড়িতে লাগিল। নিতাই কিন্তু তাহাতে দুঃখিত বা চিন্তিত নহে,—এখন তাহার দোকান না করিলেও চলে। রাধারাণীর ইচ্ছায় তাহার একমাত্র পুত্র বৃন্দাবন লেখাপড়া শিখিয়া সিরাজগঞ্জে পাটের আফিসে চাকরী করিতেছে; বেতন ও অন্যান্য উপায়ে বেশ দশটাকা রোজগার করে। বাড়ীতেও খাইবার লোক কম—নিতাই, বৃন্দাবনের স্ত্রী, আর বৃন্দাবনের একমাত্র কন্যা হরিপ্রিয়া। নিতাইয়ের স্ত্রী অনেক দিন পূর্ব্বে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন; নিতাই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া জঞ্জাল স্কন্ধে করিতে একেবারে নারাজ হইয়াছিল। পুত্র বেশ দশটাকা উপার্জ্জন করিতেছে, নিতাই কিন্তু সে জন্য দোকানখানি তুলিয়া দেয় নাই। গ্রামের কতজন কতবার বলিয়াছে "সেকরার পো, এখন বয়সও হইয়াছে, আর ছেলেও বিলক্ষণ দশটাকা আনিতেছে, এখন দোকান তুলিয়া দিয়া খাও দাও, আর হরিনাম কর।" নিতাই উত্তর দিত "অমন কথা বলবেন না; এই দোকানই আমার লক্ষ্মী। এতকাল এই কাজ করে বুড়ো হয়ে গেলাম, এখন কি আর হাত-পা কোলে ক'রে বসে থাকতে ভাল লাগে। ঐ দোকানটা আছে বলে দিন কাটে।" নিতাই দোকানে কাজ করে, আর নাতিনী হরিপ্রিয়াকে সন্ধ্যার পর হরিনাম শুনায়। বৃন্দাবন মধ্যে-মধ্যে বাড়ী আসিয়া দুই চারিদিন থাকিয়া আবার কর্ম্মস্থলে চলিয়া যায়। বাসায় পরিবার লইয়া গেলে বুড়া বাপকে কে দেখিবে, তাহার ভাত-জল কে দিবে, এই ভাবিয়া সে কোন দিন কর্ম্মস্থলে পরিবার লইয়া যাইবার কথা মনেও তুলিত না।

৫ই ফাল্গুন হরিপ্রিয়ার শুভবিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। বৃন্দাবন পনর দিনের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছে। একমাত্র

কন্যার বিবাহে বৃন্দাবন একটু সমারোহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বিবাহের তিনদিন পূর্ব্বে গ্রামের শীতল ভট্টাচার্য্য নিতাইয়ের দোকানে উপস্থিত হইলেন। বিবাহের কি আয়োজন-উদ্যোগ হইতেছে, সে সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিতাইকে বলিলেন "দেখ নিতাই-দা, বৃন্দাবনের ঐ একটি মেয়ে, আর তার বিবাহও বড় ঘরেই দিচ্ছ। সুতরাং খরচপত্রও একটু করতেই হবে। আমি বলি কি, এই উপলক্ষে গ্রামের ব্রাহ্মণবর্গের আহ্বান করা তোমার উচিত; তাঁদের পদধূলি লওয়া কর্ত্তব্য। এখন তোমার অবস্থা ভাল হয়েছে, এখন তোমার এ কাজটা করা খুবই উচিত। বৃন্দাবন যথেষ্ট উপার্জ্জন করে বলেই কথাটা বল্‌ছি, এতদিন ত বলি নাই।" নিতাই বলিল "শীতল, আমার কি সে সৌভাগ্য হবে যে, গ্রামের ব্রাহ্মণেরা আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবেন। গাঁয়ে ত আমাদের স্বজাতি অনেকেই আছে, দু-দশ জনের অবস্থাও ভাল। তারা যা ব্যাপারে কোন দিন সাহস করে নাই, আমার পক্ষে কি সে সাহস করা ঠিক হবে?" শীতল ভট্টাচার্য্য বলিলেন "তারা কি আর তোমার বৃন্দাবনের মত মাসে তিনচার শ' টাকা রোজগার করে যে, সাহস করবে।"

নিতাই বলিল "আমার ত সাহসে কুলায় না শীতল। শেষে কি সব নষ্ট হবে। না—ও কথা ভেবেও কাজ নেই। আমি গ্রামের জ্ঞাতিকুটুম্ব আর বরযাত্রী নিয়েই শুভকাজ শেষ করব। আর তুমি যে ব্রাহ্মণভোজনের কথা বল্‌ছ, তাতে মবলগ্ টাকার দরকার। বৃন্দাবনের কি সে সাধ্য আছে?" বৃন্দাবন সেখানেই উপস্থিত ছিল। সে বলিল "শীতলকাকা, টাকার জন্য আমি ভাবি নে, আপনার আশীর্ব্বাদে এত যদি করতে পারি, তা না হয় আর দুশো টাকা বেশীই খরচ হোলো। বাবার যদি ইচ্ছা হয়, আর আপনারা যদি ব্যবস্থা করতে পারেন, তা হ'লে আমার অমত নেই।" শীতল ভট্টাচার্য্য মাথা নাড়িয়া প্রফুল্ল মনে বলিল "শুন্‌লে নিতাই-দা। হাঁ, ছেলে বটে তোমার বৃন্দাবন। আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবী হয়ে থাক। এই ত ছেলের মত কথা।" নিতাই বলিল "তুমি যাই বল শীতল, আমার কিন্তু সাহস হয় না, ব্রাহ্মণ নারায়ণ, কোন দিন আমরা কেউ আমাদের বাড়ীতে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলো নিই নেই; কিসে কি হবে, শেষে কি অভিশাপে মারা যাব?" শীতল ভট্টাচার্য্য বলিল "তোমার কোন ভয় নেই নিতাই-দা, আমরা সব করে-কর্ম্মে নেব। বুঝতে পারছ না, এতে তোমার ছেলের মুখ উজ্জ্বল হবে, দশ গ্রামের লোক বল্‌বে, হাঁ, বৃন্দাবন বাহাদুর ছেলে বটে; সেকরার মধ্যে কেউ যা করতে পারে নেই, বৃন্দাবন তাই করেছে। মা লক্ষ্মী তোমাদের উপর কৃপা করেছেন, এখন এই ভাবেই ত অর্থের সদ্ব্যয় করতে হয়, কি বল বৃন্দাবন?" নিতাই বলিল "কথাটা যা বল্‌ছ শীতল, তা খুবই ঠিক। তবে কি জান, এ রকম একটা কাজ করতে দশ জ্ঞাতির সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়, আগে তাদের অনুমতি নিতে হয়। তার পর পুরুত-মশাই আছেন, তাঁরও মত জিজ্ঞাসা করতে হয়। ব্রাহ্মণভোজন করান—এ ত একটা যেমন-তেমন কাজ নয়।" শীতল বলিলেন "আরে হরিহরের আবার একটা মত কি? আমরা গ্রামের ব্রাহ্মণের মাথারা যা করব, হরিহর কি তাতে অমত করতে পারবে? আর করবেই বা কেন? এতে তারও যে সম্মান বাড়বে। আর ভয়ের কথা যা বল্‌ছ নিতাই-দা, তোমার কোন ভয় নেই; এই শীতল ভট্টাচার্য্যের হাত দিয়ে এ গ্রামের ত কথাই নেই, এ অঞ্চলের দশ গ্রামের, আরও না হয় ত শতাবধি বড়-বড় ব্যাপার হয়ে গেছে। শোন গিয়ে দেখি, কোন কাজে কি অসৌষ্ঠব হয়েছে? তবে তোমার স্বজাতিদের একটা সংবাদ দেওয়া খুব উচিত। আর ত সময় নেই; তুমি আজই সে কাজটা সেরে সন্ধ্যার সময় আমার ওখানে যেও। তোমাকে সঙ্গে করে হরিনাথ কাকার ওখানে যাওয়া যাবে, তিনিই হচ্চেন গ্রামের প্রধান। সেখানে গেলেই পরেশ মুখুর্য্যে, ও-পাড়ার নিধিরাম গাঙ্গুলী প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই দেখা হবে। সন্ধ্যার পর হরিনাথ কাকার ওখানে পাশার আড্ডা পড়ে কি না। তা হলে, আমি এখন আসি।" বলিয়া শীতল ভট্টাচার্য্য গাত্রোত্থান করিতে গেলেন। তখন বৃন্দাবন বাধা দিয়া বলিল "কাকা-ঠাকুর, একটু বসুন। আসল কথাটাই ত শোনা হোলো না। এই ব্রাহ্মণভোজনে কি আন্দাজ ব্যয় হবে, কি কি করতে হবে, সেটাও ত বুঝে দেখতে হবে।" শীতল হাসিয়া বলিলেন "দেখ্‌লে নিতাই-দা, বৃন্দাবন কেমন বুদ্ধিমান ছেলে। এই ত চাই। তা দেখ, যা যা করতে হবে, সে

সব তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই আজ রাত্রে ত হরিনাথ কাকার ওখানে আমরা যাচ্ছি; সেখানে সমস্ত কথা ঠিক ক'রে ফেল্‌বার পর, কা'ল সকালেই নিতাই-দাকে এই গ্রামের সমস্ত বাড়ীতে অনুমতি গ্রহণ করতে যেতে হবে। তার পর—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বৃন্দাবন বলিল "বাবা বুড়ো-মানুষ, শরীরও ভাল নয়। তিনি কি এ-পাড়া ও পাড়া সব বাড়ী যেতে পারবেন। আমি গেলে হয় না?" শীতল বলিলেন "আরে সর্ব্বনাশ! তা কি হয়! নিতাই-দা না গেলে কি ব্রাহ্মণেরা অনুমতি দেবেন? তোমার বাবাকেই সব বাড়ীতে অনুমতি নিতে যেতে হবে। অনুমতি হয়ে গেলে নিমন্ত্রণ করতে তুমি গেলেও হবে, অবশ্য সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ নিয়ে যেতে হবে। সে হয় হরিহর যাবে, আর না হয় আমিই যাব। তার পর শোন, অনুমতি সকলেই দেবেন, কেউ কথাটী বল্‌বেন না। যে কাজে হরিনাথ কাকা আছেন, পরেশ মুখুয্যে, নিধি গাঙ্গুলী আছেন, আমি অধ্যক্ষ আছি, সে কাজে এ গ্রামে কেউ কথা বল্‌তে সাহসই পাবে না;—এই যে হরিহর। ওহে তোমারই কথা হচ্ছিল। এসেছ, বেশ করেছ। শোন, আমি নিতাই-দাকে বল্‌ছি যে, এই ত একটি মাত্র পৌত্রী। এর শুভকর্ম্মে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণের পদধূলি নিতে হবে। তুমি কি বল? তুমি হচ্ছ এদের পুরোহিত, তোমাকে সকলের আগে জিজ্ঞাসা করতে হয়।"

হরিহর ভট্টাচার্য্য সহর্ষে বলিলেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব! এই ত চাই! এতে কার আর অমত হতে পারে। আর আপনি যখন প্রস্তাব করেছেন, তখন কার্য্য যে সুসম্পন্ন হবে, তত্র সন্দেহ নাস্তি!" শীতল সগর্ব্বে বলিলেন, "শুন্‌লে নিতাই-দা, শুন্‌ছো বৃন্দাবন, তোমাদের পুরোহিত কি বল্‌ছে। যাক্, পুরোহিতের ত মত হ'ল; এখন আসল কথা ঠিক করা যাক্। এই দেখ নিতাই-দা, তোমাদের জেতের মধ্যেই এই তুমিই প্রথম গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণের পদধূলি নিচ্ছ; সুতরাং ব্রাহ্মণদের যথাযোগ্য প্রণামী দিতে হবে।" বৃন্দাবন বলিল, "যথাযোগ্যটা কি, তাও খুলে বলুন।" শীতল বলিলেন, "হাঁ হে হরিহর, তুমিই বল না, ব্রাহ্মণদের প্রণামী কত ক'রে দেওয়া কর্ত্তব্য।" হরিহর বলিলেন, "এ সম্বন্ধে কথা বলা বড় শক্ত। প্রণামীটা কৃতির শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করে। যা উপযুক্ত হয়, আপনারা তাই ঠিক করে দেবেন; তার জন্যে আট্‌কাবে না।" বৃন্দাবন বলিল, "কথাটা পূর্ব্বেই জানা দরকার। বিশেষ আমার অবস্থা ত সবই জানেন,—এই একলা মানুষ; খা সামান্য দুই পয়সা আনি; এইটা বিবেচনা করে মোটামুটি একটা বুঝতে দেন।" শীতল বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আরও দশজনের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। কি বল, হরিহর? তা, আমার বোধ হয়, দশজনেও বাড়ী-প্রতি দুইটাকা হিসাবে প্রণামীর বেশী বল্‌বেন না। তা হলে ধর, এই আমাদের গ্রামে আমরা হচ্চি পুরো ৩৭ ঘর ব্রাহ্মণ, তা ছাড়া আধঘর আছে।" বৃন্দাবন বলিল, "পুরো ঘর আর আধঘর কথাটা ত বুঝতে পারলাম না।" শীতল হাসিয়া বলিলেন, "এই বুঝলে না বৃন্দাবনচন্দ্র! এই পুরো ঘর হচ্চি আমরা, হরিহরেরা—এই রকম সবাই; আর আধ-ঘর হচ্চে, যারা ভাগ্‌নে, কি দৌহিত্র, কি জামাই—যারা এসে আমাদের সঙ্গে বাস করছে। আমাদের গ্রামে, এই সে-দিনই হিসাব করে দেখা হয়েছে—এই আধঘর হচ্চে ৭। তা হলেই হোলো সাড়ে চল্লিশ ঘর। এখন ধর, দুটাকা হিসেবে এই সাড়ে চল্লিশ ঘরে হোল ৮১ টাকা। কেমন? আচ্ছা, ও ধর মোটামুটি একশই। তার পর ধর, ভোজন-দক্ষিণা, প্রণামী দিলেও ভোজন-দক্ষিণা দিতেই হবে। তা, আমরা ত সর্ব্বদাই এই সব কাজ করেছি; দেখেছি এই ছোট-বড় দিয়ে খুব যদি বেশী হয়, তা হোলেও ৬০ জনের বেশী ব্রাহ্মণ হবে না। তা ভোজন-দক্ষিণা একেবারে এক হারেই দিতে হবে। আমার মনে হয় আট আনা করে দিলেই বেশ হবে। তা হ'লেই ষাটজনের ভোজন-দক্ষিণা গোলো ৩০৲। এ ছাড়া অনাহুত রবাহুত ব্রাহ্মণই কি আর দু-দশ জন হবে না? ও দক্ষিণা হিসেবে ধর ৫০৲ টাকা। এই তোমার সর্ব্ব-সাকুল্যে প্রণামী-দক্ষিণাতে দেড়শ টাকা লাগবে। তার বেশী কিছুতেই যাবে না। তার পর ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা;—সে কথা আর বল্‌তে হবে কেন? তোমরা ব্রাহ্মণভোজন করাবে; যাতে ব্রাহ্মণেরা আহার করে পরিতোষ লাভ করেন, তার মত সবই করতে হবে। সে আর আমি কি বল্‌ব। কি বল হরিহর?" বৃন্দাবন বলিল, "তা হলে আমার যা আয়োজন হচ্ছিল, তার উপর আর একশ' লোকের আয়োজন করলেই

হবে।” শীতল বলিলেন, “ভেসে যাবে হে বৃন্দাবন, ভেসে যাবে। বেশী কিছু আড়ম্বর কোরো না। এই ধর—লুচী, একটা বেগুন-ভাজা, একটা তরকারী, আর একটা আলুর দম করলে ভালই হয়, বুটের দাল, একটা কি দুটো চাট্‌নী; ও সব পাঁপর-টাপর কাজ নেই হে। হালুয়াটা একেবারে বাজেখরচ। কি বল হরিহর? এ-দিকে এই; আর ও-দিকে ধর, ভাল দধি, ক্ষীর, মোণ্ডা, রসগোল্লা, বঁদে, আর যদি তার উপর একখানা করে জিলিপি দিতে পার—ব্যস্—খুব হয়ে গেল। কি বল হরিহর?” বৃন্দাবন বলিল, “আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি স্বজাতি ও বরযাত্রীর জন্য ঐ রকমই করব স্থির করেছিলাম, ঐ রসগোল্লাটাই অতিরিক্ত। তা হোক, এতই যদি হোলো—তা হলে না হয় দু-মণ রসগোল্লাই করা যাবে। তা হলে ধরুন যে, ব্রাহ্মণভোজনে এই পাতা পড়তা একটাকা; তাতে বাড়লো একশ টাকা; আর প্রণামী দক্ষিণাতে দেড়শ। এই আড়াইশ টাকা ত। বাবার যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন এ আড়াইশ টাকা খরচ করতে আমি কাতর হব না।” শীতল বলিলেন, “তবে আর কি, সব ঠিক। নিতাই-দা, তুমি আজ বিকালেই তোমার স্বজাতিদের জিজ্ঞাসা করে, সন্ধ্যার সময় আমার ওখানে যেও, দুজনে মিলে হরিনাথ কাকার কাছে যাওয়া যাবে। হরিহর, তুমিও সন্ধ্যার পর একবার যেও না—এ ত তোমারই ক্রিয়া!” এই বলিয়া শীতল ভট্টাচার্য্য উঠিলেন, হরিহরও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

সেইদিন অপরাহ্ণেই নিতাই সেকরা স্বজাতির মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদের নিকট অনুমতি লইল; তাহারা সকলেই বিশেষ আনন্দের সহিত এ প্রস্তাব অনুমোদন করিল এবং নিজেরা উপস্থিত থাকিয়া যাহা প্রয়োজন সব যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। সন্ধ্যার সময় শীতল ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া নিতাই ও বৃন্দাবন হরিনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল। শীতল ইতঃপূর্ব্বেই অনেকের নিকট কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন; হরিনাথ চক্রবর্ত্তী ও গ্রামের অনেকেই এই ব্রাহ্মণ-ভোজনের কথা শুনিয়াছিলেন। সুতরাং নিতাই ও বৃন্দাবন উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের পদধূলি গ্রহণ করিবার পর সকলেই একবাক্যে এই শুভ-কার্য্যের সাফল্য কামনা করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, “নিতাই, অতি উত্তম সঙ্কল্প করেছ। আমরা সকলেই যাব এবং যাতে কাজ সুসম্পন্ন হয়, তা করব; তোমার কিছু ভাবতে হবে না। অন্য সব কথাও শীতলের কাছে শুনেছি, এঁরা সকলেও শুনেছেন। তাতেই বেশ হবে। আর যে কার্য্যে আমাদের শীতল বাবাজি অধ্যক্ষ, তার কি অসৌষ্ঠব হবার যো আছে। আমাদের এই তল্লাটে এ সব কাজে শীতলের কাছে কেউ এগুতে পারে না। বিবাহের দিন মধ্যাহ্ণেই ব্রাহ্মণ-ভোজন হওয়া কর্ত্তব্য। শুভ-কার্য্যের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ ভোজন অতি সুব্যবস্থা।” বৃন্দাবন বলিল, “আপনারা যদি অনুমতি করেন, তা’হলে ঐ দিন মধ্যাহ্ণেই আমাদের স্বজাতিরাও আপনাদের প্রসাদ পেতে পারেন। রাত্রি দশটায় বিবাহের লগ্ন। বিবাহ শেষ হতেই এগারটা বেজে যাবে; তার পর স্বজাতি ও বরযাত্রীর আহারে বড়ই বিলম্ব হয়ে যাবে; যাঁরা দয়া করে পায়ের ধূলো দেবেন, তাঁদেরও কষ্ট হবে। তাইতে আমরা ব্রাহ্মণ-ভোজনের পরই স্ব-জাতি খাইয়ে দিতে চাই। তার পর বিবাহ শেষ হলে বরযাত্রীদের আহারের ব্যবস্থা করলে কোন অসুবিধাই হয় না।” চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, “এ ব্যবস্থা অতি উত্তম। তাই হোক। একটার মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজন যদি শেষ হয়ে যায়, তা হলে চারটার মধ্যেই তোমাদের স্বজাতি-ভোজন হয়ে যাবে। তার পর যথেষ্ট সময় থাক্‌বে; তোমরা এক রকম নিশ্চিন্ত হয়েই বিবাহের আয়োজন করতে পারবে। সব দিকেই ভাল হবে। মাঝে ত আর দুটা দিন আছে। নিতাই, তুমি কাল সকালেই সকলের দ্বারস্থ হয়ে অনুমতি নিয়ে আস্‌বে; তার পরদিন অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বদিন বিকালে নিমন্ত্রণ সারবে। আর যা-যা করতে হয়, আমরা দুবেলা উপস্থিত হয়ে সব ঠিক করে দেব। শীতল যখন আছে, তখন আর কোন ভয় নেই। এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের সকলের পক্ষ থেকে আমিই অনুমতি দিচ্ছি, তুমি আয়োজন করতে পার। শীতল, তুমিই যখন বেচারাকে এই কার্য্যে নামালে, তখন কাল তুমিই ওর সঙ্গে গিয়ে অনুমতিটা শেষ করে দিও।” নিতাই ও বৃন্দাবন তখন সকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

বৃন্দাবন আয়োজনের কোন ত্রুটিই করিল না।

বরের বাড়ী কাঞ্চনতলা, রঘুনাথপুর হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে। ব্যবস্থা হইয়াছিল, বরপক্ষ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যাত্রা করিয়া রাত্রি আটটার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে। বিবাহের দিবস প্রাতঃকাল হইতেই রন্ধন আরম্ভ হইল। এ কয়-দিন শীতল ভট্টাচার্য্যের আর অবকাশ ছিল না। তিনি দিন-রাত নিতায়ের বাড়ীতে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সমস্ত রাত ভিয়ানের স্থানে স্বয়ং মোতায়েন। ভোর হইতে না হইতেই পাচক-ব্রাহ্মণদিগকে স্নান করাইয়া রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বেলা বারটার মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত হইয়া গেল; একশত লোকের উপযুক্ত লুচী ভাজাও হইয়া গেল। শীতল হুকুম দিলেন "বাকি ময়দা এখন থাক্,—যেই ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হবে অমনি তিন খানি খোলা তুলে দিলেই হবে।"

বেলা দশটার পরই ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। নিতাইয়ের আত্মীয়-স্বজন সকলেই শশব্যস্ত। বেলা বারটা বাজিয়া গেল। নিতাইয়ের স্বজাতিগণ দলে-দলে আসিতে লাগিল; ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও দুইচারিজন আসিলেন; কিন্তু আর সকলের দেখা নাই। শীতল ভট্টাচার্য্য পুনরায় লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সে লোক যখন ফিরিয়া আসিল, তখন পনর কুড়ি জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছেন! বেলা দুইটার পর একে-একে ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা শুভাগমন করিতে লাগিলেন। এদিকে নিতাইয়ের স্বজাতিগণ সকলেই উপস্থিত। একটার মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজন শেষ হইবে; তাহার পরেই স্বজাতিগণ আহার করিবেন। বেলা দুইটা বাজিয়া গেল,—তখনও অনেক বাড়ী হইতেই কেহ আসেন নাই। হরিনাথ বাবু এই সময় আসিলেন। তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আদেশে, যে-যে বাড়ী হইতে কেহই তখন পর্য্যন্ত আসেন নাই, সেই-সেই বাড়ীতে পুনরায় লোক প্রেরিত হইল; গ্রামের সকল ব্রাহ্মণ উপস্থিত না হইলে ত কেহই ভোজনে বসিতে পারেন না।

ইনি আসিলেন ত উঁহার সাক্ষাৎ নাই। তিনটাও বাজিয়া গেল। তখন শীতল ভট্টাচার্য্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; কখন বা ব্রাহ্মণ-ভোজন হইবে, আর কখনই বা নিতাইয়ের স্বজাতিগণ আহার করিবেন; এ দিকে ফাল্গুন মাসের বেলাও অবসান হইবার বিলম্ব নাই; রাত্রি দশটায় বিবাহ। বেলা এগারটা হইতে—নিতাইয়ের স্বজাতীয় সকলে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে সঙ্গে লইয়া বসিয়া আছে; সকলেই ক্ষুধায় কাতর। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভোজন না হইলে ত কোন উপায়ই হয় না। অবশেষে প্রায় চারিটার সময় দেখা গেল যে, এক হরিশ মুখুয্যে ব্যতীত আর সকলেই আসিয়াছেন। তখন আবার মুখুয্যে-বাড়ী লোক ছুটিল। হরিনাথ বাবু বলিয়া দিলেন যে, হরিশ যদি না আসিতে পারেন, বা তাঁহার আগমনের বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে তিনি অনুমতি প্রদান করিলেই আর সকল ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন। বেলা সাড়ে এগারটার সময় ভোজন স্থানে পাতা, জল, আসন প্রভৃতি সজ্জিত হইয়াছিল; আর এখন বেলা চারিটা। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ বা বসিয়া তামাক খাইতেছেন, কেহ বা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন; দুই চারিজন বা এদিক-ওদিক করিতেছেন। নিতাইয়ের স্বজাতিগণ মহা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ নারায়ণ; কিছু বলিতে কাহারও সাহস হইতেছে না। দুই চারিজন বাড়ী ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ আরম্ভ করিয়াছেন।

স্বর্ণকার দলের মধ্যে সতীশ নামে একটী যুবক ছিল। সে কলেজে পড়ে। সে এতক্ষণও চুপ করিয়া ছিল। সেই বেলা এগারটার সময় অনাহারে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছে, আর এখন বেলা অপরাহ্ণ—চারিটা বাজিয়া গেল; এখনও ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিতে বসিলেন না। তাঁহাদের ভোজন শেষ হইবে; তাহার পরে আর সকলের ভোজন। সতীশ আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না। ইংরাজী পড়িলেই কেমন একটু রক্ত গরম হয়; বিশেষ কলেজের ছেলেরা এ সব সহ্য করিতে সহজে পারে না; তার পর ক্ষুধার জ্বালায় সকলে অস্থির। সতীশ একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "এ কি অত্যাচার, বামুন বলে কি মাথা কিনে রেখেছেন। এখন ওঁদের ভোজন হবে, তার পর এ শালাদের অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে।" নিকটেই তিন চারিজন ব্রাহ্মণ যুবক দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা সতীশের কথা শুনিয়া একেবারে দুর্ব্বাসার মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহারা গর্জ্জিয়া উঠিল "কি, এতবড় কথা; ব্রাহ্মণের অপমান! ব্রাহ্মণকে শালা বলে' গাল দেওয়া,—এত্তা বড়ি বাৎ। খাব না কেউ এ বাড়ীতে!

বেরো সব এখনই।" গোলযোগ ও চীৎকার শুনিয়া অনেকেই সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; গোলমাল্ আরও বাড়িয়া উঠিল। ব্রাহ্মণেরা যখন শুনিলেন যে কে একজন তাহাদিগকে 'শালা' বলিয়াছে, তখন তাঁহারা সকলেই ক্ষেপিয়া উঠিলেন "কি, ব্রাহ্মণের অপমান! এ বাড়ীতে আর দাঁড়াতে নেই। আর কোন্ ব্যাটা এমন কথা বলেছে তার শির লাও।" কে যে কথাটা বলিয়াছে এবং ঠিক কি কথা বলিয়াছে, তাহা তখন সেই গোলমালে কোথায় ভাসিয়া গেল; শুধু এইটুকু পাওয়া গেল যে, কে একজন সেকরা ব্রাহ্মণগণকে শালা বলিয়া গালি দিয়াছে। তখন মহা বিভ্রাট! সকলেই বলে, "কে এমন কথা বল্‌লে, কে এ সর্ব্বনাশ করলে।" সতীশ দেখিল, কথাটা একেবারে উল্‌টা হইয়া গিয়া মহাবিভ্রাট বাধিয়া উঠিল। অন্য কেহ হইলে এ সময় হয় ত আত্মগোপন করিত; কিন্তু সতীশ কলেজে-পড়া ছেলে। সে সত্য কথা বলিতে ভয় পাইল না। সে বলিয়া উঠিল, "আমিই বলেছি, কিন্তু অমন কথা বলিনি; আমি বলেছি 'আমরা শালাদের অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে।' ঠাকুরদের আমি শালা বলি নাই।" তাতে কি আর ব্রহ্মরোষ নির্ব্বাপিত হয়। দুই-চারিজন ব্রাহ্মণের মুখ হইতে তখন যে ভাষা বাহির হইল, তাহা অন্য ভাষা হইতে পারে, কিন্তু দেবভাষা নহে। সেকরাদিগের যাঁরা মুরুব্বী ছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সতীশের প্রথম কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন "সতীশ কোন অন্যায় কথা বলে নাই, ঠাকুরদেরও কোন অপমান করে নাই।" কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত ব্রাহ্মণদের তর্জ্জন-গর্জ্জনে, গালাগালিতে সে সব ডুবিয়া গেল। তখন সেকরার দলও হুঙ্কার দিয়া উঠিল—"কি, বিনা দোষে আমাদের অপমান! দেখি কত ধানে কত চা'ল।" এই বলিয়া সেকরার দল তখন ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া ঠাকুরদের ভোজনের অনুরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য দল বাঁধিয়া দাঁড়াইল। সেকরাদের দল বড় কম নয়—প্রায় দুইশত; আর ব্রাহ্মণেরা ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে লইয়া খুব বেশী হইলে পঞ্চাশ জন—আর তার মধ্যে অনেকেই মূর্ত্তিমান ম্যালেরিয়া। সেকরাদের ভীম মূর্ত্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা রণে ভঙ্গ দিলেন এবং অভিসম্পাৎ করিতে-করিতে বিবাহ-বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলেন; গ্রামের মুরুব্বী হরিনাথ বাবু ও শীতল ভট্টাচার্য্য কিছুতেই এই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে ফিরাইতে পারিলেন না। নিতাই ও বৃন্দাবন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। শুভকার্য্যে এ কি মহা বিঘ্ন! ব্রাহ্মণেরা অভুক্ত চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ ভোজন যখন হইল না, তখন সেকরারাই বা-সে বাড়ীতে পাত পাতিবে কি করিয়া। এ দিকে সন্ধ্যারও বিলম্ব নাই।

ব্রাহ্মণেরা চলিয়া গেলে সেকরাদিগের কমিটী বসিল। শেষে স্থির হইল যে, এখন স্বজাতিভোজন বন্ধ থাকুক; রাত্রিতে বিবাহ শেষ হইয়া গেলে, যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে। ব্রাহ্মণভোজন ত হইল না; কিন্তু আর এক বিপদ—পুরোহিত কোথায় পাওয়া যায়। নিতাইয়ের পুরোহিত হরিহর গ্রামেরই লোক। গ্রামের ব্রাহ্মণেরা যখন অপমান বোধ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন হরিহরকেও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইতে হইল, সে পৌরোহিত্য করিতে সাহসী হইল না। সকলে স্থির করিল, বরপক্ষ উপস্থিত হইলে এই গোলযোগের কথা তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিয়া তাঁহাদের পুরোহিতের দ্বারাই শুভকর্ম্ম শেষ করা হইবে।

নিতাই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "বাবা বৃন্দাবন, তখনই বলেছিলাম—ব্রাহ্মণভোজন কাজ নেই; এখন দেখ ত, কি অপমানটাই হোলো।" বৃন্দাবন বলিল, "বাবা, আমরা ত কোন অপরাধ করি নাই। কে কি বলিল, না বলিল, তার সত্য-মিথ্যা বিচার না করে, যাঁরা এমন ক'রে সব পণ্ড ক'রে দিতে পারেন, তাঁরা——" নিতাই পুত্রের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "চুপ, চুপ বৃন্দাবন, অমন কথা বল্‌তে নেই—ব্রাহ্মণ নারায়ণ!"

সাময়িকী

বিগত ৩০ শে চৈত্র ও শুভ ১লা বৈশাখ, এই দুইদিনে ঢাকা নগরীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন অতি সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঢাকার সাহিত্য-পরিষদ্ ও সাহিত্য-সমাজের মতভেদের জন্য বড়দিনের সময় এবং তাহার পর ইষ্টারের সময়ও যখন অধিবেশনের কোনই ব্যবস্থা হইল না, তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম, এবার অর্থাৎ ১৩২৪ সালে আর সম্মিলনের অধিবেশন হইল না, হয় ত সম্মিলনের জীবনকাল শেষ হইয়া গেল। তাহার পর অকস্মাৎ ঢাকার সাহিত্য সেবকগণের মতভেদ অন্তর্হিত হইয়া গেল; ঢাকার উৎসাহী সাহিত্যিকগণ দশদিনের মধ্যে সমস্ত আয়োজন করিয়া ১৩২৪ সালের শেষদিনে সম্মিলনের অধিবেশন করিলেন। এত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হওয়ায় আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিবে; প্রবন্ধ হয় ত মোটেই পাওয়া যাইবে না; অনুষ্ঠানকারীদিগকে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িতে হইবে। কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে এবং অনুষ্ঠানকারী মহোদয়গণের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় সম্মিলনের কার্য্যে কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় নাই; ঢাকার সাহিত্যিকগণের পক্ষে ইহা কম প্রশংসার কথা নহে।

ঢাকা সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতিকে সভাপতি-নির্ব্বাচনে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহারা যাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তিনিই সময়ের অল্পতা ও অনবকাশের কথা বলিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় একদিকের ব্যবস্থা হইল। তাহার পর, চারিটী বিভাগের সভাপতি-নির্ব্বাচন। অভ্যর্থনা-সমিতি সাহিত্য-বিভাগের জন্য চট্টগ্রামের উকীল কবি শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন এম-এ, বি-এল, ইতিহাস-বিভাগের জন্য প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, এবং দর্শন-বিভাগের শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিলেন; বিজ্ঞান-বিভাগের জন্য বাঁকিপুরের অধিবেশনেই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ঢাকার এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়; আর সম্পাদক হইয়াছিলেন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয়। ঢাকার শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ সকলেই এই সম্মিলনের সাফল্যের জন্য যথাতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। নাম করিয়া বলিতে গেলে প্রকাণ্ড একটা তালিকা দিতে হয়, কারণ আমরা ত যত্ন, চেষ্টা, আগ্রহ ও উৎসাহে কাহাকেও কম দেখিলাম না; সুতরাং বিশেষভাবে কাহারও নাম উল্লেখ করা একেবারেই অসম্ভব। সভার স্থান হইয়াছিল নূতন ঢাকা নগরীর প্রকাণ্ড সেক্রেটেরিয়েট অট্টালিকার সুপ্রশস্ত হলে; আর প্রতিনিধিগণের বাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল ততোহধিক বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং হোষ্টেলে। প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনার ভার যাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঢাকা আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকিল। তাঁহারা প্রাণপণে প্রতিনিধিগণের সেবা করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছা-সেবকগণও ঢাকার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই সকল কারণেই ঢাকার অধিবেশন এমন ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এ প্রকার ব্যবস্থা ও আয়োজন বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

এইবার সভার কথা। এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনে অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। একে অল্প কয়েক দিনের আয়োজনে অধিবেশন হইল; তাহার পর ছুটী ছিল না; এই জন্যই প্রতিনিধিগণের সংখ্যা দেড়শতের অধিক হয় নাই। কলিকাতা হইতে ২৫ জন প্রতিনিধি ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণীর নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইতঃপূর্ব্বে আর কোন সম্মিলনে উপস্থিত হন নাই। শ্রীমতী সরলা দেবী প্রথম দিনের অধিবেশনে 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' গানটী করিয়া সভার উদ্বোধন করেন; দ্বিতীয় দিনেও তিনি একটি গান করেন এবং সাহিত্য-শাখায় 'রামপ্রসাদের পদাবলী' শীর্ষক একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ

করেন। প্রথম দিনের অধিবেশনে প্রথমে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কবিবর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণটি কবিবরের উপযুক্তই হইয়াছিল। সভাস্থ সকলেই এই অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। সমাগত সাহিত্যিক-গণকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন—"হে অতিথি! ওই সেই রামপাল, ওই সেই প্রাচীন যজ্ঞবেদী আপনাদের মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে; সে ত মূক নয়, যজ্ঞের মন্ত্রের প্রতিধ্বনি এখনও তাহার প্রাণের তারে ঝনন্-রণ করিয়া বাজিতেছে। ওই সেই ভস্মসুপ্ত অগ্নি, বুঝি বা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। আছে অতিথি, আছে! যে বেদধ্বনি এই যজ্ঞভূমে উঠিয়াছিল, যে ধ্বনি অরণ্যানী শুনিয়াছে, যে ধ্বনি পদ্মায় একদিন ঘোর করিয়া ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও আছে; আকাশে বাতাসে এখনও তাহার সুর বাজিতেছে। এই সেই প্রাচীন হব্যভস্ম মাটী বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। সেই ভস্ম আজি আপনাদের ললাটদেশ শোভিত করুক্। এ ভূমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছে। হে ঋত্বিক! আবার তীরস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করুন, অগ্নি জ্বলিয়া উঠুক। দেখিবেন,—এই এতকালের সহিষ্ণু মাটী শতধা দীর্ণ হইয়া, সেই জ্বলিত-জ্বলন মহান্ ধূর্জ্জটীকে জলজ্বাল-ললাট দাপিয়া তুলিয়াছে। যিনি সহস্র সহস্র বৎসর বাঙ্গালার মৃত সতীকে স্কন্ধে করিয়া প্রলয়কালের তাণ্ডব-নর্ত্তনে সব রিষ ঈর্ষা অক্ষমতা-পরাণু-করণের মতিচ্ছন্ন অহঙ্কার জ্বালাইয়া, সেই সৃষ্টি-পারাবারের একাকার আনিয়া দিবেন—সংহারের পর আবার নীহারিকায় নূতন বাঙ্গালার সৃষ্টি হইবে। বাহান্ন পীঠের মত সারা ভারতে আবার পীঠস্থানে মন্দির উঠিবে। হে তপোনিষ্ঠ সত্যসন্ধ সাহিত্যের রথিগণ, জীবনে কর্ম্মে ধর্ম্মে একাত্ম হইয়া সেই মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করি আসুন; স্বাহা স্বধা দ্বিবিধ অগ্নিই জ্বলিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের শ্মশানে, বল্লালের ভিটায় সেই শব-সাধনায় অগ্রসর হউন। তাই বাঙ্গালীয়া আপনাদের ডাকিয়াছে। এই শ্মশানে মড়ার হাড়ে ফুলের মালা পরিয়া, কি ভুলে ভুলিয়া আছি, সেই ভুল একবার ভাঙ্গিয়া দিউন।"

———

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ শেষ হইবার পর, যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রধান সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন এবং তাহার পরই তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। সম্মিলনের কার্য্য-পরিচালন সম্বন্ধে আমরা অনেকবার যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, সভাপতি মহাশয়ও তাহাই বলিলেন। একটুকু উদ্ধৃত করিলেই পাঠকগণ তাহা দেখিতে পাইবেন। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—"বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধারণ সভাপতি ব্যতীত চারিশাখার চারিজন বিভিন্ন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেছেন, এবং প্রত্যেক সভাপতি স্ব স্ব শাখার উপযোগী স্বতন্ত্র অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন। ইহার ফলে সমাগত সুধীবৃন্দ অনেক সময় ইচ্ছা সত্ত্বেও সকল শাখার রসাস্বাদে বঞ্চিত হইতেছেন। কারণ, সময়াভাবে প্রায়ই এক সময়েই চারিশাখার ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অধিবেশন করিতে হইতেছে। শ্রোতৃবৃন্দ যোগসিদ্ধির অভাবে কায়-ব্যূহ-রচনায় অসমর্থ হইয়া হয় এক শাখায় সুস্থিত থাকেন, অথবা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শাখা হইতে শাখান্তরে বিচরণ করিয়া যুগপৎ শ্রান্তি ও নির্ব্বেদ অনুভব করেন। ইহার একটা সদুপায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে সদুপায়ের প্রধান অন্তরায় পঠিতব্য প্রবন্ধের বাহুল্য। সম্মিলনের কর্তৃপক্ষেরা প্রবন্ধ-সংগ্রহের জন্য সারা দেশময় নারদের নিমন্ত্রণ করেন। তাহার ফলে প্রত্যেক শাখাতে পাঠের জন্য নানা বিষয়ে উত্তম, মধ্যম প্রবন্ধ উপস্থিত হয়। সময়াভাবে অধিকাংশ প্রবন্ধই পঠিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এবং যদি বা দুই একজন সৌভাগ্যবান্ লেখকের ভাগ্যে প্রবন্ধ পাঠের সুবিধা ঘটে, তথাপি সেই সকল প্রবন্ধ চারিশাখার যুগপৎ অধিবেশনের হট্টগোলে যথোচিত মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না; এইরূপে অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ মাঠে মারা যাইবার উপক্রম হয়। সাহিত্য-সম্মিলনের কর্তৃপক্ষদিগকে এই বিষয়ের প্রতিবিধান করিবার জন্য আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সাহিত্য-সম্মিলনকে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান—এই চারি শাখায় বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা যে সঙ্গত ও সমীচীন, এ বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নাই। এই চারি শাখার পৃথক্ পৃথক্ অধিবেশনও যে বাঞ্ছনীয়, তাহাও বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই সকল বিশেষ অধিবেশন সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দের মিলনস্থান

না হইয়া বিশেষজ্ঞের চিন্তা-বিনিময় ও গবেষণা-পরিচয়ের কেন্দ্র করিলে কিরূপ হয়? এবং প্রত্যেক শাখার বিশিষ্ট সভাপতির অভিভাষণ যুগপৎ পঠিত না হইয়া সাধারণ সর্ভায় পর পর পঠিত হইবার ব্যবস্থা করিলে কেমন হয়? সঙ্গে-সঙ্গে সাধারণ প্রবন্ধের বাহুল্য-ঘটা সঙ্কুচিত করিয়া প্রত্যেক শাখার আলোচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক বা দুইজন ব্যক্তিকে সাধারণ শ্রোতার উপযোগী করিয়া স্ব স্ব বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আহ্বান করিলে ভাল হয়।" আমরা এই কথা প্রতি বৎসরই বলিয়া আসিতেছি; কিন্তু যাঁহারা এই সম্মিলনের কর্ণধার, তাঁহারা সে সম্বন্ধে কখনও আলোচনার অবসর পান না; অথচ বৎসরে একবার করিয়া এই প্রকার অব্যবস্থার মধ্য দিয়াই সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে।

ইহার পরই শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় একটী প্রধান কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"যদি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে, তাহার জন্য অনেকগুলি মানুষ চাই—কয়েক জন অতিমানুষও চাই—মেষের দ্বারা সে কার্য্য হইবে না, মহিষের দ্বারাও হইবে না। আমরা এমন শিক্ষা চাই, যাহার ফলে স্বতন্ত্র স্বাবলম্ব স্বনিষ্ঠ স্বাধীন সামাজিক প্রস্তুত হইবে; যাহাদের দেহে বল থাকিবে, মনে দৃঢ়তা থাকিবে, হৃদয়ে বিশ্বাস থাকিবে; এক কথায়, যাহারা এই মৃতকল্প দেশকে সজীব সজাগ করিতে পারিবে; দেশে নূতন শিল্প নূতন বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবে, নূতন সাহিত্যের নবগঙ্গা আনয়ন করিবে; নূতন বিজ্ঞানের যজ্ঞশালা রচনা করিবে; নূতন দর্শনের স্বর্ণসৌধ গড়িয়া তুলিবে। কেন বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে এইরূপ মানুষ প্রস্তুত হইতেছে না? বাঙ্গালীর বুদ্ধির অভাব নাই, অধ্যবসায়ের অভাব নাই, তথাপি এইরূপ হইতেছে কেন? আমাদের দেশে শিক্ষা কেন বন্ধ্যা হইতেছে, শিক্ষিত কেন পঙ্গু হইতেছে? ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ, বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন না করিয়া বিদেশী ভাষার দ্বারা শিক্ষা দান। এইরূপ পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে বলিয়া শোনা যায় নাই। আর কোথায়ও কখনও ছিল কি না, তাহাও জানা যায় নাই।"

তাহার পরই শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"আত্মা বৈ-জায়তে পুত্রঃ—নিজেরা ছাত্রদশায় যে সকল মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলাম, এখন শিশু পুত্রদের মধ্যে তাহার পুনরভিনয় দেখিতেছি। আমার একটী নয় বৎসরের পুত্র আছে; সে সখ করিয়া বিনা সাহায্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা ও সীতার বনবাস পড়ে। অবাধে পড়িয়া যায়, নিঃশেষ না করিয়া নিরস্ত হয় না। কিন্তু দেখিতে পাই ইংরাজি পড়িতে হইলে তাহার হৃৎকম্প হয়। দুই বৎসরের বিবিধ চেষ্টাতেও সে এখনও First Book সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিল না। শিক্ষা এ দেশে কত সুখের কত আনন্দের প্রস্রবণ হইতে পারিত, যদি না বিদেশী ভাষা-শিক্ষার বিকট ছায়া শিক্ষাঙ্গণে নিপতিত হইয়া শিশুদের হৃদয়ে ভীতি ও আতঙ্কের সঞ্চার করিত। বাঙ্গালী জাতি না কি অজেয় অমর জাতি, তাই এত শিক্ষা-সঙ্কটের মধ্যেও বাঙ্গালীর প্রতিভা একেবারে ম্লান হইয়া যায় নাই; এবং তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি একেবারে ভোতা হইয়া যায় নাই। এই প্রণালী সত্ত্বেও যে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার রাসবিহারী ঘোষ, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মনস্বী পুরুষ (বিদেশে যাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে তাঁহাদের নাম ধরিলাম না) আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাতে আশা হয় যে বাঙ্গালীকে কেহই পরাভূত করিতে পারিবে না। সার আশুতোষও গতবারে বলিয়াছিলেন—'সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় এমনই একটী সঞ্জীবনী-শক্তি আছে যাহাতে বঙ্গে কোন দিন কৃতীর অভাব হয় না, হইবেও না। যেমন অবস্থাতেই বাঙ্গালীকে ফেলিয়া দাও না কেন, বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌর্ব্বল্য আসে না।' তবে এ কথা আমি বলিতে বাধ্য যে, রবীন্দ্রনাথকে যদি আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সোপান পরম্পরা অতিক্রম করিতে হইত, তবে তিনি রবীন্দ্রনাথ হইতেন কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। কিন্তু শ্বেতভুজা শতদলবাসিনী না কি তাঁহার হৃদ্‌পদ্মে আপনার রক্তচরণ চিহ্নিত করিবেন, পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন, সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রবেশিকা অবধি পহুঁছিতে পারিলেন না। ধরণী স্বস্তিশ্বাস মোচন করিলেন, দেবতারা দুন্দুভি নিনাদ করিলেন, দিক্‌বালারা অম্লান পারিজাত-মালা হস্তে লইয়া কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, বঙ্গদেশ আর একজন মহাকবির সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত হইল। বাস্তবিক ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে যাহারা উপেক্ষিত, অনেক সময়ে তাহাদের মনীষাই দেশকে সুবাস বিতরণ করে। সকলেই জানেন ডব্লিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় এন্‌ট্রেন্স পাশ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ ইংরাজীতে ফেল হইয়াছিলেন। সম্প্রতি যে ২৬ বর্ষীয় মান্দ্রাজী যুবক কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিষয়ে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে প্রথম এফ্‌, আর, এস্‌, রূপ জয়-টীকা ললাটে ধারণ করিয়াছেন, তিনি ২বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় গলাধাক্কা খাইয়া পোর্টইঞ্জিনিয়ার আফিসে কেরাণীগিরি করিতে বাধ্য হন। কিন্তু দুষ্ট সরস্বতীর এমনই প্রেরণা এবং প্রতিভার এমনই অপ্রতিহত গতি যে, সেই

কেরাণী যুবক অপ্রত্যাশিত ভাবে কেম্‌ব্রিজে নীত হইল এবং অনুকূল অবস্থার গুণে তাহার মনীষাপুষ্প বিকশিত হইয়া উঠিল।"

কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন যে, উচ্চশিক্ষা প্রদানের উপযুক্ত পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় নাই। সভাপতি মহাশয় তাহারও উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"আপত্তি উঠিবে যে বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক কোথা যে আমরা বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিব? উত্তরে বলিতে চাই যে প্রবেশিকা ও আই, এ পরীক্ষায় তোমরা ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল ইংরেজী কেতাব পড়াও তাহার সমতুল্য গ্রন্থ বাঙ্গালাতে এখনই প্রচুর আছে। রবীন্দ্রবাবু 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে এই আপত্তির যথেষ্ট খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি শুনুন—'আমি জানি তর্ক এই উঠিবে—তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চ শিক্ষা দিতে চাও, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, সৌখীন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারী করিবে,—কিম্বা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার যোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে'।"

ইহার পর শিক্ষালয় ও শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"কিন্তু শুধু বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিলেও চলিবে না—শিক্ষালয়গুলির আব্‌হাওয়া বদ্‌লাইতে হইলে, শিক্ষা প্রণালীর আমূল সংস্কার করিতে হইবে। এখনকার স্কুল কলেজ নামধেয় বিদ্যা-বিপণিগুলিকে বিদ্যামন্দিরে—অন্ততঃ বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে, এবং তাহার অঙ্গনে প্রাচীন ভারতের গুরুশিষ্যের মধুর সম্বন্ধের মিষ্ট বাতাস প্রবাহিত করিতে হইবে, এবং শান্ত তপোবনের মুক্ত আকাশ বিলম্বিত করিতে হইবে। দেখুন, অশ্রদ্ধার দানে দাতা ও গৃহীতা—উভয়েই পতিত হয়। আমাদের ছাত্রেরা যে ইঁহাদের প্রদত্ত বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তাহার অন্যতম কারণ শিক্ষকের প্রতিকূল ভাব। পূর্ব্বকালে শিক্ষক সেবক ছিলেন—বিদ্যাকে সেবার ভাবে শ্রদ্ধার সহিত সম্ভ্রমের সহিত সংযমের সহিত ভয়ের সহিত দান করিতেন। 'শ্রদ্ধয়া দেয়ং হ্রিয়া দেয়ং সংবিদ দেয়ং অশ্রদ্ধয়া ন দেয়ম্'। সেই জন্য বিদ্যা বিদিতা হইয়া ছাত্রকে গরীয়ান্ করিত। আচার্য্যাদ্ধৈব বিদিতা বিদ্যা সাধিষ্ঠং গময়তি। কিন্তু এখন? কদর্য্য দাতা যেমন অবজ্ঞার সহিত ভিক্ষুককে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয়, অনেক স্থলে বিদেশী অধ্যাপক তেমনি অবজ্ঞায় ছাত্রদিগকে বিদ্যার খুদ বিতরণ করেন। আমরা একজন অধ্যাপকের নিকট পড়িতাম। তিনি প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন—কত বিদ্যা তাঁহার বিশোদরে নিহিত ছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু তিনি কোন দিন আমাদের মুখের দিকে তাকান নাই—তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা স্বীয় বুটের উপর সংলগ্ন থাকিত—কদাচিৎ কেতাবের উপর পড়িত—কিন্তু কোন কারণে কোন দিন আমাদের উপর পড়ে নাই। আমরা সে সময়ে রঘুবংশে বাল্মীকির তপোবন হইতে আনীতা সীতার বর্ণনা পড়িতাম—কাষায় পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা,—এবং মনে মনে তাঁহার সহিত আমাদের অধ্যাপকের তুলনা করিতাম। ইনি যদিও 'কাষায়-পরিবীত' ছিলেন না, কিন্তু সর্ব্বদাই 'স্বপদার্পিতচক্ষু' থাকিতেন। এই শ্রদ্ধার ও অশ্রদ্ধার দান লইয়া একবার দেবলোকে তুমুল কলহ হইয়াছিল। শ্রোত্রিয়ের অশ্রদ্ধার দান বড়, না পতিতের শ্রদ্ধার দান বড়। উভয় পক্ষের বক্তৃতার পর ভোট লওয়া হইল। দেখা গেল, দুই দিকের ভোট সংখ্যা সমান। তখন দেবলোকের সভাপতি প্রজাপতি ঠাকুর উঠিয়া বলিলেন, "মা কৃধ্বং বিষমং সমম্"। অসমান জিনিসকে সমান করিও না—কারণ, "শ্রদ্ধাপূতং বদান্যস্য হতমশ্রদ্ধয়েতরৎ।" পতিতের শ্রদ্ধাপূত দান শ্রোত্রিয়ের অশ্রদ্ধার দেওয়া হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। আমরাও এই কথা বলি। আমরা দিগ্‌গজ পণ্ডিতের অশ্রদ্ধার বিদ্যা-বিতরণ চাই না, অপণ্ডিতের শ্রদ্ধাপূত দানই আমাদের শিরোধার্য্য। আরও দেখুন, প্রাচীনকালে গুরু চাহিতেন যে, যেমন দিক্ বিদিক্ হইতে নদনদী আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ দশ দিক্ হইতে ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁহার আশ্রমে মিলিত হউক।

"যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরং
তথা মা ব্রহ্মচারিণঃ ধাতর আয়ান্তু সর্ব্বতঃ"

আমরা কিন্তু বিদেশী ভাষার এবং বিকট রেগুলেশনের লৌহময় প্রাচীর রচনা করিয়া শত প্রাকার-বেষ্টনীর মধ্যে বিদ্যা বধূকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছি। যদি কোন দিগ্‌বিজয়ী বীর ঐ সকল আয়সী পুরী ভেদ করিয়া অন্তর্গৃহে প্রবেশ করিতে পারে, তবে সে হয় ত বিদ্যার চকিত চমৎকৃতি কোন দিন প্রত্যক্ষ করিবে। এ দেশে যদি বিদ্যার প্রকৃত আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হয় এবং সেই সোনার অলঙ্কার রচনা করিয়া বঙ্গবাণীর বর অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতে হয়, তবে বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর হাব-ভাব আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে য়ুরোপের বিশেষত্ব বর্জ্জিত হীন অনুকৃতি না করিয়া ইহাকে ভারতীয় বিদ্যা, ভারতীয় ভাব, ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস দর্শন-চর্চ্চার কেন্দ্রস্থান করিতে হইবে। ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, আমরা পাশ্চাত্য culture হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত করিব। আমরা য়ুরোপের সাহিত্য, দর্শন, কলাবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রভূত পরিমাণে শিক্ষা ও গ্রহণ করিব। কিন্তু পূর্ব্বকালে যেমন করিয়া গ্রীক্ হুণ, শক, পহ্লব প্রভৃতিকে আপনাদিগের মধ্যে হজম করিয়াছিলাম, সেইরূপ পাশ্চাত্য বিদ্যা ও জ্ঞানকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ

করিয়া ফেলিব। তাহারা আমাদের 'ওদন' হইবে, 'উপসেচন' হইবে, তাহারা এখনকার মত আমাদিগকে অভিভূত পরাভূত করিতে পারিবে না। ঐ সকল বিদ্যা ও কলাকে আমাদের ভারতী সরস্বতীর সম্রাজ্ঞী হইতে দিব না, শুদ্ধদাসী করিয়া রাখিব।"

উপসংহারে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—

বাঙ্গালী জাতির এমন দুর্দ্দশার দিন গিয়াছে, যখন বাঙ্গালার দেশনায়কদিগকে বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার দ্রোহ করিতে হইত। আমি এক জনের কথা জানি, যিনি বঙ্গজননীর কৃতী সুসন্তান ছিলেন অথচ ইংরেজমহলে পসারের জন্য তাঁহাকে বলিতে হইত যে, তিনি বাঙ্গালা জানেন না। কি শোচনীয় অবস্থা! অবশ্য যে সকল শাপভ্রষ্ট শ্বেতাঙ্গ বিধাতার ভৌগোলিক ভ্রান্তির ফলে আমাদের এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়—

আমরা বাংলা গিয়াছি ভুলি, আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি বেয়ারা, আর মুটেদের ডাকি কুলি—

যাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ অনেক দিন হইল বলিয়া গিয়াছেন—I read English, write English, talk in English, speechify in English, think in English, dream in English,—বিধাতার আজব সৃষ্টি সেই সকল অদ্ভুত জীব দেশ হইতে বিলুপ্ত না হইলেও বিরল হইয়া আসিতেছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে যত্ন করা সময়ের অপব্যয়। কিন্তু আমরা—যাহারা বঙ্গবাণীর চিহ্নিত সেবক,—আমরাও কি তাঁহার ভাবে মসগুল, বিভোর হইতে পারিয়াছি? আমরা কি তাঁহার সেবায় সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারিয়াছি? এখনও আমাদের সাহিত্য হইতে বিলাতীর বোট্‌কা গন্ধ গেল না। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের এক জন লেখক তাঁহার সহযোগীদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত মনের মধ্যে ভাব ইংরাজীতে উদয় হয়, তত দিন যেন কেহ বাঙ্গালা লিখিতে না বসেন। বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যেন বাঙ্গালার ভাবা শিক্ষা করা হয়। এই অনুরোধ কি আমরা পালন করিয়াছি? পালন না করার ফল কিরূপ হইয়াছে? অনেক স্থলে বাঙ্গালার অর্থ করিতে হইলে ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া তবে বুঝিতে হয়। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা মূঢ়ের মত মূক থাকিয়া অগত্যা অবশেষে লেখকের জয়জয়কার করেন। এইরূপ অঘটন ঘটন সম্পাদন করিয়া আমরা কখনই একটা বিশ্ববিজয়ী সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারিব না। অথচ ঐরূপ সাহিত্য আমাদের গড়িয়া তুলিতেই হইবে; নতুবা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সমস্ত উদ্যম পণ্ড হইবে এবং আমাদের ভাষার নিয়তি ব্যর্থ হইবে। তাহা আমরা কখনই হইতে দিব না।"

এইবার সম্মিলনের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলেই আমাদের বক্তব্য শেষ হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্মিলনের অধিবেশনের ব্যবস্থা হওয়ায় অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে এবার হয় ত প্রবন্ধ বেশী সংগৃহীত হইবে না; কিন্তু আমরা শুনিলাম বিভিন্ন বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দেড় শত প্রবন্ধ আসিয়াছিল। একদিনে পৃথক পৃথক সময়ে চারিশাখার অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়া প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন সমিতি বেশী প্রবন্ধ পাঠ করিবার সময় দিতে পারেন নাই; সেই জন্য ইতিহাস শাখায় তিনটী, দর্শন শাখায় দুইটী এবং বিজ্ঞান শাখায় দুইটী মাত্র প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল; এই তিন শাখার সভাপতি মহাশয়গণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সারগর্ভ অভিভাষণও ছোট হইয়াছিল; কেবল সাহিত্য শাখাতেই অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইয়াছিল, এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়ের অভিভাষণও সুদীর্ঘ হইয়াছিল। আমরা শাখা-সভাপতি মহাশয়গণের প্রবন্ধের সারমর্ম্ম স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। পরবর্ত্তী সম্মিলন কোথায় হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই; তবে বাঁকিপুরে যখন সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তখন শুনিয়াছিলাম যে, ঢাকার পর মুঙ্গেরে অধিবেশন হইবে। শীঘ্রই এ সংবাদ জানিতে পারা যাইবে।

আজ চারি বৎসর হইতে যায়, য়ুরোপে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে; এখনও সেই যুদ্ধ অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন যুদ্ধ আর কখন হয় নাই। প্রতিদিন যে কত লোক এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রে এই মহাযুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই পাঠ করিতেছেন; সুতরাং যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ প্রদান করিতে হইবে না। আমাদের রাজা ইংরেজ যে কেবল ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, বিপন্নের সাহায্যের জন্য এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। সহস্র-সহস্র ইংরেজ অকুতোভয়ে এই রণাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছেন, দলে দলে বীর হৃদয়-শোণিত দান করিয়া স্বদেশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। কোটী-কোটী মুদ্রা প্রতিদিন বাষ্পে পরিণত হইতেছে। পৃথিবীর যেখানে যত ইংরেজ আছে, যত ফরাসী আছে, সকলেই যুদ্ধে ব্যাপৃত। আমরা ইংরেজের প্রজা, আমরা তাঁহাদের সুখ-দুঃখের অংশী; আমরাও যথাসাধ্য এই যুদ্ধে সাহায্য করিতেছি; ইংরেজের মহত্ত্ব,

ইংরেজের শৌর্য্য-বীর্য্য আমাদের এই ভারতবাসী জনগণকেও প্রবুদ্ধ করিয়াছে; ভারতবর্ষ হইতেও যথেষ্ট সৈন্য য়ুরোপের এই কুরুক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছে। যে বাঙ্গালী জাতিকে ভীরু বলিয়া য়ুরোপের লোক ঘৃণার চক্ষে দেখিত, সেই বাঙ্গালী এখন তাহাদের রাজার জন্য ইংরেজের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে, ইংরেজের মতই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে।

এতদিন যুদ্ধের ব্যাপার য়ুরোপেই নিবদ্ধ ছিল; কিন্তু রুষের সহিত জার্ম্মাণীর সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর অনেকেই মনে করিতেছেন, জার্ম্মাণীর শ্যেন-দৃষ্টি এসিয়ার দিকেও নিপতিত হইয়াছে; অনেকেই মনে করিতেছেন, য়ুরোপে সম্প্রতি যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা একটু নিবারিত হইলে জার্ম্মাণীর যুদ্ধক্ষেত্র এসিয়া মহাদেশেও প্রসারিত হইতে পারে। এখনও অবশ্য তাহার কোন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না; সুতরাং আমাদের ভীত বা চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই; কিন্তু জার্ম্মাণী বিগত চারি বৎসরকাল যে ভাবে যুদ্ধ করিতেছে, যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য নাম কলঙ্কিত করিতেছে, তাহাতে আমাদের দেশের সকলেরই পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। এই কথা মনে করিয়াই ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মহোদয় আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরকে তারযোগে জানাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে এখন হইতেই আরও সৈন্য প্রস্তুত রাখা প্রয়োজন, আরও অর্থ সংগ্রহ হওয়া আবশ্যক। আমাদের মাননীয় রাজপ্রতিনিধি মহোদয়ও মন্ত্রী মহাশয়ের তারের উত্তরে তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি, এদেশের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার বিধান করিবেন।

কর্ত্তব্য যে কি, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন,—কর্ত্তব্য অর্থ সংগ্রহ করা,—কর্ত্তব্য সৈন্য সংগ্রহ করা। যুদ্ধজয় করিতে হইলে ধন ও জন উভয়েরই প্রয়োজন। এই মহাযুদ্ধের সময় ভারতবাসী এই ধন ও জন প্রদানে কুণ্ঠিত হইবেন না; নিজের দেশ রক্ষার জন্য, নিজের আত্মীয় পরিজনকে নিরাপদ করিবার জন্য কে না প্রয়াসী হইবেন? এ দেশের পক্ষে যাহা সম্ভব, তাহা এ দেশবাসী করিবে; রাজভক্ত ভারতবাসী রাজার জন্য সবই করিবে। এখন কথা হইতেছে, কেমন করিয়া সৈন্য সংগৃহীত হইবে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে না হয় সৈন্য জুটিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে কি হইবে? এতকাল ইংরেজের আশ্রয়ে বাস করিয়া বাঙ্গালী যে একেবারে শৌর্য্যে বীর্য্যে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। আইনের কঠোর বিধানে কাহারও ত অস্ত্র ধরিবার উপায় ছিল না, বড় একখানা লাঠীও কেহ ব্যবহার করিতে পাইত না; যুদ্ধবিদ্যায় যে বাঙ্গালী একেবারে অনভ্যস্ত। তবে বাঙ্গালী যে ভীরু নহে, বাঙ্গালী যে যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করিলে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারে এবং অন্যান্য বীরজাতির ন্যায় অকুতোভয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, এ কথা এই যুদ্ধে সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশ হইতে যথেষ্ট সৈন্য সংগৃহীত হয় নাই, বলিয়া এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ আমাদের উপর কটাক্ষ করিতেছেন; কিন্তু ইহাতে আমাদের লজ্জিত হইবার কারণ নাই—সে জন্য দায়ী আমাদের শাসনকর্ত্তা রাজপুরুষগণ। তাঁহারাই এই সুদীর্ঘকাল আমাদিগকে নিরস্ত্র রাখিয়া সর্ব্বপ্রকারে আমাদের সাহস প্রদর্শনের ও বলবৃদ্ধির পথ বন্ধ রাখিয়াছিলেন; আমরাও নিশ্চেষ্ট ও নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিলাম; আজ হঠাৎ আহ্বান করিলে আমরা এতদিনের জড়তা এক মুহূর্ত্তে ত্যাগ করিব কেমন করিয়া? আমাদের দেশের যুবকগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; আমাদের ছেলেরা প্রাণপাত করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে, পরীক্ষায় পাশ হইতেছে। তাহাদের যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য সরকার বাহাদুর ত এতকাল কোন আয়োজনই করেন নাই, কোন বিদ্যালয়ই স্থাপন করেন নাই; এমন কি সখের সৈনিক দলেও বাঙ্গালীর প্রবেশাধিকার ছিল না। তাহার ফলে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে। আমাদের দোষ ত কিছুই নাই। যাক্, এতদিন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের রাজপুরুষগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, একটা জাতিকে এমন করিয়া নিরস্ত্র, নিস্তেজ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য হয় নাই। সুতরাং এখন আমরা বলিতে চাই যে, এখন হইতে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে সমরশিক্ষা প্রদানের যথারীতি ব্যবস্থা করা হউক। এমন ব্যবস্থা করা হউক যে, বই পড়িয়া পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাইলেই তাহাকে পাশ করা হইবে না, সমর-পরীক্ষায়ও

তাহাকে বেশী নম্বর রাখিতে হইবে, তাহা হইলেই সে ছেলে প্রবেশিকার ছাড়পত্র পাইবে। তাহার পর কলেজের পুস্তকপাঠের পরীক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে সমর সম্বন্ধেও পরীক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষা প্রচলিত হইলে কিছু দিন পরে আর এমন করিয়া সৈন্য সংগ্রহের জন্য বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে হইবে না, এত চেষ্টা করিতে হইবে না। বর্ত্তমানের জন্য গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় যাহা কর্ত্তব্য হয় তাঁহারা করুন; কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে বাঙ্গালী যুবকগণ অন্যান্য বিদ্যায় প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্গে-সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যায়ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা এখন হইতেই করা আবশ্যক। ইহাতে রাজা প্রজা উভয়েরই লাভ।

কল্পতরু

মকরপোত বা সবমেরিণ

[শ্রীচুণিলাল মিত্র]

মিঃ (Cyril Hall) সাইরিল হল বলেন, "Assuredly the greatest and most surprising development of modern warfare is the sudden evolution of the submarine." অর্থাৎ, মকরপোতের আকস্মিক ক্রমবিকাশ বর্ত্তমান রণনীতির আশ্চর্য্য-জনক ও চরম উন্নতি। শত্রুর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, তাহাকে নিশ্বাস ফেলিবার অবসর না দিয়া, গভীর সমুদ্রগর্ভে আত্মগোপন করিয়া

৬ ইঞ্চি মাপের হাউইজার কামান

একটী কি দুইটী টর্পেডো চালাইয়া শত্রুর সহস্র-সহস্র সৈন্যপূর্ণ ট্রান্সপোর্ট জাহাজ, বা সহস্র নাবিকে সুসজ্জিত কোটী কোটী টাকা মূল্যের সুবৃহৎ রণতরী অথবা বহুসহস্র টন খাদ্য অথবা পণ্যসম্ভারপূর্ণ যাত্রী ও বাণিজ্য-তরীকে নিমেষের মধ্যে* ডুবাইয়া দিবার পক্ষে এমন অভিনব ও সার্থক ধ্বংসাস্ত্র আর নাই বলিলেই হয়। সমুদ্রগর্ভে ভ্রমণের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে অনেক দিন। প্রায় চারি শত বৎসরের চেষ্টার ফলে আজ মানুষ জলমধ্যে অনায়াসে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিগত খৃষ্টীয় ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার উন্নতিকল্পে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। আন্দাজ বিংশতি বৎসরের মধ্যে সবম্যারিণের বর্ত্তমান উন্নতি দেখা যাইতেছে। ভবিষ্যতে ইহার আরও যে কত উন্নতি হইতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমেরিকা সকল কাজেই অগ্রণী। আমেরিকানরা যুদ্ধ-ব্যাপারে ইহার প্রথম ব্যবহার করিয়াছেন।

* Modern Weapons of War p. 152.

ভাসমান সবম্যারিণ

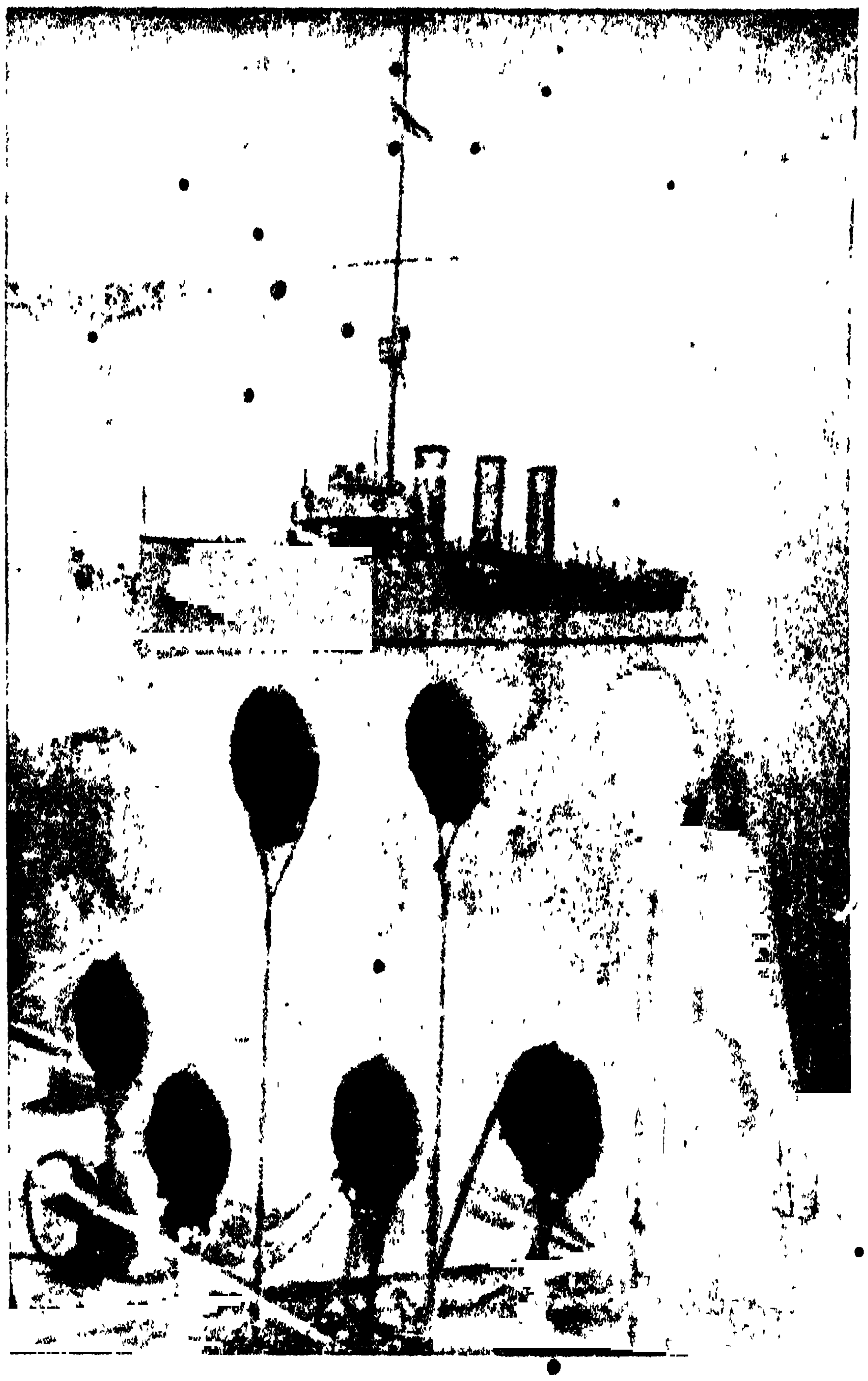

'মাইন' বিভীষিকা

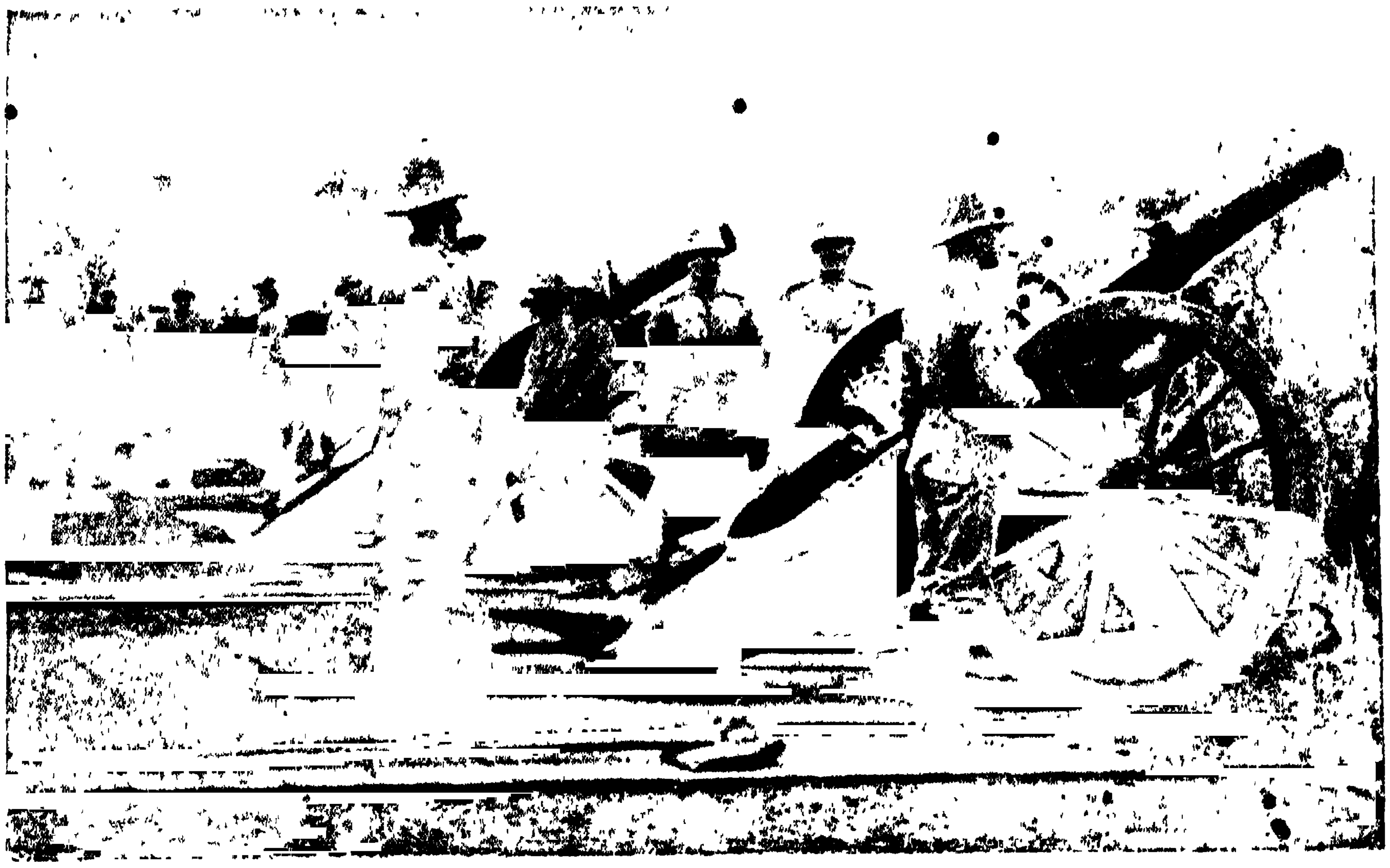

গোলাবর্ষণোদ্যত কামান

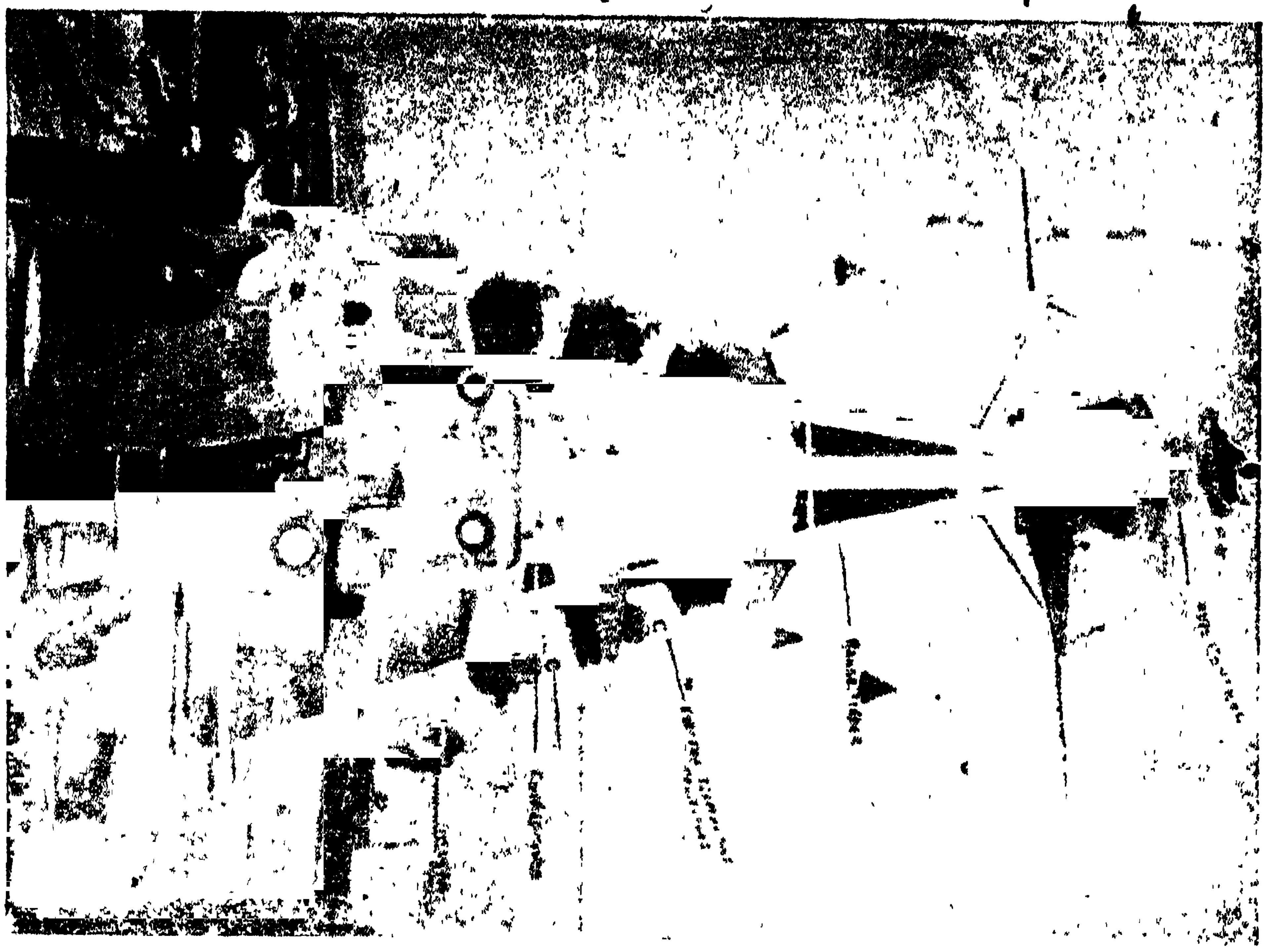

"আয়রণ ডিউক" রণতরীর সম্মুখের কামান

সমুদ্রগামী বিমানপোতের আগমন-প্রস্থানের ঘর

জলযুদ্ধে শত্রুনাশ করিবার পক্ষে মকরপোত বিশেষ উপযোগী। প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তে সমুদ্রপৃষ্ঠ যতই বিপদসঙ্কুল হউক না কেন, সে সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করিয়া এই সকল পোত সমুদ্র-গর্ভে শান্তি ও নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। শত্রু ইহাকে সহজে দেখিতে পায় না; কাজেই ইহা তাহা'র অজ্ঞাতে অনায়াসে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। ইহাকে কোনদিন জলদস্যু কিংবা শিলাবৃষ্টির অত্যাচার সহ্য করিতে হয় না। প্রচণ্ড শীতে সমুদ্র-পৃষ্ঠ জমিয়া বরফে পরিণত হইলেও, কঠিন বরফের আবরণের নিম্নস্থ তরল জলরাশির মধ্য দিয়া ইহার যাতায়াতে কোন বিঘ্ন ঘটে না। ফল কথা, ইহা টরপেডো চালনা করিয়া অনায়াসে শত্রুর ক্ষতি করিতে সমর্থ।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মিঃ রবার্ট ফুলটন মকরপোতের অদ্ভুত কার্য্য-কারিতার সম্ভাবনা বুঝিতে পারেন। তাই তিনি সেই সময়ে একখানি মকরপোত নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ডুবিয়া প্রায় চারি ঘণ্টাকাল জলের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি ব্রেষ্ট বন্দরস্থিত একখানি

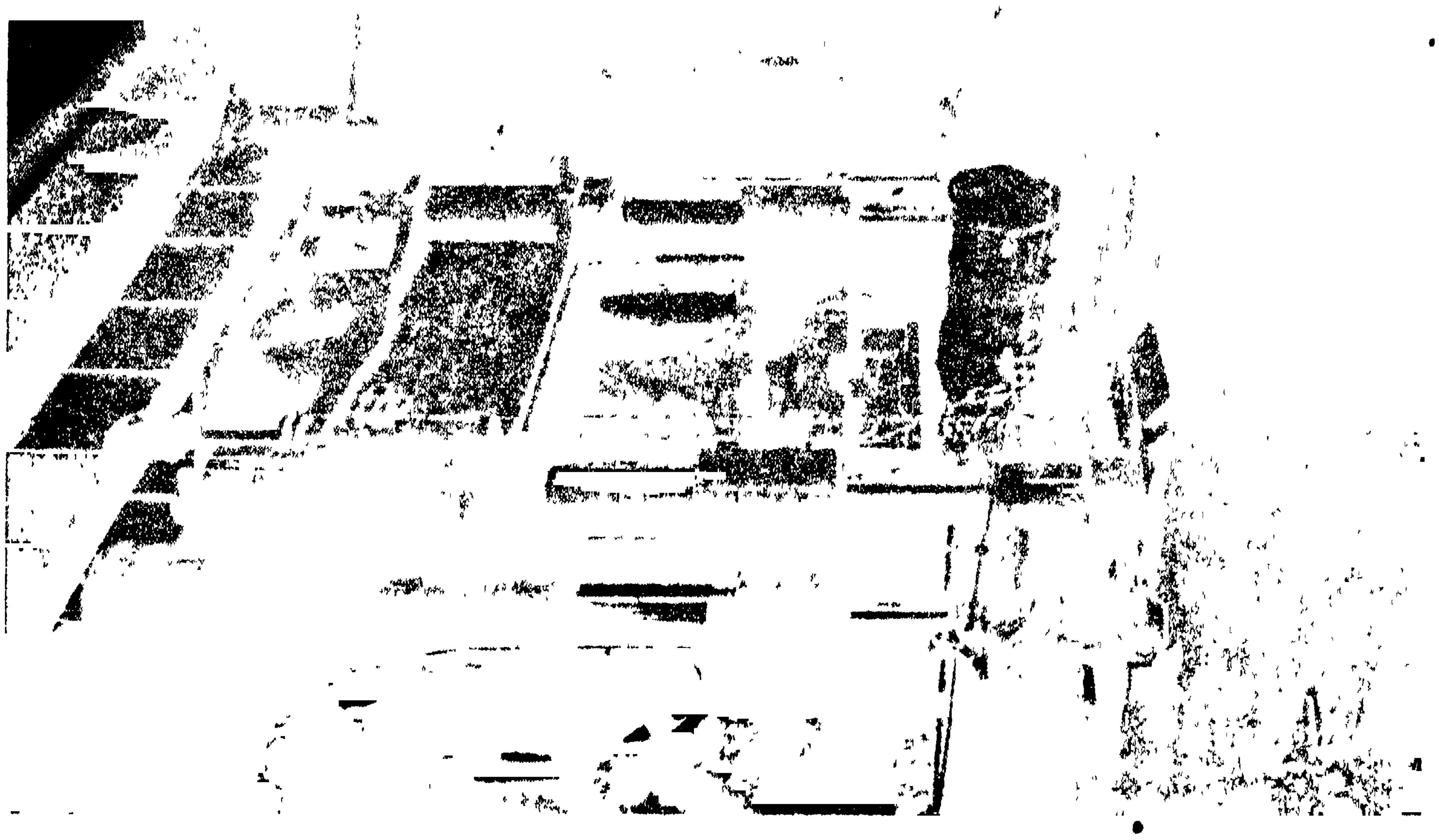

কামানের কারখানা

দৃঢ়-গোলাবর্ষী কামানে শেল ভরা হইতেছে

পোতকে টরপেডোর দ্বারা ধ্বংস করেন। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ইহার পরিকল্পে অনেক অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন ; তবে তিনি আশা করেন নাই যে, মকরপোত কোন দিন যুদ্ধ-কার্য্যে বিশেষ সাহায্যকারী হইবে। আমেরিকাবাসিগণ ক্রমে এই মকরপোতের কার্য্যফলে এত আশান্বিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা সত্যসত্যই একখানা পোত নির্ম্মাণ করিয়া নেপোলিয়ানকে সেণ্ট-হেলেনা হইতে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা সফল হয় নাই। ঐ জাহাজখানি কোনদিন আমেরিকার উপকূল পরিত্যাগ করিতে সাহস করে নাই। আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবের (Civil war) সময় ষ্টোনি সাহেব ডেভিড নামক একখানি মকর-পোত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এই পোতখানির পরীক্ষাকালে তিন বারই উহা মাঝি-মাল্লা লইয়া জলমগ্ন হয়, চতুর্থবার পরীক্ষাকালে হাউষ্টনিক নামক জাহাজকে ধ্বংস করিতে গিয়া তাহার ধাক্কায় উহা স্বয়ং ডুবিয়া যায়। বোধ হয় কিঞ্চিৎ দূরে

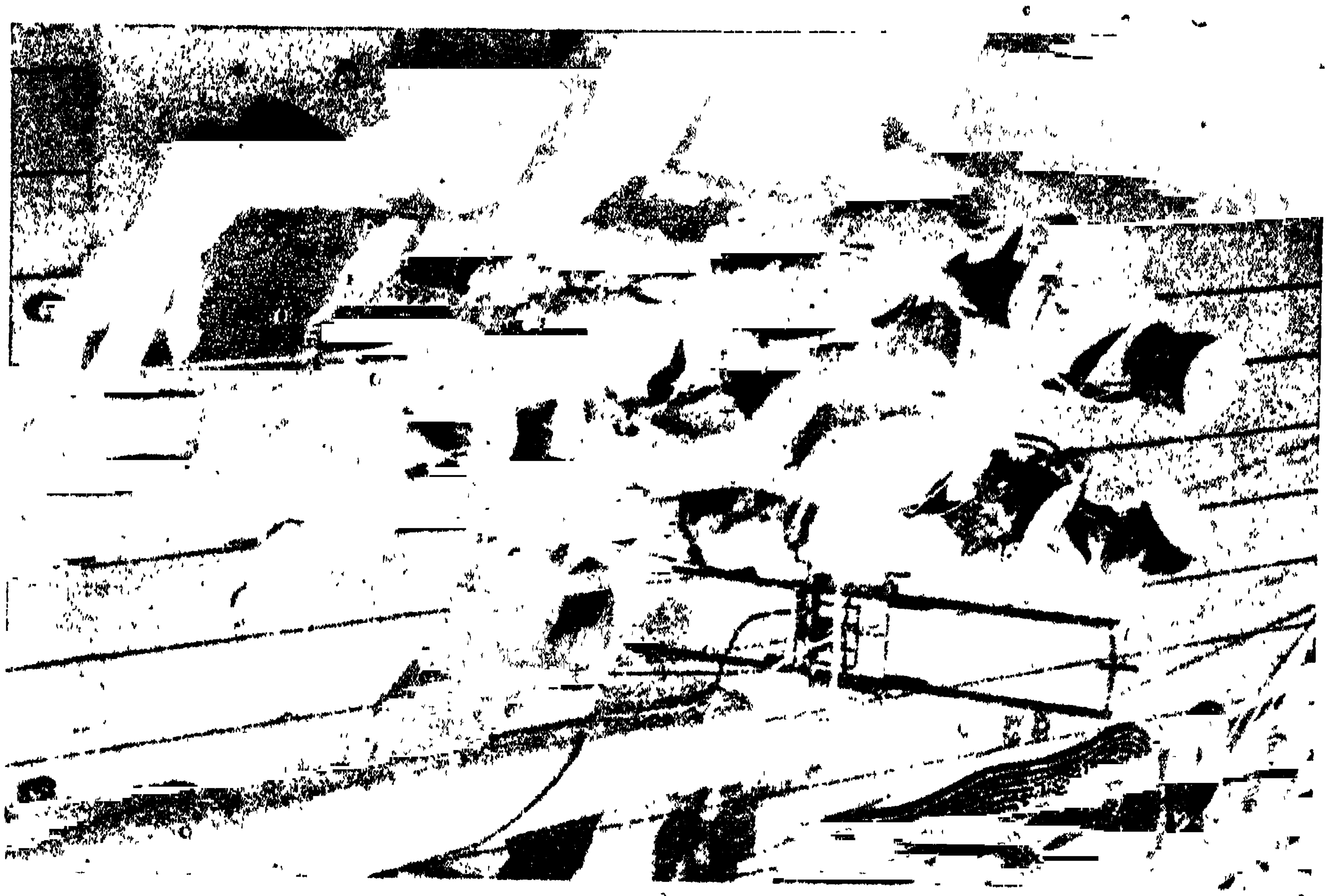

নৌ-সেনাগণের কামান-চালনা শিক্ষা

মগ্নতরির পোত

থাকিলে আর এ বিপদ ঘটিত না। উক্ত যুদ্ধে অনেকগুলি জাহাজ টরপেডোর দ্বারা নষ্ট করা হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হলাণ্ড নামক জনৈক আমেরিকাবাসী ঐ পোতের উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অনুশীলন ও পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন—(১) জলের উপর বিচরণ করিয়া শেষে কোন জাহাজের তলদেশে গমন করা; (২) জলের মধ্যে আপনার (balance) ভার সামঞ্জস্য রক্ষা করা; ৩) জল ও বাতাস সঞ্চালনের প্রতিরোধক অবস্থায় (air-light ও water-tight অবস্থায়) জলের মধ্যে কতকগুলি মানবজীবনের উপযোগী বাতাস গ্রহণ। (৪) সহজে ও দ্রুতগতিতে জলের মধ্যে প্রবেশ করা ও তথা হইতে নির্গত হওয়া। এই অনুশীলনের ফলে কতকগুলি জাহাজ নির্ম্মিত হইল বটে, কিন্তু উহারা কার্য্যোপযোগী হইল না। এই সময়ে ডেভিড নামক একখানি জাহাজ তৈয়ারী হইল বটে, কিন্তু উহা শেষে সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত হইল না। মকরপোতের বর্ত্তমান উন্নতি অনেকটা মাল মসলার উপর নির্ভর করিয়াছে (development of material), উহার নির্ম্মাণ কুশলতার উপর বিশেষ নির্ভর করিতে হয় নাই।

এই কামান হইতে ৬০ পৌণ্ড ওজনের গোলা ছুটে

ডেষ্ট্রয়ার রণতরীতে কামান স্থাপন

হলাণ্ড ও নরডনফেল্ট নামক জনৈক সুইডিশ এই সময়ে সবমেরিণের উন্নতির চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। মার্কিণ দেশীয়গণ আপনাদের সবমেরিণের উন্নতির আশায় এই দুইজন ভদ্রলোকের নিকট হইতে দুইখানি স্বতন্ত্র নক্সা (design) চাহিলে, নরডনফেল্ট্ একখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই জাহাজখানি সম্পূর্ণ নিখুঁত হয় নাই। জাহাজখানির দোষ এই ছিল যে, উহা জলের উপর কয়লার উত্তাপে বাষ্পের দ্বারা অনায়াসে চলিতে পারিত; কিন্তু জলের মধ্যে প্রবেশ করাইলেই উহার আগুন নিবাইতে হইত। মকরপোত পরিচালনার কার্য্যে নরডনফেল্ট সাহেবকে ষ্টীম এঞ্জিনের সাহায্য লইতে হইয়াছিল, কিন্তু এ সাহায্য তাদৃশ কার্য্যকর হয় নাই। তখন বৈদ্যুতিক শক্তি প্রচলিত হয় নাই, কেবলই বাষ্পীয় সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হইত। ষ্টীমের ক্ষমতা নিতান্ত মন্দ হয় নাই; আগুন

একটী ম্যাক্সিম কামান

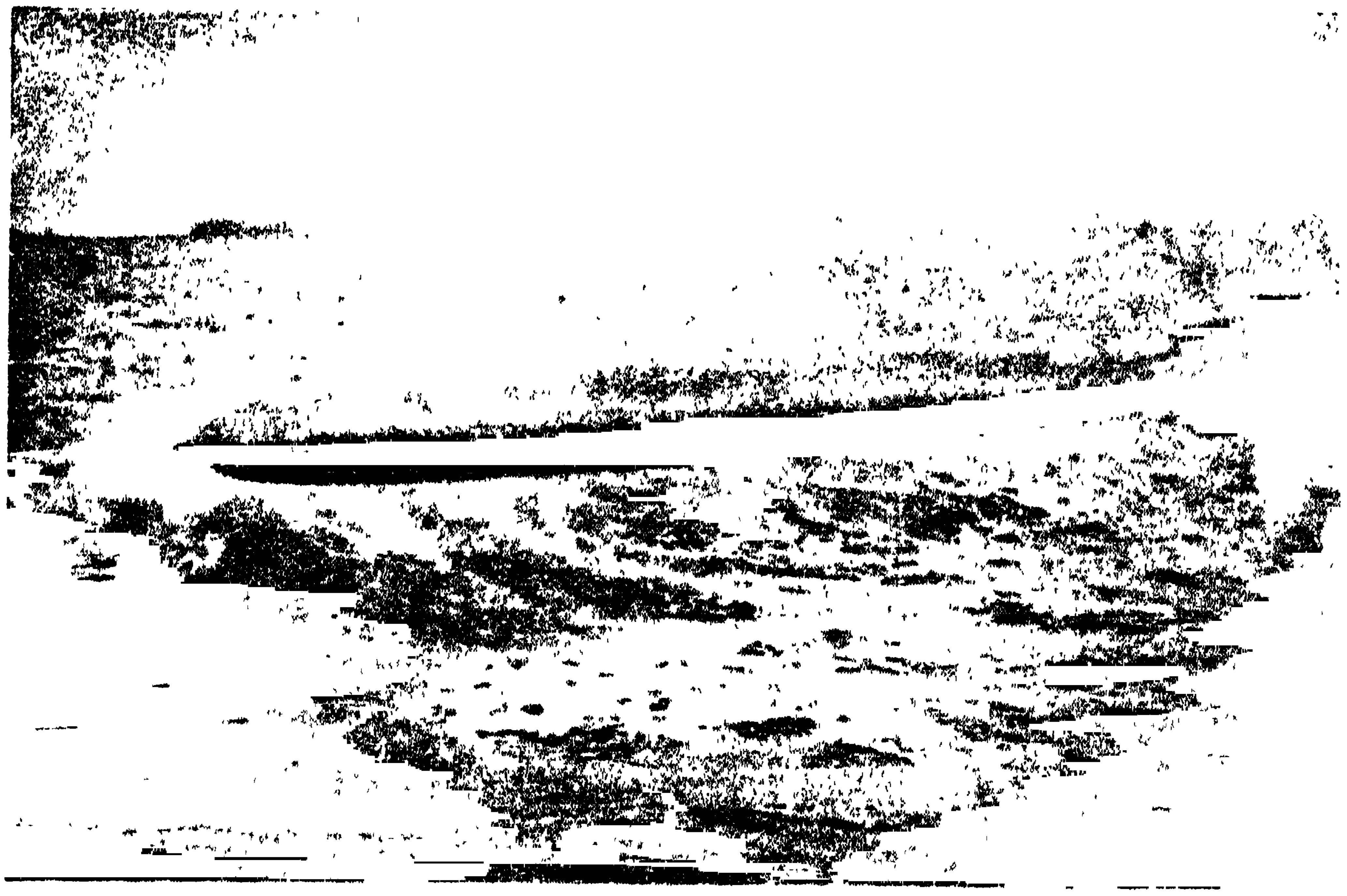

সবম্যারিণ হইতে নিক্ষিপ্ত টর্পেডো

নিবাইলেও প্রত্যেক ঘণ্টায় ১০ নট চলিত। নরডেনফেল্ট যে কয়খানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে Nordenfeldt II and III নামক জাহাজ দুখানি তুর্কিরাজ্য ক্রয় করিয়া লন। শেষে ইহার যে কি শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল, তাহা 'ইঞ্জিনিয়ার' পত্রে বিশেষ বর্ণিত আছে। এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ করিলাম।

"The Turkish boat was submerged by admitting water to tanks aided by horizontal propellers, raised

by blowing the ballast out again and reserving the propellers. Nothing could be imagined more unstable than this Turkish boat. The moment she left the horizontal position the water in her boiler and the tanks surged forward and backwards and increased the angle of inclination. * * * Inspite of these difficulties, the Ottoman officers were so impressed that the Turkish Government bought the boat. It goes without saying that it was only with the greatest difficulty the price was extracted from the Sultan's treasury. But no use whatever has been made of her, and she lies rotting away in Constantinople, unless, indeed, she has found her way piecemeal to the marine-store dealers. A paramount difficulty in the way of utilising her was that no engineers could be got to serve her. If men were appointed they promptly deserted.—*The Engineer.*

আমেরিকানগণ নরডনফেল্টের মকরপোতের দুর্দ্দশা দেখিয়া হলণ্ড সাহেবের design গ্রহণ করিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি Plunger নামক একখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। এ জাহাজের কার্য্যকারিতার বিষয় সরকারী কাগজে প্রকাশিত হইল। এই জাহাজের পরিচালন কার্য্যে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা হইল। ক্রমে তিনি এত উন্নত উপায়ে আরও জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট ঐ জাহাজখানি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নূতন designএ নির্ম্মিত জাহাজ গ্রহণ করিলেন।

সবম্যারিণের কৃতকার্য্যতার ফলে সভ্যতার কেন্দ্রে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি স্থানে হলণ্ড 'টাইপে'র জাহাজ নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। ইংলণ্ড একবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; ভিতরে-ভিতরে ইহার নির্ম্মাণ ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে গ্রেটব্রিটেন ভিকার্স ম্যাক্সিমকে পাঁচখানি সবম্যারিণ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দিলেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে কত গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইল। অনেকেই বলিতে লাগিলেন, এই কার্য্যে ইংলণ্ডের পক্ষে অন্য দেশের সাহায্য লওয়া আবশ্যক নহে। আরও অনেকে বলিলেন যে, তাঁহারা শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় রহিয়াছেন; সেই অবসর আসিলেই তাঁহারা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল মকরপোত ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে চারিটী করিয়া টরপেডোর (torpedo tubes) ঘর আছে। যখন জাহাজ হইতে এই সকল টরপেডো নির্গত হয়—তখন একটা ট্যাঙ্ক হইতে অন্য ট্যাঙ্কে জল প্রবেশ করিয়া জাহাজের ভার-সামঞ্জস্য (balance) রক্ষা করে। এই জাহাজ যখন সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে, তখন উহার মধ্যে প্রস্তরাদি নানা প্রকার বোঝাই (ballast) দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে উহাকে স্থির রাখা হয়। সবমেরিণগুলির নির্ম্মাণ কৌশল ষ্টেট্ সিক্রেট বা গুপ্তরহস্য বলিয়া গণ্য হয়। তাহা প্রকাশ করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়। বর্ত্তমান সবমেরিণের একখানি চিত্র দেওয়া গেল, তাহাতে উহার নির্ম্মাণ-কৌশল কতকটা বুঝা যায়। ইহার অভ্যন্তরভাগ যন্ত্রের দ্বারা পরিপূর্ণ; চালকযন্ত্র, ডুবো নাল, জলের গভীরতা মাপকারী যন্ত্র, টরপেডো চালনার নিমিত্ত বৈদ্যুতিক মোটর Gyroscopic compass প্রভৃতি নানা প্রকার চিত্রের আদর্শ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে যুদ্ধের দুই প্রকার সরঞ্জাম আছে। ইহা জলে ডুবিয়া টরপেডো ও জলে ভাসিয়া কামান ছুড়িতে পারে। ইহাতে কামান অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত থাকে; অর্থাৎ ঐ কামানগুলি চলন্ত প্ল্যাটফরমে রাখা হয়, কাজ শেষ হইলে উহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া হয়। সবমেরিণের নাবিকগণ আপনাদিগকে ভয়ানক সুখী মনে করে। কারণ তাহারা সমুদ্রের নিম্নদেশে বাস করিয়া বড়ই আনন্দে দিন কাটায়। প্রত্যেক সবমেরিণ জাহাজে ২৮ জন লোক নিযুক্ত থাকে। তাহাদের খাদ্যাদি বৈদ্যুতিক প্রবাহের দ্বারা প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমান বৃটিশ মকরপোতগুলি "ই" শ্রেণীভুক্ত। তাহাদের displacement আট শত টন এবং গতির বেগ ঘণ্টায় ১৬ নট। তাহাদের প্রত্যেকটী চারিটি করিয়া torpedo tubes ও দুইটি quick-firing কামানের দ্বারা সুসজ্জিত। প্রত্যেকটাতে ২৫৩০ লোক নিযুক্ত থাকে। আজকাল যে শ্রেণীর বড় সামরিক বোট অতি গোপনে নির্ম্মিত হইতেছে তাহাদের displacement ১০০০ টন। তাহাদের প্রত্যেকটীতে ২৭ জন লোক থাকে। তাহাতে দুইটী কামান ও ছয়টি টরপেডো নল আছে। ইহাদের সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না; তাহার কারণ সমস্তই সামরিক আইনের বলে গুপ্তভাবে রাখা হয়। Portsmouth ইংলণ্ডের সবমেরিণের আড্ডা। আর ডাসলার ক্রিকে ঐ সকল পোত সংস্কার করা হয়। এইখানে একটা সবমেরিণ বিদ্যালয় আছে। তাহাতে নূতন লোককে ঐ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যা শিক্ষার্থিগণকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়; কারণ ইহা শিক্ষা করা অতিশয় কঠিন। কতক্ষণ যে জাহাজখানি জলের নিম্নে থাকিবে কিংবা উপরে থাকিবে, তাহার সম্বন্ধে কোন শিক্ষানবীশের আন্দাজ না থাকায় কোন কোন লোক পলাইবার যোগাড় করে। পরীক্ষা দ্বারা এই সকল লোককে বাদ দেওয়া হয়। কেহ ভাল কাজ করিতে পারিবে না বলিয়া মনে হইলে তাহাকে প্রথম হইতে বিদায় দেওয়া হয়।

সবমেরিণের প্রত্যেক নাবিকের উপর সমস্ত জাহাজের ও অন্যান্য লোকের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। কারণ গভীর সমুদ্র-গর্ভে কোন নাবিকের ভুলের দরুণ সমস্ত জাহাজখানি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। আকস্মিক ভয় অনেক সময় সংক্রামক হয়; এই জন্য এইরূপ ভয় তরাসে লোকদিগকে সবমেরিণ পরিচালন-ব্যাপারে কোন দিন প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। কর্ত্তব্যের গুরুত্ব হেতু ইহার নাবিকগণকে বেতনও অধিক দেওয়া হয়। প্রথম-প্রথম সবমেরিণে বিপদ হওয়ায় এখন প্রত্যেক

সবমেরিণে একটী করিয়া air lock সংযুক্ত করা হইয়াছে। কোন দিন বিপদ হইলে এই স্থান হইতে প্রত্যেকে একটী করিয়া diving helmet ও jacket লইয়া conning-tower hatchএ উপস্থিত হইলে তাহাকে উপরে তুলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে পূর্ব্বে সবমেরিণে সদা-সর্ব্বদা যে বিপদপাত হইত, এক্ষণে তাহা বিরল হইয়াছে। Sir Percy Scottsএর উদ্যোগে সবমেরিণের প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে। তিনি বলেন যে, সবমেরিণের উন্নতির সহিত জলের উপরিভাগে যুদ্ধ একেবারে অনাবশ্যক হইয়া যাইবে। অধিক কি, বড় বড় "Dreadnaughts"গুলি কেবল সাজান থাকিবে, তাহার আর কোন কাজ থাকিবে না। ড্রেডনট বা সুপার-ড্রেডনটের নিষ্ফলতার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, বড়-বড় ড্রেডনটগুলি নির্ম্মাণ করিতে কত কোটী-কোটী টাকা ব্যয় হইয়া থাকে; কিন্তু সবমেরিণ অতি অল্প টাকায় ও অল্প সময়ে নির্ম্মিত হইতে পারে। যাহাতে অল্প খরচে বেশী কাজ হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় হইয়া থাকে।

এই পোতগুলি অদৃশ্যভাবে তাহাদের কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। তবে সবম্যারিণের একটা অসুবিধাও আছে। আজকাল জগতের সকল সভ্য জগৎ সমুদ্র বিমান (sea-planes) নির্ম্মাণ করিতেছে। এই বিমানের সাহায্যে তিন হাজার ফিট ঊর্দ্ধ হইতে আঠার ফিট জলের নীচে বিচরণকারী সবমেরিণকে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সবম্যারিণ হইতে ১৫০০ ফিট ব্যবধানস্থিত বিমান দেখা যায় না। টর্পেডোই সবমেরিণের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র; ইহার বলেই ইহার এত প্রসার ও প্রতিপত্তি।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, সবমেরিণ ত এত আশ্চর্য্য ব্যাপার; কিন্তু ইহা কিরূপে সমুদ্র তরঙ্গের ভিতর হইতে সহস্র-সহস্র ফিট ব্যবধানে স্থিত জাহাজকে তাগ করে ও তাহাকে টরপেডো দিয়া ধ্বংস করে? ইহাতে কোন সার্চ্চ-লাইট (search light) না এবং এমন কোন বন্দোবস্ত নাই যাহার দ্বারা সবমেরিণ তাহ উদ্দিষ্ট বস্তুকে অনায়াসে দেখিতে পারে। সবমেরিণ কেবল দিনমা তাহার (periscope) দৃষ্টিযন্ত্রের দ্বারা যা' কিছু দেখিতে পায়।

কোন-কোন সবমেরিণে তারহীন তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ সংযুক্ত থাকে তাহার দ্বারা সংবাদ গ্রহণ ও প্রেরণ করার সুবিধা আছে। কি Periscopeএর ক্রিয়া অতি আশ্চর্য্যজনক। সবমেরিণের মাস্তু গুলির উপর কতকগুলি prism থাকে; তাহাতে সমুদ্রস্থিত সম দ্রব্যের প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হইয়া একটী টেলিস্কোপের মধ্য দি আসে। যেখানে দুইটী periscope থাকে, সেখানে এক নিকটের এবং অপরটী দূরের ছবি অনায়াসে আনিয়া দেয়। যথ সবমেরিণস্থিত নাবিক তাহার পার্শ্বস্থিত দ্রব্যগুলি দেখিতে ইচ্ছা করে তখন periscope জলের উপরে উঠে। তখন ঐ কর্ম্মচারী দাঁড়াই পেরিস্কোপ সংযুক্ত বাইনোকুলার দ্বারা যে দিক ইচ্ছা সেই দিকের দ্রব্যা দেখিতে পায়। Periscope এত আশ্চর্য্যজনক হইলেও ইহা অনে সময়ে সবমেরিণকে বাঁচাইতে পারে না। অনেক সময়ে কোন কো সবমেরিণ না বুঝিয়া যুদ্ধ-জাহাজের নিচে আসিয়া পড়ে, কিংবা অ সবমেরিণের সহিত ধাক্কা লাগিয়া মারা পড়ে।

সবমেরিণের নানা দোষ অপনোদন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা কোন অনুভূতির যন্ত্র, অর্থাৎ ইহার নিকটে দিয়া কোন বড় জাহা কিংবা সবমেরিণের গমনাগমন জানিতে পারা যায় এমন কোন উপা থাকিলে, ইহার চরম উন্নতি সাধিত হইতে পারিত। সম্প্রতি কো এক বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত এইরূপ একটা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন ইহা আকাশবিহারী "বিমানের" কর্ণযন্ত্রের অনেকটা অনুরূ (aerial listening posts)।

দত্তা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ছেলের মুখে ব্যাপারটা শুনিয়া ক্রোধে, বিরক্তিতে ও আশাভঙ্গের নিদারুণ হতাশ্বাসে রাসবিহারীর ব্রহ্ম-জ্ঞান ও আনুসঙ্গিক ইত্যাদির খোলস এক মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িয়া গেল। তিনি তিক্ত-কটু কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আরে বাপু, হিঁদুরা যে আমাদের ছোটলোক বলে, সেটা ত আর মিছে কথা নয়। বামুন কায়েতের ছেলে হলে ভদ্রতাও শিখ্‌তিস, নিজের ভাল-মন্দ কিসে হয় না হয়, সে কাণ্ড-জ্ঞানও জন্মাতো। যাও, এখন মাঠে-মাঠে হাল-গরু নিয়ে কুল-কর্ম্ম কোরে বেড়াও গে! উঠ্‌তে-বস্‌তে তোকে পাখী-পড়া কো শেখালাম যে, ভালয়-ভালয় কাজটা একবার হয়ে যাক্ তার পরে যা'ইচ্ছে হয় করিস্; কিন্তু তোর সবুর সইল ন তুই গেলি তাকে ঘাঁটাতে! সে হোলো রায়-বংশে মেয়ে! ডাক-সাইটে হরি রায়ের নাতনী, যার ভ বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেতো। তুই হা বাড়িয়ে গেছিস্ তার নাকে দড়ি পরাতে—মুখ্যু কোথাকার মান-ইজ্জত গেল, অত বড় জমিদারীর আশা-ভরসা গে

মাসে-মাসে দু-দু'শ টাকা আদায় হচ্ছিল, সে গেল,—যা' এখন চাষার ছেলে চাষ-বাস করে খেগে যা! আবার আমার কাছে এসেছেন চোখ রাঙিয়ে তার নামে নালিশ করতে! যা যা—সুমুখ থেকে সরে যা হতভাগা, বোম্বেটে শয়তান!"

ঘটনাটা না ঘটিলেই যে ঢের ভাল হইত, তাহা বিলাস নিজেও বুঝিতেছিল। তাহাতে পিতৃদেবের এই ভীষণ উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার সতেজ আস্ফালন নিবিয়া জল হইয়া গেল। তথাপি কি একটু কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিতেই, ক্রুদ্ধ পিতা দ্রুতবেগে তাঁহার নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাগের মাথায় ছেলেকে যাই বলুন, কাজের বেলায় রাসবিহারী ক্রোধের উত্তেজনায় তাড়া-হুড়া করিয়াও কথনো কাজ মাটি করেন নাই, আলস্য করিয়াও কথনো ইষ্ট নষ্ট করে নাই। তাই সেদিনটা তিনি ধৈর্য্য ধরিয়া, বিজয়াকে শান্ত হইবার সময় দিয়া পরদিন তাঁহার নিজস্ব শান্তি এবং অবিচলিত গাম্ভীর্য্য লইয়া বিজয়ার বসিবার ঘরে দেখা দিলেন। এবং চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন।

বিজয়ার ক্রোধোন্মত্ততা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেলে, সে নিজের অসংযত রূঢ়তা এবং নির্লজ্জ প্রগল্‌ভতা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। বাড়ীর সমস্ত চাকর-বাকর এবং কর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে, উচ্চ কণ্ঠে সে এই যে একটা নাটকের অভিনয় করিয়া বসিল, হয় ত বা ইহারই মধ্যে তাহা নানা আকারে পল্লবিত এবং অতিরঞ্জিত হইয়া গ্রামের বাটীতে-বাটীতে পুরুষমহলে আলোচিত হইতেছে, এবং পুকুর ও নদীর ঘাটে মেয়েদের হাসি-তামাসার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই কদর্য্যতা কল্পনা করিয়া সে সেই অবধি আর ঘরের বাহিরে পর্য্যন্ত আসিতে পারে নাই। লজ্জা শতগুণে বাড়িয়া গেছে আরও এই মনে করিয়া যে, আজ যাহাকে সে ভৃত্য বলিয়া প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা করিতে কোন সঙ্কোচ মানে নাই, দুই দিন বাদে স্বামী বলিয়া তাহারই গলায় বর-মাল্য পরাইবার কথা রাষ্ট্র হইতেও কোথাও আর বাকী নাই।

তাই রাসবিহারী যখন ধীরে-ধীরে ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দ, প্রসন্ন মুখে আসন গ্রহণ করিলেন, তখন বিজয়া মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিতে পারিল না। কিন্তু ইহারই জন্য সে প্রত্যেক মুহূর্ত্তই প্রতীক্ষা করিয়াছিল। এবং যে সকল যুক্তিতর্কের ঢেউ এবং অপ্রিয় আলোচনা উঠিবে, তাহার মোটামুটি খস্‌ড়াটা কাল হইতেই ভাবিয়া লইয়া, সে এক প্রকার স্থির হইয়াই অধোমুখে বসিয়া রহিল। কিন্তু বৃদ্ধ ঠিক উল্টা সুর ধরিয়া বিজয়াকে একেবারে অবাক্ করিয়া দিলেন। তিনি ক্ষণেক কাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মা বিজয়া, শুনে পর্য্যন্ত যে আমার কি আনন্দ হয়েচে, তা জানাবার জন্যে আমি কালই ছুটে আসতাম—যদি না সেই অম্বলের ব্যথাটা আমাকে বিছানায় পেড়ে ফেল্‌তো। দীর্ঘজীবী হও মা, আমি এই ত চাই! এই ত তোমার কাছে আশা করি।" বলিয়া অত্যন্ত উচ্চ ভাবের আর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, "সেই সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময়ের কাছে শুধু এই প্রার্থনা জানাই, সুখে-দুঃখে, ভালতে-মন্দতে, যেন আমাকে তিনি যা ধর্ম্ম, যা ন্যায়, তার প্রতিই অবিচলিত শ্রদ্ধা রাখবার সামর্থ্য দেন।" বলিয়া তিনি যুক্ত-কর মাথায় ঠেকাইয়া চোখ বুজিয়া বোধ করি সেই সর্ব্বশক্তিমানকেই প্রণাম করিলেন।

পরে চোখ চাহিয়া হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন "কিন্তু এই কথাটা আমি কোনমতেই ভেবে পাইনে বিজয়া, বিলাস আমার মত একটা খোলা-ভোলা উদাসীন লোকের ছেলে হ'য়ে এত বড় পাকা বিষয়ী হয়ে উঠ্‌ল কি কোরে? যার বাপের আজও সংসারে কাজ কর্ম্মের জ্ঞান, লাভ-লোকসানের ধারণাই জন্মালো না, সে এই বয়সের মধ্যেই এরূপ দৃঢ়কর্ম্মী হয়ে উঠ্‌ল কেমন করে? কি যে তাঁর খেলা, কি যে সংসারের রহস্য, কিছুই বোঝবার জো নেই মা!" বলিয়া আর একবার মুদিত নেত্রে তিনি নমস্কার করিলেন।

বিজয়া নীরবে বসিয়া রহিল। রাসবিহারী আবার একটু মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু কোন জিনিসেরই ত অত্যন্ত ভাল নয়। জানি, বিলাসের কাজ-অন্ত প্রাণ! সেখানে সে অন্ধ! কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা তার বুকে শূলের মত বাজে; কিন্তু, তাই বলে কি মানীর মান রাখ্‌তে হবে না? দয়ালের মত লোকেরও কি ত্রুটি মার্জ্জনা করা আবশ্যক নয়! জানি, অপরাধ ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন বিচার করে না। কিন্তু তাই বলে কি তাকে অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চল্‌তে হবে? সব বুঝি। কাজ না করাও দোষ, খবর না দিয়ে কামাই করাও খুব অন্যায়, আফিসের

ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করাও আফিস-মাষ্টারের পক্ষে বড় অপরাধ; কিন্তু, দয়ালকেও কি,—না মা, আমরা বুড়ো মানুষ, আমাদের সে তেজও নেই, জোরও নেই,—সাহেবেরা বিলাসের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার যত সুখ্যাতিই করুক, তাকে যত বড়ই মনে করুক,—আমরা কিন্তু কিছুতেই ভাল বল্‌তে পারব না। নিজের ছেলে বলে ত এ মুখ দিয়ে মিথ্যে বার হবে না, মা! আমি বলি, কাজ না হয় দুদিন পরেই হোতো, না হয় দশটাকা লোকসানই হতো; কিন্তু তাই বলে কি মানুষের ভুল-ভ্রান্তি, দুর্ব্বলতা ক্ষমা করতে হবে না? তোমার জমিদারীর ভালমন্দের পরেই যে বিলাসের সমস্ত মন পড়ে থাকে, সে তার প্রত্যেক কথাটিতেই বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু, আমাকে ভুল বুঝো না মা। আমি নিজে সংসার-বিরাগী হলেও বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করা যে গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম, তা স্বীকার করি। তার উন্নতি করা আরও ঢের বড় ধর্ম্ম; কারণ, সে ছাড়া জগতের মঙ্গল করা যায় না। আর বিলাসের হাতে তোমাদের দুজনের জমিদারী যদি দ্বিগুণ, চতুর্গুণ এমন কি দশগুণ হয় শুনতে পাই, আমি তাতেও বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্য হব না—আর হচ্চেও তাই দেখ্‌তে পাচ্চি। সব ঠিক, সব সত্যি,—কিন্তু, তাই বলে যে বিষয়ের উন্নতিতে কোথাও একটু সামান্য বাধা পৌঁছলেই ধৈর্য্য হারাতে হবে, সেও যে মন্দ। আমি তাই সেই অদ্বিতীয় নিরাকারের শ্রীপাদপদ্মে বারবার ভিক্ষা জানাচ্চি, মা, তার উদ্ধত অবিনয়ের জন্যে যে শাস্তি তাকে তুমি দিয়েচ, তার থেকেই সে যেন ভবিষ্যতে সচেতন হয়। কাজ! কাজ! সংসারে শুধু কাজ করতেই কি এসেছি! কাজের পায়ে কি দয়া-মায়াও বিসর্জ্জন দিতে হবে! ভালই হয়েচে মা, আজ সে তোমার হাত থেকেই তার সর্ব্বোত্তম শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ পেয়েচে!"

বিজয়া কোন কথাই কহিল না। রাসবিহারী কিছুক্ষণ যেন নিজের অন্তরের মধ্যেই মগ্ন থাকিয়া পরে মুখ তুলিলেন। একটু হাস্য করিয়া কোমল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমার দু'টি সন্তানের একটি প্রচণ্ড কর্ম্মী, আর একটির হৃদয়ে যেন স্নেহ-মমতা-করুণার নির্ঝর! একজন যেমন কাজে উন্মাদ, আর একটি তেমনি দয়া-মায়ায় পাগল! আমি কাল থেকে শুধু স্তব্ধ হয়ে ভাবচি, ভগবান এই দুটিকে যখন জুড়ি মিলিয়ে তাঁর রথ চালাবেন, তখন দুঃখের সংসারে না জানি কি স্বর্গই নেমে আসবে! আমার আর এক প্রার্থনা, মা, এ অলৌকিক বস্তুটি চোখে দেখ্‌বার জন্যে তিনি যেন আমাকে একটি দিনের জন্যেও জীবিত রাখেন'।" বলিয়া এইবার তিনি টেবিলের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। মাথা তুলিয়া কহিলেন, "অথচ, আশ্চর্য্য, ধর্ম্মের প্রতি ত তার সোজা অনুরাগ নয়! প্রতিষ্ঠা নিয়ে কি প্রাণান্ত পরিশ্রমই না সে করেচে। যে তাকে জানে না, সে মনে করবে, বিলাসের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ছাড়া বুঝি সংসারে আর কোন উদ্দেশ্যই নেই! শুধু এরই জন্যে সে বুঝি বেঁচে আছে,—এ ছাড়া আর বুঝি সে কিছু জানে না! কিন্তু কি ভুল দেখ মা। নিজের ছেলের কথায় এম্‌নি অভিভূত হয়ে পড়েচি যে তোমাকেই বোঝাচ্চি। যেন আমার চেয়ে তাকে তুমি কম বুঝেচ! যেন আমার চেয়ে তার তুমি কম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী!" বলিয়া মৃদু-মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "আমার এত আনন্দ ত শুধু সেই জন্যেই মা আমি যে তোমার হৃদয়ের ভিতরটা আরসির মত স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি। তোমার কল্যাণের হাতখানি যে বড় উজ্জ্বল দেখা যাচ্চে। আর তাও বলি, তুমি ছাড়া এ কাজ করতে পারেই বা কে, করবেই বা কে? তার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সকলের যে তুমিই সঙ্গিনী। তোমার হাতেই যে তার সমস্ত শুভ নির্ভর করচে! তার শক্তি, তোমার বুদ্ধি! সে ভার বহন করে চল্‌বে, তুমি পথ দেখাবে। তবেই ত দুজনের জীবন একসঙ্গে সার্থক হবে মা! সেই জন্যেই ত আজ আমার সুখ ধরচে না। আজ যে চোখের উপরে দেখ্‌তে পেয়েচি বিলাসের আর ভয় নেই, তার ভবিষ্যতের জন্যে আমাকে একটি মুহূর্ত্তের জন্যেও আর আশঙ্কা করতে হবে না! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—এত চিন্তা, এত জ্ঞান, ভবিষ্যৎ-জীবন সফল কোরে তোলবার এত বড় বুদ্ধি ঐটুকু মাথার মধ্যে এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে মা? আজ আমি যে একেবারে অবাক্ হয়ে গেছি!"

বিজয়ার সর্ব্বাঙ্গ চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। রাসবিহারী ঘড়ির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "ইস্, দশটা বাজে যে! একবার দয়ালের স্ত্রীকে দেখ্‌তে যেতে হবে যে!" বিজয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তিনি কেমন আছেন?" "ভালই আছেন," বলিয়া তিনি দ্বারের দিকে

দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়া, হঠাৎ থামিয়া পড়িয়া বলিলেন, "কিন্তু আসল কথাটা যে এখনো বলা হয়নি।" বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার এই বুড়ো কাকাবাবুর একটি অনুরোধ তোমাকে রাখ্‌তে হবে বিজয়া। বল রাখ্‌বে?" বিজয়া মনে-মনে ভীত হইয়া উঠিল। তাহার মুখের ভাব কটাক্ষে লক্ষ্য করিয়া রাসবিহারী বলিলেন, "সে হবে না, সন্তানের এ আবদারটি মাকে রাখতেই হবে। বল রাখ্‌বে?" বিজয়া অস্ফুট স্বরে কহিল, "বলুন।"

তখন রাসবিহারী কহিলেন, "সে যে শুধু আহার-নিদ্রাই পরিত্যাগ করেছে, তাই নয়,—অনুতাপেও দগ্ধ হয়ে যাচ্চে জানি; কিন্তু তোমাকে মা এ ক্ষেত্রে একটু শক্ত হতে হবে। কাল অভিমানে সে আসেনি, কিন্তু আজ আর থাকৃতে পারবে না—এসে পড়্‌বেই; কিন্তু, ক্ষমা চাইবা-মাত্রই যে মাপ করবে সে হবে না—এই আমার একান্ত অনুরোধ। যে অন্যায়ের শাস্তি তাকে দিয়েচ, অন্ততঃ সে শাস্তি আরও একটা দিন সে ভোগ করুক।" এই বলিয়া বিজয়ার মুখের উপর বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া তিনি একটু হাসিলেন। স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন, "তোমার নিজের যে কত কষ্ট হচ্চে, সে কি আমার অগোচর আছে মা? তোমাকে কি চিনিনে? তুমি আমারই ত মা? বরঞ্চ তার চেয়েও বেশি ব্যথা পাচ্চো, সেও আমি জানি। কিন্তু, অপরাধের শাস্তি পূর্ণ না হলে যে প্রায়শ্চিত্ত হয় না! এই গভীর দুঃখ আরো একটা দিন সহ্য না করলে যে সে মুক্ত হবে না! শক্ত না হতে পারো, তার সঙ্গে দেখা, করো না; কিন্তু আজ সে বিফল হয়ে ফিরে যাক্‌। এই যন্ত্রণা আরও কিছু তাকে ভোগ করতে দাও—এই আমার একান্ত অনুরোধ বিজয়া।"

রাসবিহারী প্রস্থান করিলে বিজয়া অকৃত্রিম বিস্ময়ে আবিষ্টের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এই সকল কথা, এরূপ ব্যবহার তাঁহার কাছে সে একেবারেই প্রত্যাশা করে নাই। বরঞ্চ ঠিক বিপরীতটাই আশঙ্কা করিয়া, তাঁহার আগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই আপনাকে সে কঠিন করিয়া তুলিতে মনে-মনে চেষ্টা করিয়াছিল। বিলাস একাকী আঘাত খাইয়া চলিয়া গেছে, কিন্তু প্রতিঘাতের বেলা সে যে একলা আসিবে না, এবং তখন রাসবিহারীর সহিত তাহার যে একটা অত্যন্ত কড়া রকমের বোঝা-পড়ার সময় আসিবে, তাহার সমস্ত বীভৎসতার নগ্ন মূর্ত্তিটা কল্পনায় অঙ্কিত করিয়া অবধি বিজয়ার মনে তিলমাত্র শান্তি ছিল না।

এখন বৃদ্ধ ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেলে, শুধু তাহার বুকের উপর হইতে ভয়ের একটা গুরুভার পাথর নামিয়া গেল না,—সে যে এক সময়ে এই লোকটিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত, সে কথাও মনে পড়িল। এবং কেন যে এতবড় শ্রদ্ধাটা ধীরে-ধীরে সরিয়া গেল, তাহারও ঝাপ্‌সা আভাসগুলা একই সঙ্গে মনে পড়িয়া আজ তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। এমনও একটা সংশয় তাহার অন্তরের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল, হয় ত সে এই বৃদ্ধের যথার্থ সঙ্কল্প না বুঝিয়াই তাঁহার প্রতি মনে-মনে অবিচার করিয়াছে; এবং তাহার পরলোকগত পিতৃ আত্মা আবাল্য সুহৃদের প্রতি এই অন্যায়ে ক্ষুব্ধ হইতেছেন। সে বার-বার করিয়া আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, কই, তিনি ত সত্যকার অপরাধের বেলায় নিজের ছেলেকেও মাপ করেন নাই! বরঞ্চ, আমি যেন তাহাকে সহজে ক্ষমা করিয়া তাহার শাস্তিভোগের পরিমাণটা কমাইয়া না দিই, তিনি বারবার সেই অনুরোধই করিয়া গেলেন। আর সকল অনুরোধ-উপরোধ-আন্দোলন-আলোচনার মধ্যে বৃদ্ধের যে ইঙ্গিতটা সকলের চেয়ে গোপন থাকিয়াও সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, সেটা বিলাসের অসীম ভালবাসা, এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল—প্রবল ঈর্ষা।

জিনিসটা বিজয়ার নিজের কাছেও যে অজ্ঞাত ছিল, তা' নয়; কিন্তু, বাহিরের আলোড়নে তাহা যেন নূতন তরঙ্গ তুলিয়া তাহার বুকে আসিয়া লাগিল। এতদিন যাহা শুধু তাহার হৃদয়ের তলদেশেই থিতাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই বাহিরের আঘাতে ফুলিয়া উঠিয়া হৃদয়ের উপরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাই রাসবিহারী বহুক্ষণ চলিয়া গেলেও, তাঁহার আলাপের ঝঙ্কার দুই কাণের মধ্যে লইয়া বিজয়া তেমনি নিঃশব্দে জানালার বাহিরে চাহিয়া বিভোর হইয়া বসিয়া রহিল। ঈর্ষা বস্তুটা সংসারে চিরদিনই নিন্দিত সত্য, তথাপি সেই নিন্দিত দ্রব্যটা আজ বিজয়ার চক্ষে বিলাসের অনেকখানি নিন্দাকে

ফিকা করিয়া ফেলিল। এবং যাহাকে প্রতিপক্ষ কল্পনা করিয়া তাহাদের পিতাপুত্রের সহস্র রকমের প্রতিহিংসার বিভীষিকা কাল হইতে তাহাকে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত নিরুদ্যম ও নির্জ্জীব করিয়া আনিতেছিল, আজ আবার তাহাদিগকেই আপনার জন ভাবিতে পাইয়া সে যেন হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল।

কালীপদ আসিয়া বলিল, "মা'ঠান, তা'হলে এখন আমার যাওয়া হোলো না বলে' বাড়ীতে আর একখানা চিঠি লিখিয়ে দিই?" বিজয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আচ্ছা—" কালীপদ চলিয়া যাইতেছিল, বিজয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া সলজ্জ-দ্বিধাভরে কহিল, "না হয়, আমি বলি কি কালীপদ, চিঠি যখন লিখে দেওয়াই হয়েচে, তখন মাস-খানেকের জন্যে একবার বাড়ী থেকে ঘুরে এসো। ওঁর কথাটাও থাক্. তোমারও একবার বাড়ী যাওয়া—অনেক দিন ত যাওনি, কি বল?" কালীপদ মনে-মনে আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু সম্মত হইয়া কহিল, "আচ্ছা, আমি মাসখানেক ঘুরেই আসি মা'ঠান।" এই বলিয়া সে প্রস্থান করিলে তাহার কি একরকম যেন ভারি লজ্জা করিতে লাগিল; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে আর একবার ফিরাইয়া ডাকিয়া নিষেধ করিয়া দিতেও পারিল না। সেও লজ্জা করিতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাচীরের ধারে যে কয়টা ঘর লইয়া বিজয়ার জমীদারীর কাজ-কর্ম্ম চলিত, তাহার ঠিক সম্মুখেই একসার ঘন-পল্লবের লিচু গাছ থাকায়, বসত-বাটীর উপরের বারান্দা হইতে ঘরগুলার কিছুই প্রায় দেখা যাইত না। তা ছাড়া, পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের গায়ে যে ছোট দরজাটি ছিল, তাহা দিয়া যাতায়াত করিলে, কর্ম্মচারীদের কে কখন আসিতেছে যাইতেছে তাহার কিছুই জানিবার জো ছিল না।

সেই অবধি দয়াল বাড়ীর মধ্যে আর আসেন নাই। কাজ করিতে কাছারিতে আসেন কি না, সঙ্কোচবশতঃ সে সংবাদও বিজয়া লয় নাই। আর, বিলাসবিহারী যে এ দিক মাড়ান না তাহা কাহাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়াই সে স্বতঃসিদ্ধের মত মানিয়া লইয়াছিল। মধ্যে শুধু একদিন সকালে মিনিট-দশেকের জন্য রাসবিহারী দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ ভাবে দুই চারিটা অসুখের কথা-বার্ত্তা ছাড়া আর কোন কথাই হয় নাই।

মানুষের অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানুন, কিন্তু মুখের যেটুকু প্রসন্নতা এবং সৌহৃদ্য লইয়া সেদিন তিনি পুত্রের বিরুদ্ধে ওকালতি করিয়া গিয়াছিলেন, কোন অজ্ঞাত কারণে সে ভাব তাঁহার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে নিশ্চয় বুঝিয়া বিজয়া উদ্বেগ অনুভব করিয়াছিল। মোটের উপর সবটুকু জড়াইয়া একটা অতৃপ্তি ও অস্বস্তির মধ্যেই তাহার দিন কাটিতেছিল। এমন করিয়াও আরও কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

আজ অপরাহ্ণ বেলায় সে বাটীর কাছাকাছি নদীর তীরে একটুখানি বেড়াইয়া আসিবার জন্য একাকী বাহির হইতেছিল, বৃদ্ধ নায়েব মশাই একতাড়া খাতা-পত্র বগলে লইয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা কি কোথাও বার হচ্চেন? কানাই সিং কই?" বিজয়া হাসিমুখে বলিল, "এই কাছেই একটুখানি নদীর তীরে ঘুরে আস্‌তে যাচ্চি। দরওয়ানের দরকার নেই। আমাকে কি আপনার কোন আবশ্যক আছে?"

নায়েব কহিল, "একটু ছিল মা। না হয় কালকেই হবে।" বলিয়া সে ফিরিবার উপক্রম করিতেই, বিজয়া পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দরকার যদি একটুখানিই হয় ত আজই বলুন না। অত খাতা-পত্র নিয়ে কোথায় চলেছেন?" নায়েব সেইগুলাই দেখাইয়া কহিল, "আপনার কাছেই এসেছি। গত বছরের হিসেবটা সারা হয়েছে,—মিলিয়ে দেখে একটা দস্তখত কোরে দিতে হবে। তা ছাড়া, ছোট বাবু হুকুম দিয়েছেন, হাল সনের জমা-খরচটাতেও রোজ তারিখে আপনার সই নেওয়া চাই।"

বিজয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিল। নায়েব সঙ্গে আসিয়া টেবিলের উপর সেগুলা রাখিয়া দিয়া একখানা খুলিবার উদ্যোগ করিতেই বিজয়া বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল, "এ হুকুম ছোট বাবু কবে দিলেন?" নায়েব বলিল, "আজই সকালে দিয়েছেন।"

"আজ সকালে তিনি এসেছিলেন?" "তিনি তো রোজই আসেন।" "এখন কাছারি ঘরে আছেন?"

নায়েব ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এইমাত্র চলে গেলেন।"

সেদিনের হাঙ্গামা কোন আমলারই অবিদিত ছিল না।

নায়েব বিজয়ার প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝিয়া ধীরে-ধীরে অনেক কথাই কহিল। বিলাসবিহারী প্রত্যহ ঠিক এগারোটার সময় কাছারীতে উপস্থিত হন; কাহারো সহিত বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা কহেন না, নিজের মনে কাজ করিয়া পাঁচটার সময় বাড়ী ফিরিয়া যান। দয়ালবাবুর বাটীতে অসুখ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার আসিবার আবশ্যক নাই বলিয়া তাঁহাকে ছুটি দিয়াছেন, ইত্যাদি অনেক ব্যাপার মনিবের গোচর করিল।

বিজয়া লজ্জিত মুখে নীরবে সমস্ত কাহিনী শুনিয়া বলিল, "এগুলো থাক্, কাল সকালে একবার এসে আমার সই নিয়ে যাবেন।" বলিয়া নায়েবকে বিদায় দিয়া সেই-খানেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে দিনের আলো ক্রমশঃ নিবিয়া আসিল, এবং প্রতিবেশীদের ঘরে-ঘরে শাঁখের শব্দে সন্ধ্যার শান্ত আকাশ চঞ্চল হইয়া উঠিল; তথাপি তাহার উঠিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আরও কতক্ষণ যে সে এম্নি একভাবে বসিয়া কাটাইত, বলা যায় না; কিন্তু বেহারা আলো হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কর্ত্রীকে একাকী দেখিয়া যেমন চমকাইয়া উঠিল, বিজয়া নিজেও তেমনি লজ্জা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বাহিরে আসিয়াই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। যে জিনিসটি তাহার চোখে পড়িল সে তাহার সুদূর কল্পনারও অতীত। সে কি কোন কারণে কোন ছলে আর এ বাড়ীতে পা দিতে পারে? অথচ, সেই প্রায়ান্ধকারেও স্পষ্ট দেখা গেল, সে দিনের সেই সাহেবটিই হ্যাট সমেত প্রায় সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ লইয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এবং সাধারণ বাঙালীর অন্ততঃ আড়াই গুণ লম্বা পা ফেলিয়া এই দিকেই আসিতেছে।

আজ আর তাহার পুলিশ কর্ম্মচারী বলিয়া ভুল হয় নাই। কিন্তু আনন্দের সেই অপরিমিত দীপ্ত রেখাটিকে যে তাহার আকাশ-পাতাল-জোড়া নিরাশা ও ভয়ের অন্ধকার চক্ষের পলকে গিলিয়া ফেলিল! গাছ-পালায় ঘেরা আঁকা-বাঁকা পথের মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু পথের কাঁকরে তাহার জুতার শব্দ ক্রমেই সন্নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিল। বিজয়া মনে-মনে বুঝিল, তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসানো ভয়ানক অন্যায়, কিন্তু দ্বারের বাহিরে হইতে অবহেলায় বিদায় দেওয়াও যে অসাধ্য!

এই অবস্থা-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের উপায় কোন দিকে খুঁজিয়া না পাইয়া যে মুহূর্ত্তে পথের বাঁকে কামিনী গাছের পাশে সেই দীর্ঘ ঋজুদেহ তাহার সুমুখে আসিয়া পড়িল, সেই মুহূর্ত্তেই সে পিছন ফিরিয়া দ্রুতবেগে তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ নায়েব কিছুই লক্ষ্য করে নাই, নিজের মনে চলিয়াছিল; অকস্মাৎ সাহেব দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সাহেবের প্রশ্নে চিনিতে পারিয়া আশ্বস্ত এবং নিরাপদ হইয়া জবাব দিল, "হাঁ, উনি বাহিরের ঘরেই আছেন," বলিয়া চলিয়া গেল। প্রশ্ন এবং উত্তর দুইই বিজয়ার কাণে গেল। ক্ষণেক পরেই ঘরে ঢুকিয়া নরেন্দ্র নমস্কার করিল। লাঠি এবং টুপি টেবিলের উপর রাখিয়া সহাস্যে কহিল, "এই যে দেখ্‌চি আমার ওষুধের চমৎকার ফল হয়েচে। বাঃ!"

বিজয়া মনে-মনে ভাবিয়াছিল আজ বুঝি সে চোখ তুলিয়া চাহিতেও পারিবে না,—একটা কথার জবাব পর্য্যন্ত তাহার মুখে ফুটিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই লোকটির কেবল কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্রই শুধু যে তাহার দ্বিধা-সঙ্কোচই ভোজবাজির মত অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাই নয়; তাহার হৃদয়ের অন্ধকার, অজ্ঞাত কোণে সুরবাঁধা বীণার তারের উপর কে যেন না জানিয়া আঙুল বুলাইয়া দিল। এবং এক মুহূর্ত্তেই বিজয়া তাহার সমস্ত বিষাদ বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি কোরে জানলেন? আমাকে দেখে, না—কারো কাছে শুনে?" নরেন্দ্র বলিল "শুনে। কেন, আপনি কি দয়াল বাবুর কাছে শোনেন নি যে আমার ওষুধ খেতে পর্য্যন্ত হয় না, শুধু প্রেস্‌ক্রিপসানটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলেও অর্দ্ধেক কাজ হয়!" বলিয়া নিজের রসিকতায় প্রফুল্ল হইয়া অট্টহাস্যে ঘর কাঁপাইয়া তুলিল।

বিজয়া বুঝিল সে দয়ালের কাছে সমস্ত শুনিয়াই তবে আজ ব্যঙ্গ করিতে আসিয়াছে। তাই এই অসঙ্গত উচ্চ হাস্যে মনে-মনে রাগ করিয়া ঠোকর দিয়া বলিল, "ওঃ—তাই বুঝি বাকি অর্দ্ধেকটা সারাবার জন্যে দয়া করে আবার ওষুধ লিখে দিতে এসেছেন?" খোঁচা খাইয়া নরেনের হাসি থামিল। কহিল "বাস্তবিক বল্‌চি, এ এক আচ্ছা তামাসা—" বিজয়া কহিল, "তাই বুঝি এত খুসি হয়েছেন?" নরেনের মুখ গম্ভীর হইল। কহিল, "খুসি হয়েচি? একেবারে

না। অবশ্য এ কথা একেবারে অস্বীকার করতে পারিনে যে, শুনেই প্রথমে একটু আমোদ বোধ হয়েছিল; কিন্তু তার পরেই বাস্তবিক দুঃখিত হয়েছি। বিলাসবাবুর মেজাজটা তেমন ভাল নয় সত্যি,—অকারণে খামকা রেগে উঠে পরকে অপমান করে বসেন,—কিন্তু তাই বলে' আপনিও যে অসহিষ্ণু হয়ে কতকগুলো অপমানের কথা বলে ফেল্‌বেন সেও তো ভাল নয়। ভেবে দেখুন দিকি, কথাটা প্রকাশ পেলে ভবিষ্যতে কতবড় একটা লজ্জা এবং ক্ষোভের কারণ হবে। আমাকে বিশ্বাস করুন, বাস্তবিকই শুনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েচি। আমার জন্যে আপনাদের মধ্যে এরূপ একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায়—"

এই লোকটির হৃদয়ের পবিত্রতায় বিজয়া মনে মনে মুগ্ধ হইয়া গেল। তথাপি পরিহাসের ভঙ্গীতে কহিল, "কিন্তু হাসিও যে চাপ্‌তে পাচ্ছেন না।" বলিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিল।

নরেন জোর করিয়া এবার ভয়ানক গম্ভীর হইয়া কহিল, "কেন আপনি বারবার তাই মনে করচেন? যথার্থই আমি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হয়েচি। কিন্তু তখন আমি আপনাদের সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না।" একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল, "সেই দিনই নীচে তাঁর বাবা সমস্ত কথা জানিয়ে বল্‌লেন, ঈর্ষা! দয়ালবাবুও কাল তাই বল্‌লেন। শুনে আমি কি যে লজ্জা পেয়েচি বল্‌তে' পারিনে। কিন্তু এত লোকের মধ্যে আমাকে ঈর্ষা করবার মত কি আমার আছে, আমি তাও ত ভেবে পাইনে। আপনারা ব্রাহ্ম-সমাজের, আবশ্যক হলে সকলের সঙ্গেই কথা ক'ন—আমার সঙ্গেও কয়েছেন। এতে এম্‌নি কি দোষ তিনি দেখতে পেয়েছেন, আমি ত আজও খুঁজে পাইনে। যাই হোক্‌, আমাকে আপনারা মাপ করবেন,—আর ওই বাঙলায় কি বলে—অভি—অভিনন্দন! আমিও আপনাকে তাই জানিয়ে যাচ্চি, আপনারা সুখী হোন্‌।"

সে নিজের আচরণের উল্লেখ করিতে গিয়াও যে বিজয়ার সেদিনের আচরণ সম্বন্ধে লেশমাত্র ইঙ্গিত করে নাই, বিজয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল; কিন্তু তাহার শেষ কথাটায় বিজয়ার দুই চক্ষু অকস্মাৎ অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল। সে ঘাড় ফিরাইয়া কোনমতে চোখের জল সামলাইতে লাগিল।

প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, সেদিন কালীপদকে দিয়ে হঠাৎ ষ্টেশনে মাইক্রস্কোপটা পাঠিয়েছিলেন কেন, বলুন ত?"

বিজয়া রুদ্ধস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, "আপনার জিনিস আপনি নিজেই ত ফিরে চেয়েছিলেন।"

নরেন বলিল, "তা বটে; কিন্তু দামের কথাটা ত তাঁকে দিয়ে বলে পাঠান নি? তা' হলে ত আমার—"

বিজয়া কহিল, "না। জ্বরের ওপর আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু সেই ভুলের শাস্তিও ত আপনি আমাকে কম দেননি!" নরেন লজ্জিত হইয়া কহিল, "কিন্তু কালীপদ যে বল্‌লে—" বিজয়া বাধা দিয়া বলিল, "সে আমি শুনেচি। কিন্তু, যাই কেন না সে বলুক, আপনাকে উপহার দেবার মত স্পর্দ্ধা আমার থাক্‌তে পারে—এমন কথা কি কোরে আপনি বিশ্বাস করলেন! আর সত্যিই তাই যদি করে থাকি, নিজের হাতে কেন শাস্তি দিলেন না? কেন চাকরকে দিয়ে আমার অপমান করলেন? আপনার কি আমি করেছিলুম?" বলিতে বলিতেই তাহার গলা যেন ভাঙিয়া আসিল।

নরেন লজ্জিত এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বিজয়ার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, সে ঘাড় ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া আছে। মুখ তাহার চোখে পড়িল না, চোখে পড়িল শুধু তাহার গ্রীবার উপর হীরার কণ্ঠির একটু-খানি,—দীপালোকে বিচিত্র রশ্মি প্রতিফলিত করিতেছে। উভয়েই কিছুক্ষণ মৌন থাকার পরে নরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে ধীরে-ধীরে কহিল, "কাজটা যে আমার ভাল হয়নি, সে আমি তখনি টের পেয়েছিলাম, কিন্তু ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছিল। কালীপদর দোষ কি? তার ওপর রাগ করা আমার কিছুতেই উচিত হয়নি।" আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "দেখুন, ঐ ঈর্ষা জিনিসটা যে কত মন্দ, এবার আমি ভাল করেই টের পেয়েছি। ও যে শুধু নিজের ঝোঁকেই বেড়ে চলে তাই নয়; সংক্রামক ব্যাধির মত অপরকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না। এখন ত আমি বেশ্‌ জানি, আমাকে ঈর্ষা করার মত ভ্রম বিলাস বাবুর আর কিছু তেই পারে না। তাঁর বাবাও সে জন্যে লজ্জা এবং দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু আপনি শুনে হয় ত আশ্চর্য্য হবেন যে, আমার নিজেরও তখন বড় কম ভুল হয়নি।" বিজয়া মুখ না ফিরাইয়াই প্রশ্ন করিল, "আপনার ভুল কি

রকম ?" নরেন অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দিল, "আমাকে নিরর্থক ওরকম অপমান করায় আপনি যে সত্যিই ক্লেশ বোধ করেছিলেন, সে তো আপনার কথা শুনে সবাই বুঝ্‌তে পেরেছিল। তার উপর রাসবিহারী বাবু যখন নীচে গিয়ে তাঁর ছেলের ওই ঈর্ষার কথাটা তুলে আমাকে দুঃখ করতে নিষেধ করলেন, তখন হঠাৎ দুঃখটা আমার যেন বেড়ে গেল। কেবলি মনে হতে লাগ্‌ল, নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে; নইলে শুধু শুধু কেউ কারুকে হিংসে করে না। আপনাকে আজ আমি যথার্থ বল্‌চি, তার পরে ৮।১০ দিন বোধ করি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেইশ ঘণ্টা শুধু আপনাকেই ভাবতুম। আর আপনার অসুখের সেই কথাগুলোই মনে পড়ত। তাই ত বলছিলুম,—এ কি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ, বলুন ত! কাজ্‌-কর্ম্ম চুলোয় গেল—দিবারাত্রি আপনার কথাই শুধু মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এর কি আবশ্যক ছিল বলুন ত! আর শুধু কি তাই? দু-তিন দিন এই পথে অনর্থক হেঁটে গেছি কেবল আপনাকে দেখ্‌বার জন্যে! দিনকতক সে এক আচ্ছা পাগ্‌লা ভূত আমার ঘাড়ে চেপেছিল!" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। বিজয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল না, একটা কথার জবাব দিল না, নীরবে উঠিয়া পাশের দরজা দিয়া বাটীর ভিতরে চলিয়া গেল। এবং আর একজনের মুখের হাসি চক্ষের পলকে নিবিয়া গেল। যে পথে সে বাহির হইয়া গেল, সেই অন্ধকারের মধ্যে নির্নিমেষ চাহিয়া নরেন হতবুদ্ধি হইয়া শুধু ভাবিতে লাগিল, না জানিয়া এ আবার কোন্‌ নূতন অপরাধের সে সৃষ্টি করিয়া বসিল!

সুতরাং বেহারা আসিয়া যখন কহিল, "আপনি যাবেন না, আপনার চা তৈরি হচ্চে"—তখন নরেন ব্যস্ত হইয়াই বলিয়া উঠিল, "আমার চা' দরকার নেই ত।" "কিন্তু মা আপনাকে বস্‌তে বলে দিলেন।" বলিয়া বেহারা চলিয়া গেল। ইহাও নরেন্দ্রকে কম আশ্চর্য্য করিল না। প্রায় মিনিট-পনেরর পরে চাকরের হাতে চা এবং নিজের হাতে জলখাবারের থালা লইয়া বিজয়া প্রবেশ করিল। সে যে সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার মুখের উপর হইতে রোদনের ছায়া মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, তাহা অস্পষ্ট দীপালোকে হয় ত আর কাহারও চোখে ধরা পড়িত না,—কিন্তু ডাক্তারের অভ্যস্ত চক্ষুকে সে সম্পূর্ণ ফাঁকি দিতে পারিল না। কিন্তু এখন আর নরেন্দ্র হঠাৎ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিল না। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সে অনেক বিষয়েই সতর্ক এবং সংযত হইতে শিক্ষা করিয়াছিল। যে দিন সে প্রায় অপরিচিত হইয়াও অন্তরের সামান্য কৌতূহল ও ইচ্ছার চাঞ্চল্য দমন করিতে না পারিয়া হাত দিয়া বিজয়ার মুখ তুলিয়া ধরিয়াছিল, এখন আর তাহার সে দিন ছিল না। তাই সে চুপ করিয়াই রহিল।

চাকর টেবিলের উপর চা রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বিজয়া তাহারই পাশে খাবারের থালা রাখিয়া নিজের যায়গায় গিয়া বসিল। নরেন তৎক্ষণাৎ থালাটা কাছে টানিয়া লইয়া এমনি ভাবে আহারে মন দিল, যেন এই জন্যই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় নিঃশব্দে কাটিবার পরে বিজয়াই প্রথমে কথা কহিল। নীরবতার গোপন ভার আর যেন সে সহিতে না পারিয়াই, হঠাৎ একটু জোর করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "কই, সেই পাগ্‌লা ভূতটার কথা শেষ করলেন না?" নরেন বোধ করি অন্য কথা ভাবিতেছিল, তাই সে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কথা বল্‌চেন।" বিজয়া কহিল, "সেই যে পাগ্‌লা ভূতটা। যে দিনকতক আপনার কাঁধে চেপেছিল, সে নেমে গেছে ত?" এবার নরেনও হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, গেছে।" বিজয়া কহিল, "যাক্‌! তা'হলে বেঁচে গেছেন বলুন! নইলে, আরও কতদিন যে আপনাকে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে বেড়াত, কে জানে!" নরেন চায়ের পেয়ালাটা মুখে তুলিয়া লইয়া শুধু বলিল, "হাঁ।" বিজয়া পুনরায় ভালো কিছু একটা বলিতে চাহিল বটে, কিন্তু হঠাৎ আর কথা খুঁজিয়া না পাইয়া, কেবল আকণ্ঠ উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া চুপ করিয়া গেল। পরের ঘাড়ের ভূত ছাড়ায় আনন্দের জের টানিয়া চলা কিছুতেই আর তাহার শক্তিতে কুলাইল না।

আবার কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। নরেন ধীরে সুস্থে চায়ের বাটিটা নিঃশেষ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিল, "আর দশ মিনিট সময় আছে; আমি চল্লুম।" বিজয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "কলকাতায় ফিরে যাবার এই বুঝি শেষ ট্রেণ?" নরেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপিটা মাথায় দিয়া বলিল, "না, আরও একটা আছে বটে, সে কিন্তু ঘণ্টা-দেড়েক পরে। চল্লুম—নমস্কার।" বলিয়া লাঠিটা তুলিয়া লইয়া একটু দ্রুত পদেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

করুণা *

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার]

"করুণা" একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। রচয়িতার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইতিহাস-জগতে তিনি সুপরিচিত এবং আখ্যায়িকা, কাহিনী ও উপন্যাস রচনা করিয়াও তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে আপনার যশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ইতিহাসের ঘটনা-বিশেষ অবলম্বনপূর্ব্বক আখ্যায়িকা রচনার সার্থকতা আছে। জাতীয় ইতিহাসের অনেক কথা জনসাধারণ্যে কঠোর সত্যের আকারে প্রচার করিবার সুবিধা হয় না। মানুষ সব সময়েই কঠিন যুক্তি ও তর্কের অনুধাবনে সমর্থ নহে। ন্যায়ের অবরোহণ বা অধিরোহণ-প্রণালী অবলম্বনে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার বা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা সকলের নাই। যাঁহারা অনায়াসে প্রাচীন কাহিনীর কিঞ্চিৎ শুনিতে চাহেন, যাঁহারা ইতিহাস না পড়িয়া প্রাচীন সমাজচিত্র দেখিবার প্রয়াসী, যাঁহারা সত্যের উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়াও, তাহার ছায়ামাত্র উপভোগে আপনাদিগকে ধন্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস তাঁহাদের জন্য। জাতিকে উন্নীত করিতে হইলে তাহাদিগকে তাহাদের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিত করিয়া দিতে হয়। তাহাদের গৌরব ও লজ্জার বিলুপ্ত কাহিনী—তাহাদের মহৎ আত্মত্যাগ ও নীচ স্বার্থপরতার প্রাচীন আখ্যায়িকা—জাতীয় জাগরণ ও প্রসুপ্তির একটা চিত্র—জাতির হৃদয়ে আত্মসম্ভ্রম জাগাইয়া দেয়।—তাহারা আপনাকে বুঝিতে চেষ্টা করে;—সকল ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি ও গ্লানি অতীতের অন্ধকারে ফেলিয়া ভবিষ্যতের আলোকের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। তবে পুরাতন কাহিনী হইতে লজ্জা ও দুঃখের অংশটুকু ফেলিয়া দিয়া, অবমাননা ও লাঞ্ছনার কথা চাপা দিয়া, কেবল প্রাচীন গৌরবের গাথা রচনা করা ইতিহাসের, বা ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য নহে; এবং ঐরূপ রচনার বিশেষ সার্থকতা নাই। জাতি যখন দুর্ব্বল ও অক্ষম হইয়া পড়ে, আশার আলোক যখন নিভিয়া যায়—ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তখনই তাহারা অতীতের কেবল গৌরবময় যুগের কথা মনে করিয়া প্রাণে যন্ত্রণা অনুভব করে মাত্র। নিরাশ, অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্র যেমন তাহার অতীত সুখের কথা ভাবিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দেয়—শয্যাশায়ী রোগী যেমন তাহার অতীত স্বাস্থ্যের কথা স্মরণ করিয়া আকুল হইয়া উঠে, ইহাও কতকটা সেইরূপ। ইতালির অমর কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

Nessun maggior dolore
Che ricordaisi del tempo felice
Nella miseria."

"দুঃখের পীড়ন মাঝে
অতীতের সুখ-স্মৃতি,—
তার চেয়ে দুঃখ নাহি আর।"

করুণার আখ্যানবস্তু গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতন-কাহিনী। কুমার গুপ্তের রাজ্যকালের শেষ পাদে যখন সাম্রাজ্য বিলাস-বিভ্রমে দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিল, দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও স্নেহ যখন নীচ স্বার্থপরতায় ও স্বাধিকার-প্রমত্ততায় ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই সময়কার একটা ম্লান বিষাদ-গীতিকার রেশটুকু "করুণা"য় ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে।

দুঃখের একবিন্দু অশ্রু সুখের উচ্ছল মদিরা হইতে স্নিগ্ধ, কারণ তাহাতে ত্যাগের মাধুর্য্য আছে;—সুখের কলহাস্য অপেক্ষা দুঃখের ক্রন্দন প্রাণস্পর্শী, কারণ সে আত্মত্ব ভুলাইয়া দেয়;—সাহানার তীব্র ছুরিকার ন্যায় শাণিত সুরলহরী অপেক্ষা বেহাগের মলিন অনুযোগ হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলে;—তাই সাময়িক অপেরার আনন্দলহরী অপেক্ষা "করুণার" করুণ কাহিনী এত মধুর।

নায়িকার নামে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। সাধারণতঃ আজ-কালকার উপন্যাসে বিবাহ বা ঐ রকম মধুর মিলন গোছের একটা কিছু লইয়া গ্রন্থ শেষ হয়; কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি ঠিক সেরূপ নহে। ইহার প্রারম্ভ ঐরূপ মধুর মিলনরাত্রির অনেক পরে।

প্রথম পরিচ্ছেদে একটি অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। গৌড়ের মহাবলাধিকৃত ভানুমিত্রের প্রমোদোদ্যানে আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়। গুপ্তসাম্রাজ্যে দীর্ঘ-কালব্যাপী শান্তির পর, সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির ফলস্বরূপ, যে বিলাসিতা আসিয়া সাম্রাজ্যকে ভাসাইয়া দিয়াছিল, তাহার আভাস অতি পরিস্ফুটভাবে গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদেই প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিলাসের মধ্যেও ভাবী ধ্বংসের একটা ক্ষীণ হাহাকার-ধ্বনি দূরাগত অস্পষ্ট ক্রন্দনের ন্যায় কাণে আসিয়া লাগে। শুভ্র মর্ম্মরাচ্ছাদিত সোপানাবলী-পরিশোভিত বাপীতটে উপবিষ্টা পরিচারিকা-পরিসেবিতা করুণা যখন কেবল শুভ্র ও নির্ম্মল আনন্দের ও প্রীতির কথা ভাবিতেছিলেন, এবং তাঁহার জীবনের ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যখন সুদূর স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ ও অতীতের তীব্র জ্বালা হৃদয়কে ব্যথিত ও চঞ্চল করিতে অক্ষম, যখন বর্ত্তমানের ক্ষণিক সুখে জীবনব্যাপী দুঃখ ও ক্লেশ,

---

* করুণা। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। কলিকাতা, ১৩২১, মূল্য ২৲।

ত্রুটি ও গ্লানি সব ডুবাইয়া দেয়,—ঠিক সেই সময়ে, গুপ্তসাম্রাজ্যের ভাবী অমঙ্গল-সংবাদ বহন করিয়া পাটলিপুত্র হইতে গৌড়ে দূত আসিল।

গৌড়ের মহাবলাধিকৃত ভানুমিত্র স্কন্দগুপ্তের বন্ধু ও সাম্রাজ্যের অর্জ্জুন-মহানায়ক। করুণা সম্রাজ্ঞীর পালিতা কন্যা—বড় স্নেহের ও বড় আদরের। চরিত্র দুইটী অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভানুমিত্র সরল, উদার ও মহাপ্রাণ যুবক—কর্ত্তব্যকে সম্মুখে রাখিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু তিনি চিরকাল সুখে লালিত—বিপদের সহিত তাঁহার পূর্ব্বপরিচয় ছিল না। কিন্তু বিপদ যখন আসিল, তখন তিনি তাহাকে অভ্যাগত অতিথি বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং অতিথির অর্ঘ্য স্বরূপ আপনার হৃদয়ের শোণিত দান করিলেন। যাহা হয় হউক, কর্ত্তব্যকে আগে মাথায় করিয়া লইতে হইবে এবং কর্ত্তব্য পালন করিলে শুভদিন আবার আসিবে,—ইহাই তাঁহার ধারণা।

ভানুপত্নী করুণার ধ্রুব বিশ্বাস যে, তাঁহার ভানুমিত্রকে—তাঁহার দেবতাকে—তাঁহার নিকট হইতে কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। তাঁহার হৃদয় ভবিষ্যতের বিভীষিকায় ব্যথিত নহে। বর্ত্তমান তাঁহার কাছে যথেষ্ট—বর্ত্তমানই তাঁহার সত্যযুগ। যাহা অতীত তাহার জন্য অনুশোচনা নাই,—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা আর হইবে না,—তবে তাহার জন্য বৃথা খেদ কেন? হূন যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, একহস্তবিহীন ও খঞ্জ ভানুমিত্র করুণার সহিত যখন আবার গৌড়ের প্রমোদোদ্যানে আসিয়াছিলেন, তখন উদ্যানের আর সে শোভা ছিল না। উদ্যান তখন অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল,—দীর্ঘিকার সোপানাবলী হইতে মর্ম্মরাচ্ছাদনগুলি কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া করুণা বড় ব্যথিতা হইয়াছিলেন। জীবনে দুঃখতাড়নাহত হইয়াও গৌড়ের সেই পুরাতন উদ্যানে পুনর্মিলনের দিনে নূতন করিয়া সংসার পাতিবার সময় এতখানি ত্রুটিতে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। করুণার হৃদয়খানি একদিকে যেমন বৃষ্টি-ধৌত যূথিকার মত কোমল, আবার অপর দিকে তেমনই বজ্রের মত সুকঠিন। তিনি প্রিয়জনবিরহে যেমন ব্যথিতা, বিপদের সম্মুখে আবার তেমনই ধীরা, স্থির-প্রতিজ্ঞাসম্পন্না। যে দিন হূন আসিয়া পুরুষপুর অধিকার করিয়াছিল, সে দিন করুণা বড় দম্ভের সহিত বলিয়াছিলেন—"জগতে এমন কেহ নাই যে করুণার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করে।" সে দিন করুণাকে আমরা বজ্রের ন্যায় কঠিন দেখিয়াছিলাম—সে দিন হূনরাজ খিঙ্খিল সেই সেই বজ্র-কঠিন করুণার চক্ষে বিদ্যুৎ দেখিয়াছিলেন, এবং নতজানু হইয়া মাতৃ-সম্ভাষণ করিয়াছিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে উপন্যাসের আর একটি চরিত্রের সহিত আমাদের পরিচয় হয়,—ঋষভদেব ভানুমিত্রের বন্ধু ও একজন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। ঋষভদেবের চরিত্রে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের ছায়া পড়িয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদের ঋষভ-চরিত্র মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদূষকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যাঁহারা ভারতের প্রাচীন নাট্যসাহিত্যের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিত আছেন, তাঁহারা হয় ত জানেন যে, মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদূষকের একটু বিশেষত্ব আছে। মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদূষক-চরিত্রের অভিব্যক্তির সহিত যেমন সমগ্র নাট্যের পরিণতি ও বিবর্ত্তন বিজড়িত, তেমনি আমাদের আলোচ্য আখ্যায়িকার বিকাশের সহিত ঋষভ চরিত্রের অন্তর্বিকৃত স্তরসমূহ একটির পর একটি করিয়া আমাদের নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ঋষভ উদরপরায়ণ ভাঁড়-মাত্র নহেন। ঋষভ পরমহিতৈষী বন্ধু—ভানুমিত্র ও করুণার সুখে সুখী,—দুঃখে দুঃখী,—সম্পদে ও বিপদে, জীবনে ও মরণে তাঁহাদের অনুগমনে প্রস্তুত। ঋষভ-চরিত্রের সহিত Shakespeare-প্রণীত King Lear নাটকের foolএর চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে ঋষভ-চরিত্রের একটা বিশেষত্ব আছে সে তাঁহার স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম। সুদূর পুরুষপুর হইতে তিনি সাশ্রুনয়নে শ্যামলা, কল্যাণময়ী গৌড়ভূমির কথা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেন। তাঁহার শেষ ইচ্ছা যে, তাঁহার ভস্মাবশেষ তাঁহার গরীয়সী মাতৃভূমির জাহ্নবীধৌত চরণতলে যেন অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পিত হয়; এবং করুণা তাঁহার মৃত্যুশয্যার শিয়রে বসিয়া শেষ গণ্ডূষ প্রদান কালে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে বলা বোধ হয় আবশ্যক। ঋষভ-চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার জন্য একটা অবান্তর ও আনুষঙ্গিক চরিত্রের সৃষ্টি করা বোধ হয় ঠিক হয় নাই;—গোপকন্যা রোহিণীর চরিত্রের উল্লেখ না করিলেও ঋষভ-চরিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিত—এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এরূপ অবান্তর চরিত্র-সৃজনে নাট্যকলা একটু অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, ঋষভ-চরিত্রাঙ্কনে গ্রন্থকারের বিশেষ গুণপনার পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ চরিত্র গ্রন্থকারের অপর কোনও গ্রন্থে অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ঋষভের রসিকতা বড় নির্ম্মল—বড় তরল; কিন্তু এই তরলতা—এই উচ্ছল চাঞ্চল্য—দুঃখের কশাঘাতে কোথায় চলিয়া গেল—এবং তাহার স্থানে একটা গভীর কর্ত্তব্যজ্ঞান—একটা মহৎ আত্মত্যাগ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল।

গ্রন্থের দ্বিতীয় চরিত্র গুপ্ত সাম্রাজ্যের মহামন্ত্রী দামোদর শর্ম্মা। প্রাচীন ভারতে যেরূপ চরিত্রের মহামাত্য সাধারণতঃ দৃষ্ট হইত, ইহা তাহার একটি নিখুঁত চিত্র। সমগ্র সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার স্কন্ধে বহন করিবার যোগ্যতা দামোদর শর্ম্মার আছে। চাণক্যের কুটরাজনীতি, ব্রাহ্মণের উদারতা ও সাম্রাজ্য-শাসকের কঠোরতা—সকলই দামোদর শর্ম্মায় বর্ত্তমান। তাঁহাতে তোষামোদ নাই,—কর্ত্তব্য-পালন আছে;—হীনতা নাই—তেজস্বিতা আছে;—মোহ নাই,—তীক্ষ্ণ বিবেচনা-বুদ্ধি আছে। সাম্রাজ্যের কুশল, সম্রাটের ও স্বামি-কুলের শুভ, দেশের ও প্রজার কল্যাণ—এই সকলের ধ্যানেই তিনি তাঁহার জীবনের সীমান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ দামোদরকে মহামন্ত্রীর বেদিকায় উপবিষ্ট দেখিয়া আমাদের আধুনিক যুগের ভারতেতিহাসের একটি চিত্র মনে পড়ে। মোগল সাম্রাজ্যের মহামন্ত্রী জুল-ফিকর্ খাঁ একদিন সম্রাট জাহান্দর শার মন্ত্রীত্ব ঠিক এমনই ভাবে করিয়াছিলেন।

দামোদর শর্ম্মার বীণা-সংগ্রহ বিষয় থাকি খাঁ কর্ত্তৃক বিবৃত জুল্‌ফিকর্ খাঁর জীবনীর ঘটনাবিশেষ স্মরণ করাইয়া দেয়। জাঁহাদার্ শাহ কয়েকটি নৃত্যগীতপ্রিয় অকর্ম্মণ্য বন্ধুর প্রতি সম্রাট-প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ উচ্চ রাজসম্মান প্রদর্শিত হওয়াতে, জুল্‌ফিকর্ খাঁ অভিমান ও শ্লেষের সহিত একবার সম্রাটকে বলিয়াছিলেন, 'আজকাল সম্রাট-প্রীতি যেরূপ পাত্রে বর্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, নৃত্যগীতাদি না শিখিলে আমাদের পক্ষে রাজসভায় উপস্থিত থাকা বা রাজকর্ম্ম পরিচালন করা সম্ভব হইবে না।'

তা'র পর মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত। ইনি সম্রাট কুমারগুপ্তের ভ্রাতা। মানব-জীবনের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বিশাল উদার মনুষ্যত্ব পৃথিবীর ক্ষুদ্রত্বকে ছাড়াইয়া উচ্চে নির্ম্মল ও স্বচ্ছ ত্যাগ ও কর্ত্তব্যের আলোকে মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যখন এক দিন ইন্দ্রলেখার কিশোর জীবনে বসন্ত আসিয়াছিল, তখন মহারাজপুত্র মন্দ মলয়ানিল রূপে প্রবাহিত হইয়া তাহার লালসাকুঞ্জ-ভবনের নবোদ্গত বল্লরীগুলি মুকুলিত ও বিকশিত করিয়াছিলেন। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে, এমন কি, গ্রন্থকর্ত্তার অপরাপর গ্রন্থে প্রদর্শিত চরিত্র-সমূহের মধ্যেও—এরূপ পূর্ণ মনুষ্যত্বের চিত্র আর কোথাও নাই। গোবিন্দগুপ্তের চরিত্রাঙ্কন গ্রন্থকর্ত্তার পাকা হাতের তুলির কাজ। আলোচ্য গ্রন্থে দেব ও পশু-চরিত্র অনেক আছে বটে, কিন্তু মানুষ বোধ হয় এই এক গোবিন্দগুপ্ত।

স্কন্দগুপ্তের চরিত্রে দেবত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহাতে মানবের দুর্ব্বলতা নাই—ক্ষুদ্রত্ব নাই,—স্বার্থপরতা বা আত্মত্ব নাই,—মোহ নাই; আছে কেবল মহত্ব,—বিশাল উদারতা,—ত্যাগ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা;—আর আছে, যে জ্ঞান অমরত্বের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয় সেই জ্ঞান। পৃথিবীর দুঃখ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না—পৃথিবীর সুখ তাঁহাকে আপনা ভুলাইতে পারে না। বেশনগরে দিওন-পুত্র হেলিওদোরস্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গরুড়ধ্বজের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম-মূলতত্ত্বের তিনটি কথা লিখিত আছে—

ত্রিনি অমুতপদানি—[সু] অনুঠিতানি
নয়ংতি স্বগ দম চাগ অপ্রমাদ।

এই তিনটি অমৃত পদের অনুষ্ঠান স্কন্দগুপ্ত তাঁহার জীবনে সম্যক্‌রূপে দেখাইয়াছেন। দমত্যাগ এবং অপ্রমাদ তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা। ফলতঃ স্কন্দগুপ্তকে তাঁহার সমসাময়িক জনসাধারণ যে নরনারায়ণ বলিয়া জানিত এবং তাঁহার স্বদেশ-প্রেমিকতার সন্ন্যাসধর্ম্ম তাঁহার অনন্যসাধারণ সৌম্য জীবনকে যে আদর্শ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কারণ আছে। গ্রন্থকার স্কন্দগুপ্তকে এরূপ দেব-চরিত্র রূপে অঙ্কিত করিয়া ইতিহাসের অমর্য্যাদা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা মানবিকতার মধ্য দিয়া ফরাসী ঔপন্যাসিক হুগো তাঁহার Quatrevingt-treize নামক গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থাঙ্কিত সিমুর্দ্যাঁ-চরিত্রে এইরূপ রেখাপাত দেখা যায়। তবে শেষোক্ত চিত্র প্রতীচীর আদর্শ; স্কন্দগুপ্ত প্রাচীর নিজস্ব। পুত্রোপম শিষ্য, উদার, ধীর, ত্যাগী গোভ্যাঁ যখন মনুষ্যত্বের করুণ অনুযোগে ও ভাবোচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট কঠোর কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার বিচারে বিচারকের আসন গ্রহণ করিয়া সিমুর্দ্যাঁ তাঁহার মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিলেন। এই অতুলনীয় চিত্র হুগোর অমর তুলিকাগ্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

Cimourdain dit d'une voix grave, lente et ferme : —Accusé Gauvain, la cause est entendue. Au nom de la république, la cour martiale, à la majorité de deux voix contre une......

Il s'interrompit, il eut comme on temps d'arrêt ; hésitait-il devant la mort ? hésitait-il devant la vie ? toutes les poitrines étaient haletantes. Cimourdain continua :

—...Vous condamne à la peine de mort.

কিন্তু শেষে যখন গোভ্যাঁ গিলোটিনে তাঁহার কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ—তাঁহার কর্ত্তব্য-বিচ্যুতির মূল্যস্বরূপ - আপনার মস্তক প্রদান করিলেন, তখন সিমুর্দ্যাঁও তাঁহার শিষ্যের অনুসরণ করিলেন। আলোকে আঁধারে মিশিয়া গেল:—

"Cimourdain venait de saisircen des pistolets qu'il avait à sa ceinture, et au moment ou la tê te de Gauvain roulait dans le panier, Cimourdain se traversait le cœur d'une balle. Un flot de sanglui sorlit de la bouche, il tomba mort.

Et ces deux âmes, sœurs tragiques, s'envolerent ensemble, l'ombre de l'une mêlée à la lumière de l'autre.

সম্রাট কুমারগুপ্তের চরিত্র ততটা ফুটিয়া উঠে নাই। যাহা ফুটিয়াছে তাহাও গোবিন্দগুপ্তের ও দামোদর শর্ম্মার ছায়ায় ম্লান হইয়া গিয়াছে। সেটা বোধ হয় গ্রন্থকারের ইচ্ছাক্রমেই হইয়াছে। এখন কুমারগুপ্তের যৌবনের সে দৃপ্ত তেজ নাই—আর সে মহিমান্বিত বীরত্ব নাই—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ও সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র বলিয়া পরিচয় দিবার আর কিছুই নাই। এখন নীচ লালসার তাড়নায় তিনি আপনার মনুষ্যত্ব হারাইয়াছেন—ইন্দ্রিয়ের বশে আত্মবিস্মৃত—এক সামান্যা রমণীর কটাক্ষে সব ভাসাইয়া দিয়াছেন। এ চরিত্রে ফুটাইয়া তুলিবার আর কিছুই নাই। তবে যতটুকু আভাস দিলে চরিত্রের বহিরেখাগুলিমাত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং সাধারণের উপলব্ধিগোচর হয়, ঠিক সেইরূপ ভাবেই গ্রন্থের কুমারগুপ্ত-চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর ও বিশদতররূপে "করুণা"র কুমারগুপ্ত-চরিত্র অঙ্কিত করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই।

স্কন্দগুপ্ত-জননী গুপ্তকুললক্ষ্মীর দর্শন আমরা গ্রন্থে যতটা পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে বেশ বুঝিতে পারা যায়; তবে উক্ত চরিত্রে বিশেষত্বের নিতান্ত অভাব। সাধারণ হিন্দু নারীচরিত্র যেরূপ, পট্টমহাদেবী অনেকটা তাহাই। স্বামীপুত্রের শুভানুধ্যায়িনী—স্বামীর প্রেম ও পদমর্য্যাদা হারাইবার আশঙ্কায় ও দুঃখে অভিভূতা—ধর্ম্মপ্রাণা এবং আপনার জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ মমতাহীনা।

স্কন্দপ্রেয়সী অরুণা বেশ পরিস্ফুট ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ধীরা, গম্ভীরা, কোমলা, স্কন্দগতজীবনা,—প্রিয়তমের প্রত্যাবর্ত্তন-আশায় পথ চাহিয়া বাঁচিয়া ছিলেন। যখন বুঝিয়াছিলেন যে, স্কন্দের ফিরিয়া আসিবার আর আশা নাই, যখন জানিতে পারিয়াছিলেন যে জীবনের এই পারে আর কখনও তাঁহার বাঞ্ছিতকে পাইবেন না, তখন পরপারে তাঁহার সেবার জন্য গমন করিয়াছিলেন;—যদিও সেটা ভ্রম,—কিন্তু এই ভ্রম-সংশোধনের সময়ও তাঁহার অন্ধ প্রেম তাঁহাকে প্রদান করে নাই। "অরুণা" "করুণার" ন্যায় আপনাকে রক্ষা করিতে জানেন—তা জানিবেনই ত—এক বৃন্তে দুইটি ফুল কি না!

অনন্তা কুমারগুপ্তের নবীনা পট্টমহাদেবী,—ঠিক বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা; স্বার্থান্ধা—অভিনব মহত্বের;মর্য্যাদা রক্ষণে অসমর্থা হিংসাপরায়ণা। ইন্দ্রলেখার গর্ভজাতা ফল্গুযশ-কন্যার গুণরাশি ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে?

ইন্দ্রলেখা, হরিবল ও চন্দ্রসেন সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিবার কিছুই নাই। ইন্দ্রলেখা সাধারণ গণিকা,—তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানহীনা, আপনার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সবই করিতে পারে। তবে তাহার জীবনের মধ্যে তাহার কন্যার প্রতি স্নেহটুকুই তাহার কঠোর জীবনকে কোমল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সে স্নেহও বোধ হয় সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন, স্বার্থবিহীন, নহে। হরিবলের ইন্দ্রলেখা প্রীতিতে একটা মহত্তর স্বার্থ বিজড়িত আছে,—হরিবলের উদ্দেশ্য সদ্ধর্ম্মের লুপ্তগৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাহার সহিত আত্মপ্রতিষ্ঠা। চন্দ্রসেন বৃদ্ধাগণিকা ইন্দ্রলেখার প্রীতিতে চরিতার্থ, হীন ও বর্ব্বর পশুমাত্র।

গ্রন্থে তখনকার সমাজচিত্র অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আখ্যায়িকার বর্ণনাকাল আমাদের হস্তগত বাৎস্যায়ন প্রণীত কামসূত্রের রচনাকাল হইতে অধিক পরবর্ত্তী নহে। দেড় শত কিংবা একশত বৎসরে এক সাম্রাজ্যের অধীনে সমাজ বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হয় না। গ্রন্থে প্রদত্ত সমাজ-চিত্র অনেকটা বাৎস্যায়ন হইতে সংগৃহীত। ইহাতে, আমাদের বিশ্বাস যে, ইতিহাসের মর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে। স্কন্দগুপ্ত যৌবরাজ্যে পুষ্যমিত্রীয় ও হূণগণকে পরাজিত করিয়া বিচলিতা কুললক্ষ্মীকে অচলা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমবার পরাজিত হইয়া হূণগণ ভারতাক্রমণে বিরত হয় নাই। স্কন্দগুপ্তের রাজ্যাভিষেক-কালে হূণগণ পঞ্চনদ প্রদেশে এক অভিনব রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় প্রদত্ত হইয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী হূণ যুদ্ধে রাজকোষ যে শূন্য হইয়াছিল, তাহা গুপ্তসাম্রাজ্যের মুদ্রার ইতিহাসালোচনায় উপলব্ধি হয়। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর স্কন্দগুপ্ত ও পুরগুপ্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সিংহাসনের জন্য বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। এরূপ অনুমান করিবার কারণ যে বিশেষ দৃঢ়, তাহা নহে। দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের রাজমুদ্রায় স্কন্দগুপ্তের নাম দৃষ্ট হয় না বলিয়া অনেকে এরূপ স্থির করেন। কিন্তু এদিকে আবার এ কথাও বলেন যে, পুরগুপ্ত সম্ভবতঃ স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসের কঙ্কাল সংযোজনা করিয়া তাহাতে মাংস, মেদ ও প্রাণ প্রদানে সজীব করিয়া তুলিতে গ্রন্থকার নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। আখ্যায়িকাটি পড়িতে পড়িতে অতীত ভারতের সমাজ-চিত্র আমাদের নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া আসে। এইরূপ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার যে সার্থকতা আছে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

আলোচ্য উপন্যাসে প্রদত্ত কয়েকটি চিত্রের সহিত বিদেশী গ্রন্থকার কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। ভিক্ষুপর্ব্বতের চিত্রটির Lytton-প্রণীত Last Days of Pompei গ্রন্থের চিত্রবিশেষের সহিত সাদৃশ্য আছে। দেবধর-চৌরোদ্ধরণিক-সংবাদ Lytton-প্রণীত Reinzi'র চিত্রবিশেষ স্মরণ করাইয়া দেয়। দেবধরের আত্মোৎসর্গ Sienkilvoier-প্রণীত Quo vadis? নামক উপন্যাসে বর্ণিত Romanদিগের আত্মোৎসর্গ-কাহিনী হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। এবং শেষ চিত্র করুণা যেখানে উল্কা হস্তে আহত স্বামীর অনুসন্ধান করিতেছেন—তাহার সহিত Tennyson-প্রণীত Harold নামক নাটকের শেষ দৃশ্যের সাদৃশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু ইহাতে ইতিহাস অথবা আখ্যান বা নাট্যকলা কোনও রূপে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

বৌদ্ধধর্ম্ম তখন অত্যন্ত অবনত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। নীচ স্বার্থবৃত্তি ও বিলাসিতা ধর্ম্মকে ছাইয়া ফেলিয়া ফেলিয়াছিল। তবে কণিষ্ক-বিহারের সঙ্ঘস্থবিরের ন্যায় বৌদ্ধও তখন ছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মে তখনও পাপ প্রবেশ করিতে পারে নাই—উহা অনেকটা নির্ম্মল ছিল; আবর্জ্জনার অভাবে প্রবহমান নদীর জল যেমন নির্ম্মল থাকে—তেমনই নির্ম্মল ও তেমনই স্বচ্ছ। তখনকার এই উদার ধর্ম্ম আপনার দ্বার সকলের জন্যই মুক্ত রাখিত; বিদেশী যবনও এই বিশাল বনস্পতির স্নিগ্ধ ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিত।

হূণদিগের মাতৃপূজা গ্রন্থকারের নিজস্ব। ইহার যে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। পশ্চিম আসিয়ার সভ্যতালোক যখন দিগন্ত-বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন তাহার ধর্ম্মমতও স্বীয় প্রভাব বিদেশীয় ও দূরস্থ ধর্ম্মবিশ্বাসের উপরে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পশ্চিম আসিয়ায় দেবমাতা ইশ্‌তার বা আস্তার্তের পূজা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। এমন কি আসুর ও প্রাচীন বাবিরুষরাজ্যে এবং কাল্‌দীয়দিগের মধ্যেও এই মাতৃপূজার নিদর্শন আছে। তৎপরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন নামে ভিন্ন-ভিন্ন সভ্য জাতির মধ্যে এই মাতৃপূজা

রূপান্তরিত ভাবে প্রচারিত হয় এবং দেশবিশেষে কোনও নিয়মিত সময়ের জন্য দেবমাতার ভর যে স্ত্রীলোকবিশেষের উপর সঞ্চারিত হইত, এরূপ বিশ্বাসও ছিল। মধ্য আসিয়ার ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যেও প্রতীচ্য সভ্যতার প্রভাব-বিস্তার প্রদর্শন ঐতিহাসিক না হইলেও অস্বাভাবিক হয় নাই। যে সকল জাতি বর্ব্বরতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নাই, যাহাদের সমাজ-নিয়ম শিথিল, তাহাদের মধ্যে পিতৃত্ব অপেক্ষা মাতৃত্বের গৌরব অধিক। ইহার একটা কারণ এই যে, সমাজের এই প্রথমাবস্থায় মাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধ নিকটতর এবং পিতৃকুল অপেক্ষা মাতৃকুলের সহিত তাহার পরিচয় হইবার সুযোগ অধিক। শ্বেত হুণ বা এফ্‌থেলাইট্‌গণ যাহারা খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে ভারতাক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা বর্ব্বরমাত্র ছিল। তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে এইরূপ মাতৃপূজার অস্তিত্ব প্রদর্শন করা এবং মাতার আগমনে তাহাদের বিশ্বাসের আভাষ প্রদান করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও স্বাভাবিক হইয়াছে।

সমালোচ্য আখ্যায়িকায় দুইটি বিষয় বেশ শিক্ষাপ্রদ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে; প্রথম, যাহা ভবিতব্য (fate) তাহা অবশ্যম্ভাবী—বোধ হয় গ্রন্থকারের ধারণাই এইরূপ এবং তাঁহার গ্রন্থপাঠে তাঁহাকে ঘোর অদৃষ্টবাদী বলিয়াই আমাদের মনে হয়। তবে সাধারণ অদৃষ্টবাদিতার সহিত এইরূপ ভবিতব্য-বাদিতার কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। যাঁহাদের গ্রীক সাহিত্যের সহিত পরিচয় আছে, তাঁহারা এই ভবিতব্য-বাদিতার সহিত sophoclesএর fatalismএর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন।

প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্মের তিনটি শিক্ষা এই গ্রন্থে আছে—তাহা আর্য্যদিগের পূর্ব্বোক্ত তিনটি অমৃত পদ,—দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ। জীবনে সাফল্য লাভ করিতে হইলে—স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে গেলে, এই তিনটি অমৃতপদের অনুষ্ঠান আবশ্যক। এ অমৃত যে পান করিয়াছে সে অমর হইয়াছে। এ সোমরস পানে সকলেই অমর হয়—দেশ, পাত্র ও জাতিনির্ব্বিশেষে অমরত্ব লাভ করে। যাঁহারা পান করিয়াছেন, তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা প্রাচীন ঋষিগণের সহিত এ কথা বলিবার সম্পূর্ণ অধিকারী—

অপাম সোমমমৃতা অভূমা
গন্ম জ্যোতির বিদাম দেবান্‌।
কিং নূনমস্ম কৃণবদরতিঃ
কিমুধর্তিরমৃত মর্ত্যস্য ॥

পঞ্জাবে কয়েক দিন

[শ্রীকুমারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এস্‌সি]

পঞ্জাবের প্রচণ্ড শীতের পর তখন বসন্তের প্রথম হিল্লোলে প্রকৃতি-রাজ্যে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। লাহোরের বাসাটিতে আমাদের বৈঠকে স্থির হইল যে, হোলির ছুটিতে অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্যও একটু ঘুরিয়া আসা দরকার। কোলাহলমুখর সহরের বেষ্টনী প্রায় দুঃসহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; লরেন্স গার্ডেন ও রাভীর তীর বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িতেছিল, এবং শালামার বাগ ও শাহদারাও তাহাদের নূতনত্ব-বর্জ্জিত হইয়া আমাদের চক্ষে তাহাদের পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। একটু উন্মুক্ত আকাশ ও খোলা বাতাসের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

ত্রয়োদশীর সন্ধ্যায় আমাদের ছোট দলটি লাহোর ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। সঙ্গে জিনিষপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। দলের মধ্যে আমরা তিনটি প্রবাসী বাঙ্গালী ও আমাদের পঞ্জাবী বন্ধু—অধ্যাপক চিরঞ্জীবলাল।

রাভীর সেতুর উপর দিয়া আমাদের ট্রেণ ধীর-মন্থর গতিতে চলিতেছিল। বৃক্ষান্তরাল হইতে লাহোরের আলোকরাশি তাহাদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। চারিদিক জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোকে ভরিয়া গিয়াছে। নীচে রজতধারার ন্যায় রাভীর জল-রাশি পার্শ্বের তৃণবনের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্য দিয়া ভয়ত্রস্তা বালিকার ন্যায় দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। অদূরে রণজিৎসিংহের সমাধিসংলগ্ন শাহী মসজিদের শুভ্র গুম্বজ ও মিনার উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রকৃতির শান্ত মূর্ত্তির মাঝখানে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া পার্শ্বের সহযাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুজী, ইহাই কি নূরজাহানের কবর?" চাহিয়া দেখিলাম—রেলওয়ে লাইনের পাশে সেই আড়ম্বর-হীন সামান্য ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ। জ্যোৎস্নার কোমল আলোকে দীনতা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। নিয়তির পরিহাস!—সুন্দরীকুল-শিরোমণি যে নূরজাহানের হস্তে সম্রাট পুত্তলিমাত্র ছিলেন, সম্রাটের জীবদ্দশায় যে নূরজাহান

রাজ্যের একমাত্র পরিচালিকা ছিলেন, সামান্য ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে তাঁহার দেহাবশেষ রক্ষিত। যে বুদ্ধিমতী মহিলা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষরে-অক্ষরে নিজের স্মৃতি-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন,—মনে হইল, কয়েক হাত নীচেই একখানা কঙ্কাল আজ শুধু স্থান অধিকার করিয়া পূর্ব্বের সেই বিশ্ববিশ্রুত সৌন্দর্য্যের ও প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। কে জানে, জাহাঙ্গীরের পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে হয় ত আর এক তাজমহলের সৃষ্টি হইতে পারিত। অনতিদূরে রেলওয়ে লাইনের অপর পার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্য হইতে জাহাঙ্গীরের সমাধি-হর্ম্ম্যের মিনার অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

বন্ধুবরের নাতিকোমল করতাড়নায় জাগিয়া দেখি, আলোকিত ষ্টেশন-প্লাটফর্ম্মে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। নিদ্রাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওয়াজিরাবাদ না কি হে?" উত্তরের প্রবল হাস্যধ্বনিতে উঠিয়া বসিলাম; দেখিলাম, আততায়ী বন্ধুটি ব্যতীত দলের অন্য দুইজনেই হাস্যরোধে অসমর্থ হইয়া বেঞ্চির উপর গড়াগড়ি দিতেছেন। বাহিরে তাকাইয়া দেখিলাম, বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "লালা মুসা"। প্রথমে ভাবিলাম, হাসির কারণ বোধ হয় আমিই। কিন্তু বন্ধুবরের অপ্রতিভ ভাব ও হাসির অসদ্ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, আমি যখন নিদ্রিত ছিলাম, তখন একটা কিছু ঘটিয়াছে। পরে শুনিলাম, ওয়াজিরাবাদ ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে, একটি লোককে থালায় করিয়া কতকগুলি রঙ্গিন কাগজের মোড়ক লইয়া যাইতে দেখিয়া বন্ধুবর কৌতূহল-পরবশ হইয়া তাহাকে ডাকেন, এবং তাহাতে মেওয়া আছে শুনিয়া এক আনা দিয়া একটি মোড়ক ক্রয় করেন। মোড়কের ভিতর আর একটি কাগজের মোড়ক, তাহার ভিতর আর একটি মোড়ক। ক্রমে ক্রমে বন্ধুবর যখন শেষ কাগজখণ্ড বিস্তৃত করিয়া ধরিলেন, তখন গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে; গতিশীল গাড়ী হইতে বন্ধুরা দেখিলেন, তথাকথিত মেওয়া-ওয়ালা ষ্টেশনের একটি আলোকের নীচে দাঁড়াইয়া বিক্রয়লব্ধ পয়সা গণিতেছে। তখনও বন্ধুবরের হাতে মোড়কের শেষ কাগজখানি ও তাহার উপর একটি বাদাম।

আমাদের লালামুসায় গাড়ী বদল করিতে হইবে; সুতরাং জিনিষপত্র কুলির মাথায় দিয়া আমরা নামিয়া পড়িলাম।

নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আমাদের গাড়ী খিউড়া অভিমুখে চলিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই চিলিয়ান-ওয়ালা ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। অদূরে চন্দ্রমাশোভিত অসংখ্য তারকাদীপ্ত আকাশের নীচে চিলিয়ানওয়ালার রণক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিলাম। এই জনহীন নিস্তব্ধ প্রান্তরেই ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ভীষণ যুদ্ধে উত্তর-ভারতের ভাগ্য পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। ইহাই নির্দ্দেশ করিবার জন্য রণক্ষেত্রের উপর একটি স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত আছে। এক-একবার মনে হইতে লাগিল এই শান্তি, এই নির্জ্জনতা সবই স্বপ্ন; এবং এখনই সহস্র মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ এই ঘনীভূত শব্দহীনতাকে উপহাস করিয়া উঠিবে।

বিহঙ্গকাকলীমুখরিত প্রভাতে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষের সম্মুখে যে দৃশ্য উদ্ঘাটিত দেখিলাম, তাহা বাস্তবিকই হৃদয়স্পর্শী। অনতিদূরে পাহাড়ের পর পাহাড় শ্রেণীবদ্ধ লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সমতল ভূমির উপর দিয়া ছোট-ছোট নদী ও জলপ্রণালীগুলি চঞ্চল সরীসৃপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; বারিরাশি স্তব্ধ, স্থির, কম্পনশূন্য। মধ্যে-মধ্যে ছোট গ্রামগুলি নিদ্রিত অধিবাসীদের বক্ষে লইয়া সূর্য্যের অগ্রগামী পূর্ব্বদিগন্তের স্বর্ণচ্ছটাগুলির জন্যই যেন অপেক্ষা করিতেছে। কোথাও চঞ্চলতার লেশমাত্র নাই। মুগ্ধনেত্রে প্রকৃতির এই সুশোভন মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, যেন আরব্য-নিশির জিনি আমাদিগকে একরাত্রির মধ্যে কোলাহল-মুখর লাহোর হইতে এই স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে লইয়া আসিয়াছে।

ট্রেণ ক্রমে সন্ডিকুয়ারি ষ্টেশনে পৌঁছিল। ইহার নিকটেই আমাদের প্রধান গন্তব্য স্থল—খিউড়া ও তাহার সুবিখ্যাত লবণের খনি। প্রায় ৭টার সময় খিউড়ার লবণগর্ভ পাহাড়গুলি দৃষ্টিগোচর হইল এবং কিছুক্ষণ পরেই ট্রেণ খিউড়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। লাহোরের একটি পঞ্জাবী বন্ধুর আত্মীয় লালা বীরমল আমাদের জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সেদিন খনি বন্ধ থাকায় আমরা খিউড়াতে অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ অদূরবর্ত্তী ডাণ্ডোট ষ্টেশন অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলাম। স্থির হইল, ফিরিবার সময় খিউড়া দেখা যাইবে। খিউড়ায় আমাদের পাঁচটি পঞ্জাবী ছাত্র

আমাদের দলের সহিত মিলিত হইলেন এবং এখান হইতে আমাদের সহযাত্রী হইলেন।

খিউড়া হইতে ডাণ্ডোট ষ্টেশনের দূরত্ব প্রায় ৩ মাইল। ডাণ্ডোট পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন আছে; কিন্তু এই লাইনের উপর কয়লার মালগাড়ী ব্যতীত প্যাসেঞ্জার ট্রেণ চলাচলের কোন বন্দোবস্ত নাই। ডাণ্ডোটে পাহাড়ের উপর কয়েকটি কয়লার খনি আছে। এই সকল খনির পরিচালনভার লালা অমরনাথ নামক একটি পঞ্জাবী ভদ্রলোকের উপর ন্যস্ত ছিল। ইঁহাকে লাহোর হইতেই আমাদের ডাণ্ডোটে যাওয়ার কথা লেখা হইয়াছিল; এবং খিউড়া হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমাদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিবার জন্য লোক পাঠান হইয়াছিল।

ডাণ্ডোট ষ্টেশনটি পাহাড়ের পাদমূলে অবস্থিত। পাহাড়ের উপরিস্থ খনি হইতে আনীত রাশীকৃত কয়লা মালগাড়ীতে বোঝাই হইতেছে। সম্মুখেই অত্যুচ্চ পাহাড়। আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য লালা অমরনাথ-প্রেরিত লোকের নিকট শুনিলাম, তিনি পাহাড়ের শিরোদেশে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

এইখানে পর্ব্বত-গাত্রের একটু বিশেষত্ব দেখিলাম। গণিত অধ্যয়নকালে Inclined Planeএর কথা পড়িয়াছিলাম। এখানকার পর্ব্বত-গাত্রও একটি প্রকাণ্ড Inclined Plane। পর্ব্বত-গাত্রের উপর দুই সেট রেল পাশাপাশি পাতা আছে। পাহাড়ের পাদদেশে এক সেট রেলের উপর দুইটি লৌহনির্ম্মিত "ট্রাক্" দেখিলাম। এগুলিকে ঢাকনাহীন চক্রবিশিষ্ট লৌহনির্ম্মিত বড় বাক্স বলাই সঙ্গত। প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে ৩ হাতের বেশী হইবে না। শুনিলাম, পাহাড়ের উপরের খনি হইতে কয়লা আনিবার জন্য এই সকল "ট্রলী" ব্যবহৃত হয়; এবং উপরে উঠিবার জন্য আমাদিগকেও এই ট্রলীরই আশ্রয় লইতে হইবে। ট্রলীতে বসিবার জন্য দুইখানি ছোট বেঞ্চি পাতিয়া দেওয়া হইল এবং আমরা তাহাতে আসন গ্রহণ করিলাম। দেখিলাম, ট্রলীতে সংলগ্ন সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল Inclineএর উপর দিয়া উপরের দিকে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

নীচে হইতে সংকেত করা মাত্র বহুদূর হইতে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের ট্রলী-সংলগ্ন শৃঙ্খলে টান পড়িল এবং আমাদের ট্রলী পূর্ব্বোল্লিখিত দুই সেট লাইনের এক সেটের উপর দিয়া দ্রুতগতিতে উর্দ্ধদিকে উঠিতে লাগিল। পর্ব্বতগামী নানারূপ যানের কথা পড়িয়াছি,—দার্জ্জিলিঙের ক্ষুদ্র ট্রেণে ও কাশ্মীরযাত্রী টোঙ্গায় আরোহণও ভাগ্যে ঘটিয়াছে; কিন্তু এই বাষ্প-বৈদ্যুতিক-সম্বন্ধ বিহীন যান সম্পূর্ণরূপে অভিনব বলিয়াই বোধ হইল।

উর্দ্ধে, আরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। আমাদের দুইধারে পাহাড়, কোথাও বা গভীর খদ। নীচের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে মনে আপনা হইতেই একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়। এক-একবার মনে হইতে লাগিল যে, শৃঙ্খল কোনরূপে ছিঁড়িলে এই আরোহণ তৎক্ষণাৎ অধিরোহণে পরিণত হইবে এবং সেই পর্ব্বতাবতরণ স্বর্গারোহণের নামান্তর মাত্র। Inclineএর ঢালুতার একটা মোটামুটি রকম ধারণাও মনে-মনে করিলাম; এবং শৃঙ্খল ছিঁড়িলে বিশৃঙ্খল অবস্থায় গতিবেগ কি হারে বৃদ্ধি পাইবে এবং যখন ট্রলী পাহাড়ের নিম্নদেশে পৌঁছিবে (যদি ততক্ষণ পর্য্যন্ত Inclineএর মায়া না কাটান যায়), তখন সেই বর্দ্ধিত গতির মুখে কোন বস্তুর সহিত ধাক্কা লাগিলে, আমাদের পরিণামটা কিরূপ হইবে, তাহারও একটা স্থূলরকম আঁচ করিয়া লইলাম।

Inclineএর প্রায় অর্দ্ধেক অতিক্রম করার পর উপর হইতে পার্শ্ববর্ত্তী লাইন দিয়া দুইখানি ট্রলিকে আমাদের দিকে নামিয়া আসিতে দেখা গেল। তাহারা ক্রমে নিকটতর হইতে লাগিল এবং অবশেষে আমাদের পার্শ্বস্থ লাইন দিয়া নিম্নাভিমুখে চলিয়া গেল। আমাদের ট্রলীর ন্যায় ইহাদের সহিত সংলগ্ন লৌহশৃঙ্খলও উপরের দিক হইতে লম্বমান। বুঝা গেল যে, একটি সুদীর্ঘ লৌহশৃঙ্খল Inclineএর উপরিস্থ একটি বৃহৎ কপিকলের উপর দিয়া গিয়াছে। এই শৃঙ্খলের একপ্রান্ত উর্দ্ধগামী ও অপর প্রান্ত নিম্নগামী ট্রলীর সহিত সংলগ্ন। ট্রলির মধ্যে একটি নীচের দিকে নামিলেই, অপরটি উপরের দিকে উঠিবে। কপিকল ঘুরাইবার বা আবশ্যকমত স্থির রাখিবার ব্যবস্থা থাকিলে, ট্রলির গতির উপর শাসন থাকিবে। এই Inclineএর শিরোভাগে খানিকটা সমতল স্থানের উপর সুবৃহৎ কপিকল ও তৎসংলগ্ন এঞ্জিনের ঘর দেখা গেল।

এইখানে নামিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আর একটি Incline-সাহায্যে উপরে উঠা গেল। এইরূপে উপর্য্যুপরি ৩টি Incline আমাদিগকে পাহাড়ের শীর্ষদেশে পৌছাইয়া দিল। যতদূর স্মরণ হয়, এই তিনটি Incline এর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩৯০০, ৬৩৬ ও ৪০০ ফিট।

এই সকল Inclineএর উপর হইতে পাহাড়ের দৃশ্য-সম্পদ বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক। সর্ব্বোচ্চ Incline হইতে দূরের বৃক্ষ-নদ-শোভিত সমতল-ভূমি অতি সুন্দর দেখায়। ঝিলম নদীর রজতধারা দূর হইতে বিরাট পুরুষের শুভ্র যজ্ঞসূত্রের মতই প্রতীয়মান হইতেছিল, এবং পিণ্ডাদাদন-খাঁর গৃহসমষ্টি পুতুলের খেলাঘর বলিয়া বোধ হইতেছিল।

পাহাড়ের উপরে লালা অমরনাথ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখানে আমরা আবার ট্রলিতে উঠিলাম। এ ট্রলিগুলি Inclineএর ট্রলিগুলি অপেক্ষা কিছু বড় এবং এগুলিকে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য ছোট-ছোট ষ্টীম-এঞ্জিন আছে। লাইন পাহাড়ের উপর ঘুরিয়া-ফিরিয়া এক খনি হইতে অন্য খনিতে গিয়াছে। এই সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খনি হইতে বোঝাই লইয়া এই ক্ষুদ্র ট্রেণখানি Inclineএর শিরোভাগে কয়লা জমা করে; Inclineএর ট্রলি এই কয়লা ডাণ্ডোট ষ্টেশনে পৌছাইয়া দেয়। এই ছোট রেলওয়ের জন্য পাহাড়ের উপর একটি ক্ষুদ্র কারখানা (work-shop) আছে। এঞ্জিন ও ট্রলির মেরামত সেইখানেই হইয়া থাকে।

দ্বিপ্রহরের সময় আমরা লালা অমরনাথের সহিত তাঁহার বাসস্থানে পৌছিলাম। পাহাড়ের এই অংশটি অপেক্ষাকৃত সমতল ও বৃক্ষলতাবিরল। নিকটেই একটি সুন্দর Inspection Bunglow আছে। পাইপের শীতল জলে স্নান করিয়া লঙ্কা ও লবণ-সংযুক্ত আলুর তরকারী সংযোগে খুব মোটা-মোটা রুটি উদরস্থ করা গেল। এই পাহাড়ের উপর আহার্য্য দ্রব্যের অত্যন্ত অপ্রতুল; পাহাড়ের কোন-কোন স্থানে কর্ষিত ক্ষেত্র দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে এখানকার স্বল্পসংখ্যক অধিবাসীদের জীবন-ধারণের উপযুক্ত গম ছাড়া বিশেষ কিছুই উৎপন্ন হয় না।

কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর লালা অমরনাথ-প্রদর্শিত পথে আমরা যে স্থানে উপস্থিত হইলাম, তাহার ১৫।২০ হাত নীচে সেই পার্ব্বত্য ট্রেণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পাহাড়ের কোন-কোন স্থানে জলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রস্তর-গাত্র সুদীর্ঘ স্তম্ভের আকার ধারণ করিয়াছে; দূর হইতে দুর্গের ভগ্ন প্রাকার বলিয়া ভ্রম হয়। ঘুরিতে-ঘুরিতে ক্রমে আমরা এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ খনির মুখে উপস্থিত হইলাম।

এখানকার খনির একটু বিশেষত্ব আছে। রাণীগঞ্জ, ঝড়িয়া প্রভৃতি কলিয়ারীতে নিম্নাভিমুখী সুড়ঙ্গ ভূগর্ভে নামিয়া গিয়াছে; এখানকার সুড়ঙ্গগুলি পাহাড়ের ভিতর অনেকটা সোজাসুজি ভাবে (horizontally) চলিয়া গিয়াছে। এই সব টনেলের পরিসর বেশী নয়। প্রধান টনেলটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও ইহাতে এক সেট লাইন পাতা আছে; ভিতর হইতে খচ্চর কয়লা-বোঝাই ট্রলিগুলি খনি-মুখে পৌছাইয়া দেয়। এই সকল খচ্চরের গলায় ঘণ্টা বাঁধা আছে; ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইলেই টনেলের ধার ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে হয়। প্রধান টনেল হইতে ছোট-ছোট শাখা টনেল বাহির হইয়া গিয়াছে। এগুলি স্বল্প-পরিসর ও প্রায়ান্ধকার; মিল্টন-বর্ণিত নরকের Visible darknessর কতকটা ধারণা হইল। মশালের সাহায্যে এই সকল টনেলের মধ্যে কোথাও মস্তক নীচু করিয়া, কোথাও বা পূর্ব্ব বিস্মৃত সংস্কারের পুনরাবৃত্তি স্বরূপ হামাগুড়ি দিয়া আমরা পাহাড়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিলাম। খনির স্থানে-স্থানে উপরের পর্ব্বতাবরণ ভেদ করিয়া আলোক-প্রবেশের ও বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; কোথাও বা প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ঘূর্ণ্যমান পাখার সাহায্যে ভিতরের বদ্ধ বায়ু রন্ধ্রপথে বাহিরে পাঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ বায়ুর দ্বারা কক্ষ পূর্ণ করা হইতেছে। অপরিসর স্থানে কিশালকায় মজুরেরা পর্ব্বত-গাত্র হইতে "কৃষ্ণবর্ণ হীরক" কাটিয়া বাহির করিতেছে। এখানকার কয়লা উচ্চশ্রেণীর নহে; খনি হইতে লাভও খুব বেশী হয় না।

ডাণ্ডোট হইতে একটি রাস্তা পাহাড়ের উপর দিয়া চোয়া-সাদন-সা (সংক্ষেপতঃ চোয়া) নামক স্থানে গিয়াছে। ডাণ্ডোট হইতে চোয়ার দূরত্ব ৯।১০ মাইল হইবে। লাহোরের বন্ধুদের নিকট চোয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ও বিখ্যাত গোলাপ-বাগানের বর্ণনা শুনিয়া সুযোগ হইলে চোয়া দর্শনে কৃতসঙ্কল্প ছিলাম। ডাণ্ডোট হইতে চোয়ার

গিয়া, অন্য রাস্তা দিয়া খিউড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে, পূর্ব্বে ইহা স্থির হইয়াছিল; তদনুসারে ডাণ্ডোট পৌছিয়াই আমাদের ও জিনিসপত্রের বাহনের বন্দোবস্ত করিবার জন্য লালা অমরনাথকে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

খনির ভিতর হইতে আমরা যখন বাহির হইলাম, আকাশে সূর্য্যদেবের প্রভাব তখনও প্রায় অপ্রতিহত। তরুশ্রেণীর ছায়া তখনও সুদীর্ঘ হইয়া উঠে নাই এবং পাহাড়ের ঝরণাগুলির ধারে অনবগুণ্ঠিতা গৌরাঙ্গীদের জনতা তখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। সময়ের অল্পতা বশতঃ আমাদিগকে এই দিনই ডাণ্ডোট ত্যাগ করিতে হইবে। পার্ব্বত্য লাইন যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে খচ্চরওয়ালারা আমাদের "তৈজস-পত্র" লইয়া আমাদের অপেক্ষায় থাকিবে, স্থির ছিল; আমরা লাইনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ট্রলিতে যাইব ও সেখান হইতে খচ্চর-পৃষ্ঠে চোয়া যাত্রা করিব।

খনি-মুখে লালা অমরনাথের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। এক দিনের পরিচয়েই এই পঞ্জাবী ভদ্রলোকটির নিকট যে আদর ও আপ্যায়ন লাভ করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত; আর একদিন থাকিবার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লওয়া আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিন বৎসর হইল সুদূর পঞ্জাবের জন-বিরল পর্ব্বত-প্রান্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু সে-দিনের আত্মীয়তা-সুখস্নিগ্ধ প্রবাস-স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে সজীব রহিয়াছে।

ট্রলি হইতে নামিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়াও খচ্চর বা খচ্চরওয়ালাদের সন্ধান না পাইয়া আমরা চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিলাম; এমন সময় তাহাদের কিয়দ্দূরে অবস্থিতির সংবাদ পাওয়া গেল। আর কালবিলম্ব না করিয়া চোয়া অভিমুখে "খচ্চর চালনা" করা গেল।

রাস্তার ধারে গ্রামের সংখ্যা অত্যন্ত কম। কখন-কখন দূরে পর্ব্বতের মধ্য হইতে ধূম নির্গত হইয়া তথায় লোকালয়ের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিতেছে; কোথাও বা অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে কৃষাণ-বধূ ক্ষেত্রকর্ষণে তাহার স্বামীর সহায়তা করিতেছে; সান্ধ্য-বায়ু-সঞ্চালিত হরিৎ গোধূমশীর্ষের মধ্যে তাহার লাল রঙের 'সুথান' চমৎকার মানাইয়াছে। কোন-কোন স্থানে পথিপার্শ্বে জল-প্রণালীর ধারে পানীয়-আহরণার্থিনী পঞ্জাব-রমণীদের মজলিস্ বসিয়া গিয়াছে; প্রৌঢ়ারা সুখ-দুঃখের আলোচনার মাঝখানে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া পুনরায় তাহাদের ঘরকন্নার কথায় মন দিতেছে; খচ্চরের উপর অশ্বারোহণানভিজ্ঞ আরোহীদের আড়ষ্ট ভাব দেখিয়া কোন তরুণী তাহার সঙ্গিনীর নিকট নিম্নস্বরে একটু পরিহাস-সূচক মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ছাড়িল না; অস্তগামী সূর্য্যকিরণের মতই সঙ্গিনীর বিলোল নয়নে হাসির ঝিলিক্ খেলিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই রাস্তা নামিতে আরম্ভ করিল। শুনা গেল, এই উৎরাইয়ের পরেই উপত্যকার উপর চোয়া। কিয়ৎক্ষণপরেই আমরা থানা দক্ষিণে রাখিয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। লালা অমরনাথদের এখানে একটি ছোট বাঙ্গলো আছে। থানা হইতে বাঙ্গলোর খোঁজ পাওয়া গেল এবং জিনিস-পত্র সেখানে রাখিয়া আমরা কয়েকজন ৩ মাইল দূরে অবস্থিত কটাস্‌গড় দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সম্মুখে চন্দ্রালোকিত বন্ধুর পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাঁকের নীচেই জমাট অন্ধকার। আলো ও ছায়ার মধ্য দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। চারিদিক হইতে একটা মৃদু সুমিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। পথের সমরেখায় একটি ক্ষীণ জল-প্রণালী উপলখণ্ডের উপর দিয়া বিপরীত দিক হইতে নাচিতে-নাচিতে আসিতেছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমরা কটাস্‌গড়ে পৌছিলাম।

কটাস্‌গড় বা সংক্ষেপতঃ কটাস্ ("কটাক্ষের" অপ-ভ্রংশ?) বস্তুতঃ গড় নহে। ৫১ পীঠস্থানের মধ্যে ইহা অন্যতম (এখানে সতীর চক্ষু পড়িয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে)। প্রতি বৎসর বৈশাখীতে (চৈত্রের শেষ দিন) বিস্তর যাত্রী এখানে সমবেত হয় ও বাঁধান কুণ্ডের জলে স্নান করে। এই কুণ্ডটি সুগভীর। ইহার অন্তর্নিহিত কয়েকটি ঝরণা হইতে জল নির্গত হইয়া ইহাকে সর্ব্বদা পূর্ণ রাখে। উদ্বৃত্ত জল প্রণালী-মুখে বাহির হইয়া রাস্তার ধারে-ধারে চোয়া অভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে। এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র জল-প্রণালীকে চোয়া বলে; তদনুসারে চোয়া গ্রামের নামকরণ হইয়াছে।

কটাসে রামসীতার একটি সুবৃহৎ মন্দির আছে। এই মন্দিরের সেবাইত অল্প ইংরাজী জানেন। আমাদিগকে "জেন্টিলমান্‌" দেখিয়া তিনি চা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে উৎসুক ছিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে একটি পূজারী আমাদিগকে মন্দির প্রভৃতি দেখাইয়া আনিলেন। এই পূজারীটির মস্তিষ্কে রামায়ণ ও মহাভারতের একটা বিরাট খিচুড়ী পাকাইয়া গিয়াছিল; একটি মন্দির প্রদর্শনকালে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এই মন্দিরের বারান্দাতেই বহুদিন পূর্ব্বে রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ, ভীম, দুর্য্যোধন প্রভৃতি লুকোচুরি খেলিতেন।

চোয়ায় ফিরিয়া দেখিলাম, আমাদের আহার্য্য প্রস্তুত রহিয়াছে। বাঙ্গলোর তত্ত্বাবধানকারী দরওয়ান ইতোমধ্যে কয়েকখানি "খাটিয়া" আনিয়া হাজির করিয়াছে। শুনিলাম, পঞ্জাবের অনেক স্থলেই এক বা দুই আনা ভাড়ায় রাত্রির জন্য খাটিয়া পাওয়া যায়। ছারপোকার ভয়ে বারান্দার উপরে শয্যা-রচনা করাই স্থির হইল।

এই বাঙ্গলোটি উচ্চ জমীর উপর অবস্থিত থাকায় চারিধারের দৃশ্য এখান হইতে নয়নগোচর হয়। সুপ্ত গ্রামখানির উপর জ্যোৎস্নার আলোক পড়িয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। চারিদিকের পাহাড়গুলি নিঃশব্দে এই সুপ্ত সৌন্দর্য্যের প্রহরায় নিযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছিল; এবং পার্শ্বের জলপ্রণালীর অবিরাম কলকল শব্দ ঘুমপাড়ানি গানের মতই বোধ হইতেছিল।

প্রত্যূষে গ্রামের ভিতর কিছুক্ষণ বেড়াইয়া আসা গেল। জল-প্রণালী ক্ষুদ্র গ্রামটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পাহাড়ের পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সবুজ ক্ষেত্রগুলির মাঝে ছোট কুটীরগুলি শান্তির লীলাভূমি বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। নিকটেই কয়েকটি গোলাপবাগানও দেখা গেল। তখন গোলাপের সময় নয়; সুতরাং দিগ্ব্যাপিনী-লোচনলোভনীয়া" শত-শত প্রস্ফুটিত গোলাপের শোভা চর্ম্মচক্ষে দেখা হইল না।

এবার খিউড়ার পথে। রাস্তা পূর্ব্বের ন্যায় পাহাড়ের উপর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। স্থানে-স্থানে পর্ব্বত-গাত্র তৃণলতাবিরল;—চারিদিকের রুদ্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কঠোর বেষ্টনী হিসাবে সম্পূর্ণ উপযোগী।

প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় আমরা খিউড়ার সম্মুখস্থ পর্ব্বত-চূড়ায় উপনীত হইলাম। এখান হইতে খিউড়ার দৃশ্য অতি সুন্দর। চারিদিকে পাহাড়; মধ্যস্থলে উপত্যকার অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমির উপর খিউড়ার ঘন-সন্নিবিষ্ট বাড়ীগুলি। পাশের একটি পাহাড়ের উপর হরিদ্রাভ মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহগুলি স্তরে-স্তরে সুবিন্যস্ত। বিপরীত দিকে পাহাড়ের উপর লবণ-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীদের সুদৃশ্য বাসগৃহ। এই সকল পাহাড়ের পাদদেশ ধৌত করিয়া খিউড়া গ্রামের মেখলাস্বরূপ একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য জলপ্রণালী বহিয়া গিয়াছে। আমরা খচ্চরওয়ালাকে বিদায় দিয়া পাহাড়ের ঢালু গাত্র বাহিয়া নীচে নামিলাম, এবং উপলবিকীর্ণ জল-প্রণালী পার হইয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। গ্রামটি আয়তনে ক্ষুদ্র নহে; রাস্তাগুলি অপরিসর ও অপরিষ্কার; স্থানে-স্থানে আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত রহিয়াছে।

খিউড়ায় লালা বীরুমলের বাসায় সযত্ন-প্রস্তুত ভূরি-ভোজনে তৃপ্ত হইয়া খনি দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। লালা বীরুমলই পথিপ্রদর্শক। খনির প্রবেশদ্বারে আবশ্যক-মত ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হইল এবং বিস্তর ফানুস, হাউই প্রভৃতি কেনা হইল। খনি ভালরূপ দেখিবার জন্য এই সকল আসতবাজীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রথমে সন্দিহান হইলেও পরে তাহাদের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

পঞ্জাবের এই সমস্ত খনি হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে লবণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে লবণ সংগ্রহের জন্য সাধারণতঃ দুইটি উপায় প্রচলিত আছে:—প্রথম উপায়ে সমুদ্রের জল (বা অন্য কোন জল যাহাতে লবণের অংশ অধিক) বৃহৎ অগভীর চৌবাচ্চায় রাখা হয়। সূর্য্যের উত্তাপে জল বাষ্পাকার ধারণ করে এবং পরিশেষে চৌবাচ্চায় লবণ পড়িয়া থাকে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ উপকূলে এই প্রণালীই প্রবর্ত্তিত আছে। রাজপুতানায় সম্ভরের সুবিখ্যাত লবণের কারখানার চৌবাচ্চা প্রকৃতি-নির্ম্মিত। একটি প্রকাণ্ড হ্রদ (দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ মাইল, বিস্তৃতি ৩ হইতে ১০ মাইল) এই চৌবাচ্চার কায করে। বর্ষাকালে চারিদিক হইতে লবণাক্ত জল এই হ্রদে জমিতে থাকে। হ্রদের গভীরতা ১ হইতে ৪ ফিট মাত্র। গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হইতেই জল "মরিতে" থাকে এবং অবশেষে শুষ্কগর্ভ হ্রদের তলে সাদা গুঁড়ার আকারে লবণ পড়িয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রণালীতে—প্রকৃতির ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া

তথায় শত-শত যুগ হইতে সংরক্ষিত লবণ বাহির করিয়া লইলেই হইল। পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রায় সমগ্র পর্ব্বতশ্রেণীকে প্রকৃতির লবণভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। এই সুবিস্তৃত লবণগর্ভ শৈলমালাকে Salt Range বলা হইয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ লবণ-ভাণ্ডার। এই পাহাড়ে কি পরিমাণ লবণ রক্ষিত আছে, তাহার একটা মোটামুটি রকম হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। লবণস্তর কতদূর বিস্তৃত, তাহা এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নাই; কিন্তু পাহাড়ের ভিতরের লবণস্তরের সমগ্র দৈর্ঘ্য খুব কম পক্ষেও ১৩৪ মাইলের বেশী হইবে; বিস্তৃতি ৪ মাইল হইতে ১২ মাইল ও উচ্চতা ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ৩০ ফিট হইতে ২৫০ ফিট বা ততোঽধিক। লম্বে এক মাইল, বিস্তৃতিতে এক মাইল ও উচ্চতায় ৩০ ফিট পরিমাপ-বিশিষ্ট একটি লবণস্তরে প্রায় ৫ কোটি টন (১টন=২৭ মণ) লবণ আছে; সুতরাং এই Salt Rangeএ যে লবণ আছে, তাহা বাস্তবিকই অপরিমেয়। এখান হইতে গত ৫০ বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২০লক্ষ টন লবণ বাহির করা হইয়াছে; অধুনা প্রতি বৎসর প্রায় ৭০,০০০ টন লবণ সংগৃহীত হয়। সুতরাং এই অসীম ভাণ্ডার শীঘ্র নিঃশেষ হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই।

এই পর্ব্বতশ্রেণী তিনটি বিভিন্ন জেলার (ঝিলম, শাহপুর ও বন্নু) উপর অবস্থিত। প্রত্যেক জেলায় লবণসংগ্রহের নিমিত্ত একটি করিয়া কারখানা আছে। তন্মধ্যে আমাদের বর্ণনাস্থল ঝিলম জেলার খিউড়ার খনিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ১৮৭০খৃঃ হইতে এই খনির Mayo Mines নামকরণ হইয়াছে। Mayo Minesর দুইটি বিভিন্ন অংশের নাম বগ্গি ও সুজা-ওয়াল মাইন্; একটি সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ খনির এই দুইটি বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ-সাধন করিয়াছে।

Salt Range হইতে লবণ-সংগ্রহের ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। বহুকাল পূর্ব্বে, এমন কি আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পূর্ব্বেও, এখানকার খনি হইতে লবণ উত্তোলিত হইত। বোধ হয়, ইহার পর বহুদিন খনির কার্য্য বন্ধ ছিল; কারণ খনি সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। অধুনাতন যুগে আকবরের রাজত্বকালে আসফ খাঁ নামক এক সভাসদ্ সম্রাটের নিকট এই লবণ-ভাণ্ডারের কথা প্রকাশ করে এবং তদনুসারে এই সময়েই খননকার্য্য সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয়। আইন্-ই-আকবরীতে এই খনি হইতে লবণ-সংগ্রহের কথার উল্লেখ আছে। উত্তর-ভারতে শিখ-প্রভুত্বের সময় প্রচুর পরিমাণে লবণ খনিত হইত এবং মহারাজ রণজিৎসিংহ খনি হইতে ১৯ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। পঞ্জাব অধিকারের পর এই সকল খনি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হয় এবং তদবধি খনির কার্য্য সম্পূর্ণরূপে গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আছে। প্রথমে গভর্ণমেণ্টের ডিপোতে লবণ প্রতি-মণ দুই টাকা হিসাবে বিক্রয় হইত; লবণ-খননকার্য্যে খরচ মণ-পিছু আড়াই পয়সা হিসাবে পড়িত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে Salt Range হইতে গভর্ণমেণ্টের লাভ মোটের উপর প্রায় ১৫½ লক্ষ টাকা হয়। ভারতবর্ষে লবণের খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং লবণশুল্ক প্রতি-মণ দুই টাকা হইতে তিন টাকায় বর্দ্ধিত হওয়ায়, ১৮৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আয় প্রায় ৩০½ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। ১৯০৪—০৫ অব্দে খরচ-খরচা বাদে এখানকার লবণবিভাগ হইতে গভর্ণমেণ্টের আয় প্রায় ৫১ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। লবণশুল্ক মণকরা তিন টাকা হইতে কমিয়া এখন পাঁচসিকায় দাঁড়াইয়াছে এবং এই হ্রাসের জন্যই প্রতি লোকের মাসিক লবণের খরচ ১৮৭১—৭২ সালে সাড়ে তিনসের হইতে বাড়িয়া ১৯০২ ০৩ সালের হিসাবে পাঁচ সের হইয়াছে।

য়ুরোপীয় লেখকদের মধ্যে কাপ্তেন বার্ণস্ই সর্ব্বপ্রথমে এই সকল খনির বর্ণনা ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সে সময়ে খনি হইতে উৎপন্ন লবণের বার্ষিক পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ টন (?) বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে; খননকার্য্যে মণ-পিছু কিঞ্চিদধিক তিন পয়সা খরচ পড়িত। বার্ণসের পর ডাঃ এণ্ড্রু ফ্লেমিং ১৮৪৮ ও ৫১ সালে এই প্রদেশে ভ্রমণ করেন ও খনির তাৎকালীন বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীতে কার্য্য না হওয়ায় লবণ কাটিয়া বাহির করিবার সময় গুঁড়া হইয়া যাইত। লবণের চাঙ্গড় পাওয়া গেলে এই গুঁড়া লবণ শীঘ্র বিক্রীত হয় না; সুতরাং পূর্ব্বে উৎপন্ন লবণের প্রায় এক-দশমাংশ নষ্ট হইত। এই অপচয় নিবারণার্থে ১৮৬৯—৭০ অব্দে খনির ভার Imperial Customs বিভাগের (এবং অধুনা Northern India Salt Department) উপর ন্যস্ত হয়; এবং পরবর্ত্তী

বৎসরে খিউড়ার খনির তত্ত্বাবধানের জন্য একজন সুযোগ্য ইঞ্জিনীয়র নিযুক্ত হন।

আমরা খনির একটি লম্বরদারের (কুলির সর্দ্দার) প্রদর্শিত পথে প্রধান টনেল দিয়া খনির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই সুপরিসর টনেলটি বাঁধান ও অতি পরিষ্কার; মধ্যে-মধ্যে উজ্জ্বল কিটসন্ ল্যাম্পগুলি উপরের ছাদ হইতে লম্বমান; দূরে অন্ধকাররাশির মধ্যে তীব্র আলোকরশ্মিগুলি মিলাইয়া যাইতেছে। এই আলোক-আঁধারের সঙ্গমের মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম; এবং অবশেষে প্রধান টনেল ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী শাখা টনেল দিয়া একটি কক্ষে নীত হইলাম। চারিদিক হইতে কর্ম্মরত মজুরদের হাতুড়ি ও গাঁতির শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত হইলে দেখিতে পাইলাম, আমরা একটি বিশাল কক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র সেতু। আমাদের চারিপাশে ও নীচে অসংখ্য মজুর লবণ-প্রাচীর কাটিয়া কক্ষের বিস্তৃতি সাধন করিতেছে। বহু নিম্নে একটি ক্ষুদ্র হ্রদ; লবণাম্বুর উপর একখানি ছোট নৌকা ভাসিতেছে; শুনিলাম, এই হ্রদটি অত্যন্ত গভীর। কয়েকটি ফানুষ ও আতসবাজীর আলোকে বহু উর্দ্ধেস্থিত কক্ষের ছাদ দৃষ্টিগোচর হইল।

কখন প্রধান টনেল, কখনও বা তাহার শাখা অবলম্বন করিয়া শত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। লবণ-প্রাচীর ফাটাইবার জন্য চারিদিক হইতে বারুদে অগ্নি-সংযোগের শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছিল। কোন-কোন কক্ষ সুবিস্তৃত; সর্ব্বত্রই হাউই ও ফানুস উড়াইয়া দেওয়া হইল। একটি সুপরিসর কক্ষে বহু উর্দ্ধেস্থিত বায়ু-নির্গমের রন্ধ্রপথ দিয়া একটি ফানুস বাহির হইয়া গেল। বহুক্ষণ এইরূপে খনির বিভিন্ন অংশ পরিভ্রমণ করা গেল। সর্ব্বত্রই নূতনত্ব; সর্ব্বত্রই বৈচিত্র্য। ক্রমে খনির এক অংশে উপনীত হইয়া আমরা দেখিলাম,—সম্মুখে এক অনতিপ্রসর রন্ধ্রপথ, ভিতরে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। মস্তক যথাসম্ভব আনমিত করিয়া পথি-প্রদর্শকের সাহায্যে আমরা রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ লাভ করিলাম; এবং তাহার নির্দ্দেশমত সেই ঘনান্ধকারের মধ্যে সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। প্রদর্শক দ্বারা সহসা প্রজ্জ্বলিত কয়েকটি মশালের আলোকে দেখিলাম, আমাদের সম্মুখে কয়েক হাত ব্যবধানে জলরাশি। ফানুস, হাউই ও মশালের আলোমোন বলিয়াছি। করিয়াছি, নয়নগোচর হইল, তাহা কখনও বিস্মৃত হইব বর্দ্ধমান; নহিলে লাম, আমরা একটি অনতিবৃহৎ গুহার মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি; সম্মুখে স্থির, নিষ্কম্প বারিরাশি। গুহার দেওয়াল ও ছাদ হইতে আলোকরশ্মিগুলি খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; যেন শত-শত হীরকখণ্ডে প্রাচীর গাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।* মধ্যে মধ্যে ছাদ ও প্রাচীর হইতে শুভ্র রত্নখচিত হার বিলম্বিত রহিয়াছে। চারিদিকের দেওয়াল স্থির জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া জলেও ঝিকিমিকি তুলিতেছে। কৈলাসশিখরে কুবেরের রত্নভাণ্ডার বুঝি বা এইরূপই হইবে।*

ডাঃ ফ্লেমিং-বর্ণিত অপরিসর পূতিগন্ধময় অন্ধকার কক্ষসমষ্টির পরিবর্ত্তে পরিষ্কার, বায়ুসঞ্চালিত প্রশস্ত কক্ষ ও সুড়ঙ্গগুলি বিগত ৫০ বৎসরের যত্নের ও খনি-সংস্কার কল্পে অর্থব্যয়ের পরিচয় দিতেছে। পূর্ব্বে বর্ষার সময় পাহাড়ের জল সুরঙ্গপথে খনির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানারূপ বিপদ ও অসুবিধার সৃষ্টি করিত। ফলে বর্ষাকালে খনির কার্য্য বন্ধ রাখিতে হইত। অধুনা পর্ব্বত গাত্রে জল নিষ্ক্রমণের জন্য অসংখ্য নালা তৈয়ার করা হইয়াছে; কোন ক্রমে খনির মধ্যে জল প্রবেশ করিলেও বাহির হইয়া যাইবার সুবন্দোবস্ত আছে।

খনিতে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা প্রায় ১৫০০, ইহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক; এক পরিবারের লোকেরা একত্র কাজ করে। এই সকল মজুরের অধিকাংশই পুরুষানুক্রমে খনির কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

ভিতর হইতে খচ্চরের গাড়ীতে লবণ বোঝাই হইয়া খনি-মুখে আনীত হয়। এখান হইতে লবণ-গুদাম প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। গুদাম পর্য্যন্ত জমী ঈষৎ ঢালু; এই ঢালু জমীর উপর রেল পাতা আছে; তাহার উপর দিয়া লবণ-বোঝাই ট্রলি খনি-মুখ হইতে গুদাম পর্য্যন্ত

* গুহার অভ্যন্তরে লবণাক্ত জল প্রাচীর বহিয়া গড়াইয়া পড়িবার সময়, জল বাষ্পাকার ধারণ করায়, লবণ ছোট-ছোট দানার আকারে দেওয়ালে রহিয়া গিয়াছে; এবং এইরূপে দানার উপর দানা জমিয়া গুহার প্রাচীর লবণ স্ফটিকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, গুহার ভিতরে সঞ্চিত জলরাশি অত্যন্ত লবণাক্ত।

যাতায়াত করে। প্রত্যেক ট্রলিতে একটি লোক থাকে ও ব্রেক-সাহায্যে ট্রলির গতির উপর শাসন রাখে।

Salt Range হইতে উৎপন্ন লবণই বাজারে সৈন্ধব-লবণ (Rock Salt) নামে বিক্রীত হয়। এই লবণ সাধারণতঃ ঈষৎ লোহিতাভ; কিন্তু কখন-কখন স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল দেখিতে পাওয়া যায়। খিউড়ার খনিতে প্রস্থে ৬ হস্ত পরিমিত একটি সুউচ্চ লবণের প্রাচীর দেখিয়াছিলাম। এই প্রাচীরের এক দিকে একটী সাধারণ মশাল জ্বালিয়া দেওয়া হইলে, প্রাচীরের অপর দিক হইতে আলোকের অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভূত হয়। খিউড়ার লবণ অত্যন্ত বিশুদ্ধ। রাসায়নিক বিশ্লেষণে ১০০ ভাগ লবণে গড়ে ৯৮·৪ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়।

১০০ মণ লবণ খনন করিতে মোটামুটি নিম্নলিখিত রূপ খরচ হয়ঃ—

	টাকা	আনা
খননকারী মজুরদের পারিশ্রমিক	২৲	৮.৪৭
খননের জন্য বারুদ		৩.২০
খননকারী মজুরদের জন্য প্রদীপের তৈল (১০ ছটাক)		৩.৩৩
ঐ ঐ ঐ যন্ত্র ইত্যাদি		০.৫০
লবণ-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত কুলীদের পারিশ্রমিক		১৩.০০
ঐ ঐ জন্য প্রদীপের তৈল		৩.০০
	মোট ৪৲ টাকা	

যখন আমরা খনির বাহিরে আসিলাম, তখন পশ্চিমের গিরি-শিখরে সূর্য্যদেব বিশ্রাম-শয়নের আয়োজন করিতেছিলেন। অভিভাবকের সমভিব্যাহারী অশান্ত বালকের মত ইতস্ততঃ সঞ্চারণশীল রক্তচ্ছটাগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গ্রাম্য-পথে খনি-প্রত্যাগত মজুরেরা কলরব তুলিয়া গৃহে ফিরিতেছিল; এবং দুই একখানা লবণ-বোঝাই ট্রলি তাহার একমাত্র আরোহীর "পোশ পোশ" শব্দে পাদচারীদের সচকিত করিয়া রাস্তার ধার দিয়া ছুটিয়া চলিতেছিল।

সন্ধ্যার সময় আমরা খিউড়া হইতে ট্রেণে উঠিলাম। লালা বীরুমল খিউড়ায় আবার আসিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল এবং ষ্টেশনের আলোকগুলি আমাদের চক্ষের সম্মুখ দিয়া একে-একে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। অপরাহ্নের কোলাহল-মুখর গ্রামখানি এখন নিস্তব্ধ। পল্লীর একপ্রান্ত হইতে পঞ্জাবী গানের দুই-এক চরণ বাতাসে অস্পষ্ট ভাবে ভাসিয়া আসিতেছিল। প্রাকৃতিক শোভাসম্পদ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে অবসন্ন মন ও ততোঽধিক অবসন্ন দেহ সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল। কবির কয়েকটি লাইন কেবলই মনে পড়িতেছিল

"থাক তব বিকিকিনি ওগো শ্রান্ত পসারিণী
এইখানে বিছাও অঞ্চল।"

বাঙ্গালা ধাতুর রূপ

(প্রতিবাদ)

[শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল]

গত পৌষ মাসে "বাঙ্গালা ধাতুর রূপ" সম্বন্ধে আমার লেখা একটি প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইবার পর মাঘ মাসে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় সেই প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াছেন। রাখালরাজবাবু আলোচনায় যে কয়েকটী কথার অবতারণা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক।

১। রাখালরাজবাবু বলেন, "অনাদিবাবু 'করিতেছে' ও 'করিয়াছেন' শব্দগুলিতে 'তেছে' ও 'য়াছে' কে প্রত্যয় বলিয়াছেন,—ইহা ঠিক নহে" ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত মাননীয় বিদ্যানিধি মহাশয় রাখালরাজবাবুর Authority। বিদ্যানিধি মহাশয়ের ব্যাকরণের ১২০ পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই যে, তিনিও ইতেছি ও ইয়াছিকে বিভক্তি বলিয়াছেন। অতএব যোগেশবাবুর কথা যখন ঠিক, তখন আমার কোনও ভুল হয় নাই। য়াছি ও তেছির উদ্ভব সম্বন্ধে রাখালবাবুর সহিত একমত। তথা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য' দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৭ পৃষ্ঠা ও ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে'র ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। উদ্ভব ঐরূপই বটে, তবে কোনও বালককে ধাতুরূপ করিতে বলিলে, সে সটান তেছি ও য়াছি বিভক্তি যোগ করিয়াই ধাতুরূপ করিবে।

২। রাখালরাজবাবু লিখিয়াছেন, "ধরা ধাতু নহে; ইহা ধর ধাতুর

বিশেষ্যের রূপ। যথা, ধরা পড়িল না। সংস্কৃতে গম্ ধাতু না লিখিয়া "গমন" ধাতু বলিলেও ঠিক এই প্রকারই ভুল হয়।"

"সুন্দর প'ড়েছে ধরা" এইবাক্যে ধরা বিশেষ্য? কখনই নহে। যোগেশবাবুর ব্যাকরণ ১১৩ পৃষ্ঠায় আমরা দেখি—"অনেক ধাতু অপর ধাতুর সঙ্গে একযোগে ক্রিয়া সাধন করে। হওয়া, যাওয়া, পড়া, উঠা, তুলা, দেওয়া এইরূপ সহচর ক্রিয়া। করা হইল, করা গিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে ইত্যাদি উদাহরণের করা হইল বাক্যের ক্রিয়া যাদের স্বাতন্ত্র্য বরং দেখা যায়, অন্যগুলি অন্যের অনুচর্য্যা না পাইলে ক্রিয়া সমাপ্তি করিতে পারে না। যোগেশবাবুর মতে ইহারাও ধাতু বা সহচর ক্রিয়া। তাঁহার করা কায (করা Past participle) ; কায করা (ক্রিয়া) ; কায করার (বিশেষ্য) অভ্যাস। একই আকার যুক্ত "করা" তিন ভিন্ন parts of speech।

৩। রাখালরাজবাবু লিখিয়াছেন, "তিনি ইংরাজীর অনুকরণে 'আমি করিয়াছি' কে বর্ত্তমান কাল বলিয়াছেন" ইত্যাদি। আমি গোড়ায় স্বীকার করিয়া লই যে, আমি তাহা করিয়াছি। এখন যোগেশবাবু এ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা এই—

১৫৫ পৃঃ ব্যাকরণ—অতএব করিয়াছি=করি+আছি কিম্বা করিয়া +আছি=কৃত্বা অস্মি।—১৫৬ পৃঃ ব্যাকরণ—অতএব ইয়া প্রত্যয় দ্বারা অনন্তর করণ কিংবা অধিকরণ বুঝায়। ইয়া প্রত্যয় পরে বিভক্তি লাগে না। এই হেতু ইয়া প্রত্যয়ান্ত পদ অব্যয় বলা চলে। এই অব্যয় দ্বারা কর্ত্তা বিশেষিত হয়। বাঙ্গালা ব্যাকরণকার ইয়াকে ক্রিয়ার বিভক্তি মনে করিয়া, ইয়া যুক্ত ক্রিয়াপদকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলিয়া থাকেন। ক্রিয়ার বিভক্তি দ্বারা, ক্রিয়ার বচন পুরুষ ও কাল বুঝায়। ইয়া দ্বারা সে সব কিছুই বুঝায় না। ইয়া দ্বারা পরবর্ত্তী ক্রিয়ার পূর্ব্বকাল বুঝায় বটে, কিন্তু সকল স্থলে সে অর্থ স্পষ্ট থাকে না। যে ক্রিয়া বাক্যের অর্থ পূর্ণ করে, তাহার নাম সমাপিকা ক্রিয়া এবং যে ক্রিয়া করে না তাহার নাম অসমাপিকা। কিন্তু যখন ক্রিয়াতেই সন্দেহ, তখন অসমাপিকা ভাগ কল্পনা নিরর্থক। কাটিয়া ফেল, হইয়া উঠিল, ইত্যাদির ফেল, উঠিলকে সহযোগী ক্রিয়া বলা গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে দেখা গেল ফেল, উঠিল, বাস্তবিক সমাপিকা ক্রিয়া এবং ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ইয়া প্রত্যয়ান্তপদ বিশেষণবাচক অব্যয়।

অতএব যোগেশবাবু হইয়াছি হইয়া+আছি=হইবার পর+আছি—"হইয়া"টাকে বিশেষণবাচক অব্যয় বলিলেন—আছি বর্ত্তমান কাল থাকিয়া গেল। ১৫৫ পৃষ্ঠায় কৃত্বা অস্মিও তাহাই দেখাইতেছে। ১৫৮ পৃঃ ব্যাকরণে যোগেশবাবু লিখিয়াছেন, হইতে করিতে বর্ত্তমান কাল বুঝায়—হইয়া করিয়া ভূতকাল। করিতে আছি বা করিতেছি ক্রিয়া শেষ হয় নাই। করিয়া+আছি বা করিয়াছি ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। করিয়া+আছি=করিবার পর+আছি=করা কার্য্য সমাপনান্তে আছি। করা কার্য্য শেষ হইয়াছে, কিন্তু কর্ত্তা ক্রিয়া সমাপ্ত করার অবস্থায় আছেন। অতীত ক্রিয়ার ফল বর্ত্তমান—যেমন যোগেশবাবু (ব্যাকরণ ১২৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন। অতীত ক্রিয়া যিনি সম্পাদন করিয়াছেন তিনি বর্ত্তমান নহেন কেন? এই অর্থে আমি বর্ত্তমান বলিয়াছি। 'করিয়াছি' —করিয়া+আছি—করিয়াকে অব্যয় ধরিলে, আছি বর্ত্তমান; নহিলে অন্য কোন্ কাল সূচনা করে?

আমি যদি বলি, আমি শুইয়া আছি—এটা অবশ্য বর্ত্তমানকাল? (মানে আমি শয়নান্তে—শয়ান অবস্থায় আছি)। আর যদি বলি, আমি শুইয়াছি=আমি শুইয়া+আছি আমি শয়ন কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক এখনও শয়ান আছি; একেবারে অতীত বলি কেমন করিয়া? পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে করিয়াছি—পাঁচ বৎসর কথায় অতীত কাল ঠিক করিয়া দিতেছে। বাঙ্গালায় রূপ চলে তাই আছে? এক্ষণে যে ইংরাজীর অনুকরণ করিয়াছি, তাহার আলোচনা করা যাউক।

The Present Perfect :- The peculiar purport of this tense is that it invariably connects a completed action or event in some sense or other with the present time.

I have lived 20 years in Lucknow (*i. e.*, I am living there still, and began to live there 20 years ago).

The lamp has gone out (*i. e.*, it has just gone out and we are now left in the dark).

(*a*) The present perfect can be used in reference to a past event provided the state of things arising out of that event, is still present.

The British Empire has succeeded to the Mogul.

করিয়াছি র অতীত কাল সূচনা "করিয়া" এই অসমাপিকার উপস্থিতির জন্য—আসল সমাপিকা অংশ 'আছি' বর্ত্তমান কাল সূচনা করে।

৪। রাখালরাজবাবু লিখিয়াছেন কহা, বহা, রহা অনাদিবাবুর মতে হা অন্তধাতু—যোগেশবাবু যদিও এ ধাতুগুলিকে ক, র, ব, স, ল, হ, হাদিগণীয় বলিয়াছেন ১১৭ পৃষ্ঠায়; পরে ১২৪ পৃষ্ঠায় তিনি আবার বলিতেছেন—এই সকল ধাতুর পরে একটা "হ" আছে। ধাতু বাস্তবিক—গাহ, কহ, চাহ, রহ, বহ, সহ, লহ। আমার সহিত এখানে যোগেশবাবুর মত মিলে নাই। আমি ইতিমধ্যে কতকগুলিকে হা অন্ত কতকগুলিকে ওয়া অন্ত বলিয়াছি [যথা চাওয়া লওয়া] ইত্যাদি। একজনের সহিত মতের অমিল হইলেই তাহা ভুল হয় না। কেন না এখনও এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। আলোচনায় সব সিদ্ধান্ত বহুকাল পরে ঠিক হইবে।

যোগেশবাবু ১১৪ পৃঃ লিখিয়াছেন, ধাতুর উত্তর "আ" করিলে প্রয়োজকরূপ পাওয়া যায়। যথা কর্ হইতে করা (To cause to do) চেনা (To cause to make known)। ইহা আমার মনঃপূত নহে।

যদি এখন করা মানে cause to do বলা যায়, কেহ এখন সে কথা মানিবে? ১৩৮ পৃঃ যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—"প্রয়োজক অর্থে

ধাতুর উত্তর "খা" হয়। কর ধাতু হইতে করা। "হিন্দী ও মারাঠীতে ধাতু একবার আন্ত ক'রিয়া আবার আন্ত করা যায়। বাং কর, হিঃ কর, মর কর্ বাং করাণ, হি করাণা সংকরবণ।" এ ছুঠবার আন্ত (আ+অন্ত=আন্ত) করিয়া বাং করাণ কেমন করিয়া হয়?

যাওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে যোগেশ বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমি স্বীকার করি না, অথচ যোগেশ বাবুর মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহা বলিবার সাহস এখনও হয় নাই।

নামধাতু সম্বন্ধে যে তালিকা দিয়াছেন ১২২ পৃষ্ঠায় তাহা দেখিয়া মনে হয় সেগুলি সব হিন্দি বাংলায় লাতান (আজকালকার বানান লতানো) বঙ্গে লতানা শুনি নাই। ১২৬ পৃষ্ঠায় এই বাক্যটী সড়িঃ "কোন্ ধাতু কথিত ভাষায় কি রূপ ধরে তাহা দেখানা (বোধ হয় মুদ্রাকর দোষ 'দেখান' হইবে) এই প্রকরণের উদ্দেশ্য। আমি ধরা করা ধাতু বলিয়াছি, যোগেশ বাবুর মতে কর্ ধর্ এ স্থলে মতভেদ মাত্র।

৫। রাখালরাজ বাবু লিখিয়াছেন "অনাদি বাবু যা ও ত কর তর ত কে কোথাও 'ত' কোথাও 'অত' লিখিয়াছেন" আমার প্রবন্ধে ২৪ দফায় ছাপা হইয়াছে (মুদ্রাকর দোষে) প্রথম পুরুষের 'এর' 'স্থানে 'ওত' ব্যবহার করিয়াছে। ইহা এই রকম ছাপা হওয়া উচিত ছিল, প্রথম পুরুষের 'এর'র স্থানে 'ওত' ব্যবহার করিয়াছেন'।

৬। আমি আমার প্রবন্ধের ১৭ ও ১৮ দফায় লিখি:—

বাঙ্গলার এ বা ই স্থানে বিদ্যাপতিতে উ দেখা যায়—তৎপরিবর্ত্তে, বাঙ্গলায় যেখানে এ বা ই হয়, ব্রিজ ভাষায় সেখানে কখন ও 'উ' হইত লিখিতে আমার আপত্তি নাই।

৭। অন্যান্য কথাগুলি ও আলোচনার জন্য আমি রাখাল বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ;—আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মহাশয়ের মতামত বরাবর উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। 'আমাদের সর্ব্বনাম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এ প্রবন্ধে ধাতুর শ্রেণীবিভাগ লইয়া আমি তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারি নাই; স্বয়ং যোগেশ বাবুও পণ্ডিত শ্যামাচরণ শর্ম্মা ও নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তথা শ্রীশ্রীনাথ সেন মহাশয়ের পুস্তকের সাহায্য পাইলেও সকল স্থলে তাঁহাদের মত স্বীকার করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তাঁহাদের মত ভ্রান্ত, এ সিদ্ধান্তও নহে। এই আলোচনার উত্তরে যোগেশ বাবুর অনেক মতের সহিত আমার মত মিলে না, শুধু এই মাত্র বক্তব্য।

অদল-বদল

[শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা]

দীর্ঘকালের পর-সেবা আমাদিগকে কতদূর হীন করিয়াছে, তাহার একটি জীবন্ত জলন্ত প্রমাণ এই যে, পৃথিবীর অন্য সকল দেশবাসীরাই তাহাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি-নীতির সমর্থন করে,—আমরাই শুধু আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের নিন্দা করিয়া থাকি। রামকে অবতার বলিতে আমরা লজ্জায় মরিয়া যাই; কিন্তু যীশু খৃষ্টকে অবতার বলিতে য়ুরোপীয়গণ গর্ব্ব অনুভব করেন। অবতার-বাদে যদি কুসংস্কার থাকে, তবে রাম ও খৃষ্ট উভয়েই সমান কুসংস্কারের ফল। আমাদের দেশের রামনবমীর সঙ্গে এখন আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই; কিন্তু বড়দিনের উৎসব হইতে শিক্ষিত য়ুরোপীয় কিম্বা মার্কিনবাসী আপনাদিগকে স্বতন্ত্র রাখেন না;—জাতীয় অনুষ্ঠানের আনন্দ ও উৎসব ষোলআনা ভোগ করেন। তাঁহাদের সামাজিক প্রথা কিছুতেই পরিবর্ত্তিত করেন না; সামান্য খুটিনাটিটুকুও সহস্রাধিক বৎসর হইতে অপরিবর্ত্তনীয় ভাবেই চলিতেছে।

ইংলণ্ডে বহুকালের চেষ্টায় শ্যালিকা-বিবাহ আইন-সঙ্গত বলিয়া গণ্য হইলেও, সমাজ উহা গ্রহণ করে নাই। একই টেবিলে খাইতে বসিয়া ফরাসিরা চামচা দিয়া চা খাইবে, ইংরাজ ও জার্ম্মাণ পেয়ালা ধরিয়া চুমুক দিয়া চা খাইবে, ইহার অন্যথা হওয়ার জো নাই। ইংরাজী গ্রন্থে সর্ব্বত্র ইংরাজের যশঃ-কাহিনী। বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকগুলি ইংরাজ পিতা-মাতার, ইংরাজ বালক-বালিকার মহিমা-কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। রয়েল-রীডারে ছবি দেখ; এক হিন্দু আয়া (?) ইংরাজ বালিকাকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছিল। হঠাৎ বাঘ আসিয়া পড়িল। হিন্দু-আয়া প্রাণের ভয়ে ব্যতি-ব্যস্ত,—ইংরাজ বালিকা এই বিপদে স্থির ভাবে যুক্ত করে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে; এমন সময় তাহার প্রার্থনার ফল ফলিল,—দূর হইতে অলক্ষিতে থাকিয়া এক জন (অবশ্য ঈশ্বর-প্রেরিত) বাঘটাকে গুলি করিয়া মারিল। যুবতী হিন্দু আয়ার সঙ্গে ইংরাজ-বালিকার কতটা প্রভেদ, তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইল।

কুসংস্কার সকল দেশেই আছে। যে জাতি যত প্রাচীন, সেই জাতির মধ্যে কুসংস্কার ও রূপ-কথা তত অধিক।

আজকাল অনেক পাশ্চাত্য লেখক তাঁহাদের সভ্যতার লীলাভূমি প্রাচীন গ্রীস ও রোমের গৌরব রক্ষার জন্য দাসত্ব-প্রথারও একটা ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা দিতেছেন। তাঁহাদের উক্তি এই যে, যুদ্ধে পরাজিতদিগকে হত্যা না করিয়া "দাস" করিয়া রাখা হইত; অতএব নিছক দয়া হইতে দাসত্ব-প্রথার উৎপত্তি। জাপানিগণ ঘরে-ঘরে পূর্ব্ব-পুরুষের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশাত্মবোধ লাভ করিয়াছে। সমগ্র জাতির প্রতিনিধিরূপে রাজা সমগ্র জাতির পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ড-দানের (পূজার) অধিকারী; ইহাই জাপানের রাজভক্তির অটল ভিত্তি। সকলেই পূর্ব্বপুরুষের ও স্বজাতির গৌরব-গীতি গাইয়া বড় হইতেছে; আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ ও স্বদেশীকে নিন্দা করিয়া বড় হইতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

প্রকাশ্য ভাবে সকলে মিলিয়া মদ্যপান আমাদের দেশে গুণ্ডারাই করে,—স্বাস্থ্য-পান নিয়মটা এ দেশে একান্তই সভ্যতা বিরোধী।

পরস্ত্রীর পক্ষে পরপুরুষের গলা ধরিয়া নৃত্য-প্রথা আমাদের নিকট লজ্জা-জনক ও নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য। এ দেশের সাঁওতাল, কুকী, গারো, মুণ্ডা প্রভৃতি যে সকল জাতির স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্যে নৃত্য করে, তাহারাও পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া নাচে। পুরুষের গলা ধরিয়া মেয়ে নাচিতেছে—ইহা দেখিলে, এ দেশের অসভ্য জাতিরাও লজ্জায় মরিয়া যায়। হিন্দু কি মুসলমান সমাজে যে শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা নৃত্য করে, ভদ্রসমাজের মেয়েদের সঙ্গে তাহাদের নাম করা অসঙ্গত; কিন্তু তাহারাও কোন পুরুষের গলা ধরিয়া নাচা, কিম্বা পুরুষের সঙ্গে একত্র নৃত্য করা অত্যন্ত ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া মনে করে। অথচ এই প্রথাটী য়ুরোপ, আমেরিকায় সভ্যজাতিদিগের একান্ত মনোমদ ও সভ্যতার পরিচায়ক। আরও আশ্চর্য্য এই যে, কোনও রমণীই নৃত্য-চক্রে আপনার পতির সঙ্গে নাচিতে পারিবে না; সকলকেই পর-পুরুষের গলা ধরিয়া নাচিতে হইবে;—এটী বিশেষ বিধি।

আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তিতা প্রথাটা য়ুরোপের মতে বড়ই অনিষ্ট-জনক। ইহাতে স্বাবলম্বন নষ্ট হয়, কুড়ের দল বেড়ে যায়। বিলাসিতা এবং স্বার্থপরতার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ থাকায়, আমাদের দেশের শিক্ষিতগণ এই মতটা সহজেই বড় পছন্দ করিয়াছেন। বৃদ্ধ পিতা-মাতা খাটিয়া খাইবেন,—সক্ষম যুবক পুত্রের উপর নির্ভর করিবেন কেন? তাঁহাদিগকে এরূপে প্রশ্রয় দিয়া অলস করিয়া রাখা পুত্রের কাজ নয়, শত্রুর কাজ। বিধবা ভ্রাতৃবধূ, পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র, অক্ষম ভ্রাতা ভগিনী, তাহাদের ত কিছু মাত্রই দাবী নাই। তবে দশমাস গর্ভে ধারণ ও বাল্য-কালে লালন-পালন করিয়াছেন বলিয়া জননী দশ মাসের গুদাম-ভাড়া ও বেতন হিসাবে কিছু পাইতে পারেন। কিন্তু পিতা পুত্রের জন্য যাহা খরচ করিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে তাঁহার ন্যায়তঃ কিছুমাত্র প্রাপ্য নাই; কেন না তিনি যখন পুত্রের বিনা অনুরোধে তাহাকে সংসারে আনিয়াছেন, তখন পুত্রের লালন-পালন করিতে তিনি একান্ত বাধ্য। পুত্রের তাঁহার নিকট বাধ্য থাকার কিছু মাত্র যুক্তি নাই। বিশেষতঃ আত্মীয় লোকদিগকে বসাইয়া খাওয়াইয়া অকর্ম্মণ্য করা কখনই বান্ধবের কার্য্য নহে। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর যোগ্য ব্যক্তিগণ প্রমাণিত করিতে চাহে যে, তাহারা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার অনুরোধেই দয়া করিতেছে না। বস্তুতঃ আমরা ভারতবাসীরা এরূপ কার্য্যকে একান্ত পাষণ্ডতা মনে করি।

কৈ, কেহই ত স্ত্রীর প্রতি এইরূপ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা দেখায় না? সে লোকটী যে পালঙ্কে বসিয়া নবেল পড়ে আর তাস পেটায়, তাহাকে অলঙ্কারের ভারে দিন-দিন স্থবির করা ভিন্ন, খাটিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কেহ ত উপদেশ দেয় না? পুত্রকেই বা কয়টা লোক বঞ্চিত করে? গোলযোগ শুধু ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের বেলায়।

যে কাজে স্বার্থপরতা ও বিলাসিতা বৃদ্ধি পায়, তেমন ব্রত অবলম্বন করা অতি সহজ; যাহা করিতে গেলে ত্যাগী হইতে হয়, তাহা করাই কঠিন।

মানুষের টাকা-পয়সার কথাই কি সর্ব্বস্ব? হৃদয়কে বিক্রয় করিয়া কি টাকা সঞ্চয় করিতে হইবে? একান্নবর্ত্তী পরিবারে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপার্জ্জনক্ষম, তাঁহার প্রাণটা গড়ের মাঠের মত বড় হওয়া চাই; তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের মতন অন্যান্য সকলের স্ত্রী-পুত্র ঠিক সমান-সম্মান সাজন-ভোজন পাইবে, ক্ষুদ্র-হৃদয় লোক ইহা কি সহিতে পারে? "দেল-

দরিয়া” না হইলে এ কাজ পারে না। ইহা যে সংসারের সমস্ত ব্রত অপেক্ষা কঠিন ব্রত। শুধু টাকা দিলেই হইল না। সকলকে খাওয়াইয়া-পরাইয়াও সকলের কঠিন কথা শুনিতে হয়, অনেক অন্যায় আব্দার সহ্য করিতে হয়, অনেক ঝগড়া-বিবাদ ও বহু বিরক্তির মধ্যে বাস করিতে হয়, এবং মৃত্যুকালে চিরজীবনের উপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি সমান ভাবে সকলকে বণ্টন করিয়া দিতে হয়। এ যুগে এরূপ কাজ করিতে তোমার শক্তি আছে কি? বর্ত্তমান শিক্ষায় তোমার প্রাণকে এতটুকু করিয়া ফেলিয়াছে। এরূপ কাজ ভাল কি মন্দ, তাহা বিচারের পূর্ব্বে হৃদয়কে পরীক্ষা করিয়া দেখ,—তোমার মধ্যে এতটা ত্যাগ, এতটা সাহস টের পাও কি?

অলস ও অকর্ম্মণ্য করার কথা বলিতেছ? তোমার প্রৌঢ়া বিধবা ভ্রাতৃবধূ আর তাহার অপোগণ্ড শিশুটী, তাঁহাদিগকে তোমার অতুল সম্পত্তির অংশ দাও না, কুড়েমির ছলনা তাহাদের সম্বন্ধে খাটিতে পারে না। তোমার ভ্রাতৃজায়া ত যথাসাধ্য তোমার সংসারে খাটিতেছেন, তিনি ত অলস নন্। তাঁহাকে এবং তাঁহার নাবালক শিশুটীকে কি দিয়াছ? তোমার পিতা কিম্বা পিতামহ এ অবস্থায় কি করিতেন? তাঁহাদের নিজের যদি তিনটী সন্তান থাকিত, তবে ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রটী সম্পত্তির আট আনা পাইত এবং নিজের তিন পুত্রকে আট আনা দিতেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি পৈত্রিক সম্পত্তির মতনই বিভক্ত হইত। এ ত্যাগ, এ সাহস তোমাদের সম্ভবে কি? তোমরা নব্য সভ্য, তোমাদের পিতার পরিবার স্বতন্ত্র, দাদার পরিবার স্বতন্ত্র; তোমাদের পরিবার শুধু তোমাদের স্ত্রী-পুত্র।

তোমার দ্বিতল প্রাসাদের ছায়ায় তোমারই জ্যেষ্ঠ সহোদর পাতার ঘরে অর্দ্ধ-উপবাসে কাল কাটায়। তোমার পিতা-পিতামহ এতটা সহিতে পারিতেন না; এরূপ কাজে সমাজে মুখ দেখাইতেও তাঁহাদের লজ্জা হইত। বিষয়টা সমস্তই উপার্জ্জন করিয়াছিলেন রামকান্ত—কিন্তু কর্ত্তা হইলেন কৃষ্ণকান্ত। রামকান্ত উপার্জ্জন করিয়া দাদার হাতে যে অবিচারে সর্ব্বস্বার্পণ করিতে পারিয়াছেন, তাহাতেই কৃতার্থ। এ ভাব এখনও বাংলার পল্লীগ্রাম হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

তোমাদের নব্য-নীতি—এই যে, কেন একের গ্রাস অন্যে কাড়িয়া খাইবে? জিজ্ঞাসা করি, দাদা যদি পর হন, পুত্রই বা বেশী আপন কিসে? তোমার মৃত্যুর পরে তোমার বিপুল বিষয় লইয়া পুত্রেরা কি করিবে, ঠিক করিয়া বলিতে পার কি? সচরাচর যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইবে। তোমার দৃষ্টান্তে পুত্রগণ স্বার্থপর হইয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইবে এবং নানারূপে অচিরে সর্ব্বস্বান্ত হইবে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকিতে যে সংযমটুকু চাই, সেটুকু অনেক সময় লোককে সর্ব্বস্বান্ত হইতে রক্ষা করে।

তোমরা সমবায় (কো-অপারেটিভ সিষ্টেম) প্রথার প্রশংসা কর; আমাদের প্রত্যেক পল্লীতে, প্রত্যেক গৃহে এই সমবায়-প্রথা ছিল। শুধু তোমার আত্মীয়-পরিবারবর্গ নহে, —দশকর্ম্মের মধ্য দিয়া তোমার উপার্জ্জিত অর্থ সকল সম্প্রদায়ের লোকের পাতে অন্ন দিত। তখনকার লোকেরা টাকার পুঁটুলী বাঁধা অপেক্ষা টাকা ব্যয় করিয়া বেশী শান্তি ও সন্তোষ লাভ করিতেন। এখন তোমাদের সভ্যতার যুগ পড়িয়াছে—

“সাবেক সে দিন নাই শান্তির অসভ্য যুগ,
বসিয়াছে সভ্যতার হাট।
কমল দলিত এবে, অনাদরে পদতলে
হেথায় বিকায় শুষ্ক কাট॥”

গ্রাম্য কবি গাহিয়াছেন,—

“বাপের কন্যা মুড়কী পান্ না,
শালীর মণ্ডা রোজ।”

শালী নানা প্রকার,—ভার্য্যার ভগিনী, তাঁহার লালসা এবং তিনি যাহাদিগকে ভালবাসেন, তাহারা সকলেই শালা ও শালী।

য়ুরোপের প্রণালীতে চলিতে হইলে তোমার অক্ষম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দরিদ্র নিবাসে আহার করিতে হইবে এবং তুমি সেই দরিদ্র-নিবাসে কিছু মাসিক চাঁদা দিলে তোমার প্রদত্ত অর্থে তাঁহার খাদ্যের কিঞ্চিৎ অংশ কেনা যাইবে। তুমি মটর হাঁকাইয়া থিয়েটারে যাওয়ার রাস্তায় দেখিতে পাইবে তোমার দাদা—তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, দরিদ্রাশ্রমে মাথায় বহিয়া আবর্জ্জনা আনিয়া রাস্তায় ফেলিতেছে। হিন্দু কি এতটা সহিতে পারে?

একান্নবর্ত্তী পরিবারে অলস লোক বসিয়া খায়, অথবা

বসিয়া খাইতে পায় বলিয়া অলস হয়, এইটাই যদি তোমার প্রাণের কথা হয়,—তুমি তাহাদের উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দাও না কেন? এমন লোক খুব কম আছে, যে ব্যক্তি উপার্জ্জন করিতে চাহে না। উপায় করিতে পারে না বলিয়াই অলস হইয়া থাকে। আসল কথা, তুমি দশজনকে সাহায্য করিতে চাহ না, উহাতে তোমার উপভোগে বাধা জন্মে।

য়ুরোপের মধ্যে গ্রীসে ও রুশিয়ায় না কি এখনও একান্নবর্ত্তিতা একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। মার্কিনের লোকেরা গ্রীক উপনিবেশীদিগকে তেমন পছন্দ করে না;—কেন না তাহারা আমেরিকায় টাকা উপার্জ্জন করিয়া গ্রীসে পিতামাতার নিকট পাঠায় এবং মাঝে-মাঝে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে বাস করে। শুনিয়াছি, রুশিয়াতে নাকি বৌ-মাদিগকে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর কথা শুনিয়া চলিতে হয়। সে সকল দেশের অবস্থা অর্থাৎ গৃহ-শান্তি নাকি অপেক্ষাকৃত ভাল, এবং পারিবারিক হা-হুতাশও অনেকটা কম। আমাদের বিশেষ পরিচিত একজন য়ুরেসীয়ান বলিয়াছেন যে, কলিকাতা বৈঠকখানায় তিনি যে কয়দিন তাঁহার মায়ের বাড়ী ছিলেন, তাঁহাকে সে কয়দিনের বিল শোধ করিতে হইয়াছে। মা'কেও পুত্রের বাড়ী গিয়া হয় ত এইরূপ করিতে হয়। আমাদের দেশের যে কোনও অশিক্ষিত ও দরিদ্র লোককে একথা বিশ্বাস করান কঠিন কার্য্য।

একান্নবর্ত্তিতার পক্ষে ওকালতী করা এখন অরণ্যে রোদন। আমাদের আরাম-লিপ্সা ও স্বার্থপরতা একান্নবর্ত্তিতাকে গঙ্গাযাত্রা করাইয়া রাখিয়াছে। এখন কোনও প্রকারের ঔষধেই জীবন রক্ষার উপায় নাই। কিন্তু এক দল উহাকে বিদায় দিয়া আপদ গেল বলিয়া আরাম অনুভব করেন, অন্য দল উহাকে বিদায় দিয়া প্রতিমা-বিসর্জ্জনের দুঃখ অনুভব করেন। আদর্শ অনুসারে চলিতে পারিতেছি না বলিয়া আদর্শকে অপমান করা উচিত নহে।

য়ুরোপের সঙ্গে, বিশেষতঃ আমাদের রাজ-জাতি ইংরাজের সঙ্গে যদি আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের অদল-বদল হইত, অর্থাৎ আমাদের আচার-আচরণ যদি তাঁহাদের এবং তাঁহাদের আচার-আচরণ যদি আমাদের হইত,—তবে উভয় পক্ষের মনের ভাব কিরূপ হইত, একবার ভাবিয়া দেখা যাক্।

ইংরাজ যখন রাজা, তখন আমাদের আচার-ব্যবহার যাহাই হউক, সে সকলকে নিন্দা করার অধিকার তাঁহার অবশ্যই থাকিত। সেরূপ স্থলে ইংরাজ বলিতেন,—"হিন্দুরা যাহার-তাহার ভাত খায়, যাহার-তাহার সঙ্গে খায়, যে কোন জাতির মেয়ে বিবাহ করে, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহারা উচ্চজাতীয় মনুষ্য নহে। বিধবা-বিবাহ সর্ব্বশ্রেণীর পশুপক্ষী ও অসভ্যজাতির মধ্যেই প্রচলিত। হিন্দুরাও বিধবা-বিবাহ দিয়া থাকে,—অতএব ইহারা এখনও মনুষ্য-জীবনের উচ্চ স্তরে আরোহণ করে নাই। ইহারা মদ্যপায়ী এবং ইহাদের স্ত্রীলোকেরা যেখানে সেখানে যাহার-তাহার সঙ্গে বেড়ায় এবং হাট-বাজার করে; আর পরপুরুষের গলা ধরিয়া নৃত্য করে; একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকিতে জানে না; মা বাপ ও ভাই-ভগিনীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। অতএব ইহারা এখনও অসভ্য এবং কিছুতেই স্বায়ত্তশাসন, লাভের উপযুক্ত নহে।

তখন আমাদের দেশের অনুকরণপ্রিয় বাবুরা বলিতেন;—"কেনই বা ইংরাজ আমাদিগকে সম্মান করিবে? আমাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি যে এখনও একান্ত নিম্নশ্রেণীর লোকের মতনই রহিয়াছে। উঁহারা কেমন পবিত্রভাবে থাকেন, উচ্চশ্রেণী ভিন্ন অন্য শ্রেণীর ভাত খাওয়া ত দূরের কথা—জলটুকুও গ্রহণ করেন না। ইঁহারা উপবাসী থাকিলেও অন্য জাতির ছোঁয়া খান্ না। কি চমৎকার আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান! আমাদের বিধবা-বিবাহ ব্যাপারটা উঁহাদের নিকট একান্তই ঘৃণিত। আমরা পশ্বাদি জন্তুর মতন—বড় হইলে আর পিতা-মাতার ধার ধারি না; এক পরিবারে দশজন মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে জানি না;—এ সকল বিষয়ে এখনও আমরা সাধারণ জন্তুর শ্রেণীভুক্ত আছি। সু-সভ্য ইংরাজ-জাতি আমাদিগকে কিরূপ চক্ষে দেখেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে,—অনেক শিষ্টাচারী ইংরাজ ও ইংরাজ-মহিলা আমাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান না করিয়া গৃহে প্রবেশ করেন না। আমরা মল-মূত্র পরিত্যাগ করিয়া জল-শৌচ করি না, শূয়র, গাধা, গরু, ঘোড়া, যা' খুসী তাই আহার করি—আমাদিগকে ছুঁইয়া স্নান না করিবেন কেন? এই সকল আচার-ব্যবহারের দ্বারা ইংরাজগণ এমন এক উচ্চ স্তরে বিরাজ করিতেছেন যে, আমাদিগকে একজাতীয় মনুষ্য বলিয়াই মনে করেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যে আমাদিগকে সম-জ্ঞান করিবেন, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিবেন, এরূপ আশা করা—একান্তই দুরাশা ও মূর্খতা।"

স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা, দুস্থ বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবকগণের আশ্রয়, বিনয়ের অবতার, স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত-স্থল, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা, আমাদের 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারী, উদারচেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহলোকে নাই। ৮১ বৎসর বয়সে পুত্র, কন্যা, জামাতা, পৌত্র, দৌহিত্র পরিবৃত সোনার সংসার, আদর্শ গৃহস্থালী রাখিয়া তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। আজ দশ বৎসর তিনি দৃষ্টিহীন হইয়াছিলেন, তাহার পর দুই বৎসর হইল তাঁহার সন্ন্যাস রোগের সূত্রপাত হয়। এই সুদীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর বিগত ১২ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নকালে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন; মৃত্যুর দিন প্রাতঃকালে, এমন কি শেষ নিশ্বাস গ্রহণের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বেও কেহ বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার আসন্ন সময় অতি নিকটবর্ত্তী; সাধু ও পুণ্যবান পুরুষ কথা বলিতে-বলিতে চলিয়া গেলেন।

গুরুদাস বাবু বাঙ্গলা-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু এবং এক হিসাবে সেবকও বটেন। সেবাব্রত নানাভাবে উদ্‌যাপন করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা-সাহিত্যিকেরা গ্রন্থ-প্রণয়ন এবং প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া বাণীর সেবা করিয়া থাকেন; গুরুদাস বাবু প্রকাশকরূপে জনসমাজে তাহাদের প্রচার করিয়া প্রকারান্তরে বঙ্গবাণীর সেবা করিতেন। বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীরা যখন পুস্তক প্রকাশ ও পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তখন স্কুল-পাঠ্য পুস্তকই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল; অন্য শ্রেণীর পুস্তকের দেশে তেমন আদরও ছিল না, কাট্‌তিও ছিল না, পাঠকও বড় বেশী ছিল না। স্কুল-পাঠ্য পুস্তক বিদ্যালয়ে অধীত হওয়ায় বালক-বালিকারা বা তাহাদের অভিভাবকেরা দায়ে পড়িয়া তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেন। সেইজন্য এক ক্যানিং লাইব্রেরী ব্যতীত সকল পুস্তক-বিক্রেতাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্কুল-পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে গুরুদাস বাবু সাহস করিয়া অবসর-পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করেন। দেশের তখনকার অবস্থায় এরূপ একটা গুরুভার মাথায় তুলিয়া লওয়া বড় অল্প সাহসের কাজ ছিল না। এই শ্রেণীর পুস্তক ক্রয় করিতে কেহ বাধ্য ছিল না, সুতরাং এইরূপ ধরণের পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রও তখন এখনকার মত বিস্তৃত ছিল না। গুরুদাস বাবুর চেষ্টায় এই ব্যবসায়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত ও বিস্তৃত হইয়াছিল, একথা বলিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

গুরুদাস বাবুর লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আমরা শুনিয়াছি। কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটে গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু হষ্টেল প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৺প্যারীচরণ সরকারের অনুগ্রহে গুরুদাস বাবু সেই ছাত্রাবাসের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। ছাত্রাবাসে সে সময়ে যে সকল ছাত্র ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৺ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সার্ রাসবিহারী ঘোষ, মাননীয় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। গুরুদাস বাবু যখন এই ছাত্রাবাসে কার্য্য করিতেন, সেই সময় ঐ ছাত্রাবাসের সিঁড়ির নিম্নে একটী ছোট আল্‌মারী বসাইয়া তাহাতে স্বর্গীয় দুর্গাদাস করের প্রসিদ্ধ পুস্তক 'মেটেরিয়া মেডিকা'খানি বিক্রয়ার্থ রাখিয়া দিতেন এবং দুর্গাদাস বাবুর পরামর্শে ঐ আল্‌মারীর উপর "বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী" লিখিত একখণ্ড কাগজ মারিয়া দিয়াছিলেন। ইহাই লাইব্রেরী-প্রতিষ্ঠার সূচনা। তাহার পর গুরুদাস বাবু তাঁহার সেই আল্‌মারীটি,—সেই বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, আনিয়া বহুবাজার ষ্ট্রীটের একটী ক্ষুদ্র কক্ষ ভাড়া করিয়া সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই প্রতিষ্ঠার সময়ই স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং এই পুস্তকও গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য হয়। ইহা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন কলিকাতায় যোগেশ বাবুর ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, বরদা মজুমদারের পুস্তকালয়, স্কুল-বুক সোসাইটীর পুস্তকালয় ও চিনাবাজারের পদ্মচন্দ্র নাথের বইয়ের দোকান ব্যতীত নামওয়ালা কোন পুস্তকালয় ছিল না; ক্যানিং লাইব্রেরীর তখন খুব নাম-ডাক। সে সময়ে যাঁহারা বাঙ্গলা

স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

The Emerald Printing Works
CALCUTTA.

সাহিত্যের সেবক ছিলেন, সেই অল্পসংখ্যক ভদ্রলোকের পুস্তকাদি ক্যানিং লাইব্রেরীতেই বিক্রীত হইত। কিন্তু ক্যানিং লাইব্রেরীর কার্য্য পরিচালনায় নানা বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। এদিকে গুরুদাস বাবুর নামও তখন একটু-একটু করিয়া বাজারে রাষ্ট্র হইতেছিল; পুস্তক-লেখকগণ সকলেই শুনিতে পাইলেন যে, গুরুদাস বাবুর হিসাব দোরস্ত; গুরুদাস বাবু পাই-পয়সা হিসাব করিয়া বিক্রীত পুস্তকের মূল্য শোধ করিয়া দেন; তাঁহার কাছে হিসাবের জন্য বা টাকার জন্য হাঁটাহাঁটি করিতে হয় না; যে দিন যে সময়ে যাহাকে যাহা দিবেন বলিবেন, গুরুদাস বাবু তাহার অন্যথা করেন না। তখন বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু প্রভৃতি সে সময়ের সকল সাহিত্যরথীই গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে ঝুঁকিয়া পড়িলেন,—বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী তখন জাঁকিয়া উঠিল,—গুরুদাস বাবুর কাজ বাড়িয়া গেল—তিনি ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের এই বর্ত্তমান ভবনে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত করিলেন। লাইব্রেরীর উন্নতি হইল, গুরুদাস বাবুর অর্থাগম হইতে লাগিল; কিন্তু সেই পাই-পয়সা হিসাব করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে পুস্তক-লেখকগণের দেয় পরিশোধ করা তিনি ত্যাগ করিলেন না,—শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি ত্যাগ করেন নাই—তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণও সেই পথেই চলিতেছেন। ইহাই গুরুদাস বাবুর ব্যবসায়ের উন্নতির মূলমন্ত্র ছিল এবং এই মূলমন্ত্রের অনুসরণ করিয়াই তাঁহার লাইব্রেরী এখন দেশবিখ্যাত হইয়াছে। গুরুদাস বাবু বিষয়কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর প্রায় দশ বৎসর তাঁহার পুত্রদ্বয় তাঁহার কার্য্য ঠিক তাঁহারই আদর্শে পরিচালিত করিতেছেন।

গুরুদাস বাবুর সাহিত্য-সাধনা নিষ্ফল হয় নাই; ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে—বিস্তৃতিও লাভ করিয়াছে। আজ বাঙ্গলা সাহিত্য-জগতের সাহিত্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে, তাহাদের সহিত সমান আসনের দাবী করিতেছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের এই উন্নতির জন্য গুরুদাস বাবুকে যথেষ্ট পরিমাণে অভিনন্দিত করা যায়।

গুরুদাস বাবুর নাম আজ সমগ্র বঙ্গদেশে বিশ্রুত! কেবল বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে গুরুদাস বাবুর "বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী" সুপরিচিত। শুধু ভারতবর্ষ বলিলেও ঠিক কথা বলা হয় না। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি যে সকল দেশের সহিত ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ ভাবে বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—যে সকল দেশের সহিত ভারতবর্ষের সরাসরি বাণিজ্য চলিতেছে—তাহাদের অধিকাংশ স্থলেই গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয় অল্পাধিক পরিচিত।

গুরুদাস বাবু কেবল বাঙ্গলা-সাহিত্যের বন্ধু ছিলেন না—বাঙ্গলা সাহিত্যিকগণেরও তিনি পরম বন্ধু ছিলেন। যতদিন তিনি কর্ম্মক্ষম ছিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেন, ততদিন তাঁহার লাইব্রেরীতে প্রত্যহ অপরাহ্নকালে সাহিত্যিকগণের মেলা বসিত; বহু সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সমাগম হইত। গুরুদাস বাবুর অমায়িক ব্যবহারে, তাঁহার সহিত যিনিই একবার আলাপ করিতেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গলা-সাহিত্যিকগণের মধ্যে এমন অল্প লোকই আছেন, যিনি জীবনে অন্ততঃ একবারও গুরুদাস বাবুর সহিত আলাপ করিতে আসেন নাই। এবং এমন বহু সাহিত্যসেবী আছেন, যাঁহারা তাঁহার সহায়তা না পাইলে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন না।

গুরুদাস বাবু লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই; প্রচুর মূলধন লইয়া তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারেন নাই। সততা ও অধ্যবসায় তাঁহার একমাত্র মূলধন ছিল। অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে তিনি এই ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

কাব্যে ইঙ্গিত

[শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম, এ,]

জগৎ ইঙ্গিতময়। প্রকাশের প্রচেষ্টায় তুবড়ীর বারুদ যেমন আপনার শক্তির আবেগকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, আগুনের ফুল হইয়া ছড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, তেমনি করিয়াই যেন বিশ্বের অন্তর্নিরুদ্ধ এক মহারহস্য অনন্তকাল ধরিয়া, ইঙ্গিতরূপে গগনে পবনে, কর্ম্মে ক্রীড়ায়, হাসিতে অশ্রুতে, দিকে দিকে, দেশে দেশে, মনে মনে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে;—সে অভিব্যক্তির আর শেষ নাই, সে আবেগের আর বিরাম নাই। আগুনের ফুলের মতনই তাহা নিরন্তর নূতনরূপে দেখা দিতেছে; এবং দেখা দিয়াই নিমেষে নিমেষে মিলাইয়া যাইতেছে;—সে রহস্যের স্ফুলিঙ্গ-ধারার কোথাও যেন বিচ্ছেদ নাই, কোথাও যেন অবকাশ নাই, নিরবচ্ছিন্ন তাহা বিশ্বকেন্দ্র হইতে উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে। কামিনীর গন্ধ গুরু গাঢ় অন্ধকারে, ভ্রমর-গুঞ্জনাবিষ্ট নির্জ্জন মধ্যাহ্নে, করুণা-কম্পিত ভৈরবীর সুদূর আলাপে, সাহানার রেশটিতে, অর্দ্ধ-বিস্মৃতির ব্যাকুল বিভ্রমে, যৌবনের অকারণ বেদনায়, প্রাণের ব্যথিত চেতনায়, দয়িতের সহসা দর্শনে, জীবনের অজ্ঞাত আনন্দে, নারীর অলোক-সৌন্দর্য্যে, আকাশের অসীম আভাষে সেই মহা-রহস্য ইঙ্গিতের সহস্র ধারায় উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে।

কাব্য ইঙ্গিতময়, কারণ বিশ্ব ইঙ্গিতময়। কাব্য ইঙ্গিতময়, কারণ কাব্যের মধ্যেই জগতের চিরন্তন রূপের প্রতিচ্ছবি, নানা ভাবে এবং নানা ভঙ্গীতে, বিবিধ অবস্থায় এবং বিবিধ আকারে, প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে! কাব্য ইঙ্গিতময় এবং কাব্য রহস্যময়, কেন না ইঙ্গিত রহস্যাভাষ মাত্র। অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার গদ্যের বিষয়। জীবনের প্রাতিদিবসের বাহিরের ঘটনা; সংসারের বেচা-কেনা, কলহ-কোলাহল, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, আফিস-আদালত, হিসাব নিকাশ, মান-অপমান নিতান্তই গদ্যের অন্তর্গত এই জন্য, যে তাহারা অত্যন্ত ব্যক্ত, তাহাদের মধ্যে কোন গোধূলি নাই, কোন গোপনতা নাই।

কিন্তু তবুও মানুষের জানা অধিকাংশ তথ্য কি রহস্যেই না আবৃত! এই যে আমরা অঙ্গ দিয়া উত্তাপ গ্রহণ করিতেছি, নদীর জলে জোয়ার-ভাটার খেলা দেখিতেছি, আঁটি পুঁতিয়া আমগাছ করিতেছি, জলের তোড়ে কল চালাইতেছি—বৈজ্ঞানিকের নিকট ইহাদের ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্বস্তভাবে, পরম আরামের সহিত মাঝেমাঝে বলিয়া উঠিতেছি "রহস্যের মীমাংসা হইল বটে।" অণুর কম্পনে তাপ উৎপন্ন হয়, চন্দ্রের আকর্ষণে জল ফুলিয়া উঠে, অন্তরে-অন্তরে রসধারা শোষণ করিয়া বীজ আপনাকে বিস্তৃত করে, একটি গতি আর একটি গতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াও শক্তিহীন হয় না, এই বলিলেই কি সব বলা হইয়া গেল? রহস্য যাহা তাহা রহস্যই রহিল, কেবল কথার ধাঁধায়, যে শুনিতেছে সে মনে করিল, সব বুঝিলাম এবং যে শুনাইতেছে, সে মনে করিল সব বুঝাইলাম। তথ্যে এবং রহস্যে মিশাইয়া অপূর্ব্ব গদ্য পদ্যময় যে জগৎ-কাব্য রচিত হইয়াছে—তাহার ভিতর দৃশ্য যাহা, অদৃশ্য তাহা অপেক্ষা অল্প নয়, ব্যক্ত যাহা অব্যক্ত তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক; যুক্তি খানিকটা পৌঁছায়, কল্পনা তাহাকে পিছনে ফেলিয়া বহু দূর চলিয়া যায়।

এই রহস্যের ফাঁক আছে বলিয়াই ত আমরা মুক্তির নিশ্বাস ছাড়িতে পারিতেছি; নহিলে বিরাট তথ্যময় নিরেট গদ্য যদি চারিপাশ হইতে আমাদের চাপিয়া ফেলিত, তাহা হইলে কি এই জগতে আমরা বাঁচিতে পারিতাম। এই রহস্যই সুদূর তারকাকে, সুন্দর আকাশকে নীল, এবং জ্যোৎস্নাকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে। সমস্তই স্পষ্ট, উজ্জ্বল, ব্যক্ত, সীমাবদ্ধ বলিয়া বোধ হইলে এই নিখিল জগৎ কি ভয়ঙ্কর না হইয়া উঠিত। কিন্তু কেবল আরামের নিশ্বাস ত নয়, এই রহস্য-হেতু আমাদের অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে মুহুর্মুহুঃ কি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস না উঠিতেছে। কি পাইতে চাই তাহা জানি না, সে যে কত দূরে তাহাও জানি না, পাইলে যে কি হইবে তাহারও ধারণা নাই,

অথচ এক জন্ম-জন্মান্তরের পিপাসা আমাদের আর্ত্ত করিয়া তুলিতেছে,—সে অসীম অতৃপ্তি মিটাইবার সাধ্য মানুষের নাই। লাখো লাখো যুগ অন্তেও গাহিতে হয়—'তবু হিয়া জুড়ন না গেল।' তাই আমরা রাধার বিরহে আকুল হইয়া উঠি, ছায়া-সীতাকে হারাইয়া রামচন্দ্রের সহিত কাঁদিয়া উঠি, সুদূর অলকাপুরীর উদ্দেশে মেঘকে দূত করিয়া পাঠাই। এই রহস্য আছে বলিয়াই আমাদের এত বেদনা। ধনরত্ন, খ্যাতি-ক্ষমতা, স্নেহ-প্রেম অপর্য্যাপ্ত লাভ করিয়াও কাঁদিয়া কহিতেছি, "আরো চাই,—ওগো, আরো চাই।" মানবের আত্মা নিরন্তর বিলাপ করিতেছে, "বন্ধু,—বন্ধু, আমার তৃষ্ণা ত মিটিল না।" পৃথিবীর বস্তু কেমন করিয়া সেই অলোক-পিপাসার নিবৃত্তি আনিয়া দিবে? অসীমের জন্য যে ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা থামাইবার সাধ্য যে স্বর্গেরও নাই!

অতএব কাব্য কেবল ভাবগত জীবনের সমালোচনা, কিম্বা কাব্যের উদ্দেশ্য কেবল জীবন-সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা—এই কথা কি বলা যায়? রহস্যকে অস্বীকার করিয়া, এই বেদনার কণ্ঠ পলকে পলকে রুদ্ধ করিয়া, আত্মার আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া, আপনাকে সকল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অতিশয় শান্ত ও সংযতভাবে জীবনের বিচার করা—সম্ভবপর হইলেও, কাব্য-সম্পর্কে তাহাই কি সার্থক, না, সে আলোচনা সম্পূর্ণ?

কিন্তু ইহাও সত্য যে, অনির্ব্বচনীয়তা রূপে রহস্য মাত্র মনের বনপথ দিয়াই আনাগোনা করে না। হৃদয়ের রাজপথ যে তাহারই চরণ-স্পর্শের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে! বৃন্দাবনের বনে-বনে যাহার নূপুর রণিয়া-রণিয়া আত্মহারা গোপীবৃন্দের মনে উতালা সাড়া পড়াইয়া দেয়, কদমতলায় যাঁহার বাঁশী কাঁদিয়া-কাঁদিয়া রাধা, রাধা, রাধা করিয়া, থাকিয়া থাকিয়া আকুল সুরে বাজিয়া উঠে,—মথুরার প্রস্তর-কঠিন রাজপথে আবার তাহারই না রথ-চক্রের ঘর্ঘরধ্বনি শুনিয়া পুরবাসীদের চিত্ত কম্পিত হয়, সকল বীরের শঙ্খস্বর ডুবাইয়া তাঁহারই পাঞ্চজন্য না দিকে-দিকে নিনাদিত হইতে থাকে! কেবল ছায়া নহে, আলোকও যে রহস্যময়, ইহা সত্য। তবুও আলোকের দেশ দিয়া ত অনেক কবি যাত্রা করিয়াছেন! কিন্তু কেবল অনুভূতির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয় বলিয়া কি ছায়ারাজ্যের পথিক সংখ্যায় অধিক নহে? "ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে কোটিতে গোটিক হয়।" হউক; তবুও আলো-ছায়াবিজড়িত কাব্যের সেই মায়ালোকের আভাষকে কথার ইন্দ্রজাল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। অব্যক্তকে প্রায়-ব্যক্ত করিয়া তোলাও যে কবির একটি প্রধান কায।

কাব্য চিত্তরঞ্জনের উপায়মাত্র নহে। মনের উপর সুখের প্রলেপ মাখাইয়া দেয় বলিলে, কাব্যবস্তুর সমস্তই অজ্ঞাত রহিয়া গেল। কাব্য কেবল আনন্দের বিষয় বলিলেও, সব বলা হইল না। সাধারণতঃ, আমাদের অন্তঃ-শক্তি সুপ্ত, নিঃসাড়, অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ কাব্যের কার্য্য এই যে, তাহা আঘাতের দ্বারা, বেদনার দ্বারা সেই অসাড় শক্তিকে স্পন্দিত করিয়া, অন্তরকে সচেতন করিয়া তোলে। এই জন্যই হয় ত আমাদের মধুরতম সঙ্গীত সেইগুলি, যাহারা তীব্রতম দুঃখের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে। চিত্ত-ভবনের অনেক গুপ্ত কক্ষের দ্বার সেই আঘাতে মুক্ত হইয়া যায়; সেই সোণার কাঠির স্পর্শে হৃদয়পুরীর সাত মহলের শেষ মহলের শেষ গৃহখানিতে, স্বর্ণপালঙ্কশায়িতা কোন্ অপূর্ব্ব সুন্দরী রাজকন্যা জাগিয়া উঠিয়া, স্বপ্নজড়িত নেত্রে মুখের পানে চাহিয়া থাকে! এই জাগাইবার শক্তি, এই উদ্বোধনের শক্তিই কাব্যের মহাশক্তি। যাহা আবিষ্ট করে, অবসন্ন করে, আচ্ছন্ন করে—তাহা কখনই কাব্যের প্রধান গুণ নহে। জাগ্রত করিয়া কাব্য আমাদিগকে অপূর্ব্বতার রাজ্যে অন্তরিত করে। কাব্যের গুণ তাহাই—যাহা প্রচলিত কথা, প্রচলিত প্রথা এবং অভ্যস্ত চিন্তার বদ্ধ বাতাস এবং কৃত্রিম আরাম হইতে পাঠককে সহসা মুক্ত, শুদ্ধ, স্বাস্থ্যকর বায়ু-হিল্লোলের মধ্যে আনিয়া ফেলে,—নাই বা রহিল সেথায় গৃহের নিরাপদ আচ্ছাদন, নাই বা রহিল লোকালয়ের কল-কোলাহল, নাই বা রহিল আবেশের সুখশয্যা; হইলই বা তাহা অজ্ঞাত, অপূর্ব্ব-পরিচিত, আশ্চর্য্য!

কিন্তু কোন্ মন্ত্রের প্রভাবে আমাদের প্রতিদিনকার সংসার-কারাগার সহসা শ্যামল প্রান্তর, সুনীল সিন্ধু, গভীর অরণ্য, অগাধ প্রেম, অপরূপ সৌন্দর্য্য, অলৌকিক আদর্শ ও অসীম রহস্যে রূপান্তরিত হইয়া যায়? সে মন্ত্র ত অক্ষরে নিবদ্ধ করিতে হয় না, বাক্যে উচ্চারণ

করিতে হয় না। সে মন্ত্র ভাষার নহে, ভাবের নহে, রসেরও নহে—তাহা ইঙ্গিতের। ইঙ্গিত কেবল অনুভবই করা যাইতে পারে, আলোচনার জালে তাহাকে ধরিবার কোনও উপায় নাই। অনঙ্গ বলিয়াই ইঙ্গিতের শক্তি অনন্ত এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া শর-সন্ধান করে বলিয়াই তাহার লক্ষ্য অব্যর্থ। সকলের অজ্ঞাতে সে আকাশের মত, স্পষ্ট কথার অন্তরে এবং অন্তরালে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; প্রাণের মত অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া সে প্রত্যেক ভাবকে হিল্লোলিত করিয়া তুলে এবং সামান্যের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া, তাহাকে অসামান্য করিয়া ফেলে। ইঙ্গিত অলঙ্কার নহে, ইঙ্গিত কৃত্রিম নহে, ইঙ্গিত রচিত নহে, ইঙ্গিতের বিধান নাই। অথচ ভাবের গভীরতা সেই আনে, রসের মাধুর্য্য সে-ই প্রগাঢ় করে, বাক্যের ধ্বনি সে-ই তরঙ্গায়িত করে এবং সুরের মত ভাষাকে সেই অসীমের কোলে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

এইখানেই গদ্যের সহিত কাব্যের প্রভেদ। গদ্য কর্ত্তব্যের মত, কাব্য স্বপ্নের মত। গদ্য মধ্যাহ্নের ভাষা, কাব্য সন্ধ্যার উক্তি। গদ্যের গুণ স্ফুটতায়, কাব্যের গুণ ইঙ্গিতে। কখন-কখনও গদ্য কাব্য-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সাহিত্য-রসিকের নিকট ইহা অজ্ঞাত নয় যে, উৎকৃষ্ট গদ্যমাত্রেরই একটি ছন্দ আছে,—তাহা কখনও নৃত্য করিয়া ছুটে, কখনও বিলম্বিত হইয়া চলে। সুষ্ঠু কল্পনা বহু গদ্য রচনাকেই সুমধুর করিয়া তুলে এবং অনেক গদ্যই ব্যঞ্জনায় সুন্দর হইয়া উঠে। তবুও তাহারা গদ্যই থাকে,—কাব্যধর্ম্মী হইয়াও কাব্য হয় না। কারণ, প্রথমতঃ শব্দ সৌষ্ঠব অথবা অর্থ-গৌরব কবিত্বের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ নহে,—তাহারা উপলক্ষ্য মাত্র হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইঙ্গিতের বাহুল্য গদ্যের পক্ষে মারাত্মক, অস্পষ্ট-বাক্ প্রবন্ধ অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার গৃহের মত অসহ্য। তৃতীয়তঃ, প্রাণের স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত আবেগ রহস্যকে উদ্ভাসিত করিয়া স্বভাবতঃই কাব্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। কাব্য যে ছন্দে ঘনীভূত হইয়া উঠে, গদ্যছন্দ হইতে তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। চরণের গতির মত ছন্দ গদ্যকে ছুটাইয়া লইয়া যাইতে পারে; কিন্তু পক্ষের আন্দোলনের মত সে কাব্যকে আকাশে উড়াইয়া লইয়া চলে। অর্থের পর্য্যাপ্তিতেই গদ্যের চরিতার্থতা; কিন্তু বাক্য যেখানে সীমাহীনতার মধ্যে আপনার অর্থ হারাইয়া ফেলে, প্রকৃত কাব্যের আরম্ভ কিন্তু সেইখানেই। শব্দের যুক্তিযুক্ত, পরিমিত, নৈয়ায়িকী অর্থই গদ্যের বস্তু; অপরিসীম অর্থ-শক্তিশালী, বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘের মত ইঙ্গিত-পূর্ণ পদই কাব্যের প্রাণ।

রহস্য বিচিত্র। গীতিকাব্য ইহার যে দিক আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে, তাহা সৌন্দর্য্যের দিক। ধর্ম্মশাস্ত্র খুঁজিতেছে শিবকে; তাই সে উপদেশ দেয়, কর্ত্তব্য ও নীতি যতই শুষ্ক এবং কঠোর হউক, তাহা পালন না করিলে মানুষের শ্রেয়োলাভের অন্য উপায় নাই। দর্শনশাস্ত্র অন্বেষণ করিতেছে জ্ঞানের মধ্য দিয়া সত্যকে; তাই কল্পনা সেখানে পরাভূত, যুক্তি জয়ী এবং হৃদয়াবেগ ব্যর্থ। কিন্তু চিরদিন ধরিয়া কাব্য চাহিতেছে সুন্দরকে,—তাই সরসতা কাব্যেরই বিশেষ গুণ, এবং আনন্দ কাব্যেই ক্ষণে-ক্ষণে স্ফূর্ত্ত। দেহের সৌন্দর্য্য রূপ এবং প্রাণের সৌন্দর্য্য প্রেম। তাই জগতে ও জীবনে প্রেম ও রূপ একটি সুমিষ্ট সুকুমার সম্বন্ধে বাঁধা পড়িয়াছে। কখনও প্রেমের আভায় রূপ অপরূপ, এবং কখনও রূপের আবরণে প্রেম নিরুপম হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যকলায় ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাই। কালিদাস ও কীটস্ রূপের, এবং ভবভূতি ও শেলী প্রেমের অনুপম কবি। পরম সৌন্দর্য্য চিরন্তন আনন্দের বিষয়। জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণে তাহা সহসা অন্তরকে চমৎকৃত করিয়া অভ্যাস হইতে, অবসাদ হইতে জাগাইয়া তুলে। সে সৌন্দর্য্যের পরিচয়ে আত্মা হর্ষাঞ্চিত হইয়া উঠে; অথচ তাহা পাইলাম না বলিয়া বেদনা-বিধুর হৃদয় ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়ে। সেই আনন্দ ও বেদনার গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে কাব্যের উৎপত্তি। কাব্যে আন্তরিকতা এই বেদনারই নিদর্শন। বেদনার পরিসমাপ্তি যেখানে, সেইখানেই আনন্দ। কিন্তু কাব্য দ্বিধা কাটাইয়া আনন্দকেই বরণ করিয়া লয় নাই। তাই যুগ-যুগান্তর ধরিয়া দেশদেশান্তরে কাব্য উভয়ের সংঘাতে বিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। রহস্য হইতে রহস্যান্তরে লইয়া গিয়া সে আপনাকে পরিপূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারিতেছে না। এই দ্বন্দ্বের ভিতর পড়িয়া তাহার ছন্দ, অধীর শব্দ ও গভীর নীরবতার মধ্যে, গতি ও স্থিতির মধ্যে, সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে অবিশ্রান্ত ভাবে আন্দোলিত হইতেছে।

কিন্তু রস জিনিসটি আলঙ্কারিকের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, সকল সূত্র অমান্য করিয়া, ঘনীভূত হইয়া অদ্বিতীয়

এক মহারহস্য রূপেই রহিয়া গেল। তাহার কোনও পরিচয় আজ পর্য্যন্ত মিলিল না। চিরদিন ধরিয়া, নিখিল-কবি-চিত্ত আকুল করিয়া তাহার বীণা বাজিতে লাগিল, তবু তার অনির্ব্বচনীয়ত্ব ঘুচিল না। অথচ সে ত গুপ্ত নয়,—বহু লীলায় ক্ষণে-ক্ষণে তাহার রূপ ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। তাই ত অন্তহীন সুরে শাশ্বত সৌন্দর্য্য অভিব্যঞ্জিত করিয়া কাব্য আপনার প্রাণের প্রেরণায় উপল-নূপুরা তটিনীর মত ক্রমাগত অতল গভীরতার দিকে লীলায়িত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। নিবিড় বনের ছায়ার মত, ফাল্গুনী জ্যোৎস্নার মত, দূরবিস্তৃত শষ্প-শ্যামল তটভূমির মত ইঙ্গিত তাহাকে চতুর্দ্দিক দিয়া মঞ্জুল করিয়া রাখিয়াছে। অবিশ্রান্ত কলধ্বনিতেও অন্তরের আবেগ কোনও প্রকারেই যে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা যাইতেছে না; কিন্তু শব্দ যেথায় মূক, ইঙ্গিত সেথায় মুখর হইয়া উঠিতেছে এবং অসীম রহস্যের ছায়া অসীম আকাশের মত তাহার বুকে প্রতিফলিত হইয়া অনবরত স্পন্দিত হইতেছে।

নশীপুরের স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহ

আমরা অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত চিত্তে নশীপুরের মহারাজ রণজিৎ সিংহের পরলোকগমন-সংবাদ পত্রস্থ করিতেছি। গত ৩রা মে শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ সাতটার সময় ১০নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট ভবনে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক, অতর্কিত এবং অপ্রত্যাশিত। মহারাজের বয়স বেশী হয় নাই, এবং মৃত্যুর কোন পূর্ব্ব-লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। "ওয়ার কনফারেন্সে" যোগ দিবার জন্য তিনি বুধবার রাত্রিতে নশীপুর হইতে কলিকাতায় আসেন। বৃহস্পতিবার তিনি যথারীতি কনফারেন্সে যোগ দেন। পরে তিনি লাট বাহাদুরের সহিত বহুক্ষণ আলাপ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াই সহসা পীড়িত হইয়া পড়েন। চিকিৎসার অবশ্য কোন ত্রুটিই হয় নাই, কিন্তু একদিনও বিলম্ব সহিল না, শুক্রবার প্রাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

১৮৬৫ অব্দের ৯ই জুন মহারাজের জন্ম হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সাবালক হইয়া তিনি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্ত হইতে জমিদারীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করেন; এবং তাঁহার কার্য্য প্রজাবর্গ ও গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার জমিদারী-চালনার সহজ সরল ও ফলপ্রদ নিয়মাবলী নিজ-নিজ জমিদারীতে অবলম্বন করিয়া অন্য অনেক জমিদার বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

মহারাজ নশীপুর সাধারণ হিতকর কার্য্যেও অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানরূপে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৯২ অব্দে তিনি রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৭ অব্দে তাঁহার রাজা উপাধির সহিত বাহাদুর উপাধি সংযুক্ত হয়। ১৮৯৯ অব্দে মহারাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে মনোনীত হন। তিনি বহু বৎসর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ভাইস-প্রেসিডেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯১০ অব্দে তিনি মহারাজা উপাধি লাভ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৭ অব্দে গবর্ণমেণ্ট রাজবাহাদুর উপাধি নশীপুরের জমিদারদিগের বংশগত করিয়া দেন। মহারাজ রণজিতের মৃত্যুতে কুমার ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রাজা বাহাদুর উপাধি ভূষিত হইলেন। এক্ষণে তিনি নশীপুরের গদীতে আরোহণ করিবেন। কুমার ভূপেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

(একাদশ অধিবেশন)—ঢাকা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র (অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন (সভাপতি সাহিত্য শাখা)

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (সভাপতি দর্শন শাখা

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক (সভাপতি বিজ্ঞান শাখা)

শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত (সভাপতি ইতিহাস শাখা)

ভাবের অভিব্যক্তি

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

সচ্ছলতায়

অনাটনে

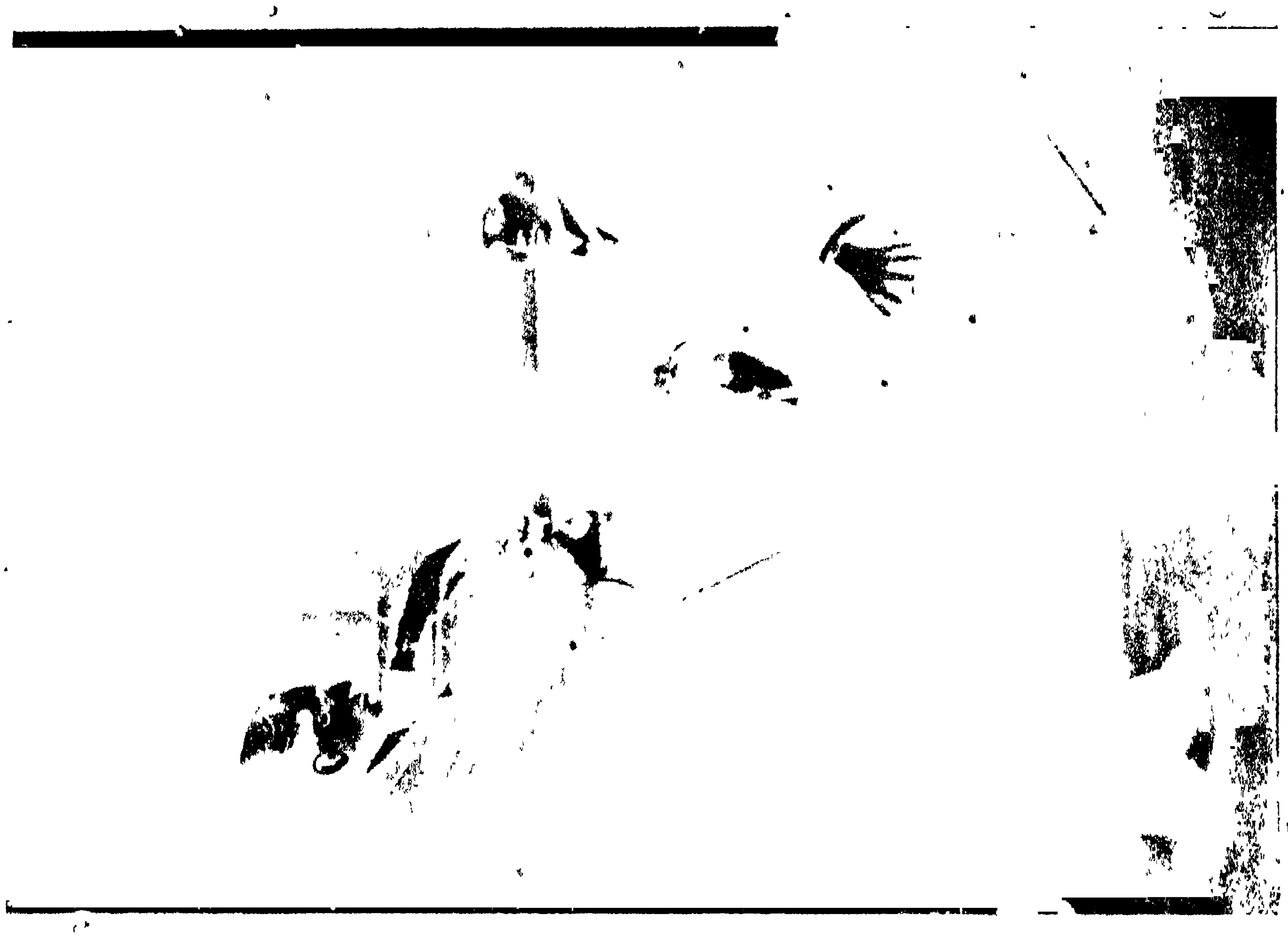

ঘটোতোল

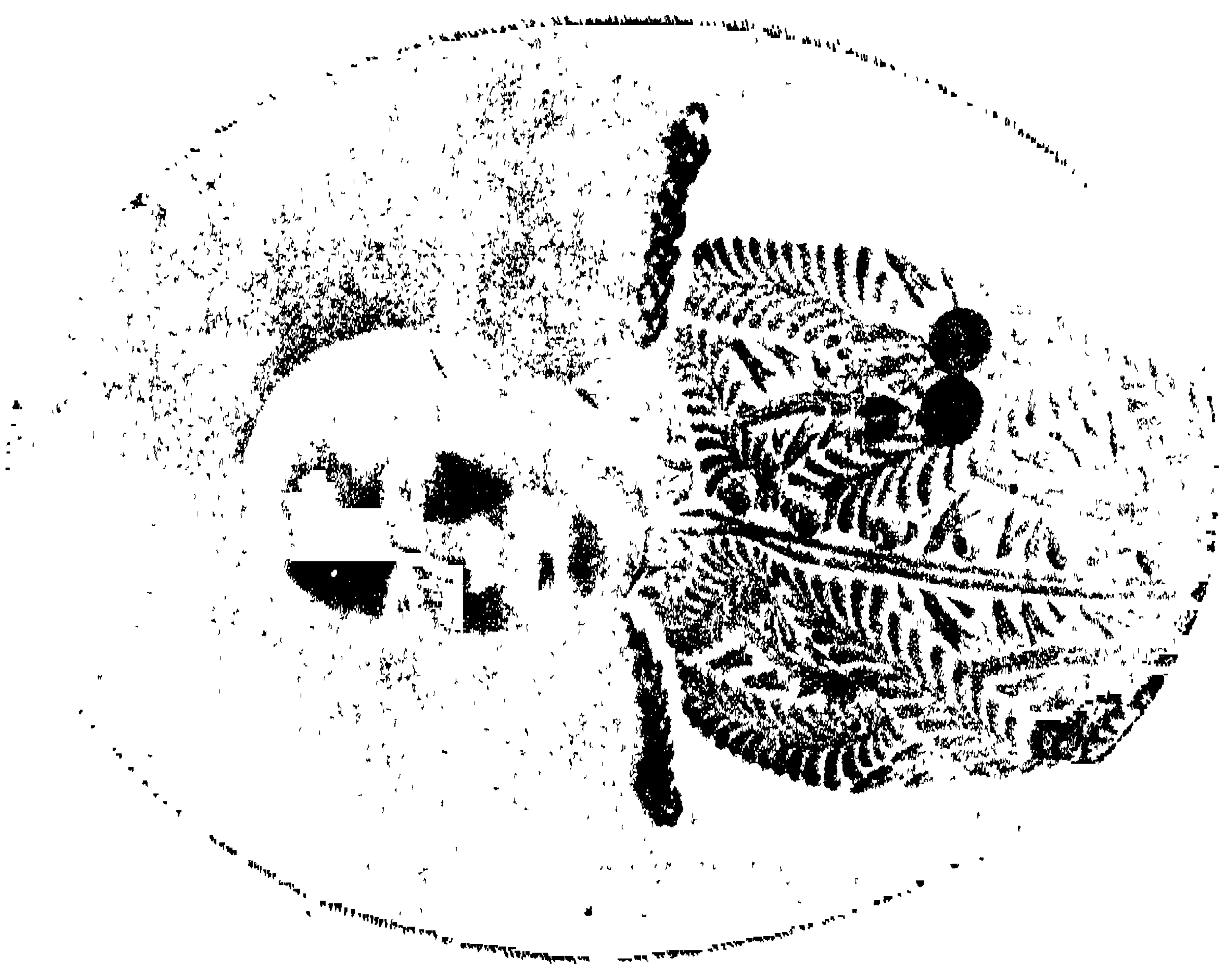

নশীপুরের স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহ

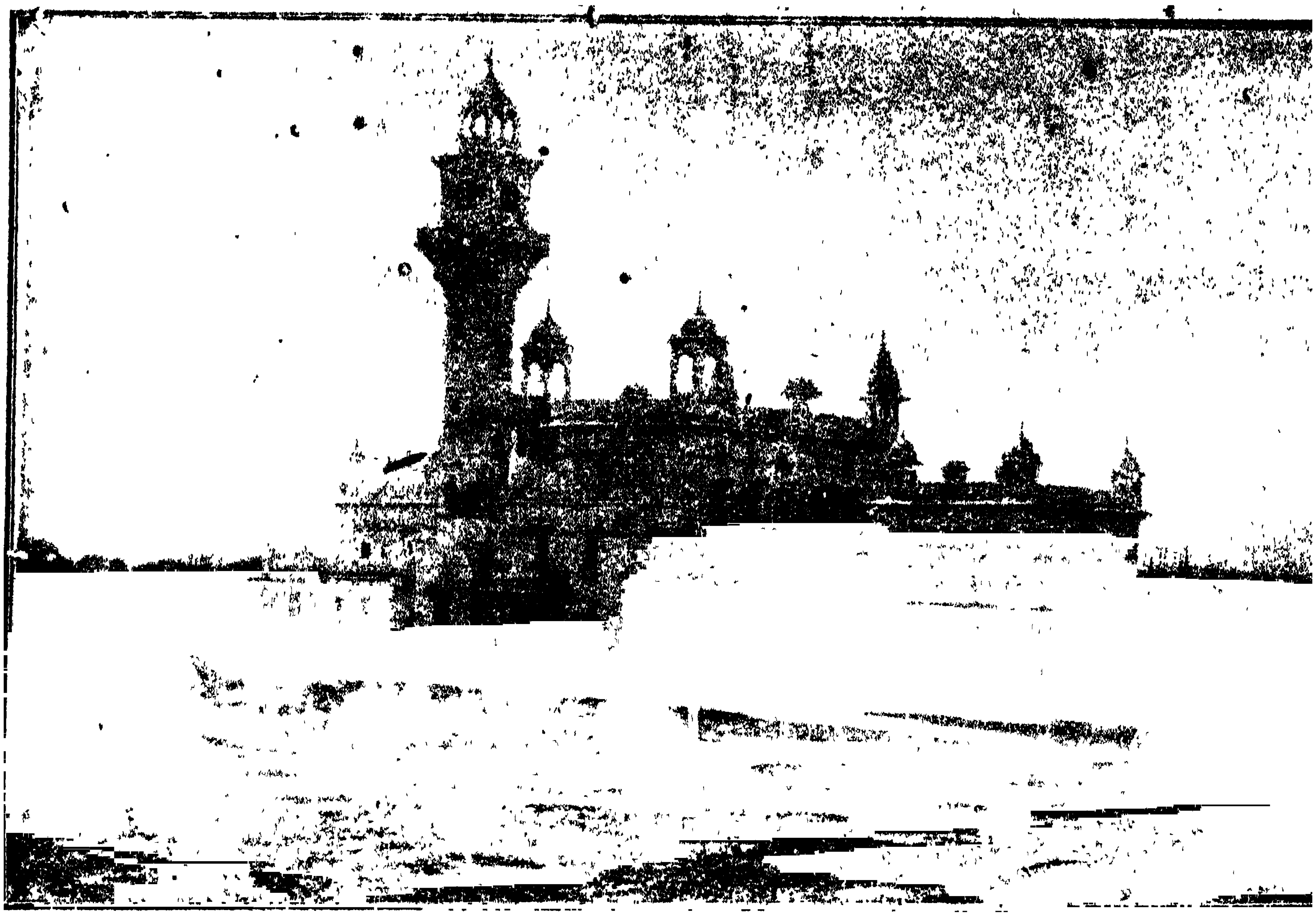

মেয়োকলেজ - আজমীর

আজমীরের সাধারণ দৃশ্য

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

সে দিন যখন মৃত্যুর পরওয়ানা হাতে লইয়া অভয়ার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন মরণের চেয়ে মরার লজ্জাই আমাকে বেশী ভয় দেখাইয়াছিল।

অভয়ার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল; কিন্তু সেই পাংশু ওষ্ঠাধর ফুটিয়া শুধু এই কটি কথা বাহির হইল,—"তোমার দায়িত্ব আমি নেব না ত কে নেবে? এখানে আমার চেয়ে কার গরজ বেশী?" দুই চক্ষু আমার জলে ভাসিয়া গেল; তবুও বলিলাম, "আমি ত চল্লুম। পথের কষ্ট আমাকে নিতেই হবে, সে নিবারণ করবার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু, যাবার মুখে তোমাদের এই নূতন ঘর-সংসারের মধ্যে এত বড় একটা বিপদ ঢেলে দিয়ে যেতে আর আমার কিছুতেই মন সরচে না অভয়া। এখনও গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখনও জ্ঞান আছে—এখনও ভদ্রভাবে প্লেগ হাসপাতালে গিয়ে উঠ্‌তে পারি। তুমি শুধু একটি মুহূর্ত্তের জন্য মনটা শক্ত কোরে বল, 'আচ্ছা যাও'।" অভয়া কোন উত্তর না দিয়া, আমাকে হাত ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া এইবার নিজের চোখ মুছিল। আমার উত্তপ্ত ললাটের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া কহিল, "তোমাকে 'যাও' বল্‌তে যদি পারতুম, তা' হ'লে নতুন কোরে ঘর-সংসার পাত্‌তে যেতুম না। আজ থেকে আমার নতুন সংসার সত্যিকারের সংসার হোলো।"

কিন্তু খুব সম্ভব সে আমার প্লেগ নয়। তাই মরণ আমাকে শুধু একটু ব্যঙ্গ করিয়াই চলিয়া গেল। দিন দশেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু অভয়া আমাকে আর হোটেলে ফিরিতে দিল না।

আফিসে যাইব, কি আরও কিছুদিনের ছুটি লইয়া বিশ্রাম করিব, ভাবিতেছি, এমন সময়ে একদিন আফিসের পিয়ন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম, পিয়ারীর চিঠি। বর্ম্মায় আসার পরে এই তাহার প্রথম পত্র। আমাকে জবাব না দিলেও, আমি কখনো-কখনো তাহাকে চিঠি লিখিতাম। আসিবার সময় এই সর্ত্তই সে আমাকে স্বীকার করাইয়া লইয়াছিল। পত্রের প্রথমেই সে ইহারই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছে, "আমি মরিলে তুমি খবর পাবেই। বাঁচিয়া থাকার মধ্যে আমার এমন কোন সংবাদই থাকিতে পারে না, যাহা তোমার না জানিলেই নয়। কিন্তু আমার ত তা নয়। আমার সমস্ত প্রাণটা যে ঐ বিদেশেই সারাদিন পড়িয়া থাকে, সে কথা এত বড় সত্য যে, তুমিও বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারো নাই। তাই জবাব না পাওয়া সত্ত্বেও মাঝে-মাঝে চিঠি দিয়া তোমাকে বলিতে হয় যে তুমি ভাল আছো।

"আমি এই মাসের মধ্যেই বঙ্কুর বিবাহ দিতে চাই। তুমি মত দাও। পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে যে বিবাহ হওয়া উচিত নয়, তোমার এ কথা আমি অস্বীকার করি না। বঙ্কুর সে ক্ষমতা হয় নাই; তথাপি কেন যে তোমার সম্মতি চাহিতেছি, সে আমাকে আর একবার চোখে না দেখলে তুমি বুঝিবে না। যেমন করিয়া পারো, এসো। আমার মাথার দিব্য রহিল।"

পত্রের শেষের দিকে অভয়ার কথা ছিল। অভয়া যখন ফিরিয়া আসিয়া কহিয়াছিল, সে যাহাকে ভালবাসে তাহারই ঘর করিতে একটা পশুকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, এবং এই লইয়া সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে স্পর্দ্ধার সহিত তর্ক করিয়াছিল, সে দিন আমি এম্‌নি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, পিয়ারীকে অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। আজ তাহারই প্রত্যুত্তরে সে লিখিয়াছে, "তোমার মুখে যদি তিনি আমার নাম শুনিয়া থাকেন ত, আমার অনুরোধে একবার দেখা করিয়া বলিয়ো, যে, রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে সহস্র কোটী নমস্কার জানাইয়াছে। তিনি বয়সে আমার ছোট কি বড় জানি না, জানার আবশ্যকও নাই; তিনি শুদ্ধ মাত্র তাঁর তেজের দ্বারাই আমাদের মত সামান্য রমণীর প্রণম্য। আজ আমার গুরুদেবের শ্রীমুখের কথাগুলি বারবার মনে পড়িতেছে। আমার কাশীর বাড়ীতে দীক্ষার সমস্ত আয়োজন হইয়া গেছে; গুরুদেব আসন গ্রহণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতেছেন, আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর প্রসন্ন মুখের

পানে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। হঠাৎ ভয়ে আমার বুকের ভিতরে তোলপাড় করিয়া উঠিল।" তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলাম, 'বাবা, আমি মন্তর নেব না।' তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মাথায় উপর তাঁর ডান হাতটি রাখিয়া বলিলেন, 'কেন মা নেবে না?' বলিলাম, 'আমি মহাপাতকী—' তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, 'তা'হলে ত আরও বেশী দরকার মা।'

"কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, 'আমি লজ্জায় আমার সত্যি পরিচয় দিইনি। দিলে এ বাড়ীর যে চৌকাটও আপনি মাড়াতে চাইতেন না।' গুরুদেব স্মিতমুখে বলিলেন, 'তবুও মাড়াতুম, তবুও দীক্ষা দিতুম। পিয়ারীর বাড়ী না হয় নাই মাড়ালুম; কিন্তু আমার রাজলক্ষ্মী মায়ের বাড়ীতে কেন আস্‌ব না মা!'

"আমি চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলাম, 'কিন্তু আমার মায়ের গুরু যে বলেছিলেন, আমাকে দীক্ষা দিলে পতিত হতে হয়। সে কথা কি সত্য নয়?' গুরুদেব হাসিলেন। বলিলেন 'সত্য বলেই ত তিনি দিতে পারেন নি মা। কিন্তু সে ভয় যার নেই, সে কেন দেবে না?' বলিলাম, 'ভয় নেই কেন?'

"তিনি পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, 'এক বাড়ীর মধ্যে যে রোগের বীজ একজনকে মেরে ফেলে, আর একজনকে তা' স্পর্শ করে না,—কেন বলতে পারো?' কহিলাম, 'স্পর্শ হয় ত করে। কিন্তু যে সবল সে কাটিয়ে ওঠে, যে দুর্ব্বল সেই মারা যায়।'

"গুরুদেব আমার মাথার উপর আবার তাঁর হাতটি রাখিয়া বলিলেন, 'এই কথাটিই কোন দিন ভুলো না মা। যে অপরাধ একজনকে ভূমিসাৎ করে দেয়, সেই অপরাধই আর একজন হয় ত স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয়ে চলে যায়। তাই সমস্ত বিধি-নিষেধই সকলকে এক দড়িতে বাধতে পারে না।' সঙ্কোচের সহিত আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'যা অন্যায়, যা অধর্ম্ম, তা' কি সবল-দুর্ব্বল উভয়ের কাছেই সমান অন্যায়-অধর্ম্ম নয়? না হলে সে কি অবিচার নয়?' গুরুদেব বলিলেন, 'না মা; বাইরে থেকে যেমনই দেখাক, তাদের ফল সমান নয়। তা'হলে সংসারে সবলে-দুর্ব্বলে কোন প্রভেদ থাকৃত না। যে বিষ পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে মারাত্মক, সেই বিষ যদি একজন ত্রিশ বছরের যুবককে মারতে না পারে, ত কাকে দোষ দেবে মা? কিন্তু, আজই যদি আমার কথা বুঝতে না পারো ত, অন্ততঃ এটি স্মরণ রেখো যে, যাদের ভিতরে আগুন জ্বলচে, আর যাদের শুধু ছাই জমা হয়ে আছে—তাদের কর্ম্মের ওজন এক তুলাদণ্ডে করা যায় না। গেলেও তা ভুল হয়।' শ্রীকান্ত-দা, তোমার চিঠি পড়িয়া আজ আমার গুরুদেবের সেই অন্তরের আগুনের কথাই মনে পড়িতেছে। অভয়াকে চক্ষে দেখি নাই, তবুও মনে হইতেছে,—তাঁর ভিতরে যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহার শিখার আভাস তোমার চিঠির মধ্যেও যেন দেখিতে পাইয়াছি। তাঁর কর্ম্মের বিচার একটু সাবধানে করিয়ো। আমাদের মত সাধারণ স্ত্রীলোকের বাটখারা লইয়া তাঁর পাপ-পুণ্যের ওজন তাড়াতাড়ি সারিয়া দিয়া বসিয়ো না।"

চিঠিখানি অভয়ার হাতে দিয়া বলিলাম, "রাজলক্ষ্মী তোমাকে শত সহস্র নমস্কার জানাইয়াছে,—এই নাও।"

অভয়া দুই তিনবার করিয়া লেখাটুকু পড়িয়া কোনমতে তাহা আমার বিছানার উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। সংসারের চক্ষে তাহার যে নারীত্ব আজি লাঞ্ছিত, অপমানিত, তাহারই উপরে শত-যোজন দূর হইতে যে অপরিচিতা নারী আজি অযাচিত সম্মানের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে, তাহারই অপরিসীম আনন্দ-বেদনাকে সে পুরুষের দৃষ্টি হইতে তাড়াতাড়ি আড়াল করিয়া লইয়া গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে অভয়া বেশ করিয়া চোখ মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়াই কহিল, "শ্রীকান্ত দাদা—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "ও আবার কি! দাদা হলুম কবে?" "আজ থেকে।" "না, না, দাদা নয়—দাদা নয়। সবাই মিলে সব দিক থেকে আমার রাস্তা বন্ধ কোরো না।" অভয়া হাসিয়া কহিল, "মনে-মনে বুঝি এই সব মতলব আঁটা হচ্চে?" "কেন, আমি কি মানুষ নই?" অভয়া কহিল, "বিষম মানুষ দেখি যে! রোহিণীবাবু বেচারা অসুখের সময় আশ্রয় দিলেন, এখন ভাল হয়ে বুঝি তার এই পুরস্কার ঠিক করেচ? কিন্তু আমার ভারি ভুল হয়ে গেছে। সে সময়ে যদি অসুখ বলে একটা টেলিগ্রাম করে দিতুম, আজ তা'হলে তাঁকে দেখতে পেতুম।"

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, "আশ্চর্য্য নয় বটে।" অভয়া ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, "তুমি মাসখানেকের ছুটি নিয়ে

একবার যাও শ্রীকান্ত দাদা। আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে তাঁর বড় দরকার পড়েছে।" কেমন করিয়া যেন নিজেও এ কথা বুঝিতেছিলাম, আমাকে আজ তাহার বড় প্রয়োজন। পরদিনই অফিসে চিঠি লিখিয়া আরও এক মাসের ছুটী লইলাম, এবং আগামী মেলেই যাত্রা করিবার জন্য টিকিট কিনিতে পাঠাইয়া দিলাম।

যাবার সময় অভয়া নমস্কার করিয়া কহিল, "শ্রীকান্ত দাদা, একটা কথা দাও।"

"কি কথা দিদি?" "সংসারে সকল সমস্যাই পুরুষ-মানুষে মীমাংসা করে দিতে পারে না। যদি কোথাও ঠেকে, চিঠি লিখে আমার মত নেবে বল?" স্বীকার করিয়া জাহাজ-ঘাটের উদ্দেশে গাড়িতে গিয়া বসিলাম। অভয়া গাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আর একবার নমস্কার করিল; বলিল, "রোহিণী বাবুকে দিয়ে আমি কালই সেখানে টেলিগ্রাম করে দিয়েচি। কিন্তু জাহাজের ওপরে ক'টা দিন শরীরের দিকে একটু নজর রেখো শ্রীকান্ত দাদা, আর তোমার কাছে আমি কিছু চাইনে।"

"আচ্ছা" বলিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিলাম, অভয়ার দু'টি চক্ষু জলে ভাসিতেছে।

গদাই পণ্ডিত

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

(নক্সা)

গোবিন্দপুরের গদাই পণ্ডিত বিখ্যাত লোক। তাঁহার পূর্ণ নাম গদাধর দে। কিন্তু গদাই পণ্ডিত না বলিয়া গদাধর দে বলিলে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে না। গদাই পণ্ডিতের বেতখানি গদারই সূক্ষ্ম সংস্করণ। তিনি যখন স্কুলের ছোট-ছোট ছেলেদের উপর কারণ-অকারণে সেই ভীষণ গদা উদ্যত করিতেন, তখন অনেক বালকের মূর্চ্ছার উপক্রম হইত। গদাই পণ্ডিতের গদা-চালন-কৌশল জ্ঞাত হইয়া স্কুলের সম্পাদক একদিন তাঁহার একটাকা জরিমানা করিয়াছিলেন,—সেইদিন হইতে দুগ্ধপোষ্য বালক-বৃন্দের পৃষ্ঠে তিনি তাঁহার গদার শক্তি পরীক্ষার প্রলোভন ত্যাগ করিলেও তাঁহার প্রহরণখানির মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই; এবং এখনও তিনি স্কুলে আসিয়া যখন-তখন তাহা মস্তকের উপর আন্দোলন পূর্ব্বক শিশু-হৃদয়ে মহা ত্রাসের সঞ্চার করেন।

গদাই পণ্ডিত ষোল বৎসর বয়সের সময় গোবিন্দপুরের 'মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়' হইতে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া গত সিকি শতাব্দীর অধিককাল গোবিন্দপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত আছেন। এই ত্রিশ বৎসর কাল চাকরী করিয়া তাঁহার বেতন আট টাকা হইতে মাসিক দশ টাকা হইয়াছে। কিন্তু এই দশটাকা মূল্যের পণ্ডিতের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হয় বিশ্ব সংসারটিকে তিনি 'মধু-পর্কের বাটি' অপেক্ষাও ক্ষুদ্র দেখেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র তিনিই মানুষ, অন্য সকলে পিপীলিকা!

পণ্ডিত মহাশয়ের বৃহৎ পরিবার; সংসারে একটি উপার্জ্জনক্ষম ছোট ভাই আছে, সে জমীদারী সেরেস্তায় মুহুরীগিরি করিয়া যে পনের টাকা বেতন পায়, তাহা সমস্তই দাদার হস্তে প্রদান করে। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় ইহাতে অসন্তুষ্ট; পণ্ডিত মহাশয়ের ধারণা, তাঁহার ভ্রাতা লোকনাথ মুহুরিগিরি করিয়া মাসে বিশ পঁচিশ টাকা 'উপরি' পায়, এবং সেই টাকা সে গোপনে তাহার স্ত্রীর নামে ডাকঘরের 'সেভিংস্ ব্যাঙ্কে' জমা করে। তাঁহার এই সন্দেহ ক্রমশঃ এরূপ প্রবল হইল যে, একদিন তিনি স্থানীয় পোষ্ট-মাষ্টারকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, কেহ 'সেভিংস্ ব্যাঙ্কে' টাকা জমা রাখিলে অন্যের নিকট সে কথা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। ইহাতে গদাই পণ্ডিতের সন্দেহ দৃঢ়মূল হইল। কিন্তু পাছে ভ্রাতার উপার্জ্জনের পঞ্চদশমুদ্রা হাত-ছাড়া হয়; এই ভয়ে তিনি ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ভাই যে পনের টাকা তাঁহাকে মাসিক সাহায্য করে, তাহার মধ্যে

দশটাকাতেই তাঁহার ভ্রাতার ও ভ্রাতৃবধূর গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন হয়, অবশিষ্ট পাঁচ টাকা ত তাঁহারই ছেলেমেয়ের ভরণপোষণে ব্যয় হয়। এই মহার্ঘ্যতার দিনে এ সুবিধাটুকু ত্যাগ করা দূরদর্শী পণ্ডিতের সঙ্গত মনে হইত না, তাই তিনি এখন পর্য্যন্ত ভ্রাতার সহিত পৃথক্ হন নাই; কিন্তু তিনি যখন-তখন দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, "ছোঁড়াটাকে সস্ত্রীক পুষিতেই আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম!" লোকনাথ একবার নিলামে সস্তাদরে একটা গাই-গরু কিনিয়াছিল,—তাহার তিন পোয়া দুধ হয়; গদাই পণ্ডিতের সুযোগ্য সহধর্ম্মিনী আধ সের দুধ জ্বাল দিয়া তদ্দারা স্বামীপুত্রের দুগ্ধ-পানের পিপাসা নিবারণ করে, অবশিষ্ট এক পোয়া দুধে আধসের জল মিশাইয়া তাহা রাত্রে দেবরকে পান করিতে দেয়। লোকনাথ একদিন বলিয়াছিল, "দামিনী ঘোষানীর দুধও যে এর চেয়ে ভাল, বৌ!"—আর কোথায় যাবে! বধূ-ঠাকুরাণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "যেমন গরু কিনেছ, তেমনই দুধ! গরুকে খোল ভুসি না দিলে কি তার দুধ মিষ্টি হয়?"—অগত্যা লোকনাথকে তাহার 'উপরি' উপার্জ্জন হইতে খোল, ভুসি, ঘাস, বিচালী সংগ্রহ করিতে হইল। কিন্তু একপোয়া দুধে আধসের জলের মাত্রা আর কমিল না।

লোকনাথের স্ত্রী একবার পিত্রালয়ে গিয়া পিতার নিকট একজোড়া সোনা-বাঁধানো চুড়ি আদায় করিয়াছিল। সে স্বামীগৃহে ফিরিলে গদাই পণ্ডিত তাহার প্রকোষ্ঠে সেই চুড়ি দেখিয়া প্রমাদ গণিল; বিস্ফারিত নেত্রে বলিল, "এই যে! ভায়া উপরি উপার্জ্জনের টাকা ভাঙ্গিয়া পরিবারকে গহনা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাপের ত টাকা রাখিবার জায়গা নাই, তাই সে মেয়েকে সোনা-বাঁধা চুড়ি দেবে!" গদাই পণ্ডিতের স্ত্রী মন্দাকিনী আবদার ধরিল, "আমাকে একজোড়া ঐ রকম চুড়ি দাও।"—কিন্তু দশটাকা বেতনের চাকরী করিয়া সোনার চুড়ি দেওয়া সম্ভব নহে; এদিকে মা-ষষ্ঠীর কৃপায় সংসারে বৎসরান্তে একটি করিয়া আগন্তুকের আবির্ভাব হইতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া আয়-বৃদ্ধির সঙ্কল্পে গদাই পণ্ডিত 'প্রাইভেট টিউসনি' আরম্ভ করিলেন। কিছুদিনের মধ্যে দুইটি 'টিউসনি' জুটিল। একটি ছেলেকে তিনি সকালে পড়াইতেন, আর একটি ভদ্রলোকের ছেলেকে রাত্রে পড়াইতেন। প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি গাড়ু-হস্তে গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী কোনও একটা বাগানে প্রবেশ করিতেন, এবং কোনদিন একটি কাঁঠালের জালি (ইঁচড়) কোনদিন বা দুইটি লেবু সংগ্রহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন; প্রায়ই কোনও দিন তিনি রিক্ত-হস্তে ফিরিতেন না। প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া আসিয়া পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার দশবৎসর বয়স্ক বড় ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া 'টিউসনি' করিতে যাইতেন। তাঁহার একটি প্রতিবেশী-গৃহে এই 'টিউসনি'।—পণ্ডিত মহাশয় পুস্তক খুলিয়া তাঁহার ছাত্রকে "পড় পড়"—"লেখ লেখ" বলিয়া এমন ধমক দিতেন যে, বাড়ীর সকলেই মনে করিত পণ্ডিত খুব যত্নের সহিত ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইতেছেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তখন তিনি নিজের ছেলেটির শিক্ষা দান কার্য্যেই ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার পুত্র ও ছাত্র উভয়েই এক শ্রেণীতে পড়িত। অঙ্ক বুঝাইবার সময় নিজের ছেলেকে বুঝাইতেন; ছাত্রটিকে বলিতেন, "আমি যাহা বুঝাইয়া দিই দেখিয়া যা।" অনেকদিন এমনও হইত, একটি অঙ্ক তাঁহার পুত্র কষিয়া ঠিক উত্তর লিখিয়াছে, কিন্তু ছাত্রটি ভুল করিয়াছে; তখন তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিতেন, "তোর কিছু হবে না এই সোজা আঁক পারলি নে? আচ্ছা, আর একটা কষ।"—ইতিমধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র নফরা একটা কাঁচা পেয়ারা চিবাইতে-চিবাইতে ছাত্র-গৃহে উপস্থিত। পণ্ডিত মহাশয় কেতাব বন্ধ করিয়া বলিলেন, "কি রে নফরা! তুই কি করতে এলি?"—নফরা অর্দ্ধ-ভক্ষিত পেয়ারাটা অদূরবর্ত্তী আটচালার 'মটকায়' নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "মালো-বৌ মাছ বিক্রী করতে এসেচে, মাছ কিনবে? মা ডাক্‌চে এসো।" পণ্ডিত মহাশয় তৎক্ষণাৎ মৎস্যানুসন্ধানে চলিলেন। সে দিনের মত 'টিউসনি' শেষ হইল। মাসের মধ্যে ঊনত্রিশ দিন এইভাবে তিনি 'টিউসনি' করিতেন! কোনদিন যদি ছাত্রের পিতা বলিতেন, 'পণ্ডিত মশায় এলেন আর চল্লেন যে!' পণ্ডিত মহাশয় অসঙ্কোচে উত্তর দিতেন, "আপনার ছেলে বড় বুদ্ধিমান; আর যে রকম উহার স্মরণ-শক্তি, গাধা ছেলের মত উহার অধিকক্ষণ পড়াইবার আবশ্যক হয় না।"—ছেলে বুদ্ধিমান ও স্মৃতিধর, একথা শুনিয়া ছেলের বাপের আনন্দ ধরিত না। পণ্ডিত মহাশয় রাত্রে যেখানে 'টিউসনি' করিতে যাইতেন, সে বাড়ী তাঁহার বাড়ী হইতে কিছু দূরে। সন্ধ্যার পর আহারাদি শেষ করিয়া তিনি একহস্তে লণ্ঠন এবং

অন্য হস্তে একগাছা বাঁশের মোটা লাঠি লইয়া ছাত্রকে বিদ্যাদান করিতে যাইতেন। তাঁহার এই লণ্ঠনটি পৈত্রিক সম্পত্তি। তাহার একদিকের কাচ বহুপূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; একখণ্ড কাগজ আটা দিয়া জুড়িয়া তাহার স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছিল; অন্য তিন দিকে কাচ ছিল বটে, কিন্তু লণ্ঠনের ভিতরে যে কেরোসিনের 'টিমি' জ্বলিত, তাহার ধূমে সেই কাচ তিনখানির স্বচ্ছতা বিলুপ্ত হইয়াছিল; দেখিয়া মনে হইত, পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে একটি সচল ধূম্র-পেটিকা দোদুল্যমান রহিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয়ের কাঁধে একখানি চাদর; কতকাল যে সে রজকালয় সন্দর্শন করে নাই, তাহা নিরূপণ করা কঠিন; সাদা ক্যাম্বিসের জুতা জোড়াটির গোড়ালি ক্ষয়প্রাপ্ত, এবং তাহার চারিদিকে চামড়ার এত তালি দেওয়া যে, ক্যাম্বিসের জুতায় চামড়ার তালি, কি চামড়ার জুতায় ক্যাম্বিসের তালি, তাহা নির্ণয় করা আরও কঠিন। যাহা হউক, পণ্ডিত মহাশয় ছাত্র-ভবনে উপস্থিত হইয়া এক ঘটি জলে প্রথমে ধূলি-ধূসরিত পদদ্বয় প্রক্ষালন করিতেন; তাহার পর জোড়া চৌকীর উপর প্রসারিত মলিন সতরঞ্চিতে বসিয়া ছাত্রের অধ্যাপনা-কার্য্যে এমন মনঃসংযোগ করিতেন যে, দশ পনের মিনিটের মধ্যেই তাঁহার নয়ন-পল্লব মুদিত হইত, এবং তাঁহার কদম্ব-কেশরের ন্যায় কেশ-কণ্টকিত মস্তকটি তাঁহার অজ্ঞাতসারে ধীরে-ধীরে বক্ষের উপর ঝুঁকিয়া পড়িত। ইত্যবসরে তাঁহার মেধাবী ছাত্র শ্লেটে অঙ্ক কষিতে-কষিতে একটি উৎকট মানুষ বা বনমানুষের চেহারা আঁকিয়া তাহার নীচে লিখিত 'গদাই পণ্ডিত।'

নিদ্রায় গদাই পণ্ডিত 'সিদ্ধনেত্র'; বেগার দেওয়ার সময় আসিলেই তাঁহার যুগল নয়ন-কূপে নিদ্রা-দেবীর আবির্ভাব হয়। রাত্রে ছেলে পড়াইতে গিয়া একবার তাঁহাকে 'বেগার' দিতে হয়। দিবাভাগে স্কুলেও তিনি 'বেগার' দেন। তিনি বলেন, "এখন আমার পেন্সনের সময় হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের ঘরে মুহুরীগিরি করিলে এতদিন দশ টাকা পেন্সন হইত।" বেসরকারী স্কুলের চাকরীতে ত পেন্সন নাই, সুতরাং তিনি পান চিবাইতে-চিবাইতে বেলা এগারটার সময় স্কুলে আসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন। তাহার পর এক ক্লাসে এক ঘণ্টা কাটাইয়া অন্য ক্লাসে গিয়া পুনর্ব্বার নিদ্রার আয়োজন করিয়া লন। চারি ঘণ্টা কাজ করিয়া এক ঘণ্টা বিশ্রাম। বিশ্রামের ঘণ্টায় তিনি লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া নিম্ন শ্রেণীর কোনও মাষ্টারকে পাইলে তাঁহার সহিত গল্পে প্রবৃত্ত হন; সে গল্পে বিশ্ব-সংসারের সকল বিষয়েরই আলোচনা থাকে; মিউনি-সিপালিটীর ট্যাক্স বৃদ্ধি, মৎস্য ও দুগ্ধের দুর্ম্মূল্যতা, আকাশে বৃষ্টির অভাব, সেক্রেটারীর পুত্রের অন্নপ্রাশনে কাঁচাগোল্লায় চিনির অল্পতা, এবং তাঁহার জামাতার লোহার সিন্দুকে টাকার পরিমাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে-করিতে ঘণ্টা কাটিয়া যায়।

অপরাহ্নে পণ্ডিত মহাশয় 'বিষয়-কর্ম্মে'র সন্ধানে বাহির হন। কাহার বাগানে কলা বা বেল পাকিয়াছে, কাহার বাড়ী কপি ও কড়াইশুঁটী হইয়াছে, কোন্ গৃহস্থের চালে চাল-কুমড়ো বেশী ফলিয়াছে, কাহার বাড়ী ভাল কাঁঠাল আছে, ইত্যাদি সন্ধান লইতেই তাঁহার অপরাহ্ন কাটিয়া যায়। গোবিন্দপুরের অধিকাংশ গৃহস্থের ছেলে স্কুলের ছাত্র, সুতরাং কলা, বেল, কুমড়া, কাঁঠাল, প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে গদাই পণ্ডিতের কোনও অসুবিধা হয় না। ছেলেরা ঘাড়ে বহিয়া তাঁহার বাড়ী জিনিস দিয়া আসে। এমন কি, ধান কিম্বা রবিশস্যাদি পাকিলে দূরবর্ত্তী পল্লীর যে সকল চাষী গৃহস্থের পুত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহা-দিগকে আদেশ করেন, "তোর বাবাকে বলিস্ আমাকে যেন দু কাঠা ধান দেয়।" কাহাকেও বলেন, "এবার গমের যোগাড় হয় নি, তোর বাবা যেন এক কাঠা গম পাঠাইয়া দেয়।" পল্লীগ্রামের চাষী গৃহস্থেরা পণ্ডিত মহাশয়কে তাহাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন দুই এক কাঠা শস্য দিয়া তাহার দাম চাহিবে, এরূপ অনুদারতা তাহাদের মনেও স্থান পায় না, সুতরাং পণ্ডিত মহাশয়ের পণ্ডিতি করিয়াও বেশ 'উপরি' লাভ হইয়া থাকে।

গদাই পণ্ডিত অন্যরূপেও উপরি উপার্জ্জন করেন। বৎসরের শেষে যখন ক্লাসের 'প্রমোশন' হয়, সেই সময় তিনি কলিকাতার পুস্তক-বিক্রেতাগণের নিকট হইতে ছেলেদের পুস্তক আনাইয়া দিবার ভার লইয়া থাকেন। এমন কি, কোন-কোন বৎসর তিনি যাট-সত্তর টাকার পুস্তক আনাইবারও 'অর্ডার' পান। ডাকে পুস্তক আনাইতে অনেক মাশুল পড়ে; এই জন্য তিনি দুই এক দিনের 'ক্যাজুয়াল্ লিভ' লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করেন।

গোবিন্দপুর হইতে রেলের ষ্টেশন সাত ক্রোশ দূরে। পণ্ডিত মহাশয় প্রত্যূষে উঠিয়া ষ্টেশনে যাত্রা করেন, গোবিন্দপুরের অতি অল্প লোকই তাঁহার মত ভ্রমণ-নিপুণ; তিন ঘণ্টায় এই সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক নটার ট্রেণে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া কুমারটুলিতে রামরতন সাহার গদীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গদীর গদিয়ান ফেলারাম বাবু গদাই পণ্ডিতের ভায়রা-ভাইয়ের দাদা। কুটুম্ব আসিয়াছেন বলিয়া ফেলারাম যথাসাধ্য আদর-যত্নে তাঁহার আতিথ্য-ভার গ্রহণ করেন। পণ্ডিত মহাশয় কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে পদব্রজে প্রথমে পুরাতন চীনাবাজারে, তাহার পর ঘুরিতে-ঘুরিতে কলেজ ষ্ট্রীটে উপস্থিত হন, এবং দুই পয়সা যেখানে সস্তা পান, সেই দোকান হইতে পুস্তক ক্রয় করেন। কলিকাতার কাজ সারিয়া পণ্ডিত মহাশয় দুই দিনেই বাড়ী ফিরিয়া আসেন; পুস্তকের বোঁঝা পথ-চল্‌তি কোনও গাড়ীতে চাপাইয়া দেন। পল্লীগ্রামের গাড়ী, গাড়োয়ান একটা ছোট-খাট মোট আনিতে ভাড়ার দাবি করে না। তখন পণ্ডিত মহাশয় প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ও ডাক-মাশুল খতাইয়া দেখিতে পান, তাঁহার পাঁচ ছয় টাকা লাভ হইয়াছে।

গদাই পণ্ডিত এই প্রকার অপ্রতিহত প্রতাপে গোবিন্দপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল পণ্ডিতি করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু সংপ্রতি তাঁহার কিঞ্চিৎ বিপদ উপস্থিত; বোধ হয় পূর্ব্বের প্রতিপত্তি আর থাকে না। এই বিদ্যালয়ে পূর্ব্বে যিনি হেড্ মাষ্টার ছিলেন, তিনি মহাজনী করিতেন। পাওনাদারের নিকট তাগাদা করিতে হইবে, সুদের হিসাব করিতে হইবে, কিস্তীবন্দী করিতে হইবে, সে সকল কাজের ভারই গদাই পণ্ডিতের উপর অর্পিত ছিল; এমন কি, কোনও দূরবর্ত্তী গ্রামে হেড্‌মাষ্টারের কোনও খাতকের বিরুদ্ধে সমন জারি করিতে হইলে গদাই পণ্ডিতই 'নিশানদার' হইয়া প্রতিবাদীকে সনাক্ত করিতে যাইতেন; মামলার তদ্বির করিতেন; এবং আবশ্যক হইলে আদালতে গিয়া হলফ্ করিয়া প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া আসিতেন। বস্তুতঃ, গদাই পণ্ডিত সকল কার্য্যেই হেড্ মাষ্টারের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন; সুতরাং তিনি ছুটি চাহিলেই হেড্ মাষ্টারের অনুগ্রহে পূর্ণ বেতনে ছুটী পাইতেন; হেড্ মাষ্টার তাঁহার সকল আবদার বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিতেন; এবং কেহ গদাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে, হেড্‌মাষ্টার সে সকল অভিযোগে কর্ণপাতও করিতেন না। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে সেই হেড্‌মাষ্টার কোনও কারণে চাকরী ত্যাগ করিলে একজন নবীন যুবক গোবিন্দপুরে হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। গদাই পণ্ডিত পূর্ব্ব প্রতিপত্তি নাশের শঙ্কায় ম্রিয়মান হইলেন বটে, কিন্তু হাল ছাড়িলেন না। তিনি স্থির করিলেন, যেমন করিয়াই হউক নূতন হেড্‌মাষ্টারের মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

গদাই পণ্ডিতের আশ্বস্ত হইবারও যথেষ্ট কারণ ছিল। এই নূতন হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের সহিত গদাই পণ্ডিতের একটু সম্বন্ধ ছিল। হেড্ মাষ্টার মহাশয় গদাই পণ্ডিতের মাতামহের মাতুলের বৈবাহিক-পুত্র। এই সম্বন্ধের খাতিরে গদাই পণ্ডিত হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে লাগিলেন; হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের শিশু পুত্রকে কোনদিন একটি বাঁশি, কোনও দিন বা একটি পুতুল কিনিয়া দিয়া, এবং তাহাকে কোলে-পিঠে লইয়া আদর করিয়া হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে দ্রব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের আশায় গদাই পণ্ডিত প্রতি মাসে পূর্ণিমার রাত্রে বাড়ীতে 'সত্য-নারায়ণের' পূজা করিতেন। গদাই পণ্ডিতের সহিত যাহাদের আনুগত্য আছে, তাহারাই এই উপলক্ষ্যে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রিত হইত। হেড্‌মাষ্টার প্রতি পূর্ণিমায় গদাই পণ্ডিতের গৃহে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে যাইতেন, গদাই পণ্ডিত নানা উপচারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। পূজায় দেবতা খুসী হন, মানুষ ত দূরের কথা। হেড্‌মাষ্টার গদাই পণ্ডিতের কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইলেন; কেহ পণ্ডিতের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করিলে তিনি সাধারণতঃ তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। গদাই পণ্ডিত বুঝিলেন, ভবিষ্যতে নূতন হেড্ মাষ্টার হইতে তাঁহার কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। তিনি পূর্ব্বে যে ভাবে ফাঁকি দিয়া চাকরী বজায় রাখিয়া আসিয়াছেন, এখনও সেই ভাবেই কাজ চলিবে।

কিন্তু হেড্‌মাষ্টার মহাশয় কাজে খুব দৃঢ়; স্বীয় সুনাম ও বিদ্যালয়ের উন্নতির প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। স্কুলের কোনও শিক্ষকের কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটী হইলে তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন

না, তিরস্কারের মাত্রা সময়ে সময়ে সীমা অতিক্রম করিত। কিছু দিনের মধ্যেই হেড্ মাষ্টার বুঝিতে পারিলেন, গদাই পণ্ডিতই 'পালের গোদা'। তিনি ক্লাশে প্রায় কোনও কাজই করেন না, স্কুলের পাঁচ ঘণ্টাই ফাঁকি দিবার চেষ্টা করেন। হেড্ মাষ্টার একদিন তাঁহাকে বন্ধু ভাবে উপদেশ দিলেন, ভবিষ্যতে তিনি যেন সাবধান হন; ছাত্রগণকে শিক্ষা-দান না করিয়া ক্রমাগত ফাঁকি দান করিলে ছেলেদের কিছুই হইবে না, তাঁহারও চাকরী বজায় রাখা কঠিন হইবে। তাঁহার দ্বারা তাঁহার কোনও আত্মীয়ের অনিষ্ট হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে।

কিন্তু ইহার ফল বিপরীত হইল। গদাই পণ্ডিত সেই দিনই বুঝিয়া ফেলিলেন, এমন ক্ষমতাপ্রিয়, দাম্ভিক, দুষ্ট হেড্ মাষ্টার গোবিন্দপুর স্কুলে আর কখনও আসে নাই। এতদিন গদাই পণ্ডিতের মুখে হেড্মাষ্টারের প্রশংসা ধরিত না, হঠাৎ তিনি অত্যন্ত বদ্ লোক হইলেন। কিন্তু গদাই পণ্ডিতের এই মত-পরিবর্ত্তনে কেহ বিস্মিত হইল না; কারণ সকলেই জানিত, যাহার নিকট গদাই পণ্ডিতের স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল, সে-ই অত্যন্ত ভাল লোক; যিনি তাঁহার স্বার্থে আঘাত করিতেন, কোনও ক্রিয়া-কর্ম্মে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন না, বা তাঁহার বুদ্ধি পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না, তিনি অত্যন্ত বদ্ লোক। আবার কেহ পুত্র-কন্যার অন্নপ্রাশনে বা বিবাহে, পিতা-মাতার শ্রাদ্ধে গদাই পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলে পূর্ব্বে তিনি যতই বদ্ লোক থাকুন, গদাই পণ্ডিত উচ্চকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করেন। হেড্ মাষ্টার গদাই পণ্ডিতের কাজকর্ম্মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন, বেলা বারটার সময় একজন মেছুনী মাছের শূন্য ঝুড়ি কক্ষে লইয়া স্কুলের চারিদিকে ঘুরিতেছে ও স্কুলের জানালা দিয়া উৎসুক নেত্রে ভিতরের দিকে চাহিতেছে, আর আপন মনে বিড়্বিড়্ করিয়া বকিতেছে। মৎস্যনারীর এই ভাব দেখিয়া হেড্-মাষ্টার মহাশয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বাছা এখানে কাহাকে খুঁজিতেছ?"

মেছুনী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমি গদাই পণ্ডিতকে খুঁজ্‌তে এসেছি মশায়! আজ বিশ দিন সে আমার কাছে দু'আনার কৈ মাছ নিয়েছে, কোন রকমে যদি পয়সা কটা বের ক'রতে পারলাম! পয়সা দিতে পারবিনে ত মাছ খাবার এত আস্বা কেন? আমি মশায় গরীব মানুষ, এতদিন পয়সা ফেলে রাখ্‌লে কি আমার চলে?"

হেড্মাষ্টার বলিলেন, "তা তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাগাদা না করে ইস্কুলে এসেছ কেন? এখানে কি তিনি তোমার জন্যে পয়সা বেঁধে এসেছেন?"

মেছুনী বলিল, "মশায় দুঃখের কথা বল্‌বো কি! পণ্ডিত খালি পালিয়ে বেড়ায়, বাড়ীতে তাগাদা করতে গেলে ঘরের কোণে গিয়ে লুকোয়। পথে-ঘাটে আমাকে দেখ্‌লে আর ঝেড়ে দৌড় মারে! তা আজ তাকে রাস্তায় ধরেছিলাম, তার কাপড়ের মুড়ো চেপে ধরে বললাম, 'অলপ্পেয়ে মিন্‌সে, আগে পয়সা ফেল, তবে তোর কাপড় ছেড়ে দেব।' পণ্ডিত বল্লে, 'দুপোর বেলা ইস্কুলে যাস্, তোর পয়সা কটা দেব।'—তাই মশায়, এসেছি।"

হেড্ মাষ্টার স্কুলের ভৃত্য নিধিরামকে দিয়া গদাই পণ্ডিতকে বাহিরে ডাকাইলেন, পণ্ডিত বাহিরে আসিতেই মেছুনী যে ভাষায় তাঁহার সম্ভাষণ আরম্ভ করিল,—মেছো-হাটা ভিন্ন অন্য কোথাও তাহা শুনিতে পাওয়া যায় না। গোলমাল শুনিয়া স্কুলের অনেক শিক্ষক বাহিরে আসিলেন, ছাত্রেরাও কেহ-কেহ দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিত বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে সহযোগী শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সমক্ষে এইভাবে লাঞ্ছিত হইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; সক্রোধে গর্জ্জন করিলেন, "বেটী ছোটলোক, ইস্কুলে আসিস্ পয়সার তাগাদা করতে? আবার গালাগালি! জুতো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবু। চিনিস্‌নে বুঝি আমাকে?" মেছুনী এবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল; সে মৎস্যের ঝোড়া মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া একেবারে গদাই পণ্ডিতের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "মার্ দেখি, এই ত কাছে এসেছি, জুতো মার!—উঃ, ঢের-ঢের জুতো দেখেছি, মাছ খেয়ে পয়সা দেবার 'মুরোদ' নেই, পয়সা চাইলে আবার জুতো মারতে আসেন! কর ত বাবাসকল, তোমরাই 'বিচের' কর। এবার যেদিন বাজারের মধ্যে দেখ্‌তে পাব,—মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে পিণ্ডিখিদ্দি ঘুরিয়ে দেব।" হেড্মাষ্টার ও অন্যান্য শিক্ষকেরা মধ্যে পড়িয়া মেছুনীকে বিদায় না করিলে মুখোমুখীর পরিণাম কি হইত বলা যায় না। মেছুনী প্রস্থান করিলে হেড্ মাষ্টার

গদাই পণ্ডিতকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিলেন। ইহাতে গদাই পণ্ডিতের আত্মসম্মানে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। গদাই পণ্ডিত-মেছুনীর তিরস্কার পরিপাক করিয়াছিলেন, কিন্তু হেড্ মাষ্টার যে অন্যান্য শিক্ষকের সমক্ষে তাঁহাকে অপদস্থ করিলেন, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না; তিনি ক্লাশে গিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই ব্যাপারের কিছু দিন পরে হেড্ মাষ্টারের বিরুদ্ধ-পক্ষের কতকগুলি লোক চক্রান্ত করিল, হেড্ মাষ্টারের বেতনে তাহাতে অনায়াসে একজন এম্, এ, উপাধিধারী হেড্ মাষ্টার পাওয়া যাইতে পারে; হেড্ মাষ্টার নানা কারণে শিক্ষকগণের নিকট অত্যন্ত unpopular হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁহার দোষে বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্য্যেরও অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিতেছে। কিন্তু 'স্কুল-কমিটি' এই চক্রান্তের সমর্থন করিতে সম্মত হইলেন না। হেড্ মাষ্টার পরে জানিতে পারিলেন, গদাই পণ্ডিতই এই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোগী। তিনি এতদিন পর্য্যন্ত যাহার সকল দোষ ঢাকিয়া লইয়া চাকরীতে বাহাল রাখিয়াছেন, সেই কৃতঘ্ন নরাধম তাঁহারই চাকরী নষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

হেড্ মাষ্টারকে জব্দ করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া, গদাই পণ্ডিত এখন তাঁহাকে সমাজে 'এক ঘরে' করিবার চেষ্টা করিতেছেন। গদাই পণ্ডিত সমাজের চাঁই মহাশয়দের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বলিয়া বেড়াইতেছেন, হেড্ মাষ্টার কলিকাতায় গিয়া মুসলমানের হোটেলে খানা খাইয়া আসিয়াছেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন; এবং তামা-তুলসী-গঙ্গাজল হাতে লইয়া তাঁহার উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে শপথ করিতেও প্রস্তুত আছেন। গদাই পণ্ডিতের মাসতুতো ভাই নটবর মজুমদার পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। অগত্যা হেড্ মাষ্টার মহাশয় তাঁহার পরমাত্মীয় গদাই পণ্ডিতের বাড়ী প্রতি পূর্ণিমায় 'সত্য নারায়ণের প্রসাদে' বঞ্চিত হইয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছেন।

Uttarpara Jaikrishna Public Library

সাহিত্য-সংবাদ

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত নূতন নাটক 'চিতোরোদ্ধার' ছাপা হইয়াছে; মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সুবৃহৎ উপন্যাস 'স্পর্শমণি' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'পরিব্রাজকের ভ্রমণ-কাহিনী' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৸৹ আনা।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত 'কিসমৎ' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ।৹ আনা।

হিতবাদী পত্রে মধ্যে মধ্যে যে 'বৃদ্ধের বচন' প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহারই কতকগুলি পুস্তকাকারে ছাপা হইতেছে; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'সিঁদুর চুপড়ী' গল্পের বই প্রকাশিত হইয়াছে; কাপড়ে বাঁধানো মূল্য ৷৷৹ আনা। 'আলেয়ার আলো' সামাজিক উপন্যাস, কাপড়ে বাঁধানো; মূল্য ১৷৵৹।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত 'তোড়া' মুখার্জ্জি বোস কোং'র আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালাভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মুখার্জ্জি বোস এণ্ড কোম্পানির আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার ৩য় ও ৪র্থ গ্রন্থ শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত 'মণিহারা' ও শ্রীফনীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত 'অকৃতজ্ঞ' প্রকাশিত হইল।

মল্লিদার সম্পাদিত 'রহস্য পিরামিড' সিরিজের প্রথম গ্রন্থ 'মৃত্যু-যবনিকা' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ১৷৹, কাগজের মলাট ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 'শমন সহচরী' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৸৹।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পালের 'গৃহ-বিচ্ছেদ' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২৲।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত সুবৃহৎ উপন্যাস 'রামগড়' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২৲।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea, of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons, 201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath, The Emerald Printing Works, 9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.